৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত

ভারতবর্ষ

সচিত্র মাসিকপত্র

একাদশ বর্ষ প্রথম খণ্ড

আষাঢ়—অগ্রহায়ণ

১৩৩০

সম্পাদক—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

প্রকাশক—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভারতবর্ষ

সূচীপত্র

একাদশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড · আষাঢ়—অগ্রহায়ণ, ১৩৩০

বিষয়ানুসারে বর্ণানুক্রমিক

চিত্র-সূচি

আষাঢ়—১৩৩০

বহুবর্ণ চিত্র

শ্রাবণ—১৩৩০

বহুবর্ণ চিত্র

ভাদ্র—১৩৩০

বহুবর্ণ চিত্র

১। ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর ২। বংশীধারী
৩। বনের পাখী ৪। খাঁচার পাখী

আশ্বিন— ১৩৩০

অগ্রহায়ণ—১৩৩০

বহুবর্ণ চিত্র

চৈতন্যদেব ও সার্ব্বভৌম

অশ্রু কম্প-স্বেদ-পুলক-ভরে থর থরি।
নাচে গায় কান্দে পড়ে প্রভু পদ ধরি॥ চৈতন্যচরিতামৃত

শিল্পী—শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়
শিল্পাচার্য্য—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতীয় কলাশালা

BHARATVARSHA

কার্ত্তিক, ১৩৩০

প্রথম খণ্ড | একাদশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

দেবী স্তোত্র

দেবি ! প্রপন্নার্ত্তিহরে ! প্রসীদ, প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য ।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি ! পাহি বিশ্বং, ত্বমীশ্বরী দেবি ! চরাচরস্য ॥
আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা, মহীস্বরূপেণ যত স্থিতাঽসি ।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতদাপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে ! ॥
ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা, বিশ্বস্য বীজং পরমাঽসি মায়া ।
সম্মোহিতং দেবি ! সমস্তমেতৎ, ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ ॥
বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ! ভেদাঃ, স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু ।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ, কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাঽপরোক্তিঃ ॥

সর্ব্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী । ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ ॥
সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে । স্বর্গাঽপবর্গদে দেবি নারায়ণি ! নমোঽস্তু তে ॥
কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি ! বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে ! শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি ! নমোঽস্তু তে ॥
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি ! গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি ! নমোঽস্তু তে ॥
শরণাগতদীনার্ত্ত পরিত্রাণপরায়ণে ! সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি ! নমোঽস্তু তে ॥

ক্ষীরচোরা গোপীনাথ

শ্রীবসন্তকুমার চাট্টোপাধ্যায় এম-এ

যস্মৈদাতুং চোরয়ন্ ক্ষীরভাণ্ডং
গোপীনাথঃ ক্ষীরচোরাভিধোঽভূৎ।
শ্রীগোপালঃ প্রাদুরাসীদ্বশঃ সন্
যৎ প্রেম্ণা তং মাধবেন্দ্রং নতোঽস্মি ॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ॥

"যাঁহাকে অর্পণ করিবার জন্য ক্ষীরপাত্র অপহরণ করিয়া গোপীনাথ "ক্ষীরচোরা" নামে অভিহিত হইয়াছেন, যাঁহার প্রেমে বশীভূত হইয়া শ্রীগোপাল (গোবর্দ্ধনে) আবির্ভূত হইয়াছিলে, আমি সেই মাধবেন্দ্রপুরীকে নমস্কার করি।"

"পূর্ব্বে মাধবপুরীর লাগি ক্ষীর কৈল চুরি।
অতএব নাম হৈল ক্ষীরচোরা হরি॥"
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ॥

বালেশ্বর হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে রেমুণা নামক গ্রাম আছে। এই গ্রামে ক্ষীরচোরা গোপীনাথের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দিরেও ক্ষীরচোরা গোপীনাথের বিগ্রহ আছে; তাহার মূল বিগ্রহ রেমুণাতে। রেমুণা এবং ক্ষীরচোরা গোপীনাথ বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ।

শ্রীচৈতন্যদেব গয়াতে ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরপুরীর গুরুর নাম মাধবেন্দ্রপুরী অতএব মাধবেন্দ্রপুরী চৈতন্যদেবের গুরুর গুরু—অর্থাৎ পরমগুরু। মাধবেন্দ্রপুরীর অপর নাম পুরী গোসাঞি। মাধবেন্দ্রপুরী বৃন্দাবনে স্বপ্নাদেশ পাইয়া জঙ্গলের মধ্যে একটি গোপালমূর্ত্তি পাইয়াছিলেন। ঐ মূর্ত্তি লইয়া তিনি বৃন্দাবনে মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং বিগ্রহের সেবা করিতেন। মাধবেন্দ্রপুরী একবার পুরী যাইবার পথে রেমুণাতে গোপীনাথের বিগ্রহ দেখিয়াছিলেন। তখন বার ভাণ্ড ক্ষীর দিয়া গোপীনাথের ভোগ দেওয়া হইতেছিল। পুরী গোসঞি পূর্ব্বে জানিয়াছিলেন যে রেমুণার ক্ষীর বিখ্যাত।* পুরী গোসাঞির মনে হইল তিনি যদি একভাণ্ড ক্ষীর পান, তাহা হইলে ক্ষীর খাইয়া দেখেন এবং কি প্রকারে ঐ ক্ষীর প্রস্তুত হয় তাহাও বুঝিতে পারেন। তাহা হইলে তিনি ঐ প্রকারে ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া বৃন্দাবনে তাঁহার গোপালের ভোগ দিতে পারেন। পুরী গোসাঞি অযাচক সাধু ছিলেন; কখনও কাহারও নিকট ভিক্ষা করিতেন না। তাঁহার মনে ক্ষীরের প্রতি লোভ হওয়াতে তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া মন্দিরের অনতিদূরে দোকানের হাটে বসিয়া মালা জপিতে লাগিলেন।

রাত্রে গোপীনাথ স্বপ্নে পূজারিকে দেখা দিয়া বলিলেন, "দেখ, এক ভাণ্ড ক্ষীর আমার ধড়ার অঞ্চল দিয়া ঢাকিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছি, তোমরা দেখিতে পাও নাই। ঐ ক্ষীরভাণ্ড লইয়া যাও। হাটে মাধবেন্দ্রপুরী নামক সাধু আছেন; তাঁহাকে ঐ ক্ষীর দাও।" পূজারি উঠিয়া দেখিল বাস্তবিক এক ভাণ্ড ক্ষীর ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা রহিয়াছে। সে আশ্চর্য্য হইয়া ঐ ক্ষীর লইয়া হাটে মাধবেন্দ্রপুরীর সন্ধান লইয়া তাঁহাকে দিল এবং স্বপ্নের বিবরণ বলিল। "কাহার নাম মাধবেন্দ্রপুরী, সে এই ক্ষীর লও। গোপীনাথ তাহার জন্য এই ক্ষীরভাণ্ড চুরি করিয়া রাখিয়াছিলেন।"

"ক্ষীর লহ এই যার নাম মাধবপুরী।
তোমার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি॥"
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

গোপীনাথের এত দয়া দেখিয়া মাধবেন্দ্রপুরী অভিভূত হইলেন। তিনি নিঃশেষে ক্ষীর পান করিয়া ভাণ্ডটি ভাঙ্গিয়া সঙ্গে রাখিলেন এবং প্রত্যহ একটি করিয়া খণ্ড খাইতেন।

মাধবেন্দ্রপুরী রেমুণাতে দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন।

---

* গোপীনাথের ক্ষীর করি প্রসিদ্ধ নাম যার।
পৃথিবীতে ঐছে ভোগ কাছে নাহি আর॥ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

তাঁহার সমাধি ও পাদুকা অদ্যাপি সেখানে পূজিত হয়। সেখানে একটি টোল স্থাপিত হইয়াছিল। শুনিলাম ছাত্রের অভাবে টোলটি উঠিয়া গিয়াছে।

গোপীনাথের মন্দিরটি প্রাচীন। সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। মন্দিরটি সাধারণ বাসগৃহের আকারের; ছাদের নিকট প্রস্তরময় মূর্ত্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। মন্দিরমধ্যে তিনটি কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত কৃষ্ণমূর্ত্তি। মূর্ত্তিগুলি ক্ষুদ্র। মধ্যের মূর্ত্তিটি গোপীনাথের। দুই পার্শ্বে মদনমোহন এবং বংশীধরের মূর্ত্তি। মূর্ত্তি সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, শ্রীরামচন্দ্র বনবাসকালে চিত্রকূট পাহাড়ে প্রস্তরের উপর ধনুর শাণিত অগ্রভাগ দিয়া তাঁহার দ্বাপরযুগের ভাবী মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া সীতাদেবীকে দেখাইয়াছিলেন। পুরীর রাজা লাঙ্গুলা নৃসিংহদেব ৭।৮ শত বৎসর পূর্ব্বে সেই মূর্ত্তি চিত্রকূট পর্ব্বত হইতে এখানে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।* রেমুণা রমণীয় অর্থাৎ মনোহর শব্দের অপভ্রংশ। কথিত আছে, লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে সীতাদেবীর স্ত্রীজন-সুলভ শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন শ্রীরামচন্দ্র এখানে চারি দিবস অপেক্ষা করিয়াছিলেন। চতুর্থ দিবসে সীতাদেবীর স্নানের জন্য সাতটি শর নিক্ষেপ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র এখানে একটি স্রোত সৃষ্টি করেন। নদীর নাম সপ্তশরা। একটা অতিশয় সঙ্কীর্ণ স্রোতকে সেই প্রাচীন নদী বলিয়া লোকে আজকাল দেখাইয়া থাকে। নিকটে একটি কুণ্ডের তীরে গর্গেশ্বর নামক প্রাচীন শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরটি অল্পদিন হইল সংস্কার করা হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন রেমুণাতে একটি প্রাচীন গ্রাম্যদেবী আছেন, তাঁহার নাম রামচণ্ডী। প্রবাদ এই যে শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবী এই মূর্ত্তি পূজা করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেব পুরী যাইবার সময় রেমুনায় গোপীনাথজি দর্শন করিয়াছিলেন।

"রেমুনাতে গোপীনাথ পরম মোহন।
ভক্তি করি কৈল প্রভু তাঁর দরশন॥
তাঁর পাদপদ্ম নিকট প্রণাম করিতে।
তাঁর পুষ্পচূড়া পড়িল প্রভুর মাথাতে॥
চূড়া পাঞা প্রভু মনে আনন্দিত হৈঞা।
বহু নৃত্য গীত কৈল ভক্তগণ লৈঞা॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

মাধবেন্দ্রপুরী জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে যে শ্লোক পড়িতে-পড়িতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, চৈতন্যদেব সেই শ্লোক আবৃত্তি করিয়া মন্দিরমধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। শ্লোকটি এই,

অয়ি দীনদয়াদ্র্রনাথ হে,
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদালোককাতরং
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহং॥

ইহা রাধাঠাকুরাণীর উক্তি; ঠাকুরাণীর কৃপায় মাধবেন্দ্র পুরীর হৃদয়ে স্ফুরিত হইয়াছিল। শ্লোকের অর্থ, হে দীন-দয়ার্দ্রনাথ, হে মথুরাপতি, তুমি কখন আমাকে দর্শন দিবে? হে দয়িত, তোমাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আমার হৃদয় অতিশয় কাতর হইয়াছে এবং ঘূর্ণিত হইতেছে। আমি কি করি?

"এই শ্লোক পড়িতে প্রভু মূর্চ্ছিত হইলা।
প্রেমেতে বিবশ হঞা ভূমিতে পড়িলা॥
* * *
অয়ি দীন অয়ি দীন প্রভু বলে বারবার।
কণ্ঠে না উচ্চরে বাণী নেত্রে অশ্রুধার॥"

রেমুণা একটি বড় গ্রাম গ্রামের নিকটে প্রাচীন দীঘি আছে। অদূরে পাহাড়ের শ্রেণী দেখা যায়। পাহাড়ের নাম নীলগিরি। তাহার পরেই উড়িষ্যার করদরাজ্য কেওঞ্জর প্রভৃতি।

বাণেশ্বর শব্দ বালেশ্বর শব্দের অপভ্রংশ। এখানে দ্বাপর যুগে নাকি বাণাসুর রাজত্ব করিত। বাণাসুর চারিটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন—বাণেশ্বর, গর্গেশ্বর, ঝাড়েশ্বর ও মণিনাগেশ্বর। গর্গেশ্বর রেমুণাতে। ঝাড়েশ্বর বালেশ্বর সহরে। বাণেশ্বর ও মণিনাগেশ্বরবালেশ্বর হইতে ৩।৪ ক্রোশ দূরে বিভিন্ন দিকে অবস্থিত। বাণাসুর প্রত্যহ

* রেমুণার মূর্ত্তি সম্বন্ধে আর একটি প্রবাদ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত উদ্ধব বারাণসীতে এই মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া পূজা করিয়াছিলেন; পরে বারাণসী হইতে মূর্ত্তিটি এখানে আনীত হয়।

বারাণস্যামুদ্ধবেন স্থাপিতঃ পূজিতঃ পুরা।
ব্রাহ্মণানুগ্রহার্থায় তত্র গত্ব স্থিতো হরিঃ॥ মুরারি।

এ সম্বন্ধে বিচারপতি ৺সারদাচরণ মিত্র প্রণীত "উৎকলে শ্রীচৈতন্য" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

এই চারিটি শিবলিঙ্গ পূজা করিতেন। বাণাসুরের কন্যার নাম উষা। কৃষ্ণের পুত্র অনুবাধা উষাকে হরণ করিয়াছিলেন। উষামেড় নামক স্থানে উষার প্রাসাদ ছিল বলিয়া লোকে এখনও দেখাইয়া থাকে।

বালেশ্বর হইতে সমুদ্রতীর চারিক্রোশ দূরে। পথে Orissa coast canal পার হইতে হয়; canalএর উপর সেতু আছে। সমুদ্রতীরে একটা সরকারি আফিস আছে, নাম Proof office। এখানে কামানের গোলা পরীক্ষা করা হয় সমুদ্রতীরে আফিস এবং কয়েকটি কর্ম্মচারীর বাড়ী। নিকটে অনেকগুলি বালির ঢিপি আছে, সেগুলি দেখিয়া কপালকুণ্ডলার বালিয়াড়ির কথা মনে হইল। এখানে সমুদ্রতটে বেশী বালি নাই। তটভূমি দৃঢ়, সমুদ্র অগভীর; একক্রোশ চলিয়া গেলেও নাকি বেশী জল পাওয়া যায় না। একটি বালিয়াড়ির উপর একটি ডাকবাঙ্গালা আছে; আমরা তাহার বারাণ্ডায় বসিয়া সমুদ্রের শোভা দেখিতে লাগিলাম। পশ্চাতে বহুদূর পর্য্যন্ত ভূমি দেখা যাইতেছিল। তখন সূর্য্যদেব দিগ্বলয় হইতে বহু উর্দ্ধে ছিলেন, কিন্তু সৌররশ্মি অতি মৃদু ও অতি ম্লান বোধ হইল। সম্ভবতঃ আর্দ্র বায়ুর উৎক্ষেপক ও তিরোধানকারী গুণে এইরূপ প্রতীতি হইতেছিল (Diffraction and absorption of rays)।

সমুদ্রের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! একদণ্ড সমুদ্রের তীরে বসিলে মন জুড়াইয়া যায়। এই দিগন্ত-বিস্তৃত বিশাল সমুদ্রের তুলনায় মানব কি ক্ষুদ্র; মানবের সুখদুঃখ, যে সকল চিন্তা অহরহঃ তাহার মনকে পর্য্যাকুল করে—এই বিশাল জগৎব্যাপারের নিকট তাহারা কি নগণ্য, এই ভাব স্বভাবতঃই মনে উদয় হয়। সমুদ্রের কল্লোলধ্বনি আমাদের চিত্তকে নিমজ্জিত করিয়া শান্ত ও স্থির করিয়া রাখে। তাহার উপর হৃদয়স্নিগ্ধকারী সমুদ্রবায়ু সর্ব্বশরীর জুড়াইয়া দেয়। যুগপৎ চক্ষু কর্ণ ও স্পর্শ এই তিনটি ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া সমুদ্রের প্রভাব বিস্তৃত হয় বলিয়া আমাদের হৃদয় এত শীঘ্র অভিভূত হয়। আমরা এরূপ একটা অস্তিত্বের সান্নিধ্য উপলব্ধি করি যাহার বিস্তার অনন্ত, যাহার অন্তর রহস্যময়ই ও ভয়ানক, যাহার শক্তি দুর্জ্জয় ও অপরিমেয়। স্বভাবতঃই আমাদের চিত্ত হইতে সকল ক্ষুদ্রচিন্তা স্খলিত হইয়া পড়ে এবং যে অনাদি অনন্ত পুরুষের মহিমা এই রুদ্র মনোহর সমুদ্রের মধ্যে প্রকশিত হইতেছে, আমাদের মন তাঁহার শ্রীচরণ উদ্দেশে বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়ে।

মানবের জয়

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম-এ, বি-এল

ভয় নাই, নাই থাক্ ঈশ্বরে বিশ্বাস,
মানবে বিশ্বাস তবু হারায়ো না প্রিয়!
সেই-ত সান্ত্বনা, শুধু সেই ত আশ্বাস,
পাষাণ-কঠিন—চিত্তে হতে নাহি দিও।
গাও মানবতা, গাও জলধি-সঙ্গীত,
সে গান প্লাবিয়া যাক সকলের প্রাণে;
দূর হয়ে যাক যত জগৎ অহিত,
সাম্যের গভীর সাম বাজুক সে গানে।

হে তরঙ্গশীর্ষ, সেই তোমার গৌরব
অন্তরে সাগর যদি কর অনুভব!
তুমি উচ্চ, তাই বলে আমি তুচ্ছ নয়;
সবার মিলনে তবে মহা-মানবতা।
"জীবনের জয়!" বল—"মানবের জয়!"
ক্ষুদ্র সুখ, ক্ষুদ্র দুঃখ, ত্যজি ক্ষুদ্র কথা
প্রাণহীন প্রাণ, বন্ধু কর প্রাণময়
এই বিশ্বযজ্ঞে আজ আনো সার্থকতা।

অমূল তরু

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(২৩)

কথা ছিল পরদিন বেলা ৩টার সময়ে বিনোদ সুনীতিকে গৃহে লইয়া যাইবে। প্রভাত হইতেই সুনীতি সুবোধের পরিচর্য্যা হইতে অবসর লইল। এমন কি প্রত্যুষে একবার মৌখিক কুশল প্রশ্নের পর আর সে সুবোধের কক্ষে প্রবেশ পর্য্যন্ত করিল না। তাহার এই আচরণ, তরুবালা ও রামদয়াল কাহারো লক্ষ্য অতিক্রম করিল না।

তরুবালা হাসিয়া কহিল, "যতক্ষণ তুমি এ বাড়ীতে আছ সুনীতি, ততক্ষণ ত তুমি নীরজা নস্। তবে ওরি মধ্যে এত লজ্জা কেন আস্‌ছে?"

সুনীতি সলজ্জ-স্মিত মুখে নিরুত্তর রহিল।

"আবার কতদিন পরে দেখতে পাবে; যাও না, একটু কাছে গিয়ে বোস না।"

সুনীতি আরক্ত-কুণ্ঠিত মুখে কহিল, "না. না. দিদি—কি; দরকার নেই।"

তরুবালা সুনীতির চিবুক স্পর্শ করিয়া হাস্যমুখে কহিল, "দরকার নেই?—না, শক্তি নেই—?"

রামদয়ালের সহিত সাক্ষাৎ হইতে রামদয়াল কহিলেন, "মনস্তত্ত্ব একটা দুরূহ জিনিস সুনীতি!"

সুনীতি মৃদু হাসিয়া কহিল, "তা হলে মনস্তত্ত্বের আলোচনা আমরা বাদ দিয়েই চল্‌ব দাদামশায়।"

রামদয়াল সহাস্য মুখে কহিলেন, "এ বাড়ীর একটি বিশেষ ঘর বাদ দিয়ে চল্‌ছ, আবার আলোচনাও বাদ দিয়ে চল্‌বে; উভয়ই ত' এক সঙ্গে বাদ দেওয়া চলে না ভাই।"

সুনীতি হাসিয়া কহিল, "ঘর বাদ দিয়ে যে চলছি, সেটা ত' মনস্তত্ত্ব নয় দাদামশায়, সেটা দেহতত্ত্ব। দেহ সেই ঘরে প্রবেশ করছে না, কাজেই ঘরটা বাদ পড়ে যাচ্ছে।"

রামদয়াল হাসিয়া কহিলেন, "দেহটা অত স্বাধীন জিনিস নয় সুনীতি; দেহ হচ্ছে মালগাড়ী আর মন হচ্ছে এঞ্জিন। মালগাড়ী থেকে এঞ্জিন খুলে নিলে তখন আর তা মালগাড়ী থাকে না, মালবাড়ী হয়ে যায়।"

সুনীতি স্মিতমুখে কহিল, "ব্যাপারটা ক্রমশঃ জটিল হয়ে পড়ছে দাদামশায়। এঞ্জিন যদি মন হোল ত' ড্রাইভার কে হবে?"

রামদয়াল কহিলেন, "ড্রাইভার হচ্ছে আসন্ন কারণ যা মনকে পরিচালিত করছে। একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিলে ব্যাপারটা জলের মত স্পষ্ট বুঝতে পারবে। এখানে

আসন্ন কারণ হচ্ছে তোমার লজ্জা, যার দ্বারা মন-এঞ্জিনে ব্রেক পড়ছে এবং কাজেকাজেই তোমার দেহ-গাড়ী একটা বিশেষ দিকে গতি হারাচ্ছে।"

সুনীতি একটু নির্ব্বাক চিন্তাশীল থাকিয়া কহিল, "কিন্তু এর মধ্যে এখনও দুই একটা জিনিস গোলমেলে রয়ে গেল দাদামশায়।"

রামদয়াল হাসিয়া কহিলেন, "আর একটা কথা বললে কোন গোলমালই থাকবে না ভাই। আসন্ন কারণের আবার আসন্ন কারণ থাকে। আমাদের এ উদাহরণের মধ্যে, আসন্ন কারণ লজ্জার আসন্ন কারণ হচ্ছে সুবোধের প্রতি তোমার প্রেম। এখন বোধ হয় আর কোন গোলযোগ নেই ?"

সুনীতি প্রথমে আরক্ত হইয়া উঠিল, তাহার পর সলজ্জ মৃদুকণ্ঠে কহিল, "বাস্তবিকই দাদামশায়, মনস্তত্ত্ব অতিশয় দুরূহ জিনিস !"

সুনীতির কথা শুনিয়া রামদয়াল উচ্চস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন।

সুনীতিকে লইয়া যাইবার জন্য বেলা আড়াইটার সময়ে বিনোদ বাগবাজার হইতে ঝামাপুকুরের মেসে উপস্থিত হইল। সুনীতি তৎপূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়াছিল; একটা ঠিকা গাড়ী আনিবার জন্য যদুকে পাঠান হইল।

তরুবালা কহিল, "ঠাকুরপোর কাছে বিদায় নিয়ে আস্‌বে চল সুনীতি।"

সুনীতি ইতস্ততঃ করিয়া দ্বিধাভরে কহিল, "থাক্ দিদি, তুমি বলে দিয়ো যে আমি চলে গিয়েছি।"

তরুবালা সবিস্ময়ে কহিল, "কি বলছ সুনীতি, তার ঠিক নেই ! ঠাকুরপো জেগে রয়েছেন, তুমি দেখা না করে চলে গিয়েছ শুনলে কি ভাববেন বল দেখি ? তুমি যদি সত্যিসত্যিই নর্স হতে, তা হলে কি না দেখা করে চলে যেতে ?"

অবশেষে বিদায় লইবার জন্য সুনীতিকে সুবোধের নিকট যাইতেই হইল। সুবোধ তখন টেবিলের নিকট দাঁড়াইয়া তাহার বহুদিন-অদর্শিত দ্রব্যাদি পরীক্ষা করিতেছিল। তাহাকে দণ্ডায়মান দেখিয়া তরুবালা আনন্দ বিস্ময়ে কহিল, "এ কি ঠাকুরপো ? উঠে দাঁড়িয়েছ ?"

সুবোধ সহাস্যে কহিল, "বিশেষ ত' কষ্ট হচ্ছে না ; মনে হচ্ছে কতকটা বেড়িয়ে আস্‌তেও পারি।"

রামদয়াল পরামর্শ মত প্রস্তুত হইয়াই সেই ঘরে বসিয়া একটা পুস্তক পাঠে রত ছিলেন। পুস্তকখানা বন্ধ করিয়া কহিলেন, "কতটা বেড়িয়ে আসতে পার মনে হচ্ছে ভায়া ? বাগবাজারে সুনীতির কুঞ্জ পর্য্যন্ত বোধ হয় অনায়াসে ?"

সুবোধ সপুলকে কহিল, "এক ফের পারি দাদামশায়। সেখানে গিয়ে পৌঁছাতে পারি, কিন্তু ফিরে আস্‌তে পারি নে।"

সুবোধের উত্তর শুনিয়া তরুবালা হাসিয়া উঠিল এবং সুনীতি অনিচ্ছাসত্ত্বেও পুনঃ পুনঃ লাল হইয়া উঠিতে লাগিল।

রামদয়াল কহিলেন, "এমন মাপ করে যিনি তোমাকে শক্তি দিয়েছেন তিনি জয়যুক্ত হোন, কিন্তু রোগীর অতি-ক্ষুধার মত এটাও যদি তোমার অতি-অনুমান হয় তাহলে সেটাকে সংযত করা কর্ত্তব্য।" তাহার পর সুনীতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "ডাক্তারের অভাবে তোমারই মত নেওয়া যাক নীরজা। এখান থেকে বাগবাজার পর্য্যন্ত হাঁটা সুবোধের পক্ষে এখন ঠিক হবে কি ?"

সুনীতির কথা কহিবার শক্তি ছিল না ; কিন্তু তাহাকে উত্তর দিবার অবসর না দিয়াই সুবোধ কহিল, "নীরজাকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা দাদমশায়, তার ডাক্তারের আমার বিষয়ে এত রকম নিষেধ আছে, আর সে গুলোকে সে এমন নির্ব্বিবাদে মানে যে, তার অনুমতি কিছুতেই পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া সুনীতির বিষয়ে কোন কথাই যখন সে আমাকে কইতে দেয় না, তখন তার বাড়ী যাবার কথা বললে ত' সে আমাকে চাবি বন্ধ করে রেখে যাবে।" বলিয়া সুবোধ হাসিতে লাগিল।

তরুবালা বলিল, "সুনীতির কথা কইতে দেয় না কেন ?"

সুবোধ সহাস্যে কহিল, "বলে, ডাক্তারের নিষেধ আছে। বোধ হয় মনে করে তাতে আমার মানসিক উত্তেজনা হবে। শুধু কি তাই ? ওর নিজের কথা পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে কইতে চায় না। আমি কিন্তু নীরজাকে বলে রেখেছি বউদিদি, পায়ে একটু জোর হলেই তার বাড়ী বোয়ে গিয়ে তার ডাক্তারের সমস্ত বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করে আসব।"

রামদয়াল ও তরুবালার মধ্যে সুবোধের অলক্ষিতে একটা চোখের সঙ্কেত হইয়া গেল। তরুবালা কহিল,

"ঠাকুরপো, নীরজা এখনই যাচ্ছে; সে তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছে।"

সুবোধ একটু বিস্ময়ের সহিত কহিল, "এরি মধ্যে? সন্ধ্যার পর খাওয়াদাওয়া করে গেলেই ত' হোত। এখনি যাবে নীরজা?"

এবার কথা না কহিয়া সুনীতির পরিত্রাণ ছিল না। তাহার উদ্বেলিত চিত্তকে কোন প্রকারে দমন করিয়া সে নতনেত্রে কহিল, "না, এখনই যাই।"

সুবোধ একটু ক্ষুণ্ণ স্বরে কহিল, "যদি একান্ত অসুবিধা হয় ত' আর কি বলব? কিন্তু মনে কোরো না নীরজা, এখন থেকে তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ শেষ হোল। তুমি যে আমাদের চিরদিনের আত্মীয় হয়ে রইলে, সে কথাটা বড় করে বলতে গিয়ে ছোট করতে চাইনে।"

সুবোধের কথা শুনিয়া আনন্দের আবেগে রামদয়ালের চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া খানিকটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। সুনীতির পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া বাম হস্ত তাহার স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়া দক্ষিণ হস্ত মস্তকে বুলাইতে বুলাইতে রামদয়াল কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "আমি আশীর্ব্বাদ করি নীরজা, তোমার প্রতি সুবোধের এই উক্তি চিরদিনের জন্য সার্থক হোক। নিজের জীবন উৎসর্গ করে জীবন দান করলেও যদি আত্মীয় না হয়, তা হলে আত্মীয় শব্দের অর্থই থাকে না।"

"তা হলে চল্লাম দাদামশায়" বলিয়া সুনীতি অবনত হইয়া রামদয়ালের পদধূলি গ্রহণ করিল এবং উঠিবার পূর্ব্বেই বহু যত্ন-অবরুদ্ধ একরাশি অশ্রু রামদয়ালের পায়ের উপর ঝরিয়া পড়িল।

বিদায়কালের এই করুণতায় সুবোধের চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইয়া আসিল এবং তরুবালা সাশ্রুনেত্রে সস্মিত মুখে অনির্ব্বচনীয় আনন্দে নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"বোস ভাই, আর একটু বাকি আছে" বলিয়া সুবোধের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রামদয়াল কহিলেন, "এখন নীরজার প্রাপ্যটা বুঝিয়ে দিতে হবে ত' সুবোধ?"

সুবোধ চকিত হইয়া কহিল, "নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই! সেটা এখনই নীরজার সঙ্গে দিয়ে দিন।"

আরক্ত মুখে মৃদুকণ্ঠে সুনীতি কহিল, "ছি—ছি, দাদা-মশায়, ছেলেমানুষী করবেন না।"

রামদয়াল কহিলেন, "ছেলে-মানুষী আমি করছিনে ভাই, তুমিই করছ। দক্ষিণান্ত না হলে ব্রত সাঙ্গও হয় না সার্থকও হয় না।" তাহার পর নিকটস্থ একটা চেয়ারে সুনীতিকে বসাইয়া দিয়া কহিলেন "এখানে একটু বোস; যে রকম কাঁপছ হয় ত পড়ে যাবে।" তৎপরে সুবোধকে কহিলেন, "তা হলে একটা হিসাব করে, যাতে কম না হয়, দেখতে শুনতে ভাল হয়—"

সুবোধ কহিল, "নীরজা যা বলবে তাই দিয়ে দিন; কিম্বা আপনিই এমন একটা স্থির করে দিন যেটা নীরজার নিতান্ত অনুপযুক্ত না হয়।"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া রামদয়াল কহিলেন, "নীরজা যে রকম অব্যবসায়ী, তাকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা। আমিও স্থির করতে মনে মনে ভয় পাচ্ছি। একে ত বুড়মানুষ, তার পর লক্ষ্মীর মত রূপসী আর সরস্বতীর মত বিদুষী এই নাতনীর প্রতি আমি এমন আসক্ত হয়ে পড়েছি যে, পারিশ্রমিকের মূল্য যদি বেশী হয়ে পড়ে, তখন তুমি মুখে বলতে পারবে না অথচ মনে মনে অসন্তুষ্ট হবে। তার চেয়ে তুমিই স্থির কর না ভাই।"

রামদয়ালের কথায় বিস্মিত ও ক্ষুণ্ণ হইয়া সুবোধ কহিল, "এ রকম অমূলক আশঙ্কা করে আমার প্রতি অবিচার করছেন দাদামশায়!"

রামদয়াল সহাস্যে কহিলেন, "তা যদি বল, তা হলে সুবিচারই করি। আমি বলি, টাকা দিয়ে নীরজার সেবা আর পরিশ্রমের মাপ করা যাবে না; তার চেয়ে অন্য রকমে নীরজাকে পুরস্কৃত করা যাক্।"

সকৌতূহলে সুবোধ কহিল, "অন্য কোন্ রকমে বলুন।"

রামদয়াল একটু ভাবিলেন, তাহার পর কহিলেন, "তোমার দেহ ও প্রাণ, যা ঐকান্তিক সেবা আর পরিশ্রমের দ্বারা নীরজা এক-রকম অর্জ্জন করেছে বলা যেতে পারে—তাই নীরজার পুরস্কার হোক। কোন একদিন শুভ লগ্নে স্বামী-স্ত্রীর অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে তোমরা দুজনে আবদ্ধ হও। এর চেয়ে ভাল মীমাংসা আমার ত আর মনে আসে না। তুমি কি বল তরুদিদি?"

তরুবালা প্রফুল্লমুখে কহিল, "এ ত বেশ কথা, আমার সম্পূর্ণ মত আছে।"

প্রথমটা সুবোধ ক্ষণকাল আরক্ত হইয়া নির্ব্বাক রহিল;

তাহার পর বিরক্তি-বিরস মুখে কহিল, "পরিহাসের মাত্রাটা এমন করে অতিক্রম করা ভাল নয় দাদামশায়! নীরজাকে এ রকম করে লজ্জিত করা তার পরিশ্রমের পুরস্কার নিশ্চয়ই নয়।"

রামদয়াল মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "তাই ত ভয় করছিলাম ভাই, আমার মীমাংসা তোমার মনঃপুত হবে না। কিন্তু পরিহাস তুমি কি করে বলছ, তাও ত বুঝতে পাচ্ছিনে। নীরজা কি এতই সামান্য, সে কি তোমার এতই অনুপযুক্ত, যে তার সঙ্গে মিলনের প্রস্তাবকে তুমি পরিহাস বল্‌তে পার?"

তরুবালা কহিল, "তুমি ভুলে যাচ্ছ দাদামশায়, ঠাকুরপো সুনীতির কথা মনে করে তোমার প্রস্তাবকে পরিহাস বলছেন।"

রামদয়াল কহিলেন, "আমি সুনীতির কথা ভুলিনি ভাই। কিন্তু সুনীতি ত সুবোধের পক্ষে স্বপ্ন-কল্পনা, ছায়া; নীরজা যে প্রত্যক্ষ, বাস্তব; তাকে উপেক্ষা করবার উপায় কোথায়?"

সুবোধ মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইয়া কহিল, "এ প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ করুন দাদামশায়। যে জিনিস যুক্তি-তর্কের বাইরে, তা নিয়ে আলোচনায় কোন ফল নেই!" তাহার পর সুনীতিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "এই অপ্রিয় আলোচনা, যা তোমাকে নিশ্চয়ই ব্যথিত এবং বিরক্ত করেছে নীরজা, তার জন্যে আমি বাস্তবিকই দুঃখিত। তোমার প্রতি আমার স্নেহ ও শ্রদ্ধার অভাব নেই, কিন্তু যে জিনিস আমার দেবার অধিকার নেই, তাই দিতে বলে এঁরা আমাকে অপ্রতিভ করেছেন। তুমি তা চাওনি তা জানি; কিন্তু তবুও এই দিতে পারিনে বলার রূঢ়তা আমাকে ব্যথা দিচ্ছে।"

রামদাল হাসিয়া কহিলেন, "কিন্তু আমি যদি হলফ নিয়ে বলি যে, নীরজা প্রতিদিন, প্রতিদণ্ড, প্রতি মুহূর্ত্ত তোমাকে ঐকান্তিক চিত্তে চেয়েছে; আমি যদি বলি সে তোমার প্রেমে আত্মহারা, তোমার জন্যে গৃহত্যাগিনী, তা হলে কি বলবে বল?"

রামদয়ালের এই অচিন্তনীয় কথা শুনিয়া সুবোধ চকিত হইয়া উঠিল। তদুপরি নতনেত্রে নিরুত্তর সুনীতিকে বিনা প্রতিবাদে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আশঙ্কায় ও সংশয়ে সে বিহ্বল, নির্ব্বাক হইয়া তাকাইয়া রহিল। রামদয়ালের কথা যে কেবলমাত্র কৌতুক বা পরিহাস ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না, তাহা মনে করিবার আর তাহার শক্তি বা দৃঢ়তা রহিল না।

সুবোধের দুস্থ অবস্থা দেখিয়া রামদয়ালের দয়া হইল তিনি সহাস্যমুখে কহিলেন, "অত চিন্তিত হবার কারণ নেই ভাই; তোমার প্রেম নীরজাকে দিতে পার না বলার রূঢ়তা তোমাকে ব্যথা দিলেও নীরজাকে ব্যথা দিচ্ছে না বরং সে তোমার নিষ্ঠা দেখে শ্রদ্ধায় ও আনন্দে নির্ব্বাক হয়ে গিয়েছে।"

রামদয়ালের কথার তাৎপর্য্য গ্রহণে অসমর্থ হইয়া সুবোধ কহিল, "আপনি সব কথা স্পষ্ট করে খুলে বলুন দাদামশায়, আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে!"

রামদয়াল মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "এত করে বললেও যদি বুঝতে না পার, তা হলে নীরজা-সুনীতি সমস্যা সমাধান করে দিই ভাই। নীরজা বলে তুমি যাকে জান, সে নীরজা নর্স নয়; সে তোমার বহু দুঃখের বহু কষ্টের, বহু সুখের, বহু সাধের মানসীপ্রতিমা সুনীতি! যাকে তুমি এতদিন দেখেও দেখনি, বুঝেও বোঝনি, এ তোমার সেই মোহিনী মায়া, অনেক দুঃখে ধরা পড়েছে, এবার ভাল করে চিনে রাখ।"

প্রথমে দুঃসহ বিস্ময়ে সুবোধ ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিল, তাহার পর যখন সহসা তাহার মনের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটার যথার্থ উপলব্ধি প্রবেশ করিল, তখন তাহার মুখ মেঘ-নির্ম্মুক্ত আকাশের মত হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। নিকটস্থ একটা চেয়ারে ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িয়া কহিল, "কিন্তু নিষ্ঠুরতা হবে দাদামশায় যদি এর পর আবার আর একটা রহস্য নিয়ে এসে এ কথাটা বদলে দেন! শপথ করে বলুন যা বল্লেন তা মিথ্যা নয়!"

অদূরে তরুবালা দাঁড়াইয়া যুগপৎ হর্ষ ও কৌতুক উপভোগ করিতেছিল; সে হাস্যোৎফুল্ল মুখে কহিল, "আমি শপথ করছি ঠাকুরপো, এ কথা একটুও মিথ্যা নয়। এ নীরজা নয়, নর্স নয়, এ আমাদের বহু আদরের ধন সুনীতি।"

"তোমার যদি এখনও সন্দেহ থাকে সুবোধ, তা হলে সাক্ষী তলব করতে হয়", বলিয়া রামদয়াল ঘর হইতে

নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং অনতি-বিলম্বে দক্ষিণ হস্তে বিনোদকে ও বাম হস্তে যোগেশকে ধরিয়া পুনঃ প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "প্রধান অপরাধিনীকে ত আগেই ধরিয়ে দিয়েছি ভাই, এখন এ দুটি অপরাধীকেও তোমার হাতে সমর্পণ করলাম; যে শাস্তি দিতে ইচ্ছা হয় দাও।"

বিনোদ অপরাধীরই মত কুণ্ঠিত স্বরে কহিল, "আমাকে ক্ষমা কর সুবোধ, তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি।"

সুবোধ তাড়াতাড়ি আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া আবেগভরে বিনোদের সহিত কোলাকুলি করিয়া কহিল, "না, না, বিনোদ! তুমি আমাকে যা দিয়েছ, তার জন্যে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ নাও ভাই!" তাহার পর সলজ্জ মুখে যোগেশকে দুইবাহুর মধ্যে টানিয়া লইয়া হাসতে হাসিতে কহিল, "তোমার সঙ্গ কিন্তু রীতিমত বোঝাপড়া আছে। যে রকম নাকাল্টা আমাকে দিয়েছ, তোমার নাম আমি রাখলাম দুর্নীতি!"

সুবোধের কথা শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল।

রামদয়াল কহিলেন, "এ চক্রান্তের আর একটি চক্রী এই মিলন-দৃশ্য দেখবার লোভে বাগবাজার থেকে উপস্থিত হয়ে দোরের পাশে অবস্থান করছেন। তিনি হচ্ছেন সুমতি, সুনীতির দিদি। তাঁর কাছ থেকে আমি একটা চিঠি পেয়েছি, যার একটা অংশ আজকের অভিনয়ে বিশেষ ভাবে পড়বার যোগ্য। চিঠিখানি সুনীতির বাবা সুমতিকে লিখেছেন। আমি পড়ি, তোমরা মন দিয়ে শোন। 'এ বিষয়ে তোমার ইচ্ছা ও মতের সহিত আমার সম্পূর্ণ ঐক্য আছে! ভগবান এমন অদ্ভুতভাবে দুইটি প্রাণীকে কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়া বাঁধিবার উপক্রম করিতেছেন তাহাতে আমার অমত করিবার কোন কারণই নাই। তুমি সুনীতি মাতাকে জানাইবে যে, সকল কথা অবগত হইয়া আমি অতিশয় সুখী হইয়াছি; আশীর্ব্বাদ করি মাতা সর্ব্বসৌভাগ্যে সৌভাগ্যবতী হউন।' এর বেশী পড়বার দরকার নেই, এইটুকুই আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট। আমরাও সর্ব্বান্তঃকরণে সুনীতির পিতার আশীর্ব্বাদে যোগদান করি।"

দ্বারান্তরালে সুমতির অঞ্চলের কিয়দংশ দেখা যাইতেছিল; সুবোধ তথায় গিয়া অবনত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, "এ চক্রান্তের মধ্যে আপনার চক্রান্ত আসলে কি ছিল, সে সংবাদ আমি বউদিদির কাছে জেনেছি; তাই নতুন করে আপনার আশীর্ব্বাদ চাইবার দরকার নেই।"

অন্তরাল হইতে মৃদুকণ্ঠে সুমতি কহিল, "না, তা নেই। প্রথম দিন থেকেই আমি সে আশীর্ব্বাদ করে এসেছি।"

রামদয়াল কহিলেন, "সব ত হোল, এখন নীরজা নর্সের দক্ষিণার কথাটা ভুলো না সুবোধ। তোমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে বিবিধ মনোবৃত্তির দ্বারা পীড়িত হয়ে সে মূক হয়ে গিয়েছে বলে মনে কোরো না যে, সে তার পারিশ্রমিক চায় না।"

নিঃশব্দে নির্ব্বাক অবনতমুখী সুনীতির প্রতি একবার চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া লজ্জিত ভাবে সুবোধ কহিল, "নীরজার যদি অপত্তি না থাকে দাদামশায়, তা আপনি যে পারিশ্রমিক স্থির করে দিয়েছেন তা দিতে আমার কোন আপত্তি নেই। আর আমি আপনার অবাধ্য নই!"

সুবোধের কথা শুনিয়া সকলে উচ্চ স্বরে হাস্য করিয়া উঠিল।

রামদয়াল সুনীতির নিকট উপস্থিত হইয়া সযত্নে তাহার হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, "লেখাপড়াজানা সহুরে মেয়েদের উপর যে কুসংস্কার ছিল, তা আজ হতে একেবারে লুপ্ত হল সুনীতি। উঠে আয় ভাই, আর একবার ভাল করে আশীর্ব্বাদ করি।" বলিয়া সুনীতিকে তুলিয়া ধরিয়া বাম হস্তে তাহার মস্তক নিজ কণ্ঠে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া দক্ষিণ হস্ত তাহার মস্তকের উপর ঘন ঘন বুলাইতে লাগিলেন। রামদয়ালের চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু ঝরিয়া সুনীতির মস্তকের উপর পড়িতে লাগিল এবং সুনীতির চক্ষু হইতে টপ্ টপ্ করিয়া মুক্তার মত অশ্রুবিন্দু মাটিতে ঝরিতে লাগিল।

এই সকরুণ দৃশ্যে যুগপৎ রৌদ্রবর্ষার মত, সকলের হর্ষোৎফুল্ল মুখে চক্ষু সজল হইয়া আসিল।

সমাপ্ত।

বাঙ্গালোর

রায় শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বাহাদুর বি-এল্

মহিসুর রাজ্যের রাজধানী মহিসুর নগরী * হইলেও, উহার সর্ব্বপ্রধান সহর – বাঙ্গালোর। দুইটি স্থানের ব্যবধান ৮৪ মাইল। রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য, রাজধানীর পরিবর্ত্তে বাঙ্গালোর হইতেই পরিচালিত হয়।

কাব্বন-পার্ক—মহিসুর গবর্ণমেণ্ট দপ্তরখানা

মান্দ্রাজ হইতে বাঙ্গালোর রেলপথে ২১৯ মাইল। রাত্রি ৮॥টায়, মান্দ্রাজের সেণ্ট্রাল ষ্টেশনে "বাঙ্গালোর মেল্" ট্রেণে আরোহণ করিলাম। ভোর ৬টার কাছাকাছি ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিলাম, ট্রেণ বাঙ্গালোর কাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং দুই একটি ভদ্রলোক প্লাট্‌ফর্ম্মে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের উপদেশ-অনুসার, 'ক্যাণ্টনমেণ্ট' ষ্টেশনেই নামিয়া পড়িলাম। ইহার পরের ষ্টেশন বাঙ্গালোর 'সিটি'—এই লাইনের শেষ সীমা (Terminus)। অধিকাংশ যাত্রীর পক্ষে, সাধারণত, 'সিটি ষ্টেশনে' নামাই সুবিধা। মহিসুর যাইতে হইলে, এই ষ্টেশনে আসিয়া Metre gauge লাইনের গাড়ীতে উঠিতে হয়। হিন্দু ভদ্রলোকদিগের জন্য বাঙ্গালোরে 'মডার্ণ হিন্দু হোটেল' নামক একটি উচ্চ শ্রেণীর পান্থ-নিবাস আছে, উহা 'সিটি' ষ্টেশনের অদূরবর্ত্তী। এই হোটেলে আশ্রয় লইবার উদ্দেশ্যে, আমিও সিটি ষ্টেশনেই নামিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট্ ষ্টেশনে জানিতে পারিলাম, আমার জন্য অন্যত্র বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করা হই-

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মূর্ত্তি

* বাঙ্গলায় 'মহীশূর' লেখা হয় কেন, জানি না। প্রকৃত নামটি 'মহিষ-উর' অর্থাৎ 'মহিষ-পুরী।' কিম্বদন্তী অনুসারে পুরাণ-বর্ণিত মহিষাসুরের বাসভূমি বলিয়া নগরের এইরূপ নামকরণ হইয়াছিল।

য়াছে। সুতরাং সিটি-ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাইবার আর প্রয়োজন ছিল না।

বাঙ্গালোরে আসিয়া প্রথমেই চারিদিকে লোহিত বর্ণের প্রাধান্য দেখিতে পাইলাম। রাজপথগুলি রক্তবর্ণ কঙ্করাবৃত; পথের ধারের বৃক্ষশাখায় অপর্য্যাপ্ত লালরঙের ফুল; সারি সারি কুটীরের ছাতে রক্তবর্ণের টালি; এবং অধিকাংশ গৃহ ও অট্টালিকা রক্তবর্ণ-রঞ্জিত।

বাঙ্গালোর পাহাড় না হইলেও, সমুদ্র-সমতল হইতে ৩০০০ ফুট উচ্চ; সুতরাং জ্যৈষ্ঠ মাসেও এখানে গ্রীষ্মের তাপ প্রখর ছিল না। অতিরিক্ত শীত-গ্রীষ্মের প্রভাব-বর্জ্জিত বলিয়া এই স্থান এংলোইণ্ডিয়ানদের বাসের পক্ষ বিশেষ উপযোগী। আমাদের দেশের অনেকে যেমন শেষ বয়সে কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কাশীবাস করেন, অনেক এংলোইণ্ডিয়ান সেইরূপ পেন্সন লইয়া বাঙ্গালোরে শেষজীবন যাপন করেন। য়ুরোপীয়দিগের 'সুখ-সুবিধা'র জন্য, 'ক্লাব' 'হোটেল' প্রভৃতির অসদ্ভাব নাই।

বাঙ্গালোর সহরটি দুইভাগে বিভক্ত। এক অংশ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত, ইহাকে 'ক্যাণ্টনমেণ্ট' বলা হয়। য়ুরোপীয়গণ এই দিকেই বাস করেন। এত বড় ক্যাণ্টনমেণ্ট অর্থাৎ ইংরাজ সেনানিবাস ভারতবর্ষে

বাঙ্গালোর রাজপথ

আর আছে কি না সন্দেহ। অন্য অংশ প্রাচীন সহর বা 'সিটি।' লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সহরের আয়তন ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। বর্ত্তমানে উহার আয়তন ২১ বর্গ-মাইল। এই সম্প্রসারণ-কার্য্য এরূপ সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে সাধিত হইতেছে, যে উহাতে নগরীর বাহ্য-সৌন্দর্য্যও বৃদ্ধি পাইতেছে। সহরের সর্ব্বত্রই বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে। বাস্তবিক, মান্দ্রাজ প্রদেশে বাঙ্গালোরের ন্যায় উন্নতিশীল নগর আর নাই। বাঙ্গালোর সহরে ভ্রমণ করিবার সময় ইহার এক-একটি নবগঠিত পল্লী চিত্রশালার এক-একখানি চিত্রপটের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। অধিকাংশ নূতন পল্লীর নাম ইংরাজী—যথা Cleveland Town, Richard Town, Richmond Town, Cox Town, Fraser Town—ইত্যাদি। রিচার্ড-টাউনের মিউনিসি-

বাউরিং ইন্‌ষ্টিটিউট্—য়ুরোপীয়দের ক্লাব

পালিটীর উদ্যানে 'বৃক্ষ-ভাস্কর্য্যের" নমুনা দেখিলাম। বৃক্ষের ডাল ও পাতা ক্রমশঃ ছাঁটিয়া উহাদিগকে সাপ, হাতী ঘোড়া মানুষ ইত্যাদি নানারূপ জীবের আকৃতি দান করা হইয়াছে।

বাঙ্গালোরে প্রধান দর্শনীয় স্থান তিনটি :—Cubbon Park 'কাব্বন-উদ্যান', রাজপ্রাসাদ, এবং লাল-বাগ। ভিক্টোরিয়ার—ও অপর প্রান্তে সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের প্রতিমূর্ত্তি। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট যুবরাজ রূপে বাঙ্গালোরে আসিয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করিয়াছিলেন। কাব্বন-পার্কের অন্যদিকে, ভূতপূর্ব দেওয়ান স্যর শেষাদ্রি আয়ারের স্মৃতিচিহ্ন—"শেষাদ্রি হল" ও পাবলিক লাইব্রেরী। এই 'হলে'র সম্মুখে স্যর শেষাদ্রি আয়ারের প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। মূর্ত্তির পাদ-পীঠে লিখিত আছে, শেষাদ্রি ১৮৮৩ হইতে ১৯০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহিষুর রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন, এবং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ভারতের বড় লাট এই প্রতিমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন।
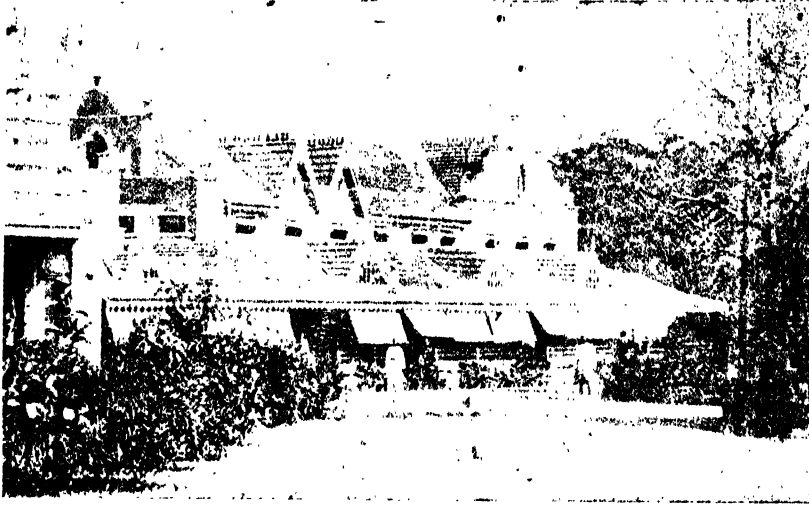
ওয়েষ্ট এণ্ড হোটেল

পার্কের অনতিদূরে, প্যারেড গ্রাউণ্ড ময়দানের পশ্চিম প্রান্তে কাব্বন-পার্ক। এই সুরম্য উদ্যানের মধ্যে মহিষুর গবর্ণমেণ্টের আফিস-আদালত। কাব্বন-উদ্যান সাধারণের সান্ধ্য-ভ্রমণের শ্রেষ্ঠ স্থান। একদিকে একটি ব্যাণ্ড ষ্ট্যাণ্ড; উহার সম্মুখে কাব্বন সাহেবর প্রস্তরমূর্ত্তি। মহিষুর রাজ্যের শাসনভার যখন বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের হাতে ছিল, তখন ১৮৩৪ হইতে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্যর মার্ক কাব্বন (Sir. Mark Cnbbon) মহিষুরের কমিশনার ছিলেন। উদ্যানের পূর্ব্ব-সীমায় একটি সুন্দর রাস্তা—উহার এক প্রান্তে মহারাণী
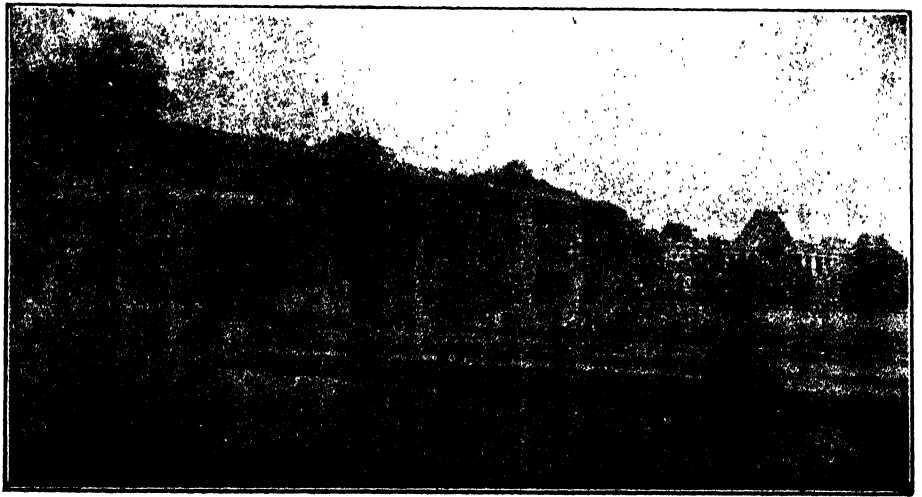
বাঙ্গালোর দুর্গের ভগ্নাবশেষ

'মিউজিয়মের' সুরম্য দ্বিতল গৃহ। ইহাতে মৃত জীবজন্তু ও পুরাদ্রব্য সংগ্রহ ব্যতীত মহিষুর রাজ্যজাত সর্ব্বপ্রকার শস্য ও খনিজ পদার্থের নমুনা প্রদর্শনের জন্য রাখা হইয়াছে। একটি কাচের আধারে আকবর শাহের শীলমোহরযুক্ত আদেশপত্র, আওরঙ্গজেব-বাদশাহপ্রদত্ত সনদ প্রভৃতি কতকগুলি প্রাচীন

ঐতিহাসিক দলিল, এবং অন্যত্র মহিসুর রাজ্যে হাতীধরার কয়েকখানি বৃহৎ চিত্র দেখিলাম। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে যখন বৃটিশ সেনাপতি শ্রীরঙ্গ-পত্তন আক্রমণ করেন, সেই সময় শ্রীরঙ্গপত্তন দুর্গ, টিপু ও ইংরাজ পক্ষের সৈন্যসংস্থান যেরূপ ছিল, উহার একটি 'মডেল' এই মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। বর্ত্তমান মহিসুরের ইতিহাসে শ্রীরঙ্গপত্তন অধিকার ও টিপু সুলতানের পরাভবের ন্যায় গুরুতর ঘটনা আর কিছু নাই।

'সিটি' অর্থাৎ পুরাতন সহরের যে স্থানে টিপু সুলতানের দুর্গ ও প্রাসাদ ছিল, সেই স্থানটি এখনও 'দুর্গ' (fort) নামে পরিচিত। একটি উচ্চ প্রাচীরের ভগ্নাংশ ব্যতীত দুর্গের অন্য কোন চিহ্নই এখন বর্ত্তমান নাই।
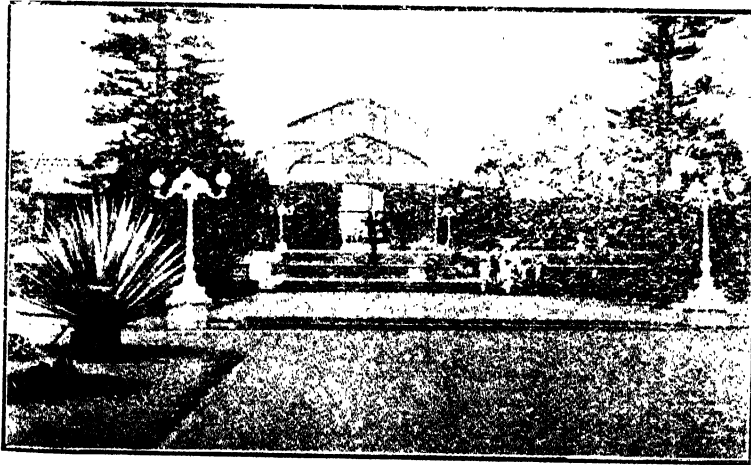
লালবাগ

লালবাগ—স্ফটিক-ভবন

কিন্তু বাঙ্গালোরের ইতিহাস এই লুপ্ত দুর্গের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। ১৫৩৭খৃষ্টাব্দে,কেম্পে গৌড়া নামক বিজয়নগর সাম্রাজ্যের একজন সামন্ত এই স্থানে একটি মৃন্ময়দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বাঙ্গালোর নগর প্রতিষ্ঠা করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে বিজাপুরের আদিলশাহী সুলতানের সেনাপতি বাঙ্গালোর অধিকার করিয়া শিবাজীর পিতা সাহাজীকে ইহা জায়গীর স্বরূপ দান করেন। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালোর মহিসুরের উদেয়ারবংশীয় রাজগণের হস্তগত হয়। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে হায়দার আলি মহিসুর রাজ্যের নিকট বাঙ্গালোর জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া, ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পুরাতন দুর্গটিকে নূতন করিয়া প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মাণ করেন। টিপু সুলতানের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধ বাধিলে, ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ কর্তৃক এই দুর্গ অধিকৃত হয়। যে স্থান হইতে তিনি টিপু সুলতানের সৈন্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে এই দুর্গ টিপু সুলতানকে প্রত্যর্পণ করা হয়, কিন্তু তিনি ইহা ভূমিসাৎ করিয়া দেন। টিপুর রাজত্বের অবসানে, মহিসুর রাজ্যের বিখ্যাত দেওয়ান পূর্ণায়া পুরাতন ভিত্তির উপরে দুর্গটি পুনরায় নির্ম্মাণ করিয়া দিলে, বহুকাল ইহা ইংরাজ-সেনানিবাসরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

দুর্গ-প্রাকারের যে অংশ এখনও অবশিষ্ট আছে, তাহা

লালবাগে স্বর্গীয় মহারাজার প্রতি মূর্ত্তি

যেমনি উচ্চ, তেমনি প্রশস্ত। আমরা উহার উপরে আরোহণ করিয়া এই দুর্গ, অতীতকালে দেখিতে কিরূপ বিশাল ও দুর্ভেদ্য ছিল, তাহাই কল্পনা করিতেছিলাম। দুর্গের মধ্যে, যেখানে টিপু সুলতানের "মহল" ছিল, একটি সাইন-বোর্ড দ্বারা উহা চিহ্নিত করিয়া রাখা হইয়াছে। প্রাকারের প্রবেশ-দ্বারসংলগ্ন ছোট একটি ঘর আছে,—উহা Goverment Fuel office জ্বালানি কাঠের আফিসরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার অনতিদূরেই ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারী।

দুর্গ হইতে এক মাইল পূর্ব্বে, সহরের উপকণ্ঠে 'লালবাগ' নামক প্রসিদ্ধ উদ্যান। হায়দার আলি এই বাগানের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। দেশ-বিদেশ হইতে নানাজাতীয় উদ্ভিদ এই উদ্যানে আনীত হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতে এত বড় উদ্যান বড় বেশী নাই। ইহার আয়তন প্রায় ১০০ একর। এই বাগানের মধ্যেই চিড়িয়াখানা। কিন্তু চিড়িয়াখানায় জীবজন্তু বেশী দেখা গেল না। বাগানের একদিকে Glass House বা 'স্ফটিক ভবন' নামক একটি প্রশস্ত গৃহ। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গীয় রাজপুত্র এলবার্ট ভিক্টর ভারত-ভ্রমণে আসিয়া এই গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই 'স্ফটিক ভবনে' বৎসরে দুইবার বাঙ্গালোরের পুষ্প-প্রদর্শনী হইয়া থাকে। লাল বাগে মহিসুরের স্বর্গীয় মহারাজা চামরাজেন্দ্র উদেয়ারের একটি অশ্বারূঢ় মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এই মহারাজা কলিকাতায় পরলোক গমন করেন। কালীঘাটের শ্মশান-ঘাটে, মহিসুর মহারাজার কারুকার্য্যখচিত স্মৃতি-মন্দির সম্ভবতঃ অনেকেই দেখিয়াছেন।

বাঙ্গালোরে সেণ্ট্রাল কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল, চক্ষু রোগের চিকিৎসালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি দর্শনযোগ্য। 'বাউরিং ইন্‌ষ্টিটিউট্' ও 'বাউরিং হাসপাতাল' স্যর মার্ক কাব্বনের পরবর্ত্তী কমিশনার বাউরিং সাহেবের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। এখানে সুদৃশ্য অট্টালিকার
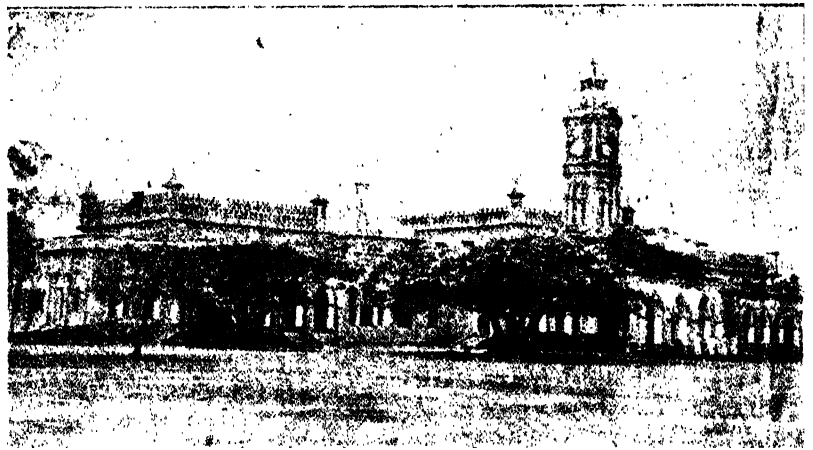
সেণ্ট্রাল কলেজ

অভাব নাই। কিন্তু মহারাজার প্রাসাদেই উহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সহরের উত্তর-পূর্ব্ব সীমানায়, ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনের নিকটে ইহা অবস্থিত। মহারাজা বাঙ্গালোরে আসিলে এই

প্রাসাদে বাস করেন। যেদিন আমরা এই প্রাসাদ দেখিতে গেলাম, মহারাজা তখন মহিশুরে;—সুতরাং প্রাসাদ দর্শনে কোন বাধা ছিল না। বিস্তীর্ণ উদ্যানের মধ্যে এই প্রাসাদ; চারিদিক ঘুরিয়া দেখিতে প্রায় তিন মাইল পথ হাঁটিতে হইল। ক্ষুদ্র পাহাড়, ফলের বাগান, ফুলের বাগান, সবজি বাগান, লতাগৃহ, জলাশয় সমস্তই এই উদ্যানে আছে। একদিকে লৌহ-তারে ঘেরা ভূমিতে হরিণ ও কাঙ্গারু চরিয়া বেড়াইতেছে; উহার নিকটেই ময়ূর পারাবতের গৃহ। দেখিয়া মেঘদূতের যক্ষের আলয়ের বর্ণনা মনে পড়িল—

"উচ্চভূমি একধারে গিরিসম দেখিবারে
নীলকান্তি শিখরে বিরাজে,
সুবর্ণ কদলী যত চারিধারে শোভা কত
মেঘে যেন সৌদামিনী সাজে।
মাধবীমণ্ডপ পরে কুরুবক শোভা করে
ফুল গন্ধে ছোটে অলিকুল,
লতায় পাতায় ঘেরা আছয়ে সবার সেরা
দুটি গাছ অশোক বকুল।
তাহার মাঝেতে আর ময়ূরের বসিবার
সোণার একটি আছে দাঁড়,
শিখী যেথা কেকাভাষী সন্ধ্যাকালে বসে আসি
আনন্দেতে উঁচা করি ঘাড়।"

প্যারেড গ্রাউণ্ড-ময়দানের উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। ইহা পূর্ব্ব-পশ্চিমে দুই মাইল দীর্ঘ। বাঙ্গালোরে হাইগ্রাউণ্ড, রেসকোস, গল্‌ফক্লাব প্রভৃতি আরও কয়েকটি মাঠ, এবং কয়েকটি বৃহৎ জলাশয় আছে। 'সম্পঙ্গি দীঘি" নামক জলাশয়ের জলের ভাগ এত হ্রাস পাইয়াছে যে উহার একদিকে 'পলো' খেলা হয়। সহরের পূর্ব্ব সীমায় 'হলসুর হ্রদ' নামক প্রচণ্ড জলাশয় দেখিতে একটি হ্রদের মত। ইহার মধ্যে কয়েকটি ছোট ছোট দ্বীপ আছে। এককোণে পাহাড়ের উপর একটি দেব-মন্দির। প্রধানতঃ এই গুলিই বাঙ্গালোরের দ্রষ্টব্য।

Victoria Hospital, Bangalore

ভিক্‌টোরিয়া হাসপাতাল

সহরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, "বাসভান গুড়ি" মহল্লার প্রান্তে, পাহাড়ের উপরে একটি শিবমন্দির। মন্দিরে শিবলিঙ্গ অথবা শিবমূর্ত্তি নাই—শুধু কৃষ্ণ-প্রস্তর-নির্ম্মিত সুন্দর একটি বৃষমূর্ত্তি আছে। সেই জন্য ইহার নাম বৃষ-মন্দির। পূজারি বলিলেন, মহাদেব এখানে অদৃশ্য-ভাবে বৃষোপরি বিরাজ করিতেছেন। স্থানটি নির্জ্জন ও মনোরম। মন্দিরের অঙ্গনের বাহিরে, ছোট একটি মন্দিরে বিঘ্নেশ্বর মূর্ত্তি। প্রবেশদ্বারের সম্মুখে, প্রস্তর-নির্ম্মিত উচ্চ ধ্বজ-স্তম্ভ। মন্দিরের উত্তরসীমায় পাথরে বেষ্টিত একটি পুষ্করিণী। নগর হইতে এই অঞ্চলে বেড়াইতে আসিয়া অনেকে এই পুষ্করিণীর ধারে বন-ভোজন করিয়া থাকেন। মন্দিরের পশ্চিম কোণে পাহাড়ের চূড়ায় উঠিবার জন্য রেলিং ঘেরা সিঁড়ি আছে। চূড়ায় উঠিয়া বহুদূর বিস্তৃত বাঙ্গালোর নগরের সাধারণ দৃশ্য দর্শন করিলাম। বাঙ্গালোরে খৃষ্টানদের অনেকগুলি গির্জ্জা আছে। সহরের দৃশ্যের মধ্যে গির্জ্জাগুলির উচ্চ চূড়া সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এই বাসভানগুড়ি মহল্লায় টাটা কোম্পানি একটি রেশমের কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। Salvation Army—'মুক্তি-ফৌজ' সম্প্রদায় কর্ত্তৃক উহা পরিচালিত
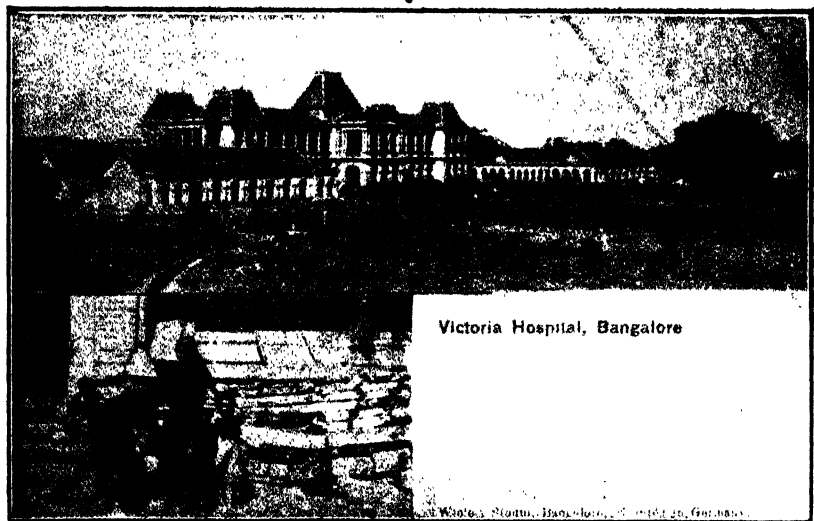
হইতেছে। এই কারখানায় প্রস্তুত রেশমী কাপড় খুব ভাল বলিয়াই মনে হইল।

দেশীয় শিল্পের পরিপুষ্টিকল্পে মহিসুর গবর্ণমেণ্ট এই রাজ্যে প্রস্তুত যাবতীয় শিল্প দ্রব্য "Crafts and Industries—সংগ্রহ করিয়া বিক্রয়ের জন্য এক স্থানে রাখিয়া দিয়াছেন। এইখানে হস্তি-দন্ত ও চন্দন-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত খেলানা প্রভৃতি যে সকল জিনিস দেখিলাম, সেগুলি অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্যের পরিচায়ক। মহিসুর রাজ্যের একটি বিশেষ সম্পদ—চন্দন তরু। গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালোরে চন্দন তৈলের কারখানা স্থাপন করিয়া এই বনজ সম্পদের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিতেছেন। আমার একজন সঙ্গী, কারখানা হইতে এক শিশি চন্দন-তৈল ও কিছু চন্দন কাষ্ঠের গুঁড়া আমাকে ক্রয় করিয়া দিলেন। মহিসুর-গবর্ণমেণ্টের সাবানের কারখানার "চন্দন সাবান" ভারতের নানা স্থানে সমাদর লাভ করিয়াছে।

বৃষ-মন্দির

মহিসুর মহারাজের আগ্রহে ও আনুকূল্যে, মহাত্মা টাটার অক্ষয়-কীর্ত্তি—Indian Research Institute নামক বিজ্ঞান-মন্দির বাঙ্গালোরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের শান্তি-নিকেতন আশ্রমের ন্যায় এই বিদ্যাপীঠ লোকালয় হইতে ঈষৎ দূরে বিস্তীর্ণ প্রান্তরমধ্যে অবস্থিত। স্থানটির নাম—'হেব্বল';—ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশন হইতে প্রায় ৩॥ মাইল পথ। কেন্দ্রবর্ত্তী প্রধান অট্টালিকার উচ্চ গম্বুজ বহু দূর হ'তে দৃষ্টিগোচর হয়। এই বিদ্যা-নিকেতনে ছাত্রদের বাসের জন্য দুইটি গৃহ এবং প্রত্যেক অধ্যাপকের জন্য উদ্যান-সংযুক্ত এক-একখানি "বাংলো" নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ৩০ জন ছাত্র এখানে থাকিয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিতেছেন—বাঙ্গালী ছাত্রও দু একটি আছেন। অধ্যাপকের সংখ্যা বেশী নহে; ইঁহারা সকলেই য়ুরোপীয় এবং য়ুরোপীয় পণ্ডিত-সমাজে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ। আমি যখন বাঙ্গালোর গিয়াছিলাম, তখন গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বিজ্ঞান-মন্দির বন্ধ ছিল। এই জন্য ইহার কার্য্যপ্রণালী দেখিবার সুযোগ পাই নাই।
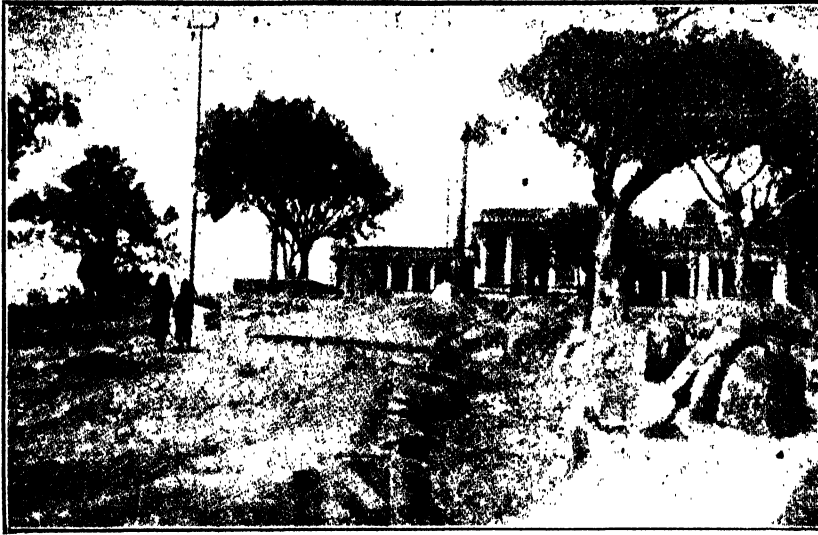
রেশমের কারখানা

বিজিতা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(৩১)

প্রভাতে সুষমা তুলসীতলাটী লেপিতেছিলেন, —পিসীমা তখনও শয্যা ত্যাগ করেন নাই,—মন্দা রন্ধনগৃহ পরিষ্কার করিতেছিল, ও পূর্ণিমা অন্য কক্ষগুলি ঝাঁট দিতেছিল,—সেই সময় কে বাহিরের রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিল "অমিয় ।"

"ওই দিদি, তোমার সেজো দেওর এসেছে।" বলিয়াই পূর্ণিমা হাতের ঝাঁটা ফেলিয়া গৃহমধ্যে লুকাইল। তাহার যে তখন খুব ভয় হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য।

সুষমা দরজা খুলিয়া দিলেন।

হাতে ব্যাগ লইয়া হাসিমুখে দাঁড়াইয়া রমেন্দ্র। হঠাৎ সুষমাকে দেখিয়াই তাহার মুখটা আরও হাসিয়া উঠিল। তখনি সে মুখ একেবারে অন্ধকার হইয়া গেল। এ কি, সুষমার হাত খালি কেন? সিঁথায় সে উজ্জ্বল সিন্দুর-রেখা কই,—সে দীপ্তিময়ী মূর্ত্তি কোথা গেল?

"বউদি! বউদি!"

তাহার হাত হইতে ব্যাগটা খসিয়া পড়িল, সে আর দাঁড়াইতে পারিল না; থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সে বসিয়া পড়িল।

এও কি সম্ভব—তাহার দাদা নাই! সে যে দাদার জন্য ত্যাগ পরিপূর্ণ করিয়া অর্থ আনিয়াছে—বউদির শূন্য গাত্র সজ্জিত করিবার জন্য গহনা লইয়া আসিয়াছে,—তাহার বড় সাধের লালপেড়ে শাড়ি, আলতা, সিন্দুর লইয়া আসিয়াছে! সে দাদাকে সুখী করিবার জন্য সব নেশা ছাড়িয়া দিয়া, কেবল অর্থোপার্জ্জনের দিকেই মন দিয়াছে,—আশাতীত উন্নতও করিতে পারিয়াছে। কিন্তু কোথায় তিনি, যাঁহার জন্য সে জীবন পণ করিয়া আপনার সঙ্গে নিয়ত যুদ্ধ করিয়াছে?

অধীর বালকের মত সে দুই হাতে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছিল—হায় হায়, কি করিল সে! মানুষের মত একটা কাজও সে করিতে পারিল না তো! চিরকাল কেবল মিথ্যা খেলাতেই দিন কাটাইল।

সেবার যখন বড়দার সহিত দেখা করিয়া সে যায়, তখন তাহার মনে প্রতিজ্ঞা জাগিয়াছিল,—সে যেমন করিয়াই হোক দাদাকে আবার বড় করিবে। দুই তিন মাস সে জ্বর আমাশায় খুব ভুগিয়াছিল; সেই জন্য সে দেওঘরে গিয়াছিল। সেখানে একটী সাহেবের সহিত তাহার পরিচয় হয়। নিজের চাকরী ছাড়িয়া সে সাহেবের কার্য্য লইয়া সিলোনে চলিয়া যায়। সেখান হইতে রীতিমত সে দেশে পত্র দিয়াছে; কিন্তু দেশের পত্র সে একখানিও পায় নাই। তাহার অর্থোপার্জ্জনের আশা পূর্ণ হইয়াছে,—কিন্তু বড়দার পায়ে অর্থ দেওয়া হইল কই? বউদির জন্য বড় সাধ করিয়া গহনা আনিল,—সে গহনা পরাইয়া প্রণাম করা হইল কই?

উচ্ছ্বসিত হইয়া সে কাঁদিতে লাগিল,—তাহার মনের কপাট যেন উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছিল।

সুষমার চোখও জলে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। চোখ মুছিয়া কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিলেন "বাইরে বসে পড়লে কেন ঠাকুরপো, বাড়ীর মধ্যে এস।"

রমেন্দ্র উঠিতে পারিল না।

সুষমা ডাকিলেন "সেজ ঠাকুরপো—"

রমেন্দ্র মুখ তুলিল,—তখনি মুখ নত করিল,—ঝর ঝর করিয়া আবার অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িল।

সুষমা বলিলেন "বাড়ীর মধ্যে এস ঠাকুরপো, বাইরে বসে থেক না।"

রমেন্দ্র মুখ মুছিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ব্যাগটা বাহিরে পড়িয়া রহিল দেখিয়া, সুষমা বলিলেন, "ব্যাগ আনলে না?"

রমেন্দ্র একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "ও আর কি হবে বড় বউদি, ওতে দাদার জন্যে—"

তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। সুষমা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া, ব্যাগ কুড়াইয়া আনিয়া বারাণ্ডায় রাখিয়া

বলিলেন, "কি করবে ভাই, মরণকে কেউ এড়াতে পারে না। আমাদের ক্ষমতা হ'ল না তাঁকে ধরে রাখতে; তিনি সুখী মানুষ এত দুঃখ কি সইতে পারেন?"

রমেন্দ্র চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "বড় দুঃখ রইল বড় বউদি, দাদাকে কোনও কথা বলতে পারলুম না। দুদিন তাঁর কাছে থাকব, সেবা করব, তা পারলুম না যে!"

সুষমা একটু নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "তিনি তোমায় পেয়ে সুখী হয়েছিলেন ঠাকুর পো,—সেবা আর কাকে বলে।"

রমেন্দ্র একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমি যে সিলোনে গেছি আমার পত্রে তা তো জেনেছিলে বউদি,—সেখানে একখানা টেলিগ্রাফ করতে পার নি?"

সুষমা বলিলেন "তখন তো জানিনি ঠাকুর পো তুমি সিলোনে গেছ। আমি তোমার মেসের ঠিকানায় টেলিগ্রাফ করেছিলুম। সিলোন হ'তে তোমার পত্র পেয়ে তার জবাবও তো দিয়েছি ঠাকুর পো,—কেন পাওনি তা কে জানে।"

রমেন্দ্র বলিল "কি হ'য়েছিল?"

সুষমা বলিলেন "অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য হঠাৎ অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে যান। তেমন ডাক্তারও ভাই রোগ চিনতে পারলে না।"

রমেন্দ্র উৎসুক হইয়া বলিল "চিকিৎসা হ'য়েছিল?

সুষমা ললাটে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "সব বলছি ভাই—সব বলছি। ছোট বউয়ের বালা বেচে পঞ্চাশটা টাকা পেলুম, সঙ্গে সঙ্গে দোকানদার এসে হাজির—সে বার টাকা পাবে। ওঁর ব্যারাম, পাছে কিছু হয়, টাকা না পায়, এই তার ভাবনা। দিলুম তার টাকা ফেলে। দু মাসের দুধের দাম, ডাক্তারের দুই টাকা করে ভিজেট, আর ওষুদের দাম,—কোথা হ'তে এত জোটে ভাই বল। কপাল খারাপ না হ'লে আর এমন হয়? দুদিনে কোথায় চলে গেল টাকা, আবার যে অবস্থা তাই হ'ল। তিনি দুঃখের মধ্যেই যাবেন যে, অনাটন তাঁর মৃত্যুশয্যারও সাথী হ'বে যে। ডাক্তার বলেছিল, শুধু বেদানার রস ঝিনুকে করে মুখে দিতে; কোথা পাব ভাই বেদানা? একটু করে সাবু নিয়ে মুখে দিতুম, সময় সময় তাতে যে একটু মিষ্টি দেব তাও জোটে নি।"

রমেন্দ্র দুই কাণে হাত চাপা দিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "আর বোলো না আর বোলো না বউদি; তোমার পায়ে পড়ি থেমে যাও। ও জ্বলন্ত সত্য কথাগুলো আর আমি শুনতে চাইনে! ওরে নিষ্ঠুর ভাগ্য, এমনই করেছিলি তুই লক্ষপতিকে, এমনই দীনাবস্থায় তাঁকে মরণের হাতে সঁপে দিলি?" তাহার কণ্ঠ আবার রুদ্ধ হইয়া আসিল।

সুষমা অঞ্চলে চোখ মুছিতে মুছিতে ভগ্ন কণ্ঠে বলিলেন, "তার পরে শ্মশানের খরচ যে দেব, তেমন একটা পয়সা হাতে নেই ঠাকুর পো। অমিয়র হাতে যে কবচটা ছিল তাই—"

রুদ্ধ কণ্ঠে রমেন্দ্র বলিয়া উঠিল "থাম বউদি, এমন নিষ্ঠুর ভাবে আমায় হত্যা কর না। দাদা, দাদা, তোমার কৃতি তিন ভাই বর্ত্তমান, তুমি এমন করে ভিখারীর মত চলে গেলে অথচ আমরা বড়লোক?"

সে দুই হাতে মুখ ঢাকিল, তাহার করাঙ্গুলি ভেদ করিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

একটু শান্ত হইয়া সে বলিল, "বউদি, আমি যে টাকা পাঠাতুম প্রতি মাসে, বড়দা কেন তা নিতে আবার অস্বীকার করেছিলেন জানো?"

সুষমা বলিলেন "তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল, কারও অর্থ নেবেন না।"

গৃহমধ্যস্থা পিসীমার কাণে রমেন্দ্রের কথা যাইবামাত্র, তিনি আছড়াইয়া পড়িয়া যোগেন্দ্রের নাম করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বাড়ীতে আবার ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গেল।

সুষমা প্রথমে শান্ত হইয়া সকলকে থামাইলেন। অন্য বিষয়ের অবতারণা করিয়া স্বামীর কথাটা তখনকার মত চাপিতে চাহিলেন,· "ব্যাগে কি আছে, খোল না ঠাকুর পো।"

চাবিটা রুমাল সুদ্ধ তাঁহার দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া রমেন্দ্র বলিল, "তুমি খোল বউদি,—ওতে যা আছে তা তোমাদেরই। আমি আর ওতে হাত দেব না।"

সুষমা ব্যাগ খুলিয়া ফেলিলেন। প্রথমেই নোটের তাড়া বাহির হইল। রমেন্দ্র বলিল, "ওই ষোল হাজার টাকা দাদাকে দেব বলে এনেছিলুম বউদি, দাদা নিলেন না।"

সুষমা সেগুলা নামাইয়া রাখিতে রাখিতে বলিলেন, "তিনি ঠিক নিজের প্রতিজ্ঞা পালন করে গেছেন ঠাকুর-পো। বেঁচে থাকতে তোমার যে টাকা পেয়েছিলেন, তা জমা দেওয়া ছিল, ছোট ঠাকুর পোর টাকাও ছিল, শ্রাদ্ধের সময় আমি সে সব নিয়েছি। তিনি তাঁর নিজের উপার্জ্জনেই কাটালেন, কারও এক পয়সাও নেন নি।"

রমেন্দ্র আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল

গহনার বাক্স খুলিয়া সুষমা বলিলেন "এ দুই প্রস্থ গহনা কার ঠাকুর পো ?"

রমেন্দ্র নত মুখে বলিল "তোমার আর ছোট বউমার জন্যে এনেছিলুম বউদি। সকল জিনিসই দুই প্রস্থ করে আছে। বড় ইচ্ছে ছিল তোমাদের দুজনকে মনের সাধে সাজাব, তোমায় প্রণাম করব, বউমাকে আশীর্ব্বাদ করব। কিন্তু আমার কোন সাধই মিটল না বউদি !"

পিসীমা আবার সুর তুলিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। সুষমা তাঁহাকে থামাইয়া বলিলেন, "যা হবার তা তো হয়েই গেছে ভাই, সে জন্যে আর ভেবে কি করবে ? এ তো মানুষের হাত নয় ঠাকুর পো, যে কথা বলবে। মেজঠাকুর পো যখন সব ঠকিয়ে নিলে, তখন সকলেই অনেক কথা বলেছিল। কিন্তু এই যে মরণ এসে এত লোকের চোখের সামনে এক কথায় অমূল্য প্রাণটাকে নিয়ে চলে গেল, কেউ তাতে একটা কথাও বলতে পারলুম না। যাক্, এ সব তো আমাকেই দিলে ?"

রমেন্দ্র এ কথার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিল না বলিল, "তোমাকেই দিলুম বড় বউদি, তুমি এখন ছোট বউমাকে পরিয়ে দাও—আর এক সুট যা খুসি তাই কর। অমিয়ের বউ আসবে, তার জন্যে ওই সুটটা তুলে রাখ।"

"সে আমি যা খুসি তাই করব'খন" বলিয়া সুষমা আবার ব্যাগের মধ্যে সবগুলি তুলিয়া গৃহে রাখিয়া আসিলেন।

দুপুর বেলা আহারাদির পর রমেন্দ্র একটু ঘুমাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, সেই সময় মন্দাকে তাহার প্রদত্ত গহনা ও কাপড়ে সাজাইয়া লইয়া সুষমা তাহার গৃহে প্রবেশ করিলেন। একটু হাসিয়া বলিলেন, "এই দেখ ভাই, ছোট বউকে সব পরিয়ে কেমন দেখাচ্ছে।"

"বেশ ক'রেছ বউদি, বউ মাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে—ঠিক যেন আমার লক্ষ্মীমাটী।" রমেন্দ্র উঠিয়া বসিল। মন্দা তাহার পায়ে মাথা রাখিল। রমেন্দ্রের মনে হইল, যেন দুই ফোঁটা জল তাহার পায়ের উপরে ঝড়িয়া পড়িল। তাহার মনটাও বড় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে সজল নয়ন অন্যদিকে ফিরাইয়া, তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলাইয়া, মন্দাকে আশীর্ব্বাদ করিল।

ধীরে ধীরে মন্দা চলিয়া গেল। রমেন্দ্র সজল নয়নে তাহার পানে চাহিয়াছিল। যখন সে চলিয়া গেল, তখন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তোমায় এমন মনের মত সাজে সাজিয়ে পায়ের ধুলো নিতে পারলুম না বউদি, এই বড় দুঃখ রইল। যাই হোক, গহনাগুলো রেখে দাও বউদি। অমিয় সতের আঠার বছরের হলেই, তার বিয়ে দিয়ে বউ মা এনে নিজের হাতে মাকে আমার সাজাব।"

সুষমা বলিলেন "ওগুলো তো আমাকেই দিয়েছ ভাই, আমি যদি কাউকে দি, তাতে কোনও আপত্তি আছে তোমার ?"

বিস্মিত হইয়া রমেন্দ্র বলিলেন, "আপত্তি আমার কিসের থাকবে ? তোমার জিনিস, তুমি যাকে খুসি তাকে দাও,—ওতে আমার কোনও অধিকার নেই। অমিয়ের বউয়ের জন্যে আমি আরও ভাল গয়না গড়াব, সেতো জানা কথা। তুমি কাকে দেবে সেটা বলতে কি কোনও আপত্তি আছে বউদি ?"

সুষমা বলিলেন, "আপত্তি কিসের ঠাকুর পো ? আমি যাকে সব দিচ্ছি তাকে এনে দেখাচ্ছি—"

তিনি চলিয়া গেলেন এবং খানিক পরেই অবগুণ্ঠনবতী পূর্ণিমাকে সঙ্গে লইয়া ফিরিলেন।

সে কিছুতেই এ কাপড় গহনা পরিতে চায় নাই,—সুষমা তাহাকে জোর করিয়া পরাইয়া দিয়াছেন। তাহাকে জোর করিয়াই টানিয়া আনিতে হইয়াছে—সে কিছুতেই আসিতেছিল না। ভয়ে ও লজ্জায় পূর্ণিমার বক্ষ কাঁপিতেছিল,—মুখ সাদা হইয়া উঠিয়াছিল।

রমেন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "বাঃ, এ কি বউদি—তুমি—"

সুষমা রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "মাপ কর ভাই। সেজ বউকে কাল রাত্রে তুমি তাড়িয়ে দিয়েছিলে, আমি তাকে কুড়িয়ে এনেছি। এ সে সেজবউ নয়,—সে দাম্ভিকা

সেজবউয়ের মৃত্যু হ'য়েছে। আমি যাকে তোমার কাছে এনেছি, তাকে নূতন বলেই ধারণা করে নাও। ভুলে যাও ভাই—আগেকার সব কথা ভুলে যাও। তোমার স্ত্রী তোমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে এসেছে, তাকে ক্ষমা কর। সে আজ তোমার শরণাগত। একে যদি আশ্রয় না দাও, তোমার স্বর্গীয় ভাই কখনই সন্তুষ্ট হইতে পারবেন না। সকলকে সুখী করলে,—একে কেন সে সুখ হতে বঞ্চিত করবে ভাই?"

তাঁহার চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল। পূর্ণিমাকে সামনের দিকে ঠেলিয়া দিয়া তিনি বলিলেন, "এগিয়ে যা সেজবউ, আর পিছিয়ে থাকা তোর সাজবে না। যা বলেছিস, যা করেছিস, তার জন্যে পায়ে ধরে ক্ষমা চা। মনে রেখে দিস্ আমার কথা, স্বামীর তুল্য দেবতা হিন্দু মেয়ের আর নেই।"

চোখ মুছিতে মুছিতে তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। পূর্ণিমা অবগুণ্ঠন তুলিয়া ফেলিয়া স্বামীর পায়ে লুঠাইয়া পড়িল; চোখের জলে পা দুখানা সিক্ত করিয়া দিয়া বলিল, "আমায় ক্ষমা কর। আমি আগে বুঝতে পারিনি তুমি কি, এখন বুঝতে পারছি। মিছে অভিমানে মত্ত হয়ে তোমায় কত না কটু কথা বলেছি। একদিনও একটা ভাল কথা, ভাল ব্যবহার আমার কাছ হ'তে—পাওনি তুমি, আজ আমার সে সব দোষ ক্ষমা কর।"

রমেন্দ্র উত্তর করিল, "আর তো সে সব ভুলতে পারা যাবে না পূর্ণিমা।"

পূর্ণিমা অধীর হইয়া তাহার পা দুখানা চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ওগো, আর আমায় শাস্তি দিয়ো না, আমার খুব শাস্তি হয়েছে। কি করে তোমায় জানাব, কি জ্বালায় জ্বলছি আমি। আমি যা করেছি, তার ফলও খুব পেয়েছি; সকল গর্ব্ব, সকল দর্প আমার চূর্ণ হয়ে গ্যাছে। আজ আমি নিজেকে বড়দির দাসী মনে করেও গৌরবান্বিত মনে করছি।"

রমেন্দ্র বলিল "পারছ কেমন করে? আমি আগে যখন বলেছিলাম, তখন যে বড় রাগ করেছিলে! তুমি আজ কেমন করে নিজেকে এত হীন করলে পূর্ণিমা?"

পূর্ণিমা ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, "তোমার পায় পড়ি, আর সে সব কথা তুলো না। আমি যা করেছি, তা ভেবে নিজেই বড় অনুতপ্ত হচ্ছি। বড়দিদি আমায় মাপ করেছেন,' তুমি আমায় মাপ করবে না কি?"

গম্ভীর হইয়া রমেন্দ্র বলিল "বউদিদি যখন তোমায় মাপ করেছেন' পূর্ণিমা, তখন আমার আর কোন কথা বলবার যো নেই। এখন চিনেছ কি তাঁকে?"

রুদ্ধ কণ্ঠে পূর্ণিমা বলিল "খুব চিনেছি।"

(৩২)

আকাশে নিবিড় মেঘ করিয়া আসিয়াছিল। দুপুরবেলা খানিক ঘুম দিয়া উঠিয়াই পিসীমা আকাশ পানে চাহিলেন, "ও পোড়াকপাল আকালকূল মেঘ করে এসেছে। বাইরে কাপড়গুলো আর ঘুঁটেগুলো পড়ে আছে, সেগুলো তুলতে হবে যে।"

মন্দা আপন মনে একখানা বই পড়িতেছিল। কথাটা কাণে আসিবামাত্র, সে তাড়াতাড়ি বই রাখিয়া বাহির হইল।

আপন মনেই সে কাপড় তুলিতেছিল,—হঠাৎ দেখিল, দরজার উপর অনিন্দ্যসুন্দরী একটা যুবতী দাঁড়াইয়া। অপরিচিতা মন্দাকে দেখিয়া সেও আর অগ্রসর হইতে পারিতেছি না।

মন্দা দেখিল, যুবতী বিধবা; তাহার মুখখানি বড় মলিন, যেন সান্ধ্য পথের মত বিষণ্ণ। চোখের পাতা যেন তার অশ্রুসিক্ত। মন্দা এক দৃষ্টিতেই তাহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত দেখিয়া লইল,—তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন বিষাদে পূর্ণ।

অমিয় বারাণ্ডায় নিবিষ্ট চিত্তে লাটাম ঘুরাইতেছিল; দরজার উপর দৃষ্টি পড়াতেই, সানন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওমা, মাসীমা এসেছে; আমার মাসীমা এসেছে গো—গো—"

বারান্দা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ছুটিয়া গিয়া সে প্রতিভাকে জড়াইয়া ধরিল।

সুষমা তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, প্রতিভা অমিয়কে বুকে টানিয়া লইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিতেছে।

সুষমা নামিয়া আসিয়া তাহার সম্মুখে আসিতেই, সে মুখ তুলিল—তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল,—সে একটা কথাও কহিতে পারিল না।

বহু দিনের পর তাঁহাকে হঠাৎ দেখিতে পাইয়া

সুষমার চোখও শুষ্ক রহিল না। অনেকক্ষণ তিনিও কথা কহিতে পারিলেন না।

পিসীমা বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "ও মা তাই তো; প্রতিভাই তো! এ কি বিচ্ছিরি আকার হয়েছে, মোটে যে চেনাই যাচ্ছে না। আরও ঢেঙা হয়েচে, গায়ের রংও কাল হ'য়ে গেছে।"

সুষমা প্রতিভার হাত ধরিয়া বলিলেন, "আয় এখানে দাঁড়িয়ে রইলি কেন?"

তিনি তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া বারাণ্ডায় বসাইলেন। নিজে তাহার পার্শ্বে বসিয়া, তাহার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিলেন, "এত রোগা হ'য়ে গেছিস কেন প্রতিভা?"

প্রতিভা চোখ মুছিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "জ্বর হয়েছিল।"

পিসীমা সস্নেহে তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া বলিলেন, "আহা, কি চেহারা ছিল, আর কি চেহারা হয়েছে। বড় বড় চোখ দুটোই কেবল মুখখানার মধ্যে ড্যাবড্যাব করচে; হাত-পা-গুলো কির কির করছে, গলার কণ্ঠা বেরিয়ে পড়েছে। হ্যাঁরে, সেখানে না কি বড় কষ্ট দেয় তোকে?"

প্রতিভা ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "না, কষ্ট আর কি।"

সুষমা তাহার ক্ষীণস্বর শুনিয়াই বুঝিলেন; একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তোর মাথা কোথা ফেটেছে, দেখি।"

প্রতিভা বিস্মিতা হইয়া তাঁহার পানে চাহিল। তাহার মাথা ফাটার খবরটা যে কি করিয়া ইঁহারা পাইলেন, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। সুষমা তাহার বিস্মিতভাব দেখিয়া বলিলেন, "আমি সব শুনেছি; শুনতে আমার কিছু বাকি নেই। তোর ভাসুর-পো তোকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছিল,—তুই অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলি। আমি এ খবর যদিন পেলুম, সেই দিনই তোর দাদাবাবুর ব্যারাম হয়। তার পর এ তিন মাস তো সেই সব হ্যাঙ্গামাতেই কেটে গেল। মনে কেবল ভাবছি, কাকে পাঠাই তোকে আনতে। ছোট ঠাকুর-পো তোর শ্বশুর বাড়ী চেনে বলে তারই প্রত্যাশায় বসেছিলুম। সে আজ চার-পাঁচ দিন বাড়ী এসেছে। শরীর খারাপ বলে এ কয় দিন যেতে পারে নি। কাল খাওয়া দাওয়ার পরে তার এখান হতে যাবার কথা। তুই কি করে কার সঙ্গে এলি প্রতিভা?"

প্রতিভা উত্তর দিল না, মুখ নীচু করিয়া রহিল। সুষমা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল না তুই কার সঙ্গে এলি? তারা যে রকম লোক—বড়-বউ পাঠালে যে তোকে?"

প্রতিভা বলিল, "তারা পাঠিয়েছে বুঝি?"

সুষমা বলিলেন, "তবে—?"

প্রতিভা বলিল "আমি পালিয়ে এসেছি।"

সুষমা বলিলেন, "একা?"

প্রতিভা বলিল, "হ্যাঁ—একা!"

সুষমা স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। প্রতিভা হঠাৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া বলিল, "আমার অপরাধের এমন কঠিন দণ্ড দিলে দিদি,—আমি যে করে দিন কাটিয়েছি সেখানে, তা একবার জানতেও নেই? দেখ দেখি আমার পিটটা—"

পিঠের কাপড় সে তুলিয়া ধরিতেই, কাল কাল দাগ-গুলা সুষমার চোখের উপর ফুটিয়া উঠিল। চমকিয়া উঠিয়া তিনি বলিলেন, "এ কি প্রতিভা, কে মেরেছে এমন করে?"

রুদ্ধকণ্ঠে প্রতিভা বলিল, "আমার ভাসুর-পো!"

সুষমা বলিলেন, "কেউ তাকে ধরে নি?"

প্রতিভা চোখ মুছিয়া বলিল, "হ্যাঁ, ধরবে আবার? কে বলেছে আমি খারাপ, ছোড়-দার—"

বলিতে বলিতে সে আবার কাঁদিয়া উঠিল। সুষমা নিজের অঞ্চলে তাহার মুখ মুছাইয়া দিতে লাগিলেন।

এত অত্যাচার মানুষে সহ্য করিতে পারে! সে পলাইয়া আসিয়াছে, বেশ করিয়াছে। সেখানে থাকিলে কোন্ দিন তাহারা ইহাকে খুন করিয়া ফেলিত, তাহার ঠিক কি।

নিজের কঠোরতা ভাবিয়া তিনি ভারি লজ্জিতা হইয়া উঠিলেন; নিজের উপর ক্রুদ্ধা হইয়া উঠিলেন। তিনিই তো প্রতিভাকে জোর করিয়া সেখানে পাঠাইয়াছিলেন। যদি না পাঠাইতেন, কোনও কষ্ট তাহাকে সহ্য করিতে হইত না।

প্রতিভার ললাটের চূর্ণ অলক-গুচ্ছ সরাইয়া দিতে দিতে তিনি বলিলেন, "বেশ করেছিস, পালিয়ে এসেছিস! কিন্তু একলা কি করে এলি,—এ সাহস্ তোকে কে দিলে তাই ভাবছি আমি।"

এ সাহস কে দিয়াছে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। বেশী অত্যাচার যেখানে, দুর্ব্বলের বুকে সেখানে শক্তি জাগিয়া উঠে; অত্যাচারই তাহাকে অসমসাহসিক করিয়া তোলে,—সে আর কিছুতেই ভয় করে না।

পিসীমা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আহা, দুধের মেয়ে বাছা কিছু জানে না। শুধু শুধু তাকে এতটা শাস্তি দেওয়া। তখনই হাজার বার বললুম বড়-বউমাকে, পাঠিয়ো না বাছা, পাঠিয়ো না। যোগেন না হোক হাজার বার বারণ করলে, কারুর ত কথা শোনা হ'ল না। মেয়েটাকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া বই আর কি। এই মার-ধোরগুলো কপালে ছিল, খণ্ডাবে কে?"

সুষমা বলিলেন, "আমি যে এত দিন এত পত্র দিলুম, তার একখানারও জবাব দিস নি কেন প্রতিভা? আমি ভাবছিলুম, তুই বুঝি আমার উপরে রাগ করে পত্র দিস নে।"

বিস্ফারিত চক্ষে প্রতিভা বলিল, "কই, তোমার পত্র তো একখানাও আমি পাই নি। আমি তোমাকে গিয়ে পর্য্যন্ত এত পত্র দিইছি, তার একখানিও পাও নি তুমি?

সুষমা বলিলেন, "না।"

প্রতিভা একটু নীরব থাকিয়া বলিল, "এবার বুঝেছি দিদি, কেন আমায় ওরা নির্য্যাতন করত। আমার দেওয়া পত্র আর তোমার দেওয়া পত্র সব আমার ভাসুর পড়তেন, তাতেই তিনি সব কথা জানতে পেরেছেন।"

সুষমা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তুই বলিস কিরে? ভাসুর হয়ে ভাদ্রবধূর পত্র—"

বাধা দিয়া সবেগে প্রতিভা বলিয়া উঠিল, "সে কাণ্ডজ্ঞান ওদের কারও নেই দিদি, ওরা সব পারে।"

তাহার শুষ্ক মুখখানার পানে চাহিয়া সুষমা বলিলেন, "আজ বুঝি তোর খাওয়া-দাওয়া হয় নি প্রতিভা?"

ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিভা বলিল, "আমি কালও কিছু খাই নি দিদি।"

"খাস্ নি?" মন্দার দিকে ফিরিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে সুষমা বলিলেন, "ছোট বউ, এই আমার ছোট বোন। একে স্নান করিয়ে নিয়ে আয়,—আমি ততক্ষণ রান্না চাপিয়ে দিইগে।"

সমবয়স্কা প্রতিভাকে দেখিয়া মন্দার বড় আনন্দ হইতেছিল।

তখনি কাপড় গামছা তৈল আনিয়া বলিল, "এস ভাই।"

অমিয় মাঝখানে লাফাইয়া পড়িয়া চোখ পাকাইয়া বলিল, "ইস! এ আমার মাসীমা। আমি নিয়ে যাচ্ছি মাসীমাকে। এস মাসীমা, আমার সঙ্গে চল।"

প্রতিভা একটু হাসিয়া বলিল, "তোর মাসীমা আমি তো হয়েই আছি,—ছোট বউয়েরও বোন হই যে আমি, তা জানিস্ নে বুঝি।"

স্নান করিয়া লইতে লইতে প্রতিভা মন্দার অনেক কথা জানিয়া লইল। কখন যে একটা দীর্ঘশ্বাস প্রায় তাহারও অজ্ঞাতে বাহির হইয়া গেল, তাহা মন্দা জানিতে পারিল না।

প্রতিভাকে আহারে বসাইয়া সে স্বামীকে খবর দিতে ছুটিল। শৈলেন তখনও নিজের কক্ষে পড়িয়া ঘুমাইতেছিল, প্রতিভার আগমন-বার্ত্তা সে কিছুই জানিতে পারে নাই।

দরজাটা খুলিয়া অতি সন্তর্পণে ভেজাইয়া দিয়া মন্দা শৈলেনের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল; একটা ধাক্কা দিয়া বলিল, "বাদলা মাথায় আর ঘুমুতে হবে না, ওঠো। বেলা তিনটে বেজে গেল, এখনও ঘুম ভাঙ্গে না,—এদিকে নাকে কাঁদবেন অসুখ করেছে।"

শৈলেন ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল; চোখ মুছিয়া স্ত্রীর পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "আমার ঘুমটাও তোমার সয় না,—ভারি হিংসুটে হয়েছ তুমি মন্দা।"

মন্দা হাসিল, "তা বই কি, অসুখ হ'লে তখন দেখবে কে? এদিকে তো আজ মাথাধরা, কাল পা হাত কামড়ানো, পরশু জ্বর আসছে—"

শৈলেন বলিল, "তা সত্যি বটে; তিনটে বেজেছে বলছ,—এই তো মাত্র দেড়টা।"

মন্দা বলিল, "না হয় আর দেড় ঘণ্টা বাড়িয়েই দিলুম।"

শৈলেন হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিয়া

বলিল, "তুমি মিথ্যাবাদী হয়েছ,—এর জন্যে তোমায় শাস্তি দেওয়া খুব দরকার। সরে যাচ্ছ যে বড়, এদিকে এস।"

মন্দা আরও সরিয়া গিয়া বলিল, "তা বই কি। শাস্তি নেবার ইচ্ছে আমার মোটেই নেই; আমি কখনো ধরা দেব না।"

শৈলেন হাসিল; মন্দা বলিল, "দেখ এসে, কে এসেছে!"

বিস্মিত হইয়া শৈলেন বলিল, "কে এসেছে?"

মন্দা বলিল, "দিদির ছোট বোন।"

দিদির ছোট বোন! শৈলেনের বুকটা সবলে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। সে বিস্ফারিত নেত্রে স্ত্রীর পানে চাহিল।

মন্দা বিদ্রূপের সুরে বলিল, "আহা, যেন জানেন না কিছু,—একেবারে আকাশ হতে পড়লেন! বড়দির বোন প্রতিভাকে চেন না তুমি,—সে তো আগে এখানেই ছিল।"

শৈলেনের মুখ অন্ধকার হইয়া আসিল। জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "চিনেছি।"

মন্দা নিকটে সরিয়া আসিল; তাহার মুখখানার দিকে চাহিয়া বলিল, "হঠাৎ এ রকম হয়ে গেলে কেন?"

শৈলেন বিষণ্ণ স্বরে বলিল, "কি রকম?"

মন্দা বলিল, "কি রকম? হঠাৎ তোমার হাসিখুসি সব মিলিয়ে গেল,—জগতের অন্ধকার সব নেমে এসে তোমার মুখে জমা হ'ল। এ রকম হবার মানে?"

শৈলেন কষ্টে এক টুকরা হাসি মুখে টানিয়া আনিয়া বলিল, "কিছু নয় মন্দা, তুমি যাও,—আমার মাথাটা বড্ড ধরেছে। আর খানিকটা শুয়ে থাকলেই ছেড়ে যাবে এখন। হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে বড্ড খারাপ কাজ করেছ তুমি।"

বুদ্ধিমতী মন্দা এ কথায় ভুলিল না,—তাহা লক্ষ্য কিছু এড়াইয়া যাইবার যো ছিল না। প্রতিভার নাম শুনিয়াই তাহার স্বামী এত বিমর্ষ হইয়া পড়িল কেন, ইহার মূলে কি আছে? তাহার স্বামীর নাম শুনিয়া প্রতিভাও যে কেমন সচকিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা তাহার মনে পড়িয়া গেল। তাহার পর প্রতিভা কেবল তাহার স্বামীর কথাই শুনিয়াছে; বুঝি বড় বড় চোখ দুইটা তাহার একবার অশ্রুভারে নমিত হইয়া পড়িয়াছিল, মন্দা তখন নিজের নেশাতেই উন্মত্তা ছিল, প্রতিভার ভাব লক্ষ্য করিবারও মত অবকাশ তাহার খুবই কম ছিল।

স্বামীর ভাব দেখিয়া মন্দার উৎসাহপূর্ণ প্রাণটা হঠাৎ দমিয়া গেল,—সে আস্তে আস্তে ফিরিয়া গেল। যাওয়ার সময় যে দীর্ঘশ্বাসটা ফেলিয়া গেল, সমস্ত ঘরখানা জুড়িয়া তাহাই কেবল জাগিয়া রহিল।

তাঁহার সে নিঃশ্বাসের শব্দে সচকিত শৈলেন মুখ তুলিল। কি একটা কথা বলিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া সে ডাকিল "মন্দা"—

কিন্তু মন্দা ততক্ষণে সরিয়া গেছে।

শৈলেন শুইয়া পড়িল, বালিশের মধ্যে মুখ লুকাইয়া সে চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

সে আসিয়াছে; না ডাকিতেই সে আপনি আসিয়াছে। শৈলেন যে তাহার কাছে বড় অপরাধী,—শৈলেন যে তাহার মনে একটা দাগ আঁকিয়া দিয়াছে।

শৈলেনের বুকেও কি সে দাগ অঙ্কিত নাই;—শৈলেন কি তাহাকে ভুলিয়াছে? শৈলেন তাহাকে সমস্ত দিয়াছে,—মন্দা তাহার কাছে পাইয়াছে মৌখিক আদর মাত্র। আজ সে প্রতিভার আগমন সংবাদ পাইয়া বড় সশঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে,—পাছে মন্দার কাছে সে ধরা পড়িয়া যায়। নিজের হৃদয়ের উপরে মিথ্যার যে আবরণটা দিয়া রাখিয়াছে সে, পাছে সে আবরণটা উন্মোচিত হইয়া প্রকৃত সত্যটা বাহির হইয়া পড়ে।

কত কষ্টে সে যে বাঁধ দিয়াছিল, তাহা প্রকৃতই বালির বাঁধ,— তাই সামান্য একটা তরঙ্গাঘাতে ভাঙ্গিয়া একাকার হইয়া গেল। হৃদয়ের স্রোত তাহার চোখে মুখে চলকাইয়া আসিয়া তাহাকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

বৈকালে সে গৃহ হইতে বাহির হইতেছিল, সামনেই পড়িল প্রতিভা। তাহার পানে চাহিবামাত্র শৈলেনের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল; সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। প্রতিভাও তাহাকে দেখিবামাত্র দ্রুতপদে সরিয়া পড়িল।

এ দৃশ্য মন্দার চোখ এড়াইল না, তাহার প্রাণের মধ্যে কি এক অব্যক্ত বেদনা জাগিয়া উঠিল।

প্রতিভা শৈলেনকে দেখিয়া এমনিই নিঃশব্দে সরিয়া যাইত—শৈলেনের সম্মুখে কেহ তাহাকে দেখিতে পাইত না।

সে দিন সে কক্ষমধ্যে বসিয়া একখানা কাঁথা সেলাই করিতেছিল,—নিকটে ছিল কেবল মন্দা, আর কেহ ছিল না। মন্দা তাহার অনিন্দ্য সুন্দরী মুখখানার পানে চাহিয়া কি ভাবিতেছিল, তাহা সেই জানে।

প্রতিভার হাতের সূতা ফুরাইয়া যাওয়ায়, সূতা পরাইবার প্রয়োজন হওয়াতে এই সময়ে সে মুখ তুলিল; দেখিল, মন্দা তাহারই পানে চাহিয়া আছে। একটু হাসিয়া সে বলিল "কি দেখছ ভাই?"

মন্দা চমকাইয়া উঠিয়া মুখ নত করিল, "কিছু না।"

প্রতিভা সূচে সূতা পরাইতে পরাইতে বলিল, "আমার কাছে দুখানা বই আছে,—রোজ মনে ভাবি তোমায় দেব,—তা আর সে অবকাশ হয়েই উঠছে না। আজ ভাই মনে করে চেয়ে নিয়ো দেখি।"

মন্দা উৎসুক হইয়া বলিল "কি বই?"

প্রতিভা সেলাই করিতে করিতে বলিল, "একখানা 'সাবিত্রী সত্যবান' আর একখানি 'সতী'।"

মন্দা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "ও বই আমার আছে।"

প্রতিভা মুখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "তবে নেবে না সে বই দুখানা তুমি?"

মন্দা বলিল "না, আর দরকার নেই।"

সে অমিয়ের মুখে আগেই শুনিয়াছে, সে বই দুখানা কে প্রতিভাকে দিয়াছে। অভিমানে তাহার বক্ষ ভরিয়া উঠিতেছিল। সে কেন সে বই লইবে? স্বামী যাহাকে উপহার দিয়া সুখী হইয়াছেন, মন্দা তাহার নিকট হইতে তাহা দান স্বরূপ লইতে চাহে না।

প্রতিভা সেলাইয়ে মনোযোগ দিয়া বলিল "বেশ—আমার কাছে থাক।"

উভয়ে আবার নীরব। মন্দার বুকের মধ্যে যে কথাটা ঠেলিয়া উঠিতেছিল, কোনও ক্রমে সেটা সে ব্যক্ত করিতে পারিতেছিল না, অথচ না বলিতে পারিলেও সে শান্তি পায় না। সে স্পষ্ট জানিতে চায়, প্রতিভা ও শৈলেনের মধ্যে সম্বন্ধ কি? যতক্ষণ না এটা জানিতে পারিবে, ততক্ষণ সে স্বামীর কাছে নিজেকে ধরা দিতেও পারিবে না।

অনেকক্ষণ পরে, মনের সব দ্বিধা, সব সঙ্কোচ কাটাইয়া ফেলিয়া সে বলিয়া উঠিল "একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি উত্তর দেবে ভাই? আমি জানি তুমি মিছে কথা বলবে না।"

প্রতিভা হাতের সূচ কাঁথায় ফুটাইয়া রাখিয়া মুখ তুলিয়া বলিল "কি কথা বল, সত্যি কথা নিশ্চয়ই বলব।"

মন্দা বলিল "তুমি আমার স্বামীকে ভালবাস?"

প্রতিভা নীরবে চাহিয়া রহিল।

মন্দা দৃঢ় কণ্ঠে বলিল "তিনিও তোমায় ভালবাসেন?"

প্রতিভা সংযত কণ্ঠে বলিল, "এ কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন ভাই? এর মানে আমি বুঝতে পারছি নে।"

মন্দা আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আমার মন যে সন্দেহে পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে, আমি সে সন্দেহকে কাটাতে চাই।"

প্রতিভা নতমুখে বলিল, "মিথ্যা বলব না,—তোমার সন্দেহ সত্যি।"

মন্দা অস্থির হইয়া বলিল, "তবে তো আমার কর্ত্তব্য-পালনও হয় না। আমি স্বামীর উপরে যে বিশ্বাস রেখেছিলুম, সবই তো তা হলে হারিয়ে ফেললুম।"

প্রতিভা শান্ত কণ্ঠে বলিল, "কেন হারাবে? আমার দিক আমি তোমায় দেখতে বলেছিনে,—এখন স্বামীর দিকটাই দেখতে বলছি। তোমার স্বামীর মনের ভাব কি, তাই জানতে পেরেছ বলে তোমার বিশ্বাস তুমি হারাবে? তুমি যদি যথার্থ ভালবেসে থাক, ভালবেসেই যাও। স্বামী ভাল কি মন্দ, তা যদি জেনে থাক, তাকে ভাল পথে ফিরাবার চেষ্টা কর। স্বামীকে মন্দ জেনে তুমি যদি রাগ করে দূরে সরে যাও, কর্ত্তব্য ভুলে যাও, তাতে তিনি আরও বেশী মন্দ হবার সুযোগ পাবেন যে। দেখছি আমি, প্রথমে তোমার মুখে যে আনন্দের দীপ্তি দেখতে পেয়েছিলুম, তা আর নেই, তোমার মুখ অন্ধকার হয়ে গেছে। আমি বুঝছি, তুমি স্বামীর কাছ হ'তে সরে গেছ। সাবধান, তফাতে যেয়ো না,—আরও কাছে যাও, একেবারে মিশে যাও তাঁর সঙ্গে। নিজের সব শক্তি জাগিয়ে তোলো, অনায়াসে একটা চিত্তজয় করতে পারবে। তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে আবার তোমারই কাছে ফিরে আসবেন।"

মন্দা নীরবে তাহার কথাগুলা শুনিয়া গেল। এ কথাগুলি তাহার প্রাণের সঙ্গে মিলিয়া গেল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, "আমি তাই করব ভাই,—তাঁকে ফিরাবার চেষ্টা করব। কিন্তু আমার চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়?"

প্রতিভা বলিল, "কেন ব্যর্থ হবে? সতীর প্রাণের কোন বাসনা কি অপূর্ণ থাকে? তা'হলে সতী সতীনাথকে পেতেন না, সাবিত্রী সত্যবানকে জীবিত করতে পারতেন না,—শৈব্যা মরা ছেলে ফিরে পেতেন না। আমায় যদি সত্যিই তিনি ভালবেসে থাকেন, সেই ভালবাসার নামে শপথ করে বলছি, সবটা তোমায় ফিরিয়ে দেব, তোমার কিছু আমি নেব না।"

মন্দা সজল চোখে বলিল, "না, আমি সে ভালবাসা চাইনে ভাই। তোমায় আমি বড্ড কষ্ট দিচ্ছি। আমরা দু বোনে সমানে সে ভালবাসা ভাগ করে নেব। আমি যা পেয়েছি, এই আমার যথেষ্ট, আর আমি চাইনে।"

প্রতিভা হাসিয়া বলিল, "আমি বিধবা বোন; কেউ আমায় ভালবাসলে তারও পাপ, আমারও পাপ।"

মন্দা জেদের স্বরে বলিল, "বিধবা কি তুমি? ইস, ঘিয়ের সঙ্গে সঙ্গে—"

"চুপ চুপ পিসীমা আসচেন—"

প্রতিভা আবার কাঁথা তুলিয়া লইল। মন্দা এ-জিনিসটা ও-জিনিসটা দুই একবার নাড়াচাড়া করিয়া, পিসীমা আসার একটু পরেই পলায়ন করিল। (ক্রমশঃ)

শরদাগমে

শ্রীনরেন্দ্র দেব

কোন্ অলকার আলোক প্রপাতে অবগাহী উঠে এলে
হে শরৎরাজ, একি রূপ আজ ত্রিভুবনে দিলে মেলে?
অরুণ কিরণে সিঞ্চিত তব কুঞ্চিত কেশদাম,
করুণ কান্ত কমনীয় মুখ অনিন্দ্য অভিরাম;
নির্ম্মল নীল নয়ন-প্রান্তে উজ্জ্বল জ্যোতি জাগে,
দীপ্ত তোমার দিব্য-মুরতি আনন্দ অনুরাগে
তরুণ তাপস, তনু-তটে তব নব-চম্পক প্রভা,
হোমশিখা প্রায় উন্নতকায় উদ্বাহু মনোলোভা,
পীত পবিত্র কৌষেয় বাস সোনালী উত্তরীয়,
ললাটে লিপ্ত চন্দন-লেখা ভুবন বন্দনীয়;
ওগো ঋত্বিক্ ঋতুকুল-ঋষি তব অর্চ্চন-বেশ
শুভ্র-শুচিতা সংযমে হেরি দেবতার উন্মেষ;
সুরু করিয়াছ একি মহারতি বিশ্ব-প্রকৃতি ঘিরে,
সপ্ত-বর্ণ রবি-কর-দীপ তব করে নাচে ধীরে,
কাশের চামর চৌদিকে আজ লীলায়িত লয়ে দোলে
অগুরু ধূপের সুগন্ধ বহে সুমন্দ হিল্লোলে,
তারি সুরভিত শুভ্র ধোঁয়া কি উঠেছে ধরণী বেয়ে,
লঘু মেঘ-রথে বলাকার প্রায় চলেছে আকাশ ছেয়ে?
রেখেছো ধৌত-ধরণীর পরে শ্যাম তৃণাসন পাতি,
বিশাল চন্দ্রাতপ-তলে জ্বেলে লক্ষ তারার বাতি,
জ্যোৎস্না-উজল আল্পনা আঁকা দেবীর পূজার পাটে,
পূর্ণ-সলিলা শত সরসীর ভরাঘট ঘাটে ঘাটে,
বাজে মাঝে মাঝে দামামা ডমরু গুরু গুরু গর্জ্জনে,
ঝরে ঝর্ঝর শান্তির ধারা ত্রিলোকের তর্পণে!
দামিনী দমকে চমকিয়া ওঠে তড়িৎ-খড়্গ তব,
অঞ্জলিপুটে বিপুল অর্ঘ্য অপূর্ব্ব অভিনব;
মৃণালের কোলে কমল কুমুদ কুরুবক করতলে
গরবী করবী সুরভি বিলায় কামিনী কেতকীদলে,
কুন্দ কলির মন্দার হার অপরাজিতার মালা
নন্দন-বন পারিজাতে আজ পূর্ণ পূজার ডালা!
কনক ধান্য-মঞ্জরী সনে নবীন দূর্ব্বাদল
তোমার রজত অর্ঘ্য-পাত্র করেছে সমুজ্জ্বল!
তব কণ্ঠের স্তুতি-গীতি-গাথা অরণ্য মর্ম্মরে,
শঙ্খ তোমার ধ্বনিত সঘনে দিগন্ত অম্বরে!
তোমার বিরাট পূজা-মণ্ডপে সুখ-মুখরিত দিশা
পুণ্য প্রভাত, প্রমোদ প্রদোষ উৎসবময়ী নিশা;
ডাকে যেন তারা ডাকে যেন আজ পরিচিত কোন্ সুরে
আয় ফিরে আয় হিয়ায় হিয়ায় মিলিবি কে সুরপুরে?
ফেলে সব কাজ ছুটে আয় আজ, বল্লভ বন্দনে,
দু'বাহু বাড়ায়ে দাঁড়ায়ে দুয়ারে দরদী যে দিন গোণে!

কাশীর বৈশিষ্ট্য

অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম-এ

'সা কাশী ত্রিপুরারিরাজনগরী পায়াদপায়াজ্জগৎ।'

বৎসরাধিক কাল পরে—[এই দীর্ঘকাল রোগ-শোকার্ত্ত লেখকের নিকট দীর্ঘতর প্রতীয়মান হইয়াছে]—আবার 'ভারতবর্ষে' দর্শন দিলাম, পাঠক-নারায়ণের নিকট অর্ঘ্য লইয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু যে স্ফূর্ত্তি ও আনন্দে আমোদর শর্ম্মার বেনামীতে 'বিষবৃক্ষের উপবৃক্ষে'র চাষ করিয়াছিলাম, 'বঙ্কিম চর্চ্চরী' বানাইয়াছিলাম এবং 'বিচিত্র বর্ণবোধে'র সচিত্র পরিচয় দিয়াছিলাম, অথবা স্বনামীতে 'বিবাহে বিবিধ বাধা' ঘটাইয়াছিলাম ও 'ধর্ম্মে মতি' স্থির রাখিয়াছিলাম, সে স্ফূর্ত্তি সে আনন্দ আর নাই। আবার যে শ্রম ও অধ্যবসায়-সহকারে 'সতীন ও সৎমা', 'মা', ছদ্মবেশ', 'সখী', 'প্রেমের কথা'ও 'বিধবা'-বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা মাসের পর মাস চালাইয়া পাঠক-সম্প্রদায়ের ধৈর্য্য-পরীক্ষা করিয়াছিলাম, সে শ্রমশীলতা ও অধ্যবসায়ও আর নাই। আজ এই গ্রহনিগৃহীত লেখক রোগজীর্ণ-দেহ, শোকদীর্ণ-হৃদয়। যাক্, নিজের ব্যক্তিগত জীবনের নিদারুণ করুণ কাহিনী বর্ণনা করিয়া পাঠকের মনে অনর্থক কষ্ট দিতে চাহি না, পাঠকের হৃদয়ে সমবেদনার উদ্রেক করিতেও চাহি না। অদ্যকার অর্ঘ্যে তুলসী চন্দন ও উদ্যানজাত মনোহর সুরভিসার পুষ্পসম্ভার নাই, আছে শুধু বিল্বদল ও গঙ্গাজল—তবে সে বিল্বদল 'আনন্দ-কাননে' চয়ন করিয়াছি, সে গঙ্গাজল-লব-কণিকা 'কাশীতলবাহিনী গঙ্গা' হইতে উত্তোলন করিয়াছি।

বিষয়—আমার সেই চিরপ্রিয়, চিরশ্রেয়ঃ, চির-আকাজ্ক্ষিত, চির-আরাধিত কাশী, হিন্দুর কাছে চির-পুরাতন, চিরনূতন, 'সকল তীর্থের রাণী' কাশী। কাশী, বারাণসী অবিমুক্তক্ষেত্র, আনন্দ-কানন, স্বর্গভূমি—কাশীর কতই নাম! কিন্তু আমার কাছে—ভক্ত হনুমানের কাছে যেমন 'রামঃ কমললোচনঃ' তেমনি—'কাশী' এই দুই অক্ষরে ছোট্ট সুখোচ্চার্য্য নামটিই সব চেয়ে মিষ্ট লাগে। তাই প্রবন্ধের নামকরণে 'বারাণসীর বৈশিষ্ট্য' বসাইলে যদিও অনুপ্রাস সুপ্রকাশ হইত, তবুও সে লোভ সংবরণ করিয়াছি।
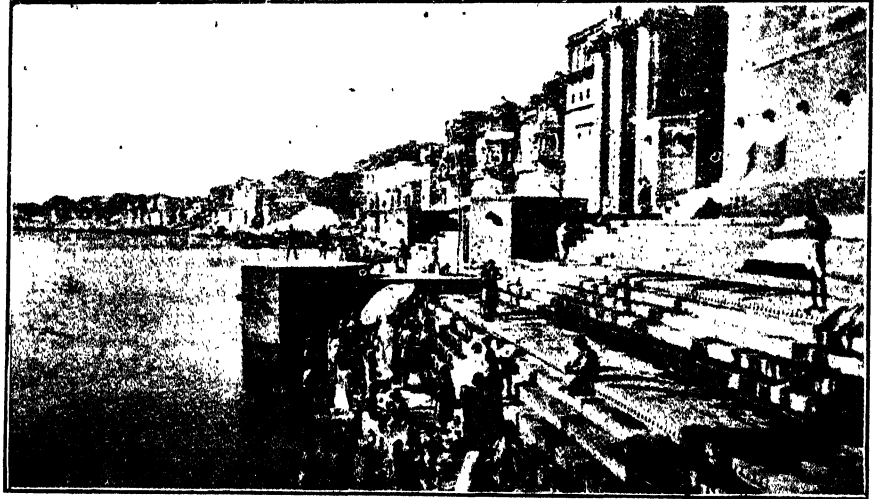
দশাশ্বমেধ ঘাট—কাশী

অনেক কাল হইতে এই পুণ্যধামে অনেকেই আসিয়াছেন। বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধদেব, শিবাবতার শঙ্করাচার্য্য, কবীর, তুলসীদাস, শ্রীগৌরাঙ্গ, ত্রৈলঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দস্বামী, বিশুদ্ধানন্দস্বামী, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কৃষ্ণানন্দস্বামী ইত্যাদি অনেক দেবতাত্মা বা দেবকল্প মহাপুরুষ কাশীধাম দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছেন, কাশীধামকেও ধন্য করিয়াছেন। দুইজন জৈন তীর্থঙ্কর—সুপার্শ্ব ও পার্শ্বনাথ—এই পুণ্যভূমিতেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আবার বিদেশ হইতে, সেকালের চৈনিক

পরিব্রাজক ধার্ম্মিকপ্রবর হিউএন্ সিয়াং, একালের মার্কিন পর্য্যটক রসিকপ্রবর মার্ক্ টোয়েন্, প্রাচ্যের মোহমুগ্ধ ফরাসী লেখক পিয়ের লোটি, প্রাচ্যকলার পক্ষপাতী সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক সহৃদয় ইংরেজ হেভেল্ (Havell) সাহেব, হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী স্থূলদর্শী খ্রীষ্টান মিশনারি পাদরী—ইঁহারাও আসিয়া 'ভুবনসুন্দরী বারাণসী'র সৌন্দর্য্য গাম্ভীর্য্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন, কাশীদর্শনে ইঁহাদিগেরও হৃদয়-ফলকে একটা গভীর ছাপ (profound impression) পড়িয়াছে। সেকেলে 'পৌত্তলিক' প্রৌঢ় মহাগঞ্জ ৺জয়নারায়ণ ঘোষাল শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে একরূপ চোখে কাশী দেখিয়াছেন, (১) আর একেলে 'অপৌত্তলিক হিন্দু' দেবী 'দিদি'তে, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 'অদৃষ্টচক্রে', এবং আরও অনেক ছোট বড় মাঝারি গল্প লেখক নানা গল্পে কাশীর মহৎ ও মোহন চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

বর্ত্তমান লেখক 'তীর্থদর্শন', "বারাণসী-দর্শনে', 'সুখের প্রবাস', 'ধর্ম্মে মতি', 'কাশীবাস' এই রচনা-পঞ্চকে ( ) কাশী-সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার যে কাশীর প্রতি কতদূর প্রবল প্রাণের টান, ইহা যদি পাঠক-সম্প্রদায় প্রণিধান করিতে না পারিয়া থাকেন, তবে বৃথাই এই অধন্য লেখকের লেখনীধারণ।

যাহা হউক, এবার দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশে কাশীতে আসিয়া, দীর্ঘকাল রোগশয্যায় পড়িয়া থাকিয়া, কাশীর বৈশিষ্ট্য যে ভাবে উপলব্ধি করিয়াছি, যে ভাবে মনের উপর ছাপ পড়িয়াছে, সে ভাবে সে চক্ষে পূর্ব্বে কখনও কাশী দেখি নাই। (যদিও পূর্ব্বে বহুবার অল্প বা অধিক দিনের জন্য কাশীবাসের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি)। রোগের তীব্র যাতনা-জনিত মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিই কি ইহার কারণ? না, 'জরারোগগ্রস্তঃ মহাক্ষীণদীনঃ বিপত্তৌ প্রবিষ্টঃ' হওয়াতে আজ অন্তশ্চক্ষুঃ ফুটিয়াছে?
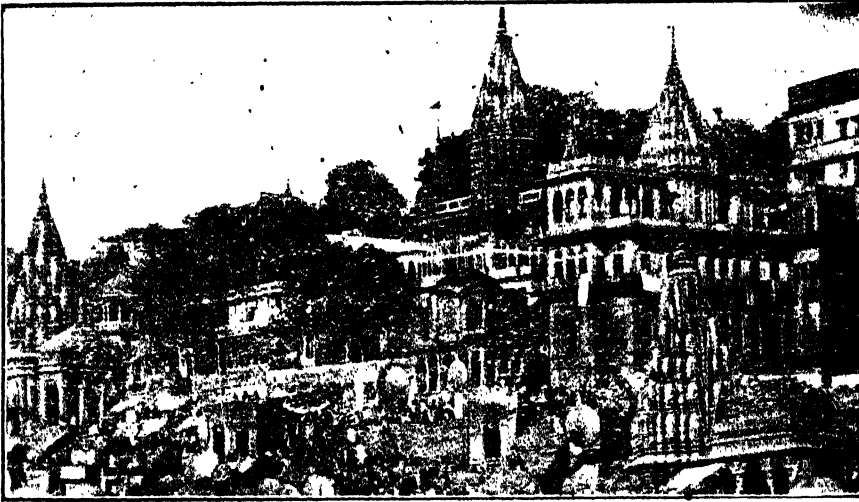
মণিকর্ণিকা ঘাট

মহর্ষি ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র যুবা ৺বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (২) আর একরূপ চোখে কাশী দেখিয়াছেন; কিন্তু উভয়েই কাশীর সৌন্দর্য্য গাম্ভীর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার গুণগান করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, 'দেবগণের মর্ত্তে আগমনে'র রিপোর্টার কাশীর উল্টা পিঠটা পি. এম্. বাগচির কালীতে রঞ্জিত করিয়াছেন। (পি. এম্ বাগচীর কালী তখন ছিল ত?) দোয়াতের বাকী কালীটুকু লইয়া 'নন্দি-শর্ম্মা' 'কাশীর কিঞ্চিৎ' মসীলাঞ্ছিত করিয়াছেন। আবার বঙ্কিমচন্দ্র অতি অল্পকথায় 'বিষবৃক্ষে', শ্রীমতী নিরুপমা

কাশী হিন্দুর মহাতীর্থ হইলেও এখানে যে শুধু হিন্দুরই বাস, তাহা নহে। হিন্দুর 'ধর্ম্মধানী'তে (৪) ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর অভাব নাই। ষ্টেশন হইতে গাড়ী করিয়া আসিয়া গোধূ-

(১) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'কাশী-পরিক্রমা' দ্রষ্টব্য।

(২) স্বল্পায়ুঃ বলেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলি (৫৫৭-৬৩ পৃঃ) বা ঠাকুরবাড়ী হইতে প্রকাশিত স্বল্পায়ুঃ (আমাদের যৌবনকালের বড় সাধের) 'সাধনা,' পৌষ ১৩০০, (১৫৬-৬৩ পৃঃ)—'বারাণসী'-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(৩) প্রথম তিনটি 'ফোয়ারা'য় ও শেষের দুইটি 'পাগলা ঝোরা'য় দ্রষ্টব্য।

(৪) 'ধর্ম্মধানী' ও 'দেবধানী' বলেন্দ্রনাথের 'বারাণসী'-প্রবন্ধে পাইয়াছি। বৈয়াকরণ কি বলেন?

লিয়া পর্য্যন্ত পৌঁছিলেই খ্রীষ্টানের গির্জ্জা নয়ন-গোচর হয়; ইহা ছাড়া সহরের অন্যান্য স্থানেও গির্জ্জা, মিশনারি স্কুল প্রভৃতি আছে। আবার বিশ্বেশ্বর-দর্শনে গেলে তাহার অদূরেই ঔরঙ্গজেবের আমলের মসজিদ দেখিতে পাওয়া যায়; বিন্দুমাধব ('বেণীমাধব')-দর্শনে গেলেও মুসলমানের কীর্ত্তি চক্ষে পড়ে; যাহাকে সাধারণ লোকে 'বেণীমাধবের ধ্বজা' বলে সেটি হিন্দুর দেবতার বিজয়-কেতন নহে, মুসলমানের মসজিদের মহোচ্চ মিনার। যাঁহারা কাশীতে নূতন আসিয়া দশাশ্বমেধ-ঘাটের-দক্ষিণ-পার্শ্ববর্ত্তী শীতলাঘাটে (৫) স্নান করেন—এই ঘাটটিই স্নানের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক, 'বাঙ্গালী-পছন্দ' ঘাট—তাঁহারা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে এই ঘাটের দক্ষিণে যে ঘাট (মুন্সীঘাট), সেটি মুসলমানদিগের একরকম একচেটিয়া। বঙ্গসীমন্তিনীগণ যে বেনারসী শাড়ীকে সুখ-সৌভাগ্যের চরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু মনে করেন, তাহা কাশীস্থ মুসলমান 'জোলা'-দের হাতের তৈয়ারি। বাস্তবিক, এই মুসলমান 'জোলা'রা শুধু কাশীর কেন, ভারতের গৌরবের নিদান, কেননা ইহাদিগের প্রস্তুত সুবর্ণখচিত কিঙ্খাব প্রতীচীতে আদর ও খ্যাতিলাভ করিয়াছে, ভারতীয় শিল্পের নিদর্শন দর্শনে পাশ্চাত্য জাতিগণ বিস্ময়াভিভূত হইয়াছে। আবার শুধু খ্রীষ্টান-মুসলমান কেন, নানকপন্থী, কবীরপন্থী, দাদূপন্থী প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকই কাশীতে আছে। 'কাশী-পরিক্রমা'য় ইহার স্বরূপবর্ণন আছে—

"রামানন্দী, শ্যামানন্দী, নিমানন্দী কত,
নানক, কবীরপন্থী, অঘোর-সম্মত ॥
ফকির, সুখরাসাহী, বৌদ্ধ যতিগণ।" ইত্যাদি।

কিন্তু আমি কাশীকে বিশেষভাবে হিন্দুর বাসভূমি বলিয়াই ধরিতেছি।

এই কাশীস্থ হিন্দুর মধ্যে আবার দুই শ্রেণী আছে। এক শ্রেণীর হিন্দু 'পশ্চিমে'র অন্যান্য সহরের ন্যায় কাশীতে বিষয়কর্ম্ম-উপলক্ষে বাস করেন; ইঁহারা মোরাদাবাদ, মীরাট, কাণপুর, লক্ষ্ণৌ, বেরিলী, লুধিয়ানা, দিল্লী, লাহোর, দেরা গাজি খাঁ, দেরা ইস্‌মাইল খাঁ প্রভৃতি সহরেও বাস করিতে পারিতেন, দৈবগত্যা কাশীতে বাস করিতেছেন।
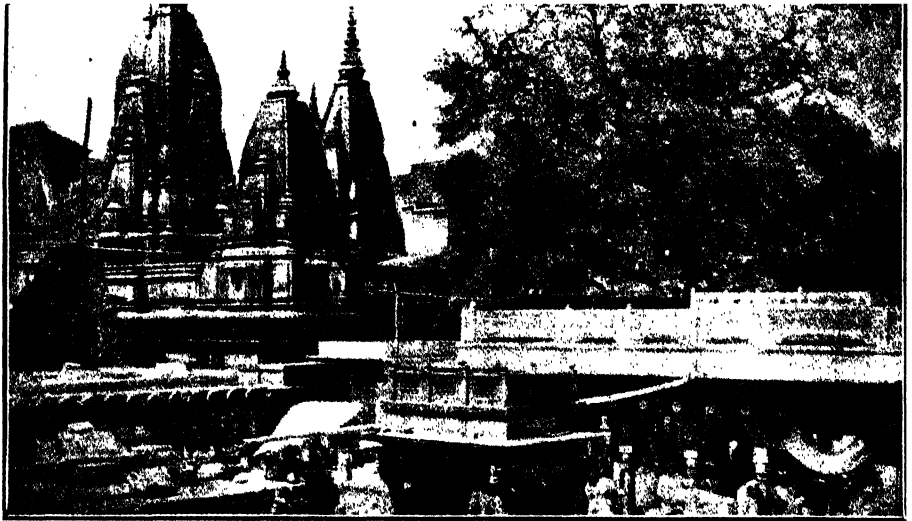
বিশ্বেশ্বর-মন্দির

ইঁহারা, কলিকাতার আফিস-ওয়ালাদের মত, সকালে সকালে কলের জলে স্নান সারিয়া চারিটি ভাত মুখে গুঁজিয়া চাকরীতে বা ব্যবসায়ে বাহির হইয়া যান। 'উত্তরবাহিনী' গঙ্গা বা বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণার সহিত ইঁহাদের কোনও সম্পর্ক নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। বড় জোর, বিশেষ বিশেষ পর্ব্ব-উপলক্ষে, ('জন্মের মধ্যে কর্ম্ম') ইঁহারা গঙ্গাস্নান ও দেবদর্শন করেন, এই পর্য্যন্ত। কেহ কেহ বা নখের কোণ দিয়া গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া মস্তকে ছিটাইয়া (তাহাতে কেশাগ্রও ভিজে না) পতিতপাবনী সুরধুনীর

(৫) ইহা প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যা বাইএর কীর্ত্তি। এই ঘাটের উপর ৺ শীতলাদেবীর ও ৺ দশাশ্বমেধেশ্বর শিবের মন্দির আছে। এই ঘাটের ঘাটোয়াল 'বিন্দু মহারাজ' অতি সজ্জন ছিলেন; বৎসরাধিক হইল তাঁহার ৺কাশীপ্রাপ্তি হইয়াছে।

সম্মানরক্ষা করেন; তাঁহারা যে হিন্দুসন্তান এই দাবী সপ্রমাণ করেন। অনেকে গা ময়লা হইবার ভয়ে গঙ্গায় অবগাহন করেন না (বিশেষতঃ বর্ষাকালে), কাহারও কাহারও আবার শুনিয়াছি গঙ্গাস্নান সহেনা, বুকে বেদনা গলায় বেদনা, সর্দ্দিকাসী, জ্বর হয়, এমন কি বাতে ধরে। যাহা হউক, আমি এই শ্রেণীর হিন্দুকে ঠিক কাশীবাসীহিসাবে দেখিতেছি না। ইঁহারা কাশীবাসী নহেন, কাশী-প্রবাসী; ইঁহারা নামে হিন্দু, কামে—।

অন্নপূর্ণার মন্দির

আমি বিশেষভাবে তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই এই প্রবন্ধ লিখিতেছি, যাঁহারা অর্থকামের চিন্তায় ও চেষ্টায় নহে, ধর্ম্মার্থী মোক্ষার্থী হইয়া কাশীবাস করেন, স্নান-দর্শন-স্পর্শন-অর্চ্চন-ধ্যান-ধারণা যাঁহাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন, মুখ্য কল্প; যাত্রা' করা যাঁহাদের নিত্যকর্ম্ম। ইঁহারাই প্রকৃত-পক্ষে 'কাশীবাসী'; আর এই 'যাত্রা'ই কাশীর বৈশিষ্ট্য, অসাধারণত্ব, কাশীর 'জান' বা প্রাণ। ইঁহাদের কথা লিখিয়াই, ইহাদের দৈনন্দিন কর্ম্ম বর্ণনা করিয়াই, লেখনী সার্থক করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, জীবন-সায়াহ্নে ইঁহাদের দলে ভিড়িতে পারিলেই জন্ম সফল বলিয়া মনে করিব। মনের প্রবল আকিঞ্চন, অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বর-চরণে হৃদ্গত নিবেদন,

"আমি কবে কাশীবাসী হ'ব?
সেই আনন্দ-কাননে গিয়ে নিরানন্দ নিবারিব।
গঙ্গাজল-বিল্বদলে বিশ্বেশ্বরে-নাথে পূজিব।
অই বারাণসীর-জলেস্থলে ম'লে পরে মোক্ষ পাব।
অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠাত্রী স্বর্ণময়ীর শরণ ল'ব।
আর বম্ বম্ ভোলা ব'লে নৃত্য ক'রে গাল বাজাব॥"

কিন্তু অন্নের সংস্থানের জন্য অন্নপূর্ণার পুরী ছাড়িয়া অন্যত্র থাকা ভিন্ন উপায় নাই; সুতরাং হৃদয়ের এ আকাঙ্ক্ষা, আশা ও প্রয়াস 'উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে'। যাক্, ব্যক্তিগত কথা ছাড়িয়া প্রকৃত অনুসরণ করি।
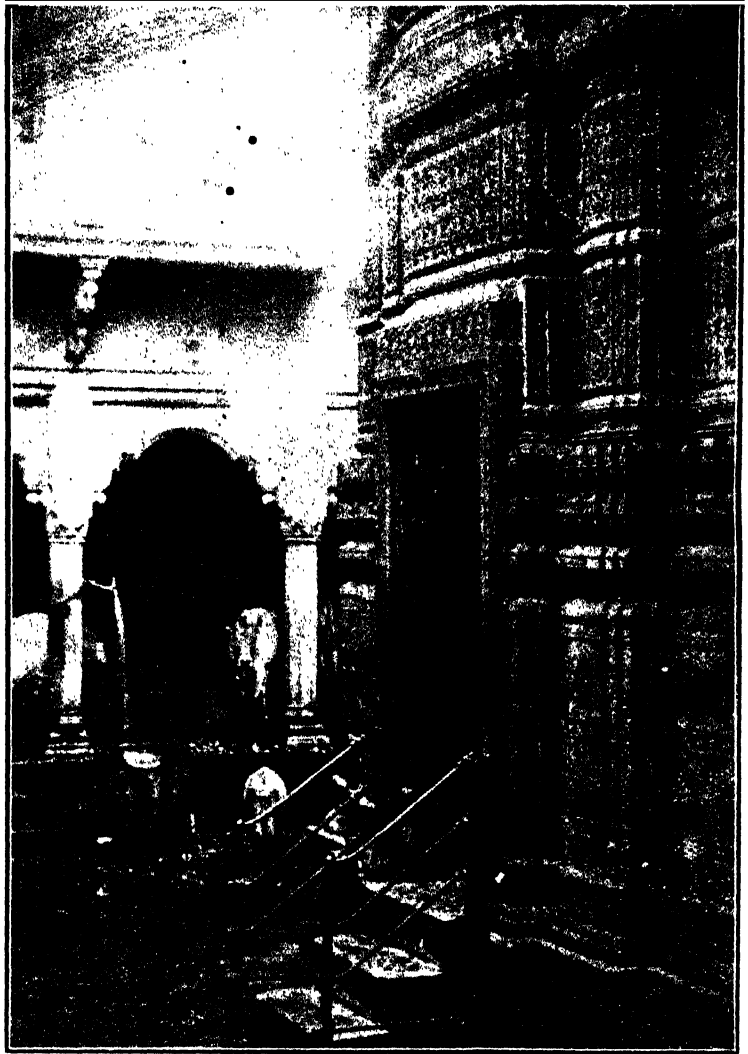
প্রাতঃকাল হইতে, শ্রীবিষ্ণুঃ, প্রত্যুষকাল হইতে,—শিব শিব শিব, ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে এই 'যাত্রা' আরম্ভ হয়, আর দিবামানের প্রথম 'ছয় দণ্ড'-মধ্যে অর্থাৎ বেলা ৮টা ৯টায় শেষ হয়। যে যেমন সকাল উঠিতে পারে, যাহার যেমন অভ্যাস, অথবা যাহার যেমন ধর্ম্ম-কর্ম্মে আগ্রহের মাত্রা (degree), সে সেইরূপ সকাল সকাল শয্যাত্যাগ করে। বলা বাহুল্য, প্রকৃত 'কাশীবাসী' সুখ-বিলাসী নিদ্রালস নহেন। পৌষ-মাঘে পশ্চিমের কন্‌কনে শীতেও

এই নিয়মের ব্যত্যয় হয় না। শয্যাত্যাগের পর মুখ-প্রক্ষালন, দন্তধাবন ও শরীরের ধর্ম্মপালনের জন্য বিধেয় প্রাতঃকালীন কার্য্যানুষ্ঠান সমাধা করিয়া শুদ্ধবস্ত্র পরিধান ও শুষ্কবস্ত্র (অনেকেরই পট্টবস্ত্র ও নামাবলি) গামছা ধাতুনির্ম্মিত কমণ্ডলু বা 'পঞ্চপাত্র ও সাজি ('পুষ্পপাত্র চন্দন-সহিত') তথ জপের মালা লইয়া 'কাশীবাসী' গৃহের বাহির হয়েন। কাশীতলবাহিনী উত্তরবাহিনী পতিতপাবনী সুরধুনীর জলে অবগাহন স্নান করিয়া কেহ আর্দ্রবস্ত্রে জলে জলে, কেহ শুষ্কবস্ত্রে পাটে বসিয়া (ধর্ম্মার্থীদের

পঞ্চগঙ্গা-ঘাট (বেণীমাধবের ধ্বজা)

সুবিধার জন্য ঘাটোয়ালরা সযত্নে এই সব কাঠের পাট পাতিয়া রাখে), কেহ দেবমন্দিরে বসিয়া (যথা পূর্ব্বোক্ত অহল্যাবাইয়ের ঘাটে ৺শীতলামন্দিরে) আহ্নিক ও জপ সারিয়া লয়েন। দশাশ্বমেধ ও শীতলা-ঘাটেই অনেকে যান; বারবিশেষে, যথা সোমবারে কেদারঘাটে, মাস-বিশেষে, যথা বৈশাখে মণিকর্ণিকায়, জ্যৈষ্ঠে দশাশ্বমেধে, শ্রাবণে কেদারঘাটে, কার্ত্তিকমাসে পঞ্চগঙ্গায়, (৬) পর্ব্ব-বিশেষে, যথা স্নানযাত্রায় ও রথযাত্রায় অসিসঙ্গমে, যাওয়া নিয়ম। সাধারণতঃ, যাহার যে ঘাটের উপর ভক্তি বা ঝোঁক, অথবা যাহার বাসস্থানের যে ঘাট নিকট, সে সেই ঘাটেই স্নানাহ্নিক করে।

এইবার গঙ্গাতীর ছাড়িয়া গঙ্গাজলপূর্ণ কমণ্ডলু বা পঞ্চপাত্রহস্তে ৺বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণার মন্দিরোদ্দেশে সকলের প্রয়াণ।

পথে সাক্ষি-বিনায়ক ও ঢুণ্ঢিরাজ (এবং শনৈশ্চর—'শনিচর') অবশ্য-দর্শনীয় ও পূজনীয়। বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণার মন্দিরে আরও অনেক দেবতা আছেন, বিশ্বেশ্বর-মন্দিরের পিছনে 'শিবের কাছারী' জ্ঞানবাপী মুক্তি-মণ্ডপ প্রভৃতি বর্ত্তমান। অনেকে খুঁটাইয়া সবগুলি-তেই যান। ঘাট হইতে মন্দিরের পথে ফুল-বিল্বপত্র কেনা হয়, সাজিতে আগে হইতেই পরিবারের পরিজন বা এক বাসার বাসিন্দা কয়েকজন দল বাঁধিয়া বাহির হয়, পথে যাইতে যাইতে ক্রমেই তাহারা দলে পুরু হয়। এই সব দলে পুরুষ বড় একটা থাকে না; অত রাত্রে সুখশয্যা ত্যাগ করা পুরুষের পোষায় না। স্ত্রীলোকদিগের এ সব বিষয়ে আগ্রহও বেশী এবং তাহারা অধিকতর কষ্টসহিষ্ণুও বটে। এই স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সধবা বিধবা, নবীনা প্রবীণা বৃদ্ধা, সব রকমই থাকে, তবে অধিকাংশই প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধা বিধবা। কেহ তন্ময় হইয়া জপ করিতেছে, কেহ মধুরকণ্ঠে নাম কীর্ত্তন করিতেছে, কেহ উচ্চৈঃস্বরে স্তব পাঠ করিতেছে, কেহ বা গুন্ গুন্ করিয়া, কেহ বা বেশ গলা ছাড়িয়া দিয়া, ধর্ম্মসঙ্গীত গাহিতেছে, আনন্দের রোল উঠিতেছে। লেখকের অবশ্য পরের মুখে ঝাল খাওয়া, শ্রীবিষ্ণু:—মিষ্টি চাখা; এখন ত রোগশয্যায় উত্থানশক্তি-রহিত, যখন সুস্থ সবল ছিলাম তখনও এত রাত্রি থাকিতে উঠিয়া স্নান না করি, এই মধুর কলধ্বনি শুনিবার, এই সুন্দর প্রাণস্পর্শী দৃশ্য দেখিবার, প্রবৃত্তি হয় নাই।

(৬) ৺বিন্দুমাধবের মন্দির-নিম্নস্থ ঘাটকে (অর্থাৎ যে ঘাটের উপর 'বেণীমাধবের ধ্বজা' বিদ্যমান তাহাকে) 'পঞ্চগঙ্গা' বলে। সহধর্ম্মিণীর প্রমুখাৎ শুনিয়াছি, এই পঞ্চগঙ্গা-প্রয়াণ বড় আনন্দের ব্যাপার। সমস্ত কার্ত্তিক মাস ধরিয়া প্রভাতী তারা ডুবিয়া না যাইতে এইখানে ডুব দিতে হয়; সুতরাং অনেক রাত্রি থাকিতেই স্নানের সঙ্কল্প লইয়া বাহির হইতে হয়। প্রায় সকলেই, একা, কচিৎ এক

আতপ-তণ্ডুল (অক্ষত) থাকে, তাহার কিয়দংশ দেবোদ্দেশে অর্ঘ্যরূপে নিবেদিত হয়, কিয়দংশ ভিক্ষুক-নারায়ণকে প্রদত্ত হয়। দুইচারিটি দানামাত্র এক এক জন ভিখারীর ভাগ্যে পড়ে, কিন্তু বহুসংখ্যক যাত্রীর নিকট এইরূপ পাইয়াই (অল্পানামপি বস্তূনাম্ ইত্যাদি, ভাষা-কথায় রাই কুড়িয়ে বেল) তাহাদের দিন-গুজরানের মত সংস্থান হয়—মা অন্নপূর্ণার এমনই কৃপা। কথায় বলে, অন্নপূর্ণার পুরীতে কেহ উপবাসী থাকে না। ফুল-বিল্বপত্র কেনার কথায় একটু বক্তব্য আছে। অত সকাল অন্য দোকানপাট খোলে না, (কাশীতে দোকানপাট কলিকাতা অপেক্ষা বেশ একটু বেলায়ই খোলে। দোকানীরাও স্নান-দর্শনান্তে অন্নসংস্থানে মন দেয়, এই কারণে কি?) কিন্তু ফুলওয়ালীরা তখনই গঙ্গাস্নানে যাইবার গলিরাস্তায় ও গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানে বসিয়াছে। [তাহারা অবশ্য অতি সাধারণ শ্রেণীর স্ত্রীলোক, অধিকাংশই বৃদ্ধা বা প্রৌঢ়া। কাব্যরসপিপাসু পাঠক তাহাদিগের মধ্যে কাব্যের নায়িকা 'রজনী' বা (Nydia) 'নিডিয়া' পাইবেন না।]

প্রাতে প্রধান দুইটি মন্দিরে (বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণার)—ভয়ানক ভিড়, ভুক্তভোগিমাত্রেই জানেন (৭)। ইহার অধিকাংশই স্ত্রীলোক, এবং তাহার অধিকাংশই আবার বৃদ্ধা। কিন্তু বৃদ্ধা বলিয়া তাহারা অথর্ব্ব নহে, বেশ শক্ত; তাহাদের কনুইএর ঠেলায় পুরুষদিগকে হঠিয়া যাইতে হয়। 'অবলা প্রবলা' এরকমটি আর কোথাও দেখি নাই। চণ্ডীতে লেখে, 'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু'। আর অন্নদামঙ্গলে লেখে, 'মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী'। সুতরাং বেশ বুঝা যাইতেছে, অন্নপূর্ণার পুরীর বুড়ীরা তাঁহারই, শক্তিরই, অংশজাতা। এত ধাকাধাকি ঠেলাঠেলিতেও সকলেরই বিশ্বেশ্বর-দর্শন ও স্পর্শনের আগ্রহ অটুট। কেহ কেহ আবার উভয় দেবতার সঙ্কীর্ণ গর্ভগৃহে জপাদিও করেন। অবশ্য গর্ভগৃহের সম্মুখস্থ অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত স্থানে জপাদি করাই সুবিধা। তাহাও অনেকে করেন। প্রণাম-প্রদক্ষিণান্তে গৃহাভিমুখে প্রয়াণ।

এই ত গেল 'নিত্যযাত্রা'। ইহা ছাড়া তিথিবিশেষে, বারবিশেষে, মাসবিশেষে, পর্ব্ববিশেষে, অথবা 'মানসিক' থাকিলে, অথবা ইচ্ছাসুখে, অন্যান্য দেবমন্দিরে যাওয়া আছে। যথা, (শনি-মঙ্গলবারে) মানসকালী বা আশা-কালী, (শীতলাষ্টমীতে) শীতলা, (শুক্লপক্ষের শুক্রবারে) সঙ্কটা-বীরেশ্বর, (সোমবারে) কেদার, (মঙ্গলবারে) বটুক-ভৈরব, কালভৈরব, কামাখ্যা, পশুপতিনাথ (শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত), বৈদ্যনাথ, (বেণীমাধব) বিন্দুমাধব ইত্যাদি। কাশীর দেবতা অসংখ্য, তাঁহাদিগের মাহাত্ম্যও অবর্ণনীয়। তাহার বর্ণনা করিতে গেলে শেষ হইবে না, পাঠক অবসর-মত 'কাশীখণ্ড' পাঠ করিয়া এ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন; অথবা সংক্ষেপে 'কাশী-পরিক্রমা' খানিতেও এ কার্য্য হইতে পারে।

এই অসংখ্য দেবদেবীর প্রসঙ্গে একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। কাশীবাসীর বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণা-দর্শন ত নিত্যযাত্রার প্রধান অঙ্গ; কেদার-গৌরী, বীরেশ্বর-সঙ্কটা-দর্শনও বার-বিশেষে হয় পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দুর্গাবাড়ী যাওয়া, মা-দুর্গা ও জগজ্জননীর জননী মা-মেনকার সাক্ষাৎকার-লাভও তিথিবিশেষে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, বিশালাক্ষীদর্শন শত-কে একজনও করেন কিনা সন্দেহ; তাঁহার মন্দির কোথায়, তাহা পর্য্যন্ত অনেকে জানেন না। অথচ কাশী ৫১ পীঠের অন্যতম, দেবী বিশালাক্ষী, শিব কালভৈরব। কালভৈরব কাশী-কোতোয়ালের নকরী লইয়া বিশ্বেশ্বরের তাঁবেদারী করিয়া কোনও প্রকারে টিকিয়া আছেন; কিন্তু দেবী বিশালাক্ষীর মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষমাহেশ্বরী কাশীপুরাধীশ্বরী' অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্যে একেবারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। (একটু স্থূল রসিকতা করিয়া বলা যায়, পীঠের দেবতা পেটের দেবতার চাপে কোণঠেশা হইয়া আছেন।)

যাক্, আসল কথা হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। তবে দেবতাদের প্রসঙ্গে এরূপ অন্যমনস্ক

(৭) সৌখীন তীর্থযাত্রীদিগের পক্ষে একটু বেলা করিয়া যাওয়াই বিধি, অত ভিড় ঠেলিতে হয় না। দুপুরে লোক খুব কম থাকে। বিকালে বাড়িতে আরম্ভ হয়, আরতির সময় আবার বিলক্ষণ ভিড় হয়। আরতিকালে নানাযন্ত্রের বাদ্যের সহিত পূজারীগণের সমস্বরে স্তব-পাঠ ভক্তিভাবে শুনিবার জিনিশ, ও দেবতার 'শিঙ্গার'-বেশ—দুগ্ধ-গঙ্গাজলে ধৌত মাল্য-শোভিত, চন্দনচর্চ্চিত—ভক্তিভাবে দেখিবার জিনিশ।

হওয়া কর্ত্তব্য। দেখা গেল, দিবসের প্রথম প্রহরটা 'কাশীবাসী'র দেবোদ্দেশে উৎসৃষ্ট। মনে এই প্রশ্ন উদয় হয়, প্রাতে এমনটি হয় কেন? জানি ইহাই শাস্ত্রের বিধি। অদ্ভুতানন্দস্বামী (লাটু মহারাজ) বলিয়াছেন, 'এ সময় প্রকৃতি অনুকূল থাকে, আর তাড়াতাড়ি ইষ্টে মন বসে।' তাহাই বা কেন হয়? আমার মনে হয়, ইহার ভিতর একটি রহস্য আছে, যেজন্য প্রাতেই মানবের মনে (৮) এই দিব্যভাবের উদ্ভব হয়। সে রহস্যটি এই—গভীর রাত্রে নিদ্রাবশে স্থূলদেহটা পৃথিবীতে পড়িয়া থাকে, আত্মা দেহ ছাড়িয়া ঊর্দ্ধগতি হইয়া আনন্দধামে আনন্দ আস্বাদন করিতে যায়, নিদ্রাভঙ্গে স্থূলদেহে ফিরিয়া আসে। (যেমন সন্তানের জাগরণের সাড়া পাইলেই জননী তাহার পার্শ্বে ছুটিয়া আসেন; অনেক সময়ে সন্তান টেরও পায় না যে জননী কাছছাড়া হইয়াছিলেন।) এই ব্রহ্মানন্দ-আস্বাদের অব্যবহিত পরেও মানবের মন দিব্যভাবে পূর্ণ থাকে। তাহার পর, কয়েক দণ্ড ব্যাপিয়া দূরবর্ত্তী দেবালয়ে-দেবালয়ে ঘুরিতে ঘুরিতে দুর্ব্বল মানব-দেহে জীবধর্ম্মবশতঃ ক্লান্তিশান্তি ক্ষুধাতৃষ্ণা আসে এবং স্থূলধর্ম্মা পৃথিবীর ধূলি-পঙ্ক-আবর্জ্জনা ও দূষিত বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া মানবমনে আবার দেবভাবের পরিবর্ত্তে সাধারণ জীবভাব বলবৎ হয়। তাহার ফলে, ফিরিবার পথে যাত্রীরা রসদ-সংগ্রহ করিয়া গৃহে ফেরেন—তখন পেটের চিন্তাই বলবতী, 'অন্নচিন্তা চমৎকারা'। 'যা দেবী সর্ব্ব-ভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা'। আলু পটোল বেগুন কুমড়া হইতে আরম্ভ করিয়া থেড়ো ঢেঁড়স নিমুয়া কাঁকরোল ঝিঙে উচ্ছে করোলা কচু কাঁচালঙ্কা কচুর শাক ও ফুল ডেঙো ডাঁটা, এমন কি বেঙের ছাতা তেলাকুচা (কবি-বর্ণিত 'বিম্বাধর' স্মরণ করুন) পর্য্যন্ত পূজাজপে পবিত্রীকৃত শ্রীহস্তে বিরাজ করেন, নামাবলির আঁচলে বাঁধা পড়েন, ফুলের সাজিতেও চড়েন। অনেক বিধবা বিড়ালের জন্য মাছ পর্য্যন্ত কিনিয়া লইতে ভুলেন না! এই শ্রেণীর কাহারও কাহারও ব্যাপারীদের কাছ হইতে আনাজ চুরি করার অখ্যাতিও আছে। ধরা পড়াতে লাঞ্ছিত হইতেও দেখা গিয়াছে। দেবভাব হইতে সাধারণ জীবভাব, তাহা হইতে এই দানবভাব বা দস্যুবৃত্তিতে অবতরণ আক্ষেপের বিষয় বটে, কিন্তু অনুষ্ঠানগত ধর্ম্মে এই গলদ ঘটিবার সম্ভাবনাই বেশী। ইহারা সত্য সত্যই দিব্যভাব-ভাবিত নহে, মনে করে শাস্ত্রবিহিত আচার-অনুষ্ঠান করিলেই দিনগত পাপক্ষয় হইবে, কেহ কেহ বা শুধু লোক-দেখান ভড়ং করে, ঠাট বজায় রাখে। তাই বেশ্যাদের গঙ্গাস্নানের ন্যায় ইহারা 'যাত্রা' করিয়াই মনকে চোখ ঠারে, পাপক্ষালন হইল, দেহ-মন শুদ্ধ হইল; বুঝে না যে এ 'হস্তিস্নান' বই আর কিছুই নহে। পরমুহূর্ত্তেই যে ধূলাকাদা সেই ধূলাকাদায়ই সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া যায়। সেদিন শুনিলাম জনৈকা কাশীবাসিনী ব্যভিচারিণী প্রবীণা বিধবা 'কেদার-বদরী' করিয়া কাশীধামে ফিরিয়াছেন—পুনর্মূষিক (পুনদূষিক?) হইবার জন্য। আহা, ঠাকরুণের কি নিষ্ঠা!

যাক্, মানবচরিত্রের এই কদর্য্য দিকটা দেখাইবার প্রয়োজন নাই। Idealistic দিক্‌টাই দেখাইতে প্রবৃত্তি হয়, আনন্দ হয়। আবার সেই দিক্‌ই প্রদর্শন করি। যাত্রান্তে বাজার করিয়া ফিরিয়া 'যাত্রী' নামাবলি জপের মালা সাজি কমণ্ডলু ঘরের কোণে একধারে ফেলিয়া রাখেন, অথবা আলনায় বা হুকে বা শিকেয় তুলিয়া রাখেন। তাহার পর অল্পক্ষণ বিশ্রামান্তে পাদপ্রক্ষালনের পর রন্ধন, দেবতাকে নিবেদন (তখনও দেবভাব একপাদ অবশিষ্ট), পরে ভোজন—'আহার কর, মনে কর, আহুতি দাও শ্যামা মারে।' 'যৎ করোমি জগত্যর্থং তদস্তু তব পূজনম্' 'নারায়ণায়ৈব সমর্পয়ামি।' 'বিষ্ণুস্তু প্যতাম্।' আহারান্তে মুখশুদ্ধি, পরে দু'দণ্ড গড়ান; আহারের পর একটু আলস্য আসে, সুতরাং তন্দ্রা-বেশ। ('মা দিবা স্বাপ্সীঃ', 'দিবাস্বপ্নং ন কুর্ব্বীত', 'আয়ুঃক্ষীণা দিবানিদ্রা' ইত্যাদি নিষেধবাক্য অল্পলোকেই জানেন বা মানেন।), তন্দ্রার ঘোরে আবার আত্মার স্থূলদেহত্যাগ ও আকাশমার্গে আনন্দধামে বিচরণ ও আনন্দ-আস্বাদন। ফলে তন্দ্রাভঙ্গে দেবভাবের জয়; তাহার প্রভাবে অপরাহ্নে 'কাশীবাসী'র কথকতা-কীর্ত্তন-পুরাণপাঠ প্রভৃতি-শ্রবণের জন্য হরিসভা, জয়মিত্রের বা কুচবিহারের কালীবাড়ী, রাজা-

(৮) অবশ্য অনেক লোকেরই ওরূপ কিছু হয় না, ওসব বালাই নাই। প্রাতে উঠিয়াই অর্থচিন্তা, অন্নচিন্তা—আর আমার মত লোভী রোগীর "আজ কি কি তরকারী খাইব, কিসের ডাল হইবে, দাদখানি চা'ল ফুরাইয়াছে কি না, 'চিনিপাতা দৈ, ডিমভরা কৈ' বাজার হইতে আনিতে যেন ভুল না হয়," এবংবিধ চিন্তা!! 'ভাবনা যাদৃশী যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।'

মেটের সত্র প্রভৃতি স্থানে গমন (৯) এবং প্রদোষকালে দেবদর্শন গঙ্গাদর্শন-স্পর্শন ও গঙ্গাতীরে সন্ধ্যাহ্নিক-জপাদি আচার নিয়ম-পালন। আবার শ্রান্তি-ক্লান্তি, ক্ষুৎপিপাসা, জীবধর্ম্ম বলবৎ, বৈকালিক ফলমূল 'মালাই' মিষ্টান্ন কিনিয়া গৃহে প্রত্যাগমন। ('মালাই' এখানে সকলের রাত্রের আহারে চাইই। ইহাতেই, অসময়ের দেহসজ্জায় চূড়ার উপর ময়ূরপাখার ন্যায়, রসলোলুপ রসনার 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'।) আবার পরদিন প্রাতঃকাল হইতে 'যাত্রা'-দির পালার পুনরাবৃত্তি—যতদিন না শিব 'তারকব্রহ্ম' নাম শুনাইয়া কাশীবাসী জীবকে মুক্তি দেন।

জানি না, আমার উর্ব্বর-মস্তিষ্ক-প্রসূত এই রহস্যোদ্ভেদ রোগজনিত খেয়াল কি প্রকৃত তথ্য? যাহা হউক, ভাল কথার মিছাও ভাল, খোসখবরের ঝুটাও মিঠা। রাম-প্রসাদ বলিয়া গিয়াছেন, 'আছে ভাল মন্দ দু'টা কথা, যা' ভাল তা' করাই ভাল।' তেমনি 'যা' ভাল তা' বলাই ভাল।' 'সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ।' এই মীমাংসা মানিয়া লইতে ক্ষতি কি? জানি, কাশীধামে তথা মানবমনে সু কু দুইই আছে, জগতে কিছুই ষোল আনা খাঁটি নহে, (ষোলকড়াই কাণা না হইলেই যথেষ্ট) শুধু খোদার উপর খোদকারিতে সেকরার হাতে পড়িয়াই যে সোণায় খাদ থাকে তাহা নহে, খনিতেও খাঁটি সোণা মিলে না, রসায়নবিদ্গণ বলেন। এ অবস্থায় ষোল আনা ভাল আশা করা যায় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মানব-প্রকৃতির Idealistic দিক্ দেখিয়া ও দেখাইয়াই আমাদের আনন্দ হয়, খুঁজিয়া খুঁটাইয়া খোঁচাইয়া, কেঁচো খুঁড়িতে সাপ খুঁড়িয়া realistic দিক্ উদ্ঘাটিত করিয়া, কালী মাখিয়া কালী ঘাঁটিয়া কালী ছড়াইয়া কি লাভ কি সুখ কি ফল? 'ততঃ কিম্?'

দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করিয়া পাঠককেও ছাত্র-ভ্রমে শিক্ষা দেওয়ার লোভ সামলাইতে পারি না; তাহাতে ত আবার স্বাস্থ্য-ভঙ্গের জন্য গ্রীষ্মের ছুটি ফুরাইলেও বেকার বসিয়া আছি, অধ্যাপনা-প্রবৃত্তি প্রবল, অথচ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার মত শক্তি নাই (যাহাকে ইং-রেজীতে বলে 'The spirit is willing but the flesh is frail'); এ অবস্থায় লেক্চার ঝাড়ার ঝোঁক রোখে কে? যাক্, আবার আসল কথায় ফিরিয়া আসিয়া এই দীর্ঘ নীরস প্রবন্ধ শেষ করি।

বাস্তবিক, এই সোণার কাশী, এই আনন্দ-কানন, এই স্বর্গভূমি, শেষ রাত্রির মঙ্গল-আরতি হইতে আরম্ভ করিয়া পরদিন রাত্রির প্রথম প্রহরান্তে শয়ন-আরতি পর্য্যন্ত দিবা-ভাবে ভরপূর, আনন্দে ওতপ্রোত। 'কাশীবাসী'র কায়-মনের সুরও ইহার সহিত তানলয়বদ্ধ। মঙ্গল-আরতির মধুর নহবত-বাদ্যে এই সুরটুকু কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশে, প্রাণ স্পর্শ করে, শয়ন-আরতির বাদ্যোদ্যম পর্য্যন্ত আনন্দে আনন্দে বিহার করিতে করিতে মনে-প্রাণে 'আনন্দ আর ধরে না রে!' তাহার পর সুষুপ্তি। (এই অভাগা লেখকের মত রোগীর জন্য নহে। 'O Sleep, O gentle sleep, Nature's soft nurse, how have I frighted thee!') [এই আবার পঠিত ও পাঠিত বিদ্যার চর্ব্বিতচর্ব্বণ!] অবশ্য যাহারা ধর্ম্মপ্রাণ, মোক্ষকাম, তাহাদেরই প্রাণে এই ঢং ঢং ঘণ্টাধ্বনি, ডিমি ডিমি ডমরুবাদ্য, নানা যন্ত্রের অপূর্ব্ব সঙ্গত, শান্তিধারা সেচন করে, কর্ণে মধুবর্ষণ করে। অপরের কর্ণে ইহা পশে না, পশিলেও প্রাণ তাহাতে বসে না, রসে না, খসিয়া ধ্বসিয়া পড়ে। এই সব বহিরঙ্গ ব্যক্তিদের বহিঃ-কর্ণে বাজে—রাত্রে রাসভরাগিণী অর্থাৎ গাধার চীৎকার (যেমন দূরের গঙ্গা নিকট হয়, তেমনি এক্ষেত্রে ৺শীতলা মাতার প্রসাদে এবং রজকের কল্যাণে ব্যাসকাশীও শিব-কাশীর কাছাকাছি হইয়াছে!) এবং কুকুর-কীর্ত্তন (কুকুর যে বটুকভৈরবের বাহন!)—আর দিনমানে, ভোর না হইতে মাখন ওয়ালীর মধুর মোলায়েম প্রভাতী, বেলা হইলে ফেরি-ওয়ালার নানা সুরের গিটকিরি, বেনারসী-বোনা তাঁতের খটখটি, (১০), অপরাহ্ণে ডাকপিয়নের

(৯) কথকতা-কীর্ত্তনের আঙ্গিনাতেও স্ত্রীজাতির ঠেলাঠেলি ধাকাধাকি কথা-কাটাকাটি। বিখ্যাত কথক ও কীর্ত্তনিয়া শ্রীযুক্ত রাম-কমল ভট্টাচার্য্যের মিষ্ট মিষ্ট ভর্ৎসনায়ও তাঁহাদিগের চৈতন্য হয় না। অনেকে আবার কথা শুনিতে শুনিতে 'ঢেঁকো' চালান। 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।' তাই ত কোন্ বুড়ী পুরীর গিয়া পুরুষোত্তমের শ্রীমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে পুঁইমাচা দেখিয়াছিল। ইতি উৎকলখণ্ডের উপসংহারে বিট্‌কেল কাণ্ড!

(১০) লেখক মদনপুরা মহল্লায় ছিলেন, এই মহল্লা জোলাদিগের প্রধান কেল্লা, দুই চারি ঘর হিন্দু এখানে থাকেন। জ্বরের যন্ত্রণায়

জোর-গলায় 'চিঠি'র ডাক, খবরের কাগজওয়ালার তার-স্বরে 'ডেলি নুজ্' 'অমৃং বাজার' চীৎকার, আর সারাদিন, অস্থির রোগীর কর্ণে এই খটখট যে 'কর্ণেষু বমতি মধুধারাম্' কিরূপ তাহা আর প্রকাশ করিয়া বলিতে চাহি না। স্ত্রী-কন্যার জন্য বেনারসী শাড়ী ও (blouse-piece) ব্লাউস্-পিস্ কেনার সাধে বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। কথনও কখনও সারারাত, ধরিয়া বানরের কিচকিচি ও ইতরশ্রেণীর হিন্দুস্থানী নারীদিগের কলহ-কাজিয়া। যাক্, বিস্তর বাজে বকিলাম। কবির কথা মনে পড়িয়া গেল—'সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।' অতএব এক্ষণে এইখানে বেদব ন্সের বিশ্রাম।

অভাগিনী

৺ইন্দিরা দেবী

সাদা হয়ে গেল ঘন কালো কেশ-রাশি।
কুঞ্চন-রেখা গণ্ডে নামিল আসি।
অঞ্জন আঁকা খঞ্জন আঁখি আর।
শীকারীরে বিধি শীকার করে না তার।
কুসুম পেলব কোমল সে তনুলতা
হয়ে গেছে' আজ স্বপ্নদিনের কথা।
মধুর অধরে নাহি সে মদির হাসি,
পতঙ্গ যাহে পক্ষ হারাত আসি,
স্থলমূল এবে দশন মুকুতাপাতি,
অমানিশা এ যে, কোথা সে জ্যোৎস্নারাতি!
চলনে চলনে খেলে না বিজলী আর,
নিবান দীপের দশা সম দশা তার।
ফুটেছিল ফুল রজনীর অবসানে,
প্রণয়ের গীত মধুপ ঢেলেছে কানে।
দিবসের ফুল নিশীথে গিয়াছে ঝরি,
সৌরভটুকু বাতাসে নিয়াছে হরি।
উড়ে গেছে অলি ভিন্ন কুসুম আশে,
ছেঁড়া মালাখানি কর্দ্দম-নীরে ভাসে।
পরিচিত মুখ ঘৃণায় ফিরায় আঁখি,
অতীতের দিন স্মরণ-অতীতে রাখি।
যে হাত দিয়েছে দাসখত লিখে পায়।
'ভিখ্' দিতে আজি ঘৃণায় সে মরে যায়।

ক্লান্ত তপন স্বর্ণ রশ্মিজাল
গুটায়ে কহিল "বিদায়, আসিব কাল।'
ক্লান্ত-চরণ পথিক ফিরিছে ঘরে;
বাবুরা চলেছে বায়ু সেবনের তরে
ছড়ি ঘুরাইয় সুবাস উড়ায়ে বায়,
লুব্ধ নয়নে দুঃখিনী ফিরিয়া চায়;
ভিক্ষার ভাষা অধর-প্রান্তে বাধে,
ভিক্ষুক হিয়া অন্তর-মাঝে কাঁদে।
ঐ দেখা যায় অট্টালিকার পরে
জ্বালি দীপখানি, কঙ্কণ-ঘেরা করে
গৃহের লক্ষ্মী মৃদুল চরণে চলি
সন্ধ্যা দেখান—সন্ধ্যা-তারায় ছলি;
হাসিমুখে শিশু মায়ের আঁচল ধরে,
হাসিমুখে স্বামী ফিরিয়া এলেন ঘরে,
পথের প্রান্তে ভিখারিণী দেখে চেয়ে,
হৃদয়-শোণিত আঁখি দিয়ে পড়ে বেয়ে।
তা'রও বুঝি ছিল এম্নি সুখের 'ঘর';
কর্ম্মের দোষে সে আজি সবারই পর;
বুদ্ধিবিপাকে কর্দ্দমে পদ দিয়া
পঙ্কিল হ্রদে পড়েছে সে গড়াইয়া;
সবই ছিল তার—তবু তার কিছু নাই
মাথা রেখে আজ মরিবার মত ঠাঁই।

বিপর্য্যয়

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল

(৩৭)

অনীতাকে তাহার দাদা যে সম্পত্তি দিয়াছিল, তাহা সে এ যাবৎ স্পর্শ করে নাই। তার নিজ নামে ব্যাঙ্কে যে টাকা ছিল, তাই লইয়া সে এতদিন কাজ চালাইয়াছে।

একদিন সে হঠাৎ চিঠি লিখিয়া সলিসিটারকে ডাকাইল, এবং তাঁহাকে তাহার সমস্ত টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিতে বলিল; এবং পার্কষ্ট্রীটের বাড়ীখানা অবিলম্বে বেচিয়া ফেলিতে উপদেশ দিল।

তার পর সে নিজ হইতেই এক ইংরেজ কণ্ট্রাক্টর ফারমে চিঠি লিখিয়া, তাহাদিগকে শ্যামাসুন্দরীর বসতবাটী ও ঠাকুরবাড়ী মেরামত করিবার আদেশ দিল। এই কণ্ট্রাক্টর অনীতার পিতার সমস্ত কাজ করিত,—ইহাদের ছাড়া যে রাজমজুরের কাজ হইতে পারে, তাহাই সে জানিত না।

ব্যাপার দেখিয়া চক্রবর্ত্তী অবাক্ হইয়া গেল। সে বলিল, "সে কি! এ বাড়ী মেরামত ক'রতে আমাদের রহিম রাজকে বল্লেই হয়, না ঐ সাহেব কোম্পানীকে হুকুম! এ যে টাকার শ্রাদ্ধ হ'বে।"

অনীতা বলিল, "আচ্ছা, টাকার জন্য চিন্তা নেই,— আমি লক্ষ্মী-নারায়ণের বাড়ীঘর মেরামত করিয়ে দিচ্ছি।"

চক্রবর্ত্তী দেখিল যে, এ কাজটা যদি তাহার হাত দিয়া হইত, তবে সে অন্ততঃ হাজার টাকা রাখিতে পারিত। সেই হাজার টাকা অতিরিক্ত খরচ হইবে,—কেবল সেটা চক্রবর্ত্তীর মত সদ্ব্রাহ্মণের পেটে না গিয়া ঐ ম্লেচ্ছদের হাতে যাইবে। কিন্তু নিরুপায়।

ইহার পর অনীতা যাহা করিল, তাহাতে চক্রবর্ত্তী তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। চক্রবর্ত্তী যে এই দুইটি অসহায়া বিধবার উপর, তাহাদেরই অন্নে পুষ্ট হইয়া, এতটা অত্যাচার করিবে, ইহা অনীতার সহ্য হইল না। সে স্পষ্টই দেখিতে পাইল যে, বাড়ী-ভাড়ার টাকা চক্রবর্ত্তী চুরী করে। আর তা ছাড়া, বাড়ীগুলি হইতে যা আয় করা যাইতে পারে, তাহা হয় না। সে কণ্ট্রাক্টর সাহেবকে ডাকিয়া এ বিষয়ে পরামর্শ করিল। পরে সে শ্যামাসুন্দরীর সম্মতি লইয়া, তাহার সলিসিটারের দ্বারা একটা বন্দোবস্ত করিল। তাহাতে সমস্তগুলি বাড়ী ও জমী একজন লোক একটা মোটা ভাড়ায় বন্দোবস্ত করিয়া লইল। বাড়ী গড়িবার, ভাঙ্গিবার, ভাড়া দিবার ও ভাড়া আদায় করিবার ভার তাহার, শ্যামাসুন্দরী মাসান্তে কেবল গুণিয়া ভাড়ার টাকাটা পাইবেন; তাহা পদ্মলোচন যাহা দিতেছিল তাহার দ্বিগুণ।

পদ্মলোচন তাহার ক্রোধ গোপন করিবার কোনও প্রয়াসই করিল না। অনীতাকে খৃষ্টান তো বলিলই, তা ছাড়া, এত সব অনভিধানিক শব্দে অভিহিত করিল যে, অনীতা কাণে হাত দিয়া পলাইল।

শ্যামাসুন্দরীকে পদ্মলোচন শাসাইল যে, সে সব ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। শ্যামাসুন্দরী যদিও স্বচ্ছল টাকা পাইয়া খুসীই হইয়াছিলেন, তবু ব্রাহ্মণের ভয়ে ম্রিয়মান হইয়া পড়িলেন। অনীতা তাঁহাকে সাহস দিল, বুঝাইয়া বলিল যে পদ্মলোচন যেখানেই যাক না কেন,—এখানে পূজারী হিসাবে তাহার যে প্রাপ্তি, তাহার অর্দ্ধেকও সে অন্য কোথাও রোজগার করিতে পারিবে না। কিন্তু ব্রাহ্মণের মান্যির ভয়ে শ্যামাসুন্দরী অনীতার কথায় সাহস করিতে পারিলেন না। শেষ পর্য্যন্ত তিনি তাঁর টাকা রাখিবার ও খরচ করিবার ভার পদ্মলোচনকেই দিলেন।

অনীতার বড় দুঃখ হইল। কিন্তু শ্যামাসুন্দরীর হিত করিতে পারিল না বলিয়াই যে সে অতিষ্ঠ হইল, তাহা নহে। শ্যামাসুন্দরী টাকা-কড়ি ছাড়িয়া দেওয়ায়, পদ্মলোচনের তেজ অসহ্য হইল। শেষে অনীতা স্থির করিল, সে এ বাড়ী ছাড়িয়া যাইবে।

গোস্বামীকে সে এ কথা বলিল। কিন্তু গোস্বামী বলি-লেন, "তুই তো যেতে পারবি নে মা! চেয়ে দেখ তোর

লক্ষ্মী-নারায়ণের পানে,—নারায়ণ যে তোর মুখ চেয়ে আছেন মা,—তুই কেমন ক'রে যাবি!"

অনীতা চাহিয়া দেখিল; তার প্রাণ সত্যই কাঁদিয়া উঠিল! এ কি আশ্চর্য্য! তবে কি সে সত্য-সত্যই নারায়ণকে প্রেম করিতে শিখিয়াছে,—সে কি সত্যই রাধার ভাবে ভাবিত হইয়াছে! তার সমস্ত শরীর পুলকিত হইয়া উঠিল। সে ধ্যানস্থ হইয়া নারায়ণের নটবর মূর্ত্তি ধ্যান করিল; মৃদুস্বরে গাহিল

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়:—

গান থামিতে-থামিতে শ্যামাসুন্দরীর বাড়ীর সঙ্কীর্ণ গলি মুখরিত করিয়া একখানা মোটর আসিয়া এই বাড়ীরই সম্মুখে দাঁড়াইল। মোটর হইতে বাহির হইল, অমল ও ইন্দ্রনাথ—অনীতা ভিতরে একটা সাড়ীর আঁচল দেখিতে পাইল। তার প্রাণটা নাচিয়া উঠিল। হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল! সে উঠিল না, কথা কহিল না, পাথরের মূর্ত্তির মত মাটি আঁকড়িয়া বসিয়া রহিল।

(৩৮)

অমলের মোটর যতই ইন্দ্রনাথের বাড়ীর কাছে আসিতে লাগিল, ততই সবার মন একটা আশঙ্কায় পীড়িত হইতে লাগিল। বাড়ীতে বাপ-মায়ের কাছে মনোরমা কি সম্ভাষণ পাইবে, প্রত্যেকে স্বতন্ত্র ভাবে তাই ভাবিতে লাগিল। কাহারও মনে আশঙ্কার অভাব ছিল না।

কিন্তু তার মধ্যে অমলের মনটা একটু রঙ্গিন হইয়া ছিল। সে স্বপ্ন দেখিতেছিল।

যখন সে দার্জ্জিলিঙ্গে শুনিতে পাইল যে, সুলতা বলিয়াছে, অমল মনোরমার প্রেমাস্পদ, তখন হইতেই সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিয়াছে। সুলতা এ কথা বলিল কেন? সে চট্ করিয়া তাহার নামে বানাইয়া এমন মিথ্যা বলিতে পারে বলিয়া সম্ভব মনে হইল না। মনোরমার সঙ্গে সুলতার ভাব ছিল, সুলতা মনোরমার কাছেই কথাটা শুনিয়া থাকিবে। মনোরমাই হয় তো তার এই অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে তার এই মনের গোপন কথাটা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে।

এ কল্পনায় অমলের অস্বাভাবিক রকম একটা আনন্দ বোধ হইল। হঠাৎ সে সমস্ত সত্তা দিয়া অনুভব করিল যে, সে কায়মনোবাক্যে মনোরমাকে ভালবাসে। এতদিনও তার অন্তর তাহাকে ভালই বাসিয়াছিল; কিন্তু মনোরমা বৈধব্যের বর্ম্ম দ্বারা আপনাকে এমন পরিপূর্ণ ভাবে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিল যে, এত বড় সাহসের কথা অমলের অন্তর আপনার কাছে স্বীকার করিতে ভরসা করিত না। সুলতার কথা শুনিয়া হঠাৎ এই জুজুর ভয় কাটিয়া গেল। সে আবিষ্কার করিল যে, বাস্তবিকই সে মনোরমাকে ভালবাসে। যদি মনোরমাকে ফিরিয়া পাওয়া যায়, তবে এখন আর তাহার তাহাকে ভালবাসিবার কোনও অন্তরায় থাকিবে না, এটা সে স্থির করিল। কেন না, এত দিন হয় তো সে ব্রাহ্ম হইয়াছে; কাজেই বৈধব্যের আপত্তিটা বড় গুরুতর নাও হইতে পারে। তা ছাড়া, আর একটা প্রকাণ্ড অন্তরায়,—ইন্দ্রনাথের সঙ্গে তার অসদ্ভাব। তাহা তো এমনি অপ্রত্যাশিত ভাবে মিটিয়া গেল! তাই মোটের উপর বেশ উৎফুল্ল চিত্তেই সে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। যখন সুকুমার বাবুর বাড়ীর দরজায় আসিয়া সে মনোরমার দেখা পাইল, তখন সে যে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল, তাহা কেবল নিছক বন্ধুর সঙ্গে সহানুভূতিজনিত আনন্দ নহে, সে আনন্দটা বেশীর ভাগই স্বার্থপর।

মোটর চালাইতে চালাইতে অমল স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। সুলতার কথা সত্য কি না? মনোরমা সত্য-সত্যই তাহাকে ভালবাসে কি না? সে সত্যই সুলতার কাছে মনের গোপন কথা প্রকাশ করিয়াছিল কি না? এ সব সন্দেহ যে একেবারে তাহার হয় নাই, তাহা নহে; কিন্তু এগুলি মাথা খাড়া করিতে পারে নাই। অমলের চিরদিনই স্বভাব যে, যে কথাটা তার মনে বসিয়া যায়, তা' সে খুব জোর করিয়াই আঁকড়িয়া ধরে; তার বাধাবিঘ্ন সে স্বীকার করে না। তার মনটা ঝড়ের মত সমস্ত অন্তরায় ভূমিসাৎ করিয়া অগ্রসর হয়। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল।

মোটর যখন ইন্দ্রনাথের বাড়ীর দরজায় আসিয়া থামিল, তখন লজ্জায় ভয়ে মনোরমা এক রাশ কাপড়ের ভিতর মুখ লুকাইয়া গাড়ীর ভিতর বসিয়া রহিল,—তার এক পা-ও উঠাইতে ভরসা হইল না। এই স্নেহের নীড় যে সে স্বেচ্ছায় অবমাননা করিয়া ছাড়িয়া গিয়াছে, এখন এখানে ফিরিয়া সে মুখ দেখাইবে কেমন করিয়া? তা' ছাড়া, তার

মনে হইল তার লজ্জার কথা। বিধবাশ্রমে তাহাকে লইয়া যে কলঙ্ক রটিয়াছিল, সেটা যেন একটা কাঁটার মালার মত তার গলার উপর চাপিয়া বসিয়াছিল। সে যেখানেই যা'ক, সে কলঙ্ক তার পিছু পিছু ছুটিয়া আসিতেছে। ইহা সে অনুভব করিল,—সে রাক্ষসের পদশব্দ সে যেন চারিদিকেই শুনিতে পাইল। এ কলঙ্কের কথা কে না বিশ্বাস করিবে! আপনি যে নিমন্ত্রণ করিয়া সে এ কলঙ্ক ডাকিয়া আনিয়াছে! কথাও তো মিথ্যা নয়! সত্যকিঙ্কর সত্য-সত্যই যে তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিল এবং সেই জন্যই সে তাহাকে বিধবাশ্রমে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। সে বিষয়ে তাহার এখন বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। সত্যকিঙ্করের যে সত্য-সত্যই কোনও দুরভিসন্ধি ছিল না, কোনও অধর্ম্ম বা পাপ তাহার অভিপ্রেত ছিল না, সে যে কেবল তাহাকে ধর্ম্মপত্নী করিবার জন্য সম্পূর্ণ ভদ্রোচিত ভাবে চেষ্টা করিতেছিল, এমন কোনও সম্ভাবনা এক মুহূর্ত্তের জন্যও মনোরমার মনে হয় নাই। সে স্থির জানিয়াছিল, সত্যকিঙ্কর অসহায়া পাইয়া তাহাকে বিলাসের দাসী করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। তাই সে তাহাকে কাপড়-চোপড় উপহার দিয়াছিল; তার সব অভাব মোচন করিয়াছিল। কেবল বিধবাশ্রমে যে কটা দিন থাকিতে হইবে, সেই কটা দিন শ্লীলতাবিরুদ্ধ বাড়াবাড়ি করে নাই। শীঘ্রই সে তাহাকে স্থানান্তরে লইয়া গিয়া তাহার সম্পূর্ণ বাসনা চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করিত,—এ বিষয়ে মনোরমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। ভাবিতে মনোরমার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। কি ভীষণ সে পরিণতি! ঘৃণায় লজ্জায় তার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। সে যে সেই পাষণ্ডের দেওয়া একখানা কাপড়ও একদিনের জন্যও পরিয়াছে,—তার দেওয়া বই পড়িয়া সময় যাপন করিয়াছে,—তার কাছে দীক্ষা লইয়াছে—ভাবিতে কলঙ্কে লজ্জায় তার গা কামড়াইতে ইচ্ছা করিতেছিল। তার আবাল্যের স্নেহনীড়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, তার সব চেয়ে প্রিয়তম যারা, তাদের সঙ্গে আসন্ন সম্ভাষণের বিভীষিকা কল্পনা করিয়া, এই লজ্জার স্মৃতি তাহার অন্তরাত্মাকে নির্ম্মমভাবে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিতে লাগিল।

ইন্দ্রনাথেরও প্রাণ কম্পিত হইল। তার গাড়ী হইতে নামিতে পা' সরিতেছিল না। তার পিতার ভয়ে সে কম্পিত হইল। ইন্দ্রের পিতা পরম স্নেহময়। কোনও দিন ছেলে-মেয়েকে তিরস্কার করেন নাই; কিন্তু তাঁর ভিতর একটা খুব শক্ত জিদ ছিল, তাহা ইন্দ্রনাথ জানিত; এবং ঠিক এই রকম ব্যাপারে যে তাঁর জিদটা খুব বেশী হইয়া উঠিতে পারে, তাহাও সে সম্ভব মনে করিল। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু,—তিনি যে মনোরমার গৃহত্যাগ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ একটা গুরুতর পদস্খলন বলিয়া মনে করিবেন, তাহা ইন্দ্রনাথের সম্ভব বলিয়া মনে হইল। তাই ইন্দ্রনাথের পা কাঁপিয়া উঠিল। একবার সে ভাবিল, মনোরমাকে এখন না আনিয়া, আর দুই দিন পরে তার বাপ চলিয়া গেলে আনিলেই ভাল হইত। এ কথা কিন্তু তার একটি বারের জন্যও মনে হইল না যে, মনোরমার গৃহত্যাগটা এর চেয়ে কোনও গুরুতর ভাবে দেখা যাইতে পারে; কেন না, সুকুমার বাবুর বাড়ীতে মনোরমাকে দেখিয়া সে সে-সমস্ত আশঙ্কার বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। সুকুমার ঘোষ ধর্ম্মান্ধ হইতে পারেন; কিন্তু তিনি অধার্ম্মিক নন। তাঁর গৃহে গিয়া মনোরমা কোনও রকমেই কলঙ্কিত হইতে পারে না।

ইন্দ্রনাথ মোটর হইতে নামিয়া কম্পিতকলেবরা মনোরমাকে নামাইল। সম্মুখের ধাপ দিয়া উঠিয়া দরজার ভিতর প্রবেশ করিল। সম্মুখে তার পিতা দাঁড়াইয়া কঠোর কণ্ঠে বলিলেন, "এ কাকে নিয়ে এলে ইন্দ্রনাথ?"

মনোরমার সমস্ত শরীর যেন ঝাঁকাইয়া দিল,—এক মুহূর্ত্তে তার বুকের ভিতর হইতে সমস্ত রক্ত ঝলক দিয়া সরিয়া গেল। ইন্দ্রনাথও চমকিত হইয়া পিতার মুখের দিকে চাহিল।

পিতা আবার বলিলেন, "কোথা থেকে এলে তুমি স্বাধীনা সুন্দরী—ঘর ছেড়ে গিয়েছিলে কোথা?"

মনোরমার মুখে কথা ফুটিল না। তার মূর্ত্তি দেখিয়া অমল ভয় পাইল,—সে তার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

ইন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি বলিল, "ও সুকুমার বাবুর বাড়ী গিয়াছিল—দীক্ষা নিতে"—

"তুমি চুপ করনা হে বাপু,—এই মূর্ত্তিমতী স্বাধীনতাকে ব'লতে দাও। সুকুমার বাবুর কাছে গিয়েছিলেন, সে কে? তার কাছে ও যায় কেন? তা' ছাড়া, সেখানেই যদি গিয়েছিল, তবে সেদিন ওর সন্ধান না পেয়ে তুমি দার্জ্জিলিঙ্গ ছুটেছিলে কেন, আর সেই যে দেড়ে বেটা এসে-

ছিল সেদিন, সেই বা কে? কি বলিস্ তুই—বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলি সুকুমার বাবুর বাড়ী?"

ইন্দ্র তাড়াতাড়ি বলিল, "হাঁ বাবা, আমরা সেখানেই ওকে পেয়েছি"—

মনোরমা মুখ নীচু করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া নথ খুঁটিতেছিল—তার হাত পা ঠক্ ঠক করিয়া কাঁপিতেছিল,—তার সমস্ত মুখ সাদা হইয়া গিয়াছিল। সে একটা কথা বলিবার প্রচণ্ড চেষ্টা করিতেছিল, কিছুতেই কথা বাহির হইতেছিল না। শেষে অনেক কষ্টে সে বলিল, "না, সুকুমার বাবুর বাড়ী যাইনি।"—

অমল ও ইন্দ্রনাথ বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইল। এ কি কথা! তিন জোড়া চোখ যেন মনোরমার মুখের ভিতর বিঁধিয়া বসিল। পিতা দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিলেন, "পাপিষ্ঠা!—তবে কোথায় গিয়েছিলি, কোথায় ছিলি এ ক'দিন বল্।"

সমস্ত বিশ্বটা যেন মনোরমার চোখে ধোঁয়া হইয়া গেল। তার সেই লজ্জার কথা, বঞ্চনার কথা, কলঙ্কের কথা কি তার বাপের কাছে, ভাইয়ের কাছে, অমলের কাছে নিজ মুখে বলিতে হইবে? অসম্ভব! এক মুহূর্ত্তে সমস্ত সংসার অন্ধকার হইয়া গেল। পড়িতে-পড়িতে সে অমলের হাত ধরিয়া সামলাইয়া গেল; অনেক কষ্টে ধীরে-ধীরে সে বলিল, "সে কথা আমায় এখন জিজ্ঞাসা ক'রবেন না;—আমি কোনও অপরাধ করিনি।"

"অপরাধ করোনি বটে!" তার বাপ চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "অপরাধ করনি বটে! পাপীয়সী, তুই নির্লজ্জের মত এই কথা বল্লি,—তোর জিভ খসে প'ড়লো না? এক ফোঁটা লজ্জা তোর রক্তে নেই—তোকে জন্ম দিয়েছি বলে' আমার যে লজ্জা হ'চ্ছে! ইন্দ্রনাথ, শোন, আমি তোমাকে ব'লে রাখছি, মনোরমা যে মুহূর্ত্তে এই চৌকাট ডিঙ্গোবে, সেই মুহূর্ত্তে আমি জন্মের মত এ বাড়ী থেকে চলে যাব,—তোমার সঙ্গেও আমার কোনও সম্পর্ক থাকবে না। আমাকে চাও, না, মনোরমাকে চাও, স্থির কর।"

ইন্দ্রনাথের মাথা ঘুরিতেছিল। মনোরমার একটা কথাই তাহাকে নির্ব্বাক করিয়া দিয়াছিল। সে এথান হইতে সুকুমার বাবুর কাছে যায় নাই,—তবে কোথায় গিয়াছিল? সে অপরাধ করে নাই, তবে সব কথা খুলিয়া বলে না কেন? ভয়ানক-ভয়ানক কল্পনা তা'র মাথায় আসিতে লাগিল! সে ভীত, চমকিত হইয়া উঠিল।

তার পিতার কথায় সে আরও বিব্রত হইয়া উঠিল। মনোরমা হাজার অপরাধিনী হউক, ইন্দ্রনাথ তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে না। পাপীয়সী হইলেও তাকে পথে বাহির করিয়া দিয়া, তাহাকে জন্মের মত ভাসাইয়া দিতে পারে না। তাই তার বাপ যদি তাহাকে শাসাইয়া বলিতেন "মনোরমাকে চাও তো তুমি এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও" তবে সে দ্বিধা না করিয়া মনোরমার হাত ধরিয়া বাহির হইয়া যাইত। কিন্তু এখন মনোরমাকে গ্রহণ করা মানে পিতাকে তার বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দেওয়া—এই ভাবে প্রশ্নটা উপস্থিত হওয়ায়, সে বড় দ্বিধায় পড়িয়া গেল। কিছুই স্থির করিতে পারিল না। অমল তা'র মুখের উপর চাহিয়া রহিল একটা মানুষের মত উত্তরের আশায়। যখন সে নীরব রহিল, তখন অমল কতকটা হতাশ হইল।

অমলের মনেও একটা ভয়ানক ধাক্কা লাগিয়াছিল মনোরমার প্রথম কথা শুনিয়া। কিন্তু শেষ যখন মনোরমা বলিল সে কোনও অপরাধ করে নাই, তখন সে পুলকিত হইল। মনোরমা বলিয়াছে অপরাধ করে নাই,—এই তার পক্ষে যথেষ্ট; আর কোনও প্রমাণই তার আবশ্যক নাই! ইন্দ্রনাথ যে তার বাপের কথায় দ্বিধা করিতেছিল, তাহাতে সে বিরক্ত হইয়া উঠিল।

ইন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ পরে ধীর ভাবে বলিল, "বাবা, আপনি রাগ করে আমাকে হঠাৎ এমন পরীক্ষায় ফেলবেন না। এখন মনোরমা থাকুক! সব কথা ভাল করে বিবেচনা করে যা স্থির হয় ক'রবেন।"

ঘাড় নাড়িয়া তাহার পিতা বলিলেন, "আমি দু'কথার মানুষ নই ইন্দ্রনাথ! মনোরমাকে রাখতে ইচ্ছা কর, সে থাক—আমি চ'ল্লাম।"

ইন্দ্রনাথ অমলের হাত ধরিয়া বলিল, "অমল, কি করি ভাই?"

মনোরমা তখনও অমলের হাত ধরিয়া ছিল। অমলের হাত ছাড়িয়া দিতে তাহার বিশেষ কোনও আগ্রহ ছিল না। সে হাত যে ভয়ানক কাঁপিতেছে, তাহা অনুভব করিয়া অমল সস্নেহে তার হাত চাপিয়া ধরিল। সে বলিল, "কি ক'রবে

ভাবছো? ভাবতে থাকো। আমি মনোরমাকে কলেজ বোর্ডিংএ নিয়ে চল্লুম।"

ইন্দ্রনাথ যেন একটা কূল পাইল। সে মাথা খাড়া করিয়া বলিল, "বাবা, আপনিই থাকুন, আমি মনোরমাকে নিয়ে যাই।"

অমল ও ইন্দ্রনাথ তাদের দুজনের ভিতর এক রকম তোল্লা করিয়া মনোরমাকে লইয়া বাহির হইয়া গেল।

মোটরে উঠিয়া মনোরমা বলিল, "খোকা?" ইন্দ্রনাথ বলিল, "থাক না ও এখানে,—বোর্ডিংএ তো ওকে নেবে না।" মনোরমার চক্ষে জল আসিল। সে কাতর দৃষ্টিতে অমলের দিকে চাহিল। অমল বলিল, "না, সেও কি হয়? খোকাকে নিয়ে এসো।"

খোকা দুয়ারের সামনেই হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল; ইন্দ্র তাহাকে ধরিয়া আনিল। সেই সময় পাশের ঘরের একটা জানালা খুলিয়া সরযূ ডাকিল, "শীগ্‌গির এসো, মার মূর্চ্ছা হ'য়েছে।"

ইন্দ্রনাথ খোকাকে মোটরে উঠাইয়া বলিল, "তুমিই এদের নিয়ে যাও ভাই, আমি পরে আসছি।"

অমল বলিল, "তবে তুমি আমার বাড়ীতেই এসো," বলিয়া মোটর ছাড়িয়া দিল। (ক্রমশঃ)

বৃদ্ধের বচন

শ্রীমানবেন্দ্র সুর

একে একে পাক্‌ছে মাথার চুল!
সবাই বলে বুড়ো হয়েছি—এটা কিন্তু ভুল;
চুল কটা যে হলেই সাদা
হ'তেই হবে ঠাকুরদাদা,
এ কথাটা একেবারেই মিছে;
মনটা যে গো দিচ্ছে হামা যৌবনটার পিছে।

* * *

বয়স যদি উৎরে আমার গিয়েই থাকে যাট,
ই ব'লে কি ভাঙতে হবেই আভাঙা এই তরুণ মনের ঠাট?
দু'কুড়ি দশ পেরিয়ে গেলেই হারিয়ে হাতের তাশ
নিতেই হবে বানপ্রস্থ কিম্বা বনবাস?
প্রাণের শাস্ত্র নয়কো' সেটা ঠিক
এবং সেটায় সায় দেয় না মনস্তত্ত্বের দিক!

* * *

ফুরিয়ে যদি গিয়েই থাকে যৌবনটার মেয়াদ—
সেটা রাখ্‌বো কেন এয়াদ?
জরায় আমার জরিয়ে দিলেও দেহের আবরণ
হাস্‌ছে যখন চির-কিশোর মন,
প্রাণটা যখন দেখ্‌ছি আজও তাজা,
জোর ক'রে আর কেন তবে নকল বুড়ো সাজা?

* * *

লোল-চর্ম্ম হ'লে কি হয় ভেতরটা যে কাঁচা,
বাইরে থেকে দেখ্‌তে প্রাচীন হ'লেও হাড়ের খাঁচা,
আত্মারাম যে পাখী—
সে যে নেচে শীশ্ দিয়ে গায়! সাম্‌লে কিসে রাখি?
বয়েস বেশী হোলে
সাধ-আহ্লাদ্ শিক্‌লী ছিঁড়ে যায় না তো সব চ'লে!

* * *

বর্ষা এসে ভাষায় আজও হৃদয় উপকূল,
বসন্ত যে তেম্‌নি কোরেই ফুটিয়ে তোলে ফুল!
তবু তাকে আপন হাতে আছড়ে পিষে মেরে
ভাবের ঘরে চুরি ক'রে মনকে আঁখি ঠেরে,
লোকলজ্জায় খায় না যারা ছোলা
তাদের ভাগ্যে শেষ বয়সে শুধুই ছাতু-গোলা!

নায়েব মহাশয়

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ম্যানেজার হামফ্রি সাহেবের অনুগ্রহে নায়েব শ্রীনাথ গোঁসাই তাহার কার্য্যক্ষেত্র একরকম নিষ্কণ্টক করিয়া তুলিল বটে, কিন্তু তাহার পারিবারিক জীবনে বিন্দুমাত্র সুখশান্তি ছিল না; বোধ হয় সে তাহা প্রার্থনীয় মনে করিত না! সে তাহার বিধবা ভগিনী জ্ঞানদা দেবীকে অত্যন্ত স্নেহ করিত, এবং তাহার সকল আবদার রক্ষা করিয়া চলিত। এ জন্য তাহার 'দ্বিতীয় সংসার' তরুণী ভার্য্যা দীনতারিণী দেবী সময়ে-সময়ে তাহাকে দশ কথা শুনাইয়া দিত। বিশেষতঃ স্বামীর পত্নীবৎসলতায় তাহার যথেষ্ট সন্দেহের কারণ থাকায়, তাহার অবস্থা জগদম্বার শাসনাধীনে জলধরের ন্যায় অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। তবে সৌভাগ্যক্রমে শ্রীনাথ নায়েবের কোন দিন 'হোঁদলকুৎকুতে' সাজিবার সাধ হয় নাই।

নায়েবের ভগিনী বলিয়া জ্ঞানদার মনে অহঙ্কারের মাত্রা এতই বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, সে মানুষকে মানুষ মনে করিত না, এবং দাদার অত্যধিক আদরে তাহার চালচলনও বিগড়াইয়া গিয়াছিল। পল্লীগ্রামের গৃহস্থ ঘরের বিধবা হইলেও, সে তাহার নির্জ্জন শয়ন-কক্ষে বসিয়া 'কি দিবসে কি নিশাথে' হারমোনিয়ম সহযোগে উচ্চৈঃস্বরে সঙ্গীতালাপ করিত; এবং সেই সকল সঙ্গীত পরমার্থ-বিষয়ক সঙ্গীত বলিয়া কোন শ্রোতারই ভ্রম হইত না। এমন কি, কোন-কোন দিন অপরাহ্ণে বা জ্যোৎস্না-পুলকিত মলয়-হিল্লোলিত মধু-যামিনীতে পথের লোকও শুনিতে পাইত, জ্ঞানদা দেবীর সুসজ্জিত শয়ন-কক্ষে গান হইতেছে—'যায় বুঝি যৌবনের তরী অকূল তুফানে!'—এই সকল সঙ্গীত নায়েবের কর্ণেও প্রবেশ করিত। দীনতারিণী এই শ্রেণীর সঙ্গীতের উপযোগিতা সম্বন্ধে স্বামীর সহিত তর্ক করিলে, ভগিনীবৎসল উদার-হৃদয় নায়েব প্রশান্ত চিত্তে বলিত, "আহা, গা'ক, গা'ক। তোমার ওতে হিংসে হয় কেন? ভগবান ওকে মেরে রেখেছেন। মন হ'লে দু'দণ্ড গান-বাজনা করবে—তাও তোমাদের সহ্য হবে না? তোমাদের কি ভয়ঙ্কর কুসংস্কার! বিধবাতে গান গাইলেই যেন ভাগবত অশুদ্ধ হ'লো! কলকাতার কত বড়-বড় ঘরের মেয়েরা বন্ধুবান্ধবের মজলিসে সঙ্গীতালাপ করে, জান্‌লে আর তিলকে তোমরা তাল করতে না। ওটা যে একটা বিদ্যে,—ললিত-কলা। মা সরস্বতী গানের দেবতা,—সে খবর রাখ না বুঝি?'

দীনতারিণী স্বামীর বক্তৃতা শুনিয়া মুখ বাঁকাইয়া বলিতেন "হ্যাঁ গো, হ্যাঁ! কল্‌কাতার বড়-বড় ঘরের ধাড়ী বিধবা মেয়েরা হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান করে—'যায় বুঝি যৌবনের তরী অকূল তুফানে!'—তুমি কাকে বোকা বুঝাতে এসেছ? যেমন ভাই, তেমনই বোন!"

দীনতারিণী নায়েবের সেরেস্তার কোন আমলা বা কান্‌সার্ণের কোন প্রজা নয় যে, নায়েব মুখের মত জবাব পাইয়া তাঁহাকে শাসন করিবে! 'দ্বিতীয় সংসারে'র কঠোর বাক্যবাণে সে জর্জ্জরিত হইয়া কুঠিতে পলায়ন করিত, এবং সেখানে গিয়া তাঁবেদারদের নিকট বীরত্ব প্রকাশ করিত! বাড়ীতে ভগিনী জ্ঞানদা ভিন্ন তাহার 'ব্যথার ব্যথী' আর কেহই ছিল না।

কিন্তু নায়েবের ছোট ভাই জ্যোতিষ জ্ঞানদার 'বেয়াদপি' সহ্য করিতে পারিত না। বাড়াবাড়ি দেখিলে সে মধ্যে-মধ্যে ভগিনীকে দু'কথা শুনাইয়া দিত; তাহার স্বেচ্ছাচারে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করিত। এজন্য জ্ঞানদা জ্যোতিষকে শত্রু মনে করিত; এবং তাহাকে জব্দ করিবার কোন উপায় আবিষ্কার করিতে না পারিয়া, সাংসারিক সামান্য-সামান্য বিষয় লইয়া জ্যোতিষের স্ত্রীর সহিত তুমুল কলহ আরম্ভ করিত। তাহার পর জ্ঞানদা, জ্যোতিষ ও তাহার স্ত্রীর ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইয়া, তাহাদের অপরাধের কথা সালঙ্কারে দাদার কর্ণগোচর করিত। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, নায়েব-পত্নী দীনতারিণী অধিকাংশ স্থলেই

দেবরের ও তাহার স্ত্রীর পক্ষ সমর্থন করিতেন; অর্থাৎ গৃহবিবাদে জ্ঞানদা যে পক্ষ অবলম্বন করিত, দীনতারিণী তাহার বিপক্ষে ওকালতনামা গ্রহণ করিতেন! নায়েব অভিযোগে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলেও, স্ত্রীর ভয়ে কোন মতামত প্রকাশ করিত না,—ভগিনীর অভিযোগগুলি অগত্যা মাঠে মারা যাইত! জ্ঞানদা মামলায় হারিয়া, অভিমানে কখন অশ্রুবর্ষণ করিত, কখন রাগ করিয়া গঙ্গাস্নান করিতে যাইত। গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া সে দীর্ঘকাল তাহার দাদার কোন বন্ধুর গৃহে কাটাইয়া আসিত। ইহাতে নায়েবের আপত্তি ছিল না হারমোনিয়মের সঙ্গে গান, গঙ্গাস্নান এবং পরিবারস্থ সকলের সহিত কলহ করিয়া দাদার উপর অভিমান—এই সকল লইয়া জ্ঞানদার বৈধব্য জীবন এক রকম সুখেই কাটিতে লাগিল। কিন্তু সঙ্কীর্ণ-চেতা, নীরস-প্রকৃতি জ্যোতিষ তাহার এই সকল সুখে বাধা দান করায়, সে জ্যোতিষকে সস্ত্রীক বাড়ী হইতে তাড়াইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল; এবং তাহাদের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিল।

একান্নবর্ত্তী পরিবারে জ্যোতিষ একে ত নায়েবের ছোট,—কেবল বয়সে ছোট নয়, উপার্জ্জনেও ছোট। তাহার উপর সে নায়েবের অধীন কর্ম্মচারী। সুতরাং সকল বিষয়েই তাহাকে নায়েবের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত। জ্ঞানদা প্রত্যহ এত মিথ্যা কথা রচনা করিয়া তাহার ও তাহার স্ত্রীর বিরুদ্ধে 'ঠকামি' করিতে লাগিল যে, দীনতারিণী সাধ্যানুসারে তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াও, জ্ঞানদার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিতে পারিলেন না। একদিন নায়েব জ্যোতিষকে সস্ত্রীক গৃহত্যাগ করিতে আদেশ করিল। দুর্ব্বল জ্যোতিষ সকল দিক ভাবিয়া দেখিয়া, দাদার আশ্রয় ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিল। কিন্তু দীনতারিণী নিষ্ঠুর স্বামীর ভ্রাতৃবিদ্বেষ ও স্বার্থপরতার পরিচয়ে এতই ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইলেন যে, নায়েবের সংসার-ধর্ম্ম মাথায় উঠিল! অবশেষে 'দ্বিতীয় পক্ষ' ও ভগিনী, উভয়কেই খুসী করিবার জন্য শ্রীনাথ গোঁসাই নায়েবী চাল চালিয়া একটা রফা নিষ্পত্তি করিল। জ্যোতিষকে আর বাড়ী ছাড়িতে হইল না; কিন্তু তাহার স্ত্রীকে পিত্রালয়ে গিয়া আশ্রয়-গ্রহণ করিতে হইল! একান্নবর্ত্তী পরিবারে বড় ভাই ছোট ভাইকে গৃহ-বহিষ্কৃত করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর, আর তাহার স্ত্রী দেবর ও দেবর-পত্নীকে তাঁহার স্নেহাঞ্চলচ্ছায়ায় আশ্রয় দানের জন্য সঙ্কীর্ণচেতা স্বার্থপর স্বামীর উপর অভিমান করিয়া অনাহারে পড়িয়া আছেন,—এরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের পল্লীভবন দূরের কথা, বাঙ্গালা দেশের গার্হস্থ্য উপন্যাসের ক্ষেত্রেও একান্ত দুর্লভ! এই 'স্বর্ণলতার' যুগে কোন প্রতিষ্ঠাপন্ন উপন্যাস-লেখকের উর্ব্বর কল্পনাও বোধ হয় এরূপ চিত্র অঙ্কিত করা দুঃসাহসের কাজ মনে করিবে!

জ্যোতিষ গোঁসাই নায়েব অপেক্ষা অধিক চতুর। সে অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করিয়া, স্ত্রীকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া দাদার সংসারেই বাস করিতে লাগিল। নায়েব দ্বিতীয় সংসারকে অসন্তুষ্ট করিয়া সংসারে বাস করা 'যথারণ্যম্ তথা গৃহম্' মনে করিতে লাগিল; এবং দীন-তারিণীর মনোরঞ্জনের জন্য তাঁহার সহোদরের, এমন কি, তাঁহার কোন-কোন জ্ঞাতি ভ্রাতারও চাকরী করিয়া দিল। তাহার মনিব ও মুরুব্বি ভক্তবৎসল হামফ্রি সাহেবকে ধরিয়া কানসারণের মধ্যেই তাহাদের চাকরী জুটাইয়া দেওয়া তাহার পক্ষে কঠিন হইল না। নায়েব-ঘরণী দীনতারিণী দেবী তাঁহার খুড়তুতো ভাই বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে সহোদর অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন। সুযোগ বুঝিয়া দীনতারিণী বীরেন্দ্রের উন্নতির জন্য স্বামীর নিকট আবদার আরম্ভ করিলেন। নায়েব নিরুপায় হইয়া হামফ্রি সাহেবের শরণাপন্ন হইল। সুরসিক হামফ্রি সাহেব নায়েবের শোচনীয় অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাকে আশ্বাস দিলেন তিনি সুযোগ পাইলেই তাহার শ্যালককে উচ্চতর পদে নিযুক্ত করিবেন।

জ্যোতিষ ব্যতীত নায়েবের আরও কয়েকটি সহোদর ছিল,—তাহারাও কানসারণে নায়েবের অধীন চাকরী করিত, এবং পৃথক বাড়ীতে বাস করিত। তাহারা নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী বলিয়া শ্রীনাথ তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিত,—তাহাদিগকে ভাই বলিয়া স্বীকার করিতে তাহার লজ্জা বোধ হইত! নায়েব কোন দিন তাহাদিগকে নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া ছুটি খাইতে দিয়াছে,—কেহই তাহার এ দুর্নাম করিতে পারিবে না। এমন কি, তাহার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান জ্ঞানেন্দ্র তাহার কাকা-কাকীদের নিকট যতটুকু স্নেহ ও আদর যত্ন পাইত, পিতা

ও বিমাতার নিকট তাহার শতাংশও পাইত কি না সন্দেহ। সে বিনয়ী, সুশীল ও সচ্চরিত্র ছিল—পিতাকে ও বিমাতাকে সে আন্তরিক ভক্তি করিত। কিন্তু সেই মাতৃহীন বালক পিতার নিকট কোন দিন সস্নেহ ব্যবহার পায় নাই। তাহার পিতা কিরূপ দুশ্চরিত্র, ধর্ম্মজ্ঞানরহিত, মহা পাপিষ্ঠ—তাহা অনায়াসেই সে বুঝিতে পারিত। যুবক সমাজে নায়েবের কুচরিত্রের সমালোচনা আরম্ভ হইলে, সে নিঃশব্দে সেই স্থান ত্যাগ করিত, এবং সর্ব্বদা ম্রিয়মান থাকিত। বালক মনের কষ্ট কাহারও নিকট প্রকাশ করিত না,—নির্জ্জনে বসিয়া কি ভাবিত; কেহ তাহার মুখে হাসি দেখিতে পাইত না। নায়েব বহু অর্থ উপার্জ্জন করিলেও, পুত্রের সুশিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় সে অপব্যয় মাত্র মনে করিত। পুত্রকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য তাহার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না!

নায়েব স্ত্রীর আগ্রহাতিশয্যে জ্যোতিষকে বাড়ী হইতে বিতাড়িত করিতে না পারিলেও, তাহার অনিষ্ট-চিন্তায় মুহূর্ত্তের জন্য বিরত হয় নাই। সহোদর হইল কি হয়, অন্যের অনিষ্ট-চেষ্টাই ছিল শ্রীনাথ গোঁসায়ের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব! যেদিন সে কাহারও অনিষ্ট করিতে না পারিত, সেদিন সে মনে করিত, দিনটাই বৃথা গেল!

জ্যোতিষ মুচবাড়িয়া কুঠীর ডাক্তার ছিল। কুঠীর সাধারণ কর্ম্মচারীদের অপেক্ষা ডাক্তারের পদমর্য্যাদা ও সম্মান একটু বেশী, এ কথা বলাই বাহুল্য। পদগৌরবে সে নায়েবের তাঁবেদার অথচ ডাক্তার বলিয়া সকলেই জ্যোতিষকে আদর ও সম্মান করে,—নায়েবের ইহা দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ হাম্ফ্রি সাহেব জ্যোতিষকে একটু ভালবাসিতেন, বিশ্বাস করিতেন,—তাহাকে কাছে বসাইয়া তাহার সহিত নানা রকম গল্প করিতেন,—কোন-কোন বিষয়ে তাহার পরামর্শও জিজ্ঞাসা করিতেন,—ইহা পরশ্রীকাতর নায়েবের সহ্য হইত না। জ্যোতিষকে কুঠীর চাকরী হইতে বরখাস্ত করিবার জন্য তাহার আগ্রহ এরূপ প্রবল হইল যে, কি কৌশলে তাহাকে পদচ্যুত করিবে; তাহাই সে দিবরাত্র চিন্তা করিতে লাগিল। জ্যোতিষ জমীদারী সেরেস্তার আমলা হইলে তাহাকে তাড়াইবার জন্য ছলের অসদ্ভাব হইত না; কিন্তু ডাক্তারের কোন ত্রুটি আবিষ্কার করা যে তাহার বিদ্যা-বুদ্ধির এলাকার বাহিরে! অথচ সাহেবের কাছে তাহার কোন গুরুতর অপরাধের প্রমাণ দিতে না পারিলে তাহাকে পদচ্যুত করাও অসম্ভব! এদিকে সে তাহার ছোট ভাই, তাহার বিরুদ্ধে 'চুকলামী' করিলে সাহেবই বা কি মনে করিবেন। কিন্তু শ্রীনাথ গোঁসাই চক্ষুলজ্জার ধার ধারিত না। অনেক চিন্তার পর সে স্থির করিল—কুঠীর ডিস্‌পেন্সারী সংক্রান্ত কতকগুলি গলদ ধরাইয়া দিয়া সে সাহেবের মনে জ্যোতিষের প্রতি অসন্তোষ ও অবিশ্বাস উৎপাদন করাইবে। তাহার পর সাহেবকে বুঝাইয়া দিবে যে, তাহাকে না তাড়াইলে ডিস্‌পেন্সারীটি মাটী হইবে; ডিস্‌পেন্সারীর মূল্যবান ঔষধগুলি জ্যোতিষ তাহার 'প্রাইভেট প্র্যাক্টিসে' ব্যবহার করিয়া স্বয়ং লাভবান হইবে; কোম্পানীর বিস্তর টাকার ঔষধ জলে পড়িবে!

জ্যোতিষ তাহার দাদাকে চিনিত। দাদা তাহাকে পদচ্যুত করিবার জন্য গোপনে চেষ্টা করিতেছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া, প্রসঙ্গক্রমে সে তাহাদের পারিবারিক সকল কথা হাম্ফ্রি সাহেবের গোচর করিল; এবং তাহার প্রতি দাদার স্নেহ ও বাৎসল্যের পরিচয় দিয়া রাখিল। অতঃপর একদিন সুযোগ বুঝিয়া নায়েব সাহেবের কাছে ডিস্পেন্সারীর কথা উত্থাপন করিল, এবং জ্যোতিষকে না সরাইলে ঔষধালয়টি অচিরে নষ্ট হইবে, ইহা বুঝাইয়া দিল। হাম্ফ্রি সাহেব নায়েবের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ডেকো গোসাইন! তোমার ভাই জোটিস্ বড়া হারাম-জাড আছে, টাহা আমার অজ্ঞাট নহে; আমি টাহার বরটরফের হুকুম পরে ডিব, এ বিষয়ে টুমি নিশ্চিণ্টো ঠাকিটে পারো।"

সাহেব মুখে এ কথা বলিলেন বটে, কিন্তু কাজে কিছুই করিলেন না দেখিয়া, নায়েব আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। তাহার সন্দেহ হইল, জ্যোতিষ গোপনে সাহেবকে দুই চারিটি মিষ্ট কথা বলিয়া তাঁহাকে বশীভূত করিয়াছে,—তাহাকে শীঘ্র তাড়াইবার আশা নাই! নায়েব জ্যোতিষকে কুঠীর চাকরী হইতে বরখাস্ত করিবার উপায় না দেখিয়া বাড়ী হইতে তাড়াইবার জন্য একটি নূতন ফন্দী আবিষ্কার করিল। কাহারও অনিষ্ট করিবার কৌশল স্থির করিতে নায়েবের মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইত না।

নায়েবের বাড়ীতে তাহার শয়ন-কক্ষ সন্নিহিত একটি কক্ষে তাহার স্ত্রী দীনতারিণী ভিন্ন পরিবারস্থ অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না; এমন কি দাসদাসীদের কাহারও কোন কারণে সেই কক্ষে প্রবেশ করা আবশ্যক হইলে, সে জন্য নায়েবের অনুমতি লইতে হইত। একমাত্র দীনতারিণী স্বামীর অনুমতি না লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে পারিত। এই কক্ষে নায়েবের গোপনীয় চিঠি-পত্র, দলিল, টাকাকড়ি সমস্তই থাকিত। কুঠী হইতে আসিয়া, সে তাহার জামা কাপড় ছাড়িয়া এই কক্ষেই রাখিত। জামার পকেটে অনেক সময়েই টাকা, নোট ও গোপনীয় কাগজপত্র থাকিত। পাছে কেহ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া এ সকল জিনিস আত্মসাৎ করে, এই আশঙ্কায় নায়েব বাড়ীর কোন লোককে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দিত না।

এক দিন প্রভাতে নায়েব মহা সোরগোল আরম্ভ করিয়া দিল। সে আর্ত্তনাদ করিয়া বলিয়া উঠিল, "আমার জামার পকেটে হাজার টাকার এক কেতা নোট ছিল, তাহা পাওয়া যাইতেছে না, কে লইল?"—শ্রীনাথ গোসাইয়ের পকেট হইতে হাজার টাকার নোট চুরি করিবে এরূপ লোক তাহার বাড়ীতে থাকা দূরের কথা, গ্রামে ছিল কি না সন্দেহ; কারণ, কাঁচা মাথা লইয়া, সিংহের গুহায় প্রবেশ করিয়া, অক্ষত দেহে প্রত্যাগমন করা বরং সম্ভব, কিন্তু নায়েবের 'নিষিদ্ধ কক্ষে' প্রবেশ পূর্ব্বক হাজার টাকার নোট হজম করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। গোঁসাই প্রভুও এ কথা জানিত। তথাপি সে অভিনয়ের ভঙ্গীতে বলিতে লাগিল, "হায়, হায়, কে এমন সর্ব্বনাশ করিল! কাহার ঘাড়ে তিনটে মাথা যে, সে আমার ঘরে ঢুকিয়া নোট গাফ করিল?"—তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া সকলেই নিস্তব্ধ,—কেহ কোন কথা বলিল না। তখন সে তাহার সহোদর জ্যোতিষ হইতে আরম্ভ করিয়া পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে এমন কি, দাসদাসীদের পর্য্যন্ত, নোটের কথা জিজ্ঞাসা করিল; বলা বাহুল্য, কেহই নোট চুরী স্বীকার করিল না।

যথা সময়ে নায়েব অত্যন্ত গরম হইয়া কাছারীতে চলিয়া গেল, এবং হামফ্রি সাহেবকে নোট চুরীর কথা জানাইল। ইঙ্গিতে সে জ্যোতিষের উপর এই অপরাধ চাপাইল! বাড়ী ফিরিয়া সে দীনতারিণীকে স্পষ্টই বলিল, "হাজার টাকার নোট,—অন্য কেহ লইতে সাহস করিবে না; জ্যোতিষই গোপনে আমার ঘরে ঢুকিয়া নোটখানা সরাইয়াছে।"—দীনতারিণী জ্যোতিষকে চিনিতেন; তিনি জ্যোতিষের পক্ষাবলম্বন করিয়া, এই অন্যায় সন্দেহের প্রতিবাদ করিলেন। ইহাতে নায়েবের ধৈর্য্য ধারণ করা কঠিন হইল; সে পত্নীকে লক্ষ্য করিয়া শ্লেষ ও গালিবর্ষণ করিতে লাগিল। দীনতারিণী স্বামীর দুর্ব্ব্যবহারে তাহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিল।

জ্যোতিষ যথাসময়ে কুঠীতে উপস্থিত হইলে, সাহেব তাহাকে তাহার দাদার নোট চুরীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। জ্যোতিষ হাসিয়া সাহেবকে বলিল, "হুজুর, দাদার নোট চুরী যাওয়ার কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা! এ তাঁর নায়েবী চাল ভিন্ন আর কিছুই নয়। চুরীর অপবাদ আমার মাথায় চাপাইয়া আমাকে বাড়ী হইতে তাড়াইবার ফন্দী! আগেও তিনি এই মতলবে যে সকল চাল চালিয়াছেন—তা হুজুরের অজ্ঞাত নয়। সে সকল ফন্দী খাটিল না দেখিয়া এই নূতন ফন্দী বাহির করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—হাজার টাকার নোট তাঁহার পকেটে ছিল। দশ বিশ টাকার নোট নয় যে, কেহ তাঁহাকে 'পান খাইতে" দিয়াছিল—তিনি তা বাক্সে না তুলিয়া ভ্রমক্রমে জামার পকেটে রাখিয়াছিলেন। তাঁহার মত হিসাবী লোকের হাজার টাকার নোট সম্বন্ধে এরূপ ভুল হওয়া কতদূর সম্ভব, তা হুজুরই বিবেচনা করিতে পারেন। তাহার পর প্রত্যূষে তাঁহার পকেটে হাজার টাকার নোট কোথা হইতে আসিল? যদি তিনি দরকারী কাজের জন্য সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া থাকেন, তাহা হইলে হারাইবার মতলবেই কি তাহা জামার পকেটে রাখিয়া বাহিরে গিয়াছিলেন? যদি কোন কাজের জন্য তিনি উহা বাহির করিয়া থাকেন—তবে সে কি কাজ, তাহা হুজুর দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কি উত্তর দিবেন জানিবার আগ্রহ হইতেছে। কোন সামান্য কাজের জন্য হাজার টাকার নোট বাহির করিবার দরকার হয় না। নম্বরী নোট,—নোটখানির নম্বর নিশ্চয়ই তাঁহার খাতাপত্রে লেখা আছে। হুজুর তাঁহার নিকট নম্বরটা চাহিলে তাঁহার মুখের ভাব কিরূপ হয়, তাহাও লক্ষ্য করিতে পারেন।"—জ্যোতিষ এ ভাবে আত্মসমর্থন করিল

যে, সাহেবেরও বিশ্বাস হইল, জ্যোতিষকে বাড়ী হইতে তাড়াইবার জন্যই নায়েবের এ একটা চাল মাত্র।—সাহেব নোট চুরীর কথা বিশ্বাস করেন নাই বুঝিয়া, নায়েব অতঃপর এই চুরী সম্বন্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য করে নাই; এবং সাহেব জ্যোতিষের প্রতি প্রসন্ন, ইহা বুঝিতে পারিয়া, সে জ্যোতিষকে বাড়ী হইতে তাড়াইবার সঙ্কল্প কিছুদিনের জন্য ত্যাগ করিল

সহোদরের প্রতি শ্রীনাথ নায়েবের ব্যবহার কিরূপ উদার ও বাৎসল্যপূর্ণ, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইল। এইবার তাহার আর একটি ভ্রাতার প্রতি তাহার স্নেহ-মমতার কিঞ্চিৎ পরিচয় গ্রহণ করুন। তাহার এই ভ্রাতার নাম হৃষীকেশ। হৃষীকেশ বহুদিন হইতে মুচি-বাড়িয়া কান্সারণে আমিনের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্যক্রমে সে নায়েবের পত্নীর ভ্রাতা না হইয়া নায়েবের ভ্রাতা হওয়ায়, দীর্ঘকাল চাকরী করিয়াও পদোন্নতির কোন সম্ভাবনা দেখিতে পাইল না। জমীদারী কার্য্যে তাহার অভিজ্ঞতা ও কার্য্যকালের পরিমাণ অনুসারে (Seniority), কান্সারণের অন্তর্গত পূর্ব্বোক্ত সূর্য্যপুর কুঠীর পেস্কারী পদে তাহারই দাবী অগ্রগণ্য ছিল; কিন্তু নায়েব তাহার 'দ্বিতীয় সংসারের' সুপারিশ অমোঘ মনে করিয়া, দীনতারিণীর ভ্রাতা—শ্যালক বীরেন্দ্রকে সূর্য্যপুরের পেস্কারীতে বাহাল করিয়াছিল। হৃষীকেশের দাবী এই ভাবে উপেক্ষিত হওয়ায় সে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইল; এবং নায়েবের 'আঁতে ঘা দিয়া' দশ কথা শুনাইয়া দিল। শ্যালকের প্রতি অন্যায় পক্ষপাতের অভিযোগ শুনিয়া নায়েব লজ্জিত হওয়া দূরের কথা, ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইল। কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বলিল, "আমার উপর তুমি অন্যায় দোষারোপ ক'রচো!—আমি কি চাকরী দেওয়ার কর্ত্তা? সাহেব নিজের ইচ্ছায় বীরেনকে সূর্য্যপুরের পেস্কারীতে বাহাল করেছেন; আমি কি করতে পারি? সে আমার স্ত্রীর ভাই ব'লেই বুঝি আমাকে এত কথা শুনিয়ে দিচ্ছ? চমৎকার বিবেচনা যা হোক!"

হৃষি মুখ বাঁকা করিয়া বলিল, "আমি তোমার ভাই না হ'য়ে তোমার পরিবারের ভাই হ'য়ে, জন্মাতে পারলে পেস্কারীটা আমাকে দেওয়া হ'ত কি না, তা তোমার শালা হ'তে না পারায় ঠিক বুঝতে পারচি নে। আমি আজ বার-চোদ্দ বছর এই কান্সারণে আমিনী করচি, সেরেস্তার সকল কাজে 'ওয়াকিফ্ হাল' আছি; আর বীরেন সেদিন ঢুক্‌লো চাকরীতে, সে জানেই বা কি, আর বোঝেই বা কি? তোমার শালা বলেই ত সে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেলে,—আমার 'কেলেম্' অগ্রাহ্যি ক'রে তাকেই পেস্কারী দেওয়া হ'ল!"

নায়েব সক্রোধে বলিল, "কোন্ গুণে সে তোমাকে ডিঙ্গিয়ে পেস্কারী পেয়েছে—তা সাহেবকে জিজ্ঞাসা কর গে। আমার সঙ্গে তর্ক ক'রে কোন লাভ নেই। আমি তোমাকে কোন কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নই।"

হৃষীকেশ ছাড়িবার পাত্র নহে। নায়েবের কাছে তাড়া খাইয়া সে সাহেবের সঙ্গে দেখা করিল; এবং তাহার কোন্ অপরাধে তাহাকে উপেক্ষা করিয়া বীরেন্ ভট্‌চাযকে সূর্য্যপুরের পেস্কারীতে বাহাল করা হইল—এ কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল।

সাহেব বলিলেন, "টোমার এরূপ যোগ্যটা কি আছে যে, টুমি সূর্য্যাপোরের পেস্কারীর ডাবী কোরিটে পার?"

হৃষীকেশ বলিল, "বীরেন ভট্‌চাজ্জিরই বা এমন কি যোগ্যতা আছে যে, আমাকে ডিঙাইয়া সে এই কাজ পায়? আমরা সকলেই হুজুরের সন্তানতুল্য। কারও ভাগ্যে লুচি চিনি, আর কেউ পাবে 'পচা আমানি'—হুজুরের হাত দিয়ে যদি এ রকম 'অবিচের' হয়—তবে দিনও মিথ্যে, রাতও মিথ্যে!"

সাহেব বলিলেন, "ডেকো ঋষি, টুমি গোসা মট্ করো। তোমাডের কাহারও প্রটি অবিচার হোয়—এরূপ আমি ইচ্ছা কোরে না। নায়েব রিপোর্ট কোরিল, সেরিস্তার তামান্ আম্‌লার মড্যে বীরেন ভট্‌চাজ বুড্ডিমান ও হিসাবী আছে, আর সে ইংরাজী জানেওয়ালা। নায়েব বাবুর সুপারিসে সে পেস্কারী পাইলো।"

হৃষীকেশ বলিল, "নায়েব বুঝি বীরেন ভট্‌চাজের সব চেয়ে বড় সুপারিসের কথা হুজুরকে জানায় নি? আমি হচ্ছি তার ভাই, আর বীরেন তার দ্বিতীয় পক্ষের পরিবারের ভাই। কত বড় সুপারিস্ হুজুর! তা সে ইংরিজীতে 'ইয়েস নো বেরিগুড্' বল্‌তে পারে বটে, দু ছত্তর ইংরিজী লিখতেও পারে হয় তো; কিন্তু সে জমিদারী

সে মুখ কেন অহরহ মনে পড়ে, পড়ে মনে। —দ্বিজেন্দ্রলাল

ী—শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র দাস গুপ্ত

BHARATVARSHA HALFTONE & PTG. WORKS

সেরেস্তার কাজ আমাদের চেয়েও ভাল জানে—এ কথা বল্‌তে কি নায়েয়ের সাহস হ'তো ? এই যে হুজুর, বার চোদ্দ বছর ধরে আমিনী করে এলাম—এ সবই 'অনথ্‌ক' হ'লো—নায়েবের পরিবারের মায়ের পেটে জন্মাতে পারি নি ব'লে ?"

সাহেব সহানুভূতি ভরে বলিলেন, "ডুঃখ্ মট্ করো ঋষি ! টোমার যোগ্যটা আমি অস্বীকার কোরিটে পারে না। নায়েবের রিপোর্টেই বীরেন পেস্কারী পাইলো। এখন আমি হুকুম ফিরাইটে না পারে ; টুমি কিছু কাল ওপিক্‌সা করো, next chance টোমার ”

ইহার উপর আর কোন কথা চলে না ; হৃষীকেশ সাহেবকে সেলাম করিয়া মাঠে বাহির হইয়া পড়িল। সাহেব নায়েবকে ডাকিয়া তাহার শ্যালকের প্রতি অন্যায় পক্ষপাতের জন্য তাহাকে ধমকাইয়া দিলেন। সাহেবের নিকট তিরস্কৃত হইয়া হৃষীকেশের প্রতি নায়েবের আক্রোশ শতগুণ বর্দ্ধিত হইল ; এবং সে তাহার অনিষ্ট সাধনের উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু সে যে হৃষীকেশের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছে—ইহা সে তাহাকে বুঝিতে দিল না ; বরং তাহাকে দুর্গাপুরের পেস্কারীতে বঞ্চিত করিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়াছে—এইরূপ ভাব দেখাইতে লাগিল।

নায়েব প্রকাণ্ড অট্টালিকায় মহাসমারোহে বাস করিত, আর তাহার ভাই হৃষীকেশ অল্প বেতনের আমিন, সে আমিনের মত একখানি খ'ড়ো বাড়ীতে বাস করিত। নায়েবের অট্টালিকার অদূরেই হৃষীকেশের বাড়ী নায়েব কোনদিন গরীব হৃষীকেশের বাড়ীর ছায়াও মাড়াইত না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কয়েক দিন পরে নায়েব হৃষীকেশের বিশ্বস্তা পরিচারিকা হরিমতিকে তাহার বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইতে দেখিয়া ডাকিয়া পাঠাইল। বলা বাহুল্য, হরিমতি কৃতার্থ হইয়া গেল। নায়েব সেদিন তাহাকে বিশেষ কোন কথা না বলিয়া, দুই একটি মিষ্ট কথায় তাহাকে বিদায় করিল, এবং তাহাকে একটি ভাল চাকরীর লোভ দেখাইয়া মধ্যে মধ্যে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আদেশ করিল। নায়েব যে হরিমতিকে ভাল চাকরীর আশা দিয়াছে—হরিমতি তাহার মনিব বাড়ীতে কাহারও নিকট এ কথা প্রকাশ করিল না ; কিন্তু চাকরীর আশায় মধ্যে মধ্যে নায়েবের সঙ্গে গোপনে দেখা করিতে লাগিল। নায়েব তাহাকে হৃষীকেশের গৃহস্থালীর সকল কথাই জিজ্ঞাসা করিত ; হরিমতিও যাহা জানিত 'বাবু'র নিকট অকপটে তাহা প্রকাশ করিত। স্ত্রীলোকের পেটে কথা থাকে না ; হৃষীকেশ দীর্ঘকাল চাকরী করিয়া কত টাকা সঞ্চয় করিয়াছে, স্ত্রীর জন্য কি কি অলঙ্কার প্রস্তুত করাইয়াছে—তাহা হৃষীকেশের স্ত্রী তারা ঠাকুরাণী হরিমতির নিকট গোপন করা আবশ্যক মনে করে নাই। এমন কি, সেই সঞ্চিত অর্থ এবং অলঙ্কারগুলি হৃষীকেশ কোন্ ঘরে কোন্ পোর্টম্যাণ্টের ভিতর রাখিয়াছিল—তাহাও হরিমতির অগোচর ছিল না। নায়েব কৌশলক্রমে হরিমতির নিকট সেই সকল কথা জানিয়া লইল।

নায়েব যেদিন এই সংবাদ জানিতে পারিল, সেই দিনই সায়ংকালে তাহার একটি বিশ্বাসী ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া বায়ু সেবনে বাহির হইল ; কিন্তু গ্রামের পথের বায়ু সেদিন তাহার মিষ্ট লাগিল না ; সে ভৃত্যসহ গ্রামান্তরে প্রবেশ করিল। সেই গ্রামের দুইটি ইতর লোকের পর্ণকুটীরের বায়ু অত্যন্ত নির্ম্মল মনে হওয়ায়, সে তাহাদের কুটীরে পদার্পণ করিল, এবং গোপনে তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া পকেট হইতে দুইটি টাকা বাহির করিল। টাকা দুইটি বায়না স্বরূপ তাহাদের হাতে গুঁজিয়া দিয়া যখন সে গৃহে প্রত্যাগমন করিল, তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছিল।

সেইদিন গভীর রাত্রে হৃষীকেশের শয়ন-গৃহের পশ্চাদ্ভাগে তিনজন তস্করের সমাগম হইল। সেখানে সিঁদ কাটিয়া দুইজন সিঁদের মুখে দাঁড়াইয়া রহিল, আর একজন সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বাক্স প্যাট্‌রা প্রভৃতি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। যে পোর্টম্যাণ্টোর ভিতর টাকা ও অলঙ্কার ছিল, তাহারা তাহা টানিয়া বাহিরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় ঘরের ভিতর শব্দ শুনিয়া তারাঠাকুরাণীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। ব্যাপার কি বুঝিতে পারিয়া সে 'চোর চোর' শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল, সুতরাং নায়েবের বায়নার টাকা দুটি মাঠে মারা গেল। চোরেরা শূন্যহস্তে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

তারাঠাকুরাণীর চীৎকার শুনিয়া জ্যোতিষ গোঁসাই নায়েবের অট্টালিকা হইতে বাহির হইয়া দ্রুতবেগে হৃষীকেশের গৃহে উপস্থিত হইল। সঙ্গে-সঙ্গে কয়েকজন প্রতি-

বেশীও নিদ্রাভঙ্গে সেখানে আসিয়া জুটিল। কিন্তু তাহারা চোর দেখিতে পাইল না। বড় ঘরের পশ্চাতের প্রাচীরে বৃহৎ সিঁদ দেখিয়া ও চোরে কিছুই লইয়া যাইতে পারে নাই শুনিয়া, হৃষীকেশের সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে-করিতে তাহারা গৃহে ফিরিল। জ্যোতিষও গৃহে (নায়েবের বাড়ীতে) প্রত্যাগমন করিয়া নায়েবের পূর্ব্বোক্ত বিশ্বস্ত ভৃত্যকে ডাকাডাকি করিতে লাগিল; কিন্তু সে ভৃত্যের কোন সন্ধান পাইল না। তখন হঠাৎ জ্যোতিষের মনে সন্দেহের সঞ্চার হইল। সে ভাবিল, চাকরটা চোরের দলে যোগ দিয়াছে না কি? যদি সে ঐ দলে মিশিয়া থাকে—তবে কি তাহা দাদার অজ্ঞাতসারে?" হঠাৎ জ্যোতিষের মনে পড়িল তাহার সর্ব্বগুণান্বিত অগ্রজ মহাশয় সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভৃত্যসহ বাহিরে গিয়াছিলেন! পর্ব্বতোবহ্নিমান—ধূমাৎ!

পরদিন প্রভাতে তস্করের সাধু চেষ্টার সংবাদ যথারীতি থানায় প্রেরিত হইল; দারোগা কনষ্টেবলসহ তদন্ত করিতে আসিল; কিন্তু নায়েব দারোগাকে তদন্ত সম্বন্ধে কোন সাহায্য করিল না; এমন কি, এতবড় গুরুতর ব্যাপার সে আমোলেই আনিল না। দেখিয়া শুনিয়া জ্যোতিষের সন্দেহ দৃঢ়মূল হইল। জ্যোতিষ নায়েব অপেক্ষা অনেক অধিক চতুর, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সে তাহার সন্দেহের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ না করিয়া, তাহার দাদার ভৃত্যের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল; এবং তাহার অসুখ হইলে এরূপ যত্নে তাহাকে ঔষধ পথ্য দিতে ও তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল যে, সে জ্যোতিষের অত্যন্ত বাধ্য হইয়া পড়িল। তখন জ্যোতিষ তাহাকে চুরী সম্বন্ধে সে যাহা কিছু জানে—সরল ভাবে প্রকাশ করিতে বলিল। ভৃত্য কথাটা গোপন রাখিবার জন্য জ্যোতিষের পা ধরিয়া অনুরোধ করিয়া, সত্য ঘটনা তাহার গোচর করিল।

জ্যোতিষ সকল কথা শুনিয়া স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিল, তাহার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "উঃ, ইহা কি মানুষে পারে? মানুষ ত' দূরের কথা—ইহা শয়তানেরও অসাধ্য! মা, তুমি বহুকাল পূর্ব্বে স্বর্গে গিয়াছ, কিন্তু কি রত্নই তুমি গর্ভে ধারণ করিয়াছিলে!" (ক্রমশঃ)

বিজয়িনী

শ্রীইন্দুমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়

মম নিভৃত জীবন নন্দন বন-
বাসিনী হাসিনী কন্যা
কল হর্ষ-তরল উচ্ছল-জল
উজ্জ্বল আলো-বন্যা।
সাধিছ বেণুতে মানস-হরণ কি তান তুমি লো তন্বি!
(মোর) আঁধার কুটীরে মাটীর প্রদীপে জ্বালিছ অতাপ-বহ্নি।
ফুটাইছ ধীরে কাননে কত না কুটজ কেতকী যূথিকা;
শ্রবণে রুচির চারু কুরুবক করে কুবলয়-কলিকা—
—গরীয়সী কেগো বাসন্তী!
মধুপ-জীবন যৌবন-বন আলো-করা জয়-জয়ন্তী।

(তুমি) রসকে করিয়া অন্তরঙ্গ সুরকে পরম আত্মীয়;
জড়কে দিতেছ জীবন-সঙ্গ দীপকের হোমে যজ্ঞীয়;
নবীন অঙ্গ পোড়া অনঙ্গে নব পরিমল অর্পণে;
পিনাকী-নয়ন-অনল শীতলি' প্রেমধারা পূত তর্পণে—
—তপোকৃশা কেগো অপর্ণে!
গলিত-হিরণ বরষ ভুবনে চকিত দেহের সুবর্ণে।
(ওগো) ধ্বনিছ নিত্য পরমা তৃপ্তি তুরিয়ানন্দ লহরী;
মরণে করিছ চরম রিক্ত জীবনের পূজা আহরি'।
নীহারিকা-রচি-চন্দ্রিকা ফুলে গাঁথিতেছ মালা একাকী;
কবে মালা গাঁথা শেষ হবে তব সেদিনের আর কি বাকী
—ওগো বিজয়িনী নারী উষসি?
মহা জীবনের মণি-অলিন্দে স্মরজিতা সুর-রূপসী।

সুমতি চক্রবর্ত্তী

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, এটর্ণি এট-ল

আত্মহত্যার চেষ্টার অভিযোগে সুমতি চক্রবর্ত্তী আদালতে অভিযুক্ত। এরূপ আসামী আর এরূপ ঘটনা অতি বিরল। সকল কথা শুনিলে হঠাৎ মনে হইতে পারে যে, এটা গল্প মাত্র। যে ভাবে ক্রমে ক্রমে আদালতে কথাগুলি প্রকাশ পাইয়াছিল, সেই অনুসারে ঘটনাগুলি বর্ণিত হইল। অকারণ সময় নষ্ট ও বুঝিবার অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা, সেজন্য ধারাবাহিক ভাব ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করা হইল।

সুমতি বিভূতিভূষণ চক্রবর্ত্তীর কন্যা। বিভূতির পিতা জমিদার সরকারে কাজ করিতেন। বিভূতি সেই জমিদার দিগের প্রতিষ্ঠিত স্কুল হইতে ১৫৲ টাকা জলপানি পাইয়া এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে প্রবেশ করেন। ক্রমে ক্রমে এম-এ, বি-এল উপাধি-লাভ করিয়া একদিকে ওকালতি ও অন্যদিকে একখানি ইংরেজি সংবাদপত্রের সহকারী সম্পাদকত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন।

পিতার মৃত্যুর সময় কলেজে বিভূতির দ্বিতীয় বৎসর। বিধবা মাতার একমাত্র সন্তান বিভূতি। জমিদার বাবুরা বিধবার ভরণ-পোষণের জন্য মাসিক ১৫৲ টাকা বৃত্তি ধার্য্য করিয়া দেন। জলপানির টাকাতেই বিভূতির খরচ চলিত। উপরন্তু ছেলে পড়াইয়া ও পরে সংবাদপত্রে লিখিয়াও কিছু-কিছু আয় হইত।

পিতা, মৃত্যুর অনতিকাল পূর্ব্বে, জেলার সদর সহরে বিভূতির বিবাহ দেন। তখনও নব বধূর ঘর করিবার বয়স হয় নাই। বিভূতির শ্বশুর অবস্থাপন্ন,সমাজে প্রতিপত্তিশালী। কিন্তু শ্বশুরবাড়ী দুর্গম পল্লীগ্রামে বলিয়া কন্যাকে প্রায়শঃ নিজালয়েই রাখিতেন। ইচ্ছা ছিল যে, জামাই মানুষ হইয়া উপার্জ্জনক্ষম হইলে সস্ত্রীক সংসার পত্তন করিবে ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া তিনি কন্যার বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। যত্ন, সফলও হ'য়া ছল। সুব্রতা মিশনের মেয়েদের কাছে প্রচলিত রীতি অনুসারে শিক্ষিতা। শ্বশুরের শ্রাদ্ধে নকীপুরে গিয়া সুব্রতার অজীর্ণ রোগাক্রমণ ঘটে। বাপের বাড়ী আসিয়া দীর্ঘকাল চিকিৎসায় ও দুইবার মধুপুরে গিয়া আরোগ্য লাভ হয়। সেই অবধি পিতা আর নকীপুরে মেয়ে পাঠান নাই।

শ্বশুর বিভূতিকে বিশেষ আদর-যত্ন করিতেন; আর ছুটীর সময় অত্যন্ত আগ্রহের সহিত জামাতাকে বাড়ী আনিতেন মধ্যে মধ্যে অনেকবার অর্থ সাহায্য লইতে জামাতাকে জেদ করিয়াছিলেন কিন্তু বিভূতি তাহাতে কখনও সম্মত হন নাই। শেষের দিকে একবার জামাই-ষষ্ঠীর কাপড়ের ভিতর একশত টাকার নোট কৌশল করিয়া গুপ্তভাবে দিয়াছিলেন। কয়েকমাস পরে শ্বশুরের শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়া বিভূতি তাহা জানিতে পারেন। কিন্তু শ্বাশুড়ীর মনে পাছে কষ্ট হয় এই ভয়ে বিভূতি সে কথা আর প্রকাশ করেন নাই তখন বিভূতি বি এল পড়িতেন আর সংবাদপত্র হইতে পাইতেন মাসে একশত টাকা। সুব্রতা বাপ মায়ের একমাত্র কন্যা। তাঁহার জেষ্ঠ ভ্রাতা যোগেন্দ্রও পিতা মাতার একমাত্র পুত্র। যোগেন্দ্র বিপত্নীক, নিঃসন্তান,—হায়দ্রাবাদে নিজামী দরবারে উচ্চপদস্থ। দেশে জনপ্রবাদ যে, যোগেন্দ্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া রাজ-পরিবারের আত্মীয় কোন ওমরাহের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। যোগেন্দ্র পিতৃশ্রাদ্ধের সময় বহু ব্যয়ে ও নানা কৌশলে সেই অপবাদমুক্ত হইয়া শ্রাদ্ধ শেষে কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া গেলেন। বিভূতির ইচ্ছা ছিল যে, সুব্রতা ও সাত মাসের সুমতিকে লইয়া কলিকাতায় পাকা বন্দোবস্ত করিয়া স্থিতি করিবেন। কিন্তু শ্বাশুড়ীর অবস্থা দেখিয়া ও তাঁহার সকাতর অনুরোধে সেবারকার মত নিরস্ত হইলেন।

কিছুদিন পরে জানা গেল যে, স্থানীয় রীতি অনুসারে যোগেন্দ্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়াই এক উচ্চ বংশীয় মুসলমান কুমারীকে বিবাহ করিয়াছেন। সংবাদ পাইয়া বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী শয্যা-শায়িনী। কেবল বলিতেন, কি পাপ করেছিলাম যে, বাপ পিতামহের পিণ্ডিলোপ হ'ল, মা দুর্গা, দুর্গতি নাশিনী! কখন-কখনও সুব্রতাকে বলিতেন "সুবী, তোরও যদি একটা ব্যাটা দেখে যেতে পেতাম, তাহলেও

আশ্বাস থাকত। যাক্ বিধাতার লিখন কে আর একটা খণ্ডাবে?

তার পাইয়া বিভূতি বৃদ্ধাকে দেখিতে গেলেন। তাঁহার ও সুব্রতার যত্নে চিকিৎসা সেবা শুশ্রূষার কোন ত্রুটি হয় নাই। যোগেন্দ্র আসিয়া শুনিলেন, মুমূর্ষু মাতা পুত্রের মুখ দেখিতে অনিচ্ছুক, কাহারও অনুনয়, বিনয়, জেদ গ্রাহ্য করিলেন না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রাণবিয়োগ হইল। যোগেন্দ্র কাহারও কথা শুনিলেন না। মাতার মৃতদেহ প্রণামান্তে ফিরিয়া গেলেন। কন্যা-জামাতা সৎকার শ্রাদ্ধাদি শেষ করিয়া কলিকাতাবাসী হইলেন।

সুমতির বয়স তখন দেড় বৎসর। সেই অবধি সস্ত্রীক বিভূতি ও যোগেন্দ্র মর্ম্মান্তিক বিবাদে পরস্পরের সহিত সম্পর্কশূন্য।

দেখিতে দেখিতে বিভূতির চারিদিকে উন্নতি হইতে লাগিল। সম্পাদক পশ্চিমে রাজ দরবারে বড় চাকরী পাওয়ায় বিভূতি সম্পাদকের আসন পাইলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুতার্কিক সদ্বক্তা বলিয়া খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। আর সঙ্গে সঙ্গে ওকালতীতেও পসার বৃদ্ধি। দুই চারিজন দেশীয় রাজার কলিকাতাস্থ এজেণ্ট-স্বরূপে একটা বাঁধা আয় দাঁড়াইল। আর্থিক উন্নতির সহিত বিভূতির চালচলন ধরণধারণে সাহেবিয়ানা দেখা দিয়া ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। বিলাত হইতে যাঁহারা এ দেশের অবস্থা দেখিতে আসিতেন, তাঁহাদের সঙ্গে দেখা শুনা, খাওয়া দাওয়া প্রতি শীতেই হইত। আর সেই সম্পর্কে বিলাতী সংবাদপত্রে প্রবন্ধাদি লিখিয়াও কিছু-কিছু আয় বাড়িত। স্বদেশী বিদেশী অভ্যাগত ব্যক্তির প্রতি সমাদর আতিথ্য কার্য্যে সুব্রতা স্বামীর যথার্থ সহধর্ম্মিণীই ছিলেন। সুমতি পাঁচ বৎসর বয়সের সময় মিশনারী মেয়ে স্কুলে বোর্ডার হয়। বিভূতি রাধারমণ নামে একটী নিবান্ধব দূর আত্মীয়কে এই সময়ে কলিকাতার বাটীতে রাখিয়া লেখা-পড়া শিখান। রমণ ক্যাম্বেলে ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বর্ণিত ঘটনার সময় জলপাইগুড়ির এক চা-বাগানে ডাক্তারি করিতেছেন।

খরচপত্রের বিষয়ে বিভূতি মুক্তহস্ত। আয় অধিক বলিয়া যথেষ্ট খরচ পত্র করিয়াও হাতে তাহাতেও বেশ দু'টাকা জমে। অনেক স্বদেশী কোম্পানীতে বিভূতি সেয়ার কিনিয়াছেন। আর সুব্রতার উত্তেজনায় জীবনবীমা করিয়া তাহার স্বত্ব স্ত্রী ও কন্যার অনুকূলে পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িবার সময় সুমতির মাতৃবিয়োগ ঘটে। কন্যার অযত্ন হইবে এই আশঙ্কায় বিভূতি আর বিবাহ করিলেন না। যথাকালে সুমতি বিশেষ প্রশংসার সহিত ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। সংস্কৃতে পারদর্শিতাই প্রশংসার বিশেষ হেতু। সুমতির আই-এ পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পূর্ব্বে হঠাৎ হৃদ্রোগে বিভূতির দেহান্ত হইল। পৃথিবীতে সুমতির আত্মীয়ের মধ্যে রহিলেন এক পিতামহী। যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে পিতার উইলের আদেশ অনুসারে পিতামহীর আশ্রয়ে সুমতিকে বাস করিতে হইবে, বিবাহ করা না করা সুমতির ইচ্ছাধীন। পিতার ইচ্ছা যে সুমতির দৃষ্টান্ত ও উপদেশে অন্তঃপুরবাসিনী হিন্দু রমণীর ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উন্নতি হয়। সুমতি পিতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া নকীপুরে পিতামহীর সহিত পৈত্রিক ভদ্রাসন বাটীতে বাস করিতে লাগিল। অবিবাহিতা বলিয়া গোলযোগ না হয় এজন্য সুমতি গেরুয়াধারিণী; তাহার ব্যবহারে কেহ কোনরূপ সাহেবিয়ানা বা অন্য কোন প্রকার বে চাল দেখিতে পান নাই। সুমতি নিজের সহজ সুন্দর ব্যবহারে গ্রামস্থ সকলেরই স্নেহ ও সমাদরের পাত্রী অভাবগ্রস্তের অভাব মোচনই সুমতির একমাত্র ব্রত। বিকালে জমিদার গৃহিণীর বাটীতে সমবেত সকলকে শাস্ত্র পাড়য়া শুনাইত। তাহার বিশেষত্ব ছিল—গীতা ও বাইবেলের একবাক্যত্ব প্রদর্শন। বালক-বালিকাদিগকে শিক্ষা দিত প্রতিদিনই। তাহার শিক্ষা দিবার প্রণালী ছিল এই যে, উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তই উৎকৃষ্ট অবলম্বন। বালক বালিকাদিগকে লইয়া রোগীর শুশ্রূষা ও সন্তপ্তের সান্ত্বনা তাহার একটী প্রধান কার্য্য ছিল। গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির পক্ষে সুমতির বিশেষ যত্ন ছিল। তাহার আর একটী কার্য্য ছিল, বিবাদ বিসম্বাদ গ্রাম্য মামলা মোকর্দ্দমা আপোষে মিটাইয়া দেওয়া। এ কার্য্যে ক্রমে ক্রমে গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ অনেকেই তাহার সাহচর্য্যে ব্রতী হইলেন।

পিতামহী প্রথম-প্রথম সুমতির হাতে খাইতেন না। তাহার আচার ব্যবহারে সে সঙ্কোচ শীঘ্রই দূর হইল। ফলতঃ বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই সুমতি যেন গ্রামের

অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়া দাঁড়াইল। নিজের বিষয় সুমতি পত্রের দ্বারা নিজের কলেজের অধ্যক্ষার সহিত সর্ব্বদা পরামর্শ করিত। তাঁহার স্নিগ্ধ পরামর্শে ও সদ্বিচার সিদ্ধ উৎসাহে সুমতির সাহস ও নিষ্ঠার বৃদ্ধি প্রভৃতি নানা বিষয়ে উপকার দর্শাইত। আর বিষয় সম্বন্ধে বিভূতির একজিকিউটর হেম বাবুর সঙ্গে সর্ব্বদা পত্র ব্যবহার চলিত।

তৃতীয় বৎসর পূর্ণ না হইতেই বৃদ্ধা পিতামহীর মৃত্যু ঘটিল। জমীদার গৃহিণীর উৎসাহে (জেদে বলিলেই ঠিক হয়) নকীপুরের পক্ষে মহাসমারোহে শ্রাদ্ধাদি সুসম্পন্ন হয়। সেই উপলক্ষে অনেক দূর আত্মীয়ের সমাবেশ হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে সুমতির রমণ দা অর্থাৎ ডাক্তার রাধারমণ দীর্ঘাঙ্গী একজন। এক বন্ধুকে বদলি দিয়া ডাক্তার বাবু চা-বাগান হইতে এক মাসের ছুটি লইয়া আসিয়াছিলেন। ইচ্ছা ছিল যে, সুমতির ভবিষ্যতের সুব্যবস্থা হইয়াছে দেখিয়া যাইবেন। কাজ কর্ম্ম শেষ হইল। দামী জিনিসপত্র জমিদার বাড়ীতে রাখিয়া সুমতি রমণ ডাক্তারের সহিত কলিকাতায় যাইবে। সেখানে হেম বাবু ও কালেজের বড় মেমের সঙ্গে পরামর্শান্তে সুমতির ভবিষ্যৎ জীবনের ব্যবস্থা স্থির হইবে। নকীপুর হইতে রেল ধরিতে নৌকায় দুই পহরের পথ। জমিদার-গৃহিণী পার্শ্বস্থ গ্রামবাসী আচাযি্য ব্রাহ্মণ দ্বারা যাত্রার দিনক্ষণ গণাইয়া ছিলেন। তাঁহার মনোরঞ্জনের জন্য সেই অনুসারে সুমতি ডাক্তার বাবুর সহিত নৌকায় উঠিল। রেলে শিয়ালদহ পৌঁছাইতে লাগে একদিন একরাত্রি। সুমতি সহরের উপযুক্ত পরিচ্ছদ পরিয়া রেলে উঠিল। গাড়ী পূর্ব্বাবধি রিজার্ভ করা ছিল। দিনের বেলা এক রকম চলিয়া গেল—কোন পদার্থ রহিল না। রাত্রে অনিদ্রার কষ্ট। সুমতি কতক্ষণ ধরিয়া "বৈরাগ্যশতক" পড়িল। পরে পুস্তকখানি মুড়িয়া নিজের মনেই আবৃত্তি করিল,

"মাতঃ মেদিনী, তাতঃ মারুত সখে জ্যোতিঃ সুবন্ধো জলভ্রে
ভ্রাত র্ব্যোম, নিবদ্ধ এষভাবতা মদ প্রণামাঞ্জলিঃ।
যুষ্মৎসঙ্গকশোপজাক স্বকৃতোদ্রিক স্ফুর নির্ম্মল
জ্ঞানাগাস্ত্র সমস্ত মোহ মহিমালীয়ে পরব্রহ্মণি॥"

রমণ বাবু বলিলেন, "সুমতি, আমি সংস্কৃত জানি না। আমায় বুঝিয়ে বল যে, কিসে তোমার মুখে এমন দেবতার ভাব এসেছে।"

"হে মাতা পৃথিবী, হে পিতা বায়ু হে সখে জ্যোতিঃ, হে অতি প্রিয় মিত্রজন, হে ভ্রাতা আকাশ, তোমাদের সম্মুখে প্রণামের জন্য এই অন্তকালীন অঞ্জলি আবদ্ধ করিতেছি। তোমাদের সঙ্গবশে উৎপন্ন যে পুণ্য তাহা দ্বারা উদ্রিক্ত প্রকাশ স্বরূপ যে জ্ঞান তাহা কর্ত্তৃক আমা হইতে সমস্ত মোহের প্রাধান্য দূর হইয়াছে। সেই আমি এখন পরব্রহ্মে লীন হইতেছি। পরমেশ্বর সর্ব্বজীবে সমান। তাঁর কাছে জাতি, দেশকালের জোর চলে না। ভর্ত্তৃহরির যে শ্লোক পড়েছি তার অনুরূপ ইতালীয় সাধু ফ্রান্সেস্কোর এক সৌর গীতি আছে। সেটাকে এর ভাবের ঠিক অনুবাদ বলে ধরিলে ধরা যেতে পারে। সেটা এই। অন্য একখানি পুস্তক লইয়া সুমতি পড়িলেন,

সৌরগীতি।

হে, পরম সর্ব্বশক্তি, শিবময় প্রভু পরমেশ, স্তুতি, জয়বাদমাল্য পূজা নিরংশে তোমাতে যেন হয় নিবেদন।

হে পরম, এ নৈবেদ্য তোমা ভিন্ন অপরের নহে যোগ্য; মানুষ নহেত যোগ্য লইতে তব নাম॥

স্তুত হৌন পরমেশ প্রভু সঙ্গে লয়ে চরাচর। সকলের প্রধান, জ্যেষ্ঠ ভাই মোর দিবাকর, দিবসে বসান যিনি, দিবসের আলো।

স্তুত হৌন প্রভু মোর ভগিনী আমার চন্দ্রমার তরে, তারকা সমূহ তরে, রেখেছেন আকাশে যাঁদের—কোমল, উজ্জ্বল, কাও সুষমায় ভরা।

স্তুত হৌন প্রভু মোর, পবন সঞ্চার তরে, স্থির বায়ু তরে, মেঘ তরে, আকাশের তরে আকাশের শান্তিতরে, সুদিন কুদিন তরে—ধারণ করিছ যাহে জীব সমুদয়॥

স্তুত হৌন প্রভু মোর ভগিনী জলের তরে, বিনম্রা, বিমলা, বামা মানুষের সেবায় নিরতা, স্তুত হৌন প্রভু মোর ভাই মোর অনলের তরে, যাঁরে দিয়ে কর তুমি রজনীর আঁধারে আলোক, সানন্দ, সুন্দর, শূর বিক্রমে প্রচুর॥

স্তুত হৌন প্রভু মোর, ভগিনী মেদিনী তরে মোর পুষ্টিতুষ্টি বিধায়িনী, নানা জাতি শস্যে, ফলে ভরা—অভাবের মাত্রা ছাপাইয়া—বিচিত্র বরণ ফুলে তৃণে মাঠ ভরা।

স্তুত হৌন প্রভু মোর, তাঁহাদের তরে তোমার প্রীতিতে যাঁরা ক্ষমে পরস্পরে, দীনতা বিপদে সুখে নহেন যাঁহারা, ধন্য তারা, পরাবে মুকুট তুমি তাঁহাদের শিরে॥

স্তুত হৌন প্রভু মোর, দেহের মরণ তরে—ভগিনী আমার—যার হাত জীব নাহি পারে যে এড়াতে। ভাগ্যহীন সেই যে মারাত্মক পাপ লয়ে মরে। কিন্তু প্রভু কি আনন্দ তাঁর পবিত্র তোমার ইচ্ছা পালিয়াছে যেই, মরণের ব্যথা সেই আর না পাইবে।

প্রভুরে করহ স্তুতি, কর সবে জয়ধ্বনি তাঁর, ধন্য ধন্য কর তাঁরে উৎসাহিত বিনম্র হৃদয়ে॥

রমণ বলিলেন,

"সে ঠিক। কিন্তু এ সব উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব। আত্মা ছাড়া আমাদের ত এই রক্ত মাংসের শরীর। সেটাও ভগবানের সৃষ্টি। তাদেরও মুখ চেয়ে কাজ করতে হয়। ইন্দ্রিয় সকলকে তৃপ্তি না দিলে তাদের সৃষ্টি ব্যর্থ করবার চেষ্টায় পরমেশ্বরের নিকট বিদ্রোহী। বুঝে দেখ, তোমার যে এই অলৌকিক রূপ যৌবন, তার ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট সদ্ব্যবহার কি নাই? মনুষ্যের কল্পিত নিয়ম অগ্রাহ্য করেও তার তৃপ্তির জন্য যত্ন কর্ত্তব্য নয় কি? বিবাহ—

"যাক বিবাহের কথা। যদ্বিধের্ম্মনসি স্থিতং তত্তবিষ্যতি। বিধাতার মনে যা আছে তাই হবে।"

"তোমার রূপ যৌবন মনুষ্যলোকের পরম শ্রেষ্ঠ সুখভোগ্য।"

এই বলিয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে, রমণ অবৈধভাবে সুমতির দেহ স্পর্শ করিল। বিস্ময় লজ্জা ঘৃণা প্রভৃতির মিশ্রণে ক্রোধে অধীরা সুমতি চক্ষে অনবরত বিদ্যুৎ বর্ষণ করিতে করিতে রমণের মুখে সজোরে পুনঃ পুনঃ চড় মারিল। রমণ তাহাকে ধরিতে গেল। সুমতি ক্ষিপ্র গতিতে তাহাকে ছাড়াইয়া গাড়ীর দরোজা খুলিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িবে, এমন সময় রমণ পশ্চাৎ হইতে ধরিল। মনের আবেগে সুমতির শরীরে যে বলের সঞ্চার হইয়াছিল—তাহার কাছে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, মৃত্যু আসন্ন—এই বুঝিয়া রমণ পরমেশ্বরের নামে শপথ করিল যে, সুমতির প্রতি গর্ভজাত পুত্রের ন্যায় ব্যবহার করিবে। সুমতি ফিরিয়া নবধৃত কাল ফণিনীর ন্যায় গাড়ীর এক কোণে বসিয়া ফুলিতে লাগিল। রমণ মুদিত নয়ন, নির্ব্বাক। বহুক্ষণ পরে সুমতি শান্ত হইয়াছে ভাবিয়া রমণ বলিল, "সুমতি, তুমি বুদ্ধিমতী। বুঝিয়া দেখ, যে আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে সে জন্য আমি নির্দ্দোষ। তোমার রূপ যৌবন আর এই নিভৃত সঙ্গই এর জন্য দায়ী।"

"ফের রূপ যৌবন! যদি তার জন্য পাপের বৃদ্ধি হয়, তবে তার এ পৃথিবীতে স্থান নাই। হে পরমেশ্বর।" এই বলিয়া পুনরায় সবেগে গাড়ীর দরোজা খুলিল। রমণ তাড়াতাড়ি গাড়ী থামাইবার শিকল টানিয়া তাহাকে ধরিল। ষ্টেসন সন্নিকট বলিয়া গাড়ী মন্দগতি, অবিলম্বে থামিল। গার্ড ও আরোহীগণ আসিয়া তদবস্থা দেখিল। রমণ তৎক্ষণাৎ অন্য দিকের দরোজা খুলিয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইল। সুমতি আত্মহত্যার প্রয়াস স্বীকার করিল। কালেজের ছুটি ফুরাইয়াছে—কালেজ খুলিবে। বড় মেম সেই ট্রেণে দার্জ্জিলিং হইতে ফিরিতেছেন, তিনি সুমতিকে চিনিতেন বলিয়া তাঁহার জিম্মায় সুমতি রহিল। অন্যমনস্কতাবশতঃ রমণের প্রতি কাহারও লক্ষ্য ছিল না।

সেই মেম ও হেম বাবুর সাক্ষ্য এবং সুমতির নিজের কথায় বর্ণিত ঘটনাগুলি আদালতে প্রকাশ হয়। হাকিম সুমতিকে বলিলেন, "আমি আইনের চাকর। অপরাধ সপ্রমাণ। আমার বিশ্বাস যে তুমি আর কখনও আত্মজীবন নাশের চেষ্টা করিবে না। বিদায় দিতেছি। বিদায়কালে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান গ্রহণ কর।"

উজান ব'য়ে যা

[শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়]

ওরে উজান ব'য়ে যা!
স্রোতের মুখে গা ঢেলেছিস্, একবার ফিরে চা।
হাত পাগুলি গুটিয়ে ধ'রে ভাবছ, আছ সুখের ঘরে;
নয়রে, সেথা দুদিন পরে নুন সাগরের ঘা!
নাইরে সেথা স্রোতের খেলা, নীল সাগরের পাক!
ঢেউয়ের বুকে উঠছে শুধু হীন মরণের ডাক
মাছ গুলি আর নয়ত খাবার তারাই তোমায় করবে সাবাড়,
ছিনিয়ে খাবে তোমায় আবার হাঙর তাহার ভাগ।
হাত পাগুলি ছেড়ে দিয়ে উজান ব'য়ে যা রে।
দেখবি সেথা, মধুর কোলে চির স্নিগ্ধ গন্ধ দোলে,
পশু পক্ষী তারাও চলে প্রেমের আকুল ভারে!
বাঁচিতে হবে তোমায় যে ভাই, উজান ব'য়ে যা রে।

সংস্কার

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

সেদিন চাটুয্যে মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপে আসরটা জমিয়াছিল ভাল। গ্রামের একমাত্র পানীয় জলের পুকুর মজিয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছিল, এবং অচিরাৎ তাহার সংস্কার না হইলে চলে না। সেইহেতু গ্রামের মাতব্বর কয়জন মিলিয়া সদরে জমিদার বাবুর নিকট পুষ্করিণী সংস্কারের প্রার্থনা করিয়া এক আবেদন-পত্র দিন দশেক হইল প্রেরণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহার ফলাফল এ যাবৎ জানা যায় নাই। আবেদন-পত্র পাঠানর পর হইতেই প্রায় প্রত্যহই সান্ধ্য বৈঠকে তাহার আলোচনা হয়। পুরাতন জমিদারের বছর-খানেক হইল মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার স্থলে এখন তাঁহার যুবক পুত্র অনিলকুমার অধিষ্ঠিত। নূতনকে কোনও দিনই মানুষে মানিয়া লইতে চাহেনা ; বিশেষ অনিলকুমারের আরও একটা দোষ ছিল এই যে সে উচ্চশিক্ষিত গ্রাজুয়েট ; সুতরাং এমন লোকের কাছ হইতে বড় কিছু যে আশা করা যায়না, অনেক গবেষণার পর প্রতি রাত্রেই এইরূপ সিদ্ধান্ত হইত ; কিন্তু এই দুই-বৎসর জমিদারী পরিচালনার মধ্যে তিনি অকীর্ত্তিকরও কিছু করেন নাই। এই যা একটু আশার কথা ! মোটের উপর সম্পূর্ণ ভরসা না থাকিলেও একেবারে আশা ত্যাগ করা যায় না, বিশেষ যখন পুষ্করিণীটা জীবন-ধারণের পক্ষে এত বড় একটা প্রয়োজনীয় ব্যাপার। সুতরাং লাভে হইতে দিনের পর দিন আলোচনাই বাড়িয়া যাইতে লাগিল।

সে দিন সন্ধ্যায়ও এ সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছিল, এবং এই আলোচনার সম্পর্কে দুই একজন প্রাচীন, এই নব্য জমিদারের নিশ্চেষ্টতার সম্বন্ধে দু একটা কঠিন মন্তব্যও প্রকাশ করিতেছিলেন। শুনিয়া বৃদ্ধ হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিনয়ের স্বরে কহিলেন, দেখুন, এতে আমাদেরও ত কিছু কর্ত্তব্য আছে ! এ পুকুরটা আমাদের গ্রামের নিজস্ব সম্পত্তি, এর ষোল-আনা উপকারই আমরা পাই। সুতরাং এ-সম্বন্ধে আমাদেরও একটু উদ্যোগ দেখান দরকার। আমরা এত ঘর এ গ্রামে আছি—আমরা কি এর সংস্কার করিতে পারি না ? অন্ততঃ কতকও আমাদের করা উচিত—তাহার পর বাকীর জন্য যদি আমরা জমিদারের আশ্রয় গ্রহণ করি, তাহ'লে সেটা শোভন হয়। কিন্তু একেবারে ষোল-আনা—

প্রবল এক টিপ নস্য লইয়া তর্কচূড়ামণি কহিলেন, হরিনাথ বলচে ভাল হে ! শাস্ত্রে বলে রাজা মা-বাপ। মা-বাপ কি আট-আনা করে হরিনাথ, আর বাকী আট-আনা ছেলের জন্যে রেখে দেয় ? মা-বাপ ষোল-আনাই করে ! বছরে বছরে আমরা যে জমিদারকে খাজনা দি, সেটা কি তার ভোগ-সুখের জন্যে, না আমরাও কিছু প্রত্যাশা করতে পারি ? শাস্ত্র-জ্ঞান না থাকলেই এমনটি বলা চলে !

চাটুয্যে মহাশয় একবার সমবেত জনমণ্ডলীর দিকে চাহিয়া চক্ষের ইসারা করিয়া হাস্যমুখে কহিলেন, তোমার নাৎনীর বিয়ের কি করলে হরিদা ?

হরিনাথ একবার ঊর্দ্ধে চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, নারায়ণ জানেন্।

প্রশ্নের ভিতর অনেকখানি শ্লেষ ছিল। দশ বৎসর আগে হরিনাথের যুবতী বিধবা কন্যা একমাত্র তিন-বৎসরের মেয়ে সুরমাকে পিতার আশ্রয়ে রাখিয়া বিপথ-গামিনী হয়। সেই হইতে এই দশবৎসর এ গ্রামবাসীর অবিরত গঞ্জনা ও বিদ্রূপের ভিতর ভগ্ন-হৃদয় হরিনাথ একমাত্র নারায়ণ ভরসা করিয়া কাটাইয়া আসিয়াছেন ; কেন না, বাস্তু ও কুল-দেবতা ত্যাগ করিয়া যাইতে কোনও দিনই তাঁহার সাহসে কুলায় নাই। দেখিতে দেখিতে সুরমাও বড় হইয়া উঠিয়াছে ; নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের গৃহে আর অনূঢ়া রাখা চলে না, কিন্তু কোনও উপায়ই হইতেছে না। দুই-এক স্থলে যে সম্বন্ধ জুটিয়াছিল, তাহা সদয় গ্রামবাসী-দের অনুগ্রহে বেশী অগ্রসর হইতে পারে নাই। সুতরাং এই প্রশ্নের ভিতর যতখানি শ্লেষ ছিল, কুৎসিত আনন্দও তাহা অপেক্ষা কম ছিল না।

উত্তরে চাটুয্যে মশায় কহিলেন, 'তোমার মেয়ের খবর জানো? সেদিন কে যেন বলছিল, তাকে কলকাতায় কোথায় দেখেছে—বেশ সুস্থ সবল—গায়ে এক-গা গয়না—

হরিনাথ আপনাকে প্রাণপণে সংযত করিতে লাগিলেন, মুহূর্ত্তে তাঁহার মুখ পাংশু হইয়া গেল, কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, নারায়ণ, নারায়ণ!

তিনি এই দশবৎসর এক প্রকার সকলের সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু আজ এই সভায় পুষ্করিণী সম্বন্ধে আরও কি করা কর্ত্তব্য এই বিষয় আলোচনায় যোগ দিবার জন্য বিশেষ ভাবে আহূত হইয়াই আসিয়াছিলেন।

চাটুয্যে মশায় কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন। তাঁহার এই মুখ-রোচক প্রসঙ্গ অবতারণায় এই সভা যে গোপন তৃপ্তি লাভ করিতেছিল, তাহাতে আরও উৎসাহিত হইয়া কহিলেন, তোমার নাৎনীকেও পাঠিয়ে দেওনা তার মা—

২

এই সময় চাটুয্যে মশায়কে বাধা দিয়া সভার একপার্শ্ব হইতে একজন অপরিচিত যুবক বলিল, কিন্তু আপনাদের পুকুরের কথাটা চাপা পড়ল যে! ভুলে যাচ্ছেন বোধ হয়—ওইটেই আসল কথা!

সভার সকলের সমবেত দৃষ্টি পড়িল এই আগন্তুকের প্রতি। সে যে কোথা হইতে কখন আসিয়া এক-প্রান্তে বসিয়াছে, কেহই লক্ষ্য করে নাই, এবং সে যে কে, তাহাও কেহ জানে না!

তখন যুগপৎ প্রশ্ন হইল, আপনি কে, মশায় কে, তুমি কে—ইত্যাদি।

যুবক কহিল, আমিও আপনাদেরই মত একজন; এই গ্রামে আমার কিছু প্রয়োজন ছিল, তাই এসেছিলাম। এখানে বহু-লোকের সমাগম দেখে এইখানেই এসেছি। আমি যখন আসি, তখন আপনারা তর্কে বিশেষ ব্যস্ত থাকায় লক্ষ্য করেন নি, বোধ করি।

ক্ষুব্ধ চাটুয্যে মশায় কহিলেন, অনধিকার প্রবেশ। এটা আপনার ভদ্রোচিত হয় নি!

যুবক হাসিয়া কহিল, হয়ত' তাই। কিন্তু স্থান-মাহাত্ম্য। ষোল-আনা ভদ্রলোকের পক্ষে এ স্থান ত্যাগ ক'রে যাওয়াই উচিত ছিল।

কথাটার ইঙ্গিত সকলকেই বিদ্ধ করিল। তর্কচূড়ামণি ঘন-ঘন নস্য লইয়া জবাবে একটা কঠিন শাস্ত্রবাক্যের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু সহসা মিলিল না! হরিনাথ প্রসন্ন মুখে এই যুবকের দিকে চাহিলেন। চাটুয্যে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, যদি ইষ্ট চান ত' আপনার এ স্থান ত্যাগ করাই ভাল।

যুবকের মুখ হইতে হাসি মিলাইল না, সে কহিল, কিন্তু রাত হ'য়ে গেল, সুতরাং আমার কোথাও যাওয়াও ত' কঠিন। চাটুয্যে মশায়, ইষ্ট হিসাবে হয়ত' বা এ রাত্রিটার জন্য আমাকে আপনার আশ্রয়ই নিতে হয়!

শুনিয়া চাটুয্যে মশায়ের প্রায় ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। উত্তরে তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে নিশ্চয়ই অতিথির সম্মান রক্ষা হয় না।

উত্তরে যুবক কহিল, কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন, হিন্দু ধর্ম্মের আদেশ। তর্কচূড়ামণি মশায় নিশ্চয়ই আমার স্বপক্ষে দু' একটা এমন শাস্ত্রের শ্লোক ব'লে দিতে পারবেন, যার অর্থ এই যে, দুর্জ্জন হ'লেও অতিথিকে ফেরান মহাপাপ!

তর্কের স্রোতে কেহই লক্ষ্য করে নাই যে, বাহিরে আকাশ সম্পূর্ণ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসন্ন বৃষ্টির সূচনা করিতেছিল। হঠাৎ একটা গর্জ্জন হওয়ায় বিস্মিত জনমণ্ডলী মেঘের দিকে চাহিয়া সভা ভঙ্গ করিতে মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিল না।

বাহিরে আসিয়া যে যার গৃহ-পানে দ্রুত চলিল; শাস্ত্র-বাক্য লঙ্ঘন করিয়া চাটুয্যে মশায়ও গৃহ-প্রবেশ করিলেন। যুবক একটু বিপদে পড়িল, কিন্তু হরিনাথ তাহাকে নিশ্চিন্ত করিলেন। তিনি সবিনয়ে তাহাকে আপনার গৃহে রাত্রি যাপনের জন্য আহ্বান করিলেন। যুবকের ইহাতে অসম্মত হইবার কোনও কারণ ছিল না।

৩

হরিনাথ বাঁড়ুয্যে মশায়ের বাড়ী পৌঁছিয়া যুবক স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে, বাঁড়ুয্যে মহাশয় একান্ত অতিথি-পরায়ণ বলিয়াই এ-বাড়ীতে রাত্রি যাপনের জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিতে পারিয়াছেন; কারণ তৃতীয় ব্যক্তির থাকিবার পক্ষে এ বাড়ীতে একান্তই স্থানাভাব।

যাহা হউক, কোন প্রকারে ব্যবস্থা হইয়া গেল। ঠাকুর-

ঘরে আপনাদের স্থান করিয়া একমাত্র শয়ন-গৃহ, অতিথির জন্য ছাড়িয়া দিলেন।

খাইবার ব্যবস্থাও হইল, কিন্তু এই একটু গোল হইল এই লইয়া যে অতিথির কোন জাত। যুবক কহিল, আমি ব্রাহ্মণ, মুখুয্যে। শুনিয়া প্রফুল্ল চিত্তে হরিনাথ দৌহিত্রীকে কহিলেন, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, দিয়ে যা খাবার দিদি, খাওয়া হ'য়ে গেলে সকড়ী তুলে নিস্, নইলে অসুবিধে হবে। শয়ন গৃহে এক পার্শ্বেই খাওয়ার ব্যবস্থা হইল।

খাবার লইয়া মেয়েটি যখন ঘরে প্রবেশ করিল, তখন সহসা মনে হইল যেন একখণ্ড বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল। যেমন সুন্দর রং, তেমনি মুখশ্রী!

এই মেয়েটিকে আশ্রয় করিয়া যে সব কুৎসিত বচন সে এইমাত্র শুনিয়া আসিয়াছিল, তাহাদের মনে করিয়া তাহার সমস্ত মন করুণায় ভরিয়া উঠিল! একের পাপে নিরপরাধ অপরের প্রতি এই যে সমাজের শাস্তি, ইহা যে সে পূর্ব্বে জানিত না তাহা নহে, কিন্তু চক্ষের সম্মুখে ইহার পরিচয় পাইয়া সে অবাক্ স্তম্ভিত হইয়া গেল! মেয়েটি যেন চোর; এই পৃথিবীতে তার মাতৃগর্ভে জন্মলাভ করিয়া সে যে পাপ করিয়াছে, এই ত্রয়োদশ বর্ষ কাল ভগবানের আলোহাওয়ার মাঝখানে বাঁচিয়া থাকিয়া ও পুষ্টিলাভ করিয়া সে যেন সে পাপের বোঝা আরও বাড়াইয়া চলিয়াছে এবং সে পাপ তাহাকেই যে শুধু মলিন করিয়াছে তাহা নহে, পরম সদাচারী সমাজের কাছে তাহার বৃদ্ধ দাদা-মহাশয়ের মাথাও চিরদিনের জন্য হেঁট করিয়া দিয়াছে! কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, যে চরিত্রবান পুরুষ তাহাদের এই অপমানের কারণ, সে এখনও এই গ্রামেই উন্নত মস্তকে বিচরণ করিতেছে, এবং যেহেতু অর্থ তাহার প্রচুর, সেই হেতু চাটুয্যে মুখুয্যেদের আন্তরিক ভক্তি-অর্ঘ্যও পাইয়া আসিতেছে!

হরিনাথ বসিয়া খাওয়াইতেছিলেন, এবং বারংবার বলিতেছিলেন যে, দরিদ্রের আয়োজনে হয়ত ক্ষুধার নিবৃত্তি হইবে না। যুবক হাসিয়া কহিল, অনেক বড়লোকও ত দেখে এলাম, কই এ আয়োজনও ত কারুর দ্বারা হোলনা বাঁড়ুয্যে মশাই—আমি খুব তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছি। আমি আপনাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত; কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন, খাবার দিয়েছেন, এ সৌজন্যের কথা কোনও দিন ভুলব না।

দুজনে খানিকটা চুপ্ করিয়া রহিলেন। তাহার পর হরিনাথ আর্দ্র কণ্ঠে কহিলেন, সভায় আমাদের পরিচয় পেয়েও যে আপনি দয়া ক'রে আমার বাড়ীতে এসেছেন, এতে—

যুবক হাসিয়া কহিল, এই জন্যেই ত' বিশেষ ক'রে এলাম, বাঁড়ুয্যে মশাই! সবাই যদি আপনাদের চাটুয্যে মশাইএর মত কেবল পুণ্যই অর্জ্জন করেন, তা হ'লে ত' দুনিয়া টেঁকেনা। আমিও না হয় আপনাদের পাপের ভাগ একটু নিলাম।

হরিনাথ চুপ্ করিয়া রহিলেন।

যুবক কহিল, আপনার নাৎনীর বুঝি বিয়ের চেষ্টা করচেন?

হরিনাথ কহিলেন, গ্রামের যে ভাব, তাতে কিছুতেই কৃতকার্য্য হ'চ্ছিনে। চেষ্টা ত' কত কচ্ছি।

এমন সময় বাহিরে একটা গোলযোগ, হাঁকাহাঁকির শব্দ পাওয়া গেল। হরিনাথ ত্রস্ত হইয়া বাহিরে গিয়া আগন্তুকদের সহিত কি সব কথাবার্ত্তা কহিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, পাল্কী নিয়ে রাজাপুর কাছারীর গোমস্তা বিনোদলাল এসেছ, বলে হুজুর—বলিয়া হরিনাথ একটা ঢোঁক গিলিলেন।

যুবক বলিল, এসেছে? আচ্ছা যাচ্ছি। তখন হরিনাথ গলায় বস্ত্র দিয়া দুই হাত জোড় করিয়া কহিলেন, হুজুরের পদার্পণ এই গরীবের বাড়ীতে হ'য়েছে বুঝতে পারিনি, দয়া করে মাপ—অনিলকুমার ব্যস্ত হইয়া কহিল, হাঁ—হাঁ, করেন কি বাঁড়ুয্যে মশাই! আপনি সদ্ব্রাহ্মণ, বয়সে বড়—আপনি ও-রকম করলে যে আমার যাওয়াই হয় না।

শুনিয়া হরিনাথ এক-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বোধ করি কাঁপিতেই লাগিলেন।

বিনা পরিচয়ে গ্রাম ও পুষ্করিণীর অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য রাজাপুর কাছারী হইতে আধক্রোশ পথ অনিল একাই হাঁটিয়া আসিয়াছিল, বলিয়া দিয়াছিল, সন্ধ্যা হইলে যান পাঠাইয়া দিতে। সহসা বৃষ্টি আসায় বিলম্ব হইয়া পড়িয়াছে। অনিল সদর হইতে রাজাপুরে

আজই আসিয়াছিল, এবং গোপনে সকল অবস্থা প্রত্যক্ষ করিবে বলিয়া সংবাদ দিতে বারণ করিয়াছিল।

বিলম্বের জন্য গোমস্তা ভয়ে প্রায় আধমরা হইয়া গিয়াছিল। হুজুরের সন্ধান করিয়া আসিতেও একটু বিলম্ব ঘটিয়াছে।

অনিল পাল্কী সমেত তাহাদের ফিরাইয়া দিল, কহিল, কাল প্রাতে পদব্রজে সে রাজাপুরে যাইবে। হরিনাথকে কহিল, আপনার এমন আদরের আতিথ্য আমি ষোল-আনাই উপভোগ করবার জন্যে, আজ রাত্তিরটা আপনার এখানেই থাকব। বৃদ্ধ কর-জোড়ে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন।

* * *

প্রাতে অনিল উঠিয়া দেখিল, যে, তাহার অনেক পূর্ব্বেই এই নিষ্ঠাবান পরিবারের সকলে উঠিয়া পড়িয়াছে। ঘর হইতে বাহিরে আসিতেই দেখিল, সুরমা ফুলের সাজি হাতে বাড়ীতে ঢুকিল।

অনিল ডাকিল, সুরমা, শোন।

সুরমা একবার দ্বিধা করিয়া আসিল। অনিল কহিল, দাদামশাই কোথায় ?

সুরমা ধীরে ধীরে কহিল, পূজোয় ব'সেচেন।

অনিল কহিল, সুরমা, খুব দরকারী কথা আছে। শোন।

সুরমা বিস্ময়ে চাহিল।

অনিল কহিল, আমি সব শুনেছি। আমি তোমাকে বিয়ে কর্ত্তে চাই। শুধু জান্তে চাই, তোমার অমত নেই। তার পর তোমার দাদামশাইকে বলব।

একটা থামে ঠেস দিয়া সুরমা পাথরের মূর্ত্তির মত খানিকটা দাঁড়াইয়া রহিল। প্রভাতের আকাশের মত তাহার মুখ রক্তিমবর্ণ হইয়া উঠিল; মনে হইল, যেন ধীরে-ধীরে তাহার চেতনা লোপ পাইতেছে! তাহার বুকের ভিতর হইতে মানব-সমাজের সমস্ত অত্যাচার যেন বিরাট বেদনার মত জমাট বাঁধিয়া কণ্ঠরোধ করিয়া দিতে চাহিল; এবং আজ প্রভাতের এই দেবতার মত করুণাশীল মানবের আকস্মিক অযাচিত এই স্নেহে তাহার অন্তর যেন শতধা বিদীর্ণ হইয়া উৎসের মত সহস্র ধারে ঝরিয়া পড়িতে চাহিল; দুই চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

ধীরে-ধীরে সে ফুলের সাজি রাখিয়া, গলায় কাপড় দিয়া অনিলকে গড় করিয়া প্রণাম করিয়া, পায়ের ধূলো মাথায় লইয়া যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন নারীহৃদয়ের অসীম কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ তাহার অপরূপ দুই চোখ দেখিয়া অনিলের বুঝিতে বাকী রহিলনা, তাহারা কি বলিতে চাহে।

হরিনাথ এই প্রস্তাবে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। অনিল তাঁহাকে শুধু এই কথা বলিয়া সাবধান করিয়া দিল, যেন এ সংবাদ তিনি কাহাকেও না দেন।

৪

বেলা দশটায় বরকন্দাজ আসিয়া খবর দিল যে, হুজুর রাজাপুর কাছারীতে আসিয়াছেন, এবং সেই দিন বেলা বারটায় স্বয়ং পুষ্করিণীর অবস্থা দেখিতে আসিবেন। তিনি বলিয়া পাঠাইয়াছেন, যেন সেই সময়ে গ্রামের মাতব্বররা উপস্থিত থাকেন।

একটা নির্ব্বাক বিস্ময়ের তরঙ্গ খেলিয়া গেল। সকলেই বুঝিল, এ হুজুর একটু নূতন ধরণের—নিজে না দেখিয়া কাজ করেন না।

চারটার সময় পুষ্করিণীর পাড়ে সমবেত গ্রামের তর্ক-চূড়ামণি, চাটুয্যে, মুখুয্যেরা সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, অদূরে প্রকাণ্ড এক ঐরাবতের মত হস্তী, এবং তাহার সহিত বিস্তর সিপাহী বরকন্দাজ আসিতেছে।

চাটুয্যে কহিলেন, ঠাট্ এসেছে হে!

মুখুয্যে কহিল, কিন্তু লোকটিকে ত দেখা গেলনা, হাতীর পিঠ যে খালি।

কাছে আসিতে দেখা গেল যে, এত আড়ম্বর করিয়া হুজুর হাঁটিয়াই আসিতেছেন। চিনিয়া লইতে দেরী হইল না, কারণ অনুগামী বহু জাঁকজমক এবং আড়ম্বরশালী পোষাকধারীদের মধ্যে হুজুরের পরণে একটি সাধারণ ধুতি এবং সাদা পিরাণ!

চাটুয্যে সভয়ে কহিলেন, ওহে কালকের সেই লোক-টার মত বোধ হ'চ্ছেনা!

তর্কচূড়ামণি নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, কতকটা, কিন্তু নিশ্চয়ই সে নয়। অসম্ভব, হুজুর কেন গোপনে সন্ধ্যার পর এখানে আসবেন?

শাস্ত্রজ্ঞ তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অভয়বাণী শুনিয়া সকলে আশ্বস্ত হইল।

হুজুর আসিয়া সকলকে অভিবাদন জানাইয়া কহিলেন, এই পুকুরের সংস্কার চান আপনারা?

তর্কচূড়ামণি কহিলেন, হুজুর!

অনিল কহিল, সংস্কারে খরচ হবে অনেক। আমার আশ্চর্য্য বোধ হ'চ্ছে যে, আপনারা একে এমন অসংস্কারের অবস্থায় কেমন করে আস্‌তে দিলেন! অথচ, শুনছি, এইটে আপনাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ,—খাবার জলের এই একমাত্র পুষ্করিণী। গ্রামের সকলে যদি গোড়া থেকে সামান্যও চেষ্টা কর্‌তেন, ত নিশ্চয়ই এর এমন অবস্থা হোতো না।

তর্কচূড়ামণি বিরস-বদনে কহিলেন, সম্ভব।

অনিল কহিল, এতে এত খরচ হবে যে, একা আমার পক্ষ থেকে বহন করা কঠিন হবে। আমার মনে হয় যে, যদি অর্দ্ধেক আপনারা গ্রাম থেকে তুলে দেন, তা হ'লে আমি অর্দ্ধেক দিতে পারি।

সমবেত জনমণ্ডলী নিঃশব্দে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। অবশেষে চাটুয্যে কহিলেন, হুজুর, গ্রাম থেকে দেওয়া কিছু কঠিন হবে।

অনিল কহিল, কিন্তু—না দিলে যে অবস্থা হবে, তা আরও কঠিন। কারণ হয়ত মোটেই সংস্কার হবে না।

তর্কচূড়ামণি উত্তরে একটা সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইলেন। যাহার মর্ম্ম এই যে, রাজার কাজই প্রজারঞ্জন।

অনিল হাসিয়া কহিল, কিন্তু পণ্ডিত মশায়, সে শ্লোকটা ভুললেও চলবে না, যেটা বলে, উদ্‌যোগী পুরুষ-সিংহকেই লক্ষ্মী প্রাপ্ত হন, কি ওই রকম একটা কিছু। উদ্যোগটা দুদিক থেকে না দেখালে যে কোনও কাজই হয় না। রাজার কাজ প্রজারঞ্জন বটে, কিন্তু যে প্রজারা জল খাবেন, তাঁদেরও ত' সে সম্বন্ধে একটা কর্ত্তব্য থাকা উচিত! আপনারা অর্দ্ধেক না দিলে এ সংস্কার হ'তে পারবে না, এই আমার বিশ্বাস।

বলিয়া মাহুতের দিকে ফিরিয়া অনিল কহিল, লে যাও হাতী।

ঐরাবত অগ্রসর হইতেই গ্রামস্থ লোক ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। হাতীর উপর চড়িয়া অনিল কহিল, চললাম।

তর্কচূড়ামণি, চাটয্যে, মুখুয্যে ইত্যাদি হাতযোড় করিয়া কহিলেন, হুজুর আরও কিছু শোনবার হুকুম হয়।

অনিল কহিল, কাল সকালে কাছারীতে আসবেন।

* * *

তাহার পর দিন সকালে কাছারী বাড়ী আবার গুলজার হইয়া উঠিল। আবার সেই পুরাতন অক্ষমতার যুক্তি। অনিল অবশেষে কহিল, বেশ, আপনাদের বামুন গাঁয়ের এ উপকারটা আমি করব। পুকুরের সংস্কার আমিই করে দেবো। কিন্তু একটা সর্ত্তে। শীঘ্রই আমার বিবাহের দিন ধার্য্য হ'য়েছে। আমার বিবাহে আপনারা গ্রাম শুদ্ধ ব্রাহ্মণ অনুগ্রহ ক'রে পদধূলি দেবেন, এবং বিবাহ থেকে বৌভাত পর্য্যন্ত যাহা কিছু অনুষ্ঠান আছে তাহাতে ষোল আনা যোগ দিবেন—এতে যদি সম্মত হন, ত' বিবাহের পরেই আপনাদের পুকুরের সংস্কার হবে।

তর্কচূড়ামণি প্রমুখ সকলে সমস্বরে কহিলেন, এ ত অতি আনন্দের কথা, সৌভাগ্যের কথা; আমরা সকলেই সম্মত।

অনিল কহিল, বেশ।

৫

গ্রামের প্রত্যেক ব্রাহ্মণের নিকটই যথাসময়ে শুভ-বিবাহ ছাপ-দেওয়া লাল লেফাফায় মোড়া নিমন্ত্রণ-পত্র আসিয়া পৌঁছিল।

নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে সদরে পৌঁছিয়া সকলে দেখিলেন, আদর-আপ্যায়নের ব্যবস্থা অতি সুন্দর। জমিদারের অট্টালিকার পার্শ্বেই সুবৃহৎ অতিথি-ভবনে বামুন গাঁয়ের অতিথিগণের থাকিবার জায়গা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

কন্যা পক্ষীয়গণ বরের গৃহ হইতে খানিকটা দূরে অবস্থান করিতেছিলেন। বিবাহের রাত্রে বহু বরযাত্রী লইয়া বর কন্যা-ভবনে বিবাহের জন্য উপস্থিত হইল। সঙ্গে অবশ্যই বামুনগাঁয়ের তর্কচূড়ামণি প্রমুখ সকলে ছিলেন।

এত দিন হরিনাথকে দেখা যায় নাই, কিন্তু সেখানে হরিনাথকে দেখিয়া বামুনগাঁয়ের দল কিছু বিপন্ন বোধ করিল। জমিদার ছোকরা যেমন খামখেয়ালি গোছের,—যদি বলিয়াই বসে, হরিনাথের সঙ্গে এক পংক্তিতে ভোজন করিতে হইবে, তবেই ত' মুস্কিল। চাটুয্যে মশায় কহিলেন, না, তাতে আমরা রাজী হ'তে পারিনে।

তর্কচূড়ামণি বিরস-বদনে কহিলেন, পুকুরের সংস্কারটা তা হ'লে হয়ত' বন্ধই হ'য়ে যাবে! আর চিন্তা করে দেখলে—হরিনাথের ত' এমন দোষ কিছুই নেই!

এই সহজ চিন্তার এত দিন কেন যে অবসর ঘটে নাই, এবং আজই সহসা ঘটিল কেন, ইহা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না।

চাটুয্যে মশায় কহিলেন, তবে এতদিন ওকে ঠেলে রেখেছিলেন কেন?

পাশ হইতে জবাব আসিল, এত দিন যদি অন্যায় করে থাকেন, ত' সেটা যে চালিয়ে যেতে হবে, এর কোন অর্থ নেই।

সকলে চাহিয়া দেখিল—অনিল। অনিল কহিল, চাটুয্যে মশায়, এই পুকুর-সংস্কারের উপলক্ষ ক'রে গ্রামেরও যদি একটা সংস্কার হ'য়ে যায়, ত মন্দ কি! আমি এটা লক্ষ্য ক'রেছি যে, আপনাদের গ্রামের আর কারুর চেয়ে হরিনাথ বাঁড়ুয্যে মানুষ হিসেবে খাটো নয়।

চাটুয্যে কহিল, কেমন করে? আপনি আমাদের গ্রামের জানেন কি!

অনিল কহিল, জানি আমি অনেক কথাই! চাটুয্যে মশায়, মনে আছে কি, সে-দিন সন্ধ্যায় একজন নিরাশ্রয় আগন্তুক বৃষ্টির আশঙ্কায় সামান্য আশ্রয় ভিক্ষা ক'রেছিল। আপনারা কেউ-ই দেন নি! সে-দিন যদি হরিনাথ বাঁড়ুয্যে আমাকে আশ্রয় না দিতেন, ত' রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে খাড়া ভিজতে হোত!

বোধ করি বজ্রপাত হইলেও কেহ এত বিস্মিত হইতেন না! তর্কচূড়ামণির নস্যের টিপ অর্দ্ধ-পথে স্থগিত রহিয়া গেল, এবং মুখোপাধ্যায় মহাশয় মুখ ব্যাদান করিয়া কহিলেন, হুজুর!

অনিল কহিল, আপনারা বোধ করি আশ্চর্য্য হ'চ্ছেন। কিন্তু যখন দয়া ক'রে পায়ের ধুলো দিয়েছেন, তখন আরও বেশী আশ্চর্য্য হবার সুযোগও পাবেন।

* * *

সে সুযোগও অবিলম্বেই ঘটিল। বিবাহান্তে দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য তর্কচূড়ামণি প্রমুখ বামুন-গাঁয়ের ব্রাহ্মণদের ডাক পড়িল।

বিবাহ সভায় বধূ বেশে সুরমাকে দেখিয়া তাঁহারা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, এবং আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই দিবালোকের মত স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

চাটুয্যে মশায়ের ইচ্ছা হইল, একদৌড়ে সে স্থান ত্যাগ করিয়া নিজের গ্রামে ফিরিয়া যান। তর্কচূড়ামণি নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু বুকের ভিতর খানিকটা যেন স্বস্তিও বোধ হইতে লাগিল।

অনিল কহিল, তর্কচূড়ামণি মশায়, এ-সময়ে আপনাদের আশীর্ব্বাদের প্রলোভন আমি সম্বরণ করতে পারলাম না, তাই এই কষ্ট দেওয়া! বলিয়া মাথা হেঁট করিল।

তর্কচূড়ামণি কম্পিত হস্তে ধান-দূর্ব্বা লইয়া দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—যন্ত্র-চালিতের মত চাটুয্যে মশায়ও তাহার পুনরভিনয় করিলেন।

বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গেল, এবং এ সংবাদও পাওয়া গিয়াছে যে, বৌ-ভাতের দিন সুরমার পরিবেশিত অন্ন বামুন গাঁয়ের ব্রাহ্মণগণ পরম পরিতোষ সহকারে ভোজন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য পুষ্করিণী সংস্কারেও বিলম্ব ঘটিল না।

পোষাকী সম্মান

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

ক্ষুদ্র যশের পান্‌সী রঙিন চাইনে আমি ভাই,
নিন্দা ঘৃণার তুফান কাটার সাধ্য যাহার নাই।
চাই আমি সেই মধুকরে
ডুববে না যা লক্ষ ঝড়ে,
ভীম মগরার বক্ষে রবে হর্ম্ম্য ভাসমান।

চাইনে আমি চাইনে যশের রাংতা জরীর তাজ
ভড়ং দেখে মূর্খ ভোলে—যাত্রাদলের সাজ।
মায়ের দেওয়া টোপর যে চাই
সমুদ্রে যা ডুববে না ভাই
বিপুল-জ্যোতি গৌরব যার হয় না অবসান।

মনরে যশের ভাট্ কি কাঙাল অগ্রদানী নস্,
রও অশূদ্র প্রতিগ্রাহী, দারিদ্র্যে নিকষ।
থাক্ কুটীরে নদীর ধারে,
যাসনে ধনী রাজার দ্বারে
তোর 'সিধা' দিন পাঠিয়ে দেবে আপনি ভগবান।

কৌতুকাঙ্কন !

হিংসুক—[ব্রিটিশসিংহ। "তাই ত ! 'রুঢ়' দেশটা তবে কি—"]

মার্কের মার্কা

বন্ধুত্ব !—[ইংরাজ ও ফরাসীর মৌখিক সদালাপ]

নিশি ভোর !—[জনবুল্। (আরব ও মেসোপোটেমিয়ার পথে যেতে যেতে) নাঃ, বেটারা আর এগুতে দিলে না! বেশ অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে গোলেমালে ঢুকে পড়া গেছ্‌ল! কিন্তু এরা জেগে উঠেছে দেখ্‌ছি, তাছাড়া নিশিও ভোর হ'য়ে এলো যে, মোরগ ডাক্‌ছে!]

আক্ষেপ—বাণিজ্য লক্ষ্মী। নাঃ, এ বেয়াড়া 'চড়াদর' আর 'মোটামজুরী' ছেলে দুটো আমাকে কিছুতেই শান্তিতে থাকতে দেবে না দেখ্‌ছি।

বুড়োবয়সের ধন!—বৃদ্ধ। ['বাঃ বেশ চলেছে—এই ছোট
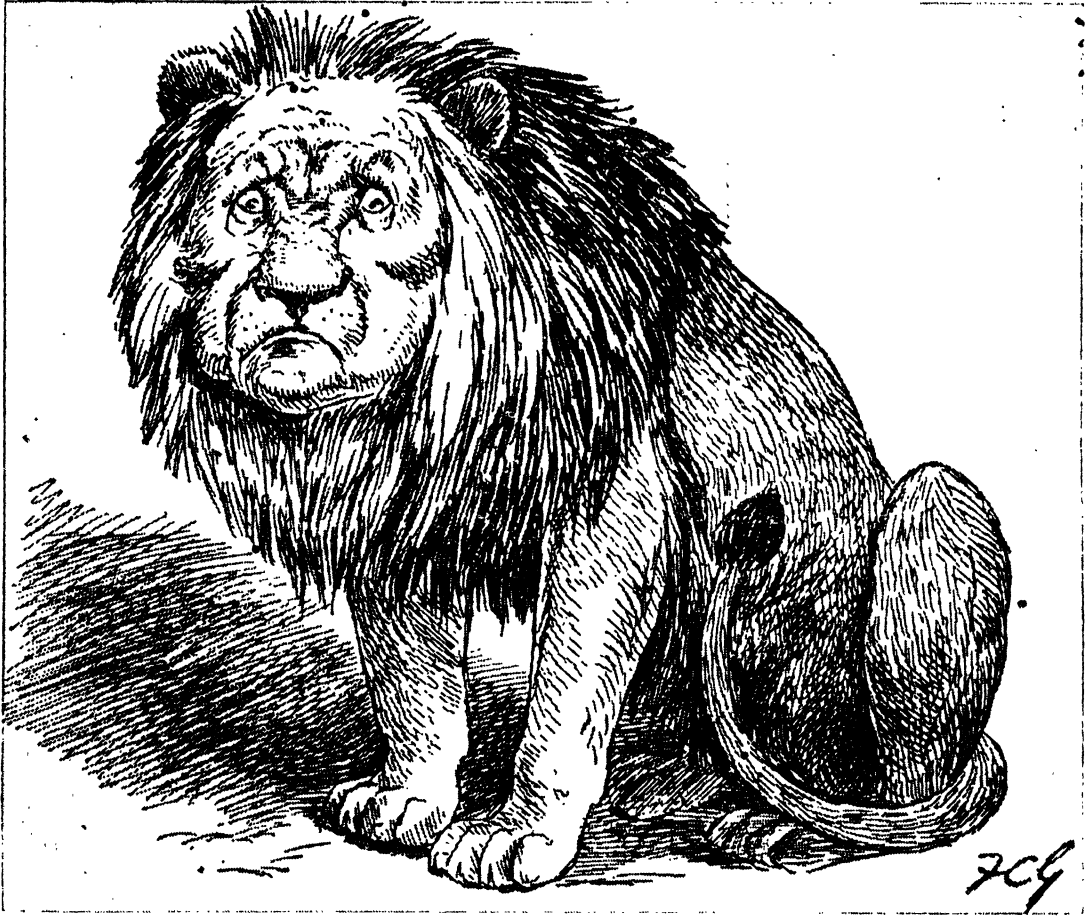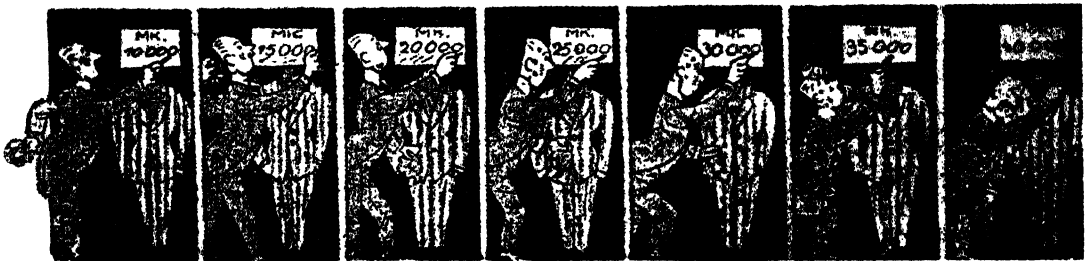
নুতন নীরো !—[তিনি যেমন রোম পুড়িয়েছিলেন, আমিও তেমনি একটা বিশ্ববিদ্যালয় জালিয়ে দিচ্ছি—!]

রাক্ষসের গ্রাস—[ফরাসী। (রূঢ়কে) ভয় নেই, আমি তোমাদের গিল্‌বো না, শুধু চিবুচ্ছি।"]
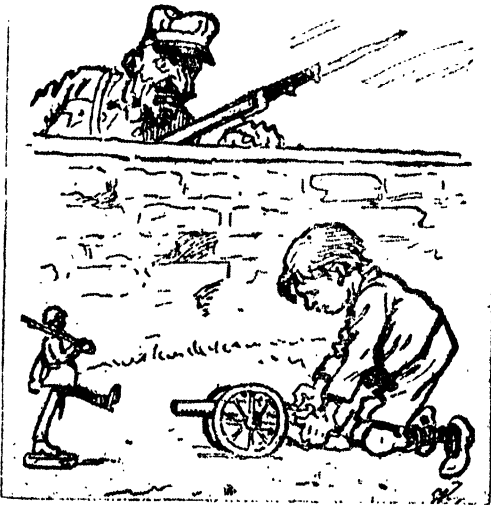
বিভীষিকা !—[অস্ত্র আইন। "সর্ব্বনাশ ! সমস্ত দেশটাকে নিরস্ত্র ...রে রেখে মনে করেছিলুম নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে ! কিন্তু ছেলেগুলোর ... খেলার ছ'লে অস্ত্রশিক্ষা হচ্ছে তার উপায় কি ?"
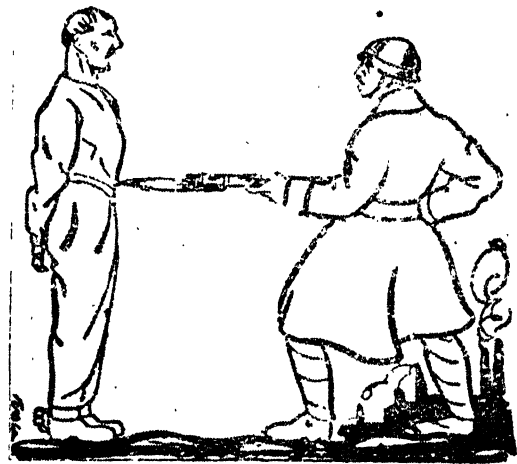
উল্টোপথ !—[ফ্রান্স। "টাকা দাও বল্‌ছি—নইলে— প্রাণ দিতে হবে !"
জার্ম্মেনী। "প্রাণ তুমি নিতে পারো বটে, কেননা সেটা এখন তোমার হাতে; কিন্তু টাকাটা যে, আমার হাতে অথচ তুমি তো হাত পা বেঁধে রেখেছে—টাকাটা দিই কেমন করে বল তো ?"]
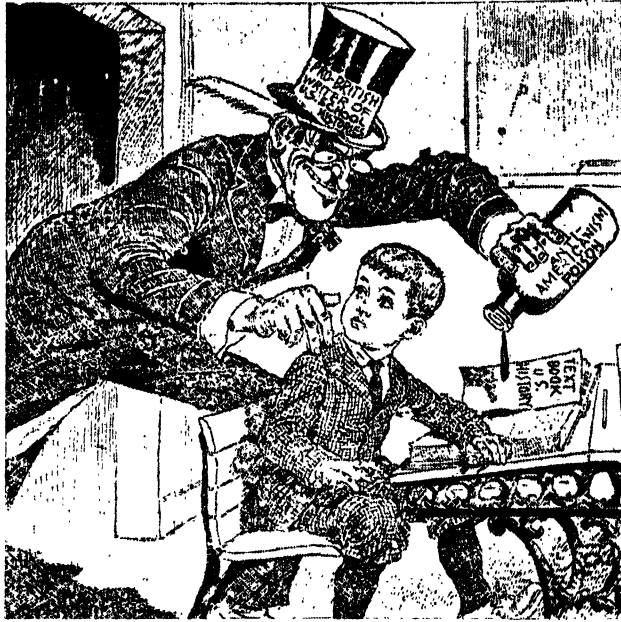
বাল্যের বিষ!—[সরলমতি শিশু যাতে বাল্যে পাঠাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গেই নিজের জাতকে ঘৃণার চক্ষে দেখ্‌তে শেখে সেই উদ্দেশ্যে পাঠ্যপুস্তকের প্রতিছত্রে বিদেশীর ভক্ত গ্রন্থকার বিষ মিশ্রিত করে দিচ্ছেন।]

হারজিত!

তুর্কী।—(ইংরেজকে) "কি দাদা! লড়াইটা তোমরাই জিতলে না?"

অরণ্যের বাণী

[সভ্যতার ব্যাধিতে মুমূর্ষু য়ুরোপকে বন্য বর্ব্বর শ্রীযকে আরোগ্য হবার সন্ধান বলে দিচ্ছে।]

ভোটমঙ্গল—["যদি পাকা মন্ত্রী রাখ্‌তে চাও তাহ'লে এবারও আমাকেই 'ভোট' দাও!"]

আড়ি!

[বলশেভিক। "কি সখী! সরে পড়ছো কেন? এসো, আর
কটু হাত ধরাধরি ক'রে নাচি!"

শ্রমজীবিনী। যাও, যাও,. ঢের হ'য়েছে—আবার তোমার সঙ্গে?—
রই মধ্যে আমার যে হাল করেছো!]

নূতন আবিষ্কার

[কোপার্নিকাস্। পৃথিবী যে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরছে এইটেই প্রথমে আমি সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেম, কিন্তু এখন বুঝ্‌তে পেরেছি

আধা কড়ি।—[বুড়ো চাষার এত বয়েস হোলো, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সে কখন তার চাষের ফসল বেচে পুরোদাম পেলে না।]

ব্যাঘাত।—[লড়াইয়ের পর নিশ্চিন্ত হয়ে কর্ত্তা (ইংলণ্ড) একটু নির্জ্জনে শান্তি উপভোগ ক'রতে বসেছিলেন; কিন্তু খোকাশত্রু (ফরাসা)

উপনিবেশ.

[কেনিয়ার সাদা কালো অধিবাসী।]

পাশবিক অত্যাচার !—[রূঢ়ে ফরাসীর কাণ্ড]

ব্রহ্মার নূতন সৃষ্টি

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মজুমদার

অসীম নীল ক্ষীরোদসাগরের মধ্যে এক অদ্ভুত রকমের গণ্ডোলায় (Venetian boat) শ্রীভগবান বিষ্ণু অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় তাম্বুল ইচ্ছা করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীভগবতী লক্ষ্মী-দেবী পদসেবায় নিযুক্তা। অরোরা বোরিয়ালিসের আলোর অদ্ভুত ছটায় সমুদ্রদেব একটা ব্রহ্মদেশীয় লুঙ্গিতে পরিণত হইয়া উঠিয়াছিল। ঠিক সেই সময়ে নারায়ণ বলিলেন, 'নাঃ, বুঝলে লক্ষ্মী, ব্রহ্মাণ্ডটা বড়ই একঘেয়ে হয়ে পড়ছে,—নূতন কিছুরই সৃষ্টি হচ্ছে না। গানে সাতটা মাত্র সুর নিয়ে ও চিত্রে গোটাকতক মাত্র বর্ণের মিশ্রণে কত অদ্ভুত রকম সুর ও ভাব ব্যক্ত ক'রে ভক্তেরা আমায় অহরহ ডাকছে; কিন্তু কোন্‌টাতে যে আমি উঠব, বুঝতে পাচ্ছিনে। ওধারে ঐ দেখ, মহাদেবের হিমরাজ্যে তিব্বতবাসীরা অনবরত কি একটা চাকা (prayer wheel) ঘুরিয়ে আমায় এত ডাকছে বলে বোধ হচ্ছে যে, শেষটা বোধ হয় বিরক্ত হয়েও তাদের কাছে ধরা দিতে হয়।

লক্ষ্মী—নাথ, আপনি দয়ার সাগর,—ভক্তের স্নেহডোরে

আপনি বাধ্য। চাকা ঘুরিয়ে আপনাকে ব্যতিব্যস্ত না করে, প্রাণের সহিত দিনান্তে একবার মাত্র ডাকলেও ত আপনি শুনতে বাধ্য। মর্ত্ত্যে যে সৃষ্টিটা, অধুনা হয়েছে, তাতে ব্রহ্মা সামঞ্জস্য রাখতে পারছেন না। আজকাল এমন সৃষ্টি-ছাড়া অভাগাদের জন্ম হচ্ছে, যাদের কাতর ডাকে আমারও ভাল ঘুম হচ্ছে না। আপনি ব্রহ্মার নিকট কৈফিয়ৎ তলব করুন; নচেৎ পা টেপা আজ থেকে বন্ধ।

বিষ্ণু—আহা, কর কি, কর কি! আমি এখনি ব্রহ্মাকে ডেকে পাঠাচ্ছি। গরুড়, শীঘ্র যাও,—ব্রহ্মাকে আমার নমস্কার দাও, আর বল, যেন চিত্রগুপ্ত—সৃষ্টির যারা 'ত্রাহি মধুসূদন' ডাকছে,—তাদের তালিকা নিয়ে অবিলম্বে এখানে হাজির দেন।

ব্রহ্মা আসিলে শ্রীভগবান সেই গৃহনৌকার আপিস ঘরে আসিলেন। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীও পদ্মের ডালনা রাঁধিতে চলিয়া গেলেন। অফিসের কার্য্যাবলি আরম্ভ হইল। অফিস-ঘরে আলোটা একটু কম ছিল। গরুড়ের এরূপ বন্দোবস্ত দেখিয়া ভগবান অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, চাঁদকে পূর্ণিমা হয়ে টেবিলে বসতে বল; আর ব্রহ্মার জন্য "হরদম তাজা" গড়গড়ায় অগ্নিদেবকে আবির্ভাব হতে বল, যাও গরুড় চট্‌পট্। অতঃপর ব্রহ্মা আসন পরিগ্রহ করিলে, নারায়ণ বলিলেন, হ্যাঁ, বলছিলাম্ কি ব্রহ্মা, সৃষ্টিটা বড় একঘেয়ে হয়ে পড়ছে। সম্প্রতি নূতন কিছু সৃষ্টি করেছেন কি? দেখি ফাইলটা! (দেখিয়া) বাঃ, এত গেল-বৎসরের ফাইল,—এ রেটে সৃজন হলে আমাদের নাম যে ডুবে যাবে। নূতন কি হয়েছে বলুন ত?

ব্রহ্মা—আজ্ঞে, গত অমাবস্যা থেকে শরীরটা ভাল নেই,—উদ্ভাবনা শক্তিও কমে গিয়েছে। মনটা নিস্তেজ থাকাতে যে দুচারটে বস্তু সৃষ্টি করেছি, সেগুলিও যেন একটু বেসুরো রকমের। তবে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব বোধ হয় একটু পূরণ করতে পেরেছি; চিত্রগুপ্ত ফাইলটা দেখ ত। বিষ্যুৎবার বেলা ৪টার সময় মনুষ্য-সমাজে কি জন্মেছে? কেরাণীর ভগবান চিত্রগুপ্ত চসমাটা নাকের ডগায় টেনে বললেন, আজ্ঞে, সেখানটা একটু মুছে গেছে।

বিষ্ণু—মুছে গেল কেন?

ব্রহ্মা—শরীরটা ভাল ছিল না,—অমনোযোগেই এ সৃষ্টিটা লিখেই ভাবলাম মুছে ফেলি। অমনি শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী পেঁচার মারফত আমায় কি জন্য ডেকে পাঠালেন, মনে হচ্ছে না। এই বাহনটার শব্দে বিচলিত হয়ে আমি ওটা ভাল করে মুছে ফেলতে ভুলে গেলাম। তাই ওরকম হয়েছে। নিজেই বুঝলাম না, ওরূপ সৃষ্টি কেন করলাম।

বিষ্ণু—তাই ত,—কিছুদিন ছুটী নলেই হত। যা হোক, সে জীবটার নাম কি, পড়ুন দেখি।

ব্রহ্মা—হাঁ, এই যে, ভাল পড়া যাচ্ছে না;—চাঁদ একটু উঁচু হও ত—দেখ দেখি চিত্রগুপ্ত 'কেরাণী' না?

চিত্র—আজ্ঞে হ্যাঁ, চাঁদের আলোয় এবার বেশ পড়া যাচ্ছে।

বিষ্ণু—এটা না পাখী? কিন্তু কেরাণী পক্ষী মনে হচ্ছে যে সৃজন হ'য়ে গেছে ব্রহ্মা! এক পাখী দুবার সৃষ্টি, কি রকম?

ব্রহ্মা—আজ্ঞে, এটা পাখী না, রীতিমত মানুষ।

বিষ্ণু—মানুষে আবার নূতনত্ব কি?

ব্রহ্মা—আজ্ঞে, আছে, পরে বলছি। দ্বিতীয়টা হচ্ছে গিয়ে—দেখ ত চিত্রগুপ্ত লাল পেন্সিলে মোটা করে লেখা আছে urgent—অর্থাৎ শীঘ্র সৃষ্টি হওয়া চাই এবং 'বেশী লোকের জন্য নয়।'

চিত্র—আজ্ঞে হ্যাঁ, পেয়েছি—"মুরগী"।

বিষ্ণু—এটাও কি আর একরকম মানুষ?

ব্রহ্মা—আজ্ঞে না, এটা হচ্ছে পাখী।

বিষ্ণু—এ ছাড়া আরও কিছু?

ব্রহ্মা—এই যে, দেখি, সেই গোলপানা ফলটা, যার গন্ধে সর্দ্দি সারে, ওর নাম কি, এই যে "পেঁয়াজ।"

বিষ্ণু—ফলে আর কি নূতনত্ব আছে?

ব্রহ্মা—আজ্ঞে, ফল গাছে ফলে,—তাতে বিলম্ব হয়; ওটা মাটীতে ফলে, বেজায় ঝাঁজ। মুরগীর পরম বন্ধু। ভীষণ শীতে প্রায়ই মহাদেবের রাজ্যে আমায় tour করতে হয়,—সর্দ্দি হয়ে পড়ে।

বিষ্ণু—(সন্দিগ্ধভাবে) আচ্ছা, মন্দ নয়। মুরগীটা কি রকম?

ব্রহ্মা—আজ্ঞে, একটু আস্তে বলাই ভাল, কারণ, শুনে ফেললে—

ঠিক সেই সময়ে গরুড় তামাক নিয়ে এসে হাজির হল।

ব্রহ্মা—(পাতা উলটাইতে উলটাইতে) এই যে মুরগী।

কচি অবস্থায় এটার সুরুয়া খেলে আধমরা মানুষ এক মাসে চাঙ্গা হয়ে দাঁড়াবে। নানা রোগে শরীরের ক্ষয় অনিবার্য্য। তখন মস্তিকের ও শরীরের পুষ্টির জন্য এটা যে কত বড় সালসা, তা আমি চারমুখেও বলে উঠতে পাচ্ছিনে। বুঝুন না কেন, এর একটা কাটলেট খেয়ে আমি উত্তর মেরু থেকে কৈলাসে যাই, আবার সটান ফিরে আসি—সর্দ্দির নাম নেই।

বিষ্ণু—তাই না কি ?

চিত্রগুপ্ত—হুজুর, এ সম্বন্ধে একটা আইন হলে ভাল হয়; যথা "বোকা হিন্দুর নিষেধ আইন।" এ না হলে মর্ত্তের লোকেরা এক দিনেই সব খেয়ে নিঃশেষ করে ফেলবে।

বিষ্ণু—(সস্মিত মুখে) সে কি ?

চিত্রগুপ্ত—আজ্ঞে, এই দেখুন না,—তেইশ কোটী হিন্দু, আর সাত কোটী মুসলমান—ইংরেজের ত কথাই নেই। তা হ'লে দেবতারা খায় কি ?

ব্রহ্মা—(ঘাড় নাড়িয়া) কথাটা মিথ্যা বলনি চিত্রগুপ্ত।

বিষ্ণু—তবে কি হিন্দুদের—

ব্রহ্মা—হয়েছে, হয়েছে,—আর ভাবা নয়। চিত্রগুপ্ত, লিখে দাও "পেঁয়াজ আর মুরগী খেলে হিন্দুর জাত যাবে।"

বিষ্ণু—তথাস্তু। এবার কেরাণীটা কি, বুঝিয়ে বলুন ত।

ব্রহ্মা—এটা যে ঠিক কি, তা বলা শক্ত। এরা দ্বিপদ জন্তু। জীবনের তিনভাগ এদের অফিসেই কাটে। শেষভাগ উন্মাদ অবস্থা। কন্যাদায়গ্রস্ত, অভাবক্লিষ্ট, গ্রীষ্মে সখাম টুইল সার্ট গায়ে, বর্ষায় জুতা বগলে, খবরের কাগজে বাসি ইলিশ মাছ মুড়ে নিয়ে শীতে kar কোম্পানির ৪॥০ দরের লাল, মেটে ইত্যাদি রঙের র‍্যাফার গায়ে; হাওড়ার পোলের উপর দিয়ে পঙ্গপালের মত ছুটেছে। অন্য কোনও চিন্তা নাই—কেবল ঐ "হাজিরা"র ছাড়া। বড় বাবুর চোক-রাঙ্গানি, সাহেবের সম্মুখীন হওয়ার ভয়। যদি ট্রাম ও মোটর চাপায় মারা যায়, তথাপি ভূত হয়ে হাজিরা দিতে বাধ্য।

বিষ্ণু—সে কি ?

ব্রহ্মা—আজ্ঞে, তা নইলে সে কেরাণীই নয়। এমন দেখা গিয়েছে, অফিসের পশ্চাদভাগে কুলগাছে বসে এক ম্যালেরিয়াগ্রস্ত কেরাণীকে দেখে সাহেব বললে, কি হে, তুমি না মরে গিয়েছ ? ভূত বললে, আজ্ঞে; আমি মরে ভূত হয়েছি বটে, কিন্তু অনুমতি পেলে এখনও হাজিরা দিতে পারি। মরেছি বটে, কিন্তু কাজে ইস্তফা দিই নাই। সাহেব সেদিন থেকে leave rules জারি করলেন। যাক, সে কথা এখন থাকুক। এদের বিষয় আরও বলছি—"কেরাণী" মানে বুঝতে হবে, যারা ক্ষিপ্রহস্তে ও গোগ্রাসে বেলা নয়টার মধ্যে যেমন করেই হোক কোন খাদ্য কিংবা অখাদ্য, রাঁধা কিংবা অর্দ্ধ সিদ্ধ যা হয়ে উঠবে, খেয়ে, ছাতা বগলে দৌড় দেবে। পানের ডিবেটা ছেলে-মেয়েরা দৌড়ে গিয়ে পকেটে দিয়ে আসবে, শরীর বলে এদের কিছু থাক্‌বে না। মনের অবস্থাও তেমনি হবে। ইচ্ছা বা অভিরুচি বলে এদের কিছুই থাক্‌তে পারবে না। এদের হিসেব রাখ্‌বার জন্য বড় বাবুরা সৃষ্ট হয়েছেন। তাঁরাও একরকম অদ্ভুত জীব। দয়া-মায়া-মমতা বলে তাঁদের কিছু থাক্‌বে না। কেবল থাক্‌বে কিসে কার্য্যটা বজায় থাকে, ও কেমন করে কম খরচে বেশি কাজ হয়, ও নিজের স্বার্থটা বজায় থাকে সেদিকে খরদৃষ্টি। এরা যা বলবে, কেরাণী ন্যায়-অন্যায় বিচার না করেই করে ফেল্‌বে। আর চট করে সেটা না করতে পারলেই তাদের চাকরি যাবে।

বিষ্ণু—চাকরি গেলে খাবে কি ?

ব্রহ্মা—আজ্ঞে, আবার হবে। অর্থাৎ না মরলে এদের চাকরি যাবে না। অন্য কোন উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করবার সাহস বা প্রেরণা এদের কখনই হবে না; কারণ, তা যদি হয় ত তার কেরাণী জন্ম ত উদ্ধারই হয়ে যাবে।

বিষ্ণু—যা হোক, ওটা মন্দ ব্যবস্থা নয়। তবু এরকম একটা সৃষ্টি করাটা কি ঠিক্ হল ব্রহ্মা—বল্‌ছিলাম কি—

ব্রহ্মা—নইলে কেমন করে হবে ? ভেবে দেখুন, কেরাণী না হলে অফিসের ত অস্তিত্বই থাকে না! এরা খেটে প্রাণান্ত হবে অথচ মাইনে বাড়বে না বললেই হয়। লাভের মধ্যে কখন-কখনও হয় ত অফিসরদের এক ফাঁকা "ধন্যবাদ" আসবে,—তা আবার কেউই বুঝবে না কার জন্য। কেরাণী হাস্‌বে না—যদি নেহাইৎ হাসে ত মুচকে; কারণ, জোরে হাসিলেই তার চাক্‌রী যাবে। মা-ষষ্টি এদের প্রতি সদয়া থাক্‌বেন। রাজাদের ছেলে পিলে হয় না,—কেরাণীর সাতটী মেয়ে, উপরন্তু দুই তিনটী ছেলে হবে, আর তারা হবে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত। তাদের মধ্যে গুটি কয়েক হয় কালাজ্বরে নয় ত ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে মারা

যাবে। এদের গৃহিণীরা কিন্তু অত্যন্ত কঠিন-প্রাণা। যদি যক্ষ্মারোগে তারা না মারা যায় ত বেশ সুখেই সধবা থাকবে, নয় বিধবা হবে। এদের ছেলেরা শিক্ষা অভাবে প্রায়ই চোর, নয় গাঁজাখোর হবে। বিদ্যা কিংবা স্বাস্থ্য না থাকায়, না কেরাণী না মুটে একটা অদ্ভুত জীব দাঁড়াবে।

বিষ্ণু—সে কি, তা'হলে এরা খাবে কি করে?

ব্রহ্মা—তাই ত (মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিলেন)—এরা যদি মণিপুরে emigrate করে ত সেখানে চাষ করে ও বিয়ে করে সুখী হবে।

বিষ্ণু—আচ্ছা, তার পর কেরাণীদের কাহিনী আরও শুনি।

ব্রহ্মা—কেরাণীদের সাংসারিক সুখ ত বুঝতেই পাচ্ছেন। অবসর পেলেই তারা ফাইল ঘাঁটবে শুলেও তারা মাথার কাছে ফাইল না রেখে কখনই শোবে না। চায়ের পেয়ালা মুখে—জিভ্ পুড়ে গেলেও ফাইলেই তাদের চোক রাখ্‌তে হবে। তামাক খেলেও ধোঁয়ার মধ্যে দিয়েও তাদের ফাইল দেখতে হবে। বাঘের মুখে, পেলেগে, ভূমিকম্পে, ইনফ্লুয়েঞ্জায়, ট্রামমোটর ও ট্রেণচাপা পড়ার ভয় কেরাণীর থাক্‌বে না। ভয় হবে কেবল pendingএর আর অফিসরের "কৈফিয়ৎ চাওয়ার"। তখনিই এদের লিভার পিলে উল্টা পাল্টা হয়ে যায়গা বদলাবে। এরা ছুটীতে কোথাও বেড়াতে গেলেও, urgent slip এদের পশ্চাদ্ধাবন কর্ব্বে। অন্যমনস্ক হওয়াই ইহাদের একমাত্র অবলম্বন; কারণ, এটা না হলে তারা পাগল হয়ে যাবে। ছেলে মেয়ে কেঁদে সারা—শেষটা চেঁচিয়ে বলছে, বাবা, আমি কানছি বাবা। কেরাণী বাপ বলছেন, এই যাই, দেখি, দাঁড়া, সতের তারিখের অর্ডারটার পর আবার যে অর্ডার হয়েছিল, সেটা গেল কোথায়? ছেলে দাওয়া থেকে টিপ করে পড়ে গেল। বাপ বল্লেন, আহা, পড়িসনে। এইরকম তাদের জীবনে না সুখ না দুঃখ। সারা জীবনটাই তাদের pending থাকবে। এরা ভাল কায দেখিয়ে উন্নতির চেষ্টা কর্লে উপর-ওয়ালারা আর কিছু না করে হাসিমুখে চারিগুণ কায তাদের স্কন্ধে চাপিয়ে তাদের পুরস্কার দেবে। অফিসার কি করে খুসি হবেন এরা বুঝতেই পারবে না। অফিসে মাইরি, সাহেব যে রকম বল্লে, তাতে ভবেশের চাকরী টেঁকা দায়, এইরূপ আলোচনাতেই এদের অবসর সময়টুকু যাবে। অফিসরের মেজাজের উত্তাপের পরিমাপ করা ও ভ্রূযুগল ও তার ললাট-রেখার daily survey করাই হবে এদের আসল কায। ছুটী চাইলেই অফিসার অসন্তুষ্ট হবে, না চাইলেও বড় সন্তুষ্ট হবে না। অফিসার চুরি করলে কেরাণীর হবে দোষ। কেন সেটা হিসাবে ন্যায্য খরচ করে দেখায়নি এই অপরাধে। আর আত্মরক্ষা করবার আগেই তাদের চাকরী যাবে।

বিষ্ণু—কি ভয়ানক!

ইতিমধ্যে স্বয়ম্ভু শিব আসিয়া উপস্থিত। তিনি ধ্যানে সবই বুঝিয়াছিলেন। ব্রহ্মার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, এত দুঃখে মানুষের হৃদয়ে বিশেষ একটা শক্তি না দিলে সে যে হৃদ্‌রোগে মারা যাবে গো! কাজটা ভাল করনি ব্রহ্মা—এরূপ সৃজন কার্য্যে সৃষ্টি রসাতলে যাবে। যাক উপায় কি, যা হয়ে গেছে। তবু আমি যা বলি, চিত্রগুপ্ত, লিখে নাও ত।

"কেরাণীরা স্বাস্থ্যের জন্য ব্রাহ্মণ হলেও পেঁয়াজ ও মুরগী খাবে, তাদের গৃহিণীরা বেজায় দুর্ব্বল হয়ে পড়লে রীতিমত সুরুয়া খাবে, তাতে জাত যেতে বারণ থাকল। আর কেরাণীদের শেষ উপায় আমার সাহায্য নিয়ে strike করা এবং শেষে non co-operate করবে যে অফিসার হতাশ হয়ে বসে পড়বে।"

বিষ্ণু—তথাস্তু।

অতঃপর মহাদেব সিদ্ধি ঘুঁটিতে বসিলেন। গরুড় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের পাতালে tourএ যাইবার আয়োজন করিতে গেলেন। কারণ দূরদর্শী শ্রীবিষ্ণু inspect করবেন—পৃথিবীটা রসাতলে গেলে পাতাল ধারণ করিবার মত strong আছে কি না। বিশ্বকর্ম্মার নিকট report তলব হল।

মুক্তির দুঃখ

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ, বি-টি

(১)

রাজদ্রোহ অপরাধে বন্দী হইয়াছিলাম। অপরাধ কথাটা ঠিক হইল না,—কথাটা অভিযোগ। সরকারি কলেজ ছাড়িয়া ন্যাশনাল কলেজে গিয়াছিলাম আমরা তিন ভাই একসঙ্গে। স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করিতাম, বিলাতী কিছু দেখিলে রাগ হইত, কাহাকেও কিছু বিলাতী কিনিতে দেখিলে নিষেধ করিতাম। এক দিন পুলিশের এক বড় কর্ম্মচারীকে নিষেধ করিয়া ফেলিয়াছিলাম। তাহার ফলে একটা বড় গোছের স্বদেশী মোকদ্দমার আসামী হইয়া গেলাম। আর একা নয়, তিন ভাই এক-দিনে একসঙ্গে জেলে আসিলাম। শুনিলাম ১২ বৎসর জেল হইয়াছে। কি করিয়া কি হইল, তাহা নিজেই বুঝি নাই, অপরকে বুঝাইব কি করিয়া?

জেলে আসার একমাস পরেই সংবাদ পাইলাম, তিনটি ছেলের এক সঙ্গে দীর্ঘ কারাবাসের সংবাদ পাইয়াই আমাদের বিধবা মাতা শয্যা লইয়াছেন। সে শয্যা তাঁহাকে আর ত্যাগ করিতে হয় নাই। আমাদের জেলে আসার দুই মাসের মধ্যেই মা মারা গেলেন। মায়ের মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া মায়ের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম। কষ্ট হইয়া-ছিল ভাই দুটির। পাশাপাশি তিনটি ঘরে আমরা তিন ভাই থাকিতাম। প্রত্যহ সন্ধ্যায় তাহাদের উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের ধ্বনি আমার কাণে আসিয়া বিদ্ধ হইত; কিন্তু সান্ত্বনা দিবার কোন উপায় ছিল না। মনে হইত, কেবল একটিবারের জন্য উহারা আমার ভাই দুটিকে যদি আমার কাছে আনিয়া দেয়! একবার শুধু তাহাদিগকে বুকটার কাছে জড়াইয়া ধরি!

আমার ঘরের ডান পাশটাতেই আমার মেজ ভাই থাকিত। বাঁ দিকে ছোট ভাই। এত কাছে থাকিতাম, অথচ কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইতাম না। ভয়ে কথা কহিবারও চেষ্টা করিতাম না; পাছে জানিতে পারিয়া ভাইদের অন্যত্র সরাইয়া দেয়।

শুধু গভীর রাত্রে ঘরের সম্মুখের প্রহরী যখন পাদ-চারণ করিয়া করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িত, তাহার পায়ের নিয়মিত শব্দ যখন ধীরে ধীরে থামিয়া আসিত, দ্বিতীয় প্রহরীর কার্য্যভার গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে যখন প্রথম প্রহরীর চক্ষে তন্দ্রার আভাস দেখা দিত, সেই অবকাশে দক্ষিণদিকের দেওয়ালে একবার অতি ধীরে আঘাত করিতাম। সেও তেমনি ধীরে তাহার উত্তর দিত। হাতের দুইটি অঙ্গুলি দিয়া দেওয়ালের একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে দুইবার শব্দ করিতাম। দুইবার উত্তর আসিত। তার পর বামদিকে ছোট ভাইয়ের দেওয়ালে ঐরূপ শব্দ করিতাম; অতি ধীরে তাহারও উত্তর আসিত। ইহাই ছিল আমাদের পরস্পরের মধ্যে কথাবার্ত্তা।

শুধু এই চারিটি শব্দ করা ও চারিটি শব্দ শোনা—ইহারই জন্য প্রাণ পড়িয়া থাকিত। সমস্ত দিন ধরিয়া ভাবিতাম, জেলখানার পিছনের গাছগুলির আড়ালে কখন সূর্য্য ডুবিয়া যাইবে,—রাজ্যের যত কাক কখন ঐখানে রাত্রিবাসের জন্য জড় হইবে,—কখন চারিদিক গাঢ় অন্ধকারে ছাইয়া যাইবে,—প্রহরীর নিয়মবদ্ধ পাদচারণা ক্লান্ত হইয়া কখন থামিয়া যাইবে, কখন সে শব্দ শুনিব ও শুনাইব!

কথা কহিতে না পারার জন্য দুঃখ হইত। একদিন কথা কহিবার জন্য একটু চেষ্টা করিয়াছিলাম। উঃ কি ভয়ানক! কি বিশ্রি সে কণ্ঠস্বর—যেন শ্মশানের বাদ্য! আর দ্বিতীয়বার কথা কহিতে চেষ্টা করি নাই।

এক দিন দক্ষিণ দিকে যথাসময়ে শব্দ করিয়া উত্তর পাইলাম না। আর একবার শব্দ করিলাম; তবু উত্তর

নাই! কি হইল? তৃতীয়বার শব্দ করিলাম; সঙ্গে সঙ্গে মেঝের উপর একটা গুরুভার পড়ার শব্দ হইল। ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল। বাহিরে তন্দ্রাতুর প্রহরীর তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সেই ঘরে কয়েকবার দুপ্‌দাপ্ শব্দ হইল। তার পর আর কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

দিন রাতের মধ্যে তিন-চার বার তাহার ঘর খোলা হইতে লাগিল। নূতন লোকের গলা, নূতন পায়ের শব্দ শুনিলাম। কে একজন বলিল—ডাক্তার। তবে কি ইনি ডাক্তার?

ডাক্তার কেন আসিলেন? তবে কি শঙ্কর অসুস্থ? নিশ্চয়ই তাই। নহিলে দেওয়ালের গায়ে তাহার পায়ের শব্দ বাজে না কেন? মেঝেয় তাহার পায়ের শব্দ শুনি না কেন?

এক দিন সেই ঘরে কেবলি পায়ের শব্দ হইতে লাগিল। কিন্তু ইহার একটিও তো তাহার পায়ের শব্দ নহে। সে যে আমি খুব চিনি। দেওয়ালের ব্যবধানে থাকিয়া লোকের আনাগোনা, কথাবার্ত্তা সমস্ত আমি অনুভব করিতে লাগিলাম। তার পর সব নিস্তব্ধ!

কি হইয়াছে জানিবার জন্য আমার অন্তরাত্মা অস্থির হইয়া উঠিল। ইঙ্গিতে অনুনয় করিয়া প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি হইয়াছে?" সে বলিল—এই ঘরের বন্দী মারা গিয়াছে

শঙ্কর মারা গিয়াছে! শঙ্কর নাই! সেই বলিষ্ঠ, দীর্ঘদেহ, স্বাস্থ্যবান্ শঙ্কর,—খেলায় যে সকলের অগ্রগণ্য, পাঠে যে বরেণ্য ছিল—সে আর নাই!

একবার তাহাকে শেষ দেখা না দেখিলে কেমন করিয়া বাঁচিব? আমার ঘরের দরজার লোহার গরাদের উপর মাথা চাপিয়া ধরিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলাম। কিন্তু কি দেখিব? শঙ্করের মৃতদেহ!

সেই ঘর হইতে বহিয়া আনিয়া তাহারা শঙ্করকে ছোট উঠানটিতে একবার নামাইল। আমি অবাক্ হইয়া অশ্রুহীন চোখে সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম।

শঙ্করের মৃতদেহ! কিন্তু কি পরিবর্ত্তন! এই কি শঙ্করের চেহারা! মানুষের চেহারা এমন করিয়া বদলায়!

শঙ্করের সে রূপ নাই, সে স্বাস্থ্য নাই, সে তেজও নাই। একটা যৎসামান্য শয্যার উপর তাহার দেহ যেন নিস্তেজ হইয়া পড়িয়া আছে—বিশাল সুন্দর শাখাবহুল ও পত্রশ্যামল বৃক্ষ হঠাৎ শুখাইয়া গেলে যেমন দেখায়!

ঐ ঘরে শঙ্কর মৃত্যু-শয্যা পাতিয়াছিল; আমি তাহাকে একবার চোখের দেখাও দেখিতে পাই নাই! কি নিঃশব্দে শঙ্কর চলিয়া গেল। একদিনের একটা আর্ত্তনাদও তো আমার কাণে আসে নাই! এত কাছে রহিয়াছি, অথচ একটি ক্ষণের জন্য তাহার তপ্ত কপালটিতে হাত রাখিতে পারি নাই, একটি মুখের কথাতেও সান্ত্বনা দিতে পারি নাই কিন্তু সে চিরদিনের মত চলিয়া গেল—আর আসিবে না। অধীনতা সে সহিতে পারিত না,—মরণে আজ সে মুক্তি লাভ করিল।

তাহারা শঙ্করের দেহ উঠাইতে গেল। মাথার মধ্যে কি রকম করিয়া উঠিল। লোহার গ্রেটিং ধরিয়া ছিলাম, তাই পড়িয়া যাই নাই।

তার পর যখন চাহিলাম—সম্মুখে সুধু শূন্য অঙ্গন পড়িয়া আছে। প্রকাণ্ড প্রাচীরে আহত হইয়া দৃষ্টি ফিরিয়া আসিল।

তার পর এক দিন ছোট ভাই গৌরাঙ্গকেও উহারা এমনি করিয়া বহিয় লইয়া গেল।

রৌদ্রে শুকাইয়া যাওয়া একটি শীর্ণ ফুলের মত তাহাকে দেখাইতেছিল। যে অনল-তাপে শাল-তরু শুকাইয়া গেল,—ছোট একটি ফুল গাছ কি তাহাতে বাঁচে?

(২)

তার পরের দিনগুলা কি ভাবে কাটিয়াছে, আমিই ঠিক বুঝিতে পারি নাই। চারিদিক হইতে আলো নিভিয়া আসিল,—বাতাস বন্ধ হইয়া গেল,—অন্ধকারে চারিদিক ডুবিয়া গেল। ক্রমশঃ সে অন্ধকার সরিয়া গেল, কিন্তু কোন ধারে একটুও আলোক ফুটিল না।

সেই আলোকহীন অন্ধকার শূন্য কারাকক্ষের পাষাণ প্রাচীরের একখণ্ড পাষাণের মত আমি পড়িয়া ছিলাম। সুখ, দুঃখ, কিছু পাইবার আশা, কিছু হারাইবার ভয়—কিছুই ছিল না। আকাশ, পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র সব আমার কাছে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। অতীতকে ভুলিয়াছিলাম,—ভবিষ্যতের কোন ধারণাই ছিল না,—বর্ত্তমান্ কোন অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছিল। জীবন মানে দাঁড়াইয়াছিল—কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম পালন করা মাত্র। তাহাও আমি করিতাম না,—প্রকৃতি আদায় করিয়া লইত।

শিল্পী—মহম্মদ আবদার রহমান চগতাই　　স্মৃতির উদ্দেশে　　BHARATVARSHA HALFTONE & PTG WORKS.

কোন জীবিত প্রাণী দেখিতাম না প্রহরীকে মনে হইত, একটা সচল প্রাচীর। জীবনের কোন চিহ্ন কোথাও ছিল না—না; আমার ভিতরে, না বাহিরে। চারিদিকে সুধু একটা বিরাট নিস্তব্ধতা.—একটা গভীর শূন্যতা সর্ব্বক্ষণ বিরাজ করিত

জীবন-মরণের মাঝামাঝি, এই অবস্থায় কত কাল ছিলাম জানি না এক দিন আমার এই শূন্যতার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। আমার অনুভূতি যেন ফিরিয়া আসিল।

একটি মধুর সুর কাণে আসিল। এতদিনকার বধির হওয়া কাণ আমার যেন জুড়াইয়া গেল। কাণের ভিতর দিয়া সঙ্গীতের স্নিগ্ধধারা আমার লুপ্তপ্রায় সুপ্ত জ্ঞানকে জাগাইয়া দিল। চাহিয়া দেখিলাম, ছোট একটি পাখী তাহার রঙিন পুচ্ছ নাচাইয়া, আমার কারাকক্ষের পিছনের দেওয়ালের উচ্চ ক্ষুদ্র বাতায়নে আসিয়া বসিয়াছে, আর মাঝে মাঝে তাহার মধুর স্বরে ডাকিতেছে। সে মিষ্ট স্বর ক্ষুদ্র প্রদীপের শিখার মত আমার অন্ধকার হৃদয়—আমার শূন্য মস্তিষ্ক আলোকিত—পরিপূর্ণ করিয়া দিল।

ছোট সুন্দর পাখীটির পানে চাহিয়া চক্ষু আমার জুড়াইয়া গেল। সেইটুকু পাখীর মধ্যে যেন আকাশের অসীমতা, শস্যসমাচ্ছন্ন প্রান্তরের শ্যামলতা, প্রিয়জনের স্নেহ সব ছিল। সে যেন আমার দুঃখের ভার লইতে,—নিঃসঙ্গের সঙ্গী হইতে,—যাহার কেহ নাই, তাহাকে স্নেহ করিতে আসিয়াছে।

এমন মিষ্ট চাহনি সে আমার পানে চাহিয়াছিল যে, আমার মনে হইয়াছিল, বুঝি আমার ভাই দুটির আত্মা ঐ পাখীটির মূর্ত্তি ধরিয়া, আমাকে সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছে।

আর একবার তাহার মধুর গান গাহিয়া পাখীটি তাহার রঙিন লঘু পক্ষ মেলিয়া উড়িয়া গেল।

তখন বুঝিলাম, সে এই পৃথিবীর পাখীমাত্র। শঙ্কর কি গৌরাঙ্গ যদি আসিত, আমার এমন মর্ম্মান্তিক অবস্থা দেখিয়া আমাকে আর ত্যাগ করিয়া যাইত না।

পক্ষ মেলিয়া সে চলিয়া গেল—আমার সুপ্ত অনুভূতিকে জাগাইয়া। নির্জ্জনতাকে দ্বিগুণ করিয়া দিয়া,—তাহার চোখের স্নিগ্ধ আলোকে আমার অন্ধকার কারাগৃহের অন্ধকারটুকু আমাকে সুধু দেখাইয়া দিয়া উড়িয়া গেল!

কারাকক্ষে বসিয়া-বসিয়া, অনুভব করিতাম, বাহিরে নীলাকাশ তাহার স্নেহচক্ষু মেলিয়া চাহিয়া আছে; শ্যামলা ধরণী তাহার স্নেহের কোল পাতিয়া বসিয়া আছে; পাখীর গান, বাতাসের স্নেহস্পর্শ প্রিয়জনের কণ্ঠস্বর রত্নরাজির মত সব সেখানে চারিধারে ছড়াইয়া রহিয়াছে!—আর আমি পড়িয়া আছি রুদ্ধ কারাগারের পাষাণ সমাধির মধ্যে একা, নিঃসঙ্গ!

(৩)

বদ্ধগৃহে আলোকাগমনের মত আমার অবস্থার মধ্যে ধীরে ধীরে অনেক পরিবর্ত্তন আসিল। প্রহরীরা আমার উপর সদয় হইয়া উঠিল। আমার শান্তিপ্রিয় স্বভাব জানিয়া সেই কারাগারের মধ্যে কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে অনেকখানি স্বাধীনতা দিল,—হাতে শৃঙ্খল দিয়া তাহারা আমাকে দিবা-ভাগে অপ্রশস্ত অঙ্গনের মধ্যে বেড়াইতে দিল।

অঙ্গনের মাঝখানে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, আকাশ প্রসন্ন চক্ষে আমার পানে চাহিয়া আছে। আশে-পাশের গাছগুলির পত্রবেষ্টিত উচ্চশির সেখান হইতে দৃষ্টিগোচর হইল। তাহাদের চোখে মুখে যেন সহানুভূতি উছলিয়া পড়িতেছে! আকাশের গায়ে পাখীগুলি উড়িয়া যাইতেছে। মনে হইল, তাহারা যেন আমাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছে—ক্ষোভ করিও না,—তুমিও এক দিন মুক্তি পাইয়া এমনি করিয়া আমাদের সঙ্গে ছুটিয়া চলিবে!

আকাশের বুকে কত বৈচিত্র্য, গাছের পাতায় কত সৌন্দর্য্য, বাতাসের স্পর্শে কি সান্ত্বনা! চাহিয়া-চাহিয়া আমার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল!

সন্ধ্যাকালে আবার যখন কক্ষের মধ্যে ফিরিয়া আসিলাম,—কক্ষের অন্ধকার ও নির্জ্জনতা যেন শতগুণ বাড়িয়া উঠিল।

কত দিন, কত মাস, কত বর্ষ এইরূপে কাটিয়া গেল। সময়ের কোন হিসাব ছিল না—হিসাবের কোন প্রয়োজনও ছিল না,—আশাতেই মানুষ দিন গণিয়া থাকে। আমার তো কোন আশাই নাই!

শেষে একদিন কারাগারের অধ্যক্ষ আমাকে মুক্তি দিতে আসিলেন। প্রহরী আসিয়া আমার হাতের শৃঙ্খল খুলিয়া দিল।

মুক্তি! মুক্তি যখন আসিল, তখন বন্ধন আর মুক্তি আমার কাছে দুই-ই সমান হইয়া উঠিয়াছে! নিরাশাই

আমার তখন আশা, নির্জ্জনতাই আমার সঙ্গী। সমস্ত পৃথিবীটাই তখন আমার কাছে একটা প্রকাণ্ড কারাগার!

সেই অপ্রশস্ত কারাকক্ষ আমার কাছে আর তখন হেয় নহে,—সে তখন আমার প্রায় তীর্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রহরী যখন সঙ্গে করিয়া আমাকে বাহিরে লইয়া যাইতে আসিল,—মনে হইল, ইহারা আমাকে দ্বিতীয়বার গৃহহারা করিতে আসিয়াছে।

কারাকক্ষের ইষ্টকগুলি তখন আমার পুরাতন বন্ধু। কক্ষের কোণে-কোণে মাকড়সা জাল রচিয়া বসিয়া আছে; তাহাদের সঙ্গে আমার প্রাণের বন্ধুত্ব জন্মিয়াছে। রাত্রে যে ইঁদুরগুলি ঘরময় দৌড়াইয়া বেড়াইয়াছে,—আমার ভুক্তাবশিষ্ট হীন খাদ্য ভাগ করিয়া খাইয়াছে,—বাহিরের উঠানে জ্যোৎস্নাময় রাতে আমার ঘরের সম্মুখে খেলা করিয়া বেড়াইয়াছে,—তাহাদের প্রতিও যে আমার প্রাণের টান জন্মিয়াছে। আমার হাতের শৃঙ্খল—সেও আমার প্রিয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে!

তাই যখন কারাকক্ষ ত্যাগ করিলাম, মনে হইল, দুঃখে ঐ পাষাণ প্রাচীরের বুক বুঝি আজ ফাটিয়া যাইতেছে! এই লৌহকবাট বুঝি এখনি কাঁদিয়া উঠিবে। দুঃখ কষ্ট দেখিয়া যাহাদের হৃদয় পাথর হইয়া গিয়াছে, সেই প্রহরীদের চক্ষু বুঝি আজ ছল ছল করিতেছে!

তার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, সজল চক্ষে আমি কারাগারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম!

মেঘ

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত বি-এ

১

ঝর ঝর ঝরে বারিধার।
কেন মেঘ! এসেছ আবার?
কত দেশ, কত দ্বীপ কত বন, কত গিরি ভ্রমি,
সাগর লঙ্ঘন করি, বিঘ্ন অতিক্রমি,
আনিয়াছ আদেশ কাহার
কাছেতে আমার?
অজানা কাহার চিঠি ল'য়ে,
কোন্ সুর, কোন্ গান, কি রাগিনী ব'য়ে?
নিশ্বাসে তোমার তৃপ্তিহীন কামনার, লালসার রব;
চাঞ্চল্যের মূর্ত্তিমতী শুভ্র সৌদামিনী সহচরী তব।
নিশ্চল, নির্ম্মল, নীল, নির্ব্বিকার নভে
তুমি আস যবে,
শান্তি তার যায় ভেঙ্গে, হয় সে বিহ্বল,
হয় উতরোল, জাগে কোলাহল।
সাদা, কাল, কত কি বরণ
কোথা হতে ভেসে এসে করে তার নীলিমা হরণ।

দেখিলে তোমায়, সেই মত আমার হৃদয়
পরিপূর্ণ হয়
উচ্চ, নীচ, পবিত্র, পঙ্কিল
শত আশা আকাঙ্ক্ষায়, ভাবে ভয়ে, কভু স্বচ্ছ, কভু বা আবিল।

থাকিতে পারি না আর স্থির,
ইচ্ছা হয় ছাড়ি গৃহ হইতে বাহির,
ছুটিতে পশ্চাতে তব;
সব মানা, সকল বন্ধন, অনুরোধ, প্রতিরোধ, বাধা, বিঘ্ন সব
হতে পার
পৃষ্ঠ পরে চড়িয়া তোমার;
তোমা সাথে ভ্রমি দেশে দেশে
অবশেষে
ফিরে যেতে কুলায় তোমার,
যেথা হ'তে লইয়া আদেশ কার, কোন্ অজানার,
যাত্রা ক'রেছিলে তুমি, ছিঁড়িয়া শৃঙ্খল, ভেঙ্গে ফেলে দ্বার।

২

যার আজ্ঞা, যার লিপি, যাহার স্তুতির সুর
তোমারে করেছে ভরপুর,
যাহা যত্নে বহি তুমি দেশে দেশে করিছ প্রচার
কথা কও, বল মোরে কি নাম তাহার?
ওগো সে কি চাঞ্চল্যের রাণী?
সে কি কোন মায়াবিনী? তার বাণী
মুখর নির্ঝর সম কোমল চপল?
ভ্রমরের মত ফুলে ফুলে ফিরে কি গো নয়ন যুগল?
চুম্বনের আশে কভু আধ-ফোটা গোলাপের কুঁড়ির সমান,
কখনো বা হাস্তে কম্পমান,
মুখখানি কখনো কি নাহি রহে স্থির?
চরণ-নূপুর তার সদা কি অধীর?
স্তনহার চারিভিতে বিতরে কি তপন কিরণ?
অলক দুলায়ে দিয়ে পলাইয়া যায় কি পবন?
পাছে প্যুছে তার
শত শত, লক্ষ লক্ষ মানুষের সার
মুগ্ধ হয়ে তার রূপে, তার মন্ত্রে, গানে,
তাহারে পাবার আশে ছোটে কি গো মত্ত প্রাণে?
পরশ তাহার মিলে না কি কোন মতে?
সদাই কি পথে পথে
বিমোহন তনুখানি স্বচ্ছ বাসে ঢেকে,
মানবেরে ডেকে ডেকে,
দূর হতে দূরান্তরে কেবলি ঘুরায়?
ওগো মেঘ! বল গো আমায়
এসেছ কি তার কাছ থেকে? ব্যাকুল পরাণ মোর
তাহারেই চায়।

৩

ওগো মেঘ! যাও ফিরে, একা যাও ফিরে;
ফেলে যাও পাছে মোরে, রেখে যাও রুদ্ধ করে
এ ক্ষুদ্র কুটীরে।
মোরে ঘিরে চারিদিকে কেবল বন্ধন,
কানে শুনি শুধুই ক্রন্দন,
নাহি হেথা উৎসাহের ভাষা,
নাহি হাসি, নাহি হেথা আশা।
রুদ্ধ আমি খোপের ভিতর,
নগরের নাড়ী সনে চলে থামে আমার অন্তর।
রসহীন, ভাবহীন, কর্ম্মহীন সভ্যতার স্রোতে
চলি ভেসে, কোন মতে
শক্তি নাই শ্লথ নদী পার হয়ে কূলে উঠিবার।
সাজে কি আমার
স্বাধীন-সাগর-জাত তোর পাছে ধাওয়া?
কিছুই ত নাহি মোর, নাহি বজ্র, নাহি ঝোড়ো হাওয়া;
পারিব না উড়াইতে, পুড়াইতে সব কিছু বাধা।
যদি গ্রাস করে পন্থা সুসংহত আঁধা,
নারিব চিনিতে পথ বিদ্যুতের অমল চমকে;
দাঁড়াইব ভয়েতে থমকে।
বিঘ্ন জয়ী অট্টহাস
অধরে আমার কভু হবে না বিকাশ।
নাহি বল, দৃষ্টি ক্ষীণ, নাহিক সাহস;
হস্ত পদ হয়েছে অবশ।
অটল, অচল, ধীর যেথা গিরিরাজ
শিরে পরি তুষারের তাজ,
আকাশে তুলিয়া মাথা মুক্তি স্বীয় করিছে প্রচার,
শরণ যাঁহার
নিস্ তুই ক্লান্ত শির লুটায়ে কোলেতে,
আমি সেথা পারিব না যেতে।
সে শুভ্র ভালের তীব্র পবিত্র আলোকে
আমি চোখে
কিছুই দেখিতে নাহি পাব।
অন্ধ হয়ে যাব,
রুদ্ধদ্বার, অন্ধকার গৃহখানা ছাড়ি,
সহসা দীপ্তির মাঝে দিই যদি পাড়ি।

৪

যাও মেঘ! চলে যাও দূরে, আরো দূরে;
রেখে যাও এ হৃদয় পুরে
তপ্ত জল, নিষ্ফল কামনা;
চলনের, স্বাতন্ত্র্যের লোভ দেখায়ো না।
রেখে যাও স্পন্দহীন, হৃদিহীন স্থবির আকাশ,
জ্বেলে যাও আকাঙ্ক্ষার শিখা, রেখে যাও তপ্ত দীর্ঘশ্বাস।

চক্ষুলজ্জা

নাট্যবিদ্যাভারতী শ্রীনির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় কবিভূষণ

বিনয় যখন নীহারকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিল, তখন নীহারের বয়স ষোল বৎসর। কলিকাতায় পল্লীসমাজ নাই এবং ষোল বৎসরের মেয়ে বিবাহ করিয়া আনা, সেখানে একটা খুব অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা নহে। তাই দুই চারিজন প্রতিবাসী দুই একবার আলোচনা করিলেও, ব্যাপারটা মুখে মুখে আলোচিত হইল না।

বিনয় লোকটা ছিল একটু প্রেমিক ধরণের। দুঃখের মধ্যে সুখ, সুখের মধ্যে দুঃখ অনুভব করা যাহাদের অভ্যাস, বিনয় সেই ধাতুর লোক ছিল; সেই জন্য তাহার বন্ধুগণ তাহাকে নব-চণ্ডীদাস বলিয়া বিদ্রূপ করিত। তাহার চোখের পাতা সামান্য কারণেই ভিজিয়া আসিত এবং একটা বড় রকম ত্যাগ স্বীকার বা বড়রকম একটা কিছু করিতে তাহার প্রাণটা সর্ব্বদা উদগ্রীব হইয়া থাকিত। নভেলের ঘটনা নাকি সংসারের বাস্তব-জীবনে বড় একটা ঘটে না; তাই বিনয়ের প্রাণটা আত্মোৎসর্গের জন্য উদগ্রীব হইয়া থাকিলেও, তেমন সুযোগ আজ পর্য্যন্ত একবারও ঘটিল না। হায়! একচক্ষু বিধাতা, 'প্রতাপ', 'অমরনাথ', 'বিহারী', 'রমেশ', প্রভৃতির জন্য তাঁহার ভাণ্ডার এমন করিয়া উজাড় করিয়া দিয়াছেন যে, বিনয়ের জন্য কিছুই সঞ্চিত রাখেন নাই।

এইবার কিন্তু ত্যাগ স্বীকারের এমন সুযোগ আসিল যে সুদে আসলেও তাহা শোধ হইতে চাহেনা— ক্ষমার চরম সুযোগও প্রাণ ভরিয়া গ্রহণ করিতে বিনয়ের ক্ষমতায় কুলাইবে কিনা—তাহাই সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল।

(২)

বিবাহের পর যখন প্রথম প্রেম সম্ভাষণের সুযোগ ঘটিল সেদিন বিনয় নীহারের হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিল। আকর্ষণে বয়স্কা পত্নী যত সহজে গায়ে ঢলিয়া পড়িবে ভাবিয়াছিল—তাহা কিন্তু হইল না। মনে হইল যেন একটু বাধা দিতেছে—যেন সরিয়া থাকিতে চাহে। বিনয় মনে করিল উহা প্রথম মিলনের লজ্জা; তাই প্রেম-গদগদ স্বরে কহিল,—আমার কাছে লজ্জা কেন নীহার? নীহার কিন্তু তবুও নড়িল না। মুখে তাহার প্রথম মিলনের ব্রীড়াভারাবনত আনন্দ নাই, মুখ মৃতের মত রক্তশূন্য;— করুণ চক্ষু দুটীতে অশ্রু টল্ টল্ করিতেছে।

বিনয়ের কাব্য এ সময় কোন কাযে লাগিলনা। কাব্য ও মনস্তত্ত্ব যতটুকু তাহার জানা ছিল, চকিতের মধ্যে সমস্তটুকুর দ্বারাই সে নীহারের এই ভাবটা কষিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু মনস্তত্ত্বের জ্ঞান যে উপন্যাস-জগতে এত সহজ, আর বাস্তবিক জগতে এত অকেজো, তাহা এই সে প্রথম বুঝিল। সঠিক কারণটা যে কি সমস্ত মনস্তত্ত্বের জ্ঞান প্রয়োগ করিয়াও তাহার কিনারা করিতে পারিলনা। নীহারের নিজের বক্তব্য না শোনা পর্য্যন্ত এই বাধা দানের সকল রকম কারণই মনে হইতে লাগিল। তখন অর্দ্ধভীতি-জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে কি তোমার পছন্দ হয় নাই নীহার? স্থির গম্ভীরস্বরে নীহার উত্তর দিল না তা কেন? সে যেন একটা কলের পুতুলের কথা কওয়া,—তাহাতে না আছে প্রেমের উত্তাপ, না আছে প্রথম সম্ভাষণের বাধবাধ ভাব, অথচ তাহার মধ্যে এতটুকুও অসত্য নাই, এমনি দৃঢ়তার সহিত তাহা উচ্চারিত। ঐ উত্তরের সত্যতা উপলব্ধি করিয়া, পছন্দ অপছন্দের ব্যাপারে আশ্বস্ত হইলেও কিন্তু তাহার ঔৎসুক্য চতুর্গুণ বাড়িয়া উঠিল—কহিল, তবে? নীহার কহিল, মুখে তোমাকে সমস্ত ব্যাপার জানাবার শক্তি আমার নাই। তবে বিবাহের পর এমন একটা দিন আসবে জেনে এবং আমার সেই দারুণ চক্ষুলজ্জা, মুখে তোমাকে সব কথা জানাবার অন্তরায় হ'বে ভেবে, সব কথাই একটা কাগজে আমি লিখে রেখেছি। আমার বাক্সের মধ্যেই আমার সেই মূল্যবান যত্ন ক'রে রেখে দিয়েছি; একটু সময়

দাও—তা তোমাকে এনে দিই। আমি তোমাকে ঠকাতে চাই নে। আগে আমার সম্বন্ধে সমস্ত জান, তার পর হয়তো তোমার কণ্ঠলগ্নই হ'ব, নয়তো যেমন বিধান ক'রবে তাই মাথা পেতে নেব, বলিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

বিনয় অবাক্ হইয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল; সেই আসন্নপ্রায় পরম রহস্যাবৃত কাগজখণ্ডটীর জন্য কক্ষমধ্যে ঘন ঘন পায়চারী করিতে লাগিল, এবং প্রতি মুহুর্ত্তেই নীহারের আগমন অপেক্ষা করিয়া দ্বারের দিকে চাহিতে লাগিল। নীহার বলিয়া গিয়াছে যে, সে তাহার মৃত্যুবান আনিয়া দিতেছে, কিন্তু মৃত্যুবানটা যে কাহার, সে তাহা তখন ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

(৩)

একটু পরেই নীহার আসিয়া বস্ত্রাভ্যন্তরে লুক্কায়িত এক তাড়া কাণফোঁড়া কাগজ বাহির করিল। চক্ষু তাহার জলে ভরিয়া গিয়াছে এবং হাত থরথর কাঁপিতেছে। দিবার অবকাশ না দিয়া, বিনয় তাহার হাত হইতে কাগজের তাড়াটা ছিনাইয়া লইল। তখন মৃদু অথচ স্থির গম্ভীর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে নীহার বলিল, আমি ঐ পাশের ঘরে যাচ্ছি; কাগজখানা প'ড়ে দেখে, যদি আমাকে ডাক্‌বার প্রবৃত্তি হয়, তবে ডেক, বা যেমন ক'রে হ'ক, তোমার আদেশ আমাকে জানিয়ে দিও; তার পর আমার পথ আমি বেছে নেব, বলিয়াই কক্ষ ত্যাগ করিল।

সন্ধ্যার ছায়া তখন ঘনাইয়া আসিতেছে। বিনয় সেই আধ-আঁধারেই পড়িবার জন্য চক্ষের সম্মুখে কাগজটাকে বিস্তৃত করিল। পুরুষের লেখার মত বেশ গোটা গোটা পরিষ্কার অক্ষর, তবু সে পড়িতে পারিল না; একদিকে আধ-আঁধার, অপর দিকে মানসিক উদ্বেগ, হস্তের কম্পন;— অক্ষরে অক্ষরে জড়াইয়া গিয়া সমস্তই মসীময় ঝাপসা দেখাইতে লাগিল। কষ্টে শক্তিসঞ্চয় করিয়া বৈদ্যুতিক আলোর সুইচ টানিয়া দিল এবং একখানি চেয়ারে উপবেশন করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু আরম্ভ করিয়াই শেষ জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া একবার শেষের পাতায় চোখ বুলাইল, তখনি আবার মাঝের কয়েকখানা পাতা একবার দেখিয়া লইল। এইরূপ আংশিক পাঠে বিভীষিকা আরও বাড়িল বই কমিল না। বুঝিল ধারাবাহিকভাবে না পড়িলে বুঝিবার চেষ্টা বৃথা, সুতরাং ধৈর্য্য ধরিয়া আবার প্রথম হইতেই পড়িতে আরম্ভ করিল।

পত্রখানি এইরূপ—

স্বামিন্!

জানি না তোমাকে স্বামি-সম্বোধনের অধিকার আমার কাছে কি না, কিন্তু আগে একটা কিছু সম্বোধন করিয়া পত্র আরম্ভ করিতেই আমরা বাল্যকাল হইতে অভ্যস্ত, তাই নিরুপায়ে স্বামি-সম্বোধনই করিলাম। যদি অনধিকারে ঐ সম্বোধন করিয়া থাকি, এই তোমার শেষ বিচার হয়, তবে নিজগুণে মার্জ্জনা করিও।

যে অবস্থায় আমার জীবনে যাহা ঘটিয়াছে, আমার জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে আমার বিশ্বাস কোন কোন স্ত্রীলোকের জীবনে অন্ততঃ তাহার কতকটা ঘটে; কিন্তু সে গোপনীয় কথা তাহারা স্বামীর নিকট,—কাহারও নিকট প্রকাশ না করিয়া, স্বামীর সাধ্বী সহধর্ম্মিণী সাজিয়া সংসারের গৃহিণী হইয়া, পূজা আহ্নিক, দেবার্চ্চনায় যোগদান করিয়া সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে; হাসিয়া খেলিয়া, লোকচক্ষে ধূলা দিয়া, সাধ্বীর অভিনয় করিয়া চলিয়া যায়। আমি তাহা পারিলাম না; কারণ আমার চিন্তাধারা বিভিন্ন; বিভিন্ন বলিয়াই, আমাকে তোমার সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করা চলিবে কি না, তাহা আমারই নিকট সমস্যা হইয়া রহিয়াছে। যে কথা আজ আমি তোমাকে জানাইবার জন্য সাহসী হইয়াছি, সে দুঃসাহস নারীজীবনে কেহ কখনও করিয়াছে কি না তাহা আমার জানা নাই। যদি পুরুষ এবং নারীর বিধান সমান হইত,—যদি পুরুষের ব্যভিচারে তাহার সাতখুন মাপ এবং নারীর সামান্য ক্রুটীতে তাহার সমাজচ্যুতি না ঘটিত, তবে হয় ত নারী নিজের স্খলন পতন ক্রুটীর কাহিনী অকপটে জানাইতে সাহসী হইত। বলিতে পার, তবে তুমি কেন তোমার জীবনের কোন্ এক অজানা ক্রুটী স্বেচ্ছায় জানাইতে বসিয়াছ? উত্তরে আমি আবার বলিব, আমার চিন্তাধারা বিভিন্ন; সুতরাং তুমি আমাকে সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করিতে পার কি না—তাহা ভাবিয়া দেখিবার সুযোগ তোমাকে দেওয়া আমার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। যাহা ঘটিয়াছে তাহা আমার একান্ত অনিচ্ছায়—তাহার সহিত আমার মনের যোগ আদৌ ছিল না। দারুণ চক্ষুলজ্জাই

তাহার জন্য একমাত্র দায়ী। বুঝিতেছি আমার এই কাহিনী পড়িতে পড়িতে তোমার রোমাঞ্চ হইবে, বুক কাঁপিয়া উঠিবে, নিজের চক্ষুকে নিজেই বিশ্বাস করিতে পারিবে না; তথাচ না শুনাইয়া আমার উপায় নাই; কারণ স্বামীকে ঠকাইয়া তাঁহারই গৃহলক্ষ্মী হইবার প্রবৃত্তি আমার মোটেই নাই। তোমারই খাইয়া পরিয়া, তোমারই ভালবাসা আকর্ষণ করিয়া, চিরজীবনটা তোমার নিকট সাধ্বীর অভিনয় করাকে আমি তোমাকে ব্যঙ্গ করা মনে করি। স্বামী তুমি, হিন্দুস্ত্রীর দেবতাস্বরূপ। তোমার সহিত সে ব্যঙ্গ করিতে পারি না; করিলে—ইহকাল ত গিয়াছেই, পরকালও যাইবে।

শুনিয়া থাকিবে, আমার মা বাল্যকালেই আমাদের ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আমার পিতা ঢিলা-ঢালা স্বভাবের লোক। নিজে সৎ, তাই সংসারের কাহারও মধ্যে যে অসৎ কিছু থাকিতে পারে, তাহা তিনি বিশ্বাসই করিতেন না। সংসারের মধ্যে দিদি আর ছোট দুই ভাই। দিদি আমার অপেক্ষা প্রায় ১৫।১৬ বৎসরের বড়। ভগ্নীপতি মহাশয় বিবাহের পর অনেকদিন আমাদের বাড়ী আনাগোনা করিয়াছিলেন; কিন্তু মাঝে আসা যাওয়া একরকম ছিল না বলিলেই হয়; শেষের দিকে আবার যাতায়াত ঘন ঘন তো হইয়াছিলই, এমন কি একাদিক্রমে তিনি কিছুদিন আমাদের গৃহে বসবাসও করিয়াছিলেন। কেন, তাহাই বলিতেছি।

তিনি মস্ত জমিদার, তাই পল্লী ছাড়িয়া সহরেই রক্ষিতা রাখিয়া নবাবী করিতেন। তাঁহার অনুপস্থিতির কয়েকটী দীর্ঘ বৎসর দিদিতে আর দিদি ছিল না। সে ভাল করিয়া খাইত না, বেশবিন্যাস করিত না, কোন হাস্যালাপে পারত-পক্ষে যোগ দিত না। সেই স্বামী যখন ফিরিয়া আসিলেন,—তখন দিদি যেন হাতে চাঁদ পাইয়া তাঁহার সমস্ত পূর্ব্ব অপরাধ একবারে ভুলিয়া গেল এবং সেবায়, যত্নে তাঁহাকে বাঁধিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

জামাইবাবু আসিলেন, তাঁহার সঙ্গে আসিল তাঁহার প্রিয় ভৃত্য রামচরণ ও প্রিয়তর মদের বোতল। আমি যখন তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলাম, তখন তিনি দিদির ঘরে বসিয়া মদ খাইতেছেন; দিদি মেজেয় বসিয়া আছে। আমি প্রণাম করিতেই জামাইবাবু আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—ইঃ নেহারী যে—অনেক বড়টী হয়েছিস, বলিয়া আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে আমার গাল দুইটী জোরে টিপিয়া দিলেন। পতি-পরিত্যক্তা দিদির মনে কি হইয়াছিল বলিতে পারি না, কিন্তু পতির এই রসিকতায় সে হাস্য করিয়া তাঁহার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিল।

জামাইবাবু দৃষ্টি-দ্বারা যেন আমাকে শুষিয়া লইতে লাগিলেন; আমি সে দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া চক্ষু অবনত করিলাম। তখন জামাইবাবু দিদিকে বলিলেন, অন্ধকার হ'য়ে গেছে, তুমি কাপড়-চোপড় কেচে এস, নেহারী ততক্ষণ আমার কাছে বসুক। দিদি উঠিয়া বলিল, নীহার, তুই একটু ওঁর কাছে বস্ ভাই, আমি কাপড়টা কেচে আসি। আমার কিন্তু থাকিতে ভাল লাগিতেছিল না, তবে হাঁ না কিছুই বলিলাম না। জামাইবাবু প্রস্থানোদ্যতা দিদিকে ফিরাইয়া বলিলেন, নীহারকে ভাল ক'রে ব'লে যাও। তুমি গেলেই ও-না-পালায়। একা থাকা আমার অভ্যাস নেই। একা থাকতে হ'লে আমিও লম্বা। না, না, ও পালাবে কেন, বলিয়া আমাকে মুখে কিছু না বলিলেও, দিদি দুটী কাতর-মিনতি-পূর্ণ চক্ষুতে আমার প্রতি চাহিয়া চলিয়া গেল। সেই চাহনীতে দিদি যেন আমাকে বলিয়া গেল "লক্ষ্মী বোনটী আমার, কতদিন পরে যদি স্বামী আসিয়াছেন তবে তোর কোনরূপ বিরক্তি দেখিয়া যেন বিরক্ত হইয়া চলিয়া না যান—দোহাই তোর। বাধ্য হইয়া বসিয়া থাকিলাম।

আমি মাথা নীচু করিয়া বসিয়া ছিলাম; পনেরো বছরের ধাড়ী আইবুড়ো মেয়ে কি কখনও কোন পুরুষের চোখে চোখে চাহিয়া কথা কহিতে পারে? হঠাৎ একবার চোখ তু'লতেই দেখি জামাইবাবু একদৃষ্টে আমার পানে চাহিয়া আছেন।

আমাকে চাহিতে দেখিয়া জামাইবাবু বলিলেন, কি প্রাণকাড়া চাউনিই করেছিস। তোর চাউনির দামই লাখ টাকা। যে বয়সে স্ত্রীলোক রূপের যাচাই করিতে শতবার আসিতে মুখখানি দেখে, সেই বয়সেও জামাইবাবুর এই রূপের প্রশংসা স্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। অথচ তাঁহার মুখের উপর কিছু বলিতেও

চক্ষুলজ্জায় কেমন বাধিয়া গেল, সুতরাং চুপ করিয়াই রহিলাম। কিন্তু সেখানে আর একদণ্ডও বসিয়া থাকিতে আমার মন সরিতেছিল না; আমি পলাইবার অছিলা খুঁজিতেছিলাম; এমন সময় দিদি আসিয়া উপস্থিত হইল; তখনকার মত পরিত্রাণ পাইলাম।

একে কুটুম্ব, তাহাতে আবার আমি তাঁহার রহস্যের পাত্রী, সুতরাং তিনি বেশ নির্ভীক ভাবেই আপন অভীষ্ট পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। আর কিছু না হোক দেখিলাম আ-যৌবন বিপথে ঘুরিয়া মনের বিষাক্ত ভাবগুলিকে মধুমণ্ডিত করিয়া মুখে বাহির করিবার শক্তি তাঁহার বেশ জন্মিয়াছে।

কয়েকদিন যে নিরাপদে কাটাইলাম তাহার কারণ, স্বামীকে সুখে রাখিবার জন্য দিদি প্রায় স্বামীর কাছ-ছাড়া হইত না, কিন্তু দিদি স্বামীকে সুখে রাখিবার জন্য যাহা করিতেছিল স্বামী মহাশয় তাহাতে বিশেষ দুঃখিতই হইতেছিলেন।

অনেক কাকুতি মিনতি করিয়াও পরিত্রাণ না পাইয়া পতি-পরায়ণা দিদি, মাতাল, মনুষ্যত্বহীন স্বামীর অনুরোধে বাধ্য হইয়া নিজে মদ খাইতে আরম্ভ করিল এবং বলিতে কষ্ট হয়, লজ্জা হয়, আমাকেও অনুরোধ করিতে বাধ্য হইল। দিনের পর দিন জামাই বাবুর এবং দিদির—দুই দিক হইতেই অনুরোধ বাড়িয়া চলিল; শেষে এমন দাঁড়াইল যে জামাই বাবুর সঙ্গে ঝগড়া এবং তাহারই ফলে দিদির মনে কষ্ট দেওয়া ভিন্ন আর উপায় রহিল না। কিন্তু আমার পক্ষে দুইটাই অসম্ভব ছিল। দিদির মনে কষ্ট দিবার ভয়েই যে জামাই বাবুকে রূঢ় কিছু বলিতে পারিতাম না— তাহাও নহে, তাঁহাকে রূঢ় কিছু বলিতে চক্ষুলজ্জাতেও বাধিত। ঐখানেই আমার দুর্ব্বলতা, আর সেই দুর্ব্বলতার জন্যই আমার সর্ব্বনাশ।

এত অনুরোধ উপরোধেও কোনরূপে যুঝিয়া আসিতেছিলাম; কিন্তু একদিন জামাইবাবু দিদির সাহায্যে জোর করিয়া আমাকে কতকটা মদ গিলাইয়া দিলেন—অনেকটা বিছানাতেও পড়িয়া গেল। অনভ্যাসে সর্ব্বশরীর চমচম্ করিয়া উঠিল। ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার জন্য দাঁড়াইলাম; পা টলিয়া পড়িয়া যাইতেছিলাম, এমন সময় জামাইবাবু আমার পতন নিবারণ করিলেন, আমি দেওয়াল আশ্রয় করিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিলাম।

দিদির কেমন বিশ্বাস-প্রবণ মন বুঝিতে পারি না। স্বামীর পূর্ব্ব চরিত্র তাহার অবিদিত নাই। তবু আমাকে লইয়া জামাইবাবুর কেন এত মাথা-ভাঙ্গাভাঙ্গি, আমাকে দিবারাত্রি কাছে রাখিবার, আমাকে মদ খাওয়াইবার জন্য তাঁহার কেন এত গরজ, তাহা কিছুতেই বুঝিত না; কিম্বা বোধ হয় বুঝিলে প্রতিবিধান করিতে হয় এবং প্রতিবিধান করিতে হইলে পাছে পলাতক স্বামী আবার পলাইয়া যায়, এই জন্য বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিত না। এমন স্নেহশালিনী, এমন মিষ্টভাষিণী এমন সেবা পরায়ণা অথচ কেবলমাত্র ঐ দিক্‌টায় কি ভীষণ স্বার্থপর! সমস্ত অত্যাচারেরই প্রতিবিধান আছে, কিন্তু স্নেহের অত্যাচারের তো প্রতিবিধান নাই!

দিদির অসুস্থতার জন্য জামাইবাবু বাবাকে বলিয়া পুরী যাইবার ব্যবস্থা করিলেন। শুশ্রূষার জন্য আমার সঙ্গে যাওয়া অনিবার্য; কারণ বাড়ীতে আর দ্বিতীয় আত্মীয়া কেহ নাই। যাইবার প্রলোভনও ছিল—জগবন্ধু দর্শন ও সমুদ্রস্নান। কিন্তু জামাইবাবু সঙ্গে থাকিবেন এই ভয়ে সেই প্রলোভনেও সুখ ছিল না। সেখানে দর্শনীয় বস্তুগুলি দেখিতে হইলে তাঁহার সঙ্গেই যাইতে হইবে, অসুস্থতার জন্য দিদি সঙ্গে থাকিতে পারিবে না। কি করিব? অস্বীকার করিতে পারিলাম না।

পুরীতে যে বাড়ীটী আমাদের থাকিবার জন্য ভাড়া করা হইয়াছিল তাহা ঠিক সমুদ্রের ধারেই। সমুদ্র দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম; কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই একদণ্ডের জন্যও দিদির সঙ্গ ছাড়িলাম না। সমুদ্র-স্নান প্রভৃতি যে সমস্ত সুখকরী কল্পনা আমাকে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করিয়াছিল, জামাইবাবুর ভয়ে সে প্রলোভনও ত্যাগ করিলাম। কেবল মাত্র একদিন জামাইবাবুর অনুপস্থিতির সুযোগে জগবন্ধু দর্শন করিয়া আসিলাম। কিন্তু, চুপ করিয়া কতদিন ঘরে বসিয়া থাকা যায়! দিদি অসুস্থা, বাহির হইতে পারে না; আমিও ঘরে বসিয়া অতিষ্ঠ হইয়া পড়িলাম। শেষে দিদির সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে জামাইবাবুর সঙ্গে বেড়াইতে যাইতে বাধ্য হইলাম। হায় মোহ! হায় চক্ষুলজ্জা!

বাহির হইবার সময় কাহাকেও সম্মুখে না পাইয়া জামাইবাবুরই প্রিয় ভৃত্য রামচরণকে আমাদের সঙ্গে

যাইতে বলিলাম, ভাবিলাম তবু তৃতীয় ব্যক্তি তো সঙ্গে থাকিবে। জামাইবাবু তাহাতে কোনই আপত্তি করিলেন না।

সমুদ্রতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে বহুবার জামাইবাবু বলিলেন, কেন তুই এত ভয় করিস্? আমি কি বাঘ যে তোকে গিলে খাব। আমি উত্তর করিলাম না।

পাশাপাশি বেড়াইবার সময় দৃশ্যতঃ মদের ঝোঁকে কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই ক্রমাগত আমার গায়ে ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন এবং কয়েকবার আমারই দেহে ভর রাখিয়া পতন নিবারণ করিলেন। সমুদ্রতীর হইতে ছোট ছোট ঝিনুক কুড়াইয়া উপহার দিয়া, এইটা অমুক মহারাজার বাড়ী, ঐ দূরে একটা ডুবুডুবু ডিঙ্গি, ঐ স্বর্গদ্বার ইত্যাদি দেখাইয়া আমাকে প্রফুল্ল করিবার চেষ্টাও চলিতেছিল। আমি কিন্তু কোন কথাতেই ভাল করিয়া কাণ না দিয়া সন্ধ্যার অছিলায় ক্রমাগত বাড়ী ফিরিবার অনুরোধ জানাইতেছিলাম। সে দিনটা ছিল আবার পূর্ণিমা। জামাই বাবু সমুদ্রে চন্দ্রোদয় দেখিবার জন্য ক্রমাগত অনুরোধ করিয়া বিলম্ব ঘটাইতেছিলেন। ক্রমে সমুদ্রবক্ষে চন্দ্রোদয়ের সূচনা হইল; আমি মন্থরগতিতে জামাইবাবুর সহিত চলিতে চলিতে সকল ভুলিয়া একমনে সেই মনোহর দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। সে কি বিস্ময়াবহ দৃশ্য! কোথায় আছি, কাহার সঙ্গে আছি,—সকল ভুলিয়া সেই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আনমনে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যখন চমক ভাঙ্গিল তখন সভয়ে দেখিলাম এমন স্থানে আসিয়াছি, যেখানে জন মানবের চিহ্ন পর্য্যন্তও নাই। ফিরিয়া দেখিলাম, বোতলবাহক ভৃত্য রামচরণ কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে, কিন্তু বোতল গেলাস খোদ বাবুর জিম্মায় রাখিয়া যাইতে তাহার ভুল হয় নাই।

অবস্থাটা বুঝিতে পলমাত্র বিলম্ব হইল না, আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল, কত কাকুতি মিনতি করিলাম, বাড়ী ফিরিবার জন্য পায়ে পর্য্যন্ত ধরিয়া অনুরোধ জানাইলাম; কিন্তু সে কথা কে শোনে? তখন আমি ফিরিবার উদ্যোগ করিতেই তিনি জোর করিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। আমি ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। সেই স্পর্শে মাথায় আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

* * * *

দিদি ক্রমে সুস্থ হইতে লাগিল। আমার প্রতিবিধানের শক্তি নাই বুঝিয়া জামাইবাবু বাহিরে ত দূরের কথা, ঘরেও আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। শেষে একদিন কক্ষান্তরে, তাঁহার দৃঢ় আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইবার জন্য, এমন ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতে লাগিলাম যে, সেই শব্দ দিদিকে আকৃষ্ট করিয়া আনিল। দিদি অনেক সহিয়াছিল, কিন্তু সে দিন আর আত্ম-সংবরণ করিতে পারিল না। সে দিন যে গঞ্জনা, যে অপমান দিদি তাহার স্বামীকে করিল, তাহার ফলে তিনি জন্মের মত দিদিকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া দিদি, পিতাকে জামাইবাবুর নিরুদ্দেশের কারণ কি যে বলিলেন, তাহা আমি শুনি নাই, কিন্তু শুনিলাম যে আমার বিবাহের জন্য একসঙ্গে অনেকগুলি ঘটক নিযুক্ত করা হইয়াছে।

এ আবার বিপদের উপর বিপদ। এই অশুচি দেহ লইয়া, সহধর্ম্মিনী সাজিয়া, কাহাকে প্রতারিত করিব?

আমার এই দেহে কামুকের স্পর্শের যে দাগ পড়িয়াছে, তাহা অকপটে তোমার সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দিলাম। সর্ব্বদাই অশান্তিতে মন ভরিয়া আছে; তবে সমস্ত অশান্তির মধ্যেও এইটুকু ভাবিয়া কিছু শান্তি পাই, যে যাহা ঘটিয়াছে তাহা অমার্জ্জনীয় অপরাধ হইলেও, তাহাতে আমার মনের কোন যোগ ছিল না; দারুণ চক্ষুলজ্জাই আমার বিপত্তির মূল। হায়, একবার যদি চক্ষুলজ্জা কোনরূপে ত্যাগ করিয়া, জোর করিয়া প্রতিবাদ করিতে পারিতাম! এখন তোমার বিচারে যাহা হয়, আমাকে জানাইয়া দিও। তোমার উত্তরের অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত থাকিলাম। ইতি—

অভাগিনী

নীহার।

(৪)

পত্রপাঠ শেষ করিয়া বিনয়ের মনে হইল সে যেন অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় চিতা হইতে উঠিয়া আসিয়াছে। সে দুই হাতে মাথার ভর রাখিয়া মাথাটা দুই চারিবার ঝাড়িয়া লইল; মাথায় যে সমস্ত বিষাক্ত চিন্তা একসঙ্গে ক্রিয়া আরম্ভ করিয়াছে, সেগুলা, অন্ততঃ তাহাদের মধ্যে কতকগুলাও যদি এই ঝাঁকানিতে নামিয়া যায়। কোন ফল হইল না। তখন উঠিয়া কক্ষমধ্যে জোরে পাদচারণা করিতে লাগিল; শেষে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ

করিল। অনেকক্ষণ চেষ্টা করিয়াও যখন সেই বিষাক্ত চিন্তার হাত হইতে অব্যাহতি পাইল না, তখন আবার উঠিয়া পড়িল। ভাবিতে লাগিল, এমন স্ত্রী লইয়া সংসার করিতে রুচি হইবে কি করিয়া ?

কিন্তু পরক্ষণেই নীহারের এই স্বীকারোক্তি তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। এই যে অকপট স্বীকারোক্তি, এই যে মহত্ত্ব, এই যে পরিণাম চিন্তা না করিয়া সত্য-প্রকাশ, শিক্ষাভিমানী হইয়াও যদি তাহার মর্য্যাদা সে না বোঝে, বুঝিবে কে ? কিন্তু ? না, আর 'কিন্তু' নয়। নীহারকে ত্যাগ করিয়া তাহাকে লোক-চক্ষে হীন করিব না এবং নিজেও লোকচক্ষে হীন হইব না—সত্যের মর্য্যাদা নষ্ট করিব না।

কোন কথা আর ভাবিবার সময় না দিয়া বিনয় নীহারের দ্বারে আসিয়া ধাক্কা দিল ; দ্বার খুলিয়া গেল। দেখিল,—তাহারই একটী তৈল-চিত্রের প্রতি চাহিয়া নীহার বিমর্ষমুখে বসিয়া আছে ; তাহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে অবিরলধারে শ্রাবণের ধারা বহিতেছে। সে এমন তন্ময়, যে দ্বার খোলার শব্দ পর্য্যন্ত তাহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। বিনয় গিয়া একবারে তাহার পিঠে হাত দিতেই সে চমকাইয়া উঠিল।

ভারাক্রান্ত গলাটা সাফ করিয়া লইয়া বিনয় কহিল, "জানি নীহার, এ সত্য বলতে তোমাকে কতখানি ত্যাগ স্বীকার করতে হ'য়েছে ; তবু তুমি সত্য বলেছ। এ সত্যনিষ্ঠা অপূর্ব্ব, মহিমময় ! মন যাহার পবিত্র, তাহাতে আর দেবতাতে আমি কোন প্রভেদ দেখি না। চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায়, তোমার এই কলঙ্ক আমার নিকট তোমার সৌন্দর্য্য বাড়িয়েই দিয়েছে। যে দেবী, তাহার স্পর্শে কখন কি ধর্ম্ম-কর্ম্ম পণ্ড হয় ? আমার সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানে তুমিই আমার সহধর্ম্মিণী।" এই বলিয়া বিনয় নীহারকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া সস্নেহে চুম্বন করিল।

প্রত্যুত্তরে নীহার কোন কথাই বলিল না, কেবল কোনো প্রকারে মুক্ত হইয়া বিনয়ের চরণে প্রণত হইল

খাতা

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী

১

আমি ম'লে আমার এ জীর্ণপত্র খাতা
কে রাখিবে যত্নে তুলে,
কে দেখিবে নিত্য খুলে,
কে মুছিবে বস্ত্রাঞ্চলে, ছিন্ন এর পাতা।

২

একদিন এই খাতা আছিল নবীন ;
শ্বেত অঙ্গে লাল কালো,
হস্তাক্ষরে শোভা ভালো,
আজি তাহা মসীরেখা মাধুরী-বিলীন।

৩

জীবনের সঙ্গী মম বহুবর্ষ ধ'রে'
কিশোর বয়স হ'তে,
কত মর্ম্ম-কথা এ'তে,
নীরবে চিত্রিত করি বিশ্ব অগোচরে।

৪

শুভ্র পত্রে নেত্রবারি গিয়াছে শুকায়ে ;
ছায়াপাতে রেখা রেখা,
চিহ্ন খালি যায় দেখা—
বেদনা-কাতর চিত্ত রয়েছে লুকায়ে।

৫

শৈশবের গত স্মৃতি, উল্লাস কাহিনী ;
যৌবনের সুষমায়
পরিপূর্ণ সমুদায়,
বাজিয়া উঠিত যাহে বসন্ত রাগিনী।

৬

আনন্দের কলহাস্য সঙ্গীত উচ্ছ্বাস,
বিরহ-বেদন কাছে
কভু নাহি আসিয়াছে ;
মাধবী প্রভাত সুখে হিয়া পরকাশ।

৭

এ খাতার অঙ্গরাগ প্রেমের চন্দনে,
কল্পনার তুলিকায়,
বিচিত্র বরণ ভায়,
মলয় অনিলে-স্নিগ্ধ সুরভি-নন্দনে !

৮

কিবা দিবা কিবা রাত্রি বান্ধব নিয়ত,
অন্তরের ব্যবধান,
নাহি তিল পরিমাণ,
খাতায় হৃদয়-চিত্র রয়েছে অঙ্কিত।

৯

আমি তারে কহিয়াছি অন্তর-বারতা,
একান্ত সুহৃদ সম
সঙ্গোপন রাখি মম,
ধরা মাঝে প্রচারিয়া দেয় নাই ব্যথা।

১০

দীর্ঘ বরষের স্মৃতি, জীবন অতীত
সযতনে প্রাণ ভ'রে,
আজিও রয়েছে ধরে ;
বয়সে মুছিয়া তারে করেনি দূরিত।

১১

সে আমার পুরাতন ভৃত্যের মতন,
অনুগত স্নেহময়,
সেবা তরে সাথে রয়,
সব ভার বক্ষ পাতি করেছে যতন।

১২

স্বদেশে প্রবাসে আমি যখনি যেথায়,
তারি সনে গেহ-বাস,
তারে নিয়ে পরবাস,
মোর গুপ্ত কথা গাঁথা তারি মমতায় !

১৩

এমন আপন-ভোলা খাতাখানি মোর,
ভাবীকালে যারে দিয়া
যেতাম, নিশ্চিন্ত হিয়া,
সে আমার ছিঁড়িয়াছে মমতার ডোর।

১৪

মাতৃভাষা যাঁর কণ্ঠে মধুর ঝঙ্কারে
একদিন বাজি উঠে,
দিগন্তে গিয়াছে ছুটে,
ভেবেছিনু তারে দিব যেতে লোকান্তরে।

১৫

গুপ্তধন দিয়া যায় ভালবাসা জনে ;
আমার সে ভালবাসা
প্রাণের অনন্ত ভাষা
আজি আমি কারে দিব তাই ভাবি মনে !

১৬

ভাবি তাই অশ্রু সদা নয়ন ভরিয়া
নিশীথে বিনিদ্র আঁখি,
কাহারে বলিয়া রাখি,
যতনে রাখিতে এ'রে আপন করিয়া।

১৭

আমি তো যাইব চ'লে, কিছু দিতে নাই,—
ধন রত্ন যারে ধরা
বুঝে সমাদর করা,
সেথানে এ ছিন্নপত্র পাইবে না ঠাঁই।

১৮

আমার বিদায় পরে খাতাখানি মোর,
কীট-দন্তে ব্যথা সয়ে
যাইবে বিলুপ্ত হ'য়ে,
সে কথা ভাবিয়া নিশা কাঁদি করি ভোর।

১৯

মাতৃভাষা যে জনার আরাধ্য পরাণে,
পর হ'য়ে আপনার,
দিতে পারি হাতে তার,
আমার এ দেবোত্তর বংশধর জ্ঞানে।

রাঙা-শাড়ী

শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায়

ক

সে আজ বেশীদিনের কথা নয়। বছর দুই পূর্ব্বে রথ-যাত্রার দিন কুঠির কাজ বন্ধ ছিল। 'মনুরো' কয়লা কুঠির সাঁওতালী কুলি-ধাওড়ার উঠানে বসিয়া কয়েকজন কুলি মদ খাইয়া হল্লা করিতেছে, এমন সময় সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে একজন সাঁওতাল যুবক তাহাদের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মাথা-ভরা লম্বা বাব্‌রী চুল, ভরাট মুখের উপর চোখ দুইটা বেশ ঢলঢলে', গলায় লাল কাঁটির মালা, হাত-পায়ের গঠন বেশ নিটোল-সুন্দর, বুকখানা বেশ চওড়া!...সে একা ছিল না,—সঙ্গে ছিল একটা কুকুর।

যুবক জিজ্ঞাসা করিল, তুদের সর্দ্দার কোথা?

সর্দ্দার সেইখানেই বসিয়া ছিল, তাহার মুখের পানে তাকাইয়া কহিল, কে, আমিই সর্দ্দার, কি বল্‌ছিস্?

—আমি তুর্ কুঠিতে কাজ করতে এসেছি। বলিয়া বাঁ-হাত দিয়া কুকুরটার পিঠে এক চাপড় মারিয়া বলিল, এই চুপ!

আর একটা কুকুর দেখিয়া সে তখন গোঁ গোঁ করিয়া মারামারি করিবার উদ্যোগ করিতেছিল।

সর্দ্দার কহিল, তুর্ নাম কি?

—লুটন্ মাঝি—

—কয়লা কাট্‌তে পারিস্ ত?

লুটন্ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হুঁ, গ।

সর্দ্দারের পাশেই যে লোকটা বসিয়াছিল, সে বলিল, জুয়ান্ সাঁওতালের ছেলে, তা আবার নারে!

একটা লোক জিজ্ঞাসা করিল, চুরি কর্‌তে জানিস্?

লুটন্ উত্তর দিবার পূর্ব্বেই আর একজন বলিল, জুয়া খেল্‌তে?

সর্দ্দার তাহাদিগকে ধমক্ দিয়া বলিল, চুপ কর্।

লুটন্ বলিল, পেটের দায়ে সবই কর্‌তে হয় মাঝি।

সর্দ্দার বলিল, বস্ কেনে, মদ খা একটুকু......ওরে ডোমন্, দে উয়াকে মদ দে।...রেতে খাবি কোথা? বেশ, আমার ঘরেই খাস্।

ডোমন্ মদের বাটিটা তাহার সুমুখে ধরিল। লুটন্ এক নিঃশ্বাসে সমস্তটা পান করিয়া বলিল, কুকুরটাকে বাঁধ্‌তে হবেক্ সর্দ্দার, যে রকম গঁ গঁ কর্‌ছে, আখুনি ছিঁড়ে দিবেক্ তুদের ওই কুকুরটাকে।

কুকুরটা ডোমনের। কথাটা শুনিয়া সে বলিয়া উঠিল, হুঁ রে, ভারি মরদ্,—আমার বাঘাকে আর মার্‌তে হয় না।

লুটন্ বলিল, দেখবি? কিন্তুক্ মরে' যায় ত' জানি না।

ডোমন্ পানপাত্রটা মাটীতে নামাইয়া বলিল, জান্‌তে হবেক্ নাই, লে।...লাগা তুর্ কুকুরকে। না হয় একটা কুকুরই যাবেক্।

সর্দ্দার বলিল, না রে, কাজ নাই।

তাহাদের মধ্য হইতে কে একজন বলিল, কুকুর ত' ডোম্‌নার লয়,—উয়ার বুনের।

ডোমন্ বলিয়া উঠিল, হোক্ কেনে, আমি ডাক্‌ছি উয়াকে,—লুট্‌নী, লুট্‌নী, অ লুট্‌নী!...

অদূরে একটা ধাওড়া-ঘরের একপাশে কয়লার গাদায় আগুন ধরানো হইয়াছিল। লুট্‌নী ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া বলিল, কিস্‌কে ডাক্‌ছিস্ দাদা?

সন্ধ্যার অন্ধকারে ধূমহীন অগ্নিশিখার রক্তাভ আলোকে লুট্‌নীকে বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। আলু-লায়িত-কেশা যুবতীর যৌবন-শ্রী মণ্ডিত মুখের পানে তাকাইয়া লুটন্ হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল, বা—! আমার নাম লুটন্ আর উয়ার নাম লুট্‌নী!...

মদের নেশায় ডোমন্ তখন চুর্ হইয়া গেছে। সজোরে মাটীতে হাতটা বার-দুই চাপ্‌ড়াইয়া কহিল, শুন্ সর্দ্দার, লক্ষ্মী, সোণা, পানুটু, তুরা সবাই রইছিস্,—উয়ার কুকুর, আমার বাঘাকে যদি হারাতে পারে তাহ'লে উয়ার বিয়া দিব লুট্‌নীর সঙ্গে, আর উ কি দিবে বলুক্।

সর্দ্দার বলিল, তুর্ বিয়া হয় নাই ত? হাঁ রে লুটন্?

লুটন্ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

সর্দ্দার কহিল, তবে তুঁই কি দিছিস্ বল্।

লুটনের দিবার মত কিছুই ছিল না। সে বলিল, আমার ত' কিছুই নাই মাঝি, তবে এই বাঁশীটি আছে,—লে! ভাথ্ বাজাঁই, খুব ভাল বাঁশী।

ডোমন্ বেশ ভাল বাঁশী বাজাইতে পারিত, তাই এ জিনিষটার উপর তাহার যথেষ্ট লোভ ছিল। লুটনের হাত হইতে বাঁশীটা টানিয়া লইয়া ডোমন্ বাজাইতে সুরু করিল। কিন্তু নেশার ঝোঁকে সে ভাল বাজাইতে পারিল না।

—দিস্, দেখাই দি। বলিয়া লুটন্ তাহার হাত হইতে বাঁশীটা কাড়িয়া লইয়া ফুঁ দিয়া বাজাইতেই সেই সামান্য বাঁশের বাঁশীটার রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে করুণ সুর বাজিয়া উঠিল, তাহাতে কেহই প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না; বলিল, বা, বাঃ! বা রে লুটন্!

লুটন্ বলিল, কি বাজালুম্ বল্ দেখি?

সর্দ্দার বলিল, কে জানে? অত সব বুঝি না।

ডোমন্ চোখ বুঝিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, বেশ বাজালি।

লুটন্ সুর করিয়া বলিল, বাজালম্—

'তুমি এসেছ কি এসো নাই,
এখনও ন—জরে দেখি নাই গো,
এখনও নজরে দেখি নাই!'

লুটন্ চুপ করিলে, ডোমন্ তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—লাগা তবে লাগা।......বাঘা, বাঘা...ক্রু!

প্রকাণ্ড কালো কুকুরটা হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিল।

লুটনী কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া এতক্ষণ বাঁশী বাজানো শুনিতেছিল; বলিল আমাকে কিস্কে ডাক্‌ছিলি?

—কিছু বলি নাই, ছাথ্ তোর বাঘার জোর। বলিয়া লুটনের কুকুরটাকে দেখাইয়া, ডোমন্ হাতে তালি দিয়া কহিল, ইস্!···ধে ধে ধে ধে!...

লুটনের কুকুরটার দিকে বাঘা আগাইয়া আসিতেছিল, লুটন্ খুব জোরে একটা শিশ্ দিয়া হাতের ইসারা করিয়া বলিল, জিন্না!

রাঘা ও জিন্নার লড়াই বাধিল। চীৎকার শুনিয়া ঘরের ভিতর যে-যেখানে ছিল, ছুটিয়া আসিয়া উঠানে জড় হইল।

একবার বাঘা, জিন্নার উপর পড়ে, আবার জিন্না আসিয়া বাঘাকে আক্রমণ করে। কিয়ৎক্ষণ ঝাপটা-ঝাপ্‌টি করিবার পর, জিন্নার কাণের খানিক্‌টা অংশ কাটিয়া রক্ত গড়াইয়া পড়িতেই লুটনীর বুকখানা গর্ব্বে এবং আনন্দে ফুলিয়া উঠিল।

একজন সাঁওতাল না জানিয়া-শুনিয়া, কুকুরটাকে থামাইতে যাইতেছিল, ডোমন বলিল, থামাস্ না—চলুক্।

জিন্না এইবার বাঘার গলায় কাম্‌ড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে ফেলিয়া দিল। বাঘা চীৎকার করিতে লাগিল।

লুটন্ একবার আড়্-চোখে লুট্‌নীর দিকে তাকাইল।

জিন্না বাঘাকে আর উঠিতে দিল না। নিমেষেই তাহার পেট কামড়াইয়া ধরিয়া নাড়ি-ভুড়ি সমেত এক-ছোবল্ মাংস টানিয়া ছিঁড়িয়া দিল। বাঘা চীৎকার করিতে করিতে পা ছড়াইয়া শেষ হইয়া গেল। জিন্না রক্তমাখা মুখে হাঁপাইতে হাঁপাইতে লুটনের নিকট আসিয়া বিজয়গর্ব্বে লেজ নাড়িতে সুরু করিল।

লুট্‌নী সজল চক্ষে বাঘার দিকে ছুটিয়া গেল।

ডোম্‌ন অবিচলিত কণ্ঠে কহিল, বেশ কুকুর লোটন্!

সর্দ্দার বলিল, মনে আছে ত' ডোম্‌না, কি হারালি?

—হঁ, আছে।

খ

তাহার পর দেখিতে দেখিতে দুইটা বৎসর পার হইয়া গেছে!

বর্ষা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। সেদিন অপরাহ্ন বেলায় সমুন্নতশীর্ষ তরুরাজির মাথার উপর পশ্চিম আকাশে আলো-ছায়ার বিচিত্র বর্ণচ্ছটা ফুটিয়া উঠিয়াছে। লুটন্ তাহার ধাওড়াঘরের পাশে একটা মাটীর ঢিপির উপর বসিয়া বাঁশী বাজাইতেছিল। আসন্ন সন্ধ্যার ব্যথিত-পাণ্ডুর আকাশে-বাতাসে করুণ বেহাগের বুক-ব্যাথানো বেদনার সুর কাঁদিয়া মরিতেছে। এমন সময় লুট্‌নী ছুটিতে ছুটিতে বন্‌শীওয়ালায় পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

বাঁশী বাজানো বন্ধ করিয়া লুটন্ হাসিতে হাসিতে বলিল, আয় ব'স্, আজ সারাদিন দেখি নাই যে?

লুট্‌নী বসিল না। বলিল,—না, বস্‌ব নাই। দাদা মদ আন্‌তে গেইছে, এখনই আস্‌বেক্।......আজ সারাদিন তুঁই আমাকে দেখিস্ নাই, সেটাও কি আমার দোষ নাকি ?

লুটন্ জিজ্ঞাসা করিল, খাদে খাট্‌ছে গেইছিলি ?

—হঁ, গেইছিলম।......কই, আমার শাড়ী এনে' দিলি নাই যে ?

—রবিবারে রাণীগঞ্জ থেকে এনে' দিব। আজ চুরি করে' তিন টব কয়লা বোঝাই দিয়েছি, ভাব্‌না কি লুট্‌নী !

—আবার আশিন্ মাসের পূজা আস্‌ছে।

—আসুক্ কেনে, তুর্ কি ? বলিয়া লুটন্ তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিল।

—বা, রাঙা শাড়ী চাই আমার,—সে-ই বাবুদের মেয়ের মতন।......ছাড়্, হাতট ছাড়্,—দাদা এখনই খুজ্‌তে আস্‌বেক্।

হাতটা ছাড়িয়া দিয়া লুটন বলিল, চারদিন চুরি ক'রে ধুরুপ্ কয়লা কেটে' দিব,—কত শাড়ী লিবি লিস্ কেনে।

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া লুট্‌নী বলিল, তুঁই যে ঝোলা-কয়লা চুরি করতে যাস্, ভয় লাগে না ?...... যদি একটা চাপ্ মাথায় পড়ে' যায় ধাঁ করে' ?

—যায় যাবেক্। তাই বলে' ডরাব নাকি ?

—যদি ধরা পড়িস্,—যদি কুঠি থেকে তেড়ে ত্থায়।

—ত্থায় দিবেক্। কত কুঠি আছে, খাট্‌ব গা।

কথাটা বলিয়াই লুটন্ একটু অন্যমনস্ক হইয়া গেল। বলিল, ও, তুর্ কথা বল্‌ছিস্ ? বিয়া না-ই বা হলো', আমার সঙ্গে যাবি। তুখে' ত' জিতে নিয়েছি—তুঁই ত' আমারই।

লুট্‌নীর একটুখানি লজ্জা হইল। কথাটা পাল্টাইবার জন্য বলিল, চুরি চামারি না করলে চলে না ?

লুটন্ ঈষৎ হাসিল ; বলিল,—উ-কথা আমি এনেক্ ভেবে দেখেছি লুট্‌নী,......আমরা জুয়ান্ বেটা ছেলে, সুখ-সোয়াস্তির জন্যে আমরা যা খুসী তাই করব। উ-সব না করলে দুবেলা পেট্ ভরে' খেতেই পাব নাই,—তা জানিস্ ?

লুট্‌নী আর সেখানে দাঁড়াইল না। পিছন্ ফিরিয়া বলিল, আমি চল্লম্।

৭

সেদিন একটা অঘটন ঘটিয়া গেল।...আশ্বিন মাসের পূজার সময় লুটনীকে রাঙা শাড়ী দিতে হইবে, উপরন্তু আরও কত খরচ আছে। তাই সেদিন একটা বন্ধ 'গ্যালারি'র মুখে কাঁটাতারের বেড়া ডিঙাইয়া লুটন্ মাঝি ঝোলা কয়লা (Hanging coal) চুরি করিয়া কাটিতে গিয়াছিল। গাঁইতি দিয়া সিউনির মুখে দু'তিনটা চোট্ দিতেই ঝড়াং করিয়া একটা প্রকাণ্ড কয়লার চাংড়া উপর হইতে ছাড়িয়া পড়িল। আর একটুকু হইলেই সেটা তাহার মাথায় পড়িয়া তাহাকে একেবারে সমাধিস্থ করিয়া দিত। কিন্তু কোন প্রকারে মাথাটা বাঁচাইল বটে,—হাত দুইটা বাঁচাইতে পারিল না। বাঁ হাতটা থেঁত্‌লাইয়া হাড়গুলা চুরমার্ করিয়া দিল এবং ডান্‌হাতের তিনটা আঙুল কোন্‌দিকে কেমন করিয়া উড়িয়া গেল, বুঝিতে পারিল না। ফলতঃ দুইটা হাতই জখম হইয়া পড়িল।

লুটন্ ভাঙা হাত লইয়া, অতি কষ্টে খাদের উপরে আসিল।

ম্যানেজার সাহেবকে না জানাইয়া ডাক্তারখানায় ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধাইয়া, ঔষধ লইয়া ধীরে-ধীরে ধাওড়াঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল। হাতের যন্ত্রণায় সে তখন অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল।

কথাটা চারিদিকে রাষ্ট্র হইতে দেরী হইল না। সর্দ্দার শুনিল, ডোমন্ শুনিল, লুট্‌নী শুনিল ; এইরূপে এ-কাণ সে-কাণ করিয়া কুঠির প্রায় সকলেই শুনিল যে, চুরি করিয়া কয়লা কাটিতে গিয়া লুটন্ মাঝির উপযুক্ত শাস্তিলাভ হইয়া গেছে,—চিরজনমের মত হাত দুইটি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে।

লুটনের তত্ত্বাবধান করিবার মত, চারটি রাঁধিয়া দিবার মত লোকজন কেহই ছিল না।

সর্দ্দার তাহাকে দেখিতে আসিয়া বলিল,—আমি তুর্ মদ্-ভাত সব এনে দিব লুটন্—তোর কোন ভাবনা নাই।

সর্দ্দারকে লুটনের অনেক কথা বলিবার ছিল, কিন্তু একটি কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। বেদনা ও

হাত-দুইটার এত যন্ত্রণা সত্ত্বেও প্রাণপণে দাঁতে দাঁত চাপিয়া নীরবে শুধু তাহার মুখের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল!

সন্ধ্যার পূর্ব্বে ডোমন্ একবার দেখিতে আসিয়া জানিয়া গেল, তাহার হাতের কোন্-কোন্ জায়গা ভাঙ্গিয়াছে এবং ভবিষ্যতে কোন দিন হাতদুটা কাজে লাগাইতে পারিবে কি-না।

ডোমন্ চলিয়া যাইবার পর, সর্দ্দারের ছোট ছেলেটা একটা বাটিতে করিয়া ভাত আনিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া গেল।

দু' এক গ্রাস খাইয়া, সে আর খাইতে পারিল না। বলিল, জিন্নাকে দে। উ কাল থেকে খায় নাই।

তাহার পর আর-কেহ আসিল না। সমস্ত রাত্রি হাতের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া লুটন্ জাগিয়াই কাটাইল।

পরদিন প্রাতে কম্পাউণ্ডার আসিয়া ঘা ধুইয়া দিয়া গেল। দুপুরে, সর্দ্দার তাহার কন্যাকে দিয়া খাবার পাঠাইয়া দিয়াছিল, পরে সন্ধ্যায় সে নিজেই আসিল। যাইবার সময় অন্ধকারে ঘরের ভিতর কেরোসিনের ডিবেটা জ্বালিয়া দিয়া গেল।

প্রথম দিন লুটনীর দেখা পাওয়া যায় নাই,—আজ এতক্ষণে সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকিয়া লুটনী ধীরে ধীরে তাহার শিয়রের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।

লুটন্ তাহার হাতের বেদনা ভুলিয়া গেল। তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, ব'স্।

লুটনী শিয়রের নিকট বসিয়া চুপি-চুপি বলিল, আমি তুখে বারণ করেছিলম্ লুটন্, তুঁই কেনে চুরি করতে গেলি?

লুটন্ অতিকষ্টে একবার ঈষৎ হাসিয়াই চুপ করিল।

লুটনী বলিল, ইদিকে কি হঁইছে জানিস্?

—কি?

—দাদা তুখে দেখ্তে এসেছিল, লয়?

—হুঁ।

—আমি লুকোঁই তুথে দেখ্তে এসেছি। তুর কাছকে আস্তে আমাকে বারণ করেছে। বলেছে, এলে ঠ্যাং খোঁড়া করে দিব।

লুটন্ চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

লুটনী আবার বলিল, পান্টুর সঙ্গে আমার বিয়া দিবেক্, —তুর সঙ্গে দিবেক্ নাই বল্ছে। বিয়াতে পান্টু দু'কুড়ি টাকা খরচ করবেক্।......

ধীরে ধীরে লুটন্ জিজ্ঞাসা করিল,—কার সঙ্গে?

—পান্টু,-পান্টু। হোই দু' নম্বরের।

—ওঃ।

তাহার পর উভয়েই চুপ করিয়া রহিল। লুটন্ বাহিরে অন্ধকার উঠানের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া ছিল।...ভয়ানক ঝড় উঠিয়াছে! অশ্বথ ও অর্জ্জুন গাছের পাতাগুলা সন্-সন্ শব্দে নড়িতেছে।.... ঝড়ো হাওয়ার একটা দমকা ঝাপ্‌টা ঘরের ভিতর ঢুকিয়া আলোটা ফস্ করিয়া নিভাইয়া দিল।......চারিদিক অন্ধকার!...

শিয়রের কাছে লুটনী বসিয়া বসিয়া তাহার চুলের উপর হাত বুলাইতেছিল। অন্ধকারে তাহার সর্ব্বাঙ্গে তড়িৎ-স্পর্শ ছুটিয়া গেল।......

লুটনের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত একটা অজানা বেদনায় শিহরিয়া উঠিল। মাথার চুলগুলা শির্ শির্ করিতে লাগিল। মনে হইল, লুটনীর মুখখানা তাহার বুকের উপরে চাপিয়া ধরিলেও বা এ তড়িৎ শিহরণ থামিতে পারে! কিন্তু কেমন করিয়া ধরিবে? তাহার বেদনার্ত্ত হাত দুইটা নিসাড় নিস্পন্দভাবে বিছানার উপর পড়িয়া আছে,—নড়াইবার শক্তি নাই!......

লুটন্ মুখে কিছুই বলিতে পারিল না। একটা অব্যক্ত বেদনার জ্বালা বুকের ভিতর গুমরিয়া মরিতে লাগিল। হাত দুইটা টন্ টন্ করিয়া উঠিতেই ধীরে-ধীরে চোখ দুইটা বন্ধ করিয়া ফেলিল।

...বাহিরে উঠান হইতে কে যেন ডাকিল, লুটনী!...

দাদা ডাকছে। বলিয়া লুটনী উঠিয়া দাঁড়াইল।... আতঙ্কে তাহার বুকটা দুর্ দুর্ করিতেছিল।

নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে লুটনী অন্ধকার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বাহির হইতে লুটনীর অস্পষ্ট উঃ! আঃ! শব্দ, শায়িত লুটনের কাণে আসিয়া বাজিল। তাহার হাতের চুড়ি ঝুন্ ঝুন্ করিতেছিল। মনে হইল, ডোমন্ তাহাকে প্রহার করিতেছে।

* * * * *

আরও পাঁচ ছয় দিন পরে, লুটনের বাঁ হাতের বেদনাটা ভয়ানক বাড়িল। ডাক্তার আসিয়া দুপুর বেলা তাহাকে 'ব্রাণ্ডি' দিয়া অচৈতন্ত করিয়া রাখিয়াছিল। যখন চেতনা ফিরিল, তখন রাত্রি কত হইয়াছে তাহার খেয়াল ছিল না। উন্মুক্ত দরজার পথে এক ঝলক্ জ্যোৎস্না আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছে।...আজ দয়া করিয়া কেহই তাহার কুটীরে পদার্পণ করে নাই। তাকাইয়া দেখিল, দরজায় বসিয়া জিন্না শুধু রাত্রি জাগিতেছে!

দূরে কতকগুলা লোক চীৎকার করিতেছিল। সঙ্গে-সঙ্গে গান ও মাদলের শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল।

কয়েকটা সাঁওতালদের ছেলেমেয়ে তাহার দরজার পাশ দিয়া পার হইয়া যাইতেছিল। লুটন্ প্রাণপনে গলাটা একবার ঝাড়িয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—গায়েন্ কিসের রে?

—হোই উয়াদের লুটুনীর বিয়া। বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া লুটন্ ডাকিল, জিন্না!

জিন্না ধীরে-ধীরে তাহার শয্যার পাশে আসিয়া লেজ নাড়িতে লাগিল। লুটন্ অতিকষ্টে মাথাটা কাৎ করিয়া জিন্নার মুখের পানে তাকাইতেই তাহার চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল। ধীরে-ধীরে চোখ বুজিয়া, একটা ঢোক্ গিলিয়া নীরবে শয্যার উপর পড়িয়া রহিল।

স্মরণে

শ্রীনিরুপমা দেবী

প্রভুপাদ শ্রীরূপ গোস্বামীর তিরোভাব দিনে।

(রাধা-দামোদর—বৃন্দাবন)

যারলীলা রসগানে মুখরিত করিলে ভুবনে,
শতাব্দী শতাব্দী ধরি তারি কোলে রয়েছ শয়নে,
হে বৈরাগী-শিরোমণি হে বৈষ্ণব কবিকুলরাজ!
তারি বুকে চুপে চুপে কোন্ লীলা নেহারিছ আজ।

'মধুর মুরলী রব' পঞ্চমেতে খেলিছে যথায়
কালিন্দী পুলিন-বনে, চির স্থান লভিয়া তথায়
মিটেছে মনের স্পৃহা অনুরাগী গায়ক-সম্রাট?
মাধুর্য্য রসের রাজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন, স্বরাট!

'তুণ্ডেতে তাণ্ডব নৃত্য' তেমনি কি করে কৃষ্ণনাথ?
অর্ব্বুদ কর্ণের স্পৃহা তৃপ্ত হল শুনি সেই গান।
কে অমৃত বর্ণ হতে আস্বাদিয়া রস নব নব
চরিতার্থ হ'ল কিগো চিত্তসহ সর্ব্বেন্দ্রিয় তব?

পার্শ্বেতে লইয়া নিজ দলবল সহমর্ম্মী জন *
কোন্ ভবসিন্ধু মথি নব গান করিছ রচন?
নব কালকূটজয়ী কটু আর সুধাগর্ব্বহারী
কোন্ প্রেমে অমরতা দাও আজ বৃন্দাবন-চারী?

তব মনোকুঞ্জ হতে সেই চির কিশোর-কিশোরী
নায়ক-নায়িকা সহ সখীবৃন্দ বিশ্ব চিত্ত ভরি
খেলে সেই ঝুলা খেলা, ব্যালাঙ্গনা বেণী দোলে শিরে,
জগৎ বিভ্রমকারী বাজে বাঁশী যমুনার তীরে।

শুনিছ হেরিছ সব শুয়ে এই সমাধি শয়নে
হে কবীন্দ্র, হে রাজেন্দ্র, ভিক্ষুক যে এসেছে চরণে
আজিকে তোমার দ্বারে, মুষ্টি ভিক্ষা করে সে কামনা
তব রাজকোষ হতে, দাও তারে বিন্দু কৃপাকণা!

(* ভুগর্ভ গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি)

স্বরলিপি

কথা সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল

রাগিনী সিন্ধু—একতালা

তাঁর এ মহামহোৎসবে
আমারও স্থান আছে
এই নৃত্য-দোদুল বিশ্ব সনে
হৃদয় যেন নাচে !
এই উদ্ভাসিত আলোর স্রোতে
হৃদয় যেন গেয়ে ওঠে
তরুর সনে—ফুলের সনে
নবীন শোভায় সাজে !

নিশীথ রাতের তারা যেন
দোলে হৃদয়তলে
রাত্রি দিবস দেউল সাজাই
প্রেমের ফুলে ফলে !
আমিও যেন বিশ্ব সনে
কুসুম ফোটাই মনের বনে,
প্রেমের সুরে বাজ্‌তে থাকি
দুঃখে সুখে কাজে।

২ ৩ ০ ১
II র্সা র্সা র্সা | -া র্সা র্রা | র্সা ণা -া | ধা পা -া I
তাঁ র্ এ ০ ম হা ম হো ৎ স বে ০

২´ ৩ ০ ১
I মা মজ্ঞা -া | রা সা -া | ন্‌া সা -া | -া -া ধ্‌ধ্‌া I
আ মা ০ রো স্থা ন্ আ ছে ০ ০ ০ এই

২´ ৩ ০ ১
I ণ্‌া -রা রা | রা রা -জ্ঞা | রা -পা পা | মা মা -রা I
নৃ • ত্য দো ছ ল্‌ বি • শ্ব, স নে •

২´ ৩ ০ ১
I মা জ্ঞা -া | র্রা সা -রা | ন্‌া সা -া | -া -া মমা II
হৃ দ য় যে ন • না চে • • • এই

২´ ৩ ০ ১
II পা -া পা | পা পা ধা | পা র্সা -া | না র্সা -া I
উদ্‌ • ভা সি ত • আ লো র্‌ স্রো তে •

২´ ৩ ০ ১
I ধা ণা -র্জ্ঞা | র্রা র্রা -া | র্মা মর্জ্ঞা -া | র্রা র্সা -া I
হৃ দ য় যে ন • গে য়ে • ও ঠে •

২´ ৩ ০ ১
I র্সা র্সা -া | র্সা র্সা -র্রা | র্সা ণা -া | ধা পা -া I
ফু লে র্‌ স নে • ত রু র্‌ স নে •

২´ ৩ ০ ১
I মা জ্ঞা -া | রা সা -রা | প্‌া সা -া | -া -া -া II
ন বীন্‌ • শো ভা য় সা জে • • • •

২´ ৩ ০ ১
II ধ্‌া ণ্‌া -রা | রা রা -জ্ঞা | মা মজ্ঞা -া | রা রা -া I
নি শী থ্‌ রা তে র্‌ তা রা • যে ন •

২´ ৩ ০ ১
I মা মজ্ঞা -া | রা সা -রা | ন্‌া সা -া | -া -া -া I
দো লে • হৃ দ য় ত লে • • • •

২´ ৩ ০ ১
I মা -পা পা | পা পা পমা | ণা ণা ণা | ধা র্সণা -ধা I
রা • ত্রি দি ব স দে উ ল্‌ সা জা০ ই

২´ ৩ ০ ১
I পা মা -জ্ঞা | রা সা -রা | ন্‌া সা -া | -া -া -া II
প্রে মে র্‌ ফু লে • ফ লে • • • •

২´ ৩ ০ ১
II মা পা পা | -া পা ধা | না -া র্সা | না র্সা -া I
আ মি ও • যে ন বি • শ্ব স নে •

২´ ৩ ০ ১
I ধা ণা -র্জ্ঞা | র্রা র্রা -া | র্মা মর্জ্ঞা -া | র্রা র্সা -া I
কু সু ম্‌ কো টা ই ম নের্‌ • ব নে •

২´ ৩ ০ ১
I পা র্সা -া | র্সা র্সা -র্রা | র্সা ণা -া | ধা পা -া I
প্রে মে র্‌ সু রে • বা জ্‌ তে থা কি •

২´ ৩ ০ ১
I মা -া জ্ঞা | রা সা -রা | ন্‌া সা -া | -া -া -া II II
দুঃ • খে সু খে • কা জে • • • •

সুধা

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

'মাতৃ-হারা মা যদি না পায় তবে আজ কিসের উৎসব'

এক

সন্ধ্যার রাঙা আলো চারিদিকে ঝরিয়া পড়িতেছে। সুধা তাহার ছোট কোলটির একদিকে সাত মাসের খোকাকে আর একদিকে তাহার প্রিয় বেড়াল পারুলকে লইয়া একটা আধপোড়া ভুট্টা খাইতে-খাইতে ছাতে উঠিবার সিঁড়ির কোণের জানালায় বসিয়া সন্ধ্যার রাঙা আলোর দিকে উদাস নয়নে চাহিতেছিল। একবার খোকাকে আদর করিয়া, একবার পারুলের পালকের মত নরম পিঠে হাত বুলাইয়া মুখে ভুট্টা পুরিয়া দিয়া সে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের স্নেহকে নিরপেক্ষভাবে বণ্টন করিতে চেষ্টা করিতেছিল। পারুল শান্ত ভাবে চোখ বুজিয়া সুধার কোলে পড়িয়া ছিল। শুধু ভুট্টার দানা যখন তাহার মুখে পড়িতেছিল, একবার অতি অলসভাবে চোখ অর্দ্ধেক খুলিতেছিল। দুধের মত সাদা তাহার দেহটা ঠেলা দিয়া সুধা বলিল—এই পারুল, ঠাকুর দেখতে যাবি ? যাবি ? পারুল একবার অতি মৃদু ডাকিয়া, ল্যাজ একটু নাড়িয়া আবার বেশ আরামের সহিত কোলে মুখ গুঁজিয়া পড়িল। সুধা নিজের ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের দিকে একটু বিষণ্ণ ভাবে চাহিল; পথ দিয়া একদল ছোট ছেলেমেয়ে নানা রংএর সিল্কের পোষাক পরিয়া হাসিয়া নাচিয়া যাইতেছে, জানালা দিয়া তাহাদের দিকে দেখিল ; পারুলের কাণ দুটি নাড়িয়া বলিল—এ ময়লা কাপড় পরে আর ঠাকুর দেখতে যায় না, নয় পারুল ? পারুল কিন্তু কোন উত্তর না দিয়া, আরামের সহিত কোলে অর্দ্ধচন্দ্রের মত কুণ্ডলী পাঠাইয়া শুইয়া রহিল দেখিয়া সুধা খোকাকে বুকে তুলিয়া চুমো দিতে লাগিল ; অমনি পারুল কোলের কাপড় হইতে মুখ তুলিয়া একটু ঘাড় বাঁকাইয়া সুধার দিকে চাহিল। সুধা হাসিয়া বলিল—অ, হিংসেয় অমনি জলে গেলেন,—কেন, এতক্ষণ কথা কইছিলুম, উত্তর দিচ্ছিলি না ! পারুল ঘাড় একটু নত করিয়া ব্যথিত নয়নে সুধার দিকে চাহিল, সুধা তাহাকে আর এক হাত দিয়া বুকের কাছে টানিয়া লইল। সহসা সিঁড়িতে পায়ের শব্দে সে চমকিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি পারুলকে কোল হইতে নামাইয়া দূরে রাখিয়া দিল, কিন্তু সম্মুখে বাড়ীর গৃহিণীর বিপুল কায়া দেখিয়া পারুল সুধার গা ঘেঁসিয়া বসিল।

স্থূলকায়া গিন্নি সিঁড়িটুকু উঠিতেই শ্রান্ত হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি সুধার দিকে একখানা শাড়ী ছুঁড়িয়া দিয়া বলিতে লাগিলেন—হাঁরে সুধি, আমি কি তোর ইয়ার, আমার সঙ্গে ঠাট্টা ; বল্লুম, তেলের শিশি নিয়ে আয়, দিয়ে গেলি তরল আলতার শিশি, আমি মেখে মরি। হাঁপাইতে-হাঁপাইতে তিনি সুধার পাশে সিঁড়িতে বসিয়া পড়িলেন। সুধা তাড়াতাড়ি পাশ হইতে পারুলকে তুলিয়া জানালার কোণে রাখিল.—গিন্নির দেহের চাপ পাইলে তাহার প্রাণ-সংশয় হইতে পারে। অবাক্ হইয়া সে বলিল—আমি কি জানি জেঠাইমা, তেলের শিশিগুলার মধ্যেই ত ওটা ছিল। ছোট বৌমা যে ভুল করিয়া এ শিশি দিয়াছিল, তাহা সে বলিল না। গিন্নি গালের পানটুকু চিবাইতে-চিবাইতে বলিতে লাগিলেন—আবার মুখের উপর চোপরা—খোকা ঘুমল—এখনও ঘুমায়নি—কি হচ্ছিল, বেড়ালকে সোহাগ—কোন্ দিন ছেলেকে আঁচড়ে—ওকে না মারলে আমার শান্তি নেই—দে খোকাকে—

সুধা খোকাকে গিন্নির কোলে দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। গিন্নি সিঁড়ির ওপর কাপড়খানির দিকে দেখাইয়া বলিলেন—যা, নে কাপড়খানা তুলে, এই তোর পূজোর কাপড়—যা কাপড় পরে ওদের সঙ্গে ঠাকুর দেখে আয়—তুলে নে—হাঁ করে রইলি কি—আমার জর্দ্দার শিশিটা কোথায়, দিয়ে যা—

সুধার বয়স সাত হইলেও এই বয়সেই সংসার সম্বন্ধে তাহার অনেক অভিজ্ঞতা হইয়াছে। শাড়ীখানি যে পুরাতন, তাহা সে দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিল। এ শাড়ীখানি সে গৃহিণীর ছোট মেয়েকে একবার পরিতেও দেখিয়াছে। সে ধীরে বলিল—আমি ঠাকুর দেখতে যাব না।

যাব না! কেন শুনি—আদিক্যেতা রাখ্—নে ধর, বলিয়া, গিন্নি শাড়ীখানি সুধার দিকে ধরিলেন। সুধা কাপড় হাতে লইল বটে, কিন্তু আপনাকে দমন করিতে পারিল না, ক্ষুব্ধ ভাবে বলিয়া উঠিল—আমি কাপড় চাই না।

চাই না! কেন? ও! কি লাটবেলাটের মেয়ে এলেন, ওর জন্যে বারাণসীর জোড় নিয়ে এস—আরে বাবু আমার স্বর্ণ মোটে একটিবার ওটি পরেছিল—যা শীগগীর, ওরা দাঁড়িয়ে আছে, এসে আমার পা আর পিঠ মালিশ করে দিবি—

গিন্নি এই তেজস্বিনী মেয়েটিকে জানিতেন। মা-হারা অনাথিনী হইলেও, তাহার আত্মসম্মান-বোধ একটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নাই, কাহারও কাছে অপমান সহ্য করে নাই। কাপড় ধরিয়া গোঁ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া গিন্নি ধীরে বলিলেন—আচ্ছা মা, আজ ওইটা পরে যাও, ছোট বৌ তোমার জন্যে একটা নতুন ভাল শাড়ী আনতে দিয়েছে—কাল পাবে;—এটা আবার চাইছে দেখ—কি অলুক্ষুণে বেড়াল—

পারুল সত্যই খুব রাগিয়া কটমট করিয়া গিন্নির দিকে চাহিয়াছিল,—ওই বিপুল শুভ্র দেহ নখ দিয়া আঁচড়াইতে পারিলে যেন তাহার শান্তি হয়। সে কর্কশভাবে ডাকিয়া উঠিতে,—আ মর, বলিয়া, গিন্নি অর্দ্ধভুক্ত ভুট্টাটা সজোরে ছুঁড়িয়া তাহাকে মারিলেন। পারুল আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, সুধা তাড়াতাড়ি তাহাকে কোলে তুলিয়া কাপড় লইয়া চলিয়া গেল। গিন্নি খোকার ননীর মত নরম গালে এক ঠোনা দিয়া বলিলেন—ঘুমো শীগ্গীর—ওকে কোলে নিয়ে আমি বসে থাকি,—কত কাজ পড়ে আছে—অ, রাঁধুনী বামনীর মেয়ে, তার দেমাক দেখ, তবু যদি সাত কুলে কেউ থাকত—ঘুমো।

সুধা কিন্তু কাপড় পরিয়া ঠাকুর দেখিতে গেল না। সে পারুলকে লইয়া ছাদের এক কোণে গিয়া বসিল। শাড়ীখানি পারুলের গায়ে ছুড়িয়া মারিয়া বলিল—নে পারুল নে, কাপড়খানা তুই ছিঁড়ে ফেল—পরব না—আমি পরব না—

পারুল ত তাই চায়। গিন্নির ওপর সকল আক্রোশ সে শাড়ীখানির ওপর মিটাইবার জন্ত শাড়ীখানির ওপর লাফাইয়া পড়িয়া নখ দিয়া কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িতে আরম্ভ করিল। ওমা! সত্যি পারুল ছিঁড়ছিস্, বলিয়া সুধা পারুলকে শাড়ী হইতে ঠেলিয়া দিল। পারুল লজ্জিত ক্ষুব্ধভাবে শাড়ীখানি পা দিয়া ঠেলিয়া শিকারের সম্মুখে বাঘের মত থাবা মেলিয়া বসিল।

ওমা, কি রকম রেগে বসেছে,—আয়, পারুল, আয়, বলিয়া সুধা হাসিয়া তাহাকে টানিয়া কাছে আনিতে গেল। পারুল সকল আদর উপেক্ষা করিয়া গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিল। পারুল, শাড়ী পরবি, বলিয়া সুধা ছেঁড়া শাড়ীটা খুলিয়া পারুলের দেহে জড়াইতে গেল—দেখ্ কি সুন্দর তোকে মানাচ্ছে। পারুল অতি বিরক্তির সহিত গা ঝাড়িয়া, শাড়ীর বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া, গম্ভীর মুখে সরিয়া বসিল। সুধা পারুলের কাণ্ড দেখিয়া হাসিয়া বলিল, বড্ড খিদে পেয়েছে পারুল, খাবি এখন—এই কথাগুলি বলিলেই পারুল সজাগ হইয়া ওঠে। কিন্তু এ বাক্যবাণও ব্যর্থ হইল। পারুল একবার করুণ নয়নে সুধার দিকে তাকাইয়া গোঁ হইয়া বসিয়া রহিল। সুধাও চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মন কি অজানা ব্যথায় ভারী হইয়া উঠিতে লাগিল। শুক্লাষ্টমীর চন্দ্র নারিকেল গাছের পাশ দিয়া ধীরে-ধীরে উঠিতেছে। চাঁদের দিকে চাহিয়া তাহার মাকে মনে পড়িল। গত বছর পূজায় তাহার মা কি সুন্দর ডুরে শাড়ী দিয়েছিলেন; মাগো, বলিয়া সে আঁচলে মুখ গুঁজিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। পারুল ধীরে তাহার গা ঘেঁসিয়া বসিয়া ছলছল চোখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। কাঁদিতে সুধার ভাল লাগিত না। এ সংসারে সে মাতৃহীনা অনাথিনী বালিকা,—তাহাকে কত দুঃখ নির্য্যাতন অপমান সহিতে হয়,—সে কত কাঁদিবে। তাহার বিধবা মা এ সংসারে রাঁধুনী ছিলেন। তিনি মারা যাবার পর তাহার আর কেউ নেই বলিয়া এ সংসারে সে আছে। গিন্নির ফরমাস খাটা—ছোট ছেলেমেয়েদের দেখা,—খোকাকে দুধ খাওয়ান,—ঘুমপাড়ান—তাঁর সব কাজ করা ইত্যাদি নানা কাজ তাহাকে করিতে হয়। ছোট ঝির মত সে আছে,—তাহার কাঁদিয়া কি হইবে?

চোখ মুছিয়া পারুলের ছলছল মুখ দেখিয়া সুধা ধমক দিল—পারুল কাঁদবি না। তার পর তাহাকে বুকে জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

দুই

সুধা নীচে কাজে নামিয়া গেলে,পারুল কিছুক্ষণ ছাদের কোণে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কোন অজানা আক্রোশের ব্যথায় সে যেন ফুলিতেছিল, ওই ছেঁড়া শাড়ীটা নখ দিয়া টুকরা-টুকরা করিয়া দিতে পারিলে যেন তাহার শান্তি হয়। কিন্তু শাড়ীটা সে রাগের চোটে সত্যই ছিঁড়িয়াছে ভাবিয়া একটু লজ্জিত হইয়া পা দিয়া শাড়ীটা ঠেলিয়া সে ছাদ হইতে রাস্তায় লাফাইয়া পড়িল। পথে কত ছোট ছেলেমেয়েরা কত রং-বেরংএর সাজ পরিয়া, পাউডার মাখিয়া, এসেন্স মাখিয়া গল্প করিতে করিতে চলিয়াছে। সুধার ব্যথিত মলিন মুখ, তাহার ময়লা ছেঁড়া কাপড় বারবার পারুলের মনে পড়িতে লাগিল; রাগে চোখ জলজ্বল করিয়া চাহিতে চাহিতে সে চলিল।

গলির মোড়ে এক প্রকাণ্ড অর্দ্ধভগ্ন অট্টালিকা আছে,—তাহার বিজন জীর্ণ অন্ধকার ঘরগুলিই তাহার প্রধান আড্ডা। যখনই তাহার মন খারাপ হইত, সে এই জীর্ণ প্রাসাদে আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত, আর ইঁদুর সম্মুখে মিলিলে শিকার করিত। আজ সন্ধ্যায় সেই বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া সে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইল। সেই প্রকাণ্ড তিনমহল প্রাসাদের এককোণে তিনটি ঘর জুড়িয়া দুইটী প্রাণী বাস করে—এক বৃদ্ধ ও এক বৃদ্ধা। বাকী সব ঘর জীর্ণ, পরিত্যক্ত, অন্ধকার। আজ সে বাড়ী আলোয় জলজ্বল করিতেছে, ঘরে ঘরে লোকের কোলাহল। তাহার চির-পরিচিত ভাঙা জানালার পথ দিয়া ঢুকিতে যাইয়া দেখিল, সে ঘরে প্রকাণ্ড উনান পাড়িয়া বামুনেরা বৃহৎ কড়ায় লুচি ভাজিতেছে। সে পথ দিয়া আর ঢোকা হইল না। ঘুরিয়া এক দেওয়ালের গর্ত্ত দিয়া সে বাড়ীর ভিতর ঢুকিল। একটা থামের আড়ালে অন্ধকার কোণ হইতে দেখিতে লাগিল, প্রকাণ্ড আঙ্গিনা জুড়িয়া দলে দলে ছোট ছেলেমেয়েরা সাজিয়া খাইতে বসিয়াছে; বামুনেরা লুচি, পোলাও, মাংস কত কি পরিবেশন করিতেছে। আর যে বুড়াকে কত সময় পেঁচার মত মুখ করিয়া চাবির থোলো ট্যাঁকে গুঁজিয়া কাসিতে কাসিতে ভূতের মত এই বাড়ীতে ঘুরিতে দেখিয়াছে, সে তাহার পেচকবদন যথাসম্ভব আনন্দোজ্জ্বল করিয়া সবাইকার খাওয়া তদারক করিতেছে। সমস্ত ব্যাপারটা পারুলের কাছে স্বপ্নের মত বোধ হইতে লাগিল। পারুলের চোখ দুইটি সর্ব্বদাই যেন ঘুমে-ভরা থাকে,—অতি অলসভাবে সে সব জিনিষ দেখে। তাহার চোখ দুইটি জলজ্বল করিয়া জ্বলিয়া উঠিল,—মনোযোগ দিয়া সে দেখিতে লাগিল। সব পাত ছেলে-মেয়েতে ভরা—শুধু ঠিক তাহার সম্মুখের সারির মাঝের একখানি পাত খালি। পাতের সম্মুখে কুশাসন নয়—এক সুন্দর গালিচার আসনের ওপর কয়েকখানি লাল কাপড় জামা ঝকমক করিতেছে। পাতে কেহ বসে নাই বটে, কিন্তু এক সোণার বড় থালে লুচি পোলাও, খুব বেশী করিয়া সাজান; তাহার চারিদিক ঘেরিয়া মাছ, মাংস, তরকারী-ভরা সোণার বাটিগুলি ঝকমক্ করিতেছে। সে যে থামের আড়ালে আশ্রয় লইয়াছিল, ঠিক তাহারই সম্মুখে পাতটি।

নিঃশব্দে সন্তর্পণে পারুল থামের আড়াল হইতে বাহির হইয়া পাতটির দিকে অগ্রসর হইল বটে, কিন্তু সে সারির ছোট মেয়েদের চোখ এড়াইতে পারিল না। 'ওরে বেড়াল' 'কি সুন্দর সাদা ভাই' 'খেতে বসেছে দেখ কি ভঙ্গী করে, যেন ওরও নেমতন্ন হয়েছে।'

কিন্তু তাহারা খাওয়ার গল্পে এত বিভোর ছিল যে, বেড়ালটিকে তাড়াইয়া দিবার কথা মনে হয় নাই,—সেও যেন তাহাদের সহিত নিমন্ত্রণ খাইতে বসিয়াছে। পারুল কিন্তু আসনের পাশে আসিয়া খাবারের দিকে চোখ দেয় নাই; সম্মুখের মাছের মুড়োটা তাহাকে লুব্ধ করিতেছিল বটে, কিন্তু সে আসনের ওপর লাল টুকটুকে সিল্কের শাড়ীখানি কিরূপে লইবে, তাহাই ভাবিতেছিল। শাড়ীখানি থাবা দিয়া ধরিয়া মুড়িয়া ছোট করিয়া দাঁত দিয়া কামড়াইয়া ধরিতে ধরিতে পারুল চমকিয়া উঠিল,—সেই বুড়োটা চোখ ঠিকরাইয়া হুঙ্কার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিতেছে—ওরে হতভাগা—লক্ষ্মীছাড়া—ওই ওই পাতে—অলুক্ষুণে—কি করছিস্ মেয়েগুলো—গিলছে—তাড়া দে—নচ্ছার—

কাপড় লওয়া হইল না বটে, কিন্তু পারুল পলাইল না। সে সম্মুখের ছোট মেয়েদের গায়ে লাফাইয়া পড়িতে লাগিল। মাগো, বলিয়া তাহারা লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহারা দাঁড়াইতে আর সবাই পারুলের ছুটাছুটিতে উঠিয়া দাঁড়াইল; চারিদিকে হৈ, চৈ, পড়িয়া গেল। রান্নাঘর

হইতে বামুনেরা ছুটিয়া আসিল, দেউড়ী হইতে দরওয়ানেরা ছুটিয়া আসিল, কত জলের গেলাস পড়িল, কত মেয়ে আছাড় খাইল; এই গোলমালের সুযোগে পারুল ধীরে শাড়ীটি মুড়িয়া মুখে পুরিয়া ছুট দিল। বুড়ো জামাকাপড়ের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল বটে, কিন্তু বেড়ালটা দূরে আছে ভাবিয়া সেদিকে দেখে নাই। যখন পারুল তাহার পায়ের পাশ দিয়া চলিয়া গেল, তাহার লক্ষ্য হইল, কিন্তু পারুলকে তাড়া করিতে গিয়া সে একটী ছোট মেয়ের ঘাড়ে পড়িল; তাহাকে সরাইয়া ছুটিতে যাইতে তাহার কাসির বেগ আসিল, কাসিতে কাসিতে হাতের চাবির থোলোটা সজোরে পারুলের দিকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িল। চাবির থোলো পারুলের পিছনে গিয়া লাগিল, ক্ষণিকের জন্য সে যন্ত্রণায় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, তারপর আঙ্গিনায় দেউড়ীতে রক্তের ফোঁটা ফেলিতে ফেলিতে সে শাড়ীমুখে সদর দরজা দিয়া পথের অন্ধকারে বাহির হইয়া গেল।

তিন

পারুল যাহার বাড়ী হইতে শাড়ী লইয়া পলাইল, সেই ধনপতি সেকরার নাম পাড়ায় সবাই জানে। তাহার নাম হইলেই কেহ বলে 'আহা', কেহ বলে 'উহুঁ'। তাহার শীর্ণ দেহ, বার্দ্ধক্য-রেখাঙ্কিত স্বর্ণবুভুক্ষু মুখ, তাহার তীক্ষ্ণ হিংস্র দৃষ্টি, রুক্ষ মেজাজ, তাহার নির্দ্দয়তা স্বার্থপরতা দেখিলে মনে হয় না একদিন ও-লোকটা হাসিয়াছে, আমোদ করিয়াছে, ভালবাসিয়াছে। কিন্তু একদিন এই বৃহৎ সুসজ্জিত প্রাসাদে আলো জ্বালাইয়া, ফুলের মালা দোলাইয়া, নহবৎ বসাইয়া, শাঁক বাজাইয়া, সোনায় মুড়িয়া সে তাহার তিন মেয়েকে বিবাহ দিয়াছে, সোনায় মুড়িয়া তাহার দুই ছেলের বৌকে ঘরে তুলিয়াছে; এই বাড়ীতে আনন্দের বন্যা বহিয়াছে, এই ঘরে ঘরে সে তাহার চার নাতির সহিত ছুটোছুটি করিয়াছে, হাসিয়াছে, গল্প করিয়াছে, তাহার প্রিয়তম নাতনীকে কোলে করিয়া দুর্গোৎসব করিয়াছে। একসঙ্গে দুজনে অষ্টমীর পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছে, নতজানু হইয়া দেবীকে প্রণাম করিয়াছে। একে একে তাহার বংশের সকল প্রদীপই নিভিয়া গিয়াছে; এখন এই বৃহৎ জীর্ণ অট্টালিকায় সে ও তাহার নিঃসন্তান বিধবা বোন বাস করে। ধনপতির গত জীবনের সুখের ইতিহাস যাহারা জানে, তাহারা বলে 'আহা'!

সংসার যখন তাহার কাছে শূন্য হইল, স্বর্ণ তাহাকে মোহগ্রস্ত করিল, অর্থের লালসায় মত্ত হইয়া সে দিনরাত দোকানের কাজে মাতিল। তাহারা যাহাকে সুদখোর মহাজন, কঞ্জুষ অর্থপিশাচরূপে জানে, তাহারা তাহার নাম হইলে বলে 'উহুঁ'। কিন্তু এই অর্থ-পিশাচের অন্তরের সোনার মরুভূমিতে একটি সুকোমল পুষ্প চির-অম্লান ফুটিয়া আছে, একটি স্নিগ্ধ স্নেহধারাকে এই অগ্নিজ্বালাময় সর্ব্বগ্রাসী স্বর্ণ-স্তূপ গ্রাস করিতে পারে নাই—সেটি তাহার স্নেহের নাতনীর স্মৃতি। এই একমাত্র নাতনী তাহার বংশের শেষ প্রদীপ ছিল; জাহাজ-ডুবি হইলে নাবিক যেমন একটুকু ভাঙা মাস্তুল পাইলে আঁকড়াইয়া থাকে, তেম্নি ধনপতি এই নাতনীকে জড়াইয়া শূন্য সংসারে পাড়ি দিতে চাহিয়াছিল। সে স্নেহ-তরীও ডুবিয়া গেল; পাঁচ বছর আগে একরাতের কলেরার আক্রমণে এক শরতের সোনার উষায় ছিন্ন মলিন শেফালির মত সে ঝরিয়া পড়িল। তাহাকে স্মরণ করিয়া ধনপতি প্রতি বৎসর পূজার সময় পাড়ার ছেলেমেয়েদের নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ায়। এই একটি দিন অর্থ-পিশাচ স্বর্ণকার মানুষটি ঠাকুর্দ্দার ব্যথার স্নেহের সাগরে ডুবিয়া যায়।

রাত্রি গভীর হইয়াছে। শারদীয় শুক্লা ষষ্ঠীর চন্দ্র হইতে সুন্দর জ্যোৎস্না ঝরিয়া পড়িতেছে, স্নেহময়ী মায়ের চাউনির মত। ধনপতির ঘরে কিন্তু একটুও জ্যোৎস্না প্রবেশ করিতে পারে না। তাহার বৃহৎ ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ। সেই ঘরের মধ্যে মোটা-মোটা লোহার গরাদে দেওয়া ছোট ঘর। সেই লোহার খাঁচায় তিন বৃহৎ সিন্দুকের পাশে পিতামহের আমলের খাটে ধনপতির মলিন শয্যা।

বিছানায় বসিয়া ধনপতি সিন্দুকের দিকে চাহিয়া ছিল; স্বর্ণলুব্ধ চোখ দুইটি স্নেহের কজ্জলে আজ স্নিগ্ধ হইয়াছে। সিন্দুকের ওপর নাতনীকে উৎসর্গ-করা কাপড় জামাগুলি সাজান। একটা শাড়ী বেড়ালে লইয়া গিয়াছে, তার জন্য প্রথম তাহার বড় রাগ হইয়াছিল; কিন্তু এখন বেড়ালটাকে মারার জন্য দুঃখ হইতেছিল,—একটা শাড়ী, তার জন্য আজ রক্তপাত না করিলেই হইত। ধীরে সে উঠিয়া একটি সিন্দুক খুলিল। নানা রংএর সিল্কের শাড়ী ফ্রক সিন্দুকের এক পাশে সাজান; এইগুলি গত ছয় বৎসরের পূজার কাপড়

জামা জমিয়াছে। সিন্দুকের আর একদিক হইতে কোম্পানীর কাগজ, হ্যাণ্ডনোট, সোনার গয়নার স্তূপের মধ্য হইতে ধনপতি সোনার কাজ-করা মখমলের একটি ছোট চটি বাহির করিল; কোণে একটি জায়গায় ছিঁড়িয়া গিয়াছে। এই চটিটি পরিয়া তাহার নাতনী ওই ঘরে হাসিয়া ঘুরিত, এই ফুটো দিয়া তাহার কচি পায়ের সুন্দর আঙুল দেখা যাইত। ধ'রে সে সেই চটির ছেঁড়া অংশে চুমো খাইল। সহসা সে চমকিয়া উঠিল, কচি মিষ্টি পায়ের শব্দ কাণে আসিতেছে, ঠিক তাহার নাতনীর পায়ের শব্দের মত। অনেক সময় তাহার এরূপ মনের ভুল হইয়াছে; কত সন্ধ্যাবেলা এই কচি পায়ের শব্দের আলেয়ার পেছন পেছন সে এই ভাঙা বাড়ীর ঘরের অন্ধকারে অন্ধকারে ঘুরিয়াছে, তাহার নাতনীর ছায়া তাহার চোখে ঝলক দিয়া কোথায় নিমেষে লুকাইয়াছে; সে পায়ের ধ্বনি যে অলীক মায়া তাহা সে বারবার বুঝিয়াও ঘুরিয়াছে; কিন্তু সে ধ্বনি ত কখনও এরূপ স্পষ্ট, এরূপ দৃঢ় হয় নাই। তাহার স্নেহ-মণ্ডিত-মুখ সহসা কঠোর, শঙ্কিত হইয়া উঠিল। তাহার সিন্দুকগুলির ওপর সহরের সকল চোর ডাকাতের দৃষ্টি আছে; তাড়াতাড়ি সিন্দুক বন্ধ করিবে না দরজা বন্ধ করিবে ভাবিতেছে, দেখিল দরজার গোড়ায় একটি ছোট মেয়ে। ধনপতি আবার চমকিয়া উঠিল; ঠিক তাহার নাতনীর মত মুখ, করুণ সুন্দর আভামণ্ডিত, তাহারি মত উজ্জ্বল দৃষ্টি, তাহারই মত দাঁড়াইবার ভঙ্গী।

কিন্তু মেয়েটি যখন কাঠের দরজা পার হইয়া লোহার দরজার সম্মুখে আসিল, সে নির্নিমেষ নয়নে মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। লোহার দরজা পার হইতে সুধার ভয় করিল; সে গরাদে ধরিয়া বলিল, আমার বেড়াল কি তোমার এই কাপড় নিয়ে গেছে? বেড়াল, শাড়ী এসবের প্রতি ধনপতির এতক্ষণ লক্ষ্যই হয় নাই। সে কিছু না বলিয়া একটু ঘাড় নাড়িয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। সুধা কাপড়খানি বিছানার ওপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিল, ওই নাও তোমার কাপড়, তুমি আমার বেড়ালকে এমন মেরেছ কেন? ভারি কাপড়!

ষাট বছরের বৃদ্ধ অতি লজ্জিত করুণভাবে এই সাত বছরের মেয়েটির দিকে চাহিল, তাহার মলিন বাসের প্রতি চোখ পড়িল, ধীরে বলিল, তুমি শাড়ীখানি নিয়ে যাও।

না আমি চাই না, তুমি এমন মেরেছ, ও খোঁড়া হয়ে গেছে, বলিয়া, সুধা পারুলের নেকড়া-জড়ান আহত পায়ের ওপর হাত বুলাইল। সে তাহার কোলেই ছিল।

—শোন, তুমি এ কাপড় নিয়ে যাও, তুমি বুঝি আজ খেতে আসনি।

—আমি চাই না কাপড়, চাই না খেতে।

মুগ্ধনয়নে ধনপতি সে মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার নাতনী ব্যথায় অভিমান করিলে তাহার মুখ এম্নি রাঙা হইয়া উঠিত।

সে নাতনীর স্বপ্ন-ছবি হারাইয়া গেল, সুধা চলিয়া গেল, পায়ের করুণ শব্দ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া মিলাইয়া গেল; ধনপতি বেদনায় শ্রান্ত হইয়া শাড়ীর পাশে শয্যায় শুইয়া পড়িল।

মাঝ-রাতে ধনপতির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে চমকিয়া শিহরিয়া উঠিল, হায় কি হইল! সে যে স্বপ্ন দেখিতেছিল, সে আট বছরের ছেলে, এই পূজার বাড়ীতে কি আনন্দ, সে লাল জরি-পাড়ের কোঁচান দেশী ধুতি পরিয়াছে, সিল্কের পাঞ্জাবী পরিয়াছে, মখমলের পাম্পসু পরিয়াছে, আতর মাখিয়াছে, তাহার নাতনীর মত একটি ছোট মেয়ের হাত ধরিয়া পাড়ায় পাড়ায় প্রতিমা দেখিয়া ঘুরিতেছে; তাহার মা তাহাকে যে একটা টাকা দিয়াছেন তাহার আট আনা সে মেয়েটির জন্য খরচ করিয়া ফেলিল, তাহাকে কাকাতুয়া, বেলুন, লজনচুষ কত কি কিনিয়া দিল;—সে কি খাওয়ার সুখ—সে কি দেওয়ার আনন্দ—সে কি সাজ-সজ্জা করার আমোদ!

সে ত আট বছরের নয়, সে যে ষাট বছরের! মাথার গোড়ায় প্রদীপ নিবু-নিবু হইয়া ভূতের মত দীর্ঘ ছায়া দেওয়ালে নাচিতেছে, কিন্তু ওই কোণে কে দাঁড়াইয়া? সেই মেয়েটি বেড়াল কোলে করিয়া এখনও দাঁড়াইয়া আছে! তাহাকে কেহ পূজার কাপড় দেয় নাই, পুতুল সন্দেশ দেয় নাই! চমকিয়া ধনপতি উঠিয়া বসিল। সহসা সিন্দুকের প্রতি চোখ পড়িতে সে চেঁচাইয়া উঠিল—সর্ব্বনাশ! প্রদীপ উস্কাইয়া দিয়া ঘরটি ভাল করিয়া দেখিল, সে সিন্দুক খুলিয়া দরজা খুলিয়া শুইয়াছে। এমন কাণ্ড তাহার জীবনে কখনও হয় নাই। সিন্দুকে চাবি দিল, দরজায় চাবি দিল, তারপর ঘরে ঘুরিতে ঘুরিতে আয়নার

সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, নিজের শীর্ণ জীর্ণ মূর্ত্তির, প্রতি ব্যথিত করুণ নয়নে চাহিয়া রহিল, তার আট বছর বয়সের কোমল সুন্দর দেহের স্বপ্ন-ছবি চোখে ভাসিয়া উঠিল ;—সেই উপহার দেওয়ার আনন্দ, খাওয়ার খাওয়ানোর আনন্দ, ভাল জামাকাপড় পরার আনন্দ, সেই সহজ সরল সুখগুলি আর জীবনে ফিরিয়া আসিবে না ? বাকী রাতটুকু সে বন্ধ ঘরে ছট্‌ফট্ করিয়া কাটাইল। আজ তাহার চুল শণের মত সাদা, তাহার দেহ ঝরা-পাতার মত শুকনো, আজ সে খাইয়া পরিয়া ত কোন আনন্দ পায় না। যখন তাহার একটাকা মাত্র সম্বল ছিল, সে আট আনা পয়সা খরচ করিয়া খেলনা কিনিয়া উপহার দিয়াছে!

চার

পরদিন সকাল-দুপুর ধনপতি তাহার বৃহৎ প্রাসাদের শূন্য ভগ্ন ঘরে-ঘরে ভূতের মত ঘুরিয়া কাটাইল। তাহার ষাট বছরের অর্থপিশাচ আনন্দহীন 'আমি'-টিকে আট বছরের সহজ সরল আনন্দময় 'আমি'র স্মৃতি ব্যথিত ও চঞ্চল করিয়া তুলিল। বিকেলে তাহার ইচ্ছা হইল, পথের ওই ছেলে-মেয়েদের মত নতুন কাপড় সে পরিবে, সাজিবে, আতর মাখিবে, বাঁশী বাজাইবে। সাজ-সজ্জা বিশেষ হইল না বটে, কিন্তু তাহার ময়লা কাপড় ও গেঞ্জি পরিয়াই সে পথে বাহির হইল। পথে সবাই দল বাঁধিয়া চলিয়াছে, কত ছেলেমেয়ে কত পুতুল খেলনা কিনিতেছে। সেও কিনিবে ;—সোনার সুন্দর এক কাকাতুয়া কিনিল, একটা লাল বেলুন কিনিল, একটা বাঁশী কিনিল, কিন্তু বাঁশী বাজাইতে পারিল না। পথের সবাই তাহার দিকে অবাক্ হইয়া দেখিতেছে, ধনপতি সেকরা খেলনা কিনিতেছে! কাহার জন্য ? হায়, খেলনা কিনিয়া দিবে এমন তাহার কেহই নাই। কাহার হাত ধরিয়া আজ সে ঠাকুর দেখিতে যাইবে ? কিছুক্ষণ বাঁশী, বেলুন, কাকাতুয়া হাতে করিয়া, ঘুরিয়া সে নিজেই অবাক্ হইয়া যাইতেছিল, সে কি পাগল হইল! পথের কোন মেয়েকে এইগুলি দিয়া বোঝা হইতে মুক্ত হইবে ভাবিতেছে, সহসা অদূরে সুধাকে দেখিয়া ধনপতি সেইদিকে ছুটিল; কাল রাতের সেই মেয়েটি একখানা লাল ডুরে পরিয়া কোলে বিড়াল লইয়া চলিয়াছে। তাহার দিকে বুড়ো বেগে আসিতেছে দেখিয়া সুধা বিরক্তির সহিত অন্যদিকে মুখ ফিরাইল, কিন্তু বুড়ো তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে একটু অবাক্ হইয়া তাহার হাতের কাকাতুয়া বেলুন বাঁশির প্রতি চাহিল। তাহার দেখার ভঙ্গী দেখিয়া একটু অপ্রস্তুত হইয়া ধনপতি ধীরে বলিল—খুকি, এগুলো নেবে ?

—আমি কেন নিতে যাব ?

—নাও, আমি তোমায় দিচ্ছি।

—না, আমি নেব না, কাল তুমি আমার বেড়ালকে মেরেছিলে—

—বুড়োমানুষ দিদি, রাগের মাথায় মেরেছি—

—না, পথ ছাড়, আমার মোটে একঘণ্টা ছুটি—

মুখ ঘুরাইয়া অন্যদিকে একটু অগ্রসর হইয়া সুধা মুখ ফিরাইয়া দেখিল, বুড়ো ছলছল চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। তাহার ব্যথিত মুখ, তাহার পুতুলগুলি ধরার ভঙ্গী, তাহার ক্লান্তকরুণ চাউনি দেখিয়া সুধার মনে একটু দুঃখ হইল। সে দাঁড়াইয়া বলিল,—তুমি কাঁদছ কেন ? তোমায় আমি কি বলেছি ?

—তুমি নিলে না এগুলো ?

—সত্যি দেবে ? নিবি পারুল ?

বুড়োর ওপর পারুলের রাগ থাকিলেও, তাহার নিকট হইতে খেলনা লইতে তাহার আপত্তি ছিল না। সে ঘাড়টি লম্বা করিয়া একটু লেজ নাড়িল।

আচ্ছা, দাও, বলিয়া সুধা স্নিগ্ধমুখে ধনপতির দিকে চাহিল। বৃদ্ধ তাহার হাতে প্রথমে লাল বেলুনটি দিল। বেলুনের সুতা পারুলের পায়ে জড়াইয়া সুধা বলিল,—কিন্তু, এতগুলো কি করে নেব ?

—আচ্ছা দিদি, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি—

—ও, আমি অনেকদূর যাব, সেই মিত্তিরদের বাড়ী ঠাকুর দেখতে—

—বেশ, বেশ, আমিও যাব।

বুড়োটি সুধার কাছে এক বেদনাময় রহস্যের মত বোধ হইতে লাগিল; তাহার ব্যথিত মুখ, অসহায় সঙ্গীহীন অবস্থা দেখিয়া তাহার করুণা হইল; বজ্রদীর্ণ ভূপতিত বৃহৎ বটবৃক্ষের জন্য পাশের ছোট ফুল যেমন ব্যথা বোধ করে, সেও তেম্নি ব্যথা বোধ করিতে লাগিল।

আচ্ছা এস, বলিয়া সে বুড়োর পাশে ধীরে ধীরে চলিল। একটু দূর অগ্রসর হইয়া ধনপতি একখানি গাড়ী ডাকিয়া

সুধাকে উঠাইল; শুধু মিস্তিরদের বাড়ী নয়, অনেক বড় বড় বাড়ীর প্রতিমা দেখিয়া আসিবার সময় ধনপতি সুধার জন্য একখানি বারাণসী শাড়ী ও খাবার কিনিয়া দিল। তাহার সকরুণ স্নেহময় অনুরোধে সুধা কোন আপত্তি করিতে পারিল না।

গাড়ী হইতে সুধাকে বাড়ীর সম্মুখে নামাইয়া দিয়া ধনপতি বলিল,—আমি তোমার বুড়োদাদা হই, বুঝলে দিদি। যদি কেউ বলে এসব কে দিয়েছে, বলবে মোড়ের ওই বুড়োদাদা। কাল আবার সন্ধ্যেবেলায় বেড়াতে যাব, কেমন?

পাঁচ

সুধা উপহার-ভারাক্রান্ত হইয়া হাসিমুখে গাড়ী হইতে নামিল বটে, কিন্তু বাড়ীতে ঢুকিয়াই তাহার ভয় হইল। বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েরা তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল, 'কোথায় গেছলি ভাই', 'কে ভাই ও বুড়ো', 'এসব কি জিনিষ ভাই'। খাবারের চেঙ্গারিটি তাহাদের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া তাহাদিগকে শান্ত করিয়া সে নিজের ঘরে গিয়া তাহার মায়ের ছোট টিনের বাক্সে কাপড় খেলনাগুলি রাখিতে গেল। খেলনাগুলি বাক্সে রাখিয়া শাড়ীখানি বারবার নাড়িয়া দেখিতেছে, স্বর্ণ আসিয়া খবর দিল—মা ডাকছেন। শাড়ীখানি বাক্সে রাখিতে গেলে স্বর্ণ বলিল—কাপড় শুদ্ধু এস, শীগ্গীর।

শাড়ীখানি হাতে করিয়া লজ্জিতভাবে সুধা গিন্নির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। গিন্নি শাড়ীখানি হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া বলিলেন—এই যে নবাবপুত্রীর বেড়ান হল। বলি কোন্ শ্বশুর দিয়েছে রে, এত খাবার, এমন কাপড়—

সুধা লজ্জিতভাবে বলিল,—ওই মোড়ের বুড়োদাদা—

—ওমা, এর মধ্যে আবার বুড়োদাদা পাতান হয়ে গেছে; স্বর্ণ-নিয়ে আয় ত আলোটা কাছে, দেখি শাড়ীখান্।

স্বর্ণ টিপ্পনী দিল—হাঁ, মা, আমরা দেখলুম, ওই যে মোড়ে বুড়ো সেকরাটা আছে না, তার গাড়ী থেকে সুধাদি নামল—

—চুপ কর স্বর্ণ, বল্ কে দিলে শুনি?

—বল্লুম ত বুড়োদাদা—

—বুড়োদাদা কে?

—ওই যে মোড়ে বড় ভাঙ্গা বাড়ী, তার পাশে তার সোনার দোকান—

—কে, ধনপতি সেকরা?

—হাঁ।

—হাসাস্নে সুধি, হাসাস্নে, ধনপতি সেকরা তোকে কাপড় খাবার কিনে দিয়েছে; বলে যার হাত দিয়ে পাই পয়সা গলে না,—লোকের বাপ মা মারা গেলেও সে তার এক পয়সা সুদ ছাড়ে না, সে তোকে—চুরি করে এনেছে কোথা থেকে—হতভাগী—আমার যে মাথা কাটা যাবে—

—আমি চুরি করিনি, সে আমায় কিনে দিয়েছে—

আবার চোপরা, বলিয়া গিন্নি হাতের পাখাটা সজোরে সুধার পিঠে ছুঁড়িয়া মারিলেন,—বল্, কোত্থেকে এনেছিস্?

ছোট বৌমা দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি ধীরে বলিলেন,—মা, আজ বছরকার দিন—

—তুমি ত বল্লে বৌমা, বছরকার দিন, এদিকে যে মেয়ে আমার চুরি করে এলো, আমরা যে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না—

—আমি চুরি করিনি, বুড়োদা—আমি কাপড় ফিরিয়ে দিয়ে আস্ছি—

—আবার তেজ দেখ, বল্লেই হল ধনপতি সেকরা দিয়েছে, আর আমি বিশ্বাস করব—ওরে অত সহজ নয়—বল্—

পারুল সুধার পাশে ঘুরিয়া ততক্ষণ রাগে ফোঁস্‌ফোঁস করিতেছিল, গিন্নি গর্জ্জন করিতে সেও দাঁত মুখ খেঁচাইয়া গর্জ্জন করিল।

—ও বাবা, এও শাসন করতে আসে—অলুক্ষুণে—কামড়াবে নাকি রে—বলিয়া মেজে হইতে পাখাটা তুলিয়া গিন্নি সজোরে তাহার পিঠে বসাইয়া দিলেন।

—কেন আমার বেড়ালকে মারছ?

—মারবে না! বেশ করব, মারব—তোর বাড়ী?

পারুল যত দাঁত বাহির করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল, তাহার পিঠে পাখার ঘা ততই পড়িতে লাগিল।

ওমা, আমার বেড়ালকে মেরে ফেল্লে গো বলিয়া আহত পারুলকে কোলে তুলিয়া সুধা বলিল,—চাই না থাকতে তোমার বাড়ীতে—চাই না—

—চাই না. কোন্ চুলো আছে?

—আমি চাই না থাকতে—পারুল, বড্ড মেরেছে?

পারুলকে বুকে জড়াইয়া সুধা চলিয়া গেল। পানে জর্দ্দা পুরিতে পুরিতে গিন্নি বলিলেন—স্বর্ণ, কাপড়খানা রাখ ত, দেখ ত বৌমা, মেয়েটা সত্যি আবার রাস্তায় বেরিয়ে না যায়।

ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হইত, কিন্তু হইল না। স্বর্ণ রিপোর্ট দিল শুধু শাড়ী নয়, সুধা আরও অনেক পুতুল খেলনা আনিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে গিন্নি সুধার ঘরে আসিয়া হাজির হইলেন। সুধা পারুলকে কোলে করিয়া আদর করিতে-ছিল। গিন্নি বলিলেন—সুধি, যা, নীচে গিয়ে খোকার ঝিনুক আর বাটি ধুয়ে দুধ নিয়ে আয়—

—আমি পারব না।

—পারব না! গিল্‌তে পার!

—আমি কি ঝি!

—না রাজরাণী! ওঠ্—

সুধা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল দেখিয়া গিন্নি বলিলেন—দেখি, আর কি সব পুতুল খেলনা এসেছে। সুধা গোঁ হইয়া বসিয়া রহিল। গিন্নি নিজেই তাহার ছোট বাক্স খুলিলেন. খেলনাগুলির পাশে তাঁহার দেওয়া পুরাতন শাড়ীখানি প্রথমেই চোখে পড়িল; তুলিয়া লইয়া দেখিলেন ছেঁড়া, কেউ ইচ্ছা করিয়া ছিঁড়িয়াছে। ক্রোধে জ্বলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—কে ছিঁড়েছে কাপড়, কে?

ভীত লজ্জিতভাবে সুধা বলিল—পারুল খেলতে খেলতে—

—খেলতে খেলতে—ওরে হতভাগী, বলি যার খাবি যার পরবি—অত দামী কাপড়—পারুল—অলুক্ষুণে—দূর হ—

রাগিলে গিন্নির জ্ঞান থাকে না, তাঁহার মোটা দেহ-খানি কাঁপাইয়া তিনি যে এবার কি করিবেন কেহ বুঝিতে পারিল না। সম্মুখে একটা লোহার ভাঙ্গা সিক পড়িয়া ছিল; ক্রোধকম্পিত হস্তে তাহা তুলিয়া লইয়া পারুলকে এক খোঁচা দিলেন। আত্মরক্ষা করিবার জন্য অসহ্য বেদনায় গর্জ্জন করিয়া পারুল গিন্নিকে কামড়াইতে আসিল। গিন্নি সজোরে আর এক খোঁচা দিলেন।

—ওগো, আমা বেড়াল মেরে ফেল্লে গো—

—দূর হ—দূর হ!—

দূর হচ্ছি—বলিয়া সুধা পারুলকে কোলে তুলিয়া বুকে জড়াইয়া নিমেষের মধ্যে ঘর ছাড়িয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া সদর দরজা পার হইয়া পথের অন্ধকারে বাহির হইয়া গেল।

ছয়।

ভোরবেলায় ধনপতির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে স্বপ্ন দেখিতেছিল, তাহার সুসজ্জিত বৃহৎ বাড়ীতে পূজার ধূমধাম, বৈঠকখানায় বন্ধুদের গল্প হাস্য, অন্দরমহলে কর্ম্মরতা বধূদের বলয়ধ্বনি, মৃদুগুঞ্জরণ, প্রাঙ্গণে নিমন্ত্রিত লোকেরা খাইতে বসিয়া গিয়াছে, চারিদিকে ছোট ছেলে-মেয়েরা ছুটোছুটি গোলমাল খেলা করিতেছে, ঘরে ঘরে ঝাড় লণ্ঠন জ্বলিতেছে, নহবৎ বাজিতেছে। ধনপতি পূজার দালানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, মায়ের কি অপরূপ রূপ!

ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া চোখ মেলিতেই দেখিল, অন্ধকার, সব অন্ধকার, তাহার অন্ধকার বিজন স্তব্ধ লোহার শিকের ঘর। তাহার যেন দম আট্‌কাইয়া যাইতেছে। কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া ঝন্‌ঝন্ করিয়া লোহার দরজা খুলিয়া ধনপতি ভাঙা পূজার দালানের দিকে ছুটিল। ভোরের আলোয় পূজার দালান রহস্যময় মায়াপুরীর মত দেখাইতেছে।

দালানের যেখানে প্রতিমা স্থাপিত হইত, তাহারি সম্মুখে ধনপতি ছুটিয়া আসিল; ভূমিষ্ঠ হইয়া মায়ের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া উঠিয়া বসিতেই সে চমকিয়া উঠিল, এ কি তাহার সম্মুখে! এ কি আলো-অন্ধকারের মায়ালীলা? লাল কাপড়ের ওপর কালো চুল ঝিকমিক করিতেছে। একটু অগ্রসর হইয়া সে বিস্ময়ে আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল,—মা, মা, এসেছিস—ফিরে এলি মা—

শূন্য ঘরে ঘরে সে আনন্দধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তাহার শুদ্ধচারিণী বোন ঘরের দরজায় গোবরজল ছড়া দিয়া ঘুরিতেছিলেন; তিনি আশ্চর্য্য হইয়া ছুটিয়া আসিলেন।

—কি দাদা, কে মেয়ে শুয়ে? একটা বেড়াল! এ, মা! তাড়িয়ে দাও—আমি ওখানটা গোবর নেপে দি—

—দেখ্ দেখ্ মা আমার ফিরে এসেছে—তুই বল্‌ছিলি আবার পূজা করতে—মা কি ভুলে থাকতে পারে? মা এসেছে—

দীপ্তমুখে আনন্দে কাঁপিতে কাঁপিতে ধনপতি ঘুমন্ত সুধা ও পারুলকে কোলে তুলিয়া তাহার ঘরের দিকে চলিল।

সাত।

বিজয়া-দশমীর সন্ধ্যা। বাড়ীর ছেলেমেয়েরা প্রতিমা-বিসর্জ্জন দেখিতে গিয়াছে। গিন্নি ছাদে খোকাকে কোলে করিয়া বসিয়া সুধার কথা ভাবিতেছিলেন। মেয়েটাকে তিনি বকিতেন ঘাটাইতেন বটে, স্নেহও যথেষ্ট করিতেন। সে রাত্রে বিড়ালটাকে অত না মারিলেই হইত, কিন্তু বেড়ালটা তাঁর দুই চক্ষের বিষ; আর একটু মার খাইয়াছে বলিয়া ছোট মেয়ের অত কি রাগ—সে ত মরিয়া যায় নাই।

ধীরে সুধা আসিয়া গিন্নির দুই পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিল,—জেঠাইমা, আমি এসেছি।

সে একখানি লাল টুকটুকে শাড়ী পরিয়াছে, তাহার মুখ মলিন, নয়, লক্ষ্মীঠাকুরণের মত সুন্দর, স্নিগ্ধোজ্জ্বল।

গিন্নি তাহার দিকে স্নেহের সহিত চাহিয়া বলিলেন—আয় মা, ছেলেমানুষ অত রাগ কি করে?

গিন্নির পাশে বসিয়া সুধা একটু লজ্জিতভাবে বলিল—দাও না জেঠাইমা খোকাকে আমার কোলে, ওর জন্যে আমার সমস্ত সময় মন কেমন করে।

খোকাকে কোলে লইয়া আদর করিতে করিতে সুধা বলিল—হাঁ, জেঠাইমা, আমার মা নাকি ওই বুড়ো দাদার কোন্ বোনের মেয়ে?

—হাঁ, সে আমি শুনেছি।

—ও তাহলে সত্যি আমার দাদা? আমি তাহলে কোথায় থাকব জেঠাইমা?

—সে তোমার যেখানে ইচ্ছে।

—না, তুমি বলে দাও জেঠাইমা, আমি কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারলুম না।

—তা ওরা তোমার নিজের লোক, তুমি হলে ওদের নাতনী, সেখানে কত আদর যত্ন পাবে—

—হাঁ, জেঠাইমা, আমায় কিছুতেই ছাড়তে চায় না, কিন্তু তোমাদের জন্যে মন কেমন করে যে—আচ্ছা খোকাকে রোজ দেখতে আসতে পারব? পা-টা অমন করছ কেন, কামড়াচ্ছে বুঝি, মালিস করে দেব?

—না, থাক্, তোকে ত বেশ সুন্দর কাপড় দিয়েছে।

চাকর আসিয়া খবর দিল এক বুড়াবাবু খুকীকে ডাকিতেছেন।

সুধা চঞ্চল হইয়া বলিল—বুড়োদাদা এসেছে, আমি বলে এসেছিলুম এক মিনিটের মধ্যে আসব, তবে ছাড়লে। আমরা ভাসান দেখতে যাব কি না।

খোকাকে চুমো খাইয়া গিন্নির কোলে দিয়া সুধা চঞ্চল-পদে চলিয়া গেল। গিন্নির চোখ একটু ছলছল করিয়া উঠিল; তিনি খোকাকে বুকে জড়াইয়া চুমো খাইলেন।

সদর দরজা পর্য্যন্ত গিয়া সুধার মনে পড়িল ছোট বৌদির সঙ্গে ত দেখা করা হয় নাই। আবার সে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া ছোট বৌদির ঘরে গেল। ছোট বৌদি তাহাকে বুকে জড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, সুধার চোখেও জল আসিল।

চাকর আসিয়া জানাইল বুড়াবাবু বড় ব্যস্ত হইতেছেন। ছোট বৌমা সুধার চোখ মুছাইয়া চুমো খাইয়া একটা মুক্তার মালা তাহার হাতে দিয়া বলিলেন—তোর বুড়োবরের আর যে বিরহ সহ্য হচ্ছে না।

রাঙা মুখে মুক্তার মালা হাতে জড়াইয়া সুধা বলিল—পারুলের জন্যে দিলে ত। বৌদিকে প্রণাম করিয়া ছুটিতে ছুটিতে সে চলিয়া গেল।

গাড়ীতে কোলের কাছে সুধাকে টানিয়া ধনপতি বলিল—এত দেরী করে? জলদি হাঁকাও গাড়োয়ান।

আজ ধনপতির হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। আজ সাজসজ্জা করিতে তাহার লজ্জা হয় নাই। সে লাল জরিপাড় ধুতি পরিয়াছে, সিল্কের পাঞ্জাবী পরিয়াছে, এসেন্স মাখিয়াছে, ষাট বছরের বৃদ্ধ আবার আট বছরের বালক হইয়াছে।

পারুল ধনপতির কোলে গম্ভীরভাবে বসিয়া ছিল; ধনপতির গলায় যে সোণার সরু হার সর্ব্বদা থাকিত সেটি তার গলায় উঠিয়াছে, এই গর্ব্বসুখে সে দীপ্ত। সুধা তাহার গলায় মুক্তার হার জড়াইয়া দিলে সে সেদিকে বিশেষ ভ্রূক্ষেপ করিল না। শুধু একটু লেজ নাড়িল।

আনন্দে অধীর হইয়া ধনপতি সুধার গালে চুমো খাইলেন। অমি পারুল চঞ্চল হইয়া খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিল। অ, হিংসের মরে যাচ্ছো, বলিয়া সুধা পারুলকে বুকে টানিয়া লইল।

আহতা

শ্রীরমলা বসু

দশ বৎসর পরে আবার মধুপুরে এসেছি। মনে পড়ে যাচ্ছে সেই দশ বৎসর আগেকার কথা, যখন এমনি একটী শারদ-সন্ধ্যায় ষ্টেশনে পায়চারী করছিলাম, আর তারি সঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে এক জোড়া কালো চোখের বেদনাভরা অশ্রুপূর্ণ চাহনি,—যে কথা মনে করে আজ এই সন্ধ্যে বেলা সেই দশ বছরের আগের কথা ছবির মত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে। কারণ সে ঘটনাটী মনের পাতে একটা বেদনার রেখা চিরদিনের জন্যে এঁকে রেখে দিয়ে গিয়েছিল। আর বেদনার অক্ষরে, ঘটনাচক্র মনের মধ্যে যে আঁচড় কেটে দিয়ে যায়, তা ছোটই হোক আর বড়ই হোক চির-দিনের জন্যে কখন একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় না। হয়তো শুধু অন্যান্য চিন্তার চাপে কিম্বা মানুষের নিজেরই ভুলবার ইচ্ছায়, মনের ধাপের অনেক নীচে পড়ে থাকে। তার পর হঠাৎ একদিন হয়তো কোন একটী সামান্য ঘটনার স্পর্শে তেমনি স্পষ্ট হয়ে আবার ফুটে ওঠে।

আমি তখন এফ্‌ এ ক্লাসের ছাত্র। কলেজের কয়েকটী বন্ধুর সঙ্গে এখানে ছুটীতে বেড়াতে আসি। বন্ধুটী বর্দ্ধমান জেলার কোন গ্রামের এক জমীদার বাড়ীর ছেলে, আমার সঙ্গে একটু দূর সম্পর্কের আত্মীয়তাও ছিল। তা ছাড়া ছেলেবেলা হতেই খুব ভাব।

আমরা দলে প্রায় সাত আট জন ছিলাম। তার মধ্যে দু তিন জন আমার সমবয়স্ক ছাড়া, আর সকলেই আমার চাইতে একটু বয়সে বড় ছিলেন। কিন্তু তাহলে কি হয়, তাঁরা সকলেই আমাদের সঙ্গে সমানে ফাজলামী ও ইয়ার্কীতে যোগ দিতেন। আমাদের মধ্যে তখন, এক বড় দাদা ছাড়া আর কারুর বিয়ে হয়নি। তিনি যা কিছু একটু অন্তঃপুর-মুখো হতেন, তা ছাড়া সে অঞ্চলের সঙ্গে আর কারুর বড় একটা সম্পর্ক ছিল না। ঠানদিদি ও বড় পিসীমা মাঝেমাঝে অনুযোগ করে পাঠাতেন "খাবার সময়টুকুও কি বাড়ীমুখো হতে নেই? এখানে এসে অবধি তোদের টিকি পর্য্যন্ত কি দিনান্তে একবার দেখতে পাব না?"

সতীশ ছিল ভারী মুখর, সে তখনি উত্তর দিত; "টিকিশুদ্ধ আসল মানুষটীকেই ভেতর বাড়ীতে সমস্তক্ষণ দেখতে পাবে, যদি টিকি বাঁধবার খুঁটীর জোগাড় কর আগে। বড় দাদাকে দেখ না, কি ছুতোয় নাতায় বাড়ীর ভেতর ঢুকতে পারলে বাঁচে এখন,—সে ভেতর থেকে খুঁটীর টান পড়ে বলেই তো।" ঠানদিদি হেসে উত্তর দিতেন "সতুর সঙ্গে পেরে ওঠবার যো নেই। তা ভাই, এ সাঁয়োতাল মুলুকে আমি এখন সে খুঁটীর জোগাড় করি কোত্থেকে? তা না হয়, দুটো চুলই পেকেছে, দুটো দাঁতই পড়েছে, এই বুড়ো খুঁটীকে যদি মনে ধরে, তবে সে তো ঘরেই আছে।"

"বুড়ো খুঁটীর সে জোর থাকলে তো, আমার টিকি বাঁধবে—" বলে সতীশ হেসে পালিয়ে যেত।

বেশ আমোদেই দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল। কলি-কাতায় পড়ার চাপ, কলেজের রুটীন মত কাজ, আর সব-তাতে সে একটা বাঁধাবাঁধি ভাবের পর, এ উন্মুক্ত জীবন বড়ই ভাল লাগছিল। কলেজের সঙ্গে যদিও আমার সম্পর্ক খুব কমই ছিল,—আমাদের ক্লাশের নরেনের সঙ্গে আমার বড় বন্ধুত্ব ছিল,—দুটীতে যেন মাণিক-জোড় ছিলাম। কলেজের সকলেই আমাদের loving couple নাম দিয়েছিল। নরেন ছিল খুব কালো রোগা ও লম্বা ধরণের, সেজন্যে সে হয়েছিল কর্ত্তা নামে অভিহিত, আর আমি একটু গোলগাল, তার চাইতে লম্বায় ছোট ও দেখতেও ফর্সা ছিলাম, আমার নাম তাই হয়েছিল "নরেন গিন্নী"। কিন্তু সে সব হাসি বিদ্রূপে আমাদের বড় বেশী এসে যেত না, —দুটীতে সত্যি বড় ভাব ছিল। ছেলেবেলার বন্ধুত্বের মত এখন সরল অকপট জিনিষ বুঝি আর সংসারে নেই মনে হয়। সত্যি নরেনকে আমি খুব ভালবাসতাম। "গিন্নী" নামটী আমাকে মানিয়েও ছিল ঠিক, কারণ আমার স্বভাবটা অনেকটা মেয়েলী ধরণেরই ছিল। আমি তাদেরই মত যাকে ভালবাসি তাহার স্নেহের এক কণাও কাকেও ছেড়ে দিতে রাজী ছিলাম না। নরেনও আমাকে খুব

ভালবাসলেও, সে বেচারা বড় মিশুক ছিল,—কলেজের অনেকের সঙ্গে তার ভাব ছিল। কিন্তু সেজন্যে অনেক সময় তাকে মুস্কিলে পড়ে যেতে হয়েছে—,তার সঙ্গে আমার অনেক অনর্থক ঝগড়ারও সূত্রপাত হয়েছে।

হয়তো কোন ছেলের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করতে দেখে, হঠাৎ আমার রাগ হয়ে যেত। তার পরই কথা বন্ধ, মান-অভিমানের পালা সুরু হোত।

কলেজে থাকতে দুই বন্ধুতে মিলে কত যে দুষ্টামী করেছি, কত যে প্রফেসরদের জ্বালাতন করেছি, তার ইয়ত্তা নাই।

যখন বি-এ ক্লাশে পড়ি, তখন একবার আমাদের দুজনের মধ্যে স্থির হল,—সপ্তাহে তিন দিন সে আমার হয়ে ও বাকি তিন দিন আমি তার হয়ে Proxy হব। আমরা দুটীতে ইচ্ছে করে সব সময় শেষের বেঞ্চিতে বসতাম। সেখানে বসে প্রফেসরদের চোখে ধূলো দেবার সুবিধা হত কি না, তাই। সেই সময় আমাদের এক ফিলজফীর প্রফেসর আসেন; তিনি Proxy সম্বন্ধে বড়ই লক্ষ্য রাখতেন। একদিন যখন নরেন ক্লাশে নেই, তখন তার নাম ডাকলেন

"—Norendranath Ray"

"Present sir !" বলে আমি উত্তর দিলাম।

"I want to see Norendranath Ray, stand up, please"

আমি সটান দাঁড়িয়ে উঠলাম। নরেনের সেই তাল গাছ প্রমাণ ৬ ফিট ৬ ইঞ্চি দেহের পরিবর্ত্তে নিজেকে দাঁড়াতে দেখে নিজেরি হাসি পেতে লাগল। প্রফেসর তাঁর নাকের ওপর চশমাটা ভাল করে খাড়া করে আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে বল্লেন "Are you sure, you are Mr. Ray"

আমি মহা বিরক্তির সহিত উত্তর দিলাম, "তা আর জানি না sir ! কলেজে পড়ি বলে কি বাপমায়ের দেওয়া নামটাও ভুলে যাব?" এমন সময় দেখি, নরেনটা এসে উপস্থিত। সে তার নির্দ্দিষ্ট স্থানে আমার পাশে গিয়ে চুপটী করে বসল। আমি তাকে চিমটী কেটে বল্লাম "দেখ্ হতভাগা, তুই এখন হিরণকুমার বোস জানলি?" এমন সময় ডাক এলো "Hirankumar Bose" নরেন "Present sir" বলে উঠল। প্রফেসরটী কতক্ষণ তার দিকে কটমট দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন মাত্র, কিন্তু আর কিছু বল্লেন না। তার পর-দিন হতে দেখি, তিনি আমাদের দুজনকে বিশেষ নজরে রেখেছেন। অতএব এক সপ্তাহের জন্যে; ক্লাশে বাহিরে সব স্থানে, আমি হলাম নরেন ও নরেন হোল হিরণ। তার পর কখন যে আমরা স্ব স্ব নাম পুনরায় অধিকার করে বসলাম, বেচারা প্রফেসরের তা খেয়ালেই আসল না। এই রকম নানা ফন্দী নানা দুষ্টামীর অনাবিল আনন্দে দিন কেটে গিয়েছে। এখন ভাবি, সেই অকৃত্রিম প্রণয়, সেই এক মুহূর্ত্ত না দেখলে অস্থির ভাব, সে গলাগলি বন্ধুত্ব সংসারের চাপে পড়ে কোথায় ভেসে গেল?

যাক, এক কথা কইতে গিয়ে, অনেক কথা এসে পড়ল। মধুপুরে সে পূজোর ছুটীটা বড়ই আনন্দে কেটে যাচ্ছিল। সকাল হতে সে উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে ছুটোছুটি, সেই পাহাড়ে ঝরণা দেখতে যাওয়া, সেই শান্ত সাঁয়োতাল পল্লীর ভিতর দিয়ে যাওয়া-আসা, আবার কখন কখন নিকটস্থ পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়া, সবই একটা নিরাবিল আনন্দের স্রোতে ভরা। ভারী আমোদেই দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল। এমন সময় সরলদাদা এক ফ্যাঁসাদ বাধিয়ে বসল।

আমাদের বাড়ীর ঠিক পেছনেই জানানা মিশনের মস্ত এক কম্পাউণ্ড ছিল। সেইখানে সকাল সন্ধ্যায় দলে দলে সব স্কুলের মেয়েরা বেড়িয়ে বেড়াত। আমাদের দেওয়ালের কাছেই একটা লতাপাতা-ঘেরা কুঞ্জের মত ছিল; মিশন হাউসটা থেকে সেটা বেশ খানিকটা দূরে ছিল; সেখান থেকে কুঞ্জের গতিবিধি কিছু দেখা যেত না। সরলদাদার ঘরের জানলা আবার ঠিক এর ওপরেই ছিল।

কয়েকদিন থেকে আমরা ছোটর দল সব টের পাচ্ছিলাম, কি একটা কাণ্ড যেন ভেতরে ভেতরে চলছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করলেই ধমক খেতাম। হঠাৎ তাঁরা সব খুব "দাদাগিরি" ফলাতে সুরু করে দিলেন। এতে আমাদের কৌতূহল আরো বেড়ে যেতে লাগল, আর আমরাও তলে তলে সন্ধানে রইলাম যে ব্যাপারখানা কি?

একদিন আমি আর জিতেন সেই ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় শুনতে পেলাম, যেন মেয়েদের গলার চাপা হাসি দেওয়ালের অপর পার হতে বাতাসে ভেসে আসছে। দেখি, ঘরের দরজা খোলা রয়েছে, অমি দুজনে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। ইদানীং সরলদাদার ঘরের দরজা প্রায় বন্ধ থাকত। সেখানে গিয়ে দেখি, জানলার

সামনে দাঁড়িয়ে সরলদাদারা কয়জনে খুব রুমাল উড়াচ্ছে। জানলার কাছে এসে নীচে চেয়ে দেখি, একদল নেটীভ ক্রিশ্চান মেয়ে, হেসে হেসে পরস্পরের গায়ে ঢলে পড়ছে। জীতেনটা এদের সকলের মধ্যে চুপচাপ ছিল, এ রকম ইয়ার্কী সে মোটে পছন্দ করত না। সে তো মহা খাপ্পা হয়ে উঠল, বল্ল, "দেখ সরলদা, এসব আবার কি আরম্ভ করেছ? এ সব আমার মোটে ভাল লাগে না। দাদা-মশাই টেরটী পেলে তখন মজা দেখতে পাবে এখন।"

এরকম একটু আধটু ইয়ার্কী তামাসাতে সবাই আমরা যোগ দিতাম বটে, কিন্তু কয়দিন পরে সত্যি দেখলাম, একটী মেয়েকে নিয়ে সরলদা বড়ই বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে। রীতিমত তাকে নিয়ে নাচিয়ে তুলেছে। যখন তখন লুকিয়ে চিঠি পাঠান হতে আরম্ভ করে, জানালা গলিয়ে ফুলের তোড়া, রুমাল ইত্যাদি ফেলা, সবি আরম্ভ করে দিল। সরলদাদার মনটি বরাবরই একটু সুন্দর মুখের দিকে টলে;—এ মেয়েটা দেখতে মোটেই সুশ্রী ছিল না, কেন যে সে তার পেছনে এমন করে লাগল বুঝতে পারলাম না।

সরল দাদার যাই উদ্দেশ্য থাকুক না কেন, মেয়েটী যে সত্যি ক্রমশঃ তার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল, তা তার মুখের ভাব দেখলেই বেশ বোঝা যেত। আমরা সরল দাদাকে এর পরিণামের জন্যে কত সাবধান করে দিতাম, কিন্তু সে সবই হেসে উড়িয়ে দিত।

এই রকম করে এক মাস কেটে গেল,—দেখতে দেখতে আমাদের কলকাতা রওনা হবার দিন এসে পড়ল। দুই-খানা ফার্ষ্ট ক্লাশ রিজার্ভ করা হোল। তখন বিকাল পাঁচটার সময় কলকাতার ডাউন এক্সপ্রেস ছাড়ত। একটু সময় থাকতেই সদলবলে ষ্টেশনে যাত্রা করা গেল। ষ্টেশন লোকে লোকারণ্য। আশ্বিনের ছুটীর আর মাত্র দু এক দিন বাকী ছিল। সকলেই যে যার কর্ম্মস্থলে ফিরে যাবার জন্যে ব্যস্ত।

হঠাৎ এক জায়গার চোখ পড়ে গেল,—দেখি, সর্ব্বনাশ! সেই মেয়েটী ষ্টেশনের প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে আছে। আমি সরল দাদার কাছে এগিয়ে গিয়ে, হাতে একটু চিমটী কেটে বল্লাম, "ঐ দেখ, কে দাঁড়িয়ে আছে। বড় 'লভ' করতে গিয়েছিলে, এবার 'ফেয়ার-ওয়েল' কর গিয়ে ভাল করে। আর এখন যদি দাদামশায়ের কাছে ধরা পড় তো, তবে টেরটী পাবে এখন।"

দেখলাম, সরল দাদার মুখটা ভয়ে শুকিয়ে গেল। "চুপ কর্ রাস্কেল" বলে সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে পায়চারী করতে লাগল। আমাদের সকলেরি বুক অল্প-বিস্তর ভয়ে দুড় দুড় করছিল; কারণ, মেয়েটী সকলকেই চেনে। এখন যদি কারুর সঙ্গে এসে কথা জুড়ে দেয়, আর যদি বা আমাদের নামে দাদামশায়ের কাছে নালিশই করতে এসে থাকে,—তবে যে সকলেই মজা টের পাব! এসব নেটীভ ক্রিশ্চান মেয়েরা যে রকম সপ্রতিভ,—ওদের অসাধ্য কিছুই নেই।

মেয়েটী কিন্তু যে স্থানে দাঁড়িয়ে ছিল, সে স্থান হতে নড়বার তার কোনই লক্ষণ দেখা গেল না। শুধু সে তার চক্ষু দুটী দিয়ে যেন সরলকে গ্রাস করবার চেষ্টা করছিল। যেখানেই সরল ঘোরাঘুরি করছে, সেখানেই তার অনিমেষ দৃষ্টি তার পাছু-পাছু ঘুরছে; যেন সে দৃষ্টি কিছুতে ফেরাতে পারছিল না,—সরলের অবয়বের প্রত্যেক অঙ্গ যেন সে মনের মধ্যে চির-অঙ্কিত করে রাখবার চেষ্টা করছিল।

কিছুক্ষণ পরে দাদামশাই মেয়েদের নিয়ে ষ্টেশনে এসে হাজির হলেন, ট্রেণও এসে হাজির হোল। দেখা গেল, দুখানি রিজার্ভ গাড়ী ট্রেণের ঠিক দুই প্রান্তে। একটাতে দাদামশাই মেয়েদের নিয়ে গিয়ে বসলেন। তাঁর টেকো মাথাখানি গাড়ীর ভেতর অদৃশ্য হতেই, আমরা যেন সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেল্লাম।

মেয়েটী দেখি, তখনও সেইখানে দাঁড়িয়ে আছে, এক একবার যেন কিসের জন্যে ইতস্ততঃ করছে,—আর উৎসুক দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। বুঝলাম, সরলের সঙ্গে একবার কথা বলতে চায়; কিন্তু আমাদের এত জনের মধ্যে আসতে লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ করছে। আমার বড় দুঃখ বোধ হতে লাগল। তখনও ট্রেণ ছাড়বার অল্প দেরী ছিল। আমি সরল দাদার কাছে গিয়ে বল্লাম, "আহা, যাও না একবারটী বেচারীর কাছে,—একটা কথা একবার বলে এসো না।"

সে শুধু একটা মুখভঙ্গি করে অন্য দিকে ফিরে দাঁড়াল। এমন সময় ট্রেণের শেষ হুইস্‌ল্ পড়ে গেল, আমরা যে যার হুড়োমুড়ি করে গাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। যখন শান্ত হয়ে বসে জানলা থেকে মুখ বার করে দেখলাম, তখন ট্রেণটা ষ্টেশনের কাছেই একটা বাঁক নিচ্ছে। তখনও

full speed এ চলতে আরম্ভ করেনি,* এবং সে স্থান থেকে প্ল্যাটফরমটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সেখানে রেলিংএর ওপর ভর দিয়ে সেই মেয়েটী তখনো অশ্রু-কাতর চক্ষে আমাদেরই গাড়ীর দিকে তাকিয়ে আছে। এমন সময় সরলের সঙ্গে চোখোচোখি হতেই, সে একটা বিকট মুখ-ভঙ্গি করল। নিমেষে মেয়েটীর সমস্ত মুখে যেন কে কালিমার ছায়া মাখিয়ে দিয়ে গেল,—যেন কে তাকে চাবুক মেরেছে, এ রকম ভাবে সে চমকে উঠল। তার চক্ষে যে জ্বালাময় আহত দৃষ্টি ফুটে উঠল—তা চলন্ত ট্রেণের গতি হতে শুধু এক নিমেষের জন্যে দেখতে পেলাম। তার পর চিরদিনের জন্যে মেয়েটীর মুখ আমাদের দৃষ্টিপথ হতে অতীতের গর্ভে নিমজ্জিত হয়ে গেল। কিন্তু আজও সে দৃষ্টিতে বাণ-বিদ্ধা হরিণীর তীব্র আঘাতের বেদনার যে ভাব ফুটে উঠেছিল, তা ভুলতে পারি নি,—ইহজীবনে বোধ হয় কখনও পারব না। সরল দাদার ওপর বড় রাগ হোল। আমি রাগ সামলাতে না পেরে বলে উঠলাম,—তখন, সে যে বয়সে বড়, সে খেয়াল মোটেই রইল না,—"সরলদা, বাঁদরামোর যথেষ্ট চূড়ান্ত কি কর নি? তার ওপর এ কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে এ অসভ্যতা কি না করলেই হোত না?"

সরলদাদাও রেগে উত্তর দিল,—"তুই কি ভেবেছিলি, ওটাকে বিয়ে করে আমি ঘরের বৌ করে নিয়ে যাব?"

"তা তো নয়ই। কিন্তু তাই তো বলেছিলাম,—অত বাড়াবাড়ি করবার কি দরকার ছিল? এ আগুন নিয়ে খেলা করবার কি দরকার ছিল? তখনি তো তোমায় আমরা কত মানা করেছিলাম। মানুষের হৃদয়টা কি খেলা করবার জিনিষ? তোমার কাছে হয় তো খেলা মাত্র, অপর পক্ষের কাছে তা হয় তো জীবন-মরণেরি ব্যাপার। তার পর তখন যদি না বুঝে না শুনে এতটা করেই ফেলেছিলে, তবে তার স্নেহাতুর আহত প্রাণে, নিজের পুরুষত্ব ফলিয়ে, এ দারুণ নিষ্ঠুর রূঢ় ব্যবহারে, এই আঘাত তাকে শেষ পুরস্কার দিয়ে আসবার কি দরকার ছিল? সে তো তোমার কাছে কিছুই দাবী করতে আসে নি। শুধু প্রাণের অসহ্য টানে,—শুধু শেষবার-কার মত,—যে পাষণ্ডকে তার বালিকা প্রাণের সব নৈবেদ্যটুকু নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছে—একবার তাকেই জন্ম-শোধ দেখতে এসেছিল।"

সরল দাদা আমাকে "যাঃ—যাঃ, অত কবিত্ব ফলাতে আর preach করতে হবে না"—বলে ঠেলে ফেলে দিল। কিন্তু দেখলাম, সে একেবারে অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে বসে রইল। সেদিন সারাটা পথ যেন আমরা সকলেই দমে গেলাম। সকলেরি মনে একজোড়া মিনতি-ভরা চক্ষের ব্যাকুল আহত দৃষ্টি দারুণ আঘাত দিচ্ছিল।

হিন্দুসমাজ

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

(গান)

হিন্দুসমাজ-শিখরে যে আজ ধর্ম্ম-নিশান ওড়ে না আর!
এ হীন সজ্জা—এ ঘোর লজ্জা—ঢেকে দে গভীর অন্ধকার!

পচে গেছে আজ হিন্দুসমাজ, মরে গেছে আজ মানুষ তার!
এ মহাপাপীকে আত্মঘাতীকে কেন মা বসুধা রেখেছ আর!
হিন্দুসমাজ হইতে তাহার নেমে গেছে এক গরিমা হায়!
যত 'নীচ' জাত্ হইতে যে-জাত্ হানিয়া লগুড় ছাড়িয়া যায়!

ছেলে বেচে 'পণ' নিতেছে ভীষণ, বুড়াদেরে করে গৌরী দান;
নাহি কোন সুখ, গোপনে অসুখ বাড়ায় তরুণী নাশিতে প্রাণ!
দুদিনে ফতুর, মুছিয়া সিঁদুর শাঁখা ভেঙে করে আর্ত্তনাদ!
কচি বিধবার ম্লান আঁখি-ধার আনিয়াছে আজ এ অবসাদ!

হিন্দু ভবন বিষাদ মগন, হতেছে বিজন নগর গ্রাম;
পুরনারী সব মলিন নীরব, শিশুর মৃত্যু অবিশ্রাম!

নাহি কিছু আর, আছে ব্যভিচার, জাত্-মারা নিষ্কর্ম্মা বীর;
নাহি গলাগলি, বড় দলাদলি, আলোচনা শুধু পরস্ত্রীর!

কি ওঁছা আচার! কিবা আছে আর!
ভাতের হাঁড়িতে জাতির প্রাণ!
বিধি-নিষেধের টানিতেছে জের,
পুঁজি অতীতের মহিমা গান!
গেছে বাবা সব, আছে ফাঁকা রব, রঘুনন্দন টিকিয়া থাক্!

সমাজের বুকে ভণ্ডরা সুখে গুণ্ডামি করি' চরিয়া থাক্!
ছিল একদিন হিন্দু যেদিন দেশে দেশে গড়ে উপনিবেশ!
আজি জাত্ যায় কথায় কথায়, হিন্দু মরিয়া হইল শেষ!
মৃত্যু নিত্য করিছে নৃত্য, তবু টৈকিক আস্ফালন!
কোথা হেন যোগী সময়োপযোগী ঘটাবে হিন্দু-সম্মিলন!

দেশ-বিদেশ

ডাক্তার শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ মজুমদার গৃহীত আলোকচিত্র—১৯২২ অব্দে গৃহীত

বোটানিকাল গার্ডেন—কলিকাতা

জেনারেল পোষ্ট-আফিস—কলিকাতা
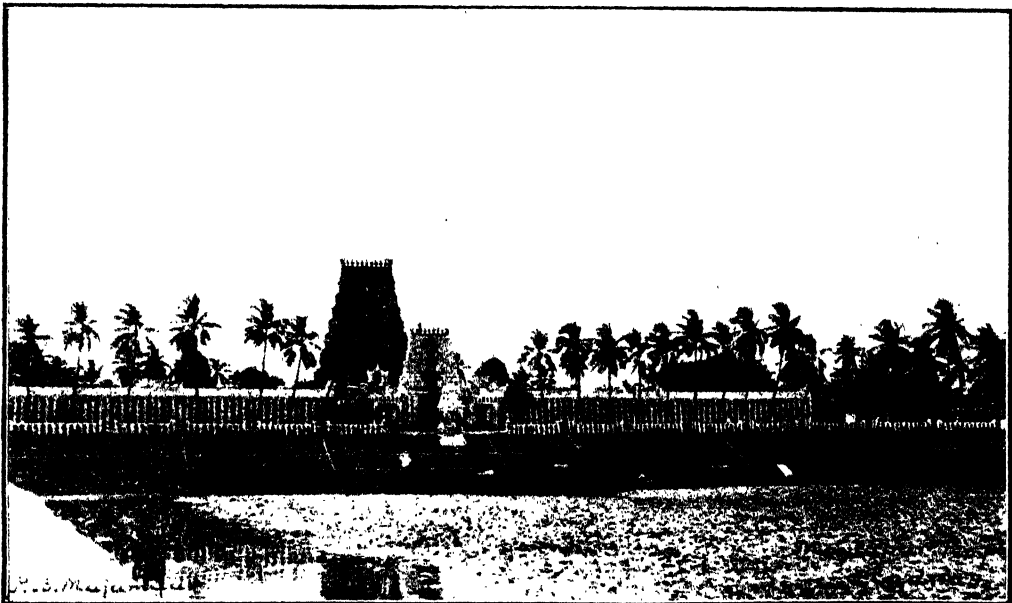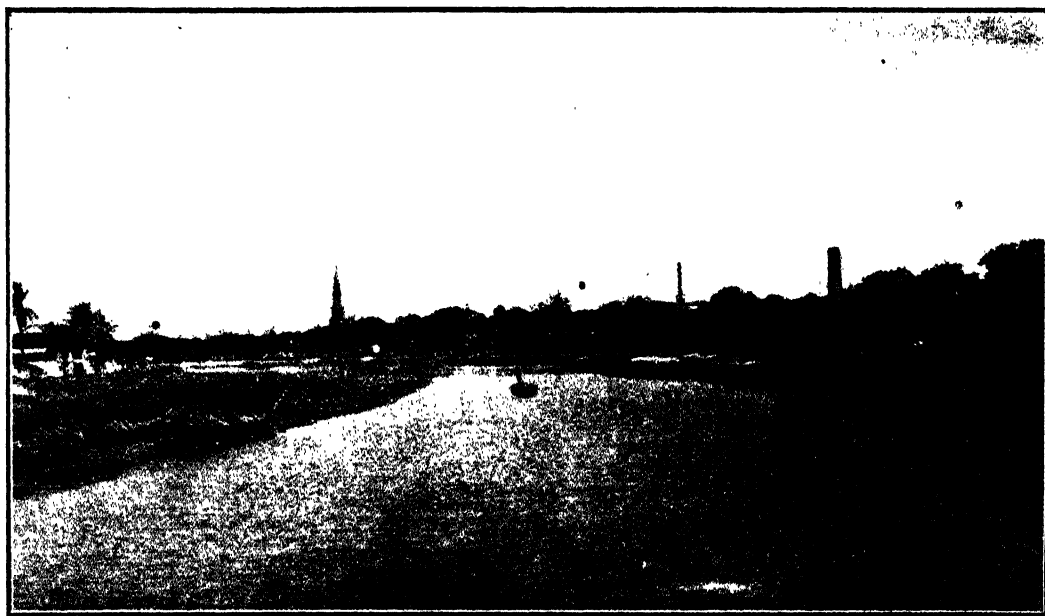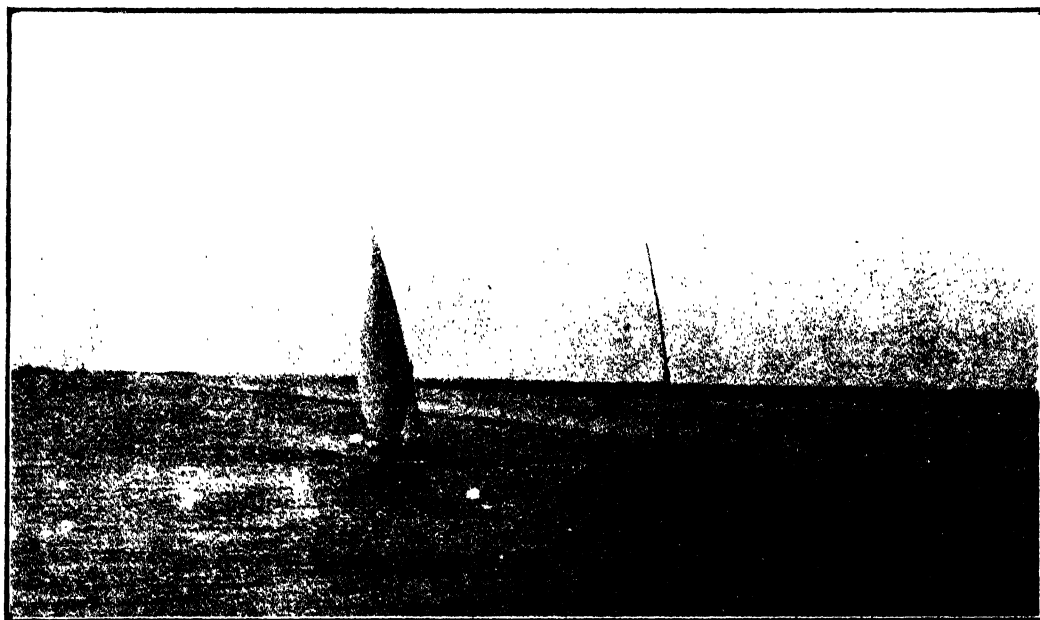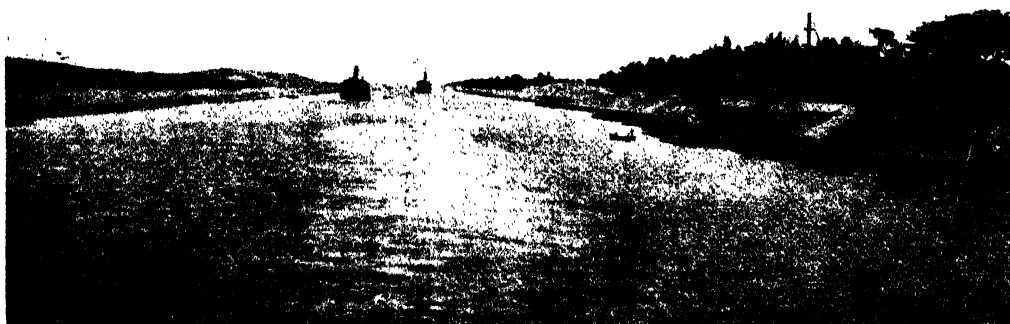
রঘুনাথপুরের দৃশ্য—মানভূম

মায়লাপুরম্ মন্দির—মান্দ্রাজ

মান্দ্রাজের একটা দৃশ্য

সুয়েজ খাল

সুয়েজ খালের মধ্যে ষ্টেসন-গৃহ

হাইড্ পার্ক ও সায়পেণ্টাইন হ্রদ—লণ্ডন

আল্‌বার্ট পার্ক—ইংলণ্ড

ষ্টীন যাদুঘর—আণ্টওয়ার্প (বেলজিয়ম)

ভজনাগার—আণ্টওয়ার্প (বেলজিয়ম)

জিব্রাল্টারের সাধারণ দৃশ্য
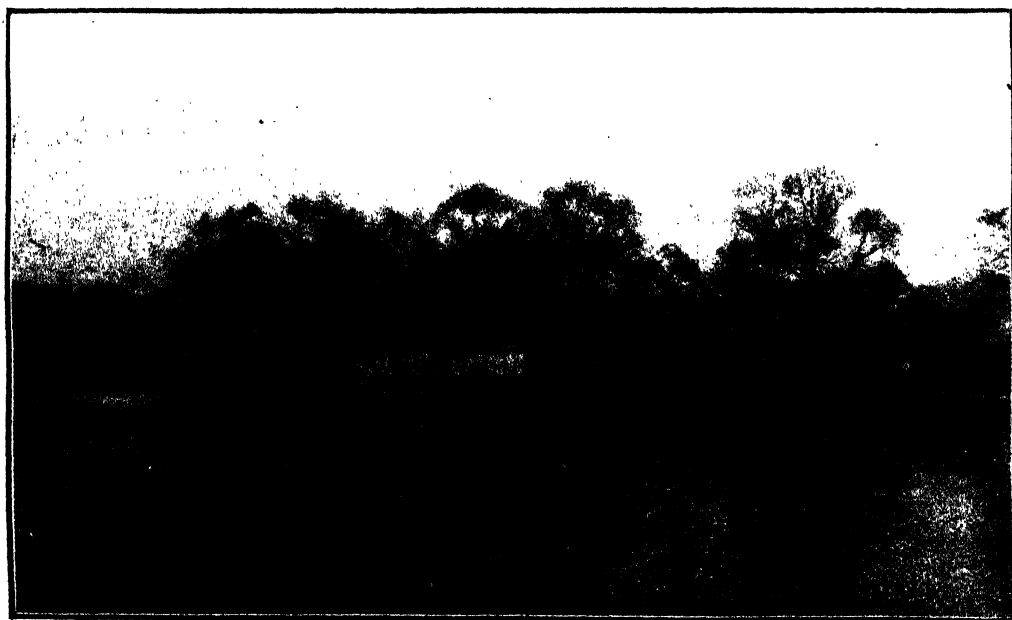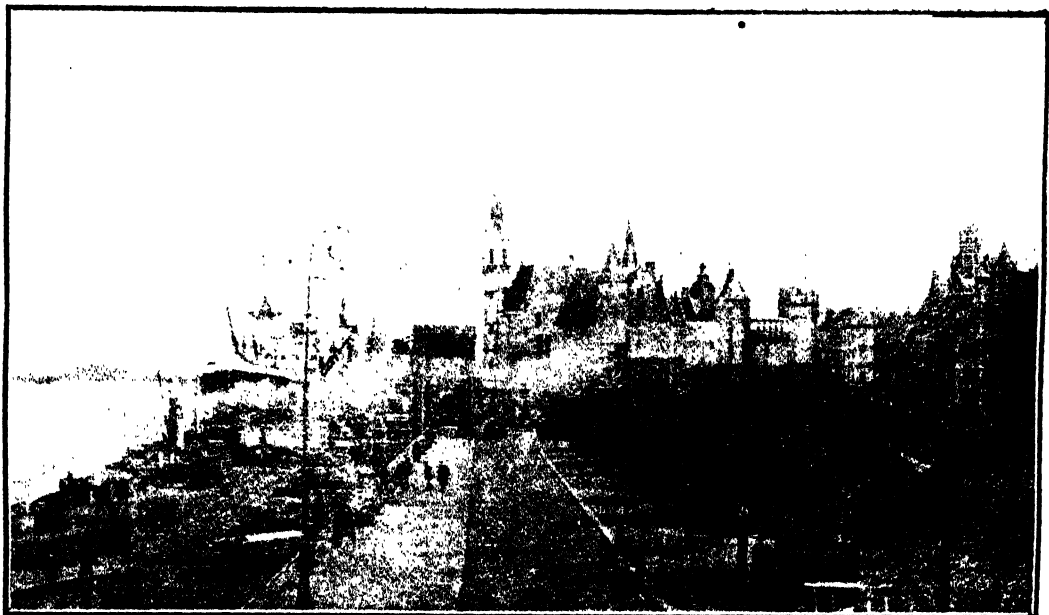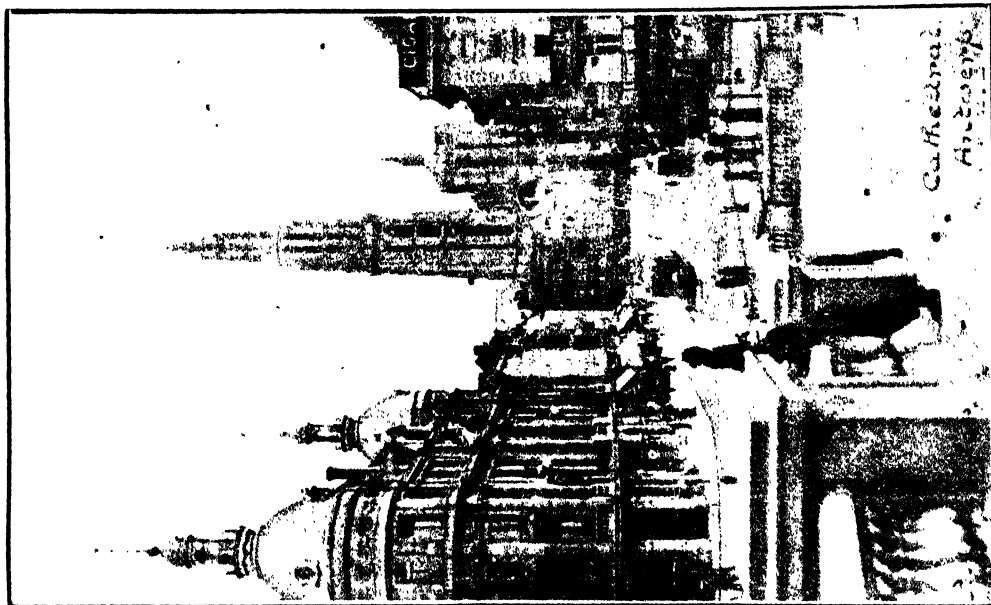
পরের পাপে

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

প্রথম পরিচ্ছেদ

জেলে যাইতে না হয়!

কমলকৃষ্ণ বাবুর দিনগুলি কাটে না।

মানুষের ভাগ্য যখন উল্টা দিকে চাকা ঘুরাইতে থাকে, তখন অবস্থাটা এমনই হয় বটে! দেশে অনেকগুলি কাচ্চা বাচ্চা লইয়া বুড়ী মা ও স্ত্রী অন্নাভাবে বস্ত্রাভাবে প্রাণে মরিয়া আছেন; কমলকৃষ্ণ শহরে থাকেন, অন্নাভাব হইলেও বস্ত্রাভাবটা সেখানে চুরী—ডাকাতি করিয়াও মিটাইতে হয়। শহরে খাও না-খাও—ছেঁড়া কাপড়ে পথে বাহির হইলেই বিপদ!

কমলবাবু আগে-আগে নানা ফন্দি-ফিকির করিয়া কিছু-কিছু রোজগার-পাতি করিতেন—শহরের বাসের খরচ চালাইয়া দেশের সংসারেও টাকা-কড়ি পাঠাইতে পারিতেন। গত কয়েক মাস হইতে কি দুঃসময় যে আসিয়াছে, সে আর বলিবার নয়। লোকটি চাপা,—আর একটু বেশী পান খাইতেন বলিয়া, সহজে কেহ মুখ দেখিয়া অবস্থাটা চিনিয়া লইতে পারিত না।

মেসের বাসায় মধ্যাহ্নকালে তক্তাপোষের উপর জীর্ণ একখানি কাঁথার উপরে শুইয়া কমলবাবু একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা পাঠ করিতেছিলেন। কাগজখানি সকালে দুঃখ-ধান্দা করিয়া ফিরিবার পথে একটি পয়সা ব্যয় করিয়া কিনিয়াছিলেন। এক পয়সায় এতগুলি কাগজ শিশিবোতলওয়ালারাও দিতে পারে কি-না সন্দেহ। আজ আহারাদির হাঙ্গামা ছিল না—গত ক'দিনই ও আপদ বালাই নাই—চারখিলি পান ও মেসের ঝির প্রস্তুত দোক্তা লইয়া কমলকৃষ্ণ বাবু সংবাদপত্র লইয়া পড়িয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে অল্প সংখ্যক যে কয়টি থিয়েটার আছে,—এই সংবাদ পত্রিকাটি তাহাদের সম্বন্ধ প্রায়ই তীব্র আলোচনা করিত;—কমলবাবুর নিকট সেই জন্যই এক পয়সা মূল্যের কাগজখানির এত দাম। বলিয়া রাখা ভাল, তিন বৎসর পূর্বে শিবপুর সনাতন নাট্য-সমাজের প্রধান অভিনেতা ও কেশিয়ার ছিলেন, শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ গুপ্ত। কেশিয়ারিতে দুই পয়সা যে না ছিল এমন নয়; কাজটা থাকিলে এ সময়ে শ্রীযুক্তকে এতটা বিপন্ন হইতে হইত না। সামান্য একটু—যাক্ সে-কথা!

তিনটা বাজিতেই মেসের বাসার ঝি খুব শব্দ করিয়া কতকগুলা বাসন ঝনঝনাৎ করিয়া কলতলায় ঢালিয়া ফেলিল; কমলবাবু উঠিয়া বসিলেন। বদভ্যাস অল্প ছিল না,—তিনটার পর চা একটু পেটে না গেলে দিনটা আর যায় না। কমলবাবু রান্নাঘরের ঘুলঘুলিতে রক্ষিত কেরোসিন তৈলের বোতলটি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আনিয়া ষ্টোভটি তৈলপূর্ণ করিতে যাইতেছেন,—ঝি-বেটি বাসন-মাজা হাতখানা খুব জোরে ঘুরাইয়া, বেশ গোটা কত ভ্রূ-ভঙ্গি করিয়া বলিয়া উঠিল, ও কি কাণ্ড-কারখানা আপনার, কমলবাবু! আপনি তেল নিয়ে যান রোজ চুপি চুপি—আর ঠাকুর আমার নামে দেয় বদনাম। বলে...

কমলবাবুর মেজাজ ছিল অতি শীতল প্রকৃতির। গলার মধ্যে যতখানি সম্ভব মধু পুরিয়া, তিনি মৃদু হাসিয়া কহিলেন—আমি রোজ নিই নে বিধু! আজই কেবল...

ঝি বাসন মাজায় মন দিল; বোধ করি, লোকটির দুরবস্থার সংবাদ সে ইতিপূর্বে শুনিয়াছিল। হইলই বা ঝি,—স্ত্রীলোক ত বটে, হৃদয় কোমল না হইয়া যে যায় না!

কমলবাবু সিঁড়িতে উঠিতেছেন,—কে একজন লোক বলিয়া উঠিল—ঝি, কমলবাবু এ বাসায় থাকেন?

ঝি সিঁড়ির দিকে চাহিয়া ঝঙ্কার দিল,—অ বাবু কে ডাকছে গো, দেখ-সে!

কমলবাবুর শ্যালক, গঙ্গারাম। গঙ্গারাম বিশুষ্ক মুখে উপরে আসিয়া বলিলেন—ভাই, বড় বিপদে পড়েছি,—তোমাকে যা হয় একটা উপায় করতেই হবে।

কমলকৃষ্ণের অধরে একটি ক্ষীণ শুষ্ক হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল; উপায় করিবার লোক তিনিই বটে! মুখে তাহা স্বীকার করিলেন না,—গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসিলেন—কি ব্যাপার?

গঙ্গারাম কহিলেন—আমার "রমণী বিলাস" আল্‌তা জান্‌তে ত ?

জানতুম।

জিনিসটার বাজারে খুব চলন হয়েছিল,—দু'পয়সা পাচ্ছিলুমও ; কিন্তু গেল বছর থেকে এক নাপতের পো কি এক আলতা যে বের করলে, আমারটার বিক্রী আর একটি নেই। অথচ আশায় আশায় দোকানও রাখ্‌তে হয়েছে। লোকজনও ছিল, খরচ-খরচা সবই ছিল। জান ত, একটিও দোকান চালাতে আজকাল কি রকম খরচ বেড়ে গেছে !

তার পর ?

একটা লোকের, ভাই, আট মাসের মাইনে জমেছিল। ব্যাটা ছোট আদালতে ডিক্রী করে এ মাসের টাকাটা পায় নি বলে বডিওয়ারেণ্ট বার করে' ধর্‌ব বলে ঘুরছে। তোমাকে ভাই এর একটা উপায় করতেই হবে।—বলিতে বলিতে প্রৌঢ় বয়স্ক গঙ্গারামবাবু অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্ক কমলবাবুর হাত দুইটি ধরিয়া হাতের মধ্যে চাপ দিতে লাগিলেন।

আমাকে কি করতে বল ?

গঙ্গারাম আকুল স্বরে বলিয়া উঠিলেন—ভাই, টাকা কটি দিয়ে আমায় জেল থেকে বাঁচাও,—পরে যেমন করে' পারি আমি তোমায় দেব।—ভদ্রলোক একটু থামিলেন, আধ মিনিট পরে পুনশ্চ কহিলেন, চল্‌তি জিনিষ, দু'দিন মন্দা হয়েছে বলে বরাবর কি আর অমনি থাকবে !

কমল-বাবু বলিলেন—তা বটে !

গঙ্গারাম একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—বেশী নয় ভাই, পঞ্চাশটি টাকা মাত্তর—তা হলেই এখনকার মত রক্ষে পাই।

কমলবাবু জিজ্ঞাসিলেন—দোকানে মাল নেই ? কম দরে ছেড়ে দিলেও ত টাকাটা পেয়ে যাও।

কিচ্ছু নেই ভাই, কিচ্ছু নেই ! আর কোথেকেই বা থাক্‌বে বল ! একটা বছর সমানে ভেঙ্গে ভেঙ্গে খেতে হচ্ছে,—শিশি-বোতল যা ছিল সব শেষ। বাকী কেবল একখানি সাইন-বোর্ড, খান-দুই প্ল্যাকার্ড—টিনের, আর একখানা মাদুর,—গোটা পঁচিশ ভাঙা ফুটো শিশি!—বলিয়া গঙ্গারাম বুক-ভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ভগ্নীপতিকে চিন্তান্বিত মুখে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া কহিলেন—দোহাই ভাই, অমত কর' না, টাকা কটা ফেলে দাও, নইলে...

গঙ্গারাম !

গঙ্গারাম হাঁ করিয়া চাহিলেন।

ক'দিন পেটে ভাত নেই জান ?

স্বর শুনিয়া আশা-ভরসা গঙ্গারামের নির্মূল হইয়া গেল ; বডিওয়ারেণ্টখানা ঠিক যেন সামনে আসিয়া পড়িয়াছে, এমনি ভাবে সভয় দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

আজ তিন দিন ! তিন রাত্তির ! বুঝলে ভায়া !—কমলবাবু ম্লান হাসি হাসিয়া ষ্টোভটি জ্বালিয়া দিলেন। বার কতক ফচ ফচ করিয়া পাম্প করিয়া দিয়া একটি কলাই-করা বাটীতে জল চড়াইতে চড়াইতে শ্যালকবরের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসলেন চা খাবে ? 'র" কিন্তু,—উইদাউট 'সুগার'।

নাঃ, বলিয়া গঙ্গারাম মাথায় হাত দিয়া বসিলেন।

চা পানান্তে কমলবাবু মধ্যাহ্নের রক্ষিত দুইটি পান ও দোক্তার ঠোঙ্গাটি বাহির করিয়া আবার গঙ্গারামের পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। বলিলেন—সময় যখন খারাপ পড়ে বুঝলে হে গঙ্গারাম।

গঙ্গারাম সবই বুঝিতেছিলেন,—কেবল কি উপায়ে জেল হইতে রক্ষা পাইতে পারেন, সেইটি ছাড়া। হঠাৎ যেন কি একটা কথা মনে পড়িয়া গেল, কমলবাবু—বলিলেন, আচ্ছা, তোমার দোকানের 'গুড্ উইল্' ত একটা আছে,—সেইটা বাঁধা দিয়ে কিম্বা বেচে...

কে নেবে ভাই ! ব্যবসা যখন পড়ে যায়, গুড উইল তার ব্যাড উইল্ হয়ে যায়। আবার যদি সুদিন আসে, তখন আবার গুড্ উইল হবে—এখন একদম ব্যাড উইল !

কমলকৃষ্ণ বাবু কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তার পর সহসা কহিয়া উঠিলেন,—আচ্ছা। দেখ গঙ্গারাম, তুমি কাল সকালে একবার এস,—আমাদের মেসের ধরণীধর বাবুর একটা কিছু করবার ভারি ঝোঁক,—আফিস থেকে আসুন,—তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি। তবে লোকটি বড় সন্দিগ্ধচিত্ত,—হঠাৎ বিশ্বাস কাউকে করে না। তা—আচ্ছা—তা সে এক রকম,—এক কাজ কর, দোকানটা যেন তুমি আমাকে বেচেছ, এমনি একটা লিখে দিও।

এখন দেব ?

এখন না, আগে কথা কই। দরকার হয়, কাল তখন লিখে দিও। কত টাকা বল্লে—পঞ্চাশ ?

হাঁ ভাই! দেখ কমল-দা, জেলে যেতে না হয়।—বাষ্পোচ্ছ্বাসে বেচারার গলাটি বন্ধ হইয়া গেল।

না—না! অত ভাবতে হবে না, যা। কাল সকালে আসিস্।

নিশ্চয় আসিবেন বলিয়া গঙ্গারাম ধীরপদে বাহির হইয়া গেলেন। পথে দুই পা চলেন, চারিদিক চারবার দেখেন, সদা ভয়—জেলে যাইতে না হয়!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভগবান আছেন বৈ-কি!

'রমণীবিলাস' আলতা হঠাৎ বাজারে ধরিয়া গেল। গঙ্গারামের কোন পাত্তা নাই। সেই যে ক'মাস আগে পঞ্চাশটি টাকার দায়ে দোকানটি হস্তান্তরিত করিয়া গেলেন, আর দেখা নাই। কমলকৃষ্ণ বাবু এইটুকু কেবল জানিতেন,—যে-বাসায় গঙ্গারাম স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া বাস করিতেন, সেই বাড়ীর মালিক—জাতে সে লোকটা গন্ধবণিক—গঙ্গারামকে ছোট আদালতের পেয়াদা দিয়া বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। তার পর লোকটা যে কোথায় গেল, কেহ জানে না। আসল বাস তাহাদের নিমতা গ্রামে। সেখানেও যে গঙ্গারাম যায় নাই, তাহার প্রমাণ, গঙ্গারামের যে ভগিনীটী কমল বাবুর গৃহে অধিষ্ঠান করিতেন, তিনিই দাদার ছেলে-মেয়ের সংবাদ লইতে যে খাম লিখিয়াছিলেন, তাহা নিমতা এবং আরও বহু দেশ ঘুরিয়া মৃত ডাকঘরের মার খাইয়া কয়েকমাস হইল ফিরিয়া আসিয়াছে। কমলবাবু আর কি করিবেন, স্ত্রীকে নানা প্রবোধবাক্যে ভুলাইয়া ব্যবসায়-কর্মে মনঃসংযোগ করিলেন।

ধরণীবাবু পঞ্চাশ টাকা গুড্ উইলের জন্য, আরো দুই শত মুদ্রা ব্যবসায়টি চালাইবার জন্য কমলবাবুর হাতে দিয়া, হঠাৎ না-বলা না-কহা একদিন তাঁহার দেশের বাড়ীতে গিয়া মারা পড়িলেন। ধরণীবাবুর ছোট ভাই মেসের বাসার আসবাবপত্রগুলা লইয়া গেল; কিন্তু আড়াইশ' টাকা লইবার কথা মুখেও উচ্চারণ করিল না। ধরণীধরবাবু লোকটি যে কিরূপ উচ্চ ও সদাশয় ছিলেন, কমলকৃষ্ণবাবু মনে-মনে তাহা স্বীকার করিলেন, এবং মঙ্গলময়কে ধন্যবাদ দিলেন।

তাঁহার ধন্যবাদ পাইয়াই হোক, অথবা ভাগ্যচক্র সু-পথে পরিচালিত হইবার দরুণই হোক, রমণীবিলাস আলতা বাজার ছাইয়া ফেলিল। অন্যান্য আলতা-ওয়ালারা বিনা-মূল্যে গাদা গাদা নমুনা পাঠাইয়াও কিছুই করিতে পারিল না। লোকে নমুনায় নমুনায় ঘর ভরাইল, জিনিষ কিনিল না।

এক বছর কাটিয়া গিয়াছে। সে কমলবাবু আর নাই। মলঙ্গা লেনে একশ'টাকা দিয়া একখানি ছোট খাট বাড়ী ভাড়া লইয়া স-স্ত্রীক, স-পুত্র বাস করেন। মা গঙ্গালাভ করিয়াছেন। মেসের রান্নাঘরের কুলুঙ্গী হইতে কেরাসিন অপহরণ করিয়া ষ্টোভ জ্বালিতে হয় না। 'র' ও 'উইদাউট্ সুগারে' চা মনুষ্য-জিহবার অত্যন্ত অনুপযুক্ত—তাহা তিনি মুক্তকণ্ঠে কহিয়া থাকেন। পাণ খাওয়া আজকাল আরও বাড়িয়াছে; তবে দোক্তা খাওয়া তিনি ত্যাগ করিয়াছেন। পরিবর্ত্তে কাশীর কিমাম্ খাওয়া ধরিয়াছেন। এক পয়সার কাগজ পড়া ছাড়িয়া দেন নাই বটে, কিন্তু কিনিতে আর হয় না,—কাগজওয়ালার একটি লোক—মোটা সোটা, চশমা-চোখে, নাছোড়বন্দা লোক—নিত্য আসে, খোসামোদ করে, কাগজ একখানি করিয়া প্রতি সপ্তাহে দিয়া যায়, বিজ্ঞাপনের আশায়! কমলবাবু বিজ্ঞাপন দিবেন বলিয়াছেন, কিন্তু এখন নয়,—আগে তিনি বাজারের 'ডিম্যাণ্ড' 'মিট্' করুন, তার পর। এখন বিজ্ঞাপন দিলে 'সাপ্লাই' করিতে না পারিয়া তাঁহাকে অপ্রস্তুত হইতে হইবে।

দুইটি ছেলে "বঙ্গবাসীতে" পড়িতেছে, বড় মেয়েটি বেথুনে যায়, ছোটটিও ভিক্টোরিয়ার গাড়ী চড়িয়া যায় আসে বটে, লেখা পড়া কিছুই করে না। বাড়ীতে দুইজন মাষ্টার আছে, ছেলে মেয়েদের দেখে। কোলের ছেলেটি এক বছরের, তার নামকরণ করা হইয়াছে, ভাগ্যকুমার! গৃহিনীর বিশ্বাস, সে যেদিন গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, সেইদিন হইতেই তাঁহাদের ভাগ্যের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ভাগ্যকুমার ভগবান নামধারী উড়িয়া ভৃত্যের কোলে চড়িয়া ওয়েলিঙটন স্কোয়ারে দিনমান ভোর বসিয়া দাঁড়াইয়া বেড়ান।

গৃহিনীকেও সংসারে খাটিতে হয় না,—রাঁধুনী বামুন আছে, ঝি আছে, চাকর আছে। সম্প্রতি আবার ক্যোচম্যান সহিস হইয়াছে। কর্ত্তা দোকানে বাহির হইয়া গেলে গৃহিণী উপন্যাস পাঠ করেন, অলিন্দে দাঁড়াইয়া ট্রাম চলাচল দেখেন, তাঁহাকেও কত লোক দেখে।

ভগবান খুবই সুপ্রসন্ন। এ্যালায়েন্স ব্যাঙ্ক ফেল হইবে, এ খবর কমলবাবু একদিন আগে কি করিয়া জানিতে

পারিয়াছিলেন,—টাকাটা তুলিয়া খাস্ ইম্পীরিয়েল ব্যাঙ্কে গচ্ছিত করিয়া আসিলেন। পরদিন শহরের চারিদিকে যখন কান্নাহাটি পড়িয়া গিয়াছিল, কমলবাবু তখন গৃহিনীর কোলের কাছে শুইয়া, সান্ধ্য সংবাদপত্র পাঠ করিয়া হাসি-গল্পের দ্বারা ঘটনাটা বুঝাইবার চেষ্টা পাইতেছিলেন।

এই সময় এক কাণ্ড ঘটিল। গঙ্গারাম কাশী হইতে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতে লাগিলেন। গঙ্গারাম শেষ একখানি পত্রে এমন কথাও লিখিলেন, কাশীতে 'বিলাসের গুব' চলন। ধরণীবাবু তাঁহাকে যদি কিছু অর্থাদি দেন, তবে স্ত্রী পুত্র লইয়া তিনি অকাল-মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পান। ধরণীবাবু ত জানেন, তিনি দায়ে পড়িয়াই পঞ্চাশটি টাকা মাত্র লইয়া...ইত্যাদি। কমলবাবু আর নীরব থাকিতে পারিলেন না,—স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত ধরণীবাবুর সহিত (!) আলাপ করিয়া জানিলেন যে, গঙ্গারাম লেখাপড়া করিয়া দিয়াছে,—দোকানে তাহার কোন স্বত্ব নাই। সে যদি পুনরায় প্রলাপ বকে, ধরণীবাবু আদালতের সাহায্যে তাহাকে জুয়াচোর প্রমাণ করাইয়া...ইত্যাদি!

গঙ্গারাম উক্ত পত্র পাইয়া অনেক দিন আর উচ্চবাচ্য করেন নাই। কিন্তু কুহকিনী আশা তাঁহাকে নানা প্রলোভন দেখাইয়া কলিকাতা সহরে টানিয়া আনিল। আশা এই বুঝাইল, ধরণীবাবু অতি উদার ও অমায়িক লোক, সামনে গিয়া কাঁদিয়া পড়িলে তাঁহার দয়া হইবেই। বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরের পাঁচীলে মাথা ঠুকিয়া গঙ্গারাম কাশী ত্যাগ করিলেন।

"রমণীবিলাস" কার্য্যালয়ের লোক ধরণীবাবু নাম শুনিয়াছে বলিয়া স্মরণ করিতে পারিল না। অবশেষে একজন অতি কষ্টে মনে করিতে পারিল যে, কমলবাবুদের মেসে পোষ্টাফিসের একটি বড়বাবু থাকিতেন,—তাঁহার নাম ছিল ধরণীধর নাগ,—বৎসর দুই হইল,তিনি লোকান্তর গমন করিয়াছেন,—অন্য সংবাদ কেহ জানে না। আরও তাহারা জানাইল, কমলবাবু কারবারের মালিক বটে, কিন্তু তিনি এখানে আসেন না, বাড়ীতেই থাকেন। বাড়ীটা সেণ্ট্রাল-এ্যাভিনু ও মানিকতলার ঠিক মোড়ে, সম্প্রতি বাইশ হাজার মুদ্রায় ক্রীত হইয়াছে।

কমলবাবু স্বর্গীয় ধরণীবাবুর সহিত কালও সাক্ষাৎ হইয়াছে বলিলেন। দোকানের লোক তাঁহাকে জানে না; কারণ, তিনি একটি দিনও দোকান দেখিতে আসিবার সুযোগ করিয়া উঠিতে পারেন না,—পোষ্টাফিসের বড় কাজও বটে, ছুটিও আদপে নাই।

গঙ্গারাম বলিলেন—তা সে যা'হকগে ভাই, তুমি ত জান, দোকানের গুড্ উইলটি মাত্র আমি পঞ্চাশ টাকায় বাঁধা দিয়েছিলুম, বেচি নি ত!

কমলবাবু একটু বিরক্তভাবে বলিলেন,—অত শত আমি জানি নে ভাই,—তোমার সেই লেখাটি ধরণীবাবুর কাছে আছে, চাও ত এনে দেখাতে পারি।

সে আর আমি দেখে কি করব ভাই! তোমরা কি লিখেছিলে না লিখেছিলে, দেখবার মত কি আর মাথার ঠিক আমার ছিল তখন!

কমলবাবু ক্রোধ-উষ্ণ স্বরে কহিলেন—না দেখেই সই করেছিলে?

তাই করেছিলাম। সে থাকগে ভাই, বড় কষ্টে পড়েছি, কিছু পাইয়ে দাও, কাশী চলে যাই।

কমলবাবু বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া, প্রশ্ন করিলেন—কি বলে পাইয়ে দেব?

সে তুমি জান ভাই!

আমি জানি নে। আর অধর্ম্ম প্রাণ থাকতে আমি করতে পারব না।

অধর্ম্ম?

নয়? জিনিষ তাঁর, আমি তোমাকে টাকা পাইয়ে দেব, কি বলে? ভোগা দিয়ে? আমার দ্বারা ঐটি হবে না, গঙ্গারাম।

গঙ্গারাম ধর্ম্মনিষ্ঠ ভগিনীপতির মুখের পানে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া গেলেন; অনেকক্ষণ পরে একটি বুক-ভাঙ্গা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—আমারও ধর্ম্মের পাওনা ভাই...

ধর্ম্মের হয়, পাবে। না হয় পাবে না।

দেওয়া না দেওয়া তোমার হাত।

এই বলছ ধর্ম্ম আবার বলছ...

তুমি ইচ্ছে করলে, পার।

না, পারিনে।

* * * ভগবান আছেন,—মাত্র দু'টি কথা বলিয়া গঙ্গারাম প্রস্থান করিলেন। কমলবাবু ডাকিয়া বলিলেন—পাঁচ দশ টাকা অমনি চাও দিতে পারি, অধর্ম্ম করতে পারব না।

শিল্পী—শ্রীযুক্ত বরদাচরণ উকীল

যশোদা-দুলাল

Bharatvarsha Halftone & Ptg. Works

করে কাজও নেই,—বলিয়া শীর্ণকায় লোকটি অন্তর্ধান হইলেন।

কমলকৃষ্ণ বাবু দিন পাঁচেকের পরেই শীলেদের বাড়ী খুব ভাল রামায়ণ গান হইতেছে শুনিয়া স্ত্রীকে ব'ললেন—সত্যি রামায়ণ দেখার ইচ্ছে ?

স্ত্রী অনেকবার এই অভিপ্রায় জানাইয়াছিলেন—সফলকাম হন নাই,—অভিমানের স্বরে বলিলেন—খুব হয়েছে, যা-ও!

রাগ করে কি পাগ্‌লি!

না করবে না! ভগবান যদি বা মুখ তুলে চাইলেন,—তাঁর নাম শুনব, দু'পয়সা খরচ হবে বলে তা'ও করতে দেবেন না,—আবার সোহাগ জানানো হচ্ছে।

কালই ঠিক করে আস্‌ছি। বাড়ীতে ভগবানের নাম হবে—এ ত ভাল কথাই!

পাড়ার বর্ষিয়সী রমণীগণ একবাক্যে কহিল—পুণ্যাত্মা লোক বটে এরা!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আস্তিক ও নাস্তিক

ঠিক তের বছর পরের কথা।

গঙ্গারামের কাশীপ্রাপ্তির সংবাদ পাইয়া কমল বাবুর স্ত্রী গঙ্গারামের পুত্রটিকে নিজের কাছে আনাইয়া লইলেন। মেয়ে দু'টির আগেই বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। একজন বিধবা হইয়া শ্বশুরালয়ে আছে; অন্যটি বৃদ্ধ স্বামীর পবিত্র কুলে কলঙ্ক লেপন করিয়া কাশীধামেরই কোন এক স্থানে কালামুখে বিরাজ করিতেছে। ছেলেটিও যে রকম হাবা-গঙ্গারাম,—সেও যে কস্মিন্‌কালে কিছু করিবে, এমন মনে হয় না। এমনই গর্দভ সে ছেলে,—আপন পিসির বাড়ী ত এটা, থাকে যেন কোথাকার কোন্ পরের বাড়ীতে আছে। খাইবার ও শুইবার সময় অন্দরে আসে,—অন্য সময় চাকরমহলে গিয়া পোড়ার মুখ পোড়াইয়া বসিয়া থাকে। কমলকৃষ্ণবাবু জ্বলিয়া যান; কিন্তু কি করিবেন! গৃহিণীর একমাত্র স্বর্গগত ভ্রাতার একটি বংশধর!

কমলবাবু বৃদ্ধ হইয়াছেন, কাজকর্ম ছোট ছেলেটি সব দেখে। বড় ছেলে দুইটির একটি ব্যারিষ্টারী করিতেছে; অন্যটি ডাক্তার হইয়া, সাইন-বোর্ড টাঙ্গাইয়া, ডাক্তারীর মহলা দিতে সুরু করিয়াছে। উভয়েই বিবাহিত। ছোট এখনও অবিবাহিত আছে, সম্ভবতঃ থাকিবেও। সেই না-কি চণ্ডীচরণ—তার মামাত ভাইয়ের দুইটি ভগিনীর বিবাহবার্ত্তা চণ্ডীর মুখেই শুনিয়াছে; শুনিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, বাঙ্গালা দেশের অমনই কোন অভাগিনীকে মৃত্যু-যন্ত্রণা হইতে ত্রাণ করিতে পারে যদি, তবেই সে দার-পরিগ্রহ করিবে; অন্যথা যাহা আছে সে, তাহাই থাকিবে। কমলবাবু হাসেন,—মুখে কিছু বলেন না বটে, তবে ভাবেন, অর্থ যে কি বস্তু এ ব্যাটা এখনো যদি না বুঝিল, এত বড় কারবার বজায় থাকিবে কি করিয়া ?

ঐ ভাবেন-ই,—বেশীক্ষণ এ সকল চিন্তায় মগ্ন হইতে তিনি পারেন না। দিনরাত মালাজপ, আহ্নিকপূজা, হরিনাম-কীর্ত্তন,—অষ্টপহর এই সকল লইয়াই আছেন। বাড়ীতে এ সকল ত হইবার নয়, হইয়া উঠেও না। নিকটবর্ত্তী স্থানে একটি কালী-মন্দির আছে, সেখানে বসিয়াই ধর্মকর্ম করিয়া থাকেন। রাত্রে কচিৎ কোন দিন পুত্রদের নিকটে আসিয়া বসেন; কারবারগুলির সংবাদাদি শ্রবণ করিয়া থাকেন। কোন কোন দিন একেবারেই শয়নকক্ষে উঠিয়া পড়েন। ছেলেরা কয়লার, আলতার, কাপীর কারবারের যেদিন যে খবর থাকে, গিয়া শুনাইয়া আসেন।

তিনি বারবার তাহাদের কহিয়া দিয়াছেন যে, বিষয় কর্মঘটিত ব্যাপারে আমাকে আদপে জড়াইয়ো না বাপু। ছেলেরা এমনি অবাধ্য যে, বাপের কথা কিছুতেই রাখিবে না। একদিন ছোট ছেলে ঝরিয়া খনির বন্দোবস্ত লইয়া কি-সব গোলমাল হইয়াছে বলিতেই, বৃদ্ধ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, তখনি, ছোট ছেলের উপর যে আমমোক্তারনামা দেওয়া আছে, তাহা প্রত্যাহার করিবার আদেশ দিলেন। বড় ছেলে দুই চারবার আপত্তি করিল বটে, কিন্তু পিতার জেদই শেষ পর্য্যন্ত বজায় রহিল। ছোট ছেলে প্রচুর অবসর পাইয়া যেদিন মামাতভাই শ্রীমান চণ্ডীর সহিত মিশিয়া সন্ধ্যার পূর্বে সাজিয়া গুজিয়া বেড়াইতে বাহির হইল, সেই দিনই আবার আমমোক্তার তাহাকে নিযুক্ত করা হইল। কিন্তু এবার তাহাকে বিশেষভাবে জানাইয়া দেওয়া হইল, যে পরকালের যাত্রীকে বিষয় কর্মে লিপ্ত না করিয়া, হরিনামের শুভ অবসর দেওয়া হোক। আর পরিবার মধ্যে ইহাও ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল যে, চণ্ডী অত্যন্ত

নাস্তিক, ব্রাহ্মণ দেখিলে নমস্কার করে না, বিজয়া দশমীর দিন পরম পূজ্যপাদ মাতুলকে প্রণাম করে নাই ইত্যাদি। অতএব উহাকে এক মাসের সময় দেওয়া হইতেছে—ও যদি ইতোমধ্যে আস্তিক না হইতে পারে, তবে এ গৃহ ত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও তাহাকে আশ্রয় লইতে হইবে।

চণ্ডীচরণের পিসি তাহার হরিনাম-রত পিসে মহাশয়কে আমলেই আনিতেন না; বলিলেন,—চণ্ডীর কি আমার হরিনামের বয়েস হয়েছে—বালাই!

চণ্ডীচরণও বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—মামা এত হরিনাম ত করেছেন, দেখা যাক্ তাঁর পরলোক গমনটা কেমন হয়!

পিসে মহাশয় বলিলেন,—পরে হবে আর কি, বাপের মতন রাস্তার হন্যে কুকুরের মত ঘুরে ঘুরে মরবে।

চণ্ডীচরণ কথাটা শুনিল। সামনে প্রত্যুত্তর দিল না; আড়ালে বলিল,—না হয় রাস্তাতেই মরব, তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু তোমার মরণটা না দেখে মরি ত আমার নাম চণ্ডীচরণ নয়,—রামকালা!

কমলকৃষ্ণ বাবু হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া বাড়ী ফেরেন,—চণ্ডীচরণ এত বড় নাস্তিক যে, বাড়ীশুদ্ধ লোক তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় দেয়,—সে কি-না কটমটিয়ে চেয়ে থাকে, হাসে! বড় ছেলে বিলাত বেড়াইয়া আসিয়াছে—সে-না-হয় মাথা নীচু নাই করিল;—তুই কি? বিলাতের নাম শুনিয়াছিস্? ছোট ছেলেটি বিষয়-কর্ম্মে ব্যস্ত, তাহার অত সময় নাই,—তুই ব্যাটা কি কারস? বাড়ীর গৃহিণীর মাথায় এত বড় সংসারের ভার, মাথা নামাইতে গেলে সংসার ধসিয়া পাড়বে,—কিন্তু তুই! সংসারের কুটাটি ত ভাঙ্গিয়া উপকার করিতে পারিস্ না? চাকর বাকর অত সভ্যতা জানে না, তাহাদের দোষ না-হয় নাই ধরিলাম,—তুই কি বল্ ত! ভদ্রলোকের ছেলে, হিন্দুর ছেলে হইয়া পূজনীয় ব্যক্তির—বিশেষ সেই ব্যক্তি যখন হরিনাম গান করিয়া আসিল, একটু পায়ের ধূলা লইয়া ধন্য হইবি, তা'ও পারিস্ না? আর বাড়ীশুদ্ধ লোকের দেখিয়াও তোর জ্ঞান হয় না!

চণ্ডীচরণ হাসিয়া বলিল,—বাড়ী শুদ্ধ লোকের মধ্যে ত ঐ নবীন ঘোষ গমস্তা! তা বেটা আবার মানুষ, চামচিকেও পাখী! হা হা! নবীন ঘোষ পায়ের ধূলা নেয় বলিয়া আমাকেও লইতে হইবে! পিসের কি বুদ্ধি! এত শয়তানী বুদ্ধি ধর পিসে মশাই, আর এই ছোট্ট ভুলটাও করিয়া বসিলে!

কমলকৃষ্ণ ভুল করিয়াছিলেন কি-না জানি না, মত-পরিবর্ত্তন তিনি করিলেন না। উপরন্তু কহিলেন,—তাঁহার পুণ্যের সংসার ঐ পাপিষ্ঠের সংস্পর্শে ধ্বংস হইয়া যাইবে,—যেন-তেন-প্রকারেণ, উহাকে বিদায় করিতেই হইবে!

চণ্ডীচরণ মনে-মনে বলিল,—ঐটি হচ্ছে না, তুমি যতদিন আছ, শর্ম্মারাম নড়ছেন না। শেষ দেখ্‌তেই হবে।

কিন্তু মানুষের ধৈর্য্য কতদিন থাকে বল! কমলকৃষ্ণের ধৈর্য্য একদিন সত্যই ভাঙ্গিল। তিনি হরিনাম করিতে যাইবার কয়েক মিনিট আগে চণ্ডীকে ডাকাইয়া বলিলেন,—তুমি পাষণ্ড—দূর হও!

চণ্ডী নীরবে দাঁড়াইয়া আছে; পিসে মহাশয় আবার বলিলেন,—এসে যদি তোমায় দেখ্‌তে পাই, দরওয়ানকে দিয়ে......

চণ্ডীর পিসিমা ছুটিয়া আসিয়া পড়িলেন, ক্ষেপেছ! ওর ভাইয়ের ছেলের 'ভাত', ও থাক্‌বে না! না রে চণ্ডী, তুই ওঁর কথা শুনিস্ নে বাবা! বুড়ো হয়ে আক্‌কেলের মাথা খেয়ে বসে আছেন!

চণ্ডীর পিসে মহাশয় রণে ভঙ্গ দিবার পূর্ব্বে কহিলেন,—কিন্তু ও···

পিসিমা বলিলেন,—খুব হয়েছে, আর বিদ্যে ফলিয়ে কাজ নেই। যা করতে যাচ্ছ, যাও!

চণ্ডীর সম্মুখে আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয় দেখিয়া পিসে মহাশয় প্রস্থানই করিলেন। পিসিমাও একসঙ্গে ডিক্রী ডিস্‌মিস্ করিয়া দিলেন, নাতির ভাত পর্য্যন্ত চণ্ডীর এখানে অবস্থান রদ করিবার ক্ষমতা চণ্ডীর পিসে মহাশয়ের ঠাকুর-দাদারও নাই!

জ্যেষ্ঠপুত্রের পুত্রের অন্নপ্রাশনের আর দেরী ছিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কুলাঙ্গার

সমারোহের বিন্দুমাত্র ত্রুটীও যাহাতে না হয়, সেইরূপ আয়োজনই হইতেছে। থিয়েটার, বায়স্কোপ, সমস্তই হইবে। কনিষ্ঠপুত্র পিতার নিকট সবিস্তারে কহিতেছিল, অদূরে বসিয়া জ্যেষ্ঠপুত্র সাহেবপাড়ায় নিমন্ত্রণ-পত্র বিলির

ব্যবস্থা করিতেছিলেন। পিতা কহিলেন,—আমাদের হরি-সভার গানটাও রাখতে হবে।

জ্যেষ্ঠপুত্র পেন্সিলটি দাঁতে চাপিয়া একবার পিতাকে দেখিয়া লইল মাত্র। কনিষ্ঠ প্রবলবেগে হস্তপদ সঞ্চালিত করিয়া কহিলেন,—ননসেন্স! রামযাত্রা! এখানে, কিছুতেই না!

পিতা বলিলেন,—তোমরা শোন-নি, তাই অমন কথা বলছ। হরিনাম হলে, তোমাদের ও মাগীদের কোমর নাচান কেউ দেখ্‌বে না।

উদ্ধত পুত্র কহিলেন;—তেমন লোককে আমরা নিমন্ত্রণ করব না।

পিতার যুক্তি—হরিসভার 'দাদাদের' আমি বলেছি!

কেন বলতে গেলেন আপনি আমাদের না জানিয়ে?

যা হয়ে গেছে···

কিছু হয় নি, হবেও না। দাদা, কি বল?

জ্যেষ্ঠপুত্র বিলাত-ফেরত লোক; বেশ ধীর সংযত; ভিতরের ভাব বাহিরে প্রকাশ হইবার নয়; বলিলেন,—হরিনাম এখনকার রুচির যোগ্য নয় বলেই আমার বিশ্বাস!

কনিষ্ঠপুত্র বামহস্তের তালুর উপর দক্ষিণ হস্ত দ্বারা এক বিষম চপেটাঘাত করিয়া বলিল,—নিশ্চয় না—সে আর বল্‌তে! এ কি কার ও অন্তর্জলী হচ্ছে যে হরিনাম করতে হবে।

কিন্তু···

হবে না।

আমি ···

না।

পুত্রদ্বয়ের মাতা বলিলেন,—ছেলেরা বড় হয়েছে, এখন তাদের কথা···

পিতা মহারোষে কহিলেন,—আমি বড় নই! আমার কথা কি ফ্যালনা? আমি দোব হরিনাম! পয়সা আমার—ও ব্যাটাদের নয়। মাগীর নাচ বন্ধ করে আমি...

কনিষ্ঠ পুত্রটি দালান দিয়া কোথায় যাইতেছিলেন, দরজার কাছে দাঁড়াইয়া পড়িয়া কহিলেন,—মা বাবাকে বল, হরিনাম যদি করতে হয়, এ বাড়ীতে আমরা অন্নপ্রাশনই করতে দেব না, কালীঘাটে গিয়ে শুধু ভাত মুখে দিয়ে আন্‌ব!

মা'কে কষ্ট করিয়া কোনি কথা কহিতে হইল না, পিতা স্বয়ং সব শুনিলেন। বিষহীন বিষধর বৃথা গর্জ্জন শেষ করিয়া বিবরে প্রবেশ করিলেন।

রাত্রে জলস্পর্শ করিলেন না, বলিলেন, জ্বর-জ্বর!

পুত্রদ্বয়কে আসিয়া জননী সংবাদ দিলেন। পুত্রদ্বয় বলিল,—আশ্চর্য্য নয় মা, কলকাতার ঘরে ঘরে যে রকম ডেঙ্গু হচ্ছে, তাতে পড়াই সম্ভব।

মা বুঝাইতে গিয়াছিলেন, ডেঙ্গু নয়। ছেলেরা হেলথ্‌ অফিসারের রিপোর্ট দেখাইয়া, ঘরে বিছানায়, সর্ব্বত্র ইউক্যালিপটাস্‌ ছড়াইবার পরামর্শ প্রদান করিয়া, কর্ম্মান্তরে ব্যাপৃত হইল।

চণ্ডীচরণ রাত্রে আহারাদির পর পিসে মহাশয়ের অন্ধকার ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া স্বগতোক্তি করিল,—আমিই একা নাস্তিক, আর সবাই আস্তিক—না?

কমলকৃষ্ণ রাত্রে হুঙ্কার দিয়া গৃহিণীকে কহিলেন,—বল গে ওদের, হরিসভা বসাতেই হবে। নইলে আমি অন্নত্যাগ করব।

গৃহিণীর মুখের উপর ছেলেরা বলিল,—বুড়ো হয়ে বাবার ভীমরথি হয়েছে মা! দু'হাজার লোকের মাঝে একটা কেলেঙ্কারী না করলেই নয়।

গৃহিণী আবার ফিরিয়া আসিলেন, অনুনয়ের সুরে বলিলেন,—কর্ত্তার ইচ্ছে, অত লোক আস্‌বে, বাড়ীতে হরিনাম হলে সবাই আনন্দ পাবে।

কনিষ্ঠ পুত্র গোঁয়ার-গোবিন্দ তুল্য; কহিল,—কেলেঙ্কারী আর আনন্দ এক নয় মা। যাহ'ক তুমি বলে দাও গে মা, ওসব হবে না, হবে না, হবে না।

চণ্ডীচরণ সমস্তই শুনিল; নিজের নাস্তিকতার বিরুদ্ধে নজীর খাড়া করিতেই অতি প্রত্যূষে বাহির হইয়া পাড়াময় খবরটা জাহির করিয়া দিল। জাহির করিয়া যখন বাড়ী ফিরিল, বাড়ীতে তখন কান্নাহাটি পড়িয়া গিয়াছে। পিসে মহাশয় আর নাই! সকালে বিছানায় তাঁহার প্রাণহীন দেহ পড়িয়া আছে।

পাড়ার নরনারী যাহারা ভোরে চণ্ডীচরণের মারফৎ হরিনাম-সংবাদ শুনিয়াছিল, তাহারা একবাক্যে কহিল,—পুণ্যাত্মা লোকটা ছেলেদের পাপেই এমন করে মরল গা! ছিঃ ছিঃ! কুলাঙ্গার পুত্র হলেই অমনি হয়।

চণ্ডীচরণ ইহার প্রতিবাদ আর করিল না,—পাছে করিতে হয়, চলিয়া গেল,—বোধ হয় কাশীতেই ফিরিয়া গেল।

পল্লী-চিত্র

শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার বি-এ

১

আয়না কবি দেখ্‌বি তোরা তোদের সাধের 'পল্লীরাণী'—
বট পাকুড় আর বেনু-বনে বেতস-ঘেরা অঙ্গখানি,
এঁদো পুকুর পানায় ভরা, কিল্‌ বিলিয়ে পোকা নাচে,
সকল ভিটাই শ্মশান মরু, কয়েক প্রাণী আজো বাঁচে;
পাঁজরা ফুঁড়ে হাড় কখানি যায় যে গোণা নিরন্তর;
এরাই যে গো পল্লীবাসী, বাঙ্গলা দেশের বংশধর,
বাপ্‌ পিতামোর বাস্ত-ভিটা আজও এরা কামড়ে আছে,
'পল্লী'—তোরা করিস্‌ ঘৃণা—স্বর্গ সে যে এদের কাছে।

২

পূজার সময় বাড়ী-বাড়ী উঠ্‌ত বেজে সানাই বাঁশী,
নহবতের করুণ সুরে মিশতো সবার প্রাণের হাসি,
রথতলাতে রথের দিনে বস্‌তো তাদের ছোট্ট 'মেলা'
দোলের দিনে প্রাণ খুলিয়া করত তারা রঙ্গের খেলা,
নদীর ধারের বটতলাতে করত তারা 'চড়াই ভাতি'
'গারসী' দিনে খেলায় মেতে জাগত তারা সারা রাতি;
সে সব কথা স্বপ্ন আজি, কোন্‌ বিধাতার অভিশাপে
বাঙ্গলা পুড়ে ছাই হয়েছে—আর কারো নয় মোদের পাপে।

৩

কোথায় বা সে 'ধানের গোলা', কোথায় বা সে 'গোলাবাড়ী'
'গোয়াল' ভরা ছিল গরু—দুধ ঘিয়েরি ছড়াছড়ি;
শস্য-শ্যামল ছিল যে মাঠ—নদীর বুকে স্বর্গ-সুধা—
দেশ বিদেশের ভিখারীদের মিটিয়ে দিত তৃষ্ণা ক্ষুধা,
সন্ধ্যা হতেই মন্দিরেতে শঙ্খ ঘণ্টা উঠ্‌তো বেজে,
তুলসীতলায় প্রদীপ জেলে—করত প্রণাম স্বর্গ সে যে,
কামার কুমার কায়েত বামুন তাঁতি জোলা ছিল যে ভাই,
কার শাপেতে এমন করে' বাঙ্গলা পুড়ে হয়েছে ছাই!

৪

নদীর বুকে 'চর' জেগেছে, নাই সে সুধার জলধারা,
শস্যবিহীন মাঠ যে ধূ ধূ করেছে পড়ে শ্মশানপারা,
ছোট্ট ছেলে তারও বুকের হাড় কখানি গোণা যায়,
ঐ পুকুরের 'সুধাবারি' পান করে সে পিপাসায়,
পেট পুরে সে পায় না খেতে সহ্য করে উপবাস,
বঙ্গদেশের ভবিষ্যতের করিস্‌ নে আর সর্ব্বনাশ;
এদের বুকে টেনে নিয়ে ক্ষুধায় দুটো অন্ন দে,
শিক্ষা দিয়ে জাগিয়ে তোল্‌—এদের ঘৃণা করিস্‌ নে।

৫

রোজ সকালে লাঙ্গল কাঁধে ছোটে এরা মাঠের পানে,
পরাণ খুলে উদাস সুরে মাতে এরা ভাটেল গানে,
ছোট্ট কাপড় পরে' এরা, ময়লা গামছা দিয়ে কাঁধে,
রাখ্‌তে যায় যে নিমন্ত্রণ; সরল প্রাণে হাসে কাঁদে,
প্রতিবেশীর সুখের দিনে কোমর বেঁধে কাজে লাগে,
দুখের দিনেও বুক ফুলিয়ে আসে এরাই সবার আগে,
'সরলতা' হারিয়েছ যা সভ্যতারি স্পর্শে আসি,
হাস্যমুখে শিক্ষা কর এদের পায়ের তলায় বসি।

৬

এদের বুকের রক্ত চুষে তোরা থাকিস্‌ রাজার হালে,
'জলকষ্টে' মরক লেগে মরে এরাই পালে পালে,
'মটর গাড়ী' হাঁকিয়ে এসে পরিশ্রমে পড়িস্‌ লুটে,
সারাটা দিন 'লাঙ্গল ঠেলে' এদের মুখে রক্ত উঠে,
বুক ফেটে যায় পিপাসাতে, এদের পেটে অন্ন নাই,
এরা তোদের 'অন্নদাতা', এরা তোদের আপন ভাই,
রাখিস্‌নে আর আঁধার মাঝে, জগত-সভায় তুলে ধর,
জীবন মরণ সুখে-দুখে তোদের চিরসাথী কর।

পরশুরাম রচিত :: নারদ বিচিত্রিত

(১)

সন্ধ্যা হব হব। নন্দবাবু হগ সাহেবের বাজার হইতে ট্রামে বাড়ি ফিরিতেছেন। বীডন ষ্ট্রীট পার হইয়া গাড়ি আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল। সম্মুখে গরুর গাড়ি। আর একটু গেলেই নন্দবাবুর বাড়ির মোড়। এমন সময় দেখিলেন পাশের একটি গলি হইতে তাঁর বন্ধু বঙ্কু বাহির হইতেছেন। নন্দবাবু উৎফুল্ল হইয়া ডাকিলেন—"দাঁড়াও হে বঙ্কু, আমি নাবচি।" নন্দর দু বগলে দুই বাণ্ডিল, ব্যস্ত হইয়া চলন্ত গাড়ি হইতে যেমন নামিবেন অমনি কোঁচায় পা বাধিয়া নীচে পড়িয়া গেলেন।

গাড়িতে একটা সোরগোল উঠিল এবং ঘ্যাচাং করিয়া গাড়ি থামিল। জনকতক যাত্রী নামিয়া নন্দকে ধরিয়া তুলিলেন। যাঁরা গাড়ির মধ্যে ছিলেন তাঁরা গলা বাড়াইয়া নানা প্রকারে সহানুভূতি জানাইতে লাগিলেন। "আহা হা বড্ড লেগেচে—থোড়া গরম দুধ পিলা দোও—দুটো পা-ই কি কাটা গেছে?" একজন সিদ্ধান্ত করিল মৃগী। আর একজন বলিল ভীর্মি। কেউ বলিল মাতাল, কেউ বলিল বাঙাল, কেউ বলিল পাড়াগেঁয়ে ভূত।

বাস্তবিক নন্দবাবুর মোটেই আঘাত লাগে নাই। কিন্তু কে তা শোনে। "লাগেনি কি মশায়, খুব লেগেচে—দু মাসের ধাক্কা—বাড়ি গিয়ে টের পাবেন।" নন্দ বার-বার করযোড়ে নিবেদন করিলেন যে প্রকৃতই তাঁর কিছু-মাত্র চোট লাগে নাই। একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলিলেন—"আরে মোলো, ভাল করলে মন্দ হয়। পষ্ট দেখলুম লেগেচে তবু বলে লাগেনি।"

এমন সময় বঙ্কুবাবু আসিয়া পড়ায় নন্দবাবু পরিত্রাণ পাইলেন, ট্রাম গাড়িও ছাড়িয়া গেল।

বঙ্কু বলিলেন—"মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গিয়েছিল আর কি। যা হোক, বাড়ির পথটুকু আর হেঁটে গিয়ে কাজ নেই। এই রিক্‌শ—"

রিক্‌শ নন্দবাবুকে আস্তে আস্তে লইয়া গেল, বঙ্কু পিছনে হাঁটিয়া চলিলেন।

নন্দবাবুর বয়স চল্লিশ, শ্যামবর্ণ, বেঁটে গোলগাল চেহারা। তাঁর পিতা পশ্চিমে কমিশারিয়েটে চাকরী করিয়া বিস্তর টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালে একমাত্র সন্তান নন্দর জন্য কলিকাতায় একটি বড় বাড়ি, বিস্তর আসবাব এবং মস্ত এক বাণ্ডিল কম্পানির কাগজ রাখিয়া যান। নন্দর বিবাহ অল্প বয়সেই হইয়াছিল, কিন্তু এক বৎসর পরেই তিনি বিপত্নীক হন এবং তার পর আর

বিবাহ করেন নাই। মাতা বহুদিন মৃতা,—বাড়িতে একমাত্র স্ত্রীলোক এক বৃদ্ধা পিসি। তিনি ঠাকুর সেবা লইয়া বিব্রত, সংসারের কাজ ঝি-চাকররাই দেখে। নন্দবাবুর দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে আপত্তি নাই কিন্তু এ পর্যন্ত তাহা হইয়া উঠে নাই। প্রধান কারণ—আলস্য। থিয়েটার, সিনেমা, ফুটবল ম্যাচ, রেস এবং বন্ধুবর্গের সংসর্গ—ইহাতেই নির্ব্বিবাদে দিন কাটিয়া যায়, বিবাহের ফুরসৎ কোথা? তার পর ক্রমেই বয়স বাড়িয়া যাইতেছে, আর এখন না করাই ভাল। মোটের উপর নন্দ নিরীহ, গোবেচারী, অল্পভাষী, উদ্যমহীন, আরামপ্রিয় লোক।

নন্দবাবুর বাড়ির নীচে সুবৃহৎ ঘরে সান্ধ্য আড্ডা বসিয়াছে। নন্দ আজ কিছু আক্রান্ত বোধ করিতেছেন; সেজন্য বালাপোষ গায়ে দিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া আছেন। বন্ধুগণের চা এবং পাঁপরভাজা শেষ হইয়াছে, এখন পান সিগারেট এবং গল্প চলিতেছে।

গুপীবাবু বলিতেছিলেন—"উহুঁ। শরীরের ওপর অত অযত্ন কোরোনা নন্দ। এই শীতকালে মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়া ভাল লক্ষণ নয়।"

নন্দ। মাথা ঠিক ঘোরেনি, কেবল কোঁচার কাপড়টা বেধে—

গুপী। আরে না, না। ঘুরেছিল বৈকি। শরীরটা কাহিল হয়েচে। এইত কাছাকাছি ডাক্তার তফাদার রয়েচেন। অত বড় ফিজিশিয়ান আর সহরে পাবে কোথা? যাওনা কাল সকালে একবার তাঁর কাছে।

বঙ্কু বলিলেন, "আমার মতে একবার নেপালবাবুকে দেখালেই ভাল হয়। অমন বিচক্ষণ হোমিওপ্যাথ আর দুটি নেই। মেজাজটা একটু তিরিক্ষি বটে, কিন্তু বুড়োর বিদ্যে অসাধারণ।"

ষষ্ঠিবাবু মুড়িশুড়ি দিয়া এককোণে বসিয়া ছিলেন। তাঁর মাথায় বালাক্লাভা টুপি, গলায় দাড়ি এবং তার উপর কম্ফর্টার। বলিলেন,—"বাপ্, এই শীতে অবেলায় কথনো ট্রামে চড়ে? শরীর অসাড় হলে আছাড় খেতেই হবে। নন্দর শরীর একটু গরম রাখা দরকার।"

নিধু বলিল,—"নন্ দা, মোটা চাল ছাড়। সেই এক বিরিঞ্চির আমোলের ফরাস তাকিয়া, লক্কড় পাল্কি গাড়ী আর পক্ষীরাজ ঘোড়া, এতে গায়ে গত্তি লাগবে কিসে? তোমার পয়সার অভাব কি বাওয়া? একটু ফুর্ত্তি করতে শেখ।"

সাব্যস্ত হইল কাল সকালে নন্দবাবু ডাক্তার তফাদারের বাড়ী যাইবেন।

(২)

ডাক্তার তফাদার M. D., M. R. A. S. গ্রে-স্ট্রীটে থাকেন। প্রকাণ্ড বাড়ি, দুখানা মোটর, একটা ল্যাণ্ড। খুব পসার, রোগীরা ডাকিয়া সহজে পায় না। দেড়ঘণ্টা পাশের কামরায় অপেক্ষা করার পর নন্দবাবুর ডাক পড়িল। ডাক্তার সাহেবের ঘরে গিয়া দেখিলেন এখনো একটি রোগীর পরীক্ষা চলিতেছে। একজন স্থূলকায় মাড়োয়ারি নগ্নগাত্রে দাঁড়াইয়া আছে। ডাক্তার ফিতা দিয়া তাহার ভুঁড়ির পরিধি মাপিয়া বলিলেন—"বস্ সওয়া ইঞ্চি বঢ়্ গিয়া।" রোগী খুসী হইয়া বলিল, "নবজ্ তো দেখিয়ে।" ডাক্তার রোগীর মণিবন্ধে নাড়ীর উপর একটি মোটরকারের স্পার্কিং প্লগ ঠেকাইয়া বলিলেন,—"বহুৎ মজেসে চল্ রহা।" রোগী বলিল,—"জবান ত দেখিয়ে।" রোগী হাঁ করিল, ডাক্তার ঘরের অপর-দিকে দাঁড়াইয়া অপেরা গ্লাস দ্বারা তাহার জিভ দেখিয়া বলিলেন,—"থোড়েসি কসর্ হ্যায়। কল্ ফিন্ আনা।"

রোগী চলিয়া গেলে তফাদার নন্দর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"ওয়েল?"

নন্দ বলিলেন,—"আজ্ঞে বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেচি। কাল হঠাৎ ট্রাম থেকে—"

তফাদার। কম্পাউণ্ড ফ্রাক্‌চার? হাড় ভেঙেচে?

নন্দবাবু আনুপূর্ব্বিক তাঁর অবস্থা বর্ণনা করিলেন। বেদনা নাই, জ্বর হয় না, পেটের অসুখ, সর্দ্দী, হাঁপানি নাই। ক্ষুধা কাল হইতে একটু কমিয়াছে। রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছেন। মনে বড় আতঙ্ক।

ডাক্তার তাঁহার বুক, পেট, মাথা, হাত, পা, নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—"জিভ দেখি।" নন্দবাবু জিভ বাহির করিলেন।

ডাক্তার ক্ষণকাল মুখ [illegible]কাইয়া কলম ধরিলেন। প্রেসক্রিপ্‌শন লেখা শেষ হইলে নন্দর দিকে চাহিয়া

'এখন জিভ টেনে নিতে পারেন'

বলিলেন,—"আপনি এখন জিভ টেনে নিতে পারেন। এই ওষুধ রোজ তিনবার খাবেন।"

নন্দ। কি রকম বুঝচেন?

তফাদার। ভেরি ব্যাড।

নন্দ সভয়ে বলিলেন,—"কি হয়েচে?"

তফাদার। আরো দিনকতক ওয়াচ না করলে ঠিক বলা যায় না। তবে সন্দেহ কচ্চি cerebral tumour with strangulated ganglia. ট্রিফাইন করে মাথার খুলি ফুটো করে অস্ত্র করতে হবে, আর ঘাড় চিরে নার্ভের জট ছাড়াতে হবে। শর্ট সার্কিট হয়ে গেছে।

নন্দ। বাঁচব ত?

তফাদার। দমে যাবেন না, তা হলে সারাতে পারবো না। সাতদিন পরে ফের আসবেন। মাই ফ্রেণ্ড মেজর গোঁসাইএর সঙ্গে একটা কন্‌সলটেশনের ব্যবস্থা করা যাবে। ভাত-ডাল বড় একটা খাবেন না। এগ ফ্লিপ, বোনম্যারো সুপ, চিকেন ষ্টু, এই সব। বিকেলে একটু বর্গণ্ডি খেতে পারেন। বরফজল খুব খাবেন। হ্যাঁ, বত্রিশ টাকা। থ্যাঙ্ক ইউ।

নন্দবাবু কম্পিত পদে প্রস্থান করিলেন।

সন্ধ্যাবেলা বঙ্কুবাবু বলিলেন, "আরে তখনি আমি বারণ করেছিলুম ওর কাছে যেও না। ব্যাটা মেড়োর পেটে হাত বুলিয়ে খায়। এঁঃ, খুলির ওপর তুরপুন্ চালাবেন!"

ষষ্ঠিবাবু। আমাদের পাড়ার তারিণী কবিরাজকে দেখালে হয় না?

গুপীবাবু। না না, যদি বাস্তবিকই নন্দর মাথার ভেতর ওলট-পালট হয়ে গিয়ে থাকে, তবে হাতুড়ে বদ্যির কম্ম নয়। হোমিওপ্যাথিই ভাল।

নিধু। আমার কথা ত শুনবে না বাওয়া। ডাক্তারি তোমার ধাতে না সয় ত একটু কোবরেজি করতে শেখ।

দরওয়ানজি দিব্বি একলোটা বানিয়েচে। বল ত একটু চেয়ে আনি।

হোমিওপ্যাথিই স্থির হইল।

(৩)

পরদিন খুব ভোরে নন্দবাবু নেপাল ডাক্তারের বাড়ী আসিলেন। রোগীর ভিড় তখনো আরম্ভ হয় নাই, অল্পক্ষণ পরেই তাঁর ডাক প'ড়ল। একটি প্রকাণ্ড ঘরের মেঝেতে ফরাস পাতা। চারিদিকে স্তূপাকারে বহি সাজানো। বহির দেওয়ালের মধ্যে গল্পবর্ণিত শেয়ালের মত বৃদ্ধ নেপাল বাবু বসিয়া আছেন। মুখে গড়গড়ার নল, ঘরটি ধোঁয়ায় ঝাপ্‌সা হইয়া গিয়াছে।

নন্দবাবু নমস্কার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। নেপাল ডাক্তার কট্‌মট্ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,—"বস্‌বার যায়গা আছে।" নন্দ বসিলেন।

নেপাল। শ্বাস উঠেচে ?

নন্দ। আজ্ঞে ?

নেপাল। রুগীর শেষ অবস্থা না হলে ত আমায় ডাকা হয় না, তাই জিজ্ঞেস করচি।

নন্দ সবিনয়ে জানাইলেন তিনিই রোগী।

নেপাল। ডাকাত ব্যাটারা ছেড়ে দিলে যে বড় ? তোমার হয়েচে কি ?

নন্দবাবু তাঁহার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিলেন।

নেপাল। তফাদার কি বলেচে ?

নন্দ। বল্লেন আমার মাথায় টিউমার আছে।

নেপাল। তফাদারের মাথায় কি আছে জানো ? গোবর। আর টুপীর ভেতর সিং, জুতোর ভেতর খুর, পাৎলুনের ভেতর ল্যাজ। খিদে হয় ?

নন্দ। দুদিন থেকে একবারে হয় না।

নেপাল। ঘুম হয় ?

নন্দ। না।

নেপাল। মাথা ধরে ?

নন্দ। কাল সন্ধ্যাবেলা ধরেছিল।

নেপাল। বাঁ দিক ?

নন্দ। আজ্ঞে হাঁ।

নেপাল। না ডান দিক ?

নন্দ। আজ্ঞে হাঁ।

নেপাল ধমক দিয়া বলিলেন,—"ঠিক করে বল।"

নন্দ। আজ্ঞে ঠিক মধ্যিখানে।

নেপাল। পেট কামড়ায় ?

নন্দ। সেদিন কামড়েছিল। নিধে কাবলী মটর-ভাজা এনেছিল তাই খেয়ে—

নেপাল। পেট কামড়ায় না মোচড় দেয় তাই বল।

নন্দ বিব্রত হইয়া বলিলেন,—"হাঁচোড়-পাঁচোড় করে।"

ডাক্তার কয়েকটি মোটা-মোটা বহি দেখিলেন, তারপর অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"হুঁ। একটা ওষুধ দিচ্চি নিয়ে যাও। আগে শরীর থেকে এলোপাথিক বিষ তাড়াতে হবে। পাঁচ বছর বয়সে আমায় খুনে ব্যাটারা দু গ্রেণ কুইনীন দিয়েছিল, এখনো বিকেলে মাথা টিপ্ টিপ্ করে। সাতদিন পরে ফের এস। তখন আসল চিকিৎসা সুরু হবে।"

নন্দ। ব্যারামটা কি আন্দাজ করচেন ?

ডাক্তার ভ্রুকুটি করিয়া বলিলেন,—"তা জেনে তোমার চারটে হাত বেরুবে নাকি ? যদি বলি তোমার পেটে differential calculus হয়েচে, কিছু বুঝ্‌বে ? ভাত খাবে না, দুবেলা রুটি, মাছ মাংস বারণ, শুধু মুগের ডালের যুস, স্নান বন্ধ, গরম জল একটু খেতে পার। তামাক খাবে না, ধোঁয়া লাগলে ওষুধের গুণ নষ্ট হবে। ভাবচো আমার আলমারীর ওষুধ নষ্ট হয়ে গেছে ? সে ভয় নেই, আমার তামাকে সলফর থার্টি মেশান থাকে। ফি কত তাও বলে দিতে হবে নাকি ? দেখচো না দেওয়ালে নোটিশ লট্‌কানো রয়েচে বত্রিশ টাকা ? আর ওষুধের দাম চার টাকা।"

নন্দবাবু টাকা দিয়া বিদায় হইলেন।

নিধু বলিল,—"কেন বাওয়া কাঁচা পয়সা নষ্ট করচ ? থাকলে পাঁচরাত বক্সে বসে ঠিয়াটার দেখা চল্‌ত। ও নেপাল বুড়ো মস্ত ঘুঘু, নন্‌দাকে ভালমানুষ পেয়ে জেরা করে থ করে দিয়েচে। পড়্‌তো আমার পাল্লায় বাছাধন, কত বড় হোমিওফাঁক দেখে নিতুম। এক চুমুকে তার আলমারী শুদ্ধু ওষুধ সাবড়ে না দিতে পারি ত আমার নাক কেটে দিও।"

'হাঁচোড় পাঁচোড় করে'

গুপী। আজ আপিসে শুনছিলুম কে একজন বড় হাকিম ফরক্কাবাদ থেকে এখানে এসেচে। খুব নামডাক, রাজা মহারাজারা সব চিকিৎসা করাচ্চে। একবার দেখালে হয় না?

ষষ্ঠি। এই শীতে হাকিমি ওষুধ? বাপ্, সরবৎ খাইয়েই মারবে। তার চেয়ে তারিণী কোবরেজ ভাল।

অতঃপর কবিরাজি চিকিৎসাই সাব্যস্ত হইল।

(৪)

পরদিন সকালে নন্দবাবু তারিণী কবিরাজের বাড়ি উপস্থিত হইলেন। কবিরাজ মহাশয়ের বয়স ষাট, ক্ষীণ শরীর, দাড়ি গোঁফ কামানো। তেল মাখিয়া আট হাতি ধুতি পরিয়া একটি চেয়ারের উপর উবু হইয়া বসিয়া তামাক খাইতেছেন। এই অবস্থাতেই ইনি প্রত্যহ রোগী দেখেন। ঘরে একটি তক্তপোষ, তাহার উপর তেলচিটে পাটি এবং কয়েকটি মলিন তাকিয়া। দেওয়ালের কোণে দুটি ঔষধের আলমারী।

নন্দবাবু নমস্কার করিয়া তক্তপোষে বসিলে কবিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবুর কন্থে আসা হচ্চে?" নন্দবাবু নিজের নাম ও ঠিকানা বলিলেন।

তারিণী। রুগীর ব্যামো ডা কি?

নন্দবাবু জানাইলেন তিনিই রোগী এবং সমস্ত ইতিহাস বিবৃত করিলেন।

তারিণী। মাথার খুলী ছেঁদা করে দিয়েচে নাকি?

নন্দ। আজ্ঞে না, নেপালবাবু বল্লেন পাথুরি, তাই আর মাথায় অস্তর করাই নি।

তারিণী। নেপাল? সে আবার কেডা?

নন্দ। জানেন না? চোরবাগানের নেপালচন্দ্র রায় M. B., F. T. S.—মস্ত হোমিওপ্যাথ।

তারিণী। অঃ, হ্যাপলা, তাই কও। সেডা আবার ডাগদর হল কবে? বলি, পাড়ায় এমন বিচক্ষণ কোবরেজ থাকতি ছেলে ছোক্‌রার কাছে যাও কেন?

নন্দ। আজ্ঞে, বন্ধু-বান্ধবরা বল্লে ডাক্তারের মতটা আগে নেওয়া দরকার, যদিই অস্ত্র চিকিৎসা করতে হয়।

তারিণী। যষ্ঠিবাবু-রি চেন? খুল্‌নের উকীল যষ্ঠি রাবু?

নন্দ ঘাড় নাড়িলেন।

তারিণী। তাঁর মামার হয় উরুস্তম্ভ। সিবিল সার্জন পা কাট্‌লে। তিন দিন অচৈতন্নি। জ্ঞান হলি পর কইলেন, আমার ঠ্যাং কই? ডাক্‌ তারিণী স্যানরে। দেলাম ঠুকে এক দলা চ্যবনপ্রাশ। তার পর কি হল কও দিকি?

নন্দ। আবার পা গজিয়েচে বুঝি?

"ওরে অ ক্যাবলা, দেথ্‌ দেথ্‌ বিড়েলে সবডা ছাগলাদ্য ঘৃত খেয়ে গেল"—বলিতে বলিতে কবিরাজ মহাশয় পাশের ঘরে ছুটিলেন। একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া যথাস্থানে বসিয়া বলিলেন,—"দ্যাও, নাড়ীডা একবার দেখি! হঃ, যা ভাবছিলাম তাই। ভারি ব্যামো হয়েছিল কথনো?"

নন্দ। অনেকদিন আগে টাইফয়েড হয়েছিল।

তারিণী। ঠিক্‌ ঠাউরেচি। পাচ বছর আগে?

নন্দ। প্রায় সাড়ে সাত বছর হল।

তারিণী। একই কথা, পাচ দেরা সারে সাত। প্রাতিক্কালে বোমি হয়?

নন্দ। আজ্ঞে না!

তারিণী। হয়, Zানতি পার না। নিদ্রা হয়?

নন্দ। ভাল হয় না।

তারিণী। হবেই না ত। উর্দ্ধ হয়েচে কি না। দাঁত কন্‌কন্‌ করে?

নন্দ। আজ্ঞে না।

'হয়, Zানতি পার না'

তারিণী। করে, Zন্তি পার না। যা হোক, তুমি চিন্তা কোরোনি বাবা। আরাম হয়ে যাবানে। আমি ওষুধ দিচ্চি।

কবিরাজ মহাশয় আলমারী হইতে একটা শিশি বাহির করিলেন এবং তাহার মধ্যস্থিত বড়ির উদ্দেশে বলিলেন—"লাফাস্ নি, থাম্ থাম্। আমার সব জীয়ন্ত ওষুধ, ডাক্‌লি ডাক শোনে। এই বড়ি সকাল সন্ধ্যি একটা করি খাবা। আবার তিন দিন পরে আস্‌বা। বুজেচ?

নন্দ। আজ্ঞে হাঁ।

তারিণী। ছাই বুজেচ। অনুপান দিতি হবে না? ট্যাবা লেবুর রস আর মধুর সাথি মাড়ি খাবা। ভাত খাবা না। ওল সিদ্ধ, কচু সিদ্ধ এই সব খাবা। নুন ছোবা না। মাগুর মাছের ঝোল একটু চ্যানি দিয়ে রাঁধি খাতি পার। গরমজল ঠাণ্ডা করি খাবা।

নন্দ। ব্যারামটা কি?

তারিণী। যারে কয় উদুরি। উর্দ্ধশ্লেষ্মাও কইতি পার।

নন্দবাবু কবিরাজের দর্শনী ও ঔষধের মূল্য দিয়া বিমর্ষ চিত্তে বিদায় হইলেন।

নিধু বলিল—"কি দাদা, বোক্‌রেজির সাধ মিটল?

গুপী। নাঃ, এ সব বাজে চিকিৎসার কাজ নয়। কোথাও চেঞ্জে চল।

বঙ্কু। আমি বলি কি, নন্দ বে-থা করে ঘরে পরিবার আনুক। এ রকম দামড়া হয়ে থাকা কিছু নয়।

নন্দ চিঁ চিঁ রবে বলিলেন—"আর পরিবার। কোন্ দিন আছি, কোন্ দিন নেই। এই বয়সে একটা কচি বউ এনে মিথ্যে জঞ্জাল জোটানো।"

নিধু বলিল—"নন্ দা, একটা মটোর কেন মাইরি। দুদিন হাওয়া খেলেই চাঙ্গা হয়ে উঠবে। সেভেন সিটার হড্‌সন্। যেটের কোলে আমরাও ত পাঁচজন আছি।"

ষষ্ঠি। তা যদি বল্লে, তবে আমার মতে মোটরকারও যা, পরিবারও তা। ঘরে আনা সোজা, কিন্তু মেরামতি খরচা যোগাতে প্রাণান্ত। আজ টায়ার ফাট্‌লো, কাল গিন্নির অম্বলশূল, পরশু ব্যাটারী খারাপ, তরশু ছেলেটার ঠাণ্ডা লেগে জ্বর। অমন কাজ কোরোনা নন্দ। জেরবার হবে। এই শীতকালে কোথা দুদণ্ড লেপের মধ্যে ঘুমুব মশায়, তা নয়, সারারাত প্যান্ প্যান্ ট্যা ট্যা।

নিধু।—ষষ্ঠি খুড়ো যে রকম হিসেবি লোক, একটি মোটাসোটা রোঁওলা ভাল্লুকের মেয়ে বে কল্লে ভাল করতেন। লেপ কম্বলের খরচা বাঁচত।

গুপী। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন। কাল সকালে নন্দ একবার হাকিমসাহেবের কাছে যাও। তার পর যা হয় করা যাবে।

নন্দবাবু অগত্যা রাজি হইলেন।

(৫)

হাজিক্-উল-মুলক্ বিন লোকমান নুরুল্লা গজন ফরুল্লা অল্ হকিম-উনানী লোয়ার চিৎপুর রোডে বাসা লইয়াছেন। নন্দবাবু তেতলায় উঠিলে একজন লুঙ্গীপরা ফেজধারী লোক তাঁকে বলিল—"আসেন বাবুমশয়। আমি হাকিমসাহেবের মীরমুন্সী। কি বেমারি বোলেন, আমি লিখে হুজুরকে এত্তেলা ভেজিয়ে দিব।"

নন্দ।—বেমারি কি সেটা জান্‌তেই ত আসা বাপু।

মুন্সী।—তব্ ভি কুছু ত বোলেন। না-তাক্‌তি, বুখার, পিল্লি, চেচক্, ঘেঘ, বাওয়াসির, রাত-অন্ধি—

নন্দ।—ও সব কিছু বুঝলুম না বাপু। আমার প্রাণটা ধড়ফড় করচে।

মুন্সী। সো হি বোলেন। দিল্ তড়পনা। মোহর এনেছেন?

নন্দ। মোহর?

মুন্সী। হাকিমসাহেব চাঁদি ছোন না। নজরানা দো মোহর। না থাকে হামি দিচ্চি। পয়তালিশ টাকা, আর বাট্টা দো টাকা, আর রেশমী রুমাল দো টাকা। দরবারে যেয়ে আগে হুজুরকে 'বন্দেগী জনাব' বোলবেন, তার পর রুমালের ওপর মোহর রেখে সামনে ধরবেন।

মুন্সী নন্দবাবুকে তালিম দিয়া দরবারে লইয়া গেল। একটি বৃহৎ ঘরে গালিচা পাতা, একপার্শ্বে মসনদের উপর তাকিয়া হেলান দিয়া হাকিমসাহেব ফরসীতে ধূমপান করিতেছেন বয়স পঞ্চান্ন, বাব্‌রি চুল, গোঁফ খুব ছোট করিয়া ছাঁটা। আবক্ষলম্বিত দাড়ির গোড়ার দিক্ সাদা, মধ্যে লাল, ডগায় নীল। পরিধান সাটিনের চুড়িদার

ইজার, কিংখাপের জোব্বা, জরীর তাজ। সম্মুখে ধূপদানে মুসব্বর এবং রুমী মস্তগী জ্বলিতেছে, পাশে পিকদান, পানদান, আতরদান ইত্যাদি। চারপাঁচজন পারিষদ হাঁটু মুড়িয়া বসিয়া আছে এবং হাকিমের প্রতি কথায় কেরামৎ বলিতেছে। ঘরের কোণে একজন ঝাঁকড়া-চুলো চাপ-দেড়ে লোক সেতার লইয়া পিড়িং পিড়িং এবং বিকট অঙ্গভঙ্গী করিতেছে।

মুন্সী। ডরুবেন না মশয়। জনাবকে আপনার মাথা দেখ্লান।

নন্দর মাথা টিপিয়া হাকিম বলিলেন—"হড্ডি পিল্‌পিলায় গয়া।"

মুন্সী। শুনছেন? মাথার হাড় বিল্‌কুল নরম হয়ে গেছে।

হাকিম তিনরঙা দাড়িতে আঙুল চালাইয়া বলিলেন—"মুর্গা মুর্খ্।"

'হড্‌ডি পিল্‌পিলায় গয়া'

নন্দবাবু অভিবাদন করিয়া মোহর নজর দিলেন। হাকিম ঈষৎ হাসিয়া আতরদান হইতে কিঞ্চিৎ তুলা লইয়া নন্দর কাণে গুঁজিয়া দিলেন। মুন্সী বলিল—"আপনি বাংলায় বাতচিত বোলেন। হামি হুজুরকে সমুঝিয়ে দিব।"

নন্দবাবুর ইতিবৃত্ত শেষ হইলে হাকিম ঋষভ কণ্ঠে বলিলেন—"শির্‌লাও।"

একজন একটা লাল গুঁড়া নন্দর চোখের পল্লবে লাগাইয়া দিল। মুন্সী বুঝাইল—"আঁখ ঠাণ্ডা থাকবে, নিদ হবে।" হাকিম আবার বলিলেন—"রোগন্ বব্বর।" মুন্সী হাঁকিল—"এ জি বাল্‌বর, অস্তুরা লাও।"

নন্দবাবু "হাঁ-হাঁ-আরে তুম্ করো কি—" বলিতে বলিতে নাপিত চট করিয়া তাঁহার ব্রহ্মতালুর উপর দু-ইঞ্চি সমচতুষ্কোণ কামাইয়া দিল, আর একজন তাহার

উপর একটা দুর্গন্ধ প্রলেপ লাগাইল। মুন্সী বলিল—"ঘব্‌ড়ান কেন মশয়, এ হচ্চে বব্বরী সিংগির মাথায় ঘি। বহুৎ কিম্মৎ। মাথার হাড্ডি শকৎ হবে।"

নন্দবাবু কিয়ৎক্ষণ হতভম্ব অবস্থায় রহিলেন। তার পর প্রকৃতিস্থ হইয়া বেগে ঘর হইতে পলায়ন করিলেন। মুন্সী পিছনে ছুটিতে ছুটিতে বলিল—"আমার দস্তুরী ?" নন্দ একটা টাকা ফেলিয়া দিয়া তিন লাফে নীচে নামিয়া গাড়িতে উঠিয়া কোচম্যানকে বলিলেন "হাঁকাও।"

সন্ধ্যাকালে বন্ধুগণ আসিয়া দেখিলেন বৈঠকখানার দরজা বন্ধ। চাকর বলিল, বাবুর বড় অসুখ, দেখা হইবে না। সকলে বিষণ্ণ চিত্তে ফিরিয়া গেলেন।

(৬)

সমস্ত রাত বিছানায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া ভোর চারটার সময় নন্দবাবু ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আর বন্ধুগণের পরামর্শ শুনিবেন না, নিজের ব্যবস্থা নিজেই করিবেন।

বেলা আটটার সময় নন্দ বাড়ি হইতে বাহির হইলেন এবং বড় রাস্তায় ট্যাক্সি ধরিয়া বলিলেন—"সিধা চলো।" সংকল্প করিয়াছেন, মিটারে একটাকা উঠিলেই ট্যাক্সি হইতে নামিয়া পড়িবেন, এবং কাছাকাছি যে চিকিৎসক পান তাহারই মতে চলিবেন,—তা সে এলোপ্যাথ, হোমিও-প্যাথ, কবিরাজ, হাতুড়ে, অবধূত, মাদ্রাজী বা চাঁদসীর ডাক্তার যে-ই হোক।

বউবাজারে নামিয়া একটি গলিতে ঢুকতেই সাইন-বোর্ড নজরে পড়িল—"ডাক্তার মিস্ বি মল্লিক।" নন্দবাবু "মিস্" কথাটি লক্ষ্য করেন নাই, নতুবা হয়ত ইতস্তত করিতেন। একবারে সোজা পরদা ঠেলিয়া একটি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

মিস্ বিপুলা মল্লিক তখন বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া কাঁধের উপর সেফটিপিন আঁটিতেছিলেন। নন্দকে দেখিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন—"কি চাই আপনার ?"

নন্দবাবু প্রথমটা অপ্রস্তুত হইলেন, তারপর মরিয়া হইয়া ভাবিলেন—"দূর হোক্ না হয় লেডি ডাক্তারের পরামর্শই নোবো।" বলিলেন—"বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি।"

মিস্ মল্লিক। পেন আরম্ভ হয়েচে ?

নন্দ। পেন ত কিছু টের পাচ্চি না।

মিস্। ফার্ষ্ট কনফাইনমেণ্ট ?

নন্দ। আজ্ঞে ?

মিস্। প্রথম পোয়াতী ?

নন্দ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—"আমি নিজের চিকিৎসার জন্যই এসেচি।"

মিস্ মল্লিক আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"নিজের জন্য ? ব্যাপার কি ?"

সমগ্র ইতিহাস বর্ণনা শেষ হইলে মিস্ মল্লিক নন্দবাবুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দুচারিটি প্রশ্ন করিয়া কহিলেন—"আপনার নামটি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?"

নন্দ। শ্রীনন্দদুলাল মিত্র।

মিস্। বাড়ীতে কে আছেন ?

নন্দ জানাইলেন তিনি বহুদিন বিপত্নীক, বাড়িতে এক বৃদ্ধা পিসি ছাড়া কেউ নাই।

মিস্। কাজকর্ম্ম কি করা হয় ?

নন্দ। তা কিছু করি না। পৈত্রিক সম্পত্তি আছে।

মিস্। মোটরকার আছে ?

নন্দ। নেই, তবে কেনবার ইচ্ছা আছে।

মিস্ মল্লিক আরো নানা প্রকার প্রশ্ন করিয়া কিছুক্ষণ ঠোঁটে হাত দিয়া চিন্তা করিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বামে দক্ষিণে ঘাড় নাড়িলেন।

নন্দ ব্যাকুল হইয়া বলিলেন—"দোহাই আপনার, সত্যি করে বলুন আমার কি হয়েচে। টিউমার, না পাথুরী, না উদরী, না কালাজ্বর, না হাইড্রো-ফোবিয়া ?"

মিস্ মল্লিক হাসিয়া বলিলেন, "কেন আপনি ভাবচেন ? ও-সব কিছুই হয় নি। আপনার শুধু একজন অভিভাবক দরকার।"

নন্দ অধিকতর কাতর কণ্ঠে বলিলেন—"তবে কি আমি পাগল হয়েচি ?"

মিস্ মল্লিক মুখে রুমাল দিয়া খিল খিল করিয়া বলিলেন—"ও ডিয়ার ডিয়ার নো। পাগল হবেন কেন ? আমি বল্‌ছিলুম, আপনার যত্ন নেবার জন্য বাড়িতে উপযুক্ত লোক থাকা দরকার।"

নন্দ।—কেন, পিসিমা ত আছেন

মিস মল্লিক পুনরায় হাসিয়া বলিলেন—"দি আইডিয়া! মাসী পিসির কাজ নয়। যাক, আপাতক একটা ওষুধ দিচ্চি, খেয়ে দেখবেন। বেশ মিষ্টি, এলাচের গন্ধ। এক হপ্তা পরে আবার আসবেন।"

'দি আইডিয়া

*   *   *   *   *

নন্দবাবু সাত দিন পরে পুনরায় মিস্ বিপুলা মল্লিকের কাছে গেলেন। তারপর তুদিন পরে আবার গেলেন। তারপর প্রত্যহ।

তারপর একদিন নন্দবাবু পিসিমাতাকে ৺কাশীধামে রওনা করাইয়া দিয়া মস্ত বাজার করিলেন। একঝুড়ি গল্‌দা চিংড়ি, একঝুড়ি মটন, তদনুযায়ী ঘি, ময়দা, দই, সন্দেশ' ইত্যাদি। বন্ধুবর্গ খুব খাইলেন। নন্দবাবু জরী-পাড় সূক্ষ্ম ধুতির উপর সিল্কের পাঞ্জাবী পরিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিলেন।

মিসেস্ বিপুলামিত্র এখন আর স্বামী ভিন্ন অপর রোগীর চিকিৎসা করেন না। তবে নন্দবাবু ভালই আছেন। মোটরকার কেনা হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, সান্ধ্য আড্ডাটি ভাঙিয়া গিয়াছে। *

* William Caine's Among the Doctors. নামক গল্পের ছায়া অবলম্বনে।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জাপান

শ্রীনরেন্দ্র দেব

"চীন ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপান
তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"

স্বদেশ-প্রেমিক কবি যেদিন অসভ্য জাপানের স্বাধীনতার উল্লেখ ক'রে তাঁর নিদ্রিত দেশবাসীদের উদ্বুদ্ধ করবার জন্য এই অমর গাথা রচনা করেছিলেন, সেদিন তিনি হয়ত স্বপ্নেও ভাবেন নি যে সেই অসভ্য জাপান এত শীঘ্র জগতের শীর্ষ-শক্তি সমূহের একজন ব'লে পরিচিত হবে। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে অসীম অধ্যবসায় ও অমিত পরিশ্রমে জাপান যেন মন্ত্রসিদ্ধের মত একেবারে পাঁচশত শতাব্দী কাল অতিক্রম ক'রে বিরাট উন্নতির যে অভ্রভেদী শিখরে উঠে দাঁড়িয়েছে,—বিস্মিত জগৎ তাই দেখে জাপানকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করতে বাধ্য হয়েছে। জাপানের রাজধানী টোকিয়ো আজ জগতের কোনও দেশের রাজধানীর কাছে শোভায়—সৌন্দর্য্যে—ঐশ্বর্য্যে—সম্পদে হীন ছিল না, জাপানের প্রধান বাণিজ্য বন্দর ইয়োকোহামা আজ পৃথিবীর যে কোনও শ্রেষ্ঠ বন্দরের সমতুল্য হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু, দৈব দুর্ব্বিপাকে সেদিন ভীষণ ভূমিকম্প, বিপুল জলোচ্ছ্বাস ও প্রলয়ের ঝঞ্ঝাবাতে জাপানের সেই সুরম্য রাজধানী, সেই অতুলনীয় বন্দর একেবারে ধ্বংস ও বিধ্বস্ত হয়ে মহাশ্মশানে পরিণত হয়েছে!

জাপানী সৈরিন্ধ্রী

এই আকস্মিক দৈব রোষানলে বিকলাঙ্গ জাপানের মর্ম্মন্তুদ্ আর্ত্তনাদ শুনে আজ বিশ্বের লোক সমবেদনায় কাতর হয়ে তার প্রতি অসীম সহানুভূতি জানিয়ে তাকে সাহায্য করতে উদ্যত হ'য়েছে। জাপান ভারতেরই প্রতিবাসী, এসিয়ার গৌরব-মুকুট; তাই আজ তার এই ঘোর দুর্দ্দিনে তার কথাই আমাদের কেবলই মনে হ'চ্ছে। জাপানের সব কথা গুছিয়ে ব'লতে হ'লে একখানি বিরাট গ্রন্থ হ'য়ে পড়বে এবং সেভাবে কিছু বলবার আমাদের আর কোনও প্রয়োজনও নেই। কারণ লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সুদীর্ঘকাল জাপান প্রবাসের অভিজ্ঞতা নিয়ে জাপান সম্বন্ধে বাংলাভাষায় একখানি সুলিখিত সচিত্র গ্রন্থ প্রকাশ ক'রে বাঙ্গালী পাঠকদের উপহার দিয়েছেন।

রেশমী সুন্দরীর দল
জাপানের রেশমের কারখানায় মেয়েরাই বেশীর ভাগ কাজ করে

জাপানের প্রমোদ-উদ্যান

শিশুর জন্মদিনে

জাপানী শ্রমণ

কামার-বাড়া—(জাপানের কামার-বাড়ী প্রায়ই দেখা যায় নেহাইয়ের উপর বড় হাতুড়ীটা পিটছে কামার-বউ নিজেই)

চা-নো-উ।—(জাপানী বাড়ীর চায়ের মজলিশ)

জাপানের কৃষক পরিবার
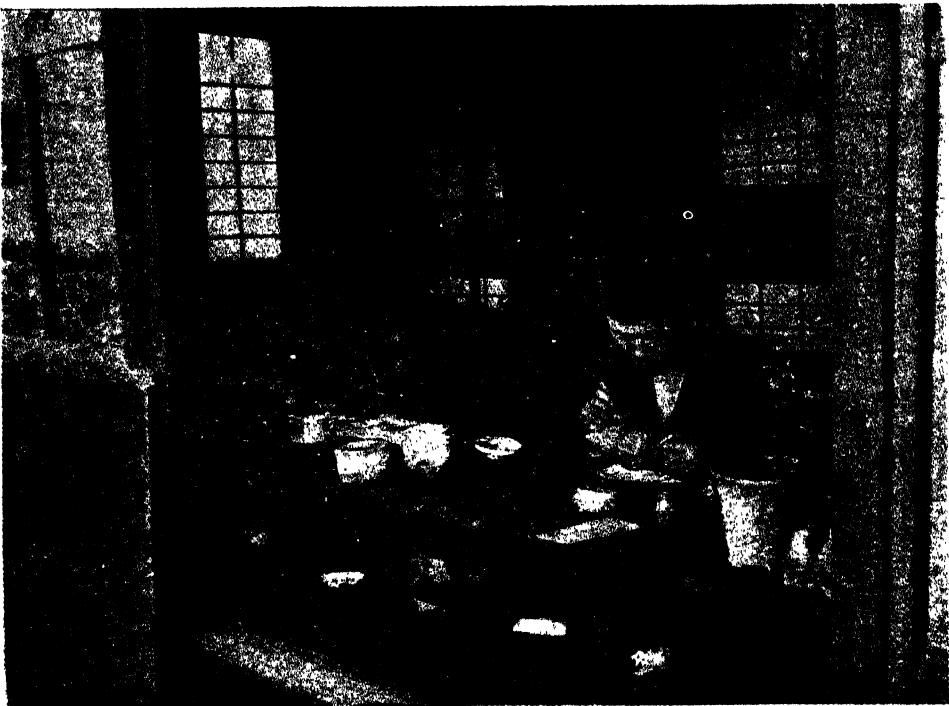
মীনের কাজ

(জাপানী ফুলদানী প্রভৃতি পাত্রে যে চমৎকার মীনের কাজ করা থাকে সেটা জাপানের একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্প)

টাট্‌কা চীনেমাটির বাসন
(এইমাত্র পোড়াবার চুল্লী থেকে বার ক'রে নিয়ে যাচ্ছে)

চীনেমাটির লণ্ঠন
(জাপানী শিল্পীরা চীনেমাটির লণ্ঠন তৈরি করছে)

বাঁশঝাড়ের পথে—(জাপানে এই সরু সরু লম্বা তল্‌তা বাঁশের বড় বড় জঙ্গল আছে। এই বাঁশ থেকে জাপানীরা হরেক রকম আস্‌বাব তৈয়ার করে। বাঁশঝাড়ের ভিতর দিয়ে বেড়াবার চমৎকার পথ করা আছে। জাপানী মেয়েরা এই পথ দিয়ে 'রিক্‌শ' চড়ে বেড়াতে খুব ভালবাসে। জাপানেই 'রিক্‌শ' গাড়ীর প্রথম সৃষ্টি। 'রিক্‌শ'র পুরো নাম হচ্ছে "জান-রিকীশা" 'জান' মানে মানুষ, 'রিকী' মানে শক্তি এবং 'শা' মানে গাড়ী! অর্থাৎ মানুষের জোরে যে গাড়ী চলে!)
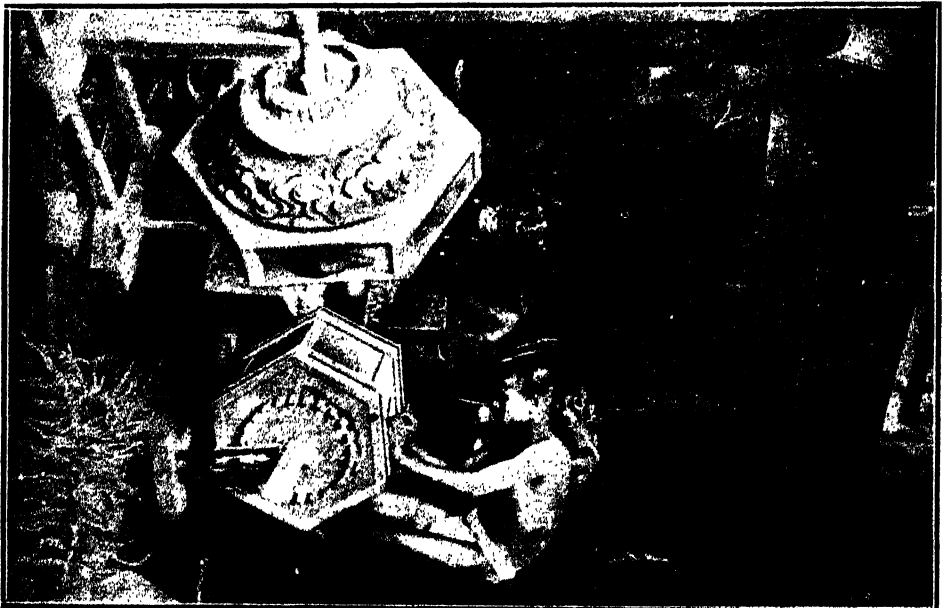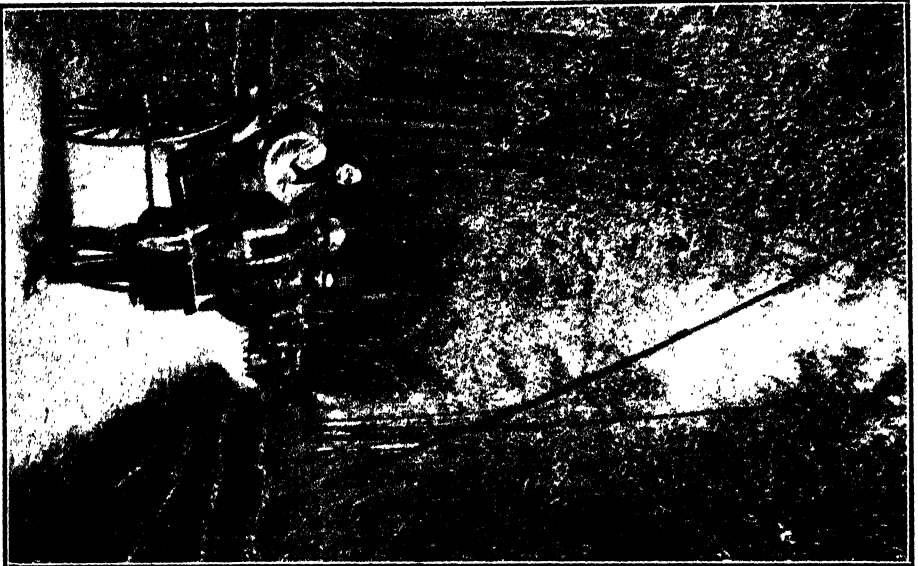
বিবাহ সভায়—(বিবাহ সভায় জাপানী কনের আদরই বেশী)
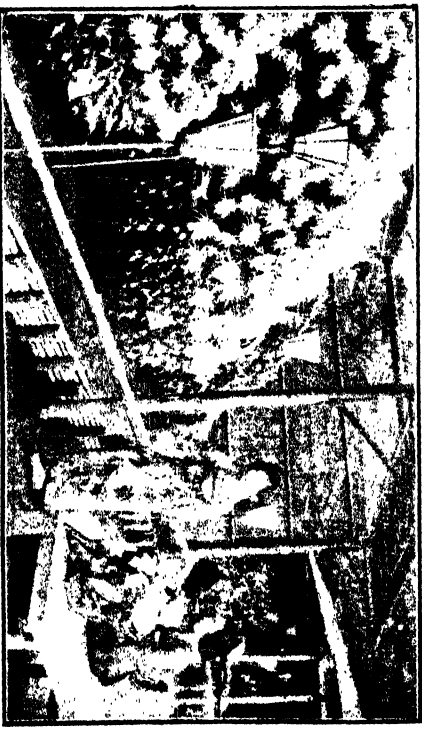
পুষ্প-প্রদর্শনী—(জাপানীরা এত ফুল ভালবাসে যে সেখানে প্রত্যেক ঋতুতে পুষ্প-প্রদর্শনী হয়

জাপানের বিষয় সবিশেষ জানবার যাঁদের কৌতূহল হবে, তাঁরা সুরেশ বাবুর বইখানি প'ড়লেই জাপানের সমস্ত পরিচয় পাবেন। আজ আমরা কেবল পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের অসভ্য জাপান এবং তার নব-অভ্যুদয়ের ইতিহাসটুকু লিপিবদ্ধ ক'রে এই প্রবন্ধ শেষ ক'রবো।

ও রূপসী কন্যা, সবিতাদেবী—যাঁর অসীম কৃপায় ধরণী আজিও ধন্যা হ'য়ে আছেন, তিনি স্বয়ং স্বর্গরাজ্য থেকে তাঁর এক পৌত্রকে পাঠিয়ে দিলেন এই দেশে রাজ্য স্থাপন করবার জন্য। এবং তাঁকে ব'লে দিলেন যে, বৎস। এই স্থানে পুরুষানুক্রমে আমার বংশধরেরা রাজ্য কর'বে
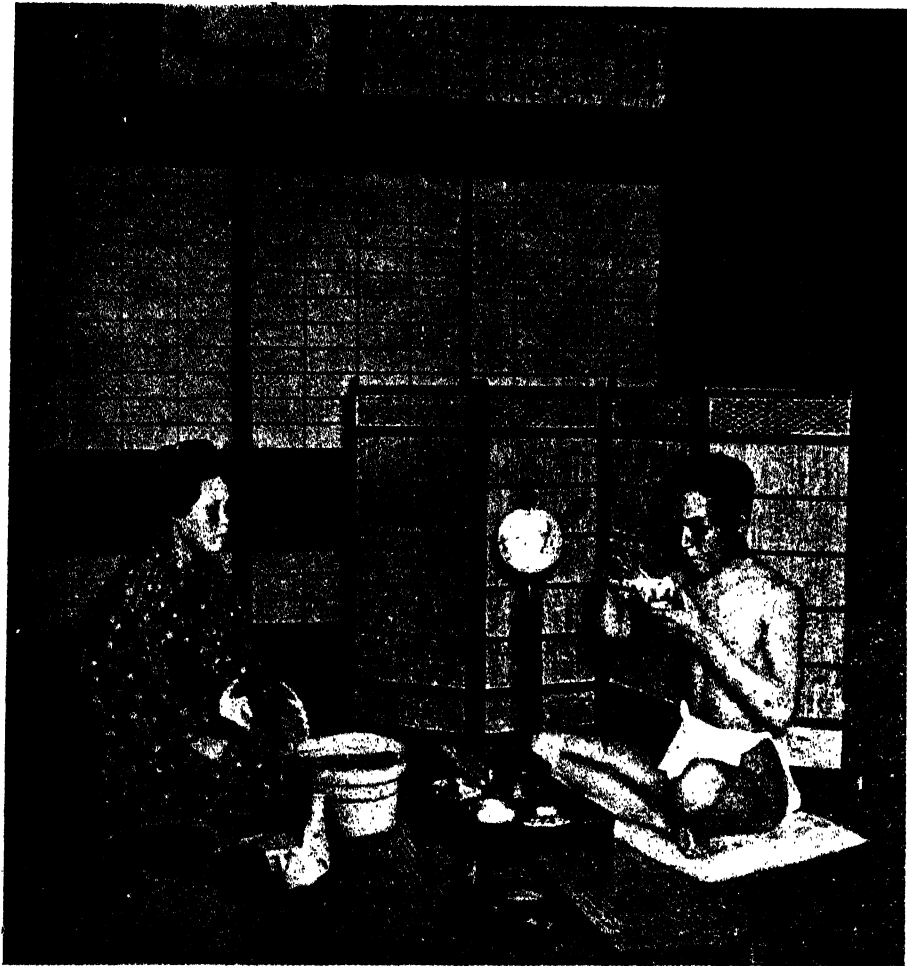
জাপানী হোটেলে

(অতিথি যে শ্রেণীরই লোক হোক্ না কেন, হোটেলের একজন না একজন বাঁদি সদাসর্ব্বদা তার পরিচর্য্যা করে)

জাপানের পৌরাণিক কাহিনীতে বিবৃত আছে, যে, "সৃষ্টির প্রথম যুগে যখন চারিদিকে কেবল প্রলয় পয়োধি-জল ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, তখন ভূলোকে সর্ব্বাগ্রে জাপানের জন্ম হয়। সৃষ্টিকর্ত্তারা যখন এ আদিম ভূমির নির্ম্মাণকার্য্য শেষ করলেন, তখন তাঁদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী

এবং এ দেশ দ্বিতীয় স্বর্গরাজ্যের মতো চিরদিন অমর হয়ে থাকবে।"

স্বর্গবাসী অসংখ্য দেবতার সঙ্গে ভগবতী সবিতার পৌত্র মর্ত্তে অবতরণ ক'রলেন এবং কীয়ূশীউর দক্ষিণে তাকাচীহো পর্ব্বতের উপর বসবাস করতে লাগলেন। জাপানের

প্রধান নরপতি মহারাজ জিম্মু এই পর্ব্বতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ভগবতী সবিতার পৌত্রের সাক্ষাৎ বংশধর। তাঁকে দেব-অংশের চতুর্থ পুরুষ বলে গণ্য করা হয়। মহারাজ জিম্মুর পূর্ব্বপুরুষেরা যে কাজের ভার নিয়েছিলেন, তিনিই সে কাজ সম্পূর্ণ করেন। মধ্য জাপানের ইয়ামাটো প্রদেশ পর্য্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তার লাভ করেছিল। তিনিই এই দ্বীপের আদিম অসভ্য বর্ব্বর জাতকে সভ্য ও সুশাসিত করেছিলেন। খৃঃ পূঃ ৬৬০ সালে তিনি এই সাম্রাজ্য স্থাপনা ক'রে সর্ব্বপ্রথম রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করেন।

কিন্তু জাপানের এই পৌরাণিক কাহিনী সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মত হচ্ছে যে, জিম্মু একদল ভাগ্যান্বেষী দুঃসাহসিক এশিয়াবাসীর দলপতি হ'য়ে বহুদেশ পর্য্যটন করবার পর জাপানে এসে উপস্থিত হন; এবং জাপানের আদিম অধিবাসীদের বাহুবলে পরাস্ত ক'রে তাদের উপর নিজের আধিপত্য স্থাপন করেন। জিম্মুর পরবর্ত্তী তেত্রিশ জন ভূপতি ও রাজ্ঞী দ্বাদশ শতাব্দী ধরে রাজ্য পরিচালনা করেন; তাঁদের মধ্যে মহারাণী জিঙ্গোর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ এঁরই রাজত্বকালে জাপান 'কোরিয়া' বিজয় করেছিল। কিন্তু এই বিজিত দেশ কোরিয়ার
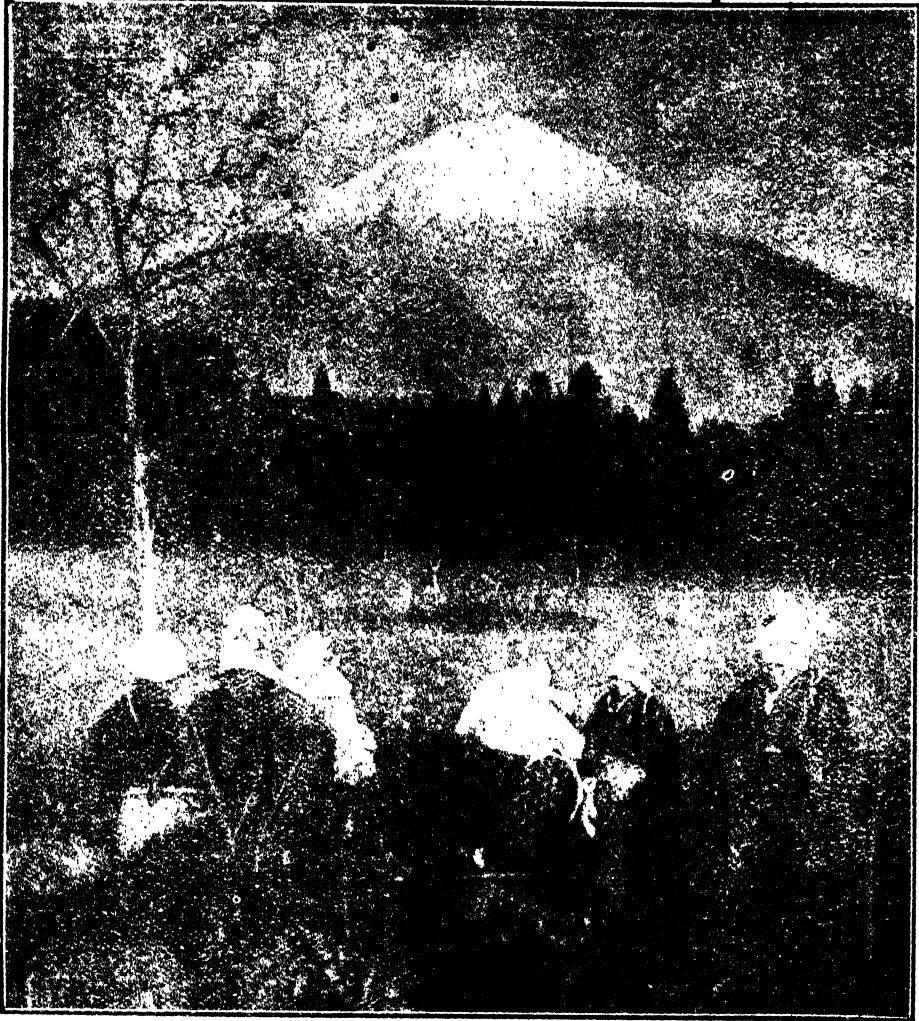
ফুজিয়ামা
(জাপানের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ আগ্নেয়গিরি ; এই আগ্নেয়-গিরিগর্ভ জাপানের আপামর জনসাধারণের তীর্থস্বরূপ)

চাষার মেয়ে
(মেলা দেখে বাড়ী ফিরছে)
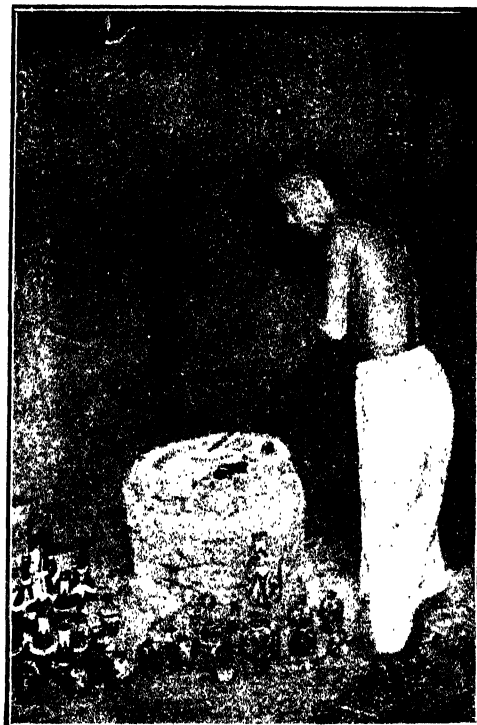
কাচ-কারিগর

অতিথি-সেবা
(অতিথি যেমন সুখাদ্য আহার্য্যে পরিতুষ্ট হ'ন, ততোধিক সুন্দরী পরিবেশনকারিণীদের যত্নে আপ্যায়িত হন)
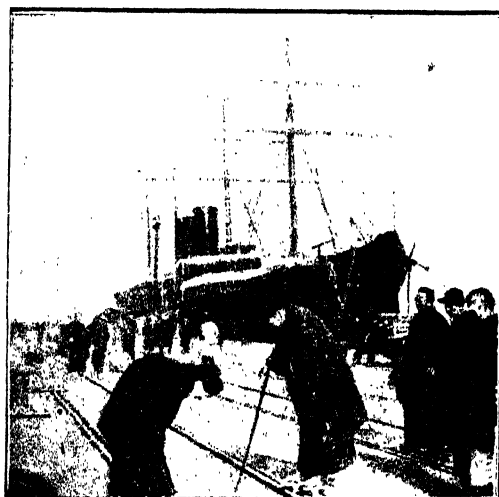
য়োকোহামা বন্দর
(জাপানের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দরটি সেদিনের প্রলয়কাণ্ডে লয় পেয়েছে)

কাছেই জাপানকে শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, অনেক জিনিষ শিখতে হ'য়েছিল। জাপান বিজয়ী হ'লেও শিক্ষার ও সভ্যতার দিক থেকে সে তখন কোরিয়ার অনেক পশ্চাতে পড়ে ছিল। কারণ, চীনের সভ্যতার আলোক জাপানে পৌছবার বহুপূর্ব্বেই কোরিয়াকে উজ্জ্বল করে তুলেছিল। সভ্যতার সর্ব্ববিধ গৌরবে কোরিয়া যখন গৌরবান্বিত, জাপান তখন পৃথিবীতে একেবারে নিরক্ষর জাতির মধ্যে পরিগণিত ছিল। কোরিয়া বিজয়ের পর জাপান তার কাছে যে রাষ্ট্রনীতি ও সামাজিক রীতি শিক্ষা করেছিল, সে শিক্ষা দ্বাদশ শত বৎসর ধ'রে জাপানকে পথ নির্দ্দেশ ক'রেছে।

বীণাবাদিনীর দল—(এরা পথ দিয়ে গান গেয়ে বীণা বাজিয়ে বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করে জীবিকা উপার্জ্জন করে)

জাপানে সামাজিক সংস্কার আরম্ভ হবার পূর্ব্বেই ধর্ম্ম সংস্কার সুরু হয়েছিল। কোরিয়া ও চায়না থেকে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী আচার্য্য ও ধর্ম্ম-প্রচারক দলবদ্ধ হ'য়ে জাপানে এসে তাদের মধ্যে নূতন ধর্ম্ম প্রচার করতে আরম্ভ করেন; এবং শীঘ্রই সমগ্র জাপানকে তাঁদের নবধর্ম্মে দীক্ষিত ক'রতে সক্ষম হয়েছিলেন। সম্রাট ও তাঁর সভাসদ্ ও পার্শ্বচরগণ থেকে সুরু করে সে দেশের দীনতম লোকটি পর্য্যন্ত সমস্ত জাতটা এই নবধর্ম্ম স্বেচ্ছায় ও সানন্দে গ্রহণ করায় জাপান বৌদ্ধধর্ম্মের এক বিরাট কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল;

জাপানী তরুণী

এবং এসিয়ার শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প নীতি প্রভৃতি আয়ত্ত করা তাদের পক্ষে খুব সহজ হয়ে এসেছিল।

খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে জাপানের রাষ্ট্রীয়গঠন হুবহু চায়নার অনুকরণে দাঁড়িয়েছিল। একজন সর্ব্বশক্তিমান রাজার শাসনাধীনে থেকে জাপান চারিদিক দিয়ে দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হ'তে লাগল। সমগ্র জাপান

জাপানের রাজধানী টোকিয়ো
(এই সুন্দর সহরটি সেদিনের ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে গেছে)

বালিকা বিদ্যালয়ে—(ফুলের সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে)
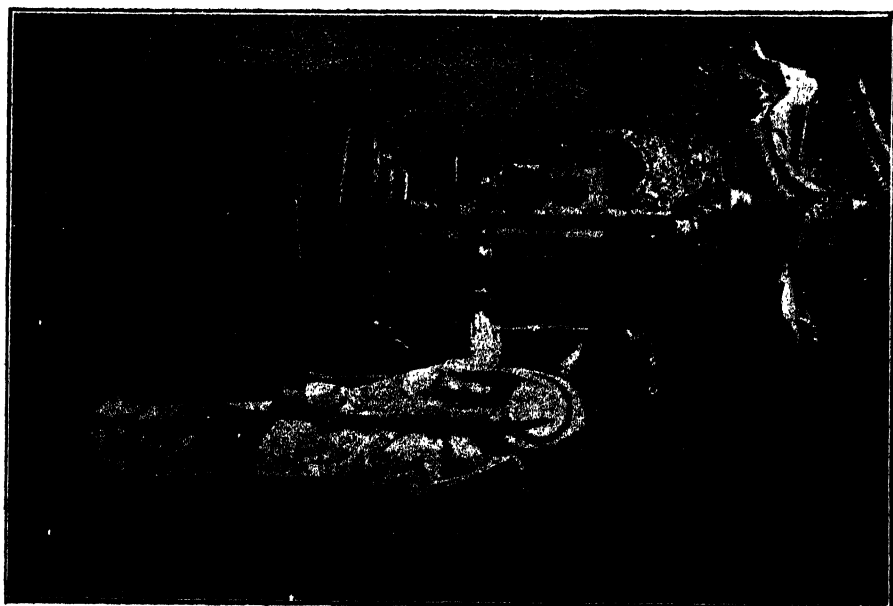
জাপানী পূজারিণী

জাপানী ভিক্ষুণী

কৃত্রিম সরোবর—(এই সরোবরগুলির আকার অত্যন্ত সুবৃহৎ, বিশাল হ্রদের মতো দেখায়, কিন্তু জল কোথাও এক হাঁটুর বেশী নেই। মাঝে মাঝে পাথরের তৈরি পদ্মপাতা বসানো আছে, তার উপর দিয়ে পা ফেলে অনায়াসে সরোবর পার হ'য়ে যাওয়া যায়)
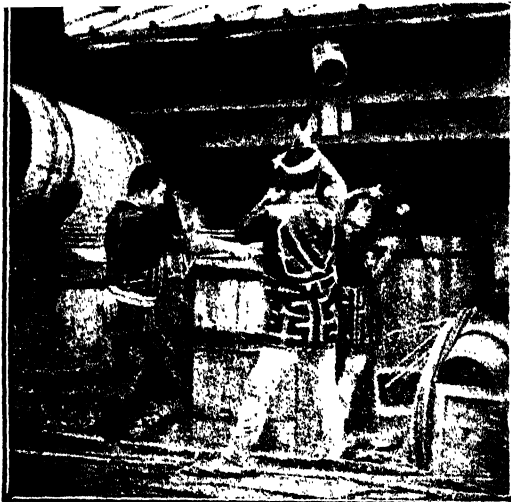
জাপানের সূত্রধর

গেকীন ও সামীসেন
(দুইটিই জাপানী তারের যন্ত্র, সেতার ও শরদ শ্রেণীর)

শিক্ষিত সভ্য ও সুশাসিত হ'তে প্রায় তিনশত বৎসর সময় লেগেছিল। দেওয়ানী ফৌজদারী ও সামরিক প্রভৃতি সমস্ত ক্ষমতাই তখন সম্পূর্ণরূপে রাজার হাতে ন্যস্ত ছিল। সিংহাসনের আদেশ সকলকে নতশিরে মানতে হ'তো। এই তিন শতাব্দীর মধ্যে জাপানে একাধিক প্রতিভাশালী নৃপতি সিংহাসন অলঙ্কৃত ক'রে গেছেন। তাঁদের শক্তি ও সাহসের জোরে তাঁদের বীর্য্য পরাক্রম ও নেতৃত্বের সহায়তায়, তাঁদের জ্ঞান-পিপাসা শিল্পানুরাগ ও কাব্য-লিপ্সার কল্যাণে জাপান প্রভূত উন্নতি লাভ ক'রেছিল। কিন্তু এই তিন শতাব্দীর পরই দেখা যায় যে, জাপানের রাজশক্তি ক্রমে অবনতির পথে চলেছে। রাজ্যেশ্বরেরা ক্রমে ভোগী, অলস, বিলাসী, মদ্যপায়ী, নৃত্য-গীতপ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতা প্রভৃতি নীচ এবং কলুষিত আমোদে আসক্ত হ'য়ে পড়তে লাগল। এই সময় রাজশক্তি প্রায় সবটাই রাজার পার্শ্বচর ও রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারী ফুজিবারা বংশের সর্দ্দারদের করতলগত হ'য়ে পড়েছিল। প্রবাদ আছে যে, এই ফুজিবারা

জাপানী পল্লীবালা

বংশের কোন এক প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষ নাকি ভগবতী সবিতার পৌত্রের অনুগমন ক'রে স্বর্গরাজ্য থেকে মর্ত্ত্যে নেমে এসেছিলেন!

পুতুলের মত রাজাকে বসিয়ে রেখে তাঁর সিংহাসনের অন্তরাল থেকে এই ফুজিবারা বংশীয়েরা প্রায় পাঁচ শতাব্দী ধ'রে জাপানের ভাগ্যদেবতার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ফুজিবারা বংশেও এমন সব কৃতবিদ্য লোক জন্মেছিলেন, যাঁরা তাঁদের এই সহজপ্রাপ্য রাজশক্তির অপব্যবহার না ক'রে, এবং সিংহাসনের প্রলোভন এড়িয়ে, দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন ক'রে গেছেন। জাপানের রাজবংশের অনেকেই এই ফুজিবারা কুলের বিদুষী কন্যাদেরই পাণি-পীড়ন করতেন। ফুজিবারা পরিবারের মধ্যেও জাপানের একাধিক রাজকুমারীর বধূরূপে প্রবেশ লাভ করবার সৌভাগ্য হ'য়েছিল। বড় বড় রাজকর্ম্মচারীর পদে এই ফুজিবারা বংশধরদেরই একচেটে অধিকার জন্মে গেছল।

জাপানী জ্যোতির্ব্বিদ্

জাপানের সর্ব্বপ্রথম রাজধানী ছিল

'নারা' নগরে। অষ্টম শতাব্দীর পরে রাজধানী নারা নগর থেকে 'কোয়তো' সহরে স্থানান্তরিত হয়। কোয়তো এক সময় বিলাস ও সভ্যতার চরম কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। কাব্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে, নৃত্যে, বিদ্যায়, বৈভবে, জ্ঞানে ও পুণ্যে কোয়তো একদিন ইন্দ্রের অমরাবতীকেও পরাস্ত করেছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মোৎসবের এক একটি বিরাট অনুষ্ঠানের সময় সমস্ত জাপান যেন দেবলোকের সুরসভার মত বিপুল শোভা সৌন্দর্য্যে সমুজ্জ্বল ও অজস্র আমোদ প্রমোদে মুখর হয়ে উঠ্‌তো! এই সময়টাকেই জাপানের ইতিহাসের 'সুবর্ণ-যুগ' বলা যেতে পারে। এই যুগে জাপানের অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ কাব্য ও কথার ভিতর দিয়া যে উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি হ'য়েছিল, তার অক্ষয় ও অপূর্ব্ব সম্পদরাশি এখনও পর্য্যন্ত জাপানী সাহিত্যকে জগতের মধ্যে উজ্জ্বল ক'রে রেখেছে। এই যুগের জাপানী সাহিত্য আলোচনা ক'রলে তদানীন্তন জাপানের যে চিত্রখানি চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে, তার কোথাও এক বিন্দু কলঙ্কের কালিমা লেগে নেই! সে এক শুভ্র সুন্দর শান্তিময় আনন্দ-উজ্জ্বল সহজ স্নিগ্ধ আরামপ্রদ অকলুষ ও মহিমময় জীবনের অনুপম ছবি!

কেশ-প্রসাধন

চা-বাগানের কুলি মেয়েরা

পরে ফুজিবারা বংশের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে জাপানের তায়রা ও মীনামোতো নামে আর দুটি সম্রান্ত বংশের সর্দ্দারেরা তাদের শক্তি একত্র ক'রে বিদ্রোহ করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিলেন। এই দুইটি পরিবারও জাপানের রাজ-বংশ-সম্ভূত শাখা। এঁদের মধ্যেও অনেক বড় বড় বীর, বড় বড় যোদ্ধা, তাঁদের অদ্বিতীয় শক্তি ও প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে

ফুজিবারা বংশের উচ্ছেদ সাধন করবার পরই রাজ-শক্তির অধিকার নিয়ে এই দুই পরিবারের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল; এবং এতদিনের মিত্রতা বিস্মৃত হয়ে তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে চিরশত্রুর মত ঘোর যুদ্ধে লিপ্ত হ'য়েছিলেন। ফুজিবারাদের সহিত তায়রা ও মীনামোতো-দের মিলিত সংঘষ এবং পরে মীনামোতো ও তায়রাদের পরস্পরের মধ্যে দীর্ঘকাল যুদ্ধ-বিগ্রহ পরিচালিত হওয়ায় জাপানে "সামুরাই" বলে একদল রণদক্ষ ক্ষাত্র-ধর্ম্মী বীর-জাতির সৃষ্টি হ'য়েছিল। এরা সকলেই হয় তায়রা নয় মিনামোতো এই দুই পরিবারের কারুর না কারুর দলভুক্ত ছিল, এবং যুদ্ধবিদ্যাই ছিল এদের উপজীবিকা।

তায়রাদের সঙ্গে যখন মীনামোতোদের যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল, তখন জাপানের প্রসিদ্ধ বীর সর্দার কাইয়োমোরীর অধীনে তায়রারাই প্রথমটা জয়লক্ষ্মীর কৃপালাভে সৌভাগ্যবান হ'য়েছিল। কিন্তু ১১৩৫ খৃঃ অব্দে কাইয়োমোরীর মৃত্যুর পর মীনামোতোরা প্রবল হ'য়ে ওঠে; এবং ১১৮৫ সালে তাদের বিখ্যাত অধিনায়ক মহাবীর 'য়োরীতোমো'র অধীনে যুদ্ধ ক'রে অদ্ভুত বিক্রমে তায়রাদের পরাস্ত ক'রে বিজয়লক্ষ্মীকে আপনাদের অঙ্কশায়িনী করেছিল। এই যুদ্ধে তায়রারা একেবারে ধ্বংস হ'য়ে যায়। য়োরীতোমো কেবলমাত্র যে বীর ছিলেন তা নয়, তিনি যেমন অসাধারণ শক্তিশালী সেনানায়ক তেমনি তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন অদ্বিতীয় রাজনীতি-বিশারদ ছিলেন। তায়রাদের সম্পূর্ণরূপে বিধ্বংস ক'রে জাপানে তিনি যখন মীনামোতোদের মহিমা-ধ্বজা উড়িয়ে দিলেন, সম্রাট স্বয়ং তখন রাজসভায় তাঁকে বহু মানে আহ্বান ক'রে এনে "শেয়ী-তাই-শোগুণ" উপাধি দিয়ে সম্মানিত করলেন। "শেয়ী-তাই-শোগুণ" উপাধির অর্থ হচ্ছে "শত্রু-বিজয়ী বীর"। এই 'শেয়ী-তাই-শোগুণ' কথাটি লোকের মুখে মুখে ক্রমে ছোট হয়ে এখন কেবল মাত্র 'শোগুণ' হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতিই 'শোগুণ' উপাধিতে ভূষিত হ'তো ব'লে শোগুণদের হাতেই রাজ্যের সামরিক বিভাগের ভার সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত ছিল। রাজ-ক্ষমতা তখন ক্ষাত্র-শক্তির উপরেই ষোল আনা নির্ভর কোর্‌তো। সুতরাং শোগুণরা শীঘ্রই সম্রাটের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হয়ে উঠলো। য়োরীতোমো 'কীয়োতো' সহর থেকে রাজধানী তুলে নিয়ে এসে 'কামাকুরা' নগরে প্রতিষ্ঠিত ক'রেছিলেন এবং নিজের প্রচণ্ড প্রতিভা ও অসাধারণ শক্তির প্রভাবে কামাকুরাকে সত্বর এক বিরাট সমৃদ্ধিশালী সহরে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনিই ছিলেন সাম্রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা, সম্রাটের অস্তিত্ব কেবল মাত্র রাজ্যের একটি শোভা-পুত্তলীতে পর্য্যবসিত হয়েছিল। মীনামোতো শোগুণদের পর হোযো বংশীয়েরা প্রধান হ'য়ে উঠেছিল, এবং হোযোদের পর আশীকাগাদের হাতে রাজশক্তি এসে পড়েছিল। তারপর যথাক্রমে নোবুনাগা ও হীদেয়োশী সাম্রাজ্যের কর্ণধার হ'য়ে উঠ্‌ছিলেন। কিন্তু তাঁরা দুজনে কেহই শোগুণ ছিলেন না। হিদেয়োশীর মৃত্যুর পর তোকুগাওয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও শোগুণ উপাধিধারী স্বকৃত-পুরুষ আয়েইয়াসু জাপানের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা হয়ে উঠেন। এঁর আমলে প্রতিষ্ঠিত জাপানের নূতন রাজধানী 'ইয়েদো' নগর সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুসমৃদ্ধ ও সুপ্রসিদ্ধ হ'য়ে উঠেছিল। তোকুগাওয়া শোগুণরা ১৬০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত অপ্রতিহত প্রভাবে জাপানের রাজশক্তি পরিচালনা করেছিলেন। শোগুণদের অধীনে জাপানের ইতিহাসে অনেক উল্লেখযোগ্য নূতন ঘটনা ঘ'টে গেছে। যেমন ১২৮১ সালে মোঙ্গল-দিগ্বিজয়ী কুব্‌লাই খাঁর জাপান আক্রমণ। ১৩৩৩ সালে হোযোদের সহিত আশীকাগাদের বিরোধ এবং হোযোদের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে আদি শোগুণ য়োরীতোমোর প্রতিষ্ঠিত রাজধানী কামাকুরার ধ্বংস। ১৫৪২ সালে জাপানে সর্ব্বপ্রথম য়ুরোপীয় জাতির পদার্পণ ও ক্রমে সেখানে য়ুরোপীয় বাণিজ্য ও খৃষ্টধর্ম্মের বহুল প্রচার। ১৫৯২ থেকে ১৫৯৮ সালের মধ্যে হীদেয়োশী কর্ত্তৃক কোরীয়া প্রদেশে পুনর্‌ভযান ও সম্পূর্ণভাবে কোরীয়া রাজ্য গ্রাস। ১৬৩৫ সালে তৃতীয় তোকুগাওয়া শোগুণ দুর্দ্ধর্ষ-বিক্রম ইয়েমেৎসু কর্ত্তৃক অমানুষিক চেষ্টায় খৃষ্টধর্ম্মের উচ্ছেদ এবং জাপানে বিদেশীর প্রবেশ নিষেধ ও বিদেশীদের সঙ্গে বাণিজ্যের আদান প্রদান প্রভৃতিও রহিত হয়। তার পর ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে মার্কিন নৌবহর নিয়ে আমেরিকা যুক্ত-রাজ্যের প্রতিনিধি কমোডোর পেরীর জাপানে অভিযান এবং জাপান যাদের এতদিন 'লালমুখো বর্ব্বর' ব'লে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখ্‌তো সেই শ্বেতকায় য়ুরোপীয়দের জাপানে প্রবেশাধিকারের এবং বাণিজ্য বিস্তারের নিষেধ

জাপানকে প্রত্যাহার ক'রতে হ'য়েছিল। এই সময় থেকে দলে দলে শ্বেতাঙ্গ বণিকেরা জাপানে প্রবেশ ক'রতে আরম্ভ করে।

১৮৬৭ সালে সম্রাট মেইজীর রাজত্বকালে শোগুণদের প্রভুত্ব একেবারে বিলুপ্ত হ'য়ে যায়। কারণ য়ুরোপীয়দের জাপানে প্রবেশাধিকার রোধ করতে না পারায় শোগুণরা জনসাধারণের চক্ষে বড় হীন হ'য়ে পড়েছিল। শোগুণদের প্রভুত্ব নাশের সঙ্গে সঙ্গে জাপানের ইতিহাসের এক নব অধ্যায় সূচিত হোলো, যার ফলে জাপান আজ পৃথিবীর মধ্যে একটা শক্তিশালী জাত বলে পরিগণিত হয়ে উঠেছে।

শোগুণদের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে জাপানে এতকাল ধ'রে যে সামন্ত-তন্ত্র প্রচলিত ছিল, যার কঠোর বন্ধনে সমগ্র জাপান জাতটা নিস্তেজ ও নির্ব্বীর্য্যের মত অসাড় হয়ে পড়েছিল, সেই লোহশৃঙ্খল থেকেও সে মুক্তি পেয়ে গেল। জাপানের সমস্ত সামন্তরাজ তাদের নিজ নিজ রাজ্যাধিকার স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ ক'রে তাদের সমস্ত ক্ষমতা সম্রাটের হাতে ফিরিয়ে দিলে; এবং তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে জাপান এক মহারাজ্যে পরিণত হ'ল। এই সঙ্গে জাপানের সামুরাই সম্প্রদায় অর্থাৎ যুদ্ধব্যবসায়ী ক্ষাত্র ধর্ম্মাবলম্বী সর্দ্দারেরা তাদের যা কিছু বিশেষ সম্মান ও দাবী দাওয়া প্রশান্ত অন্তঃকরণে পরিত্যাগ ক'রে স্বজাতির ও স্বদেশের কল্যাণের জন্য সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে সমান হ'য়ে নেমে দাঁড়াল। ভারতবর্ষে যেমন ব্রাহ্মণদের কতকগুলো বিশেষ অধিকার ও বিশেষ সম্মানের দাবী দাওয়া চিরকাল ধ'রে চলে আস্ছে, এই সামুরাই সম্প্রদায়ের জাপানে ঠিক তেমনিই প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু তাঁরা রাজ্যের মঙ্গলার্থ যখন নিজেদের সকলের সঙ্গে সমান বলে ঘোষণা করে দিলেন, জাপান থেকে তখন জাতিভেদ-প্রথা উঠে গেল। 'এতা' ও 'হীনন্' প্রভৃতি জাপানের যেসব অস্পৃশ্য নমঃশূদ্র জাতি এতকাল সমাজচ্যুত হয়ে একপাশে প'ড়ে থাক্তে বাধ্য হয়েছিল, তাদের সকলকে জাতে তুলে নিয়ে জাপান বিষময় ছুঁৎমার্গ পরিত্যাগ করে দৃঢ়বদ্ধ একতায় শক্তিশালী হ'য়ে উঠ্ল!

ব্রিটিশের কাছে ভারতের পরাধীনতার সংবাদ পেয়ে, য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জের হাতে চায়নার লাঞ্ছনা দেখে, এবং ইংরেজ ও মিলিত য়ুরোপীয় শক্তির হাতে নিজেদের ঘরের সাৎসুমা ও চোশীয়ু সামন্ত রাজ্যের দুরবস্থা প্রত্যক্ষ ক'রে জাপান আপনার ভবিষ্যৎ চিন্তায় শঙ্কাকুল হ'য়ে উঠেছিল, এবং সময় থাক্তে থাক্তে সত্বর সাবধান হ'তে না পারলে তাদেরও অবস্থা যে ভারতবর্ষের মতই হ'য়ে দাঁড়াবে, এটা তারা বেশ বুঝ্তে পেরেছিল। তাই পররাজ্য-লোলুপ য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জের রাক্ষস-গ্রাস থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য জাপান একেবারে একাগ্রচিত্ত হয়ে উঠেছিল। আধুনিক বিজ্ঞানবলে বলীয়ান শক্তিমত্ত বর্ত্তমান য়ুরোপকে বাধা দিতে হ'লে, প্রাচীন প্রথা আঁক্ড়ে পড়ে থাক্লে যে কিছুতেই আর চল্বে না, এ কথা তথাকথিত অসভ্য জাপানেরও মাথায় ঢুকেছিল। তাই সে সমগ্র দেশময় ঘোষণা ক'রে দিলে, "ওগো, আর তোমরা প্রাচীনকে আঁক্ড়ে পড়ে থেকোনা, উঠে দাঁড়াও, এগিয়ে চলো—বর্ত্তমানের জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ করতে; নবযুগের নূতন সভ্যতাকে বরণ ক'রে নাও! বরণ ক'রে নাও পাশ্চাত্যের বিদ্যাবুদ্ধি শক্তি সম্পদ, রীতি-নীতি-প্রকৃতি—প্রাবল্য-প্রবণতা ও প্রাণ! মানুষ হও, ওগো, মানুষ হও! আজ আবার তোমাদের নূতন করে মানুষ হ'তে হবে! নবযুগের নূতন উন্নতির পথে বুক ফুলিয়ে ছুট্তে হবে!" রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী ও সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের সামনে সম্রাট স্বয়ং দেবতার নামে এই সকল বিধি-ব্যবস্থা প্রচলিত করবেন বলে শপথ করলেন। সম্রাটের আদেশকে ঈশ্বরের আজ্ঞাস্বরূপ সমগ্র জাপান নতশিরে মেনে নিয়ে দেখতে দেখ্তে আজ নূতন মানুষ হয়ে উঠেছে!

জাপান যখন প্রাচীনের মোহ কাটিয়ে নূতনকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত হ'ল, তখন জাপানের রাজসিংহাসনে ছিল এক চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক বালক সম্রাট! সম্রাটের প্রতিনিধি স্বরূপ হ'য়ে যাঁরা সে সময় রাজ্য পরিচালনা করতেন, তাঁদের মধ্যে জনকতক দূরদ্রষ্টা বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন; তাঁদেরই প্রাণান্ত চেষ্টায় ও দৃঢ় অধ্যবসায়ের ফলে জাপান শুধু আসন্ন অধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়া নয়—জগতের মধ্যে আজ একটা শ্রেষ্ঠজাতি ও প্রাচীর সকল দেশের অপেক্ষা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। জাপানের সেই সব চিরস্মরণীয় রাষ্ট্র-গুরুকে নব জাপান গড়ে তোলবার জন্য বড় কম বেগ পেতে হয়নি! এ কথা অস্বীকার করলে অন্যায় হবে—যে জাপানের একদল অল্পবুদ্ধি লোক, মানব-ধর্ম্মের চিরাগত

দুর্ব্বলতার বশে নূতনকে বরণ করে নিতে কেবলমাত্র আপত্তি নয়,—নূতনের অভিযানের বিরুদ্ধে রীতিমত প্রচণ্ড বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। প্রাচীনকে পরিত্যাগ করাটা তাঁরা মহাপাপ ব'লে ঘোষণা করা সত্বেও রাজ-শক্তির প্রবল উদ্যমে স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডের মত সে বাধা—প্রচণ্ড হ'লেও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি! অথচ সেদিন জাপানের রাজকোষে অর্থ ছিল না,—রাজস্ব আদায়ের কোনও একটা সুবন্দোবস্ত ছিল না, প্রতিবেশী অপর কোনও রাজ্যের নিকট ঋণ গ্রহণ করবার মত নিজেদের কোনও পাট্টা ছিল না—সামরিক শৃঙ্খলাধীন ও বর্ত্তমান যুদ্ধ-বিদ্যায় সুশিক্ষিত সৈন্যদল ছিল না,—রণপোত বা নৌবহর তো দূরের কথা একখানি বাণিজ্য-পোতও তার সমুদ্রকূলে সেদিনও পর্য্যন্ত জন্মায়নি! যে দেশ তখনও রেলপথ দেখেনি, ডাকঘর কি শোনেনি, টেলিগ্রাফ কাকে বলে জানেনা—আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান, বাণিজ্য বিনিময়' আদান প্রদান সম্বন্ধেও যারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল, তাদের পক্ষে সেই অবস্থা থেকে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে একেবারে য়ুরোপীয় যে কোনও শ্রেষ্ঠ দেশের সঙ্গে সমান সুসভ্য হ'য়ে ওঠাটা, ভাবতে গেলে এক রকম অসম্ভব ব্যাপার বলেই মনে হয় বটে, কিন্তু তথাপি জাপানের সেই সব প্রতিভাশালী রাষ্ট্রগুরুর অসাধারণ সামর্থ্যে ও স্বদেশপ্রীতির গুণে জগতে সেই অচিন্ত্য অদ্ভুত অঘটনও সম্ভব হয়ে উঠেছে।

পঞ্চাশ বৎসর আগের সেই জংলী জাপান—সামন্ত-তন্ত্রের অভিসম্পাতে পরস্পরের মধ্যে আত্মকলহ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়ে ক্রমেই অধঃপতনের দিকে যে এগিয়ে চলেছিল, সে আজ বিধাতার অনুগ্রহে যথাসময়ে সচেতন হ'য়ে উঠে, প্রাচীনের লৌহ শৃঙ্খল চূর্ণ করে, নবীনের জয়মাল্য মাথায় প'রে ধন্য হয়ে গেছে। আজ জাপানের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একটা প্রবল স্বাদেশিকতার ভাবে অনুপ্রাণিত। দেশের রাজার প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় তারা সকলে আজ একই পতাকাতলে একত্র সমবেত হ'য়ে জাতীয় একতার সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। জাপানে আজ এমন কোনও নরনারী বালক বৃদ্ধ বা যুবা নেই যে তার দেশের জন্য ও তাদের মীকাদো বা ধর্ম্মরাজ সম্রাটের জন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে সদাসর্ব্বদা প্রস্তুত নয়! দেশের কাজে বা রাজার জন্য জীবন উৎসর্গ করাটাকেই তারা ইহ-লোকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য বলে মনে ক'রে। এমন কোনও বৃহত্তম ত্যাগ নেই যা স্বদেশ-প্রেমিক জাপান তার জন্মভূমির জন্য ক'রতে পারে না! এই যে সকলের আগে দেশকেই বড় ক'রে দেখা, জননী জন্মভূমিকে যথার্থই স্বর্গাদপি গরীয়সী ব'লে মনে করা—এই উচ্চ দেশাত্মবোধই জাপানকে আজ এত শীঘ্র এমন এক নিয়ম-তন্ত্রাধীন শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করেছে! জাপানে আজ রাজকুমার থেকে দেশের দীনতম মজুরটি পর্য্যন্ত সকলেরই সাম্রাজ্যের মধ্যে একই সমান রাষ্ট্রীয় অধিকার! জাপানে আজ যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই সর্ব্বরকমে স্বাধীন স্বায়ত্ত-শাসন-প্রথা অল্পদিনের মধ্যে তাকে আজ জগতের সমস্ত বড় বড় খৃষ্টান শক্তিপুঞ্জের সঙ্গে সমান করে তুলেছে। আজ জাপানের বার্ষিক রাজস্ব প্রায় ২০৫ কোটী টাকার কাছাকাছি! জাপানী জনসাধারণ রাজ-তহবিলে প্রতি বৎসর অকাতরে গুরুভার খাজনা জমা দিয়ে যাচ্ছে! জাপানের বহির্বাণিজ্যের মূল্য দাঁড়িয়েছে আজ প্রায় সাড়ে ছয়শত কোটী টাকার উপর। জগতের হাটে সে আজ ইংলণ্ড আমেরিকা ও জার্ম্মেনীর মত বণিকশ্রেষ্ঠ জাতেরও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে উঠেছে!

ইংলণ্ড একদিন যাকে ঋণ দেওয়ার অযোগ্য এবং বিত্তহীন রাজ্য মনে করে হেয় জ্ঞান করেছিল, সেই জাপানের কাছে ইংলণ্ডকে আজ ঋণ গ্রহণ ক'রতে হ'য়েছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে ঘোষণা মাত্র জাপান আজ রণক্ষেত্রে বিশ লক্ষ সৈন্য সমাবেশ ক'রতে সক্ষম! যে প্রথা অনুসারে জাপানে আজ সৈন্য-গঠনপ্রণালী প্রচলিত হ'য়েছে তা'তে অদূর ভবিষ্যতে জাপানের সম্রাট চল্লিশ লক্ষাধিক সুশিক্ষিত সৈন্যের মালিক হ'য়ে উঠবেন। জাপানের নৌবল আজ জগতের দ্বিতীয় স্থান অধিকার ক'রতে পেরেছে। জাপানের বড় বড় বাণিজ্যতরী আজ পৃথিবীর প্রত্যেক বন্দরে তার বিপুল বাণিজ্য সম্ভার বহন করে নিয়ে যাচ্ছে! সমগ্র জাপান জুড়ে আজ অসংখ্য রেলপথের জাল বিস্তৃত হয়েছে। ডাকঘর, তার বিভাগ, কলকারখানা, খনি খাদ, বৈদ্যুতিক কলকব্জা ইত্যাদি আধুনিক সর্ব্ববিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, জলের কল, মিউনিসিপালিটি, বিশ্ববিদ্যালয়, ইস্কুল, আদালত, হাসপাতাল, জেল প্রভৃতি যা কিছু বর্ত্তমান সভ্যতার

উপযোগী ও প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান—জাপানে আজ তার কোনও কিছুরই অভাব নাই। জাপানের শিক্ষাপদ্ধতি আজ যে প্রণালী ধ'রে চ'লেছে তাতে জাপানের ভবিষ্যৎ বংশধরদের উপার্জ্জনের চিন্তায় কোনও দিনই কাতর হ'তে হবে না। জাপানের কারাগারে অপরাধীর শাস্তির প্রতিই কর্ত্তৃপক্ষ তাদের সমস্ত কঠোর দৃষ্টি আবদ্ধ না রেখে কিসে তারা আবার মানুষ হ'য়ে উঠ্‌বে, তাদের নৈতিক চরিত্র ক্রমশঃ অবনতির দিকে না গিয়ে কেমন করে আবার উন্নতির পথে অগ্রসর হবে, এইসব দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখে।

চায়না ও রুষিয়ার যুদ্ধে জাপানের শক্তি পরীক্ষা হ'য়ে গেছে। এশিয়ার এই বিজয়ী তরুণ বীরকে য়ুরোপ সসম্ভ্রমে আজ আপনাদের পার্শ্বের আসন ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'য়েছে। জাপানের ঔপনিবেশিক রাজ্যও নিতান্ত অল্প নয়। চায়না যুদ্ধের ফলে সে ফরমোজা দখল ক'রেছে রুষ যুদ্ধের ফলে সে সাখালীয়েন ও লীয়াউতুঙ্‌ এবং সমগ্র কোরীয়া রাজ্য ফিরে পেয়েছে। গত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর সে জার্ম্মাণীর অধিকৃত প্রশান্ত সাগরের সমস্ত দ্বীপপুঞ্জ হস্তগত ক'রেছে। মাঞ্চুরিয়া ও মোঙ্গলীয়া প্রদেশে সে ধীরে ধীরে নিজের যে প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে, তার ভিত্তি একেবারে সুদৃঢ় হয়ে গেছে।

গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে জাপান এই স্বপ্নাতীত উন্নতি সাধন করেছে, এবং এ সমস্তই সম্ভব হয়েছে জাপানের শ্রেষ্ঠতম মহামহিম সম্রাট মীকাদো মেইজীর রাজত্বকালের মধ্যে। বিয়াল্লিশ বৎসরকাল সিংহাসন অলঙ্কৃত ক'রে ১৯১২ সালে ইনি ইহলোক পরিত্যাগ করেছেন। মেইজীর উপযুক্ত পুত্র কুমার য়োশীহিতো এখন জাপানের সম্রাট। দেব-অংশসম্ভূত নৃপতি জিম্মুর সাক্ষাৎ বংশধরগণের মধ্যে ইনি হচ্ছেন শতদ্বাবিংশতি পুরুষ। পৃথিবীর কোনও দেশে আর এমন প্রাচীন রাজবংশ নেই। আড়াই হাজার বৎসর ধ'রে এরা পুরুষানুক্রমে জাপানে রাজ্য পরিচালনা করে আসছেন। এই রাজবংশের কেবলমাত্র নিজস্ব সম্পত্তিরই বার্ষিক আয় হচ্ছে পঁচাত্তর কোটী টাকা, যা পৃথিবীর আর কোনও রাজবংশের নেই। জাপান ও জাপানের সমস্ত উপনিবেশ জড়িয়ে লোকসংখ্যা কিন্তু মোটে সাত কোটী সত্তর লক্ষ মাত্র। আমাদের কেবল বাংলা বিহার উড়িষ্যার লোকসংখ্যাই এর চেয়ে ঢের বেশী! অথচ উভয় দেশের বর্ত্তমান অবস্থার কত প্রভেদ! জাপানের ঐতিহাসিকদের এ কথা অকপটে স্বীকার করতেই হবে যে, পাশ্চাত্য গুরুর কাছে য়ুরোপীয় শিক্ষায় দীক্ষিত হ'য়ে, পশ্চিমের জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে, তাদের রীতিনীতি পদ্ধতি প্রক্রিয়া অবলম্বন ও অনুসরণ ক'রে সে আজ এত শীঘ্র তাদের সমকক্ষ হ'তে পেরেছে; কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য যে সে আজ দেড়শত বৎসরের উপর য়ুরোপের এক সর্ব্বশক্তিমান জাতির পদতলে বসেও নিজের উন্নতি করা দূরে থাক্‌ বরং অবনতির দিকেই এগিয়ে চলেছে!

মায়ের পূজা

শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

(১)

দেশের মধ্যে নামজাদা কৃপণ হচ্ছে অমিয় গাঙ্গুলী। সৎকাজে ত সে এক পয়সাও ব্যয় করতই না, এমন কি নিজের স্ত্রীর অসুখের সময়ও পয়সা খরচের ভয়ে তাঁর ব্যায়রামটাকেও 'ওটা কিছু নয়, দু'দিন বাদে সেরে যাবে' বলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল। সেই সাধ্বী পত্নী স্বামীর ক্রোড়ে মাথা রেখে পরপারে যখন চলে গেল, তখন অমিয়র কাঁধে পড়ল এক ৭ বৎসরের বালিকা। মাতৃহারা বালিকা শ্যামলীকে মানুষ ক'রে তুলতে অমিয়কে যে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছিল, সেটা অনিবার্য্য।

কয়েক বৎসর এই রকম করে গেটে গেল। শ্যামলী বড় হয়ে উঠল। পাত্রের সন্ধানে অমিয় সারা দেশটা খুঁজে বেড়াতে লাগল—কিন্তু তার মনের মত অথচ অল্প পয়সায় পাত্র মেল না। মেয়ে বড় হয়ে উঠল—অমিয়

আর নিশ্চিন্ত হয়েও থাক্‌তে পারল না। পুনরায় নূতন উদ্যমে সে পাত্রের অনুসন্ধান করতে লাগল। অবশেষে কুমিল্লায় একটী পাত্র পাইল। অমিয় শ্যামলীকে সেই সুদূর কুমিল্লায় বিবাহ দিল।

বিবাহের পরদিন পাত্রের পিতা জিজ্ঞাসা করিল "আপনার মেয়েকে কবে আনবেন ?"

অমিয় বলিল "না মশাই, এখন আনব না। এখানে কেউ মেয়েছেলে নেই—আপনাদের বৌ আপনারা আদর যত্ন করে রাখবেন। তাছাড়া কুমিল্লা,—সে ত আর এখানে নয়—মিছামিছে কতকগুলা পয়সার শ্রাদ্ধ করা।"

শ্যামলী বিবাহের পর সেই যে শ্বশুরবাড়ী গেল, তার পর আর সে এক বৎসর পিত্রালয়ে আসিল না। তার বাপের ব্যবহারের কথা ভুলিয়াও সে তার শ্বশুরালয়ে কোন দিন বলেনি। কিন্তু দুঃখিনী শ্যামলীর অদৃষ্টে শ্বশুরালয়ে বাসও উঠিল। তার স্বামী বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছিল। বিবাহের পর সেই জ্বর ক্রমে কালাজ্বরে পরিণত হইয়া, একদিন সকলকে কাঁদাইয়া সে চলিয়া যাইল। শ্যামলীর শ্বশুর তাহাকে নিজে সঙ্গে করিয়া তাহার পিত্রালয়ে পৌঁছাইয়া দিয়া গেল;—সেই অবধি শ্যামলী পিত্রালয়েই রহিয়াছে।

(২)

হিন্দু-বিধবার যেরূপে বৈধব্য-ব্রত প্রতিপালন করা উচিত, তার কোন ত্রুটীই শ্যামলী করিত না; সে অত্যন্ত শ্রদ্ধাচারে জীবনটাকে পরিচালিত করতে বরাবর চেষ্টা করে এসেছে—এবং এতদিন পর্য্যন্ত সে সম্বন্ধে কোন ত্রুটীও সে জ্ঞানতঃ করে নাই। শ্যামলীর বরাবরই ইচ্ছা যে তাদের বাড়ীতে দশভুজার প্রতিমা গড়িয়া মায়ের পূজা হয়; কিন্তু বাপের কৃপণতার কথা ভাবিয়া সে তার ইচ্ছা কোন দিনই অমিয়র নিকট ব্যক্ত করে নাই।

সেদিন বিকাল-বেলা শ্যামলী তাদের রকের উপর বসিয়া ভাবিতেছে—যারা দরিদ্র, মা কি তাদের বাড়ী আসেন না—তারা কি মায়ের সেবার অধিকারী হতে পারে না। শ্যামলী ভাবিল এবারে সে নিশ্চয়ই মায়ের পূজা করিবে। দরিদ্রের মা—দরিদ্রের মত তার মেয়ের বাড়ী আসবেন—মেয়ে তার সাধ্যমত মার সেবা করবে—এতে দয়াময়ী মা বিরূপ হতে পারবেন না। আপন মনে সেই সন্ধ্যায় অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া শ্যামলী কত কথাই ভাবিল। স্থির করিল তার এ বাসনা পিতার নিকট ব্যক্ত সে করবে। অমিয় যদি তাকে কোন রূপ সাহায্য না করে—নিজের অলঙ্কার বিক্রয় করে সে তার বাসনা মেটাবে।

(৩)

অমিয় দুপুরবেলা আহারে বসলে শ্যামলী পার্শ্বে বসে বলল "বাবা!"

"কেন মা।"

"তোমায় এতদিন কোন কথা বলিনি। আমার একটা আবদার রাখবে?"

"কি মা, বল না।"

"আমার অনেকদিন হতেই ইচ্ছে—মা দশভুজার পূজা করি।"

হাতের গ্রাসটী হাতে রাখিয়াই বিস্মিত নয়নে শ্যামলীর মুখের দিকে চাহিয়া অমিয় বলিল "সে কি মা, দুর্গা পূজা,—সে যে অনেক পয়সার খেলা। পাগলী মেয়ে, আমরা যে মা অতি গরিব। অত টাকা কোথায় পাব?"

"কেন বাবা! মা কি তাঁর দরিদ্র সন্তানের বাড়ী আসেন না? বিশ্বজননী কি কেবল তাঁর ধনী সন্তানের গৃহেই যান? তা নয় বাবা—মা চিরকালই স্নেহময়ী মা। তিনি তাঁর সন্তানের অর্থে তুষ্ট নন, ভক্তিতে বাঁধা।"

"তা হলেও মা, যাদের অর্থ নেই তাদের কিছুই নেই। তুমি ও ইচ্ছা মন থেকে মুছে ফেল।"

"জানি বাবা, জানি। যে কাজে অর্থের সঙ্গে সম্বন্ধ, তুমি সে কাজ কখনই করতে চাও না। বেশ আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু পারি ততটুকু দিয়ে মাকে বাড়ী আনব।"

অমিয় আর কোন কথা বলিল না। অভিমানী কন্যার অভিমানের সঙ্গে সঙ্গে স্নেহময় পিতার হৃদয়েও আঘাত লাগল। কিন্তু সে আঘাত সে হাসিমুখে সহ্য করতে সম্মত—তবু অর্থ-ব্যয়ে রাজী নয়।

অমিয় আহারাদি সেরে চলে গেলে শ্যামলী বসিয়া বসিয়া স্থির করিল তার স্বামীর স্মৃতিকে মনে জাগিয়ে রাখবার

জন্যেই তার স্বামীর শেষ দান খানকতক গহনা—যা সে শত বিপদেও খরচ করে নাই—তাই বেচে সে মায়ের পূজা করবেই।

(৪)

শ্যামলীদের বাড়ীর পার্শ্বেই ছিল বৃদ্ধ পোটো দুলালের বাড়ী। শ্যামলী চুপে চুপে একখানি গয়না লইয়া পরদিন দু'পুর বেলা দুলালদের বাড়ী আসিয়া ডাকিল "দুলালদা—ও দুলালদা।"

"কি দিদিমণি। হঠাৎ কি মনে করে।"

"শোন দুলালদা, আমায় দশভূজা মায়ের একখানা প্রতিমা গড়ে দিতে হবে।"

কিছুক্ষণ অবাক্ হয়ে তার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া দুলাল বলিল "তুমি কি পাগল হলে দিদিমণি।"

"না দু'লালদা, আমি ঠিকই আছি। আমায় একখানা প্রতিমা গড়ে দিতে হবেই।"

"তুমি বাপের মত নিয়ে আমার কাছে এসেছ—না শেষে এই বুড়ো বয়সে গাঙ্গুলী মশায়ের কাছে থড়মপেটা হ'তে হবে।"

"সে ভয় তোমার কিছু নেই। টাকা আমি দেব।"

"টাকার জন্যে দু'লাল তোমার ঠাকুর গড়তে ইতস্ততঃ করছে না দিদিমণি। ইতস্ততঃ করছে তোমার বাপের রাঙ্গা চোখের কথা ভেবে। জান ত দিদিমণি, যে কাজে অর্থব্যয় আছে, অমিয় গাঙ্গুলী সে কাজে কখনই নামে না। তুমি ত জান মা—তুমি তার একমাত্র বিধবা কন্যা হয়েও বারব্রতর জন্যে কি কখন বাপের কাছ হতে একটা পয়সা বার করতে পেরেছ?"

"দুলালদা, সে সব কথা থাক্—এ পূজার সঙ্গে বাবার অর্থের কোন সংস্রব নেই। আমার অর্থ নেই—অর্থ ব্যয় করে মাকে পূজা করতেও পারব না। তুমি একটু ভক্ত খরচ করে প্রতিমাখানা গড়ো দাদা।"

"আর কিছু বলতে হবে না দিদিমণি। প্রতিমা তৈয়ারী থাক্‌বে'খন, সময়মত লোক দিয়ে তুলে নিয়ে যেয়ো।"

শ্যামলী বাটী ফিরিল।

পঞ্চমীর দিন প্রতিমা বাড়িতে আনিয়া শ্যামলী দেখিল তার বাবা বিদেশে চলে গেছেন। শ্যামলী মহা বিপদে পড়িল। প্রতিমাখানি যথাস্থানে রেখে সে তাদের কুলপুরোহিতকে খবর পাঠালে। বৃদ্ধ ঠাকুর জ্ঞানশঙ্কর কিছুক্ষণ পরে আসিলেন। তাঁহার পরামর্শে যথারীতি মায়ের পূজার আয়োজন করে শ্যামলী ষষ্ঠীর বোধন সপ্তমীর পূজা সাঙ্গ করল। সকলে চলে গেলে শ্যামলী প্রতিমার সামনে বসে স্তব পড়তে লাগল:—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া শ্যামলী সেই পূজার দালানের এক পার্শ্বে আঁচল বিছাইয়া শুইয়া পড়িল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে নিদ্রিত হইল। শ্যামলী স্বপ্নে দেখিল যেন দশভূজা মা তার মাথার নিকট দাঁড়াইয়া বলিতেছেন—শ্যামলী, আমার ইচ্ছা আমার দরিদ্র সন্তান যারা অভুক্ত, তুই তাদের পরিতৃপ্তি করে খাওয়া,—পারবি কি মা? বলিয়াই মা অদৃশ্য হইলেন। শ্যামলী চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিয়া বসিয়া দেখিল—কিছুই নাই, প্রতিমা যেমন ছিল ঠিক তেমনই রহিয়াছে। সে প্রতিমার দিকে চাহিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল "মা, তোর এ দরিদ্র মেয়ের ওপর এ কি ভার দিলি মা—আমার আর কি কোথায় আছে মা, যে তোর সন্তানদের পরিতোষ করে খাওয়ায়। মা, মা, জ্ঞানহীনা আমি—অন্ধ আমি, আমায় পথ দেখিয়ে দে মা।' মায়ের সামনে বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া শ্যামলী তার প্রাণের নিবেদনগুলা জানিয়ে সে সেখান হতে চলে গেল।

তার পর সন্ধ্যা-আরতির আয়োজন করে প্রতিমার সম্মুখে চামর হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া মায়ের মূর্ত্তি দেখে শ্যামলী প্রাণে এক অফুরন্ত সুখ অনুভব করছিল, এমন সময় তার শ্বশুর আসিয়া ডাকিল "মা।"

শ্যামলী পিছন ফিরিয়া চাহিয়া বলিল "কে? বাবা।"

"হাঁ মা, আমি। তুমি মায়ের পূজা করছ, আমায় খবর দাওনি কেন মা?"

শ্যামলী বলিল "এই বয়সে অতদূর হতে আসতে পাছে আপনার কষ্ট হয়, সেজন্য খবর দিইনি বাবা।"

শ্যামলীর শ্বশুর হাসিয়া বলিলেন "তুমি আমায় ফাঁকি দিলে কি ফাঁকি পড়ব মা। দয়াময়ী মা আমার ওপর নির্দ্দয় নন।"

শ্যামলী বলিল "বাবা, কাল স্বপ্নে মা আমায় আদেশ করেছেন তাঁর অভুক্ত সন্তানদের মহা-অষ্টমীতে পরিতোষ করে খাওয়াবার জন্যে। কিন্তু আমি কি করে মায়ের আদেশ পালন করব বাবা ?"

"তার ব্যবস্থা তিনি নিজেই করেছেন মা। এই নাও টাকা। এ দিয়ে মায়ের আদেশ পালন কর।" আনন্দে শ্যামলীর সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

* * * *

মহা-অষ্টমীতে অমিয়র বাড়ী বহু কাঙ্গালী খাইল। কর্ম্মকর্ত্তা শ্যামলী ও তাহার শ্বশুর। সে দিন বৈকালে অমিয় বাড়ী ফিরিল। কিন্তু সে যা দেখিল তাহাতে সে নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। সে খরচের ভয়ে আজ কয়দিন গৃহত্যাগী, অথচ তার বাড়ী এ কি ব্যাপার! সমস্তই একটা প্রহেলিকার মত তার মনে হইতে লাগিল। অমিয় তখন প্রথমে দালানের উপর মায়ের মূর্ত্তির কাছে শ্যামলীকে বসে থাকতে দেখে সেখানে গিয়া বলিল "এত আয়োজন কে করলে মা।"

"যাঁর পূজা তিনিই করেছেন বাবা।"

"সে কি ?"

"এ অতি ধ্রুব সত্য কথা। মায়ের পূজা ধনী দরিদ্রের সমান অধিকার—মা অর্থে বশ কোন কালই হন না—মনে ভক্তি রেখে তাঁকে ডাকতে পারলে তিনি সন্তানের সব আবদার সহ্য করেন।"

মূঢ়ের মত কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া—তার পর—নতমস্তকে মায়ের সামনে করযোড়ে অমিয় বলিল—

ন জানামি দানং ন চ ধ্যান যোগং
ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্র মন্ত্রম্।
ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাস যোগ্যং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥

ব্যঙ্গ-চিত্র

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ-অঙ্কিত

"প্রাণ চায় চক্ষু না চায়, এ কি দুস্তর লজ্জা"

"সখি, এত খেলা নয়, খেলা নয়"

"ও আমার নবীন সাথী ছিলে তুমি কোন্ বিমানে"

দেবী-মাহাত্ম্য

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

শ্রীরামপুর জায়গাটা ইংরাজি আমলের First Chapterএর জিনিস্,—তাই আসপাশের গ্রাম বা সহরগুলির অনেকটা অগ্রগামী; অনেক সম্ভ্রান্ত সম্পত্তিশালী আধা-সম্পত্তিশালীর বাস। আয়েসের সামগ্রীগুলো এই সব স্থানেই আড্ডা খোঁজে। তাই 'চা'টাও চট্ করে এখানে চলে গিছলো এখানে সকলেই একটু উঁচু চালে চলতে চায়।

ক্ষেত্তর বাবুদের বৈঠক্ থেকে তাসের আড্ডা ভেঙ্গে যখন প্রফুল্ল উঠে পোড়ল'—তখন রাত প্রায় এগারটা। সঙ্গীরা সঙ্গ নিলে; রাস্তায় বেরিয়ে বল্লে—শীতে কালিয়ে গিছি, চল, তোমার ওখানে এক কাপ চা খেয়ে যাওয়া যাক্।

প্রফুল্ল বল্লে—আমার মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে তোমরাই ব'লে ফেল্লে!

একটু তফাৎ থেকে আওয়াজ এল,—"এ অন্তর্যামীটি কে?"

সকলেই সোৎসাহে বলে উঠলো—খুড়ো না কি! আসুন—আসুন,—Welcome।

খুড়ো—না বাবাজি, রাত হেয়ে গেছে—তোমরাই যাও।

অবিনাশ—ইস্, বেজায় স্ত্রৈণ হয়ে পড়চেন দেখচি—

খুড়ো—স্ত্রৈন মত ধরতে হয়েছে যে বাবাজি। আর Cruelty to animals কেন? ওর প্রায়শ্চিত্তের পাত্তা যে পুঁথিতেও পাই না। সর্ব্বভুক্ ইংরেজ বাহাদুরও—কাঁকড়ার দাড়া ভাঙ্গাটা, দণ্ডবিধির বেড়াজালে ফেলে দিয়েছেন। তবু রক্ষে—যদি দয়া করে একটু কামড়ায়।

অবিনাশ—কেন?

খুড়ো—সব পাপটা চাপে না,—কিছু ক্ষয় হয়। মধু-লিপিও বল্‌চেন না—

"নিরস্ত্র যে অরি—
নহে রথীকুলপ্রথা আঘাতিতে তারে।"

অবিনাশ—ওঃ, past all recovery, একদম দুরারোগ্য!

প্রফুল্ল—এখন আসুন তো, দু ছিলিম গুড়ুক খেয়ে যেতেই হবে।

খুড়ো—ছোঁয়াচ ধরতে পারে বাবাজি—

প্রফুল্ল—সে ভয় রাখবেন না, আমাদের মিন্-মিনে মীনরাশি নয় খুড়ো,—এ সব সিংহরাশি।

খুড়ো—"স্ত্রী আচারে" বটে!

প্রফুল্ল—এখন চলুন্ তো,—দু'খানা গরম গরম কড়াই-শুঁটির কচুরি খেয়ে যেতেই হবে। ও-সব বৈঠকী-কথা বৈঠকে বসে শোনা যাবে।

খুড়ো—তয়ের না কি?

প্রফুল্ল—কতক্ষণ লাগ্‌বে? ও'ছিলিম চলতে চলতেই এসে প'ড়বে।

খুড়ো—বাজার থেকে?

প্রফুল্ল—খুড়োর মাথা খারাপ হ'ল দেখচি! বাড়ীতে এদের কাজটা কি?

খুড়ো—তা বটে। ওঁদের আবার কাজটা কি? ওঁদের নিজের কাজ ত নেই-ই বটে!

বারবাড়ীর দরজা ঠেল্‌তেই খুলে গেল। অবিনাশ আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্লে—"এ কি রকম! এত রাত হয়েছে—দরজা খোলা! এটা ত' ভাল ব্যবস্থা নয় প্রফুল্ল; এক হপ্তার মধ্যে তিন্ তিন্ জায়গায় চুরী হয়ে গেল—শোন নি কি?"

প্রফুল্ল—শুনে ফল?

অবিনাশ—বুঝলুম না।

ইতিমধ্যেই বৈঠকখানায় আলো দেখা দিলে। "বস্‌বে এস,—এসে বলচি" বলেই প্রফুল্ল বাড়ীর মধ্যে চলে গেল।

রাত সাড়ে এগারটা,—পাড়া নিস্তব্ধ; বাড়ীর মধ্য থেকে স্পষ্ট শোনা গেল—প্রফুল্ল বলচে, চট্ ক'রে খান-কতক কড়াইশুঁটির কচুরি আর পাঁচ কাপ চা বানিয়ে

ফেল। অপেক্ষাকৃত নীচু সুরে বলা হ'ল—আর তাওয়াদার এক ছিলিম তামাক বৈঠকখানার দোরগোড়ায় রেখে এলেই আমি নিয়ে-নেব অখন। এইটে আগে,—বুঝলে!

রমনী-কণ্ঠে শোনা গেল—এত রাত্তিরে খুকী আর বিভূতি একমুড়োয় পড়ে থাকবে,—তাদের কাছে যে-কারুর থাকা দরকার।

প্রফুল্ল—ঘরে আলো ত জ্বলচে।

রমনী সকাতরে বল্লেন—যদি ভয়টয় পায়—তুমি এক একবার দেখো—

প্রফুল্ল বিরক্ত হয়ে জবাব দিলে—আচ্ছা, সে হবে এখন; তুমি চট করে নাও,—ভদ্দরলোকদের দেরী করাতে পারব না। আর দেখ—আমার তরে আজ আর আলাদা লুচি ভেজে কাজ নেই, ওই কচুরি হলেই হবে।

প্রফুল্লর রাত্রে লুচি খাওয়া অভ্যাস; যত রাত্রই হোক্ সেটা গরম গরম ভেজে দিতে হয়। তাই রমনী বল্লেন, সে কি হয়—তোমার তা হলে খাওয়াই হবে না। তোমার তরে দু'খানা লুচি ভেজে দিতে আমার আর কতক্ষণ লাগবে।

তা যা হয় কর',—আর অমনি গোটাকুড়িক পান সেজে, গড়গড়ার সঙ্গে রেখে এসো—বলতে বলতে প্রফুল্ল বেরিয়ে এলো।

(২)

"হল ব'লে" বল্‌তে বলতে প্রফুল্ল বৈঠকখানায় প্রবেশ করেই টেবিলের ওপর থেকে একজোড়া ঝক্‌ঝকে তাস মাইফেলের মাঝখানে ফেলে দিয়ে বল্‌লে—ততক্ষণ দু'হাত চলুক্।

কুমুদ বল্‌লে—বাঃ—দেখি দেখি, এ জিনিস কোথা থেকে জোগাড় করলে,—বেঙ্গল-ক্লাব থেকে বুঝি?

খুড়ো বল্‌লেন—মেকিঞ্জি-লায়েন্ বজায় থাকুক্, প্রফুল্লর অভাব কি! মার্কাটা দেখেছ—বাক্সের ওপর ঘুঘু ব'সে—ভারি rare (দুর্লভ) জিনিস্, আবার তেম্‌নি পয়মন্ত! প্যারিসের পণ্ডিতেরা ওর নামকরণ করেছিলেন—"রমণী-নিগ্রহ"! বড়লোকের বৈঠকখানাতেই ও'র বাস;—বাবাজীর সময় ভাল।

"খুড়ো এইবার খুল্‌চেন" ব'লে, প্রফুল্ল একখানা তুলে নিয়ে, খুড়োর সামনে এগিয়ে ধরে বল্লে—একবার গ্লেজ্‌টা (মসৃণতাটা) দেখুন।

খুড়ো—ও আর দেখাতে হবে না বাবাজি,—আমার কপালের চেয়েও গ্লেজ্‌টা বেশী দেখচি;—কোথাও কিছু ঠেক্ খায় না—ছোঁবার আগেই পিছলে যায়।

উপেন তাসাতে গিয়ে, তাসগুলো বৈঠকখানাময় ছড়িয়ে গেল।

খুড়ো বল্‌লেন—জিনিস্ বটে! বোধ হয় ভিজিয়ে খ্যালে।

উপেনকে "জানোয়ারটা" ব'লে কুমুদ কুড়ুতে লেগে গেল।

"ওঃ" ব'লেই প্রফুল্ল ভেতরদিকের দোরটা খুলে তাওয়াদার গুড়ুক সহিত গড়গড়াটা আর রূপোর পানের ডিপে, আসরে হাজির করে দিলে।

খুড়ো বল্‌লেন—ঝি-মাগী এত রাত অবৃধি রয়েছে না কি! সাধে বলেছি—প্রফুল্লর সময় ভাল!

প্রফুল্ল—ঝি আবার কোথায় দেখলেন! সে বেটি বেলাবেলি সন্ধ্যে জ্বেলেই—নিজের আলো নিবিয়ে দেয়!

খুড়ো—তুমি ত বাবাজি বৈঠকে ব'সে—তবে তামাক্ সাজলে কে?

প্রফুল্ল—কেন—আর কেউ সাজতে পারে না না কি! সাধে বলেচি—খুড়োর মাথা খারাপ হ'তে আরম্ভ হয়েছে।

খুড়ো—সম্প্রতি অনেকের মুখেই ওই কথাটা শুনচি। আনন্দ এই যে,—মাথাটা তাহলে আগে ভাল ছিল। দেখচি নিজে সেটা না ধরতে পেরে—ছেলেবেলা থেকে কত ভাল জিনিসই খুইয়ে এসেছি!

উপেন—তার আর ভুল নেই খুড়ো,—হাতী যদি নিজের দেহটা দেখতে পেত—তা'হলে—

খুড়ো বাধা'দে বল্‌লেন—ঐ "তাহলে"টা আর ভেজে বলতে হবে না বাবাজি;—মানুষ আর্সি তয়ের করে দেশের অধিকায় ছেলেগুলোর কি উপকার করে দিয়েছে—

উপেন ছিল স্থূলকায়। একটা বড় রকমের হাসি পড়ে গেল। তরঙ্গটা মিলিয়ে এলে, অবিনাশ বল্লে—কথাটা ভুলেই গিছলুম,—হাঁহে প্রফুল্ল, তখন জিজ্ঞেস করলুম—এত রাত পর্য্যন্ত সদর দোরটা অমন খোলা রয়েছে,

অথচ চারদিকে চোরের উপদ্রব চলেছে,—শোননি কি? তুমি বল্‌লে—"শুনে ফল্‌"! তার মানে কি?

প্রফুল্ল—এমন কিছু না। একদিন রাত্রে বেড়িয়ে এসে ডাকলুম,—দু'মিনিট হয়ে গেল উত্তরও নেই—দোর খোলাও নেই! রাত তখনো সাড়ে বারোটা হয়নি হে;—রাগে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে গেল। সজোরে একটা লাথ মারতেই খিল্‌টা কোথায় ছিট্‌কে গেল।

খুড়ো—মায়ের দুধ খেয়েছিলে বটে! তার পর?

প্রফুল্ল—দেখি, লণ্ঠান্‌ নিয়ে ছুটে আসচেন। খুকিটে চিল চেঁচাচ্চে;—বরদাস্ত করতে পারলুম না,—লাণ্ঠানটা ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম।

খুড়ো—আমিও ঠিক তাই ভাবছিলুম,—ও সময়ে ওছাড়া আর কিছু আসতেই পারে না fitও করে না। আমি নিজে না পারলেও, তোমাকে দুষ্‌তে পারি না। দাব থাকা চাই বই কি? তা না ত স্ত্রী পুরুষে প্রভেদ থাকে কোথায়?

প্রফুল্ল—শুনুন,—তার পর সাড়ে তিন মাস হয়ে গেল,—আজো দোরের খিলটে হ'ল না! সেটাও কি আমার কাজ?

খুড়ো—তুমি যে অবাক্‌ করলে বাবাজি! তুমিই ভাংবে, আবার সারাতে হবেও তোমাকেই! তাহ'লে ত যার অসুখ তাকেই ডাক্তার ডাকতে—তাকেই ওষুধ আনতে যেতে হয়। এ ত সংসার নয়, এ যে শাঁখের করাত! তোমার ত তা'হলে বাঁচোয়া নেই দেখচি।

অবিনাশ—ও জাতই ঐ রকম।

খুড়ো—তাইত',—বিষময়—বিষময়! আচ্ছা, অতবড় ছেলে—সেটা করে কি? নেণ্টো ছ'বছরের হ'ল না! এই ত' মুচীপাড়ার পাশেই গুপে ছুতরের ঘর,—বড় জোর দেড় পো পথ। সদর রাস্তার ওপরেই,—এত' ভয় কিসের! বউ-মা নিজে যেতেও ত' পারেন—

প্রফুল্ল—অদেষ্ট খুড়ো—অদেষ্ট; টাকা রোজগারও কোরব', আবার ছুতোর খুঁজতেও ছুটবো—

খুড়ো—মজা মন্দ নয়! না, তা আমি নিজে যাই হই, এতে সায় দিতে পা'র না বাবাজি।

প্রফুল্ল—সব ত' শোনেন নি,—সেদিন গরুটো থানায় গিছলো, আমি না ছাড়িয়ে আনলে ত' আসবে না! চুলোয় যাক্‌—নিলেম হয়ে গেছে, বেঁচেছি।

খুড়ো—বল' কি,—অমন পোষা গরুটো নাহ'ক অন্যের গর্ভে গেল। দু'পা গিয়ে থানায় ক'রে জানতেও কি দু' ছেলের মা'র ভয়! ওঁরা যে আমাদের রক্ষক,—এটাও কি এতদিনে বোঝেন নি!

উপেন—দোরের খিল্‌টে করিয়ে নিতে যারা পারে না, তারা গরু ছাড়াতে যাবে—

প্রফুল্ল—চুলোয় যাক্‌,—চোরে নে' যায়, ওরই যাবে,—রাখতে পারে ওরই থাকবে,—ও সব আর আমি ভাবি না।

খুড়ো—বেশ করেছ, আমিও ঐ ব্যবস্থা দিতে যাচ্ছিলাম। তা না ত' ও-জাত জব্দ হবে না বাবাজি।

কুমুদ—বলচেন বটে,—কিন্তু ও-জাতটিকে বাগাতে ভীমার্জ্জুনও পারেন নি।

খুড়ো—ও কথা আমি মানি না। তারা লেখাপড়া শিখলে কবে বাবা। ওঁদের প্রোফেসার ছিলেন ত' সেই দু'ধের কাঙাল দ্রোণাচার্য্য। সারা মহাভারতখানা ঢুঁড়ে একখানা Row's Hintsএর খোঁজ মেলে না। উচ্চশিক্ষা না পেলে হবে কেন? 'কৌশলকুমার' (Bachelor of arts) অন্ততঃ 'প্রথম কৌশলী' (First arts) হওয়াটা চাই। আমি হ'টে গেলুম কেন! কৌশলে কুলোয় না বলেই ত'। তা' ব'লে তোমরা কেন হ'টবে; তোমরা ত' 'প্রথম কৌশলের' কোর্স পেরিয়ে পড়েছিলে বাবাজি! লেগে থাকলেই পারবে—শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘনম্‌।

কুমুদ—পারচি কই খুড়ো! এই ত' গেল রবিবারের কথা,—নিতাইদের বৈঠকে পাশা চলছিল,—কি জমেই ছিল! তিন চার কাপ্‌ চা'ও চলে গেল—

খুড়ো—তা চলবে না,—ওটা হ'ল ভদ্রলোকের বাড়ী! তার পর!

কুমুদ—সে ছেড়ে কি ওঠা যায়—

খুড়ো—উঠ্‌তে বলে কে! ওঠবার কথা ত' কোথাও নেই,—মহাভারতে ত' তার দরাজ ব্যবস্থা রয়েছে। তবে শুধু মূর্খের মত খেললেই হয় না—আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য থাকা চাই। পাণ্ডবদের পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে একটু বুদ্ধি ধরতেন বড়টি—তাই ও-জাতকে বিদেয় করবার সহজ উপায় খেলার মধ্যেই খুঁজে নিচ্ছলেন,—আর তা ক'রে তবে উঠেছিলেন।

তোমরা পথ থাকতে অন্ধ ! হিঁদুর শাস্ত্র ত' পথ বাতলাতে বাকি রাখেন নি ; moral courage চাই বাবাজি, মরেল করেজ চাই ।

উপেন—খুড়োর মাথা বটে !

খুড়ো—এই যে বাবা, একটু আগে মাথা বিগড়েচে ব'লে দমিয়ে দিছলে, যাক্—Paradise regained ! তার পর ।

কুমুদ—বাড়ী এলুম—স'হুটো ! বড় গরম বোধ হ'তে লাগলো ! ছেলে-মেয়েগুলো—চিল চেঁচাচ্ছে ! 'মেয়েগুলোকে অন্নপূর্ণার স্তোত্র শেখান হয়েছে কি না—তারির সুর তুলেছে । ওবে'টা আলাউদ্দীন্ খিলজির কুলজি নিয়ে খই ভাজ্‌চে—পাড়া মাথায় করেছে ! লোক বাড়ী আসে ঠাণ্ডা হবার জন্যে ;—সর্ব্বশরীর জ্বলে গেল । এক দাব্‌ড়িতে সব থামিয়ে দিলে, মিনিটাকে জিজ্ঞেস করলুম—"তোর মা কোথায় ?" বল্‌লে—"দুটো বেজে গেল দেখে, তাড়াতাড়ি পূজোটা সেরে নিতে বসেছেন ; তুমি এলে, আমাকে তেল দিতে বলেচেন ; কি তেল মাখবে বাবা,—ফুলেলা না জবাকুসুম আনবো ?" সামলে বল্লুম—শীগ্‌গির আসতে বল্ আগে,—একটু পা টিপে দিক্ ; ঠাণ্ডা না হয়ে নাইতে পারব না । মেয়েটা ফিরে এসে বললে কি না—"মা বললেন্, আর দু'মিনিট্,—প্রণামটা সেরেই যাচ্চি ।" আমি ততক্ষণ পা টিপে দিচ্চি বাবা । এই ব'লে এগুতেই—ঠাশ্ করে এক চড় বসিয়ে দিয়েই, বেরিয়ে পড়লুম । মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে ডাকতে লাগলো—বাবা যেও না—মা এসেছেন,—এত বেলায় যেও না বাবা—

খুড়ো—ফেরনি ত ?

কুমুদ—সে বান্দাই নই !

খুড়ো—আমার বরাবরই ধারণা, তোমাতে পদার্থ আছে ।

কুমুদ—তার পর কিন্তু মেয়েটার তরে—

খুড়ো—Never mind,—ওইগুলো হল weakness ; এখন থেকে পাকানো চাই হে । কোন জেগুয়ারের হাতে পড়বেই ত' ! তাঁর বাপ নেবেন রক্ত (টাকা) আর তিনি নেবেন জান্ ;—না পাক্‌লে প্রাণ বাঁচ্‌বে কিসে ?

প্রফুল্ল—খুড়ো এইবার "মহৎ" হলেন দেখচি—ক্রমশঃ মিষ্টিক্ হচ্চেন,—"জেগুয়ার" আবার কি ?

খুড়ো—ঐ যে কি ব'লে, কুমুদ যা হে,—গ্রাজুয়েট—গ্রাজুয়েট ।

একটা হাসির মধ্যে কথাটা চাপা প'ড়ে গেল । আঘাতটা কিন্তু কুমুদকে লেগেছিল, সে উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করলে—আপনাদের শাস্ত্রে বলে না—স্ত্রীলোকের স্বামীই দেবতা ?

খুড়ো—বলে বই কি বাবাজি ; তবে যুগ-ধর্ম্মও আছে কি না, সেটা মান ত ? সবই এখন বাড়্‌মুখো (Progressive) ; দেখ না—আগে ছিলেন নবগ্রহ,—পরে প্রচুর প্রমাণ সহিত জামাতারা দশমের দাবী করেচেন ; পঞ্চভূত—এখন ভূতের আড্ডায় দাঁড়াচ্চে ; নবধা কুল-লক্ষণম্ এখন শতধায় অগ্রসর । পূর্ব্বের চেয়ে বেড়ে চলেছে সবাই—কমচে কেবল সুখ । দেবতাও বেড়েছে বাবাজি,—এখন স্ত্রীলোকের শুধু স্বামী দেবতা নেই,—অপদেবতা, উপদেবতা, কাঁচাখেগো দেবতাও জুটেছে । সেকেলে দেবতারা এখন নবাবী আমলের টাকা—অচল্ ! যদি কেউ সংস্কার দোষে মানেন ত'—সন্ধ্যার সময় শাঁখ বাজিয়ে—আধ পয়সার বাতাসা দেখিয়ে চা'য়ে ফ্যালেন ! কিন্তু অপদেবতার আরতির আয়োজন নিশুতি রাতে । তাঁরা হাত পা বার ক'রে খান,—খুঁৎ হলেই ঘাড় ভাঙেন ! সদাই জাগ্রত ।

সকলে হাসিমুখে শুনলেও কথাটার মধ্যে জ্বালা ছিল ; অবিনাশ বলে উঠলো—এসব ত' এক তরফা ডিক্রী,—দেবীদের কাজটা শুনি ।

খুড়ো—এক কথায়,—পেটভাতায় নিরেট বিশ ঘণ্টা দাসী-বৃত্তি, অর্থাৎ সকলকে খাইয়ে যদি বাঁচে সেইটাই আহারের Scale । নীরবে দোষ বহনের ভাঙা কুলো, আর স্বামীদের আত্মরক্ষার শিখণ্ডী হয়ে থাকা ।

অবিনাশ—অর্থাৎ ?

খুড়ো—অর্থাৎ ! সব দোষই তাঁর । যখন দু'পয়সা আনে, অর্থাৎ লুচি হালুয়া, পোলাও কালিয়া চলে, তখন সেটা নিজেদের কৃতিত্ব, আর বিদ্যা বুদ্ধির সুফল ; যখন অভাব, তখন—পরিবার অগোছানে—লক্ষ্মীছাড়া ! অর্থাৎটা এই সব ।

উপেন—টাকা রাখতে কেউ বারণ করে না কি !

খুড়ো—এইবার ঠকিয়েছ বাবাজি । যা'তা ব'লে অধর্ম্ম

বাড়াতে পারব না,—এইটে তাঁদের খুব দোষ, এ স্বীকার করতেই হবে। আমিও ভাবছিলুম—রোজগার ত' কেউ কম কর না—কেউ ৮০৲, কেউ ১০০৲, এই মুটো মুটো টাকা আনচো, অথচ দরকারে পাবে না?—খরচটা কি? রোজ ৩।৪ টাকাই হোক, কোনদিন না হয় ৫।৭ হ'ল। ফি মাসে ত' আর জুতো জামা কিনতে হয়না,—গড়ে, ১০৲ টাকা মাস ধরলেই ঢের। তাতেও যদি টাকা না রাখতে পারেন, তার আর জবাব নেই।

অবিনাশ—খুড়ো হিসেবের বাগ্ দেখছি!

খুড়ো—কেন বাবাজি, ভুল করলুম না কি?

প্রফুল্ল—কেন ওসব শুনচো,—পরিবার সম্বন্ধে ওঁর একটু weakness আছে।

কুমুদ—একটু!

উপেন—বিলক্ষণ! ম্যাডটো বলতে পার।

প্রফুল্ল—আচ্ছা,—কেন বলুন ত' খুড়ো,—ও-জাতটা কি এতই দুষ্প্রাপ্য!

খুড়ো—তোমরা বুঝবে না প্রফুল্ল,—তোমাদের কেউ artist, কেউ জেগুয়ার—I mean গ্রাজুয়েট;—আমি যে বাবাজি দু'য়ের বার। আমার গেলে ত আর হবে না। তোমাদের ডিগ্রির ডেবায় অনেকেই সর্বাঙ্গণা দেবী বিসর্জ্জন দিতে ছুটবে; আর আমার একটা ঝি জোটে ত' তার fee জুটবে না। বাড়ীতে শয়তানের ঝাঁক চাব্বিশ ঘণ্টাই বর্গীর হাঙ্গাম চালাচ্চে; সামলাবে কে বলো; আর দিনরাত নিজের মুখ বুজে, আর সবার মুখ খোলবার ব্যবস্থা করবেই বা কে বাবাজি! এই দেখই না বাবাজি—এই তিন পোর রাতে, কোন মাসীর-মার কুটুম্ দেবতাদের জন্যে কড়াইশুঁটির কচুরি ভাজতে বসেছেন। তবে দুঃখ করতে পার বটে,—এত সুবিধেতেও পয়সা রাখতে পারেন না। ব্যাঙ্ক রয়েছে, সেভিং ব্যাঙ্ক রয়েছে, দুপা গিয়ে কেবল রেখে আসা। ভাবলে বড় দুঃখ হয় বাবাজি।

অবিনাশ—না রাখেন নিজেই ভুগবেন, after me the deluge.

খুড়ো—তাত' বটেই, শাস্ত্রই বলচেন—সম্বন্ধ জীবনাবধি। ঠিকুজি দেখিয়েছ ত?

অবিনাশ—এ আবার কি ঠিকুজি দেখিয়ে জানতে হয়।

খুড়ো—তা বটে,—ওটা আমারি ভুল হয়েছে বাবাজি। যারা তৃতীয় প্রহরের মুখে সেরেফ্ একটু জল দেয়,—যাদের খাওয়া না খাওয়ার খোঁজ নেবার কেউ নেই, যারা ১০৪ জ্বরেও দুবেলা যেন্নমং খাটে,—রেঁধেও খাওয়ায়; যাদের কোথাও অসুখের অবসরই নেই—খাটুনী, আর হুকুম তামিলেই সর্ব্বাঙ্গ ভরা, তারা মরবার সময় পাবে কখন। ঠিক ই ত,—ঠিকুজি দেখতে হবে কেন? Life Insure করনি ত'?

অবিনাশ—রাম কহো।

খুড়ো—বাঃ—কি শান্তি! বেড়ে আছ বাবাজি!

প্রফুল্ল—কিন্তু আপনার না কি একটা আছে।

খুড়ো—আমার কথা ছেড়ে দাও বাবাজি,—না মনিষ্যি, না জন্তু। ঘরে একপাল কাল-ভৈরব—শেষ পেটের জ্বালায় তোমাদেরি ঘরে সিঁদ দেবে যে; আর তোমাদের খুড়ি, কোথাও শাসন বাসন আর রন্ধন নিয়ে শিবপুজার সুখভোগ করবেন।

উপেন—দেখচো খুড়ো কতটা কাহিল!

অবিনাশ—আসল কন্যারাশি।

খুড়ো—প্রফুল্ল—"মেষ রাশি" বলে ভুলটা সুধরে দাও। কিন্তু বাবাজি, ৪০ বছর আগে আমার এ অপবাদ ছিল না।

প্রফুল্ল—এখন বয়সটা কত খুড়ো?

খুড়ো—পিসিমার হিসেবে ১৮।১৯, ঠিকুজিতে দেখি ৩৬, কোন্‌টা ঠিক—কি করে বোলবো। গুরুজনের কথায় অবিশ্বাস করতে পারি না! তবে আমার এমনটা হবার কারন,—আমায় শ্বশুরবাড়ীর তরফ থেকে ওষুধ করেছিল, তার প্রমাণও পিসিমা পেয়েছিলেন। জানই ত, বাবাজি, আমাদের সংসার বরাবরই একটানা স্বচ্ছল, বিবাহটাও হয়ে গেল একদম্ খাঁটি সমান্ ঘরে। তারাও যেমন বসন্তকালের জন্যে হাঁ ক'রে থাকে,—আমরাও তাই।

প্রফুল্ল—কেন?

খুড়ো—কোকিলের ডাক শোনবার তরেও নয়, দক্ষিণে হাওয়া পাওয়ার জন্যেও নয়,—শগুনে খাঁড়ার জন্যে বাবাজি; তাতে ২।৩ মাস বেশ কেটে যায় কি না,—তোমাদের মোচকাটা খাঁড়ায় দিন কাটে না বাবাজি। বসন্তে ভ্রমণং পথ্য এই শাস্ত্রবাক্য রক্ষা করতে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে পড়ি। দেখি, সেথায় বেদান্ত আরম্ভ করবার কি

সুব বস্থাই হয়ে রয়েছে,—যা দেখি, সর্ব্বত্রই একমেবা-দ্বিতীয়ম্। মুক্তো, ছেঁচকি, ছ্যাঁচড়া, ঝোল অম্বল—ডাঁটার ডেঁড়ে-সলাই! অবস্থার কৃপায় অভ্যাস দুরস্ত ছিল,—সাদরে সাপটে নিলুম। অভাবে ছিবড়ে ফ্যালার বদ-অভ্যাস কস্মিনকালে ছিল না। কিন্তু বাড়ী ফিরে তার ফুট ধোরল। পাঁচু ডাক্তার সামলে দিলে, কিন্তু পিসিমার সঙ্গে তাঁর মতের মিল হ'ল না। বামাল পেয়ে ডাক্তার ঠিক কর লেন—বদহজম; পিসিমা বল্‌লেন—ওগুলো ওষুধের শেকড়! এখন দেখ্‌চি পিসিমাই রাইট্‌! তা না ত' পুরুষসিংহের এ দশা দাঁড়াবে কেন। বুঝি সব বাবাজি, কিন্তু কাজের বেলায় সেই শেকড়ে আটকায়। তা নাহ'লে সেদিন—থাক্—তোমরা আবার কি ব'লবে—

প্রফুল্ল—না খুড়ো, বল্‌তেই হবে,—তাতে আর হয়েছে কি।

খুড়ো—কথাটা কিছুই নয়;—জানই ত'—আমাদের বিনোদ বাবুরও আজকাল সময় ভাল,—ইষ্টাকিন্ পোরে পাইখানায় যায়; সন্ধ্যে বেলায় বৈঠকে দশজন আসে,—বিশ কাপ্ চা, বিশ ছিলিম তামাক, ৬০ খিলি পান, আর এন্‌তার জরদা সুরতি, ফুর্ত্তিতে চলে। আমাদের এক পাঁচিলেই বাস; তাঁর বৈঠকখানা সদর রাস্তার ওপরেই—

কুমুদ—অত বোঝাতে হবে না—আমরাই ত' তার daily passenger—

খুড়ো—বটে! শুনলাম, দিন পনের থেকে বিনোদের পরিবারের বিকেল হলেই মাথা ধরে আর ঘুসঘুসে জ্বর হয়। ওটা অবশ্য শোনবার কথা নয়;—মেয়ে মানুষের অসুখ কবে হয় কবে যায়,—পুরুষদের সে খোঁজ রাখ্‌তে গেলে আর সংসার চলে না, কারণ—সত্যিই চলে না! সে দিকটায় চোখ বোজাই সমীচীন!

প্রফুল্ল—ব্যাপারটা কি?

খুড়ো—উতলা হবার মত' কিছু নয় বাবাজি! গত রবিবার তিনটের পর আমার সব্জীবাগের বেড়া বেঁধে এসে, নিজের কামরায় তামাক সাজতে বসেছি, ব্রাহ্মণী দাওয়ায় ব'সে বড়ি তুলছেন, অপর একটি স্ত্রীকণ্ঠ কানে এলো। তিনি অতি কুণ্ঠিতভাবে বলচেন,—"দিদি, দয়া করে তোমার ক্ষ্যাস্তোকে যদি আমার একটি কাজ ক'রে দিতে বলো। আজ ক'দিন বাড়ী ঢুকেই একবার ক'রে শোনান—বৈঠকখানার বারদিকের চাতালটা যে বড়ই অপরিষ্কার হয়ে রয়েছে—দেশ-শুদ্ধ লোক দেখে যাচ্ছে! কোন দিন বলেন—রাস্তা থেকে দেখলে ছোট লোকের বাড়ী ব'লে মনে হয়। একদিন বললেন—ভদ্রলোকেরা আসেন—লজ্জায় ম'রে থাকতে হয়। সে দিন বললেন,—কি পাপই করেছি—এ নরকবাস আর ঘুচলো না! আজ দু'দিন সদর দিয়ে না এসে খিড়কী দিয়ে বাড়ী আসেন, মনও খুব ভার ভার, অকারণেই চোটে ওঠেন। কাল বললেন—"সোমবার থেকে 'মেসে' থাকবো ঠিক্ করেচি; কালকের রাতটে দয়া করে উদ্ধার ক'রে দাও,—যাঁরা আজও এই ম্যাথরের বাড়ী আসেন, তাঁদের চারটি পোলাও আর মাংস খাইয়ে ছুটি নিয়ে বাঁচি।"

এই ব'লে বিনোদ বাবুর স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে বললেন—এই জ্বর গায়ে যদি ১৫।১৬ দিন পাঁচটা ঘর, গোয়াল, উঠোন, বাসন—সব পরিষ্কার রাখতে পারি ত' ১০ হাত চাতালটা ঝাট্ দেওয়াই কি পারি না। সদর রাস্তার ওপর বাড়ী,—সাম্‌নে হ'রে স্যাকরার দোকানে রাতদিন ভদ্র-লোকের ভিড়, দিনের বেলা বেরুই কি ক'রে। সন্ধ্যে না হতেই বৈঠকে ওঁর বন্ধুরা আসেন—১২টা রাতে খেলা ভাঙে। তার পর ওঁকে খাইয়ে সব সারতে দেড়টা বেজে যায়,—তখন একলাটি রাস্তার ওপর যেতে ভয় করে দিদি। আবার ভোর পাঁচটা না বাজতে ৫।৭ জন চা খেতে আসেন। এখন আমি 'ক করি বল' দিদ! আমি কি বুঝচি না—এত কথা, এত কাণ্ড, কেবল ওই র'কটুকু ঝাঁট দিতে পারিনি ব'লে।

ব্রাহ্মণী বল্লেন—কি এমন বড় কাজটা, দু'মিনিটও ত' লাগে না! ও টুকু তাঁর নিজে ক'রে নিলে কি হয়! এর তরে এত পর্ব্ব—দু'সপ্তা ধরে উল্‌টো পাক! কি অধর্ম্ম!

বিনোদ বাবুর স্ত্রী চোখ মুছতে মুছতে বল্‌লেন—আমার উপায় থ'কলে ওঁকে ব'লতে হবে কেন। গেল বছর নগর-সংকীর্ত্তন দেখতে বৈঠকখানার জানালায় এসে দাঁড়িয়েছিলুম। তাতে আমার আর কি বাকিটে ছিল,—সবই জান ত' দিদি। এখন তুমি না বাঁচালে—আমার যে কি অদৃষ্টে আ.ছ জানি না, ব'লে কাঁদতে লাগলেন। ব্রাহ্মণী তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,—আমি

এক্ষুণি ক্ষেন্তিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি বোন ; এ আবার একটা বড় কাজ না কি !

বিনোদ বাবুর স্ত্রী বললেন—বন্ধুদের বোল্‌তে বেরিয়েছেন, বেশী দেরী নাও হতে পারে—তাই আমার তাড়া ; আমি আর দাঁড়াব না দিদি—বল্‌তে বল্‌তে দ্রুত চলে গেলেন।

আমি ঘরে ব'সে টিকের ফুঁ দিতে দিতে শুনছিলুম, কখন যে ফুঁ বন্ধ হয়ে গেছে জানি না ; দেখি, তামাক পুড়ে—সব নিবে ছাই ! ফেলে রেখে উঠলুম। ক্ষেন্তি শজনে ফুলের সন্ধানে বেরিয়েছে—কখন ফিরবে ঠিক্ নেই। ঝাঁটাগাছটা নে বেরুলুম। ব্রাহ্মণী বললেন—কোথা যাও ? বললুম—আস্‌চি।

গিয়ে দেখি, রকের ওপর—তামাকের গুল আর ছাই, সিগারেটের শেষটা, দেশালায়ের কাটি, পানের ছিব্‌ড়ে। ত্'আঁচড়েই সাফ্ হয়ে গেল—দু'মিনিটও লাগলো না। সেগুলো যথাস্থানে ফেলে দিয়ে ফিরে এলুম। তামাক সাজতে সাজতে ভাবতে লাগলুম,—আচ্ছা, এতে বিনোদের আটকাচ্ছিল কোন্‌খানটায় ! করলে ত' মনটা প্রফুল্লই হয় ; তবে—না ক'রে এতটা কষ্ট, এতটা অশান্তি ভোগ করবার কারণ কি ?

কুমুদ—আপনি সেটা বুঝবেন না খুড়ো -

খুড়ো—না বাবাজি,—পারুচি আর কই। এতে খারাপ ত কিছু খুঁজে পাচ্ছি না ; বরং (অন্যের হলেও) কোরে পেলুম, একটু আনন্দ।

উপেন—সকলেরি মান সম্ভ্রম ব'লে একটা দরকারি জিনিষ আছে,—সেটা গরীব দুঃখীরাও বজায় রেখে চলতে চায়।

খুড়ো—বটে ! কেবল স্ত্রীলোকের বুঝি সেটা নেই, না থাকা উচিত নয় ? তোমাদের গুরুরা এমন কথা কোথাও বলেচেন কি ? তাঁদের ত ঘোড়া টওলাতে, বাগান কোপাতে, পত্নীর বুটের তলায় হাত দিয়ে গাড়ী চড়াতে দেখেচি বাবাজি।

প্রফুল্ল—That's another thing.

খুড়ো—তা হলেই বাঁচি। যা হক্ বাবাজি ভাবতে লাগলুম,—চৌধুরী মশাই তবে কোন্ নজীরে সেদিন ব'লে ফেললেন,—Your hand is never the worse for doing your own work. There was never a nation great until it came to the knowledge that it had nowhere in the world to go to for help—বোধ হয় except to wife কথাটা চেপে গিছলেন।

অবিনাশ—আরে বাস্—Bravo ! কে বলে—

খুড়ো—না বাবাজি—সে অপবাদ দিও না ; বেণী মাষ্টার মানে বুঝিয়ে দিছলেন, আমার ওই মুখস্থটুকুই দাবী। যা হোক্ বাবাজি, সেদিন গুড়ুকে অভদ্রা প'ড়েছিল, তামাক খাওয়া আর হয়নি। ধরানো টিকেখানায় দু'ফোঁটা চখের জল পোড়ে ছাঁক্ কোরে উঠে। ব্রাহ্মণী বলে উঠলেন—"এখন আবার রান্নাঘরে ঢুক্‌লে কেন ? ওই ক'খানা কুমড়ো ভাজ্‌তে, এখনি আধ-পলা তেল ঢেলে বোস্‌বে।"

কুমুদ—তা হ'লে ও-কাজও—

খুড়ো—তা করতে হয় বই কি,—দরকার হ'লেই করতে হয় বাবাজি ; তা না ত' দুঃখের ভাত মুখে উঠবে কেন ! করতে কি আয়,—ঐ Co-operationএর বিশ্বাসটুকুই যে তার সুখ—

হঠাৎ ছেকল-নাড়ার শব্দ হওয়ায়, প্রফুল্ল অন্দরের দিকের দোরটা খুলতেই, দু'খাল গরম গরম কচুরি, এক রেকাবী হালুয়া এগিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ কাপ্ চা, তার পরই তাওয়াদার তামাকের সুগন্ধ !

খুড়ো চা খান না, একটু উঁচু গলায় বল্‌লেন্—দু'চার খা। আলাদা ক'রে রেখ মা। নারায়ণকে দেবার ক্ষমতা হয় না, তোমাদের কল্যাণে আজ তাঁকে নিবেদন ক'রে প্রসাদ পাব।

প্রফুল্ল—সে কি ! এখন খাবেন না !

খুড়ো—না বাবাজি। নতুন জিনিসটে যদি তোমাদের কল্যাণে জুটলো, বাড়ীতে নারায়ণ রয়েছেন, তাঁকে দিয়ে—

প্রফুল্ল—তাইত, মিছে এতটা কষ্ট দিলুম—

খুড়ো—তুমি দাওনি বাবাজি, আমি ইচ্ছে করেই নিলুম,—তা না ত' তোমাদের তাড়ায়—এমন পরিপাটি জিনিস্ তয়ের হ'ত না,—ওগুলোর সঙ্গে মায়েরও হাতটা পা'টা পুড়তো ! তোমরা ত' জান না বাবাজি, কত ধানে কত চাল হয়,—হুকুম্ আর হুম্‌কিটাই অভ্যাস করেছ ! যাক্, তোমাদের উত্তেজনা আসে, এমন একটা কিছু নিয়ে ২।৩

ঘণ্টা বাজে বোকে যদি না তোমাদের বসিয়ে রাখতুম,—যতই সব অতিষ্ঠ হ'তেন আর হাই তুলতেন,—তোমার তাগাদাও ততই উগ্র হ'য়ে বউমার উপর উচ্চগ্রামে গিয়ে পৌঁছুতো,—আর এই পরিশ্রমের পুরস্কারট, অকারণ তিরস্কারের রূপই ধোরত।

কুমুদ—সেইটে সামলাবার জন্যেই বুঝি ব'সেছিলেন?

খুড়ো—সত্যই তাই বাবাজি! তা না ত, আমি কি জানি না কাদের সঙ্গে তর্ক করচি; আমি কি বুঝি না বাবাজি, যে, তোমরা যা ক'রে থাক', সেটা অনেক প'ড়ে-শুনে হাসিল করেছ;—সেটা academyর আবিষ্কার; তার ওপর কথা কওয়া আমার বিদ্যের কাজ নয়! রাত দুটো পর্য্যন্ত সময়টা যাতে কেটে যায়, উতলা হ'য়ে প্রফুল্লকে না চঞ্চল কোরে বোসো, তাই বাজে কথাটা তুলে ব্যথা দিয়েছি, কিছু মনে কোরো না বাবাজি। শুনিচি ত বড় বড় ঘসিটি বেগম পর্য্যন্ত চিরজীবন ঘাস কেটেছিলেন; রুক্মিণীও পাকশালায় পাক থেয়ে 'বড় রাঁধুনী' নাম পেয়েছিলেন,—যাদের যা কাজ। সংসারের কাজ ত' সাংেস্তা ধাঁদের নয়,—তাঁদের সেরেফ্ শাসন,—তবে না রাজ্য চলে?

অবিনাশ—খুড়ো এতক্ষণে ধাতে এসেছেন!

খুড়ো—অধর্ম্মের ভয়টা রাখতে হয় যে বাবাজি, পরজন্ম মানি যে!

উপেন—Nothing is too late—এখন পথে আসুন খুড়ো,—পায়ের ধূলো দিন্।

খুড়ো—আশীর্ব্বাদ করি—সুমতি হোক!

ভারত-ভ্রমণ

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত এম-এ

আমাদের লজিক প্রফেসার গোকুল বাবু ক্লাস হইতে আসিয়াই কহিলেন—"আপনাদের দিয়ে কিছু হবে না। এত বড় একটা মান্ধাতা-আমলের ভারতবর্ষ চোখের সামনে পড়ে রয়েছে, তা' দেখবার নাম নাই। যেমনি ছুটি হলো, অমনি নাক চোখ বন্ধ করে একদম বাড়ীর দিকে ছুট! এই বাড়ী বাড়ী করতে করতেই ভারতবর্ষটা উচ্ছন্ন গেল।"

স্তূপীকৃত টিউটোরিয়েলের খাতা হইতে চক্ষু উঠাইয়া ইংরাজীর প্রফেসার নিত্যবাবু কহিলেন,—"তা, বেশ, এই দেখছেন ত—এইগুলো ছুটির আগেই দেখে দিতে হবে। তা' কাশ্মীর যদি যান তবে আমি যেতে পারি।"

গোকুলবাবু কহিলেন—"আপনি যে যাবেন তা' বুঝা গেছে মোটে নাই শ্বশুরবাড়ী তার আবার গেরস্থালী। ঘর থেকে দু পা বের হবার নাম নাই, যাবেন কিনা কাশ্মীর! ওর চাইতে বললেই পারতেন আমি জাপান ডিঙ্গিয়ে আমেরিকায় যাব।"

এমন সময় ইতিহাসের প্রফেসার তাঁহার বাইক হইতে বাহির ধপাস করিয়া নামিয়া ক্রমান্বয়ে দরজার গোড়ায় সাত আটটা লাথি বসাইয়া গাড়ীখানাকে ঘরে আনিয়া রাখিলেন। তার পর চেয়ারে বসিয়া পাখাটার দিকে তাকাইয়া কহিলেন—"এই বিশুনটার জ্বালায় আর পারা গেল না। দিব্যি পাখাটার দড়টা খুলে নিয়ে গেছে। প্রিন্সিপালের কাছে রিপোর্ট না করে উপায় নাই।"

কেষ্ট বাবুর যে ঐ সময়টা হাওয়া না হইলে চলে না, তাহা বিশুনচন্দ্র জানিত। একটা চল্লিশ হাত লম্বা ছিন্ন-ভিন্ন কুয়ার দড়ি কোথা হইতে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে লইয়া আসিয়া পাখাতে লাগাইয়া খুব কর্ত্তব্যপরায়ণ ভৃত্যের মত সে পাখাটা টানিতে লাগিল। দড়িটার চেহারা দেখিয়া গোকুল বাবু আর নিত্য বাবু হা.সয়া উঠিলেন। কেষ্ট বাবু কহিলেন—"দেখো, কুয়া কি রশি লে আয়েঙ্গে কেইসা, আরে কেইসা জল উঠাবে সবাই?

বিশুন কহিল—"কৈ হরজ নেই, বাবু।"

এমন সময় প্রিন্সিপালের ঘরে টুং করিয়া আওয়াজ হইল, আর তখনই বিশুনচন্দ্র সেখানে চলিয়া গেল।

গোকুল বাবু কহিলেন—"দেখুন কেষ্ট বাবু, এসব ভাল নয়। হিন্দিটা জানেন না অথচ বোলবেন। এতে যে লোক হাসে, তা কি মাথায় ঢোকে না ?"

নিত্য বাবু খাতায় নম্বর দিতে দিতে মাথা নাড়িয়া কহিলেন—"মানলুম না, আমি মানলুম না। আপনি হিন্দির একটা স্পেশালিষ্ট হলে কথাটা খাটত। কেষ্ট বাবু যা হিন্দি জানেন, সাহেব হলে ওর জোরেই উনি সিনিয়র পরীক্ষাটা হেলায় পাশ করে ফেলতেন।"

গোকুল বাবু কহিলেন—"রেখে দেন আপনার বাজে কথা। এই দেখুন ব্রাড্‌শ নিয়ে এসেছি। চলুন সবাই মিলে আমরা South India রামেশ্বরম্ পর্য্যন্ত দেখে আসি।"

কেষ্ট বাবু কহিলেন—"বেশ, আমি যাব আপনার সঙ্গে। কিন্তু সিলোন পর্য্যন্ত প্রোগ্রাম করতে হবে। কলোম্বোতে তিন দিন, ক্যাণ্ডি সেকেণ্ড সিটি তাতে দুই দিন, আর অনুরাধাপুর অনেক হিষ্টোরিকাল (ঐতিহাসিক) জিনিস আছে—রিজ ডেভিড্ একবার দেখলেই বুঝতে পারবেন—সেখানে একদিন। এই ছটা দিন, ধরুন এক সপ্তাহ সিলোনে কাটাতেই হবে।"

গোকুল বাবু বলিলেন—"বেশ, বেশ, আমার আপত্তি নাই। তবে বন্ধে কুলালে হয়।"

নিত্যবাবু খাতাগুলি বাঁধিয়া কহিলেন—"তা খুব কুলাবে। কিন্তু কথা হচ্ছে এই, যে রাস্তায় যাবেন সে রাস্তায় কেন টাকা নষ্ট করে ফিরবেন। এক কাজ করুন—জব্বালপুর, বিলশা, অজন্তা, ইলোরা হয়ে একদম বম্বে চলে যান! বম্বে থেকে পুণা হয়ে হায়দ্রাবাদ, সেকেন্দ্রাবাদ, মাইশোর, মাদুরা হয়ে কলোম্বো চলে যান। সেখান থেকে মাদ্রাস, ভাইজাগ, কোনারক, পুরী হয়ে কলকাতায় গিয়ে বায়োস্কোপ দেখে চোখ বুজে ঘরে ফিরে আসুন।"

গোকুলবাবু সবিস্ময়ে কহিলেন—"আপনার দেখছি ইণ্ডিয়ার ম্যাপটা একদম মুখস্ত। তবে অত দেখতে গেলে অন্ততঃ তিনমাস লাগবে বোধ হয়।"

নিত্যবাবু কহিলেন—"তা আপনারা যদি ব্যাটা ছেলে না হতেন, তবে তাই লাগতো বটে। একটু চটপট্ করে নেবেন—একমাসেই হয়ে যাবে।"

এমন সময় প্রিন্সিপাল Mr. M. Patra আসিয়া কহিলেন—"আপনারা টুরে যাচ্ছেন বুঝি? আমার ওসব দু'বার করে হয়ে গেছে। Weather ভাল থাকলে আমিও আপনাদের পার্টিতে যোগ দিতে পারি। লুশু আর গোয়া আমার দেখা হয় নাই। আর এই দেখুন, আপনাদের সব পরীক্ষার চেক এসে গেছে। রেজিষ্ট্রার খুব ভাল সময়েই পাঠিয়েছে যা হো'ক।"

রেজিষ্ট্রার 'রশের' চেক পাইয়া সকলেই প্রফুল্লিত হইয়া উঠিলেন। নিত্যবাবু কহিলেন—"গোকুলবাবু আর কেষ্টবাবু যাবেন ঠিক করেছেন, আমিও যাব ভাবছি।"

গোকুল বাবু কহিলেন—"কিন্তু, বন্ধটা যদি এক সপ্তাহ বেশী হতো তা' হলে ভাল করে দেখা যেত। আমরা অজন্তা, ইলোরা হয়ে কলোম্বো পর্য্যন্ত যাব।"

মিষ্টার পাত্র কহিলেন—"তা দিয়ে দেব। গরমের ছুটি কেটে নিলেই চলবে এখন। তা, আপনারা প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেলুন। আমাকে একবার দেখাবেন মাত্র।"

আর অপেক্ষা না করিয়া মিষ্টার পাত্র গিয়া তাঁহার মোটরে উঠিলেন। গোকুলবাবু নিত্যবাবুর হাতে ব্রাড্‌স-খানা দিয়া কহিলেন—"এইবার কাগজ কলম নিয়ে প্রোগ্রাম করে ফেলুন।"

কেষ্টবাবু দুই মিনিট পরে কহিলেন—"মিষ্টার পাত্র গিয়ে মুস্কিল বাধাবে। puritan লোকটা! না খেলা যাবে তাস—না খাওয়া যাবে চুটো চুরোট।"

গোকুলবাবু কহিলেন—"সে ভয় নাই। ও যাবে সেকেণ্ড ক্লাসে—আর আমরা যাব ইণ্টার।"

নিত্যবাবু কহিলেন—"ইণ্টার আমি পারব না, বলে রাখলুম। ছেলেকে কলেজে ভর্ত্তি করতে আমার প্রায় দুশো টাকা লেগে যাবে। হয় গ্লাডষ্টোন অবতার হয়ে, নয় মহাত্মার মত সুমার্জ্জিত সুগন্ধ-লেপিত রয়াল ক্লাসে যেতে হবে। নইলে বলে রাখলুম হাজার টাকার কম লাগবে না।"

কেষ্টবাবু কহিলেন "ইণ্টার মাথায় থাক। ঐ রয়াল ক্লাসেই যাওয়া যাবে।"

প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া প্রোগ্রাম ঠিক করা হইল। গোকুলবাবু কহিলেন—"খসড়াটা আমি নিয়ে যাই। বড় lengthy দেখাচ্ছে। যদি কমান-টমান যায়, একবার চেষ্টা করে দেখব।"

এমন সময় পণ্ডিতজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কেষ্টবাবু রেজেষ্ট্রী হাতে করিয়া ক্লাস হইতে ফিরিয়া কহিলেন—"পণ্ডিতজী, রামেশ্বর যায়েঙ্গে?"

গোকুলবাবু কহিলেন—"এই মলো, আবার হিন্দি! আপনার হিন্দির চোটেই আমাদের যাওয়াটা মাটি হবে।"

পণ্ডিতজী কহিলেন—"কাহেয়ে। হাম বাংলা থোরা থোরা জান্‌তেছি।"

গোকুলবাবু কহিলেন—"একা রামে রক্ষে নাই সুগ্রীব দোসর। একদিকে হিন্দি আরেক দিকে বাংলা, একেই বলে সিলা আর ক্যারিবডিস্।"

নিত্যবাবু অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া কহিলেন—"পণ্ডিতজী, আপনি একটু কৌসিস করুন। ম্যাট্রিকের বাংলার examiner নিশ্চয়ই হতে পারবেন।"

পণ্ডিতজী কহিলেন—"কাহে! হামি কি বাংলা নেই জানেন আপ ভাবেন?"

কথাটা কোন রকমে চাপা দিয়া গোকুলবাবু কহিলেন—"আপনি ক্লাসে যান পণ্ডিতজী। আমরা রামেশ্বর যাচ্ছি। আপনি যাবেন?"

পণ্ডিতজী কহিলেন—"তীরথমে?"

কেষ্টবাবু কহিলেন—"অজন্তামে, ইলোরামে, সিলোনমে—আরও অনেক স্থানমে।"

পণ্ডিত আর অপেক্ষা না করিয়া মাথা নাড়িয়া ক্লাসে চলিয়া গেলেন।

কেষ্টবাবু কহিলেন—"আমার কিন্তু চা না হলে সকালে চলে না, পায়খানাই হয় না।"

গোকুলবাবু কহিলেন—"সেজন্য ভাবনা নাই। পি-টি ফ্যাক্টরীর বিশুদ্ধ হিন্দুরুটি গোটা ছয় নিয়ে যাব। লাহার দোকান থেকে দার্জ্জিলিং পিকো দুই পাউণ্ড আর ছয় টিন কন্‌ডেন্সড্ মিল্ক আর কয়েক টিন জেলী নিলেই চলবে। গিন্নিকে আমার টিফিন বাস্কেট সাজিয়ে রাখতে বলেছি।"

নিত্যবাবু কহিলেন—"একটা ষ্টোভ্ আর একটা ইক্‌মিক আর কিছু চাল ডাল নিলে আরও ভাল হবে।"

গোকুলবাবু কহিলেন—"বেশ ভাল idea; নেওয়া যাবে এখন। পথে আর খাবার ভাবনা ভাবতেই হবে না।"

কেষ্টবাবু কহিলেন—"কয়েক বাক্স বিস্কুটও নিয়ে যাবেন।"

নিত্যবাবু কহিলেন—"বড় বোঝা হবে কিন্তু। কুলি ভাড়া দিতে দিতে প্রাণান্ত হতে হবে।"

কেষ্টবাবু বলিলেন—"কুলিভাড়া এক পয়সা দেব না। এতগুলি মানুষ যাব—হাতে হাতে নামালেই চলবে।"

গোকুলবাবু কহিলেন—"সে সব তখনই দেখা যাবে। প্রত্যেককে তিন চারশো টাকা নিয়ে বেরুতে হবে।"

নিত্যবাবু কহিলেন, "তিনশো নিলেই চলবে। তবে আমি চারশো নেব।"

গোকুলবাবু ও কেষ্টবাবু দুইজনেই কহিলেন—"আমরাও তাহলে চারশো করে নেব।"

নিত্যবাবু কহিলেন—"আজই যেয়ে যেন জিনিসপত্র ঠিক করে রাখেন। কাল পাঁচটার গাড়ীতে কিন্তু start করতে হবে।"

কেষ্টবাবু কহিলেন—"একটা কোডাক নিতে পারলে বড়ই ভাল হতো। ফিরে এসে খুব লম্বা আর্টিকেল লেখা যেত।"

নিত্যবাবু কহিলেন—"আর্টিকেল লিখিতে জানলে কোডাক লাগে না। কত জন না দেখেও লম্বা-চওড়া প্রবন্ধ লিখে বসে! আমাদের ডাঃ নদে বানার্জ্জির বইএ দেখবেন সেন্ট্রাল এসিয়ার কত ছবি! সবাই ভাববে বানার্জ্জি না জানি কতই না দেখে এসেছে।"

এমন সময় মিষ্টার পাত্র আসিয়া কহিলেন—"প্রোগ্রামটা ভালই হয়েছে। আমিও যেতে পারি। তবে জানেন-ত আমার বেতো শরীর, weather খারাপ হলে আমি যাব না।"

মিষ্টার পাত্র চলিয়া গেলে কেষ্ট বাবু কহিলেন—"লোকটা কি অলক্ষুণে। শুভ কাজে প্রথম থেকেই কুডাক ডাকছেন।"

পণ্ডিতজী আসিয়া কহিলেন—"যাইয়ে আপলোক। রামেশ্বরমে হামার সাথ দেখা হবে।"

কেষ্টবাবু কহিলেন—"উঁহু ওখানে নেহি। কলম্বোমে। হুয়া বহুৎ ভাল কেলা আর বহুৎ বড়া তরমুজ আছে পণ্ডিতজী। জানেন?"

কেষ্টবাবুর রস পণ্ডিতজী বুঝিতে না পারিয়া নীরবেই

রহিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই নিত্যবাবু আর গোকুলবাবুকে হাসিতে দেখিয়া সকলের উপর বিরক্ত হইয়াই তিনি সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

গোকুলবাবু বাড়ী আসিয়া টিফিন বাস্কেটটা ভাল করিয়া দেখিলেন কি কি বাকী আছে। তারপর একটা কাগজে সমস্ত জিনিসের লিষ্ট করিয়া গণিলেন,—ত্রিশটা জিনিস। কিন্তু বাস্কেটে মাত্র পোনরটা জিনিস থাকায় মহা ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—"শীগ্‌গীর খাবার দাও, আমায় এক্ষুণি লাহার দোকানে যেতে হবে।"

গিন্নি কহিলেন—"যাও না স্নান করে এস। খাবার ত আমার তৈরী হয়েছে অনেকক্ষণ।"

গোকুলবাবু কহিলেন—"স্নান করতে গেলে আর কুলুবে না। শেষে ট্রেণ ফেল করে ফিরে আসতে হবে।"

গিন্নি কহিলেন—"যাওয়া যাওয়া করে তুমি পাগল হবে শেষে। কাল যাবে, আর এখন থেকেই তোমার ট্রেণ ফেল করা হচ্ছে। বলিহারি বলতে হয় তোমাকে।"

গোকুলবাবু কহিলেন—"আমার বাক্সটা গুছিয়েছ?"

গিন্নি কহিলেন—"সেজন্য ভাবতে হবে না। কাল ত তোমার সকালে কলেজ। কলেজ থেকে এসেই দেখবে সব সাজান হয়ে আছে।"

"না না, তা করলে চলবে না। আজ বিকেলেই সব গুছিয়ে রেখ।"—এই কথা বলিয়াই গোকুলবাবু একটা সিগারেট ধরাইয়া বাথরুমের দিকে চলিয়া গেলেন।

সেইদিন রাত্রিতেই গোকুলবাবুর জিনিসপত্র সব গোছান হয়ে গেল। গিন্নি কহিলেন—"চাল, ডাল নিয়ে যাচ্ছ, কিন্তু মশলা পাবে কোথায়? বল ত দিয়ে দেই।"

গোকুলবাবু সিগারেটে একটা টান দিয়া কহিলেন—"তা দাও না, ভালই হবে।"

গিন্নি মশলার কৌটাগুলি বাস্কেটে ভরিতে যাইতেছেন এমন সময় গোকুলবাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া কহিলেন—"রসো।" তারপর পকেট হইতে লিষ্টটা বাহির করিয়া বাস্কেটের কাছে আসিয়া বসিয়া কহিলেন—"কিছু ত উঠাও নাই?"

গিন্নি কহিলেন—"না উঠাই নাই।"

গোকুলবাবু তখন একটা কৌটা হাতে লইয়া কহিলেন "এতে কি আছে?"

গিন্নি কহিলেন—"হলুদ।"

গোকুলবাবু লিখিলেন—Extra No. 1 Halud.

এই রকমে প্রত্যেক কৌটাটি মহামূল্যবান লিষ্টে উঠাইয়া গিন্নিকে সেগুলি বাস্কেটে তুলিবার অনুমতি দিলেন।

পরের দিন কলেজে আসিতেই কেষ্টবাবু ও নিত্যবাবু কহিলেন—"সব ঠিক ত?"

গোকুলবাবু কহিলেন—"কিচ্ছু ভাবতে হবে না। সব ঠিক হয়ে গেছে।"

কলেজ হইতে ফিরিয়াই গোকুলবাবু তাড়াতাড়ি স্নানের ঘরে গেলেন। এদিকে আকাশ যে মেঘে ভরিয়া গিয়াছে সে দিকে তাঁহার দৃষ্টিই যায় নাই। গোকুলবাবুর সামনে ভাতের থালাটা রাখিয়াই গিন্নি তাড়াতাড়ি করিয়া দরজা বন্ধ করিতে লাগিলেন। গোকুলবাবু কহিলেন—"কেন, দরজা বন্ধ করছ কেন?" গিন্নি কহিলেন "দেখছ না, ঝড় উঠে আসছে, আর ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি আসছে!'

কথা শেষ হইতে না হইতেই একটা জানালা খুলিয়া গেল, আর বৃষ্টি আসিয়া ঘরে পড়িতে লাগিল। গিন্নি তাড়াতাড়ি গিয়া জানালাটা বন্ধ করিয়া দিলেন, আর একটু দেরী হইলেই খাওয়াটা নষ্ট হইত।

সেই যে ঝড়বৃষ্টি সুরু হইল, তাহা আর ক্ষান্ত হইল না। তিনটার সময় গোকুলবাবু ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—"গাড়ীটা যদি সকালেই ঠিক করে রাখতুম ত'হলে আর বেগ পেতে হতো না। আর দেরী করা ভাল নয়, ঠাকুরকে গাড়ী আনতে পাঠিয়ে দাও এখনই।"

গিন্নি কহিলেন—"দেখ ত আকাশের দিকে চেয়ে। বৃষ্টি যে আজ ছাড়বে তা-ত বোধ হয় না। এত ঝড় জলে কেউ আবার বেরুবে!"

গোকুলবাবু কহিলেন—"তুমি যে আমার tourএর বিরুদ্ধে তা আমি জানি। আর সবাই যাবে, আমিই কেবল এই গাড়ীটার জন্য পড়ে থাকব। সবাই বলবে মস্ত বড় বীর, কিন্তু কাজের বেলায় ঠন্ ঠন্।"

গিন্নি মুখখানি গম্ভীর করিয়া পান সাজিতে বসিয়া গেলেন। অগত্যা গোকুলবাবু নিজে যাইয়াই ঠাকুরকে গাড়ী ডাকিতে পাঠাইয়া দিলেন।

ঠাকুর চলিয়া গেলে গোকুল বাবু ফিরিয়া আসিয়া গিন্নির পানের ডিবা হইতে দুইটা পান উঠাইয়া মুখে পুরিয়া

কহিলেন—"দেখ খাওয়ার দিনটায় রাগ করো না। সামনের পরীক্ষার জন্য যে চেক আসবে তার সব-কটা টাকাই তোমার। তা থেকে একটা পয়সাও আমি নেব না বলে রাখলুম।"

গিন্নি কহিলেন—"আমি বুঝি তোমার টাকার জন্যই রাগ করেছি? কেন বল্‌লে আমি তোমার tourএর বিরুদ্ধে?"

গোকুলবাবু কহিলেন—"ঘাট হয়েছে, মাপ কর।"

গিন্নি কহিলেন—"তা বেশ, কিন্তু ষ্টেশনে যদি কাউকে না দেখ, গাড়ীতে চড়ে বসো না কিন্তু। বাড়ীতেই ফিরে এসো। আর যদি রাস্তায় টাকার দরকার হয় তবে 'তার' করো। অসুখ বিসুখ হলে জানিও কিন্তু। যেথান সেথানকার জল খেও না! আর খুব সাবধানে চলা-ফেরা করো।"

গোকুল বাবু কহিলেন—"সেজন্য ভাবতে হবে না! খোকন এখনও ইস্কুল থেকে এলো না। তার সঙ্গে দেখা করে যেতে পারলুম না।"

চারটার সময় জলে ভিজিতে ভিজিতে ঠাকুর গাড়ী লইয়া উপস্থিত হইল। গোকুল বাবু আর বিলম্ব না করিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। জিনিসপত্রগুলি কোন মতে বৃষ্টির হাত হইতে রক্ষা করিয়া গাড়ীর মধ্যে স্থাপন করিয়া ঠাকুর ছাতা মাথায় দিয়া কোচওয়ানের পার্শ্বে উঠিয়া বসিল।

গাড়ীর মধ্যেও বৃষ্টির ছিট্‌ আসিতেছিল। কিন্তু তাহাতেও গোকুলবাবু দমিলেন না। ষ্টেশনে নামিয়া দেখিলেন বন্ধুবর্গের কেউ আসেন নাই। মনের মধ্যে একটা সন্দেহ, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্থিরতা জাগিয়া উঠায় গোকুলবাবু এক জায়গায় স্থির থাকিতে পারিলেন না! বাহিরের দরজার কাছে আসিয়া বারম্বার দেখিতে লাগিলেন নিত্যবাবুরা আসিতেছেন কি না! এই রকম বার-কয়েক ঘুরিতে ফিরিতেই তাঁহার কোটটা ভিজিয়া গেল। তখন ঝড় আর বৃষ্টির বেগ যেন আরও বৃদ্ধি পাইল।

পাঁচটা বাজিতে যখন প্রায় পোনর মিনিট বাকী, তখন গোকুল বাবুর মনে হইল নিত্য বাবুরা বোধ হয় 'উত্তর সরাই' গিয়াছেন! ঐ ষ্টেশনটাই তাঁদের কাছে। "বেশ কামালপুর যেয়ে দেখা হবে।" লুপ্তপ্রায় আশা আবার ফিরিয়া আসিল। গোকুল বাবু একরকম ছুটিয়া গিয়াই একখানা কামালপুরের টিকিট কিনিয়া তাড়াতাড়ি গিয়া ট্রেণে উঠিলেন।—গাড়ী পাঁচটার সময়ই ছাড়িয়া দিল।

গোকুল বাবুর গিন্নি ছয়টার সময়েও ভাবিতেছিলেন তাঁহার স্বামী ফিরিয়া আসিবেন। কিন্তু তখনও তাঁহাকে না আসিতে দেখিয়া ভাবিলেন যে ঝড় বৃষ্টি কাহাকেও আট্‌কাইয়া রাখিতে পারে নাই।

এমন সময় ছাতা মাথায় দিয়া এক রকম ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া কেষ্ট বাবু বাহির হইতে ডাকিলেন—গোকুলবাবু, গোকুল বাবু, বাড়ী আছেন?" খোকন আর একটু হইলেই বাইরের ঘরের দরজা খুলিয়া দিত। কিন্তু তার মা তাহাকে নিষেধ করায় সে চুপ করিয়া রহিল। কেষ্ট বাবু মিনিট পাঁচেক পরে ডাকিলেন—"খোকন, খোকন, বাড়ী আছ?" খোকন ডাক শুনিয়া মায়ের মুখের দিকে তাকাইল। মা এবারেও নিষেধ করিলেন। আরও মিনিট পাঁচেক ভিজিয়া কেষ্ট বাবু ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে কামালপুরে আসিয়া কাহাকেও না দেখিয়া গোকুলবাবু তাঁহার বন্ধুগণের উপর বিষম চটিয়া গেলেন। ফিরিবার গাড়ী সেই নয়টায়। এতক্ষণ ওয়েটিং রুমে পড়িয়া থাকা আর নরক ভোগ করা সমান। গোকুল বাবুর তখন কেবল মনে হইছিল—"আহা, গিন্নির কথা যদি শুনতাম, তাহলে এ দুর্ভোগ আর ভুগতে হতো না।"

বাক্স হইতে শুক্‌না কাপড় চোপড় বাহির করিয়া জামা কাপড় সব বদলাইয়া গোকুল বাবু কেলনারের দোকানে যাইয়া দুই কাপ চা খাইয়া খুব জোরে দুইটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

তার পর প্রায় দশটার সময় বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া যখন দরজায় ধাক্কা দিয়া গোকুল বাবু ডাকিলেন—"খোকন" তখন তাঁহার গিন্নি ব্যতীত আর সকলেই ঘুমাইতেছিল। গিন্নি দরজা খুলিয়া দিয়াই কহিলেন—"এতক্ষণ কোথায় বসে ছিলে?"

খুব নম্রভাবে গোকুল বাবু কহিলেন—"এই কামালপুরে।"

"বলিহারী বুদ্ধি তোমার" বলিয়া গিন্নি তাঁহার জন্য খানকতক লুচি ভাঁজিতে বসিয়া গেলেন।

সেদিন সারারাত্রি গোকুল বাবু স্বপ্নে কেবল বলিতে লাগিলেন—অজন্তা ইলোরা জব্বলপুর—কি সুন্দর!

সন্তরণ প্রতিযোগিতা

গত ৬ই আশ্বিন, রবিবার,—গত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও গঙ্গায় ত্রয়োদশ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। সন্তরণ আরম্ভ হইবার জন্য যে সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল,—জোয়ার ভাটার দরুণ সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের একঘণ্টা পরে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। সর্ব্বসমেত ৪৮জন প্রতিযোগীর মধ্যে দুই একজন ছাড়া প্রায় সকলেই শেষ পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। এবার প্রথম পুরস্কার পাইয়াছেন সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের (কেন্দ্রীয় সন্তরণ সমিতি, হেদুয়া) শ্রীমান প্রফুল্ল ঘোষ। এই সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের বার্ষিক সন্তরণ প্রতিযোগিতায় শ্রীমান প্রফুল্ল ঘোষ একবার চারিটী শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ও বহু সংখ্যক পদক প্রাপ্ত হন।

এবারকার গঙ্গায় সন্তরণ প্রতিযোগিতা দর্শন করিবার জন্য গঙ্গার দুইধারে ঘাটে-ঘাটে বহু লোক-সমাবেশ হইয়াছিল। তীরে স্থানাভাব বশতঃ অনেকে নৌকা করিয়া সন্তরণকারীদের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছিল; লোকের উত্তেজনা উৎসাহের সীমা ছিল না। শেষ বরাবর নৌকার ভিড়ে গঙ্গা ছাইয়া যাওয়ায় সন্তরণকারীদের বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছিল। সুখের বিষয় এত গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা এবং লোক ও নৌকার সমাবেশ সত্ত্বেও কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই। প্রত্যেক সন্তরণকারীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রক্ষক ছিল; তা ছাড়া আশে পাশে দর্শকদের নৌকা ত ছিলই।

শ্রীমান প্রফুল্ল ঘোষ ২ ঘণ্টা ২০ মিনিটে আহিরীটোলার ঘাটে আসিয়া পৌছেন।

প্রথম পুরস্কার ছাড়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কারও সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের দুইজন সদস্যই পাইয়াছেন। অর্থাৎ

শ্রীমান প্রফুল্ল ঘোষ (সেণ্ট্রাল সুইমিং) ১ম পুরস্কার ২ঘ ২০মিঃ
" পি, এম, পাল (সেণ্ট্রাল সুইমিং) ২য় " ২ ঘ ২৩ মিঃ
" আর, এ, রক্ষিত (সেণ্ট্রাল সুইমিঃ) ৩য় " ২ ঘ ২৩½মিঃ

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

আর চতুর্থ পুরস্কার শ্রীমান আর, বি, সাধু খাঁ—(সরস্বতী ইনষ্টিটিউট)—২ ঘণ্টা ২৫ মিনিট

ও পঞ্চম পুরস্কার শ্রীমান এইচ চ্যাটার্জ্জি—২ ঘণ্টা ২৬ মিনিট

শোক-সংবাদ

পরলোকগত সুকুমার রায় চৌধুরী

সুকুমার রায় চৌধুরী আর ইহজগতে নাই; কাল কালা-জ্বরে দুই বৎসর ভুগিয়া তিনি অকালে ৩৫ বৎসর বয়সে অনন্তধামে প্রস্থান করিয়াছেন। সুকুমার বাবু লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হাফটোন ব্লক প্রস্তুতকারক খ্যাতনামা সাহিত্যিক উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (ইউ, রায়)' মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিশেষ সম্মানের সহিত বি-এস্-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি হাফটোন সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য য়ুরোপে গমন করেন এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া পিতার পর-লোক গমনের পর তিনিই তাঁহাদের কার্য্যালয়ের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেন। সুকুমারবাবু 'সন্দেশ' নামক শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন; শিশু-সাহিত্য রচনায় তাঁহার অসামান্য দক্ষতা ছিল; গল্প, কবিতা, ছড়া প্রভৃতি তিনি এমন সুন্দর লিখিতেন যে, শিশুরা কেন, বয়োজ্যেষ্ঠেরাও সেগুলি পাঠ করিয়া অতুল আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করিতেন। এমন বন্ধু-বৎসল, উদার-হৃদয়, সদানন্দ যুবক বন্ধুকে অকালে হারাইয়া আমরা বড়ই শোকার্ত্ত হইয়াছি; সুকুমার বাবু যে এমন করিয়া অসময়ে চলিয়া যাইবেন, এ কথা আমরা কখনও ভাবিতে পারি নাই। ভগবান তাঁহার শোক-সন্তপ্ত আত্মীয়-বন্ধুগণের হৃদয়ে শান্তিধারা বর্ষণ করুন।

সুকুমার রায় চৌধুরী

খবরাখবর

অতি সুসংবাদ! আমাদের শ্রীমান শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবার 'জগত্তারিণী' স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার পূজনীয়া মাতৃদেবীর স্মৃতি-রক্ষাকল্পে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মারফৎ, বাঙ্গালা দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণকে প্রতি বৎসর ক্রমান্বয়ে একটী স্বর্ণপদক দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিগত বৎসর দেশপূজ্য রবীন্দ্রনাথ এই পদক লাভ করিয়াছিলেন; এবার শ্রীমান শরৎচন্দ্র এই স্বর্ণপদক পাইলেন। সর্ব্বাংশে উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করায় স্বর্ণপদকেরই সম্মান বৃদ্ধি হইল।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, বঙ্গের উজ্জ্বলরত্ন মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সুদীর্ঘকাল বিচারাসন অলঙ্কৃত করিয়া এক্ষণে অবসর গ্রহণ করিলেন। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিবেন, কি জীবনের অবশিষ্টকাল কাশীধামে কি প্রয়াগে কাটাইবেন, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। আমরা কিন্তু তাঁহাকে দেশেই দেখিতে চাই।

এবার পূজার দীর্ঘ অবকাশে কোন্ বাঙ্গালী মহারথী কোথায় গমন করিবেন, তাহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই; তবে যাঁহারা 'হোমে' যাইবেন তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন। এবার বিভিন্ন রেল কোম্পানী পূজা উপলক্ষে রেলের ভাড়া কমাইয়া দিয়া অনেকের দেশ-ভ্রমণের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এ সুবিধা কিন্তু প্রথম, দ্বিতীয় ও মধ্য শ্রেণীর যাত্রীরাই উপভোগ করিবেন; ১১১ নম্বরের যাত্রীদের অদৃষ্টে সেই পূর্ব্ব হারই বজায় রহিল।

১৮১৮ অব্দের ৩নং রেগুলেশন আবার মাথা নাড়া দিয়াছেন। সেই স্বদেশী ও বোমার আমলে একবার তাঁহার দর্শনলাভ ঘটিয়াছিল; আবার এই 'স্বরাজি' আমলে পুনরায় সেই ঘুণেধরা, মরচেপড়া রেগুলেশন অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেদিন শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ এক ডজন যুবককে অন্তরীণে আবদ্ধ করা হইয়াছে। বাজারে গুজব যে, এবার আর খেপ লা জাল নহে, একেবারে বেড়া জাল ফেলা হইয়াছে; অনেক রুই কাতলা পর্য্যন্তও না কি এই জালে আটক পড়িবেন। আহা, পূজার কয়টা দিন সবুর করিয়া জাল ফেলিলে ভাল হইত না?

সাঁখারীটোলার পোষ্ট-মাষ্টারের হত্যা অপরাধে বরেন্দ্রনাথ ঘোষ নামক একটি নবীন যুবক অভিযুক্ত হইয়াছিল এবং হাইকোর্টের সেসনস্ জজের বিচারে তাহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইয়াছিল। জুরীদিগকে নাকি আসামী পক্ষের কথা ভাল করিয়া বুঝান হয় নাই, এই অজুহাতে আসামীপক্ষের বারিষ্টারগণ হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চে আবেদন করেন। অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় চারিজন বিচারপতি সহ এই আবেদনের বিচার করেন। তাঁহারা একবাক্যে বলিয়াছেন যে, জুরীদিগকে সেসনস্ জজ মহাশয় সমস্ত কথাই যথা-আইন বুঝাইয়া দিয়াছিলেন; সুতরাং আবেদন নামঞ্জুর হইল। বরেন্দ্রনাথকে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিতে হইবে। তবে যদি বঙ্গের গবর্ণর বাহাদুর দয়া প্রদর্শন করিয়া যুবকের প্রাণদণ্ড রহিত পূর্ব্বক অপর কোন দণ্ড বিধান করেন, সে পৃথক কথা।

এই হত্যাকাণ্ড উপলক্ষে আরও অনেক কুকীর্ত্তির কথা প্রকাশিত হইয়াছে; অনেকগুলি যুবক ডাকাতি ও নরহত্যা অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে। ইহারা না কি দল বাঁধিয়া দেশোদ্ধারকল্পে অগ্রসর হইয়াছিল এবং তাহারই জন্য নানা স্থানে ডাকাতি করিয়াছিল। আলিপুরে এই দলের বিচার চলিতেছে। একজন যুবক আসামী সরকারপক্ষের সাক্ষী হইয়াছে; সরকার তাহার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করায় সে দলের সমস্ত কীর্ত্তিকাহিনী আদালতে প্রকাশ করিতেছে। মামলা এখনও শেষ হয় নাই।

ব্যবস্থাপক-সভাসমূহের তিন বৎসরের অভিনয় শেষ হইয়া গিয়াছে; 'আগামী নবেম্বর মাসে আবার নূতন করিয়া সদস্য বাছাই হইবে, নূতন করিয়া মন্ত্রী মনোনীত হইবে। চারিদিকে সোরগোল পড়িয়াছে; অন্য প্রদেশের কথা বলিতেছি না, বাঙ্গলা দেশে শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছে, ভোট-ভিক্ষার ধুম পড়িয়া গিয়াছে; কলিকাতার পাড়ায়

পাড়ায়, মফঃস্বলের গ্রামে গ্রামে নির্ব্বাচনপ্রার্থীর দল কোথাও বা স্বয়ং কোথাও বা প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া ভোট ভিক্ষা করিতেছেন, নিজের নিজের কৃতিত্বের সার্টিফিকেট দাখিল করিতেছেন; এবং সভ্যপদ পাইলে কি কি অমূল্য রত্ন দান করিবেন, তাহার সুদীর্ঘ ফর্দ্দও দাখিল করিতেছেন। এবারকার পূজার বাজার এই সভ্যপদপ্রার্থীরাই গরম রাখিবেন দেখিতেছি ! — ——

এই সদস্য-নির্ব্বাচনক্ষেত্রে এবার আর এক দল অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিন বৎসর পূর্ব্বে যখন প্রথম নির্ব্বাচন হয়, তখন কংগ্রেসের বিধান অনুসারে কংগ্রেসী দল নির্ব্বাচন-ক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; সুতরাং দেশে-নেতৃদল ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন নাই। এবার কিছু দিন হইতে এই নির্ব্বাচন-ক্ষেত্রে প্রবেশের কথা লইয়া কংগ্রেসে খুব আন্দোলন আলোচনা চলিয়াছিল। প্রথমে স্থির হইল যে, কংগ্রেসওয়ালারা কেহ নির্ব্বাচন প্রার্থী হইতে পারিবেন না। এ ব্যবস্থা একদলের মনের মত না হওয়ায় তাঁহারা নূতন করিয়া একদল গঠন করিয়া তাহার নাম দিলেন, স্বরাজদল; অর্থাৎ কংগ্রেসের মধ্যে একটা দলাদলি সুরু হইল। বেগতিক দেখিয়া এই সেদিন দিল্লীতে এক বিশেষ কন্‌গ্রেসের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে একটা রফা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে; স্থির হইয়াছে যে, কন্‌গ্রেসদলের যাঁহারা ব্যবস্থাপক সভায় যাইতে চান, তাঁহারা যাইতে পারেন; তাহাতে কন্‌গ্রেস আপত্তি করিবেন না; তবে কন্‌গ্রেসের নাম লইয়া কেহ প্রবেশার্থী হইতে পারিবেন না; খাঁটী কন্‌গ্রেসী দল নির্ব্বাচন-প্রার্থী হইবেন না; এবং যাঁহারা হইবেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে কোন বাধা-বিপত্তি ঘটাইবেন না। এই বিধানের বলে এবার স্বরাজদল বাঙ্গালা দেশের ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ-প্রার্থী হইয়াছেন। পূর্ব্ববারে এ দল দূরে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিয়াছিলেন, এবার তাঁহারা সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং এবারকার ভোট-যুদ্ধ দর্শনীয় ব্যাপার হইবে। পূজাটা কাটিবে ভাল !

———

কয়েকজন জ্যোতির্ব্বিদ্ না কি গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, আগামী ২২শে আশ্বিন মহালয়ার দিন বাঙ্গলা দেশে একটা খণ্ড-প্রলয় হইবে। চারিদিকে যে প্রকার প্রলয়ের ধুম পড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালা দেশ যে অক্ষত শরীরে, বহাল তবিয়তে পূজার আমোদ ও ভোটের লড়াই দেখিবেন, তাহা মনে হয় না। তবে 'ভারতবর্ষে'র পাঠক পাঠিকাদিগের কার্ত্তিকের 'ভারতবর্ষ' প্রাপ্তির বিঘ্ন ঘটিবে না, কারণ আমরা মহালয়ার পূর্ব্বেই, ১৫ আশ্বিনেই কাগজ বাহির করিলাম।

———

সাহিত্য সংবাদ

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর, ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া প্রমুখ ১৬ জন সাহিত্যিক লিখিত অপূর্ব্ব উপন্যাস "ভাগের পূজা" প্রকাশিত হইল, মূল্য ২৲ টাকা।

৺দামোদর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত—"শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার" বিরাট সংস্করণ বহুকালের পর পুনরায় মুদ্রিত হইয়াছে, মূল্য ২১৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় প্রণীত নূতন নাটক "মালবের রাণী" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১॥০ টাকা।

শ্রীযুক্ত মুণীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত—"স্মৃতি পূজা" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ১৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "শিথিল কবরী" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ১৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থের—"ব্যথার সুখ" প্রকাশিত হইল মূল্য ১॥• টাকা।

শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল দাস গুপ্ত প্রণীত—"চোখের নেশা" প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ২৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত—"বিধির খেলা" প্রকাশিত হইল মূল্য ১।• টাকা।

শ্রীযুক্ত গদাধর সিংহ রায় এম-এ বি-এল প্রণীত—"টাকার নেশা" প্রকাশিত হইল, মূল্য ১।• টাকা।

সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র, সুচিকিৎসক শ্রীমান্ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় এম-বি প্রণীত 'কলেরা চিকিৎসা' চিত্র-শোভিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১৲।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বসু প্রণীত গল্প-পুস্তক 'মায়াপুরী' ত্রিবর্ণ-প্রচ্ছদ-পটে শোভিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১॥০ টাকা।

Publisher—**Sudhanshusekhar Chatterjea,**
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—**Narendranath Kunar,**
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street. CALCUTTA.

সুজাতা ও বুদ্ধ

শিল্পী—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত]

[Bharatvarsha Halftone & Ptg. Works

অগ্রহায়ণ, ১৩৩০

প্রথম খণ্ড | একাদশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

প্রণবাদির অধিকারী

সত্যভূষণ শ্রীধরণীধর শর্ম্মা

প্রণবাদিতে অধিকার সম্বন্ধে সংশয় বশতঃ জ্ঞানানুষ্ঠান পূর্ব্বক অনির্ব্বচনীয় জগদীশ্বরের শাস্ত্রসিদ্ধ উপাসনায় অনেক হিন্দু বিমুখ ; এবং এই উপাসনা গ্রহণেচ্ছু অনেক হিন্দু সন্তান পৈতৃক ধর্ম্মে উপযুক্ত উপদেষ্টার অভাবে ধর্ম্মান্তরে প্রবেশ করিতেছেন ; অথবা আন্তরিক ধর্ম্মশূন্য হইয়া কালাতিপাত করিতেছেন। স্ববৃত্তিসহ পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ স্ত্রী-শূদ্রকে, উক্ত উপাসনার প্রশস্ত অবলম্বন যে প্রণবাদি, তাহাতে অনধিকারী বোধে, তাহাদিগকে এ বিষয়ে উপদেশ দানে বিরত ; এবং অন্যে উপদেশ দিলে সেই উপদেষ্টাকে গর্হন করিতেছেন। অতএব এ বিষয়ে শাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রায় নিরূপণার্থ বর্ত্তমান প্রবন্ধ রচিত। ইহাতে ভ্রম প্রমাদ লক্ষিত হইলে, অনুকম্পাপরবশ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ লেখককে শাসন করিবেন। পক্ষান্তরে, প্রদর্শিত সিদ্ধান্ত যদি কাহারও সম্মতি-ভাজন হয়, তবে তিনি লোক-হিতার্থ নিজ সম্মতি প্রকাশ করুন, ইহাই বিনীত প্রার্থনা। লেখকের শাস্ত্রাভ্যাস নিজ পরিত্রাণের জন্য,—পাণ্ডিত্যের জন্য নহে।

প্রণবাদিতে সকলেরই অধিকার

(অনুকূল পক্ষ)

স্ববৃত্তিস্থ পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ যাঁহারা হিন্দু সমাজের প্রেরক, এবং বিষয়ী ব্রাহ্মণ ও সাধারণ হিন্দুগণ যাঁহারা প্রেরিত, তাঁহারা অনেকেই বলেন যে, প্রণব গায়ত্রী উচ্চারণে ও হোমকার্য্যে স্ত্রী-শূদ্রের অনধিকার। ওঁকার যে প্রণব, তাহার উচ্চারণে অনধিকারীর ইহকালে ও পরকালে

সর্ব্ব প্রকার অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী। অনধিকারীকে প্রণবদাতা ব্রাহ্মণেরও অধোগতি সুনিশ্চিত। শাস্ত্রীয় বিচারের পূর্ব্বে এ বিষয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বহুকালব্যাপী ব্যবহার আলোচনায় বিষয়টী সুবোধ্য হইবার সম্ভাবনা। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে আলবেরুণী নামে একজন মুসলমান পণ্ডিত গজনবী সুলতান মামুদ কর্ত্তৃক পঞ্জাব অঞ্চলে প্রেরিত হন। তিনি তাৎকালিক বহু পণ্ডিত ব্রাহ্মণের নিকট বহু সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত-সার একখানি আরবীয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থে রক্ষিত। তৎপ্রণীত সেই গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছে। তাহাতে তাঁহার প্রণব প্রাপ্তির বিশিষ্ট প্রমাণ (১) আছে। পরে বাদশাহ ঔরংজীবের ভ্রাতা দারা সুকো বহু উপনিষৎ পারস্য ভাষায় অনুবাদ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আঁকেতি দুপে-রোঁ নামক ফরাসী পণ্ডিত কৃত সেই অনুবাদের ফরাসী অনুবাদ হইতেই পাশ্চত্য দেশে উপনিষৎ প্রচারের সূত্রপাত। ঐ শতাব্দীর শেষ ভাগে কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্টের সুপ্রসিদ্ধ বিচারক সর উইলিয়ম জোন্স স্ববৃত্তিসহ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকটেই সপ্রণব গায়ত্রী প্রাপ্ত হইয়া, তাহার যথাযথ ভাব রক্ষা পূর্ব্বক সুন্দর ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রায় সমকালেই শ্রীরামপুরের খৃষ্টীয় প্রচারক ওয়ার্ড-ও ঐরূপ সপ্রণব গায়ত্রী প্রাপ্ত হন। এখন সর্ব্বত্রই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সানুবাদ সপ্রণব সব্যাহৃতি গায়ত্রী প্রচারিত হইয়া অল্পমূল্যে জাতি-লিঙ্গ-সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সকলেরই প্রাপ্তব্য। সম্প্রতি বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নিঃসঙ্কোচে অধ্যাপক টিবো সাহেবের নিকট বেদ শাস্ত্রে পরীক্ষা দিয়া উপাধি লাভ করিয়াছেন। কায়স্থ কুলোদ্ভব পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় কাশীস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী হইতে বেদান্তরত্ন উপাধি পাইয়াছেন। তথা বারুজীবী-বংশাবতংস শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার রায় বাহাদুর মহাশয় বেদান্তবাচস্পতি উপাধি বিভূষিত। পূজনীয়া শ্রীমতী বাসন্তী দেবী বঙ্গদেশে উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা বেদান্ততীর্থ। বেদান্ত সাক্ষাৎ বেদ ও সপ্রণব, ইহা সকলেরই বিদিত। অন্য দিকে দেখা যায় যে, সর্ব্বজনের ব্যবহারযোগ্য ওঁকারযুক্ত নাম স্থান ও ব্যক্তি বিশেষকে প্রদত্ত। কাশীধামের একটী মহল্লা ওঁকারেশ্বর নামে বিখ্যাত। ধর্ম্মবর্ণলিঙ্গ নির্ব্বিশেষে মনুষ্য মাত্রেই নির্ব্বিবাদে এই নাম উচ্চারণ করিতেছেন। নর্ম্মদার সন্নিকটস্থ ওঁকারেশ্বর নামক তীর্থস্থান সর্ব্বজনবিদিত। এদিকে কলিকাতায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে শুর ওঁকারমল জেটিয়ার নাম সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহার নাম হইতে রামকৃষ্ণপুরে একটী রাস্তার নাম হইয়াছে ওঁকারমল জেটিয়া লেন। তদ্ব্যতীত আরও অনেক ব্যক্তির নাম আছে ওঁকারমল। যুগধর্ম্ম ও দেশাচার অনুসারে বর্ত্তমান ব্যবহার যেরূপ, তাহাতে এ বিষয়ে অধিকতর অনুসন্ধান প্রয়োজনীয় কি না সন্দেহের বিষয়। এজন্য প্রত্যক্ষতঃ বা সংসর্গ দোষে যদি কোনই আপত্তি নাই, এই সিদ্ধান্ত শিরোধার্য্য করিতে হয়, তাহা হইলে পতিতের মধ্যে আর ইতর-বিশেষ কি? অধিকন্তু সমগ্র বৌদ্ধ জগতে প্রণব সাধারণ্যে প্রচারিত। ব্রাহ্মসমাজের প্রণবই একমাত্র মন্ত্র। ইহুদিদিগের মধ্যে প্রণব অপ্রচলিত নহে। হিব্রু বাইবেলের গ্রীক অনুবাদে "ওন" পরমেশ্বরের নাম বলিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রণব অপ্রকাশিত রাখা এখন ইচ্ছা করিলেও অসম্ভব। এ সম্বন্ধে প্রাচীন ব্যবহার কিরূপ ছিল? স্ত্রী, শূদ্র, দ্বিজবন্ধু অর্থাৎ পতিত ব্রাহ্মণদিগের হিতার্থ পুরাণ রচনা। সূতবংশীয় লোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবা পুরাণবক্তা। পুরাণের বহু স্থানে প্রণব প্রাপ্তব্য। সূত অবশ্যই প্রণব উচ্চারণ করিতেন। সঞ্জয় ও দ্বিজেতর সঞ্জয় ব্যাসের প্রসাদে দূর শ্রুতিলাভ করিয়া সপ্রণব ভগবদ্‌গীতা ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইয়াছিলেন। ইহা মহাভারতে বর্ণিত। পাতঞ্জল যোগসূত্রস্মৃতি। ইহাতে স্ত্রী-শূদ্র সকলেরই অধিকার। যোগসূত্রে সাংখ্য মতে স্বীকৃত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অতিরিক্ত একটী তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। সেই ষড়্‌বিংশ তত্ত্ব ঈশ্বর। তাঁহাতে প্রণিধান নামক ভক্তি বিশেষ দ্বারা শীঘ্র সমাধিলাভ হয়, তাঁহার বাচক বা নাম প্রণব। অর্থচিন্তা পূর্ব্বক প্রণব জপের দ্বারা সত্বর সমাধিলাভ হয়। (যোগসূত্র; ১।২৩—২৯। ঈশ্বর প্রণিধানৎবা ইত্যাদি) এ মতে স্পষ্ট প্রাপ্তব্য যে, যোগের অধিকারী বলিয়া সকলেই প্রণবের অধিকারী। এখানে গীতা ও পাতঞ্জল স্মৃতি এক বাক্য। এ বিষয়ে মনুস্মৃতি অবশ্য আলোচ্য।

(১) The Hindus begin their books with Om; the word of creation Alberuni's India. vol. I pp 771-73.

কেন না—

"যৎকিঞ্চিন মনুরবদৎতদেব ভেষজং।" (২) ইতি ছান্দোগ্য উপনিষৎ। "মন্বার্থা বিপরীতা যা সা স্মৃতি ন প্রকাশ্যতে"। ইতি বৃহস্পতিঃ।

প্রণব ও গায়ত্রী সম্বন্ধে ভগবান মনুর উপদেশ তাঁহার নামে প্রসিদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রের ২য় অধ্যায়ের ৭৪তম শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী ১০ শ্লোকে অভিব্যক্ত। শ্লোক দশকের প্রথম শ্লোকে বিধি দিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ অধ্যয়নের আরম্ভে ও শেষে প্রণব উচ্চারণ করিবেন। করণে সুফল, অকরণে প্রত্যবায়।

৭৪তম শ্লোকে কুশ হস্তে তিনবার প্রাণায়াম করিয়া ওঁকার উচ্চারণ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিবার বিধি। ৭৬তম শ্লোকে প্রাপ্তব্য যে, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক তিন বেদ হইতে অকার, উকার মকার এই তিন স্বর উদ্ধারে ওঁকার। ভূ, ভুবঃ, স্বঃ এই তিন ব্যাহৃতিও সেই রূপে উদ্ধৃত। ৭৭তম শ্লোকে কথিত যে, সাবিত্রার তিন পাদ এইরূপে তিন বেদ হইতে সংগৃহীত। এইহেতু সন্ধ্যাকালে প্রণব-ব্যাহৃতি-যুক্ত সাবিত্রী জপে বেদবিৎ ব্রাহ্মণ ত্রিবেদ অধ্যয়নের পুণ্য লাভ করেন। ইহা ৭৮তম শ্লোকে কথিত। ৭৯তম শ্লোকে উক্ত মন্ত্র জপের অন্য ফলের উল্লেখ আছে যে, গ্রামের বাহিরে, নদীতীরে বা অরণ্যে সহস্রবার জপে ত্রৈবর্ণিক মহাপাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন, যেমন সর্প পুরাতন চর্ম্ম হইতে মুক্ত হয়। স্ব স্ব ক্রিয়া কালে ত্রৈবার্ণিকের পক্ষে উক্ত মন্ত্র ত্যাগ নিন্দার হেতু। ৮০তম শ্লোকে ইহা ব্যক্ত হইয়াছে। এই কয়েকটী শ্লোকের প্রধান প্রয়োগ-ক্ষেত্র ত্রৈবার্ণিক মনুষ্য। প্রণব আদ্যন্ত উচ্চারণে বেদাধ্যায়ন সম্পূর্ণ ফলপ্রদ হয়। সন্ধ্যায় জপ কারণে সপ্রণব সব্যাহৃতি সাবিত্রীই বেদবিদের পক্ষে সাঙ্গ বেদাধ্যায়নের পুণ্য প্রদায়িনী। বিশেষ স্থানে কালে সংখ্যায় জপ করিলে মহাপাপ বিনাশিনী, স্ব স্ব ক্রিয়ার অনুষঙ্গে ব্যবহারে সাধু সমাজে নিন্দা নিবারণী। ইহার অতিরিক্ত ফলান্তরের উল্লেখ নাই। আর এই সকল ফলই ত্রৈবর্ণিকে আবদ্ধ। এ পর্য্যন্ত পরব্রহ্ম প্রাপ্তিরূপ মোক্ষের প্রসঙ্গশূন্য। পরবর্ত্তী দুই শ্লোকের বিষয় ভিন্ন। ঐহিক ফলের সম্পর্ক-শূন্য—এইটী বুঝাইবার জন্যই সপ্রণব সব্যাহৃতি সাবিত্রীর পুনরাবৃত্তি। নতুবা ৮১তম শ্লোক আনর্থব্যাদি দোষ স্পর্শ হইত। বিষয়ান্তর সূচনার জন্যই ঐ শ্লোক নির্দ্দোষ। বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়াই এই শ্লোকটী নিম্নে উদ্ধৃত যথা—

"ওঁকার পূর্ব্বিকা স্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়ো ব্যয়াঃ।
ত্রিপাদাচৈব গায়ত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখং।" ৮১। (৩)

এখানে "ব্রহ্মণো মুখং" এই দুইটী শব্দের অর্থ সম্বন্ধে টীকাকারগণ বিকল্প কল্পনা করিয়াছেন। 'ব্রহ্ম' শব্দে 'বেদ' ও 'পরব্রহ্ম' দুই বুঝাইতে পারে। শব্দ ব্রহ্ম বেদের এক প্রসিদ্ধ নাম। মুখ শব্দে আরম্ভ ও দ্বার বা উপায়। এইরূপ অর্থভেদজনিত বিকল্প। এখানে মেধাতিথি বলিতেছেন—

"এষ সাবিত্রী ব্রহ্মণো মুখং।
আদ্যত্বাৎ মুখ ব্যপদেশঃ।

অতশ্চারম্ভঃ। অধ্যায়মে তৎ ইতি অষ্টৈব অর্থবাদঃ। অথবা মুখং দ্বারং উপায়ো ব্রহ্ম প্রাপ্তিরনেন ভবতি তদেবাহ। কুল্লূক ভট্টেরও এই মত। যথা "সাবিত্রী ব্রহ্মণো বেদস্য মুখং আদ্যং তৎ পূর্ব্বক বেদাধ্যায়ন আরম্ভাৎ। অথবা ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ প্রাপ্তেদ্বারং। এতদধ্যায়ন জপাদিনা নিষ্পাপস্য ব্রহ্ম জ্ঞান প্রকর্ষেণ মোক্ষবাপ্তেঃ।

এই সাবিত্রী ব্রহ্মের মুখ আদ্যত্বহেতু মুখ এই উক্তি। তাহা হইতে এই অধ্যায় আরম্ভ এজন্য ইহা এই সাবিত্রীর অর্থবাদ অর্থাৎ প্রশংসাবাক্য। অথবা মুখ অর্থে দ্বার বা উপায়। ইহার দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়, এই কথা বলিয়াছেন।

সাবিত্রী ব্রহ্মের অর্থাৎ বেদের মুখ অর্থাৎ আদ্য। যে হেতু সাবিত্রী পূর্ব্বক বেদাধ্যায়নের আরম্ভ। অর্থাৎ ব্রহ্মের অর্থাৎ পরব্রহ্মের প্রাপ্তির দ্বার। যেহেতু ইহার অধ্যয়ন ও জপাদির দ্বারা নিষ্পাপ ব্যক্তির ব্রহ্ম জ্ঞানের প্রকর্ষতাবশতঃ মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। অন্যান্য টীকাকারদিগের মধ্যে সর্ব্বজ্ঞ নারায়ণ বিকল্পিত অর্থের প্রথমটী মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন। যথা—"ব্রহ্মণো বেদস্য মুখং তত্তস্মাদারভ্য এতৎ এব জপ কার্য্য।" অপরেরা দুই অর্থই পর্য্যায়ভেদে বিকল্পিত ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। যথা,

(২) মনু যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ঔষধ স্বরূপ। মনুর অর্থের বিপরীত যে স্মৃতি, তাহা প্রশংসার যোগ্য নহে।

(৩) ওঁকার ও অব্যয় ফলের হেতু যে তিনটী মহা ব্যাহৃতি, তদ্‌যুক্ত ত্রিপাদা গায়ত্রী ব্রহ্মের মুখ বলিয়া বিশেষরূপে জানিতে হইবে।

"ব্রহ্মণঃ পরব্রহ্মণঃ মুখং প্রাপ্ত্যুপায়ং
বেদস্য প্রধানভূতং বা।—ইতি রাঘবানন্দঃ। (৪)
ব্রহ্মণো বেদস্য মুখং শরীরং।
অথবা বেদাধিগমন দ্বারং। (৫) ইতি নন্দনঃ।
ব্রহ্মণঃ বেদস্য মুখং আগুস্ত
তৎপূর্ব্বকং বেদাধ্যয়নং বিজ্ঞেয়ং।
...ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ প্রাপ্তি দ্বারং
এতদধ্যয়ন জপাদিনা। ইতি রামচন্দ্রঃ।

ব্রহ্মের অর্থাৎ বেদের মুখ আগুস্ত ওঁকার জপ ও অধ্যয়ন পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন—ইহা বিশেষ রূপে জ্ঞাতব্য। ব্রহ্মের অর্থাৎ পরমাত্মা প্রাপ্তির উপায় হইতেছে ইহার অধ্যয়ন জপাদি দ্বারা। টীকাকারদিগের মধ্যে মেধাতিথি ও কুল্লূক সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যেও রামচন্দ্রের বিকল্পিত অর্থের শেষ বিকল্প মোক্ষ পক্ষে। প্রচলিত নিয়মানুসারে শেষ বিকল্পই বক্তার নিজের অভিপ্রেত বলিয়া গ্রাহ্য। অধিকন্তু মেধাতিথি প্রথম বিকল্পকে অর্থবাদ অর্থাৎ প্রশংসামাত্র বলিয়াছেন,—ইহা কোন প্রকার বিধি নহে। ফলে দাঁড়াইতেছে এই যে, পরব্রহ্ম প্রাপ্তি বা মোক্ষই এখানে ইহাঁদের মতে বিধেয়। নন্দন বা রাঘবানন্দ কর্ত্তৃক একই অর্থ গৃহীত হইয়াছে। উভয়েরই শেষ বিকল্প মোক্ষসম্পর্করহিত। রাঘবানন্দের প্রথম বিকল্প মোক্ষ বিষয়ক, শেষ বিকল্প বেদ পক্ষে। "বেদান্য প্রধান ভূতং বা"। সমগ্র বেদের অপেক্ষা প্রধান এইরূপ অর্থ করিলে এখানে অর্থবাদ মাত্র দাঁড়ায়। যেহেতু, সমগ্র বেদের অপেক্ষা যে অপর কিছু প্রধান—হইতে পারে, এ কথা কেহই স্বীকার করিবেন না। বেদের অন্য সর্ব্ব অংশ অপেক্ষা, সাঙ্গ সাবিত্রীকে বেদাংশ রূপে গণ্য করিয়া তাঁহার প্রাধান্য এখানে কথিত। এই ভাবে অর্থ করিলেও তাহা নির্দ্দোষ উক্তি হয় না। পূর্ব্ববর্ত্তী ৭৬তম ও তাহার পরের দুই শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, প্রণব ব্যাহৃতি-ত্রয়, তথা ত্রিপাদ গায়ত্রী এই তিন তিন বেদ হইতে সংগৃহীত। ইহাদের সম্মিলনে উদ্ভূত যে সপ্রণব, সব্যাহৃতি সাবিত্রী, তাহা কোন বৈদিক মন্ত্রবিশেষ নহে যে, এক জাতীয় বলিয়া অপর সকল বেদ মন্ত্রের তুলনায় ইহার প্রাধান্য হইবে। সাঙ্গ সাবিত্রী দুই সন্ধ্যা জপ করিলে বেদজ্ঞ বিপ্র সমগ্র বেদাধ্যয়নের পুণ্য লাভ করেন। এ জন্যই ইহাদের প্রাধান্য—এরূপ অর্থও নির্দ্দোষ নহে। বেদজ্ঞানের অভাবে বর্ণিত পুণ্য লাভ পক্ষে সাঙ্গ সাবিত্রী জপ নিষ্ফল। বেদজ্ঞত্বকে আশ্রয় করিয়াই কথিত ফলদাত্রী,—এ দৃষ্টিতেও পূর্ব্বোক্ত প্রাধান্য রক্ষা হয় না।

বেদপক্ষীয় যে বিকল্পিত অর্থ—তৎসম্বন্ধে আরও একটী দ্রষ্টব্য আছে। সপ্রণব সব্যাহৃতি বেদ পাঠের আরম্ভে জপ্তব্য বা পঠিতব্য,—এইটি ধরিয়া লইয়া উক্ত বিকল্পিত অর্থ গৃহীত হইয়াছে। এইরূপ ধারণার সহিত পূর্ব্বো-ল্লিখিত ৭৪তম শ্লোকের এক-বাক্যত্ব রক্ষার উপায় জিজ্ঞাসিত হইলে, তাহার সদুত্তর অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয়। ৭৪তম শ্লোকটী এই, যথা—

ব্রাহ্মণঃ প্রণবং কুর্য্যাৎ আগুবন্তে চ সর্ব্বদা।
স্রবত্যনোঙ্কৃতং পূর্ব্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্য্যতি॥ (৬)

এখানে প্রণবেরই উল্লেখ রহিয়াছে; ব্যাহৃতি ও সাবিত্রীর উল্লেখ নাই। পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষার্থ প্রথম বিকল্প মেধাতিথির টীকানুসারে অর্থবাদ অর্থাৎ প্রশংসার জন্য অত্যুক্তি মাত্র এবং শেষ বিকল্পটি যথার্থবাদ বা প্রকৃতবাদ—এই সিদ্ধান্তই সমীচীন। অধিকন্তু, এখানে ইহাও বিচার্য্য যে, এ শ্লোকের কোন্ অর্থটী পরবর্ত্তী শ্লোকের সহিত সঙ্গত হয়। পরবর্ত্তী শ্লোকটী এই। যথা,—

সোহধীতে হৈন্যহন্যেতাং ত্রিনিবর্ষ্যাতেন্দ্রিতঃ।
সব্রহ্ম পরমভ্যেতি বায়ুভূতো স মূর্ত্তি মনো॥ (৭)

এ শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, নিরালস্যে সপ্রণব সব্যাহৃতি সাবিত্রী তিন বৎসর অর্থ চিন্তা পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিলে পরব্রহ্ম প্রাপ্তি বা মুক্তিলাভ হয়। মুক্তি ব্রহ্মজ্ঞানে এ সিদ্ধান্ত সর্ববাদিসম্মত। মেধাতিথি এই শ্লোকের

(৪) ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদের মুখ। তাহা হইতে বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করিয়া এই তিনটীর জপ কর্ত্তব্য। ব্রহ্মের অর্থাৎ পরব্রহ্মের মুখ অর্থাৎ প্রাপ্তির উপায়। অথবা বেদের প্রধানভূত।

(৫) ব্রহ্মের অর্থাৎ বেদের শরীর অথবা বেদার্থ জ্ঞানের দ্বার।

(৬) ব্রহ্মণ সর্ব্বদা বেদাধ্যয়নের অন্ত্যান্তে প্রণতা সংযুক্ত করিবে পূর্ব্বে সপ্রণব হইলে অর্থ ক্ষরিয়া পড়ে, শেষ সপ্রণব হইলে হৃ শীর্ণ হয়।

(৭) যিনি প্রতিদিন নিরালস্যে তিনবৎসর ইহাকে অধ্যয়ন করেন তিনি বায়ু অর্থাৎ বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্রগামী ও মূর্ত্তিমান আকাশ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী হইয়া পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন।

টীকায় বলিতেছেন, "মোক্ষার্থিণোঽয়ং বিধিঃ" অর্থাৎ মোক্ষার্থীর প্রতি ইহাই শাস্ত্রীয় আজ্ঞা। মোক্ষাধিকার বর্ণাশ্রমে আবদ্ধ নহে। এ সিদ্ধান্তও সর্ব্ববাদিসম্মত। প্রমাণ বেদান্ত-সূত্রে প্রাপ্তব্য। এই তিনটী সূত্র সেই প্রমাণ। অন্তরাচাপিতু তদ্দৃষ্টেঃ। ৩য় অঃ ৪র্থ পাতা ৩৬ সূত্র। বর্ণাশ্রম বিহিত ক্রিয়া বিনাও ব্রহ্মজ্ঞান দেখা যায়। অপিচ স্মর্য্যতে ঐ ঐ ৩৭ সূ। স্মৃতিতেও এইরূপ কথিত আছে। "বিশেষানুগ্রহশ্চ।" ঐ ঐ ৩৮ সূ।

বর্ণাশ্রমবিহিত ক্রিয়াশূন্য মুক্তি সাধকের প্রতি পরমেশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ।

এখানে এইমাত্র বক্তব্য যে, মোক্ষার্থীর প্রতি যে সপ্রণব সব্যাহৃতি গায়ত্রী অধ্যয়নের বিধি, তাহাতে বর্ণাশ্রমের অপেক্ষা নাই। কেন না, মোক্ষার্থীর পক্ষে এই অধ্যয়ন অবশ্য কর্ত্তব্য। যেথানে অধিকার নাই, সেথানে কর্ত্তব্য অসম্ভব। অতএব মনুক্ত বিধানে প্রচলিত ব্যবহার নির্দ্দোষ। মোক্ষ সাধক মাত্রেরই প্রণব ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী সম্বন্ধে অধিকার শাস্ত্রসঙ্গত।

প্রনব বিষয়ক যে শ্রুতি ভগবান মনু স্মরণ করিয়াছেন, তাহা এই :—

অতহ এনং শৈব্যঃ সত্যকামঃ পপ্রচ্ছ। সয়োঽবৈ ভগবন্ মনুষ্যেষু প্রায়নান্তং ওঁকারং অভিধ্যায়ীত। কতমং বাব স লোকং জয়তীতি ॥ ১ ॥

তস্মৈ সহ উবাচ। এত উদ্ব সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যৎ ওঁকার। তস্মাৎ বিদ্বান এতে নৈব আয়তনেন একতর অন্বেতি ॥ ২ ॥

ইহা প্রশ্নোপনিষদের ৫ম প্রশ্ন ॥ অস্যার্থঃ। পূর্ব্বের চারি প্রশ্নের সমাপ্তির পর শিবি-পুত্র সত্যকাম মহর্ষি পিপ্পলাদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ভগবন, মনুষ্যের মধ্যে যে কেহ আজীবন ওঁকার অধ্যয়ন করে, তাহার দ্বারা সে কোন লোক জয় করে ? ॥ ১ ॥

তাঁহাকে তিনি অর্থাৎ পিপ্পলাদ বলিলেন, "হে সত্যকাম, এই ওঁকার সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম। ইহাকে অবলম্বন করিয়া প্রাপ্তজ্ঞান (সাধক) পূর্ব্বোক্ত ভাবের একতর ভাবে ব্রহ্ম লাভ করেন। এখানে সাধকের মনুষ্যত্ব মাত্র উল্লিখিত,—বর্ণাশ্রমের নাম গন্ধও নাই। যে কোন মনুষ্য ওঁকারের অভিধ্যান অর্থাৎ অর্থ চিন্তা পূর্ব্বক ওঁকারের বাচ্য, অর্থাৎ যাঁহার একটী কল্পিত নাম ওঁকার, তাঁহাতে নিষ্ঠালাভ করিবে, তাহারই ক্রম মুক্তি বা সাক্ষাৎ মুক্তি অবশ্যম্ভাবী, ইহাই শ্রুতির প্রতিজ্ঞা। কঠশ্রুতিও দ্বিতীয় বল্লীতে এখানে এক বাক্যে।

সর্ব্বে বেদাঃ যৎ পদমাম নন্তি তপাংসি সর্ব্বানি চ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি ত ৎে পদং সংগ্রহেন ব্রবীমোম্যেতৎ। এতদেব্ব্য বাক্ষরং ব্রহ্ম এতেদেব্যাক্ষরং পরং ॥ ১৫ ॥ এতদ্দেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্যতৎ ॥ ১৬ ॥

সর্ব্ববেদ যে বস্তুকে প্রতিপন্ন করেন, যাহাকে প্রাপ্তির জন্যই সর্ব্ব তপস্যা, যাঁহাকে পাইতে ইচ্ছুকগণ ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করেন, সেই বস্তু তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি, সে বস্তু ওঁ ॥ ১৫ ॥ এই অক্ষরই অপর অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম, এই অক্ষরই পর অর্থাৎ নিগুণ ব্রহ্ম। এই অক্ষর জানিয়া যিনি যে প্রকার ইচ্ছা করেন, তাঁহার সেই প্রকারে ব্রহ্ম প্রাপ্তি বা ব্রহ্ম বিজ্ঞান হয়। তাৎপর্য্য এই যে, সাধকের ইচ্ছানুসারে সগুণ ব্রহ্ম প্রাপ্তি বা নির্গুণ ব্রহ্ম বিজ্ঞান হয় ॥ ১৬ ॥

এখানে বর্ণাশ্রমের উল্লেখাভাব। শ্রুতুক্ত ব্রহ্মচর্য্য শব্দে যদি কেহ প্রথম আশ্রম গ্রহণ করেন, তিনি শঙ্কর-ভাষ্যে দেখিবেন যে, "ব্রহ্মচর্য্যং গুরু কুল বাস লক্ষণং অন্যদবা।" গুরুকুল বাস ভিন্ন অন্য প্রকার ব্রহ্মচর্য্য আছে, ইহাই আচার্য্যের অভিপ্রায়।

যদি এ তর্ক উঠে যে, পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতি স্মৃতিতে মনুষ্য শব্দে অধিকারী মনুষ্য ও যঃ শব্দে যোধিকারী, এই ভাবে স্পষ্টার্থের সঙ্কোচ হইবে। তাহাতে জিজ্ঞাস্য হয় যে, শ্রুতি বাক্য ভিন্ন অন্য বাক্যে শ্রুতির অর্থ সঙ্কোচের চেষ্টা নির্দ্দোষ কি না ! শ্রুতির সহিত অন্য শাস্ত্রের বিরোধ হইলে "শ্রুতিরেব গরিয়সী,—শ্রুতি-বিরুদ্ধ শাস্ত্রান্তরই পরিত্যাজ্য।

যাঃ বেদবাহ্যা স্মৃতয়ঃ যশ্চে কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ।
সর্ব্বাস্তাঃ নিষ্ফলাঃ প্রেত্যতমো নিষ্ঠাহিতাঃ

অস্যার্থঃ—স্মৃতাঃমনুঃ স তম্

"যে সকল স্মৃতি বেদের বহির্ভূত, যাহা সৎতর্কে অপ্রতিষ্ঠিত, সে সকল স্মৃতি তমোনিষ্ঠ, পরলোকে নিষ্ফল।" অতএব শাস্ত্রান্তর দ্বারা শ্রুতির অর্থ সঙ্কোচ হইতে পারে না। শুদ্ধ নির্গুণ শ্রুতিতে শ্রুত্যন্তর সংগ্রহই ব্যাসাদি আচার্য্যের অনুমোদিত, আলোচ্য শ্রুতি শুদ্ধ নির্গুণ নহে ;

এজন্য শ্রুত্যন্তর সংগ্রহ অবৈধ। অতএব উদ্ধৃত শ্রুতি-বাক্যের স্পষ্টার্থের বৃদ্ধি বা সঙ্কোচের স্থান নাই। (৮) অপিচ, ইহার বিরুদ্ধ শ্রুতিই বা কোথায়? দশমহোপনিষৎ মহাভারত পঞ্চম বেদ, মহাভারত সপ্রণব, তথাপি ভগবান ব্যাসের আজ্ঞা যে,

প্রাবয়েৎ চতুরান বর্ণান কৃত্বা ব্রাহ্মণমগতঃ বেদস্যা ধ্যায়নমিদং তচ্চ কার্য্যং মহৎ স্মৃতং (৯)॥ ইতি

মহাভারত, মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়।

বেদাধ্যয়নের সহিত সাঙ্গ গায়ত্রী যদি ফলের ঐক্য বশতঃ স্ত্রী-শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ বলা হয়, তবে সেই একই কারণে মহাভারতও নিষিদ্ধ। যে পূর্ব্বোদ্ধৃত ব্যাসের মতে মহাভারত শ্রবণও বেদাধ্যয়ন।

পূর্ব্ব প্রদর্শিত আলোচনার ফলে ইহাই শ্রুতি স্মৃতি সম্মত সৎ সিদ্ধান্ত বলিয়া দাঁড়ায় যে, বর্ণাশ্রম-লিঙ্গ-নির্ব্বিশেষে মুমুক্ষু মাত্রেই সপ্রণব সব্যাহৃতি গায়ত্রীর অধিকারী। কিন্তু সম্পূর্ণ শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত আচার এই হিমালয় হইতে আসমুদ্র বিস্তৃত ত্রিকোণ ভূভাগে কুত্রাপি বর্ত্তমানে প্রচলিত কি না? ইহা দুর্নিবাধ্য। বঙ্গভূমিতে বৈদিক আচার ত্যাগ আধুনিক বা বিদেশীয় সংস্পর্শোৎপন্ন নহে। লক্ষ্মণ সেনের ধর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীমৎ হলায়ুধ প্রায় আট শত বৎসর পূর্ব্বে তাৎকালিক আচার ভ্রংশ দেখিয়া তাহার কথঞ্চিৎ প্রতিকারার্থ "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" রচনা করিয়াছিলেন।

রাঢ়ীয় বারেন্দ্রস্তু অধ্যয়ন বিনা কিয়ৎ এক বেদার্থস্য কর্ম্ম মীমাংসা দ্বারেন যজ্ঞ ইতি কর্ত্তব্যতা বিচার ক্রিয়তে। ন চ এতেনাপি মন্ত্রার্থ-জ্ঞানং। মন্ত্রণার্থস্য এব প্রয়োজনং। যতঃ তৎ পরিজ্ঞানং এব শুভ ফলং। তৎ অজ্ঞানে চ দোষঃ। অর্থাৎ রাঢ়ীয় বারেন্দ্রগণ বিনা অধ্যয়ন এক বেদের কিয়দংশের কর্ম্ম মীমাংসা দ্বারই যজ্ঞ—ইত্যাদিরূপ কর্ত্তব্যতা বিচার করেন। কিন্তু ইহাতে মন্ত্রার্থ জ্ঞান হয় না। মন্ত্রার্থেরই প্রয়োজন। যেহেতু সেই জ্ঞানই শুভ ফল। তাহার জ্ঞানাভাবে দোষ।

এক শতাব্দীর পর স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ প্রতিকারের চেষ্টাও করেন নাই। অধিকন্তু কয়জন ব্রাহ্মণই বা স্মার্ত্ত আহ্নিক তত্ত্বানুসারেই চলিতেছেন?

বঙ্গভূমিতে বৈদিক আচারের অপ্রচার প্রত্যক্ষ। পিতৃগৃহে বা কালীঘাটে অনুষ্ঠিত উপনয়ন অবৈদিক। শেষোক্ত প্রথা সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয় কি না—স্ববৃত্তিস্থ পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণের বিবেচ্য। বস্তুতঃ বঙ্গদেশের আচার ও উপাসনা প্রণালী তান্ত্রিক। শ্রীমৎ রঘুনন্দন স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ধৃত এই তন্ত্র বচন "আগমেক্তো বিধানেন কলৌ দেবনে যজেৎ সুধী।" তথা "বেদোক্ত বিধিনা ভদ্রে, আগমোক্ত স সুধী।" এই বরাহ পুরাণীয় বাক্যই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্ম-রক্ষক হইয়াছে। উপনয়নে সাবিত্রী দীক্ষা সত্ত্বেও দশবিধ সংস্কারের বহির্ভূত মন্ত্রদীক্ষা ব্যতীত ব্রাহ্মণের উপাসনার বা সাধনার উপায়ান্তর নাই। যেহেতু বৈদিক সাধন পরিত্যক্ত। এখন ব্রাহ্মণ্য রক্ষার উপায় হইয়াছে অবৈদিক উপনয়ন আর রুদ্রোপস্থান, সূর্য্যোপস্থান ও সন্ধ্যায় কএকটী বৈদিক মন্ত্রের অর্থজ্ঞানশূন্য আবৃত্তি। কিন্তু সাধন পক্ষে এ সকলের কোনটীরই সার্থকতা নাই। কি বৈষ্ণব কি শাক্ত উভয় সম্প্রদায়েই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর সকলেরই সাধন প্রণালী অভিন্ন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে বর্ণ নির্ব্বিশেষে ইষ্টসাধন প্রণালী একই। শাক্ত সম্প্রদায়েও সেইরূপ। এজন্য বর্ত্তমান বিষয়ে তন্ত্রোক্ত বিধি নিষেধ আলোচ্য।

প্রসিদ্ধ "শাক্তানন্দ তরঙ্গিনী"তে গ্রন্থকার ব্রহ্মানন্দ পুরী প্রচলিত নিবন্ধ-কর্ত্তাদিগের ব্যবস্থা ও সেই ব্যবস্থার অনুকূল প্রমাণ আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন এইরূপ। যথা, ভূতশুদ্ধৌ

"তন্ত্রোক্ত' প্রণবং দেবি বহ্নিজায়ঞ্চ সুন্দরী।
প্রজপেৎ সততং শূদ্রোনাত্র কার্য্যা বিচরণা"॥
স্বাহা প্রণব সংযুক্তং শূদ্রে মন্ত্রং দদাতি যঃ।
শূদ্রো নিরয়গামী স্যাদ্ব্রাহ্মণো যাত্যধমাং গতিং॥
ইতি বৈদিক মন্ত্র পরং।"

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে শ্রীসদাশিবের উক্তি—

বিপ্রা বিপ্রোত্তরাশ্চৈব সর্ব্বে পত্রাধিকারিণঃ (১০)। ৩য় উল্লাস।

(৮) আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ব্রঃ সুঃ ৩।৩।১২ আপ্রাপ্য।

(৯) সম্মুখে ব্রাহ্মণ রাখিয়া চতুর্ব্বর্ণকেই মহাভারত শুনাইবে। ইহাই বেদাধ্যয়ন। ইহার করণে মহাফল স্মৃতি সম্মত।

(১০) "ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম" মন্ত্রে বিপ্র ও বিপ্রেতর সকলেই অধিকারী।

বিচার এইখানেই সমাপ্ত হইতে পারে; যেহেতু "শাক্তানন্দ তরঙ্গিনী" শাক্তগুরু সম্প্রদায়ে সমাদৃত ও বৈদিক মন্ত্র অপ্রচলিত। সপ্রণব সব্যাহৃতি গায়ত্রীর ব্যবহার কি বৈষ্ণব কি শাক্ত কোন সাধনেই প্রায় নাই।

হে দেবি তন্ত্রোক্ত প্রণব ও স্বাহা হে সুন্দরি শূদ্র সতত প্রকৃষ্টরূপে জপ করুন, ইহাতে বিচারের কর্ত্তব্যতা নাই। স্বাহা প্রণব সংযুক্ত মন্ত্র শূদ্রকে দিলে শূদ্র নরকগামী হয় আর ব্রাহ্মণের অধোগতি হয়। ইহার বিষয় হয় বৈদিক মন্ত্র। ভিন্ন ভিন্ন ইষ্ট দেবতার উপাসনায় বিশেষ বিশেষ গায়ত্রীর প্রয়োগ দেখা যায়। ব্রাহ্মণ ভিন্ন দ্বিজবর্ণ সমগ্র দেশে বিশেষতঃ বঙ্গভূমিতে নাই, ইহাই স্মার্ত্ত পণ্ডিতদিগের মত। সেই ব্রাহ্মণদিগের ব্রাহ্মণ্য রক্ষার জন্যই গায়ত্রীর ব্যবহার বৈধ। প্রয়োজনান্তরং নাস্তিঃ। কাজেই অন্যের পক্ষে বৃথা শ্রম বলিয়া নিষিদ্ধ। আর ব্রাহ্মণের বিশিষ্টতা রক্ষার জন্যও নিষিদ্ধ। কিন্তু এ নিষেধ কোন প্রসিদ্ধ শাস্ত্রে দেখা যায় কি ? প্রণবের নিষেধই গায়ত্রী সপ্রণব বলিয়া নিষিদ্ধ—এ যুক্তি প্রণব অনিষিদ্ধ হইলেই পরিত্যজ্য হয়। আর যদি বেদ পাঠ নিষেধ বলিয়াই গায়ত্রী নিষিদ্ধ হয়, তাহার উত্তর পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। সপ্রণব সব্যাহৃতি গায়ত্রী কোন বিশেষ বেদ মন্ত্র নহে। বেদের সারভূত স্বতন্ত্র মন্ত্র। ইহাই যে ভগবান মনুর উক্তি তাহা পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে। এজন্য বেদ পাঠ নিষিদ্ধ হইলেও গায়ত্রী নিষিদ্ধ হয় না। বেদ পাঠ নিষেধের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তাহার আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। তন্ত্র শাস্ত্রে স্ত্রীগণের গায়ত্রীতে অধিকার স্পষ্টাক্ষরে বিহিত হইয়াছে; এবং শাস্ত্রানুসারে স্ত্রী-শূদ্রের সমানাধিকার।

এমন যদি সন্দেহ হয় যে, সাধিকার গায়ত্রীতে অধিকার কেবল মানস জপার্থে—মানস জপ অশ্রুতি গোচর, অতএব সাধিকার গায়ত্রী উচ্চারণে অধিকার নাই—এ সন্দেহ বিচারসহ নহে,—অমূলক। উপদেষ্টার নিকট গায়ত্রী লাভের পর উচ্চারণ শুদ্ধির জন্য অবশ্যই অপরকে শুনাইতে হয়। গায়ত্রীর দুষ্ট উচ্চারণ বিশেষ অকল্যাণকর। কেন না, অন্যায় কারায়া স্থানেজ করে ইতি যঃ পঠেৎ।

সচণ্ডাল ইতি খ্যাতো ব্রহ্ম হত্যা দিনে দিনে॥ ইতি নির্ব্বাণতন্ত্রং ৩য় পাটল।

অর্থাৎ গায়ত্রীর অন্তর্গত যে "ধিয়োয়ো" তাহার অন্তর্গত 'ধি' এবং পরবর্ত্তী যে "য়" আর "য়" র পরবর্ত্তী অপর যে "য়" এই দুই "য়" কে যে "জ" বলিয়া উচ্চারণ করে, সে চণ্ডাল ও প্রতিদিন তাহার নূতন নূতন ব্রহ্ম হত্যার পাতক হয়।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যদি মুমুক্ষু মাত্রেরই বর্ণাশ্রম লিঙ্গ নির্ব্বিশেষে প্রণবাদিতে অধিকার থাকে, তবে পণ্ডিত মণ্ডলে তাহার নিষেধ হইয়াছে কেন? বৈদিক সাধন প্রণালী অপ্রচলিত। তান্ত্রিক সাধন ভিন্ন অন্য সাধন হিন্দু সমাজে অপ্রাপ্য কি শাক্ত কি বৈষ্ণব উভয়েরই আগমোক্ত সাধনই এক মাত্র আশ্রয়। আর সেই সাধনে ব্রাহ্মণের সহিত অব্রাহ্মণের কোনই প্রভেদ নাই। যে উপায়ে শাক্ত ব্রাহ্মণের ইষ্ট-সিদ্ধি, অব্রাহ্মণেরও তাহাই। সেইরূপ বৈষ্ণব সম্প্রদায়েও ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ উভয়েরই ইষ্ট-সিদ্ধির একই উপায়। ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অথচ, হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণপ্রমুখ না হইলে তাহার ব্রাত্যত্ব অবশ্যম্ভাবী। কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণ আগমনের পূর্ব্ববর্ত্তী বৌদ্ধ সমাজের সহিত তাহার ভেদ থাকে না। আর ব্রাহ্মণের বর্ণগত প্রাধান্যও লুপ্ত হয়। আচারে বৈদিকত্বের ক্ষীণ গন্ধও যদি না থাকে, তবে কলির ব্রাহ্মণ হওয়াও অসম্ভব। অথচ, শুধু জাতি রক্ষার জন্য দীর্ঘকাল ব্যাপী পরিশ্রমরূপ মূল্য দিয়া ব্রাহ্মণত্ব সংগ্রহ করিতে ব্রাহ্মণ কুলোৎপন্ন কয়জন প্রস্তুত? সকলেরই চেষ্টা—কিসে সুলভ মূল্যে লৌকিক ব্রাহ্মণত্ব মিলে। পরমার্থের জন্য শিবোক্ত বা গোস্বামী দর্শিত সাধনই যথেষ্ট। কিন্তু সার্ব্বভৌমত্ব বশতঃ ইহাতে সামাজিক ব্রাহ্মণত্ব থাকে না।

এজন্যই শ্রীসদাশিবের উক্তি, দ্বিজাতীনাং শূদ্রেভ্যঃ ভেদার্থং পরমেশ্বরি। সিদ্ধেয়ং বৈদিকী প্রোক্তা প্রাগেব আহ্নিক কর্ম্মাণাম্। অন্যথা শাম্ভবৈর্মার্গৈঃ কেবলং সিদ্ধিভাগ ভবেৎ।

সত্যং সত্যং পুণঃ সত্যং সত্য মে
তন্মসংশয় * মহানির্ব্বাণতন্ত্র (৮ মউঃ)

হে পরমেশ্বরি, শূদ্র সকলের সহিত দ্বিজাতির ভেদ রক্ষার জন্যই আহ্নিক কর্ম্মের পূর্ব্বে বৈদিক সন্ধ্যা কথিত হইয়াছে। নতুবা কেবল শিবোক্ত প্রণালীতেই সিদ্ধির অধিকারী হয়—ইহা সত্য সত্য সত্য নিঃসন্দেহ।

বিজিতা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(৩৭)

বড় সুখেই দিন কাটিতেছিল,—হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইয়া সকল সুখের অবসান করিয়া দিল।

গাড়ী করিয়া নৃপেন্দ্র কোথায় যাইতেছিল, হঠাৎ গাড়ী উল্টাইয়া পড়িল সুষমার সেই বাড়ীটির সামনে। নিজের বাড়ীতে লইয়া যাইবার সাহস না করিয়া সুষমা পূর্ব্ব কথা ভুলিয়া নৃপেন্দ্রকে তাহারই বাড়ীতে লইয়া গেলেন।

সুলতা সুষমাকে দেখে নাই, রক্তাক্ত দেহ স্বামীকে দেখিয়াই "মাগো, কি সর্ব্বনাশ হ'ল আমার" বলিয়া সে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল।

যখন তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন সে উঠিয়া বসিল। এ কি, নৃপেন্দ্রের মাথার কাছে বসিয়া এ কে? শান্ত পবিত্র জ্যোতিতে উজ্জল ব্রহ্মচারিণী মূর্ত্তি এ কে। এ বেশ সে কখনও না দেখিলেও সে চোখ দেখিয়া চিনিতে পারিল। আছড়াইয়া পড়িয়া ক্রন্দনোচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল "দিদি, বড়দি, এসেছ তুমি?"

তাহাকে তুলিয়া সুষমা বলিলেন "আমি তো সঙ্গে সঙ্গেই এসেছি বোন।"

সুলতা চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল "এত অপমানের পরও আসতে পারলে দিদি? আমরা যে একরকম তোমার তাড়িয়েই দিয়েছিলুম। সে অপমান কি একটুও বাজেনি তোমার প্রাণে দিদি,—আমার কেমন করে এলে তবে?"

সুষমা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "যদি তোমাদের এ বিপদ না হ'ত মেজবউ, আমি কখনও আসতুম না। তোমরা কঠিন হ'য়ে থাকতে পার, আমরা কঠিন হ'তে পারি নি। সম্পদে আমায় পাওনি, বিপদে পেয়েছ; কারণ বিপদের মধ্যেই প্রকাশ হ'তে বড্ড ভালবাসি আমি। আমায় আমার কর্ত্তব্য টেনে এনেছে, তোমরা টানতে পারনি মেজবউ।"

মেজবউ নীরবে কেবল চোখ মুছিতে লাগিল। এতক্ষণ নৃপেন্দ্রের পদতলে উপবিষ্টা প্রতিভার পানে তাহার চোখ পড়ে নাই; এখন সে দিকে চাহিয়াই বিস্মিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "প্রতিভাও এসেছে যে।"

সুষমা গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন "প্রতিভাও আমার মন্ত্রে দীক্ষিতা হয়েছে যে। আমি যেখানে যাব, প্রতিভাকেও সেখানে দেখতে পাবে; আমাকে ছাড়া প্রতিভা থাকতে পারে না।"

মেজবউ খানিক নীরব হইয়া রহিল। তাহার পর হঠাৎ সুষমার পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িয়া, দুই হাতে পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া, আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "আমায় মাপ কর দিদি, আমি তোমাদের বড্ড জ্বালিয়েছি, আমার জন্যে তোমরা—"

বাধা দিয়া তাহাকে তুলিবার চেষ্টা করিয়া সুষমা

ব্যস্ত ভাবে বলিলেন "ও কি করছ ভাই মেজবউ, পায়ে ধরতে আছে কি? ছি ছি—ওঠো বলছি। ঝি চাকর দেখলে বলবে কি?"

সুলতা পা ছাড়িল না, আরও শক্ত করিয়া ধরিয়া মুখখানা পায়ের উপর রাখিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "বল, তুমি আমাদের সব দোষ ক্ষমা করবে কি না,—তবে আমি পা ছাড়ব, নইলে ছাড়ব না।"

বাধ্য হইয়া সুষমা বলিলেন "ক্ষমা করেছি ভাই, তুমি ওঠো।"

মেজবউ পা ছাড়িয়া উঠিল, উচ্ছ্বসিত অশ্রু চাপিতে চাপিতে বলিল, "আজ কয়দিন ধরে—সত্যি দিদি, প্রাণের মধ্যে বড্ড শূন্যতা অনুভব করছি; কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিনে। মনে হচ্ছে, তোমরা সেই ছোট্ট বাড়ীখানাতে কি সুখেই দিন কাটাচ্ছ, আর আমি এই অসীম ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হ'য়েও মনে একটু শান্তি পাচ্ছি নে। দিদি, আজ কয় দিন হ'তেই মনে হচ্ছে, যাই তোমাদের ফিরিয়ে আনি; শূন্য ঘর সব খাঁ খাঁ ক'চ্ছে, আবার সব পূর্ণ করে ফেলি কিন্তু বড্ড লজ্জা হ'ল দিদি। আমিই যে যত সর্ব্বনাশের মূল, আমিই যে এ তুফান উঠিয়েছি, ভাইয়ের বুক হ'তে ভাইকে ছিঁড়ে তফাৎ করেছি। বট ঠাকুরের ব্যারামের সময় ছিলুম না এখানে,—ফিরে এসে যখন শুনলুম তিনি নেই, তখনই আমার মনে হ'ল, আমরাই তাঁকে মেরে ফেলেছি। দিদি, সেই হ'তে আমি কেবল ভাবছি, আমার বুকের মধ্যে দিনরাত কে হাতুড়ি দিয়ে পিটছে, তেমনি ঝনঝনে আওয়াজে ডেকে বলছে তুই ই তোর ভাসুরকে খুন করেছিস।"

সুষমা শান্তকণ্ঠে বলিলেন, ওটা "তোমার মনের ভুল ভাই মেজবউ; তাঁর সময় হয়েছিল তাই তিনি চলে—"

বাধা দিয়া তীব্র কণ্ঠে সুলতা বলিয়া উঠিল "সময় হয়তো হয়েছিল, মৃত্যু তাঁকে অন্যরূপে নিত, তাতে প্রাণে শান্তি পেতুম। কিন্তু এ কি মরণ দিদি? মরণ তো সবারই আসে; একেবারে বাকশক্তিহীন, অনাহারে ক্ষীণ—"

সুষমার মুখখানা নিমেষে সাদা হইয়া গেল; তিনি অতি কষ্টে বলিলেন "মাপ কর ভাই মেজবউ, সে সব পুরান কথাগুলো আর তুল না। আমি সে সব স্মৃতি মন হ'তে মুছে ফেলবার চেষ্টায় আছি,—নূতন উৎসাহে মনকে মাতিয়ে তুলছি,—আমায় দমিয়ে দিয়ো না।"

তাঁহার মুখপানে চাহিয়া সুলতা ক্ষীণকণ্ঠে বলিল "আমি যে আমার মনের ব্যথা প্রকাশ করতে চাই দিদি। আমার বুকে যে রাবণের চিতা দিনরাত ধু ধু করে জ্বলছে,—আমি কিছুতেই সে আগুণ নিভাতে পারছিনে যে। তোমার পায়ে পড়ি দিদি, তোমরা সবাই এসে তেমনি করে আবার থাক, তোমাদের সংসার আবার তোমাদের হাতে নাও, আমাকে মুক্তি দাও। আমি এ গুরুভার আর বইতে পারছিনে, আমার মাথা ভেঙ্গে পড়ছে। আমায় একলা এ বাড়ীতে এমন করে রাখলে আমি বাঁচব না, আমি পাগল হ'য়ে যাব।"

অধীরভাবে দুই হাতে সে মাথাটা টিপিয়া রাখিল। তাহার অবস্থা বিবেচনা করিয়া সুষমা বলিলেন "সে কথা পরে হ'বে ভাই,—মেজঠাকুর পো আগে ভাল হ'য়ে উঠুন, তার পরে।"

সুলতা ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল "তারপরে আসবে তো?"

সুষমা সংক্ষেপে বলিলেন "দেখা যাক।"

রুক্ষকণ্ঠে সুলতা বলিল "দেখা যাক কি? তোমার জোর নাকি? আমি নিজে গিয়ে গাড়ী করে সব নিয়ে আসব, ঘর দোর এমন করে সব ভেঙ্গে দিয়ে আসব যে আর সেখানে বাস করতে হবে না। বল—আসবে?"

সুষমা একটু হাসিয়া বলিলেন "আসব।"

আনন্দে সুলতার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল,—সে দুই হাতে সুষমার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল।

সুষমা ও প্রতিভার যত্নে নৃপেন্দ্র অনেকটা ভাল হইয়া উঠিল। সুষমা তখন বাড়ী ফিরিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন দেখিয়া সুলতা কাঁদিয়া স্বামীকে বলিল "দিদি তো আমার কথা শুনবে না, তুমিই বল না কেন একটু?"

নৃপেন্দ্র শুষ্কমুখে বলিল "আমার কি বলবার মত মুখ আছে মেজবউ, যে কোনও কথা বউদিকে বলতে যাব? আমার মুখ আমি যে নিজেই পুড়িয়ে নষ্ট করেছি।"

সুলতা স্বামীর উপর অত্যন্ত রাগ করিয়া সুষমার দিকে ফিরিল। তাহার পা দুখানা আবার জড়াইয়া ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "যদি যাবেই দিদি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চল। আমি এ বাড়ীতে আর এক তিল থাকতে পারব না।"

সুষমা বলিলেন "তা কি হয় ভাই মেজবউ ?"

"তবে আমি মরি, তুমি আমার মরা দেহটা দলে চলে যাও,—কেউ আর তোমায় বাধা দিতে থাকবে না—" বলিতে বলিতে সুলতা মাথা খুঁড়িতে লাগিল।

সুষমা ব্যস্ত হইয়া তাহাকে ধরিয়া বলিলেন "পাগলামি কর না ভাই! মেজঠাকুর পো, তুমি বসে শুধু মজা দেখছ বুঝি, বুঝাও না একটু, আমি আর পারিনে যে।"

নৃপেন্দ্র একটু হাসিয়া, সঙ্কুচিত কণ্ঠে বলিল, "বউদি, আমার বল্‌তে সাহস হচ্ছে না, তোমাকে—তুমি যদি—"

সুষমা বলিলেন, "ও হরি, তুমিও ওই দলে? কিন্তু ভাই, এটা মোটেই ভাল হচ্ছে না তোমার,—এই গোষ্ঠীর প্রতিপালন করতে কত খরচ পড়বে তা তো জান ?"

নৃপেন্দ্র দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকাইয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "আর লজ্জা দিয়োনা বউদি। আমি তোমার চাকর, তোমার সন্তান, তোমারই সম্পত্তি আমি ভোগ কর্‌ছি মাত্র—অন্ততঃ তাই বলে জেনো। মিছে মোহে ভুলে একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছি,—তার জন্যে কি ক্ষমা পাব না বউদি? তোমার অমিয় যদি একটা অন্যায় কাজ করে ফেলে, তুমি কি মাপ কর না বউদি? আমাকেও কি তেমনি চোখে দেখে মাপ করবে না ?"

সুষমার কোমল হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল; অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া তিনি বলিলেন "মাপ করলুম ঠাকুরপো।"

বহুকাল পরে আজ আবার সকল পরিবার এক হইল,—বাড়ীতে আনন্দের তুফান উঠিল। সুষমা মুখে হাসিতেছিলেন, কিন্তু হৃদয়টা তাঁহার ফাটিয়া যাইতেছিল। আবার সবই হইল, কিন্তু যে এই আনন্দের প্রতিষ্ঠাতা, সে আজ কোথা,—কোন অনন্ত লোকে সে বিশ্রামলাভ করিতে গিয়াছে ?

সুষমার চোখ হইতে কয়েক ফোঁটা জল ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল। তিনি উর্দ্ধদিকে চোখ তুলিয়া প্রণাম করিয়া স্বামীর নিকট প্রার্থনা করিলেন "দেব—আশীর্ব্বাদ কর, যেন এখানকার কাজ সেরে শিগগীর তোমার কাছে যেতে পারি।

(৩৮)

পূর্ণিমার নিশি, দশদিক অনাবিল রজতশুভ্র জ্যোৎস্না ধারায় ভরিয়া গেছে। সেই ছোট স্বচ্ছতোয়া পুষ্করিণীর চারিদিককার বেলফুল গাছে অসংখ্য বেলফুল ফুটিয়া ফাল্গুন বাতাসের সঙ্গে খেলা করিতেছে। আর একদিকে কয়েকটা চামেলি গাছ আগাগোড়া সাদা ফুলের গয়না পরিয়া চাঁদের আলোয় নিজের ঝলমলে সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইয়া অবাক হইয়া চাহিয়া আছে।

প্রতিভা ঘাটের উপর একা বসিয়া। ক্ষুদ্র শুভ্র পা দুখানা তার এক ধাপ নীচে জলের মধ্যে স্থাপিত। বকুল গাছের ছায়া পিছনে,—পাতার ফাঁকে চাঁদের আলো এক এক জায়গায় আসিয়া পড়িয়া হীরার মত চিকমিক করিয়া জ্বলিতেছে। গাছের উপর বসিয়া একটা পাপিয়া চীৎকার করিতেছিল, অনেক দূর হইতে আর একটা পাপিয়া তাহার উত্তর দিতেছিল,—তাহার প্রত্যুত্তরটা খুব ক্ষীণ হইয়াই কাণে আসিতেছিল।

প্রতিভা নিস্তব্ধভাবে বসিয়া ছিল,—তাহার দৃষ্টি কোথা ন্যস্ত ছিল, তাহা জানা যায় না। প্রতিভার কোলের উপর সেই বই দুখানা পড়িয়া ছিল। সে জানে না, কেন এ বই দুখানা হাতে করিয়া সে এখানে আসিয়াছে,—পড়িবে বলিয়াই সম্ভবতঃ। এখানে আসিয়া রাত্রির অপরিসীম নীরব সৌন্দর্য্যের মধ্যে সে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। সে এখন নিজের অস্তিত্বও হারাইয়া ফেলিয়াছে।

চাঁদের শুভ্র কিরণ-হার বুকে পরিয়া ছোট ছোট ঢেউগুলি কেমন সারি বাঁধিয়া চলিয়া যাইতেছে; এক এক সারি যায় আবার আসে, আবার যায়, আবার আসে। কত লক্ষ সারি আসিল, কত লক্ষ সারি ঢেউ চলিয়া গেল, কে তাহা গণিয়া ঠিক করিবে।

প্রতিভার চোখ বোধ হয় সেই দিকে ছিল, সে সহসা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

পিছন হইতে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে কে ডাকিল, "প্রতিভা !"

এ আহ্বান তাহার কাণে বাজিল না।

আবার কে ডাকিল "প্রতিভা—"

প্রতিভা চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল শৈলেন। আজ প্রতিভা উঠিল না, একটুও নড়িল না; যেমন জলের পানে দৃষ্টি রাখিয়া বসিয়া ছিল, তেমনি বসিয়া রহিল।

শৈলেন বলিল "এত রাত্রে একলা বসে কি করছ প্রতিভা ?"

আজ কথা কহিতে প্রতিভার কণ্ঠ কম্পিত হইল না, সে বলিল, "জল দেখছি।"

শৈলেন বলিল "জল দেখে কি হবে, বাড়ী যাও।"

তাহার কণ্ঠ বড় কোমল—পরিষ্কার।

প্রতিভা নড়িল না।

শৈলেন বলিল "খিড়কীর দরজা ঝি এখনই বন্ধ করে দেবে—বাড়ী যাও। লোকে এখনি কত কথা বলে ফেলবে তার ঠিক কি?"

প্রতিভা স্থির কণ্ঠে বলিল "আমি লোকের কথাকে আর ভয় করিনে।"

ব্যগ্র কণ্ঠে শৈলেন বলিল "ভয় কর না, কেন কর না?"

প্রতিভা বলিল "লোকের কথা ঢের শুনেছি, শুনে শুনে বুকটা এখন এমন পাষাণ হ'য়ে গেছে যে, তাদের কথা আর দাগ বসাতে পারে না। সত্যি আমি যদি খাঁটি হই, হাজার কথা বলুক না তারা, ভয় কি তাতে? আমি জানব আমি ভাল, আর কিছু দরকার নেই।"

শৈলেন আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া রহিল। এই কি সেই প্রতিভা? এত সাহস, এত তেজ, সে কোথায় পাইল? সে প্রতিভার কিছুই যে ইহাতে দেখা যাইতেছে না।

প্রতিভা তাহার দিকে ফিরিল, একটু হাসিয়া বলিল, "আপনি আমার কথা শুনে খুব আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছেন বোধ হয়!"

শৈলেন বলিল "আশ্চর্য্য হ'ব কেন?"

প্রতিভা বলিল "দুই বছর আগে একদিন এইখানেই আপনার সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল, যে দিন এই বইদুখানা আমায় দিয়েছিলেন আপনি। মনে করে দেখুন দেখি, সে দিন কত লজ্জা—কত সঙ্কোচের মধ্যে দিয়ে এ দুখানা আমি বয়ে নিয়ে গেছলুম বাড়ীতে। আপনি আজ সেইদিন আর আজকের দিনে মিলিয়ে দেখে একটুও আশ্চর্য্য হচ্ছেন না কি?"

শৈলেন বলিল "বাস্তবিক আশ্চর্য্য হচ্ছি প্রতিভা। আগে আমায় দেখলে তুমি লুকাতে, আমার কথা কানে যাবামাত্র বহু দূরে সরে যেতে তুমি; আজ যদি কেউ দেখে ফেলে, সে ভাবনাটা তোমার মনে নাই কেন?"

প্রতিভা আবার হাসিল, বলিল "আজ লুকাতে হ'বে না যে, আমি আপনাকে ভালবাসি। আজ আমার গোপন করে বেড়াতে হ'বে না; আজ আমি সকলের সামনেই প্রকাশ হ'য়ে পড়েছি। সেদিন ভয় ছিল, পাছে আমার গোপন কথা ব্যক্ত হ'য়ে যায়—আজ তো আর সে ভয় নেই।"

শৈলেন স্তম্ভিত হইয়া তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানার পানে চাহিয়াছিল; রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "তুমি আমায় ভালবাস প্রতিভা, নিজের মুখেই তা স্বীকার করছ?"

প্রতিভা উত্তর করিল "হ্যাঁ, নিজের মুখেই স্বীকার করছি।"

শৈলেন আবেগভরা কণ্ঠে বলিল, "তবে তুমি আমার সে পত্রের উত্তর না দিয়ে পালিয়েছিলে কেন—অনর্থক কষ্টগুলো সহ্য করবার জন্যে প্রতিভা?"

প্রতিভা বলিল "কেন পালিয়েছিলুম তাই জিজ্ঞাসা করছেন? তখন আমি নিজেকে সংযত করতে পারিনি। পাছে কোন পাপ এসে আমায় স্পর্শ করে—তাই পালিয়েছিলুম! বুঝতে পেরেছিলুম, আমায় আত্মরক্ষার জন্যে সাধনা দরকার; সেই সাধনা করবার জন্যেই আমি এ বাড়ী ছেড়েছিলুম। এখানে থাকলে বোধ হয় দিন দিন অবনতির পথেই নেবে যেতুম,—আর ওঠবার পথও আমার থাকত না।"

শৈলেন একটু নীরব থাকিয়া বলিল "আজ আর সে ভয় নেই তোমার প্রতিভা?"

প্রতিভা বলিল "না।"

শৈলেন বলিল "কেন নেই?"

প্রতিভা বলিল "আপনাকে যথার্থ ভালবাসতে পেরেছি, আপনার ভালবাসাই আমায় অমর করে তুলেছে। আপনাকে আমি আর বাইরে দেখছিনে, দেখছি, আমার অন্তরে রয়েছেন। আজ আমি যথার্থ জয়ী হ'য়েছি, তাই আমার সঙ্কোচ আর নেই। যতদিন আপনাকে বাইরে দেখেছিলুম, ততদিনই সঙ্কোচ ছিল,—এখন যে আপনি মিশে গেছেন আমার প্রাণে,—তবে আর ভয় কি।"

শৈলেন নীরবে তাহার পানে চাহিয়া রহিল; অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমি কেন তোমার মত হ'তে পারলুম না প্রতিভা?"

প্রতিভা উত্তর করিল, "সাধনা করুন, সিদ্ধিলাভ

করবেন। এ জড়দেহের আকাঙ্ক্ষা করে কিছুমাত্র লাভ নেই,—যার শেষ শুধু শ্মশানে চিতাভস্মেই সার হবে মাত্র। দেখুন দেখি, এই জলটার পানে তাকিয়ে, কি দেখতে পাচ্ছেন ?"

শৈলেন চাহিল. বলিল, "কিছুই না।"

প্রতিভা বলিল, "ঢেউ দেখতে পাচ্ছেন না কি ?"

শৈলেন বলিল, "হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। ঢেউগুলো অবিরত আসছে আর চলে যাচ্ছে।"

প্রতিভা বলিল, "এমনি করে আমরাও আসছি আর যাচ্ছি। আমাদের মনের মধ্যে এই একটা সত্য কথাকে জাগিয়ে রাখতে হ'বে—আমাদের দেহের ধ্বংস আছে,—সুতরাং দৈহিক মিলনই আমাদের লক্ষ্য নয়। দৈহিক মিলন যদি ভগবানের অভিপ্রেত হ'ত,—আমায় বিধবার বেশে সাজিয়ে আপনার সামনে পাঠাতেন না। মনে জেনে রাখুন, আমি জনমে-জনমে আপনার,—বাস তা'হলে আর আমার পানে তাকাবার আপনার দরকার হ'বে না।"

শৈলেন বলিল, "তোমার কথাই মেনে চলব প্রতিভা, কিন্তু সময় সময় হৃদয় যে বড় অশান্ত হ'য়ে ওঠে।"

প্রতিভা বলিল, "কেন অশান্ত হ'তে দেবেন। হৃদয় মানে আপনার ইচ্ছাশক্তি—যেটাকে আপনি নিরন্তর আহার দানে বঞ্চিত করে তুলেছেন,—সেটাকে আপনিই কি দমন করে রাখতে পারেন না ? আপনার এ অস্বাভাবিক ভালবাসাটা আমার উপর হ'তে ফিরিয়ে নেন দেখি! আমি এ রকম ভালবাসা পেতে মোটেই ইচ্ছে করি না। আমার মনে হয়, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা আয়োজন—মন ভুলাবার। যদি সত্যিই ভালবেসে থাকেন, সেটা খুব সংক্ষিপ্ত করে হৃদয়ের একপাশে ফেলে রাখবেন, আর যা—তা সব মন্দাকে দেবেন,—কারণ মন্দাই তা পাবার যথার্থ অধিকারিণী। আমি তার কাছে আপনার এই ভালবাসার নামেই শপথ করেছি, তার জিনিস তাকেই আমি ফিরিয়ে দেব,—কক্ষনো নেব না।"

শৈলেন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমি যদি পরজন্মের আশায় থাকি প্রতিভা ?"

প্রতিভা শান্ত কণ্ঠে বলিল, "বেশ, সেই অপেক্ষা করুন।"

ধীরে ধীরে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। শৈলেনের প্রদত্ত সেই বই দুই-খানা সে ফিরাইয়া দিল না,—হাতে করিয়া লইয়া অগ্রসর হইল।

শৈলেন তাহার পানে চাহিয়া রহিল; কখনও প্রস্ফুটিত জ্যোৎস্নার মধ্য দিয়া, কখনও গাছের ছায়ার অন্ধকারের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে কোথায় যে সে গভীর অন্ধকারের মধ্যে লীন হইয়া গেল, শৈলেন তাহা জানিতে পারিল না।

নীরবে সে আলোকোজ্জ্বল নীলাকাশপানে চাহিয়া রহিল; তাহার পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, "তাই হোক। দেহের বিভিন্নতা রেখে তোমায় যেন না ভালবাসতে পারি। দৈহিকের দিকে লক্ষ্য যেন না থাকে, আত্মার আত্মায় মিল হ'য়ে যাব। ভগবান! আশীর্ব্বাদ কর, যেন চিত্তজয় করতে পারি।"

নীরবে সে হাত দু'খানা কপালে ঠেকাইয়া ফিরিল।

সমাপ্ত

মরা জাতির স্বরাজ-সাধনা

শ্রীহরিহর শেঠ

আমরা যে একেবারে মরিয়াছি, অবশ্য এ কথা ঠিক না হইলেও, মরিবার পথে যে অগ্রসর হইতেছি, এ কথা ঠিক। জরা-ব্যাধিগ্রস্ত মরণোন্মুখ জীবের প্রার্থনা-কামনার মধ্যে যা যা হতে পারে, তাহাতে পরলোকের রাজ্যে বা স্বাধীনতার অতীত কোন দেশে যাইবার কামনা থাকিতে পারে,—কিন্তু স্বরাজ বা ঐ মত কিছু কামনার বিষয় হওয়া ত সম্ভবপর নহে। যখন ব্যাধির তীব্রতা, নৈরাশ্যের ব্যাকুলতা, আসন্ন চির-বিরহের দুঃখে দেহ-মন সমাচ্ছন্ন, তখন ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষা, বিলাসের মোহ বা প্রতিষ্ঠার অদম্য লালসা যদি সম্ভব না হয়, তবে এই নিত্য জরা-ব্যাধি-

অভাব-গ্রস্ত, অশন-বসনের ভিখারী জাতির পক্ষে প্রকৃত স্বরাজ-সাধনার কথা রোগীর মুখে প্রলাপের বুলির মতই অর্থহীন। রোগীর সে কথা বুঝিবার ক্ষমতা না থাকিলেও, সেবা-নিরত পার্শ্বের লোকেরা নিতান্ত অজ্ঞ বা বধির না হইলে, তাহা বুঝিতে তাহাদের বাকি থাকে না। আমাদের এই স্বরাজ সাধনার কথা জগতের জীবন্ত জাতিদের কাছে কি এমনই প্রলাপের মত প্রতিভাত হইতেছে না?

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার হইতে পারে, কিন্তু দীর্ঘকালের পরাধীনতায় জাতি যখন ক্রমে ক্লীবত্ব, জড়ত্ব প্রাপ্ত হইতে থাকে, তখন তাহাদের পক্ষে প্রকৃত স্বরাজ-সাধনার অপেক্ষা বড় সাধনা খুব কমই কল্পনা করিতে পারা যায়। যে সামগ্রী কল্পনার মধ্যে সহজে পাওয়া যায় না তাহার কথা—যাহা এখন আন্দোলনের বিষয় হইয়াছে—তাহাও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয় না। তদ্ভিন্ন আমাদের স্বরাজ সাধনা অকস্মাৎ আসিবার কি কারণ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাও বিবেচনা করা দরকার। কারণ ভিন্ন কোন কাজই হয় না। কি কারণ হইতে এই সাধনা আসিয়া থাকে? এই দীর্ঘ-কালের পর হঠাৎ কতকগুলি লোকের কেন এ খেয়াল আসিয়া মনোমধ্যে উদয় হইল? এবং জগতের যে সকল জাতি এইরূপ দীর্ঘকালের পর স্বাধীনতা বা স্বরাজের জন্য প্রস্তত হইয়াছে, তাহাদের যে যে কারণ হইতে সে আকাঙ্ক্ষা উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, সেই সব কারণ আমাদের মধ্যে কিছু উপস্থিত হইয়াছে কি না, তাহাও চিন্তা করিবার বিষয়।

বিনা প্রয়োজনে আকাঙ্ক্ষার উদয় হয় না। আকাঙ্ক্ষা না আসিলে চেষ্টা আসে না। বিনা চেষ্টায় কিছু পাওয়া একেবারে দুর্লভ হয়ত না হইতে পারে, কিন্তু তাহা লাভ করা যে খুবই কঠিন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। অভাবেই প্রয়োজনটা সহজে উপলব্ধি হইয়া থাকে। এই যে অভাব ইহা প্রায় দুই প্রকারের দেখা যায়। যাহা ব্যতিরেকে চলে না, তাহা না থাকা এক প্রকৃত অভাব; আর শিক্ষা, নবোদ্ভূত মনোবৃত্তি বা পারিপার্শ্বিক অবস্থাদি হইতে নূতন করিয়া অভাবের সৃষ্টি আর একটী। এতদুভয়ের মধ্যে আমাদের কি অভাব হইয়াছে, এবং কোন্‌টি হইতে আমাদের স্বরাজ-লিপ্সা আসিতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার।

উভয়বিধ অভাবেরই আমাদের অভাব নাই। অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, উৎসাহ, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি এ সকলেরই অভাব ত আছেই; তাহা ছাড়া শিক্ষার ব্যভিচার জন্য রোগীর দুষ্ট ক্ষুধার ন্যায় অপরের দেখিয়া বা অন্য কারণোৎপন্ন অলীক অভাব সকলেরও নিত্য সৃষ্টি হইতেছে। স্বরাজের ন্যায় দুঃখ-লভ্য জিনিষ ভিন্নও উক্ত সকল অভাবের মধ্যে অন্ততঃ অনেকগুলি সহজে মোচন হইতে পারে। কিন্তু সেদিকে অনেক সময়ই গভীর উদাসীনতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আত্মরক্ষার জন্য যার আসক্তি নাই, অন্নের জন্য যার চেষ্টা নাই, এক কথায় বাঁচিবার জন্য যার উদ্যোগ নাই, তার আছে স্বরাজ বা স্বাধীনতা পাবার আকুলতা? এ ত প্রত্যয়ের কথা নয়।

অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য বা বাঁচিবার জন্যই এই স্বরাজ-সাধনা,—কেহ এ কথা বলিলে তাহার প্রতিবাদ নাই। যে সকল মহাপুরুষ স্বরাজ লাভের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছেন, উহা লাভের উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্ন বস্ত্রলাভ বা বাঁচাই অন্যতম কারণ থাকিতে পারে। সে বাঁচা জাতির জন্য; ব্যক্তিগত ভাবে হয়ত অনেক ক্ষেত্রে সে সব মহাত্মাদের মৃত্যুভয় কারণ নহে। কিন্তু কথা হইতেছে দেশবাসী যে সাধা-রণের জন্য তাঁহাদের এই সংগ্রাম, তাহাদের মধ্যে যাহারা আন্দোলন ছাড়িয়াছে তাহাদের কয়জনের সে চিন্তা আছে। সে চিন্তা আসলে, তাহারা প্রকৃত সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে, সিদ্ধিলাভ নিকট হইয়া পড়ে। কিন্তু অভাবের সীমা যে স্থানে পৌঁছিলে, আমাদের মত একটা জাতির সে চিন্তা সে সাধনা আসিতে পারে, অভাবের সীমা কি এখন সে স্থানে পৌঁছিয়াছে? জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বস্তু উদরের জন্য অন্নের যে অভাবে মানুষের প্রাণ রক্ষা অসম্ভব হইয়া থাকে—এখানকার জল বাতাস এখনও তাহা হইতে দেয় নাই। এখনও ধরিত্রীর যে উর্ব্বরতা আছে এবং যে পরিমাণে জমি পতিত আছে, তাহাতে অতি অল্প পরিশ্রমেই সারা দেশের অন্নাভাব দূর হইয়া উদ্বৃত্ত হইতে পারে। এমন সহজে দুটি ভাতের জোগাড় পৃথিবীর আর কোন দেশেই হয় না। একটা নারিকেলে একজনের একবেলা উদরপূরণ হইতে পারে, এ নারিকেল কত সহজে উৎপন্ন হয়। দুটো লাউ কুমড়ার বীচি প্রাঙ্গণের পাশে একবার পুঁতিয়া দিলে, অন্ততঃ এক মাসের তরকারির সংস্থান হইতে পারে। একটা

তেঁতুল বা চাল্‌দা গাছ একটা ছোট পাড়ার অম্ল ব্যঞ্জনের অভাব মোচন করিতে পারে। বৎসরের মধ্যে দুই এক মাস কত দরিদ্রের শুধু আম খাইয়াই কাটিয়া যায়। সুতরাং অনাহারে মরিবার মত অবস্থা আমাদের এখনও আইসে নাই। সে অবস্থা না হইলে এই উৎসাহ উদ্দীপনাহীন, অসাড় নিরীহ জাতির পক্ষে স্বরাজ লাভের কণ্টকাকীর্ণ পথে অগ্রসরের কথা স্বপ্নের বিষয় হইতে পারে, তাহা বাস্তব বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না। স্বরাজ পাইবার জন্য যে সব উপাদানের প্রয়োজন, জীবিকা সমস্যা চরম সীমায় উপস্থিত হইলে অর্থাৎ প্রাণ ধারণ তেমন সঙ্কট হইলে সে উপাদান সংগ্রহের শক্তি আসিয়া থাকে—এই বিশ্বাসেই এত কথা বলিলাম। জানি না আমার ধারণা ভ্রান্ত কি না।

মানব মনের মধ্যে আর একটা জিনিষ আছে, যাহাতে আঘাত লাগিলে সকল দুর্ব্বলতা, সকল স্থবিরতা ভুলাইয়া দিয়া পঙ্গুকেও গিরি লঙ্ঘনের সাহস আনিয়া দেয়,—নিতান্ত নির্বীর্য্যকেও তাহার দৈহিক বলের দৈন্যতা বিস্মৃত করাইতে পারে। সেটি আত্মমর্য্যাদা। কিন্তু হায়, এ হতভাগা জাতির আত্মমর্য্যাদা নিত্য লাঞ্ছিত, পদদলিত হইলেও তাহা বোধের জ্ঞান,—সে অনুভূতি কোথায়? যাহা থাকিলে মানুষের সে জ্ঞান,—সে বোধের শক্তি থাকে, তাহা প্রধানতঃ শিক্ষা। এ দেশের শতকরা পঁচানব্বই জন শিক্ষাহীন। অবশিষ্টের মধ্যে শিক্ষা যে ভাবে দেওয়া হয়, তাহাতে,—প্রকৃত আত্মমর্য্যাদা বলিতে যাহা বুঝায়, সে জ্ঞানের সম্যক বিকাশ হয় কি না সন্দেহ। নচেৎ আজ ভারতবন্ধু মহাত্মা গান্ধী, আলি ভ্রাতা ও অন্যান্য অকপট দেশসেবকদিগের নির্য্যাতন আমাদিগকে, অন্ততঃ আমাদের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত তাঁহাদেরও কি বিচলিত করিতে পারে না? তাঁহারা কাহার জন্য এমন করিয়া আপনাদিগকে উৎসর্গ করিয়াছেন, সকল দৈহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে কিসের জন্য স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিয়া দুঃখকে বরণ করিয়া লইয়াছেন? গান্ধী দেবতা নহেন,—জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব না হইতে পারেন, কিন্তু শ্রেষ্ঠ মানবদের মধ্যে যে একজন, সে বিষয় সন্দেহ নাই! এমন মানব-সুহৃদের জন্য দেশের শিক্ষিত বলিতে যাঁহাদের বুঝায়, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন বিদগ্ধ হৃদয়ে দিনপাত করিতেছেন? জাতির আত্মমর্য্যাদা বোধ থাকিলে ই নির্ব্বীর্য্য জাতির দ্বারাই কি অভাবনীয় অনর্থই ঘটিতে পারিত, তাহা ভবিতব্য জানেন।

আত্মমর্য্যাদা মানবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম; কিন্তু শিক্ষাই একমাত্র জিনিষ যাহার দ্বারা সেই ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। সেই ধর্ম্মকে দেশ-হিত ও সমাজ-হিতে লাগাইতে হইলে, একমাত্র শিক্ষাই আবশ্যক। সে শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে হইলে, কেবল পরের দিকে চাহিয়া থাকিলে চলিবে না। পরে যা দিতে পারে, তা দিয়াছে, দিতেছে। যে বিদ্যা হইতে যাহা পাওয়া সম্ভব নয়, তাহা কখন সে বিদ্যা হইতে পাওয়া যাইবে না। যে বিদ্যায় নিজস্ব ভুলাইয়া পরকে উপাসনা করিতে শিখায়, বিজ্ঞান দিয়া বিবেক ভুলাইয়া দেয়, কাঞ্চন ভুলিয়া কাচকে আদর করিতে শিখায়,—সে বিদ্যার অন্য অনেক গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু একটা এত দিনের পরাধীন জাতির প্রকৃত আত্মমর্য্যাদা বোধ জন্মাইতে বা জাগাইতে পারে না। শুধু বক্তৃতা বা দুই পাঁচ জন দেশ-ভক্তের কর্ম্ম-পদ্ধতির দৃষ্টান্ত একটা স্বাধীন জাতির ভিতর যে কাজ করে, একটা মরণোন্মুখ পরাধীন জাতির জীবনে সে সাড়া আনিয়া দিতে পারে না। প্রকৃত অভাবোদ্ভূত অনুভূতির কথা স্বতন্ত্র। নচেৎ যাহা পাইলে জাতীয় জীবন উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে,—পরের মুখে সে বিষয়ের অমূল্য উপদেশ কথা শুনিয়া সে অনুভূতি আসা খুবই দুরূহ। প্রকৃত অভাবের তীব্র তাড়নামূলক নহে, এমন, বা সে অনুভূতি-রহিত, স্বরাজ-সাধনার মধ্যে আন্তরিকতার অস্তিত্ব বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। সকল জাতির মধ্যেই দুই পাঁচ জন মানুষকে সময় সময় অনেক অগ্রসর হইয়া যাইতে দেখা যায়। তাঁহাদের সাধনাকে ভিত্তি করিয়া জাতির সাধনার মূল সূত্র রচিত হইতে পারে; কিন্তু তাহা বা তাহাদের দেখাদেখি আকুলতাবিহীন অন্তঃসারশূন্য কেবল বাক্যের সমষ্টিকে জাতির সাধনা বলিতে পারা যায় না।

তর্ক বাঁচাইয়া পদে পদে চলিতে হয়। বর্ত্তমানের শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিমাত্রই যে আত্মমর্য্যাদাহীন, বিবেকহীন, মনুষ্যত্বশূন্য, এ কথা আমি বলি না। শিক্ষাতেই এ সব গুণাবলীর বিকাশ হয়। কিন্তু উপস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ত্রুটির দিক লক্ষ্য করিয়াই যাহা কিছু

থাকি। এই শিক্ষিতদের মধ্যে যথার্থ মনুষ্যপদবাচ্য অনেকে আছেন, তাহা বলাই বাহুল্য। আবার উক্ত শিক্ষাহীন-মাত্রই যে মনুষ্যত্ববর্জ্জিত, তাহাও নহে।

আমাদের স্বরাজ সাধনা ব্যাপক হোক বা না হোক,—কৃত্রিম অকৃত্রিম যাহাই হউক,—যথার্থ সাধকদিগের সিদ্ধিলাভের পথে একটা বড় ধাঁধা রহিয়াছে। তাহার অপসারণ ভিন্ন সাফল্য কল্পনা করা ভুল যদি নাও হয়, তথাপি, তাহা নিরতিশয় কষ্টসাধ্য। ভারতে হিন্দু-মুসলমানের চির-দ্বন্দ্বের অবসান ব্যতিরেকে, ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সমাজে ব্যক্তি ও সম্প্রদায়গত পরাধীনতার নিগড় মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, স্বরাজ লাভ স্বপ্নসম অলীক বলিয়াই মনে হয়। ইতর, অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য প্রভৃতি আখ্যাত আপামর সাধারণ জাতি সমূহকে, উন্নত শ্রেণী বলিয়া যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা আপনার করিয়া লইতে না পারিলে, জাতির অর্দ্ধেক নারীজাতির ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে না পারিলে, স্বরাজ-সাধনা সাফল্য-মণ্ডিত হইতে পারে না। প্রভুত্বের জন্য, দম্ভের জন্য, স্বার্থের জন্য, দুঃখ, মর্ম্মবেদনা, অসন্তুষ্টি, অশান্তিকে স্বেচ্ছায় হৃদয়ে স্থান দিয়া কাহারও পক্ষে কোন শ্রেষ্ঠ স্তরে পৌছান সম্ভবপর হইতে পারে না। যে নিজে বিবিধ ভাবে আক্রান্ত, তার পক্ষে উচ্চ পথে অগ্রসর হওয়া চলে না। অন্তরের মধ্যে নিত্য সংগ্রাম লইয়া অন্ধকার কণ্টকময় পথ ধরিয়া গন্তব্য স্থানে পৌছিবার কল্পনা বাস্তবে পরিণত করা সম্ভবপর নহে। আত্মপক্ষ সুদৃঢ় না হইলে অপরের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ হয় না।

যে কোন সাধনার মূলে ব্যক্তিগত বা অপর গোপনীয় উদ্দেশ্য থাকিতে, স্বরাজের মত কোন জিনিষ পাওয়া যাইতে পারে না। স্বল্প কতিপয়ের মধ্যে আন্তরিকতার অভাব না থাকিতে পারে; কিন্তু সমগ্র জাতির সে আন্তরিকতাপূর্ণ স্বরাজ-সাধনার মত কারণ এখনও উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অন্নাভাব যথেষ্ট হইলেও অনাহারে মরিবার পূর্ণ লক্ষণ এখনও প্রকট হয় নাই। আত্মমর্য্যাদা নাশের জ্বালায় সমগ্র বা জাতির অধিকাংশকে এখনও বিচলিত করিতে পারে নাই। বিচলিত হইবার মত অবস্থা যদিও হইয়া থাকে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা এখনও অনেকেরই আসে নাই। সে জন্য জাতির আত্মমর্য্যাদা বোধ জাগিবার মত শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন। নচেৎ দুই-একটা জালিনওয়ালাবাগের অভিনয় দ্বারা তাহা হইবে না। কোথায় কে উপাধি বর্জ্জন করিলেন, কোথায় হাকিমি বা ওকালতি ত্যাগ করিলেন,—ত্যাগের হিসাবে সে যাহাই হোক, তাহাতেই এমন একটা পরাধীন জাতির স্বাধীনতা বা স্বরাজ আসিতে পারে না। নিরন্ন বেকারগণের উত্তেজনায় হয় ত কোন দেশে স্বরাজ আনিবার কথঞ্চিৎ উপায় হইতে পারে। আমাদের দেশে অন্নহীন বেকার আছে, বিলাত জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশেও আছে। কিন্তু তথাকার কথা, আর এই মরণ পথের পথিক প্রাণশূন্য বেকারদের কথা স্বতন্ত্র। সেখানকার বেকার-সমস্যা তথাকার রাজশক্তিকে বিচলিত করিতে পারে। এখানে রাজার কাছে সেটা এমন একটা সমস্যাই নহে। এখানে বেকারগণ ভিক্ষা করিতে করিতে নির্ব্বিরোধে নিঃশব্দে তিল তিল করিয়া মরা সহজ মনে করে। জাতি বলিতে এখানে শুধু হিন্দু মুসলমান বা বাঙ্গালীকে লক্ষ্য করিয়া বলি নাই, ভারতবাসীকেই একটা জাতি বলিয়া ধরিয়াছি।

ত্যাগের কথা হইতেছিল। ত্যাগ স্বরাজ লাভের একটি অমোঘ অস্ত্র। কিন্তু সে ত্যাগ যথার্থ ত্যাগ হওয়া আবশ্যক। ত্যাগের মুখোসের মধ্যে ভিন্নাকারে ভোগের মূর্ত্তি লুকান থাকিলে চলিবে না। কাহাকেও অর্থ উপার্জ্জনে বিরত হইয়া দেশের কাজের নামে এদিক ওদিক করিতে দেখিলে, বা প্রকাশ্যে বিলাস বা ভাল বসন ভূষণ ত্যাগ করিতে দেখিলেই যে তাহাকে ত্যাগি-শ্রেষ্ঠ মনে করিতে হইবে, তাহা বলিতে পারা যায় না। ধন, বিলাস, ব্যসন এমন কি গৃহ, সংসার সব ত্যাগ করিয়াও যাহার সাধনায় মানুষকে বিভোর থাকিতে দেখা যায়, এমন কি তাহারই জন্য যে উক্ত সকল ত্যাগ, সে ত্যাগে কিছুই হইবে না।

স্বরাজ ভারতের কাম্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। উৎপীড়ন অত্যাচার হইতে তাহা পাইবার সুযোগ আসিতে পারিলেও তাহা কখন ঈপ্সিত হইতে পারে না। কিন্তু আমাদের ম্লান আত্মমর্য্যাদায় ঘা দিয়া জাগাইতে হইলে, সেজন্য এখনও অত্যাচার অপমানের বাকি আছে। এ পথ দিয়া আমাদের স্বরাজ পাইতে হইলে নিত্য অধিকতর উৎপীড়ন আবশ্যক। চিন্তাশীল ভিন্ন ভিন্ন মহাত্মাদিগের দ্বারা

নির্দ্দিষ্ট স্বরাজলাভের ভিন্ন ভিন্ন পথ আবিষ্কৃত হইয়া থাকিতে পারে, এবং সে পথ সত্যই স্বরাজের বাঁধা পথ হইতে পারে। কিন্তু সে পথে যাইয়া কাম্যফল আনিবার পথিক কয়জন? আনিবার জন্য যে লোকের দরকার, তাহাই অগ্রে গঠিত হওয়া আবশ্যক। যাঁহাদের প্রাণ সত্যই দেশের জন্য কাঁদিয়াছে, সেই সকল মহাত্মগণ মিলিয়া এখন মাত্র সেই প্রকৃত গঠনকার্য্যে মনোনিবেশ করাই আগেকার কার্য্য। নচেৎ একটা নূতন কিছু করিয়া দেশের নামে অলীক আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ প্রসারের চেষ্টা করিয়া কিছুই হইবে না। পূজার দালানে জগজ্জননীর প্রতিমা আনিয়া মায়ের পূজার অছিলায় আত্মপূজার আয়োজন দ্বারা সাধারণ নিরীহ দশজনের চক্ষে ধুলা দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা যেমন প্রকৃত মাতৃপূজা সাধিত হয় না, সেইরূপ জাতির মুক্তিও ভণ্ডামির দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। সেজন্য শঠতা-কপটতারহিত, পূত পবিত্র দেহ মনে উৎকট সাধনায় আপনাকে পূর্ণ উৎসর্গ দ্বারা সুপ্ত শক্তি জাগ্রত করা ভিন্ন দুটো মুখের কথায় স্বরাজ আসিবে না। স্বরাজের নামে স্বকে পুরোবর্ত্তী করিবার হীনতা দেশ আর সহ্য করিবে না। দেশের জন্য দেশবাসীর ঐকান্তিকতা চাই। যতদিন তাহা না আসিবে, ততদিন একজন যোগ-নিরত ত্যাগী মহাত্মা বা একজন সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহামানব দেহে-মনে বিদগ্ধ হইয়াও স্বরাজ আনিতে পারিবেন না। বঙ্গবিধবার দুঃখে কাতর হইয়া মহাত্মা বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহের প্রচেষ্টা বিফল হওয়ার মত জগদ্বরেণ্য মহাত্মা গান্ধীর প্রচেষ্টাও বিফল হইবে। পরন্তু দেশ যেদিন প্রকৃত স্বরাজকামী হইয়া উহা পাইবার জন্য অন্তরে অন্তরে লালায়িত হইবে, সেদিন স্বরাজ বিনা আয়াসে আপনা হইতেই আসিবে। যে শিক্ষায়, যে সাধনায় সেই আকুলতা আসে—ভগবান এই মরা জাতির হৃদয়ে তাহা কবে আনিয়া দিবেন, তিনিই জানেন। ভগবানের কাছে দয়ার ভিখারী হইতে হইলে স্বতঃই মনে হয়। তিনি আমাদের সেই স্বরাজ দিন, যাহার পথ—রাষ্ট্রীয় স্বরাজ আনবার আগে,—রাজা প্রজা সকলের জন্য—চিরদিন সমানভাবেই উন্মুক্ত আছে। যাহা পাবার জন্য যুদ্ধ, বিগ্রহ, বিদ্রোহ, অসহযোগের আবশ্যক হয় না। রাজ আইনে যাহার পথ রুদ্ধ নহে এবং যাহা পাইলে স্বরাজ না পাইয়াও ব্যক্তিগতভাবে অনেক বিষয়েই রাষ্ট্রিয় স্বরাজলাভের সমান হয়। সেই নিজের মধ্যে জ্ঞান গরিমা মণ্ডিত স্বরাজ বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, যাহার অধিকারী হইতে পারিলে তখন আর রাষ্ট্রীয় স্বরাজ পাইবার জন্য ভিক্ষা বা যুদ্ধ কিছুরই আবশ্যক হইবে না। ঐশ্বর্য্যশালী ও আভিজাত্যের দাম্ভিকতা দরিদ্রের দিকে রক্ত কটাক্ষ দেখাইতে পারিবে না। ভগবান কি এই দীন দুর্ব্বল অভিশপ্ত জাতিকে সত্যপ্রতিষ্ঠিত প্রেমমূলোদ্ভব সেই স্বরাজ দিবেন না?

মিলিত

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম-এ বি-এল্

আমার একার সুখ, সুখ নহে ভাই,
সকলের সুখ, সখা, সুখ শুধু তাই!
আমার একার আলো সে যে অন্ধকার,
যদি না সবারে অংশ দিতে আমি পাই।
সকলের সাথে বন্ধু, সকলের সাথে,—
যাইব কাহারে বল ফেলিয়া পশ্চাতে?
ভাইটি আমার সে যে ভাইটি আমার,
তারে ছেড়ে যেতে পারি এমন প্রভাতে?
নিয়ে যদি নাহি পারি হতে অগ্রসর,
সে আমার দুর্ব্বলতা, শক্তি সে তো নয়।
সবাই আপন হেথা, কে আমার পর;
হৃদয়ের যোগ সে কি কভু ছিন্ন হয়?
এক সাথে বাঁচি আর এক সাথে মরি'
এস বন্ধু, এ জীবনে সুমধুর করি।

অমলা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১

শীতকালের দিন,—পাঁচটা বাজিতে বাজিতেই সন্ধ্যা হইয়া আসে। হরমোহন মুখোপাধ্যায় অফিস হইতে আসিয়া সামান্য জলযোগ করিয়াই গৃহিণী প্রভাবতীকে কহিলেন, "একটা গায়ের কাপড় দাও, একবার বেরোতে হবে।"

স্বামী অফিস হইতে যখন আসেন, তখনই তাঁহার মুখে একটা গভীর চিন্তার রেখা প্রভাবতী লক্ষ্য করিয়াছিলেন; মনে করিয়াছিলেন, হরমোহন জলযোগ করিলে সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন। তাহার উপর হরমোহন বাহিরে যাইবেন শুনিয়া প্রভাবতী বুঝিলেন, নিশ্চয়ই একটা কোন অশুভ ঘটনা ঘটিয়াছে, কারণ, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত সন্ধ্যার পর হরমোহন গৃহ হইতে বাহির হইতেন না,—বিশেষতঃ শীতের রাত্রে।

চিন্তান্বিত হইয়া প্রভাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মুখ শুক্নো দেখ্‌চি; কি হয়েছে বল দেখি? কোথায় যাবে এখন?"

বিমর্ষ মুখে হরমোহন কহিলেন, "একবার অমলার শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে। আজ অফিস যাওয়ার সময় তার শ্বশুরের একটা চিঠি পেয়েছিলাম, তখন আর তোমাকে দেখাই নি। অফিসের কোটের পকেটে আছে, বার করে দেখ।"

প্রভাবতী তাড়াতাড়ি পত্র বাহির করিয়া পাঠ করিলেন। অমলার শ্বশুর, অর্থাৎ হরমোহনের বৈবাহিক গোবিন্দনাথ, হরমোহনকে পত্র লিখিয়াছেন। পত্রে লেখা ছিল, "যে আপনার বংশগত কলঙ্কের কথা গোপন করিয়া ভদ্রলোকের ঘরে কন্যা সমর্পণ করে, তাহাকে আমি ইতর মনে করি। আমার গৃহে অব্রাহ্মণের কন্যার স্থান কিছুতেই হইবে না। আপনার কন্যার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ দিয়া আমি সমাজে পতিত হইয়াছি; বিধিবৎ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে উঠিব। অদ্য হইতে আপনার কন্যা আমার পুত্রবধূ নহে। যত শীঘ্র সম্ভব আমি আমার পুত্রের বিবাহ দিব। আপনি আজ সন্ধ্যার পর আসিয়া আপনার কন্যাকে লইয়া যাইবেন; নচেৎ তাঁহাকে আজ রাত্রেই ভৃত্যের মারফৎ আপনার গৃহে পাঠাইয়া দিব।"

তিনমাস হইল হরমোহনবাবুর কন্যা অমলার সহিত বিজয়নাথের বিবাহ হইয়াছে। বিজয়নাথের পিতা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর এই মহা বিপ্লবের মধ্যেও হিন্দুধর্ম্মের চরম গোঁড়ামীতে নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন; এবং সামাজিক খুঁটিনাটির সামান্য ব্যতিক্রমও তিনি সহ্য করিয়া চলিতেন না। তাই কয়েক দিন হইতে একটা কোনও সংবাদ অবগত হইয়া অবধি তাহার সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য বিশেষরূপে অনুসন্ধান লইতেছিলেন। আজ প্রত্যুষে সে সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ অবগত হওয়ার পর, আর এক দিনও অপেক্ষা না করিয়া, তদণ্ডেই নূতন বৈবাহিক হরমোহনকে পত্র লিখিয়া ভৃত্যের মারফৎ পাঠাইয়া দিলেন।

গোবিন্দনাথের পত্র পাঠ করিয়া প্রভাবতী চিন্তায় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। হরমোহনের পিতামহের জন্ম বিষয়ে একটা কাহিনী বহু দিন হইতে প্রচলিত আছে। এক সময়ে তাহা লইয়া এমন একটা গোলযোগ উপস্থিত হয় যে, তাহার ফলে হরমোহনের পিতাকে গ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে হয়। কলিকাতায় সমাজ নাই, সুতরাং দলাদলির উপদ্রবও নাই। সমাজের জগন্নাথ-ক্ষেত্র কলিকাতায় আসিয়া হরমোহনের পিতা শান্তিলাভ করিলেন। মধ্যে আর কোনও গোলযোগ ছিল না। হরমোহনের বিবাহের সময়ে একবার সেই কথা উঠিয়াছিল,—কিন্তু প্রভাবতীর পিতা তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। তাহার পর আর কখনও এ প্রসঙ্গ উঠে নাই। গোবিন্দনাথের পত্রে যে সেই প্রসঙ্গেরই উল্লেখ ছিল, তাহা বুঝিতে প্রভাবতীর বিলম্ব হইল না।

পত্রখানা মুড়িয়া রাখিয়া প্রভাবতী চিন্তিত মনে কহিলেন, "তুমি কি বলবে?"

হরমোহন কহিলেন, "দেখি, যদি বুঝিয়ে সুঝিয়ে মন থেকে ও কথাটা দূর করতে পারি।"

"অমলকে নিয়ে আসবে ?"

"সহজে আনব না। তবে যদি একান্ত না শোনে, তা হলে ত আর ফেলে আস্‌তে পারব না !"

প্রভাবতী কহিলেন, "এনো না। আজ যদি অমলা তোমার সঙ্গে চলে আসে, তাহলে ব্যাপারটা পাকা হয়ে দাঁড়াবে; পরে আর পাঠান শক্ত হবে। আর একটা কথা, রাগারাগি কোরো না; তুমি আবার একটুতেই রেগে ওঠ। তুমি যখন মেয়ের বাপ, তখন তোমাকেই নীচু হতে হবে।"

হরমোহন প্রভাবতীর দিকে একটু বিরক্তি-ব্যঞ্জক দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, "কেন, মেয়ের বাপ বলে আমার আত্ম-সম্ভ্রমের জ্ঞান থাকৃতে নেই না কি ?"

প্রভাবতী দেখিলেন, আর কথা বাড়াইলে বিপরীতই হইবে; হরমোহন গৃহ হইতেই ক্রুদ্ধ হইয়া যাইবেন। তাই, আর কোনও কথা না বলিয়া, একখানা গাত্রবস্ত্র আনিয়া হরমোহনকে দিলেন। দুর্গা নাম স্মরণ করিয়া হরমোহন গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

(২)

ওয়েলিঙ্গটন্ স্কোয়ারের নিকট গোবিন্দনাথের বৃহৎ অট্টালিকা। বৈঠকখানায় সুবিস্তৃত শয্যার উপর অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় গোবিন্দনাথ আলবোলার দীর্ঘ নল হস্তে করিয়া তামাক খাইতেছিলেন; এবং নিকটে বসিয়া প্রতিবেশী বিনোদ পাল চামচ নাড়িয়া ফুটন্ত চা শীতল করিতেছিলেন।

গোবিন্দনাথ মুখ হইতে নল সরাইয়া, বিনোদ পালের দিকে অর্দ্ধোন্মীলিত চক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "কি হে ? এ কথা জেনে শুনে কি বাড়ীতে স্থান দেওয়া যায় ? তুমিই বল না। স্থান দেওয়া যায় কি ?"

বিনোদ পাল চায়ের পেয়ালা মুখে তুলিয়াই, পুনরায় ডিসের উপর নামাইয়া রাখিয়া, চামচ দিয়া একমনে চা নাড়িতে লাগিলেন।

"বল না হে ? কথা কচ্ছ না কেন ? তোমার হলে তুমি রাখতে ?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া বিনোদ কহিলেন," তা বটে ! তবে কি না মেয়েটার জন্যে বড় দুঃখ হয় !"

গোবিন্দনাথ উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, "তা কি করব ! সংসারের নিয়মই এই,—একজনের দোষে আর একজন কষ্ট পায়।"

বিনোদ কোন উত্তর না দিয়া চায়ের পেয়ালা মুখে তুলিলেন।

একজন ভৃত্য আসিয়া কহিল, "বৌদিদির বাপ এসেছেন।"

গোবিন্দনাথ কহিলেন, "এইখানে নিয়ে আয়।" বলিয়া পুনরায় তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া শুইয়া পড়িলেন।

বিনোদ পাল ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "আমি তবে উঠি ভায়া !"

গোবিন্দনাথ কহিলেন, "বিলক্ষণ ! তোমার সামনেই সব কথা হবে বলেই ত' এই শীতে তোমাকে ডাকিয়েছি ! তুমি বোস।"

"আমি থাকলে একটু অসুবিধা হবে না কি ?"

"কিছু না !"

হরমোহন ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করিয়া গোবিন্দ-নাথকে বিনীতভাবে নমস্কার করিলেন। প্রতি-নমস্কার না করিয়া গোবিন্দনাথ অঙ্গুলি সঙ্কেতে একটা চেয়ার দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, "বসুন।"

হরমোহন আসন গ্রহণ করিলে গোবিন্দনাথ কহিলেন, "গাড়ী নিয়ে এসেছেন ত' ?"

হরমোহন মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "আজ্ঞে না।"

"কেন ?"

হরমোহন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া একবার বিনোদ পালের দিকে চাহিলেন। সে চাহনির অর্থ বিনোদ সহজেই বুঝিল। কহিলেন, "গোবিন্দ, আমি আসি ভাই।" বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিলেন।

গোবিন্দনাথ ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "না, না, বোস বোস। তোমার সঙ্কুচিত হবার কোন কারণ নেই। এ অন্তঃপুরও নয়, আর মন্ত্রণা-ঘরও নয়,—এখানে কোন গুপ্ত কথাও হবে না।" আলবোলা হইতে কলিকা উঠাইয়া বিনোদের হস্তে দিয়া কহিলেন, "এই নাও, তামাক খাও, তোমার পাশে হুঁকা রেখে গিয়েছে।"

হরমোহনকে লক্ষ্য করিয়া বিনোদ কহিলেন, "আগে উনি খান।" বলিয়া গোবিন্দনাথের আলবোলায় কলিকা রাখিতে গেলেন।

ব্যস্তভাবে বাধা দিয়া গোবিন্দনাথ কহিলেন, "আমার ঘরে শুধু বামুন-কায়েতেরই হুঁকা আছে,—ওঁদের হুঁকা নেই। তা হলে বাজার থেকে নতুন হুঁকা আনাতে হয়। তুমি খাও।"

গোবিন্দনাথের কথা শুনিয়া হরমোহনের অন্তরে যেন উত্তপ্ত লৌহশলাকা প্রবেশ করিল কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রভাবতীর উপদেশ মনে পড়িয়া গেল—"রাগারাগি কোরো না। মেয়ের বাপকে নীচু হতে হয়।" অতি কষ্টে আত্ম-সম্বরণ করিয়া হরমোহন নীরবে বসিয়া রহিলেন। বিনোদ পাল অতিশয় সঙ্কুচিত এবং ক্লিষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে তামাক টানিতে লাগিলেন।

হরমোহনের দিকে বক্রভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া গোবিন্দ কহিলেন, "গাড়ী আনেন নি, তা আপনার মেয়েকে কি হাঁটিয়ে নিয়ে যাবেন? আপনার যদি তাতে পয়সার সাশ্রয় হয়, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে পথ অনেকটা, একটা গাড়ীর বোধ হয় দরকার হবে।" বলিয়া গোবিন্দনাথ একজন ভৃত্যের নাম করিয়া হাঁক দিলেন।

ভৃত্য আসিলে তাহাকে কহিলেন, "যা, একখানা ঠিকে গাড়ী নিয়ে আয়। শ্যামবাজার যাবে।"

আঘাতের উপর আঘাত খাইয়া হরমোহনের মন একেবারে বাঁকিয়া বসিয়াছিল। হৃদয়হীন অভদ্র গোবিন্দ-নাথকে শান্ত করিবার জন্য তোষামোদ করিতে একেবারেই প্রবৃত্তি হইতেছিল না,—বিশেষতঃ, তাহা করিলেও যখন কোন উপকারের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছিল না। কিন্তু দুর্ভাগিনী কন্যার স্নেহ-করুণ মুখ স্মরণ করিয়া হরমোহন স্থির করিলেন, একবার ভাল করিয়া চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। বিনোদ পালের উপস্থিতির জন্য একটু সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। কিন্তু আর অপেক্ষা করাও চলে না—গাড়ী আসিয়া পড়িলে, তখন আর সুবিধা হইবে না। হরমোহন কহিলেন, "দেখুন, আপনার চিঠি পেয়ে পর্য্যন্ত আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে! এ কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা,—আমার কোন পরম শত্রু আমাকে বিপদে ফেলবার জন্য আপনাকে এ কথা বলেছে। আপনার মত বিজ্ঞ ব্যক্তি—"

হরমোহনের কথায় বাধা দিয়া গোবিন্দনাথ কহিলেন, "আমার বিজ্ঞতায় আপনার যদি কোন সন্দেহ না থাকে, তা হলে জানবেন, আমি আমার কোন কর্ত্তব্য অসমাপ্ত রাখি নি। এ সংবাদ আমি আজ পাই নি,—প্রায় দশ দিন হল পেয়েছি। যখন প্রথম পাই, তখন এ বিষয়ে আপনাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা সমীচীন বলে মনে করিনি; কারণ, সংবাদ ভুল হলে, অকারণ আপনার মনে কষ্ট দেওয়া হত। এ সংবাদ পাওয়া মাত্র আমি অনুসন্ধান আরম্ভ করেছি। সে যেমন-তেমন অনুসন্ধান নয়,—অন্ততঃ পাঁচ ছয় জন লোক আপনাদের গ্রামেই গিয়েছে। তারা সকলেই আপনার পিতামহর বিষয়ে একই সংবাদ নিয়ে এসেচে।"

হরমোহন কহিলেন, "গ্রামে আমাদের শত্রুর অভাব নেই,—তারা সকলেই মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে।"

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া গোবিন্দনাথ কহিলেন "এ কথা মন্দ নয়! ভদ্রলোকদের বিশ্বাস করব না,—আর বিশ্বাস ক'রব আপনাকে!"

আত্মসম্বরণ করা হরমোহনের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। কহিলেন, "কেন, আমি কি অভদ্র না কি?—"

গোবিন্দনাথ দৃঢ় স্বরে কহিলেন, "সে বিষয়ে সন্দেহ আছে না কি? যে অব্রাহ্মণ হয়ে এমন করে ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ করে, তাকেও ভদ্র বলতে হবে না কি? আপনার বাড়ী থেকে আমি মেয়ে এনেছিলাম বলে তবু আমার পরিত্রাণের একটা পথ আছে,—যে আপনার ঘরে কন্যা সমর্পণ করবে, তার কি উপায় হবে বলুন দেখি! হাড়ি মুচি ডোমকেও ভদ্র বলতে পারি, কিন্তু আপনাকে পারিনে!"

গোবিন্দনাথের কথা শুনিয়া বিনোদ পাল মনে মনে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিলেন। কড়িকাঠের দিকে উদাস ভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "গোবিন্দ, মিছে কথা বাড়িয়ে কোন লাভ নেই। তুমি যা করবে, তা ত করবেই, মিছে ভদ্রলোককে—"

বাধা দিয়া গোবিন্দনাথ উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, "তুমি ভুল করছ বিনোদ! গোবিন্দ চাটুয্যে ভদ্রলোকের মর্য্যাদা রাখতে জানে,—ভদ্রলোককে আপনার বৈঠকখানায় বসিয়ে অপমান করবে এত ইতর সে নয়! কিন্তু—"

বিনোদ বিব্রত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "গোবিন্দ, তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না; আমি তোমাকে চুপ করতেই বলেছিলাম পুনরুক্তি করতে বলি নি! আমার সে উদ্দেশ্য ছিল না।"

গোবিন্দনাথের দুর্ব্বাক্যের নিষ্ঠুর পীড়নে হরমোহনের মন একেবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল! এক দিকে গোবিন্দনাথের দুর্ব্ব্যবহার, এবং অপর দিকে কন্যার অনিষ্টের আশঙ্কা—এই উভয়ের নিষ্পেষণে হরমোহনের আত্মসম্মান এতক্ষণ উৎপীড়িত অথচ উপায়হীন হইয়াছিল। সহসা তাহা যখন প্রবলভাবে সাড়া দিয়া উঠিবার উপক্রম করিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই বিনোদচন্দ্র ক্ষীণভাবে তাঁহার পথ অবলম্বন করায় হরমোহন চিত্ত সংযত করিবার অবসর পাইলেন। বাষ্পের অতিরিক্ত বেগে বয়লার ফাটিবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় তাহার এক পাশে একটি ছিদ্র করিয়া দেওয়ায়, ক্রুদ্ধ বায়ু সেথান দিয়া কিয়ৎ পরিমাণে নির্গত হইয়া গেল। অগ্নির মূর্ত্তি ধরিয়া যাহা জ্বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিল,—সহানুভূতির ক্ষীণতম আঘাতেই তাহা অভিমানের আকারে রূপান্তরিত হইয়া গেল। হরমোহন কহিলেন, "আমি না হয় অভদ্র,—ধরুন, আমি আপনার নিকট কথাটা গোপন রেখে গুরুতর অপরাধ করেছি; কিন্তু আমার মেয়ের ত' কোন অপরাধ নেই,—তাকে কেন পায়ে ঠেলবেন? তার প্রতি দয়া করুন!"

গোবিন্দনাথ কহিলেন, "একজন পাপ করে, আর একজনকে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়,—এই ত' সংসারের নিয়ম। প্রবঞ্চনা করে ভদ্রলোকের ঘরে মেয়ের বিয়ে না দিয়ে, যদি নিজেদের সমাজের মধ্যে দিতেন, তা হলে আর আপনার মেয়ের কষ্টের কোন কারণ হোত না। আপনার মেয়ে কষ্ট পাবে বলে ত' আমি ধর্ম্মত্যাগ করতে পারি নে!"

হরমোহন তপ্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "আমার নিরপরাধা কন্যার সর্ব্বনাশ করে ধর্ম্মের নামে আপনি যে মহা অধর্ম্ম করছেন, ঠিক জানবেন এর প্রায়শ্চিত্ত আপনাকেও করতে হবে,—আপনিও বাদ পড়বেন না!"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিকৃত স্বরে গোবিন্দনাথ কহিলেন, "প্রায়শ্চিত্ত আমাকে ত' করতেই হবে। কিন্তু আপনার যুক্তিটা ঠিক বুঝলাম না ত! আপনার কন্যা যদি নিরপরাধ হয়, তা হলে একজন বেশ্যার মেয়েরই বা অপরাধ কোথায়? তারও ত' জ্ঞানকৃত কোন দোষ বা পাপ নেই?"

গোবিন্দনাথের এই তুলনার উক্তিতে হরমোহনের স্ত্রীর উপর প্রত্যক্ষ ভাবে হয় ত' কোনও আঘাত ছিল না,—কিন্তু হরমোহন তাহাই মনে করিয়া একেবারে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ধৈর্য্যের উপরে কিছুক্ষণ হইতে প্রবলভাবে যে উৎপীড়ন চলিতেছিল সহসা তাহা যখন এইরূপে নির্ম্মম ভাবে সীমা অতিক্রম করিল, তখন হরমোহন কন্যার ইষ্ট অনিষ্টের কথা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গেলেন। শত শিখায় যাহা দাবানলের মত প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, আর তাহাকে বৃথা আশা বা আশঙ্কায় চাপিয়া রাখা গেল না। উন্মত্তের মত হরমোহনের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল; কহিলেন, "তোমার মত চামারের বাড়ী থেকে যত শীঘ্র আমার মেয়েকে নিয়ে যাই, ততই মঙ্গল! মনে করব, আজ হ'তে সে বিধবা হয়েছে, আজ নিজ হাতে তার সাঁথের সিঁদুর মুছে দেব! তোমার মত পাপিষ্ঠের মুখ দর্শন করলেই তার পাপ হবে!"

শুনিয়া গোবিন্দনাথ উঠিয়া বসিলেন! হরমোহনের দিকে তীক্ষ্ণ, কুঞ্চিত দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "বটে! বিষ নেই,—কিন্তু কুলোর মত চক্র আছে দেখ্‌চি যে! আমার বাড়ী বসে আমাকে অপমান? আমার জন-দশবার চাকর আছে,—একবার তাদের হাতে আপনাকে অর্পণ করব না কি? তাতে অবিশ্যি আপনার মানের ক্রটি হবে না,—কিন্তু শারীরিক ক্লেশ একটু হতে পারে।" গোবিন্দনাথ চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "দেবী সিং!"

প্রভুর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া দেবী সিং মুহূর্ত্তের মধ্যে কক্ষের ভিতর আসিয়া হাজির হইল "হজুর!"

ব্যস্ত হইয়া বিনোদ পাল কহিলেন, "গোবিন্দ, এ কি ছেলেমানুষী তুমি করছ? তোমার কি বুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছে!" বলিয়া বিনোদ দেবীসিংকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন।

বিনোদচন্দ্রের কথায় কর্ণপাত না করিয়া গোবিন্দনাথ কহিলেন, "নিকালো শুয়ার কো।" বলিয়া হরমোহনকে দেখাইয়া দিলেন।

চাকর দিয়া প্রহারের ইঙ্গিতে হরমোহন লজ্জায়, ঘৃণায় ও আশঙ্কায় কাঠের মত শক্ত হইয়া বসিয়া ছিলেন।

গোবিন্দনাথের আদেশ শুনিয়া বেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; এবং বাঁশের মোটা লাঠিটা শক্ত করিয়া ধরিয়া দেবীসিংএর দিকে আরক্ত নয়নে চাহিয়া কহিলেন, "খবরদার, এক পা এগোলে মাথা গুঁড়িয়ে দোব!"

বিড়ালের চেয়ে কুকুরের শক্তি অধিক, এ ধারণা বিড়ালেরও আছে, কুকুরেরও আছে। কিন্তু নিরুপায় অবস্থায় বিড়াল যখন সম্মুখের দুই পা উঁচু করিয়া বিকট মুখভঙ্গীর সহিত ফ্যাঁস্ ফাঁস্ শব্দ করিতে থাকে, তখন কুকুরকেও আপনার শক্তির বিষয়ে সন্দিহান হইতে হয়। নিরীহ হরমোহনকে গোবিন্দনাথ অসঙ্কোচে আক্রমণ করিয়া চলিয়াছিলেন, কিন্তু সহসা যখন হরমোহন নিজের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দাঁড়াইলেন, তখন গোবিন্দনাথ বা দেবী সিং কেহই ব্যাপারটা সুবিধার বিবেচনা করিল না। দেবী সিং মনে করিল, প্রভুর আদেশ পালন করিতে গিয়া পৈত্রিক মস্তককে ওরূপ ভাবে বিপন্ন কর কোন ক্রমেই উচিত নহে; এবং গোবিন্দনাথ স্পষ্ট বুঝিলেন, যে বাক্যের ভিতরে যতই ঝাঁজ ভরিয়া দেওয়া যাউক না কেন তাহাতে মানুষের মাথা ফাটে না; পরন্তু বাঁশের লাঠি অতিরিক্ত মোটা হইলে অবলীলাক্রমেই ফাটে! প্রথমে কাহার মস্তকের উপর বংশ-দণ্ডের পরীক্ষা করিবেন, হরমোহন তাহাই ভাবিতেছিলেন কি না, ঠিক জানি না, এমন সময়ে, বাহিরে বারাণ্ডায় পরিচারিকার অনুবর্ত্তিনী একটি বালিকা-মূর্ত্তি দেখা গেল। সেই মূর্ত্তি দেখিবামাত্র হরমোহন বেগে ঝড়ের মত ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গিয়া, বালিকাকে দুই বাহুর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া কহিলেন, "চল্ মা, চল্ মা! এ পাপ-পুরী যত শীঘ্র ছেড়ে যেতে পারিস ততই ভাল!" বলিয়া বালিকাকে লইয়া হরমোহন গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন।

গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ যখন মিলাইয়া গেল, তখন গোবিন্দনাথ তাকিয়ায় হেলান দিয়া কহিলেন, "আঃ, পাপ গেল!"

বিনোদচন্দ্র প্রস্থানের উদ্দেশ্যে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গোবিন্দনাথ কহিলেন, "এরি মধ্যে চললে কেন হে? তামাক খেয়ে যাও।"

বিনোদ কহিলেন "না, আর বসব না। রাত হয়েছে।" বলিয়া বিনোদ চলিয়া গেলেন। (ক্রমশঃ)

জয়চন্দ্র *

রায় শ্রীপ্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর বি-এল্

ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা আছে। উহা রাজা, মহারাজা, সম্রাটের জন্ম, মৃত্যু ও তাঁহাদের রাজত্বের কাল-নির্ণয় মাত্র নহে। কি কারণে ও কি কি অবস্থায় এক দেশ অন্য দেশবাসীদের করায়ত্ত হইয়াছে; পরাজিত রাজা বা জাতির কি দুর্ব্বলতা ছিল ও জেতার কি গুণ ছিল; কি দোষে এক জাতির অধঃপতন আরম্ভ ও অধঃপতনে সে জাতির শেষ হইয়াছে; কি কারণে অন্য জাতি কোন্ বিষয়ে শ্রেষ্ঠতার জন্য তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছে ও কি উপায়ে প্রজাবর্গ ও অন্যান্যের উপর আধিপত্য করিয়াছে; কোন্ রাজাদের অধীন প্রজাদের কি উপায়ে কি কি স্বত্ব ও স্বার্থ ও অধিকার লাভ হইয়াছে ও তাহাদের উন্নতি হইয়াছে; কোন্ রাজত্বকালে তাহাদের স্বত্ব ও স্বার্থ ও অধিকার হইতে তাহারা কিরূপে বঞ্চিত হইয়াছে ও তাহাদের অধোগতি হইয়াছে; কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প কি উপায়ে কোন্ রাজত্বকালে উন্নত হইয়াছে ও কোন্ রাজত্বকালে তাহার ধ্বংস হইয়াছে ও তাহার কারণ; কোন্ রাজত্বকালে কি সুব্যবস্থায় প্রজাগণের স্বাস্থ্য বিস্তার, জ্ঞানে ও অর্থোপার্জ্জনে অগ্রসর হইয়াছে ও কোন্ রাজত্বে কাহার দোষে প্রজাগণ জ্ঞান-বিদ্যা-বিরহিত হইয়াছে; কি প্রকারে ও কোন্ অবস্থায় দেশে ধনাগম

* পাবনা "কিশোরীমোহন" ছাত্রগণের পাঠাগারের নবম বার্ষিক অধিবেশনে, ১৩৩০ সালের ২২শে ভাদ্র তারিখে পঠিত।

হইয়াছে ও কি প্রকারে তাহার প্রতিরোধ হইয়াছে; জেতার নিকট হইতে বিজিত জাতি কি কি সদ্‌গুণ ও দোষ গ্রহণ করিয়াছে ও নিজের কি কি সদ্‌গুণ হারাইয়াছে; জেতা ও বিজিত জাতির পরস্পরের সম্মিলনে উভয়ের ভাষার সম্পদ্‌ কি পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে ও চিন্তায় স্রোতের কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে—এই সকল লক্ষ্য করিয়াই ইতিহাস পাঠ করা উচিত। তাহা না হইলে, এক রাজত্বের অবসান, অন্য রাজত্বের অভ্যুত্থান ও তাহার সন, তারিখ জানিয়া কোন বিশেষ লাভ নাই; আর তাহাতে বিশেষ অভিজ্ঞতাও জন্মে না। ইতিহাস পাঠে যদি অভিজ্ঞতা না জন্মিল, তবে ইতিহাস পাঠ বৃথা।

ইতিহাস যাঁহারা লিখিয়াছেন বা যাঁহারা উহার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহাদের চরিত্র ও সত্যবাদিতার উপর ইতিহাসের মূল্য অনেকটা নির্ভর করে। কোন কোন ঐতিহাসিক পক্ষাবলম্বী হইয়া মিথ্যা রটনা করেন বা প্রকৃত ঘটনায় অপলাপ করিয়া ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করেন; কেহ বা কতক সত্য গোপন করিয়া নিজ মনোমত ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। এক জাতি বা এক রাজা পরাস্ত হইলে, পরবর্ত্তী রাজার গুণগ্রাম যে ঘোষিত হইবে, তাহা ত' নিশ্চয়। তৎসঙ্গে পরাজিত রাজার নানা দুর্নাম উপস্থিত হয়; ও পরবর্ত্তী রাজা যে মহৎ উপকারের উৎস, তাহাও ঘোষিত হয়। সময় সময় ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, পরাজিত অন্যের স্কন্ধে দোষ চাপাইয়া নিজ পক্ষকে নির্দ্দোষ সপ্রমাণ করিতে, অন্ততঃ নিজ পক্ষের দোষের লাঘব করিতে চাহেন ও কাহারও উপর বিশ্বাস-ঘাতকতার আরোপ করিয়া নিজের দুর্দ্দশার কারণ নির্দ্দেশ করেন। ইহার উদাহরণও অল্প নয়। ইহার বিষময় ফল এই যে, যে কারণ হইতে যে কার্য্যের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার জানিবার সুযোগ হয় না,—মিথ্যা প্রমাণে সত্য নির্ণীত হয় না। অনেক স্থলে প্রমাণ যে মিথ্যা, তাহা দেখান যায়; কিন্তু তাহাতে সত্য ত অবধারিত হইল না।

আমার বর্ত্তমান প্রস্তাব জয়চাঁদ ও মহম্মদ ঘোরী সম্বন্ধে। গজনিপতি মহম্মদ ঘোরী (বা সাহবুদ্দীন) বহুবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া নিষ্ফল-প্রযত্ন হইয়াছিলেন। পরে দৃঢ় অধ্যবসায়ের বলে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহার এই কার্য্য হইতে কি শিক্ষা করিব? ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন :—

> আরভ্যতে ন খলু বিঘ্ন ভয়েন নীচৈঃ
> প্রারভ্য বিঘ্নবিহতা বিরমন্তি মধ্যাঃ
> বিঘ্নৈঃ পুনঃ পুনরপি প্রতিহন্যমানাঃ
> প্রারব্ধ চোত্তমজনা ন পরিত্যজন্তি ॥

বিঘ্ন হইবে, এই ভয়ে যাহারা কার্য্য আরম্ভ করে না, তাহারা নীচ প্রকৃতির লোক। যাহারা কার্য্য আরম্ভ করিয়া উহা হইতে বিরত হয়, তাহারা মধ্যম শ্রেণীর লোক; আর যাহারা সংকল্পিত কার্য্য আরম্ভ করিয়া পুনঃ পুনঃ বিঘ্ন দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়াও প্রারব্ধ কার্য্য হইতে বিরত হয় না, তাহারাই শ্রেষ্ঠ।

ইহা হইতে বুঝিলাম, মহাম্মদ ঘোরীর দৃঢ় প্রচেষ্টার পরিণাম সফলতা। এ ত তাঁহার সদ্‌গুণ। কিন্তু কি দোষে হিন্দু রাজ্য পরদেশবাসীর করতলগত হইল?

এই সম্বন্ধে চাঁদকবি বলেন যে, দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ ও কান্যকুব্জাধিপতি জয়চন্দ্রের মধ্যে ঘোর ঈর্ষা ও বিবাদ বিসম্বাদ ছিল। জয়চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞস্থলে সকল নৃপতি উপস্থিত ছিলেন; ছিলেন না পৃথ্বীরাজ ও তাঁহার ভগ্নীপতি সমরসিংহ। জয়চাঁদ তাঁহাদের অবমাননা করিবার জন্য উভয়ের স্বর্ণমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া, দৌবারিক-বেশ পরিধান করাইয়া উহা যজ্ঞশালার দ্বারদেশে স্থাপন করেন। যজ্ঞান্তে জয়চন্দ্রের কন্যা সংযোগিতা (সংযুক্তা) স্বয়ম্বরা হইবার কথা ছিল। যজ্ঞান্তে সংযোগিতা (সংযুক্তা) অন্যান্য নৃপতিকে উপেক্ষা করিয়া পৃথ্বীরাজের স্বর্ণময় মূর্ত্তির গলে বরমাল্য দিয়াছিলেন।

পৃথ্বীরাজ পূর্ব্ব হইতে অবগত ছিলেন যে, সংযুক্তা তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী। বলা বাহুল্য, শত্রুকে এইরূপে বরমাল্য দেওয়ায়, কানোজরাজ জয়চন্দ্র অতিশয় ক্রোধান্বিত হন। পৃথ্বীরাজ বাহুবলে জয়চন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সংযুক্তাকে হস্তগত করিয়া, নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজের সঙ্গে যুদ্ধে অপারগ হইবেন বুঝিয়া, গজনিপতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; ও তাঁহাকে বহু অর্থ ও সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিলেন। পরে ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরীর সঙ্গে ঘোর যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ পরাজিত হইলেন। পৃথ্বীরাজ যবন-করে বন্দী হইলে তৎপুত্র(রায়নসি

নারায়ণ সিংহ) দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কিন্তু অল্প দিন পরে তিনি মুসলমান কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। সুতরাং দিল্লীরাজ্য মুসলমান হস্তে পতিত হইল। এই ত' গেল চাঁদকবির বর্ণনা। চাঁদকবির বর্ণিত বৃত্তান্ত অনেক ঐতিহাসিকেরা গ্রহণ করিয়াছেন; প্রসঙ্গতঃ এখানে বলা যাইতে পারে যে, চাঁদকবির গ্রন্থ কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট হইলেও, অনেক স্থলে তাহা ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে অসংলগ্ন বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। জয়চাঁদের বিশ্বাসঘাতকতা, স্বদেশদ্রোহিতা, ধর্ম্মদ্রোহিতা কাব্যে ও ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাই কি প্রকৃত সত্য?

বিদ্যাপতির নাম সকলেই জানেন। তিনি "পুরুষ পরীক্ষা" নামক এক গ্রন্থ রচনা করেন। বিদ্যাপতি পাঁচশত বৎসরের কিছু অধিক কাল পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। তৎকালে যে কাহিনী প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা তৎপ্রণীত পূর্ব্বোক্ত পুস্তকে দেখিতে পাই। ৺মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের অনুবাদ হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল। আপনারা দেখিবেন যে, উহাতে জয়চন্দ্র-চরিত্র স্বদেশদ্রোহীরূপে চিত্রিত হয় নাই।

"* * * কান্যকুব্জ নগরে জয়চাঁদ নামে কাশীপুরীর এক রাজা ছিলেন। তিনি সকল দিগ্বিজয় করিয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবীর কর গ্রহণেতে বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া সকল রাজার প্রধান হইয়াছিলেন। শুভদেবী নামে নিজ পত্নীতে অনুরাগী হইয়া তাহার অতিশয় বশীভূত হইলেন এবং সেই স্ত্রীর সহিত নিরন্তর ক্রীড়া করেন।" "* * * এক সময় শাহাবুদ্দীন নামে যবনরাজ চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া যোগিনীপুর হইতে আসিয়া রাজা জয়চন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে কান্যকুব্জ নগরে উপস্থিত হইল। পরে উভয় পক্ষের সৈন্যেতে অনেক কাল যুদ্ধ হইল ও তাহাতে অনেক সৈন্য নষ্ট হইল। * * * পশ্চাৎ যবনরাজ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল এবং ঐ প্রকারে যবনরাজ যুদ্ধ স্থান হইতে অনেকবার পলায়ন করিল।

"* * * যবনরাজ * * জয়চন্দ্র রাজার নগরে এক লোক পাঠাইল। সেই লোক কান্যকুব্জের সংবাদ জানিয়া যবনেশ্বরের নিকট আসিয়া নিবেদন করিল, হে মহারাজ, রাজা জয়চন্দ্রের অনেক সেনা আছে এবং সকল ভৃত্য প্রভুভক্ত এবং রাজার জ্ঞান অতি নির্ম্মল। যবনেশ্বর ঐ কথা শুনিয়া চরকে জিজ্ঞাসা করিল যে, রাজা জয়চন্দ্র কাহার পরামর্শ শুনিয়া কার্য্য করেন। চর নিবেদন করিল রাজা জয়চন্দ্র বিদ্যাধর মন্ত্রীর ও শুভদেবী রাণীর মন্ত্রণা শুনিয়া সকল কার্য্য করেন। * * * এবং রাণীর আজ্ঞার বহির্ভূত হন না।

"* * * পরে যবনরাজ এই বিবেচনা করিলেন যে, ব্রাহ্মণ সর্ব্বত্র প্রবেশ করিতে পারেন। এই কারণ চতুর্ব্বেদবেত্তা এবং সকল ভাষাতে চতুর চতুর্ভুজ, নামা ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে চতুর্ভুজ তুমি দশলক্ষ টাকা লইয়া এবং কান্যকুব্জ নগরে কিছু কাল থাকিয়া ঐ ধন ব্যয়েতে আর আপনার চতুরতাতে শুভদেবী রাণীকে আমার বশীভূতা করিয়া দাও। এই কার্য্য সিদ্ধ হইলে আমি তোমার পূজা করিব।

* * * পশ্চাৎ চতুর্ভুজ ঐ প্রকারে দশলক্ষ টাকা লইয়া জয়চন্দ্র রাজার নগরে উপস্থিত হইলেন। পরে নানা প্রকার চেষ্টাতে রাজ-সভায় গমনাগমন করিয়া রাজার দেবার্চ্চন সময়ে বেদপাঠ করিতে নিযুক্ত হইলেন এবং ক্রমেতে রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাণী ব্রাহ্মণের মিষ্ট বাক্যেতে সন্তুষ্টা হইয়া ব্রাহ্মণকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করেন। ব্রাহ্মণও রাণীর সাক্ষাৎ নানা প্রকার ইতিহাস কহেন। অনন্তর চতুর্ভুজ কোন সময়ে অবকাশ পাইয়া রাণীকে কহিতে লাগিলেন যে, রাজমহিষি, পৃথিবীর মধ্যে তুমি ধন্যা। শাহাবুদ্দিন যবনেশ্বর সর্ব্বদা তোমার গুণ ও রূপের প্রশংসা করেন। রাণী ঐ কথা শুনিয়া কহিলেন যে, যবনরাজ কি আমাকে জানেন। ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, দেবি, যবনেশ্বর তোমাকে জানেন এবং তোমার সৌন্দর্য্যের সকল কথা শুনিয়াছেন। কিন্তু ইহার অতিরিক্ত কথা কহিতে আমি অত্যন্ত ভীত হই! রাণী শুনিয়া কহিলেন, হে বিপ্র, তুমি কিছু ভয় করিও না যে বক্তব্য হয় বল। পরে চতুর্ভুজ রাণীকে ঐ কথা শুনিতে সন্তুষ্টা জানিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন যে, এক সময়ে যবনেশ্বর এক রত্নময় অঙ্গুরীয় পাইয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন, হা বিধাতা, এমন রত্নাঙ্গুরীয় আমাকে দিলেন, কিন্তু শুভদেবীকে আমারে দিলেন না। যদি সেই স্ত্রীরত্নকে আমাকে দিতেন তবে এই রত্নাঙ্গুরীয় তাঁহার হস্তে দিয়া আমি আপনার

জন্ম সার্থক করিতাম অতি সামান্য স্ত্রীর হস্তে এ অঙ্গুরীয় দিব না। এইরূপ বিলাপ করিয়া পুনশ্চ কহিলেন যে, রাজা জয়চন্দ্র শুভদেবীকে পাইয়াছেন, অতএব পৃথিবীর মধ্যে রাজা জয়চন্দ্রই ধন্য। যবনরাজ এইরূপ কহিয়া ঐ অঙ্গুরীয় আপন নিকটে রাখিয়াছেন। হে দেবি, যদি আপনি আজ্ঞা করেন, তবে সেই অঙ্গুরীয় আনিয়া তোমাকে দিতে পারি। রাণী ঐ সকল কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন যে, আমারে সেই অঙ্গুরীয় দিলে, তোমাদের কি ফল হইবে। ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন যে, তুমি স্ত্রীরত্ন, সে রত্নাঙ্গুরীয় তুমি হস্তে দিলেই উপযুক্ত হয়। অতএব তুমি যদি আজ্ঞা কর, তবে সেই অঙ্গুরীয় আনিয়া কল্য তোমাকে দিতে পারি। রাণী ঐ সকল কথা শুনিয়া কোন উত্তর করিলেন না। ব্রাহ্মণ পরদিন সেই অঙ্গুরীয় রাণীকে দিলেন। রাণী পরপুরুষের প্রতি ও পরদ্রব্যেতে কখনও দৃষ্টি করেন নাই। কিন্তু ঐ অঙ্গুরীয় পাইয়া পরম সন্তুষ্টা হইলেন। তখন চতুর্ভুজ রাণীকে সন্তুষ্টা দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে সম্প্রতি আমার পরিশ্রম সফল হইল, এবং যবনেশ্বরের কার্য্য সিদ্ধ হইবে এমত বুঝা যাইতেছে।

"* * * রাণীও এ ব্রাহ্মণের বাক্যেতে ক্রমে ক্রমে যবনরাজের সহবাস বাসনা করিতে লাগিলেন। পরে যবনেশ্বর ঐ সকল সংবাদ শুনিয়া আপনার সকল সৈন্যের সহিত কান্যকুব্জ নগরের সন্নিধানে উপস্থিত হইল।

"* * * পশ্চাৎ উভয় রাজার যুদ্ধারম্ভ হইল। * * পরে শাহবুদ্দিন যবনরাজ ঐ যুদ্ধে রাজা জয়চন্দ্রকে জয় করিয়া তাঁহার দুর্গ গ্রহণ করিল এবং সমুদয় রাজ্য অধিকার করিল। আর কোষের সমস্ত ধন দিয়া আপনার সেনাগণের পরিতোষ করিল কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া জয়চন্দ্র রাজাকে পাইল না। রাজা জয়চন্দ্র কোন স্থানে গিয়াছেন কিংবা তাঁহাকে কেহ নষ্ট করিয়াছেন, ইহার কোন সংবাদ জানিতে পারিল না। অনন্তর যবনরাজ রাজা জয়চন্দ্রের রাণী শুভদেবীকে আপনার নিকটে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে রাজ্ঞি, তুমি রাজা জয়চন্দ্রের কি প্রকারে পত্নী। পরে শুভদেবী উত্তর করিলেন যে, আমি রাজার প্রথম বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নী অতি প্রিয়তমা ছিলাম। সম্প্রতি তোমার অনুরাগ শুনিয়া তোমার ভার্য্যা হইলাম। যবনেশ্বর ঐ কথা শুনিয়া কহিল, ওরে পাপিনি, রাজা জয়চন্দ্র তোর উত্তম স্বামী, তুই তাহার হিত চেষ্টা না করিয়া তাহাকে নষ্ট করিলি, ইহাতে বুঝি যে তুই আমার নিকটে থাকিলে আমাকে নষ্ট করিবি তুই স্বামী-ঘাতিনী, তোকে নষ্ট করা উপযুক্ত। ইহা কহিয়া খড়্গেতে ঐ স্ত্রীর শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া চতুর্দ্দিকে ক্ষেপন করিল।"

আপনারা দেখিলেন, বিদ্যাপতির বর্ণনায়, মহম্মদ ঘোরী অনেকবার জয়চন্দ্র কর্ত্তৃক পরাজিত হন এবং নির্ম্মল জ্ঞানী বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। এই কি তাঁহার শত্রু পৃথ্বী-রাজের শত্রুর সঙ্গে মৈত্রী ভাব ?

চাঁদকবির মতে ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে পৃথ্বীরাজের সঙ্গে শেষ যুদ্ধ হইয়াছিল। পরে বিজয়োন্মত্ত যবনরাজ কানোজ আক্রমণ করিলেন। জয়চন্দ্র পলায়নপর হইলেন। পথি-মধ্যে নৌকা জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। চাঁদ-কবি জয়চন্দ্রকে স্বদেশদ্রোহী, নীচ, স্বার্থপর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ও পরিণামে তাঁহার উপযুক্ত অপমৃত্যু ঘটাইয়া-ছেন। কিন্তু মুসলমান ইতিহাস লেখকদিগের মতে, জয়চাঁদ রণক্ষেত্রে বীরের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে প্রায় লক্ষাধিক সৈন্য সহকারে বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া জয়চাঁদ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। মহম্মদ ঘোরীর সহিত পৃথ্বীরাজের শেষ যুদ্ধের সময়ে জয়চন্দ্র ও পৃথ্বীরাজের মধ্যে ঈর্ষা ও মনোমালিন্য থাকায়, জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজের সঙ্গে সম্ভবতঃ যুদ্ধে যোগদান করেন নাই ; এবং পৃথ্বীরাজ যে জয়চন্দ্রকে ঐ যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাও জানা যায় না ; সম্ভবতঃ মনোমালিন্য বশতঃ আহ্বান করেন নাই। পৃথ্বীরাজের বিপুল সৈন্যবল ছিল ; তজ্জন্য জয়চন্দ্রের সাহায্যও প্রয়োজন হয় নাই এবং যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় পৃথ্বীরাজের জয়লাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। বহিঃশত্রুকে দমনের সময় অন্তর্ব্বিবাদে ভুলিয়া যাইয়া সাধারণ শত্রুকে দমনের জন্য একত্র হওয়া অতি উচ্চদরের কথা। কিন্তু পৃথ্বীরাজের সঙ্গে তজ্জন্য অযাচিত ভাবে যোগ না দেওয়া ও মহম্মদ ঘোরীর সঙ্গে পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে যোগ দেওয়া সম্পূর্ণ পৃথক কথা।

আমি ঐতিহাসিকগণের উপর ভার দিতেছি যে, এই জয়চন্দ্রের চরিত্রে চাঁদকবি যে কলঙ্ক-কালিমার আরোপ

করিয়াছেন, [illegible] কি সঙ্গত ? এই জয়চন্দ্রের অন্য নাম জয়ন্ত। নৈষধচরিত-প্রণেতা কবি শ্রীহর্ষ ইঁহার সম্বন্ধে এ[illegible] রচনা করেন :—

"গোবিন্দনন্দন তয়া চ বপুঃশ্রিয়া চ
মাস্মিন্ নৃপে কুরুত কামধিয়ং তরুণ্যঃ
অস্ত্রী করোতি জগতাং বিজয়ে স্মরঃস্ত্রী
রস্ত্রী জনঃ পুনরনেন বিধীয়তে স্ত্রী।

জয়চন্দ্র গোবিন্দচন্দ্রের পৌত্র ও বিজয়চন্দ্রের পুত্র। শ্লোকের অর্থ এই যে হে তরুণীগণ গোবিন্দের বংশে জন্ম বলিয়া, ও তাঁহার সুশোভন কান্তি দেখিয়া ইঁহাকে কামদেব বলিয়া ভ্রম করিও না। কামদেব-জগৎ-বিজয় কার্য্যে রমণীকে নিজের অস্ত্র স্বরূপ ব্যবহার করেন (অস্ত্রী করোতি); কিন্তু এই রাজা জগৎ বিজয়ে অস্ত্রী অর্থাৎ অস্ত্রধারী সম্মুখাগত ব্যক্তিকে "স্ত্রী" শব্দবাচ্য করেন।

এই শৌর্য্য-বীর্য্য-সম্পন্ন অসংখ্য সৈন্যবলযুক্ত নির্ম্মল জ্ঞানী অতি বিস্তৃত রাজ্যের রাজাকে চাঁদকবি যেরূপ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যে ঐ কবির অন্যান্য "তথ্যের" ন্যায় ইহাও বিতথ্য।

রাণীকে বশীভূত করিয়া দেশ জয় করিবার কথা মহম্মদ ঘোরীর পক্ষে নূতন নহে। এতৎ পূর্ব্বে তিনি ঐরূপ চতুরতা করিয়া উচ্চা নামক রাজ্য অধিকার করেন। ইতিহাস-লেখক ফিরিস্তা বলেন যে, ঐ রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিয়া মহম্মদ ঘোরী দেখিলেন যে, সম্মুখ সমরে জয়লাভের সম্ভাবনা নাই। তিনি জানিতে পারিলেন যে, রাজা স্ত্রৈণ। তিনি রাণীর নিকট গোপনে প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যদি নগর ছাড়িয়া দেন, তবে সুলতান মহম্মদ ঘোরী তাঁহাকে বিবাহ করিয়া রাজমহিষী করিবেন। রাণী সম্মত হইলেন। পরিণামে উচ্চা রাজ্য সুলতানের হস্তগত হইল। উচ্চা রাজ প্রাণ হারাইলেন। রাণী ও রাজকুমারী মুসলমান হইলেন, কিন্তু মহম্মদ ঘোরী রাণীর পাণিগ্রহণে অস্বীকার করিলেন।

বিদ্যাপতির বর্ণনা বিশ্বাস করিলে, কান্যকুব্জ আক্রমণ ও জয়কাল ইহা মহম্মদ ঘোরীর দ্বিতীয়বার চাতুরী। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, আমরা এই ইতিহাস আলোচনায় কি জ্ঞান লাভ করিলাম? অন্যান্য জ্ঞানের মধ্যে একটি জ্ঞানের কথা আমার মনে উদয় হইতেছে। তাহা নিম্ন-লিখিত গল্পে কথিত হইবে। ইহা পঞ্চ তন্ত্রে বা হিতোপদেশ বা ঈশপের গল্পে নাই। বৃদ্ধ পরম্পরায় শুনিয়া আসিয়াছি। তাহা এই :—

এক নদীর তীরে বৃহৎ অরণ্য ছিল। তাহাতে ক্ষুদ্র বৃহৎ শিশু, যুবা ও বৃদ্ধ নানাজাতীয় বৃক্ষ ছিল। হঠাৎ নদী তীরে সুতীক্ষ্ণ কুঠার পরিপূর্ণ শত শত নৌকা উপস্থিত হইল। অরণ্যবাসী বৃক্ষগণের অসীম ভয় হইল। কয়েকজন যুবা, বৃদ্ধ এক বৃক্ষের নিকট যাইয়া বিপদ জানাইয়া বলিল, "ঐ সকল কুঠার ব্যবহৃত হইলে বন নির্ম্মূল হইবে,—কাহারও রক্ষা নাই; উপায় কি?" বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের কেহ কি ঐ কুঠারের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে।" যুবকেরা বলিল "না।" বৃদ্ধ বলিল "নিশ্চিন্ত থাক। আমাদের মধ্যে কেহ কুঠারে প্রবেশ না করিলে, সাধ্য কি সুতীক্ষ্ণ কুঠার আমাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারে।" এই স্থানে এই প্রবন্ধ শেষ হইল।

বিপর্য্যয়

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল

(৩৯)

পথের মধ্যে অমল এক জায়গায় গাড়ী দাঁড় করাইয়া অনীতার কর্ম্মচ্যুত আয়াকে গাড়ীতে উঠাইয়া লইল।

তার বাড়ীতে যখন তার মোটর আসিয়া থামিল তখন আনন্দে অমলের মন নৃত্য করিতেছে। আলিবাবা যখন গাধার পিঠে তার চোরাই মাল, পথের সকল শঙ্কা পার হইয়া

বাড়ীর ভিতর অ নিয়াছিল, তখন তার যেমন আনন্দ যেমন আতঙ্ক হইয়াছিল, তেমনি আনন্দ, তেমনি আতঙ্ক হইল অমলের! মনোরমাকে সে একরকম পথে কুড়াইয়া পাইয়াছে। অমূল্য রত্ন কুড়াইয়া পাইয়া সে তার ঘরে আনিয়াছে! কিন্তু রাখিতে পারিবে কি? এ পাখী শিকলে বাগ মানিবে কি?

নামিয়াই অমল মনোরমাকে অনীতার পরিত্যক্ত ঘরটিতে লইয়া গেল। সে ঘর অনীতা যেমন রাখিয়া গিয়াছিল,—তেমনি সুন্দর, তেমনি সুসজ্জিত আছে! অমল তার একটি আসবাবও নড়চড় করে নাই। যদি অনীতা একদিন এই ত্যক্ত নীড়ে ফিরিয়া আসে, তবে সে যেন কোনও জিনিসেরই অভাব না বোঝে—ইহাই অমলের কামনা ছিল। অনীতা ফেরে নাই,—কিন্তু যে আসিয়াছে, সে অনীতার চেয়ে কম প্রিয় নয়!

অমল কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "তোমার বড় উত্তেজনা গিয়েছে,—তুমি মুখ হাত ধুয়ে একটু শুয়ে পড়। তোমার দাদা এলে তোমায় ডাকাব। আয়া তোমার এখানে থাকবে।"

অবসন্ন দেহে মনোরমা সেই পালঙ্কের গদীওয়ালা বিছানায় বসিয়া পড়িল। একবার স্নিগ্ধ ক্লান্ত কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে অমলের মুখের দিকে চাহিল। সে দৃষ্টিতে অমলের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল!

অমল পুলকিত চিত্তে বলিয়া গেল, "তোমার বোর্ডিংএ যাওয়াই যদি স্থির হয়, তবে কাল পরশুর মধ্যে আমি সব ঠিকঠাক করে দেবো এখন,—তুমি কোনও চিন্তা করো না। হাঁ খোকা, তোমার ক্ষিদে পেয়েছে বোধ হয়!"

খোকার সত্যই ক্ষুধা পাইয়াছিল। অমল বয়কে ডাকিয়া খোকাকে তার জিম্মা করিয়া দিল। তার পর সে বলিল, "হাঁ, তোমারও তো বোধ হয় আজ খাওয়া হয় নি? তোমার রান্নার উদ্যোগ করে দেব? আমার উড়ে বেয়ারা বোধ হয় জাতে ভাল, জিজ্ঞাসা ক'রছি"—বলিয়া সে বেয়ারাকে ডাকিতে ছুটিল।

মনোরমা বলিল, "আপনি কিছু ব্যস্ত হবেন না। আমি দীক্ষিত ব্রাহ্ম, আপনার বাবুর্চ্চির হাতে খেতে আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু আমি খেয়েছি, আমার এখন মোটেও ক্ষিদে নেই।"

এই কথা শুনিয়া অমলের মন, কি জানি কেন, আনন্দে নাচিয়া উঠিল।

মনোরমা খানিক বাদে বলিল, "দেখুন, বোর্ডিংএ ছাড়া আর কোথাও কি আমার জায়গা হ'বে না? আমি বোর্ডিংএ যেতে চাই না।"

অমল আরও খুসী হইল; বলিল "আমারও তোমাকে বোর্ডিংএ পাঠাবার মোটেই ইচ্ছা নেই মনোরমা।"

"আপনার কি ইচ্ছা?" বলিয়া মনোরমা প্রীত দৃষ্টি অমলের মুখের উপর নিবদ্ধ করিল,—অমলের চক্ষে কি একটা দেখিয়া সে মাথা নীচু করিল; তার মুখ লাল হইয়া উঠিল।

অমলের মুখও লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। বুকের ভিতর টিপ টিপ করিতে লাগিল। আস্তে আস্তে বলিল, "আমার কি ইচ্ছা, মনোরমা, সে কথা ব'লতে সাহস হয় না,—পাছে, দেবী তুমি,—তোমায় আমি না জেনে অঘাত করে বসি। কিন্তু যদি সাহস দেও, যদি বলবার অপরাধটা ক্ষমা করে নেও, তবে বলি মনোরমা, তুমি আমার এই গৃহের অধিষ্ঠাত্রী হ'য়ে, আমার জীবনের ধ্রুবতারা হ'য়ে, এই ঘরেই বাস কর।"

তার ব্যগ্র চক্ষু দুটি মনোরমার মুখের উপর বসাইয়া দিয়া অমল উৎকণ্ঠিত ভাবে উত্তরের প্রতীক্ষা করিল।

এ কি কোলাহল অন্তরে তার অনুভব করিল মনোরমা! হৃদয়ের কন্দরে কন্দরে তার এ কি উৎসবের বাঁশী বাজিয়া উঠিল! বাল-বিধবার উষর হৃদয়ে এত রসের ফোয়ারা ছুটাইয়া দিল কে? এক মুহূর্ত্তে সমস্ত অন্তর ভরিয়া এক বিশাল তাণ্ডব নৃত্য লাগিয়া গেল,—আনন্দের বেদনায় মনোরমা পীড়িত হইয়া পড়িল। তার মনে হইল, এ আনন্দে তার অধিকার নাই। এ উৎসব হৃদয়ের অবৈধ বিদ্রোহ! কিন্তু বিদ্রোহই যে আজ সম্রাট হইয়া বসিয়াছে; তাহাকে বাধা দিবে কে?

মনোরমার সমস্ত অন্তরটা এক অপূর্ব্ব আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে দেখিতে পাইল, ইহাই তার জীবনের চিরদিনের লক্ষ্য ছিল। এত দিন সে এই সৌভাগ্যই চোরের মত তার গোপন হৃদয়ের কন্দরে কামনা করিয়াছে। ইহারই পায় বিকাইতে চাহিয়াছে বলিয়া সে এতদিন আপনাকে পীড়ন করিয়াছে—আজ

সে সৌভাগ্যের চরম সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে—আর কিছুই তার বলিবার নাই। সে এই আনন্দের নীরব মুগ্ধ সম্ভোগে আত্মহারা হইল। সে কি করিবে, কি বলিবে, কিছুই ভাবিয়া পাইল না। কেবল অবিরত অশ্রুধারা তার গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া গেল।

একটু স্থির হইয়া সে ভাবিতে বসিল। তাহার মনে হইল, সে অমলকে কেন পাইবে? সে কি তা পাইবার যোগ্য? কি সে, যাতে অমলের মত স্বামী পাইয়া সে জীবন ধন্য করিবে? হতভাগিনী বিধবা সে, অবিশ্বাসিনী পত্নী—তার কি অধিকার আছে অমলের পবিত্র হৃদয়ের অধীশ্বরী হইবার? এত বড় অবিচারও কি বিধাতার রাজ্যে হইতে পারে? বেশ হইয়াছে, এই তার পাপের যোগ্য শাস্তি! এমনি করিয়া আসন্ন সার্থকতায় প্রলুব্ধ করিয়া নিরাশায় ব্যথায় তাকে পীড়িত না করিলে, ভগবানের ন্যায় বিচারে তার যোগ্য শাস্তি হইত না।

কিন্তু—এই কি বিধাতার ন্যায় বিচার? এমনি করিয়া ব্যর্থতার আগুনে পুড়াইবার জন্য তার হৃদয়ে এতটা বাসনা না দিলে কি ভগবানের ন্যায়ের জগৎ টিকিত না! পরীক্ষা? হায় সে কি কম পরীক্ষা দিয়াছে? স্বামী হারাইয়া সে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা মনকে সংযত করিতে চেষ্টা করিয়াছে,—তার সমস্ত শরীর মনকে যথাসম্ভব পীড়িত করিয়াছে। তার সে সাধনা এমন করিয়া ব্যর্থ না করিয়া দিলেই কি চলিতেছিল না? জীবনে সে এমন কি ভীষণ পাপ করিয়াছিল, যে, জীবনের আরম্ভে সে জগতের সকল সুখ-সম্ভোগে বঞ্চিত হইল—আর সঙ্গে সঙ্গে তার কঠোর সন্ন্যাস-ব্রত হইতেও সে বঞ্চিত হইল? তার মত এমন পরীক্ষা কার কবে হইয়াছে? এতটা আত্মসংবরণ কে কবে করিয়াছে? কিন্তু তার এই চেষ্টার কি এই পুরস্কার? সহস্র সহস্র নরনারী তো জগতে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে,—তাদের তো কই এমন অগ্নিপরীক্ষায় পড়িতে হয় না! তাদের তো জীবন এমন করিয়া সব দিক দিয়া ব্যর্থ হয় না! সে এমন কি পাপ করিয়াছে যে, এমনি করিয়া তার দুই কূল পুড়াইয়া ভগবান তাহাকে অকূলে ভাসাইয়া দিলেন।

ভাবিয়া ভাবিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া মনোরমা এ অকূলে থই পাইল না। কান্নার বেগ থামিল না। ব্যথার বোঝা কিছুই কমিল না! তার সমস্তটা ব্যর্থ জীবনের প্রতিদিন খুঁটিয়া খুঁটিয়া সে দারুণ অবিচারের বেদনায় জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়া লুটাইতে লাগিল।

এদিকে অমল মনোরমার ঘর হইতে বাহির হইয়া তার আফিস ঘরে দুয়ার বন্ধ করিয়া বসিল। দুহাতে মাথাটা চাপিয়া সে বসিয়া রহিল। তার মাথায় ভিতর ঘূর্ণীবায়ু বহিতেছিল। কোনও একটা কথাই সে ঠিক করিয়া ভাবিতে পারিল না। তার সমস্তটা অন্তর একটা তীব্র জ্বালাময় ধিক্কারে ভরিয়া গেল! তার যেন মনে হইল, সে একটা দেবতাকে অপমান করিয়া আসিয়াছে। আপনার ছোট মনের ক্ষুদ্র ওজনে মাপ করিয়া সে দেবীকে মানুষী রূপে দেখিয়া যে ধৃষ্টতা করিয়া বসিয়াছে, তাহার আর মার্জ্জনা নাই। এখন সে মনোরমার কাছে বা ইন্দ্রনাথের কাছে মুখ দেখাইবে কেমন করিয়া, তাহা ভাবিয়া পাইল না। তার নিজেকে মাটির সঙ্গে মিলাইয়া দুই পায়ে দলিয়া পিষিয়া মারিতে ইচ্ছা করিতেছিল।

অনেকক্ষণ এমনি করিয়া থাকিয়া সে তার টেবিলের একটা ড্রয়ার খুলিয়া তাহার একটা নিভৃত কোণ হইতে, একটা বাক্স বাহির করিল। সে বাক্সের ভিতর একটা চেইনে ঝুলান সোনার ফ্রেমে আঁটা একখানি অত্যন্ত ছোট ফোটোগ্রাফ বাহির করিয়া সে দেখিতে লাগিল। ছবিখানি মনোরমার—সে নিজে হাতে তুলিয়াছিল—এমন কতই তো সে তুলিয়াছে। এ খানা তুলিয়া সে এমনি করিয়া বাঁধাইয়া রাখিয়াছে,—কতদিন সে এই চিত্র বুকে করিয়া কাটাইয়াছে।

অমল মনোরমাকে অনেকদিন হইলই ভালবাসিয়াছে, এবং এ সম্বন্ধে সে মনের সঙ্গে কোনও দিনই কোনও লুকোচুরি করে নাই। কিন্তু তার এ ভালবাসা ছিল তার অতি গোপন সম্পদ, তার জীবনের বীজমন্ত্র! এ কথা মুখ ফুটিয়া বলিলে সর্ব্বনাশ! এ কথা কোনও মতে প্রকাশ হইলে মনোরমার অপমান করা হইবে—কেন না, মনোরমা দেবী—ব্রহ্মচারিণী! এই স্থির করিয়া সে এত দিন ধরিয়া তার সকল প্রেম বুকের ভিতর সম্পূর্ণ সঙ্গোপনে চাপিয়া রাখিয়াছে। আজ সে এতদিনকার সকল যত্ন ফুলতার মত একটা চপলার তুচ্ছ কথায় নির্ভর করিয়া ভাসাইয়া দিয়া কি ভীষণ সাহস করিয়া বসিয়াছে—ছি! ছি! ছি!

অমল লকেটখানা বন্ধ করিয়া চেইনটা এমন করিয়া জামার তলা দিয়া পরিল যে, লকেটটা ঠিক তার বুকের উপর রহিল। তার পর অনেকক্ষণ শূন্য মনে ভাবিতে ভাবিতে তার মনে পড়িল যে, মনোরমা সম্বন্ধে এখন তার কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে হইবে। এতক্ষণ যে সব কল্পনা সে করিয়াছিল, সে সবই এখন অগ্রাহ্য, অবিবেচ্য হইয়া গেল। এখন কি উপায় করা যায়? সে ভাবিল, মনোরমাকে বিধবাশ্রমে কিম্বা কলেজ বোর্ডিংএ পাঠান ছাড়া আর উপায়ান্তর নাই। ভাবিতে ভাবিতে আবার সেই সব অতীত স্বপ্নের আলোচনায় অমল ডুবিয়া গেল। অনেকক্ষণ পর সে আপনাকে স্বপ্নসাগর হইতে টানিয়া তুলিয়া ভাবিল যে, সে সব কথা ইন্দ্রনাথ আসিলে তার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করা যাইবে। কিন্তু এখন তো আর এক মুহূর্ত্তও মনোরমাকে তার বাড়ীতে রাখা ভাল দেখায় না। ইহাতে মনোরমা না জানি কি ভাবিবে!

হঠাৎ তার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল। সে যে এমনভাবে মনোরমাকে একলা ফেলিয়া আসিয়াছে, মনোরমা তো লজ্জায় আত্মহত্যা করিয়া বসিবে না। কে জানে? শঙ্কিত চিত্তে সে তাড়াতাড়ি দুয়ার খুলিয়া দেখিল, বেয়ারা টুকুকে লইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছে। বেয়ারাকে মনোরমার কথা জিজ্ঞাসা করিতে, সে বলিল, মনোরমা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

অমল আয়াকে ডাকিয়া বলিল, "তুমি ওই ঘরেই গিয়ে বসে থাক, মনোরমার ঘুম ভাঙ্গলে আমাকে খবর দিও।—কাপড় চোপড় ছাড়া হ'লে খবর দিও।" তখন তার মনে হইল মনোরমার কাপড় চোপড় কিছুই নাই। সে আয়াকে ফিরাইয়া তাহার কাছে অনীতার একটা আলমারীর চাবী দিয়া বলিল, "আলমারী থেকে একখানা কাপড় বের ক'রে প'রতে বলো, তার পর আমি কাপড় এনে দেবো।"

তার পর সে টেলিফোনের রিসীভারটা হাতে করিয়া তা'র এক বন্ধুকে ডাকিল। বন্ধু বাড়ী ছিলেন না, তাঁর স্ত্রীও বাড়ী নাই। বেয়ারাকে অমল টেলিফোঁতে বলিল যে, মেম সাহেব আসিলেই যেন তাঁকে অমলের বাড়ী আসিতে বলে,—একটি মেয়েকে তাঁহাদের বাড়ী লইয়া যাইতে হইবে। বিশেষ জরুরী দরকার।

টুকু ততক্ষণ অমলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তার কাতর মুখখানা দেখিয়া অমলের প্রাণটা কাঁদিয়া উঠিল। সে টুকুকে বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিল, তার মন কেবলি বলিতে লাগিল—"মনোরমার ছেলে।"

(৪০).

মনোরমা কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বেলা পড়িয়া গিয়াছে।

ঘুম ভাঙ্গিয়া সে তার প্রাণে বেদনার একটা তরল প্রলেপ অনুভব করিল, কিন্তু চট্ করিয়া সকল কথা স্মরণ হইল না। ক্রমে সব কথা মনে হইল, সে বিছানায় বসিয়াই ভাবিতে লাগিল।

আয়া বাথরুমে মুখ হাত ধুইবার সরঞ্জাম সব ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। মনোরমা উঠিতেই তাহাকে মুখ হাত ধুইয়া কাপড় ছাড়িতে বলিল। বলিল, "সাহেব ব'লেছেন, এই আলমারী থেকে কাপড় চোপড় বেছে নিয়ে এখন প'রতে, তার পর আপনার কাপড় এনে দেবেন।" আলমারীটা খুলিয়া দিয়া সে বাহিরে দাঁড়াইল।

মনোরমা অন্যমনস্ক ভাবে উঠিয়া আলমারীর কাছে দাঁড়াইল। যে আলমারী আয়া খুলিয়া দিয়াছিল, তাহাতে বিধবার পরিবার যোগ্য কাপড় তো ছিলই না, আটপৌরে কাপড়ের কাছাকাছিও কিছু ছিল না। এটা ছিল কেবল নানারকম রঙ্গ বেরঙ্গের সিল্কের কাপড় জামায় বোঝাই।

আলমারীর সামনে দাঁড়াইয়া মনোরমার একটু হাসি পাইল। তার মনের ভিতর শাশ্বত নারী, শোভার লালসা লইয়া জাগিয়া উঠিল। সে খুব ভাল একটা salmon রঙ্গের সাড়ী ও ব্লাউজ বাহির করিয়া লইয়া বাথরুমে গেল। গা ধুইয়া সে কাপড় চোপড় যথাসম্ভব সুবিন্যস্ত করিয়া পরিল। তাহার ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ আঁচড়াইয়া বেশ একটু বাহার করিয়া জড়াইয়া রাখিল। এ সব বিদ্যা সে খুব ভাল করিয়াই জানিত, আর বৌদিদির উপর এ বিদ্যা সে অনেক দিনই ফলাইয়াছে। সজ্জিত হইয়া যখন সে আরসীর ভিতর নিজের মূর্ত্তির দিকে একবার শেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তখন তার রূপ দেখিয়া সে প্রীত হইল। কেন খুসী হইল তাহা সে বুঝিল না—বরং পোষাক করিয়া খুসী হওয়ায় সে নিজের উপর বেশ একটু রাগ করিল।

আমরা তা'র মনের তল'র খবর রাখি—সেখানে তার নিজের অজ্ঞাতসারে যে সব প্রক্রিয়া ঘটিয়া সজ্জায় এই আনন্দবোধ জন্মিয়াছিল, তাহা সংক্ষেপতঃ এই। অমল তাহাকে ভালবাসে আজ সে তাহা বুঝিয়াছে—তাই নিজের কাছে আজ তার দাম বাড়িয়া গিয়াছে। যে তুচ্ছ শরীরকে সে এতদিন কেবল পীড়ন করিয়াই আসিয়াছে, তাহাকে আজ অমলের খাতিরেই তার একটু আদর করিতে ইচ্ছা হইতেছিল। তা' ছাড়া, যদিও সে বেশ অনুভব করিতেছিল যে, তার হাতের লক্ষ্মী সে পায় ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, এবং আর অমল ফিরিয়া তাহাকে সাধিবে না, তবু এ আশা সে কিছুতেই ছাড়িতে পারিতেছিল না যে অমল আবার আসিয়া তার প্রেম-ভিক্ষা করিবে। তার মনের গোপনতম কন্দরে সে সেই শুভ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতেছিল, এবং সেই শুভ সুযোগ ঘটাইবার জন্য নিজেকে অমলের চক্ষে সম্পূর্ণরূপে নয়নাভিরাম করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা হইতেছিল।

বাথরুম হইতে বাহির হইয়াই কিন্তু লজ্জায় তার পা' হইতে মাথা পর্য্যন্ত ভরিয়া গেল। একবার মনে হইল ছুটিয়া গিয়া আবার তাহার সাদা কাপড়খানা পরিয়া আসে। কিন্তু সে কাপড়খানা যে ভিজিয়া গিয়াছে এবং তাহা পরা যে একেবারেই অসম্ভব, তাহা স্মরণ করিয়া সে বেশ একটু তৃপ্তিবোধ করিল। তার পর সে আলমারীর ভিতর সাড়ীগুলির দিকে চাহিয়া দেখিল—সে যাহা পরিয়াছে তার চেয়ে কম জমকাল কিছুই সে আলমারীর ভিতর নাই; দেখিয়া সে আরও আশ্বস্ত হইল—সে এতক্ষণে মনকে বুঝাইতে পারিল যে তাহাকে বাধ্য হইয়াই এই সজ্জা করিতে হইয়াছে। তার মন অনেকটা ঠাণ্ডা হইল।

সে আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইল। কেন বাহির হইল? কে জানে!—তার মন তাকে ঠেলিয়া বাহির করিল। আস্তে আস্তে শঙ্কিত পদক্ষেপে সে নীচে গেল। ড্রইং রুমের দিকে যাইতে তাহার পা কাঁপিতে লাগিল—যদি অমল সেখানে থাকে! তবু সে সেইখানে গেল। সেখানে অমল নাই দেখিয়া সে পরিতৃপ্ত হইল না, বরং বেশ একটু নিরাশ হইল।

অমল কিন্তু শীঘ্রই আসিয়া পড়িল। মনোরমা ড্রইং রুমে বসিয়া অন্যমনস্কভাবে অনীতার একখানা গানের বই লইয়া পাতা উল্টাইতেছিল, আর সব তা'তেই খুব বিরক্তি বোধ করিতেছিল। এমন সময় অমল হঠাৎ সে ঘরে ঢুকিয়া এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিল। দু'জনেরই মুখ, নিজেদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

এতক্ষণ অমল টুকুর সঙ্গে খেলা করিতেছিল। তার সঙ্গে সে বেশ ভাব জমাইয়া লইয়াছিল। তার সমস্ত অন্তর এই প্রিয়দর্শন শিশুটির প্রতি স্নেহে পরিপ্লুত হইয়া গিয়াছিল। তার মায়ের কাছে যে স্নেহ ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহা ইহার উপর দ্বিগুণ বেগে প্রবাহিত হইল। সে তাহাকে নানা রকমে খেলা দিয়া পরম তৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিল।

টুকুকে তার আফিস-ঘরে রাখিয়া অমল ড্রইং রুমে তার ফটো এলবাম লইতে আসিল। আসিয়া মনোরমার এই মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া এক মুহূর্ত্ত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। পর মুহূর্ত্তে তার মনে হইল যে, তার পক্ষে এ অবস্থায় মনোরমার কাছে দাঁড়াইয়া থাকা অপরাধের কাজ হইতেছে। অথচ যখন দুজনে মুখোমুখি হইয়াই পড়িয়াছে তখন কোনও কথা না বলিয়া ফিরিয়া যাওয়াও ভয়ানক অন্যায় হইবে। তাই সে অগ্রসর হইয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "তোমার বিশ্রামটা বেশ ভাল হ'য়েছে তো মনোরমা?"

মনোরমা কেবল বলিল "হাঁ।" তার পর দু'জনেই চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ বাদে মনোরমা বলিল, "বসুন।" যে কোচখানার উপর মনোরমা বসিয়া ছিল, সেইখানেই মনোরমা বই সরাইয়া অমলের জন্য জায়গা করিয়া দিল। অমল বসিয়া খানিকক্ষণ আমতা আমতা করিয়া বলিল, "মনোরমা, আমি তোমার সঙ্গে আজ যে ব্যবহার ক'রেছি, তা' ভুলতে পারবে কি?"—

এই তো সেই সুযোগ! এবারও কি মনোরমা ভুল করিবে?—এবার ভুল করিলে আর কি এ সুযোগ আসিবে? মনোরমা তার হৃদয়ের সমস্ত বল সংগ্রহ করিয়া, মাটির দিকে চাহিয়া লজ্জা-নম্র মুখে অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলিল, "ভুলতেই কি হবে? যদি না পারি?"

কথাটা বলিয়াই সে লজ্জায় মরিয়া গেল। কি নির্লজ্জের মত সে এই কথাটা বলিল! অমল তাহাকে ভাবিবে কি?

অমল কথাটায় চমকিত হইয়া মনোরমার মুখের দিকে চাহিল। সে মুখের ভাব দেখিয়া তার মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। লজ্জায় তার মুখখানা রক্তজবার মত লাল হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু চোখের কোণে প্রেমের দীপ্তি, ও অধর-কোণে একটা গুপ্ত হাসির রেখা লজ্জায় ঢাকিতে পারে নাই।

অমল সাহস করিয়া বলিল, "ভুলতে পারবে না; কেন ?"

একটু বিষণ্ণভাবে মনোরমা বলিল, "আপনি কি আমার সে কথা ভোলাটাই ইচ্ছা করেন ?"

অমলের প্রাণ নাচিয়া উঠিল, সে বলিল, "তুমি যদি না ভুলতে চাও মনোরমা, তবে আমি তোমায় ভোলাতে চাইব ? এও কি সম্ভব ?" তার পর মনোরমার একখানা হাত নিজের হাতের ভিতর টানিয়া লইয়া অমল বলিল, "মনোরমা, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমায় বুঝিয়ে বল, আমি ভুল বুঝিনি তো ? যদি ভুল বুঝে থাকি, তবে আমায় ক্ষমা করো। কিন্তু আমার মনে হ'চ্ছে, তুমি আমায় ভালবাস,—আমার মন ব'লছে, আমার আশা সফল হ'বে, তুমি আমার হ'বে।"

হবে কি ? করস্পর্শে মনোরমার সমস্ত শরীরের ভিতর একটা তীব্র বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়া গিয়া তাহার সমস্ত শরীর অসাড় করিয়া দিল। তাহার অন্তরে আনন্দের মহোৎসব লাগিয়া গেল, তার অন্ধকার অন্তরের অমাবস্যা অভিভূত করিয়া হৃদয়ের কোণায় কোণায় দেওয়ালীর রোশনাই জ্বলিয়া উঠিল। সে অমলের কাঁধে মাথা রাখিয়া বলিল, "এখনো কি তুমি বুঝতে পারছো না ?"

অমল উঠিয়া পড়িল। "Hurrah" বলিয়া একটা চীৎকার করিয়া মনোরমাকে দুই হাতে সাপটিয়া বুকের কাছে ধরিয়া, "তবে পরশু আমাদের বিয়ে—কেমন, রাজী ?"

মনোরমা হাসিয়া বলিল, "যা তোমার ইচ্ছা !" টেলিফোনের ঘণ্টা শুনিয়া সে আফিস-ঘরে ছুটিয়া গেল টেলিফোন করিতেছিলেন তার সেই বন্ধুটি, অমলের চারুদির স্বামী—তিনি বলিলেন, "আমার স্ত্রীকে এখনি যেতে ব'লছ, ব্যাপার কি ? মোটর তৈয়ারী, আমরা যাচ্ছি,—কিন্তু চারুদি খবরটা শুনবার জন্য ভারি ব্যস্ত হ'য়েছে, কি ? কার মেয়ে আনতে হ'বে ?" অমল হাসিয়া বলিল, "আমার bride !" "সে কি ?"

"পরশু আমার বিয়ে।"

"মেয়েটা কে ?"

"এসেই দেখ না ভাই।"

"আচ্ছা আসছি—এসে তোর কাণটা আচ্ছা করে মলে দিচ্ছি—লুকিয়ে লুকিয়ে এত বিদ্যা !"

তার পর অমল টেলিফোন করিল, তার আর এক বন্ধুর কাছে—ইনি বিবাহের রেজিষ্ট্রার—তাঁহার সঙ্গে বন্দোবস্ত স্থির হইল, পরশুই বিবাহ হইবে।

অমল ড্রইং রুমে ফিরিয়া গেল। মনোরমা স্মিতহাস্যে তাহাকে পুরস্কৃত করিল। অমল তাহাকে নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া, সে যে সব বন্দোবস্ত করিয়াছে, তাহা জানাইল—আনন্দ সিন্ধু উছলিয়া উঠিল।

তার পর অমল একখানা চেয়ারে বসিয়া তার হাঁটুর উপর মনোরমাকে বসাইল। বুক হইতে লকেটটা টানিয়া বাহির করিয়া দেখাইল। মনোরমার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—সে বলিল, "এ কক্ষণো আমি নই—এ কোন এক মেম সাহেবের মুখ !"

অমল, মনোরমার চিবুক ধরিয়া বলিল, "তা' বই কি ? হাঁ তা বটে—সে মেমটীর নাম Mrs. Monorama."

"অমল এ কি ?" দুয়ারের নিকট হইতে স্তম্ভিত ভীত ইন্দ্রনাথের কণ্ঠ শুনিয়া মনোরমা ও অমল দুজনেই বিদ্যুতাহতের মত চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। (ক্রমশঃ)

সিন্ধুপ্রদেশে নূতন আবিষ্কার

শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ভারতবর্ষের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। এই ইতিহাস গড়িয়া তোলার দিকে প্রাচীন ভারতের কোনপ্রকার নজরও ছিল না। ইতিহাসের মালমশলা তাই তাঁহারা রক্ষা করিয়া যান নাই। এইজন্য আজ যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস গড়িয়া তোলার দিকে ঝোঁক দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অসাধারণ বেগ পাইতে হইতেছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস গড়িয়া তুলিবার উপাদান সাধারণতঃ দুইটি। প্রথমটি—প্রাচীন ভারতের গ্রন্থারণ্য। এই অরণ্যের ভিতর হইতে খুঁজিয়া হাতড়াইয়া দুই-চারিটি শ্লোক সংগ্রহ করিয়া, তাহারই সাহায্যে ঐতিহাসিকেরা ভারতের বিচ্ছিন্ন ইতিহাসকে একটা কাঠামোর ভিতর পুরিতে চাহিতেছেন। দ্বিতীয় উপাদান, প্রাচীন নগর প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ, শিলালিপি, মুদ্রা, তাম্রশাসন ইত্যাদি। বর্ত্তমানে এই ধ্বংসাবশেষগুলির উদ্ধারসাধনের দিকে ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সিন্ধুপ্রদেশের একটি ধ্বংসাবশেষের আবিষ্কার করিয়াছেন। ইতিহাসের দিক দিয়া তাঁহার এই আবিষ্কার অমূল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সিন্ধুপ্রদেশে ইতিহাসের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বহু জিনিষ ধ্বংসস্তূপের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া আছে,—ঐতিহাসিকেরা এ সন্দেহ অনেকদিন হইতে করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং সেখানে খননের কাজও বহু দিন পূর্ব্বেই সুরু হইয়া গিয়াছে। রাখালদাসবাবুও গোটা সিন্ধুপ্রদেশকে তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়া অবশেষে তাঁহার কর্ম্মকেন্দ্র বর্ত্তমান মোহেঞ্জ-দারো বা মোহেঞ্জ-মারী নামক স্থানেই স্থাপন করেন। এই স্থানটি ডোকরী হইতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। ডোকরী নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের রুক-কোট্রী সেকশনের একটি ষ্টেশন। প্রায় ছয় শত বিঘা পরিমাণ জমিতে ১৯২২-২৩ সালের শীতকালে তাঁহার খননের কাজ সুরু হয়। এখানে যে-সব জিনিষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার দ্বারা ইতিহাসের অনেক অনুসন্ধান যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, সে সম্ভাবনা আজ বিশেষভাবেই দেখা দিয়াছে।

রাখালদাসবাবু খননের জন্য এই অঞ্চলের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ টিলাটিই সর্ব্বাগ্রে বাছিয়া লইয়াছিলেন। ফলে এখানে একটি বৌদ্ধমন্দিরের নিশানা পাওয়া গিয়াছে। সিন্ধুনদের সাবেক সৈকত-শয্যার একটি কৃত্রিম মঞ্চের উপর এই মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই আবিষ্কারের ফলে, রাখালদাসবাবু খ্রীষ্ট-পর প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে সিন্ধুনদের জলধারাটি যে কোন্ অঞ্চলকে বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা অবিসংবাদিতভাবেই প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

সিন্ধুনদের সাবেক গতিপথ লইয়া অনেকেই একমত হইতে পারিতেছেন না। বর্ত্তমানে এই মতটি বিশেষভাবে পরিগৃহীত হইয়াছে যে, সিন্ধুনদের 'পূর্ব্ব নাড়া' নামে খ্যাত প্রাচীন পথটি উহার 'পশ্চিম নাড়া' নামে খ্যাত পথটি হইতে প্রাচীনতম। কিন্তু রাখালবাবুর আবিষ্কার প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে এ মত ভ্রান্ত—ইহার ভিতর সত্য নাই। বস্তুতঃ খ্রীষ্ট পর প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে সিন্ধুনদের জলধারা যদি এই মন্দিরের পাশ দিয়াই প্রবাহিত হইয়া থাকে, তবে পূর্ব্বোক্ত মত কিছুতেই প্রামাণ্য বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না।

ব্যাবিলনের প্রাচীন শিল্পীদের মত সিন্ধুপ্রদেশের প্রাচীন শিল্পীরা খ্রীষ্টের আগমনের আগে এবং পরেও বড় বড় কৃত্রিম মঞ্চ গড়িয়া তাহারই উপরে মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিত। সিন্ধুপ্রদেশের মত সমতল-ভূমিতে বন্যার উপদ্রব অবশ্যম্ভাবী। এই বন্যার হাত হইতে মন্দিরগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য ৪০।৫০ ফিট উঁচু প্রাচীরের দ্বারা তাঁহারা মন্দিরগুলিকে ঘেরিয়া দিতেন। রাখালদাসবাবু এই টিলাটি ছাড়াও আরও দুইটি উচ্চ টিলা খনন করিয়া মন্দিরের চিহ্ন আবিষ্কার করিয়াছেন। এই মন্দিরগুলি সিন্ধুনদের সাবেক সৈকতের দ্বীপগুলির উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাদের নির্ম্মাণকাল খ্রীষ্ট-পর দ্বিতীয় শতাব্দী।

প্রথম মন্দিরটিতে যে স্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা রৌদ্রে শুকানো ইঁটের তৈয়ারী; কিন্তু যে আয়ত মঞ্চের উপর স্তূপটি নির্ম্মিত, তাহার ইট আগুনে-পোড়ান। মাঝের ঘরটির চারিদিক ঘিরিয়া ঘরের পর ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরের প্রবেশ-পথ উত্তর-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। সেখান হইতে একটি প্রশস্ত সোপান জলের ধার পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। এই মন্দিরের শীর্ষদেশের অংশটি খ্রীষ্ট-পর দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিখ্যাত কুশান্-সম্রাট্ প্রথম বাসুদেবের রাজত্বকালে (১৫৮-১৭৭ খ্রীঃ) তৈরী হইয়াছিল। তাঁহার সময়ের বহু মুদ্রা এই আবিষ্কারের সঙ্গে এবং অন্যত্রও পাওয়া গিয়াছে।

এই স্তূপের ভিতরটা ফাঁপা। এক সময়ে ইহার ভিতর বুদ্ধের দেহাবশেষ রক্ষিত ছিল। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের মুসলমান-জমিদারেরা তাহা খুঁড়িয়া তুলিয়া ফেলিয়াছেন। অনেক ধনরত্ন এখানে প্রোথিত আছে, এই বিশ্বাসই যে তাঁহাদিগকে স্তূপটিকে এরূপ ভাবে বিধ্বস্ত করিতে প্রোৎসাহিত করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্তূপের গাত্র এক সময় নানাবিধ চিত্রের দ্বারা পরিশোভিত ছিল। বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক সার অরেল্ ষ্টাইন্ মধ্য-এশিয়ায় যে-সমস্ত স্তূপ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাদের গাত্রে যে-সমস্ত চিত্র অঙ্কিত আছে, এই স্তূপটির দেওয়ালের চিত্র অনেকটা সেই চিত্রেরই অনুরূপ। এই সব চিত্রে খাঁটি ভারতীয় রংএর পরিচয় পাওয়া যায়। প্রায় ১৭শত বৎসর রৌদ্র বৃষ্টির অত্যাচার সহ্য করিয়া সে রং এখনও চমৎকার ভাবে টিকিয়া আছে। বাদামী রংএর জমীর উপর বা হলুদ রংএর সুন্দর সুন্দর ফুলের পরিকল্পনাগুলি এখনও বিকৃত হয় নাই। নীল, হলদে, লাল, সাদা, কালো ইত্যাদি রংএ চিত্রিত বৌদ্ধযুগের পৌরাণিক কাহিনীও অনেকগুলি এই ধ্বংসাবশেষ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

যে মঞ্চটির উপর স্তূপ নির্ম্মিত, তাহার নীচে এমন-সব প্রমাণ আছে, যাহাতে বুঝা যায়, সেটি আর একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর তৈরী। সম্ভবতঃ যে সমস্ত শক-দস্যু খ্রীষ্টের জন্মের পরে পরেই প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ধ্বংসের তাণ্ডব-নৃত্য নাচিয়া গিয়াছে, তাহারাই এই মন্দিরটিকে ধ্বংস করিয়াছে। খ্রীষ্ট-পর প্রথম শতাব্দীতে তৈরী এই মন্দিরটি নানা রকমের ভাস্কর্য্যের (bas-relief) দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, এবং এই ভাস্কর-মূর্ত্তির কতকগুলি ধ্বংসাবশেষ মন্দিরের সম্মুখের বালুবেলার ভিতর পাওয়া গিয়াছে। একটী মূর্ত্তি বর্ব্বরদের মাথার মত, মুখে তাহার সূচ্যগ্র দাড়ি, এবং মাথায় লম্বা টুপী।

চত্বরের চতুর্দ্দিকের ঘরগুলিতে খ্রীষ্ট-পর দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রচুর প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মুদ্রাগুলি ঘরের মেঝের নীচে মৃৎপাত্রে রক্ষিত ছিল। কতকগুলি মুদ্রা একেবারে নূতন ধরণের—ভারতের আর কোথাও এ যাবৎ এরূপ মুদ্রা পাওয়া যায় নাই। উত্তর-পশ্চিম ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম তাম্রমুদ্রার সহিত ইহাদের চমৎকার সাদৃশ্য আছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে যে সব তাম্রমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সমস্তই প্রায় 'পাঞ্চ' চিহ্নিত। কিন্তু এগুলির বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, এগুলি সমস্তই খোদাই করা। আবিষ্কৃত মুদ্রাগুলি অন্ততঃ তিনটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথম শ্রেণীর মুদ্রা দেখিয়া মনে হয় প্রাচীন সিন্ধু প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম এবং প্রাচীন পারস্য-ধর্ম্ম এক সঙ্গেই প্রসার লাভ করিয়াছিল। কারণ মুদ্রাগুলিতে বুদ্ধের চেহারার সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিবেদীর চিত্রও খোদিত আছে। এই অগ্নিবেদীর চিত্র পারস্যের পার্থিয়ান্ বংশের মুদ্রায় পাওয়া যায় নাই;—পাওয়া গিয়াছে কেবল ভারতের কুশান্ রাজাদের মুদ্রায়। কিন্তু মোহেঞ্জ-দারোতে আবিষ্কৃত এই মুদ্রাগুলি কুশান্ মুদ্রা অপেক্ষা যে ঢের প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্তূপের ভিতর হইতে আবিষ্কৃত দ্বিতীয় শ্রেণীর মুদ্রাগুলি গোলাকৃতি,—কুশান্-সম্রাট্দের তাম্রমুদ্রা হইতে হাল্কা। তাহাদের অনুরূপ তাম্রমুদ্রাও সম্ভবতঃ ইতি পূর্ব্বে ভারতের কোন স্থানে আবিষ্কৃত হয় নাই। তাহাদের একপিঠে ভারতবাসীদের যুদ্ধদেবতা দেবসেনাপতি বা মহাসেন বা কার্ত্তিকেয়ের প্রতিমূর্ত্তি, এবং অন্যপিঠে নানা দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি। এই শেষোক্ত মুদ্রাগুলি সম্ভবতঃ কুশান্ মুদ্রার সমসাময়িক।

তৃতীয় শ্রেণীর মুদ্রাগুলি শীলমোহর। ইতিহাসের দিক্ হইতে এগুলি সম্ভবতঃ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয়; কারণ এগুলিতে যে-সব উৎকীর্ণ অক্ষর আছে, তাহা এ

পর্য্যন্ত কেহ পাঠ করিতে পারে নাই। এগুলির ভাষা-রহস্য অবগত হইতে পারিলে, ইতিহাসের ধারা হয় ত আবার একটা নূতন পথ গ্রহণ করিবে; অন্ততঃ, তাহার সম্ভাবনা যে একেবারেই নাই, তাহা জোর করিয়া বলা চলে না।

প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে দক্ষিণ-পঞ্জাবের মণ্টগোমারী জেলার হারাপ্পা নামক স্থানে একটি স্তূপের ভিতর হইতে কতকগুলি মোহর (seals) আবিষ্কৃত হইয়াছিল। দুই তিন বৎসরপূর্ব্বে রায় বাহাদুর পণ্ডিত দয়ারাম আরও কতকগুলি মোহর আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কানিংহাম প্রমুখ প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এই সমস্ত মোহরের উৎকীর্ণ অক্ষর প্রাচীন ব্রাহ্মী অক্ষরের পর্য্যায়ের ভিতর ফেলিয়াছেন। এই ব্রাহ্মী অক্ষরমালাই না কি ভারতের বর্ত্তমান অক্ষরগুলির পূর্ব্ব-পুরুষ। হারাপ্পার এই মোহরগুলির মত মোহর ভারতের আর কোথাও ইতিপূর্ব্বে আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু সম্প্রতি রাখালদাস বাবু মোহেঞ্জ-দারোতে যে মোহরগুলি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাদের সহিত হারাপ্পার মোহরের কোন প্রভেদ নাই। যাহারা এই অক্ষরমালা ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রভাব যে পঞ্জাব হইতে সিন্ধুপ্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, সে বিষয়ে অতঃপর সন্দেহ করিবার আর কোন কারণ থাকে না। কিন্তু রাখালদাস বাবু এই সম্পর্কে একটি

মীরপুর খাস স্তূপ-সিন্ধু—(খননের পূর্ব্বে—উত্তর পূর্ব্বদিক হইতে)
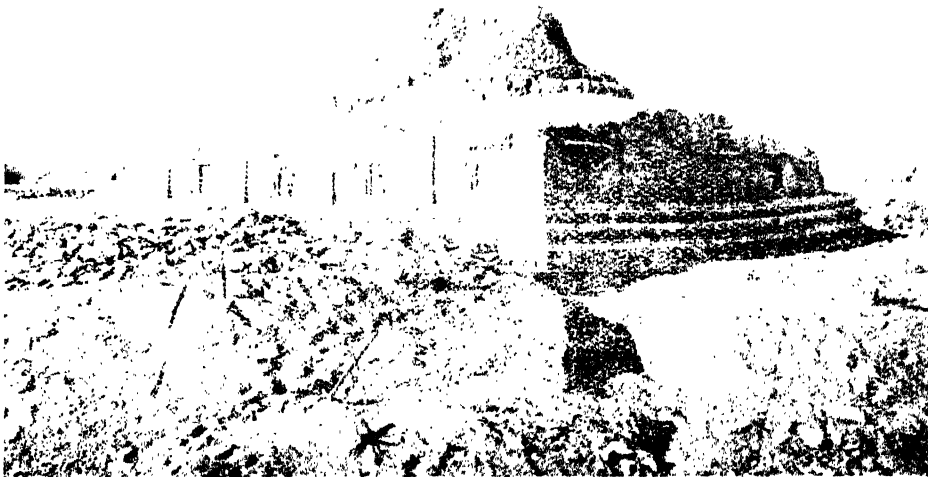
মীরপুর-খাস স্তূপ-সিন্ধু—(খননের পর—উত্তর পূর্ব্বদিক হইতে)
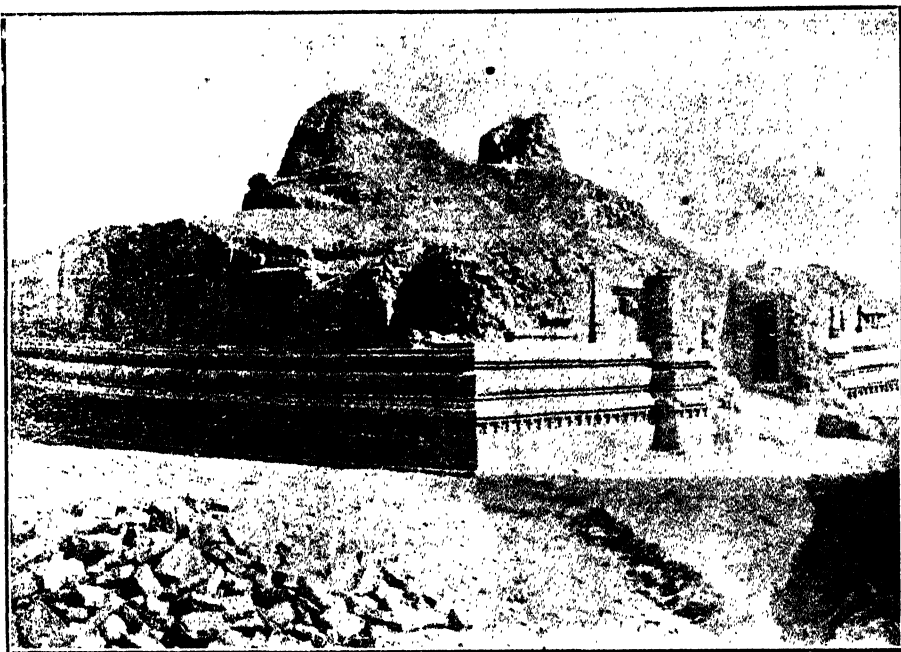
স্তূপের উত্তর-পশ্চিম কোণ
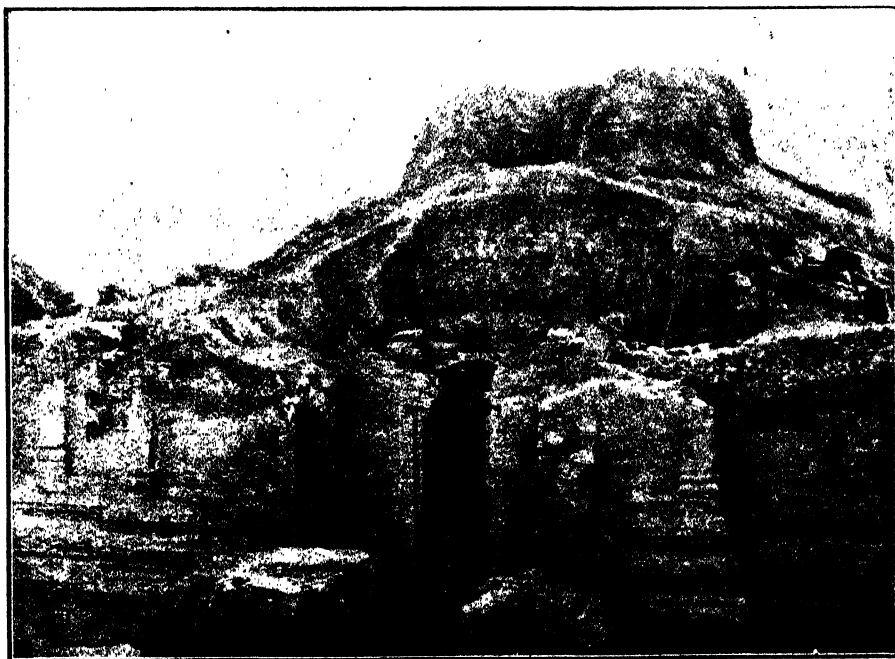
স্তূপের পশ্চিম পার্শ্বস্থিত দেব-মন্দির
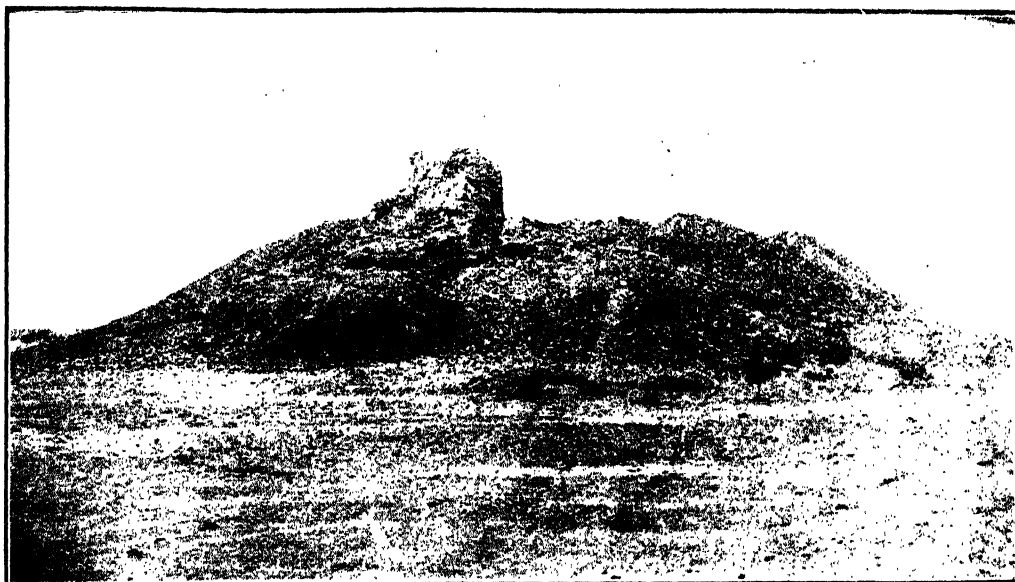
ব্রাহ্মণাবাদের নিকটে দেপার ঘাংরো গ্রামে বৌদ্ধ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ
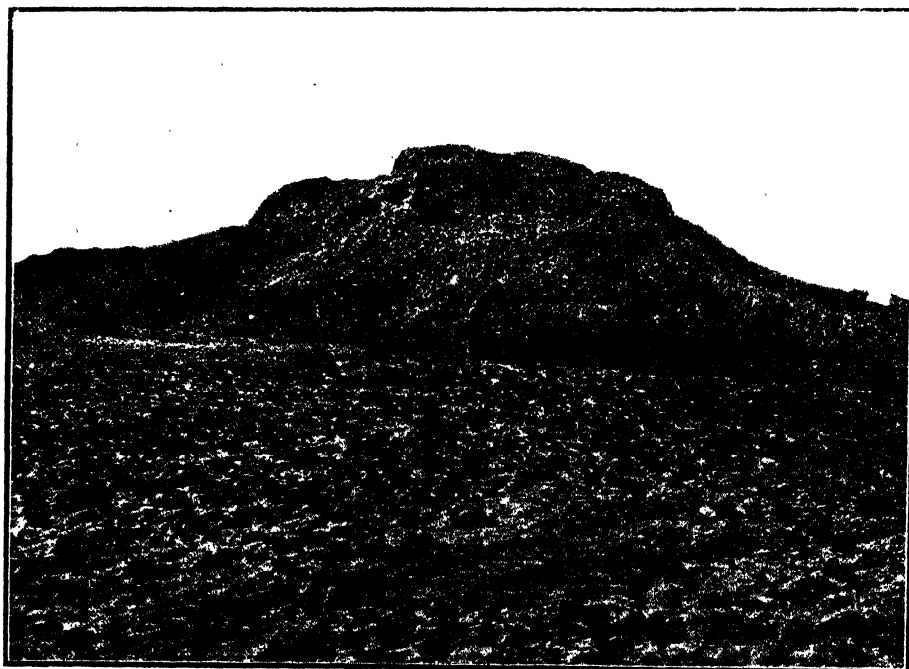
মুহেন-জো—দারো মঠ

মুহেন-জো—দারো স্তূপ

বিষয়ে কানিংহাম্ প্রমুখ প্রত্নতত্ত্ববিদদের সঙ্গে একমত হইতে পারেন নাই। তিনি মনে করেন, এই সব মোহরের উৎকীর্ণ অক্ষরগুলি প্রাচীন ব্রাহ্মী অক্ষর নহে—'চিত্রাক্ষর' (hieroglyphics) মাত্র। ভারতের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল ডাঃ ডি-বি-স্পুনার রাখালবাবুর মতেরই সমর্থন করিতেছেন।

রাখালদাস বাবুর আবিষ্কৃত তিনটি মোহর, দুইটি বিভিন্ন রকমের মিত্রাক্ষরের পরিচয় প্রদান করিতেছে। তাঁহার আবিষ্কৃত চারপাঁচটি মুদ্রা হইতেও আর এক ধরণের চিত্রাক্ষরের পরিচয় পাওয়া যায়, যাহা মিশরীয় চিত্রাক্ষর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহা ছাড়া, এই সব চিত্রাক্ষর হইতে এ কথাটাও বেশ বুঝা যায় যে, যাঁহারা এই-সব চিত্রাক্ষর ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহারা অসভ্য ছিলেন না। অন্ততঃ নিজেদের একটা বিশেষ মুদ্রা-প্রচলন-পদ্ধতি যে তাঁহাদের ছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এশিয়ার নূতন ধরণের চিত্রাক্ষরের এই আবিষ্কারটাই সম্ভবতঃ একমাত্র আবিষ্কার মিশরের চিত্রাক্ষর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এই চিত্রাক্ষরগুলি প্রাচীন উৎকীর্ণ লিপি-বিদ্যার একটি বিশেষ শাখা প্রতিষ্ঠিত করিবে।

এই-সব মোহরের আর একটা বিশেষত্ব এই যে, এগুলিতে একটি 'ইউনিকর্ণের' চেহারা আঁকা, আর সেই ইউনিকর্ণের পিঠে জিন-আঁটা।

এই দ্বীপটিতেই রাখালবাবু আরও একটি স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই শেষোক্ত স্তূপটির ভিতর হইতে প্রায় দুই শত শ্বেত-পাথরের পাত্র (caskets) পাওয়া গিয়াছে। অর্থানুসন্ধিৎসু দস্যুদের হাত যে এগুলির উপরেও পড়িয়াছিল,—ইহাদের ভগ্নাবস্থাই তাহার প্রমাণ। এই-সব আবিষ্কারের ভিতর মুসলমান সময়ের প্রকৃষ্ট চিহ্ন একটিও পাওয়া যায় নাই। সিন্ধু প্রদেশের প্রথম যুগের আরব-শাসনকর্ত্তাদের আমলের ছোট ছোট তাম্র-মুদ্রায় সিন্ধুপ্রদেশের 'ব'দ্বীপটি একরূপ পরিপূর্ণ। কিন্তু এই নবাবিষ্কৃত স্তূপগুলিতে সে-সব তাম্র-মুদ্রারও সন্ধান মেলে নাই। সুতরাং মোহেঞ্জ-দারোর এই ধ্বংসাবশেষ হইতে এ সত্যটা বেশ স্পষ্ট ভাবেই প্রমাণিত হয় যে, এই পুরাতন নগরটি, নদীর স্রোত অন্যদিক দিয়া প্রবাহিত হওয়ার দরুণ, খ্রীষ্ট-পর তৃতীয় শতাব্দীতেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল এবং মুসলমানদের অষ্টম শতাব্দীর সিন্ধু-বিজয় তাহার অনেক পরের ঘটনা।

নায়েব মহাশয়

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

বিংশ পরিচ্ছেদ

নায়েব শ্রীনাথ গোঁসাই ভূতপূর্ব নায়েব সর্ব্বাঙ্গ সান্যালের জামাতা মনোমোহন মৈত্রকে মহাশত্রু জ্ঞানে পদচ্যুত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই; কিন্তু হাম্‌ফ্রি সাহেব নায়েবকে খুসী করিবার জন্য মনোমোহনকে কান্‌সারণের অধীন সূর্য্যনগর কুঠীতে বদলী করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার উপর গোয়েন্দাগিরি করিবার জন্য নায়েব তাহার শ্যালক বীরেন্দ্রকে উক্ত কুঠীর পেস্কারী পদে বাহাল করিয়াছিল, এ কথা পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে। মনোমোহন সূর্য্যনগরে বদলী হইলেও নায়েব তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টায় বিরত হইল না। বীরেন্দ্রের প্রতি তাহার আদেশ ছিল, মনোমোহনের ছিদ্র আবিষ্কারের জন্য সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে; এবং তাঁহার কোন ত্রুটি দেখিতে পাইলেই গোপনে তাহার নিকট 'রিপোর্ট' করিবে। যদি কোন অপরাধে মনোমোহনকে পদচ্যুত করাইতে পারে, তাহা হইলে বীরেন্দ্র ভগিনীপতির অনুগ্রহে সূর্য্যনগরের নায়েবী লাভ করিবে, এই আশায় সে মহা উৎসাহে গোয়েন্দাগিরি করিতে লাগিল। নায়েব তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমিন হৃষীকেশকে এবং অন্নদাতা ও দুর্দ্দিনের আশ্রয়দাতা সর্ব্বাঙ্গ সান্যালের জামাতা মনোমোহনকে কান্‌সারণের চাকরী হইতে তাড়াইতে পারিলে নিষ্কণ্টক হইবে, এই আশায় ক্রমাগত তাহাদের দোষ খুঁজিতে লাগিল। সহোদর হৃষীকেশের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া শ্যালক বীরেন্দ্রকে সূর্য্যনগরের পেস্কারী দেওয়াতে, হৃষী নায়েবের উপর জাতক্রোধ হইয়াছিল। নায়েবও তাহাকে হাতে না মারিয়া ভাতে মারিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। হৃষীকেশের দুর্ভাগ্য,—সে নায়েবের দৃষ্টির বাহিরে অন্য কোন কুঠীতে বদলী হইয়া হাঁফ ফেলিবার সুযোগ পাইল না।

সূর্য্যনগর মুচিবাড়িয়ার এলাকাভুক্ত কুঠী; সুতরাং এই কুঠীর ম্যানেজার মিঃ হড্‌সন্ কান্‌সারণের ম্যানেজার হাম্‌ফ্রি সাহেবের তাঁবেদার (Subordinate)। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত 'সব্‌ডিভিসনাল আফিসার' জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের যে সম্বন্ধ, হাম্‌ফ্রি সাহেবের সহিত হড্‌সন সাহেবের সম্বন্ধও ঠিক সেইরূপ। কিন্তু বংশমর্য্যাদায় মিঃ হড্‌সন হাম্‌ফ্রি সাহেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মিঃ হড্‌সন সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি সুশিক্ষিত, সদাশয়, নিরপেক্ষ ও ধর্ম্মভীরু কর্ম্মচারী ছিলেন। অল্পদিন পূর্ব্বে স্বদেশ হইতে এদেশে চাকরী করিতে আসায়, তিনি খাঁটি জন বুষের মহৎ গুণগুলি বিসর্জ্জন দিয়া 'কুঠেল সাহেব'-দের দোষগুলি আয়ত্ত করিতে পারেন নাই; স্বার্থ অপেক্ষা মনুষ্যত্বই তাঁহার নিকট আদরের বস্তু ছিল। স্বার্থের অনুরোধে তিনি আত্মসম্মান ও বিবেকের মস্তকে পদাঘাত করিতে রাজী নহেন দেখিয়া, হাম্‌ফ্রি সাহেব তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কতকটা হতাশ হইয়াছিলেন! তিনি মিঃ হড্‌সনকে নির্ব্বোধ ও অকর্ম্মণ্য মনে করিতেন; অনেক সময় তাঁহাকে হিতোপদেশও দিতেন; কিন্তু হড্‌সন তাঁহার নায়েব শ্রীনাথ গোঁসাই নহেন। তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা হড্‌সন মিঃ হাম্‌ফ্রির বড় তোয়াক্কা রাখিতেন না। বলা বাহুল্য, এরূপ উপরওয়ালার অধীনে চাকরী করিয়া সূর্য্যনগর কুঠীর আমলা মাত্রেই বেশ সুখে ছিল। সাহেব তাহাদের ভালবাসিতেন এবং বিশ্বাস করিতেন। তাহারাও সাহেবকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিত, তাঁহাকে মুরুব্বি মনে করিত। তিনিও সাধ্যানুসারে তাহাদের সাহায্য করিতেন। হাম্‌ফ্রি সাহেব এজন্য সময়ে সময়ে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন। তিনি বলিতেন, হড্‌সনের কাছে অতিরিক্ত indulgence পাইয়া সূর্য্যনগরের আমলাগুলা অত্যন্ত বে-সায়েস্তা হইয়া উঠিয়াছে,—তাহাদিগকে controlএ রাখিবার শক্তিও তাঁহার নাই! এরূপ লোক ম্যানেজার হইবার যোগ্য নয়। উঠিতে বসিতে বাপান্ত চাবুক ও রেকাব-দল—আমলাদের দিয়া কাজ আদায়ের অব্যর্থ মুষ্টিযোগ; যে ম্যানেজার তাহা না পারেন, তিনি ম্যানেজারীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন

না। কালা নেটিভগুলাকে জুতার নীচে রাখাই ম্যানেজার-দের কার্য্যদক্ষতার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ,—হড্‌সন ইহা কবে বুঝিবে?

যাহারা কপট, নিষ্ঠুর, সঙ্কীর্ণচেতা, তাহারা প্রায়ই কাপুরুষ হয়; এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, উচিতবক্তা, তেজস্বী লোককে তাহারা ভয় করিয়া চলে; প্রকাশ্য ভাবে অন্যায়ের সমর্থন করিতে সাহস করে না। এইজন্য উপরওয়ালা হইয়াও হাম্‌ফ্রি সাহেব মিঃ হড্‌সনকে স্বেচ্ছানুসারে পরিচালিত করিতে পারিতেন না; অন্যায় ও ইতরতার প্রতি হড্‌সনের যে স্বাভাবিক ঘৃণা ছিল, হাম্‌ফ্রি সেই ঘৃণার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে লজ্জিত হইতেন। মিঃ হড্‌সনকে অনেক বিষয়েই তাঁহার উপরওয়ালা হাম্‌ফ্রি সাহেবের মুখাপেক্ষা করিতে হইত; বিশেষতঃ, কাহাকেও কোন কাজে বাহাল বা বরখাস্ত করা, জমীজমা সংক্রান্ত কোন বন্দোবস্ত, প্রজাসাধারণের কোন হিতকর অনুষ্ঠানে সাহায্য প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার কোন ক্ষমতা ছিল না,—হাম্‌ফ্রি সাহেব মঞ্জুর না করিলে, তিনি ঐ সকল ব্যাপারে চূড়ান্ত হুকুম দিতে পারিতেন না। প্রজাদের অসুবিধা ও কর্ম্মচারীদের কষ্ট দূর করিবার জন্য তাঁহার এরূপ প্রবল আগ্রহ ছিল যে, অনেক সময়েই কার্য্যোদ্ধারের জন্য তিনি হাম্‌ফ্রি সাহেবকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিতেন; এবং হাম্‌ফ্রি সাহেবকে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও মিঃ হড্‌সনের অনেক প্রস্তাব মঞ্জুর করিতে হইত। এক এক সময় তিনি মিঃ হড্‌সনের ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন, কিন্তু মুখে কিছুই বলিতেন না।

ছোট বড় সকল আমলা, যখন ইচ্ছা হড্‌সন সাহেবের সম্মুখে গিয়া, তাহাদের অভাব-অভিযোগের কথা অসঙ্কোচে তাঁহার গোচর করিত,—তিনি তাহাতে বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট হইতেন না। মনোমোহন কার্য্যদক্ষ আমলা ছিলেন, এবং মিঃ হড্‌সনের প্রত্যেক আদেশ সযত্নে পালন করিতেন। এজন্য মনোমোহন সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা খুবই ভাল ছিল। তিনি মনোমোহনকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন। অনেক জটিল বিষয়ে তিনি মনোমোহনের পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করিতেন।

বলা বাহুল্য, শ্রীনাথ নায়েবের শ্যালক ও গোয়েন্দা বীরেন্দ্র হড্‌সন সাহেবের পেস্কার বলিয়া কোন ব্যাপারই তাহার অজ্ঞাত থাকিত না। 'মনোমোহন বুদ্ধিবলে ও চাতুর্য্য-কৌশলে হড্‌সন সাহেবকে মুঠার ভিতর পুরিয়াছে; সে সাহেবকে যে কাতে শোয়াইতেছে, সাহেব সেই কাতে শুইতেছেন, এবং তাঁহাকে যাহা বুঝাইতেছে, তিনি তাহাই বুঝিতেছেন' বীরেন্দ্রের 'গোপনীয় পত্রে' শ্রীনাথ নায়েব এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইয়া উঠিল। হড্‌সন সাহেবের উপর সে বড়ই অসন্তুষ্ট হইল; কিন্তু মিঃ হড্‌সনের অনিষ্ট সাধন তাহার এক্তিয়ারের বাহিরে। অগত্যা সে মনোমোহনেরই দোষোদ্ঘাটন করিয়া মিঃ হাম্‌ফ্রির নিকট হড্‌সন সাহেবকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। নায়েব বুঝিল, হাম্‌ফ্রি সাহেবের নিকট হড্‌সন অপদস্থ হইয়া বকুনী খাইলেই, মনোমোহনের প্রতি মিঃ হড্‌সনের বিশ্বাস নষ্ট হইবে, শ্রদ্ধাও দূর হইবে। তখন মনোমোহনকে জব্দ করা অনেকটা সহজ হইবে। সুতরাং সদর হইতে কথায় কথায় মনোমোহনের 'কৈফিয়ৎ তলপ' হইতে লাগিল; মনোমোহন সদর সেরেস্তার কৈফিয়তের চোটে অস্থির হইয়া উঠিলেন, এবং কাজকর্ম্মে যথেষ্ট সতর্কতাবলম্বন করিলেন। কিন্তু দুরাত্মার ছলের অসদ্ভাব নাই; কিছুদিন পরে সূর্য্যনগর কুঠীর আর একটি আমলা একটি গুরুতর ভুল করিয়া বসিল। বীরেন্দ্র সেই ভুল মনোমোহনের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়া নায়েবকে গোপনে জানাইল—এই ভুলের জন্য মনোমোহনই দায়ী। নায়েব হাম্‌ফ্রি সাহেবকে মনোমোহনের অপরাধের গুরুত্ব বুঝাইয়া দিলে, মিঃ হাম্‌ফ্রি মনোমোহনের কৈফিয়ৎ তলপ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না,—তাঁহাকে পদচ্যুত করিবারও সঙ্কল্প করিলেন। মনোমোহন অগত্যা হড্‌সন সাহেবের শরণাপন্ন হইলেন। হড্‌সন সাহেব বুঝিতে পারিলেন, মনোমোহনকে পদচ্যুত করিবার জন্য সদর আফিসে ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইয়াছে। তিনি হাম্‌ফ্রি সাহেবকে জানাইলেন, যে অপরাধে মনোমোহনের কৈফিয়ৎ তলপ করা হইয়াছে—সেই অপরাধের জন্য মনোমোহন দায়ী নহে, এ জন্য তিনিই একা দায়ী, এবং ইহা তাঁহারই ভ্রমের ফল। অগত্যা মনোমোহনকে পদচ্যুত করিবার এরূপ অব্যর্থ সুযোগটি মাঠে মারা গেল। হড্‌সন সাহেবের অনুগ্রহে মনোমোহন সে যাত্রা নিষ্কৃতি পাইলেন বটে, কিন্তু হাম্‌ফ্রি সাহেবের ধারণা হইল—যে

নায়েবকে রক্ষা করিবার জন্য মিঃ, হড্‌সনের মত দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ইংরাজ ম্যানেজারকে সকল দোষ নিজের ঘাড়ে গ্রহণ করিতে হয়, সেই নায়েবের উৎকট প্রভাব হইতে মিঃ হড্‌সনকে মুক্ত করিতে না পারিলে, ভবিষ্যতে তাহা দ্বারা কুঠীর বিস্তর ক্ষতি হইতে পারে। সে মিঃ হড্‌সনকে মুঠায় পুরিয়া নানা ভাবে স্বার্থসিদ্ধি করিতেছে। তাহাকে শাসনে রাখা মিঃ হড্‌সনের সাধ্যাতীত। নায়েব শ্রীনাথ গোঁসাই হাম্‌ফ্রি সাহেবকে বুঝাইয়া দিল, ধূর্ত্ত মনোমোহন হড্‌সন্ সাহেবকে সাক্ষী গোপাল পরিণত করিয়া, সূর্য্যনগর এলাকার শাসন দণ্ড স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং মনোমোহনকে সরাইয়া বীরেন্দ্র পেস্কারকে সূর্য্যনগর কুঠীর নায়েবীতে নিযুক্ত করিলে, এক দিকে যেমন কান্‌সারণের স্বার্থরক্ষা হইবে, তেমনই অন্য দিকে 'ঝিকে মারিয়া বৌকে শিক্ষা দেওয়া' হইবে হড্‌সন সাহেব বুঝিতে পারিবেন—নায়েবের পক্ষ সমর্থন করিয়া সকল দোষ নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করায়, তাঁহার আশ্রিত-বাৎসল্য প্রতিপন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহাতে তাঁহার ব্যক্তিগত পদগৌরব ক্ষুণ্ণ হইয়াছে,—তাঁহার অযোগ্যতা সপ্রমাণ হইয়াছে।

নায়েবের এই যুক্তি হাম্‌ফ্রি সাহেব সঙ্গত বলিয়াই মনে করিলেন। কিন্তু গুরুতর অপরাধ ব্যতীত মনোমোহনকে পদচ্যুত করা অবৈধ ভাবিয়া, তিনি তাঁহাকে কিঞ্চিৎ মাসিক বৃত্তি দিয়া নায়েবী পদ হইতে অপসারিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। দ্বিতীয় পক্ষের ক্রোধ ও অভিমানের কথা স্মরণ করিয়া নায়েব তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য সূর্য্যনগর কুঠীর নায়েবীটা বীরেন্দ্রকে দেওয়ার আশায় মিঃ হাম্‌ফ্রির স্তবস্তুতি আরম্ভ করিল। সাহেব নায়েবের সুপারিস অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া, বীরেন্দ্রকেই নায়েবী পদে নিযুক্ত করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। নায়েবের ভাই হৃষীকেশের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া হাম্‌ফ্রি সাহেব নায়েবের স্ত্রীর ভাইকে পূর্ব্বে সূর্য্যনগরের পেস্কারী দিয়াছিলেন; হৃষী সাহেবের নিকট দরবার করিলে, তিনি তাহাকে ভরসা দিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে তাহার প্রতি সুবিচার করিবেন,—ভাল চাকরী খালি হইলে, তাহাকেই সেই পদে নিযুক্ত করিবেন। সূর্য্যনগরের নায়েবীপদ খালি হইতেছে শুনিয়া হৃষীও আশ্বস্ত হৃদয়ে সাহেবের নিকট উপস্থিত হইল, এবং সাহেবকে তাঁহার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দিল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সাহেব কোন দিন হৃষীর নিকট তাহাকে উচ্চতর পদে নিযুক্ত করিবার অঙ্গীকার করা দূরের কথা, কোনও রকম আশা-ভরসা দিয়াছিলেন, ইহাও স্মরণ করিতে পারিলেন না; তাহাকে কড়া কথা বলিয়া তাড়াইয়া দিলেন। এদিকে নায়েবও—হৃষী তাহার ভাই হইয়া তাহার শ্যালকের মুখের গ্রাস কাড়িয়া খাইবার চেষ্টা করিতেছে—এই সংবাদ জানিতে পারিয়া, হৃষীকে প্রকাশ্য ভাবে কদর্য্য ভাষায় গালি দিতে লাগিল। সেরূপ অভদ্র গালাগালি ও অশ্লীল রসিকতা ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে পারে না। ভদ্র সমাজ দূরের কথা, তত্দূর নির্লজ্জতা ও ইতরতার পরিচয় দেওয়া ডোম, চামার, ধাঙড়দের পক্ষেও লজ্জাজনক।

সাহেবের নিকট গিয়া প্রত্যাখ্যাত ও ভ্রাতা কর্ত্তৃক প্রকাশ্য ভাবে অপমানিত হইয়া হৃষী মর্ম্মাহত হইল। তাহার ধারণা ছিল—সাহেব লোক আর যাহাই করুক, অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না; কিন্তু হাম্‌ফ্রি সাহেব অনায়াসে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া গালি দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না! তাহার উপর তাহার ভ্রাতার এই ব্যবহার! দুঃখ-কষ্টে, অভিমানে ও আত্মগ্লানিতে অভিভূত হইয়া হৃষীকেশ উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিল! পুলিশ রিপোর্ট করিল, শিরঃপীড়ার অসহ্য যন্ত্রণায় সে আত্মহত্যা করিয়াছে। শিরঃপীড়াই বটে!

সেই দিন হইতে মর্ম্মাহত, অকালে মৃত্যু কবলিত ব্রাহ্মণের দীর্ঘশ্বাস ও অভিসম্পাত ছায়ার ন্যায় ভ্রাতৃহন্তা, মিত্রদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক, কৃতঘ্ন মহাপাপিষ্ঠ নায়েবের অনুসরণ করিতেছে! কিন্তু নায়েব প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও শ্যালক বীরেন্দ্রকে আর সূর্য্যনগরের নায়েবীতে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিল না। হৃষীকেশের শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ হাম্‌ফ্রি সাহেবের কর্ণগোচর হইলে, ক্ষণকাল তিনি স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল, হৃষীর মৃত্যুর জন্য তিনিই দায়ী। তিনি তাহাকে উচ্চতর পদে নিযুক্ত করিবার আশা দিয়াছিলেন; অথচ সেই সুযোগ উপস্থিত হইলে, তিনি অঙ্গীকার বিস্মৃত হইয়া তাহার সর্ব্বপ্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বীরেন্দ্রকে নায়েবী পদ প্রদানের অভিপ্রায় করিলেন! ইহা তাঁহার ন্যায় পদস্থ ভদ্রলোকের পক্ষে

কতদূর গর্হিত হইয়াছে বুঝিয়া, সাহেব বড়ই অনুতপ্ত হইলেন; এবং সেই অনুতাপ বাক্যে প্রকাশ করিয়া প্রথমতঃ নায়েবকে কতকগুলি তিরস্কার করিলেন। তাহার পর তাহাকে জানাইলেন, বীরেন্দ্রকে সূর্য্যনগরের নায়েবী দেওয়া হইবে না! 'অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোপি ভয়ঙ্করঃ।'

স্বামীর নীচতা, কপটতা, চরিত্রহীনতার পরিচয় পাইয়া নায়েবের 'দ্বিতীয় সংসার' দীনতারিণী দেবী পূর্ব্ব হইতেই তাহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়াছিলেন। নায়েব তাঁহার মানভঞ্জন ও মনোরঞ্জনের জন্য শ্যালক বীরেন্দ্রকে সূর্য্যনগরের নায়েবী দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিল,—হাম্ফ্রি সাহেবের আদেশে সে আশা বিলুপ্ত হইল। কুক্রিয়াসক্ত প্রতারক স্বামী শত অপরাধের উপর ভ্রাতৃহত্যা ও ব্রহ্ম হত্যার পাতক সঞ্চয় করিয়াছে শুনিয়া, দীনতারিণীর পক্ষে ধৈর্য্য ধারণ করা কঠিন হইল। তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া মূল্যবান গৃহসামগ্রী হইতে তৈজসপত্র পর্য্যন্ত চূর্ণ করিতে লাগিলেন। নায়েব ইহাতে বাধা দানের চেষ্টা করায়, তিনি রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিতে যষ্ঠি হস্তে তাহাকে শাসন করিতে উদ্যত হইলেন! তাহার পর যে অভিনয় আরম্ভ হইল, ভদ্র-সাহিত্যে তাহার বর্ণনা প্রকাশের যোগ্য নহে। সেই দুর্দ্দমনীয় দম্পতি-কলহের উপর যবনিকা নিক্ষেপ করাই কর্ত্তব্য। অবশেষে দীনতারিণী দেবী রমণীর সর্ব্বাপেক্ষা সাংঘাতিক ব্রহ্মাস্ত্রের সহায়তা গ্রহণ করিলেন;—তিনি অনাহারে অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে পিতৃগৃহে প্রস্থান করিলেন। নায়েব তখন পরকীয়ার প্রেমতরঙ্গে ভাসমান,—পিতৃভবন-গমনোন্মুখা দুঃশীলা পত্নীকে ফিরাইবার চেষ্টা করিল না। বোধ হয় মনে মনে বলিল, "এ রোষ রবে না চিরদিন!" অতঃপর নায়েব ঘরে বিন্দুমাত্র শান্তি নাই দেখিয়া—

"ঘর কৈল বাহির, বাহির কৈল ঘর,
পর কৈল আপন, আপন কৈল পর।"

নায়েবের ব্যবহারে অন্য লোক দূরের কথা, তাহার বালক পুত্র জ্ঞানেন্দ্র পর্য্যন্ত ক্ষুব্ধ না হইয়া থাকিতে পারিল না। সেই মাতৃহীন বালক কোন দিন বিমাতার স্নেহযত্ন লাভ করিতে পারে নাই; পিতা সর্ব্বদা সুখের সন্ধানে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়,—বাড়ীতে তাহার মুখের দিকে চাহিবারও তেমন কেহ নাই। সে দিন দিন মনের দুঃখে ও অযত্নে শুকাইয়া উঠিতে লাগিল। সে কাহারও সহিত মন খুলিয়া কথা বলিত না,—সর্ব্বদাই নির্জ্জনে চিন্তা করিত; এমন কি, তাহার পিসিকেও তাহার কোন অভাবের কথা জানাইত না। অবশেষে জ্ঞানেন্দ্র কঠিন রোগে আক্রান্ত হইল। সে নায়েবের ছেলে,—তাহার চিকিৎসার ত্রুটি হইবার কথা নয়; নায়েব মহাসমারোহে তাহার চিকিৎসা আরম্ভ করিল। মুচিবাড়িয়ার ডাক্তারেরা প্রাণপণে তাহার চিকিৎসা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ায়, জাফরগঞ্জের সদরে চিকিৎসার জন্য তাহাকে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে জেলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ তাহার চিকিৎসা করিয়াও তাহাকে পরমায়ু দিতে পারিলেন না। ভগবান তাহাকে নিজের কোলে টানিয়া লইলেন,—অস্ফুট কুসুমকোরক অকালে ঝরিয়া পড়িল; মায়ের কাছে গিয়া সে চিরশান্তি লাভ করিল। তাহার মৃত্যু সংবাদে তাহার পিসি, কাকা, কাকীরা অশ্রুত্যাগ করিয়াছিল; কিন্তু তাহাকে হারাইয়া তাহার পিতার হৃদয়ে কিরূপ আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই; কারণ, কেহই কোন দিন পুত্র-শোকে তাহাকে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে, কিংবা তাহার নয়ন-কোণে অশ্রু দেখিতে পায় নাই। কেহ বালকের অকাল বিয়োগের জন্য দুঃখ করিলে, নায়েব বলিত, 'ছোঁড়ার চিকিচ্ছেয় বিস্তর টাকা অপব্যয় করলাম; ধেরো ছিলাম, ধার শোধ করেছি! ভগবান দিয়েছিলেন, তিনিই ফেরৎ নিলেন। সংসার অসার, মায়াময়; অগ্র পশ্চাৎ সকলকেই ঐ পথে যেতে হবে। সংসারের গতিই যখন এই, তখন আর অনিত্য পদার্থের জন্য দুঃখ করে লাভ কি ভাই!"

পুত্রের মৃত্যুর পর নায়েবের উচ্ছৃঙ্খলতা আরও বাড়িয়া উঠিল! সংসার মায়াময় ও অনিত্য স্থির করিয়া, নায়েব নিত্য সুখের সন্ধানে উন্মত্তের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এই অবস্থায় এক দিন সে সন্ধান পাইল,—মুচি-বাড়িয়ার এলাকাধীন শিমুলতলা গ্রামে নাটু বৈরাগীর ষোড়শ বর্ষীয়া সধবা কন্যা সরলা বোষ্টুমী এই অসার অনিত্য সংসারধামে একমাত্র সার ও নিত্য পদার্থ! সুতরাং নায়েব সেই নিত্য ধন লাভ করিবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিল, এবং সুদক্ষ শিকারী নিযুক্ত করিল। এক দিন

গভীর রাত্রে সেই নিত্যপদার্থ মুচিবাড়িয়ার আক্কেল আলি নামক একটি মুসলমান প্রজার গৃহে নীত হইল। আক্কেল আলি নায়েব গোস্বামী প্রভুর ন্যায় নিষ্ঠাবান সাত্ত্বিক লোক ছিল না; সে এই নিত্যধন অপেক্ষা অনিত্য ও অসার অর্থটাকেই অধিক মূল্যবান মনে করিয়া 'চোরের উপর বাটপাড়ী' করিল, অর্থাৎ মাণিকচরের একটি রূপ-জীবিনীর নিকট তাহাকে নগদ একশত টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়া, "শত্রুঞ্চ গৃহমাগতম্" এই নীতিবাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিল! টাকাগুলির আদান-প্রদান গোপনেই হইল, এবং সরলা যখন গরুর গাড়ীতে উঠিয়া রূপের হাটে চলিল, তখন তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইল, তাহাকে তাহার পিত্রালয়েই প্রেরণ করা হইতেছে, সুতরাং সে কোন রকম গণ্ডগোল বা আপত্তি করিল না।

কিন্তু 'নিত্য ধন' হস্তান্তরিত হইয়া গোরুর গাড়ীতে স্থানান্তরে প্রেরিত হইতেছে—এই সংবাদ সেই রাত্রেই নায়েব গোস্বামী প্রভুর কর্ণগোচর হইল! নায়েব তৎক্ষণাৎ মুচিবাড়িয়া থানার জমাদার সাহেবালি মিঞাকে ডাকাইয়া গোশকট হইতে 'নিত্য ধন' উদ্ধার করিতে আদেশ করিল। সাহেবালি জমাদারের বাড়ীও শিমুলতলা গ্রামে; সরলার পিতা নাটু বৈরাগী তাহার সুপরিচিত। সাহেবালি সেই রাত্রেই সরলাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া নিজের বাসায় রাখিয়া দিল, এবং ভবিষ্যতে পাছে তাহাকে কোন ফ্যাসাদে পড়িতে হয়—এই আশঙ্কায় সে নাটু বৈরাগীকে সংবাদ পাঠাইল।

রসময় দারোগা তখন মুচিবাড়িয়া থানার সব্-ইন্‌স্পেক্টর। এই দারোগাটি নলিনী দারোগার মাস্‌তুতো ভাই! সুতরাং নায়েবের আদেশ সে তাহার উপর-ওয়ালার আদেশের ন্যায় অমোঘ মনে করিত। নাটু বৈরাগীকে তাহার অপহৃতা কন্যার সংবাদ পাঠানো হইয়াছে শুনিয়া, পর দিন অতি প্রত্যুষেই কুঠীর হালসানা ও পাইক পাঠাইয়া নায়েব সাহেবালি জমাদারের বাসা 'ঘেরাও' করিল। তাহার পর রসময় দারোগা সহ সেই বাসার ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহার সাধনার অবলম্বন 'নিত্য ধন' উদ্ধার করিল! মুচিবাড়িয়ায় এরূপ লোক একজনও ছিল না, যে, নায়েব ও তস্য দোস্ত দারোগার এই অবৈধ কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে সাহস করে! সাহেবালি জমাদার কুঠীর প্রজা।—তাহার উপর দারোগা নায়েবের সহায়,—সে নায়েবের এই 'বে-আইনী অনধিকার প্রবেশে'র বিরুদ্ধে একটা কথাও জোর করিয়া বলিতে পারিল না। বরং নায়েবই তাহাকে জানাইয়া দিল—এই ব্যাপার লইয়া যদি সে আন্দোলন করে, বা এ সম্বন্ধে কোন কথা 'উপরে' জানায়—তাহা হইলে নারীহরণের 'চার্জ্জে' নায়েব পুলিশ সাহেবকে দিয়ে তাহার চাকরীর মস্তক ভক্ষণ করাইয়াই ক্ষান্ত হইবে না,—মুচিবাড়িয়ার এলাকা হইতেও তাহাকে বিতাড়িত হইতে হইবে। অনিত্য সংসারের মায়া ত্যাগ করিয়া নিত্যধন লাভের জন্য নায়েবের প্রাণ এতই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল! সাহেবালি জমাদার তাহার আস্তানা-টুকু এবং ততোধিক মূল্যবান দুর্লভ চাকরীটুকু বজায় রাখিবার জন্য অশ্রুধারায় গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরণ কমল প্লাবিত করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল—এমন কর্ম্ম সে আর কখনও করিবে না, অর্থাৎ বাটপারের কবল হইতে চোরামাল উদ্ধার করিয়া সেই সংবাদ গৃহস্বামীকে জানাইবে না!

দেবেন্দ্র বাবু নামক একটি ভদ্রলোক তখন মুচি-বাড়িয়ার পুলিশ-তরণীর কর্ণধার, অর্থাৎ পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর। শ্রীনাথ নায়েবের সঙ্গে তাঁহার 'হরিহর আত্মা',—ইহা কাহারও অজ্ঞাত ছিল না। তিনি নায়েবের সহিত পরামর্শ করিয়া ঘটনার পূর্ব্ব দিন 'নল্‌চে আড়াল দিয়া' তামাক খাইয়া-ছিলেন; অর্থাৎ তিনি মুচিবাড়িয়া উপস্থিত থাকিতে তাঁহার চোখের পর এতবড় বে-আইনী কাণ্ডটা উদ্ঘটিতে দেওয়া 'দৃষ্টিকটু' হইবে মনে করিয়া মফঃস্বলে যাত্রা করিয়া-ছিলেন। ঘটনার পরদিন তিনি মুচিবাড়িয়ায় প্রত্যাগমন করিলে, সাহেবালি জমাদার হুজুরের নিকট কাঁদিয়া পড়িল। হুজুর তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "কার হুকুমে তুমি বোষ্টুমীটাকে জোর করে গাড়ী থেকে ধ'রে এনে তোমার বাসায় রেখেছিলে? গোড়াতেই ছিল তোমার কুমতলব! নায়েব ও দারোগা তোমার বাসায় ঢুকে তোমার 'জেনানা' বের করে নিয়ে যায় নি ত? তবে আর এত দুঃখ কেন? পুলিশে চাকরী করতে গেলে এ সব 'ঝক্কি' এক আধটু সহ্য করতে হয়। চাকরীটুকু বজায় রাখ্‌তে চাও ত চেপে যাও বাবা! এ কথা নিয়ে আর 'গুলতুনি' ক'রো না। জলে বাস ক'রে কুমীরের লেজে খোঁচা দেওয়া বেজায় আহাম্মুকি।'—সুতরাং জমাদার এই ব্যাপার লইয়া আর

উচ্চবাচ্য করিল না। যে রক্ষক সে-ই ভক্ষক হইলে আর উপায় কি? এই অভিশপ্ত দেশে মফঃস্বলের পল্লীতে পল্লীতে এরূপ কাণ্ড কত ঘটিতেছে, কয়জন তাহার সংবাদ রাখে?

কিন্তু গোস্বামী প্রভুর এই কুকীর্ত্তির জের এখানেই মিটিল না। নায়েব মুচিবাড়িয়ার জনসাধারণকে নিঃস্বার্থ পরোপকারের দৃষ্টান্তে মুগ্ধ করিবার জন্য, সরলা বোষ্টমীকে তাহার বিশ্বস্ত অনুচর পীরবক্স হালসানার জিম্মা করিয়া দিয়া, তাহাকে বলিল, "এই মেয়েটাকে শিমুলতলায় নিয়ে গিয়ে, ওর বাপ নাটুবোরেগীর বাড়ীতে রেখে আয়।" নায়েবের সদাশয়তার পরিচয় পাইয়া সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। প্রভুর কি নিষ্ঠে!

সরলার স্বামী তাহাকে তাহার পিত্রালয়ে রাখিয়া জীবিকার্জ্জনের জন্য স্থানান্তরে থাকিত। সাহেবালি জমাদার মাণিকচরবাসিনী রূপোপজীবিনীর কবল হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া শিমুলতলায় নাটুর বাড়ীতে সংবাদ পাঠাইলে, নাটু সেদিন গ্রামান্তরে ভিক্ষা করিতে যাওয়ায়, কন্যার বিপদের কথা জানিতে পারিল না। তিনদিন পরে গৃহে ফিরিয়া সে সকল কথা শুনিতে পাইল, এবং ক্ষণকাল বিশ্রাম না করিয়া, কন্যাকে বাড়ী আনিবার জন্য মুচিবাড়িয়ায় যাত্রা করিল।

নাটু বৈরাগী কন্যার সন্ধানে সাহেবালি জমাদারের বাসায় গিয়া শুনিতে পাইল, নায়েব শ্রীনাথ গোঁসাই তিন দিন পূর্ব্বে সরলাকে তাহার বাসা হইতে স্থানান্তরিত করিয়াছে! এই সংবাদে নাটু সেইখানে বসিয়া পড়িয়া মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিল। সাহেবালি তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া নায়েবের কাছে পাঠাইয়া দিল।

লম্পট-চূড়ামণি নায়েবের কবল হইতে সুন্দরী যুবতী কন্যাকে উদ্ধার করিয়া আনা তাহার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির পক্ষে কত বড় কঠিন কাজ, তাহা নাটুর অজ্ঞাত ছিল না; তথাপি কন্যার আশা ত্যাগ করিতে না পারিয়া, সে কুঠীতে গিয়া নায়েবের পদপ্রান্তে আছড়াইয়া পড়িল,—কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বাবা, আপনি আমাদের মা বাপ,—আমার মেয়েটিকে ফেরত দিয়ে আমাদের প্রাণরক্ষে করুন, ভগবান আপনার কল্যাণ করবেন। মেয়েটার 'গব্বধারিণী' মেয়ের শোকে কেঁদে কেঁদে পাগলের মতন হয়েছে, আহার নিদ্রে তেয়াগ করেছে।"

নাটুর কথা শুনিয়া নায়েব বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "আজ তিন দিন হ'ল পীরবক্স হাল্‌সানা তোমার মেয়েকে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে তোমাদের গাঁয়ে রেখে এসেছে ত! সে কি বাড়ী যায় নি? তবে গেল কোথায়? খোঁজ করে দেখ,—কারও সঙ্গে সে কোন দিকে সরে প'ড়ে থাকতে পারে।"

নাটু কাঁদিতে কাঁদিতে কুঠীর বাহিরে আসিল; তাহার পর আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া মুচিবাড়িয়া ও শিমুলতলার সন্নিহিত বহু গ্রামে কন্যার অনুসন্ধান করিতে লাগিল; কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান মিলিল না! সরলা স্বেচ্ছায় কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছে, এই জনরব গ্রামে প্রচারিত হইল; নাটুর সমাজের চাঁইমশায়রা বৈঠক বসাইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, "নাটু যদিস্যাৎ সেই কুলত্যাগিনী কন্যাকে গৃহে স্থান দান করে, তাহা হইলে তাহাকে একঘরে করিয়া রাখা হইবে।" সরলার স্বামী কৃষ্ণদাস মহান্ত দশঠাকুরের বৈঠকে প্রতিজ্ঞা করিল, তাহার স্ত্রী ফিরিয়া আসিলে সে তাহাকে 'পরিত্যাগ' করিবে। নাটুর আর একটি অবিবাহিত কন্যা ছিল; তাহার বিবাহে বিঘ্ন ঘটিতে পারে এই ভয়ে অতঃপর সে কন্যার অন্বেষণে বিরত বিরত হইল। কেবল সরলার মা কন্যার শোকে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। সর্ব্বান্তর্যামী ভিন্ন অন্য কেহ তাহার মর্ম্মভেদী দুঃখ বুঝিতে পারিল কি না সন্দেহ!

সরলা কোথায়, এবং তাহার পরিণাম কি?—পাঠকগণ ইহা বোধ হয় সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন। মায়াময় অনিত্য সংসারে 'নিত্য বস্তু' হাতে পাইয়া তাহা ত্যাগ করিবে,—নায়েব এরূপ নির্ব্বোধ ছিল না। নায়েবের বিশ্বস্ত অনুচর পীরবক্স হাল্‌সানা তাহার পরামর্শানুসারে সরলাকে সঙ্গে লইয়া রমাইপুর নামক একটি ক্ষুদ্র পল্লীর এক প্রান্তে অরণ্য-মধ্যবর্ত্তী একটি নির্জ্জন কুটীরে রাখিয়া আসিল। সেখানে একটা বুড়ীর উপর সরলার রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত হইল। সেই বুড়ী তাহার ভাত জল সরবরাহ করিত, এবং সে পলায়ন করিতে না পারে—এজন্য তাহার পাহারায় থাকিত। যে কয়দিন সে সেখানে কয়েদ ছিল, নায়েব প্রত্যহ সন্ধ্যার পর সেই কুটীরে গিয়া সরলাকে নানা প্রলোভনে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিত। সে নায়েবের

পাপ প্রলোভনের বশীভূত না হইয়া, সেই পিশাচের পা ধরিয়া কাঁদাকাটি করিল; কিন্তু সেই লম্পট পিশাচের হৃদয় তাহার কাতর ক্রন্দনে বিচলিত হয় নাই; অভাগীর অশ্রু নরপশুর লালসানল নির্ব্বাপিত করিতে পারে নাই!

কয়েকদিন পরে সকল কথা হাম্‌ফ্রি সাহেবের কর্ণগোচর হইলে, তিনি নায়েবকে খাস কামরায় ডাকাইয়া, তাহাকে গোপনে কি বলিলেন প্রকাশ নাই; কিন্তু সেই দিনই পীরবক্স হাল্‌সানা সেই নিভৃত আরণ্য কুটীরে সরলার সহিত দেখা করিয়া তাহাকে শিমুলতলায় রাখিয়া আসিতে চাহিল। সরলা অশ্রু মুছিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার অনুসরণ করিল। পীরবক্স সরলাকে তাহার পিতৃগৃহে পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। অপ্রত্যাশিতভাবে সরলাকে গৃহে ফিরিতে দেখিয়া তাহার মা তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। সরলা কাঁদিতে কাঁদিতে নরপিশাচ নায়েবের ষড়যন্ত্র ও তাহার প্রতি পৈশাচিক অত্যাচারের কাহিনী পিতামাতার গোচর করিল।

সরলা ফিরিয়া আসিয়াছে শুনিয়া সেইদিন সায়ংকালে সমাজের 'দশ ঠাকুর' খুব ঘটা করিয়া বৈঠক বসাইল; সেই বৈঠকে নাটুকে হাজির করা হইল। চাঁই মশায়রা হুকুম দিলেন, "তোমার কুলত্যাগিনী কন্যা তোমার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছে। কাল প্রাতে যদিস্যাৎ তাহাকে তোমার বাড়ীতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সমাজের সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। অতএব আজ রাত্রেই তাহাকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দাও।"

হতভাগ্য নাটুকে দশ ঠাকুরের আদেশ শিরোধার্য করিতে হইল। সরলা তাহার স্বামীর পা ধরিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিল; কিন্তু তাহার পিতা বা স্বামী তাহাকে গৃহে স্থান দান করিয়া সমাজের নিকট অপরাধী হইতে সাহস করিল না। কন্যাকে বিদায় দেওয়ার সময় তাহার মাতার কি মর্ম্মভেদী ক্রন্দন!

পিতৃগৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া সরলা গ্রামপ্রান্ত-বাসিনী এক 'বোষ্টুমী'র গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিল; কিন্তু লোকের উপহাস ও টিট্‌কারীতে গ্রামে বাস করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইল! অগত্যা 'বোষ্টুমী' তাহাকে সঙ্গে লইয়া নগরে গেল, এবং তাহার পরিচিতা এক বেশ্যার গৃহে রাখিয়া আসিল। তার পর?—তার পর যাহা হইল, এবং তাহা যে জটিল সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে—তাহা 'অভাগী,' 'বিন্দুদাদা' 'ঈশানীর' প্রবীণ গ্রন্থকার হৃদয়-শোণিত অশ্রুতে পরিণত করিয়া প্রাণের আবেগে উপন্যাসের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন; সুতরাং আমার অযোগ্য লেখনী এইখানেই বিশ্রাম গ্রহণ করিল। যদি কোন দিন 'নায়েব মহাশয়' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়—তাহা হইলে এই 'মিত্রদ্রোহী, ভ্রাতৃঘাতী, বিশ্বাস-ঘাতক, নারী-নির্য্যাতক মহা পাপিষ্ঠের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিরূপে আরম্ভ হইল, সে কিরূপে অপদস্থ ও অপমানিত হইয়া, প্রভুত্ব, পরাক্রম, ও ঐশ্বর্য্যের শিখর হইতে পদাঘাতে বিতাড়িত হইল, তাহা বঙ্গীয় পাঠক সমাজের গোচর করিব।

সমাপ্ত

অন্তিমে

শ্রীসত্যগোপাল গুহ

কতদিন, কতবার ডাকিয়াছি আমি
আকুল পরাণে তোমা, হে জীবন-স্বামি!

কত গানে—কত সুরে অন্তর বেদন
করিয়াছি নিশিদিন পদে নিবেদন।—
শোন নাই অধমের দুঃখ গান কভু,
দয়া করে দাও নাই দরশন প্রভু।
সংসারের দুঃখ-ভারে ভারাক্রান্ত আজ
অবসন্ন দেহ মোর—ঘিরে আসে সাঁঝ;—

বাজে না মোহন সুরে মরমের বীণ্,
আঁখি হ'ল জ্যোতিহারা—কণ্ঠ হ'ল ক্ষীণ্,
ডাকিতে শকতি আর নাহি দয়াময়,
নিবিড় আঁধার রাশি গ্রাসিছে হৃদয়।
আজি কি এসেছে নাথ, মরণের বেশে
দেখা দিতে অধমেরে এ জীবন-শেষে।

"মানব-শত্রু মনু"

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

"মনু-পরাশর থেকে অবধি মহাপুরুষরাই এ জাতিকে মেরে রেখেছেন—এর ধমনীতে সনাতন পক্ষাঘাত, ইন্‌জেক্ট' করে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যই হয়েচে স্বাধীনতার মূলমন্ত্র। আর মনু যখন "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি" ফতোয়া জাহির করে দেশের অর্দ্ধেক মানুষকে অমানুষ করে রাখবার ফন্দী করলে জঘন্য স্বার্থের অনুরোধে, তখনই মহামানবের মহাশত্রুর মনে মৎলব ছিল যে, বাকী অর্দ্ধেকও তাদের পঙ্গুত্বের আওতায় পড়ে অচিরে খোঁড়া ব'নে যাবে—আর তারা চলবে না, চিন্তা করবে না, শেখান বুলি কপচে দিন কাটিয়ে দেবে। তিনি যদি নি-খরচায় অমর হয়ে থাকবার জন্যে এই ব্যবস্থা করে থাকেন, তবে তিনি সিদ্ধকাম হয়েচেন বলতে হবে। কিন্তু তাঁর অমরত্ব কিনতে হয়েচে, আমাদের মৃত্যুর বিনিময়ে।"

যুগান্তর।

যুগান্তরে প্রকাশিত এই রচনাটি শ্রাবণের 'ভারতী' পত্রিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা কি হিসাবে লিখিত হইয়াছে? "কৌতুককণা" বলিয়া না গুরুতর ভাবে, (seriously) বুঝা গেল না।

মনুর সঙ্গে পরাশর কেন এক কাঠগড়ায় ভর্ত্তি হইলেন? যে পরাশর—

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ,
পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরন্যো বিধীয়তে।"

ইত্যাদি শ্লোকের জনক, তিনি প্রসিদ্ধ দাগী আসামী "মহামানবের" মহাশত্রুর সহিত এক পর্য্যায়ভুক্ত না হইতেও পারিতেন। এটা গালি পাড়িবার সুবিধার জন্যই হইয়াছে বোধ হয়?

তার পর দ্বিতীয় কথা এই—"মহাপুরুষরা এর ধমনীতে সনাতন পক্ষাঘাত 'ইন্‌জেক্' করে এ জাতিকে মেরেচেন"—কিন্তু সেই মনু কি এই দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন? দেড়শত বৎসর পূর্ব্বেও তো বাঙ্গালীর মধ্যে অনেক বীর ছিলেন, রাজা ও শাসনকর্ত্তা বর্ত্তমান ছিলেন, সুস্থদেহ ও আয়ুষ্মত্তাও ছিল। নয়শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবাসীরা দুর্ব্বল ও অকাল-মৃত্যুর কবলে পতিত "ডাইং রেস" বলিয়া কখনই গণ্য হয় নাই। তৎপূর্ব্বে এ জাতির ঐশ্বর্য্য সমৃদ্ধির খ্যাতি এতই লোক-প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে, অর্দ্ধ-পৃথিবীর অধিবাসিবর্গকে ইহার প্রতি প্রলুব্ধ করিয়া ইহাকে আক্রমণ করিতে দলে দলে টানিয়া আনিয়াছে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া প্রবল বহিঃশত্রুর আক্রমণ সহ্য করিয়া এই "খোঁড়া ব'নে যাওয়া" "পঙ্গু" জাতিই আজিও যেন-তেন-প্রকারেণ টিকিয়া আছে। একেবারে ধরণীর অঙ্গ হইতে নিঃশেষ হইয়া মুছিয়া যে যায় নাই, তাহার একমাত্র কারণ ঐ মহামানবের মহাশত্রুর প্রবর্ত্তিত পথে জাতি-স্বাতন্ত্র্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর অচল হইয়া খাড়া থাকা। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মত সেটা সহজসেব্য লঘু জিনিস নয় বলিয়াই, আজও আর্য্য সভ্যতার ও আর্য্যজাতির একটা ক্ষীণধারা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। নতুবা এত দিনে শক, হুন, গ্রীক, আফগান, পাঠান ও মোগলের অনুকরণে ইহার অস্তিত্বের 'অ'-ও দেখা যাইত না। যে জাতির উপরে সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া বৈদেশিক আক্রমণ চলিতেছে—আজও নিবৃত্তি হয় নাই—যে জাতির পুরুষের স্বাধীনতা নাই,—সে দেশের স্ত্রীলোকের 'স্বাতন্ত্র্য' রক্ষা করা বড় সহজ বটে! আজি এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার দিনেই যে স্বাতন্ত্র্য দিতে অস্থির হইয়া উঠিতে হয়, সেই সকল বিশৃঙ্খলার যুগে তাহা দিবার যোগ্য ছিল। মনুর যুগে পাঠান মোগল বহিঃ শত্রুর আবির্ভাব না থাক, সংহিতার যুগে শক হুনের এবং স্মৃতির যুগে অসুরের অর্থাৎ ঘরের শত্রুর অভাব ছিল না। অনার্য্য আদিম জাতির অত্যাচার ছিল। তদ্ভিন্ন, "মহামামবের মহাশত্রু" মনু স্ত্রীলোককে "ঘেরাটোপ চড়াইয়া বোরকা" পরাইয়া তাতারিণী প্রহরিণীর প্রহরার মধ্যে তাহাদের সংস্করণের বন্দোবস্ত কোথাও করিয়া যান নাই। মা ও তাদের পিতা পতি ও পুত্রের সহায়তার মধ্যে বাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন,—এর চেয়ে সুসঙ্গত ও সংযত ব্যবস্থা, সুখের ও সৌভাগ্যের অবস্থা নারীর পক্ষে আর কি হইতে পারে? জগতে মানব-সংসারে এই পিতা, পতি, পুত্রাপেক্ষা প্রিয় বস্তু কি থাকিতে পারে? তাদের সঙ্গ সুখ ত্যাগ করিয়া কোন্ সংযত-চরিত্রা স্নেহশীলা নারী মরুময় স্বাতন্ত্র্য জীবনের কামনা করিয়া থাকেন? এখনকার দিনে যে সব নারী কলেজের শিক্ষা পাইয়া ভাল চাকুরী করিতেছেন, তাঁরাও দেখি, কেহ দরিদ্র পিতার, কেহ পাঠ্যাবস্থ ভ্রাতার সাহায্যের জন্য সেই ধন নিয়োগ করিতেছেন,—শুধু স্বাতন্ত্র্যে ত কই সকলের মন ভরিতেছে না? তবে 'স্বাতন্ত্র্য' অনুচিত বলাতেই কি এমন অপরাধ ঘটিয়াছিল? তার পর সেই "ফতোয়াটা জাহির" হওয়ার পরেই কি রাজপুতানার কর্ম্মদেবী, পদ্মিনী, যশোবন্ত-মহিষী, মীরাবাই, রাণী ভবানী, অহল্যাবাই প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়াছিল, না পূর্ব্বেই? ঐ ফতোয়া জাহিরের ফলে বাকি আধখানা পঙ্গুত্বের আওতায় পড়ে খোঁড়া বনে যাওয়ার ফলে কি [মনুর স্মৃতির সময়ই তাঁদের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে, সংহিতা পরের।] চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, পাল ও গুপ্তরাজ প্রভৃতি, বাপ্পারাও, হামির প্রতাপসিংহ, রাজসিংহ, প্রতাপাদিত্য, সীতারাম রায়, মোহনলাল, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল? যদি কর্ম্মবীরের অসংখ্য তালিকার পূর্ব্বের ও পরের ধর্ম্মবীরগণের একটা সংখ্যা নির্দ্দেশ করা যায়, তবে তো একটা পুস্তকাকার ধারণ করে।

বুদ্ধদেব [মনু-স্মৃতির পরে জন্ম] আনন্দাদি শিষ্যবর্গ, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য সুরেশ্বরাদি শিষ্য-প্রশিষ্যবর্গ, কুমারিলভট্ট, বিদ্যারণ্য, শ্রীচৈতন্যদেব এবং অত দূরের কথায় কাজ কি? এই সেদিনেও তো শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব, রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, প্রভৃতি কর্ম্মী পুরুষের এবং বিদ্যাসাগর-জননী, ভূদেব-জননী, প্রভৃতি গরীয়সী নারীর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, তাঁদের অভ্যুদয়কে ত কই "মহামানবের মহাশত্রু মনু" "পঙ্গু করিয়া" চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই? এই "খোঁড়া বনে যাওয়াও" তাঁরই শেখান বুলি কপ্‌চে দিন কাটিয়ে দিতে দিতেই ত দেখিতেছি এই আর্য্যভূমে নানা মত ও নানা পথেরই সৃষ্টি হইয়াছে,—আজও তার বিরাম নাই। এই মনুশাসিতগণের মধ্য হইতেই বৌদ্ধবাদের উদ্ভব, তাহার মধ্যেহ আবার চারি মত; এই মনু-শাসিতগণের মধ্য হইতেই শঙ্কর ও রামানুজের ধর্ম্মসংস্কার মীমাংসাদি দর্শনের বিস্তৃতি; নানকপন্থীর উৎপত্তি, মহাপ্রভুর প্রেম-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আর্ত্ত নারায়ণের সেবাধর্ম্মের প্রচার; রাজা রামমোহনের যুগ-ধর্ম্মের সংস্কার; কেশবচন্দ্রের সাধারণ সমাজ সংস্থাপন; বিদ্যাসাগর-ভূদেবের সাত্বিক দান-ধর্ম্ম ও উচ্ছৃঙ্খল নব্য বঙ্গে সংযমের দৃষ্টান্ত দ্বারা আলিবন্ধন, এবং সংযতভাবে কালোচিত সমাজ ও গৃহসংস্কার ইত্যাদিতে খোঁড়া বনে যাওয়ার কোনই প্রমাণই তো দেখিতে পাই না। ইংরাজী

শিক্ষার প্রবর্ত্তন কাল হইতেও কত সুবিখ্যাত ও অবিখ্যাত পুরুষ ও মহিলার আবির্ভাব হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই! মানব-শত্রু মনুশাসনে শাসিত সমাজের ও পিতা মাতার মধ্য হইতেই এই সকল পূর্ব্বতন ও আধুনিকতম নর এবং নারীর আবির্ভাব হইতেছে, না ইঁহারা ভূমিগর্ভ হইতে, যজ্ঞবেদী হইতে, অথবা বিমান-বিচ্যুত হইয়া মর্ত্তভূমে আবির্ভূত হইতেছেন? যদি মানব-সমাজের অর্দ্ধেক পঙ্গুত্বের আওতায় পড়ে "খোঁড়া বনে" যাইত, তাহা হইলে আধুনিক এই নব্য লেখকের দল মনু-সংহারকল্পে এতই লম্ফ-ঝম্ফ করিতেন কিরূপে?

তার পর দেখা যাক, মনুর জঘন্য স্বার্থের অনুরোধটা কি? বিলাতি ডিটেক্‌টিভের উপন্যাসে এবং বাস্তবেও একবার কে একজন ফুলার সাহেবের মোকদ্দমায় এই "জঘন্য স্বার্থের অনুরোধে" এক পাপিষ্ঠ ডাক্তার দ্বারায় রোগীর পাপিষ্ঠ ভ্রাতার বা পাপিষ্ঠা পত্নীর তীব্র বিষ ইন্‌জেক্ট করিয়া হত্যা করার কথা পড়িয়াছিলাম। ফলে ইহারা সেই হত ব্যক্তির উত্তরাধিকার লাভে বিপুল অর্থের অধিকারী হইত। এই মানবের মহা শত্রুর সেরূপ কিছু সুযোগ পাওয়া সম্ভব ছিল কি না, সে খবর এখন আর পাওয়া যায় না। "আর তারা চলবে না, চিন্তা করবে না, কেবল তাঁরই বুলি কপ্‌চে দিন কাটিয়ে দেবে, তিনি নি-খরচায় অমর হয়ে থাকবেন" এই যুক্তির সারবত্তা আমাদের কোন মতেই হৃদয়ঙ্গম হয় না। মনুর পর তো অনেক ধর্ম্ম-সংস্কারক ও প্রবর্ত্তক আসা-যাওয়া করিলেন, তাঁদের বুলি কেহ শুনিল কেহ শুনিল নাই বা কেন? আর মনুরই বা শুনিল কেন? অনেকে ত স্ত্রীকেও পুরুষের কাছাকাছি অধিকার দিয়াছিলেন, তবে তাঁরা সে অধিকারে দৃঢ় থাকিতে সমর্থা হইলেন না কেন? বৌদ্ধযুগে মনু-শাসনপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আর্য্য সমাজের নরনারী সেই উদ্দাম স্বাধীনতার স্বাদ পাওয়ার পরেও আবার কি জন্য নিজেদের কণ্ঠ মনুর শাসন-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে দিলেন? "সনাতন পক্ষাঘাতের ইনজেক্‌সন" পুনরপি গায়ে ঠেকিতে দিলেন কেন? মনু বিধানের বহির্ভূত বৌদ্ধ ধর্ম্মে কদাচারীর ও শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মে নেড়ানেড়ির সৃষ্টি হইয়া উহাদের লণ্ড ভণ্ড করিয়া ফেলিল কেন? এ সকল অবশ্য-বিচার্য্য বিষয়গুলা কি ঐ সকল লেখকবৃন্দ একটুখানি বিচার করিয়া দেখিবেন? যাহা মানবসমাজের অনুপযোগী, তাহা সনাতন ভাবে সে সমাজে স্থান লাভ করিতে পারে না। মানুষ যখন ছোট হয়, তখন সে নিজের কোন দোষই দেখিতে পায় না, পরন্তু নিজের দায় পরের ঘাড়ে ফেলিতেই ভালবাসে। আরও হীনতার চিহ্ন, সে দায়িত্ব গুরুজনের প্রতি প্রয়োগ করা। অনেক অকর্ম্মণ্য মূর্খ ছেলেকে বলিতে শুনিয়াছি "আমার না হয় বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল না, বাবা আমায় মেরে ধরে লেখা পড়াটা শেখান নি কেন?" অথচ সেও জানে, বাবা বেচারী চেষ্টার ত্রুটী মাত্র করে নাই। কোন বওয়াটে ছেলের গল্পে শোনা যায় যে, বাবাকে "শালা" বলিয়া উল্লেখ করিলে, শ্রোতা বিষম আপত্তি তোলায়, উত্তর দিয়াছিল যে, "আরে, ঘরের বাবা, তাকে বলেছি, তার হয়েছে কি? রাস্তার লোককে বল্‌তে গেলে যে ধরে পিটিয়ে দিত।" এইটাই অবনতির উত্তম দৃষ্টান্ত! আমাদেরও এখন সেই পূর্ণ অবনতির কাল উপস্থিত, তাই না জানিয়া না ভাবিয়া পিতৃপিতামহগণের ও প্রপিতামহ-স্থানীয় ঋষি-প্রবর্ত্তিত সমাজ ও ধর্ম্মবিধিকে গালি পাড়িয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকি। ইয়ুরোপীয়েরা বিশেষতঃ ইংরাজ ইহা করিতেও পারেন, কারণ তাঁদের পূর্ব্বপিতামহ জলদস্যু হেঙ্গিষ্ট এবং হর্‌সা। আর আমাদের পূর্ণ মানব মনু প্রভৃতি, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, শাস্ত্রী, বাচস্পতি বাৎস্য প্রভৃতি। একজনদের আদি মানব জ্ঞানশক্তি-বিহীন আদম ও ইব্, একজনের আদি সৃষ্ট জনক, সনাতন সনৎকুমারাদি, যারা পূর্ণ জ্ঞানী বলিয়া সৃষ্টি কার্য্যেই বিতৃষ্ণ হইয়া উহা প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক মুক্তিমার্গ গ্রহণ করিলেন। একজনরা অবনতি হইতে উন্নতি লাভ করিতেছে, অপরে উন্নতাবস্থা হইতে অবনত হইয়াছে। দুজনের অতীত কাহিনী ঠিক এক নয়। কিন্তু ভাবের রাজ্যে বাস্তবের অধিকার কতটুকু; এবং এদেশীয়ের রাজনীতি আলোচনা যখন নিরাপদ নয়, অর্থনীতির আলোচনা যখন শ্রমসাপেক্ষ, ধর্ম্মনীতির আলোচনায় যখন প্রবৃত্তি কম, তখন ঋষিকুলের মুণ্ডপাত করাই সব চেয়ে নিরঙ্কুশ আলোচ্য হইয়া দাঁড়াইবে তাহা বিচিত্র নহে। কোন খৃষ্টান তাঁর বাইবেলের যীশু খৃষ্টের নিন্দাবাদ সহ্য করিবেন না, কোন মুসলমান কোরাণ বা পয়গম্বরের ত নহেই; কিন্তু হিন্দুর দেহ মন বুদ্ধি সেই সনাতন "পক্ষাঘাতে 'আড়ষ্ট" বলিয়াই বোধ করি তাঁদের শাস্ত্র ধর্ম্ম ও ধর্ম্মবেত্তাকে "পাঁচশত

পয়জার" গুণিয়া মারিলেও তাঁদের অসাড় দেহে এবং ততোধিক আড়ষ্ট চিত্তে মনুষ্যোচিত কোন উত্তেজনারই সঞ্চার হয় না। নিন্দুক যথেচ্ছ মুখে "মনু হইতে মহাপুরুষদের" গালি পাড়িয়া নিজের অক্ষমতার সমস্ত ত্রুটীই স্খালন করিয়া থাকেন। রুগ্ন ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদের লক্ষণই ইহাই। স্বাস্থ্যবান ও সবলগণের ও লোকপালদিগের অভ্যুদয় ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি নিষেধের দ্বারা রুদ্ধ হইয়া কোন দিন থাকে নাই বা থাকিতেও পারে না।

মনু নর এবং নারীকে সমাজ-অঙ্গের দুই দিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বেদ এবং বেদসম্মত শাস্ত্র [মনু প্রভৃতি] নর এবং নারীর মিলন দ্বারা উভয়ের একত্ব বিধান করিয়াছেন। বিবাহই এই একীকরণ কার্য্যের সেতু! বিনা বিবাহে নর বা নারী কেহই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হন না বলিয়াই শাস্ত্র সাধারণতঃ অধিকাংশ নরনারীর জন্যই বৈবাহিক বিধানকে শ্রেয় ধর্ম্মরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁদের মতে—

অর্দ্ধ ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যাশ্রেষ্ঠতমঃসখা।
ভার্য্যামূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যামূলংতরিষ্যতঃ॥

স্ত্রী মনুষ্যের অর্দ্ধ শরীর, স্ত্রী শ্রেষ্ঠতম সখা, স্ত্রী ধর্ম্ম অর্থ কামের মূলরূপা স্ত্রী ভবসাগর তরণের জন্য পুরুষের পক্ষে প্রধান আশ্রয়।

নারীকে তাঁরা সমাজ-শরীরের অর্দ্ধাংশ বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁকে পুরুষের ধর্ম্ম কর্ম্ম কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গের মূলরূপা বলিয়াছেন। স্বভাবতঃ সবল-শরীর পুরুষকে ক্লেশবহুল জীবিকার্জ্জনে শারীর শ্রমের কার্য্যে বাহিরে নিয়োগ পূর্ব্বক নারীকে তাঁর পক্ষে অবশ্য ভরনীয়ারূপে বাকি অর্দ্ধের অধিকার অন্তঃপুরে স্থাপন করায় তাঁর সম্মান বা সুযোগ কোনটার হানি হয় নাই। নারী স্বাতন্ত্র্য বর্জ্জিত হইলেও তাঁর স্বামীর সহিত একাত্মতা স্বীকৃত হইয়াছিল; স্বামীর সকল কর্ম্মে, ধর্ম্মে অধিকার জাত হইয়াছিল; স্বামীরা যদি তাহাদের শিব না গড়িয়া বানর গড়িয়া বসেন, সে দোষ ব্যবস্থাকারের নয়—নিজেদেরই অপদার্থতার। যে রাজ্যে মনু জন্মগ্রহণ করেন নাই, সেই সকল দেশের বিধানও কি কতকটা এই নীতির অনুসারিণীই নহে? মহাত্মা যীশুও তো স্বামীকে "স্ত্রীর মস্তক" বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। *

তাহার জন্য কি স্বদেশের মেয়েরা অধম হইয়া গিয়াছেন; যদি তাঁহারা তাঁদের স্ত্রীদের উত্তম গড়িতে পারিয়া থাকেন তো সে ব্যবস্থাকারেরই গুণে নয়—নিজেদেরই কৃতিত্বে।—"প্ল্যান একই যে যেমন কারিগর, তার হাতের গুণে শিল্পের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ ঘটিয়াছে।

সকল দেশের মহাপুরুষদের সকল বাণীই একই কল্যাণ-চিন্তা-প্রসূত। তাই তন্মধ্যে পার্থক্য আমরা কমই দেখিতে পাই। এঁদের সকলকার মতেই নর এবং নারী পরস্পরের জন্য সৃষ্ট হইয়া সততা ও সতীত্ব রক্ষায় যত্নশীল ও পরস্পরের সহিত একাত্মতা লাভ করিবেন। এ ভিন্ন তাঁদের কোন অসদভিসন্ধি ছিল বলিয়া জানা যায় না। ফলে যদি ইউরোপ এই সৃষ্টি-বিধির মস্তকে সাতশো পয়জার মারিয়া উদ্দাম বিবাহচ্ছেদের প্রচলন করিয়া ব্যভিচারের (adultely) স্রোত প্রবাহিত করেন, হিন্দু বিবাহবিধির সকল বিধিকেই উদ্ধত পদাঘাত পূর্ব্বক দূরীভূত করিয়া দিয়া বৈবাহিক "কম্পিটিসনে (প্রতিযোগিতায়) পরস্পরকে চ্যালেন্জ্ (যুদ্ধার্থ আহ্বান) করাই জীবনের মুখ্য গৌরব বোধ করেন, (কুলীন সম্প্রদায়ে), সেজন্য খৃষ্ট বা মনু কেহই দোষভাজন

5. And Jesus answered and said unto them, for the hardness of your heart he wrote you this precept.

6 But from the Beginning of the creation God made them male and female.

7. For this cause shall a man leave his father and mother, and cleave to his wife.

8. And they twain shall be one flesh. So then they are no more twain but one flesh.

9. What therefore God hath joined together let not man put asunder.

11. ...Whosoever shall put away his wife and marry another, comiteth adultery against her.

12. And if a woman shall put away her husband, and be married to another, she commiteth adultery (St Mark. 10)

এই কথাগুলিও কি এদেশীয় "মানব শত্রুদের"ই পতি পত্নী সম্বন্ধের কঠোর বাধ্যতা মূলক বিধিরই—

দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহ অর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজ মসৃজৎ প্রভু!

এই বাক্যেরই প্রতিধ্বনি নহে?

* 4. And they said Moses suffered to write a bill of divorcement, and to put her away.

হইতে পারেন না। সে তাঁদের প্রবৃত্তির দোষ এবং সেই হীন প্রবৃত্তির প্রশ্রয় যত অধিক লোকে দান করিবেন, তাঁহাদেরই দোষ। মহাপুরুষের মহাবাণী মহান্ মঙ্গলেরই সৃজন করিয়া থাকে, অমঙ্গলপ্রসূ হইতেই পারে না। ইতর প্রাণী জীবরাজ্যেও দেখা যায়, স্ত্রী শরীর হইতে স্বভাব-সবল পুং জাতীয় জীব স্ত্রী জাতির কতকটা রক্ষণাবেক্ষণ চেষ্টা করিয়া থাকে। ইতর প্রাণী হইতে মানব সমাজ পর্য্যন্ত যে সমাজ যত উন্নত, তাহাতেই এই বিধি ততই সুপ্রতিষ্ঠ। ইহাই নৈসর্গিক।

সনাতন ধর্ম্ম বিধানানুসারে নারীর স্থান তাঁর গৃহরাজ্যে পুরুষের অপেক্ষা উচ্চে বই নীচে নয়। নারী নিজ পতির পূর্ণতা সম্পাদন করিবার অধিকারিণী, তাঁহার পুন্নাম নরকত্রাতা পুত্রের জননী ও মাতা, অতএব ঐ সকল কার্য্যের উপযুক্ত ভাবে তাঁহাকে রক্ষণ ও পালনের জন্য পুরুষ তাঁহাকে আয়াসসাধ্য জীবিকার্জ্জনের বহির্ভূত থাকিতে দিয়া স্বয়ং সেই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে বাধ্য। স্ত্রীও নিজ পতি পুত্রাদির প্রতি যাহাতে সমধিক মনোযোগিনী থাকিতে পারেন, তাঁদের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদনে অমানোযোগিনী না হয়েন, তাহারই জন্য পাতিব্রত্য ধর্ম্মের দৃঢ় ব্যবস্থা আছে এবং দুষ্ট পুরুষ প্রবৃত্তিকে বেগবান নদী-স্রোতের সহিত তুলনীয় অনুভব করাতে অরক্ষণীয়া ভাবে নারীর যথেচ্ছা-চরণ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি"র এ অর্থ না যে নারী দিবানিশি শাস্ত্রী পাহারার মধ্যেই বাস করিবেন। সে ব্যবস্থা যদি আজ দেশের কোথাও বর্ত্তমান থাকে, বা কথনও বর্ত্তমান ছিল বলিয়া শুনা গিয়া থাকে, তার জন্য মনু প্রভৃতি মহাপুরুষেরা দণ্ডবিধির কোন ধারার মধ্যে পতিত হন না। সেটা বাহিরের আমদানী,—ঘরের শক্রর বিধান নয় এবং সে যুগে হয়ত ইহার প্রয়োজনীয়তাও ঘটিয়াছিল; এখন আর নাই।

যদি কোন শাস্ত্রীয় বিধি-ব্যবস্থা এক্ষণে দেশ-কাল-পাত্রানুসারে পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন ঘটিয়াছে কেহ বোধ করিয়া থাকেন, যদি কোন সদর্থযুক্ত পুরাতন বিধি ব্যাখ্যাকারের অল্পজ্ঞতা প্রযুক্ত কদর্থযুক্ত হইয়া কুফল-প্রসূ হইয়া দাঁড়ায়, যদি আধুনিকগণের স্বল্পজ্ঞতা ও স্বল্পশক্তিমত্তা প্রযুক্ত প্রতিপালনে অপারগতা বশতঃ কোন-কোন শাস্ত্রবিধি সংস্কৃত হওয়ার আবশ্যকতা বোধ হইয়া থাকে, তবে তার প্রতিকার চেষ্টা সাবহিত চিত্তে ও অত্যন্ত সাবধানতার সহিত উপযুক্ত ব্যক্তিগণের পরামর্শানুসারে করিতে হয় আমাদের অপেক্ষা অন্ততঃ সহস্র গুণে বিচক্ষণ বিদ্বান, ও অসাধারণ যৌগবিভূতিযুক্ত পূর্ব্বতন মহাপুরুষদের উদ্দেশ্য ও সূক্ষ্মদর্শিতার কোন ধারণাই না রাখিয়া তাঁদের অনর্থক গালি পাড়ায় কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধিরই সম্ভাবনা নাই। মাত্র ইহাতে নিজেদের লঘুত্বের পরিচয় প্রকাশ হইয়া পড়ে। "মহামানবের মহাশত্রু মনু" অনুপ্রাসের ছটায় শুনিতে মন্দ নয় বটে, কিন্তু শ্রোতা-বিশেষের কাণে ইহা গুরুজনের প্রতি গালি বর্ষণের মতই অশ্রাব্য।

অকাল মৃত্যু ও বাল্য-বিবাহ

শ্রীপদ্মনাভ দেবশর্ম্মা

এই সম্বন্ধে শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী ভাদ্র ও আশ্বিনের "ভারতবর্ষে" প্রায় পনর পৃষ্ঠাব্যাপী সমালোচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধের শিরোনামের সঙ্গে বর্ণিত বিষয়ের সৌসাদৃশ্য রাখা যদি যুক্তিসঙ্গত হয়, তবে ইহার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—অকালমৃত্যুর সঙ্গে বাল্যবিবাহের কি সম্পর্ক তাহাই দেখান। কিন্তু শ্রদ্ধেয়া মহিলা ধান ভানিতে শিবের গীত গাহিতে (অবশ্যই তাঁহার বন্ধুবর্গের অনুরোধে) এতই মত্ত হইয়াছেন যে, ধান ভানার কাজটা কিছুতেই সুসম্পন্ন হয় নাই। তাঁহার শিবের গীতে হয় ত অনেকেই চটিবেন, এ ধারণাও তাঁহার আছে; কিন্তু সে বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, তাঁহার সেরূপ আশঙ্কার কোনও কারণ নাই; কেন না, প্রধানতঃ হয় ত দুই শ্রেণীর লোকের ইহাতে চটিবার কথা—

১। অতি প্রাচীন ভাবাপন্ন খাঁটি ব্রাহ্মণগণ—যাঁহারা

হয় ত স্ত্রীলোকের পক্ষে সামাজিক বিধি নিয়ম সম্বন্ধে আলোচনা করাকে ধৃষ্টতা মনে করিতেন। এবং যাঁহারা তাঁহাদের বংশধর নামধারী লোকদিগকে লুচী ভাজিতে দেখিলে, রুটী বেচিতে দেখিলে, কালী খাড়া করিয়া কষাইয়ে'র ব্যবসা চালাইতে দেখিলে, ম্লেচ্ছের দাসত্ব করিতে দেখিলে, অথবা শামলা মাথায় দিয়া অস্পৃশ্য জজ-সাহেবকে সারা-দুপুর সেলাম ঠুকিতে দেখিলে—চামার, মেথর, দোসাদের পর্য্যন্ত ঘৃণিত কার্য্যে উপার্জ্জিত পয়সা ছলে, বলে, কৌশলে গ্রহণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ এবং স্ত্রীর গহনা গড়াইয়া স্ত্রীর মনোরঞ্জন করিতে দেখিলে, তৎক্ষণাৎ তাহাদের নাম, পদবী, পৈতা কাড়িয়া লইয়া চণ্ডালের অধম করিয়া দিতেন, যাহাতে তাহারা আর ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে ভুল ধারণা সমাজে প্রচারিত করিতে না পারে। এবং অন্য দিকে গুণযুক্ত শূদ্রকে এমন কি ভর্ত্তৃহীনার পুত্রকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া আলিঙ্গন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

২। বর্ত্তমান সমাজ-সংস্কারকগণ—যাঁহারা সময়ের উপযোগী রীতি-নীতি সমাজে প্রচলিত করিতে চাহেন।

কালের মহিমায় প্রথম শ্রেণীর লোক নির্ম্মূল হইয়াছে! আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক অর্থাৎ সমাজ-সংস্কারকগণ হয় ত মনে করিবেন যে, একজন অবগুণ্ঠনবতী মহিলা—যাঁহার দৃষ্টি পিতার ঘর ও স্বামীর ঘরের দেওয়ালের বাহিরে যাইবার সুযোগ পায় নাই,—তিনি যে সমস্ত দেশটাকে তাঁহার পিতার ঘর ও স্বামীর ঘরের মতই মনে করিবেন, এবং ঘরের কোণে বসিয়া দুই চারিখানা বহির অধীত বিদ্যার নিক্তির দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর সামাজিক রীতি-নীতিগুলিকে ওজন করিবেন, ইহাই স্বাভাবিক—তজ্জন্য তাঁহাদের চটিবার কিছুই নাই।

প্রবন্ধের এক স্থানে তিনি সুধিজনকে নীরটুকু ত্যাগ করিয়া ক্ষীরটুকু গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সুধিজন মানে আমরা মনে করিয়াছি পাঠকগণ; তাই আমরা সুধী না হইয়াও এ সম্বন্ধে আলোচনায় অগ্রসর হইতে সাহসী হইয়াছি।

যাহা হউক, এক্ষণে ক্ষীরটুকু সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। অকাল-মৃত্যুর সঙ্গে বাল্যবিবাহের দোষগুণের যতটা সম্পর্ক, তাহার সিদ্ধান্তে ত দেখিতে পাই, বাল্যবিবাহের বিরোধী সমাজ-সংস্কারকগণ এবং উহার পক্ষপাতিনী শ্রদ্ধেয়া লেখিকা—উভয়েই এক-মতাবলম্বী। শাস্ত্রের বচন পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করিয়া শ্রদ্ধেয়া মহিলা ইহাই দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, "পঞ্চবিংশতি অপেক্ষা অল্পবয়স্ক পুরুষ ষোড়শ বর্ষ বয়স্কা অপেক্ষা অল্পবয়স্কা স্ত্রীর গর্ভাধান করিবে না। তাহাতে গর্ভস্থ শিশুর হানি হইয়া থাকে।" বাল্যবিবাহের বিপক্ষে যাঁহারা, তাঁহারাও ত এই কথাই বলেন! তবে লেখিকা মহাশয়া ও তাঁহাদের মধ্যে তফাৎ এই যে, তিনি বলেন যে, এগার বার বৎসর বয়সেই বালিকার বিবাহ দাও; অর্থাৎ তাহাকে স্বামী-সহবাসের অধিকার দাও। কিন্তু সর্ব্বদা সতর্ক পাহারা দাও; যেন বালিকার ষোল বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বে তাহার স্বামী তাহার সহিত সহবাস করিবার সুবিধা না পায়। ইহা যে কতদূর শক্ত কাজ, তাহা প্রভাত বাবু তাঁহার একটা ছোট গল্পে দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। আর সমাজ-সংস্কারকেরা বলেন যে, স্বামীসহবাসের অধিকারটাই যাহাতে বালিকাকে পনর ষোল বৎসর বয়স্কা হইবার পূর্ব্বে না দেওয়া হয়, তাহার নিয়ম করা কর্ত্তব্য; অর্থাৎ বিবাহটা যেন আগে না হয় *। এই ত ক্ষীরের কথা।

আর নীর—যাহা ফেণাইয়া প্রবন্ধ অতবড় দীর্ঘ করা হইয়াছে, তাহাও—যদি পাঠক মনোযোগের সহিত পাঠ করেন, তবে দেখিবেন যে, আমার মত যাঁহারা গরীব অথচ পাঁচ ছয়টি কন্যার জনক (তাহাদের সকল মেয়েদের জন্য সুপাত্র পাওয়া এক প্রকার অসম্ভব) তাহাদিগের মেয়েদিগকে যুবতী করিয়া অবিবাহিতা রাখিতে, লেখিকার আপত্তি ত নাইই, বরং সহানুভূতি আছে। যাঁহারা বড়লোক, শিক্ষিত, অথচ হয় ত দুই একটী কন্যার পিতা, তাঁহাদের কন্যাদের জন্যই বাল্যবিবাহের এই নূতন বিধি। যদিও আমার ধারণা যে দেশের যেরূপ গতি, তাহাতে অল্প কাল পরেই সব বড়লোক ভায়াকেই আমার মতই গরীব হইতে হইবে।

এই বড়লোকের ব্যাপারে গরীবকে টানিয়া আনিবার জন্য যে উপমাটা প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা নিতান্তই

* বাল্যবিবাহের ঘোর বিরোধী ব্রাহ্মসমাজের বিবাহের ব্যবস্থাতেও না কি আছে যে, চৌদ্দ বৎসর পূর্ণ হইলেই বালিকা বিবাহের উপযুক্তা হয়।—লেখক।

কাল্পনিক। পাত্র যতই ভাল ভাল পাশ করা, দেখিতে অতি সুন্দর ও অত্যন্ত সচ্চরিত্র হউক না কেন, এরূপ দৃষ্টান্ত লক্ষের মধ্যে একটাও পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। আর যদি এরূপ ঘটনা সম্ভবপরও হয়, তাহা হইলেও জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, যে, সেই শিক্ষিত যুবকটী কি অজ পাড়াগাঁয়ে অজ্ঞের মতই ঘুরিয়া বেড়াইবে, না, তাহাকে ওকালতী, প্রফেসরী বা হাকিমী করিবার জন্য সহর বা নগরে আসিতে হইবে। যে ধনী পিতা সুবুদ্ধি বা দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ শুধু পাত্র দেখিয়াই অজ পাড়াগাঁয়ের গরীবের ঘরে কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইবেন, তিনি নিশ্চয়ই এই আশা করিয়াই বিবাহ দিবেন যে, তাঁহার কন্যা উপযুক্ত স্বামীর সহিত স্বামীর চাকুরীর স্থানে—তাহা সুদূর পাটনাতেই হউক আর লক্ষ্ণৌতেই হউক—সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিবে। কার্য্যতঃ ঘটেও তাহাই। আর যদি দোষ-ত্রুটীযুক্তা, শিক্ষিতা যুবতী ধনীকন্যাকে অজ পাড়াগাঁয়ে শ্বশুর-শাশুড়ীর সহিত বাস করিতেই বাধ্য হইতে হয়, তাহাতেও চিন্তান্বিত হইবার কোনও কারণ নাই, কেন না উপযুক্ত পুত্রের বধূ—তাহাতে আবার ধনীকন্যা,—ইহার দোষ ত্রুটী গরীব পাড়াগেঁয়ে শ্বশুর-শাশুড়ী ও অন্যান্য আত্মীয়-আত্মীয়ারা যে অনায়াসে ক্ষমা করিয়া মিলিয়া মিশিয়া সংসারে সুখে বসবাস করিবেন, এ যুগে সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।

লেখিকা নিজে শিক্ষিতা—তাই স্ত্রীশিক্ষার ইনি পক্ষপাতিনী; ইহা স্বাভাবিক। এবং বাল্যবিবাহে মেয়েদের যে শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটে, তাহাও তিনি বিশেষরূপেই অবগত আছেন। তাই, যাহাতে দুই দিক্ বজায় থাকে, তাহার জন্য তিনি পিতৃঘরের পরিবর্ত্তে শ্বশুর-ঘরে মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছুক। এ বিধি নিতান্তই অভিনব। কোনও দেশে কোনও কালে এ বিধি ছিল বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না। আমাদের যদি সংস্কৃত, ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, বর্ম্মিজ, জাপানী এবং চৈনিক ভাষা জানা থাকিত, তবে অনেক অনুস্বার বিসর্গ অনেক এ, বি, সি; অনেক সিবুপ্লে; অনেক ডেয়ার, ডি ডাস; অনেক অজাদি নাপ্পিয়াদি; অনেক কাতাকানা হারাগানা; এবং অনেক সিনাজী উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিতে পারিতাম যে, সকল দেশে, সকল কালে কন্যা পিতৃগৃহেই শিক্ষা পাইত এবং পাইতেছে। যাহা হউক, কোন্ গৃহে কন্যাকে শিক্ষা দেওয়া সহজসাধ্য, তাহার বিচার ও-প্রবন্ধ যাঁহাদের জন্য লিখিত, সেই শিক্ষিত ধনী ব্যক্তিগণ করিবেন। আমার মত অর্দ্ধশিক্ষিত (কেন না ইংরেজীতে আমার ভাল জ্ঞান নাই) চালকলা দ্বারা কষ্টে জীবিকানির্ব্বাহকারীর বক্তব্য এই যে, যে শ্রেণীর লোকের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শ্রদ্ধেয়া মহিলা এ বিধি প্রবর্ত্তনের অভিলাষিণী তাঁহাদের, সকল ঘরের আবহাওয়াই প্রায় এক প্রকার; তাই পিতৃগৃহের শিক্ষিত কন্যা শ্বশুরঘরে অনায়াসেই খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারিবেন। তবে নৈষ্ঠিক হিন্দু, বেল্লিক হিন্দু বা উভয়ের খিচুড়ী হিন্দুগণের ঘরের মধ্যে বাহিক চাল-চলনের এক-আধটুকু তারতম্য হইতে পারে বটে,—তাহা কন্যার পিতা পাত্রের জাতিকুল দেখিবার সময় যদি এ সম্বন্ধে একটু খোঁজ লয়েন, তবে অনায়াসেই এ সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

বিদেশীয় রীতিনীতি সম্বন্ধে আলোচনাটা একান্তই অবান্তর। সে সম্বন্ধে এইমাত্র বলিলেই হয় ত যথেষ্ট হইবে যে, বিদেশী সমাজের বিশৃঙ্খলার কারণ যৌবন-বিবাহ বা স্ত্রী-স্বাধীনতা নয়। সমাজের ও বিবাহের আদর্শই তজ্জন্য দায়ী। যৌবন-বিবাহ হিন্দুরও ছিল এবং অনেক স্থলে এখনও আছে; কিন্তু তাহা সমাজে বিশৃঙ্খলা আনে নাই। আর যিনি মহারাষ্ট্র দেশে গিয়াছেন এবং সেখানকার মেয়েদের সহিত মিশিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তিনিই মুক্ত কণ্ঠে বলিবেন যে, তাঁহাদের নৈতিক চরিত্র আমাদের ঘোমটাবৃতা মেয়েদের নৈতিক চরিত্র অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নয়। ভারতের যে যে স্থানে মুসলমানেরা বিশেষ আধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই, সেই সেই স্থানেই দেখিতে পাই যে, হিন্দুমেয়েদের পর্দ্দা নাই। তাই ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে, ঘোমটার ব্যবহার মুসলমানদের নিকট হইতেই নকল করা। যে হিসাবে বাঙ্গালীর মেয়ে গাউন পরিলে মেমসাহেব বলিয়া খ্যাতি পাইবার যোগ্য হন, সেই হিসাবে অবগুণ্ঠনবতী বাঙ্গালীর মেয়ে বেগম সাহেব আখ্যা অনায়াসেই পাইতে পারেন।

উপসংহারে লেখিকা মহাশয়ের নিকট আমাদের নিবেদন এই যে, তিনি যে কথা চিরদিন শুনিয়া আসিয়াছেন,—"স্পষ্ট কথায় কষ্ট নাই"—সেই আদর্শেরই যেন অনুসরণ করেন। কষ্ট করিয়া অস্পষ্টকে ফেণাইয়া যেন স্পষ্টকে জটিল

না করেন। সমাজ সম্বন্ধে যাহা লিখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা যেন সমাজের সকল অবস্থার লোকের প্রতি সমভাবে প্রযুজ্য হয়। সমাজে গরীবের সংখ্যাই চৌদ্দ আনা; তাহাদের ঘরের সংবাদ জানা না থাকিলে, সামাজিক প্রবন্ধ লেখা পণ্ডশ্রম মাত্র। তিনি নিজে যে সংস্কৃত, ইংরেজী ও বাঙ্গলায় সুশিক্ষিতা, এ সংবাদ বাঙ্গলার কাহারও বোধ হয় জানিতে বাকি নাই; তাই বাঙ্গালা প্রবন্ধে সংস্কৃত ও ইংরেজীর অবতারণা করিলে, তাঁহার নিজের কোনই গৌরববৃদ্ধি হইবে না। কিন্তু আমার মত অর্দ্ধশিক্ষিতের পক্ষে প্রবন্ধটী বোঝা কষ্টসাধ্য হইবে। তাহার পর, এ দৃষ্টান্ত যে তাঁহার নূতন শিষ্য বা শিষ্যাদের প্রবন্ধ লিখিবার গতিকে কোন্‌দিকে প্রবাহিত করাইবার সম্ভাবনা, তাহার নমুনা আশ্বিনের "ভারতবর্ষে' তাঁহার নিজের প্রবন্ধের পরের প্রবন্ধটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারিবেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে ইহা খুবই ভয়াবহ।

নারী

শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়

শ্রাবণ মাসের "ভারতবর্ষে" শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর "স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা" সম্বন্ধে কয়েকটি কথা শীর্ষক একটী প্রবন্ধ ও ঠিক তাহারই পূর্ব্ববর্ত্তী "নারীর কথা" শীর্ষক শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দুই এক ছত্র লিখিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর প্রবন্ধ অতি সুন্দর যুক্তিসমূহে পূর্ণ, এবং আমার মত সেকেলে মতবাদী হিন্দু-সন্তানের অতিশয় হৃদয়গ্রাহী। আমরা এস্থলে প্রবন্ধদ্বয়ের সমালোচনা করিতে বসি নাই,—বসিয়াছি এই সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা বলিতে।

প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, হিন্দু সমাজে নারীর স্থান পুরুষদিগের উপরে না নীচে। শক্তিসাধকগণকে আচার সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার সময়ে তন্ত্র-শাস্ত্রে দেবদেব মহাদেব বলিয়াছেন ;—

"স্ত্রীষু রোষং প্রহারঞ্চ বর্জ্জয়েৎ মতিমান সদা।
স্ত্রীময়ঞ্চ জগৎ সর্ব্বং স্বয়ঞ্চৈব তথা ভবেৎ।
স্ত্রীদ্বেষো নৈব কর্ত্তব্যো বিশেষাৎ পূজনং স্ত্রিয়ঃ।"

* * * * *

অন্যত্র—

"বালাংবা-যৌবনোন্মত্তাং বৃদ্ধাং বা সুন্দরীং তথা।
কুৎসিতাং বা মহাদুষ্টাং নমস্কৃত্য বিভাবয়েৎ।
তাসাং প্রহারং নিন্দাঞ্চ কৌটিল্যমপ্রিয়ং তথা।
সর্ব্বথা ন চ কর্ত্তব্যমন্যথা সিদ্ধিরোধ কৃৎ।
স্ত্রিয়ো দেবাঃ স্ত্রিয় প্রাণাঃ স্ত্রিয় এব বিভূষণং॥"

* * * *

অন্যত্র—

"নৈব যোষিৎ-সমারাধ্যা ন বিষ্ণুর্ণাপি শঙ্করঃ।
স্ত্রিয় প্রাণাঃ স্ত্রিয়ো দেবাঃ স্ত্রিয় এব বিভূষণা।
স্ত্রীসঙ্গিনা সদা ভাব্যমন্যথা ন প্রসীদতি।
দোষান্ন গণয়েৎ স্ত্রীণাং গুণমেব প্রকাশয়েৎ।
শতাপরাধ-সংযুক্তাং পুষ্পেনাপি ন তাড়য়েৎ॥

* * * *

অন্যত্র—

"বৃথা ন্যাসং বৃথা পূজা বৃথা জপো বৃথা স্তুতিঃ।
বৃথা সদক্ষিণা হোমো যত্তপ্রিয়করঃ স্ত্রিয়াঃ!
বরং জনমুখান্নিন্দা বরং বা গর্হিতং যশঃ।
বরং প্রাণ পরিত্যাগো না কুর্য্যাদপ্রিয়ং স্ত্রিয়াঃ।
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন পূজিতব্যা নিতম্বিনী।
যদ্যদিষ্ট তমং লোকে লভতে তত্তদেবহি।"

* * * *

অন্যত্র—

ন ধাতা নাচ্যুতঃ শম্ভু ন চ বাহং সনাতনঃ।
যোষিদপ্রিয় কর্ত্তারং রক্ষিতুং ক্ষমতেহপিকঃ॥

ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, হিন্দু সাধকের নারীকে আরাধ্যা দেবীর চক্ষে দেখা কর্ত্তব্য। যিনি তাহা না করিয়া স্ত্রীলোকের অপ্রিয় কার্য্য বা তাঁহাদের উপর অত্যাচার পীড়নাদি করেন, তাঁহাকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কেহই রক্ষা করিতে সমর্থ হন না। এত গেল শাস্ত্রের কথা, যাহা আজকাল সভ্য হইয়া আমরা মানি না, অধিকাংশ স্থলে গাঁজাগুরী ইত্যাদি বলি। তাহার পর, নারী আমাদের মাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, কন্যা, মাসী, পিসী প্রভৃতি অন্যান্য মাতৃস্থানীয়াগণ, এবং ভাইঝি, ভগিনী প্রভৃতি কন্যা-স্থানীয়াগণ। তাঁহারা আমাদের অবহেলার অনাদরের সামগ্রী নহেন,—তাঁহারা আরাধনা ও আদরের বস্তু। তাঁহাদের দাসী, বাঁদির মত সংসারে খাটিবার কথা নহে, সংসারে আনন্দময়ী মাতৃমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অশান্ত ও কার্য্যক্লান্ত পুরুষগণকে শান্তিদান ও পালন করা তাঁহাদের কার্য্য। কঠোর সংসারের কঠিন অর্থোপার্জ্জন কার্য্য তাঁহাদের সাজে না,—অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তিতে সংসার-প্রতিপালনই তাঁহাদের কার্য্য। জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া কঠোর সাধনা করিলে তবে হিন্দু সাধক শাস্ত্রানুসারে দেব-দেবীর প্রত্যক্ষ দর্শন পান। জগতে প্রত্যক্ষ দেবতার মূর্ত্তি মা! এই জাগতিক মায়ের আরাধনা (অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে পূজা ইত্যাদি, ও ভক্তি) করিলে জগজ্জননীর আরাধনা সিদ্ধ হয়। এত গেল গর্ভধারিণী জননীর কথা। শাস্ত্রোক্ত নির্দ্দেশ অনুসারে কুমারী ও সধবাগণের রীতিমত দেবী ভাবে পূজা করিলে, তাহার ফলও প্রত্যক্ষ। মূর্ত্তিমতী স্নেহ ও করুণা—নারী; আমাদের ভগিনী, স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতি সকলেরই মধ্যে সেই মাতৃত্বের ধারা,—সেই স্নেহ ও করুণার প্রস্রবণ কি নাই? এই সবার মধ্যেই কি সেই জগজ্জননীর ছায়া বর্ত্তমান নাই? "বিশেষাৎ পূজনং স্ত্রিয়ঃ"—শাস্ত্র বলেন স্ত্রীলোককে পূজা করিতে,—পীড়ন করিতে নহে। স্ত্রীলোক মাত্রেই,—ইঁহাতে উচ্চ নীচ নাই,—ছোট বড় নাই,—ব্রাহ্মণ শূদ্র নাই,—সবাই সেই জগন্মাতার প্রতিবিম্ব,—সবাই পূজনীয়া, সবাই মাতৃমূর্ত্তি। শাস্ত্রানুসারে কুমারী ও সধবাপূজা করিলে প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায়।

মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে আমাদের দেশের নারী এইরূপ পূজনীয়া, এইরূপ আরাধ্যাই ছিলেন। তাহার পর, আমরা বড় অনুকরণ-প্রিয়,—মুসলমান রাজত্বকালে মুসলমানের দেখাদেখি, এবং বোধ হয় কতকটা বাধ্য হইয়াও, ক্রমশঃ সে নারীভক্তি, নারীপূজা বিস্মৃত হইয়া আমরা নারীকে বিলাসের বস্তু, পাশববৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপকরণ রূপে দেখিতে লাগিলাম। বোধ হয় এই সময় হইতেই আমরা আমাদের মায়েদের (মা অর্থে এখানে সমস্ত স্ত্রীজাতি) পীড়ন করিতে আরম্ভ করিলাম।

আমাদের দেশে অবরোধ-প্রথাও পূর্ব্বে ছিল না। এখনও মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে, যেখানে মুসলমান-প্রভাব তেমন বিস্তৃত হয় নাই, সেই সকল স্থানে অবরোধ-প্রথা নাই,—ভদ্রমহিলাগণ অবাধে রাজপথে ভ্রমণাদি করেন। মুসলমান রাজত্বকালে আমাদের দেশে (আবার তদপেক্ষা অধিক উত্তর-পশ্চিম ও পঞ্জাব অঞ্চলে) এই অবরোধ-প্রথা প্রচলিত হইয়া এখনও চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু তথাপি বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে অবরোধ নাই বলিলেই হয়; সেখানে মায়েরা অবাধে এ-বাটী ও বাটী ভ্রমণ করিয়া বেড়ান ও পরস্পর আলাপাদি করেন।

এই স্থলে পল্লীগ্রামের আর একটী মধুর আত্মীয়তা ভাবের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। নিঃসম্পর্কীয়া কায়স্থ-কন্যা ব্রাহ্মণ-সন্তানের "কায়েত পিসী" বা "কায়েত খুড়ি।" এ আত্মীয়তা কেবল মুখের কথা নহে,—ইহার ভিতরে একটা মধুর স্নেহও গুপ্ত ভাবে থাকে, এবং আবশ্যক হইলে সেই স্নেহ পূর্ণভাবে প্রকটিত হয়। আমাদের বাল্যকালে আমাদের বাটীতে চণ্ডালজাতীয় দুই ভাই ছিল। তাহারা প্রজা এবং চাকর (গরু ও বাগানের কায করিবার জন্য)। নাম দলু সর্দ্দার (বহু পূর্ব্বে না কি ইনি ডাকাতের সর্দ্দার ছিলেন) ও অক্রূর। ইহারা দুই ভাইয়ে আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবকে ও খুল্লতাতকে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। আমার জ্ঞান হওয়ার পূর্ব্বে অক্রূরের মৃত্যু হইয়াছিল, বৃদ্ধ দলুর স্কন্ধে আমিও কয়েক বৎসর চড়িয়াছি। এই দলু চাঁড়াল আমাদের "দলুদাদা" ছিল, তাহাকে কোনও দিন কেবলমাত্র "দলু" বলিয়া আমরা ডাকি নাই। এইরূপ পুরাতন ভৃত্য ও "কায়েত পিসী" প্রভৃতির চিত্র এখন আমরা উপন্যাসাদিতে

ভাইফোঁটা

শিল্পী— শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী [BHARATVARSHA HALFTONE & PTG. WORKS

দেখিতে পাই,—বাস্তবিক আজও এমন সম্বন্ধ পল্লীগ্রামে আছে কি না বলিতে পারি না ; আমরা বাল্যজীবনে (প্রায় ৩৫।৩৬ বৎসর পূর্ব্বে) ইহা যথার্থ দেখিয়াছি।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অবরোধ-প্রথাটা আমাদের নিজস্ব নহে—মুসলমানের নিকট ধার করা। সেকেলে মতবাদী হইলেও এ প্রথা যে ভাল, তাহা আমরা বলি না ; তবে রাজা বিদেশী ও বিধর্ম্মী, এবং নানাদেশের নানা ধর্ম্মের লোকজন কলিকাতার মত বৃহৎ রাজধানী সহরে বাস করেন,—এইজন্য আমাদের মায়েদের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া (অন্ততঃ ঐ সকল "পরের" কাছে) একটু "কিন্তু" হইয়া চলাফেরা করা কর্ত্তব্য,—একেবারে অবাধে রাজপথে পরিভ্রমণ, ব্যাগ ও ছাতা হস্তে লম্ফ-প্রদান করিয়া ট্রামারোহণ প্রভৃতি দৃশ্যগুলি আমাদের সেকেলে চক্ষে কেমন বিসদৃশ ঠেকে। আর অতটা আবশ্যকই বা কি ? তোমরা "মা", সেই "জগজ্জননী মায়ের" জাতি,—তোমরা সেইরূপ "মাই" থাক মা ! স্ত্রীজনোচিত কোমলতা, করুণাময়ী মাতৃমূর্ত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কঠোর পরুষ ভাব গ্রহণ করিলে আর সে ধ্যানের আরাধ্য মূর্ত্তি থাকে না। মা ! হিন্দুর মেয়ে, হিন্দুর পত্নী, হিন্দুর মাতা, হিন্দুর শাস্ত্রোক্ত ধ্যানের মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া দিয়া বিদেশীর ধার-করা সাজ পরিবার প্রয়োজন নাই।

যাঁহাদের আদর্শ লইয়া মা লক্ষ্মীরা আমাদের উচ্চ গোড়ালি দেওয়া বুট, মোজা, বনেট, চেষ্টারফিল্ড্ কোট প্রভৃতি পরিধান করিয়া প্রকাশ্য রাজপথে পরিভ্রমণ করেন, —সেই পাশ্চাত্য মহিলাগণের পুরুষজনোচিত পরিচ্ছদ ও অশ্বারোহণাদি দেখিলে (হয় ত বিলাতে এ সকল আবশ্যক হইতে পারে, এবং তদ্দেশীয়দিগের চক্ষে হয় ত দেখায়ও সুন্দর) আমাদের মনে হয়, বুঝি ইঁহারা স্ত্রীলোক নহেন,— স্ত্রীজন-সুলভ কোমলতা, মধুরতা, করুণা, স্নেহ, পরদুঃখকাতরতা, প্রভৃতি কোমল বৃত্তিগুলি বুঝি ইঁহাদের নাই। এ কথা কতকটা পরিমাণে সত্যও বটে—পাশ্চাত্য মহিলাদিগের এরূপ কোমলতা নাই। বিলাতে বিবাহিত জীবন অতি অল্পই আমাদের মত সুখ শান্তিময় হইয়া থাকে। প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়, বিবাহের অল্প দিন পরেই স্বামী স্ত্রীতে বিবাদ-বিসম্বাদ আরম্ভ হয়, এবং পাঁচ-সাত বৎসর পরেই আদালতের সাহায্যে বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বামী অপর স্ত্রী, ও স্ত্রী অপর স্বামী অন্বেষণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বিবাহ করেন, এবং হয় ত আবার পূর্ব্বমত বিচ্ছেদ হয়। এইরূপ কাহারও কাহারও জীবনে তিন-চার বার হয়, এবং তজ্জন্য স্বামী সাংসারিক সুখ-শান্তি তাঁহারা পান কি না খুবই সন্দেহ। এরূপ অনেক স্থলেই পাশ্চাত্য মহিলাগণেরই দোষ অধিক, পুরুষগণের ততটা নয় ; এবং স্ত্রীর বিলাসবাসনা ও পুরুষের তৎপূরণের অক্ষমতাই প্রধানতঃ তাহার কারণ। কোন কোন স্থলে Scandalএর (লোক-নিন্দার) ভয়ে প্রকাশ্য আদালতে বিচ্ছেদ না হইলেও, স্ত্রী-পুরুষে ভিতরে-ভিতরে একটা understanding (চুক্তি) করিয়া লইয়া উভয়ে প্রকাশ্য ভাবে স্বতন্ত্র না হইলেও, স্বামী অপর স্ত্রী এবং স্ত্রী অপর পুরুষ লইয়া বাস করেন। এরূপ অবস্থা পাশ্চাত্যগণের মধ্যে, কেবল বিলাতে কেন, এক্ষণে আমাদের দেশেও বিরল নহে। আমাদের বোধ হয়, মেয়েদের অবাধে পুরুষগণের সহিত মেলামেশা ইহার একটা প্রধান কারণ। জিজ্ঞাসা করি মা, অবাধে পুরুষগণের সহিত মেশার ফলে শেষে যদি হিন্দু-সমাজে কোন কালে এইরূপ অবস্থা হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে কি হইবে, একবার ভাবিয়াছ কি ? হিন্দুর শাস্ত্রে ও সমাজে divorce প্রথা নাই। যদি কোনও দিন পাশ্চাত্য অনুকরণে courtship করিয়া বিবাহ হিন্দুসমাজে প্রচলিত হয় (কতকটা বুঝি বা হইয়াছেও)—বরকন্যা বংশমর্য্যাদা, কুল ইত্যাদি কোনও বিষয় না দেখিয়া, নবপ্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে জাতি বিচার পর্য্যন্ত না করিয়া, কেবল মোহে পড়িয়া বিবাহ করিলেন, তাহা হইলে বিবাহের অল্প দিন পরেই অর্থাৎ প্রথম মোহটা কাটিবার পরই স্ত্রীপুরুষে ঐ পাশ্চাত্য অনুকরণেই বিবাদ-বিসম্বাদ হইতে লাগিল, স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই জীবন ক্রমশঃ একপ্রকার অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন কি হিন্দু সমাজেও আদালতের সাহায্যে পবিত্র বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিবার প্রথা প্রচলিত করিবে ? হাঁ মা, তখন কি প্রথম স্বামী পরিত্যাগ করিয়া আবার courtship করিয়া আর একটী পুরুষকে স্বামীরূপে গ্রহণ করিবে ? এ কথা মনে হইলেও যে শরীর শিহরিয়া উঠে জননী ! হিন্দুর সমাজ কি এতদূর অধঃপতিত হইবে ?

স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিই নীচ ভোগ-বাসনা-তৃপ্তি-কামনায় অধঃপতিত হয়। হিন্দুর মধ্যে অধিকাংশ স্থলেই পুরুষগণই অধিক উচ্ছৃঙ্খল ও অতি শীঘ্রই চরিত্রহীন হইয়া

পড়ে। কিন্তু পুরুষ যদি পরস্ত্রী গমন করে, তাহা হইলে স্ত্রীই বা পরপুরুষ ভজনা কেন না করিবে? সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর আদর্শ যাঁহাদের সম্মুখে, তাঁহাদের মুখে এও কি একটা যুক্তি জননি? শ্রীমতী অনুরূপা দেবী যথার্থই বলিয়াছেন, এরূপস্থলে সে পুরুষও সমাজের অঙ্গে দুষ্টব্রণ স্বরূপ—সে স্ত্রীলোকের মত কেন, তদপেক্ষা অধিক ঘৃণ্য ও দণ্ডনীয় হওয়া কর্ত্তব্য; পুরুষের স্ত্রীর নিকট দায়িত্ব অধিক। শাস্ত্রের বিধানও তাহাই। পুরুষ-চালিত সমাজ শাস্ত্র জানেন না বলিয়াই আজ পরস্ত্রীরত। পুরুষ সমাজের চক্ষে ঘৃণ্য হন না, নতুবা শাস্ত্র স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের পক্ষেই সমান। এমন কি, পুরুষের পক্ষে কোন-কোনও স্থলে শাস্ত্র কঠিনতর শাস্তির বিধান করিয়াছেন।

তাহার পর স্ত্রী-শিক্ষা। শিক্ষার অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু সে শিক্ষা এখনকার প্রচলিত বেথুন কলেজ বা মিশনারী বালিকা বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা নহে,—সে শিক্ষা শ্রীমতী অনুরূপা দেবী কথিত ধর্ম্মের ভিত্তিতে স্থাপিত বিদ্যালয়ে হওয়া কর্ত্তব্য। কিছুদিন পূর্ব্বে স্বর্গীয়া মাতাজি মহারাণী কলিকাতায় মহাকালী পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। আমি এই পাঠশালার দর্জ্জিপাড়া শাখার সহিত কিছুদিন সংশ্লিষ্ট ছিলাম। এইরূপ পাঠশালায় আমাদের মেয়েদের শিক্ষা হওয়া আবশ্যক। এই সম্বন্ধে তৎকালের একটা ঘটনা আমার স্মরণ হইল। বোধ হয় তৎকালীন সংবাদপত্রেও এ ঘটনাটী বাহির হইয়াছিল। মাতাজি মহারাণী একদিন শ্রীশ্রী৺কালীঘাটে ৺মায়ের দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ঠিক মন্দিরের নীচে একটী যুবতী ও তৎপশ্চাতে একটী বৃদ্ধা ও আরও দুই-তিনটী যুবতী ও প্রৌঢ়া আসিয়া মাতাজিকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন। মাতাজি চিনিতে না পারিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, প্রথমোক্ত যুবতীটী বলিলেন "মা, আমি আপনার মহাকালী পাঠশালায় পড়িতাম।" তৎপরে নাম-ধামাদি জিজ্ঞাসা করিবার পর মাতাজি ও তাঁহার সঙ্গের পাঠশালার কর্ত্তৃপক্ষীয় দুই একজন মেয়েটীকে চিনিতে পারিলেন। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধাটী অগ্রসর হইয়া আপনাকে মেয়েটীর খাশুড়ি বলিয়া পরিচয় দিলেন; ও কৃতজ্ঞ গদ্গদ্‌কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন যে, ঐ বধূ গৃহে আসিবার পূর্ব্বে তাঁহার গৃহে দিবারাত্রি অশান্তি, দিবারাত্রি কলহ-কোলাহলে ঘর কাক-চিল বসিতে পারিত না। লক্ষ্মী-স্বরূপিণী বধূ গৃহে আসিয়াই প্রথমে (খাশুড়ি স্বয়ং স্বীকার করিতেছেন) অশান্ত হৃদয়া ও কলহ-মুখরা খাশুড়িকে শিবপূজা করাইতে আরম্ভ করিলেন। রন্ধন-গৃহের সমস্ত ভার বালিকা হইলেও স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। একাধারে লক্ষ্মী ও অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক এক-এক করিয়া কলহের বীজগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে বৃদ্ধা বলিলেন, এই ৬।৭ বৎসরের মধ্যে সেই অশান্তিময় গৃহে মূর্ত্তিমতী শান্তি আসিয়া সকলই শান্তিময় করিয়া ফেলিয়াছে। এক্ষণে তাঁহার সংসার পাড়ার মধ্যে (বোধ হয় ভবানীপুরে) আদর্শ হিন্দু সংসাররূপে পরিগণিত হইয়াছে।

এই ত গেল মহাকালী পাঠশালার আদর্শ। অপর পক্ষে পাঠক কল্পনা-চক্ষে দেখুন, হিন্দুর ঘরে বুট-বনেট-পরা বধূ আসিলেন। বৃদ্ধা খাশুড়ী ও শ্বশুর সেকেলে—সুতরাং আধুনিক মতে একটু "শুচিবাই" আছে। কোনও প্রয়োজন হইলে, বৃদ্ধ শ্বশুর-খাশুড়ীর ইষ্টপূজার গৃহে সবুট শ্রীচরণ অর্পণ করিয়া অশুচি হস্তে পূজার সামগ্রী, হয় ত জপের মালা পর্য্যন্ত স্পর্শ করিলেন। রন্ধনশালায় গমন করিলে ধোঁয়া লাগিয়া গায়ের রং ময়লা হইবে, গায়ে গন্ধ হইবে,—আবার হিষ্টীরিয়ার ভয়ও আছে; সুতরাং রান্নাঘর বর্জ্জন ভিন্ন উপায় নাই। এ অবস্থায় বৃদ্ধা খাশুড়ী বা ননদকে রন্ধনকার্য্য করিতেই হইবে। প্রাতঃকালে বৌমার শয্যাপার্শ্বে চায়ের পেয়ালা লইয়া গিয়া মায়ের ঘুম ভাঙ্গাইতে হইবে, ও ডিনার-টেবিলে, পাঁচ জন বন্ধু বান্ধবসহ বৌ-ব্যাটা আহারে বসিলে, খানসামারূপে serve করিতে হইবে (হা ভগবান! এদৃশ্যও দেখিয়াছি!! বৃদ্ধা একমাত্র সন্তানকে ত্যাগ করিয়া তীর্থবাসিনী হইতে পারেন নাই)! এ অবস্থায় সেই বৃদ্ধ শ্বশুর-খাশুড়ী বা বিধবা ননদ বা পিসী মাসী যদি কেহ থাকেন, তাঁহাদের সে সংসার হইতে ক্রমে দূরে গমন পূর্ব্বক কাটনা কাটিয়া বা পরের ঘরে (যেখানে হিন্দুয়ানী আছে) রাঁধুনী বা দাসীবৃত্তি করিয়া দিনপাত করিতে হয়। এরূপ না হইলে হিন্দুরমণীর উপার্জ্জনের প্রয়োজনীয়তা অতি অল্পই হইতে পারে।

অবশ্য যে স্ত্রীলোকের কোন কুলে কেহ কোথাও আপনার বলিতে নাই, তাঁহাকে আপনার জীবিকার উপায় নিজেরই করিয়া লইতে হয়। সেরূপ স্ত্রীলোকের সংখ্যা

বোধ হয় আমাদের বাঙ্গলা দেশে তেমন অধিক নহে। আর অধিক হইলেও শ্রীমতী অনুরূপা দেবী কথিত কয়েকটী স্ত্রীজনোচিত উপায়ে বোধ হয় তাঁহাদের সকলেরই জীবিকা উপার্জ্জন হইতে পারে।

শেষোক্ত আধুনিক বুট বনেট-পরা বধূর সংসারে অবশ্য "আস্‌খাওড়া পস্‌খাওড়া" রূপিনী (বা রূপী) ননদ, পিসী, মাসী ও পুরুষ—(দেবর, ভাসুর, ভাইপো, ভাগ্নে) প্রভৃতির স্থান না হওয়াই উচিত। সে বধূ শ্বশুর-গৃহে আসিবার পূর্ব্বেই মেয়েলী ভাষায় বলেন, "বর বর বর! তোমার কখানি ঘর? আমি গিয়েই হব স্বতন্তর।" তাঁহাদের কথায় আমাদের প্রয়োজন নাই। কিন্তু পূর্ব্বকথিত মহাকালী পাঠশালার আদর্শে গঠিত সংসারে দূর-সম্পর্কীয়া দু' তিনটী মাসী-পিসীর স্থান বেশ হইতে পারে। ইঁহারা সংসারে অল্পবয়স্কা বালিকাগণকে নানা প্রকার শিক্ষা (রন্ধন, সেলাই, অন্যান্য শিল্প পুরাণাদি পাঠ করিয়া নীতি শিক্ষা, লেখাপড়া শিক্ষা, ধাত্রী-বিদ্যা সম্বন্ধীয় শিক্ষা—আমাদের সেকেলে মাসী পিসীগণ বিদ্যালয়ে পাঠ না করিয়া ধাত্রীবিদ্যায় যতদূর পারদর্শিনী ছিলেন, আমাদের বোধ হয় পাশকরা ধাত্রীগণ তাহার শতাংশের একাংশও নহেন) দিবেন ও "ভাত হাঁড়ির ভাত" খাইয়া ও আবশ্যক বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া, সুখে হাসিমুখে আনন্দময়ী মাতৃরূপিনী হইয়া থাকিবেন। ইহাতে কতদূর উপকার হইল দেখুন,—প্রথমতঃ বিধবার আপনার থাকিবার ও খাওয়া পরার ব্যবস্থা হইল, (তাঁহার মধ্যে মধ্যে হাত খরচের অর্থ গৃহস্থ দিতে সমর্থ না হইলে, পৈতা কাটা প্রভৃতি ছোট-খাট কার্য্য করিবেন। সেকালের বৃদ্ধারা করিতেন। তাহাতেই তাঁহাদের যথেষ্ট হইত।) তার-পর গৃহস্থ তাঁহার খাওয়া পরার জন্য ব্যয় করিয়া কি পাইলেন? সংসারে রন্ধনাদি কার্য্যে গৃহিণীর বা অন্যান্য মহিলাগণের সাহায্য হইতে লাগিল,—পালা করিয়া সকলে রন্ধনশালার ভারগ্রহণ করিতে লাগিলেন। জ্ঞানবৃদ্ধা তিনি,—ছোট মেয়েদের বা বধূদের উপরিউক্ত সকল প্রকার শিক্ষা হইতে লাগিল, তাহাদের প্রাথমিক শিক্ষা বিদ্যালয়ে না গমন করিয়াই হইতে লাগিল। মহাকালী পাঠশালায় সংস্কৃত শিক্ষা হয়। সে আদর্শে শিক্ষিতা মহিলা কেবল "কথামালা" "বোধোদয়" মাত্র না পড়াইয়া, বালিকা ও যুবতীগণকে আরও উচ্চ বাংলা এবং সংস্কৃত "হিতোপদেশ" এমন কি "রঘুবংশ" "কুমারসম্ভব" বা পুরাণাদি পর্য্যন্ত পড়াইতে সক্ষম হইবেন। আমাদের মতে এই শিক্ষাই আমাদের মেয়েদের পক্ষে যথেষ্ট, ইংরাজি অধিক শিখিবার প্রয়োজন নাই। নিতান্ত আবশ্যক হয় ত অল্প পড়িতে বুঝিতে ও লিখিতে পারিলেই হইবে। সংস্কৃতশাস্ত্রে যত শিখিবার আছে, এত অন্য কোনও ভাষায় আছে কি না জানি না।

পোষাক পরিয়া আফিস যাইয়া বা আদালতে ওকালতি করিয়া উপার্জ্জন মায়েদের একেবারেই চলিবে না। তাহার অনেকগুলি অখণ্ডনীয় দোষ শ্রীমতী অনুরূপা দেবী দেখাইয়াছেন। সেগুলির পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। আর একটী ভয়ানক দোষের কথা আমরা এস্থলে বলিতেছি। মাতা আঁতুড়ঘরের কয় দিবস হয় ত কোনও গতিকে অফিসের ছুটী লইয়া, আদালত কামাই করিয়া, তৎপর দিবসই স্নান আহার করিয়া পোষাক পরিয়া অফিস ছুটিলেন। সদ্যোজাত শিশু-পুত্রের স্তনদুগ্ধ পান করা ভিন্ন উপায় নাই, কাযেই বাপ মা wet nurse (মাই দেওয়া দাই) রাখিলেন। সে জাতিতে কখনই কুলীন কুমারী হইবে না—নিশ্চয়ই হাড়ি, ডোম, অন্ততঃ কৈবর্ত্ত এমনি একটা কিছু হইবে; হয় ত মুসলমানও হইতে পারে। ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ বালক বা বালিকা সেই হাড়ি বা ডোমের ঝির স্তনদুগ্ধ পানে পুষ্ট বা অপুষ্ট যাই হোক হইতে লাগিল। মা! পূর্ব্বকালে আমরা (পুরুষরা) স্তনদুগ্ধের বড়াই করিতাম, এবং প্রায় অর্দ্ধশতাব্দিকাল বয়সে এখনও সময়ে সময়ে বলিয়া থাকি,—"ওহে, আমি অনেক বয়েস পর্য্যন্ত মার মাইদুধ খেয়েছিলাম, আমি এ দুষ্কর কায করতে পারব না?" আমাদের গর্ভধারিণীরাও সেকালে গর্ব্ব করিয়া সন্তানদের বলিতেন, "দেখ, তুই যদি আমার মাইদুধ খেয়ে থাকিস, তা হলে নিশ্চয়ই অমুক কঠোর কাযটা করতে পারবি।" হ্যাঁ মা, উপরিউক্ত রোজগেরে মায়ের ডোমনীর স্তন্যপায়ী-সন্তানটী কার স্তনদুগ্ধের গর্ব্ব করিবে, বলিতে পার? আর সে জননীই বা ওরূপ ক্ষেত্রে কাহার স্তনদুগ্ধের দোহাই দিয়া সন্তানকে প্রবোধিত করিবেন? পুত্র কি বলিবে,—"দেখ, আমি হাড়ির ঝির মাই খেয়েছি!" আর মা কি বলিবেন, "ওরে, তুই যে ডোমনীর মাই খেয়েছিস—এ কাযটা পারলিনে?"

মা, স্তনদুগ্ধে সন্তানের প্রকৃতি যতদূর ভাল-মন্দের দিকে চালিত হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ কুমার বা কুমারী সেই ডোমনী ও হাড়ীর ঝির প্রবৃত্তি নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে—এবং ব্রাহ্মণ বা কায়স্থের পবিত্র ভাব তাহাদের মধ্যে অতি অল্পই থাকিবে। এরূপ সন্তানকে আমরা পিতৃ-মাতৃহীন অভাগা ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারি না; এবং সে দুর্ভাগ্য তাহাদের পিতৃ-মাতৃ-দত্ত। সে সন্তান পিতা-মাতার নিকট কতদূর কৃতজ্ঞ, কতদূর কর্ত্তব্যপরায়ণ হইবে, বলিতে পারি না। অবশ্য হালী নিয়মে পাশ্চাত্য অনুকরণে ছেলে বড় হইলে ও উপার্জ্জনক্ষম হইলেই বাপ-মার সহিত সম্বন্ধচ্ছেদ করিয়া দূরে যাইবার কথা,—তাহার পর সে উপযুক্ত (বা অনুপযুক্ত?) পুত্র হাড়ির ভাবেই থাকে কি ডোমের ভাবেই থাকে, তাহা পিতা মাতার দেখিবার কথা নহে। কিন্তু সেও আমাদের সেকেলে মতে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য। বাংলার একান্নবর্ত্তী সংসারের মত আর কিছু নাই—এ কথা এখন অনেক সাহেবও স্বীকার করেন।

জ্ঞানবৃদ্ধ হাস্যরসার্ণব নাট্যাচার্য্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বহুদিন পূর্ব্বে তাঁহার "তাজ্জব ব্যাপার" নামক প্রহসনে নিপুণ হস্তে যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন (আমি বহুদিন কার্য্যব্যপদেশে বিদেশে থাকিয়া বঙ্গদেশের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেকটা অনভিজ্ঞ)—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী ও শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর প্রবন্ধদ্বয় পাঠ করিয়া মনে হইতেছে, বুঝি বা প্রবীণ গ্রন্থকার ভাব-চক্ষে ভবিষ্যৎ বাঙ্গালী সমাজের অবস্থা দেখিয়া সে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন! প্রবীণ নাট্যাচার্য্য যে অসম্ভব চিত্র সমাজের বক্ষে চাবুকরূপে অঙ্কিত করিয়াছিলেন, কালে (বোধ হয় ২৫।৩০ বৎসর) সেই অসম্ভবই কি সম্ভব হইবে? ছি মা, ছি! তোমরা হিন্দুর আরাধনার বস্তু—তোমরা হিন্দুর জীবন-সঙ্গিনী,—তোমরা হিন্দুর স্নেহের পুত্তলী মূর্ত্তিমতী করুণা,—এ পবিত্র পুণ্যমূর্ত্তি মুছিয়া বিদেশীয় অনুকরণে অমৃত বোধে সমাজে বিষ এনো না মা! মা তোমরা! তোমরাই হিন্দুর জাতীয় ভিত্তি! বাঙ্গালীর গর্ব্ব! তোমরাই গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, সি, আর, দাস, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতির গর্ভধারিণী! তোমরাই এক দিকে আমার মত তুচ্ছ ও অকৃতী সন্তান এবং অপর দিকে প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মগণকে গর্ভে ধারণ করিয়াছ, করিতেছ এবং ভবিষ্যতেও করিবে। বাংলার গর্ব্ব—ভারতের গর্ব্ব—যতগুলি সন্তান, সবই তোমাদেরই গর্ভে জন্মিয়াছিল। তোমাদেরই গর্ভে জন্মিয়া বাংলার বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন প্রমুখ—সাহিত্য. বঙ্কিমচন্দ্র দামোদর প্রমুখ—উপন্যাস; দীনবন্ধু, গিরিশ ঘোষ, অমৃত বোস প্রমুখ—নাটক; ঈশ্বর গুপ্ত, হেমচন্দ্র নবীন রবীন্দ্র প্রমুখ—কাব্য; জগদীশ, প্রফুল্ল প্রমুখ—বিজ্ঞান; ইত্যাদি ইত্যাদি অসংখ্য কৃতী সন্তানের কৃতিত্বে আজ বঙ্গভূমি উজ্জ্বল। সে কৃতিত্বের অনেকটাই কি তাঁহারা তোমাদের গর্ভের,—তোমাদের স্তনদুগ্ধের তোমাদের শিক্ষা দীক্ষার, তোমাদের পালনের, তোমাদের স্নেহের, তোমাদের করুণার গুণে পান নাই কি জননি? (যিনি মার কাছে প্রথম নীতি ও অন্যান্য শিক্ষা পান নাই, সে পুরুষকে আমরা নিতান্ত হতভাগা বলি।) তোমাদের পূর্ব্ব-চিত্রিত এবং পূর্ব্ব-পরিচিত স্নেহময়ী, করুণাময়ী, অন্নপূর্ণা মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে এখনকার এ বিকৃত মূর্ত্তি দর্শনে যে আমরা ব্যথা পাই জননি! আমাদের প্রাণ শিহরিয়া উঠে, ভবিষ্যতে কেমন একটা বিকৃত চিত্র কল্পনা-নয়নে দেখিয়া আতঙ্কে প্রাণ কম্পিত হইয়া উঠে। না মা, ও কায নাই; যেমন মায়ের জাতি আছ, তেমনি থাক,—ও বিকৃত মূর্ত্তি সৎমা হইয়া সন্তানদের ভয় দেখাইয়ো না। সৎমার বড় জ্বালা শুনিতে পাই। সৎমা হইলে যে পীড়ন করিবে,—সন্তান আমরা—আমাদের করুণা তো করিবে না মা!

তোমরা তো সামান্যা নও মা! সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, এ তিনই তোমাদের কার্য্য। শাস্ত্র বলেন, আদিদেব মহেশ্বরও শক্তিহীন অবস্থায় শব,—শক্তিযুক্ত হইলে সগুণ এবং শক্তিহীন অবস্থায় নির্গুণ। এ শক্তি তোমরাই মা! জগৎ শিবশক্তিময়। ভগবতী স্বয়ং যোগীশ্বর মহেশ্বরকে যোগশিক্ষা দিবার সময় বলিয়াছেন—

"তদ্রূপাঃ পুরুষাঃ সর্ব্বে মদ্রূপাঃ সকলাঃ স্ত্রিয়ঃ।
ইমং যোগং মহাদেব ভাবয়স্ব দিনে দিনে।"

সোম

শ্রীব্রজলাল মুখোপাধ্যায় এম-এ, এটর্নি-এট-ল

(৪)

Dr. P. Von Rothএর প্রবন্ধের সার মর্ম্ম এখানে দিতে'ছ। তিনি বলিয়াছেন, সোম আর্য দিগের বড়ই প্রিয়বস্তু। ইঁহারা দেবতাদিগকে সোম পান করাইয়া তাঁহাদের নিকট ধনরত্নাদির প্রার্থনা করিতেন। সোম সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা যায়, সে সকলই যেন অনিশ্চিত। সোমরস প্রস্তুত করিবার জন্য কোন্ উদ্ভিদ ব্যবহৃত হইত, তাহা স্থির করা আবশ্যক। আধুনিক ভারতবর্ষ হইতে প্রাচীন ভারতের নিদর্শন যদি পাওয়া যাইত, তাহা হইলে বড়ই সুখের বিষয় হইত; এবং সোমের পরিচয় বিনা আয়াসেই পাওয়া যাইত। নিঘণ্টু (বৈদ্যক) প্রভৃতি আধুনিক গ্রন্থে নানাপ্রকার সোমের পরিচয় পাওয়া যায়; যথা, সোম, সোমলতা, সোমবল্লী ইত্যাদি। এই সকল উদ্ভিদের বিবরণ পাঠ করিলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, সেগুলি বৈদিক সোম হইতে পৃথক। আধুনিক সোম, যথা, Ruta graveolus (willed), Vernonia on the linintica. Tinospora cordifalia (menis Dermum cordifalium (willed)। আধুনিক সোমগুলির মধ্যে, সোমলতা নামীয় উদ্ভিদের দাবী থাকিতে পারে। সোমবল্লীকে Rosbargh asclepias acida বলিয়া স্থির করিয়াছেন; তৎপরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকেরা ইহাকে sarcostemma জাতীয় বলিয়াছেন Wight এই উদ্ভিদটীর নাম দিয়াছেন sarcostemma Brevistigma; এবং ইহাকেই Stemnson সামবেদের অনুবাদে ভ্রমবশতঃ Sarcostemma viminale বলিয়া ধরিয়াছেন। Sarcostemma brevistigma ও Sarcostemma acidum বোধ হয় একই উদ্ভিদ-বিশেষের নামান্তর মাত্র। Sarcostemma acidum নামক উদ্ভিদ নিষ্পত্র এবং অন্য বৃক্ষকে জড়াইয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। ইহার শাখা সকল বেলনাকার (cylindrical), গ্রন্থিযুক্ত ও মসৃণ। কচি শাখাগুলি সক্ষীর বটে এবং আশ্রয় না পাইলে ঝুলিয়া

অবনত হইয়া পড়ে; এবং সেগুলির স্থূলত্ব অঙ্গুলি পরিমিত। ইহার ছোট ছোট ফুলগুলি শ্বেতবর্ণ, ইহার শাখার অগ্রভাগ একত্র দেখা যায়, এবং সেগুলি সুগন্ধযুক্ত। ইহা সক্ষীর বটে এবং সেই কারণেই ইহার দাবী স্বীকার করা যায়। তৃষ্ণার্ত্ত পথিকেরা তৃষ্ণা নিবারণ করিবার জন্য এই উদ্ভিদের শাখাগুলি চিবাইয়া রসাস্বাদন করে।

Prof. Haug বলিয়াছেন যে sarcostemma intermedium (Wight, Icones ১২৮১) নামীয় উদ্ভিদ্‌টী বৈদিক সোম বটে। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত বিশ্বাসযোগ্য নহে। আমরা এই মাত্র স্বীকার করিতে পারি যে, সোম শব্দযুক্ত যতগুলি উদ্ভিদের নাম জানা আছে, তন্মধ্যে সোমলতাই আধুনিক সোম। কিন্তু সোমলতাই যে বৈদিক সোম বটে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। উপরিউক্ত সোমগুলি গ্রীষ্মপ্রধান ভারত-ভূমিতেই দেখা যায়। সেগুলিকে চক্ষু ও সিন্ধু নদীর উচ্চপ্রদেশের নিকটস্থ পর্ব্বতোপরি এত অধিক পরিমাণে জন্মাইতে পারে যে, সেথান হইতে আনয়ন করিয়া সোমযাগের ন্যায় বৃহৎ যাগ সকল সম্পাদিত হইতে পারে, তাহা বিশ্বাসযোগ্য কথা নহে। সোমরস সম্বন্ধে ঋষিগণ যে প্রকার উল্লসিত হইতেন, তাহা হইতে বোধ হয় যে আগে সোম যথেষ্ট পরিমাণে আবশ্যক হইত। দেশান্তরের কবিগণ যে ভাষায় দ্রাক্ষার গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন, ঋষিগণ তদ্রূপ ভাষায় সোমের গুণগান করিয়াছেন। কোথাও ইহাকে স্বাদুতম (ঋ ৮ ৪৮।১) বলিয়াছেন, কোথাও ইহার নিকট অশ্বাদিরত্ন ও শত সংখ্যক সোমভাগের প্রার্থনা করিয়াছেন (ঋ৪।৩২।১৭;৮-৩৭।১)। Xenophon দেখিয়াছিলেন যে, আর্মিনীয়গণ এক প্রকার যব-সুরা একটী পাত্রে রাখিয়া তাহা হইতে খড়ের নলদ্বারা পান করিয়া থাকে। সেই পাত্রে ধান্যগুলি ভিজাইয়া রাখা হয় এবং সেই পাত্রে গাঁজলাইয়া তোলা হয়। Aztecদিগের মধ্যে Cortex দেখিয়াছিলেন যে, Agave নামক তরুর পত্র বাঁটিয়া তাহারা একটী পানীয় প্রস্তুত করিয়া থাকে। বোধ হয় সোম এই জাতীয় উদ্ভিদ এবং উচ্চ আসিয়াতে ঋষিনিবাসের নিকটেই সোম প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। Aztecদিগের পানীয় অধিক দিন রাখিতে পারা যায় না; এবং Yacua গ্রন্থেও সোম বহু দিবস রাখিয়া নষ্ট করার জন্য অভিসম্পাত আছে। কিন্তু যে উদ্ভিদ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত, সেটী যে সেই দেশ হইতে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে, তাহা সম্ভবপর নহে। যতই উচ্চপ্রদেশে ইহার নিবাস, ততই ইহার লোপের বা নাশের সম্ভাবনা অল্প Sarcostemma নামক উদ্ভিদের বীজ সহজেই বায়ুভরে দূরদেশে যাইয়া পড়ে। এই সকল কারণে প্রতীয়মান হয় যে, বৈদিক সোম sarcostemma জাতীয় ছিল কিম্বা asclipias জাতীয় বটে ভারতীয় প্রবাদটী সত্য হইবার সম্ভাবনা। যে উদ্ভিদের আধুনিক নাম সোমলতা, সেই উদ্ভিদ পূর্ব্বে সোম বলিয়া পরিচিত ছিল এবং বৈদিক যুগের পরিচিত সোমের আধুনিক নাম হইয়াছে, সোমলতা। দুইটী কারণে এই অনুমান দৃঢ়ীভূত হয়; যথা:—(১) Sarcostemma ব্যতীত অন্য কোন উদ্ভিদ হইতে অনুপকারী ও মিষ্টরস পাওয়া যায় না। (২) সোমের বা সোমের গ্রন্থির নাম অংশু। এই শব্দ Euphorbia জাতীয় উদ্ভিদে প্রযুক্ত হইতে পারে বটে। কিন্তু Euphorbiaর রস পান করা অসম্ভব। এই শব্দে আমরা বুঝিয়া থাকি, নলাকৃতি বা বেলনাকৃতি, কীলক-সদৃশ গ্রন্থি, যেগুলিকে সরস ছোট শসার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সূত্র পাকাইয়া বস্ত্রখণ্ডের প্রান্তভাগের যে বেলনাকৃতি দোদুল্যমান অংশ প্রস্তুত করা যায়, তাহাও অংশু নামে অভিহিত হয়; যথা অংশুপট্ট। পুনশ্চ অংশুমৎ-ফল অর্থে কদলী বুঝায়। তাহার কারণ এই যে, কদলী ফলগুলি বেলনাকৃতি বটে এবং সেগুলি একটী কাণ্ডের চতুর্দ্দিকে কীলকের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। বেদের মধ্যে এমন কোনও কথাই নাই, যাহা হইতে অনুমান করা যায় যে, সোম অন্য তরুকে আশ্রয় করিয়া জড়াইয়া উঠে; এবং সোমের পুষ্পের সৌগন্ধের কোনও প্রমাণ নাই। কিন্তু অপর পক্ষে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সোম-প্রধান দেশে প্রথম বিষয়টী অসাধারণ না হওয়ায়, বিশেষভাবে লক্ষিত হয় নাই; এবং পুষ্প সম্বন্ধেও বিশেষভাবে লক্ষ্য না করার কারণ এই হইতে পারে যে, রস নিষ্কাশনের উদ্দেশ্যে পুষ্পগুলি তাহাদের আবশ্যক হইত না।

Roth সাহেবের প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য। Prof. Rothএর প্রবন্ধের যুক্তি যে আমি সম্পূর্ণ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি, তাহা আমার বিশ্বাস নহে। কিন্তু যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহা এই যে, যদিও বৈদিক প্রমাণে

সোমকে লতা বলা যায় না, কিন্তু সোম নিষ্পত্র, সক্ষীর, সুস্বাদু, সুগন্ধময় পুষ্পযুক্ত ; ও ইহার শাখা বা অন্য কোনও অংশ বেলনাকার ; এবং এই সকল গুণযুক্ত আর্য্য-নিবাসের সমীপে সুপ্রাপ্য কোনও উদ্ভিদই প্রকৃত সোম বটে। আর্য্যনিবাস ছিল চক্ষু ও সিন্ধুনদের নিকটে, এবং এই প্রদেশে উপরিউক্ত গুণযুক্ত একজাতীয় তরু বা লতা পাওয়া যায়। সেটীর নাম Sarcostemma। এই জাতীয় তরুর অনেক বিভাগ আছে। যথা, Sarcostemma brevistigma, sarcostemma viminale, sarcostemma acidum, sarcostemma intermedium, sarcostemma brunonianum। এতন্মধ্যে sarcostemma acidum সরস হওয়ায়, ইহার দাবী গ্রাহ্য। Sarcostemma acidum এর আধুনিক সংস্কৃত ভাষার নাম সোম শব্দ-যুক্ত ; সুতরাং sarcostemma acidum ও সোমের ঐক্য প্রমাণিত হয়। উক্ত প্রদেশে প্রাপ্ত উদ্ভিদের মধ্যে মাত্র sarcostemma হইতেই রস পাওয়া যায় এবং ইহাতেই অংশু আছে। অংশু শব্দে বস্ত্রান্তে যে বেলনাকার দোদুল্যমান খণ্ডগুলি থাকে, তাহাকেই বুঝা যায়। এই অর্থের সাপক্ষে আমরা দেখি কদলীবৃক্ষকে অংশুমৎফলা বলা হয়। উক্তরূপ বস্ত্রাঞ্চলের ন্যায় কদলী ফলগুলি দোদুল্যমান ও বেলনাকার থাকায় কদলীবৃক্ষের ঐ নাম হইয়াছে।

আর্য্য (ঐল) গণের নিবাসস্থান সম্বন্ধে Roth যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা Pargiter তাঁহার Ancient Indian Historical Tradition নামক গ্রন্থে বহু যুক্তি ও তর্কের দ্বারা অস্বীকার করিয়াছেন ; এবং তিনি দেখাইয়াছেন যে Roth ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ আর্য্য-নিবাস সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা ভ্রমপূর্ণ। Pargiter সাহেব যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মত স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য। সুতরাং Roth-নির্দ্দিষ্ট প্রদেশে সোমের অনুসন্ধান অনর্থক মাত্র।

Pargitar সোমের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, সোম নিষ্পত্র, সক্ষীর, সুগন্ধি পুষ্পযুক্ত, ও সুস্বাদু। এই সকল গুণের অস্তিত্ব যে সকল মন্ত্র হইতে পাওয়া যায়, সেগুলি উদ্ধার করিয়া ব্যাখ্যা করা উচিত ছিল। সোম নিষ্পত্র নহে ও তৎসম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি। সক্ষীর অর্থে দুগ্ধবর্ণ রস বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বৈদিকমন্ত্রে ক্ষীর শব্দে জল বুঝা যায় (নিঘণ্টু ১।১২)। যাহা হইতে রস নির্গত হয়, তাহাকেই সক্ষীর বলা যায়। সোম পুষ্পের গন্ধ সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সোমকে প্রায়ই মধু বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু বোধ হয় তাহা সোমরস পানে উন্মত্ত ব্যক্তির প্রশংসা-বাক্য মাত্র। সোমশব্দ যুক্ত কতকগুলি নাম পাওয়া যায়—যথা সোমলতা, সোমবল্লী ইত্যাদি। Rosbargh সোমলতা শব্দে asclipias acida (=sarcostemma brevistigma) (x, 32) এবং Rate graurolens (x, 374) উভয়ই ধরিয়াছেন। এ দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় এবং সামান্য ভাবে দেখিলেই ইহাদের প্রভেদ বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং sarcostemma ও Ruta উভয়ই সোমাখ্যা প্রাপ্ত হইতে পারে না। এতৎসম্বন্ধে Wight কৃত Medicinal Plants নামক গ্রন্থের ৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই দুইটীর মধ্যে কোন্‌টীকে সোমাখ্যা দেওয়া যাইবে? সোমকে যদি নিষ্পত্র বলিয়া অনুমান করা হয়, তাহা হইলে sarcostemma brevistigma স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু বেদে সোম নিষ্পত্র নহে, সুতরাং sercostemma brevistigma ত্যাজ্য। Roth সোমকে সপত্র বলিয়া স্বীকার করেন না ; সুতরাং Rutaকে সোম বলিতে পারেন না। সোমের বৈদিক পরিচয় যাহা কিছু আমরা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার সহিত Rutar মিলন হয় না, এবং Rutar নিবাস মধ্য-হিমালয়ে নহে। Prof Roth বলিয়াছেন যে সোম নামে একটী উদ্ভিদের বিষয় বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যায় এবং তাঁহার লিখনভঙ্গী হইতে বুঝা যায় যে, সোম Ruta gramolens সোমলতা = vernonia authelmatica এবং সোমবল্লী = Tinospora cordifolia. সোমও Ruta graveslens একই উদ্ভিদের নামান্তর কি না, সে বিষয় বিচারের অধিকার আমার নাই ; কিন্তু একটী কথা বলা আবশ্যক। সোম শব্দে যে কোন উদ্ভিদকে বুঝায় তাহা ডল্লন জানিতেন না। তিনি কেবলমাত্র বলিলেন সোমঃ সোম এব। সোমবল্কল ইত্যাদৌ। এই ব্যাখ্যাটী খুব সরল ও প্রাঞ্জল বটে, কিন্তু আমার কিছু উপকার হইল না ; কারণ সোমের ন্যায় সোমবল্কলও অনবগত। ডল্লনমতে অমৃতা = গুড়ূচী। পুনশ্চ সোমরাজী = গুড়ূচী বটে, কিন্তু অমৃতা ও সোম-

রাজী সুশ্রুত মতে বিভিন্ন পদার্থ। Roxborgh এর মতে সোম=সোমলতা=asclepias acida (II, 30) সোমরাজ=vernonie authelmiutica (III, 406) গুলঞ্চ—(?)=menispermum cordifolium (III,-811)=Tinospora cordifolia (Bentley & Trimeb 1, 12) সোমরাজী=Paederia foetida (1. 683) সোমী=adenanthera aculeata (II 371)। এই-গুলির মধ্যে জাতিগত ভেদ যথেষ্ট রহিয়াছে এবং রূপে ও গুণে ইহাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। সুতরাং ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সোম শব্দাক্ত উদ্ভিদের নাম হইতে যে বৈদিক সোমের পরিচয় পাওয়া যাইবে, ইহা নিতান্ত ভ্রান্ত বিশ্বাস। Prof Roth যে কয়টী সোমের উল্লেখ করিয়াছেন তদ্ব্যতীত বহুতর সোমের নাম সুশ্রুতগ্রন্থে পাওয়া যায়। যথা:—"এক এব খলু ভগবান সোমঃ স্থান নামাকৃতিবীর্য্য বিশেষৈশ্চতুর্ব্বিংশতিধা ভিদ্যতে।

অংশুমান মুঞ্জুমাংশ্চৈব চন্দ্রমা রজতপ্রভঃ।
দূর্ব্বা সোমঃ কনীয়াংশ্চ শ্বেতাক্ষঃ কনকপ্রভঃ।
প্রতান বাংস্তালবৃন্তঃ করবীরোংশবানপি।
স্বয়ং প্রভো মহাসোমো যশ্চাপি গরুড়াহৃতঃ।
গায়ত্র্যৈষ্টুভঃ পাংক্তো জাগতঃ শাংকরস্তথা।
অগ্নিষ্টোমো রৈবতশ্চ যথোক্ত ইতি সংজ্ঞিতঃ।
গায়ত্র্যা ত্রিপদা যুক্তো যশ্চোড়ুপতিরুচ্যতে।
এতে সোমাঃ সমাখ্যাতো বেদোক্তৈর্ণামভিঃ শুভৈঃ।

এই অধ্যায়েই গ্রন্থকার পুনরায় বলিয়াছেন:—

সর্ব্বেষামেব সোমানাং পত্রানি দশপঞ্চ চ।
তা'ন শুক্লে চ কৃষ্ণে চ জায়ন্তে নিপতন্তি চ॥

* * *

সর্ব্ব এব তু বিজ্ঞেয়াঃ সোমাঃ পঞ্চ দশচ্ছদাঃ।
ক্ষীর কন্দল তাবন্তঃ পত্রৈর্ণানা বিধৈ স্মৃতাঃ॥

* *

ন তান পশ্যন্ত্যধর্ম্মিষ্ঠাং কৃতঘ্নাশ্চাপি মানবাঃ
ভেষজ দ্বেষণশ্চাপ ব্রাহ্মণে দ্বেষণ স্তথা।

(সুশ্রুত চিকিৎসিত ২৯ অ)

সুশ্রুত গ্রন্থ হইতে আমরা এই পর্যন্ত পাই যে, সোম ২৪ প্রকার আছে। বেদোক্ত নামের দ্বারা উহাদের আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের সাধারণ লক্ষণ এই যে, তাহাদের ১৫টী পত্র, শুক্লপক্ষে প্রতিদিন একটী করিয়া পত্র জন্মায় এবং কৃষ্ণপক্ষে ঝরিয়া যায়। সেগুলি সক্ষরী কন্দবান্ ও লতাবান্ (?)। বর্ণনাটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, কিন্তু কাল্পনিক; এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্যান্য অধ্যায় যে সোমযুক্ত নাম সেগুলি বাস্তব বটে, কিন্তু কোনটী হইতেই বৈদিক সোমের পরিচয় পাওয়া নিতান্ত অসম্ভব।

অংশু শব্দের অর্থ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে কিছু লিখিয়াছি। Prof Roth উ-শব্দের অর্থ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এক্ষণে তাহাই বিচার্য্য। অংশু শব্দ জড়িত কতকগুলি শব্দ আছে, সেগুলির অর্থ বিচার করা আবশ্যক। অংশুক—বস্ত্র বিশেষতঃ উত্তরীয় বস্ত্র (উড়ানী ইতি ভাষা) এবং উ-শব্দে তেজপাতাও বুঝায়। তেজপত্র cinnamnmum cassia, Wight, Icones ১২৩; Bentley Trimen ২২৩) বাউতরুর কোন অংশই বেলনাকার নহে, পরন্তু পত্রগুলিতে যথেষ্ট সূক্ষ্ম সূত্র আছে। অংশুমৎফলা—অংশুমৎ ফলং যস্যাঃ স অর্থাৎ অংশুমৎ ফল যাহার (musa saprientum)—কদলী ফল। সুতরাং কদলী ফলকে অংশুমৎ বলা হইয়াছে, অংশু নহে। Prof Roth যে অর্থ করিয়াছেন তাহা কি ব্যাকরণ শুদ্ধ? কদলী ফলে সূক্ষ্ম সূত্র আছে, সে কারণেও এই নাম উপযুক্ত হয়। অংশুমতী—শালপর্ণী (Hedysarum Gangeticum) (Wight, Icones ২৭১) ইহার ছোট শুঁটীগুলি ঠিক বেলনাকার না হইলেও, প্রায় তদ্রূপ বটে, কিন্তু সেগুলি এমন ভাবের নহে যে তাহা হইতে উ-তরুর নামকরণ হইতে পারে। পরন্তু ইহা সূক্ষ্ম সূত্র ও রেখাবিশিষ্ট। অংশুপট্ট শব্দের অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ হওয়া উচিত নহে। অংশু অর্থাৎ সূক্ষ্ম সূত্রের দ্বারা প্রস্তুত পট্টবস্ত্রকে অংশুপট্ট বলা যায়। আমাদের দেশীয় প্রাচীন উত্তরীয় বা দশা-পবিত্র যাহা একালেও যজ্ঞাদিতে ব্যবহৃত হয়, তাহাতে দেখা যায় যে, তাহার প্রান্তে সূক্ষ্ম সূত্র দোদুল্যমান থাকে। অংশুমান্ শব্দের মূল অর্থ হইতে কোমল, কৃশ, (ইংরেজী slender) ভাব পাওয়া যায়। অংশু শব্দ সম্বন্ধে Prof Roth যাহা বলিয়াছেন, তাহা যে ঠিক হইতে পারে না, তৎসম্বন্ধে আর দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। অথর্ব্ব বেদে (৮।৭।৪) একটী মন্ত্রে অংশুমতী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সেটী এই:—

পস্তুবতী শুম্বিনীরেক শুঙ্গাঃ প্রতন্বতী রোষধীরা বদামি।
অংশুমতীঃ কাণ্ডীনর্য্যা বিশাখা হ্বয়ামি তে বীরুধো
বৈশ্বদেবী রুগ্রাঃ পুরুষ-জীবুনীঃ॥

এই মন্ত্রটী রোগাপনোদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার দুইটী পদ আপাততঃ আলোচ্য। অংশুমতীঃ ও কাণ্ডিনীঃ। এই পদদ্বয় যে সমানার্থক পরন্তু ভিন্নার্থক, কাণ্ড শব্দের দুইটী অর্থ আছে যথা দণ্ড ও সন্ধিবিচ্ছিন্ন অংশ এই দুইটী অর্থ সামঞ্জস্য করিলে, ইহার মধ্যে মৌলিক অর্থ পাওয়া যায়; পর্ব্বযুক্ত যথা ইক্ষু, Whitray ও অনুবাদ করিয়াছেন jointed। সুতরাং অংশুমতী শব্দে নিশ্চয়ই কাণ্ডযুক্ত (Joiuted) অর্থ করা যায় না। উপরে যে প্রবন্ধটী সমালোচিত হইল, সেটী হং ১৮৮১ সালে প্রকাশিত হয়। তৎপরে ১৮৮৪ সালে আর একটী প্রবন্ধ লেখেন এবং তাহাতে বলেন যে বেদে সোম সম্বন্ধে যাহা কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় তৎসমস্তই তিনি প্রথম প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন। এ কথাটির মূল্য কি, তাহা পাঠক স্বয়ং বিচার করিবেন। Roth যে দুই একটী কথা বলিয়াছেন, তাহাতে বৈদিক পরিচয় কোথায়? যতটুকু পরিচয় তিনি দিয়াছিলেন, তাহা হইতে Dr. Regel বলিয়াছেন, যে তাহার মধ্যে কোন কোন অংশের সহিত নিম্নলিখিত উদ্ভিদের সহিত মিল হয় যথা—Euphorbia জাতি। Ferulaceae জাতি, Cannabise জাতি, Compositoe জাতি। Regel দেখিলেন Roth যে অসম্পূর্ণ পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে কোন একটীর প্রকৃত মিলন হয় না, তবে Fritillasia জাতীয় একটী গাছ আছে সেটী উল্লেখযোগ্য বটে। শুনিতে পাওয়া যায় যে Fritillasiaর (Xogle, Illustration of the Botany of Himalayan mountains ৯২) কন্দ কতকটা সোমের ন্যায় ব্যবহৃত হইত। Regel আরও বলিয়াছেন যে Herr Wilkins এর মতে Peganum Harmala নামক উদ্ভিদটী সোম বটে। পাঠক দেখিবেন যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কারণ Regel দেন নাই। Pegamum Harmala ও Ruta জাতীয়। Ruta সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। Regel বলিয়াছেন Fraxirus জাতীয় একটী তরুতে কোন কোন অংশ সোমের সাদৃশ্য আছে। সেই তরুর ত্বকের ভিতরের অংশ একদিন ভিজাইয়া রাখিলে হরিদ্বর্ণ রস পাওয়া যায় এবং সেই রস দেশবাসীগণ দুগ্ধমিশ্রিত করিয়া পান করিয়া থাকে। পাঠক দেখিবেন যে Fraxinus (Brandis, Iudiau Trees ৪৪৩) এবং Roth বর্ণিত সোম এ দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু; এবং আমরা সোমের যে সকল লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি, তাহা হইতেও বিভিন্ন। এই তরুটীর সম্বন্ধে আরও কিছু জানা আবশ্যক। Braudis বলেন যে Fraxinus Floribundaর দেশীয় নাম সুম। Fraxinus জাতীয় আর একটী তরু আছে, তাহার নাম Fraxinus Ornus; এই তরুর সম্বন্ধে Bentley ও Friman তাঁহাদের রচিত Medicinal Plants নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে ইহার গাত্রচ্ছেদ করিলে চিনি সদৃশ একপ্রকার রস নির্গত হয়, তাহাকেই manna (মান্না) বলা হইয়া থাকে। মান্না বহু প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বস্তু এবং ইহার সহিত সোমের সাদৃশ্য আছে বলিয়া ভ্রম হইবারও সম্ভাবনা। কিন্তু এ বিষয়ে প্রধান বিচার্য্য এই যে, Fraxinus Orrusকে সুম বলে না এবং সোমে মাদকতা শক্তি আছে, কিন্তু মান্নাতে তাহা নাই।

Roth প্রথম প্রবন্ধে সোমের আবাস স্থান নির্ণয় করিয়া দিয়া বলিলেন যে অমুক স্থানে অমুক লক্ষণে লক্ষিত যে তরু, তাহাই সোম। তৎপরবর্ত্তী প্রবন্ধে কিন্তু প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন, সোম কোথায় জন্মায়?

Rothএর প্রবন্ধ সম্বন্ধে Sir George Watt এর অভিমত। Sir George Watt বলিয়াছেন যে তিনি সোম সম্বন্ধে গ্রন্থ ও সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছেন বটে, কিন্তু Roth যে যুক্তি ও সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তিনি অনুসরণ করিতে সক্ষম নহেন। Roth যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে সোমকে sarcostomma জাতীয় বলিয়া স্থির করা যায় না। Rothএর এই মত লইয়া বিশেষভাবে আলোচনা করায় সোম আবিষ্কার পক্ষে বৈজ্ঞানিকদিগের বাধা হইতে পারে। Roth স্বকীয় মত সমর্থন ও বিপক্ষ মত ধ্বংস করিবার চেষ্টা না করিয়া, যদি সোম সম্বন্ধীয় মন্ত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করিতেন, তাহা হইলে বরং ভাল হইত। Watt বলিয়াছেন যে সোম যে সক্ষীর (ক্ষীর অর্থে দুগ্ধবান্) তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। এবং ইহাও সম্ভবপর হইতে পারে যে, বৈদিক সোমে ক্ষীরের সম্পূর্ণ অভাব ছিল। সোম যে গাঁজলা উঠাইয়া পান করা হইত, তাহারও কোনও

প্রমাণ নাই। এমন হইতে পারে যে সোম কেবল থেঁতো করিয়া বা জলে সিদ্ধ করিয়া পান করা হইত। Roth সাহেব বলিয়াছেন যে সোমগুলি বাছিয়া লইয়া, কোন অনির্দ্দিষ্ট উপায়ে তাহা হইতে রস নির্গত করা হইত। সোম দেবতাদিগের প্রীতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হইত। যে বস্তু দেবতাদিগের প্রীতির উদ্দেশে দেওয়া যাইত, সে বস্তু নিশ্চয়ই উপাসকের আনন্দজনক ছিল। Asclipias জাতীয় উদ্ভিদের রস কিন্তু আনন্দজনক নহে। আকন্দ বা মান্দার ;—ইহারা asclipias জাতীয়, এবং ইহাদের রস অতি বিস্বাদ। এই প্রকার বিস্বাদ পানীয় যে ঋষিগণ দেবতাদিগের প্রীতির জন্য উৎসর্গ করিতেন বা নিজেরা পান করিতেন, ইহা অভাবনীয়।

বেদ ও বিজ্ঞান

অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

বিজ্ঞানের দৃষ্টি লইয়া বেদ ব্যাখ্যান করিতে যাইয়া যে প্রণালীতে আমাদের চলিতে হইবে, তাহা আমরা দু একটা নমুনা লইয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। অদিতি, ইন্দ্র, অগ্নি, সোম—এ সকল সম্বন্ধে বেদে যে সমস্ত ঋক্ আছে, সে সমস্ত ঋকের সোজাসুজি মানে সব যায়গায় করা যায় না, এবং বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে সে সকলের মধ্যে কোন কোনটায় এমন সব কথা স্পষ্টভাবে বা প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়, যে সব কথার উপর টীকা ঠিক কাশীধামে বসিয়া আজকাল আর তেমন করিয়া লেখা চলিবে না, যেমন করিয়া লেখা পশ্চিমের ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরিতে বসিয়া চলিবে। কথাটা আপনারা সতর্ক হইয়া লইবেন। আমি ম্যাক্সমুলার, রোথ, বেবার প্রভৃতি পশ্চিমদেশের গবেষণাপন্থী পণ্ডিতদের দিয়া বেদের টীকা লিখাইবার ফরমাইস দিতেছি না; সে জাতীয় টীকা গাড়ি গাড়ি লিখা হইয়াছে; আমি তাহার যে সামান্য একটু আধটু পড়িয়াছি, তাহাতে সে জাতীয় টীকার প্রতি আমার শ্রদ্ধাধিগম্য হয় নাই। আমি নব্য বিজ্ঞানের নূতন পরীক্ষা ও চিন্তার ধারায় একটীবার অবগাহন করিয়া লইয়া বেদের অংশ-বিশেষের টীকা লিখিবার কথা আপনাদিগকে বলিতেছি। পশ্চিমদেশের জ্ঞান-ধারায় অবগাহন করিলেই এখন আর খৃষ্টান হইয়া যাইবার আশঙ্কা বড় একটা করি না। ফলতঃ, আমার বক্তব্য এই যে, নব্য-বিজ্ঞানের হাল খাতাখানা একবার পড়িয়া না লইলে, অনেক বৈদিক রহস্য আমাদের কাছে হেঁয়ালির মত রহিয়া যাইবে, অথবা অসম্বদ্ধ প্রলাপ বলিয়া উপেক্ষিত হইবে, নয় ত, "সরল" ব্যাখ্যার মুষ্টিযোগে ভয়াবহ হইয়া উঠিবে। অনেক ঋকে এমন দুটো-একটা কথা দেওয়া আছে, অথবা কথাগুলিকে এমন ভঙ্গীতে বলা হইয়াছে যে, সে কথাগুলির তাৎপর্য্য এবং সে ভঙ্গীর সার্থকতা বুঝিতে যাইলে, নব্য-বিজ্ঞানের গির্জ্জাগুলিতে আমাদের এক আধবার ঢুকিতেই হয়। বলা বাহুল্য, ইহাতে আস্তিক্যের পাতিত্য ঘটিবে না। গেল দুইবারের বক্তৃতায় বেদের নানা স্থল হইতে মন্ত্র উদ্ধার করিয়া এবং বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে তাহাদের মর্ম্মাবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়া, ভরসা করি, আমরা বেদ ও বিজ্ঞানের মামলায় বাজে গোল অনেকটা থামাইয়া দিতে পারিয়াছিলাম। এ কথাও আমি আপনাদের বারবার শুনাইয়া রাখিয়াছি যে, শুধু পদার্থবিদ্যা (Physical Science) দিক্ হইতেই যে বেদ বুঝিতে হইবে এমন নহে; বেদ বোঝার নানান্ স্তর আছে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবু বলিয়াছিলেন—গানে যেমন সপ্তস্বর তিন গ্রাম আছে, বেদার্থ উপলব্ধিরও তেমনি নানা থাক্ আছে। পদার্থ-বিজ্ঞানের দিক্ হইতে যে ব্যাখ্যা তাহা আধি-ভৌতিক ব্যাখ্যা; এ ব্যাখ্যা বাদ দিলে কোন মতেই চলিবে না—বিশেষ এই যুগে, যখন বিজ্ঞান আমাদের বিশ্বাসকে এতখানি দখল করিয়া বসিয়াছে। তবে এ ব্যাখ্যা ছাড়া অন্যস্তরের ব্যাখ্যাও আছে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটিও আপনারা ভুলিবেন না যে, আমি যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

আপনাদের পাতে পরিবেশন করিতেছি, তাহা সাক্ষাৎ অমৃত নহে, সুতারং চক্ষু বুজিয়া গলাধঃকরণ করিয়া যাইবার জিনিষ ইহা নহে। আমি ব্যাখ্যার একটা মোটামুটি প্রাথমিক নক্সাটা আপনাদের সাম্‌নে উপনীত করিতেছি. আপনারা দেখিয়া-শুনিয়া, সংশোধন, পূরণ, এমন কি পরিবর্জ্জন করিয়া লইবেন। এই একটা নূতন দিকে আপনাদিগের চিন্তা যাইলে ভাল হয়; শুধু এইটুকুই আপনাদের কাছে আমার আব্‌দার। বেদ আলোচনা করিতেছি বলিয়া আমার বাক্য বেদবাক্য নহে। আমি বৈজ্ঞানিক নহি, তবে বিজ্ঞানের দু-চারিটা কথা শুনিতে পাই, শুনিয়া আমার মনে হইয়াছে—'এই কথাগুলি দ্বারা আমাদের বেদের কোন কোন অস্পষ্ট অংশ পরিষ্কার হইতেছে, অনেক বাঁকা কথা সত্য সত্যই সরল হইতেছে নয় কি? ভাবিয়া দেখা যাক্। প্রয়োজন হইলে পরীক্ষাতেও নামিতে হইবে। বিজ্ঞানাগারে না কুলায়, সিদ্ধাশ্রমেও যাত্রা করিতে হইবে।' আমি আপনাদিগকেও সঙ্গে লইতে চাই এই বিংশ শতাব্দীর এরোপ্লেনের ভৈরব গর্জ্জনের নিম্নে বসিয়া আবার সেই পুরাণো মন্ত্রের অনুধ্যান ও উদ্‌যাপন করিতে যাওয়াটাকে যাঁহারা বাঙ্গালা মস্তিষ্কের অপব্যবহার মনে করিতেছেন, আমার সেই হিতৈষী বন্ধু-বর্গ কবিরাজ মহাশয়ের কাছে আমার জন্য কিঞ্চিৎ মধ্যম নারায়ণ তৈল তৈয়ারি করিবার বায়না দিয়া রাখিবেন। যাহা হউক, আপাততঃ আমাদের আলোচনা চলিতে থাকুক। আজিকার পালায় আখড়াই এই পর্য্যন্ত।

অদিতি দেবমাতা। তাঁহাকে লইয়া আরম্ভ করিয়াছিলাম। এই অদিতির মূর্ত্তি এমন একটা কোয়াসায় ঘেরা যে সে কোয়াসা আমাদের বুদ্ধি বিবেচনা, এমন কি কল্পনাও ভেদ করিতে পারে না। তিনি সৃষ্টির গোড়ার অখণ্ড, অপরিচ্ছিন্ন বস্তুটি, "অব্যক্তাদীনিভূতানি" বলিয়া যে জিনিষটাকে ভগবান্ অর্জ্জুনের কাছে আভাসে জানাইয়াছিলেন, অদিতি সেই বস্তু। বিজ্ঞানের ঈথার সেই অব্যক্ত, অখণ্ড, বিভু পদার্থটির মোটামুটি রকমের প্রতিনিধি অথবা প্রতীকমাত্র, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি সেই অব্যক্ত পদার্থ, যিনি এই তেত্রিশকোটি দেবতাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন এবং এখনও কোলে ধরিয়া আছেন, তাঁহার কথা বলিতে গিয়া বেদও হেঁয়ালির ভাষায় কথা কহিয়াছেন। এ রকম ছাড়া স্পষ্ট কোনই বিবৃতি দেওয়ার উপায় নাই। ১০।৭২।৪ বলিতেছেন—"অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন, দক্ষ হইতে আবার অদিতি জন্মিলেন।" মজার কথা দেখুন—অদিতি মা হইয়াও আবার মেয়ে। ৫ ঋক্ বলিতেছেন—"হে দক্ষ! অদিতি যে জন্মিলেন, তিনি তোমার কন্যা।" এ রহস্য ভাঙ্গিবে কে? শুধু এখানে নয় অনেক স্থলেই শ্রুতি হেঁয়ালির ভাষায় কথা কহিয়াছেন। ১০।৫৪।৩ বলিতেছেন—হে ইন্দ্র! আমাদের আগেকার কোন্ ঋষিই বা তোমার অখিল মহিমার অন্ত পাইয়াছিল? তুমি আপন দেহ হইতে তোমার পিতা-মাতাকে এক সঙ্গে উৎপাদন করিয়াছিলে। পিতামাতা হইলেন—দ্যাবা পৃথিবী। এমন সব মজার কথা আরও বিস্তর আছে। সে সিরিজের কথা আমরা আগে বারবার বলিয়াছি. সেই কথা মনে না রাখিলে এ সব হেঁয়ালির কূল কিনারা কিছুই পাইব না। যে অদিতি মা, তিনি অবশ্য চরমা অদিতি বা পরমা অদিতি—the continuum in the limit—সেই নিরতিশয়রূপে অখণ্ড ও বিভু পদার্থ যাহা নিখিল দ্রব্যের ও ক্রিয়ার আশ্রয়। সে পদার্থটী কি? চিৎ বা চৈতন্য। একটা চৈতন্যের মধ্যেই জগৎটা চলিতেছে। চৈতন্য আলাদা, দেশ (Space) আলাদা, কাল (Time) আলাদা, ক্ষিতি, অপ্ ইত্যাদি ভূতগুলা আলাদা, এ রকম ভেদ ব্যবহারিক, অর্থাৎ কাজ চালাইবার ভেদ। স্বরূপতঃ, চৈতন্যের বাহিরে কোন কিছুরই থাকার প্রমাণ নাই। চৈতন্যই আকাশ-রূপে জড়জগতের ঠাঁই করিয়া দিয়াছে, চৈতন্যই আবার কালরূপে জগৎটাকে প্রবাহরূপে বহাইতেছে। না জানিলে এ সব কিছুই নহে। এই চৈতন্যকে একটা পরিচ্ছিন্ন চৌদ্দপোয়া দেহের মাপে কাটিয়া লইয়া ভাবি যে তাহার এলেকার বাহিরে একটা প্রকাণ্ড অনাত্মীয় জগৎ পড়িয়া রহিয়াছে। এই প্রকারে আপনারা পাঁচজনে আমার বাহিরে;—মাটি, জল, বাতাস, আকাশ আমার বাহিরে। কিন্তু সত্য সত্যই যে বাহিরে তাহা কে বলিল? কেন যে এই রকম বাহিরে ভাবিতেছি, তাহার কৈফিয়ৎ দিবার সাধ্য আমার নাই। তবে এই রকম না ভাবিলে ব্যবহার চলে না, সংসারটা থামিয়া যায়। কিন্তু ব্যবহারে যাহাই হউক, আসলে চৈতন্যের মধ্যেই সব। এ কথাটার বিস্তার আর

এখানে করিব না, তবে এই চৈতন্যকেই শ্রুতি বলিয়াছে ব্রহ্ম, আত্মা, চিদাকাশ। সেদিন ছান্দোগ্য হইতে যে জ্যায়ান্ ও পরা প আকাশের কথা শুনাইয়াছিলাম, তাহা এই চিদ্রূপ আকাশ। আমরা যেটাকে আকাশ ভাবি, অথবা বিজ্ঞান যেটাকে ঈথার ভাবেন, সে আকাশ এ ং সে ঈথার চিদাকাশেরই মূর্ত্তি বিশেষ। সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস ভাবিবেন না। শ্রুতি সেরূপ দ্বৈতবাদের বিরোধিনী। ব্যবহারের কথা ছাড়িয়া দিলে, আমাদের অনুভবেও, আলাদা আলাদা ভাবিবার কোনই ভিত্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। চরম আধার ভাবে দেখিলে যাহা চৈতন্য তাহাই অপেক্ষাকৃত খাটো করিয়া দেখিলে আকাশ, কাল এবং ঈথার যে সিঁড়ির লিমিট বা সর্ব্বোচ্চ স্তর চিদাকাশ, তাহারই নীচের থাক্ আকাশ ও ঈথার। যদি আধার বস্তুটিকে চরম ভাবেন তবে তিনি হইলেন অদিতি—বেদ যাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতেছেন। ইনি সাক্ষাৎ চিন্ময়ী বা চৈতন্যরূপিনী। বিজ্ঞান এখনও 'স্পেস্' ও 'ঈথার' লইয়া পড়িয়া আছে, কিন্তু আকাশ ও ঈথারকে ক্রোড়ে করিয়া রাখিয়াছেন যে চিন্ময়ী অদিতি, তাঁহার সন্ধান এখন পর্য্যন্ত বিজ্ঞান পায় নাই। আকাশ সোজা কি বাঁকা, ঈথার আছে কি নাই—এ সব কথা লইয়া বিজ্ঞানের চোখে ঘুমটি নাই; কিন্তু যে অদিতির মুখটি পানে চাহিলে সকল সংশয় ছিন্ন, সকল গ্রন্থি ভিন্ন, এবং সকল অধ্রুব ধ্রুব হইয়া যায়, সেই অদিতির সম্বন্ধে বিজ্ঞানের চোখে এখনও মহাঘুম জমাট বাঁধিয়া আছে। আকাশ ও ঈথার শেষ পর্য্যন্ত চেহারা বদ্‌লাইয়া কিরূপ দাঁড়ায়, তাহা এখনও কেহ বলিতে পারিতেছে না; কিন্তু জানার মধ্যে, চৈতন্যের মধ্যেই যে সব রহিয়াছে, এ কথায় তর্ক আছে কি, সন্দেহ আছে কি? তোমার তর্ক ও সন্দেহও যে জানার ভিতরে। একটা রেখা টানিয়া বলিয়া দাও ত—এই পর্য্যন্তই জানার এলেকা, তার বাহিরে যেটা রহিয়াছে সেটা অজানা। নিজের ছায়া নিজে লাফাইবার প্রয়াসের মত চৈতন্যের বাহিরে কোন একটা কিছু ফেলিয়া রাখিবার প্রয়াস একান্তই ব্যর্থ হইবে। বিচার করিয়া কথাটা বুঝাইবার নহে, আপনারা নিজের নিজের অনুভবের সঙ্গে কথাটা মিলাইয়া লইবেন।

এই যে ছেদহীন চৈতন্যাকাশ তাহাই পরমা অদিতি, এবং ইহাই বিশ্বভুবনটার আশ্রয় ও গতি। 'দিত্' ধাতু ছেদনে ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ব্যবহারের খাতিরে এই ছেদহীন চৈতন্য বা আত্মাকে যেন কাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া লইয়াছি। এই টুক্‌রাগুলির পরস্পরের এলেকা স্বতন্ত্র। আমার বাহিরে তুমি, তোমার বাহিরে সে এইরূপ। এইরূপ না' হইলে পরস্পরের কারবার চলে না। কারবার আদৌ চলিল কিরূপে, এবং এবংবিধ কারবার চলিবার প্রয়োজনটা যে কি, তাহা আমি বলিতে পারিব না; ইহা অনির্ব্বচনীয়। কার্য্যতঃ কারবার চলিতেছে—নানা শকাতে নানা জীবে মেশামিশি ও ছাড়াছড়ি করিতেছে; এরূপ হইতে গেলে অবশ্য এ জিনিস হইতে ও জিনিসটা কোন রকমে আলাদা হওয়া চাই। মূলাধার বস্তুটি, অর্থাৎ চেতনা, ছেদহীন হইলেই অদিতি, আর তাহার মধ্যে বিভিন্ন গণ্ডী বা এলাকা আসিয়া পড়িলেই, তাহা হইল দিতি। ১০।৫৫।১ বলিতেছেন—তোমার সেই শরীর দূরে আছে, মনুষ্যগণ পরাঙ্মুখ হইয়া তাহা গোপন করে।" কঠশ্রুতি বলিতেছেন—"পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ"। ব্যবহার বা কারবার চালাইবার জন্য আমাদের দৃষ্টি আত্মার স্বরূপে স্থির না হইয়া বাহিরে ছুটিয়া যাইতেছে এবং ভিতরের ও বাহিরের মধ্যে একটা গণ্ডী টানিয়া লইতেছে; বাহিরটাকেও নানা টুক্‌রায় কাটিয়া বাঁটিয়া লইতেছে। ইহার ফলে অদিতির বিপুল কায়া আমাদের দৃষ্টিতে যেন গোপন হইয়া যাইতেছে। বিপুলকে বিপুল বলিয়া আমরা দেখিতেছি না, চিনিতেছি না। সে কায়া যে কেমন ধারা বিপুল তাহার বৈদিক বিবরণ শুনুন:—"তোমার সেই গোপনীয় শরীর, যাহা বিস্তর স্থান ব্যাপ্ত করিয়া আছে, তাহা অতি বিপুল। তাহা দ্বারা তুমি ভূত ভবিষ্যৎ সৃষ্টি কর। যে যে জ্যোতির্ম্ময় বস্তু উৎপাদন করিতে ইচ্ছা হইল, সেই সমস্ত প্রাচীন বস্তু উহা হইতে উৎপন্ন হইল।" ১০।৫৫।২ "ইন্দ্র আপন শরীরে দ্যাবা পৃথিবী ও মধ্যভাগ সমস্ত আকাশ পূর্ণ করিলেন। ১০।৫৫।৩। ১০।১২১।৭ বলিতেছেন—"ভূরি পরিমাণ জল সমস্ত ভূমি আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহারা গর্ভধারণ পূর্ব্বক অগ্নিকে উৎপন্ন করিল, তাহা হইতে, দেবতাদিগের একমাত্র প্রাণস্বরূপ যিনি, তিনি আবির্ভূত হইলেন। কোন্ দেবকে হব্য দ্বারা পূজা করিব?" ৯ ঋক্ বলিতেছেন—"যিনি

পৃথিবীর জন্মদাতা, যাঁহার ধারণ-ক্ষমতা অপ্রতিহত, যিনি আকাশকে জন্ম দিলেন, যিনি আনন্দবর্দ্ধনকারী ভূরি পরিমাণ জল সৃষ্টি করিয়াছেন।" ইত্যাদি। এই সব মন্ত্রে দেবতার যে শরীরের মহিমা আমাদিগকে শুনান হইতেছে, সে শরীর আমাদের কাছে গোপন হইয়া পড়িয়াছে। সে শরীর সাক্ষাৎ স্বপ্রকাশ চৈতন্য হইলে কি হইবে, সে দেহ বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ হইলে কি হয়, সংসার করিতে বসিয়া আমরা তার দিশে হারাইয়া ফেলিয়াছি, তার কথা শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ করি, আত্মার খপর শুনিলে ভাবি এ কি যেন একটা আজগবি খপর শুনিতেছি! আত্মা নিজের চোখে এই ভাবে ঠুলি না বাঁধিলে, বিরাট হইয়া বামন না সাজিলে, যে সংসার-ব্যবহার চলে না, তাহা আর খোলসা করিয়া বলার দরকার আছে কি? আমাদের চলিত ব্যবহার হইতে দুটো একটা দৃষ্টান্ত দিই।

রাত্রিতে নির্ম্মেঘ আকাশের পানে আপনি তাকাইলেন। আমি শুধাইলাম—কি দেখিলেন? আপনি উত্তর করিলেন—ঐ বড় তারাটা। কিন্তু সত্যসত্যই শুধু কি ঐ একটা তারাই আপনি দেখিলেন? আকাশের অনেকখানিই আপনার চোখে পড়িয়াছে; সুতরাং আপনি দেখিয়াছেন বিস্তর তারা; তবে হয় ত একটা তারাই বিশেষভাবে অন্বেষণের বিষয় ছিল এবং সেইটাকেই আপনি বিশেষভাবে দেখিলেন। আর পাঁচটা জিনিস যে সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়াছেন, তাহাতে আপনার তেমন আটা ছিল না বলিয়া তাহা না দেখারই সামিল হইয়া পড়িল। বিশেষভাবে দেখিতে গেলে আমাদের এইরূপ পক্ষপাত করিতেই হয়। যাহা কিছু দেখিতেছি সেই সবটাকেই স্বীকার করিলে কাজ চলে না; তাহার মধ্যে বাছিয়া শুনিয়া লইতে হয়। এইরূপ বাছিয়া লইবার জন্য আমাদের ভিতরে যে ব্যবস্থা রহিয়াছে, সেটার নাম মনঃসংযোগ। পথে-ঘাটে চলিতে ফিরিতে গেলেও বাছিয়া বাছিয়া দেখিতে শুনিতে হয়। অপক্ষপাতে সব দেখিতে শুনিতে গেলে এই কলিকাতার পথে এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই মোটর চাপা পড়িয়া অক্কা পাইতে পাইবে। বাগানে বসিয়া আছি। আমায় যদি শুধান—কি শুনিতেছেন? আমি জবাব করিব—ঐ সহকারে মুকুলমঞ্জরীর মাঝে কালোবরণ ঢাকিয়া নববসন্তের যে কোকিলটা ডাকিতেছে, তারই শব্দ। বিরহী না হইলেও আমার মনটা এখন ঐ ডাকের দিকেই গিয়াছে, এবং ঐ কোকিলের ডাকটাই এখন আমার জ্ঞানের বিশেষ বিষয়। কিন্তু ঐ ডাকে পক্ষপাত হইতেছে বলিয়া, আর পাঁচটা শব্দ যে আদৌ আমার কাণে আসিতেছে না, এমন নহে। ঘুঘুর ডাক, চিলের ডাক, কাকের ডাক, ছেলেপিলেদের খেলার শব্দ, রাস্তায় ফেরি-ওয়ালার ডাক, আরও কত কি জড়াজড়ি করিয়া আমার কর্ণকুহরে আসিতেছে এবং চেতনাকে কতকটা জাগাই-তেছেও, কিন্তু বিশেষভাবে নহে। এগুলি আজি যেন শুনিয়াও শুনিতেছি না। মনে ভাবিতেছি এবং তোমার প্রশ্নের জবাবে বলিতেছি—কোকিলের ডাকটাই শুনিতেছি। গোটা করিয়া দেখিতে গেলে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই আমাদের অনুভব (experience) একটা বিপুল সমুদ্র বিশেষ, কত না জিনিস শুনিতেছি, দেখিতেছি, আঘ্রাণ করিতেছি, স্পর্শে অনুভব করিতেছি, ভিতরে কল্পনা জল্পনা করিতেছি। কিন্তু এই সবটায় আমার ত ঠিক দরকার নাই। তাই এই প্রকাণ্ড দেখা-শুনার ভাবা-চিন্তার মাঝ হইয়া ছোট এক টুকরা কাটিয়া বাছিয়া লইয়া ভাবি, সেই টুকুই আমার আপাতত জানা (experience)। এই ভাবে আমি দাঁড়াইয়া বক্তৃতা পাঠ করিতেছি, আপনারা দশজনে দেখিতেছেন শুনিতেছেন; সত্য সত্যই দেখিতেছেন শুনিতেছেন আরও অনেক জিনিসই। ট্রামের শব্দ, গাড়ীর শব্দ, গোলদীঘির গোল, আরও কত কি আপনাদের কাণে আসিতেছে; তবে বিশেষভাবে শুনিতেছেন আমার কথাগুলি, এবং ভাবিতেছেন যেন শুধু তাহাই শুনিতেছেন। দেখার মামলাও এইরূপ। আমার দিকে তাকাইয়া শুধু আমার হাতে এই অফুরন্ত কাগজের তাড়া দেখিয়াই দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন এমন নহে, টেবিল-গুলা চোখে পড়িতেছে, আলো, ছবি, দেওয়াল, শ্রোতৃবৃন্দ—অনেক জিনিসই চোখে পড়িতেছে, তা হয়ত বিশেষভাবে নহে। আপনাদের দেখার পক্ষপাত রহিয়াছে আপাততঃ এই কাগজগুলার দিকে। এ ক্ষেত্রেও গোটা দেখাটাকে কাটিয়া ছাঁটিয়া টুক্‌রা করিয়া লইতেছেন। এইরূপ না করিলে যে ব্যবহার আদপে চলে না। ট্রামের শব্দ ও আমার শব্দ অপক্ষপাতে শুনিবেন, এ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলে, অথবা ঐ ছবিখানা ও আমাকে অপক্ষপাতে দেখিবেন এমন মানসিক থাকিলে, আমার বকায় কোনই

লাভ হইবে না, আপনাদেরও শোনা না-শোনারই সামিল হইবে। আমাদের জানার মধ্যে তাই পক্ষপাত চাই কারবারের খাতিরে আমাদের অনুভবের সাগর তাই ছোট-খাট খানা-ডোবার মত সাজিয়া আমাদের কাছে হাজির। সেই খানা-ডোবাগুলাকেই আমরা স্বীকার করিয়া নিজ নিজ এলাকাভুক্ত করিয়া লই।

এই জন্য বলিতেছিলাম যে আমাদের অনুভবের চেহারাখানা বিপুল হইলেও আমরা নিজের প্রয়োজন মত তাহাকে বেশ বামন সাজাইয়া লইতে শিখিয়াছি; বসবাসের জন্য দেওয়াল তুলিয়া ছাদ ফেলিয়া অসীম আকাশকে যেমন ধারা পরিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছি, সংসার-ব্যবহার চালাইবার জন্য তেমনিধারা পরদা দিয়া ঘিরিয়া আমাদের সত্যকার বড় বড় অনুভবগুলাকে ছোট করিয়া লইতেছি। সত্য সত্য অনুভব সব সময়ে বড়ই হইতেছে; তবে তার মধ্যে সামান্য এক টুক্‌রাতেই আমার হয়ত দরকার, সুতরাং সেই টুক্‌রাখানিই আমি স্বীকার করিয়া লইতেছি, বাকিটা আমার জ্ঞানের দ্বারে উপস্থিত হইলেও আমি আমোলে আনিতেছি না। কথাটা এতক্ষণে খেয়াল করিলেন কি? এ কথাটা না বুঝিলে আমরা বুঝিব না, অদিতি বা ইন্দ্রের বিপুল শরীর গোপন হয়, এ কথা বেদ কেন বলিতেছেন। বেদ হেতুও দিতেছেন—আমরা পরাঙ্মুখ বলিয়া। পরাঙ্মুখ না হইয়া উপায় কি? নহিলে সংসার চলে না যে। এ কথা কয়টা এ প্রসঙ্গে সংক্ষেপেই সারিলাম, আমার পূর্ব্ব প্রকাশিত Approaches to Truth এবং Patent wonder গ্রন্থে ইহার খুবই ফলাও করিয়া আলোচনা করিয়াছি পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের ১৮২ পৃষ্ঠা হইতে একটুখানি উদ্ধার করিতেছি। "A thought or knowledge may thus properly be regarded as a function of the emotional and conative prepossessions and repressions of the mind. The universe of experience is indeed too large for any of my ordinary interests of life; an infinity of features, emotive, cognitive and conotive, are there in solution, as it were, in this universe. But I care not for all this infinite richness of my intuitive life. At a given moment a particular interest, say the writing of this essay possesses me. This special interest behaves and operates in my actual universe of the moment as if it were a thread of special preferences dipped in the universal solution. All sorts of things are there in this solution, but my thread selects only some and rejects others, and accomplishes by such a selective operation what I look upon as my crystallized fact of the moment. The thread of interest gathers around itself a crystal, a pragmetic fact as I have often called it, and I fancy that this little crystal of my creation is my fact How easily I seem to forget my universe—the general solution! Thus the operation of interest in life is analogous to the process of crystallization; it essentially involves the ignorance of the whole and preference of a part." বাঙ্গালায় যে কথা কয়টা বলিতেছিলাম, উদ্ধৃত অংশে, সূত্রের চারিধারে মিছ্‌রি প্রভৃতির দানা কেমনধারা বাঁধে তাহারই উপমা দিয়া বলিলাম। কথাটা সংক্ষেপে দাঁড়াইল যে, আমরা কাজ চালাইবার খাতিরে আমাদের গোটা গোটা অনুভূতিগুলিকে কাটিয়া ছাঁটিয়া ছোট করিয়া লই। যে পরদা দিয়া ঘিরিয়া বড়কে ছোট করিয়া লই, অখণ্ডকে খণ্ডিত করিয়া লই, সেই পরদার নাম অবিদ্যা—Principle of veiling, ইহাই হইতেছে অদিতি ও দিতের রহস্য। অনন্তভাবে অনুভবকে দেখ, পাইবে অদিতি; তাঁহার ভূলোকে দ্যুলোকে অন্তরীক্ষে আস্তীর্ণ বপু আর তোমার কাছে গোপন থাকিল না। আবার পরদা দিয়া ঘিরিয়া অনুভবকে খণ্ডিত, পরিচ্ছিন্ন করিয়া লও, পাইবে দিতি। পুরাণে শুনিয়াছেন, অদিতি দেবতাগণের এবং দিতি দৈত্যগণের প্রসূতি। কথাটার রহস্য এতক্ষণে পরিষ্কার হইল কি? অভেদ দৃষ্টিতে, সমগ্র দৃষ্টিতে দেবতা, আর ভেদদৃষ্টিতে, খণ্ডিত বুদ্ধিতে দৈত্য। বেদ অনেক দেবতার কথা বলিয়াছেন, এবং আপাততঃ তাঁহাদিগকে আলাদা আলাদা বলিয়া

ঠেকে ; কিন্তু ইন্দ্র, অগ্নি ; অগ্নি, সূর্য্য ;—ইত্যাদি দেবতাদের সকল ভেদ মন্ত্র ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। জোড়া জোড়া দেবতা বা অনেক দেবতা লইয়া বেদ একটা সূক্ত দিতেছেন ; শেষকালে বিশ্বকর্ম্মা, ইন্দ্র, প্রজাপতি বা হিরণ্যগর্ভে গিয়া নিখিলদেবগণকে মিলাইয়া দিতেছেন। অতএব এখানে নানাত্বের পিছনে একত্ববুদ্ধি রহিয়াছে। দেবতারা সত্য সত্যই আলাদা, এ কথা বেদ বলিতে চাহেন না। এ কথার প্রমাণ আমরা ক্রমশঃ দিতে থাকিব। ফল কথা, ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, সোম—সকলেই সর্ব্বব্যাপী অখণ্ড বস্তু, এই কথাই আমরা পুনঃপুনঃ বেদে দেখিতে পাই। কাজেই দেবগণ অদিতির সন্তান। দেবতা ভাবিতে গিয়া আমাদের বিশেষ কোনও পর্দ্দা ফেলিয়া অনুভবকে খণ্ডিত বা সঙ্কুচিত করিয়া লইতে হয় না। ইন্দ্রের স্তুতি করিতেছি, কিন্তু গণ্ডী টানিয়া সত্যসত্যই ইন্দ্রের এলেকা স্বতন্ত্র করিয়া দিবার দরকার নাই। তিনিই সব করিয়াছেন এবং তাঁহাতেই সব রহিয়াছে, এ কথা বেদ বার বার বলিতেছেন। অতএব ইন্দ্রকে গর্ভে ধরিয়া, অদিতির মহিমা খর্ব্ব হইল না। অন্যায়ন ও পরায়ণ যিনি, তিনি তাহাই রহিলেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে যখন স্বরূপবিচ্যুতি ঘটিল না, তখন অদিতির গর্ভে ইন্দ্র হইয়াছেন, এ কথা বলাও যা, আর ইন্দ্রের প্রভাবেই অদিতি জন্মিয়াছেন, এ কথা বলাও তা। আমার লক্ষিত পদার্থ যে এক। কাজেই এই একভাবে বেদের হেঁয়ালি পরিষ্কার হইয়া গেল। ছেলে মেয়ের বাপ—এ কথা আমরা একভাবে বুঝিলাম। অন্য রহস্যও আছে। শুধু ইন্দ্র বলিয়া নহে, অগ্নি, সূর্য, সোম—ইঁহাদের সম্বন্ধে মন্ত্রগুলি পড়িয়া দেখুন—তাৎপর্য্য ঐ একই। তিনিই সব করিয়াছেন এবং তাঁহাতেই সব রহিয়াছে।

গেঁয়ো

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ

(১)

গ্রীষ্মের ভরা দুপুর। রামনগরের শিবশেখর সান্যাল অত বেলায় মনিব-বাড়ী হইতে বাড়ী ফিরিয়া স্ত্রীকে বলিল,—"হরিনাথ কোথায়? বাড়ীতে নেই বুঝি?"

সুনীতি হাসিয়া বলিল—"না। আজ এসেই ছেলের খোঁজ যে বড়?"

শিবশেখর অপ্রসন্ন মুখে বলিল—"হুঁ। দরকার আছে। ছেলেটা আমায় জ্বালিয়ে তুললে দেখ্‌ছি। অত বড় ধাড়ি ছেলে—কোথায় আমার একটা কাজে লাগবে—তা না, কেবল পাড়ায় পাড়ায় যত সব বয়াটে ছেলের সাথে ঘুরে বেড়ানো, আর অন্ন ধ্বংস করা। আজ তারই একদিন, কি আমারই একদিন আমি দেখে নেবো।"

সুনীতি স্বামীর রাগের হেতু বুঝিতে পারিল না ; বুঝিবার চেষ্টা করিয়া স্বামীকে আরও ক্ষিপ্ত করিয়া না তুলিয়া বলিল—"থাক্—সে সব পরে হবে। এত বেলা হয়েছে—নাইবে বা কখন, আর খাবেই বা কখন?"

"আর নাওয়া খাওয়া"—এই বলিয়া শিবশেখর হতাশ ভাবে একখানি টুলের উপর বসিয়া পড়িল। সুনীতি নিকটে বসিয়া হাতপাখা লইয়া স্বামীকে বাতাস দিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ দম লইয়া শিবশেখর বলিল—"আর পরের গোলামী করতে ইচ্ছে হয় না। যদি বড়ছেলেটাও মানুষ হ'তো—তাহলে কি আর এমনি দশা হয়।"

সুনীতি পুত্রের পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিল—"তা ওর বয়সই বা কত—আর একটু বড় হলেই সংসারে মাথা দেবে।"

"তোমার তো ওই কথা।—হরিনাথ এখনও কচি খোকাটিই আছে—না? উনিশ বছরের ধাড়ি হলো—এখনও ওর সংসারে মাথা দেবার বয়স হ'লো না। বয়স হবে কি যখন চিতেয় শোবে!"

সুনীতি শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—"বালাই. ষাট! ও কি অলুক্ষণে কথা তোমার!"

শিবশেখর রাগিয়া বলিল—"হুঁ—আমার অমনি কথা। পরের চাকুরি আর সেই সঙ্গে সঙ্গে যদি গালাগাল খেতে হ'তো—তাহ'লে বুঝ্‌তে মাথা ঠিক থাকে কি করে! এ তো আর বাড়ীতে বসে ভাত ডাল রান্না করা নয়!" স্বামীর মন্তব্যে সুনীতির চোখে জল আসিয়া পড়িল। সে কোনও প্রতিবাদ না করিয়া বলিল—"একটু বসো, তামাক সেজে আনি।"

আজ সত্যই শিবশেখরের মাথার ঠিক ছিল না। সে জমিদারের সামান্য গোমস্তা। আজ একটা তুচ্ছ ভুলের জন্য জমিদারের নায়েবের নিকট সে বিস্তর ভৎর্সনা খাইয়া আসিয়াছে। তাহার পর এতখানি রাস্তা। তপ্ত রৌদ্র মাথায় করিয়া রাস্তায় আসিতে আসিতে তাহার মগজ একেবারে গরম হইয়া উঠিয়াছিল; এবং যত রাগ যাইয়া পড়িয়াছিল, তাহার প্রথম পক্ষের পুত্র হরিনাথের উপর। সেই তো তাহার এই দুর্দ্দশার কারণ। সে যদি মানুষ হইত—তাহা হইলে এই বৃদ্ধ বয়সে কি তাহার পরের গোলামী করিতে হয়? সে শেষকালে কোথায় একটু বিশ্রাম লাভ করিবে—তা নয়, তাহাদেরই ভরণপোষণের জন্য প্রাণপাত করিয়া তাহাকে খাটিয়া মরিতে হইতেছে!

সুনীতি তামাক সাজিয়া আনিলে, শিবশেখর তামাক টানিতে টানিতে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিল। স্নান ও আহার শেষ করিতে সেদিন তাহার বেলা দুইটা বাজিয়া গেল। তখনও হরিনাথের দেখা নাই। শিবশেখর স্ত্রীকে বলিল—"আজ ও এলে ভাত দিও না।—ওকে ভাতে না মারলে সায়েস্তা হবে না দেখ্‌ছি।" সুনীতি কোনও উত্তর দিল না; কারণ, স্বামীর কোনও আদেশ পালন করিতে সে কুণ্ঠিত নয় বটে, কিন্তু আজকার এই আজ্ঞাটি সে কোনও মতেই পালন করিতে পারিবে না যে!

হরিনাথ সমস্ত দেহে কাদা মাখিয়া প্রকাণ্ড একটা রুই মাছ ঘাড়ে করিয়া যখন বাড়ী ফিরিল—তখন বেলা বোধ করি তিনটা। মাছটি ধপাস করিয়া উঠানে আছড়াইয়া ফেলিয়া সে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল—"মা—মা!" সুনীতি তখন সবেমাত্র হেঁসেল তুলিয়া নিজের ও হরিনাথের ভাত ঢাকিয়া রাখিয়া শয্যা আশ্রয় করিয়াছে। শিবশেখরও তখন বাড়ী ছিল না—পাড়ার আড্ডায় বেড়াইতে গিয়াছিল। পুত্রের উচ্চ চীৎকারে পাড়া সচকিত হইয়া উঠিলেও, সুনীতি কোনও সাড়া দিল না। কারণ সে ভাবিয়াছিল—আজ অভিমান করিয়া দেখিবে, ছেলের মতিগতি ফিরে কি না!

হরিনাথ সপত্নী-পুত্র হইলেও অতি শিশুকাল হইতে সে ইহাকে নিজের পুত্রের মতই মানুষ করিয়া আসিয়াছে; এবং নিজে দুই সন্তানের জননী হইলেও, এই সপত্নী-পুত্রের প্রতি ভালবাসার তাহার অন্ত ছিল না।

হরিনাথের চীৎকারে সুনীতি উঠিল না; কিন্তু তাহার পুত্র মণ্টু ও কন্যা টুনি দাদার কাছে আসিয়া, এত বড় মাছটি দেখিয়া, আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিল।

হরিনাথ বিরক্ত হইয়া, তাহাদের এক ধমক দিয়া, বলিয়া উঠিল—"আর অমন করে লাফাতে হবে না—বাঁদর কোথাকার। মা কোথায় গিয়েছে—চীৎকার করতে করতে যে গলা ফেটে গেল!"

টুনি বলিল—"মা ওই ঘরে শুয়ে রয়েছে যে!"

হরিনাথ বিস্মিত হইয়া বলিল—"কেন রে—অসুখ করেছে না কি?" এক অসুখ ভিন্ন যে মা তাহার এই উচ্চ চীৎকার সত্ত্বেও ঘরে অনায়াসে শুইয়া থাকিতে পারে—এ ধারণা তাহার ছিল না। তাহার সমস্ত উৎসাহ নিবিয়া একেবারে জল হইয়া গেল। সে মনে মনে কল্পনা করিতে করিতে আসিয়াছিল—আজ এই এত বড় মাছটি দেখিয়া তাহার জননীর মুখে কতখানি তৃপ্তির হাসি ফুটিয়া উঠিবে—তাহাকে আজ কত আদর করিয়া খাইতে দিবেন! কিন্তু তাহার কিছুই হইল না তো! উপরন্তু একবার মা মাছটিকে চোখেও দেখিতে উঠিলেন না! হায় রে তাহার কপাল!

মণ্টু বলিল—"না দাদা, অসুখ করে নি তো। তুমি অতবেলা পর্য্যন্ত এলে না দেখে, বাবা রাগ করছিলেন কি না—তাই মা শুয়ে আছে।"

ভয়ে ভয়ে হরিনাথ জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা কোথায় রে?" তাহার পিতা বাড়ীতে নাই শুনিয়া সে অনেকটা আশ্বস্ত হইল? এবং পরক্ষণেই রাগে আগুন হইয়া বলিতে লাগিল—"এ বাড়ীর সব নিমকহারাম! আমি কি নিজের কাজের জন্য এত দেরী করেছি? সকলের জন্য মাছ ধরতেই তো আমি গিয়েছিলাম—আমার একার জন্য তো আর নয়?" তারপর সে যে কত বড় প্রকাণ্ড একটি মাছ ধরিয়া আনিয়াছে, তাহাই ঐ ঘরের মধ্যে নির্ব্বিকার ভাবে

শয়ান তাহার মা টিকে জানাইবার জন্য বলিতে লাগিল—"আজকের এই মাছটি কি বড় সোজা মাছ! যাকে বলে পাকা রুই। হুঁ—এর ওজনও তো আধমণের কম হবে না। এত বড় মাছ কি ধরা বল্লেই ধরা! আস্‌তে দেরী হবে না? বড়শীতে গাঁথলুম—একটার সময়, তুল্‌তে-তুল্‌তেই না এত দেরী হয়ে গেল।" তাহার বাড়ীতে আসিবার অযথা বিলম্বের এই কৈফিয়ৎ দেওয়া সত্ত্বেও যখন তাহার মা উঠিল না, তখন সে শুনাইয়া-শুনাইয়া বলিতে লাগিল—"বেশ—মাছ ধরতে গিয়েছিলাম বলেই যদি এত রাগ—তা হ'লে মাছটা এখুনি জলে ফেলে দিয়ে আস্‌ছি। এখনও খাবি খাচ্ছে। জলে ফেলে দিলে বাঁচ্‌তেও পারে তো!"

হরিনাথ ভাবিয়াছিল—মাছটি ফেলিয়া দিবার কথাতে তাহার মা উঠিয়া আসিয়া—এত বড় মাছটি দেখিয়া তাহাকে ফেলিয়া দিতে নিষেধ করিবে। কিন্তু মিনিট দুই তিন অপেক্ষা করিয়াও যখন সে সব কিছুই হইল না—তখন হরিনাথ ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া বলিতে লাগিল—"হুঁ—বোধ হয় উনি ভাবছেন—আমি সত্যিই মাছ ফেলে দিয়ে আস্‌বো না। কিন্তু আমার যে কথা সেই কাজ, তা বুঝি জানেন না। আমি এক দুই তিন গুণ্‌তে গুণ্‌তে যদি না ওঠেন—তা'হলে সত্যিই ফেলে দিয়ে আস্‌বো—হ্যাঁ!" এবং তার পর মুহূর্ত্তেই সে জোরে বলিয়া উঠিল—'এক'। মিনিট খানেক দম লইয়া আবার গুণিল—'দুই।' তার পর সে বলিতে লাগিল—"আর দেরী নাই—একবার তিন গুণ্‌লে কিন্তু। তি...ন। এখনও যদি আসে, তা হলেও এত বড় মাছটা জলে যায় না! তবু এলো না! আচ্ছা বেশ—আমি দেখে নিচ্ছি। এই 'তি···ন'। এই মণ্টু, এই টুনি, ধরতো মাছের ল্যাজের দিক। জলে ফেলে দিয়ে আসি। এত বড় মাছ একা নিয়ে যাওয়া কি সোজা!"

সুনীতি ঘরের ভিতর হইতে এই সরল পুত্রটির হাঁক-ডাক ও মন্তব্য শুনিয়া সুখী হইয়া উঠিতেছিল। প্রথম সে ভাবিয়াছিল—আজ হরিনাথকে খুব গোটাকতক কড়া কথা শুনাইয়া দিবে। কিন্তু ইহার সরলতা, কথার ভঙ্গী, আন্তরিকতা—তাহার বুকের মধ্যে পুলকের বাণ ডাকাইয়া তুলিল। ছিঃ—এই সরল বালকের উপর কি সে রাগ করিয়া থাকিতে পারে? স্বামীরও কি ইহার উপর রাগ করা উচিত? সে উঠি-উঠি করিয়াও উঠিতেছিল না—হরিনাথের বালক-সুলভ সরলতাপূর্ণ রাগের কথাগুলি তাহার কাণে বড়ই মধুর বাজিতেছিল।

এদিকে, দাদার হুকুম শুনিয়া মণ্টু ও টুনির মুখ এতটুকু হইয়া গেল। এত বড় মাছটি হাতের মধ্যে আসিয়া আবার চলিয়া যায় ভাবিয়া তাহারা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ভয়ে ভয়ে মণ্টু জিজ্ঞাসা করিল—"সত্যিই কি ফেলে দেবে দাদা?"। হরিনাথ বলিল—"হুঁ—ফেলে দেবো না ছাই। আমার দায় পড়েছে ফেলে দিতে। ও যদি মাছ না কোটে, আমি কুটে ফেল্‌ছি। এই নিয়ে আয় তো, বঁটিটা। না—না, থাক, আমিই আনছি।" হরিনাথ সত্যসত্যই বঁটি লইয়া মাছ কুটিতে বসিল। এই-বার আর সুনীতিদেবী না উঠিয়া পারিল না। যথাসম্ভব মুখ গম্ভীর করিয়া হরিনাথের নিকট আসিয়া বলিল—"এখন ওঠ বাপু, চান্ করে গিল্‌বে কি না গেলো।" হরি-নাথ কোনও উত্তর দিল না—শুধু মাছের মাথাটি দেহ হইতে বিচ্যুত করিয়া ফেলিল।

সুনীতি বুঝিল—সহজে হরিনাথ উঠিবে না। তাই তাহার নিকটে বসিয়া পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"ওঠ্ বাবা—ডুব দিয়ে এসে চাট্টি মুখে দে। মুখ যে একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে।" জননীর সস্নেহ কথায় এইবার হরিনাথের চোখে জল আসিয়া পড়িল—বলিল—"এতক্ষণ কোথায় ছিলি পোড়ামুখী? এখন আবার আদর দেখানো হচ্ছে।" এই বলিয়া আর সেখানে না দাঁড়াইয়া, গামছা লইয়া নদীর ঘাটে চলিয়া গেল। সুনীতি মনে মনে ভাবিলেন,—"হুঁ, ওঁরও যেমন,—এই ছেলের ওপর আবার রাগ করে!"

(২)

রাত্রে আহারের সময় অত বড় মাছের মুড়াটি দেখিয়া শিবশেখর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এ কি! এত বড় মুড়ো এলো কোত্থেকে?"

সুনীতি হাসিয়া বলিল—"শুধু মুড়ো নয়—ওর সাথে আধমণে পাকা রুই মাছও এসেছে। তোমার ছেলের কীর্ত্তি আর কি!"

"বটে!" বলিয়া শিবশেখর মুড়াটি পাতের উপর

টানিয়া লইল। সুনীতির—এই মাছের কথা স্বামীকে পূর্ব্বেই না বলিবার উদ্দেশ্য ছিল। ভাবিয়াছিল—হঠাৎ মুড়াটি দেখিয়া স্বামী আনন্দিত হইয়া উঠিবেন, এবং পুত্রের উপর সেই ক্রুদ্ধ ভাবটুকুও এই আনন্দের আবেগে দূর হইয়া যাইবে। কিন্তু স্বামী মাছ সম্বন্ধে কোনও উচ্চবাচ্য করিলেন না দেখিয়া—সে একটু দমিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পর শিবশেখর জিজ্ঞাসা করিল—"হরিনাথ বাড়ী ফেরেনি বুঝি ?"

"না। আজ ও বড্ড ভয় পেয়েছে—তুমি রাগ করেছো শুনেছে কি না!"

শিবশেখর গম্ভীর হইয়া শুধু বলিল—"ও।" তারপর মুড়াটি প্রায় নিঃশেষ করিয়া আনিয়া বলিল—"আমি একটা কথা ভাবছি। হরিনাথকে এখান থেকে কল্‌-কাতায় পাঠাবো। শুনেছি—সেখানে না কি পয়সার অভাব নাই—কুড়িয়ে নিতে পারলেই হ'লো। গাঁয়ে থেকে শুধু বয়াটেপনা করে বেড়ালেই চলবে না। আমি কিছু চিরকালই বেঁচে থাকবো না। তখন সংসারের ভার নিতে হবে তো!"

সুনীতি শঙ্কিত হইয়া বলিল—"ওইটুকু ছেলেকে তুমি সেই বিদেশ বিভুঁয়ে পাঠাতে চাও? কেন, এখানে থেকে কি কোনও কাজ করা চলে না ?"

অবিচলিত স্বরে শিবশেখর বলিল—"না। যেখানে তুমি আছ—সেখানে ও কাজে মন দিতে পারবে না। তোমার আদরেই ও বিগ্‌ড়ে গেল। এ গ্রাম-ছাড়া না করলে আর চল্‌বে না।"

খোঁটা খাইয়া সুনীতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—"সেবার লেখাপড়া শেখার জন্য যেথায় পাঠিয়েছিলে—তা সেখানেই বা ওর কিছু হ'লো না কেন, শুনি? সেখানে কি আমি ছিলুম, না আমি আদর দিয়ে সেখানেও বিগ্‌ড়ে দিয়েছিলুম ?"

মৃদু হাসিয়া শিবশেখর বলিল—"সেখানে তুমি ছিলে না সত্যি—কিন্তু খুব বেশী দূরেও তো ছিলে না। মাত্র দশ ক্রোশের ব্যবধান ছিল। এবার আর তা নয়—একেবারে কল্‌কাতায়। সে যে দুশো মাইলের ওপর—ইচ্ছা করলেই তো আসা চল্‌বে না!"

সুনীতির মাতৃ হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। অত দূর—অত দূর সন্তানকে পাঠাইতে হইবে!

শিবশেখর আজ স্থির-সংকল্প করিয়া ফেলিয়াছিল—পুত্রকে কাজের সন্ধানে দূর-দেশে পাঠাইবে। বৃদ্ধ বয়সে গালি খাইয়া তাহার মনে ধিক্কার জন্মিয়াছে। এই ছেলেটা যদি কিছু উপার্জ্জন করিতে পারে—তাহা হইলে সে পরের গোলামী হইতে অব্যাহতি লইবে। পাড়ায় বেড়াইতে যাইয়া, মাতব্বরদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সে জানিতে পারিয়াছে—কলিকাতায় পাঠানোই ভাল। সেখানে উপার্জ্জনের হাজার হাজার পথ খোলা রহিয়াছে। তাই শিবশেখর মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে—কালই হরিনাথকে কলিকাতায় পাঠাইবে। আর সে দেরী করিবে না।

হরিনাথ রাত্রি দশটার সময় বাড়ী ফিরিতেই, পিতা তাহাকে তলব করিল। কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই সে বলিল—"কালকে তোমাকে কাজের চেষ্টায় কলকাতা যেতে হবে। এখানে বসে থাকলে চল্‌বে না।"

হরিনাথ পিতার কথার উত্তরে কিছুই বলিতে পারিল না—তাহার সমস্ত শরীর এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে একবার কাঁপিয়া উঠিল মাত্র। শিবশেখর পুনরায় বলিল—"জিনিষপত্র যা নেবে, দেখে শুনে আজই গুছিয়ে নেও। কাল দশটার ট্রেণে যেতে হবে কি না!"

হরিনাথ আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না—ধীরে ধীরে বাহির হইয়া নিজের শয়নঘরে বালিশে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল।

মিনিট দশেক পর সুনীতি আসিয়া সস্নেহ কণ্ঠে বলিলেন—"হরিনাথ!" হরিনাথ মাথা তুলিল না। মাতা শিয়রের কাছে আসিয়া পুত্রের মস্তকে স্নেহের পরশ বুলাইয়া বলিল—"হরিনাথ, খাবি চল্।" হরিনাথ কোনও উত্তর দিল না—শুধু তাহার অস্ফুট ক্রন্দনের শব্দ স্পষ্ট হইয়া মায়ের কাণে গেল।

সুনীতি ব্যাকুল হইয়া তাহার মাথাটি কোলের ভিতর টানিয়া লইয়া বলিল—"কাঁদিস্ নে বাবা। ছিঃ! কত লোক তো বিদেশে চাকরি করতে যায়—তারা কি কাঁদে রে পাগ্‌লা। আর চাকরি না করলে চল্‌বেই বা কেন। উনি আর কত দিন পরের গোলামী করবেন—বল্ তো। নিজের ইচ্ছে করেই তো যেতে হয়।"

হরিনাথ ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল—"তা তো হয়।

কিন্তু কালই আমি যাই কি করে—বল্ তো? কাল যে রবিবার। কাল কি বাড়ী থেকে বেরোতে হয়?"

সুনীতি হাসিয়া বলিল—"তুই কি মেয়েমানুষ রে! রবিবারে তোরও যাত্রা নাই?"

হরিনাথ বলিল—"তা না হয় হ'লো। কিন্তু যাও বল্লেই যাই কি করে? কাউকেই যাওয়ার কথা বলি নি তো।"

"ওঃ, এই কথা। তা কাল সকালেই না হয় বলিস্। এখন খাবি চল্।" "আমি কিছুতেই খাব না।"

"খাবিনে কি রে! অত বড় মাছ নিজে হাতে ধরে আন্লি—সবাই খেল আর তুই-ই খাবিনে?"

হরিনাথ কাঁদতে কাঁদিতে বলিল—"ইস্—দরদ তো কত!" কথাটা খট করিয়া সুনীতির মর্ম্মে আসিয়া বিদ্ধ করিল। হায় রে সন্তান! মায়ের দরদ যে কত, তুই তার বুঝিবি কি রে!

অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াও তাহাকে খাওয়াইতে না পারিয়া সুনীতি স্বামীর কাছে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"হরিনাথ কিছুতে খেলো না। তা ওরই বা দোষ কি! বিদেশে যাবে—কথা নাই বার্ত্তা নাই—হঠাৎ যাও বল্লে মন খারাপ হয় না!"

শিবশেখর জিজ্ঞাসা করিল—"কবে যেতে চায় ও?"

"ও কি আর যেতে চায়। তা দু'চার দিন পরে পাঠালেই তো হয়।" শিবশেখরের মনও এতক্ষণে অনেকটা নরম হইয়া আসিয়াছিল—বলিল—"আচ্ছা, তাই হোক। বুধবারে গেলেই হবে।"

সুনীতি হরিনাথকে এ কথা জানাইলে, সে চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল এবং মায়ের পশ্চাতে রান্নাঘরে প্রবেশ করিল।

(৩)

সেদিন রাত্রে হরিনাথের ভাল করিয়া ঘুম হইল না। ঐ জিনিসটার এ পর্য্যন্ত কোনও দিনই তাহার অভাব হয় নাই। সে দিনের বেলা এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থির হইয়া বসিত না বটে—কিন্তু রাত্রে বিছানায় শুইলেই গভীর নিদ্রায় অচ্ছন্ন হইয়া পড়িত। কিন্তু তার বড় সাধের গ্রাম ত্যাগ করিয়া কোন্ অপরিচিত বিদেশ কলিকাতায় যাইতে হইবে শুনিয়া—তাহার মন এম্‌নি বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল যে, সে আর স্থির হইয়া ঘুমাইতে পারিল না। আর তিন দিন তাহার এই গ্রামে থাকিবার মিয়াদ! তার পর সেই অজানা অপরিচিতের দেশে যাত্রা করিতে হইবে!

সে ভাবিতে লাগিল—কলিকাতা—সে কেমন যায়গা? শুনিয়াছি—তাহাদের 'জেলা'—যেখানে সে পড়িতে গিয়াছিল—তাহার চেয়েও না কি সেটা বড় সহর। ঐ ক্ষুদ্র সহরেই তাহার মন বসে নাই—কোনও রকমে সেকেণ্ড ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়া আর থাকিতে না পারিয়া, গ্রামের শ্যামল কোলে ফিরিয়া আসিয়াছিল। তবে তাহার চেয়েও বড় সহরে সে টিকিবে কি করিয়া? সেখানে তো এখানকার মত বট-অশ্বত্থের সুশীতল ছায়া নাই,—স্বচ্ছ সলিলে ভরা ভাল পুকুর নাই,—বিস্তৃত সবুজ রঙ্গের ক্ষেত নাই। সেখানে তো শনি-মঙ্গলবারে হাট বসে না,—রাখালেরা বাঁশের বাঁশী বাজাইয়া গরু চরায় না,—ইচ্ছামতী নদী এমনই কুলুকুলু রবে বহিয়া যায় না। এখানকার মত সেখানে দুপুর বেলায় ন্যাড়া বটতলায় আড্ডা জমে না,—গোপালজীর মন্দিরে সন্ধ্যার পর একত্র হইয়া হরিসংকীর্ত্তন হয় না! এইগুলির অভাবেই না সহরে যাইয়া তাহার পড়া হইল না—তবে আবার তাহার পিতা কি ভাবিয়া তাহাকে অতদূর পাঠাইতে চাহিতেছেন? কিন্তু আর উপায় নাই—সে মরুক আর বাঁচুক, তাহাকে যাইতেই হইবে। তাহার হৃদয় হাজারই বেদনায় টন্‌টন্ করুক—কেউ তাহার দিকে তাকাইয়া দেখিবে না। এম্‌নি স্বার্থপর সংসার! স্বার্থের জন্যই না তাহার পিতা জোর করিয়া গ্রাম হইতে তাহাকে বিদায় করিতেছে!

এক-একবার তাহার মনে হইতেছিল—সে কালই পলাইয়া এখান হইতে অন্য গ্রামে চলিয়া যাইবে। তারপর, বুধবারের পরে আবার গ্রামে ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু আবার ভাবিল—তাহা হইলেই বা কি হইবে? তখন কি ইহারা জোর করিয়া পুনরায় কলিকাতা পাঠাইতে পারিবে না! অনেক চিন্তা করিয়া সে স্থির করিল—হাঁ, সে যাইবে। কিন্তু আর সে ফিরিবে না—গ্রামের নিকট চিরবিদায় লইয়া যাইবে! দেখা যাক—তাহাতেই ইহারা জব্দ হয় কি না!

সকালে যখন হরিনাথ শয্যাত্যাগ করিল—তখন দেখা

গেল, তাহার মুখে কে যেন কালির ছোপ মারিয়া দিয়াছে। সুনীতি ব্যাপার বুঝিয়া দুঃখিত স্বরে বলিল—"কাল সারা রাত ঘুমোস্‌নি বুঝি হরিনাথ?" হরিনাথ মুখ ভেঙ্গচাইয়া বলিল—"তা দিয়ে তোমার দরকার? আমি মরলেই বা কি, আর বাঁচলেই বা কি তোমাদের।" সুনীতি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সেদিন তাহাকে যে দেখিল—সেই বিস্মিত হইল। তাহার সদানন্দময় মুখখানি একরাত্রের মধ্যেই একেবারে দীপ্তিহীন হইয়া গিয়াছে। সে সকলকেই জানাইল যে পরশু গ্রাম ত্যাগ করিয়া সে রোজগারের চেষ্টায় কলিকাতায় চলিয়াছে। গ্রামের মাতব্বরেরা তাহাকে উৎসাহ দিতে লাগিল—আর সমবয়সীরা দুঃখিত হইল। কিন্তু কিছুতেই তাহার মনের দুঃখ ঘুচিল না। সে অনবরত গ্রামের ভিতর তাহার প্রিয় স্থানগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল।

পুত্রের ভাব দেখিয়া সুনীতি আকুল হইয়া স্বামীকে জানাইল—"ওগো, ওকে কল্‌কাতা পাঠিয়ে দরকার নাই। দেখ্‌ছো না কেমন মুস্‌ড়ে পড়েছে।" শিবশেখর টলিবার পাত্র নয়—অবিচলিত স্বরে বলিল—"ও কিছু নয়—সব ঠিক হয়ে যাবে।"

দেখিতে-দেখিতে যাইবার দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। ভোর হইতে না হইতেই হরিনাথ নিজের দরকারী জিনিষ-পত্র গুছাইয়া লইয়া একবার গ্রামটি প্রদক্ষিণ করিয়া আসিল। তাহার বুকের ভিতর বিদ্রোহের প্রবল ঝড় উন্মত্ত ভাবে বহিয়া যাইতেছিল—কিন্তু বাহিরে সেদিন স্থির, সংযত। গ্রামের লোক যাহার সহিত দেখা হইল—তাহারই সঙ্গে হাসিমুখে দু'একটি আলাপ করিয়া সে বিদায় লইল।

শিবশেখর ও সুনীতি উভয়েই হরিনাথের ভাব দেখিয়া সত্যই বিস্মিত হইয়া গেল! তাহাদের ধারণা ছিল—আজ নিশ্চয়ই সে যাইবার সময় গোল বাধাইয়া তুলিবে! কিন্তু সে নিজেই সমস্ত ঠিক করিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া, শিবশেখর সুখী হইয়া ভাবিল—"যাক্—ছোঁড়াটার সুবুদ্ধি হয়েছে দেখ্‌ছি।"

সুনীতির মনটা কিন্তু কেমন খুঁতখুঁত করিতে লাগিল—হরিনাথের এই স্বভাব-বিরুদ্ধ ভাবটি তাহার নিকট বড় ভাল বোধ হইল না। তবু সে মনে ভাবিল, যাবার সময় কাঁদাকাটি না করে, সেই বরং ভাল।

সময় হইলে পিতা-মাতার পায়ের ধূলি লইয়া, ভাই বোনের মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইয়া সে যাত্রা করিল। ষ্টেশন গ্রাম হইতে দেড়ক্রোশ। বাড়ীর কৃষাণ তাহার ছোট্ট পুঁটুলুটি লইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল। গ্রাম ছাড়িয়া যখন তাহারা ক্ষেতের রাস্তা ধরিল—তখন হরিনাথ একবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া গ্রামের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিল। এইবার তাহার অশ্রু আর বাধা মানিল না—চোখের কোণ হইতে টপ-টপ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কোথায় সে চলিয়াছে—তার চির-আদরের পল্লী ত্যাগ করিয়া কোন্ অজানা দেশে সে যাত্রা করিয়াছে।

হরিনাথকে গ্রামের দিকে তাকাইয়া চোখের জল ফেলিতে দেখিয়া, কৃষাণেরও অশ্রু সম্বরণ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল—সে ধরা গলায় বলিল—"দাদা বাবু? সময় যায় যে!"

তাহার কথায় হরিনাথের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে, আবার সে নিঃশব্দে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার মনের মধ্যে আকুল হইয়া বাজিতেছিল—"ওগো পল্লীজননী আমার, বিদায়—বিদায়!"

গ্রাম ছাড়িয়া কিছু দূর আসিয়া হরিনাথ অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া কৃষাণকে বলিল—"আচ্ছা রহিম, এই যে আমাকে জোর করে ওরা পাঠালো—তাতে কি ওদের একটু কষ্ট হলো না।"

রহিম বলিল—"কষ্ট কি আর হয় না দাদাবাবু!"

দাদাবাবু তাহাকে এক ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল—"কষ্ট হয়, না ছাই! কষ্ট হলে কি আর এম্‌নি ভাবে ছেলেকে জোর করে যমের মুখে পাঠায় রে। কিছু কষ্ট হয় নি ওদের—কিছু না। আমার বাপ মা—দুই-ই আমার শত্রু, বুঝেছিস্! আচ্ছা দেখ্, আমি কি বাড়ীর কোনও কাজই করি না? আমি থাক্‌তে কি ওদের কোনও দিন মাছ কেন্‌বার পয়সা লেগেছে, না তরি-তরকারি কোনও দিন বাজার থেকে আন্‌তে হয়েছে? এ সব তো আমিই যোগাড় করে দিইছি। ঐ যে বাগানটুকু আমি নিজের হাতে করেছি, অমন শাকসব্জির বাগান গাঁয়ের মধ্যে আর কোন্ শালার আছে, তুই বল্ তো? আমি যাচ্ছি—এবার যদি ও বাগান আর থাকে, তা'হলে—বুঝেছিস্ রহিম—আমার নাম বদলে রাখিস্।"

রহিম বলিল—"তাই কি আর থাকে।"

হরিনাথ উৎসাহ পাইয়া বলিতে লাগিল—"না, কক্‌খনো থাক্‌বে না। আর আমি না থাকলে মণ্টু আর টুনিকেই বা দেখ্‌বে কে বল্‌। ওদের দাদা-অন্ত প্রাণ তো! আমি চলে গেলে, ওরা যদি শুকিয়ে রোগা না হয়ে যায়, তা হ'লে আমি কি বলেছি! আমার ওপরে দরদ না থাকে, অন্ততঃ ওদের মুখ চেয়েও তো আমাকে এমনি দূর করে দেওয়া উচিত হতো না।"

রহিম বলিল—"সে তো ঠিক কথা।"

"আর দ্যাখ্‌, আমিই যেন মায়ের সৎ ছেলে—কিন্তু ওরা তো আর নয়। ওদের ভালো-মন্দর দিকে তো দেখা উচিত ছিল তার। এই আমের সময় ওদের হাতে কে গাছ থেকে ভাল আম পেড়ে দেবে বল্‌ তো?" ভাই বোনের কথা বলিতে-বলিতে তাহার চোখে আবার জল আসিয়া পড়িল। তার পর চোখ মুছিয়া বলিতে লাগিল—"এই আম-কাঁঠালের সময় মা-বাপ বিদেশ থেকে ছেলেদের বাড়ী নিয়ে আসে—আর আমাকে কি না এই সময়েই বাড়ী থেকে দূর করে দিলে! সৎমা কি না, তাই—আমার নিজের মা থাকলে কি আর এম্‌নি হ'তো। কক্‌খনো হ'তো না—এ আমি বলে দিচ্ছি রহিম।"

রহিম বলিল—"তাই কি আর হয়।"

হরিনাথ তাহাকে এক প্রচণ্ড ধমক দিয়া বলিল—"তা হয় না তো কি—চাষা ভূত কোথাকার! আমার নিজের মা কি কক্‌খনো এত আদর যত্ন করতে পারতো রে গাধা! চাষা কি না—তুই আমার এমন মায়ের মর্ম্ম কি বুঝ্‌বি? ফের যদি মায়ের বিরুদ্ধে কোনও কথা শুনি, তোর জিব উপড়ে ফেলবো—হাঁ!"

রহিম ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল—তার পর বুদ্ধি করিয়া বলিল—"আমাদের মার বিরুদ্ধে কি কেউ কিছু বল্‌তে পারে!"

হরিনাথ খুসী হইয়া বলিল—"না—কেউ পারে না। অমন মা কি কারু হয়!" মায়ের কথা বলিতে গিয়া আবার তাহার অশ্রু সংবরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। কাপড়ের খোঁটে অশ্রু মুছিয়া বলিতে লাগিল—"আমাকে এম্‌নি করে বিদেশে পাঠানোর দোষ তো শুধু বাবার—আর কারু নয়! তাঁর চাই টাকা—বড়মানুষ হবেন! বেশ!—আমিও তোকে বলে দিচ্ছি রহিম—আমি যদি টাকা উপায় না করতে পারি, তা'হলে আমি বামুনের ছেলে নই। এই শরীর পাত করে টাকা উপায় করবো। কিন্তু আর আমি গাঁয়ে ফিরছি নে—এ কথাও তোকে জানিয়ে দিচ্ছি। টাকাই যদি সব—ছেলে যদি কিছুই নয়—তা'হলে সেই টাকা নিয়েই ওরা থাকুক।"

এম্‌নি নানা এলোমেলো কথার মধ্যে দিয়া তাহারা ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। যথাসময়ে ট্রেণও আসিয়া উপস্থিত হইল। ট্রেণ ছাড়িবার পূর্ব্বে হরিনাথ রহিমের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল—"রহিম, আমার বাপ মা, ভাই-বোনদের তুই এখন থেকে দেখিস্‌ রে। তাদের যেন কষ্ট না হয়।" ট্রেণের লোকগুলি অবাক্‌ হইয়া, এত বড় বয়স্থ যুবককে কাঁদিতে দেখিয়া, মজা পাইয়া, সহাস্যে নানা রকম মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল।

(৪)

ট্রেণ যখন শেয়ালদহ পৌঁছিল—তখন ভোর ছয়টা। হরিনাথ ট্রেণ হইতে নামিয়া এত লোকের সমারোহ, কুলির হাঁকাহাঁকি, কোচমানের চীৎকারে অবাক্‌ হইয়া গেল। জীবনে এমন দৃশ্য সে কখনও দেখে নাই। দেখিতে-দেখিতে প্লাটফর্ম্মটি ক্রমশঃ জনশূন্য হইয়া উঠিল। যে যার জিনিষপত্র লইয়া গন্তব্য স্থানের উদ্দেশে যাইতেছে দেখিয়া তাহার মনে পড়িল—তাহাকেও যাইতে হইবে। কিন্তু কোথায় সে যাইবে—কোথায় তার স্থান? অনেক-ক্ষণ বিমূঢ় ভাবে প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, সে একজন যাত্রির পিছন্‌ পিছন্‌ প্ল্যাটফর্ম্মের বাহিরে আসিল। রাস্তায় আসিয়াও সে দেখিল—তেম্‌নি অগণিত লোক দুই পাশের ফুটপাথের উপর দিয়া চলিয়াছে; আর তাহারই মাঝের রাস্তা দিয়া অগণিত গাড়ী-ঘোড়া দৌড়াইতেছে। রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া সে ভাবিতে লাগিল—কোন্‌ পথ ধরিয়া সে যাইবে—এই বিশাল পুরীতে কোথায় তার আশ্রয় মিলিবে,—কাহার কাছে সে চাকুরীর উমেদারী করিবে। তাহার পিতা বলিয়া দিয়াছেন—এখানে অর্থ উপার্জ্জনের হাজার রকমের পথ খোলা আছে। কিন্তু কে তাহাকে সেই পথের খোঁজ দেখাইয়া দিবে! দুঃখের আবেগে তাহার কান্না আসিয়া পড়িল।

তাহার এক একবার মনে হইতেছিল—আবার ট্রেণে

চড়িয়া গ্রামে ফিরিয়া যায়। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের অশান্ত মনকে শাসন করিয়া মনে-মনে বলিল—না, আর কখনও সে ফিরিবে না। এই রাস্তার উপর না খাইয়া মরিবে—তবু আর সে ফিরিবে না। যতই তার মনের কষ্ট উদ্দাম হইয়া উঠিতেছিল—ততই তার ক্রোধ ভীষণ ভাব ধারণ করিতেছিল।

হঠাৎ একটা কথা তাহার মনে বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল। এখানে অনিল আছে তো! তাহার ঠিকানাও তো সে জানে—সে যে এই কলিকাতা হইতেই তাহাকে একখানি চিঠি লিখিয়াছিল। অকস্মাৎ অকূলে যেন সে কূল পাইল। এই অনিলের সাথে কতই না তার ভাব ছিল, যখন সে জেলার ইস্কুলে পড়িত। এক সাথে খেলা, আহার, বেড়ানো। দুইজন কখনও কাছছাড়া হইত না। বন্ধুর কথা মনে পড়িতেই, তাহার মুখে চোখে আনন্দের লহরী খেলিয়া গেল; এবং তাহার কপালে যে আর কষ্ট নাই, এই ভাবিয়া সে অনেকটা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

অনেক খোঁজ করিতে-করিতে, নানা রাস্তা ঘুরিয়া, হরিনাথ যখন অনিলের মেসে উপস্থিত হইল—তখন বেলা আটটা। মেসে ঢুকিতেই একজন ভদ্রলোককে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—"এখানে অনিল আছে—আমাদের অনিল!" ভদ্রলোকটি আগন্তুকের চেহারা, মলিন পরিচ্ছদ ও কথাবার্ত্তার ভঙ্গী দেখিয়া বুঝিয়া লইল—এ একটা গেঁয়ো ভূত—সহরে হালে আমদানি। তাই বিদ্রূপের সুরে বলিল—"আপনাদের অনিলকে তো আমরা চিনিনে মশাই!"

হরিনাথ বিস্মিত হইয়া বলিল—"এ্যাঁ—অনিলকে চেনেন না? সেই যে হরিশপুরের বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য্যির ছেলে? যে আমার সাথে এক সঙ্গে পড়তো?"

ভদ্রলোকটি হাসিয়া বলিল—"অতশত জানিনে মশাই—তেতালায় এক অনিল থাকেন—পরখ করে দেখুন, সেই আপনার অনিল কি না।" হরিনাথ ঘুরিতে-ঘুরিতে তেতালায় উঠিয়া অতি কষ্টে অনিলকে আবিষ্কার করিল। সে তখনও শয্যাত্যাগ করে নাই পাশ ফিরিয়া শুইয়া ছিল। হরিনাথ তাহার মুখটা একবার উঁকি মারিয়া দেখিল—সেই অনিল কি না! তার পর নিঃসন্দেহ হইয়া, সেই আগেকার মত তাহার পিঠে এক প্রচণ্ড কিল মারিয়া বলিয়া উঠিল—"ওরে অনিল—এতক্ষণেও বিছানা ছেড়ে ওঠা হয় নি রে গাধা!" বিষম বিরক্তিতে মুখ ফিরাইয়া অনিল হরিনাথকে দেখিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেল। কিন্তু তাহার বিরক্তির ভাব দূর হইল না—অপ্রসন্ন মুখে বলিল—"কবে এসেছ?" হরিনাথ অনিলের আন্তরিকতাহীন কথা শুনিয়া দমিয়া গেল—বলিল—"এখুনি।"

"ও। আচ্ছা বস—"বলিয়া সে তক্তপোষের একটা কোণ দেখাইয়া দিল। অনিল ভাবিতে লাগিল—এ আপদ তো ঘাড়ে চাপ্‌লো দেখ্‌ছি—কবে যে নামবে কে জানে? গেঁয়ো-ধরণের চালচলন—মেসের বোর্ডারদের কাছে অপদস্থ হতে হবে দেখ্‌ছি।

আর হরিনাথ মনে মনে ভাবিতে লাগিল—এই কি সেই বাল্যের সঙ্গী অনিল! যে মনে করিয়াছিল—তাহাকে দেখিয়া অনিল কত উল্লসিত হইয়া উঠিবে-কিন্তু এ যে ঠিক তাহার বিপরীত! তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। কোনও রকমে নিজেকে সম্বরণ করিয়া বলিল—"অনেক বেলা হয়েছে—এখনো ওঠো নি যে। শরীর কি অসুস্থ?" তাহার কথায় এবার আর তেমন উৎসাহের সুর বাজিয়া উঠিল না।

অনিল অনেকটা তাচ্ছিল্যের সুরে বলিল—"না, অসুখ করবে কেন? চা না আন্‌লে উঠি কি করে!"

হরিনাথ অবাক্ হইয়া অনিলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অনিল চা খায়—ইহারই অপেক্ষায় সে শয্যা-ত্যাগ করিয়া উঠিতেছে না! এখানকার কি এই রীতি? তাহারা যখন একসঙ্গে স্কুলের বোর্ডিংএ থাকিত—তখন তো এমন ছিল না! কে আগে উঠিতে পারে—ইহাই লইয়া পাল্লা দিত। এমন কি, সকলে আগে উঠিতে পারিবে বলিয়া খেয়ালের বসে তাহারা অনেক রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়াছে। আর চা তাহারা স্পর্শ করা দূরে থাকুক, চোখেই খুব কম দেখিয়াছে। না—অনিলটা আর সে অনিল নাই—একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে।

ভৃত্য চা লইয়া আসিলে, অনিল জিজ্ঞাসা করিল—"হবে এক কাপ্?"

হরিনাথ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া একটু সরিয়া বসিল।

অনিল তাহার ভাব দেখিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল—"ভয় নাই, জোর করে মুখে ঢেলে দেব না।" তার পর এক চুমুক খাইয়া বলিল—"এ না হলে আমার চলে না—এম্‌নি বদ-অভ্যাস হয়ে গ্যাছে।"

হরিনাথ বলিল—"কিন্তু মুখ না ধুয়েই—"।

অনিল মৃদুহাস্যে বলিল—"হুঁ। এই তো দস্তুর। চা পেটে না পড়লে জড়তা ভাঙ্গে না কি না!"

"ও"—বলিয়াই হরিনাথ আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল।

নানা ভঙ্গীতে চায়ের কাপে চুমুক দিয়া চা নিঃশেষ করিয়া অনিল বলিল—"এখানে কি মনে করে আসা হয়েছে হরিনাথ?"

হরিনাথ ধীরে-ধীরে তাহার সমস্ত কথাই বলিয়া গেল। সমস্ত শুনিয়া একটু হাসিয়া অনিল বলিল—"চাকুরি মেলা কি সোজা কথা! অনেক উপযুক্ত লোক চাকুরি চাকুরি করে টো টো করে ঘুরছে—তুমি তো তুমি! বাপ্ তো কলকাতা চোখেও দেখে নি—এদিকে ছেলেকে তো পাঠিয়েছে খুব। এর চেয়ে গ্রামে লাঙ্গল ধরলেও কাজ হ'তো। যাক্, চেষ্টা করে দেখ—যদি মেলে। তা কত টাকা নিয়ে কলকাতা এসেছ?"

হরিনাথ তাহার পরম বন্ধুর কথার ভাব দেখিয়া আন্তরিক কষ্ট অনুভব করিয়া বলিল—"এখন আমার কাছে ১১৸৶৯ পাই আছে।" অনিল অনেকটা আশ্বস্ত হইল—না, তাহা হইলে একেবারে নিঃসম্বল নয়।

সে হাসিয়া বলিল—"একেবারে কড়াক্রান্তি পর্য্যন্ত ঠিক! যাক্, কয়দিনের খরচ চল্‌বে। এর মধ্যে চেষ্টা করে দেখো, যদি কিছু মেলে। এখন মুখটুখ ধোও।" তাহার হাতের কাছে টুথপেষ্টের টিউবটি আগাইয়া দিয়া বলিল—"আমার কাছে তো—সেই কি বলে—'দাঁতন্' নেই। আজকের মত এই দিয়েই মুখ ধুতে হবে। দেখো, গন্ধে যেন বমি না হয়।" অনিল হাসিতে হাসিতে টুথব্রাস দিয়া দাঁত ঘষিতে লাগিল—আর হরিনাথ চুপ করিয়া নত-মুখে বসিয়া রহিল। বন্ধুর বিদ্রূপে সে মর্ম্মান্তিক আহত হইয়া ভাবিতে লাগিল—এই কি সেই অনিল!

(৫)

দুই একদিনের মধ্যেই হরিনাথ এই নতুন জীবনে অনেকটা অভ্যস্ত হইয়া পড়িল। তাহার মুখে সে আনন্দের জ্যোতিঃ ফিরিয়া আসিল না বটে, কিন্তু তবু মনের জড়তা অনেকটা কাটিয়া গেল। বেলা দশটার সময় কিছু খাইয়া সে কাজের চেষ্টায় বাহির হইয়া পড়িত—আর সন্ধ্যার অনেক পরে, ক্লান্ত-দেহে ব্যর্থতার বোঝা লইয়া মেসে ফিরিয়া আসিত।

অনিল প্রত্যহই জিজ্ঞাসা করিত—"কি হে, আজ কিছু সুবিধে হলো?" হরিনাথ বলিত—"কই আর হয়। শুধু শুধু হাঁটিতে হাঁটিতে পায়ে ব্যথা ধরে গেল আর কি!"

অনিল হাসিয়া বলিত—"এ আমি আগেই জানি!"

হরিনাথ হাত-মুখ ধুইয়া ঘরের এক কোণে কম্বলের উপর শুইয়া ভাবিত—তাহারই ক্ষুদ্র গ্রামখানির কথা। সেখানে এতক্ষণে হয় ত গোপালজীর সন্ধ্যা-আরতি শেষ হইয়াছে—সকলে চরণামৃত পান করিয়া কেশবকুণ্ডুর দোকানে তাসের আড্ডায় চলিয়াছে। এতক্ষণ বোধ হয় তাহার মা রান্না শেষ করিয়া মণ্টু ও টুনিকে লইয়া রূপকথা বলিতেছেন। গ্রামের সব তেম্‌নি আছে—শুধু সে-ই নাই। তাহার কথা কি গ্রামের কেউ মনে করে না? তাহার মা কি তাহার জন্য চোখের জল ফেলেন না? তাহার ভাই-বোন কি তাহার জন্য কান্নাকাটি করে না? এই সব ভাবিতে ভাবিতে তাহার চোখের জল দুর্নিবার হইয়া ওঠে। সে তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলে—কি জানি, যদি অনিল দেখিয়া ফেলে।

কয়েক দিন পরে হরিনাথ মেসে ফিরিল খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে। অনিল সহানুভূতি দেখানো দূরে থাকুক, বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল—"ও কি? গাড়ী-চাপা পড়েছিলে না কি?"

হরিনাথ গম্ভীর হইয়া বলিল—"হুঁ।"

অনিল উচ্চহাস্যে ঘর কাঁপাইয়া বলিয়া উঠিল—"যা ভেবেছি, ঠিক তাই। কোন্ গাড়ীর তলে পড়েছিলে—গরুর নয় তো?" হরিনাথ কোনও উত্তর দিল না—শুধু ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহার পরম বন্ধুর দিকে তাকাইয়াই দৃষ্টি সরাইয়া লইল।

পরদিন অনিল অফিস যাইবার সময় হরিনাথকে ঘর হইতে বাহির হইতে না দেখিয়া বলিল—"কি হে, আজ বেরোবে না? পায়ের ব্যথা কমেনি বুঝি?"

স্থির গম্ভীরস্বরে হরিনাথ বলিল—"না। আর

বেরোনোর দরকার নাই।" অনিল মনে করিল—হরিনাথের চাকরি সন্ধান করিয়া লইবার উদ্যম একবার গাড়ী-চাপা পড়িয়াই শেষ হইয়াছে। এইবার দেশের ছেলে দেশে ফিরিয়া যাইবে। সে হাসিয়া বলিল—"কেন—চাকুরির সখ মিটেছে?"

হরিনাথ বলিল—"হুঁ। চাকুরি আমার জুটেছে।"

অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া অনিল একদমে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া ফেলিল—"কবে? কোথায়? কি কাজ? কত মাইনে?"

এতগুলি প্রশ্নের বহর দেখিয়া হরিনাথ হাসিয়া বলিল—"ভড়কিও না অনিল। সব কথা পরে শুনো—তোমার অফিসের দেরী হয়ে যাচ্ছে যে।" অনিল বলিল—"তা হোক্।"

হরিনাথ বলিতে লাগিল—কাল সে যে মোটরকারে প্রায় চাপা পড়িবার মত হইয়াছিল—তাহার আরোহী ছিলেন একজন সাহেব। ধাক্কা খাইয়া সে পড়িয়া যাইতেই, সাহেবটি গাড়ী থামাইয়া তাহাকে সেই গাড়ীতে তুলিয়া ফেলেন। অবশ্য এই ঘটনায় লোক জমিয়া মোটর ঘিরিয়া ফেলে—কিন্তু তাহার আঘাত বিশেষ গুরুতর না হওয়ায়, সাহেবকে ছাড়িয়া দেয়। সাহেবটি একজন ধনী ব্যবসাদার। তাহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া সাহেব হরিনাথের এখানে আগমনের উদ্দেশ্য জানিতে পারেন। সমস্ত শুনিয়া, দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার অফিসে কেশিয়ারের পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহাকে আগামী সোমবার হইতে কাজে যোগ দিতে হইবে।

অনিল সমস্ত শুনিয়া শুষ্ক মুখে বলিল—"তা বেশ—বেশ। মাইনেটা কত হলো।"

"আপাততঃ একশো করে দেবে।"

অনিলের কণ্ঠ হইতে তালু পর্য্যন্ত শুকাইয়া উঠিল—একশো! তাহার যে মাত্র চল্লিশ! কোনও রকমে হাসির ভাব মুখে টানিয়া আনিয়া সে বলিল—"যা হোক্, একটা উপায় হলো তোমার! ভাগ্যিস্ গাড়ী-চাপা পড়েছিলে।"

অনিল চলিয়া গেলে হরিনাথ মনে করিল—বন্ধুর শ্লেষবিদ্রূপের খোঁচা এতদিনে যেন দূর হইয়া গিয়াছে—সে এইবার ইহাদের সম্মুখে অনেকটা মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে।

সন্ধ্যার পর, অনিল মেসে ফিরিয়া এই সংবাদ মেসে রাষ্ট্র করিয়া দিল। সকলেই অবাক হইয়া মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল—"গেঁয়ো ভূতটার বরাত-জোর খুব! গাড়ী-চাপা তো অনেকেই পড়ে—যমের বাড়ীও অনেকেই যায়। কিন্তু নেহাৎ ভাগ্যের জোর না থাকিলে কি আর গাড়ী-চাপা পড়ে মোটা মাইনের চাকরি জোটে হে!"

সকলে একে একে আসিয়া উপদেশের উপর উপদেশ বর্ষণ করিয়া হরিনাথকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। একজন বলিল—"হরিনাথবাবু, চুলগুলো কালই হেয়ার্ কাটারের বাড়ী থেকে ছাঁটিয়ে আসুন। যে বুনো গোঝের চুল—সাহেব চটতে কতক্ষণ। গাড়ী-চাপা-পড়া চাকরি মশায়, দেখে শুনে করবেন।"

গেঁয়ো হরিনাথ এই মুখর সহরবাসীদের কথায় আজ আর বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইল না—কারণ, সে আর কিছু না বুঝিলেও, এটুকু বুঝিতে পারিয়াছিল যে, তাহার এই অপ্রত্যাশিত চাকুরি প্রাপ্তিতে এই সব অপদার্থ হিংসুকগুলি যে মর্ম্মপীড়া পাইতেছে, তাহার তুলনায় কথায় বেশী বেদনা দেওয়া অসম্ভব।

(৬)

শ্রাবণ মাসের সন্ধ্যা। হরিনাথ জানালার গরাদে ধরিয়া ঘনকৃষ্ণ মেঘে ঢাকা আকাশের দিকে তাকাইয়াছিল। আজ এই বাদল সন্ধ্যায় আর-বছরের এমনি দিনের কথাই তার মনে পড়িতেছিল। সে তখন গ্রামে। বর্ষার সময় গ্রামের খাল বিল সমস্ত জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলে, ডিঙ্গি নৌকা লইয়া বাইচ খেলা, জাল লইয়া মাছ ধরাতেই দিনরাত্রির অনেক সময় কাটিয়া যাইত। সে কি অফুরন্ত আনন্দ-উত্তেজনায় দিনগুলি কাটিয়াছে! বর্ষণ আরম্ভ হইলে, যখন খালবিল, পুষ্করিণী হইতে কইমাছ কাণে হাঁটিয়া সার বাঁধিয়া ডাঙ্গায় উঠিত—তখন গ্রামের বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত কেহই ঘরে চুপটি করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিত না। সকলেই মাছ ধরিবার জন্য জলের ধারে আসিয়া উপস্থিত হইত। কিন্তু এখানে—এই বিশাল নগরীতে পল্লীর সেই মনোরম চিত্রের অতি সামান্য রেখাটুকু পর্য্যন্ত নাই। এখানে মেঘের গুরু-গম্ভীর গর্জ্জন রাস্তায় হরেক রকমের যান-বাহনের কোলাহলে ডুবিয়া যায়—সারি সারি
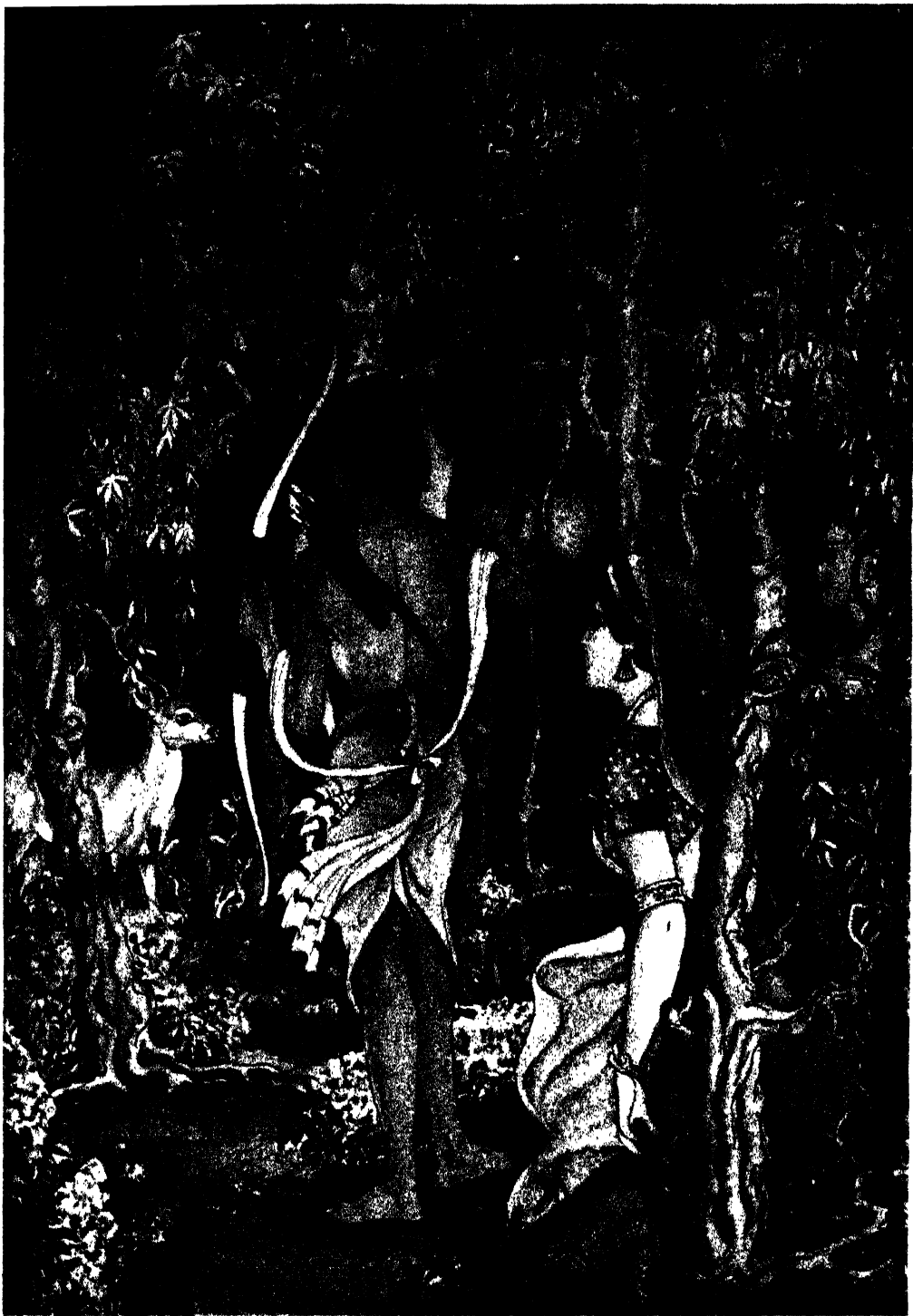
মায়া-মৃগ

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ] [BHARATVARSHA HALFTONE & PTG. WORKS.

"এই দশ টাকা।"

হরিনাথ বাক্স খুলিয়া টাকা বাহির করিয়া দিল। এত টাকার কি প্রয়োজন—তাহাও সে জিজ্ঞাসা করিল না। অনিল টাকা কয়টি হাতে পাইয়া খুসী হইয়া বলিল—"তোমার কাছে মোট পঞ্চাশ টাকা নেওয়া হলো আমার। এই মাসের মাইনেটা পেলেই শোধ করে দেব।"

অনিলের ছলনা দেখিয়া মনে মনে হাসিল—কারণ, তাহার মাহিনার চল্লিশ টাকা দিয়া কি করিয়া সে পঞ্চাশ টাকা শোধ দিবে—তাহা সে বুঝিতে পারিল না। অথচ এ মিথ্যাটুকু অনিলের না বলিলেও চলিত।

অনিল টাকা লইয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল—হঠাৎ কি মনে করিয়া ফিরিয়া হরিনাথের স্কন্ধের উপর হাত রাখিয়া বলিল—"হরিনাথ!"

হরিনাথ জিজ্ঞাসু নেত্রে তাহার দিকে চাহিল।

অনিল বলিল—"তোমার মন খারাপ বল্‌ছিলে।—কিন্তু এখানে—এই সহরেও তো মন ভাল করবার অনেক জিনিস আছে!"

হরিনাথ ব্যগ্র হইয়া বলিল—"আছে? আছে?"

উৎসাহিত হইয়া অনিল বলিতে লাগিল—"আছে বৈ কি, হরিনাথ। এখানে স্ফূর্ত্তির যত রকমের জিনিষ আছে—কোথায় তোমাদের পাড়াগাঁয়ে তা মিল্‌বে। এই মেসের ঘরে চুপটি করে বসে থাকলে তো সে আনন্দের খোঁজ পাবে না। একটু চোখ মেলে তাকিয়ে দেখ্‌তে হয়। যার অর্থের অভাব নাই—তার স্ফূর্ত্তির অভাব নাই এখানে। আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে—এখন আসি। এইবার একটু চেষ্টা করে দেখ্‌বো—তোমাকে চাঙ্গা করে তুল্‌তে পারি কি না।"

অনিল হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল—আর হরিনাথ বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল—এ কোন্ স্ফূর্ত্তির কথা অনিল তাহাকে বলিয়া গেল—কোন্ অমৃতের সন্ধান সে দেখাইয়া দিবে!

(৭)

দুই দিন পর অনিল হরিনাথকে বলিল—"হরিনাথ, চল না হে, একটু ঘুরে আসি।"

হরিনাথ বিস্মিত হইয়া বলিল—"কোথায়?"

"এই বায়স্কোপে। আজ বড় সুন্দর ফিলম্ আছে। বায়স্কোপ তো কোনও দিন দেখনি—দেখে এসো, বেশ লাগ্‌বে।"

হরিনাথ বলিল—"না থাক—বাজে খরচ করি এমন টাকা আমার নাই।"

মুরব্বীর ভঙ্গীতে অনিল বলিল—"কিছু পরোয়া নাই—আমি দেব।"

হরিনাথ তীব্র দৃষ্টিতে অনিলের দিকে চাহিল। সে দৃষ্টির এম্‌নি তেজ যে যাহার উপর তাহা বর্ষিত হয়—সেই সঙ্কুচিত, লজ্জিত হইয়া উঠে। অনিলের মাথাও হেট হইয়া আসিল।

"অনিল, তোমার বাবা কি করেন?"—হরিনাথের এই প্রশ্নে অনিল একটু থতমত খাইয়া গেল। তার পর সে ভাবটা সামলাইয়া লইয়া বলিল—"সে খোঁজে তোমার দরকার?" তাহার কথার স্বরে বেশ জানা গেল যে, তাহার মর্য্যাদায় আঘাত লাগিয়াছে।

হরিনাথ বলিল—"দরকার আছে বৈ কি অনিল। তোমার বাড়ীর অবস্থা তো আমার জান্‌তে বাকি নেই। তোমার বাপ যজমান বাড়ী থেকে যা কিছু পান, তাই দিয়ে সংসার চালান। তাঁরই ছেলে হয়ে তোমার এত বাজে-খরচ করা কি উচিত? মাইনে যা পাও, তার চেয়ে বেশী খরচ কর তুমি—তবে বাড়ীতে পাঠাও কি, শুনি?"

অম্লান বদনে অনিল বলিল—"কিছুই না। কিন্তু এইটুকু জেনে রাখো হরিনাথ—আমি এখানে এসেছি স্বেচ্ছায়। তোমার মত বাপ মা পয়সার লোভে আমাকে জোর করে পাঠান নি।"

এই কথাটুকুর মধ্যে যেটুকু খোঁচা ছিল—তাহা হরিনাথকে বড় মর্ম্মান্তিক ভাবে বিদ্ধ করিল। সে বিবর্ণ মুখে বলিল—"সে কথা সত্যি অনিল।"

হরিনাথকে আঘাত করিতে পারিয়াছে ভাবিয়া অনিল সন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। সে সহাস্যে বলিল—"কিন্তু বাপ মা ধরে বেঁধে পাঠিয়েছে বলে সব টাকা তাঁদের দিতে হবে—এর তো কোনও হেতু নাই হরিনাথ। নিজের জন্যও তো কিছু রাখ্‌তে হয়।"

হরিনাথ চুপ করিয়া রহিল। অনিল বলিতে লাগিল—"আমি হলে কি করতুম জান? অমন বাপ মাকে এক

পয়সাও পাঠাতুম না। যারা নিজের স্বার্থের জন্য জোর করে ছেলেকে—”

“অনিল!” হরিনাথের তীব্র কণ্ঠস্বরে অনিল থামিয়া গেল “তুমি কি করতে, সে আমি জানি। কিন্তু সবাই তুমি নয়—এইটুকু মনে রেখো ”

ক্রুদ্ধস্বরে অনিল বলিল—“কিন্তু এতই যদি বাপের সুপুত্তুর তুমি—তবে কেন আবার রাগ করে বলা হয়—‘আর গ্রামে ফিরবো না, আর ওদের মুখ দেখবো না’!”

শান্ত স্বরে হরিনাথ বলিল—“তুমি ভুল বুঝেছো অনিল। সেটা রাগের কথা নয়—অভিমানের কথা! রাগ আর অভিমান দুটো আলাদা জিনিষ। অভিমান হয় তাদেরই উপর, যাদের ভালবাসা যায়।”

তার পর মৃদু হাসিয়া বলিল—“আমরা গেঁয়ো ভূত—আমরা করি অভিমান। বাপ মায়ের উপর রাগ করা আমাদের স্বভাব নয়, যা তোমরা—এই সহরের লোকেরা পার। কিন্তু এ সব বাজে কথা থাক তোমার দেরী হয়ে যাচ্ছে না? বায়স্কোপে যাবে কখন?”

ক্ষুব্ধ ভাবে অনিল বলিল—“এই যাচ্ছি। কিন্তু আমি তোমার ভালোর জন্যই এসেছিলুম—মাঝ থেকে কতগুলো কথা শুনিয়া দিলে!” অভিমান-ক্ষুব্ধ অনিল উঠিয়া দাঁড়াইল। হরিনাথ তাহার হাত ধরিয়া কোমল কণ্ঠে বলিল—“অনিল, সত্যি বল্‌ছো, তোমার সাথে গেলে মন ভাল হবে?”

গম্ভীর ভাবে অনিল বলিল—“আমার তো তাই বিশ্বাস।”

হরিনাথ বলিল—“বেশ, চলো। কিন্তু আমার কি বিশ্বাস জান অনিল? আমার বিশ্বাস—যে আনন্দ পয়সা দিয়ে কিনতে হয়, তার মধ্যে প্রাণ নেই—তাতে স্ফূর্ত্তি হয় না।”

বায়স্কোপ দেখিবার পর অনিল হরিনাথকে লইয়া ট্যাক্সিতে গড়ের মাঠ, ইডেন গার্ডেন প্রভৃতি ঘুরিয়া যখন মেসে ফিরিল—তখন রাত দশটা। অনিল জিজ্ঞাসা করিল—“কেমন লাগ্‌ছে হরিনাথ—মন একটু ভাল বোধ হচ্ছে না কি?”

হরিনাথ ইহার উত্তরে কিছু বলিল না; শুধু বলিল—“হুঁ।”

উৎসাহিত হইয়া অনিল বলিতে লাগিল—“ভাল লাগ্‌বে বৈ কি—ওগুলো তো আর ভাল না লাগ্‌বার জিনিষ নয়। তুমিও যেমন—শুধু চুপটি করে মেসের কোণে বসে থাকলে কি করে ভাল থাকবে।”

তার পর একটু হাসিয়া বলিল—“এ তো কি! আরও ভাল জিনিষের সন্ধান তোমাকে দিতে পারি! আস্‌ছে শনিবার তোমাকে একবার থিয়েটারে নিয়ে যাব।”

হরিনাথ হাসিয়া বলিল—“থিয়েটারের পর আর কি কিছু নাই অনিল?”

“তাও আছে হরিনাথ। কিন্তু ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে হবে—নইলে বদহজম হবে কি না?”

হরিনাথ এ কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—“আজ কত খরচ হলো তোমার?”

“বিশেষ কিছু নয়—ছয় টাকা।”

সে রাত্রে অনিলের ঘুম হইল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল—এতগুলি টাকা বৃথাই সে নষ্ট করিয়া ফেলিল—ইহার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না!

(৮)

অনিলের হরিনাথকে নিজের পয়সা দিয়া বায়স্কোপ দেখাইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। সে মনে করিয়াছিল—ইহাকে ধীরে ধীরে লোভ দেখাইয়া তাহার দলে টানিতে পারিলে, আর অর্থের অনাটন হইবে না। একবার এই সহরের নানা রঙ-বেরঙের স্ফূর্ত্তির আবর্ত্তে তাহাকে নামাইতে পারিলে, আর কিছু না হউক, উহারই ঘাড় ভাঙ্গিয়া তাহারও দিন যাইবে ভাল ভাবেই। তাই সে পাকা ব্যবসাদারের মত ঠিক করিল যে, প্রথম প্রথম সে-ই পয়সা খরচা করিয়া হরিনাথকে নানা আমোদে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিবে। তার পর একবার হরিনাথ ভাল ভাবে টোপ গিলিতে পারিলে, সে পাকা খেলোয়াড়ের মত তাহাকে খেলাইয়া লইয়া বেড়াইবে। যদি এই গেঁয়ো ভূতের মাথায় হাত না বুলাইতেই পারিল—তাহা হইলে বৃথাই সে এ বার বছর সহরে বাস করিতেছে।

কিন্তু তাহার সব মতলবই ফাঁসিয়া গেল। শনিবারে হরিনাথকে লইয়া যাইবে মনে করিয়া তাহার নিকট

আসিতেই, সে স্পষ্ট জবাব দিয়া বসিল—সে কোথাও যাইতে পারিবে না, তাহার শরীর ভাল নাই।

অনিল হাসিয়া বলিল—"এতদিন তো মন খারাপ ছিল—আবার শরীর খারাপ হলো কবে থেকে?"

গম্ভীর কণ্ঠে হরিনাথ বলিল—"যেদিন তোমার ছয় টাকা খরচ করিয়েছি—সেই দিন থেকে। আমি বেশী বকতে ভাই পারবো না। তুমি যেখানে ইচ্ছে যাও অনিল—আমাকে আর টেনো না। আমি এমনি বেশ আছি!" অনিল এইবার সত্যসত্যই রাগ করিল। কারণ, তাহার অচলা ধারণা হইয়াছিল, আজ আর হরিনাথ কোনও আপত্তি করিবে না।

সে ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল—"তুমি যাবে কি না, তাই জিজ্ঞেস করতে এসেছিলুম। নইলে, তুমি যাও কি থাক, তাতে আমার কিছু আসে-যায় না। সেটা তোমার নিজের গরজ, বুঝেছ?" সে বাহির হইয়া যাইতেছিল—হরিনাথ তাহার একখানি হাত ধরিয়া স্নিগ্ধ হাস্যে মুখ ভরিয়া বলিল—"অনিল, রাগ করো না ভাই! তোমাদের এই সহরের আমোদে আমাদের মন ভরে না—বরং মনের জ্বালা বাড়ে। সে রাত্রে আমার ঘুম হয় নি। ওসব এই সহরের লোকদেরই পোষায়—যাদের চোখে ঘুম নাই।"

অনিল চলিয়া গেলে, হরিনাথ শয্যায় শুইয়া পড়িল। আজ কয় দিন হইতে তাহার শরীর ভাল নাই। সহরের আবহাওয়া তাহার একেবারেই সহ্য হইতেছে না। তাহার মাঝে মাঝে মনে হইতেছিল—এই ইট পাটকেল-ঘেরা সহরে ছাড়িয়া সে যদি দূরে—অনেক দূরে—গ্রামে চলিয়া যায়—তবেই আবার মনের স্ফূর্ত্তি, প্রাণের সরলতা, লাভ করিয়া সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারে। কিন্তু তাহা তো হইবার উপায় নাই। এই সহরে—এই ধোঁয় বর্ণে ভারাক্রান্ত বাতাসের মধ্যেই তাহাকে থাকিতে হইবে,—আর মুক্ত বায়ুতে বিচরণ তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে না। যত দিন তাহার প্রাণের স্পন্দন ক্ষীণমাত্র থাকিবে—তত দিন তাহাকে অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইবে; শেষ নিঃশ্বাস পড়িলে তাহার ছুটি—তাহার নিষ্কৃতি।

(৯)

দেখিতে দেখিতে পূজা আসিয়া পড়িল। সুনীতির এবার কোনও কাজেই মন বসিতেছিল না,—তাহার মাতৃহৃদয় অনুক্ষণ হরিনাথের জন্য আকুল-বিকুলি করিতেছিল। আজ ছয়মাস সে গৃহছাড়া। সে এখন কোথায় কি করিতেছে, বাঁচিয়া আছে কি না, কোনও সংবাদই তাহারা জানে না। পুত্রের অভাব এই সময় সুনীতি বড় তীব্র ভাবেই অনুভব করিতেছিল। পূজ-বাড়ী হইতে ঢাকের নিনাদে সমস্ত পল্লী মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল; ঐ শব্দ সুনীতির বুকে বড় কঠিন হইয়া বাজিতে লাগিল। কিন্তু সংসারে থাকিতে হইলে হাজার সুখ-দুঃখের মধ্যেও কর্ত্তব্যটুকু করিয়া যাইতে হয়। তাই ঘরদোর পরিষ্কার করা, ছেলেদের জন্য মুড়িমুড়কি, নাড়ু, মোয়া সবই তাহার তৈরী করিতে হইতেছিল বটে, কিন্তু মনে তাহার সুখের লেশমাত্র ছিল না।

সেদিন সপ্তমী। সকাল হইতে মন্টু ও চুনি প্রতিমা দেখিবার জন্য বায়না ধরিয়াছে। কাঁদিতে কাঁদিতে তাহারা চোখ ফুলাইয়া ফেলিল দেখিয়া সুনীতি স্বামীকে বলিল—"ওগো, ছেলে মেয়ে যে কেঁদে খুন হ'লো—ওদের ঠাকুর দেখিয়ে আন না।" শিবশেখর ছেলেদের লইয়া বাহির হইয়া গেল।

প্রতিমা দেখিয়া শিবশেখর ছেলেমেয়ে লইয়া যখন হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাড়ী ফিরিল—তখন বেলা এগারোটা। বাড়ী আসিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে ডাকিল—"ও গিন্নি, গিন্নি!" সুনীতি রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া দেখিল—স্বামীর এক হাতে বড় একটি পার্শ্বেল ও অন্য হাতে একটা ইন্সিওরের খাম।

শিবশেখর আনন্দে গদগদ হইয়া বলিল—"হরিনাথ পাঠিয়েছে এই সব।" সুনীতির বুকের ভিতর আনন্দের লহরী খেলিয়া গেল—তাহা হইলে পুত্র তাহার বাঁচিয়া আছে!

আনন্দের আবেগে শিবশেখরের চোখ-দুটি ছলছল করিতে লাগিল—কহিল—"হরিনাথ পাঁচশো টাকা পাঠিয়েছে। সে কল্‌কাতায় একশো টাকা মাইনের চাকুরি করে।"

পার্শ্বেলটি খোলা হইলে দেখা গেল—তাহাতে দুইখানি ভাল খদ্দরের কাপড়—হরিনাথ তাহার বাপ মার জন্য পাঠাইয়াছে। আর ভাই বোনের জন্য পাঠাইয়াছে—দুইটা করিয়া ভাল জামা, আর কতকগুলি খেলনা।

মণ্টু ও চুণি জিনিষগুলি দেখিয়া আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিল।

শিবশেখর আনন্দের আবেগে বলিতে লাগিল—“এত দিনে আমাদের দুঃখু ঘুচলো। আর পরের গোলামি করছি না। পাঁচশো টাকা পাঠিয়েছে—এ্যা। এ যে আমার পাঁচ বছরের উপার্জ্জন! দেখ্‌লে গিন্নি, ছেলেকে বিদেশে পাঠানোর ফল!”

কয়েকটি কথা মনে উদয় হইতেই, সুনীতির প্রফুল্ল ভাব মন্দীভূত হইয়া আসিল।—হরিনাথ পূজার সময় বাড়ীতে আসিল না কেন? এ সময় সবাই ছুটি পায়—শুধু সেই কি পাইল না? না—নিশ্চয়ই সে অভিমান করিয়া আছে।

সে ম্লান মুখে বলিল—“পাঁচশো টাকা, এত জিনিষ পাঠালো—কিন্তু সে কি আসতে পারলো না। তাকে আজই একখানা চিঠি লিখে দাও—সে যেন অতি অবিশ্যি আসে।”

শিবশেখর বলিল—“হুঁ, তোমারও যেমন—আর কি তার গ্রামে মন বসে। সে এখন কলকাতায়—মস্ত বড় সহরে।—গ্রামের কথা এত দিন ভুলে বসে আছে।”

“তা ভুলুক।—কিন্তু তার মায়ের কথা সে আজ পর্য্যন্ত ভোলে নি—এ কথা আমি জোর করে বল্‌তে পারি। তুমি এখুনি তাকে চিঠি লেখো।”

শিবশেখর চিঠি শেষ করিয়া ঠিকানা লিখিতে গিয়া দেখিতে পাইল, হরিনাথ ঠিকানা দেয় নাই। সে সুনীতিকে বলিল—“দেখেছো ছেলের কীর্ত্তি! ঠিকানা দিতে ভুলে গেছে।”

“ঠিকানা দেয়নি!”

“না।”

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সুনীতি বলিল—“বুঝেছি—সে আমাদের শাস্তি দিতে চায়। সে আমাদের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করেছে।”

“কি করে বুঝ্‌লে?”

“ওগো—এটুকুও কি বুঝ্‌তে পারি নে আমি? আজ ছ'মাস সে বাড়ীছাড়া—এ পর্য্যন্ত একটা খবরও সে দেয় নি!—এত দিন পরে যদিও বা চিঠি লিখ্‌লো—তবুও তার ঠিকানাটা দিল না। এতে আর কি মনে হয়?”

শিবশেখর চুপ করিয়া রহিল। সুনীতি বলিতে লাগিল—“আমরা চেয়েছি অর্থ—সে তাই পাঠিয়েছে। তার মনে দারুণ আঘাত করে তাকে বিদেশে পাঠিয়েছি—তাই সে অভিমান করে এলো না।”

শিবশেখর পুরুষ মানুষ—অর্থের সঙ্গেই তার বিশেষ কারবার; সে অত তলাইয়া না বুঝিয়া, হাসিয়া বলিল—“কিন্তু অভিমান করে সে বেশী দিন থাক্‌তে পারবে না। এখন না আসুক—পরে নিশ্চয়ই আসবে।”

আর্ত্ত স্বরে সুনীতি বলিয়া উঠিল—“না গো, না—সে তেমন ছেলে নয়। আমি যে তাকে খুব চিনি। তোমাকে আজই কল্‌কাতা যেতে হবে—তাকে না আন্‌লে চল্‌বে না।”

শিবশেখর বলিল “পাগল! আমি কি কল্‌কাতার কিছু চিনি যে সেখানে যাব!”

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকাইয়া সুনীতি বলিল—“নিজে যেতে পারো না—অথচ ছেলেকে পাঠিয়েছ তো খুব। ও কথা বল্‌তে লজ্জা করে না তোমার।” তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল—সে দ্রুতপদে সেস্থান হইতে চলিয়া গেল।—শিবশেখর কিছুক্ষণ সেই স্থানে বিমূঢ়ের মত বসিয়া থাকিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইল—কেন না, তাহার ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের কথা পাড়া-প্রতি-বাসীকে না জানানো পর্য্যন্ত সে স্বস্তি পাইতেছিল না।

(১০)

শীতকাল। সূর্য্য তখনও অস্ত যায় নাই। কিন্তু কলিকাতা সহর ঘন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হইয়া অন্ধকারাবৃত হইয়া উঠিয়াছে। হরিনাথ অফিসের ছুটির পর ক্লান্তদেহে নিজেকে টানিয়া লইয়া মেসে ফিরিতেছিল। প্রত্যহ বৈকালে তাহার জ্বর আসিত—আজও সে সুস্থ ছিল না।

সেই জ্বরাক্রান্ত দেহ লইয়া জনবহুল রাস্তার ভারী বাতাসে চলিতে তাহার নিঃশ্বাস রোধ হইয়া আসিতেছিল।—কিন্তু হাজার কষ্ট হইলেও, বৃথা অপব্যয়ের ভয়ে সে ট্রামে চড়িত না।

কিছুদূর আসিয়া হরিনাথ দেখিল—রাস্তার মাঝখানে অসম্ভব জনতা জমিয়া গিয়াছে। সে সেইখানে আসিয়া ব্যাপার কি বুঝিতে পারিল। একটি লোক মোটর

চাপা পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে। তাহার প্রাণহীন রক্তাক্ত দেহ রাস্তার ধূলায় লুটাইতেছে। সেই দৃশ্য দেখিয়া হরিনাথ শিহরিয়া সরিয়া আসিল। এই ধরণের দৃশ্য সে এখানে যে কত দেখিয়াছে—তাহার ইয়ত্তা ছিল না। তবুও কেন যে সে ইহাতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছে না বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সে ভাবিতে ভাবিতে চলিল—আজ ঐ লোকটি মোটর চাপা না পড়িয়া যদি সে পড়িত—তাহা হইলেই তো ভাল হইত! এই সহরে তিল তিল করিয়া নিজেকে মৃত্যুর মুখে তুলিয়া না দিয়া—একেবারে মরিয়া যাওয়াই তো শ্রেয়! পরক্ষণেই তাহার মনে হইল—না, সে এখানে মরিবে না। তাহার প্রাণ বাহির হইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে সে তাহার গ্রামে উপস্থিত হইবে। যেখানকার বাতাসে সে প্রথম নিঃশ্বাস লইয়াছে—সেখানেই সে তাহার শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিবে। কে জানে এটুকু তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে কি না।

'এই বাবু হটো জলদি'—আতঙ্কে হরিনাথ সরিয়া যাইতেই, একখানি জুড়ি গাড়ী তাহার পাশ দিয়া বেগে চলিয়া গেল। আর একটু হইলে সে চাপা পড়িয়াছিল আর কি! হরিনাথের বড় হাসি পাইল—সদাসর্ব্বদা মৃত্যুকে হাতের কাছে রাখিয়া, কি সুখেই লোকে এখানে বাস করে! গ্রামের নিরুদ্বেগ শান্তিকে উপেক্ষা করিয়া মানুষ কত দুঃখই না ভোগ করিতেছে এখানে!

কিছুদূর অগ্রসর হইতেই, আবার ফুটপাথের উপর জনতা দেখিয়া, হরিনাথ ব্যাপার কি দেখিবার জন্য উঁকি মারিল। দেখিল—একটি ভদ্রলোক মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিয়াছে—আর তাহাকেই ঘিরিয়া অনেকগুলি লোক জটলা করিতেছে। অদূরে লাল পাগড়ি মাথায় পুলিশ নিরুদ্বেগ দাঁড়াইয়া তাহার গোঁফ পাকাইতেছে। একজনকে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিতেই সে বলিল—বাবুটির পকেট কাটিয়া এক হাজার টাকা সমেত ব্যাগটি তুলিয়া লইয়া গাঁটকাটা সরিয়া পড়িয়াছে। সে প্রায় তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছিল,—কিন্তু অল্পের জন্যই পারিয়া উঠে নাই। গভর্ণমেণ্টের বেতনভোগী এই নির্লজ্জ অপদার্থ প্রাণীটির কথা শুনিয়া হরিনাথ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।—এই অপহৃত ব্যক্তিটির জন্য কি জানি কেন তাহার একটুও দুঃখ বোধ হইল না।—তাহার মনে হইল—বেশ হইয়াছে। যাহারা স্বেচ্ছায় সুখের আশায় সহরে বাস করে,—যাহাদের নানারকমে ঠকিয়াও শিক্ষা হয় না—তাহাদের এম্‌নি শাস্তি হওয়াই দরকার।

মেসে পৌঁছিয়া হরিনাথ সেদিন আর শয্যা আশ্রয় করিল না তাহার মন হঠাৎ আজ যেন হালকা হইয়া আসিয়াছিল। মনে করিল—আজ একবার অনিলের কাছে যাইবে। সেইদিন তাহাকে বিমুখ করিবার পর অনিল আর বড় একটা হরিনাথের নিকট আসিত না—হরিনাথও আপনাকে লইয়াই থাকিত। আজ সে অনেক দিন পরে অনিলের কক্ষে উপস্থিত হইল। অনিল তখন প্রসাধনে নিযুক্ত ছিল। হরিনাথ হাসিয়া বলিল—"কি হে, বেরোচ্ছ না কি?"

অনিল হরিনাথের আগমনে একটু বিস্মিত হইয়াছিল; গম্ভীর ভাবে বলিল—"হুঁ! কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়েছো যে বড়?"

হরিনাথ হাসিয়া বলিল—"ইচ্ছে হলো। কিন্তু তুমি যাচ্ছ কোথায়? থিয়েটারে?"—"হুঁ"।

অনিলকে বিস্মিত করিয়া দিয়া হরিনাথ বলিল—"অনিল, আমিও যাব আজ।"

মৃদু হাসিয়া অনিল বলিল—"সে কি কথা হরিনাথ—তাতে দোষ হবে না?"

"জানি নে। তবে সেদিন তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে অবধি মনটাও আমার ভাল নাই"

অনিল মুচকি হাসিল। সে বুঝিতে পারিল, এত দিনে হরিনাথের মতিগতি ফিরিয়াছে। মনে মনে কি যেন সঙ্কল্প করিয়া বলিল—"কিন্তু আমার ফিরতে দেরী হবে যে!" হরিনাথ উদাসভাবে বলিয়া ফেলিল—"তা হোক। মেসে তো আমার অনেক কাজ!"

থিয়েটারে লইয়া যাইবার ভান করিয়া অনিল হরিনাথকে যেখানে লইয়া আসিল—সে এক দুর্গন্ধময় সঙ্কীর্ণ গলি। তাহারই দুই পাশের বাড়ীর দরজায়, দোতালার বারান্দায় অসংখ্য নারী সজ্জিত হইয়া দাঁড়াইয়া। এই গলির ভিতর আসিয়া, কি জানি কি এক অজ্ঞাত ভয়ে, হরিনাথের কণ্ঠ হইতে তালু পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া আসিল—এই শীতের রাতে তাহার গা দিয়া ঘাম ঝরিতে

লাগিল। শুষ্ক কণ্ঠে হরিনাথ বলিল—"এ কোথায় আনলে অনিল ?"

হরিনাথের ভাব দেখিয়া মহাখুসী হইয়া অনিল বলিল—"ভয় কি হরিনাথ। ওরা অবলা। ওদের দেখে ভয় পাবার তো কোনও হেতু নাই।"

ম্লানমুখে হরিনাথ বলিল—"কিন্তু থিয়েটারে যাবে যে বল্লে ?" "যাব বৈ কি। এদিকে এক বন্ধু আছে আমার—চল না, একটু ঘুরে যাই।"

একটি বাড়ীর দরজায় আসিয়া অনিল বলিল—"একটু দাঁড়াও—আমি এখুনি ফিরছি।" অনিল ভিতরে চলিয়া গেলে, হরিনাথ একা সেই দরজার সামনে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বুকের ভিতর কি যেন এক অজানা ভয়ে ঢিপঢিপ করিতে লাগিল। তাহার অনুশোচনা হইতে লাগিল—কেন আজ অনিলের সাথে আসিবার খেয়াল তার মাথায় চাপিয়াছিল। মিনিট পাঁচেক পরে অনিল বাহির হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"ওহে হরিনাথ, বন্ধুটি আমায় কিছুতেই ছাড়ছেন না। তোমার দর্শন-ভিখারী তিনি। এ বাড়ীতে একটু পায়ের ধুলো দেবে কি ?" হরিনাথের মুখ দিয়া কোনও কথা বাহির হইল না—শুধু ফ্যাল ফ্যাল করিয়া সে অনিলের দিকে চাহিয়া রহিল।

অনিল তাহাকে এক রকম টানিয়াই বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল। এক সুসজ্জিত কক্ষে তাহাকে বসাইতেই, পাশের ঘর হইতে এক সজ্জিতা নারী বাহির হইয়া কদর্য্য হাসি হাসিতে হাসিতে হরিনাথকে বলিল—"বলি বঁধু—বন থেকে তো বেরিয়েছে বহু দিন। কিন্তু এদিকে পা মাড়াওনি কেন বলতো ?"

হরিনাথ এই নির্লজ্জ উক্তির কোনও উত্তর দিতে পারিল না—অধোবদনে চুপ করিয়া রহিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল—কোথায় কোন্ নরককুণ্ডে অনিল তাহাকে লইয়া আসিয়াছে! এখান হইতে সে কিরূপে উদ্ধার পাইবে!

অনিল তাহাকে অভয় দিয়া বলিল—"ভয় কি হরিনাথ, চঞ্চলা তোমায় খেয়ে ফেলবে না।"

চঞ্চলা হাসিতে হাসিতে হরিনাথের একখানি হাত ধরিয়া বলিল—"ভয় করছে ? আহা ষাট্ ষাট্,—দেখো, যেন মূর্চ্ছা যেয়ো না!" তাহার কথার ভঙ্গীতে অনিল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

চঞ্চলা অনিলকে দেখাইয়া বলিতে লাগিল—"তোমার এই বন্ধুটিও সেদিন এখানে এসেছিল—সেদিন এঁরও এই অবস্থাই হয়েছিল। তোমারও সব ঠিক হয়ে যাবে—ভয় কি ? তুমি না কি মনের অসুখে ভুগছো ? ও আরামের ওষুধ তো ডাক্তার কবরেজ দিতে পারবে না।—আমারই কাছে যে ওর ওষুধ রয়েছে।"

অনিল হাসিয়া বলিল—"দেখ তো—বন্ধুটিকে এইবার রোগমুক্ত করতে পার কি না।"

"অনিল!" হঠাৎ সমস্ত দেহের শক্তি একত্র করিয়া হরিনাথ বজ্র গম্ভীর স্বরে বলিল—"অনিল, আমি যাচ্ছি।" সে চঞ্চলার হাত ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

অনিল ব্যস্ত হইয়া বলিল—"উঠ্ছো যে এখুনি ? একটু বসো না—আমিও যাব যে!"

তীব্রকণ্ঠে হরিনাথ বলিল—"না, আর বসবো না। ঢের হয়েছে।" সে দৃঢ়পদক্ষেপে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

চঞ্চলা বলিল—"একেবারে গেঁয়ো। ওর ঘাড়ের ভূত নামতে এখনও দেরী আছে।"

হরিনাথ মেসে ফিরিয়া আসিয়া একেবারে শয্যা আশ্রয় করিল। তাহার আর কোনও কিছু ভাবিবার শক্তি ছিল না। সমস্ত শরীর কম্পিত করিয়া তাহার প্রবলবেগে জ্বর আসিয়া পড়িয়াছে। জ্বরের ঘোরে সে শীঘ্রই অচৈতন্য হইয়া পড়িল।

(১১)

"অনিল!"

অনিল ব্যগ্রভাবে বলিল—"কি—শরীরটা একটু ভাল বোধ হচ্ছে এখন ?" হরিনাথ পাণ্ডুর মুখে হাসির রেখা টানিয়া বলিল—"হাঁ। আজ কয়দিন বিছানায় পড়ে আমি ?"

"বিয়াল্লিশ দিন। কিন্তু তুমি বেশী কথা বলো না—ডাক্তার বারণ করেছে।"

একটু উত্তেজিত ভাবে হরিনাথ বলিল—"তা করুক। ডাক্তার ডাক্‌লেও আমি বলিনি—তার উপদেশও আমি মানবো না।"

তার পর কিছুক্ষণ দম লইয়া বলিল—"ডাক্তার কি বলেছে গেলপিং থাইসিস্ ?"

অনিল বলিল—"হুঁ—না, ঠিক অতটা নয়। কিন্তু এ ব্যারাম তো এক দিনে সৃষ্টি হয়নি—অনেক দিন ধরে ভিতরে-ভিতরে হয়েছে। আগে থেকে চিকিৎসা করালে—"

বাধা দিয়া হরিনাথ বলিল—"প্রয়োজন মনে করি নি। যাক্—জানালাটা একবার খুলে দাও ভাই। দম যেন আট্‌কে আসছে।" অনিল জানালা খুলিয়া দিল।—বাহিরে তখনও সম্পূর্ণ অন্ধকার হয় নাই—কেবল নৈশ অন্ধকার ও কয়লার গাঢ় ধোঁয়া জমাট বাঁধিবার উপক্রম করিতেছিল।

হরিনাথ অনেকক্ষণ বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"ওই যে ধোঁয়া তার কালো পর্দায় সহরটা ছেয়ে ফেল্‌ছে,—ও কি জানো অনিল! আমার মনে হয় সহরের সব পাপ, ব্যভিচার একত্র হয়ে জমাট বেঁধে ঐ ধোঁয়ার আকারে দেখা দেয়। তাই এখানে সহজে নিঃশ্বাস পড়ে না—বুক যেন চেপে ধরে।"

তার পর একটু দম লইয়া বুক চাপিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল—"যেখানে মানুষ মানুষের বুকে অক্লেশে ছোরা মারে,—ধনীর গর্ব্বিত চালচলন দরিদ্রকে প্রকাশ্য রাস্তায় হত্যা করে,—বন্ধু বন্ধুর অনিষ্টের জন্য সর্ব্বনাশের পথে টেনে নিয়ে যায়—সেখানকার বাতাস এম্‌নি ভারী হওয়াই তো উচিত!

তাহার কথায় অনিল অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করিয়া নড়িয়া চড়িয়া বসিল। হরিনাথের সেটুকু দৃষ্টি এড়াইল না —সে মৃদু হাসিয়া বলিল—"অনিল, অস্থির হয়ো না ভাই। আর তোমাকে বিরক্ত করবো না—আজই আমি বাড়ী যাবো!"

অনিল বিস্মিত হইয়া বলিল—"এই শরীর নিয়ে তুমি যাবে কি করে হরিনাথ? একজন সঙ্গে যেতে হবে তো?"

"কিছু দরকার নাই অনিল—আমি একাই যেতে পারবো। কিন্তু কেন যাচ্ছি, অনিল, জানো? বুঝ্‌তে পেরেছি—আর বাঁচবো না। তাই আমার শেষ নিঃশ্বাস ফেল্‌তে গ্রামে চলেছি। এখানে মর্‌লে আমার আত্মার সদ্গতি হবে না।"

রাত্রের ট্রেণে অনিল হরিনাথকে তুলিয়া দিল। ট্রেণ ছাড়িবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে হরিনাথ তাহার একখানি হাত ধরিয়া পরম স্নেহভরে বলিল—"অনিল, তোমাকে হয় ত আমি অনেক রকমে জ্বালিয়ে গেলাম—সে সব আমায় মাপ করো। আর তোমাকে বিরক্ত করবো না—শুধু এই চিরবিচ্ছেদের পূর্ব্বে এইটুকু ভগবানের কাছে জানাচ্ছি—তিনি যেন তোমায় সুখে রাখেন।—আর তুমি আমার হয়ে এইটুকু প্রার্থনা কর ভাই—যেন এই ট্রেণের মধ্যেই আমার প্রাণ বের না হয়। পল্লী জননীর শ্যামল কোলে পৌঁছিয়ে যেন আমার শেষ নিঃশ্বাস পড়ে।"

* * * * *

গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়া হরিনাথ কি করিয়া যে ট্রেণ হইতে নামিল, কি করিয়া যে গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে শুইয়া পড়িল—তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। এই উত্তেজনায় সে অনেকখানি রক্ত বমন করিয়া ফেলিল। গাড়োয়ান আরোহীটির শারীরিক শোচনীয় অবস্থা ও রক্ত-বমনের বহর দেখিয়া ভড়কাইয়া গেল। এখন ইহাকে যাহাতে সে তাড়াতাড়ি গ্রামে পৌঁছাইয়া দিতে পারে, সেজন্য দ্রুতবেগে গাড়ী চালাইয়া দিল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক মূর্চ্ছাহতের মত পড়িয়া থাকিয় হঠাৎ সংজ্ঞা লাভ করিয়া হরিনাথ অতি ধীরে হতাশের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"রামনগর এখনও এলো না গাড়োয়ান?"

গাড়োয়ান বলিল—"ঐ যে গাঁ দেখা যাচ্ছে বাবু!"

"এ্যা—দেখা যাচ্ছে।" বলিয়া হরিনাথ সমস্ত শরীরের ভর দিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তখন তাহার দেহে এমন শক্তি অবশিষ্ট ছিল না যে, উঠিয়া বসিতে পারে। সে শয্যার উপর ঘুরিয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক রক্ত তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া আসিল। মিনিট পাঁচেক দম লইয়া সে ধীরে ধীরে বুকে ভর দিয়া মাথা উঁচু করিল—হাঁ, সত্যই ত তাহাদের গ্রামের সীমা দেখা যাইতেছে। ঐ যে গাছ-পালার উচ্চ শীর্ষ ভেদ করিয়া গোপালজীর মন্দিরের চূড়া দেখা যাইতেছে। তাহার সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়া আনন্দের লহরী খেলিয়া গেল—আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া পরম তৃপ্তিভরে বলিয়া উঠিল—আঃ!

গাড়ী যখন গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিল—তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। কিন্তু তখন আর হরিনাথের দেহে প্রাণ ছিল না। গ্রামে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহা গ্রামের নির্ম্মল মুক্ত বাতাসে মিশিয়া গিয়াছিল।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

কয়লা ও তড়িৎ

অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম-এ

(১) •

কয়লার কথা ভারতবর্ষে বেশী আলোচিত হয় না। এমন কি উচ্চ-শিক্ষিত ভারতবাসীরাও কয়লা সম্বন্ধে অতি সামান্য জ্ঞান রাখেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু কয়লা বর্ত্তমান জগতের প্রাণ-স্বরূপ। কয়লা-বিজ্ঞান আধুনিক সভ্যতার বিজ্ঞান-মণ্ডলের চাবি-বিশেষ। ইংলাণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মানি ইত্যাদি সকল দেশেই কয়লা সম্বন্ধে কত বিশেষজ্ঞ সমাজে উচ্চতম সম্মান পাইয়া থাকে।

রুর হাতছাড়া হওয়ার ফলে জার্ম্মানির কয়লা-বিশেষজ্ঞেরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। বস্তুতঃ ভার্সাই সন্ধির পর হইতেই জার্ম্মাণ কয়লা-বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। বিগত চার পাঁচ বৎসর ধরিয়া কয়লার কথা আলোচনা করা একমাত্র বিজ্ঞান-সেবীদেরই নয়, শিল্প-ফ্যাক্টারির মালিকদের এবং মামুলি নরনারীর নিত্য কর্ম্মের মধ্যে পরিণত হইয়াছে।

ভার্সাইয়ের সন্ধির ফলে জার্ম্মানি অনেক জনপদ হারাইয়াছে। এই সকল জনপদে কয়লার খনি ছিল অনেক। খাদে কয়লা উঠিত এত যে, গোটা জার্ম্মান মুলুকের জন্য শিল্প ও গৃহস্থালীর কয়লা জোগানো ত হইতই, অধিকন্তু জার্ম্মান কয়লা দেশবিদেশে রপ্তানি হইত।

কিন্তু ভার্সাইয়ের প্রভাবে জার্ম্মানির লোকসান হইয়াছে বিস্তর। দেশবিদেশে কয়লা পাঠানো ত দূরের কথা, স্বদেশের কাজে যত কয়লা দরকার, সব জার্ম্মানির স্বদেশী খাদে উঠানো অসম্ভব। জার্ম্মানরা বিদেশ হইতে অনেক কয়লা আমদানি করিতে বাধ্য হইতেছে। শতকরা ৩৩ অংশ (অর্থাৎ জার্ম্মানদের দরকারী কয়লার তিনভাগের এক ভাগ) পাঁচ বৎসর ধরিয়া বিদেশ হইতে আসিতেছে।

(২)

কয়লা শব্দে আমরা ভারতবর্ষে বোধ হয় কাল রঙের কুচকুচে শক্ত পাথর জাতীয় বস্তু ছাড়া আর কিছু বুঝি না। কিন্তু কয়লার ওস্তাদেরা এই বস্তুর ভিতর নানা জাতি-ভেদ করিতে অভ্যস্ত।

সরেস সেরা কয়লাকে বলে আন্‌থ্রাসিট। অতি উচ্চ শ্রেণীর লোহা ও ইস্পাত তৈয়ারি করিবার জন্য আন্‌থ্রাসিট কাজে লাগে। কিন্তু এই জাতীয় কয়লা বড় বেশী পাওয়া যায় না।

আন্‌থ্রাসিট পাওয়া যায় জার্ম্মানির পূর্ব্ব অঞ্চলে সার দরিয়ার দুইধারকার জনপদে। জার্ম্মানির পশ্চিম অঞ্চলে সিলেশিয়া জনপদেও এই কয়লার খাদ আছে অনেক। তাহা ছাড়া রুর অঞ্চলের খাদগুলার অনেকাংশে আন্‌থ্রাসিট উঠে।

ভার্সাইয়ের সন্ধির ফলে সার-মুলুক বিলকুল জার্ম্মানির হাতছাড়া হইয়াছে। জেনেভার লীগ অব নেশুনসের বিচারে সিলেশিয়ার একটুকরা পোল্যাণ্ড পাইয়াছে। আর মাস পাঁচেক ধরিয়া রুর অঞ্চলও ফ্রাঁসের তাঁবে রহিয়াছে। কাজেই আন্‌থ্রাসিট কয়লার প্রধান খাদগুলার প্রায় সবই জার্ম্মানির নিকট হইতে পুরান শত্রুরা ছিনিয়া লইয়াছে। আন্‌থ্রাসিট-সমস্যা জার্ম্মানির শিল্প-মুলুককে আজ বিষম অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে।

(৩)

জার্ম্মানরা দায়ে পড়িয়া বিলাত হইতে আন্‌থ্রাসিট আমদানি করিতেছে। বিলাতী কয়লাওয়ালার ব্যবসায়ে ফুলিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজ সমাজে মজুর সমস্যাও কমিয়াছে। কাজেই বিলাতের রাষ্ট্র-বীরেরা ভার্সাই, জেনেভা এবং ফ্রান্সের রুর কাণ্ডকে অতি সুনজরেই দেখিতেছে। জার্ম্মানির "সর্ব্বনাশে" ইংরাজের "পৌষমাস" উপস্থিত।

কিন্তু সত্য কথা—আন্‌থ্রাসিটের টানাটানিতে জার্ম্মানরা এখনো কাবু হয় নাই। জার্ম্মানিকে শিল্পের তরফ হইতে কাবু করা সহজ নয়। কয়লার সমস্যাটা জার্ম্মানরা প্রাণপণে মীমাংসা করিতে সচেষ্ট।

প্রথম কথা, সিলেশিয়ার কিছু অংশ আজও জার্ম্মানির হাতে আছে। এই অংশের খাদেও আন্‌থ্রাসিট কয়লা উঠে। যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মানরা খাদগুলা ষোল আনা খাটাইত না। আজ দুর্দ্দিনে বাধ্য হইয়া জার্ম্মানির ফ্যাক্টারি-মালিকেরা খাদগুলাকে পুরাপুরি খাটাইতেছে। ফলতঃ সিলেশিয়ার আন্‌থ্রাসিট হইতে জার্ম্মানির কয়লা সমস্যা খানিকটা সহজ হইয়া উঠিতেছে।

দ্বিতীয় কথা, জার্ম্মানির মধ্যপ্রদেশে একপ্রকার কয়লা পাওয়া যায়। তাহার ভিতর পাথরের পরিমাণ খুব কম। মাটি, বালু এবং জল সেই কয়লার প্রধান অংশ। ইহাকে ইগনিট ব্রাউনকোল বা "নরম কয়লা" বলে। আন্‌থ্রাসিটের তুলনায় ইগনিটকে কয়লা না বলিয়া মাটি বলাই উচিত।

যাহা হউক, ইগনিট ব্যবহার করিয়াও অনেক শিল্প চালানো যায়। ইগনিটকে নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার দ্বারা শক্ত এবং উন্নত করিয়া তোলা সম্ভব। বহুকালের গবেষণার ফলে জার্ম্মান শিল্পের ওস্তাদেরা ইগনিটকে খুব মজবুত করিয়া তুলিয়াছে।

রাইন মুলুকের অনেক কয়লাই ইগনিট। এই ইগনিটকে আন্‌থ্রাসিটের কাছাকাছি ঠেলিয়া তুলিবার জন্য জার্ম্মান বৈজ্ঞানিকেরা অনেক মেহনৎ করিয়াছেন। আজ আন্‌থ্রাসিটের টানাটানির ফলে

সেই মেহনৎ আরও বাড়িয়া গিয়াছে। মধ্যপ্রদেশের ইগ্‌নিটকে রাইন জনপদের ইগ্‌নিটের সমান কার্যক্ষম করিয়া তোলা জার্ম্মান শিল্পের এক বিরাট সাধনায় পরিণত হইতেছে।

(৪)

ইগ্‌নিট কয়লাকে শক্ত করিয়া একপ্রকার বৃকেট বা ইট তৈয়ারি করা হয়। ইহাতে আন্‌থ্রাসিটের আগুন পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু ঘর গরম করিবার পক্ষে এবং ফ্যাক্টারির উনানগুলা জ্বালাইবার পক্ষে ইগ্‌নিটের ইট কাজ চলে মন্দ নয়। কাজেই যতদিন ইগ্‌নিট জার্ম্মানির মধ্যপ্রদেশে মজুত আছে, ততদিন জার্ম্মান গৃহস্থ ও ফ্যাক্টারি-মালিকেরা মাথায় হাত দিয়া "হায় হায়" করিবে না। কয়লা বিজ্ঞানের গবেষণায় পাকা মাথাগুলাকে বাহাল করিয়া জার্ম্মান ধনকুবেরগণ খানিকটা আশ্বস্ত আছে।

এদিকে জার্ম্মান শিল্প-সংসারে আর একটা নয়া লক্ষণ দেখা দিয়াছে। কয়লার ব্যবহার যথাসম্ভব কমাইয়া কাজ চালাইবার প্রয়াস সুরু হইয়াছে। কয়লার ঠাঁইয়ে আসিতেছে তড়িৎ। ইতিমধ্যেই ইলেক্‌ট্রিসিটির সাহায্য লইয়া জার্ম্মানরা আন্‌থ্রাসিট ও ইগ্‌নিট দুইয়ের চাহিদাই কমাইতে পারিয়াছে।

রেলগাড়ীগুলা চালানো হইতেছে তড়িতের শক্তিতে। কাজেই কয়লা বাঁচিয়া যাইতেছে বিস্তর। যে যে কারবারে কয়লা নেহাৎ দরকার, সেই কারবারের জন্য কয়লা রাখিয়া দেওয়া হইতেছে।

কয়লার এঞ্জিনের বদলে তড়িতের এঞ্জিন কাজে লাগাইতে সময় কিছু লাগে। দুইচার দিনের ভিতরই এই পরিবর্ত্তন সাধন করা সম্ভব নয়। তাহা সত্ত্বেও বার্লিনের ভিতর এবং বার্লিনের সীমানার আশে পাশে তড়িতের আয়োজন সুরু হইয়া গিয়াছে।

একমাত্র রেলই তড়িতে চলিতেছে, এরূপ ভাবিবার কারণ নাই। বহু কারখানার এঞ্জিনঘর চলিতেছে আজকাল তড়িতে। ইলেক্‌ট্রিসিটি জার্ম্মানিতে এক নয়া শিল্প-যুগ আনিতেছে। সেই শিল্প যুগে মজুরদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিবে কম।

(৫)

কয়লার অভাবে জার্ম্মানরা তড়িতের শরণাপন্ন হইতে চলিল। অষ্ট্রিয়ানরা ইতিমধ্যেই তাহাদের আল্পস পাহাড়ের রেলগুলায় তড়িতের সরঞ্জাম লাগাইতে সুরু করিয়াছে। দুনিয়া কয়লার যুগ হইতে তড়িতের যুগে আসিয়া পৌঁছিতেছে। এই নয়া যুগে জার্ম্মানির তড়িৎ-বিশেষজ্ঞের জগতে বিশেষ প্রতাপশালী থাকিবে।

বার্লিনের তড়িৎ-কারখানাগুলা অনেক দিন হইতেই জগৎ-প্রসিদ্ধ। আজ জগতের সকল দেশের এঞ্জিনিয়ারগণ আবার বার্লিনকে তীর্থক্ষেত্র সমঝিতেছে। চীনা, জাপানী, চিলিয়ান, ব্রেজিলিয়ান সকল জাতীয় শিল্পজ্ঞেরা বার্লিনের কারখানা দেখিতে অথবা কারখানায় কাজ করিতে ঝুঁকিতেছে।

তড়িতের এক সুবিধা এই যে, কারখানাটা হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত—পঁচিশ-পঞ্চাশ দেড়শ দুশ মাইল দূর পর্য্যন্ত—ইহার শক্তি চালান করা সম্ভব। বার্লিনে যতগুলা এঞ্জিনঘরে তড়িতের সাহায্য লওয়া হইতেছে, সেইগুলার শক্তি আসে গোল্‌পা শহর হইতে। সেই শহর বা পল্লীকে বলা যাইতে পারে বার্লিনের শক্তি-কেন্দ্র। ইহার প্রভাবে বার্লিন প্রচুর পরিমাণে কয়লা হইতে "স্বাধীন" হইয়া গিয়াছে।

এই ধরণের শক্তিকেন্দ্র স্যাক্‌সনি জেলায় আছে। অনেকগুলা মধ্য-প্রদেশের ছোট ছোট কেন্দ্রগুলাকে বড় করা হইতেছে। নয়া নয়া শক্তিকেন্দ্র কায়েম করা হইতেছে ও জার্ম্মানির ইলেক্‌ট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারেরা জার্ম্মানিকে কয়লা-সমস্যা হইতে উদ্ধার করিতেছেন। ইহাকে বলে মাথার জোরে স্বদেশ সেবা।

উরাঁওদের কথা

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ

(৫)

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, যে যখন উরাঁওরা রোহতাস হইতে বহিষ্কৃত হইয়া ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে প্রবেশ করে, তখন তাহারা নিতান্ত অসভ্য ছিল না। আর্য্যদিগের সহিত একত্র বাসের ফলে তাহারা যথেষ্ট সভ্যতা অর্জ্জন করিয়াছিল। যখন তাহারা আর্য্যদিগের সংস্পর্শে আসে নাই,—দাক্ষিণাত্যে বাস করিত, তখন তাহারা কিরূপ জীবন যাপন করিত, সেই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক্।

উরাঁওদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে অতি প্রাচীন কালে বানর নামে আর্য্যদিগের নিকট পরিচিত ছিল, সে কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাহাদের রাজ্য 'কিষ্কিন্ধ্যা' দাক্ষিণাত্যে তুঙ্গভদ্র নদের উত্তরাঞ্চলে বিন্ধ্যপর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই কিষ্কিন্ধ্যা অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন বানর-রাজেরা, ভিন্ন ভিন্ন অংশে রাজত্ব করিত। বানর-রাজ বালি কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে আপনার রাজ্য স্থাপন করিয়া বানর প্রজাদিগের শাসন ও পালন করিতেন। কোনও কারণে বালির সহিত তদীয় ভ্রাতা সুগ্রীবের বিবাদ হওয়ায় সুগ্রীব নির্ব্বাসিত হইয়া কতিপয় অনুচরের সহিত মলয় পর্ব্বতে গিয়া বাস করিতে থাকেন; এবং সেইস্থানেই পত্নী-বিরহ-কাতর শ্রীরামচন্দ্রের সহিত কাষ্ঠে-কাষ্ঠে ঘর্ষণোৎপাদিত অগ্নির সম্মুখে বন্ধুত্ব সূত্রে বদ্ধ হন ও আর্য্যদিগের সংস্পর্শে আসেন।

কিষ্কিন্ধ্যার রাজপ্রাসাদ বর্ণনা প্রসঙ্গে রামায়ণে কথিত আছে যে, রাজা পর্ব্বতগুহা সজ্জিত ও বাসোপযোগী করিয়া সপরিবারে তন্মধ্যে বাস করিতেন। তাঁহাদের প্রধান অস্ত্র ছিল বৃক্ষশাখা ও প্রস্তরখণ্ড। ধনুর্ব্বাণের ব্যবহারে রাম-রাবণের যুদ্ধের সময়েও তাঁহাদের জানা ছিল না।

তাঁহাদের প্রধান আহার ছিল বৃক্ষপত্র, ফল, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লতা গুল্ম, শাক ও বৃক্ষমূল। আর্য্যদিগের সহিত একত্রে থাকিতে থাকিতে বোধ হয় মৃগয়া করিতে ও মাংস ভক্ষণ করিতে শিক্ষা করেন। সুরায় তাঁহারা বিশেষ ভক্ত ছিলেন। যখন বালি সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিতে বাহির হন এবং শ্রীরামচন্দ্রের বাণে হত হন, তখন তাঁহার

বদনমণ্ডলে সুরাপান চিহ্ন বর্ত্তমান। আবার সুগ্রীব রাজ্যলাভ করিবার পর, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়াকে বিবাহ করিয়া, সুরাপানে উন্মত্ত ও বিভোর হইয়া সীতার উদ্ধারের প্রতিজ্ঞা একেবারে বিস্মৃত হওয়ায় লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক যথেষ্ট ভর্ৎসিত হইয়া ও হনুমান কর্ত্তৃক নানাপ্রকারে উৎসাহিত হইয়া অবশেষে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন।

অতি প্রাচীনকালে মনুষ্য-সমাজে বিবাহ প্রচলিত ছিল না, এ কথা আমরা রাজনৈতিক পণ্ডিতদিগের নিকট শুনিয়াছি। লোকের পরিচয় তখন মাতৃত্বের মধ্য দিয়া হইত। এখনও কোনও কোনও অসভ্য জাতিদিগের (যথা অষ্ট্রেলিয়ার অরুন্ত (Australian Aruntas) মধ্যে বহু পুরুষ বিবাহ (polyandry) প্রচলিত আছে। বলাই বাহুল্য ইহা বহু প্রাচীন প্রথারই সামান্য উন্নত অবস্থা। প্রাচীন কালের বানরদিগের মধ্যেও তাই ছিল। তাই হনুমানের জন্ম কেশরি পত্নী অঞ্জনার গর্ভে ও পবনদেবের ঔরসে। সুগ্রীবের জন্ম ঋক্ষ-পত্নীর গর্ভে ও ইন্দ্রের ঔরসে। রামচন্দ্রের বানর সেনার অনেকেরই জন্ম এইরূপে।

তাহাদের রাজ্যশাসন সম্বন্ধেও রামায়ণ হইতে কিছু আভাস পাওয়া যায়। তাহারা যথেষ্ট বিচারশক্তি সহকারে রাজ্যশাসন করিত ও প্রজাপালন করিত এবং প্রজারাও যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত রাজার আদেশ পালন করিত। অরণ্যে ও পর্ব্বতগুহায় তাহারা বাস করিত এবং প্রয়োজন হইলে দৈহিক শক্তি সামর্থ্য দিয়া রাজার আদেশ পালন করিত। এমন কি রাজাজ্ঞায় প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে কুণ্ঠিত হইত না।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, আর্য্য-সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব্বেও তাহারা নিতান্ত বর্ব্বর ছিল না। তবে তাহারা বনে জঙ্গলে বাস করিত, বন্য ফলমূল ও পত্র আহার করিত, এবং বৃক্ষশাখা, লাঠি ও প্রস্তরখণ্ড অস্ত্ররূপে যুদ্ধে ব্যবহৃত হইত। তাহাদের মধ্যে বিবাহের বিশেষ কোনও বাঁধাবাঁধি ছিল না; অগ্নির ব্যবহার তাহাদের অজ্ঞাত ছিল না। সুরাপান করিতে তাহারা খুব ভালবাসিত। রাজা প্রজাদিগকে স্নেহসহকারে পালন করিতেন, প্রজারাও রাজাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত।

তাহাদের যখন রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা এইরূপ, সেই সময়ে তাহারা আর্য্য-সংস্পর্শে আসে। রামচন্দ্র যখন সীতাদেবীর উদ্ধার সাধন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন তাঁহার দ্রাবিড় জাতীয় অনুচরেরাও অনেকে তাঁহার অনুগমন করে। পথে অধিক পরিমাণে সভ্য আর্য্যজাতীয় আচার ব্যবহার, সুদৃশ্য নগর নগরী এবং শস্যশ্যামলা ক্ষেত্ররাজি দর্শন করিয়া ও অবশেষে শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকোৎসব দর্শন করিয়া যে অভিজ্ঞতা তাহারা অর্জ্জন করে, তাহাই কার্য্যে পরিণত করিতে সঙ্কল্প করিয়া তাহারা আর্য্যাবর্ত্তেই ক্ষেত্রাদি লইয়া কৃষিকার্য্য ও পশ্বাদি পালন করিতে আরম্ভ করে। আর্য্যদিগের নিকট হইতেই তাহারা বস্ত্রবয়ন, কৃষিকার্য্য, যুদ্ধার্থে ধনুর্ব্বাণ ব্যবহার, উন্নত প্রণালীতে রাজ্যশাসন প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা করে এবং ক্রমে বংশবৃদ্ধির সহিত ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ইহারা ভ্রমণ করিতে করিতে পীপর নগর, হর্দ্দিনগর, নন্দনগড় প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া করুষ দেশে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং রাজা করাথের নেতৃত্বাধীনে করুষ রাজ্য স্থাপন করে। এই করুষ দেশে তাহারা বহুকাল অবস্থান করে ও কৃষিকার্য্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করে।

পরে এই স্থান হইতে আবার শত্রু কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া যখন তাহারা রোহতাস অঞ্চলে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে, তখন তাহারা সভ্যতায় আর্য্যদিগের সমকক্ষ না হইলেও একেবারে যে অসভ্য ছিল না, তাহা রোহতাস দুর্গ নির্ম্মাণ হইতেই বুঝিতে পারা যায়। পরে যখন এই স্থান হইতেও বিতাড়িত হইয়া তাহারা ঝাড়খণ্ডের পর্ব্বতবেষ্টিত উপত্যকায় আসিয়া উপনীত হয়, তখন তাহারা দেখে যে সেখানে এক জাতীয় লোক বাস করিতেছে—তাহারা কৃষিকার্য্য ভাল জানে না; বন্যজন্তু শিকার করিয়া এবং বনজ ফলমূল খাইয়া প্রধানতঃ জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। উরাঁওরা এই স্থান যথেষ্ট নিরাপদ বিবেচনায় এই অঞ্চলেই বাস করা স্থির করিয়া তত্রত্য অধিবাসী 'হোরোকো' (১) দিগের সহিত যুদ্ধাদিতে প্রবৃত্ত না হইয়া তাহাদের কথা মত তাহাদেরই মত যথেচ্ছ জীবনযাপন করিতে স্বীকৃত হইয়া শান্তিতে বাস করিতে আরম্ভ করে। উরাঁওরা পশ্চিমাংশের বনজঙ্গল পরিষ্কার করিয়া বাস করিতে থাকে ও 'হোরোকো'রা পূর্ব্বাভিমুখে চলিয়া যায়।

ওরাঁওরা যে হোরোকোদিগের সহিত যুদ্ধাদিতে প্রবৃত্ত হয় নাই, সে বিষয়ে নিম্নলিখিত প্রমাণ আছে—There is no tradition of war between the two tribes, and according to the Munda tradition, they allowed the Uraons to settle, on condition that they ate meat and discarded the sacred thread. (২)

এই অঞ্চলে আসিয়া উরাঁওরা তাহাদের অর্জ্জিত সভ্যতা মুণ্ডাদিগের মধ্যে প্রচার করিতে থাকে এবং উন্নত প্রণালীতে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করে।

According to Uraon tradition they were the more civilized race and introduced the use of the plough. (৩) অর্থাৎ উরাঁওদের কিংবদন্তী অনুসারে তাহারাই এতদুভয় জাতির মধ্যে অধিক সভ্য ছিল; এবং তাহারাই এই স্থানে লাঙ্গলের প্রচলন করে।

এই অঞ্চলে তাহারা যেমন এক দিকে খাদ্যাখাদ্য বিচার ত্যাগ করিয়া মুণ্ডাদের মত জীবনযাপন করিতে থাকে, অন্য দিকে আবার বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে নিরাপদ থাকায় আপনাদের রাজনৈতিক

(১) হোরোকো—মানুষ। মুণ্ডারা আপনাদিগকে এই নামে পরিচিত করে।

(২) Ranchi Gazetteer.

(৩) Ranchi gazetheer.

ও সামাজিক উন্নতি সাধন করিতে থাকে,—সুন্দর সুন্দর গ্রাম ও পল্লী নির্ম্মাণ করে; বন কাটিয়া, পাথরেরও বুক চিরিয়া শোভন শস্যক্ষেত্র প্রস্তুত করে। এ দিকে আর্য্যদিগের সংস্পর্শে না থাকায়, মুণ্ডাদিগের মত ভূত পূজা করিতে শিক্ষা করে এবং গ্রাম্য অপদেবতাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য নিজেদের নির্ম্মিত গ্রামগুলিতেও দু এক ঘর মুণ্ডাকে রাখিয়া দেয়।

(৬)

ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের আদিম অধিবাসীরা যে আগন্তুকদিগের সহিত কলহবিবাদ না করিয়া তাহাদিগকে অবাধে বাস করিতে দিল, তাহার কারণ প্রধানতঃ এই মনে হয় যে, আগন্তুকেরা তাহাদের উন্নত প্রণালীতে কৃষিকার্য্য ও পশুপালন করিলে, মুণ্ডাদিগের ক্ষতি না হইয়া লাভ হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। দ্বিতীয়তঃ ঝাড়খণ্ড নিতান্ত বন-সমাকীর্ণ;—যদি উরাঁওরা সেই বন পরিষ্কার করিয়া লইয়া বাস করে, তাহাতে তাহাদের ক্ষতি কিছুই নাই। তার পর আগন্তুকেরা তাহা-দিগের অপেক্ষা সভ্য ও সশস্ত্র—তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া মুণ্ডাদের পক্ষে বিশেষ সম্ভব নয়।—তবে উরাঁওরা যজ্ঞসূত্র ধারণ করিত, খাদ্যাখাদ্যের বিচার করিত, সেইজন্য মুণ্ডারা উরাঁওদিগকে এই সর্ত্তে থাকিতে দিল যে, তাহারা যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিবে এবং খাদ্যাখাদ্যের বিচার করিবে না। উরাঁওরা বহু কাল যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া এবং এক স্থান হইতে অন্য স্থানে তাড়িত, লাঞ্ছিত হইয়া, ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা আর্য্যদের অনুকরণ করিয়াও আর্য্য হইতে পারে নাই;—লাভই বা এমন কি করিয়াছে? যদি 'হোরোকো'দের কথামত কাজ করিয়া শান্তিতে ও নির্ব্বিবাদে এই পর্ব্বত-বেষ্টিত শত্রুর অগম্য স্থানে চিরকাল থাকিতে পায়, ক্ষতি কি? তাই তাহারা মুণ্ডাদের কথামত কার্য্য করিল—পূর্ব্ব-সংস্কার ত্যাগ করিয়া অসভ্য মুণ্ডাদিগের সহিত মিশিয়া গেল। কিন্তু মুণ্ডারা অপেক্ষাকৃত সভ্য উরাঁওদের সংস্পর্শে আসিয়া কিঞ্চিৎ উন্নত হইয়া উঠিল।

ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন কালে প্রজাতন্ত্রমূলক শাসননীতি প্রচলিত ছিল। রাজ্যের অধিপতি স্বরূপ একজন রাজা থাকিলেও, তিনি প্রজা-দিগের মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিতেন না; বরং তাহাদের সাহায্য ও পরামর্শ মতেই রাজকার্য্য পরিচালন করিতেন; এমন কি, নূতন রাজার রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বে প্রজাদিগের অভিমত লওয়া হইত। উরাঁওরা সেই হিন্দুদের নিকট হইতেই এই সব শিক্ষা লাভ করে; কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ বা অবসর পায় নাই। এইখানে এই পার্ব্বত্য অঞ্চলে বহিঃশত্রুর অগম্য স্থানে তাহারা সেই শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে তৎপর হয়; তাহারা আপনাদের সামাজিক ও রাজ-নৈতিক উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করে।

তাহারা প্রথমে সাধারণতঃ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া, বাসোপযোগী স্থান অন্বেষণ করিয়া, প্রতি দল পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বন-জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া পল্লী নির্ম্মাণ করে। এই এক একটি দল এক-একজনের নেতৃত্বাধীনে তাহারই আত্মীয়-স্বজনের গোষ্ঠি ছিল। যখন সেই ক্ষুদ্র দলগুলির লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন, ক্রমশঃ পল্লী বাড়িয়া গ্রাম এবং গ্রাম বাড়িয়া কাছাকাছি কয়েকটি গ্রামের সৃষ্টি হইয়া গেল, এবং সকল গ্রাম মিলিত হইয়া একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে (village kingdoms) পরিণত হইতে লাগিল। এই সকল পল্লী এবং গ্রাম উরাঁওরা এমনই স্থানে স্থাপন করিত, যেথানে নিকটেই নদী অথবা জলের প্রস্রবণ আছে। আজও অধিকাংশ উরাঁও গ্রামের নিকটেই জলের 'ডাড়ী' (৪) (spring) এবং পুরাতন বনের চিহ্ন বর্ত্তমান।

এই সকল গ্রামের প্রত্যেকটিতেই একজন করিয়া নেতা এবং গ্রাম-সমষ্টিরও একজন নেতা থাকিত। এই গ্রাম-সমষ্টিগুলিকে উরাঁওরা 'পাড়্‌হা' বলিত। নেতারা সাধারণতঃ সেই গ্রাম বা 'পাড়্‌হা'র সর্ব্বপ্রথম অধিবাসী বা তাহাদেরই বংশধর। তাহাদের নির্ব্বাচন দুই ভাবে হইত। প্রথম—হিন্দুদের মত নেতৃত্ব, যথা, পিতার নিকট হইতে পুত্রের উত্তরাধিকার; এক্ষেত্রে কিন্তু জনসাধারণের অনুমোদন লইয়া নেতৃত্ব পাইত। দ্বিতীয়তঃ—তিন হইতে পাঁচ বৎসরের জন্য পূর্ব্বনেতার আত্মীয়দিগের মধ্য হইতে জনসাধারণ কর্ত্তৃক নূতন নেতা নির্ব্বাচিত হইত।

তখনকার গ্রামনেতা বা 'পারহা-রাজা' যে ভাবে নির্ব্বাচিত হইত, এখনও প্রায় সেইরূপেই হয়। তবে এখনকার নেতাদের কার্য্য ও ক্ষমতা তখনকার নেতাদের কার্য্য ও ক্ষমতা হইতে অনেক পৃথক। যাহা হউক, এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা যাইবে।

তখনকার নেতাদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও পারমার্থিক—এই তিনরূপ কার্য্যই করিতে হইত। রাজনৈতিক কার্য্যের মধ্যে প্রধান ছিল, গ্রামের ও 'পারহা'র শান্তি রক্ষা করা এবং অন্য 'পারহা'র সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহাদির আবশ্যক হইলে তাহার বন্দোবস্ত করা। সামাজিক কার্য্যের মধ্যে জাতীয় অনুশাসন সর্ব্বসাধারণকে মানিতে বাধ্য করা। আর পারমার্থিক কাজের মধ্যে দেও, দেশওয়ালী, দরহা প্রভৃতি দেবতা ও অপদেবতাদিগকে পূজার্চ্চনা দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া গ্রাম ও 'পারহা'কে ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করাই প্রধান। এই সকল কার্য্যের জন্য তাহাদের পাঁজীপুথি, বা তন্ত্রমন্ত্রের কোনও প্রয়োজন ছিল না,—নেতারা আপনাপন ইচ্ছামত জনসাধারণের অনুমোদিত দিনে পূজা করিত। তবে দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য শূকর, ছাগল, কুক্কুট এবং কখন-কখনও নরবলি দিয়া 'হাঁড়িয়া' (একরূপ মদ্য) সহকারে পূজা করিতে হইত। বস্তুতঃ উহাদের রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্ম এই তিনের মধ্যে এমনই নিকট সম্বন্ধে যে, প্রায় এক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এই সকল কার্য্য পরিচালনা করিবার জন্য পাড়্‌হা রাজা ও গ্রাম্য নেতাকে সাহায্য করিবার জন্য এক-একটী সভা থাকিত। সেই সভা গ্রামের বা 'পারহা'র 'পঞ্চ' নামে পরিচিত হইত। এই পঞ্চে সাধারণতঃ ৫ হইতে ২১ জন পর্য্যন্ত প্রতিনিধি থাকিত। গ্রামের প্রত্যেক

(৪) উরাঁওরা জলের প্রস্রবণকে 'ডাড়ী' বলে।

গৃহকর্ত্তার মত লওয়াও অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচিত হইত। নেতা সেই পঞ্চের প্রধান সদস্য (President) রূপে গ্রাম-শাসন, ও ন্যায়ান্যায়ের বিচার করিত। শাস্তির মধ্যে অপরাধের গুরুত্ব হিসাবে নির্ব্বাসন, 'একঘরে' করা ও জরিমানা করা হইত। সে সময়ে মুদ্রার চলন ছিল না, সেইজন্য জরিমানা হইলে অপরাধীকে গ্রামস্থ প্রধান-প্রধান ব্যক্তিদিগকে ভোজ দিতে হইত। পারহা-পঞ্চে প্রতি গ্রামের প্রতিনিধি থাকিত। তাহারা এমনই অপরাধের বিচার করিত, এবং এমন সকল বিষয়ের বিচার ও আলোচনা করিত, যাহা 'পারহাস্থ'গত একাধিক গ্রামের বা অন্য 'পারহার' সহিত সংশ্লিষ্ট। গ্রামের পঞ্চের বিচার কাহারও অমনোনীত হইলে, 'পারহা'-পঞ্চের কাছে আবেদন চলিত। এই সকল পারহা ৫ হইতে ২১টি গ্রামের সমষ্টি লইয়া গঠিত হইত। চুরি, ডাকাইতি ইহাদের মধ্যে একেবারেই ছিল না।

পারহা-রাজা বা গ্রাম্য নেতা হিন্দুদের মত রাজার কর আদায় করিত না। তাহাদের জন্য পৃথক-পৃথক শস্যক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট ছিল।

পারহা বা গ্রাম্য 'পঞ্চ' যখন সর্ব্বসাধারণের কার্য্যের জন্য আহূত হইত, তখন তাহার খরচ (ভোজ ও হাঁড়িয়া) সর্ব্বসাধারণকে বহন করিতে হইত; এবং অপরাধীর বিচার করিবার জন্য আহূত হইলে, আবেদনকারী ও অপরাধীকে ঐ ব্যয় বহন করিতে হইত। তবে এমন কতকগুলি কার্য্য ছিল (যেমন কোনও জাতীয় উৎসব প্রভৃতি) যাহার খরচ সর্ব্বসাধারণ বহন করিত না—নেতাদিগকে বহন করিতে হইত। তাহার জন্য নেতাদের পৃথক্ শস্যক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট ছিল।

এইরূপে উরাঁওরা কেবল আপনাদের সামাজিক ও জাতীয় উন্নতি সাধন করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল না। তাহারা যেরূপ ধৈর্য্যের সহিত, অধ্যবসায় সহকারে এই বনসমাকীর্ণ পার্ব্বত্য ভূভাগের অনুর্ব্বর জমী নিংড়াইয়া শস্যোৎপাদন করিত, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাহারাই এখানে ক্রম-নিম্ন শস্যক্ষেত্র (terraced land) প্রস্তুত করিয়া প্রকৃতিকে হাস্যমুখরিত করে। যাহাতে বৃষ্টির জল বা পাহাড়ের জল সকলের জমীতেই পড়িতে পায়, সেই উদ্দেশ্যে এইরূপ সিঁড়ির মত ধাপে-ধাপে উচ্চ হইতে ক্রম-নিম্ন শস্যক্ষেত্রের সৃষ্টি।

লাঙ্গল, ফাল, ও শিকার এবং যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ করিবার জন্য প্রত্যেক গ্রামে বা 'পারহা'য় এক বা দুই ঘর 'লোহার' (কামার), পূজা এবং অন্যান্য উৎসবে বাদ্য বাজাইবার জন্য দুই-এক ঘর 'ঘাসী' বাঁশের ঝুড়ী প্রভৃতি তৈয়ার করিবার জন্য দুই এক ঘর 'গোড়াইত' প্রভৃতি জাতিকেও তাহারা শস্যক্ষেত্র দান করিয়া বাস করায়। বস্ত্র বয়ন তাহারা নিজেরাই করিত। (এই লোহার প্রভৃতি জাতি উরাঁও, মুণ্ডাদিগেরই কোনও মিশ্র শ্রেণী—আপনাপন ব্যবসায়ের জন্য তাহারা পৃথক জাতিতে পরিণত হইয়াছে।)

এইরূপে উরাঁওরা ঝাড়খণ্ডে আসিয়া চাষের সময় চাষ করিয়া এবং অবসরকালে শিকার করিয়া বেশ শান্তিতে বাস করিতে লাগিল। দিনের বেলা নিজেদের এবং গ্রামস্থ অপরাপর ব্যক্তিদিগের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া, এবং রাত্রিতে গ্রাম্য 'আখড়ায়' সমবেত হইয়া, নৃত্যগীতে চারিদিক মুখরিত করিয়া, এই সবল কর্ম্মী শান্তিপ্রিয় উরাঁওরা বহুদিন—প্রায় খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী পর্য্যন্ত—বেশ নিরাপদে এই অঞ্চলে বাস করিবার পর, তাহাদের মধ্যে এমনই একটি ঘটনা ঘটিল, যাহা একটা ধূমকেতুর মত তাহাদের শান্ত ভাগ্যাকাশে উদিত হইয়া, তাহাদের ভবিষ্যৎ দুর্ভাগ্য অত্যাচার, ও পীড়নের পূর্ব্ব-সূচনা করিয়া দিল।

ব্যাঙ্কের কথা

শ্রীবামনদাস মৈত্র বি-এ

অল্প সময়ের মধ্যে কয়েকটা নামজাদা বড় ব্যাঙ্ক ফেল পড়ায়, যে সমস্ত ব্যাঙ্ক এখনও টিকিয়া আছে, তাহাদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে একটা সংশয়ের উদ্রেক হইয়াছে। সকলেই বলিতেছেন যে, ইম্পিরিয়াল বা পোষ্টাফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক ভিন্ন বিশ্বাস করিয়া কোন ব্যাঙ্কেই টাকা রাখা সঙ্গত নহে। বাস্তবিক পক্ষে ধরিতে গেলে, জনসাধারণের এই উক্তির বা ধারণার মূলে অনেকখানি সত্যই নিহিত আছে। সমস্ত কারবারেরই কার্য্য পরিচালনা প্রথার উপর উহাদের শুভাশুভ নির্ভর করে। অনেক সুপ্রতিষ্ঠ কারবারও পরিচালনা, প্রণালীর দোষে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে দেখা গিয়াছে। আবার কাল বিশেষে অনেক কারবার সাবধানতা ও সুবিবেচনার সহিত পরিচালিত হইয়াও স্থায়ী হইতে পারে নাই।

প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, যে কোন কারণেই হউক, একটা ব্যাঙ্ক ফেল পাড়লে, তাহার সঙ্গে-সঙ্গে আরো ২।৪টা ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়া যায়। সাধারণতঃ দুইটী কারণে এরূপ ঘটনা সম্ভবপর হয়। প্রথমতঃ, একটা ব্যাঙ্ক ফেল পড়িলে, অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতকারীদিগের মনে স্বতঃই একটা ভয় ও সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয়। তাঁহারা দলে দলে তাঁহাদের আমানতের টাকা তুলিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। এমন কি, ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তাঁহারা ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিবার জন্য আগ্রহান্বিত হ'ন। ভারতবর্ষে বোধ হয় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ছাড়া এমন কোন ব্যাঙ্ক নাই, যাহা ২।১ দিনের মধ্যে আমানতের (অন্ততঃ অস্থায়ী আমানতের) সব টাকা ফিরাইয়া দিতে পারে। টাকা দিতে না পারিলেই, ব্যাঙ্ক বন্ধ করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, অনেক ব্যাঙ্কেরই অতিরিক্ত টাকা কোন একটা বিশেষ ব্যাঙ্কে জমা রাখা হয়। এই বিশেষ ব্যাঙ্কটি ফেল পড়িলে, আমানতকারী ব্যাঙ্কের টাকাও মারা পড়িয়া যায়। এই ক্ষতি ব্যাঙ্ক সহ্য করিতে পারিলেও, উহার আমানত-দাতারা ব্যাঙ্কের এই ক্ষতির সংবাদ অবগত হইয়া, তাঁহাদের আমানতের টাকা তুলিয়া লইবার জন্য উপস্থিত হ'ন। এক্ষেত্রেও পূর্ব্বোক্ত ব্যাঙ্কের ন্যায় ইহারও আয়ুষ্কাল শেষ হইয়া যায়।

ব্যাঙ্ক ফেল পড়িবার যে দুইটী কারণের উল্লেখ করিলাম তাহা নিবারণ করিবার উপায় সাধারণতঃ ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ বা পরিচালকদিগের উপরে নির্ভর করে না। আমানতকারী জনসাধারণ যদি তাঁহাদের ব্যাঙ্ক-

গুলির উপরে একটু বিশ্বাস রাখেন, তবে ঐ ব্যাঙ্কগুলির ঐরূপ দুর্দ্দশা নাও হইতে পারে। ব্যাঙ্কের ২।৩ বৎসরের উদ্বর্ত্তন পত্র (Balance-Sheet) একটু মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করিলেই, উহার প্রকৃত আর্থিক অবস্থা অনেকটা জানা যাইতে পারে। দুঃখের বিষয়, আমানত-কারীদিগের নিকটে উক্ত উদ্বর্ত্তন পত্র পাঠাইবার কোন নিয়ম বা ব্যবস্থা নাই। আমার বিবেচনায়, আমানতকারীদিগের মনে বিশ্বাস স্থাপন করিবার জন্য তাঁহাদিগের নিকট ব্যাঙ্কের বাৎসরিক উদ্বর্ত্তন পত্র পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। তাঁহারা তদ্দৃষ্টে ব্যাঙ্কের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন।

একটা সুখের বিষয়, গত কয়েক মাসের মধ্যে যে সমস্ত ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটিই বড় ব্যাঙ্ক। সুখের বিষয় এইজন্য বলিলাম যে ভারতের সহরে সহরে বা পল্লীতে পল্লীতে যে সমস্ত ছোট ব্যাঙ্ক দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকদিগের নানাপ্রকারে উপকার করিয়া আসিতেছে, তাহাদের কোন একটীরও ফেল হইবার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। এই ধরণের অধিকাংশ ব্যাঙ্কই দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকদিগকে বিশেষ প্রয়োজনের সময় টাকা ধার দিয়া, তাঁহাদিগের অনেক উপকারই করিয়া থাকে; বিশেষতঃ এই সকল ব্যাঙ্কই তাঁহাদিগের উদ্বৃত্ত টাকা জমাইবার ভাণ্ডার। কঠিন পরিশ্রমে তাঁহারা যাহা উপার্জ্জন করেন, তাহার মধ্য হইতে ভবিষ্যতের সুখের আশায় বা একটা নির্দ্দিষ্ট আয়ের জন্য তাঁহাদের উদ্বৃত্ত টাকা এই সব ব্যাঙ্কেই জমা রাখিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর সহর বা পল্লী ব্যাঙ্ক ফেল পড়িলে, তাঁহাদের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। সহর ও পল্লী ব্যাঙ্কগুলির কার্য্য পরিচালনা সম্বন্ধে কয়েকটি আবশ্যক কথার অবতারণা করিতেছি,—আশা করি, তাহা কাহারো অপ্রীতিকর হইবে না।

পরিচালকগণ (Managing Agents.)

নির্দ্দিষ্ট মূলধন লইয়া যে সমস্ত যৌথ কারবার (Limited Companies) গঠন করা হয়, তাহা ভারতীয় কোম্পানী আইনানুসারে (Indian Companies Act) রেজেষ্টারী করিতে হয়। কয়েকজন উদ্যোক্তা (Promoters) মিলিয়া কারবার খাড়া করেন এবং তাঁহাদের মধ্য হইতে ২।৩ জন স্বরচিত সুবিধাজনক সর্ত্তে আপনাদিগকে পরিচালক নিযুক্ত করেন। পরিচালকদের যে সকলেরই যৌথ কারবার পরিচালনা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, তাহা ধারণা করা ভুল। অনেক পরিচালকই উচ্চ বেতনে উপযুক্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া কারবারের কার্য্য পরিচালনা করিবার চেষ্টা করেন। পরিচালকগণ মাসান্তে তাঁহাদের পারিশ্রমিকের টাকা লইয়াই তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ করিয়া থাকেন। যদি কোন কারবারের একাধিক পরিচালক থাকেন, তবে তাঁহারা উচ্চ বেতনে কর্ম্মচারী না রাখিয়া, নিজেরাই কারবারের কার্য্য পরিচালনা করিয়া, কোম্পানীর অনেকটা ব্যয় হ্রাস করিতে পারেন। অবশ্য এরূপ প্রথাও আছে যে, পরিচালকগণ যে পারিশ্রমিক পাইয়া থাকেন, তাহার মধ্য হইতে কর্ম্মচারিদিগের বেতন দিতে হয়। নিম্নের হিসাবটি পরীক্ষা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, সেরূপ ক্ষেত্রেও পরিচালকগণ শুধু বসিয়া থাকিয়াই কতকগুলি টাকা লইয়া থাকেন।

পরিচালকদিগের	মাসিক পারিশ্রমিক—৩০০৲
বাদ	একজন ম্যানেজার (মাসিক)—১০০৲
„	একজন অধস্তন কর্ম্মচারী (মাঃ) ২৫৲
„	একজন চাপরাসী (মাঃ)—১০৲

উপরিউক্ত হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, কর্ম্মচারী প্রভৃতির বেতন দিয়াও পরিচালকদিগের ১৬৫৲ মাসিক বৃত্তি দাঁড়াইতেছে। পরিচালক নিযুক্ত না করিয়া যদি কর্ম্মচারী রাখিয়াই কারবারের কার্য্য পরিচালনা করা যায়, তবে ঐ কোম্পানীর মাসিক ১৬৫৲ টাকা বাঁচিয়া যায়। কর্ম্মচারিদিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য একজন সুদক্ষ ডিরেক্টারকে সাপ্তাহিক ১০৲ করিয়া দিলেও, কোম্পানীর মাসিক ব্যয় হ্রাস হয়। কাজেই আমার বিবেচনায়, উপরে একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টার রাখিয়া, কর্ম্মচারী দ্বারা যৌথ কারবারের কার্য্য পরিচালনা করা বাঞ্ছনীয়।

যদি পরিচালকই নিযুক্ত করিতে হয় তবে তাঁহাদের সুবিধাজনক ও স্ব-রচিত সর্ত্তে একটা নির্দ্দিষ্ট পারিশ্রমিকে পরিচালক নিযুক্ত করা উচিত নহে। একটা নির্দ্দিষ্ট কমিশন তাঁহাদের দেওয়া সঙ্গত মনে করি। এই প্রথা অবলম্বন করিলে অন্ততঃ তাঁহারা নিজেদের স্বার্থের খাতিরেও কারবারের উন্নতি বিধানে তৎপর হইতে পারেন।

ডিরেক্টার (Directors)

যৌথকারবার গঠন করিবার সময় পরিচালকগণ নির্ব্বাচিত ও পরিচিত ব্যক্তিদিগকে ডিরেক্টার নিযুক্ত করেন। ফলে এই দাঁড়ায় যে, ডিরেক্টারগণ পরিচালকদিগের কোন কার্য্যই পর্য্যবেক্ষণ করেন না,—শুধু ফি লইবার জন্য ডিরেক্টার-সভায় উপস্থিত হইয়া, পরিচালকদিগের উত্থাপিত প্রস্তাবগুলির সমর্থন করেন মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে, ডিরেক্টার-গণ কোম্পানীর অংশিগণের প্রতিনিধি। বহুসংখ্যক অংশীর পক্ষে কারবারের কার্য্য পরিদর্শন করা সম্ভব নহে; এজন্য তাঁহাদের মনোনীত কয়েকজন সুদক্ষ ব্যক্তিকে ডিরেক্টার নিযুক্ত করার প্রথা আছে। সত্য কথা বলিতে কি, অংশিগণ ডিরেক্টার নিয়োগ বিষয়ে কোন প্রকার মনোযোগই দেন না। প্রতি বাৎসরিক সভায় কোন ডিরেক্টারের কার্য্যকাল শেষ হইলে, পরিচালকগণই তাঁহাদের মনোনীত ডিরেক্টারের নাম অংশীদের মনোনয়নের জন্য প্রস্তাব করেন। অংশীরা উক্ত ডিরেক্টারের গুণাগুণের বিচার না করিয়াই, তাঁহাকে ডিরেক্টার নিযুক্ত করিয়া থাকেন। যাহাতে অংশীদিগের মধ্য হইতে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ডিরেক্টার নিযুক্ত হ'ন, সে বিষয়ে তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা উচিত।

যে কোন যৌথ কারবারের অনুষ্ঠানপত্র (Prospectus) দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, কারবারের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। অনুষ্ঠান-

পত্র বিশেষ অনুসন্ধান ও বিবেচনার সহিতই দেখা হইয়া থাকে। অনুষ্ঠান পত্রে যে কোম্পানীর শতকরা ৫০৲ টাকা লাভ দেখান হইয়া থাকে, সে কোম্পানীর অন্ততঃ ২০৲ টাকাও লাভ হওয়ার আশা করা যাইতে পারে। তবু যে লাভ হয় না, বা কোম্পানী স্থায়ী হইতে পারে না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। পরিচালকগণ, ডিরেক্টার সম্প্রদায় এবং অংশীরা একযোগে যদি কোম্পানীর উন্নতি-বিধানে পরিশ্রম করেন, তবে কোম্পানীর উন্নতি নিশ্চিত বলিয়াই মনে করি।

অংশিগণ (Shareholders)

অংশিগণই যথার্থ পক্ষে যৌথ কারবারের মালিক। কারণ, তাঁহাদের টাকাই কারবারের মূলধন। পরিতাপের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, তাঁহারা তাঁহাদের অংশের টাকা দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন, এবং বৎসর না যাইতেই লভ্যাংশের (Dividend) জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। কারবার যথাযথ পরিচালিত হইতেছে কি না, সে সন্ধান রাখা তাঁহারা আবশ্যক মনে করেন না। এমন কি, বাৎসরিক সভায়ও (Annual General Meeting) তাঁহাদের অনেকের দেখা পাওয়া যায় না। অংশীদিগের নিকটে যে উদ্বর্ত্তন পত্র পাঠান হয়, তাহা তাঁহাদিগের বিশেষরূপে পরীক্ষা করা উচিত। হিসাব-পরীক্ষকেরা (Auditors) হিসাব পাশ করিয়া দিলেই যে তাহাতে গলদ থাকিতে পারে না, তাহা মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে। অংশীদের মনে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে, বাৎসরিক সভায় পরিচালকদিগের নিকটে কৈফিয়ৎ লওয়া উচিত।

অনেক যৌথ কারবারে দেখা যায় যে, অংশীদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য, কারবারে যে লাভ হয়, তাহার সমস্তই তাঁহাদিগের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এমন কি, রিজার্ভ ফণ্ডও রাখা হয় না। রিজার্ভ ফণ্ড কারবারের বিপদের সম্বল। অংশীদিগের উচিত যে, লাভের একটা অংশ রিজার্ভ ফণ্ডে রাখিয়া অবশিষ্টাংশ লভ্য হিসাবে নিজেরা গ্রহণ করেন। অনেক বিলাতী কারবার শতকরা ৫৲ টাকার বেশী লভ্যাংশ অংশীদিগকে দেন না। অবশ্য কারবার যখন নিশ্চিতরূপে স্থায়ী হয়, তখন বেশী লভ্যাও দেওয়া যাইতে পারে। যতদিন স্থির ভিত্তির উপরে কারবারের প্রতিষ্ঠা না হয়, ততদিন অংশীদের কোন লভ্য না লওয়াই সঙ্গত।

সহর বা পল্লী-ব্যাঙ্ক (Rural or Urban Banks)

ব্যাঙ্কের বিষয়ে লিখিতে বসিয়া উপরে যৌথকারবার সম্বন্ধে যাহা লিখিলাম, তাহা বাহ্যতঃ অপ্রাসঙ্গিক মনে হইলেও, কার্য্যতঃ উক্ত বিষয় সকলেরই বিশেষতঃ অংশীগণের জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

সহর বা পল্লী ব্যাঙ্কগুলির প্রায় অধিকাংশেরই টাকা কর্জ্জ দেওয়া প্রধান কার্য্য, এবং ঐ টাকার সুদই ব্যাঙ্কের লভ্য। অনেক ব্যাঙ্ক কর্জ্জ দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন লাভজনক ব্যবসাও করিয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে লাভের পরিমাণ বেশীও হয়। টাকা কর্জ্জ দেওয়া ব্যাপারটা খুবই কঠিন কাজ। দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া টাকা দাদন করা কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ হ্যাণ্ডনোট, সু-খত, সম্পত্তি রেহেন, অলঙ্কারাদি বন্ধক, কোম্পানীর কাগজ (Government Papers), কোম্পানী সেয়ার (Company Shares) প্রভৃতি লইয়া টাকা দেওয়া হইয়া থাকে।

হ্যাণ্ডনোট (Pro-note)

অনেক ব্যাঙ্কই কার্য্য ও পরিশ্রম লাঘব করিবার জন্য হ্যাণ্ডনোট লইয়া টাকা কর্জ্জ দিয়া থাকে। হঠাৎ টাকার আবশ্যক হইলে কর্জ্জকারী হ্যাণ্ডনোট লইয়া টাকা দিবার জন্য ব্যাঙ্ককে অনুরোধ করেন। ব্যাঙ্কের বিশেষ পরিচিত ও অবস্থাপন্ন লোকদিগকে হ্যাণ্ডনোটের উপরে টাকা কর্জ্জ দেওয়া যাইতে পারে। তবে কর্জ্জকারীর অন্য স্থানে পূর্ব্ব দেনা আছে কি না, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। প্রথমে হ্যাণ্ডনোটে টাকা দিলেও, পরে উহা বদলাইয়া দলিল রেজেষ্টারী করিয়া লওয়া সঙ্গত বিবেচনা করি। অনেক ব্যাঙ্কেই নিয়ম আছে যে, হ্যাণ্ডনোটে একজনকে টাকা দেওয়া হয় না। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একযোগে হ্যাণ্ডনোট সহি করিলে, টাকা দেওয়া হইয়া থাকে। এবং কর্জ্জকারীরা একযোগে ও পৃথক পৃথক ভাবে ঐ টাকার জন্য দায়ী থাকেন। ইহাতে ব্যাঙ্কের এই সুবিধা যে, ব্যাঙ্ক হ্যাণ্ডনোটে স্বাক্ষরকারীদের যে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে টাকা আদায় করিতে পারে। অনেকের নিকট শুনিয়াছি যে, একাধিক ব্যক্তি হ্যাণ্ডনোটে নামে সহি করিলেও, একজন মাত্র টাকা লইয়া থাকেন এবং অন্যেরা বন্ধুত্বের খাতিরে তাঁহার সহিত একযোগে হ্যাণ্ডনোটে নাম সহি করেন; কারণ ঐ সব ব্যাঙ্ক একজনকে হ্যাণ্ডনোটের উপরে টাকা দেয় না। পরে এই দাঁড়ায়, বাস্তবিক যিনি টাকা লইয়াছেন, তাঁহার নামে নালিশ বা ডিক্রি না হইয়া, যাঁহারা অনুরোধে পড়িয়া নাম সহি করিয়াছেন; তাঁহাদের নামে নালিশ বা ডিক্রি হয়। এই সব অভিযোগের মূলে বাস্তবিক সত্য আছে কি না, তাহা অবধারণ করা কঠিন। কারণ, যে সকল ব্যাঙ্কে উক্তরূপে টাকা ধার দেওয়ার প্রথা আছে, তাহারা স্পষ্টই বলিয়া থাকে যে, ২।৩ জন একযোগে যদি টাকা ল'ন, তবেই টাকা দেওয়া হইয়া থাকে। নতুবা রীতিমত দলিল রেজেষ্টারী করিয়া দিতে হইবে। এইরূপ ভাবে টাকা লইবার পূর্ব্বে কর্জ্জকারীর বন্ধুদিগের বিশেষ বিবেচনা করা উচিত যে, যিনি টাকা লইতেছেন, তিনি দেনা পরিশোধ করিবেন, কিম্বা করিতে পারিবেন কি না।

সু-খত

কর্জ্জের টাকা ১০০৲ টাকার কম হইলে, অনেক সময়ে সু-খত লিখাইয়া লওয়া হয়, এবং তাহা রেজেষ্টারী করা হয় না। এই প্রথা বড়ই খারাপ। কর্জ্জের টাকা কমই হউক আর বেশীই হউক, দলিল রেজেষ্টারী করিয়া লওয়া উচিত। সু-খতে টাকা দিলেও কর্জ্জকারীর অবস্থা বিশেষ রূপে অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য; এবং কর্জ্জকারীর সম্পত্তি আদি বেনামী কি না, অন্য স্থানে রেহেনাবদ্ধ কি না, তাহার অনুসন্ধান করা বিশেষ দরকার। আমার মতে ৫০৲ টাকার বেশী সু-খত লইয়া

দেওয়া উচিত নহে ; এবং সুদের টাকা আসলের সিকি অংশ হইলেই টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করা সঙ্গত।

রেহেন (Mortgage)

স্থাবর সম্পত্তি রেহেন লইয়া টাকা দিবার সময়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। দেখিতে হইবে (১) সম্পত্তি অন্য স্থানে রেহেনে আবদ্ধ কি না, (২) সম্পত্তির অন্য কোন অংশিদার আছে কি না (৩) সম্পত্তি অন্য কোনরূপ দায়ে আবদ্ধ কি না, (৪) খাজনাদি বাকী আছে কি না, (৫) সম্পত্তির মূল্য কত, (৬) রেহেনদাতার রেহেন দেওয়ার ক্ষমতা আছে কি না প্রভৃতি।

রেহেনাবদ্ধ সম্পত্তি, সময় বিশেষে পুনরায় রেহেন লইয়া টাকা দেওয়া যাইতে পারে। যে টাকার জন্য সম্পত্তি রেহেনাবদ্ধ, এবং পরে পুনর্ব্বার রেহেন লইয়া যে টাকা দেওয়া যাইতে পারে, তাহা একযোগে করিয়া যদি দেখা যায় যে, সম্পত্তি বিক্রয় করিলে সাকুল্য টাকা পাওয়া যাইতে পারে, তবেই রেহেনাবদ্ধ সম্পত্তি পুনরায় রেহেন লইয়া টাকা দিলে কোন ক্ষতির কারণ হইবে না। ইহাও দেখিতে হইবে যে, সম্পত্তির মূল্য অন্ততঃ কর্জ্জের টাকার চারগুণ হয় কি না। তাহা যদি না হয়, তবে টাকা দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করি না। এবং সুদে-আসলে উভয় টাকা সম্পত্তির মূল্যের অর্দ্ধেক দাঁড়াইলেই, টাকা আদায়ের চেষ্টা করিতে হইবে। সম্পত্তি নিলামের দ্বারা টাকা আদায় করিতে গেলে, ন্যায্য মূল্যে সম্পত্তি কখন বিক্রীত হয় না।

যদি সম্পত্তির একাধিক অংশিদার থাকেন, এবং একজন অংশিদার তাঁহার অংশের সম্পত্তি রেহেন দিয়া টাকা কর্জ্জ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহার অংশের যে মূল্য হইবে, তাহার ষষ্ঠ ভাগ টাকা দেওয়া যাইতে পারে। কারণ, এরূপ স্থলে সম্পত্তি সরিকান জন্য অনেক সময়ে ন্যায্য মূল্য সম্পত্তি বিক্রীত হয় না। সম্পত্তির বিষয়ক দলিলাত প্রভৃতি বিচক্ষণ উকীল দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া তবে টাকা দেওয়া সঙ্গত।

বন্ধক (Pawn)

অলঙ্কারাদি বন্ধক দিয়া অনেকে টাকা লইয়া থাকেন। বিশেষ দক্ষ লোক দ্বারা অলঙ্কারের মূল্য ধার্য্য করিতে হয়। অলঙ্কারাদি যে মূল্যে ক্রীত, বা প্রস্তুত করিতে যাহা ব্যয় হইয়াছে, তাহা অলঙ্কারের মূল্য বলিয়া মনে করা ঠিক নহে। যে ধাতুতে উহা প্রস্তুত করা হইয়াছে সেই ধাতুর ওজনানুসারে শুধু তাহার মূল্য অবধারণ করিতে হইবে। বাজার-দর অপেক্ষা অন্ততঃ শতকরা ২০৲ টাকা কম ধরে মূল্য হিসাব করা দরকার। কারণ, ধাতুর বাজার-দর সব সময়েই এক প্রকার থাকে না। যে টাকা কর্জ্জ দিতে হইবে, অলঙ্কারের ধাতুর মূল্য তাহার তিন গুণ হওয়া আবশ্যক ; এবং সুদে আসলে টাকা ধাতুর মূল্যের চার আনা অংশ হইলে টাক আদায় করিতে হইবে।

শেয়ার-প্রতিভূ (Security of Com Shares)

যৌথ কারবারের শেয়ার-প্রতিভূ রাখিয়া টাকা কর্জ্জ দেওয়ার প্রচলন আছে। তবে যে কোম্পানীর শেয়ার তাহার আর্থিক অবস্থা বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া টাকা দেওয়া উচিত। ক্রমান্বয়ে গত তিন বৎসরের উদ্বর্ত্তন পত্র দেখিলেই কোম্পানীর অবস্থার বিষয় অবগত হওয়া যায়। শেয়ারের বাজার দর দেখিয়াও কোম্পানীর অবস্থা জানা যাইতে পারে। শেয়ারের বাজার দর সব সময়ে ঠিক থাকে না। গত তিন বৎসরের মধ্যে যে সময়ে শেয়ারের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা কম ছিল, সেই সময়ের মূল্যের ১ ভাগ পরিমাণ টাকা কর্জ্জ দেওয়া যাইতে পারে। রেলওয়ে প্রভৃতি কতকগুলি কোম্পানীর একটা নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য পরিচালনা ক্ষমতা কোম্পানীর হাতে থাকে। নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইলে উক্ত কোম্পানীর শেয়ারের কোন মূল্য থাকে না। শেয়ার-প্রতিভূ রাখিয়া টাকা দিবার সময়ে এই সব বিষয় বিশেষরূপে অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

কোম্পানীর কাগজ (Govt. Papers)

কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতি (গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কীয়) প্রতিভূ স্বরূপ রাখিয়া টাকা কর্জ্জ দেওয়া যাইতে পারে। কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতির বাজার-দরের খুব কম হ্রাস-বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। অন্যান্য কোম্পানীর মত গবর্ণমেণ্টের ফেল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। যে টাকা দেওয়া যাইবে, কোম্পানীর কাগজের মূল্য তাহার ১½ গুণ হওয়া আবশ্যক। বাজারে কোম্পানীর কাগজের যে দর, তাহাই মূল্য রূপে ধরিতে হইবে।

জামিন নামা (Surety Bond)

কর্জ্জকারী অনেক সময়ে অবস্থাপন্ন লোককে জামিন দিয়া টাকা লইয়া থাকেন। আমি ব্যক্তিগত জামিনের পক্ষপাতী নহি। যদি জামিনদার নিজের সম্পত্তি জামিন স্বরূপ দিতে পারেন, তবে অনায়াসেই টাকা দিতে পারা যায়। সম্পত্তি রেহেন লইয়া টাকা দিবার কালে যে ভাবে অনুসন্ধান করিতে হয়, এক্ষেত্রেও জামিনের সম্পত্তি সম্বন্ধে সেইরূপ অনুসন্ধান করিতে হইবে। স্থল ও পাত্র বিশেষে যদি ব্যক্তিগত জামিন লইয়াই টাকা দেওয়া সঙ্গত মনে হয়, তবে জামিননাম রীতিমত রেজেষ্টারী করিয়া লইতে হইবে।

উপসংহারে

আমার বিনীত নিবেদন এই যে, যেখানে দশের স্বার্থ বিজড়িত সেখানে যৌথ কারবারের ডিরেক্টার সম্প্রদায়ের এবং পরিচালকদিগে সততা, সাধুতা, সাবধানতা ও কার্য্যদক্ষতা দ্বারা তাঁহাদের বিশ্বাস আহর করাই উচিত। নিজের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য অন্যের স্বার্থ বলিদা দেওয়া সর্ব্বতোভাবে অসঙ্গত। নানা কারণেই যৌথ কারবারগুলি উপর দেশবাসীর শ্রদ্ধা কমিয়া যাইতেছে। এই ধরণের কারবারগুলি বাস্তাবকই দেশোন্নতির অন্যতম সোপান। কাজেই যৌথ কারবারে উপরে যাহাতে সকলের আবার আস্থা জন্মিতে পারে, সকলের এক যোগে তাহারই চেষ্টা করা উচিত।

মন্বন্তর ও অয়ন-গতি

অধ্যাপক শ্রীরাজকুমার সেন এম এ

আর্য্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ দুই রকমের বর্ষ ব্যবহার করিয়াছেন—এক, মনুষ্য পরিমাণের বর্ষ, আর দৈব পরিমাণের বর্ষ। মনুষ্যদিগের এক বৎসরে দেবতাদিগের এক দিন। উত্তরায়ন দেবতাদিগের দিবা এবং দক্ষিণায়ন তাহাদিগের রাত্রি। উহার ৩ দিনে দেবতাদিগের এক মাস এবং তাহার ১২ মাসে এক বৎসর। অর্থাৎ মনুষ্যদিগের ৩৬০ বৎসরে দেবতাদিগের এক বৎসর। জ্যোতিঃ শাস্ত্রের প্রায় সমস্ত গণনাই ২, ৩, প্রভৃতির বর্গমূলের ন্যায় নিঃশেষিতরূপে গণনা করা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে সে সকল রাশির বিশুদ্ধতার জন্য দশমিক সপ্তম স্থান পর্য্যন্ত গণনা করিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়া থাকে। দশমিক আবিষ্কারের পূর্ব্বে ৬ শূন্য কি সাত শূন্য যুক্ত অঙ্ক দ্বারা অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ কি কোটি কোটি বর্ষের ফল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কাজেই আর্য্য ঋষিগণ, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, মহাযুগ, মন্বন্তর, কল্প প্রভৃতি দীর্ঘকালব্যাপী যুগের অবতারণা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বোধ হয় এ সকল লম্বা লম্বা রাশিকে অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব করণোদ্দেশ্যেই তাঁহারা দৈববর্ষের ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

যুগের নাম		কলি পরিমাণে		মনুষ্য বর্ষ পরিমাণে		দৈব বর্ষ পরিমাণে
কলি	=	১	=	৪৩২০০০	=	১২০০
দ্বাপর	=	২	=	৮৬৪০০০	=	২৪০০
ত্রেতা	=	৩	=	১২৯৬০০০	=	৩৬০০
সত্য বা কৃত	=	৪	=	১৭২৮০০০	=	৪৮০০
দৈব বা মহাযুগ	=	১০	=	৪৩২০০০০	=	১২০০০

উহার এক হাজার মহাযুগে ব্রহ্মার এক দিবা, বা কল্প। তাঁহার রাত্রিও সেই পরিমাণ। ৭১ মহাযুগে এক মন্বন্তর, তাহার সন্ধি এক সত্যযুগের সমান। এক কল্পে ১৪টী মন্বন্তর ও ১৫টী মনু সন্ধি। মহাযুগের হিসাবে ধরিলে সত্য যুগ = ১ মনু সন্ধি = ৪ মহা যুগ। অতএব ১ কল্প = ১৪ স সন্ধি মন্বন্তর + আদিতে ১ সন্ধি

= (১৪×৭১.৪×৪) মহাযুগ

= (৯৯৯.৬×৪) মহাযুগ

= ১০০০ মহাযুগ

ইহাতে দেখা যায় চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার বর্ষে এক কলিযুগ ; দ্বাপর, ত্রেতা ও সত্য যুগ ক্রমে উহার দ্বিগুণ, ত্রিগুণ ও চতুর্গুণ ; এক মহা যুগ উহার ১০ গুণ। ৭১ মহাযুগে এক মন্বন্তর এবং ৭১.৪ মহাযুগে এক স-সন্ধি মন্বন্তর। ১৪ মন্বন্তর ও সন্ধি অথবা ১৪ স-সন্ধি মন্বন্তর ও আদিতে এক সন্ধিতে এক কল্প বা ব্রহ্মার এক দিবা।

মনুসংহিতাতে কলি, দ্বাপর, ত্রেতা ও সত্য এবং দৈবযুগের পরিমাণ দিয়া বলা হইয়াছে

দৈবিকানাং যুগানান্তু সহস্রং পরিসংখ্যায়া।
ব্রাহ্মমেক মহর্জ্জেয়ং তাবতী রাত্রি রেবচ ॥ ১।৭২

অর্থাৎ সহস্র দৈবযুগে বা মহাযুগে ব্রহ্মার এক দিন, তাঁহার রাত্রিও সেই পরিমাণ।

মন্বন্তর যে কল্পের অংশ তৎসম্বন্ধে মনুসংহিতা কিছু বলেন না। মন্বন্তর সম্পর্কে এই মাত্র বলা হইয়াছে যে

স্বায়ম্ভুবাদ্যাঃ সপ্তৈতে মনবো ভূরি তেজসঃ।
স্বে স্বে হন্তরে সর্ব্বমিদ মুৎপাদ্যাপুঃ চরাচরং ॥ ১।৬৩

অর্থাৎ স্বায়ম্ভুবাদি ভূরিতেজা সপ্ত মনু স্বীয় স্বীয় অন্তরে বা অধিকার সময়ে এই চরাচর বিশ্ব উৎপাদন করিয়া পালন করিয়াছিলেন।

সাবর্ণাদি অপর সপ্ত মনু সম্বন্ধে কিছু বলা হইল না। মন্বন্তরকে কল্পের অন্তর্গত এক ভাগ স্বরূপ পুরাণেই প্রথম বর্ণিত হইয়াছে।

পুরাণের সময়ে মহর্ষিগণ দেখিলেন, ৭১ বৎসরে অয়নগতির পরিমাণ প্রায় এক অংশ হয়। সুতরাং এক মহাযুগ কি এক কল্পেও ৭১এর গুণিতক না হওয়াতে তাহাতে অয়নগতির বাহির পূর্ণ ভগণ হইতে পারে না। অতএব তাঁহারা ৭১ মহাযুগে এক মন্বন্তর ধরিয়া এক কল্পে ১৪ মন্বন্তরের আবির্ভাব করিলেন এবং কল্পের যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে জল বলিয়া উল্লেখ করিলেন।

বিষ্ণুপুরাণ প্রথমাংশ তৃতীয়াধ্যায়ে বলা হইল।

ব্রহ্মণো দিবসে ব্রহ্মন্ মনবশ্চ চতুর্দ্দশ।
ভবন্তি পরিমাণঞ্চ তেষাং কাল কৃতংশৃণু ॥ ১৫
চতুর্যুগসহস্রাং সংখ্যাতা সাধিকাহ্যেক সপ্ততিঃ।
মন্বন্তরং মনোঃ কালঃ সুরাদীনাঞ্চ সপ্তম ॥ ১৭
ত্রিংশৎ কোট্যস্চ সম্পূর্ণাঃ সংখ্যাতা সংখায়া দ্বিজ।
সপ্ত ষষ্টি তথান্যানি নিযুতানি মহামুনে ॥ ১৮
বিংশতিশ্চ সহস্রাণি কালো হয় সাধিকং বিনা।
মন্বন্তরস্য সংখ্যেয়ং মানুষে বৎসরে দ্বিজ ॥ ১৯

ইহাতে দেখা যায় বিষ্ণুপুরাণের মতে ব্রহ্মা এক দিবসে বা এক কল্পে চতুর্দ্দশ মনু এবং মন্বন্তরের পরিমাণ ৭১ মহাযুগ ধরিয়া তাহাকে ১৪ গুণ করিলে কল্পের কিছু অবশিষ্ট থাকে। মনুষ্য বৎসর সংখ্যায় উহার পরিমাণ ত্রিশকোটি সাতষট্টি লক্ষ কুড়ি হাজার। সাধারণতঃ নিযুত দ্বারা আমার দশলক্ষ বুঝিয়া থাকি। কিন্তু এই স্থলে উহার অর্থ এক লক্ষ। শ্রীধর স্বামীর টীকা দ্রষ্টব্য। অভিধানেও নিযুত অর্থ লক্ষ আছে। পরে উদ্ধৃত বায়ু পুরাণের বচনে লক্ষ শব্দই ব্যবহার করা হইয়াছে।

এই মন্বন্তর কালকে ১৪ গুণ করিয়া কল্প হইতে বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট ২৫৯২০০০০ থাকে এবং তাহা ১৫ সত্যযুগের সমান।

৭১ বৎসরে অয়নগতি এক অংশ ধরিয়া তাহাকে ৩৬০ গুণ করিলে ২৫৫৬০ বৎসরে অয়নগতির এক ভগণ হইয়া থাকে। মন্বন্তর কালকে তদ্দারা ভাগ করিলে এক মন্বন্তরে অয়নগতির পূর্ণ ১২০০০ ভগণ হইয়া থাকে। এক অংশে ৩৬০০ বিকলা তাহাকে ৭১ ভাগ করিলে

অয়নগতির বার্ষিক মান ৫০.৭ বিকলা পাওয়া যায়। পুরাণকালের ঋষিগণ অয়নগতির বার্ষিক মান ৫০.৭ বিকলা এবং এক মন্বন্তরে উহার ১২০০০ ভগণ অবধারণ করিয়াছিলেন।

এতৎ সম্পর্কে বায়ু পুরাণ বলেন —

সপ্তষষ্টিশ্চ লক্ষাণি ত্রিংশৎ কোটীস্তথৈবচ।
বিংশতিশ্চ সহস্রাণি মন্বন্তর মিহোচ্যতে॥
চতুর্যুগৈক সপ্তত্যা মন্বন্তরমিতিশ্রুতিঃ।
কল্পে মন্বন্তরৈরেভি চতুর্দ্দশভি রুচ্যতে॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণ, কালিকাপুরাণ, বিষ্ণু স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থেও এইরূপ কথাই বলা হইয়াছে। তৎপরে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ দেখিলেন ৭১ বৎসরে অয়নগতির মান এক অংশ অপেক্ষা কিছু কম এবং ৭২ বৎসরে এক অংশ অপেক্ষা বেশী হইয়া থাকে। কাজেই সত্যযুগ পরিমাণ এক সন্ধির উল্লেখ করিয়া মন্বন্তরের পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি করিয়া সূর্য্যসিদ্ধান্তে বলা হইল।

যুগানাং সপ্ততিঃ সৈকা মন্বন্তর মিহোচ্যতে।
কৃতাব্দ সংখ্যা তস্যান্তে সন্ধিঃ প্রোক্তা জলপ্লবঃ॥
স সন্ধয়স্তে মনবঃ কল্পে জ্ঞেয়াশ্চতুর্দ্দশ।
কৃত প্রমাণ কল্পাদৌ সন্ধিঃ পঞ্চদশ স্মৃতঃ॥
ইত্থং যুগ সহস্রেণ ভূত সংহারকারকঃ।
কল্পো ব্রাহ্ম মহঃ প্রোক্তং সর্ব্বরী তস্য তাবতী॥

প্রথমাধ্যায় ১৮।১৯।২০

অর্থাৎ ৭১ মহাযুগে এক মন্বন্তর এবং তাহার অন্তে সত্য যুগ পরিমাণ এক সন্ধি বা জলপ্লব। এক কল্পে চতুর্দ্দশ সসন্ধি মন্বন্তর এবং প্রারম্ভে সত্য যুগ পরিমাণ এবং সন্ধি মোট পঞ্চদশ সন্ধি। এইরূপে সহস্র মহাযুগে ভূত সংহারক এক কল্পে বা ব্রহ্মার দিন, তাহার রাত্রিও সেই পরিমাণ।

মহামতি ভাস্করাচার্য্যও সিদ্ধান্ত শিরোমণির গ্রহগণিতাধ্যায়ে বলিয়াছেন

মণুঃক্ষমানৈর্যুগৈর্ম্মনুভিশ্চতৈর্ভবেৎ।
দিনং সরোজ জন্মনো নিশাচ তৎপ্রমাণিকা॥ ২৩।
সন্ধয়ঃ স্যুর্ম্মনুনাং কৃতাব্দৈঃ সমাঃ।
আদি মধ্যাবসানৈর্যুক্তে মিশ্রিতে॥
স্যাদ্ যুগানাং সহস্রং দিনং বেধসঃ।
সোঽপি কল্পে ভুবাত্রস্ত কল্পদ্বয়ং॥ ২৪।

৭১ মহাযুগে এক মনু। চতুর্দ্দশ মনু পরিমিত কাল ব্রহ্মার এক দিবস। দিবাকালের তুল্য পরিমাণ কাল তাঁহার রাত্রি। চতুর্দ্দশ মন্বন্তরের আদি মধ্য ও শেষে সত্যযুগ পরিমাণ কাল মনুসন্ধি। পঞ্চদশ সন্ধিসহ চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে এক সহস্র যুগ। উহাই ব্রহ্মার এক দিবস বা কল্প নামে অভিহিত। ব্রহ্মার অহোরাত্র দুই কল্প কাল।

বর্ত্তমানযুগের প্রধান প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ মনে করেন, এক হাজারকে (১৪×৭১·৪×·৪) তে বিভক্ত করা আর্য্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের পক্ষে একটা আকস্মিক ঘটনা মনে করা সঙ্গত নহে। ইহার অবশ্য কোন গূঢ় রহস্য ছিল। হিন্দু পণ্ডিতগণ কোন জটিল বিষয়ের মীমাংসা করিলে, উহার উপপত্তিসহ বিস্তৃত বিবরণ উল্লেখ না করিয়া, কেবল সূত্রাকারে স্থূল মর্ম্ম কোন দেবতার নামে প্রকাশ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন। এই স্থলেও সূর্য্যদেবের নামে এক কল্প বা সহস্র মহাযুগকে ১৪ সসন্ধি মন্বন্তর ও আদিতে সত্যযুগ পরিমাণ পঞ্চদশ সন্ধির উল্লেখ করিয়া তন্মধ্যে অয়নগতির সূর্য্যমান ঢাকিয়া রাখা বিচিত্র নহে।

আমাদের সকল শাস্ত্রই গুরুর নিকট শিক্ষা করার ব্যবস্থা। কারণ, গুরুমুখে না শুনিলে অনেক স্থলে কেবল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া গূঢ় রহস্য ভেদ করা সম্ভবপর নহে। উপযুক্ত গুরুর অভাবে অনেক গূঢ়তত্ত্ব কেহ অবগত হইতে পারেন নাই এবং কালে তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অয়নগতি সম্বন্ধে কেহ বলেন ৫৪ বিকলা, কেহ বলেন ৬০ বিকলা ইত্যাদি—উপরিউক্ত সূক্ষ্ম মানের গূঢ় রহস্য ভেদ করিতে না পারা ভিন্ন বোধ হয় কিছু নহে।

Sir William Jones অয়নগতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, আমাদের এরূপ বিবেচনা করার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে যে, প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ অধিকতর বিশুদ্ধ গণনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদিগের সেই জ্ঞান ১৪ মন্বন্তর ৭১ দৈবযুগ ইত্যাদির মধ্যে গুপ্তভাবে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। (১)

মহাত্মা M. Brennand বলেন অঙ্কবিন্যাসের আকারে দেখা যায়, উহার রচয়িতার বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছিল অর্থাৎ ৪৩২ অঙ্ক বিশিষ্ট কলিযুগকে অপরিবর্ত্তিত ভাবে গুণ করা। যদি বিশেষ কোন উদ্দেশ্য না থাকিত তবে মনুসংহিতা মহাযুগকে এক সহস্র গুণ করিয়া কল্প ঠিক করার কথা যে আছে, তাহা ১৪×৭১·৪×·৪ এইরূপ জটিল করিয়া বলিবে কেন? (২)

এক সসন্ধি মন্বন্তরে অয়নগতির ১২০০০ ভগণ অথবা ৭১.৪ বৎসরে এক অংশ ধরিলে উহার বার্ষিক মান ৫০.৪ বিকলা হয়। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মতে উহার মান ৫০.২ বিকলা। পূর্ব্বে

---

(১) We may have reason to think that the old Indian Astronomers had made a more accurate calculation but concealed their knowledge under the veil of 14 Manwantaras 71 divine ages & c. Brerunands Hindu Astronomy p.81.

(২) The form of the number shows that its inventers had an especial design in view in its construction i. e. to multiply the Kali period with the significant figures 432 unchanged If they had no other design, there would have no reason why they should have deviated from the rule laid down in the Institutes of Manu which only required that they should multiply the divine age by a thousand"

Brennand's Hindu Astronomy p 182.

দেখান হইয়াছে যে, পুরাকালের ঋষিদিগের মতে উহার মান ছিল ৫০·৭ বিকলা।

ইহাতে যদি কেহ আপত্তি করেন যে, প্রাচীন আর্য্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ অয়নগতির এত সূক্ষ্ম মান অবগত থাকিলে সূর্য্যসিদ্ধান্ত কেন বলেন

ত্রিংশৎ কৃত্যো যুগে ভস্মাং চক্রং প্রাক্ পরিলম্বতে।
তদ্‌গুণৈর্ভূ দিনৈ ভক্তদ্‌দ্যুগণাদ্ যদবপোতে।
তদ্দোস্ত্রিঘ্না দশাপ্তাংশাবিজ্ঞেয়া অয়নাভিধা॥ সূ ৯।১০

ইহার ব্যাখ্যাতে টীকাকার অয়নগতির বার্ষিক মান ৫৪ বিকলা স্থির করিয়াছেন; এবং তিনি বলেন, তিন গুণ করিয়া ১০ ভাগ করার কথা বলাতে উহার ভগণ ঠিক ৩৬০ অংশ না হইয়া ৩৬০×৩/১০ = ১০৮ অংশ ধরা হইয়াছে। তিনি আরও বলেন, অয়নগতি যে সর্ব্বদা পশ্চিম দিকে হয় তাহা নহে, কোন সময়ে পশ্চিম দিকে এবং কোন সময়ে পূর্ব্বদিকে হইয়া থাকে। সেই সময়ে উহার গতি পশ্চিম দিকে ছিল বলিয়া "প্রাক্ পরিলম্বতে" বলা হইয়াছে।

ইহার মতে ক্রান্তিপাত বিন্দুর দোলায়মান গতি, অশ্বিনীর আদি বিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম ২৭ অংশ পশ্চিম দিকে পূর্ব্ব ভাদ্রের শেষ ২০ কলা পর্য্যন্ত যাইয়া পূর্ব্বাভিমুখে অশ্বিনীতে আসে এবং তথা হইতে পূর্ব্বদিকে ২৭ অংশ কৃত্তিকার প্রথম ২০ কলা পর্য্যন্ত যাইয়া পুনঃ পশ্চিমাভিমুখে অশ্বিনীতে আসে। ইহাই উহার এক ভগণ। ক্রান্তিপাত বিন্দুর উক্তরূপ দোলায়মানগতি পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ সমর্থন করেন না। ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের মধ্যে ভাস্করাচার্য্য, মুঞ্জাল প্রভৃতি বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ উহা স্বীকার না করিয়া পরিষ্কার "ব্যস্ত" অর্থাৎ বিপরীত দিকে বলিয়াছেন।

পরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ সূর্য্যসিদ্ধান্তের অনেক স্থানে পরিবর্ত্তন এবং নূতন পাঠের যোজনা করিয়াছেন। সংপ্রতি সাহিত্য পরিষদে "সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও পঞ্জিকা গণনা" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম-এ মহোদয় লিখিয়াছেন "বর্ত্তমান কালে প্রচলিত সূর্য্যসিদ্ধান্ত আদি সূর্য্যসিদ্ধান্ত নয়। ইহাতে একাধিক ব্যক্তির রচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। বরাহ মিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকা গ্রন্থে আমরা যে প্রাচীন সিদ্ধান্তের পরিচয় পাই, তাহার সংখ্যা সমূহও বর্ত্তমান সূর্য্যসিদ্ধান্তের সংখ্যা সমূহ হইতে অনেক পৃথক্।" আমার মনে হয়

"তদ্‌গুণৈর্ভূ দিনৈ উক্তাদ্ দ্যুগণাদ যদপাপ্যতে।
তদ্দোস্ত্রিঘ্না দশাপ্তাংশা বিজ্ঞেয়া অয়নাভিধাঃ॥

ই শ্লোকটী ভাস্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী কোন জ্যোতির্ব্বিদ্ যোজনা করিয়াছেন। কারণ ভাস্করের সময়ে সূর্য্যসিদ্ধান্তে এরূপ পাঠ থাকিলে, তিনি কখনও সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে অয়নগতির ভগণ এক কল্পে তিন অযুত বলিতেন না। ইহাতে বোধ হয় সেই সময়ে উপরিস্থিত শ্লোকে "ত্রিংশৎ কৃত্যঃ" স্থলে "ত্রিংশৎ কৃত্বঃ" পাঠ ছিল এবং পরবর্ত্তী তদ্‌গুণৈঃ ইত্যাদি শ্লোক আদৌ ছিল না। অন্য কোন গ্রন্থে দোলায়মান গতির উল্লেখ থাকিলে ভাস্করের মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোক উহার সমালোচনা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না। মহাত্মা W. Brennand যাহা এতৎ সম্পর্কে বলেন, তাঁহার মর্ম্ম এই যে ত্রিভেলোরের জ্যোতিঃ সারণী দেখিয়া লি জেণ্টিল আবিষ্কার করেন যে হিন্দুমতে অয়নগতির বার্ষিক মান ৫৪ বিকলা এবং আধুনিক সকল সিদ্ধান্তেই এই মান গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু সার উইলিয়ম জোন্‌স্ সন্দেহ করেন যেন সূর্য্যসিদ্ধান্ত সঙ্কলনের পূর্ব্বে অয়নগতির অধিকতর বিশুদ্ধ মান স্থির করিয়া তাহা চতুর্দ্দশ মন্বন্তরের অন্তরালে গুপ্তভাবে রাখা হইয়াছিল। (৩)

ইহাতে দেখা যায়, যাহারা ক্রান্তিপাত বিন্দুর বার্ষিক ৫৪ বিকলা দোলায়মান গতির উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মতে হিন্দু জ্যোতিষের আদি বিন্দু চিরকালই অশ্বিনী নক্ষত্রের আরম্ভে এবং ক্রান্তিপাত বিন্দু উক্ত আদি বিন্দু হইতে কখনও ২৭ অংশের বেশী দূরবর্ত্তী হইতে পারে না।

কোন প্রাচীন ঋষি এই মতের সমর্থন করেন নাই; বরং প্রাচীন ঋষিদিগের কথা আলোচনা করিয়া, উক্ত মত যে ঠিক নয়, তাহাই প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

মহাত্মা বালগঙ্গাধর তিলক বহু বৈদিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার The Orion নামক গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ক্রান্তিপাত বিন্দু অতি প্রাচীনকালে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের প্রারম্ভে ছিল, তৎপরে মৃগশিরার আরম্ভে, তৎপরে কৃত্তিকার এবং অবশেষে কলির ৩৬০১ বর্ষে অশ্বিনীর আরম্ভে ছিল।

পুনর্ব্বসুর আরম্ভ অশ্বিনী হইতে ৮০ অংশ দূরে,—সুতরাং ক্রান্তিপাত বিন্দু অশ্বিনী হইতে ২৭ অংশের বেশী দূরে থাকিতে পারে না—এই কথা প্রাচীন ঋষিদিগের মতের বিরুদ্ধ। তাঁহার প্রমাণগুলি সংক্ষেপে নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

মুখং বা এতদৃতুনাং যদ্ বসন্তঃ। তৈ, তে ব্রাঃ ১-১।২।৬। এতদুপরি কাল মাধব বলেন "সংবৎসর ক্রম রূপত্বেন বসন্তস্য প্রাথমং দ্রষ্টব্যং।"

ইহাতে দেখা যায়, বৈদিক সময়ে বসন্তই বৎসরের প্রথম ঋতু রূপে পরিগণিত ছিল। বিশেষ ভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, পূর্ব্বে ব্যবহারিক ক্রিয়া কর্ম্মের জন্য এক রকম এবং বৈদিক গণনাদির জন্য অন্য রকম বৎসরের ব্যবহার হইত।

তেষাঞ্চ সর্ব্বেষাং নক্ষত্রাণাং কর্ম্মসু কৃত্তিকাঃ।
প্রথম সাচক্ষতে শ্রবিষ্ঠস্তু সংখ্যায়াঃ॥

বেদাঙ্গ জ্যোতিষ সম্পর্কে সোমা কর ধৃত গর্গোক্তি। বসন্তো গ্রীষ্মো বর্ষা দেব ঋতবঃ। শরদ্ধেমন্তঃ শিশির স্তে পিতরঃ। .....স (সূর্য্যঃ)

---

(৩) He Gentil had discovered from Astronomical Tables of Trivelore that the Hindus made the value of the Precession of the Equinoxes 54" and this value is also assumed in all the modern Siddhantas. Sir W. Jones tsuspected that a more correct value of the precession had been obtained at some earlier period than that in which the Surjya Sidchanta was compiled and that it had a connection with the 14 manwantaras. Hindu Astronomy, p. 181.

যত্র উদগা বর্ত্ততে দেবেষু তর্হি ভবতি দেবা। স্তন্তিগোপায় অর্থ যত্র দক্ষিণাবর্ত্ততে পিতৃষু তর্হি ভবতি পিতৃ। স্তনগোপায়তি।

শত পথ ব্রাঃ ২।১৩।১

বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা ইহারা দেব ঋতু। শরৎ হেমন্ত শিশির ইহারা পিতৃ ঋতু......যখন সূর্য্যদেব উত্তর দিকে গমন করেন, তখন তিনি দেবতাদিগের মধ্যে থাকেন; এবং দেবতাদিগকে রক্ষা করেন। যখন তিনি দক্ষিণদিকে গমন করেন, তখন তিনি পিতৃদিগের মধ্যে থাকেন; এবং পিতৃগণকে রক্ষা করেন।

ইহাতে দেখা যায়, উত্তরায়ন হইতে আরম্ভ করিয়া বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা তিনটী দেব ঋতু এবং দক্ষিণায়ন হইতে আরম্ভ করিয়া শরৎ হেমন্ত শিশির এই তিনটী পিতৃ ঋতু।

আশ্লেষার্দ্ধাদাসীদ্যদা নিবৃত্তিঃ কিলোষ্ণ কিরণস্য
যুক্তময়নং তদাসীৎ সাংপ্রতময়নং পুনর্বসুতঃ॥

পঞ্চসিদ্ধান্তিকা

যখন অশ্লেষার মধ্য স্থানে সূর্য্য নিবৃত্ত হইতেন, অর্থাৎ দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইত, তখন অয়ন যুক্ত বা ঠিক ছিল। সংপ্রতি পুনর্ব্বসুতে দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয়।

আশ্লেষার্দ্ধাদ্দক্ষিণ মুত্তরময়নং রবের্দ্ধনিষ্ঠাদ্যং।
নূনং কদাচিদাসীদ্ যেনোক্তং পূর্ব্বশাস্ত্রেষু॥
সাম্প্রময়নং সবিতুঃ কর্কটাদ্যং মৃগাদিতশ্চান্যৎ।
উক্তাভাবোবিকৃতিঃ প্রত্যক্ষ পরীক্ষণৈ ব্যক্তিঃ।

বৃহৎ সংহিতা তৃ ১।২

বরাহ মিহির বলেন পূর্ব্ব শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে অশ্লেষার মধ্যভাগে সূর্য্যের দক্ষিণায়ন এবং ধনিষ্ঠার আদিতে উত্তরায়ন আরম্ভ। কিন্তু সংপ্রতি উক্ত দুই অয়ন ক্রমে কর্কটের ও মকরের আদিতে হইয়া থাকে। এই বিকৃত ভাব প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারাই ব্যক্ত।

প্রপদ্যেতে শ্রবিষ্ঠাদৌ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুদক্।
সার্পার্দ্ধে দক্ষিণার্কস্তু মাঘ শ্রাবণয়োঃ সদা॥ বেদাঙ্গ জ্যোতিষ।

ধনিষ্ঠার প্রথমে উত্তরায়ন এবং অশ্লেষার মধ্যস্থানে দক্ষিণায়ন মাঘ ও শ্রাবণ মাসে সর্ব্বদা হইয়া থাকে।

মুখং বা এতন্নক্ষত্রাণাং যৎ কৃত্তিকাঃ। তৈঃ ব্রাঃ প্র—৫।২।৭

নক্ষত্রাদিগের মধ্যে কৃত্তিকাই মুখ অর্থাৎ প্রথম। দেবগৃহা বৈনক্ষত্রাণি। কৃত্তিকা প্রথমং বিশাখে উত্তমং তানি দেব নক্ষত্রাণি। অনুরাধা প্রথমং অপভরণী রুত্তমং তানি যম নক্ষত্রাণি।

এ সকল প্রমাণ সম্পর্কে মহাত্মা বাল গঙ্গাধর তিলক যাহা বলেন, তাহার মর্ম্ম এই—তৈত্তেরীয় সংহিতার সময়ে ক্রান্তিপাত বিন্দু কৃত্তিকাতে ছিল, তৎসম্পর্কে এ সকল শ্লোক কেবল পরিপোষক প্রমাণ নহে, প্রত্যক্ষ প্রমাণও বটে। কারণ মাঘী পূর্ণিমাতে উত্তরায়ন হইলে চন্দ্রাবস্থিত দক্ষিণায়ন বিন্দু মঘাতে ছিল এবং মঘা হইতে পশ্চাদ্দিকে সপ্তম নক্ষত্র কৃত্তিকাতে ক্রান্তিপাত বিন্দুর অবস্থান বুঝা যায়। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের প্রমাণের উপরে তৈত্তেরীয় সংহিতা ও ব্রাহ্মণে চারিটী বিভিন্ন কথা পাওয়া যায়: এবং তাহাতে দেখা যায়, সেই সময়ে ক্রান্তিপাত বিন্দু কৃত্তিকাতে ছিল। (১) নক্ষত্রগণের ও তাহাদের অধিদেবতার ফর্দ্দ (list) কৃত্তিকাতে আরম্ভ। (২) কৃত্তিকা নক্ষত্রদিগের মুখ এবং কৃত্তিকাই দেবনক্ষত্রের প্রথম। (৩) পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে, ক্রান্তিপাতের উপরে উত্তর গোলার্দ্ধে অবস্থিত নক্ষত্রগণকে দেবনক্ষত্র বলা হইত। (৪) উত্তরায়ন মাঘ মাসে হইত। এই সকল কথাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রমাণ করিতেছে যে, ক্রান্তিপাত কৃত্তিকাতে ছিল। কৃত্তিকাতে ক্রান্তিপাত থাকা সম্পর্কে অধিকতর সমর্থক বৈদিক প্রমাণ আমি আবশ্যক মনে করি না। (৪)

ইহাতে দেখা যায় যে, কোন সময়ে ক্রান্তিপাত বিন্দু কৃত্তিকাতে ছিল এবং কৃত্তিকা হইতেই সকল গণনা করা হইত। বর্ত্তমান সময়েও নাক্ষত্রিকী দশা কৃত্তিকা হইতেই গণনা করা হইয়া থাকে।

তৎপরে মহাত্মা বাল গঙ্গাধর তিলক দেখাইয়াছেন যে, অশ্বিনী হইতে একান্তর কৃত্তিকাতে ক্রান্তিপাত থাকার ন্যায় কৃত্তিকা হইতে একান্তর পুনর্ব্বসুতে ক্রান্তিপাত থাকার প্রমাণও বৈদিক গ্রন্থে রহিয়াছে।

---

(8) The passage thus supplies not only confirmatory but direct evidence of the coincidence of the Krittikas with the vernal equinox in the days of Taitt Sanhita. For if the winter Solstice fell on the full moon day in Magha, then the summer solstice, where the moon must then be, must coincide with the asterism of Magha and counting 7 Nakshatras backwards we get the vernal equinox in the Krittikas Independently of the Vedanta Jyotish we thus have four different statements in the Taitt Sanhita and Brahmans clearly showing that the vernal equinox was then in the Krittikas. Firstly the list of the Nakshatras and their preceding deities, given in the Taitt. Sanhita and Brahmana, all beginning with the Krittikas. Secondly an express statement in the Taitt. Brahmana that the Krittikas are the month of the Nakshatras. Thirdly a statement that the Krittikas are the first of the Deva Nakshatras, that is, as I have shown before, the Nakshatras in the northern hemisphere above the vernal equinox. Fourthly the passage in the Taitt-Sanhita above discussed which expressly states that the Winter solstice fell in the month of Magha.

The vernal equinox is referred to the Krittikas directly in all these passages and I do not think that any more confirmatory evidence from the Vedic works is required to establish the proposition that the Krittikas coincided with the vernal equinox when the Taitt. Sanhita was compiled. The Orions, p. 54.

ফল্গুনী পূর্ণমাসে দীক্ষেরন্ মুখং বা এতৎ সংবৎসরস্ম যৎ ফল্গুনী পূর্ণ-মাসো মুখত এব সংবৎসর মারভ্য দীক্ষতে। তৈ তেঁ সং সপ্তম—৪।৮

এষাহ সংবৎসরস্ম প্রথমা রাত্রি যৎ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী।

শত-পথ ব্রাঃ চতুর্থ ২।২।১৮

এযাবৈশমা রাত্রিঃ সংবৎসরস্থ যদুত্তর ফল্গুনী মুখত

এব সংবৎসরস্থাগ্নি মাধায় বলীয়ান্ ভবতী। তৈ তে ব্রাঃ প্রথম ১।২।৮

মুখং বা এতৎ সংবৎসচস্থ যৎ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী। সাঃ ব্রাঃ চতুর্থ—৪

মুখ-মুত্তর ফল্গুনৌ পুচ্ছং পূর্ব্বে। তৎ যথা প্রবৃত্তস্থানতৌ সমেতৌ স্থাভং। এব মেতৎ সংবৎসরস্থানতৌ সমেতৌ ভবতঃ।

গোপথ ব্রাঃ প্রথম — ১৯

এই সকল মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে বৎসরের মুখ বা আরম্ভ ছিল। উত্তর ফল্গুনী বৎসরের মুখ এবং পূর্ব্বফল্গুনী পুচ্ছ অর্থাৎ উত্তর ফল্গুনীতে বৎসরের আরম্ভ এবং পূর্ব্ব ফল্গুনীতে বৎসরের শেষ হইত। পূর্ণিমার দিন চন্দ্র যদি উত্তর ফল্গুনীর আরম্ভে থাকে তবে সূর্য্য তাহার চতুর্দ্দশ নক্ষত্র পূর্ব্বভাদ্রপদের মধ্যে থাকা আবশ্যক। "মুখং বা এতদৃতুনাং যদ্ বসঃ" এই বাক্যের সহিত মিলাইয়া দেখা যায়, সেই সময়ে উত্তরায়ন পূর্ব্বভাদ্রপাদের মধ্যে ছিল। সুতরাং পূর্ব্বভাদ্রপাদের মধ্য হইতে গণনা করিয়া ৬ৄ নক্ষত্র মৃগশিরার প্রথম পাদে ক্রানতিপাত বিন্দু থাকা বুঝা যাইতেছে।

পরন্তু মৃগশিরার অপর নাম অগ্রহায়ণী—"মৃগশীর্ষে মৃগশিরা স্তস্মিন্নেবাগ্রহায়ণী।" অমরকোষ ইহাতেও দেখা যায়। সূর্য্য অগ্রহায়ণী বা মৃগশিরা নক্ষত্রে আসিলে বর্ষারম্ভ হইত বলিয়াই উহার নাম অগ্রহায়ণী হইয়াছিল।

এই সকল প্রমাণ আলোচনা করিয়া তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম :—

তৈতেরীয় সংহিতা ব্রাহ্মণের যে, সকল শ্লোকে দেখা যায় যে ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে বর্ষারম্ভ হইত, তাহা ধরিয়া আমি দেখাইয়াছি, মৃগশিরার অপর নাম অগ্রহায়ণী। যদি যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করা যায় তবে কোন পুরাতন সময়ে ক্রান্তিপাত বিন্দু মৃগশিরাতে ছিল বুঝা যায়। গোল ক্ষেত্রে দৃষ্টি করিয়া সহজেই বুঝা যায় যে ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে সূর্য্য উত্তরায়ন বিন্দুতে থাকিলে, চন্দ্র পূর্ণ হওয়ার জন্য তাহার বিপরীত দক্ষিণায়ন বিন্দুতে উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রে থাকা আবশ্যক। উত্তর ফাল্গুনীতে দক্ষিণায়ন এবং মৃগশিরাতে ক্রান্তিপাত। মাঘ মাসে উত্তরায়ন হইলে কৃত্তিকাতে ক্রান্তিপাত, আবার পৌষ মাসে উত্তরায়ন হইলে অশ্বিনীতে ক্রান্তিপাত। এবং অশ্বিনী ও পৌষ, কৃত্তিকা ও মাঘ এবং মৃগশিরা ও ফাল্গুন পরস্পর সম্বন্ধ বর্ষারম্ভ-যুগল, সম্পূর্ণ অয়ন গতির উপর নির্ভর করে। পূর্ব্বোক্ত ঘটনা, ভক্তিমূল ও উপকথা আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে, আর্য্য সভ্যতায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যে ঐ সকল বর্ষারম্ভ ছিল, তাহার যথেষ্ট বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। (৫)

ইহাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, বহু পূর্ব্বে আর্য্য ঋষিগণ ক্রান্তিপাত বিন্দু মৃগশিরা নক্ষত্রে অবলোকন করিয়া তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। অশ্বিনী হইতে মৃগশিরা পঞ্চম নক্ষত্র, সুতরাং অশ্বিনী হইতে উহার দূরত্ব ৫৩ অংশ ২০ কলা।

তৎপূর্ব্বে ক্রান্তিপাত বিন্দু পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে দেখা সম্বন্ধে তিনি দেখাইয়াছেন,

চিত্রা পুত্রমাসে দীক্ষেরন্ চক্ষুর্ব্বা এতৎ সংবৎসরস্য
যচ্চিত্রা পূর্ণমাসো মুখতো বৈ চক্ষু মুর্খত এব ভৎ
সংবৎসর মারভ্য দীক্ষন্তে তস্য ন নির্বাস্তি। ৩১স্তা ব্রাঃ পঞ্চম ৯

যদি চৈত্রী পূর্ণিমাতে উত্তরায়ন হয়, তবে চিত্রার প্রারম্ভে স্থিত চন্দ্র পূর্ণ হওয়ার জন্য সূর্য্য তাহার চতুর্দ্দশ নক্ষত্র রেবতীর মধ্য স্থানে থাকা আবশ্যক। সুতরাং সেই সময়ে উত্তরায়ন বিন্দু রেবতীর মধ্য স্থানে থাকা বুঝা যাইতেছে। তথা হইতে ৬ৄ নক্ষত্র গণনা করিয়া ক্রান্তিপাত বিন্দু পুনর্ব্বসুর প্রথম পাদে ছিল বুঝা যায়।

পরন্তু বৃহৎ সংহিতা উপলক্ষে ভট্টোৎপল গর্গোক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,—

"প্রবিষ্ঠাদ্যাৎ পৌষ্ণার্দ্ধে চরতঃ শিশিরঃ॥"

২৭ নক্ষত্রে ৬ ঋতু, সুতরাং এক এক ঋতু ৪ নক্ষত্র ব্যাপ্ত। এখানে বলা হইল ধনিষ্ঠার আরম্ভ হইতে রেবতীর মধ্য পর্য্যন্ত ৪ নক্ষত্র ব্যাপৃত শীত ঋতু। ইহাতে দেখা যায়, সেই সময়ে রেবতীর মধ্য স্থানে উত্তরায়ন বিন্দু ছিল এবং সেই স্থানেই শীতের অবসান ও বসন্তের আরম্ভ হইত।

এতৎ সম্পর্কে মহাত্মা বাল গঙ্গাধর যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে :—

(৫) Commencing with the passages in the Taitt. Sanhita and Brahmana, which declare that the Phalguni full moon was once the New Year's night, we found that the Mrigashiras was designated by a name which if rightly interpreted showed that the vernal equinox coincided with that asterion in old times...... A reference to the figure will show at a glance, if the Sun be in the Winter solstice on the Phalguni full moon day, the moon to be full, must be diametrically opposite to the Sun and also near Phalguni. Uttara Phalguni will thus be at the Summer Solstice and the Vernal equinox will coincide with the Mrigashiras. With the Solstice in the Magha, the equinox will be in the Krittikas; while when Uttarayan begins in Pousha, the equinox is in Ashwini. Ashwini and Pousha, Krittikas and Magha, and Mrigashiras and Phalguna, are thus the Correlative pairs of successive year beginnings depending entirely upon the precession of the equinoxes and the facts, statements, texts and legends discussed in the previous chapter supply us with reliable evidence direct and indirect of the oxistence of these year beginnings in the various periods of Aryan Civilization. The Orion, p. 199.

যেমন ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে উত্তরায়ন থাকিলে মৃগশিরাতে ক্রান্তিপাত থাকা বুঝা যায়, তেমন চৈত্রী পূর্ণিমাতে উত্তরায়ন থাকিলে পুনর্ব্বসুতে ক্রান্তিপাত ছিল বুঝা যায়। দেখিতে হইবে এইক্ষণ আমরা অতি প্রাচীন সময়ে প্রবেশ করিতেছি। সম্ভবতঃ এই সময়েই কিয়ৎ পরিমাণ বিশুদ্ধতার সহিত প্রথম বর্ষারম্ভ করা হইয়াছিল। এতৎ সম্পর্কে বেদে উপকথার ন্যায় প্রস্তাব ব্যতীত পরিষ্কার কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। পুনর্ব্বসু কখনও নক্ষত্রদিগের প্রথম ছিল বলিয়া কোন কথা দেখা যায় না; অথবা অগ্রহায়ণীর মত কোন প্রতিশব্দও পাওয়া যায় না। পুনর্ব্বসুর এই পুরাতনতম অবস্থান সম্বন্ধে বেদেও প্রাসঙ্গিক কথা রহিয়াছে। পুনর্ব্বসুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অদিতি। ঐতেরীয় ব্রাহ্মণে ও তৈত্তেরীয় সংহিতাতে আছে যে অদিতি এমনই ভাগ্যবতী যে সমস্ত যজ্ঞের আরম্ভ ও সমাপ্তি তাহাতেই হইবে। দেবতা-দিগের নিকট হইতে যজ্ঞ কোথায় পলাইয়া গেল, তখন দেবতাদিগের আর যজ্ঞ করার ক্ষমতা রহিল না। তাঁহারা জানিতেন না যে, সে কোথায় গেল। তখন অদিতির সাহায্যে কোন্ সময়ে যজ্ঞ আরম্ভ করা উচিত তাহা তাঁহারা স্থির করিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে ইতঃপূর্ব্বে যজ্ঞারম্ভের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল না। তখন সূর্য্য অদিতিতে অর্থাৎ পুনর্ব্বসুতে আসিলে যজ্ঞ বা বর্ষারম্ভ হওয়া স্থির হইল। অদিতি হইতেই আদিত্যদিগের জন্ম অর্থাৎ সূর্য্যের বার্ষিক গতির আরম্ভ। (৬)

(৬) With the Phalguni full moon at the Winter solstice, the Vernal equinox was in Mrigashiras, so with the Chitra full moon at the solstice, the Vernal equinox would be in Punarvasu ....It must be observed that we are here entering upon the remostest period of antiquity, when the year was probably first determined with some approach of accuracy, and even in Vedas there is hardly anything beyond vague traditions about this period. There is no express passage which states that Punarvasu was ever the first of Nakshatras nor have we in this case a synonym like Agrahayana or Orion wherein we might discover similar traditions There are however some indications about the oldest position of Punarvasu preserved in the sacrificial literature. The presiding deity of Punarvasu is Aditi and we are told in Aitiriya Brahman 1-7 and the Taitt. Sanhita vi 1,5,1 that Aditi has been that all sacrifices must commence and end with her. The sacrifice went away from the Gods. The Gods were then unable to perform any further ceremonies and did not know where it had gone to and it was Aditi that helped them in this state, to find out the proper commencement of the sacrifice. This clearly means that before this time sacrifices were performed at random but it was at this time resolved and fixed to commence them at Aditi. It was from her that the Adityas were born (Rig x-72), (Shat. Br. iii) or the seen cammenced his yearly course. (See mesne IV 95) The Orion p. 199,

"তিক্ত হ'তে কাতর সুধাবস"

মনুষ্য-সম্পদ রূপে মানবেতর জীব

শ্রীহরিহর শেঠ

মানব তাহাদের সুখ সম্পদের জন্য জগতের কোন্ জিনিষটী নিজেদের কাজে না লাগায়! যার দ্বারা যে কাজ পাওয়া যায়, তা উদ্ভিদ, খনিজ, সামুদ্রিক, চেতন, অচেতন, যাহা কিছু জলে, ভূমিতে বা আকাশে, দুরারোহ পর্ব্বতকন্দরে বা অসীম জলরাশির অন্ধকারময় তলদেশ হইতে সংগ্রহ করিতে পারে, তাহা করিয়া নিজেদের ভোগে লাগায়, নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করে। গভীর অরণ্য-মধ্যে যে সকল ভীষণ ও শক্তিশালী জন্তু লোক-চক্ষু হইতে দূরে অবস্থান করে, তাহারাও মানুষের সম্পদের ভাণ্ডারের যে পূর্ণতা সাধন করিয়া থাকে, তাহাও বড় কম নহে।
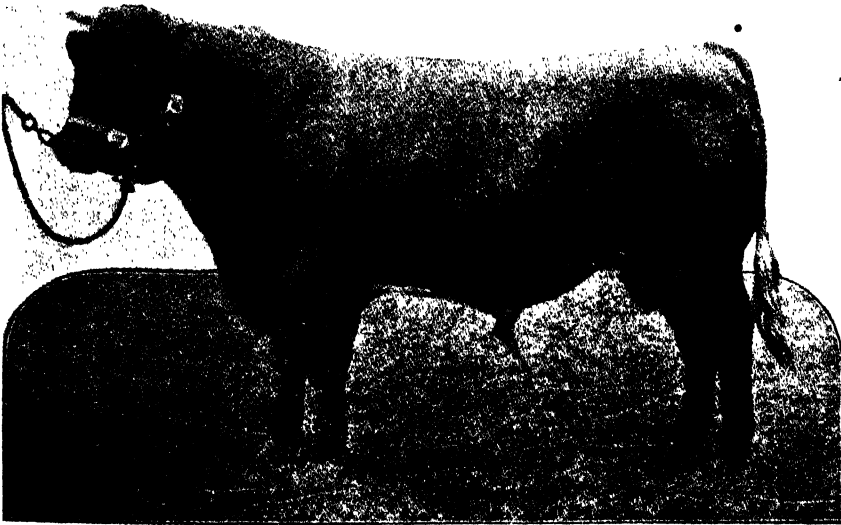
ছোট জাতীয় মূল্যবান গাভী

ক্ষুদ্র সিং বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট বুলদ

আমরা এ দেশে গাভী, ঘোড়া, ছাগল, শূকর প্রভৃতি জন্তু সকল হইতে বা হাঁস মুরগী ও বিবিধ সুন্দর সুন্দর বিহঙ্গম হইতে অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকি। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশসমূহের অধিবাসীরা জীব জন্তুর ব্যবসায় করিয়া যে প্রকার অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে, তাহা এ দেশের তুলনায় অদ্ভুত। ভারতবর্ষে জন্তু জানোয়ারের ব্যবসা যে নাই, তাহা নহে। তবে সে সব সাধারণ

একটি জননাশ্ব, ৩৭০০ গিনিতে বিক্রয় হয়

পুরস্কার প্রাপ্ত ছোট ঘোড়া

ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান গোশালার এক অংশ
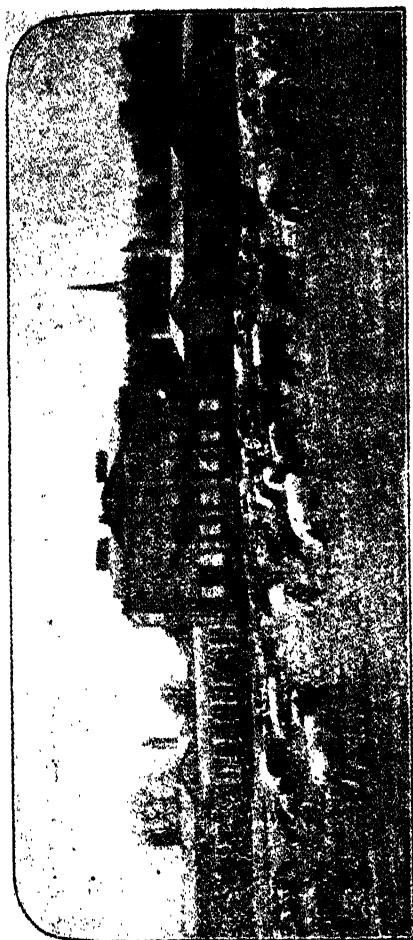
গৃহপালিত জন্তু লইয়া, এবং নিতান্ত সাদাসিদা ভাবে, কোন একটা বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন না করিয়াই, হইয়া থাকে। অনেক সময় হাটে বা মেলা-ক্ষেত্রেই প্রায় জীবজন্তুর বেচা-কেনা হইয়া থাকে; নচেৎ বড় রকমে এবং নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে জীব-জন্তুর ব্যবসার এদেশের কোথাও আছে বলিয়া শুনা যায় না। হাতী ঘোড়া উট প্রভৃতি বড় বড় জন্তুও হরিহরছত্র বা ঐরূপ অন্য কোন মেলায় বিক্রীত হইয়া থাকে; কিন্তু পৃথিবীর অন্যাংশে যেরূপ চেষ্টা, বায় ও উৎসাহের সহিত শুধু হাতী ঘোড়া নয়, ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতিরও সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা আছে, তাহা এই বহুবিধ জন্তু-জানোয়ার-পূর্ণ জঙ্গলময় ভারতের অধিবাসীদের পক্ষে একটা জ্ঞাতব্য বিষয়। অন্যান্য দেশে মনুষ্য-চেষ্টায় মনুষ্যেতর জীবদেহের যেরূপ উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে, এবং যে রূপ অধিক মূল্যে তাহা বিক্রীত হইয়া থাকে, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

শবাধারবাহী ঘোটক

একটি মূল্যবান অশ্ব

চীন দেশের পর্ব্বত হইতে জন্তু আনয়ন

ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জন্তু জানোয়ারের বাজার আছে। তন্মধ্যে অষ্ট্রীয়ার হামবার্গ নগরের উপকণ্ঠে একটী পশুশালা আছে; উহাই বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম।

ইহার স্বত্বাধিকারীর নাম মিঃ কার্ল হ্যাগেনবেক্। ইনি জন্তু-ব্যবসায়ীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া খ্যাত। এই পশুশালায় কেবলই যে বিবিধ জন্তু জানোয়ার রক্ষিত হইয়া বিক্রীত বা অন্যের সহিত অদল-বদল করা হইয়া থাকে তাহা নহে; প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাকে প্রাণিতত্ত্ব শিক্ষার একটী প্রতিষ্ঠান বলিতে পারা যায়। যত প্রকার জন্তু-জানোয়ার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রায় সমস্তই এখানে বিক্রয়ার্থ প্রভূত পরিমাণে মজুত থাকে। সম্পূর্ণ আধুনিক ভাবে পশুশালা নির্ম্মাণের যাহা কিছু ব্যবস্থা, সমস্তই এখানে শিক্ষা করিতে পারা যায়। ভিন্ন ভিন্ন দেশের পশুপক্ষী কি ভাবে পালন করিতে হয়, তাহার বিষয় জ্ঞাতব্য পরামর্শাদি জানা যায়। এখানে সর্ব্বাপেক্ষা যাহা দর্শকের নয়ন আকর্ষণ করিয়া থাকে, তাহা মনুষ্য-চেষ্টায় উৎপন্ন নূতন-নূতন জীব।

ভারতীয় ও আফ্রিকার সারস

আফ্রিকার অষ্ট্রিচ পক্ষী

এই বিশাল পশুশালার, শুধু ইউরোপে নহে, এসিয়া আফরিকা ও আমেরিকাতেও স্থানে-স্থানে শাখা আছে। যে দেশের জঙ্গলে যে সব জন্তু পাওয়া যায়, সে দেশের সেই সকল স্থানে তথাকার স্থানীয় লোক, বিশেষতঃ জন্তুর কারবারে বিশেষজ্ঞগণকে তাহারা জন্তু ধরার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকে। এইরূপে তাহারা নিউবিয়া, আবিসিনিয়া ও সেনিগালের জঙ্গল হইতে সিংহ, বাঙ্গলার জঙ্গল হইতে ব্যাঘ্র ধরিয়া লইয়া যায়। তিব্বত ও সাইবেরিয়া হইতেও তাহারা ব্যাঘ্র আমদানী করিয়া থাকে।

সচরাচর ব্যাঘ্র ও সিংহের গহ্বর হইতে ব্যাঘ্রী ও সিংহীকে বধ করিয়া শিকারীরা তাহাদের শিশু শাবকদিগকে ধরিয়া লইয়া আসে এবং প্রথম প্রথম তাহাদিগকে ছাগদুগ্ধ বোতলে করিয়া বা অন্য উপায়ে পান করায়। তৎপরে কিছু বড় হইলেই ছোট ছোট পক্ষীর মাংস দিয়া থাকে। যত দিন না অন্ততঃ তিন চারি মাসের হয়, ততদিন তাহাদের ইউরোপে লইয়া যায় না।

সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকারের সিংহ উত্তর আফরিকার পর্ব্বত হইতে আনীত হয়। পূর্ণ-বয়স্ক সিংহ ১০০ হইতে ২০০

পাউণ্ড পর্য্যন্ত দরে এক একটী বিক্রীত হইয়া থাকে। সাইবেরিয়ার বৃহৎ ব্যাঘ্রের এক একটী ৩০০ পাউণ্ডও দাম হয়। পারস্ত বলখান হ্রদ ও রুষিয়ার অন্তর্গত তুর্কিস্থান হইতেও ব্যাঘ্র সংগৃহীত হইয়া থাকে।

ভাল ভাল এবং নূতন জাতীয় জন্তু সংগ্রহ করিতে অনেক অর্থ ব্যয় করিতে ও সময় সময় অনেক অজানা দেশে বহু বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। এক সময় একজন রুষ-ভ্রমণকারীর ভ্রমণবৃত্তান্ত মধ্যে এক প্রকার বন্য ঘোড়ার সন্ধান পাইয়া মিঃ হ্যাগেনবেক মধ্য এসিয়ার সাঙ্গারীয়া মরুভূমিতে এক দল লোক পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তথায় প্রায় দুই সহস্র স্থানীয় লোক নিযুক্ত করিয়া বাহান্নটী বাচ্ছা ঘোড়া সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই পশুশালাকে পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য যাহা কিছু করা দরকার, যত অর্থ-ব্যয় আবশ্যক, তাহার কোন ত্রুটী করা হয় না। ভল্লুক, কেঙ্গারু, হরিণ, উষ্ট্র, জিরাফ, হস্তী, বাঁদর, কুর্ম্ম, জেব্রা, মেষ প্রভৃতি সমস্ত জন্তু ও অষ্ট্রীচ, সারস, হাড়গিল্লা হইতে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎকৃষ্ট জাতীয় সকল প্রকার পক্ষী ও বহু বিষধরসর্প এবং অন্যান্য সরীসৃপ সমস্তই প্রভূত পরিমাণে সর্ব্বদা মজুত থাকে। সিসিলি

সাইবিরিয়া দেশের উষ্ট্র

দ্বীপের কচ্ছপ অত্যন্ত বৃহদাকারের। বহু ব্যয়ে তাহাও এখানে সংগৃহীত আছে। এই জাতীয় কচ্ছপ ৩০০ পাউণ্ড দরেও এক-একটী বিক্রয় হইয়া থাকে।

আরব উষ্ট্রযূথ

কেবল বহু জন্তু জানোয়ার সংগ্রহ করিয়াই ইহার স্বত্বাধিকারী সন্তুষ্ট নহেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার নিজ চেষ্টায় যে সব নূতন নূতন জন্তুর উদ্ভব হইয়াছে, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। সেখানে অশ্ব ও জেব্রার সংমিশ্রণে উৎপন্ন জেবরুল নামক এক প্রকার জন্তু এবং সিংহ ও শার্দ্দূলের সংমিশ্রণে উৎপন্ন সিংহ-শার্দ্দূল নামক আর এক প্রকার নূতন জন্তু দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত

হইতে হয়। এইরূপ আরও বিবিধ নূতন জন্তু আছে।

পশুশালায় হাঁস ও উহাদের থাকিবার ঘর

এই সুবৃহৎ পশুশালার ব্যাপারও যেমন বৃহৎ, ইহার কার্য্যক্ষেত্রও প্রায় সমস্ত পৃথিবীব্যাপী। সমস্ত সভ্য দেশের চিড়িয়াখানা সমূহে এখান হইতে জন্তু জানোয়ার সরবরাহ করা হয়, এবং সকল বড় বড় রাজারাই এখানকার খরিদ্দার। ইহা হইতে প্রচুর অর্থাগমও হইয়া থাকে। এক একটী পশু-পক্ষীর চালানের মূল্য ৫০০০০৲ টাকা। এরূপ চালান তথা হইতে প্রায়ই হইয়া থাকে। তাঁহারা অনেক সময় নূতন চিড়িয়াখানা নির্ম্মাণ ও তথায় পশু-পক্ষী সরবরাহ করিয়া বহু অর্থ পাইয়া থাকেন। একটী মাঝারি রকমের পশু-শালার জন্য জমির মূল্য বাদ ১৫০০০০০৲ টাকাও পাইয়া থাকেন।

জন্তু জানোয়ারদিগকে সার্কাস বা প্রদর্শনীতে দেখাইবার উপযোগী করিয়া শিক্ষা দিবার জন্য সেখানে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। শিক্ষিত জন্তু বিক্রয় করিয়া বিস্তর অর্থোপার্জ্জন

হামবার্গ পশুশালায় ভারতীয় হস্তী

হইয়া থাকে। একবার পঞ্চাশ যাট্‌টী বিভিন্ন শিক্ষিত জন্তু প্রায় ছয় লক্ষ টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল।

এই পশুশালা এক কথায় জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ এবং তথায় মানবেতর জীব জন্তুদের সম্বন্ধে যাহা কিছু পরীক্ষা সম্ভব, তাহা সকলই হইয়া থাকে।

মিঃ হ্যাগেনবেক্‌ অতি সামান্য ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়া নিজ চেষ্টায় জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জন্তু-ব্যবসায়ী হইয়াছেন। তাঁহার সম্মানও যথেষ্ট। তিনি বহু রাজসম্মানে ভূষিত। তাঁহার পশুশালা দেখিবার জন্য অনেক বড়বড় সম্ভ্রান্ত লোকের শুভাগমন হইয়া থাকে।

মধ্য আফ্রিকায় জেব্রা শিকার
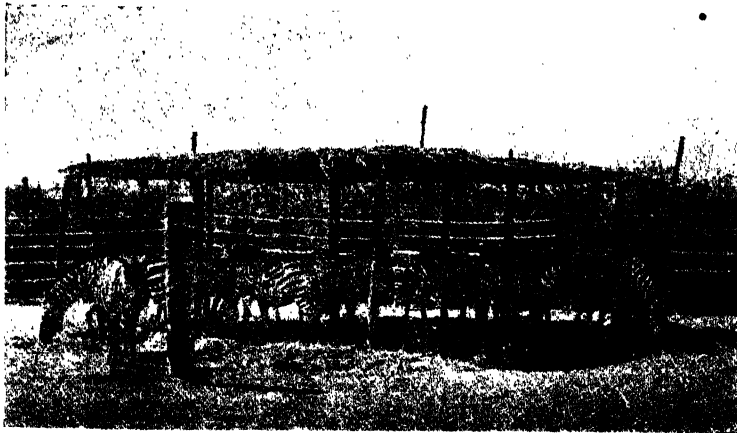
হামবার্গ পশুশালায় লইয়া যাইবার জন্য জেব্রা

সখের সামগ্রীর মূল্যের কোন অবধি নাই। বন্য ভয়াবহ জীব-জন্তুকে খেলা শিখাইয়া যেমন তাহাকে মূল্যবান পণ্যে পরিণত করা যায়, সেইরূপ গৃহপালিত পশু-পক্ষীর মনুষ্য-চেষ্টায় দেহ ও শক্তির উৎকর্ষ সাধন করিয়া তাহা হইতে অসম্ভব মূল্য পাওয়া যায়। এ দেশে কি ব্যবসা, কি কৌতুহল তৃপ্তি কোন দিক দিয়াই এ সব বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা দেখা যায় না। ইংলণ্ডে অধিবাসীরা চেষ্টা দ্বারা এ বিষয়ে কি পরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়াছে, এ স্থলে সে সম্বন্ধে সামান্য উল্লেখ করিয়া ও কয়েকটী অদ্ভুত মূল্যবান জন্তুর ছবি দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

বিশিষ্ট উপায়ে মেষ, শূকর, ষাঁড়, প্রভৃতি জন্তুর দেহের ওজন যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। একটী ষাঁড় গড়ে প্রতিদিন আড়াই পাউণ্ড, ভেড়া পোনে বার আউন্স এবং ছোট শূকর শাবক দেড় আউন্স ওজনে বাড়িতে দেখা গিয়াছে। সখের জন্য ধনী লোকে অস্বাভাবিক গঠনের জন্তুসকল বহু মূল্যে ক্রয় করিয়া থাকেন। এমন কি একটী মেষ বিশ হাজার টাকা, একটী অশ্ব এক লক্ষ টাকার অধিক দরেও বিক্রীত হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে অবশ্য মেষের মূল্যাধিক্যের যাহা কারণ, ঘোড়ার ঠিক তাহাই নহে।

মেষের মাংসাধিক্যই গুণ, কিন্তু অশ্বের চাকচিক্য ও গঠনের পারিপাট্য ভিন্ন অশ্বোচিৎ গুণ অবশ্য যথেষ্টই আছে। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার লক্ষাধিক টাকা মূল্যের
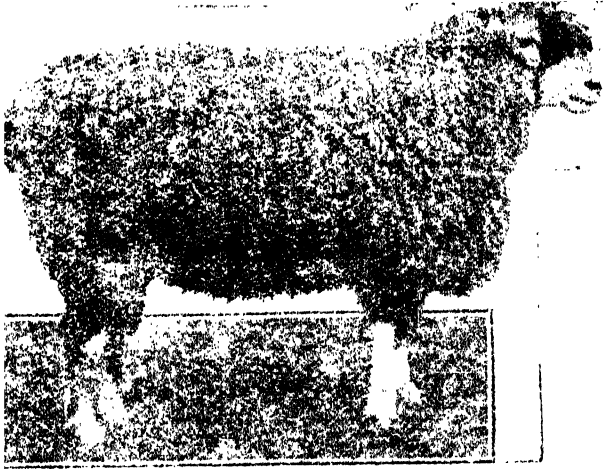
লম্বা লোমবিশিষ্ট ভেড়া, ১৪৫০ গিনিতে বিক্রীত হয়

কথা অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। ক্ষুদ্রাকারের জন্য বা প্রবৃত্তির খেয়ালে গঠন-বৈচিত্র্যের জন্যও মূল্য অধিক

পুরস্কার প্রাপ্ত স্থূলাকার মেষ

হইয়া থাকে। বেলজিয়ামে শবাধার লইয়া যাইবার জন্য এক প্রকার মন্থরগামী ঘোটক আছে, উহার মূল্য খুব বেশী।

উৎকৃষ্ট ক্ষুদ্র-শৃঙ্গ বলদ এক একটী ১৫০০০৲ হইতে ৭০০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দামে বিক্রীত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়; এবং ঐ জাতীয় একটী গাভী একটী বকনা ও একটী বাছুর সমেত ৭৫০৭ পাউণ্ড ১০ শিলিং দরে বিক্রীত হইয়াছিল। গাভীর মূল্য তাহার দুগ্ধের পরিমাণের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, ইহাই যে দেশের লোকের জানা আছে, তাহাদের পক্ষে এ কাল্পনিক মূল্য ধারণা করা দুরূহ। বিলাতের মধ্যে এসেক্স নগরে একটী গোশালা আছে, উহাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। তথায় সহস্রাধিক গাভী রক্ষিত হইয়া থাকে; এবং প্রত্যহ দুই সহস্র ইম্পিরিয়াল গ্যালন অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে দুগ্ধ পাওয়া যায়। তথায় যে গাভীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুগ্ধ দেওয়ার কথার উল্লেখ আছে, তাহা পরিমাণে বৎসরে ১৬৭৪ গ্যালন। ইহা হইতেও উপরিউক্ত কাল্পনিক মূল্যের কারণ নিরাকরণ করা যায় না। *

বামন ভিক্টোরীক

* যে সকল বিলাতি মাসিক হইতে এই প্রবন্ধের উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা কিছু পুরাতন, সুতরাং উল্লিখিত পশুশালা প্রভৃতি এখনও নিশ্চয় আছে কি না জানি না।—লেখক।

সার্ধানার শোচনীয় অবস্থা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিষয়ের উত্তরাধিকারী

বেগম সমরু ও তাঁহার বড় সাধের সার্ধানার ইতিহাস আমরা অভিন্ন বলিয়া মনে করি। সার্ধানার সুখ-সমৃদ্ধির ইতিহাস পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু এই উন্নতির ইতিহাসই শেষ ইতিহাস নহে,—সার্ধানা ও তথা তাহার উত্তরাধিকারীর শোচনীয় পরিণাম এই ইতিহাসকে পরিসমাপ্ত করিয়াছে।

সমরুর দুই বিবাহ। প্রথম পক্ষের পুত্র জফর্-ইয়াব্ কাপ্তেন লিফেভারের কন্যা জুলিয়ানাকে (১) বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফলে এলয়সিয়াস্ নামে এক পুত্র, এবং ১৯শে নভেম্বর ১৭৮৯ জুলিয়া য়্যান্ নামে এক কন্যার জন্ম হয়। পুত্রটি অকালেই মারা যায়; জুলিয়া য়্যান্ বড় হইয়া বেগমের বিষয়-কার্য্যের পরিদর্শক—কর্ণেল জর্জ্জ ডাইস্ (Col. G. A. D. Dyce) নামে একজন স্কচের সহিত পরিণীত হন (১৮০৬)। কর্ণেলের অনেকগুলি ছেলেমেয়ে জন্মিয়াছিল বটে, কিন্তু একটি পুত্র ও দুইটি কন্যা ছাড়া বাকি সবগুলিই শৈশবে মারা যায়। পুত্রটির নাম ডেভিড অক্‌টারলোনী ডাইস্ (জন্ম ৮ ডিসেম্বর ১৮০৮) এবং কন্যা দুইটির নাম য়্যান মারী (জ. ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৮১২), এবং জর্জ্জিয়ানা (জ. ১৮১৫)। দিল্লীতে কর্ণেল ডাইস্-পত্নীর মৃত্যু হইলে (১৩ জুন, ১৮২০), বেগম সমরুই মাতৃহারা শিশুদের লালন-পালনের ভার লইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তাহারা বড় হইলে ১৮৩১, ৩রা আগষ্ট কাপ্তেন রোজ ট্রুপ নামক কোম্পানীর বেঙ্গল আর্ম্মির জনৈক ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারীর সহিত য়্যানের, এবং পল্ সোলারোলী নামক একজন ইতালীয়ের (পরে মার্কুইস্ অব্ ব্রায়োনা) সহিত জর্জ্জিয়ানার বিবাহ দেন। বিবাহকালে তাহারা বেগমের নিকট হইতে যৌতুকস্বরূপ অনেক দামী হীরা-জহরৎ আসবাবপত্রাদি পাইয়াছিল। বেগমের পরিবারভুক্ত অন্যান্য মেয়েছেলেদের মত এই মেয়ে-দুইটিও পর্দ্দাপ্রথা মানিয়া চলিত—প্রকাশ্য রাজপথে বড় একটা পা বাড়াইত না, এবং তাহাদের বেশভূষা ছিল সম্পূর্ণ এদেশী।

বেগম সমরু এক সময়ে ঠিক করিয়াছিলেন, কর্ণেল ডাইস্‌কেই তাঁহার ব্যক্তিগত বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া যাইবেন। কিন্তু কর্ণেল "বদ মেজাজ ও ঔদ্ধত্যের ফলে বেশিদিন বেগমের সুনজরে থাকিতে পারেন নাই,—১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চাকুরীতে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন।" (Sleeman, ii. 286.) বেকন বলেন (ii. 47) "ইংরাজ-সরকারের সহিত কর্ণেলের গোপন পত্র-ব্যবহারের অজুহাতে বেগম তাঁহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন।" তাঁহার পদে নিযুক্ত হইলেন—তাঁহারই পুত্র ডেভিড অক্‌টারলোনী ডাইস্। এই ব্যাপারের পর বেগম যে কয় বৎসর বাঁচিয়াছিলেন, কর্ণেল তাঁহার শত্রুতা করিয়াছেন—এমন কি পুত্র ডেভিড ডাইসের উপরও তিনি তেমন প্রসন্ন ছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

বেগমের নিজের কোন সন্তান-সন্ততি হয় নাই। তিনি মাতৃহারা ডেভিডকে নিজের বুকভরা স্নেহ বিলাইয়া তাহার মাতার অভাব পূরণ করিয়াছিলেন। ডেভিড যাহাতে সুশিক্ষালাভ করে, সেদিকেও তাঁহার বিশেষ নজর ছিল। মীরাটে অবস্থিত ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চ্যাপ্‌লেন্ রেভারেণ্ড ফিশারের উপর তিনি ডেভিডের শৈশব-শিক্ষার ভার দেন। একজন সমসাময়িক ইংরাজ লিখিয়াছেন, "ডেভিড দিল্লী কলেজে লেখাপড়া শেখেন। ইংরাজী ও ফার্সীতে তাঁহার অসাধারণ দখল। বয়সে নবীন হইলেও, প্রবীণের মত কর্ম্মপটু। দেখিতে বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট; গায়ের রংটা ফর্সা ছিল না বটে, কিন্তু আকৃতিতে বেশ একটা সৌম্যভাব ও বুদ্ধিমত্তার ছাপ ছিল। দয়াশীল, উন্নতমনা ডাইস্ পরিচিত সকলেরই প্রিয়পাত্র।" (Bacon, ii.

---

(১) ইনি বহুবেগম নামেও পরিচিত ছিলেন। সার্ধানার ক্যাথলিক-সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার কবর আছে। কবরের উপর খোদিত লিপিতে প্রকাশ, ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর, ৪৫ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। (*Sardhana and its Begum*, pp. 20-21).

47-8). কৃতিত্বে ও মধুর স্বভাবে ডাইস্ বেগমের বিশেষ বিশ্বাসপাত্র হইয়া উঠেন। বেগম শেষ-বয়সে তাঁহারই উপর বিষয়-কর্ম্মের সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। ডাইসের এই সৌভাগ্যে অনেকেরই মনে যে ঈর্ষার অনল জ্বলিয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

বিষয়-সম্পত্তি

খোদার শেষ পরওয়ানা জারি হইবার কিছু পূর্ব্বেই বেগম সমরু তাঁহার নিজস্ব বিষয়-সম্পত্তির বিলি-বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮৩১, ১৬ই ডিসেম্বর তাঁহার উইল হয়। (২) উইলের একজিকিউটর ছিলেন—ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল ক্লিমেন্স ব্রাউন্ নামক ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জনৈক কর্ম্মচারী, এবং ডেভিড ডাইস্।

কিন্তু এই ইংরাজী উইলখানিই বেগম যথেষ্ট বলিয়া মনে করেন নাই। তাই ১৮৩৪, ১৭ই এপ্রিল মীরাটের ম্যাজিষ্ট্রেট ও স্থানীয় গণ্যমান্য লোকজনকে সার্ধানা-প্রাসাদে আহ্বান করিয়া, তিনি সর্ব্বসমক্ষে পালিত পুত্র ডেভিড ডাইস্‌কে তাঁহার নিজস্ব বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ঘোষণা করিয়া ফার্সীতে একখানি দানপত্র (৩) (Deed of Gift) লিখিয়া দেন। সেই অবধি ডেভিড ডাইস্‌কে 'সোম্বার' নাম গ্রহণ করিতে হয়।

বেগমের বেশির ভাগ বিষয়-সম্পত্তিই ডাইস সোম্বার পাইয়াছিলেন। (৪) উইলে লেখা ছিল, তিনি নগদ দুই লক্ষ টাকা পাইবেন; তবে ৩০ বছরের পূর্ব্বে এই টাকায় স্বত্ববান্ হইতে পারিবেন না—ততদিন উইলের দ্বিতীয় একজিকিউটর ব্রাউন্ই টাকাটা কোম্পানীর কাগজে খাটাইয়া তাহার আয়টা ডাইসকে দিবেন। ১৮৩৬, ১২ই মার্চ্চ তারিখে লেখা মীরাট ম্যাজিষ্ট্রেটের একখানি পত্রে প্রকাশ (Pol. Con. 23-5-1836, No. 73) বেগম প্রায় অর্দ্ধ কোটি (৪৭,৮৮,৬০০ সিক্কা) টাকার কোম্পানীর কাগজ রাখিয়া যান। ইহাও ডাইস্ পাইয়া থাকিবেন। পরন্তু বেগমের গহনাগাটি হীরা-জহরৎ আসবাব বাসনপত্র, তাঁবু, মায় হাতী ঘোড়া, ছাগল-ভেড়া গরুবাছুর মোষ—সবই ডাইস্ সোম্বার পাইয়াছিলেন। আগ্রা, দিল্লী, ভরতপুর, মীরাট, সার্ধানা প্রভৃতি স্থানে বেগমের যে প্রাসাদ, জমিজমা, বাগান-বাগিজা, বাজার-হাট ছিল, তাহাও তিনি পান। পান নাই কেবল—যমুনার পশ্চিম-তীরস্থ বাদশাহ্‌পুর-ঝারসা পরগণা, ও সুবা আকবরাবাদে (আগ্রা) অবস্থিত মৌজা ভোগীপুরা-শাহ্‌গঞ্জ। এগুলি, এবং বেগমের অস্ত্রশস্ত্র সামরিক সাজসরঞ্জাম (৫) জাগীর-দখলের সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানী বাজেয়াপ্ত করেন। কোম্পানীর এই আচরণে ডাইস্ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। তিনি প্রতীকারের আশায় উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশের ছোটলাটের দরবার হইতে আরম্ভ করিয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দরবার পর্য্যন্তও

(২) ডাইস্ সোম্বারের *Refutation* পুস্তকের ৩৭৩-৭৫ পৃষ্ঠায় উইলের শেষাংশ ছাপা হইয়াছে। পঞ্জাবের সরকারী দপ্তরখানায় সমগ্র উইলখানির একটা 'নকল' আছে। পঞ্জাব-গভর্মেণ্ট আমাকে ইহার প্রতিলিপি পাঠাইয়াছেন—ইহাতে উইলের সালটি ভ্রমক্রমে ১৮৩১ না হইয়া ১৮৩০ লেখা আছে।

(৩) ইহার ইংরাজী-অনুবাদ *Refutation* (pp. 370-70) পুস্তকে দ্রষ্টব্য। বেগমের পূর্ব্বেকার ইংরাজী-উইলে যে-সব সর্ত্ত ছিল, সেগুলি যে বজায় থাকিবে—দানপত্রে তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ ছিল।

(৪) উইল অনুসারে, ডাইস্ সোম্বার ছাড়া আরও ৩৫৭০০০ সোনাৎ টাকা এইরূপে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল:—একজিকিউটর ব্রাউন্ পারিশ্রমিকস্বরূপ ৭০ হাজার সোনাৎ টাকা; জনকতক অন্তরঙ্গকে ১,৫৭,০০০ সোনাৎ টাকা; ডাইস সোম্বারের দুই ভগিনী—য্যান্ মারী এবং জজিয়ানাকে যথাক্রমে ৫০ ও ৮০ হাজার সোনাৎ টাকার সুদ। বেগমের মৃত্যুর পর তাঁহার ছোটবড় সব-রকম কর্ম্মচারী ও চাকর বাকরকে বিদায় দিবার সময় পাওনা-গণ্ডা ছাড়া অতিরিক্ত এক মাসের করিয়া মাহিনা দেওয়া হইয়াছিল। [ডাইস্ বিষয়ে স্বত্ববান্ হইয়া "বিলাত যাইবার পূর্ব্বে দুই ভগিনীর প্রত্যেককে নিজের সম্পত্তি হইতে নগদ ২০ হাজার পাউণ্ড—প্রায় দুই লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন। *Refutation*, p. 55].

বেগম "মৃত্যুর পূর্ব্বে ডাইস্‌কে বলিয়া যান যে, তাঁহার চিকিৎসক ডাঃ ড্রেভারকে যেন নগদ ২০ হাজার টাকা দেওয়া হয়।" (Pol. Con. 22-2-1836, No. 26; Bacon, ii. 59).

(৫) "ডাইসের হিসাব-মত এই সামরিক সাজসরঞ্জামের মূল্য ৪৯২,০৯২—অর্থাৎ প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা।" (*Refutation*, 396n, 171). তবু তিনি "কেল্লা, আপিস-ঘর প্রভৃতির হিসাব ছাড়িয়া দিয়াই এই মূল্য ধরিয়াছিলেন।" (*Ibid*, p. 446n).

অভিযোগ উপস্থিত করিতে কসুর করেন নাই; কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। (৬)

(৬) কিন্তু ডাইস্-পত্নী প্রতীকার-চেষ্টায় স্বামীকেও হার মানাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তিনি প্রধানতঃ সমৃদ্ধিশালী বাদশাহ্পুর-খারসা পরগণা উদ্ধারের জন্য কোম্পানীর সহিত অনেক মামলা-মোকদ্দমায় অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। শেষে মোকদ্দমা প্রিভি-কাউন্সিল পর্য্যন্তও গড়ায়। ফরিয়াদীর বক্তব্য এই,—পরগণাটি আল্‌তাম্‌ঘা' বা বংশানুক্রমে ভোগ করিবার সম্পত্তি—জাগীরভুক্ত জমি নহে। বেগমের সহিত কোম্পানীর যে সন্ধি হয়, তাহার সর্ত্তানুসারে বেগমের মৃত্যুর পর কেবলমাত্র "দোয়াবের অন্তর্ভুক্ত" জাগীরই কোম্পানীর খাস করিবার কথা;—বাদশাহ্পুর পরগণা দোয়াবের বাহিরে, সুতরাং কোম্পানীর ইহাতে হাত দিবার কোনই অধিকার নাই।

কোম্পানী বলেন, দৌলৎ রাও সিন্ধিয়ার সহিত ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়, তাহার বলে তাঁহারা দোয়াব ও যমুনার পশ্চিমতীরস্থ ভূখণ্ডের মালিক। 'জাগীর' হিসাবে বেগম পরগণাটি ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন মাত্র। এ ছাড়া বাদশাহ্পুর যে লাখ্‌রাজ সম্পত্তি, তাহার নজির—দিল্লীশ্বরের মোহরাঙ্কিত আসল সনদখানি ফরিয়াদী দেখাইতে পারেন নাই,—দেখাইয়াছিলেন তাহার নকল, তাহাতেও আবার গলদ ছিল অনেক। (সনদের নকল—*Refutation*, pp. 373-383) শেষে ১৮৭২, ১১ই মে তারিখে প্রিভি-কাউন্সিলের রায়ে মোকদ্দমায় কোম্পানীরই জয় হয়।

তবে এই সূত্রে প্রতিপন্ন হয় যে, সার্ধানার সামরিক-সাজসরঞ্জাম বেগমেরই অর্থে ক্রয় করা হইয়াছিল; সুতরাং ডাইস্-পত্নী সুদসমেত ইহার ন্যায্য মূল্য পাইবেন।

যাঁহারা এই মোকদ্দমার বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের *Privy Council Judgments* পড়িতে অনুরোধ করি। এই মামলা-সম্পর্কে আরও দুইখানি বই আছে:—

(১) Sombre (David Ochterlony Dyce) *The Heirs of Dyce Sombre V. the Indian Government.* The History of a suit during thirty years between a private individual and the government of India. Westminster, 1865. 8°.

(২) Sombre *(Hon.* Mary Ann Dyce). Afterwards FORESTER (Mary Ann). *Baroness Forester.* In the Prerogative Court of Canterbury. Dyce Sombre against Troup, Solaroli intervening, and Prinsep, and the Hon. East India Company, also intervening. In the goods of D. O. Dyce Sombre,...deceased. Scripts—pleadings—answers—interrgatories—minutes—and exhibits. (Depositions of witnesses.) 2 vols. 8. Privately printed:] London [1855?]

এই বই দুখানির সন্ধান করিতে পারিলে হয় ত আরও কিছু নূতন কথা জানা যাইতে পারে।

অমৃতে গরল

৩০ বৎসর বয়সে ডাইস্ বেগমের বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী হইলেন; সঙ্গে সঙ্গে বিলাত-প্রবাসের জন্য তাঁহার মন নাচিয়া উঠিল। এই সময় বেগম সমরুর দুইজন বন্ধু তাঁহাকে দুইখানি পত্র লেখেন। লর্ড কোম্বারমিয়ারের পত্রে ছিল বিলাত যাইবার জন্য অনুরোধ, আর কর্ণেল স্কীনারের পত্রে ছিল নিষেধ—তিনি ফার্সী বয়েৎ লিখিয়া তাঁহাকে বিলাত যাইবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিবার পরামর্শ দেন। ডাইস্ তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। ডাইসের জন্ম এদেশে হইলেও তাঁহার পিতা ছিলেন স্কচ, সুতরাং ইউরোপের প্রতি তাঁহার একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। তিনি বিলাত যাইবার সঙ্কল্প করিয়া, ৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আগমন করেন। কিন্তু বিলাত রওনা হইতে এক বছরের উপর বিলম্ব হইয়া গেল। কারণ "তাঁহার পিতা কর্ণেল জর্জ্জ ডাইস ['নয় বৎসরের বাকি মাহিনা বাবদ'—*Refutation*, p. 346] বেগমের সম্পত্তি হইতে ১৪ লক্ষ টাকা দাবী করিয়া বসেন। ডাইস্ সোম্বার বেগমের সম্পত্তির একজিকিউটর; সুতরাং কর্ণেল জর্জ্জ ডাইস্ পুত্রের নামেই কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমা রুজু করেন।" (Letter dated 21 4-1837 from Dyce Sombre To W. H. Macnaughten, Secy. to Govt. of India, Pol. Con.). "মোকদ্দমা শেষে আপোষে নিষ্পত্তি হয়" (*Refutation*, p. 346). ইহার অল্পদিন পরেই ভগিনীপতি সোলারোলীর উপর স্থাবর বিষয়-সম্পত্তির ভার দিয়া ডাইস সোম্বার বিলাত যাত্রা করেন। মাসখানেক যাইতে না যাইতেই কর্ণেল জর্জ্জ ডাইসের মৃত্যু হয় (১৮৩৮, এপ্রিল)। মৃত্যুকালে যে পিতাপুত্রে দেখা হয় নাই, তাহা বলা বাহুল্য।

ডাইস্ সোম্বার বিলাত পৌঁছেন—১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে। পর বৎসর তিনি রোমের San Carlo ধর্ম্মমন্দিরে বেগম সমরুর আত্মার শান্তি-কামনায়, মহাসমারোহে তৃতীয় বার্ষিক (২৭ জানুয়ারী ১৮৩৯) স্মৃতি-উৎসব সম্পন্ন করেন। সভায় বহু গণমান্য লোকের সমাগম হইয়াছিল। এই উপলক্ষে রোমের ইংলিশ্

কলেজের অধ্যক্ষ, রেঃ ডাঃ ওয়াইজ্‌ম্যান্ একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন। (৭)

বিলাতে অল্পদিনের মধ্যেই অগাধ ধনসম্পত্তির মালিক ডাইস্ সোম্বার অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ১৮৩৮, আগষ্ট মাসের প্রারম্ভে তিনি দ্বিতীয় ভাইকাউণ্ট সেণ্ট ভিন্‌সেণ্ট—এডওয়ার্ড জারভিসের একমাত্র জীবিতা কন্যা মারী য়্যান্ জারভিসের সঙ্গে পরিচিত হন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে ভালবাসার সূত্রপাত হয়। শেষে ১৮৪০, ২৬শে সেপ্টেম্বর ডাইস্ তাঁহাকে যথারীতি বিবাহ করেন। ডাইস্-পত্নীর বয়স তখন ২৭-২৮। বিবাহের পর বৎসর ডাইস্ পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

কিন্তু বিবাহ তাঁহার জীবনে সুখের কারণ না হইয়া পরম দুঃখের—সর্ব্বনাশের—কারণ হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কিছুদিনের মধ্যেই পত্নীর সঙ্গে তাঁহার অসদ্ভাব আরম্ভ হইল। একদিন তিনি পত্নীকে স্পষ্টই খুলিয়া বলিলেন যে, তাহার আচরণ আদর্শ পত্নীর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এমন কি শেষে না কি তিনি পত্নীর সতীত্বে পর্য্যন্ত সন্দেহ করিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন। প্রধূমিত অগ্নি এতদিনে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। ডাইস্-পত্নী স্বামীকে উন্মাদ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার জন্য ডাক্তার ডাকা হইল। তারপর ডাইস্ অকস্মাৎ একদিন অবাক হইয়া দেখিলেন, গৃহদ্বারে সতর্ক প্রহরী—এক আধজন নয়—তিন তিনজন! ইচ্ছামত বাড়ীর বাহির হওয়া নিষিদ্ধ। বৈকালে বাড়ীর বাহির হইবার অনুমতি থাকিলেও একা বাহির হইতে পারিতেন না, দুইজন প্রহরীর সঙ্গে তাঁহাকে বাহির হইতে হইত। ১৮৪৩, মার্চ্চ হইতে চারিমাস কাল ডাইস্‌কে এইরূপে পত্নীর হস্তে নজরবন্দী হইয়া বাস করিতে হয়। এই সময়ে হঠাৎ তাঁহার বাসায় একটি কমিশন্ বসিল। কমিশন্ মত প্রকাশ করিলেন—ডাইস্ মনোব্যাধিগ্রস্ত, সুতরাং নিজ বিষয়-সম্পত্তি দেখিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। ৩১শে জুলাই চ্যান্‌সারীর জুরীরাও একবাক্যে সেই মতই বহাল রাখিলেন।

কিন্তু সুখের বিষয় এই, ডাইস্‌কে পাগলা-গারদের দুর্ভোগটুকু ভোগ করিতে হয় নাই। জুরীদের বিচারের পর, শরীরের অবস্থা খারাপ হওয়ায় তাঁহাকে একজন ডাক্তারের সঙ্গে ব্রিষ্টল ও লিভারপুলে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সেই সুযোগে লিভারপুল হইতে ১৮৪৩, ২১শে সেপ্টেম্বর ডাইস্ গোপনে সরিয়া পড়েন, এবং পরদিন সন্ধ্যার সময় প্যারিসে উপস্থিত হন। তিনি তখন কপর্দ্দক-হীন. কাজেই পরবর্ত্তী প্রায় আট মাস কাল তাঁহাকে দেনা করিয়াই দিন কাটাইতে হইয়াছিল। ইতিমধ্যে 'পাগলের' বিষয়-সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল। যাঁহার বিষয়-সম্পত্তির আয় ছিল "বছরে প্রায় ২০ হাজার পাউণ্ড—দুই লক্ষ টাকা" (*Refutation* p. 245). অগাধ সুখৈশ্বর্য্যের মধ্যে লালিত-পালিত সেই ডাইস্ সোম্বার এখন কমিটির দেওয়া যৎসামান্য বৃত্তিতে অতিকষ্টে দিনাতিপাত করিতে বাধ্য হইলেন। বিষয়ের আয় হইতে ডাইস্-পত্নী নিজ খরচ-খরচার জন্য বছরে চারি হাজার পাউণ্ড—৪০ হাজার টাকা—কমিটির নিকট হইতে পাইতে লাগিলেন।

ডাইস্ স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, চ্যান্‌সারীর ডাক্তারগণের কাছে বা বিচারালয়ে তাঁহার সম্বন্ধে সুবিচারের আশা 'নিশার স্বপন।' তাই তিনি জগত-সমক্ষে নিজ সুস্থমস্তিষ্কের প্রমাণ দিবার জন্য ভিন্ন পথ অবলম্বন করিলেন। ফ্রান্স, বেল্‌জিয়ম্, রুশিয়া, এমন কি ইংলণ্ডের বড় বড় ডাক্তারগণের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহারা সকলেই একবাক্যে তাঁহাকে সম্পূর্ণ সুস্থমস্তিষ্ক ও নিজ বিষয়-সম্পত্তি দেখিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত স্বীকার করিয়া, প্রকাশ্যভাবে হলফ্ করিলেন। যথাসময়ে একথা বিলাতের লর্ড চ্যান্‌সেলারের গোচর করা হইলে তাঁহাকে আবার চ্যান্‌সারীর ডাক্তারদের নিকট পরীক্ষা দিবার জন্য আহ্বান করা হয়। সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে (১৮৪৮, ১০ই নভেম্বর) ডাইস্ বিলাতে পৌঁছিলে তাঁহার স্ত্রী স্বামীকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যাকুলতা দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু যে স্ত্রী তাঁহার সকল দুর্দ্দশার মূল, সেই স্ত্রীর মুখদর্শন করিবার ইচ্ছা ডাইসের যে ছিল না, তাহা না বলিলেও চলে। কিন্তু শেষে তিনি পত্নীর একান্ত অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই।

(৭) *Sardhana & its Begum* পুস্তিকার ৫৩-৬৪ পৃষ্ঠায় সমগ্র বক্তৃতাটি মুদ্রিত হইয়াছে।

সাক্ষাৎকালে স্ত্রী স্বামীকে বলিয়াছিলেন,—'তুমি ভাল হও, আবার আমরা স্বামি-স্ত্রীতে ঘর করি। ইহাই আমার অন্তরের কামনা।'

উত্তরে ডাইস বলেন,—'হায় নারী! এখনও কি তুমি সে আশা হৃদয়ে পোষণ কর? দীর্ঘ ছয় বৎসরের কঠিন অভিজ্ঞতা কি প্রমাণ করিয়া দেয় নাই যে তোমাতে-আমাতে মিলন অসম্ভব?'

ডাইস্ পত্নী স্বামীর মন ভিজাইবার অনেক চেষ্টা করিলেন। এরূপ করিবার কারণও ছিল। তাঁহার মনে বোধ হয় এইরূপ আশঙ্কা জন্মিয়াছিল যে, স্বামী যদি এবার প্রকৃতিস্থ বলিয়া প্রমাণিত হন, তবে তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি যে তাঁহারই হাতে যাইবে। তখন তাঁহার গতি কি হইবে?

যাহা হউক, ডাইস্-পত্নীর দুশ্চিন্তার মেঘ শীঘ্রই কাটিয়া গেল। চ্যান্সারীর দুইজন ডাক্তার ডাইস্‌কে পরীক্ষা করিয়া লর্ড চ্যান্সেলারকে তাঁহাদের মন্তব্য পাঠাইলেন,—

"যখন আমরা ডাইস্ সোম্বারের ব্যাধির দীর্ঘতার পরিমাণ ভাবিয়া দেখি; যখন ভাবি তাঁহার আত্মসংযমের বহর—যাহার বলে তিনি এতগুলি দেশী ও বিদেশী ডাক্তারকে প্রবঞ্চিত করিতে পারিয়াছেন, তখন তাঁহার মুখের কথায় বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।"

এই অপূর্ব্ব যুক্তির উপর টিপ্পনী অনাবশ্যক, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এই দুইজন ডাক্তারের কথার উপর নির্ভর করিয়াই আদালত মোকদ্দমায় ডাইস্-পত্নীকে ডিক্রী দেন। অনন্যোপায় ডাইস্ নিজের দুর্দশার কথা শেষে মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে নিবেদন করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলেন, কিছুতেই কিছু হইবার নহে। তাই যাহারা তাঁহার সহিত বেইমানী করিয়াছে—মিত্রভাবে মিশিয়া শত্রুর মত তাঁহার বুকে ছুরি হানিয়াছে—তাহাদের মুখের মুখোস খুলিয়া দিয়া, জগতের হাটে চিনাইয়া দিবার জন্য ১৮৪৯, আগষ্ট মাসে প্যারিস হইতে ৫৮২ পৃষ্ঠাব্যাপী এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পুস্তকের নাম,—*Mr. Dyce Sombre's Refutation of the charge of Lunacy brought against him in the Court of Chancery.* (৮) এই পুস্তকের ৫৮০ পৃষ্ঠায় ডাইস্ পূর্ব্বোক্ত ডাক্তারদের যে উচিত জবাব দিয়াছেন, তাহা আমরা উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। তিনি বলিয়াছেন,—

"আমার পাগলামী যদি চারিটী দেশের বড় বড় চিকিৎসককে প্রতারিত করিতে পারে, তবে সে পাগলামী যে ডাক্তার সাউদে ও ব্রাইটের *sanity* অপেক্ষা সংস্রগুণে শ্রেয়, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই!"

দুঃখে নৈরাশ্যে ডাইসের শরীর ভাঙিয়া পড়িল। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় বিলাতে ফিরিয়া আসেন। "সেখানে ১৮৫১, ১লা জুলাই সেণ্ট জেম্‌স্ ষ্ট্রীটের ফেন্‌টন্স হোটেলে তাঁহার সকল জ্বালার অবসান হয়।" (*Cal. Rev.* 1880, p. 459). ধনী হইয়াও নির্ধনের মত বন্ধুবান্ধবহীন অসহায় অবস্থায় তাঁহার এই শোচনীয় মৃত্যুর কথা ভাবিলে মন বেদনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। মৃত্যুর ১৬ বৎসর পরে, ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে, তাঁহার দেহাবশেষ সার্ধানায় আনীত হইয়া, তাঁহার মাতৃকল্পা বেগম সমরুর পাশে সমাহিত করা হয়।

মরিবার আগে ডাইস্ উইল করিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি সার্ধানায় খ্রীষ্টান-বালকদের স্কুল-প্রতিষ্ঠাকল্পে ব্যয়িত হইবে;—সার্ধানার প্রাসাদই এই শিক্ষাগারের কেন্দ্রস্বরূপ হইবে। এই উইল যাহাতে মিথ্যা প্রমাণিত না হয়, সেজন্য ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অব্ ডিরেক্টারের চেয়ারম্যান্ ও ডেপুটী চেয়ারম্যান্‌কে এক্‌জিকিউটার নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। পারিশ্রমিক-স্বরূপ ইঁহাদের দুইজনের প্রত্যেককে দশ হাজার পাউণ্ড—এক লক্ষ টাকা—করিয়া দিবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু তাঁহারা উভয়ে অনেক মামলা-মোকদ্দমা করিয়াও ডাইসের সম্পত্তি উদ্ধার করিতে পারেন নাই। প্রত্যেক বিচারালয়েই—এমন কি শেষে প্রিভি-কাউন্সিলেও ডাইসের উইল 'পাগলের উইল' বলিয়া অগ্রাহ্য হয়। অপুত্রক ডাইস্ সোম্বারের সমগ্র সম্পত্তির আইনতঃ মালিক হইলেন—তাঁহার বিধবা মারী য়্যান্ ডাইস্ সোম্বার।

এই মারী য়্যান্ ১৮৬২, ৮ই নভেম্বর দ্বিতীয়বার জর্জ্জ

(৮) এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থখানি দেখিবার অবকাশ দিয়া, হাইকোর্টের খ্যাত উকীল শ্রীযুক্ত দাশরথি সান্যাল এবং কলিকাতার Gillanders Arbuthnot & Co.'র O. Couldrey মহোদয়—আমাকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন।

সিসিল ওয়েল্ড—তৃতীয় ব্যারণ ফরেষ্টারকে বরমাল্য অর্পণ করেন। এই সময় হইতে তিনি লেডি ফরেষ্টার নামে পরিচিত হন।

স্থাবর সম্পত্তির পরিণাম

দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াও লেডি ফরেষ্টার বেশিদিন স্বামীর সঙ্গ-সুখ ভোগ করিতে পারেন নাই। ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ লর্ড ফরেষ্টারের মৃত্যু হয়। ইহার সাত বৎসর পরে, ৮০ বৎসর বয়সে, লেডি ফরেষ্টারও পরলোকগমন করেন (৭ই মার্চ্চ ১৮৯৩)। (৯) যতদিন তিনি বাঁচিয়াছিলেন, ততদিন সার্ধানার প্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন ভূমি হস্তান্তরিত করেন নাই। (১০) তাঁহার মৃত্যুর পর আগ্রার ক্যাথলিক-সম্প্রদায়, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর ২৫ হাজার টাকা দিয়া উহা নীলামে ক্রয় করেন। এখন সেখানে একটি স্কুল ও দেশীয় খ্রীষ্টান-বালকদের অনাথ-আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে।

দিল্লী, আগ্রা, মীরাট প্রভৃতি স্থানে বেগম সমরুর যে ভূসম্পত্তি ছিল, তাহা খুব সম্ভব বহু পূর্ব্বেই ডাইস্‌পত্নী নীলামে বেচিয়াছিলেন।

সার্ধানা-প্রাসাদের অভ্যর্থনা-গৃহগুলির মধ্যে বীচি, মেল্‌ভিল্‌, জীবনরাম প্রভৃতি সে যুগের খ্যাতনামা চিত্রকরের আঁকা বেগমের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের প্রায় ২৫ খানি সুন্দর চিত্র ছিল। (১১) ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ প্রাসাদ-বিক্রয়ের অনতিপূর্ব্বে—লেডি ফরেষ্টারের প্রতিনিধি এই উৎকৃষ্ট চিত্রগুলি প্রাসাদ হইতে স্থানান্তরিত করেন। লেডি ফরেষ্টারের উৎকীর্ণ চিত্রখানি (engraving) ছাড়া, প্রায় সবগুলিই গভর্ণমেণ্ট ক্রয় করেন। এগুলি এখন এলাহাবাদ গভর্মেণ্ট হাউসের একটি হলে শোভা পাইতেছে। (১২) লেডি ফরেষ্টারের চিত্রখানি বিলাতে তাঁহার এক আত্মীয়ের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

---

(৯) ডাইস্‌-পত্নীর বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে S. Bernard Burke's *Peerage* (1023), pp. 928, 1956-7 দ্রষ্টব্য।

(১০) এখনও সার্ধানা বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের দেশীয় দুঃস্থ লোক-জনের সুবিধার জন্য সার্ধানায় যে হাঁসপাতাল ও ডিস্‌পেন্‌সরী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বেগমেরই অর্থে। বেগমের উইলে নির্দ্দিষ্ট ছিল, ডাইসের ভগিনী য়্যান মারী ৫০ হাজার টাকার একটি ট্রষ্ট ফণ্ডের আয় ভোগ করিবেন, কিন্তু যদি তাঁহারা স্বামি-স্ত্রী অপুত্রক অবস্থায় মারা যান, তাহা হইলে ফণ্ডের আয় কোন সৎকর্ম্মে ব্যয়িত হইবে। ১৮৬২, ৫ই জুলাই ট্রুপ, এবং ইহার পাঁচ বৎসর পরে (১৮৬৭, ১৮ই মার্চ্চ) তাঁহার পত্নী য়্যানের মৃত্যু হয়। তাঁহারা অপুত্রক ছিলেন; এই কারণে উইলের নির্দ্দেশমত, লেডি ফরেষ্টার ফণ্ডের মূলধন—৫০ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ—লইয়া ১৮৭৬, ১৫ই এপ্রিল সার্ধানায় একটি হাঁসপাতাল ও ডিস্‌পেন্‌সরী প্রতিষ্ঠার জন্য এক নূতন ট্রষ্ট ফণ্ডের সৃষ্টি করেন। এই প্রতিষ্ঠানের জন্য তিনি নিজে একখানি গৃহসমেত ১ বিঘার উপর লাখরাজ জমি দান করিয়াছিলেন। ফণ্ডের আয় হইতে সমস্ত খরচ-খরচা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।—Indenture dated 15-4-1876.

(১১) ছবিগুলির মধ্যে এই কয়খানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:—

(১) বৃদ্ধ বয়সে বেগম সমরু—চিত্রকর মেল্‌ভিল্‌। বেগম মূল্যবান্ উচ্চাসনে বসিয়া তামাক খাইতেছেন।

(২) বেগম ও শিশু ডাইস্‌ সোম্বার।

(৩) ডাইসের দুই ভগিনীপতি—ব্যারন্ সোলারোলী ও কর্ণেল ট্রুপ।

(৪) লৎ কোম্বারমিয়ার ও বেগম সমরু—ভরতপুর-পতনের পর মিলিত হইতেছেন।

(৫) 'বেগমের চিকিৎসক ও ডাইস্‌ সোম্বারের বিশ্বস্ত বন্ধু'—ডাঃ টমাস্ ড্রেভার।

(৬) রোমে অঙ্কিত ডাইস্ সোম্বারের চিত্র:—এই ছবিখানির নীচে ডাইসের শ্বশুর ভাইকাউণ্ট সেণ্ট ভিন্‌সেণ্ট—এডওয়ার্ড জারভিস (১৮৫৬), ডাইস্ সোম্বার (১৮৪২), এবং ডাইস্‌-পত্নী মারী য়্যান্ ডাইস্ সোম্বারের তিনখানি engraving ছিল।

(১২) দিল্লীর লালা শ্রীরাম সাহেবের নিকট পুরুষবেশে হুকাহস্তে বেগমের একখানি প্রাচীন চিত্র আছে। দিল্লী মিউজিয়মে দুইখানি ও স্লীমানের গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে বেগমের একখানি চিত্র আছে।

ইঙ্গিত

শ্রীবিশ্বকর্ম্মা

এ্যালুমিনিয়াম

আজ এ্যালুমিনিয়াম ধাতুর কথা কহিব।

এ্যালুমিনিয়াম ধাতু-নির্ম্মিত বাসন লোকের এত পছন্দ হইয়াছে যে, ইহা আমাদের সনাতন পিতল কাঁসার বাসনকে প্রায় তাড়াইতে বসিয়াছে। এ্যালুমিনিয়ামের এতটা জনপ্রিয় হইবার কারণ, ইহা দেখিতে সুন্দর, ব্যবহারে সুবিধাজনক, এবং পিতল-কাঁসায় কয়েকটি দোষ ইহাতে নাই। সেইজন্য আজকাল প্রায় গৃহস্থ-ঘরেই পিতল-কাঁসার বাসনের সঙ্গে প্রচুর এ্যালুমিনিয়ামের বাসনও ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু যাহারা এ্যালুমিনিয়ামের বাসন তৈয়ার করে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি অতি লোভী, জুয়াচোর, পাষণ্ড লোক আসিয়া জুটায়, নিষ্কলঙ্ক * এ্যালুমিনিয়ামে কলঙ্ক স্পর্শ করিয়াছে ; ক্রমে ইহা লোকের শ্রদ্ধা হারাইতেছে। পরিণামে বোধ হয় ইহার ব্যবসায় একেবারে মাটি হইয়া যাইবে। অথবা হয় ত এ্যালুমিনিয়ামের বাসনের ব্যবসায়কে রক্ষা করিবার জন্য খুব কড়া আইন করা আবশ্যক হইবে। আগে জুয়াচোরদের জুয়াচুরীর কথা বলি, তার পর আইন করিবার আবশ্যকতার কথারও আলোচনা করিব।

এ্যালুমিনিয়ামের বাসনের সকল কারখানাওয়ালাই অবশ্য জুয়াচোর নহে। সেইজন্য, বাজারে যে নানান মার্কাওয়ালা এ্যালুমিনিয়ামের বাসন চলিতেছে, তাহাদের মধ্যে ভয়ানক পার্থক্য ঘটিয়াছে। অথচ, এ্যালুমিনিয়ামের বাসন একটীমাত্র মূল ধাতু হইতে প্রস্তুত হওয়া উচিত,—পিতল কাঁসার ন্যায় কোনরূপ মিশ্র ধাতু হইতে নহে ; এবং তাহাদের কোয়ালিটীও একই রকম, অর্থাৎ মূল এ্যালুমিনিয়াম ধাতুর মতই হওয়া উচিত। কিন্তু আসলে হইতেছে কি ? ভিন্ন ভিন্ন মার্কার কয়েকটি বাসন লইয়া পরীক্ষা করিলেই এই পার্থক্য, এবং আমার বক্তব্যটুকু সহজে বুঝা যাইবে। সে পরীক্ষা করাও খুব সহজ—রসায়নাগারে যাইতে হইবে না।

এক একটী বাসন লইয়া আপনি তাহার গায়ে আপনার হাতের একটী আঙ্গুল দিয়া একটু জোরে মর্দ্দন করিলে এই পার্থক্য সহজেই ধরিতে পারিবেন। খাঁটি এ্যালুমিনিয়ামের বাসনে আঙ্গুল দিয়া ঘষিলে আপনার আঙ্গুলে কোন রকম দাগ পড়িবে না, বাসনের উজ্জ্বলতাও কোনরূপে ক্ষুণ্ণ হইবে না। কিন্তু যে বাসন খাঁটি এ্যালুমিনিয়ামে প্রস্তুত নয়, সে বাসনে আঙ্গুল ঘষিলে বাসনেও দাগ পড়িবে, আপনার আঙ্গুলেও দাগ পড়িবে। নরম লেড পেনশিলের শিশ কিম্বা গ্র্যাফাইট চূর্ণ আঙ্গুলে ঘষিলে যে রকম দাগ পড়ে,—এ দাগটিও ঠিক সেই রকম। এ্যালুমিনিয়ামের বাসনে আঙ্গুল দিয়া ঘষিলে যদি এই রকম দাগ পড়ে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, বাসনের ধাতু বিশুদ্ধ এ্যালুমিনিয়াম নয়, উহার সঙ্গে সীসা মিশ্রিত আছে, এবং এই সীসা অতি ভয়ঙ্কর বিষ। পিতল কাঁসার মত মিশ্র ধাতুর অন্যতম উপকরণ সীসা হইলেও, এ ক্ষেত্রে সীসা যে ভাবে অন্য ধাতুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিত থাকে, তাহাতে অনিষ্টের আশঙ্কা অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু এ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে সীসা তত ঘনিষ্ট ভাবে যে মিশ্রিত থাকে না, তাহা আঙ্গুলের দাগ হইতেই বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। সীসা-মিশ্রিত এ্যালুমিনিয়ামের বাসনে খাদ্যাদি সহজেই বিষাক্ত হইতে পারে। অতএব এ্যালুমিনিয়ামের বাসন কিনিবার সময় খুব সতর্ক ভাবে পরীক্ষা করিয়া তবে কেনা উচিত। মিশ্র এ্যালুমিনিয়ামের বাসনে খাদ্য বিষাক্ত হইবার সম্ভাবনা ত আছেই, তা' ছাড়া, ইহাতে গৃহস্থেরও খুব লোকসান। কারণ, বিশুদ্ধ এ্যালুমিনিয়ামের বাসন খুব টেঁকসই ; কিন্তু সীসা মিশ্রিত বাসন তত টেঁকসই হয় না,—উহা শীঘ্রই ফুটা হইয়া গিয়া একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ পুরাতন এ্যালুমিনিয়ামের বাসন বিক্রয় করাও বড় কঠিন। কারণ, নূতন এ্যালুমিনিয়ামের বাসনের সের যদি দশ টাকা হয়, ত' পুরাতন এ্যালুমিনিয়ামের বাসনের সের বারো আনার বেশী হইবে না। এবং বাসনগুলি হালকা বলিয়া বিক্রী করিয়াও বেশী পয়সা পাওয়া যায় না। কাজেই প্রায়

* বিশুদ্ধ এ্যালুমিনিয়ামের বাসনে অম্লদ্রব্য রাখিলেও পিতল-কাঁসার বাসনের ন্যায় ইহাতে কলঙ্ক ধরে না বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

কোন গৃহস্থই এ্যালুমিনিয়ামের পুরাতন অকর্ম্মণ্য বাসন বিক্রয়ে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেন না—উহা কিছুদিন ঘরে পড়িয়া থাকিয়া হারাইয়া যায়, অথবা জঞ্জালের সঙ্গে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

জেনেভা নগরের আন্তর্জ্জাতিক শ্রমজীবী কন্‌ফারেন্স সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইমারতী রঙের কাজে সীসাঘটিত কোন রং ব্যবহৃত হইতে পারিবে না; কারণ, সীসা অত্যন্ত উগ্র বিষ,—যাহারা সীসাঘটিত রঙ লইয়া নাড়াচাড়া করে, তাহাদের শরীরে সীসার বিষ প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ করিয়া শীঘ্রই তাহাদিগকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। সেইজন্য আমার মনে হয়, গৃহস্থ-লোকের নিত্য ব্যবহার্য্য এ্যালুমিনিয়ামের বাসনে সীসা মিশ্রিত করিয়া তাহাকে কলঙ্কিত করিলে, সেটা গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। আমি মনে করি, এ্যালুমিনিয়ামের বাসনে সীসা মিশ্রিত হয় কি না, এবং তাহাতে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে কি না, এবং থাকিলে, তাহা নিবারণের ব্যবস্থা করিবার জন্য আইন রচনা করা আবশ্যক কি না, গবর্মেণ্টের তাহা অনুসন্ধান করা উচিত, এবং অনুসন্ধানের ফলাফল সাধারণের গোচর করা কর্ত্তব্য।

এ্যালুমিনিয়াম ধাতু ভারতের নিজস্ব জিনিস। ইহার শিল্পও অল্প দিন মাত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু হৃদয়হীন লোভী ব্যবসায়ীরা নিষ্ঠুর ভাবে এই শিশু শিল্পের গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছে। কাজেই জাপান ও জার্ম্মাণী হইতে এ্যালুমিনিয়াম ধাতুর প্রচুর জিনিস আমদানী হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা যদি নিজেরাই নিজেদের সর্ব্বনাশ করি, তবে কে আমাদের রক্ষা করিতে পারে?

এ্যালুমিনিয়ামের অনেক গুণ। সুতরাং ইহার একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনায় কোন দোষ হইবে না, আশা করি।

রসায়ন শাস্ত্রে ইহার সংক্ষিপ্ত নাম Al.। ইহার আণবিক ভার (Atomic weight) ২৭ (অথবা, ২৬.৯) এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব (specific gravity) ২.৭। সীসার আণবিক ভার ২০৫.৪। সীসার মূল্যও খুব সুলভ, এবং তাহা দেখিতেও কতকটা সাদা। কাজেই এ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে সীসা মিশাইলে সাদা চোখে তাহা ধরিতে পারা যায় না, এবং কমদামের ভারী জিনিস মিশাইয়া খুব লাভও করা যায়। তাই বোধ হয় এ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে সীসা মিশ্রিত হয়। ইহাতে যেমন ব্যবসায়ীদের লাভ, গৃহস্থ খরিদ্দারের তেমনি সমূহ ক্ষতি—কম দামের জিনিস খুব বেশী দাম দিয়া কিনিতে হয়, আর বিষাক্ত হওয়াটা ফাউ।

এ্যালুমিনিয়াম পৃথিবীতে যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে; তবে কম পরিমাণে সংগৃহীত হইতেছে বলিয়াই বোধ হয় এখন ইহার দাম এত বেশী। Feldspar, granite অভ্র, cryolite, কর্দ্দম প্রভৃতি পদার্থের সঙ্গে এ্যালুমিনিয়াম মিশ্রিত ভাবে থাকে। পূর্ব্বে এ্যালুমিনিয়াম সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য ও ব্যয়-সাধ্য ছিল। এখন বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পরিচালিত করিয়া এ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশনের অল্প-ব্যয় সাধ্য উপায় বাহির হওয়ায় উহা সাধারণের ব্যবহারযোগ্য হইয়াছে।

কর্ম্মক্ষেত্রে এ্যালুমিনিয়াম ধাতু এত বেশী প্রয়োজন সাধন করিতে পারে যে, লৌহের ঠিক নীচেই ইহাকে স্থান দেওয়া যায়। লোহার মূল্য খুব কম এবং ধাতুগুলির মধ্যে লৌহই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কাজ দেয়। অনেকে আশা করেন যে, এ্যালুমিনিয়াম ধাতু পৃথিবীতে যেরূপ প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাতে অল্প ব্যয়ে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে সংগৃহীত হইবার ব্যবস্থা হইলে ইহা ক্রমে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে লৌহকে তাড়াইয়া তাহার স্থান অধিকার করিতে পারিবে। তবে এই আশা কতদূর ফলবতী হইবে, তাহা এখনও বলা যায় না।

ফটকিরি এ্যালুমিনিয়ামের একটী যৌগিক রূপ। Kaoline নামক পদার্থের অন্যতম উপাদান এ্যালুমিনিয়াম। ইদানীং Bauxite নামক এক প্রকার পদার্থ হইতে এ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত হইতেছে। এই Bauxite এক প্রকার লাল মাটী—পাথুরে মাটী ছাড়া আর কিছুই নয়। Les Baux নামক স্থানে এই মাটী প্রথমে লোকের নজরে পড়ে। এই স্থানের নামানুসারে ঐ মাটীরও নাম হইয়াছে—Bauxite। প্রথমে লোকে ইহাতে লৌহ আছে মনে করিয়া লৌহ বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু লোহা বাহির হয় নাই; তবে aluminium বাহির হইয়াছিল বটে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণ ভারতে ও ব্রহ্মদেশে এই রকম মাটী দেখিয়া Les Baux-এরই মত ভুল করিয়া ইহা হইতে লোহা বাহির করিবার চেষ্টা হয়; বলা বাহুল্য,

Les bauxএর মত এখানেও সে চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছিল। কিন্তু পরীক্ষার ফলে এই rusty coloured laterite deposit বা Bauxite বা ইঁটের বা লোহার মরিচার মত রঙের লাল পাথুরে মাটী হইতে লোহা অপেক্ষা বহুগুণে মূল্যবান aluminium ধাতু বাহির হইয়াছে। মান্দ্রাজের সরকারী শিল্প বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মিঃ চ্যাটারটন (Mr. Chatterton, Principal of the Madras School of Arts) মান্দ্রাজে aluminiumএর বাসনের শিল্প প্রবর্ত্তিত করিয়া ভারতবর্ষের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন এই aluminium প্রস্তুত করিতে কষ্টিক সোডার দরকার। আর aluminium প্রস্তুত করিবার সময় বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগের ফলে লবণাক্ত জল বিশ্লিষ্ট হইয়া chlorine gas উৎপন্ন হয়। সেই ক্লোরিণ গ্যাস চূণের মধ্য দিয় চালান করিলে byproduct হিসাবে bleaching powder উৎপন্ন হইতে পারে। কষ্টিক সোডা ও bleaching powder—এই দুই জিনিষই কাগজ প্রস্তুত করিবার প্রধান দুইটী উপাদান। ভারতবর্ষে এখন ক্রমে ক্রমে কাগজের কল অধিক সংখ্যায় স্থাপিত হইতে চলিয়াছে। কিন্তু এই দুইটী প্রধান ও অপরিহার্য্য মসলার জন্য কলগুলিকে বিদেশের মুখাপেক্ষা করিতে হয়। কিন্তু তাহাতে স্বভাবতঃই কাগজের পড়তা অধিক পড়ে। অতএব সোডার কারখানা ভারতে স্থাপিত হওয়া উচিত। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, এ্যালুমিনিয়াম, সোডার কারখানা, কাগজের কল, ব্লীচিং পাউডারের ফ্যাক্টরী—এ সব পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট শিল্প। (Sir George Watt, The Commercial Products of India.)

এইখানে আমার একটু বক্তব্য আছে। মেদিনীপুর যাইতে বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের ধারে যে লাল পাথুরে কঙ্করময় মাটী দেখা যায়, উহার কখনও কোন রাসায়নিক পরীক্ষায় বিশ্লেষণ হইয়াছিল কি? রকম দেখিয়া মনে হয়, উহা laterite deposit বটে, তবে উহাতে লোহা আছে কি এ্যালুমিনিয়াম আছে, কি কি আছে, তাহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে মন্দ হয় না। এই মাটীর কিছু নমুনা মান্দ্রাজের সরকারী শিল্প-বিদ্যালয়ে কিম্বা কোন এ্যালুমিনিয়ামের কারখানায় অথবা অন্যত্র পাঠাইয়া রাসায়নিক ভাবে বিশ্লেষণ করাইলে ভাল হয়।

এ্যালুমিনিয়ামের মিশ্র ধাতু

সীসক ছাড়া অন্য প্রায় সকল ধাতুর সহিত এ্যালুমিনিয়াম উত্তম রূপে মিলিত হইয়া মিশ্র ধাতু উৎপন্ন হয়। সীসার সঙ্গে এ্যালুমিনিয়ামের মিলন অনেকটা তেলের সঙ্গে জলের মিলনের মত। সেইজন্য সীসা মিশ্রিত এ্যালুমিনিয়ামের বাসনের গায়ে আঙ্গুল দিয়া ঘষিলে আঙ্গুলে সীসার দাগ পড়ে। অন্য ধাতুর সঙ্গে এ্যালুমিনিয়াম মিলিত হইয়া রীতিমত alloy উৎপন্ন হয়। এই alloy দুই শ্রেণীর; যাহাতে এ্যালুমিনিয়ামের ভাগ কম এবং অন্য ধাতুর ভাগ বেশী থাকে, তাহা এক শ্রেণীর; এবং যাহাতে অন্য ধাতু কম, এ্যালুমিনিয়াম বেশী, তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীর মিশ্র ধাতুতে এ্যালুমিনিয়ামের গুণ অনেক বাড়িয়া যায়; দ্বিতীয় শ্রেণীর মিশ্রধাতুতে এ্যালুমিনিয়াম অন্য ধাতুকে অধিকতর গুণসম্পন্ন করে।

তাম্র ও এ্যালুমিনিয়াম

সর্ব্বাপেক্ষা তাম্রের সহিত এ্যালুমিনিয়াম মিলিত করিয়া যে মিশ্রধাতু উৎপন্ন হয়, তাহার দ্বারা অনেক বেশী কাজ হয়। ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ তাম্র এ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে মিশাইয়া বিভিন্ন গুণসম্পন্ন মিশ্রধাতু গঠিত হয়। তাহাদের বর্ণও বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। শিল্পে তাহাদের প্রয়োগও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাম্র শতকরা ৮০ ভাগ কিম্বা তদপেক্ষা অধিক লইয়া বাকী এ্যালুমিনিয়ামের দ্বারা শত ভাগ পূরণ করিয়া যে মিশ্র ধাতু উৎপন্ন হয়, তাহা অনেকটা স্বর্ণের ন্যায় দেখায়। ৯০ ভাগ তাম্র ও ১০ ভাগ তাম্রের মিশ্রণে প্রায় খাঁটি সোণার ন্যায় উজ্জ্বল এক প্রকার মিশ্র ধাতু উৎপন্ন হয়। ইহার বর্ণ সহজে বিকৃত হয় না। ইহার দ্বারা অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিলে প্রায় স্বর্ণালঙ্কার বলিয়া ভ্রম হয়। কষ্টিপাথরে না কষিলে সহজে মিশ্রধাতু বলিয়া ধরা যায় না ৯৫ ভাগ তাম্র ও ৫ ভাগ এ্যালুমিনিয়াম লইলে মিশ্রধাতুটি আরও উত্তম হয়। ইহাদের পালিসও চমৎকার খোলে।

প্যাণ্টালুনের বোতাম

এ যাবৎ আমি যাহা বলিলাম, তাহা ভূমিকা মাত্র। আমার আসল বক্তব্য এই—প্যাণ্টালুনে যে পিতলের বোতাম ব্যবহৃত হয়, আমি পুরাতন অব্যবহার্য্য এ্যালুমিনিয়ামের বাসন হইতে সেই রকম বোতাম তৈয়ার করিবার

প্রস্তাব করিতেছি। এ্যালুমিনিয়ামের পুরাতন বাসন প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থ-ঘরেই আজকাল দুই চারিটা করিয়া পাওয়া যাইতে পারে। সেইগুলি কিনিয়া আনিয়া এক জায়গায় সংগ্রহ করিতে হইবে। তার পর সেগুলি কাটিয়া এবং মুগুর দ্বারা পিটিয়া পুনরায় পাত প্রস্তুত করিয়া যন্ত্রের সাহায্যে punch করিতে হইবে। তিন সেট যন্ত্র হইলেই চলিবে। Punch করিবার জন্য এক সেট, মার্কা মুদ্রিত করিবার জন্য এক সেট ও ছিদ্র করিবার জন্য এক সেট—এই তিন সেট যন্ত্র আবশ্যক। যন্ত্রগুলির কল-কব্জা ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে কিনিতে পাওয়া যাইতে পারে; কিম্বা তৈয়ার করাইয়া লওয়া যাইতেও পারে। এক এক সেট সাধারণ যন্ত্রের মূল্য ২৫০৲ টাকা; এবং বিশেষ মজবুত ভাবে কেবল এই কাজের জন্য প্রস্তুত করাইয়া লইলে ৫০০৲ টাকা হিসাবে পড়িতে পারে। আর ডাইস এক এক সেটের মূল্য ৪০৲ টাকা হইতে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত হওয়া সম্ভব। পুরাতন বাসনে যদি না কুলায়, তবে মান্দ্রাজ অঞ্চলের এ্যালুমিনিয়ামের কারখানা হইতে এ্যালুমিনিয়ামের চাদর আমদানী করা যায়।

কেবল এ্যালুমিনিয়াম কেন, পিতলের চাদর হইতে যে সমস্ত হালকা দেনো বাসন তৈয়ার হয়, তাহাও প্রায় ঘরে ঘরে পাওয়া যায়। পুরাতন অবস্থায় সেগুলির দামও খুব কম। তাহা হইতেও বোতাম প্রস্তুত করা চলিতে পারে। নূতন গোটা পিতলের চাদর কলিকাতার বাজারে সর্ব্বদা কিনিতে পাওয়া যায়। তাহা হইতেও বোতাম প্রস্তুত হইতে পারে। যন্ত্র এবং ডাইস ঐ একই প্রকার। মোট কথা, প্যাণ্টালুনের বোতাম প্রস্তুত করা একটা নূতন ব্যবসায়, এবং লাভজনকও বটে; এবং এই ব্যবসায়ে বেশী মূলধনও দরকার হইবে না। এখন এই ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করা চলিতে পারে কি না, তাহা ভাবিতে থাকুন,—এ সম্বন্ধে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে পরামর্শ করুন,—এবং সন্ধানসুলভ লইতে আরম্ভ করুন।

ব্ল্যাঙ্কো

সাদা ক্যাম্বিসের জুতা ধূলা কাদা লাগিয়া ময়লা কালো হইয়া যায়। তাহার রূপ ফিরাইয়া আনিবার জন্য ব্ল্যাঙ্কো ব্যবহার করিতে হয়। ব্ল্যাঙ্কোর প্রধান উপকরণ খড়ি, পাইপ ক্লে, চায়না ক্লে, kaoline, whiting, zinc white, sulphate of zinc প্রভৃতির যে কোন একটী। ইহার সহিত কিছু গঁদ ভিজানো জল, ভাতের মাড়, এরারুট, শটী বা অন্য কোন প্রকার ষ্টার্চ্চের পাতলা আটা মিশাইয়া চাপ দিয়া জমাট বাঁধিয়া লইতে হয়, এবং ভিজা ও নরম থাকিতে থাকিতেই ট্রেড মার্ক বা ফার্ম্মের বা প্রস্তুতকারকের নাম ষ্ট্যাম্প করিয়া লইতে হয়। খড়ি প্রভৃতি উপকরণ গুলি খুব মিহি ভাবে চূর্ণ করিয়া সাবধানে ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত সামান্য পরিমাণ নীল রং মিশ্রিত করিয়া লইলে উহার বর্ণ খুব উজ্জ্বল হয়। তাহার সহিত উপযুক্ত পরিমাণে খব পাতলা গঁদের জল (ছাঁকা) বা ভাতের মাড় (ছাঁকা) মিশাইয়া ঘন কাদার মত করিয়া লইয়া ছাঁচে ফেলিয়া চাপ প্রয়োগ করিলে বেশ শক্ত হইয়া যাইবে। তার পর নাম, মার্কা প্রভৃতি ষ্ট্যাম্প করিয়া রৌদ্রে কিম্বা মৃদুতাপে শুকাইয়া লইতে হইবে।

ব্ল্যাঙ্কো তরল অবস্থায় শিশিতে বা টীনের কৌটায় ব্যবহার করাও চলে। এরূপ করিতে হইলে zinc white বা sulphate of zinc ব্যবহার করাই প্রশস্ত। তবে তাহার সহিত কিছু গ্লিসরিণ (zinc white এক সের, ১০ তোলা গ্লিসারিণ) মিশাইয়া লইতে হয়। তাহা হইলে শীঘ্র শুকাইয়া জমিয়া যাইতে পারে না। তরল ব্ল্যাঙ্কোতে গঁদের জল কিছু বেশী দরকার হইতে পারে।

খড়ির রাসায়নিক নাম Calcium Carbonate। সোডা ওয়াটার প্রভৃতি বিলাতী জল প্রস্তুত করিবার সময় Carbon dioxide প্রস্তুত করিয়া বোতল ভর্ত্তি করিয়া লইতে হয়। বোতলের ভিতর এই বাষ্প প্রবলচাপে পানীয় জলের সঙ্গে ঘনীভূত অবস্থায় থাকে বলিয়া বোতল খুলিবার সময় শব্দ হয় ও বুদ্‌বুদ্‌ উঠে। এরেটেড ওয়াটারের কারখানাওয়ালারা Calcium Carbonateএর সঙ্গে sulphuric acid মিশাইয়া Carbon dioxide প্রস্তুত করিয়া লয়। Calcium Carbonateএর সঙ্গে sulphuric acid মিশ্রিত হইলে Carbon dioxide বিশ্লিষ্ট হয়। যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা Calcium sulphate। ইহাও দেখিতে সাদা। ইহাতে তাহাদের কোন কাজ হয় না বলিয়া তাহারা ইহা ফেলিয়া দেয়। ইহা খুব সস্তায়- এক প্রকার বিনামূল্যে পাওয়া যাইতে পারে; এবং ইহা হইতেও ব্ল্যাঙ্কো প্রস্তুত হইতে পারে। তাহা হইলে ব্ল্যাঙ্কো প্রস্তুত করিবার পড়তা খুব কম পড়ে।

Crayon pencil

Blanco ছাড়া ইহা হইতে আরও একটী জিনিস প্রস্তুত হইতে পারে। সেটী crayon pencil। প্রস্তুত প্রণালী একই; কেবল ছাঁচ আলাদা অর্থাৎ ব্ল্যাঙ্কোর ছাঁচ না ব্যবহার করিয়া একটী আঙ্গুলের সমান মোটা পেনশিলের আকারের ছাঁচে ঢালিয়া শুকাইয়া লইতে হইবে।

এ এক রকম Crayon pencil—ইহা কেবল স্কুলের Black boardএ ব্যবহার্য্য। আর এক রকম Crayon pencil আছে; তাহা কাগজে ব্যবহার করা যায়। ইহার পস্তুত-প্রণালী একটু ভিন্ন রকমের এবং ইহা কেবল সাদা নয়, ভিন্ন ভিন্ন রঙের হয়। কালো রঙের পেনসিলের জন্য ভূষা ১০ ভাগ, সাদা মোম ৪০ ভাগ, চর্ব্বি ১০ ভাগ; ঘোর নীল রঙের জন্য প্রুসিয়ান ব্লু ১৫ ভাগ, গঁদ ৫ ভাগ, চর্ব্বি ১০ ভাগ; ফিকা নীল রঙের জন্য প্রুসিয়ান ব্লু ১০ ভাগ, সাদা মোম ২০ ভাগ, চর্ব্বি ১০ ভাগ; সাদা রঙের জন্য zinc white ৪০ ভাগ, সাদা মোম ১০ ভাগ, চর্ব্বি ১০ ভাগ; হলদে রঙের জন্য ক্রোম ইয়োলো ১০ ভাগ, সাদা মোম ২০ ভাগ, চর্ব্বি ১০ ভাগ: চর্ব্বি ভেড়ার বা গরুর হইলেই চলিবে। দরকার বোধ করিলে ভাগের কিঞ্চিৎ ইতরবিশেষও করিয়া লওয়া যাইতে পারে। একটী লৌহ বা এনামেলের পাত্র গরম করিয়া তাহাতে মশলাগুলি ঢালিয়া দিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া ও মর্দ্দন করিয়া মিশাইয়া লইতে হইবে। ঠাণ্ডা হইয়া জমিয়া আসিলে, পেনশিলের আকারের ছাঁচে ঢালিয়া লইলেই হইল।

আবহাওয়া

দেশ

নারী-সমস্যা

ভারতীয় মহিলা-সঙ্ঘ।—মাদ্রাজ, ২৪শে অক্টোবর। মাদ্রাজের ভারতীয় মহিলা-সঙ্ঘ ভোট দান ব্যাপারে মহিলাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য একটী সভা আহ্বান করিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। ঐ সভায় মহিলারা যাহাতে আগামী সপ্তাহে পোলিং ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়া যে সব নির্ব্বাচন-প্রার্থী গতবার মহিলাদের উন্নতির চেষ্টা করিয়াছেন তাহাদের ভোট দেন সেই চেষ্টা করা হইবে।—[এসোসিয়েটেড প্রেস]

নারী-নির্য্যাতন।—গত ৫ই অক্টোবর রাত্রে লালগোলা ঘাটের ফ্যালাটের বিশ্রামাগারে ষ্টেসনের ছোট বাবু তাঁহার পরিচিত দুইজন ভদ্রলোক ও দুই জন মহিলার বিশ্রামের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া ঐ ফ্যালাটের খালাসীকে অনুরোধ করেন যে, রোহনপুরের ঐ যাত্রী কয়জন তাঁহার পরিচিত, কাজেই তাঁহাদিগকে যেন নামাইয়া দেওয়া না হয়। রাত্রি অনুমান ১২টার সময় উক্ত খালাসী উক্ত ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলাদের অপমান করিয়া বিশ্রামাগার হইতে তাড়াইয়া দেয়। পরদিন প্রভাতে উক্ত ভদ্রলোকদের লিখিত আবেদন পত্র সহ ছোট বাবু ফ্যালাটে যাইয়া রাত্রের ঘটনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় ফ্যালাটের কেরাণী ও খালাসীর সহিত তাহার বচসা হইয়া যায়। ফল কি হইল এখনও জানা যায় নাই।—হিন্দুরঞ্জিকা।

সভা-সমিতি

রাজসাহী মহিলা-সমিতি।—বিগত ২০শে আশ্বিন রবিবার অপরাহ্ণ প্রায় ৪৷৷০ ঘটিকার সময় প্রমথনাথ বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে রাজসাহী মহিলা-সমিতির চতুর্থ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এবারও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্তা হেমলতা রায় সভার অধিষ্ঠাত্রী হইয়াছিলেন। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর, আয় ব্যয়ের হিসাব পাঠ করা হয়। তারপর "কুটীর শিল্প" সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হয়। তিনজন মহিলা এই সম্বন্ধে প্রবন্ধ আনিয়াছিলেন। এই আলোচনা কালে সভার মধ্যে নূতন উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। তার পর অন্যান্য আলোচনাদির পর একটী সঙ্গীত হইয়া সভার কার্য্যের শেষ হয়। দুর্য্যোগের জন্য মনে করা গিয়াছিল সভা হইবে না। কিন্তু এই দুর্য্যোগের মধ্যেও প্রায় ২০।২৫ জন মহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন। এবারও মল্লিক কোম্পানী মোটর দিয়া সাহায্য করিয়াছেন।

—হিন্দুরঞ্জিকা।

সদনুষ্ঠান

বেহার বন্যা

আরার সাহায্য-সমিতির কাজ।—আরা জেলায় বন্যা-প্রপীড়িতদের সাহায্য করিবার জন্য সরকারী কর্ম্মচারীগণ যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদের সাহায্য বিতরণ কার্য্য যথেষ্ট যত্নের

সহিত করা হইতেছে না বলিয়া, অনেক দুষ্ট লোক ঐ সাহায্য লইয়া নেশা পানে উহার অপব্যয় করিতেছে। মাড়ওয়ারী রিলিফ কমিটী, ওয়ার্দ্ধা সেবা সমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, ভোলানন্দ মিশন, আর্য্য রিলিফ কমিটী প্রভৃতি যথেষ্ট কাজ করিতেছেন। কিন্তু ইহাদের অনেকেই যথোচিত শৃঙ্খলার সহিত কাজ করিতে পারিতেছেন না। মারওয়ারী রিলিফ কমিটীর আসল কাজ অপেক্ষা দলের প্রতিপত্তির দিকে বেশী নজর। তাঁহারা বেশী অর্থব্যয়ে পরোটা বিলাইতে ব্যস্ত; কিন্তু ঋণদানের ব্যবস্থা করিলে কম পয়সায় তাঁহারা বেশী কাজ করিতে পারিতেন। রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি কাজ করিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদের অর্থের স্বচ্ছলতা নাই। ব্যক্তিগত ভাবে যাঁহারা সাহায্য বিতরণের চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের অর্থের সদ্ব্যয় হয় নাই। সাধু ও ব্রাহ্মণদের পুরী ও মিঠাই খাওয়াইয়াই তাঁহার সন্তুষ্ট। জনৈক বদান্য গুজরাটী বণিকের অর্থ এইরূপে ব্যয় হইয়াছে। জঠরাম শেঠ প্রদত্ত কম্বলগুলিও এইরূপ বিশৃঙ্খল ভাবে বিতরিত হইয়াছে। ইহাঁদের উচিত ছিল এই সমস্ত জিনিষ ও টাকা কোনও কমিটির হাতে দেওয়া। সকলের চাইতে ভাল কাজ করিতেছেন জেলা কংগ্রেস কমিটী। বিহারে ষোলটী কেন্দ্র স্থাপন করিয়া কাজ করিতেছেন। স্বয়ং রাজেন্দ্রপ্রসাদ সমস্ত নিজে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। ইঁহারা অর্থ ও বীজ শস্য বিতরণ করিতেছেন। ইঁহাদের কাজে কংগ্রেসের উপর দেশের লোকের শ্রদ্ধাভক্তি বাড়িয়া গিয়াছে।—স্বদেশ।

চুরি-ডাকাতি-খুন-জখম

খুলনায় জলদস্যুর আক্রমণ

গহনা নগদে ১০০০৲ টাকা চুরি।—১০ই অক্টোবর বুধবার কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক সেনগুপ্ত এবং তাঁহার ভ্রাতা এস, কে, সেন পূজার ছুটীতে নৌকা করিয়া তাঁহাদের নিজ গ্রাম কালিয়ায় যাইতেছিলেন। তাঁহারা ভৈরব নদীতে একখানি বড় পানশী নৌকা ভাড়া করিয়া নৌকার মধ্যে পূজার জিনিষপত্র গুছাইয়া রাখিয়াছিলেন। নৌকার মধ্যে অধ্যাপক সেনগুপ্ত, তাঁহার পুত্র এবং ভাইপো ও নৌকার ৪ জন মাঝি ঘুমাইয়াছিল। রাত্রি প্রায় ১টার সময় কতকগুলি বদমায়েস নৌকার একখানি জানালা ঝাপ ভাঙ্গিয়া ভিতরে ঢোকে এবং দুইটী বাক্স ও আরও কতকগুলি জিনিষপত্র সহ চম্পট দেয়। মিঃ সেনগুপ্তের চীৎকারে একজন মাঝি ঘুম হইতে জাগিয়া উঠে। দস্যুরা তাহাকে আহত করিয়া নিজেদের নৌকায় উঠে এবং রূপসা নদীর দিকে যাত্রা করে। নৌকার ভিতর হারিকেন লণ্ঠন জ্বলিতেছিল বলিয়া নৌকার ভিতরকার জিনিষপত্র দেখিবার পক্ষে ডাকাতদের খুব সুবিধা হইয়াছিল। ডাকাতির কিছুক্ষণ পরেই সদর পুলিশ থানায় খবর পাঠান হয়। থানা ঘটনাস্থল হইতে অল্প দূরেই অবস্থিত। কিন্তু নৌকার যোগাড় করিতে করিতে ডাকাতরা বহুদূরে চলিয়া যায়। বাক্স দুইটীর মধ্যে গহনাপত্র ও নগদে প্রায় এক হাজার টাকার মাল ছিল। ঘটনার দুই দিন পূর্ব্বেই পুলিশ খবর পাইয়াছিল যে, একদল দস্যু ফরিদপুর হইতে খুলনার দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই খবর পাওয়ার পর পুলিশ বিভাগ হইতে এ বিষয়ের তদন্তের জন্য একজন হেড কনষ্টেবলকে খুলনা পাল্সীঘাটে পাঠান হয়। কিন্তু ইহাতে কিছুই ফল হয় নাই।—স্বরাজ।

স্ত্রী-হত্যা।—কসাই আবদুল গণির বাস ১১নং আলিমুদ্দিন ষ্ট্রীটে। সে দিন ভোর বেলায় একখানা রক্তাক্ত ছুরী হাতে করিয়া সে তালতলা থানায় যাইয়া বলে যে, এই ছুরী দিয়া এইমাত্র তার স্ত্রীকে খুন এবং অপর দুইজন লোককে আহত করিয়াছে। ঘটনাস্থল পার্ক ষ্ট্রীট থানার অন্তর্গত বলিয়া আসামীকে পুলিশের হেপাজতে তখনই পার্ক ষ্ট্রীট থানায় পাঠান হয়। ইন্স্পেক্টার মালকাহি ঘটনাস্থলে যাইয়া দেখেন যে স্ত্রীলোকটি গলা কাটা অবস্থায় পড়িয়া আছে। সেই ঘরেই সেখ কসিম নামে একব্যক্তি ও আসামীর আট বৎসরের মেয়ে আহত অবস্থায় পড়িয়াছিল। দুইজনকেই পুলিশ অবিলম্বে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেন, কিন্তু তাহাদের জীবনের আশা খুব কম। প্রকাশ যে আসামী পুলিশের নিকট এক বর্ণনা করিয়াছে এবং সেই সম্পর্কে বলিয়াছে যে সে তার স্ত্রীকে সেখ কলিমের সহিত দেখিয়া তার চরিত্রে সন্দেহ করিয়া তাকে খুন করিয়াছে। পরে সে সেখ কলিম ও তার মেয়েকে আক্রমণ করে এবং উভয়কে আহত করিয়া তালতলা থানায় যায়। এই সম্পর্কে আরও তদন্ত চলিতেছে।

—স্বরাজ।

শিল্প—বাণিজ্য

দেশী ও বিলাতী সূতা ব্যবহারকারী মিলের তালিকা

তালিকা।—ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত কাপড়ের কলের কোন কোন কল দেশী সূতা, ইংলণ্ডীয় সূতা ও বিদেশী সূতা ব্যবহার করেন, তাহার একটা তালিকা সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে এই তালিকা দেওয়া গেল:—

(ক) দেশী সূতা ব্যবহারকারী কল—১। কেটরাজ বাবু স্পিনিং য়্যাণ্ড উইভিং কোং। ২। ষ্টার শাপুরজি ভরুচা মিল। ৩। কস্তুরচান্দ মিল। ৪। ব্রাদবরী মিল। ৫। ফিনিক্স মিল। ৬। ক্রাউন স্পিনিং য়্যাণ্ড উইভিং কোং। ৭। মুখানজি গোকুলদাস স্পিনিং য়্যাণ্ড উইভিং কোং ৮। ভিক্টোরিয়া মিল। ৯। রাজা গোকুলদাস। ১০। রুবি মিল। ১১। বোম্বে কটন ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং। ১২। কুচলা স্পিনিং য়্যাণ্ড উইভিং কোং। ১৩। এডওয়ার্ড স্পিনিং য়্যাণ্ড উইভিং কোং। ১৪। প্রেসিডেন্সি মিল। ১৫। জামশেদ মিল। ১৬। কোহিনুর মিল। ১৭। ডায়মণ্ড স্পিনিং কোং। ১৮। সওয়ান মিল। ১৯। খটাউমানেকজি স্পিনিং কোং। ২০। ফিনলে মিল। ২১। হিন্দুস্থান স্পিনিং কোং। ২২। প্রোব ম্যানুফ্যাকচারিং কোং। ২৩। এলফিনষ্টোন স্পিনিং কোং।

(খ) বিদেশী সূতা ব্যবহারকারী মিল—১। মথুরাদাস মিল। ২। সিমপ্লেক্স মিল। ৩। প্রানেট মিল। ৪। মাধবজী মিল।

(গ) কেবল পাড়ে বিদেশী সূতা ব্যবহারকারী মিল—১। করিম-

াই মিল। ২। ই, পাবনে মিল। ৩। ফজলুল ভাই মিল। ৪। ক্রসেণ্ট মিল। ৫। ইণ্ডিয়ান ব্লিচিং কোং। ৬। ইন্দোর মালওয়া ্মল। ৭। পার্ল্স মিল। ৮। প্রিমিয়ার মিল। ৯। করিমভাই পনিং প্রেসিং কোং। ১০। বোম্বে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল মিল। ১১। টাটা মিল।

(ঘ) ইংলণ্ডীয় সুতা ব্যবহারকারী মিল—১। মালেক পেটিট কোং। । বোম্বে ম্যানুফ্যাকচারিং কোং। ৩। দিনসা পেটিট ম্যানুফ্যাকচারিং ়াং। ৩। বোম্বে পেটিট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং। সম্মিলনী

হিন্দু মুসলমান

হিন্দু-মুসলমানে প্রবল বিদ্বেষ—ঝাঁসীর ১৯শে অক্টো- র তারিখের সংবাদে প্রকাশ, রামলীলা উপলক্ষে হিন্দুদিগের এক শোভাযাত্রা বাহির হয়। হিন্দুরা এক মসজিদের নিকটে আসিবামাত্র কদল মুসলমান তাহাদিগকে আক্রমণ করে। ফলে পাঁচজন হিন্দু াহত হইয়াছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ প্রহরী মোতায়েন করা হইয়াছে।

হিন্দুস্থান

শিক্ষা

স্বদেশ হিতৈষণা—সন্তোষের কতিপয় যুবকের ঐকান্তিক গ্রহে তথায় মুচি বালকদের জন্য তাহাদের নিজ পল্লীতেই একটী অবৈ- ্ক নৈশবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। আমরা আশা করি, এই ্যালয় স্থায়ী হইবে এবং উহা দ্বারা এই অনুন্নত সমাজের প্রকৃত ্নের পথ উন্মুক্ত হইবে। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা যুবকদিগের স্বদেশ- তষণা প্রশংসার্হ এবং অনুকরণযোগ্য।

বিদ্যাসাগর বাণীভবনে ২৫০০০৲ দান—শ্রীমতী ্মতী দত্ত গত বৎসর বাণীভবনের স্থায়ী তহবিলে ১০,০০০৲ টাকা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পরলোকগত স্বামী পুরাণচন্দ্র দত্তের ্চিহ্ন স্বরূপ ঐ ভবন নির্ম্মাণ কল্পে আরো ২৫০০০৲ দান অঙ্গীকার ্য়াছেন। সম্মিলনী

বাংলায় শিক্ষা—অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলা দেশ শিক্ষায় প পশ্চাৎপদ তাহা নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে। আমে- ্য়, ইংলণ্ডে, সুইডেনে ও সুইজারল্যাণ্ডে শতকরা ৯৯ জন শিক্ষিত, ্য় ৯১, হল্যাণ্ডে ৯০, বেলিজয়ামে ৮০, আয়র্লণ্ডে ৭১, ইটালীতে রুশিয়ায় ২৫ জন শিক্ষিত। বাংলা দেশে মাত্র শতকরা ১০ জন ্ত। অর্থাৎ ১০০ জনের মধ্যে মাত্র ১০ জন বাঙ্গালী কম-বেশী পড়া জানে। বাংলায় শতকরা ১৬ জন হিন্দু শিক্ষিত কিন্তু শিক্ষিত ্মানের সংখ্যা শতকরা ৬ জন। হিন্দুদের মধ্যে শতকরা ২৭ জন এবং ৩।০ জন নারী শিক্ষিত; কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে শতকরা ন পুরুষ ও অর্দ্ধজন নারী লেখাপড়া জানে। ইংরেজী শিক্ষিত ্দীর মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা শতকরা প্রায় ৫ জন, মুসলমানের সংখ্যা ্রা কিঞ্চিদধিক একজন। আনন্দবাজার পত্রিকা

রাষ্ট্রনীতি

পাঞ্জাবের অবস্থা—পঞ্জাব সরকার সম্প্রতি এক ইস্তাহার করিয়াছেন। ইহাতে প্রকাশ যে, প্রবন্ধক কমিটী বা আকালী দল যে সকল সংবাদ প্রচার করে তাহা ছাপাইলেই সম্পাদকদিগকে আদালতে অভিযুক্ত করা হইবে।

গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটী জানাইয়াছেন যে, পুলিশ তারণ তারণের আকালীদলের অফিস খানাতল্লাস করিয়া সমস্ত জিনিষপত্র লইয়া গিয়াছে। মুক্তেশ্বরে নয়জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আঞ্জুমান ইসলামিয়ার এক সভা বড়লাট বাহাদুরের আগমন উপলক্ষে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার জন্য খিলাফৎ কমিটির সেক্রেটারী মিঃ হিফসামদীন এবং মিঃ আবদুল গফরকে ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের ১০৭ ধারা মতে জামিন দিতে বলা হয়। জামিন দিতে অস্বীকার করায় তাঁহাদিগকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে। পুলিশ তিন দিন ধরিয়া লাহোরের 'নেশন' পত্রিকার অফিস খানাতল্লাস করিয়াছে। খানাতল্লাসের পর পুলিশ নেশন পত্রিকার সম্পাদক সর্দ্দার গুদিৎ সিংহকে গ্রেপ্তার করে। সর্দ্দার গুর্দিৎ সিংহকে লাহোর হইতে অমৃতসরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। অমৃতসরে 'নেশন' পত্রিকার ছয়জন ডিরেক্টারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ৫৮ জন শিখ এবং 'নেশন' পত্রিকার ম্যানেজিং ডাইরেক্টার দেওয়ান চমনলালকে গ্রেপ্তার করার জন্য শমন জারী করা হইয়াছে। ডাক্তার কিচলুকেও শীঘ্রই গ্রেপ্তার করা হইবে বলিয়া একটা গুজব রটিয়া গিয়াছিল। পরে জানা গিয়াছে যে, এই সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা। পুলিশ গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটির মুখপত্র 'আকালী' এবং 'পরদেশী' অফিস খানাতল্লাস করিয়া অফিস তালাচাবী বন্ধ করিয়া দেন। প্রায় এক সপ্তাহকাল বন্ধ থাকিবার পর পত্রিকা দুইখানি আবার দেখা দিয়াছে। ১৭ই তারিখে শিখ লীগের অধিবেশনের দিন ধার্য্য করা হয়। পুলিশ অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান সর্দ্দার বালসিংহ এবং সেক্রেটারী সর্দ্দার হরিসিংহকে ১৬ই তারিখে গ্রেপ্তার করে। এই সকল ধরপাকড় সত্ত্বেও সভার অধিবেশন হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু ১৭ই তারিখে জলন্ধরের ম্যাজিষ্ট্রেট দশদিনের জন্য জলন্ধরে ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের ১৪৪ ধারা বলবৎ করিয়াছেন। ১৭ই তারিখ সমস্ত প্যাণ্ডালটী পুলিশ প্রহরী দ্বারা ঘিরিয়া রাখা হয়। ফলে শিখ লীগের অধিবেশন স্থগিত রাখিতে হইয়াছে।

রেলওয়ে ষ্টেশনে একদল পুলিশ প্রহরী মোতায়েন রাখা হইয়াছে। মৌলানা মহম্মদ আলী এবং ডাক্তার কিচলু জলন্ধরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য শোভাযাত্রা করিতে দেওয়া হয় নাই।

শিখ লিগের অধিবেশন—১৪৪ ধারা ধার্য্য করার ফলে এক দল লোক মোটর গাড়ী করিয়া জলন্ধর জেলার বাহিরে হোসিয়ারপুর জেলায় এক সভা আহ্বান করে। সভায় মৌলানা মহম্মদ আলী এবং ডাক্তার কিচলু বক্তৃতা করিয়াছিলেন। স্বরাজ

ধর্ম্ম—সমাজ

সন্ধ্যা মিটিল—ছিল ব্রাহ্মণ হ'ল খৃষ্টান, আবার এলো জাতে ফিরে।

—মাদ্রাজের মানারগুড়ি মিশন কলেজের ছাত্র কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার প্রায় তের বৎসর পূর্ব্বে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে। ধর্ম্মান্তর গ্রহণের সময় তাহার মনে অত্যন্ত অনুশোচনা হইতে থাকে এবং সে পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণের জন্য ব্যগ্র হয়। পণ্ডিত পরিষদ তাহাকে সমাজে পুনঃ গ্রহণের পাতি দিয়াছেন। কুম্বা কোনামের বৈষ্ণব মন্দিরে পণ্ডিতমণ্ডলী মিলিত হইয়া তাহার যথাবিহিত ব্যবস্থা করিয়াছেন;

অনুন্নত জাতির সভা—সম্প্রতি দেরাদুন জেলার অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের এক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। চৌধুরী বেহারীলাল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মেথর প্রভৃতি অনুন্নত শ্রেণীর অনেক প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত হইয়াছিল। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বক্তৃতা দিয়া সামাজিক আন্দোলনের উপকারিতা বুঝাইয়া দেন। শেঠ লক্ষ্মীচাঁদ চামারদিগের জন্য মন্দির তৈয়ার করে একখণ্ড জমি এবং এক হাজার টাকা দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

হিন্দু ধর্ম্মসভায় ছুঁৎমার্গ পরিহারের ব্যবস্থা রাজসাহীর বোয়ালিয়া হিন্দু ধর্ম্মসভা প্রাঙ্গণে মাননীয় শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী এম.এ. বি-এল, এম-এল-সি মহাশয়ের সভাপতিত্বে অস্পৃশ্য হিন্দুদের আচরণীয় করিবার জন্য হিন্দু জনসাধারণের একটী প্রকাশ্য সভা আহূত হইয়াছিল। সভার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভবানীগোবিন্দ চৌধুরী উকিল প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ছুঁৎমার্গ পরিহারের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করিয়া বক্তৃতা করেন। হিন্দুসমাজের কয় শ্রেণীর লোকদিগকে অস্পৃশ্য বিবেচনায় ঘৃণা প্রকাশ করায় তাহারা যে মুসলমান ও খৃষ্টধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে, ইহা সভায় বিশদভাবে বুঝাইয়া দেওয়ায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে ছুঁৎমার্গ পরিহারের ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। স্থানীয় ধর্ম্মসভার পণ্ডিত মহোদয়গণেরও এ সম্বন্ধে মতামত লওয়া হইবে স্থির হইয়াছে। সম্মিলনী

স্বাস্থ্য

কালাজ্বরের প্রকোপ।—আসাম প্রদেশই না কি কালাজ্বরের জন্মভূমি। বৎসর কয়েক পূর্ব্বেও এই ভীষণ ব্যাধির প্রকোপ আসাম প্রদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল। অধুনা বঙ্গ ব্যাপিয়া ইহার বিস্তৃতি। বিশেষজ্ঞগণের মতে ছারপোকা এই রোগের বাহন। সেই কারণেই অত্যল্পকালের মধ্যেই ইহার এত বিস্তার হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন ইহা ম্যালেরিয়ারই প্রকার ভেদ বা অবস্থান্তর মাত্র। সে যাহাই হউক, অধুনা বঙ্গদেশে এই কালব্যাধির প্রকোপ প্রতিদিনই যে অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাইতেছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই।

রাজসাহী জেলার সর্ব্বত্রই এই কাল ব্যাধির বীজ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সদর, নাটোর ও নওগাঁ মহকুমার সর্ব্বত্রই কালাজ্বরের প্রকোপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। সর্ব্বত্রই বহুলোক এই রোগে নিত্য আক্রান্ত। অথচ দেশের লোক দরিদ্র—ক্ষুধায় অন্ন ও পরিধানের বসন যোগাইতেই অসমর্থ, চিকিৎসার খরচ পাইবে কোথায়? মফঃস্বলে তেমন অভিজ্ঞ চিকিৎসকই বা কয়জন মিলে? ব্যয়সাধ্য চিকিৎসা করাইয়া এই ব্যাধির প্রতিকার লাভ কয়জনের পক্ষে সম্ভব? কাজেই অচিকিৎসায় বা কুচিকিৎসায় যে কত লোক নিয়ত মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

ব্রহ্মচারী বিনোদের সন্ন্যাসী-সংঘ আজ আর বঙ্গদেশে অপরিচিত নহে। সেবার মধ্য দিয়া ইঁহারা বাঙ্গালীর হৃদয়রাজ্য জয় করিয়াছেন। তাঁহাদের অন্তরে নিজেদের সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ব্রহ্মচারী বিনোদের সহকর্ম্মী স্বামী সত্যানন্দ, নওগাঁ ও উত্তরবঙ্গ সেবাশ্রম নামে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান যে গড়িয়াছেন, তাহাও পাঠকগণের অবিদিত নাই। নওগাঁতে তাঁহারা অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা বিনাব্যয়ে দরিদ্র রোগীগণের কালাজ্বর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তথাকার কার্য্য সুপরিচালিত হইতেছে দেখিয়া আসিয়াছি। সম্প্রতি নাটোরেও তাঁহারা কালাজ্বরের চিকিৎসা কেন্দ্র খুলিতেছেন। এই সাধু প্রচেষ্টার সাহায্যকল্পে নাটোরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট, নাটোরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া সন্ন্যাস সাহায্য সমিতির উদ্বৃত্ত তহবিল হইতে স্বামী সত্যানন্দের হস্তে দুই সহস্র মুদ্রা দিতে স্বীকার করিয়া সকলেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

আর জেলাবোর্ড কি করিতেছেন? দরিদ্র দেশবাসীর কষ্টার্জ্জিত ধন তাহাদেরই কল্যাণে ব্যয় করাই যাঁহাদের কার্য্য, তাঁহারা এ সময় দরিদ্র ও নিঃসহায় দেশবাসীর বিনাব্যয়ে চিকিৎসা লাভের পথ সুগম করিবার জন্য স্বামী সত্যানন্দের সেবাশ্রমকে সাহায্য করিবেন না কি? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস সন্ন্যাসী সংঘের এই সাধু প্রচেষ্টার কথঞ্চিৎ সাহায্য কল্পে অর্থ সাহায্য করিলে, জেলা বোর্ড নিশ্চিতই স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিবেন মাত্র। আমরা জেলাবোর্ডের সদস্যগণকে ও সুযোগ্য চেয়ারম্যান মহোদয়কে এই বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া রাজসাহীবাসী দরিদ্র রোগীগণের জীবনরক্ষা কল্পে সাহায্য করিতে অনুরোধ করি।

হিন্দুরঞ্জিকা

বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন জেলাগুলির লোকসংখ্যা।—মৈমনসিংহ—৪৮ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭ শত ৩০, ঢাকা—৩১ লক্ষ ২৫ হাজার ৯ শত ৬৭, ত্রিপুরা—২৭ লক্ষ ৪৩ হাজার ৭৩, মেদিনীপুর—২৬ লক্ষ ৬৬ হাজার ৬ শত ৬০ জন, ২৪ পরগণা—২৬ লক্ষ ১৮ হাজার ২ শত ৫, বাখরগঞ্জ—২৬ লক্ষ ২৩ হাজার ৭ শত ৫৬, রঙ্গপুর—২৫ লক্ষ ৭ হাজার ৮ শত ৫৪, ফরিদপুর—২২ লক্ষ ৪৯ হাজার ৮ শত ৫৮, যশোহর—১৭ লক্ষ ২২ হাজার ২ শত ১৯, দিনাজপুর—১৭ লক্ষ ৫ হাজার ৩ শত ৫৩, চট্টগ্রাম—১৬ লক্ষ ১১ হাজার ৪ শত ২২, রাজসাহী—১৪ লক্ষ ৮৯ হাজার ৬ শত ৭৫, নদীয়া—১৪ লক্ষ ৮০ হাজার ৫ শত ৭২, নোয়াখালি—১৪ লক্ষ ৭২ হাজার ৭ শত ৮৬, খুলনা—১৪ লক্ষ ৫৩ হাজার ৩৪, বর্দ্ধমান—১৪ লক্ষ ৩৮ হাজার ৯ শত ২৬, পাবনা—১৩ লক্ষ ৮৯ হাজার ৪ শত ৯৪, মুর্শিদাবাদ—১২ লক্ষ ৬২ হাজার ৫ শত ১৪, হুগলী—১০ লক্ষ ৮০ হাজার ২ শত ৪২, বগুড়া—১০ লক্ষ ৪৮ হাজার ৬ শত ৬, বাঁকুড়া—১০ লক্ষ ১৯ হাজার ৯ শত

৪১, হাওড়া—১ লক্ষ ১৭ হাজার ৪ শত ৩, মালদহ—৬ লক্ষ ৮৫ হাজার ৬ শত ৬৫, জলপাইগুড়ী—৯ লক্ষ ৩৬ হাজার, কলিকাতা—৯ লক্ষ ৭ হাজার ৮ শত ৫১, বীরভূম—৮ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫ শত ৭০, দার্জ্জিলিং—২ লক্ষ ৮২ হাজার ৭ শত ৪৮, চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য—২ লক্ষ ৭২ হাজার ২শত ৪৩, কুচবিহার রাজ্য—৫ লক্ষ ৯২ হাজার ৪ শত ৮৯, ত্রিপুরা রাজ্য—৩ লক্ষ ৪ হাজার ৪ শত ৩৭, সিকিম রাজ্য—৮১ হাজার ৭ শত ২১ জন। সম্মিলনী

ভারতের বড় বড় সহরের আদমসুমারি।—সহরতলী সহ কলিকাতার লোকসংখ্যা ১৩ লক্ষ ৭২ হাজার ৫ শত ৪৭ জন, বোম্বায়ের লোকসংখ্যা ১১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৯ শত ১৪ জন, মান্দ্রাজে ৫ লক্ষ ২৬ হাজার ৯ শত ১১ জন, হায়দ্রাবাদে—৪ লক্ষ ৪ হাজার ১ শত ৮৭ জন, রেঙ্গুনে ২ লক্ষ ৪১ হাজার ৯ শত ৬২ জন, দিল্লীতে ৩ লক্ষ ৪ হাজার ৪ শত ২০ জন, লাহোরে ২ লক্ষ ৮১ হাজার ৭ শত ৮১ জন, আমেদাবাদে ২ লক্ষ ৭৪ হাজার ৭ জন, লক্ষ্ণৌয়ে ২ লক্ষ ৪০ হাজার ৫ শত ৬৮ জন, বাঙ্গালোরে ২ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪ শত ৯৬ জন, করাচীতে ২ লক্ষ ১৬ হাজার ৮ শত ৮৩ জন, কানপুরে ২ লক্ষ ১৬ হাজার ৪ শত ৩৬ জন ও পুনায় ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৭ শত ৯৬ জন লোক বাস করেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে যত লোক বাস করে, বোম্বাই কর্পোরেশনের সীমানায় তদপেক্ষা অধিক লোক বাস করে। কলিকাতার পার্শ্বে ২৩টী মিউনিসিপালিটীর এলাকার মধ্যে ৫ লক্ষ ৯ হাজার ১ শত ৮২ জন লোক বাস করে।

সম্মিলনী

বিদেশ

গ্রীসে আবার বিদ্রোহ

এ গবমেণ্ট চাহি না—লণ্ডনের ২২শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, গ্রীস হইতে যে সমস্ত খবর আসিতেছে তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, সেখানে খুব কড়াকড়ি চলিতেছে এবং সেই খবর পাঠে জানা যায় যে, নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে খবরের কাগজের উপর যে কড়াকড়ি চলিয়াছে তাহাতে দেশবাসী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছে। কয়েকটি সংবাদে প্রকাশ যে, মসিয়ে পলসটিয়াল্স পেলপনিসাস সৈন্যের জেনারেল ও অন্যান্য সেনাপতিদিগের কার্য্যাবলীর নিন্দা করিয়া এক ঘোষণা-পত্র জারী করিয়াছেন। জেনারেল মেটাকসাস ও তাঁহার সংবাদপত্রের ডিরেক্টারগণ নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। বিদ্রোহীগণকে এক ঘণ্টার মধ্যে চলিয়া যাইতে আদেশ করা হইয়াছে, নতুবা এরোপ্লেন হইতে তাঁহাদিগের উপর বোমা মারা হইবে।

পরবর্ত্তী এক সংবাদে প্রকাশ যে, রাজার পক্ষে মেটাকসাস ২০০০ লোক ও ৬টি কামান লইয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং এরোপ্লেনের সাহায্যে সমস্ত রাজধানীময় বিদ্রোহের ঘোষণাপত্র ছড়ান হইয়াছে। প্রকাশ যে, সৈন্যদিগকে ভুলাইবার জন্য এই বিদ্রোহে ভেনিজেলাসের দলের জেনারেল গারগাবডিস ও লিওনাইপুলোস ও অন্যান্য সেনাপতি-গণ যোগ দিয়াছেন। ইহারা সকলেই ইতিপূর্ব্বে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গবমেণ্ট পদত্যাগ করুন—এথেন্সের ২২শে অক্টোবর তারিখের সংবাদে প্রকাশ, কয়েকটি প্রাদেশিক সৈন্য বিভাগে বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছে। যাহাতে নির্ব্বাচনে কোন পক্ষপাতিত্ব না হয় তাহার জন্য বিদ্রোহীগণ বর্ত্তমান গবমেণ্টকে পদত্যাগ করিতে বলিয়াছে।

সেনানীদের প্রবঞ্চনা—এথেন্সের ২৩শে অক্টোবর তারিখের সংবাদে প্রকাশ, চালমিস হইতে যে খবর আসিয়াছে, তাহাতে জানা যায়, অধিকাংশ বিদ্রোহী সেনাই আবার সেনাদলে ফিরিয়া আসিতেছে, তাহারা বলিতেছে সেনাধ্যক্ষেরা তাহাদিগকে প্রবঞ্চিত করিয়াছে। ভেনিজেলোস এবং জেমিসের দলের লোকেরা বিদ্রোহী-দের বিরোধী আন্দোলনের নিন্দা করিয়া ইস্তাহার জারী করিতেছে।

রাজাকে চাই।—এথেন্সের ২২শে অক্টোবর তারিখের সংবাদে প্রকাশ, বিদ্রোহীরা এই মর্ম্মে একটি ঘোষণা করিয়াছে, রাজা শাসনভার গ্রহণ করুন এবং নূতন গবমেণ্ট নিযুক্ত করুন, নতুবা দেশে অন্তর্দ্রোহের আগুন জ্বলিবে।—হিন্দুস্থান।

জর্ম্মণীতে অন্তর্দ্রোহ

ব্যাভেরিয়াও বুঝি স্বতন্ত্র হয়

সেনাদলকে সমঝানী।—লণ্ডন, ২১শে অক্টোবর বার্লিন গবমেণ্ট এবং ব্যাভেরিয়া গবমেণ্ট দুইয়ের মধ্যে গোলা চলিতেছে। উভয়েই জর্ম্মণ জাতির প্রাধান্য কামনা করিতেছেন। সে উদ্দেশ্যের অন্তরায় ঘটাইবার দোষ তাঁহারা একে অপরের উপর চাপাইতেছেন। ভন কার এক ঘোষণা জারী করিয়া বলিয়াছেন যে, ব্যাভেরিয়া জর্ম্মণ সাম্রাজ্য হইতে স্বতন্ত্র হইতে চাহে না, তবে আন্তর্জ্জাতিকতা এবং কমিউনিষ্ট নীতির তাঁহারা বিরোধী। বার্লিন গবর্ণমেণ্ট ভন কারের এই ঘোষণার উত্তরে জানাইয়াছেন যে, তিনি তাঁহার ভিতরের মতলব চাপা দিয়া ঐ সব কথা বলিতেছেন। জর্ম্মণীর প্রধান সেনাধ্যক্ষ ভন সিকট ব্যাভেরিয়ার সপ্তদশ সংখ্যক বাহিনীকে এই বলিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে তাহারা যেন বার্লিন গবমেণ্টের অনুগত থাকে এবং প্রধান সেনাধ্যক্ষের আদেশ বিনা বাক্যব্যয়ে মানিয়া চলে।

রাইন অঞ্চলে সাধারণতন্ত্র ঘোষণা

স্বতন্ত্রবাদীদের পতাকা উত্তোলন।—প্যারিস, ২১শে অক্টোবর আজ (রবিবার) ভোর রাত্রি ৪টার সময় আইলা চ্যাপেলে রাইন অঞ্চলের সাধারণতন্ত্র ঘোষিত হইয়াছে। স্বতন্ত্রবাদীরা সহরের অফিস আদালত সমস্ত দখল করিয়াছে, এবং টাউন হলের উপর সাধারণতন্ত্রের পতাকা উড়াইয়া দিয়াছে। জর্ম্মণ পুলিশ স্বতন্ত্র-বাদীদের কার্য্যে কোনরূপ বাধা দেয় নাই, সাধারণতন্ত্রীরা তাহাদিগকে বাধা দিতে নিষেধ করিয়া এক ইস্তাহার জারী করিয়াছে।

স্বতন্ত্রবাদীদের বলাবল।—বার্লিন, ২১শে অক্টোবর আইলা চ্যাপেলে যে সাধারণতন্ত্র ঘোষিত হইয়াছে, তাহাকে ততটা বড় রকমের ব্যাপার বলিয়া মনে করিতেছেন না। তাঁহারা বলিতেছেন, উহা স্থানীয় কতকগুলি লোকের চক্রান্তের ফল মাত্র, ফরাসী বেলজিয়ানের অধিকারভুক্ত জর্ম্মণীর অপর অংশে ঐ আন্দোলন ছড়াইবে না। এবার সশস্ত্র স্বতন্ত্রবাদীদের সংখ্যা মাত্র দুই হাজার ছিল। ফরাসী এবং বেলজিয়ান এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিবে। — স্বরাজ

দক্ষিণ আফ্রিকায় এসিয়াবাসী

শ্বেতাঙ্গদেরই প্রভুত্ব চাই

জেনারেল হার্জ্জগের বক্তৃতা।—কেপটাউন, ২৩শে অক্টোবর দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয়দলের নেতা জেনারেল হার্জ্জগ আজ ডারবানের এক সভায় বক্তৃতাকালে বলেন, দক্ষিণ আফ্রিশ্বেতাঙ্গ জাতিরই প্রভুত্ব থাকা আবশ্যক। তিনি বলেন, শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গ জাতিকে যদি পৃথক করা যায়, কৃষ্ণাঙ্গদিগকে শ্বেতাঙ্গদের সহিত অবাধে প্রতিযোগিতা করিবার পথ উন্মুক্ত রাখা যায়, তাহা হইলে দক্ষিণ আফ্রিকাতে শ্বেতাঙ্গ জাতির সভ্যতা আর বজায় থাকিবে না। কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গ জাতির চেষ্টাতেই দক্ষিণ আফ্রিকার উন্নতি ঘটা সম্ভব, এ কথাটা আমাদের ভুলিলে চলিবে না। তিনি বলেন, শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গদের পৃথক করিবার নীতির ফলে উভয় সম্প্রদায়েরই উন্নতি ঘটিবে। নিজের নিজের নির্দ্দিষ্ট স্থানের ভিতর থাকিয়া উভয়-সম্প্রদায়ই সমান সুবিধাভোগ করিবে। এসিয়াবাসীদের সম্বন্ধে জেনারেল হার্জ্জগ বলেন, দেশীয় কৃষ্ণাঙ্গদের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করা হইবে, এসিয়াবাসীদের সম্বন্ধে তেমন ব্যবস্থা হইবে, এসিয়াবাসীদিগকে নিজেদের দেশে পাঠাইবার নীতি সম্বন্ধে তিনি বলেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে অসুবিধায় পড়িতে হয়, এমন কিছু আমরা করিতে চাহি না, তেমন কোন অসুবিধার সৃষ্টি না করিয়াই এসিয়াবাসীদিগকে দেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা চালান যাইবে। —স্বরাজ

সম্পাদকের বৈঠক

প্রশ্ন

৬০। অনেকে বলেন যে, পেঁপে গাছ ও ডালিম গাছ বসতবাটীর ভিতর থাকিলে গৃহ-স্বামীর কোন সন্তানাদি হয় না, এবং সন্তানাদি হইলেও তাহারা অকালে মরিয়া যায়। এ কথার মূলে কোন সত্য নিহিত আছে কি? শ্রীউমাকান্ত পাল।

৬১। মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত, বহরমপুর হইতে ২২ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে, কান্দি মহকুমায়, পাঁচথুপী নামক একটী গ্রাম আছে। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, ঐ গ্রামে বুদ্ধদেবের "পঞ্চস্তূপ" ছিল। তাহারই নামানুসারে পাঁচথুপী নাম হইয়াছে। এবং আরও শুনিতে পাওয়া যায় যে, কোন এক সন্ন্যাসী ঐ গ্রামে "পঞ্চতপ" করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন; সেইজন্য উক্ত গ্রামের ঐরূপ নাম হইয়াছে। এইরূপ ঐ স্থানে নানা জনশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায়। গ্রামের উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে এখনও একটী ভগ্নস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্তূপ কাহার দ্বারা, কোন সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং ইহা কতদূর সত্য, অনুগ্রহ পূর্ব্বক কেহ জানাইলে বাধিত হইব।

৬২। মশলা বাটার শীল, নোড়া কিংবা তেলের ভাঁড় সধবাদিগের হাত হইতে মাটিতে পড়িয়া যাইলে কিংবা ভাঙ্গিয়া যাইলে গৃহস্থের অমঙ্গল হয় এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা শাস্ত্রগত না প্রবাদ?

৬৩। বৃহস্পতিবারে কিংবা নিজের জন্মবারে ক্ষৌরকার্য্য করিতে নাই কেন?

৬৪। সন্তানাদির অশুভ কোন কথা বলিলে স্ত্রীলোকেরা "বালাই ষাট" বলে কেন? এই ষাটের অর্থ কি? শ্রীপরমেশচন্দ্র সিংহ।

৬৫। বঙ্গদেশে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর কুলীন কায়স্থ জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। একশ্রেণী বঙ্গজ কুলীন কায়স্থ—ঘোষ, বসু, গুহ এবং মিত্র; দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলীন কায়স্থ—ঘোষ, বসু এবং মিত্র। দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজ গুহকে কুলীন শ্রেণীভুক্ত না করিবার কারণ কি? এবং বঙ্গজ সমাজেই বা গুহকে কুলীন শ্রেণীতে স্থান দিবার কারণ কি? এবং দুই সমাজের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধাদি না হইবারই বা কারণ কি? ঐতিহাসিক প্রমাণ সহ বিস্তারিত জানাইলে যারপরনাই সুখী হইব।

৬৬। বঙ্গদেশে কোথাও এমন কোন স্কুল (গভর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রাপ্ত কিম্বা প্রাইভেট) আছে কি না, যেখানে থাকিয়া মেজবাতি বানান শিক্ষা এবং তাঁতের কাজ শিক্ষা করা যায়; এবং থাকিলে কোথায়, মাসিক কত খরচ পড়ে প্রভৃতি বিস্তারিত জানাইলে অনুগৃহীত হইব।

শ্রীঅমূল্যচরণ গুহ।

৬৭। সূর্য্য হইতে শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গলের গড় দূরত্ব যথাক্রমে ৬ কোটি ৭০ লক্ষ মাইল ও ৯ কোটি ২০ লক্ষ মাইল ও ১৪ কোটি ১৫ লক্ষ মাইল। তাহা হইলে পৃথিবী হইতে শুক্র ২ কোটি ৫০ লক্ষ মাইল এবং মঙ্গল ৫ কোটি ৫ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু গ্রহকক্ষের কক্ষ-পথ প্রলম্বিত বৃত্তাভাস বলিয়া পৃথিবী হইতে শুক্রের

নিকটতম দূরত্ব ২ কোটি ২৫ লক্ষ মাইল, আর মঙ্গলের নিকটতম দূরত্ব ৩ কোটি ৪০ লক্ষ মাইল হইয়া থাকে। তথাপি বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা সকলেই একবাক্যে মঙ্গলকে পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ বলিয়া থাকেন কিরূপ? এরূপ বৈচিত্র্য কি সকল বৈজ্ঞানিকেরই বৈচিত্র্য? না অন্য কোনরূপ নিয়ম আছে? কেহ এই বিজ্ঞপ্তির বৈগুণ্য নিরাকরণ করিয়া দিলে বাধিত হইব। শ্রীদ্বারকানাথ মাইতি।

৬৮। নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাটের নিকটবর্ত্তী মালিপোতা গ্রামে ৺পাঁচু ঠাকুর আছেন। অনেক স্ত্রীলোক, যাঁহাদের ২।১টী শিশু সন্তান মারা গিয়াছে, এই ৺পাঁচু ঠাকুরের ঔষধ ধারণ করেন এবং ঔষধ ধারণের পর যে সকল সন্তান্ হয়, তাহারা প্রায়ই জীবিত থাকে। এই ৺পাঁচু ঠাকুরের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কাহারও জানা থাকিলে অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে উপকৃত হইব। ঠাকুর কত বৎসর এখানে আছেন এবং কিরূপেই বা তাঁহার প্রতিষ্ঠা হইল? কেহ কেহ বলেন কোন মহাপুরুষের আত্মা শিশুমঙ্গল সাধনের জন্য এই স্থানে আবদ্ধ আছেন। কথাটা কতদূর সত্য এবং সঙ্গত? মায়াদেবী।

৬৯। কৃত্তিবাসের রামায়ণে দেখা যায়, সূর্য্যবংশীয় হারীতের পুত্র হরিবীজ এবং হরিবীজের পুত্র হরিশ্চন্দ্র। রাজা হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্র ঋষিকে সর্ব্বস্ব দান করিয়া পুণ্যভূমি বারাণসীর শ্মশান ঘাটে চণ্ডালের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। গঙ্গার যে ঘাটে রাজা হরিশ্চন্দ্র চণ্ডালের কার্য্যে প্রবৃত্ত ছিলেন এবং যে ঘাটে তাঁহার স্ত্রীপুত্রের সহিত মিলন হইয়াছিল সেই ঘাট বর্ত্তমান সময়ে "হরিশ্চন্দ্রের ঘাট" নামে প্রসিদ্ধ। হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্ব এবং রোহিতাশ্বের পুত্র সগর। কপিল মুনির শাপে সগরের ৬০ হাজার পুত্র ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং সগরবংশ উদ্ধারের জন্য পর পর তিন পুরুষ তপস্যা করিয়াও কেহই গঙ্গাকে মর্ত্তে আনয়ণ করিতে সক্ষম হয় নাই। পরে ঐ বংশের দিলীপ-পুত্র ভগীরথ কঠোর তপস্যা করিয়া মর্ত্তে গঙ্গা আনয়ন করেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজত্বকালে মর্ত্তে গঙ্গা ছিলেন কি না এবং যে হরিশ্চন্দ্রের ঘাট বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহাই প্রকৃত হরিশ্চন্দ্রের লীলা স্থল সেই শ্মশান ঘাট কি না এ সম্বন্ধে কোন মহোদয় আলোচনা করিলে অনুগৃহীত হইব। শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৭০। মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল্ তমোলুক ও দোর প্রভৃতি পরগণার হৈমন্তিক ধান্যের জমিতে এক প্রকার জলজ উদ্ভিদ উদ্ভূত হইয়া ধান্যক্ষেত্র আবৃত করিয়া ফেলে। ইহাতে রোপিত ধান্য গাছ জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া যায়। যে জমিতে ১২।১৩ মণ ধান্য উৎপন্ন হইত তথায় এই জলজ উদ্ভিদ জমান দরুন ২।৩ মণের অধিক ধান্য উৎপন্ন হইতেছে না।

এই জলজ উদ্ভিদকে এতদ্দেশে "গেঁদুয়া" কহে। গেঁদুয়ার আকৃতি পুষ্করিণীর ঝাঁজির (শৈবাল) মত, ইহার গন্ধ মৎস্যের আঁইশের গন্ধের ন্যায়, গেঁদুয়া ৩ ইঞ্চি হইতে ১২।১৩ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। গেঁদুয়া ধ্বংসের উপায় কেহ নির্দ্দেশ করিলে এতদঞ্চলের বিশেষ উপকার সাধিত হয়। শ্রীজগন্নাথ দাস।

৭১। এ বৎসর কার্ত্তিকে কলাই ফসলের প্রথম অবস্থায় গাছগুলি খুব সতেজ হইয়া উঠিয়াছিল, সকলে আশা করিয়াছিল প্রচুর পরিমাণে ফসলটী হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ শুয়ানামক একপ্রকার কীট দ্বারা সমস্ত ফসলটী নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কি উপায়ে এই কীট নষ্ট হইতে পারে, যদি কোন কৃষিতত্ত্ববিদ জানেন অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে বাধিত হইব। শ্রীভক্তিভূষণ ঘোষ।

৭২। পৃথিবীর মধ্যে নারী ব্রহ্মদর্শন করিয়াছে কি না এবং তাঁহারা কোন দেশীয়া কে কে, এবং কি নামধেয়া জানিতে ইচ্ছা করি।

পৃথিবীতে নারী কর্ত্তৃক কি কি অজ্ঞাত বিষয় আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে? তাঁহাদের নাম কি কি?

শ্রীরাধারাণী দত্ত।

৭৩। Adamsonia Digieaca বৃক্ষের যে কোন একটী পল্লব ধরিয়া নাড়া দিলে, সেই বৃহৎ বৃক্ষের সমস্ত পল্লবগুলি ধীরে ধীরে নড়িতে থাকে। অথচ অন্য কোন বৃক্ষের এরূপ হয় না। ইহার কারণ কি? শ্রীগোবিন্দলাল পাল।

৭৪। ৯।১০ বৎসরের পুরাতন পোড়ার দাগ নিঃশেষে কি উপায়ে মিলাইয়া যাইতে পারে? শ্রীআশুতোষ সান্যাল।

৭৫। ভারতে যে দ্বাদশটী অনাদি শিবলিঙ্গ আছে, কোথায় কোথায় এবং তাহার বিশেষত্ব কি?

আরশোলা বিনাশ করার সহজ উপায় কি?

পায়ে জুতার ঘর্ষণে যে কড়া পড়ে তাহা সারিবার উপায় কি?

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

উত্তর

রক্ত আমাশয়ের ঔষধ

বাবলার কুঁড়ি সিকিভর লইয়া ফুলবাতাসার সহিত বাটিয়া খাইলে, রক্ত আমাশয় সারিবে। ঐ—রোগের, আর একটী ঔষধ, একটী স্কাকুই গাছের শিকড়। খুব ছোট শিকড় ২।৩টা গোলমরিচ সহ বাটিয়া খাইলে সেইদিনই সারিবে। রক্ত আমাশয় রক্ত বেশী পড়িলে কুকসিমা অর্থাৎ কুকুর শোঁকার রস বা দুর্ব্বার রস ২ তোলা খাওয়াইলে নিশ্চয় সারিবে। বিশেষ আবশ্যক হইলে সকাল সন্ধ্যা দুবার খাইলেই যথেষ্ট। শ্রীআদ্যাশক্তি বসু

শনির স্তব

'দশরথ কৃত শনিস্তব' যেটী আছে তাহা রামায়ণের রাজা দশরথ নহে, দশরথ নামে একজন মুনি ঐ শনিস্তবটী রচনা করিয়াছিলেন। পিপ্পলাদ নামে একজন মহর্ষি ছিলেন। শ্রীউষারাণী ঘোষ

প্রশ্ন নং ৪৮

(১) হিমালয়ের উচ্চ শিখরে বরাস ফুল (Rhododendron) পাওয়া যায়। সিমলা বা ঐ অঞ্চলে পরিচিত লোক মার্ফৎ ইহা সংগ্রহ করা কঠিন নহে। তিনটা ফুল একটু মিছরির সহিত বাটিয়া খাইলে

তিনদিনে রক্তামাশয় সারে। প্রাতে ব্যবহার্য্য। নূতন রক্তামাশয়ে বিশেষ ফলপ্রদ। (পরীক্ষিত)

(২) ভাল গব্যঘৃত চায়ের চামচের দু চামচ লইয়া গরম করিবে, পরে উহাতে এক মটর আন্দাজ ভাল হিং ফেলিয়া দিবে। হিং ভাল রকমে ভাজা হইয়া গেলে উহা লালচে হইয়া যাইবে। তখন হিংটি ফেলিয়া দিয়া ঘৃত অল্প ঠাণ্ডা করিয়া সেবন করিবে। প্রাতে খালি পেটে সেবন করা বিধি। ৭ দিন ব্যবহারে পুরাতন বা নূতন রক্তামাশয় সারে। পুরাতন রোগে বেশী ফলপ্রদ। ইহাতে পথ্য—ঘোল ভাত বা কাঁচকলার ঝোল ও ভাত। ছোট ছেলেদের অর্দ্ধ মাত্রা ব্যবস্থা। (পরীক্ষিত)

(৩) বেল কচি অবস্থায় কাটিয়া শুকাইয়া রাখিতে হয়। খোসা ফেলিয়া দিতে হয়। এইরূপে প্রস্তুত বেলশুঁঠ পসারিদের দোকানেও পাওয়া যায়। বেলশুঁঠ ও চিনি সমভাগে চূর্ণ করিয়া সেবনীয়। সকালে ও বিকালে দুইবার খাওয়া বিধি। যাবতীয় আমাশয় রোগে ইহা বিশেষ উপকারী। শ্রীমতী মোহিনী দেবী

পাথরকুচির পাতার রস এক আউন্স কিঞ্চিৎ লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ সকালে একবার করিয়া তিনদিন সেবন করিলে যে কোনরকম রক্ত আমাশয় হউক না কেন নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে।

শ্রীগিরিজাভূষণ ভট্টাচার্য্য

গজভুক্ত কপিত্থ

হস্তীর পাকস্থলী হইতে এমন একপ্রকার রস নির্গত হয় যাহার শক্তিতে কয়েৎবেলের ভিতরকার শস্য তরল অবস্থায় প্রাপ্ত করাইয়া গায়ের সূক্ষ্ম ছিদ্র পথ দ্বারা আকর্ষণ করিয়া লয়।

বাসগৃহে শকুনি

খড়ের ছাউনি বাসঘরের চালে শকুনি বসিলে যে গৃহাদি নষ্ট হয় ইহা শুধু প্রবাদ নয়। শাস্ত্রে ইহার প্রমাণ আছে। নানাবিধ কদর্য্য পচা মাংসাদি আহার জন্য শকুনির হাওয়া বা সংস্পর্শ অত্যন্ত দূষিত। কাজেই গৃহে শকুনি বসিলে নানারূপ বিষ সংক্রান্ত হয় এবং তাহাই গৃহস্থের হানির কারণ বলিয়া মনে হয়। শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

আশ্বিন মাসের ৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর

হাতী শুঁড়োর গাছের মূল শিকড়ের ছাল জিরা ভিজান জলের সহিত বাটিয়া প্রাতে খাওয়ালে যে প্রকারের আমাশয় হউক ২।১ দিনে সারিয়া যাইবে। আফুলা গাছ হইলে ভাল হয়। অর্থাৎ যে গাছের শিষ বাহির হয় নাই এরূপ গাছ। পল্লীগ্রামে এ গাছ যথেষ্ট পাওয়া যায়। বহু পরীক্ষিত সত্য। শ্রীতরুবালা ঘোষ

চোরে চোরে মাসতুতো ভাই

কয়েকজন চোর রাত্রিতে চুরি করিতে বহির্গত হইয়া সমস্ত রাত্রি চৌর্য্য কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। হঠাৎ দেখিল রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে, আর একটু পরেই ধরা পড়িতে হইবে। তখন তাহারা নিরুপায় হইয়া উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। এমন সময় দেখিল যে একজন বৃদ্ধ প্রাতঃকৃত্য সমাপনার্থ ঘর হইতে বহির্গত হইল, তাহারা সেই অবসরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দড়ি দ্বারা প্রস্তুত চারপায়ে খাটখানা বাহির করিয়া অপহৃত জিনিষগুলি মাদুর দিয়া মড়ার মত করিয়া বাঁধিল এবং খাটের উপর রাখিয়া কাপড় দিয়া ঢাকিল, তাহার পর চারিজনে স্কন্ধে করিয়া বাহির হইল। রাস্তায় আসিয়া খুব জোরে জোরে বলিতে লাগিল, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে।

পথিকেরা প্রাতঃকালে মড়া দেখিয়া পাশে সরিয়া দাঁড়াইতে লাগিল, তাহারা নির্ব্বিঘ্নে পথ চলিতে লাগিল। এমন সময় আর একজন চোর সমস্ত রাত্রি ঘুরিয়া ঘুরিয়া কিছুই চুরি করিতে পারে নাই বলিয়া হতাশমনে সেই রাস্তা দিয়া গৃহে ফিরিতেছিল। সে খাটের নিচে গাড়ুর নল দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে চোর বলিয়া চিনিতে পারিল।

যখন আগের চোরেরা বলে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে" তখন শেষের চোর বলে "ঐ নল দেখা যায় রে" আগের চোরেরা ভাবিল সর্ব্বনাশ! এই ত ধরা পড়িয়াছি, তখন তাহারা বলিল "ভাগ নাও ত এসো।"

এই কথা শুনিয়া শেষোক্ত চোর মহা সন্তুষ্ট হইয়া "কবে মরেছে মেসে" বলিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিল। সেইজন্য লোকে বলে চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। শ্রীমোমরেজ আলী খাঁ

শ্রীভবনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের রামরূপ ধারণ

পঞ্চপাণ্ডবগণ বনবাস কালে একদিন অর্জ্জুন ভ্রমণ করিতে করিতে পদ্ম গন্ধ পাইলেন, তিনি সেই গন্ধ লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি সুন্দর এক উদ্যানের কাছে উপস্থিত হইলেন। উদ্যানে প্রবেশ করিতে যাইবেন, এমন সময় হনুমান আসিয়া বলিলেন, আমার উদ্যানে প্রবেশ করিও না। আমি এই পদ্মফুল দ্বারা আমার ইষ্টদেবতা রঘুবীরকে পূজা করিয়া থাকি। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তোর রঘুবীর? হনুমান বলিলেন আমার রঘুবীরকে জানিস্ না মূঢ়! আমার রঘুবীর কত বড় বীর ছিলেন, তিনি রাবণ, কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি বধ করিয়াছেন, সেতুবন্ধন করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া অর্জ্জুন হাসিয়া উঠিলেন, এবং বলিলেন, যে ভারি ত তোর রঘুনাথ বীর! যে বীর হইবে সে বাণের দ্বারা সব করিবে। তোর রঘুনাথ তাহা না করিয়া, বানর ও গাছ-পাথরের সাহায্যে সেতু বান্ধিলেন। হনুমান বলিলেন, বাণের দ্বারা কে সেতু বান্ধিতে পারে, কে এমন বীর আছে। অর্জ্জুন বলিলেন, যে আমি পারি। হনুমান বলিলেন, চল সাগরের পাড়ে, কেমন তুমি বাণের দ্বারা সাগর বান্ধিতে পার দেখিব। তখন অর্জ্জুন ও হনুমান সাগরের কূলে গেলেন। অর্জ্জুন গাণ্ডীব দ্বারা ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ বরিষণ করিয়া নিমেষের মধ্যে সাগর বান্ধিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া হনুমান বিস্মিত হইলেন। তাহার পর হনুমান বলিলেন যে, আমার রঘুনাথ যে সেতু বান্ধিয়াছিলেন, তাহার উপর দিয়া আমরা অসংখ্য অসংখ্য কটক পার

বিষাদিনী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাকান্ত দাস গুপ্ত [BHARATVARSHA HALFTONE & PTG. WORKS

হইয়াছিলাম। এই তোমার সেতু দিয়া কি তাই পারিব। অর্জ্জুন বলিলেন, নিশ্চয়। তখন হনুমান উত্তরের দিকে গেলেন, এবং শতেক যোজন দেহ বিস্তৃত করিয়া, প্রতি লোমে লোমে গাছ পাথর আনিয়া বলিলেন, আমি এখন তোমার সেতু দিয়া পার হই। অর্জ্জুন সেই বিরাট দেহ দেখিয়া ভয় পাইলেন, তবু বলিলেন যে হও। হনুমান তখন বলিলেন দেখিও আমার ভার কি সহ্য করিতে পারিবে। আমরা অসংখ্য কটক সেই সেতু দিয়া পার হইয়াছিলাম। অর্জ্জুন বলিলেন এই সেতুও সেইরূপ পারিবে। হনুমান তখন এক পদ সেতুর উপর দিয়া অপর পদ দিয়াছেন, এমন সময় সাগরের জল লাল হইয়া গেলে হনুমান তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, মনে ভাবিলেন এ কি? হনুমান তখন সেতুর উপর হইতে পদ সরাইয়া ধ্যানস্থ হইয়া দেখিলেন, সেতুর নীচে তাঁহার অভিষ্ট দেব রঘুমণি। তখন হনুমান স্তব করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সেতুর নীচে কূর্ম্ম রূপ ধরিয়াছিলেন, এবং পদচাপে মুখ দিয়া রক্ত উঠিয়া সমুদ্রের জল লাল হইয়া গিয়াছিল। হনুমান বলিলেন, আমি এ কি করিলাম, প্রভুর গায়ে পদ দিলাম। এই বলিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ উঠিয়া বলিলেন, তোমরা দ্বন্দ্ব ছাড়। তোমরা উভয়েই আমার পরম ভক্ত, দুজনে বন্ধুতা কর। অর্জ্জুন ও হনুমান তখন বিস্মিত হইলেন। হনুমান বলিলেন, প্রভু! যদি দয়া করিলে, তবে আমাকে সেই নবদূর্ব্বাদল রামরূপ দেখাও। তখন শ্রীকৃষ্ণ ধনুকধারী রাম হইয়া হনুমানকে দেখা দিলেন। অর্জ্জুন ও হনুমান বন্ধুতা করিলেন, এবং হনুমান বলিলেন অর্জ্জুন! তুমি আজ হইতে আমার সখা হইলে। এবং যুদ্ধের সময় আমি তোমার সহায় হইব। তাই অর্জ্জুনের কপিধ্বজ রথ এবং শ্রীকৃষ্ণ অবতারে এই সময় হনুমান রামরূপ দেখিয়াছিলেন।

("কাশীরাম দাসের মহাভারত" "বনপর্ব্ব")

শ্রীমতী সুবোধবালা ঘোষজায়া।

তাসখেলার সৃষ্টি

ফ্রান্সের রাজা ষষ্ঠ চার্লসের প্রকৃতি সাতিশয় বিমর্ষ ছিল। তাই তাঁহার মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিবার জন্য সর্ব্বপ্রথমে খেলার তাসের সৃষ্টি হয়। ইহা ১৩৯০ খৃষ্টাব্দের কথা। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

প্রত্নতত্ত্ব

'শাহজালাল' মুসলমানদিগের একজন প্রসিদ্ধ ফকির ছিলেন। তিনি মক্কায় থাকিতেন; কিন্তু তাঁহার অসাধারণ শক্তির কথা শুনিয়া তখনকার দিল্লীর মোগল বাদশা তাঁহাকে সাদরে তাঁর সভায় নিমন্ত্রণ করেন এবং তাঁহাকে আনিবার জন্য বহু সৈন্যসামন্ত, চতুর্দ্দোলা প্রভৃতি পাঠাইয়া দেন। কিন্তু শাহজালাল তাহাদের ফিরাইয়া দিয়া একাকী পদব্রজে তাহাদের আগেই দিল্লীর সভায় উপস্থিত হইলেন। সম্রাটও তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন। এবং সেই হইতে শাহজালাল স্থায়ীভাবে সেখানেই বাস করিতে আরম্ভ করেন।

এই সময়ে শ্রীহট্ট নগরে, গৌরগোবিন্দ নামক একজন মহা প্রতাপশালী লোক রাজত্ব করিত। একবার একটি মুসলমান পুত্র কামনায় একটি গরু কোরবাণী করে, তাহাতে গৌরগোবিন্দ তাহাকে ও তাহার পরিবারের সকলকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। ইহাতে মুসলমানরা অত্যন্ত চটিয়া যায়; কিন্তু হিন্দুরা তখন প্রতাপশালী বলিয়াই কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই এবং নীরবে নানাপ্রকার অত্যাচার সহ্য করিতে বাধ্য হয়। এই খবর দিল্লীতে শাহজালালের কাণে পৌঁছায়—তিনি আর থাকিতে না পারিয়া প্রায় তিনশত শিষ্য, একজোড়া পায়রা, কতকগুলি মাছ এবং আরও কতকগুলি জিনিষ পত্রাদি লইয়া পদব্রজে চলিয়া আসেন। কথিত আছে যে তিনি শ্রীহট্ট পার্শ্বস্থিত পূর্ণ সুর্ম্মা নদী সমস্ত শিষ্য সহ পদব্রজে পার হন।

সেখানে আসিলে শাহজালালের অসাধারণ ও অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাইয়া সকলে স্তব্ধ ও ভীত হইয়া পড়ে এবং অচিরে গোলমাল মিটিয়া যায়। তারপর তিনি আর ফিরিয়া যান নাই, শ্রীহট্ট নগরেই জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কাটাইয়া যান। শুনা যায় শ্রীহট্টে তাঁর অনেক অদ্ভুত কীর্ত্তি আছে। একবার তিনি একটি উচ্চ পাহাড় মন্ত্রবলে অর্দ্ধেকের বেশী মাটির নীচে বসাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি একটি মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং সেই মস্‌জিদেই তাঁর কবর দেওয়া হয়। এই মস্‌জিদটিকে 'শাহজালালের মোকাম' অথবা 'শাহজালালের দরগা' বলা হইয়া থাকে। তিনি যে কয়েকটি মাছ আনিয়াছিলেন তাহা এখনও জীবিত এবং অনেক রকম সুন্দর রাঙালী মাছে পরিণত হইয়াছে। একটি কূপ আছে, তাহা হইতে সারা বৎসর অবিশ্রান্তভাবে জল পড়িতে থাকে। কথিত আছে যে ইহার সহিত মক্কার সংযোগ আছে তিনি যে দুটি পায়রা আনিয়াছিলেন তাহা এখন লক্ষে পরিণত হইয়াছে। এবং সেইরূপ পায়রাকে পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু-মুসলমান সকলেই 'জালালের কবুতর' বলিয়া থাকে। মস্‌জিদে একটি মুরগীর ডিম আছে—সেটা শাহজালালের সময়ের এবং সেটির ওজন তিনপোয়ার কম হইবে না। একটি পাথর আছে সেখানে—কথিত আছে যে শাহজালাল সেটাতে কনুইয়ের ভর দিয়াছিলেন এবং পাঁচ আঙ্গুলে চড় মারিয়াছিলেন—সেইজন্য সেই পাথরটিতে পাঁচ আঙ্গুলের দাগ এবং কনুইয়ের ভরে গর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। কথিত আছে যে কিছুদিন আগে একটী লোক ছাতা দিয়া শাহজালালের সংরক্ষিত মাছগুলির একটিকে আঘাত করে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে লোকটি রক্তবমি করিতে করিতে মরিয়া যায়। মস্‌জিদের চতুঃপার্শ্বস্থ স্থানগুলিতে সব রকম ফলের গাছ আছে; এমন ফল নাই যাহা সেখানে পাওয়া না যায়—এবং সেখানকার লোকেরা বলে যে শাহজালাল এ সমস্ত করিয়া গেছেন। আরও কথিত আছে যে এমন রোগ ছিল না যাহা তিনি আরোগ্য না করিতে পারিতেন। এ বিষয়ে একটি অদ্ভুত গল্প আছে—একবার একটি লোক খাবারের সহিত 'এঁটুলী' পোকা খাইয়া ফেলে এবং সেই পোকাটা তাহার উদরের ভিতর ক্রমাগত বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে। শেষে পেটের অবস্থা ভয়ানক শোচনীয় হইয়া উঠে। নানারূপ বৃথা চিকিৎসার পর তাহাকে শাহজালালের কাছে আনা হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ রোগ নির্ণয় করিয়া তাঁহার নিজের একটি লোককে একটি কুকুর কাটিয়া ভাল করিয়া মাংস

তৈয়ারী করিতে বলেন। কুকুরের মাংস তৈয়ারী হইলে, রোগীকে তাহা খাইতে দেওয়া হয়। অবশ্য তাকে বলা হয় যে ইহা খুব ভাল পাঁঠার মাংস। সকলেই জানেন বোধ হয় এঁটুলী পোকা কুকুরের শরীরে কিভাবে জড়াইয়া থাকে। যখন মাংসগুলা পেটে গেল, তখন সমস্ত পোকাগুলি মাংস জড়াইয়া ধরিল, কিছুক্ষণ পরে ফকির সাহেব রোগীকে বলিলেন যে তাহাকে কুকুরের মাংস খাওয়া' হইয়াছে। এইরূপ কথা শুনিলে স্বভাবতঃ লোকের ঘৃণা আসে এবং সেই রোগীটিও বমী করিতে আরম্ভ করে। বমির সহিত মাংস এবং মাংসের সহিত পোকাগুলি সব ক্রমে ক্রমে বাহির হইয়া পড়িল। এই রকম অদ্ভূত উপায়ে তিনি রোগীকে ভাল করেন। আরও অসংখ্য রোগীকে তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়াছিলেন। এখনও পর্য্যন্ত শাহজালালের নাম শ্রীহট্ট নগরে প্রায় লোকের মুখে মুখে শুনা যায়। এমন কি তাঁহার বিষয় লিখিত ছোট ছোট গল্প স্কুলে বালকদের পাঠ্য পর্য্যন্ত হইয়াছে।

শ্রীহরিপদ রায়।

আলেয়া

"আলেয়া" একরকম বাষ্প; বাতাসের সঙ্গে মিশে ভয়ানক দাহ্য পদার্থে পরিণত হয় এবং সময়ে সময়ে জ্বলিয়া ওঠে। এর বৈজ্ঞানিক নাম "মিথেন" বা "মার্শ গ্যাস"—জলা যায়গাতে অনেক সময়ে দেখা যায় বলে শেষোক্ত নাম। আমেরিকা ও রাসিয়ার কোন কোন তেলের খনিতে এবং পুরানো পুকুর, অপরিষ্কার ডোবা প্রভৃতি জলা স্থানে এ বাষ্প পাওয়া যায়। ছোট গাছপালা বা বড় গাছের ডালপাতা যখন কম বাতাসে বা জলের ভেতর পচতে থাকে, তখন এ বাষ্পের জন্ম হয়। একভাগ কয়লা (Carbon) আর চারভাগ উদ্‌জান (Hydrogen) বাষ্পের রাসায়নিক সংমিশ্রণে এর উৎপত্তি। এ বাষ্প বাতাসের অম্লজানের সংস্পর্শে এলে অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ হয়,—সামান্য একটু আগুন পেলেই ভীষণ শব্দ ক'রে জ্বলে ওঠে। কয়লার খনিতে এর দরুণ অনেক লোকের মৃত্যু ঘটে। অনেক সময়ে মিশ্রণেই এত তাপ হয় যে আলদা আগুন না পেলেও জ্বলে (reaches ignition point)—তাই আমরা পুরানো জলাশয়ের ধারে প্রায় প্রতি রাত্রিতেই এই আলো দেখ্‌তে পাই। অনেকটা যায়গায় এই বাষ্প জন্মিলে, এক জায়গায় জ্বলে উঠে সেখানকার বাতাসের অম্লজান (oxygen) ফুরিয়ে গেলে নিবে যায়। আবার নিকটবর্ত্তী আর এক জায়গায় জ্বলে। কারণ, অম্লজানের সাহায্য ব্যতীত সাধারণতঃ আগুন জ্বলতে পারে না। এইরকম অল্প সময়ের ভেতর কাছাকাছি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জ্বলতে দেখা যায় এবং আলেয়া চ'লে বেড়াচ্ছে ব'লে ভ্রম হয়। দিনের বেলা আলেয়া না দেখ্‌তে পাবার বিশেষ কোন কারণ নেই; তবে দিনে অন্য কাজে ব্যস্ত থাকি ব'লে জলা যায়গার ওপর বিশেষ মনোযোগ রাখি না; আর আলেয়ার অনুজ্জ্বল আলো সূর্য্যের তীব্র আলোকে চাপা প'ড়ে যায়—তাই এ আলো দেখি না। আলেয়া ভূতযোনি এবং লোকের অনিষ্টকারক বলে কারও কারও যে ধারণা আছে, তার মূলে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য নেই।

নগেন্দ্রনাথ সেন বি-এস্‌-সি
নরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়
প্রমোদনাথ আচার্য্য বি-এ
কানাইলাল মুখোপাধ্যায় (টুনু)
চৈতন্য ও কল্পনা ঘোষ
শিবনারায়ণ বাগুলি।

বাসগৃহে শকুনী

শকুনী ঘরের চালে বসিলেই সর্ব্বদা অমঙ্গল হয় না। এই বিষয় গৃধ্র-পতন শান্তি হইতে জানা যায়—

"প্রাগ্ দ্বিত্রিচতুর্থযামেষু দ্যুনিশোরদ্ভুতেষু সর্ব্বেষ্বানিলাগ্নি শক্রবরুণা-মণ্ডল পতয়ঃ শুভাশুভাভৈশ্চ।"

অর্থাৎ দিনরাত্রির প্রথমাদি চতুর্থ যাম পর্য্যন্ত যথাক্রমে বায়ু, অগ্নি, ইন্দ্র ও বরুণ মণ্ডলপতি এবং তাঁহারা নক্ষত্রানুসারে শুভ এবং অশুভ ফল সূচনা করেন।

"১২। ১৩। ১৪। ১৫। ৫। ১। ৭
আর্য্যাম্নাদিচতুষ্ক চন্দ্রতুরগাদিত্যেষুবায়ুর্ভবেৎ।
৮। ২৫। ১৬। ২। ৪। ১০। ১১
দেবেজ্যাজবিশাখ যাম্যযুগলে পিত্র্যদ্বয়েচানলঃ।
২১। ২২। ২৩। ৪। ১৭। ১৮
বিশ্বাদিত্রয়ধাতৃমৈত্রযুগলে মিস্ত্রোভবেন্মণ্ডলঃ।
৯। ২৬। ২৪। ২৭। ১৯। ২০
সর্পোপান্ত্য সত্যান্ত মূলযুগলেশালেশ্বলামীশ্বরঃ।

উপরিলিখিত অঙ্কগুলি ঐ ঐ সংখ্যক নক্ষত্রাধিপ ত জ্ঞাপক। ঐ নক্ষত্রগণেরও যথাক্রমে বায়ু, অগ্নি, ইন্দ্র এবং বরুণ মণ্ডল হইবে।

"পবন দহনৌনেষ্টৌ যোগস্তয়োরতিদোষরঃ।
সুরপ বরুণৌশস্তৌ যোবস্তয়োরপি শোভনঃ।
সবরুণমরুন্মিশ্রঃ শক্রস্তথাগ্নি সমাযুতঃ।
ফল বিরহিতঃ সেন্দ্রোবায়ুস্তথাগ্নিযুতোঽম্বুনঃ।

বঙ্গার্থ—

বায়ু এবং অগ্নি উভয়ই অনিষ্টজনক। উহাদের যদি যোগ হয়, তবে অত্যন্ত দোষদায়ক। (অর্থাৎ শকুনী পতন সময় বেলা মণ্ডল ও নক্ষত্র মণ্ডল গণনায় উভয়এই যদি পবন কিম্বা অগ্নি মণ্ডলপতি হন, তবে অত্যন্ত খারাপ ফল মনে করিতে হইবে) অগ্নি ও বরুণ শুভ, উহাদের উভয়ে যোগ হইলে বিশেষ শুভফল লাভ হয়। বায়ু ও বরুণ এবং ইন্দ্র ও অগ্নি মণ্ডলপতিরূপে মিলিত হইলে মিশ্র ফল দান করিবে। (অর্থাৎ আংশিক শুভ ও আংশিক অশুভ) ইন্দ্র ও বায়ু এবং অগ্নি ও বরুণ মণ্ডলপতিরূপে মিলিত হইলে কোনরূপ (শুভ কিংবা অশুভ) ফল হয় না। উপরিলিখিত গণনানুসারে গৃধ্রপতন সময় গণনা করিলে যদি দোষজনক সময় বিবেচিত হয় তবে "যন্মণ্ডলেঽদ্ভুতং জাতং শান্তিস্তদ্দেবতা-

ভ্রম" অর্থাৎ যে দেবের মণ্ডলাধিপতিত্বে খারাপ ফল সূচনা হওয়ার সম্ভাবনা, সেই দেবতার উদ্দেশে "অদ্ভুত শান্তি" করিবার নিয়ম। অধিকন্তু নিম্নলিখিত অবস্থায় গৃধ্র গৃহের উপর পতিত হইলে কোনরূপেই অশুভদায়ক নহে; সুতরাং শান্তি নিষ্প্রয়োজন। যথা:—

"ক্রীড়ানুরক্তো রতিমাংসলুব্ধোভিতোরুজার্ত্তঃ পতিতো বিহঙ্গঃ।
নাসৌগৃহস্থস্য বিনাশ হেতুর্দোষঃ সমুৎপদ্যত আহরার্থ্যাঃ॥"

অর্থাৎ ক্রীড়ায় অনুরক্ত, এবং ঈপ্সিত মাংসলোভে, কিম্বা ভীত ও রোগাক্রান্ত হইয়া যদি গৃধ্র গৃহে পতিত হয়, তবে উহা গৃহস্থের বিনাশদায়ক দোষ উৎপাদন করে না ইহাই মনীষিগণের অভিমত॥

উপরিলিখিত শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে—"নাসৌ গৃহস্থস্য বিনাশ হেতুঃ।" এই পদ দ্বারা প্রতীতি জন্মে যে উক্ত বর্ণিত অবস্থাপন্ন ভিন্ন অবস্থান্তর প্রাপ্ত গৃধ্র গৃহের উপর পতিত হইলে নিশ্চয়ই বিনাশ হেতু।

যে গৃহে শকুনী পতিত হয়, রুচি হইলে ব্রাহ্মণকে গৃহদানের বিনিময়ে গৃহের মূল্য দান করিলেও গৃহস্বামী নিয়মিত শান্তি বিধান পূর্ব্বক সে গৃহ ব্যবহার করিতে পারেন। এই বিষয় শাস্ত্রে আছে:—

"ব্রাহ্মণায় গৃহংদত্ত্বা দত্ত্বাতন্মূল্যমেববা।
গৃহ্ণীয়াদ্ যদি রোচেত শান্তিক্ষেমাং প্রয়োজয়েৎ॥

আবার যদি শুভ সময়ে গৃধ্র পতন হয় অর্থাৎ শান্তির কোন নিমিত্ত না থাকে, তাদৃশ অবস্থায় শান্তি করিলে অধিকন্তু শান্তির নিমিত্ত জন্মাইবে যথা—

"নির্নিমিত্তকৃতাশান্তি র্নিমিত্তমুপপাদয়েৎ॥

গৃধ্রাদি পতনে খড়ের ছাউনি ঘর ত্যাগ করা অল্পব্যয়সাধ্য এবং সহজসাধ্য বলিয়া উহা কেহ কেহ করেন; কিন্তু মূল্যবান গৃহ কিম্বা প্রাসাদাদি ত্যাগ করিবার বিষয় বিশেষ শোনা যায় না। উহা অধিক ব্যয়ে নির্ম্মিত বলিয়া অধিকাংশ লোকই এস্থলে "দত্ত্বা তন্মূল্যমেববা" এই বাক্যের সার্থকতা করেন। শ্রীকাশীনাথ কাব্যতীর্থ সাহিত্যশাস্ত্রী

কবি নিত্যানন্দ (মিশ্র) চক্রবর্ত্তী

কংসাবতী নদীর যে শাখা পূর্ব্ববাহিনী হইয়া মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার কাশীযোড়া পরগণার উত্তর সীমা নির্দ্দেশ করিয়া রূপনারায়ণ নদের সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই শাখার দক্ষিণ তীরস্থ খয়রা কানাইচক গ্রামে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণবংশ সম্ভূত কবি (নিত্যানন্দ মিশ্র) চক্রবর্ত্তী সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাশীযোড়াধিপতি রাজা রাজনারায়ণের রাজত্ব সময়ে (১৭৫৬-১৭৭০ খৃঃ অঃ) জীবিত ছিলেন। তিনি উক্ত কাশীজোড়া-রাজ রাজনারায়ণের সভাসদ ছিলেন। রাজসভায় তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। তিনি তাঁহার স্বরচিত শীতলামঙ্গল জাগরণগ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন,—

"বিরচিল চক্রবর্ত্তী কবি নিত্যানন্দ।
"নিত্যানন্দ রচে গীত সেই সভাসদ॥"
শীতলার পদ তলে, কবি নিত্যানন্দ বলে
সাকিন কানাইচকে ঘর॥"
"কাশীযোড়া ভাটি-পাড়া অতি বিচক্ষণ।
রাম তুল্য রাজা তাহে রাজনারায়ণ॥
নিত্যানন্দ কবি গায় খয়রায় ঘর।
বিদ্যাবন্ত নয় কিন্তু শীতলা কিঙ্কর॥

সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ভবানী মিশ্র ইঁহার বৃদ্ধ-প্রপিতামহ ছিলেন। ভবানী মিশ্রের পুত্র মনোহর মিশ্র, মনোহর মিশ্রের পুত্র চিরঞ্জীব মিশ্র, চিরঞ্জীব মিশ্রের পুত্র রাধাকান্ত মিশ্র, রাধাকান্ত মিশ্রের পুত্র চৈতন্য মিশ্র। এই চৈতন্য মিশ্র ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তিনি তাঁহার বংশপরিচয় সম্বন্ধে স্বরচিত পুস্তকে লিখিয়াছেন,—

"বিশারদ সর্ব্বশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত ভবানী মিশ্রী,
তস্য পুত্র মিশ্র মনোহর।
তার পুত্র চিরঞ্জীব, কি গুণে তুলনা দিব,
যার সখা প্রভু দামোদর॥
রাধাকান্ত তস্য পুত, অশেষ গুণেয় যুত,
শ্রীচৈতন্য যাহার নন্দন।
তাহার অনুজ ভ্রাত, নিত্যানন্দ গুণযুত,
গায় ভেবে শীতলা চরণ॥"

কবির বংশধরগণ এখনও দীন ভাবে উক্ত খয়রা কানাইচক গ্রামে বাস করিতেছেন। ইহার পূর্ব্ব বাস কোথায় ছিল, জানিতে পারা যায় না। তবে এ কথা সত্য যে, ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে কেহ প্রথম এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন নাই। ইনিই সর্ব্বপ্রথম এই অঞ্চলে আসিয়া বাস করেন। কথিত আছে যে, হলধর সিংহ নামক কোন লোক ইহাকে এই নদীতীরস্থ রম্যস্থানে তাঁহাকে বাস করাইয়াছিলেন। কবি তাঁহার স্বরচিত পুস্তকে এ কথা স্বীকার করিয়াছেন,—

"নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণে রচিল মধুক্ষর।
প্রতিষ্ঠিল গঙ্গাতটে সিংহ হলধর॥"

কবির রচিত পুস্তকের মধ্যে একমাত্র শীতলার জাগরণ পালা ব্যতীত অন্য কোন পুস্তক আমাদের হস্তগত হয় নাই। শুনা যায় তিনি অনেক পুস্তক লিখিয়াছিলেন; কিন্তু সেইগুলি কালের কবলিত হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার জাগরণ পালা পাঠে তাঁহার ভাব, ভাষা ও রচনার পরিপাট্য দেখিয়া বোধ হয় না যে তিনি নিত্য নব নব রচনায় আত্ম-নিয়োগ করিতেন না। যাহা হউক তাঁহার রচনাশক্তির অধিকাংশ নিদর্শন কালের করাল কবলে পতিত হইলেও যে তাঁহার নাম অদ্যাবধি এই অঞ্চলস্থ বৃদ্ধগণের মুখে কীর্ত্তিত হইতেছে ইহাই পরম সৌভাগ্যের বিষয়। শ্রীউপেন্দ্রকিশোর সামন্ত রায়।

"শিবের ধ্যানের ব্যাখ্যা"

মহাদেবের ধ্যানাম্বিত "পঞ্চবক্ত্রং" "ত্রিনেত্রং" এই বিশেষণ দুইটীর প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ আশ্বিন সংখ্যায় যে ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ কষ্টকল্পিত। প্রকৃত ব্যাখ্যা এইরূপ:—"পঞ্চবক্ত্রং" বিশেষণে শিবের পাঁচটী মুখকেই বুঝাইতেছে,—বৃহস্পতি বা অন্য কাহাকেও এখানে বুঝাইতেছে না। শিবের পাঁচটী মুখই শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ এবং শিবের

পূজাতেও শিবের পঞ্চমুখের পূজা বিহিত আছে। আরও এক কথা, যেখানে শব্দের মুখ্যার্থ পাওয়া যায়, সেখানে গৌণার্থ কল্পনা অন্যায্য। অতএব "পঞ্চবক্ত্রং" "যাঁহার পাঁচটী মুখ আছে" অর্থাৎ পঞ্চমুখ বিশিষ্ট শিবকে—এইরূপ অর্থ।

"ত্রিনেত্রং" এই পদটীতে দুইটী সমাস আছে। প্রথমটী একশেষ দ্বন্দ্ব যথা—("ত্রীণি ত্রীণি ত্রীণি ত্রীণি ত্রীণি")=ত্রীণি=ত্রীণি নেত্রাণি যস্য+তম্ ত্রিনেত্রং বহুব্রীহি।

প্রত্যেক মুখে তিনটী তিনটী নেত্র হইয়াছে যাহার অর্থাৎ শিবের প্রত্যেক মুখেই তিনটী করিয়া নেত্র আছে বলিয়া তাঁহাকে ত্রিনেত্র বলে। ত্র্যম্বক শব্দেরও ঐরূপ ব্যাখ্যা। ললাটে এক চক্ষু, মুখে দুই চক্ষু —এই তিন চক্ষু।

শিবের ধ্যানের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাটী আবশ্যক বোধে প্রদত্ত হইল।

মহেশ্বরকে নিত্য (সর্ব্বদা) এইরূপ ভাবে ধ্যান করিবে, রজত পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার গাত্র শুভ্রবর্ণ, সুন্দর চন্দ্রখণ্ড (অর্দ্ধচন্দ্র) তাঁহার মস্তকের ভূষণ স্বরূপ, রত্নময় বেশে তাঁহার দেহ উজ্জ্বল, অথবা স্ফটিকাদি মণিরত্নের ন্যায় তাঁহার দেহ উজ্জ্বল কান্তিবিশিষ্ট। (শিবের ৪টী হাত, বামে ২টা ও দক্ষিণে ২টা, তাই ধ্যানে বলিতেছেন বামদিকে প্রথম হাতে) পরশু (কুঠার বা টাঙ্গি) ২য় হাতে মৃগমুদ্রা (অঙ্গুষ্ঠ, মধ্যমা ও অনামিকা সংযুক্ত করিয়া তর্জ্জনী ও কনিষ্ঠাকে উচ্চ করিয়া রাখার নাম মৃগমুদ্রা, মৃগমুদ্রায় ভক্তের অন্বেষণ বুঝায়) দক্ষিণ দিকের ১ম হাতে বর ও ২য় হাতে অভয় মুদ্রা। তিনি প্রসন্নমূর্ত্তি ও পদ্মাসনে উপবিষ্ট, দেবগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে স্তব করিতেছেন। তিনি ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়া আছেন। তিনি জগতের আদি, এবং জগতের কারণ (উপাদান কারণ) সমস্ত ভয়নাশকারী, এবং তাঁহার পাঁচটী মুখ, (যথা—চারিদিকে ৪টী ও উর্দ্ধে ১টী মোট ৫টী। উর্দ্ধ মুখটীর নাম "ঈশান" এইটীই প্রধান ও সর্ব্বদা পূর্ব্বদিকে অবস্থিত, দক্ষিণ দিকস্থিত মুখ "অঘোর" নামে খ্যাত, উত্তরস্থ মুখ "বামদেব", পশ্চিম মুখের নাম "সদ্যোজাত" ও পূর্ব্ব মুখের নাম তৎপুরুষ। অতএব শিব "পঞ্চবক্ত্র" অর্থাৎ পাঁচমুখ বিশিষ্ট) এবং প্রত্যেক মুখে তিনটী করিয়া (১৫টী) নয়ন। এইরূপ শিবকে সর্ব্বদা চিন্তা করিবে। শ্রীদিবাকর কাব্য ব্যাকরণতীর্থ

আষ্ট্রেলিয়া

শ্রীনরেন্দ্র দেব

ইংরাজ উপনিবেশ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হ'য়ে যে দ্বীপটি আজ জগতের কাছে সুসভ্য ও সম্পদশালী বলে পরিচিত হয়েছে, বহু পুরাকালে পৃথিবীর প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভূগোলের কোলভ্রষ্ট হ'য়ে সেই দ্বীপটি একদিন দক্ষিণ-প্রশান্তমহাসাগরের বুকে অসহায়ের মতো ভেসে এসেছিল।

প্রলয়ের বারিবর্ষণে, প্রবল প্রভঞ্জনে ও আগ্নেয় গিরির গৈরিক নিঃস্রাবে যেদিন এই দ্বীপের পর্ব্বতমালা বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, সেদিন গভীর গিরিগর্ভের যত গোপন রত্নরাজি তাদের পাষাণ অবগুণ্ঠন হারিয়ে সবার কাছে এই দ্বীপের ঐশ্বর্য্য মেলে ধরেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আষ্ট্রেলিয়ার তদানীন্তন আদিম অধিবাসীরা এতদূর বর্ব্বরতার মধ্যে নিমগ্ন ছিল যে সোণা, রূপা, তামা, লোহা, টিন, কয়লা প্রভৃতি তাদের দেশের অফুরন্ত বহুমূল্য খনিজ পদার্থগুলির কোনও মর্য্যাদাই তারা তখন জানতোনা।

কাপ্তেন কুক্ যেদিন এই বিশাল দ্বীপটিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন সেদিনও সভ্যতালোকিত জগতের মধ্যে নিতান্ত একঘরের মতোই আষ্ট্রেলিয়া বন্য বর্ব্বরতা ও আদিম অসভ্যতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছিল। প্রাচীন চীন ও বিশাল ভারতীয় সভ্যতার এত সন্নিকটে থেকেও এতবড় একটা সমৃদ্ধিশালী দেশ যে কেমন ক'রে তখনও পর্য্যন্ত অনাবিষ্কৃত প'ড়েছিল বিস্মিত ঐতিহাসিকেরা তার কোনও একটা সঙ্গত কারণ এখনও পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ ক'রতে পারেন নি।

আষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইংরাজ ঔপনিবেশিকেরা এসে দেখলেন যে সে দেশের অরণ্য ভূগর্ভ বা ভূপৃষ্ঠ হ'তে তখনও পর্য্যন্ত মানুষ একটি কণামাত্র সম্পদও আহরণ করেনি। প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যে সম্পদশালিনী এই দেশ যেন এক সালঙ্কারা পূর্ণযৌবনা কুমারী রাজকন্যার মতো বরমাল্য হাতে ক'রে তাদেরই পতিত্বে বরণ করবার জন্য অপেক্ষা করছিল।

সুসজ্জিত কারুন্দী যোদ্ধা
(এর শিরঃসংলগ্ন পক্ষ, বাহুবলয় ও বক্ষের বিচিত্র রেখা সমস্তই মন্ত্রঃপূত)

পুষ্পচয়ন রত

গম-ক্ষেত্র

প্রপাত তীর্থ—(উত্তর কুইন্সল্যাণ্ডের অরণ্য মধ্যের এই সুন্দর জলপ্রপাতটি আষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের একটি প্রধান তীর্থ)

প্রথম ভূমিকর্ষণ ।
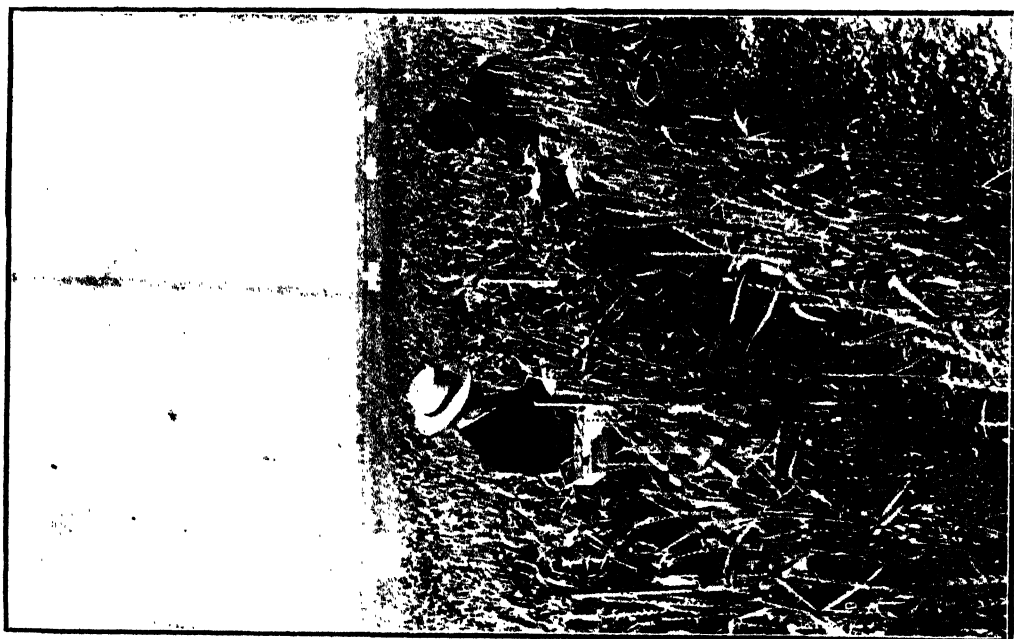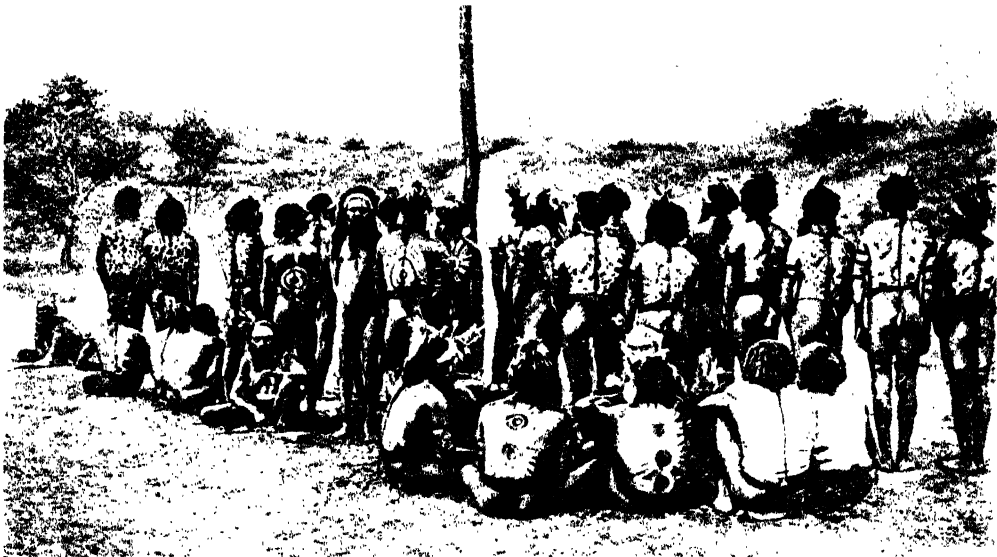
দণ্ড পূজা।—(আষ্ট্রেলিয়ার কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসীরা সর্ব্বাঙ্গে আলপনা এঁকে এই দণ্ড পূজায় যোগ দেয়)
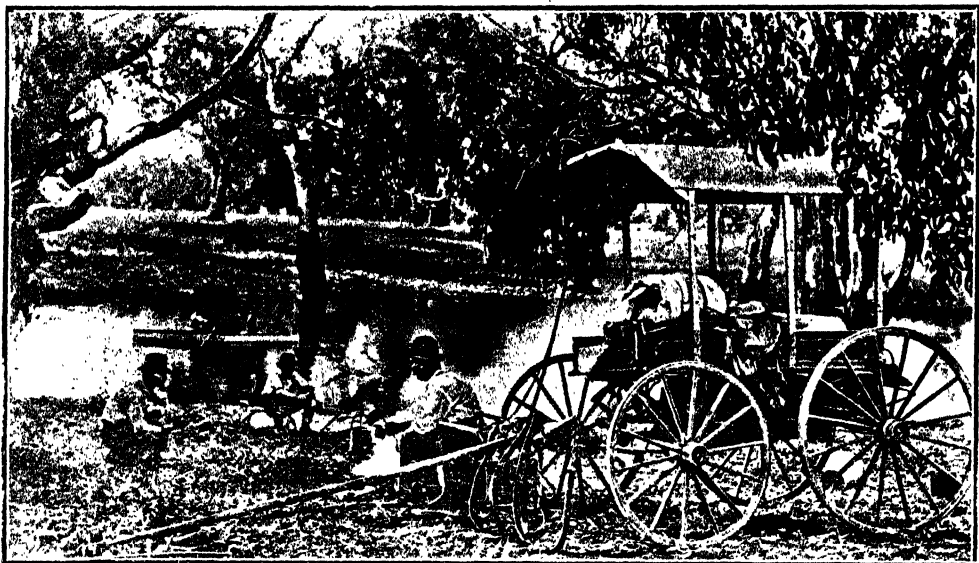
নদীর ধারে বিশ্রাম
(উপযুক্ত স্থান অনুসন্ধানে নির্গত ঔপনিবেশিকের দল পথশ্রান্তি দূর করছে)

প্রথম ঔপনিবেশিকের দল
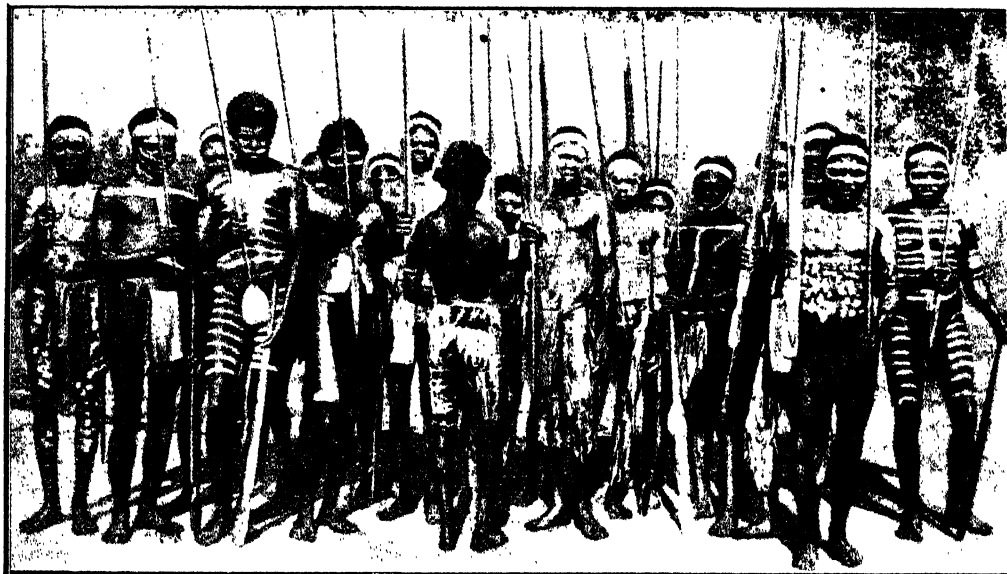
যুদ্ধসজ্জায় আষ্ট্রেলিয়ার একদল আদিম অধিবাসী

খনি-পর্য্যবেক্ষকের তাঁবু
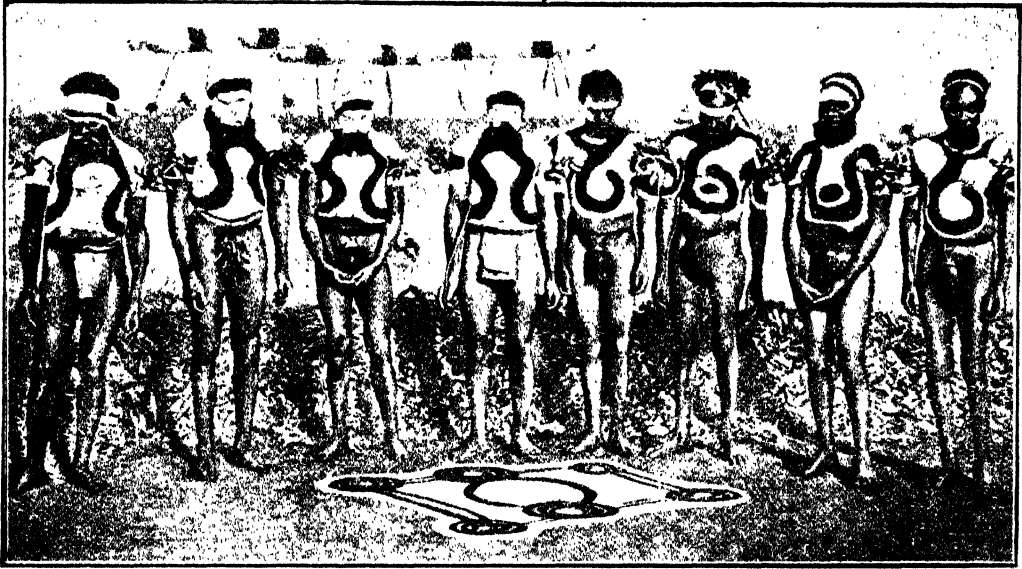
সর্প যজ্ঞ—(আহারোপযোগী সর্পকুল বৃদ্ধির জন্য আদিম অধিবাসীরা সর্প-বেশ পরিধান করে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে)

ধনুর্দ্ধরেরা
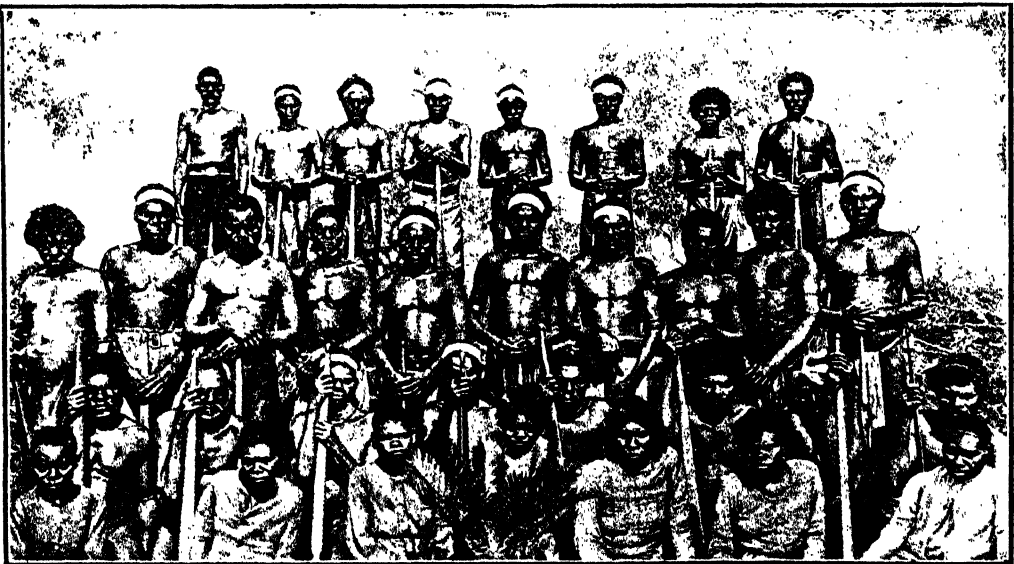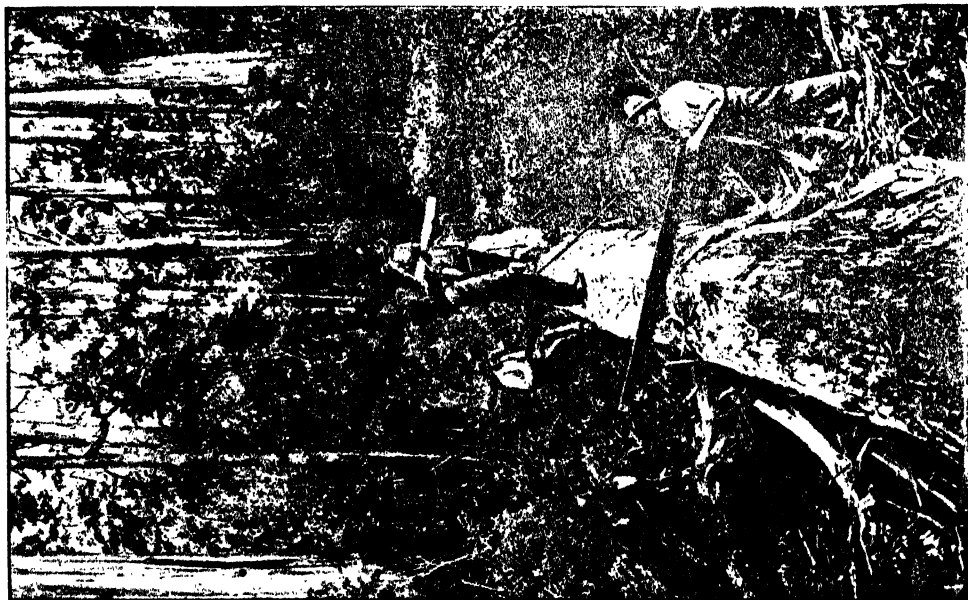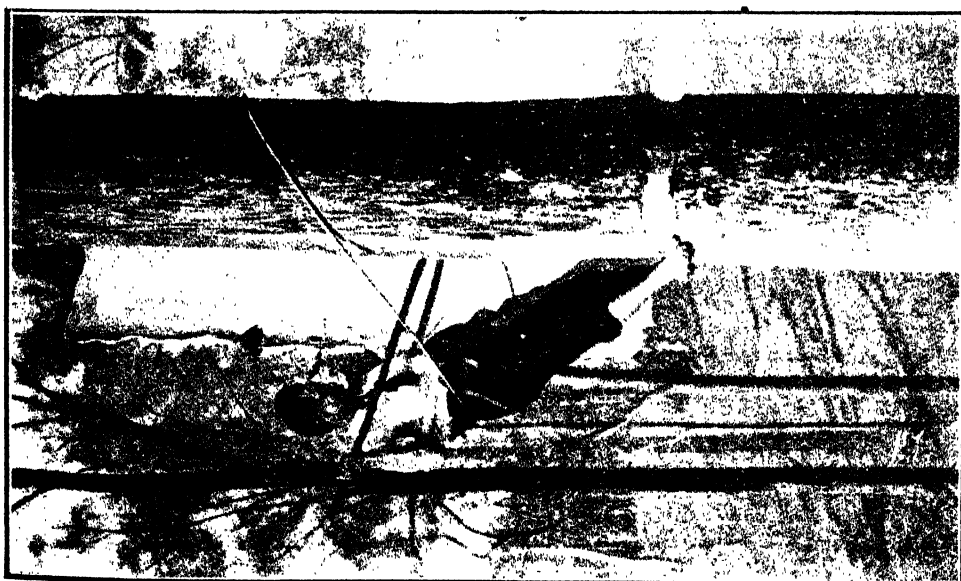
গাছের ছাল তোলা—(যে সব গাছ কেটে ফেলার মজুরী পোষায় না অথচ রাখলে জমীর ক্ষতি করে, আষ্ট্রেলিয়ায় সেই সব গাছের ছাল তুলে ফেলে সেই গাছটাকে মেরে ফেলা হয়)

কাষ্ঠ সংগ্রহ

মাছধরা—(বর্ব্বর কৃষ্ণকায়রা নদীর স্রোতের ভিতর থেকে বর্শাবিদ্ধ করে মাছ ধরে)

ওয়াগাইয়া ওঝা—(ঝাড় ফুঁক মন্ত্রতন্ত্র ও দৈব ওষুধের ওস্তাদ)
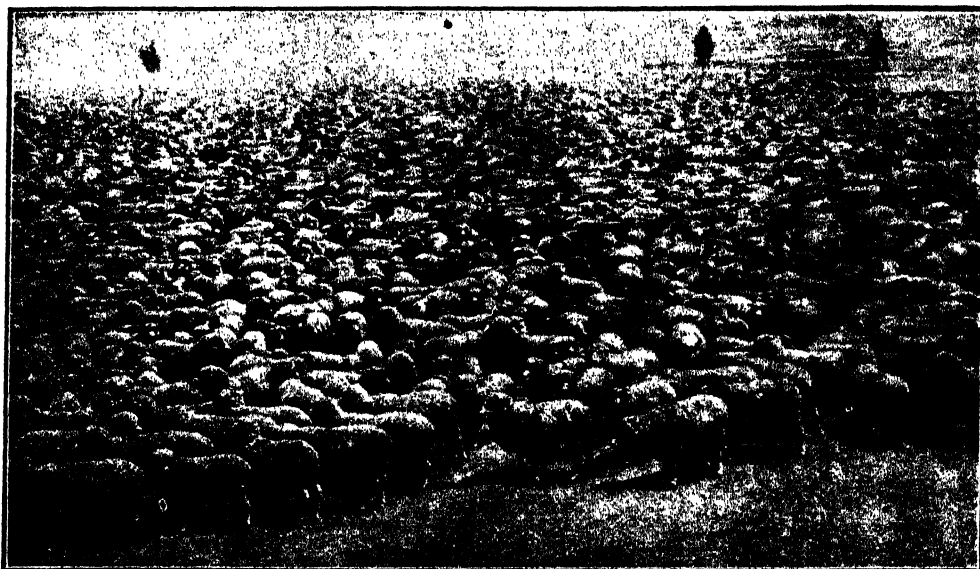
মেরুনো পশমের আড়ত

সোনার খনির উষ্ট্রবাহিনী

খনি হইতে স্বর্ণোত্তোলন

ছাঁটাই কলে জীবন্ত ভেড়ার লোম কাটা

পশম বাছাই

স্বর্ণবাহী উষ্ট্রশ্রেণী

শূলপাণির দল

আষ্ট্রেলিয়ার কৃষ্ণ পরিবার

গোয়া গোপালের গরুর পাল
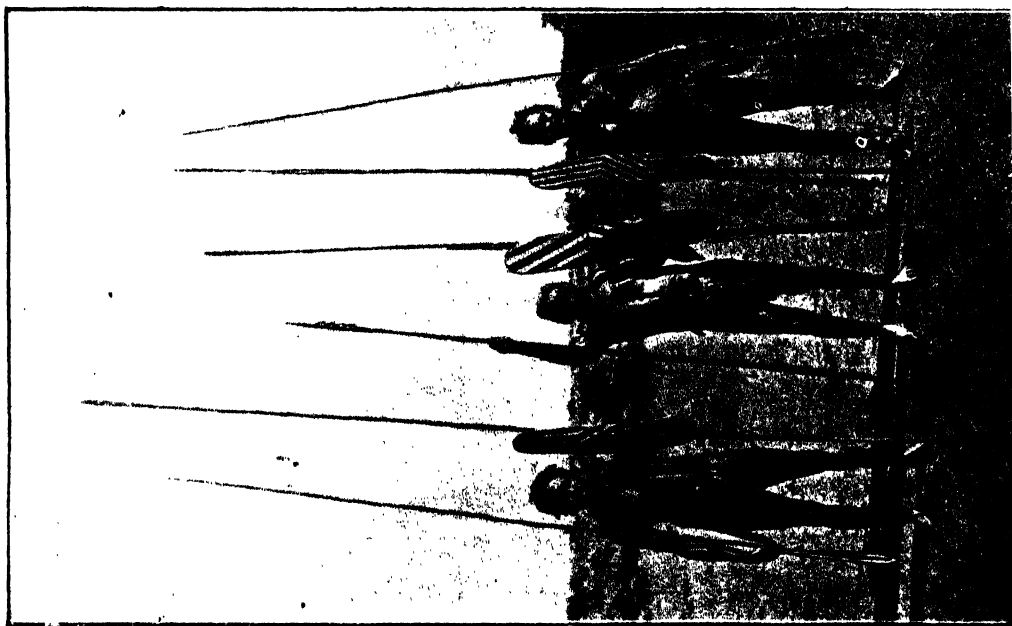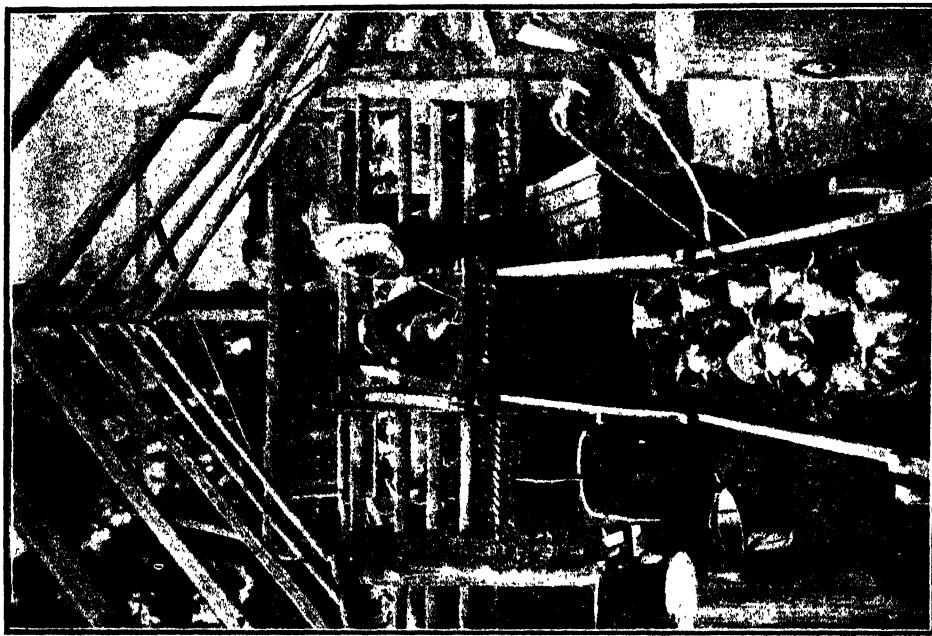
মেষ-রক্ষা—(কীটের আক্রমণে মেষপাল ধ্বংস হ'য়ে যায় বলে আষ্ট্রেলিয়াতে প্রত্যেক ভেড়াটিকে পোকার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্ম মধ্যে মধ্যে বিষাক্ত রাসায়নিকে স্নান করিয়ে দেওয়া হয়)
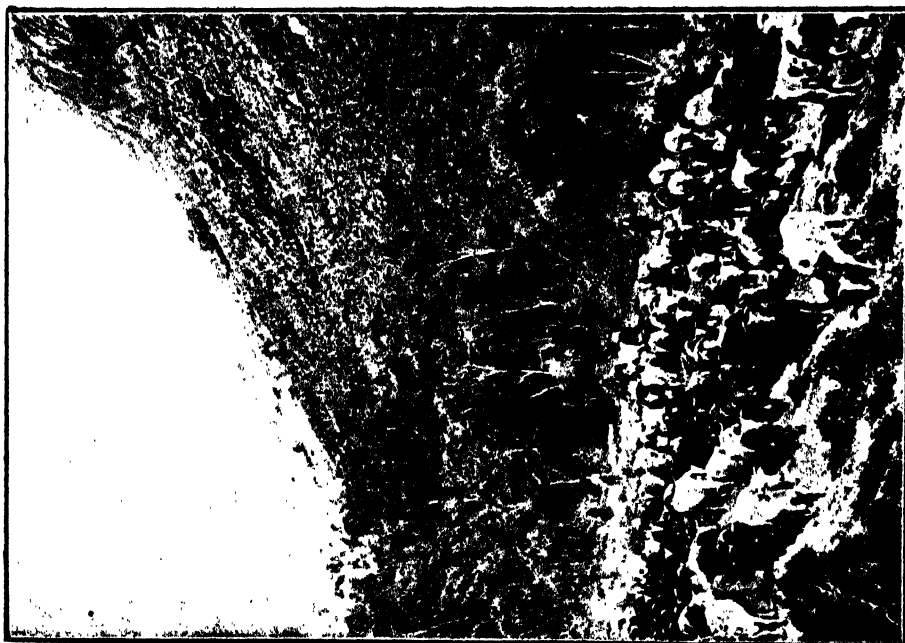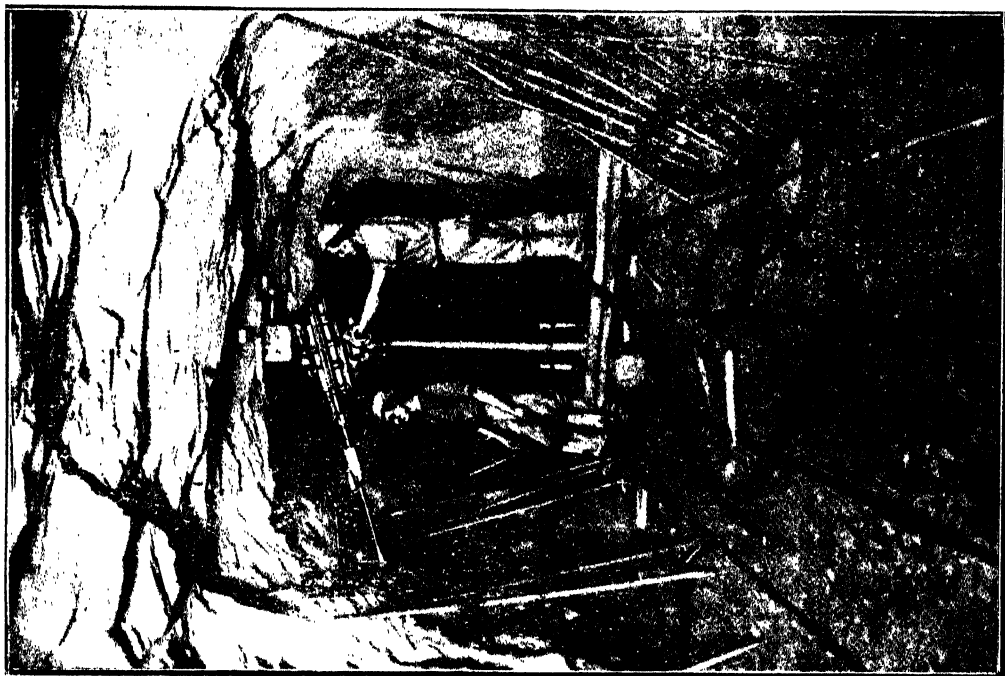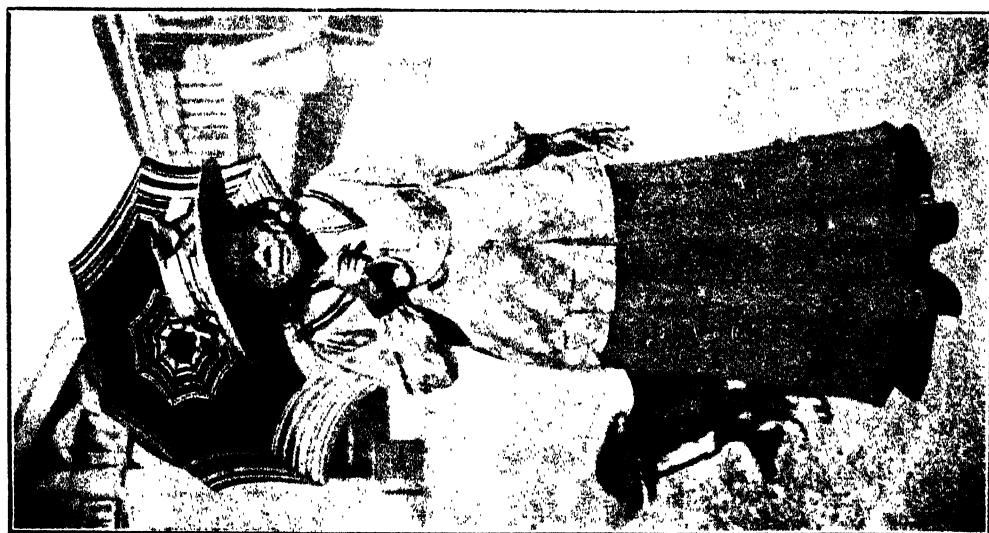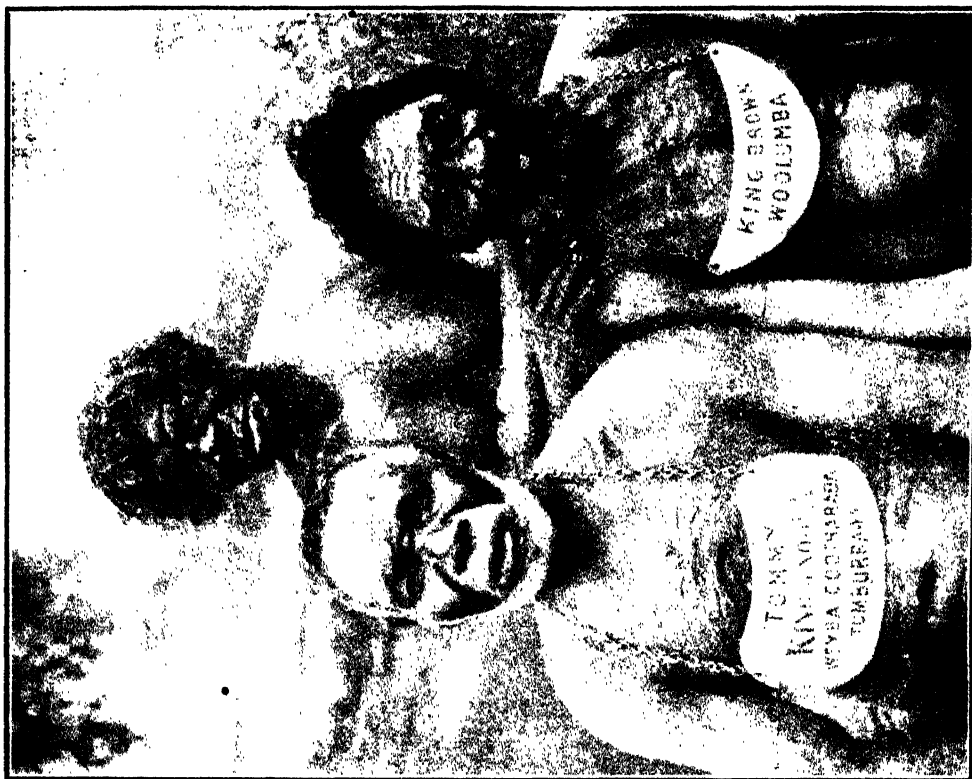
সোনার খনির খাদ

আলোকপ্রাপ্তা কৃষ্ণাঙ্গিনী

বৈদ্যরাজ
(ইনি স্বর্গভিষক ও রুক্কা দেবের প্রিয় শিষ্য এবং সর্ব্ববিধ রোগের ধন্বন্তরী)

সমুদ্রকুলের কৃষ্ণজাতীয় সর্দ্দারদ্বয় ও সর্দ্দারণী

মেষপালক

আষ্ট্রেলিয়ার প্রসিদ্ধ ঘোড়া

খনিজ সম্পদে ঐশ্বর্য্যশালিনী হ'লেও আষ্ট্রেলিয়ার প্রধান অভাব ছিল শস্য-সম্পদের। প্রথম দলের ঔপনিবেশিকরা এখানে এসে শস্যাভাবে, খাদ্যোপযোগী মাংসাভাবে ও উৎকৃষ্ট পানীয় জলের অভাবে অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছিল। গোড়ায় কিছুদিন তাদের খাদ্যোপযোগী শস্য ও মাংসাদি আমদানী ক'রে খেতে হ'য়েছিল, কিন্তু এখন সেখান থেকে প্রচুর শস্য, মাংস, ফল ও মাখন দেশ-বিদেশে রপ্তানি হ'চ্ছে।

সিড্‌নী বন্দরের চারপাশে উপযুক্ত পরিমাণ শস্যাদি উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নয় দেখে ঔপনিবেশিকরা কৃষি-উপযোগী শস্যক্ষেত্রের সন্ধানে বেরিয়ে দেখলে যে সিড্‌নির পালনের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র দেখিয়ে দিলে। আষ্ট্রেলিয়ার অদ্বিতীয় 'মেরীণো' পশম এই অধিত্যকারই অধিবাসী মেষপালের দান।

নীল পর্ব্বতের ওপারে পৌঁছে ঔপনিবেশিকরা তখন আরও অগ্রসর হয়ে অধিকতর উর্ব্বর ভূমি ও পশুপালনোপযোগী ক্ষেত্র অনুসন্ধান ক'রতে আরম্ভ করে দিলে। এই অনুসন্ধানে বেরিয়ে তারা প্রায়ই বিপদগ্রস্ত হ'য়ে প'ড়তো; জঙ্গলে পথ হারিয়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হ'য়ে তারা আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য অনেক সময় নিকটবর্ত্তী টেলিগ্রাফের তার কেটে দিয়ে উদ্ধারের জন্য অপেক্ষা ক'রতো। সংবাদ আদান-প্রদানে
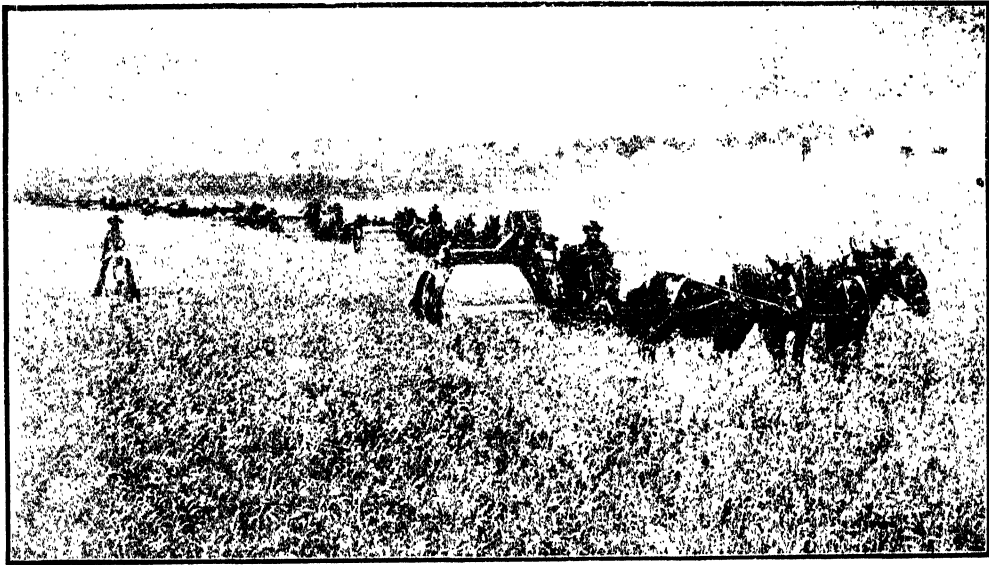
শস্য ক্ষেত্র

পশ্চিমে সমুদ্রতীর থেকে চল্লিশ মাইল দূরে বিশাল 'নীল পর্ব্বত' তাদের পথরোধ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। বহু অনুসন্ধান করেও তারা তখন সে পর্ব্বত লঙ্ঘন ক'রে যাবার কোন সহজ পন্থা খুঁজে পায়নি, পরে বিজ্ঞানের সাহায্যে সেই দুর্ভেদ্য পর্ব্বত ভেদ করে তারা ওপারে যাবার পথ তৈরি করে নিয়েছিল। নীলপর্ব্বত অতিক্রম করে তারা যে উচ্চ পার্ব্বত্য উপত্যকায় এসে পৌঁছাল, সেই সুবিস্তৃত পার্ব্বত্য ভূখণ্ড তাদের বিবিধ খনিজ সম্ভার উপহার দিতে সুরু করলে এবং তার পশ্চাতের বিস্তৃত অধিত্যকা আষ্ট্রেলিয়াকে শস্য ও পশু অসুবিধা উপস্থিত হ'লেই টেলিগ্রাফের তার পরীক্ষা করবার জন্য সিড্‌নী থেকে বা আরও কাছাকাছি কোনও টেলিগ্রাফ ষ্টেশন থেকে লোক ছুট্‌তো এবং তারা গিয়ে প্রায়ই দেখ্‌তে পেতো, যেখানে তার কাটা গেছে সেখানে কেউ না কেউ তাদের আশাপথ চেয়ে অপেক্ষা ক'রছে! অনেক সময় লোক যেতে দেরী হ'লে দেখা যেতো পথভ্রষ্ট লোকটি হয়ত সেখানে অনাহারে মরে পড়ে রয়েছে!

নীলপর্ব্বত অতিক্রম করার সঙ্গেসঙ্গেই তারা সিড্‌নী ও উইণ্ডসর্ থেকে দুটী প্রশস্ত রাস্তা পাহাড়ের ওপার

পর্য্যন্ত তৈরী করে নিয়েছিল এবং বিস্তৃত রেলপথও নির্ম্মাণ ক'রে ফেলেছিল। তাছাড়া আষ্ট্রেলিয়ার উত্তর-সীমান্তের ডারউইন বন্দর থেকে দক্ষিণ প্রান্তের আডেলাইডে পর্য্যন্ত সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য টেলিগ্রাফের তার খাটিয়ে নিয়েছিল।

প্রথম ঔপনিবেশিকের দল যখন তাদের ঘোড়া, গরু, ভেড়া, কুকুর, হাঁস, মুর্গী প্রভৃতি সঙ্গে করে বলদে-টানা মালগাড়ী চড়ে তাঁবুপাট বগলে নিয়ে আষ্ট্রেলিয়ায় এসে হাজির হয়েছিল, তখন দিন-কতক তাদের অনেকটা সেই গল্পের রবিন্সন্ ক্রুশোর মতো অবস্থা হয়েছিল। তখন ঔপনিবেশিকরা সপরিবারে তাদের দাস দাসী অনুচর ও সঙ্গীদের সঙ্গে মিলে-মিশে ছুঁতোর, কামার, মিস্ত্রী, মজুর, গোয়ালা, রাখাল, নাপিত, বামন, ডাক্তার বৈদ্য প্রভৃতি জুতা শেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যই নিজের হাতে সম্পন্ন ক'রতো। এই সময় তাদের যে সব ছেলে মেয়ে সেখানে জন্মগ্রহণ ক'রলে, প্রকৃতির কোলের উপর মুক্ত আলো বাতাসের মধ্যে বেড়ে উঠে এবং বিশুদ্ধ আহার্য্যের গুণে তারা অন্য দেশের ছেলে মেয়েদের চেয়ে সুস্থ, সবল, ক্ষিপ্র, চপল, উদার ও উৎসাহী হয়ে উঠ্‌ল এবং সেই দ্বীপে এক নূতন শক্তিশালী সুন্দর জাতি গড়ে তুললে।

এই নূতন শ্বেত আষ্ট্রেলিয়ান জাতির সংগঠনে সে দেশের আদিম অধিবাসীদের কোনও সাহায্যই নেওয়া হয়নি বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে বর্ব্বর কালা আদমীদের বর্জ্জন করা হয়েছিল; ভবিষ্যৎ জাতির শরীরে যাতে বিশুদ্ধ ইংরাজ রক্তই প্রবাহিত থাকে এই উদ্দেশ্যে ঔপনিবেশিকরা সকলেই যে যার শ্বেত কামিনীদের সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে বিপত্নীক ও কুমারের দলও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল বলে স্ত্রীলোক ঘটিত একটা অশান্তি কিছুদিন তাদের মধ্যে খুব প্রবলভাবেই চলেছিল।

সেকালে এই ঔপনিবেশিকের দল অনেকটা সেই আরব বেদুইনদের মতো তাদের ঘোড়া আর কুকুরের জন্য প্রাণ দিতেও পশ্চাৎপদ হোতো না। আবার অতিথি সেবায় তারা একেবারে জনে জনে দাতাকর্ণ হয়ে উঠেছিল; এমন কি সীমান্ত-প্রহরীরাও যখন কাজে বেরিয়ে চলে যেতো, সেই সময় তারা নিজেদের ঘরের দ্বার খুলে রেখে দিয়ে যেতো এই উদ্দেশ্যে যে, যদি কোনও ক্লান্ত পথিক সেদিকে এসে প'ড়ে রাত্রের মতো বিশ্রাম নিতে চায়, তাহলে দ্বার বন্ধ দেখে তাকে ফিরে যেতে হবে না! দ্বারদেশে অতিথির সুবিধার জন্য একখানি বিজ্ঞাপন এঁটে রেখে দিয়ে যেতো, তাতে লেখা থাক্‌তো কুটীরের মধ্যে কোথায় ভোজ্য দ্রব্য আছে, কোথায় পানীয় আছে! প্রয়োজন না হ'লে যে অতিথি তাদের আহার্য্য স্পর্শও করবে না এবং আবশ্যক হ'লেও তারা যে প্রয়োজনাতিরিক্তও কিছু গ্রহণ করবে না—অতিথির সততার উপর এ বিশ্বাসটুকু তাদের ছিল; আর অপরিচিত আগন্তুকের প্রতি এই অগাধ বিশ্বাস থাকার জন্যে কোনও দিনই তাদের কাউকে অনুতাপও করতে হয় নি!

আজকাল কোনও যাত্রী জাহাজ থেকে আষ্ট্রেলিয়ার যে কোনও একটি বৃহৎ বন্দরে যখন অবতরণ করবেন, তিনি দেখবেন যে আষ্ট্রেলিয়ার বন্দর ও সহর সমস্তই ইংলণ্ডের বন্দর ও সহরের হুবহু নকল মাত্র! সেখানে কৃষ্ণকায় উলঙ্গ বর্ব্বরেরা নেই, বিষাক্ত-ভীষণ অজগর নেই, কাঙারু প্রভৃতি বন্য জন্তু ঘুরে বেড়াচ্ছে না; সেখানে রীতিমত ট্রাম, মটোর, বাস্, গাড়ী-ঘোড়া সবই চল্‌ছে, ইলেকট্রিক্ ও গ্যাসের আলো জ্বল্‌ছে! সারি সারি দোকানপাট সাজানো, এবং রাজপথে পুলিশ পাহারা দিচ্ছে! তবে, ইংলণ্ডের সহর আর আষ্ট্রেলিয়ার সহরে দুটি বিষয়ে বিশেষ তফাৎ আছে বটে, আর সে প্রভেদ এত বিপরীত যে, যে কোনও আনাড়ী পর্য্যটকের চ'খেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। প্রথম তফাৎ হ'চ্ছে সহরের আবহাওয়ার। আষ্ট্রেলিয়ার সহর ইংলণ্ডের সহরের তুলনায় উষ্ণতর ও রবি-করোজ্জ্বল। দ্বিতীয় প্রভেদ সহরবাসীদের বেশভূষায় ও আদব-কায়দায়! ইংলণ্ডের মতো এখানে পোষাকের কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই, যার যেমন সুবিধে সে সেইরকম কাপড় চোপড় পরেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। তবে এখানকার মেয়েদের পোষাকের বাহারটা যেন একটু বেশী রকমের। এখানকার সহরের দু'একটা রাস্তা আছে যেখানে পরস্পরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হবে বলেই মেয়েরা বেড়াতে যায় এবং বেশ একটু বেশীরকম সেজেগুজেই তারা আসে! সে পোষাকের ধরণ অনেকটা থিয়েটারে বা বৈকালিক কোনও আমোদ প্রমোদে যোগ দিতে যাবার বা কোনও উৎসব উপলক্ষে ভোজ

প্রভৃতিতে নিমন্ত্রণে যাবার মতো পোষাক! আষ্ট্রেলিয়ার সহরবাসীদের মধ্যে আদব কায়দার তেমন কিছু কড়া নিয়ম কাণুন প্রচলিত নেই। একজন অপরিচিত যুবক যে কোনও একজন অপরিচিতা যুবতীর সঙ্গে অনায়াসে পথে চল্‌তে চল্‌তে আলাপ ক'রতে পারে; তাদের মধ্যে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য একজন উভয়ের জানিত তৃতীয় ব্যক্তির সাহায্যের আবশ্যক হয় না। অচেনা লোককে সে দেশের মেয়েরা সন্দেহের চক্ষে দেখে না, বরং বন্ধু ভাবেই মুখের পানে চেয়ে দেখে এবং নির্ব্বিকারে আলাপ করে।

এই রকম হঠাৎ পরিচিত পথের লোককে ক্ষণকালের আলাপের মধ্যেই আষ্ট্রেলিয়ান মেয়েরা গৃহে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে আস্‌তে একটুও দ্বিধা বোধ করে না, অথবা তার সঙ্গে বন-ভোজনে যেতে বা কোনও আমোদ উৎসবে যোগ দিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করে না। বিদেশী যাত্রী কেউ অনায়াসে পথের যে কোনও নরনারীকে ধরে আলাপ করে তার সাহায্যে সহরের চারিদিক ঘুরে ফিরে দেখে শুনে আসতে পারেন। সেদেশের যে কোনও স্ত্রী পুরুষ অপরিচিত বিদেশী অতিথিকে তাদের সহরটি সহাস্যমুখে যেন কর্ত্তব্যকর্ম্মের মতো নিজে সঙ্গে ক'রে নিয়ে দেখিয়ে শুনিয়ে বেড়াবে। আষ্ট্রেলিয়ানদের চরিত্রের মধ্যে একটা দিল-খোলা, প্রাণ-খোলা—সহজ সরল প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন বিধি-ব্যবস্থার প্রতি একটা প্রগাঢ় অনুরাগ বা প্রবল ভক্তি এদের মধ্যে একেবারেই দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। চিত্তের একটা সদাপ্রফুল্ল ভাব এবং গুরু লঘু সকল বিষয়ই বেশ স্ফূর্ত্তির সঙ্গে হাল্‌কা ভাবে নেওয়ার একটা প্রবৃত্তি ছাড়া আর এদের সমস্ত দোষ গুণই ইংরেজদের সঙ্গে মিলে যায়। ইংলণ্ডের ধর্ম্মই এদের ধর্ম্ম; তবে এদের মধ্যে কারুর ভিতরই ধর্ম্মের কোনও রকম গোঁড়ামী নেই। ইংলণ্ডের সাহিত্যই এদের সাহিত্য, একই নাট্য কাব্য উপন্যাস ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞানের এরা সহযোগী পাঠক, একইরকম নাটকের অভিনয় এরা দেখে এবং একইরকম খাদ্য গ্রহণে জীবনধারণ করে।

আষ্ট্রেলিয়ায় আভিজাত্য-গৌরবের কোনও কণ্টকাকীর্ণ ব্যাপার নেই। সমাজের যে কোনও গণ্যমান্য বর্দ্ধিষ্ণু লোকের ছেলেরা—দরকার পড়লে বা অভাব বোধ করলে সামান্য কুলী-মজুরের কাজ ক'রতেও লজ্জা বোধ করে না। আজকের একজন সামান্য মজুর হয়ত কাল দেশের প্রধান মন্ত্রী বা প্রধান বিচারকের আসন অলঙ্কৃত ক'রতে পারে। কেউ কোনওদিন এখানে জিজ্ঞাসা করে না যে "অমুক লোকটি কার ছেলে? কোথায় বাড়ী? কি ক'র্‌তো আগে, বা কেমন ক'রে এতবড় হোলো?" আজ পর্য্যন্ত আষ্ট্রেলিয়ায় যতগুলি প্রধান মন্ত্রী নির্ব্বাচিত হ'য়ে গেছেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন অতি দরিদ্র অল্পবেতনভোগী এক রাজকর্ম্মচারীর পুত্র, একজন ছিলেন গাড়ী মেরামতি এক মিস্ত্রীর ছেলে, একজন ছিলেন এক চাষী মজুরের সন্তান, একজন ছিলেন কয়লার খনির এক কুলির ছেলে, একজন ছিলেন এক কেরাণীর বংশধর!

রাজনীতি-ক্ষেত্রেও যেমন-সমাজনীতি ক্ষেত্রেও ঠিক তেম্‌নি। আভিজাত্য-গৌরবের কোনও একটা বিশিষ্ট মর্য্যাদা আষ্ট্রেলিয়া কোনওদিনই স্বীকার করে না। সে দেখে শুধু তার ব্যক্তিত্ব! লোকটার নিজের গুণ কি, স্বভাব কি রকম, চরিত্র কি ধরণের কি প্রকৃতির মানুষ সে—ব্যাস্! (ক্রমশঃ)

দয়াল হরি

শ্রীদেবরঞ্জন গুহঠাকুরতা

দয়াল নাম ধরেছ হরি, তোমার নামের সার্থকতা
পরখ করে দেখব এবার আছে কি? না বৃথা কথা!
কত দয়াল তুমি হরি, বুঝব এবার তোমায় ডেকে
তোমার চরণ শরণ বিনা শান্তি বল পেয়েছে কে?
ছুটেছিনু মত্ত হ'য়ে বিত্তলোভে ক্ষিপ্ত-প্রাণ
দরিদ্রের বক্ষপরে উৎপীড়নের তীক্ষ্ণ বান
পাষাণ সম কঠিন হিয়া অবিশ্বাসে দগ্ধ দেহ,
কুটিলতায় হৃদয় ভরা নাইক দয়ামায়া স্নেহ।
চলেছিনু প্রবল বেগে পাপের খরস্রোতে ভাসি,
কোন্ অজানা শুভক্ষণে বাজল প্রাণে তোমার বাঁশী;
কতই স্নেহে তুমি মোরে সে পথ হতে নিলে তুলে,
একদিনো ত পতিত-পাবন ডাকিনিক তোমায় ভুলে।
দারুণ পাপের কুণ্ড হ'তে এই রূপেতে মুক্ত করি
তোমার নামের সার্থকতা দেখালে হে দয়াল হরি।

চীন সমস্যা

(Bertrand Russell মহোদয়ের "The Problem of China" বইখানির সম্বন্ধে)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

উপরিলিখিত বইখানি আমার বড় ভাল লেগেছিল ও বইখানি পড়ার সময়ে সেটির একটি সমালোচনা লেখবার ইচ্ছা হয়েছিল। তারপর ভেবে চিন্তে আমার মনে হ'ল যে এই বইখানি সম্বন্ধে ঠিক সমালোচনা লেখবার দাবী না করাই বোধ হয় ভাল, যেহেতু চীনদেশ বা সভ্যতা সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত বিশেষ কোনও অভিজ্ঞতা নেই। এ সম্বন্ধে যা জ্ঞান আছে, তার প্রায় সবই শোনা বা পড়া কথার উপর প্রতিষ্ঠিত। এরূপ ক্ষেত্রে "সমালোচনা করতে চাই" এ কথা বলাটাই অনেকটা ধৃষ্টতার মত শোনায়। কেবল এ সম্পর্কে আমাদের সাধারণ বিচার-বুদ্ধি দিয়ে দু চারটে কথা বলা চলে। আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের এর বেশী উচ্চাশা নেই। তাই পাঠকদের কাছে আমার অনুরোধ এই যে আমার এই প্রবন্ধটিকে যেন তাঁরা "চীন সমস্যা" বইখানির সমালোচনা বলে মনে না করেন। এই বইখানি পড়ে আমার অনেক কথা মনে হয়েছিল ; এ প্রবন্ধে আমি সেই দু চারটি কথারই কিছু আলোচনা করতে চাই, এই মাত্র।

তবে যার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না, সে বিষয় নিয়ে বেশি মাথা ঘামিয়ে লাভ কি? এ প্রশ্ন মনে উদয় হতে পারে বটে। এর উত্তর এই যে এ বইখানি আমার কাছে এত ভাল লেগেছিল, ও বিশেষ করে বর্ত্তমান চীন সমস্যার সঙ্গে আমাদের সমস্যার এত মিল আছে বলে মনে হয়েছিল যে, এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে আমাদের শেখবার যথেষ্ট আছে বলে মনে না করেই পারি নি।

বিশেষ করে শেখবার আছে এই জন্য যে, এ বইখানির মধ্যে এক জাতীয় লোকের অপর জাতীয় লোককে ও সভ্যতাকে বোঝবার এমন একটা আন্তরিক ও খাঁটি সহানুভূতি ফুটে উঠেছে, যেরূপ সহানুভূতি ও চেষ্টা সংসারে এক খুব জ্ঞানী ও উদার লোকের কাছেই মেলা সম্ভব ; এবং আমাদের এ বিয়োগ-বহুল জগতে যে দু চারটি বস্তুতে খুব বেশী লাভ করার আছে ও সান্ত্বনার প্রলেপ বিদ্যমানতার মধ্যে সংস্কার-মুক্ততা ও উদারতার স্থান খুবই উঁচুতে। এ বিষয়ে রাসেল বর্ত্তমান ইংলণ্ডের—শুধু ইংলণ্ডের নয়, সমগ্র পাশ্চাত্যের—একজন মস্ত লোক। শুধু এ বিষয়ে কেন, অনেক বিষয়েই য়ুরোপের চিন্তা-জগতে রাসেলের স্থান খুবই উচ্চে। এমন কি অনেকে মনে করেন, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায়, ভাবের গভীরতায়, উদার সত্যনিষ্ঠায় এবং প্রায় সর্ব্বপ্রকার সংস্কারের রাহিত্যে রাসেলের স্থান বর্ত্তমান জগতে কারুর চেয়েই নীচে নয়। তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথাই লেখা যেতে পারত, যা আমাদের কাছে লাভজনক হত ; কিন্তু তাতে বর্ত্তমান প্রবন্ধের আকার অত্যন্ত বেড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে বলে, আমি ইচ্ছা সত্ত্বেও একটু জোর করেই নিজেকে সে চেষ্টা থেকে নিরস্ত করলাম। এখানে কেবল এইটুকু

বলে রাখি যে, শুধু তাঁর গণিত ও দর্শনে মৌলিকতায় নয়, নানান দিকে constructive স্বাধীন চিন্তায় রাসেল যে একজন অসাধারণ ব্যক্তি, তা তাঁর প্রত্যেক বইয়ে পাওয়া যায়। বিশেষ করে তাঁর সমাজ-সম্বন্ধীয় লেখার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের পরিচয় থাকা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় বলে আমি মনে করি। কারণ তাঁর এ সব লেখার মধ্যে যে অন্তর্দৃষ্টি, গভীর চিন্তা, মৌলিকতা, উদারতা ও সবচেয়ে বড় জিনিষ—সত্যনিষ্ঠার সমাবেশ আছে, তা থেকে প্রত্যেক চিন্তাশীল লোকেরই যথেষ্ট শেখবার আছে। আপাততঃ তাঁর চীন-সমস্যার উপর বইখানির আলোচনায় আমার এ কথার কিছু প্রমাণ দেবার ইচ্ছা আছে। তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যেও খুব অসাধারণত্ব আছে যার একটু নিকট পরিচয় লাভ করার সৌভাগ্য বর্ত্তমান লেখকের হয়েছিল। রাসেলের সম্বন্ধে অনেক কথাই লেখা যেতে পারত, তবে সে সব পরে বিস্তারিত ভাবে করার ইচ্ছা আছে বলে আপাততঃ তাঁর জীবন সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র বলেই ক্ষান্ত হই যে, তিনি যুদ্ধের বিপক্ষে লেখবার জন্য ইংলণ্ডে জেল খেটেছিলেন ও কেম্ব্রিজ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। সাধারণ মানুষে সত্যকার মহত্ত্ব ও স্বাধীন চিন্তা বড় একটা পরিপাক কর্ত্তে পারে না; কারণ গভীর অন্তর্দৃষ্টির কাজ মানুষের ভবিষ্যৎ চিন্তা, ও সত্যকার মঙ্গল নির্দ্ধারণের চেষ্টা—যেটা অনেক সময়েই সাধারণ মানুষের কাছে বিপজ্জনক বোধ হয়; যেহেতু তাদের দৃষ্টির পরিধি কম। তবে এ সম্পর্কে রাসেল বড় সুন্দর বলেছেন:—"But those who want to gain the world by thought, must be content to lose it as a support in the present. Most men go through life without much questioning, accepting the beliefs and practices which they find current, feeling that the world will be their ally if they do not put themselves in opposition to it. New thought about the world is incompatible with this comfortable acquiescence. * * * Without some willingness to be lonely, new thought can not be achieved." (Principles of Social Reconstruction) তাঁর অন্যান্য বইয়ের মতন "চীন সমস্যায়"ও আমরা তাঁর স্বাধীন চিন্তার ও স্বজাতির দোষ সমালোচনার পরিচয় পাই যা পড়ে এমন কি Hon'ble Fisher, "The Nation" এর সম্পাদক প্রমুখ তথাকথিত উদারপন্থীগণও (Liberals) রাসেলের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছেন। সব দেশেই নিজেদের সমালোচনায় সব চেয়ে বেশী চটে প্রবীণদের দল যারা চিরকালই কমবেশি গতানুগতিকতার পক্ষপাতী। তবে ভরসা এই যে নবীনের দল এতে সাড়া দেয় এবং সেই জন্য সমাজ-সংস্কার কাজে তাঁদের অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তাঁরাই কাজ করেন বেশী; বলা বাহুল্য রাসেল তাঁর উদার মতের জন্য ইংলণ্ডে মোটেই লোকপ্রিয় নন। আমি তাঁকে বর্ত্তমান ইংলণ্ডে তাঁর প্রভাব কিরূপ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার সঙ্গে একটু হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, "৩৫ বৎসরের নীচে যারা, তারা আমার প্রতি সদয়ই বলা যেতে পারে, কিন্তু ৩৫ বৎসরের ওধারে যাঁরা, তাঁরা এ হতভাগ্যের প্রতি বড়ই বিমুখ।"

"চীন সমস্যা" বইখানি নিয়ে একটু স্বাধীন ভাবে দুচারটী কথা বলবার অভিপ্রায় নিয়েই আজ কলম ধরেছি, সমালোচকের মঞ্চে আরোহণ করে নয়, এ কথা পূর্ব্বেই বলেছি। তাই আশা করি এতখানি ভূমিকার অবতারণা করার অপরাধ মার্জ্জনীয়। তবে এরূপ কমবেশি অবান্তর কথা ভবিষ্যতেও দু চারটি বলবার স্বাধীনতা আমি নিতে চাই, এ কথা আগে থেকেই বলে রাখা ভাল। কারণ আমার মনে হয়, এই উপায়েই আমার উদ্দেশ্য সব চেয়ে ভাল সাধিত হবে। সে উদ্দেশ্যটা হচ্ছে—প্রথমতঃ কোনও বিদেশী সভ্যতার শ্রেষ্ঠ গুণগুলির প্রতি আমাদের মধ্যে দু চার জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা; ও দ্বিতীয়তঃ এ পক্ষে য়ুরোপের একজন শ্রেষ্ঠ মনের কাছ থেকে আমাদের কতখানি শেখবার আছে সেটা সাধ্যমত একটু দেখান।

রাসেলের এই বইখানির মধ্যে তিনি অনেকবার লিখেছেন যে চীনাদের তিনি ভালবেসে ফেলেছিলেন। কাজেই অনেক স্থলে তাঁর চীনাদের প্রশংসাটা একটু বেশী উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়া হয় ত সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়। তবে তাঁর বৈজ্ঞানিক যুক্তিপ্রিয় মনের লাগাম তিনি যে বরাবরই একটু কষে রাখার চেষ্টা করেছেন, এ সত্যটীর পরিচয় প্রায়ই পাওয়া যায়। রাসেলের চীন-চরিত্র সম্বন্ধে মতামতের কোনও বিশেষ প্রতিবাদ করার মত অভিজ্ঞতা আমার নেই, তবে য়ুরোপে যে দু চার জন চীনাদের সঙ্গে আমার পরিচয় লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল, তাদের চমৎকার শীলতা ও ভদ্রতা যে আমার একটু বিশেষ করে ভাল লেগেছিল, এ কথা প্রসঙ্গতঃ বলে রাখতে পারি, এবং এ থেকে আমার মনে হয়েছিল যে, রাসেল যে চীনাদের সৌজন্য সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত ভাবে প্রশংসা করেছেন তা সম্ভবতঃ অতিরঞ্জিত নয়। রাসেলের বইখানি পড়ে চীনাদের সম্বন্ধে আরও অনেক ভুল ধারণা কেটে যায়। একটা অচেনা, অজানা সভ্যতাকে একটু বেশী দুর্জ্ঞেয় ও অনেক ক্ষেত্রে বেশি নিষ্ঠুর ও পাশবিক মনে হওয়াটা বোধ হয় সাধারণের মধ্যে খুবই সহজ; কারণ দেখা যায়, সংসারে অধিকাংশ ভুল-বোঝাই মূল কারণ অপরের সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব, এ বিষয়ে ক্ষমতার অভাব নয়। এ সম্বন্ধে আমি দুই একটী উদাহরণ দিতে চাই। ইংলণ্ডের একজন বড় অভিনেতা Mathuson Lang মহাশয় Mr. Wu বলে একখানা নাটক লণ্ডনে অনেক দিন ধরে অভিনয় করেন। সেটী যে সেখানকার লোকদের কাছে এত চিত্তাকর্ষক হয়েছিল তার প্রধান কারণ,—এ বইখানির লেখক মহাশয় তার চীনা নায়ককে এক মহা বুদ্ধিমান, নিষ্ঠুর, পাশবিক মানুষরূপে চিত্রিত করেছিলেন। ফ্রান্সেও একজন খুব নামজাদা লেখক Octaer Mirbeau তাঁর একখানি প্রসিদ্ধ বইয়ে "Le Jardin des Supplice" (অমানুষিক যন্ত্রণার বাগান) চীনাদের অমানুষিক Cold-blooded পাশবিকতার যে কল্পিত চিত্র এঁকেছেন, তা পড়তে পড়তে বাস্তবিকই লোমহর্ষণ হয়। অথচ এ

সব কল্পনার যে কোনও ভিত্তি থাকতেই পারে না তা চীনাদের সঙ্গে যিনিই একটু সম্পর্শে এসেছেন তিনিই জানেন। প্রায় প্রত্যেক সভ্যজাতির মধ্যেই একদল তরলমতি লোক থাকেন, যাঁরা খুব সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর যুক্তি বা তথ্যের উপর নির্ভর করে অপরাপর সভ্যতাকে একটু হেয় প্রতিপন্ন করবার প্রয়াস পান, যেহেতু এ চেষ্টার মধ্যে আমাদের অহমিকার চরিতার্থতা-রূপ একটা নিম্নশ্রেণীর আনন্দ থাকে। এবং এ তরল প্রবৃত্তিটিকে জয় করা নিতান্ত সহজও নয়, যেহেতু আমাদের অহমিকা বস্তুটি একটু বিশ্বাসঘাতক। সে অলক্ষ্যে নিজেদের দোষগুলিকে আমাদের কাছে ছোট করে দেখায় ও গুণ-গুলিকে বড় প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করে। কাজেই আমাদের বিচার-বুদ্ধির মধ্যে প্রায়ই পক্ষপাত এসে পড়ে ও আমরা অপরকে সহজেই ভুল বুঝে থাকি। একটা উদাহরণ দেব। দেখা যায় য়ুরোপে অনেক লোকের মধ্যেই একটা ধারণা আছে যে, সব প্রাচ্য মনই না কি রহস্যময় ও দুজ্ঞেয়, অথচ এরূপ theoryর ভিত্তি কি জিজ্ঞাসা কর্লে তারা বিশেষ কোনও সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে না। আমাদের দেশেও যে এ প্রবৃত্তিটা নেই তা নয়। আমরাও চীনা বলতে বুঝি—চীনা-বাজারের জুতানির্ম্মাতার দলকে ও তাদের কথা উঠলেই তাদের আফিম-খোর মনে করে তাদের প্রতি একটা অবজ্ঞা বোধ করে থাকি।

এ সব স্থলে যে য়ুরোপীয়েরা আমাদের দুজ্ঞেয় বলে ঠিক করে বসে, ও আমরা চীনাদের অবজ্ঞা করে থাকি, তার মূলে থাকে একটা অহমিকা যে আমরাই বিধাতার বরপুত্র। রাসেল এই Chauvinism এর উপর খড়্গ-হস্ত। তিনি বার বার বলেছেন যে, চীন সভ্যতাকে য়ুরোপীয় সভ্যতার চেয়ে ছোট মনে করার কোনও সঙ্গত কারণই নেই: "We must cease to regard ourselves as missionaries of a superior civilization." (১১ পৃঃ) "The Chinese have a civilization and a national temperament in many ways superior to those of white men." (২২১ পৃঃ) "We are firmly persuaded that our civilization and our way of life are immeasurably better than any other, so that when we come across a nation like the Chinese, we are convinced that the kindest thing we can do to them is to make them like ourselves. I believe this to be a profound mistake * * * the nation is built upon a more humane and civilized outlook than our own." (১৯৭ পৃঃ) ইত্যাদি ইত্যাদি। রাসেল আমাকে বলেছিলেন যে চীনাদের মধ্যে তিনি যে শুধু মনোজ্ঞ সদ্ব্যবহার পেয়েছিলেন তাই নয়, তাদের মধ্যে তিনি বন্ধুও পেয়েছিলেন। য়ুরোপ প্রাচ্য মনকে দুজ্ঞেয় বলে যে অপবাদ প্রায়ই দিয়ে থাকেন, সে সম্বন্ধে তিনি লিখছেন "প্রাচ্য অত্যন্ত চতুর এই বাজে কথায় আমি বিশ্বাস করি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে শঠতার প্রতি-যোগিতায় একজন ইংরেজ বা আমেরিকানের কাছে একজন চীনা শতকরা ৯০ বার হেরে যাবে।" (১৯৯ পৃঃ)

রাসেলের স্বজাতির দোষ সমালোচনায় সত্যনিষ্ঠার (যদিও কখনও কখনও তিনি স্বজাতিকে একটু বেশি কষাঘাত করেছেন বলে মনে হয়) দৃষ্টান্ত আমাদের অনুকরণীয়। তাঁর চীন সমস্যা বইখানিতে তাঁর নিরপেক্ষতা এত বেশি ফুটে উঠেছে যে, তা আমাদের impress না করেই পারে না। সে সব দৃষ্টান্ত দেওয়া অসম্ভব। তবে যে দুই এক স্থলে তাঁর সত্যপ্রিয়তা আমার কাছে একটু বেশি ভাল লেগেছিল, তার মধ্যে তাঁর জাপানের সমালোচনা অন্যতম। তিনি তাঁর বই-খানিতে য়ুরোপীয় imperialismএর মতন জাপানী imperialism এরও যথেষ্ট নিন্দা করেছেন; কিন্তু বলেছেন যে, যদি চীনদেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল পরতেই হয়, তবে জাপানের অধীনতাই বোধ হয় অন্য সব জাতির অধীনতার চেয়ে কম হানিকর হবে; কারণ কেবল তাদের কাছেই চীন সভ্যতার বিশেষত্বটির খানিকটা বজায় থাক্‌তে পারে, যা অন্য কোনও য়ুরোপীয় জাতির কাছে আশা করা বিড়ম্বনা। চীনদেশকে ভালবাসা সত্ত্বেও এবং জাপানী পাশবিকতাকে ঘৃণা করা সত্ত্বেও এইটা নিরপেক্ষতা খুব সহজ নয়। কারণ যদি অপর কোনও দেশকে কারুর অধীন হ'তেই হয় তবে সেটা আমাদের জাতিরই অধীন হোক্, এইরূপ মনে হওয়াই স্বাভাবিক—এমন কি উদার মানুষের ক্ষেত্রেও। তা ছাড়া তিনি জাপানকে অত্যন্ত কঠোর ভাবে সমালোচনা করার সময়ও বলেছেন যে "জাপান যে আজ একটা পাশবিক হয়ে উঠেছে তা তার স্ব-ইচ্ছায় নয়। জাপান চেয়েছিল নিজের মতন থাকতে। কিন্তু শ্বেত জাতিদের তাতে সুবিধে হ'ল না। জাপান দেখ্‌ল যে শ্বেতজাতিদের সঙ্গে কেবল দুরকম আচরণ সম্ভব:—হয় তাদের অধীনতা স্বীকার করা, না হয় তাদেরই শিলনোড়া নিয়ে তাদের দন্তমূলভঙ্গের সাধু চেষ্টা।" কাজেই "Japan adopted the latter course, and developed a modern army trained by the Germans, a modern navy modelled on the British, modern machinery derived from America and modern morals copied from the whole lot * * * However they began to be respected when they defeated Russia, and after they had captured Tsing Tao and half-enslaved China they were admitted to equality with the other Great Powers at Versailles." (১৬৭-১৬৮ পৃঃ) রাসেলের জাপানের imperialismএর সমালোচনার ক্ষেত্রেও স্বজাতির প্রতি বিদ্রূপের কশাঘাত অনুধাবনের যোগ্য। আর এক স্থলে তিনি লিখছেন যে জাপানীরা বলে শ্বেতজাতি নিষ্ঠুর, অহঙ্কারী, স্বার্থপর, তারা মনে করে জগৎ কেবল তাদের জন্যই সৃষ্ট ইত্যাদি। একবার টীকাচ্ছলে রাসেল লিখছেন, "আমাদের পাপের এই তালিকা আমার কাছে সম্পূর্ণ সত্য মনে হয়। কিন্তু এ থেকে আমাদের এইটেই মনে

হওয়া স্বাভাবিক যে, যে জাতি আমাদের এই চোখে দেখে, তারা কাজে অন্ততঃ আমাদের পন্থা অবলম্বন কর্ব্বে না।" কিন্তু "That, however, is not the moral which the Japanese drew. They argue on the contrary that it is necessary to imitate us as closely as possible. We shall find that, in the long catalogue of crimes committed by Europeans towards China, there is hardly one which has not been equalled by the Japanese" (১২১ পৃঃ)

রাসেল অন্য জাতির সমালোচনা প্রসঙ্গেও নিজেদের (অর্থাৎ ইংরাজকে) নিষ্কৃতি দেন নি। অনেক স্থলেই তিনি 'we' বলতে ইংরাজকেও বুঝেছেন। কেবল বোধ হয় আমেরিকা সম্বন্ধে তাঁর আক্রোশটা একটু বেশি যদিও Americanism সম্বন্ধে তাঁর অধিকাংশ কথাই সত্য। তবে আমেরিকার বিরুদ্ধে য়ুরোপের শীর্ষস্থানীয় লোকের একটা বিরাট অবজ্ঞা আমার প্রায়ই চোখে পড়ত, তাই রাসেলের চীনপ্রসঙ্গে আমেরিকান সভ্যতার সমালোচনাকে অনেক স্থলে আমার কাছে একটু বেশি কঠোর বলেই মনে হয়েছিল। তবে আমেরিকানদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রধান অভিযোগগুলি প্রধানতঃ সত্য; অর্থাৎ :—(১) তাদের মধ্যে সমস্ত মানুষকে ঠিক আমেরিকান করে তোলার একটা দুর্জ্জয় সাধু প্রচেষ্টা আছে। (২) জীবনের সবই uniform বা একাকার করে ফেলাটাকে তারা একটা মস্ত জিনিষ মনে করে। (৩) অপরকে না বুঝে তাদের বিশেষত্বটুকু অঙ্কুরে বিনাশ কর্ত্তে তারা মোটেই ইতস্ততঃ করে না। (৪) তাদের মধ্যে একটা একগুঁয়ে আদর্শবাদ আছে যেটা "is apt to be incompatible with tolerance, with the practice of living-and-let-live, which alone can make the world endurable for its less pugnacious and energetic inhabitants." (১৬১ পৃঃ) আরও, "আমেরিকার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমেরিকাই কেবল জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক, অন্য সব জাতি মূর্খ ও পাপী।" রাসেল ঈষৎ হেসে লিখছেন . শেষ কথাটি অকাট্য, কেবল প্রথমটির সম্বন্ধে একটু সন্দেহের কারণ আছে (১৫৯ পৃঃ)। রাসেল বলছেন "Everybody knows Labouchere's comment on Mr. Gladstone, that like other politicians he always had a card up in his sleeve, but unlike the others, he thought the lord had put it there. This attitude, which has been characteristic of England, has been somewhat chastened by satire of men liko Bernard Shaw. But in America it is still just as prevalent as before" (১৬০ পৃঃ) আমেরিকানদের সম্বন্ধে রাসেল বলছেন যে সেখানকার লোকমত বিশ্বাস করে—ব্যবসা বাণিজ্যে, প্রটেষ্ট্যাণ্ট-নৈতিকতায়, ব্যায়ামে, ও স্বাস্থ্যোন্নতির বন্দোবস্তে (১৬০ পৃঃ)। অপিচ, "আমেরিকানরা চিরকালই মিশনারি থাকে; তবে—সেটা তারা যা মনে ভাবে, অর্থাৎ খৃষ্টধর্ম্মের, তার নয়—সেটা হচ্ছে আমেরিকানিস্‌মের। (২২১ পৃঃ)। এর পর তিনি একটু বেশি কঠোর হয়ে পড়েছেন ও লিখছেন, "This (অর্থাৎ Americanism) means, in practice, the substitution of tidiness for art, cleanliness for beauty, moralizing for philosophy, prostitution for concubines (as being easier to conceal) and a general air of being fearfully busy for the leisurely calm of the traditional Chinese." আরও "It it (i. e. American influence) prevailed it would, no doubt, by means of hygiene, save the lives of many Chinamen, but would at the same time make them not worth saving." (২২ পৃঃ)

শ্বেত সভ্যতার মন্দ দিকটা রাসেলের মহান্ প্রাণ হয় ত একটু বেশী তীক্ষ্ণভাবেই অনুভব করেছেন, তাই তাঁর স্বজাতীয়দের এই দিক্‌টার প্রতি আক্রমণের আর অন্ত নেই বল্লেই হয়। তবে আত্মগুণকীর্ত্তনে প্রতি রোমে পুলক অনুভব করাটা মানুষের কাছে এত সহজ যে তার রাশ কড়া করে ধরার একটু বেশী দাম না দিয়েই পারা যায় না। এ কথাটা আমাদের সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য এবং এ সম্পর্কে য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ আন্তরিকতার পরশ আমাদের মনের পক্ষে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। তাই রাসেল-প্রমুখ মহাজনের আত্মদোষকে একটু নির্দ্দয় ভাবেই সমালোচনা করার প্রবৃত্তিকে আমি একটু বড় করে দেখতেই চাই। কারণ আমাদের দেশে উল্‌টো প্রবণতাটা – অর্থাৎ স্বজাতির শ্লাঘা ও বিদেশী সভ্যতাকে রসাতলে পাঠানর চেষ্টাটা—অন্য অন্য দেশের চেয়ে অনেক বেশি এ কথা য়ুরোপকে দেখে আমার বিশেষ করেই মনে হয়েছে।

তবে এই সূত্রে রাসেল য়ুরোপীয় সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্থানে স্থানে যতটা হতাশ হয়ে পড়েছেন তার খুব আশঙ্কা আছে বলে আমার মনে হয় না। আমি এ সম্বন্ধে তাঁর দুচারটে মত উদ্ধৃত করেই আমার বক্তব্যটি পরিস্ফুট করে তুলতে চেষ্টা করব। রাসেল যা বলছেন তার মোট কথাটা এই যে য়ুরোপীয়রা হচ্ছে progress ও efficiency রূপ fetishএর একনিষ্ঠ উপাসক। তার ফলে তারা পেয়েছে ক্ষমতা ও অর্থ। চীনরা চায়—শান্তি, সহানুভূতি, প্রীতি ভালবাসা ও নিরুপদ্রব সত্য উপভোগ। Progress ও efficiencyর চিন্তা তাদের মনের তন্ত্রীতে বিশেষ কোনও অনুরণন তোলে না। (১৩ পৃঃ) "তাদের সভ্যতা মানুষের সুখের দিক্ দিয়ে বিচার করে দেখ্‌তে গেলে আমাদের সভ্যতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।" (১৬৭ পৃঃ) ফলে তারা পেয়েছে জীবনে অপেক্ষাকৃত শান্তি; বর্ত্তমানকে ভোগ করবার ক্ষমতা; ভালবাসবার ও ভাববার সুযোগ (২২১ পৃঃ); সৌজন্য, আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান (১৯০ পৃঃ); আর্টে মনোজ্ঞতা, জীবনে reasonableness (১৮৯ পৃঃ); জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ (১৯২ পৃঃ) ইত্যাদি। চীন জাতির গুণাবলী সম্বন্ধে রাসেল খুবই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন। এতে কোন আপত্তির কথা নাই, বরং এটা সুখেরই বিষয় যে এত বড় একজন লোক একটা সম্পূর্ণ বিদেশী সভ্যতার এতটা গুণগ্রাহী হতে পেরেছেন। কিন্তু পক্ষান্তরে

তিনি যখন অনেক সময় স্বজাতির দোষ দেখাতে গিয়ে হতাশ হয়ে পড়েছেন (১৮ ও ১৯ পৃঃ) তখন তাতে আমরা সম্পূর্ণ সায় দিতে পারি না। তবে আমার মনে হয় যে তাঁর বর্ত্তমান নৈরাশ্য অনেকটা সাময়িক, যার কারণ হচ্ছে গত মহাযুদ্ধের বিরাট ধ্বংসের দৃশ্য। আমরা এ ধ্বংসের পরিমাণ দেশে থেকে ঠিক বুঝতে পারি না। তাই আমরা অনেক সময় উপলব্ধি করি না যে এ শ্মশানের দৃশ্য খুব কাছে থেকে দেখার ফল একজন বড় optimistএর মনের উপর কতখানি হতে পারে। রাসেলের যুদ্ধের পরের লেখা তুলনা করে দেখলে আমরা বুঝতে পারি যে মানুষের বিরাট উন্মত্ততার দৃশ্য তাঁকে কতখানি অভিভূত করেছে।

আগেকার লেখা :—"আমার এ বিষয়ে মনে কোনই সন্দেহ নেই যে একদিন না একদিন মুক্তির বলে আমরা আমাদের অন্ধ প্রবৃত্তিগুলিকে জয় করব যার জন্য জগতে যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটে।" Social Reconstruction ৮৮ পৃঃ। আরও "চিন্তার ক্ষমতা পরিণামে অন্য যে কোনও মানুষী শক্তির চেয়ে মহৎ। যাদের মধ্যে চিন্তার ক্ষমতা আছে, ও মানুষের অভাব অনুযায়ী ভাববার কল্পনা আছে, তারা একদিন না একদিন তাদের বাঞ্ছিত মঙ্গল সাধন কর্ব্বেই যদিও হয় ত তাদের জীবদ্দশায় নয়। (ঐ বই ২২৬ পৃঃ) কেন না, "The ultimate power of those whose thought is vital is far greater than it seems to men who suffer from contemporary politics." (ঐ বই ২২৫ পৃঃ) 'বর্ত্তমান সময়ে মানুষের ধর্ম্মের ন্যায় অপরকে উৎপীড়ন করার নিষ্ঠুর প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে লোপ পেয়েছে—অথচ মানুষের এ হিংস্রতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রথমে মাত্র দুচারজন সাহসী দার্শনিক। (ঐ পৃঃ) সোস্যালিজম্ সম্বন্ধেও তাই ইত্যাদি। এবম্বিধ নানারূপ যুক্তির মধ্যে, প্রকৃতির অন্ধ নিষ্ঠুরতা সত্ত্বেও দুর্ব্বল ক্ষীণদৃষ্টি মানুষের অসাধ্য সাধনের নানা দৃষ্টান্তে *; বিজ্ঞানকে কার্য্যতঃ ধ্বংস প্রমুখ নিষ্ঠুর কাজে লাগালেও সেটা যে বিজ্ঞানের আসল কাজ নয় অত্যাচার মাত্র,—তার প্রধান mission হচ্ছে আমাদের একটা নির্লিপ্ততা শিক্ষা দেওয়া ও স্বীয় মঙ্গল-অমঙ্গল নিরপেক্ষ হয়ে শুধু সত্যের জন্য নিজেদের তৈরী কর্ত্তে শেখা—এই কথা জোর করে বলার মধ্যে †; দর্শন-শাস্ত্রের চর্চ্চা করা উচিত কোন ক্ষুদ্র প্রয়োজন বাদের জন্য নয় মনকে বড় করার জন্য—এ বিশ্বাসে ‡—সর্ব্বত্রই রাসেল তাঁর মনের একটা অনুপম প্রদার optimism ও ঐকান্তিক সংস্কার মুক্তির পরিচয় দিয়েছেন। এরূপ আদর্শবাদ ও optimismএ তাঁর যুদ্ধের পূর্ব্বেকার লেখা ওতঃপ্রোত। এবার তুলনা করার জন্য তাঁর যুদ্ধের পরের লেখা নেওয়া যাক :—

"বিজ্ঞান হয় ত একদিন এমন কিছু আবিষ্কার করবে যা দিয়ে মানুষ যুদ্ধের দ্বারা ধরা হতে সমগ্র মানব বংশের এককালীন লোপ সাধন কর্ত্তে পার্ব্বে। এইটেই হচ্ছে যুদ্ধ বিগ্রহ শেষ করার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়।' (Theory and practice of Bolshevism ১৩২ পৃঃ) যে বিজ্ঞানকে তিনি এত ভালবাসেন তার অপচারে (abuse) কতটা ব্যথিত হলে এত বড় একটা মন তাকে নিয়ে তামাসা কর্ত্তে পারে সেটা বোধ হয় সহজেই অনুমেয়। বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিককে দিয়ে যে বর্ত্তমান জগতে ধ্বংসের কাজ সাধিত হয়েছে তাতে তিনি বিজ্ঞানের আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর নিজের বিশ্বাস হারিয়ে এমন অযৌক্তিক কথাও বলে ফেলেছেন :—

"What makes us superior is Newton and Robert Boyle and their scientific successors. They make us superior by giving us greater proficiency in the art of killing. It is easier for an Englishman to kill a Chinaman than for a Chinaman to kill an Englishman. Therefore our civilization is superior to that of China." রাসেলের মিলিটারিজ্‌মের বিরুদ্ধে এই কথাগুলির মধ্যে যে ঝাঁজের অস্তিত্ব অনুভব করি তাতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর একটা পুরুষোচিত উদ্দীপ্ত ক্রোধের ও স্বজাতির আত্ম-প্রবঞ্চনার উপর কঠোর কশাঘাতের পরিচয় পাই; কারণ এটা বাস্তবিকই সত্য যে পাশ্চাত্য যে আজ নিজেকে প্রাচ্যের চেয়ে বড় বলে মনে করে সেটা প্রধানতঃ তাদের পাশব বলের শ্রেষ্ঠতার জন্য—তাদের মধ্যে যেগুলো সত্যই ভাল জিনিষ আছে সে গুণগুলির কথা ভেবে নয়। তবে মুখে তারা এটা সহজে স্বীকার করে না এবং অনেক ক্ষেত্রে মনেও স্পষ্টভাবে বোঝে না। তাই রাসেলের উপরোক্ত কথাগুলির মধ্যে তাঁর আন্তরিকতা ও আত্ম-সমালোচনার প্রবৃত্তিকে শ্রদ্ধা না করেই পারা যায় না। তবে তিনি যে ব্যঙ্গচ্ছলেও এজন্য নিউটন প্রমুখ নিঃস্বার্থ জ্ঞানের সাধককে দায়ী কর্ত্তে পারেন এতে বোঝা যায় যে নিজেদের মধ্যে নিষ্ঠুর ধ্বংসের নিষ্ঠুর দৃশ্য বড় বেশি কাছে থেকে দেখে তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ balance ও cosistency এ ক্ষেত্রে কতকটা হারিয়ে ফেলেছেন। জগতে বোধ হয় এমন কোনও কিছুই নেই—তা সে বিজ্ঞানই হউক, বা আর্টই হোক্ বা সাহিত্যই হোক্ বা ভালবাসাই হোক্—যার অপব্যবহার অসম্ভব; এ কথা কে না জানে? তবু

* A Freeman's Worship প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, তাঁর Mysticism and Logic বইখানিতে।

† The Place of Science in a liberal education প্রবন্ধ, পূর্ব্বোক্ত বই।

‡ The Problems of Philosophy পুস্তকের The Value of Philosophy প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য যেখানে তিনি উচ্চকণ্ঠে বলছেন Philosophy is to be studied * * * above all because through the greatness of the universe which philosophy contemplates, the mind also is rendered great and becomes capable of that union with the universe which constitutes its highest good.

যাঁদের হৃদয়ং আদর্শবাদে বেশি সাড়া দেয় তাঁরা অনেক সময়েই ভাল কিছুর ব্যভিচারের জন্য এত বেশি ক্ষোভ অনুভব করেন যে পরিণামে এ ব্যভিচারকে আক্রমণ কর্ত্তে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আসল ভাল জিনিষটিকেও জলাঞ্জলি দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করে বসে থাকেন।

টলষ্টয়ের শেষ জীবনে তাঁর সব প্রকার বড় আর্টের বিলোপ কামনা করাটা এ কথার আর একটা উদাহরণ। তবে রাসেলকে তাঁর "চীনসমস্যা" বইখানিতে ছাড়া অন্য কোথাও এতটা বিচলিত হতে দেখতে পাওয়া যায় না। তাই তাঁর পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে এতটা নৈরাশ্য একটু আক্ষেপের বিষয় বলে আমি মনে না করেই পারি না। তবে টলষ্টয় তাঁর "আর্ট কি?" বইখানিতে আর্টের অসারতাগুলিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে যেমন আমাদের অনেক উপকার সাধন করেছেন, রাসেলও বর্ত্তমান বিজ্ঞানের অন্ধ উপাসক-গণের প্রশংসার মধ্যে অসারতাকে তেমনি তীব্র বিদ্রূপ করেছেন। উদাহরণতঃ তিনি বলছেন "আমরা যখন কাগজে পড়ি যে একটি বিমানযান (aeroplane) থেকে একটি বোমা ছুড়ে একটা সমগ্র নগর ধ্বংস করা যায়, তখন আমরা শিউরে উঠি ও ভাবি যে সেটা আতঙ্কে,—কিন্তু বস্তুতঃ সেটা বিজ্ঞানের শক্তির উল্লাসের দরুণ। বিজ্ঞান আমাদের দেবতা। আমরা তাঁকে বলি, আপনি যদি আমাদের হত্যাও করেন তাহলেও আমরা আপনাকে বিশ্বাস কর্ত্তে ছাড়ব না" (৮০ পৃঃ)। তবে "চীনসমস্যা" লেখবার সময় তাঁর মনোভাব যে একটু বেশি রকম সাময়িক বিষাদের দ্বারা অভিভূত হয়েছিল আমার এ কথা মনে করার কারণ এই যে ঠিক সেই সময়েই (১৯২২ সালে) তিনি আর একখানি পুস্তিকায় লিখছেন যে তিনি চান যে Scientific temper গুণটির আদর হোক্, যেহেতু "The scientific temper is capable of regenerating mankind and providing an issue for all our troubles. (Free thought and official Propaganda. ৪৪ পৃঃ)

এই কারণে আমার মনে হয় না যে পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্বন্ধে রাসেলের যে নৈরাশ্যের পরিচয় আমরা তাঁর "চীনসমস্যায়" পাই তার কোনও গভীর ভিত্তি আছে। তিনি যে যুদ্ধের পরে য়ুরোপের, বিশেষতঃ রুষ দেশের, মহাশ্মশানের দৃশ্যে কতটা ব্যথা অনুভব করেছিলেন তার পরিচয় আমরা পাই যখন রুষদেশের শত নিরাশ্রয় নরনারীর সম্বন্ধে তিনি লিখছেন "(I) found on the sand a strange assemblage of human beings half-nomads, wandering from some remote region of famine, each family huddled together" ইত্যাদি। অপিচ "তারা মানুষ নিশ্চয়ই কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার পক্ষে বোধ হয় একটা কুকুর বা বেড়ালের সঙ্গেও তাদের চেয়ে বেশি ঘনিষ্টতা স্থাপন করা সহজ ছিল।" (১৯ পৃঃ) কবি যে গভীর দুঃখে গেয়েছিলেন "What man has made of man !" সেই পাশবিকতাকে এতটা নগ্নভাবে দেখে রাসেলের হৃদয় যে কতটা ব্যথা পেয়েছিল তা আমরা এ কয়টি কথা থেকেই বুঝতে পারি। ফলে তিনি সে সময়ে নৈরাশ্যের কবলে পড়ে লিখছেন :—"And at last I began to feel that all politics are inspired by a grinning devil, teaching the energetic and quick-witted to torture submissive populations for the profit of pocket or power or theory." (১৯ পৃঃ)

"এইরূপ মনের অবস্থা নিয়ে আমি চীন যাত্রা করেছিলাম—একটা নূতন আশা পেতে।" (২০ পৃঃ) কাজেই ঠিক এ অবস্থায় যে চীন জাতির সৌজন্য, শান্তিপ্রিয়তা, tolerance, জ্ঞানানুরাগ, যুদ্ধব্যবসায়ীর প্রতি অবজ্ঞা, আত্মসমাহিতত্ব (dignity), কলানুরক্তি, রসিকতা-প্রিয়তা প্রভৃতি তৃপ্তিদায়ক গুণগুলি তাঁর একটু বেশী ভাল লাগবে সেটা আমরা বেশ বুঝতে পারি। তবে ঠিক্ এই কারণেই আমার মনে হয় তিনি কখনও কখনও চীন জাতির কোনও কোনও দোষকে একটু ছোট করে ও নিজেদের অনুরূপ দোষকে একটু বড় করে না দেখেই পারেন নি। এর অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পার্ত্ত কিন্তু বাহুল্য ভয়ে মাত্র একটা উদাহরণ দিয়েই ক্ষান্ত হব। চীনারা পিতৃমাতৃ-ভক্তিকে এত বেশি বড় করে দেখে যে পরিবারবর্গকে প্রতিপালনার্থে তারা public কাজেও সততা বর্জ্জন কর্ত্তে অনেক সময়ে ইতস্ততঃ করে না। (৪১ পৃঃ) এখন দেখা যায় যে সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের স্বার্থের গণ্ডীর পরিধি বাড়তে থাকে। অর্থাৎ প্রথমে মানুষ ভাবে শুধু নিজের সুখ, তার পর স্ত্রী পুত্রের সুখ, তার পর পরিজনের সুখ, তার পর বন্ধুবান্ধবের সুখ, তার পর স্বজাতির সুখ ও সর্ব্বশেষে বিশ্বমানবের সুখ। কাজেই স্বজাতির সুখদুঃখে সাড়া দেওয়াটা শুধু পরিবারের সুখদুঃখে সাড়া দেওয়ার চেয়ে বেশি গৌরব-জনক ও সভ্যতাসূচক। কিন্তু রাসেল দেশভক্তি বা Patriotism রূপ গুণটির শুধু মন্দ দিকটাই বড় করে লিখছেন যে এটি পিতৃমাতৃভক্তির চেয়ে নিশ্চয়ই বেশি অনিষ্টকারী। তাঁর এপক্ষে যুক্তি কিন্তু খুব সন্তোষজনক নয়। তিনি বলছেন "Both of course err in inculcating duties to a certain portion of mankind to the practical exclusion of all the rest." ঠিক কথা। "But patriotism directs one's loyalty to a fighting unit which filial piety does not (except in a very primitive society)" অপিচ, "The principal method of advancing the interests of one's own nation is homicide, the principal method of advancing the interest of one's family is corruption and intrigue." অতএব স্বদেশভক্তির চেয়ে পিতৃমাতৃভক্তি কম অনিষ্টকর"—এই হচ্ছে রাসেলের যুক্তি ও সিদ্ধান্ত। কিন্তু corruption ও intrigue এর মধ্যে থাকলে মনকে যে ভাবে খর্ব্ব করে ফেলা হয়, খোলাখুলি যুদ্ধবিগ্রহ—যার মধ্যে স্বার্থত্যাগের সুযোগও নিতান্ত কম নেই—মনকে ততটা হীন করে ফেলে কি না—জোর করে বলা কঠিন। অথচ রাসেল এটা খুব জোর

করেই বলেছেন (certainly কথাটির ব্যবহার দ্রষ্টব্য)। অথচ তিনি নিজেই লিখেছেন—"I should like to preach the will to doubt." (Free thought and official propaganda (১৭পৃ:) রাসেলের attitude সর্ব্বত্রই জ্ঞানসাধকের, সত্যানুসন্ধীর, নিরপেক্ষ গুণগ্রাহীর। কাজেই তাঁর পক্ষে এরূপ সন্দেহজনক বিষয়েও এতটা স্থির নিশ্চিততা খুব consistent নয়। তাই আমার মনে হয় যে রাসেল হয়ত চীন সভ্যতাকে একটু বেশি বড় করে ও নিজেদের সভ্যতাকে একটু বেশি ছোট করে দেখে থাকতে পারেন। বাহুল্য ভয়ে আমি আর এ বিষয়ে উদাহরণ দিলাম না। আমি এ প্রসঙ্গটি নিয়ে যে এতটা আলোচনা করা দরকার মনে করলাম তা আরও এই কারণে যে রাসেলের স্বজাতি সমালোচনায় আমাদের অনেক তথা-কথিত দেশভক্তরা হয়ত উল্লাসে আত্মহারা হয়ে পড়তে পারেন যে, "তবে আর কি! য়ুরোপীয় সভ্যতা রসাতলে ত গিয়েছেই—সুতরাং আমরাই সব বিষয়েই শ্রেষ্ঠ এটা প্রমাণ হয়ে গেল।" যে আত্মশ্লাঘা ও chauvinismকে হেয় প্রতিপন্ন কর্ত্তে মহাপ্রাণ রাসেলের চেষ্টার আর অন্ত নেই বলেই মনে হয় সেই রাসেলের লেখা হতে যেন আমরা এ অসার প্রবৃত্তির খোরাক না যোগাই।

পরিশেষে "চীন-সমস্যার" সমাধান সম্বন্ধে রাসেল যে দু'চারটি কথা ভেবেছেন সে সম্বন্ধে কিছু না লিখে এ প্রবন্ধের শেষ কর্ত্তে পাচ্ছি না; কারণ এ সমস্যাগুলির সঙ্গে আমাদের সমস্যাগুলির অনেকস্থলে খুব আশ্চর্য্য রকম মিল আছে দেখা যায়। এ বিষয়ে নিজের বিশেষ কোনও মন্তব্য লেখা নিষ্প্রয়োজন; কারণ রাসেলের এ সম্পর্কে সমাধান-গুলি এতই সুচিন্তিত যে সেগুলি প্রায় অধিকাংশ স্থলেই অকাট্য বলেই মনে হয়। তাই আমি তাঁর বইখানির শেষ অধ্যায় (The Outlook for China) থেকে মাত্র কতকগুলি অংশ উদ্ধৃত করেই এ প্রবন্ধটি শেষ করব—যদিও এপক্ষে সমস্ত অধ্যায়টি অনুবাদ করে দিলেও হয়ত মন্দ হ'ত না। তবে তাতে প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে যাবে বলে আমি নিরস্ত হলাম। এই অধ্যায়টি আমাদের সকলেরই বিশেষ করে পড়া উচিত বলে আমি মনে করি, ও তার প্রধান কারণ এই যে রাসেল চীন দেশের জন্য যে সমাধানগুলি নির্দ্দেশ করেছেন সেগুলি কোথাও reactionary নয়, রাসেলের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের ক্ষমতা এ অধ্যায়ে খুবই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে বলে আমি মনে করি। অপিচ তিনি বোঝেন যে আমরা যতই কেন না চেষ্টা করি সভ্যতার প্রগতিতে (progress) old order of things এ ফিরে যাওয়ার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র, কালের অতিপাতের সঙ্গে সঙ্গে নূতনত্ব আস্‌বেই ও কাজেই নূতন সামঞ্জস্য খুঁজে বাহির করাই হচ্ছে আমাদের কর্ত্তব্য, অনড় পুরাতনে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। মানুষ তা কখনও পারেও নি পার্ব্বেও না। "We have grown incapable of believing in a state of static perfection and we demand of any social system which is to have our approval, that is should contain within itself a stimulus towards something still better. (Roads to Freedom p. 168) তা সত্ত্বেও ইতিহাসে দেখা যায় যে, বর্ত্তমানের দুঃখ-কষ্টকে অনেক সময়ে একটু বেশি বড় করে দেখার দরুণ পুরাকালে ফিরে যাওয়াটাই এ সবের অমোঘ মহৌষধ বলে অনেকে মনে করেন। এঁরা তাঁদের পরদুঃখকাতরতার জন্য আমাদের সম্মানভাজন হলেও এঁদের solution (সমাধান) গুলিকে খুব সত্য বলে মনে করা চলে না। তা করা চল্‌লে হয়ত আমাদের নূতন করে ভাব্‌বার প্রয়াস না পেয়ে শুধু পুরাকালের মনীষীদের চিন্তা নিয়ে নাড়াচাড়া করে চল্‌লেই হ'ত। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে এই সব reactionaryদের উপদেশ অনেক সময়ে প্রথমটায় আমাদের একটু বিচলিত করে তুল্‌লেও পরিণামে আমাদের গতিরোধ কর্ত্তে পারে না; আমরা সম্মুখপানেই চলি ও চল্‌বই—নিত্য নূতন বিপদ্ নিয়ে। নূতন সমস্যার উদয়ে মানুষ কখনও ভয় পায় নি বরং তার সমাধানের চেষ্টাতেই সে তার বুদ্ধি ও বিচার-শক্তির সার্থকতা পায়। রাসেলের চিন্তাধারার বরাবর সাম্‌নে দিকে চলারই একটা স্বাভাবিক গতি আছে। এ জন্য পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর reactionaryদের আলোচনা করার চেয়ে রাসেল, ক্রপটকিন প্রমুখ মানুষের চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামালে বেশি লাভ করার সম্ভাবনা আছে বলেই মনে হয়।

যে সভ্য শ্বেতজাতিরা অদম্য উৎসাহে চীনজাতিকে আপোষে গ্রাস করবার সাধু কল্পনা কচ্ছেন তাঁদের কবল হ'তে চীনারা কেমন করে পরিত্রাণ পেতে পারে ভেবে ভেবে প্রথমটায় রাসেল ঠিক করেছিলেন যে এর একমাত্র উপায় আছে। অর্থাৎ "চীনজাতির ধৈর্য্য অসীম, আমার বোধ হয় য়ুরোপীয় জাতিরা আর ১০০ বৎসরের মধ্যেই যুদ্ধ-বিগ্রহে নিজেদের বিলোপ সাধন করে ফেল্‌তে পার্ব্বে। তখন চীনারা শুধু তাদের শান্তিপ্রিয়তার জন্যই অবশিষ্ট থাক্‌বে ও তাদের সত্যকার সভ্যতার আরও বিকাশ কর্ত্তে পার্ব্বে।" (১৬ পৃঃ) তাহলে কিন্তু আমাদের অবস্থা কি রকম হবে এটা ভাবার মধ্যে একটা আমোদ আছে। ব্যঙ্গোক্তি ছেড়ে রাসেল শেষে বল্‌ছেন যে চীন জাতির নিজেদের চেষ্টায়ই স্বজাতিকে রক্ষা কর্ত্তে হবে বাইরের সাহায্যের আশা করা বিড়ম্বনা (২৪০ পৃঃ)। আমাদের সম্বন্ধে এ কথা যে অক্ষরে অক্ষরে খাটে তা বোধ হয় বলাই বাহুল্য। রাসেল বলছেন, "সমস্যাটা কিন্তু শুধু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার নয় সভ্যতার স্বাধীনতারও বটে। কিন্তু তা লাভ কর্ত্তে হলে চীনাদের আমাদের দোষগুলির অন্ততঃ কিছু না শিখলে চলবে না। কারণ নৈলে আমরা তাদের শ্রদ্ধা করব না ও তারাও বিদেশীর উৎপীড়নের হাত হতে নিষ্কৃতি পাবে না। কেবল এ পক্ষে তারা আমাদের দোষ যত কম অনুকরণ করে ততই ভাল (২৪১ পৃঃ)।" রাসেল আর এক স্থলে বলছেন যে "যদিও তিনি militarismকে কোনও মতেই সমর্থন কর্ত্তে পারেন না, কিন্তু তবু যদি কোনও চীনা তাঁকে জিজ্ঞাসা করে একটু militaristic না হলে চীনজাতির স্বাধীন হওয়ার অন্য কোনও উপায়ই বা আছে কি না তাহলে তাকে এ বিষয়ে কোনও উত্তর দেওয়াও কঠিন।" তাই রাসেল

বল্‌ছেন যে একটু দেশভক্তি (patriotism) থাকা দরকার যদিও স্বদেশীয়ের প্রতি এ অনুরাগ যাতে বিদেশীর প্রতি বিরাগে পরিণত না হয় সেদিকে সর্ব্বদা একটা সতর্ক দৃষ্টি থাকা দরকার। তবে তিনি বল্‌ছেন "It can not be too strongly urged that patriotism should be only defensive not aggressive. But with this proviso, I think a spirit of patriotism is absolutely neccessary to the regeneration of China" বিশ্বমানবত্বে বিশ্বাস কর্ত্তে পারার আগে আমাদের কি করা উচিত জিজ্ঞাসা করায় রাসেল আমাকে একবার পরিষ্কার বলেছিলেন "I think you must first be independent."। আমার বোধ হয় এ কথা খুবই ঠিক। আমরা ব্যক্তিগত বা জাতীয় সংস্কার এক লাফেই কাটিয়ে উঠতে বোধ হয় পারি না, ধাপে ধাপে উঠতে হয়। তবে রাসেল বলছেন যে "Independence is to be sought not as an end in itself, but as means towards a new blend of a western skill with the traditional Chinese virtue" কারণ এটি না হলে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার দাম খুব বেশি হবে না। আমাদের বোধ এ কথায় সায় দেওয়া শক্ত হবে না—অন্ততঃ তাঁদের পক্ষে হবে না যাঁদের য়ুরোপের সভ্য গুণগুলির সঙ্গে পরিচয় আছে। রাসেল বলছেন যে চীনদের স্বীয় সভ্যতার আরও বিকাশ সাধন কর্ত্তে হলে তিনটী জিনিষের দরকার। যথা ১। ভাল রাজ্যশাসন; ২। স্বীয় পরিচালনে রেখে স্বদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি; ৩। শিক্ষার বিস্তার। প্রথমটি না হলে দ্বিতীয়টি হবে না এবং দ্বিতীয়টি না হলে তৃতীয়টির জন্য টাকার যোগাড় হওয়া কঠিন। তবে দ্বিতীয়টি চীনাদের অধীনে না থাক্‌লে তাদের দেশের টাকা বিদেশীর পকেট পূর্ণ করবে বলে এ বিষয়ে স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের সম্বন্ধে এ সব কথাই অক্ষরে অক্ষরে খাটে এ বিষয়ে বোধ হয় মতভেদ হবে না। তার পর রাসেল বাধ্যতামূলক শিক্ষা সম্বন্ধে অনেকগুলি জানা কথা বলছেন, যথা, এ শিক্ষা নইলে রাষ্ট্রীয় চৈতন্য (consciousness) হয় না, সত্যকার গণতন্ত্র হয় না ইত্যাদি। তবে শিক্ষার পরিচালনের ভার চীনাদের হাতে থাকা একান্ত দরকার। তারা অনেক সময় বিদেশী শিক্ষক আনতে পারে এবং যদি তাদের সংখ্যা খুব বেশি না হয় তবে তাতে বিশেষ ক্ষতিও নেই। ক্ষতি আছে কেবল এ বিষয়ে পরিচালনার ভার বিদেশীর হাতে রাখা, যেহেতু তাতে করে একটা জাতি তার জাতীয় বিশেষত্ব হারায় (২৪৮ পৃঃ)। এ বিষয়ে আমরা ভুক্তভোগী, তাই এর উপর কোনও টীকা অনাবশ্যক। "রিসার্চ্চের (গবেষণার) জন্য এখনও কিছুদিন অনেক চীন ছাত্রকে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা নিতে হবে, তবে খুব বেশির ভাগ ছাত্রদের জন্য স্বদেশেই শিক্ষার বন্দোবস্ত বাঞ্ছনীয়।" কারণ, Returned students have to a remarkable extent the stamp of the country from which they have returned, particularly when that country is America" (২৪৯ পৃঃ) আমেরিকার সম্বন্ধে, এই ঝাঁজটি বাদ দিলে বোধ হয় এ বিষয়েও রাসেলের সঙ্গে একমত হওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব হবে না।

রাসেলের মত এই যে চীনাদের পক্ষে পাশ্চাত্য অর্থনীতি বা রাষ্ট্রনীতির থিওরি জানা বিশেষ দরকার নেই; যেহেতু এ সব কথার খুব যে বিশ্বজনীনতা আছে তা নয়। তবে তাদের শেখা দরকার বিজ্ঞান (৭১ পৃঃ)। রাসেল বিজ্ঞানের মহা ভক্ত। I believe the scientific outlook to be immeasurably important to the human race. (Theory and Practice of Bolshevism ৮ পৃঃ, আরও তাঁর Free Thought and Official Propaganda এবং Mysticism & Logic বই দুখানি এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য)। রাসেল বলেন, সংসারে যে কয়টি জিনিষ তাদের নিজেদের জন্যই বড় সে কয়টী হচ্ছে "Knowledge, art, instinctive happiness and relations of friendship and affection (১১ পৃঃ)। তাঁর "চীনসমস্যা" বইখানিতে চীনজাতির গুণ বর্ণনার সময় তিনি দেখিয়েছেন যে তাদের সবই আছে কেবল বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছাড়া। য়ুরোপের কাছে যদি তাদের কিছু শিক্ষা করবার থাকে, তবে সে কেবল এই শেষপ্রকার জ্ঞানের চেষ্টা। তাদের সৌজন্য ও স্বভাবের মধুরতা, সরলতা ও শান্তিপ্রিয়তার (২৫০ পৃঃ) সঙ্গে যদি তারা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শেখে ও তার দ্বারা তাদের সমস্যার সমাধান করবার জ্ঞান অর্জ্জন করে—তাহলে "Out of the renaissance spirit now existing in China, it is possible, if foreign nations can be prevented from working havoc, to develop a new civilization better than any that the world has yet known." ২৫০ পৃঃ। এটা একটা মস্ত আশার কথা যে আমাদের প্রতিবেশীর মধ্যে এমন মহৎ গুণ আছে, কারণ তাহলে আমরাও তা থেকে একদিন না একদিন লাভ কর্ত্তে পারবই এবং মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে এ সবই মস্ত লাভস্বরূপেই গণ্য হবে। (আত্মশক্তি)

ভারতের বিদেশী বাণিজ্য

শ্রীমন্ত সওদাগর

(সেপ্টেম্বর ১৯২৩)

পণ্যদ্রব্য—১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের বাণিজ্যের মোটামুটি হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

	১৯২২	১৯২৩	১৯২২ হইতে ১৯২৩ সালের কমবেশী বেশী (+) কম (—)	
	লাখটাকা	লাখটাকা	লাখটাকা	শতক
রপ্তানি	২০,৪৩	২২,৬২	+২,১৯	+১০,৭
পুঃ রপ্তানি	১,২১	৮২	—৪০	—৩২,৮
মোট রপ্তানি	২১,৬৫	২৩,৪৪	+১,৭৯	+৮
আমদানি	১৮,২৪	১৮,৭২	+৪৮	+২৬

মোট রপ্তানির আধিক্য ৩,৪১৪,৭২

অর্থ—এই মাসে বে-সরকারি অর্থের আমদানির মূল্য ৩,৬১ লাখ, এবং সেপ্টেম্বর ১৯২২ সালে অর্থাৎ এক বৎসর পূর্ব্বে ঐ মাসে ৪,৫০ লাখ টাকা। বে-সরকারি হিসাবে অর্থের রপ্তানির মূল্য ৫১ লাখ এবং ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৫৮ লাখ টাকা।

আমদানি—১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের সহিত তুলনায় ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের খাদ্য দ্রব্যাদির মূল্য ৯৯ লাখ টাকার বেশী অর্থাৎ ৩,৪৫ লাখ টাকা হইয়াছিল; বৃদ্ধির কারণ প্রধানতঃ অধিক চিনির আমদানি। কাঁচা মাল বা অ-নির্ম্মিত দ্রব্যাদির মূল্য ৩৩ লাখ কমিয়া ১,৩৭ লাখে দাঁড়াইয়াছিল; হ্রাসের কারণ প্রধানত কয়লা, তৈল, এবং কাঁচা রেশমের কমতি। প্রায় নির্ম্মিত বা সম্পূর্ণ নির্ম্মিত দ্রব্যাদির মূল্য ১১ লাখ কমিয়া ১৩,৬৫ লাখ হইয়াছিল। কমতির কারণ পিতল, তামা ইত্যাদি ধাতব পদার্থ, কলকব্জা, ও ধাতব তৈজস-পদার্থাদির কমতি আমদানি, যদিও তুলার বস্ত্রাদির ও লোহালক্কড়ের বাড়তি আমদানি ছিল। জীবজন্তুর মূল্য ৩৮০০০ টাকা কমিয়া ২ লাখ, ও ডাক বিভাগীয় আমদানি ৮ লাখ কমিয়া ২৩ লাখ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল।

আমদানি বিভাগে বাড়তি ও কমতি

১৯২২ সেপ্টেম্বরের সহিত তুলনা

বাড়তি

বিশুদ্ধ চিনি	১,১২,১৯,৪২৯
কাঁচা তুলা	১১,১২,২২২
লোহার চাদর	২৫,১০,৪৬০
রেলের গাড়ী	২৫,০০,৭৪২
তুলার বস্ত্র (ধোয়া)	১৭,৭৯,০৬৮
" " (রঙ্গিন)	১,১১,৮৯,৫২৪
পশমের বস্ত্র	১১,৪৯,১২০

কমতি

কয়লা	১২,১৫,৫৭৩
মণিমুক্তাদি	১৭,০৯,৮২৭
খনিজ তৈল (কেরোসিন নয়)	১৬,৮৪,২১২
কাঁচা রেশম	৮,১১,৬৯৪
তৈজস পত্র	৭,৯৮,৩১৪
বৈদ্যুতিক কলকব্জা	১০,০৬,৪৩২
তুলার কলের ঐ	৩২,১০,৩৭২
সূতা	১০,০২,৭৬২
তুলার বস্ত্র (কোরা)	১,১২,৫৮,৫১৫
ডাকবিভাগে আমদানি	৭,৫৬,৩৬৭

রপ্তানি—সেপ্টেম্বর ১৯২২ সালের সহিত তুলনায় সেপ্টেম্বর ১৯২৩ সালে খাদ্য দ্রব্যাদির মূল্য অধিক গম ও চায়ের রপ্তানির জন্য ১৯২ লাখ বাড়িয়া ৮,০৫ লাখ টাকা হইয়াছিল। কাঁচা মাল ২৩ লাখ কমিয়া ৭,৯৬ লাখ দাঁড়াইয়াছিল,—কমতির কারণ কাঁচা চামড়া, তৈল, পশু-লোম এবং বীজাদির কমতি রপ্তানি। প্রায় নির্ম্মিত বা সম্পূর্ণ নির্ম্মিত দ্রব্যাদির মূল্য পাটের প্রস্তুত দ্রব্যাদির হ্রাসের জন্য ৫৩ লাখ কমিয়া ৬,৩২ লাখ হইয়াছিল।

রপ্তানি বিভাগে বাড়তি ও কমতি
১৯২২ সেপ্টেম্বরের সহিত তুলনা

বাড়তি

গম	৪৮,১৮,৮৮৯
চা (কাল)	২,৩৩,৮৬,৭৫২
লা	৩৭,৭২,০৪১
তিসি	২১,৮৬,৪৩৯
কাঁচা পাট	১৮,৭৯,০৩৯

কমতি

চীনা বাদাম	১৬,২৪,৮২১
কাঁচা পশম	২৯,৭৫,৬৫৮
সূতা	১২,৭০,৫৩৯
গুণ চট (পরিমাণ বেশী)	৪৯,১৩,২২৯

জাহাজের খবর—১৯২৩ সেপ্টেম্বরে ২১৫ খানি জাহাজ বিদেশ হইতে ভারতে মাল লইয়া আসিয়াছিল এবং ২৬৯ খানি জাহাজ ভারত হইতে বিদেশে মাল লইয়া গিয়াছিল; পূর্ব্ব বৎসর ঐ মাসের জাহাজের আনুক্রমিক সংখ্যা ২২০ ও ২৩৮। এ মাসে ৫১১ হাজার টন মাল আমদানি ও ৬১০ হাজার টন মাল রপ্তানি হইয়াছিল।

নিম্নে সেপ্টেম্বর ১৯২৩ সালে ভারতের সর্ব্বপ্রধান বিদেশের সহিত বাণিজ্যের সম্বন্ধ নির্ণীত হইল :—

	আমদানি লাখটাকা	শতক %	রপ্তানি লাখটাকা	শতক %
যুক্তরাজ্য	১০,৬৭	৫৭	৭,৬২	৩৩·৭
জাপান	১,০১	৫·৪	১,০৩	৪·৬
জার্ম্মেণী	৮০	৪·২	১,১১	৯·৪
আমেরিকার যুক্ত সাম্রাজ্য	৮৩	৪·৪	২, ৯	১০·৬
জাভা	২,৩৫	১২·৫	—	—

শোক-সংবাদ

৺পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ

৺পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ

বাঙ্গালীর আর এক রথী সেদিন অন্তর্হিত হইয়াছেন—রায় বাহাদুর পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ পরলোকগত হইয়াছেন—বিহারপ্রবাসী বাঙ্গালীর নেতৃস্থানীয় পূর্ণেন্দুনারায়ণ চলিয়া গেলেন। এমন কর্ম্মী, এমন জ্ঞানী, এমন পবিত্রচরিত, এমন ভক্ত সাধকের অন্তর্দ্ধানে দেশের যে ক্ষতি হইল, তাহার আর পূরণ হইবে না। বিহার প্রদেশে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা স্থাপনের জন্য যাঁহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন, পূর্ণেন্দুনারায়ণ তাঁহাদের অন্যতম;—সমগ্র বিহার প্রদেশে কি বাঙ্গালী কি বিহারী, কি হিন্দু কি মুসলমান, সকলেই পূর্ণেন্দুনারায়ণের নেতৃত্ব স্বীকার করিতেন। তিনি সত্যসত্যই পূর্ণেন্দু ছিলেন। তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র বিহার হইলেও তিনি যখন তখনই বাঙ্গলা দেশে ছুটিয়া আসিতেন। তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যের অকৃত্রিম সেবক ছিলেন। তাঁহার ন্যায় পরম বন্ধুর বিয়োগে আমরা বড়ই ব্যথা পাইয়াছি। ভগবান তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণের হৃদয়ে শান্তিধারা বর্ষণ করুন।

মিঃ পিয়ার্সন

পরলোকগত মিঃ পিয়ার্সন

মিঃ পিয়ার্সন সাহেবের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি সাহেব ছিলেন না, তিনি বাঙ্গালী ছিলেন, নতুবা সাত সমুদ্র তের নদীর পারের এই শ্বেতাঙ্গ পুরুষ আমাদের দেশের জন্য এমন করিয়া আত্ম-নিয়োগ করিবেন কেন ? এক একজন মানুষ থাকেন, তাঁহারা সকল গণ্ডীর বাহিরে, যাঁহারা সকলের, বিশ্ব যাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র। মিঃ পিয়ার্সন তাহাই ছিলেন। কবিবর রবীন্দ্রনাথের বোলপুরের শান্তি-নিকেতনকে মিঃ পিয়ার্সন তাঁহার নিকেতন করিয়া লইয়া-ছিলেন ; যেখানেই যান না কেন, শান্তিনিকেতনে তাঁহার ফিরিয়া আসা চাই। তাই সে দিন ইয়োরোপ হইতে শান্তিনিকেতনের এই যাত্রী ইটালীতে নেপল্‌সের নিকট রেলগাড়ী হইতে পড়িয়া গিয়া জীবন হারাইলেন ; বোল-পুরের শান্তিনিকেতনে, তাঁহার পরম বন্ধু রবীন্দ্রনাথের শান্তিধামে আর তাঁহার আগমন হইল না—তিনি পরম শান্তিধামে চলিয়া গেলেন। এমন অকৃত্রিম ভারতবন্ধুর এমন ভাবে তিরোভাবে আমরা বড়ই শোকসন্তপ্ত হইয়াছি। তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য বোলপুরের শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ যে চিকিৎসালয় স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন, আমরা তাহার সাফল্য কামনা করি।

৺অশ্বিনীকুমার দত্ত

বরিশালের অশ্বিনীকুমার, বাঙ্গালার অশ্বিনীকুমার ভারতের অশ্বিনীকুমার আর ইহজগতে নাই,—সাধকপ্রবর যে কার্য্য সাধনের জন্য এ দেশে আসিয়াছিলেন, সে কার্য্য প্রাণপণে আজীবন সম্পন্ন করিয়া অশ্বিনীকুমার সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিলেন; আমরা তাঁহার অভাবে হাহাকার করিতেছি। দেশ-সেবায় উৎসর্গীকৃত-জীবন অশ্বিনীকুমারের পরিচয়, তাঁহার সাধনার কথা, তাঁহার নিষ্ঠার কথা, তাঁহার মহানুভবতার কাহিনী, বাঙ্গালা দেশের সকলেই জানেন; বরিশালের কর্ম্মবীর অশ্বিনীকুমার সত্য সত্যই দেশের একজন নেতা ছিলেন। তিনি বক্তৃতা-বাগীশ ছিলেন না, তিনি কর্ম্মী ছিলেন, দেশের প্রকৃত কল্যাণ কিসে হইবে, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন; তাই বিশ্বপ্রেমের বাণী ত্যাগ করিয়া তিনি দেশের, তাঁহার বরিশালের কল্যাণের দিকেই আত্ম নিয়োগ করিয়াছিলেন; এবং তাহারই ফলে সমগ্র বঙ্গদেশে তাঁহার অনুপম আদর্শ সংক্রামিত হইয়াছিল; কর্ম্মীসংঘ স্থাপিত হইয়াছিল। বাঙ্গালাদেশের নবযুগের অভ্যুত্থানের জন্য যাঁহারা মনঃপ্রাণ নিয়োজিত করিয়াছিলেন, অশ্বিনীকুমার তাঁহাদের অন্যতম। আমাদের দুর্ভাগ্য, অশ্বিনীকুমার বিগত কয়েক বৎসর একেবারে শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন; অনেকবার তাঁহার জীবন-সংশয় হইয়াছিল। অবশেষে মহাকালীর আহ্বানে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার এই কালীপূজার দিন অপরাহ্ণকালে ৬৮ বৎসর বয়সে, তাঁহার বরিশাল, তাঁহার বাঙ্গালাদেশ, তাঁহার সহস্র সহস্র ভক্তের বন্ধন ছিন্ন করিয়া জগজ্জননীর কোলে চলিয়া গেলেন। আমরা হাহাকার করিয়া বলিতেছি—হায় মা বঙ্গভূমি, তুমি যে এক অমূল্য রত্ন হারাইলে!
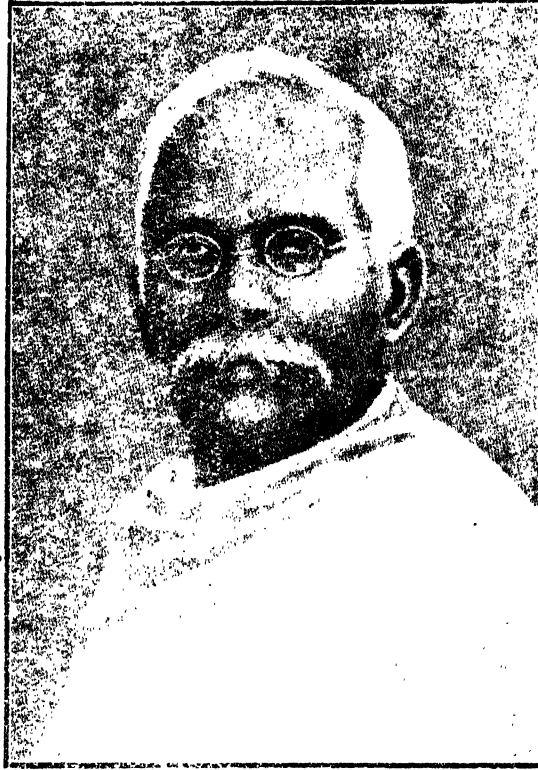
৺অশ্বিনীকুমার দত্ত

দুঃখের রূপ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

রুদ্র সে চণ্ড সে সত্য সে নিত্য,
রুক্ষ সে তিক্ত সে— তবু সে যে বিত্ত!
আসে সে যে বিনা ডাকে,
শত পাকে বেড়ি থাকে,
বন্ধু সে প্রিয়তম—পরিচিত চিত্ত।

সোহাগের বাণী তার চির মধু-বর্ষী;
সে রূপের সুরা যে গো অন্তরস্পর্শী!
সাথে তার ভারে ভার
নব নব সম্ভার
কত ব্যথা আঁখি-জল আনে চিত কর্ষি।

শ্রাবণের ভানু সম আনি ক্ষীণ হাস্য
ক্ষণিকের গান গাওয়া নহে তার লাস্য ;
নয় পথ-পথিকের
সখ্য সে ক্ষণিকের,
নহে সে যে কথকের ঠাট কূট ভাষ্য।

সুখ সে যে কর্কশ তীব্র সে মদ্য
নাহি কালি, নাহি কাল, কেবলি সে অদ্য।
ভোগ কর' ডুবে যাও
বাধায় বিদায় দাও,
মাত' ভোল' নাচ' গাও, সুখ অনবদ্য !

কত বহু আয়োজন চেষ্টা ও যত্নে
আসে সুখ, মুখ তার সুমুখর প্রশ্নে ;
এতটুকু অনাদরে
অভিমানে ঘৃণা ভরে
চলে যায় অকাতরে কাড়ি লয়ে রত্নে !

প্রভাতের শেফালিকা, চকিতের দৃষ্টি,
রমণীর যৌবন, শরতের বৃষ্টি,
গণিকার লাজ ভান,
ভার্য্যার অভিমান,
মেঘ-রাতে কৌমুদী—সম সুখ-সৃষ্টি।

দুঃখ সে দুর্ম্মদ, দুর্দ্দম, দুর্ব্বার ;
সে হঠাৎ উত্তাল, সূক্ষ্ম সে ক্ষুরধার ;
ভূকম্প বাত্যা সে
আসে সলিলোচ্ছ্বাসে—
মন্থিয়া, মন্থিয়া, করি সব চুরমার।

গড়ে দুখ নব লোক, গাহে নব সঙ্গীত
মঙ্গল-মহাবাণী তার চির-ইঙ্গিত !
দুঃখীর কিবা ভয় ?
সে যে সয়, মহাশয়,
ভগবান্ নিজে যে গো তারি জয়-বন্দিত।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ঐতিহাসিক গ্রন্থ "মধ্যযুগে বাঙ্গলা" প্রকাশিত হইয়াছে ; মূল্য ৩৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত বেচারাম লাহিড়ী বি-এল প্রণীত "সৎসঙ্গ ও সদুপদেশ" প্রকাশিত হইল ; মূল্য ৸৹ আনা।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত রহস্যলহরী সিরিজের "চীনের নব নায়ক," "মেকির বুজরুকী" ও লোহার থাবা" প্রকাশিত হইয়াছে ; মূল্য প্রত্যেকখানি ৸৹ বার আনা।

রাজর্ষি গোপালচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী প্রণীত "রাসতত্ত্বম্" বাহির হইল ; মূল্য ২৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত সূর্য্যপদ সোম প্রণীত নূতন উপন্যাস "মন্ত্রদীক্ষা" প্রকাশিত হইল ; মূল্য ২৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ প্রণীত নূতন উপন্যাস "স্নেহের শাসন" প্রকাশিত হইল ;—মূল্য ২৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত "রঙ্গালয়ের রঙ্গ-কথা" প্রকাশিত হইল, মূল্য ১৷৹ টাকা।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য প্রণীত "দেবীপ্রতিমা" প্রকাশিত হইল, মূল্য ২৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন দাস প্রণীত "অরুণার বিয়ে" প্রকাশিত হইল, মূল্য ১৲ টাকা।

৷৹ আনা সংস্করণের ৯২।৯৩ সংখ্যক পুস্তক শ্রীযুক্ত মাণিক ভট্টাচার্য্য প্রণীত "পাথরের দাম" ও শ্রীযুক্ত অজয়কুমার সেন প্রণীত "প্রজাপতির দৌত্য" প্রকাশিত হইয়াছে।

মাইকেল লাইব্রেরী, খিদিরপুর :—আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৪ কবি সম্রাট মধুসূদনের স্মরণার্থ উক্ত পাঠাগারের উদ্যোগে নবম বার্ষিক "মধু-মিলন" উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে নিম্নলিখিত বিষয়ে শ্রেষ্ঠ কবিতা লেখককে একটী রৌপ্য পদক প্রদত্ত হইবে।

বিষয় :—"মধু স্মৃতি"

কবিতা ২০০ ছত্রের অনধিক হওয়া আবশ্যক এবং আগামী ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে উক্ত লাইব্রেরীর সম্পাদকের নিকট প্রেরিতব্য।

শ্রীযুক্ত অমূল্যরতন মুখোপাধ্যায় প্রণীত "জীবনের শান্তি" প্রকাশিত হইল। মূল্য দেড় টাকা।

Publisher—**Sudhanshusekhar Chatterjea,**
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—**Narendranath Kunar,**
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street. CALCUTTA.

রাম

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সিংহ

Bharatvarsha Halftone & Ptg. Works.

পৌষ, ১৩৩০

দ্বিতীয় খণ্ড   একাদশ বর্ষ   প্রথম সংখ্যা

অবতারবাদ

অধ্যাপক শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

অবতারবাদ সম্বন্ধে শিক্ষা ও সংস্কার বশতঃ যাহা নিজের মনে বুঝিয়াছি, তাহাই এ প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ভুল-ভ্রান্তি সমস্তই আমার নিজের; তবে বিশ্ব-মানবের চিন্তার ধারা হইতে কয়েকটি ধারণা সঙ্কলন করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। কোনও সাম্প্রদায়িক মতে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য অবতারবাদকে গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করি নাই, বা অস্বীকার করি নাই। অবতারবাদ বিশ্ব-জনীন হইলেও, ভারতবর্ষ এবং পাশ্চাত্য দেশে ইহা বিশেষ আকার ধারণ করিয়াছে। নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করিতে গেলেও, যে দেশে যে ভাব আদৃত হইয়াছে, তাহার যথা-স্থানে উল্লেখ অনিবার্য্য। তবে ভারতবর্ষের সভ্যতার সহিত অবতারবাদ বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট; সেই কারণে স্বদেশীয় ভাবগুলির অবতারণা করিয়া ক্রমশঃ পাশ্চাত্য ভাবগুলির বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিব।

হিন্দু সভ্যতার মূলমন্ত্রগুলি অল্পের মধ্যে জানাইতে গেলে, আমরা তিনটি কথায় ইহার সূচনা করিয়া থাকি:— চতুরাশ্রম, বর্ণাশ্রম ও অবতারবাদ। আর্য্যগণ জীবনের স্তরে-স্তরে উন্নতির জন্য চতুরাশ্রমের নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যাহাতে সমাজবদ্ধ হিন্দু-সন্তানদিগের মধ্যে সাংসারিক জীবনে আর্থিক ঐক্য (solidarity) ও আন্তরজনীন নির্ভরপরায়ণতা (interdependence) থাকে, অথচ জাতীয় জীবন সমগ্র শক্তির কেন্দ্র হইতে পারে, তাহার জন্য বর্ণাশ্রম। চলিত ভাষায় কথাটি জাতি-ভেদে পরিণত হওয়ায়, ও কালের দুর্ব্বিপাকে ইহা বিকৃত হইয়া যাওয়ায়,

ইহার মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব আসিয়া পড়িয়াছে; নচেৎ ইহা সমাজ-রক্ষার এক সুমহৎ সঙ্কল্প। ধর্ম্মকে উন্নতিশীল করিবার জন্য, এবং নানাপ্রকার বাধা-বিঘ্ন থাকা সত্বেও যুগ-ধর্ম্মের অভিব্যক্তির সাহায্যে আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য, অবতারবাদের সৃষ্টি মোট কথা, চতুরাশ্রম, বর্ণাশ্রম ও অবতারবাদ আত্ম-রক্ষা, সমাজ-রক্ষা ও ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য হিন্দু-সভ্যতার তিনটি সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালী। প্রথম দুইটি কার্য্যে আমরা কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বা হইতে পারি নাই, তাহার আলোচনা এস্থলে প্রশস্ত নহে। তবে ধর্ম্ম রক্ষার জন্য বা ধর্ম্মকে জীবনের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে যুগে-যুগে আমাদের দেশে অবতারগণ আসিতেছেন, তাহা আমরা বর্ত্তমান কালেও অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতে পারি।

"অবতার" কথাটির অর্থ কি? ঈশ্বর জগতে জীব-রূপে অবতীর্ণ হ'ন। এক্ষণে বুঝিতে হইবে, এস্থলে ঈশ্বর অর্থে সগুণ ঈশ্বর—যিনি নিজেকে স্বপ্রকাশ করিতেছেন। সগুণ ও নির্গুণ ঈশ্বরের মধ্যে যদি কিছু প্রভেদ থাকে, তাহা আমরা বলিতে পারিব না; কারণ, ব্যক্ত ও অব্যক্তের মধ্যে কি গভীর যোগাযোগ আছে, তাহা মানবের ভাষায় জানান যায় না। তবে অনুভূতির দিক্ হইতে ভক্তগণ বলিয়া থাকেন যে, ঈশ্বরের রূপ, রস বা গুণ যখন আমরা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা ধারণা করি, তখন আমরা সগুণ ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করিয়া থাকি। যখন রূপ, রস বা গুণের প্রাচুর্য্য বা অভাব আমাদের অন্তরে উপলব্ধ হইয়া থাকে, যখন আর দেখিবার বা বুঝিবার কিছু থাকে না, তখন আমরা নির্গুণ ঈশ্বরের দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ি। অতএব নির্গুণ পরমেশ্বরের কাছে যাইতে গেলেও, সগুণ ঈশ্বরের পরিচয়-লাভের প্রয়োজন হয়।

সগুণ পরমেশ্বরের প্রকাশ সত্য, প্রেম ও সৌন্দর্য্যের ক্রম-বিকাশের ভিতর দিয়া আমাদের নিকট ধরা পড়িয়া থাকে। ঈশ্বরের সত্য রূপ ইতিহাসে ও বিজ্ঞানে মানব-অভিজ্ঞতার ধারা অবলম্বন করিয়া আমাদের কাছে জীবন্ত হইয়া উঠে। তাঁর সৌন্দর্য্য প্রকৃতির অন্তরাল হইতে মানব-মনকে আকৃষ্ট করে। তাঁর প্রেম বিশেষ করিয়া অবতার-দিগের ভিতর দিয়া আমাদের চিত্তকে উপচাইয়া দে'য়। মানুষ চিন্তাশীল অবস্থায় ঈশ্বরের সত্য রূপ বুঝিতে সমর্থ হ'ন। শিল্প কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে বা সৌন্দর্য্যের পূজারী হইলে, নানাবিধ কলায় ও প্রকৃতির মধ্যে পরমেশ্বরের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারেন। কিন্তু যখন নিজের শক্তি তাদৃশ স্ফুরিত হয় নাই, অথবা চেষ্টা দ্বারা শান্তি লাভ করা যায় না, তখন ঈশ্বর দর্শনের প্রকৃষ্ট উপায় তাঁর প্রেমে আত্মসমর্পণ করা; এবং সে শুভ বাতাস এ পৃথিবীতে কালে-কালে বহাইবার জন্য অবতারদিগের আগমন।

এক্ষণে দেখা যাক্, অবতারবাদের তাৎপর্য্য কি? আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমরা ইহাই বুঝিয়াছি যে, সৃষ্টি ও স্রষ্টার চিরন্তন অভেদ ভাব রক্ষা করিবার জন্য ইহা এক নিগূঢ় কৌশল। পিতা-মাতা যেমন সন্তানের জীবনে বাঁচিয়া থাকেন, সেইরূপ সৃষ্টির মধ্যে যে সৃষ্টিকর্ত্তা ধরা দিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তিনি যদি কেবল আমাদের ভিতরেই স্বপ্রকাশ হ'ন, আমাদের বাহিরেও উপস্থিত হইয়া আহ্বান না করেন, তাহা হইলে আমরা অন্তরে বাহিরে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইব কি করিয়া? মানুষও ত ধর্ম্ম-জীবনে বহির্জগতের সহিত একাত্মবুদ্ধি ছাড়িতে পারেন নাই—বরং ধর্ম্মের ইতিহাসে এই আকাঙ্ক্ষার ক্রমোন্নতি দেখিতে পাই মানব-জাতির ভ্রাতৃত্ব,—মানুষ যে দিন হইতে স্বার্থের গণ্ডির উপরে উঠিবার সঙ্কল্প করিয়াছে, সেইদিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীবুদ্ধ মানবকে জীবের সহিত একাত্মবোধে দীক্ষিত করিবার জন্য "অহিংসা" মূলতন্ত্র দিয়া গেলেন। কয়েক শতাব্দী পরে শ্রীগৌরাঙ্গ চরাচর-ব্যাপী জড়-চেতনার সহিত মানব মনকে একীভূত করিবার জন্য আত্ম-পর-জ্ঞান-বর্জ্জিত ও বৃক্ষের চেয়েও সহিষ্ণু হইতে আদেশ দিয়া গেলেন। মানুষের অন্তর-প্রকৃতির পক্ষে যদি এইরূপ অভেদ-ভাব সহজ-সাধ্য ও সকল রকমে প্রীতিজনক হইতে পারে, তাহা হইলে সেই পরম পিতার, জীবের সহিত লীলা করিবার যে আগ্রহ ও আনন্দ, তাহা কি ততোধিক ভাবে স্বাভাবিক ও কল্যাণজনক নহে?

আমাদের মনে হয়, বড় যদি ছোটর সহিত মিলিত হইতে না পারে, সিন্ধু যদি বিন্দুকে আকর্ষণ না করে, যদি অসীম ও সসীমের অবিচ্ছেদে যোগ না থাকে, তাহা হইলে সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও ঐক্য একেবারেই অসংলগ্ন ও অশান্তি-মূলক হইয়া পড়ে। তবে এইরূপ ছাড়াছাড়ি ভাব যে

জগতে কদাপি ছায়া বিস্তার করে না, তাহা নহে। চিত্তের এইরূপ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দুঃখ, তাপ প্রভৃতি ও জীবের নানা প্রকার দুর্গতি জন্মলাভ করিয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় জীব অনেক সময়ে মনে করিয়া থাকে, যেন বিধাতা নাই, তাহার আত্মশক্তিও লুপ্তপ্রায় এবং দুর্দ্দান্ত সংসারই একমাত্র সত্য। এতাদৃশ বিপদসঙ্কুল অবস্থায় সৃষ্টি কিরূপে রক্ষা পাইতে পারে? পাশ্চাত্য দেশের জ্ঞানরাজ্যে দুইটি পথের ইঙ্গিত পাই—Revolution (প্রলয়) ও Evolution (বিবর্ত্তন)। প্রলয়কালে কষ্টের অবধি থাকে না। বিবর্ত্তনের মধ্যেও ডারউইনের মতে কত মারাত্মক প্রতিযোগিতা বর্ত্তমান। আমাদের শান্ত মন এ সকল বাস্তবতার দ্বন্দ্বের মধ্যে কার্য্য-পদ্ধতি ও কর্ম্ম-কর্ত্তাকে খুঁজিয়া পায় না। আমাদের বিশ্বাস, মঙ্গলসূচক পরিবর্ত্তন বাস্তব-জগতে সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে, ভাবজগতে উন্মেষ লাভ করিয়া থাকে। বিপদের সময়, অথবা প্রয়োজনের সময়, পরমেশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা সৃষ্টির সহিত মিলিয়া গিয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করে। কিন্তু সেই মঙ্গল-ইচ্ছা দ্বারা সৃষ্টিকে প্রয়োজন মত নিয়োজিত করিবে কে? ব্যক্তিগত জীবনে দেখিতে পাই, দুঃখের মধ্যে দরদীর স্পর্শ পাইয়া জীব সুস্থ হয়; কিন্তু সেই দরদীর প্রাণ বেদনা-অনুভবকারীর চেয়ে কত শক্তিশালী! সেইরূপ জাতীয় জীবনে বা বিশ্ব-হিতার্থ অবতারগণ দেখা দে'ন—যাঁদের মন সম-সাময়িক কালের সমস্ত দুর্দ্দশা ধারণা করিতে সমর্থ। যতটুকু বুঝিয়াছি—তিনি তাঁহার যুগের মনের মানুষ, জাতীয় বা বিশ্ব মনের উপর তাঁর প্রভাব বিস্তৃত হয়, সামঞ্জস্য রক্ষা পায়, জগৎ সুন্দর হয়,—যিনি "শিবম্" তাঁর নূতন ভাবে প্রতিষ্ঠা হয়। এইরূপ পরিবর্ত্তনের আভাস দিতে গিয়া গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"পরিত্রাণায় সাধূনাম্, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

পাঠক-পাঠিকাগণ হয় ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, বাস্তব-জগতের বিবর্ত্তন ও প্রলয়বাদ ভাব-রাজ্যের সাধুদিগের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতদিগের বিনাশ সাধনের ইচ্ছার সমষ্টিগত ফল মাত্র। অন্তরে যে ভাল-মন্দের দ্বন্দ্ব চলিতেছে, এবং মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা ও অমঙ্গলের ধ্বংস হইতেছে, তাহারই অনুরূপ ক্রিয়া বাহ্য-জগতে সম্পন্ন হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? তবে সৌভাগ্যের বিষয়, এইখানেই মীমাংসার চরম নহে। অবতারের আগমনে সাধুগণ রক্ষা পাইবেন, ও দুষ্কৃতগণ বিনাশপ্রাপ্ত হইবে, ইহা ত ধর্ম্ম-সংস্থাপনের অঙ্গীভূত ফল। কিন্তু দুষ্কৃতগণের সংহারকার্য্য আধ্যাত্মিক জগতে কতদূর প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে মতের অনৈক্য দেখিতে পাই। মহাপ্রভু যীশু বলিয়াছেন, "তোমরা দুর্জ্জনের প্রতিরোধ করিও না।" তিনি ক্রুশে প্রাণ দিয়াছিলেন—তাই বলিয়া কি স্বর্গীয় ধর্ম্মের অবতারণা করিতে পারেন নাই? আমাদের মনে হয়, যিনি অমঙ্গলের বিনাশ করিয়া ধর্ম্ম-স্থাপন করেন, তাঁহাকে গীতার উক্তি অনুসারে "অবতার" বলা যাইতে পারে। কিন্তু যিনি অমঙ্গলকে মঙ্গলে পরিণত করেন, তিনি শ্রীভগবানের স্বরূপ। পাণ্ডব-সখা শ্রীকৃষ্ণকে অবতার বলা যাইতে পারে। কিন্তু ভাগবতের গোপাল ভক্তের হৃদয়-পুতলি,—ভক্ত তাঁহাকে শ্রীভগবানের আসনে না বসাইয়া কোন মতেই পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না।

অথচ উভয়ত্রই শ্রীকৃষ্ণ একই ব্যক্তি! ইহা কিরূপে সম্ভব? আমাদের মনে হয়, প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন সাময়িক লক্ষ্য ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার প্রয়াসী, সেইরূপ, যাঁহারা পুরুষোত্তম, তাঁহারাও খানিকটা নিজ সময়ের পরিবর্ত্তনের নেতাস্বরূপ এবং আংশিক ভাবে জগতের চিরকালের আধ্যাত্মিক ভাণ্ডারের ব্যাপারী। যিনি নিজ যুগের, তিনি ধর্ম্মের ইতিহাসে অবতার। যিনি যেভাবে চিরকালের আদর্শ স্বরূপ, তিনি সেই হিসাবে ভগবানের সহিত জড়িত। উদাহরণ দ্বারা কথাটা বোঝা যাক! পুরাণে দশ অবতারের মধ্যে মৎস্য, বরাহ ইত্যাদির উল্লেখ দেখিতে পাই। ইঁহারা, আমাদের মনে হয়, সংগ্রাম করিয়া জগতকে আদিম অবস্থায় উন্নতির পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিষ্ণু বা রক্ষণশীল দেবতার অংশ বিশেষ। আবার অন্যদিকে দেখিতে পাই, শ্রীরামচন্দ্র, বুদ্ধদেব প্রভৃতির নামও অবতারদিগের মধ্যে ধরা হইয়াছে। অথচ আংশিক হিসাবে ইঁহারা নিজ যুগ ছাড়িয়া চিরন্তন ভাবে মানব-মনে স্থান জুড়িয়া আছেন। এবং এই ভাবে তাঁহারা অবতারেরও বাড়া; ইঁহাদের ভগবানের অংশ বলিতেও ভাবুক জন কুণ্ঠিত হইবেন না। আমাদের মনে হয়, যীশুকেও যে তাঁর ভক্তগণ ভগবানের অংশ বলিয়া

চিনিয়া ল'ন, তাহাও এই হিসাবে পরিকল্পিত হইয়া থাকে। অবশ্য আমাদের মনে রাখিতে হইবে, যীশু মন্দের প্রতিরোধ করিবার বিধান না দিলেও, দুষ্কৃত ব্যক্তি যে কিরূপে দাবাগ্নির মধ্য দিয়া আত্ম-শুদ্ধির পথে অগ্রসর হ'য়, তাহার আভাস দিতে ছাড়েন নাই। তবেই দেখা যাইতেছে, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-জগতেও পাপের প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যম্ভাবী, যদিও খৃষ্টের জীবন আমাদের কাছে প্রেমের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

অবতারদিগের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে, মনের মধ্যে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে—তাঁহাদের পরস্পরের জীবনগত আদর্শ বা বাণীর মধ্যে কি কোন বিরোধ আছে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে কিংবা প্যালেষ্টাইনে বা আরব দেশে কিংবা অন্যান্য দেশে যুগ-ধর্ম্মের ধারা কিরূপে প্রবাহিত হইয়া পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা ইতিহাস পাঠকগণ অবগত আছেন। সাময়িক হিসাবে আলোচনা করিতে গেলে, নিজ-নিজ কাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা হিসাবে অবতারদিগের চরিত্রগত পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সকলেই ধর্ম্মপিপাসু ও ভগবৎ-সান্নিধ্য-প্রয়াসী; তাহা সত্য; কিন্তু সকলেই এক জিনিষ লাভ করেন না, বা প্রচার করেন না। আমাদের দেশেই দেখিতে পাই, বুদ্ধদেব জ্ঞানলাভ করিলেন, গুরুগোবিন্দ শক্তি লাভ করিলেন, আবার আমাদের নিমাই প্রেমে গলিয়া গেলেন। ভগবানের আশীর্ব্বাদে তাঁহারা আধ্যাত্মিক জগতে এক-একটি মণির মালা। সাধারণ মানুষ তাঁহাদিগকে ভক্তিভরে আলিঙ্গন করিয়া ধন্য হ'ন। আমরা অবাক্ হইয়া যাই—একই ভগবানের রাজত্বে এতপ্রকার ভিন্নপন্থী ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতা কিরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন। ভিন্নতার মধ্যে যাঁহারা অভিন্নকে পা'ন, রূপের মধ্যে যাঁহারা অরূপের আস্বাদ পান, তাঁহারাই নিত্য-নূতন অভিব্যক্তির মধ্যে সেই চির-পুরাতনের প্রকাশ বুঝিতে সমর্থ হ'ন। আমরা শুধু লক্ষ্য করিয়াছি, অবতারদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রতি বড়ই সহৃদয় ভাব প্রতিভাত হইয়াছে। সমসাময়িক সাধুজনের ত কথাই নাই, যাঁহারা কালভেদে বিচ্ছিন্ন, তাঁহাদের মধ্যেও হৃদ্যতা দেখা যায়। খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখিতে পাই, একজন অবতার আসিবার পূর্ব্বে তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তীগণ তাঁহার আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া যা'ন। আমাদের ঋষি-কবি চণ্ডীদাসও এক শতাব্দী পূর্ব্বে গোরাচাঁদের লীলার কথা ভাবের ঘোরে ভবিষ্যৎবাণী করিয়া গেলেন। এইরূপে প্রত্যেক দেশেই ধর্ম্মনেতৃগণ যেন সকলে মিলিয়া এক বিশেষ গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া আছেন। প্রেমের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ তাঁহাদিগকে অভিন্ন-হৃদয় করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু তাঁহাদিগকে শুধু জাতীয় সম্পত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া ক্ষান্ত হওয়া যায় না। সকল জাতির সকল মানবের বন্ধু তাঁহারা; কাল বিশেষে বা দেশ বিশেষে তাঁহাদের কাহারও প্রভাব সীমাবদ্ধ নহে। সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি যেমন কোন দেশ বিশেষের নহে, সমগ্র জগতের উপকারী দেবতা; সেইরূপ অবতারগণ সকল গৃহে সকল সংসারে অবতীর্ণ আছেন ও থাকিবেন। যিনি তাঁহাদের লইয়া সম্ভোগ করিতে পারিবেন, তাঁহারই পরিতৃপ্তি দিকে-দিকে ছড়াইয়া পড়িবে।

এইরূপে অবতারগণ যুগে-যুগে পৃথিবীতে আসিয়া মানবের আদর্শ স্থল হইতেছেন। তাঁহারা ঈশ্বর হইতে আসেন, আবার ঈশ্বরে ফিরিয়া যা'ন। তাঁহাদের এই ফিরিবার পথটুকু, তাঁহাদের জীবনে, আমাদের হিতার্থ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই পথে কি করিয়া চলিতে হয়, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। আমরা শুধু তাঁহাদের জীবনের চরম অবস্থা সম্বন্ধে যেটুকু সাধারণ ভাবে আলোচনা করিতে পারি, তাহাই বলিব। তাঁহাদের কাহাকেও দেখা যায়, ঈশ্বরের জ্ঞান অহরহ অর্জ্জন করিয়া সেই ভাবে ভগবানকে আত্মস্থ করিতেছেন। কেহ বা ঈশ্বরের নিকট হইতে মনকে টানিয়া লইয়া, নিজেকে আহুতি দিয়া, জীবে দয়া বিলাইয়া, অবিনশ্বর ধামে অগ্রসর হইতেছেন। আবার হয় ত কেহ প্রেমের আতিশয্যে বিশ্বকে ছাড়াইয়া, জীবনের সকল সম্পর্কে ঈশ্বরের ভালবাসা আস্বাদন করিয়া, তাঁহার সহিত মিলিয়া মিশিয়া আছেন। আধ্যাত্মিক জীবনের ভাষায় বলিতে গেলে, এই তিন অবস্থাকে আত্মানুভূতিতে ঈশ্বর দর্শন, বিশ্ব-অনুভূতির ভিতর দিয়া ঈশ্বরের সহিত যোগ, ও লীলা বলা যাইতে পারে। এই তিনটি অবস্থা হইতে অদ্বৈতবাদ, নির্ব্বাণ ও ভক্তিমার্গ মানব-মনে সচরাচর পরিকল্পিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ লোকে শঙ্কর, বুদ্ধ ও শ্রীচৈতন্যের মধ্যে এই তিন ভাবের প্রাচুর্য্য দেখিয়া, তাঁহাদের স্বরূপ বুঝিতে সচেষ্ট হ'ন। আমাদের কিন্তু বিশ্বাস, সকল অবতারের মধ্যেই এই তিন অবস্থা

একাধারে বর্ত্তমান আছে। তবে ব্যক্তিত্বকে ছাড়িয়া বিশেষত্বটুকু বুঝিতে যাই বলিয়া সামঞ্জস্যের দিক্‌টা আমাদের চক্ষে পড়ে না। উদাহরণ স্বরূপ আমরা খৃষ্টের কথা বলিতে চাই। তিনি এক স্থলে বলিতেছেন, "আমি এবং আমার পিতা একই।" আর এক স্থলে তাঁহার শিষ্যেরা যখন তাঁহাকে বলিলেন, "প্রভো, আমাদিগকে পিতার দর্শনলাভ করাইয়া দিন" তখন যীশু উত্তর করিলেন, "এতদিন আমি তোমাদিগের সঙ্গে আছি, তথাপি আমাকে কি জান না? যে আমাকে দর্শন করিল সে পিতাকে দর্শন করিল। তবে আমাদিগকে পিতার দর্শনলাভ করাইয়া দিন এ কথা কেমন করিয়া বলিতেছ?" এ অবস্থায় আত্মানুভূতির ভিতর দিয়া ঈশ্বর দর্শনের শেষ সীমায় দাঁড়াইয়া খৃষ্ট অদ্বৈতবাদ প্রচার করিলেন না কি? এক্ষণে কোন খৃষ্ট-ভক্ত শঙ্কিত চিত্তে বলিতে পারেন, "সাধারণের পক্ষে তাঁহার অবস্থা অনুধাবন করা সাধ্যাতীত।" আমাদের কিন্তু মনে হয়, যদি সাধারণ মানুষ ঈশ্বরের মত পূর্ণ হইতে অক্ষম হ'ন তাহা হইলে যীশু কখনও বলিতেন না, "তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন সিদ্ধ (perfect), তোমরাও তেমনই সিদ্ধ হও!" অন্য দিকে, বিশ্ব-অনুভূতির পথ ধরিয়া কি ভাবে বিশ্ব-প্রেমিক খৃষ্ট, আত্মবলি দিয়াছিলেন ও শত্রু-মিত্র সকলকে সমভাবে প্রেম করিতে বলিয়া গেলেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। তা'ছাড়া শিশুদিগকে কাছে টানিয়া, পতিতাকে উদ্ধার করিয়া, শিষ্যদিগের সেবা করিয়া কিরূপে তিনি ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ঈশ্বরের প্রেম আস্বাদন করিয়া লীলা করিলেন ও জীবনের সকল সম্পর্কে ঈশ্বরকে সম্মুখে রাখিয়া চলিতে বলিলেন, তাহাও উল্লেখযোগ্য। মোট কথা, এই তিনটি অবস্থার চরমে পৌঁছিয়া সকল অবতার জীবন্মুক্ত হইয়াছেন; এবং তাঁহাদের নির্দ্দেশ মত এই ত্রিধারার স্রোতে জীবন ভাসাইতে প্রত্যেক মানবই সমর্থ। এইরূপে অবতারগণ চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। একজন ভারতবর্ষীয় ভক্ত বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বর যে পরিমাণে খৃষ্টে, খৃষ্ট যে পরিমাণে আমাতে, ঈশ্বর সেই সেই পরিমাণে আমাতে।" প্রত্যক্ষভাবে ভালবাসিতে পারিলে, এ অভিমত সকল অবতারের সম্বন্ধে সত্য।

ভারতবর্ষীয় এবং পাশ্চাত্য অবতারবাদের যখন নানা ভাবে সাদৃশ্য দেখিলাম, তখন ইহাদের প্রভেদটুকু লক্ষ্য করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতে চাই।

ভারতবর্ষের ধার্ম্মিকমণ্ডলী অবতারগণের কৈশোরলীলা ও মধ্যলীলার প্রতি আকৃষ্ট হ'ন। পাশ্চাত্য ভক্তগণ খৃষ্টের অন্ত্যলীলার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া থাকেন; তাঁহার বাল্যকালের বা যৌবনকালের বিশেষ খবর রাখেন না। জীবন-লীলার মাধুর্য্য অফুরন্ত; সেইজন্য ভারতবর্ষের ভক্তগণের নিকট অবতারগণের সংখ্যা সামান্য নহে। মৃত্যুর আবরণ প্রত্যেকের জীবনে অভিনব হইলেও, ইহার একটি মর্ম্মস্পর্শী চিত্র পাশ্চাত্য জগতে সৃষ্ট হইয়াছে; এবং খৃষ্টের মহাপ্রয়াণ সম্বন্ধে কুমুদরঞ্জনের ভাষায় বলিতে গেলে :—

"যুগ যুগ ধরি কবি আঁকে সে করুণ ছবি
বেঁধে রাখে আঁখি জল ললিত গাথায়।"

খৃষ্টভক্তগণ ইহাতেই সন্তুষ্ট হ'ন নাই। তাঁহারা নানা ভাবে ক্রুশের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ স্থলে সে সমস্ত মতামতের উল্লেখ করিবার প্রয়োজন দেখি না। শুধু নমুনা স্বরূপ, হিন্দুস্থান স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এতাদৃশ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যাহা প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি :—

"The Figure of the cross :—My will is represented well by a straight line—thus, running from birth to death in unbroken current through the flesh and the world in all manner of self-indulgence into the hidden abyss. God's will is represented by a perpendicular I thus, falling from heaven like a bolt of thunder. The two wills meet and from the figure of the cross + thus. It cuts me, severs me, hinders me, clogs me, compels me; but thy will, O God, saves me. That cross means the life and death of the son of God; "for me", therefore, "to live is Christ and to die is gain." (Heart beat, P. 59) তবেই দেখা যাইতেছে খৃষ্টের অন্তিমলীলা খৃষ্ট-ভক্তদিগের নিকট জীবন-সর্ব্বস্ব।

ভারতবর্ষীয় ভক্তগণের নিকট মৃত্যুর এই জ্বালাময়ী চিত্র ততটা হৃদয়গ্রাহী নহে। আমাদের মনে হয়, ইহা

শুধু আত্মজ্ঞানের পার্থক্য। যাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র ইহলোকের সুখ-সম্পদের প্রতি আস্থা স্থাপন করিতে নিষেধ করে, তাঁহাদের কাছে প্রত্যেক দিনটি মন্দের আধার, সমগ্র জীবন পরীক্ষাস্থল এবং ক্রুশই একমাত্র অবলম্বন। অন্যদিকে যাঁহারা অনন্ত জীবনের অনন্ত সুখ দুঃখের হিসাব মিলাইতে ব্যস্ত নহেন; জন্মমৃত্যু, পাপপুণ্য—যাঁহাদের কাছে সত্যের চেয়েও প্রবলতর হইতে পারে নাই, তাঁহারা, অবতারগণের জীবনের যে অংশে আনন্দময়ের ও জ্ঞানময়ের উপলব্ধি হইয়াছে, তাহারই সমাবেশ নিজ জীবনেও আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। একজন বেশী মাত্রায় বৈরাগ্য সাধন করিতে ইচ্ছুক; অপর-জন বিবেককে নানাপ্রকারে পরিপূর্ণ করিতে নিযুক্ত। অথবা বিবেক এবং বৈরাগ্য সকল দেশেই অনন্ত জীবন ও পরলোক সাধনের জন্য আবশ্যক সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

শোকাশ্রু

(ভক্তিভাজন মহাত্মা ৺অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের স্বর্গারোহণে)

শ্রী'বীরকুমার-বধ' রচয়িত্রী

তুমি নাকি চলি গেছ দেব!
সমস্ত ভারত আঁধারিয়া?
নিবে গেছে উজ্জ্বল তপন
হিমাচল পড়েছে খসিয়া?

তুমি নাকি চলি গেছ দেব!
বঙ্গ মা'র "কোহিনুর" মণি—
তোমা পেয়ে জননী কৃতার্থা,
কুলোজ্জ্বল, পবিত্র অবনী!

তুমি যদি চলি গেছ দেব!
তব শত সহস্র সন্তানে,
কে করিবে জিজ্ঞাসা, সংযমী,
মনুষ্যত্ব দিবে শিক্ষা দানে?

তুমি যদি চলি গেছ দেব!
অনাথেরা কার মুখ চাবে,
পিতৃস্নেহ মায়ের মমতা,
তারা আর কার কাছে পাবে?

রোগার্ত্ত অভাগা অশরণ
মাথা রাখি স্নেহকোলে কার,
মা'র সেবা লভি কার হাতে
শান্তি, তৃপ্তি পাবে মরিবার?

সত্য, প্রেম, পবিত্রতা মাখি
কে গড়িবে সাধু পুণ্যবান—
মহাপাপী জগাই মাধাই,
"ভক্তিযোগে" পাবে নবপ্রাণ?

তুমি যদি চলি গেছ দেব!
আমরা কি দিব পরিচয়—
তুমি যে গো জাতীয় গৌরব,
বাঙ্গালীরে সবে ধন্য কয়!

স্নিগ্ধ সৌম্য ও দেব-মূরতি
আর মোরা পাব না দেখিতে,
মানব দেবতা হয় কিসে
তাও আর পাব না শিখিতে?

উছলিয়া উঠিছে জাহ্নবী
পরশি পবিত্র চিতা তব,
স্বরগে মঙ্গল-বাদ্য বাজে,
সেথা আগমনী মহোৎসব!

আমাদেরি নিভে গেছে আলো,
শুকায়েছে সুখের জলধি,
বিশ্ব যেন শুষ্ক মরুভূমি,
এ শোকের নাহি যে অবধি!

আমরা অধম দুরাচার
তাই কি দেবতা, গেলে ছাড়ি?
সৌভাগ্যের অযোগ্য আমরা,
তাই কি নিয়তি নিল কাড়ি?

কেন গেলে দেবর্ষি বশিষ্ঠ!
আত্মত্যাগী, যোগী, সত্যব্রতী!
কে ঘুচাবে জাতি-দুরদৃষ্ট,
কি হবে মা অরুন্ধতী-গতি?

আমরা কি হারায়েছি তোমা—
না না না না সে কি সর্ব্বনাশ,
দীপ্তিমান জ্যোতিষ্কের মত
তব দীপ্তি স্থির অবিনাশ!

চিরজীবী সতীর দয়িত
চিরজীবী দেব-প্রাণ যার,
চিরজীবী ও পুণ্য-চরিত
চিরজীবী অশ্বিনীকুমার'!

বিপর্য্যয়

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল্

৪১

ইন্দ্রনাথের মায়ের মূর্চ্ছা একটু গুরুতর রকমের হইয়াছিল। সমস্ত দিন ধরিয়া তিনি পুনঃ পনঃ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন,—বাড়ীর সবাই অত্যন্ত ভয় পাইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি অনেকটা আস্বস্থ হইলেন।

স্ত্রীর রকম সকম দেখিয়া ইন্দ্রনাথের পিতা অত্যন্ত ভড়কাইয়া গিয়াছিলেন। শেষে তিনি উপযাচক হইয়া স্ত্রীকে ব'ললেন, "আমি মনোরমাকে নিয়ে আসবো,—তাকে আর কিছু বলবো না,—তুমি সুস্থ হও।"

ইন্দ্রনাথ এই শুভসংবাদ লইয়া মনোরমাকে আনিতে গেল। পরম আনন্দিত চিত্তে সে অনেক দিনের পর অমলের বাড়ীতে প্রবেশ করিল। ঘরে ঢুকিয়া সে যে দৃশ্য দেখিল, তাহাতে সে বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে-সঙ্গে তার মনে হইল আর এক দিনের কথা, যে দিন অমল এই বাড়ীতেই ঠিক এমনি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। তবে প্রভেদ এই যে, তখন ইন্দ্রনাথ ছিল প্রায় নির্দ্দোষ, আর আজ অমল নিজে;—ইন্দ্রের মনটা ক্ষেপিয়া উঠিল।

সে কেবল বলিল, "অমল, এ কি!"

এক মুহূর্ত্ত অমল লজ্জায় স্তব্ধ হইয়া রহিল। তার পর একবার সে মনোরমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল—সে লজ্জায় ভয়ে যেন মরিয়া যাইতেছে। অমল হাসি-মুখে ইন্দ্রনাথের কাছে অগ্রসর হইয়া বলিল, "ভাই, আমায় congratulate কর—পরশু আমাদের বিয়ে।"

অমল ইন্দ্রনাথের হাত ধরিল, কিন্তু ইন্দ্রনাথ বেশ একটু জোরের সঙ্গে তার হাত ছাড়াইয়া লইল।

অমল দুই পা পিছাইয়া গিয়া মনোরমাকে ধরিয়া দাঁড়াইল। তীব্র শ্লেষের দৃষ্টিতে ইন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া বলিল, "কুণ্ঠিত হ'চ্ছ ভাই? দুঃখ হ'চ্ছে, তোমার এই উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত, তাড়িত ভগ্নীটির একটা দৃঢ় আশ্রয় মিলেছে বলে'? বড় দুঃখ হ'য়েছে, অভিমানে তোমার বড় আঘাত লেগেছে একে তোমার পায়ে ধরে' সাধতে হ'বে না ব'লে, দু'মুঠো অন্নের জন্য তোমার কাছে ফিরে ফিরে ভিক্ষা করতে হবে না বলে! দুঃখ করো না ভাই, ভগবানের এমনি বিচার। যখন মানুষ সাহস করে' বিচারের নাম করে হিংসা ক'রতে যায়, তখন তিনি অনেক সময়েই সে বিচারের শিকারটা এমনি করে' কেড়ে নিয়ে পরিহাস করেন। এক দিন শক্ত ঘা' খেয়ে আমি এই কথাটা বুঝেছিলাম—সে কথা তোমার মনে না থাকবার কথা নয়।"

এই শেষ খোঁচাটায় ইন্দ্রনাথের মনের গড়া চড়া-চড়া কথাগুলি একেবারে মুশড়িয়া পড়িল। সে কতকটা নরম

ভাবেই বলিল, "তুমি যে কথাগুলো বল্লে, সে যে কত বড় মিথ্যা, তা' যে তোমার অন্তর না জানে, এ কথা আমি মনে করি না। মনোরমাকে আমি ত্যাগ করেছি, তুমি আশ্রয় দিয়েছ; আমি তার উপর অত্যাচার করেছি, আর তুমি তা'কে ভালবেসেছ! সে অকূলে ভেসে গেছে, আর তার উপায় নেই, তোমাকে যে কোনও মূল্য দিয়ে আশ্রয় করা ছাড়া তার গতি নেই, এই বুঝিয়ে তুমি যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও মনোরমাকে তা'র এত দিনকার আদর্শ থেকে স্খলিত ক'রেছ, এ যে তোমার কত বড় নীচতা তা কি তোমার একটিবারও মনে হ'লো না। তোমার হাতের ভিতর সে এসে প'ড়েছে বলে তাকে তুমি এমনি ক'রে—ওঃ কি বলবো, মুখে আমার কথা সরছে না। অমল, তুমি এত বড় পাপিষ্ঠ!"

অমল তার ক্রোধ চাপিয়া বলিল, "দেখ ইন্দ্রনাথ, তোমার নিজের মনটা খাটো বলে, সবাইকে অতখানি খাটো মনে করো না। মনোরমা আমার হাতের ভিতর এসে পড়েছে, সে নিতান্ত অসহায়, তাই ব'লেই যে আমি তাকে আত্মসাৎ ক'রতে চেষ্টা ক'রবো, এত বড় নীচ আমি নই—আমি তেমন কোনও চেষ্টা করেছি কিনা, তা' তোমার বোনের কাছেই জিজ্ঞাসা করো। তার পর তোমাদের ব্যবহার আমার কাছে যতই পশুর মত মনে হ'ক না কেন, আমার মনের কথা তোমার বোনের কাছে খুলে বলে' তার মনে ব্যথা দেব, এত বড় ছোটলোক আমি নই। আচ্ছা, তোমার মনের ভিতর এ কথাটাও তো একবার আসতে পারতো যে, আমরা দু'জনে দু'জনকে হয় তো বরাবরই ভালবেসে এসেছি—আজ বিধাতার চক্রে সেই দুটি ভালবাসার ভিতর-কার পরদাটা খসে পড়েছে! তা' কেমন করে হ'বে! সেটা শুধু যে সত্য হ'ত তাই নয়, সেটা মনে করায় তোমার যে একটা স্বভাব-বিরুদ্ধ উদারতা দেখান হ'ত।"

ইন্দ্রনাথ মনোরমার মুখের দিকে চাহিল। মনোরমা যে নিঃশেষ নির্ভরের সহিত অমলের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল, ইন্দ্রনাথ তাহা দেখিল। তা'র চোখের ভিতর অনন্ত প্রীতির ছায়া দেখিতে পাইল—তার পর ইন্দ্রনাথ নীরবে মাটির দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল।

মনোরমা যে অমলকে ভালবাসিয়াছে, এ সম্বন্ধে আর তাহার সন্দেহ রহিল না। কিন্তু ইহাতে তাহার হৃদয় আনন্দে অভিষিক্ত হইল না। মনোরমা ইহাতে তাহার মনের চক্ষে অনেকগুলি ধাপ নামিয়া গেল। বিধবা ব্রহ্মচারিণী মনোরমা,—তত্ত্বজ্ঞানী, সত্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মপ্রাণ মনোরমার আদর্শ সে এতদিন ধ্যান করিয়া প্রীতি গর্ব্ব ও আনন্দে পরিপ্লুত হইয়াছে; এ মনোরমা যে সে মনোরমা নয়—সাধারণ নারী মাত্র, এ কথা ভাবিতে তার মনে একটা বিষম খোঁচা লাগিল। বিধবা-বিবাহ যে অবস্থা বিশেষে ভাল, তাহা সে এতদিন স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। তা' ছাড়া এই মনোরমারই বিবাহের সম্ভাবনা কল্পনা সে এক দিন করিয়াছে কিন্তু তার পর এত দিন চলিয়া গিয়াছে মনোরমাকে সে এত দিন এতটা স্বতন্ত্ররূপে জানিয়াছে যে, বিবাহের নিম্ন আদর্শটা মনোরমার সম্বন্ধে খাটিতেই পারে না, এ কথা সে ধরিয়া লইয়াছিল। তাই এই দারুণ কথাটা তার বুকে শেলের মত বিঁধিল।

অমলও অনেকটা নরম হইয়া বলিল, "কি ভাবছো ইন্দ্রনাথ! তুমি কি মনে ভাব অমল মিত্তিরের আর বিয়ে হ'বার কোনও সম্ভাবনা ছিল না! আমিও জানি, তুমিও জান যে, আমি ইচ্ছা ক'রলে খুব ভালই বিয়ে ক'রতে পারতাম। তবে এত রাজ্যি ছেড়ে কেবল তোমার এই বোনটিকেই বিয়ে ক'রতে চাইলাম, কিসের জন্য?—এ কি কেবল একটা ঝোঁক! আমাকে এমন ঝোঁকের মাথায় এত বড় একটা কাজ কোনও দিন ক'রতে দেখেছ! তা নয় ইন্দ্রনাথ—আমি মনোরমাকে ভালবেসেছি, মনোরমাও আমাকে ভালবেসেছে—আজ নয়, অনেকদিন থেকেই আমরা পরস্পরকে ভাল বেসেছি। এটা আনন্দের কথা, সৌভাগ্যের কথা! তুমি ভুল বুঝে, এ নিয়ে একটা দুঃখ গড়ে তুলো না।"

ইন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া শেষে উৎকণ্ঠিত মনোরমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "মনোরমা, অমলের এ কথা সত্য?"

মনোরমা হঠাৎ রক্তজবার মত লাল হইয়া গেল। মাটির দিকে চাহিয়া অত্যন্ত মৃদুস্বরে সে বলিল, "সম্পূর্ণ।"

ইন্দ্রনাথ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তবে আমি তোমাদের সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ ক'রছি, তোমরা সুখী হও। অমল, তোমায় বৃথা কটু কথা ব'লেছি, ক্ষমা করো।"

অমল লাফাইয়া আসিয়া ইন্দ্রনাথের হাত ধরিয়া খুব করিয়া ঝাঁকাইয়া দিল। ইন্দ্রনাথ কিন্তু এই সম্ভাষণে তার মত মাতিয়া উঠিতে পারিল না। অমল হাত ছাড়িলে সে একটা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল।

অমল বলিল, "Cheer up old boy! আবার ভাবছ কি?"

ইন্দ্রনাথ বলিল, "ভাবছি অমল, বাবা মাকে এ খবর কি ক'রে দেব!"

অমল বলিল, "কেন, তাঁদের পরিত্যক্ত কন্যা ভেসে যায় নি, একটা আশ্রয় পেয়েছে, পাপে ডোবে নি, ধর্ম্মপথে আছে—এ কথা শুনলে কি তাঁদের বুক ভেঙ্গে যাবে মনে হচ্ছে?"

ইন্দ্র। তা নয় ভাই, অবস্থা এখন সম্পূর্ণ অন্যরূপ,—আমি এখন মনোরমাকে নিতে এসেছিলাম!"—বলিয়া ইতিমধ্যে তাহাদের বাড়ীতে যাহা হইয়াছে, সব কথা বলিল।

মনোরমা আনন্দিত হইল, সে অমলের দিকে চাহিয়া বলিল, "তবে আমি আজ দাদার সঙ্গে বাড়ী যাই না? একেবারে পরশু এসে"—বলিয়া লজ্জিত হইয়া থামিল।

অমল জিজ্ঞাসা করিল, "সে হ'বে কি ইন্দ্রনাথ?"

ইন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আমার তো মনে হয় না যে বাবা থাকতে ও আর বাড়ী থেকে বেরুতে পারবে!"

মনোরমার স্মিত মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল।

অমল বলিল, "তবে একেবারে পরশু রাত্রে বিয়ের পর গিয়ে তাঁদের নমস্কার ক'রে আসবো, কি বল মনোরমা?"

মনোরমা মাথা নীচু করিয়া হাসিল। একখানা মোটর আসিয়া গাড়ী বারান্দায় থামিল। তাহার ভিতর হইতে পিল পিল করিয়া কতকগুলি যুবতী ও প্রৌঢ়া বাহির হইয়া হাস্য কলরবে গৃহ মুখরিত করিয়া তুলিলেন। পিছু পিছু একটি আধাবয়সী ভদ্রলোক নামিয়া চুরোট কামড়াইয়া অমলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "Oh you sly old fox!"

একটি সুন্দরী বলিলেন, "But where is the vixen."

আর এক সুন্দরী হাসিয়া বলিলেন, "এটা তোমার বড় বাড়াবাড়ি jealousy অমি! অমল তোমার হাতছাড়া হয়েছে ব'লে যে তার স্ত্রীকে তুমি vixen ব'লবে, তার কি মানে আছে?" অনি ইহাকে একটা ঠোণা মারিয়া বলিল, "ওঃ বড় যে দরদ; jealousy তোর না আমার?"

মনোরমাকে এই দলের ভিতর ঠেলিয়া দিয়া অমল বলিল, "vixen না fairy, পরখ করেই নেও না অনি।" তখন একটা ভয়ানক হাসাহাসি মাতামাতি লাগিয়া গেল। অমল ক্রমে তাহাদের প্রত্যেককে বসাইয়া, ইন্দ্রনাথ ও মনোরমাকে তাহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আলাপ করিয়া দিল। চারু দি, সুশীলা দি প্রভৃতির নাম তার অনেক দিনই জানা ছিল, আজ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইল। অনেকক্ষণ আনন্দ-কল্লোলের পর মহিলার দল মনোরমাকে লইয়া চলিয়া গেলেন। অমল তাঁদের একজনের হাতে একখানা সাদা চেক সই করিয়া দিয়া দিল। তাঁহারা এখন বাজার ঘুরিয়া মনোরমার সাজ-পোষাক ও বিবাহের সরঞ্জাম কিনিতে চলিলেন। বাজার হইয়া গেলে মনোরমা চারুদির বাড়ীতে যাইবে এবং আজ রাত্রে সেখানেই থাকিবে। পরশু বিবাহও সেখানেই হইবে স্থির হইয়াছে। মনোরমা মোটরে চড়িয়া একবার কাতর দৃষ্টিতে খোকার দিকে চাহিল। অমল তাড়াতাড়ি খোকাকে গাড়ীর ভিতর ঠেলিয়া দিতে গেল।

ইন্দ্রনাথ বলিল, "না থাক, আজ ও আমার সঙ্গেই চলুক।" মনোরমার মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। কিন্তু সবাই এই ব্যবস্থাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন।

৪২

ইন্দ্রনাথের সবই যেন স্বপ্ন বলিয়া মনে হইল। এরা যেন কেউ মানুষ নয়! ওই মেয়েগুলি এই যে প্রজাপতির মত, উড়িতেছে,—এই মুহূর্ত্তে যেন তারা সব হাওয়ায় মিলাইয়া যাইতে পারে। ঐ যে ইন্দ্রনাথের পরিচিত আর একখানা মুখ ভাসিয়া বেড়াইতেছে—বাস্তবতা সম্বন্ধে ইহাদের সঙ্গে তাদের কোনও প্রভেদই সে দেখিতে পাইল না। সেটা যেন এদেরই মত সমান সত্য—সমান স্বপ্ন—সে মুখ যে এ বাড়ীর ভিতর সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া রহিয়াছে, এ বাড়ীর সব ঐশ্বর্য্যে যে তার ছাপ রহিয়াছে—অনীতা ছাড়া কি এ বাড়ী কল্পনা করা যায়!

ইন্দ্রনাথের মনে ভারি আশ্চর্য্য বোধ হইল এই যে, তার

দুঃখিনী বোন মনোরমা এই সব ঐশ্বর্য্যের মালিক হইবে—অনীতার জায়গায় সে-ই এ বাড়ীর অধীশ্বরী হইবে—এ কি সত্য? সে ভাল করিয়া চোখ রগড়াইয়া দেখিল, স্বপ্ন নয়। ঐ যে দামী সাড়ী-পরা মেয়েটিকে লইয়া সবাই নাচানাচি করিতেছে, সমস্ত বাড়ীটা যাকে চারিদিক হইতে স্নেহের সহিত বেষ্টন করিয়া ধরিতেছে—সে সত্যই সেই মনোরমা, না স্বপ্ন,—কে জানে?

মনোরমা,—দুঃখিনী বিধবা মনোরমা এই ঐশ্বর্য্যের মধ্যে রাণী হইয়া বসিবে। যে সংসার, যে ঐশ্বর্য্য, যে সৌষ্ঠব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া ইন্দ্রনাথ তার নিজের সংসারের সমস্ত আয়োজনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিত, লোলুপ দৃষ্টিতে যে আদর্শ আয়ত্ত করিতে সে চাহিত—সে সব মনোরমার! এও কি সম্ভব? কিন্তু সেই সংসারই কি? কই—তবে যে এ সংসারের ক্ষুদ্রতম বস্তুটি একটা সৌন্দর্য্যরসে ভরিয়া রাখিত, যার চরণস্পর্শে সমস্ত গৃহ পুলকিত, উজ্জ্বল হইয়া উঠিত সে অনীতা কই - অনীতা আর এ সংসারে নয়, তার স্থানে আজ মনোরমা! কি আনন্দ! কি দুঃখ! কি সৌভাগ্য দুঃখিনীর! কি দুর্ভাগ্য অনীতার!

আর একটি চিত্র ইন্দ্রনাথের মনে ভাসিয়া উঠিল—সেটি মনোরমার প্রথম স্বামীর—ব্যথিত, পীড়াক্লিষ্ট, দারিদ্র্য-পীড়িত সেই যুবক যে শেষ দৃষ্টি দিয়া আশ মিটাইয়া মনোরমার দিকে চাহিয়া দেখিয়াছিল—সেই মুখ, সেই দৃষ্টি মনে পড়িল। বুকের ভিতর কাঁটার মত এ ছবি বিঁধিল,—ইন্দ্রনাথের চক্ষু ভরিয়া উঠিল।

সবাই চলিয়া গেল। ইন্দ্রের চোখের সম্মুখে আবছায়ার মত ভাসিতে লাগিল—অমলের আনন্দ-উজ্জ্বল মুখ! তা'র প্রাণে শেষে সত্য-সত্যই আনন্দের ছোঁয়াচ লাগিয়া গেল।

তার পাশে তার হাত ধরিয়া খোকা করুণ কণ্ঠে ডাকিল "মামা!"

স্বপ্নের রাজ্য হইতে ইন্দ্রনাথ ধপ্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল, তা'র প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। এ ডাকের ভিতর সে দেখিতে পাইল, বিশ্বের যত দুঃখ, যত বেদনা জমাট হইয়া রহিয়াছে। মনোরমা আজ যে ইহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে—এটা যেন এ শিশুর জন্মের শোধ দুঃখের নিমন্ত্রণ। এই শিশু মনোরমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিল—এখন এ মা হারাইল। প্রেমের আবর্ত্তে পড়িয়া মনোরমা এ শিশুকে আর কি সে আদর, সে যত্ন দিতে পারিবে? সেই ঘূর্ণাবর্ত্তের পাকে এই ক্ষুদ্র শিশু তার হৃদয় হইতে ছিট্‌কাইয়া কোথায় পড়িবে কে জানে? সে শিশুকে বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিল।

অমল আসিয়া তাহাকে কোলে টানিয়া লইল। তার যত দামী দামী সুন্দর খেলনা ড্রইং রুমে সাজান ছিল, সব তাহাকে উপহার দিয়া বসিল। তার পর ইন্দ্রনাথকে বলিল, "চল, খোকাকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসা যাক।"

মোটরে করিয়া সে ও ইন্দ্রনাথ খোকাকে নানা জায়গায় ঘুরাইয়া বেড়াইল; বায়স্কোপ দেখাইল, নানা রকম খাবার খাওয়াইল, আর নূতন পোষাক, কাপড়, বাঁশী, খেলনা প্রভৃতি একরাশ কিনিয়া আনিল। তার পর অমল তার বাড়ীর কাছে নামিয়া খোকাকে চুম্বন করিয়া ইন্দ্রনাথের কোলে দিল। মোটর অনেক রাত্রে তাহাদিগকে ইন্দ্রনাথের বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিল।

ইন্দ্রনাথের পিতা তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। মায়ের শয্যাপার্শ্বে সরযূ বসিয়া সেবা করিতেছে।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই বাবা?—এই যে দাদু! ওঃ, এত খেলনা কোথায় পেলে।"

খোকা বলিল, "এ সব আমি নিজে দেখে কিনেছি" বলিয়া একটি একটি করিয়া সবগুলি খেলনা দেখাইতে লাগিল।

মা আবার বলিলেন, "কই বাবা, সে কই?"

ইন্দ্রনাথ কেবল বলিল, "সে আজ এলো না। পরশু আসবে।"

"কোথায় আছে সে? ভাল আছে?"

"হাঁ ভাল আছে। অমলের চারুদির বাড়ীতে সে আছে, তার জন্য কোনও চিন্তা নাই।"

"আহা! অমল আর জন্মে আমার বাপ ছিল নিশ্চয়। বাছাকে পথে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছিলেন উনি।" বলিয়া তিনি অশ্রু মোচন করিলেন।

ইন্দ্রনাথ একথা সেকথার পর বলিল, "মা, তুমি একবার ব'লেছিলে মনে আছে, 'মনোরমার আবার বিয়ে দে।' এখন আমার মনে হ'চ্ছে, তার বিয়ে হ'লেই ভাল হয়, না?"

মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "তা' হ'ত বই কি বাবা, কত মেয়ে তো বিধবা হ'য়ে ফের বিয়ে ক'রে সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার ক'রছে।"

"হ'ত, কেন মা। এখনো কি হয় না?"

"কে জানে? এখন আর কেই বা ওকে বিয়ে ক'রবে?"

"যদি কেউ করে, যদি খুব ভাল ছেলে হয়, তবে তুমি কি বল?"

মা উঠিয়া বলিলেন, "তুই কি বলছিস্? এ কথা কেন জিজ্ঞাসা ক'রছিস বল!"

মায়ের মুখের ভাব দেখিয়া ইন্দ্রনাথের ভরসা হইল। সে বলিল, "মনোরমা এলো না কেন জান? পরশু তার বিয়ে!"

উত্তেজিত কণ্ঠে মাতা বলিলেন, "বলিস্ কি? কার সঙ্গে বিয়ে?"

"অমলের সঙ্গে।"

সরযূর হাতের পাখা পড়িয়া গেল—মুখ চোখ হাঁ করিয়া সে স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল। ইন্দ্রের মাও অবাক্ হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ কেউ কিছু বলিল না।

মায়ের বুকে যে সব বিরুদ্ধ শক্তির সংঘাত হইতেছিল তাহা কে বর্ণনা করিবে। কিন্তু শেষে তাঁর স্নেহই জয়ী হইল। স্মিতমুখে তিনি বলিলেন, "বেঁচে থাকুক!" অমল ও মনোরমাকে দেখিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

সরযূ বলিল, "হাঁ গো, সত্যি নাকি? উপায় কি হ'বে?" মায়ের কথায় ইন্দ্রনাথের বুক হইতে একটা বোঝা নামিয়া গিয়াছিল। সে হাসিয়া বলিল "উপায় আর কি হ'বে—তোমার যা উপায় হ'য়েছে, সেই রকমই,—তবে একটু জাঁকাল গোছের। বড় বাড়ী, জুড়ী, মোটর, টাকার কাঁড়ি—এই সব সামান্য প্রভেদ!"

সরযূরও মনে প্রথমে ব্যাপারটা একটু খোঁচা দিয়াছিল। কিন্তু অমলের বাড়ীর জাঁক-জমক, আর অমলের স্বভাব-চরিত্রের স্মৃতিতে তার মনের গ্লানি অনেকটা কাটিয়া গেল। তখন তার জানিতে ইচ্ছা হইল, কি করিয়া এমনটা হইল। মনোরমাকে নিরিবিলি ডাকিয়া সব কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য সে অস্থির হইয়া উঠিল। ইন্দ্রের কথার উত্তরে সে মৃদুস্বরে বলিল "মরণ আর কি? আমার সে উপায় হ'তে যাবে কেন? আমার কি ঠাকুরঝির মত দশা।" "বালাই, ষাট!" বলিয়া ইন্দ্রনাথ নিজের গায়ে ও মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল, বলিল, "তা হ'তে যাবে কেন? ষাট! আমার শত্রু মরুক!" সরযূ একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "তা মরে কই? ম'লে তো আর একটা উৎসব দেখা যেত।"

ইন্দ্রের এ কথাটা ভাল লাগিল না, সে বলিল "তার মানে?" সরযূ মুখখানা একটু নীচু করিয়া রহিল, কথা কহিল না শেষে সে সম্পূর্ণ অপ্রসাঙ্গিক ভাবে বলিল, "অনীতার সঙ্গে দেখা হ'য়েছে?" ইন্দ্র গম্ভীর ভাবে বলিল, "না।" আর কিছু বলিল না।

ইন্দ্রের মা অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, "এ কথা ওঁকে এখন ব'লে কাজ নেই। ভালয় ভালয় বাড়ী যাই, "তার পর বলা যাবে।"

ইন্দ্র এ কথার যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিল; কিন্তু বলিল, তারা যে পরশু দিন জোড়ে আসবে তোমাদের আশীর্ব্বাদ নিতে।"

মা বলিলেন, "তার কাজ নেই, তুই বারণ করিস্। আমিই তাদের বাড়ীতে গিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রে আসবো।"

সরযূ নীরবে খোকাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। কি জানি কেন, খোকাকে দেখিয়া তার বুকের ভিতর কান্না ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

———

নিয়ম-রক্ষা *

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি-এ

এক দিন কোন ভাগ্যবান বড় সাধে দেবায়তন রচনা করিয়া তাহার স্তম্ভে প্রাচীরে কৃত্রিমে সোণার গাছে হীরার ফুল ফুটাইয়াছিলেন। সেই হীরার জৌলুসে যাহাতে গর্ভ-গৃহ-প্রান্তের এতটুকু সুপ্ত অন্ধকারও লুপ্ত হইয়া যায়, সে জন্য অনেক মূল্যে স্ফটিকের ঝাড় কিনিয়া, ঝাড়ের শত বাহু দিকে দিকে মেলিয়া দিয়াছিলেন—বাহুতে বাহুতে গন্ধ-তৈলের দীপ জ্বলিয়াছিল। সে সুরসজ্জের সমুন্নত চূড়ায় সেদিন মহাকালের ত্রিশূলের শিখরে শিখরে তপ্ত তপনের দীপ্ত কিরণ সাগ্নিক ব্রাহ্মণের হোমশিখার মত ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিত উঠিত। আজ তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! স্বয়ং নীলকণ্ঠ আজ বিষের জ্বালায় অচৈতন্য—তাই বুঝিতে পারিতেছেন না, তাঁহারই করধৃত যে শূল একদিন বহু দৈত্যদানব বিনাশ করিয়াছিল—আজ তাহা তাঁহারই অস্থিপঞ্জর ভেদ করিতেছে!

গর্ভগৃহের বামে দক্ষিণে, প্রান্তে কেন্দ্রে একদিন যে সকল মহার্ঘ্য ঝাড় জ্বলিয়াছিল, তাহাদের শাখা প্রশাখা ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতেও যাহা আছে, তাহাদের মাথায় মাথায় ঘৃতের দীপ জ্বালিয়া দিবার কাহারও না আছে সাধ না আছে সাধনা—না আছে শক্তি, না আছে ভক্তি। এ কালের গৃহস্বামী সেই কলঙ্কলাঞ্ছিত রত্নবেদীকে বিড়ম্বনার সমান জ্ঞান করিয়াও ভয়ে ভয়ে তাহারই পাদমূলে একটী ভগ্ন জীর্ণ মৃন্ময় প্রদীপ জ্বালিয়া দূরে দাঁড়াইয়া পরিতৃপ্ত হৃদয়ে দেখিতেছেন—নিয়মরক্ষার ব্যাঘাত ঘটে নাই ত! সেই স্তিমিতপ্রায় প্রদীপের কম্পিত শিখা যে এখন ঘূর্ণ্যমান চামচিকার বাতাসেই নিবু নিবু, সেটা যে তিনি দেখিতেছেন না, তাহা নহে! দেখিতেছেন—কিন্তু পিতৃপুরুষের সে পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ করিবার সাহসও নাই—ইচ্ছাও নাই! দেশীর মাথায় বিদেশী পরগাছা এখন জাঁকিয়া বসিয়াছে।

নিয়ম-রক্ষার মোহ এমনি করিয়াই আমাদিগের জ্ঞান বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে যে, আমরা পরম সুখে শাঁস ফেলিয়া খোসাকেই লেহন করিতেছি। অধর যে প্রতি পলে রুধিরসিক্ত হইতেছে সেদিকে লক্ষ্য নাই! আমরা চলিয়াছি বারোয়ারি তলায় দেবীর চরণের সন্ধানে—এ দিকে চণ্ডী-মণ্ডপের অন্তরে সারির পর সারি বাদুড় ঝুলিতেছে! হাটে যেখানে সাগর-কল্লোল উত্থিত হইতেছে, সেইখানে খুঁজি-তেছি তপশ্চরণের আসন,—যে শ্মশানের আগুন রাবণের চিতার মত জ্বলিতেই আছে, পূজার কুসুম চয়ন করিবার জন্য আমরা সেইখানে চলিয়াছি! যাহারা এমন করিয়া নিজেকে ফাঁকি দিতে পারে, তাহারা যে বিশ্বকে ঠকাইতে চাহিবে, সে আর একটা বেশী কথা কি? ভালো জহুরী যে, সে অনায়াসেই চিনিয়া ফেলে আসল কি ঝুট—রাং কি সোণা। পদে পদে তাই ধরাও পড়িতেছি—কিন্তু মোটেই সেটা স্বীকার করি না! আমরা—

> "বিজ্ঞভাবে নাড়িব শির
> অসংশয়ে করি স্থির
> মোদের বড় এ পৃথিবীর
> কেহই নহে আর।"

এ কথা আমরা ভাবি না—

> "পরের কাছে হইব বড়
> এ কথা গিয়ে ভুলে'—
> বৃহৎ যেন হইতে পারি
> নিজের প্রাণ-মূলে।"

ভাবি না—

> "ক্ষুদ্রতার মন্দিরেতে
> বসায়ে আপনারে,
> আপন পায়ে না দিই যেন
> অর্ঘ্য ভারে ভারে।
> জগতে কত মহৎ আছে
> হইব নত সবার কাছে,
> হৃদয় যেন প্রসাদ যাচে
> তাদের দ্বারে দ্বারে।"

* উলুবেড়িয়া আনন্দময়ী সেবা-সমিতিতে পঠিত।

হায় রে! যাহাদের দুর্গোৎসব প্রতি দিনের ছিল, তাহাদের দুর্গোৎসব এখন বর্ষের পরে আসে—আর তাহার আগমনী বাজে এখন গ্রামোফোনে; ভক্তের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে নহে! একদিন দুর্গোৎসব যাহাকে রিক্ত করিয়া বিলাইয়া দিত - তাহার পূজা-মণ্ডপে প্রবেশ করিতে এখন নিদর্শন-পত্র চাই! যেখানে অন্নকুট বসিত, এখন সেখানে ভাড়া-করা মিষ্টান্নের থালি! মহাদেবীর মহাস্নানের জন্য এক দিন যাহারা কত না ব্যয়ে কত না শ্রমে সপ্তসিন্ধুর বারি আনিত—পদ্মরেণুদকে ভৃঙ্গার পূর্ণ করিত—সহস্র ধারায় সরস্বতীর বারি ঢালিত—আজ তাহারা শুধু গঙ্গাজলেই নিয়ম-রক্ষা করিতেছে। এখনও সঙ্কল্প করিয়া পূজা আরম্ভ হয় বটে, কিন্তু শেষ হয় বিকল্পে।

এই যে বাঙ্গালার সমাজ—কত বৃদ্ধ, কত পুরাতন। যুগের পর যুগ আপনার শক্তিকে ব্যয় করিতে সে কুণ্ঠিত হয় নাই। পাঠান, মোগল, ইংরাজ সকলেই এক একবার বেশ নাড়া দিয়াছে। এত ঝড় যাহার মাথার উপর দিয়া গেল—সে কি এখনো বাঁচিয়াই আছে? গঙ্গায় ভাটার টানের মত যাহার প্রাণ-শক্তি ব্যয়িত হইয়াছে—আমরা এখন শুধু ইন্‌জেক্‌সনের বলে তাহাকে নবজীবন দান করিতে প্রয়াসী। মৃতকল্প মানুষ কি সূচের খোঁচায় সাড়া দেয়?

কালের স্রোত অবিরাম গতিতে চলিয়াছে। সে যেন অপ্রতিহত জোয়ারের জল। বুদ্ধিমান সে, যে সেই জোয়ারকে অনুকূল করিতে পারে। জগন্নাথের রথের মত আমাদের এই সমাজ—অনড়, অচল। তাহার পশ্চাতে ডুরি লাগাইয়া যতই আমরা টানিতেছি, ততই তাহার ভীষণ চক্রগুলি আরও পঙ্কেই ডুবিতেছে! পৃথিবীর সমুদায় জাতি যখন আকাশের গ্রহ নক্ষত্র "টানিয়া ছিঁড়িয়া পাড়িয়া ভূতলে, নূতন করিয়া গড়িতে চায়"—আমরা তখন নিয়ম-রক্ষা করিতেই গলদ্‌ঘর্ম্ম! আমরা পুরাতনকেও পাইতেছি না, পাইলেও হৃদয়ের সকল শ্রদ্ধা দিয়া চাহিতেছি না,—আর নূতনকে লাভ করিবার জন্যও পাথেয় সংগ্রহ করিতেছি না। একটীর উপর ঘোর অরুচি—তবুও তাহাকে গলাধঃকরণ করিতেছি, রোগী যথা নিম খায় নয়ন মুদিয়া; আর, আর একটী লাভের জন্য যে দীর্ঘপথ পর্য্যটনের প্রয়োজন, আমাদের সে শক্তির অভাব। আমাদের সংসারে সর্ব্বদাই মধুর অভাব বলিয়া গুড় দিয়া ব্রত-নিয়ম পালন করিয়া আসিতেছি—মধু সংগ্রহ করিতে হইলে হুলটীকেও যে বরণ করিয়া লইতে হয়, সেই ভয় আমাদিগকে দিনের পর দিন এত অসহায় করিয়া তুলিতেছে যে, ফলে বাঙ্গালায় মরে যত, জন্মে তার অনেক কম—বাজারে কুইনাইন যত, ঘরে প্লীহা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। বিজ্ঞ বৃদ্ধেরা শুধু কপালে হাত দিয়া বলিতেছেন—'তাই ত! এ গ্রহ-বৈগুণ্য, এ বিধিলিপি,—যাহা হইবার হইবেই! কাহার সাধ্য যে এ অনুশাসনের বিরুদ্ধ অঙ্গুলী হেলন করে।

পুরাতন সমাজ—সে যতই কেন পুরাতন হউক না—একেবারে তাহাকে পরিত্যাগ করা চলে না। যুগ-যুগান্তের স্মৃতি তাহার সহিত জড়িত; যুগ যুগান্তের অভিজ্ঞতায় সে বৃদ্ধ, বহু ঝড়-তুফান সহিয়াও সে যখন আছে—মরে নাই, তখন বলিতে হইবে যে, তাহার অন্তরে কিছু সত্য আছেই—উহা একেবারে সারশূন্য নহে। কিন্তু এ কথা ঠিক নহে যে পুরাতন বলিয়াই তাহা সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ—তাহার আর সংস্কারের প্রয়োজন নাই। যুগধর্ম্ম যেদিকে আমাকে টানে, আমাকে সেই দিকেই যাইতে হয়। যদি না যাই, তবে সংঘর্ষের ফলে মৃত্যুকেই লাভ করিতে হয়।

প্রাণবন্ত জাতির সমাজও প্রাণবন্ত। সে সমাজ সংঘর্ষের ভয় করে না—মতবাদের ভয় করে না—তাহা আত্ম-প্রবঞ্চনা করিতে জানে না। চক্ষে যাহা দেখা যায়, তাহার চেয়ে বড় প্রমাণ নাই। বেশী দিন নহে, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু, শিখ, জৈন এবং বৌদ্ধদিগের একটী আদম-সুমারী হইয়াছিল। তাহার ফলে জানা গেল ৪ বৎসরেরও কম বয়সের বিবাহিত বালকের সংখ্যা ৮৯০৫১ এবং বালিকার সংখ্যা ২২৩৫৬৬; আরও দেখা গেল ৪ বৎসরের কম বয়সের বিধবার সংখ্যা ১০৬৪১"। ইহা দেখিয়াও যে সমাজ নিয়ম-রক্ষার জন্য গৌরীদান করিতে ব্যগ্র—সে সমাজের আমূল সংস্কারের প্রয়োজন নাই—(কারণ উহা অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং দেবতার দানে পরিপুষ্ট) ইহা যিনি বলেন, অচিরেই তাঁহার চিকিৎসার প্রয়োজন! যে আদম-সুমারীর কথা বলিলাম, তাহাতে আরও প্রকাশ হইয়াছিল যে, ৫ হইতে ৯ বৎসর বয়স্ক বিবাহিত বালকের সংখ্যা ছয়লক্ষ দুই হাজার এবং বালিকার সংখ্যা ১৮½ লক্ষ। এই বয়সের বিধবার সংখ্যাও তাই ৫২৭৫৯; তবুও অষ্টমে

গৌরীদানের নিয়ম রক্ষা না করিলেই নয়! স্বর্গটা কি এতই সহজলভ্য?

অশ্বলায়ন ও পরাশরের পরিচয় জানিবার জন্য আমরা ব্যাকুল হই বা না হই—গৌরীদান-রূপ নিয়ম-রক্ষার বিরুদ্ধবাদীদিগকে তর্কে পরাজিত করিবার জন্য অশ্বলায়ন ও পরাশরের মত অনায়াসে আবৃত্তি করিয়া থাকি। দুর্ব্বলের ইহাই লক্ষণ! যখন শুনি, মনু এবং বৌদ্ধায়ন গৌরীদানের ব্যবস্থা করেন নাই; যখন শুনি, সুশ্রুতের ন্যায় অসাধারণ চিকিৎসক দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন যে, ষোড়শবর্ষের রমণী বালিকা মাত্র; যখন শুনি, কোন কোন তন্ত্রের নির্দ্দেশও এইরূপ, তখনও আমরা নিরস্ত হই না! বলি পিতৃ-পিতামহ যাহা করিয়া গিয়াছেন, বিনা বিচারে তাহাই অনুসরণ করিতে হইবে, নতুবা নরক ভিন্ন গতি নাই। অন্ধ নিয়ম-রক্ষার এ সেই প্রাচীন এবং ভিত্তিহীন যুক্তি! পিতৃ-পিতামহ সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন, আমরা কি তাহাই? পিতৃ-পিতামহ ধর্ম্ম বুঝিতেন, ধর্ম্ম মানিতেন—আমরা কি কেহ অকপটে বলিতে পারি, কোন ধর্ম্মের ধার ধারি? আমরা যাহা মানি, তাহা খোসা-ভুষি মাত্র—তাহা রন্ধনশালা ও গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা! যে চিত্তশুদ্ধি সকল ধর্ম্মের সার, তাহা হইতে আমরা যে কত দূরে আছি, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। যে প্রেম সকল ধর্ম্মের প্রাণ, তাহা হইতে আমরা যে কত দূরে আছি, তাহা কি কোন দিন ভাবিয়া দেখিয়াছি?

আপনার ভীষণ বিষে ঘৃণা নিজেও জ্বলিয়া মরে, যে তাহাকে আশ্রয় দেয় তাহাকেও জ্বালাইয়া মারে। সমাজের অঙ্গে অঙ্গে সেই বিষের ফোস্কা, প্রলেপ লাগাইব কোথায়? মানুষ যেখানে মানুষকে এত ক্ষুদ্র করিয়া দেখে—এত অবহেলা করে—এত লাঞ্ছনার কালি তাহার গায়ে ঢালিয়া দেয়, সেখানে কল্যাণ থাকে না। জীবন রক্ষার যে প্রচেষ্টায় বাঁধ দিয়া জল বাঁধিতে হয়—আবার সেই কারণেই বাঁধ কাটিয়া জল বাহিরও করিয়া দিতে হয়। জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত জলের ঘড়াটীর মত একই নিয়ম রক্ষা করিতে গেলে সে শিকলটাই যে শেষে আমার কণ্ঠরোধ করিবে। আগে মানুষ—তার পর তাহার সমাজ—তার পর সে সমাজের মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, অশ্বলায়ন, পরাশর। আগে জীবন, তার পর সমাজ ও তাহার বন্ধন। এই বন্ধনও মুক্তি দেয়—বন্ধন প্রাণশক্তিকে উচ্ছৃঙ্খল হইতে দেয় না। উচ্ছৃঙ্খলতা ও মুক্তি এক নহে। সেই কারণেই সমাজ ও তাহার বন্ধন। সেই কারণেই পরাশর, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য। তাঁহারা শুধু এক যুগের নহেন—যুগে যুগে তাঁহাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিতেছে। যে যুগে স্বর্গ হইতে ভাগীরথীর ধারা নামিয়া রুদ্রদেবের জটার মধ্যে লীলায় খেলিয়াছিল—সে যুগের মহাদেব শূলাগ্রে সতীদেহ বহন করিয়া মহাব্যোমে বিচরণ করেন নাই—সে যুগের হর-কোপানলে মদন ভস্মীভূত হয় নাই!

সে এক কাল ছিল, যখন নারী অনূঢ়া থাকিলেও দোষের কারণ হইত না। ব্রহ্মবাদিনী গার্গী, মৈত্রেয়ী, প্রতিথেয়ী প্রভৃতি যে যুগে পূজা পাইয়াছেন, সে যুগে আবার নারীর বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া গৃহীত ও পরিচালিত হইয়াছিল। সেকালের সমাজের জীবন ছিল—লোকের শক্তি ছিল,—সেকালে কেহ শুধু নিয়ম-রক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত হইত না, জীবন-রক্ষা করিত। সেকালের সমাজ নিজের কর্ম্মের পুণ্যে বারের পর বার সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরকে ফিরাইয়া আনিয়াছে—কলিযুগকে চিরস্থায়ী আসন দান করে নাই। পৃথিবীর শুভদিন যে একবার আসিয়াই ফিরিয়া যায় তাহা নহে—উহা আসে যায়, আবার আসে, আবার যায়। মাহেন্দ্র-যোগ যেমন ব্যক্তিগত জীবনে পায় প্রতিদিনের ব্যাপার—উহা সমাজের জীবনেও সেইরূপ। উহাকে আবাহন করিয়া আনিতে হয়—পাদ্য অর্ঘ্যে স্থাপিত করিতে হয়—পূজার মাল্য দিয়া তুষ্ট করিতে হয়। সে পূজায় প্রাণ চাই—সে প্রাণে শ্রদ্ধা ও বল চাই। অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার বল চাই। শুধু নিয়ম-রক্ষা করিলে সে শ্রদ্ধা ও বল লাভের সম্ভাবনা নাই। জীর্ণ চণ্ডীমণ্ডপের ভাঙ্গা দাওয়ায় যে অন্ধ বিচার-সভা বসে, তাহার রক্তচক্ষু দেখিয়া মাটীর ভিতর প্রবেশ করিলে সে পূজা সার্থক হইবে না! কবি বলিয়াছেন—

Strong walls do not a prison make,
Nor iron bars a cage.—

আমরা মনের মধ্যেই কারাগার রচনা করিয়া তাহার প্রহরীস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছি। নিজের গঠিত বন্ধন-শৃঙ্খলে দিবা-নিশা নিজেকেই অষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধিতেছি। সে বন্ধনের হস্ত হইতে মুক্তি দিতে পারে, এমন শক্তিমান কেহ নাই।

সে মুক্তি নিজেকেই অর্জ্জন করিতে হইবে—সে মুক্তি অর্জ্জন করিবার শক্তি নিজেকেই সাধনার দ্বারা ও সত্যের দ্বারা লাভ করিতে হইবে। সে জন্য যদি ঝড়ের মত উঠিতে হয়, ওঠা চাই ;—যদি উল্কার মত ধাইতে হয়, ধাও তাই—যদি বজ্রের অনলে দগ্ধ করিতে হয়, কর তাই।

"পড়ে থাকা পিছে, ম'রে থাকা মিছে,
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই।"

এ যাত্রা শুধু একজনের নহে। ইহা তোমার আমার সকলের। এই জগন্নাথের রথকে যদি পঙ্কমুক্ত করিতে হয়, তাহা হইলে সকলে মিলিয়া ইহার ডুরি ধরিয়া টানিতে হইবে।

"পিছু হ'তে ডাকে মায়ার কাঁদন,
ছিঁড়ে চলে যাও মোহের বাঁধন,
সাধিতে হইবে প্রাণের সাধন—
মিছা নয়নের জল ভাই।"

অতীতের স্মৃতি লইয়া শুধু স্বপ্ন রচনা করিয়া ফল কি? অতীতকে যদি বর্ত্তমানে সফল করিতে পারি, তবেই সিদ্ধি লাভ হইবে। চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ বর্ষের বালকের কণ্ঠে যদি বালিকা বধূর মালা তুলিয়া দাও—সংসারকে চিনিবার ও জানিবার পূর্ব্বেই যদি তাহাকে পুত্র-কন্যায় পরিবেষ্টিত সংসারী করিয়া তোলো, যদি দেশে শুধু হীনবল ও ক্ষীণ-আয়ুর চাষ কর, তবে জীবন-সংগ্রামে মৃত্যু ভিন্ন গতি কোথায়? ক্ষুদ্র এতটুকু বালিকা—বাঙ্গালার অনাঘ্রাত ফুল্ল শুভ্র পবিত্র যূথিকা। সে তোমার ধর্ম্মাধর্ম্মের খোঁজ রাখে না,—তোমার পাপ পুণ্যের বিচার জানে না,—তোমার পিতৃ-পিতামহের কোন্ নিয়মটী রক্ষা করিবার জন্য তুমি তাহাকে বলি দিতে বসিয়াছ তাহা সে বুঝে না। যাহা থাকিলে সে বুঝিত, তাহাকে তাহা দাও নাই, যাহা পাইলে সে তোমাকে ন্যায়ের তর্কে পরাজিত করিতে পারিত, তাহা তাহাকে পাইতে দাও নাই। বিদেশের কুয়াসা আসিয়া দেশের জ্যোৎস্নাকে মলিন করিয়াছে! সহসা নিদ্রাভঙ্গে সে দেখিল, তুমি তাদের চারিদিকে কেবল হাসি বাঁশী ও গীত রচনা করিয়াছ—চারিদিকে কুসুমের মালা সাজাইয়াছ। বিহ্বলা সে তোমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে কি জানে যে তুমি তাহার বলিদানের আয়োজন করিতেছ। তাহার পর সে স্বপ্নঘোর কাটিতে না কাটিতেই সে দেখিল সংসারে সে একা—শুধু একা নহে, একটী নিষ্প্রভ প্রদীপের কম্পিত দীপশিখা অঞ্চলে ঢাকিয়া রক্ষা করিবার ভারও তখন তাহার। তাহার সিঁথীর উজ্জ্বল সে সিন্দুর-বিন্দু আর নাই—তাহার শীর্ণ কর দুইটী কাটিয়া ছিঁড়িয়া শঙ্খ বলয় সবই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে সে যখন আসিয়া তোমার কণ্ঠলগ্ন হইল—সেদিনও তোমার বুক ভাঙ্গে নাই! দুইদিন পর বৈশাখের একাদশীতে যখন সে পার্শ্বের কক্ষে শুষ্ক-কণ্ঠে মৃত্যু-কামনা করিতেছে—তুমি তখন অনায়াসে বৃহৎ মৎস্যের মস্তক চর্ব্বণ করিতেছ—তবুও ভগবানের বজ্র তোমার শিরে ভাঙ্গিয়া পড়ে না! তাহা পড়িতে পারে না। তোমার প্রায়শ্চিত্ত যদি অত সহজে ঘটে, তবে ফল ভুগিবে কে? তোমার পাপে যদি আমিও দগ্ধ না হইলাম তাহা হইলে তোমাতে আমাতে আবার সমাজ কিসের? এইরূপে পুড়িয়া পুড়িয়া বাঙ্গালার সমাজ এখন মৃতকল্প হইয়াছে। তোমারই পুণ্যে সে আবার প্রাণ পাইবে—পূজার অর্ঘ্য লাভ করিবে।—অগ্রসর হও, শুধু নিয়ম রক্ষা করিও না—

"স্বপনের সুখ, সুখের ছলনা,
আর নাহি তাহে প্রয়োজন।
দুঃখ আছে কত, বিঘ্ন শত শত,
জীবনের পথে সংগ্রাম সতত;
চলিতে হইবে পুরুষের মত
হৃদয়ে বহিয়া বল ভাই।
আগে চল্, আগে চল্ ভাই!"

আগে চলিবার একমাত্র উপায় সাধনা। জানি না ত'—কিসের সাধনা করিব। সাধনা করিব মন্ত্রের। মন্ত্র! কৈ মন্ত্র! কোথায় মন্ত্র? কোথায় গুরু? যদি আকাঙ্ক্ষা থাকে, গুরু মিলিবেই। আবার নানক চৈতন্য রামমোহন মিলিবেই। তোমার অন্তরে যে পরম দেবতা এখন সুপ্তি-মগ্ন, তিনিই জাগ্রত হইয়া তোমাকে দীক্ষিত করিবেন। কিন্তু মন্ত্রকে ধারণা করিতে হইলে যে আয়োজন চাই, তাহা ত' আর কেহ করিয়া দিবে না। আমার অঙ্গন আমাকেই মার্জ্জনা করিতে হইবে;—আমার দেবতার আসন যেখানে বিছাইব, সে স্থান আমাকেই পবিত্র করিয়া লইতে হইবে। জ্ঞান-মন্দাকিনীর ধারা ঢালিয়া আমাকেই

যে সে পূজার বেদী মাজিতে হইবে। সত্যের আলোকে আমার এই অন্ধকার মন্দিরটাকে উজ্জল করিবার ভার আমার;—আমার দেশের অরণি হইতেই যজ্ঞের অগ্নি লাভ করিতে হইবে, বিদেশের বিজলী বাতি হইতে নহে! আমরা বিশ্ব-বিদ্যাপীঠ রচনা করিয়াছি—তাহার চূড়ায় যে আলোক জ্বলিতেছে, তাহা এ দেশের নহে। সেই আলোক-ধারা দেশের নানা স্থানে বিচ্ছুরিত হইয়াছে। আমরা কৃত-কৃতার্থ হইয়া মনে করিতেছি, জ্ঞান লাভের সুযোগের ত' অভাব নাই। বৎসরের পর বৎসর 'ট্রেড মার্ক' দিয়া বাঙ্গালার বালক বালিকাকে বিবাহের বাজারে বাহির করিতেছি—মেকারের নামে যেমন পাদুকার দাম হয়, তেমনি তাহাদের দামও হইতেছে! যে শিক্ষা বাঙ্গালী বালক ও বালিকাদের জাতীয় নীতি ও সত্যের সঙ্গে যোগ রাখিতে দেয় না—ভারতের Ideal হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত ক'রে—দূরে লইয়া যায়, সে শিক্ষাকে শিক্ষা বলা বিড়ম্বনা মাত্র! সে শিক্ষা উকীল, হাকিম, ডাক্তার সৃষ্টি করুক—তাহা শুশ্রুষা বা inspectrees, স্ত্রী সাহিত্যিক বা স্ত্রী-ম্যাজিষ্ট্রেট সৃষ্টি করুক, তাহা বাঙ্গালার জলপ্লাবনে লেডি ভলাণ্টিয়ারের ব্যূহ রচনা করুক—কিন্তু তাহা সেইগুলি দেয় না, যাহা না থাকিলে বাঙ্গালী তাহার বাঙ্গালীত্বের আসন হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যায়;—দিন শেষে দেখে, তাহার স্থান না আছে প্রাচ্যে, না আছে প্রতীচ্যে; প্রতীচ্য তাহাকে দেখিয়া ভয় পায়—প্রাচ্য মনে করে সে একটা *Paria*—সে ময়ূরপুচ্ছে দাঁড়কাক!

বঙ্গনারী আমাদের সেই বিশ্ববিদ্যাপীঠে শিক্ষিতা হইয়া আজকাল বাঙ্গালা মা'দিকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার দাবী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার মূলে বর্ত্তমান ভোগাকাঙ্ক্ষা। য়ুরোপ যে দিন ঘোষণা করিল জ্ঞানই শক্তি, সে দিন পৃথিবী চমৎকৃত হইয়াছিল। তাহাদের জ্ঞান তখনই শক্তি, যখন তাহা মানুষকে ভোগ হইতে ভোগে লইয়া যায়। এ নীতি য়ুরোপীয় শিক্ষার পাদপীঠ হইতে পারে—কিন্তু ইহা ভারতীয় শিক্ষার বিরোধী। বহুশত বৎসর পূর্ব্বে এমন কি য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মুখে ভাষা ফুটিবারও পূর্ব্বে ভারত বলিয়াছে—জ্ঞানং মুক্তিঃ। এই নীতির মূল ত্যাগে, ভোগে নহে। সকল ইংরাজ যদি আজ ধ্যান-ধারণায় বাঙ্গালী হইয়া পড়ে, তবে তাহা যেমন ইংলণ্ডের পক্ষে জার্ম্মাণযুদ্ধ অপেক্ষাও বিপজ্জনক, তেমনি বাঙ্গালার নরনারী যদি আজ ইংরাজ হইয়া পড়ে, তবে বাঙ্গালার পক্ষে তাহা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর অপেক্ষাও ভয়াবহ!

আজ একটী পুরাতন কথা মনে পড়িল। কিছুকাল পূর্ব্বে বাঙ্গালার কোন একটী স্থানে জলপ্লাবন হইয়াছিল। নানা স্থান হইতে কর্ম্মী আসিয়া বন্যাপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্য করিতে লাগিলেন। বুকড়ী চালের ভাত এবং ডাল খাইয়া এবং কখনো বা অনাবৃত স্থানে, কখনো বা তণ্ডুলপূর্ণ থলিয়াগুলির উপর নিশাযাপন করিয়া তাঁহাদের দিন কাটিতে লাগিল। সেই দুর্দ্দিনে বাঙ্গালার মাতৃ-হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। তাঁহারা যথাসাধ্য সাহায্য করিতে লাগিলেন। কয়েকজন শিক্ষিতা মহিলা একটু অধিক দূর অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা বন্ধুদের বারণ মানিলেন না, ভলাণ্টিয়ারের দল গড়িয়া বন্যাপীড়িত স্থানে আগমন করিলেন। তাঁহাদের নিতান্ত বেশী আগ্রহ দেখিয়া পুরুষ কর্ম্মিগণ কহিলেন, "আমাদের যতদূর সাধ্য, আপনাদের কার্য্যে সহায় হইব।" বন্যাপীড়িত স্থানটিকে নানা কেন্দ্রে ভাগ করিয়া কাজ চলিতেছিল। নারী-কর্ম্মিগণ যে কোন্ কেন্দ্রে আসিয়াছিলেন, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহাদের নেতৃস্থানীয়া যিনি তিনি আসিয়াই দেখিলেন 'কমোড' নাই (!) খাবার মেজ নাই, স্মেলিং সল্ট নাই ইত্যাদি। তাঁহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। পুরুষ কর্ম্মীদিগের মধ্যে কেহ কেহ জননীদের আহারের ব্যবস্থা করিলেন—সেই ডাল, ভাত এবং ঐ রকম আর দুই একটা দেশী জিনিষ। সে স্থানে যাহা উৎকৃষ্ট ছিল, তাহাই সংগৃহীত হইয়া থাকিবে! নেতৃস্থানীয়া নারী-কর্ম্মী না কি শুনিয়াই বলিয়াছিলেন—I hate native dishes. Thank you. A cup of tea will do for the night." বলা বাহুল্য, এক পেয়ালা চা'র বাটীতে চুমুক দিয়াই—মা আমার সমস্ত রাত্রি অনাহারে কাটাইয়া পরদিন স্থানান্তরে গিয়াছিলেন! যাহারা পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নাকি কেবলই শুনিয়াছিল—"Oh! Horrible—Oh! Shocking!" ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ত আমার মহিমময়ী মার মূর্ত্তি নয়—এ বুঝি সৎমা! তাই কি? এই যে দৃষ্টান্তটী আজ নিবেদন করিতেছি, ইহাই কি বলিয়া দেয় না যে আমরা পরম যত্নে শুধু সোনার পাথরের বাটী গড়িতেছি? আমাদের

দেশের শিক্ষার ব্যবস্থাই কি এইরূপ অভিনব সৃষ্টির জন্য দায়ী নহে?

প্রত্যেক দেশেরই একটা করিয়া বিশিষ্টতা আছে। তাহা হারাইলেই সব হারানোর সমান হইল। চিন্তার স্বাধীনতা শুধু যে মানুষ মাত্রেরই জন্মগত অধিকার, তাহা নহে,—উহাই জাতিকে শ্রেষ্ঠ করে, মহৎ করে, জাগ্রত সচেতন ক'রে। সেই চিন্তার ধারাকে তাহার নির্দ্দিষ্ট খাত হইতে অন্য পথে চালিত হইতে দিলেই উহা জাতির পক্ষে অনিষ্টকর হইয়া উঠে। ভারতে যে বলবীর্য্যের কোনোদিন অভাব ছিল তাহা নহে। ভারতবর্ষের বীরগণ ইচ্ছা করিলে যে সেকালে পরিচিত ভারতের বাহিরে অবস্থিত ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য জয় করিয়া আরও বলদৃপ্ত হইতে পারিতেন না, তাহা বিশ্বাস করি না। কিন্তু যে মন্ত্র অন্তরে থাকিয়া ভারত-বাসীকে কর্ম্মে লিপ্ত করিয়াছিল, তাহা ত্যাগের মন্ত্র। সেই জন্যই ভোগাসক্ত রাবণের পতন ঘটিয়াছিল। রাবণ সত্য হউক, বা কল্পিত হউক তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। সে চিত্র ইহাই দেখায় যে, ভোগাকাঙ্ক্ষা পতনের কারণ।

আজ যে ব্যক্তি-স্বতন্ত্রতার দাবী মাথা তুলিয়াছে, তাহার সঙ্গে এই ত্যাগের সম্বন্ধ নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে কোন মাসিকে একজন বঙ্গমহিলা লিখিয়াছিলেন—আজ নারী "তার বঙ্গগৃহ-কোণ থেকে জেগে উঠেছে। আর গৃহের জানালা-দ্বার মুক্ত ক'রে দিয়ে, বাহিরের মুক্ত আলোক ও বাতাস সে অন্দরে আহ্বান করে নিতে চায়। যদি দরকার হয়, বাহিরে গিয়ে তা সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে চায়—তাতে যদি কখনো পথের ধূলো গায়েই লাগে তার—তবে সে ধূলোকে ঝেড়ে নিয়ে নিজেকে বাঁচাবার ও চালাবার শক্তি যে আপনা থেকে তার ভিতরে সঞ্চিত হয়ে উঠবে। আজ সে সত্যি জগতের বিস্তীর্ণতর কর্ম্মক্ষেত্রে নেমে আসবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে যদি, তাহলে পুরুষ-সমাজে এ নিয়ে এত আশঙ্কা ও সমস্যার সৃষ্টি কেন যে হবে, তা বুঝতে পারা যায় না।" এই উক্তিই সুস্পষ্ট ভাবে দেখাইয়া দেয় যে বঙ্গনারীর ব্যক্তি-স্বতন্ত্রতার দাবী কেবল ভোগের দাবী। এই দাবী যতই প্রবল হইতে আরম্ভ হইয়াছে, ততই একটা সামাজিক সমস্যা জটিল হইতে কেন যে জটিলতর হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা লেখিকা বুঝিতে না পারিলেও তাঁহার লেখায় প্রকাশ পাইতেছে তিনি তীব্র ভাষায় কহিতেছেন "নারী কি চায়? নারী আর দেবীও হ'তে চায় না, খেলনার জিনিষও শুধু সে আর নয়। কবির চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে এক সাথে সুরমিলিয়ে মন তার এখন বলতে আরম্ভ করেছে—

> দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
> পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
> নই; অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
> পিছে, সেও আমি নহি।"

নারী যে দিন আর দেবী হইতে চাহিবে না—বলিবে "সে শুধু নারী হ'তে চায়" তার চেয়ে বড় দুর্ভাগ্যের দিন ভারতের আর ঘটিতে পারে না। কারণ ভারত নারীকেই শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মহাদেবীরূপে তাহার নিত্য পূজা করে। তাহাই ভারতবর্ষের সনাতন Ideal। নারী যেখানে খেলার সামগ্রী হইয়াছে, সেখানে আমরাই তাহার জন্য দায়ী। যে শিক্ষা দিয়া আমরা তাহাদিগকে দিনে দিনে পলে পলে গড়িয়া তুলিতেছি, সে শিক্ষা যে ভারতবর্ষের আদর্শের সহিত যোগ রক্ষা করিতেছে না—ইহাই এই নারী-বিদ্রোহের কারণ। যাহাদের অনুকরণে আমরা এই শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছি, সকল স্থলে না হইলেও অনেক স্থলে তাহারা খেলার সামগ্রী—এবং কোন স্থলেই তাহারা দেবীত্বের আসন লাভ করে নাই। সেখানকার দার্শনিক Ruskin বলিয়াছেন—"A man's work for his house is to secure its maintenance progress and defence; the woman's to secure its order comfort and loveliness." আর ভারতের ঋষি বলিতেছেন—স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়াশ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন" —গৃহে স্ত্রী ও শ্রীর মধ্যে কোন ভেদ নাই।

বাঙ্গালা দেশের নানা স্থানে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, সে সকল বিদ্যালয়ে বালিকাদিগকে না পাঠাইয়া উপায় নাই,—কারণ বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাপ বিবাহের passport স্বরূপ গণ্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সে সকল বিদ্যালয় নারীর অন্তরে দেবীকে স্থাপন করিতে পারিতেছে কি না আমরা সে বিচারে উদাসীন। এ সেই নিয়ম-রক্ষা—বালিকাবিদ্যা-লয়ে মেয়েকে পাঠাইতেই হইবে, পাঠাইতে হয়! কঠিন

জীবন-সংগ্রামের দোহাই দিয়া আমরা নিশ্চিন্তে চক্ষু মুদিত করিয়া থাকি ; এবং যেমন আর দশটা সামাজিক সমস্যাকেও উপেক্ষা করি, তেমনি ইহার দিকেও চাহিয়া দেখি না। এ জন্য আমরা আর কাহাকেও দোষী করিতে পারি না—অদৃষ্টবাদেরও আশ্রয় লইতে পারি না। স্রোতের শেওলা যেমন ভাসিয়া যায়, তেমনি ভাসিয়া যাওয়াটাই যখন বেশ আরামদায়ক, তখন তাহাকেই অবলম্বন করিয়াছি।

ভদ্র মোরা, শান্ত বড়,
পোষ-মানা এ প্রাণ
বোতাম-আঁটা জামার নীচে
শান্তিতে শয়ান।
দেখা হলেই মিষ্ট অতি,
মুখের ভাব শিষ্ট অতি,
অলীক দেহ ক্লিষ্ট গতি,
গৃহের প্রতি টান ;
তৈল ঢালা স্নিগ্ধ তনু
নিদ্রার সে ভর,
মাথায় ছোট, বহরে বড়
বাঙালী সন্তান !

কিন্তু হায়—

ইহার চেয়ে হতেন যদি
আরব বেদুয়িন !
চরণ তলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন !
ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি,
জীবন স্রোত আকাশে ঢালি।
হৃদয়তলে বহ্নি জ্বালি,
চলেছি নিশিদিন ;
বরষা হাতে ভরসা প্রাণে
সদাই নিরুদ্দেশ,
মরুর ঝড় যেমন বহে
সকল বাধাহীন।

আমরা যে ভাবে নিয়ম রক্ষা করিয়া আসিতেছি, তাহা আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কেন, ব্যক্তিগত জীবনে পর্য্যন্ত শুধু মিথ্যা ও ভণ্ডামীরই প্রশ্রয় দিতেছে। তাহা আমাদিগকে প্রতিদিন এক অসত্য হইতে অন্য অসত্যে লইয়া যাইতেছে। আজ মনে পড়ে সেই দিন, যে দিন চিতোর রাজসন্ন্যাসী মহারাণা প্রতাপের করচ্যুত হইয়াছিল। সেদিন তিনি দারুণ ক্ষোভে হেম ও রজত পাত্র দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তৃণের শয্যা ও তরুপত্রের পাত্রে ভোজন সন্ন্যাসী প্রতাপের অবলম্বন হইল। তিনি পণ করিলেন, যতদিন চিতোর পুনরুদ্ধৃত না হয়, ততদিন সেই সন্ন্যাসব্রত পালন করিবেন—বিলাস-বাসনা তত দিন আর তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইবে না। পূর্ব্বে সেনাদলের পুরোভাগে রণডঙ্কা বাজিত—চিতোরের পতনের পর মহারাণার আদেশে উহা সেনাদলের পশ্চাতে বাজিতে লাগিল। তাহার পর মনে পড়ে সেই দিন, যেদিন পর্ব্বত-বেষ্টিত পেশোলা তীরে উদয়পুরের রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া প্রতাপ একখানি পর্ণকুটীরে বাস করিতে লাগিলেন এবং শেষে সেই কুটীরেই প্রাণত্যাগ করিলেন। আজিও রাজপুত নিয়ম-রক্ষা করিয়া আসিতেছে বটে, আজিও সে তাহার হেম ও রজত পাত্রের নিম্নে একটী বৃক্ষপত্র রাখিয়া প্রতাপের অনুশাসন পালন করিতেছে! সুখশয্যার তলদেশে তৃণগুচ্ছ স্থাপিত করিতেছে। ইহাই ভারতবর্ষের একটী শ্রেষ্ঠ বীরজাতির নিয়ম-রক্ষা। একটী বৃক্ষপত্র বা একগাছি তৃণ যদি বিলাস ও আড়ম্বরের পাপকে দূর করিতে পারিত, তাহা হইলে কথা ছিল না!

এইরূপে নিয়ম রক্ষা করিয়া পিতৃ-পুরুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ভান করা অপেক্ষা নিয়মভঙ্গকারী হইতে পারিলে জড়ত্ব দূর হইয়া দেহে প্রাণ আসিতে পারে ; কর্ম্মব্যাকুলতা কর্ম্মহীনতার স্থান গ্রহণ করিতে পারে। কুসংস্কার ধর্ম্মহীনের ধর্ম্ম। বহু দিনের সঞ্চিত কুসংস্কারের ফলে মানুষের দুর্ব্বল হৃদয়ে এইরূপে নিয়ম-রক্ষার প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়। বাঙ্গালার সামাজিক সংস্কার সাধন করিতে হইলে আর নিয়ম-রক্ষা করিলে চলিবে না। যদি ভুল হয় তা' হউক—ভোলানাথের ঝুলি ঝাড়িয়া বাছিয়া বাছিয়া ভুলগুলিই আশীর্ব্বাদ স্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে—তাহাদের লইয়া কর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে হইবে।

একটা কিছু করেনে ঠিক,
ভেসে ফেরা মরার অধিক,
বারেক্ এদিক্ বারেক ওদিক্
এ খেলা আর খেলিসনে ভাই !

আপনাকে যে জয় করিতে পারে না, সে পরকে অভয় দিবে কিরূপে? নিজে যে ভয়ে মরে, সে সমাজের দেহে প্রাণ আনিবে কিরূপে? সত্যকে আশ্রয় না করিলে কোন কাজেই ভয় দূর হইবে না। সমাজের দেহে যেখানে যে ব্যাধি আছে, সুনিপুণ চিকিৎসকের ন্যায় তাহার সন্ধান করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইবে;—যদি প্রয়োজন হয়, অস্ত্রোপচার করিতেও কুণ্ঠাবোধ করিলে চলিবে না। কবি তাই বজ্র নির্ঘোষে কহিতেছেন—

তোর আপন জনে ছাড়চে তোরে
তা বলে ভাবনা করা চল্‌বে না!
তোর আশালতা পড়্‌বে ছিঁড়ে,
হয়ত রে ফল ফলবে না—
তা বলে ভাবনা করা চল্‌বে না!
আস্‌বে পথে আঁধার নেমে,
তাই বলেই কি রইবি থেমে,
ও তুই বারে বারে জ্বাল্‌বি বাতি,
হয়ত বাতি জ্বল্‌বে না—
তা বলে ভাবনা করা চল্‌বে না।

মায়াবিনী

শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায়

১

মাইনু সাঁওতালের মেয়ে। বয়স—বিশ কি ত্রিশ, ঠাহর করিবার উপায় নাই। চেহারাখানা ঠিক্ যেন কালো মার্ব্বেল পাথরের ভিতর হইতে কুঁদিয়া বাহির করা হইয়াছে। গায়ের রংটা ফর্সা হইলে হয় ত তাহাকে রাজরাণী বলিতাম, কিন্তু অসভ্য সাঁওতালের মেয়ে সে,—খাদের নীচে কয়লার ঝুড়ি মাথায় বহিয়া পেটের দায়ে সমস্তটা দিন খাটিয়া মরে,—তাহার আবার রূপ, তাহার আবার গুণ!......

মাসখানেক হইল, সে ইকড়ার কয়লা-কুঠিতে কাজ করিতে আসিয়াছে, কিন্তু ইহারই মধ্যে তাহাকে চিনে না এরকম লোক কুঠি খুঁজিলে দু' একটা পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

হাসি তাহার মুখে চব্বিশঘণ্টা লাগিয়াই আছে, চোখের জলের সহিত মাইনুর পরিচয় কোন দিন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না?

পাঁচ নম্বর কুলি-ধাওড়ার এক টেরে একটা আম-গাছের তলায় ছোট্ট একটা ঘরে সে বাস করে। দিনে কিংবা রাত্রে, যেদিন যখন খুসী, খাদের নীচে খাটিতে যায়,—যা'র তার সঙ্গে হাসে, কথা কয়, আপন মনে গান করে। কোন দিন রাঁধে, কোন দিন বা শুধু মদ খাইয়াই পড়িয়া থাকে। এমনি করিয়া বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই তাহার জীবনের দিনগুলা কাটিতেছিল।

...বর্ষাকাল। গত রাত্রি হইতে বেশ জোরে-জোরে বৃষ্টি নামিয়াছে। অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া মাইনু দেখিল, বৃষ্টি তখনও ধরে নাই, অথচ তাহাকে কাজে যাইতে হইবে। কাল দিনের বেলা সে যাহা কিছু রোজগার করিয়াছিল, রাত্রে মদ খাইয়া তাহা শেষ করিয়াছে। নেশার ঘোরে পড়িয়া না থাকিলে হয় ত তাহার নিঃসঙ্গ বাদল-রাত্রিটা কাটানো দায় হইয়া উঠিত। তথাপি আজ সকালে উঠিয়া প্রথমেই তাহার মনে হইল, ছি, ছি, সে করিয়াছে কি! আজ ছ' আনা পয়সা থাকিলে হয় ত সে পেট পুরিয়া খাইয়া বাঁচিত! ক্ষুধার্ত্ত মাইনু আজ তাহার অবসন্ন শরীর লইয়া খাদের নীচে পরিশ্রমের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইত!

কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টির জোর কমিয়া আসিল। মাইনু বাহিরে তাকাইয়া দেখিল, কর্দ্দমাক্ত পথের ধারে খানা-ডোবাগুলো বর্ষার জলে থৈ-থৈ করিতেছে, এবং তাহারই আশে-পাশে ভেকের অশ্রান্ত কল-ধ্বনি সুরু হইয়াছে।

গাছের ডালে-ডালে কাক্‌গুলা পাখা ঝাড়িয়া চীৎকার করিতেছে, চারিদিক ফর্সা হইয়া গেছে, দূরে—কয়েকটা তালগাছের ফাঁকে পূব্‌-গগনের সীমা-রেখায়, ক্ষান্ত-বর্ষণ নীল আকাশের গায়ে অরুণ-আলোর রক্তাঞ্জলি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রভাত হইতে বিলম্ব নাই।......

পিপাসার্ত্ত মাইনু ঢক্‌ ঢক্‌ করিয়া খানিকটা জল খাইয়া সপসপে' পথের উপর নামিয়া পড়িল।

গত রাত্রে মদ খাইয়া আজ এই বাদল-প্রভাতেও তাহার ঘন-ঘন পিপাসা পাইতেছিল।—তাহার চোখের সুমুখে ধরিত্রী তখনও রিম্‌-ঝিম্‌ করিতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার তরুণ হিয়ার স্বতঃ উৎসারিত আনন্দ-উৎস এতটুকু মন্দীভূত হয় নাই। মাইনু জড়িত চরণে পথ চলিতে চলিতে গান ধরিল,—

"নদীতে পড়েছে বান, পার কর ভগবান,
বল্‌ দাদা, কত দূরে জামতাড়া !—"

কুঠির একজন ছোক্‌রা বাবু সেই পথ ধরিয়া বোধ হয় কুলি-ধাওড়ার দিকেই আসিতেছিল। মাইনুর গানের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া ফিক্‌ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

মাইনু তাহার গতি রোধ করিয়া সুমুখে দাঁড়াইয়া পড়িল। গান বন্ধ করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল,—হাস্‌লি কেনে বাবু ?

বাবু বলিল,—বাঃ, হাস্‌বার জো নেই আমার ?

মাইনু ছাড়িবার পাত্রী নয়, বলিল,—বল্‌ বাবু, তুখে বল্‌তেই হবেক্‌ হাস্‌লি কেনে।......আমাকে দেখে...লয় ?

—না।...তোর গান শুনে'।

বা রেঃ। বলিয়া মাইনু তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিয়া আবার চলিতে লাগিল। হাত দশ-বারো আসিয়া আবার গান ধরিল,—

"হাওয়া গাড়ী টম্‌ টম্‌ বাবুর বাগানে,
ও ছোঁড়া তুই বলে যা রে—হাস্‌লি কেনে !
বলে' যা, হাস্‌লি কেনে !"

মাইনু অফিস-ঘরের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছিল, এমন সময় পথের ধারে, বোয়ান্‌-ঝোপের নিকট হইতে গুরু-গম্ভীর স্বরে কে যেন ডাকিল, মাইনু !

মাইনু চমকিয়া পিছন্‌ ফিরিতেই এক বৃদ্ধ সাঁওতালের দিকে তাহার নজর পড়িল। তার ডান্‌ হাতে লণ্ঠন, বাঁ হাতে একটা ছাতি। কোটরগত চোখ দুইটা জল্‌-জল্‌ করিতেছে !

মাইনু হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল। বজ্রাহতের মত পথের ধারে দাঁড়াইয়া কহিল,—ইখান্‌কেও এসেছিস্‌ পারিয়া ?...আমি যাব নাই, যা।

—হুঁ, যাবি নাই ? তুর্‌ বাপ্‌কে যেতে হবেক্‌।

—কিস্‌কে ? কই নিয়ে যা দেখি ? দেখি কেমন মরদ্‌।

বৃদ্ধ এইবার একটু নরম হইয়া বলিল, এই স্তাথ্‌ শুন্‌ মাইনি, ভালয় ভালয় বল্‌ছি, চল্‌। তা না হলে' সায়েব্‌কে বল্‌বগা।

—হুঁ। বড ত' সায়েবকে ডরাই কি না। আমি যা—ব নাই। তুঁই কি কর্‌বি কর্‌। বলিয়া হাসিতে হাসিতে মাইনু চলিয়া গেল।

পারিয়াও ধীরে-ধীরে ম্যানেজার সাহেবের বাংলার দিকে অগ্রসর হইল।

বাংলোঘরের সম্মুখে অপরিসর বাগানের লাল কাঁকর-বিছানো রাস্তার উপর সাহেব পায়চারি করিতেছিল। পারিয়া হাত হইতে ছাতা ও লণ্ঠনটা নামাইয়া, একটা সালাম্‌ করিয়া বলিল, সাহেব শুন্‌।

সাহেব তাহার মুখের পানে তাকাইতেই পারিয়া জানাইল যে তাহার বিবাহিতা পত্নী মাইনু, তাহাকে ছাড়িয়া আজ মাসখানেক পলাইয়া আসিয়াছে এবং তাহারই কুঠিতে কাজ করিতেছে। সে তাহাকে পুনরায় নিজের কাছে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে চায়, সুতরাং সাহেবকে ইহার প্রতিবিধান করিতেই হইবে।

সাহেব গম্ভীরভাবে বলিল, মাইনু ? কই, মাইনু বলে এখানে কেউ নাই।

—না সাহেব, আমি এখনই তাখে দেখেছি।

—কোথা ?

—তুর্‌ খাদেই খাট্‌তে গেল।

—ডাক্‌ তাকে।

পারিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তাহেলে আর তুর্‌ কাছ্‌কে আস্‌ব কেনে সাহেব; আমার কথা শুন্‌বেক্‌ নাই।

—আমাদের সদ্দারকে ডাক্ তবে, আমি বলে' দিছি। বলিয়া সাহেব পুনরায় পায়চারি করিতে লাগিল।

সর্দ্দারকে ডাকিতে গিয়া পারিয়া দেখিল, ট্রাম লাইনের ধারে দাঁড়াইয়া মাইনু হাসিতেছে।

পারিয়া কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই মাইনু জিজ্ঞাসা করিল, সায়েবকে বলেছিস্?

হুঁ। চল্ তুখে ডাক্‌ছে।

—চল্। বলিয়া মাইনু তাহার আগেই সাহেবের নিকট আসিয়া বলিল, কি বল্‌ছিস্ সায়েব?

—তুই পালিয়ে এসেছিস্?

মাইনু হাসিয়া উত্তর দিল, ধেৎ! পালাঁই আস্‌তে আমার রং লেগেছে।

সাহেব বলিল, ও কি তবে মিছে কথা বল্‌ছে?... ও তোর কে হয়?

—হবেক্ আবার কে? উ আমার কেউ লয়।

মুখের সাম্‌নে স্পষ্ট জবাব শুনিয়া পারিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না।

মাইনুর কথা শুনিয়া সাহেব একবার উভয়ের মুখের পানে তাকাইল। মাইনু তখন মুখ টিপিয়া মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতেছিল।

প্রভাত-আলোকের মতই সুন্দর এই সাঁওতাল যুবতীর মুখের উপর কি ছিল কে জানে। সাহেব সেদিক হইতে তাহার চোখ দুইটা কোন প্রকারেই ফিরাইতে পারিতেছিল না। বলিল, হাস্‌ছিস্ কেনে? তুই নিশ্চয় ওর বৌ।

—বা সাহেব! বলিহারি তুর্ লজর্ যা-হোক্! উ বুড়া আর আমি ছুক্—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মাইনু আবার হাসিয়া উঠিল।

সাহেব এবার নিজেও একটুখানি না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। জোর করিয়া তামাকের পাইপটা দাঁতে দাঁতে চাপিয়া ধরিয়া সাহেব হাসি বন্ধ করিয়া বলিল, তুই মিছেই এসেছিস্ বুড়ো, তুই ওকে পাবি না। দেখ্‌ছিস্ না মনের ভাব?

—তা বেশ। আমি চল্লম। বলিয়া বৃদ্ধ পারিয়া, তাহার ছাতা ও লণ্ঠনটি পুনরায় তুলিয়া লইল। একবার কাতর দৃষ্টিতে মাইনুকে শেষ দেখা দেখিয়া লইয়া বুড়া চলিতে লাগিল।

সে যখন বাগানের 'গেট' পার হইয়া রাস্তায় গিয়া পৌঁছিল, সাহেব ও মাইনু তখনও পাশাপাশি দাঁড়াইয়া তাহাকেই লক্ষ্য করিতেছে।

সাহেব ঈষৎ হাসিয়া ডাকিল, মাইনু!...বোধ হয় সে তাহাকে কোন কথা বলিতে যাইতেছিল। 'আসি' বলিয়া মাইনু পারিয়ার দিকে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

পারিয়া তখন গুদামের নিকট রাস্তা ভাঙিয়াছে। মাইনু খপ্ করিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিল। বলিল, এই, কোথা চল্লি তুঁই?

—কেনে, মুনিয়ার কুঠি।...ছাড়্। বলিয়া বৃদ্ধ তাহার হাতটা ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল।

মাইনু সহাস্যমুখে বলিল,—বাবা লো! রাগ গ্যাখ্ বুড়ার!...আয়, আয়, আমার ঘরকে আয় পারিয়া। এইখানেই থাক্, আর মুনিয়াকে যেঁয়ে কাজ নাই।

বুড়া বলিল, তুঁই কুন্ ধাওড়ায় থাকিস্?

—তুঁই আয় কেনে,—হোই পাঁচ নম্বরে। বলিয়া বুড়াকে একপ্রকার টানিতে টানিতে মাইনু তাহার ক্ষুদ্র কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

পারিয়াকে ঘরের ভিতর বসাইয়া বলিল, আমরা এইখানেই থাক্‌ব। তুঁই আর ইথান্ থেকে যেতে পাবি নাই কিন্তুক! বলিয়া, কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল, তুই এইখানে বস্ তাহেলে, আমি খাদ্‌কে যাই।

মাইনুকে ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছা পারিয়ার ছিল না, তাই জিজ্ঞাসা করিল, কেনে?

—খাট্‌তে যাব নাই ত' খাবি কি? তুথে খাওয়াব কি?......তুর মতন ত' টাকা নাই যে বসে' বসে' খাব?

শেষের কথাটা বুড়ার প্রাণে বেশ আঘাত দিল। মুনিয়ার কয়লা-খাদে পারিয়া বহুকাল হইতে সর্দ্দারি করিয়া দু' তিনশ টাকা জমাইয়াছিল এবং সেই অর্থের লোভে মাইনুর বাবা এই বুড়ার হাতে মাইনুকে সমর্পণ করিয়া দিয়া মরিয়া গেছে। কিন্তু বিবাহের পর হইতেই মাইনু পারিয়ার নিকট হইতে পলাইয়া যায়, পারিয়া আবার ধরিয়া আনে, মাইনু আবার পলায়। এম্‌নি করিয়া উভয়ের মধ্যে একটা মনোমালিন্যের সৃষ্টি হওয়ায় পারিয়া প্রাণপণে

তাহার সঞ্চিত অর্থগুলি নিজের কাছে সাবধানে রাখিত, মাইনুর হাতে দিতে তাহার সাহস হইত না। মাইনু সে অর্থের প্রত্যাশীও ছিল না, আজ হঠাৎ কি ভাবিয়া কথাটা বলিয়া ফেলিল। পারিয়ার মনটাও বেশ সদয় ছিল, তাই সে ধীরে ধীরে কোমর হইতে টাকা তোড়াটি খুলিয়া ঘরের মেঝের উপর নামাইয়া দিয়া বলিল, এই লে, ভারি ত টাকা!...এতদিন দিথম্ নাই—তুঁই পালাথিস্ বলে'। শেষকালে বেইমানি করিস্ না কিন্তুক্।

মাইনু হঠাৎ গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিল, ও মা গঃ! তুর্ টাকা কে চাইলেক্ থাল্‌ভরা?

—তা হোক্ মাইনু, লে। বলিয়া বৃদ্ধ টাকাগুলা তাহার দিকে সরাইয়া দিল।

মাইনু বলিল, তবে দে, আজকার থরচের মতন দে। চাল্, ডাল কিনে আনি।

পারিয়া হাসিতে হাসিতে একটি টাকা মাইনুর হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, চট্ ক'রে আসিস্। আমি তা কত্তে উনোন্‌ট ধরাঁই রাখি। লয়?

—হ' দেখ্ কয়লা আছে। আর হোই ও ভই কুলঙ্গাতে জিয়াশালাই। বলিয়া মাইনু চলিয়া গেল।

৩

দিন পনের পরে পারিয়া জ্বরে পড়িল। মাইনু ভাবিল, সামান্য জ্বর, তু' একদিনের মধ্যেই সারিয়া যাইবে। কিন্তু আট-দশ দিনেও যখন জ্বর ছাড়িল না, তখন তাহার একটু চিন্তা হইল কুঠির ডাক্তারবাবুকে ডাকিয়া আনিয়া বলিল, উয়াকে ভাল করে' দে বাবু, জ্বরের ঘোরে দিনরাত তন্‌ছট করছে।

রোগী দেখিয়া ডাক্তার বলিলেন, আগে খবর দিলে হতো মাইনু, এ আর বাঁচবে না। ডবল নিমোনিয়া হয়েছে।

বিস্ময় বিহ্বল দৃষ্টিতে ডাক্তারের মুখের পানে তাকাইয়া মাইনু বলিল, নামুনি?...বাঁচ্‌বেক নাই তাহলে?...তুঁই যদি ভাল ভাল ওষুধ দিস্?

ডাক্তারবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না। রাতটা পেরোলে হয়।

...সম্মুখে পত্র-বহুল আমগাছের শাখায় শাখায় পাখীর কলরব; দূরে খাদের মুখে টব-গাড়ীর ঘড়্‌ঘড়্ শব্দ কাণে আসিয়া বাজিতেছে বাহিরে সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে রাস্তা-ঘাট ধীরে-ধীরে ডুবিয়া যাইতেছিল। মাইনু সেই দিকে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, ওষুধ দিবি ত? না, তাও দিবি নাই?

হ্যাঁ, ওষুধ নিবি আয়। বলিয়া ডাক্তারবাবু বাহিরে আসিয়া 'বাইকে' চড়িলেন।

প্রদীপটা পারিয়ার শিয়রের নিকট রাখিয়া দিয়া একবার তাহার মুখের নিকট ঝুঁকিয়া পড়িয়া মাইনু জিজ্ঞাসা করিল, জল খাবি?

পারিয়া সংজ্ঞাহীন অবস্থায় শয্যায় পড়িয়া ছিল,—কোন কথা বলিল না।

মাইনু ঔষধ আনিবার জন্য তাড়াতাড়ি ডাক্তারখানার উদ্দেশে বাহির হইল।

ঔষধ লইয়া ফিরিবার পথে অবিলাশের সঙ্গে দেখা। অবিলাশ জাতিতে হাড়ি, অতিশয় ভাল মানুষ। বহুদিন পূর্ব্বে পারথাবাদ কলিয়ারীতে মাইনুর সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছে। লোকটা অতি গরীব; ছোট-ছোট সাতটা ছেলে-মেয়ে, তাহার উপর স্ত্রী অকর্ম্মণ্য। নিজে গতর থাটাইয়া যাহা কিছু রোজগার করে, তাহাতে তাহার সংসার চলে না।

অবিলাশ অন্ধকার রাস্তার উপরেই একটা লাঠি হাতে লইয়া হন্ হন্ করিয়া ডাক্তারখানার রাস্তা ধরিয়া চলিতেছিল, মাইনুও বিপরীত দিক হইতে আসিতেছিল। পথের মাঝে মাইনু একেবারে তাহার গায়ের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িতেই অবিলাশ চাৎকার করিয়া উঠিল, কে রে?

মাইনু গলার আওয়াজটা চিনিতে পারিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল,—অবিলাশ! ছ্যাথ্ দেখি, আর একটুকু হলেই গেইছিলম আর কি!

অবিলাশ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, মাইনু, কোথা গেছিলি?

—ডাক্তরের কাছ্‌কে। পারিয়া হয় ত বাঁচ্‌বেক্ নাই অবিলাশ।

অবিলাশ থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, কেনে. উয়ার আবার কি হলো?

—কে জানে ভাই, বুড়ার কি হইছে কে জানে! বলিয়া মাইনু চলিয়া যাইতেছিল; অবিলাশ বলিল, আমি

সাত-ঝঞ্ঝাটে পড়েছি মাইনু,—আমারও বৌ'ট বাঁচ্ বেক্ নাই; সাত সাতটা ছেলে,—বলিস্ কি মাইনু,—আবার আর একটু। পাঁচ দিন ধরে' কষ্ট খেছে, ডাক্তর ডাক্‌তে চল্লম।

—আবার? বলিয়া মাইনু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—হঁটে! তুর্ হথো ত' বুঝ থিস্ মজা। এম্‌নি করে হাস্‌তিস্ তাহ'লে।

—তা-মর্ খাল্-ভরা! বলিয়া মাইনু চলিয়া গেল।

ঘরে গিয়া দেখিল, প্রদীপটা তখনও মিট্-মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। পারিয়া মলিন শয্যা হইতে গড়াইয়া গড়াইয়া মেঝের উপর অনেক দূরে চলিয়া আসিয়াছে। মাইনু অতিকষ্টে বৃদ্ধকে পুনরায় বিছানার উপর শোওয়াইয়া দিল। গলাটা তখন ঘড়্ ঘড়্ করিতেছিল। শিশি হইতে একদাগ ঔষধ পারিয়ার মুখে ঢালিয়া দিতেই চোয়াল বহিয়া ঔষধটা গড়াইয়া পড়িল।

পারিয়ার নিষ্প্রভ চক্ষু দুইটা তখন ঘোলাটে হইয়া গেছে। বুকটা ধুক্ ধুক্ করিতেছে; মাইনুর সন্দেহ হইল, সে বোধ হয় আর বেশীক্ষণ নয়।

ক্রমাগত কয়েকদিন পরিশ্রম করিয়া, রাত্রি জাগিয়া, না খাইয়া মাইনু বড় বেশী ক্লান্ত হইয়া পরিয়াছিল

প্রদীপের শিখাটা একটুখানি বাড়াইয়া দিয়া, দরজার নিকট আঁচল বিছাইয়া মাইনু শুইয়া পড়িল।

অবিলাশ ডাক্তারখানা হইতে ফিরিবার পথে একবার মাইনু ও পারিয়ার সংবাদ লইয়া যাইবে ভাবিয়া দরজার নিকট আসিয়া ডাকিল, মাইনু!

মাইনু জাগিয়াই ছিল, মাথা তুলিয়া বলিল, অবিলাশ! ডাক্তর এলো নাই?

হাতের ঔষধটা দেখাইয়া বলিল, না। এই ঔষধ দিলেক্। বল্লেক্, ইয়াতেও যদি কিছু না হয়, তখন ডাক্‌বি।...বুড়া কেমন আছে?

—ওই স্থাখ্ কেনে; বলিয়া মাইনু শায়িত পারিয়ার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিল।

অবিলাশ ধীরে ধীরে পারিয়ার নিকট অগ্রসর হইয়া ডাকিল, পারিয়া!

কোন উত্তর না পাইয়া, ঝুঁকিয়া পড়িয়া স্তিমিত আলোকে তাহার মুখখানা ভাল করিয়া দেখিতে গিয়া চমকিয়া উঠিল। হাতের শিশিটা মাটিতে নামাইয়া পারিয়ার বুকের উপর হাত দিয়া, অবিলাশ বলিল, মাইনু, উঠ্,—বুড়া হঁয়ে গেইছে।

কথাটা শুনিয়া মাইনু তাড়াতাড়ি উঠিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল, এঁ্যা!

—হঁ। মরে' গেইছে। এই স্থাখ্। বলিয়া অবিলাশ প্রদীপটা তুলিয়া পারিয়ার মুখের উপর ধরিল। মাইনু বলিল, আমি কিছুই জান্‌তে লেরেছি অবিলাশ!...তাহেলে এত রেতে কি করি?

উভয়েই নিস্তব্ধভাবে মৃত পারিয়ার মুখের পানে তাকাইয়া বসিয়া রহিল। বাহিরে তখন বাদল-রাত্রির অন্ধকার ঝম্‌ঝম্ করিতেছে!

কিয়ৎক্ষণ পরে অবিলাশ বলিল, তুই বস্,—আমি শিশিটা রেখে আসি। লোকজন কাঠ-কয়লার জোগাড় করতে হবেক্ ত?

—হঃ যা। বলিয়া মাইনু তাহার একখানা মোটা কাপড় দিয়া পারিয়ার মৃত দেহটা আবৃত করিয়া দিল।

অবিলাশ চলিয়া গেলে, মাইনু শুষ্ক চক্ষে আর একবার বাহিরের দিকে তাকাইয়া দেখিল, সমস্ত আকাশের গায়ে কালো মেঘ থম্ থম্ করিতেছে। দিনের বেলা বৃষ্টি নামে নাই, বাদল-ভীরু আকাশটা ক্ষণে ক্ষণে বিজলীর ভয়ে চমকিয়া উঠিতেছিল।......

৪

চার পাঁচদিন পরে খাদের নীচে কাজ করিতে গিয়া মাইনুর সহিত ম্যানেজার-সাহেবের দেখা হইল।

দশ নম্বর গ্যালারির পাশে, ঝুড়ি মাথায় দিয়া হাতে কেরোসিনের ডিবে লইয়া মাইনু আপন মনে চলিতেছিল, এমন সময় সাদা সুট্-পরা ম্যানেজার সাহেব তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, মাইনু, শুনলাম, সেই বুড়া নাকি মরেছে।

মাইনু একগাল হাসিয়া বলিল,—হঁ, মরে গেইছে।

সাহেব বলিল, তবে তুই এক কাজ কর্। খাদের ছুটির পর আমার সঙ্গে দেখা করিস্—

কেনে সায়েব্? বলিয়া মাইনু তাহার মুখের পানে তাকাইল।

—কথা আছে, বল্‌ব। বলিয়া সাহেব ত্রস্তপদে পাশের মেন্ গ্যালারি দিয়া চলিয়া গেল।

বৈকালে মাইনু বাংলোবাড়ীতে সাহেবের নিকট গিয়া দাঁড়াইতেই, সাহেব বলিল, তোকে আর খাদে খাট্‌তে হবে না মাইনু, তুই আমার বাংলোতেই থাক্—আমার কাজ-টাজ করবি।

—বেশ। বলিয়া মাইনু জিজ্ঞাসা করিল, আজ থেকেই?

—হ্যাঁ, আজ থেকেই। আমার বড় খান্‌সামার ঘরের পাশে যে ঘরটা আছে, ওই ঘরেই থাক্‌বি।

—কেনে সাহেব, তুর্ মেম্ আস্‌বেক্ নাকি? বলিয়া মাইনু মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতে লাগিল।

হ্যাঁ। বলিয়া সাহেব তাহার পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া মাইনুর দিকে ছুড়িয়া দিয়া বলিল, যা, মদ খেয়ে আয় গা।

টাকাটা তুলিয়া লইয়া মাইনু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; কহিল, মদ, এক টাকার?

এক টাকার মদ খেতে পারিস্? বলিয়া সাহেব ধপাস্ করিয়া হাত-পা মেলিয়া ইজি চেয়ারটার উপর শুইয়া পড়িল।

—না সায়েব, তা লারি।

—তবে যত পারিস্ খাস্।

মাইনু হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

মদ খাইয়া যখন ফিরিল, তখন রাত্রি হইয়াছে।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিল, এত রাত কেন হলো তোর?

মাইনু বলিল, দিনের বেলাকার ভাত রাঁধা ছিল, সে গলা খেঁয়ে এলম। আমার টাকা ছিল, কাপড় ছিল, সব নিয়ে এলম। বল্ সায়েব, ইবারে তুর্ কি কাজ আছে বল্—করি।

সাহেব আলোকোজ্জ্বল কক্ষে বসিয়া কি একখানা বই পড়িতেছিল। মুখ তুলিয়া মাইনুর দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

মাইনু হাসিতে হাসিতে বলিল, অমন করে' চাইছিস্ কি সাহেব? বল্ কি কাজ কর্‌তে হবেক্।

সাহেব বলিল, না, এখন কিছু কাজ নাই। মেম সাহেব এলে তোকে আমার কাজ কর্‌তে হবে। এখন দিনকতক এম্‌নি থাক্।

—তেবে এখন গায়েন্ করি গা বলিয়া মাইনু চলিয়া যাইতেছিল।

সাহেব ডাকিল, এই মাইনু, শোন্!

চৌকাঠের নিকট মাইনু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কি!

—কেয়াড়িটা বন্ধ কর্।

মাইনু বুঝিতে পারিল না। বলিল,—কেয়াড়ি কাথে বলে?

সাহেব অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া দিল,—দরজা।

মাইনু বলিল, ও, দুয়ারুট। কেনে?

—বন্ধ করে' আয় এইদিকে শোন্।

—কেনে, কি হবেক্?

—আয় না, শোন্।

—না, বল্ তুঁই।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিল, কত মদ খেলি?

—কেনে, চার আনার।

—বাকি পয়সা কি করলি?

—এই লে। বলিয়া আঁচলের খুঁট হইতে বাকী বারো আনা পয়সা খুলিয়া মাইনু সাহেবকে দিতে গেল।

পয়সাগুলা মাইনু ইজিচেয়ারের হাতলের উপর নামাইতে যাইবে, এমন সময় সাহেব তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিল।

মাইনু বলিল, ছাড়্।

সাহেব হাতখানা না ছাড়িয়া মাইনুর খোঁপার দিকে তাকাইয়া বলিল, ফুল কোথা পেলি?

মাইনু হাসিতে হাসিতে বলিল, হোই তুর্ বাগিচায়।

সাহেব ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—কেন, আমার বাগানের ফুল কেন তুল্‌লি?

—বেশ করব। বলিয়া হেঁচ্‌কাটানে সাহেবের হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া দূরে দাঁড়াইয়া মাইনু হাসিতে লাগিল।

সাহেব চেয়ার ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া মাইনুর দিকে অগ্রসর হইল।

মাইনু দরজার নিকট সরিয়া আসিয়া বলিল, খবর্‌দার্ সাহেব, তাহলে রইব নাই তুর্ ঘরে।

সাহেব থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, বলিল, না, না, কিচ্ছু বলি নাই, তুই থাক্। এই নে, তোর পয়সা নিয়ে

যা। বলিয়া সাহেব পয়সাগুলা চেয়ারের উপর হইতে তুলিয়া তাহাকে দিতে গেল।

—রাখ্ তুর্ পয়সা, ইয়ার্ পর্ লিব। বলিয়া মাইনু ফিক্ করিয়া একবার হাসিয়া দ্রুতচরণে সেখান হইতে বাহির হইয়া গেল।

৫

সাহেবের নিষেধ সত্ত্বেও পরদিন প্রাতে মাইনু খাদের নীচে কাজ করিতে গেল।

বেলা প্রায় দশটার সময় অবিলাশ গাঁইতি দিয়া কয়লা কাটিতেছিল; মাইনু বলিল, এই, রাখ্ রাখ্ গাঁইতি রাখ্—দিনরাত কাজ করছিস্, মরে' যাবি যে!

গাঁইতি নামাইয়া অবিলাশ বলিল, মর্তে আর বাকী আছে নাকি মাইনু......উঃ! বলিয়া হাত দিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া অবিলাশ বলিল, ঘরে বৌ'টাকে নিয়ে সারারাত জেগেছি, আজ আবার না খাট্‌লে কেউ খেতে পাবেক্ নাই।

—আয়, আয়, একটুকু জিরে'ই লে। ভারি ত' কাজ! বলিয়া মাইনু অবিলাশকে টানিতে টানিতে সেখান হইতে লইয়া আসিল।

তিন চারটা গলিরাস্তা পার হইয়া একটা নির্জ্জন অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে যাইয়া মাইনু বলিল, এই থান্‌টা বেশ ঠাণ্ডা। ব'স্,—তুর্ মেয়ে কেমন আছে?

অবিলাশ মাইনুর পাশে বসিয়া বলিল, কে জানে মাইনু, বাঁচ্‌বেক্ কি না কে জানে!

—ছেলে হয় নাই?

—হইছে একটা ক্যাৎরা পারা। ধুকপুক্ কর্‌ছে, সেটাও মর্‌বেক্—বাঁচ্‌বেক্ নাই।

—কি ছেলে?

—বিটি ছেলে। বেটা হলেও বা মাল্ কেটে' খেতো।

মাইনু হাসিয়া বলিল, কেনে, বিটি ছেলে কি ছেলে লয় না কি? আমরা খাটি না?......তুর্ মতন পাঁচটা মরদ্ পুষ্‌তে পারি আমি।

—আগুন্ খুব বলছিস্। ছেলে হলেই বুঝ্‌থিস্ মজা। ......পরশু তুখে খুঁজ্‌তে গেইছিলম, কোথা ছিলি?

—পরশু? কেনে, ঘরেই। কাল থেকে কোথা আছি জানিস্?

—কোথা? বলিয়া অবিলাশ তাহার মুখের পানে তাকাইল।

—সায়েবের বাংলাতে। বলিয়া মাইনু হাসিতে লাগিল।

—উথানকে মর্‌তে কি জন্যে গেইছিস্?

একটা 'পিলারে'র গায়ে মগ্‌বাতিটা ঝুলিতেছিল। মাইনু সেইদিকে তাকাইয়া অন্যমনস্কের মত বলিল, কেনে, কি হবেক্ তার?

অবিলাশ বলিল, হবেক্ নাই কিছুই। তাই বল্‌ছিলম্, সায়েব্‌ট বড় বজ্জাৎ।

উভয়েই কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

অবিলাশ জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ মাইনু, তুঁই শাঙা কর্‌বি নাই?......

হাসিতে হাসিতে মাইনু বলিল, কেনে, তুঁই তাহেলে আমাকে রাখিস, না কি?

—ধেৎ। বলে একটাকে নিয়েই খাওয়াতে লাচ্ছি।

—আমাকে ত' খাওয়াতে হবেক্ নাই, আমি একাই একশ'। বলিয়া মাইনু জোরে জোরে হাসিয়া উঠিল। হঠাৎ গ্যালারির মুখে তীব্র একটা 'সেফ্‌টিবাতি' হাতে লইয়া সাহেব আসিয়া দাঁড়াইতেই উভয়ে অবাক্ হইয়া সেইদিকে তাকাইয়া রহিল।

সাহেব বলিল, এই! তোরা এখানে কি করছিস্—কাজে যা।

অবিলাশ গাঁইতি ও আলো হাতে লইয়া চলিয়া গেল।

মাইনু চলিয়া যাইতেছিল, সাহেব খপ্ করিয়া তাহার অঞ্চলপ্রান্ত টানিয়া ধরিতেই সে দাঁড়াইয়া পড়িল।

সাহেব বলিল, এইবার!

মাইনু গর্জ্জিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কি?

—খাদে আস্‌তে বারণ করছিলাম, তবু যে এলি?

মাইনু বলিল, তুর্ ঘরে চুপ করে' বসে' বসে' কি কর্‌ব?

সাহেব হঠাৎ হাতের বাতিটা নিভাইয়া দিয়া দূরে ছুড়িয়া দিল।......নিমেষেই এই পাতাল গহ্বরের অন্ধকার চোখের সুমুখে আরও বিরাট হইয়া উঠিল।

সাহেব ধীরে ধীরে বলিল, চুপ্! চেঁচাস্ না।

মাইনুর বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল।

সাহেব পাৎলুনের পকেট হইতে একটা রিভলভার বাহির করিয়া অন্ধকারেই মাইনুর হাতের নিকট ধরিয়া বলিল দেখেছিস্, এটা কি?

কই? বলিয়া মাইনু হাত দিয়া নাড়িয়া দেখিয়া বলিল, কে জানে ত!

—পিস্তল।......চেঁচালেই মেরে' ফেল্‌ব।

মাইনু নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সাহেব পিস্তলটা রাখিয়া মাইনুর হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, উয়ার সঙ্গে কি হচ্ছিল তোর?

মাইনু কথা বলিল না। তাহার সর্বাঙ্গ ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল। ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহার মধ্যে সাহেবের চক্ষু দুইটা মাইনুর মুখের উপর জ্বল্-জ্বল্ করিতে লাগিল।......

শেষ

বেলা বারোটার সময় মাইনু খাদ হইতে উঠিয়া সাহেবের বাংলোবাড়ীর যে-ঘরে সে রাত্রি কাটাইয়াছিল, সেখান হইতে তাহার পরিত্যক্ত দুইখানা কাপড় এবং পারিয়ার দেওয়া টাকার থলিটি সঙ্গে লইয়া ধীরে ধীরে মাতাল-শালে গিয়া উপস্থিত হইল।

তখন হইতে আরম্ভ করিয়া বেলা তিনটা পর্যন্ত সে কত যে মদ খাইল, তাহার ইয়ত্তা নাই। মদের দাম দিয়া তাহার আর সেখান হইতে উঠিয়া যাইবার ক্ষমতা ছিল না। তাহার শুষ্ক মলিন মুখখানি দেখিয়া মনে হইতেছিল, এ যেন সে মাইনু নয়। প্রায় ঘণ্টাখানেক পড়িয়া থাকিবার পর, একটুখানি সুস্থ হইলে মাইনু ধীরে-ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া আপন মনে চলিতে লাগিল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে অবিলাশের ধাওড়াঘরের নিকট গিয়া ডাকিল,—অবিলাশ!

মাইনুর ডাক শুনিয়া অবিলাশ ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল; বলিল, তুখেই আমি খুজ্‌ছিলম্ মাইনু, আয় শুন্—আমার সর্ব্বনাশ হঁইছে।

মাইনু ভাবিল, বোধ হয় তাহার স্ত্রী মারা গিয়াছে। তাই আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, কি, কি হলো অবিলাশ?

অবিলাশ বলিল, সায়েব বলেছে, আমি আঁর কাল থেকে ই খাদে খাট্‌তে পাব নাই।......আর এই স্থাখ্। বলিয়া অবিলাশ তাহার হাঁটুর উপরের কাপড়টা তুলিয়া দিতেই, মাইনু সবিস্ময়ে দেখিল, চাবুকের ঘায়ে খানিকটা স্থানের চাম্‌ড়া ফাটিয়া রক্ত বাহির হইতেছে।

মাইনু বলিল, সাহেব মেরেছে না কি?··· কেনে বল্ দেখি অবিলাশ?

—উবেলায় সেই তুঁই দেরী করে' দিলি, তাথেই এক-গাড়ী কয়লা চুরি করেছিলম্।......তা না করলে আমার পেট চলে কি করে' বল্ দেখি?

—হাঁ। খুব করেছিস্, বেশ করেছিস্। তুইও সায়েবকে মার্‌তে লার্‌লি?...না, না, মারিস্ নাই বেশ করেছিস্,—উয়ার সব পারে। তুর এখন মরে গেলে চল্‌বেক নাই।·····আমি আর দাঁড়াতে লার্‌ব—চল্লুম। এই লে। বলিয়া, টাকার তোড়াটা অবিলাশের হাতের দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল, ধর্,ইয়াতে তুর্ অনেক্‌দিন চল্‌বেক্।

অবিলাশ তোড়াটা হাতে লইয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—ই কোথা পেলি তুঁই?......আর তুর্ কি হবেক্?

—আমি যুথাই পাই কেনে, তুর্ কি?

—আর তুঁই চল্লি কোথা?

—আমি চট্‌কলে কাজ কর্‌তে যাব, ইথানে থাক্‌ব নাই।

অবিলাশ মাইনুর হাতখানা ধরিয়া বলিল, যাস্ না, যাস্ না মাইনু, অমন্ কাজটি করিস্ না। আমার এক বুন্ গেইছিল। তার লতিজার এক-শেষ হঁইছিল। মেয়ে-দের মান্ ইজ্জৎ কিছুই থাকে না।

আগ্রহাতিশয্যে মাইনু বলিল, ঠিক্ জানিস্ তুঁই?

—অই, তা আবার জানি না। আমার বুন্ গেইছিল যে!

—আমি সেইখানেই যাব।

অবিলাশ বলিল, শেষকালে মান্ ইজ্জৎ সব ঘুচাবি কেনে, যাস্ না মাইনু!

—মান্ ইজ্জৎ আমার থাক্‌লেই ত? বলিয়া জোর করিয়া ঈষৎ হাসিয়া মাইনু টলিতে টলিতে বাগানের পথ ধরিয়া চলিয়া গেল।

মালয় ও শ্যামরাজ্য

অধ্যাপক শ্রীবিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় এম-এ

গত ২৭শে জুলাই কলিকাতা হইতে 'ইথিওপিয়া' নামক জাহাজে আমি শিঙ্গাপুর যাত্রা করি। এবার আমি সঙ্গী-হীন অবস্থাতেই সেই সুদূর দেশে চলিয়াছিলাম; কারণ, গত বৎসর আমাদের তিব্বতযাত্রী দলের নেতা অধ্যাপক কশ্যপ গ্রীষ্মাবকাশে পুনরায় তিব্বতেই গিয়াছিলেন। একাকী হইলেও আমার উৎসাহের অভাব ছিল না; কারণ, সুদূর প্রাচ্যের বৌদ্ধ রাজ্যগুলি পরিদর্শন করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা অনেক দিন হইতেই মনে মনে পোষণ করিয়া আসিয়াছি। আজ আমার সেই অভিলাষ সফল হইতে চলিয়াছে দেখিয়া, আমি অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম। স্বাধীন বৌদ্ধ প্রদেশ শ্যামরাজ্য পরিদর্শন আমার এই সমুদ্র-যাত্রার উদ্দেশ্য।

সমুদ্র অত্যন্ত চঞ্চল ও উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল থাকায়, আমরা কেহই সমুদ্র-পীড়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি নাই। 'কালাপানির' পর্ব্বত প্রমাণ সফেন তরঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্রই আমার মাথা ঘুরিতেছিল—আমি যেন বিহ্বল হইয়া পড়িতেছিলাম। ব্রহ্মদেশের উপকূলের দিকে জাহাজ অগ্রসর হইতে থাকিলে, আমাদের অবস্থা ক্রমশঃ ভাল হইতে লাগিল। রেঙ্গুন সহর দেখিবার জন্য তিনদিন সেখানে অবস্থান করি। এখানকার বৌদ্ধ সুবর্ণ-মন্দির (Shwe Dagon) একটি দেখিবার জিনিষ। নানাবিধ মনোরম সুগন্ধি পুষ্পে সজ্জিত এবং সুন্দর পোষাক পরিহিত ফুলের মতই সুন্দর উপাসকবৃন্দ-পূর্ণ মন্দিরটি দেখিলে সত্যই মুগ্ধ হইতে হয়। রেঙ্গুন সহরটী দেখিতে অনেকটা ভারতীয় সহরের ন্যায়; এখানে ব্রহ্মদেশীয় বিশেষত্ব কিছু নাই দেখিয়া একটু যেন হতাশ হইয়া পড়িলাম।

মালয় রমণী

রেঙ্গুন হইতে যাত্রা করিয়া তিন দিন পরে পেনাং পৌছাই। মালয় উপদ্বীপের উপকণ্ঠে অসংখ্য নারিকেল-বৃক্ষ-সমাচ্ছন্ন এই দ্বীপটি অতি মনোরম। অগণ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আর তাহার মধ্যবর্ত্তী খাড়া পাহাড় দেখিতে যেন মনোমুগ্ধকর ছবির মত।

৮ই আগষ্ট প্রত্যুষে আমরা শিঙ্গাপুর বন্দরে পৌঁছি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ীগুলির দৃশ্য অতি চমৎকার। এক একটি গৃহ যেন অভেদ্য দুর্গের মত সুরক্ষিত। চীনা জেটিতে অবতরণ করিয়া জাহাজের ডাক্তার, কেরাণী এবং বেতার-বার্ত্তা প্রেরকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। ইঁহারা সকলেই বাঙ্গালী তার পর শিঙ্গাপুরের পরিচ্ছন্ন বিস্তৃত রাস্তা দিয়া গন্তব্য স্থানের উদ্দেশে অগ্রসর হইলাম। রাস্তাগুলির দুই পার্শ্বে প্রাসাদতুল্য বৃহৎ অট্টালিকা। আমি এখানকার একজন সম্ভ্রান্ত শিখের নিকট পরিচয়-পত্র লইয়া আসিয়াছিলাম। এই ভদ্রলোকটি শিয়ালকোটে (পাঞ্জাব) প্রস্তুত, খেলিবার সরঞ্জাম শিঙ্গাপুরে বিক্রয় করিয়া থাকেন। আমার আশ্রয়দাতা, অমৃতসরের খালসা কলেজের একজনকে অতিথি রূপে পাইয়া অত্যন্ত পুলকিত হইলেন। তাঁহার আতিথ্যে আমি অত্যন্ত তৃপ্তি সহকারে আহার করিলাম। নিরামিষভোজী ছিলাম বলিয়া কয়েক দিন জাহাজে আমাকে একরূপ উপবাসী হইয়াই থাকিতে হইয়াছিল—এখানে সে ক্ষতি পূরণ করিয়া লইলাম। আহারাদির পর পদব্রজে ভ্রমণে বাহির হইলাম। আল্‌কাত্‌রা-ঢালা ধূলিহীন রাস্তাগুলি ঝকঝক করিতেছে। ধূলি-মলিন পাঞ্জাব প্রদেশের অধিবাসীর নিকট ইহা এক বিস্ময়কর বস্তু। রিক্‌শ চড়িয়া ভ্রমণ এখানকার ফ্যাসান—সে দেখিতেও বেশ সুন্দর। রিক্‌শ-চালক সকলেই চীনবাসী—তাহাদিগকে কোনও কথা বুঝাইয়া বলা অতি দুরূহ ব্যাপার। যাহা হউক, আমার আশ্রয়দাতাকে সঙ্গে লইয়া রিক্‌শতে (এখানে 'বেচা' নামে অভিহিত) বেশ একটু ঘুরিয়া আসা গেল। সমুদ্র তট-সন্নিকটস্থ রাস্তাগুলি অতিশয় সুদৃশ্য। বৃহৎ প্রাসাদ-শ্রেণী, সুরক্ষিত ক্রীড়া-ক্ষেত্র, নোঙ্গর-করা বিশাল জাহাজগুলি যে মনোরম দৃশ্যের সৃজন করিয়াছে, তাহা সত্যই উপভোগ্য।

রবার বাগান

পর দিন নিজাম নামক একজন বাঙ্গালী মুসলমান ভদ্রলোক শিঙ্গাপুর-প্রবাসী কয়েকজন বাঙ্গালীর গৃহে লইয়া গেলেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসাদার পরলোকগত আব্দুল ওয়াহেদের বাণিজ্য-পরিচালক মিষ্টার মহম্মদ আলি এবং বাবু অনুকূলচন্দ্র চন্দ্র এই সুদূর দেশের সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যবসাদার। এক দিন অপরাহ্ণে মিঃ মহম্মদ আলির মোটরকারে সমস্ত শিঙ্গাপুর সহরটি প্রদক্ষিণ করি। মাঝে মাঝে যখন মোটরকার পাহাড়ের গা বাহিয়া উপরে উঠিতেছিল, তখন নীল সমুদ্রের উদার দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছিলাম। তানজং কাতুংএ যে সন্ধ্যা অতিবাহিত করি, সেদিনকার কথা আমি কোনও দিন ভুলিতে পারিব না। এই স্থানটি

সম্ভ্রান্ত লোকগণের প্রধান আশ্রয়স্থল। সমুদ্র-তটের ধার দিয়া বরাবর চীনা বণিকগণের সুরম্য বিপণি। জাপানী হোটেলগুলির সংলগ্ন মঞ্চগুলি সমুদ্র-সলিল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সেই মঞ্চের উপর বসিয়া সমুদ্রের লীলায়িত তরঙ্গগুলির দেখিতে দেখিতে যে কেহ চা পান করিতে পারেন। আর এক দিন নারিকেল ও রবার-বৃক্ষের ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া ট্রাম গাড়ীতে চড়িয়া ডাঃ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সহিত দেখা করিবার জন্য যাই। তাঁহার তত্ত্বাবধানে এখানে একটি সুন্দর চিকিৎসালয় চালিত হইতেছে।

লালবর্ণ। আলুর মত দেখিতে আর একরকম ফল আছে; তাহার ভিতরের রং হলদে এবং তাহা খাইতে বেশ সুস্বাদু। আর এক প্রকারের ফল দেখিলাম—তাহাকে চীনা ভাষায় 'Cat's eye' বলিয়া থাকে। সত্যই ইহার খোসা ছাড়াইলে, ভিতরটা দেখিতে বিড়ালের চোখের মত। এখানে নানা রকমের সুস্বাদু কলা পাওয়া যায়। ভারতীয় সর্ব্বপ্রকার শাক-সবৃজী এখানে দেখিতে পাইলাম।

শিঙ্গাপুর প্রবাসীগণের মধ্যে চীনারাই বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। তাহারা স্থানীয় শিল্প বাণিজ্য একরূপ এক-

শিঙ্গাপুর বন্দর
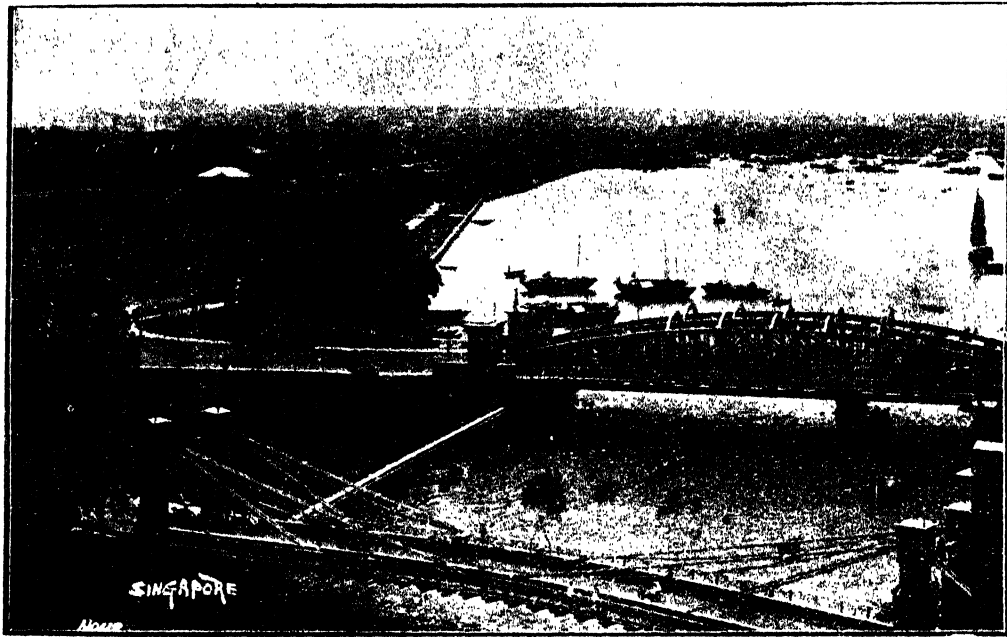
শিঙ্গাপুর একটি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। রবারের ব্যবসাই এখানকার সর্ব্বপ্রধান ব্যবসা—কিন্তু সম্প্রতি ইহার অবস্থা বিশেষ সুবিধাজনক নহে। এখানে নৌবিভাগের আড্ডা স্থাপন করিবার প্রস্তাব চলিতেছে। এখানকার অধিবাসীরা আশা করিতেছে, তাহা হইলে স্থানীয় বাণিজ্যের উন্নতি হইতে পারে।

আমার আশ্রয়দাতা সর্দ্দার বুলদীপ সিং পাইনএপ্‌ল, ম্যাঙ্গোষ্টিন্‌স, র‍্যাম্পষ্টান্‌স প্রভৃতি নানাজাতীয় স্থানীয় ফল প্রায়ই আমাকে আনিয়া দিতেন। র‍্যাম্পষ্টান্‌স ফল খাইতে অনেকটা লিচুর মত, তবে ইহার লম্বা লম্বা থস্‌থসে আঁসগুলি

চেটিয়া করিয়া লইয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেকেই নাম-জাদা ধনী। 'New World' নামে এখানে একটি আমোদ-প্রমোদের স্থান আছে। এখানে ধনী পরিবারের চীনা মহিলাগণের চোখ-ঝলসানো বহুমূল্য পোষাক এক বিস্ময়কর দেখিবার বস্তু বটে! মালয়বাসীরা তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিতে পারে নাই,—তাহারা স্বদেশে থাকিয়া পাহারাদারী অথবা মোটর চালানো প্রভৃতি অল্প মাহিনার কাজ লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে।

শিঙ্গাপুরে একটি সুন্দর ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ভারতীয় সঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছে। এখানে পড়িবার জন্য ভারতীয়

সংবাদপত্রাদি এবং নানারূপ খেলিবার ব্যবস্থা আছে। বাবু অনুকূলচন্দ্র চন্দ্র এই সঙ্ঘের সহকারী সভাপতি। 'উত্তর ভারতীয় হিন্দুসঙ্ঘ' নামে এখানে আর একটি সমিতি রহিয়াছে। এই সঙ্ঘ দ্বারা একটি হিন্দু নৈশ বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করিতে এবং কিছু বলিবার জন্য আমি আহূত হইয়াছিলাম। ভারতীয়গণের মধ্যে মান্দ্রাজীরাই (হিন্দু ও মুসলমান) এখানকার প্রধান বাসিন্দা। তাহাদেরও এখানে সঙ্ঘ রহিয়াছে। শিঙ্গাপুর-প্রবাসী ভারতীয়গণের মধ্যে খদ্দরের প্রচলন বেশ দেখিলাম। ডাক্তার ছোটা সিং, বাবু রামধারি সিং প্রভৃতির ন্যায় মহানুভব স্বদেশ-ভক্তগণের চেষ্টাতেই ইহা সম্ভব হইয়াছে।

১৪ই আগষ্ট মঙ্গলবার অপরাহ্ণে পেনাংএ সাউথ শ্যাম এক্সপ্রেস্ ধরিবার জন্য ট্রেণযোগে সিঙ্গাপুর ত্যাগ করি। এই এক্সপ্রেসখানি প্রতি বৃহস্পতিবার পেনাং হইতে ছাড়ে এবং শ্যামরাজের রাজধানী ব্যাঙ্কক (Bangkok) পর্য্যন্ত গমন করে। জোহর প্রণালী (the Strait of Johore) পার হইবার জন্য ষ্টীমলঞ্চে উঠিতে হইল। এই প্রণালীটি শিঙ্গাপুর ও মালয় উপদ্বীপকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। লঞ্চ হইতে অবতরণ করিয়া জোহর ষ্টেশনে পুনরায় ট্রেণে চড়িলাম। এই স্থান মালয় ফেডারেটেড্ ষ্টেট্সের অন্তর্ভুক্ত। জোহর প্রণালীর উপর একটি বৃহৎ সেতু নির্ম্মিত হইতেছে—ইহা শিঙ্গাপুর ও মালয় রাজ্যের সংযোজক স্বরূপ হইবে।

এফ, এম, এস্, ট্রেণে এক ডলার (অর্থাৎ এক টাকা বারো আনা) অতিরিক্ত দিলে ঘুমাইবার জন্য বার্থ পাওয়া যায়। পর দিন প্রাতঃকালে মালয় রাজ্যের প্রধান সহর কুয়ালা লম্পর (Kuala Lampar) পৌঁছিলাম। মালয় রাজ্য পেরাক্, সেলাঙ্গোর, পহাং প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশ দ্বারা সংগঠিত এবং ব্রিটিশ রক্ষিত দেশীয় রাজন্যবর্গ দ্বারা শাসিত। এখানে আমাদের গাড়ী বদল করিবার কথা। ট্রেণে ছাড়িবার কিছু বিলম্ব থাকায় গাড়ীতে চড়িয়া সহরটি দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। নগরটি দেখিতে অতি সুন্দর। পাহাড়ের গাত্রে সুন্দর চিত্রের ন্যায় উদ্যান এবং হিন্দু আরবীয় (Indo-Saracenic) শিল্পকলার আদর্শে গঠিত চিত্তাকর্ষক অট্টালিকাগুলি সত্যই দেখিবার মত। এইখানে আমি সর্ব্বপ্রথম পান্থ-পাদপ (Travellers' palm) দেখিলাম। এই গাছ দেখিয়া আমার পেখমধারী ময়ূরের

পান্থ-পাদপ
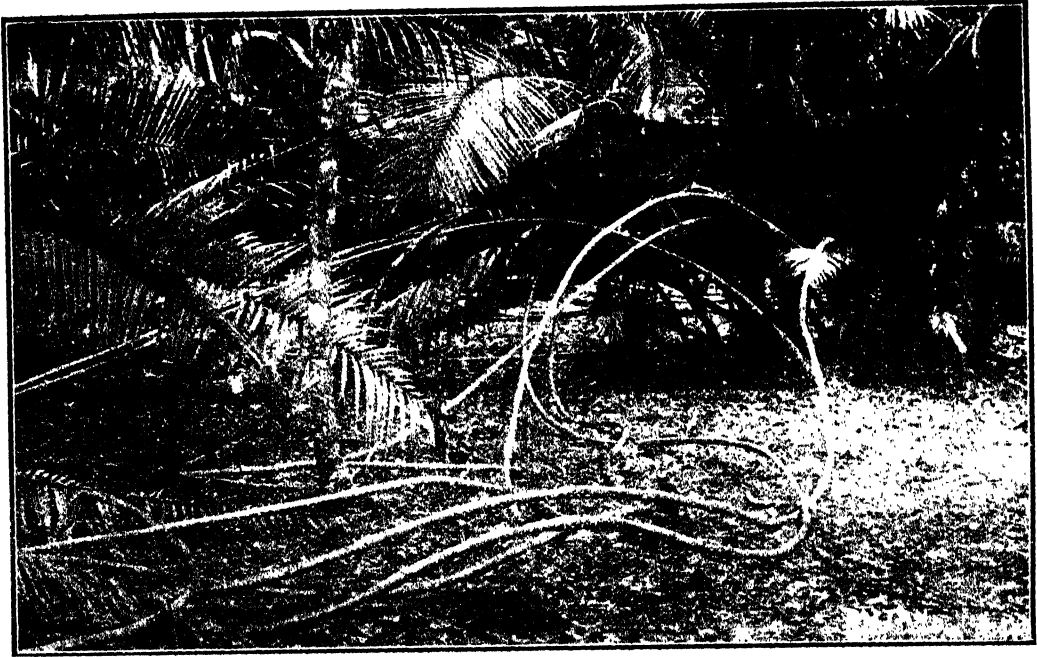
বেতের ক্ষেত

কাতুং (শিঙ্গাপুরের সৌখীন স্থান)

কথা মনে পড়িল। এখানে ভারতীয়গণের অনেক দোকান দেখিতে পাইলাম—পরিচ্ছন্ন 'ইউনিফর্ম্ম' পরিহিত শিখ সৈন্য ও পুলিস সর্ব্বত্র চোখে পড়িল।

সময় ফুরাইয়া আসিয়াছে বলিয়া তাড়াতাড়ি ষ্টেসনে ফিরিয়া ট্রেণে চড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে ট্রেণ সীমাহীন রবার ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিল। এগুলি অনেক স্থলে পাহাড়ের শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে দেখিলাম। রবার ক্ষেত্র এদেশের প্রধান বিশেষত্ব।

সহস্রবাহু-মন্দির

শ্রীফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচ্য-ভারতের শিল্পী গোয়ালিয়র দুর্গে যে মনোহারী, ভাব-মোহন, সৌন্দর্য্য মণ্ডিত-কারু-কার্য্যের অতুল নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন,—তন্মধ্যে "সহস্রবাহু-মন্দিরই" শ্রেষ্ঠ। গোয়ালিয়র দুর্গে প্রাচীন যুগের যে সকল কীর্ত্তি-চিহ্ন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে,—শিল্পী যেন তন্মধ্যে ইহাকেই প্রস্তুত করিতে নিজের শিল্পী-কলার সমস্ত প্রতিভা নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে শিল্প-প্রতিভার নিদর্শন ঝরিয়া পড়িতেছি,—তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা যায়। এইরূপ সূক্ষ্ম কারুকার্য্য ভারতের বাহিরে অন্যত্র দুর্লভ! ইহার গুম্বজে, ইহার থামে, ইহার দেয়ালে, ইহার তোরণে, ইহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে শিল্প যেন সজীব-মূর্ত্তি হইয়া দাঁড়াইয়া! এক কথায় সমস্ত মন্দির শিল্প-সম্ভারে পূর্ণ। একজন ইংরাজ ঐতিহাসিকের মতে,—"...are richly ornamented with sculptures."

"গোয়ালিয়র দুর্গে" বড় "সহস্র-বাহু-মন্দির"

এই শিল্প অতি সুন্দর—সৌন্দর্য্য-গাম্ভীর্য্যের মধ্যে অপূর্ব্ব সমবেশ-কৌশলে অনির্ব্বচনীয়! ইহা প্রস্তুত করিতে শ্রম, যত্নের কোনই ত্রুটি লক্ষিত হয় না;—সুন্দরকে আরও সুন্দর করিয়া তুলিবার চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান। কত শত ঝড়-ঝাপটা ইহার মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে—কিন্তু আজও সেইরূপ নীরব, নিষ্পন্দ,—অচল, অটল, স্থিরভাবে মাথা উঁচু করিয়া, দুই ভ্রাতার ন্যায়, দুইটি মন্দির দুর্গের মধ্য-স্থলে,—পূর্ব্ব-প্রান্তের শেষ সীমানায় দাঁড়াইয়া সৌন্দর্য্য-প্রিয় সমাজের কৌতূহল জাগ্রত করিতেছে।

দূর হইতে বোধ হয় ঠিক যেন কেহ কাঠের কারুকার্য্য-খচিত একটি মন্দির বসাইয়া দিয়াছে। নিকটে আসিয়া ভ্রম যখন দূর হয়, তখন সত্যই অবাক্ হইতে হয়, মুগ্ধ হইতে হয়—আমাদের ভারতবর্ষের সমুন্নত শিল্প-কলার নিদর্শন দেখিয়া! এই সব দেখিয়া বোধ হয় আমাদের ভারতে শিল্প-কলার অভাব মোটেই ছিল না। তবুও পাশ্চাত্য পণ্ডিত ওয়েষ্টমেকটের মতে, "There is no temptation to dwell at length on the sculptures of Hindustan." আর স্পষ্টবক্তা সার জর্জ্জ বার্ডউড বেশ গম্ভীর ভাবে বলিয়া গিয়াছেন, "Sculptures and paintings are unkonwn as fine arts in India." (?)

আমাদের প্রাচীনযুগের কাহিনী হইতে আমরা বঞ্চিত; কিন্তু প্রস্তর গাত্রে এই মূল্যবান শিল্প-কার্য্য সকল আমাদের সম্মুখে সে যুগের সে আলেখ্য ধরিয়াছে, তাহা সত্যই গৌরবজনক!

এই মন্দির দেখিতে যাইতে হইলে 'উরবাহী দরজা' দিয়া যাওয়া সুবিধাজনক। পথটি চড়াই,—শত শত পার্ব্বত্য-পক্ষীগণের অপূর্ব্ব কাকলীর জয়শ্রীতে পূর্ণ;—খরগোস মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ন্যায় চকিতে চোখের সম্মুখ হইতে সরিয়া যায়। মাঝে মাঝে-ময়ূরের উচ্চ রব গম্ভীর স্থানটিকে সচকিত করে দেয়;—তাহা-দের নৃত্য দেখিয়া পথিককে দুদণ্ড দাঁড়া-ইয়া চক্ষু সার্থক করিয়া লইতে হয়। সহসা পথের মাঝে, ডান হাতের দিকে,—পাহাড়ের গায়ে,—সর্ব্বোচ্চ'আদিনাথে'র মূর্ত্তিটি নূতন দর্শকের মনে বিস্ময় জাগাইয়া তোলে। ইহার উপরে উঠিবার জন্য পাথরের সোপান ঘুরিয়া-ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার সাহায্যে আমরা কত-বার উঠিয়া মূর্ত্তির বুকের উপর নাম লিখিয়া আনন্দ অনুভব করিয়াছি।

গোয়ালিয়র দুর্গে বড় সহস্রবাহু মন্দিরের গর্ভ-গৃহের তোরণ

দ্বিতীয় তোরণের নিকট উপরে উঠিবার পথটি সহজ করিবার জন্য সোপান চলিয়া গিয়াছে। তাহার পর "তৈলাঙ্গনা-মন্দিরের" কাছাকাছি "সূর্য্য কুণ্ডের" পার্শ্বের পথ ধরিলেই অবিলম্বে সহস্র-বাহুর নিকট উপস্থিত হওয়া যায়। ইহা প্রাচীন প্রস্তর-শিল্প-কীর্ত্তির একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। একজন ঐতিহাসিকের ভাষায়, "...Very beautiful examples of eleventh century work."

ঐতিহাসিকের মতের ঐক্য নাই—অনেকেই ইহাকে জৈন-মন্দির বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু যে মূর্ত্তি-গুলি অতি নিপুণতার সহিত খোদিত হইয়াছে, তাহা সমস্তই আমাদের তেত্রিশ কোটি দেবতার প্রতিচ্ছবি,—তাহা হইতে সহজে অনুমেয় মন্দির জৈনদিগের নয়—হিন্দুদিগের

প্রথমে সোপান-সাহায্যে বড় মন্দিরে প্রবেশ করিলেই দুই-দিকে দুইটি লিপি প্রাচীর-গাত্রে দেখিতে পাওয়া যায়;—ইহা ১১৫০ শকাব্দের (A. D. 1093)। লিপিতে 'পদ্মনাথের' কথাটার উল্লেখের জন্য জৈন দিগের ষষ্ঠ সন্ন্যাসী পদ্মপ্রভা-নাথের ভ্রম হয়, এবং সেই কারণে সকলে ইহাকে জৈন-মন্দির বলিয়া অভিহিত করেন। কিন্তু সম্পূর্ণ-মন্দির ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কৃষ্ণ ইত্যাদি দেবতার সুন্দর, সূক্ষ্ম মূর্ত্তির ভারে নুইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। সেই কারণে ইহাকে জৈন-মন্দির বলা যায় না।

মন্দিরে দুইটি তোরণ। একটি প্রবেশ-দ্বার, অপরটি ভিতরে। এই তোরণগুলির কারুকার্য্যই সমধিক উল্লেখযোগ্য ও সুন্দর। বৃহৎ একটি কারুকার্য্য-খচিত পাথরের মধ্যস্থলে তোরণ। দুটিরই গঠনাদর্শ এক-রূপ, ও কারুকার্য্য বড়ই চমৎকার। এই সব তোরণে অসংখ্য দেবতার মূর্ত্তি, পশু ও পুষ্পলতার চিত্র খোদিত

আছে। কতবার গিয়াছি, শুধু আত্মবিস্মৃত হইয়া ইহার শিল্প-চাতুর্য্যই পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি। প্রত্যেক তোরণের উপরে পদ্ম-হস্তে অনেকগুলি বিষ্ণু-মূর্ত্তি;—ইহা হইতে অনুমান করা যায় মন্দিরটি বিষ্ণুকে অর্ঘ দিবার জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মন্দির দুইটি রাজা মহীপালের কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজেন্দ্রলালবাবু বলেন মহীপালের রাজত্বকালে, "...a figure of Padmanath a Jain divinity came suddenly into existence." এবং সেই কারণে তাঁহার মতে ইহা জৈন-মন্দির। কিন্তু ইহাতে হিন্দুদিগের নানারূপ

মন্দির সম্বন্ধে প্রস্তরস্তম্ভে যে লিপি উৎকীর্ণ ছিল,—সেই লিপি-সংযুক্ত প্রস্তর-স্তম্ভটি—মন্দির হইতে ১৫০ ফিট দূরবর্ত্তী স্থানে অদ্যাপি বর্ত্তমান। ইহাতে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল তাহা এখন মুছিয়া গিয়াছে। খুব সম্ভব, এই স্তম্ভ হইতে আমরা মন্দির সম্বন্ধে আরও কিছু বেশী পরিচয় পাইতাম। পূর্ব্ব-যুগে রাজাদিগের ইতিহাস প্রস্তর-লিপিতেই উৎকীর্ণ হইত;—যাহা কিছু তাঁহারা করিতেন সে সব কীর্ত্তি চিরদিনের জন্য লিপিতে খোদাই করিয়া দিতেন।

গোয়ালিয়র দুর্গে বড় সহস্রবাহু মন্দিরের থাম ও গম্বুজ

দেবতাদিগের মূর্ত্তি বিশেষতঃ-বিষ্ণুকে পদ্ম-হস্তে উচ্চাসনারূঢ় দেখিয়া ক্যানিংহাম বলেন, "I infer Padmanath must be one of the many titles of Vishnu." ষষ্ঠ জৈন-সন্ন্যাসীর নাম পদ্ম-প্রভা, পদ্মনাথ নয়; সেই কারণে পদ্ম-হস্তে বিষ্ণুকেই "...Lord of Lotus" বলিতে হইবে।

"সহস্রবাহু-মন্দির" ১০০ ফিট লম্বে ও ইহার চৌড়াই ৬৩ ফিট। উত্তর ও পশ্চিমদিকে মন্দিরের বাহিরে বারান্দার মত আছে। উত্তরদিকে ইহার প্রবেশ-দ্বার;—দক্ষিণের মন্দিরের শেষে, একটি অন্ধকার, সুন্দর কারুকার্য্য-খচিত পূজার ঘরের মত নির্জ্জন কুঠরী।

ইহার বর্ত্তমান উচ্চতা প্রায় ৭০ ফিট। ইহার চূড়া কিন্তু প্রায় ধ্বংস হইয়া গিয়াছে;—সেই কারণে মনে হয় কোনকালে ইহা ১০০ ফিটের কম উঁচু ছিল না। সম্পূর্ণ মন্দির কারুকার্য্যময়, পাষাণ-খণ্ডের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে;—উপরের অধিকাংশ পাথর খসিয়া পড়িয়াছে; সেই খসিয়া-পড়া পাথরে শিল্পের যে অনিন্দ্য-সুন্দর প্রতিভা বিকশিত হইয়াছিল তাহা অদৃশ্য হইয়াছে,—সেই কারণে শিল্প-কলার যে অন্যান্য গঠন নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহা আর পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি আছে—তাহারই নিম্নের সারিতে হাতিগুলি সম্মুখে মাথা করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

উহার নিম্নে পুষ্পহার-বিভূষিত সুন্দর বৃক্ষ এবং উড্ডীয়মান কিন্নরী—মাঝে মাঝে অলঙ্কারের প্রতিচ্ছবি—যাহা মিঃ ক্যানিংহামের মতে "...too fine and delicate for the near and prominent position which they occupy."

মন্দির তিনভাগে বিভক্ত,—ইহা অতি পরিষ্কাররূপে দূর হইতেই বোঝা যায়। দুই তলারই ছাদ নিম্নে থামের সাহায্যে দাঁড়াইয়াছে। মন্দিরের দক্ষিণদিকে সব-শেষে যে নির্জ্জন আলো-আঁধারে কক্ষ আছে,—তাহার উপরকার প্রায় অনেকগুলি পাথর ভাঙ্গিয়া খসিয়া গিয়াছে,—সেইজন্য অনুমান করা যায় না উহার প্রকৃত উচ্চতা পূর্ব্বে কত ছিল। ক্যানিংহাম বলেন, "I infer that the sanctum could not have been less then 150ft. in height." উহার চূড়া অত উঁচু ছিল বলিয়া বহুপূর্ব্বেই পড়িয়া গিয়াছে, কারণ বাবরের মতে, "Teli-mandir is the highest building in the fort." তাহা হইলে ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে বাবরের দুর্গ আগমনের আগেই পদ্ম-নাথের সব-চেয়ে উঁচু মন্দিরটি ভগ্নদশায় নিপতিত হয়।

মন্দিরের অভ্যন্তরিক দৃশ্য বড়ই সুন্দর। ইহার আলাদা আলাদা ৫টি ভাগ আছে,—প্রবেশ করিয়াই 'অর্দ্ধমণ্ডপ' সমস্তই কারুকার্য্য ও মূর্ত্তি-চিত্রে অঙ্কিত;—এমন কি বিষ্ণুর হস্তে পদ্মের প্রত্যেক পাপড়ির সৌন্দর্য্য সকলকে মুগ্ধ করে। সোপানটি পর্য্যন্ত শিল্পের পরিচয় দিতেছে। তাহার পর তোরণ,—ইহা দেখিতে অতি চমৎকার। ভিতরে গিয়াই 'মধ্য-মণ্ডপ' ও তাহার পরই 'মহা-মণ্ডপ।' চতুর্থ অংশের নাম 'অন্তর্লা',—চারদিকে চারটি ছোট ছোট কুঠরী;—পঞ্চম "গর্ভ-গৃহ" ইহার দ্বারটি বাহিরের তোরণের মত।

বর্ত্তমান শতাব্দীর রুচি অনুযায়ী অনেক প্রকারের নূতন নূতন গড়নের অলঙ্কার আবিষ্কৃত হইতেছে—কিন্তু এই তোরণের ছুটি দেখিলে বুঝিতে পারা যায়—এ সব আবিষ্কার নূতন নয়, অতি প্রাচীনযুগে ভারতবাসীর মস্তিষ্কে ইহার উদ্ভাবনা হইয়াছিল। স্বর্ণের উপর যেরূপ কারুকার্য্য হইয়া নূতন গড়নের অলঙ্কার বাজারে প্রচলিত হইতেছে,—(যাহা সভা-সমাজকে মুগ্ধ—অথবা আত্মহারা করিয়া তোলে)—সেই ধরণের—অথবা আরও আশ্চর্য্যজনক গঠনের নানাবিধ অলঙ্কার, শিল্পী একাদশ শতাব্দীতে, সামান্য পাথরের তোরণে খোদাই করিয়া গিয়াছেন। মূর্ত্তিগুলিতে শিল্পী শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির সৌন্দর্য্য ফুটাইবার জন্য এত চেষ্টা করিয়াছেন যে, দেখিয়া সত্যই আশ্চর্য্য হইতে হয়! ইহাদের অঙ্গ-লাবণ্য এরূপ সুষমা-মণ্ডিত, যে
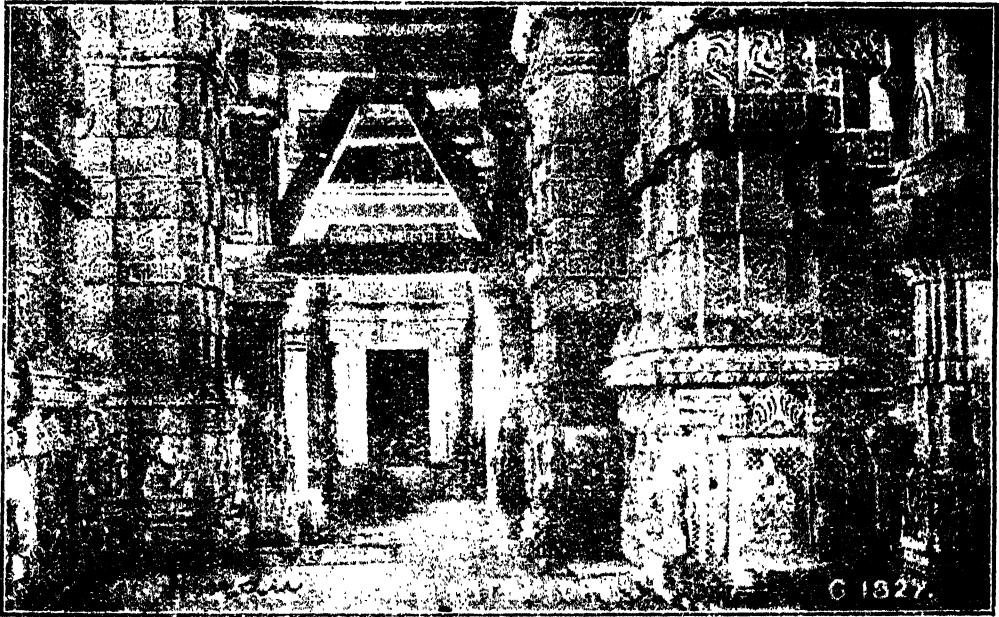
গোয়ালিয়র দুর্গে বড় সহস্রবাহু মন্দিরের তোরণ ও প্রাচীরগাত্রে-কারুকার্য্য

বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া থাকা যায় না। কিন্নরীর লীলাচঞ্চল পাদসঞ্চালনে দর্শক-মনোহারী নৃত্য, এ সকল এত নিপুণভাবে খোদিত হইয়াছে যে শিল্প-প্রিয় মানবের মনে আনন্দের ঢেউ খেলাইয়া দেয়! সর্ব্বত্রই সূক্ষ্ম-শিল্পের পরিচয় জাজ্বল্যমান;—গাত্রের ভূষণগুলি বেশ সুস্পষ্ট হস্তের ও বাহুর অলঙ্কার, কণ্ঠের হার, শিরোভূষণ প্রভৃতির অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের রচনা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। কৃষ্ণের বাঁশী হস্তে দাঁড়াইবার ভঙ্গিমা দেখিয়া হঠাৎ বোধ হয়—এখনি বুঝি বাজিবে বাঁশরী!

পারা যায়। থামের উপরকার শিল্প আরও সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে; ইহার কারুকার্য্যময় লতাপাতাগুলি আরও সূক্ষ্মভাবে উৎকীর্ণ হইয়াছে। মুসলমানদের যুগে ইহাতে একবার চূণকাম করা হয়, তাহার চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান।

গোয়ালিয়র দুর্গে যখন মুসলমানদিগের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন হইতে 'পদ্মনাথ' হিন্দুদিগের পূজা হইতে বঞ্চিত হ'ন। খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহা অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়া ছিল। পশ্চিমদিকের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে
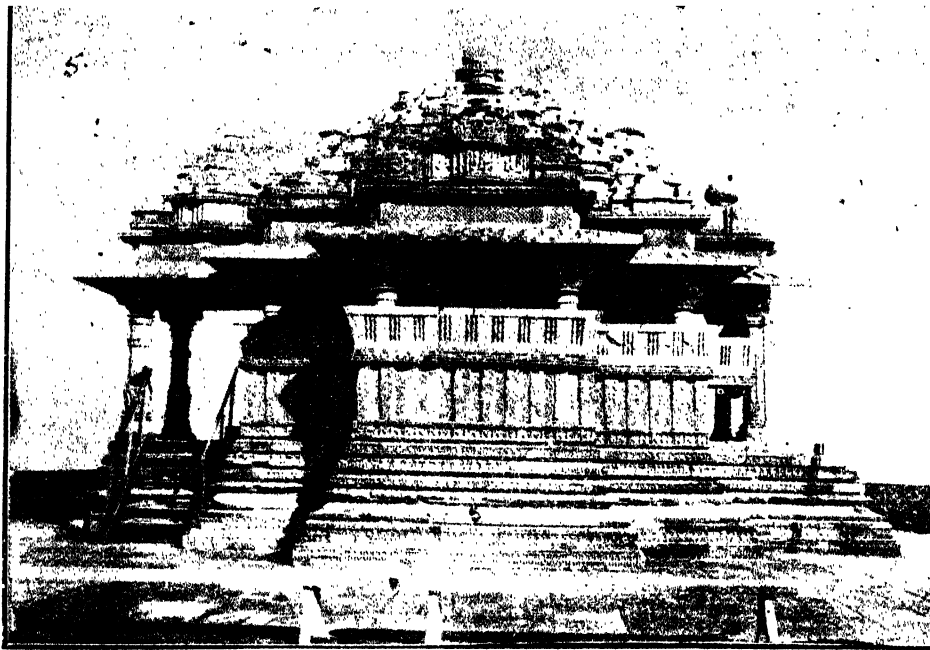
গোয়ালিয়র দুর্গে ছোট সহস্রবাহু-মন্দির

'মধ্যমণ্ডপের' গম্বুজও দেখিবার মত; ইহা ৩১ ফিট, গোলাকার—নিম্নে কারুকার্য্য-খচিত থামের সাহায্যে আজও দাঁড়াইয়া। শেষাংশ ছাদটি ছোট ছোট থামের উপর ভর করিয়া আছে। এই ছাদটিও গোলাকার ভাবে ঘুরিয়া গিয়া 'মধ্য-মণ্ডপে'র গম্বুজকে আলিঙ্গন করিয়াছে। থামে, গম্বুজে ছাদে সর্ব্বত্রই ঐরূপ সূক্ষ্ম শিল্প।

শিলালিপি হইতে জানা যায় মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য বিক্রম ১১৪৯ অব্দে (A. D. 1092) শেষ হইয়াছিল। মন্দিরের অভ্যন্তরের কারুকার্য্য শেষ হইতে আরও সময় লাগিয়াছিল; ইহা ভাস্কর্য্যের ভিন্নতা হইতে সহজে বুঝিতে

১১৬০ সম্বতের (A. D 1103) অসম্পূর্ণ একটী লিপি আছে; এই স্থানে আরও দুইটি লিপি আছে—একটি ১৫২২ সম্বতের (A. D 1465) ও অন্যটি ১৫৪০এর (A. D 1483)। এই লিপি হইতে জানিতে পারা যায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে মন্দিরটি আবার হিন্দু কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছিল, তখন তোমরবংশীয় নরপালগণের বিজয়-কেতন দুর্গে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই শতাব্দীতে গোয়ালিয়র দুর্গ হিন্দুদিগের হস্তচ্যুত হইয়া মুসলমানদিগের করতলগত হইল। তখন হইতে দুর্গটি "used as a prison"

এই সব প্রাচীন স্মৃতি একবারে নির্ম্মূল করিবার জন্য

মুসলমান নৃপতিগণ প্রায় সমস্ত মূর্ত্তিগুলিকে বিকৃত করিয়াছেন কাহারও হস্তপদাদি ছিন্ন আবার কাহারও মাথাটি স্কন্ধের উপর হইতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। কাহারও নাকটি এরূপ সুন্দরভাবে কাটা হইয়াছে যে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না!

ছোট 'সহস্র-বাহু'-মন্দির" ইহারই প্রতিচ্ছবি; একই গঠনের, প্রভেদের মধ্যে উহার চেয়ে ছোট ও একতলা। "গর্ভ-গৃহ" ব্যতীত ইহা চতুর্দ্দিকে খোলা। পদ্ম-নাথ মন্দিরের পশ্চিমে দুর্গের শেষ সীমানায় ইহা অবস্থিত। এ স্থান হইতে নিম্নের দৃশ্য অতি চমৎকার। একদিকে বৃহৎ-সুন্দর মনোমুগ্ধকারী উদ্যান ও অপরদিকে প্রাচীন গোয়ালিয়রের করুণ ছবি!

ইহার ক্ষুদ্র কুঠরী অদৃশ্য হইয়াছে। মন্দিরের শেষাংশ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়; মুসলমানগণ এতদিন দুর্গের শাসন-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও ইহাকে কেন নিষ্কৃতি দিলেন? অনেকগুলি মূর্ত্তির দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে বটে, কিন্তু অধিকাংশই আস্ত। ইহার বাহ্যিক গঠন সাধারণ। 'মহা মণ্ডপ' ২৩ ফিট; গোলাকার ছাদ চারটি থামের উপর নির্ভর করিতেছে। পশ্চিমদিকে ইহার প্রবেশ-দ্বার। ইহাতেও শিল্প-কলা বিকশিত হইয়াছে। থামগুলির চতুর্দ্দিকে যৌবন-পুষ্পিতা, রত্নালঙ্কার ভূষিতা নর্ত্তকীগণ নৃত্যপরায়ণা।

ইহাও বিষ্ণু-মন্দির। ক্ষুদ্র কুঠরীর তোরণের মধ্যস্থলে গরুড়ের উপর গদাহস্তে বিষ্ণু আসীন—তাঁহার ডান দিকে বেদ-হস্তে ব্রহ্মা ও বাঁদিকে শিব। কোন লিপিতে ইহার সম্বন্ধে কিছু উৎকীর্ণ না থাকায় ইহার নির্ম্মাণকাল অপরিজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু বড় 'সহস্র-বাহু'-মন্দিরের গঠনপ্রণালী দেখিয়াই বলিতে হইবে, একই নির্ম্মাণকর্ত্তা কর্ত্তৃক এই দুটি তৈরী হওয়া সম্ভব। ইহার এক নাম "শাশ-বাহু"—অর্থাৎ শাশুড়ী বধূ; ইহা হইতে বোঝা যায় দুইটিতে নিকটতর সম্পর্ক আছে। বড়টি যখন মহীপাল কর্ত্তৃক খৃঃ ১০৯২ শতাব্দীতে প্রস্তুত হইয়াছে, তখন ক্যানিংহামের মতে, "I would assign the smaller temple either to one of his queens or to some other member of his family."

এই চিরস্থায়ী দুইটি কীর্ত্তিস্তম্ভ গোয়ালিয়র দুর্গে এখনও সমুন্নতশিরে সগৌরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

হটু ঘোষ

শ্রীধূর্জ্জটী অধিকারী

১

তাকে হটু ঘোষ বলেই প্রবীণেরা ডাকতেন। আর তরুণের দল ব'লতো খুড়োমশাই। বর্দ্ধমানের উকিল মহলে তার পসার ছিল খুব; কেন না, মামলা সাজাতে আর সাক্ষ্য দিতে সে না কি অদ্বিতীয় ছিল। নূতন উকিল সমর বোস, বছরখানেক ব্যবসা খুলেই, দুখানা গাড়ী, আর চার মহল বাড়ীর মালিক হতে পেরেছিল না কি তারই সহায়তা পেয়ে।

এই হটুর গ্রামের নাম ছিল মকুবপুর। সেখানে বাসের ভূমি ও চাষের জমীর অনুপাতে বসতি ছিল খুবই অল্প; তাই, বাংলার অন্যান্য গ্রামের মত, মকুবপুরের কুটীরগুলির অধিকাংশই শুধু পাগল হাওয়ার উদাস সুরে আর্ত্তশ্বাস মিশাতো; আর মাঠগুলি সব আগাছার বসন প'রে কোনও রকমে লজ্জা রক্ষা করতো।

কিন্তু দশ-বিশ বছর আগে মকুবপুর ঠিক এমনটাই ছিল না। তখন গ্রামের উত্তরে ছিল কায়স্থের ও দক্ষিণে ছিল ব্রাহ্মণের বাস; আর মধ্যভাগে যেন বুকটী জুড়ে ছিল বিশ-ত্রিশ ঘর চাষা। তাদের কেউ বা দুলে, কেউ বা জেলে, কেউ বা মুচি, কেউ বা ডোম। এ খবরটী না জানালেও গল্পের ক্ষতি হ'ত না হয় ত; কিন্তু এর পিছনে দূর অতীতের মানুষগুলির যে মনের ছবির আভাসটুকু

জাগছে, সেটা তুচ্ছ ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ছোটর প্রতি এই যে আসল অনুরাগ, বড় জাতের আবাস-ঘেরা গ্রাম্য ভবনের আঙ্গিনায় ছোট জাতের এই যে অধিষ্ঠান,—অতীত যুগের বড় জাতের কতখানি উঁচু প্রাণের এ যে স্পষ্ট পরিচয়,—তা' কি আর বেশী ক'রে বুঝিয়ে দিতে হবে?

কোন্ সুদূর কালে দামোদরের একটী ধারা এই গ্রামের মধ্য দিয়ে বয়ে যেত—সেই চাষার নীড়ের তল বেয়ে। এখন তার স্মৃতিটুক জাগিয়ে আছে মাত্র একটী শুষ্ক রেখা; কাঙাল মেয়ের, পূজোর সময় তুলে-রাখা-নূতন কাপড় পরার মত—সে বর্ষায় বর্ষায় জলাম্বরীতে অঙ্গ ঢেলে উৎসব সজ্জায় সাজে।

নদী শাখা গ্রামের মাঝ দিয়ে ব'য়ে গেলেও, উভয় তীরের লোক তখন এক গ্রামেরই সামিল ছিল। একবার না কি কোন্ জমিদারের যুগে দুই তীরকে দুটো গ্রামে বিভাগ করবার কথা হ'য়েছিল; কিন্তু প্রজারা রাজার কাছে একবাক্যে জানায় যে, দামোদরের এই ললনা—মা যে ইনি তাদের,—জননীর দু'বাহু ধ'রে দু'ধারে নেচে খেলে বেড়ায় তারা,—তাদের পৃথক্ করার প্রয়াস কেন রাজার! সেই অবধি অনেক দিন আর এ বিষয়ে কেউ কোনও উচ্চবাচ্য করেন নি। হঠাৎ এক সময়ে গ্রামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন সমর বোসের ঠাকুরদাদা—বিপিন বোস। সদরে, সাহেব মহলে, তাঁর না কি খুব নাম হ'ল—পূর্ত্ত-বিভাগের কি একটা কাজে খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে। তখন দেশময় যে নূতন সাড়া পড়ে গিয়েছিল ব্রিটিশ-রাজের দিকে-দিকে-প্রচারিত বিশ্ব-প্রীতির মন্ত্র-ঘটায়,—সেই ডাকের টানে ইনি পল্লী ছেড়ে বেরিয়ে গেছলেন একটা মস্ত কিছুর প্রলোভনে। এক যুগের পর যখন জন্মকুঞ্জে ফিরে এলেন, তখন তাঁরে কেউ বা বলল 'বাবু', কেউ বা বলল, 'ভাগ্যবান'; আবার কেউ বা বলল 'সাধু'; কিন্তু সবার বলা অগ্রাহ্য ক'রে তিনি হলেন,—ক্ষুদ্র একটী সাহেব।

তখন নূতন বাংলার এই নূতনতর জীবের মান, যশঃ, খ্যাতি ছাপিয়ে উঠল বামুণ-পণ্ডিত বাচস্পতির চেয়ে। কারণ, সকল কাজে, সকল ফাঁকে এই বাচস্পতি বোসজারই মুখপানে চাইতেন—স্ত্রৈণ যেমন পত্নীর মুখের পানে চায়; আর তাই দেখেই, সেই পল্লীসংসারের আর সকল ছেলে-পুলের দলও চেয়ে থাকতো মহা বিস্ময়ে সেই লোকটীরই পানে।

প্রথম মোহের অবসানেই বাচস্পতি আত্মভ্রম বুঝলেন। কিন্তু তখন ভুলের পথে সারা গ্রামটাকে এতদূর নিয়ে গেছল যে, ফিরতে হবে শুনে, তারা চমকে' উঠে, উপহাস করে' বাচস্পতিকে পাগল আখ্যা দিল। তাতেও যখন তিনি দমলেন না, তখন এক দিন বোস মহাশয় নিজে ধমক্ দিয়ে বললেন, "ভট্‌চাজ! জমিদারের ইচ্ছামত তোমার টোলের বৃত্তি বন্ধ হ'ল এবার; কারণ, তুমি যা শেখাও, তা'র দ্বারা চালকলা বাঁধার বিদ্যা ছাড়া, পুল বাঁধবার, কল চালাবার, তথা সভ্য হবার, বিদ্যা কিছুই হয় না। ঐ টাকাটা এবার থেকে আমার নূতন স্কুলে দেওয়া হবে। অতএব আজ থেকে এ সব ফাঁকি-বাজি ছেড়ে দিয়ে অন্য কাজে মন দাও।"

ক্রমে বাচস্পতি আর বিপিন বোসের মাঝে একটা ব্যবধান বেশ বড় হ'য়েই উঠল। বছর ঘুরতেই সেটা এমন আকার ধারণ করল যে, দেখতে দেখতে মকুবপুরে দু'টো পাড়ার সৃষ্টি হয়ে গেল;—একটা হ'ল দখিণ পাড়া, আর একটা হ'ল 'উতোর'। কিন্তু তা'তেও যেন বোসজার মেজাজ সরিফ হ'ল না। তিনি কোমর বেঁধে চেষ্টা করে', অনেক মাথা আর বিস্তর চাঁদি খরচ করে', সেই নদী-রেখার দোহাই দিয়ে, মকুবপুরকে দুটো গ্রামে বিভাগ করলেন। বোসজার দিক অর্থাৎ উতোর পাড়া হ'ল খাস মকুবপুর; আর, নিশ্চয়ই শ্রুতি-মধুর হবে ব'লেই, দখিণ পাড়া হ'ল বেকুবপুর।

বড়র দেখাদেখি ছোটর দলেও একটা ভাঙ্গাভাঙ্গি হ'য়ে গেল—সেই ক'ঘর চাষার কতক রইল বেকুবপুরে তা'দের বহুকালের বাস্তুভিটে আঁকড়ে; আর কতক গেল বোস মহাশয়ের এলাকায় তাঁরি দেওয়া বিঘা কয়েক জমীর উপর নূতন কুটীর বাঁধতে।

বংশানুক্রমে মকুবপুর আর বেকুবপুর এই রেষারেষির রেশটুকু বজায় রাখতে পেরেছিল। আর এই সুরেতেই হটু ঘোষ, খুব ওস্তাদি চালে গেয়েছিল একখানা গান, গেল ফাল্গুনের শেষে।

হটু যদিও মকুবপুরে থাকত, কিন্তু তা'র সম্পর্ক ছিল দুই গ্রামেরই সঙ্গে। দায়-দফা কনে.ই আছে,— ইসার-

ধর্ম্ম ক'রতে গেলে, এর হাত থেকে না কি নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। এই দায় দফায় পরের জন্য মাথা দিতে হটু ছিল অগ্রণী ;—তাই দুই দলই খুড়ো মশাইকে খুব মানত, আর সকল কাজেই তাকে ডাকত।

২

ফাল্গুনের এক দিনের শেষে বেকুবপুরের জগাই দুলে প্রতিবেশী আর কয়েকজন জাত-ভাইকে আপন বাড়ীতে ডেকে অনেকক্ষণ কি পরামর্শ করল। তার পর ঘরের বহির্দ্বার ভিতর থেকে অর্গলবদ্ধ ক'রে, সবাই মিলে কি একটা গোপন কাজে লেগে পড়ল—অবশ্য খুব উল্লাসভরে। কিন্তু তা'দের চাপা হাসির লহরগুলি আর মৃদু কথার গুঞ্জন-ধ্বনি রুদ্ধদ্বারের বাধা ঠেলে আকাশ বেয়ে যে ছুটতে পারে, এ ধারণা মোটেই তাদের ছিল না। তাই প্রহর রাতে, সহসা কার করাঘাতে, জগাইএর গৃহদ্বার যখন আর্ত্তস্বরে নিনাদ করে উঠল, তখন তাদের দেহের মাঝে যেন তড়িত খেলে গেল। কিছুক্ষণ তারা নীরব হ'য়েই রইল ; কিন্তু করাঘাতের ফাঁকে-ফাঁকে যখন চৌকিদারের গলার আওয়াজ তীব্র স্বরে জেগে উঠল, তখন জগাই দুলে ধীরে-ধীরে কম্পিত করে গৃহদ্বার অর্গল-মুক্ত করল। দুয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল মকুবপুরের মধু মুচি, যদু পঞ্চায়েত, নিধু চৌকিদার,—আর সেই এলাকার দারোগাবাবু ও তাঁর সঙ্গী দুজন পাঁড়ে।

জগাইএর উঠানে জলন্ত চুল্লীর উপর একটা বড় মাটীর পাত্র বসান ছিল ; আর কিছু দূরে ঢেঁকিশালার পাশে রক্ত ও কাদামাখা কি একটা জিনিস পড়ে ছিল। মধু মুচি সেটা তুলে নিয়ে দারোগা বাবুকে বলল, "এই দেখুন বাবু, যা বলেছিলুম—হুবহু মিলিয়ে নিন। এই দেখুন, শিরদাঁড়ার দুপাশ সাদা, আর এই ল্যাজটী দেখুন কালো। এ নিশ্চয়ই আমার ছাগল 'বুধি'। 'এই হতভাগারা ধরে এনে রান্না সুরু করে দিয়েছে।"

পাঁড়ে আর চৌকিদারের জিম্মায় আসামীর দলকে যদু পঞ্চায়েতের বৈঠকখানায় নিয়ে আসা হল। সঙ্গে এল বেকুবপুরের দুলে-বাগ্দীর যত ছেলে, যত মেয়ে, যত বধূ, আর যত মায়ের দল তাদের সজল আঁখির নীরব মিনতি নিয়ে। আর মকুবপুরেরও বড়-ছোট সবাই এল—বেকুবপুরের বেকুবগুলোর সাজাটা কি হয় তাই দেখতে। উভয় পক্ষের জবাব শুনে দারোগা বাবু গম্ভীর ভাবে বললেন,"দেখ জগাই—কাজটা করেছ খুবই গর্হিত.—চালান দিলেই সাজা হবে নিশ্চিত। অতএব আমার কথা শোন,—এই ছাগলটার বিনিময়ে মধু মুচিকে দশটী টাকা দিয়ে সকল হাঙ্গাম মিটিয়ে দাও।" একটী ছাগ-শিশুর বিনিময়ে দশ টাকা মধু মুচির লাভ বলেই মনে হ'ল, এবং খুব আহ্লাদেই সে দারোগাবাবুকে মস্ত এক সেলাম ঠুকল ; আর বেকুবপুরের মেয়ের দল মন খুলে মনে-মনে 'দারোগা বাবু রাজা হো'ক' এই প্রার্থনাই রাজার-রাজার কাছে জানাল। নবীন চৌকিদারের জিম্মায় দারোগা বাবু সদল জগাইকে ছেড়ে দিলেন, আর বললেন, "নবীনের হাতে টাকা পাঠিয়ে দাও —নবীন না আসা পর্য্যন্ত আমরা এইখানেই রইলুম।"

৩

পঞ্চায়েতের বৈঠকখানার এক কোণে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে ছিল হটু ঘোষ। বসে-বসে সে মিটিমিটি চাইছিল, আর দারোগাবাবুর বিচার-প্রণালী দেখছিল। জগাইএর দল যখন শুক্নো নদীর ওপারে তালপুকুরের পাড়ের কোলে অদৃশ্য হ'য়ে গেল, তখন সে হঠাৎ উঠে, একটা হাই তুলে, আর দুটো তুড়ি দিয়ে সরে পড়ল, 'বাড়ী যাই' বলে। কিন্তু বাড়ীর পথে মোটেই না গিয়ে, পঞ্চায়েতের বৈঠকখানার পিছন দিয়ে সে ছুটল বেকুবপুরের পানে। এর আমবাগান, ওর বাঁশবন, তার ত্যক্ত ভিটে ঊর্দ্ধশ্বাসে অতিক্রম করে' হটু জগাইএর খিড়কিতে এসে "জগাই" বলে দুটো ডাক দিতেই, শশব্যস্তে সে বেরিয়ে এল।

হটুর কথা বলবার একটা বিশেষ ভঙ্গী ছিল। তার সহজাত তোত্‌লামির পরিচয় ঢাকবার চেষ্টায় সে কথার মাঝে দু'একটা অবান্তর কথা বলত, যথা—'আর-সমস্ত' ও 'বুঝলে-কি না'। এই 'বুঝলে-কি না' ও 'আর-সমস্ত' —এই দুটীর আড়ম্বর থেকে বিছিন্ন করলে, হটুর কথার যেন সকল মাধুর্য্যই লোপ পেত। জগাই সম্মুখীন হবামাত্রই, হটু তা'র হাত দুটো ধ'রে, চোক দুটো বিস্ফারিত করে, খুব বিচলিতের মত বলে উঠল, "জগাই ! আর-সমস্ত, তুই করলি কি ! টাকা দিতে স্বীকার পেলি ! এতে করে

;ঝলে-কি-না—আর-সমস্ত তোর সর্ব্বনাশ হবে যে রে—একেবারে সর্ব্বনাশ আর-সমস্ত।" হতাশ ভাবে জগাই বলল, "কি করব খুড়োমশাই,—হাতে-নাতে ধরা পড়েছি. আর উপায় কি। আর তাও কি ছাই এই দশটাকার সম্বল আমার আছে ;—সবাই মিলে যদি কোনো রকমে এই রাত্রের মধ্যে জোগাড় করে দিতে পারি ত' যথেষ্ট।"

"ওরে আহাম্মুক, তোকে আর-সমস্ত টাকা জোগাড় করতে হবে না ; টাকা, বুঝলে-কি-না, দিতেই হবে না, আর-সমস্ত, মোটে।"

আধঘণ্টা কাল হটু চাপা গলায় যে বক্তৃতা দিল, তার মর্ম্ম হ'চ্ছে এই—দশটাকা অবশ্য এমন কিছু বেশী টাকা নয় ;—জগাইএর না থাকে, হটু অম্লানবদনে জগাইএর উপকারের জন্য দিতে পারে। কিন্তু এই টাকা দেওয়া মানে আজীবন পুলিসের কাছে দাগী হ'য়ে থাকা। এর পর, এই গ্রামে কিংবা এর আশে-পাশে যেখানেই চুরি হোক না কেন, পুলিস এসে তাদেরই আগে তল্লাস করবে। এমন কি, মাসখানেক পূর্ব্বে পঞ্চায়েতের ভাই'পোর বাড়ীতে যে চুরিটা হ'য়ে গেছে—তার মূলে যে সবান্ধব জগাই দুলেই আছে, এ কথা ত' এইমাত্র সবাই মিলে দারোগা-বাবুকে বলছিল। দশটাকা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া মানে, এ ব্যাপার আদালতে এই ভাবেই নিষ্পন্ন হ'তো ; কিন্তু বড় চুরির দাবী দিয়ে, অর্থাৎ ঐ পঞ্চায়েতের ভাইপোর বাড়ীর চুরির দাবী দিয়ে যদি চালান দিতে পারে, তাহ'লে সাজাও হবে খুব, আর সঙ্গে-সঙ্গে কোম্পানির কাছে দারোগার খাতিরও বেড়ে যাবে বেজায়।"

সরল জগাই হটুর কথায় যেন দিব্য-দৃষ্টি লাভ করল। সে তখন খুড়োমশাইয়ের পা দুটো জড়িয়ে ধরে কাতর স্বরে বলল, "আমায় তুমি বাঁচাও খুড়োমশাই।" "বাঁচাব ব'লেই ত' আর-সমস্ত দৌড়ে আসা। আর-সমস্ত আমি কি আর, বুঝলে-কি-না—হ্যাঃ। ডাক্ দেখি একবার, আর-সমস্ত, তোর বন্ধুদের।" সবাই এলে হটু তাদের বলল, "আর-সমস্ত জগাইকে আমি বুঝলে-কি-না বেশ ক'রে বুঝিয়ে বলেছি। তোরা আর-সমস্ত গর্দ্দভ—বুঝলে-কি-না—গর্দ্দভের মত ভয় পাস নি মোটে। সটান্ দারোগাকে বলবি যে, আর সমস্ত ছাগল আমরা বুঝলে-কি-না চুরি মোটেই করি নি। ঐ কাণা নদী—বুঝলে-কি-না—ঐ নদীর ধারে ছাগল ম'রে আর সমস্ত পড়েছিল, আমরা তাই তুলে নিয়ে এসে—বুঝলে-কি-না রান্না করেছিলুম। তোদের ভয় বুঝলে-কি-না কিছুমাত্র নেই—আমি সব বাঁচিয়ে দেব—ঐ এক বুঝলে-কি-না—ছাগলের আর-সমস্ত ছাল হ'তেই সব কর্ম্ম ফর্সা করে দেব। ঐ ছাল থেকেই বুঝলে-কি-না—আদালতে আর-সমস্ত প্রমাণ করব যে, এই ছাগল আর-সমস্ত শিয়ালে মেরেছে—বুঝলে-কি-না—জগাই নয়, রমা নয়, হরা নয় আর-সমস্ত মানুষ নয়—বুঝলে-কি-না—শিয়াল। হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ—এই হটু ঘোষ—অমন কত শত বুঝলে-কি-না দারোগাকে আর-সমস্ত ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দিয়েছে। ভয় নেই তোদের বুঝলে-কি-না—'নির্ভরসায়'যা বলে গেলুম, আর-সমস্ত করে যা ; আমি রইলুম পিছনে—বুঝলে-কি-না—"

গভীর রাতে, নবীন চৌকিদারের মুখে জগাই টাকা দেবে না শুনে দারোগাবাবু সব ক'টাকে চালান দিলেন সদরে। এদিকে বেকুবপুরের দুলেপাড়ার ঘরে ঘরে উঠল কান্নারোল। যাদের বেঁধে নিয়ে গেল, এদের কেউ ছিল বা স্বামী, কারও কেউ হয় ত' ভাই, কেউ বা কারও অন্নের উপায়—একটীমাত্র ছেলে, আর কেউ হয় ত' চার-পাঁচটী কাঙাল শিশুর অন্নদাতা পিতা।

সকাল হ'তেই হটু প্রতি ঘরে গিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগল। 'বুঝলে-কি-না' ও 'আর-সমস্তর' ভারে তার ভাষারাণী অবশ্য খুব মন্থরগতিতে চলছিল ; কিন্তু তা'র একটা মোহিনী-শক্তি ছিল নিশ্চয়ই, নইলে শোকার্ত্তের দল ক্রমে ঠাণ্ডা হ'ল কেন।

বেলা দশটা অবধি পরিশ্রম ক'রে হটু আপন ঘরে ফিরে এসে, স্নানাহার সেরে, এক ক'লকে তামাক সেজে, টানতে বসে গেল। সাদা ধূমের পাকে-পাকে তার মনের কোণে কি যে পাক খাচ্ছিল, আর তার ঠোঁটের কোণে থেকে-থেকে কিসের হাসি যে ফুটছিল, তা সে-ই জানে।

৪

তখন ধরণী ম্লানমুখে অস্ত-সূর্য্যের পথের পানে তাকিয়েছিল,—আর নিরাশার ছবিখানির মতই জগাই দুলের স্ত্রী শূন্যপ্রেক্ষণে বসেছিল তা'র আপন কুটীর-দ্বারে।

মধু চৌকিদার খানিক আগে তা'র স্বামীর খবর দিয়ে গেছে। সংবাদ জগাই ছুলের একমাস ক'য়েদের হুকুম হ'য়েছে। জেলের শ্রম হয় ত' জগাইএর প্রতিদিনের শ্রমের চেয়ে অধিক কিছু নয়; কিন্তু দিনের শেষে ক্লান্ত-দেহে যখন সে শয্যা গ্রহণ করবে, তখন কা'র করাঙ্গুলির পরশগুলি তা'র শ্রান্তিহরণ করবে? ওগো, ঘুম যে হয় না তার নিত্য সাঁঝে পা দুটো না টিপে দিলে।

তালতরুর শীর্ষ হ'তে দিনের আলোর আল্পনা ঐ ত সরে গেল; দীঘির পাড়ের আমবনে অন্ধকারের জাল-বোনা ঐ ত' সুরু হ'ল। এমনই সময় তা'র দীর্ঘ দেহ তাঁতপুকরের দখিণপাড়ে উঠত জেগে; এমনই সময় ঘরে এসে চ্যাটাই পেতে উঠানেতে শ্রান্ত-দেহ এলিয়ে দিত—পা টিপে দাও—ব'লে। আসবে না—আসবে না—গেল ক'দিন আসে নি সে—আরও একমাস আসবে না;—হায় রে।—

অথচ তাকে ফিরে পেতে চেষ্টার ক্রটি সে ত কিছুই করে নি। খুড়োমশায়ের কথা মত ছুলে পাড়ার আর সকলের চেয়ে সে বরং বেশী কিছুই করেছিল। খাড়ু বাজু থেকে বর্ষার জন্য সঞ্চিত জ্বালানি কাঠগুলি পর্য্যন্ত বেচে সে হটুর হাতে নগদ একশ টাকা গ'ণে দিয়েছে—মামলার খোরাকের জন্য। তবুও, হা ভগবান, মুক্তি তার মিল্ল না। খুড়োমশাই যে অনেক আশা দিয়ে গেল—তার কথাগুলো কি মিথ্যা তবে শুধুই? আর ওপাড়ার বামুনদাদা—বাচস্পতির নাতি—তারই বা কেমন মাকে ডাকা। সেও ত পূজার খরচ যৎসামান্য নেয় নি—মা কি তবে মা নন্—পাথরের সং সেজে, লোকের পূজা বৃথাই নেন তিনি!

এমন কত চিন্তাই তার মনের মাঝে ভিড় করছিল—তার তালিকা দেওয়া যায় না। ভাবনা-বিহ্বলা সারা রাতই বসে-বসে হয় ত ভাবত,—হটু এসে তাকে চেতনার রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে এল। সান্ত্বনার খানিক মিষ্ট ভনিতার পর হটু তারে বলল,—"দুলে বউ—আর-সমস্ত আমার কপাল বড় মন্দ। শিয়ালে যে বুঝলে কি-না ছাগলটাকে মেরেছিল, এটা আর-সমস্ত প্রমাণ করতে পারলুম না। সরকারী ডাক্তার আর-সমস্ত—ঐ আমার পিস্তুতো ভাই নির্ম্মল গো—সে বুঝলে কি-না ছুটি নিয়ে সিম্লে পাহাড় গেছলো—তাইতেই ত বুঝলে-কি-না তার সার্টিফিকেট-খানা আর-সমস্ত পাওয়া গেল না। সেটা যদি আর-সমস্ত সময়মত পেতুম, তাহ'লে দেখে নিতুম, বুঝলে কি-না—দেখে নিতুম ঐ আর-সমস্ত আহাম্মুক ডেপুটীকে। কিন্তু এখনো বলছি, আর-সমস্ত তোমাকে দুলে বউ, বুঝলে-কি-না, এই হাড়ক'খানা থাকতে যদি আমি আর-সমস্ত জগাইকে খালাস করতে না পারি, তাহ'লে, বুঝলে কি-না, আমার নামই বদ্‌লে দিও—আর-সমস্ত—হ্যাঁঃ—এ আবার একটা মাম্‌লা। তবে আর সমস্ত আরও কিছু বুঝলে-কি-না টাকা চাই; আপীল করবো জগাইয়ের হয়ে।"

—টাকা? আরও টাকা? হা অদৃষ্ট আবার টাকা কোথায় তার?—ঋণ? তাই বা কে দেবে,—কি ভরসায় দেবে? জগাই—সে-ই যে ঋণ শুধবে—সারা-জীবন বিনা মাহিনায় মহাজনের মজুর খেটে। একশ টাকায় হ'ল না,—আবার টাকা দিলেই কি হবে? মামলায় হারজিত দুটোই আছে—মধু চৌকিদার স্পষ্ট বলে গেছে।

হটু কিন্তু হট্‌বার পাত্র নয়। নানা যুক্তি-তর্কের অবতারণা করে সে দুলে-গিন্নীকে বোঝাতে বসে গেল। ডেপুটি আর জজের বিচারে যে আকাশ-পাতাল ভেদ, তার দুএকটা দৃষ্টান্ত দিল। অবশেষে বলল যে স্বামীর চেয়ে দামী জিনিস হিন্দুর মেয়ের আর কি আছে? বুকের রক্ত দিলে যদি স্বামী ফিরে আসে, হিন্দুর মেয়ে কুণ্ঠিত নয় তাতে। সীতা-সাবিত্রীর দেশে জন্ম নিয়ে তুচ্ছ পয়সার মায়ায় কেউ কখনো নিশ্চিন্ত থাকতে পারে স্বামীকে বিপদের মাঝে ফেলে?

এই শেষ কথাটা দুলে-গিন্নীর বুকে গিয়ে বাজল! তাই ত—সে করছে কি? এখনো ত গরু দুটো রয়েছে, লাঙ্গল আছে, মাছ ধরবার খেয়া জাল, বীজের ধান,—এ সব ত আছে। স্বামীর জন্য এগুলো ত বেচে দিলেই পারে। কার জন্য এ সব সরঞ্জাম? স্বামী বিনা তার বাঁচবারই বা কি প্রয়োজন?—না, না—সর্ব্বস্ব খুইয়েও তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

"খুড়ো মশাই! কাল সকালে এসো—টাকার জোগাড় করে রাখব আমি।"

৫

যা দেখবার তা দেখে, যা শুনবার তা শুনে—জজ সাহেব রায় লিখতে বসে গেলেন।

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তখন জগাই শূন্যপানে চেয়ে ছিল। হয় ত তার মনের ব্যথা নীরব ভাষায় ব্যথাহারীর চরণতলে জানাচ্ছিল। তার সঙ্গীরা সব নতদৃষ্টিতে পদাঙ্গুষ্ঠে বিচার-কক্ষের ভূমিপৃষ্ঠে রেখাঙ্কনের বৃথা প্রয়াস পাচ্ছিল—তারাই ছিল এই মামলারূপ মহাযজ্ঞের বলি।

উকিল শ্রেণীর পুরোভাগে সমর বোস বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চুষছিলেন—এই সহজাত বৃত্তিটী তাঁর অভ্যাসে পরিণত হ'য়েছিল—উকিল হ'য়েও ভুলতে পারেন নি;—তিনিই ছিলেন এই যজ্ঞের পুরোহিত।

এই কাঠগড়ার পাশ থেকে বিচিত্র ভঙ্গীতে হাতমুখ নেড়ে যে ব্যক্তি জগাইএর দৃষ্টি আকর্ষণের বৃথা প্রয়াস পাচ্ছিল—সে ছিল এই হমাযজ্ঞের হোতো, হটু ঘোষ।

হটুর অধ্যবসায় দেখে প্রহরীর বোধ হয় একটু দয়া হ'ল। সে জগাইএর পৃষ্ঠদেশে তার যষ্টিদণ্ডের একটী মৃদু-কঠোর পরশ দিয়ে, তাকে চেতনার রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে এল।

হটু তখন নিম্নস্বরে বলতে আরম্ভ করল—"দেখ জগাই, আর-সমস্ত রায় যা লিখছে তা' আমি বুঝলে কি-না এইখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই বলে দিতে পারি। অনেক মামলাই আর সমস্ত এই ঘরেতে করেছি কি না, তাই জজ সাহেবের বুঝলে-কি-না কলমের টান দেখেই আর-সমস্ত বলে দিতে পারি সব। ঐ—ঐ যে টানটী মারলে কলমের—বুঝলে-কি-না, ওটী হচ্ছে বুঝলে-কি-না—এই যে বলে দিচ্ছি সব। আর-সমস্ত এইচ্, ও, এন্, ও—অনা; আর, এ—রে; বি, এল, ওয়াই; আর-সমস্ত আর যায় কোথা, একেবারে বুঝলে-কি-না বেকসুর খালাস। হুঁঃ—এ কি আর আর-সমস্ত ধামাধরা ডেপুটি? এ—বুঝলে-কি-না—একেবারে খোদ জজ সাহেব। হুঁঃ!"

হটুর কথা শুনে জগাই একটু ম্লান হাসি হাসিল। পরক্ষণেই জজ সাহেবের রায় শুনে জগাই কাঠগড়ার রেলিং ধ'রে কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল—তার সহচরগণ আর্ত্তনাদ করে উঠল। সকলেরই তিনমাসের জেলের হুকুম হ'য়েছে।

শৃঙ্খলিত কয়েদীর দল যখন প্রহরী-বেষ্টিত হ'য়ে বিচারালয়ের প্রাঙ্গণে নীত হ'ল, তখন হটু এসে তাদের বলল—"আর সমস্ত, দেখ জগাই—আমি, বুঝলে-কি-না এই কাল মকুবপুর থেকে আসছি। আমি দেখে এলুম বুঝলে-কি-না, যে জল-অভাবে, আর-সমস্ত, মাঠগুলো সব জমে পাথর হয়ে গেছে। আর-সমস্ত লাঙ্গলের দাগ বসে না মোটে। এখন দেশে গিয়ে চাষের কাজ ত তোদের জুটত না—বসে-বসে আর-সমস্ত কেবল ঘরের অন্ন ধ্বংস করতিস। তার চেয়ে বুঝলে-কি-না এই তিনমাস কোম্পানীর মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে বুঝলে-কি না, পেটপূরে দিব্যি খেয়ে আরাম ক'রে নে। এই চৈৎ, বোশেখ, জষ্টি—বুঝলে-কি-না—এই তিন মাস। তার পরই আষাঢ় মাস—বর্ষা—বুঝলে-কি-না—বর্ষা আর যায় কোথা। তোরাও দেশে ফিরবি, আর 'দেবতাও' এদিকে নামবে। দেশে ফিরেই লেগে যাবি দেশের কাজে।"

রাধার লিপি

শ্রীআশুতোষ কবিগুণাকর বি-এ

কাঁদায়ে অবলায় যেদিন শ্যামরায়
গোকুল পরিহরি গিয়াছ মথুরায়—
সেদিন হ'তে দাসী বাঁধেনি কেশদাম,
মুকুর দূরে পড়ি কাঁদিছে অবিরাম।
কাজল আঁখি যুগ করেনি বিলপন—
কোথা সে শোভারাগ, কোথা সে প্রসাধন?
কোথা সে চীনবাস যেতেছে গড়াগড়ি,
মেখলা মুরছিয়া ধূলায় আছে পড়ি!
কাঁকন কেঁদে মরে নূপুরে সুর না'হ—
নয়ন নভঃপানে কেবলি আছে চাহি।
আর না সখী সনে লইয়া হেমঝারি
ধরিয়া বনপথ ভরিতে যাই বারি।
গৌরতনু মোর মরণ অভিসারে
পাণ্ডু হ'য়ে আসে—মিলাবে হাহাকারে?

অকাল-মৃত্যু ও বাল্য-বিবাহ

অধ্যাপক শ্রীসত্যশরণ সিংহ বি-এস্, এম-এ-জি-এ

গত ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যার 'ভারতবর্ষে' শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর "অকাল-মৃত্যু ও বাল্য বিবাহ" নামক যে প্রবন্ধটী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সকলেরই পাঠ করা উচিত। তিনি উক্ত প্রবন্ধে অনেক কাজের ও সার কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু সে সার ও কাজের কথা অনেকগুলি বিষয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে একখানি বড় পুস্তক হইতে পারে। আমি তাঁহার প্রবন্ধকে কতখানি সমর্থন করি, আর কোন্ কোন্ বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার মতের পার্থক্য, তাহা এই প্রবন্ধে দেখাইব। আমার প্রবন্ধ তাঁহার প্রবন্ধের কতকটা সমর্থক ও কতকটা প্রতিবাদরূপে গৃহীত হইতে পারিবে। আমার ধারণা, আমার মতে সব বিষয়ে সায় দিবার মত লোক পাঠকপাঠিকাদের মধ্যে কেহ না কেহ থাকিবেন।

ইহা সত্য যে বাঁশকে কাঁচা অবস্থায় বেশ বাঁকান যায়, আর পাকা অবস্থায় তেমন বাঁকান যায় না। সেই মত ছোট মেয়ে বিবাহ করিলে সে সহজে পোষ মানে,—তাহাকে যেভাবে শিক্ষা দিতে চাহ না কেন, সে সেই শিক্ষা লইবে। আর ডাগর মেয়ে বা ধেড়ে মেয়ে বিবাহ করিলে তখন তাহার মনের গতি আর এক রকম হইয়া দাঁড়ায়। সেই মনের গতিকে ফিরাইতে অনেক বেগ পাইতে হয়। এমন কি সময়ে সময়ে স্বামী তাহাকে সম্পূর্ণ নিজের মনের মত করিয়া লইয়া চালাইতে পারে না। তখন স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া বাধে ও সংসারে অশান্তি ঘটে। তবে হিন্দু আইনে ডাইভোরস্ বা সেপারেসন্ নাই বলিয়া উভয়কে ঐ কলহপূর্ণ সংসারে থাকিয়া জীবন কাটাইয়া শেষ করিতে হয়। যদি আইন থাকিত, তা'হলে তাঁহাদের পাশ্চাত্য জাতিদের মত ডাইভোরস্ কোর্টে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। আজকাল আমেরিকান সমাজেও কেহ ডাগর মেয়ে পত্নীরূপে লইতে চাহে না। "মার্কিনদের চলিত কথায় ষোড়শী বালিকাকে "sweet sixteen" বলে। কোন কোন যুবক বলিয়া থাকে ঐ বয়সের মেয়ের পাণিগ্রহণ করা উচিত। কারণ অধিক বয়সের মেয়েরা সহজে বিবাহে সম্মতি প্রকাশ করেন না, সুদীর্ঘ কোর্টসিপের প্রয়োজন হয়। মার্কিন মাতৃগণও আজকাল বেশী বড় করিয়া মেয়েদের বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন না।" (১)

ছোটবেলা হইতে যুবক স্বামী ও বালিকা পত্নীতে একত্র থাকাতে কেমন একটী ভালবাসা জন্মে। সে ভালবাসা বেশ পূর্ণ প্রেমে পরিণত হয়। সে প্রেম এমনি যে যদি

(১) লেখক প্রণীত "আমেরিকা ভ্রমণ", ১৩২৮

স্বামীর মৃত্যু ঘটে, স্ত্রীর বড়লোক বাপ, মা বা আত্মীয় থাকা সত্ত্বেও সে স্বামীর ভিটেতে দিনাতিপাত করে। সে ভিটে ছাড়িয়া বাপ ভাইয়ের ভিটেতে গিয়া তাহার থাকিতে ইচ্ছা করে না। ঐরূপ জলন্ত দৃষ্টান্ত আমি আমার ঠাকুরমা, মা, ভগ্নী ও বৌ'দিদির জীবনে দেখিতেছি। (পাঠক পাঠিকারাও নিশ্চয় তাঁহাদের ইদৃশ আত্মীয়ের জীবনেও দেখিতেছেন।) উহাঁদের সকলেরই বাল্য-বিবাহ। এই সম্পর্কে একটী পরিবারের কথা মনে পড়িল, তাহা বলি। একটী ডাগর মেয়ে বৌ'রূপে ঐ পরিবারে আসে। আমি সেই বৌ'কে জিজ্ঞাসা করি—"তোমার শাশুড়ী কেমন আছেন?" তাহার উত্তরে সে বলে, "শাশুড়ী মরে নাই—এখনও বেঁচে আছে।" এই উত্তর হইতে আমরা এই বুঝিতে পারি যে, শাশুড়ী মরিলে নিজ রোজগারে স্বামীকে ভাশুর বা দেবরদের নিকট হইতে পৃথক করিয়া লইয়া অন্যত্র থাকিব বা তাহাদের "ভাতে মারিতে" পারিব ইহাই ঐ বৌটীর অভিপ্রায়। বাল্য-বিবাহে প্রেমের মাধুর্য্য কতখানি তাহার দু'একটী দৃষ্টান্ত দিব। স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে আমার দিদি শাশুড়ী (২) স্বামীর ফটো প্রত্যহ ফুল দিয়া পূজা করেন ও তৎপরে জল স্পর্শ করিয়া থাকেন। আর একটী মহিলা তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইলে স্বামীর পাদুকাদ্বয়কে মাথার বালিসের নীচে রাখিয়া রাত্রে শুইতেন। ইহার অপেক্ষা ভীষণতর প্রথা এই বঙ্গদেশে এক সময় ছিল তাহা শ্রীমতী মানকুমারীর ভাষায় বলিতেছি :—

"সধবার বেশ পরিয়া ললনা,
পতি শব বুকে যতনে ধরে।
দেখ রে মানুষ! দেখ রে দেবতা!
এ মরণে সতী কি যুগে মরে!
"ধূ ধূ ধূ ধূ অই গরজে অনল,
হু হু হু হু ছোটে তরঙ্গ সদল,
স্বন স্বন করি বহিল সমীর,
ফুরাল ফুরাল সে দু'টী শরীর।
পতি-দেহে সতী হইল লয়।" (৩)

স্বামী-স্ত্রীর এমনি ভালবাসা যে, স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রী ভাবে যে তাহার সব সুখ ফুরাইল তাই সে পৃথিবীতে আর বাঁচিয়া থাকিতে চাহিত না। তাই স্বামীর সহিত স্ত্রী এক চিতায় ভস্মীভূত হইত। গভর্ণমেণ্ট যদি ঐ প্রথা বন্ধ না করিয়া দিতেন, তাহলে আজকালকার দিনেও স্বামীর সহিত স্ত্রীর সহমরণের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যাইত।

বাল্য-বিবাহের যেমন সুফল আছে, তেমনি আবার কুফলও আছে। লেখিকা তাঁহার আত্মীয়-কুটুম্বকে লইয়া (সে একটী ছোট রকমের গণ্ডী) তাঁহাদের ও ঠাকুর পরিবারের Family traits হইতে দেখাইতেছেন যে, বাল্য-বিবাহে দীর্ঘ আয়ু লাভ করা যায়। আমিও এরূপ দেখাইতে পারি যে, অনেক পরিবার বাল্য-বিবাহের ফলে দীর্ঘায়ু হয় নাই। যদি ঠাকুর পরিবারে বাল্য-বিবাহের ফলে দীর্ঘ আয়ু লাভ হইয়া থাকে, তবে রবি ঠাকুরের familyতে আজকাল বাল্য-বিবাহ হয় না কেন? যদি সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে যত বাল্য-বিবাহ হইয়াছে, সেই সব পরিবারের traits পাওয়া যায় বা লওয়া যায়—তাহলে বাল্যবিবাহের দ্বারা দীর্ঘ আয়ু পাওয়া যায় এরূপ সিদ্ধান্তে আসা যায় না। (৪)

পাঠ্যাবস্থায় বিবাহিত হইলে ছাত্রদের লেখাপড়ার ব্যাঘাত ঘটে। (৫) তাহা যে সত্য তাহা আমার অনেক ছাত্রের জীবনে দেখিয়াছি। আজকালকার যুবকরা বিবাহ হইলে মেসে বা হোটেলে বসিয়া পত্নীর চিঠির প্রত্যাশা করিতে থাকে। কেহ বা চিঠি না পাইলে বালিকা স্ত্রী'র উপর রাগ করে। হায়! আমার এমন স্ত্রী! আমার বন্ধুটী আজকার ডাকে তাহার পত্নীর চিঠি পাইল, আর আমি পাইলাম না। এবার শ্বশুর-বাড়ী গিয়া তাহাকে চিঠি লেখাইতে শেখাব। বিবাহিত ছাত্রের মন সর্ব্বদা ঐ সব চিন্তায় নিযুক্ত থাকে। রহিল তাহার কলেজের পড়া, এখন সে শ্বশুর-বাড়ী চলিল। তার পর যে সব

(২) এই প্রবন্ধ লেখার পর সংবাদ পাই যে, ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন।—লেখক।

(৩) কাব্যকুসুমাঞ্জলি—"সহমরণ"

(৪) আমেরিকায় আজকাল Eugenics Record Officeএ মার্কিন পরিবারের "Family Traits" রাখা হইতেছে। ভারতে সেরূপ কিছু আমাদের গভর্ণমেণ্ট করিতেছেন না। সুতরাং সমস্ত ভারতবর্ষে বাল্যবিবাহে যে দীর্ঘ আয়ু হইতেছে তাহার actual figures পাওয়া শক্ত।—লেখক।

(৫) কাহার কাহারও যদি ব্যাঘাত না ঘটে, তাহা সৎসঙ্গে মেশার দরুণ ও বাপ-মা প্রদত্ত সংযম গুণ থাকাতে।—লেখক।

তালতলী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
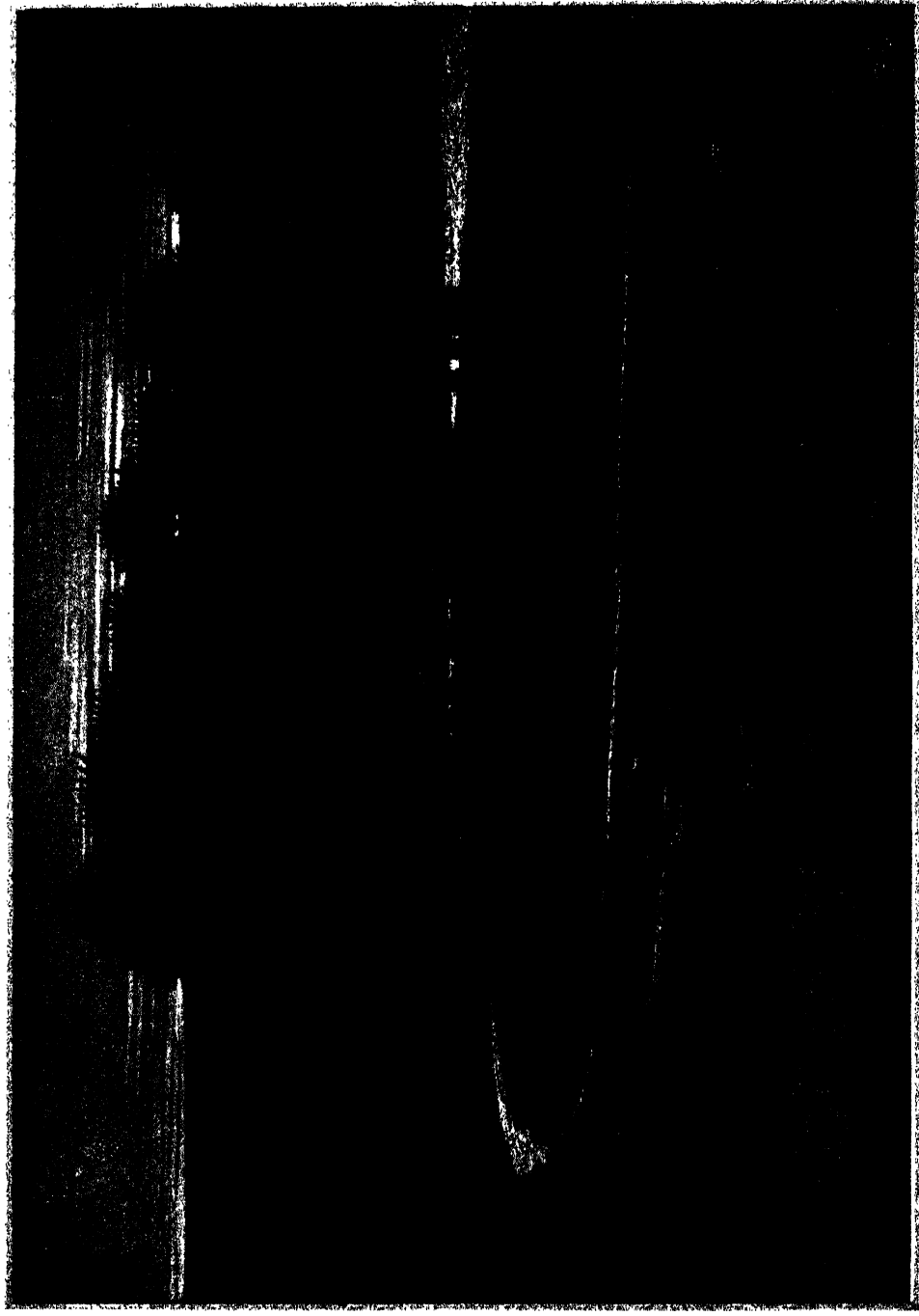
Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

নাটক, নভেল আজকাল বাজারে উঠিয়াছে. যে সব গল্প মাসিক পত্রিকাতে থাকে, যুবক ত সে সব পড়েই, তাছাড়া নিজের পত্নীকে পড়িতে উপদেশ দেয়। (৬) এ স্থলে উভয়ের তখন সংযমী হওয়া শক্ত হয়। তখন ছেলেপিলে হইতে আরম্ভ করে। পাঠ্যাবস্থায় ছেলে বা মেয়ের বাপ হইয়া পড়ে। যদি অর্থের সঙ্গতি না থাকে, তবে এ হেন যুবককে পড়ায় "ইতি শেষঃ" করিয়া চাকরীর জন্য ছুটিতে হয়। কি বলেন আমাদের সহৃদয় পাঠক! তাই নয়?

এমনও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, স্বামী শ্বশুর-বাড়ী আসিয়াছেন। সরলা বালিকা স্বামী সন্নিধানে যাইতে অনিচ্ছুক। তখন তাহার দিদি বা বৌদিদি বা কোন প্রবীণা ভীতা, ক্রন্দননিরতা বালিকা স্ত্রীকে বল পূর্ব্বক স্বামী সন্নিধানে প্রেরণ করে। এরূপ ক্ষেত্রে এই বুঝিতে হইবে যে, প্রথমতঃ লজ্জা বশতঃ, দ্বিতীয়তঃ উভয়ের মধ্যে ভালবাসার বীজ অঙ্কুরিত হয় নাই বলিয়া, বালিকা স্ত্রী স্বামী সন্নিধানে যাইতে অনিচ্ছুক। এরূপ বাল্যবিবাহে, যে স্ত্রীর "নারীত্ব" দেখা দেয় নাই তাহার নারীত্ব শীঘ্র ঘটাইবার সুযোগ করিয়া দেওয়া হয়। মূল কথা বাল্যবিবাহে শীঘ্র নারীত্ব দেখা দেওয়া সম্ভবপর বিবাহ দেরীতে হইলে নারীত্ব একটু দেরীতে হইত। কলিকাতা মেডিকাল কলেজের ডাক্তার চার্লস বলেন, "নিতান্ত অল্প বয়সে স্ত্রীলোকের ঋতুমতী হইবার প্রধান কারণ বাল্যবিবাহ। বিবাহ দ্বারা বালিকা যে অস্বাভাবিক অবস্থায় নিপতিত হয়, তাহাতেই তাহারা অল্প বয়সে ঋতুমতী হইয়া থাকে।" পরলোকগত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, এম-ডি, সি-আই-ই মহোদয় লিখিয়াছেন:—"স্ত্রীলোক ঋতুমতী হইলেই সুস্থ সন্তান প্রসব করিবার উপযুক্ততা জন্মে, এরূপ মনে করা নিতান্ত ভ্রম। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, অল্প বয়সে সন্তান প্রসব করিলে কেবল যে অল্পজীবী এবং অসুস্থ সন্তান জন্মগ্রহণ করে এরূপ নহে, মাতার স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। আমি নিজে যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহা হইতে বলিতে পারি যে, বাল্যবিবাহ এবং অল্প বয়সে গর্ভধারণের জন্য আমাদের স্ত্রীলোকেরা নানা প্রকার পীড়ায় যাবজ্জীবন কষ্ট পায়। অল্প বয়সে বিবাহের জন্যই স্ত্রীলোক ঋতুমতী হয়। যদি অল্প বয়সে বিবাহ উঠিয়া যায়, তাহা হইলে অল্প বয়সে ঋতুমতী হওয়াও কমিয়া যাইবে।" (৭)

শারীরিক গঠন সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে গর্ভসঞ্চার হইলে, প্রসবকালে প্রসূতির প্রাণ লইয়া টানাটানি ঘটে। এ সম্বন্ধে বোম্বাই নগরের বিখ্যাত ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডরং বলেন, "২০ বৎসর বয়সে বিবাহ হইলে প্রসব যন্ত্রণায় মৃত্যুর সংখ্যা কমিয়া যাইবে।" ডাক্তার হোয়াইট্ বলেন, "১৫।১৬ বৎসরের পূর্ব্বে দেশীয় বালিকাদিগের ন্যূন কল্পে বিবাহের বয়স হয় না। কিন্তু ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখিলে শরীরের বিকাশ হয়, প্রসবের বিপদ কমিয়া যায় এবং অধিকতর সুস্থ সন্তান জন্মগ্রহণ করে।"

ভারতবর্ষে বালবিধবার সংখ্যাও কম নহে এক কলিকাতা সহরেই ১৫ বৎসরের কম বয়স্কা বালবিধবার সংখ্যা ১৮২৫৬। (৮) দেরী করিয়া বিবাহ দিলে এত অল্প বয়সে বিধবা না হইতে পারিত। ধরুন, একটী মেয়ের ১২ বৎসরে বিবাহ দেওয়া হয়, সে এক বৎসর না পার হতেই বিধবা হয়। সে ক্ষেত্রে যদি তাহার দেরীতে বা আরো দু' বৎসর পরে বিবাহ দেওয়া হইত, তাহলে আরো দু'বৎসর ত মাছ খাইতে পাইত, সাড়ী গয়না পরিতে পারিত। তাহার সধবা মা, পৃথিবীর সব সুখ অনুভব করিবেন, তাঁহার মেয়ে কিন্তু তা করিতে পারিবে না। একি কম কষ্টের কথা! (৯) ১৬ বৎসর বয়সের ন্যূন বয়স্ক বালিকার বিবাহ হইলে বালবিধবার সংখ্যা যত বেশী হয়, ১৬ বৎসর বা তদূর্দ্ধ

---

(৬) কোন কোন মেয়েরা অল্পবয়সে অর্থাৎ এঁচোড়ে পাকিয়া যায়। তাহারা আর স্বামীর শিক্ষার অপেক্ষা রাখে না। সে সব স্ত্রীকে ছাত্রীরূপে" ঘরে রাখিয়া "ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করা" অসম্ভব। বরং তাহাতে সে বধূ বিগড়াইয়া যাইতে পারে।—লেখক।

(৭) Journal of Medicine. July. 1871

(৮) The Statesman, March, 1923.

(৯) এমন অনেক দেখা গিয়াছে যে, বাল্য বিবাহে বিধবা হইলে, আবার সেই বিধবাদের বিদ্যাসাগরের মতে বিবাহ দেওয়া হয়, এখন সেই মহিলারা দ্বিতীয়বার বিধবা না হইয়া স্বামী স্ত্রী, একঘর ছেলেপিলে লইয়া কেমন সুখে জীবনযাপন করিতেছেন। আমাদের দেশে হিন্দু বিধবাদের বিবাহের নিয়ম সাধারণ ভাবে প্রচলিত হয় নাই। যখন বালবিধবাদিগের পুনরায় বিবাহ সহজসাধ্য নহে, তখন বিবাহের বয়স কিছু বৃদ্ধি হওয়া বালিকাদিগের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে।— লেখক

বয়স্কা কুমারীর বিবাহের ফলস্বরূপ বৈধব্যের মাত্রা তত বেশী বাড়িতে পারে না। ১৬ বৎসর বয়স্কা মেয়ের বিবাহ হইলে শীঘ্র জননী হ'বার সম্ভাবনা, সুতরাং একটী সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'বার পর বিধবা হইলেও পৃথিবীতে সেই বিধবার দাম্পিত্ব ও স্নেহের ধন বর্ত্তমান থাকে। অল্প বয়সে বিধবা হইলে সেরূপ সন্তানের জননী হওয়ার সম্ভাবনা।

অনেক বালবিধবা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন না করিতে পারিয়া বা প্রলোভনে পড়িয়া ভ্রষ্টাও হইয়া পড়িতেছে।

অকাল-মৃত্যুর জন্য বাল্য-বিবাহ যে কোন দোষে দোষী নহে, তাই বা কি করিয়া বলি। শরীরের গঠন পূর্ণ হইবারপূর্ব্বে গর্ভসঞ্চার হইলে প্রসূতির প্রাণ লইয়া টানাটানি ঘটে। প্রসব যন্ত্রণায় যদি প্রসূতির মৃত্যু ঘটে, আর যদি সন্তানকে বাঁচাতে যাওয়া যায়, সেই সন্তানও মাতৃ-স্তন হইতে বঞ্চিত হইয়া বেশী দিন পৃথিবীতে বাঁচে না। এ সম্বন্ধে রায় বাহাদুর ডাঃ হরিধন দত্ত বলিয়াছেন, "অতি অল্প বয়সে গর্ভবতী হইলে স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতি হয়; এবং সে স্থলে প্রসব ব্যাপার যে কি বিপজ্জনক, তাহা বলা যায় না। ইহার বিষময় ফল ডাক্তারেরা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। ১৬ বৎসরের পূর্ব্বে স্ত্রীলোকদিগের বস্তিদেশের অস্থিগুলি পরিপুষ্ট না হওয়ায় সন্তান প্রসবের পথ সঙ্কীর্ণ থাকে। সুতরাং অতি অল্প বয়সে সন্তান প্রসব করিতে প্রসূতির নিদারুণ কষ্ট হয়; এবং এমন কি, সময় সময় প্রাণ পর্য্যন্ত বহির্গত হইয়া অতি কষ্টে সন্তান প্রসূত হইলেও, তাহা কখন কখন মৃত অথবা অপুষ্টাঙ্গ হইয়া থাকে। আমাদের দেশে শিশু সন্তানের মৃত্যু-সংখ্যার আধিক্যের ইহার একটী অন্যতম কারণ।" (১০)

আমাদের দেশ এখনও সভ্য হয় নাই। সভ্য হইলে আমরা ৬।৭ বৎসরের গরীব বালিকা স্ত্রীকে সীমন্তে সিঁদূর, হাতে নোয়া, উলঙ্গ দেহ অবস্থায় পথে ঘাটে দেখিতাম না। আদাম ও ইভ যে গাছের ফল খাইয়াছিলেন, তাহাদের সেই গাছের ফল খাওয়ান দরকার। কিন্তু খাওয়াইলে হইবে কি? কেন এমন বালিকা-বধূ উলঙ্গ হইয়া বেড়ায়? সাড়ী কিনিবার পয়সার অভাব বশতঃ নয় কি? যে দেশ এমন গরীব, সে দেশে বাল্য বিবাহ দিয়া একঘর ছেলেপিলে লইয়া দারিদ্র্যের কশাঘাতে কষ্ট পাওয়ার চেয়ে দেরীতে বিবাহ দিয়া সংসারের কষ্ট কি কম করা যাইতে পারিত না? একজন ইংরাজ বন্ধু হিন্দু পরিবারে এত ছেলেপিলে দেখিয়া বলেন, "আমরা তোমাদের মত এত মূর্খ নহি যে এতগুলি ছেলের বাপ হব। তোমাদের ত আয় এত, কি করে তোমরা সংসার চালাও?"

আজকালকার বাজারে দু' একটী পাস করা বাঙ্গালীর বেতন ৩০ হইতে ৪০ টাকার মধ্যে। এমন অবস্থায় স্ত্রী, তা ছাড়া আর যদি ২।৩টী ছেলে হয় তবে কলিকাত বা অন্য কোন আক্রা-গণ্ডা সহরে বাড়ী ভাড়া, দুধের দাম প্রভৃতি কিরূপে চালান সম্ভবপর হয়? (১১) লেখিকা না হয় বড় ঘরের মহিলা, তাঁহার না হয় অন্ন চিন্তা না থাকিতে পারে—কিন্তু আজকাল অধিকাংশ বাঙ্গালীর ঐরূপ অন্ন চিন্তা। মুটে মজুর তাহাদেরও ঐরূপ অন্ন চিন্তা। লেখিকার দাদামহাশয়ের আমলে জিনিষপত্র সব সস্তা ছিল। দুধ টাকায় ১৬ সের ছিল, ঘি টাকায় ৩ সের ছিল, কাজেকাজেই তখন বাল্যবিবাহের সন্তান-সন্ততি যথেষ্ট খাইতে পাইত, সেই কারণবশতঃ দীর্ঘায়ু পাইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে যখন সব খাবার জিনিষ আক্রা ও ভেজাল, মাথা রাখিবার স্থান—যেমন বাড়ী বা একখানি ঘর তারও ভাড়া বৃদ্ধি হইয়াছে—এ ক্ষেত্রে বাল্য-বিবাহের দ্বারা "প্রজাবৃদ্ধি" কখন উচিত নহে এরূপ আধমরা, ক্ষীণজীবী মা'র সন্তান সবাই কখন বলিষ্ঠ বা দীর্ঘায়ু হয় না।

এইরূপ আক্রা-গণ্ডা যুগে যাহার যাহা আয় আছে, তাহাতে আর কুলাইতেছে না। এরূপ ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহ করিলে, সংযমী হইবার অভাবে, সন্তানের সংখ্যা এত শীঘ্র বাড়িতে থাকে যে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করা ভিন্ন অন্য উপায় থাকে না। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"—পুত্র হউক এই জন্য দার-পরিগ্রহ করা উচিত। তাই বলিয়া নারীরা ইহা চাহে না যে অনেক সন্তান হউক। (১২) প্রসব

(১০) নারী-জীবন, পৃষ্ঠা ১৪।

(১১) লেখিকা "সহর-বাসের মমতা" পরিত্যাগ করিয়া "পল্লীতে গিয়া বাস" "গো সেবা" প্রভৃতির কথা বলিয়াছেন। এ সব বলা সোজা কিন্তু সকলের পক্ষে কার্য্যে করা শক্ত।— লেখক

(১২) মিসিসিপি বিশ্ববিদ্যালয়ের "তুমি কতগুলি সন্তানের মা হইতে চাও?" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে অধিকাংশ ছাত্রী ৪টী সন্তানের জননী হইতে চাহে—এই উত্তর দিয়াছিল।—শ্রীমতী সুষমা সিংহের লেখা, "কি কি গুণ দেখিয়া বিবাহ করা উচিত", প্রবাসী, মাঘ, ১৩২৯। হিন্দুসমাজেও একটীমাত্র পুত্র জন্মাইলে শাস্ত্রের নিয়ম রক্ষিত হয়। লেখক

বেদনা কেমন তাহা নারী ভিন্ন পুরুষ বোঝে না। আমি দু' একটী হিন্দু সমাজের মহিলা, যাঁহাদের বাল্যবিবাহ হইয়াছে, তাঁহাদের অপর নারীর নিকট বলিতে শুনিয়াছি, "বলুন, ত, কি করলে আমার ছেলেপিলে না হয়? বছর বছর এক একটী করিয়া ছেলে হইয়া আমি যে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হয়ে পড়ছি, তিন তিনটী ছেলের যত্নও করিতে পারিতেছি না। কোন রকমে আমরা স্বামী স্ত্রীতে তাহাদের লইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছি। আমার যদি আর সন্তানাদি না হয় তাহলে বলবতী হইতে পারি…" আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে ঐরূপ মনের কথা "ভারতবর্ষে"র বিবাহিতা পাঠিকাদের নিকট হইতেও পাওয়া যাইতে পারে। বৎসর বৎসর গর্ভবতী হওয়াতে স্বাস্থ্য-সম্পন্না নারী রুগ্নকায়া হইয়া পড়িতেছে। ২০তে বুড়ী হইতেছে। স্বাস্থ্যহীন সন্তানের মা হইয়া পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন কি? কি গরীব, কি ধনী, ঘরে এক ঘর ছেলেপিলে হউক ইহা কাহারও বাঞ্ছনীয় নহে। কারণ তাহাতে গর্ভিনীর শরীর বজায় থাকিবে কি না সন্দেহ। আর, গরীবদের হইলে দারিদ্র্যে মরিতে হয়। কশাঘাতে নিজেরাও দারিদ্র্যে মরিতেছেন, কশাঘাতে আবার ঘন ঘন সন্তানদের পৃথিবীতে আনিয়া তাহাদের কষ্ট দেওয়া কেন? (১৩) এরূপ ক্ষেত্রে সংযমী হইয়া থাকা নিতান্ত উচিত। কিন্তু তাহা সকলের কাছে যখন সম্ভবপর হয় না, সে ক্ষেত্রে birth-control league (জন্ম-দমন সমিতির) উপদেশমত গর্ভ নিয়মিত করা দরকার। ১৪) যদিও আমি এই সমিতির সমস্ত কার্য্য সমর্থন করি না, তথাপি ইহাদের উপদেশগুলি সকলেরই পড়িবার বিষয়।

লেখিকা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন "পুরুষের ২৭।২৮।২৯।৩০ এবং মেয়ের যদি ১৭।১৮।১৯।২০ তে বিবাহই ঘটিবে, তবে সন্তান সন্ততি জন্মিবে কখন? দেশে প্রজা বৃদ্ধির উপায় কি?" তাঁহার কি ধারণা যে, উক্ত বয়সে বিবাহ হইলে ছেলে মেয়ে হইবার সম্ভাবনা থাকে না? তখনও ছেলে মেয়ে হইবে। যদি "১৮" বৎসরে মেয়ের বিবাহ দেওয়া হয়, স্ত্রীলোকদের সন্তান উৎপাদন করিবার ক্ষমতা ৪৫ বৎসর অবধি যখন, তখন ঐ ১৮ বৎসরের মেয়ের যদি ৩ বৎসর অন্তর সন্তান হয়, তাহলে ৪৫ বৎসর বয়সে সে ৯টী ছেলের মা হইতে পারে। ১২ বৎসর বয়সে বিবাহ দিলে যতগুলি ছেলে হইত, "১৮" বৎসরে সেই মেয়ের বিবাহ দিলে ততগুলি ছেলে হইতে পারে, তখনও তাহার "যৌবন" নষ্ট হয় না। যখন ১৮ বৎসরে মেয়ের বিবাহ দিলে সেই একই সংখ্যক সন্তান হইতে পারে তখন ১২ বৎসরে বিবাহ না দিয়া ১৮ বৎসরে বিবাহ দিলে ক্ষতি কি হয়? ১২ বৎসরের বিবাহিত মেয়ের ৪৫ বৎসর বয়স অবধি যদি সন্তান হইতে থাকে, তাহার সন্তানের মধ্যে রুগ্ন ও মৃত্যুর সংখ্যা বেশী হয়। অল্প বয়সে বিবাহ দিয়া এভাবে "প্রজা-বৃদ্ধি" (১৫) করা প্রস্তাবে কোন সভ্য সমাজ সাড়া দিবে না। এই সব ভাবিয়া আজকাল মেয়েদের বিয়ের বয়স বাড়াইবার কথা ভারতবর্ষের চারিদিকে হইতেছে। সেদিন কাশীতে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও ভারতবর্ষের অন্যান্য লোকেরা সমবেত হইয়া একটী হিন্দু মহা সভা করেন। সেই সভাতে মেয়েদের বয়স বাড়াইবার কথা স্থির হয়।

ভারতের প্রকৃত গৌরবের দিনে হিন্দুশাস্ত্রে যৌবন বিবাহ প্রচলিত ছিল। সেই যৌবন বিবাহ কোন্ যুগে কেমন ভাবে চলিয়া আসিয়াছে, এখন কতখানি দশের সমর্থন পাইতেছে, তাহা নিম্নে দেখাইতেছি:—

ক। বৈদিকযুগ (২০০০-১৪০০ খৃষ্ট পূর্ব্ব)। (Vedic Period) হিন্দু-সভ্যতার এই বরণীয় যুগে পরবর্ত্তীকালের মত কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না, মানুষের প্রয়োজনীয়তার উপর বিবাহাদি সম্পর্ক নির্ভর করিত। বালিকাগণ বিবাহ না করিয়াও পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইত না, এবং পিতৃ-গৃহে সসম্মানে বাস করিত। ঋগ্বেদ, ২।১৭-৭)। বৈদিকযুগে যৌবন-বিবাহ প্রচলিত ছিল। নিম্নলিখিত বেদবাক্য দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, সেকালে

(১৩) "এক রুসিয়া ছাড়া ভারতবর্ষের জন্ম-সংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেশী।" —অধ্যাপক গোপাল জি।

(১৪) যে সব উপদেশ এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তাহা যদি কেহ জানিতে চাহেন তাহা অধ্যাপক গোপম জি, Indian Birth Regulation Society, Delpi বা American Birth control League হইতে এ মর্ম্মে যে সব পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে তাহা পড়িয়া অবগত হইতে পারেন। —লেখক।

(১৫) এ সম্বন্ধে আলোচনা ইহার আগের দু'টী paragraphএও দেখুন। —লেখক।

যৌবন বিবাহ হইত। (১) যুবতী জায়া প্রাপ্ত হইলে গুণী ব্যক্তি যেরূপ তাহার প্রতি কুপিত হয়েন না।" (ঋক্, ৮ম, ২সূ, ২৯)। (২) "যে কোন কন্যা পিতৃ গৃহে বিবাহ লক্ষণযুক্তা আছে, তাহার নিকট যাও" (১০ম, ৮৮সূ, ২১)। (৩) "নিতম্ববতী অপর অবিবাহিতা রমণীর নিকট গমন কর এবং তাহাকে পত্নী করিয়া পতি সংসর্পিনী করিয়া দাও।" (১০ম, ৮৫সূ, ২২)। পরবর্ত্তী-কালের যুবতীগণের স্বয়ম্বর প্রথার পূর্ব্বাভাষ এ যুগেও লক্ষিত হইয়াছিল। যথা—"সুন্দরী সদ্‌গুণ-ভূষিতা রমণী আমাদের মধ্যে নিজের প্রিয়পাত্রকে স্বামীরূপে মনোনীত করেন।" (১০।২৭।১২)।

খ। মহাকাব্য প্রণয়নের যুগ (Epic Period; ১৪৮০—১০০০ খৃষ্ট-পূর্ব্ব)।

এইকালে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শিক্ষালাভের জন্য কেহ কেহ পরিষদে (বর্ত্তমান কালের বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ শিক্ষা-মন্দিরে) গমন করিত, কেহ বা গুরু-গৃহে থাকিয়া পাঠাভ্যাস করিত। সেখান হইতে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তাহারা গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বিবাহ-পূর্ব্বক সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট হইত। এই সময়েও বাল্যবিবাহ অজ্ঞাত ছিল।

মহাভারতে আছে—'প্রজা ন হীয়তে তস্য রতিশ্চ ভরতর্ষভ (অনু, ৪৪অ), যৌবন বিবাহেই সন্তানগণও স্ত্রীর প্রতি অনুরাগহীন হয় না।

মহাভারতে পুনরায় আছে—'ত্রিংশদ্বর্ষঃ ষোড়শাব্দাং ভার্য্যাং বিন্দেত নগ্নিকাং' অর্থাৎ ৩০ বৎসরের পুরুষ ১৬ বৎসরের নগ্নিকা কন্যাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিবে। গৃহ্য-সূত্রকার নগ্নিকা অর্থে ঋতুবতী বলেন। রামায়ণে নারী শ্রেষ্ঠা সীতাদেবী প্রভৃতির যৌবন বিবাহের পরিচয় সকলেই জানেন।

গ। দর্শন প্রণয়নের যুগ (Rationalistic Period; ১০০০—২৪২ খৃষ্ট-পূর্ব্ব)।

হিন্দু সভ্যতার তৃতীয় যুগে ব্রাহ্মণগণ ৮ হইতে ১৬ বৎসরের মধ্যে, ক্ষত্রিয়গণ ১১ হইতে ২২ বৎসরের মধ্যে এবং বৈশ্যগণ ১২ হইতে ২৪ বৎসর বয়সের মধ্যে গুরুর নিকট শিক্ষাব্রত গ্রহণ করিত। ১২।২৪।৩৬।৪৮ বৎসর ধরিয়া বালকগণ গুরুর নিকট যথাক্রমে এক, দুই, তিন বা চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া গৃহে ফিরিয়া বিবাহ করিত এবং স্নাতকরূপে (অর্থাৎ যে ব্যক্তি শিক্ষা সমাপনান্তে স্নান করিয়াছেন) গার্হস্থ্য ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত। সংখ্যায়নের নিম্নলিখিত বাক্য দ্বারা বুঝা যায় যে, সেকালে যৌবন-বিবাহ প্রচলিত ছিল. "বিবাহান্তে বরকন্যা তিন রাত্রি যেন সহবাস হইতে বিরত থাকে।"

ঘ। বৌদ্ধযুগ (Buddhistic Period; ২৪২ খৃষ্ট পূর্ব্ব—৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত)।

এই যুগ রাজা অশোকের সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ইতিহাস বিখ্যাত চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েনসাঙ বলেন যে, "সে সময় ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ ৩০ বৎসর বয়সে শিক্ষা সমাপন করিত এবং গৃহে ফিরিয়া আসিয়া সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট হইত।" মনু বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না, হিন্দু ছিলেন। বৌদ্ধ সমাজের পাপাচার ধীরে ধীরে হিন্দু সমাজকে আক্রমণ করিতেছে দেখিয়া মনু হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য সমাজকে কঠোর নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় হইতে বাল্য-বিবাহের প্রথম সূত্রপাত হইলেও যৌবন বিবাহ সাধারণতঃ ছিল। যদিও মনু বলেন—

"ত্রিংশদ্বর্ষোদ বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশ বার্ষিকীং", অর্থাৎ ৩০ বৎসরের পুরুষ ১২ বৎসরের হৃদ্যা (অর্থাৎ হৃদয়ের প্রীতিদায়িনী—চলিত কথায় যাহাকে 'বাড়ন্ত' বলে) কন্যাকে বিবাহ করিবে। কিন্তু সেই মনু আবার বলেন—

> কামমারণাত্তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যার্ত্তুমত্যপি।
> ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণ হীনায় কর্হিচিৎ॥
>
> (৯অ, ৮৯)

অর্থাৎ গুণহীন পাত্রে পিতা কদাপি প্রাপ্ত-যৌবনা কন্যাকেও সম্প্রদান করিবে না। ভাষ্যকার মেধাতিথি ঋষি লিখিতেছেন যে, "যৌবন সঞ্চারের (ঋতুমতী হইবার) পূর্ব্বে কন্যাদান অনুচিত এবং তাহার পরেও উপযুক্ত পাত্র লাভ না করিলে বিবাহ দিবে না।"

অন্যত্র মনু বলেন—

> ত্রীণি বর্ষান্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
> ঊর্দ্ধন্তু কালাদে তস্মাদ্বিন্দেত সদৃশ পতিং॥
>
> (৯অ, ৯০)।

অর্থাৎ কুমারী কন্যা ঋতুমতী হইবার পর তিন বৎসর

উদীক্ষা পূর্ব্বক কালযাপন করিবে, তাহার পর সদৃশ পতি লাভ করিবে।

"ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাম্বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ।" অর্থাৎ ২৪ বৎসরেরর পুরুষ ৮ বৎসরের বালিকাকে বিবাহ করিলে ধর্ম্মে বা উন্নতি লাভের সকল বিষয়ে শীঘ্র শীঘ্র অবসাদ প্রাপ্ত হয়েন।

ঙ। পৌরাণিক যুগ (Pauranic Period ; ৫০০ ১১৯৪ খৃষ্টাব্দ)।

পৌরাণিক যুগে নিয়মের কঠোরতা ভীষণাকার ধারণ করিল। বাল্যবিবাহ সমর্থক বিধান বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং ইহা সমাজে প্রচলিত হইয়া পড়িল। সমাজ চির-কালই পরিবর্ত্তনশীল। আজ যাহা ভাল বলিয়া সাদরে গৃহীত হইল, কাল তাহা পরিত্যক্ত হইতে সময় লাগে না। কিন্তু এই যুগেও বাল্যবিবাহের কুফল দেখিয়া অস্ত্র-চিকিৎসাবিশারদ সুশ্রুত জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিলেন—

উনষোড়শ বর্ষায়াম প্রাপ্ত পঞ্চবিংশতিং।
যন্থাধ্যত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ সঃ বিপদ্যতে॥
জাতো বা ন চিরং জীবেজ্জীবেদ্বাদুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাদত্যন্ত বালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ॥

(সুশ্রুত শারীরস্থান, ১০ম)।

অর্থাৎ "২৫ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক পুরুষ যদি অপ্রাপ্ত ১৬ বর্ষীয়া কন্যাতে সন্তানোৎপাদন করে, তবে সেই সন্তান গর্ভেতেই বিপদগ্রস্ত হয় এবং যদি বা জন্মগ্রহণ করে, তবে সে দুর্ব্বলেন্দ্রিয় ও অদীর্ঘজীবী হয়, অতএব অত্যন্ত বালিকা-বস্থায় গর্ভাধান করিবে না।" শাস্ত্রের অনুশাসন ইহা অপেক্ষা স্পষ্টতর আর কি হইতে পারে? হিন্দুগণের বিশ্বাস যে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মহাদেবের সৃষ্টি। হিন্দু হইয়া এই শিব-বাক্যের অবমাননা করা কি উচিত? মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে আছে,—

"অজ্ঞাত পতিমর্য্যাদামজ্ঞাত পতিসেবানাম্।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাত ধর্ম্ম শাসনম্॥"

অর্থাৎ যে বালিকা পতিমর্য্যাদা ও পতিসেবা জ্ঞাত নহে এবং ধর্ম্মশাসন জ্ঞাত নহে, পিতা এমত বালিকার বিবাহ দিবেন না।

বালিকার পক্ষে ইহা সম্ভবপর নহে বলিয়া যৌবন বিবা-হেরই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, কুন্তী, দ্রৌপদী, উত্তরা, রুক্মিনী, ইন্দুমতী, সুভদ্রা, গান্ধারী, দেবযানী, প্রমদ্বরা, পৃথা প্রভৃতি সতী-শিরোমণি আর্য্যনারী-গণের ভিন্ন ভিন্ন যুগে যৌবনেই বিবাহ হইয়াছিল। যখন যৌবন-বিবাহ এই সকল উচ্চবংশে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন সাধারণ হিন্দু সমাজেও যে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সেকালে স্বামী নির্ব্বাচনেরও প্রথা ছিল; দেবী সাবিত্রী তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্বয়ম্বর প্রথাও যৌবন বিবাহ পরিচায়ক।

শাস্ত্রে সমাজ-রক্ষার নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সামাজিক জীবনের প্রকৃত ছবি দেখিতে হইলে সম-সাময়িক নাটক, ও উপাখ্যানের শরণাপন্ন হইতে হয়। মহাকবি কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতির কাব্য, নাটক যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, যৌবনেই নরনারীর বিবাহ হইত। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদিতে যৌবন-বিবাহের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অতীত যাহাদের এত উজ্জ্বল ও মধুর, ভবিষ্যৎ কেন তাহাদের অন্ধকারময় হইবে?

চ। মুসলমান রাজত্ব।

হিন্দু রাজত্বের অবসানে মুসলমানগণ এদেশের অধীশ্বর হইলেন। অত্যাচারের ভয়ে হিন্দুগণ জাতিকুল রক্ষার জন্য বাল্য-বিবাহের আশ্রয় লইয়া মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ছ। ইংরেজ রাজত্ব।

বিধির বিধানে সুসভ্য ইংরেজগণ এদেশের রাজা হইলেন। দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। শিক্ষা প্রচারের সহিত হিন্দুগণের বিবাহের বয়স বৃদ্ধি পাইতেছে।" (১৭)

লেখিকার লেখা পড়িলে মনে হয় যে, তিনি সেকেলে ধরণের গুণবিশিষ্টা মহিলা। যাহা তাঁহার আমলে চলিয়া আসিয়াছে, তাহাই যে বরাবর চালাইতে হইবে এমন কিছু কথা নাই। "The old order changeth yielding place to new." মানুষ জ্ঞান শিক্ষালাভ করিতেছে, দেশ বিদেশে যাইতেছে; জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া অনেকে

---

(১৭) শ্রীপ্রবোধচন্দ্র রক্ষিতের "বাল্য বিবাহ" নামে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধ যাহা ১৩২৪-এর মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্রের "তাম্বুলি-সমাজ" মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতে উদ্ধৃত।

reformed হইয়া ও আসিতেছে। সমাজকেও reformed করিতেছে। মেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাসও করাইতেছে, ডাগর করিয়া মেয়ের বিবাহ হিন্দুসমাজে দিতেছে। এখনকার দিনে সবদিক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিতে গেলে ১৬ বৎসরের কমে মেয়ের বিবাহ দেওয়া উচিত নহে।

লেখিকা আধুনিক মেয়েদের শিক্ষার কথা যাহা বলিয়াছেন, সে সম্বন্ধে কিছু বলি। আজকাল স্কুল, কলেজে যে সব শিক্ষা মেয়েরা পাইতেছে তাহাতে তাহারা প্রকৃত "মা" হইবার শিক্ষা পাইতেছে না। "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় I. Aতে Sanskrit, Logic, Botany ও B. Aতে English, History, Botany প্রভৃতি conbination of subjects ছাত্রীদিগকে লইবার অনুমতি দিয়াছেন। chemistry ও soil Physics না জানা থাকিলে Botany বুঝা শক্ত হয়। সুতরাং ঐ সমস্ত ছাত্রীর বিদ্যাও সেইরূপ হয়। তাহারা জানে যে, ঐ রকম subjectগুলি সংসারের কোন কাজেও আসিবে না, উপস্থিত পাশ করা নিয়ে দরকার।" (১৮) "অতটা পরিশ্রমে যত কিছু" মেয়েরা শোনে "তার অধিকাংশ জীবনপথে চলার কোন সাহায্যে" লাগে না। কাজেকাজেই আকজো বিদ্যা ভুলিতে হয়। "মার্কিন দেশে নারীর পক্ষে যাহা সমধিক প্রয়োজনীয় সেই বিষয়গুলি বিশেষরূপে শিক্ষা দেওয়া হয়। যথা (১) Principles of Selection and Preparation of food (this includes butter making, preservation of fruits etc) (আহার্য্য বস্তুর গুণাগুণ বিচার ও তাহার প্রস্তুত প্রণালী, মাখন মোরব্বা প্রভৃতি তৈয়ারী করা) (২) Dietetics (পথ্যাদির ব্যবস্থা), (৩) Home economies (গৃহকর্ম্মে মিতব্যয়িতা), (৪) Household management (গৃহের যাবতীয় কর্ত্তব্যের সুবন্দোবস্ত) (৫) Millinery (টুপি, জরী প্রভৃতি পরিচ্ছদের কাজ), (৬) Laundry (কাপড় ধোলাই ও ইস্ত্রির কাজ) (৭) child nature - শিশুর স্বভাবের প্রতি দৃষ্টি), (৮) House Sanitation (গৃহের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা), (৯) Art and Design (চিত্র ও অন্যান্য শিল্পকার্য্য), (১০) Physical training (শারীরিক ব্যায়াম); অর্থাৎ যাহা শিক্ষা করিলে ভবিষ্যতে তাহারা সুগৃহিণী হইতে পারে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই সকল শিক্ষা প্রদত্ত হয়। এই সকল বিষয় পড়িতে পড়িতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও লওয়া যাইতে পারে:—ইংরাজি, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, প্রভৃতি। মূল কথা, স্ত্রীজাতি যাহাতে সুগৃহিণী হয় ও vocational education পায়, সেইরূপ Curriculum করা হইয়াছে। (১৯)

আমি বিবাহ করিয়া স্ত্রী ঘরে আনিলে আমার পরলোকগত বড় জেঠা মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "বৌমা রাঁধিতে জানেন? যে স্ত্রীলোক রাঁধিতে জানে না তার নারী হয়ে জন্মগ্রহণ করা বৃথা।" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাস করা একটী বড়লোকের মেয়ে, বিধবা হওয়ার পর, মফস্বলে যান। সকালে তাঁহার চা খাওয়া অভ্যাস ছিল। বাড়ীতে চাকর বা ঝি তখন কাহাকে নিযুক্ত করিতে পারেন নাই। তবে ঐ মফস্বল বাড়ীতে একজন অভিভাবক ভদ্রলোক ছিলেন। উক্ত মহিলা অনেকবার উনন ধরাইতে চেষ্টা করেন। যখন কিছুতেই পারিলেন না তখন তিনি অভিভাবক ভদ্রলোকের নিকট যাইয়া বলেন—"দেখুন, আমি উনন ধরাতে জানি না, আপনি উননটা ধরিয়া দিতে পারিবেন?" শেষে ঐ ভদ্রলোক তাঁহার উনন ধরাইয়া দেন তবে রান্না হয়। এ রকম পাস করা মেয়ে যে বাঙ্গালীর ঘরে বিদ্যমান—যিনি উনন ধরাতে, ছেলে মানুষ করিতে, বা একদিন চাকরাণী না আসিলে বাসন মাজিতে, বা রান্নাঘর নিকাইতে বা আহার প্রস্তুত করিতেও সম্পূর্ণ অপারগ—ইহা বড়ই দুঃখের কথা! আমরা মেয়েদের সুগৃহিণী করিবার মত শিক্ষার curriculum আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কবে হইতে করিব?

(১৮) লেখকের প্রবন্ধ, "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনে স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর"; ভারতবর্ষ, বৈশাখ, ১৩২৫।

(১৯) লেখক প্রণীত, "আমেরিকা ভ্রমণ", ১৩২৮।

আমাদের কথা

সফিয়া খাতুন

শ্রাবণ মাসের "ভারতবর্ষে" শ্রদ্ধেয়া অনুরূপা দেবী স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ে একটা সারবান প্রবন্ধ লিখেছেন। তবে স্থানে স্থানে তিনি শিক্ষিতা মেয়েদের উপর যেসব দোষ দিয়েছেন, তা সত্য বটে; কিন্তু তার জন্য যে মেয়েরা দায়ী নহে, তা কি তিনি জানেন না? আর তা'ছাড়া তিনি আমাদের স্বাধীনতার যে আভাষ দেখিয়েছেন, এবং যার জন্য তিনি ভবিষ্যৎ অমঙ্গল চিন্তা করে ভয় পাচ্ছেন, আমরা ত সেরকম স্বাধীনতা চাই না।

এ কথা যেন কেহ ভুলে না যান যে, ভারতের স্ত্রী-স্বাধীনতা ও ইয়োরোপের স্ত্রী-স্বাধীনতার রাত-দিন তফাৎ—একেবারে আকাশ আর পাতাল। আমরা আমাদের দেশের আবহাওয়ার ভিতর দিয়েই স্বাধীন হতে চাই। সোজা কথায় আমরা এই চাই—পুরুষ বিবাহের সময় যেসব প্রতিজ্ঞা করে স্ত্রীকে গ্রহণ করেন, তা যদি সত্যিকার মত পালন করেন, তবেই আমাদের স্বাধীনতা বজায় থেকে যায়। আমরা পুরুষের দাসী (slave) নই। স্বামী স্ত্রীতে সকল বিষয়েই সমান অধিকার—এ ত শাস্ত্রায় লেখা আছে। কিন্তু কাজের বেলায় তা করা হয় কি? হতে পারে দু-একটা পরিবারে স্বামী স্ত্রীকে আপন আত্মার ন্যায় সমান অধিকার দিয়ে থাকেন। কিন্তু এই দু একটা পরিবার নিয়েই ত আর তামাম ভারতবর্ষটা নয়? আমার বিশ্বাস, শতকরা তিনজন লোক স্ত্রীকে সমান অধিকার দেন কি না সন্দেহ।

অনেকে হয় ত বলবেন যে, আজকাল কোন শিক্ষিত যুবকই স্ত্রীকে দাসী ভাবেন না। এ কথা কি করে বিশ্বাস করব? আমরা আর ত দু'চোখ খেয়ে বসি নাই? গ্র্যাজুয়েট জামাইয়ের দল টাকার জন্য দীন-দরিদ্র শ্বশুরের ঘর বাড়ী পর্য্যন্ত নীলামে তুলছেন। যার তাও নাই, তার মেয়েকে বিবাহ করে তাড়িয়ে দিচ্ছেন,—একেবারে পথের ভিখারিণী করে। জামাই শ্বশুরকে পত্র দিচ্ছেন "টাকা দাও, তা না হলে তোমার মেয়ে তোমারই রইল।" মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে বিবাহ দেওয়া হচ্ছে; শেষে হতভাগিনী বিয়ের পরদিনই গলায় ফাঁস দিচ্ছে (কোন মুসলমান পরিবারে)। আর কত বলব। স্ত্রীকে একমাত্র ভোগের জিনিষ বা একটা অস্থাবর সম্পত্তি মনে না করলে, এমন পাষণ্ড মানুষ হতে পারে না।

সেদিন 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় দেখলাম, কাশীবাসী কোন ব্রাহ্মণ তাঁহার বিবাহিতা কন্যা নিয়ে পর্য্যন্ত মহাবিপদে পড়ে গেছেন। জামাতাটী বি-এ পাশ, কলকাতার কেরাণী, অধিকন্তু মাতাল ও চরিত্রহীন। মেয়েটী ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দিভাষা বেশ ভাল জানেন; গৃহকর্ম্মেও সুনিপুণা। পাষণ্ড এমন সতী-সাধ্বী ও সুগৃহিণী স্ত্রীকে মেরে ধরে তাড়িয়ে দিয়েছে। এদিকে মেয়ের পিতাও সংসারত্যাগী। ভাই বন্ধু আর কেহ নাই। এখন এই মেয়ের ভরণ-পোষণ কে করে? আজ যদি এই মেয়েটী স্বাধীন হতেন, অর্থাৎ নিজের পায়ে দাঁড়াবার মত যদি তাঁহার মনের বল থাকত, তবে হয় ত সংসারত্যাগী পিতা বা নিজেকে এত লাঞ্ছিত হতে হত না।

মেয়েটী বেশ ভাল লেখা পড়া জানেন, অথচ দুমুঠো ভাত জুঠছে না। এতে কি প্রমাণ হয় না যে, এই মেয়েটীর একমাত্র স্বাধীনতার অভাবেই এ অবস্থা ঘটেছে?

অনেকের বিশ্বাস, আমরা স্বাধীন হতে চাই—অর্থাৎ মেম সাহেব সাজতে চাই। এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। খৃষ্টীয় সমাজের মেয়েরা যে ভাবে চলছেন, তাহা আমাদের স্বাধীনতার আদর্শ নয়। বিদেশীয় আচার ব্যবহারে চলতে গিয়ে আজ খৃষ্টীয় সমাজের এত অধঃপতন। এ কথা মহামতি সি, এফ, এণ্ড্রুজের ন্যায় জগৎ-বিখ্যাত মিশনারীও স্বীকার করেছেন। তিনি ভারতবন্ধু ষ্টোক্স-এর সংক্ষিপ্ত জীবনীতে বলেছেন যে, ইয়োরোপীয় সভ্যতায় ভারতবাসীকে খৃষ্টান করতে গিয়ে মিশনারীরা একটা মস্ত বড় ভুল করেছেন।

যাক্, আমাদের দেশের মেয়েরা কোন দিনই পর্দ্দা-নশীন বা পরাধীনা ছিলেন না। এসব পর্দ্দার সৃষ্টি হয়েছে বিলাসী মোগল পাঠান রাজাদের দ্বারা। ইহারা

মেয়েদের একমাত্র ভোগের জিনিষই মনে করতেন; এবং যেসব পাশবিক উপায়ে রাজপুত সুন্দরীদের এনে জেনানাতে পুরতেন, তাতে ওরা কাহাকেও বিশ্বাস করতে পারত না। নিজেদের স্বভাব চরিত্র লইয়া অন্যের স্বভাব চরিত্রের তুলনা করতেন বলে, মেয়েদেরে একেবারে অসূর্য্যাম্পশ্যা করে রা তেন।

এই মোগল রাজত্বের পূর্ব্বে দেশে স্ত্রী পুরুষে একমত সমান অধিকার ছিল। তা না হলে স্বয়ম্বর ও গান্ধর্ব্ব বিবাহ প্রথা থাকত না।

আমাদের মুসলমান সমাজেও ঠিক তাই। কোরাণ (দঃ) বলছেন এক, আর তার উপাসকরা করছেন আর। লেখা আছে, হে পয়গম্বর, তোমার স্ত্রী, কন্যা ও বিশ্বাসীদের স্ত্রীগণকে বল, যেন তাহারা তাহাদের কাপড়ের উপরে ঢিলা লম্বা জামা পরে......"

ইসলামের পর্দ্দা ত এই। আর সেই জায়গায় মেয়েদের সিন্দুকে পুরে রাখা হয়। হজরত মোহাম্মদএর (দঃ) স্ত্রী বিবি আয়েসা তখনকার দিনে খলিফা নির্ব্বাচন ব্যাপারে প্রকাশ্য সভায় যোগ দিতেন। তা ইতিহাসে পাওয়া যায়। হজরৎ আলীর (রা) পৌত্রী সখিনা উচ্চ-শিক্ষিতা ছিলেন। অনেক সময় তিনি পণ্ডিত পুরুষদের সঙ্গে জ্ঞানচর্চ্চা করতেন। খলিফা মামুনের স্ত্রী বুরান, ভগ্নি উমমুললফজল খলিফা হারুনর রশিদের স্ত্রী জোবায়েদা প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক ছিলেন। ফখর-উন-নিসা বোগদাদের জামে মসজিদে সাহিত্য, অলঙ্কার-শাস্ত্র ও কাব্য বিষয়ে প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিতেন। তাপসী রাবেয়ার কথা ত সকলেই জানেন।

বিবাহ সম্বন্ধে ব্যবস্থা আছে, বিবাহে প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষেরও যেমনি সম্মতি প্রয়োজন, প্রাপ্ত-বয়স্কা স্ত্রীলোকেরও তেমনি সম্মতি প্রয়োজন। বয়স্কা নারী ইচ্ছামত বিবাহ করিতে পারেন। অভিভাবক অল্প-বয়স্কা বালিকার বিবাহে বালিকার পক্ষ হতে সম্মতি দেন; কিন্তু স্থান-বিশেষে বয়স্কা হয়ে সেই স্ত্রী বিবাহ অস্বীকার করতে পারেন! কিন্তু সমাজপতিরা করছেন কি? জোর করে মেয়ের মতের বিরুদ্ধে বিয়ে দিচ্ছেন। সেদিন খবরের কাগজে দেখলাম, একটী মেয়েকে তার চাচার ঘরের ভাইয়ের সঙ্গে অর্থাৎ খুড়াত ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিয়ের পূর্ব্ব হতেই মেয়ে এই বিবাহে ঘোর আপত্তি করে আসছে। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী। তাকে জোর করে পাত্রস্থ করা হয়। হতভাগিনী অনন্যোপায় হয়ে গলায় ফাঁস দিয়েছে ঠিক বিয়ের পরদিনই!

যাক্, বল্‌তে যাচ্ছিলাম এই পর্দ্দার কথা। ভারতে পর্দ্দা একমাত্র মোগলরা এনেছে; এবং এই সময় হতেই আমরা দাসীত্ব প্রাপ্ত হয়েছি।

শ্রদ্ধেয়া অনুরূপা দেবী লিখেছেন "যদি স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকারে সামাজিক ও পারিবারিক সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিত, যদি প্রকৃতির বিধানে নারী সকল ক্ষেত্রেই পুরুষের সমকক্ষ হইবার যোগ্য হইতেন; তাহা হইলে সৃষ্টির প্রথম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি এই যুগ-যুগান্তর পর্য্যন্ত তাঁহাদের পুরুষের অধীনতায় বাস করিতে হইত না।"

জানি না তিনি "অধীনতা" শব্দে এখানে কি বুঝাতে চেয়েছেন। তবে চাকর দাসীর যেমন অধীনতা,—তিনি কি তাই বুঝাতে চেয়েছেন?

যদি তা না হয়, তা'হলে স্ত্রী কোন দিনই পুরুষের অধীন ছিলেন না। উভয়েই প্রেমের বন্ধনে মিলিত। তাতে যদি অধীনতা বুঝতে হয়, তা'হলে স্ত্রী যেমন পুরুষের অধীন, পুরুষও তেমনি স্ত্রীর অধীন। স্ত্রী অন্যায় করলে বা কুপথগামিনী হলে তাকে শাসন করবার স্বামীর যেমন অধিকার, স্বামীও স্বেচ্ছাচারী বা কুপথগামী হলে তাকে সুপথে আনবার জন্য শাসনাধিকার স্ত্রীর আছে। নারীর এই অধিকারের অভাবেই আজ দেশের এত দুর্দ্দশা।

আমরা এম্-এ, বি-এ পাশ করে নিজের নারীত্ব কি মাতৃত্বকে ভুলে যাব না। প্রকৃতির বিধানে আমরা সকল বিষয়ে পুরুষের সমান না হলেও, জ্ঞান বিষয়ে যে সমান বা কোন-কোন স্থলে বেশীও হতে পার; তার যথেষ্ট প্রমাণ এ দেশেই আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় অনেক মেয়েই প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। পাবার বেলায় যে তাদের নিকট হতে সেই একঘেয়ে প্রেমের গল্প, কবিতা বা এক-আধটা স্বদেশী গান ভিন্ন আর কিছু পাওয়া যায় না, তার জন্য কি বিশ্ববিদ্যালয় দায়ী নহে? তাদের শিক্ষার আর কি বন্দোবস্ত করা হয়েছে যে, তাদের নিকট হতে অন্য কিছু পাবার আশা করতে পারি। বিজ্ঞান বিষয়ে বা টেক্‌নিকেল কোন আর্ট'তে শিক্ষা দিবার

জন্য কোন স্কুল কলেজ আছে কি ? যে সব মেয়েরা বিদেশে যেতে পেরেছেন, তাঁরা বিজ্ঞান কি অন্যান্য বিষয়ে বেশ নাম করে এসেছেন। মাদ্রাজের মিস্ গঙ্গা মাদেপ্পা বিলাতের বিজ্ঞানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাধি ডি-এস্‌সি লাভ করেছেন। গেল বছর আমেরিকার সানফ্রান্সিস্কো-প্রবাসী শ্রীযুক্ত হীরালাল হালদার মহাশয়ের কন্যা কুমারী লীলা হালদার মিকানিকেল ও ইলেক্‌ট্রিকেল এঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। কুমারী শকুন্তলা রাও বি-এস্‌সি জার্ম্মেনীতে "পটারী" শিক্ষা করতে গিয়েছেন। আমাদের দেশের ছেলে মেয়েদের খেলার খেলনা আমাদের ছেলেদের মনোমত করে তৈরী করবার জন্য চায়ের পেয়ালা, ফিডিং কাপ, কোমট প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য আসবাবপত্র নিজ দেশী উপায়ে যাতে তৈরী করা যায়, তা শিক্ষা করতে গিয়েছেন। তাঁহার ইচ্ছা, তিনি দেশে এসে একটী পটরী ফার্ম খুলবেন এবং তাহাতে শুধু স্ত্রী মজুর রেখে কাজ শিক্ষা দিবেন। এসব মেয়েদের কার্য্যকলাপ দ্বারা কি প্রমাণ হয় না যে, মেয়েরা জ্ঞানরাজ্যে পুরুষের চাইতে কোন অংশে কম নহে ?

শ্রদ্ধেয়া মহাশয়া বলেন "মেয়ে পুরুষ যদি সমান শিক্ষা লাভ করিয়া একই কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন, তবে ঘর-সংসারের অবস্থা কিরূপ হইবে ?"

এ ত বড় আশ্চর্য্যের কথা ! মানুষ কি লেখাপড়া শিখে চাকুরীর জন্য ? মেয়েরা বি-এ পাশ করলেই যে চাকুরী করতে যাবে তার মানে কি ? যাঁহার স্বামীর অবস্থা অতি দীন তিনি চাকুরী করতে বাধ্য হন। অবিবাহিতা যে সব মেয়েদের পিতামাতা বৃদ্ধ, উপায়ের কোন পথ নাই, অথচ ছোট ভাই বোন আছে, তাদের লেখাপড়ার বা ভরণপোষণেরও কোন বন্দোবস্ত নাই ; এ রকম মেয়েরা চাকুরী করতে বাধ্য হন। এ অবস্থায় চাকুরী করা কি বড় দোষের কথা ? এসব মেয়েরা চাকুরী করেও ঘর-সংসার করে থাকেন। তবে গল্প গুজব দ্বারা বৃথা সময় নষ্ট করবার মত সময় তাদের থাকে না। উপন্যাস পড়ে, তাস খেলে বা পরনিন্দা, পরচর্চ্চা করে সময় নষ্ট করবার সুযোগ তাদের হয়ে উঠে না। খেতে পান না বলেই, চাকুরী করে থাকেন। তাতে দশ পাঁচটা চাকর কি করে রাখা যায় ? আজকাল মানুষের আর্থিক অবস্থা যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে সামান্য মোটা অন্নই খেতে পাচ্ছে না, দশটা চাকর রাখবে কি করে ? স্ত্রী চাকুরী করলেও স্বামী পুত্রকে খাইয়ে, তবে নিজ কর্ম্মে যান। একজন লেডী ডাক্তারের পদ যে জগৎ সংসারের সকলে পাবে, তার কোন অর্থ নাই।

এরূপ অবস্থায় মেয়েরা হয় শিক্ষয়িত্রীর না হয় গবার্ণেসের কাজ করে থাকেন।

সাহেবের গাল খাবার চাইতে নিজ আত্মীয়ের গাল খাওয়া কি করে যে ভাল, তা বুঝতে পারি না। গাল খাওয়া কি এদের মামুলী সম্পত্তি (?) যে, যখন গাল খেতেই হবে, তখন সাহেবের গাল খাওয়ার চাইতে না হয় আত্মীয়ের গাল খাওয়াই ভাল। শ্রদ্ধেয়া মহাশয়া কি পল্লীগ্রামের বিধবাদের লাঞ্ছনার কথা জানেন না ? ভ্রাতৃজায়ার নাক-সিটকানী, আর স্ত্রৈণ ভ্রাতার চোক-রাঙ্গানী ঠিক যে পোড়া ঘায়ে লবণ দেবার মত, তা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য কেহ বুঝিতে পারে না। দিনের মধ্যে দুবার লাথি দিয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছে, তবু কি করে, শুধু এক মুঠা অন্নের জন্য আবার সেখানেই যাচ্ছে ; সারা রাত নিজ দুঃখের কথা ভেবে চোখের জলে বালিশ ভিজাচ্ছে।

এসব মেয়েরা যদি নিজ উদরান্নের জন্য একটা স্বাধীন উপায় খুঁজে নেন, অর্থাৎ গৃহ-শিক্ষয়িত্রী গবার্ণেস, এমন কি নার্সের কাজ করেন, তবে কি সমাজপতিদের কাছে বড় একটা অন্যায় করে বসলেন ? সম্প্রতি বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষাশ্রমে মেয়েদের প্রিন্টিং, কম্পোজিটিং, ফটোগ্রাফী প্রভৃতি টেক্‌নিকেল আর্ট শিক্ষা দেবার বন্দোবস্ত হচ্ছে। এসব নিরাশ্রয়া মেয়েরা যদি টেক্‌নিকেল আর্ট শিক্ষা করেন, তবে বোধ হয় সাহেবের গাল বা আত্মীয়ের গাল খেতে হয় না।

তা'ছাড়া এ রকম নিরাশ্রয়ার সংখ্যা আমাদের বাংলা দেশেও বড় কম নয় ! আট নয় বৎসরের শিশু এদেশে বিধবা হয় এবং সেই বৈধব্যকে চিরদিনের জন্য বরণ করতে হয়।

প্রত্যেক ঘরেঘরেই এরকম গলগ্রহ অন্ততঃ দু' চারজন আছেন। সংসারে হয় ত' একজন উপার্জ্জন করে ; কিন্তু সে উপার্জ্জনকারীর স্ত্রী-পুত্র ভিন্ন এরকম গলগ্রহ দু' চারজন থাকেন। সংসারের উন্নতি হয় কি করে পাঠক ? আমাদের

দেশের অর্থাভাবের ইহা একটা প্রধান কারণ নয় কি? একজনের আয়ের উপর দশজন নির্ভর করে। এক একজন লোক এক একটা সংসার এমনি ভাবে ভরণপোষণ করতে গিয়ে পথের ভিখারী সাজে! আমরা কি স্ত্রী কি পুরুষ সবই পরমুখাপেক্ষী বলে আজও পরাধীন আছি। কি করে ইকনমিষ্ট হতে হয় তা জানি না।

শ্রদ্ধেয়া মহাশয়া চরকায় সূতা কাটতে বলেছেন। আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি, শুধু এর উপর নির্ভর করে একটা মানুষের জীবিকা অর্জ্জন করা চলে না! অন্যান্য দেশের মেয়েরা পোষাক তৈরী করে যথেষ্ট টাকা উপার্জ্জন করে থাকেন, আমাদের মেয়েদের জন্য সে রকম কোন স্থায়ী বন্দোবস্ত নাই। থাকলে বোধ হয় কেহ চাকুরী করতে চাইত না।

আসল কথা, সবের মূলেই শিক্ষা। যে শিক্ষা আজকাল আমাদের ছেলে মেয়েরা পাচ্ছে, এটা একরকম বাঘের হাতে গরু চরাণী দেবার মত। ছেলে মেয়ে যদি সাহেব মেম সাজতে চায়, তার জন্য আমি ছেলে মেয়েদের বড় দোষ দিই না। যারা তাদের শিক্ষা দিতে যাবেন, তাঁরা হ্যাটকোট, আর গাউন পেটিকোট পরে সাহেবিয়ানা জাহির করে যাবেন। গুরুমশাই যা করেন, তাই ত সব চাইতে ভাল। কাজেই গুরুমহাশয়ের মত পোষাক পরতে ছেলেরা চাইবে না কেন? তা'ছাড়া সাদা চামড়া না হলে না কি আজকাল শিক্ষা ভাল হয় না। মেয়েদের যে কয়টা কলেজ আছে—তার সবকয়টার লেডী প্রিন্সিপাল মেমসাহেব। এ সব মেমসাহেবরা এ দেশের আচার ব্যবহার বা সভ্যতার বিষয়ে কিছুই জানেন না। অথচ তাঁরাই যাচ্ছেন আমাদের মেয়েদের শিক্ষা দিতে। ফলে এই হয় যে নিজেদের সাহেবিয়ানাই শিক্ষা দিতে থাকেন।

আমাদের ছেলে কি মেয়েকে যে দেশবাসী শিক্ষা দিতে আসুন না, তাঁকে প্রথমে একেবারে ভারতবাসী সাজতে হবে। তার পর যদি শিক্ষা দিতে যান, তবে সে শিক্ষাটা ঠিক হবে। মহামতি পিয়ার্সন, সি, এফ্, এণ্ড্রুজ, মিস্ নবোল (ভগিনী নিবেদিতা) ও মিসেস্ এনি বেসান্ট-এর ন্যায় যে সব বিদেশী ভারতবর্ষকে ভালবাসতে পারবেন, একমাত্র তাঁরাই এ দেশের ছেলেমেয়েদের গুরু সাজতে পারবেন।

উপরিউক্ত জগৎ-পূজ্য নরনারীরা ভারতকে এত ভালবেসেছেন যে, ভারতবাসীও তা পারে নাই। ইঁহাদের প্রত্যেকেই ভারতবাসীর সামাজিক, রাজনৈতিক বা আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে এদেশবাসীর চাইতেও বিশেষ ঘনিষ্ট সূত্রে আবদ্ধ আছেন।

ভগিনী নিবেদিতা যে ভারতকে কত ভালবাসতেন, তা যে তাঁকে দেখেছে সেই মাত্র জানে। বাঙ্গালী যুবককে হ্যাটকোট পরতে দেখে তিনি বড় দুঃখ করতেন। এই প্রসঙ্গে আমার ছেলেবেলার একটী ঘটনা না বলে আর পারছি না। আমার পিতৃদেব তাঁহার বড় ভক্ত ছিলেন। তাই আমার শিক্ষার ভারটা তাঁর হাতে পড়ে। একদিন একেবারে খাঁটি বিলেতী লেডীস্ সু পায়ে দিয়ে তাঁর কাছে গিয়েছি। আমার পোষাক দেখে তিনি এত রাগ করেছিলেন যে, এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত আমার বাবার সঙ্গে কথা বলেন নাই। বাবার অপরাধ, কেন আমাকে মেম তৈরী করছেন। এজন্যই বলি, যাঁরা ভারতকে ভালবাসিতে পারেন না, তাঁদের ভারতে শিক্ষা দিবার কোন অধিকার নাই

এ দেশটা হচ্ছে Simple living and high thinking-এর দেশ। এদেশের গুহা গহ্বরবাসী ঋষিরা গাছের ফল মূল খেয়ে যে সব সত্য আবিষ্কার করে গেছেন, পাশ্চাত্যের ভোগ-বিলাসী পণ্ডিতদের মাথায় তা আজও খেলে নাই। আমাদের দেশের ছেলে মেয়েদের মানুষ করতে হলে ঠিক সেভাবেই করতে হবে। তা না হলে ছেলে হবে সাহেব, আর মেয়ে হবে মেম। এ কথা একেবারে ধ্রুব সত্য।

ভোগ-বিলাসের ভিতর দিয়ে যে শিক্ষা, সে শিক্ষা আমাদের ধাতে সইবে না। ভারতের শিক্ষা ছিল ত্যাগের ভেতর দিয়ে। সে চির-পুরাতন শিক্ষা ভিন্ন আমাদের ছেলে মেয়েদের মানুষ করা যাবে না।

চেয়ার টেবিল বা ডেস্কের স্থানে নলখাগ বা মুক্তা গাছের তৈরী চাটাই স্থান পেলে আমাদের ছেলে-মেয়েরা শিক্ষার সময়, তারা যে ভারতবাসী তা ভুলে যেত না। বোলপুরে যে ছেলেরা গাছতলায় বসে পড়ে, আর মাষ্টার মশাইও সেই গাছের তলায় একেবারে সাদাসিদে ভাবে বসে শিক্ষা দেন, তা নিজ চোখে দেখেছি; এবং তা দেখে

আমার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, ঠিক এভাবে আমাদের ছেলে মেয়েদেরে শিক্ষা যত দিন না দেওয়া যাবে, ততদিন আমাদের স্বাধীন হওয়ার নামে জল-পিণ্ডি দিয়ে বসে থাকাই ভাল।

বিশ্ব-ভারতীর ছেলে-মেয়েরা গাছতলায় বসে গভীর গবেষণাপূর্ণ তত্ত্বের যখন মীমাংসা করেন, তখন এক একবার মনে হয়, সেই অতীতের ভাস্করাচার্য্যের নিকট মৈত্রেয়ীর শিক্ষার; তখন তপোবনে মুনি বালকদের শিক্ষার দৃশ্য কল্পনা-রাজ্যে আঁকতে চেষ্টা করি। তবে মেয়েদের শিক্ষা সেখানেও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয় নাই। বিলাসিতার প্রতি ছেলেদের যতটুকু উদাসীনতা দেখা যায়, মেয়েদের ততটা হয় নাই। ভারত-নারী বলে পরিচয় দিয়ে যদি স্বাধীন হতে হয়, তাহলে বিলেতী নাম-গন্ধ ছেড়ে একেবারে শাঁখা সিদুঁর মাত্র নিতে হবে এবং তার পর ইংরেজী, লাটিন, ফরাসী, জার্ম্মেনী প্রভৃতি যত ভাষা আছে তা শিক্ষা কর, দেখবে, তখন সে সব সাহিত্যের মোহ তোমাদের সাহেব মেম তৈরী করবে না। তখন সে সব বৈদেশিক সাহিত্যের নভেল নাটক পড়ে সে দেশের সভ্যতা বা আচার ব্যবহারকে প্রাধান্য না দিয়ে নিজের ভারতীয় সভ্যতা বা তার আচার ব্যবহারকেই শ্রেষ্ঠ মনে করবে এবং তাকেই প্রাণ দিয়ে ভাল-বাসবে। তখনকার এম-এ বি-এ পাশ করা মেয়েকে যেমন রান্না-ঘরে দেখতে পাবে, তেমনি সভায় সমিতিতেও দেখতে পাবে। অবশ্য এখনকার শিক্ষিতা মেয়েরা যে পাকশাক করেন না, তা মানি না। হতে পারে, কোন কোন মেয়ে পাকশাক না করতে পারেন। কারণ, হাতের পাঁচ আঙ্গুল ত আর সমান নয়? কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে আমি এমন অনেক মেয়ে দেখেছি, তাঁরা বি এ পাশ করে শ্বশুর শ্বাশুড়ী নিয়ে একেবারে বৌ সেজে ঘরকন্না কচ্ছেন। নববিধান সমাজের চট্টগ্রামনিবাসী কোন ভদ্রলোকের পুত্র-বধূকে দেখে আমি সত্যই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম মেয়েটী বি-এ পাশ। তিনি শ্বশুর, শ্বাশুড়ী ননদ, বা দেবরদের আশ্চর্য্য সেবা করেন। স্নেহাতুরা শ্বাশুড়ী বধূকে পাকশাক করে কষ্ট করতে দিতে চান না। তাই একটী ঠাকুর রেখেছিলেন। বৌটী ঠাকুরটীকে জোর করে তাড়িয়ে দিয়ে নিজে ঠাকুরের কাজ করছেন। তাঁর বিশ্বাস, ঠাকুরের পাকে শ্বশুর শ্বাশুড়ীর খাওয়া ভাল হয় না। তাই নিজ হাতে সমস্ত খাবার তৈরী করে দেবর ও ননদদের খাইয়ে তাদের নিজ নিজ স্কুল কলেজে পাঠিয়ে শ্বশুর শ্বাশুড়ীকেও নানা রকম সেবা করে স্বামীর জন্য বসে থাকেন। স্বামীটি ডাক্তার। কাজেই অনেক দিন বাড়ী ফিরতে অনেক দেরী হয়ে যায়। মেয়েটী ততক্ষণ বসে থাকেন। স্বামী এলে তাঁর খাওয়া হলে পর আহার করেন। এ রকম মেয়ে হয় ত বেশী না পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু তার চাইতে উনিশ বিশ মেয়ে ঢের আছেন।

অবশ্য আধুনিক শিক্ষা ছেলেদের যত সর্ব্বনাশ করতে পেরেছে, মেয়েদের ঠিক ততটা করতে পারে নাই।

এই পর্ব্ব এখানেই শেষ করি। বলছিলাম আমাদের প্রকৃত শিক্ষার কথা। প্রকৃত শিক্ষা অর্থাৎ ভোগ-বিলাসিতাশূন্য যে শিক্ষা, সে শিক্ষা আমাদের মেয়েদের দিতে পারলে, আমাদের সব দিক দিয়েই উন্নতি দেখা যেত।

আজ আমাদের অন্নগত প্রাণ কেন? পেট পুরে দু' মুঠো খেতে পাই না। ১০০৲ টাকা বেতনের যুবক স্ত্রীরই ভরণপোষণ করতে পারছেন না। অবশ্য শিক্ষিতা মেয়েদের স্বামীদের কথাই বেশী করে বলছি। তার মূলে আধুনিক মেয়েদের শিক্ষা! অবশ্য তার জন্য আমি মেয়েদের বড় দোষ দেই না। কারণ তারা যে শিক্ষা পেয়ে আসে, তা ছাড়ে কি করে?

আজকাল শিক্ষয়িত্রীরা মেয়েদের পড়ার দিকে যতটা নজর দেন, তাদের পোষাক পরিচ্ছদের দিকে তার দ্বিগুণ দিয়ে থাকেন। মেয়েটীর কাপড় কখানা, সেমিজ, ব্লাউস, পেটীকোট, সাড়ী, জুতা প্রভৃতি কয় দস্ত করে আছে ইত্যাদি। মেয়ের বাবার ক্ষমতা থাক আর না থাক, মেয়েকে বোর্ডিংএ রাখতে হলে, এ সব দশ পনর জোড়া করে দিতেই হবে। এই হল শিক্ষা।

কেন বাপু, আমাদের এত ব্লাউস পেটী-কোটের দরকার কি? পূর্ব্বে যে আমাদের দেশে এ সব ছিল না, তখনকার মেয়েরা কি স্বামীর ঘর করেন নাই? এই সর্ব্বনাশী শিক্ষা না পেলে ত আর, প্রথম পিতামাতা তার পর স্বামীকে প্রাণান্ত হতে হয় না।

আর শুধু শিক্ষিতা মেয়েদের কথাই বলছি কেন।

যেসব মেয়েরা স্কুল কলেজে পড়ছেন না, তাঁদের মধ্যেও বিলাসিতাটা বেজায় বেশী। অবশ্য তাঁদের শিক্ষার অভাবে এ অবস্থা, আর এদের একমাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নামধেয় কুশিক্ষার জন্য এই অবস্থা।

পর্দ্দানসীন মেয়েদের শরীর ভরে অলঙ্কার থাকা চাই। স্বামী দিতে পারুন আর নাই পারুন, অলঙ্কার চাই-ই চাই।

স্বামী স্ত্রীর হাতের তৈরী খাবার খেয়ে তৃপ্ত হন ঠিক। কিন্তু এই তৃপ্তি হতে আজকাল শুধু শিক্ষিত মেয়েদের স্বামী বঞ্চিত নহেন, কলকাতার শতকরা ৯৯টী সচ্ছল পর্দ্দানশীন ঘরের মেয়েরা নিজ হাতে পাকশাক খুব কমই করে থাকেন। ঠাকুর আর ঝির উপর দিয়েই সব চালিয়ে দেন।

তাই বলি, এক সর্ব্বনাশ হচ্ছে শিক্ষার অভাবে, আর হচ্ছে কুশিক্ষার প্রভাবে।

মোট কথা, আধুনিক শিক্ষার একেবারে অস্তিত্ব লোপ না পেলে, স্ত্রীশিক্ষা কি স্ত্রীস্বাধীনতা, বা ছেলেদের শিক্ষা কি দেশের স্বাধীনতা সবই আকাশ-কুসুম।

সতী

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

রাত্রিদিন নিদ্রাহীন
ওই তব ম্লানমুখ স্মৃতিপথে রাখি'
দলিতের ভগবানে বলি ডাকি' ডাকি'
"সতী-গর্ব্ব নাহি তার নিও
মৃত্যু তারে দিও।"

কায়মনে এতদিন
তুমি যে ঢালিয়া দিলে অনিবার ধারে
স্নেহ তব, প্রীতি তব—দিলে আপনারে
কোনো মূল্য নাহি কি তাহার,
কোনো অহঙ্কার?

তোমারি সে গুরুজনে
বলিল যে বারবার তব শুভকামী
আমারে দেখায়ে নিত্য, "ওই তোর স্বামী
এত যারে বেসেছিস্ ভালো;
ওই তোর আলো।"

তাহারা কিভাবে মনে
যে বিমল বরমালা আশাভরা চিতে
রেখেছ নবীন করি হৃদয়-অমৃতে
ব্যগ্র বক্ষে চাপি দুই করে
মোর কণ্ঠ তরে

ভয়ে তাহা হবে শ্লথ?
ব্যথা দিয়া সুধা তার করিবে হরণ,
টুটিবে সোহাগ-ডোর করিয়া পীড়ন
পরিহাসে টলিবে প্রণয়?
উন্মাদ নিশ্চয়!

হইও না অবনত
জানি সখি এতকাল সহিয়াছ কি যে,
আঁখিজলে নিরন্তর গেল বুক ভিজে,
তবু বলি, তবু এই মাগি
পড়িও না ভাঙি।

কোনদিন ফুলহারে
হয়তো বা দুইহাত এক করি দিয়া
পুরাঙ্গনা আমাদের ঘেরিয়া ঘেরিয়া
উলুধ্বনি করিবে উৎসবে
কী দিন সে হবে!

নাহি হয়,—পরপারে
মরমের প্রেমব্রত হইবে সফল,
আর কারো হ'তে হয়, বুকে ধর' বল
অকলঙ্ক রাখিতে জীবন
বারিতে মরণ।

দানের মর্য্যাদা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

১

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীতে ছাদের উপর মাদুরখানা বিছাইয়া অমরনাথ শুইয়া পড়িয়াছিলেন। নিকটে একটা মোমবাতির আলোকে বসিয়া কন্যা উমা একখানা বই পড়িয়া পিতাকে শুনাইতেছিল।

চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে চাঁদের আলোয়,—মোমবাতির দীপ্তি চারিদিকে বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে নাই। মাঝে মাঝে ঝরঝর করিয়া চৈত্রের উতল বাতাস আসিয়া দীপ-শিখাটীকে কাঁপাইয়া নিবাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল। উমা তখন বই ফেলিয়া তাড়াতাড়ি দুই হাতে দীপ-শিখাটীকে বাতাসের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

হঠাৎ এক সময় দুর্দ্দান্ত বাতাস অতর্কিতে আসিয়া আলোটা নিবাইয়া দিয়া গেল। উমা সচকিত হইয়া যখন বইখানা ফেলিয়া দুই হাত বাড়াইল, তখন আলো নিবিয়া গিয়াছে।

উমা বলিল "আলোটা নিবে গেল বাবা, জ্বেলে নিয়ে আসি ?"

অমরনাথ অন্যমনস্ক ভাবে শুইয়া ছিলেন, কন্যার কথায় সচকিত হইয়া মুখ ফিরাইলেন, "নিবে গেল আলোটা ? আর কতখানি বাকি আছে মা ?"

উমা বলিল "বেশী নেই বাবা, দুই পাতা বাকি আছে।"

শ্রান্তকণ্ঠে অমরনাথ বলিলেন "এখন তবে থাক মা, কাল শুনব।"

উমা বইখানা বন্ধ করিয়া বলিল "তবে থাক বাবা, কাল শুনো।"

অমরনাথ চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলেন, উমাও চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

অদূরে প্রবাহিতা গঙ্গা; তাহার ছোট ছোট ঢেউগুলার উপরে চাঁদের আলো পড়িয়া চিকমিক করিয়া জ্বলিতেছিল। ওপারের গাছগুলা মাথায় জ্যোৎস্না মাখিয়া বুকে অন্ধকার ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহারি মাঝে গা লুকাইয়া একটা পাপিয়া অবিরত চীৎকার করিতেছিল—চোখ গেল—চোখ গেল।

নীচে একটা চীৎকার শুনা গেল "দোহাই হুজুর, দোহাই হুজুর, মারবেন না—মারবেন না, সব বলছি।"

সঙ্গে সঙ্গে নায়েবের গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল "ফের চীৎকার করছিস্ বেটা ? দেখছি তোর মুখ না বাঁধলে তুই—"

উমা পিতার পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে বাবা ? মতিকাকা কাকে মারতে হুকুম দিচ্ছেন ?"

অমরনাথ উত্তর করিলেন "আমি বিশেষ কিছু জানিনে মা, তবে বিকেলে মতি বলছিল বটে, রতন জেলে ভারি হাঙ্গামা বাধিয়েছে, তাকে জব্দ করা বিশেষ দরকার; বোধ হচ্ছে তাকেই শাসন করছে।"

উমা বলিল "শাসন কি বাবা ?"

অমরনাথ কন্যার পানে চাহিয়া সস্নেহে একটু হাসিলেন, বলিলেন "শাসন মানে মার আর কি ?"

উমার কোমল হৃদয়খানা ব্যথিত হইয়া উঠিল। হতভাগ্য রতনজেলের কথা ভাবিয়া সে সজল নেত্র পিতার মুখের উপর রাখিয়া বলিল "না মেরে শাসন করা যায় না বাবা ? তবে যে শুনেছি প্রহার করার চেয়ে স্নেহের শাসনের শক্তি বেশী ? তা যদি হয় বাবা, তবে না মেরে মুখের মিষ্টি কথা দিয়ে শাসন করলেই তো ভাল হয়।"

অমরনাথ বলিলেন "তা হয় মা, সে আমিও জানি। কিন্তু এও জেনো, মানুষের মধ্যেও এমন লোক আছে, যারা কোন শাসনই মানতে চায় না। তাদের কাছে স্নেহের বাঁধন নেই, স্নেহের শাসন তারা মানতে পারে না। জগতে দেবতাও আছে মা, আবার শয়তানও আছে। সকলকে একই জিনিস দিয়ে সন্তুষ্ট রাখা যায় না। তাই যে যেমন, তাকে তেমনি দিতে হয়। কেউ বা মিষ্ট স্নেহে ধরা দেয়,

কেউ বা তাতে প্রশ্রয় পেয়ে যায়। সকলকেই দেবতা বলে ভেব না মা, সকলকেই স্নেহের শাসনে বাঁধতে চেয়ো না, আবশ্যক হলে চোখরাঙানীও দিয়ো। এই যে লোকটা, একে আমি এত দিন স্নেহের শাসনেই বশ করতে চেয়েছিলুম। তোমার বাপকে তো তুমি জানো মা,—তোমার বাপ সহজে বিচলিত হয়ে কোনও কাজ করে বসে না এ যখন স্নেহের শাসন মানলে না, তখন আমায় বাধ্য হয়ে একে জোর করে বশে আনতে হবে; আর তাকে শুধু চোখরাঙানী দিলে চলবে না, হাতের কাজটাও চাই।"

উমা নতমুখে বসিয়া রহিল। একটু পরে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল "এতে কি একে বশে আনতে পারবে বাবা?"

অমরনাথ বলিলেন "ভগবান জানেন।"

উমা শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। সে দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দটা পিতার কাণে গেল। তিনি বলিলেন "দুঃখ হচ্ছে মা, কিন্তু এ তোমার সম্পূর্ণ মিথ্যা কষ্ট করা। ছেলেমানুষ তুমি, এখনও লোক চিনতে পার নি, সংসার কেমন তা এখনও জানতে পার নি, তাই একটুতেই ব্যথা পাও। যখন সংসার চিনবে, তখন লোকও চিনবে,—দেখবে, এর মধ্যে দেবতা আর শয়তান পাশাপাশি ভাবেই বাস করছে; যে যার ন্যায়সঙ্গত দাবী, তাই চাচ্ছে। দেবতা যা চায়, তাকে তাই দাও। কিন্তু শয়তান যা চায়, তা যদি তাকে না দাও, সে কিছুতেই তোমার কথা কাণেও তুলবে না, তোমার শত্রুতাচরণ করবেই। একজন লোক—সে আজীবন কাল দুঃখ কষ্টের মধ্যেই বাস করে আসছে,—প্রত্যেক দিন কত মারই যে খাচ্ছে তার ঠিক নেই। কোন দয়ালু ভদ্রলোক তাকে দেখে ভারি কষ্ট পেয়ে নিজের কাছে আনলেন, তাকে ভাল খেতে পরতে দিলেন। কিন্তু সে লোকটির কাছে এ সব কিছুই ভাল লাগল না; কারণ, সে প্রত্যেক দিনই মার গাল সইতে এমন অভ্যস্ত হয়েছিল যে, এক দিন এগুলো না হলে তার মনে হয়, দিনটাই বৃথা গেল। সে পর দিনই পালিয়ে গিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলে,—ভাবলে, বাপরে, ও সব কি আমি সহ্য করতে পারি? সংসারে এমনি শয়তানও আছে মা, যে উপকারকে অপকার বলেই জেনে নেয়,—আর সেইটে নিয়ে একটা ভয়ানক কাণ্ডও করে বসে।"

উমা চুপ করিয়া পিতার পানে চাহিয়া রহিল। ভাবিয়া দেখিল তাঁহার কথাই ঠিক। আর পিতা যাহা বলেন, তাহা কখনই মিথ্যা হইতে পারে না।

অমরনাথ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "সংসারের এই সব দেখে শুনে সময় সময় বড় মনটা খারাপ হয়ে যায়। মনে ভাবি, সব ফেলে একবার ছুটে পালিয়ে যাই। পালিয়ে যেতুম ঠিক—যদি তুই না থাকতিস উমা। তখন কেউ আমায় বেঁধে রাখতে পারত না।"

উমা বলিল "আর উষার বিয়ে বাবা—"

অমরনাথের মুখখানা বিমর্ষ হইয়া গেল। তিনি বলিলেন "ঠিক কথা বলেছিস উমা, উষার বিয়ের একটা ভাবনা আছে মাথায়।"

একটুখানি নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন "কলকাতার পাত্রটী সব রকমেই ভাল; কিন্তু আমার মন সরছে না যে উমা।"

উমা বলিল "কেন বাবা?"

অমরনাথ বলিলেন "কেন তা জিজ্ঞাসা করছিস মা? আমি নিষ্ঠাবান হিন্দু, তাদের সঙ্গে যে আমার কোন মতেই মিলছে না উমা। ছেলেটী বিলাত-ফেরৎ, ডাক্তার হয়েছে, ছেলের বাপ ব্যারিষ্টার। যদিও তারা হিন্দু মতের বলছে, তবু তাদের শিক্ষাটা—"

উমা বলিল "না বাবা, তারা তো ব্রাহ্মও হয় নি বা খৃষ্টানও হয় নি। তারাও বলছে তারা হিন্দু। স্বেচ্ছায় তারা আমাদের ঘরের মেয়ে নেবে, এটা কি ভাল নয়? শিক্ষা তাদের আছে—সে তো ভালই, আমিও তো তাই ভালবাসি বাবা। অশিক্ষিত পরিবারে, অশিক্ষিত ছেলের হাতে মেয়ে দেওয়া কে প্রার্থনা করে! আমার মত যদি নাও বাবা—তবে এই ছেলেটীর সঙ্গেই বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করে ফেল। ছেলের ফটোও তো দেখেছি, চেহারাও বেশ ভাল, আমাদের উষার সঙ্গে বিয়ে হলে বেশ মানাবে।"

অমরনাথ গম্ভীর মুখে বলিলেন "কিন্তু—হবে কি রকম জানিস? জলের মাছকে ডাঙ্গায় তুললে যেমন তার অবস্থা হয়, ঠিক তেমনি। একে সে পল্লীগ্রামের জলবাতাসে মানুষ, লেখাপড়া যা জানে তা তাদের বাড়ীর উপযুক্ত নয়, বাংলা আর সংস্কৃতটাই শিখিয়েছি, ইংরাজি শিখাই নি। এতে সে কলকাতার সেই সব সাহেবঘেঁসা লোকদের

কাছে গিয়ে থাকতে পারবে তো? আজকাল ধর্ম্মটা কেউ সহজে বিসর্জ্জন দেয় না, কিন্তু মতটা নিঃসঙ্কোচে নিজেদের মধ্যে চালিয়ে যায়। তারা হিন্দু, কিন্তু মতে তারা পুরো সাহেব। আমার সেই ভাবনা, আর কিছুই ভাবছি নে।"

উমা একটু নীরব থাকিয়া বলিল "তারা যখন সব জেনে শুনেও নিতে চাচ্ছে, তখন তোমার ভাবনা কেন বাবা? তারা নিজেদের মত ওকে দুদিনে তৈয়ারী করে নেবে।"

অমরনাথ শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন "সে ভাবনাও বড় কম ভেব না উমা। যাকে আমি নীতি, সংযম শিক্ষা দিয়ে দেবীরূপে গড়ে তুলেছি, সে যদি সে সব বিসর্জ্জন দিয়ে অসংযমী, দুর্নীতিপরায়ণ হয়, সেটা আমার বুকে কি রকম কঠিন ভাবেই বাজবে। আমার মেয়েকে আমি শান্ত, সংযত দেখতে চাই, তাকে বিলাসিনী দেখতে চাইনে; দেব দ্বিজে ভক্তিমতী দেখতে চাই, ঘৃণায় সঙ্কুচিতা হয়ে সরে যাওয়া দেখতে চাইনে। আমি যে অমূল্য জিনিসটী তৈরী করেছি, তাকে আবার নিজেরই হাতে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ফেলব উমা?"

উমা বলিল "কিন্তু, এও তো হতে পারে বাবা—তোমার মেয়ে সে সংসারে গিয়ে ধর্ম্মে, জ্ঞানে সে সংসার উজ্জ্বল করে তুলবে, অন্ধ বিজাতীয়ভাবাপন্নদের আবার স্বধর্ম্মে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনবে। এ রকম কি হতে পারে না বাবা?"

অমরনাথ বলিলেন "জগতে কি না হতে পারে মা? কিন্তু কথা হচ্ছে, অনেকে আবার নিজেকে হারিয়েও ফেলে। অনেকগুলো প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র একটী মেয়ের শক্তি কিছুতেই দাঁড়াতে পারে না,—বিশেষ সে মেয়েটী আবার স্ত্রী রূপেই যাবে। যাই হোক, আমি এখানেই ঠিক করি। ভগবান যা করবেন তাই হবে—তিনি করাচ্ছেন, আমি উপলক্ষ হয়ে করে যাচ্ছি মাত্র। তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, তিনি এই ক্ষুদ্র বালিকাটীকে দিয়েই নিজের কাজ করিয়ে নেবেন।"

নীচে বালিকা ঊষার ডাক শুনা গেল "দিদি—"

"যাই—"উমা উঠিল।

অমরনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "ঊষা বুঝি জল খেতে ডাকছে?"

উমা মুখ ফিরাইয়া উত্তর করিল "আজ একাদশী বাবা।"

"একাদশী?"

পিতা মুখখানা বালিসের উপর রাখিয়া নীরব হইয়া গেলেন। উমা নীচে চলিয়া গেল।

২

অনেক দিনের কথা সে—যেদিন অমরনাথের স্ত্রী—উমার মা অভয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

তখন উমা ছিল পাঁচ বৎসরের, ঊষা দুই বৎসরের। সংসারে অমরনাথের পিসীমা ছিলেন, তিনিই এই শিশু মেয়ে দুটির ভার লইলেন।

কাজটা বড় কম ছিল না। তিনি বৃদ্ধা, যে সময়ে লোকে ভগবানের নাম গ্রহণ করে, সংসারের দেনা-পাওনা অনেকটা চুকাইয়া ফেলিয়া একটু তফাতে সরিয়া দাঁড়ায়, সেই সময়ে তাঁহার ঘাড়ে দুইটী শিশুর ভার পড়িল। হরিনামের মালা ও ঝুলিটী দেয়ালের হুকে ঝুলাইয়া রাখিয়া তিনি দুইটীকে দুই কোলে তুলিয়া লইলেন।

অবশ্য সে চিরকালের জন্যই নহে। কারণ দুই দিন যাইতে না যাইতেই তিনি অমরনাথকে বিবাহের জন্য ধরিয়া বসিলেন। গম্ভীর মুখে অমরনাথ মাথা নাড়িলেন।

বগলা ঠাকুরাণী ব্যাকুল হইয়া বলিলেন "বিয়ে করবি নে, সে আবার কি কথা রে? কিসের বয়েস তোর, তোর বয়েসে যে অনেকে প্রথম বিয়ে করে। পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়েস, এখনি তুই সংসারের সঙ্গে দেনা-পাওনা চুকাতে চাস না কি?"

হাসিয়া অমরনাথ বলিলেন "তাও কি হতে পারে পিসীমা? দেনা-পাওনা চুকানো আমার মত লোকের কাজ নয়। চুকাতে পারতুম—যদি মেয়ে দুটো না থাকত। ও দুটো যখন আছে, তখন তফাতে গেলেও চলবে না, ওদেরই ভার নিতে হবে।"

বগলা দেবী বলিলেন "তবু বিয়ে করবি নে? ছোট মেয়ে দুটো—ওদের দেখতেও তো একটা লোকের দরকার। তুই তো বাইরে বাইরেই থাকিস,—কে এদের দেখা-শোনা করবে বল দেখি?"

অমরনাথ বলিলেন "তুমি তো আছ পিসীমা?"

রাগ করিয়া হাতখানা নাড়িয়া বগলাদেবী বলিলেন "তাই বলে চিরকালই তোর সংসারে আমি পড়ে থাকি

আর কি ? আমার নিজের তো আর কাজকর্ম্ম কিছু নেই,—ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ভাসিয়ে দিয়ে ছেলে মানুষ করি। না, তুই বিয়ে কর বা নাই কর, আমার তাতে কি ? আমি ঠিক বলছি কিন্তু অমর, এই আসছে পুজোর পরেই আমি কাশী চলে যাব। কোথায় এখন জপ তপ করব, তা না, সংসার আর সংসার। সংসার আমার সঙ্গে যাবে, না ? কক্ষনো আমি আর তোর কোনও কথা শুনব না, আমি যাবই পুজোর পরে, তা জেনে রাখিস।"

অমরনাথ হাসিয়া বলিলেন "তা বেশ তো পিসীমা, যেয়ো তুমি পুজোর পরে, আমি বাধা দেব না তোমাকে। পুজোর তো এখনও দেরী আছে, এই তো মাঘ মাস সবে পড়েছে। এ কয়টা মাস থাকো, মেয়ে দুটোকে একটু দেখো শোনো, বেশী ভার তোমায় নিতে হবে না।"

রাগ ভরেই পিসীমা বলিলেন "দায় পড়েছে তোর মেয়েদের দেখতে আমার। ইচ্ছে হয় নিজে দেখা শোনা কর, না হয় না কর, আমার বয়ে গেল তাতে।"

অমরনাথ নিশ্চিন্ত ভাবেই বাহিরে চলিয়া গেলেন; কারণ তিনি বগলাদেবীকে বেশই চিনিতেন রাগই করুন, দুঃখই করুন, যে কাজ তাঁহার হাতে পড়িয়াছে, তাহা তিনি পরিপাটীরূপে শেষ করিবেনই। মেয়ে দুটিকে তিনি প্রাণের অধিক ভালবাসিতেন, তাহা অমরনাথ বেশ জানিতেন। ইহাদের ছাড়িয়া পিসীমা কোথাও আর নড়িতে পারিবেন না, সে বিষয়ে অমরনাথ নিশ্চিন্ত ছিলেন।

বগলাদেবী বাহিরে বাহিরে খুবই আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেন, মায়ার পুতলী মেয়ে দুইটার জন্যই যে তিনি রহিয়া গিয়াছেন, তাহাদের যে তিনি ভালবাসেন, সে কথাটা কখনই মুখে আনিতেন না। তিনি লোকের কাছে আস্ফালন করিতেন, আমি কি ওদের জন্যে পড়ে আছি ? ওদের আমি দুচোখে দেখতে পারিনে। আছি কেবল সংসারটা ভেসে যাবে—তাই। এইবার অমরের একটা বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে কাশী যাত্রা করব। বিশ্বনাথের চরণে এখন ঠাঁইটা পেলে হয়, আর দেশে ফিরছিনে।"

এক পূজার জায়গায় তিন চার পূজা চলিয়া গেল, বগলাদেবীর পূজা আর শেষ হইতে চায় না। পূজা আসার মাসখানেক পূর্ব্ব হইতে তিনি ভারী ব্যস্ত হইয়া পড়েন,—কি করিয়া যে পিতৃপুরুষের পূজাটা শেষ করিতে পারিবেন, এই ভাবনায় তাঁহার আহার নিদ্রা একেবারেই দূর হইয়া যায়। পূজা শেষে মাসখানেক লাগে পায়ের হাতের ব্যথা সারিতে, সর্দ্দি সারিতে। তাহার পর হঠাৎ আবার তাঁহার মনে পড়িয়া যায় কাশীর কথা,—বিশ্বেশ্বরের চরণে লয় হইবার ইচ্ছাটা মনে ভাসিয়া উঠে।

কিন্তু কিছুতেই তিনি অমরনাথের আর বিবাহ দিতে সমর্থ হইলেন না। অমরনাথের বড় কঠোর পণ, সে পণ ভাঙ্গা পিসীমার ন্যায় বৃদ্ধার কাজ নহে।

বাহিরেরও অনেক আকর্ষণ অমরনাথ অনুভব করিতেছিলেন। বিদ্বান বিপত্নীক জমীদারকে জামাতারূপে পাইবার জন্য অনেক পিতামাতাই ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। অনেক সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ের ফটোও আসিয়া অমরনাথের টেবিলে স্তূপীকৃত হইয়াছিল; কিন্তু অমরনাথ অটল। তিনি কিছুতেই বিবাহ করিবেন না বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা গৃহের তাড়না ও বাহিরের আকর্ষণ কিছুতেই টলাইতে পারিল না।

মেয়েদের শিক্ষার ভার তিনি নিজের হাতে তুলিয়া লইলেন। জ্যেষ্ঠা উমা যথার্থই উমা। সে যেমন সুন্দরী, তেমনি বুদ্ধিমতী। তাহার মনটী যেমন সরল, তেমনি উদার। এত কোমল প্রকৃতির মেয়ে ছিল সে যে সামান্য কিছু দুঃখের কারণ দেখিয়া লোকে যেখানে কেবল একটা আহা বলিত, সেখানে সে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিত। সংসারের কুটিলতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, সংসারের মোহ তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই।

অষ্টমবর্ষীয়া কন্যার বিবাহ দিয়া অমরনাথ গৌরীদানের ফললাভ করিয়াছিলেন। ছেলেটী তখন মাত্র চতুর্দ্দশবর্ষীয়, থার্ডক্লাসে পড়িত। গরীবের ছেলে, তাহাকে গৃহে রাখিতে পারিবেন বলিয়া অমরনাথ তাহাকেই কন্যা দান করেন। গোপীনাথ সর্ব্বাংশে উমার যোগ্য স্বামীই ছিল। তাহার সৌন্দর্য্য, জ্ঞান, বুদ্ধিবৃত্তি, অমরনাথ সবগুলিই পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, বিবাহের পর এক বৎসর গত না হইতেই উমা স্বামী হারাইল। যে সময় তাহার খেলিবার বয়স, সেই সময়েই সে সর্ব্বস্ব হারাইয়া বাঙ্গালার বিধবা শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িল।

বড় আদরের কন্যা উমার এই শোচনীয় অদৃষ্ট দেখিয়া

অমরনাথ শয্যা লইলেন। অনেক কষ্টে, অনেক চিকিৎসায় তিনি ভাল হইলেন, কিন্তু মনের সুখশান্তি তাঁহার একেবারেই ঘুচিয়া গেল।

প্রথমটায় উমা কিছুই বুঝিতে পারে নাই। বিবাহ যে কি—এবং বিধবা হওয়াই বা কি, তাহা সে জানিত না। বাড়ীতে আমিষ বিভাগ তাহার জননীর পরলোকগতা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়া গিয়াছিল। অমরনাথ নিরামিষ-ভোজী ছিলেন. মেয়ে দুটীও জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত নিরামিষ-ভোজীই ছিল। পূর্ব্বেও যেমন ছিল, এখনও আহারাদির ব্যবস্থা তেমনিই রহিল। অলঙ্কার বা ভাল কাপড় কিছুই তাহাকে ত্যাগ করিতে হয় নাই। সুতরাং বিধবা হওয়া যে কি, তাহা জানিবার উপায় না থাকায় উমা কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে আগেও যেমন হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইত, এখনও তেমনি বেড়াইতে লাগিল।

কিন্তু জ্ঞান হইল কিছুদিন পরে; কিছুদিন পরে সে নিজের অবস্থা বেশ বুঝিতে পারিল। উমা দেহ অলঙ্কার-শূন্য করিল, ঠাকুর-মায়ের থান লইয়া পরিল। বালিকা কন্যা যখন এই বেশে শোকার্ত্ত পিতার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন দৃঢ়চিত্ত অমরনাথও নিজের দৃঢ়তা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন "আমার সামনে এ বেশ নিয়ে আসিস নে মা, আমি তোর এ বেশ দেখতে পারি নে।"

কিন্তু তাহাই আবার দুই দিনে সহিয়া গেল। তাহার সহিত কথা কহিতে অমরনাথ ভুলিয়া যাইতেন সে বিধবা; যে মুহূর্ত্তে কথাটা তাঁহার মনে পড়িয়া যাইত, আর্ত্তভাবেই তিনি বুকখানা চাপিয়া ধরিতেন।

কেন অত তাড়াতাড়ি তাহার বিবাহ দিতে গেলেন, আট বছর বয়সেই সে তাহার সব অধিকার হারাইয়া ফেলিল। যদি আধুনিক মতে বিবাহ দিতেন,—অবশ্য তাহার ললাটের বৈধব্য লেখা কিছুতেই খণ্ডন করিতে পারিতেন না, সে বিধবা হইতই, তবু—তবু স্নেহময় পিতার বুকে একটু সান্ত্বনা থাকিত। আবার ভাবিতেন, তাহার ললাট-লিপিতে অষ্টম বৎসরে পরিণীতা এবং নবম বৎসরে বিধবা হওয়া আছে, তিনি তাহা খণ্ডন করিতেন কিরূপে? যে যাহার অদৃষ্টলিপি সঙ্গে করিয়াই আনিয়া থাকে, তাহার জন্য মানুষ দায়ী হইতে পারে না। এই কথাটী ভাবিয়াই তিনি তাঁহার অসীম দুঃখের মধ্যে একটু সান্ত্বনা লাভ করিতেন।

আর একটা কথাও তাঁহার মনের মধ্যে মাঝে মাঝে উঁকি দিত, কিছু সাহস করিয়া সে কথাটাকে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। সে কথাটা মনে উঠিবামাত্র তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধি সেটাকে তখনি চাপা দিয়া ফেলিত।

আবার কি উমার বিবাহ দেওয়া যায় না? সে নবম বৎসরেই বিধবা. স্বামীর কি জানে, কি বুঝে সে? সে বয়সে মেয়েরা পুতুল খেলিয়াই থাকে; পুতুল খেলার মতই, উমার বিবাহ হইয়াছে; সে পুতুলটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আর বিবাহ দেওয়া যাইবে না কেন? সমাজ ঘৃণা করিবে, কিন্তু অধঃপাতে যাক সমাজ। সমাজের তিনি ঢের উপকার করিয়াছেন, সেই উপকারের পরিবর্ত্তে সে যদি অপকার করে, করুক, তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই। তিনি আত্ম-সুখ বিসর্জ্জন দিয়াছেন, বালিকা উমার সুখহন্তা হইবেন না। তিনি স্নেহময় পিতা, পিতার কাজই করিয়া যাইবেন।

কিন্তু উষা আছে। তাহাকে হিন্দুগৃহে দিতে হইবে, তাহার পরে।

উষাকে তিনি শীঘ্র বিবাহ দিতে সম্মত ছিলেন না। একজনের খুব কম বয়সে বিবাহ দিয়া তাহার ফল পাইয়াছেন, কি জানি উষার অদৃষ্টেও যদি তাই ঘটিয়া যায়। যতদিন রাখিতে পারা যায়—থাক না কেন?

উষা চতুর্দ্দশ উত্তীর্ণ হইয়া পঞ্চদশ বৎসরে পড়িয়াছে, বগলা দেবীর চোখে ঘুম ছিল না, আহার ছিল না। উমাও এ বিষয়ে পিতার মন আকৃষ্ট করিত;—বাস্তবিকই উষা বড় হইয়া উঠিয়াছে, আর তাহার বিবাহ না দিয়া রাখা ভাল দেখায় না।

অমরনাথ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "মেয়ের বিয়ে দিতে আর আমার ইচ্ছে নেই পিসীমা। উষা বেশ আছে; নিজের মনে খেলছে বেড়াচ্ছে সকলের সঙ্গে মিশতে পারছে। বিয়ে হলেই হয় তো বিধবা হয়ে যাবে, তখন আমি আবার তাকে দেখব কি করে? নিজের হাতে উমার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়েছি, উষাকেও এ বেশে সাজাতে আর ইচ্ছে নেই আমার।"

বগলা দেবী বলিয়া উঠিলেন "বালাই ষাট, উষার

কেন উমার মত অদৃষ্ট হতে যাবে রে অমর? একজনের হলেই কি সকলের হতে হয়? কি যে সব অলক্ষুণে কথা বলিস, কিছু ঠিক নেই তার। ও সব কথা মুখে আনিস নে বলছি, মেয়ের বিয়ের যোগাড় দেখ।”

উমা বলিল “আমায় তুমি অমন করে কেন দেখ বাবা? আর আমার অদৃষ্ট-বশে আমি বিধবা হয়েছি বলে উষাও যে হবে তেমন কোনও কথা নেই। আমার দুঃখ কিসের? আমি বেশ রয়েছি তো। তোমরা বল আমি বিধবা হয়েছি আমার বড্ড দুঃখ, কিন্তু আমি ভাবছি আমার মোটে বিয়েই হয় নি, আমি ছোট বেলা হতে এখনও তোমার সেই উমাই রয়েছি। আমাকে তুমি বিধবা ভেব না। উষার বিয়ের চেষ্টা কর, নইলে লোকে ভারি নিন্দে করবে।”

অমরনাথ কন্যার কথা শুনিয়া মুখখানা ফিরাইয়া গোপনে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। (ক্রমশঃ)

বিবিধ-প্রসঙ্গ

স্বপ্নতত্ত্ব

শ্রীসরসীলাল সরকার এম-এ এল্-এম-এস্

পূর্ব্বে ডাঃ ফ্রয়েডের একটি স্বপ্ন-বিশ্লেষণের উল্লেখ করিয়া নিজের একটি স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছি। এইবার আমার অন্য একটি স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

এই স্বপ্ন আমি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে দেখিয়াছিলাম। কোন-কোনও ব্যক্তি-বিশেষের নিকটে তিনি যে তাঁহার গুণানুযায়ী popular হইতে পারেন নাই, তাহার কিছু কারণ বোধ হয় আমার এই স্বপ্নের ভিতর পাওয়া যাইতে পারে। স্বপ্নটি এইরূপ—বাড়ীর সম্মুখে যে ফুলবাগান আছে, সেখানে শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার গায়ে গাউনের মত আলখেল্লা। সঙ্গে একটি ব্যাগ। সেই বাগানে উদ্ভিদাদি পরীক্ষা করিবার জন্য একটি ছোট মাইক্রস্কোপ্ এবং ছোট ছোট ছুরি কাঁচি আছে। তিনি এক একটি ফুল ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন ও বলিতেছেন যে, এইটি Calyx (সবুজ পাপড়ি) এইটি Corrolla (রঙ্গীন পাপড়ি)।

এই স্বপ্ন-বিশ্লেষণের জন্য প্রথমতঃ ফুলবাগান সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। আমি যখন এক জায়গায় সিভিল সার্জ্জন হইয়া যাই, তখন একটি সুন্দর সাহেবী ফ্যাসানের সরকারি বাড়ী অবস্থান করিবার জন্য পাই। এই বাড়ীর সম্মুখেই একটি সুন্দর জাফরির বেড়া দিয়া ঘেরা ফুলবাগান ছিল। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী সিভিল সার্জ্জন আমাকে বলিয়া গেলেন—“দেখুন, এই বাড়ীর পাশেই সাহেবদের খেলিবার ক্লাব। এইখানে সাহেব মেমসাহেবরা বৈকালে টেনিস্ খেলে। সেইজন্য এই বাগানটি বেশ পরিপাটি ও সুন্দর করিয়া রাখিবেন। তাহা না হইলে বাঙ্গালীদের রুচির অখ্যাতি হইতে পারে। আমরা বাঙ্গালীরা এই নতুন সিভিল সার্জ্জনের পদ প্রাপ্ত হইতেছি। যদি এই সব বিষয়ে পারিপাট্যের অভাব দেখাই, তাহা হইলে সাহেবদের ধারণা হইতে পারে যে, আমরা এরূপ বড় পদের অযোগ্য। বাগান পরিষ্কার রাখিবার জন্য আমার পনরো টাকা মাহিয়ানার একজন মালী আছে; আপনিও তাহাকে সেই কাজের জন্য নিযুক্ত রাখিবেন।”

অবশ্য তাঁহার কথায় আমাকে সম্মত হইতে হইল। কিন্তু মাসে মাসে যখন পনরো টাকা মালীকে গুণিয়া দিতে হইত, তখন টাকাগুলি অযথা খরচ হইতেছে বলিয়া হয় ত মনের মধ্যে দুঃখ হইত।

এই বাগানটি বিলাতী ফুলে ভরা ছিল। গৃহিণীর নিকট শুনিলাম, এ ফুলে দেবপূজা হয় না। তখন এই ফুল তুলিয়া, ছিঁড়িয়া, মাইক্রস্কোপে পরীক্ষা করিয়া, ফুলের বিভিন্ন অংশ দেখিয়া, সময় কাটাইতাম। হয় ত এই পরীক্ষা করিয়া দেখার মধ্যে আমার কার্য্যের একটা সংজ্ঞা (symbol) জ্ঞাপন করিত। কারণ, ফুলগুলি যখন বিলাতী, তখন ইহা ছিঁড়িবার এবং বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবারই যোগ্য। যদি ফুলগুলি দেশী হইত, তাহা হইলে হয় ত এরূপ হইত না। এই প্রস্ফুটিত ফুলগুলির দিকে তাকাইয়া হয় ত কখনও মনের মধ্যে কবিতার ভাব উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু ভিতরে কবিতার রস মোটেই না থাকায় চেষ্টাগুলি একেবারে নিরর্থক হইত।

স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিলাম, স্বপ্নে যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখিয়াছি, তাহা আমার পুত্রকেই ইঙ্গিত করিতেছে। কারণ, আমার পুত্রকে রবিবাবুর শান্তি-নিকেতন আশ্রমে পড়িতে দিয়াছি। সেবার সে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবে। আমার ইচ্ছা ছিল এই যে, সে এই পরীক্ষায় পাশ হইলে, যাহাতে ভবিষ্যতে সে মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়িতে পারে, সেইজন্য তাহাকে I. Sc. ক্লাসে ভর্ত্তি করিয়া দিব; এবং যাহাতে সে I Sc. classএ Botany, Physiology প্রভৃতি বিষয় পড়ে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিব। যখন তাহাকে বোলপুরে ভর্ত্তি

করিয়া দিই, তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বোলপুর সম্বন্ধে আমার নিকট গল্প করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—তিনি বোলপুরের ব্রহ্মবিদ্যালয় যখন প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তাঁহার এই ইচ্ছা ছিল যে, যাহাতে বালকগণ physically এবং intellectually strong হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে; এবং এইজন্য তিনি Hard trainingএর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। বোলপুর তাঁহার পূজনীয় পিতৃদেবের সাধনার স্থান ছিল। তিনিও সেখানে নিজের আধ্যাত্মিক সাধনার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

তিনি তাহার পর ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলেন যে, আধ্যাত্মিক বিকাশের দ্বারাই ছাত্রজীবনের যথার্থ বিকাশ হয়—এইরূপ Hard trainingএর দিকে চেষ্টা করিয়া বিশেষ লাভ নাই। তিনি ছোট ছোট ছাত্রগণকে উপদেশ দিবার সময়েও তাঁহার আধ্যাত্মিকতার কথা খর্ব্ব করিয়া বলেন না। তাঁহার অনেক কথা, যাহা বোলপুরের বাহিরের লোকেরা বুঝিতে পারে না—এখানকার ছোট ছোট ছাত্ররা তাহা বুঝিতে পারে। সর্ব্বশেষে তিনি বলিয়াছিলেন—বোলপুরের ছাত্রেরা এখান হইতে যাহা লইয়া যায়, সাধারণতঃ তাহা অন্য স্থানে পায় না। এই শেষ কথাটা আমার মনের উপর গভীর ভাবে দাগ কাটিয়াছিল। স্বপ্নে আমার পুত্রকে রবিঠাকুর রূপে দেখিতে পাইয়াছিলাম তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, আমার পুত্র বোলপুর হইতে রবিঠাকুর যাহা বলিয়াছেন—তাহা লইয়াছে,—অর্থাৎ রবিঠাকুরের স্বরূপ যেন তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে।

কিন্তু স্বপ্নের সংজ্ঞার মধ্যে একাধিক ভাব আছে। স্বপ্নে যে রবিঠাকুরের মূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাতে রবিঠাকুরের নিজের সম্বন্ধে আমার যে মনোভাব, তাহাও ঐ স্বপ্নের সংজ্ঞার মধ্যে প্রস্ফুটিত আছে।

আচার্য্য ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় একবার খুলনায় যান। ছেলেদের স্কুলের পারিতোষিক বিতরণের সভায় প্রেসিডেণ্ট হইতে খুব খুসী হন জানিয়া, একটি স্কুলের পারিতোষিক বিতরণের উদ্যোগ করিয়া, তাঁহাকে সেই সভায় প্রেসিডেণ্ট করা হয়। ডাঃ রায় ছেলেদের পুরস্কার বিতরণ করিয়া, ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা করিতে সুরু করিলেন—"হে ছাত্রগণ, তোমাদের মধ্যে যাহারা পুরস্কার পাইয়াছ, তাহারা সুখী হইয়াছ; কিন্তু যাহারা পাও নাই, তাহাদেরও অসুখী হইবার কারণ নাই। কারণ, যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, বা বিশ্ববিদ্যালয়কে পদাঘাত করিয়াছে, তাহাদের মধ্যেও অনেকে বড়লোক হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ—Sir R N. Mukherjee কিংবা Contractor, J. C Banerji. ইঁহারা শিবপুর-ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে বিশেষ যশের সহিত পাশ করিয়া বাহির হইতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহারা যেমন অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন, সেরূপ অর্থ, যাঁহারা যশের সহিত পাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। কেশবচন্দ্র এনট্রান্স পরীক্ষায় ফেল করেন—কিন্তু তাঁহার মত বক্তা—যাহারা ভাল ভাবে পাশ করিয়া বাহির হইয়াছে—তাহাদের মধ্যে কেহ কি? এই শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলাতে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে যদি ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়া আসিতেন—তাহা হইলেও কি তিনি বেশী বড়লোক হইতে পারিতেন?"

ডাঃ রায়ের বক্তৃতার এই অংশ শুনিয়াই আমার বক্তৃতার প্রতি মনোযোগ হঠাৎ যেন বাধা প্রাপ্ত হইল। আমি তখন চক্ষু মুদিত করিয়া, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যারিষ্টারের গাউনে কিরূপ দেখান তাহার কল্পনা করিয়া, মানসিক চিত্রাঙ্কনে মনোযোগ দিলাম। বোধ হয় ডাঃ রায়ের বক্তৃতার এই অংশই আমার মনের গভীর স্তরে ঘা দিয়া, মনের ভিতর এই প্রশ্নের উদয় করিয়াছে যে, রবিঠাকুর যেরূপ হইয়াছেন, তাহা না হইয়া যদি অন্য কিছু হইতেন—তাহা হইলে কিরূপ হইত? স্বপ্নে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার অনেকটা চেষ্টা আছে। আমার ধারণা, পাশ্চাত্য জগতে গেটের মত সাহিত্যিক আর জন্মায় নাই। কবি গেটের প্রতি আমার শ্রদ্ধার একটি কারণ এই যে, তিনি যেমন কবি ছিলেন, তাঁহার তেমনি বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি ছিল। দেহতত্ত্ব (Anatomy) শাস্ত্রে গেটেই প্রথমে আবিষ্কার করেন যে, আমাদের মাথার হাড়গুলি আমাদের মেরুদণ্ডের হাড়গুলির পরিবর্ত্তন হইয়া হইয়াছে। উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের মধ্যে গেটেই প্রথমে আবিষ্কার করেন যে, ফুলের Calyx, Corrolia, এইগুলি বৃক্ষের পত্রের রূপান্তর দ্বারাই হইয়াছে। স্বপ্নে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে Calyx, Corrolia লইয়া আলোচনা করিতেছেন—তাহাতে মনে হয় যে, যেন আমি আমার ভিতরের মনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি এই 'গেটেত্ব' আরোপ করিতেছি। কিন্তু ঐ ফুলের পাপড়ি লইয়া বিশ্লেষণ করিবার যে চিত্র দেখিয়াছি, তাহাতে যে তাঁহার উপর শুধু 'গেটেত্ব' আরোপ আছে—তাহা নয়, রবিঠাকুর তাঁহার গদ্য ও কবিতার মধ্যে biological philosophy অনেকখানি আলোচনা করিয়াছেন—যেগুলি যে আমাকে গভীর ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল—তাহারও ভাব আছে। দৃষ্টান্ত স্থলে এই ফুল সম্বন্ধেই তিনি যাহা বলিয়াছেন—তাঁহার লেখা হইতে তাহা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

"ফুলে দেখা যায় তার পাপড়ির বিস্তার, তার বর্ণের ছটা; ফলে দেখ্‌তে পাই তার বাইরের সঙ্কোচ, তার পাপড়ির খসে পড়া, অন্তরের মধ্যে তার বীজের বিকাশ। এই বীজের মধ্যেই ভাবী জীবন নিগূঢ় কেন্দ্রীভূত।

তেমনি মানুষ প্রবৃত্তির রাজ্যে বাহিরে আপন রঙ ফলিয়েচে, বাইরে যতদূর পারে আপনাকে সমারোহে বিস্তীর্ণ করচে। অন্তরে তার সমস্ত উল্টে গেল। বাইরের যে আয়োজন সবচেয়ে বেশী করে চোখে পড়েছিল, সে সবই পাপড়ির মত খসে পড়ল। সেখানে সমস্ত বিক্ষিপ্ত শক্তি সংক্ষিপ্ত হল ভাবী জীবনের একটি বীজের উপর। যেমন তাই হল, অমনি অন্তর রসে ভরে উঠল।"

রবিঠাকুর সম্বন্ধে আমার ভিতরের গভীর মনে যে সমালোচনার ভাব চলিতেছে—তাহাতে বুঝা যায় যে ইহা আমার নিজের অহঙ্কারের সঙ্গে জড়িত। অর্থাৎ আমি নিজের অহঙ্কারের ভিতর দিয়া রবি-

ঠাকুরকে দেখিতেছি,—রবিঠাকুর ঠিক যে কিরূপ, তাহা আমি বুঝিতে ও জানিতে চেষ্টা করিতেছি না। আমি নিজে ফুল ছিঁড়িয়া Microscopeএ দেখিতাম—রবিঠাকুরকে দিয়াও তাহাই করিতেছি। আমার নিজের মধ্যে বৈজ্ঞানিকতার গর্ব্ব আছে, গেটের স্বরূপত্ব রবিঠাকুরের উপর আরোপ করিয়া তাঁহাকেও সেইরূপ করিতেছি—অর্থাৎ ঠিক এইরূপ না হইলে আর রবিঠাকুরকে ভাল লাগে না। আমার বোধ হয় যে দেশের মধ্যে রবিঠাকুরসম্বন্ধে মাঝে মাঝে যে বিরূপতা দেখা যায়—তাহাও এইরূপ বিকারসম্ভূত। রবিঠাকুরকে আমাদের নিজের মনের মধ্যে ধরিতে পারি না বলিয়াই তাঁহার উপর বিরক্তি, ক্রোধ এবং বিদ্বেষের ভাব অনেক স্থলে উৎপন্ন হয়।

এইবার আমি অন্যের কয়েকটি স্বপ্নের বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইব।

(১) একজন ভদ্রলোক zoological departmentএ কোনও একটি চাকুরিতে নিযুক্ত ছিলেন। পরে মৎস্য বিভাগের একটি চাকুরিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।—তিনি একটি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন; তাহা এই—যেন একটি বিড়াল আসিয়া তাঁহার ঘরের মাছগুলি খাইয়া ফেলিতেছে। তিনি বৈজ্ঞানিক, বুদ্ধিমান লোক,—নিজেই এই স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। যেদিন রাত্রে তিনি এই স্বপ্ন দেখেন, তাহার পূর্ব্বদিন তিনি দেখিয়াছিলেন যে একটি বাঘ, একটি নীল গাই এবং একটি নূতন রকমের গর্দ্দভকে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় লইয়া আসা হইয়াছে। যেদিন স্বপ্ন দেখেন—সেইদিন মাছ যাহাতে পচিয়া না যায় তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য Smoking process অর্থাৎ ধোঁয়া দিয়া রক্ষা করিবার পরীক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার চাপরাশিকে এই কাজের দিকে লক্ষ্য রাখিতে বলিয়া অন্য কাজে চলিয়া যান। কিন্তু চাপরাশির ত্রুটিতে মাছগুলি অতিরিক্ত তাপে পুড়িয়া গিয়া পরীক্ষা নিষ্ফল হইয়া যায়। তাহাতে তিনি অত্যন্ত মনঃক্ষুন্ন হন। স্বপ্নে যে বিড়াল দেখিয়াছিলেন—তাহার ইংরাজি হইতেছে Cat। Cat কথাটি এই তিনটি কথার আদ্য অক্ষর লইয়া নির্ম্মিত হইয়াছে—Cow, Ass, Tiger। Cow—তিনি যে নীলগরু দেখিয়াছিলেন তাহাকে, Ass সেই গর্দ্দভটিকে এবং Tiger সেই বাঘটিকে ইঙ্গিত করিতেছে। তিনি যখন zoological departmentএ ছিলেন, তখন কিছুদিন একটি সূচীপত্র (index) তৈয়ারী করিয়াছিলেন। তাহাতে পশু, কীট, পতঙ্গাদির নামের আদ্য অক্ষর-গুলির প্রতি মনোনিবেশ করিয়া সাজাইতে হইত। স্বপ্নের মধ্যেও এই ভাব সংক্রামিত হইয়াছিল। স্বপ্নে বিড়াল মাছ খাইয়া ফেলিতেছে—ইহার অর্থ এইরূপ বোধ হয় যে—যদি zoological deparment, fishery departmentকে গ্রাস করিয়া ফেলিত—তাহা হইলে ভাল হইত। কারণ, তাহা হইলে তিনি এই fishery department (যাহাতে তাঁহার মাছ পুড়িয়া যাইবার জন্য হাঙ্গামার মধ্যে পড়িতে হয় এবং যাহার জন্য হয় ত উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট হইতে দু'কথা শুনিতেও হয়) হইতে তাঁহার মনোমত zoological depattmentএ যাইতে পারেন।

(২) রেলওয়ের একজন ফিরিঙ্গি কর্ম্মচারী তাঁহার একটি স্বপ্ন-বৃত্তান্ত আমাকে বলেন। তাহা এই—গভর্ণমেণ্ট যেন একটি চাপরাশিকে দিয়া অনেক স্বর্ণমুদ্রা তাঁহাকে ঘুষ স্বরূপ পাঠাইতেছেন। তিনি তাহা লইতে চাহিতেছেন না; কিন্তু ইহা যেন ধমক দিয়া তাঁহাকে দিবার চেষ্টা হইতেছে।

হঠাৎ এই ফিরিঙ্গি কর্ম্মচারীটির এত সাধু ইচ্ছা হইল কেন—তাহা অনুসন্ধানের জন্য আমি স্বপ্নের অর্থ নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়া ঘটনাটি শীঘ্রই বুঝিতে পারিলাম। এই ফিরিঙ্গি কর্ম্মচারীটি বিশেষরূপে মাতাল। তিনি এক জায়গায় Railway Refreshment Roomএ বসিয়া মদ খাইতেছিলেন। এক পেগ মদ খাইয়া ঐ Refreshment Roomএর চাপরাশিকে পুনরায় মদ আনিতে বলিতেছিলেন। সেই চাপরাশিটি ইতস্ততঃ করিতেছিল—সেইজন্য সাহেবের সহিত বচসা হইতেছিল। এই সময় সেই Refreshment Roomএ একটি Scotland দেশীয় খাঁটি সাহেব প্রবেশ করেন। এই সাহেবটি ফিরিঙ্গি সাহেবের অধীনস্থ কর্ম্মচারী। কথায় কথায় খাঁটি সাহেবটির সহিত ফিরিঙ্গি সাহেবের বচসা হয়। তাহাতে খাঁটি সাহেবটি ফিরিঙ্গি সাহেবের নাকে ঘুঁসি মারিয়া নাক ভাঙ্গিয়া রক্ত বাহির করিয়া দেন। তাহার পর ফিরিঙ্গি সাহেবটি বাড়ীতে গিয়া চিকিৎসা করান এবং ডাক্তারের Certificate লইয়া গুরুতর আঘাতের চার্জ্জে ঐ খাঁটি সাহেবটির নামে পুলিশে নালিশ করেন। এ সম্বন্ধে রেলওয়ে ডিপার্টমেণ্টের enquiry হয়। তাহার ফলে দুই সাহেবকেই শাস্তি দিয়া দুই বিভিন্ন স্থানে বদলি করা হয়। তাহার পর ঐ ফিরিঙ্গি সাহেবটিকে, খাঁটি সাহেবের নামে যে মোকর্দ্দমা রুজু করা হইয়াছে, তাহা তুলিয়া লইবার জন্য বলা হয় এবং তাহা না করিলে যে তিনি আরও শাস্তি পাইবেন এ কথাও তাঁহাকে জানানো হয়। ইহাই ফিরিঙ্গি সাহেবের স্বপ্ন দেখিবার কারণ।

(৩) একজন গৃহস্থাশ্রমত্যাগী যুবক ব্রহ্মচারী তাঁহাদের আশ্রম-সংক্রান্ত কোনও কার্য্যের উপলক্ষে একটি গ্রামে যান। ঐ স্থানে এক অবিবাহিত ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণের বাড়ী তিনি অবস্থান করেন। তাঁহার কার্য্য শেষ হইলেও ঐ গ্রাম হইতে চার পাঁচ ক্রোশ দূরের কোনও দর্শনীয় ধ্বংসাবশেষ দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। হঠাৎ তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসেন। তিনি তাঁহার একটি স্বপ্নের অর্থ বলিবার জন্য সেইদিন স্বপ্নটি আমাকে বলেন। স্বপ্নটি এই:—ঘোড়ার উপর একজন চাপিয়াছে, ডান হাতে বল্লম। মুখটা একটা মাঠের দিকে। একজন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে "কি করে charge করে ভাই?" সে ঘোড়ার উপর প্রায় শুইয়া বল্লমটা প্রায় সোজা করিয়া ধরিয়া বলিল—"আল্লাহো আকবর।" ঘোড়াটা সোজা ছুটিয়া গেল।

স্বপ্নে আছে—'মুখটা একটা মাঠের দিকে।' এখানে মাঠটি মঠের Association word (ভাব-সংহতি)। ঘোড়সোয়ারটি সন্ন্যাসী স্বয়ং। স্বপ্ন বিশ্লেষণকারীরা জানেন যে Lance দিয়া charge করা

কিংবা ঘোড়ার পিঠে শয়ন করা প্রভৃতি সংজ্ঞা প্রচ্ছন্ন কামভাবকে ইঙ্গিত করে। ঐ শুদ্ধাত্মা ব্রহ্মচারীটির স্বপ্ন দেখিবার আগে কোনও ঘটনাক্রমে মনে হয় যে তাঁহার কোনও খাদ্যদ্রব্য এমন কোনও স্ত্রীলোক দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়াছে যিনি সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ-স্বভাবা নহেন। এইটি তাঁহার স্বপ্নদর্শনের কারণ এবং এই কারণেই তিনি শীঘ্র সেস্থান ত্যাগ করেন। স্বপ্নে যে 'আল্লাহো আকবর' কথার উল্লেখ আছে, সেইমত তিনি যেন ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতেছেন এই ইঙ্গিত আছে।

(৪) একটি বালিকা তাহার বিবাহের কিছুদিন পরে স্বপ্ন দেখে যে সে মোটরের সিটে বসিয়া যাইতেছে, আর তাহার ছোট ভগ্নী foot boardএর উপর বসিয়া আছে। এই বালিকাটি বিবাহের পর মোটরগাড়ী করিয়া শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করে। স্বপ্নের ভাব এই যে, তাহার যেমন ভাল বিবাহ হইয়াছে, তাহার ছোট ভগ্নীর সেরূপ ভাল বিবাহ হইবে না।

প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র দত্ত এম-এ

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট প্রজাস্বত্ব বিষয়ক নূতন আইন লিপিবদ্ধ করার সঙ্কল্প করিয়া তদুপলক্ষে একটী কমিটি নিযুক্ত করায় বিষয়টী লইয়া দেশে বেশ একটু আন্দোলন চলিতেছে। এ সম্বন্ধে খবরের কাগজ বা মাসিকপত্রাদিতেও প্রবন্ধাদি প্রকাশ করা হইতেছে। অতএব এ বিষয়ে সামান্য একটু আলোচনা করা অসঙ্গত হইবে না।

লর্ড কর্ণওয়ালিশ যখন জমিদারদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া, তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে ভূমির অধিকারী করিয়া দেন, তখন সে কাজটা যে সব দিক দিয়া ন্যায় ও আইনসঙ্গত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। কারণ, মুসলমান আমলে জমিদার বলিতে সর্ব্বত্রই ভূমির স্বত্বাধিকারী বুঝাইত না। জমিদার শব্দ তখন নানা অর্থ-বোধক ছিল। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভব নয়। যাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষ তথ্য জানিতে চান, তাঁহারা ঐ সময়কার ইতিহাস আলোচনা করিবেন।

কর্ণওয়ালিশ ও অন্যান্য যাঁহারা জমিদারদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন. তাঁহারাও জানিতেন যে, জমিদারকে তাঁহারা যেস্বত্ব দিতেছেন,জমিদার তাহার ন্যায্য অধিকারী ন'ন। এ সম্বন্ধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বিষয়ে পার্লেমেণ্ট যে select committee বসান, তাহার fifth report হইতে (১৮১২ ইং) কতক অংশ তুলিয়া দিতেছি। "They" (the Directors of the East India Company) seemed to consider a settlement of the rent in perpetuity, not as a claim to which the landholders had any pretensions, founded on the principle and practice of native government, but as a grace, which it would be a good policy for the British government to bestow upon them. In regard to the proprietory right to the land, the recent enquiries had not established the Zaminder on a footing of the owner of a landed estate in Europe, who may lease out portions and employ and dismiss labourers at pleasure; but on the contrary had exhibited from him down to the actual cultivator, other inferior Land-holders, whose claim to protection government readily recognised, but whose rights were not, under the principles of the present system so easily reconcilable as to be at once susceptible of reduction to the rules about to be established in perpetuity.

বলা বাহুল্য যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে ভূমির নানা প্রকার স্বত্বাধিকারী ও রায়তের আইনতঃ দাবী কার কত এ সম্বন্ধে, যতটুকু জানা দরকার বা খোঁজখবর লওয়া উচিত, কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ তাহা জানিতেন না এবং তদ্রূপ খোঁজখবর লইতে পারেন নাই। কোম্পানীর ডাইরেক্টারগণ তাঁহাদের এই ত্রুটী সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন না। এ সম্বন্ধে উক্ত রিপোর্টে আরও লেখা আছে—"These (i. e., these rights) the directors particularly recommended to the consideration of the government, who, in establishing the permanent rules were to leave an opening for the introduction of any such in future, as from time to time may be found necessary, to prevent the ryots being improperly disturbed in their possessions and subjected to unwarrantable exactions."

কোম্পানী ভাবিয়াছিলেন যে, জমিদারদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলে পর, উহাতে এক দিকে তাঁহাদের বার্ষিক রাজস্ব যেমন নিয়মিত ভাবে সহজে আদায় হইবে. অন্য দিকে জমিদারদের তত্ত্বাবধানে কৃষি ও কৃষকেরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে। কোম্পানীর আশা যে একেবারেই ফলবতী হয় নাই, তাহা নহে। মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে ও কোম্পানীর আমলের প্রথমাবস্থায় দেশ ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষিজীবনে একটা সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইল সন্দেহ নাই। এ ভাবে দেখিতে গেলে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সে সময়ে যে একটা বড় প্রয়োজন ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। জমিদারগণ অনেক ক্ষেত্রেই নিজেদের স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া যাহাতে দেশে কৃষির বিস্তার হয় সে বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। জমিদারদের সহায়তায় দেশে শান্তি স্থাপন ও অরাজকতা নিবারণ করা সহজ হইয়াছে। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা এক সময়ে দেশে সুফল ফলিলেও, চিরদিন এবং সব বিষয়েই যে তাহা মঙ্গলজনক হইবে, এ ধারণা ভ্রান্ত।

বস্তুতঃ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিষফলও এ দেশে কম ফলে নাই। মুসলমান রাজত্বে একটা আইন ছিল যে, কৃষক তাহার রাজস্ব রীতিমত আদায় দিলে, জমিদার বা সরকারের অন্য কোন তহশীল কর্ম্মচারী তাহার সম্পত্তি বা স্বত্বের উপর কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নিরক্ষর গরীব কৃষকদের ঘাড়ে 'জমিদার'দিগকে চাপাইয়া দেওয়া হইল। জমিদার ইচ্ছা করিলে প্রজাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন, ইচ্ছা করিলে তাহাকে পথের ভিখারী করিতে পারেন। অবশ্য জমিদারদের মধ্যে অনেক মহৎপ্রাণ ব্যক্তি সে সময়েও ছিলেন—আজও আছেন। কিন্তু প্রজা কোন সত্য বা কল্পিত কারণে জমিদারের রোষ-দৃষ্টিতে পড়িলে, তাহার সর্ব্বস্বান্ত হইতে বেশীক্ষণ লাগিত না। অনেক ক্ষেত্রেই জমিদারগণ আদর্শ-চরিত্র নহেন এবং ছিলেন না। বিশেষতঃ তাঁহারা নিজেদের বিষয় নিজেরা না দেখিয়া কর্ম্মচারীদের হস্তে কার্য্যভার দেন ও দিতেন। এরূপ কর্ম্মচারীদের মধ্যে অনেকে এমন নির্দ্দয়, নীচাশয় ছিল ও আছে যে, তাহারা নিজ স্বার্থ পরিপুষ্টি করিবার বা কুপ্রবৃত্তি জন্য প্রজাদের নানা ভাবে উৎপীড়ন করিত এবং এখনও করে। অনেক দুশ্চরিত্র জমিদার কঠোরহস্তে প্রজাদের নিকট হইতে যতদূর খাজনা আদায় করিতে পারিতেন তাহা করিতেন। দুরন্ত জমিদার ও তাহার নরপিশাচ কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে আদালতের আশ্রয় লওয়া গরীব প্রজার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। প্রথমতঃ জমিদারের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে লোক পাওয়াও অসম্ভব ছিল। বিশেষতঃ 'বিদ্রোহী' প্রজাকে মিথ্যা মোকদ্দমা হাঙ্গামা ইত্যাদি দ্বারা জব্দ করা প্রবল প্রতিপক্ষদের পক্ষে সহজ ছিল এবং আজও অনেকটা আছে।

১৭৯৯ ইংরেজীর ৭নং রেগুলেশন মতে জমিদারগণ আদালতের আশ্রয় না লইয়াই প্রজাদের ধান, গরু ইত্যাদি আটক করিতে পারিতেন এবং অশেষ যন্ত্রণা দিয়া তাঁহাদের প্রাপ্য আদায় করিতেন বা আক্রোশ মিটাইতেন।

১৮২২ ইংরেজীতে কোম্পানী প্রজাদের রক্ষার নিমিত্ত নূতন বিধান করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু তাহাতে প্রজার অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইল না। ১৮৫৯ ইংরেজীতে ক্যানিং সাহেব জোতস্বত্ব বিষয়ে নূতন বিধান করিলেন (Act X of 1857) ১৭৯৩ সাল হইতে বা ২০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে, যে সব প্রজারা একভাবে খাজনা দিয়া আসিতেছে, তাহাদের খাজনা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে না—এরূপ বিধান করা হইল। যাহারা ১২ বৎসর জমি জোত করিবে, তাহাদের জোত স্বত্ব বজায় থাকিবে এবং উপযুক্ত কারণ ব্যতীত জমিদারগণ তাহাদের খাজনার হার বাড়াইতে পারিবেন না। এই সময় হইতে জমিদারগণকে ফারগ দিতে বাধ্য করা হইল। কিন্তু এ আইনও যথেষ্ট ফলপ্রদ হইল না। জমিদারগণ নানাভাবে আইনের হাত এড়াইয়া প্রজাদের উৎপীড়িত করিতে লাগিলেন। অতএব ১৮৮৫ সালে গবর্ণমেণ্ট নূতন আইন করিতে বাধ্য হইলেন। বর্ত্তমানে সেই Bengal Tenancy Actই প্রচলিত আছে। এই আইন মতে প্রজাদের Occupancy এবং non-occupancy ryot এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যাহারা ১২ বৎসর এক গ্রামে জমি জোত করিয়াছে, তাহাদের occupancy ryot শ্রেণীভুক্ত করিয়া, তাহাদের জমিতে কতক স্বত্ব দেওয়া হইয়াছে; এবং জমিদারগণ যাহাতে অযথা খাজনা বৃদ্ধি করিতে না পারেন তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট এইরূপে বিভিন্ন সময়ে নানা আইন করিয়া জমিদারের অন্যায় উৎপীড়ন হইতে প্রজাদের রক্ষা করিয়া আসিতেছেন এবং তাহাদের জোতের জমিতে কতক স্বত্ব ও অধিকার দিয়াছেন। যাঁহারা এই প্রকার আইন লিপিবদ্ধ করার পক্ষপাতী নন, এবং প্রজাকে এই সব অধিকার দেওয়া বে-আইনী বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের Permanent settlement Regulationএর (Regulation I of 1793) নিম্নলিখিত sectionটী ভাল করিয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করি। "It being the duty of the ruling power to protect all classes of people and more particularly those who from their situatian are most helpless, the Governor General in Council will, whenever he may deem it proper, enact such regulations as he may think necessary for the protection and welfare of the dependent taluqdars, raiyats and other cultivators of the soil; and no Zaminder, indepent Taluqdar or other actual proprietor of the land shall be entitled on this account, to make any objection to the discharge of the fixed assessment which they have respectively agreed to pay."

(২)

প্রজাস্বত্ব আইন করিয়া বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট চাহিতেছেন প্রজাদিগকে প্রধানতঃ তাহাদের জোতস্বত্ব বিক্রয় করিবার অধিকার দিতে। রায়তের জোতস্বত্ব সম্বন্ধে ১৮৮৫ ইংরেজীর ব্যবস্থা পরিষ্কার নহে। বর্ত্তমানে জোতস্বত্ব বিক্রয় করিতে হইলে রায়তকে প্রমাণ করিতে হয় যে, এইরূপ হস্তান্তরিত করার প্রথা দেশে বর্ত্তমান আছে। আদালতে এ সম্বন্ধে দেশে প্রথা (custom) আছে বলিয়া প্রমাণ করা মোটেই সহজ নয়। একে ত দলিলাদির সাহায্যে প্রমাণ করা দুরূহ, তাহার উপর রায়তের প্রতিপক্ষগণ প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার। তাই বর্ত্তমানে পরিষ্কার ভাবে প্রজাকে তাহার জোত বিক্রয়ের অধিকার দিবার কথা উঠিয়াছে। প্রস্তাবটী কতদূর সঙ্গত বা অসঙ্গত, তাহা আমরা পরে দেখিব। তবে প্রায়ই একটা কথা বলা হয় যে, এইরূপ নূতন আইন লিপিবদ্ধ করা বে-আইনী হইবে। কেন না চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা জমিদারদিগকে জমির উপর সর্ব্বপ্রকার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। প্রস্তাবিত আইন দ্বারা জমিদারের স্বত্ব ক্ষুণ্ণ করিলে ন্যায়মতে সরকার বাহাদুর জমিদারের নিকট হইতে নির্দ্ধারিত রাজস্ব পাইতে পারেন না। আমি ইতঃপূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা

কালেও গবর্ণমেণ্ট প্রজার উন্নতিকল্পে পরে যে কোন বিধিব্যবস্থা করার ক্ষমতা হাতে রাখিয়াছিলেন এবং তদনুসারে কাজ করিয়াও আসিয়াছেন। বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজন হইলে যে কোন নূতন আইন প্রচার ও পুরাতন আইন রদ করিতেও পারেন। স্থান কাল পাত্রভেদে ব্যবস্থাও ভিন্নরূপ হয়। ১৫০ বৎসর আগেকার একটা আইন যে আমাদের জাতীয় জীবনকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিবে, ইহা কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি স্বীকার করিবেন না। প্রয়োজন হইলে গবর্ণমেণ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রদও করিতে পারেন। জোতস্বত্বের ব্যবস্থা ত সামান্য কথা।

আরও একটা কথা বিশেষভাবে তলাইয়া দেখা দরকার। জোতস্বত্ব বিষয়ে প্রজার কতদূর অধিকার থাকিবে বা না থাকিবে, ইহা আইনের লৌহ ছাঁচে ফেলিয়া বিচার করা সঙ্গত নয়। বিষয়টীকে অর্থনীতির principles বা মূলমন্ত্র দিয়াই প্রধানতঃ বিচার করিতে হইবে। যে দেশে শতকরা ৭২ জন লোক কৃষক, সে দেশে জাতীয় উন্নতি বলিলে প্রথমতঃ কৃষি ও কৃষকের উন্নতি কি ভাবে হইতে পারে তাহাই বুঝিতে হইবে। মুষ্টিমেয় জমিদারের নিমিত্ত লক্ষ লক্ষ কৃষককে উৎসর্গ করা চলে না।

মানবের সকল প্রকার উন্নতির মূলে আশা, উৎসাহ ও স্বাধীনতা থাকা দরকার। বঙ্গের কৃষক একদিন সরল, ধর্ম্মভীরু ও স্বাধীন ছিল। তাহারা চাষ করিয়া সোণা ফলাইত, পল্লীবাসী আত্মীয়-স্বজনের প্রীতিতে বাড়িয়া উঠিত। গ্রামে ঘরে ঘরে লক্ষ্মী বিরাজ করিতেন। কিন্তু আজ আর সে দিন নাই। দারিদ্র্য বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজমানা; নিরুৎসাহ প্রত্যেকের বুক শোষণ করিতেছে। এই অধঃপতনের নানা কারণ আছে। তবে আমরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকেও ইহার একটা বড় কারণ বলিয়া মনে করি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসাদাৎ জমিদারগণ যখন ভূমির সর্ব্বপ্রকার স্বত্বাধিকারী হইলেন, তখন প্রজাদের হিতাহিত, জীবন-মরণ, উন্নতি-অবনতি তাঁহাদের করুণা ও অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিল। জমিদারদের মধ্যে কাহারও-কাহারও এবং তাঁহাদের কর্ম্মচারীদের অত্যাচারের কাহিনী বাংলার কৃষকসমাজে বহুদিন যাবত প্রবাদের মত চলিয়া আসিয়াছে। এই সব অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় ছিল জমিদার ও তাহার কর্ম্মচারীদের মন যোগাইয়া তোষামুদি করিয়া থাকা। যখন দেশে প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে কোন আইন প্রচলিত ছিল না, দেশে সাধারণ শিক্ষার আলো বর্ত্তমান সময়ের মত এত বিস্তৃত হয় নাই, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে তখন কৃষক আপনার স্বাধীনতা হারাইয়া প্রকৃত পক্ষে অনেকটা ক্রীতদাসের মত হইয়া পড়িল। তাহার চাষবাসের জমি হস্তান্তরিত হইলে সে জীবনের সম্বল হারাইবে। অতএব জমিদারকে তুষ্ট রাখাই তাহার বাঁচিয়া থাকার একমাত্র উপায়। এই ভাবে দাসত্বের অবশ্যম্ভাবী ফল নৈতিক অধঃপতন। তাই ক্রমে ক্রমে প্রভুদের নীচ তোষামুদি করিতে যাইয়া প্রজারা ম্রিয়মান হইয়া পড়ে—তাহারা আত্মবিশ্বাস হারায়। আজকাল অবস্থার কতক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তবুও কৃষকদের সর্ব্বত্রই যে একটা উৎসাহহীনতা, নিজের ক্ষুদ্রতা, ও কার্য্যোদ্যমের অভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহার জন্য প্রজাদের ঘাড়ে জমিদারদের চাপাইয়া দেওয়া কাজটা যে কতটা দায়ী, তাহা আমরা ভাবিয়াও দেখি নাই।

জমিদারদের ভূমির সর্ব্বপ্রকার অধিকারী করিয়া দেওয়ায় গ্রাম্য-জীবনের ও কৃষকের নৈতিক অধঃপতন যে শুধু এইটুকু হইয়াছে—তাহা নহে। সহরে বসিয়া কাতর চক্ষে যাঁহারা গ্রামের চিত্র অঙ্কিত করেন, তাঁহারা গ্রামবাসীকে সরল, ধর্ম্মভীরু, প্রীতিপরায়ণ এই ভাবে চিত্রিত করেন। কিন্তু তাঁহারা কল্পনায় কেবল কাব্য রচনা করিয়া যান। গ্রাম্য জীবনের সহিত আমার মত যাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রাখেন, তাঁহারা জানেন যে, সে কেবল একটা সুখস্বপ্ন মাত্র। মিথ্যা সাক্ষ্য, মিথ্যা আচরণ, পরের অপকার প্রচেষ্টা, হিংসা, বিদ্বেষ প্রভৃতি গ্রামে যত আছে, সহরে তত হয় না। এবং এই নৈতিক অধঃপতনের জন্য গ্রাম্য জীবনের নেতা জমিদার বা তাহার কর্ম্মচারীগণও যে অনেকটা দায়ী, তাহা অস্বীকার করিলে চলে না। অনেকস্থলে ইহাদেরই প্ররোচনায় আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে যাইয়া প্রজারা মিথ্যা কথা বলিতে শিখিয়াছে। জমিদারের সঙ্গে জমিদারের আড়াআড়ি, দাঙ্গা হাঙ্গামা ইত্যাদি সর্ব্বদাই চলিতেছে। এরূপ দৃষ্টান্ত চোখের সামনে পাইয়া, পরের মাথা ভাঙ্গিয়া দিতে উত্তেজিত হইয়া প্রজারা যে দিন দিন মামলাবাজ হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আগেই বলিয়াছি, এই সব নৈতিক অধঃপতনের অনেক কারণ আছে। কিন্তু কর্ণওয়ালিশের এই বিধানটাও যে তাহার একটা বড় কারণ, তাহা যাঁহারা চোখ মেলিয়া দেখিতে পারেন, তাঁহাদের বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

প্রজাদের আর্থিক বা নৈতিক উন্নতির প্রধান উপায়—তাহাদের বুকে উন্নতির আশা জাগ্রত করিয়া দেওয়া, তাহাদিগকে স্বাধীন ও দায়িত্ব-জ্ঞান পূর্ণ করা। এবং তার জন্য তাহাদের প্রধান সম্বল চাষের ভূমিতে জোতস্বত্বের উপর তাহাদের সম্পূর্ণ অধিকার থাকা উচিত। প্রজা বুঝুক যে সেও মানুষ, জমিদারের ক্রীতদাসের নয়; যতক্ষণ সে তাহার খাজনা ন্যায়মত আদায় দিবে, ততক্ষণ তাহাকে কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া চলিতে হইবে না—নীচ তোষামুদী করিতে হইবে না। জোতস্বত্বের উপর তাহার সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া মাত্রই যে তাহার এত দিনের এই সব সংস্কার, অভ্যাস, মানসিক ও আর্থিক দৈন্য দূরীভূত হইয়া পড়িবে, আমি অবশ্য এ কথা বলিতেছি না। বিশেষতঃ অনেক স্থলেই কৃষকেরা অজ্ঞ—নানাভাবে দুর্ব্বল। অসৎ জমিদার তাহার উপর সহস্র প্রকারে অত্যাচার করিতে পারিবেন। কিন্তু জোতস্বত্ব বিষয়ক আইন প্রণীত হওয়ার পর হইতে কৃষকগণ যে একটা নৈতিক বল (moral strength) পাইয়াছে, এবং তাহাতে তাহাদের দুর্ব্বলতা, ক্ষুদ্রতা অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে,—যাঁহারা ইদানীং গ্রামে কৃষকদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা এ কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। আমরা চাই, জোতস্বত্ব আইন এমন ভাবে রচিত হউক, যাহাতে কৃষকদের এই স্বাধীনতাটুকু বজায় থাকে—যাহাতে তাহা

আরও বৃদ্ধি পায়। তাহারা নিজেরা যে মানুষ, তাহাদের অদৃষ্ট যে তাহাদেরই হাতে, এ কথা তাহারা বাস্তব জীবনে উপলব্ধি করিয়া লউক।

কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি অযথা জমিদারদিগকে আক্রমণ করিতেছি। তাঁহাদের মধ্যে অনেক সদাশয় ব্যক্তি আছেন, যাঁহাদের দ্বারা দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতেছে বা হইয়াছে। কিন্তু আমি এই systemএর বিরুদ্ধবাদী, এবং ইহা হইতে দেশে যে নানা অকল্যাণ সাধিত হইতেছে বা হইতে পারে, আমি তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি।

আর্থিক উন্নতি প্রবল উন্নতি-আকাঙ্ক্ষাকে আশ্রয় করিয়া বর্দ্ধিত হয়। আর নিজের শ্রমলব্ধ ধন যাহাতে সর্ব্বতোভাবে নিজের হাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, এ বিষয়ে কর্ম্মীর মনে দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে, কাজ কখনও সুচারু রূপে সম্পন্ন হয় না। কৃষকের বেলাও ঐ এক কথাই খাটে। কৃষকের প্রধান সম্বল তাহার চাষের জমি; এবং এই জমিতেই সে তাহার শ্রমবল ও সামান্য মূলধন খাটাইয়া যে ফসল উৎপন্ন করে, তাহা দ্বারাই তাহাকে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়। এই ফসলের উপরই তাহার সুখ, শান্তি, উন্নতি নির্ভর করে। অতএব যাহাতে কায়মনপ্রাণে জমির উন্নতিকল্পে কৃষক যথেষ্ট চেষ্টা করে, সেজন্য ঐ জমিতে তাহার জোতের উপর সম্পূর্ণ অধিকার থাকা প্রয়োজন। এবং জমিদারকে উপযুক্ত খাজনা দিয়া সে যাহাতে নিশ্চিন্ত ভাবে আপনার কাজ করিয়া যাইতে পারে, তাহার মনে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস থাকা দরকার; এবং সে নিশ্চিন্ত, বিপদের সময় বা অভাবের তাড়নায় সে যাহাতে তাহার জোতস্বত্ব বন্ধক দিয়া টাকা পাইতে পারে, অথবা জোতস্বত্ব হস্তান্তরিত করিতে পারে, সে ক্ষমতাও তাহাকে দেওয়া উচিত। কারণ, এরূপ অধিকার পাইলে, জমির উন্নতিকল্পে প্রজা যত খাটিবে, অন্য কোন অবস্থায় সেরূপ করিবে না। দ্বিতীয়তঃ, কৃষক-দল গরীব; তাহাদের সঞ্চিত ধন নাই বলিলেও চলে। অতএব প্রজা তাহার শ্রমবল ভূমিতে নিয়োজিত করায় ভূমির যে উৎকর্ষ সাধন করা হইতেছে, তাহাকেই প্রজার মূলধন ও সঞ্চিত ধন ধরিয়া লইতে হইবে। বিপদে আপদে যদি তাহার এই ভূমিতে সঞ্চিত ধনকে আশ্রয় করিয়া বিপদের হাত এড়াইতে পারিবে—এরূপ আশ্বাস কৃষকের থাকে, তবেই সে কেবল ভূমির উন্নতিকল্পে সম্যক যত্ন করিতে উৎসুক হইবে।

কৃষকদের প্রধান অভাব মূলধনের। হালের গরু, বীজ, সার ইত্যাদি কিনিতে পারে, সেরূপ আর্থিক অবস্থা অনেকেরই নাই। তাই দেখা যায় যে, কৃষকগণ প্রায়ই ঋণগ্রস্ত, ও রক্তশোষক সুদখোরের অত্যাচারে জর্জ্জরিত। অবশ্য আমাদের নানাপ্রকার সামাজিক আচার-ব্যবহারও এই ঋণের কতকটা হেতু সন্দেহ নাই। যাহা হউক, গ্রামে কৃষকদের অনেক সময় বাধ্য হইয়া শতকরা ৩৬৲টাকা বা ততোধিক সুদেও টাকা ধার করিতে হয়। যাঁহারা অর্থনীতির সাধারণ সূত্রগুলিও অবগত আছেন, তাঁহারাও বুঝিবেন, কৃষককে এই অসম্ভব হারে সুদ দিতে হয় কেবল তাহাদের credit নাই বলিয়া। ইহাতে এক দিকে যেমন কৃষক যথেষ্ট টাকা ধার করিতে পারে না, অন্য দিকে যে সামান্য টাকা ধার করে, তাহাও পরিশোধ করিতে না পারিয়া, ক্রমশঃ ঋণজালে জড়িত হয়। মহাজনের তাড়নায় ফসল জন্মিবামাত্রই তাহা নামমাত্র মূল্যে—অনেক ক্ষেত্রে এই সব সুদখোর মহাজনদের নিকটই বিক্রয় করিতে হয়। এইরূপ দুর্দ্দশায় হাবুডুবু খাইয়া সে ক্রমশঃ জীবনে ও কর্ম্মে নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে এবং দায়িত্ব-জ্ঞানহীন হয়। অবশ্য কোন এক বিধি-ব্যবস্থা দ্বারাই এই সব সমস্যার সমাধান হইবার নহে। সামাজিক ও নৈতিক উন্নতিকল্পে দেশে সাধারণ শিক্ষার প্রচলন করা আবশ্যক। কৃষকের আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন করার জন্য দেশে যথেষ্ট সমবায় ঋণদান সমিতি বা Co-operative Credit Society স্থাপন করা উচিত। তবে রায়তদিগকে তাহাদের জোতের জমি বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার করার বা তাহাদের জোতস্বত্ব হস্তান্তরিত করিবার ক্ষমতা দিলে, তাহাদের credit বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে; এবং তাহারা সহজে অল্প সুদে তাহাদের প্রয়োজনীয় টাকা পাইতে পারিবে সন্দেহ নাই।

যাঁহারা মনে করেন যে, প্রজাদের জোতস্বত্ব হস্তান্তরিত করার ক্ষমতা দিলেই, তাহারা অযথা ঋণগ্রস্ত হইয়া উচ্ছন্ন যাইবে, তাঁহারা বাংলার কৃষকদের সঙ্গে সম্যক্ পরিচিত আছেন বলিয়া মনে হয় না। কৃষকেরা নিশ্চয়ই এত উচ্ছৃঙ্খল নয়। তাহারা তাহাদের শুভাশুভ বিচার করিতে পারে। আমাদের কৃষকের শ্রম ও সংযম অন্য কোন দেশের কৃষকের চাইতে কম বলিয়া মনে হয় না। অতএব তাহাদের এ বিষয়ে স্বাধীনতা দিলেই যে তাহারা এ স্বাধীনতার অপব্যবহার করিবে, এমন সিদ্ধান্ত করিবার কোন কারণ নাই। সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে যথেষ্ট পরিমাণে Land Bank ও Co-operative Credit Societies স্থাপিত হইলে বরং ফল অন্যরূপ হইবে বলিয়াই মনে করি। প্রজা যখন দেখিবে তাহার credit বাড়িয়াছে, সে সহজে অল্প সুদে টাকা ধার করিতে পারিতেছে, ও সুবিধামত ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হইয়াছে, তখন তাহার প্রাণে নূতন উৎসাহ ও আশা আসিবে, তাহার মনের জোর বাড়িবে ও চরিত্রের উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ১৮৮৫ সালের আইনমতেও জোতস্বত্ব বিক্রয় করিতে পারা যায়। তবে প্রমাণ করিতে হয় যে, দেশে এই প্রকার হস্তান্তর করার প্রথা বর্ত্তমান আছে। অবশ্য আদালতে এরূপ প্রমাণ করা সহজ নহে। তাই জোতস্বত্ব হস্তান্তর করিতে হইলে, জমিদারের আদেশ লইয়া তাঁহাকে যথোচিত নজরানা দিয়া হস্তান্তরিত করিতে হয়। এইভাবে অনেক জমির জোতস্বত্ব হস্তান্তরিত হইয়াছে এবং জোতস্বত্ব বন্ধক দিয়াও টাকা ধার করা হইতেছে। কিন্তু তাহাতে প্রজাদের মঙ্গল না হইয়া অমঙ্গলই হইয়াছে। জমি হস্তান্তর করার ক্ষমতা জমিদারের হাতে থাকায়, তাহাতে প্রজাদের credit মোটেই বাড়ে নাই। বিশেষতঃ জোতস্বত্বের যাহা উপযুক্ত দাম, তাহার অধিকাংশই জমিদার লইয়া যান। জোতস্বত্ব বন্ধক রাখার সময় মহাজন জানে না যে, সে তাহা নীলাম করাইতে পারিবে কি না।

তাই তাহাকে একটা বড় risk লইতে হয়। অতএব এত দিন জোত-স্বত্ব বন্ধক রাখায় বা হস্তান্তর করায় সুদখোর মহাজন ও জমিদারেরই লাভ হইয়াছে; প্রজাদের কোন শুভ হয় নাই। অতএব বর্ত্তমান জোতস্বত্ব যত হস্তান্তরিত হইতেছে, পরিষ্কারভাবে জোতস্বত্বের উপর প্রজাদের সম্পূর্ণ অধিকার দিলে, জোতস্বত্ব তদপেক্ষা কম হস্তান্তর হইবে বলিয়াই মনে করি। প্রজারা যদি সহজ উপায়ে কম সুদে মূলধন সংগ্রহ করিয়া ভূমি চাষ করিতে পারে এবং স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার মত সুযোগ পায়, তবে অচিরেই তাহাদের নৈতিক জীবনেও একটা আমূল পরিবর্ত্তন আসিবে, তাহাদের নিজেদের প্রতি ও পরিবারের প্রতি দায়িত্বজ্ঞানও বাড়িবে সন্দেহ নাই।

অবশ্য রায়তদিগকে এই ক্ষমতা দেওয়ায় জমিদারগণ যাহাতে অযথা ব্যতিব্যস্ত না হন তাহা দেখিতে হইবে। জোতস্বত্ব বিক্রয় করার সময় জমিদারকে উপযুক্ত নোটীশ দেওয়া উচিত। জমিদার যদি দেখাইতে পারেন যে, নূতন জোতদারের হাতে জমি গেলে তাঁহার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে, অথবা তাঁহার জমির অপব্যবহার করিয়া ধ্বংস করা হইতেছে, তবে তিনি তাহাতে বাধা দিতে পারিবেন—এরূপ আইন থাকা উচিত।

কেহ কেহ বলিতেছেন, প্রজাদের জোতস্বত্ব হস্তান্তরিত করার ক্ষমতা দিলে, দেশের সব জমি বিদেশী ধনীর করতলগত হইবে, অথবা কৃষি কোম্পানীর হাতে পড়িবে। বলা বাহুল্য, এরূপ কল্পিত ভয়ের দোহাই দিয়া বিষয়টী চাপা দেওয়া মোটেই ঠিক নয়। বিদেশীরা যদি এই দেশীয় জমিদারী হস্তগত করিয়া থাকেন, তবে তাহা প্রজাদের দোষে করেন নাই। উচ্ছৃঙ্খল জমিদারের অমিতব্যয়িতাই তাহার জন্য দায়ী। দেশে কোথায়ও কৃষি কোম্পানী স্থাপিত হইলেই তাহাতে ভয়ে জর্জ্জরিত হইবার কোন কারণ নাই। বাংলার কৃষকগণ অনেক পুরুষ ধরিয়াই চাষের জমিকে সম্বল করিয়া বাঁচিয়া রহিয়াছে। তাহারা যে সহজে তাহাদের চাষের জমি কোম্পানীর হাতে সমর্পণ করিবে, এরূপ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নহে। বিশেষতঃ জোতস্বত্ব আইন নূতন ভাবে গঠিত হইলে, প্রজাদের নিজের জমির প্রতি মমতা বাড়িবে বৈ কমিবে না।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, প্রজাকে তাহার জোতস্বত্বের উপর সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়াই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। অবশ্য জমিদারগণ যাহাতে অযথা দুষ্ট প্রজার চক্রান্তে ব্যতিব্যস্ত না হন, তাহার জন্য উপযুক্ত আইন থাকা উচিত। আমরা চাই, এদেশে Free tenantry class বা স্বাধীন রায়তদল সৃষ্টি করিয়া তোলা। স্বাধীনতাই সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূল—এই যুগে বোধ হয় তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন না। স্বাধীনতা হইতেই চিত্ত-বৃত্তির বিকাশ হয়, কাযে উৎসাহ আসে, জীবনে স্ফূর্ত্তি পাওয়া যায়। দেশের বার আনা অংশ লোক কৃষক। বলা বাহুল্য ইহাদের কল্যাণ না হইলে জাতির কল্যাণ সাধিত হইবে না।

মহাকবি কালিদাস কি বাঙ্গালী?

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম-এ

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ কাব্যতীর্থ মহাশয় কয়েক বৎসর হইতে নানা অনুসন্ধান ও গবেষণার দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, মহাকবি কালিদাসের জন্মভূমি প্রাচীন রাঢ়দেশের অন্তর্ভুক্ত বর্ত্তমান বীরভূম জিলার অধীন "সিঙ্গুরীগড্ড" নামক গ্রাম; সুতরাং কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন। কবিভূষণ মহাশয় যে সকল প্রমাণের বলে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা একটি প্রবন্ধের আকারে প্রকাশিত করিয়াছেন *। মহাকবি কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন—কবিভূষণ মহাশয়ের এই উক্তি যথার্থ হইলে বাঙ্গালীমাত্রেই বিশেষ গৌরবান্বিত হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আমরা সাধ্য অনুসারে কবিভূষণ মহাশয়ের যুক্তিগুলির আলোচনা করিয়াও সেগুলির কোন সারবত্তা স্বীকার করিতে পারিতেছি না। তবে ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি—কবিভূষণ মহাশয় এ ক্ষেত্রে যে পরিশ্রম ও গবেষণা করিয়াছেন, তাহা খুব প্রশংসনীয়। এ যাবৎ কেহ যে তাঁহার সিদ্ধান্ত খণ্ডনের জন্য বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন—তাহাও আমরা জানিতে পারি নাই। এরূপ একটা কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়ের প্রতি এরূপ ঔদাসীন্য আমাদের স্বভাবসিদ্ধ নিশ্চেষ্টতারই আর একটী উদাহরণ ব্যতীত আর কি মনে করিব? এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, এই বিষয়টির সম্যক্ আলোচনা করিতে যে বিদ্যাবুদ্ধি ও গবেষণার প্রয়োজন,—আমাদিগের তাহা নাই। এ সম্বন্ধে যোগ্য ব্যক্তিদিগের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যেই আমরা এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভরসা করি, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ এ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের সমীচীন আলোচনা প্রকাশিত করিয়া, এই জটিল বিষয়ের মীমাংসার সাহায্য করিয়া ধন্যবাদ অর্জ্জন করিবেন।

আমরা এখন কবিভূষণ মহাশয়ের প্রদর্শিত যুক্তিগুলির আলোচনা করিব। কালিদাস যে বাঙ্গালী ছিলেন, কবিভূষণ মহাশয় সে সম্বন্ধে দুইটি মুখ্য প্রমাণ ও কতকগুলি আনুষঙ্গিক প্রমাণ দিয়াছেন। তিনি উক্ত উভয়বিধ প্রমাণ সম্বন্ধে ইহাও লিখিয়াছেন যে—"প্রধান কারণ বা বিনিগম হেতু (Irrevertible Proof)। কারণ কূটে কার্য্য হয়; কার্য্য বিষদরূপে বুঝাইতে হইলে, কতকগুলি পরিপোষক কারণও আবশ্যক করে, কাজেই কয়েকটি পরিপোষক কারণও দিতেছি। তাহা কেবল আমার প্রথম কারণকে বা মুখ্য কারণকে দৃঢ় করিবার জন্য মাত্র। যিনি প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি আমার মুখ্য কারণদ্বয় খণ্ডিত করিবেন। পরিপোষক কারণে দোষ উদ্ঘাটন করিলে মুখ্য সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হয় না।"

* "কালিদাস সমিতির চতুর্থ-শাখা কালিদাস জন্মপীঠ সভার অনুষ্ঠান পত্র"—৩৭ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতায় কালিদাস সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কবিভূষণ মহাশয়ের প্রদর্শিত মুখ্য প্রমাণ দুইটি উপস্থাপিত করিতে যাইয়া তিনি লিখিয়াছেন :—

"মহাকবি কালিদাস গণিত জ্যোতিষে বড় পণ্ডিত ছিলেন, তিনি "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন; তাঁহার ফলিত জ্যোতিষেও অসাধারণ অধিকার ছিল। তিনি রঘুবংশে রঘুর জাতচক্র দিয়াছেন এবং স্থানে অস্থানে ফলিত জ্যোতিষের অনেক কথা ব্যবহার করিয়াছেন। তাহা দেখিয়া মনে হয়, তিনি তদানীন্তন ভারতের রাজধানীতে ফলিত জ্যোতিষের ব্যবসায় করিতেন। তাঁহার জ্যোতিষজ্ঞানে কোনও ভুল ভ্রান্তি ছিল না। তাঁহার গ্রন্থে পঞ্জিকা ব্যবহার তিনি অভ্রান্তরূপেই করিয়াছিলেন।

(১) বর্ষারম্ভ।—বাঙ্গালায় বর্ষারম্ভ বা নববর্ষ গ্রীষ্ম ঋতুতে হয়; দ্রাবিড়ে বর্ষারম্ভ বর্ষা ঋতু হইতে হয়, কর্ণাটে ও উৎকলে শরৎ ঋতু হইতে বর্ষারম্ভ হয়; মধ্যদেশ হইতে সিন্ধুদেশ পর্য্যন্ত হেমন্ত ঋতুতে হয়; ইউরোপীয়গণ শীত ঋতুতে বর্ষারম্ভ গণনা করেন, হিন্দুস্থানে বসন্ত হইতে হয়।

কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন,—তিনি ঋতুসংহারে, মেঘদূতে ও শকুন্তলায় গ্রীষ্ম ঋতু হইতেই বর্ষারম্ভ করিয়াছেন। দ্রাবিড়ী হইলে তিনি বর্ষাকে প্রথম আসন দিতেন, কর্ণাটী হইলে তিনি শরৎকালকেই মস্তকে ধরিতেন, তিনি উজ্জয়িনীর লোক হইলে হেমন্ত ঋতু হইতেই গ্রন্থের প্রথম বর্ণনা ধরিতেন, আর তিনি ইউরোপীয় হইলে শীতকালের প্রথম উল্লেখ করিতেন, তিনি হিন্দুস্থানী হইলে,—বসন্ত ঋতু হইতে গ্রন্থের আরম্ভ করিতেন। কিন্তু তিনি খাঁটী বাঙ্গালী ছিলেন, তাই তিনি গ্রীষ্মকাল হইতে বর্ষ-গণনা আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রাদ্ধে বসন্ত হইতে বর্ষ-গণনা আরম্ভ। অমরে অগ্রহায়ণে বর্ষারম্ভ। প্রাচীন উৎকলে বারমাস্যায় অগ্রহায়ণে বর্ষারম্ভ।

(২) মাসের তারিখ। তিনি বাঙ্গালীর মত সৌরমানে মাসের তারিখ দিয়াছেন; তিনি ১লা আষাঢ় তারিখে মেঘদূত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি রামগিরি, রামগড় বা উজ্জয়িনীর লোক হইলে,—নিশ্চয়ই মালব দেশীয় মাসের দিন গণনার রীতি গ্রহণ করিতেন। তিনি মালবনাথ বিক্রমাদিত্যের পঞ্জিকা গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই লিখিতেন—আষাঢ়শুক্লপ্রতিপদি তিথৌ। তিনি হিন্দুস্থানী জ্যোতিষী হইলে লিখিতেন—মিথুনসংক্রান্তেগতাংশ—একদিনে। আষাঢ়ের ১ম দিন জ্যোতিষের একটা গণ্ডগোলের কথা, কোনও হিন্দুস্থানী-ছাত্রকে "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" এই কথার ব্যাখ্যা করিতে দিলে সে কিছুতেই তাহা বুঝাইতে পারিবে না। বিখ্যাত টীকাকার মল্লিনাথ এই কথার অর্থ বুঝাইতে অনেক বৃথা বাক্যব্যয় করিয়াছেন। "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ"—প্রণেতার "দিবস" ও "তিথির" তারতম্য যে কি বস্তু তাহার উত্তম জ্ঞান ছিল।

* * * *

"আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" কথার অর্থ ১লা আষাঢ়। মল্লিনাথ বাঙ্গালা পঞ্জিকা জানিতেন না, তাই এই কথার ব্যাখ্যা করিতে অনেক বৃথা বাক্যব্যয় করিয়াছেন। তিনি এইরূপ অপব্যাখ্যা নৈষধে "উলুলু" কথার ব্যাখ্যায় করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—উলুলু—মঙ্গলগীতি বিশেষঃ। বাঙ্গালা দেশতত্ত্ব তাঁহার জানা থাকিলে, তিনি লিখিতেন উলুলু—উলুধ্বনি। কালিদাস খাঁটী বাঙ্গালী ছিলেন, বাঙ্গালীর দুই কোটী হিন্দু নরনারীর যাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, সেই বলিবে "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" কথার অর্থ—১লা আষাঢ়। এমন কি বাঙ্গালার একটি বর্ণজ্ঞানহীনা রমণীকে পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিলে সেও এ কথার অর্থ ১লা আষাঢ় বলিবে।

কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন—এ সম্বন্ধে আর কারণ না দিলেও চলে। যেমন মুদ্রিত পুস্তকের আবরক-পত্র দেখিয়া—কে লিখিয়াছে এবং কোথা হইতে লিখিয়াছে বুঝা যায়, যেমন ডাকে পত্র পাইবামাত্র তাহার শিলমোহর দেখিয়া বুঝা যায় যে—এই পত্র কবে কোথা হইতে আসিতেছে, সেইরূপ ঋতুসংহারের প্রথম শ্লোক, শকুন্তলার তৃতীয় শ্লোক, মেঘদূতের দ্বিতীয় শ্লোক পড়িয়াই বুঝা যাইতেছে—ইহা একজন বাঙ্গালীর লেখা।"

কবিভূষণ মহাশয়ের প্রদর্শিত মুখ্য প্রমাণদ্বয়ের অঙ্গহানি করা না হয়, সেজন্য আমরা উহা সবিস্তারে উদ্ধৃত করিলাম। এখন আমাদিগের বক্তব্য লিখিব।

অবান্তর কথা হইলেও প্রথমেই বলা আবশ্যক যে, "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" গণিত-জ্যোতিষের গ্রন্থ নহে,—ইহা একখানা ফলিত জ্যোতিষের গ্রন্থ। তবে উহাতে বৃহজ্জাতক ইত্যাদি প্রসিদ্ধ ফলিত জ্যোতিষের গ্রন্থে যাহা নাই——সেই নক্ষত্র-পরিচয় ও নক্ষত্রের উদয় ও অস্ত দ্বারা রাত্রিলগ্নের পরিমাণ নির্ণয়ের বর্ণনা আছে। "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" গ্রন্থখানির বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, উহাতে গ্রন্থকার নিজকে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব প্রভৃতি কাব্যের প্রণেতা ধন্বন্তরি ক্ষপণক প্রভৃতি দ্বারা গঠিত বিক্রমাদিত্যের সুপ্রসিদ্ধ নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন কালিদাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং নিজের প্রাদুর্ভাবকাল ৫৭ পুঃ খৃষ্টাব্দের সমকালীন বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন। অবিসংবাদিত প্রমাণদ্বারা স্থির হইয়াছে যে, বিক্রমাদিত্যের তথাকথিত নব-রত্ন সভার অমরসিংহ ও বরাহমিহির ৫৭ পুঃ খৃষ্টাব্দের বহু শতাব্দী পরবর্ত্তী ছিলেন। পুরাতত্ত্ববিদেরা অমরসিংহ ও বরাহমিহিরের প্রাদুর্ভাব-কাল খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতক স্থির করিয়াছেন। এই সময় নির্দ্দেশে সন্দেহ করার কোনও কারণ দেখা যায় না। মহাকবি কালিদাসকে এখন প্রত্নতত্ত্ববিৎ কোন পণ্ডিতই খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পরবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করেন না। সুতরাং কিংবদন্তীর নব-রত্ন-সভায় কালিদাসের সহিত বরাহমিহির ও অমরসিংহের যুগপৎ প্রাদুর্ভাব এখন সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়াই বিশেষজ্ঞেরা স্থির করিয়াছেন। এ অবস্থায় "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" গ্রন্থের পূর্ব্বোক্ত উক্তি যে প্রক্ষিপ্ত বা ভাক্ত (Literary forgery) সে বিষয়ে এখন সুধীবর্গের মতদ্বৈধ নাই। পূর্ব্বাপর যেমন অনেক সংস্কৃত কবি কালিদাসের রচনার অনুকরণ করিয়াছেন—তাহাতে অল্পাধিক কৃতকার্য্যতাও লাভ করিয়াছেন—জ্যোতির্ব্বিদাভরণ-প্রণেতাও তাহাই

করিয়াছেন,—আর তাঁহার রচনা কালিদাসের নামে চলে কি না—পরীক্ষা করার জন্য নিজকে রঘুকার কালিদাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যদি নব-রত্ন সভা ও উহার সময়ের উল্লেখ না করিতেন, তাহা হইলে সাধারণের চক্ষে ধূলি দেওয়া চলিলেও চলিতে পারিত; কিন্তু তিনি বেশী আঁটাআঁটি করিতে যাইয়াই কার্য্য নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন;—বিশেষজ্ঞের নিকট তাঁহার উক্তি অসম্ভব সুতরাং রচয়িতার পরিচয় কৃত্রিম বলিয়া গণ্য হইয়াছে। যাহা হউক মহাকবি কালিদাস তাঁহার কাব্যগুলিতে 'স্থানে অস্থানে' (?) জ্যোতিষ জ্ঞানের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তিনি কোন জ্যোতিষগ্রন্থের প্রণেতা না হইলেও, তাঁহার সৌর, সাবন প্রভৃতি মাসের তারতম্য বিলক্ষণ জানা ছিল ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। সুতরাং আমরা কালিদাসের জ্যোতিষ জ্ঞানের কথা স্বীকার করিয়া লইয়াই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

কবিভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—কালিদাস ঋতুসংহারে, মেঘদূতে ও শকুন্তলায় গ্রীষ্ম ঋতু হইতে বর্ষারম্ভ করিয়াছেন। বস্তুতঃ মেঘদূত ও শকুন্তলা সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। মেঘদূতের যক্ষ আষাঢ়ের প্রথম দিবসে মেঘদর্শনে প্রিয়তমার নিকট সংবাদ প্রেরণের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন,—তিনি আষাঢ়ের প্রথম দিবসে অর্থাৎ ভারতের বেদ, স্মৃতি, প্রভৃতি শাস্ত্র ও তদনুযায়ী অমর-কোষ প্রভৃতি গ্রন্থে জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়—এই দুইটি মাসে গ্রীষ্ম ঋতু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া গ্রীষ্ম ঋতুতেই মেঘের দ্বারা প্রিয়তমাকে নিজের সংবাদ জ্ঞাপন করেন। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা বলা যায় না যে, কালিদাস আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে মেঘদূত লিখিতে আরম্ভ করেন কিংবা কালিদাসের মতে আষাঢ় হইতেই বর্ষারম্ভ ধরিতে হইবে। শকুন্তলায় দেখা যায় যে সূত্রধার গ্রীষ্ম ঋতুতে ঐ নাটকাভিনয়ের অবতারণা করিয়াছেন। ইহা দ্বারাও এরূপ বুঝায় না যে, কালিদাস গ্রীষ্ম ঋতু হইতে বর্ষারম্ভ করিয়াছেন। যাহা হউক ঋতুসংহারে যে গ্রীষ্ম ঋতু হইতে বর্ষারম্ভ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা দ্বারা কালিদাসের বাঙ্গালীত্ব প্রমাণিত হয় কি না তাহা দেখা যাউক।

বর্ত্তমান মাস-গণনার আরম্ভ কোথায়?—এই জিজ্ঞাসার উত্তরে ১৩২৯ সালের জ্যৈষ্ঠের "প্রবাসী" পত্রিকার ২১৩ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র-চন্দ্র ভট্টশালী মহাশয় কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ, তৈত্তিরিয় সংহিতা হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে আছে "মধুশ্চ মাধবশ্চ বাসন্তিকাবৃতু, শুক্রশ্চ শুচিশ্চ গ্রৈষ্মাবৃতু, নভশ্চ নভস্যশ্চ বার্ষিকাবৃতু, ইষশ্চোর্জ্জশ্চ শারদাবৃতু, সহশ্চ সহস্যশ্চ হৈমন্তিকাবৃতু, তপশ্চ তপস্যশ্চ শৈশিরাবৃতু" তৈ—স ৪, ৪, ১১০।

নগেন্দ্রবাবু ইহার অনুবাদ করিয়া লিখিয়াছেন—'মধু ও মাধব (চৈত্র ও বৈশাখ) বসন্ত ঋতু, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় গ্রীষ্ম ঋতু, শ্রাবণ ও ভাদ্র বর্ষা ঋতু, আশ্বিন ও কার্ত্তিক শরৎ ঋতু, অগ্রহায়ণ ও পৌষ হেমন্ত ঋতু এবং মাঘ ও ফাল্গুন শিশির ঋতু।' তিনি মন্তব্যে লিখিয়াছেন—"এখানে দেখা গেল—সেই বৈদিক কালের মাসগুলির ও আজকালের মাস গণনার মধ্যে পার্থক্য নাই বাললেই চলে।" আর সংস্কৃত প্রমাণ উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। স্মৃতি, পুরাণ ও অমর-কোষাদির ন্যায় কোষগ্রন্থে ঠিক এইরূপ ঋতুবিভাগই দৃষ্ট হয়। কালিদাস শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইলে তিনিও জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়—এই দুইটি মাসকে গ্রীষ্ম ঋতু বলিয়া স্বীকার না করিয়া পারেন না। তিনি সেরূপ অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসদ্বয় দ্বারা বর্ষারম্ভ করিয়া থাকিলে সেই বর্ষটি কোন্ মতের বর্ষ এবং তিনি কোন্ দেশীয় বলিয়া গণ্য হইবেন? সুতরাং অগত্যা বলিতেই হইবে যে ঋতুসংহারে বর্ণনারম্ভ গ্রীষ্ম ঋতু দ্বারা করিলেও তদ্দ্বারা বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত বৈশাখ দ্বারা বর্ষারম্ভ কালিদাসের স্বীকৃত ও তজ্জন্য তিনি বাঙ্গালী ছিলেন ইহা প্রমাণিত হয় না। যদি কেহ বলেন "নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ" তাই মহাকবি কালিদাস ঋতুবিভাগ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মত অগ্রাহ্য করিয়া, বাঙ্গালার লৌকিক-মতই গ্রহণ করিয়াছেন;—আমরা তদুত্তরে বলিব—তিনি যে সেরূপ করিয়াছেন তাহার কোনই প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে তিনি যে পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র সম্মত ঋতুবিভাগ মান্য করিতেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ কালিদাসের গ্রন্থাবলীতেই রহিয়াছে। আমরা নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি। খুঁজিলে বোধ হয় এরূপ দৃষ্টান্ত আরও পাওয়া যাইবে।

(ক) বাঙ্গালার প্রচলিত মতে ভাদ্র ও আশ্বিন শরৎ ঋতু। শাস্ত্রে আছে—কার্ত্তিকের শুক্লা একাদশী তিথিতে শ্রীহরি অনন্ত-শয্যা হইতে উত্থিত হন। উহার পরবর্ত্তী পূর্ণিমা (প্রসিদ্ধ রাস-পূর্ণিমা) বাঙ্গালার এই প্রচলিত মতে শরৎকালের অন্তর্গত হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতির মতে এই পূর্ণিমাতেই শারদীয় মহারাস-লীলা সংঘটিত হয়। কালিদাস মেঘদূতে যক্ষের মুখে বলিয়াছেন—

"শাপান্তো মে ভুজগ-শয়নাদুত্থিতে শাঙ্গপাণৌ
মাসানন্যান্ সময় চতুরো লোচনে মীলয়িত্বা।
পশ্চাদাবাং বিরহগুণিতং তং তমাত্মাভিলাষং
নির্বেক্ষ্যাবঃ পরিণত-শরচ্চন্দ্রিকাসু ক্ষপাসু॥"

"হরি-শয়নান্তে প্রিয়ে! শাপ অন্ত হবে গো আমার,
বাকি যে চারিটী মাস—চক্ষু মুদি' কাটাইবে তার;
বিরহেতে ভাবি' ভাবি'—মনে যাগে যত আশা যার
মিটাইবে দোহে মিল' জ্যোৎস্নাময়ী শারদ-নিশায়।"

(মৎকৃত পদ্যানুবাদ ২১ পৃষ্ঠা।)

বলা বাহুল্য যে, আশ্বিন ও কার্ত্তিক দুইটি মাস শরৎ ঋতু না ধরিলে শ্রীহরির উত্থানের পরবর্ত্তী রাত্রিগুলির পক্ষে "পরিণত-শরচ্চন্দ্রিকাসু" বিশেষণ কোনরূপেই সঙ্গত হইতে পারে না।

(খ) রাম ও লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ-বিঘ্ন-বিনাশের জন্য তপোবনে গমন করার পূর্ব্বে মাতৃ-চরণে প্রণত হইলে যেরূপ শোভা হইল, তাহার বর্ণনা করিয়া কালিদাস লিখিয়াছেন—

"মাতৃবর্গচরণস্পৃশৌ মুনে
স্তৌ প্রপদ্য পদবীং মহৌজসঃ।
রেজতুর্গতিবশাৎ প্রবর্ত্তিনৌ
ভাস্করস্য মধুমাধবাবিব।"

রঘুবংশ ১১।৭

অর্থাৎ রাম ও লক্ষ্মণ মাতৃগণের চরণ-স্পর্শ করিয়া, মহাতেজস্বী মুনির পদবীর অনুসরণে প্রস্থিত হইলে সূর্য্যের গতি-অনুসারে প্রবর্ত্তিত চৈত্র ও বৈশাখ মাসদ্বয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন। চৈত্র ও বৈশাখ পরস্পর সংযুক্ত ও ঋতুশ্রেষ্ঠ বসন্তের সজ্ঞকে স্বীকার না করিলে কালিদাসের এই উপমার সৌন্দর্য্য বুঝা যায় না। 'মধুমাধবৌ' মাসযুগল বৈদিক-কাল হইতেই ভারতীয়-শাস্ত্রে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। কালিদাসের কাব্যেও তাহাই দেখিতে পাই।

জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যদি কালিদাসের ঋতুসংহারে গ্রীষ্ম-ঋতুর বর্ণনা দ্বারা গ্রন্থারম্ভ করায় কালিদাসের মতে বৈশাখমাসে বর্ষারম্ভ প্রমাণিত না হয়—তাহা হইলে উহার আর কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। এ কথার উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে আমাদিগের দেখা কর্ত্তব্য—কালিদাস তাঁহার কাব্যগুলিতে সর্ব্বত্রই গ্রীষ্মের বর্ণনাদ্বারা ষট্ ঋতুর বর্ণন আরম্ভ করিয়াছেন কি না?

সকলেই জানেন কালিদাস আদিরসের বর্ণনায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বিরহের 'বার মাস্যার' ন্যায় কালিদাস, ভর্ত্তৃহরি প্রভৃতির কাব্যে বিলাসের ও 'বার মাস্যা দেখা যায়। রঘুবংশের উনবিংশ সর্গে কালিদাস অযোধ্যাধিপতি অগ্নিবর্ণের যে ষট্ ঋতু-সমুচিত বিলাস-বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে প্রথম প্রাবৃট বা বর্ষার ও তৎপরে যথাক্রমে শরৎ, হেমন্ত, শিশির, বসন্ত ও গ্রীষ্মঋতুর সমুচিত বিলাস বর্ণিত হইয়াছে। কালিদাসই আবার মেঘদূতের উত্তর-মেঘে অলকা-পুরীতে সকল ঋতুর পুষ্প-সম্ভারের যুগপৎ সুলভতা সূচিত করার উদ্দেশ্যে লিখিয়াছেন—

"হস্তে লীলা-কমলমলকং বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্র-প্রসব-রজসা পাণ্ডুতা মাননেশ্রীঃ।
চূড়া-পাশে নবকুরবকং চারু-কর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপসমজং যত্র নীপং বধূনাম্॥"
"করে পদ্ম, অভিনব কুন্দ রাজি শোভিত কুণ্ডলে,
লোধ্র-পুষ্প-পরাগে যে পাণ্ডুকান্তি সুন্দর বদন,
কেশ-পাশে কুরবক, শ্রবণে শিরীষ চারু দোলে,
বর্ষার কদম্ব যথা সুন্দরীর সীমন্ত ভূষণ!"

(সংস্কৃত পদ্যানুবাদ ১৮ পৃষ্ঠা)

মল্লিনাথ প্রভৃতি সকল টীকাকারের মতেই এ শ্লোকে কবির অভিপ্রায় এই যে, শরতের পদ্ম, হেমন্তের কুন্দ, শিশিরের লোধ্র-কুসুম, বসন্তের কুরবক, গ্রীষ্মের শিরীষ ও বর্ষার কদম্ব অলঙ্কার সকল ঋতুতেই সুলভ অর্থাৎ অলকায় ষটঋতুর পুষ্প-সম্ভার যুগপৎ বর্ত্তমান।

কালিদাসের জন্ম-ভূমি যেখানেই হউক না কেন, তিনি যে মালব রাজসভায় কিছুকাল ছিলেন, এই প্রসিদ্ধ কিম্বদন্তী অমূলক মনে করার কোন কারণ পাওয়া যায় নাই। কবি-শ্রেষ্ঠ ভর্ত্তৃহরিও কিম্বদন্তী অনুসারে মালবরাজ বিক্রমাদিত্যের অগ্রজ ছিলেন। তিনি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'শৃঙ্গার-শতক' নামক কাব্যে ষট্-ঋতু সমুচিত বিলাস-বর্ণনা করিতে যাইয়া প্রথমেই বসন্তের ও তৎপরে যথাক্রমে গ্রীষ্মাদি অবশিষ্ট ঋতুগুলির বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং বলিতেই হইবে যে তিনিও মালবের পঞ্জিকা মানিয়া প্রথমেই অগ্রহায়ণ অর্থাৎ হেমন্তের বর্ণনা করেন নাই। রঘুবংশে ও মেঘদূতে যথাক্রমে বর্ষা ও শরতের বর্ণনা প্রথমে সন্নিবেশিত করায় কোনও স্পষ্ট কারণ আমরা খুঁজিয়া পাই নাই। কাল্পনিক কারণ অবশ্যই অনুমান করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহাই যে কালিদাসের অভিপ্রেত—সেরূপকোন নিশ্চিত প্রমাণ না থাকায় তাহা প্রমাণরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে না। বিলাসী অগ্নিবর্ণের পক্ষে যোগ্যতম বলিয়া প্রাধান্য দিবার ইচ্ছা থাকিলে, কালিদাস বসন্তঋতুর দ্বারা আরম্ভ অথবা 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'—নীতি-অনুসারে বসন্ত দ্বারা শেষ করিতেন। অলকার বর্ণনা সম্বন্ধেও সেই কথাই খাটে। সে যাহা হউক—পূর্ব্বোক্ত বর্ণনার আর যাহাই উদ্দেশ্য থাকুক না কেন—কবিভূষণ মহাশয়ের লিখিত বৈশাখের দ্বারা বর্ষারম্ভ সূচিত করার কোন উদ্দেশ্য তাহাতে থাকিতে পারে না—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতেই হইবে। পূর্ব্বোক্তরূপ জ্যৈষ্ঠমাসে সর্ব্ব-বাদি সম্মত গ্রীষ্ম-ঋতুর আরম্ভ স্বীকার করিলে, কালিদাস সর্ব্বশেষে ঋতু-শ্রেষ্ঠ বসন্তের মধুর বর্ণনা দ্বারা কার্য্য শেষ করিবেন বলিয়াই ঋতু-সংহারে প্রথমে গ্রীষ্মের বর্ণনা সন্নিবেশিত করিয়াছেন—অনুমান করিলে বোধ-হয় অসঙ্গত হইবে না। এরূপ করার পক্ষে অন্য কারণও আছে। ইহা প্রসিদ্ধ কথা যে, ভারতে প্রাচীন সংবৎ অপেক্ষা শকের প্রচলন অধিক ছিল। বর্ত্তমান বাঙ্গালা ১৩৩০ সালের সমপরিমিত (Corresponding) ১৮৮৫ শকে ১৯৮০।১৯৮১ সম্বৎ বটে। জ্যোতিষিক গণনায় সৌর বৈশাখের আদি হইতে শকাব্দের ও চৈত্রের শুক্ল প্রতিপৎ হইতে সংবতের গণনা আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমান শকের বৈশাখ অবধি কার্ত্তিকের শেষ পর্য্যন্ত ১৯৮০ সংবতের মধ্যে ও অগ্রহায়ণ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১৯৮১ সংবতের মধ্যে পতিত হইয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান শকাব্দ মধ্যে যে ১৯৮০।১৯৮১ এই দুইটি সংবতের অংশ পতিত হইয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যায়। প্রাচীন বহুসংখ্যক শিলা-লিপিতেই শকাব্দের ব্যবহার দেখা যায়; এমন কি খৃষ্টীয় ৪র্থ ও ৫ম শতকের মধ্যবর্ত্তী মালবের অধিকাংশ শিলালিপিতেই সংবতের পরিবর্ত্তে শক ব্যবহৃত হইয়াছে। কবিভূষণ মহাশয়ের প্রবন্ধের শেষ দফায় উল্লিখিত পাটলিপুত্রের শিলা-লিপি অনুসারে ৩২০ খৃষ্টাব্দে কালিদাস বর্ত্তমান থাকিলে তিনিও শকাব্দের গণনা-প্রণালী অনুসারে বৈশাখ হইতেই বর্ষারম্ভ স্বীকার করিতেন—এরূপ অনুমান করিলে অসঙ্গত হইবে না। বৈশাখ মাসটিকে যে শাস্ত্রীয় মতানুসারে কালিদাস বসন্ত ঋতুর অন্তর্গত বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি; এ অবস্থায় বসন্ত ঋতুর দ্বারা বর্ণনারম্ভ করিলেও বৈশাখের সহিত চৈত্রকে টানিয়া আনিতে হইত এবং সেই জন্যই বর্ষারম্ভের সহিত উহা সামঞ্জস্য-

যুক্ত হইত না ; অধিকন্তু তাহাতে "ন হি সুখং দুঃখৈ বিনা লভ্যতে' ও 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' এই কবি-সিদ্ধ নীতি-দ্বয়েরও ব্যত্যয় ঘটিত। জ্যৈষ্ঠ মাস অর্থাৎ গ্রীষ্ম ঋতুর দ্বারা বর্ণনারম্ভ করায়—উহা বর্ষারম্ভের সহিত সামঞ্জস্য-যুক্ত না হইলেও তাহাতে অন্য দুইটি উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং ঋতুসংহারে গ্রীষ্ম ঋতুর দ্বারা বর্ণনারম্ভ করাই অধিক সমীচীন মনে হয়।

কবিভূষণ মহাশয়ের প্রদর্শিত ২য় মুখ্য প্রমাণটির গুরুত্বও আমরা বুঝিতে পারি নাই।

জ্যোতিষ-শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ কালিদাস যে সৌর মাস ও সৌর দিন-গণনার পদ্ধতি জানিতেন না এবং বাঙ্গালী ব্যতীত আর কেহ যে, বৈশাখ হইতে সৌর বর্ষারম্ভ ও সৌর দিন-গণনার ব্যবহার করেন না—ইহার কি প্রমাণ আছে? যদি তর্কস্থলে স্বীকারও করা যায় যে, কালিদাস তিথি-অনুযায়ী মাস অর্থাৎ চান্দ্রমাস ব্যতীত অন্য মাস ব্যবহার করিতেন না, তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি? তিনি যদি পহেলা আষাঢ় বলিতে আষাঢ়ের শুক্ল-প্রতিপদ্‌ই বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলেও ত এক একটা তিথি প্রায় এক অহোরাত্রের সম-পরিমিত বলিয়া 'আষাঢ়ের শুক্ল প্রতিপদ্ তিথিতে' এই পল্লবিত-বাক্যের পরিবর্ত্তে প্রায় সমার্থক 'আষাঢ়ের প্রথম দিবসে' বাক্যটি ব্যবহার করিতে পারেন। তার পরে মেঘদূতের ২য় শ্লোকের 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' বাক্যটির পাঠ ও অর্থ লইয়া টীকাকারদিগের মধ্যে যে বিষম বিতর্ক আছে, তাহা মল্লিনাথের টীকার পাঠকবর্গের অবিদিত নহে। কবিভূষণ মহাশয় সন্দিগ্ধ-বাক্যটির প্রকৃত পাঠ ও অর্থ কি হইবে তাহা বিচার না করিয়াই মল্লিনাথের ব্যাখ্যাকে অপব্যাখ্যা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। মল্লিনাথের ভ্রম-প্রমাদ হইতে পারে না—এমন কথা কেহই বলিবেন না; কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যার দোষ দেখাইতে হইলে কথাটা একটু ভালরূপে বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। মেঘদূতের ২য় শ্লোকে আছে যে যক্ষ "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" রামগিরির সানু-দেশে দৃপ্ত গজ-রাজের ন্যায় স্নিগ্ধ-শ্যামল একটা মেঘ দেখিলেন। ৩য় শ্লোকে আছে,—"প্রত্যাসন্নে নভসি দয়িতাজীবিতালম্বনার্থং" ইত্যাদি, অর্থাৎ শ্রাবণ প্রত্যাসন্ন হইয়াছে,—তাই প্রিয়ার জীবন রক্ষার জন্য যক্ষ মেঘের দ্বারা তাঁহার নিকট নিজের কুশলবার্ত্তা পাঠাইতে সমুৎসুক হইলেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, পহেলা আষাঢ় তারিখে 'শ্রাবণ প্রত্যাসন্ন' অর্থাৎ নিকটবর্ত্তী হইয়াছে—ইহা বলা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? এই কল্পিত বিরোধ পরিহারের জন্য কতিপয় টীকাকার যয় শ্লোকের "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" পাঠের পরিবর্ত্তে কোনও কোনও হস্ত-লিপি পুঁথির লিখিত "আষাঢ়স্য প্রশম দিবসে" পাঠই সমীচীন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মল্লিনাথ "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" পাঠ স্বীকার করিয়াই সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন। পূজ্যপাদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার মেঘদূতের পাঠ-বিবেকে মল্লিনাথের ব্যাখ্যাসম্বন্ধে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। ইহাতেই বোধ হয় যে তিনি মল্লিনাথের ব্যাখ্যায় কোনও অসঙ্গতি দেখিতে পান নাই। মল্লিনাথ আপত্তিকারীদিগের বিতর্ক খণ্ডনজন্য বলিয়াছেন যে, মেঘদূতের উত্তর-মেঘে যক্ষ বলিয়াছেন,—

"শাপান্তো মে ভুজগশয়নাদুত্থিতে শাঙ্গপাণৌ
মাসানন্যান্ গময় চতুরো লোচনে মীলয়িত্বা।"

অর্থাৎ শ্রীহরি অনন্ত-শয়ন হইতে উত্থিত হইলে আমার শাপান্ত হইবে; (অতএব) চক্ষু বুজিয়া (কোনও মতে) বাকী চারিটা মাস কাটাইবে। শাস্ত্র-অনুসারে কার্ত্তিকের শুক্লা-একাদশীতে শ্রীহরি অনন্ত-শয্যা হইতে উত্থিত হন—এজন্যই পঞ্জিকায় উক্ত একাদশী "উত্থান-একাদশী" বলিয়া প্রসিদ্ধ। আষাঢ়ের "প্রথম দিবসে" পাঠ হইলে আষাঢ়ের শুক্লা প্রতিপৎ হইতে কার্ত্তিকের শুক্লা একাদশী পর্য্যন্ত ৪ মাস ১০ দিন ব্যবধান হয়। "প্রশম দিবসে" পাঠ ধরিলে শ্রাবণের প্রথম হইতে কার্ত্তিকের শুক্লা একাদশী পর্য্যন্ত ব্যবধান ৩ মাস ১০ দিন। সুতরাং "প্রথম দিবসে" পাঠ ধরিলে যেমন পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকের চারিমাস কাল হইলে ১০ দিন বেশী হয়, "প্রশম দিবসে" পাঠ করিলেও তেমন চারি মাস হইতে ২০দিন কম হয়। মল্লিনাথ বলেন যে উভয়রূপ পাঠেই যখন দিনের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না—তখন আষাঢ় মাসটি সম্পূর্ণ গত করিয়া যক্ষের মেঘ-দর্শন কল্পনা করার কোনই হেতু নাই। প্রকৃত পক্ষে শ্রীহরির অনন্ত-শয্যা হইতে উত্থানের অর্থাৎ শাপাবসানের চারিমাস কাল বাকী আছে—ইহা বলাই কবির অভিপ্রেত; তিথি বা তারিখ ধরিয়া সূক্ষ্ম গণনা কবির অভিপ্রেত নহে—সুতরাং "প্রথম দিবসে" স্থলে "প্রশম দিবসে" পাঠ কল্পনা সমীচীন নহে।

আমাদের মতে মল্লিনাথের তর্ক অখণ্ডনীয়। এখানে বলা আবশ্যক যে, সকল টীকাকারই পশ্চিমাঞ্চলের রীতি অনুসারে শুক্লা প্রতিপৎ তিথি হইতেই মাসের আরম্ভ ধরিয়াছেন।

কবিভূষণ মহাশয় "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" বাক্যের যে বাঙ্গালার পঞ্জিকামতে ১লা আষাঢ় অর্থ করেন, তারা স্বীকার করিলেও পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের 'প্রত্যাসন্ন শ্রাবণের' সহিত পুরা একটা মাসের ব্যবধান হওয়ার অসঙ্গতি অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। এতদ্ভিন্ন ১লা আষাঢ় তারিখে শুক্লা বা কৃষ্ণা কোন্ তিথি—তাহার কোন নিশ্চয়তা বা উল্লেখ না থাকায় তদবধি কার্ত্তিকের শুক্লা একাদশী তিথি পর্য্যন্ত কিরূপে চারিমাস কাল ব্যবধান আছে—তাহা বুঝিবার কোনও উপায় না থাকায়—মহাকবির উক্তি অবোধ্য ও অযৌক্তিক হইয়া পড়ে। আমাদের বিবেচনায় এরূপ একটি সন্দিগ্ধ পাঠ-ভেদের উপর এত বড় একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করিতে যাওয়া নিতান্তই দুঃসাহসের কার্য্য। কবি-ভূষণ মহাশয়ের স্বীকৃত অর্থ তর্ক-স্থলে প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিলেও কালিদাসের পক্ষে সৌর দিন গণনা অনুসারে 'পহেলা আষাঢ়' বাক্যটি বাঙ্গলার প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করার কোন বাধা দেখা যায় না; তর্ক-স্থলে উহা কালিদাসের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া স্বীকার করিলেও আষাঢ়ের শুক্ল প্রতিপদ্ অর্থ বুঝাইতে 'পহেলা আষাঢ়' বাক্যটির ব্যবহারেও আমরা কোন অসঙ্গতি দেখিতে পাই না; অতএব কবিভূষণ মহাশয় বিশেষ দৃঢ়তার সহিত উপস্থাপিত করিলেও, দুঃখের বিষয় যে, আমরা তাঁহার মুখ্য প্রমাণদ্বয়ের যথার্থতা স্বীকার করিতে পারিতেছি না।

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীনরেন্দ্র দেব

১। ইনস্যুলীন্

বিশ্বমানবের হিতসাধন করেছেন বলে ডাক্তার ফ্রেডরিক্ গ্র্যাণ্ট্ ব্যাণ্টিং এবার "নোবেল প্রাইজ্" পেয়েছেন। বহুমূত্র ব্যাধি এতদিন দুরারোগ্য ছিল। দেশ-বিদেশের বহু মনীষী মেধাবী পণ্ডিত এই

ডাক্তার ফ্রেড্রিক গ্র্যাণ্ট ব্যাণ্টিং

ইনস্যুলীনের প্রয়োগ

ইনস্যুলীন্

কাল ব্যাধির আক্রমণে অকালে ইহলোক হ'তে অপসারিত হ'য়েছেন। এই দুশ্চিকিৎস রোগে ভারতবর্ষের যে ক্ষতি হয়েছে তা অপরিমেয়। ডাক্তার ব্যাণ্টিং এতদিন পরে এই রোগের এক মহৌষধ আবিষ্কার ক'রেছেন। ব্যাণ্টিং একজন ক্যানেডিয়ান চাষার ছেলে, বয়স সবে ৩১ বৎসর। মাত্র ছয় বৎসর আগে তিনি ক্যানেডার মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ ক'রে বেরিয়েছেন। ডাক্তারী পাশ করবার পরই তিনি গত য়ুরোপীয় যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন! যুদ্ধে আহত হয়ে ফিরে আসবার পর তিনি ক্যানেডা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসায়নিক পরীক্ষাগারে একজন সামান্য সহকারী পরিচারকরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

ডাক্তার ব্যাণ্টিংয়ের আবিষ্কৃত বহুমূত্র ব্যাধির ঔষধের নাম "ইন্স্যুলীন্।" ইনস্যুলীন্ লাটিন কথা—অর্থ হচ্ছে "দ্বীপ।" পশু অন্ত্রস্থ যে কোষমণ্ডলের রস থেকে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়, চিকিৎসাশাস্ত্রে তার নাম হচ্ছে "ল্যাঙ্গার্হ্যান্স্ দ্বীপ-

পুঞ্জ" (Islands of Langerhans) তাই থেকেই এর নামকরণ হয়েছে 'ইন্‌স্যুলীন্‌'। এই ঔষধ সূচাগ্রে ত্বক ভেদ ক'রে রোগীর দেহের মধ্যে প্রয়োগ করা হয়। য়ুরোপ ও আমেরিকার বড় বড় হাসপাতালে এই ঔষধের পরীক্ষা হ'য়ে গেছে। প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, বহুমূত্র রোগ থেকে যদি কোনও ওষধ মানুষকে বাঁচাতে পারে, তবে সে একমাত্র এই 'ইনস্যুলীন্‌!'

২। পূর্ব্ব জন্মের প্রমাণ

ডারউইনের 'বিবর্ত্তনবাদ' পড়বার পর 'চৌরাশী লক্ষ

যোনী' ভ্রমণ ক'রে তবে মনুষ্যজন্ম লাভ হয় এ'কথাটাকে একেবারে নিছক গাঁজার প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিতে এখন অনেকেই ইতস্ততঃ করেন। কথাটা যে খুবই সত্য, জীবতত্ত্ববিদেরা সেটা নানাদিক দিয়ে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। মানবদেহ বিশেষ লক্ষ্য ক'রে দেখ্‌লে সে যে এককালে জলচর, খেচর ও ভূচর প্রভৃতি জন্তু ছিল, মানুষের সেই সব পূর্ব্ব জন্মের বহু প্রমাণ এখনও তার দেহের গঠনের মধ্যে সুস্পষ্ট দেখ্‌তে পাওয়া যায়। খেচরের তৃতীয় আঁখিপল্লবের চিহ্ন এখনও মানুষের চখের কোণের ক্ষুদ্রতম ও সূক্ষ্ম চর্ম্মাবরণটুকুর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। মানুষের মস্তকের পশ্চাদ্‌ভাগে যে 'পাইনীয়াল' চর্ম্মগ্রন্থিটি আছে (Pineal Gland) সেটি পুরাকালের তৃতীয় চক্ষুর অস্তিত্বের প্রমাণ।

পূর্ব্ব জন্মের প্রমাণ

যে মাংসপেশীর সাহায্যে মানুষ নানারকম মুখভঙ্গী করতে পারে, কেউ কেউ তাঁদের কানও নাড়তে পারেন, তারসঙ্গে

ভ্রূকুঞ্চন ও ললাটের চর্ম্ম প্রসারণ করবার শক্তিটাও মানুষের প্রাচীন পশুজন্মের পরিচয়টাই সপ্রমাণ ক'রে দেয়। মানুষের কানের গঠন বানর ও বনমানুষ প্রভৃতি পশুর সঙ্গে অবিকল মিলে যায়। কর্ণমূলের অভ্যন্তরস্থ শ্রবণ-নালী মাছের কান্‌কোর রূপান্তর মাত্র। হাতের পায়ের নখ সেই পশুজন্মের থাবার কথা স্মরণ করিয়া দেয়। দীর্ঘকাল ধরে জামা কাপড় প'রতে শিখে মানুষের গায়ের লোম প্রায় বিরল হ'য়ে এসেছে, কেবল শরীরের যেখানে যেখানে গাত্রাবরণের ঘর্ষণ লাগবার সুযোগ হয়নি সেই সেই স্থানগুলি এখনও রোমাকীর্ণ হ'তে দেখা যায়। মানুষের উদরাভ্যন্তরস্থ 'এ্যাপেন্‌ডিক্স্'টি বৃক্ষভোজী পশুর অতিরিক্ত পাকস্থলীর চিহ্নাবশেষ মাত্র। মেরুদণ্ডের নিম্নে লাঙ্গুলাস্থি গোপন হ'য়ে আছে। চরণাস্থির সঙ্গে করাস্থির সমান গঠন চতুষ্পদের চিহ্ন জ্ঞাপক। হাতের আঙুলের মতো কতকটা মুঠা করে পায়ের অঙ্গুলের দ্বারা কিছু ধরতে পারাটা জীবজন্মের অভ্যাসের ফল!

৩। চীনের বাদাম

চীনের বাদাম আমরা সখ করে কখনও কখনও খাই, কিন্তু আমেরিকায় চীনের বাদাম একটা প্রধান খাদ্য। শুধু খাদ্য নয়, চীনের বাদাম আমেরিকায় কৃষিবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাক্তার জর্জ্জ ডব্লিউ কার্ভারের সুদীর্ঘ অধ্যবসায় ও পরীক্ষার ফলে, উপস্থিত তাদের শতাধিক প্রয়োজনে ব্যবহার হচ্ছে। চীনের বাদামের দুধ ও মাখন, চীনের বাদামের আটা, বিস্কুট, কেক্, মোণ্ডা, হিমানী-ক্ষীর (Ice Cream), পনীর, শস্, মার্গারীন্ প্রভৃতি দেড়শ' রকম ভোজ্য দ্রব্য ছাড়া চীনের বাদাম থেকে খাবার ও মাখবার তৈল, পশুদের পোষ্টাই খাদ্য, এবং নানাবিধ রাসায়নিক পদার্থও প্রস্তুত হচ্ছে—যেমন নয়প্রকার কাঠের পালিশ, উনিশ রকম চামড়ার রং, ধাতুরঞ্জন, চর্ব্বি, কাপড় কাচা ও গায়ে মাখা সাবান, লেখবার কালি, ট্যানিক্ এ্যাসিড, ও গ্লিসারীণ প্রভৃতি।

ডাক্তার কার্ভার এখনও চীনের বাদাম নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছেন, তিনি আশা করছেন শীঘ্রই চীনের বাদাম থেকে কতকগুলি অমূল্য ঔষধও আবিষ্কার করবেন। চীনের বাদামের শক্ত খোলা ভাঙবার পর বাদামের গায়ে যে পাতলা লাল ছালটি ঢাকা থাকে, ডাক্তার কার্ভার
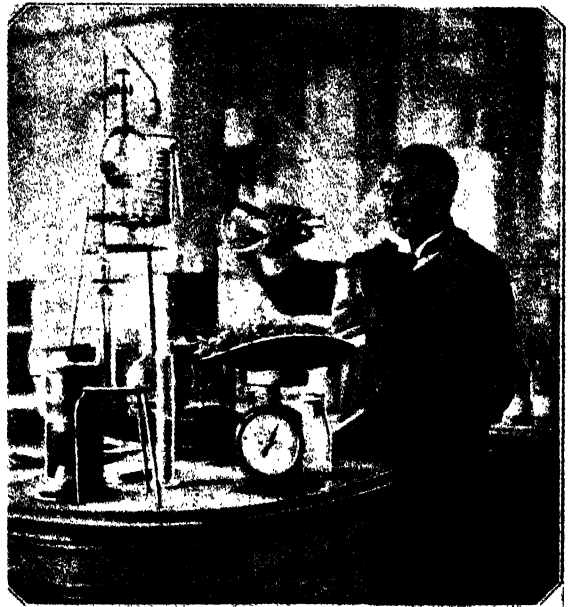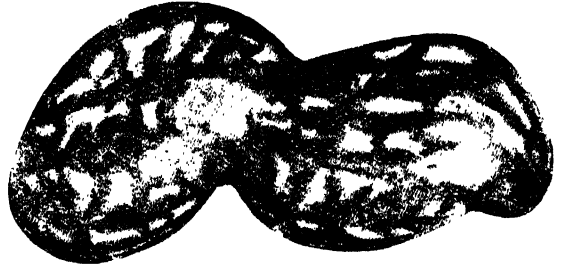
চীনের বাদামের দুগ্ধ
(প্রোঃ কার্ভার চীনের বাদাম থেকে দুধ তৈরি ক'রছেন)

তাই থেকে সম্প্রতি 'কুইনিন' তৈরি ক'রতে পেরেছেন। তাঁর প্রস্তুত চীনের বাদামের দুধ গরুর দুধের চেয়ে মিষ্ট ও সুস্বাদু এবং বারোগুণ বেশী উপকারী।

৪। নূতন নীড়েন

ক্ষেত বা বাগান থেকে আগাছা তুলে ফেল্‌বার জন্য আর হেঁট হ'য়ে বা উবু হ'য়ে বসে কাজ ক'রে কোমর পিঠ টাটিয়ে তোল্‌বার দরকার হবে না। এক রকম নূতন নীড়েন তৈরী হ'য়েছে, সেটি হাতে করে ক্ষেতে বা বাগানে বেড়াতে বেড়াতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আগাছা উপড়ে ফেলা

চল্‌বে। একগাছা ছড়ির মুখে দুটো লোহার লম্বা লম্বা কাঁটাদাঁত আঁটা আছে। কাঁটা দুটোর মুখের কাছাকাছি একটু ওপরে একটা হুড়কো লাগানো আছে। আগাছার

নূতন নীড়েন

গোড়ায় কাঁটার মুখ চেপে ঢুকিয়ে দিয়ে ছড়িতে টান দিলে হুড়কোয় আটকে আগাছা আপনি উপ্‌ড়ে আসে!

চুলে ঢেউ খেলানো

৫। কেশের কসরৎ

য়ুরোপের মেয়েরা সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য সতত লালায়িত। রূপ ক্রয় করবার জন্য তারা অকাতরে অর্থব্যয় করতে প্রস্তুত, কারণ শারীরিক সৌন্দর্য্যের উপর তাদের ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করে। নারীর সৌন্দর্য্যের একটা প্রধান অঙ্গ হ'চ্ছে তার কুঞ্চিত কেশদাম। তাই কুন্তলের কমনীয়তা ও দেহের লাবণ্য বৃদ্ধির জন্য সে দেশে অনেক কল-কারখানা স্থাপিত হয়েছে। মাথার চুল চিরকাল কোঁকড়ান ক'রে রাখ্‌বার জন্য যত প্রকার বৈদ্যুতিক কেশ-কুঞ্চন যন্ত্র উদ্ভাবিত হ'য়েছে, তার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
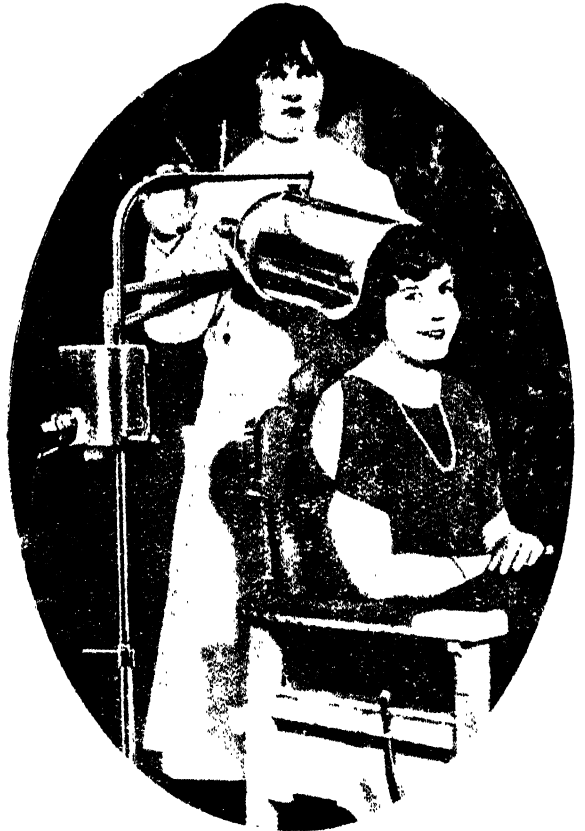
রূপী-টুপি

হ'চ্ছে 'মেডুশা'। এই যন্ত্রটি ঝাড়ের মতো উপর থেকে ঝোলে, ঠিক তার নিচের একখানি চেয়ারে সৌন্দর্য্যাভিলাষিণীকে বসিয়ে তাঁর মাথার কেশগুচ্ছকে যন্ত্রসংলগ্ন ছোট ছোট কুঞ্চন-দন্তে পাকিয়ে ঢেউখেলানো আরকে ভিজিয়ে ফ্লানেল জড়িয়ে বায়ুপ্রবেশহীন নলের মধ্যে পুরে সাত মিনিটকাল

চুল কোঁকড়াবার ঝাড়

উত্তাপ দিতে হয়। তারপরই নলাভ্যন্তরস্থ কুঞ্চনদন্ত থেকে কেশগুচ্ছ মুক্ত ক'রে আঁচড়ে ছেড়ে দিলেই চমৎকার কোঁকড়া চুল চিরস্থায়ী হ'য়ে যায়। আর একরকম যন্ত্র আছে, তাতে মাত্র এক হপ্তার জন্য মাথার চুল কোঁকড়ানো থাকে। এতে বেশী হাঙ্গামা নেই, এক গ্লাস জলে মাথার চুল ভিজিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে এই যন্ত্রের সাহায্যে জলটুকু শুকিয়ে নিলেই চুলগুলি ঢেউখেলানো থেকে যায়। স্নানের পর কোঁকড়ানো ভিজে চুল চট্ করে শুকিয়ে নেবার জন্য একরকম 'রূপী-টুপি' বেরিয়েছে। ভিজে চুলের উপর এই টুপি চাপা দিয়ে বৈদ্যুতিক উত্তাপে উষ্ণ বায়ু সঞ্চারিত করে অল্পক্ষণের মধ্যে চুল শুখিয়ে ফেলা হয়। প্যারিসে একরকম 'রূপ-দীপ' বেরিয়েছে। এই দীপের তীব্র উজ্জল

রূপ-দীপ

নীল আলোকরশ্মি দেহ ও কুন্তলের উপর কিছুক্ষণ বিকীর্ণ ক'রলে চোখ মুখের রং একেবারে তরুণ অরুণাভ হ'য়ে ওঠে। মাথার চুলগুলি রেশমের মত চিকণ দেখায়। নবযৌবনের পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য যেন যাদুবলে আবার সর্ব্বাঙ্গে ফুটে ওঠে! তবে এ পরিবর্ত্তন চিরস্থায়ী হয় না।

৬। জল-সাইকেল

এই সাইকেল বা পা-গাড়ী পথে চলে না, কিন্তু জলে চলে। সমুদ্রে স্নান করবার সময় আজকাল এই জল-সাইকেল চড়া একটা ফ্যাসান হয়ে উঠেছে। জলে চলবার

জল সাইকেল

সময় গাড়ীর সবটাই জলের মধ্যে ডুবে থাকে, কেবল সামনের আর পেছনের হাওয়া-ভরা বায়ু-পাত্র দুটি ভাস্‌তে থাকে। পাদানী চালাবার সঙ্গে সঙ্গে একখানি তিনডেলে দাঁড় ঘুরতে থাকে, আর জল-সাইকেল জলের মধ্যে চল্‌তে সুরু করে। ডাইনে বাঁয়ে গাড়ী ঘোরাবার জন্য হাতল ধরে' সেইদিকে ফেরাতে হয়; হাতলের প্রান্তে হাল আঁটা আছে ব'লে সেই হ'চ্ছে গাড়ীর গতি-নিয়ামক। বায়ুপাত্র আঁটা আছে বলে এ গাড়ীর কলকব্জা খারাপ হ'য়ে গেলেও আরোহীর জলে ডুবে মরবার আশঙ্কা নেই।

৭। আব্‌রু-দ্বার

"বাড়ীতে কে আছেন?" বলে সদরে ক্রমাগত কড়া-নাড়া ও মহা ডাকাডাকি প'ড়ে গেলেও কর্ত্তা বা অপর পুরুষ কেউ বাড়ীতে না থাকলে গিন্নীরা প্রাণ গেলেও দরজা খোলা তো দূরে থাক সাড়া পর্য্যন্ত দেন না। সেই সব লাজুক গিন্নীদের জন্যে একরকম 'আব্‌রু-দ্বার' আবিষ্কৃত হ'য়েছে। এই দ্বারের তলদেশে একটা গুপ্ত ছিট্‌কিনি লাগানো আছে, গৃহিণী ইচ্ছা করলে দ্বার যতটুকু মাত্র মুক্ত করবার অভিলাষ কর্বেন, তাই করতে পার্বেন তাঁর চারু চরণের ঈষৎ চাপে! আগন্তুক কিছুতেই বাইরে থেকে ধাক্কা দিয়ে দরজা তার বেশী আর খুলতে পারে না, কারণ সেই ছিট্‌কিনীটি মেঝের সঙ্গে এঁটে গিয়ে গৃহদ্বার দুর্ভেদ্য করে তোলে। সেই ইচ্ছামত ঈষৎ উন্মুক্ত দ্বারপথে লাজুক গৃহিণী নবাগতের

আব্‌রু দ্বার

পরিচয় নিয়ে তাকে কর্ত্তাদের খবর জানিয়ে দিতে পারেন।

৮। দন্তরোগে দৃষ্টি-হীন—

দাঁতের দোষ থেকে যে সব রকম ব্যাধির উৎপত্তি হ'তে পারে, একথা আজকাল সকল শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকেই স্বীকার ক'রছেন। স্বাস্থ্যের সঙ্গে দন্তের যে অতি নিকট সম্বন্ধ, এতে আর কোনও ভুল নাই। বৈজ্ঞানিকেরা এই সত্য সপ্রমাণ করেছেন। খাদ্য পরিপাক করবার জন্য দন্তের সাহায্য একান্ত আবশ্যক। ভুক্ত পদার্থ উত্তম রূপে চর্ব্বিত না হ'লে পাকস্থলীর পাচক রস উক্ত খাদ্য সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ ক'রতে পারে না। পরিপাক মন্দ হ'লে অজীর্ণ, অম্লরোগ, উদরাময়, মাথা ধরা, মাথা ঘোরা, দুর্ব্বলতা এসব তো প্রায়ই হ'তে দেখা যায়; তাছাড়া আরও এমন সব রোগ হয় যা আনাড়ী লোকেরা ধারণাও ক'রতে পারে না যে, দাঁতের সঙ্গে এসব রোগের কোনও সম্পর্ক আছে!

শ্রীমতী ক্যাথারীন ব্রাইডেন
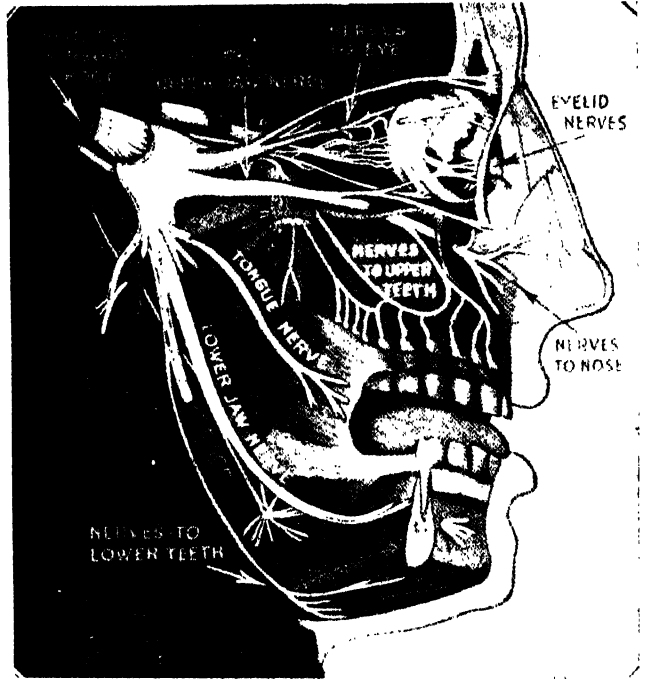
দাঁত ও নাক, মুখ, চোখ, কান কণ্ঠ প্রভৃতির নিকট সম্বন্ধ

বাত, মূত্রাশয়ের রোগ, পাকস্থলীর মধ্যে নালীঘা ও কর্কট রোগ, শ্বাসকণ্ঠ, যক্ষ্মা, কণ্ঠনালীর ঘ, গলায় বিচী ওঠা, নাকে ঘা, এ সমস্তই দাঁতের রোগ থেকে জন্মায়! সম্প্রতি জানতে পারা গেছে যে দাঁতের দোষে মানুষ দৃষ্টিহীন পর্য্যন্ত হ'তে পারে। ক্যাথারিন ব্রাইডেন নামে জনৈক মহিলা দাঁতের ব্যায়রামে অনেকদিন ধরে ভুগছিলেন---অল্প বয়সেই তাঁর দৃষ্টি-শক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছিল এবং যৌবনে পদার্পণ করবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দৃষ্টিহীন হ'য়ে পড়েছিলেন। নানারকম চিকিৎসা করেও তবু তিনি চক্ষের দৃষ্টি-শক্তি ফিরে পাননি! এখন তাঁর বয়স সবে মাত্র তেইশ। দাঁতের যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে তিনি সম্প্রতি তাঁর দাঁতগুলি সব তুলিয়ে ফেলেছেন। দাঁতের জন্যে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়েছিল, অজীর্ণ রোগে তাঁর ওজন প্রায় ১৫ সের কমে গেছল;—বারোমাস সর্দ্দি কাশী আর গলার ব্যথায় তিনি ভুগতেন। কিন্তু দাঁত তুলিয়ে ফেলবার পর থেকে—তাঁর শরীরের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন উপস্থিত হ'ল; তাঁর বারমাসের সর্দ্দি, কাশী, গলার ব্যথা তো একেবারে সেরে গেলই, তা ছাড়া অজীর্ণ রোগ আরাম হ'য়ে তাঁর নষ্ট স্বাস্থ্য ধীরে ধীরে পরিপুষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল এবং সব চেয়ে আশ্চর্য্য যে, এগারো বৎসরের উপর যিনি অন্ধ হ'য়ে ছিলেন, তাঁর সেই অপহৃত দৃষ্টি-শক্তি আবার নূতন আনন্দ নিয়ে তাঁর চখের কোলে ফিরে এলো! সুতরাং দাঁতের রোগকে অবহেলা করা যে কোনরকমেই উচিত নয়, এ কথা বলাই বাহুল্য।

৯। আলোক মুকুট

কালিফোর্ণিয়ার সাক্রামেণ্টো অঞ্চলের সৌখীন সুন্দরীরা আলোর মুকুট মাথায় দিয়ে রূপের জ্যোতিঃ দীপ্ত ক'রে তোলবার চেষ্টা ক'রছেন। রঙীন রেশমের মুকুটাকৃতি স্বচ্ছ টুপীর মধ্যে নীল বৈদ্যুতিক আলো জ্ব'লে উঠলে মুকুটটি উজ্জ্বল নীলাভ হয়ে ওঠে। মুকুটের চূড়ার উপর একটি কমলালেবু রংয়ের বৈদ্যুতিক আলোক-মূর্ত্তি রক্তিম-

আলোক মুকুট

রশ্মি বিকীর্ণ ক'রে সুন্দরীদের শির-শোভা সমুজ্জ্বল ও নয়নাভিরাম ক'রে তোলে! মুকুটের এই বৈদ্যুতিক আলোগুলি সুন্দরীদের বসনাভ্যন্তরে গুপ্তভাবে রক্ষিত ব্যাটারীর সাহায্যে জ্বলে
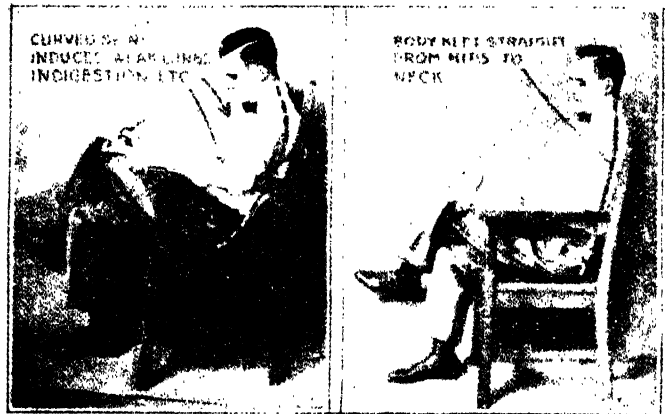
ভুল বসার দোষ　　　ঠিক বসার নিয়ম
(পাছা থেকে ঘাড় পর্য্যন্ত সিধে থাক্‌বে)

১০। চেয়ারে বসা।

পশ্চিমের অনুকরণে আমরা আজকাল অনেকেই চেয়ার টেবিলে বসে কাজ করা অভ্যাস করেছি বটে, কিন্তু চেয়ারে কি ভাবে বস্‌বার নিয়ম তা অনেকেই জানিনি বলে অল্প-বয়সে মেরুদণ্ডের বক্রতা, ফুস্‌ফুসের বা শ্বাসযন্ত্রের দোষ, পিঠের শিব
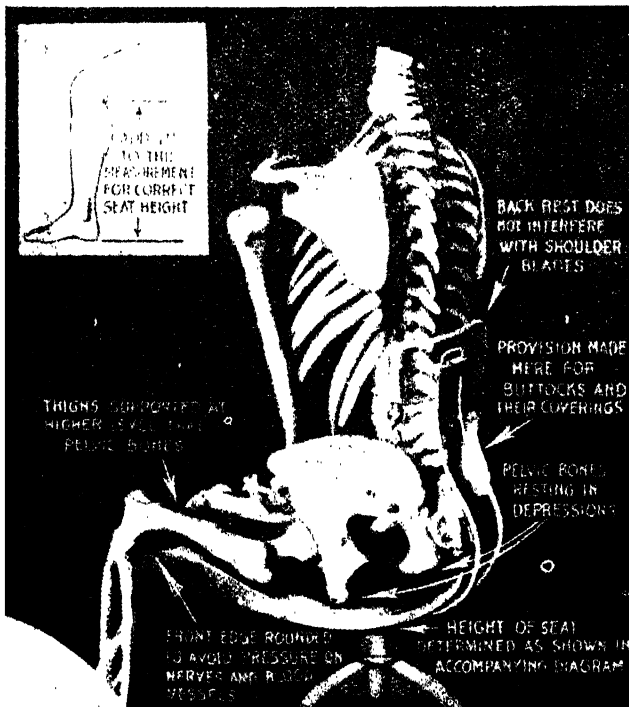
শারীর-বিজ্ঞানানুযায়ীক চেয়ার নির্ম্মাণের আবশ্যকতা

চেয়ারে বসা। (সাম্‌নে ভুল পিছনে ঠিক)

বিজ্ঞানসম্মত চেয়ার

দাঁড়ায় বেদনা, পাছার দুরবস্থা প্রভৃতি রোগে ভুগে যৌবনেই জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ছি! চেয়ার টেবিল যে দেশের সৃষ্টি, তাদের মধ্যেও অনেকে চেয়ারে বস্‌বার সঠিক নিয়মটি জানে না। চেয়ারের উপর ধনুকের মতো হ'য়ে বসা একেবারেই উচিত নয়। চেয়ারের ভিতর দিকে সম্পূর্ণ ঠেলে ঢুকে সমস্ত পিঠটি চেয়ারের পৃষ্ঠে ঠেকিয়ে একেবারে সিধে হ'য়ে বসাই হ'চ্ছে চেয়ারে বসার সঠিক রীতি। আজকাল নানা ফ্যাসানের যে সব চেয়ার তৈরী হচ্ছে, সেগুলিতে বেশীক্ষণ বসা উচিত নয়, কারণ শারীর-বিজ্ঞানের মতে সেগুলির গঠন সম্পূর্ণ ভুল। চেয়ার এমনভাবে তৈরি করা উচিত যাতে সিধে হ'য়ে বসবার কোনও অসুবিধা না হয়।

বেদনার সুর

শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

দিগদিগন্তে গুমরি' গুমরি'
বুক ফাটা একি কাঁদন জাগে,
শঙ্কিত প্রাণ উঠিছে শিহরি'
ভয়-বিস্ময়-বেদন-রাগে!

সন্তান-হারা রিক্তা জননী,
রচে নিশিদিন দুখের অবনী;
দীর্ঘনিশাস মর্ম্ম বিদারি'
কত না করুণ মরণ মাগে!

ছিঁড়ি বন্ধন মেঘ-পঞ্জর
রূপ-জ্যোতি একি ভূতল পাশে?
গর্জ্জন-রত সিন্ধুর স্বর
পাতাল ফুঁড়িয়া নিখিলে আসে!

বিদেশে কাঁদিয়া সন্তান সারা,
মাতৃ-পরাণে পশে তার সাড়া;
প্রতি গৃহ-কোণে, অশ্রু-সজল
চোখ দুটি' সদা মানসে ভাসে!

আঘাত-ব্যথায় পাষাণ-হিয়ায়
ফুটিতে পারে না যে সব কথা;—
মূকের রসনা বন্ধনে হায়
বুকে জাগে শত দহন-ব্যথা!

নিঃস্বের প্রাণ চির-সম্বলে,
মর্ম্ম-নিশাসে, নয়নের জলে,
পূর্ণ করিয়া নিখিল বিশ্ব
যুগে যুগে কে যে ধেয়ান-রতা!

অমলা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৩

অমলা শ্বশুরালয় হইতে বহিষ্কৃত হওয়ার পাঁচ ছয় দিন পরে কোন এক অপরাহ্নে বিজয়নাথ তাহার দ্বিতলস্থ শয়ন কক্ষে শয্যায় শয়ন করিয়া অনুদ্যত চিত্তে বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিল। ওয়েলিংটন্ স্কোয়ারের কিয়দংশ তথা হইতে দেখা যাইতেছিল। তথায় নিম্ন শ্রেণীর বহুসংখ্যক লোক সমবেত হইয়া কোনও বিষয় লইয়া তুমুল বচসা বাধাইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের কলহ বা কোলাহলের প্রতি বিজয়নাথের কিছুমাত্র মনোযোগ ছিল না। যে দুরন্ত বেদনা এই কয়েক দিন বুকের মধ্যে দপ্ দপ্ করিয়া নিরন্তর তাহাকে ব্যথিত করিয়াছে, তাহারই নিরবশেষ আঘাতে তাহার সমস্ত চেতনা বিকল হইয়া ছিল। সে অসংলগ্ন ভাবে নিজের বর্ত্তমান অবস্থা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছিল। বাল্যকাল হইতেই সে মাতৃহীন। ভ্রাতা বা ভগ্নী কেহই তাহার ছিল না। বিপত্নীক পিতার একমাত্র সন্তান হইয়াও সে স্নেহ অপেক্ষা অধিকতর শাসনেরই মধ্যে পালিত হইয়া বড় হইয়া উঠিয়াছে। বিষয়-বিজ্ঞ কঠোর পিতার কর্ত্তব্য পরিচালনার অবকাশে মাঝে মাঝে গোবিন্দনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী বিনোদিনী আসিয়া মরুভূমির মধ্যে বৃষ্টিধারার মত, কিছু দিনের জন্য বিধি-নিয়ন্ত্রিত সংসারের মধ্যে একটা স্নেহ-সরসতার সৃষ্টি করিত; কিন্তু সে নিতান্তই মাঝে মাঝে। কঠিন পর্ব্বত যেমন গিরি-নির্ঝরিণী উচ্ছ্বাসকে একটুও নিরোধ করে না, অবলীলাক্রমে নিজের কঠোরতার উপর দিয়া বহিয়া যাইতে দেয়, ঠিক সেইরূপে গোবিন্দনাথ বিনোদিনীর সর্ব্বপ্রকার ইচ্ছা-অভিলাষ কার্য্য-কলাপের নিম্নে শান্ত হইয়া থাকিতেন। সংসারে অমলা প্রবেশ করিবার পর বিজয়নাথের বৈচিত্র্যহীন জীবন কয়েক দিনের জন্য এক নূতন আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু এক অচিন্তিত ঘটনার মধ্য দিয়া দীপ্তিটুকু চিরদিনের জন্য অপসৃত হইয়া গেল, রহিল শুধু অনপনেয় দাহ! শীতকালের দ্রুত-বিলীয়মান অপরাহ্নের অস্পষ্টতার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বিজয়নাথের গভীর-বিদ্ধ চিত্ত একটা অপরিমেয় গ্লানি ও ঘৃণায় সমগ্র বিশ্বসংসারের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

পদশব্দে বিজয়নাথ ফিরিয়া দেখিল কক্ষে একজন ভৃত্য প্রবেশ করিয়াছে। কোন প্রশ্ন না করিয়া সে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

"দাদাবাবু, আপনাকে কর্ত্তামশাই ডাকছেন।"

"কেন? কি দরকার?"

ভৃত্য প্রয়োজন নির্দ্দেশ করিতে পারিল না।

ক্ষণকাল অলস ভাবে পড়িয়া থাকিয়া বিজয়নাথ বিরক্তি সহকারে শয্যাত্যাগ করিল; তৎপরে নিম্নতলে বৈঠকখানায় গোবিন্দনাথের নিকট উপস্থিত হইল।

গোবিন্দনাথ বৈঠকখানায় একাকী অবস্থান করিতেছিলেন, বিজয়নাথকে দেখিয়া কহিলেন, "বোস।"

বিজয়নাথ উপবেশন না করিয়া অন্যদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আর কোনও প্রকার ভূমিকা না করিয়া গোবিন্দনাথ কহিলেন, "তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেছি। পঁচিশে মাঘ তোমার বিবাহ দিব।"

বিজয়নাথের উত্ত্যক্ত বিদ্রোহী মন এই প্ররোচনায় একেবারে সংযমহীন হইয়া উঠিবার উপক্রম করিল কিন্তু কোনও রূপে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া সে কহিল, "স্থির করবার আগে একবার আমাকে ডাকালে ভাল হোত।"

"কেন?"

বিজয়নাথ একটু ভাবিয়া লইয়া বলিল, "তা হলে যাদের সঙ্গে কথা স্থির করেছেন, তাদের নিকট অপ্রতিভ হবার কারণ ঘটত না।"

গোবিন্দনাথ ধীরে ধীরে তামাক টানিতেছিলেন;

বিজয়নাথের কথা শুনিয়া আলবোলায় নলটা স্থাপন করিয়া বিজয়নাথের দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "ঠিক বুঝলাম না। অপ্রতিভ হবার কারণ কেন ঘটবে?"

বিজয়নাথ দৃঢ়স্বরে কহিল, "আমি বিয়ে করব না।"

"কেন?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া বিজয়নাথ কহিল, "প্রবৃত্তি নেই।"

উত্তর শুনিয়া গোবিন্দনাথ উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেন; কহিলেন, "তুমি যখন এতটা প্রবৃত্তিবাগ্র হয়ে উঠেছ, তখন কথাটা আর একটু পরিষ্কার করে জানা দরকার। হর-মোহনের মেয়েকে কি তুমি ত্যাগ কর নি?"

বিজয়নাথ কহিল, "সে কথা শেষ হয়ে চুকে গেছে; সে কথা আবার তুলে লাভ কি? সে বিষয়ে ত' আমার সঙ্গে আপনার সব কথা হয়ে গিয়েছে।"

"তবে বিয়ে করতে প্রবৃত্তি নেই কেন?"

বিজয়নাথ অবিচলিত কণ্ঠে কহিল, "ঠিক সেই জন্যেই প্রবৃত্তি নেই। আবার যার সঙ্গে বিয়ে হবে, বলা যায় না ত' দিন পরে তাকেও হয়ত আবার ত্যাগ করতে হতে পারে। তার চেয়ে বিয়ে না করাই ভাল।"

পুত্রের এ কৈফিয়তে গোবিন্দনাথ কিছুমাত্র প্রসন্ন হইলেন না। বিজয়নাথের কথায় যে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ও তিরস্কার নিহিত ছিল, তাহা তাঁহাকে তীব্রভাবে দংশন করিল। বিজয়নাথের প্রতি আরক্ত নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "তুমি কি বলতে চাও যে, এখন থেকে তুমি আমার কোন কথা মেনে চলবে না, নিজে স্বাধীন মতে চলবে?"

বিজয়নাথ কহিল, "না, আমি ঠিক তা বলতে চাইনে, কিন্তু এটুকু আপনাকে জানাচ্ছি যে, দ্বিতীয়বার বিবাহ আমি করব না। অতএব অনর্থক আপনি সে বিষয়ে কারো সঙ্গে কথা কয়ে অপদস্থ হবেন না।"

গোবিন্দনাথের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। কহিলেন, "তুমি আমাকে এত দুর্ব্বল মনে কোরো না যে, তুমি আমার একমাত্র ছেলে বলে তোমার সব রকম উপদ্রব আমি সহ্য করে চলব!"

অমলাকে পরিত্যাগ করিবার বিষয়ে আলোচনার সময়ে গোবিন্দনাথ একবার বিজয়নাথকে এই বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, অমলাকে পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত না হইলে তিনি বিজয়নাথকে পরিত্যাগ করিবেন। পুনরায় গোবিন্দনাথকে সেই ইঙ্গিত করিতে দেখিয়া বিজয়নাথের চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল এরূপ হীনতা স্বীকার করা অপেক্ষা পথে পথে ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করাও শ্রেয়। সে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "আপনার সম্পত্তির লোভে আমি সব রকম অপমান সহ্য করে চলব, আমাকেও তত দুর্ব্বল মনে করবেন না। আপনার রক্ত আমার শরীরে আছে, আমি আপনার পোষ্যপুত্র নই!"

এত বড় কথার উত্তরে গোবিন্দনাথ কোনও কথা খুঁজিয়া পাইলেন না। তিনি নির্ব্বাক্‌ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

গোবিন্দনাথের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বিজয়নাথ কহিল, "এ বিষয়ে আপনি যা স্থির করবেন, তা আমাকে জানাবেন। যে বিষয়ে আমি আপত্তি জানিয়ে গেলাম তা ছাড়া আর কোনও বিষয়ে আমার আপত্তি হবে না।" বলিয়া বিজয়নাথ তথা হইতে প্রস্থান করিল।

মানুষের আয়ুর শেষ আছে, কিন্তু জ্ঞানের শেষ নাই, সে কথা সেদিন গোবিন্দনাথ কতকটা বুঝিয়াছিলেন।

৪

সময় জিনিসটা এমন যে, তাহার গতিকে আর কিছু না বলিলেও অবাধ বলা নিশ্চয়ই চলে। সুখ দুঃখ, রোগ শোক, হাস্য রোদন, কোন কিছুরই খাতিরে তাহার অন্ধ অবিশ্রাম গতি এক মুহূর্ত্তেরও জন্য সংহৃত থাকে না। তাই হরমোহনের বেদনাপীড়িত সংসার দুঃখের গুরুভার বহন করিয়াও জগতের সহিত তাল রাখিয়া চলিল। চলার অবশ্য প্রভেদ আছে, কেহ সুখের হাওয়া; গাড়ীতে অবলীলাক্রমে চলিয়াছে, কেহ দুঃখের ভগ্নপদে সকাতরে চলিয়াছে। কিন্তু চলা ভিন্ন কাহারও উপায়ান্তর নাই, চলিতেই হইবে।

শ্বশুর-গৃহ হইতে অমলার বহিষ্কৃত হওয়ার পর ক্রমশঃ ধীরে ধীরে দীর্ঘ তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। হরমোহন ও প্রভাবতীর হৃদয়ের ক্ষতর উপর কালের প্রলেপ পড়িয়া পড়িয়া ক্রমশঃ তাহা অধিক হইতে অল্প হইয়া আসিয়াছে; দুর্ভাগিনী কন্যার দুরদৃষ্ট লইয়া তাঁহাদের যে মনকষ্ট এখন

তাহার সহিত তাঁহারা অনেকটা বোঝাপড়া করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে তাঁহাদের এই স্বামীত্যক্তা কন্যাটিকে তাহার সীমন্তে সিন্দুর এবং হস্তে লৌহবলয় থাকা সত্ত্বেও বিধবারই মত গণনা করিতে হইবে, এবং তাঁহাদের কন্যাও যাহাতে তাহার যথার্থ অবস্থা উপলব্ধি করিয়া আপনাকে তদতিরিক্ত কিছু মনে না করে, সে বিষয়েও তাঁহারা মনোযোগী হইতেছিলেন।

কিন্তু এ বিষয়ে অমলার চিত্তের গতি তাহার পিতা-মাতার অনুগামী ত ছিলই না, বরং বিপরীত ছিল। যে দিন বৈবাহিকের সহিত বচসা করিয়া হরমোহন অমলাকে নিজ গৃহে লইয়া আসেন, সেদিন পিতামাতার চাঞ্চল্য দেখিয়া অমলারও মন অধীর হইয়া উঠিয়াছিল সত্য, কিন্তু সেদিন তাহার বালিকা হৃদয়ে সে তরঙ্গ উত্থিত হয় নাই এখন যাহা সময়ে সময়ে তাহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তখন তাহার চিত্তে বাসনা-কামনার উন্মাদনা ছিল না, তাই ক্ষতির মাপকাঠিও ক্ষুদ্র ছিল। কিন্তু তাহার পর এই তিন বৎসরে ক্রমশঃ তাহার দেহ ও মনে যৌবনের প্রবল প্লাবন যে কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে, তাহার অনিবার্য্য উপদ্রব হইতে সে কেমন করিয়া পরিত্রাণ পাইবে? পলে পলে ক্রমশঃ যাহা সঞ্চিতই হইয়া উঠিতেছে, অথচ সার্থকতার বিস্তৃত প্রবাহে প্রশান্ত হইয়া বহিয়া যাইবার উপায় নাই, তাহা উদ্দাম না হইয়া আর কি হইবে?

প্রথমে অমলা ব্যাপারটাকে নিতান্ত সামান্যরূপেই গ্রহণ করিয়াছিল। পিতায় শ্বশুরে বচসা, যাহার কোনপ্রকার গুরুতর কারণ তাহার অজ্ঞাত, কাজেই অল্প দিনে মিটিয়া যাইতে বাধ্য। স্বামীর নিকট সে যে শুধু নিরপরাধা তাহাই নহে; এই অল্পদিনের মধ্যেই সে যে স্বামীর হৃদয় অনেকখানি অধিকার করিয়া লইয়াছিল সে জ্ঞানও তাহার ছিল। তবে কেন সে স্ত্রীর সহজ এবং ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হইবে? কেন সে মনে করিবে যে পাপ না করিয়াও আজীবন ধরিয়া তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে? কিন্তু কোনো প্রকার পরিবর্ত্তন না আনিয়া যখন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটিয়া গেল, তখন শান্ত বালা ব্যস্ত হইয়া বিজয়নাথকে কয়েকখানি পত্র লিখিল। প্রথমে সহজ পত্র, তাহার পর অভিমান, তাহার পর ক্রোধ, সর্ব্বশেষে মিনতি। প্রত্যেক পত্রটি লিখিয়া উত্তরের অপেক্ষায় সে উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত; মনে মনে বিজয়নাথের পত্রের মর্ম্ম কল্পনা করিত। অকারণ নিষ্ঠুর আচরণের জন্য পত্রমধ্যে কত দুঃখ, কত অনুতাপ প্রকাশ, তাহার পর সেই অসঙ্গত অপরাধ স্খালনের জন্য কি ব্যাকুল ও কাতর ভাষায় ক্ষমা প্রার্থনা করা! পত্রের প্রতি অক্ষর যেন দুঃখ ও বেদনার এক একটি পর্দ্দা! নিজের অনুযোগ ও ভৎর্সনা-তীক্ষ্ণ পত্রের উত্তরে বিজয়নাথের কল্পিত কাতর পত্র পাঠ করিয়া অমলা মনে মনে কুণ্ঠা ও ক্লেশ অনুভব করিত। তাহার পর একদিন বসন্তের কোন এক অপূর্ব্ব সন্ধ্যায়, যখন প্রকৃতি গন্ধে-বর্ণে, পুষ্পে-গীতে, প্রমত্ত কামিনীর মত লালসা-চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, মলয় পবন, চন্দ্র কিরণ ও পাপিয়ার তান মিশ্রিত হইয়া এক অদ্ভুত রসায়ন প্রস্তুত হইয়াছে, ও সেই উগ্র আসব পান করিয়া বিশ্ব বিবশ হইয়া টল্‌মল্ করিতেছে, মিলনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণে সহসা বিজয়নাথ আসিয়া উপস্থিত হইবে,—ব্যথিত, অনুতপ্ত! চক্ষে আকুল আগ্রহ, বক্ষে ব্যাকুল প্রেম! শান্ত বালা মুদ্রিত কলিকার মত, সঙ্কুচিত শুক্তির ন্যায় আপনাকে আপনার মধ্যে নিবদ্ধ করিয়া কঠিন হইয়া অবস্থান করিবে,—সংজ্ঞাহীন, শব্দহীন, অসাড়! তাহার পর আবেদন নিবেদন মিনতি বিনতি; তাহার পর সহসা কখন চক্ষের পলকে বাহুতে কণ্ঠে অধরে অধরে, বক্ষে বক্ষে নিবিড় মিলন!

কিন্তু হায়, কোথায় সে অধীর উন্মত্ত মিলন! কোথায় পত্র-পত্রোত্তর! কোথায় বসন্তের মদালস সন্ধ্যা! এ যে নিদাঘের নির্দ্দয় প্রদাহে সমস্ত জ্বলিয়া পুড়িয়া গেল! এইরূপে দিনে পর দিন অতিবাহিত হইয়া ক্রমশঃ মেঘের মধ্যে বজ্রের মত শান্ত বালার অন্তঃকরণে দুঃখের মধ্যে বিদ্বেষ উৎপন্ন হইল। মনের যখন এইরূপ অধীর বিদ্রোহী অবস্থা তখন সহসা এক দিন অমলার জীবন-পথে প্রমথ আসিয়া দাঁড়াইল। (ক্রমশঃ)

কলিকাতার গৃহ-সমস্যা

শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় বি-ই, এ-এম-আই-ও-ই

নিম্নে একটি বাড়ীর চিত্র দেওয়া গেল। এইরূপ বাড়ী তৈয়ারী করিতে ২ কাঠা ২ ছটাক জমির আবশ্যক। বাড়ীটি দোতালা—নিচে ৪ খানি ঘর ও একটি বারাণ্ডা; ইহা বৈঠকখানা-রূপেও ব্যবহৃত হইতে পারে। তাছাড়া রান্না ও ভাঁড়ার ঘর, স্নানের ঘর ও পাইখানা। উপরেও ঐরূপ ৪টা শোবার ঘর। এইরূপ বাড়ী তৈয়ারী করিতে মোট খরচের হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

খরচের হিসাব

পরিমাণ	বিবরণ	দর	হিসাবে	দাম
২৩২৬	বনিয়াদ খোদাই	৮৲	১০০০ ঘন ফিট	১৯৲
১৫৯৯	মাটি ভরাট	৮৲	,,	১৩৲
৫৮১	বনিয়াদের কন্‌ক্রিট	৪৫৲	শতকরা	২৬১৲
১৫৯৬	বনিয়াদের ও ভিতের গাঁথনি	৫০৲	,,	৭৯৮৲
১৬৮১	নীচের তলায় ইটের গাঁথনি	৫২৲	,,	৮৭৪৲
১৪৯৮	দোতলায় ইটের গাঁথনি	৫৪৲	,,	৮০৯৲
৩৩৫	নীচের তলায় ৫ ইঞ্চি পার্টিসান দেওয়াল	।৵০	বর্গফুট	১২৬৲
২৯৬	দোতলায় ৫ ইঞ্চি ঐ	॥০	,,	১৪৮৲
	কাঠের কাজ			
১০০.৮১	দরজা জানালার চৌকাঠ	৬॥০	ঘনফুট	১২১৲
৭০৭ বর্গফুট	১॥০ ইঞ্চি খড়খড়ির পাল্লা	১॥৵০	বর্গফুট	১১৩৯৲
৭০৭ বর্গফুট	১॥০ ইঞ্চি কাচের পাল্লা	১।০	,,	৮৮৪৲
৪৩৮ ,,	১॥০ ইঞ্চি প্যানেল পাল্লা	১॥০	,,	৬৫৭৲
	লোহার কাজ			
১৭·৫৭ হন্দর	লোহার কড়ি	১০৲	হন্দর	১৭৫৲
১৭·৭৭	,, বরগা	১১৲	হন্দর	১৯৫৲
৯৪৮	নীচ তলার মেজে	২৫৲	শতকরা বর্গফুট	২৩৭৲
৯৪৮	একতলার ৪· ইঞ্চি টেরেস্ মেজে (এক লেয়ার টালির উপর)	৪৫৲	,,	৪২৭৲
৯৪৮	একতলার ছাদ পলস্তার	৫॥০	,,	৫৩৲
৯৪৮	ঐ চুণের কাজ	১৸০	,,	১৭৲
৯৪৮	দোতলায় সিলিং কমপ্লিট	।৵০	বর্গফুট	৩৫৫৲
১৭২৪	রাণীগঞ্জ টালির কাজ (কাঠের ফ্রেম ও বরগা সমেত)	২৫৲	শতকরা বর্গফুট	৪৩২৲
১৮৩	১" ইঞ্চি ড্যাম্প প্রুফ্ অস্তর	২২৲	শতকরা বর্গফুট	৪০৲
১০১২২	বালির কাজ	৫৲	,,	৫০৬৲
৭৪৯৭	চুণের কাজ	১॥০	,,	১১২৲
২১৪৬	সিমেণ্ট পলস্তার	১২৲	,,	২৫৭৲
২৬২৫	রংএর পোচড়া	১৸০	,,	৪৬৲
২৫২	সিঁড়ি	২০০৲		২০০৲
১৫ ফুট	রেলিং	২৲	ফুট	৩০৲
৫০৮০	দরজা জানালা ও লোহার কাজের রং	৫॥০	শতকরা বর্গফুট	২৭৯৲
				৯২১০৲
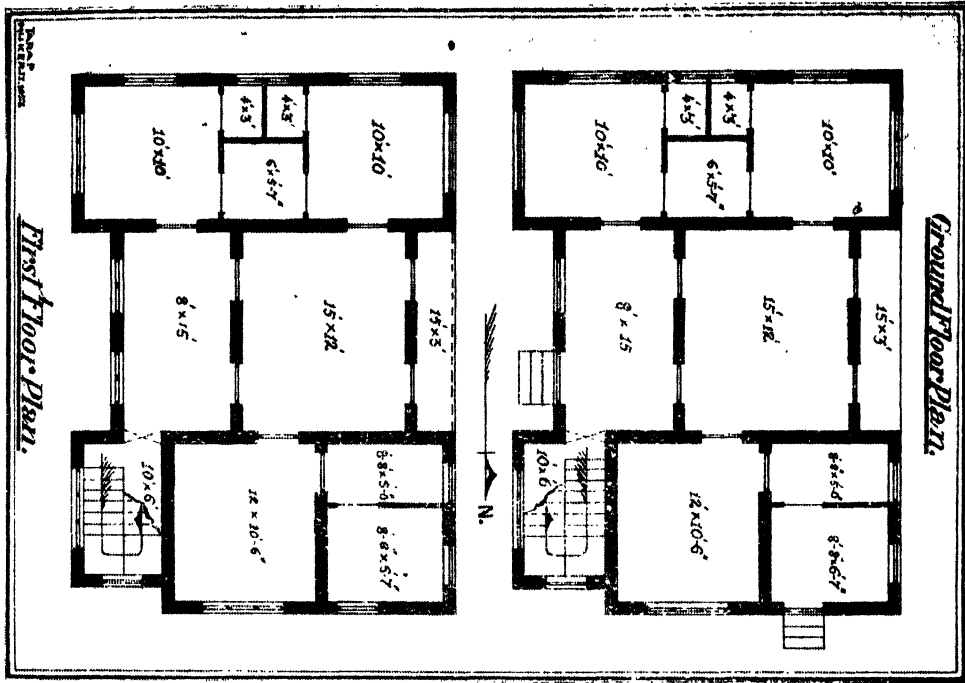
১ নং চিত্র

২ নং চিত্র

বনিয়াদের খোয়া উত্তমরূপে পেটাই হইলে পর গাঁথনি আরম্ভ করিতে হইবে। কিন্তু গাঁথনি করিবার পূর্ব্বে খোয়ার উপর দিক ঠিক level হওয়া চাই। তার পর গাঁথনি জমির সহিত সমান level হইলে, গাঁথনির পাশের

গর্ত্ত মাটি ভরাট করিয়া দিবে। ঐ মাটি একফুট একফুট করিয়া ভরা উচিত ও মাঝে মাঝে জল দেওয়া দরকার; তাহা হইলে পরে আর মাটি বসিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। প্রত্যহ গাঁথনি শেষ হইলে রাজমিস্ত্রিরা চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে গাঁথনির উপর চূণ সুরকী দিয়া আল করিয়া জল বাধিয়া দিবে। গাঁথনি ৩।২ দিন এইরূপে ভিজা থাকা দরকার।

জমির উপর হইতে পুনরায় গাঁথনি আরম্ভ করিবে। ও পোতা বা মেজে পর্য্যন্ত হইলে ১ ইঞ্চি মোটা পাথরকুচি ও সিমেণ্ট বালিতে Damp Proof Course দিবে।

৪ ভাগ পাথরকুচি, ২ ভাগ বালি ও ১ ভাগ সিমেণ্ট মিশাইয়া Damp Proof Course করিতে হয়।

এই Damp Proof Course দেওয়ালের উপর দিবার সময় দরজার জায়গা ফাঁক রাখা উচিত।

গাঁথনির প্রত্যেক ইটটির চারিদিকে মসলা থাকিবে—কোন দিকে যেন ফাঁক না থাকে। এইটি উত্তমরূপে দেখিতে হইবে, কারণ ইহার উপরই গাঁথনির শক্তি নির্ভর করে। গাঁথনির ইট অন্ততঃ ৩।৪ ঘণ্টা জলে ভেজা চাই ও চূণ সুরকী উত্তমরূপে মিশান দরকার। বেলচাকিতে মিশাইতে পারিলে ভাল হয়।

পোলাও *

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি-আই-ই

শ্রীমদদ্বৈত-বংশাবতংস সুকবি বেণোয়ারীলাল দাদা বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত। তিনি বহুদিন পূর্ব্বে "খিচুড়ী" রাঁধিয়া বঙ্গসাহিত্য-সেবকগণের পাতে পাতে পরিবেষণ করিয়াছিলেন। তাহার পর অনেক দিন ধরিয়া মাল-মসলা সংগ্রহ করিয়া, তাঁহাদিগকে এবার পোলাও খিলাইবার আয়োজন করিয়াছেন। এবার যেমন সময় বদলাইয়াছে, আহার্য্যের প্রকৃতিও সেইরূপ পৃথক্ হইয়াছে;—এবার আর "রন্ধন" নয়, এবার "পাকান"।

গ্রন্থের নাম হইয়াছে "পোলাও"; তজ্জন্য সর্গগুলির নাম হইয়াছে "হাঁড়ী";—তাহার সংখ্যা একাদশ। "হাঁড়ী" একটু বড় হইলে, তাহার নাম হয় "হাঁড়া"। দুই একটি "হাঁড়ী" হাঁড়ী নয়, "হাঁড়া"। সকলগুলিই গরমাগরম, সবে মাত্র চুলা হইতে নামাইয়া দমে বসান হইয়াছে, মুখ দিয়া এখনও তপ্ত ভাপ উঠিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তাহাই সকলের সান্‌কীতে ঢালিয়া দেওয়া হইতেছে। এই পোলাওয়ের বাবুর্চ্চী স্বয়ং গো-স্বামী; 'গাই-বাঁধা' থাকিতেও, ঘৃতের অভাবে দুঃখ করিয়া জানাইয়াছেন;—

"ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ, তাতেও সাপের চর্ব্বি!"

সুধু সেটা হইলেও, স্বদেশী হইত; কিন্তু ইহাতে বিলাতী চর্ব্বিরই আতিশয্য;—তাহা অ-বেমালুম ভাবে ইংরাজী অক্ষরের অ-গলিত কাঠিন্যে ধরা পড়িয়া যাইতেছে। খাঁটি বাঙ্গালার পক্ষে তাহা গলাধঃকরণ করা দূরে থাকুক, তাহার অঙ্গভোজন-চেষ্টাও অসম্ভব। তাঁহাদের জন্য ইহা "পাকান" হয় নাই;—ইহা কেবল ইঙ্গবঙ্গের জন্যই সময়োপযোগী মাল মসলায় মসগুল। "খিচুড়ী" নিরামিষ বলিয়া, গোস্বামি-তনয় তাহার রন্ধনকার্য্যে অবলীলাক্রমে সিদ্ধহস্ততার পরিচয় প্রদান করিতে পারিয়াছিলেন। "পোলাও" আসলে সামিষ, কেবল জাতিকুল-বৈষ্ণবকুল-রক্ষাপ্রয়াসী ব্যক্তি-বিশেষের খাতিরে নিরামিষ হইয়া থাকে। সামিষ অংশের তুলনায় নিরামিষ অংশটুকু অধিক উপাদেয় হইয়াছে। নমুনা,—

কি না ছিল? সব ছিল। সব গেছে দূরে,—
সত্য ছিল,—শিশির সমান নিরমল,
দয়া ছিল,—[সু] কোমল দ্রাক্ষারসে রসা,
ধর্ম্ম ছিল,—ভূমানন্দ-মুকুট-ভূষিত,
লোক-প্রেম? তাও ছিল,—অতুল ধরায়।

* শ্রীবেণোয়ারী লাল গোস্বামী প্রণীত-মূল্য পাঁচ সিকা।

গেল কেন? সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু সত্যই যে "সব গেছে দূরে"—তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। ফল কি হইয়াছে? গোস্বামি-কবি তাহাই বিনাইয়া বিনাইয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন;—বৈষ্ণব বলিয়া কাটিয়া কুটিয়া জীবহত্যা-পাপে লিপ্ত হইতে না পারিয়া, প্রাণ মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া, চামড়া (বিনাইয়া) উঠাইয়া লইয়া, নগ্নরূপ দেখাইতে গিয়া, বহু কৃষ্ণের জীবকে ছট্‌ফটানি সহ্য করিতে বাধ্য করিয়াছেন!

এরূপ গ্রন্থের যথাযোগ্য সমালোচনা অসম্ভব। ইহাতে যে সকল ব্যক্তিগত, মতগত, এবং বিষয়গত নিন্দা-প্রশংসা উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার অধিকাংশই তর্কসঙ্কুল; তাহার একমাত্র সুযোগ্য সমালোচক,—মহাকাল। কবি বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন; কবি-গৃহিণীও আর তরুণী নাই। তথাপি বৈষ্ণব বলিয়া, বুড়া বয়সেও কবির রসভাণ্ড শুষ্ক হয় নাই; গৃহিণীকে লইয়াই তাহার প্রথম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ভদ্র কণ্ঠার উপর এইরূপ আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎক্ষেপে যাহার আরম্ভ, তাহার শেষ কিন্তু বৈষ্ণবোচিত পরকীয়া-প্রীতিতে ডগমগ। বাঙ্গালা আখ্যায়িকা-গ্রন্থের দুইটি নারীচরিত্র কবির বিচারে রমণী-চরিত্রের আদর্শ। বৌদিদি তেমন লেখা-পড়া জানিলে, এবং সকল কথা তলাইয়া বুঝিতে পারিলে, কবির জন্য পায়েস রাঁধিতে বসিয়া, চিনি ভ্রমে লবণ দিয়া ফেলিতেন! কবি কিন্তু অকপটে অকুণ্ঠিতকণ্ঠে তখনও গাহিতেন :—

> শরতের কিঙ্করাণী রবির বিনোদা
> জগতের কাব্যবনে যুগল মন্দার।

প্রথমে মনে হয়,—ইহা ব্যঞ্জনার উদাহরণ; মন্দার কুসুম গন্ধহীন, মন্দার বৃক্ষও কণ্টকাকীর্ণ। কিন্তু তাহা নয়।

> উভয়ের তুলি যেন কোন্ মন্ত্রবলে
> বিধাতার বর্ণপাত্র করিয়া পরশ
> আঁকিয়াছে দুইজনে যুগল রতন।

এখানে 'পরশ' শব্দ 'হরণ' অর্থে বুঝিতে হইবে, নতুবা স্পর্শ মাত্রে তুলিকা বর্ণ-সিক্ত হইতে পারে না। বাঙ্গালার যুবজনচিত্তমুকুরে এই শ্রেণীর নিদর্শন কেমন প্রতিফলিত হইতেছে জানি না; তবে দাদার মত বুড়াকেও টলাইয়া কবুল করাইয়াছে;—'

> নবীন নবায়মান
> কত্তে যদি চাও প্রাণ,
> শরতের সাবিত্রীরে কর বিলোকন;
> কোথায় রসের খনি, শচীন্দ্র কমলমণি,
> এ যে পোকরাজ আর গলিত কাঞ্চন।

এই সাবিত্রীকে হাতের কাছে পাইলে দাদামহাশয় কি করিতেন, ইচ্ছামাত্র ব্যক্ত করিয়া, তাহার পরিচয় দিয়াছেন;—

> ইচ্ছা করে কণ্ঠে তার
> দোলাইয়া পুষ্পহার
> চেয়ে থাকি ভক্তিভরে সারাটি জীবন।

দাদা বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ইহা যে বিশ্ব-শিক্ষকগণেরও সার সিদ্ধান্ত, তাহার প্রমাণ—বিশ্ব-বিদ্যালয়! তাহা এক কবি-রাজকে ডাক্তার বানাইয়াছে, আর একজনের মাথায় জগত্তারিণী-জয়পতাকা বাঁধিয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছে।

প্রভাতকুমার এখন যৌবন সন্ধ্যায় উপনীত; তাঁহার দাগা বুলাইবার দিন অতীত হইয়াছে, তথাপি তিনি দাগা বুলাইতে গিয়া দাগা পাইয়াছেন। কবি তাঁহার সান্কীতে প্রথম হাঁড়ী হইতেই যে অদ্ধ-সিদ্ধ উত্তপ্ত সফেণ খাদ্য ঢালিয়া দিয়াছেন, তাহা গিলিতে বা ফেলিয়া দিতে উভয়-সঙ্কট। যথা,—

> এখন তিনি রাজার মিতে,—
> মত্ত থাকেন কাব্য-চর্চ্চায়, মত্ত থাকেন নৃত্যগীতে,
> বিলাতী প্রেম, গোলাপ জলে, যত্ন করি মিশিয়ে,
> বঙ্গনারীর কোমল হৃদয় দিচ্ছেন ভায়া বিষিয়ে।
> "সিন্দুর কৌটার" যুনানি-প্রেমের মনমাতানি ছন্দে
> সুশী ছুঁড়ি তান ধরেছে কতই মহানন্দে।

এ জগতে ডাকাত দিগ্বিজয়ীর সম্মান ভোগ করে, চোর মৌলিক মালিক বলিয়া বাহবা পায়; সুতরাং গাঁটকাটার উপর কঠিন কষাঘাত কপাল-দোষের ঝকমারী। ছোঁড়ারা যাহা চাহিবে, "ছুঁড়ীরা" তাহারই যোগান দিবে; না পারিলে,—সুশীর দলের পোয়াবারো। এই সরল সত্যের আঁচটুকু রচনা-ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ায়, গল্পলেখককে এত নাস্তানাবুদ হইতে হইয়াছে। অধিকাংশ গল্প-লেখকই একটা না একটা অজুহাতে, এইরূপ নাস্তানাবুদ হইয়াছেন। সে বিচার সরাসরি, তাহার আপিল নাই। যথা,—

সুরেন ভট্টো লেখেন novel আঙ্ক আঙ্কের অভাব নাই,
Occult রসের Mysticism উড়িয়ে দিচ্ছে সদাই ছাই।
কল-কৌশল নাইক কোথায়, চিত্রে নাইক দীপ্তি,
ভাষায় ফোটে না ফুল্ল মল্লি, মেটে না কোথাও তৃপ্তি।

বঙ্গভাষার ইতিহাস লেখক এই সান্‌কী-ভোজে বাদ পড়েন নাই। কিন্তু তিনি পাইয়াছেন,—ধৃষ্ট ভূষ্ট অশিষ্ট পেঁয়াজ! তিনিও একবালে কবির ন্যায় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন; তখন বিদ্যাই ছিল সুন্দর কণ্ঠহার;—সেই বিদ্যা-সুন্দর এখন "বিদ্যা-সুন্দর"-বিরোধী।

ধূর্জ্জটির প্রিয় বঙ্গনায়ক নামটি তাঁহার দীনেশ;—
দীন ছিলেন, ভক্ত বলিয়া হ'য়েছেন আজি ধনেশ।
যে দিন ইনিই রায় গুণাকরে হেসে করিলেন নির্ব্বাসন,
সে দিন হইতে "বিদ্যা সুন্দর" কাটছে বাজারে বড়ই কম।

তবে উপাধিতে দুইজনে কিঞ্চিৎ সাম্য আছে। তিনি ছিলেন "রায় গুণাকার"; ইনি হন "রায় বাহাদুর"। লেখার জন্যই উভয়ের নামের সঙ্গে লেজুড়-সংযোগ। এক জনের গুণ; আর এক জনের বাহাদুরী।

আমাদের বেণুদাদার অনেক দিনের পাকা হাত,—তাহা আড় খেমটা বাজাইতে গিয়াও, পরণের বেলায়, সকল তালই সমান বাজাইয়া দিতে পারে। কেবল চৌতাল, সুরফাঁক, আড়াঠেকা, মধ্যমান, ধামার, ঝাঁপতাল নয়; গড়েরহাটা ব্রহ্মতাল, রুদ্রতালও মূর্ত্তিমান হইয়া দেখা দিতে বাধ্য হয়। ব্রহ্মতাল যেমন লম্বা, তাহার নমুনাও সেইরূপ :—

জলজ্যোতি কলাযুতা ও সেমুশী কার,
চ্ছুরিত বিভায় যার বঙ্গ আলোকিত?
বিদ্যাতপে সিদ্ধকাম জ্বলন্ত পাবক,
গরিমার আসনেতে সদা সমাসীন,
তেজবন্ত মহাতপা দুর্ব্বাসা সমান।

* * * *

দোষ যদি থাকে থাক্, দীর্ঘ বিশালতা—
স্ফটিক-নির্ম্মল চিত্ত উদাত্ত চরিত—
গর্ব্বের জিনিস উহা, সাধনার ধন।
তবু যেন মনে হয়, ধীরোদাত্ত বীর
স্বার্থ তার দূরে ফেলে, দূরে ফেলে নিজ
ক্ষুদ্র প্রভুত্বের স্পৃহা, অমিতা বিক্রম,
(তুচ্ছ) করি সুখ্যাতির বীণার ঝঙ্কার,
(ভ্রূভঙ্গে) মল্লার রাগ আলাপন করি,
মাতৃ-পূজকের দলে যোগদান (করি)
ডুবাতেন প্রাণ (যদি) অমিয়-পাথারে,—
এ বঙ্গ,—ভারত অঙ্গে শুমস্তক সম,—
উঠিত ঝলকি; যত) দর্দ্দুরী-ভক্ষক
পুচ্ছ গুটাইয়া সব ঢুকিত গুহায়।
তাই যদি হত, তবে গৃহী আশুতোষে
"শূলপাণি" রূপে বঙ্গ করিত দর্শন।

রুদ্রতালের নমুনা থাকিয়া থাকিয়া আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া তুলিতেছে। তাহাই আর সকল তাল ডুবাইয়া দিয়া, চিতান চেতাইয়', অচেতনকে সচেতন করিতে চেষ্টা করিতেছে। তাহা যেমন আন্তরিক, সেইরূপ মর্ম্মস্পর্শী। তাহার জন্য গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ সময়োপযোগী হইয়াছে। কবি কিন্তু বঙ্গ সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকার উপর আস্থা-হীন। তাঁহার ধারণা,—

বাঙ্গালী পাঠক স্রোতে গা ঢালিয়া পারে ভাসিতে,
বিজ্ঞজনের হাসিটি দেখিয়া পারে হাসিতে।
উজাতে চাহে না, উজাতে জানে না,
আগ্রহ করিয়া গ্রন্থ কেনে না,
যদি কেহ কেনে, পড়ে কদাচন,
চাহে না রুচিরে করিতে মার্জ্জন,—
যদি কেহ পড়ে, বুঝিতে (না পারে)
গ্রন্থকারে গালি পাড়ে।
বোকামী ভূতটা (সকলেরি) ঘাড়ে;
না বুঝেও গালি ঝাড়ে।

ইহাতে পাঠক-সমালোচক তুল্যভাবে আক্রান্ত হইলেও, সাহস করিয়া বলিতে পারি, বড় দিনের মরসুমে কবির এই কাব্য তপ্ত কেকের মত রাতারাতি বিকাইয়া যাইবে, —সকলেই পড়িবে,—কেহ কিনিয়া, কেহ চাহিয়া লইয়া, কেহ বা চুরি করিয়া;—তবে সকলেই যে বুঝিবে, কেহই গালি পাড়িবে না, এমন ভরসা করা যাইতে পারে না। পাট্‌কেল ছুঁড়িলে, ইট আসিয়া ঘাড়ে পড়িয়া থাকে;—এ জগতে এক গালে চড় খাইয়া, আর এক গাল পাতিয়া দিবার উপদেশ যিশুখৃষ্টের মন্ত্রশিষ্যেরাও মানিয়া চলিতে পারেন নাই; গান্ধীজির উপদেশেও কেহ পারিবে না। গায়ে

কাদামাটি লাগিবার ভয়ে দাদা জড়সড় হইয়া সরিয়া না দাঁড়াইলে, আমি কিন্তু অম্লানবদনে অভয়দান করিয়া, কোলাকুলি দিতে প্রস্তুত ; যদিও আমি সেইদলে,—

ভারতমাটীর কোন্ গহনে সত্য আছে পোঁতা,
তাই তুল্‌তে সাবল হাতে ঘোরেন (যে সব) হোতা।

জলধর দাদার পনসোপম ভুঁড়ি লক্ষ্য করিয়া, কবি লিখিয়াছেন,—সে কাঁঠাল কাঁঠালই থাকিবে, তাহার বুকে থাকিবে—"ভীম ভুঁতুড়ী।" তাঁহার সম্পাদিত "ভারতবর্ষও" নিস্তার লাভ করে নাই, তাহার সানকীতে পড়িয়াছে—একরাশি তেজপত্র! তবে সম্পাদককে রেহাই দিয়া, কবি, লিখিয়াছেন,—

এই না হ'লে মনের মতন মাসিক ত আর চলে না।
দাদার বা কি দোষ দিব ভাই, দাদা ত আর দেবতা না।

'মানসীর, বর্ণনায় কবি-কল্পনা তাহাকে নাস্তানাবুদ করিতে ত্রুটি করে নাই। আরম্ভটা এইরূপ ;—

রূপনগরের মানসী তার ভাঙ্গা নূপুর দিয়ে পায়,
রাস্তার কাছে নাকি সুরে তালকাটা গান কেসে গায়।

ভাল হউক, আর মন্দ হউক, সকলেই কিছু না কিছু পাইয়াছেন,—কিছুই পান নাই কেবল "বসুমতী"। কবির দলের দুই চারিজন আসল পোলাও একটু আধটু পাইয়াছেন ; আর সকলের সানকীতে বাজে মাল পড়িয়াছে ;—কাহারও ভাগ্যে মরিচ, কাহারও বা আদাকুচি, কাহারও কেবল আস্ত পেঁয়াজ। এ দলে ছোট, বড়, জীবিত, সদ্যমৃত, কেহই বাদ পড়েন নাই। দুই একটা নমুনা,—

রমণী কবির বিলাসবতী কবিতামধুর নিচোলে
বাহার দেওয়া জরির ফিতে শুধুই কেবল ঝলমলে।
*   *   *   *   *   *
ঝরাফুল ওতো মর্ম্মরফুল, রূপ আছে, নাহি প্রাণ,
(তাই) এতই দৃপ্ত, এতই নৃত্য, এতই অভিমান।
*   *   *   *   *   *
আচ্ছা ধূমো হস্তিকায় বই লিখেছে দেব-কবি,
নিত্য কথার বস্তা বেঁধে, এত কেন গোলযোগ,
রদিমাল টানাই সার, লোকে বলবে কর্ম্মভোগ।

দেশে যেমন নেতার বাড়াবাড়ি হইয়াছে, সেইরূপ আড়াআড়ি ছাড়াছাড়ি তাড়াতাড়িও বাড়িয়া উঠিয়াছে। এই নেতার দল বাদ পড়েন নাই। তাঁহারা কে, এবং কে কেমন,—কবি তাহার পরিচয় দিবার জন্য নেতা কে, আগে তাহার একটা সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহা একাংশে শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন না করিলে, উদ্ধৃত করিতে পারিতাম। কে কি পাইয়াছেন, দুই একটা নমুনা দেওয়া যাইতেছে :—

বিপিনচন্দ্র

কত লেখা লিখেছিলে, এখনো লিখিছ ;
পেঁচোবরা ভ্রূণ যথা আতুর-কুটীরে
জনমিয়া মরে যায় জননীর বুকে,
তোমার logic-সিক্ত হিজিবিজি গাথা
বাহির হইবামাত্র মরণেরে ভজে।

সুরেন্দ্রনাথ

স্নেহে ধন্য আছিলাম সুরেন্দ্র তোমার
সিসিরোর কণ্ঠচোরা বাগ্মীশির-শোভা।
*   *   *   *
কোথা হ'তে এল বল নির্ম্মম অভাব,
তোমার এ নিদারুণ সুবর্ণ-পিপাসা ?

স্বরাজ

মাথা লয়ে মাথা খেলা নহেক স্বরাজ ;
দম্ভভরে প্রভুত্বের দাবানল জ্বালি,
প্রাণের বৈচিত্র্য হরা নহেক স্বরাজ ;
মানুষের অধিকার মানুষকে দিয়া,
ন্যায়ের পবিত্র হর্ষ উপভোগ করি,
যে পুলক পায় নর,—তাহাই স্বরাজ।

ইহা সাংসারিক স্বরাজ। আর একটি স্বরাজ আছে, তাহা সাংসারিক নহে, আধ্যাত্মিক। যথা,—

ক্ষমতার তাজপরা কুক্কুট-হৃদয়
আইনের প্রহরণ করিয়া ধারণ,
দুর্ব্বলেরে নির্য্যাতন-পেষণ-যন্ত্রণা
দিয়ে যারা বড় হয়, তারা বড় নয়,—
তারা বড় নয়,—এই কথা বলিবার
অবাধ শকতি, এই শকতির নাম
নৈসর্গিক, আধ্যাত্মিক, নির্ম্মল স্বরাজ।

এই স্বরাজের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া, কবি ইহার প্রধান পুরোহিতের বর্ণনায় লিখিয়াছেন,—

আমার জনমভূমি প্রিয় শান্তিপুর ;
যারে বঙ্গনরনারী মানে তীর্থ বলি,
যেথায় অদ্বৈত, মম উর্দ্ধতন পিতা
জনমিয়া, ভক্তিরসে চিরদিন তরে
দিব্যস্থানে পরিণত গিয়াছেন করি,—
সেই শান্তিপুর মম গৌরবের খনি।
শ্রীঅদ্বৈত-বক্ষভেদি ভক্তি-তরঙ্গিণী
এনেছিল স্বর্ণপদ্ম উজানে বহিয়া,
সেই পদ্ম বাঙ্গালার শ্রীচৈতন্য প্রভু !
যার প্রেমে ভেসেছিল, নহে শুধু সাধু,
অসাধুও সাধু হয়ে অকৈতব সুখ
উপভোগি, বৈকুণ্ঠেতে গিয়াছেন চলি।
কোটি কোটি প্রাণমাঝে অদ্বৈত-প্রভাব
প্রবেশিয়া, [তীব্র] ব্যথা করিয়া সঞ্চিত,
আনিয়াছে অভিশপ্ত ভারত মাঝারে
শুদ্ধপ্রাণ মহামতি দেবতা গান্ধীরে।

গান্ধীভক্ত আর কোনও বাঙ্গালী এমন করিয়া তাঁহাকে বাঙ্গালার নিজের ধন বলিয়া আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। ইহার গৌরবে গুর্জ্জর ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। এই চরিত্র-চিত্রাঙ্কনে কবি যে রচনা-লালিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা উপভোগ্য। কবির এক ভূত-পূর্ব্ব ছাত্র (অধুনা স্বনামখ্যাত স্বরাজ-প্রচারক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) ভূমিকা লিখিয়া, ইহারই উল্লেখ করিয়া, শিষ্যোচিত গুরুদক্ষিণা প্রদান করিয়াছেন।

বৃদ্ধ কবির ভারত-প্রীতি তাঁহার বঙ্গ-প্রীতির বাহ্য-বিকাশ। বঙ্গ-প্রীতির মূলকেন্দ্র—শান্তিপুর। তাহার মধ্যবিন্দু কবির "উর্দ্ধতন পিতা" শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য গোস্বামী। তাঁহার "উর্দ্ধতন পিতা" নরসিংহ নাড়িয়াল আমার "উর্দ্ধতন পিতা" মধু মৈত্রকে কন্যাদান করিয়া যে মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার সহিত মৈত্র-বংশের অদ্বৈত-প্রীতি জড়িত হইয়া রহিয়াছে,—উভয় বংশের আত্মীয়তা এত-কালেও পুরাতন হইয়া পড়ে নাই। কবি যে গৌরবের দাবি করিয়াছেন, আমিও তাহার এক অংশীদার। সুতরাং অদ্বৈত-প্রভাব যে গুর্জ্জর জয় করিয়াছে, এই লোভনীয় কল্পনার সমালোচনা করিয়া রসভঙ্গ করিব না।

শেষ হাঁড়ীটি একা রবীন্দ্রনাথকে নিবেদন করিয়া, কবি কাব্য শেষ করিয়াছেন। ইহা "মধুরেণ সমাপয়েৎ"—রীতির মর্য্যাদা রক্ষা করে নাই। যে দিন কবীন্দ্রের সঙ্গে এই কবির প্রথম পরিচয় সংসাধিত হয়, সে দিনের বর্ণনায় ইহার আরম্ভ। তাহার কথা স্মরণ করিয়া কবি লিখিয়াছেন,—

তিতাল্লিশ বর্ষ আজি কোথা গেছে চলি
চলে গেছে বুকে লয়ে কত মধু মধু।

তখন

উদ্ভিন্ন-যৌবন তুমি পঞ্চমীর শশী
স্নিগ্ধোজ্জ্বল রাঙ্গাশশী আছিলা প্রভায়।

তাহার পর "স্বদেশীর দিনে" কবি কবীন্দ্রের মধ্যে এক নব সৌন্দর্য্যের আবিষ্কার সাধন করেন।

স্বদেশীর দিনে তোমা কবীন্দ্র-কেশরী
দেখেছিনু যে বিগ্রহে, সে বিগ্রহে আজ
দেখিতেছি মহাপ্রাণ গান্ধীরে আমার।

এখন আর সে বিগ্রহ রবীন্দ্রে দৃষ্টিগোচর হয় না কেন, কবি তাহার কারণ কল্পনা করিয়াছেন :—

দরিদ্র বাঙ্গালী আজ। তার অনুভূতি
পঙ্গুত্বের জড়িমায় হয়েছে নিশ্চল।
সাড়া তারা দেয় নাই, কলকণ্ঠ, তব
সাহানা গলিত বাক্যে,—তাই অভিমানে
যেথায় অক্ষুণ্ণপ্রাণ করিছে বিরাজ
সেই স্থানে করিতেছ মুরলীবাদন।

অথবা

পশ্চিমের মধুময়ী অপূর্ব্ব মায়ায়
বাঁধিয়াছে তোমা, তাই এ ঘোর দুর্দ্দিনে
বৈরাগ্যের মালা তুমি করিতেছ জপ।

ইহাতে পূর্ব্বরাগাদি বৃন্দাবন-লীলার সকল রসই উথলিয়া উঠিয়াছে। কেবল মানভঞ্জন হয় নাই, কিন্তু মানটুকু অকপট প্রেমের সকপট অভিব্যক্তি :—

সাহিত্যের কারাগারে যৌবনের রবি
আছে বাঁধা ; মধুর নিষ্ঠুর প্রিয়তম,
যাও তুমি ফিরে যাও, চাহি না তোমায়।

পূজা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত
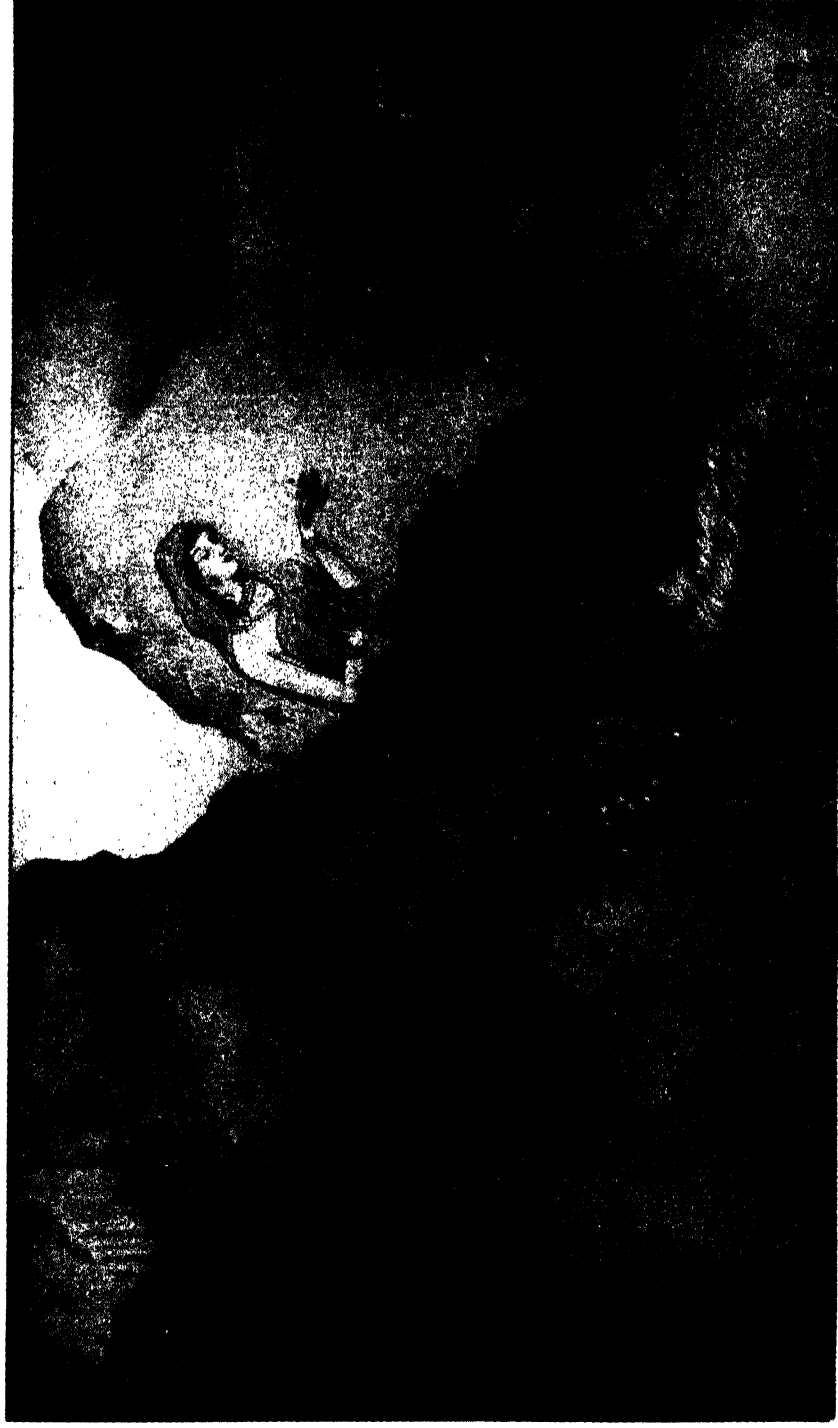
Bharatvarsha Halftone & Printing Works

বিদ্যুতের বিদ্রূপ

শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়

এক

ষ্টিমারে ভয়ানক ভীড় হয়েছিল। এত ভীড় হয়েছিল যে, লোক বসা তো দূরের কথা, দাঁড়িয়ে থাক্‌বারও স্থান করে' নিতে পার্‌ছিল না। তবুও তার পর আর ষ্টিমার না থাকায়, সকলেই সেইটাতেই ভীড় বাড়াচ্ছিল। ছেলে, বুড়ো, পুরুষ ও মেয়েদের বিচিত্র গলার বিচিত্র স্বর-লহরীতে এক অপূর্ব্ব সুরের সৃষ্টি করে' তুলেছে; সে সুরে করুণাই হয়, আনন্দ মোটেই হয় না। সেটা যে ষ্টিমার কোম্পানির সুব্যবস্থায় হতভাগ্যদের কাতরানি—আনন্দধ্বনি তো নয়। তারা সকলেই তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। তারাই কোম্পানিকে বেশী পয়সা দেয় কি না তাই সর্ব্বত্রই তাদের প্রতি এই সুব্যবস্থা।

জয়ন্ত ষ্টিমারের রেলিং ধরে' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই ব্যাপার দেখ্‌ছিল, আর রাগে তা'র পেশীবহুল সবল সুগঠিত দেহ ফুলে ফুলে উঠ্‌ছিল। এই-সমস্ত নিরীহ বেচারীদের উপর অত্যাচার দেখেই তার রাগ হচ্ছিল। রাগ নিজের মধ্যে পোষণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না, কাজেই সে চুপ করে' দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিল।

ছেলেবেলা হতেই জয়ন্তর স্বভাব একটু ডানপিটে রকমের। গাছে চড়ে' ও সাঁতার কেটেই অধিকাংশ সময় স কাটিয়ে দিয়ে এসেছে। বেড়াবার সখও তার খুব বেশী। বড়লোকের ছেলে, নিজেই নিজের কর্ত্তা, কাজেই তার ইচ্ছায় বড় একটা বাধা পড়্‌ত না। আজও তাই সে ষ্টিমারে করে' বেড়াতে চলেছে। সঙ্গে কেউ ছিল না। একা বেড়াতেই সে ভালবাস্‌ত, একজন চাকর পর্য্যন্তও সে সঙ্গে নিত না। ষ্টিমারের একটা কেবিনে সে বাসা নিয়েছিল। ষ্টিমারের যাত্রার শেষ সীমানা পর্য্যন্ত সে বেড়াতে যাবে—সে প্রায় চার পাঁচ দিনের পথ।

বর্ষাকাল। পদ্মার ভীষণ তরঙ্গের মাথার উপর দিয়ে ষ্টিমারখানা একটা মোচার খোলার মত হেল্‌তে দুল্‌তে ছুটে চলেছে। তরঙ্গময়ী পদ্মা যতবার তাকে তরঙ্গের আঘাতে সাম্‌নে অগ্রসর হ'তে বাধা দিচ্ছে, ততবারই সে ব্যঙ্গভরে তরঙ্গকে ভঙ্গ করে' ছুটে চলেছে। তবুও পদ্মাকে একটু ভয় করে' তাকে অগ্রসর হ'তে হচ্ছে। কোনও দিকে তীরের চিহ্নমাত্রও দেখা যাচ্ছে না। আকাশে মেঘ জমে আছে। বৃষ্টিও অল্প অল্প পড়্‌ছে। সারেং অতি সন্তর্পণে ষ্টিমার চালাচ্ছিল।

সন্ধ্যার কিছু আগে বৃষ্টি মাথায় করে' ষ্টিমার এক ঘাটে লাগল। ঘাটে কেউ নাম্‌ল না, উঠ্‌ল কেবল বৃদ্ধ ও এক তরুণী। বৃদ্ধ ও তরুণী পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে' পিচ্ছিল পথে নিজেদের বাঁচিয়ে কোনও রকমে ষ্টিমারে এল। তাদের সমস্ত কাপড়-চোপড় ভিজে গেছে।

জয়ন্তর কেবিনের ঠিক পাশেই মেয়েদের চট-ঘেরা কেবিন। সেটা তখন বৃষ্টি ও ঝড়ের আশঙ্কায় তুলে' দেওয়া হয়েছিল। বৃদ্ধ একজন খালাসীকে সেটা ফেলে দিতে বল্‌লেন। সে বলে' গেল, সেটা এখন ফেলা হবে না। বৃদ্ধ তরুণীকে ডেকে বল্‌লেন,—'আয় মা, আমরা এইখানে একপাশে বসি।' তার পর পাশের লোকদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বল্‌লেন,—'আর এঁদের লজ্জা কি,—এঁরা তো আমাদেরই জ্ঞাত, ভাই-বন্ধু।' বলে' এক পাশে বৃষ্টির ছাট্‌ বাঁচিয়ে কোন রকমে নিজের স্থান করে' নিয়ে, তরুণীকে নিজের কোলের কাছে বসিয়ে নিলেন। তরুণী একটু সঙ্কুচিত হ'য়ে বসে আস্তে আস্তে বল্‌লে,—'বাবা, আপনি গা-টা একটু ঢাকা দিয়ে বসুন। একে আপনার শরীর ভাল নয়, তা'তে ঠাণ্ডা লাগ্‌লে আবার অসুখ বেড়ে যাবে।' বলে' সঙ্গের বাক্স খুলে একখানা কম্বল বের করে' বৃদ্ধকে ঢেকে দিয়ে, তাঁর কোলের কাছ ঘেঁসে বস্‌লো।

জয়ন্ত তার কেবিনের বাইরে একখানা চেয়ারের উপর বসে' বসে' এই-সমস্ত দেখ্‌ছিল ও শুন্‌ছিল। তরুণীর সহজ সরল ভঙ্গীতে তার প্রাণের কোন্‌ এক কোণে একটু

তরঙ্গের সৃষ্টি হ'য়ে উঠেছিল। তরুণীর লজ্জা ও সঙ্কোচের মধ্যে জড়তার লেশ মাত্র ছিল না। লজ্জা ও নম্রতার মধ্যেও একটা সহজ সরল ভাবের মাধুর্য্য ছিল। জয়ন্ত মুগ্ধ বিস্ময়ে তাদের দিকে চেয়ে দেখ্‌ছিল। তাদের সঙ্গে আলাপ কর্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছিল। কিন্তু কোথা থেকে সঙ্কোচের ঢেউ এসে তাকে বাধা দিচ্ছিল।

এমনি সময় বৃদ্ধ তরুণীকে ডেকে বল্‌লেন,—'ইলা মা, সেদিনকার সেই বইটা পড়্‌না, শুনি ততক্ষণ। সময়টাও খানিক কেটে যাবে।'

ইলার মুখ লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ল। মনে মনে ভাব্‌লে, বাবা যেন কি! এত লোকের সাম্‌নে নিজের মেয়ের বিদ্যা জাহির কর্‌তে চান। কিন্তু সে ভাব সাম্‌লে নিয়ে বই বের করে' পড়্‌তে লাগল। রবিবাবুর চয়নিকা থেকে সে পড়্‌তে লাগ্‌লো,—

কেবল তব মুখের পানে
চাহিয়া,
বাহির হ'নু তিমির রাতে
তরণীখানি বাহিয়া!

প্রথমে স্বর নীচু করে' পড়ে' যেতে লাগ্‌ল। কিন্তু ক্রমশঃ ভাবের উত্তেজনায় স্বর একেবারে উচ্চে উঠ্‌লো, জয়ন্ত শুন্‌তে শুন্‌তে, সঙ্গীত-মুগ্ধ হরিণের মত, কখন্ নিজের অজ্ঞাতসারে একেবারে তাদের কাছে—ইলার পিঠের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে।

পড়া শেষে ইলা যখন বইটা নামিয়ে লজ্জারুণ মুখ তুলে' একবার চারিধারে দেখে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল, ঠিক এমনি সময় জয়ন্তর প্রশংসমান চোখের দৃষ্টির সঙ্গে তার দৃষ্টির মিলন হ'ল। লজ্জায় ইলার সমস্ত শরীর শিউরে উঠ্‌ল। জয়ন্ত নিজেকে ধন্য মনে কর্‌লে।

জয়ন্ত সঙ্কোচ-কুণ্ঠা-জড়িত কণ্ঠে বৃদ্ধকে বল্‌লে,—'কিছু মনে না করেন তো একটা অনুরোধ করি। আপনারা যদি আমার কেবিনে আসেন, তাহলে বড়ই বাধিত হ'ব। আমি আপনার ছেলের মত, সেই জোরেই অনুরোধ কর্‌তে সাহস কর্‌ছি। আশা করি, এতে অমত কর্‌বেন না!' তার পর ইলার দিকে চেয়ে বল্‌লে,—'আর এঁর বাইরে থাক্‌তে অসুবিধা হ'বে। আমি একলা, আপনারা সকলে আমার কেবিনে থাক্‌তে পারেন। আমি সারেংএর সঙ্গে ভাব করে' নিয়েছি, সেইখানেই এই কটা দিন বেশ থাক্‌ব।" বলে' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বৃদ্ধের ও ইলার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

বৃদ্ধ একবার সম্মতির জন্যে ইলার মুখের দিকে চাইলেন। কিন্তু সেখানে মতামতের ভাষা ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পার্‌লেন না। তাঁর মন, জয়ন্তের আত্মীয়ের মত সম্বোধনে, যাওয়ার দিকেই ঝুঁকে পড়েছিল। পাছে ইলা অমত করে সেই জন্যে তার দিকে চাইলেন। কিন্তু কোনও উত্তর পেলেন না। কাজেই একটু ইতস্তত করে' নিজেই একটু কিন্তু হ'য়ে উত্তর কর্‌লেন,—'তা বাবা, আমার কোনো আপত্তি নেই,—তবে তোমার কষ্ট হবে, কাজ নেই। আমরা এই-খানেই এই কটা দিন কাটিয়ে দেবো। কেমন ইলা, পার্‌বি না?' বলে' ইলার মুখের দিকে চাইলেন। ইলা কোনো জবাব দিলে না, চুপ করে' বসে' রইল।

শেষকালে উভয় পক্ষের যুক্তি-তর্কের ভিতর দিয়ে ঠিক হ'য়ে গেল যে, ইলা ও বৃদ্ধ জয়ন্তর কেবিনে গিয়েই থাক্‌বেন, তাঁদের যাত্রা-কালের শেষ দিন পর্য্যন্ত। সেই সঙ্গে জয়ন্তকেও স্বীকার কর্‌তে হ'ল যে, তাকে বৃদ্ধের বাড়ীতে গিয়ে কিছু দিন থাক্‌তে হ'বে। জয়ন্ত যেখানে বেড়াতে যাচ্ছে, সেইখানেই বৃদ্ধের বাড়ী। কাজেই জয়ন্তও বাধ্য হ'য়ে এবং কতকটা আনন্দের সঙ্গে রাজী হ'য়ে গেল। তৎক্ষণাৎ জয়ন্ত নিজেই বৃদ্ধের জিনিষপত্র নিজের কেবিনে এনে ফেল্‌লে।

দুই

মানুষ যেখানে যত বেশী নিঃসহায়, সেখানেই সে সামান্য একটু অবলম্বন পেলেই, তাকে প্রাণপণ-বলে জড়িয়ে ধরে। আর মানুষের স্বভাবই হচ্ছে যে, সে কখনও একলা নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাক্‌তে পারে না। এইটাই হচ্ছে স্বাভাবিক। তার মানে, মানুষ বাড়ীর বাইরে গেলেই, তারে অপরের সঙ্গে পরিচিত হবার স্পৃহা কিছু প্রবল হ'য়ে পড়ে। আর সেই সময়ই দু'জন অপরিচিত চট্ করে' উভয়ের কাছে পরিচিত হ'য়ে সম্বন্ধ এত গাঢ় করে' ফেলে যে, ভেবেই ঠিক করে' উঠা যায় না যে, এটা কেমন করে' হ'লো।

তাই আজ জয়ন্ত ও ইলার দুটি আলাদা জীবন-তন্ত্রীর

তার কথনও এক হ'য়ে জড়িয়ে গিয়ে একই সুরে বাজতে আরম্ভ করেছে। ষ্টিমারের ঘরকন্না বেশ জমে উঠেছে। ইলা তার নিপুণ হাতে খাওয়ানো-দাওয়ানোর ভার তুলে নিয়েছে। খাওয়ার সময় জয়ন্ত ও তার বাবা যোগেশ-বাবুকে যখন সে নিজে পরিবেষণ করে' খাওয়ায় ও নানা অভিযোগ ও অনুযোগ করে' জয়ন্তকে খাওয়ার জন্য জিদ করে, তখন তার ভিতর নারীত্বের গৌরব ফুটে উঠে তাকে বেশ একটা তৃপ্তি ও আনন্দ দেয়।

এক এক দিন জয়ন্ত ইলার রান্নায় সাহায্য কর্‌তে গিয়ে, নিজের অক্ষমতার পরিচয় দিয়ে, প্রথমে ইলার সঙ্গে ঝগড়া কর্‌ত, ও পরে হাসির বন্যায় নিজের হার স্বীকার করে নিত। ইলা হেসে বল্‌তো,—'যান, আপনার আর রাঁধ্‌তে হ'বে না, খুব হয়েছে। আপনার রাঁধবার বিদ্যে যে কতদূর, তা' জান্‌তে পেরেছি।'

জয়ন্ত হেসে বল্‌ত,—'আচ্ছা, তার পর পরীক্ষা করুন, জানি কি না।' পরীক্ষা দিতে গিয়ে রান্নার এমন সমস্ত উদ্ভট মসলার নাম কর্‌তো যে, ইলা হেসেই লুটোপুটি খেত। জয়ন্ত মুখ গম্ভীর করে' বল্‌ত,—'আর কোনো দিন আপনার সাম্‌নে কোনো কথা বল্‌ব না। সব তাতেই আপনি আমায় ঠাট্টা কর্‌বেন বই তো নয়' বলে' চুপ করে' গোঁজ হ'য়ে বস্‌ত ইলা কাতর হ'য়ে ক্ষমা চাইতেই, সে হেসে ফেল্‌ত। সঙ্গে সঙ্গে ইলাও হেসে ফেল্‌ত। এমনি করে'ই তাদের আড়ি ঝগ্‌ড়ার ভিতর দিয়ে উভয়ের প্রাণের পরিচয় হচ্ছিল।

সেদিন যখন জয়ন্ত ইলার কাছ হ'তে জোর করে' বঁটি কেড়ে নিয়ে নিজের তর্‌কারী কোটার নিপুণতা দেখাতে গিয়ে হাত কেটে ফেল্‌লে, সেদিন ইলা এমন অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়্‌ল, যেন এটা তার দোষেই হয়েছে। সে তাড়াতাড়ি কাপড় ছিঁড়ে কাটাটা বেঁধে দিলে। জয়ন্ত অনুযোগের স্বরে বল্‌লে,—'হাত কাট্‌লাম আমি নিজের দোষে, আপনি কেন এমন অপ্রস্তুত হ'য়ে কাপড় ছিঁড়ে ফেল্‌লেন বলুন তো। এ ভারী অন্যায় আপনার।' ইলা কোন কথা না বলে' শুধু জয়ন্তের মুখের দিকে একবার চেয়েই মুখ নীচু কর্‌লে।

সেই দিন হ'তে ইলা জয়ন্তকে রান্নার কাছে আস্‌তে দিত না। জয়ন্ত জোর করে' এলে তাকে ছোট ছেলের মত হুকুম করে' দূরে বসিয়ে রাখ্‌ত। যোগেশ-বাবু মধ্যে মধ্যে তাদের ঝগড়ার বিচারক হতেন। তাঁকে ঘিরে দুই তরুণ হৃদয়ের মিলন-পথ এই জলযাত্রায়, হাল্‌কা জলো হাওয়ার মত হাল্‌কা হয়ে মুক্ত হ'য়ে পড়েছিল।

সন্ধ্যা বেলা। আকাশে বর্ষারাণী তাঁর মেঘময় বেণী এলিয়ে দিয়েছেন। দু'একটা জলচর ষ্টিমারের ধারে ধারে ঘুরে ঘুরে বিচিত্র কলরবে উড়ে বেড়াচ্ছে। ষ্টিমার দোল্ খেতে খেতে জলের সঙ্গে লড়াই করে, ছুটে চলেছে।

জয়ন্ত কেবিনের সাম্‌নে একটা চেয়ারে বসে' আছে। কোলের উপর একখানা বই খোলা পড়ে' আছে। সে আকাশের দিকে চেয়ে বর্ষারাণীর ভীষণ মনোরম মূর্ত্তি দেখ্‌ছিল। ইলা কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে জয়ন্তের চেয়ারের পিছনে আস্তে আস্তে গিয়ে, চেয়ারটার ঠেসান দেবার হাতলের উপর হাত রেখে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে জয়ন্তকে বললে,—'কি ভাব্‌ছেন অত করে' বলুন তো? আকাশে কোনো পরীর সন্ধান পেলেন না কি, যে, অত করে' তাকিয়ে আছেন?' বলে' ইলা হেসে উঠ্‌ল।

জয়ন্ত চম্‌কে মুখ ফিরিয়ে ইলার দিকে তাকিয়ে আর চোখ ফিরিয়ে নিতে পার্‌লে না। ইলার পরণে ছিল একখানি ঘন নীলাম্বরী কাপড়। চুলগুলি খোলা—সমস্ত পিঠ একেবারে নিবিড় ভাবে ঢেকে ফেলেছে। এই কালোর খেলার মাঝে সুগৌর মুখখানি, মেঘের কোলে বিদ্যুতের চম্‌কানির মত দীপ্ত পাচ্ছে। কপালের উপর একটি সিঁদুরের টিপ, যেন কোণ-ভাঙা মেঘের ফাঁকে তারা উঁকি মার্‌ছে।

জয়ন্ত একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হেসে বল্‌লে,—'আকাশে পরী দেখিনি। এইখানকার পরীরাণীর কথা ভাব্‌ছিলাম। আপনাকে ভারী সুন্দর মানিয়েছে। আজ থেকে আপনাকে বর্ষারাণী বলে' ডাক্‌ব।'

ইলা লজ্জারাঙা মুখে সে কথা চাপা দিয়ে হেসে উত্তর কর্‌লে,—'আচ্ছা, আপনি আমাকে আপনি বলে' ডাকেন কেন বলুন তো। এবার থেকে আপনি বলে' ডাক্‌লে উত্তর দেবো না কিন্তু বলে' রাখ্‌ছি।'

জয়ন্ত তুমি বলতে রাজী হ'ল না। তার পর নানা

তর্কের ভিতর দিয়ে ঠিক হল, দু'জনেই দুজনকে তুমি বলে' ডাক্‌বে। এমনি করেই নানা কথার মধ্যে দিয়ে আসর জমে' উঠ্‌ল, জমাট-বাঁধা মেঘের তলে, সেই রকমই জমাট হ'য়ে।

রাত্রিবেলা আকাশের অবস্থা ভীষণ হ'য়ে উঠ্‌ল। সারেং ভয় পেয়ে ষ্টিমার নোঙ্গর করলে। চারিধারে অন্ধকার যেন বিরাট্ দৈত্যের মত হাঁ করে' ষ্টিমারখানাকে গিল্‌তে আস্‌ছে। নিশুতি রাতে সকলের ভাবনা-সজাগ ঘুমের ঘোর ভাঙিয়ে প্রবল বেগে ঝড় ও জল আরম্ভ হ'ল। ষ্টিমারখানা বাতাসের ধাক্কা খেয়ে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌তে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে সকলের প্রাণও কেঁপে উঠতে লাগ্‌লে,—না জানি, এই রাত্রের অন্ধকারের ভিতর কি বিপদ্ ঘটে। সকলের মুখেই উদ্বেগের চিহ্ন। খালাসীরা তাদের অভয় মুখে ভয়ের ছাপ নিয়ে ছুটোছুটি কর্‌ছে। কারণ, তারা যে সামান্য ঝড়-জলে ভয় পায় না। পদ্মা উত্তাল তরঙ্গে আলোড়িত হ'য়ে উঠেছে—তার রাক্ষসী ক্ষুধা নিয়ে যেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে গিল্‌তে আস্‌ছে।

জয়ন্ত আর ইলা ষ্টিমারের একধারে রেলিং ধরে' বৃষ্টির মধ্যে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল। জয়ন্ত ইলার দিকে ফিরে বল্‌লে,—'বর্ষারাণী, আমার কিন্তু আজ ভারী আমোদ হচ্ছে। আজ এই বিরাট্ রুদ্রদেবকে সাক্ষী করে' হয় তো আমাদের মিলন হবে, আর সেই মিলন আমাদের শেষ মৃত্যু-মিলন হবে।' বলে' হেসে ইলার মুখের দিকে তাকালে ইলা একটু ম্লান হাসি হেসে চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ ঝড়ের প্রকোপ কিছু প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ল। ষ্টিমার জলের আছ্‌ড়ানি ও ঝড়ের ধাক্কায় দুলে দুলে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। ষ্টিমার বেশীক্ষণ প্রলয়-দেবের সঙ্গে লড়াই কর্‌তে পার্‌লে না। নোঙ্গরের বাঁধন থেকে মুক্ত হ'য়ে, পাগলা ঝড়ের সঙ্গে মাতাল হ'য়ে অনির্দ্দিষ্ট পথে ছুটে চল্‌ল।—সকলে হায় হায় করে' উঠ্‌লো। কিন্তু কোনও উপায় নেই।

কিছুক্ষণ পরে ষ্টিমার হঠাৎ কিসে ধাক্কা খেয়ে কেঁপে উঠে নিশ্চল্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে আর্ত্তনাদ উঠ্‌লো—ষ্টিমারে জল উঠ্‌ছে, রক্ষা পাওয়া ভার।

সারেংএর আদেশে সবাই জীবন-রক্ষক ভেলা নিয়ে সজ্জিত হ'য়ে, মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও মরণ-জয়ী হবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়ালো। সকলেই জানে যে, ঝড় জলের হাত হ'তে নিষ্কৃতি পেলেও পদ্মার কাছে নিস্তার নেই।

জয়ন্ত ও ইলা হাত ধারাধরি করে' মৃত্যুর প্রতীক্ষায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। তাদের পাশেই যোগেশ-বাবু। ষ্টিমার তখন ডুব্‌তে আরম্ভ করেছে। জল তাদের পায়ের পাতা চুম্বন করে' বরণ করে', বুকের কাছে উঠে' আলিঙ্গন কর্‌তে লাগ্‌ল। ষ্টিমার একেবারে তলিয়ে যাবার আগেই তারা জলে ঝাঁপিয়ে পড়্‌লো, পিছনে যোগেশ-বাবু। পরে তাঁর আর কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না।

এমনি করে' অনির্দ্দিষ্টের উদ্দেশে, জয়ন্ত ও ইলা পরস্পর পরস্পরকে ধরে', মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই কর্‌তে কর্‌তে সাঁতার কাট্‌তে লাগ্‌ল। ক্রমশঃ হাত পা সব অবশ শিথিল হ'য়ে এল, ক্রমাগত ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করে' করে'।

মুখে কারো কথা নেই। অবশ ভাবে কোনও রকমে ভেসে চলেছে, কেবল বাহুর বন্ধনে দুজনে দুজনকে বেঁধে। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ঢেউ এসে দু'জনের অবশ বাহুর বন্ধন ছিন্ন করে' দু'জনকে পৃথক্ করে' দিয়ে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আকাশের বুক চিরে, তাদের বিদ্রূপ কর্‌বার জন্যেই যেন, বিদ্যুৎ চম্‌কে উঠ্‌ল। দু'জনে দু'জনকে দেখ্‌তে পেলে, দূরে দুটো ঢেউয়ের মাথার উপর শিথিল অবসন্ন দেহে ডুব্‌ছে ভাস্‌ছে। তার পর সব অন্ধকার, কেউ কাউকে দেখ্‌তে পেলে না। বাতাস সোঁ সোঁ করে' দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌তে লাগ্‌ল। মেঘ বৃষ্টির অশ্রুধারায় কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। তাদের খবর এখন কেবল দিতে পারে রাক্ষসী পদ্মা, আর প্রলয়ের রুদ্র দেবতা।

আলোক ও প্রাণ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম-বি-এ-সি

এই জগতে আলোক হইতে যে প্রাণী-জগতের উৎপত্তি তাহা বহুকাল হইতেই সকলে জ্ঞাত আছে। আলোক বিহনে যে প্রাণী-জগৎ লুপ্ত হইত, তাহায় আর সন্দেহ নাই। এই জন্যই বোধ হয় সূর্য্যকে মানব জাতি দেবতা জ্ঞানে পূজা করে। এতাবৎকাল এটা অবশ্য বিশ্বাসের উপরই কেবল নির্ভর করিয়া চলিয়া আসিতেছিল, ইহার বিজ্ঞানসম্মত কোন পরীক্ষা-সিদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। আধুনিক কালে রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা এই সমস্যার কতকটা সমাধান হইয়াছে, এবং ইহাই দেখাইবার চেষ্টা হইতেছে যে, জড় জগৎ হইতেই প্রাণীজগতের উৎপত্তি।

ইহা বুঝাইবার প্রারম্ভে আপনাদিগকে আলোক সম্বন্ধে কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য বলা আবশ্যক। আপনারা বোধ হয় অনেকেই জানেন যে, কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে ইংলণ্ড দেশে সার্ আইজাক্ নিউটন্ (Sir Isaac Newton) নামে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আলোক সম্বন্ধে গবেষণা ও পরীক্ষা করিয়া ইহাই স্থির করিয়াছিলেন যে, আলোক কেবল সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম রেণুকণা মাত্র এবং উহা তাহার উৎপত্তিস্থল হইতে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। ইহার গতি তিনি এইরূপ স্থির করেন যে, উহা প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল হিসাবে চলে। ইহাকেই ইংরাজিতে Corpuscular or Emanation Theory of Light বলে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার হিসাবে আলোক কোন পদার্থ বিশেষ এবং ইহার গতিও অনেকটা বায়ুর সঞ্চালন-গতির ন্যায়। এই ধারণার দ্বারা সকল সময়েই কিন্তু আলোকের সকল কার্য্যের সুমীমাংসা হইত না। এই কারণে অনেক বৈজ্ঞানিকের মনে কিছু খট্‌কা উপস্থিত হয়। পরে য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক Huyghens সাহেব Newton সাহেবের ঐ কল্পনার বিরুদ্ধে নিজ মত প্রচার করেন। তাঁহার মতে আলোক-রশ্মি চতুর্দ্দিকে ঢেউএর ন্যায় গতিতে ছড়াইয়া পড়ে,—ঠিক যেরূপ শব্দের ঢেলগুলি হয়; এবং ইহার গতি আদৌ বায়ু-

সঞ্চালন-গতির ন্যায় নহে। অবশ্য পরীক্ষার দ্বারা পরে এই মতই জগতে গ্রাহ্য হইয়াছিল। ইহাকে ইংরাজিতে Undulation or Wave Theory of Light বলে। তিনি আরও বলেন যে, উহা কোনরূপ পদার্থ-বিশেষ নহে;—ঐ কম্পনেরই ফলে আলোকের উৎপত্তি হয়। তবে গ্রহ-নক্ষত্রাদি হইতে পৃথিবীতে আলোক আগমনের কারণ নির্ণয় করিবার জন্য তাঁহাকে শূন্যে ঈথার (Ether) নামক কোনও পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই পদার্থের সঠিক বর্ণনা আজি পর্য্যন্ত কেহই করিতে পারেন নাই। অথচ ইহা যে নাই তাহাও বলিতে পারা যায় না; কারণ, শূন্যে গগন-মার্গে ২৫০ মাইলের ঊর্দ্ধে বায়ুর অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হয়। আলোকের এইরূপ ধারণাই বহুকালাবধি চলিয়া আসিতেছিল। ১৯ শতাব্দীর মধ্যভাগে Maxwell সাহেব হঠাৎ প্রচার করিলেন যে, আলোক কেবল বৈদ্যুতিক চুম্বক শক্তির একটা প্রকাশ মাত্র (Electro-magnetic energy)। এই অনুমান-মূলক পরীক্ষার দ্বারা আশাতীত ফললাভ হইল; এবং বৈজ্ঞানিকগণের নিকটও এই অনুমান বিশেষ সমাদর প্রাপ্ত হইল। অবশ্য Huyghens সাহেবের ঢেউএর কল্পনাটা প্রায় সমগ্রই বাহাল রহিল; তবে কেবল ঐ ঈথারের কম্পনের মধ্যে যে চক্রাকার ঢেউগুলির কল্পনা করা হইয়াছিল, তাহার স্থলে বৈদ্যুতিক চুম্বক-শক্তির কল্পনা বাহাল হইল। কোন স্থির জলাশয়ের মধ্যখানে একটা ঢেলা নিক্ষেপ করিলে তাহার চারিধারে যেরূপ সমকেন্দ্র চক্রাকার কতকগুলি ঢেউএর উত্থান ও পতন হয়, সেইরূপ আলোকদানকারী পদার্থের চারিধারেও ঐরূপ ঢেউএর উত্থান ও পতন হয়; ইহাই মোটামুটি ভাবে Huyghens সাহেবের কল্পনা। এক্ষণে Maxwell সাহেবের কল্পনায় ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, যাহা এতদিন আলোক বলিয়া জানা ছিল, তাহা কেবল উত্তাপের বিকীর্ণতা শক্তি (Radiant energy)। সূর্য্যের আলোকও কেবল তাহার উত্তাপ বিকীর্ণতার তেজ মাত্র।

সম্প্রতি Planck এবং Einstein সাহেবদের আলোক সম্বন্ধে নূতন মন্তব্য প্রকাশিত হওয়াতে Huyghens সাহেবের কল্পনা প্রায় টলটলায়মান হইয়াছে। এই যে নূতন অতি আধুনিক ধারণাটি, ইহার দ্বারা গাছপালার উপর আলোকের ক্রিয়ার অনেকটা সঠিক মীমাংসা হয়, কিন্তু ইহার দ্বারা পদার্থ-বিজ্ঞানের দৃষ্টি-শাস্ত্রের (Optics) কতক-কতক বিষয়ের মীমাংসা ভালরূপ হয় না। সেইজন্য এইখানে পুনরায় গলদ আসিয়া উপস্থিত হইল। সুতরাং যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, আলোক তাহা হইলে কিরূপ পদার্থ, তাহার আর উত্তর পাওয়া গেল না;—মোটের উপর আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিলাম, আলোক আমাদিগকে আলোকদানে সমর্থ হইল না। যাহা হউক, এই Planck এবং Einstein সাহেবদের আলোক সম্বন্ধে ধারণাটার বিষয় আপনাদিগকে কিছু বলিতে চাহি। ইঁহাদের কল্পনাটার বাঙ্গালা ব্যাখ্যা করা বিশেষ কঠিন। তবে মোটামুটি যতদূর সম্ভব, তাহার কথঞ্চিৎ আপনাদিগকে বলিতেছি।

তাঁহাদের মতে আলোক একটা ধমনীয় শক্তি, যাহার প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই, যখনই কোনও পরমাণু (atom) ভাঙ্গিয়া ছড়াইয়া পড়ে। অর্থাৎ কি না, ঐ ব্যাপারটা যেন ঐ সকল অণুপরমাণুদের আভ্যন্তরিক কোনও একটা সংঘর্ষণজনিত আকস্মিক দুর্ঘটনা। সূর্য্যের চারিধারে যেরূপ গ্রহেরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ঠিক সেইরূপ ভাবেই তড়িতণুগুলি (Electron) পরমাণুর ভিতরকার কোনও এক তড়িতণু কেন্দ্রের চারিধারে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু এগুলি হঠাৎ যখনই পথভ্রষ্ট হইয়া অপর একটির ঘাড়ে যাইয়া পড়ে, তখনই তাহার শক্তি বা তেজ আংশিক ভাবে শূন্যে ছড়াইয়া পড়ে, এবং ইহাই আলোক রূপে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাকে ইংরাজিতে "light quanta" বলে। এই শক্তি যদি অত্যধিক পরিমাণে বহির্গত হইতে থাকে, তাহা হইলে আমরা অতি বেগুণে রঙ্গের রশ্মি প্রাপ্ত হই (Ultra-violet light), এমন কি X-Ray আলোক-রশ্মিও প্রাপ্ত হইতে পারি। কিন্তু এই শক্তি যদি অত্যল্প পরিমাণে বহির্গত হইতে থাকে, তাহা হইলে আমরা অতি কোমল লাল রঙ্গের রশ্মি প্রাপ্ত হই (Infra-red light)। তাহা হইলে আপনারা দেখিতেছেন যে, ফলে আমরা পুনরায় সেই নিউটন সাহেবেরই Emanation Theoryতে আসিয়া পড়িতেছি। তবে তাহার

সহিত ইহার এইটাই তফাৎ যে, তাঁহার মতে আলোক একরূপ পদার্থ বিশেষ ছিল, আর আধুনিক কল্পনায় উহা বৈদ্যুতিক চুম্বক-শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। ইহাই হইল আজকালকার Quantum Theory of Light।

উপরিউক্ত আলোক বিষয়ের জ্ঞান কেবল মাত্র পদার্থ-বিজ্ঞান হিসাবে দেখান হইয়াছে। এখন উহাকে রাসায়নিক-বিজ্ঞান হিসাবে দেখা যাউক। আজকাল আলোককে একপ্রকার তেজ বা শক্তিরূপে জ্ঞাত হওয়ার পর হইতে ইহার দ্বারা সম্পন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ার কারণগুলি বিবৃত করা অনেকটা সহজ হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, ইহার দ্বারা যখনই কোন কার্য্য সমাধা হয়, তখনই বুঝিতে পারা যায় যে, আলোক-শক্তি অপর কোনও রূপ শক্তিতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ১৯ শতাব্দীর প্রারম্ভে Grotthus নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক এইরূপ নিয়ম দেখান যে, যখনই কোনও পদার্থ হইতে উত্তাপ বহির্গত হইতে না পারিয়া সেই পদার্থেই আবিষ্ট হইয়া যায়, তখনই photo-chemical কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই নিয়ম অদ্যাবধি বাহাল আছে। তবে আলোকের সকলটাই যে রাসায়নিক ক্রিয়ায় ব্যয়িত হইবে, এমন কোন মানে নাই। হয় ত তাহার কতক অংশ উত্তাপে পরিণত হইয়া যাইতে পারে, কতক অংশ বা আলোকই রহিয়া যাইতে পারে; আর কতকটা বা অপর কোনরূপ শক্তিতে পরিণত হইয়া যাইতে পারে।

এক্ষণে দেখা যাউক, সূর্য্য-রশ্মি পৃথিবীতে পৌঁছিবার পূর্ব্বে বায়ুমণ্ডলে কতরূপ রাসায়নিক ক্রিয়া সমাধা করিয়া আইসে। রাসায়নিক জড় পদার্থ হইতে অজড় পদার্থে আলোক-শক্তির সাহায্যে পৌঁছান যেরূপ ভাবে সংঘটিত হয়, ইহার ক্রিয়াও নিশ্চয়ই তদ্রূপ ভাবে হইয়া থাকে। ইহারই আরও একপদ অগ্রসর হইতে চাহেন আমাদের জীবাণুতাত্ত্বিকগণ (Biologists)। তাঁহারা জড়জগৎ হইতে একেবারে প্রাণীজগতের মধ্যে সোজা-সুজি ভাবে চলিয়া আসিতে চাহেন। কিন্তু ইহার জন্য পৃথিবীকে এরূপ ভাবে শীতল হইতে হইবে, যাহাতে করিয়া জড় হইতে প্রাণীজগতের সৃষ্টি সম্ভবপর হয়। কারণ, Jacques Loeb নামক জনৈক আমেরিকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, যে সকল গরম জলের স্বাভাবিক উৎসের (geysers) উত্তাপ ৫৫৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা তদূর্দ্ধ, সেই সকল উৎসে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জীবাণু বা গাছপালা জন্মগ্রহণ করিতে পারে না। কাজে-কাজেই আমরা ইহা হইতে ধারণা করিতে পারি যে, এ পৃথিবীতে কোনরূপ প্রাণী সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে ইহা নিশ্চয়ই ঐ উত্তাপের নিম্নে পৌঁছিয়াছিল। আরও ধারা-বাহিক যুক্তির দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, অতি প্রাচীন কালে—কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর জল বায়ু নিশ্চয়ই আধুনিক জল বায়ু হইতে ভিন্ন প্রকারের ছিল। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, তখনকার কালে বায়ুতে Carbon dioxide গ্যাস ও জলের পরিমাণ অত্যধিক ছিল, এবং উত্তাপও খুব বেশী ছিল। তাঁহারা আরও বলেন যে, আধুনিক কালের আলোক-রশ্মির অতি-বেগুণে রশ্মি (ultarivolet rays) অপেক্ষা অত প্রাচীনকালের আলোক-রশ্মিতে ঐ রশ্মি আরও অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। কারণ, ইহা পরীক্ষিত জ্ঞান যে, অধিক উত্তাপযুক্ত আলোক-রশ্মিতে অধিক পরিমাণে অতি বেগুণে রশ্মি বর্ত্তমান থাকে।

এক্ষণে আমরা পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন-শাস্ত্র এবং ভূতত্ত্ব বিদ্যা হইতে কতকটা ধারণা করিতে পারি যে, কিরূপ উপায়ে জড় পদার্থের ক্রমবিকাশে প্রাণী জগতের সৃষ্টি হইল। আধুনিক রসায়নাগারের সাহায্যে এ বিষয় আমরা কিছু পরীক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি। অবশ্য পৃথিবীর প্রারম্ভে আগ্নেয়গিরির ন্যায় যে ভীষণ অগ্ন্যুৎ-পাদন হইয়াছিল, তাহার দ্বারা সমগ্র আকাশ-মার্গ রাসা-য়নিক নানাবিধ জড় পদার্থের ধূলিকণায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল; সেই নিমিত্ত নানাবিধ প্রাণী-জগতের সৃষ্টিও সম্ভবপর হইয়াছিল। আধুনিক কালে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যু-পাতের সময় দেখা যায় যে নানা প্রকার চুম্বক-শক্তি-সম্পন্ন লৌহ-ধাতব পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়,—ইহারা অনেক প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটনে বিশেষ সাহায্য করে। এইরূপ দ্রব্যাদিকে ইংরাজীতে Catalyst কহে। এই সকল লৌহ পদার্থ অম্লজান বাষ্পকে (Oxygen) শক্তি-সম্পন্ন করে, এবং বাষ্পীয় জলের বিশ্লেষণে তাহা হইতে উদ্‌জান বাষ্প (Hydogen) পৃথক করিয়া দিতে পারে। এ

বিষয়ে অনেক বৈজ্ঞানিক যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। Dakin, Neuberg, Mc Callum, Fenton প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ অনেক পরীক্ষার দ্বারা লৌহ পদার্থের ঐরূপ আশ্চর্য্য গুণের সন্ধান পাইয়াছেন। ইহার সামান্য একটা উদাহরণ আপনাদের নিকট বলিলেই বুঝিতে পারিবেন। বিশুদ্ধ (Tartaric acid) তেঁতুলাম্লস্ফটিক জলে দ্রবীভূত করিয়া সূর্য্যের কিরণে রাখিয়া দিলে তাহার একটুও পরিবর্ত্তন হয় না, কিন্তু উহাতে যৎসামান্য লৌহলবণ (Ferric chloride) মিশ্রিত করিয়া দিলেই উহা অতি সত্বর বিশ্লেষিত হইয়া যায়। অধিকাংশ প্রাণীর শোণিতের মধ্যে লৌহ ধাতু যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। আমাদের শোণিতের যে লাল রং হইয়াছে, তাহা কেবল একপ্রকার লৌহময় জীবাণুর বর্ণের জন্য। আসল শোণিতের কোনও বর্ণ নাই,—তাহা লালাবৎ একপ্রকার তরল পদার্থ মাত্র। এই জীবাণুগুলির আকৃতি জন্তু হিসাবে কখনও বা চক্রাকার, কখনও বা ডিম্বাকার; এবং সেই আকারেরও তারতম্য আছে। বৃহদাকার জীবের শোণিতের জীবাণুগুলি মনুষ্য-শোণিতের জীবাণুগুলি অপেক্ষা অনেক বড়; যেমন, হস্তীর শোণিতের জীবাণুগুলি মনুষ্য-শোণিতের জীবাণুগুলি অপেক্ষা প্রায় পঞ্চগুণ বৃহত্তর। ইহাদের মধ্যে এক প্রকার লৌহ ধাতু ঘটিত পদার্থ আছে; তাহাকে ইংরাজিতে hæmoglobin বলে। এই "হেমগ্লোবিন" শরীর মধ্যে অপরিষ্কার রক্তে ঐরূপ ভাবেই থাকে; কিন্তু উহা আমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সময় বায়ু হইতে অম্লজান বাষ্প (oxygen)টিকে আটক করিয়া রাখিয়া নিজে oxy-haemoglobinএ পরিণত হয় এবং আমাদের শোণিতকে সতেজ ও পরিষ্কার করিয়া দেয়। এই "অক্‌সি-হেমোগ্লোবিন" পদার্থের মধ্যে প্রায় শতকরা ০·৪ ভাগ লৌহধাতু আছে। অশুদ্ধ রক্ত বর্ণে প্রায় অল্প কালাচে হয় এবং ইহা শিরার ভিতর প্রবাহিত হইতে থাকে। আর বিশুদ্ধ রক্ত বর্ণে উজ্জ্বল লাল হয় এবং ইহা ধমনীর মধ্যে প্রবাহিত হইতে থাকে। লৌহধাতব পদার্থের দ্বারা কেন যে অম্লজান বাষ্প ধৃত হয় বা সতেজ হয়, তাহার কোন মীমাংসা অদ্যাপি হয় নাই; কিন্তু ইহার এইরূপ শক্তির জন্য প্রকৃতির উপর যে ইহার কিরূপ প্রভাব থাকিতে পারে, তাহা বলা বাহুল্য।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলীতে সূর্য্যকিরণ দ্বারা কিরূপ রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়, তাহাই বিশদ রূপে দেখা যাউক। য়ুরোপের রসায়নবিদ্‌গণ ইহার পরীক্ষার জন্য সুইজারলণ্ড দেশের "আল্পস্" পর্ব্বতের মন্টিরোজা (Monte Rosa) নামক তুঙ্গ শৃঙ্গের উপর একটি রসায়নাগার স্থাপিত করিয়াছেন। এই চূড়ার উচ্চতা প্রায় তিন মাইল হইবে। ইহার শৃঙ্গে উঠিবার সময় সূর্য্যতাপ এত প্রখর বলিয়া অনুভূত হয় যে, গাত্রচর্ম্ম কোন তৈলাক্ত পদার্থের দ্বারা মর্দ্দিত করিয়া না উঠিলে, চর্ম্মে ফোস্কা উঠিয়া যায়। চক্ষু রঙ্গিন কাচের চশমা দ্বারা আবৃত না করিলে উহা ঝলসিয়া যায়। পর্ব্বতের নিম্নভাগে কিন্তু ঐ একই সূর্য্যকিরণ কত মধুর, কত আরামপ্রদ,—ইহার দ্বারা কত প্রকার ব্যাধির উপশম হয়। কিন্তু যে অংশ হইতে পর্ব্বতটি চির তুষারাবৃত, সেই অংশ হইতে উপরিভাগে যত উচ্চে উঠা যায়, সূর্য্যকিরণ মানবের ততই শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। ইহার কারণ আর কিছুই নহে; কেবল আমরা তখন অধিক পরিমাণে ultraviolet রশ্মির তাড়নায় অস্থির হই। এই রশ্মিই অত্যধিক পরিমাণে উপভোগ করিলে প্রাণী প্রাণহীন হইয়া যায়। ইহা ব্যতীত পর্ব্বতোপরি আরও এই এক ভয়ের কারণ আছে যে, মানবদেহ অল্পে-অল্পে বিষাক্ত হইয়া যায়; কারণ চিরতুষার-সীমার ঊর্দ্ধস্থিত বায়ুস্তরের মধ্যে অধিক পরিমাণে nitric oxide, nitrous oxide, ozone, hydrogen peroxide, এবং ammonium nitrate পাওয়া যায়, যাহার দ্বারা আমাদের রক্তের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া উহাকে বিষময় করিয়া ফেলে। ইহাই পার্ব্বত্য-ব্যারামের (mountain sickness) মূল কারণ। মন্টিরোজার উপত্যকার বায়ুর রাসায়নিক বিশ্লেষণে ঐ সকল পদার্থের ভাগ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। রসায়নবিদ্‌গণ বলেন যে, ঐ সকল পদার্থ প্রথমত NOH. পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাকে ইংরাজিতে nitrosyl কহে, এবং ইহা প্রায় Prussic acidএর তুল্য বিষ। বিখ্যাত ইতালীয় রসায়নবিদ্ Angeli সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এই nitrosylটা অজড় রসায়ন পদার্থ aldehydeএর সহিত মিলিত হইয়া hydroxamic acidএ পরিণত হয়। আমেরিকা দেশের রসায়নাচার্য্য Oskar Baudischও ইহার পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি জলযুক্ত বায়ুকে violet এবং ultraviolet রশ্মির উত্তাপে রাখিয়া

দিয়া প্রথমে nitrosyl প্রস্তুত করেন ; পরে তাহাতে formaldehyde নামক অজড় রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত করিয়াও ঐ দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের রসায়ন বিদ্ E. E. C. Baly সাহেবও ঐ দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তবে তিনি formaldehydeএর পরিবর্ত্তে সোরার জলে carbon dioxide গ্যাস প্রবিষ্ট করাইয়া তাহাকে ঐরূপ ভাবে রশ্মিতে রাখিয়া দিয়াছিলেন। এই formaldehydeএর সহিত nitrosyl সংযুক্ত হইলে সর্ব্বপ্রথমে উহা nitroso-methyl alcoholএ পরিণত হয় $\left(\begin{smallmatrix}H\\H\end{smallmatrix}>C<\begin{smallmatrix}NO\\OH\end{smallmatrix}\right)$। এই দ্রব্যটিই গাছপালা মধ্যে সূর্য্যকিরণ সাহায্যে বায়ু, জল ও carbon dioxide হইতে জন্মায় এবং ইহা উৎপন্ন হইবামাত্রই তৎক্ষণাৎ বিশ্লেষিত হইয়া methyl-alcoholও ammoniaয় পরিণত হয়। এই methyl-alcoholটি গাছপালার বিশেষরূপে প্রাণপোষক ; ইহা হইতে গাছপালারা আপন আপন চিনি, মাড় (starch) প্রভৃতি দ্রব্য তৈয়ার করিয়া লয়। Ethyl-alcohol কিন্তু উহাদের পক্ষে বিষ। মানুষের পক্ষে ইহার ঠিক উল্টা। আমরা ethy-lalcohol মদ্যরূপে ব্যবহার করিতে পারি ; কিন্তু methyl-alcohol খাইলে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য্য। Stoklasa এবং Baly সাহেব উভয়েই প্রমাণিত করিয়াছেন যে, জলের মধ্যে carbon dioxide গ্যাস উত্তমরূপে প্রবিষ্ট করাইয়া তাহাতে ultra-violet রশ্মির উত্তাপ লাগাইলে, তাহা হইতে formaldehyde প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ঐ জলে অত্যল্প ক্ষার দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া দিলে formose নামক এক প্রকার সুমিষ্ট চিনি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কারণে একজন খুব রসিক বৈজ্ঞানিক বলিয়াছিলেন যে, কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বেকার পৃথিবীতে নিশ্চয়ই সরবৎ রূপে সুমিষ্ট বৃষ্টি পতিত হইত। এক্ষণে ইহাতে কথঞ্চিৎ প্রমাণিত হইল যে, প্রকৃতিতে আলোক সাহায্যে কিরূপ ভাবে জড় পদার্থ হইতে অজড় পদার্থের সৃষ্টি হইতেছে।

আলোকের সাহায্যে যে অনেক প্রকার ব্যারাম আরোগ্য হইতে পারে, ইহা বহু পূর্ব্বকাল হইতেই মানব জাতির জানা ছিল। কিন্তু তাহা কিরূপে যে সংঘটিত হইত, তাহা জানা ছিল না। অধুনা ইহা বৈজ্ঞানিক মতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, অনেক প্রকার চর্ম্মরোগ, অস্থিক্ষত (Taberculosis of the bones) এবং ক্ষীণাস্থি রোগ (Rickets বা osteomalacia) কেবলমাত্র আলোক সাহায্যেই আরোগ্য হইতে পারে। Mercury arc ল্যাম্পের নীলাভ আলোকরশ্মির যে ঐরূপ আরোগ্যকারী শক্তি আছে, তাহা গত যুদ্ধে বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। ভারতবাসীদিগের মধ্যে সর্ব্বত্রই একটা প্রথা দৃষ্ট হয় যে, আঁতুড়ে ছেলেদের গাত্রে উত্তমরূপে সর্ষপ তৈল মর্দ্দন করিয়া কিয়ৎকালের জন্য তাহাদিগকে সূর্য্যের আলোকে শোয়াইয়া রাখা হয়। এ প্রথা যে শিশুদিগের অস্থি সবল করিবার পক্ষে কত উপকারী, তাহা বিজ্ঞান আজকাল প্রমাণ করিতেছে। অনেক সৌখিন ললনা হয় ত এ প্রস্তাবে নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন, সন্দেহ নাই ; কারণ তাঁহাদের ধারণা যে, এ প্রথাটা বড়ই অসভ্য, এবং ইহাতে শিশুর গাত্র-চর্ম্ম কাল বর্ণের হইয়া যাইবে। কিন্তু আমেরিকা দেশে বড়-বড় ডাক্তারেরা এ প্রথার সমর্থন করেন, এবং mercury arc ultraviolet রশ্মির সাহায্যে rickets বা osteomalacia ব্যারামও আরোগ্য করিতেছেন। তাঁহারা প্রতি দিন রোগীদিগকে দুই তিন মিনিট কাল ঐ ল্যাম্পের ultraviolet রশ্মির দুই হাত দূরে বসাইয়া রাখেন মাত্র ; তাহাতেই তাহাদের ক্ষীণাস্থি রোগ সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য হইয়া যায়। মানবদেহে অনেকগুলি রাসায়নিক ধাতব পদার্থ আছে, যাহার কোন একটির অল্পতায় শরীরে ব্যাধির উৎপত্তি হয়। জীবজন্তু ও মনুষ্যের হাড়গুলি কেবল চুণ ও ফসফরাস্ পদার্থের রাসায়নিক সংমিশ্রণ মাত্র। এই পদার্থটিকে ইংরাজিতে calcium phosphate কহে ; এবং ইহারই অল্পতায় এই ক্ষীণাস্থি রোগের উৎপত্তি হয়। অধুনা ইহা বৈজ্ঞানিক ভাবে সপ্রমাণিত হইয়াছে যে, ঐ ultraviolet রশ্মির সাহায্যে রক্তের মধ্যে ফসফরাস্ পদার্থটির বৃদ্ধি হয় এবং এই কারণে ক্ষীণাস্থি রোগ সত্বর আরোগ্য হইয়া যায়।

পৃথিবীতে আলোক হইতেই যে প্রাণের উৎপত্তি, তাহা কথঞ্চিৎ প্রমাণিত হইল। কালে ইহা আরও অধিক পরিমাণে প্রমাণিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইহার জন্য বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার, রসায়নবিদ্ এবং জীবাণু-তাত্ত্বিকদিগের পরস্পর সাহায্য অত্যাবশ্যক হইবে। Pasteur সাহেব বলিয়াছিলেন যে, মানবজীবন তখনই অমূল্য, যখনই তাহা সমগ্র মানব জাতির হিতার্থে ব্যবহৃত হয়।

ধ্যান

শ্রীসতীশচন্দ্র সান্যাল

ধ্যান কি? ধ্যান বলিলে কি বুঝি?

ধ্যানং নির্বিষয়ং মনঃ

সাঙ্খ্য প্রবচন সূত্র। ৬।২৫

অন্তঃকরণে বিষয়ের অভাব, বিষয়ের পরিশূন্যতা, বৃত্যন্তরের পরিশূন্যতার নাম ধ্যান।

অন্তঃকরণে বিষয়ের অভাব বলিলে বিষয়-বৈরাগ্য বুঝায়। বিষয়ের দোষ উপলব্ধি হইলে, অর্থাৎ বিষয় অনিত্য, সুতরাং দুঃখের মূল সুতরাং দোষযুক্ত, এই জ্ঞানের উদয় হইলে বিষয় বৈরাগ্য উদয় হয়—বিষয়ের প্রতি তখন অনুরাগ তিরোহিত হয়, বিষয়-বাসনা তখন থাকে না। সুতরাং অন্তঃকরণ তখন নির্বিষয়।

ধ্যান করিতে হইলে ধ্যেয় পদার্থের ধারণা আবশ্যক। ধারণা কি? ধারণা কাহাকে বলে?

যত্র যত্র মনো যাতি ব্রহ্মণস্তত্র দর্শনাৎ।
মনসো ধারণঞ্চৈব ধারণা সা পরামতা॥

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতি। ১২২

মন যে যে বিষয়ে গমন করে, সেই সেই বিষয়ে ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন পূর্ব্বক যে মনস্থাপন, তাহাকেই উৎকৃষ্ট ধারণা কহে।

ধারণার জন্য অভ্যাস অর্থাৎ চিত্তস্থৈর্য্যসাধন প্রয়োজন।

বীতরাগ বিষয়ং বা চিত্তম্।

পাতঞ্জল দর্শন। সমাধিপাদ। ৩৭

সর্ব্ববিষয়ে আসক্তিশূন্য অথবা চিত্তবৃত্তি রসকল বাসনার প্রতি বীতরাগ হইলে চিত্ত স্থির হয়।

অভ্যাস করিতে করিতে, অর্থাৎ কালে, চিত্ত স্থির হইলে একাগ্রতা আসে;—সেই এক, ধ্যেয় পদার্থ তখন অগ্রে বিদ্যমান থাকেন। চিত্ত তখন অনন্যচিত্ত একমনাঃ, একনিষ্ঠ। একনিষ্ঠ হইলে অপরূপ জ্যোতিঃ দর্শন ঘটে। সেই জ্যোতিঃ দর্শন ঘটিলে, শোক তাপের অতীত হইতে পারা যায়।

বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী।

পাতঞ্জলদর্শন। সমাধিপাদ। ৩৬

নিজের ইচ্ছানুরূপ কোন দিব্য বস্তুর ধ্যান দ্বারাও চিত্তের একাগ্রতা জন্মে।

যথাভিমত ধ্যানাদ্ বা। ঐ ৩৯

সুতরাং একাগ্রচিত্ত হইতে হইলে, নির্বিষয় হইয়া কোন অপরূপ জ্যোতিঃ, বা কোন দিব্য মূর্ত্তি, বা কোন দিব্য বস্তুর ধ্যান করা প্রয়োজন। অপরূপ জ্যোতিঃ বল, দিব্য মূর্ত্তি বল, দিব্য বস্তু বল,—সমস্তই পৃথক পৃথক শব্দ, পৃথক পৃথক নাম; বস্তুতঃ একই পদার্থ। সুতরাং সেই একেরই ধারণা চিত্তে অঙ্কিত করিয়া সেই একেরই ধ্যান করা আবশ্যক।

যখন, যেখানে, চিত্ত স্থির হইবে, তখন সেইখানেই ভগবদ্ধ্যানে মনকে নিযুক্ত করিবে।

চিত্ত চঞ্চল। চঞ্চল চিত্তকে স্থির করা কঠিন। ভগবৎকৃপায় চিত্ত যদি কোন সময়ে স্থির হয়, তবে কাল বা স্থানের অপেক্ষা না করিয়া, তখনই, সেই স্থানেই ভগবদ্ধ্যানে মনকে নিযুক্ত করিবে। কোন ক্ষুদ্র কারণ, অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে অন্তঃকরণের বৃত্তি প্রবাহের প্রতিরোধক যেন না হয়। চিত্তকে স্থির করাই মুখ্য উদ্দেশ্য—নিরূপিত কাল বা নিরূপিত স্থান চিত্ত স্থির করিবার সহায় মাত্র। কথিতও আছে—

ন স্থান নিয়মশ্চিত্ত প্রসাদাৎ।

সাঙ্খ্যপ্রবচন সূত্র—৬।৩১

ধ্যানাদির জন্য স্থান নিয়ম নাই। যে স্থলে চিত্ত প্রফুল্ল হয়, সেই স্থলেই ধ্যান করিবে।

আরও—

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ।

বেদান্তদর্শন। প্রথম পাদ। ৪।১১

যে স্থানে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে, সেই স্থানই উপাসনার যোগ্য। এ সম্বন্ধে স্থানাদির কোন বিশেষ নিয়ম নাই।

"ধ্যানাদির জন্য স্থানের নিয়ম নাই"—এ কথার তাৎপর্য্য

কি? যিনি দেশ-কালময় অথচ দেশকালাতীত; নামরূপময় অথচ নামরূপাতীত; সর্ব্বব্যাপী অথচ সর্ব্বাতীত; জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে যাঁহার সত্তা; এমন পদার্থ নাই যাহাতে তাঁহার সত্তা নাই, তাঁহাকে ধ্যান করিবার জন্য কি কোন বিশেষ স্থান বা কাল নির্দ্দিষ্ট থাকিতে পারে?

যস্মিন সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যঃ সর্ব্বং সর্ব্বতশ্চ যঃ।
যশ্চ সর্ব্বময়ো নিত্যং তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ॥

মহাভারত।

যাঁহাতে সমস্ত লীন, যাঁহা হইতে সমস্ত উদ্ভূত, যিনি সমস্ত, সমস্তই যিনি, যিনি সর্ব্বময় নিত্য, সর্ব্বাত্মক—তাঁহাকে ধ্যান করিবার জন্য কি কোন বিশেষ স্থান বা কাল নির্দ্দিষ্ট থাকিতে পারে? ভাবিয়া দেখিলে বিশ্বই যে বিরাট দেব-মন্দির, সর্ব্বক্ষণই যে ধ্যানের ক্ষণ।

কথিত আছে গুরু নানকজী একদিন এক দেব-মন্দিরের দিকে পা ছড়াইয়া শয়ন করিয়াছিলেন। জনৈক ব্যক্তি তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া, গুরু নানকজীকে বলিলেন—"আপনি জ্ঞানী হইয়া দেবমন্দিরের দিকে পা ছড়াইয়া শুইয়া আছেন? গুরু নানকজী বলিলেন—"ভাই, যে দিকে দেবমন্দির নাই, আমার পা দু'খানা সেই দিকে টানিয়া রাখিয়া দাও।" এই কথায় ঐ ব্যক্তির জ্ঞানের উদয় হইল—দেবমন্দির নাই, এমন স্থান তাহার চক্ষে পড়িল না।

কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে, এই জ্ঞান, এই দর্শন লাভ করিয়াই ত ভক্তসখা অর্জ্জুন ভগবান নারায়ণ হরিকে অধে, উর্দ্ধে, সম্মুখে, পশ্চাতে, চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাইয়া ভক্তি-গদগদ চিত্তে বলিয়াছিলেন—

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তুতে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্ত বীর্যামিত বিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥

গীতা—১১।৪০

এইরূপ জ্ঞান-উপদেশই ত একদিন দেবাদিদেব মহাদেব রাক্ষসকুলভূষণ শ্রীরাম-ভক্ত বিভীষণকে প্রদান করিয়াছিলেন। অগ্রজের নিকট পদাহত, মর্ম্মাহত, অপমানিত হইয়া, গৃহ, ধন, জন ত্যাগ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইবার উদ্দেশ্যে বিভীষণ বহির্গত হইয়াছেন। পথে, কুবেরালয়ে আসিয়া তিনি উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীরাম-চন্দ্রের সম্মুখে কি প্রকারে তিনি উপস্থিত হইবেন, লোকে তাঁহাকে কি বলিবে, শ্রীরামচন্দ্রই তাঁহাকে বিশ্বাস করিবেন কি না—এই প্রকার কত কথা তাঁহার চিত্তকে আন্দোলিত উদ্বেলিত—করিতেছে। তখন—

তাহা দেখি পরম দয়ালু শূলপাণি।
কহিতে লাগিলা তার অভিপ্রায় জানি॥
**　**　**　**
**　**　**　**
একি একি বিভীষণ বড় চমৎকার।
হইতেছে এ সংশয় কিরূপে তোমার॥
কহিতেছি মোরা যাঁরে করিতে আশ্রয়।
তাঁহার ভজনে নাহি সময় নির্ণয়॥
**　**　**　**
**　**　**　**
সত্যসুখ জ্ঞান ধন তনু রঘুপতি।
পরমাত্মা ভগবান কহে শ্রুতি যতি॥
জীবের নিয়ন্তা অবিচিন্ত্য শক্তিধর।
সৃষ্টি স্থিতি লয়কর্ত্তা জগত ঈশ্বর॥
কেহ তাঁরে ব্রহ্ম বলি করে উপাসন।
কেহ নারায়ণ বলি করয়ে ভজন॥
হয়েছেন তিনি লোকে সম্প্রতি প্রকট।
সাধিতে ভক্তের সুখ নাশিতে সঙ্কট॥
সময় নির্ব্বন্ধ নাহি তাঁহার ভজনে।
করিবে তখনি হবে ইচ্ছা যবে মনে॥

রামায়ণ, সুন্দরাকাণ্ড।

তাই বলিতেছিলাম, সমস্তই দেবমন্দির। যেখানে বসিয়া তাঁহাকে ভাবিবে, সেই স্থলই তাঁহাকে ধ্যান করিবার স্থল; যখনই তাঁহার ধ্যান করিবে, সেই কালই তাঁহাকে ধ্যান করিবার কাল।
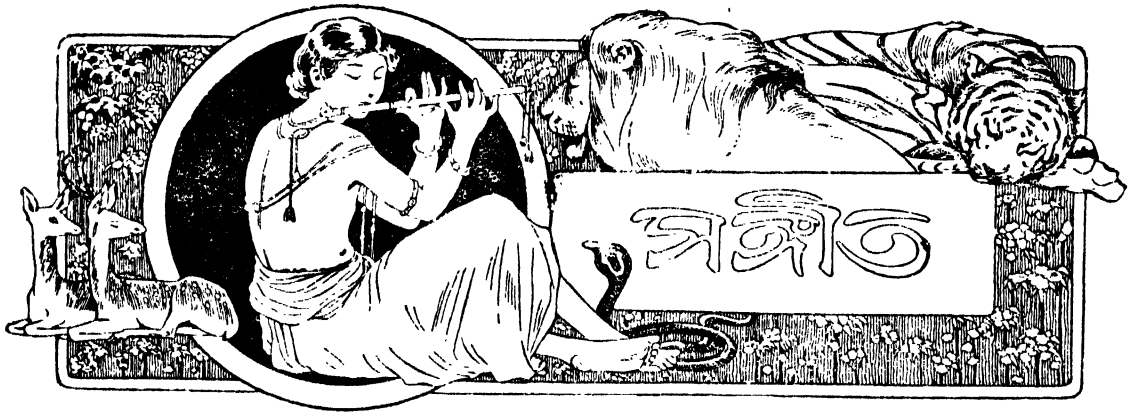
স্বরলিপি

কথা—শ্রীদিলীপকুমার রায়   সুর—গজল হইতে   তাল—কার্ফা

কেন ?

যদি দিন না দেবে তবে এত ব্যথা কেন সওয়াও ?
যদি আশা নাহি রবে মিছে বোঝা কেন বওয়াও ?
যদি মেঘ না দেয় বারি কেন আশায় রাখ তারই ?
যখন চাতক তৃষায় পাগল- পারা কৃপার আশায় যারই ?
যদি মেঘের নানা খেলা শুধু মিছে রঙের মেলা,
তবে হৃদয়- তন্ত্রী বাজে কেন সকাল সন্ধ্যে বেলা ?
যদি সৃষ্টি শুধুই মায়া তবে কেন আলো ছায়া,
শত গীতি গন্ধ বর্ণ প্রাণে তোলে দখিন হাওয়া ?
যদি অশ্রু ব্যথার মাঝে মোদের মিছে সৃষ্টি কাজ এ—
তবে বি ফ ল তা র মাঝেও কেন আশার বাঁশী বাজে ?

II {সা ঋা ' মা -া -া সা | মা -া গমা গমা | পা দা পা -া | -া -া
যদি দি ন্ - না দে - বে - ত - বে - - -

পা পা | পা দা পদা র্সণা | ধণা -া 'পা দা | পমা পা মগা মা | া া} II
এ ত ব্য - থা - - - কে ন স ও য়া ও - -

ণদা ণা | র্সা -া র্সা -া | -া -া র্সা র্সা | র্সা র্রা ণর্সা র্রর্মা | র্জ্ঞর্রা র্সণা
য দি আ - শা - - - না হি র - বে - - -

ধা ণা | ণা -া ধর্সা ণণা | -া পা পা দা | পমা পা মগা মা | া া II II
মি ছে বো - ঝা - - - কে ন ব ও য়া ও - -

ণদা ণা | র্সা -া র্সা -া | -া -া র্সা র্সা | র্সা র্রা ণর্সা র্র্মা | জ্র্রা র্সণা
য খন　চা - ত -　- ক তৃ ষায়　পা - গ -　- ল

ধা ণা | ণা -া ধর্সা ণণা | -া পা পা দা | পমা পা মগা মা | া া II II
পা রা　কৃ - পা -　- র আ শায়　যা র ই -　- -

ণদা ণা | র্সা -া র্সা -া | -া -া র্সা র্সা | র্সা র্রা ণর্সা র্র্মা | জ্র্রা র্সণা
ত বে　হৃ - দ য়　- - ত স্ত্রী　বা - জে -　- -

ধা ণা | ণা -া ধর্সা ণণা | -া পা পা দা | পমা পা মগা মা | া া II II
কে ন　স - কা -　- ল স ন্ধ্যে　বে - লা -　- -

ণদা ণা | র্সা -া র্সা -া | -া -া র্সা র্সা | র্সা র্রা ণর্সা র্র্সা | জ্র্রা র্সণা
শ ত　গী - তি -　- - গ ন্ধ　ব র ণ -　- -

ধা ণা | ণা -া ধর্সা ণণা | -া পা পা দা | পমা পা মগা মা | া া II II
প্রা ণে　তো - লে -　- - দ খিণ　হা ও য়া -　- -

ণদা ণা | র্সা -া র্সা -া | -া -া র্সা র্সা | র্সা র্রা ণর্সা র্র্মা | জ্র্রা র্সণা
ত বে　বি - ফ -　- - ল তার　মা - ঝে -　- -

ধা ণা | ণা -া ধর্সা ণণা | -া পা পা দা | পমা পা মগা মা | া া II II
কে ন　আ - শা -　- র বাঁ শি　বা - জে -　- -

ণদা ণা | র্সা র্গা র্গা -া | -া র্গা র্গা র্মা | র্মা র্গা র্মর্পা র্মর্গা | র্মা া
য দি　মে - ঘ -　- না দে য়　বা - রি -　- -

র্জ্ঞা র্রা | র্সা র্রা র্জ্ঞর্পা র্মর্গা | র্মা র্রা র্রা র্জ্ঞা | র্রর্সা র্রা র্সণা সা | া া
কে ন　আ - শা -　- য় রা খ　তা - রি -　- -

ণদা ণা | র্সা র্গা র্গা -া | -া র্গা র্গা র্মা | র্মা র্গা র্মর্পা র্মর্গা | র্মা া
য দি　মে - ঘে -　র না না -　খে - লা -　- -

র্জ্ঞা র্রা | র্সা র্রা র্জ্ঞর্পা র্মর্গা | র্মা র্রা র্রা র্জ্ঞা | র্রর্সা র্রা র্সণা সা | া া
শু ধু　মি - ছে -　- - র ঙের　মে - লা -　- -

ণদা ণা | র্সা র্গা র্গা -া | -া র্গা র্গা র্মা | র্মা র্গা র্মর্পা র্মর্গা | র্মা া
য দি　সৃ - ষ্টি -　- শু ধু ই　মা - য়া -　- -

র্জ্ঞা র্রা | র্সা র্রা র্জ্ঞর্পা র্মর্গা | র্মা র্রা র্রা র্জ্ঞা | র্রর্সা র্রা র্সণা সা | া া
ত বে　কে - ন -　- - আ লো　ছা - য়া -　- -

ণদা ণা | র্সা র্গা র্গা -া | -া র্গা র্গা র্মা | র্মা র্গা র্মর্পা র্মর্গা | র্মা া
য দি　অ - শ্রু -　- ব্য থা র　মা - ঝে -　- -

র্জ্ঞা র্রা | র্সা র্রা র্জ্ঞর্পা র্মর্গা | র্মা র্রা র্রা র্জ্ঞা | র্রর্সা র্রা র্সণা সা | া া
মো দের　মি - ছে -　- - সৃ ষ্টি　কা - জে -　- -

সম্পাদকের বৈঠক

প্রশ্ন

১। কাগজ প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা

কাগজ প্রস্তুত প্রণালী ভারতবর্ষের কোথাও শিক্ষা করা যায় কি? সম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে কতকাল লাগে? মাসিক খরচ কত পড়ে?

শ্রীত্রৈলোকানাথ রায় চৌধুরী

২। পিপীলিকার উৎপাত

'ভারতবর্ষ' এবং 'প্রবাসী'তে পিপীলিকা নিবারণ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইয়াছে—সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া দেখিয়াছি, এখানকার পিপীলিকার দল কিছুতেই পরাস্ত হইতেছে না। ইহারা আমাদের দেশের সাধারণ ছোট লাল পিঁপড়া, দলবদ্ধ ভাবে আমাদের কামড়াইয়া, বিছানার চাদর বালিসের ওয়াড় ময়লা কাপড় প্রভৃতি ফুটা করিয়া তৃপ্ত না হইয়া, ষ্টীলট্রাঙ্কের ভিতর ঢুকিয়া গরদের, সিল্কের, ও সাধারণ কাপড় জামা পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে আরম্ভ করিয়াছে—রাতে হঠাৎ যন্ত্রণায় ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে দেখি, চোখের পাতা আক্রমণ করিয়াছে।

মশাল জ্বালিয়া দলে দলে পোড়াইয়া দেখিয়াছি কেরাসিন তৈল, মেথিলেটেড স্পিরিট, ইউকালিপটাস্ তৈল, কপূর ইত্যাদি বহুবিধ দ্রব্য ছড়াইয়া দেখিয়াছি—উহারা একেবারে ভ্রূক্ষেপও করে না। আলনার উপরে জামা কাপড়ে ঢুকিয়া থাকে, ঝাড়িতে ভুলিয়া গিয়া জামা কাপড় পরিলে আর রক্ষা নাই। আমাদের জীবন অসহ্য করিয়া তুলিয়াছে। কোনও সহৃদয় বৈজ্ঞানিক, রাসায়নিক অথবা যে কেহ হউন না কেন, যদি ইহাদের পরাস্ত করিবার একটা উপায় বলিয়া পাঠান, তাহা হইলে তাঁহার নিকট আমরা চিরঋণী থাকিব।

এল, এম ভাদুড়ী

৩। বিষ্ণুশর্ম্মা

হিতোপদেশকার বিষ্ণুশর্ম্মা কোন্ সময়ে কোন্ দেশে ও কোন্ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন? কোথায় তাঁহার মৃত্যু হয়? আর মৃত্যু সময় বা কত? তাঁহার পিতামাতার নাম কি? অদ্যাপি তাঁহার কোন বংশধর জীবিত আছেন কি না?

৪। পৌরাণিক প্রশ্ন

সূর্য্যবংশীয় বৈবস্বত মনু-পুত্র ইক্ষ্বাকুর শত পুত্র ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। কিন্তু তাঁহার তিন পুত্রের নাম মাত্র আমাদের গোচর হয়—যথা, জ্যেষ্ঠ বিকুক্ষি, ২য় বিকুক্ষি ও ৩য় নেমি। সুধীবৃন্দের কাছে আমার এই প্রার্থনা যে, যদি তাঁহারা ঐ পুত্রত্রয় ছাড়া অন্য পুত্রগুলির নাম জ্ঞাত থাকেন, তবে সম্পাদকীয় বৈঠকে জানাইয়া বাধিত করিবেন।

৫। মেয়েলী সংস্কার

পূর্ব্ববঙ্গে রাত্রিকালে বিশেষ ঝড় উঠিলে মেয়েরা ঝড়ের শান্তির জন্য সুপারি-কাটা কাটারিতে গামোছা জড়াইয়া, যে কোণ হইতে ঝড় উঠিতে থাকে, বাসগৃহের সেই কোণস্থ খুঁটিতে, জড়ান গামোছার অংশ বিশেষ দ্বারা কাটারি কসাইয়া বাঁধিয়া রাখে। এই ব্যাপার পূর্ব্ববঙ্গ ছাড়া অন্য কোন স্থলে পরিলক্ষিত হয় কি না? আর ইহার উদ্দেশ্যই বা কি?

৬। শাস্ত্রীয় প্রশ্ন

পিতা বর্ত্তমান থাকাতেও একমাত্র পুত্র, মাতা মরিয়া গেলে, গয়ায় পিণ্ডদানের অধিকারী হইবে কি না?

৭। সংস্কার দ্বন্দ্ব

এক গালে থাপ্পড় মারিলে, অন্য গালে থাপ্পড় মারিতে হয় কেন? শুধু একগালে কাহাকেও থাপ্পড় মারিলে, অনেকেই লোকে বলিয়া থাকে যে, একগালে থাপ্পড় মারিতে নাই,—মারিলে অবিবাহিত থাকিতে হয়। এ কথার অর্থ কি?

৮। রঘুবংশ

রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে রঘুর দিগ্বিজয় কালে বর্ণিত "প্রাচীন বহিঃ" রাজা কে? এবং পূর্ব্বদিকের কোথায়ই বা তাঁহার রাজ্য ছিল? "কপিশা" নদীর ভৌগোলিক বৃত্তান্ত কি? বর্ত্তমানে উহা কোন্ নামে অভিহিত? "মহেন্দ্র" পর্ব্বতের বর্ত্তমান ভৌগোলিক অবস্থান ও নাম কি? পাণ্ড্য দেশ তাম্রপর্ণী নদী, মলয় ও দর্দুর নামক শৈলদ্বয়, মুরলা নদী, ত্রিকূট পর্ব্বত, কম্বোজ দেশ,—ইহাদের বর্ত্তমান নাম ও অবস্থিতি স্থান কোথায়?

শ্রীমোহিনীমোহন বিদ্যার্থী

৯। হাতকাঁপা রোগ

এখন দেখিতে পাই যে অনেক যুবক, বৃদ্ধ ও প্রৌঢ় "হাত কাঁপা" রোগে ভুগিতেছে। অর্থাৎ লিখিতে গেলে ভাল লেখা একেবারেই বাহির হয় না, হাত চলে না, তাড়াতাড়ি লিখিতে একেবারেই অক্ষম। ইহার কারণ কি? ইহার কি কোন প্রতিকার আছে? শ্রীসুবলদাস ধর

১০। ইতুপূজা

শ্রীশ্রীমিত্রপূজাকে ইতুপূজা বলে কেন?

১১। জাতি-তত্ত্ব

সুবর্ণ-বণিকের গৃহে পতিতপাবনাবতার শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু

অন্ন ভক্ষণ করিয়াছিলেন। সেই সুবর্ণবণিকের গৃহদেবতাকে সুবর্ণবণিকের স্বজাতীয় ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য ব্রাহ্মণেরা পূজা করেন না কেন?

শ্রীউমাকান্ত পাল

১২। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব

শবদাহ করিলেও তাহার নাভীটি পড়িয়া থাকে কেন? উহার বৈজ্ঞানিক কারণ কেহ বলিলে বাধিত হইব। শ্রীরামেন্দ্রনাথ ঘোষ

১৩। কৃষি কথা

ভারতবর্ষের কোন স্থানে 'কোকো'র (cocoa) চাষ হয়? ভারতের মৃত্তিকা কোকো চাষের পক্ষে অনুকূল কি না?

১৪। চকোলেটের কারখানা

ভারতবর্ষে দেশীয় মূলধনে পরিচালিত, চকোলেট প্রস্তুতের কোন কারখানা আছে কি না? চকোলেট প্রস্তুতের প্রণালী কি?

১৫। কাঁচকড়া

কাঁচকড়া কোন্ কোন্ বস্তুর সংমিশ্রণে প্রস্তুত হয়? ভারতবর্ষে কাঁচকড়ায় নির্ম্মিত পুতুলের কোন কারখানা আছে কি?

শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দেবী

১৬। কাশীতে ভূমিকম্প

কথিত আছে যে কাশীতে ভূমিকম্প হয় না; ইহা কি সত্য? না অমূলক জনরব মাত্র। যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কি? শ্রীনিশাকান্ত রায়

১৭। আলুর চাষের ক্ষতি

আমি গত কয়েক বৎসর ধরিয়া গোলআলুর চাষ করিতেছি। মাটি এটেল-প্রধান দোয়াঁস। খোল ও ছাই সার ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু আলু জন্মিতে আরম্ভ হইলে এক প্রকার পোকা ও এক প্রকার লাল পিপড়া মাটীর নীচে আলু নষ্ট করিয়া থাকে। ইহার প্রতিকারের কোন উপায় আছে কি না? শ্রীঅপর্ণাকুমার চৌধুরী

১৮। শিখি মাইতি

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলা ৩ ভাগের ১০ম পরিচ্ছেদে লিখিত আছে যে

মাধবী দেবী শিখি মাইতির ভগিনী
শ্রীরাধার দাসী মধ্যে যাঁর নাম গণি

শিখি মাইতির আদি-নিবাস কোথায়? শিখি মাইতির কোন জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে কি না? শিখি মাইতির বংশ আছে কি না, মাধবী দেবীর যদি কোন জীবনী প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহার ঠিকানা জানিতে চাই। শ্রীশশিভূষণ মাইতি

১৯। মল্লভূমি ও মল্লরাজ

বর্দ্ধমান-বিভাগের মধ্যে কেবলমাত্র বন-বিষ্ণুপুরের নৃপতিগণই "মল্ল" উপাধিধারী এবং তাঁহাদের অধিকৃত স্থানগুলিই "মল্লভূমি" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। এই মল্লভূপতিগণের রাজ্য যে এক সময় মেদিনীপুরের উত্তরাংশেও বিস্তৃত ছিল, তাহা Bankura gazetteer, Oldham's Some Historical and Ethnical Aspects of the Burdwan District প্রভৃতি পুস্তক পাঠে জানা যায়। কিন্তু তাঁহারা যে কোন্ সূত্র হইতে মল্লভূমির এই সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা আমরা অবগত নহি। কিন্তু মল্লরাজগণ কর্ত্তৃক বর্ত্তমান মেদিনীপুরান্তর্গত চেতুয়-বরদা জয়ের জনশ্রুতি হইতে এই সীমা নির্দ্দেশের কারণ কতখানি অনুমান করা যাইতে পারে। অপর দিকে "ভক্তিরত্নাকরে"র রচনার সময় মেদিনীপুরের উত্তর ভাগের কতখানি যে মল্লভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল, ভক্তিরত্নাকরের ১৫শ তরঙ্গের এই পয়ারটী হইতে বুঝা যায়।

"মল্লভূমি মধ্যেতে রয়নী নামে গ্রাম।
গ্রাম পাশে নদী সুবর্ণরেখা নাম॥"

বর্ত্তমানে এই রয়নী গ্রামখানি নাকি মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত; কিন্তু যখন ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থখানি রচিত হয়, তখন উহা মল্লভূমির অন্তর্গত ছিল বলিয়াই বোধ হয় কবি মল্লভূমির মধ্যে রয়নী গ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন; নচেৎ করিতেন না। বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখিতে পাই, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ঐ রয়নী গ্রামের অধিপতি ছিলেন—দুই ভ্রাতা—রসিকানন্দ ও মুরারি। ইঁহারা বন-বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-রাজা বীরহাম্বিরের সমসাময়িক। আইনী আক্‌বরী নামক গ্রন্থে না কি উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিষ্ণুপুর-রাজের নিজের ১৫টী এবং তাঁহার অধীনস্থ ১২টী সামন্ত রাজার ১২টী দুর্গ ছিল। সুতরাং সেই সময়ের মল্লভূমির মধ্যে অবস্থিত রয়নী গ্রামের এই রসিকানন্দ ও মুরারি ঐ বীরহাম্বির মহারাজেরই সামন্ত রাজা কি না, তাহা যদি কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি প্রমাণাদিসহ "ভারতবর্ষে" আলোচনা করেন তাহা হইলে বিশেষ উপকৃত হইব। শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ রায়

উত্তর

রাগ ও রাগিণী পরিচয়

দ্বাদশবিধ-তোড়ী—দরবারী, আসাবরী, গুর্জ্জরী, গান্ধারী, বাহাদুরী, নাচারী, লক্ষ্মী, দেশী, খট, মুদ্রা, সুহা, সুঘরাই, ও জৌনপুরী।

সপ্তসারঙ্গ—বৃন্দাবনী, মধুমাধবী, গৌড়, সামন্ত, বড়হংস, শুদ্ধ, এবং মিঞাকী।

অষ্টাদশ কানেড়া—দরবারী, মুদ্রাকী, কৌশিকী, হোসেনী, সুহা, সুঘরাই, আড়ানা, সাহানা, বাগেশ্রী, গারা, নাগধ্বনি, টঙ্ক, কাফি, কোলাহল, মঙ্গল, শ্যাম, মিঞাকি-জয়জয়ন্তী, ও মিশ্র কানেড়া॥

রাগরাগিণীর বিস্তার করিবার যে নিয়ম বা পদ্ধতি প্রশ্নকর্ত্তা জানিতে চাহিয়াছেন, তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করা যায় না। তবে সাধারণ কয়েকটী নিয়ম আছে, যাহার উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া বিস্তার করিতে হয়। স্বরগ্রামের এবং আরোহণ অবরোহণের পদ্ধতি বজায় রাখিয়া প্রত্যেক রাগের বাদি, সম্বাদি, অনুবাদী, ও বিবাদী স্বরের প্রতি

বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। এতদ্ভিন্ন গ্রহ, অংশ, ন্যাস, অপন্যাস, সন্ন্যাস, বিন্যাস, সমবায়, সম্বলংঘন, অলঙ্কার, আক্ষিপ্তি, আলপ্তি, প্রস্তার, মূর্চ্ছনা ইত্যাদি আরও অনেক বিষয়ের বিশেষ ব্যুৎপত্তি হইলে তবে, রাগরাগিনী বিস্তার করা চলে। প্রথমাবস্থায় হয় না এবং আমার মনে হয় চেষ্টা করাও উচিত নয়। রাগের প্রকৃতি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়। রাগের প্রকৃতির জ্ঞান মনস্তত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান। হৃদয়ের ভাব যেমন কথায় ব্যক্ত করা চলে না, রাগের প্রকৃতিও কথায় প্রকাশ হয় না। উহা সাধনার বিষয়। প্রবাদ আছে—

"রাগী, বাগী, পারখী, নারী ও ভাও
ইন্ পাঁচোকো গুরু হৈ, পরন্ত উবজে অঙ্গ সভাও"।

যাহা হউক, গোটের উপর উপরোক্ত নিয়মের ত্রুটী থাকিলে রাগিনী অশুদ্ধ হয়। আলাপে যেমন রাগরাগিনী প্রস্ফুটিত ও বিস্তার হয়, গানে ততটা হয় না। ধ্রুপদ অঙ্গের গানে অনেকটা হয়, খেয়াল অঙ্গের গানে তাহা অপেক্ষা কম হয়, এতদ্ভিন্ন অন্য অঙ্গের গানে দেহটা হয়, প্রাণ দেওয়া চলে না। আমার বোধ হয় উপরিলিখিত পদ্ধতি যতদূর সম্ভব বজায় রাখিয়া অন্ততঃ বিলম্বিত লয়ে বিস্তার-পদ্ধতি শিক্ষা করাই যুক্তিসঙ্গত।

হিন্দু সঙ্গীতশাস্ত্রমতে ষড়জের কোন নির্দ্দিষ্ট ওজন ধরা নাই। যার যেমন ইচ্ছা নিজ নিজ কণ্ঠানুযায়ী স্বাভাবিক স্বরকেই ষড়জ করিয়া গাহিতে পারেন। নিজ নিজ স্বাভাবিক ষড়জ হইতে নীচু কিম্বা উচু ষড়জ স্থির করিলে গায়কের কষ্ট হইয়া থাকে।

গ্রাম বিষয়ের অনেক কথা আছে। হিন্দু সঙ্গীতশাস্ত্রমতে গ্রাম তিন প্রকার। ষড়জ, গান্ধার ও মধ্যম। অন্য কোন স্বরের গ্রামত্ব দেন নাই। গ্রাম বিষয়ের সম্যক উপলব্ধি করা এত দুরূহ যে, শাস্ত্রকারেরা গান্ধারকে গ্রামত্ব দিয়াও, মর্ত্তলোকে প্রচলিত হওয়া সম্ভব নয় বিবেচনা করিয়া গান্ধার গ্রামকে দেবলোকে পাঠাইয়াছেন। অধুনা মধ্যম গ্রামেরও প্রচলন দেখিতে বা শুনিতে পাই না, থাকিলেও ষড়জ ভিন্ন অন্য কোন স্বরের গ্রামত্ব বুঝা আমাদের ন্যায় লোকের পক্ষে অতীব কঠিন। আমার বিশ্বাস, অধুনা ষড়জ ভিন্ন অন্য কোন স্বরের গ্রাম নাই, এবং যাবতীয় রাগরাগিনী ষড়জ গ্রামে গীত হইয়া থাকে। প্রগকর্ত্তা শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের "সঙ্গীত-সারে" গ্রাম বিষয়ে কতক জানিতে পারিবেন।

আলাহিয়া জাতীয় রাগিনীর নাম—নট, ছায়ানট, দেওবাট, কেদারনট, নটনারায়ণ, বৃহন্নট, হাম্বিরনট, কল্যাণনট, সামন্তসারঙ্গ, সুরসারঙ্গ, বড়হংস-সারঙ্গ, বৃন্দাবনি-সারঙ্গ, মধুমাতসারঙ্গ, মেঘ, শঙ্করাভরণ, কোকভ, কর্ণাট, বেলাবল, বিভাষ, লুম, দেওগিরি, দেশকার, হেমখেম, প্রদীপীকা।

সিন্ধুজাতীয় রাগিনী—মুখারী, সুঘরাই, মধ্যমাদি, বাগেশ্বরী, কাফি, ধনাশ্রী, সৈন্ধবী, ধানী, পটমঞ্জরী, নীলাম্বরী, ভীমপলাশী, বাহার, মেঘমল্লার, মিঞামল্লার, সুরমল্লার, রামদাসী মল্লার, গৌড়, সুহা, সাহানা, পিলু।

ভৈরবী জাতীয়—গুর্জ্জরী, গান্ধারী, আশাবরী, খট্।

ইমন্ জাতীয়—কল্যাণী, ভূপালী, হাম্বীর, কেদারা, হিন্দোল, রমণী, শ্যাম, গোড়সারঙ্গ, মালশ্রী, চন্দ্রকান্ত।

ঝিঝিট জাতীয়—খাম্বাজ, সুরট, দেশ, কামোদ, তিলকামোদ, গারা, বরাটী, রাগেশ্বরী, নারায়ণী, জয়াবতী, তিলঙ্গিকা, দুর্গা।

কানেড়াজাতীয়—মালকোশা, নায়কী, মুদ্রাকী, হোসেনী, দেশিতোড়ী, জৌনপুরীতোড়ী, আড়ানা, দর্ব্বারি কানেড়া, কৌশিকীকানেড়া॥

তানপুরা মিলন সচরাচর প্রথম তারটী, অর্থাৎ পিতলের সরু তারটী মুদারা গ্রামের পঞ্চমে বাঁধা হয়, মধ্যের পাকা লোহার তার দুইটী ঐ গ্রামের ষড়জে ও চতুর্থ তারটী অর্থাৎ পিতলের কিম্বা রৌপ্যের মোটা তারটী উদারাগ্রামের ষড়জে বাঁধা হয়। যার যেরূপ গলার ওজন সেইরূপ সুরে ষড়জ অর্থাৎ জুড়ির তার দুইটী বাঁধা উচিত। যে, যে, রাগরাগিনীর পঞ্চম বিবাদী সেই সেই রাগরাগিনী গাহিবার সময় পঞ্চমের তারটী মধ্যমে বাঁধিয়া লইতে হয়।

তম্বুরায় সঙ্গীতের সকল প্রয়োজন সাধিত হয়। সুরের বৈজ্ঞানিক বিষয়ের তথ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে সাধনার আবশ্যক। সাধকগণ সাধনাবলে তম্বুরায় সকল স্বরের অনুরণাত্মক ধ্বনি আছে বুঝিতে পারেন। উপরিলিখিত নিয়মে ষড়জ ও পঞ্চমে বাঁধা হইলে এমন কি ২২টী শ্রুতি কর্ণগোচর হয়। আমাদের মত লোকেও ৭টী স্বর শুনিতে পাই। বড় বড় বর্ত্তমান ওস্তাদরা ১২টী অর্থাৎ ৭টী শুদ্ধ ও ৫টি বিকৃত স্বর সমস্তই শুনিতে পান। ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, তম্বুরা গায়কের কত সাহায্য করে। হারমোনিয়ম প্রভৃতি বাঁধাসুরের যন্ত্রে তম্বুরার কাজ সাধিত হয় না। যেহেতু হারমোনিয়ম প্রভৃতি বাঁধাসুরের যন্ত্রে অনুরণাত্মক ধ্বনি (harmonies) পাওয়া যায় না। কেবল "C" সুরে গান করিলে পর্দ্দা বা কীএর সাহায্যে গায়কের সামান্যতর সাহায্য হয়। হারমোনিয়ম প্রভৃতি বাঁধা সুরের যন্ত্রগুলি tempered scaleএ বাঁধা। Tempered scaleএর সুরগুলির হিন্দুস্থানী শুদ্ধ scaleএর সুরের সহিত কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। সুতরাং সম্পূর্ণভাবে গায়কের সাহায্য হয় না। "C" ভিন্ন অন্য কোন scaleএ গান করিলে বা বাজাইলে শুদ্ধ স্বরের সহিত মিলিবেই না। উদাহরণ স্বরূপ "C" Sharp Scaleএ যদি বাজান যায়, তাহা হইলে শুদ্ধ রেখাব ও ধৈবত সুর হারমোনিয়মে পাওয়া যায়না। "D" Sharpএ বাজাইলে কোমল গান্ধার, শুদ্ধ গান্ধার, মধ্যম, কড়ি মধ্যম, কোমল নিষাদ ও শুদ্ধ নিষাদ সুরগুলি পাওয়া যায় না। এইরূপ বাকি সমস্ত Scaleএই কতক কতক সুর পাওয়া যায় না।

উপরন্ত হারমোনিয়ম প্রভৃতি যন্ত্রে মিড় বা মূর্চ্ছনা বাহির হয় না। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বা বাজনা মীড় ও মূর্চ্ছনা পূর্ণ, সুতরাং ঐ সকল বাঁধা যন্ত্র হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের উপযোগী নয়।

আরও যে সকল রাগরাগিনীর কোমল সুর হারমোনিয়মে পাওয়া

যায় না, হারমোনিয়মে তাহা বাদিত হইলে কিরূপ শুনায় বিশিষ্ট অভিজ্ঞগণ সেটুকু বেশ বুঝিতে পারেন। মনে করুন কানেড়ার খাম্বাজ কোমল বা পুরিয়ার রেখার কোমলের সহিত হারমোনিয়মের ঐ সকল স্বর বাজান হইলে বেসুরা শুনাইবেই; এবং গায়কের গলা হইতে যখন ঐ সকল স্বর বাহির হইবে, তখন তাহা হারমোনিয়মের স্বরের দিকেই ঝুঁকিবে। তাহা হইলে রাগরাগিনীর বিশেষত্ব নষ্ট ও আসল সঙ্গীতের প্রলাপ হইবে। সঙ্গীত-বিজ্ঞান ও স্বরমিল শাস্ত্র হিসাবে তানপুরা গানের বিশেষ উপযোগী। স্বাধীনভাবে গলার রেওয়াজ করার পক্ষে উপযোগী ও ইহার সহিত অভ্যাস করিলে স্বরের উৎকর্ষ সাধন হইয়া থাকে। গান গাওয়া বা স্বর সাধনা হারমোনিয়ম প্রভৃতি বাঁধা যন্ত্রের সাহায্যে খুব সহজ বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু ঐ সকল যন্ত্রের সাহায্যে গান শিক্ষা করা প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইলেও, কিছুদিন পরে দেখা যায় যে, যাঁহারা ঐ সকল যন্ত্রের সাহায্যে গান শিক্ষা করেন বা গাহিয়া থাকেন, তাঁহারা স্বাধীনভাবে গাহিতে প্রায়ই অক্ষম, গাহিলেও কষ্ট বোধ করেন। তাহার কারণ এই যে, তাঁহাদের গলার স্বর যন্ত্রের স্বরকে অনুধাবন করে, যন্ত্র একবার ছাড়িয়া দিলে গলার দোষ বাহির হইয়া পড়ে ও তখন একেবারেই মিষ্ট শুনায় না।

শাস্ত্র মতে তালের সংখ্যা তিনশতেরও অধিক দেখা যায়। প্রচলিত হিন্দুস্থানী মতে সচরাচর যে সকল তাল বাজান হয়, তাহা অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের "সঙ্গীতসার" ও সঙ্গীতাচার্য্য যোগেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "সঙ্গীতচন্দ্রিকা"য় দেখিতে পাইবেন। তন্মধ্যে চৌতাল, ধামার, ঝাঁপতাল, সুরফাক্তা, তেওরা, রূপক, আড়াচৌতাল, ঢিমাতেতালা, ব্রহ্মতাল, রুদ্রতাল, লক্ষ্মীতাল ইত্যাদি পাখোয়াজ বা মৃদঙ্গে বাদিত হয় এবং কাওয়ালী, মধ্যমান, একতালা, ঠুংরী, কাহারবা, পোস্তা, দাদ্‌রা, খৎ, আড়া, খেমটা, ঢিমাতেতালা ইত্যাদি তবলায় বাদিত হয়।

আমের আচার

কাঁচা আম দিয়া নানারূপ মুখরোচক আচার তৈয়ারী করা যায়। আমগুলির ভিতরে যখন অল্প অল্প আঁটি হয়, সেই আঁটি সমেত সেই আমগুলি চার ফাঁড়া দিয়া কাটিয়া ভিতরের শাঁস ফেলিয়া দিতে হয়। আমটি ফাঁড়িয়া যে মাত্র চার খণ্ডই করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। পরে সেগুলিতে লবণ ও ধনে কালজিরা প্রভৃতি আধগুঁড়া করিয়া মাখাইতে হইবে। পরে একটা মুখমোটা শিশির ভিতর সেগুলি ভরিয়া, আধশিশি পরিমাণ আমে একশিশি ভাল সরিষার তেল ঢালিয়া দিয়া, শিশির মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। এই শিশি মাঝে মাঝে রৌদ্রে দিতে হয়। মসলা মাখাইয়া তেল দিবার পূর্ব্বেও কাঁচা আম কয়েক দিন রৌদ্রে দিতে হয়, যাহাতে আমের রসটা অনেকটা শুকাইয়া আসে। দুই মাস কি তাহার কিছু কম সময় তেলে ভিজিয়া ঐ আম উৎকৃষ্ট আচারে পরিণত হয়। যদি তেল শুকাইয়া যায়, তবে পুনরায় তেল দিতে হয়। মোট কথা আমগুলি সর্ব্বদা তেলে ডুবিয়া থাকা দরকার। এই আচারকে "আমতেল" বলে। ইহার তেলও খুব মুখরোচক হয়। এই "আমতেল" পূর্ব্ববঙ্গের একটি প্রধান মুখরোচক চাট্‌নি। ইহার আমগুলি যেমন মুখরোচক, তেল ভাতের সহিত মাখিয়া খাইতে ততোধিক সুস্বাদু লাগে। আমগুলিতে মসলা মাখাইবার পূর্ব্বে উপরের ছাল ফেলিয়া দিতে হয়।

(২) পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আম কাটিয়া মসলা মাখাইতে হইবে। পরে মাত্র এক দিন কি দুই দিন রৌদ্রে রাখিয়া, যাহাতে আমগুলি বেশ ভিজিয়া যায়, এই পরিমাণে তেল দিয়া, তাহা ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। পরে সবটুকু তেল আমের গায়ে শুকাইয়া গেলে খাইতে খুব সুস্বাদু লাগে। ইহাতে আমের উপরের ছাল ফেলিয়া দেওয়ার দরকার করে না। আর আমগুলি কাটিয়া মাত্র দুই খণ্ড করিয়া দিলেই চলে।

(৩) আমগুলির ছাল ছাড়াইয়া খুব কুচিকুচি করিয়া কাটিবে। পরে উহাতে উক্ত প্রকার মসলার সহিত শুকনা মরিচ আধকোটা করিয়া মাখাইবে। কয়েক দিন রৌদ্রে রাখিয়া পরে খানিকটা তেল মাখাইয়া শিশিতে বন্ধ করিয়া রাখিবে। ঐ তেল আমের সহিত মজিয়া গেলে উৎকৃষ্ট ঝাল আচার তৈয়ারী হইবে। মসলার সহিত একটু পুদিনা পাতা মাখাইয়া দিলে আচারটি বেশ সুগন্ধ হইবে।

(৪) আমগুলির ছাল ছাড়াইয়া লইয়া পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকারের মধ্যে যেরূপ ইচ্ছা কাটিতে পার। পরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মসলা ও তাহার সহিত পুদিনা পাতা মাখাইয়া রৌদ্রে দিবে। রস শুকাইয়া গেলে, তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণ গুড় মাখাইয়া পুনরায় রৌদ্রে দিবে। ১০।১২ দিন রৌদ্রে থাকিলে উৎকৃষ্ট "মিষ্টি আচার" তৈয়ারী হইবে।

(৫) আমগুলির ছাল ছাড়াইয়া প্রথমোক্ত প্রকারে কাটিয়া, সামান্য পরিমাণে লবণ মাখাইয়া রৌদ্রে দিয়া, পরে চিনির রসে পাক করিলে আমের মোরব্বা প্রস্তুত হয়।

টমেটোর আচার—ডাঁসা ডাঁসা টমেটোগুলির স্থানে স্থানে চাকু দিয়া ফাঁড়িয়া মসলা মাখাইয়া রৌদ্রে দিবে। পরে উপযুক্ত পরিমাণ ভিনিগারের মধ্যে ভিজাইয়া রাখিলেই উৎকৃষ্ট টমেটোর আচার প্রস্তুত হইবে।

এই প্রকারের ভিনিগারের মধ্যে ভিজাইয়া, শুধু টমেটো কেন, মরিচ, আদা, এমন কি লাউ কুমড়ার পর্য্যন্ত আচার তৈয়ার করা যায়।

সমস্ত আচারই খুব সাবধানে রাখিতে হয়। যে শিশিতে উহা রাখিবে, তাহার মুখ আঁটিয়া বন্ধ করিবে। কখনও আলগা রাখিবে না। আর মাসে অন্ততঃ ৪।৫ দিন শিশি সমেত উহা রৌদ্রে দিবে। বৃষ্টি হইলে তাহার পরদিন অবশ্য অবশ্য রৌদ্রে দিবে। নহিলে আচার নষ্ট হইয়া যাইবে।

শ্রীতারাপদ লাহিড়ী

কৃষ্ণমাতা কালী

কালীবিলাস তন্ত্রে ২১শ পটল হইতে ২৮শ পটল পর্য্যন্ত কৃষ্ণমাতা কালীর বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় সদাশিবের

ঔরসে গৌরীর রূপান্তর কালীর গর্ভে কৃষ্ণের উৎপত্তি। এই কালীর ধ্যান এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"জটাজুটসমাযুক্তাং চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরাম্।
পূর্ণচন্দ্রমুখীং দেবীং ত্রিলোচনসমন্বিতাম্॥
দলিতাঞ্জন সঙ্কাশাং দশবাহুসমন্বিতাম্।
নবযৌবনসম্পন্নাং দিব্যাভরণভূষিতাম্॥
সুচারুদশনাং নিত্যাং সুধাপুঞ্জসমন্বিতাম্।
শৃঙ্গাররসসংযুক্তাং সদাশিবোপরিস্থিতাম্॥
দিঙ মণ্ডলোজ্জলকরীং ব্রহ্মাদিপরিপূজিতাম্।
বামে শূলং তথা খড়্গাং চক্রং বাণং তথৈব চ॥
শক্তিঞ্চ ধারয়ন্তীং তাং পরমানন্দরূপিনীম্।
খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমেব চ॥
ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি দক্ষহস্তে চ ভূষিতাম্।
উগ্রাং ভয়ানকীং ভীমাং ভেরুণ্ডাং ভীমনাদিনীম্॥
কালিকাং জটিলাঞ্চৈব ভৈরবীং পুত্রবেষ্টিতাম্।
আভিঃ শক্তিভিরষ্টাভিঃ সহিতাং কালিকাং পরাম্॥
সুপ্রসন্নাং মহাদেবীং কৃষ্ণক্রোড়াং পরাৎপরাম্।
চিন্তয়েৎ সততং দেবী ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাম্॥
মহামোক্ষপ্রদাং নিত্যাং ধ্যায়েৎ পরমগোপিতাম্।"

দেবীর মস্তকে জটাজুট এবং শিরো অর্দ্ধচন্দ্রের দ্বারা অলঙ্কৃত, মুখ পূর্ণচন্দ্রের মত সুন্দর, চক্ষুঃ তিনটি, শরীরের বর্ণ রগড়ানো কজ্জলের মত কাল, দশখানা হাত, দেবী নবযৌবনসম্পন্না, সুন্দর অলঙ্কারে ভূষিতা, সুচারুদশনা, অমৃতপুঞ্জে পরিপূর্ণা, শৃঙ্গাররসসংযুক্তা, শবরূপী সদাশিবের উপরি দণ্ডায়মানা, ব্রহ্মাদিদেবগণকর্ত্তৃক পরিপূজিতা। তাঁহার শরীরের আভায় দিঙ্মণ্ডল উজ্জলীকৃত। তিনি বামদিকের পাঁচ হস্তে অধোদিক্ হইতে যথাক্রমে শূল, খড়্গ, চক্র, বাণ ও শক্তি, এবং দক্ষিণদিকের পাঁচ হস্তে ঊর্দ্ধদিক্ হইতে যথাক্রমে খেটক (চর্ম্ম), জ্যাসংযুক্ত ধনুঃ, পাশ, অঙ্কুশ ও ঘণ্টা অথবা পরশু ধারণ করিয়াছেন। উগ্রা, ভয়ানকী, ভীমা, ভেরুণ্ডা, ভীমনাদিনী, কালিকা, জটিলা, ভৈরবী, এই আটটি শক্তি দেবীর সহিত অবস্থিত আছেন। এই শক্তিগণের প্রত্যেকের কোলে স্তন্যপানরত শিশুপুত্র অবস্থিত। সুপ্রসন্না মহাদেবীর ক্রোড়েও স্তন্যপানরত শিশু কৃষ্ণ অবস্থিত। চতুর্ব্বর্গপ্রদা দেবীকে এইরূপে চিন্তা করিবে।

কালীবিলাসতন্ত্রে দুর্গাপূজা বিস্তৃতভাবে উক্ত হইয়াছে। সেই দুর্গাপূজার প্রসঙ্গেই কৃষ্ণমাতা কালীর কথা উক্ত হইয়াছে। কালীবিলাসতন্ত্রেও দুর্গার "জটাজুটসমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাম্" এই প্রসিদ্ধ ধ্যানটিই কথিত হইয়াছে। দুর্গা ও কালীর স্থূলরূপে কতক সাদৃশ্য ও কতক বৈসাদৃশ্য আছে। সাদৃশ্য এই—উভয়েই জটাজুটসমাযুক্তা, অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরা, ত্রিনয়না, দশবাহুসমন্বিতা। আয়ুধ উভয়েরই তুল্য। তবে দুর্গার দক্ষিণ হস্তের আয়ুধগুলি কালীর বামহস্তে এবং বাম হস্তের আয়ুধগুলি কালীর দক্ষিণ হস্তে। দুর্গার পার্শ্বে চণ্ডা চণ্ডবতী প্রভৃতি অষ্টশক্তি, কালীর পার্শ্বে উগ্রা, ভয়ানকী প্রভৃতি অষ্টশক্তি। বৈসাদৃশ্য—দুর্গা গৌরবর্ণা সিংহবাহিনী কালী কৃষ্ণবর্ণা শববাহনা। দুর্গা শিষ্টের রক্ষার জন্য অসুর বিনাশ করিতেছেন, কালী জগৎপালনকর্ত্তা কৃষ্ণরূপী বিষ্ণুকে স্তন্যদ্বারা প্রতিপালন করিতেছেন। উভয় মূর্ত্তিতেই পালনীশক্তির সমাবেশ। উভয় মূর্ত্তিই অভিন্ন, দুর্গা হইতেই এই কালীর বিকাশ। এই জন্যই দেবী প্রশ্ন করিতেছেন—

"দশভূজময়ীং দুর্গাং দলিতাঞ্জনসন্নিভাম্।
কালিকাং পরমাং দিব্যাং শ্রীকৃষ্ণ ক্রোড়সংস্থিতাম্।
কথয়স্ব দয়ানাথ যোগধ্যানপ্রদ প্রভো॥"

[কালীবিলাসতন্ত্র ২১।৩]

কালীবিলাসতন্ত্রে কৃষ্ণমাতা কালীর যে উৎপত্তি বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—সৃষ্টিপালনাভিলাষিনী মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা কামবীজযুক্তা হইয়া কামবাণে পীড়িতা হয়েন। * কামবাণদিগ্ধ হইয়াই তিনি রূপপরিবর্ত্তনে কালীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। এই অবস্থায় সদাশিবসংযোগে কৃষ্ণের জন্ম। পরে স্তন্যদানে কৃষ্ণকে প্রতিপালন করিয়া পরে রাধার সহিত গোলোকে বিহার করিবার জন্য আদেশ করেন।

পালনকর্ত্তা বিষ্ণুও শক্তি হইতেই উৎপন্ন এবং শক্তির নিদেশেই তিনি পালনক্রিয়া সম্পাদন করেন, এই ভাব সূচনা করিবার জন্যই কৃষ্ণ মায়ের ক্রোড়ে স্তন্যপাননিরত। শক্তি ভিন্ন শিব শবতুল্য, শক্তিই শিবের হৃদয়ে অবস্থিতি করিয়া সৃষ্টি স্থিতি পালন করিতেছেন, এই ভাব সূচনা করিবার জন্য শবরূপী সদাশিবের হৃদয়ে মায়ের অবস্থিতি।

কৃষ্ণমাতা কালীর ধ্যান, মন্ত্র ও পূজা-পদ্ধতি কালীবিলাসতন্ত্রেই উক্ত হইয়াছে। মুদ্রিত কালীবিলাস তন্ত্র অশুদ্ধি-বহুল এবং কতক অংশ তাহাতে নাই। পূজা-পদ্ধতির প্রয়োজন হইলে হস্তলিখিত শুদ্ধ পুঁথির সাহায্য লইতে হইবে। শ্রীসতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ

শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শন অধ্যায়ে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" ইহা বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কোনও কার্য্য বিশেষের উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই;—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু দেখিতেছি, সমস্তই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এবং তাঁহাতেই বিলীন হইতেছে, ইহাই গীতার উক্তি। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" এই মহাবাক্যের উহা অপেক্ষা স্পষ্টতরভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর নহে।

জয়দেব কৃষ্ণভক্ত ছিলেন, এবং তাঁহাকেই তিনি ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। "অবতার" এই শব্দ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রয়োগ করিলে তাঁহাকে লঘু করা হইবে, এই ভয়েই ভক্ত জয়দেব ভগবান্‌কে দশ অবতারের অন্যতম বলেন নাই। স্বামী বিবেকানন্দ ঠিক এই ভাবেই পরমহংসদেবকে অবতার বলিয়া ঘোষণা করেন নাই।

(স্বামি-শিষ্য সংবাদ দ্রষ্টব্য)।

* শিবশক্তির মিথুনীভাবেই বিশ্বের সৃষ্টি, এবং এই মিথুনীভাবেই কামের বিকাশ, কামসম্বন্ধ ভিন্ন সৃষ্টি হইতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণত্বসম্বন্ধে স্বয়ং ব্রহ্মার নিকট হইতে শ্রুত হইয়া পরাশর মৈত্রেয়কে বলিতেছেন ;

সূর্য্যং নত্বা গ্রহপতিং জগদুৎপত্তি-কারণম্।
বক্ষ্যামি বেদ-নয়নং যথা ব্রহ্ম-মুখাচ্ছ্রুতম্॥

মৈত্রেয় উবাচ—

রামকৃষ্ণাদয়ো যে চ হ্যবতারা রমাপতেঃ।
তেঽপি জীবাংশকাঃ প্রোক্তাঃ কিংবা ব্রূহি মুনীশ্বর॥

পরাশর উবাচ—

রামঃকৃষ্ণশ্চ ভো বিপ্র নৃসিংহঃ শূকরস্তথা।
এতে পূর্ণাবতারশ্চ হ্যন্যে জীবাংশকান্বিতাঃ॥

মৈত্রেয় জিজ্ঞাসা করিলেন, রমাপতি ভগবানের রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি অনেক অবতার আছে,—তাঁহারা পূর্ণাবতার কিংবা অংশাবতার, ইহা কীর্ত্তন করুন। উত্তরে পরাশর বলিলেন, হে বিপ্র, রাম, কৃষ্ণ, নৃসিংহ ও বরাহ, এই চারিটি পূর্ণাবতার, অন্যান্য সকল অংশাবতার।

শ্রীরাধারঞ্জন বসু এম্-এ (বিদ্যাবিনোদ)

"গজভুক্ত কপিত্থ" উত্তরের প্রতিবাদ

উত্তরে যে লেখা হইয়াছে হস্তীর পাকস্থলী হইতে একপ্রকার রস নির্গত হইয়া কয়েৎবেলের ভিতরকার শাঁস তরল করাইয়া বেলের গাত্রের ছিদ্র দিয়া বহির্গত করাইয়া লয়।

ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ; কারণ হস্তীকে কয়েৎবেল খাওয়াইয়া পর দিবস বিষ্ঠার সহিত দেখা গিয়াছে যে উহা খণ্ড খণ্ড হইয়া বাহির হয়। পণ্ডিত শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর মহাশয় কোন নেটিভ ষ্টেটের লাইব্রেরীতে হস্তলিখিত পুঁথিতে নিম্নলিখিত বাক্যটি দেখেন—

''কপিত্থস্যর গত কীট, গজ ইতি অভিধীয়তে''

ইহা পাঠে তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, হস্তীভুক্ত কয়েৎবেল খণ্ড খণ্ড অবস্থায় বাহির হয়। আর গজ নামক একপ্রকার কীট ইহার বোঁটার নিকট ছিদ্র করিয়া প্রবেশ করে এবং সমস্ত শাঁস খাইয়া বাহির হইয়া যায়, ইহাতে খোলার কোন ক্ষতি হয় না। সেই নিমিত্ত বলা উচিত "গজের কয়েৎবেল খাওয়া" ; ''হাতীর কয়েৎবেল খাওয়া" বলা বা লেখা উচিত নহে। শ্রীরামেন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীশ্রীসরস্বতী

"ভারতবর্ষ মাসিক পত্রে'' সম্পাদকের বৈঠকে একজন প্রশ্ন করিতেছেন যে, লক্ষ্মী দেবী কি সরস্বতীর শ্বশ্রূঠাকুরাণী? লেখক একটি উদ্ভট-শ্লোকের অর্থ লইয়া এই প্রশ্ন করিবার সুষ্ঠু সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। উদ্ভট সাগরের শ্লোকগুলি ত রূপক। রূপকের ব্যাখ্যা শাস্ত্রেই আছে। শ্রীশ্রীসরস্বতী মাতা বাক্যের ঈশ্বরী। এই জন্যই তাঁহার নামান্তর বাগেশ্বরী, বাক্ দেবতা, বাগীশা, বাণী, বিদ্যা, ভারতী ইত্যাদি। অপরতঃ তিনি ব্রহ্মাত্মজা বলিয়াও বিখ্যাতা। গায়ত্রী, সাবিত্রী ও সরস্বতী ব্রহ্মার কন্যা বলিয়াই পুরাণে কথিত হয়।

বাক্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে লেখা আছে, "ভূমা মহাপুরুষ চিন্তা করিলেন লোকসমুদায়ে আমি লোক প্রেরণ করিব। অমনই জল হইতে পুরুষ সৃষ্টি করিলেন। তিনি পুরুষের উদ্দেশে ধ্যানস্থ হইলেন ; অমনই ডিম্বের ন্যায় একটি মুখ বাহির হইল। অতঃপর মুখ হইতে বাক্, বাক হইতে অগ্নি হইল। তার পর নাসাছিদ্র হইতে প্রাণ, প্রাণ হইতে বায়ুর আবির্ভাব হইল।" ব্রহ্মের (ভূমা পুরুষের) মুখ হইতে বাক্যের উৎপত্তি হওয়ায় বাগীশ্বরী দেবীর নামান্তর ব্রহ্মকন্যা। অপরে বলে তিনি ব্রাহ্মীরূপা গায়ত্রী সাবিত্রী।

"অগ্নি বাক্ রূপে ব্রহ্মের মুখে, বায়ু প্রাণ রূপে নাসায়, আদিত্য দর্শনরূপে চক্ষুতে, দিক্ শ্রবণরূপে কর্ণে, বৃক্ষলতা কেশরূপে ত্বকে, চন্দ্রমা মনরূপে হৃদয়ে, মৃত্যু অপান রূপে নাভিতে, জল বীর্য্যরূপে লিঙ্গে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ সমস্ত আত্মা বা জ্ঞান (ব্রহ্ম) হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন।"

ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টির অভিলাষে একটি কন্যার সৃষ্টি করিলেন। ঐ কন্যার অনেক নাম আছে, তন্মধ্যে গায়ত্রী ও সাবিত্রী নামেই তিনি অধিক প্রসিদ্ধা। মতান্তরে ব্রহ্মার পত্নী সাবিত্রী দেবী কার্য্যান্তরে নিরতা থাকায়, যজ্ঞশীল প্রজাপতির যজ্ঞের নিকট উপস্থিত হইতে পারিলেন না ; তখন ব্রহ্মার আদেশে দেবরাজ ইন্দ্র একটি গোপ কন্যাকে তাঁহার সহধর্ম্মিণীরূপে যজ্ঞস্থলে আনয়ন করিলেন। তাঁহার নামই গায়ত্রী।

সাবিত্রী দেবীই যে গায়ত্রী, তাহার প্রমাণ স্বরূপ এই বলা যায় যে, সাবিত্রীর একটি নাম "গায়ত্রী"। অপরতঃ তিনি বেদ-প্রসবিনী সূর্য্য-মণ্ডলাধিষ্ঠাত্রী দেবী, এবং ব্রহ্মার পত্নী ব্রাহ্মণী।

ভগবতী সরস্বতী দেবীরও ঐ নাম, ঐ সংজ্ঞা। তিনি ব্রহ্মার কন্যা ও বিষ্ণুর পত্নী বলিয়া প্রকীর্ত্তিতা। কিন্তু ব্রহ্মাও যিনি বিষ্ণুও তিনি। "হরতি প্রাণীনাং পাপানি হরিঃ" ও "সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি" এই অর্থে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুঃ দুইই হয়। "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানু প্রাবিশৎ" এই শ্রুতি অনুসারে বিষ্ণু শব্দের অর্থও ঐ। বিশ+নু=যিনি জগতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন ইত্যাদি। সাবিত্রী সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে—

"সর্ব্বলোক প্রসবণাৎ সবিতা স তু কীর্ত্ত্যতে।
যতস্তু দেবতা দেবী সাবিত্রীত্যুচ্যতে ততঃ।
বেদ প্রসবনচ্চাপি সাবিত্রী প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥

সাবিত্রী বেদপ্রসবিনী ; সরস্বতীও বেদজননী। অতএব উভয় দেবতাই এক ; কেবল উপাধি মাত্র বিভিন্ন। সাবিত্রী বেদমন্ত্র। উহা স্বর লয়ে গীত হইত বলিয়া সাবিত্রীর নাম গায়ত্রী। অথবা "গায়ন্তং ত্রায়সে যস্মাৎ গায়ত্রী ত্বং ততঃ স্মৃতা।" (ব্যাসঃ) অথবা গয়া এব গায়াঃ গায়ান্ (প্রাণান্) ত্রায়তে সা ইতি গায়ত্রী। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বলিলেন "কে পুনর্গয়াঃ ? প্রাণা বাগাদয়ো বৈ গয়াঃ। বাক্যের ঈশ্বরী, প্রাণের ঈশ্বরী, এবং সর্ব্বেশ্বরীই বাগীশ্বরী।

গায়ত্রী শব্দ দ্বারাই সাবিত্রীত্ব সূচিত হয়। গায়ত্রী প্রাণের ঈশ্বরী। যথা শঙ্করভাষ্যে—"স আচার্য্য উপনীয় মানবকং অষ্টবর্ষং যামেবামুং গায়ত্রীং সাবিত্রীং সবিতৃ দেবতা কা মন্বাহ পচ্ছোঽর্দ্ধর্চশঃ সমস্তাঞ্চ। এষা এব সা সাক্ষাৎ প্রাণো জগত আত্মা মানবকায় সমর্পিত ইহ ইদানীং

ব্যাখ্যাতা নাম্না স আচার্য্যঃ যস্মৈ মানবকায় কথাহ অমুব্যক্তি তস্য মানবকস্য গয়াং প্রাণান্ ত্রায়তে নরকাদি পতনাৎ।" অতএব প্রমাণিত হইল জগৎ প্রসবিনী বলিয়া ব্রহ্মাই সাবিত্রী। আর সাবিত্রীই গায়ত্রী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

গায়ত্রীকে ব্রহ্মার কন্যা বলার কারণ কি? তাহার উত্তর শ্রীহরিবংশে—"একাকী প্রজাপতি ব্রহ্মা লোকসর্জ্জনার্থ, তপস্যা তেজঃ প্রভাব ও নিয়মদ্বারা আত্মসদৃশী স্বীয় শরীরার্দ্ধ হইতে এক সুন্দরী ভার্য্যা সমুৎপাদন করিলেন। সেই ভার্য্যায় রমণ করিয়া তাহা হইতে প্রজাপতি, সাগর, সরিৎ, বেদমাতা ত্রিপদা গায়ত্রী এবং গায়ত্রী-সম্ভব চারি বেদের সৃষ্টি করিলেন।" (ষন্নবত্যধিক শততম অধ্যায়)।

সরস্বতী দুইটি নহেন। তিনি এক। তিনিই গায়ত্রীরূপে বেদপ্রসবিনী, সাবিত্রীরূপে জগজ্জননী, তিনিই কমলা, তিনিই ভারতী। ঐশ্বর্য্যধারিণী লক্ষ্মী ও বাগদেবী সরস্বতী ভগবান বিষ্ণুর (সত্ত্বগুণধারক স্বপ্রকাশ স্বরূপ বিভুর) অঙ্কলগ্না অর্থাৎ আশ্রিতা।

"উদ্ভট সাগরের" মনোরম শ্লোকটির অর্থ এই :—

"নাথে কৃতপদাঘাত শচুলুকিত তাতঃ সপত্নিকা সেবা।

ইতি দোষাদিব রোষাদ্ মাধব যোষা দ্বিজং ত্যজতি॥"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ (ভৃগু) বিষ্ণু বক্ষে পদাঘাত করিয়াছেন, (লক্ষ্মীর পিতা সমুদ্র) সমুদ্রকে (অগস্ত্য) গণ্ডূষ দ্বারা পান করিয়াছেন, আর সপত্নী সরস্বতীর অর্চ্চনা করেন (বেদ পাঠ করেন) বলিয়া লক্ষ্মীদেবী দ্বিজগণকে ত্যাগ করিয়াছেন। (বিদ্যারত কবি কোবিদগণ প্রায়ই দরিদ্র হন)।

লক্ষ্মীর সপত্নী সরস্বতী ইহাও রূপক। লক্ষ্মীর পিতা ভৃগু; ভৃগুর পিতা ব্রহ্মা; সুতরাং বিষ্ণুর শ্বশুর ভৃগু। আর ব্রহ্মা শ্বশুরের পিতা (পিতামহ)। ক্ষীরোদ-সমুদ্র মথনে লক্ষ্মীর উৎপত্তি বলিয়া ক্ষীরাব্ধিও লক্ষ্মীর পিতা। বরুণ সূর্য্যের ও ব্রহ্মার একটি নাম। সুতরাং লক্ষ্মী এবং সরস্বতী উভয়ই ব্রহ্মার কন্যাস্থানীয়া।

শ্রী শব্দের অর্থ কমলা ও সরস্বতী। ক—ব্রহ্মত্ব ম—শিবত্ব লা—দান করেন; যিনি ব্রহ্মত্ব ও শিবত্ব দান করেন তিনিই কমলা। জগজ্জননী প্রকৃতি দেবী ব্রহ্মা বিষ্ণ্বাদির সৃজন-কর্ত্রী বলিয়া খ্যাতা। সেইজন্যই লক্ষ্মীদেবীর পুত্রবধূ সরস্বতী।

"উদ্ভট সাগরের" দ্বিতীয় শ্লোকটি এই :—

"শ্বশ্রুং বিনা বৃত্তিরিহ স্বতন্ত্রা প্রায়ঃ সুধানামপবাদ হেতুঃ।

যদ্যাপি লোকে রময়া বিহীনা সতীমপী ভামসতীং বদন্তি।"

ব্রহ্মা কোনও সময়ে স্বীয় কন্যায় সঙ্গত হইতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার পঞ্চমুণ্ডের একটি খসিয়া পড়ে! (মৎস্যপুরাণ দ্রষ্টব্য) এইজন্যই পুত্রবধূর ঐ অপবাদ! বলা বাহুল্য, এতৎ সমুদায়ই রূপক। আমার রূপক ও উপমা" প্রবন্ধে এ সকল কথা "এডুকেশন গেজেটে" আলোচিত হইয়াছে। শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

যখন দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হয় তখন আহার করিলে অতি সহজে পরিপাক হয়। প্রত্যহ এই নিয়মে আহার করিলে কখনও অজীর্ণ পীড়া হইবে না ইহা ধ্রুব সত্য এবং বহু পরীক্ষিত। ইহার তত্ত্ব স্বরোদয় শাস্ত্রে লিখিত আছে। শ্রীনারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

চন্দ্রের কলঙ্ক

আমি বঙ্গের সুধী সমাজে নিম্নলিখিত বিষয়টীর সত্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছি। আশা করি আপনারা আমার প্রশ্নের যথাযথ প্রমাণ সহ উত্তর দানে বাধিত করিবেন। এ বিষয়ে আমিও যেরূপ মীমাংসায় উপনীত হইয়াছি, তাহা নিম্নে দিলাম।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত ত্র্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ে (ইহা মোক্ষধর্ম্ম প্রকরণের অন্তর্গত) মনু, বৃহস্পতিকে বলিতেছেন,—"দর্পণ তুল্য চন্দ্রমণ্ডলে প্রতিবিম্বিত জগৎকে কলঙ্ক রূপে অবলোকন করত মনুষ্য যেমন এই জগৎই চন্দ্রমণ্ডলে, বিলোকিত হইতেছে, ইহা অনুভব করিতে পারে না, তদ্রূপ .....ইত্যাদি—"।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে চন্দ্রের উপরে যে কাল দাগ দেখা যায় তাহা এই পৃথিবীরই প্রতিবিম্ব; ইহাই পৌরাণিক মত। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলেন "উহা অর্থাৎ ঐ কাল দাগ চন্দ্রমণ্ডলের পাহাড় প্রভৃতির দৃশ্য, অথবা তাহাদেরই শৃঙ্গের, মাল-ভূমিস্থ ছায়ার প্রতিবিম্ব।" ইহার মধ্যে কোনটা সত্য?

আমার সমস্যা

চন্দ্রকে যদি দর্পণ বলিয়াই ধরা হয়, (চন্দ্র যে "দর্পণের মত একটী গ্রহ, বা নিজেই ইহা একটী দর্পণ, এবং উহার নিজের কোন আলোক নাই উহাতে সূর্য্যের আলোক পড়ে, ও সেই আলোকই পৃথিবীতে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত) তাহা হইলে সহজেই দেখা যাইতেছে যে, উহার মধ্যে পাহাড় পর্ব্বত কিছুই দেখিতে পাওয়া সম্ভবপর নয়। কারণ দর্পণে মুখ দেখিলে উহার পশ্চাতে যে পারদ থাকে তাহা সেরূপ দৃষ্টি গোচর হয় না; এবং উহাতে যখন মুখ দেখা যায় তখন কেবল আমাদের মুখের বা দর্পণের সম্মুখস্থ জিনিষেরই প্রতিবিম্ব উহাতে পতিত হয়; সেইরূপ, চন্দ্রকে যখন দেখা যায়, তাহা দূরবীক্ষণ যন্ত্র (Telescope) দ্বারাই হউক আর চর্ম্ম চক্ষেই হউক, তখন পৃথিবীর প্রতিবিম্ব তাহাতে দেখিতে পাওয়া যাইবেই যাইবে।

এখন চন্দ্রের পৃথিবী দিকের সম্বন্ধে কিছু বলি। কেহ কেহ বলেন যে 'চন্দ্রের পৃথিবীদিকের উপরি ভাগে কোন পর্ব্বত বা পাহাড় আছে, এবং সেই দৃশ্যকেই চন্দ্রের কাল দাগ বলিয়া জ্ঞান করা যায়'। কিন্তু আমি সামান্য প্রমাণের দ্বারা দেখিয়াছি যে, তাহা হইতে পারে না। আপনারাও দেখিলে দেখিতে পাইবেন যে, একটী দর্পণের উপরি ভাগে, "চন্দ্রের পর্ব্বতের স্বরূপ," কিছু মসী বা কজ্জল লেপন করিয়া, সেই দর্পণটী সূর্য্য কিরণে ধরিলে, উহা হইতে যে আলোক প্রতিফলিত হয়, সেই আলোক ছায়াযুক্ত আলোক হয়; অর্থাৎ সেই আলোকের মধ্যভাগে ছায়া থাকে। এখন চন্দ্রের উপরিভাগে যদি ঐরূপ পর্ব্বত প্রভৃতি কিছু থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই চন্দ্রের আলোকও ঐরূপ হইত।

আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির শেষ মীমাংসা এই যে. দর্পণের দিকে যখন দৃষ্টি করা যায়, তখন দর্পণের সম্মুখে যাবতীয় পদার্থই উহার মধ্যে দৃষ্ট হয়। এই জন্য আমার মনে হয়, আমাদের শ্রেষ্ঠতম প্রজাপতি মনুর উক্তিই ঠিক। শ্রীমতী মৃণালিনী চৌধুরাণী

শুক্র, চন্দ্র স্ত্রী না পুরুষ ?

শুক্র ও চন্দ্র স্ত্রীগ্রহ নহে ; কিন্তু উহারা স্ত্রীজনোচিত গুণ-সমূহের অধিকারী এবং স্ত্রীজাতির অধিপতি বলিয়া শাস্ত্রে উহাদিগকে স্ত্রীসংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে :—

"পুংসাং সূর্য্যারবাগীশা যোষিতাং চন্দ্র-ভার্গবৌ।
ক্লীবানাং বুধ-মন্দৌ চ পতয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥"
—বৃহজ্জাতক চন্দ্রিকা।

"ভৌমার্ক-জীবাঃ পুরুষাঃ ক্লীবৌ তু সৌম-ভানুজৌ।
স্ত্র্যাখ্যৌ ভার্গব-চন্দ্রৌ দ্বৌ তৎ-পতিত্বাৎ তথোচ্যতে॥"
—বৃহৎ পারাশরীয় হোরা।

শ্রীরাধারঞ্জন বসু এম-এ

শ্রীমতী ও শ্রীমত্যার পার্থক্য

১। অল্পবয়স্ক ব্যক্তি বা স্নেহ পাত্র হইলে শ্রীমান্ ও স্ত্রীলিঙ্গে শ্রীমতী এই ব্যবহারের প্রতি কারণ এই যে শ্রী+মতু প্রশস্তার্থে মতুঃ-প্রত্যয় হইয়া থাকে। এই মতু প্রত্যয়ের দ্বারা উহাকে অত্যন্ত শ্রীসম্পন্ন ও আদরণীয় বুঝাইয়া থাকে। এই শ্রীমতী ও শ্রীমান্ শব্দে স্নেহাধিক্য বুঝানোই তাৎপর্য্য। যেখানে স্নেহাধিক্য বা আশীর্ব্বাদ বুঝাইবার আবশ্যকতা নাই, কেবলমাত্র শ্রীসম্পন্ন বুঝানোই উদ্দেশ্য, সেখানে শ্রীযুক্ত ব্যবহার করা উচিত।

২। বয়োজ্যেষ্ঠ ও সমাজে সম্মানিত ব্যক্তিকে কনিষ্ঠোচিত শ্রীমান্ বা শ্রীমতী শব্দে ব্যবহার করিলে তাহাকে পরিহাস করা হয়; সুতরাং এই স্থলে শ্রীমান্ বা শ্রীমতী এই শব্দটী অবজ্ঞাসূচক হইয়া থাকে।

৩। শ্রীমদ্গুরু পরম্পরা ইত্যাদি স্থলে যে মতুপ্রত্যয়ান্ত শ্রীমৎগুরু পরম্পরা বিশেষণ রূপে নির্দ্দেশ করা যায়, তাহাতে প্রশস্ত ও শ্রীবিশিষ্ট বুঝায়, সেখানে কোনও অবজ্ঞা বা পরিহাস বক্তার তাৎপর্য্য নয়, উৎকর্ষ বুঝানই উদ্দেশ্য। উৎকর্ষাপকর্ষ বক্তার ইচ্ছানুসারেই হইয়া থাকে।

৪। শ্রীমান্ বা শ্রীমতী শব্দ এই ব্যবহার লোকের ইচ্ছানুসারেই চিরপ্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে যে দোষগুণ সমাজের ব্যবহার অনুসারে লক্ষিত হয়, তাহাতে শব্দ রচনার কৌশলে লেখকের তাৎপর্য্যই মূলীভূত কারণ। প্রাচীন লিপি দেখিয়া বুঝা যায় যে, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন সময় হইতে অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের পদাবলি রচনার কাল হইতেই এই শ্রীমতী প্রভৃতির ব্যবহার প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

৫। আর যে শ্রীমত্যাম্ শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে এরূপ শব্দ কোথাও কেহ ব্যবহার করেন বলিয়া বোধ হয় না।

৬। বর্ত্তমান সময় লোকে শ্রীমতী অমুকী দেবী বা দাসী লিখেন; কিন্তু সেটায় ব্যাকরণ দোষ পড়িয়া যায়। কারণ, নাম বিশেষ্যপদ, মতী বিশেষণ পদ। বিশেষ্য বিশেষণে সমাস করিলে পুংবৎ হইয়া যায়। তাহাতে শ্রীমৎ অমুকী দেবী এইরূপ হইবে। সুতরাং এইরূপ না লিখিয়া শ্রীঅমুকী দেবী বা দাসী লিখা যুক্তিযুক্ত। তবে যদি কেহ বলেন যে, আমি সমাস করিব না, সে অন্য কথা। তা হইলে শুনিতে ভাল হইবে না।

শ্রীতুলসীরাম চট্টোপাধ্যায়

গত আশ্বিন মাসের ভারতবর্ষে সম্পাদকের বৈঠকে শ্রীযুক্ত গঙ্গাগোবিন্দ রায় মহাশয় ৺ আত্মারাম সরকার মহাশয়ের ভোজ বল যাদুবিদ্যার সম্বন্ধে যে কৃতিত্ব উক্ত মাসিক পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বিশেষ আনন্দিত হইলাম।

তাঁহার মাতৃভূমি বা বাসস্থান বনবিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তর্গত ছিলিম গ্রামে লেখা আছে। তাহা না হইয়া হুগলী জেলার অন্তর্গত (উপস্থিত হাওড়া) কমলাপুর গ্রামে হইবে। তিনি আমারই পূর্ব্বপুরুষ। তাঁর গুণাবলি সম্বন্ধে প্রকাশিত বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ একমত। তাঁহার বংশাবলির বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

৺মাধবরাম সরকার
|
১, ৺বাঞ্ছারাম সরকার ২, ৺আত্মারাম সরকার ৩, ৺গোবিন্দরাম সরকার
4, ৺রামপ্রসাদ সরকার
|
৺পঞ্চুরাম সরকার
|
৺রাধানাথ সরকার
|
৺বামাচরণ সরকার
|
তস্য পুত্র লেখক— শ্রীজীবনকৃষ্ণ সরকার

অশ্বিনীকুমার

কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ

পূর্ব্বাকাশ-শোভা, দীপ্ত নক্ষত্র যেমতি
নিশান্তে প্রকাশে স্নিগ্ধ রশ্মি-সমুজ্জ্বল!
তেমতি ভাতিল তব সাধনার জ্যোতিঃ;
প্রদানিল জ্ঞান-প্রেম-ভক্তি নিরমল!
জড়তায় ভরা, সুপ্ত, অবসন্ন দেশে,
জাগিল দেশাত্ম-বোধ আহ্বানে তোমার,
সহিলে সে রাজরোষ বীর-বন্দী-বেশে,
বরিলে প্রশান্ত মুখে রুদ্ধ কারাগার।
মজি' দেবী-তত্ত্বে ছিলে চির আরাধনে,
শুদ্ধ, পূত, শান্ত, সৌম্য ঋষি সনাতন!
ত্যাগের আদর্শ হেন এ মর ভবনে,
কে বল দেখাবে, দেব, তোমার মতন।
আর কি হেরিবে বঙ্গ কভু এ নয়নে,
হাস্যোজ্জ্বল জ্ঞানমূর্ত্তি—প্রভাত তপন!—

আষ্ট্রেলিয়া

(দ্বিতীয় পর্য্যায়)

শ্রীনরেন্দ্র দেব

আষ্ট্রেলিয়ার ঔপনিবেশিকদের সামাজিক জীবনে জাতিভেদের কোনও অলঙ্ঘ্য প্রাচীর না থাকায় শ্রমজীবী বা মজুর সম্প্রদায়ের মধ্যেও যে লোক উপযুক্ত হোয়ে ওঠে, সে অনায়াসে সমাজের উচ্চস্তরে আসন পায়। যারা দেশের গণ্যমান্য ও সম্ভ্রান্ত লোক হ'য়ে ওঠে তাদের সন্তানেরা যদি পৈতৃক গুণের অধিকারী হ'তে না পারে, তা হ'লে পিতার খাতিরে গুণহীন পুত্র সে দেশে কোনও সম্মানই পায় না! ব্রাহ্মণের সন্তান বলেই সেও যে নমস্য ও পূজ্য, এ কথা নবীন আষ্ট্রেলিয়া স্বীকার করে না; তাই সেখানে যোগ্য লোকের অযোগ্য পুত্রদের সমাজের উচ্চস্তর থেকে সরে গিয়ে নিম্নস্তরের উপযুক্ত লোকদের জন্য সে স্থান ছেড়ে দিতে হয়।

আষ্ট্রেলিয়ায় বৎসরের তিনশত পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে অন্ততঃ তিনশ'টি দিন বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রবিকরোজ্জ্বল ও আনন্দবর্দ্ধক। সে দেশের আবহাওয়ার গুণে সেখানে সারা বৎসর ধরে ক্রীকেট্ খেলা চলতে পারে। ছুটীর দিনে সর্ব্ব শ্রেণীর আষ্ট্রেলিয়ানদের প্রধান আমোদ হচ্ছে একটি বন-ভোজনের অনুষ্ঠানে। যুবক যুবতীদের তো কথাই নেই, বালক বালিকা ও বুড়োবুড়ীরাও এই আমোদে যোগ দেয়। দলের সকলের সঙ্কুলান হ'তে পারে এরূপ পরিমাণ আহার্য্য বস্তু সঙ্গে নিয়ে এক একটা দল সকালবেলাই বেরিয়ে পড়ে একটা রম্যস্থানের সন্ধানে। সেখানে পৌঁছে তারা নিজেরা রাঁধা-বাড়া করতে লেগে যায়। আষ্ট্রেলীয়ার প্রায় প্রত্যেক সহরেরই উপকণ্ঠে সুরম্য কাননভূমির সন্ধান পাওয়া যায়। প্রকৃতি যেন সেখানে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী হ'য়ে বিরাজমানা!
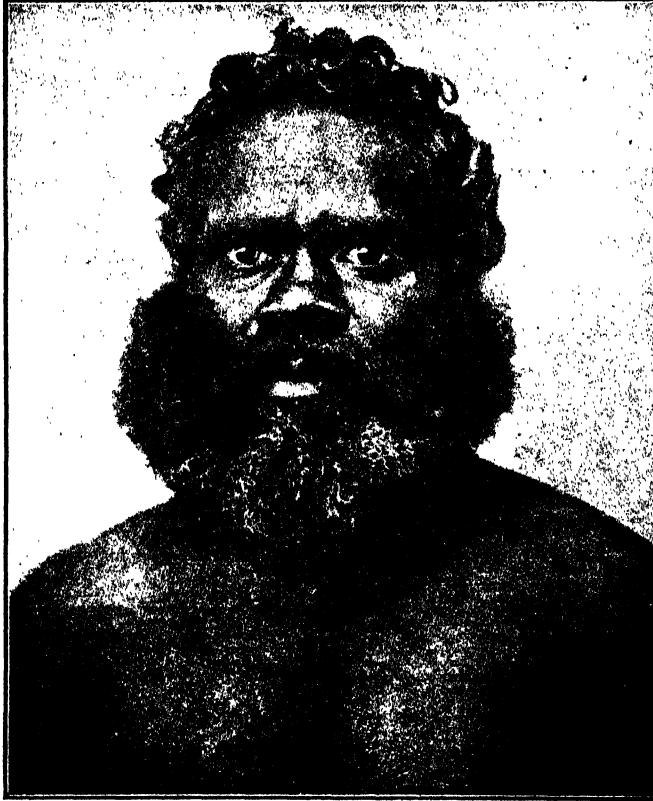
বড়ামুঙ্গা সর্দ্দার।—(আষ্ট্রেলিয়ার আদিম ও প্রাচীনতম অধিবাসী হ'চ্ছে এই বড়ামুঙ্গা জাতি। এরা এখনও চাষবাস করতে শেখেনি, ফল মূল ও শাক সব্জী খেয়ে থাকে।)

খাওয়া দাওয়ার পর পুরুষেরা ধূমপান ক'রতে ক'রতে মেয়েদের সঙ্গে বসে গল্প করে, নাটক বা কাব্য পড়ে, কিম্বা কোনও রকম অলস খেলায় নিযুক্ত হয়। বিকেলের দিকে চা তৈরি হয়। চা একেবারে না হ'লেই নয়। আষ্ট্রেলীয়ানরা মেয়ে পুরুষে চা খাবার যম! তারা ডিনার টেবিলে খেতে বসেও চা খায়। যারা জীবনে কোনওদিন চা খায় না, যদিও সেরকম লোক আষ্ট্রেলিয়ায় খুব কমই আছে, তারাও বন ভোজনে গেলে চা'য়ের অমর্য্যাদা করতে সাহস করে না। কারণ বনভোজনের সনাতন প্রথা

কঙ্কাল সংকার।—(এক বৎসর পরে বৃক্ষের উপর থেকে মৃতব্যক্তির কঙ্কাল নামিয়ে তার অস্থিগুলি সংগ্রহ করা হচ্ছে।)

শ্রাদ্ধোৎসব।—(বৃক্ষবল্কলাবৃত ও পক্ষ শোভিত মৃতের বাহু-অস্থিখানি সমবেত আত্মীয় বন্ধুগণের মধ্যে বহন করে আনা হ'চ্ছে।)
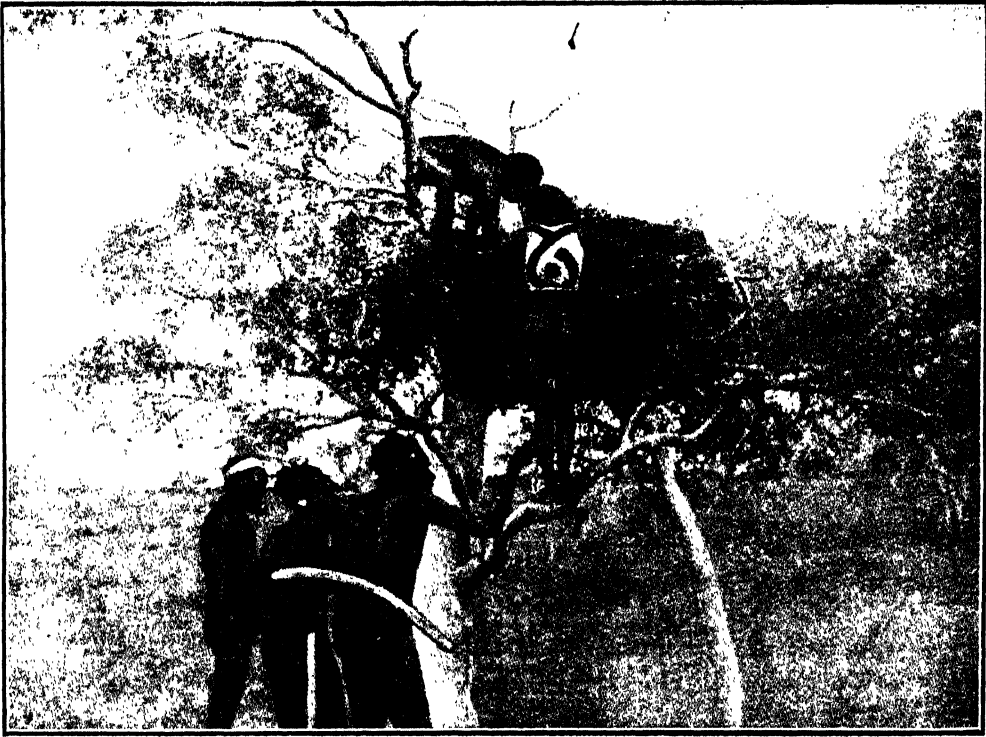
তরুসমাধি।—(বড়মুঙ্গারা শবদেহ গাছের উপর তুলে এক বৎসর ডালপালা চাপা দিয়ে রেখে দে

শোকসভা।—(অস্থি-বাহকেরা এসে মৃতের পিতার হস্তে অস্থিখানি সমর্পণ করে। শোকার্ত্ত পিতা আবার সেখানি যখন সন্তানের বয়োজ্যেষ্ঠার হাতে তুলে দেন, তখন মেয়ের দল উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে আরম্ভ করে)

অস্থি-তর্পণ।—(অবশিষ্ট বাহু-অস্থিখানি বৃক্ষবল্কলে আবৃত ক'রে 'অপোশাম' রোমের রজ্জুতে বেঁধে তার একদিক পালকের দ্বারা সুসজ্জিত করা হচ্ছে।)

স্ত্রী-আচার'।—(মেয়েরা মুখে খড়ি মেখে উরুদেশে শোকচিহ্নস্বরূপ অস্ত্রাঘাত ক'রে মৃতের বাহু-অস্থিখানি সমাধির পূর্ব্বে ক্রোড়ে ধারণ ক'রে আছে।)

অস্থি-উৎসর্গ।—(মৃতের ভ্রাতা এসে মেয়েদের কাছ থেকে অস্থিখানি ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে ঘাতকের সাম্‌নে প্রসারিত ক'রে ধরে। ঘাতক পাষাণ-হাতুড়ীর আঘাতে অস্থিখানি চূর্ণ করে দিলে মৃত্তিকার মধ্যে পুঁতে ফেলা হয়।)

নৃত্য শিক্ষা।—(অরুন্তায়া উৎসবের বেশে নৃত্য-শিক্ষা করছে।)

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি।—(তরুণীর দাঁত ভেঙে দিয়ে তাকে আরও সুন্দরী করা হ'চ্চে।)

শোকাকুলা।—(পতিবিয়োগে শোকাতুরা সপত্নীদ্বয় কেশ-কর্ত্তন করে খড়ি মেখে বসে রোদন করছে।)

কুটীর না কোটর ?—(ঘাসপাতা চাপা এই ক্ষুদ্র অপরিসর ঝোপের মধ্যে তারা সচ্ছন্দে বাস করে।

মৃত্যুশয্যায়।—(মৃত্যুকালে সমস্ত স্ত্রী ও পুরুষ আত্মীয়েরা চারিপার্শ্বে সমবেত হয়। স্ত্রীলোকেরা উচ্চৈঃস্বরে রোদন ক'রে, পুরুষেরা কেউ কেউ শোকোন্মত্ত হয়ে আপন অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করতে থাকে ; রোরুদ্যমানা স্ত্রীলোকেরা তাদের নিরস্ত করবার জন্য ব্যাকুল ভাবে অনুরোধ ক'রতে থাকে।)

কঙ্কাল-কবর ।—(একখানি বাহু-অস্থি ভিন্ন অন্য সমস্ত অস্থিগুলি উইটিবির মধ্যে প্রোথিত করা হচ্ছে ।)

শোভাযাত্রা ।—(একদল লোক যখন অপর একদল লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে যায়, কোনও বিবাদ বিসম্বাদ নিষ্পত্তির জন্যই হোক বা সুখ সমাধার নিমন্ত্রণেই হোক্‌, তারা সকলে মিলে একসঙ্গে রণমূর্ত্তিতে নৃত্য করতে করতে ও গর্জ্জন করতে করতে অগ্রসর হয় । তাদের সেই শোভাযাত্রা এক অপূর্ব্ব দৃশ্য ।)

সমাধি উৎসব।—(বাহু-অস্থিখানি সমাধিস্থ করবার পূর্ব্বে একটি উৎসব-অনুষ্ঠান হয়, এই অনুষ্ঠানের শেষ প্রথা হ'চ্ছে পুরুষেরা সকলে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে পা ফাঁক ক'রে দণ্ডায়মান হয়, আর স্ত্রীলোকেদের হামাগুড়ি দিয়ে একে একে তাদের উভয় পদতলের নিম্ন-দিয়ে চলে যেতে হয়। সর্ব্বশেষ নারীর নিকট অস্থিখানি থাকে; সে পার হ'য়ে আসবা মাত্র তার হাত থেকে অস্থিখানি ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে ভেঙে ফেলে সমাধিস্থ করা হয়।)

রোগীর চিকিৎসা।—(পীড়িত ব্যক্তির রোগ বালাই দূর করবার জন্য এরা ঝাড়ফুঁক করে এবং রোগীর শরীর থেকে শত্রুর কুদৃষ্টি শোষণ করে নেয়।)

অনুসারে সেখানে চা পান করতে সকলেই বাধ্য! কাজে-কাজেই চা-বিরোধীদেরও শান্তশিষ্ট ছেলেটির মত সুড় সুড় ক'রে হাত বাড়িয়ে চায়ের পেয়ালাটি নিয়ে ভাল মানুষের মত চুমুক দেওয়া সুরু করতে হয়। বড়দিন কিম্বা ইষ্টারের সময় লম্বা ছুটী পেয়ে কোনও কোনও দল সপরিবারে সহর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বনের মধ্যে পাহাড়ের ঝর্ণার ধারে, নদীকূলে বা সমুদ্রতীরে—তাঁবু গেড়ে একেবারে সপ্তাহকাল কাটিয়ে আসে। এই বাইরে গিয়ে খোলা যায়গায় দু'চার দিন বাস করবার ঝোঁক আষ্ট্রেলিয়ানদের মধ্যে খুব প্রবল থাকায় সে দেশের সাধারণ লোকের স্বাস্থ্য খুব ভাল।

কুমুদ কহ্লার শোভিত স্রোতস্বিনী।—(আষ্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ নদনদীতে এমনি সুন্দর কমলবন দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এই শালুক ও পদ্ম ফুল সায় ডাঁটা পাতা সমেত আষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের একটিপ্রধান শাকশব্জী জাতীয় খাদ্য।)

সিন্ধু-গাভী।—(এরা সমুদ্রের প্রাণী বটে কিন্তু সমুদ্র-তীরের ঘাস খেয়ে প্রাণধারণ ক'রে। এরা মৎসাকৃতি বটে কিন্তু স্তন্যপায়ী জীব, ডিমপাড়ে না। আদিম অধিবাসীরা এদের বর্শাবিদ্ধ ক'রে শিকার করে। এদের মাংস খেতে শূকর মাংসের চেয়েও সুস্বাদু! আষ্ট্রেলিয়ার শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকেরা এর সন্ধান ও আস্বাদ পেয়ে আজকাল বড় বড় জাল নিয়ে গিয়ে সমুদ্র থেকে এদের ধরে নিয়ে আসছে।)

সমুদ্রে ফেন-স্নান আষ্ট্রেলিয়ানদের একটা নিত্য-নৈমিত্তিক কাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে! সমুদ্রস্নানের একটা নেশা এদের—বিশেষ করে এদের মেয়েদের মধ্যে এমন ধরেছে যে, সারাদিনের মধ্যে যে কোনও সময়েই সমুদ্রের ধারে যাও না—দেখবে হাজার মেয়ে আষ্ট্রেলিয়ার অসীম বিস্তৃত সাগরকূলে যেন স্নানযাত্রার উৎসব লাগিয়ে দিয়েছে! একদিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর আর একদিক থেকে ভারত্ সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গ তুলে ছুটে এসে আষ্ট্রেলিয়ার দু'পাশে আছাড় খেয়ে পড়ছে—আর সেই দুই ভীমপারাবারের ফেনিলোচ্ছল উর্ম্মি-ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে মহারঙ্গে নৃত্য ক'রতে ক'রতে—তরুণ তরুণীর দল যেন জলকুমার ও জলকন্যাদের মত নির্ভয়ে খেলা ক'রছে!
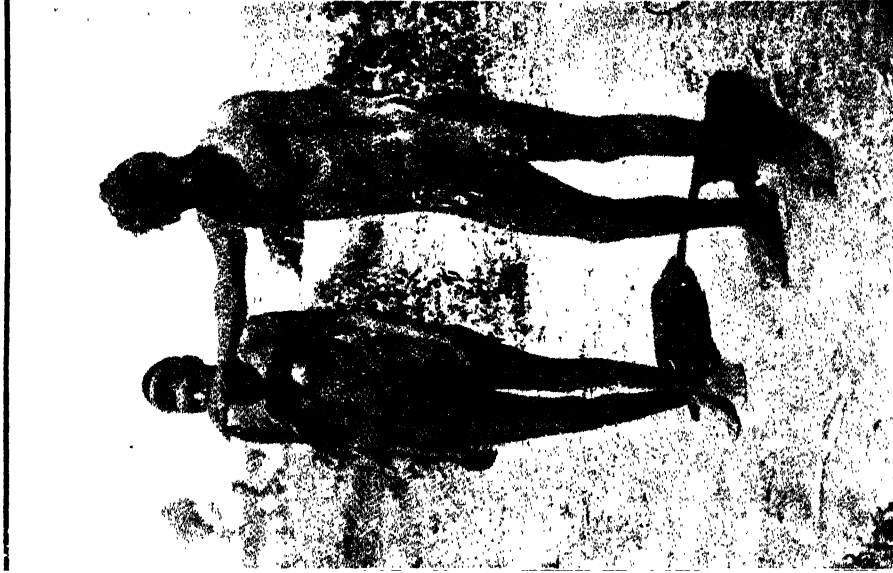
মৌন-ব্রত।—(পতি বা অপর কোনও পুরুষ আত্মীয়ের মৃত্যুর পর পত্নীকে ব অন্য আত্মীয় রমণীদের কিছুদিন মৌনব্রত অবলম্বন করে থাকতে হয়। সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে গেলে তারা মৌনব্রত উদ্‌যাপনের জন্য মৃতের পুরুষ আত্মীয়দের নিকট ভোজ্য উপহার নিয়ে আসে এবং কথা বলবার আগে প্রত্যেক পুরুষের কনিষ্ঠাঙ্গুলি দংশন করে।
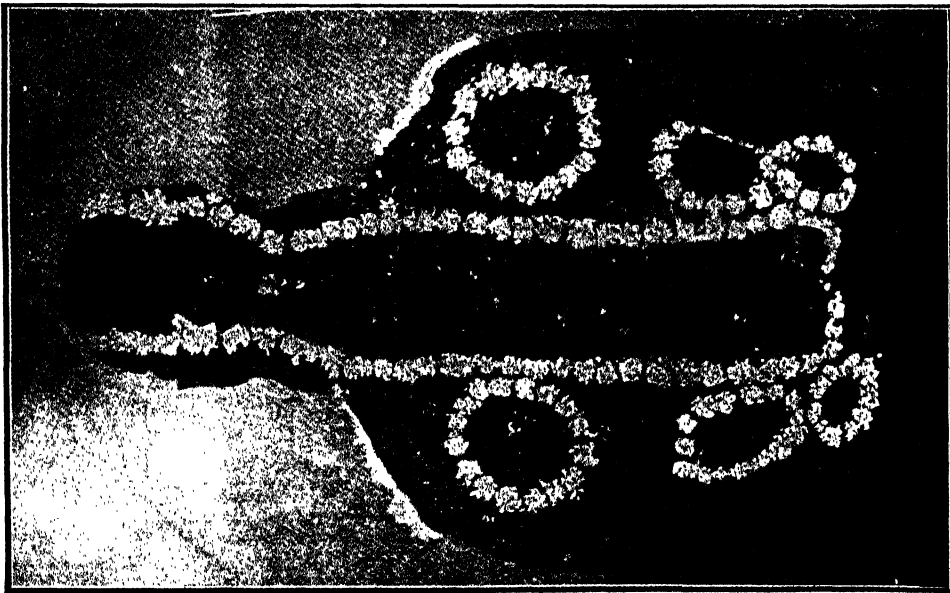
যাদুকর।—(ইনি যাদুবলে তৃণ উৎপাদন ক'রতে পারেন বলে যশস্বী হয়েছেন।)

ঘোড়দৌড়, জুয়াখেলা প্রভৃতি খাস্ মোকামের যে সব বেয়াড়া আমোদ প্রমোদ আছে, আষ্ট্রেলিয়ানরা সেগুলি সমস্তই তাদের নূতন দেশে আমদানী করেছে। এই খাস মোকামের যা কিছু নির্ব্বিচারে আমদানী ক'রতে গিয়ে আষ্ট্রেলিয়াকে দিনকতক ভারি ভুগতে হ'য়েছিল। সেখানে খরগোস্ দেখতে পাওয়া যেতো না বলে একজন ঔপনিবেশিক সখ ক'রে কয়েক জোড়া খরগোস নিয়ে গিয়ে সেখানে রেখেছিলেন। বছর কতক পরে দেখা গেল যে খরগোসের উৎপাতে টেঁকা দায়, চাষবাস প্রায় বন্ধ হ'য়ে যাবার যোগাড় হয়েছে! ক্ষেতে পা বাড়ায় কার সাধ্য! চারিদিকেই খরগোসের পাল একেবারে পিল পিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে! কারণ মাদী খরগোসরা তিনমাস বয়স হলেই বাচ্ছা পাড়তে সুরু করে আর প্রত্যেক মাদী খরগোস্‌টা বছরে অন্ততঃ নব্বুইটা ছানা প্রসব করে! সুতরাং কয়েক বৎসরের মধ্যে খরগোসের জ্বালায় আষ্ট্রেলিয়ানদের এমন অবস্থা হোলো যে রীতিমত তাদের সৈন্যদল সংগঠন করে খরগোস-বংশ নির্ম্মূল করবার অভিযান ক'রতে হ'লো! কারণ শৃগাল কুকুর প্রভৃতি খরগোস-ভোজী জীবের সেখানে কিঞ্চিৎ অভাব ছিল। শেষটা কিন্তু আষ্ট্রেলিয়ানরা আবিষ্কার ক'রে ফেল্‌লে যে খরগোস ধ'রে বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করা যেতে পারে এবং খরগোসের অত্যাচার থেকে শস্যক্ষেত্র বাঁচাবারও সহজ উপায় একটা আছে; তখন অনেকেই চাষবাস ছেড়ে খরগোসের ব্যবসা সুরু করে দিলে। এখন কেবল খরগোসের ব্যবসা থেকেই আষ্ট্রেলিয়ার বার্ষিক আয় দেড় কোটী টাকার উপর!

ভিতর মুল্লুকের চেয়ে সমুদ্রোপকূলের জায়গার আবহাওয়া বেশ ভাল বলে ঔপনিবেশিকরা প্রায় সকলেই সমুদ্রকূলের কাছাকাছি বাস করে। আষ্ট্রেলিয়ার ছয়টা বড় বড় সহরে সেখানকার শতকরা বেয়াল্লিশ জন লোক আস্তানা নিয়েছে। ভিতর মুল্লুকে বাস করবার একটা প্রধান অসুবিধে হ'চ্ছে লোকজনের অভাব! কালা আদমীদের নিয়ে কাজ চালাবার চেষ্টা ক'রলে হয়তো মফস্বলে থাকা তাদের পক্ষে সহজ হ'তে পারতো, কিন্তু আষ্ট্রেলিয়ানরা দৃঢ় পণ করেছে যে এ উপনিবেশটা তারা শ্বেতাঙ্গদেরই একচেটে ক'রে রাখবে সুতরাং কালা আদমীদের প্রবেশ সেখানে অনেকদিন থেকেই বন্ধ হ'য়ে গেছে।

আষ্ট্রেলিয়ার আর একটা বিশেষত্ব হ'চ্ছে সেখানকার বিচিত্র তরুলতা, ফুলফল ও জীবজন্তু! প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে সব জীবজন্তুর কথা আমরা কেবলমাত্র প্রাণীতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থে পড়েছি এবং কোনও কোনও যাদুঘরে যাদের বিরাট অস্থি বা কঙ্কালমূর্ত্তি দেখে তাদের প্রাচীন অস্তিত্বের প্রমাণটুকু পাই, সেই সব শ্রেণীর অতিকায় জীবজন্তু কতক কতক আষ্ট্রেলিয়ায় এখনও জীবন্ত দেখতে পাওয়া যায়! 'ক্যাঙারু'ই হ'চ্ছে আষ্ট্রেলিয়ার প্রধান জীব। তা ছাড়া হরেক রকমের কাঠবিড়ালী সাপ আর এক রকম গাং-শূয়োরও সেখানে খুব বেশী দেখতে পাওয়া যায়। গাং-শূয়োর জীবটি দেখতে ঠিক প্রকাণ্ড একটি শূকরের মতোই,

ষ্টিংরে মাছ
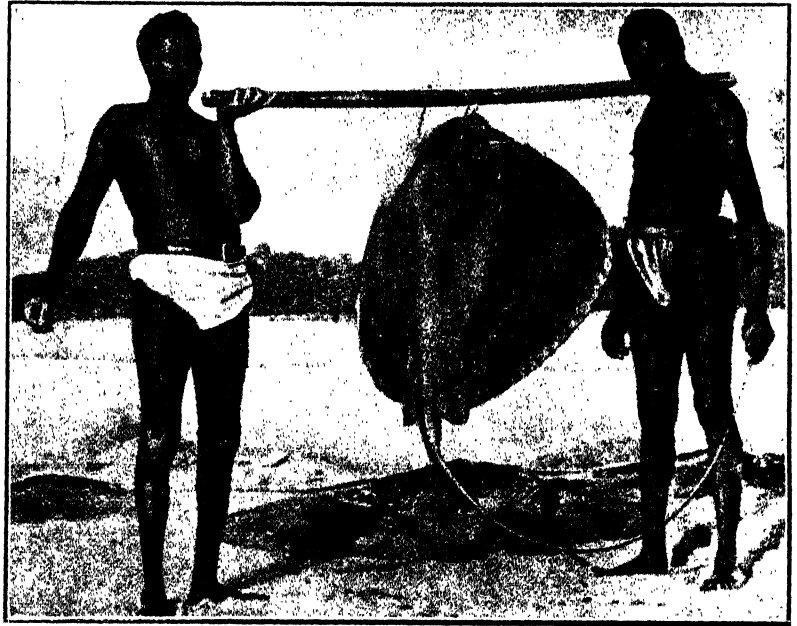
(উত্তর-পশ্চিম আষ্ট্রেলিয়ার এক প্রকার সামুদ্রিক মাছ; বিরাট আকৃতির ও সুদীর্ঘ পুচ্ছ বিশিষ্ট।)

সুন্দর বর্ব্বর।—(এই ভাস্কর-খোদিত প্রস্তরমূর্ত্তির মত সুগঠিত আকৃতির বর্ব্বরেরা কেম্বি্জ উপসাগরস্থ দ্বীপে বাস করে। একজন দৈর্ঘ্যে সাতফুটেরও বেশী। ইনি পাহাড়ের চূড়োর উপর উঠে ঈগলপাখীর বাসা থেকে ডিম তুলে নিয়ে যাচ্ছেন।)

কিন্তু নদীনালা খালবিলের ধারে গর্ত্ত খুঁড়ে মাটির ভিতর বাস করে বলে এদের ঠিক শূকরের পর্য্যায়ে ফেলা চলে না।

আষ্ট্রেলিয়ায় পিঁপড়ে আর উইপোকার উপদ্রব খুবই। কাঠের আস্‌বাবপত্র মায় কাঠের বাড়ী পর্য্যন্ত এদেশের উইপোকায় উদরসাৎ করে ফেলে! পাখী এখানে হরেক রকমের দেখতে পাওয়া যায়! স্বর্গ-বিহঙ্গম বা বার্ডস্‌ অফ প্যারাডাইজ এখানকার 'পাপুয়া' প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর আছে। লাল ঝুঁটীওলা কালো কাকাতুয়া পাখী আর হলদে ঝুঁটীওলা সাদা কাকাতুয়া আষ্ট্রেলিয়ার একটা বিশেষত্ব! এ ছাড়া 'কুকাবুরা' বলে এখানে প্যাঁচার মতন দেখতে এক রকম পাখী আছে; এদের বিশেষত্ব হ'চ্ছে অদ্ভুত ডাক! দূর থেকে এদের ডাক শুনলে মনে হবে ঠিক যেন গাছের ওপর থেকে কোনও মানুষ খিল্‌ খিল্‌ করে হাস্‌ছে! নতুন লোকে শুনলে কিছুতেই বিশ্বাস করবেনা—যে পাখী ডাক্‌ছে,—কোনও লোক গাছে উঠে হাস্‌ছে না! কুকাবুরাদের সেখানে ভারি আদর, কারণ এরা সাপের যম! সাপ মেরে তাদের পরম উপকার ক'রে।

য়ুরোপ থেকে আষ্ট্রেলিয়ায় যেতে হ'লে প্রথমেই ফ্রীম্যাণ্টেল্‌ প্রদেশের 'পার্থ' বন্দরে এসে নামতে হয়। 'পার্থ' হচ্ছে পশ্চিম আষ্ট্রেলিয়ার প্রধান সহর। ফ্রীম্যাণ্টেল প্রদেশটা আষ্ট্রেলিয়ার প্রায় এক চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু লোকসংখ্যা অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে খুব কম, এমন কি তাশমানিয়ার মত ক্ষুদ্র দ্বীপটীও লোকসংখ্যায় এর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। তবে খুব শীঘ্রই এ অঞ্চলে লোকের বাস বেড়ে উঠবে বলে আশা করা যায়। পশ্চিম আষ্ট্রেলিয়ার উত্তরে সমুদ্রতীরে বিস্তৃত মুক্তার কারবার চলে। এ অঞ্চলের ভিতর মল্লুকের বৃহৎ সোনার খনি পৃথিবীর মধ্যে পরিচিত। তা ছাড়া কৃষি ও পশুপালনের

মকাতীরা।—(বৈদিক যুগের 'অরণী' কাষ্ঠের মতো অগ্নি-উৎপাদনের জন্য আষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা চক্‌মকির পরিবর্ত্তে দুই খণ্ড কাষ্ঠ ব্যবহার করে। একখানি চ্যাপটা নরম কাঠ, আর একখানি রুলের মত শক্ত সরু লম্বা কাঠ। চ্যাপ্টা কাঠের উপর সরু লম্বা কাঠখানি চেপে ঘোরাবার সময় যে স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় তারই সাহায্যে শুষ্ক তৃণে অগ্নি সংযোগ ক'রে নিয়ে এরা দীপশলাকার কাজ চালায়। এই অগ্নি-উৎপাদক যন্ত্রটিকে তারা বলে 'মকাতীরা।')

কারবারটাও এদিকে দিন দিন বিস্তারলাভ ক'রছে।

ফ্রিম্যাণ্টেলে জাহাজ থেকে নেমে ট্রেনে করে পশ্চিম আষ্ট্রেলিয়ার মরুপ্রদেশ উত্তীর্ণ হ'য়ে একেবারে সোজা পূর্ব্ব আষ্ট্রেলিয়ার যে কোনও সহরে এসে উঠা যায়। দক্ষিণ আষ্ট্রেলিয়াই হচ্ছে অন্য সকল প্রদেশের চেয়ে ঐশ্বর্য্যশালী। এখানকার প্রধান সহর হ'চ্ছে 'আডেলাইডে'। দ্রাক্ষাকুঞ্জ, কমলা লেবুর বন, বাদাম ও জলপাইয়ের জঙ্গলে পরিবেষ্টিত এই সহরটি যেন ছবির মত দেখতে! আঙুরের সময় এক পেনীতে অর্থাৎ চার পয়সায় সেখানে এত আঙুর পাওয়া যায় যে, একজন লোক খেয়ে ফুরোতে পারে না। জনকতক সম্পন্ন ঔপনিবেশিক এইখানে এসে প্রথম আড্ডা গেড়ে-

ক্ষতস্মৃতি।—(শোকার্ত্ত পুরুষ অস্ত্রাঘাতে আপন উরুদেশ ক্ষত করে পড়ে আছে।)

ছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল যে জগতের এমন জায়গায় গিয়ে বাস ক'রবো যেখানে দারিদ্র্যের দুঃখ দৈন্য থাক্‌বেনা! তাদের এ উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয়েছে! আডেলাইডে সহরে ভিক্ষুক নেই। জীর্ণবস্ত্র-পরিহিত, অনাহারে শীর্ণ, অভাব-ঝঞ্ঝাহত দরিদ্রের পাণ্ডুর মলিন নিরানন্দ মুখ এখানে একটিও চখে পড়বেনা। সকলেরই চ'খে মুখে একটা স্বচ্ছলতার সহজ দীপ্তি, এবং বেশে ভূষায় একটা লক্ষ্মীশ্রী দেদীপ্যমান!

আডেলাইডে থেকে ট্রেণ ক্রমে 'লফ্‌টী' পাহাড়ের উপর দিয়ে উঠে তারপর আস্তে আস্তে ওপারের নামাল জমিতে নেমে 'মারে' নদীর মোহানা পার হয়ে চলে যায়। মারে হ'চ্ছে আষ্ট্রেলিয়ার সব চেয়ে বড় নদী। আষ্ট্রেলিয়ার যে বিস্তৃত গিরিশ্রেণীকে "আষ্ট্রেলিয়ান আল্‌পস্‌" বলে, সেই-খানেই 'মারে'র জন্ম। পাহাড় থেকে বেরিয়ে সাগরাভি-মুখে যাবার পথে 'মরম বিদ্ধগী' (Marrumbidgee River) ও 'প্রিয়তমা' (River Darling) নামে দুই শাখানদীকে সে সখীরূপে সঙ্গে নিয়েছে। এই দুই নদীতে একদল ভব-ঘুরে লোক ভেসে বেড়ায়; তাদের পেশা হ'চ্ছে মাছ ধরে বেড়ানো, অর্থাৎ—জেলের কাজ করা, আর মাঝে মাঝে জাগঞ্জ-ঘাটে এসে যে কোনও খুচরো রোজগারের চেষ্টা!

'মারে' নদী পার হবার পর ট্রেণ আষ্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত 'মাল্লী মরুভূমি' অতিক্রম করে চলে। 'মাল্লী মরুভূমি' নাম শুনে কেউ যেন ভাববেন না যে সেই উত্তপ্ত বালুকাময় শাহারা মরুভূমিরই কোনও নিকট আত্মীয়! মাল্লী হচ্ছে একরকম ছোট জাতের (ইউক্যালিপটাস) গাছ। এই গাছ সেখানে এত বেশী যে, একেবারে জঙ্গল হয়ে গেছে! চারিদিকে যতদুর চক্ষু যায়, ততদুর পর্য্যন্ত কেবল এই মাল্লীর বন দেখতে পাওয়া যায় বলে এখানকার নাম হয়েছে 'মাল্লী মরুভূমি।'

এর পরই হ'চ্ছে আষ্ট্রেলিয়ার সর্ব্বপ্রধান সহর মেলবোর্ণ।

মেলবোর্ণের অধিবাসীরা তাদের সহরটির উল্লেখ করবার সময় বলে মার্ভেলাস মেলবোর্ণ! অর্থাৎ অপরূপ মেলবোর্ণ নগর! এই অপরূপ সহরটি ইয়ারা নদীর কূলে প্রতিষ্ঠিত। এইখানেই ইয়ারা নদী হাডসান্ উপসাগরে এসে মিশেছে। এবং সেই যুক্ত-বেণীর মুখেই বিখ্যাত ফিলিপ বন্দর। মেলবোর্ণ যথার্থই এক অপরূপ নগর। এই সুন্দর ও সুবৃহৎ সহরটিই হচ্ছে এখন আষ্ট্রেলিয়ার রাজধানী। এইখানেই তাদের পার্লিয়ামেণ্ট বা শাসন-সভার অধিবেশন হয়।

মেলবোর্ণ থেকে বেরিয়ে কৃষিপ্রধান প্রদেশ ভিক্টোরিয়ায় আসতে হয়। এখানকার ছোট খাটো সহরগুলির সব যেন সহাস্যভাব! এখানকার লোকেরা সবাই কায়িক পরিশ্রমের গুণে ধীরে ধীরে সম্পদ্‌শালী হয়ে উঠছে। এরা গরু চরিয়ে খায়; ধান, ছোলা, গম, যবের চাষ করে, দুধ মাখনের যোগান দেয়, ভেড়া পোষে। ভিক্টোরিয়া প্রদেশের আলবুরী অঞ্চলে আবার মারে নদী পার হ'তে হয়। এ'দিকটা হচ্ছে মারে নদীর উৎপত্তি-মুখ। এই মুখে মারে পার হ'য়ে 'নিউ সাউথ ওয়েলস্' প্রদেশে প্রবেশলাভ ঘটে! নিউসাউথ ওয়েল্‌সের রীভারীণা জেলাটা মেষ-ভূমি ব'লেই বিখ্যাত! এইখান থেকেই জগদ্বিখ্যাত মেরীনো পশম পৃথিবীর সব দেশে চালান যায়।

অরুন্তা জাতীয় লোক

(এরা আষ্ট্রেলিয়ার মধ্য প্রদেশস্থ মরুভূমির বাসিন্দা। বাহুতে প্রেয়সীদের কেশ নির্ম্মিত 'বাজু' পরিধান করে। বুকে পেটে শোকের অস্ত্রাঘাত চিহ্ন। কাহারও মৃত্যুতে শোকার্ত্ত হ'লে এরা আপন অঙ্গে অস্ত্রাঘাতের দ্বারা ক্ষত চিহ্ন এঁকে তার স্মৃতি ধারণ করে থাকে।)

নিউ সাউথ ওয়েল্‌সের প্রধান সহর হ'চ্ছে সিড্‌নী। সিড্‌নী আবার আষ্ট্রেলিয়ার বাণিজ্য-প্রধান নগর। সিড্‌নীর জ্যাক্‌সন বন্দর জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দর বলে খ্যাত। সিড্‌নী থেকে ব্রীসবেন্ সহরে যেতে হয়। ব্রীসবেন হ'চ্ছে উত্তর আষ্ট্রেলিয়ার কুইন্স্‌ল্যাণ্ড প্রদেশের প্রধান সহর। কুইন্সল্যাণ্ডের আরও উত্তরে আষ্ট্রেলিয়ার প্রসিদ্ধ আখের ক্ষেত বিশাল স্থান অধিকার করে আছে।

আষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের বিষয় কিছু না বল্‌লে আষ্ট্রেলিয়ার বিবরণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ যদি পৃথিবীর কোথাও এখনও পর্য্যন্ত থাকে, তবে সে বোধ হয় এই আষ্ট্রেলিয়াতেই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এখানকার আদিম অধিবাসীরা এখনও সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় থাকে। মাতৃগর্ভ থেকে এদেশের নরনারী যে বেশে ভূমিষ্ঠ হয়, জীবনের অবশিষ্ট কটা দিনও এরা সেই ভাবেই কাটিয়ে দেয়। তবে কেউ কেউ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চিত্রবিচিত্র করে; কোনও কোনও জাত মাথায়, হাতে বা নাকে কোনও রকম একটা কিছু অদ্ভুত অলঙ্কার পরে; আর দু'একটা জাত যারা সেই প্রস্তর-যুগের সভ্যতা পর্য্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছে,তারা কটি-বন্ধন-রজ্জুর সঙ্গে সম্মুখের দিকে একটুকরা গাছের ছাল বা খানিকটা লতাপাতা বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে যথেষ্ট লজ্জা-নিবারণ করা হ'য়েছে বলে মনে করে! আজকাল অনেকেই কৌপীনমাত্র পরিধান করে সভ্যশ্রেণীভুক্ত হবার চেষ্টা করছে।

আষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের ঠিক কালা আদমী বলা চলে না। তাদের বর্ণ অনেকটা ঘনশ্যাম বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। এরা এখনও ভবঘুরের মতো জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, এক জায়গায় স্থায়ীভাবে ঘরবাড়ী বেঁধে

বাস করতে শেখেনি। কোনও রকম ধাতুপাত্র বা মৃৎপাত্র এরা ব্যবহার করতে জানেনা সুতরাং নির্ম্মাণ করতেও শেখেনি। এদের কারুরই গৃহপালিত কোনও পশু নেই, কারণ ঠিক যাকে গৃহ বলা যেতে পারে এরকম গৃহও এদের কারুর নেই এবং এরা কোনও গৃহপালিত পশুর আবশ্যকতাও বোধ করেনা। (ক্রমশঃ)

ভারতের বিদেশী-বাণিজ্য

(অক্টোবর ১৯২৩)

শ্রীমন্ত সওদাগর

বৃটিশ ভারতের অক্টোবর ১৯২৩ সালের বাণিজ্য-তালিকায় দেখা যায় যে এ মাসে আমদানি ও রপ্তানি পূর্ব্বমাস অর্থাৎ ১৯২৩ সেপ্টেম্বর থেকে কিছু বৃদ্ধি হয়েছে। বে-সরকারি আমদানির মূল্য ১,৮৭ লাখ টাকা বাড়িয়া ২০,৬০ লাখ টাকা হয়েছে। রপ্তানি ১,৯৫ লাখ আর পুন রপ্তানি ১৬ লাখ বাড়িয়া ২৪,৫৭ ও ৯৮ লাখ টাকায় পঁহুছিয়াছে। নিম্নে ১৯২৩ ও ১৯২২ অক্টোবর এবং এপ্রিল হইতে অক্টোবর এই সাতমাসের মোট হিসাব দেওয়া গেল :—

	অক্টোবর ১৯২৩	অক্টোবর ১৯২২	বেশী (+)	কম (—)
	লাখ	লাখ	লাখ	শত
আমদানি	২০,৬০	২২,৯১	—২,৩১	—১০.১
রপ্তানি	২৪,৫৭	২০,৬৬	+৩,৯১	+১৮.৯
পুঃ রপ্তানি	৯৮	৯৭	+ ১	+১.০

	সাতমাস এপ্রিল হইতে অক্টোবর ১৯২৩	১৯২২	বেশী (+)	কম (—)
	লাখ	লাখ	লাখ	শত
আমদানি	১,৩১,১৫	১,৩৩,৪৬	—২,৩১	—১.৭
রপ্তানি	১,৮১,১২	১,৫৫,৫৪	+২৫,৫৮	+১৬.৪
পুঃ রপ্তানি	৮,০৪	৭,৯৭	+ ৭	+ .৯

কারেন্সি নোট সমেত এ মাসে বে-সরকারি অর্থের আমদানি ৪,৭২ লাখ টাকা। আর ১৯২৩ সেপ্টেম্বরে ৩,১০ লাখ এবং ১৯২২ অক্টোবরে ৩,৬৬ লাখ টাকা। নিম্নে সোণা ও রূপার হিসাব দেওয়া গেল :—

	এপ্রিল হইতে অক্টোবর ১৯২৩	১৯২২	বেশী (+)	কম (—)
	লাখ	লাখ	লাখ	শতক
আমদানি সোণা	২০,৪০	২১,৪৪	—১,০৪	— ৫
রপ্তানি ঐ	৫	৪	+ ১	+২৫
আমদানি রূপা	১১,৬৮	৯,৭৮	+১,৯০	+১৯
রপ্তানি ঐ	১,৩৫	২,২৬	— ৯১	—৪০

পণ্যদ্রব্য, অর্থাদি, কৌন্সিল বিল, মুখাঙ্কিত টাকার কাগজ (নোট) ইত্যাদির সম্বন্ধসমেত হিসাবে দেখা যায় যে, কয়েক মাসের পর ভারতের দৃশ্যমান বাণিজ্যের পাল্লা বিরুদ্ধবাদী হইয়াছে, অর্থাৎ ১৯২৩ অক্টোবরে বিদেশে আমাদের ৬৪ লাখ টাকা দেনা দাঁড়াইয়াছে। গত সেপ্টেম্বরে ভারতের ১,৯৮ লাখ টাকা পাওনা ছিল। আর ১৯২২ অক্টোবরে ৪ ক্রোর টাকা দেনা ছিল। ১৯২৩ এপ্রিল হইতে অক্টোবরে পাওনা হয়েছে ২৬,০০ লাখ, আর গত বৎসর ঐ সাত মাসে পাওনা হয়েছিল ৮,৭৭ লাখ টাকা।

আমদানি বিভাগে পরিবর্ত্তন—

১৯২২ অক্টোবরের সহিত তুলনায়—

এ মাসে খাদ্যদ্রব্যাদি ও কাঁচা মালের দাম ক্রমিক ৪৬ লাখ ও ৪১ লাখ বাড়িয়া—২,১৭ লাখ ও ১,৭০ লাখ টাকা হয়েছিল। নির্ম্মিত দ্রব্যাদির দাম ৩,১৬ কমিয়া ১৪,৪৫ লাখ টাকা হয়েছিল। খাদ্য-দ্রব্যাদির মধ্যে বিশুদ্ধ চিনি ওজনে ১৩০০০ টন ও দামে ৫৭ লাখ বাড়িয়াছিল। কাঁচা মালের মধ্যে কেরোসিন তৈল ১৩ লাখ, তুলা ৯ লাখ, মণি-মুক্তা ৮ লাখ, আর রেশম ৭ লাখ বাড়িয়াছিল। নির্ম্মিত দ্রব্যাদির মধ্যে কোরা তুলার কাপড় পরিমাণে ১০৪ মিলিয়ন গজ থেকে ৫৪ মিলিয়ন গজে আর দামে ৩,৩৯ লাখ থেকে ১,৭২ লাখে নেবেছিল। ধোয়া কাপড় ৪২ মিলিয়ম গজ থেকে ২৬ মিলিয়ম, আর ১,৫২ লাখ টাকা থেকে ৯৬ লাখ টাকায় নেবেছিল। রঙ্গিন কাপড় ২ মিলিয়ন গজ আর ১১ লাখ টাকার বেশী আমদানি হয়েছিল। কলকব্জা (—৬৫ লাখ), তৈজসপত্র (—১০ লাখ) কাগজ (—৯ লাখ)। এইগুলি উল্লেখযোগ্য কমতি। অধিকন্তু লোহার চাদর ও পশমী কাপড়ের ১৫ লাখ ও ৮ লাখ টাকার বাড়তি আমদানি ছিল।

রপ্তানি বিভাগে পরিবর্ত্তন—

খাদ্য দ্রব্যাদির মধ্যে এক চায়েতেই ১৯২৩ অক্টোবরে ৭,০৪ লাখ অর্থাৎ গেল বছর থেকে এক ক্রোর টাকার বেশী মাল রপ্তানি হয়েছিল। কাঁচা মাল ১,৫৬ লাখ বাড়িয়া ১০,২০ লাখে পঁহুছিয়াছিল, তুলা (+১,৬৪ লাখ) এবং তৈলবীজ (+.৭২ লাখ) বাড়তি রপ্তানির কারণ। পাট ৮৭ লাখ টাকার কমতি রপ্তানি হয়েছিল। মোট তুলার রপ্তানি হচ্ছে ২৪ হাজার টন; তার মধ্যে জাপান ও ইটালী—৫,৫০০ টন অর্থাৎ প্রত্যেকে ২৩ শতাংশ নিয়েছিল। যুক্তরাজ্য ৪,৪০০ টন অথবা ১৮ শতাংশ; আর বেলজিয়াম, ৩ ৭০০ টন ও জার্ম্মানী ১,৬০০ টন নিয়েছিল। ৮৯,০০০ টন পাট রপ্তানি হয়েছিল, কিন্তু বিদেশে চাহিদা মন্দ থাকায় গেল বছরের তুলনায় ৬৭ লাখ কমিয়া ২৩৯ লাখ টাকা হইয়াছিল। নির্ম্মিত দ্রব্যাদি ১২৯ লাখ বাড়িয়া ৭,২০ লাখ হইয়াছিল; বাড়তির কারণ ৫৫ লাখ টাকার তুলার দ্রব্যাদি ও ৫০ লাখ টাকার পাটের দ্রব্যাদির অধিক রপ্তানি। সুতা (তুলা) ৪ মিলিয়ন পৌণ্ড ও ৩৪ লাখ টাকার বেশী রপ্তানি হয়েছিল, কারণ ইজিপ্ট ও চায়নায় ভারতীয় তুলার যথেষ্ট চাহিদা ছিল। চটের থলে ১৯২২ অক্টোবর থেকে এই অক্টোবরে সংখ্যায় ও দামে ৩৬ মিলিয়ন ও ১,৬৪ লাখ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। আর গুণচটও শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ বাড়িয়া ১,৫৯ মিলিয়ম গজ ও ২,৭৩ লাখ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। চট রপ্তানির বেশী ভাগ আমেরিকার যুক্ত রাজ্য, তার পর যথাক্রমে আর্জ্জেন্টিনা, ক্যানেডা, যুক্তরাজ্য ও অষ্ট্রেলিয়া লইয়াছিল।

বাণিজ্যে বিদেশের সম্বন্ধ—

১৯২২ অক্টোবরে যুক্তরাজ্য আমদানিতে সমস্ত পণ্যদ্রব্যের ৬১.৫ ও ১৯২৩ অক্টোবরে ৫৩.০, এবং রপ্তানিতে ঐ ঐ মাসে ২৮.৮ এবং ৩১.২ শতাংশ স্থান অধিকার করিয়াছিল। জার্ম্মেণী, জাপান, ও আমেরিকার যুক্তরাজ্য আমদানিতে ও রপ্তানিতে যথাক্রমে ৪.৬, ৬.০ ও ৪.০ এবং ৫.৫, ৪.৫, ১০.৪।

জাহাজের খবর—

এমাসে ২৬৬ খানি জাহাজ ৫৮১ হাজার টন মাল নিয়ে ভারতে এসেছিল, আর ২৭৯ খানি জাহাজ ৬১০ হাজার টন মাল রপ্তানি করেছিল। গত বৎসর ঐ মাসের আনুক্রমিক সংখ্যা হচ্ছে, আমদানি—জাহাজ ২৯৬, মাল ৫৪২ হাজার টন; আর রপ্তানি—জাহাজ ২৬৩, মাল ৫৮০ হাজার টন।

স্বপ্ন

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

১

আকাশের পূর্ব্বদিক মেঘে ঢাকা, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিতেছে। কালো মেঘের ফাঁক দিয়া উষার প্রথম স্বর্ণরেখা দিল্লীর জুম্মা মসজিদের স্বর্ণমণ্ডিত গম্বুজের চূড়ায় পড়িয়া একটু ঝিক্‌মিকি করিতেছে। চারিদিক এখনও অন্ধকার, মসজিদের লাল পাথরের পূর্ব্বতোরণ-দ্বার প্রভাতালোকে রক্তের মত রাঙা হইয়া ওঠে নাই। পশ্চিমদিকের তারাগুলি ধীরে ধীরে নিভিয়া আসিতেছে, শুধু একটি তারা মিনার-চূড়ার ওপর দপ্‌দপ্‌ করিতেছে।

ভোরের আলো আগুনের শিখার মত কাঁপিয়া কালো মেঘের বুক ফাটিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তাহারি দিকে একবার চাহিয়া জুম্মা মসজিদের মিনারের ওপর হইতে মুয়াজ্জিন দিবসের প্রথম নমাজের জন্য সকলকে আহ্বান করিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রির বিলাস উৎসব শেষে ভোগশ্রান্ত দিল্লী নগরী সুপ্ত, তাহার আহ্বান নিদ্রিত নগরের স্তব্ধ পথে পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল। মসজিদের বাহিরের প্রাঙ্গণে সুপ্ত এক চক্ষু মুসলমান ভিক্ষু মির্জ্জা আজানের আহ্বান ধ্বনিতে জাগিয়া মনে মনে আল্লার নাম করিয়া আবার ছেঁড়া কম্বলখানি জড়াইয়া ভাল করিয়া শুইল। লালসাতপ্ত সঙ্গীত-মুখর নূপুর-নিক্কণ ক্ষুব্ধ ভোগ-উল্লাসময় নিশীথ শেষে উৎসব-দীপমালা-নির্ব্বাপিত দিল্লীর হিমশীতল শুব্ধ উষার আকাশে মুয়াজ্জিনের আহ্বান করুণ ক্রন্দনের মত বাজিতে লাগিল।

মসজিদ হইতে কিছু দূরে এক পাথরের বাড়ীতে এক বয়স্ক বাঙ্গালী যুবক শঙ্কর জাগিয়া ছিল। বাড়ীর ছাদের কোণে একটি ঘরে সে প্রদীপ জ্বালিয়া গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে। মধ্য-রাত্রে একটি অঙ্ক কসিতে আরম্ভ করিয়াছিল; গণনায় এত নিমগ্ন ছিল যে, রাত্রি কখন শেষ হইয়া গিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করে নাই। আজানের আহ্বান-শব্দে সে একবার চমকিয়া উঠিয়া আকাশের দিকে চাহিল। যে তারা লইয়া সে গণনা করিতেছিল, সেটী কখন নিভিয়া গিয়াছে। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপটি উস্কাইয়া দিয়া সে আবার অঙ্কে মন দিল।

এই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ যুবকটি কাশীতে শাস্ত্রপাঠ শেষ করিয়া ভারতের সকল তীর্থ দর্শন করিতে করিতে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা দেখিয়া পর্য্যটন করিয়াছে। তাহার বিদ্যাবুদ্ধি, রাজনীতি-জ্ঞান দিয়া ভারতকে সেবা করিবার জন্য সে বহু হিন্দু রাজার সভায় থাকিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিছুদিন পেশোয়া বাজীরাওএর সভায়, কিছুদিন চিতোরের রাণা অমরসিংহের সঙ্গে ছিল। কিন্তু সর্ব্বত্র ঈর্ষা, হীনতা, একতার অভাব, লুণ্ঠন-প্রবৃত্তি দেখিয়া রাজনীতি ছাড়িয়া জ্যোতির্ব্বিদ্যায় মনোনিবেশ করিয়াছে। রাজার সহিত রাজার সম্বন্ধ, প্রতি রাজ্যের লোকসংখ্যা, সৈন্যসংখ্যা ছাড়িয়া, তারার সহিত তারার সম্বন্ধ, তাহাদের দূরত্ব ইত্যাদি গণনা করে। দিল্লীতে সে জয়পুররাজ জয়সিংহের নব-নির্ম্মিত যন্তর-মন্তর দেখিতে আসিয়াছে। এখানে একজন মুসলমান জ্যোতির্ব্বিদের সহিত আলাপ হওয়াতে তাহার সহিত জ্যোতিষ শাস্ত্র আলোচনা করিবার জন্য ও ভাল করিয়া আরবী ও ফার্সী ভাষা শিখিবার জন্য রহিয়া গেছে। কাশী হইতে নিজের মা ও বোনকে আনিয়া এখন দিল্লীতেই বাস করিতেছে।

দিল্লী দুর্গের নিকট যমুনাতীরে লাল পাথরের এক প্রকাণ্ড প্রাসাদের সাদা মার্ব্বেল পাথরের এক ঘরে আর একটি যুবক সারা রাত্রি জাগিয়া বই পড়িতেছিল। যুবকটি বয়সে তরুণ, মুসলমান; তাহার মুখখানি আশায় জ্বলজ্বল করিতেছে; কালো চোখ দুটি স্বপ্নে ভরা! সে জ্যোতির্ব্বিদ্যা পড়িতেছিল না, ফরাসী ভাষায় লিখিত যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে একখানি বই পড়িতেছিল। কয়েকটি প্রসিদ্ধ যুদ্ধের বর্ণনা পড়িতে পড়িতে সে রাত্রি কাটাইয়া দিয়াছে, তাহা সে লক্ষ্য করে নাই। ভোরের নমাজ পড়ার আহ্বান শুনিয়া সে ধীরে মখমলের গালিচা হইতে উঠিল, কিংখাবের

পর্দা সরাইয়া বাহিরের বারান্দায় বাহির হইল। নীচে যমুনার জল কালো চোখের মত ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে। একবার উষার আকাশের দিকে চাহিয়া সে নমাজ পড়িল; তার পর আবার ঘরে ঢুকিয়া সমর-বিদ্যা সম্বন্ধে বইখানি তুলিয়া লইল। ঘরের মধ্যে দিল্লীশ্বর আকবরের একখানি সুন্দর তস্‌বীর ঝুলিতেছে। তাহার দিকে একবার ভক্তি-বিমুগ্ধ চোখে চাহিল। সম্মুখে ভারতের একখানি মান-চিত্র পড়িয়া আছে। ভারতের ছবির দিকে বহুক্ষণ চাহিয়া রহিল। এ ত এক ভারত নয়, খণ্ড খণ্ড রাজ্যময় কত জাতি ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত, বিদ্রোহঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ যুদ্ধাগ্নি-দগ্ধ অশান্ত ভারত, কে হিন্দু মুসলমান মিলাইয়া শিখ-জাঠ-রোহিলা-রাজপুত-মারাঠা-মোগলকে এক মঙ্গল সূত্রে গাঁথিয়া এ শতছিন্ন ভারতকে এক শান্তিময় রাজ্য-পাশে বাঁধিবে? সেই অনাগত বীরের প্রতীক্ষায় দুঃখিনী ভারত জাগিয়া আছে। হয়ত সে, কে জানে, হয়ত মোগল-বংশের এই দীনতম সন্তানের কপালে আল্লা মিলন-বিজয় টীকা জ্বালাইয়া দিবেন, এ যুগান্তরের বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ ভালে প্রলয়াগ্নিতে তাহারি নাম জ্বলিয়া উঠিবে। না, নাম সে চাহে না আল্লা, সেই মিলন প্রয়াসী বীরের দীনতম সহচর হইয়া সে জীবন উৎসর্গ করিতে চায়। সে হিন্দু হোক, সে মুসলমান হোক, সে শীঘ্র আসুক, সে আজ আসিয়া মহামিলন মন্ত্র-শিখায় এ বিচ্ছিন্ন ভারতের সকল বিরোধ ভস্ম করিয়া দিক।

যুবকটি যখন যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে বইখানি শেষ করিল, তখন প্রভাতের আলোয় চারিদিক উজ্জ্বল। বইখানি শেষ করিয়া আর একবার সে ভারতের মানচিত্রের দিকে চাহিল। রাত্রির মায়ায় সে যে স্বপ্ন ভাবিয়াছে, প্রভাতের আলোয় তাহা আশ্চর্য্য হাস্যকর বলিয়া তাহার বোধ হইল। মানচিত্রখানি ধীরে মুড়িয়া সে ধীরে ডাকিল—শিরিণ।

দাদা, বলিয়া একটি তরুণী দ্বারের পর্দা সরাইয়া ঢুকিল। তরুণী দুই তিনবার পর্দা সরাইয়া ঘরে উঁকি মারিয়াছে, কিন্তু দাদাকে ডাকিতে সাহস হয় নাই।

শিরিণ, আমি চকে যাচ্ছি, তোর জন্যে কিছু আনতে হবে?

না, দাদা, কিন্তু তুমি বিশ্রাম করে কিছু খেয়ে যাও।

না, আমায় এক্ষুণি যেতে হবে, তোর কিছু কিনতে হবে?

আচ্ছা, দাদা, যদি সেই রকম সোনার সুতো কিছু নিয়ে এসো, আর কতকগুলা নীলা, তাহলে আমার আসন বোনাটা শেষ হয়।

কার জন্যে এত আসন বোনা—কোন বর এসে বসবে?

যাও, দাদা, না এবার আসনের খুব ভাল একটা নমুনা পেয়েছি, এবার ভাল একটা আসন বুনবো তোমার সিংহাসনের ওপর পাতবার জন্যে!

সিংহাসন—কথাটা শুনিয়া যুবকটির মুখ রাঙা হইয়া গেল। ধীরে বলিল,—না শিরিণ, কোন সিংহাসন আমি চাই না, আমি যা চাই তা বুঝি স্বপ্ন।

ধীরে যুবকটি ঘর হইতে বাহির হইয়া, পাঠান প্রহরীকে ঘোড়া সাজাইতে হুকুম দিয়া, বেশ বদলাইবার জন্য পাশের ঘরে গেল।

এই মুসলমান যুবকটি যখন ঘোড়ায় চড়িয়া চাঁদনীচকের দিকে বাহির হইল, জ্যোতির্বিদ যুবকটি তখনও নিবিষ্ট-মনে অঙ্ক কসিতেছে। তাহার গণনা আর শেষ হয় না দেখিয়া, একটি তরুণী দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া একটু ভ্রূকুটি করিয়া ডাকিল—দাদা! দাদাকে নিরুত্তর দেখিয়া সে যুবকটির কাছে গিয়া লম্বা কোঁকড়া চুলগুলি একটু আদর করিয়া টানিয়া কাণের কাছে মুখ লইয়া ডাকিল—দাদা!

শেষ অঙ্কগুলির ওপর চোখ রাখিয়া মাথাটা একটু নাড়িয়া বলিল—কি, কি চাই?

ওঠ না ছাই।

কেন?

ওঠ, একবার বাজার যেতে হবে।

বাজার? রোস যাচ্ছি, এ অঙ্কটা শেষ করে নি।

ও অঙ্ক শেষ করতে বসলে আজ আর আমাদের হাঁড়ি চড়বে না।

বাজার, রামলালের কি হল?

তার যে অসুখ করেছে—

ও ভুলে গেছলুম—

ওঠ, কাল মা'র একাদশী গেছে, জান ত, কিছু ফল আগে নিয়ে এস—

পাশা খেলা

শিল্পী—শ্রীমতী রমা দেবী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works
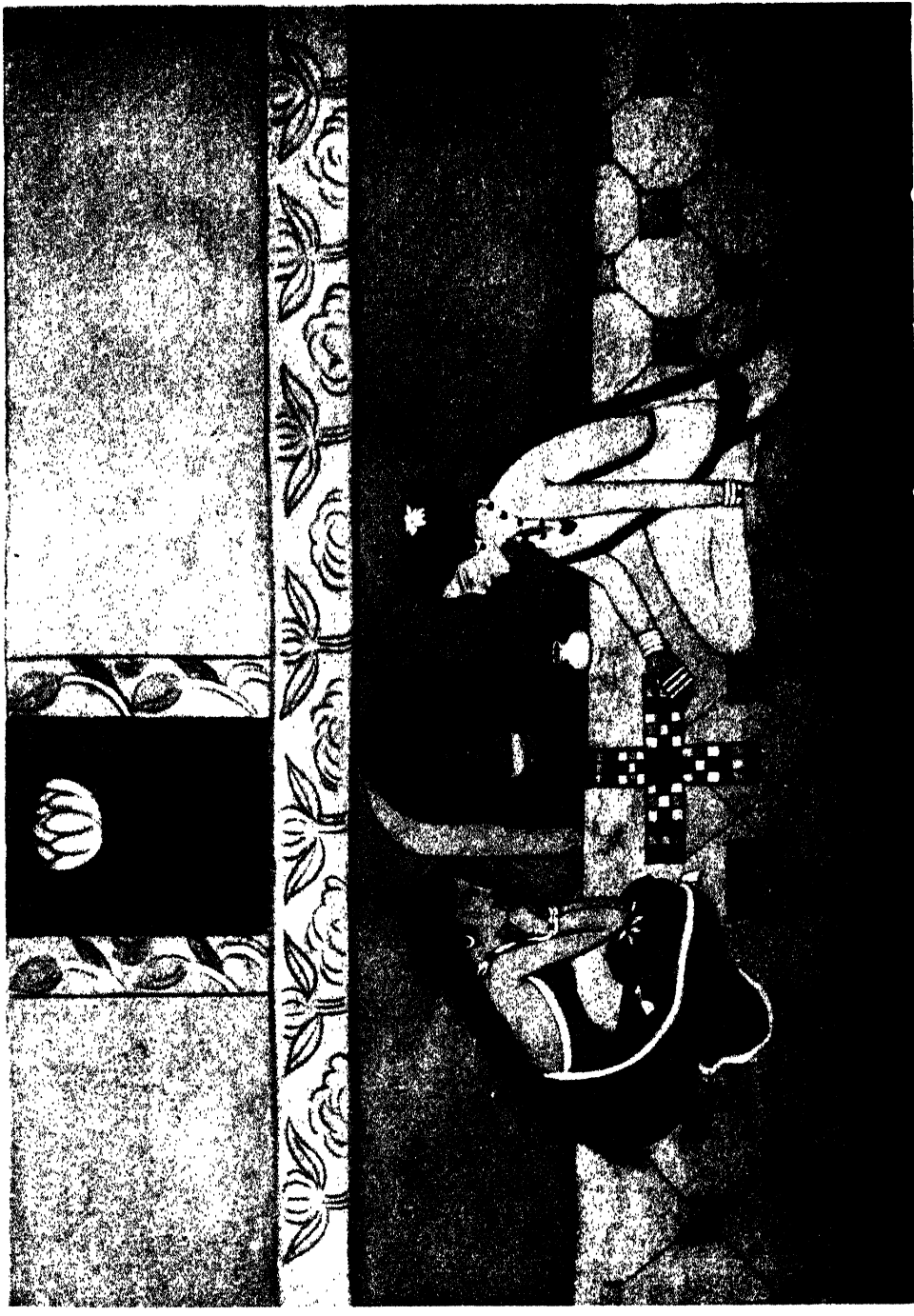
মার একাদশী—কথাগুলি কাণে যাইতেই শঙ্কর তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। ব্যস্ত হইয়া বলিল—কি কি আনতে হবে শীগ্‌গীর বল।

যাও, আগে স্নান করে কাপড়টা ছেড়ে এস, বলছি—বলিয়া দাদাকে শুদ্ধ হইতে পাঠাইয়া যমুনা দাদার পুঁথি সাজাইয়া রাখিয়া ঘরটা গোছাইতে লাগিল।

২

দিল্লীর চাঁদনী চক প্রভাতে শান্ত, জনবিরল। এ চক দিনের আলোয় জাগে না, রাতের ভোগ-উৎসবের রোসনাইতে জাগে। তখন এখানে দোকানে দোকানে লাল-নীল ঝাড়ের আলো ঝল্‌মল্ করে, সারঙ্গী বাজে, গান ওঠে, হাসি ওঠে, নর্ত্তকীরা নৃত্য করে; সুরার স্রোতে উল্লাসের স্রোত বয়, সুন্দরীদের কটাক্ষে, ফুলের মালায়, আতরের গন্ধে, নানা রংএর বেশের রংএর ঝল্‌মলানিতে মায়াপুরী হইয়া ওঠে।

আজ সকালে চকে একটু চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছে। দিল্লীর প্রসিদ্ধা বাইজী সুন্দরীশ্রেষ্ঠা জামেলা স্বর্ণমণ্ডিত শিবিকায় চক দিয়া যমুনায় স্নান করিতে যাইতেছে। পথে লোক কম বলিয়া শিবিকার সোনার ঝালরের পর্দ্দা তুলিয়া দিয়াছে। অনুপম রূপশ্রীতে পথ আলো করিয়া চলিয়াছে। শিবিকা ধীরে যাইতেছে, মাঝে মাঝে থামিতেছে; পথের ফকির ভিক্ষুকদের ভিক্ষা দিতে দিতে বাইজী চলিয়াছে।

সুনেহরি মস্‌জিদের পাশে বৃহৎ ফলের দোকান। সেই দোকানের পাশে ভিক্ষুক মির্জ্জার দৈনিক বসিবার স্থান। সেইখানে বসিয়া কোরাণ আবৃত্তি করিয়া সে দোকানের প্রতি ক্রেতার কাছ থেকে কিছু আদায় করে। সেই দোকানে শঙ্কর ফল কিনিতে আসিবামাত্র সে তাহার প্রাপ্যটা জানাইয়া একটা উর্দ্দু গান গাহিতেছিল। শঙ্কর আঙুর বেদানা কিনিয়া কিছু আঙুর মির্জ্জাকে দিতে গিয়া অবাক্ হইল। মির্জ্জা অতি অলস আধ-ঘুমন্তভাবে বসিয়া মাথা দোলাইয়া গাহিতেছিল, সহসা সে গান থামাইয়া লাঠি না ধরিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল, পথের দিকে চলিল। দোকানের সম্মুখে যে বাইজীর শিবিকা আসিয়াছে তাহা শঙ্কর লক্ষ্য করে নাই। মস্‌জিদের সম্মুখের ভিক্ষুকদলের কোলাহল শুনিয়া, সকলকে উৎসুক শশব্যস্ত দেখিয়া শঙ্কর একবার মুখ ঘুরাইয়া দেখিল, সম্মুখে এক শিবিকায় এক সুন্দরী মুসলমান নারী, তাহাকে দেখিয়া মুখের নীল ওড়না দোলাইতেছে। নিমেষের জন্য তাকাইয়া শঙ্কর মুখ ঘোরাইল। পথের সকলে অনিমেষ নয়নে যাহার দিকে তাকাইয়া আছে, তাহার দিকে একবার চাহিয়া আর সে দেখিল না। কতকগুলি আঙুর মির্জ্জার বসিবার জায়গায় ফেলিয়া দিয়া সে একটু দ্রুতবেগে চলিয়া গেল।

জামেলা চোখ ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। মুখের ওপর নীল ওড়না ঢাকা দিয়া সে মির্জ্জার হাতে একটা স্বর্ণমুদ্রা দিয়া বলিল, মির্জ্জা, ও লোকটা কে?

মির্জ্জা তাহার একচক্ষু নাচাইয়া বারবার মাথা দোলাইয়া সেলাম করিতে লাগিল; অর্থাৎ মির্জ্জা বুঝিয়াছে, ও লোকটির সব সন্ধান লইবে, আর কিছু বলিতে হইবে না।

ভিক্ষুকদের তাড়াতাড়ি বিদায় করিয়া বাইজী শিবিকাবাহকদের একটু তাড়াতাড়ি যাইতে বলিল। শিবিকা আবার প্রায় শঙ্করের পাশে আসিয়া পড়িল। শঙ্কর তাহার দিকে একবার চাহিয়াও দেখিল না। ব্যথিত ক্ষুব্ধ চোখে জামেলা শঙ্করের সুন্দর দেহের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পাৎলা ছিপছিপে চেহারা যেন আলোর ফোয়ারা, সমস্ত দেহ হইতে যেন কি জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। তাহার দেহের তপ্তকাঞ্চনের মত রং যেন আগুনের আভা। সুন্দর পুরুষ সে অনেক দেখিয়াছে; কিন্তু এমন তেজোময় দেহ সে দেখে নাই। নিমেষের জন্য সে তাহার মুখ দেখিয়াছিল, সেই এক নিমেষে যেন তাহার দেহে বিদ্যুতের স্পর্শ হইয়া গেছে। শঙ্কর পাশের এক গলি দিয়া চলিয়া গেল। বিমুগ্ধ নয়নে সে তাহার চলিয়া-যাওয়ার দিকে চাহিয়া রহিল।

পথের আর সকলে রূপসী জামেলাকে দেখিতে এত ব্যস্ত যে, শঙ্করের দিকে কেহ লক্ষ্য করে নাই। শুধু একটি মুসলমান যুবক তাহাকে লক্ষ্য করিয়াছিল; জামেলার মত তাহাকে দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছিল। শঙ্করকে দেখিয়া সে বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় আনন্দে অভিভূত হইয়াছিল। এ যেন তাহার কাছে এক নব জ্যোতিষ্কের আবিষ্কার। এত দিন যাহাকে খুঁজিতেছিল, তাহাকে সহসা এ শুভ প্রভাতে পাইয়াছে।

শরীররক্ষী সৈনিকের কাছে ঘোড়াটা রাখিয়া সে চক ছাড়িয়া শঙ্করের পেছনে পেছনে গলিতে ঢুকিল। মোহাবিষ্টের মত তাহার পিছনে চলিয়াছে। শঙ্করের তেজোজ্জ্বল প্রতিভাদীপ্ত মুখ একবার দেখিয়াই সে বুঝিয়াছে, এ বিরাট পুরুষটিকে তাহার চাই।

শঙ্কর নিজের বাড়ী আসিয়া ভিতরে ঢুকিতে, সেও তাহার পেছনে পেছনে প্রবেশ করিল। কিন্তু দরজা পার হইয়া ভেতরে ঢুকিয়া শঙ্কর কোথায় গেল খুঁজিয়া পাইল না। পাশে সিঁড়ি দেখিয়া অর্দ্ধেক উঠিয়া সে সম্মুখে এক সুন্দরী তরুণী দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। তরুণীটি দ্রুতপদে নামিয়া আসিতেছিল, হঠাৎ সম্মুখে এক তরুণ মুসলমানকে দেখিয়া একটু বিস্মিত একটু ভীত হইয়া আপনার গতিবেগ থামাইল। ভ্রূকুটি করিয়া সে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু যুবকটির অতি সুকুমার মধুর মুখ দেখিয়া তাহার মুখে কিছু ফুটিল না। কোন বাদশাহের পুত্র স্বপ্নের মত তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার মাথায় হীরা ঝকমক করিতেছে, মুখখানি জলজল করিতেছে, সাঁচ্চার কাজ-করা জামা, সোনালী রেশমের পায়জামা ঝিকমিক করিতেছে। স্বপ্নভরা কালো চোখদুটির দিকে চাহিয়া সে মুখ রাঙা করিয়া বিমুগ্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। যুবকটি তাহার চেয়েও আশ্চর্য্য হইয়া তরুণীর মুখের দিকে চাহিল, বাদশাহের রঙ্গমহলে, দিল্লীর অনেক আমীর-ওমরের উৎসব-গৃহে সে অনেক সুন্দরীকে দেখিয়াছে, কিন্তু এমন নির্ম্মলোজ্জ্বল মধুর মূর্ত্তি দেখে নাই। নীলবসনমণ্ডিতা তরুণীর তনুবল্লরীর সম্মুখে ধীরে মাথা নত করিয়া সে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া দরজা পার হইয়া পথে বাহির হইয়া গেল। কেন সে এখানে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা সে ভুলিয়া গেল, শুভ্র প্রভাতের নির্ম্মল নীল আকাশের দিকে চাহিয়া এক মধুর মুখের স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে সে আনমনে চলিয়া গেল।

৩

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় কুতবমিনারের নিকট এক ভাঙা মসজিদের ওপর বসিয়া শঙ্কর সূর্য্যাস্ত দেখিতেছিল। চারিদিকে ক্রোশের পর ক্রোশ ধ্বংসের স্তূপ—কত মর্ম্মর-প্রাসাদ, কত মসজিদ, কত দুর্গ, কত রাজার সমাধি ধূলার সহিত ধূলা হইয়া গিয়াছে। মহাকালের কলকল্লোল যেন এ ধূলায় স্তব্ধ, কত শতাব্দীর ভারত ইতিহাসের ধারা এই ভগ্নস্তূপের মরুভূমিতে লুপ্ত হইয়া স্তম্ভিত হইয়া আছে। এই চিরবিজন চির-উদাস স্থানে শঙ্কর মাঝে মাঝে একা আসিত।

আজ সে একা নহে, তাহার পাশে এক তরুণ রাজপুত বসিয়া। এ রাজপুত যুবকটি দিল্লীতে তাহার বাড়ীর নিকট হইতে তাহার সঙ্গ লইয়াছে, এবং তরুণ প্রাণের উচ্ছ্বাসে তাহার মন জয় করিয়াছে। সমস্ত পথ তাহারা নানা গল্প করিতে করিতে আসিয়াছে; কিন্তু এই ভাঙা মসজিদের ওপর সন্ধ্যার আলোয় দুইজনেই স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। উত্তর কোণে দিল্লীর ওপর মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে। অস্তগামী সূর্য্যের আলোয় সেগুলি রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। শঙ্কর সেইদিকে উদ্দীপ্ত মুখে চাহিয়া বসিয়া ছিল; তাহার চোখ-মুখও যেন জ্বলিতেছিল। রাজপুত যুবকটি তাহার মুখের দিকে একটু বিস্মিত ভাবে চাহিতে, সে বলিল—দেখতে পাচ্ছ?

কি?

চিতানলশিখা, দেখছ না; শ্মশানের ওপর চিতাগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে। ওই যে দিল্লীর ওপর ভয়ঙ্কর রাঙা মেঘে আতঙ্কিত আকাশ দেখছ, আকাশ ওর চেয়েও ভীষণ হয়ে উঠবে—দেখছ না, বিলাসিতা ভোগের আগুন, লালসা কামের আগুন জ্বলছে,—একটা রাজত্ব, একটা সভ্যতা জ্বলে ছাই হয়ে যাচ্ছে—ওই মোগলসাম্রাজ্যের শ্মশানশয্যার ওপর প্রলয়ের লক্ষ লক্ষ অগ্নিশিখা ওই রাঙা মেঘের মত আকাশে কেঁপে কেঁপে উঠবে—তারপর সব ছাই, ছাই হয়ে যাবে;—এই চারিদিকে যেমন ভগ্নস্তূপ দেখছ, ওই দিল্লীও একদিন এক সাম্রাজ্যের সমাধি-শ্মশান হয়ে থাকবে—

তার পর?

তারপর অরাজকতা, অমানিশার অন্ধকার—

আমি কিন্তু দেখছি, নব অরুণোদয় হচ্ছে—

কোথায়?

ভারতের চারিদিকে—আজ মহাশক্তির ভূমিকম্পে যদি মোগল সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে, মোগলমহিমাধ্বজা যদি ধূলায় লুটায়—কিন্তু ভারতের চারিদিকে মহান পর্ব্বত-চূড়ার মত কি নব নব শক্তি জাগছে না? নব নব জাতি ওঠেনি? রাজপুত জেগেছে,

মারাঠা জেগেছে, শিখ জেগেছে—এ দিল্লী যদি ছাই হয়ে যায়, সেই শ্মশান-ভস্মের ওপর নতুন দিল্লী উঠবে। সে দিল্লী শুধু মোগলের দিল্লী নয়, সে শিখ-জাঠ-রোহিলা-রাজপুত-মারাঠা মোগলের যুক্ত অসির ওপর গড়ে উঠবে—

তুমি স্বপ্ন দেখছ—শুনতে পাচ্ছ, এ দিল্লীর ওপর শবলুব্ধ শকুনিদলের মত কারা ছুটে আসছে! মাঝে মাঝে আমি দিল্লীর পথে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াই,—আমি শুনতে পাই, দিকে দিকে নবজাগ্রত শক্তিদের সৈনিকদলের পদভরে ভারত কেঁপে ব্যথিত হচ্ছে—দিল্লীর পথ ধরে তারা ছুটে আসছে—আমি শুনতে পাই, ঘোড়ার খুরের অবিশ্রাম শব্দ, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, রক্তের কল্লোল—মসজিদ ভেঙ্গে আগুন জ্বালিয়া রক্তের স্রোত ব'য়ে প্রতিহিংসা নিতে শিখ আসছে, 'হর হর' শব্দে ঘোড়া হাঁকিয়ে রাজ্যলাভের জন্য রাজপুত আসছে, মারাঠা ধনরত্ন লুণ্ঠন করে নবশক্তি পরীক্ষা করবার জন্য আসছে—

কিন্তু সে বীর কি আসবে না, যে সমস্ত শক্তি এক করে দিল্লীতে শান্তি আনবে—

দেখ, ওই দূরে কে যেন গেল—ওই ভাঙা সমাধিটার পাশ দিয়ে কে গেল, এক নারীর মত—

আমি মাঝে মাঝে এখানে সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখিছি, এই ভগ্নস্তূপের মধ্যে কে নারী ঘুরে বেড়াচ্ছে—নিমেষে দেখা দিয়ে মিলিয়ে যায়—মনে হয়, যেন অনাথিনী বিষাদিনী দিল্লীমাতা তাঁর কোন বীরসন্তানের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—

তরুণ যুবকের করুণ স্বপ্নময় মুখখানির দিকে চাহিয়া শঙ্কর বিস্মিত হইয়া বলিল—কে তুমি রাজপুত ?

গুরু, আমি আপনার শিষ্য, বলিয়া যুবকটি শঙ্করের পদধূলি লইয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিল।

গুরু নয়, বল বন্ধু, বলিয়া শঙ্কর তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল।

আমি স্বপ্ন দেখছি না, আসুন, আপনাকে দেখাচ্ছি, বলিয়া যুবকটি শঙ্করের হাত ধরিয়া ভগ্নস্তূপের মধ্যে কোথায় লইয়া চলিল। (ক্রমশঃ)

ইঙ্গিত

শ্রীবিশ্বকর্ম্মা

নূতন শিল্প সৃষ্টি

আজকাল বাজারে (মনোহারীর দোকানে, পানের দোকানে, বিড়ির দোকানে, বেণেতি মশলার দোকানে এবং আরও নানা স্থানে) একটী নূতন জিনিস সকলেরই বোধ হয় নজরে পড়িয়াছে। জিনিসটি বিশেষ কিছুই নয়—দেওয়ালে টাঙানো এ্যালম্যানাকের মত পুরু কার্ড-বোর্ডে একখানি সুরঞ্জিত সুন্দর ছবি, এবং সেই কার্ড বোর্ডের গায়ে সেলাই করা হোমিওপ্যাথিক ঔষধের শিশির মত বারোটি টিউব শিশি। শিশিগুলির গায়ে রংচঙে লেবেল, এবং ভিতরে একটু একটু আতর বা এসেন্স। শিশির মাথায় একটী পিতলের কিম্বা পিতলের ন্যায় ব্রোঞ্জ রং করা টিনের টুপি। গন্ধ দ্রব্যটির তীব্রতা বা মৃদুগ্রতার হিসাবে এই জিনিসটির দামের ইতর-বিশেষ হয়।

নানা রকম আতর আপনারা নিশ্চয়ই ব্যবহার করিয়া থাকেন। আতর রাখিবার নানা প্রকার শিশিও নিশ্চয়ই আপনাদের ঘরে আছে। হোমিওপ্যাথিক টিউব শিশি বা ঐ ধরণের অন্য রকম শিশিও আপনাদের মধ্যে অনেকেই নানা সূত্রে ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। কার্ড-বোর্ডের সচিত্র এ্যালম্যানাকও ইংরেজী বৎসরের শেষ ভাগে ও নববর্ষের প্রারম্ভে কিছুদিন পর্য্যন্ত অনেকেই উপহার পাইয়া ও দিয়া থাকেন। এখন, এই কয়েকটি শ্রেণীর জিনিস লইয়া একত্র করিয়া একটী নূতন শিল্প বিরচিত হইল। প্রথমে একজন বুদ্ধি খাটাইয়া এই শিল্পটির প্রবর্ত্তন করিলেন। কিছু দিনের মধ্যে অপরে তাঁহার অনুকরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই জিনিসটি বাজারে চলিয়া

গেল, এবং ক্রমে একটী স্বতন্ত্র নূতন শিল্পে পরিণত হইল। এইরূপে প্রতিনিয়ত নূতন নূতন শিল্প-দ্রব্যের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। এই ধরণের নূতন নূতন শিল্প লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারিলেই টিঁকিয়া যাইতেছে। নচেৎ দুই চারি দিন পরে তাহা বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

নিজের মন দিয়া অনেক স্থলেই অপরেরও মনের ভাব কতকটা বুঝা যায়। কারণ, মানুষের চিন্তা-প্রণালী সৌন্দর্য্যানুভূতি, প্রভৃতি মনোবৃত্তিগুলি অধিকাংশ স্থলেই প্রায় এক রকম,—ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় ও ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোক হইলেও মানুষের মনের ভাবের অনেক সময়ে ও অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে অনেকটা মিল দেখিতে পাওয়া যায়।

আমি অনেকবার বলিয়াছি, আবার বলিতেছি, সৌন্দর্য্য শিল্পের প্রাণ। লোকে প্রথমে চোখ দিয়া শিল্পের সৌন্দর্য্য বিচার করে, তার পর তাহার গুণের পরিচয় লয় ও মূল্য নির্দ্ধারণ করে। "আগেতে দর্শনধারী পিছেতে গুণ বিচারি।" শিল্পের সৌন্দর্য্য মানুষের চোখে লাগিলেই তাহা জনপ্রিয় হইয়া উঠে।

একটী সুন্দর গোলাপ ফুল ফুটিয়া থাকিলে অধিকাংশ লোকই তাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইবে। এস্থলে জাতি, বর্ণ ভেদ নাই, দেশ-ভেদও নাই। সকল জাতীয় সকল বর্ণের এবং সকল দেশের লোকই সুন্দর গোলাপ ফুলটিকে সুন্দর দেখিয়াই মুগ্ধ হইবে। তেমনি একটী সুন্দর শিল্পদ্রব্য দেখিয়া লোক মাত্রেই মুগ্ধ হয়। মানুষের প্রকৃতিই এই রকম।

এখন, মানব-মনের এই সাধারণ ধর্ম্মের সুযোগ লইয়া বুদ্ধিমান, উদ্ভাবনী-শক্তিশালী শিল্পীরা নূতন নূতন শিল্পের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। অবশ্য সকল স্থলেই যে কেবলমাত্র সৌন্দর্য্যই শিল্পের প্রধান অবলম্বন, তাহা নহে। জিনিসটির ব্যবহার্য্যতাই তাহার প্রধান গুণ। কিন্তু, তাহা সত্ত্বেও তাহাকে সৌন্দর্য্য দান না করিলে তাহা রীতিমত শিল্প-দ্রব্যে পরিণত হইবে না।

আপনাদের মধ্যে যাঁহাদের কল্পনা-শক্তি আছে, উদ্ভাবনী-শক্তি আছে, কাজ আটকাইলেই যাঁহারা হাল ছাড়িয়া দিয়া বসেন না, কার্য্যোদ্ধারের জন্য যাঁহারা চিন্তা করিতে পারেন, এবং ভাবিয়া ভাবিয়া বুদ্ধি খাটাইয়া একটা না একটা সদুপায় স্থির করিতে পারেন, আমি তাঁহাদের উদ্দেশে বিশেষ ভাবে বলিতেছি, তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন দেখি, নূতন কোন্ জিনিস তৈয়ার করিলে আমাদের দেশের লোকের খুব কাজে লাগিবে, এবং তাহাকে কি ভাবে লোকের সামনে ধরিলে তাহারা না কিনিয়া থাকিতে পারিবে না? কিম্বা কোন্ পুরাতন শিল্প-দ্রব্যকে কিরূপ নূতন আকার দিলে লোকের বেশী পছন্দ হইবে, তাহারা পুরাতন ছাড়িয়া নূতন আকারেই তাহার বেশী আদর করিবে? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতেই মাথায় নূতন নূতন ফন্দী গজাইবে, আপনারা নূতন নূতন শিল্পের উদ্ভাবন ও প্রচলন করিতে পারিবেন।

কথাটা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য আর দুই একটা দৃষ্টান্ত বিচার করিয়া দেখা যাক। পূর্ব্বেকার কাপড়-কাচা ডালা সাবানের বদলে আজকালকার চৌকা, মার্কামারা রঙ বেরঙের সাবান কিরূপে প্রচলিত হইল, তাহা বোধ হয় আমি একবার আপনাদের বলিয়াছি। আল্তা মান্ধাতার আমল হইতে আমাদের দেশের মা লক্ষ্মীরা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। পূর্ব্বে তুলার চাক্তী লাক্ষারসে ছোবাইয়া শুকাইয়া লইয়া আল্তা প্রস্তুত করা হইত; আজকাল তরল আল্তার বহুল প্রচলনের ফলে তুলার নুটির আল্তার ব্যবহার ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে, তাহাও বোধ হয় আজকাল সকলেই লক্ষ্য করিতে পারিতেছেন। এমন কি, নাপিতানীরাও আজকাল তুলার চাক্তির পরিবর্ত্তে তরল আল্তা ব্যবহার করা বেশী সুবিধাজনক বলিয়া মনে করিতেছে; এবং তাহাদের চুবড়ীর ভিতর তরল আল্তার শিশি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

আমাদের দেশে যাঁহারা একটু বেশী রকম সাহেব-ঘেঁষা, সাহেবী চালচলনে অভ্যস্ত, এবং সাহেবদের দোকানে জিনিসপত্র কিনিয়া থাকেন, তাঁহারা জানেন, সাহেব-মেমদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য এক একটা কাজের উপযোগী প্রায় সব জিনিস একসঙ্গে একটী বাক্সের মধ্যে পাওয়া যায়। ধরুন, ক্ষৌর কার্য্যের জন্য ক্ষুর চাই, শেভিং সোপ চাই, শেভিং ব্রাস চাই, নখ ঘষিয়া ক্ষয় করিবার জন্য একটী উকার মত জিনিস দরকার। এ সব জিনিসই ভিন্ন ভিন্ন কারখানায় ভিন্ন ভিন্ন লোকের দ্বারা

প্রস্তুত হইয়া বাজারে আমদানী হয়, এবং প্রত্যেকটি জিনিস স্বতন্ত্র ভাবে কিনিতে পাওয়া যায়। একজন লোক বুদ্ধি খাটাইয়া এই সব জিনিস একত্র করিয়া একটা বাক্সের মধ্যে ভর্ত্তি করিলেন। বাক্সটি এমন ভাবে তৈয়ার করিলেন, যাহাতে ক্রেতায় ব্যবহারের সুবিধা হয়; এমন কি, দেশ ভ্রমণকালে তাহা সহজে সঙ্গে লওয়া চলে। বাক্সের ভিতর প্রত্যেক জিনিসটি রাখিবার জন্য তাহার আকার অনুযায়ী খাঁজ কাটা হইল বা খোপ তৈয়ার হইল। বাক্সটি দেখিতেও সুন্দর হইল। তাহা বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য হাতল প্রভৃতিরও সুব্যবস্থা করা হইল। এমন কি একটা কল বসাইয়া চাবি দিবার বন্দোবস্তও বাকী থাকিল না। ক্রেতা সব জিনিসগুলি এক যায়গায় সুসজ্জিত অবস্থায় পাইয়া খুসী হইলেন। সুন্দর ও ব্যবহারোপযোগী বাক্সটি পাইয়া তিনি কিছু অতিরিক্ত মূল্য দিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না।

আবার দেখুন, মেম সাহেবরা সেলাইয়ের কাজে, বোনার কাজে অতি সুনিপুণা। সেলাইয়ের জন্য সূচ, সূতা, কাঁচি, সেলাইয়ের সময় আঙুলে পরাইবার পিতলের বা এ্যালুমিনিয়ামের টুপি, ক্রুসের কাঁটা প্রভৃতি অনেক জিনিস দরকার হয় এই সমস্ত জিনিসই ভিন্ন ভিন্ন কারখানায় প্রস্তুত হয়। কিন্তু সাহেবদের দোকানে এই সব জিনিস (স্বতন্ত্র ভাবে একেবারেই যে পাওয়া যায় না, তাহা নহে, কিন্তু) প্রায়ই একসঙ্গে একটা বাক্সের মধ্যে পাওয়া যায়। তাহার সাধারণ নাম work box। Work box বলিলেই তাহারা প্রায় সব সরঞ্জামে সজ্জিত একটা সুন্দর বাক্স আপনাকে দিবে। বাক্সটি এমন ভাবে তৈয়ারী যে, সব জিনিস রাখিবার উপযুক্ত খাঁজ কাটা স্থান তাহাতে থাকে। কোন জিনিস হারাইবার বা নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না গুছাইয়া রাখিলে যখনই যে জিনিসটার দরকার, তখনই সেই জিনিসটি পাওয়া যায়।

আরও দেখুন, দাঁত মাজিবার সরঞ্জাম। টুথ ব্রাস, টুথ পিক, টুথ পাউডার, টুথ পেষ্ট প্রভৃতি সমস্ত দাঁত মাজিবার ও মুখ ধুইবার সরঞ্জাম একত্র করুন। সেগুলিকে একটা সুদৃশ্য বাক্সের মধ্যে সুন্দর ও ব্যবহারের সুবিধাজনক ভাবে সাজাইয়া বিক্রয়ার্থ ক্রেতার চোখের সামনে ধরুন। আপনি যদি বাক্সটির ডিজাইন ভাল রকম করিতে পারেন, বাক্সটি যদি সুদৃশ্য ও লোভনীয় হয়, তাহার ভিতরকার জিনিসগুলি যদি সুন্দর ভাবে ও সহজে ব্যবহারোপযোগী করিয়া সাজাইয়া রাখা হয়, তাহা হইলে ক্রেতা তাহা কিনিবেই।

এইরূপ বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর জিনিস ছাড়াও আরও অন্য অনেক জিনিস বাক্সের মধ্যে রাখিয়া বিক্রয় করা যায়। সে ক্ষেত্রে বাক্সটি কেবল দেখিতে সুন্দর হইলে চলিবে না, তাহার ভিতরকার জিনিস ব্যবহার করিতে করিতে ফুরাইয়া গেলেও যাহাতে বাক্সটিকে অন্য রকমে ব্যবহার করা যায়, এমন ভাবে সেটী তৈয়ার করা আবশ্যক। এ রকম জিনিসও বিলাতী অনেক পাওয়া যায়। সাবানের কাগজের বাক্স তেমন টেঁকসই নয়। তবু সাবান ফুরাইয়া যাইবার পর খালি বাক্সেও অনেকে অনেক জিনিস রাখিয়া থাকেন, এবং যত দিন তাহার পরমায়ু থাকে, তত দিন তাহা এই ভাবে ব্যবহৃত হয়। এখন, সাবানের কাগজের বাক্সের পরিবর্ত্তে যদি সুরঞ্জিত কাঠের বাক্স ব্যবহার করা যায় (যেমন বাক্স এক সময়ে জাপানী দামী সাবান রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হইতে দেখিতাম), তাহা হইলে সাবানের উপর বাক্সটিও ক্রেতার পক্ষে স্বতন্ত্র একটা প্রলোভনের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়, এবং তিনি সে জন্য কিছু অতিরিক্ত মূল্য দিতেও কাতর হন না। কারণ, সাবান ফুরাইয়া যাইবার পর তিনি নিজে উহা অন্য কাজে ব্যবহার করিতেও পারেন, অন্ততঃ ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সুন্দর বাক্সটিতে তাহাদের পুতুল, খেলনা, অথবা নানাবিধ শিশু-সুলভ গোপনীয় জিনিস রাখিতে পারে। এরূপ বাক্স পাইলে শিশু-চিত্ত যে খুব খুসী হয়, তাহা বোধ করি না বলিলেও চলে।

এবার কালীপূজার সময় এই বুড়া বয়সে আমি নিজেও একটুখানি এইরূপ প্রলোভনে পড়িয়াছিলাম, এবং আমার মত আরও অনেকে যে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন; তাহারও প্রমাণ পাইয়াছিলাম। চরকাবাজী হাতে করিয়া ঘুরাইবার জন্য সাধারণতঃ বাঁশের চেয়াড়ীর কাটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এবার একজন বাজীওয়ালা বুদ্ধি করিয়া মেম সাহেবদের হ্যাট-পিনের মত ছোট ছোট পিন ব্যবহার

করিয়াছিলেন। সে পিন অনেকেই বোধ হয় দেখিয়াছেন, এবং হয় ত ব্যবহারও করিয়াছেন। একটী চারি-পাঁচ অঙ্গুলী পরিমাণ বড় ছুঁচের মাথায় ছিদ্রের পরিবর্ত্তে কাচ বা চীনা মাটার মাঝারি আকারের একটী গুঁতি পরাইয়া দিলে যাহা হয়, এ পিনও তাহাই। শুধু ঐ পিনটির লোভেই আমি চরকাবাজী অনেকগুলি কিনিয়াছিলাম, এবং বাজী পোড়ানো হইয়া যাইবার পর পিনগুলির জন্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে খুব কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম; এবং দেখিয়া খুব আমোদও পাইয়াছিলাম। বোধ হয় আরও অনেকের আমার মত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল।

বিবাহের সময় কনে বধূকে উপহার দেওয়া আজকাল একটা প্রথা দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বিবাহের পর পাকস্পর্শ বা বৌভাতের দিন বরের বন্ধুরা বৌয়ের মুখ দেখিবার সময় নগদ টাকা না দিয়া প্রায় কিছু উপহার দেন। বেশীর ভাগ লোকে স্ত্রীপাঠ্য উপন্যাসাদি দিয়া থাকেন, কেহ কেহ অন্য শ্রেণীর উপহারও দেন। আমি বলি, ঐ রকম একটী বাক্সের মধ্যে নব-বধূর ব্যবহারোপযোগী এসেন্স, আতর, সাবান, পাউডার, রুজ, তরল আলতা, পমেটম, মাথার কাঁটা, স্নো, প্রভৃতি জিনিস দিয়া এক একটা উপহার বাক্স সাজাইলে, কিম্বা বধূর যদি সূচি-শিল্প জানা থাকে, তবে work boxএর মত কোন বাক্স সাজাইয়া দিলে, অন্ততঃ বিবাহের মরসুমে তাহা বেশ বিক্রয় হইতে পারে। ভিতরকার জিনিসগুলি অবশ্য বাজার হইতেই সংগ্রহ করিতে হইবে। কেবল বাক্সটি তৈয়ার করাইতে হইবে, এবং সাজাইবার কৌশল চাই। বাক্সটি দেখিতে সুদৃশ্য হইলে, ব্যবহারোপযোগী ও মজবুত হইলে, এবং মনের মত করিয়া জিনিসগুলি সাজাইতে পারিলে, বিক্রয়ের জন্য ভাবিতে হইবে না—এরূপ জিনিসের ক্রেতা অনেক মিলিবে।

বিলাতী ব্যবসায়ীরা কেবল পূর্ব্বোল্লিখিত ঐ কয় প্রকার জিনিস বাক্সবন্দী করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। ছেলেমেয়েদের স্কুলের সরঞ্জাম, যথা শ্লেট পেনশিল, লেড পেনশিল, কলম, কালীপূর্ণ দোয়াত বা খালি দোয়াত ও কালীর ট্যাবলেট, ইরেজার, ব্লটিং ও রাইটিং প্যাড, এক্সারসাইজ বুক প্রভৃতি স্কুলে ব্যবহার্য্য অনেক জিনিস একসঙ্গে একটী বাক্সের মধ্যে পাওয়া যায়। আর্টিষ্টদের রং, তুলি, drawing pencil, crayon pencil ও অন্যান্য সরঞ্জাম একত্র বাক্সের মধ্যে পাইবেন। Surveyor বা আমীনদিগের সরঞ্জাম, যথা, compass, কাঁটা, tape, level প্রভৃতি বাক্সবন্দী হইয়া বিক্রয় হয়। এমনি খুঁজিলে হাজার হাজার দৃষ্টান্ত মিলিতে পারে। বুদ্ধিতে আপনারা কোন জাতির অপেক্ষা খাটো নন। এখন ভাবিতে শিখুন। ভাবিতে শিখিলে অনেক নূতন ব্যবসায়ের ফন্দী আপনাদের মাথায় গজাইতে পারে।

শিল্পে ভারতের বৈশিষ্ট্য

কলকারখানার কথা উঠিলেই আমরা ইয়োরোপীয় সমাজের মুখপত্র এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলির মুখে, এবং দেশীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা কেবল ইয়োরোপীয়গণের কথার প্রতিধ্বনি মাত্র করিতে জানেন, আর কিছুই জানেন না, তাঁহাদের মুখে, শুনিতে পাই যে, ভারতবাসী আমরা কৃষি-প্রধান জাতি। আমরা শিল্পী নই, কলকারখানা স্থাপন করা আমাদের ধাতে সহে না। এদেশে কলকারখানা স্থাপনের চেষ্টা করা বৃথা শক্তিক্ষয় মাত্র। আমরা কেবল ধানের চাষ করিয়া বিদেশীদের মুখে অন্ন যোগাইয়া দিব; আমরা পাটের চাষ করিব, সেই পাট সস্তায় কিনিয়া ইয়োরোপীয়রা বড় বড় পাটের কল বসাইয়া সূতা ও গুণচট, থলে প্রস্তুত করিয়া তাহাদের স্বদেশে বিদেশে চালান দিবে; আমরা তুলা উৎপাদন করিয়া দিব, সেই তুলা বিদেশে গিয়া সূতা ও বস্ত্রে রূপান্তরিত হইয়া এদেশে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের লজ্জা নিবারণ করিবে। আমার মনে হয়, এই ধরণের কথা বলিয়া আমাদিগকে দমাইয়া দিবার চেষ্টা করা হয় মাত্র। এদেশে কলকারখানা বসিলে যাঁহাদের স্বার্থহানি হইবে, তাঁহারা স্বার্থহানির আশঙ্কায় এইরূপ মিছামিছি আমাদিগকে ভয় দেখান মাত্র। এত বড় দেশ ভারতবর্ষ,—যাহাকে মহাদেশ বলিলেই হয়, এবং বলাও হইয়া থাকে, যেখানে মহাদেশের সকল লক্ষণ বিদ্যমান, পৃথিবীর সকল দেশের ঋতু, আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক সংস্থান যে দেশে বিদ্যমান, সে দেশে কলকারখানা স্থাপনের চেষ্টা বৃথা শক্তিক্ষয়—এ কথা আমি বিশ্বাসও করি না, স্বীকারও করি না। ভারতে কলকারখানা স্থাপন করা যদি পণ্ডশ্রমই হইত, তাহা হইলে ইয়োরোপীয়েরা এদেশে

আসিয়া বড় বড় পাটের কল, কাপড়ের কল, তেলের কল, ময়দার কল, কাগজের কল, লোহার কারখানা স্থাপন করেন কোন্ সাহসে ?

ভারতের প্রধান অধিবাসী হিন্দু ও মুসলমান। এই দুই জাতি শিল্পী নহেন, এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য ? হিন্দুদিগের কথাই বলি। হিন্দুরা ছত্রিশ জাতি, এবং বোধ হয় আরও অনেক উপজাতিতে বিভক্ত। হিন্দুদের চারিটী বর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—মানব-জীবনের চারিটী প্রধান কার্য্যের ভার লইয়াছিলেন। তার পর, তাঁতি, কামার, কুমার, ছুতার, সোণার প্রভৃতি এক এক জাতি এক একটী বিশেষ শিল্প লইয়া পুরুষানুক্রমে চর্চ্চা করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু ইয়োরোপীয়দের মতে যে দেশ কৃষি-প্রধান, সেই দেশের অন্যতম প্রধান অধিবাসী হিন্দুদের মধ্যে চাষা বলিয়া স্বতন্ত্র কোন জাতি নাই। আমার মনে হয়, আমরা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীজাতি; শিল্পমূলক জাতিভেদ প্রথা প্রধানতঃ তাহারই পরিচায়ক। আমার আরও মনে হয়, হিন্দুদের প্রত্যেক জাতিই এক একটী শিল্প পেশা স্বরূপ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এবং সকলেরই প্রায় দুই দশ বিঘা করিয়া জমি থাকিত; তাহাতে তাঁহারা চাষ বাস করিতেন। শিল্পই তাঁহাদের মুখ্য অবলম্বন, এবং কৃষিকার্য্য গৌণ ব্যাপার ছিল। তাই অন্য সকল শিল্পের উপলক্ষে এক একটী জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু চাষা বলিয়া স্বতন্ত্র কোন জাতির সৃষ্টি হয় নাই।

আর এক দিক দিয়া দেখিলেও কথাটা বেশ পরিষ্কার হয়। প্রকৃতি দেবী ভারতবর্ষকে মানবের প্রয়োজনীয় কোন পদার্থেই বঞ্চিত করেন নাই। ভারতের ক্ষেত্রে, ভারতের অরণ্যে, ভারতের ভূগর্ভস্থ খনিতে প্রায় সকল জিনিসই পাওয়া যায়। যে দেশে যে ভূমি মাল (raw material) উৎপন্ন হয়, সেই দেশের লোকেরা তাহার ব্যবহার জানিবে, এবং সেই দেশেই সেই সকল পদার্থ শিল্পদ্রব্যে রূপান্তরিত হইয়া তদ্দেশবাসীর ব্যবহারে আসিবে, ইহাই স্বাভাবিক। তবে ভারতবর্ষের বেলাই বা এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিবে কেন, তাহা কেহ আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারেন কি ? ভারতবাসীরা যে খনি-বিদ্যায় ওস্তাদ ছিলেন, এ তত্ত্ব আজকাল ভারতীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতরা আমাদের প্রাচীন পুঁথি ঘাঁটিয়া বাহির করিতেছেন। সুতরাং ধাতু-শিল্পে ভারতবাসী আনাড়ী নহেন, হইতে পারেন না। ভারতের ইস্পাত-শিল্প যে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল, ইহাই এখনও আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তার পর বস্ত্রশিল্প। কলে সস্তায় চলনসই গোছের সুদৃশ্য বস্ত্র প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু তাহাতে শিল্পীর হাতের গুণের পরিচয় বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, তাহা প্রাণহীন শিল্প। কিন্তু ভারতের তাঁতীর হাতে তাঁতে বোনা কাপড় জীবন্ত, প্রাণময় শিল্প। তাহার অনুকরণ এ পর্য্যন্ত হয় নাই, হইতে পারে না। ভারতের অন্যান্য শিল্পের সম্বন্ধেও এই কথা। সুতরং ভারতে শিল্প-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্তরূপ মন্তব্য কতদূর সমীচীন, তাহা বুঝা কিছুমাত্র কঠিন নহে।

এ ত গেল হিন্দুদের কথা। তার পর ভারতের অন্যতম প্রধান অধিবাসী মুসলমানদিগের কথা। মুসলমান সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা আমি বিশেষ কিছু জানি না; মুসলমান সমাজে শিল্পের প্রভাব কতখানি, তাহার ঠিক ধারণা আমি করিয়া উঠিতে পারিব না। তবে মুসলমান সমাজের বাহিরে থাকিয়া কেবল প্রতিবেশী হিসাবে যতটুকু ধারণা করা যায়, আমি কেবল সেইটুকুই বলিতে পারি। এবং আমার মনে হয়, হিন্দুদের অপেক্ষা তাঁহারা শিল্পে কোন অংশেই কম নহেন। তাজমহলের কল্পনা যাঁহারা করিতে পারেন, দিল্লি আগ্রার ন্যায় সহর যাঁহারা গড়িতে পারেন, সৃষ্টির সুন্দর শ্রেষ্ঠ মনোহর সুকোমল পুষ্প হইতে ততোধিক সুকোমল আতর যাঁহারা আহরণ করিতে পারেন, যে সমাজের মহিলারা চারুচিকণ শিল্পে অদ্বিতীয়া, গজদন্ত শিল্পে যাঁহাদের তুলনা মিলে না, তাঁহারা শিল্প-প্রচেষ্টায় পৃথিবীর কোন দেশের কোন জাতির অপেক্ষা কম কিছুতেই হইতে পারেন না। সেই হিন্দু-মুসলমান অধ্যুষিত ভারতে কলকারখানার প্রতিষ্ঠায় যাঁহারা বাধা দিতে চাহেন, স্তোক বাক্যে যাঁহারা আমাদিগকে ভুলাইতে চাহেন, তাঁহারা যে আমাদের কতবড় হিতৈষী, সে কথা আমরা না বুঝিলে, সে কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া শিল্প-প্রতিষ্ঠায় নিশ্চেষ্ট থাকিলে, সর্ব্বনাশ আমাদেরই। আমরা প্রধানতঃ কৃষিজীবী জাতি, ভারতের অধিবাসীদের শতকরা ৯৫ জন কৃষক, ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, এখানে শিল্প-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা নিষ্ফল,—এ

সকল কথা অর্থহীন, স্বার্থ-প্রণোদিত বাজে কথা মাত্র। এ সব কথা ভুলিয়া যাইতে হইবে।

বস্তুতঃ, শিল্প-প্রতিষ্ঠায় ভারতবাসী যে আর উদাসীন নহে, ভারতীয় শিল্পীর কুম্ভকর্ণের নিদ্রা যে ভাঙিয়াছে, তাহার লক্ষণও বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি, এই যে সে দিন বিলাতে ইম্পীরিয়াল কনফারেন্স ও ইম্পীরিয়াল ইকনমিক কনফারেন্স হইয়া গেল, সেখানেও শিল্পীভারতের জাগরণের লক্ষণ বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিগণের মুখে মহাতঙ্কের আকারে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। বস্তুতঃ ভারতের নষ্ট শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে শিল্পে ভারতের বৈশিষ্ট্যও বজায় রাখিতে হইবে। তবে, আমরা আগেকার মত গৃহশিল্পের পুনঃপ্রবর্ত্তন করিব, কিম্বা আধুনিক কালের উপযোগী কলকারখানার প্রতিষ্ঠা করিব, সে স্বতন্ত্র কথা। যদি শ্রীভগবান দিন দেন, তবে আর এক দিন সে কথার আলোচনা করা যাইতে পারিবে।

কলিকাতা ইউনিভারসিটি ট্রেনিং কোর—বাৎসরিক ক্যাম্পিং

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র মজুমদার

এই বৎসর উক্ত Corpsএর Annual camp training কাঁচড়াপাড়ায় হইয়াছিল এইরূপ Camp-training প্রত্যেক বৎসরেই একবার করিয়া, ১৫ দিনের জন্য হয়।

দূর হইতে ক্যাম্পের দৃশ্য

এই বৎসর training 3rd Nov হইতে 17th Nov পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

আমাদের কয়েকজন বন্ধু, যাঁহারা trainingএ ছিলেন, আমরা জন চারেক তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম।

ওখানে বেলা দুইটার সময় পৌছান গেল, এবং গিয়ে দেখি যে, তখন সব সেদিনের মত ছুটি পেয়েছে।

তার পর সব বেড়িয়ে দেখা গেল, কি রকম ব্যাপার Camp-training জিনিষটা। তাঁদের কাছ থেকে সমস্ত দিনের কাজের routine একটা লিখে নেওয়া গেল।

ভোর ৫॥০ টার সময় Quarter guard Commander সকলকে উঠিয়ে দেবার জন্যে চেঁচিয়ে সকলকে জাগিয়ে দেন। উঠে সব Physical drillএর জন্যে Civil-dress কর্ত্তে হয়। তার পর ৬॥০টা হইতে ৭॥০টা পর্য্যন্ত Physical drill এবং bayonet fighting শেখান হয়। ৭॥০টা হইতে ৮॥০ পর্য্যন্ত morning tea। ৮॥০টা থেকে ৯টার ভিতরে full uniform পরে নিতে হয় এবং ৯টা থেকে ১২টা পর্য্যন্ত Parade কর্ত্তে হয়।

১২টার পর থেকে ২টার মধ্যে স্নানাহার ইত্যাদি এবং দুইটার পর থেকে সকলের ছুটি ৪টা পর্য্যন্ত এবং কোন কোন datoonএর long range firing হয়।

তার পর ৪টে থেকে ৭॥০টা পর্য্যন্ত খেলাধূলা এবং আমোদ আহ্লাদ ইত্যাদি।

এটা কেবল যাদের Night guard duty আছে তারা ছাড়া আর সকলের পক্ষে Compulsory.

তার পর ৮টার সময় রাত্রির ভোজন এবং ৯॥০ টার সময় শুয়ে পড়া।

আর ১০টার সময় আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়া।

দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম

এই ১৫ দিনের মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। প্রথমটি হচ্ছে —কৃত্রিম যুদ্ধ। নিকটের একটা গ্রাম একদল আক্রমণ করতে গিয়েছে, আর এক দল গ্রাম রক্ষা করছে। আর একটা হচ্ছে G. O C. General Wilsonএর visit এবং সমস্ত পরিদর্শন।

ক্যাম্পের দৃশ্য

চয়ন

বারোয়ারী

বক্তৃতা, Propaganda আর সভ্য-গড়া ছেড়ে দিয়ে, নিরুপদ্রব অসহযোগ নিয়েছিলুম; অর্থাৎ হতাশ-প্রেমের কবিতা লেখা সুরু করেছি। কেন না, দেখলুম, কবিতা লেখাটা মন্দ নয়; যদিও তার দাম নেই, তবু নাম আছে—আর অনেকটা বাঁচোয়া। যা কিছু লেঠা তা ঐ ছন্দের বেলায়। তাই অগত্যা বাধ্য হয়ে যে অভিনব ছন্দ আবিষ্কার করেছি, তা এই পোড়া দেশের সমালোচকরা সমঝাতেই পারলে না। তা হচ্ছে ছন্দ-পতন-ছন্দ!

সেদিন তখন কবিতা লিখচি—চার লাইন লিখেচি—

পুরাতন গীতি গেয়ো না
পুরাতন প্রীতি চেয়ো না
পুরাতন স্মৃতি ছেয়ো না
তোমারি মনো-মন্দিরে!

লেখা বড় বেশী দূর এগোচ্ছিল না, কেন না, মন্দিরের সঙ্গে কি মেলাই তারই ফন্দী আঁটছিলাম। এমন সময় পণ্ডিতজী তাঁর বিপুল ভুঁড়ির সহায়তায় দরোজা ঠেলে ঘরের মধ্যে দেখা দিলেন।

ডবোল-চেয়ার একত্র করে পণ্ডিতজীর উপবেশন-দুষ্কার্য্যটী সমাধা হলে পর, কুশল প্রশ্ন করে জিজ্ঞাসা করলুম, পণ্ডিতজী, একটা কবিতা লিখচি, কিন্তু মিলচে না।

পণ্ডিতজী দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বল্লেন—তবে ত ভাবনার কথা বাপ্। যাদের কবিতায় মিল আছে, তাদের জীবনে তা নেই; আর যাদের জীবনে মিল আছে, তারা কবিতায় তার কসরৎ করতে যায় না!

আমি বল্লুম—আমার মত অভাজনের পক্ষে তাহলে ত ডবোল সমস্যা হল!

পণ্ডিতজী শুধু ঈষৎ হাস্যের দ্বারা যেন সমস্ত মুস্কিল আসান করে, আমার মনটা লঘু করে দিলেন। বল্লেন—পড় ত বাপু তোমার কবিতেটা—

পড়লুম—

পুরাতন গীতি গেয়ো না
পুরাতন প্রীতি চেয়ো না
পুরাতন স্মৃতি ছেয়ো না
তোমারি মনোমন্দিরে।

পণ্ডিতজী যে গাছপাকা কবি (born poet) তা আমার জানা ছিল না, তিনি শোনবামাত্রই বল্লেন—এ যে গূঢ় অভিসন্ধি রে! তারপর তাঁর মুখখানা আষাঢ়স্য প্রথম দিবসের মত হয়ে এল; তিনি আমার প্রতি নিতান্ত করুণ আঁখিপাত করে বল্লেন—

হবি তুই রাজবন্দী রে!

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাঁর ছানাবড়া-প্রতিম চোখ দুটীর দিকে জিজ্ঞাসুভাবে চাইতেই, তিনি অনাসক্তের মত বল্লেন—তবে শোন্। তুই যা লিখেছিস্, এতে রাজদ্রোহ, প্রজাদ্রোহ, গাঁজাদ্রোহ সবই রয়েচে; এবং এর জন্য তোর সুদীর্ঘ কারাবাস, নির্ব্বাসন, দ্বীপান্তর, ফাঁসি সবই হতে পারে, অন্ততঃ হওয়া উচিত।

আমি ভয়ে ভয়ে বল্লুম—কি করে পণ্ডিতজী, এ যে নিতান্ত অহিংস—হতাশ প্রেমের কবিতা!

পণ্ডিতজী অমায়িকভাবে মোলায়েম হাস্য করে বল্লেন—সে কি আর জানিনে? প্রেমে হতাশ না হলে কি আর কেউ কবিতা লেখে, বক্তৃতা করে, খবরের কাগজ ছাপায়, না, গোসাঘরে অর্থাৎ জেলে যায়?

আমি বল্লুন—বেশ বুঝিয়ে দিন্, আমি ত জানিনে এর কোথায় Seditionএর Seed রয়েচে।

পণ্ডিতজী বল্লেন—তুমি যে লিখেচ—পুরাতন গীতি গেয়ো না,—এর মানেটা কি, না, নতুন গান গাও! এদেশে নবরসের মধ্যে আট-রসের গান লেখা ও গাওয়া হয়ে পচে গেছে, বাকী আছে কেবল একটী, সেটী হচ্চে বীররস। আর তুমি সবাইকে সেই উচু সুর ভাঁজতে বলচ—সুতরাং এটা হচ্চে দস্তরমত সিডিশন, ১২৪ক ধারা, বুঝতে পারলে?

পণ্ডিতজীর গবেষণায় আমার বাক্য-স্ফূর্ত্তির শক্তি রহিত হল। পণ্ডিতজী বলে চল্লেন—

"তার পর লিখেচ পুরাতন প্রীতি চেয়ো না। তারও মানে হচ্চে—নতুন প্রেম চাও। নতুন প্রেম কি হতে পারে? সব প্রেমই পুরানো হয়ে গেচে, গল্প ও উপন্যাস-লেখকের অনুসন্ধিৎসায় সম্ভব অসম্ভব কোন প্রেমই ঘট্তে বাকী নেই—সম্ভব অসম্ভব স্থানকাল পাত্রে অনেকেই প্রেম চেয়েচে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেউ যার প্রেম চাইবার কল্পনা স্বপ্নেও করেনি, সে হচ্চে সি, আই, ডির প্রেম। তুমি এই কবিতা লিখে সবাইকে সি, আই, ডির সঙ্গে প্রেম করতে বলেচ। আর তুমি জানো love-এও কিছু unfair নেই, war-এও নেই—অতএব love যা war৪ তাই! সুতরাং তুমি সি, আই, ডির সঙ্গে ভাষার মারপ্যাচে যুদ্ধ করতেই বলেচ। আর সি, আই, ডি পুলিশই যে রাজা, তা এদেশের বালক, বৃদ্ধ ও বনিতারা জানে। অতএব এটা হচ্চে যুগপৎ ১২০ ও ১২১ ধারা—Conspiracy এবং waging war against His Majesty.

শিকারী বেড়াল মুহ্যমান নেংটী ইঁদুরের দিকে যেমন নিস্পৃহ চোখে চেয়ে থাকে, পণ্ডিতজী সেই ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। পণ্ডিতজীর বিশেষজ্ঞতায় আমাকে বিশেষ অজ্ঞ বনতে হল; আর আমার অবস্থা মাথায় ন বস্তা চাপালে যা হয় তাই।

শ্রোতার মৌনসম্মতি অনুমান করে, পণ্ডিতজী ধীরে ধীরে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিয়ে চল্লেন—তার পর লিখেচ, পুরাতন স্মৃতি চেয়ো না। এর মানেটা কি বাপু? তোমরা কি তবে মনু-স্মৃতি চাও না, এই সনাতন হিন্দু জাতটাকে গোল্লায় দেবে ঠাউরেছ, তার বদলে তোমাদের নতুন হনু-স্মৃতি আমদানি করবে? ওসব বিলিতী চালান, আর্য্য-পুত্র আমি কখনই সমর্থন করব না। এটা হচ্চে রীতিমত সামাজিক সিডিসন!

যাক্, এর জন্যে জেল হবার ভয় নেই জেনে ঈষৎ আশ্বস্ত হয়ে বল্লুম—এত আমাদের ঘরোয়া লড়াই, রাজার সঙ্গে কিছু নয়ত।

পণ্ডিতজী বল্লেন—বটে আর কি! তোমরা ভায়ে ভায়ে মারামারির ছুতায় কুস্তি কসরৎ শিখে শক্তি সঞ্চয় করবে, আর তৃতীয় পক্ষ বাড়ীওয়ালা তাই নির্ব্বিকার হয়ে বসে বসে দেখবে ভেবেচ? গায়ে জোর হলে, চাই কি, একদিন তোমরা দুজনে এক হয়ে by force তাকেও ত divorce করে দিতে পারো। সুতরাং এর জন্যও তোমার জেল হবে—ভয় নেই। আগের দুটোর তুলনায় এর দণ্ড বোঝার ওপর শাকের আঁটী, গায়ে লাগবে না বিশেষ। এর জন্য তুমি পড়বে ১৫৩ক ধারায়—অর্থাৎ Promoting enmity between two classes of His Majesty's subjects. অর্থাৎ সেই-যুগের মনু পরাশর যাজ্ঞবল্ক্য, অত্রি, হারীতের সঙ্গে এ যুগের মণীন্দ্র, পরেশ, যজ্ঞেশ্বর, অতীন্দ্র, হীরালালের শত্রুতা বৃদ্ধি।

আমি বল্লুম—সে কি, তাঁরা ত আর ইংরেজের প্রজা ছিলেন না যে এই Charge খাটবে।

মুখ-বিকৃতি করে পণ্ডিতজী বল্লেন—ছিলেন না? আলবৎ ছিলেন। তাঁদের বংশধররা যখন আছেন তখন তাঁরাও থাক্তে বাধ্য, সুদ যে আদায় করচে আসলেও তারই দাবী—এটা আর বুঝতে পারো না বাপু! আর জেরায় যদি between two classes নাই-ই টেঁকে, তাতে কি! একতরফাতেও তোমার মত সন্দিগ্ধ লোকের জেল দেওয়া উচিত।

আমি অকূল পাথারে পড়ে গেলাম। পণ্ডিতজী উঠলেন, যাবার সময় সদয় হয়ে বল্লেন—যে রকম দিন কাল দেখ্চ, তাতে ওসব বদারেশন ছেড়ে দাও, ঐ ছাই কবিতা লিখো না। শুধু খাও দাও ঘুমাও আর বায়স্কোপ দেখ; নইলে Reg. III of 1449 এর ফাঁদে কোন্ দিন আট্‌কে যাবে, নিজেও বাঁচবে না, কাজেই বাপের নামও ডোবাবে।

পণ্ডিতজী এই Sermonএর সঙ্গে চার মণ আমার মাথায় চাপিয়ে যেমন এসেছিলেন তেমনি হাস্য-মুখে বোধ করি মহাপ্রস্থান করলেন!

—(যুগান্তর)

স্যার উইলিয়ম জোন্সের সংস্কৃত শিক্ষা

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন

ভারতে ইংরাজ অধিকারের প্রথম অর্দ্ধ শতাব্দীতে যে সকল মনস্বী রাজপুরুষ অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে সংস্কৃত ভাষায় গভীর জ্ঞান লাভ করিয়া নিজ নিজ পাণ্ডিত্য প্রদর্শনে প্রাচ্য প্রতীচ্য উভয় দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর বিস্ময় ও প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন, স্যার উইলিয়ম জোন্স তাঁহাদেরই অন্যতম। নিজ জন্মভূমি হইতে শত সহস্র ক্রোশ দূরে অপরিজ্ঞাত দেশে ভিন্ন ভাষা-ভাষী অচেনা লোকের মধ্যে, অসংখ্য প্রতিকূল ঘটনার সহিত যুদ্ধ করিয়া, কত কষ্টে, কত অসুবিধায় তিনি সংস্কৃত ভাষায় সম্যক পারদর্শিতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং তৎকালে এতদ্দেশীয় জনগণই বা ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন বাক্য ও সমাজ শাসনের প্রতি কতটুকু সম্মান প্রদর্শন করিতেন, তাহা দেখিবার জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

স্যার উইলিয়ম জোন্স ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টে'র বিচারপতি রূপে ভারতে পদার্পণ করেন। ভৃত্যবর্গের সহিত কথোপকথন করিবার জন্যই তিনি প্রথমে একটু হিন্দুস্থানী শিক্ষা করেন। এদেশে সংস্কৃতের আদর দেখিয়া স্যার উইলিয়ম সংস্কৃত শিক্ষার অভিপ্রায়ে একজন অধ্যাপকের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া কোন ব্রাহ্মণই ম্লেচ্ছকে দেবভাষা শিক্ষা দিতে সাহসী ছিলেন না। তদানীন্তন কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ শিবচন্দ্র স্যার উইলিয়মের বন্ধু ছিলেন। তিনিও বন্ধুর জন্য অধ্যাপক সংগ্রহের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, কিন্তু মহারাজার চেষ্টা, স্যার উইলিয়মের বিজ্ঞাপিত মোটা বেতনেও কোন ফল হইল না। মোটা বেতনের প্রলোভনে দু'একটী পণ্ডিত গোপনে উইলিয়মের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতেছিলেন—তাঁহাদের প্রতিবেশিগণ ইহা অবগত হইয়া সামাজিক শাসনের ভয় দেখাইলেন। সুতরাং একঘরে হইবার ভয়ে অধ্যাপকগণ আর স্যার উইলিয়মের বাটীর ত্রিসীমা মাড়াইতেও সাহস পাইলেন না। স্যার উইলিয়ম নিজে বাঙ্গলায় সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র নবদ্বীপে গিয়া অধ্যাপকগণের বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন অধ্যাপকই তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। অবশেষে অনেক অনুসন্ধান, অনেক চেষ্টার পর রামলোচন কবিভূষণ নামক একজন বৈদ্যজাতীয় সুশিক্ষিত পণ্ডিত মাসিক ১০০৲ টাকা বেতনে স্যার উইলিয়মকে সংস্কৃত শিক্ষা প্রদানে সম্মত হইলেন।

রামলোচন হাওড়ার নিকটবর্ত্তী সালখিয়াবাসী ছিলেন; তখন তাঁহার বয়স ৬০ বৎসরের উপর। তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা কেহই ছিল না, সংসারে তিনি মাত্র একাকী, সুতরাং একঘরে হইবার ভয় বড় রাখিতেন না। ইহা ব্যতীত তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক ছিলেন। পাড়াপ্রতিবেশীরা রোগ পীড়ায় তাঁহাকেই ডাকিত—তাঁহার উপর লোকের শ্রদ্ধা ভক্তিও যথেষ্ট ছিল। সুতরাং স্যার উইলিয়মকে সংস্কৃত শিক্ষা দিলেও লোকে তাঁহাকেই ডাকিবে এ ভরসা তাঁহার খুব ছিল। নির্দ্দিষ্ট বেতন ব্যতীত সালখিয়া হইতে স্যার উইলিয়মের বাসা খিদিরপুর এবং খিদিরপুর হইতে সালখিয়া যাতায়াতের পাল্কী-ভাড়া পাইবেন, এই বন্দোবস্তে কবিভূষণ অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিলেন।

কবিভূষণ মহাশয় একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তাই অধ্যাপক ও অধ্যয়নার্থীর মধ্যে নিম্নলিখিত ৮টী সর্ত্তের কথা হয়—

১। একটী একতলা গৃহে অধ্যাপনার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে।

২। পাঠাগারের মেজে মর্ম্মর প্রস্তরাবৃত করিতে হইবে।

৩। পাঠাগারের মেজে ও দেওয়াল (যতদূর হাতে পাওয়া যায় ততদূর) প্রতিদিন গঙ্গাজল দ্বারা মার্জ্জনা করিবার জন্য একজন হিন্দু ভৃত্য নিযুক্ত করিতে হইবে।

৪। কাষ্ঠাসন ব্যতীত অন্য কোন আসন পাঠাগারে ব্যবহৃত হইবে না এবং ঐ কাষ্ঠাসনগুলি প্রতিদিন গঙ্গাজলে ধৌত করিতে হইবে।

৫। প্রাতঃকালেই অধ্যাপনার সময় নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে।

৬। নির্দ্দিষ্ট পাঠ সমাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে এক পেয়ালা চা ভিন্ন অধ্যয়নার্থী আর কিছুই আহার বা পান করিতে পারিবেন না।

৭। গোমাংস, শূকর মাংস কিংবা কাঁটা চামচ প্রভৃতি পাঠাগারে নিষিদ্ধ হইবে।

৮। অধ্যাপকের ব্যবহারের জন্য পাঠাগারের নিকটবর্ত্তী গৃহটীও প্রত্যহই গঙ্গাজলে মার্জ্জন করিতে হইবে। এই গৃহে একপ্রস্থ কাপড় রক্ষিত হইবে। পাঠাগারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে অধ্যাপক নিজ কাপড় পরিবর্ত্তন করিয়া এই কাপড় পরিধান করিবেন; আবার বাড়ী আসিবার সময় এই কাপড় রাখিয়া নিজ কাপড় পরিধান করিয়া আসিবেন।

জ্ঞানপিপাসু অধ্যয়নার্থী অধ্যাপকের এ আবদারে সম্মত হইলেন—কবিভূষণ মহাশয়ও সার উইলিয়মের শিক্ষাকার্য্য আরম্ভ করিলেন।

পাঠারম্ভকালে স্যার উইলিয়ম সংস্কৃতের কিছুই জানিতেন না, আবার অন্যদিকে তাঁহার অধ্যাপক কবিভূষণ মহাশয়ও ইংরাজী ভাষার সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন—সার উইলিয়ম যে একটু হিন্দুস্থানী শিখিয়াছিলেন, পরস্পরের মধ্যে তাহার সহায়তায়ই কথাবার্ত্তা চলিত।

যাহা হউক অধ্যাপক ও অধ্যয়নার্থী উভয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও বুদ্ধি প্রাখর্য্যে এক বৎসরের মধ্যেই স্যার উইলিয়ম সহজ সংস্কৃতে নিজ মনোভাব প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রথম সংস্কৃত শিক্ষার্থীর পক্ষে বিশেষ্যের লিঙ্গ ও ক্রিয়ার বিভক্তি শিক্ষা করিতেই বিশেষ বেগ পাইতে হয়। স্যার উইলিয়ম সর্ব্বপ্রথম ক্রিয়া ও বিভক্তির তালিকা করিয়াই ধাতুরূপ শিখিতে আরম্ভ করেন, ইহাই আমাদের অনুমান হয়। কিন্তু তিনি ঠিক কোন্ প্রণালীতে উহা শিক্ষা করিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে বহু অনুসন্ধানেও তাহা আমরা জানিতে পারি নাই।

একদিন অধ্যাপক মহাশয়ের সহিত কথা-প্রসঙ্গে স্যার উইলিয়ম সংস্কৃত সাহিত্যে দৃশ্য কাব্যের অস্তিত্ব অবগত হয়েন। সহরের ধনী-দিগের গৃহে যে নাট্যাভিনয় হইত, কলিকাতায় সেকালের ইংরাজ অধিবাসিবর্গের নিকট তাহা অবিদিত ছিল না। কবিভূষণ মহাশয়ও তাহা জানিতেন। এই নাট্যাভিনয় প্রসঙ্গের আলোচনাকালে কবিভূষণ মহাশয় স্যার উইলিয়মকে বলেন যে, একালের ন্যায় সেকালেও ভারতীয় রাজা, মহারাজা ও ধনীবৃন্দের দরবারে নাট্যাভিনয় হইত। এই হইতেই স্যার উইলিয়ম সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য অধ্যয়ন করিতে আগ্রহান্বিত হয়েন। প্রথমেই তিনি মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নামক নাটক অধ্যয়ন করেন। উত্তরকালে, স্যার উইলিয়ম পদ্যে গদ্যে এই নাটকেরই এক ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধ বয়সে অধ্যাপক কবিভূষণ মহাশয়ের স্বভাব কিছু খিট্ খিটে রকমের হইয়াছিল। বিশেষতঃ তিনি টোলের ধরনেই ছাত্রকে শিক্ষা দিতেন, তাহাতে কোন কোন সময় কোন কথা ভালরূপে না বুঝিতে পারিয়া স্যার উইলিয়ম দ্বিতীয়বার সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে অধ্যাপক বিরক্ত হইয়া বলিয়া ফেলিতেন "ও, এ অতি জটিল প্রশ্ন, গরুখোরের পক্ষে ইহা ঠিক বুঝা অসম্ভব।" স্যার উইলিয়ম নিজ অধ্যাপককে বিশিষ্টরূপে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন, তাই প্রাচীন অধ্যাপকের এ কঠিন তিরস্কারেও তিনি বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ হইতেন না।

অধ্যাপক কবিভূষণ মহাশয় ১৮১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। কিন্তু তিনি স্মার্ত্ত বা দার্শনিক ছিলেন না, সুতরাং ব্যাকরণ ও কাব্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া স্যার উইলিয়ম যখন স্মৃতি ও হিন্দুধর্ম্মের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে অন্য অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে হইল। এ সময় দেশের লোকে অনেকটা উদার ভাবাপন্ন হইয়াছিল, সুতরাং স্মৃতির অধ্যাপক খুঁজিয়া লইতে স্যার উইলিয়মকে এবার আর অধিক বেগ পাইতে হয় নাই। —(প্রতিভা)

আবহাওয়া

দেশ

স্বাস্থ্য

লর্ড লিটনের ভুল ধারণা—গত ৩রা ডিসেম্বর লর্ড লিটন্ কৃষ্ণনগরে গিয়া জেলাবোর্ড ইত্যাদির অভিনন্দনের উত্তরে নদীয়া জেলার স্বাস্থ্য ও লোকসংখ্যার হ্রাস বিষয়ে যে সব কথা বলিয়াছেন, তাহা একেবারেই ভুল। বঙ্গের লাটের পক্ষে বাঙ্গলার কোন জেলা বিষয়ে এইরূপ অমূলক কথা বলা নিতান্তই বিসদৃশ। লাটসাহেবই হউন আর সরকারের যে কোন উচ্চ কর্ম্মচারীই হউন, কেহই প্রকৃত সংবাদ রাখিতে চেষ্টা করেন না—ইহাই আমাদের মনে হয়। বাঙ্গলার স্বাস্থ্য বিভাগের বেণ্টলী সাহেবও কি কোন সংবাদ রাখেন না? যদি প্রকৃত অবস্থা বেণ্টলী সাহেব জানিতেন তবে লাট সাহেব এইরূপ ভ্রান্তিপূর্ণ কথা কি প্রকারে বলিলেন? তিনি ত লর্ড লিটনকে নদীয়া যাইবার পূর্ব্বেই ঐ জেলার অবস্থা বলিয়া দিতে পারিতেন।

নদীয়া জেলায় ম্যালেরিয়ার ধ্বংসলীলা কি পরিমাণে লোকসংখ্যার হ্রাসের কারণ হইয়াছে তাহা গত সেন্সাস রিপোর্টে প্রকাশ পাইয়াছে, অথচ কৃষ্ণনগরে লাট সাহেব বলিয়া আসিয়াছেন যে, সমগ্র নদীয়া জেলা তেমন কিছু অস্বাস্থ্যকর নয়, তবে কোন কোন থানায় জন্ম সংখ্যা হইতে মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু মোটের উপর জেলার সাধারণ অবস্থা ভালই; এবং রিপোর্টে প্রকাশিত সংখ্যার কথা উল্লেখ করিয়া অকাতরে বলিয়া আসিয়াছেন,—যে সব থানায় লোকসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে, তাহার আয়তন সমগ্র জেলার আয়তনের ১০০ ভাগের ১৫ভাগ মাত্র। লাট সাহেবের বক্তৃতাংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"Figures show that the district as a whole is not unhealthy, although in certain thanas the death-rate has exceeded the birth-rate. But these thanas occupy only 15 per cent, of the district, which in this respect compares favourably with the average district in Bengal."

গত সেন্সাস্ রিপোর্টে দেখা যায়, সমগ্র নদীয়া জেলাতেই লোক-সংখ্যার হ্রাস হইয়াছে। জেলার মোট ২৫টী থানার মধ্যে ২৩টীতেই লোকসংখ্যা গড়ে শতকরা ৮ জন করিয়া কমিয়াছে, কেবল কুমারখালী ও খোক্‌সা এই ২টী থানার লোকসংখ্যা শতকরা ১৬ জন মাত্র বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং এই জেলার আয়তনের (২৭৭৮ বর্গ মাইল) তুলনায় এই দুইটী থানার আয়তন (১৪২ বর্গ মাইল) ২০ ভাগের একভাগ মাত্র অর্থাৎ জেলার শতকরা ৯৫ ভাগ স্থানেই লোকসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে এবং সমগ্র বাঙ্গলায় এই জেলার মত কোন জেলায় এইরূপ বিস্তৃতভাবে লোকসংখ্যা হ্রাস পায় নাই। সুতরাং লাট সাহেবের তিনটী কথাই ভ্রমপূর্ণ। সেন্সাস্ রিপোর্ট হইতে নদীয়া জেলার প্রত্যেক থানার আয়তন ও লোকসংখ্যা উদ্ধৃত করা যাইতেছে। তাহা হইতে আমাদের কথা প্রমাণিত হইবে।

	বর্গমাইল	লোকসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি (১৯১১—১৯২১) শতকরা
নদীয়া		—৮·০
সদর মহকুমা	৭২১	—৯·৪
থানা—		
কালীগঞ্জ	১১২	—১০·৭
নাকাসিপাড়া	১৪০	—৫·৮
কিসনগঞ্জ	৫৭	—২০·৩
হাঁসখালী	১০৪	—১১·৩
কৃষ্ণনগর	১৩৫	—৭·৬
চাপড়া	১৩০	— ঐ
নবদ্বীপ	৪০	— ঐ
রাণাঘাট মহকুমা	৪৩০	—৪·৪
শান্তিপুর	৭৭	—৬·২
রাণাঘাট	১৬৫	—৬·৬
চাকদহ	১২২	—১·৫
হরিণঘাটা	৬৬	— ঐ
কুষ্টিয়া মহকুমা	৫৮২	—৪·২
কুষ্টিয়া	১২৯	+১·০
মীরপুর	১২৩	—১২·৫
ভেড়ামারা	৫২	— ঐ
কুমারখালী	১১০	+১·৬
খোক্‌সা	৩২	+ ঐ
দৌলৎপুর	১৩৬	—৩·৩
মেহেরপুর মহকুমা	৬০৮	—১১·৭
করিমপুর	১৬৬	—১১·৭
গাঙ্গনী	১২৫	—১২·৫
মেহেরপুর	১৩৩	—১৩·৮
তেহট্ট	১৮৪	—৯·৬

চুয়াডাঙ্গা মহকুমা	৪৩৭	—১১.৪
চুয়াডাঙ্গা	১১২	—১২.১
আলমডাঙ্গা	১৩২	—৯.৩
দামুরহুদা	১১৬	—১৪.২
জীবননগর	৭৭	—১০.৩

আনন্দবাজার পত্রিকা

ওলাউঠার আক্রমণ বৃদ্ধি—গত ২৪শে নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বাঙ্গালায় সংক্রামক ব্যাধিতে কত লোকের মৃত্যু হইয়াছে, তাহার রিপোর্ট প্রাদেশিক স্বাস্থ্য বিভাগে আসিয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, উক্ত সপ্তাহে বাঙ্গালা প্রদেশের পনেরটী জেলায় ওলাউঠা রোগে মৃত্যুর হার বাড়িয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহের পূর্ব্ব সপ্তাহে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, রাজসাহী এবং নোয়াখালী জেলাতে ওলাউঠায় কাহারও মৃত্যু হয় নাই; কিন্তু আলোচ্য সপ্তাহে যথাক্রমে ২, ১, ৯ এবং ১ জনের মৃত্যু হইয়াছে। হাবড়ায় ১ হইতে ৬, বাখরগঞ্জে ১ হইতে ৯, চব্বিশ পরগণায় ৩ হইতে ৬, নদীয়ায় ২১ হইতে ২৪, রঙ্গপুর ৪০ হইতে ৭০, বগুড়ায় ১৮ হইতে ২৩, মালদহে ৪ হইতে ২২, ঢাকায় ৪০ হইতে ৬৭, ময়মনসিংহে ২১০ হইতে ২৭১, ফরিদপুরে ৬ হইতে ১৪, এবং ত্রিপুরায় ০ হইতে ৩৪ জনে ওলাউঠায় মৃত্যুর হার বাড়িয়াছে। নিম্নলিখিত কয়েকটী জেলায় ওলাউঠায় আলোচ্য সপ্তাহে মৃত্যুর হার কমিয়াছে:—বৰ্দ্ধমানে ৩ হইতে ০, মুর্শিদাবাদে ৯ হইতে ৩, যশোহরে ১০৭ হইতে ৭৩, দিনাজপুরে ৭ হইতে ৩ এবং পাবনায় ৮ হইতে ৪ জনের মৃত্যুর হার কমিয়াছে। কলিকাতায় এবং আসানসোল মাইনিং সেটেলমেন্টে আলোচ্য সপ্তাহে এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে ওলাউঠায় মৃত্যুর হার সমানই ছিল অর্থাৎ যথাক্রমে একজন ও সাতজন করিয়া মরিয়াছিল। খুলনা হইতে কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

বসন্ত রোগে আলোচ্য সপ্তাহে মৃত্যুর হার সামান্য বাড়িয়াছে। এই রোগে নদীয়ায় ৩ জন এবং চট্টগ্রামে ৬ জনের মৃত্যু হইয়াছিল।

কলিকাতায় আলোচ্য সপ্তাহে ইনফ্লুয়েঞ্জায় দশজন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

প্লেগে আলোচ্য সপ্তাহে বাঙ্গালার কোন স্থান হইতে মৃত্যুর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই নায়ক

কালা জ্বর—গত ৬০।৭০ বৎসর যাবৎ বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব চলিয়া আসিতেছে। এর ফলে প্রতি বৎসর ৭।৮ লক্ষ লোক যমের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করে।

"একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর।" এখন আবার কালা জ্বর দেখা দিয়াছে। এই ভীষণ শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করা প্রত্যেক দেশ-হিতৈষী ব্যক্তির অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গত ৫।৭ বৎসর পূর্ব্বে নোয়াখালীর লোক কালা জ্বর কাহাকে বলে জানিত না। কিন্তু ইতিমধ্যে ইহা প্রায় ঘরে ঘরে সুপরিচিত। বেগমগঞ্জ থানার কাজীপুর হাটের অদূরস্থ কোন গ্রামে নাকি গত এক মাসে ১৩০ জন লোক শুধু কালা জ্বরেই মরণকে বরণ করিয়াছে। আর এখন ঐ অঞ্চলে এমন ঘর নাই যেখানে ২।৪ জন ভুগিতেছে না। ফেণী মহকুমায় খণ্ডল অঞ্চল তকালা জ্বরের লীলা-ক্ষেত্র। লক্ষ্মীপুরার দিকেও নাকি ইহার প্রকোপ কম নহে। সহরের বুকের উপরই এখন তিন শতের অধিক লোক কালা জ্বরে ভুগিতেছে। অতএব শীঘ্র ইহার প্রতীকারের জন্য সর্ব্বসাধারণ, জেলাবোর্ড, লোকেলবোর্ড, মিউনিসিপালিটী ও সরকার এক যোগে না লাগিলে এই সোনার দেশ শ্মশানে পরিণত হইতে আর অধিক দিন আবশ্যক হইবে না।

সত্য বটে স্থানীয় সিভিল সার্জ্জন ও জেলা বোর্ড তাঁহাদের অপরাপর কর্ত্তব্যের মধ্যে কালা জ্বর তাড়নকেও একটা ধরিয়া নিয়াছেন। কিন্তু ইহা দেশ-জোড়া বিরাট কার্য্যের অকিঞ্চিৎকর প্রতীকার। এ জেলায় যে কয়েকটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, তাহার সকল ডাক্তারও নবাগত—কালাজ্বর চিকিৎসায় বিচক্ষণ কিনা সন্দেহ। অতএব সকলকে ঐ বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত করা, কালাজ্বর প্রতীকারের সাধারণ নিয়মগুলি পুস্তিকা আকারে মুদ্রিত করিয়া সর্ব্বত্র বিনামূল্যে বিতরণ করা, স্থানে স্থানে সভাসমিতি করিয়া জ্বরের সংক্রামকত্ব নিবারণের জন্য উপদেশ দেওয়া, কালাজ্বরের ঔষধ স্থান বিশেষে বিনামূল্যে বা অল্পমূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা, চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

এই বৃহৎ কার্য্যে, সরকার, জেলা বোর্ড ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সমবেত চেষ্টার আবশ্যক। স্থানীয় সেবা-সমিতি, খাদেমল ইছলামের নেতৃগণকেও আমরা এই কার্য্যোগে ঝাঁড় দিয়া সাড়া দিতে আহ্বান করিতেছি। নোয়াখালি হিতৈষী

হিন্দু—মুসলমান

সাহারাণপুরে অধিবেশন—নিখিল ভারত রাষ্ট্র সমিতির প্রেসিডেণ্ট কোণ্ডা বেঙ্কটাপ্পা জানাইতেছেন যে, অদ্য (মঙ্গলবার) হইতে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ-তদন্ত-কমিটি সাহারাণপুরে তদন্ত করিবেন। শ্রীযুক্ত তেঙ্কটাপ্পা আজমীরবাসীদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া ডাঃ মামুদকে সাহারাণপুরে গিয়া সেখানে যাহাতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হয়, সে জন্য চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। বন্দে মাতরম্

ঝালকাঠিতে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ—বরিশাল হইতে জনৈক ভদ্রলোক তারযোগে জানাইতেছেন যে, ঝালকাঠির সন্নিহিত সুতালড়ী গ্রামে একটী হিন্দুমন্দির লইয়া স্থানীয় মুসলমান ও মালাকরদিগের মধ্যে বিষম বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে। মুসলমানেরা পরামর্শ করিয়া উক্ত মন্দিরের পার্শ্বস্থ স্থান হিন্দুদিগকে লইতে দেয় নাই। তাহারা জোরপূর্ব্বক মন্দির অপবিত্র করিয়া মন্দিরটীকে মসজিদরূপে ব্যবহার করিতে চেষ্টা করে। মালাকরেরা পুলিশের সাহায্য লয়। মন্দিরটী বর্ত্তমানে পুলিশের পাহারায় আছে। স্থানীয়

হিন্দু মুসলমান নেতাগণ বিরোধটী মিটমাট করিবার জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা করিতেছেন। অমৃতবাজার পত্রিকা

মিলন-কমিটী—জনরব নোয়াখালীস্থ হিন্দু-মুসলমান-প্রেম ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়িতেছে। এই ভাঙ্গা প্রেমে জোড়া দেওয়ার উপায় নির্দ্ধারণার্থ গত রাত্রে স্থানীয় কংগ্রেস আফিসে একটা সব কমিটী বসিয়াছিল। অনেক বাদানুবাদের পর নাকি স্থিরীকৃত হইয়াছে যে পাঁচ জন করিয়া বিশিষ্ট হিন্দু ও মুসলমানকে লইয়া একটা মিলন-কমিটী গঠন করিতে হইবে। আর এই দশ জনের উপর প্রেসিডেণ্ট থাকিবেন স্থানীয় আর, সি, মিশনের পাদ্রী সাহেব!

আমরা কমিটীর সিদ্ধান্তে আশ্বস্ত হইয়াছি। দেখা যাউক মিলনটা কিরূপ জমে। নোয়াখালি হিতৈষী

সদনুষ্ঠান

অর্দ্ধকুম্ভ মেলা সেবা সমিতির আবেদন।—আগামী ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে অর্দ্ধকুম্ভ মেলা আরম্ভ হইবে। এলাহাবাদের সেবা সমিতি এই মেলার জন্য নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটী আবেদন প্রকাশ করিয়াছেন।

আগামী অর্দ্ধকুম্ভ মেলার সময় এলাহাবাদে যে সমস্ত যাত্রী উপস্থিত হইবেন, তাঁহাদিগকে সাধারণ ভাবে ও চিকিৎসাদি ব্যাপারে সাহায্য করিবার জন্য এলাহাবাদের সেবা সমিতি একটী স্বেচ্ছাসেবক সঙ্ঘ গঠন করিবার নিমিত্ত মনস্থ করিয়াছেন। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় শ্রেণীরই স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠন করা হইবে। এই কার্য্যে যাঁহারা আত্ম-নিয়োগ করিতে চাহেন তাঁহারা সমিতির নিকট সমস্ত সংবাদ জানিতে পারিবেন। সমিতি নিম্নলিখিত কার্য্য-তালিকা ঠিক করিয়াছেন:—
(১) টিকিট ক্রয় কালীন এলাহাবাদ ষ্টেশনে যাত্রীদিগকে সাহায্য করা
(২) সুশিক্ষিত ডাক্তার ও বৈদ্যের তত্ত্বাবধানে, উপযুক্ত নার্স ও কম্পাউণ্ডার সমেত কয়েকটী দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা। এই চিকিৎসালয় হইতে যাত্রীদিগের চিকিৎসাদির বন্দোবস্ত করা হইবে।
(৩) আহত ব্যক্তিগণকে সেবা শুশ্রূষা করা ও যাঁহারা—বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোক ও বালক বালিকা আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে লোকজনের ভিড়ের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবেন, তাঁহাদিগের আত্মীয়ের অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদিগকে যথাস্থানে পৌছাইয়া দেওয়া। এ সমস্ত জনহিতকর কার্য্যের জন্য সমিতি অন্ততঃ ৫০০ শত উৎসাহী স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিতে চান। অবশ্য স্বেচ্ছাসেবকদিগকে এই কার্য্যে কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। বন্দেমাতরম্

চুরি—ডাকাতি—খুন—জখম

খুনের মরসুম।—সিরাজগঞ্জের অধীন হরিণাবাগবাটী অঞ্চলে খুনের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। খুনের পর খুন হইয়া যাইতেছে, অথচ কোনটারই আস্কারা হইতেছে না।

কিছুদিন পূর্ব্বে একটী যুবক—একটী বেশ্যার ছেলে—মৃত অবস্থায় অন্য একটি বেশ্যার ঘরে পড়িয়া আছে দেখা গেল। রহস্যাবৃত মৃত্যু, চারিদিকে সোরগোল পড়িয়া গেল। পুলিশ আসিল। কিছুই হইল না।

তার পর একটী বিদেশী গোয়ালা বহুদিন এখানে বসবাস করিতে-ছিল। একদিন দেখা গেল তার মৃতদেহ নদীতে ভাসিতেছে। ঘরের তৈজসপত্র অপহৃত। পুলিশ আসিল, কিছুই হইল না। তার পর কালকুমারী নাম্নী একটী বেশ্যা নৃশংসভাবে হত অবস্থায় তার বাড়ীতে পড়িয়া আছে দেখা গেল। তদন্তে প্রকাশ পাইল তার গহনাপত্র অপহৃত হইয়াছে। ইহারও কোনও কিছু হইল না। আর একটা রহস্যাবৃত মৃত্যু ঘটনা ঘটিয়াছে। দেবী মালিনী নাম্নী একটি ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকের লাস উধাও হইয়া গিয়াছে, কোনও খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না। নানা জনে নানা কথা বলিতেছে। এ পর্য্যন্তও লাসের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। কোনও কিনারা যে হইবে এমন ত বোধ হইতেছে না।

এইরূপে দেখা যাইতেছে কোন খানেই কোন খুন সন্তোষজনকরূপে আস্কারা হইতেছে না। এইরূপ পুনঃ পুনঃ খুন হওয়ায় ও অপরাধী ধৃত না হওয়ায়, স্থানীয় অধিবাসীগণ নিতান্ত ভয়বিহ্বল অবস্থায় বাস করিতেছে। আমরা কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিতেছি। স্বরাজ (পাবনা)

নেত্রকোণায় চুরি ও ডাকাতি।—একজন পত্র-প্রেরক লিখিয়াছেন, "নেত্রকোণা সবডিভিসনের অন্তর্গত মদন থানার এলাকাধীন হাসনপুর, সাইতপুর, বাঙ্গালা, তিরশ্রী, দেওরসহিলা, কাইকুড়িয়া, মাটুয়া, ছত্রকোণা ও এই সকল গ্রামের নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গ্রামে আজ ২।৩ বৎসর যাবৎ চোর, ডাকাত ও বদ্‌মায়েসের উপদ্রব এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, দেখিলে মনে হয়, যেন এই সকল স্থান গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন নহে। বিগত ২৬শে কার্ত্তিক সোমবার রাত্রিতে আমার বাড়ীতে মধ্যের ঘরের ভিত্তিতে সিঁদ কাটিয়া আমার ৺পিতৃদেব ঈশানচন্দ্র সরকার (ময়মনসিংহ কালেক্টরীর ভূতপূর্ব্ব তৌজিনবীশ) মহাশয়ের প্রোপার্জ্জিত চারি বাক্স স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ ১০০৲ টাকা ও অন্যান্য মালামালে প্রায় ৩।৪ হাজার টাকার জিনিষ লইয়া আমাদের একেবারে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে। যে ভাবে চুরি হইয়াছে তাহা দেখিলে মনে হয় যে ইহা দৃষ্টতঃ চুরি হইলেও ডাকাতির অনুরূপ। কারণ আমি যে ঘরে ছিলাম, সে ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া এরূপ ভাবে নির্ভয়ে চুরি করিয়াছে যে, আমি শব্দমাত্র করিলে আমার প্রাণ বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল। নিকটস্থ সাইতপুর গ্রামে একটী লোককে মারিয়া সর্ব্বস্বান্ত করিবার জন্য দরজা বন্ধ করিয়া অগ্নি প্রদান করিয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন এবম্বিধ স্থানে আমরা ধনপ্রাণ লইয়া সশঙ্ক আছি। আশা করি আমাদের সহৃদয় ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সাহেব স্বয়ং উপযুক্ত প্রতীকার করিয়া নিরীহ গ্রামবাসীকে এই ভীষণ অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবেন। অধিকন্তু আমাদের সানুনয় প্রার্থনা যে পুলিশ সাহেব স্বয়ং আসিয়া তদন্ত করিয়া চোর, ডাকাত দমন করতঃ বৃটিশ শাসনের গৌরব রক্ষা করিবেন।" চারুমিহির

বাঙ্গালী যুবক গ্রেপ্তার।—পানমগঞ্জের অধিবাসী মহেন্দ্রকুমার সাহার দোকানে গত সোমবার রাত্রিতে প্রায় ১২ জন লোক লাঠি ও ছোরা লইয়া ডাকাতি করিয়া লোহার সিন্দুক হইতে নগদ প্রায় ১২০০৲ টাকা লইয়া চম্পট দিয়াছে। কাপাসিয়া থানার অধীনে একটী গ্রাম হইতে আর একটি ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

গ্রেপ্তার—গত কয়েক মাসের মধ্যে এই জিলার নানাস্থানে কয়েকটি ডাকাতি হইয়া গিয়াছে, এ সংবাদ পাঠকবর্গ অবগত আছেন। সম্প্রতি পুলিশ এই সব ডাকাতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সন্দেহে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস নামক জনৈক যুবককে ঢাকা রেলওয়ে ষ্টেশনে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। এরূপ প্রকাশ, এই যুবকটি নাকি স্বরাজ্যদলের তাঁবে আবদুল করিম সাহেবের নির্ব্বাচনের জন্য ভোট সংগ্রহ করিতেছিল। ঢাকা প্রকাশ

শিক্ষা

বসু বিজ্ঞান-মন্দির স্মৃতি-বার্ষিকী।—গত ৩০শে নবেম্বর, আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে, তাঁহার ছাত্রগণ ও উক্ত মন্দিরের সভ্যগণ ঐ মন্দির স্থাপনের ষষ্ঠস্মৃতি-বার্ষিকী সম্পন্ন করেন। অধ্যাপক এন্, সি নাগ গত ১৩ বৎসর উক্ত বিজ্ঞান মন্দিরে কি গবেষণা হইয়াছে, তাহার একটা আভাষ দেন।

বাঙ্গালী ছাত্রের বৃত্তিপ্রাপ্তি।—কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট স্কুল অব আর্টের ছাত্র মিঃ অতুল বসু ইউরোপে কলাবিদ্যা শিখিবার জন্য 'গুরুপ্রসন্ন ঘোষ' বৃত্তি পাইয়াছেন। তিনি আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে লণ্ডন যাত্রা করিবেন এবং তথায় দক্ষিণ কেনসিংটনে রয়েল কলেজ অব আর্ট অথবা রয়াল একাডেমী স্কুলে ভর্ত্তি হইবেন।

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কনভোকেশন।—গত ৪ঠা ডিসেম্বর সন্ধ্যার সময় মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন হইয়া গিয়াছে। মহামান্য চ্যান্সেলার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ ১০৩৩ জন গ্রাজুয়েট উপাধি গ্রহণের জন্য উপস্থিত ছিলেন। ৭১০ জন গ্রাজুয়েট অনুপস্থিত ছিলেন। এ বৎসর প্রায় পঞ্চাশ জন মহিলা গ্রাজুয়েট ডিগ্রী পাইয়াছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা

মিঃ আলী করিম।—মিঃ আলী করিমের বাড়ী বেগমগঞ্জ থানার হাজীপুর গ্রামে। ইনি ভূপাল ষ্টেটের সহকারী রাসায়নিক ছিলেন। সম্প্রতি বার্ষিক ১০০ এক শত পাউণ্ড ষ্টেট স্কলারসিপ পাইয়া বিগত ২৪শে নবেম্বর বোম্বাই হইতে ইংলণ্ডে রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। উদ্দেশ্য, বিলাত যাইয়া উদ্ভিদ ও মৎস্যাদি হইতে তৈল প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিক্ষা করা। আমরা এই কর্ম্মিযুবকের যশঃসৌভাগ্য কামনা করিতেছি।

নোয়াখালি হিতৈষী

কৃষি—শিল্প—বাণিজ্য

আফগানিস্থানে ফলের ব্যবসায়।—পেশোয়ারের ২০শে নবেম্বর তারিখের তারের খবরে প্রকাশ :—আফগান সরকারের সাহায্য পাইয়া আফগানিস্থানে দুইটী ট্রেডিং কোম্পানী গঠিত হইয়াছে বলিয়া সম্প্রতি আফগানিস্থানের সংবাদপত্রসমূহে বিস্তারিত সংবাদ প্রচার করা হইয়াছে। তাহার একটি কোম্পানীর নাম "আমানীয়া ব্রাদার্স কোম্পানী" এবং আর একটীর নাম "ফ্রুট কোম্পানী"। পূর্ব্বোল্লিখিত কোম্পানীটি সকল রকমের সাধারণ ব্যবসায়ের কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছে; আর দ্বিতীয় কোম্পানীটি কাবুল ও ভারতবর্ষের মধ্যে সকল রকমের শুকনো ও তাজা ফলের কারবার খুব বড় রকমে চালাইবে বলিয়া বন্দোবস্ত করিয়াছে। আমানিয়া ব্রাদার্স কোম্পানী কাবুলে একখানি দোকান খুলিয়াছে এবং তুর্কিস্থান, পারস্য এবং ভারতবর্ষে এজেণ্ট পাঠাইয়াছে। এই ব্যাপারে ব্যবসায়ীগণের মনে বিষম উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে; কারণ তাহারা যে একচেটীয়া ব্যবসায়ের ফল ভোগ করিতেছিল তাহা নষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা তাহাদের মনে উদয় হইয়াছে। নায়ক

নারীসমস্যা

জয়মিত্রের ষ্ট্রীটে পতিতা বিতাড়ণ।—কলিকাতা ৩নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত জয় মিত্রের ষ্ট্রীটে, বহু ভদ্রলোকের বাস; পাশা-পাশিই বারাঙ্গনা পল্লী। গত ১৯২১ সনে এই রাস্তাটিকে প্রকাশ্য রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য কয়েকজন কমিশনার আবেদন করেন কিন্তু "বিশেষ বেশ্যালয় কমিটি" ঐ সময়ে চীৎপুর রোডটীকে প্রধান রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিবার সকল করিতেছিলেন; তাঁহারা জয় মিত্রের ষ্ট্রীটকে প্রধান রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিবার অনুপযুক্ত মনে করেন। কলিকাতা কর্পোরেশন ১৯২১ সনের ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে, তাঁহাদের মতই গ্রহণ করেন।

পুনরায় গত মে মাসে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীগণ আর একখানি আবেদনপত্র প্রেরণ করেন; ওয়ার্ড কমিশনার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দত্ত ঐ আবেদনপত্র সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেন। গত ২৪শে আগষ্ট, ডিষ্ট্রিক্ট কমিটীর এক অধিবেশনে স্থিরীকৃত হয় যে ১৯০৭ সনের কলিকাতা ও সহরতলির পুলিশ এ্যামেণ্ডমেণ্ট কার্য্য বিধির ৪৩ (১) (সি) ধারানুযায়ী জয় মিত্রের ষ্ট্রীটকে প্রধান রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করা হউক। ঐ রাস্তা সম্বন্ধে পুলিশ কমিশনার, তাঁহার ১৪ সেপ্টেম্বরের চিঠিতে জানাইতেছেন যে, ঐ ষ্ট্রীটে ১১ খানি বাড়ীতে ৪৮ জন বেশ্যা থাকে। ইহারা দুই মাস হইতে ১২ বৎসর কাল পর্য্যন্ত ঐখানে থাকিয়া আসিতেছে। ঐ রাস্তা প্রধান রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিতে তাঁহার কোনই আপত্তি নাই।

পতিতাগণের মধ্যে যাহারা ঐস্থানে বাড়ী নির্ম্মাণ বা ক্রয় করিয়াছে, তাহারা কর্পোরেশনে আবেদন করিয়াছে। নায়ক

আবার নারীর উপর অত্যাচার।—প্রকাশ, চণ্ডীতলা থানা আইয়া গ্রামের জ্যোতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পাঁচকড়ি বন্দ্যো-পাধ্যায় উক্ত গ্রামের জনৈক ব্রাহ্মণের যুবতী স্ত্রীকে ঘর হইতে টানিয়া লইয়া মাঠের ভিতর তাহাকে সারারাত্রি রাখিয়া তাহার উপর

অত্যাচার করে। স্ত্রীলোকটী পরদিন নিকটবর্ত্তী থানায় এই ঘটনা প্রকাশ করেন। পুলিশ তদন্ত করিয়া ঘটনা মিথ্যা বলিয়া রিপোর্ট দেয়। ম্যাজিষ্ট্রেট এই রিপোর্টে সন্তুষ্ট না হইয়া নথীপত্র তলব করিয়াছেন। শ্রীরামপুর

বাধ্যতামূলক বহু বিবাহ।—শ্রীমতী কারপিসকোভা নাম্নী জেকোস্লোভাকিয়ার পার্লামেন্টের জনৈক মহিলা সভ্য আইন দ্বারা বহু বিবাহ চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন। তিনি এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন যে, প্রত্যেক পুরুষকেই তাহার ব্যক্তিগত মতামত যাহাই হউক না কেন, দুইটী করিয়া বিবাহ করিতে হইবে, না করিলে তাহাকে কঠোর দণ্ড দেওয়া হইবে। পাশ্চাত্য জগতে নূতন আশ্চর্য্য ব্যাপার বটে! বিগত যুদ্ধের কারণে পুরুষ সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় রমণীগণের স্বামীপ্রাপ্তি দুরূহ হইয়াছে, তাহাতেই এই চেষ্টা। নোয়াখালি হিতৈষী।

বাঙ্গলার হিন্দু কৃষক কোথায় গেল?—১৯২১ সালের হিসাব অনুসারে দেখা যায় বাঙ্গলার জনসংখ্যা ৪,৭০৫,৪২,৬২।

তন্মধ্যে হিন্দু ২,০৮,০৯১৪৮,

মুসলমান ২,৫৪,৮৬,১২৪।

বাঙ্গালার কৃষক সংখ্যা ৩,০৫,৪৩,৫৭৭।

তন্মধ্যে হিন্দু ১,০১,৭১,৫০৫,

মুসলমান ১,৯৭,২১,৮৫১।

১৯২১ সালের হিসাবে দেখা যায় বাঙ্গালার কৃষক সংখ্যা ছিল ২৯৭৪৮৬৬৬।

তন্মধ্যে হিন্দু ১০৪৫০২৫৮,

মুসলমান ১৮৭১১৯৬৯।

দশ বৎসরে হিন্দু কৃষকের সংখ্যা ২৭০৭৫৩ কম হইয়াছে। কিন্তু দশ বৎসরে মুসলমান কৃষকের সংখ্যা ১০০২১৫৯ বাড়িয়াছে।

বাঙ্গালার হিন্দুদিগকে জিজ্ঞাসা করি, হিন্দু কৃষক কমিল কেন এবং মুসলমান কৃষক বাড়িল কেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করা কি আবশ্যক মনে করেন না?

হিন্দু কৃষকের সংখ্যা কমিল কেন তাহার কয়েকটী কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি।

(১) হিন্দু কৃষক অনেকেই বিবাহ করিতে পারে না; পণ না দিলে কন্যা পাওয়া যায় না; টাকার অভাবে অনেকেই অবিবাহিত থাকে; সুতরাং তাহাদের বংশ লোপ পাইতেছে।

(২) হিন্দুর মধ্যে বিবাহ প্রচলন নাই। প্রৌঢ় বয়সে যাহারা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে তাহারা ৮।১০ বৎসরের কন্যা বিবাহ করে; সন্তান হওয়ার পূর্ব্বেই স্ত্রীকে বিধবা করিয়া পরলোকযাত্রা করে। সুতরাং যাহারা বিবাহ করিতে পারে, তাহারাও বংশবৃদ্ধি করিতে পারে না।

(৩) যদি বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকিত, তবে প্রৌঢ় বয়সে কৃষকেরা বিধবার পাণিগ্রহণ করিতে পারিত এবং পুত্র কন্যা রাখিয়া পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইতে পারিত।

(৪) বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকিলে কন্যাপণ উঠিয়া যাইত; সুতরাং কৃষকদের বিবাহ করা দুঃসাধ্য হইত না।

বঙ্গের হিন্দু কৃষকদের সংখ্যা যদি বৃদ্ধি করিতে হয়, তবে অবিলম্বে বিধবা বিবাহ প্রচলন করিতে সকলের দৃঢ়সঙ্কল্প হওয়া উচিত।

(৫) হিন্দু কৃষকেরা পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে পায় না। হিন্দু কৃষকদের অনেকেরই গাভী নাই; সুতরাং দুধ, দই, ঘি খাইতে পায় না। অপরদিকে প্রায় সমস্ত মুসলমান কৃষক গাভী পালন করে। গৃহজাত দুধের কিয়দংশ বিক্রয় করে, অপরাংশ নিজেরা পান করিয়া থাকে। মুসলমানেরা দিবসের কার্য্য অবসানে মাছ ধরে, হিন্দু প্রায়ই তাহা করে না। মুসলমান পুষ্টিকর মাংসাদি আহার করে, হিন্দুর তাহার সুবিধা নাই। সুতরাং হিন্দু কৃষক দুর্ব্বল, মুসলমান সবল। মুসলমান সবল দেহ লইয়া যেরূপ উৎকৃষ্ট চাষ করিতে পারে, হিন্দু দুর্ব্বল দেহে তাহা পারে না। কাজেই মুসলমান কৃষকের যেরূপ আয়, হিন্দুর সেরূপ নয়। দরিদ্রতা হিন্দু কৃষক ধ্বংসের আর এক কারণ।

(৬) হিন্দু কৃষক পুরুষানুক্রমে একই বাড়ীতে বাস করে; বহুকালের জঞ্জাল ও আবর্জ্জনা ও বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বস্থ জঙ্গল তাহার আবাসভূমিকে অস্বাস্থ্যকর করিয়া তোলে। অধিকাংশ মুসলমান কৃষক এক বাড়ীতে বহুদিন থাকে না। তাহাদের বাড়ীতে বৃক্ষাদিও বেশী নাই। তাহারা সচরাচর নদীর নূতন চরে যাইয়া বসতি স্থাপন করে। সুতরাং তাহাদের দেহ হিন্দু কৃষকদের মত শীঘ্র জরাজীর্ণ হয় না।

(৭) হিন্দু কৃষক তাহার দুর্ব্বল দেহে এক বিঘা জমিতে যত শস্য উৎপাদন করে মুসলমান কৃষক তদপেক্ষা বেশী উৎপাদন করিয়া থাকে, সুতরাং কৃষিকার্য্যে মুসলমানের যত লাভ হয়, হিন্দুর তত হয় না। হাটবাজারে হিন্দু যে মূল্যে শস্যাদি বিক্রয় করিতে চায়, মুসলমান তাহা অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে। প্রতিযোগিতায় হিন্দু হারিয়া যাইতেছে; সুতরাং বাধ্য হইয়া অনেক হিন্দু কৃষক কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করিতেছে।

হিন্দু কৃষক লোপ হওয়ার কতকগুলি কারণ উল্লেখ করিলাম। এতদ্ব্যতীত আরো অনেক কারণ আছে। হিন্দু কৃষক সংখ্যা হ্রাস হওয়ার প্রধান কারণ যে বিধবা বিবাহের অপ্রচলন এবং বিধবা বিবাহ প্রচলন না করিলে বাংলা দেশে যে হিন্দু কৃষকের চিহ্নমাত্র থাকিবে না এতদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং হিন্দু কৃষক রক্ষা করা যদি উচিত মনে হয়, তবে বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ-কায়স্থ বৈদ্যগণ আর কালবিলম্ব না করিয়া বিধবা বিবাহ প্রচলন করিতে আরম্ভ করুন।

(সঞ্জীবনী)

কাউন্সিল নির্ব্বাচন।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য-নির্ব্বাচন শেষ হইয়া গিয়াছে। ফলাফলও বাহির হইয়াছে। এবারের নির্ব্বাচনে প্রায় অধিকাংশ স্থলেই স্বরাজ্যদল জয়লাভ করিয়াছেন।

স্বরাজ্যদলের জয়ে দেশে জাতীয়তার জয় সূচিত হইয়াছে, দেশের প্রকৃত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। দেশে মডারেটদের আর স্থান নাই। কাউন্সিলে যাইয়া স্বরাজ্যদলের সফলতার সম্বন্ধে কাহারও কাহারও মনে সন্দেহ থাকিতে পারে, কিন্তু কাউন্সিল নির্ব্বাচনে যে স্বরাজ্যদলের পূর্ণ সাফল্য হইয়াছে, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই।

এবারের নির্ব্বাচনে এমন সব ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহা কালের ঘোর পরিবর্ত্তন সূচনা করিতেছে। মিঃ এস, আর দাশ ও স্যার সুরেন্দ্রনাথের পতন ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বিশেষতঃ স্যার সুরেন্দ্রনাথের পরাভবে ইহাই স্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে যে, এককালে যিনি যত বড় দেশসেবী হউন না কেন, পরে যদি তিনি দেশের বিরুদ্ধে গমন করেন, লোকমতকে পদদলিত করেন, তবে তাঁহারও পতন অবশ্যম্ভাবী। সুরেন্দ্র-পতনে আমরা দুঃখিত হইয়াছি, কিন্তু বিস্মিত হই নাই। কেন না, এরূপ যে হইবে তাহা সকলেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথও বোধ হয় এজন্য অপ্রস্তুত ছিলেন না। যখন তিনি জাতীয়তার মূর্ত্ত অবতার মহাত্মা গান্ধীর পুণ্যপুত অহিংস অসহযোগনীতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, যখন তিনি লোকমতকে পদদলিত করিয়া বিদেশী ব্যুরোক্রেশীর সহিত সহযোগিতা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখনই তিনি বুঝিয়াছিলেন—তাঁহার বুঝা উচিত ছিল, দেশবাসী ইহা নীরবে সহ্য করিবে না, ইহার ফল তাঁহাকে হাতে হাতে পাইতে হইবে। আজ সুরেন্দ্রনাথের পরাভবে তাঁহার স্বহস্তরোপিত বিষবৃক্ষের ফল ফলিল — ব্যারাকপুর সুরেন্দ্রনাথের ওয়াটার্লু। (যুগবার্ত্তা)

কলিকাতায় পুরুষ ও স্ত্রী—কলিকাতা সহরে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যার অনুপাত অত্যন্ত অস্বাভাবিক। খাস কলিকাতায় প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় মাত্র ৪৭০ জন স্ত্রীলোক, হাওড়াতে প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় ৫২০ জন স্ত্রীলোক এবং ২৪ পরগণা ও সহরতলীতে প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় ৬১৪ জন স্ত্রীলোক। বাঙ্গলার মফঃস্বল সহরে সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের সংখ্যা প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় ৮১৬ জন। যে সমস্ত মফঃস্বল সহরে ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র বা কল কারখানা আছে, সেই সব স্থানে আবার স্ত্রীলোকের সংখ্যা কলিকাতা সহরের মতই কম,—প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় ৫৩৭ জন। টিটাগড়, কাঁচড়াপাড়া, বজবজ প্রভৃতি স্থানে স্ত্রী-সংখ্যা প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় ৪৩৬ হইতে ৪৪০ জনের মধ্যে। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, বাঙ্গলার স্ত্রীলোকেরা, যেকোন কারণেই হোক, অধিকাংশই গ্রামে বাস করে; সহরের ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র বা কলকারখানার কাজে এখনও এদেশে স্ত্রী-মজুরের আমদানী, পাশ্চাত্য দেশের মত হয় নাই।

স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা তুলনা করিতে গিয়া আর একটা ব্যাপার চোখে পড়ে। ইউরোপ ও আমেরিকার প্রায় সর্ব্বত্র পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী। ইউরোপে যুদ্ধের পর অবশ্য স্ত্রী-সংখ্যা কিছু বেশী বাড়িয়াছে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেও ঐ সব দেশে পুরুষের তুলনায় স্ত্রী-সংখ্যাই বেশী ছিল। ভারতের সর্ব্বত্র বিশেষতঃ বাঙ্গলাদেশে তাহার বিপরীত অবস্থা; এমন কি ৪০।৫০ বৎসরের সেন্সাস তুলনা করিলে দেখা যায় যে, বাঙ্গলার সহরে ও মফঃস্বলে স্ত্রী-সংখ্যা পুরুষের তুলনায় বাড়িতেছে না, কমের দিকেই যাইতেছে। নিম্নের তালিকা হইতে ব্যাপারটী অনেকটা বুঝা যাইবে—

প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় স্ত্রী-সংখ্যা

	১৯২১	১৯১১	১৯০১	১৮৯১
কলিকাতা সহর	৪৭০	৪৭৫	৫০৭	৫২৬
২৪ পরগণা ও সহরতলী	৬১৪	৬৫৬	৬৮০	৭৭২
হাওড়া	৫২০	৫৬২	৫৭৭	৬৫৪
মফঃস্বলের ব্যবসা বা কলকারখানার সহর	৫৩৭	৫৮২	৬০৫	৬৮৫
সাধারণ মফঃস্বল সহর	৮১৬	৮৪১	৮৬৯	৯০৩
সমগ্র বঙ্গ	৯৩৪	৯৪৫	৯৬০	৯৭৩

(১৮৮১ সালে সমগ্র বঙ্গের স্ত্রী-সংখ্যা প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় ৯৯৪ জন ও ১৮৭২ সালে ৯৯২ জন ছিল।)

এই তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে, বাঙ্গলার সর্ব্বত্র পুরুষের তুলনায় স্ত্রী সংখ্যা কমিতেছে। সমাজতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, ইহা কোন জাতির পক্ষে সুলক্ষণ নহে। উন্নতিশীল জাতিদের মধ্যে প্রায় সর্ব্বত্র স্ত্রী-সংখ্যা বেশী দেখা যায়। আমাদের দেশে ইহার ব্যতিক্রম, জাতির জীবনী-শক্তির অভাব সূচনা করিতেছে।

এই সঙ্গে আর একটী ব্যাপারও লক্ষ্য করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের সংখ্যা কমিলেও, ২০ হইতে ৪০ বৎসর বয়সের স্ত্রীলোকের সংখ্যা কমে নাই, বরং বাড়িয়াছে। হিন্দু-স্ত্রীলোকদের মধ্যে ইহা বিশেষভাবে দেখা যায়। বিগত দশ বৎসরে ২০ হইতে ২৫—এই বয়সের হিন্দু-স্ত্রীলোকের সংখ্যা (প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায়) ৩৬৬ হইতে ৩৮৫ বাড়িয়াছে, ২৫ হইতে ৩০ বৎসর বয়সের হিন্দু-স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৩৩৫ হইতে ৩৬৭ বাড়িয়াছে এবং ৩০ হইতে ৪০ বৎসর বয়সের হিন্দু-স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৩১৭ হইতে ৩৬৯ বাড়িয়াছে। ফিরিঙ্গী বা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও স্ত্রী-সংখ্যা কিছু বাড়িয়াছে। সহরের উত্তরাঞ্চলে শ্যামপুকুর, কুমারটুলি, জোড়াবাগান এবং জোড়াসাঁকো অঞ্চলে হিন্দু-স্ত্রীলোকের সংখ্যা বাড়িয়াছে; অন্যদিকে পার্কষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া টেরেস এবং কলিঙ্গবাজারে ফিরিঙ্গী-স্ত্রীলোকের সংখ্যা বাড়িয়াছে।

উপরে যাহা দেখাইলাম, তাহার রহস্য বুঝিতে হইলে আর একটা কথা পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার। যে সহরে পুরুষের সংখ্যার অনুপাতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা এত কম, সেখানে দুর্নীতি ও বেশ্যাবৃত্তির আধিক্য হইবেই। সমস্ত কলিকাতা সহরে, ১৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়সের স্ত্রীলোকের সংখ্যা মোট ৪৯৮১১৩ বা ৫ লক্ষ জন; তার মধ্যে বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা মাত্র ১০৩০১৭ জন বা ১ লক্ষের কিছু উপরে। ইহাদের মধ্যে, কলিকাতায় ৮৮৭৭, সহরতলীতে ৬৪১ এবং

হাওড়ায় ১২৯৬ জন স্ত্রীলোকের নাম প্রকাশ্য বেশ্যা বলিয়া লেখা হইয়াছে। বাদ বাকী কত স্ত্রীলোক যে "অপ্রকাশ্য বেশ্যা", "গুপ্ত বেশ্যা" বা "হাফ গেরস্ত," তাহা অনুমানেই বুঝা যায়। ধরিতে গেলে সহরে প্রকৃতপক্ষে বেশ্যার সংখ্যা প্রতি ১৮ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে ১জন! এক সম্প্রদায়ের লোক "জাত বৈষ্ণব" বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেয়; ইহাদের স্ত্রীলোকের অনেকেই বেশ্যাবৃত্তি করিয়া জীবন ধারণ করে। কলিকাতা সহরে 'জাতবৈষ্ণব'দের মধ্যে প্রতি হাজার পুরুষে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১১৫৯ জন। ২০ হইতে ৪০ বৎসর বয়সের 'জাত বৈষ্ণব' স্ত্রীলোকের সংখ্যা প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় ১১৭০ জন এবং ৪০ এর উপরে প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় ১৪৫৮ জন। এই সমস্ত অধিক বয়স্কা 'জাত বৈষ্ণব' স্ত্রীলোকগণই ঝি, পানওয়ালী, 'বাড়ীওয়ালী' প্রভৃতির ব্যবসা করে। ফিরিঙ্গীদের মধ্যেও পুরুষদের তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী দেখা যায়। যাঁহারা কলিঙ্গবাজার প্রভৃতি অঞ্চলের খবর রাখেন, তাঁহারা ইহার রহস্য বুঝিতে পারিবেন।

যে সমস্ত নীতিবাগীশ লোক সহরে দুর্নীতি দমনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাঁহারা এই সমস্ত তথ্য ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিবেন। কার্যাকারণ সম্বন্ধ সর্ব্বত্রই আছে। কি কি সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে সহরে বেশ্যাবৃত্তি ও দুর্নীতি বাড়িতেছে,—তাহা না জানিলে শুধু একটা ফাঁকা আইন করিয়া কিছুই লাভ হইবে না। মানুষকে ভাল হইবার সুযোগ না দিলে, দুর্নীতি দমন করা অসম্ভব। আনন্দবাজার পত্রিকা

কলিকাতায় লোকসংখ্যা—কলিকাতা বাঙ্গলাদেশের রাজধানী হইলেও, এখানে বাঙ্গালীর প্রাধান্য নাই, এমন কি উহা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। ১৯২১ সালের লোক গণনায় হাওড়া ও সহরতলীর সহিত সমগ্র কলিকাতা সহরের লোকসংখ্যা ১৩,২৭,৫৪৭ জন। তার মধ্যে খাস কলিকাতার লোকসংখ্যা ৯০০৮৫১। এই লোকসংখ্যার মধ্যে বাঙ্গালী ও অ-বাঙ্গালীর অংশ কত, নিম্নলিখিত তালিকার প্রতি দৃষ্টি করিলে কতকটা বুঝা যাইবে।

খাস কলিকাতা—৯০৭৮৫১

(জন্মস্থান অনুসারে)

কলিকাতা সহর	২৪ পরগণা ও হাওড়া	বাঙ্গলার মফঃস্বল
৩০৪৭৭৬	৯৯১২৪	১৭৫৬৬৪
বঙ্গের বাহিরে ভিন্ন প্রদেশ		ভারতের বাহিরে বিদেশ
৩১৪২৩৬		১৪০৫১

অর্থাৎ খাস কলিকাতার সমগ্র-লোকসংখ্যার শতকরা প্রায় ৩৫ জন অ-বাঙ্গালী। বাঙ্গলার মফঃস্বল হইতে আগত লোকের সংখ্যা কলিকাতার লোকসংখ্যার শতকরা ১৯৩৫ ভাগমাত্র; অর্থাৎ কলিকাতার মফঃস্বলবাসী বাঙ্গালী অপেক্ষা অ-বাঙ্গালীর সংখ্যা প্রায় ডবল।

হাওড়ার লোকসংখ্যার শতকরা ৪০·৪৬ ভাগ অ-বাঙ্গালী এবং সহরতলী ও ২৪পরগণার শতকরা ৩১·৭৫ ভাগ অ-বাঙ্গালী। বাঙ্গলার মফঃস্বলবাসী লোকের সংখ্যা হাওড়া ও চব্বিশ পরগণার সহরতলীতে যথাক্রমে মাত্র শতকরা ১০·৭৪ ভাগ ও শতকরা ১১·১৬ ভাগ মাত্র।

এক বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশের লোকই কলিকাতার লোক সংখ্যার প্রায় পাঁচভাগের একভাগ দখল করিয়া আছে। কলিকাতার লোকসংখ্যার দশভাগের একভাগ যুক্তপ্রদেশ হইতে আসিয়াছে। সহরের হাজার করা ২৩ জন রাজপুতানার লোক। ভিন্নপ্রদেশের যে সমস্ত জেলা হইতে বেশী লোক কলিকাতায় আসিয়াছে, তাহার দুই একটী নমুনা নীচে দিলাম:—গয়া—৪৮১১৪, পাটনা—২৮০৩৪, সাহাবাদ—২৬৭৪১, মজফঃপুর—২১০৫৩, মুঙ্গের—২০৬৯০, কটক—৪৫৮৭৯, বালেশ্বর—১৬৪৯৯, বারাণসী—১৬৬১৫, গাজীপুর—১৫৩৯৯, বালিয়া—১৪০৯২, আজমগড়—১২০৬২, জৌনপুর—১২৩৪১, বিকানীর—১২৫৯৬, জয়পুর—১১৭১৪।

এর সঙ্গে বাঙ্গলার মফঃস্বলের কোন জেলা হইতে কতলোক কলিকাতায় আসিয়াছে, তাহার তুলনা বেশ কৌতুহলজনক হইবে:—হুগলী—৪১০৯২, মেদিনীপুর—৩৬০৮২, ঢাকা—৩০৪৬৫। বর্দ্ধমান—২০৬২৭, নদীয়া—১৬২৩৫, ফরিদপুর—১০৫৮৬, যশোহর—৯৫৪৮, বাখরগঞ্জ—৭২১৮, বাঁকুড়া—৭১৭৯, মুর্শিদাবাদ—৬১০৯, খুলনা—৫৭৫৪। এই দুই তালিকার তুলনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কলিকাতা বাঙ্গালীর রাজধানী নয়, উহা বিহারী, উড়িয়া, মাড়োয়ারী ও হিন্দুস্থানীদেরই সহর।

খাস কলিকাতা ও হাওড়ায় যত লোক স্থায়ীভাবে বাস করে, সাধারণতঃ আদম শুমারীতে তাহাদেরই হিসাব ধরা হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতার নিকটবর্ত্তী মফঃস্বল হইতে ডেলী-প্যাসেঞ্জাররূপে যে সমস্ত লোক দিনের বেলায় কলিকাতায় কাজ করিতে আসে এবং সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরিয়া যায়, তাহাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। ইহারা প্রত্যুষে নাকেমুখে দুইটি অন্ন গুঁজিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে রেলে ষ্টীমারে চড়ে, আবার সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর ক্লান্তদেহে গৃহে ফিরিয়া যায়। গ্রাম্যজীবন বা পারিবারিক জীবন এদের নাই বলিলেও চলে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, অন্ন-সমস্যার ফলে এই জাতীয় জীবের সংখ্যা কলিকাতায় ক্রমেই বাড়িতেছে। ইহাদের অধিকাংশ কেরাণীর দল হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, চব্বিশপরগণা, নদীয়া প্রভৃতি স্থান হইতে বহু লোক প্রত্যহ এইভাবে কলিকাতায় ডেলী-প্যাসেঞ্জার হইয়া আসিয়া কাজ করে। ইহাদের সংখ্যা ক্রমে কিরূপ বাড়িতেছে, 'লোকাল রেলওয়ের' মাসিক টিকিটওয়ালা প্যাসেঞ্জারদের তালিকা হইতেই উহা কতকটা বুঝা যাইবে—

রেলের নাম—১৯০১, ১৯১০, ১৯২০
হাওড়া, ই, আই—৩১৫৪৩, ৫৪১৮৭, ১০৯৬৩২
হাওড়া, বি, এন—৬১১৮, ৯৭৫১, ২৯৫৩৩
হাওড়া আমতা ও
হাওড়া শিয়াখালা—১০৮১, ৭৫২২, ১৭৫৬৫
শিয়ালদহ, ই, বি— ... ৩১৭৬৬, ৯৩৬৫৩৪
শ্যামবাজার—বারাসত
বসিরহাট ১২২৪

(আনন্দবাজার পত্রিকা)

শোক-সংবাদ

৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় আর ইহজগতে নাই—৫৭ বৎসর বয়সে বৃদ্ধ পিতা-মাতা, পুত্রদ্বয় ও সংখ্যাতীত আত্মীয় বন্ধুগণকে শোকসাগরে ভাসাইয়া পাঁচকড়িবাবু সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। প্রায় সাত আট মাস তিনি শয্যাগত ছিলেন; আমরা সকলেই মনে করিয়াছিলাম এ যাত্রায় তিনি নীরোগ হইবেন; মধ্যে তিনি একটু সুস্থও হইয়াছিলেন। তাহার পরই আবার রোগ বৃদ্ধি হয় এবং সেই দুশ্চিকিৎস্য বহুমূত্র রোগেই তাঁহার জীবনান্ত হইল। পাঁচকড়িবাবু কি ছিলেন, তাহার পরিচয় বাঙ্গালা দেশের কাহাকেও দিতে হইবে না; তিনি, বলিতে গেলে,

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

এ দেশে সর্ব্বজন পরিচিত ছিলেন। আজ ত্রিশ বৎসর তিনি নানাভাবে বাঙ্গালা দেশের সেবা করিয়াছেন, সে কথা কেহ ভুলে নাই, ভুলিবে না। তিনি ত চলিয়া গেলেন, কিন্তু পশ্চাতে রাখিয়া গেলেন বৃদ্ধ মাতা-পিতা; তাঁহাদের কথা মনে করিয়া সকলেই কাতর হইবেন। পাঁচকড়িবাবু মাতা-পিতার একমাত্র সন্তান; এই প্রৌঢ় বয়স পর্য্যন্তও তিনি মা বাপের আদুরে আবদারের ছেলে ছিলেন। এমন পুত্রের বিয়োগে বৃদ্ধ বৃদ্ধা যে কি অবস্থায় আছেন, তাহা ভাবিয়াই আমরা অধীর হইতেছি—তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা ত নাই। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি ইঁহাদিগকে শোক-তাপের অতীত করুন।

৺সূর্য্যকুমার অগস্তি

মেদিনীপুরের স্বনামখ্যাত পণ্ডিত সূর্য্যকুমার অগস্তি মহাশয়ের পরলোক গমনের সংবাদে আমরা বড়ই দুঃখিত

সূর্য্যকুমার অগস্তি

হইলাম। অগস্তি মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম উজ্জ্বল রত্নস্বরূপ ছিলেন। তিনি এম, এ, উপাধি লাভ করিয়া প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ প্রতিযোগিতায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইয়াছিলেন এবং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে "ষ্ট্যাটুটারি সিভিল সার্ভিস" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। অনেক জেলাতে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের

কার্য্য করিয়া ১৯১২ খৃষ্টাব্দে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে যখন মেদিনীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন হয়, তখন অগস্তি মহাশয় ঐ সম্মিলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মেদিনীপুরের সকল হিতকর অনুষ্ঠানেই তাঁহার উৎসাহ ও সম্বন্ধ ছিল। রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি মেদিনীপুরেই অবস্থান করিতেছিলেন। অবশেষে, হৃৎপিণ্ডের ও মূত্রাশয়ের পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া তিনি চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের ন্যায় সুচিকিৎসকের অশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহার জীবন রক্ষা হইল না। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পুত্র ও পরিবারবর্গের শোকে আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

পুস্তক-পরিচয়

ভাগের পূজা।—মূল্য দুই টাকা। এই 'ভাগের পূজা' উপন্যাসের লেখক একজন নহেন—ষোলজন পূজারী ও পূজারিণী এই পূজায় ব্রতী হইয়াছিলেন। 'যমুনা' পত্রিকায় প্রত্যেক মাসে একজন করিয়া এই উপন্যাসখানিকে একটু একটু করিয়া অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। যাঁহার যেমন খেয়াল, যাঁহার যতটা শক্তি-সামর্থ্য তিনি তাহাই এই ভাগের পূজায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন; আটজন পূজারী ও আটজন পূজারিণী মিলিয়া এই উপন্যাসখানি শেষ করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন হাতের লেখা বেশ বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, স্থানে স্থানে জোড় না মিলিলেও গল্পটা মোটের উপর বেশ গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার অধিক কিছু বলা শোভন হইবে না, কারণ এ পূজার অংশ যে আমরাও গ্রহণ করিয়াছিলাম। এইমাত্র বলিতে পারি যে, এমন ভাল কাগজে ভাল ছাপা, এমন সুন্দর বাঁধাই এবং ষোলজনের লেখা দুই টাকা দিয়া কিনিলে কাহারও অপব্যয় বলিয়া মনে হইবে না।

স্নেহের শাসন।—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, কাব্যরত্ন প্রণীত, মূল্য দুই টাকা। এই সুন্দর উপন্যাসখানি পড়িয়া আমরা পরম আনন্দ উপভোগ করিয়াছি, কারণ এখানি একটু স্বতন্ত্র ধরণের উপন্যাস। বাঙ্গালী সাহেবের গৃহদেবতা গোবিন্দজী এই উপন্যাসের মেরুদণ্ড; তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া একটা ইঙ্গ-বঙ্গ পরিবারে ভগবানের অপার করুণার খেলা গ্রন্থকার অতি সুকৌশলে দেখাইয়াছেন। সবগুলি চরিত্রই বেশ ফুটিয়াছে। আগাগোড়া কেমন একটা পবিত্রতা, একটা নিষ্ঠার সুবাসে গ্রন্থখানি ভরপুর। একেলে সেকেলে সকলকেই এই গ্রন্থখানি মুগ্ধ করিবে।

বিধির খেলা।—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু রায় চৌধুরী প্রণীত, মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র। উপন্যাসখানির নাম বিধির খেলা। এ জগতে বিধির খেলা সবই, সুতরাং গ্রন্থকার বইখানির নামকরণ ঠিকই করিয়াছেন। বারবনিতার প্রলোভনে পড়িয়া যুবকেরা কেমন করিয়া যথাসর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দেয়, তাহার কয়েকটী চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। কুল-ললনা কেমন করিয়া নরপিশাচের করতলগত হয়, তাহাও ইহাতে আছে এবং বিধির বিধানে বারবনিতা কেমন করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে, তাহাও দেখান হইয়াছে। সবই পুরাতন কথা; তবুও গ্রন্থকার সেই পুরাতন কথাই বেশ গোছাইয়া বলিয়াছেন। বইখানির ছাপা, কাগজ, বাঁধাই অতি উৎকৃষ্ট।

মেনকারাণী।—শ্রীতারকনাথ সাধু প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা। এই কিছুদিন পূর্ব্বেই রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সাধু মহাশয়ের 'ভোলানাথের ভুলে'র পরিচয় দিয়াছি, তাহার পরেই তিনি 'মেনকারাণী'কে বাঙ্গালা সাহিত্যের দরবারে হাজির করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সাধু মহাশয়ের উদ্দেশ্য অতি সাধু; তিনি আদর্শ হিন্দু-মহিলার চিত্র অঙ্কনে প্রয়াসী হইয়া এই 'মেনকারাণী' লিখিয়াছেন। তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার মেনকারাণী সত্যই আদর্শস্থানীয়া। ঘরে ঘরে মেনকারাণী আবির্ভূতা হউন, গ্রন্থকারও ইহাই কামনা করেন, আমরাও সর্ব্বান্তঃকরণে সাধু গ্রন্থকারের এই সাধু প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি। শ্রীযুক্ত সাধু মহাশয় বাঙ্গালা-সাহিত্যের সেবায় সত্যসত্যই অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত।

টাকার নেশা।—শ্রীগদাধর সিংহ রায় এম-এ, বি-এল্, প্রণীত, মূল্য পাঁচসিকা। এখানি উপন্যাস। ছেলের বিবাহ দিয়া দুপয়সার সংস্থান করিতে অনেকেই চান, এই উপন্যাসের বৈকুণ্ঠ মজুমদার সেই দলের এম-এ পাশ—একেবারে চরম চামার। তার প্রায়শ্চিত্তও তেমনই হইয়াছিল। বইখানি বেশ লেখা হইয়াছে, চরিত্রগুলিও বেশ ফুটিয়াছে। সবই বেশ হইয়াছে, কিন্তু অর্থ-পিশাচ বরের বাপদের যদি এই উপন্যাসখানি পড়িয়া চৈতন্যোদয় হয়, শ্রীকণ্ঠের শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া যদি কেহ ব্যথিত হন, তাহা হইলেই উপন্যাসখানি লেখা সার্থক হইবে।

নারীর প্রাণ।—শ্রীবামাপ্রসন্ন সেনগুপ্ত এম-এ প্রণীত, মূল্য আট আনা। 'নারীর প্রাণ' গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সনস্ প্রকাশিত আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার একনবতিতম গ্রন্থ। গ্রন্থারম্ভে

কৈফিয়তেই গ্রন্থকার বলিয়াছেন, এই বইখানি তাঁহার প্রথম লেখা; সুতরাং নবীন লেখকের প্রথম রচনা হিসাবেই ইহার বিচার করিতে হয়। প্রথম লেখা বলিয়া বইখানিকে একেবারে উপেক্ষা করা চলে না; গ্রন্থকার যে কয়েকটী চরিত্র এই বইখানিতে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার দুই একটী বেশ ফুটিয়াছে, 'গীতা'র অপেক্ষা নির্ম্মাল্যের চরিত্রাঙ্কন আর্ট হিসাবে দাঁড়াইয়াছে। এই নবীন লেখক যে পরে যশস্বী হইবেন, তাহা এই বইখানি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

চোখের নেশা।—শ্রীকিশোরীলাল দাস গুপ্ত প্রণীত, মূল্য দুই টাকা। এখানিও উপন্যাস। লেখক নবীন কি প্রবীণ, তাহা জানি না, কিন্তু লেখা খুব পাকা, নিষ্ঠাবান হিন্দু সন্তানের ছাপ এই উপন্যাসখানির সর্ব্বত্র বিদ্যমান। গল্পের আখ্যানভাগ অতি সুন্দর, চরিত্রগুলিও অতি মনোরম ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। পুরুষ চরিত্রের মধ্যে অনিলকে গ্রন্থকার একেবারে দেবতারূপে চিত্রিত করিয়াছেন; বিনয়ের চরিত্রও বেশ হইয়াছে; দুই ভাই মহেন্দ্র ও জ্ঞানেন্দ্র—একজন গোঁড়া হিন্দু, অপরজন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম; এ জাতীয় চরিত্র সর্ব্বদাই চোখে পড়ে। রমণী চরিত্রের মধ্যে সাধনা অতুলনীয়া; অন্যগুলিও বেশ হইয়াছে। আমরা এই উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি; এবং বলিতে পারি, যিনি এই উপন্যাসখানি পাঠ করিবেন, তিনিই লেখকের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। আমরা গ্রন্থকারকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি।

পাথরের দাম।—শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ, বি-টী, প্রণীত মূল্য আট আনা। আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার দ্বিনবতিতম গ্রন্থ এই পাথরের দাম। লেখক শ্রীমান মাণিক ভট্টাচার্য্য পাঠক সমাজে বিশেষ পরিচিত; তাঁহার ছোট গল্প ও উপন্যাস অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। এই বইখানিতে তিনি কয়েকটী ছোট গল্প লিখিয়াছেন; প্রথম গল্পের নামানুসারে বইখানির নামকরণ হইয়াছে। ইহাতে পাথরের দাম, কর্ম্মত্যাগ, সমস্যা, কলির ভাই, দুঃস্বপ্ন, অগ্নি-পরীক্ষা, বিজ্ঞতার মূল্য, দীক্ষা, পার্ব্বতী, ও ইস্কুলের বাবু, এই কয়টী ছোট গল্প আছে। সবগুলিই সুলিখিত, সুতরাং সুপাঠ্য; পাঠকগণ পড়িয়া আনন্দলাভ করিবেন। গল্প কয়েকটীর মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য অগ্নি-পরীক্ষা ও দীক্ষা।

প্রজাপতির দৌত্য।—শ্রীঅজয়কুমার সেন প্রণীত, মূল্য আট আনা। এই ছোট গল্পের সংগ্রহ পুস্তকখানি আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার ত্রিনবতিতম গ্রন্থ। শ্রীমান অজয়কুমার নানা মাসিক পত্রে যে সমস্ত ছোট গল্প লিখিয়াছেন, তাহারই কয়েকটী এবং দুইটী নূতন গল্প দিয়া এই পুস্তকখানি ছাপাইয়াছেন। প্রশংসার কথা এই যে, গল্পগুলি সত্য সত্যই ছোট এবং এই ছোট গল্পের মধ্যে ভাব-বিশেষ প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীমান বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন; নবীন লেখকের পক্ষে এই সাফল্য কম কথা নহে।

রঙ্গালয়ের রঙ্গ-কথা।—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা। শ্রীযুক্ত অবিনাশ বাবু স্বর্গীয় নাট্যরথী গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন; ছায়ার ন্যায় তিনি গিরিশবাবুর সঙ্গী ছিলেন; সুতরাং রঙ্গালয়ের রঙ্গ-কথা বলিতে তিনি হক্‌দার। বিগত দুই যুগের অধিককাল অবিনাশ বাবু রঙ্গালয়ের সহিত সংসৃষ্ট আছেন। তিনি কোন দিন অভিনয় করেন নাই। কিন্তু অভিনেতাদিগকে তিনি বিশেষ ভাবে জানিতেন এবং এখনও জানেন। কাজেই বিভিন্ন রঙ্গালয়ে যখন যে রঙ্গ-কথা হইয়াছে, তাহার অনেকই তিনি স্বকর্ণে শুনিয়াছেন, কতক বা অপরের মুখেও শুনিয়াছেন। সেই সকল রঙ্গ-কথা একত্র সংগ্রহ করিয়া এই বইখানি লিখিয়াছেন। রঙ্গ-ব্যঙ্গ এখন এক রকম উঠিয়া যাইতে বসিয়াছে; এ সময় অবিনাশ বাবু এই বইখানি ছাপাইয়া পাঠক পাঠিকাগণকে দুই দণ্ড আমোদ উপভোগ করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। বইখানি সুন্দর হইয়াছে, যেমন ছাপা, তেমনই বাঁধাই, আবার কয়েকখানি আলোক-চিত্রও আছে। জিনিস হিসাবে দেড় টাকা মূল্য খুব কমই হইয়াছে।

অংশুমতী।—শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য সাত সিকা। 'অংশুমতী' উপন্যাস। গ্রন্থকার বহুদিন হইতে পশ্চিমাঞ্চল-বাসী; সুদূর লাহোরে বসিয়াও যে তিনি মাতৃ-ভাষার চর্চ্চা করিয়া থাকেন, ইহা বিশেষ আনন্দের কথা। প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা তেমন ছিল না। এখন সে ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এখন চিরপ্রবাসী বাঙ্গালীরাও বাঙ্গলা ভাষার চর্চ্চায় বিশেষ মনোনিবেশ করিয়াছেন। তাহার প্রমাণ এই প্রবীণ লেখক মহাশয়ের উপন্যাস 'অংশুমতী'। বইখানি অতি সুন্দর হইয়াছে। একেলে নভেলের ধারা অনুসারে লিখিত না হইলেও আখ্যানভাগ বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে। সাধারণ দুর্ব্বলচিত্ত মানব প্রলোভনের বশীভূত হইয়া কি প্রকারে দ্রুত অধঃপতিত হয়, তাহা অতি সুন্দরভাবে মনোজ্ঞ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। বইখানি পড়িয়া সকলেই আনন্দ লাভ করিবেন।

কমলাকান্তের পত্র।—মূল্য এক টাকা। লেখকের নাম নাই। 'কমলাকান্তের দপ্তর' বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন; তিনি নিজের নাম গোপন করেন নাই; কিন্তু এই 'কমলাকান্তের পত্র'—লেখক নাম গোপন করিয়াছেন। আমরা কিন্তু তাঁহাকে চিনি, বিশেষ ভাবে জানি, বন্ধু বলিয়া গৌরবও অনুভব করি। কিন্তু নামটা তিনি যখন গোপন করিয়াছেন, তখন আমরাও প্রকাশ করিলাম না। তবে, ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছি, এমন কৃতী, এমন পণ্ডিত, এমন তত্ত্বজ্ঞ, এমন সুরসিক লেখক বেশী দিন আত্মগোপন করিতে পারিবেন না। এই 'কমলাকান্তের পত্র'ই তাঁহাকে শুধু জাহির করিবে না, তাঁহাকে যশস্বী করিবে। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরের' পার্শ্বে এই 'কমলাকান্তের পত্র' নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে স্থান গ্রহণ করিতে পারে, এ কথা আমরা এই পুস্তকের প্রকাশক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় এম এ মহাশয়কে জানাইয়া দিতেছি। এই পুস্তকের ইহার অধিক পরিচয় আর কি, তাহা আমরা জানি না। যিনি বাঙ্গলা পড়িতে জানেন, তাঁহাকেই এই বইখানি পড়িবার জন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি।

ভক্তিমতী।—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত, মূল্য ১।০। এখানি উপন্যাস। শ্রীমান বিজয়রত্ন কলিকাতাবাসী হইলেও পল্লীর সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষার সহিত তাঁহার যে ঘনিষ্ট পরিচয় আছে, তাহা এই 'ভক্তিমতী' গ্রন্থখানি পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। অতি মনোরম একটী পল্লী গৃহস্থ-পরিবারের চিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি যে কয়টী চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে সিন্ধু ও নির্ম্মল অতি সুন্দর হইয়াছে। সিন্ধুর শ্রীধরের প্রতি ভক্তিকে আধুনিকেরা অন্ধ কুসংস্কার বলিতে পারেন, কিন্তু ঐ প্রকার ভক্তিতেই মুক্তিলাভ হয়। বইখানির ছাপা কাগজ প্রভৃতি বেশ মনোজ্ঞ।

কলেরা চিকিৎসা (সচিত্র)।—শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায় এম-বি প্রণীত, মূল্য এক টাকা। কলিকাতা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের এসিষ্টাণ্ট রিসার্চ্চ ওয়ার্কার শ্রীমান অরুণকুমার এই কলেরা চিকিৎসা বইখানি লিখিয়াছেন। রজার্স সাহেব কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত সেলাইন চিকিৎসা আজ জগৎ-প্রসিদ্ধ। ইংরাজী ভাষায় এ সম্বন্ধে অনেক ভাল পুস্তক আছে। বাঙ্গালা ভাষায় ছিল না; শ্রীমান অরুণকুমার সেই অভাব পুরণ করিলেন। আমরা চিকিৎসক নহি, তবুও বইখানি আগ্রহ সহকারে পড়িয়াছি, এবং কেমন করিয়া সেলাইন ইন্‌জেক্‌সন করিতে হয় তাহা, অরুণকুমারের লেখার গুণে বুঝিতে পারিয়াছি। বইখানি সকলেরই ঘরে থাকা দরকার, কারণ ওলাউঠা ত দেশে লাগিয়া আছেই।

মায়াপুরী।—শ্রীমনীন্দ্রলাল বসু প্রণীত, দাম এক টাকা আট আনা। গত তিন বছরের মধ্যে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় লেখক মহাশয় যে সকল ছোট গল্প লিখিয়াছেন, তাহারই কয়েকটা লইয়া এই 'মায়াপুরী' রচনা করিয়াছেন। মনীন্দ্রবাবু বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার গল্প ও উপন্যাসগুলির মধ্যে একটা নূতন সুর আনিয়া ফেলিয়াছেন; তিনি গদ্যকাব্য লেখেন। আমরা তাঁহার সুন্দর, সুরঞ্জিত বর্ণ-শিল্পের মোহে এমন অভিভূত হইয়া যাই যে, গল্পের আখ্যানভাগ ভুলিয়া যাই। নিপুণ চিত্রকরের মত তিনি শব্দের পর শব্দ বসাইয়া, অলঙ্কারের পর অলঙ্কার সাজাইয়া মায়াপুরী রচনা করেন; বর্ত্তমান সংগ্রহ-পুস্তকে তাহার প্রমাণ আছে। চিত্র-শিল্পী শ্রীমান চারুচন্দ্র রায় বি-এ অঙ্কিত প্রচ্ছদপট মায়াপুরীরই মত হইয়াছে।

মণিকাঞ্চন।—শ্রীফণীন্দ্র নাথ পাল বি-এ প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা। শ্রীযুক্ত ফণীবাবু উপন্যাস-সাহিত্যে বিশেষ যশঃ লাভ করিয়াছেন; তিনি লিখিতেও পারেন খুব বেশী। রোগ-শয্যায় পড়িয়া তিনি এই 'মণিকাঞ্চন' বইখানি লিখিয়াছেন। উপন্যাসের আখ্যান ভাগ বেশ হইয়াছে, কোন স্থানে জড়তা নাই, কোথাও মলিনতা নাই। মানদা, লতিকা, অপূর্ব্বের চরিত্র চিত্রণ সুন্দর হইয়াছে। ফণীন্দ্রবাবুর ভাষা কোন দিনই কষ্টকল্পিত নহে, বেশ ঝরঝরে। তাঁহার অন্যান্য উপন্যাসের ন্যায় এখানিও পাঠক সমাজে আদর লাভ করিবে।

দুরন্ত দেবতা।—শ্রীবিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল দুই টাকা।

বইখানি পড়িতে আরম্ভ করিয়া প্রথম মনে হইয়াছিল, এখানি বুঝি একখানি ডিটেকটিভ উপন্যাস। দেখিলাম, চুরি, ডাকাতি, খুন এবং পেশাদার ও এ্যামেচার টিকটিকির অভাব না থাকিলেও বইখানি ঠিক ডিটেকটিভ উপন্যাসের পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে না। গ্রন্থকার একজন বাঙ্গালী কলেজের ছাত্রকে এ্যামেচার ডিটেকটিভ রূপে হাজির করিয়া তাহার দ্বারা যে অসাধ্যসাধন করাইয়াছেন, তাহাতে যেমন তাঁহার অসীম স্বজাতি-প্রীতি ফুটিয়া উঠিয়াছে, পক্ষান্তরে তিনি সেইরূপ ভাস্কর পত্নীর চরিত্র এমন ভাবে গড়িয়াছেন যে, সে ডাকাত হইলেও তাহাকে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি না দিয়া থাকা যায় না, এবং তাহার বিয়োগান্ত প্রেমের সর্ব্বশেষ মর্ম্মান্তিক দৃশ্যে অশ্রু সংবরণ করা কঠিন হয়। গ্রন্থের নায়ক ভাস্কর পাঁড়ে ডাকাত হইলেও স্বদেশপ্রেমিক ডাকাত; স্বদেশের কল্যাণ-কামনায় অর্থ সংগ্রহ করাই তাহার ডাকাতির মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু স্বদেশপ্রেমের অপেক্ষা পত্নী-প্রেম বলবত্তর হওয়ায় সে ডাকাতি ছাড়িয়া সংগৃহীত সমস্ত অর্থ দেশের নামে উৎসর্গ করিয়া পত্নীকে লইয়া দরিদ্র গৃহস্থরূপে সাধুভাবে শান্তিতে বাস করিতে গেল; কিন্তু নাছোড়বান্দা টিকটিকিরা তাহা ঘটিতে দিল না, এবং গ্রন্থের উপসংহার বিয়োগান্ত হওয়া অনিবার্য্য।

সঙ্গীত দর্পণ—প্রথম ভাগ শ্রীযাদবকৃষ্ণ বসু প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র স্বরলিপি সাহায্যে গীতবাদ্য শিক্ষা করিবার পুস্তকের অভাব নাই। এই পুস্তকখানিও সেই ধরণের, তবে ইহার বিশেষত্ব এই যে ইহাতে তবলার ঠেকা সেতারের গৎ এবং অন্য সঙ্গীতের স্বরলিপি সমস্তই একই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বহিখানিতে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট সুর ও তালের হিন্দী গান আছে, কিন্তু গানগুলির অনেক কথা এরূপ অদ্ভুত হিন্দীতে লিখিত হইয়াছে, যে তাহার অর্থোদ্ধার দুঃসাধ্য। স্বরলিপিগুলিতে সম মাত্রা ও তালাঙ্ক ব্যবহার করিয়াই গ্রন্থকার ক্ষান্ত হইয়াছেন, কিন্তু তিনি একটু শ্রম স্বীকার করিয়া রীতিমত মাত্রার তারতম্য হিসাবে গীতগুলির স্বরলিপি দিলে শিক্ষার্থীর শিখিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইত।

সুরের তালিকায়—"কালনেড়া" ও "গোড়সারঙ্গ," দেখিলাম। ইহা কি মুদ্রাকর প্রমাদ? আমরা কালাংড়া ও গৌরসারঙ্গ বলিয়াই এই দুই সুরের নাম জানি।

বহিখানিতে শিখিবার অনেক জিনিষ আছে, এবং যদি কোন গায়ক এই পুস্তকের একখানি গানও নিজের চেষ্টায় সম মাত্রাগুলি বিভাগ বণ্টন করিয়া গাহিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি ঐ একখানি গানেই তাঁহার শ্রোতাদের মুগ্ধ করিবেন।

সাময়িকী

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচন ব্যাপার কতকটা নির্ব্বিবাদে,—কিন্তু সম্পূর্ণ নির্ব্বিঘ্ন নহে,—সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কতকটা নির্ব্বিবাদে এই জন্য বলিলাম যে বাঙ্গলার স্থানে স্থানে নির্ব্বাচন উপলক্ষে লাঠালাঠিও চলিয়াছিল বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। আর নির্ব্বাচন যে সম্পূর্ণ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় নাই, তাহার প্রমাণ,—বেশী দূরে নয়,—২৪ পরগণায় নির্ব্বাচন ক্ষেত্রেই পাওয়া গিয়াছিল; এই নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে অসংখ্য মোটর গাড়ী চলাফেরা করিয়াছিল, এবং একটা বৃদ্ধা না কি একখানি মোটরের তলায় পড়িয়া আত্মবলি দিয়াছে। সে যাহা হউক, যেমন করিয়াই হউক, নির্ব্বাচন ব্যাপার শেষ হইয়া গেল,—তিন বৎসরের জন্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর পাওয়া গেল।

এই সব নির্ব্বাচন ব্যাপার এদেশে এখনও সম্পূর্ণ tame affair, অর্থাৎ খুব মোলায়েম জিনিস। কিন্তু এবার বিলাতে পার্লামেন্টে নির্ব্বাচন উপলক্ষে যে সব কাণ্ড ঘটিয়াছে, এবং তাহার যতটুকু সংবাদ তারে বেতারে এদেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে আক্কেল গুড়ুম হইয়া যায়। সেখানে নির্ব্বাচন উপলক্ষে গুণ্ডামি, দলাদলি পূর্ণ মাত্রায় চলিয়াছিল। ইষ্টক-বৃষ্টি, দরজা জানালা ভাঙা, কুকুর বেড়াল শিয়ালের ডাক, এমন কি মহিলা নির্য্যাতন পর্য্যন্ত অবাধে চলিয়াছিল। অনেক অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা স্বয়ং নির্ব্বাচন-প্রার্থিনীরূপে অথবা স্বামীর বা আত্মীয় স্বজনের সাহায্যকারিণীরূপে নির্ব্বাচন সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের লাঞ্ছনার একশেষ হইয়াছিল। পদাঘাত, গায়ে থুথু নিক্ষেপ, মারপিট কোনটাই বাকী ছিল না। অনেকে আহতাও হইয়াছিলেন। তথাপি, তাঁহাদের অধ্যবসায় ও ধৈর্য্যকে ধন্যবাদ দিতে হয়,—এত কাণ্ডের পরও পুরাতন পার্লামেন্টের তিনজন মহিলা সদস্যার স্থলে নূতন চারিজন ও পূর্ব্ববর্ত্তী তিনজন—মোট এই সাতজন নূতন পার্লামেন্টের মহিলা সদস্যা রূপে নির্ব্বাচিতা হইতে পারিয়াছেন। ক্রমেই যে ইঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। তখন পার্লামেন্টে তাঁহাদের বলবৃদ্ধি হইলে তাঁহারা যে এই নির্য্যাতন লাঞ্ছনার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন, সে পক্ষেও আমাদের মনে একটুও সন্দেহ নাই। নির্ব্বাচন উপলক্ষে পাশবিকতা ও বর্ব্বরতায় মাত্রা এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, অনেকেই মনে করিতেছেন, নূতন পার্লামেন্টের সর্ব্বপ্রথম কাজ হইবে আইন করিয়া এই সকল অত্যাচার নিবারণ করিয়া বৃটিশ জাতি প্রকাশ্য সভা করিবার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখা।

পার্লামেন্ট বা কাউন্সিলের সদস্য নির্ব্বাচন ব্যাপার খাঁটি বিলাতী জিনিস। আসল জিনিস যখন বিলাত হইতেই আসিয়াছে, তখন তাহার আনুষঙ্গিক ব্যাপারগুলি, যথা, গুণ্ডামি, দলাদলি, মহিলা-নির্য্যাতন প্রভৃতিও যে ক্রমে ক্রমে এদেশে আসিয়া উপস্থিত হইবে তাহা বিচিত্র নহে। বিশেষতঃ বিলাতের ন্যায় এ দেশের মহিলারা কিছু কিছু নির্ব্বাচনাধিকার লাভ করিয়াছেন, ক্রমে আরও পাইবেন। এবং আজ হউক বা কাল হউক, তাঁহারাও যে প্রকাশ্যে নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে আসিয়া দেখা দিবেন, এবং কেহ বা ভোটার রূপে কেহ বা নির্ব্বাচন-প্রার্থিনীরূপে নির্ব্বাচন-সমরে যোগ দিবেন তাহাও স্বতঃসিদ্ধ কথা। তখন এ দেশের নির্ব্বাচন ক্ষেত্রগুলির অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইতে পারে, তাহার কল্পনা আর এখন করিয়া কাজ নাই।

এখন নির্ব্বাচন ত হইয়া গেল; কিন্তু তাহার ফলাফল কি দাঁড়াইল? এই সংবাদটি জানিবার জন্য সকলেই বোধ হয় উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছেন। তা ফল মন্দ হয় নাই। এখানকার নির্ব্বাচন ক্ষেত্রেও দলাদলির প্রভাব বড় অল্প ছিল না, এবং সকল দলই নিজের নিজের কোলের

দিকে ঝোল টানিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন; এবং শুনিতে পাই; নির্ব্বাচন যুদ্ধে জয় লাভের জন্য সদসৎ কোন উপায়ই নিন্দনীয় বলিয়া বর্জ্জিত হয় নাই। আমাদের সমাজ ও ধর্ম্মের অবস্থা এবং লোকের মনের গতি বিলাতে যে সকল উপায়ে সিদ্ধিলাভ হয় এখানে তাহার সকলগুলি চলে না। কিন্তু নির্ব্বাচন-পার্থীরা এবং তাঁহাদের দলবল তাই বলিয়া নিশ্চেষ্ট বা নিশ্চিন্ত ছিলেন না,—এখানকার উপযোগী উপায়ও অবলম্বিত হইয়াছিল। ফলে, প্রায় সকলেই মোটামুটি ভোটারদিগকে সশরীরে স্বর্গে তুলিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; কেহ কেহ আকাশের চাঁদ ধরিয়া দিবার প্রলোভন দেখাইতেও ত্রুটি করেন নাই। এইভাবে নির্ব্বাচন কার্য্য শেষ করিয়া ফলাফল এইরূপ দাঁড়াইয়াছে—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার মোট ১৪০জন সদস্যের মধ্যে ২৬ জন সরকারী মনোনীত, এবং বাকী ১১৪জন নির্ব্বাচিত; তন্মধ্যে অমুসলমান ৪৬জন, মুসলমান ৩৯জন, ইয়োরোপীয়ান ৫জন, এ্যাঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান ২জন, জমিদার ৫জন, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ২জন ও শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্র হইতে ১৫জন নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। দলাদলির হিসাবে ২৪জন অমুসলমান ও ১৫জন মুসলমান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ জন—এই ৪০ জন স্বরাজ্য দলভুক্ত। এক তরফা হিসাব। আবার কোন কোন হিসাবে দেখা যায় স্বরাজ্য দলভুক্ত সদস্য সংখ্যা ৫১ জন; এবং ব্যবস্থাপক সভায় মেজরিটি তাঁহাদেরই দিকে। মধ্যে আবার অনেক গণ্ডগোলের কথাও শোনা যায়। অনেকে না কি স্বরাজ্য দলের সাহায্যে নির্ব্বাচিত হইয়া এখন বাঁকিয়া বসিতেছেন; বলিতেছেন, স্বরাজ্য দলের সঙ্গে তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। সে যাহা হউক, নূতন ব্যবস্থাপক সভায় বৈঠক আরম্ভ হইতে ত আর বেশী দেরী নাই। কার্য্যক্ষেত্রে বুঝা যাইবে কে স্বরাজ্যদলের, এবং কে নয়।

এ ত গেল সদস্য নির্ব্বাচনের পালা। ইহার পর আর একটা বড় পালা আসিতেছে। সেটা—মন্ত্রী মনোনয়ন। সে পালাটাও বড় সোজা নয়। বিশেষতঃ মন্ত্রী মনোনয়নের পরই মন্ত্রীদের বেতন নির্দ্ধারণের কথা উঠিবে। গত তিন বৎসর ধরিয়া মন্ত্রীদের বেতন কমাইবার প্রস্তাব লইয়া অনেক আন্দোলন আলোচনা হইয়া গিয়াছে। ব্যবস্থাপক সভাতেও এই আন্দোলনের ঢেউ পৌঁছিয়াছিল। ফলে যাহা হউক একটা সিদ্ধান্তও হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে সমস্তই বৃথা হইবে, কথাটা আবার নূতন করিয়া উঠিবে। ফলে আন্দোলনটাও আবার নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিবে। সুতরাং মন্ত্রী-মনোনয়ন ও মনোনীত মন্ত্রীদের বেতন নিদ্ধারণ না হইয়া গেলে ব্যবস্থাপক সভা সম্বন্ধে শেষ বা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এখনও বহুদূর।

আজ আমরা একজন কৃতি বাঙ্গালী ছাত্রের কৃতিত্বের পরিচয় দিবার সুযোগ লাভ করিয়া আনন্দলাভ করিলাম।

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন মজুমদার

উপরে যাঁহার চিত্র দেখিতেছেন, ইনি শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন মজুমদার এফ-আর-সি-এস (লণ্ডন)। ইনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৯১৯ সালে অস্ত্র চিকিৎসা বিদ্যা (Surgery) গুণপনার নিদর্শন স্বরূপ Mcleod স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। পরে কিছু দিন Prince of wales হাসপাতালের Senior House Surgeon রূপে সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া ১৯২১ সালে

বিলাত যাত্রা করেন। সম্প্রতি তিনি লণ্ডনের Royal College of Surgeonএর fellow হইয়াছেন। এখন তাঁহার উপাধি T. R. C. S. ইনি খুলনা জেলার শ্রীপুর গ্রামের অধিবাসী এবং হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন মজুমদার মহাশয়ের পুত্র। আমরা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

এক সময়ে যে ভারতবাসী নিজেদের জাহাজে পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া বাণিজ্য করিয়া বেড়াইত, সেই ভারতবাসী-দের মধ্যে মুষ্টিমেয় জনকতক লোক এখন জাহাজে খালাসীর কাজ করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া জাহাজ সংক্রান্ত অপর কোন কার্য্যে বা উচ্চপদে ভারতবাসীর নিযুক্ত হইবার সুযোগ নাই। ভারতবাসীকে অতঃপর এই সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে কি না, খালাসীর অপেক্ষা উচ্চতর পদে অর্থাৎ অফিসার, মেট, ষ্টিউয়ার্ড, এঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি পদে ভারতবাসীকে নিযুক্ত করা যাইতে পারে কি না তাহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান, বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত করিবার জন্য বোম্বায়ে ইণ্ডিয়ান মার্কেণ্টাইল ম্যারিণ কমিটির বৈঠক বসিতেছে। ভারতবাসীদের নিজেদের জাহাজ নাই, ভারতের বহির্বাণিজ্য ভারতবাসীর হাতে নাই, সেইজন্য ভারতবাসী নৌবিদ্যা প্রায় ভুলিতে বসিয়াছে। অথচ, এই নৌবিদ্যা না জানা থাকিলে, ভারতবাসী বৈদেশিক বাণিজ্যে পুনরায় নিযুক্ত না হইলে ভারতের সনাতন দারিদ্র্য ঘুচিবে না। কারণ ভারতের কাঁচা মাল বিদেশে পাঠাইতে হইলে বিদেশী বণিকদের জাহাজে মাল চালান দিতে হইবে, এবং তৎপরিবর্ত্তে বিদেশ হইতে তৈয়ারী মাল কিনিয়া তাহাও বিদেশী বণিকদের জাহাজে এদেশে আমদানী করিতে হইবে। অর্থাৎ বহির্বাণিজ্য সম্পর্কিত সকল ব্যাপারেই ভারতবাসীকে পরমুখাপেক্ষী, পরের হাততোলা, পরনির্ভরশীল হইয়া থাকিতে হইতেছে। কোন জাতির পক্ষেই এরূপ অবস্থা সুলক্ষণ নহে। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে। তাহা করিতে হইলে আমাদের নিজেদের জাহাজ চাই, আমাদের নৌবিদ্যা জানা চাই, সম্পূর্ণরূপে ভারতবাসীদের দ্বারা পরিচালিত জাহাজ লইয়া দূর মহাসমুদ্রে যাতায়াত করিতে হইলে যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক—চর্চ্চার অভাবে যাহা আমরা হারাইতে বসিয়াছি, অথবা হারাইয়াছি, সেগুলি আবার আয়ত্ব করিতে হইবে। সমুদ্রগামী জাহাজের কাজকর্ম্ম কতকটা আমাদের হাতে আসিলে আমাদের অন্নসমস্যা অনেকটা সহজ হইয়া আসিবে। কিন্তু এখন যাঁহাদের হাতে ভারতের বহির্বাণিজ্যের ভার আছে, তাঁহারা যে সে ভার আংশিক ভাবেও ভারতবাসীর হাতে ছাড়িয়া দিতে সহজে সম্মত হইবেন না, সে কথা বলাই বাহুল্য। প্রকৃত কথা বলিতে কি, ইণ্ডিয়ান মার্কেণ্টাইল ম্যারিণ কমিটির কাছে তাঁহারা যেরূপ সাক্ষ্য দিতেছেন, তাহা ভারতবাসীর স্বার্থের অনুকূল নহে। তাঁহাদের আপত্তির প্রধান কথাগুলি ভারতবাসীর বিভিন্ন জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম ও সমাজ-সংশ্লিষ্ট। মোটামুটি, তাঁহাদের যুক্তিগুলি নিতান্ত অসার নহে। কিন্তু তাহা হইলে ত চলিবে না। আমাদিগকে এই সকল যুক্তি খণ্ডন করিতে হইবে; কেবল মুখের কথায় নহে, কেবল যুক্তির বদলে যুক্তির অবতারণা করিয়া নহে,—কার্য্যক্ষেত্রে, হাতে হেতেড়ে কাজ করিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে, যে জাহাজের কাজে ভারতবাসীদের নিযুক্ত করিলে, তাহারা জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম ও সমাজ সংক্রান্ত কোন আপত্তি আমলে না আনিয়া সানন্দে সাগ্রহে এই কার্য্যে যোগদান করিতে প্রস্তুত। তবেই এই প্রায়-ভুলিয়া-যাওয়া নৌবিদ্যা পুনরায় আমাদের হস্তগত হইবার আশা আছে। নচেৎ আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, অন্ধকার।

নদীয়ার উঠবন্দী প্রথা বহুদিন হইতেই প্রজার বিশেষ কষ্টের কারণ ছিল এবং ঐ প্রথা উৎপাটনের জন্য পূর্ব্বে বহুবার চেষ্টা হয় কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। পরে নূতন শাসন সংস্কারক আইন অনুসারে অধিক বেসরকারী সভ্য লইয়া ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইলে মিঃ সৈয়দ এরকান আলী সাহেব ব্যবস্থাপক সভার মধ্যে "রায়ত ও শ্রমজীবী সমিতি" গঠিত করিয়া তাহার সভাপতি স্বরূপে কয়েকটী প্রস্তাব পেশ করেন এবং উঠবন্দী প্রথা উঠাইবার প্রস্তাবও তাহার মধ্যে অন্যতম। এই প্রস্তাবগুলির ফলেই বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির প্রস্তাবের মধ্যে উঠবন্দী প্রথা উঠাইবার আইন পাশ হয়। গভর্ণর বাহাদুর সম্প্রতি কৃষ্ণনগরে যাইয়া

বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যবস্থাপক সভায় নদীয়ার প্রতিনিধিগণ উঠবন্দী আইনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে কোন আলোচনা করেন নাই; মিষ্টার এরফান আলী সাহেব রায়তের পক্ষে এই আইন পাশের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। এতদিনে নদীয়ার প্রজাদের একটা মহা অসুবিধা দূর হইল।

বিলাতের সাম্রাজ্য শিল্প প্রদর্শনীতে প্রেরণের উপযুক্ত দ্রব্যনির্ব্বাচনের উদ্দেশ্যে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে একটী করিয়া প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইতেছে। সে দিন বঙ্গের লাট লর্ড লীটন বাহাদুর কলিকাতা গড়ের মাঠে ইডেন উদ্যানে এইরূপ একটী প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। এই প্রদর্শনীতে দ্রষ্টব্য দ্রব্যাদি কি পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছে ও হইবে তাহা এখনও নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না, কারণ, এখনও সকল স্থান হইতে সকল জিনিস প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছায় নাই; তবে দেশী বিলাতী নাচ তামাসার বিরাট আয়োজন হইয়াছে, তাহা প্রদর্শনীর বিস্তারিত বিবরণ ও বিজ্ঞাপন দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়; এবং প্রদর্শনী দেখিবার জন্য যত না হউক নীচ তামাসার আমোদ উপভোগ করিবার জন্য বেশী লোক প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে গমন করিতেছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। আমরা অবশ্য নাচ তামাসার বিরোধী নহি; কিন্তু এত বড় একটা ব্যাপারে লোকশিক্ষার যে সুযোগ রহিয়াছে, সেটা উপক্ষিত না হয় তাহাও দেখিতে হইবে। আমাদের মনে হয়, প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে দর্শকগণের সমক্ষে প্রদর্শকেরা তাঁহাদের দ্রব্যাদির গুণাগুণ, প্রস্তুত-প্রণালী ও ব্যবহার-প্রণালী ব্যাখ্যা করিবার এবং demonstrate করিবার ব্যবস্থা করিলে, এই মহৎ অনুষ্ঠানটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে; এবং দর্শকেরাও যথেষ্ট উপকৃত হইতে পারে, তাহাদের অর্থব্যয়ও সার্থক হইতে পারে।

কলিকাতার খৃষ্টীয় মিশনারী কনফারেন্স ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বাঙ্গলা সাহিত্যে পরীক্ষা গ্রহণের একটী অভিনব প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিতেছেন। এই পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত একটী নিয়মাবলীর প্রতিলিপি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। কয়েকটি নিয়ম ও পরীক্ষার প্রণালী আমাদের অতি সুন্দর বলিয়া বোধ হইল। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সংবাদপত্র ও মাসিকপত্র হইতে প্রশ্ন নির্দ্ধারিত হওয়ায় ব্যবস্থা যেমন অভিনব তেমনি শিক্ষাপ্রদ বলিয়া মনে হইতেছে। দৈনিক না হউক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রগুলিতে শিক্ষণীয় বিষয় যথেষ্ট থাকে; কিন্তু পরীক্ষা দিবার জন্য কেহ কোন কালে সাময়িক পত্রাদি পাঠ করেন কি না তাহা আমরা জানি না। সাধারণতঃ লোকে দৈনিক সংবাদগুলি জানিবার জন্য, কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য এবং কিঞ্চিৎ আমোদ লাভ করিবার জন্যই দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্র পড়িয়া থাকে। যদিও তাহারা তাহাদের অজ্ঞাতসারেই কিছু না কিছু নূতন নূতন শিক্ষালাভ করিয়া থাকে, তথাপি সে শিক্ষার পরিমাণ যৎসামান্য, এবং তাহাও বোধ হয় স্থায়ী হয় না। কিন্তু স্কুল বই পড়ার মত করিয়া কেহ যে সংবাদপত্র বা মাসিকপত্র পড়েন না, অর্থাৎ Study করেন না, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। আমাদের বোধ হয় যাঁহারা কলিকাতা খৃষ্টীয় মিশনারী কনফারেন্সের পরীক্ষা বোর্ড কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত পরীক্ষা দিতে চাহিবেন, তাঁহাদিগকে অতঃপর অন্ততঃ একখানি সাপ্তাহিক ও একখানি মাসিকপত্র নিয়মিত ভাবে Study করিতে হইবে। তাহার ফলে লোকশিক্ষার প্রসার যে অনেকটা বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে আমাদের মনে লেশমাত্র সন্দেহ নাই।

সেদিন শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের এক সভায় ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ইংরেজী পাস বিষয়ের নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তনমূলক প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। ইংরেজীর পাঠ্য বিষয়:—১। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থিগণ শুদ্ধ, প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় ইংরেজী লিখিতে এবং আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ লেখকদের প্রবন্ধ বুঝিতে পারে কি না, তাহাই পরীক্ষা করা হইবে। 'বোর্ড অব ষ্টাডিস্' কর্ত্তৃক অনুমোদিত ইংরেজী পদ্য ও গদ্য রচনাসম্বলিত সিণ্ডিকেট

কর্তৃক নির্ব্বাচিত পুস্তক পাঠ করিতে হইবে। ইংরেজী পরীক্ষায় এক পেপারে (1st paper) ভারতীয় ভাষা-সমূহ হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ করিতে হইবে। নির্ব্বাচিত পুস্তকসমূহ হইতেও প্রশ্ন থাকিবে। ব্যাকরণ রচনা ও অন্যান্য বিষয়সমূহও থাকিবে। ইংরেজীর প্রথম পেপারে (1st paper) মাতৃভাষা হইতে ইংরেজীতে অনুবাদের জন্য ৫০ নম্বর ও রচনার জন্য ৩০ নম্বর এবং গ্রামারের জন্য ২০ নম্বর; দ্বিতীয় পেপারে (2nd paper নির্ব্বাচিত পুস্তক হইতে ৫০ নম্বর ও অপঠিত বিষয়সমূহের জন্য ৫০ নম্বর থাকিবে। বর্ত্তমান প্রণালীতে ছাত্রদের ইংরাজীতে আশানুরূপ জ্ঞান হইতেছে না দেখিয়া এইরূপ পরিবর্ত্তন হইল।

"বুদ্ধ-গয়ার বৌদ্ধ-মন্দিরটি হিন্দুদিগের হাত হইতে ফিরাইয়া লইবার জন্য ভারতবর্ষের বৌদ্ধরা কিছুদিন হইতে আন্দোলন সুরু করিয়াছেন। বৌদ্ধরা বলেন যে, এই মন্দিরটি বৌদ্ধদের। মন্দিরটি বাস্তবিক পক্ষে কাহাদের—সে বিষয়ে সঠিক কিছু জানা যায় না। যদি তাহা বৌদ্ধদেরই হয়, তবে তাহা হিন্দুদের কবলে গিয়া পড়িল কি করিয়া, এবং তাহা বৌদ্ধদিগের হাতে ফিরাইয়া দিতে কি বাধা আছে, সে সম্বন্ধে সরকারী কোনো মন্তব্য আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। মান্দালয়ের আরাকান প্যাগোডার ট্রষ্টীরা এবং মান্দালয়ের বৌদ্ধ-অধিবাসিগণ স্থির করিয়াছেন যে, লর্ড রেডিং সেখানে উপস্থিত হইলে তাঁহারা এই সম্বন্ধে তাঁহার নিকট এক আবেদন করিবেন। হয় তো এবার একটা পাকা কথা শুনিতে পাওয়া যাইবে।"

কয়েক দিন পূর্ব্বে ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের একটি বিরাট স্মৃতিসভা হইয়াছিল। সভায় এত লোকের সমাবেশ হইয়াছিল যে, হলের ভিতর স্থান না হওয়ায় কলেজ স্কোয়ারে স্বতন্ত্র একটী সভার অধিবেশন করিতে হয়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আচার্য্য রায় মহাশয় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, অশ্বিনীকুমার নৈতিক চরিত্রের দ্বারা সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গকে অভিভূত করিয়াছিলেন। তাঁহার এত ব্যক্তিত্ব ছিল যে, দোকানদারেরা পর্য্যন্ত তাঁহার অনুমতি না লইয়া কোন বিলাতি দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে নাই। শ্রীযুত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন, আজ সকল সম্প্রদায়ের লোক অশ্বিনীকুমারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতেছেন ইহার দ্বারা সূচিত হইতেছে যে বাঙ্গালী আজ সকল প্রকার বিদ্বেষ-বুদ্ধি জলাঞ্জলি দিয়াছে। অশ্বিনীকুমার যুবকগণের চরিত্র গঠনের জন্য আজীবন নিজের জীবনের আদর্শ দ্বারা চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলেন, অশ্বিনীকুমার দেশ-মাতৃকাকে ভালবাসিতেন, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতে হইলে দেশ মাতৃকাকে ভালবাসিতে হইবে। শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল বলেন, অশ্বিনীকুমারের স্মৃতি তবেই রক্ষিত হইবে যদি তাঁহার শ্মশান ভস্ম হইতে বাঙালী যুবকগণের হৃদয়ে নূতন তেজের সঞ্চার হয়। শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় বলেন, আজিকার এই বিরাট ও বিপুল জনসঙ্ঘ দেখিয়াই বোধ হইতেছে, দেশের লোকের হৃদয়ে অশ্বিনীকুমারের কতটা স্থান ছিল। তারপর আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রকে সভাপতি করিয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটি অশ্বিনীকুমারের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবেন।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "দুরন্ত দেবতা" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রণীত "ঝড়ের পাখী" প্রকাশিত হইল। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

আট আনা সংস্করণের ৯৪ সংখ্যক পুস্তক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত "সাধে বাদ" প্রকাশিত হইল। মূল্য ।০ আট আনা।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত "অমূল তরু" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নূতন গীতাভিনয় "রাজা যদুমল্ল" প্রকাশিত হইল। মূল্য ১৷০ দেড় টাকা।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত নূতন উপন্যাস "ভুলভাঙ্গা" প্রকাশিত হইল। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত প্রণীত "পুরাতন প্রসঙ্গ" দ্বিতীয় পর্য্যায় প্রকাশিত হইল। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "নদের নিমাই" প্রকাশিত হইল। মূল্য ২৲ দুই টাকা।
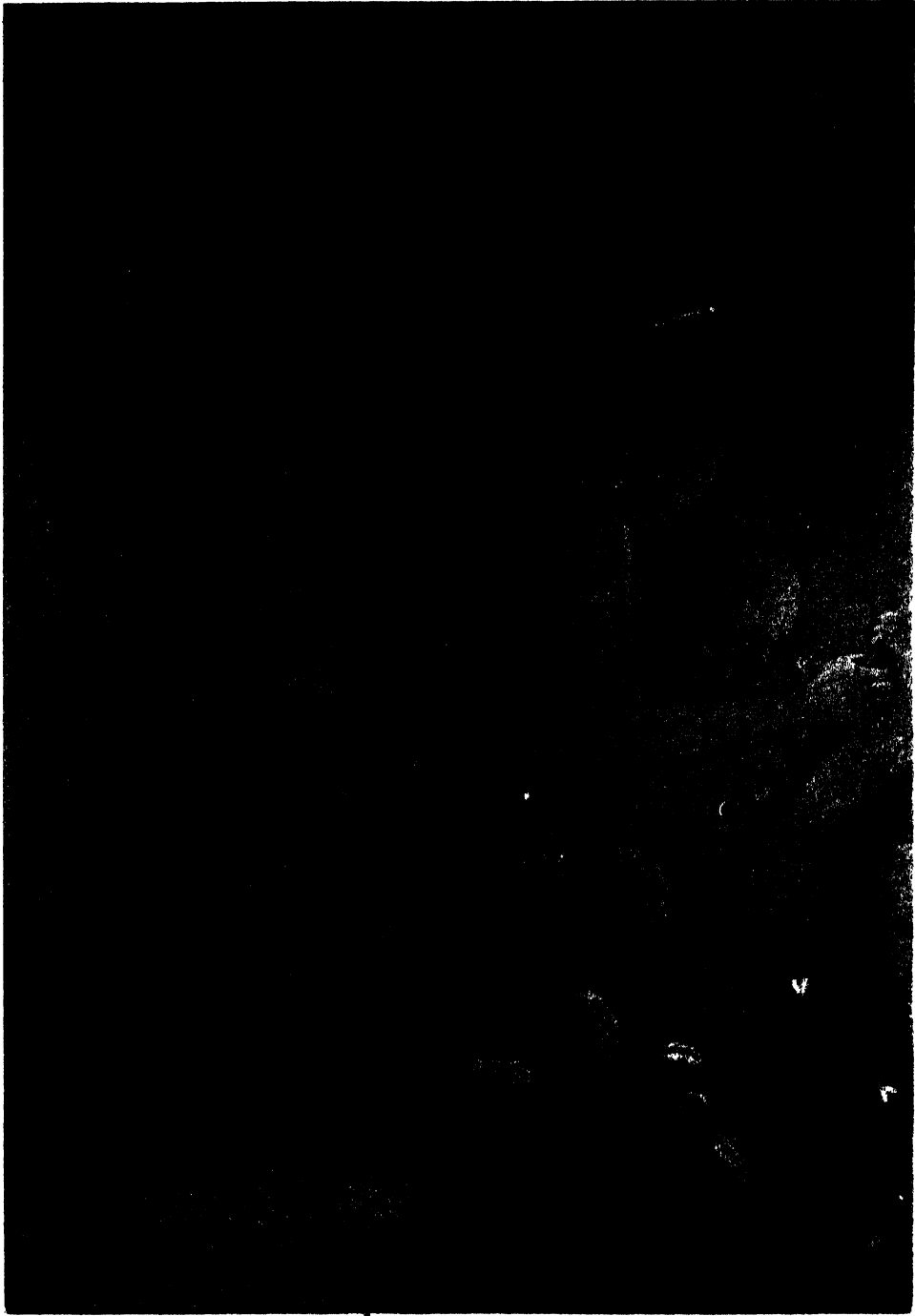
blisher—**Sudhanshusekhar Chatterjea,**
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—**Narendranath Kunar,**
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street. CALCU

জীবনের বোঝা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মিত্র মহাশয়ের সৌজন্যে

BHARATVARSHA HALFTONE & PRINTING WORKS

মাঘ, ১৩৩০

দ্বিতীয় খণ্ড | একাদশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

শ্রীযুক্ত এফ, সি, মানুক বার-এ্যাট্-ল

ভারতীয় চিত্রবিদ্যা *

অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

আপনাদের এই বিবার ও উড়িষ্যা প্রত্নতত্ত্ব—সমিতির সহকারী সভাপতি স্যার বসন্ত মল্লিক যখন আমাকে ভারতীয় চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে অভিভাষণ পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করেন, তখন আমি দুইটী কারণে ইতস্ততঃ করিয়াছিলাম। প্রথমতঃ, আমি কোন দিন এরূপ ভাবে বক্তৃতা করি নাই; বিশেষতঃ, তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত এরূপ সদস্যগণের সম্মুখে গুরুতর বিষয়ে মতামত প্রকাশ বিশেষ সাবধানতার সহিতই করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, যদিও শত সহস্র চিত্র আমি ভারতবর্ষ, পারিস ও লণ্ডনে দেখিয়াছি, ও নাড়াচাড়া করিয়াছি, এবং এই সম্বন্ধীয় তথ্যও সংগ্রহ করিয়াছি, তথাপি আমি সকল বিষয় এখন পর্য্যন্ত সুবিন্যস্ত করিতে সমর্থ হই নাই। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টী অত্যন্ত তর্কবহুল এবং তজ্জন্যই আমি বক্তৃতা দিতে অত্যন্ত দ্বিধা বোধ করিয়াছিলাম। যাহা হউক, এরূপ বিষয়, এরূপ পণ্ডিতগণের

* বিহার ও উড়িষ্যা প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান সমিতির বাৎসরিক অধিবেশনে ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত পি, সি, মানুকের অভিভাষণ।

সম্মুখে পর্য্যালোচনা করিলে, আমার যতই ক্রটী থাকুক, বিষয়টী অধিকতর পর্য্যালোচিত হইবে বিবেচনায়, আমি আমার বক্তব্য আপনাদের সম্মুখে সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

প্রারম্ভেই আমি বলিতে পারি যে, বিষয়টী পাটনার ন্যায় স্থানেই আলোচিত হইবার যোগ্য। যে খুদাবক্স পাঠাগারে অমূল্য চিত্র সংগৃহীত ও রক্ষিত হইয়াছে, তাহা এই পাটনা শহরেরই অন্তর্ভূক্ত; আপনাদের অনুমতিক্রমে আমি আমার চিত্রাবলীর কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে পারি। প্রকাশ্য সভায়, আমি আমার পরলোকগত বন্ধু খানবাহাদুর খুদাবক্সের অমূল্য সংগ্রহ ও তাহা সাধারণের ব্যবহারার্থ প্রদানের কথাও এ স্থানে ব্যক্ত করিতে পারি। ব্যক্তিগত ভাবে আমি তাঁহার পুত্র খুদাবক্সের নিকট হইতে চিত্র সংগ্রহে যে সাহায্য পাইয়াছি, তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতেছি।
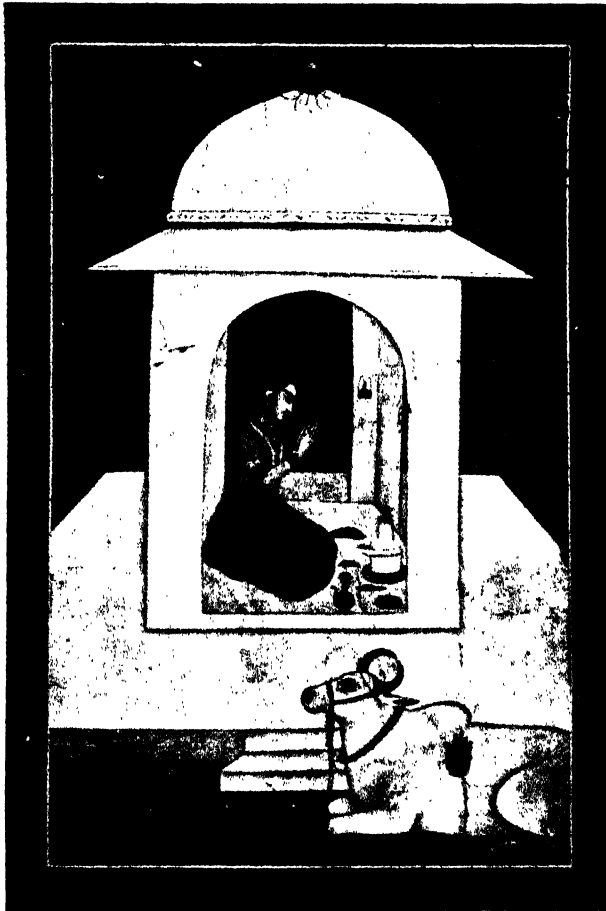
মন্দির ও শ্বেত মার্ব্বেল-প্রস্তর নির্ম্মিত চত্বর

ভারতীয় চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বেই, যে সকল শ্রোতা পাশ্চাত্য মত পোষণ করেন, তাঁহাদিগকে আমি সাবধানতার সহিত আমার মতামত আলোচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি। তাঁহারা গ্রীক বা রোমের মতের অনুসরণ করিয়া প্রাচ্য চিত্রকলা সম্বন্ধে যে বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন, তাহা যেন পরিত্যাগ করেন। ইতিমধ্যেই সভ্য জগৎ এই চিত্রপদ্ধতি যে উচ্চশ্রেণীর, তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। আমি এই সকল পারসীক ও ভারতীয় চিত্রসমূহের মধ্যে বাস করিয়া নিশ্চিন্ত মনে এবং অকপট চিত্তে বলিতে পারি যে, তাহারা নিঃসন্দেহে পশ্চিমাঞ্চলের সভ্যতা ও আদর্শ-পুষ্ট চিত্রাপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে।

আমি যদ্দুর অবগত আছি, তাহা হইতে অনুমান করিতে পারি যে, খৃষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর অজন্তা চিত্রের সময় হইতে পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দীর ইণ্ডো-পারসীক বা মুগল চিত্রের মধ্যবর্ত্তী যুগের কোন চিত্রের নিদর্শন আমরা দেখিতে পাই না। অজন্তা ও অন্যান্য গুহামধ্যস্থ চিত্রগুলি যে শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীত হইলেও সুরক্ষিত অবস্থায় আছে, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তাহারা পর্ব্বতগাত্রে, কন্দর মধ্যে সুচিত্রিত হইয়াছিল। প্রাসাদ, মন্দির এবং এইরূপ স্থান-সমূহের চিত্রগুলি সাধারণতঃ আক্রমণকারীর হস্তে লুণ্ঠনের সামগ্রী হইয়াছিল। অবশ্য ঋতুর প্রভাবও ইহাদের পরিবর্ত্তনে সহায়তা করিয়াছিল। মুগল-যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে যবদ্বীপ ও এসিয়ার অন্যান্য জনপদসমূহের প্রচলিত সংস্কৃত চিত্রলিপি বা চিত্রিত পাণ্ডুলিপির কথা এস্থলে আমি উল্লেখ করিতেছি না। স্যার ওরিয়েল ষ্টীন্ এবং অন্যান্য আবিষ্কারক-গণ আবিষ্কৃত মধ্য-এসিয়ার চিত্রের কথাও আমি উল্লেখ করিতেছি না। মিঃ ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ তাঁহার পুস্তকে উল্লিখিত কোন কোন ছবির প্রতিলিপি প্রদান করিয়াছেন; এইগুলির সহিত অজন্তা চিত্রের বিশেষ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

সকলেই ইহা অবগত আছেন যে, আকবরের পিতা বাবর অনেকগুলি চিত্রকরকে চিত্রাঙ্কনে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদিগের পোষণ করিতেন। বাবর সুবিখ্যাত পারসিক

হর-ধনুর্ভঙ্গ

ঝুলন

মানভঞ্জন

চিত্রকর বিহ্জাদের সমসাময়িক ছিলেন। নিরক্ষর কিন্তু সুপণ্ডিত আকবরই মুগল চিত্রবিদ্যার প্রথম এবং প্রধান প্রতিপোষক ছিলেন; এবং তিনিই মুগল চিত্রবিদ্যায় উৎসাহ প্রদান করেন। জাহাঙ্গীরও চিত্রকলার প্রতিপোষক ছিলেন এবং তাঁহার সময়ে চিত্রকরগণ বিশেষ উৎসাহ পাইতেন। তাজনির্ম্মাতা শাহজাহানের সময়েই মুগল চিত্রবিদ্যা উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসী চিত্রকর রেম্ব্রাণ্ডই এই সকল চিত্র অম্লানবদনে নকল করিয়াছিলেন। কর্তৃক চিত্রিত—দৃষ্টে চীনের প্রভাবের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এবং তদ্দৃষ্টে পূর্ব্বোক্ত মত গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না।

সে যাহাই হউক, পারসীক চিত্রবিদ্যা ভারতবর্ষে আসিয়া নূতন আদর্শের সংস্রবে নব কলেবর প্রাপ্ত হইল। মুগল চিত্রবিদ্যায়, বিশেষতঃ দরবার চিত্রে, যতই আড়ষ্টভাব থাকুক না, ক্ষুদ্রাকারের চিত্রগুলি যে চক্ষুর আনন্দ বর্দ্ধন ও তৃপ্তি-সাধন করে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। একাধিক চিত্রকর যে একখানি চিত্র রচনার সহায়তা করিত, ইহার

হরধনুর্ভঙ্গ—আর একটী দৃশ্য

মুগল চিত্রপদ্ধতি সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, ইহা পারস্যে উদ্ভূত এবং পরে ইহা ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পারসিকগণ নিঃসন্দেহে এই বিদ্যা চীনদেশীয় চিত্রকরগণের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিল। অনেকে এই মত পোষণ করেন না। তাঁহাদের মতে পূর্ব্বপারস্যের চিত্রবিদ্যাই চীন হইতে উদ্ভূত, পশ্চিম পারস্যের সহিত চীনের কোন সম্পর্ক ছিল না। খুদাবক্স লাইব্রেরীর শাহনামার প্রথম পৃষ্ঠার চিত্রটী, যাহা সম্ভবতঃ বিহ্জাদ প্রমাণ পাওয়া যায়; তবে, এ কথা মুগল বাদশাহগণের উৎসাহে অঙ্কিত সুবৃহৎ চিত্র সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইতে পারে। পক্ষান্তরে, মুগল রাজত্বের মধ্য ও শেষ যুগের অনেক চিত্র যে সম্পূর্ণ ভারতীয় তাহা বলা যাইতে পারে। কোন কোন সমালোচক ইহা হইতেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মুগল চিত্রকলা-পদ্ধতি সম্পূর্ণই ভারতীয়। কিন্তু, এরূপ সিদ্ধান্তের কোন ভিত্তি নাই, এবং ভারতবর্ষের এরূপ দাবী করিবার কোন প্রয়োজনীয়তাও নাই। প্রকৃত-

পক্ষে, পারসিক্ চিত্রকরগণ হিন্দুচিত্রকরগণের সহিত এক-ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে করিতে ভারতীয়-পদ্ধতিতে অসম্পূর্ণ-রূপে অভ্যস্ত হইয়া উহাই গ্রহণ করে। পারসিক চিত্রকর-তাহারা তাহাদের চিরন্তন পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া জন্তু ও মনুষ্য অঙ্কিত করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এগুলি চক্ষুর তৃপ্তি সাধন বা মনে আনন্দ প্রদান করে না। হিন্দুচিত্রকর-

দোললীলা
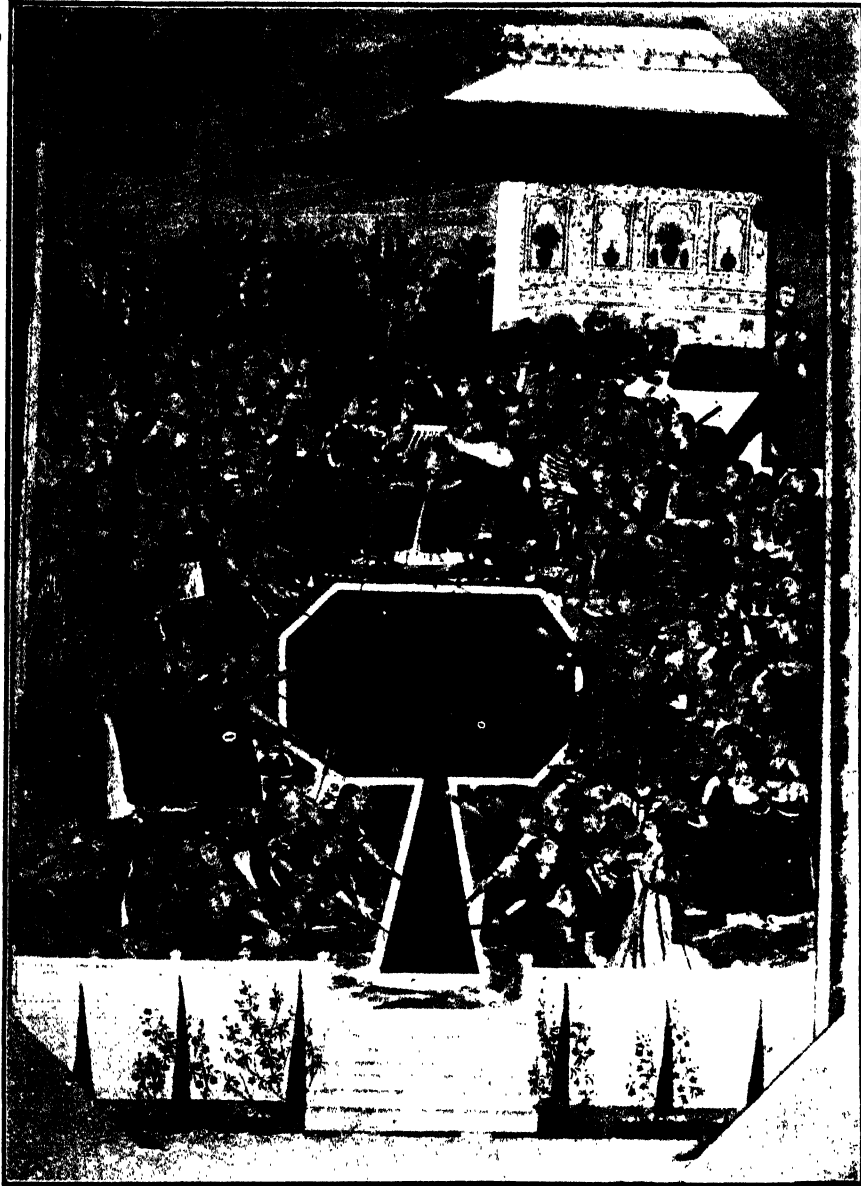
গণ সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সুন্দর হস্তলিপির উন্নতি সাধন করে। তাহারা এই লিপি সুচিত্রিত করিতে আরম্ভ করে। ফলে, এইগুলিও সুন্দর চিত্রে পরিণত হয়। তৎপরে গণের এরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না। তাহাদের দেব-দেবীর চিত্রসমূহ তাহাদের নিকট জীবন্ত মূর্ত্তি ছিল। ইহারই ফলে হিন্দুচিত্রকরগণ কর্ত্তৃক চিত্রসমূহ আত্মার তৃপ্তি

সাধনে সমর্থ হইত। ইতিমধ্যে এক নূতন সম্প্রদায় উদ্ভূত হইল ;—অন্য নামের অভাবে ইহাকে রাজপুত চিত্রপদ্ধতি আখ্যা দেওয়া হইল। এইগুলি বর্ণচিত্রে অপেক্ষাকৃত মধুর এবং প্রথম চিত্রাপেক্ষা অধিকতর পবিত্র। উজ্জ্বলতায় এগুলি হীন হইলেও এগুলি নয়নানন্দকর। এই শ্রেণীর চিত্রসমূহে চিত্রকরের দস্তখত প্রায়শঃই দেখা যায় না এবং চিত্রের সময় নির্ণয়ে কষ্ট পাইতে হয়।

অতঃপর, কাংড়াচিত্র পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা যাইতে মধ্যে এরূপ চিত্র আছে, যাহাকে দিল্লী, বা জয়পুর বা রাজপুত বা 'কাংড়া—ইহার কোন পদ্ধতিভুক্ত করা যায় না।

অতঃপর, পাটনার চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি আলোচিত হইতে পারে। গত শতাব্দীর শেষভাগে এই চিত্রকলা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস, পাটনা সহরের দুইজন ধনী ও চিত্রপ্রিয় জমিদারের অনুগ্রহেই ইহা সম্ভবপর হইয়াছিল। তাঁহাদের মৃত্যু হইলে, চিত্রকরগণ পাটনা ত্যাগ

মুসলমান সমাজের বিবাহ উৎসব

পারে। ১৭৬০ হইতে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে পর্য্যন্ত এই চিত্রকরগণের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মোলারামের সময় নির্ণয় করা হয়। গঙ্গা নদীর অন্যতম শাখা অ কানন্দার তীরস্থ ঘাড়োয়ালে তিনি প্রাচুর্ভূত হইয়াছিলেন। এই চিত্রকর ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দের অঙ্কিত চিত্রগুলি বড়ই সুন্দর। হিন্দু পৌরাণিক চিত্রগুলি অঙ্কন করিতে ইঁহারা সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

আমার ইহাও বোধ হয় যে, বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। কারণ, আমার সংগ্রহের করিয়া কলিকাতা ও অন্যত্র গমন করেন ; এবং এই সকল চিত্রকরগণের অন্যতম বংশধর ঈশ্বরী প্রসাদ বর্ত্তমানে কলিকাতা আর্টস্কুলের সহকারী অধ্যক্ষ। ইনি একজন সুবিখ্যাত চিত্রকর।

কিন্তু, এই সকল চিত্রকর তাঁহাদের বঙ্গীয় সহযোগিগণের ন্যায় বঙ্গীয় চিত্রকলা-পদ্ধতিভুক্ত হইয়াছেন। পৃথিবীখ্যাত শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অভয় কবচে সুরক্ষিত হইয়া ইঁহারা চিত্রাঙ্কনে রত। পাটনার শ্রীযুত

প্রফুল্লরঞ্জন দাশ জজমহাশয়ের নিকট এই চিত্রকলান্তর্গত অনেক চিত্র ও আমার নিকটেও কয়েকখানি চিত্র আছে। এই পদ্ধতির অনুরক্ত ব্যক্তিগণ বলিবেন যে, এই শ্রেণীর চিত্রকরগণ প্রকৃতির উচ্চাঙ্গ প্রকাশ করিতেই রত। সমালোচক বলিবেন যে, ইঁহাদের চিত্রে ভগবানের সহিত জীবের প্রত্যক্ষ যোগের নিগূঢ়তা প্রকাশের ব্যর্থ প্রয়াস দৃষ্ট হয়। বঙ্গে চিত্রাঙ্কন পদ্ধতিতে যে বৈদেশিক ভাবের আধিক্য প্রবেশ করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; এবং আমি এই আতিশয্যের নিন্দা করি। ভারতবর্ষ অতীত কালে যাহা করিয়াছে, আমি তাহার একান্ত অনুরক্ত; এবং জাপান ও য়ুরোপীয় পদ্ধতির সহিত সহানুভূতি আমার নাই। আমি আপনাদিগকে যে চিত্র দেখাইতেছি, তদ্দৃষ্টেই আপনারা দেখিতে পাইবেন যে, ভারতবর্ষের অতীত গৌরব-স্মৃতির অনুসরণই কর্ত্তব্য।

তাঞ্জাম আরোহণে সম্রাট

[পাটনার সুবিখ্যাত ব্যরিষ্টার শ্রীযুত পি, সি, মানুক মহাশয় যে চিত্রসমূহ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার মূল্য ন্যূনকল্পে পাঁচ লক্ষ টাকা। এই চিত্র সম্বন্ধে তিনি বিহার ও উড়িষ্যার প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান-সমিতির বাৎসরিক অধিবেশনে যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাঁহারই অনুরোধে আমরা তাহার অনুবাদ প্রদান করিলাম; এবং সঙ্গে সঙ্গে কয়েকখানি ছবির প্রতিলিপি প্রদান করিলাম। অবশ্য প্রতিলিপিতে মূল ছবির আদর্শ কিছুই পাওয়া যায় না। শ্রীযুত মানুক মহাশয় "পাটনার চিত্র" Art Treasures of Patna) নামক আমার পুস্তকের ও এই প্রবন্ধের জন্য ছবি প্রকাশের যে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য এইস্থানে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।—অনুবাদক।]

দানের মর্য্যাদা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(৩)

"এদিকে আয় ঊষা, চট করে চুলটা বেঁধে দেই।"

ঊষা তখন লেস বুনিতেছিল, মুখ তুলিয়া হাসিয়া বলিল, "অত তাড়াতাড়ি কিসের দিদি? থাক না, বিকেলে বেঁধে দিয়ো'খন।"

উমা একটু হাসিয়া বলিল, "বিকেলে যে আসবে তারা দেখতে! আর বিকেলের দেরীই বা কত? তিনটে বেজে গ্যাছে, দেখছিস্ নে, রোদ কোথা চলে গ্যাছে।"

ঊষা নতমুখে বুনিতে বুনিতে বলিল, "থাক না দিদি, দেখতে আসবে তা আবার সেজে গুজে—"

"যা, যা, নেকামো করিস নে, নে, রাখ ওগুলো—"

ঊষার হাত হইতে সূতার গুটি ক্রুশ টানিয়া ফেলিয়া উমা তাহার মাথা লইয়া বসিল।

"আহা, কি তুই হয়েছিস বল দেখি ঊষা! চুলগুলো—তা একটু যত্ন নেই; কাপড়খানা—তা যা তা হলেই হল। তোর কি কিছু নেই, কিছু পরতে পাস নে? তোর মত মেয়েরা কেমন চুলের ফ্যাসান করে, কেমন গুছিয়ে কাপড় পরে, আর তুই হয়েছিস যেন একটা হাবা, কিছু যদি বুঝিস।"

ঊষা হাসিল। তখনি আবার গম্ভীর হইয়া বলিল "কি হবে?"

উমা। কিসের কি হবে?

ঊষা বলিল "এই চুল বেঁধে কি ভাল কাপড় পরে?"

উমা রাগের ভাব দেখাইয়া বলিল "হয় আমার মাথা আর মুণ্ডু।"

ঊষা হাসিয়া দিদির হাতখানায় একটু নাড়া দিয়া বলিল "রাগ কর না দিদি, মাইরি, আমি মিথ্যে বলছি নে। ভাল করে চুল বেঁধে, কাপড় পরে কি হবে, তা তো জানি নে। দিন এমন ভাবেও তো কেটে যায়, তবে—"

বাধা দিয়া উমা বলিল "দিন সব ভাবেই তো কেটে যায় ঊষা! তবু ভাল আর মন্দ। সব থাকতেও থাকিস কেন একটা চাষার মত। চিরদিন এমনি ভাবটা রাখতে পারিস, তবে তো বুঝি। যে ঘরে যাবি, সে আবার তেমনি ঘর। সেই বিলাসিতার মাঝে যদি ঠিক থাকতে পারিস, তবেই বুঝব।"

পিসীমা আসিয়া বসিলেন; বলিলেন "হ্যাঁরে উমা, তারা শুনছি না কি খিষ্টেন? তারা না কি সব খায়, মেয়েরা না কি জুতো পরে। অমর জেনে শুনে এই খিষ্টেনের ঘরে মেয়েটা দেবে,—বাপ হয়ে মেয়েটাকে এমন করে মাটী করবে?"

উমা ঊষার বেণী জড়াইয়া দিতে দিতে বলিল, "কে

বললে তারা খৃষ্টান ঠাকুরমা? খৃষ্টান হলে কি হিন্দুর ঘরে হিন্দু মতে বিয়ে করতে পারে? আমাদের যেমন সমাজ আছে, সব জাতের মধ্যেও তেমনি একটা সমাজ আছে। তোমাকে কে এই মিথ্যে কথাটা বলেছে বল দেখি?"

বগলা দেবী বলিলেন "আর দিদি—সব্বাই বলছে। কেউ একলা বললে তার নামটা না হয় করা যেত। একলার মুখ ছাপানো যায়, একশ লোকের মুখ বন্ধ করা কি সোজা কথা? একলা কেউ যদি এ কথাটা বলত, তোর ঠাকুরমা কি এমনি আস্তে-আস্তে ঘরে ফিরে আসত? আচ্ছা, খিষ্টেন তো নয়, কিন্তু তাদের বাড়ীর মেয়েরা সব নাকি জুতো পায় দেয়, সব যায়গায় বেড়ায়? যার সঙ্গে বিয়ের কথা হচ্ছে, তারই একটী বোন আছে, সে না কি কলেজে পড়ে, বোর্ডিং না কি—সেখানে থাকে? এতগুলো কথা—আমি তাই ভাবছি, একটা কথা না হয় মিথ্যে হতে পারে, এতগুলো কথা কি মিথ্যে হতে পারে?"

উমা একটু থামিয়া বলিল, "আমি বলি সেটা মন্দ কি ঠাকুরমা? লেখাপড়া সবাই জানেন, জ্ঞান আছে, ধর্ম্ম আছে—"

বাধা দিয়া মুখ বিকৃত করিয়া বগলা দেবী সরোষে বলিয়া উঠিলেন, "আমার মুণ্ডু আছে। মেয়েটাকে তুই আর তোর বাবা হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে চাস—দে গিয়ে। আমার কি, আমার মত তো কেউ নিবিনে তোরা, নিজেরাই যে লায়েক হয়েছিস। যাক, আমি এই আসছে দোল-পূর্ণিমাতে কাশী চলে যাব। স্বচ্ছন্দে থাকতে পারব, কারও ভাবনা ভাবতে হবে না।"

রাগ করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

উষার চুল বাঁধা তখন শেষ হইয়া গিয়াছিল। সে ফিরিয়া দিদির চোখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, "না দিদি, ওখানে আমার বিয়ে হতে পারবে না।"

উমা বলিল, "কেন রে?"

উষা বলিল, "আমি তাদের ঘরে থাকতে পারব না। তারা যা তা খাবে, আমাকেও তাই খেতে হবে তো! তারা জুতো পরবে, আমাকেও তাই পরতে হবে। আমি যা তা খেতে পরতে পারব না। না দিদি, কক্ষনো ওখানে আমার বিয়ে হতে পারবে-ই না। তুমি বাবাকে বলে দিয়ো—"

উমা শান্তকণ্ঠে বলিল, "সেজন্যে তোর আমার মাথা ঘামানোর কি দরকার উষা? বাবা রয়েছেন, তিনিই দেখবেন শুনবেন। তুই যে বলছিস, তুই বিয়ে করতে পারবি নে, এই কথাটা বাবাকে জানাতে, ছিঃ, এ কথা কি জানানো যায় বাবাকে? বাবা কি ভাববেন বল দেখি এই কথা শুনলে? ভাববেন, আজকালকার মেয়েগুলো এমনই হয়েছে যে, নিজেদের বিয়ের কথাও বাপ-মাকে জানাতে একটু লজ্জা বোধ করে না।"

পিতার সেই ভাবনার মূর্ত্তিটা কল্পনায় মনে আনিতে বালিকা উষার গণ্ড-কর্ণ আরক্ত হইয়া উঠিল। সে বলিয়া উঠিল, "সত্যি দিদি, আমি তা একটুও ভাবিনি কিন্তু। ভাগ্যিস মনে করিয়ে দিলে তুমি, নচেৎ কি হতো।"

তাহার পাগলামীর কথা শুনিয়া উমা একটু হাসিল। সযত্নে তাহার ললাটের উপর পতিত একটা চুল সরাইয়া দিয়া বলিল, "আর সত্যি বাবার যতটা জ্ঞান, যতটা বুদ্ধি, তা কি আমাদের একটুও আছে? বাবা আমাকে বলছিলেন, কি করি। আমি বললুম,—যদি উষার ক্ষমতা থাকে, সে তাদেরই ফিরিয়ে স্বধর্ম্মে আস্থা আনাতে পারবে। বাবা শুনে খানিকটে ভেবে বললেন, তবে এখানেই ঠিক করি। সত্যি উষা, তোর মনের যদি জোর থাকে, তবে যেখানে তুই আছিস সেখানেই থাকবি, কেউ তোকে এক চুল সরাতে পারবে না। বরং যারা দূরে আছে, তারাই তোর কাছে সরে আসবে। তুই ছেলেমানুষ, সংসারের কি-ই বা জানিস। ভগবানের ওপরে বিশ্বাস রাখিস, বাবার দৃষ্টান্ত সামনে রাখিস, বাস, আর কিছু তোকে করতে হবে না।"

উষাকে দাসীর সহিত ঘাটে গা ধুইতে পাঠাইয়া দিয়া উমা পিতার সন্ধানে গেল।

অমরনাথ নিজের গৃহে টেবিলের ধারে দাঁড়াইয়া পরলোকগতা পত্নীর বৃহৎ তৈল-চিত্রখানার পানে চাহিয়া কি ভাবিতেছিলেন। উমা গৃহে প্রবেশ করিতেই তিনি মুখ না ফিরাইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে, উমা?"

উমা বলিল, "হ্যাঁ বাবা।"

অমরনাথ বলিলেন, "এ বিয়ে হতে পারবে না মা। ভদ্রলোক আসছে আসুক, দেখে যাক—কিন্তু বিয়ে দেওয়া হবে না।"

অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া উমা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বাবা? বিয়ে হতে যে পারবে না, এমন কি কথা আছে?"

অমরনাথ একখানা চেয়ার সরাইয়া লইয়া বসিয়া বলিলেন, "কথা আছে বই কি মা? পিসীমা মহা আপত্তি তুলেছেন। এইমাত্র কেঁদেকেটে আমায় বললেন, যেন হাত-পা ধরে মেয়েটাকে জলে ফেলে দেওয়া না হয়। তাঁর কান্নাতে মনটা ভারি খারাপ হয়ে গাচ্ছে। তা ছাড়া তর্কচূড়ামণি, আরও অনেকে এসেছিলেন—যেন জানাশোনা এই বিধর্ম্মীর ঘরে মেয়ে না দিই।"

উমা মাথা নত করিয়া খানিক দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার পর ধীরে-ধীরে বলিল "আচ্ছা—"

সে বাহির হইয়া গেল।

বাড়ীতে বাস্তবিক সেদিন অনেক লোকেরই শুভাগমন হইল। নিষ্ঠাবান অমরনাথকে সকলেই নিষেধ করিলেন, যেন সে ঘরে মেয়ে না দেওয়া হয়। তাঁহার মেয়ের বিবাহের ভাবনা কি? উমা সুন্দরী, বেশ শিক্ষিতা, জমীদারের মেয়ে, তাহাকে বিবাহ করিতে অনেক সুপাত্র আসিয়া ছুটিবে।

সন্ধ্যার ট্রেণে কলিকাতা হইতে দুইটী ভদ্রলোক আসিয়া মেয়ে দেখিয়া খুবই পছন্দ করিলেন; এবং বিবাহের কথা-বার্ত্তা ঠিক করিতে অমরনাথকে লইয়া বসিলেন।

অমরনাথ বিমর্ষ-মুখে বলিলেন, "আমার কোনই আপত্তি ছিল না; কারণ, আপনাদের আমি চিনি, ছেলেকেও আমি চিনি। কিন্তু এখানে এই বিষয় নিয়ে একটা ভারি গোল উঠেছে। আমার অন্তঃপুরেও সে গোল পৌঁছেচে। পাত্রেরা যে কিছু ইংরাজি-ঘেঁসা লোক—"

পাত্রের মাতুল হাসিয়া উঠিলেন, "ঠিক কথা বলেছেন আপনি। কিন্তু তাদেরকে এইটা বুঝিয়ে বলে দেবেন, পাত্রের মা নিষ্ঠাবান ভট্টাচার্য্যের ঘরের মেয়ে, সেখানে ম্লেচ্ছাচার হওয়ার ভয় নেই। আর তিনি যদি ইচ্ছা করতেন—উচ্চশিক্ষিতা অনেক মেয়ে আছে, যারা স্বেচ্ছায় তাঁর পুত্রবধূ হতে প্রস্তুত—তাদেরই কেউ তাঁর ঘরে আসতে পারত। কিন্তু তিনি বেছে-বেছে চান এমনি ঘরের মেয়ে—সুন্দরী, বেশ শিক্ষিতা, একটু বয়স্থা, আর হিন্দু। এ রকম জুটেছে ঠিক আপনারই ঘরে; তাই এখানেই আমরা এসেছি। আমাদের ছেলের বিয়ের ভাবনা কি বলুন, আমি আর আমার বোনই হতে দিচ্ছিনে। দেখুন, আপনার ইচ্ছে হয়, আপনি এখানে বিয়ে দিতে পারেন। না পারেন বলুন, আমরা বিদায় নেই।"

অমরনাথ সকল দ্বিধা সঙ্কোচ দূর করিয়া বলিলেন, "না, আমি এখানেই বিয়ে দেব। আপনারা একেবারে আশীর্ব্বাদ করে যেতে পারেন। আমিও কাল পরশু আশীর্ব্বাদ করে আসব। এই মাঘ মাসেই কয়েকটা দিন আছে, তার মধ্যে যেটাতে সুবিধা বোধ করবেন, আপনারা সেইটেতেই বিয়ে দিয়ে ফেলুন।"

উমার আশীর্ব্বাদ হইয়া গেল।

অমরনাথ পুরোহিত মহাশয়কে দিয়া পঞ্জিকা দেখাইলেন, বিবাহের দিন ঠিক হইল মাসের কুড়ি তারিখে।

বিদায় লইয়া পাত্রের মাতুল ও অপর ভদ্রলোকটী কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন।

(৪)

পাত্র সভাস্থ হইল, গ্রামের লোকে হাঁ করিয়া এই বিলাতফেরৎ মস্ত বড়— অথচ হিন্দু-ডাক্তার পাত্রকে দেখিতে লাগিল।

মৃন্ময় সুপুরুষ, বিদ্বান। তাহার মাতা পরম হিন্দু ছিলেন, কিন্তু পিতা একেবারেই নাস্তিক ছিলেন। এই দুইটার মাঝামাঝি মত লইতে গিয়া সে একটা খিচুড়ি মত তৈয়ারী করিয়া ফেলিয়াছিল। সে কখনও ঈশ্বরকে অত্যন্ত ভক্তি দেখাইত, কখনও বা পায়ের তলায় ফেলিবার প্রস্তাবও করিত। এক কথায়, তাহার মাথার ঠিকই ছিল না। মা তাহাকে পাগল ছেলে বলিয়া উড়াইয়া দিতেন। পিতা তাঁহার নিজের মতে ছেলেটিকে সম্পূর্ণ তৈয়ারী করিবার চেষ্টা করিতেন।

মৃন্ময় কলিকাতা ইউনিভার্সিটী হইতে বি-এ ডিগ্রি গ্রহণ করিয়াছিল কুড়ি বৎসর বয়সে। সেই বৎসরেই সে বিলাত গিয়াছিল এবং সেখানে কয়েক বৎসর থাকিয়া চিকিৎসা-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া নামের আগে ডক্টর এবং নামের শেষে এম-ডি যোগ করিয়া সে দেশের ছেলে দেশে ফিরিল।

মতটা বিলাত যাইবার আগে যাহা ছিল, বিলাত গিয়া বেশ সুমার্জ্জিত করিয়া যখন ফিরিল, তখন পিতা নিজের

প্রতিভা পুত্রে বিকশিত হইতে দেখিয়া যেমন আনন্দিত হইয়া উঠিলেন, পুত্র যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়া একেবারে নাস্তিক হইয়া গিয়াছে দেখিয়া মা তেমনি ব্যথিতা হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

মৃন্ময়ের চরিত্রে একটা বিশেষত্ব ছিল, সে মাকে খুব ভক্তি করিত, ভালবাসিত। শুধু মায়ের জন্যই সে প্রবল অনিচ্ছা-সত্ত্বেও এই হিন্দুগৃহের অল্প-শিক্ষিতা বালিকাটীকে পত্নীত্বে বরণ করিয়া লইতে অগ্রসর হইল। পিতা আপত্তি করিয়াছিলেন; কিন্তু স্ত্রীর চোখের জলে অবশেষে তাঁহাকেও পরাস্ত হইতে হইয়াছিল।

সম্প্রদানের সময় পার্শ্বে উপবিষ্টা জড়পিণ্ডবৎ স্ত্রীটির উপর চোখ পড়িতেই মৃন্ময়ের হৃদয় ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। ভবিষ্যতে এই জড়ভাবাপন্না স্ত্রীটিকে লইয়াই তাহার জীবন যাপন করিতে হইবে, ইহা ভাবিতে অনুতাপে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। হায়, কেন সে এক মুহূর্ত্তে মায়ের চোখের জলে নিজের দৃঢ়তা হারাইয়া ফেলিল,—কেন সে ভবিষ্যৎ না ভাবিয়াই জেদ করিয়া বসিল যে, যে কোনও মেয়ে মা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন, চোখে না দেখিয়া তাহাকেই সে বিবাহ করিয়া ফেলিবে! এক মুহূর্ত্তের ভুলটী তাহার সারা জীবনের মত সঙ্গের সাথী হইয়া রহিল,—কিছুতেই আর ইহাকে তফাতে রাখা চলিবে না।

তাহার হাতের উপর সুগোল সুগৌর একখানা হাত পড়িল, অমরনাথ কন্যা সম্প্রদান করিলেন। সেই মুহূর্ত্তে মৃন্ময় হাতখানা টানিয়া লইবার জন্য একটু চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু তখনি মনে পড়িয়া গেল আর অনর্থক চেষ্টা। কেবল একটা কলঙ্ক মাত্র, আর কিছুই হইবে না। সাধারণের চোখে সে ইহাতে নীচুই হইয়া পড়িবে, উঁচু হইতে পারিবে না।

বিবাহের একটা মন্ত্রও সে পাঠ করে নাই। অমরনাথ সন্দিগ্ধ চোখে তাহার মুখপানে চাহিতেছিলেন; সে মুখে এমন একটা ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল, যাহা দেখিয়া অমরনাথ মোটেই শান্তি পাইতেছিলেন না। তাঁহার মনে হইতেছিল, উষাকে বাস্তবিকই তিনি জলে ফেলিয়া দিলেন; এ বিবাহ কেবল গরলই উৎপন্ন করিবে, সংসার সুখময় করিতে পারিবে না।

তাঁহার মনটা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল,—বিবাহ কার্য্য শেষ হইতেই তিনি উঠিয়া বাহিরে গেলেন। কোলাহল আর ভাল লাগিতেছিল না; তিনি একটা নির্জ্জন স্থান অন্বেষণ করিতেছিলেন।

বাড়ীর পার্শ্বে একটা ছোট ফুলবাগান ছিল। বাড়ীটা গ্যাসালোকে উজ্জ্বল, কোলাহলে মুখরিত,—এ বাগানটা নির্জ্জন, আলোকশূন্য। অন্ধকার সেখানে এত ঘন ছিল না, বাহিরের প্রাঙ্গণের গ্যাসালোক সেই অন্ধকার কতকটা ভেদ করিয়া সেখানে আসিয়া পড়িয়াছে।

অমরনাথ শ্রান্ত দেহখানা কোনও মতে বহন করিয়া আনিয়া সেখানে একখানা বেঞ্চে বসিয়া পড়িলেন।

এক কথায় বিদ্বান, সুচরিত্র, রূপবান, ঐশ্বর্য্যশালী—মানুষের যাহা প্রার্থিত, তাঁহার জামাতায় সে সব গুণই আছে। কিন্তু তবু—তবু তাঁহার মনে হইতেছে,—না, কাজটা ভাল হইল না। তিনি মনকে প্রবোধ দিতে চাহিলেন, কিন্তু হৃদয়ের মধ্য হইতে বার বার তবু কে ডাকিয়া বলিতে লাগিল—ভাল হয় নাই, আগাগোড়া ভুলের বশে চলিয়াছ, এই ভুলের ফল একদিন পাইতে হইবে।

অমরনাথ চমকাইয়া উঠিলেন, কি ভুলের ফল পাইতে হইবে। উমার মত কি? জীবনে কত ভুল কাজ করিয়াছেন, ফল তো সবগুলিরই লাভ হইয়াছে। এ ভুলের কি ফল পাইবেন!

উমার কথাটা মনে হইতেই তাঁহার হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল। এমনি একটা রাত্রে প্রাণাধিকা অষ্টম বর্ষীয়া উমাকেও উদ্বাহ বন্ধনে বাঁধিয়াছিলেন, সেদিনও বাড়ীখানাকে সাজাইয়া ছিলেন, ইহার চেয়েও বেশী উৎসব করিয়াছিলেন। উমার সেই অবগুণ্ঠনাবৃত শ্রী দেখিয়া কি আনন্দেই না তাঁহার বুক ভরিয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর এক বৎসর পরে—আঃ, সে দিনটা কি দিনই না আসিল।

অমরনাথের অজ্ঞাতে তাঁহার দুইটী চোখ কখন সজল হইয়া উঠিয়াছিল, কখন দুই ফোঁটা জল গণ্ড ভাসাইয়া হাতের উপর পড়িয়া গেল।

ছি, ছি, তিনি করিতেছেন কি? আজ যে উষার বিবাহ-রাত্রি। তাহার মা নাই, তিনি আজ এই শুভ দিনে চোখের জল ফেলিয়া কি দম্পতির অমঙ্গল কামনা করিতেছেন?

তাড়াতাড়ি মুখ চোখ মুছিয়া ফেলিয়া তিনি শান্ত, নীরব আকাশখানার পানে চাহিলেন। কি সুন্দর নক্ষত্র-খচিত আকাশ। লক্ষ হীরার টুকরা যেন বুকে ধরিয়া হাসিতেছে।

শান্ত আকাশের পানে চাহিয়া অমরনাথ দুটি হাত ললাটে স্পর্শ করাইয়া গভীর সুরে বলিয়া উঠিলেন, "নাথ, আজীবন তোমায় বিশ্বাস করেই এসেছি প্রভু, অনেক ঝড় তুফান মাথার উপর দিয়ে চলে গ্যাছে, তবু বিশ্বাস হারাই নি। দেখ, জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত যেন এমনি বিশ্বাস রেখেই যেতে পারি, যেন বিশ্বাস হারিয়ে না যেতে হয়। নিজের জন্য কোনও দিন প্রার্থনা করিনি নাথ, প্রার্থনা করবার কোনও দরকার হয় নি। উমার জন্যেও কোনও দিন প্রার্থনা করি নি,—সে যা পেয়েছে তাইতেই সুখী হোক। কিন্তু ওগো পরম পিতা, আজ যে কাজটি করলুম, যদি তা ভুলের বশে হয়ে থাকে—প্রার্থনা করছি, সে ভুলের দণ্ড আমাকেই দেওয়া হোক। যাকে আজ নিজের হাতে সাজিয়ে দিলুম, নারীর শ্রেষ্ঠ, বাঞ্ছিত যে আসনে আজ প্রতিষ্ঠিত করলুম, পিতার ভুলের জন্য সে যেন সে আসনচ্যুত না হয়।

"বাবা, তুমি এখানে, আমি যে সারা বাড়ীখানা খুঁজে বেড়াচ্ছি এদিকে—"

উমা আসিয়া পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইল

রুদ্ধ কণ্ঠে অমরনাথ বলিলেন "কেন মা, আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছ কেন?"

বিস্ময়ের সুরে উমা বলিল "কেন? বাঃ, কখন বিয়ে শেষ হয়ে গ্যাছে, সারাদিন যে উপোস করে আছ তা বুঝি মনে হচ্ছে না। মেয়ের বিয়ে বুঝি আর কোন বাপেই দেয় না, তোমার মত সব্বাই আনন্দে আত্মহারা হয়?"

"আনন্দ!" অমরনাথ হাসিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সে চেষ্টার ফলে চোখে আসিয়া পড়িল অশ্রু-জল। তিনি বলিলেন "আনন্দ নয় মা আনন্দময়ী, বড় কষ্টেই ছুটে এসেছি এখানে। মনে ভেবে ঠিক করতে পাচ্ছিনে—কি করলুম, কাজটা ভাল করলুম কি মন্দ করলুম। আমি বরাবর দেখে আসছি—ভেবে যা ভাল করতে যাই, সেটা মন্দ ফলই উৎপন্ন করে।"

উমা বলিল, "এ কথা কেন বাবা? আমি দেখছি কাজটা খুব ভালই হয়েছে। মৃন্ময়ের কিছু খারাপ দেখতে পাচ্ছিনে তো।"

অমরনাথ গম্ভীর হইয়া বলিলেন "ছেলেমানুষ তুই মা, সংসার চিনতে, মানুষ চিনতে এখনই কি পারবি? আমি তোর বাপ, অভিজ্ঞতা আমার বেশ আছে, যাতে আমি জানতে পেরেছি এ বিয়েতে মৃন্ময়ের একটুও মত ছিল না। নেহাৎ দায়ে পড়েই সে বিয়ে করতে এসেছে। একে তো তারা চলে বিদেশী ভাবে, তার পরে মৃন্ময়ের এই ভাব,—আমার মনে হচ্ছে, উষাকে আমি জীবন্তেই আগুনে ফেলে দিলুম,—সে বুঝি জন্মেও সুখী হতে পারবে না।

তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

চমকাইয়া উমা বলিয়া উঠিল "না বাবা, ও সব চিন্তা মনেও এন না। উষা কি আমার তেমনি বোন, সে কি অনাদর করবার জিনিস? তার শিক্ষা যে তোমারি কাছে বাবা, সে যে যথার্থ রত্ন, কাচ তো নয়। ওকে অনাদর করতে পারে, এমন লোক জগতেই নেই। তুমি চল, জল খাবে। রাত কতটা হয়ে গ্যাছে দেখ তো?"

পিতার হাত ধরিয়া সে টানিয়া উঠাইল।

জলযোগান্তে অমরনাথ গিয়া নিজের গৃহে শুইয়া পড়িলেন।

বাসর তখন জনাকীর্ণ—নারীবৃন্দে সে স্থান ভরিয়া গিয়াছে। ঠাকুরমা নাতজামাইয়ের আহার করাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। উমা এখনও এদিকে আসে নাই। সারাদিন-রাতের পরিশ্রম,—কিন্তু তাহার দৃষ্টি ছিল পিতার দিকে। বিবাহের সময় সে দূরে ছিল, আয়ুষ্মতীদের কাছে থাকিবার অধিকার তাহার ছিল না; দূরে থাকিয়া মৃন্ময়ের উন্নত, বলিষ্ঠ চেহারা দেখিয়া বাস্তবিকই সে পুলকিতা হইয়া উঠিতেছিল। উষা সুখী হইবে, এ কল্পনা করিতে তাহার মনটা যেমন পুলকে পূরিয়া উঠিতেছিল, সে একেবারে পর হইয়া গেল ভাবিতেও তেমনি বিষাদে হৃদয় আচ্ছন্ন হইতেছিল।

বিবাহ শেষে সে পিতাকে জল খাওয়াইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া ঘুরিতেছিল। তাহার পর খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাগান হইতে তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া জল খাওয়াইয়া সে শান্তি

পাইল। নিমন্ত্রিতগণের আহারাদি পূর্ব্বেই শেষ হইয়া গিয়াছিল, কাজকর্ম্মও ফুরাইয়া গিয়াছিল।

রাত তখন তিনটা বাজিয়া গিয়াছে। একটু বিশ্রামার্থ নিজের কক্ষে যাইতে গিয়া সে বাসরের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মৃন্ময় বালিসটায় হেলান দিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অসভ্য হিন্দু গৃহের মেয়েদের নির্লজ্জ আচরণের কথা ভাবিতেছিল, এবং যে কোনও সভ্য সমাজে এরূপ ব্যবহার করিলে যে কিরূপ কাণ্ডটা ঘটিত, তাহাই মনে মনে বিচার করিতেছিল। পার্শ্বে পড়িয়া উষা তো আরামে ঘুম দিতেছিল। তাহাকে জাগাইয়া রাখিবার চেষ্টা কেহ করে নাই, কিন্তু বেচারা বরকে কেহই নিস্কৃতি দিতে চায় না। বর ঘুমাইলে যে বাসরটা মাঠেই মারা যায়।

বহুদিনের অতীত একটা স্মৃতি ধীরে ধীরে উমার মনে জাগিয়া উঠিল। তখন সে বড় ছেলেমানুষ, কি হইতেছে তাহাই জানে না। কে একটী ছেলে তাহার পার্শ্বে বসিয়া ছিল,—সে লজ্জায় চোখ তুলিয়া তাহার পানে চায়ও নাই। আট বছরের মেয়ের লজ্জা, কথাটা হাসির বটে, কিন্তু হিন্দু-গৃহে হাসিবার কিছুই নাই। ছোট বেলা হইতেই মেয়েদের কানে বর কথাটা তুলিয়া দেওয়া হয়। পাঁচ বছরের মেয়েটী—সকলের সঙ্গে মারামারি করে, কিন্তু বরের কথা শুনিয়াই পরণের কাপড়খানি খুলিয়া মাথায় মুখে চাপা দেয়। উমা যদি বরকে দেখিয়া লজ্জা করিবার কথা না জানিত, তবে সে ভাল করিয়া দেখিত; কিন্তু এই লজ্জা তাহাকে উষার মতই এক কোণে ঠাসিয়া রাখিয়াছিল।

সেই দিনের কথাটা মনে পড়িতে উমা অন্যমনস্ক হইয়া গেল; সে যে বাসর ঘরের সামনেই দাঁড়াইয়া, সে কথা তাহার মনে রহিল না।

মেয়েরা বরকে গান গাহিবার জন্য ধরিয়াছিলেন। বর এ পর্য্যন্ত একটা কথাও কহে নাই। ইহাতে সে বেচারাকে কথা শুনিতে হইয়াছিল বড় কম নয়। অবশেষে একটী ছোট মেয়ে যখন তাহার কাণ মলিয়া দিল তখন মৃন্ময় তাহার সকল ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিল।

"এই চললুম আমি, আর যদি কখনও আসি—"

সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বাসরে রীতিমত একটা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। সে গোলযোগে উষার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সে উঠিয়া বসিয়া দুই চোখ ডলিতে লাগিল। মহিলারা মৃন্ময়কে বসাইবার এত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মৃন্ময় কিছুতেই আর বসিল না। সে পণ ধরিল, এই রাত্রি-শেষের ট্রেণ ধরিয়াই সে কলিকাতায় চলিয়া যাইবে, কিছুতেই এখানে থাকিবে না।

উমা আর বাহিরে থাকিতে পারিল না,—গৃহে ঢুকিয়া পড়িল। মৃন্ময়ের মুখের উপর দুইটা চোখ রাখিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল "তুমি এই চারটের ট্রেণেই কলকাতায় ফিরে যেতে চাও,—কিন্তু যাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করেছ, তাকে রেখে যাবে কোথায়?"

মৃন্ময় তাহাকে সামনে দেখিয়াই যেন অপস্তুত হইয়া পড়িল। এ মেয়েটীকে সে একবারও দেখে নাই। এমন সুন্দর, দৃঢ় মূর্ত্তি যে এখানে এমন ভাবে সে দেখিতে পাইবে, সে আশাও করে নাই। এমন স্পষ্ট কথাও যে কেহ তাহার মুখের উপর বলিতে সক্ষম হইবে, তাহাও সে ভাবে নাই। সে একবার উমার মুখের পানে তাকাইয়াই চোখ নীচু করিল। স্বস্থানে বসিতে বসিতে মৃদুকণ্ঠে বলিল "কিন্তু এঁদের বেজায় রকম অত্যাচার। দুর্ভাগ্যের কথা, আমি কখনও আশা করি নি যে, এ রকম পীড়ন আমায় উপরে হতে পারবে। আমি এত দেশ বেড়িয়েছি,—নিঃসম্পর্কীয় পুরুষের কাছে মেয়েরা যে এমন লজ্জাহীন কথা বলতে পারেন, তার গায়ে হাত পর্য্যন্ত তোলেন, এ কোথাও দেখি নি।"

উমা উগ্রকণ্ঠ স্নিগ্ধ করিয়া বলিল, "তা হতে পারে; আমি তা অস্বীকার করছিনে। বাসরটা আমাদের দেশে বহুকাল হতেই চলে আসছে। এই একটা দিন সবাই এ অত্যাচারটা সহ্য করে যায়। তুমি বিদেশী সভ্যতার মধ্যে মানুষ হয়েছ, এ সব দেখতে পাওনি, জানোও না। কিন্তু —এটা ঠিক, তুমি হিন্দু বলেই আমার বোনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। যখন সেটা সহ্য করতে পেরেছ, তখন হিন্দু সমাজের একটা অঙ্গ এই বাসরটা আর তার অত্যাচারটাও তেমনি করে সহ্য করে যেতে হবে। এ দিনটা তোমায় কেউ মানবে না, সবাই তোমায় যা না তাই বলবে। অবশ্য এটা যে খুব ভাল রীতি, তা আমি বলছিনে,—আমরা সবাই

বাসরের বিরোধী। কিন্তু সমাজে যখন চলে আসছে, আমরা কেন তার বিরুদ্ধাচরণ করতে যাব? সমাজের অঙ্গহানি করে এটা বাদ দেওয়া আমরা কোনও মতেই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করিনে। আশা করছি তুমিও করবে না।"

বিস্ময়ে মৃন্ময় উমার পানে চাহিয়া রহিল। হিন্দুর মধ্যে এমন শিক্ষিতা, এমন উন্নতহৃদয়া নারী যে থাকিতে পারে, তাহা তাহার ধারণায় ছিল না। কিন্তু এমন বেশ কেন? উমা একটু হাসিয়া বলিল "আমি এঁদের বলছি, এঁরা আর তোমায় বিরক্ত করবেন না, তুমি এখন অনায়াসেই ঘুমাতে পারবে, তা হলে বোধ হয় তুমি খুসী হবে।"

মৃন্ময় মাথা নত করিয়া হাসিয়া ফেলিল। উমা সস্নেহে উষার পানে তাকাইয়া বলিল "তুই ঘুমো ভাই, বসলি কেন?"

উষা অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়া দিদির পানে চাহিল। উমা ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। মৃন্ময়ের মনে হইল তাহার চোখের সামনে যে উজ্জ্বল আলোটি জ্বলিতেছিল, উমা অন্তর্হিতা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহা নিভিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

ভারতীয় সঙ্গীত ও স্বর-সম্বাদ *

শ্রী বাণী দেবী

সাধারণত আজকাল আমাদের ধারণা এই যে, ভারতীয় সঙ্গীতে স্বর-সম্বাদ বা harmony কখনও ছিল না বা হইতে পারে না, কেবল melody বা তান ছিল এবং আছেও। † এখানে সঙ্গীতের ব্যাপক অর্থ ধরিয়া, কেবল কণ্ঠসঙ্গীত নহে, সেতার প্রভৃতি যন্ত্রবাদিত তান প্রভৃতিও সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত ধরিতে হইবে। কোমল ও কড়ি সহ সপ্তস্বরের মধ্যে কতকগুলি স্বর লইয়াই এক একটি তানের সৃষ্টি। সেই এক একটি তানের এক একটি রূপ আছে। সেই এক একটি তানের বিভিন্ন আকারে (উদারা, মুদারা, তারা এবং উহাদের সংমিশ্রণোদ্ভূত) সমাবেশ অথবা বিভিন্ন সম্বাদী তানের সংযুক্ত সমাবেশ হইতেই এক একটি শুদ্ধ বা মিশ্র রাগের উৎপত্তি হয়। রাগ সুপরিস্ফুট হইলেই তাহার ভিতর হইতে তানের রূপ স্বপ্রকাশ হইয়া পড়ে। সেই রূপকেই সেই রাগের বা তাহার তানের প্রাণ বলা যাইতে পারে। তানের সেই সুরগুলিকে পরস্পর-সম্বাদীরূপে ভাঁজিতে পারিলেই melody বা সুতান রাগের উৎপত্তি হয়; সেগুলির মধ্যে কোন বিবাদী সুর প্রবেশ করাইলেই তানের প্রাণ কাটিয়া যায়। প্রত্যেক গানই এইরূপে একটা-না-একটা শুদ্ধ বা মিশ্র রাগের উপর দাঁড়াইয়া থাকে। প্রত্যেক গানের ভিতর দিয়াই রাগের এই মূল সুর বা তান ঝঙ্কৃত হইতে থাকে। আসলে তানকেই melody বলা উচিত, কিন্তু লক্ষণার বলে তানমূলক রাগ ও গানকেও melody বলা হয়। কিন্তু স্বর-সম্বাদে বা harmonyতে ঐ মূল তানের প্রত্যেক স্বরের সঙ্গে তাহার নানা বিভিন্ন সম্বাদী স্বর এমন সমান্বিতভাবে ঝঙ্কৃত করা হয় যে, ঐ প্রত্যেক স্বরের প্রকাশে এবং সেই সঙ্গে সমস্ত গানটির সমগ্র প্রকাশে একটা সম্বাদীভাব প্রকাশ পায়—আমাদের কাণে বেসুরা লাগে না।

এই স্বর-সম্বাদ ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞদিগের নিকটে জ্ঞাত

* আজকাল কেহ কেহ harmony'র অনুবাদ করেন স্বরসন্ধি। তাহা ঠিক নহে। harmony'র মূল প্রাণ হইল একটা সমগ্র রাগের পরিপোষক বিভিন্ন তানের এবং তাহাদের বিভিন্ন আকারের ভিতর এবং সেই তানগুলির অন্তর্গত বিভিন্ন সুরগুলির পরস্পরের মধ্যে একটা সম্বাদী ভাব। এই কারণে আমরা harmony'র অনুবাদ করিলাম স্বর-সম্বাদ; harmonise-স্বর-সম্বাদ্ধ বা সম্বাদিত করা ইত্যাদি। স্বর-সম্বাদের ভিতর স্বরসন্ধি বা chord অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারে; কিন্তু স্বরসন্ধি সকল সময়ে স্বর-সম্বাদে নাও পরিণত হইতে পারে। আমরা chordএর অনুবাদ করিলাম স্বরসন্ধি; উভয়ের ভাব হইতে কতকগুলি সম্বাদী স্বরের সন্ধি বা মিলনমাত্র।

† অভিধানে melody অর্থে রাগ করা হইয়াছে, আমরা করিলাম তান। melodious song=সুতান গান। কতকগুলি তানের দ্বারা মিলিত হইয়া যে একটী বিশেষ রসপূর্ণ সুরের সৃষ্টি করে, তাহাকেই রাগ বা tune বলে।

ছিল অথবা অজ্ঞাত ছিল? আমরা প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রে "রক্তং নাম বেণুবীণাদিস্বরাণামেকীব রক্তমিত্যুচ্যতে" (Hindu Music) পাই, অর্থাৎ বেণু, বীণা প্রভৃতির স্বরগুলি বাজাইয়া একীসাধনের নাম "রক্ত।" ইহা ব্যতীত, প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রে আমরা "বহুলস্বর", "বাদী", "বিবাদী" "সম্বাদী" প্রভৃতি শব্দ প্রাপ্ত হই। এই সকল হইতে আমরা যুক্তিসঙ্গত অনুমান করিতে পারি যে পুরাকালে এদেশে স্বর-সম্বাদ অপরিজ্ঞাত ছিল না। স্বর-সম্বাদের ভাব অন্তরে না থাকিলে এই সমস্ত শব্দ আসিতেই পারিত কি না সন্দেহ। প্রাচীনকালের সঙ্গীতজ্ঞদিগের অন্তরে স্বর-সম্বাদের কথা উঠা কিছু আশ্চর্য্য নহে। কোলদের ন্যায় অসভ্যদের সঙ্গীত যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিয়াছেন যে তাহাদেরও সঙ্গীতে স্বর-সম্বাদ কেমন সুন্দররূপে প্রকাশ পায়। ঐ অসভ্যদিগের সঙ্গীতে যখন স্বর-সম্বাদের পরিচয় পাওয়া যায়, তখন আর্য্যদিগের আদিম সঙ্গীতেও যে স্বর-সম্বাদ প্রকাশ পাইবে, তাহা বলা বাহুল্য। আমরা গুরুজনদের মুখে শুনিয়াছি যে, সামগানে স্বর-সম্বাদ অতি উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে প্রকাশ পায়।

পৌরাণিক যুগের কুরুক্ষেত্র সংগ্রামের পর, অন্তত বৌদ্ধযুগের পর তো নিশ্চয়ই, এই স্বর-সম্বাদের জ্ঞান নানা কারণে এদেশের সঙ্গীতজ্ঞদিগের অন্তরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু শোনা যায় যে, বৌদ্ধযুগের বহুকাল পরে আকবরের রাজত্বকালে তানসেন কণ্ঠ হইতে স্বরসন্ধি বা chord বাহির করিতেন—কণ্ঠেই সা ও গা একসঙ্গেই বাহির করিতেন। এই স্বরসন্ধি প্রকাশের চেষ্টাতেও আমরা স্বর-সম্বাদ প্রকাশেরই ক্ষীণ আভাস দেখিতে পাই। তানসেনের ন্যায় সঙ্গীতজ্ঞের নিকট শাস্ত্রীয় স্বর-সম্বাদতত্ত্ব নিশ্চয়ই অজ্ঞাত ছিল না। হয়তো ভারতীয় সঙ্গীতে স্বর-সম্বাদ নূতনভাবে জাগাইয়া তুলিবার ইচ্ছা তাঁহার অন্তরে স্বতই উদ্ভূত হইয়াছিল; অথবা এমনও হইতে পারে যে, সেই সময়ে এদেশে ইউরোপীয়দের যথেষ্ট আমদানি হওয়াতে তাহাদের স্বর-সম্বাদ-সম্বলিত গান তাঁহার কাণে পৌঁছিয়াছিল এবং তাঁহার ন্যায় সঙ্গীতের তত্ত্বজ্ঞ ও ব্যবহারত অভিজ্ঞের কাণে সেই স্বর-সম্বাদ ধরা পড়াতে তিনি তাহা কণ্ঠে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কণ্ঠসঙ্গীতের ন্যায় যন্ত্রসঙ্গীতের উন্নতিসাধনে তিনি বিশেষ কোন চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় না। যন্ত্রসঙ্গীতে তিনি যদি স্বর-সম্বাদ পুনঃস্থাপিত করিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা তাহা হইলে তাহা নিশ্চয়ই স্থায়িত্ব লাভ করিত। যাই হোক্, ইহা স্থির যে ভারতীয় সঙ্গীতে স্বর-সম্বাদ অজ্ঞাত ছিল না।

তবে ভারতীয় সঙ্গীত হইতে স্বর-সম্বাদ বিলুপ্ত হইল কেন? আমাদের মতে স্বর-সম্বাদ বিলুপ্ত হইবার অন্যতম প্রধান কারণ ভারতীয় কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের ফলে স্বর-সম্বাদজ্ঞ প্রাচীন সঙ্গীতজ্ঞদিগের অভাব হওয়া। আমরা তো প্রত্যক্ষ করিলাম যে, বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের বিশ্বগ্রাসী অগ্নিতে ইউরোপের কত শত সহস্র গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তি আত্ম-বলি দিতে বাধ্য হইয়াছেন; এই প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের বলে আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি যে, ভারতীয় মহাসমরেও নিশ্চয়ই বহুতর সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত আহুতি প্রদত্ত হইয়াছিলেন।

সঙ্ঘবদ্ধ ভাবের অভাবও ভারতীয় সঙ্গীত হইতে স্বর-সম্বাদ বিলুপ্ত হইবার আর একটি গুরুতর কারণ বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমানে যেমন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, মহা-সমরের ফলে সমগ্র পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে পূর্ব্বের ন্যায় সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার ভাব আর নাই—তাহা বিলুপ্ত হইবার দিকে চলিয়াছে; সেইরূপ মহাভারত, পুরাণ ও তৎপরবর্ত্তী ভারতের ইতিহাস আলোচনা করিলে অনুমান হয় যে, ভারতীয় কুরুক্ষেত্রের পরেও ভারতবর্ষ হইতে সঙ্ঘবদ্ধের ভাব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি-বিহীন কতকগুলি বিচ্ছিন্ন রাজ্যের জন্ম হইয়াছিল। সেই সকল বিচ্ছিন্ন রাজ্যের বিচ্ছিন্ন ভাব যে জনসাধারণের উপর ব্যক্তিগত ভাবেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। এই প্রকারে গ্রামে গ্রামে বিচ্ছেদপ্রাণ সামাজিক দলাদলি প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবের ছায়া পরিদৃষ্ট হইলেও বস্তুত তাহা দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বরসম্বাদও অন্তর্হিত হইয়া গেল।

পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের উত্তরাংশে যেখানে শীতাধিক্য প্রভৃতি নানা কারণে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার ভাব স্বভাবতই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, সেখানেই স্বরসম্বাদও খুব উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে দেখা যায়। কিন্তু

স্পেন, ইটালি প্রভৃতি ইউরোপের দক্ষিণাংশে যেখানে গ্রীষ্ম ঋতুর অধিকতর প্রাদুর্ভাবের কারণে এবং প্রাচীন সভ্যতা ও বহুতর সংগ্রাম প্রভৃতির ফলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার ভাব অপেক্ষাকৃত কম, সেখানে স্বরসম্বাদের উন্নতি যেন কতকটা স্থগিত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে তানমূলক রাগরাগিণীর অনুরূপ Madrigal, Serenade প্রভৃতি অভিব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছে দেখা যায়। কোন রাগরাগিণীকে বৃহদাকারে (on a grand scale) স্বর-সম্বদ্ধ করিয়া গাহিতে বা বাজাইতে চাহিলে অনেক লোকের দরকার হয়, এবং তাহা শুনিবার জন্যও বহুতর লোকসমাগম, আলো, সজ্জা প্রভৃতির প্রয়োজন হয় বলিয়া মনে হয়। সজ্জনতা, সঙ্ঘবদ্ধভাব, লোকসমাগম প্রভৃতিই স্বরসম্বাদের উপযুক্ত ক্ষেত্র।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভারতীয় সঙ্গীতে স্বরসম্বাদের অভাবের তৃতীয় গুরুতর কারণ হইতেছে, পৌরাণিক যুগের কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের মহা হত্যাকাণ্ডের পর বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভৃতি বৈরাগ্যমূলক বিবিধ ধর্ম্মের উদ্ভব ও আবির্ভাব। এই হত্যাকাণ্ডের পর সংসারের, বিশেষত সংসারের আমোদ-প্রমোদের প্রতি ভারতবাসীর একটা গভীর ঔদাস্য জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাহা না হইলে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় বৈরাগ্যমূলক ও ঔদাস্যপ্রাণ ধর্ম্মের দৃঢ়প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব হইত না। বৈরাগ্য ও উদাসভাব আমোদপ্রমোদের জন্য লোকসঙ্গ সহ্য করিতে পারে না—একাকী আত্মরতি হইয়া থাকিতে চাহে। কাজেই ভারতবাসীর মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া গীতবাদ্য করিবার প্রাণ চলিয়া গিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে স্বরসম্বাদের অস্তিত্বও তাহারা ভুলিয়া গেল। তখন দুই চারিজন সমধর্ম্মী ভক্তের সঙ্গে একান্তে বসিয়া যে তানমূলক রাগরাগিণীর সাহায্যে আপনার আত্মার সঙ্গে কথোপকথন করা যায়, তাহাই জনসাধারণের রুচিকর বোধ হইল, এবং কাজেই সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণও তাহারই উন্নতিসাধনে সচেষ্ট হইয়া কৃতকার্য্য হইলেন। আমাদের রাগরাগিণীর উপযুক্ত ক্ষেত্র হইল নির্জ্জনতা।

প্রাণের নির্জ্জনতাপ্রাণ উদাস প্রভৃতি ভাব ব্যক্ত করিবার পক্ষে তানমূলক রাগরাগিণী বিশেষ সহায় হইলেও স্বরসম্বাদের সাহায্যেও যে ঐ সকল ভাব একেবারেই ব্যক্ত করা যায় না তাহা নহে, তবে তাহা করিতে সঙ্গীতে বিশেষ একটু কুশলতা লাভ আবশ্যক। বীঠোবেনের (Beethoven) Sonata Pathetique বা Funeral March স্বরসম্বদ্ধ হইলেও তাহা শুনিলে প্রাণের ভিতর সত্যই কেমন এক উদাসভাব জাগিয়া উঠে। কিন্তু স্বরসম্বদ্ধ সঙ্গীতে যতই কেন এই সকল নির্জ্জনতাপ্রাণ ভাব প্রকাশের চেষ্টা হউক না, তাহার মধ্য হইতে একটা কি-জানি-কি গোলমালের ভাব, রাশি রাশি লোকজনের অস্তিত্বের আভাস, এককথায় একটা প্রবল সজ্জনতার ভাব প্রচ্ছন্ন ও অন্তঃসলিলরূপে প্রতি মুহূর্ত্তে উঁকিঝুঁকি মারিতে থাকে। আবার সেইরূপ, তানমূলক রাগরাগিণী দ্বারা আমরা যতই কেন সজ্জনতাপ্রাণ বীরত্ব বা আমোদ-প্রমোদের ভাব ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করি না, তাহার মধ্যে একটা নির্জ্জনতার ভাব, আপনার সঙ্গে একটা নিভৃত কথোপকথনের ভাব উঁকি না মারিয়া থাকিতে পারে না। রসম্বাদকে আমরা সঙ্গীতের আধিভৌতিক বা material দিক এবং তানমূলক রাগরাগিণীকে সঙ্গীতের আধ্যাত্মিক বা spiritual দিক বলিতে পারি। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে আধিভৌতিক বা ঐহিক সুখভোগের ভাব প্রবল বলিয়াই সেখানে সঙ্গীতের আধিভৌতিক আকারও সহজেই প্রবল হইয়াছে; ভারতে আধ্যাত্মিক ভাব প্রবল বলিয়াই এখানে সঙ্গীতেরও আধ্যাত্মিক আকারই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই আধ্যাত্মিকতার কারণেই ভারতের সঙ্গীত এতই উচ্চ আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে যে, তাহার বিজ্ঞান আবিষ্কার করিতে এবং তাহার প্রাণের সন্ধান পাইতে পাশ্চাত্যদের বহুকাল লাগিবে।

ভারতীয় সঙ্গীত হইতে স্বরসম্বাদ বিলুপ্ত হইলেও সম্পূর্ণ মুছিয়া যায় নাই, তাহার ছায়া রহিয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য সঙ্গীত হইতেও যেমন তান সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইতে পারে না, সেইরূপ ভারতীয় সঙ্গীত হইতেও স্বরসম্বাদ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইতে পারে না; কারণ, সাধারণত মানুষের এবং মানুষের সমষ্টি বা সমাজের মোটামুটি ভাব প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য সকল দেশেই এক—পাশ্চাত্যদিগেরও যেমন সুখ-দুঃখ আছে, প্রাচ্যদিগেরও তেমনি সুখদুঃখ আছে। ভারতবাসী যেমন সমস্তক্ষণ বৈরাগ্যে ও ঔদাস্যে ডুবিয়া থাকিতে পারে না, সময়ে সময়ে তাহার প্রাণে হর্ষ জাগিয়া উঠিতে বাধ্য; পাশ্চাত্যবাসীও তেমনি সমস্তক্ষণ আমোদ

আহ্লাদেই নিমগ্ন থাকিতে পারে না, তাহারও প্রাণে সময়ে সময়ে দুঃখের আঘাত লাগিতে বাধ্য। প্রভেদ এই যে, পাশ্চাত্যেরা দুঃখ অপেক্ষা সুখকেই প্রাণের সহিত বরণ করিয়া লয়; আর সুখ অপেক্ষা দুঃখকেই প্রাণের সহিত বরণ করা ভারতবাসীর মজ্জাগত ভাব। পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞের প্রাণে যখন দুঃখ জাগিয়া উঠিল, তখন তিনি স্বর-সম্বাদের ভিতর দিয়াই দুঃখের তান প্রকাশের চেষ্টা করিলেন। সেই চেষ্টার ফলেই বীঠোবেনের Sonata Pathetique প্রভৃতি টমাস মুরের করুণ-তান সুপ্রসিদ্ধ গানগুলি এবং serenade প্রভৃতি নৈশসঙ্গীতের উৎপত্তি। আবার যখন প্রাচ্য সঙ্গীতজ্ঞের প্রাণে হর্ষ বা সমুন্নতা-প্রাণ কোন ভাব উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তখন তিনি তানমূলক রাগরাগিণীর ভিতর দিয়াই সেই ভাবের ঝঙ্কার প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিলেন। তাহারই ফলে এদেশে টপ্পাজাতীয় সঙ্গীতের জন্ম।

সেতারের তার বাঁধিবার প্রণালীর ভিতরেও স্বর-সম্বাদের ছায়া দেখিতে পাই বলিয়া মনে হয়। সেতারের যে তিনটি প্রধান তার, সেই তিনটি তার তিনটি প্রধান সুরে (ম্, স্, ও প্) বাঁধা হয়।* এই তিনটি সুরের প্রত্যেকটিকে ভিত্তি করিয়া পাশ্চাত্য সঙ্গীতে তিনটি করিয়া সুর লইয়া (যথা স গ প) এক একটি স্বরসন্ধি রচিত হয়। সেই একএকটি স্বর-সন্ধিকে ইংরাজীতে Primary triad বা প্রধান স্বরত্রয়ী বলে। সেতারে এই তিনটি প্রধান তার ভিন্ন আর চারিটি তার প্, স্, স এবং প বা র্স য়ে বাঁধা হয়। স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এই চারিটি তারও প্রধান তিনটি তারের সঙ্গে সম্বাদীরূপেই বাঁধা হয়। তার বাঁধার প্রণালী হইতেই বুঝা যায় যে, এদেশীয় বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভাবক এবং সঙ্গীতজ্ঞ-দিগের স্বরসম্বাদবিষয়ক বেশ একটু জ্ঞান নিশ্চয়ই ছিল। সেতারের তিনটি তার মৌলিক বলিয়াই উহার নাম ত্রি-তার, পারসীতে সি-তার, এবং অপভ্রংশে সেতার হইয়াছে। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, সেতারে স্বরসম্বাদ সুন্দররূপে আনা যায়। সেতার বীণের অনুকরণে গঠিত; সেতারে যখন স্বরসম্বাদ সম্ভব হয়, তখন বীণ, এসরাজ প্রভৃতি উহার অনুরূপ বাদ্যযন্ত্রেও তাহা সম্ভব না হইবার কোনই কারণ দেখি না।

প্রচলিত নাই বলিয়া একালের ওস্তাদেরা বিচার না করিয়াই সিদ্ধান্ত করেন যে, ভারতীয় কণ্ঠসঙ্গীতে অথবা সেতার প্রভৃতি যন্ত্রসঙ্গীতে স্বরসাধন আনা সম্ভব নহে। তাহা যদি হইত, তবে তানসেন সঙ্গীতের ভিতর দিয়াই বা স্বরসম্বাদ আনিবার চেষ্টা করিলেন কেন? বর্ত্তমানে বাদ্যযন্ত্রে ওস্তাদেরা যে সমস্ত গৎ বাজান, সে সমস্তের ভিতরে কেবল রাগরাগিণীই আত্মপ্রকাশ করিলেও গৎ বাজাইবার সঙ্গে ঝঙ্কার দিবার যে প্রথা আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে, তাহা হইতেই তো আমরা এদেশীয় সঙ্গীতে স্বরসম্বাদের আদিম আভাস প্রাপ্ত হই। বীণ, সেতার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে ঝঙ্কার-তারের বন্দোবস্ত হইতে স্পষ্ট মনে হয় যে, ঐ সকল যন্ত্র কেবল তান বা melody বাজাইবার উদ্দেশ্যেই প্রস্তুত হয় নাই, harmony বা স্বরসম্বাদকেও প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ দৃষ্টির সম্মুখে রাখিয়া উদ্ভাবিত হইয়াছিল। একথা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি যে, এদেশে স্বরসম্বাদ পরিজ্ঞাত ছিল না, অথবা এদেশীয় কণ্ঠ বা যন্ত্রসঙ্গীতে স্বরসম্বাদ ফুটাইয়া তোলা যায় না, বা সম্ভব হইলেও শ্রুতিমধুর হইবে না। এমনও কোন কথা নাই যে, স্বরসম্বাদের উন্নতির চেষ্টা করিলেই ধরিতে হইবে যে, আমরা তাহা পাশ্চাত্য সঙ্গীত হইতে হুবহু ধার করিয়া লইতেছি। বর্ত্তমানে যদি কোন গৎ, তান বা রাগরাগিণীকে স্বরসম্বদ্ধ করা যায়, তাহাকে সম্পূর্ণ নূতন ঘটনা বলা যুক্তিসঙ্গত মনে করি না। ইহাকে আমরা ভারতীয় সঙ্গীতে স্বরসম্বাদের পুনরভিষেক বলিতে পারি।

সামঞ্জস্যেই জগতের সৃষ্টি। কেবল বিকর্ষণ শক্তি থাকিলেও সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকিত না, প্রত্যেক পরমাণু বিচ্ছিন্ন হইয়া কোথায় থাকিত তাহা কে জানে? কেবল আকর্ষণ শক্তি থাকিলেও সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকিত না, সকল পরমাণু মিলিয়া গিয়া একটি মহাতাল পাকাইয়া থাকিত। আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তিদ্বয় সামঞ্জস্যের সহিত কার্য্য করিতেছে বলিয়াই এই শোভনসুন্দর বিচিত্র সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। সামঞ্জস্যের উপরে কেবল সৃষ্টি নহে, এই বিশ্ব-জগতের স্থিতি ও উন্নতিও দাঁড়াইয়া আছে। সঙ্গীতেরও প্রকৃত রক্ষা ও উন্নতি সাধনে ইচ্ছুক হইলে আমাদিগকে সামঞ্জস্যের পথে চলিতে হইবে; ভগবানকে কেন্দ্রে রাখিয়া আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক সঙ্গীতের প্রয়াগসঙ্গম সাধন

* ম্ – মুদারা মা; স্ – মুদারা সা, প্ – অতিমুদারা পা; – উদারা সা।

করিতে হইবে। সঙ্গীতের কেবল আধ্যাত্মিক দিক লইয়া থাকিলে স্থূল শরীরবিশিষ্ট মানুষ সংসারে চলিতে পারিবে না, প্রতি পদে পরাজয় সহ্য করিতে বাধ্য হইবে; কেবল আধিভৌতিক দিক লইয়া থাকিলে সূক্ষ্ম আত্মা উপযুক্ত রসের অভাবে ক্রমে শুষ্ক হইয়া যাইবে এবং সেই সঙ্গে শরীরও ধ্বংসের পথে চলিবে। ভারতের ঋষি-মুনিরা এই সামঞ্জস্যের পথ আবিষ্কার করিয়া সেই পথে ভারতবাসীকে পরিচালিত করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের সময়ে ভারতবর্ষ জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। এই সামঞ্জস্যের পথে দাঁড়াইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা যেখানে যাহা ভাল দেখিতেন, তাহাই নিজের করিয়া লইবার চেষ্টাও করিতেন এবং করিতে পারিতেনও। ভাবধারার মধ্যে সামঞ্জস্য আনিবার জন্য, আবশ্যক হইলে অন্যের নিকট হইতে ভাল জিনিস গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। এই কারণেই ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র রোমকদিগের নিকট হইতে দু-এক বিষয়ে ঋণ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। আমাদেরও বর্ত্তমানে ঘরের কোণে বসিয়া কূপমণ্ডুকের মত নিজের যাহা কিছু তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। আমাদের বুঝিতে হইবে যে, অনন্তস্বরূপ ভগবানের অনন্ত রাজ্যে অনন্ত ভাবধারা ফুটিয়া উঠিতেছে। তাহার সঙ্গে বাষ্পীয় যন্ত্র, তড়িৎ যন্ত্র, বেতার টেলিগ্রাফ প্রভৃতির সাহায্যে সহস্র সহস্র যোজন-ব্যবহিত দেশবিদেশের মধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানের যে কি প্রকার আদান-প্রদান চলিতেছে, সুমেরু ক্রমে ক্রমে কিরূপ দ্রুতগতিতে কুমেরুর সহিত মিলনের পথে চলিয়াছে, চক্ষু খুলিয়া তাহা দেখিলে নির্ব্বাক হইয়া যাইতে হয়। এখন আর মূর্খের মত দেশ-বিদেশের জ্ঞানবিজ্ঞান প্রত্যাখ্যান করিলে চলিবে না। সঙ্গীতরাজ্যেও আমরা যদি আমাদের ভারতীয় সঙ্গীতকে উন্নতির অভিমুখে তুলিয়া ধরিতে চাহি, তবে আমাদেরও তানমূলক রাগরাগিণীর মধ্যে স্বরসম্বাদ নিশ্চয়ই আনিতে হইবে। ইহার জন্য পাশ্চাত্য সঙ্গীতের নিকটেও যদি কোন সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, তবে তাহাতে লজ্জার কোনই কথা নাই। আমাদের রাগরাগিণীর সহিত স্বর-সম্বাদের মহা মিলন সাধিত হউক। এ মিলন সাধিত হইলে ভারত নিশ্চয়ই সঙ্গীতরাজ্যে পূর্ব্বকালের ন্যায় শীর্ষস্থান অধিকার করিবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, কোন সঙ্গীতজ্ঞ সাধক একনিষ্ঠভাবে এ বিষয়ে অগ্রসর হইলে নিশ্চয়ই সফলকাম হইবেন।

বিপর্য্যয়

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল

(৪৩)

অমল অনেক হিসাব করিয়া ইন্দ্রনাথকে সঙ্গে করিয়া অনীতার সন্ধানে শ্যামাসুন্দরীর গৃহে অভিযান করিয়াছিল।

শ্যামাসুন্দরীর ঠাকুর-দালানে প্রবেশ করিয়া অমল ও ইন্দ্রনাথ দেখিল গোস্বামীজীর অসুন্দর মূর্ত্তি—তাদের প্রাণে এ মূর্ত্তি খুব একটা প্রীতির উৎস খুলিয়া দিল না। কিন্তু পাশে বসিয়া ও কে?

অনীতা পরিয়াছিল একখানা সামান্য লালপেড়ে গৈরিক বস্ত্র ও একটা সাদাসিধা গেরুয়া রঙের সেমিজ। তার গলায় ছিল একটা তুলসীর মালা, হাতে কেবল এক জোড়া বালা। এই যোগিনী মূর্ত্তি যে অনীতার, তাহা অমল ও ইন্দ্রনাথ বুঝিতেই পারিল না।

অনীতা চাপিয়া মাটীতে বসিয়া রহিল, মাটীর দিকেই চাহিয়া রহিল। তার বুকের ভিতর এ কি তাণ্ডব নৃত্য, এ কি আনন্দ-কল্লোল, এ কি দুঃখের তরঙ্গ! এত দিন গিয়াছে, তবু কি তার হৃদয় একটু শান্ত হয় নাই! ইন্দ্রনাথকে কাছে দেখিয়া এখনও সে এত অধীর!

সে একবার লক্ষ্মীনারায়ণের দিকে চাহিয়া মনে মনে

বলিল, "ঠাকুর, এ কি তোমার লীলা! একবার দাসীর হৃদয়ে উদয় হ'য়ে আবার কি তা'কে ত্যাগ ক'রলে— আমার হৃদয় একেবারে নিঃশেষে তোমার ক'রে নিলে না কেন? কেন আমার এ পরীক্ষা? আমি দীন, আমি দুর্ব্বল! তোমার চরণ-রেণুর তো যোগ্য নই স্বামী! তবে কেন দাসীর এ পরীক্ষা!" সে চক্ষু মুদ্রিত করিল, তা'র মানস-নয়নে ভাসিয়া উঠিল ইন্দ্রনাথেরই আনন্দ-উজ্জ্বল মূর্ত্তি—কিন্তু তার ভিতর ও কি? ও কার মূর্ত্তি! কার ও-বাঁশী, কার ও-চূড়া! মরি, মরি, কি সুন্দর! তার মাথার ভিতর বড় গোলমাল বাধিয়া গেল।

অমল ও ইন্দ্রনাথ অনীতাকে দেখিয়া স্তব্ধ ও নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শেষে অনেক কষ্টে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে অমল ডাকিল, "অনীতা!"

অনীতা নীরব, স্তব্ধ, তদ্গতচিত্ত!

ব্যস্ত হইয়া ইন্দ্রনাথ ডাকিল "অনীতা!"

চক্ষু মেলিয়া অনীতা বলিল, "কি?"

নামাবলীখানা গলায় জড়াইয়া অনীতা গড় হইয়া ভক্তিভরে ইন্দ্রনাথের পায়ে প্রণাম করিল।

ইন্দ্রনাথ চমকিত হইয়া বলিল, "এ কি অনীতা, আমাকে মিছে লজ্জা দিও না।"

অমল একটা রহস্যের আবরণ দিয়া, তার অনুভূত যাতনা ঢাকিয়া ফেলিবার চেষ্টায় কষ্ট করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "যাক ইন্দ্রনাথ, তুমি দেখছি এক লাফে দেবতা হ'য়ে উঠলে!"

অনীতা হাসিয়া বলিল, "হাঁ দাদা, আমার দেবতা! কেন তুমি কুণ্ঠিত হ'চ্ছ? তুমি যে আমার গুরু, তুমিই আমার গৌর, তুমিই আমার নারায়ণ! তুমি আমাকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছ, তাই আমি নারায়ণকে পেয়েছি।"

অমল ত্যক্ত হইয়া উঠিল। অনীতার স্পষ্টই religious mania হইয়াছে দেখিয়া সে ক্ষুব্ধ হইল। আর এই একটা অপরিচিত বৃদ্ধের সামনে সে এমনি পাগলামি করিয়া নিজেকে খেলো করিতেছে দেখিয়া, সে তাড়াতাড়ি কথাটা ঘুরাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল। সে বলিল, "অনীতা, আমরা তোমাকে বাড়ী নিয়ে যেতে এসেছি। ফিরে চল। অতীত ভুলে যাও বোন, আমার উপর এখন আর রাগ রেখো না। আজ তুমি আমার বাড়ীতে না গেলে আমার সব উৎসব মাটী হ'য়ে যাবে।"

এ কথার উত্তরে অনেকগুলি প্রশ্ন একসঙ্গে অনীতার মনে হইল। তার মধ্যে সে প্রথম বলিল, "কিসের উৎসব দাদা?"

"কাল আমার বিয়ে?"

অনীতা আনন্দিত হইল। বলিল, "তাই না কি? হাঁ দাদা, কার সঙ্গে, বুঁটলী বুঝি।"

"বুঁটলী না হাতি—এ তার চেয়ে ঢের ভাল। তুই চট্ ক'রে কাপড়-চোপড় নিয়ে আয় দেখি। আমি আগে থেকে বলবো না।" বলিয়া হাসিল।

অনীতা গোস্বামীর দিকে চাহিল। গোসাঁই হাসিয়া বলিলেন, "যাও মা, ভাইয়ের বিয়েতে যাবে না?"

অমল তীব্র দৃষ্টিতে বৃদ্ধের দিকে চাহিল। কোথাকার কে এ, যে, তার ভগ্নীর উপর চট্ করিয়া এমন প্রভু হইয়া বসিয়াছে? এ সব ব্যাপার অমলের মোটেই ভাল লাগিল না। পাছে অনীতা চটিয়া যায়, এই ভয়ে সে অতি কষ্টে আত্মদমন করিল। কিন্তু তার দৃষ্টি গোস্বামীকে প্রীতিতে অভিষিক্ত করিল না।

অনীতা উঠিয়া বলিল, "চলো দাদা, যাই।"

গোস্বামী হাসিয়া বলিলেন, "এই বেশে কি মা উৎসবের বাড়ী যেতে আছে? লক্ষ্মীরূপে আজ যাও মা, বিয়ের বাড়ীতে কি যোগিনী হ'য়ে যাওয়া সাজে?"

অনীতা হাসিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিতে গেল। অমল তাহার অসাক্ষাতে গোস্বামীকে বলিল, "তুমি—আপনি কে ম'শায়?"

"শ্রীভগবানের দাসানুদাস, শ্রীরাধাগোবিন্দ গোস্বামী!"

এ নাম অমলের শোনা ছিল। গায়ক ও ভক্ত বলিয়া ইঁহার খ্যাতি ছিল, যদিও অমল ইতিপূর্ব্বে কখনও তাঁহাকে দেখে নাই।

সে হাত তুলিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল। ইন্দ্রনাথ তাঁহার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল। গোস্বামীজী হাসিয়া তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অমল বলিল, "আপনার নাম অনেক শুনেছি, দেখা পেয়ে সুখী হ'লাম। আপনার সঙ্গে গোটা কয়েক কথা ব'লতে চাই, আমার এই ভগ্নীর সম্বন্ধে।"

"কি কথা বাবা ?"

"অনীতাকে কি আপনি বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত ক'রেছেন ?"

"না, আমি করি নি, উনি যে মন্ত্রদীক্ষা পেয়েছেন, তা' আজ শুনতে পেলাম।"

"কার কাছে পেয়েছে ?"

"শুনলেন তো, এই বাবুটির কাছে!"

অমল একটু উষ্ণ ভাবে বলিল, "দেখুন ঠাকুর, ও-সব কথার মার-পেঁচ ছাড়ুন। আমার এই শ্যালকটি বৈষ্ণব ধর্ম্মের কোনও ধার ধারেন না, আর কাণে মন্ত্র দিয়া পয়সা রোজগার করা ওঁর ব্যবসা নয়"—

শান্ত মুখে গোস্বামী কহিলেন, "আমারও নয়।"

"হ'তে পারে। কিন্তু কোনও একজন এমন আছে, যে আমার বোনের ধনদৌলতের খবর রাখে, এবং মন্ত্র নিয়ে কারবারও করে থাকে। সে ইন্দ্রনাথ নয়। সেটি কে আমি তাই জানতে চাই।"

"তেমন লোক থাকতে পারে বই কি !"

এই লোকটির শান্ত পরিহাস অমলের সহিষ্ণুতার অন্তর ভেদ করিয়া গেল। সে বলিল, "শুনে সুখী হ'লাম। কিন্তু বলুন দেখি, অনীতাকে গেরুয়া পরালে কে ?"

"শচীর দুলালকে যে পথে বের ক'রেছিল, সেই পরিয়েছে বাবা—ওই তো তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, সেই চক্রী—ওর কাছে জিজ্ঞাসা কর। সুক্রান্ত থাকে জবাব পাবে।" বলিয়া গোস্বামী লক্ষ্মীনারায়ণকে দেখাইয়া দিলেন।

অমল ক্ষেপিয়া উঠিল, বলিল, "সোজা কথার সোজা জবাব দেওয়া দেখছি আপনার অভ্যাস নাই। তবু আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। অনীতার টাকাকড়ি কি সবই লক্ষ্মীনারায়ণের পেটে গেছে, না এখনো কিছু অবশিষ্ট আছে?"

"তাঁর টাকাকড়ির খবর তো আমি জানিনে বাবা! তবে শুনেছি, এই মন্দির তিনি মেরামত করে দিয়েছেন—"

"আচ্ছা, সে হাজার আষ্টেক—তার পর ?"

"লক্ষ্মীকে একটা হার দিয়েছেন, সে বুঝি হাজার থানেক টাকার। আর একটা মহোৎসব ক'রেছিলেন, সে টাকা আমিই খরচ ক'রেছি, জানি—এক হাজার টাকা তাতে খরচ হ'য়েছে। এ ছাড়া আর কোনও কিছু ক'রেছেন ব'লে তো জানি নে।"

অমল। আপনি টাকাকড়ির কোনও খবর না রেখেও যখন হাজার দশেক টাকার হিসাব মিলিয়ে দিলেন, তখন যিনি খবর রাখেন, তিনি কেন না আর হাজার বিশেক খতিয়ে দেবেন। তা' যা'ক, সে বড় বেশী নয়। তার পর আর একটা কথা—ম'শায়ের সঙ্গে অনীতার সম্পর্কটা কি ? থামুন, আগে আমার বক্তব্যটা স্পষ্ট ক'রে বলে নি, যাতে আপনি কোনও রকম ভুল না ক'রতে পারেন। আপনি তাকে মন্ত্র-দীক্ষা দেন নি, অথচ তার উপর আপনার বেশ প্রভুত্ব আছে দেখতে পাচ্ছি। আপনি তার টাকা পয়সার খবর রাখেন না, তবু হাজার দশেক টাকার হিসাব দিলেন। এ সম্বন্ধটা একটু জটিল ঠেকছে। কাজেই, ম'শায় যদি আপনার সঙ্গে অনীতার প্রথম সাক্ষাৎ থেকে আরম্ভ ক'রে, এ পর্য্যন্ত তার সঙ্গে যা কিছু সম্পর্ক হ'য়েছে, তার একটা সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ বিবরণ দেন, তবেই ভালো হয়।"

গোস্বামী হাসিয়া বলিলেন, "তাই বলছি। তবে বিবরণটি সংক্ষিপ্ত না বিশদ, না সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ হ'ল, সেটা বিচারের ভার তোমার! মা আমাকে ডাকিয়েছিলেন নবদ্বীপ থেকে কীর্ত্তন শিখবেন ব'লে। আমি এসে তাঁকে কীর্ত্তন শেখাতে আরম্ভ ক'রে দেখতে পেলাম যে, মায়ের সঙ্গীতশাস্ত্রে অসামান্য দখল। কিন্তু কীর্ত্তন তো শুধু শাস্ত্রজ্ঞানে হয় না—এতে চাই প্রাণ, ভক্তি, প্রেম। ভক্তের প্রাণ যখন প্রেমরসে বিহ্বল হ'য়ে সঙ্গীতের ধারায় প্রবাহিত হয়, সেই হ'ল কীর্ত্তন"——

অমল বলিল, "এ স্থানটা অত বিশদ না হ'লেও চ'লবে—তার পর।"

"সংক্ষেপে, আমি মাকে ব'ল্লাম, মা, শুধু কসরতে চলবে না, ভক্তি চাই। মা বল্লেন, সে পাবো কোথায় ? আমি বল্লাম সাধন ক'রতে হবে'—মা সাধন ক'রলেন।"

"রসুন—সাধনের প্রক্রিয়া ? মন্ত্রটা আপনি দিলেন।"

"না, আমি দি'নি! মা বল্লেন, 'আমায় দীক্ষা দিন'। আমি তো জানি তিনি কে, আর তাঁর ভিতর কি আছে, তাঁকে দীক্ষা দিবার আমি কে ? আমি বল্লাম, তোমাকে দীক্ষা দেবেন লক্ষ্মীনারায়ণ। সত্যিই মায়ের দীক্ষা হ'য়ে গেল—দেখতে দেখতে মায়ের চেহারা ফিরে গেল, তিনি কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হ'য়ে গেলেন।"

"হাঁ, হাঁ, আপনি বল্লেন, কৃষ্ণ যদি পেতে চাও, বিলাস ছাড়, গয়না কাপড় বিলিয়ে দেও, সর্ব্বস্ব খুইয়ে ভিখারী হ'য়ে নারায়ণের চরণ আশ্রয় কর! কেমন না? তাই তিনি গেরুয়া ধরলেন।"

"না বাবা, আমি সে কথা বলিনি। আজ হঠাৎ দেখলাম, মা রাণীবেশ ছেড়ে যোগিনী সেজেছেন। আমি মোহে অন্ধ, তাই বল্লাম, মা, 'এ বেশ কেন?' মা বল্লেন 'বড় ইচ্ছা হ'ল।' আমি মাথা পেতে শুনলাম।"

ইন্দ্রনাথ এসব বৃত্তান্ত শুনিয়া যেন একটা অপূর্ব্ব রোমাঞ্চ অনুভব করিল। এও কি সম্ভব। অমলের ব্যঙ্গের স্বর যেন তাহার সহজ ভক্তির উপর একটু রূঢ় আঘাত করিতেছিল। এবার অমল কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সে বলিল, "ঠাকুর, আর একটু ভেঙ্গে বলুন এই দীক্ষার কথাটা,—কেমন ক'রে কোথা থেকে এ দীক্ষা হ'ল, আমার জানতে বড় কৌতূহল হ'চ্ছে।"

"সে তো আমি ব'লতে পারবো না বাবা! মা আমার মধুর-রসে ভরপুর! তার সঙ্গে নারায়ণের কি সম্বন্ধ, কি সম্ভাষণ, তা' কি আমি খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস ক'রতে পারি? আমি জানি না। তবে জানি এই যে, কৃষ্ণপ্রেম গ্রহণ ক'রবার জন্য তাঁর হৃদয় প্রস্তুত হ'য়েই ছিল—তিনি প্রেমে ভরপুর হ'য়েছিলেন, কিন্তু যে তাঁর তৃষিত অন্তর প্রেমরসে সরস ক'রে দেবে, তার সন্ধান পাননি। ঠিক যেন শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগের পূর্ব্বাবস্থা! কীর্ত্তনের ভিতর দিয়ে শ্রীরাধার মধুর কথার ভিতর প্রাণ ঢেলে দিতে দিতে কখন যে মায়ের নারায়ণের সঙ্গে প্রেমবন্ধন হ'য়ে গেছে, আমি তা তো টের পাইনি।"

সহজ সুন্দর বেশভূষা করিয়া অনীতা আসিয়া উপস্থিত হইল। তার তুলসীমালার উপর সে একটা সরু চেন পরিয়াছে। বালা খুলিয়া দু'গাছা সাদাসিধে ব্রেসলেট পরিয়াছে। তিলকটি ভাল করিয়া পরিয়াছে; আর একখানা চওড়া লাল পেড়ে মুগার সাড়ী পরিয়াছে এই বেশে তার মূর্ত্তি এত স্নিগ্ধ-শান্ত, সুন্দর ও শ্রীযুক্ত দেখাইল যে, সবাই মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। সে লক্ষ্মী-নারায়ণের সম্মুখে গড় হইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিল। তারপর উঠিয়া হাস্যমুখে বলিল, "এখন চল দাদা!"

অমল ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ছিল, অপ্রসন্ন চিত্তে বলিল, "তোর কাপড়-চোপড়, গহনা-পত্র সব নিয়ে চল্—এখানে আর কেন?"

অনীতা একটু হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, সে পরে দেখা যাবে। আগে বউ আসুক। তার সঙ্গে বোঝাপড়া হ'ক।"

"না, সে কিছুতেই হ'বে না। তা' হ'লে বুঝবো, তুই আমাকে ক্ষমা ক'রতে পারিসনি।"

গদ্গদ-কণ্ঠে অনীতা বলিল, "না দাদা, তা' নয়। এ বাড়ী বোধ হয় আমার ছাড়বার উপায় নেই।"

"কেন?"

"কেন? বৌদিকে এর পর জিজ্ঞাসা করো কেন তার তোমার বাড়ী ছাড়বার জো নেই! সে-ই জবাব দেবে।"

ইন্দ্রনাথের চোখের কোল ভিজিয়া উঠিল। সে অমলের হাত ধরিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "অমল, এখন ওকে পীড়াপীড়ি করো না!"

অমল মুখভার করিয়া বলিল, "যা' ইচ্ছা কর। চল।"

অনীতা গোস্বামী ঠাকুরকে গড় হইয়া প্রণাম করিল, গোসাঞিজি সঙ্কুচিত ভাবে দুই হস্ত কপালে ঠেকাইয়া বলিলেন, "শ্রীবিষ্ণু!"

তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া ড্রাইভার মোটরের দরজা খুলিল। একটা সাড়ীর তলায় জুতা-পরা এক জোড়া সুন্দর পা দেখা দিল। তার পর সাড়ীটার একটু চঞ্চলতা দেখা দিল। ক্রমে দরজার কাছে একখানা সুন্দর মুখ ফুটিয়া উঠিল।

অমলের মুখ চট্ করিয়া সহজ হইয়া গেল। ওষ্ঠের কোণে একটা হাসিও ফুটিয়া উঠিল। সে অনীতার দিকে ফিরিয়া হাসিয়া বলিল, "অনীতা, তোমাকে আমার ব্রাইডের সঙ্গে—"

অনীতা একটু থমকিয়া দাঁড়াইল, ভাবিল, এও কি সম্ভব? শেষে সে হাসিয়া, "ও পোড়ারমুখী তুই," বলিয়া মোটরের ভিতর লাফাইয়া উঠিল। অনীতা ও মনোরমা দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইল।

(৪৪)

বিবাহ-সভায় ইন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিল না; তার দুইটি কারণ ছিল। প্রথম কথা, মনোরমার বিবাহের কথা পিতার নিকট হইতে গোপন করিয়া সে একটা দারুণ

অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। মিথ্যা কথা ও মিথ্যা আচার তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ; বিশেষ বাপের কাছে এত বড় একটা বিষয় লইয়া বঞ্চনা করিতে তার ভয়ানক আত্মগ্লানি হইতেছিল। তার পিতা যদি মনোরমা সম্বন্ধে কোনও কথা তাহাকে জোর করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, তবে সে হয় তো সব কথাই বলিয়া ফেলিতে বাধ্য হইত। এই এক মিথ্যাচারের বোঝা বহিয়া, বিবাহে গিয়া আবার আরও মিথ্যা কথনের প্রয়োজন সৃষ্টি করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। যদিও পিতা জানিতে পারেন যে মনোরমার বিবাহ হইতেছে, তবু ইন্দ্রনাথ যে বিবাহে গিয়াছে এ কথা সঙ্গে সঙ্গে জানিয়া তাঁর ক্লেশবৃদ্ধি হওয়া ভিন্ন কোনই লাভ হইবে না।

কিন্তু ইহা ছাড়া আরও এক কারণে সে বিবাহে যাইতে পারিল না। তাহার প্রথম ভগ্নীপতির সেই রোগ-পাণ্ডুর মুখের সেই বেদনাভরা, নির্ভরভরা দৃষ্টি তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে বিষম খোঁচা দিতেছিল। সে খোকাকে পাশে লইয়া আজ সমস্ত দিন বসিয়া ছিল। ইহার মুখের ভিতর ইহার পিতার সেই মুখের ছায়া দেখিয়া দেখিয়া সে পীড়িত হইতেছিল। সেই মাতার ক্রোড়চ্যুত বালকের উদাস দৃষ্টি তাহার প্রাণের ভিতর দারুণ হাহাকার তুলিয়া দিতেছিল। সে কিছুতেই আজ মনের ভিতর আনন্দ জাগাইয়া তুলিতে পারিল না।

বিবাহে খুব বেশী ভিড় হয় নাই; কেবল অমলের নিতান্ত অন্তরঙ্গ কয়েকটি বন্ধু ছিল। অতিথিদিগের মধ্যে আনন্দ-উৎসবের কোনও ত্রুটি ছিল না—কিন্তু নিরাবিল আনন্দ-ধারার মধ্যে দুইটি ছায়াপাত হইয়াছিল।

মনোরমার অন্তরেও এমনি আর একটি দিন ও তাহার পর দুই বৎসরের স্বামী সহবাসের চিত্র থাকিয়া থাকিয়া খোঁচা দিয়া উঠিতেছিল। অমল পাশে থাকিলে তাহার হৃদয় উজ্জ্বল ছায়াশূন্য হইয়া উঠিত, কিন্তু অমল অন্তরালে গেলেই তাহার প্রাণ সেই অতীত স্মৃতির বেদনায় নিপীড়িত হইতেছিল।

অমল বারবার তাহার কাছে আসিয়াছে, প্রতিবারেই আসিয়া সে তার বলিষ্ঠ হৃদয়ের তীব্র প্রেমের ধারায় তাহাকে অভিষিক্ত করিয়া ধন্য করিয়াছে। বৈকাল বেলায় বিবাহের একটু পূর্ব্বে সে যখন আসিল, তখন মনোরমা বিবাহের সজ্জায় সজ্জিত হইতেছে। অমলের তিনটি নারী বন্ধু বসিয়া সজ্জার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি অনেক আলোচনার পর তাহার অঙ্গে বসাইতেছেন। অমল আসিয়াছে সংবাদ পাইয়া ইঁহাদের একজন গিয়া তাহাকে বলিলেন, "ঠিক আধ ঘণ্টাকাল ধন্না দিয়া না থাকিলে দেবীর দর্শন লাভ হইবে না। তবে যদি সাধনার জোর থাকে, তবে ১৫ মিনিটে দেখা হইলেও হইতে পারে।"

অমল সানন্দচিত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

যখন নারী-পরিষৎ সাজসজ্জা সম্পূর্ণ করিয়া মনোরমাকে ছুটি দিলেন, তখন তার হৃদয় আকণ্ঠ অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। তাহারা মনোরমাকে অমলের কাছে যখন ঠেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল, তখন সে জলভরা বিদ্যুৎভরা মেঘের মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মনোরমার ভূষিত মূর্ত্তি দেখিয়া অমল বিস্মিত আনন্দে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া এক মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিল—যেন সে মনোরমাকে এই প্রথম দেখিল! তার পর সে মনোরমার উপর লাফাইয়া পড়িয়া যত্নের সহিত তাহার দুই বাহুর ভিতর তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। মনোরমার যত্নরুদ্ধ অশ্রুধারা হঠাৎ ছাড়া পাইয়া প্রচণ্ডবেগে তাহার দুই গণ্ড প্লাবিত করিয়া দিল।

অমল ব্যথিত বিস্ময়ের সহিত তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া বলিল, "কাঁদছো কেন মনুয়া?"

মনোরমা অমলের বুকে মাথা রাখিয়া বুকের বোতামটা মুচড়াইতে মুচড়াইতে বলিল, "শুনলে তুমি রাগ করবে না? আমাকে তুমি তবু ভালবাসবে?"

অমল একটু শঙ্কিত হইয়া বলিল, "কি মনো, কি কথা বল।"

মনোরমা থামিয়া থামিয়া বলিল, "আজ আমার বারবার কেবলি মনে পড়ছে তা'র কথা! একদিন সেও এমনি করে আমায় আদর ক'রেছিল। আমি তাকে আজ মনে ক'রছি ব'লে তুমি রাগ ক'রবে না?"

কাতর দৃষ্টিতে মনোরমা অমলের মুখের দিকে চাহিল।

সুধু এক মুহূর্ত্তের জন্য একখানা ক্ষুদ্র মেঘ অমলের আনন্দময় মুখের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল। একবার বুকের ভিতর সে একটা নিবিড় বেদনা অনুভব করিল।

তার পর আরও ঘনিষ্ট ভাবে মনোরমাকে বুকে টানিয়া

সে বলিল, "না মনো, রাগ ক'রবো না। বরং তুমি যদি আজকের দিনে সে অভাগ্যকে একটিবার ব্যাথার সঙ্গে স্মরণ না ক'রতে, তবে তোমায় হৃদয়হীনা মনে ক'রতাম।"

মনোরমার হৃদয় অমলের প্রতি নূতন করিয়া প্রেম ও কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল; কিন্তু চক্ষু ছাপাইয়া আরও অশ্রুর বন্যা ছুটিল।

অনেকক্ষণ পরে সে বলিল, "অনেকদিন ভেবেছি যে, তার স্মৃতি আমার প্রাণের ভিতর থেকে লুপ্ত হ'য়ে গেছে। তাই আমি তার ছবিখানা সরিয়ে ফেলে দিয়েছিলাম। কিন্তু—আজ বুঝছি, আমি এতদিন বুঝিনি; আজ তোমাকে ভালবেসে নূতন করে' বুঝছি যে, আমি তাকে হারিয়েছি। এই স্মৃতির জন্য আমাকে ক্ষমা করো প্রিয়তম!"

অমল স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "ক্ষমা ক'রছি না মনো, তোমায় শ্রদ্ধা করছি! তুমি কি এখন একটু একলা থাকতে ইচ্ছা কর? তবে এখন আমি যাই!"

মনোরমা অমলকে আঁকড়িয়া ধরিয়া বলিল, "না, যেয়ো না, তোমার বুকে মাথা রেখে আমায় কাঁদতে দাও, তাতেই আমার সুখ, তাতেই শান্তি। নইলে, কান্না পেলে মনে হয় যেন আমি অপরাধ করছি।"

কিছুক্ষণ পরে মুখ মুছিয়া শান্ত কণ্ঠে মনোরমা বলিল, "দাদা এলেন না?"

গম্ভীর উদার মূর্ত্তি অমল বলিল, "না, সে লিখেছে যে, আজ এলে তার বাপকে বঞ্চনা ক'রতে হ'বে, তা' সে পারবে না।"

মনোরমা মুখ নীচু করিয়া রহিল। চারুদি বাহিরে দরজার কাছে খুব একটা সোরগোল করিয়া তার পর অন্যদিকে চাহিতে চাহিতে ঘরে ঢুকিলেন। ইহাদের দিকে চাহিতেই দেখিলেন, দুইজনে প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তিতে দুইটি স্বতন্ত্র চেয়ারে বসিয়া আছে। ঠিক এমনটি দেখিবার আশায় তিনি ঐ অধর কোণে লুকান হাসি আর চোখের কোণের দুষ্ট চঞ্চলতা লইয়া আসেন নাই। দেখিয়া অবাক্ হইলেন।

হাসিয়া চারুদি' বলিলেন, "বাঃ, এ তো বেশ প্রিয় সম্ভাষণ!" হাতজোড় করিয়া বলিলেন, "ওগো হাঁড়িমুখ মহাশয় ও মহাশয়া, দূর স্বপ্নলোকে আপনাদের আমায় স্মরণ করিয়ে দিতে হ'চ্ছে যে আজ আপনাদের বিয়ে, ফাঁসী নয়!"

অমল শান্ত হাসি হাসিয়া বলিল, "দুটোতে খুব বেশী তফাৎ আছে কি চারুদি?"

"হাঁ, তা তোমাদের দুজনের মুখ দেখলে বলতে ইচ্ছা হয় বটে যে কোনও তফাৎ নেই।"

চারুদির স্বামী মিষ্টার রায় আকর্ণ-বিশ্রান্ত হাস্য পুরোবর্ত্তী করিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "কিসে তফাৎ নেই চারু?"

চারু মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "বিয়েতে আর ফাঁসীতে।"

মিষ্টার রায় মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "কিছু না, কিছু না! বিবাহের মধ্যে আমাদের যে সব অনুষ্ঠান আছে, তার মধ্যে আমার মতে একটা এই হওয়া উচিত যে, একটা দড়ি ফাঁস গেরো দিয়ে বরের গলায় বেঁধে ক'নের হাতে দেওয়া উচিত—সেটা ঠিক খাঁটি symbolism হয়।"

চারু বলিলেন, "তা ঠিক, কিন্তু একটু সামান্য ভুল হ'ল, ফাঁসীটা থাকবে ক'নের গলায় আর দড়িটা থাকবে বরের হাতে।"

অমল হাসিয়া বলিল, "দুটোই ঠিক। তবে রায়ের কথাটায় একটু ভুল আছে। বোধ হয়, দড়িটা বরের গলায় না হ'য়ে নাকে থাকা উচিত।"

"Bravo my boy! ঠিক বলেছ!"

"বাঃ বেশ, চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা—একটা গোলমাল ক'রলেই সত্য প্রতিষ্ঠা হ'য়ে যায় না। উপস্থিত তোমার নাকের দড়িটা আমার কর্ত্তাটির হাতে এবং মনোরমার গলার দড়িটা আমার হাতে দেওয়ার দরকার হ'য়েছে। সবাই অপেক্ষা ক'রছে, এখন আর তো তোমাদের একত্র থাকা ভাল দেখাচ্ছে না।"

মিঃ রায় বলিলেন, "বাস্তবিকই তো এ কি বেয়াড়াপনা। শুভদৃষ্টির আগে দেখা-শোনা, এ কোন্ দেশী কথা! বেরোও তুমি ঘর থেকে! চলো! বাইরে বসো গে। চুপটি ক'রে সাধু সেজে বসে থাকবে, কেউ যেন টের না পায় যে, কোনও দিন তুমি ক'নের ছায়াও দেখতে পেয়েছ।" অমলকে তিনি দুয়ারের দিকে ঠেলিয়া দিলেন।

অমল মনোরমার কাছে বিদায় লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল। কাঁদিয়া মনোরমার হৃদয় অনেকটা হাল্কা হইয়া গিয়াছিল। এই রহস্যালাপে তাহা আরও পরিষ্কার হইয়া

গেল। চারুদি তাহাকে শেষ ফিনিস দিবার জন্য ড্রেসিং রুমে লইয়া গেলেন।

বিবাহের আসরে বসিয়া হঠাৎ মনোরমার বুকের রক্ত শুকাইয়া গেল,—সে একটা পাথরের মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া গেল;—পার্শ্বে চাহিয়া সে দেখিল, বিবাহে আচার্য্যের স্থানে বসিয়া আছেন সত্যকিঙ্কর! সত্যকিঙ্করও চমকাইয়া উঠিলেন, কিন্তু তাঁর শ্মশ্রুবহুল মুখে কোনও ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না।

এ ব্যাপারের একটা ইতিহাস আছে। অমল স্থির করিয়াছিল, তাহার বিবাহে কোনও ধর্ম্মানুষ্ঠান না হইয়া শুধু সোজাসুজি রেজেষ্ট্রী করা হইবে। কিন্তু মনোরমার মুখ এ কথায় অন্ধকার হইয়া উঠিল। তার জীবনের এত বড় একটা অনুষ্ঠানে ভগবানের আশীর্ব্বাদ না লইয়া অগ্রসর হইতে তার বড় সঙ্কোচ বোধ হইল। অমল কাজেই ধর্ম্মানুষ্ঠানে রাজী হইয়া একেবারে শেষ মুহূর্ত্তে আচার্য্য খুঁজিতে ছুটিল। মনোরমা ধরিল, সুকুমার বাবুকে আচার্য্যের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হউক। এ সম্বন্ধে অনেকের গুরুতর আপত্তি ছিল, কেন না, এ পক্ষে সকলেই সাধারণ সমাজের লোক,—নববিধান সমাজের আচার্য্য আসিয়া এখানে পৌরোহিত্য করেন, ইহা কাহারও মনঃপূত হইল না। তবু অমল সকলের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া নিজে সুকুমার বাবুর বাড়ী গেল।

বিনীত ভাবে সুকুমার বাবুর কাছে তাহার কৃত অন্যায় অপমানের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া অমল তাঁহাকে বিবাহে পৌরোহিত্য করিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু সুকুমার বাবু স্বীকৃত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "তোমাদের আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করছি তোমরা সুখী হও, কিন্তু মনোরমার বিবাহে আচার্য্য পদ লইতে আমার গুরুতর আপত্তি আছে। আমাকে ক্ষমা কর।"

মনোরমার সম্বন্ধে বিধবাশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার কাছে সমস্ত বিবরণ প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে জানাইয়াছিলেন। এই অভিযোগের বিরুদ্ধে সন্তোষজনক প্রমাণ না পাইলে তিনি এই অপবিত্র বিবাহে যোগ দিতে পারেন না, এই কথা সুকুমার বাবু ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু অমলকে তিনি সে কথা কিছু বলিলেন না।

যখন কিছুতেই সুকুমার বাবুকে টলান গেল না, তখন অমল তাড়াতাড়ি তাহার এক বন্ধুকে সাধারণ সমাজের নরেন্দ্র বাবু কি যোগেশ বাবুকে ঠিক করিতে বলিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। সেই বন্ধু নানা লোকের কাছে ঘুরিয়া কাহাকেও সেদিন পাইল না, কেবল সত্যকিঙ্কর বাবুকে অনেক বলিয়া কহিয়া আর একটা কাজ ছাড়াইয়া সন্ধ্যাবেলায় আনিয়া হাজির করিল। সত্যকিঙ্কর জানিতেন অমলের বিবাহ; কাহার সঙ্গে তাহা তিনি জানিতেন না। তাই যখন মনোরমাকে দেখিলেন, তখন তিনি চমকাইয়া উঠিলেন।

বিবাহ যতক্ষণ চলিল, ততক্ষণ সভাস্থ অনেকেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আলাপ করিতে লাগিলেন। সত্যকিঙ্করকে দেখিয়া তাঁহারা শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন; অতি দীর্ঘ প্রার্থনা ও উপদেশে তিনি অতি-বড় সহিষ্ণু উপাসকেরও অন্তর ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেন বলিয়া তাঁহার একটা খ্যাতি ছিল। আর তাঁর উপদেশ ও প্রার্থনার বিশেষত্ব এই যে, তিনি ভুলিয়াও কখনও একটি নূতন কথা বা একটা সরস কথা বলিতে পারিতেন না। বহু পুরাতন জীর্ণ মন্ত্রের পুনঃপুনঃ বিজৃম্ভণ ছাড়া তাঁহার বক্তৃতায় কেহই কিছু খুঁজিয়া পাইত না।

মিষ্টার রায় বলিলেন, "ভগবানের উপর লোককে যদি চটিয়ে দেওয়াই ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য হয়, তবে সত্যকিঙ্করকে উপাচার্য্য করাটা খুব সঙ্গত হ'য়েছে।"

আর একজন বলিলেন, "আর, সমাজে যাই হ'ক না কেন, বিয়ের সভায় এই সব লম্বা লম্বা বক্তৃতা একেবারেই অগ্রাহ্য!"

হঠাৎ হারমোনিয়ম বাজিয়া উঠিল, সমস্ত শ্রোতার হৃদয় মথিত করিয়া অনীতা গাহিল,—

(এদের) জীবনতরী ভাসলো আজি
প্রেমের পাথারে;
হালে বসে, প্রেমের ঠাকুর,
চালাও ইহারে।
ঝঞ্ঝা যদি এসে পড়ে,
পাগল সাগর দোলে ঝড়ে,
অভয় দিয়ে ছায়া দিও
তোমার আঁচরে।

(ওগো) চির-যুগল, এই যুগলে
ঠাঁই দিও হে চরণ-তলে,
(তোমার) দয়ায় যেন হৃদে সদা
পুলক সঞ্চারে।

সঙ্গীত থামিয়া গেল! এক মুহূর্ত্ত সমস্ত সভা সঙ্গীত-রসে মোহমুগ্ধ হইয়া পড়িয়া রহিল। একদিকে একটা অশান্তির মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল—পরমেশ্বরকে 'যুগল' বলিয়া সম্বোধনে বৈষ্ণব পৌত্তলিকতার আভাসে কয়জন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম অশুচিবোধ করিতে লাগিলেন।

সত্যকিঙ্কর অনেকক্ষণ নীরবে ধ্যানস্থ থাকিয়া মুখ খুলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, সবাই শঙ্কিত হইয়া উঠিল। কিন্তু স্বর শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইল। এ তো সত্যকিঙ্করের সিংহনাদ নয়, তদ্গতচিত্ত সাধকের মৃদু সম্ভাষণ। কথা শুনিয়া তাহারা আরও আশ্চর্য্য হইল। সত্যকিঙ্কর শান্তকণ্ঠে কেবল বলিলেন,—

"হে প্রেমের ভগবান, হে মিলনের দেবতা, তুমি এই নূতন প্রেমিক দুটীকে তোমার চরণে আশ্রয় দাও, তোমার পুণ্য-স্নিগ্ধ দৃষ্টির উজ্জ্বল আলোকের তলে ইহাদের অন্তরে প্রেম-শতদল পুঞ্জে পুঞ্জে বিকশিত হইয়া তোমার করুণার ধারায় অভিষিক্ত হইয়া উঠুক। বরবধূ ও তাহাদের বন্ধুদের তোমার চরণে এই একমাত্র প্রার্থনা দয়াময়—তোমার প্রেমময় নাম ইহাদের জীবনে জয়যুক্ত হউক!"

এত সংক্ষিপ্ত, এত সরস, এত নূতন কথায় ভরা প্রার্থনা সত্যকিঙ্করের মুখে কেহ কখনো শোনে নাই।

প্রার্থনার শেষ স্বর যখন সভার শান্ত গভীরতার ভিতর মিলাইয়া গেল, তখন অনীতা কলকণ্ঠে আবার একটী গান গাহিল। তারপর সত্যকিঙ্কর উপদেশ দিলেন।

আচার্য্যের উপদেশ দিবার সময় সত্যকিঙ্কর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কেবল বলিলেন,—

"শ্রীমান অমলকুমার, শ্রীমতী মনোরমা তোমরা বিদ্বান্, বুদ্ধিমান; সংসারে তোমরা অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছ; ভগবানে তোমরা ভক্তিমান। তোমরা যে পথে আজ পরস্পরের হাত ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছ, সে পথের পাথেয় তোমরা যথেষ্ট সঞ্চয় করিয়াছ;—আমি তোমাদিগকে কি উপদেশ দিব?—কেবল আশীর্ব্বাদ করি, ভগবানের অপার করুণা তোমাদের উপর বর্ষিত হউক। তোমরা দুজনেই জীবনে ভগবানের করুণার পরিচয় পাইয়াছ;—তিনি তোমাদিগকে কত বিপদ, কত প্রলোভন, কত কলঙ্ক, কত পরীক্ষার ভিতর দিয়া অক্ষত, মহান্ করিয়া রক্ষা করিয়াছেন;—তাঁর এই করুণা তোমাদের জীবনে যদি নিরন্তর জাগ্রত থাকে, তবে আর তোমাদের কোনও চিন্তাই নাই।"

ব্যস্. উপদেশ শেষ হইয়া গেল। বরকন্যা হাত ধরিয়া উঠিয়া বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে করমর্দ্দন ও নমস্কারাদি করিল।

সত্যকিঙ্করের হাত ধরিয়া অমল খুব জোরে ঝাঁকাইয়া বলিল, "আপনাকে কি বলে' ধন্যবাদ দেব জানি না, খুব সংক্ষেপে সেরেছেন, It was a pleasant surprise."

সত্যকিঙ্কর নীরবে প্রতি-নমস্কার করিয়া অগ্রসর হইল। মিষ্টার রায় সত্যকিঙ্করের হাত ধরিয়া খুব ঝাঁকাইয়া বলিল, "Thank you, thank you! লুচিগুলো গরম থাকতে থাকতে যে শেষ করেছ, তাতে বহু ধন্যবাদ।"

সত্যকিঙ্কর কথা কহিল না।

একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক অগ্রসর হইয়া সত্যকিঙ্করকে বলিলেন, "বড় সুন্দর উপাসনা, সুন্দর সরস ক্ষুদ্র উপদেশ—আপনার মুখে এমন কথা আরও অনেক শুনতে আশা করি।"

সত্যকিঙ্করের চোখের ভিতর একটু চকচকে হইয়া উঠিল। সে নীরবে নমস্কার করিয়া অগ্রসর হইল। পর মুহূর্ত্তে আর কেহ তাহাকে দেখিল না। আজ সে অন্তর ঢালিয়া উপাসনা করিয়াছে—আর অন্তরের সমস্ত আশীর্ব্বাদ যৌতুক দিয়া সে তার একমাত্র প্রেমাস্পদকে অমলের হাতে দিয়া গেল।

সত্যকিঙ্কর না খাইয়া অমনি চলিয়া গেল দেখিয়া সবাই নানা কথা বলিতে লাগিল, কেহই কারণ বুঝিতে পারিল না। মনোরমা কতক বুঝিল, কিন্তু ভুল বুঝিল।

* * * *

রাত্রেই মনোরমার মা একেলা তাঁর এক আত্মীয়ের সঙ্গে আসিয়া বরকন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন। (ক্রমশঃ)

কোষ্ঠীর ফলাফল

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার কোষ্ঠীতে না কি লেখা ছিল,—চিরজীবন ঘুরিয়া মরিতে হইবে। তরুণ বয়সে কথাটা বেশ লাগিয়াছিল,—উৎসাহ আগ্রহও আনিয়াছিল। যৌবনে মহাজনদের পন্থা অনুসরণ করিয়া এমন চাকুরী স্বীকার করিলাম যে, অল্পদিন মধ্যেই কোষ্ঠীর ফল দল বাঁধিয়া দেখা দিতে লাগিল; আমি কক্ষচ্যুত গ্রহের মত সবেগে সতের বৎসর নানাস্থানী হইয়া ঘুরিতে লাগিলাম। সখ্ মিটিলেও ফলের good luck (শুভদৃষ্টি) তখনো তুঙ্গী,—জল স্থল মরু গিরি নির্ব্বিশেষে সমান ফলিতে লাগিল। শেষে চীনের প্রাচীরে পায়চারি করিয়া, মাঞ্চুরিয়ার মাটী মাড়াইয়া, রাজপুতানার মরুভূমি ভেদ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখি—কোষ্ঠীখানি উইয়ের উদরস্থ হইয়াছে! যাক্, আপদ গিয়াছে,—ফলের জড় মরিয়াছে,—বাঁচা গেল। সুদীর্ঘ বিশ বৎসর ধরিয়া যেরূপ ফ্যালাও ভাবে ফল ফলিয়াছে, তাহাতে সহজেই বুঝিলাম—নিশ্চয়ই চতুর্ব্বর্গ লাভ হইয়া গিয়া থাকিবে;—স্বর্গপ্রাপ্তির আর বেশী বিলম্ব নাই। এখন Segregation campএ (ভিন্ন গোয়ালে) অপেক্ষা করাই সুবুদ্ধি-সঙ্গত। কাশী আমাদের ভূস্বর্গ, আপাততঃ সেই স্বর্গে থাকাই বিধেয়। তাড়াতাড়ি যাহা জুটিল পেনসন্ লইয়া, পাত্তাড়ি গুটাইয়া, কাশী রওনা হইয়া পড়িলাম।

(২)

৺কাশীধামে বাসা বাঁধিতেছিলাম, ইচ্ছা—আর নড়াচড়া নয়, একেবারে শিব হইয়া leave (ছুটী) লইব। মানুষের স্পর্দ্ধা তাহাকে বুঝিতে দেয় না যে, তাহার নিজের ইচ্ছাই চরম নহে। পূর্ণিয়া হইতে পরমাত্মীয়দের জরুরি ডাক্ আসিল,—বিশেষ কাজ আছে!

অধিকার মত জগতের বহু বাহার আস্বাদন করিয়া কাশী আসিয়াছিলাম; এখন ধর্ম্মকর্ম্ম ছাড়া, অর্থাৎ আহার নিদ্রা ছাড়া যে, আমার আর কোন কাজ থাকিতে পারে, তাহা মাথায় আসে নাই। যাহা হউক, কুটোকাটি পড়িয়া রহিল,—অপস্বর্গে পুনর্যাত্রা করিলাম। পূর্ণিয়ায় পৌছিয়াই দেখি, সেই বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে দেওঘর যাইবার পরোয়ানা প্রস্তুত! কি পাপ! "মরিয়া না মরে রাম—এ কেমন বৈরী!"

নষ্ট-কোষ্ঠী উদ্ধার হইল না কি? আবার যে ফল ধরে! ব্রাহ্মণী পূর্ণিয়াতেই ছিলেন; তিনিই মুখপাত্রীরূপে (দুঃখদাত্রী বলা আইনে আটকায়) অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া বলিলেন,—"দেরী করলে ত' চলবে না, আর দিন নেই, শীগ্গির তয়ের হ'য়ে নাও।" বলিলাম—"তয়ের হ'য়ে ত' অনেক দিন থেকেই রয়েছি, কেউ নেয় কই!" কথাটা বোধ হয় তাঁহার ভাল লাগিল না, একটু বিরক্ত হইলেন,—কিন্তু তাগাদা বাহাল রহিল।

শুনিয়াছি সার্ উইলিয়ম্ জোন্স্ (Sir William Jones) সংস্কৃত শাস্ত্রে সেরা পণ্ডিত ছিলেন, আমাদের সকল শাস্ত্রই না কি পড়িয়াছিলেন; কিন্তু তখনকার নবদ্বীপের প্রধান পণ্ডিত তাঁকে নূতন একটি শাস্ত্রের সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলেন, যেটির নাম "অনটন" শাস্ত্র, এবং যা তাঁর দেখা ছিল না। কার্য্য হইতে অবসর লইবার জন্য আমার ছট্‌ফটানি ধরিয়াছিল, তাই তাড়াতাড়ি অসময়েই retire করি। উদ্দেশ্য নূতন আর কিছু দেখিতেছি না, অবস্থা আর যোগ্যতা মত সব কাজই করিয়া দেখা হইয়াছে,—এখন কাশী গিয়া নিশ্চিন্তে শেষ কয়টা দিন কাটানো। কিন্তু অচিরেই পরমাত্মীয়েরা, বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণী, বাত্‌লে দিলেন,—"ব্যাগার" বলিয়া যে বড় কাজটি আছে, তাহার অন্ত নাই; এবং কেহ তাহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

বুঝিলাম—"ব্যাগারের" জন্যই এখন বাঁচিতে হইবে! যথা,—দুধ্‌টো উনানে বসানো রইল, দেখো উথ্‌লে না পড়ে,—আমি আহ্নিকটে সেরেনি। মাছগুলো না বিড়ালে নে'যায়,—গা' ধুয়ে আসি! ননীগোপালকে নিয়ে একটু খেলা কর',—ও ভারি শান্ত ছেলে. আমি একবার হরিমতিদের বাড়ী যাচ্ছি;—তাদের গুরুপুত্তুর এসেছেন—হারমোনিয়া বাজিয়ে কি হরিনামই ক'রচেন, পশুপক্ষীতে

থির্ হ'য়ে 'শোনে।—এই শাঁখটা রইল', সন্ধ্যে হ'য়ে যায় ত' তিনবার ফুঁ দিও (অর্থাৎ-ফুঁকো)—ইত্যাদি। শাঁখটা শিঙ্গা হইলেই ভাল হইত, ফুঁকিতে পারিলে আরাম ছিল! ননীগোপাল যে কিরূপ শান্ত ছেলে তা অষ্টপ্রহরই প্রত্যক্ষ করি, আর পালাই পালাই করি। ওই বর্ব্বরটির ক্ষুদ্র মস্তিষ্কটি এমনি উর্ব্বর—এরি মধ্যে সে দেশলায়ের বাক্স সংগ্রহে সিদ্ধহস্ত; সেদিন ভাঁড়ার ঘরের বড়ির হাঁড়ির মধ্য হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়া "মশারি বাজি" খেলিয়াছিল! নিবাইতে নিবাইতে সাড়ে তিন হাত সাফ্। তখন সেই শান্ত ছেলে লইয়া, কত আদর, কত আশঙ্কা, কত মানসিক; কারণ—সোণারচাঁদ গিছলো আর কি,—হরি রক্ষা করেছেন! পরে শুনিতে হয়,—হ্যাঁগা তুমি মানুষ না কি? বাড়ীতে ব'সে রয়েছ—ইত্যাদি, এবং বলিতে হয়—"যদি চাল্লিশ বছরে না চিনে থাক', সেটা কি আমার অপরাধ?" এখন ফুল-বেঞ্চের রায়ে আমারই দোষ সাব্যস্ত,—আমিই গিল্টি (guilty)! এই কিল্‌টি নীরবে হজম্ করাই বিধি। সে যাহা হউক,—ছেলে শান্ত বটে; কিন্তু প্রাকৃতিক বেগ্ এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফলগুলা ত' শান্ত অশান্ত ভেদে আসে না, আর সে-ফল্ চতুর্বর্গের চৌহদ্দিও মাড়ায় না, অথচ ভোগটা পুরোপুরি চার-পো! আবার বোঝাটা চাই—আহ্নিক আর হরিনাম (যাহা পশুপক্ষীতে থির্ হ'য়ে শোনে), তাহা আমার তরে নয়, তাহাতে আমার অধিকার পঞ্চাশ পেরিয়েও জন্মায় নাই; বাকি-গুলার তরেই বাঁচিয়া থাকা! কোন দিন বা শুনিতে হয়—"একটু নড়াচড়া ভাল গো,—বরাবর বাইরে বাইরে ঘুরেচ';—একবার পায়ে পায়ে ঐ বোসেদের বেড়ার ধারে গিয়ে, ব'সে ব'সে চারটি সজনে-ফুল কুড়িয়ে আনো দিকি, আহার ওষুধ দুই-ই হবে,—এই নাও, এই ধামিটে নাও!" কি দয়া! আবার হাইজিনের হাউই ছাড়ে যে! কোন দিন বা দেখিতে হয়,—বড় নাতি তস্করের মত রুদ্ধদ্বারে—টেবিল-আয়নার' সম্মুখে, ভাস্কর পণ্ডিতের ভণিতা ভাঁজিতেছে, আর একটা মোটা পাশ বালিসের ওয়াড়ের বন্ধন-রজ্জুতে একটা নিবস্ত বাতি একবার করিয়া ঝাকাইতেছে আর—"সংহার-সংহার" বলিয়া ঝাঁকাইয়া উঠিতেছে! কিন্তু "সংহার" কথাটার কোন্ অক্ষরের উপর accent (ঝোঁক) পড়িলে জীবনটা সার্থক হয়, তাহা কিছুতেই ঠিক্ করিতে পারিতেছে না; কখন accent on second half, কখন' on third one third, কখন first one seventh syllableএর উপর চাপাইয়া দেখিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে দানীবাবু সে সময় কত ডিগ্রি angleএ গ্রীবা বক্র করেন এবং তাঁহার নাসারন্ধ্র কতটা diametreএ dilated (বিস্ফারিত) হ'য় ও অক্ষিগোলক খোল ছাড়িয়া কতটা বাহিরে আসে, তাহার কসরৎও চলিতেছে। তখন ইচ্ছা হয় বলি—"ওরে রাস্কেল্, আস্‌চে বারে কর্কট জন্ম নিস্, ও দুঃখ থাকিবে না, চোখ ঠেলিয়া নাকের ডগার সমরেখায় অনায়াসে আনতে পারিবি,—দু'শো বাহবা পড়ে যাবে, এবারটা দয়া করে চরকা কাট্,- বড় দুঃসময়।"—একটু পরেই গুন গুন্ স্বরে কেশ-প্রসাধন,—গ্রিসিয়ান্ স্লিপার পায়, ও গন্ধ-গোকুলের মত ভরভরে গন্ধ ছড়াইতে ছড়াইতে বেগে জরুরি কার্য্যে পাঁচ ঘণ্টার মত প্রস্থান! বাহিরে পা দিয়াই আওয়াজ—"দোরটা খোলা রইল; গরু না ঢোকে!" তখন বলিতে হয়—"পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে ঢুকবে না,—ভয় নেই।" কেই বা শোনে, বরং ক্রমোচ্চাব স্বরে tidal progressionএ ধনুষ্টঙ্কার-curveএ, আমারি কাণে আসে "আ—মা র—দে—শ"। তখন হাসি পায়, মনে মনে বলি—"তোমার চোদ্দোপুরুষের দেশ! ও-"বেশে" দেশ হয় না রে পাজি!"—তবে ননীগোপাল বেঁচে থাকুক,—রাত্রে মশায় rush (তাড়া) করিলে, ফস্ করিয়া সুবর্ণচন্দ্র-কৃত সিঁদ্‌বোন্ দিয়া ছুটিয়া পলাইবার সুবিধা হয়।

কার্য্য হইতে অবসর লইলে দেখিতেছি সুবিধা বিস্তর! পূজনীয় শাস্ত্রকারেরা পঞ্চাশোর্দ্ধে বনে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। এখন কিন্তু সে মুখো পা বাড়াইলেই forest department (বন-বিভাগ) ফেরার আসামী বলিয়া চালান্ দেন। কাজেই কাশী যাই, কারণ কাশীর অপর একটি নাম—"আনন্দ-কানন";—এই mild doseও বুঝি তলায় না। যদ্‌বিধের্ম্মনসি স্থিতম্।

(৩)

পঞ্জিকা দেখার প্রয়োজন ছিল না,—পেন্‌সন্-প্রাপ্ত লোকের আর শুভ-অশুভ দিন কি? তাহার আবার বিপদ-আপদ কি? তাহার বাঁচিবার যত্নটাই যে হাসির কথা! (শাস্ত্রকারেরা 'মহাপাতক' বলিয়া একটা মহা অনর্থ

ঘটাইয়া গিয়াছেন, নচেৎ যে গরু দুধ দেয় না, তাহাকে রাখাটা মস্ত একটা economic problemএর (অর্থনৈতিক সমস্যার) মধ্যে পড়িয়া যাইত; আর গো-ব্রাহ্মণ ত চিরকাল এক ব্রাকেটের মধ্যে পড়িয়াই আছে।) তাই পঞ্জিকার পরিবর্ত্তে টাইম্ টেবেলের টান্ ধরিল। এক-দুই ক্রমে তিনখানি নাড়াচাড়া করিয়া, পথের পাত্তা লাগিল, কিন্তু আত্মা শুকাইয়া গেল। পূর্ণিয়া হইতে কাটিহার; কাটিহার হইতে মনিহারি ঘাট; পরে ষ্টিমারে গঙ্গাপার হইয়া সকরিগলি ঘাট; তথা হইতে সাহেবগঞ্জ; সাহেবগঞ্জ ছাড়িয়া কিউল্; কিউল হইতে যশ্‌ডি; যশ্‌ডি হইতে destination অর্থাৎ ঠিকানায়! উল্লিখিত প্রত্যেক স্থানেই যাবা-ওঠা, যান-পরিবর্ত্তন, অর্থাৎ আমার পক্ষে 'জান পরিবর্ত্তন'! এক টুক্‌রা কাগজে এই সময় ও ওট্-বোসের তালিকা টুকিবার পর দেখি সেখানি যেন কালা-জ্বরের temparature chart দাঁড়াইয়াছে! এই জ্বর ভোগ করিতে হইবে, উপায়ান্তর নাই। মনে হইল ইহা অপেক্ষা North Pole (উত্তর মেরু) আবিষ্কারে লাগিয়া পড়া সহজ।

তাগাদায় অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। "সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল" ভাবিয়া প্রাণভয়ে পলাতক প্রাণীর মত পরদিনই শুভাশুভ-নিরপেক্ষ কোন এক মুহূর্ত্তে দুর্গা বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। ভাগ্যবানেরা বলেন Life is holy and Sweet—মিথ্যা নয়!

যাহা হউক, একটি সহকারী সঙ্গী পাইলাম। ভাল হইল কি মন্দ হইল, তাহা এক্ষণে ডিঃ গুপ্ত মহাশয়ের দাওয়ায়ের মত—"ফলেন পরিচীয়তে" থাকাই ভাল। নানা চিন্তা সমেত ইণ্টার ক্লাসে enter করা গেল,—কারণ আমরা মধ্যবিত্ত। চিন্তাগুলি 'নিরাকার' তাই রক্ষা, নচেৎ সে বোঝা গাড়ীতে ঢুকিত না,—'ব্রেক্-ভানে' দিতে হইত, এবং তাহার পশ্চাতে পথের সম্বলও সাবাড় হইয়া যাইত।

শুনিয়াছি—সাপে-কাটা রোগীকে সর্ব্বক্ষণ সজাগ রাখার ব্যবস্থা করিতে হয়,—পাছে ঢুল্ ধরে। আমাদের কিসে কাটিয়াছিল, সেটা ভাষায় না বলাই ভাল, তবে এ-যাত্রায় আমাদেরও ঢুল্ ধরিবার ক্ষো-টি ছিল না। ওট্-বোস্ করিতে করিতে দিনরাত কাটিতে লাগিল; সুতরাং সহজেই আবিষ্কার করিয়া ফেলিলাম,—এই গেঁটে যাত্রাটি সাপে-খাওয়া রোগীর একটি 'টোট্‌কা'। যাত্রাটি শুধুই গেঁটে ছিল না,—প্রত্যেক গাঁটের দু'পিটেই কাঁটা,—পাশ ফিরিলেই ফোটে,—কুলিদের বুলি শুনিলে কুম্ভকর্ণেরও নিদ্রাভঙ্গ হয়! হায়, তখনো জানিতাম না—আমার সহকারীটি দাঁড়াইয়া এবং চক্ষু না বুজিয়া ঘুমাইতে পারেন।

(৪)

ক্রমে তখন কিউলে আসিয়া পড়িয়াছি। কুলি-জি আশ্বাস দিয়া গেলেন,—বিলম্ব আছে, ট্রেণ আসিলেই বোঝাই দিবেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে; দৌড়দার প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে শীতের হাওয়া, হু হু করিয়া অবাধ ছুটিয়াছে। ট্রেণের অপেক্ষায় বহুলোক বোচকা-বুচ্‌কি লইয়া, কেহ বসিয়া, কেহ শুইয়া, হিম আর হাওয়ায় জড়সড়। আমাদের জন্য সর্ব্বত্রই এক ঢালা-ব্যবস্থা আর খোলা-দরবার। সব যেন সড়কের মাল। আচ্ছাদন-যুক্ত অংশটুকু প্রায় কোম্পানীর কুপুত্রেই ভরাট;—কুলি প্রভৃতিরা আপাদ-মস্তক ঢাকিয়া, লম্বা হইয়া দখল করিয়াছে; দুইজন বা একজোড়া করিয়া বসিবার, দুইখানি বেঞ্চিও বর্ত্তমান! পূর্ব্বাগতরা তাহা পুট্‌লি সমেত পূর্ণ করিয়াছেন, ও এমন মুড়ি দিয়া গুঁড়ি মারিয়া আছেন যে, কোন্‌টি পুঁটলি, কোন্‌টি মালিক তাহা বুঝিয়া লওয়া কঠিন তাহার সম্মুখে কুলি-জি আমাদের সামান্য মালপত্রগুলি নামাইয়াছিলেন।

একস্থানে দাঁড়াইয়া সরাসরি হাওয়া খাওয়া অপেক্ষা, একটু নড়িয়া চড়িয়া নাড়ী বজায় রাখিবার চেষ্টা পাওয়াই ভাল ভাবিয়া যেই দুই পদ অগ্রসর হইয়াছি, অলক্ষ্যে আকাশবাণী হইল—"এটা পার্ক (Park) নয় মশাই,—কিউল্ ইষ্টেসন্;—পেছন ফিরলেই পুঁটলি সরে যায়। বরং বোচ্‌কার উপর চেপে sit down (বসুন)। এটা মহতের আড্ডা, তাঁরা যাত্রীদের ভার লাঘব ক'রতে সর্ব্বদাই যত্নবান!" এদিক ওদিক তাকাইতেছি, আবার আওয়াজ আসিল—"এই একটু আগে একজনের পুঁটলি পাচার হয়েছে, সে পাগলের মত' ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্চে।" বুঝিলাম বেঞ্চিস্থিত দুইটি মোড়কের মধ্যে কোন একটি এই সতর্কবাণী ঘোষণা করিলেন। উদ্দেশে

কৃতজ্ঞতা প্রকাশানন্তর আমার বেতের ট্রাঙ্কটি চাপিয়া বসিলাম, এবং নস্তদানিটি বাহিরের পকেট্ হইতে ভিতরের পকেটে চালান্ দিলাম।

আমার সহকারী-সঙ্গী জয়হরি—দৈর্ঘ্যে প্রায় ছয় ফিট্, ওজনে সওয়া দুই মণ, এবং বয়সে সাতাশ; সুতরাং মনে কিঞ্চিৎ সাহস পাইয়াছিলাম। চাহিয়া দেখি, সে সোজা প্ল্যাটফর্ম্ম ধরিয়া চলিয়াছে;—নিশ্চয়ই এই ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়া, কোন একটি স্বাভাবিক পীড়া প্রবল হইয়া থাকিবে। মিনিটখানেক পরেই সেইদিকে একটা "মার্ মার্" শব্দে সকলকে সচকিত করিয়া দিল। কিন্তু সকলেই পুঁটলির সঙ্গে বাঁধা! আমি জয়হরিকে না দেখিতে পাইয়া উদ্বিগ্ন হইলাম; বেঞ্চি লক্ষ্য করিয়া বলিলাম,—"অনুগ্রহ ক'রে একটু দেখবেন, আমি আমার সঙ্গীটির খোঁজ লই, আর ব্যাপারটা কি, তা শুনে আসি।" অনুমতিটা সহজেই পাইলাম; বুঝিলাম—তিনিও ঘটনাটা জানিবার জন্য উৎসুক।

এস্থলে একটা বিশেষ কথা আছে, যাহা বাদ দিলে ঘটনাটা খোলসা হইবে না। কিউল্ ইষ্টেসন্ হইতে অন্যূন পঞ্চাশ হাঁড়ি (কলস) দধি, প্রত্যহ রাত্রে কলিকাতায় চালান যায়; এবং প্রাতে,—রবিবাবুর ভাষায়:—

"বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি"—লয় চুপে চুপে; অর্থাৎ রাজধানীর রসে—এক হাঁড়ি, সাত হাঁড়িতে উন্নতিলাভ করিয়া, ক্রেতাদের দীর্ঘায়ু লাভে সাহায্য করে। (ইভি সায়েন্স্)।

কিউল্ সম্ভবতঃ গৌড় মণ্ডলের গণ্ডীর মধ্যেই পড়ে, বা গণ্ডী ঘেঁসিয়া থাকে; আর গোড়-গয়লারাই এই মধু (সুধা) নিত্য সরবরাহ করে,—"গৌড়জন যাহে—" ইত্যাদি।

আজও সেই-সব দধিভাণ্ড বা মধুভাণ্ড—মধু-চক্রাকারে প্ল্যাটফর্ম্মের উপর, গাড়ীর অপেক্ষায় রক্ষিত ছিল। মালিকেরা অদূরেই স্ব স্ব বাঁকের উপর বসিয়া, কেহ সুর ভাঁজিতে, কেহ খইনি টিপিতেছিল। ইষ্টেসনে তাহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি খুবই, কারণ অনেকেই "মধুংলিহ"। হনকালে—

গিয়া যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম, তাহাতে হাঁসিব কি কাঁদিব, কি মাথা খুঁড়িব, স্থির করিতে পারিলাম না। দেখি—জয়হরি একদম সেই হাড়ি (হাঁড়ি) পাড়ার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে; এবং বাঁকহস্তে 'গৌড়জন' তাহাকে ঘিরিয়া এই মারে ত' এই মারে। যে সব শব্দ বাত চলিয়াছে, তাহাতে রক্তপাত হইতে আর বিলম্ব নাই। এমন সময়ে সহসা জয়হরির চট্‌কা ভাঙ্গিল; সে একবার চারিদিক চাহিয়া আসন্ন মুহূর্ত্তে বলিল,—"ভাই,—শো গিয়া থা"! দু'একজন বলিয়া উঠিল,—"হাঁ—নাক্ তো বোল্ রহা থা।"

আগুনে যেন জল পড়িল, একটা হাসির সঙ্গে Crisis over,—ফাঁড়া কাটিয়া গেল। তাহারা তাহার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে ব্যূহের বাহির করিয়া দিল, ও নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল,—"বাঙ্গালীকা সবই আজব্ হায়"।

আমি মনে মনে ভাঁজিতেছিলাম, বলিব—"রাতকাণা হায়", নচেৎ নিস্তার নাই; সেটা ফাঁশিয়া গেল। বলিলাম—"কিছুদিন হইতে এই কঠিন রোগ আশ্রয় করিয়াছে, বড়ই শোচমে (দুর্ভাবনায়) পড়িয়াছি ভাই। সেদিন রাস্তায় নূতন গরম কোট্‌টি কে খুলিয়া লইয়াছেন, উনি কিছুই টের পাননি। ডাক্তার বৈদ্যে জবাব দিয়া হায়, হাকিম হাল্ ছোড়া হায়। এখন সকলেবি রায়—ঝাড় ফোঁক্।" তাহারা উৎসাহের সহিত বলিল—"ইয়ে তো বহুত্ ঠিক্ বাত্ হায়।" পরে আমাকে "চূড়ানন্দ ঝা"র ঠিকানা লিখাইয়া দিল, ও বলিল,—"প্রেতমোচনের অমন ওস্তাদ্ দুনিয়ায় আর দ্বিতীয় নাই।" কাগজখানি তিনবার মাথায় ঠ্যাকাইয়া বুক্ পকেটে রাখিলাম, ও এইভাবে তাহাদের শ্রদ্ধা সহানুভূতি আকর্ষণ ও উপদেশ অর্জ্জন করিয়া, আসামী লইয়া ফিরিলাম।

মোড়ক্ মধ্যস্থ মানুষটি উন্মুখ হইয়া ছিলেন; মোদ্দাটা শুনিয়া বলিলেন—"বলেন কি—এ যে পথে নারীর বাবা! এক্ষুনি ওঁর কাছায় আর আপনার কোঁচায় গাঁটছড়া বেঁধে ফেলুন;—এমন বিপদও সঙ্গে আনে!" জয়হরি অপ্রতিভের মত বলিল—"কখনো কখনো হয়ে যায়।"—অবিকশিত মোড়ক মহাশয় বলিলেন,—"বাবা—তোমার ওই 'কখনো' তেই কুম্ভকর্ণকে হটিয়ে দিয়েছ,—তিনি শুয়ে ঘুমুতেন!" পরে আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"ওঁকে কতদূর টান্‌তে হবে?" বলিলাম—"দেওঘর পর্য্যন্ত।" তিনি বলিলেন "ওঃ বৈদ্যনাথ যাচ্ছেন, ওঁর কল্যাণে 'হত্যা' দিতে বুঝি?"

আমি বলিলাম—"না, দেওঘরেই দরকার আছে।" তিনি বলিলেন—"ওই হোলো, দেওঘর আর বৈদ্যনাথ ত' ভিন্ন নয়; কাজটা সেরে এলেই ভাল হয়, আবার ত ওঁকে নিয়ে ফিরতে হবে।"

আমি ত' অবাক; দেওঘর আর বৈদ্যনাথ তবে কি একই জিনিস! মনে পড়িল,—পঠদ্দশায় একবার জিওগ্রাফির প্রশ্ন ছিল—"মম্বাসা কোন্ নদীর উপর অবস্থিত?" আমি অনেক চিন্তার পর লিখিয়াছিলাম,—"গোদাবরী নদীর উপর।" অবশ্য কারণ ছিল,—এমন হৃষ্ট পুষ্ট নাম, গোদাবরীর সান্নিধ্যেই থাকা সম্ভব; দ্বিতীয়তঃ পঞ্চতন্ত্রের অনেক পাখীই গোদাবরী-তীরস্থ শাল্মলী তরুতে বাসা বাঁধিত, সুতরাং মম্বাসা গোদাবরী তীরেই সম্ভব। পণ্ডিতেরা কেতাবের কথারই কদর করিতে জানেন, imaginationএর (কল্পনার) কদর জানেন না,—সেবার তাই মোট সাত নম্বর পাই। দুঃখ করিয়া লাভ নাই, ও বদ অভ্যাস তাঁহাদের যাইবার নয়।

যাহা হউক, ভাবিলাম মোড়ক-মধ্যস্থ মানুষটি নিশ্চয়ই কোন ইস্কুলের বিচক্ষণ শিক্ষক হইবেন, নচেৎ এত ঢাকিয়া ঢুকিয়া থাকেন কেন;—পরের মগজ নিজের মগজে রাখিতে হইলে, বোধ হয় ইহাই দস্তুর। পাছে বে-ফাঁস্ হইয়া পড়ে তাই আমাদের তালপত্রে লিখিত শাস্ত্রাদিকেও "ছিন্নবস্ত্র বিমণ্ডিত" হইয়া থাকিতে হয়। প্রবাদ আছে কোন এক "হবুচন্দ্র" নামধেয় মন্ত্রীও না কি এই প্রথার দস্তুর-মত পক্ষপাতী ছিলেন। এই সব নজির বর্ত্তমান থাকিতে আমাদের মোড়ক মহাশয়ের কথা অবিশ্বাস করিতে পারিলাম না; নিশ্চয়ই দেওঘর ও বৈদ্যনাথ এক বস্তুই হইবে; জগতে এমন ত' বহুত হইয়াও গিয়াছে। বঙ্কিম বাবুর সাধের জাহানাবাদ এক্ষণে আরামবাগে দাঁড়াইয়াছে; সহপাঠী নসীরামকে 'নসীরাম' বলিলে, বিরক্ত হয়, উত্তর দেয় না; সে এখন—"সচ্চিদানন্দ স্বামী!" নিশ্চয়ই ৺ বৈদ্যনাথধামও দেওঘর নাম পরিগ্রহ করিয়া থাকিবেন। সর্ব্বাঙ্গে একটা শিহরণ অলক্ষ্যে শুড়্‌শুড়ি দিয়া গেল। ৺ বৈদ্যনাথধামে চলিয়াছি এ জ্ঞান থাকিলে, আর একটি বুচ্‌কি বাড়িত,—ব্রাহ্মণী নিশ্চয়ই front হইয়া দাঁড়াইতেন, এবং সেই ব্রাহ্মস্পর্শ ক্ষেত্রে আমাকে মধ্য পথেই কোথাও লাফ্ মারিয়া হাঁপ ছাড়িতে হইত। এতদিন পরে আজ ignorance is bliss কথাটার প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিয়া আরাম বোধ করিলাম।

(৫)

এই সময়—"টিসন্ ছোড়া হৈঃ" শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টাধ্বনি হইতেই, প্ল্যাট্‌ফর্ম্মস্থিত সজীব নির্জ্জীব পুঁটলিগুলি নড়িয়া উঠিল, ও মুহূর্ত্ত মধ্যে সজীবগুলি—বোচকা-বুচ্‌কি কাচ্চা বাচ্চা পৃষ্ঠে লইয়া অপোজমের মত ছুটিতে আরম্ভ করিল। আমাদের কুলি বা কলি আসিয়া বলিলেন—"চলিয়ে বাবুজি, উ-পলাট্‌ফারমমে।" তথাস্তু।

এ কি! দেখি এক প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ-মুখে উপস্থিত। সর্ব্বনাশ এর মধ্যে ত' আমাদের প্রণয়-ঘটিত কোন কথাই ছিল না, তবে এ বৃথা বিপদের মুখে আত্মসমর্পণ কেন; এ সিঁদ্‌নে' মাথা দেওয়া gallantryর নির্ভীক নাগরালির বাহবা দেবে কে! কিন্তু ভাবিবার সময় নাই, ট্রেণ—এলুম্ এলুম্ শব্দে, তাহার আগমন ঘোষণা করিতেছে;—বৈতরণী পার হইতেই হইবে! দুর্গা বলিয়া স্রোতে গা ঢালিলাম। বহু পশ্চাত হইতে আওয়াজ আসিল—"পকেট্ সামলে ভাই,—এ ভিড়্ 'ভাসুরকে' ভরা!" এ যে সেই মোড়ক্ মহাশয়ের গলা!

যখন আবার আকাশের তলায় মাথা দেখা দিল, তখন এক-গা ঘামিয়া গিয়াছি। কবিদের তারকা-রাজি তখন হাসিতেছিল কি কাঁদিতেছিল, তাঁহারাই বলিতে পারেন; আমাদের তাহা দেখিয়া রাখিবার মত অবস্থা ছিল না। সম্মুখে তখন 'বিশ্বরূপ' উপস্থিত,—যাহা দেখিয়া অর্জ্জুন আড়ষ্ট হইয়াছিলেন। দেখি অসংখ্য 'অভিনয়-চঞ্চল' হস্ত, পদ, নাক, মুখ, চোখ, improved by হরেক রকমের বুলি! ('গীতায় এটুকু বাদ পড়িয়াছিল।) তাহা একত্র উদ্গত হইয়া যে শব্দের সৃষ্টি করিতেছে,—তাহাই বোধ হয় 'দেবভাষা'! বুঝা ত দুঃসাধ্যই, কান্‌পাতাই মুস্কিল! শুনিয়াছিলাম—ভগবান কোন কিছুই বৃথা করেন নাই,—সবই দরকারী। বধিরতারও যে সার্থকতা আছে আজ তাহা বুঝিলাম।

যাহা হউক, এখন যাই কোথা? যাহা দেখিতেছি, তাহাতে ত' শনিরও প্রবেশ-পথ নাই। এই সময় এক দ্বার দিয়া বহির্ম্মুখী তিন মূর্ত্তি খসিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্ত-

মুখী তিরিশ মূর্ত্তি ঝুঁকিল! সৃষ্টির সব জিনিসই দরকারী, দেখি,—জয়হরি forward হইয়া হাঁকিল—'আসুন' এবং হাত ধরিয়া টানিল। তখন—রামে বা রাবণে মারে-র অবস্থায় পড়িয়া গেলাম, অগ্র পশ্চাৎ সমান হইয়া দাঁড়াইল, একদম Buffer State!

অস্বীকার করিলে মহাপাতক হয়,—এতক্ষণে জয়হরির জবর-দস্ত মূর্ত্তি কাজে লাগিল। গত বৎসর সে 'লালিমলির' একটা পাঁচ হাত পরিমিত কালো কম্ফর্টার কিনিয়াছিল ;—সদ্ব্যবহারে অধুনা সেটা এগারো হাতে পরিণত। তাহার সাত পাক্ মাথায়, দুই ফেরে কর্ণ রোধ, দুই ফের কণ্ঠে, তেহাই—বক্ষে ঢ্যারা—(স) রচনা করিয়া 'কটি বেড়ী বান্ধই' মধ্যস্থলে সুদৃশ্য গ্রন্থিরূপে কুষ্ট-নাভিপদ্ম সৃষ্টি করতঃ 'দশম ভাগের ভাগ' ঝুরির মত ঝুলিতেছিল! ফুল্-মোজার উপর মাল্‌কোঁচা। এই ছয় ফিট্ জীবটির হাতে একটা বর্শা থাকলে 'কিং আর্থারে'র 'ল্যান্স্ লট্' না হইয়া যায় না। সুতরাং যাহারা দ্বার রোধ করিয়াছিল, তাহারা সম্ভবতঃ সভয়ে পথ ছাড়িয়া দিয়া বলিয়াছিল :—

"আনন্দে প্রবেশ' লঙ্কা নিঃশঙ্ক হৃদয়ে।"

এই বিশ্বরূপ মধ্যে মিশিয়া সাযুজ্য লাভের পূর্ব্বেই—চক্ষু কর্ণ দুই-ই বুজিয়াছিলাম; কারণ সে অবস্থায়—শ্রবণ ও দর্শনেন্দ্রিয় রোধ করাটাই,—তাহাদের প্রকৃত কাজে লাগানো। এতদ্বারা 'ফিলজফি' একটু জটিল হইল বটে, কিন্তু সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রহিল। যখন চক্ষু খুলিলাম, দেখি—একস্থানে (বা অস্থানে) খাড়া Straight lineএর (সরল রেখার) মত দাঁড়াইয়া আছি! "তুমি আমি" আর নাই; সব জমাট্ বাঁধিয়া গিয়াছে; কেবল বিভিন্ন মুখ আর চোখ্—ধড়্ এক!

শুনিয়াছিলাম—সাযুজ্য লাভের পর না কি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ আর শান্তি। কিন্তু অনেক আঁচিয়াও কোনটারই স্বাদ পাইলাম না, স্বেদের প্রাচুর্য্য যথেষ্টই পাইলাম। 'অমন অবস্থায় প'ড়্‌লে" নস্যখোরদের সকলেরি যা হয়, আমারও তাহাই হইল, অর্থাৎ নস্য লইবার প্রবল ইচ্ছা। কিন্তু হাত তখন বে-হাত, নস্যদানী সাযুজ্যের গর্ভে,—শ্রীভগবানে সমর্পিত! আহা, সে কি আনন্দ,—কি শান্তি!

সহসা দ্বাররক্ষক বা দ্বার-রোধকদের মধ্যে একটা গারগোল—"নহি—নহি" শব্দে প্রকাশ পাইল—কারণটা সহজেই সকলে বুঝিয়া লইয়া, তাহাতে যোগ দিলেন; কারণ, সাযুজ্য অবস্থায় গ্রহণ বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না, তখন লোকে প্রবৃত্তির পারে পৌঁছিয়া যায়, তাই (সরোষে ও সজোরে ধাক্কা মারিয়া) ত্যাগই বিধি! কিন্তু এ কি! এ যে আবার সেই সুপরিচিত স্বর! বোধ হয় সুবিধা নয় দেখিয়া তিনি দৈবতে হাঁকিলেন—"বোলো ভাই, গান্ধী মহারাজকি জয়!" কি আশ্চর্য্য প্রভাব, উত্তেজিতেরা বিমূঢ়বৎ হইয়া গেল, কাহারো আর কথা ফুটিল না—কণ্ঠে জড়তা আসিয়া গেল। কেহ কেহ বলিয়া ফেলিল—"আপনি স্থান করিয়া লইতে পারেন ত' আমাদের কোন আপত্তি নাই।" "ভাই ভাই এক ঠাঁই" বলিতে বলিতে তিনি ত' উঠিয়া পড়িলেন! আরোহীগুলি গান্ধী মহারাজের নামে যেন গেঞ্জী বনিয়া গেল! তিনি যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, স্থানও ততই পরিসর হইতে লাগিল। বেশ সুবিধা করিয়া লইয়া, তিনি আর একবার সিংহনাদ ছাড়িলেন,—"আউর একদফে প্রেমসে বোলো ভাই, মহাত্মা গান্ধীজিকি জয়"। সঙ্গে সঙ্গে গগনভেদী জয়ধ্বনি হইল, এবং তাহা আশপাশের গাড়ীতে সংক্রামিত হইয়া আদি ও অন্তে গিয়া অনন্তে মিশাইল। পরক্ষণেই দেখি—আপ্ বইঠিয়ে তো" বলিয়া ৫।৭ জন তাঁহাকে বসিবার স্থান করিয়া দিল। সজীব মন্ত্র বটে! কোন সুউচ্চ পদাভিষিক্ত ইংরাজ সত্যই বলিয়াছিলেন—"He (Gandhi) was their (319,000 000 peoples') God. * * * Gandhi's was the most colossal experiment in world's history and it came within an inch of succeeding. * * *"

আগের কোন ইষ্টেসন্ হইতে কয়েকটি ভব্য বেশধারী বিহারী ভদ্রলোক, সম্ভবতঃ সাযুজ্যের বহু পূর্ব্বে, সালোক্য মাত্র লাভ করিয়াছিলেন, ও সতরঞ্চি বিছাইয়া পাঁচজনে দশজনের স্থান দখল করিয়া বসিয়াছিলেন। ইঁহারা যে শিক্ষিত, তাহাতে কাহারো সন্দেহ করিবার কিছু ছিল না; কারণ, পার্শ্বেই Nice লেখা বিস্কুটের বাক্সটির উপর Three Castle সিগারেটের কৌটা ও তদুপরি Vulcan দেশালাই শোভা পাইতেছিল। তাঁহারা চা পানান্তে তিন কেল্লা ফুঁকিতেছিলেন। উল্লিখিত 'জয়নাদ' তাঁহাদের সহিষ্ণুতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। একজন প্ল্যাটফর্ম্মের দিকে মুখ

বাড়াইয়া মিষ্টার গার্ড—Mr. Guard, হাঁকিতে লাগিলেন। আবার ভগবান এমনি রহস্য-প্রিয় যে, ঠিক তাঁহাদেরি প্রায় সম্মুখেই আমাদের নব আগন্তুকটির আসন নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন! গার্ড একবার বক্রগ্রীবায় চাহিয়াই—সোণার চশমা-পরা সোণা ব্যাংয়ের মত কালো মুখখানা নজরে পড়িতেই, মুখ ফিরাইয়া সজোরে আলো দেখাইলেন; গাড়ী ছাড়িল।

(৬)

কোম্পানীর আকমাড়া কলে ঢুকিয়া সকলেই অল্প বিস্তর সরস হইয়া পড়িয়াছিলেন,—সকলেরি ঘাম দেখা দিয়াছিল। পাগ্‌ড়িটি খুলিয়া ফেলায়,—এতক্ষণে শব্দভেদী পরিচয় শেষ হইল, মানুষটিকে চাক্ষুষ দেখিবার সুযোগ পাইলাম। বয়স পঞ্চাশের উপকূলে উপস্থিত; বেঁটে গড়ন,—ময়রার দোকানের মালিকের মত বেশ গোলগাল্। চক্ষু দুইটি আলুবকরার বিচি পরিমাণ, অথবা চতুর্দ্দিকের মাংসের চাপে ঐরূপ দেখাইতেছিল। মাথাটি বড়, কিন্তু কেশ-বিরল; মধ্যে টাক্ থাকায় অনেকটা ফাঁক; কাল চুল কয়গাছি সাদার আওতায় পড়িয়া গিয়াছে। সুপুষ্ট দুই গালের গর্ভে পড়িয়া নাসিকাটি কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া আসিতেছে। যে কারণেই হউক গোঁফ্ জোড়াটা ত্যাগ করা হইয়াছে; কিন্তু তাঁর দন্তগুলি সবই বজায় আছে, এবং তাহারা জীবন্ত ছাগেরও ভয়ের কারণ বলিয়াই অনুমান করি। ইনি আয়েসা বা তিলোত্তমা নহেন যে, রূপ বর্ণনার আবশ্যকতা ছিল; কিন্তু আমার বহুক্ষণের আগ্রহটা যে ভাবে মিটিল, তাহাও যে একক উপভোগ করার মত নহে!

এই আগন্তুকটির উপর কেল্লা মারা (Three castle সেবী) বাবু কয়টি খুবই চটিয়াছিলেন। একজন বিরক্তি-ব্যঞ্জক মুখে প্রশ্ন করিলেন—"আপ্ কাঁহাকে লোক্ হায়?"

উত্তর—হাম্ কঁহিকে লোক্ নেহি হায়!

বাবু—তব্ আপ্ ক্যা হায়?

উত্তর—"ধেমোশালিক্" হায়!

আমি প্রমাদ গণিলাম। যাত্রা করিয়াছি মাঘ মাসে, যে মাসের পূর্ণিমাটি প্রসিদ্ধ হয়েছেন—"মঘা" সংযুক্ত হয়ে! এখন সামলাইতে পারিলে হয়। রায় মহাশয়ের রায়ে—মাত্র—"রেলে কলিসন্ হয়," এই কথাই আছে; এ যে আবার—"ফ্রিকসনের" উপক্রম!

বাবু—ধেমোশালিক্ কোন্ চিজ্ হায়?

উত্তর—বড়া আজব্ চিজ্ বাবুজি;—আপ্ মালিক হোকে নেহি জান্‌তে? যেমন জাত্ হারাকে বষ্টুম বন্‌তা হায়, হাম্ ধেমোশালিক্ বন্ গিয়া।

বাবু—উ ক্যায়সা?

উত্তর—উ অ্যায়সা; লেকিন্ বর্ণনা কুছ বেশী হায়।

বাবু—আপ্ বোলিয়ে—

ব্যাখ্যাটা শুনিবার কৌতূহল সকলকেই পাইয়া বসিল। আগন্তুক আরম্ভ করিলেন:—

"ধেমোশালিক্ বন্‌নেকে ওয়াস্তে—বুঝেছ উপেন—সর্ব্ব প্রথম,—মা কো জলদি জলদি গঙ্গা পাওয়ানো চাই। বাপ্‌কো ভি পাওয়াতে পারলে বহুত আচ্ছা;—অসমর্থ হোনে কাশী যাত্রা করাবে। তারপর ভারি ভারি চিজ্—টেবিল, চেয়ার, খাট, সিন্দুক, আলমারি, বাসন, বগায়রা নিলাম, আউর গরু বাছুর দানপুণ্য করনে হোগা। গরীব আশ্রিত আত্মীয় কোই রহে তো—রাস্তামে হাঁকা দেবে। কুত্তাকে মিউনিসিপালিটির লাঠির মুখে দেবে, আর বিল্লিকে আছাড়্ মারকে সাবাড়্ কোরবে। তদনন্তর স্ত্রী আর তিন কন্যা লেকে রাস্তামে দাঁড়াবে। অতঃপর কোমর বাঁধকে, প্যাঁকাটি জ্বাল্‌কে, হরিবোল্ দেকে—ঘরবাড়ীর মুখাগ্নি করকে—ফুঁক দেনা চাই। এযাম্ প্রকার মে ভিটে ভস্ম হ'য়ে গেলে, তিন দফে বোল্‌না চাই—

"বাংলার মাটি বাংলার জল্—
শূন্য হোক্—শূন্য হোক্
হে ভগবান্!"

পরে এক দৌড়ে রেজেষ্ট্রী আপসমে যাকে, গেঁটের কড়ি দেকে, জমি, জল, আর পোড়া ভিটেকা নতুন নামকরণ কোরবে—"ঘুঘুডাঙ্গা"। ব্যস্, নিশ্চিন্ত হোকে ঘুঘুর নামে দান-পত্র দস্তখৎ করকে;—দেশের জলস্পর্শ না করকে, স্ত্রী-কন্যা লেকে, বগল্ বাজাকে, একদম টিসেন্ মুখে টেনে পাড়ি লাগাও। হাওড়া পুলের মাঝমধ্যিখানে পৌছকে—গৃহদেবতা শালগ্রাম, বাণলিঙ্গ যো কুছ জঞ্জাল্ থাকে—গঙ্গাজিমে টপাটপ্ ডালো। Then টিসেন্ পৌছকে টিকস্ কাটাও,—আউর পাটনা, গয়া আরা, ছাপরা,

মুঙ্গের, ভাগলপুর, যাহাঁ খুসী ভাগো। ঠিকানামে যাকে nest (বাসা) বানাও, ভগবান্ বন্ যাও। অর্থাৎ বাংলাকে "ভূমি জল তৃণ শূন্য" "আত্মীয় বিমুখ" "ভস্মকিট্" বোলকে উচ্ছন্ন সার্টিফিটি (certificate) দাখিল করো, তব্ আলবৎ—প্রপন্ন সার্টিফিকেট হাসিল্ হো যায়গা! তদনন্তর বড়ি মজিমে নোক্‌রি করো, চাক্‌রি বাজাও, বক্‌রি চরাও, টোক্‌রি বেচো, লেড়কী কো ম্যাড্‌কেলিমে লাগাও, সব্ রাস্তা সাফ্। বুঝেছ উপেন!"

বাবুজি—ইসিকা নাম "ধেমোশালিক" হো যানা;—জিস্‌কো আপ্ উচ্চ শিক্ষিত লোক্, রাজভাষামে—"ডোমিসাইল্ড্ (Domiciled) কহতে হেঁ। আপ্ তো গুজরাটু হায়,—সব্ সমঝতে হেঁ।

অপর একটি বাবু সন্দিগ্ধ দৃষ্টি সংযুক্ত অল্প কথায় বলিলেন—"হাম্‌লোক্ গুজরাটকে নেহি পাট্‌নেকে হায়।"

আগন্তুক বলিলেন—"আপ্ লোক্ বি-এ পাস্ তো হায়?"

তখন অন্য একটি বাবু বলিলেন—"O you mean graduate" (তোমার বলবার উদ্দেশ্য "গ্র্যাজুয়েট্"?)"

উত্তর হাঁ বাবুজি—ওহি বাং।

শুনিয়া, বাবু কয়টির হাসি আর থামে না। হাসির হাওয়ায় ব্যাপারটা কিছু ফিকে হইয়া আসিল। ভাবিলাম—রক্ষা! কি সর্ব্বনাশ—এ যে "দো-দমা"! আবার আরম্ভ করিলেন;—"আউর একটু হায় বাবুজি"—

বাবু—বোলিয়ে—বোলিয়ে—

পুনরারম্ভ:—কার্যাস্থলকে dutyমে একদা কল্‌কাত্তা যাকে পড়া। ধর্ম্মশালামে কলা থাকে কাটিয়ে দিয়া, ইতি মধ্যমে পত্নী পত্র ভেজা। স্বরুমে দেখি লিখা হায় 'পরদেশী সেঁইয়া!" দেখ্‌তেহি বক্ষ একদম্ দশ হাত ভঁইয়া! Family Certificate ভি মিল্ গেঁইয়া!

আপ্ লোক্‌কে কৃপা সে, এক্ষণে কিঞ্চিৎ বেতন, কথঞ্চিৎ "ইদিক্-উদিক্" মিলা'কে, মজিমে হায় বাবুজি। আত্মীয় কুটুম্ব ঘুচ্ গিয়া—কোই "বালাই" নেহি। ইচ্ছা হায়—আগামী ভূত চতুর্দ্দশীমে গয়াজি যাকে, আপনা পূর্ব্বাশ্রমকে মুখমে পিণ্ডদান করতঃ, পাক্কা সহোদর বন্ যায়েঙ্গে; কানাইলাল মিত্র"—কানাইয়া লাল মিশ্র হো যায়গা। আপ্ লোক্ অভয় দিজিয়ে বাবুজি।"

বাবুদের মুখের বর্ণ ক্রমে কাঁচা সিঁদুরে-আঁবের মত হইয়া আসিতেছিল, চক্ষুও চাপা বিদ্রোহ-ব্যঞ্জক হইয়া দাঁড়াইতেছিল। কিন্তু এই সময় কোন্ এক ষ্টেসনে ট্রেন্ থামিল; দেখি, আগন্তুক উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ও দুঃখের সহিত বলিলেন—"সব বাত্‌ই রয়ে গিয়া,—মাপ্ করবেন বাবুজি,—মেহেরবণী রাখবেন। অধুনা হাম্ সব ভাই ভাই হায়; আমাদের coal-washing (অঙ্গার ধৌতিকরণ) পুরা দস্তর চল্ রহা হায়; purification (আত্ম-শুদ্ধি) অচিরাৎ হো যায়গা;—বোলো ভাই—non-violence in spirit-কি (অহিংস মনোবৃত্তিকি) জয়!—বড়িয়া ভ্রাতৃভাব কি জয়!!" এই বলিতে বলিতে প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে পা দিয়াই হাঁকিলেন্—এইবার কিন্তু রহস্য ছোড়কে, পবিত্র দিল্‌মে বোলো ভাই—"শ্রীগান্ধি মহারাজকি জয়।"

তখন রাত বোধ হয় নয়টা। নৈশ গগন, পবন, প্রান্তর, কাঁপাইয়া সহস্র সহস্র কণ্ঠে তাহা একযোগে ধ্বনিয়া উঠিল। সেই তরঙ্গ-তাড়নে নক্ষত্রগুলি যেন সচকিতে চাহিল। প্রকৃতির শান্ত অনাড়ম্বর সাঁওতাল ভূমির উপর, এই হীরামুখীরা যেমন অবাধে অবগুণ্ঠন মোচন করে, এমন বোধ হয় আর কোথাও নয়। ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ অতি সন্নিকট। উভয়ের কেহই সভ্যতাভিমানী মানুষের গর্ব্বিত হস্তের প্রসাদ গ্রহণ করে নাই,—স্বভাবেই প্রতিষ্ঠিত আছে।

আগন্তুক ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেলেন। বাবুদের কেহ বলিলেন—'idiot' (বিকৃত-মস্তিষ্ক), কেহ বলিলেন—"বিচ্ছু বাঙ্গালী"। যিনি একটু মাতব্বর গোছের ছিলেন, তিনি যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম—"লোকটা কোথায় কাজ ক'রে জেনে নিতে পারলে না?" অর্থাৎ-তা হ'লে—

সাধারণ আরোহীরা বলাবলি করিতে লাগিল—"মহারাজকি চেলা হায়;—হিন্দুস্থানমে ওই একৃহি 'ইলমদার' জাত হায়।" ইত্যাদি। তাহারা সরল প্রকৃতির অশিক্ষিত গাঁওয়াল লোক;—আপিস-আদালতের সুধায় ক্ষুধা মেটায় না।

(৭)

গাড়ী ছাড়িল। প্ল্যাট্‌ফর্ম্ম পার হইবার মুখেই দৈববাণীর মত আবার সেই কণ্ঠস্বর,—"মনে যেন থাকে—

আপনাদের ঘশেডিতে নেবে অন্য গাড়ীতে উঠতে হবে। সঙ্গীটি—।" বস্, গাড়ী সবেগে ছুটিল, উপদেশ অসমাপ্ত রহিয়া গেল! পথে পাওয়া বন্ধু—পথেই হারাইলাম,—বোধ হয় ইহজন্মের মত।

অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম,—কত কথাই স্রোতের মত হুহু করিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল,—মাথার মধ্যে কি মনের উপর দিয়া সেটা লক্ষ্য ছিল না। লোকটির সবই বোধ হয় ঠেকে শেখা। দেহটা জ্বলিয়া পুড়িয়া অঙ্গারে দাঁড়াইয়াছে। বোধ হয় বহু আশা লইয়া 'বিদেশে চণ্ডীর কৃপা' ভাবিয়া আসিয়া পড়েন; পরে চতুর্দ্দিকের সহানুভূতিশূন্য আবেষ্টনীর ধাক্কায়, ধোঁকা মিটিয়াছে,—দেহ মন, আশা উৎসাহ, ভাঙ্গিয়া গিয়াছে দেশে না থাকায়—ভিটে ভূমিসাৎ। তাহা এখন—জঙ্গল, শৃগাল আর ঘুঘুর দখলে। দেশের লোকের সহানুভূতি সরিয়া গিয়াছে,—কেহ আপন বলিয়া কাছে আসে না। সাধিয়া কথা কহিলে কথা কয়,—সে কথার সুরে আন্তরিকতা নাই, বরং এড়াইবার ঝোঁকই বেশী। ২০।২৫ বছরের ছেলে-মেয়েরা চেনেই না,—হাঁ করিয়া থাকে,—পর বা অপরিচিত ভাবিয়া সরিয়া যায়। দোষ ত' তাহাদের নয়। যে দেশের অন্নজলে, যে দেশের মাটিতে, যে দেশের ভালবাসা আত্মীয়তায়—এ দেহের, এ জীবনের প্রারম্ভ ও পুষ্টি, যে ভিটার প্রতি রেণু পূজ্য পিতামাতা ও পূর্ব্ববর্ত্তীগণের চরণ স্পর্শে পূত ও তীর্থতুল্য, বোধ হয় যে বাটীর ভগ্ন দেউলসকল, দেব-কার্য্যের শুভ হোমাবশেষ ঘৃতধারা আজিও মুছিয়া ফেলে নাই, এবং আজ যাহা দেখিলে পূর্ব্বপুরুষদের অশ্রুধারা বোধে নিশ্চয়ই বেদনায় প্রাণ হায় হায় করিয়া ওঠে, এ সব ঋণ যে অপরিশোধ্য। যাহাদের শাস্ত্রে সামান্য অতিথিকে বিমুখ করিলে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে, তাহারা কি এই আলিঙ্গন-উন্মুখ মহান অতিথিকে বিমুখ করিয়া কোথাও শান্তি পাইতে পারে! মানুষ ভুল করে, পরে ইচ্ছা সত্ত্বেও শোধরাইতে পারে না, কষ্টে দিন কাটায়।

ক্রমে আগন্তুকের 'ধেমোশালিক' অবস্থার—লাভের দিকটার একটা আনুমানিক চিত্র যেন দেখিতে পাইলাম;—কয়েকখানি খোলার ঘর; উঠানে পালঙ শাক্, ঘরের চালে লাউগাছ ঢেউ খেলিতেছে। ধোপা, ম্যাথর, আর আপিসের চাপরাসীরা সেলাম করিতেছে। মুদী, ডাক্তার আর কাপড়ের দোকানের তাগাদা দ্বারে উপস্থিত। কর্ম্মস্থলে অধর্ম্মই ভরসা, কারণ উন্নতির আশা আড়ষ্ট। সব তৈলটুকু নিঃশেষ করা হইয়াছে,—এখন গর্ত্ত পুড়িতেছে। সম্ভবতঃ সত্য অবস্থাও এই। যাহা হউক,—মুমূর্ষুর প্রায়ই সদিচ্ছা জাগে, তাই স্বজাতির (আমাদের) প্রতি এই সহৃদয়তা; অর্থাৎ—এ অবস্থায় যতটুকু সম্ভব।

এই সব ভাবিয়া, তাঁহার ওই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, অযাচিত সরল-স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সাহায্যে,—প্রাণটা উদাস হইয়া উঠিল। অন্তরে কেবলি মৃদু ঝঙ্কার উঠিতে লাগিল:—

"পথিক "অজানা—তব গীত' সুর
বাজিতেছে প্রাণে—ভীষণ ও মধুর"!

সহসা মাদলের আওয়াজ কাণে গেল! বাহিরে চাহিয়া দেখি—বিশ্বস্রষ্টার এই নিভৃত নিকুঞ্জে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের কোলে কোলে, প্রকৃতির প্রিয় পুত্রেরা, সারাদিনের স্বাধীন শ্রমের পর, আনন্দ-সঙ্গীত তুলিয়া স্ত্রী-পুরুষে নৃত্য করিতেছে পূর্ব্ব চিত্রটির সহিত কি বৈসাদৃশ্য! এখানে সভ্যতার শয়তানীর ঠাঁই নাই,—তাহার জ্বালা-যন্ত্রণার সরঞ্জাম নাই। মোটারের মদগর্ব্ব, টাকার টঙ্কার, অট্টালিকার অহঙ্কার, বিষয়ের বিষদাহ, খেতাবের খোয়ে-বন্ধন, হাইকোর্টের হাউইবাজি—আজিও ইহাদের নির্ম্মল আনন্দটুকু নষ্ট করিবার প্রবেশ-পথ পায় নাই। হায় রে সভ্যতা,—তোমাকে সাত সেলাম্!

জয়হরি কি ভাবিতেছিল জানি না; আমি তাহার দিকে চাহিতেই বলিল,—"কিছুই হ'ল না মশাই।" ভাবিলাম—তাহারো বুঝি বৈরাগ্য আসিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি হোলো না?" সে বলিল—"কেবল কথাতেই শেষ হ'য়ে গেল!" বুঝিলাম "হাতাহাতি" হইল না, ইহাই তাহার দুঃখের কারণ! আর এক চিন্তা চাপিল;—অধুনা এ-দিক্‌টাতেও সতর্ক থাকিতে হইবে! সুখের আর সীমা রহিল না। এই একশো চুয়াল্লিসের মরসুমে,—সাথে এই সু-সঙ্গ!

(৮)

বোধ হয় রাত তখন ১০টা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অন্ধকার যেমন গভীর,—'পাহাড়ে-ঝিঁঝিঁ'র ডাকও তেমনি

প্রবল। ট্রেন্ আবার এক ষ্টেসনে উপস্থিত হইল। কুলিরা হাঁকিল—"যশডি জংসেন্"। সঙ্গে সঙ্গে ৪।৫টি মূর্ত্তি—কেহ গাড়ীর হাতল্, কেহ রেলিং ধরিয়া টপাটপ্ পা'দানে উপস্থিত হইয়া বলিল—"দেওঘর বৈদ্যনাথকে যাত্রী উতর আইয়ে।" পুনরায়—ভাষান্তরিত করিয়া—"বৈদ্যনাথ দেওঘরের যাত্রীর এই স্থানে উতরতে হোবে বাবুজি।" বেশ কথা।

দেখি, জয়হরি দরজার মুখে উপস্থিত হইয়া পড়িয়াছে, এবং "দিন্না বাবুজি" বলিয়া তাহার হস্ত হইতে একজন বেতের ট্রঙ্কটা টানিয়া লইতেছে; তাহার পোষাক কিন্তু কুলির মত নয়। বলিলাম—"কার হাতে দিলে?" প্ল্যাট্‌ফর্ম্ম হইতে উত্তর আসিল—"কোন চিন্তা নেই বাবুজি,—হামি বাবার পাণ্ডা আছে।" কয়েকজন নামিবার পর, আমি ফাঁক্ পাইলাম। নামিয়া দেখি—জয়হরির 'নীলকমলের' অবস্থা; ৭।৮ জন ষণ্ডাষণ্ডা পাণ্ডায়, তাহাকে ঘিরিয়া একই প্রশ্ন করিতেছে;—"মোশায়ের পাণ্ডার নামটি কি আছে,—পিতার নামটি কি আছে?"

জয়হরি বেশ সোজা পথটি অবলম্বন করিল। আমার দিকে অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ করিয়া, ছোট্ট দুই কথায়, এত বড় বিপদটি সহজেই এড়াইল। বলিল—"উনি সব জানেন"! এতক্ষণে বুঝিলাম—বুদ্ধিও আছে। এইবার আমার পালা। পলক না পড়িতেই যেন পোলো চাপা পড়িলাম। আমার বুদ্ধির বদ্‌নাম পিসিমাও দিতে পারেন নাই, ভগবৎ কৃপায় আজিও ও-জিনিসটি আমাতে নাই। সরল ভাবেই বলিলাম—"পাণ্ডাজি,—আমাদের আপনজন দেওঘরে থাকেন, তাঁদের বাড়ীতেই যাইব,—কাজ আছে। এখন কিছু বলিতে পারিব না। এ সম্বন্ধে আজ মাপ চাই। পাণ্ডা আর গুরু কখনো পর হন্ না। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। যখন এসেছি, বাবা কৃপা করেন ত' দর্শন করিতেই হইবে।"

সকলেই বলিয়া উঠিল—"অবশ্য করবেন্, বাবা ঠাকুর কৃপা ক'রবেন;—আহা—ভক্তি তো বাঙ্গালীর!" এইরূপ মিষ্ট কথার পর তাহারা বলিল—"ভুলবেন্ না বাবুজি, মনে রাখবেন এই আমাদের জীবিকা; আপনারা আমাদের সম্পত্তি,—অন্নদাতা" এই বলিয়া তাহারা অন্য যাত্রীর অনুসন্ধানে গেল। কেবল জামীন স্বরূপ যাঁহার হস্তে আমাদের বেতের ট্রঙ্কটি গিয়া পড়িয়াছিল, তিনি বলিলেন,—"এখন চলুন বাবুজি, গাড়ীমে বৈঠিয়ে দি।" সেই বেশ কথা। আমরা দেওঘরের গাড়ীতে বসিলে, তিনি ট্রঙ্ক প্রভৃতি তুলিয়া দিয়া বলিলেন,—"কুছু দরকার রহে তো বলুন—আনিয়ে দি। গাড়ী এখন বহুৎদের ঠ্যায়েরবে!" আমাদের কিছুরই আবশ্যক নাই শুনিয়া, তিনি বলিলেন,—"মেজ্ বিছাকে আরাম করুন, হামি ঠিক্ সময়মে আস্‌বে। কেউ পুছবে তো বলবেন—'আমরা নন্দকিশোরকা যাত্রী';—ভুলবেন না বাবুজি।" এই বলিয়া তিনি সম্ভবতঃ অন্য যাত্রীর সন্ধানে গেলেন।

মধ্যে মধ্যে এক একটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল মূর্ত্তি,—সহসা গাড়ীর মধ্যে মুখ বাড়াইয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল,—"মোশার নামটি কি আছে?—মোশার পিতার নামটি কি আছে?—মোশার পাণ্ডার নামটি কি আছে?"—সকলেরি ঐ তিন প্রশ্ন! আমাকে এই ত্র্যহস্পর্শ সামলাইবার, আর "মোশার" কামড় ভোগ করিবার ভার দিয়া জয়হরি প্লাট্‌ফর্ম্মে বেড়াইতে লাগিল। ঠাণ্ডায় আর পাণ্ডায় অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। দেখি, জয়হরি একপ্রান্তে হিমের মধ্যে দাঁড়াইয়া, এক এক টান্-টানে এক একটি আস্তো আস্তো সিগারেট্ আমূল শেষ করিয়া ফেলিতেছে! যাক্—জাগ্রত অবস্থায় আছে জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটা হইল; গাড়ী যেন ক্রমেই গা ঢালিল,—নড়েও না, সাড়াও দেয় না। দারুণ শীত, অন্ধকার গাড়ীর মধ্যে যাত্রীরা মুড়ি দিয়া নিস্তব্ধ; লোক আছে কি নাই বোঝা যায় না। বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—এই ভাবে বাকি রাতটুকু কাটিয়া যায় ত' মন্দ নয়; নচেৎ শীতের এই গভীর রাতে, কোথায় এক্ অজানা জায়গায় উপস্থিত করিয়া দিয়া তাড়া দিবে—নামিয়া যাও! কথাটা ভাবিতেও ভয় হয়। কারণ সঙ্গে যে ঠিকানা আছে, সম্ভবতঃ তাহা মহম্মদ রেজাখাঁর সেরেস্তা হইতে সংগৃহীত;—সাঁওতাল পরগণার চৌহুদ্দি বিশেষ! সেটেল্‌মেণ্ট্ আপিসের কোন বিচক্ষণ সার্ভেয়ারের শরণাপন্ন না হইলে, তাহার পাত্তা লাগাইতে পারিব না। ভাবিয়াছিলাম ষ্টেসনে রাতটা কাটাইয়া দিব, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত আগন্তুকের নিকট তাহার চেহারার আভাস পাইয়া হতাশ হইয়াছি। সেটি জ্যামিতির 'বিন্দু'-বিশেষ—without

length and breadth, দৈর্ঘ্যও নাই, প্রস্থও নাই! সুতরাং একৈ ভরসা—নন্দকিশোর। সে বলিয়াছে—"কুছ চিন্তা নেই বাবুজি, ইচ্ছা করেন গরীবের ঘর আছে—সে আপনাদেরই; না হয় টিসেনের সাত গজকে মধ্যে সুন্দর দো-মহলা ধরমশালা আছে; সেখানে বিশ্রাম করবেন। আপনার যা পচিন্দ্ হয়। প্রাতঃকাল হোতেই হামি হাজির হোবে,—ঠিকানা ঢুঁড় দেবে। কুচ্ছু চিন্তা কোরবেন না বাবুজি।"—এমন সুমধুর কথা, এমন আন্তরিকতাপূর্ণ আশ্বাসবাণী,—অজানা অচেনা ভূমে, এই গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন গভীর শীতের রাত্রে, কে শুনায়? উচ্চ শিক্ষা পাইয়া যাঁহারা মূর্খতা বর্জ্জন করিয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে বোধ করি এমন নির্ব্বোধ অল্পই আছেন।

বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি,—উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে ও শ্মশানে যঃ তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ! জানি না কি কারণে প্রবাস-তীর্থের পাণ্ডারা বান্ধবের কোটা হইতে বাদ পড়িয়াছেন। বিষ্ণুশর্ম্মা (?) বোধ হয় দূর বিদেশের তীর্থের ধার ধারিতেন না। অধুনা "উৎসব" ত' প্রায় উঠিয়াই গিয়াছে;—"ব্যসনের" মধ্যে প্রধান দেখিতেছি ঘোড়-দৌড়,—স্বয়ং সরকার তার স্বপক্ষে, সুতরাং কোন বালাই নাই;—'দুর্ভিক্ষ' অভ্যাসের মধ্যে absorbed,—একবেলা চা খাইয়া বেশ চলে। রাষ্ট্র নাই—"রাষ্ট্রবিপ্লবের" চিন্তাও নাই; যাহার আছে, চিন্তার ভার তাঁহার। "রাজদ্বারে" বান্ধবের অভাব নাই, বরং প্রাচুর্য্যই পাই,—অনেকেই ব্রিফ্‌লেস্ ঘুরিতেছে;—আর "শ্মশানে" মিউনিসিপালিটি আছেন—কাজেই 'বান্ধবের' সেকেলে ব্যাখ্যা এখন obsolete—অচল। এখন ভ্রমণ বা অজীর্ণ-দমন বাপদেশে অনেকেই সপরিবারে তীর্থাদিক্ষেত্রে উপস্থিত হন্; অনেককেই এই পাণ্ডাদের আশ্রয়, অন্ততঃ সাহায্য লইতে হয়। এখন ঐ সেকেলে শ্লোকটি পরিবর্ত্তিত হইয়া "তীর্থে ও চাকুরী-স্থলে য তিষ্ঠতি স বান্ধব" হইলেই যেন সঙ্গত হয়। যাক্, ওসব পণ্ডিতদের অধিকারের কথা।

আমি ভাবিতে লাগিলাম পাণ্ডা বেচারীদের কথাই;—ইহারা সর্ব্বক্ষণই আমাদের সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতে প্রস্তুত, এবং করিয়াও থাকে। আমরা কিন্তু ইহাদের উপর যেন predisposed ভাবে (আগে থেকেই) বিরক্ত! বোধ হয় ইহারা এক কথা বারবার কয় বলিয়া। এমন কি ইহাদের একটা ভাল কথা বা সৎপরামর্শও সহিতে পারি না,—অবিশ্বাস করি, চটিয়া নিজেদের দৌর্ব্বল্য দেখাইয়া বসি। ইংরাজি শিক্ষায় সভ্য হইবার পর ভিক্ষুকদের উপর আমাদের এই মেজাজটা শতকরা সাতানব্বই জনের সুপ্রকট। পাণ্ডারা ভিক্ষুক নয়। তাহারা কিন্তু আমাদের এই অকারণ অসীম অবহেলা, অপমান, তিরস্কার, গায়ে না মাখিয়া যাত্রীদের ইচ্ছা পালনে উন্মুখ ও তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে ব্যস্ত। তাহারা আমাদের এই মেজাজটার সহিত বিশেষ পরিচিত;—তাই তাহারা আমাদের চেনে,—আমরা তাহাদের চিনি না। পিতার নাম, পাণ্ডার নাম প্রভৃতি বারবার জিজ্ঞাসা করিতে তাহারা বাধ্য, কারণ অপরের যাত্রী তাহারা ভাঙ্গাইয়া লইতে চায় না, নিজের অধিকারের লোকই তাহারা খোঁজে। পাণ্ডার নাম বলিতে পারিলেই সকল গোল মিটিয়া যায়। শিক্ষিত না হইলেও ইহারা পুরুষানুক্রমে এই নিয়ম রক্ষা করিয়া আসিতেছে। আর উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত আমরা—ভোট-সাধকেরা, আজ বারবার স্থলে শতবার লোকের দ্বারস্থ হইয়া একই কথা শতবার শুনাইতেছি; মোটরের চাকা দিয়া তাহাদের ভিটা চষিয়া ফেলিতেছি; তাহাদের ভদ্রস্বভাব ও চক্ষুলজ্জার সুবিধাটুকুর আশ্রয় লইয়া, তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে (অনেক স্থলেই) মিথ্যাকে বরণ করাইতেছি এবং স্বার্থান্ধ হইয়া অন্যের ভোট ভাঙ্গাইয়া লইতেছি; সম্মানী প্রতিযোগির নাম কুকুরের গলায় বাঁধিয়া বিলাতী রহস্য প্রকাশ করিতেছি। এ সব উৎপাত উপদ্রব বোধ হয় বিরক্তিকর নহে, কারণ এ সব নাকি দেশের ও দশের উপকারের জন্য করা হইয়া থাকে, এবং ইহাই নিয়ম। 'পাণ্ডা' কথাটা ইংরাজি শব্দ নয়, তাই তাহার ন্যায়সঙ্গত কাজটা বড়ই বিরক্তিকর উপদ্রব বলিয়া ঠ্যাকে। আমাদের mentalityর মহিমাই এইখানে।

ট্রেন্‌খানি যেখানে দাঁড়াইয়া হিম খাইতেছিল, তাহার দুই ধারেই বিস্তৃত বালুময় ভূমি। মধ্যে মধ্যে এক-একখানি অতিকায় শিলাখণ্ড মুখ গুঁজিয়া নিদ্রিত। অদূরে যশেডি পাহাড়। উপরে নক্ষত্র-খচিত নির্ম্মল আকাশ ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। রাত বারটার আমল চারিদিক নিস্তব্ধ।

সহসা গাড়ীর সন্নিকটেই একটা 'ফেউ' ডাকিয়া উঠিল।

চারিদিকের নিবিড় নিস্তব্ধতা—তাহার সুস্পষ্টতা বাড়াইয়া, সকলকে সচকিত করিয়া দিল। দেখি জয়হরি সশব্দে হুড়্‌মুড়্‌ করিয়া, দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্যের মত, গাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া—একদম বাঙ্কের উপর হাজির হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"ব্যাপার কি ?—গাড়ী ছাড়্‌লো না কি ?"

জয়হরি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—"শুনতে পেলেন্ না ?" বলিলাম—"কি,—ফেউয়ের ডাক্ ?—তা হয়েছে কি ?"

জয়হরি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"বলেন কি মশাই !—ও-তো শুধু ফেউয়ের ডাক্ নয়,—সঙ্গে কর্ত্তাও আছেন। ও-ডাক্‌টা যোগরুঢ়ী" !

উদাহরণটা উপভোগ্য বটে। জয়হরির নিবাস—"লোহারাম শিরোমণির" সান্নিধ্যে।

বলিলাম—"তা হলেও, তোমার ভয়টা কি ? এ অঞ্চলে এতবড় বাঘ নেই যে, তোমাকে কায়দা করে।"

জয়হরি বলিল—"আপনি দেখ্‌ছি বাঘের শিকার দেখেন নি ! ওর ছোটবড় নেই মশাই,—বড় বড় গরু নিয়ে যায়।"

বলিলাম—"তা হ'লে ভয়ের কথা বটে,—সাবধান হওয়াই ভাল।"

গাড়ী গা-নাড়া দিল। দেখি—নন্দকিশোর ঠিক আসিয়া হাজির ! বলিল—"গাড়ী ছোড়্‌চে বাবুজি। আধা ঘণ্টামে পৌঁহুছে দেবে।"

এ সংবাদে আমার বিশেষ সুখ ছিল না। বলিলাম—"তুমি কিন্তু আমাদের রাতটা কাটাবার একটা উপায় করে দিও।" নন্দকিশোর বলিল,—"আপনি ফিকর্ ক'রবেন না,—ধর্ম্মশালাতে উত্তম ঘরমে রাখিয়ে দেবো,—আরামসে বিশ্রাম ক'রবেন। টিসেন্‌সে এক মিনিট্‌ও লাগবে না। সেথানে হামার সব পরিচিত লোক আছে,—কুছু চিন্তার কারণ নেই। প্রয়োজন হোবে তো হামি সাথ্ সাথ্ থাকবে। প্রাতঃকাল হোতেই বাসায় পৌঁহুছে দেবে। যেমন আজ্ঞা ক'র্‌বেন্,—হামি তাবেদার আছে।" আহা—এমন অভয়বাণী ত্রেতাযুগে মহর্ষি বাল্মীকি, অসহায়া জনকরাজ-দুহিতাকে একবার শুনাইয়াছিলেন ;—আর কলিতে নন্দকিশোর আজ আমাকে শুনাইল ! আমি সোজা হইয়া বসিয়া—সজোরে একটিপ্ নস্য লইলাম। গাড়ী ছাড়িল।

অর্দ্ধ পথে আধখানা ইষ্টেসন্ আছে। যে সকল ভদ্র লোকের ঐ অঞ্চলে স্বাস্থ্য-নিবাস আছে, তাঁহারা উক্ত ইষ্টেসনে নামিবার অনুরোধ গার্ডকে পূর্ব্বাহ্নে জানাইয়া রাখিলে, মিনিট খানেকের জন্য তথায় গাড়ী থামানো হয়। কাজ না থাকিলে সোজা গাড়ি চলে। আমাদের 'বুড়ি' ছুঁইয়াই অগ্রসর হইতে হইল,—দুইজন নামিয়া গেলেন।

এতক্ষণে এই গেঁটে যাত্রার সমাপ্তি আসন্ন হইলেও,—তাহার পরের অবস্থাটা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত থাকায়,—মনে উদ্বেগই ঘনাইতে লাগিল। গাড়ীও বার দুই ঘড়াং ঘড়াং করিয়া বস্-বস্ বলিতে বলিতে থামিল। নন্দকিশোর বেতের ট্রঙ্কটি দখল্ করিয়া,—"আসেন্ বাবুজি" বলিয়া নামিয়া পড়িল। 'আসেন' ছাড়া উপায়ও ছিল না ;—জয়হরির কাঁচা-ঘুমটা ভাঙ্গাইতে হইল। উভয়ে নামিলাম। নন্দকিশোর বলিল—"ভিড়্ কম্‌তে দিন বাবুজি"। বাবুজির তাহাতে কোন আপত্তি ছিল না ;—যতটা সময় কাটে।

এই অবসরে ইষ্টেসনটি একবার দেখিয়া লইলাম। ছোট ছোট দুইখানি ঘরের সম্মুখে একটু বারাণ্ডা। সেটুকু যেন অনুপ্রাসের আড়ত,—বাক্স, বস্তা আর বাণ্ডিলে বোঝাই। 'দাশুরায়' ইষ্টেসন্ মাষ্টার থাকিলে, বোধ হয় "বস্তার" উপর "বসিবার" অনুমতি পাইতে পারিতাম,—অনুপ্রাস অক্ষুণ্ণ থাকিত ;—অধুনা সে আশা নাই।

পাঁচ মিনিটেই ভিড় পাতলা হইয়া পড়িল। এ-রাত্রে সব গেল কোথায়, কিছুই বুঝিলাম না। নন্দকিশোর বলিল—"আব্ আইয়ে বাবুজি।" এখন বেওয়ারিস্ মালের সামিল হইয়া পড়িয়াছি, বলিলাম—"চলিয়ে"। ফটকের মুখে নন্দকিশোর বলিল,—"টিকস্ দিজিয়ে বাবুজি"। প্রস্তুতই ছিলাম ;—টিকিট্ দু'খানি রেলের বাবুটির হস্তে দিলাম। তিনি টিকটের দিকে না দেখিয়া,—জয়হরিকে দেখিতে লাগিলেন ; ভাবটা যেন বলিবেন—"এঁর একখানা টিকিটে হবে না মশাই।" সেটা আর বলিলেন না, অপাঙ্গে একটু হাসির রেখা টানিয়া বলিলেন- "বাঙ্গালী না কি !" তখন আমার উত্তর দিবার মত অবস্থা নয় ; সকলের প্রকৃতিও রহস্য-সহ নয়। চাই কি এইবার সহানুভূতিবশে জিজ্ঞাসা করিতেও পারেন—"এত রাত্রে যাবেন কোথায় ?"—দুরাশা !

এমন সময় সহসা সুমধুর বংশীধ্বনির মত কর্ণে পশিল—

"আসুন—আর হিম খাওয়া কেন!" চমকিয়া চাহিলাম। এ বয়সে, আর এ-রাতে, এক ধর্ম্মরাজের কাছেই এ আহ্বান আশা করিতে পারি,—তুমি কে বন্ধু?

জয়হরি সোৎসাহে বলিয়া উঠিল—"জামাইবাবু যে!" চাহিয়া দেখি,—ফুল্‌কাটা চুলগুলি বাঁচিয়ে, একখানা রাঙ্গা র‍্যাপার মুড়ি দেওয়া, হাস্য-মধুর মুখ। তাই ত'—শ্রীমান নাতজামাই-ই ত' বটে! এ কি স্বপ্ন—না বারো-আনার বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার ফল! এই নাটক-সুলভ (dramatic) অবস্থায় ইচ্ছা হইল, জগৎসিংহের মত বলি—"আমি কোথায়।"—আমার ইচ্ছাটাই হইয়াছিল, কিন্তু সত্য সত্যই—আয়েসার মত সুমিষ্টস্বরে warning আসিল—"কথা কহিবেন না"! অর্থাৎ—চলে আসুন। বহুৎ বেশ!

সঙ্গে ঠাকুর চাকর হরিকেন্ হস্তে উপস্থিত ছিল; তাহারা নন্দকিশোরের দখলী ট্রাঙ্ক প্রভৃতি লইল। নন্দকিশোরের উৎসাহ-ভঙ্গ হয় দেখিয়া বলিলাম,—"তুমি ভেব না, সকালে দেখা হবে।" শ্রীমানের পায়ে চটি দেখিয়া বলিলাম—"গাড়ী ঠিক করা আছে না কি?" শ্রীমান অস্ফুট হাস্যে বলিলেন—"আপনাকে কি হাঁটিয়ে নিয়ে যাব!" সম্পর্ক ত' তা নয়।

ইষ্টেসনের ১০।১২ হাত পশ্চাতেই রাজপথ; তাহা পার হইয়া অন্য একটি রাস্তায় পা দিয়াই বলিলাম—"গাড়ী কই।"—"এই যে—উঠে পড়ুন" বলিয়াই শ্রীমান একখানি বাড়ীর রোয়াকে উঠিয়া পড়িলেন। চাকর পূর্ব্বাহ্লেই পৌঁছিয়া, আলো হাতে দাঁড়াইয়া ছিল। চার মিনিটে—সকল চিন্তার অবসান!

হঠাৎ এই অভাবনীয় অবস্থাটার আনন্দ উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই adventure টা মাটি হইয়া যাওয়ার ক্ষোভও যেন অন্তরে অন্তরে অনুভব করিলাম। আশ্চর্য্য মানুষের প্রকৃতি! নন্দকিশোর তখনো উপস্থিত,—একটু তফাতে পরের মত দাঁড়াইয়া;—পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে সেই ত' আমাদের অকূলের কাণ্ডারী ছিল! তাহাকে বলিলাম—"নন্দকিশোর, তুমি কোন সন্দেহ রেখ না, আমাদের অন্য পাণ্ডাও যদি থাকে, তা হলেও তুমি আমাদের নূতন পাণ্ডা রইলে, তোমাকে আমরা ছাড়চি না, তুমি এখন আরাম কর'গে।" সে বলিল—"বাবুজি, আমি আপনাদের তাবেদার, আপনাদেরি ভরসা রাখি। বাবা বৈদ্যনাথ আপনাদের মঙ্গল ক'রবেন, গরীবকে ভুলবেন না,—আমি সকালে আসবে।" বলিলাম—"নিশ্চয় আসবে, একটু বেলায় এসো। তুমি না হ'লে আমাদের চ'লবে না।" নন্দকিশোর খুসী হইয়া চলিয়া গেল। তাহাকে খুসী হইতে দেখিয়া, আমার প্রাণটাও শান্তি বোধ করিল। এতক্ষণ কোথায় যেন একটা বেদনা ছিল।

পরবর্ত্তী অধ্যায়টা পুরোপুরি আনন্দ,—আহার, আর আরামের। প্রথম দশটা মিনিট অবশ্য খাঁটি ধর্ম্ম কথায় কাটিল;—যথ—ভোঁদার মা কেমন আছে; পাঁচীর পেটের অসুখ কেমন; সোতে এখনো সেজে মোতে কি? ভুলো তেঁতুলের তোলো সাবাড় ক'রচে না ত'? এবার কুমড়ো বড়ি কেমন হ'ল? পোড়ার-মুখো হনুমানের জ্বালায় আমাদের আর কিছু করবার যো নেই। এবারকার নতুন গরুটো খুব শান্ত—ঘুমুতে জানে না। দু'বেলায় তিনপো দুধ দিচ্চে,—তা মন্দ কি। এক দোষ নেদে মরেন—পেটে কিছু সয় না। রাক্কুসীর জ্বালায় বাইরে কাপড় শুকুতে দেবার যো নেই,—আদা-আদি খেয়ে ফ্যালে। সে দিন গদীর নতুন্‌ র‍্যাপারখানা পেটে পুরেচেন,—মরেও না, হাড় জুড়োয়! ইত্যাদি।

গরম জল প্রস্তুতই ছিল,—মুখ হাত পা ধুইয়া বাঁচিলাম, শীতে জড়সড় করিয়া দিয়াছিল। পরে—একাসনেই চা, লুচি, বেগুনভাজা, কপির তরকারি, রসগোল্লা! হুবহু আলাদিনের রাজ্যি! জয়হরি চুপি চুপি বলিল—"এঁরা বুঝি মাছ খান না?" বলিলাম—"চুপ্ চুপ্ মাল পাড়ার গুরুর শিষ্য।" শুনিয়া সে একটু যেন মনমরা হইল। আমার ইচ্ছা চা খাইয়াই পা ছড়াই। জয়হরি ডাক্তারি পড়িয়াছিল; সে বলিল—"বলেন কি মশাই, এমন কাজটি ক'রবেন না। এ শীতে শরীরের (heat and vitality) শারীরিক উষ্ণতা ও জীবনীশক্তি বজায় না রাখলে কি রক্ষা আছে!" এই বলিয়া সে জোর পেটে vitality বজায় করিতে লাগিল। ধর্ম্মশালায় এ vitality রক্ষা যে কিসে হইত তাহা ভগবানই জানেন। আমি সামান্য কিছু মুখে দিলাম। রাত দুইটা বাজিয়াছে,—শয্যা লইতে পারিলে বাঁচি।

শয্যা প্রস্তুতই ছিল। সে রাত্রে আর কথা না বাড়াইয়া,—চার-পা লম্বা করিয়া বাড়াইয়া দেওয়া গেল,—

অবশ্য দুই জনে। "যোগরুঢ়ী" কি না জানি না।— সে কি আরাম!

চক্ষু না বুজিতেই জয়হরির vitalityর পরিচয় পাওয়া গেল;—নাসিকাধ্বনির তাড়নায় গৃহ-মধ্যস্থ তৈজসাদি সাড়া দিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু এই কসরতি tripএ এত ক্লান্তি আসিয়াছিল—নিদ্রা রুধিল না;—এই "Rip van Winkle"এর পার্শ্বে কি করিয়া ও কখন যে ঘুমাইয়া পড়িলাম, জানি না।

ভাত-কাপড়ের কথা

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল,

সেদিন একখানা কাগজের সংবাদস্তম্ভে পড়িলাম "শ্রীযুক্ত—অমুক স্থানে পাটচাষের পরিমাণ কমাইবার জন্য বক্তৃতা করিয়াছেন। পাটে যে আমাদের দেশের কতদূর অনিষ্ট হইতেছে তাহা সকলেই জানেন, ...ইত্যাদি।"

সেই কাগজেই বোধ হয় একদিন পড়িয়াছিলাম যে, বিলাতী মাল কিনিয়া, আমাদের কোটি কোটি টাকা বিদেশে রপ্তানি হইতেছে, ইহাতে দেশ ক্রমশঃ দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে"......ইত্যাদি।

এ সব কথার চলতি এত বেশী যে, এ সম্বন্ধে যে আজ-কাল আর বিচারের কোনও অবসর আছে, তাও অনেকে স্বীকার করিতে চান না। দারুণ অন্ন-বস্ত্রের সমস্যায় পীড়িত দেশবাসী ভাত-কাপড়ের অভাবটা হাড়ে-হাড়ে অনুভব করে এবং সে সম্বন্ধে যে কোনও সিদ্ধান্ত আপাত-রম্য তাহা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিয়া থাকে।

এ কথা দুটির মধ্যে যে কোনও সত্য নাই, তাহা নহে, বরং অনেকটা সত্যই আছে। পাটের ব্যবসা আমাদের দেশে যে ভাবে চলিতেছে, ইহাতে দেশের খুব যে বেশী অমঙ্গল হইতেছে, সে কথা পরে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। তা'ছাড়া যে মাল আমাদের দেশেই অনায়াসে তৈয়ার হইতে পারে, তাহা বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি, তাহাও নিঃসন্দেহ সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া যে ভাবে কথাটি লোকের মুখে মুখে রটিতেতে, বা ছাপার হরপে বিলি হইয়া হাটে মাঠে ছড়াইয়া বেড়াইতেছে, সে ভাবে যে ইহা সত্য নয়, তাহা একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে

বিদেশী মাল আমদানীর ফলে বিদেশে আমাদের টাকা চলিয়া যাইতেছে, এবং সেই টাকায় বিদেশী ধনী হইতেছে এবং আমরা দরিদ্র হইতেছি, এই কথা ঠিক সত্য নয়। পাটের চাষে আমাদের আপত্তি করিবার কোনও হেতু থাকিত না; কেন না, পাট খুব বেশী পরিমাণে রপ্তানি হয় এবং তার মূল্যটা বিদেশ হইতে আমাদের দেশে আসে। কাজেই বিদেশের টাকায় আমাদের দেশ ধনী হয়। সুতরাং যত বেশী পাট রপ্তানি করা যায়, ততই আমাদের বেশী ধনী হইবার কথা। ইহাতে আপত্তি হইবার কারণ কি?

কারণ আছে, কিন্তু সে অন্যরূপ। প্রথমতঃ আবশ্যকের অতিরিক্ত পাট যদি জন্মে, তবে বিদেশী ক্রেতা কেবল চাপিয়া বসিয়া থাকিলেই আমাদের গরীব চাষী ও ব্যবসায়ীদের পাটের দাম কমাইয়া দিতে পারেন। কাজেই বেশী পাট জন্মাইলেই যে বেশী টাকা ঘরে আসিবে, তাহার কোনও মানে নাই। পাটের দাম এইরূপে এতটা কমিয়া যাইতে পারে যে, পাটের চাষে লাভ না হইয়া লোকসান দাঁড়াইতে পারে।

তা ছাড়া, যদি লোকে পাট বেশী জন্মাইয়া ধান এত কম জন্মায়, যে, দেশের খাদ্যের পরিমাণ কমিয়া যায়, তবে ধানের দাম বাড়িয়া যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে সব আবশ্যক জিনিষেরই দাম অল্প-বিস্তর বাড়িয়া যাইবে। এমন যদি হয়, তবে চাষী পাট বেচিয়া যে টাকাটা বেশী পাইল, তার দ্বারা তার অভাব মিটাইবার শক্তি বাড়িবে না। যদি চালের দাম চার টাকা মণ হয়, তবে দশ টাকায় যে পরি-মাণ চাল পাওয়া যাইবে, আট টাকা মণ চাল হইলে ঠিক

তার অর্দ্ধেক চাল পাওয়া যাইবে। সে স্থলে আমি যদি পাট বেচিয়া ১০৲ টাকার স্থলে ২০ টাকাও রোজগার করি, তবে আমি বাস্তবিক বেশী ধনী হইব না।

সুতরাং, যদি পৃথিবীর আবশ্যকের অতিরিক্ত পাট জন্মান যায়, এবং পাট জন্মাইবার ফলে যদি ধানের আবাদ এতটা কমিয়া যায় যে, পাটে যে টাকা ঘরে আসে তার চেয়ে বেশী খরচ হয় আবশ্যক জিনিষপত্র কিনিতে, তবেই পাটের আবাদে দেশের অনিষ্ট হইতেছে বলিতে হইবে। নচেৎ পাট আবাদ করিয়া সমস্ত পৃথিবীর টাকা ঘরে আনিলে, আমাদের দেশবাসী ধনী বই নির্ধন হইবার কোনও কারণ নাই।

কথাটা যথাসম্ভব সরল করিয়া বলিলাম। ইহার মধ্যে আরও অনেক জটিলতা আছে। বিদেশের টাকা ঘরে আসিলেই যে দেশ সমৃদ্ধ হয়, আর ঘরের টাকা বিদেশে গেলেই যে দেশ দরিদ্র হয়, তার কোনও মানে নাই। তা ছাড়া, পাটের ব্যবসায় জিনিষটা এমন জটিল যে, পাটের লাভ যাহা, তার খুব বেশী অংশ দেশের লোকের হাতে যে আসেই, তাহা নয়; আর যাও বা দেশের লোকের হাতে আসে, তারও খুব কম ভাগ কৃষকের হাতে যায়। এই সব কারণে সমস্যার যে সব জটিলতা সৃষ্টি হয়, তাহা আপাততঃ তফাতে রাখিয়াই কথাটা বলিলাম। যে ভাবে ইহা বলিলাম, সে ভাবে ইহা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও মোটামুটি রকমে সত্য।

এই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তবে কথাটা দাঁড়ায় এই যে, পাটের চাষ দেশের অনিষ্ট করে না, মোটের উপর দেশের সমৃদ্ধি বাড়ায়। তবে সে আবাদ যদি অতিরিক্ত হয়, কিম্বা ধান্যের আবাদ যদি পাটের চাপে পড়িয়া অতিরিক্ত রকম কম হয়, তবে ইহাতে অনিষ্ট হইতে পারে। সেই অবস্থা হইয়াছে কি? দেশের আবশ্যকের চেয়ে অল্প খাদ্য কি উৎপাদিত হইতেছে? পৃথিবীর ব্যবহারের জন্য যত পাট আবশ্যক, তার চেয়ে বেশী পাট কি উৎপন্ন হইতেছে?

পাঠকদের মধ্যে হয় তো অনেকে নিঃসংশয়ে বলিবেন "হাঁ।" আমি জোর করিয়া "হাঁ"-ও বলিতে পারি না, "না"-ও বলিতে পারি না। কেন না আমার যতদূর জানা শোনা আছে, তাহাতে এ বিষয়ে কোনও নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান এ পর্য্যন্ত হয় নাই। সেরূপ অনুসন্ধান যে আবশ্যক, সেই কথা বুঝাইবার জন্যই আমার এ প্রচেষ্টা।

যাঁরা বলেন যে, আবশ্যকের অতিরিক্ত পাটের আবাদ হইতেছে, তাঁহাদের সোজাসুজি যুক্তি এই যে, পাটের দাম অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ এ যুক্তি বেশ সঙ্গত। কোনও জিনিষের চাহিদার পরিমাণের চেয়ে বেশী পরিমাণে সেই জিনিষ বাজারে আসিলে তাহার দাম পড়িয়া যায়, ইহা অর্থনীতি-শাস্ত্রের একটা সরল সূত্র। কিন্তু এ সরল সূত্র সব জায়গায় খাটে না। তার অনেক কারণ আছে। তার মধ্যে একটি কারণের কথা এখানে উত্থাপন করিব। যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতার সঙ্গে সামনাসামনি কারবার হয়, সেখানে এ সূত্র যেমন খাটে, পাটের ব্যবসায়ে তাহা খাটিতে পারে না। পাটের চাষী পাট উৎপাদন করে, ব্যবহার করে, ধর, মরিশাসের চিনির কারবারীরা। কিন্তু এই দুইজনের মধ্যে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বসিয়া আছে অনেকগুলি লোক। প্রত্যেকেই অল্প-বিস্তর চাপিয়া মাল ছাড়ে, যাহাতে সুবিধা দরে বেচা-কেনা করিতে পারে। পাটের কলওয়ালারা যদি বেশী লাভজনক মনে করে, তবে তারা ঠিক যতটা চট বাজারে দরকার সবটা না ছাড়িয়া তার চেয়ে কিছু কম ছাড়িয়া দাম বেশী করিয়া পোষাইয়া লইবে। আবার কলওয়ালা যে বড় মহাজনের কাছে পাট কেনে, সেও তেমনি বাজার আগলাইয়া বসিয়া থাকে, যাতে সে বেশী সুবিধায় মালটা বেচিতে পারে। এমনি করিয়া ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বাধা পাইয়া আসল চাহিদাটা কৃষকের কাছে যাইয়া পৌঁছায়। সুতরাং চাহিদা ও মূল্যের সম্পর্ক বিষয়ে সরল সূত্রটি এখানে সম্পূর্ণ খাটে না।

তা ছাড়া, আর একটা কথা এই যে, কাঁচা পাটের খরিদ্দারের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম, আর তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ। তাই তাহারা ডাণ্ডী হইতে বসিয়া বাঙ্গালার পাটের দর ঠিক করিয়া দেয়। এখানকার অসংবদ্ধ ব্যবসায়ীর দল বা চাষী কেহই সে দরে "না" বলিতে পারে না। ফলে বাস্তবিক পক্ষে পাটের দর প্রত্যক্ষ ভাবে চাহিদা ও উৎপাদনের উপর নির্ভর করে না। ইহা যে তাহার উপর নির্ভর করে না তাহা ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, পাটের কেনা-বেচার চুক্তি এবং তার দাম স্থির হয় পাট জন্মিবার বহু-পূর্ব্বে। এই Forward contract ব্যবস্থার ফলে পাটের ব্যবসা একটা উচ্চ অঙ্গের জুয়াখেলায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। সে কথা পরে বলিব।

কাজেই পাটের দর পড়িয়া গিয়াছে বলিয়াই, এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না যে, চাহিদার চেয়ে বেশী পাট জন্মান হইতেছে। হয় তো হইতেছে; কিন্তু সে কথা বিনা বিচারে, বিনা অনুসন্ধানে অমনি এক নিঃশ্বাসে বলিয়া দেওয়া যায় না।

আর যদি তাই হয়, তাহা হইলে পাটের চাষের পরিমাণ কমাইলেই যে চাষীর বা দেশের লোকের লাভ হইবে, তার কোনও মানে নাই। পাটের তাহাতে দাম বাড়িবে সত্য, কিন্তু তাহাতে চাষীর যে উপকার হইবেই, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। এমনও হইতে পারে যে চাষীর তাহাতে লোকসান হইবে। ধর, আমার জমীতে পাট আবাদ করিয়া এই মন্দা বাজারে আমি বছরে পাঁচ টাকা দরে পঞ্চাশ টাকা পাই। সে স্থলে যদি আমি অর্দ্ধেক জমীতে পাট আবাদ করি, তবে হয় তো সাত টাকা দরে পাট বেচিয়া পঁয়ত্রিশ টাকা পাইব। আর অর্দ্ধেক জমী আবাদ করিয়া যে ফসল তুলিব তাহার মূল্য হয় তো দাঁড়াইবে দশ টাকা; যদি এমন অবস্থা হয় তবে তো বিনা বিচারে পাটের আবাদ কমাইলেই প্রজার লাভ হইবে বলা যায় না। কাজেই পাটের আবাদ কমাইলেই যে চাষীর উপকার হইবেই, এ কথা বলা যায় না।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে "হাঁ" "না" বলাও তেমনি শক্ত। আমাদের সমস্ত জাতির খাদ্যের শস্য যে কতটা দরকার, তার কোনও বিশ্বাসযোগ্য অনুসন্ধান এ পর্য্যন্ত হয় নাই। আর দেশে কি পরিমাণ ফসল জন্মে তাহাও ঠিক কাহারও জানা নাই। তা ছাড়া কতটা জমীতে কোন্ বছরে পাট বা ধান রবিশস্যের আবাদ হইয়াছিল তাহারও বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ নাই। এ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট যে সব বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নয়।

কাজেই বলা যায় না যে, বাস্তবিক পাটের আবাদের ফলে ধানী জমীর পরিমাণ বিশেষ রূপে কমিয়াছে কি না। কমিয়া থাকিলেও কতটা কমিয়াছে তাহা বলা অসম্ভব। যতটা কমিয়াছে, তাহাতে চাষীদের এবং দেশের লোকের ভাল হইয়াছে না মন্দ হইয়াছে, সে কথা বলার কোনও দৃঢ় ভিত্তি নাই।

যদি ধানের জমী এত কমিয়া গিয়া থাকে যে, আমাদের সমস্ত জাতির খাদ্যের জন্য যতটা ধান হওয়া দরকার তাহা হয় না, তবে তাহা নিঃসন্দেহ খারাপ। তেমন হইয়াছে কিনা বলা কঠিন। এ সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত মোটামুটি রকমে করা যাইতে পারে ধান চালের রপ্তানির দিকে দৃষ্টি করিয়া। যদি দেশ হইতে ধান চাল রপ্তানি হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, আমাদের আবশ্যকের অতিরিক্ত ধান চাল জন্মিতেছে। কিন্তু তাহা ঠিক সিদ্ধান্ত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না। এমন বলা যাইত, যদি আমরা বুকে হাত দিয়া বলিতে পারিতাম যে সকল লোকে ভর পেট খাইয়া যাহা বাড়তি থাকে, তাহা ছাড়া কখনও রপ্তানি হয় না। কিন্তু হাজার হাজার লোকে আধপেটা খাইয়া বা না খাইয়া থাকিলেও যে রপ্তানি হইয়া থাকে, তাহা কে না জানে?

কাজেই কেবল রপ্তানির দিকে চাহিয়াই বলা চলে না যে, আমাদের আবশ্যকের অতিরিক্ত ধান চাল জন্মায়; পক্ষান্তরে ইহাও বলা যায় না যে বেশী চাউল জন্মায় না।

ঠিক সমস্ত জাতির খাদ্যের জন্য এবং আপদ বিপদের সঞ্চয়ের জন্য যে পরিমাণ খাদ্য শস্য জন্মান দরকার, তার অতিরিক্ত খাদ্যের ফসল জন্মাইয়া অপচয় করায় দেশবাসীর বা কৃষকের কোনও স্বার্থ নাই (১)। তার অতিরিক্ত ধান যদি জন্মান যায়, তবে তার একমাত্র সদ্ব্যবহার রপ্তানি করা। কারণ রপ্তানির দ্বারা যে অর্থ লাভ হয়, তাহাতে দেশ সমৃদ্ধ হয়। রপ্তানি না করিয়া সে অতিরিক্ত শস্য দেশে ফেলিয়া রাখিলে, তাহা কেবল সম্পদের অপচয় মাত্র। সুতরাং আবশ্যকের অতিরিক্ত এই যে কৃষি-সম্পদ, ইহার একমাত্র প্রয়োজন তার বিক্রয় মূল্য দিয়া।

এখন ধর, আমাদের দেশে দুই কোটী মণ ধান হইলে সবার পেট ভরে। দুর্ব্বৎসর প্রভৃতির ব্যবস্থার জন্য আরও ধর এক কোটী মণ ধান জমান সঙ্গত। এই তিন কোটী মণ ধান দেশের খাদ্যের জন্য দরকার। অথচ ধর, দেশের সমস্ত জমীতে যদি ধানই খালি আবাদ করা যায়, তবে ত্রিশ

(১) কতটা খাদ্য দরকার, এ প্রশ্নটা নানারকম অর্থে ধরা যাইতে পারে। জিনিষের দরকারের পরিমাণটা অনেকটা তার মূল্যের উপর নির্ভর করে—ধান যদি দুর্ম্মূল্য হয় আর গম সস্তা হয়, তবে ধানের প্রয়োজনটা কাজেই কম হইবে। সে সব কুটিলতা উপস্থিত না করিয়া আমি এখানে চালকে একমাত্র খাদ্য ধরিয়া লইয়া তাহার দরকারের পরিমাণ অর্থে এই ধরিতেছি যে, সুস্থ অবস্থায় থাকিবার জন্য সমস্ত দেশবাসীর যে খাদ্য প্রয়োজন সেই খাদ্যের সমষ্টির পরিমাণ।

কোটী মণ ধান জন্মান যায়। যদি আমরা বছর বছর এই ত্রিশ কোটী মণ ধানও জন্মাই, তবু আমাদের আবশ্যক খরচ তিন কোটী মণ ধানই হইবে। আর সাতাশ কোটী মণ ধান রপ্তানী করিতে হইবে। না করিলে সমস্ত জাতির সম্পদের পক্ষে ভয়ানক হানি হইবে এখন এই রপ্তানির শস্য ধানই হউক বা পাটই হউক, তাতে দেশের কিছু আসে যায় না। যাতে বেশী লাভ হয়, তাই আবাদ করাতেই দেশের বেশী উপকার। কেন না তাহাতেই দেশ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। সাতাশ কোটী মণ ধান বিক্রী করিয়া যদি ২৭০ কোটী টাকা পাওয়া যায়, এবং তার স্থলে সমস্ত পাট আবাদ করিয়া তাহা বিক্রয় করিলে যদি মাত্র ২০০ কোটি টাকা পাওয়া যায়, তবে সে স্থলে ধান আবাদ করাই দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক। পক্ষান্তরে যদি সেই পরিমাণ জমীতে পাট আবাদ করিয়া তিনশ' কোটি টাকা পাওয়া যায়, তবে পাট আবাদ করাই দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে।

ফল কথা, দেশের জন্য প্রয়োজনীয় ঐ তিনকোটী মণ ধানের অতিরিক্ত যে কিছু ফসল হয়, তার ভাল মন্দ সম্বন্ধে একমাত্র মানদণ্ড,—তাহা বিক্রী করিয়া কত দাম পাওয়া যায়।

দেশের বর্তমান অবস্থায় কোন্‌টা দরকার,—পাটের বদলে ধান আবাদ করা, না পাটের আবাদ বজায় রাখা, না বাড়ান? এ সব সমস্যার মীমাংসা করিতে হইলে, প্রথমে জানা দরকার যে, দেশের খাদ্যের জন্য কি পরিমাণ খাদ্যশস্য জন্মান প্রয়োজন, এবং কি পরিমাণে সেই শস্য জন্মিতেছে। তার অতিরিক্ত যে শস্য জন্মায়, সেটার মধ্যে কতটা পাট, কতটা ধান বা কতটা অন্য ফসল হইলে বেশী টাকা ঘরে আসে, সে কথা নির্ণয় করা দরকার। তাহা না করিয়া পাটের আবাদ কমাইতে বা ধানের আবাদ বাড়াইতে লোককে পরামর্শ দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এমন অনুসন্ধান এ পর্য্যন্ত কেহ করিবার চেষ্টা করেন নাই। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া যে সব ব্যক্তি বাহির হইতেছেন, তাঁহারা দল বাঁধিয়া এই অনুসন্ধান কার্য্যে ব্রতী হইলে অনেক সুফল লাভ হইতে পারে। কিন্তু সে অনুসন্ধান না করিয়া চট্ করিয়া এ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। বিড়ম্বনা সুধু নয়, হয় তো বা ঘোর দেশদ্রোহিতাও হইতে পারে।

আমি এ সম্বন্ধে কোনও অনুসন্ধান করি নাই; কেন না, ইহা আমার ব্যবসায় নহে, এবং আমার এ অনুসন্ধান করিবার যোগ্যতা নাই। তাই আমি যোগ্য ব্যক্তিদের বিশেষভাবে এই অনুসন্ধান করিতে আহ্বান করিতেছি। অনুসন্ধানের ফলে যাহা সাব্যস্ত হয়, সেই অনুসারে কাজ করিতে সকলের উঠিয়া পড়িয়া লাগা আবশ্যক হইবে। কিন্তু এ অনুসন্ধান না করিয়া কেবলমাত্র পরের মুখ হইতে চলতি ধুয়া ধার করিয়া হৈ চৈ করিলে, আমরা দেশের কি যে অনিষ্ট করিয়া বসিব জানি না।

এই ধর, আমাদের এই ধুয়া যে, পাট আবাদ করিও না, ধান আবাদ কর। এবং প্রকৃত অবস্থা যদি এই হয় যে, দেশের খাদ্যের উপযুক্ত যথেষ্ট ধান চাউল জন্মিতেছে এবং অতিরিক্ত জমীতে পাট আবাদই বেশী লাভজনক, তবে আমরা এই ধুয়া ধরিয়া যদি লোককে পাট বর্জ্জন করিতে বলি, তবে দেশের হিত কিছুই করিব না, অহিত করিয়া বসিব এই দায়িত্ব স্মরণ করিয়া আমাদের এ বিষয়ে একটা আলগা সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া হৈ চৈ না করিয়া এ বিষয়টি বিশেষজ্ঞের দ্বারা বিশেষ অনুসন্ধান করান দরকার।

সম্পূর্ণ বিনা অনুসন্ধানে যে এ ধুয়াটা উঠিয়াছে, তাহা নয়। কিন্তু সে অনুসন্ধান হইয়াছে কেবলমাত্র পাটের ব্যবসাদারদের দ্বারা, কেবলমাত্র তাঁদের ব্যবসার দিক হইতে। পাটের পরিমাণ কমিলে মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ীরা মোটের উপর লাভবান হইবেন; কেন না, তাহা হইলে তাঁহারা খরিদ্দার-সঙ্ঘের উপর চাপ দিবার সুযোগ পাইবেন। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু পাটের ব্যবসাদারের যে স্বার্থ, তাহাই দেশবাসীর স্বার্থ নয়—এ কথাটা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমরা যে খাইতে পরিতে পাই না, এটা আমরা হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছি, এবং সেই জন্যই সাধারণ লোকে এত চট্ করিয়া মানিয়া লয় যে, ধান যথেষ্ট জন্মিতেছে না, তাই খাইতে পাইতেছি না। কিন্তু এ কথা ঠিক না হওয়াই সম্ভব। খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলেই যে সবাই খাইতে পাইবে, তাহা তো নয়। সমাজের জটিল ব্যবস্থায় এমন প্রায়ই দাঁড়ায় যে, একজন অজস্র খাদ্য অপচয় করিতেছে, আর একজন না খাইয়া মরিতেছে। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে হয় তো

দেখা যাইবে যে, যারা খাইতে পায় না, তাহারা খাইবার অধিকারের এই অসমতা বশতঃই খাইতে পায় না, দেশে ধানের অভাবে নয়। অজস্র পরিমাণে ধান চাল জন্মাইয়া খাদ্যের মূল্য কমাইলে হয় তো বেশী লোক খাইতে পাইবে; কিন্তু অপর পক্ষে অনেক বেশী জাতীয় সম্পদের অপচয় করা হইবে। দেশকে সমৃদ্ধ ও সুখী করিতে হইলে, অপচয় বাড়াইলে চলিবে না, চারিদিক দিয়া অপচয় নিবারণ করিতে হইবে। কাজেই অনুসন্ধান দ্বারা ইহা যদি সাব্যস্ত হয় যে. দেশে অন্নের অভাব নাই. তার বিতরণের আলস্যই লোকের না খাওয়ার হেতু, তবে প্রকৃত দেশ-হিতৈষীর পক্ষে এই আলস্য দূর করিয়া দেশের কৃষিসম্পদ যাহাতে সকল কর্ম্মীর মধ্যে ন্যায্য ভাবে ছড়াইয়া পড়ে, সেই সামাজিক ব্যবস্থার উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করিতে হইবে।

সমাজের এখনকার যে অবস্থা, তাহাতে কৃষিসম্পদ সৃষ্টি করে কৃষক, কিন্তু তার বিতরণের ভার লয় ব্যবসায়ী। ব্যবসার system ক্রমশঃই জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে। এক হিসাবে সমস্ত বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়ী-সঙ্ঘ সমস্ত বিশ্বের সম্পদের ভাগ করিবার ভার লইয়াছে। এই জটীল ব্যবসায় জগতের একমাত্র নিয়ামক স্বার্থ। পরস্পরের স্বার্থ-সংঘাতমূলে ব্যবসা চলিতেছে। ফলে বিতরণ ব্যাপারটা যে অনেক স্থলেই ঠিক উপযুক্ত রকম হইতেছে না, তাহা আজকালকার সমাজতত্ত্বজ্ঞেরা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশে সোস্যালিষ্টগণ দেখাইয়াছেন যে, স্বার্থসংঘাত-মূলক ব্যবসায়ের বন্দোবস্তে পৃথিবীর বহু সম্পদের অযথা অপচয় হইতেছে, সম্পদ বিতরণের অনুচিত অসামঞ্জস্য হইতেছে। তাহার ফলে যে খাটিয়া মারতেছে, সে খাইতে পায় না, আর যে অলস জুয়ারী সে পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া শ্রমিকের কষ্টের ধন-সম্পদ দুহাতে উড়াইতেছে। সে সব কথা বিস্তারিত করিয়া বলিবার স্থান এখানে নাই। ব্যবসায়ের জটিল ব্যবস্থার চাপে পড়িয়া বাঙ্গালার কৃষি-সম্পদের বিতরণে যে আলস্য উপস্থিত হইয়াছে তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেখাইব।

পাট জন্মায় চাষী। সে হাটে লইয়া বেচে, না হয় বাড়ী বসিয়া বেচে। ফড়িয়ারা তাহা কিনিয়া দেয় মহাজনের কাছে। এই মহাজন বড় বড় মহাজনের সঙ্গে অগ্রিম চুক্তি করিয়া বসিয়া থাকেন যে এবারকার বৎসরে দুইলাখ বা দশলাখ মণ পাট এত দরে জোগাইবেন। সেই বড় মহাশয় তো কলিকাতার কোনও Baler বা চট-কলের সঙ্গে চুক্তি করেন। "বেলার" চুক্তি করেন বিলাতের খরিদ্দার দের সঙ্গে।

এই যে সব বেচাকেনার চুক্তি, ইহা পাট জন্মিবার বহু পূর্ব্বে হয়। ১৯২১ সনে যে পাট বাঙ্গলায় জন্মিল, সে পাট হয় তো ১৯২২ কি ২৩ সনে মরিসাসে চিনির কারখানায় বস্তা হইয়া পৌছায়। ১৯ ২ সনে যে বস্তার প্রয়োজন হইবে, তাহার সম্বন্ধে একটা আন্দাজ করিয়া চট-কলের মালিক বেলারদের সঙ্গে চুক্তি করেন ১৯১৯ সনে। বেলার আন্দাজ করেন যে ১৯২১ সনে পাটের কি বিক্রী দর হইতে পারে। এই দুই আন্দাজের উপর যে চুক্তি হয়, তাহা সম্পূর্ণ কল্পনামূলক। বেলারের সঙ্গে তার নিম্নতর মহাজনের এবং তাহাদের সঙ্গে অন্য মহাজনের পর্য্যায়ক্রমে যে চুক্তি হয়, তাহার একমাত্র ভিত্তি কল্পনা এবং সরকার বাহাদুরের কৃষিবিভাগের পোনেরো আনা মনগড়া forecast। কার্য্যকালে মহাজন দেখিতে পায় যে, যে পাটের জন্য সে দশ টাকা দরে চুক্তি করিয়াছে, তাহা ফড়িয়াদের কাছে সে ছয় টাকা দরে কিনিতে পায়. এবং ফড়িয়ারা তাহা পাঁচ টাকা দরে চাষার কাছে কেনে। সুতরাং মহাজন অনায়াসে মণকরা ৪৲ টাকা লাভ করিয়া বড়লোক হয়। পক্ষান্তরে এমনও হয় যে, মহাজন যেখানে বেলারকে নয় টাকা দরে পাট জোগাইবে বলিয়া চুক্তি করিয়াছে, সেখানে তার পাটের খরিদ দর পড়ে বারো টাকা। কাজেই মহাজনকে লোকসান দিতে হয় মণকরা দুই টাকা।

ব্যাপারটা যেখানে ষোল আনা হাওয়ার উপর, সেখানে লাভের অঙ্ক খুব বেশী না হইলে লোকে অগ্রসর হইবে কেন? কাজেই পাটের ব্যবসা খুব লাভের ব্যবসা। এ কথার মানে এই যে, যে পাট বেলার বা কলওয়ালা দশ টাকা দরে কিনিতে প্রস্তুত, সে পাট বেচিয়া চাষী পায় হয়তো মাত্র চারটাকা; আর যদি দুর্ভাগ্যক্রমে ফসল খুব ভাল হয়, তবে তো চাষার পাওনা আরও কমিয়া যায়।

সাধারণ কেনাবেচার বাজারেও এমনি ঝুঁকি কতকটা ব্যবসাদারকে লইতে হয় বলিয়া সে লাভের একটা ভারী অংশ লয়। কিন্তু পাটের ব্যবসার মত এত ঝুঁকি এ দেশের কোনও ব্যবসায়ে কেহ কোনও দিন লয় না; এত লোকসানও কেউ দেয় না, এত লাভও করে না।

আমাদের দেশে পাট জন্মিয়া যেমন এখানকার কলে কতক এবং ডাণ্ডীতে কতক বোনা হইয়া সমস্ত পৃথিবীময় বিক্রী হয়, তেমনি আমেরিকা ও ইজিপ্টে তুলা জন্মিয়া ল্যাঙ্কশায়ারে বুনান হইয়া সমস্ত পৃথিবীতে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে বিক্রী হয়। সেখানেও এমনি জুয়াখেলা অল্প-বিস্তর চলে। কিন্তু সেখানকার তুলার চাষীরা এমন অসহায় নয়। সেখানে তুলার চাষ বড় বড় সঙ্ঘবদ্ধ কম্বাইন বা ট্রাষ্টের হাতে। তাহারা কলওয়ালাদের হাতে নয়, কলওয়ালারাই তাহাদের হাতে। তুলার দাম ঠিক করিয়া দেয় আমেরিকার আবাদকারীরা, ল্যাঙ্কাশায়ারকে সেই দর মাথা পাতিয়া মানিতে হয়। সেখানকার আবাদকারীরা বাজারের তেজী মন্দা হিসাব করিয়া আবাদের পরিমাণ ঠিক করে, কাজেই তাহাদের কিছুতে বিশেষ লোকসান হইতে পারে না।

আমাদের পাট আবাদ করে ছোট ছোট কৃষক, যারা হয় তো এক বিঘা দুই বিঘা জমীতে পাট জন্মায়। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কোনও সংযোগই নাই। একে অন্যের খবর রাখে না, আর কেউই বাহিরের দুনিয়ার খবর রাখে না। কেবল জানে যে নিকটবর্ত্তী হাটে পাটের দর কবে কত হইল। আর সে দর তারা বিধিনির্দ্দিষ্ট নিয়মের মত মানিয়া লয়। তাদের বিচ্ছিন্ন সম্পদ একত্র করে ফড়িয়া। তাহার সঙ্গে চাষীদের খাদ্যখাদক সম্বন্ধ। চাষীদের ভাল হউক, সমগ্র জাতির যাতে ভাল হয় সেই পরিমাণে পাটের আবাদ হউক, এ কথা ভাবা তাহাদের কাজ নয়: তাদের কাজ একদিকে চাষী ও অপর দিকে মহাজনকে ঠকাইয়া যথাসম্ভব বেশী লাভ করা। যে মহাজন ফড়িয়ার কাছে মাল কেনে, তার কাজ তার চুক্তি অনুসারে বড় মহাজনকে পাট যোগাইয়া যথাসম্ভব বেশী লাভ করা। এমনি করিয়া পরস্পরকে খাওয়া-খাওয়ি করিয়া পাটের বিপুল ব্যবসা চলিতেছে। ইহার খুব উপরের স্তরে ছাড়া কোথাও কোনও সংযোগ নাই, কোথাও সঙ্ঘবন্ধন নাই, পৃথিবীর পাটের চাহিদার দিকে এবং দেশের খাদ্যের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পাটের উৎপত্তি নিয়মিত করিবার আয়োজন কোথাও নাই; কিসে দেশ সব চেয়ে বেশী সমৃদ্ধ হয়, চাষীর হাতে সব চেয়ে বেশী টাকা আসে, এ ভাবনা ভাবিবার কেহ নাই।

ইহার ফলে হইতেছে একটা ভীষণ যজ্ঞ, যার ভিতর দেশের স্বার্থ ও অর্থ, কৃষীবলের সুখ ও ঋদ্ধি নিত্য আহুতি দেওয়া হইতেছে পাটের ব্যবসা গড়িয়া উঠিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালার চাষার যে অবস্থা ছিল, এখন তার চেয়ে তার অবস্থা অনেকটা ভাল,—অন্ততঃ কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত ভাল ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পাট বেচিয়া যে টাকা তাহারা পাইয়াছে, অন্য ফসল বেচিয়া সে পরিমাণ টাকা তাহারা কখনও পাইত না। চাষীর যখন প্রয়োজনীয় খাদ্য-শস্যের চেয়ে অনেক বেশী ফসল জন্মাইতে হয় খাজনা দিতে, মহাজনের সুদ দিতে, কাপড়চোপড় ও অন্যান্য আবশ্যক জিনিষ কিনিতে, তখন এই অতিরিক্ত ফসল যত দামে সে বেচিতে পারে তাহাতেই তার মঙ্গল। কাজেই পাটের আবাদ করিয়া চাষী উপকৃত হইয়াছে এবং এই পাটের সম্পদে অল্পবিস্তর সমস্ত দেশই সমৃদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু যে বিরাট ব্যবস্থা-বন্ধন দ্বারা এই পাটের বেচাকেনা হইতেছে, তাহার ফলে লাভের পরিমাণটা চাষীর ঘরে যথাসম্ভব কম যাইতেছে, এবং স্তরে স্তরে ব্যবসায়ীরা যথা-সম্ভব লইতেছে এবং অপচয় সম্ভবতঃ খুব বেশী হইতেছে। অর্থাৎ চাষী এবং দেশের লোক পাটের দ্বারা যে পরিমাণে সমৃদ্ধ হইতে পারিত সে পরিমাণে সমৃদ্ধ হইতেছে না।

কেবল স্বার্থ ও পরস্পর প্রতিযোগিতায় এই সমস্ত ব্যবসা চলিতেছে। এমন হওয়া খুব সম্ভব যে, তার ফল ক্রমে দাঁড়াইয়াছে এই যে, যার যেখানে জমী আছে, সে সেখানে প্রাণপণে যথাসম্ভব বেশী করিয়া পাট বুনিতেছে। ইহার ফলে হয় তো এত পাট জন্মিতেছে যে, পাটের আখেরী খরিদ্দার যে ডাণ্ডীর মহাজন বা কলওয়ালা, তাহারা নিশ্চিন্ত মনে দাম কমাইয়া লইতেছে। এত কমাইয়া লইতেছে যে, চাষীর লোকসান হইতেছে। অনেক পরিশ্রম করিয়া অনেক টাকা খরচ করিয়া চাষী যে পাট উঠাইয়াছে, তাহা সে হয় তো তিন চার টাকা দরে বেচিতে বাধ্য হইতেছে। যদি ইহার বদলে এই শক্তি তাহারা অন্য ফসল জন্মাইতে নিয়োজিত করিত, তাহা হইলে তাহারা অনেক বেশী লাভবান হইত। কাজেই হয় তো অতিরিক্ত পরিমাণে পাট জন্মাইয়া দেশের কৃষি-সম্পদের অপচয় হইতেছে।

অল্প-বিস্তর সব ব্যবসায়েই এমনি অপচয় হয়—বর্ত্তমান

ফিরোজ শা-স্তম্ভ—গৌড়
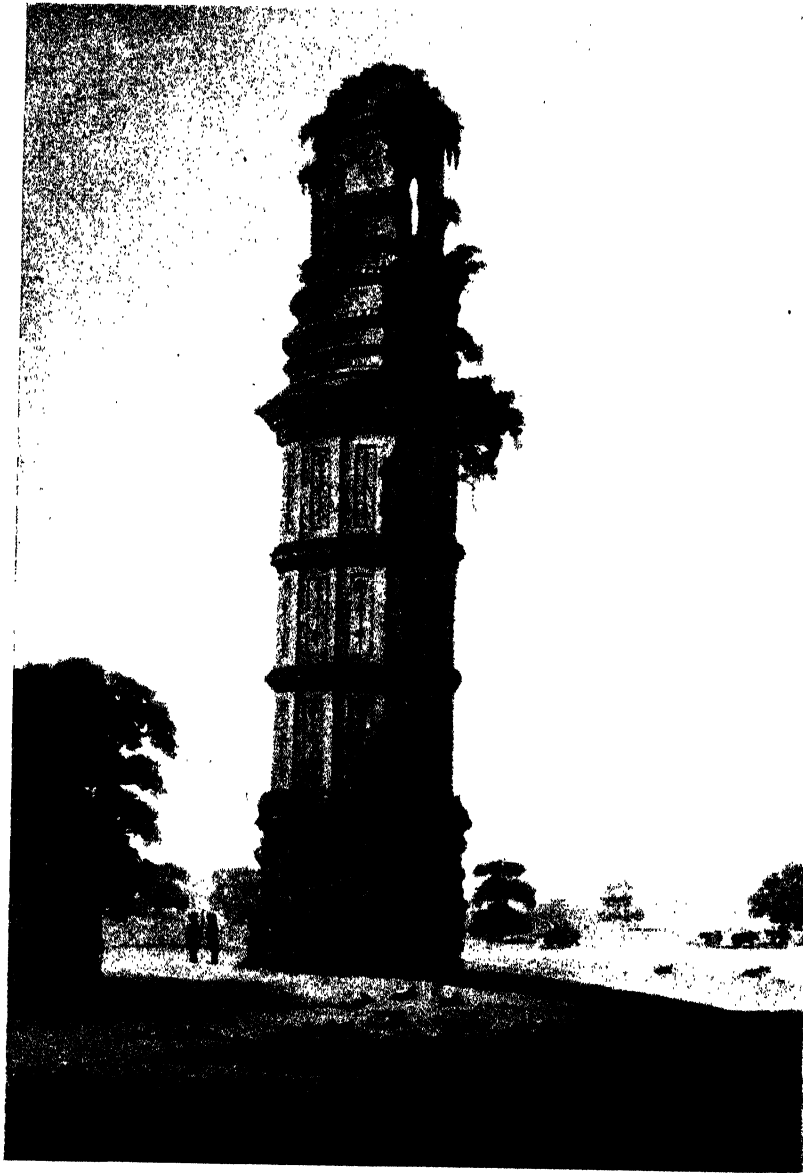
ব্যবসায়-পদ্ধতির এটা একটা গুরুতর দোষ। কিন্তু পাটের বেলায় একটা এমন সুবিধা আছে, যাহাতে এমন অপচয় হইবার কোনও দরকার নাই। সে সুবিধাটা এই যে, পাট বাঙ্গলা দেশের একচেটিয়া সম্পত্তি, তাহা জন্মায় কেবল বাঙ্গালার চাষী। ইহার যে চাহিদা আছে, তাহা এখন পর্য্যন্ত আর কোনও উপায়ে মিটিবার সম্ভাবনা নাই। কাজেই, যদি আমাদের দেশের চাষী ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে আড়া-আড়ি কোনও উপায়ে নিবারণ করা যায়, এবং চাষী ও চটের খরিদ্দারের ভিতর এমন একটা প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ঘটান যায়, যাহাতে খরিদ্দারের প্রয়োজন অনুসারে পাট জন্মান ও যোগান হইবে, এবং ন্যায়সঙ্গত লাভ রাখিয়া পাট বিক্রী করা যায়, তবে এই সব অপচয় নিবারণ হইতে পারে।

সে রকম ব্যবস্থা হওয়া অসম্ভব নয়। আমেরিকায় এমন ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু সেখানে শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি; দুই পক্ষে বড় বড় capitalist; দুই পক্ষই সঙ্ঘবদ্ধ। তার মধ্যে কলওয়ালার গরজ তুলাওয়ালার চেয়ে বেশী বলিয়া, তুলাওয়ালা কলওয়ালাকে অনেকটা শাসাইতে পারে। পক্ষান্তরে, পাট যেমন বাঙ্গলার সম্পূর্ণ নিজস্ব, তুলা, অনেকটা হইলেও, তেমন পরিপূর্ণ ভাবে আমেরিকার নিজস্ব নয়—আর তাহা অন্য দেশেও ক্রমশঃ বেশী পরিমাণে জন্মান যাইতে পারে। বাঙ্গলায় যেমন একদিকে এই সুবিধা আছে যে, পাট বাঙ্গলা ছাড়া অন্য কোথাও জন্মে না, আর ইহার তুল্য অন্য কোন বস্তুও এখন পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, অপর পক্ষে এখানে এই প্রকাণ্ড অসুবিধা যে, এখানে একদিকে সঙ্ঘবদ্ধ capitalist, অপর দিকে পরস্পর-সম্পর্ক-শূন্য অসংঙ্ঘবদ্ধ গরীব প্রজা। মাঝখানে যারা আছে, তাদের স্বার্থের সঙ্গে প্রজার স্বার্থের পরিপূর্ণ যোগ নাই।

এ অবস্থার প্রতিকারের একমাত্র উপায় সমবায় (co-operation)। মনে কর, প্রত্যেক গ্রামে যারা পাট জন্মায়, সেই গৃহস্থের দল একত্র হইয়া একটা ক্ষুদ্র সমবায় করিল। তাহাদের নিকট হইতে ন্যায্য মূল্যে পাট কিনিয়া কলওয়ালার কাছে বেচিবার জন্য একটা সমগ্র দেশব্যাপী বিরাট কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন হইল, যাহার সভ্য এই সমস্ত দেশব্যাপী কো-অপারেটিভ সোসায়েটি। তাহা হইলে পাটের উৎপাদক (grower) ও গ্রাহক (consumer) ইহাদের মধ্যে আর কোনও মধ্যবর্ত্তী থাকে না। আর উভয় পক্ষের সম্পর্কও তাহা হইলে এমন হয়, যাহাতে কলওয়ালার কোনও রকম আধিপত্যই খাটে না।

এমন একটা বিরাট সমবায় গঠিত করিয়া তুলিতে অনেক দিন সময় লাগিবে। গ্রামে গ্রামে একটি একটি করিয়া ছোট ছোট সোসায়েটী গড়িয়া তুলিতে হইবে। সে কাজ যে কত কঠিন, তাহা যাঁহারা এইরূপ সোসায়েটি গড়িবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। এমন সোসাইটি গড়িয়া তুলিবার পক্ষে অনেকগুলি গুরুতর অন্তরায় আছে, যাহার জন্য এ কাজ আরও অতিরিক্ত রূপ কঠিন।

সুতরাং একটা দেশব্যাপী বিরাট কো-অপারেটিভ ফেডারেশন গড়িয়া বর্ত্তমান অবস্থার প্রতিকার করার আশা সুদূর-পরাহত। ইতিমধ্যে বর্ত্তমান পদ্ধতিতে ব্যবসা চলিতে থাকিলে তাহার বহু পূর্ব্বে প্রজার সর্ব্বনাশ সাধন এবং সঙ্গে সঙ্গে হয় তো ব্যবসাটির মুণ্ডপাত হইবে এমন আশঙ্কা করিবার গুরুতর হেতু আছে।

এ ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুতর। যাঁহারা প্রজার ও সমগ্র বাঙ্গলা দেশের প্রকৃত হিতকামী, আশা করি, তাঁহারা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য স্থির করিবার চেষ্টা করিবেন। যাঁহাদের এ বিষয়ে চিন্তা করিবার শক্তি আছে, যাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও বিশেষ জ্ঞান আছে, তাঁহারা এই বিরাট দেশব্যাপী পাটের ব্যবসাটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুসন্ধান করিলে অবশ্যই এমন একটা প্রতিকার বাহির করিতে পারিবেন, যাহাতে ব্যবসার সমস্ত দোষ নিরাকরণ হইয়া ইহা সর্ব্বতোভাবে দেশের হিতসাধন করিতে পারিবে। বাঙ্গলায় আজ অর্থনীতি-শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞের অভাব নাই; তাঁহাদের অনুসন্ধান-স্পৃহারও যথেষ্ট পরিচয় আমরা রোজই পাইতেছি। এই সব পরীক্ষক ব্যক্তি যদি এই বিরাট সমস্যার প্রতি উপযুক্ত চেষ্টা ও আয়োজনের সহিত মনোনিবেশ করিতে পারেন, তবে প্রতিকার একটা অবশ্যই মিলিবে। বর্ত্তমান ব্যবসায় বন্ধনের কোন্‌খানে ফাঁক আছে, কোন্‌খানে দোষের আকর আছে, তাহা আলোচনা করিয়া বাহির হইবে, এবং সমস্ত দোষ ও ত্রুটি নির্দ্ধারিত হইলে, এমন একটি উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে,

যাহার দ্বারা পাটের ব্যবসায়ের বর্ত্তমান দোষসমূহ নিরাকৃত হইতে পারে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নই, এবং এ বিষয়ে কোনও মতামত দিবার জন্য যে পরিমাণ গবেষণার প্রয়োজন তাহা আমি করিতে পারি নাই। সুতরাং এই সমস্যার সমাধানের ভার আমি লইতে চাই না। আমার এ সব কথা বলিবার একমাত্র উদ্দেশ্য বিশেষজ্ঞদের এইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ। তবে একটা কথা বোধ হয় মোটের উপর বলা যাইতে পারে। এ কাজে গভর্ণমেণ্টের হাত দিতে হইবে। গভর্ণমেণ্ট পাট পরিবেশনের সকল ভার ব্যবসায়ীদের হাতে নির্ব্বিরোধে ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকিলে, কোনও মতেই এ সমস্যার সমাধান হইবে না, ইহাই আমার বিশ্বাস। কোন্ প্রণালীতে গভর্ণমেণ্ট ইহা নিয়মিত করিবার ভার লইলে ব্যবসায় সম্যকরূপে দেশের হিতার্থ নিয়োজিত হইতে পারে, তাহা বিশেষ বিবেচনার সহিত নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

এ প্রবন্ধে আমি যে সমস্ত কথা বলিলাম, সেগুলিকে বেশ সুসংবদ্ধ নিবন্ধ বলিয়া আমি দাবী করিতে পারি না। পাটের চাষ ও ব্যবসা সম্বন্ধে কতকগুলি সমস্যা যেমন ভাবে আমার মনে আসিয়াছে, তাহাই লিখিয়া গেলাম। কারণ আমার মনে হয় যে, এসব প্রশ্নের সম্যক সমাধানের উপর আমাদের বাঙ্গালী জাতির জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে। কৃষি আমাদের প্রধান উপজীবিকা, আর কৃষি-সম্পদের মধ্যে পাট আমাদের প্রধান সম্পদ। পাটের টাকায় কেবল চাষী ধনী নয়, সমস্ত বাঙ্গালী ধনী। কাজেই পাটের কথা বাস্তবিক পক্ষে সমস্ত জাতির ভাত-কাপড়ের কথা। এতবড় একটা গুরুতর বিষয়ে বিনা বিচারে কেবল পরের মুখে ধার করা বুলি সম্বল করিয়া আমরা নিষ্পত্তি করিতে চেষ্টা করিলে, হয় তো দেশের এতবড় একটা অনিষ্ট করিয়া বসিব যে, যুগ যুগ অনুতাপ করিয়া তাহার দুঃখ মিটিবে না।

সমস্যাটির সমাধান আর বেশী দিন ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না। এখন যে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের হাতে পাটের ব্যবসা আছে, তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য এই যে, কি উপায়ে এই ব্যবসা হইতে সব চেয়ে বেশী লাভ করা যাইতে পারে। সেই চেষ্টার ফলে এই ব্যবসার মধ্যে এমন কতকগুলি লোক আসিয়া পড়িয়াছে, যাহারা শুষিয়া লাভ আদায় করিয়া ব্যবসাটীকে মারিবার ব্যবস্থা করিতে পারে। এমন হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। এক দিন বাঙ্গলা দেশে নীলের আবাদ একচেটিয়া ছিল, আর তার বিক্রয়ের ক্ষেত্র ছিল পৃথিবীব্যাপী। নীলকরেরা লাভ খাইয়া খাইয়া এত লোভী হইয়া উঠিল যে, তাহাদের পেট আর কিছুতেই ভরে না। ফলে নীলের চাষ চাষীর পক্ষে রীতিমত লোকসান-জনক হইয়া উঠিল. তখন আরম্ভ হইল অত্যাচার, উৎপীড়ন, তার পর বিদ্রোহ। তার ফলে বাঙ্গলা দেশ হইতে নীলের চাষ নিঃশেষে উঠিয়া গেল. তখনও কৃত্রিম নীল বাজারে দেখা দেয় নাই। তাহার পর পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল নীলের ব্যবসা বেহারে পুরা দমে চলিয়াছে। রহিয়া সহিয়া ব্যবসা করিলে, চাষাকে খাওয়াইয়া নিজেরা খাইলে বাঙ্গালার নীলকরও অন্ততঃ এই পঞ্চাশ ষাট বৎসর টিকিয়া থাকিতে পারিত, দেশেরও হয় তো তাহাতে লাভ হইতে পারিত। পাটের ব্যবসায়ে যে ক্রমে সেই অবস্থা দাঁড়াইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? পাটের ব্যবসায়ে জুয়া খেলার পরিমাণ অসম্ভব রূপে বাড়িয়া চলিয়াছে। তার ফল এখন চাষাদের উপর গিয়া পড়িতেছে। রক্তচোষা জুয়াড়ী ব্যাপারীর সংখ্যা আরও পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলে, নীলের চাষীর মত পাটের চাষীও যে "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি" বলিয়া ডাক ছাড়িবে না, কে বলিতে পারে।

যদি সে দিন আসে, তবে বাঙ্গলা দেশের পক্ষে তাহা বড় দুর্দ্দিন হইবে। বাঙ্গলার এত বড় একটা সম্পদ যদি এমনি করিয়া মারা যায়, তবে বাঙ্গালী জাতির দারিদ্র্য বাড়িয়া যাইবে। তাই এখন হইতে সাবধান হওয়া দরকার। কিসে সে ব্যবসায়টি রক্ষা পায় এবং চাষী তার ন্যায্য লাভ পায়, সে দিকে দৃষ্টি দিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে গভর্ণমেণ্টের সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক নিশ্চয়। কিন্তু অর্থ-নীতিতে যাঁরা কৃতবিদ্য এবং এরূপ অনুসন্ধানে যাঁহারা অভিজ্ঞ, তাঁহারা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাবে এই বিষয়ে একটা খুব পাকা রকমের নিরপেক্ষ অনুসন্ধান করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

গরুড়

শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ, বি-টি

গরুড় বিষ্ণুর বাহন—পক্ষিশ্রেষ্ঠ, পক্ষিকুলের রাজা। গরুড় সম্বন্ধে আমাদের এখন যাহা ধারণা তাহা আমরা পুরাণ হইতে পাইয়াছি। পুরাণকার একেবারে নূতন বৃত্তান্তের সৃষ্টি সকল সময় করিতেন না। অনেক স্থলে দেখা যায় যে, পুরাণে যে সকল বৃত্তান্ত আছে, তাহার মূল বেদ প্রভৃতি আরও প্রাচীন গ্রন্থ।

ঋগ্বেদের ১।৮৯।৬এ তার্ক্ষ্য অরিষ্টনেমি বলিয়া দুইটি নাম বা শব্দ আছে। তার্ক্ষ্য অরিষ্টনেমির নিকট সূক্ত-প্রণেতা ঋষি মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। ভারতের বেদভাষ্যকার অরিষ্টনেমিকে বিশেষণ করিয়া তার্ক্ষ্য অর্থে গরুড় বুঝিয়াছেন; কিন্তু উইলসন্ সাহেব শব্দটির অর্থ গরুড় হইতে পারে কিনা সে বিষয়ে সন্দিহান; কারণ সে যুগে গরুড়সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না। ঋগ্বেদের ১০।১৭৮এ দেখা যায়, ঋষি তার্ক্ষ্য দেবতার (১) স্তব করিতেছেন। তাহাতে আছে যে তার্ক্ষ্য দেবগণ কর্ত্তৃক সোম আনয়নের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১৮।৬) আছে, গায়ত্রী যখন সোম আনিতে যান, তার্ক্ষ্য তাঁহার পথিপ্রদর্শক হইয়াছিলেন। শতপথ ব্রাহ্মণে তার্ক্ষ্য বৈপশ্যত নামে পক্ষিরাজের উল্লেখ আছে। গায়ত্রী কর্ত্তৃক সোম আনয়নের যে কাহিনী বৈদিক গ্রন্থে আছে, তার্ক্ষ্যের কাহিনী তাহার সহিত মিশিয়া গরুড়ের উৎপত্তি কাহিনী-রচনায় যে সহায়তা করিয়াছে ইহা একরূপ নিশ্চিত। বেদে তার্ক্ষ্য গরুড়কে না বুঝাইলেও পরবর্ত্তী যুগে শব্দটির সহিত গরুড়ের সম্পর্ক-স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছিল। প্রধান প্রধান পুরাণে তার্ক্ষ্য ও অরিষ্টনেমির নাম পাওয়া যায়। মহাভারতের আদিপর্ব্বে (৬৫শ অঃ) কশ্যপ ও বিনতার সন্তানগণের মধ্যে গরুড় ও অরুণের নামের সহিত তার্ক্ষ্য ও অরিষ্টনেমির নাম আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে (২য় অঃ) আছে অরিষ্টনেমির পুত্র গরুড়। বায়ু পুরাণ (৬৫।৫৪) অনুসারে অরিষ্টনেমি কশ্যপের ন্যায় একজন প্রজাপতি। বিষ্ণু পুরাণের ইংরাজী অনুবাদক উইল্‌সন্ সাহেব একটি পাদ-টীকায় মহাভারত হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, অরিষ্টনেমি কশ্যপের আর একটি নাম। শ্রীমদ্ভাগবত অনুসারে তার্ক্ষ্য কশ্যপেরই নাম। ব্রহ্মাণ্ড, বায়ু, মৎস্য ও বিষ্ণু পুরাণে আছে তার্ক্ষ্য ও অরিষ্টনেমি বৎসরের নির্দ্দিষ্ট কাল সূর্য্যরথে বাস করেন। (২) বিষ্ণু পুরাণের টীকাকার শ্রীধর স্বামী ঐ স্থলের টীকায় দুইজনকেই যক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তার্ক্ষ্য অরিষ্টনেমির নামের এই গোলকধাঁধার মধ্যে শুধু এইটুকু বুঝা যায় যে ঐ দুইজনের সহিত গরুড়ের কিম্বা সূর্য্যের অল্পাধিক পরিমাণে সংস্রব রহিয়াছে। বেদে বিষ্ণুদেবতা সূর্য্যের রূপান্তর মাত্র। পুরাণে অদিতি-পুত্র যে দ্বাদশ আদিত্যের নাম পাওয়া যায় তাহার মধ্যে সূর্য্য ও বিষ্ণু আছেন। সুতরাং পুরাণ অনুসারে সূর্য্য ও বিষ্ণু দুই ভ্রাতা। (৩) তথাপি বিষ্ণুর সহিত তার্ক্ষ্য-অরিষ্টনেমির সম্পর্কের কোন স্পষ্ট উল্লেখ পুরাণে আছে বলিয়া বোধ হয় না।

ঠিক গরুড় নামটি ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না। তবে 'সুপর্ণ' 'গরুত্মান্' বলিয়া দুইটি শব্দ অগ্নি ৪ বা সূর্য্যের উপর আরোপ করা হইয়াছে (১।১৬৪।৪৬)। পরবর্ত্তী যুগে সুপর্ণ ও গরুত্মান্ দুইটি শব্দই গরুড়ের নাম হইয়াছে। বেদে বিষ্ণুর বাহনের উল্লেখ না থাকিলেও সূর্য্যের বাহনের উল্লেখ আছে। আর্য্যগণ দেখিতেন সূর্য্য পূর্ব্বাকাশে উঠিয়া পশ্চিমে চলিয়া পড়িতেছেন, সুতরাং তাঁহারা কল্পনা করিয়া লইলেন, সূর্য্যের অশ্ববাহন বা অশ্বযুক্ত রথ আছে। সূর্য্যের কিরণ দ্রুতগামী, তেজোবিশিষ্ট; অশ্বেরও সেই গুণ আছে। তাহার উপর অশ্বের গুণে আর্য্যগণ মুগ্ধ; দ্রুত গমনাগমনের জন্য, যুদ্ধে ব্যবহারের পক্ষে অশ্বতুল্য উপকারী জীব তাঁহারা পান নাই, (৫) তাঁহাদিগের নিকট অশ্ব শ্রেষ্ঠ বাহন। মানব দেবতাকে আপনার আদর্শেই কল্পনা করে। আর্য্যগণ

১। ভাষ্যকার তার্ক্ষ্যকে 'সুপর্ণ' বলিয়াছেন এবং ঐ সূক্তে অরিষ্টনেমি তার্ক্ষ্যের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। যাস্ক তার্ক্ষ্যকে মধ্যমস্থান দেবতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন সুতরাং তিনি ইন্দ্র বা বায়ুর প্রকারভেদ বা রূপান্তর মাত্র। বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে ইন্দ্রের ষড়বিংশ নামের মধ্যে তার্ক্ষ্য নাম আছে। মহাভারতের আদিপর্ব্বে (৬৬।৩১) গরুড় ও অরুণকে আদিত্যগণের মধ্যে পরিগণিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ইন্দ্রও একজন আদিত্যকশ্যপ পুত্র। সুতরাং তার্ক্ষ্য ইন্দ্র-গরুড় উভয়কেই বুঝাইতে পারে।

২। শতপথ ব্রাহ্মণ অনুসারে যজ্ঞের গ্রামনী ও সেনানী তার্ক্ষ্য ও অরিষ্টনেমি শরতের দুই মাস বুঝাইতেছে। পুরাণ অনুসারে তাঁহারা হেমন্তের দুই মাস সূর্য্যরথে বাস করেন।

৩। বেদের আদিত্য সংখ্যা ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া দ্বাদশে পরিণত হয়। বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে দ্বাদশ আদিত্যেরই উল্লেখ আছে। মহাভারতে আছে যে বিষ্ণু দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ কিন্তু গৌরবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা হইতে বোধ হয় তিনিই আদিত্যগণের মধ্যে সর্ব্বশেষে প্রবেশলাভ করেন।

৪। গরুড়ের জন্মকালে তাঁহাকে মহাভারতে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি-রাশির সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

৫। প্রাচীন আর্য্যরাজ্য মিতান্নি এককালে পশ্চিম এসিয়াখণ্ডে

যখন অশ্বকে বাহন করিলেন তখন তাঁহারা পূজনীয় প্রধান দেবতা-গণেরও ঐ বাহন কল্পনা করিলেন। সেইজন্য ইন্দ্রের বাহন হরি, সূর্য্যের বাহন হরিৎ, বায়ুর অশ্বের নাম নিযুৎ।

বেদে সূর্য্যের বাহন অশ্ব কিন্তু মহাভারতে বিষ্ণুরূপী সূর্য্যের বাহন পক্ষী। ইহার অপ্রধান কারণ মনে হয়—বেগ হিসাবে পক্ষী অশ্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, (১) যদিও আকার হিসাবে হীন। সুতরাং যদি আকার ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে পক্ষী বাহনের রাজা হইতে পারে। গরুড়ের আকৃতি ও ক্ষমতা ভয়াবহই হইয়াছিল, আর এরূপ হওয়ার প্রয়োজনও হইয়াছিল। বৈদিক যুগে ইন্দ্রের প্রাধান্য যত ছিল, পরবর্ত্তী যুগে তাহার কিছুই ছিল না। পরবর্ত্তী যুগে ইন্দ্র নামে মাত্র দেবেন্দ্র; উহা বিষ্ণু ও শিবের প্রাধান্যের যুগ। তখন বিষ্ণুর বল এত অধিক হইল যে, বিষ্ণুর বাহনের নিকট সুরপতি ইন্দ্রকেও পরাজিত হইতে হইয়াছিল।

বাহন হিসাবে পক্ষী যে নগণ্য নহে, তাহা গ্রীক পুরাণ হইতেও জানা যায়। গ্রীকদিগের দেবরাজ জিউসের বাহন ঈগল পক্ষী। মিশর দেশের সূর্য্যদেবতা রা, শ্যেনপক্ষী তাঁহার চিহ্ন স্বরূপ ছিল। জাপানে সূর্য্য দেবতা নহেন, তিনি দেবী, এক কাক তাঁহার পক্ষী। চীনদেশীয় পৌরাণিক কাহিনী-অনুসারে ঐরূপ একটী পক্ষী সূর্য্যে বাস করে, তাহার বর্ণ লোহিত, তিন পদ। (২) প্রাচীন পারসীক আবেস্তা গ্রন্থে বিজয় বা বেরেথ্রঘ্ন (বৃত্রঘ্ন)র সহিত একস্থানে 'শ্যেন' পক্ষীর তুলনা করা হইয়াছে। অন্য স্থানে আছে বেরেথ্রঘ্ন ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে দাঁড়কাক মূর্ত্তি একটি। আর একটি কাহিনী অনুসারে প্রভা যখন দাঁড়কাক-মূর্ত্তিতে যিমকে ত্যাগ করিয়াছিল, মিথ্র (দিবালোক) তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিথ্র সম্বন্ধে আর একটি প্রাচীন কাহিনী হইতে জানা যায় যে তিনি যখন ষণ্ডরূপী মহাশত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিলেন, তাঁহার হিতৈষী বন্ধু সূর্য্য তাঁহার সাহায্যের জন্য আপনার দাঁড়কাককে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। গ্রীকদেশে এপোলো সূর্য্যদেবতা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। শ্যেন, হংস, দাঁড়কাক তাঁহার পক্ষী বলিয়া পবিত্র বিবেচিত হইত। বৈদিক গ্রন্থে সূর্য্যকে হংস বলা হইয়াছে। কোথাও বা

যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন মিতান্নির অশ্বারোহী সৈন্যই তাহার বিজয় গৌরবের কারণ।

১। পক্ষীর বেগের উপর লক্ষ্য রাখিয়াই বোধ হয় ১০।৯৯।৬ষ্ঠ ঋকে মরুৎগণের সহিত পক্ষীর তুলনা করা হইয়াছে।

২। এই পদ-সংখ্যার সহিত বৈদিক বিষ্ণুর বা বিষ্ণুর বামন-মূর্ত্তির তিন পাদের কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয় না। অবশ্য বৌদ্ধ-ধর্ম্মের কল্যাণে চীন দেশের সহিত ভারতবর্ষের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু সে ভারতবর্ষ প্রধানতঃ বৌদ্ধ ভারতবর্ষ, আর তিন প্রভৃতি কয়েকটি সংখ্যা অধিকাংশ জাতির মধ্যেই অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া বিবেচিত হয়।

তাঁহাকে দিব্যালোকের সুপর্ণ, শ্যেন, অরুণবর্ণ সুপর্ণ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। কল্পনাবলে সূর্য্যের সহিত পক্ষীর তুলনা করা সর্ব্বদেশের মানবের পক্ষেই সম্ভবপর।

সূর্য্য রূপীর বিষ্ণু বাহন পক্ষী হওয়ার প্রধান কারণ শ্যেন কর্ত্তৃক সোম আহরণের বৈদিক আখ্যায়িকা। বৈদিক যুগে আর্য্যগণ সোমের ভক্ত ছিলেন। তাঁহারা সোম পান করিয়া মত্ত হইতেন এবং সোম বলিয়া উন্মত্ত হইতেন। এই সোম পরে অমৃত উপাধি পান। সোম অমৃত এই বিশ্বাসের ভিত্তি বৈদিক যুগেই স্থাপিত হইয়াছিল ৮।৪৮।৩। ঋগ্বেদের নবম মণ্ডল সোমের স্তবস্তুতিতে পূর্ণ। সূক্তগুলি হইতে দেখা যায় ঋষিগণ আত্মহারা সোমের গুণগান করিতেছেন। সূক্তগুলির অনেক স্থলে সোমরসক্ষরণের সহিত শ্যেনপক্ষীর গতির তুলনা আছে এবং সোমকে শ্যেন উচ্চস্থান হইতে লইয়া আসিয়াছে এরূপ বর্ণনাও আছে। এই শ্যেনের আখ্যায়িকা হইতে গরুড়কর্ত্তৃক অমৃত-আহরণের কাহিনীর উৎপত্তি হইয়াছে।

সোম একটি লতা, তাহার পত্র আছে। শ্যেন পক্ষী, তাহার পক্ষ আছে। সুপর্ণ অর্থে সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট কিম্বা সুন্দর পত্রবিশিষ্ট উভয়ের যে কোনটি হইতে পারে। সোমকে অনেক স্থলে সুপর্ণ বলা হইয়াছে। তাহার উপর সোম উচ্চস্থান মুজবান পর্ব্বতে অবস্থান করেন এ কথাও আছে। পক্ষীও আকাশে বিহার করে। সুতরাং সুপর্ণ সোম যে সুপর্ণ শ্যেন বা শুধু সুপর্ণ অর্থাৎ সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট পক্ষিরূপে কল্পিত হইবেন, তাহা বিচিত্র নহে। তাহার পর সোমকে সুপর্ণ পৃথিবীতে লইয়া আসিল এরূপ কল্পনা স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়।

সোম-আনয়ন সম্বন্ধে যে বৈদিক উপাখ্যান আছে তাহা আলোচনা করিলে তাহার সহিত পৌরাণিক আখ্যায়িকার সাদৃশ্য দেখা যাইবে। ঋগ্বেদে আছে যে সোম আনিবার জন্য শ্যেন পক্ষীর মাতা শ্যেনপক্ষীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং সোম কৃশানুর বাণের ভয়ে ভীত হইয়াছেন। (৩) অন্য এক স্থানে আছে শ্যেন আকাশ হইতে সোম আনিবার কালে কৃশানুর নিঃক্ষিপ্ত শরে আহত হইয়াছিলেন; তাহাতে তাঁহার একটি পালক খসিয়া যায় (৪।২৭।৩-৪)।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে ঋষি ও দেবগণ চিন্তা করিতেছিলেন সোমকে দিব্যধাম হইতে কিরূপে আনা যায়। অবশেষে তাঁহাদিগের আদেশে ছন্দসমূহ পক্ষিরূপে সোম আনিতে গেলেন। সকলেই অকৃতকাম হইলেন, কেবল গায়ত্রী সোম আনিতে পারিলেন। কিন্তু আসিবার সময় কৃশানু নামে একজন সোমপালের নিঃক্ষিপ্ত তীরে তিনি আহত হ'ন এবং তাঁহার বামপদের একটি নখর ছিন্ন হয়।

শতপথ ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় সংহিতার আখ্যায়িকাগুলি হইতে পুরাণের কাহিনীর ভিত্তি আরও স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। কদ্রুর নাম, (৪)

৩। ১।৭৭।২; এই শ্যেন-জননীই অবশেষে বিনতা হইয়াছেন। ১০।১১।৪ এ আছে অগ্নি শ্যেনকে পাঠাইয়াছিলেন।

৪। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৬।১) দেখা যায় কাদ্রবেয় (কদ্রুপুত্র)

অশ্বের আখ্যায়িকার উল্লেখ শতপথ ব্রাহ্মণে আছে। ঐ পুস্তকে আছে, দেবগণের ইচ্ছা হইল যে সোম আকাশ হইতে তাঁহাদের নিকটে আসেন। সেই জন্য তাঁহারা সুপর্ণী ও কদ্রু নামে দুইটি মায়া সৃজন করিলেন। দুই জনের মধ্যে কলহ হয়। অবশেষে স্থির হইল তাঁহাদের মধ্যে যিনি অধিক দূরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে পারিবেন, তিনিই অপরকে লাভ করিতে পারিবেন। সুপর্ণী বলিলেন, "সলিলরাশির পারে যূপকাষ্ঠে বদ্ধ একটি শ্বেত অশ্ব রহিয়াছে।" কদ্রুর দৃষ্টিশক্তি আরও তীক্ষ্ণ, তিনি অশ্ব ত' দেখিলেনই, তাহার পর তাহার পবনে আন্দোলিত পুচ্ছও দেখিলেন। সুপর্ণী গিয়া দেখিয়া আসিলেন কদ্রুর কথাই সত্য। কদ্রু বলিলেন, "দিব্যলোকে সোম রহিয়াছে, তুমি তাহা আনিয়া মুক্তিলাভ কর।" সুপর্ণী ছন্দসকলকে প্রসব করিলেন, (১) এবং গায়ত্রী স্বর্গ হইতে সোম আহরণ করিলেন, সুপর্ণী মুক্তি-লাভ করিলেন (৩।৬।২।২-৯, ১৫)। যখন গায়ত্রী সোম আনিতে-ছিলেন তখন পদরহিত একজন তীর নিঃক্ষেপক তাঁহার একটি পালক বা সোমের একটি পত্র (২) ছেদন করিয়াছিলেন (৩।৩।৪।১০)। তৈত্তিরীয় সংহিতায়ও এই বিবরণ আছে (৬।১।৬)। তথায় উল্লেখ আছে যে কাহার রূপ অধিক ইহা লইয়া কদ্রু ও সুপর্ণীর মধ্যে কলহ হইয়াছিল।

পৌরাণিক গরুড়-কাহিনীর পূর্ণ বিকাশ মহাভারতে। স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ড ব্রাহ্মখণ্ড ও নাগরখণ্ড হইতেও গরুড়ের কাহিনী পাওয়া যাইতে পারে। আদিপর্ব্বে আছে—বালখিল্য মুনিগণের আকার ও ক্ষমতার ক্ষুদ্রতা দেখিয়া ইন্দ্র উপহাস করিলে পর তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া নূতন ইন্দ্র-সৃষ্টির জন্য যজ্ঞ করেন। তাহার পর কশ্যপ মধ্যস্থ হইয়া ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব রক্ষা করেন ও পত্নী বিনতার গর্ভে পক্ষিকুলের ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করিবেন এইরূপ স্থির করেন।

কশ্যপ দক্ষের দুই কন্যা কদ্রু ও বিনতাকে বিবাহ করেন। কশ্যপের বরে কদ্রুর সহস্র নাগপুত্র জন্মে। বিনতারও দুই পুত্র হয়, কিন্তু তাঁহার অবিমৃষ্যকারিতার জন্য প্রথম পুত্র অরুণ অঙ্গহীন হ'ন। তিনি পরে সূর্য্যের সারথি হইয়াছিলেন। বিনতার দ্বিতীয় পুত্র গরুড়।

কদ্রু ও বিনতা একদিন অশ্বরাজ উচ্চৈঃশ্রবাকে দূরে দেখিয়া তাহার পুচ্ছের বর্ণ লইয়া তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন। বিনতার মতে পুচ্ছ শ্বেতবর্ণ, কদ্রুর মতে তাহা কৃষ্ণবর্ণ। স্থির হইল, যাহার কথা মিথ্যা হইবে সে অন্যের দাসী হইবে। কদ্রুর আদেশে তাঁহার নাগ-পুত্রগণ উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছ অবলম্বন করিয়া রহিল। ফলে পুচ্ছের বর্ণ কৃষ্ণ হইল। বিনতা পরাজিত হইয়া কদ্রুর দাসী হইলেন। ইহার পর গরুড়ের জন্ম।

প্রকাণ্ড আকার ও প্রভূত-পরাক্রমশালী হইয়াও গরুড়কে বিমাতা ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদিগের দাসত্বস্বীকার করিতে হইল। সে বল যে কি প্রচণ্ড তাহা গজকচ্ছপ-ভক্ষণ ও বটশাখা-ধারণের বৃত্তান্ত হইতে কিছু কিছু জানা যায়। বীরপুত্র মাতার নিগ্রহ দেখিয়া তাঁহার দাসত্ব-মোচনের সর্ত্ত জানিতে চাহিলে নাগগণ কহিল যে অমৃত আনিয়া দিতে পারিলে মাতাপুত্র মুক্ত হইবেন। অমরগণ অমৃতরক্ষার জন্য যথেষ্ট আয়োজন করিয়াছিলেন। তথাপি গরুড় তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া অমৃতের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং অগ্নিব্যূহ, ঘূর্ণ্যমান চক্র ও রক্ষক সর্পদ্বয়কে ব্যর্থ করিয়া অমৃতহরণ করিলেন। বিষ্ণু তাঁহার পরাক্রম দেখিয়া প্রীত হইয়া তাঁহার সহিত বরবিনিময় করিলেন। ফলে গরুড় অমরত্ব লাভ করিলেন এবং বিষ্ণুর বাহন হইলেন। বিষ্ণু গরুড়ধ্বজ হইলেন।

বিজয়ী গরুড় যখন অমৃত লইয়া প্রস্থান করিতেছিলেন তখন ইন্দ্র তাঁহার প্রতি বজ্রনিঃক্ষেপ করিলেন। অক্ষতদেহ গরুড় দেবেন্দ্রের ব্যর্থ চেষ্টাকে উপহাস করিয়া পক্ষের একটি স্বরূপ পত্র ত্যাগ করিলেন। এইজন্য মহাভারতে তাঁহাকে আর একটি নাম দেওয়া হইয়াছে 'সুপর্ণ'। ইন্দ্র প্রীত হইয়া তাঁহার সঙ্গে বন্ধুত্বস্থাপন করিলেন। ইন্দ্রের বরে নাগগণ গরুড়ের ভক্ষ্য হইল এবং গরুড়ও প্রতিজ্ঞা করিলেন অমৃত নাগগণকে পান করিতে দিবেন না। গরুড় অমৃত লইয়া গিয়া মাতাকে মুক্ত করিলেন। অমৃত কুশের উপর থাকিল। নাগগণ তাহা ভক্ষণ করিবার পূর্ব্বেই ইন্দ্র তাহা হরণ করিলেন। নাগগণ শূন্য কুশ লেহন করিয়া খণ্ডজিহ্ব হইল।

মহাভারতে লিখিত গরুড়ের সম্বন্ধে অন্যান্য আখ্যায়িকার অব-তারণার পূর্ব্বে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণে আছে গায়ত্রী সোম আনিয়াছিলেন। গায়ত্রীর সহিত সূর্য্যের সম্পর্ক আছে। বেদ-ও পুরাণ-অনুসারে সূর্য্যের রথে সাতটি অশ্ব। ইহার পৌরাণিক ব্যাখ্যা—গায়ত্রীপ্রমুখ সাতটি ছন্দই সূর্য্যের সাত অশ্ব। এখনও গায়ত্রী মন্ত্র যাহা পাঠ করা হয় তাহা সূর্য্যেরই স্তব। বৈদিক যুগে সোমের সহিত গায়ত্রীর সম্পর্ক—সম্বন্ধে একজন পণ্ডিতের মত-গায়ত্রীচ্ছন্দে সূত্র উচ্চারণ করিতে করিতে পর্ব্বত প্রদেশ হইতে সোমকে আনয়ন করা হইত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে জানা যায় যে সোমের প্রাতঃসবণে গায়ত্রীচ্ছন্দের প্রয়োজন হইত। গায়ত্রীকর্ত্তৃক সোম-আনয়নের আখ্যায়িকাই যে গরুড়ের কাহিনীর মূল তাহা পুরাণের যুগেও লোকে বিস্মৃত হয় নাই। বৈদ্যগ্রন্থে সোমলতার বিভিন্ন নামগুলির

অর্ব্বুদ নামক সর্পদেহ মহর্ষি সোমাভিষবের সময় গ্রাব বা পাষাণখণ্ডের স্তুতিপাঠ করিতেন। শতপথ ব্রাহ্মণে সর্পরাজ একজন অর্ব্বুদের নাম পাওয়া যায়। অথর্ব্ববেদে অর্ব্বুদির নাম পাওয়া যায়। ভাষ্যে তাঁহাকে সর্প-ঋষি অর্ব্বুদের পুত্র বলা হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় সংহিতায় ও কদ্রু রমণী। পৌরাণিক কদ্রুকাহিনীতে সম্ভবতঃ সর্পদেহ ঋষি কাদ্রবেয় অর্ব্বুদ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ) ও সর্পরাজ কাদ্রবেয় অর্ব্বুদ (শতপথ ব্রাহ্মণ)এর কাহিনী মিশিয়া গিয়া কদ্রু সর্প-জননীতে পরিণত হইয়াছেন। অর্ব্বুদ নামে কদ্রুপুত্র এক সর্পের নামও পাওয়া যায়।

১। ঐ স্থলেই বলা হইয়াছে সুপর্ণী বাক্। সুতরাং তিনিই ছন্দোজননী।

২। পর্ণ বলিতে পালক ও বৃক্ষপত্র দুই-ই হয়।

মধ্যে গরুড়'স্তুত ও গায়ত্রী নামও পাওয়া যায়। বায়ুপুরাণের মতে (৬৯ অঃ) গায়ত্রীআদি ছন্দ বিনতার সন্তানগণের মধ্যে পরিগণিত; এই বিনতাই সুতরাং ছন্দোজননী বা বাক্ বা সুপর্ণী। অধিকাংশ পুরাণে সুপর্ণী নাম নাই, তাহার স্থলে বিনতা আছে। (১)

গরুড়ের সহিত অমৃতরক্ষকদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল। মহাভারতের এই স্থলে গন্ধর্ব্ব ও অগ্নির উল্লেখ আছে। ইহাও বৈদিক উপাখ্যানের স্মৃতির ভগ্নাবশেষ। ঋগ্বেদে বলা হইয়াছে গন্ধর্ব্বগণ সোমের রক্ষক; অন্যত্র আছে অগ্নি সোমের রক্ষক (১০।৮৫)। গন্ধর্ব্বগণ বাণ-নিঃক্ষেপকারী ইহারও উল্লেখ আছে। বেদে ও ব্রাহ্মণে কৃশানুর নাম আছে, তাঁহার শরেই গায়ত্রীর পালক বা নখর ছিন্ন হইয়াছিল। মহামতি সায়নাচার্য্যের মতে কৃশানু একজন সোমরক্ষক গন্ধর্ব্ব। তাঁহার সহিত গরুড়ের প্রতি বজ্রনিঃক্ষেপকারী ইন্দ্রের কোন সম্বন্ধ নাই। ঋগ্বেদে একস্থলে কৃশানুকে দেব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অভিধানে কৃশানু অগ্নির একটি নাম। বায়ুপুরাণে কৃশানুকে 'সম্রাড়গ্নি' বলা হইয়াছে।

গরুড় অমৃত আনিয়া কুশের উপর রক্ষা করিয়াছিলেন। বৈদিক যুগে সোমকে কুশের উপর স্থাপন করা হইত। গরুড়ের জন্মপ্রসঙ্গে পুরাণে বালখিল্যমুনিগণের অবতারণা কেন হইয়াছে বুঝা গেল না। ঋগ্বেদে বালখিল্য সূক্ত কতকগুলি আছে। সেগুলির অধিকাংশ ইন্দ্রের স্তুতিগান পুরাণে বালখিল্য মুনিগণ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন; কোন কোন পুরাণের মতে তাঁহারা ক্রতু এবং সন্নতির পুত্র। তাঁহারা অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ, কুশ সংগ্রাহক ও নিয়ত সূর্য্যরথবাসী। তাঁহারা সূর্য্যের সহচর—সূর্য্যের সহিত তাঁহাদের এইটুকু সম্বন্ধ বুঝা যায়।

গরুড়ের কীর্ত্তিকলাপ-সম্বন্ধে আরও কতকগুলি পৌরাণিক আখ্যায়িকা আছে। অমৃত আহরণের পূর্ব্বে গরুড় নিষাদগণকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ইহারা হরিভক্তিহীন কোন জাতি। বিষ্ণু-পুরাণ হইতে জানা যায় ব্রাহ্মণগণ হরিদ্বেষী অত্যাচারী রাজা বেণকে হত্যা করিয়াছিলেন। বেণের এক পুত্রের নাম নিষাদ। নিষাদ ও নিষাদের সন্ততিগণ পূর্ব্বপুরুষ বেণের ন্যায়ই দেবদ্বেষী। এ স্থলে বিষ্ণুভক্ত গরুড়ের সহিত নিষাদগণের শত্রুতার উল্লেখ করা পুরাণকারের পক্ষে অসম্ভব নহে। (২)

গরুড়ের ক্ষমতা বুঝাইবার জন্যই বোধ হয় বৃহৎকায় গজকচ্ছপের অবতারণা করা হইয়াছে। মহাবল মহাকায় গরুড় যদি অতিকায় জন্তু না বহন করেন তবে তাঁহার ক্ষমতা পরিস্ফুট হইয়া উঠে না। গজ-কচ্ছপের আখ্যায়িকাটি সম্ভবতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের ৮ম স্কন্ধের গজকুম্ভীরের আখ্যায়িকার ন্যায় রূপক নহে।

উদ্যোগপর্ব্বে (১০৫অঃ) গরুড় বলিতেছেন তিনি শ্রুতশ্রী, শ্রুতসেন, বিবস্বান, রোচনামুখ, প্রস্তুত ও কালকাক্ষ প্রভৃতি দানবগণকে বধ করিয়াছিলেন। এ সকলের বিবরণ কিছু নাই। ইহা ব্যতীত আর দুইটি উপাখ্যান আছে, তাহাতে গরুড়কে পরোপকারী বলিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে। মহামুনি গালব যাহাতে বিভিন্ন রাজার নিকট হইতে অভিলষিত দান গ্রহণ করিয়া গুরুদক্ষিণা দিতে পারেন সেইজন্য গরুড় মুনিবরকে লইয়া নানা দেশে গিয়াছিলেন। এই পরোপকারবৃত্তি গরুড়ের বংশগত ধর্ম্ম; ইহার জন্য তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বৃদ্ধ জটায়ু প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। গরুড়ের আর একটি কার্য্য—রামলক্ষ্মণকে নাগপাশবন্ধন হইতে মুক্ত করা। (৩) রামায়ণে আছে যে গরুড়ের স্পর্শে রামলক্ষ্মণের দেহে সর্পশরজনিত ক্ষতসকল দূর হইয়াছিল (লঙ্কাকাণ্ড, ৫০ সর্গ)। নানাগ্রন্থে গারুড়ী মন্ত্রের প্রভাবের উল্লেখ আছে। সর্পভয় নিবারণের জন্য এখনও আমরা গরুড়ের নাম করি। গরুড় নাগগণের ভক্ষক, সুতরাং নাগবিষ-দমনের ক্ষমতাও তাঁহার ছিল। তাহার উপর তিনি সূর্য্যরূপী বিষ্ণুর বাহন। পূজ্যপাদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মৈত্র অধিকারী মহাশয় 'সূর্য্যপূজা' প্রবন্ধে (বামাবোধিনী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯) দেখাইয়াছেন যে আর্য্যগণ বৈদিককাল হইতেই সূর্য্যের ত্বগ্‌দোষনাশক ক্ষমতার কথা জানিতেন। সমালোচনার উদ্দেশে ঐ প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার মহাশয়ের 'মন্দিরের কথা' হইতে ব্রুক্ সাহেবের লেখার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। ব্রুক্ সাহেব গরুড় ও পারস্যদেশের সিমুর্গ্ পক্ষীর তুলনা করিয়াছেন। সিমুর্গ পক্ষীর জন্য বীর রুস্তমের আঘাত আরোগ্য হইয়াছিল। (৪) রামায়ণে রাম-লক্ষ্মণের আঘাতও সেইরূপ আরোগ্য হইয়াছিল।

১। মহাভারতের স্কন্দের জন্মবৃত্তান্ত-প্রসঙ্গে বিনতাকে 'সুপর্ণী' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে তার্ক্ষ্যের (কশ্যপের) (কশ্যপের) চারি পত্নী—বিনতা, কদ্রু, পতঙ্গী, যামিনী, তন্মধ্যে সুপর্ণা (বিনতা) গরুড়কে প্রসব করেন। মনে হয় বৃহদ্দেবতাও মহাভারতে সুপর্ণী স্থলে বিনতার নাম প্রথম উল্লিখিত হইয়াছে। বৃহদ্দেবতাগ্রন্থে কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নী (দক্ষকন্যা)র মধ্যে বিনতার সহিত কদ্রুরও নাম পাওয়া যায় এবং কশ্যপের পত্নীগণ হইতে গন্ধর্ব্ব, সর্প, রাক্ষস, পক্ষিগণ উৎপন্ন হইয়াছিল তাহাও বলা হইয়াছে।

২। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে নিষাদগণ সম্ভবতঃ ভারতেরই অধিবাসী কোন আদিম জাতি। তাহা হইলে গরুড় কর্ত্তৃক তাহাদের হিংসা হয়ত' আর্য্যগণের সহিত অনার্য্যের বিবাদের কাহিনীর একটি অংশ।

৩। যিনি যখনই নাগপাশে বদ্ধ হইয়াছেন, গরুড়ই তাঁহাকে মুক্ত করিয়াছেন। এইরূপে বলি এবং অনিরুদ্ধ মুক্তিলাভ করেন।

৪। পারস্যকবি ফার্দ্দৌসি লিখিয়াছেন রুস্তমের পিতা জাল্ সিমুর্গ পক্ষীর দ্বারা লালিত পালিত হইয়াছিলেন। রুস্তমের জননীর পার্শ্বদেশ বিদারণ করিলে পর রুস্তম জন্মগ্রহণ করেন। সিমুর্গের পালকের স্পর্শে এই ক্ষত বিলুপ্ত হয়। রুস্তম যুদ্ধে আহত হইয়া এইরূপ পালকের স্পর্শে নিরাময় হন। শাহনামার সিমুর্গ পক্ষীর পালকের এই রোগনাশকারী ক্ষমতার কাহিনী আবেস্তাগ্রন্থ হইতে গৃহীত। সিমুর্গ্ পক্ষী আবেস্তার বরেন্জানা (শ্যেন বা দাঁড়কাক)র

গরুড়ের চরিত্রে এইরূপে কোমল কঠোর গুণের সমাবেশ হইয়াছে। গরুড়কে মহাপুরুষোচিত গুণাবলীতে বিভূষিত করিয়া পুরাণকারগণ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। পুরাণে বড় বড় দেবগণের দর্পচূর্ণ হইয়াছিল। গরুড় বাহন, তাঁহারও দর্পচূর্ণ হইয়াছিল। ইন্দ্র সারথি মাতলি যখন কন্যার জন্য পাত্র-অন্বেষণ করিয়া সুমুখ নামক নাগকে সুপাত্র বলিয়া স্থির করিলেন, তখন ইন্দ্র ও বিষ্ণু গরুড়ের সহিত নাগগণের জাতিগত বৈরভাব অগ্রাহ্য করিয়া, পূর্ব্বসন্ধি বিস্মৃত হইয়া সুমুখকে অমরত্ব প্রদান করিলেন। এ ক্ষেত্রে গরুড়ের ক্রোধ হওয়া স্বাভাবিক। যখন গরুড় ইন্দ্রকে তিরস্কার করিয়া দর্পপ্রকাশ করিতেছিলেন তখন বিষ্ণু আপনার বাহুভারে গরুড়কে ক্লিষ্ট করিয়া তাঁহার দর্পচূর্ণ করিলেন। গরুড় তপোরতা শাণ্ডিলীকে অপমান করিয়াছিলেন সেইজন্য তাঁহার পক্ষসকল স্খলিত হইয়া দেহ মাংসপিণ্ডবৎ হইয়াছিল। এইরূপে দ্বিতীয় বার গরুড়ের স্পর্দ্ধা চূর্ণ হয়। গরুড় অনুনয়দ্বারা শাণ্ডিলীকে তুষ্ট করিয়া পূর্ব্ববৎ পক্ষলাভ করেন। ইহা মহাভারতের বৃত্তান্ত; স্কন্দপুরাণের নাগরখণ্ডে আছে মহাদেবের কৃপায় গরুড়ের পক্ষোদ্গাম হয়।

সুযোগ পাইলে পরবর্ত্তী প্রবন্ধে ভারতের গরুড়-কাহিনীর সহিত বায়ুপুরাণে (৬৯ অঃ) গরুড়ের পত্নীগণের নাম আছে—ভাসী, ক্রৌঞ্চা, ধৃতরাষ্ট্রী প্রভৃতি গরুড়ের পঞ্চভার্য্যা। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে কয়েক-জনের নাম সুমুখ, সুরূপ, সুরস, বল ইত্যাদি। মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে (১০১ অঃ) তাঁহার সুমুখ, সুনেত্র, সুবল প্রভৃতি ছয়জন পুত্রের নাম আছে। অন্যান্য দেশের পৌরাণিক কাহিনীর তুলনা, গরুড়ের মূর্ত্তি ও অন্যান্য বৃত্তান্তের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয় কেন?

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত এম-এ, এফ-আর-ই-এস

ব্যাঙ্ক জিনিষটা ভারতবর্ষে ইয়োরোপ, আমেরিকা ও জাপানের মত সর্ব্বজন-পরিচিত না হইলেও, যাঁহারা একটু ব্যবসা বাণিজ্য করেন বা উহার খোঁজ রাখেন, তাঁহাদের অনেকেরই অজ্ঞাত নহে। আবার ব্যাঙ্ক জানা থাকুক আর নাই থাকুক, ব্যাঙ্ক ফেল পড়িলে তাহা যে একটা সর্ব্বনাশকর ঘটনা, এ কথা গ্রামের কৃষককেও বুঝাইতে হয় না। ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে, বা ব্যাঙ্কের কি কি কাজ, এ কথা নূতন করিয়া বিস্তৃতভাবে বলিবার অবসর আমাদের নাই। পূর্ব্বে এই পত্রিকায়ই তাহার আলোচনা করা গিয়াছে। * তবে মোটামুটি, টাকা লইয়াই ব্যাঙ্কের কারবার। এই টাকার লেনাদেনা বিশ্লেষণ করিলে ধার নেওয়া এবং ধার দেওয়ায় দাঁড়ায়।

মনে করুন, একজন লোক ব্যাঙ্কে হিসাব খুলিয়া টাকা রাখিয়াছেন। যিনি টাকা রাখিয়াছেন, তিনি হইতেছেন ব্যাঙ্কের পাওনাদার, আর ব্যাঙ্ক হইল তাহার দেনাদার। এইরূপ যত লোক ব্যাঙ্কে টাকা রাখে, তাহারা সকলেই ব্যাঙ্কের পাওনাদার বা উত্তমর্ণ; অর্থাৎ ব্যাঙ্ক তাহাদের নিকট ধারিয়া থাকে। ব্যাঙ্কের সাধারণের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করার মধ্যে আবার প্রকার-ভেদ আছে। ব্যাঙ্ক কতকগুলি টাকা এই সর্ত্তে ধার করে, যাহা চাহিবামাত্র পরিশোধ করিতে হয়, এবং উত্তমর্ণের হুকুমমত তৃতীয় ব্যক্তিকে দিতে হয়। ইংরাজি Current accountএর বাংলা তর্জ্জমায় যাহাকে "চলতি হিসাব" বলে। সেই হিসাবের টাকাগুলিই এই সর্ত্তে জমা রাখা হয়। অবশ্য যাহার ৫০০০৲ জমা আছে, সে ৫০০৲ চাহিলে বা চেক (cheque) কাটিয়া কাহাকেও দিতে বলিলে ৫০০৲ টাকাই দিতে হয়, সব টাকা দিবার কোন প্রয়োজন বা আইনের বাধ্যবাধকতা নাই। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, মোক্কেল (constiuent) যদি এক চেকেই ৫০০০৲ টাকা কাটিয়া বসে, তাহা হইলে সমস্ত টাকাই একসঙ্গেই দিতে হইবে, কিছু কম করিয়া দিলে চলিবে না।

ইহা ব্যতীত আর একরকম হিসাবেও একসঙ্গে সমস্ত টাকা তুলিয়া লওয়া যায়; তাহার নাম সেভিংস হিসাব। বাংলায় "উদ্বৃত্ত অর্থের হিসাব" বলা যাইতে পারে। পোষ্টাফিসের অনুগ্রহে সেভিংস বা উদ্বৃত্ত অর্থের হিসাব আর কাহাকেও ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে হয় না। তবে এই হিসাবে সপ্তাহে একবারের বেশী সাধারণতঃ টাকা তুলিতে দেওয়া হয় না, যদিও দিনে পাঁচবার জমা দিলেও তাহাতে ব্যাঙ্কের কাহারও আপত্তি করিবার সম্ভাবনা বড় বেশী নাই। ইহার আর এক অসুবিধা এই যে (যদিও বিভিন্ন ব্যাঙ্কে বিভিন্ন নিয়ম) খুব বেশী টাকা এই হিসাবে রাখিতে দেওয়া হয় না। সাধারণতঃ ৫০০০৲ হইতে ১০,০০০৲ এর বেশী টাকা কোন ব্যাঙ্কই এইরূপ হিসাবে রাখিতে রাজি নয়। এইস্থানে আর একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, সমস্ত ব্যাঙ্কই মোক্কেলগণকে এইরূপে হঠাৎ, একসঙ্গে সমস্ত টাকা উঠাইয়া লইবার পুরোপুরি ক্ষমতা দেয় না। আমি এক ব্যাঙ্ক জানি, যাহাদের নিয়ম হইতেছে যে, একবারে ৫০৲ টাকার অতিরিক্ত কেহ তুলিতে পারিবে না। আবার অপর এক ব্যাঙ্ক সপ্তাহে একবারে ১০০০৲ পর্য্যন্ত তুলিতে দেয়। প্রথমোক্ত ব্যাঙ্ক একটু বেশী হুসিয়ার ও কড়া; কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত ব্যাঙ্কের নিয়ম বোধ হয় খুব অসুবিধাজনক নহে। যাহা হউক, উদ্বৃত্ত অর্থের হিসাবে ব্যাঙ্কের দেনার দায়িত্ব এইরূপ।

নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বেশী সুদ দিয়া ব্যাঙ্ক টাকা ধার করিয়া থাকে। ব্যাঙ্কের ভাষায় ইহার নাম স্থায়ী জমা (Fixed Deposit)। তিন, ছয় বা নয় মাসের কিম্বা একবৎসরের জন্য সাধারণতঃ স্থায়ী জমা গ্রহণ করা হয়। ভারতবর্ষের বড় বড় ব্যাঙ্কের কোনটাই দুই বৎসরের অতিরিক্ত কালের জন্য স্থায়ী জমা গ্রহণ করে না। বঙ্গদেশের কোন

অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্করণ। আবেস্তাগ্রন্থে আছে অহুর মজদ্ জরাথুষ্ট্রকে উপদেশ দিতেছেন যে ঐ পক্ষীর পালক অঙ্গে ঘর্ষণ করিলেই তিনি শত্রুর মন্ত্রে উৎপন্ন অসুখ হইতে অব্যাহতি পাইবেন।

* মৎলিখিত "ব্যাঙ্ক" শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন। অগ্রহায়ণ, ১৩২৮, ভারতবর্ষ।

আফিসগুলি পাঁচ বৎসরের জন্যও স্থায়ী জমা গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাদের টাকা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালের জন্য লগ্নি (Investment) হয় বলিয়াই ইহারা বেশী দিনের জন্য স্থায়ী জমা গ্রহণ করিয়া থাকে। এই প্রকারের হিসাবে ব্যাঙ্কের দায়িত্ব হইতেছে, নির্দ্দিষ্ট কাল পূর্ণ হইবার পরে সুদসহ আসল টাকা উত্তমর্ণকে ফিরাইয়া দেওয়া। নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বে টাকা ফিরাইয়া লইবার আইনতঃ অধিকার উত্তমর্ণের নাই; এজন্য স্থায়ী আমানতে ব্যাঙ্ক অনেকটা নিশ্চিন্ত। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনে টাকা পরিশোধ করিতে অক্ষম হইলে চলিবে না; কারণ, সেদিন উত্তমর্ণের সুদসহ আসল ফিরাইয়া পাইবার অধিকার জন্মে।

আমরা তিন প্রকারের হিসাবে ব্যাঙ্কের আমানতী টাকা ফিরাইয়া দিবার বিভিন্নরূপ দায়িত্ব দেখিলাম:—(১) চলতি হিসাব—যে কোন সময়ে ব্যাঙ্ককে টাকা পরিশোধ করিতে হইতে পারে; (২) উদ্বৃত্ত অর্থের হিসাব—সপ্তাহে যে কোন দিন সমস্ত টাকা বা নিয়মানুযায়ী বৃহত্তম সংখ্যক টাকা পরিশোধ করিতে হইতে পারে; (৩) স্থায়ী আমানত—নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইলে সুদসহ আসল টাকা পরিশোধ করিতে হইবে।

ইহা ব্যতীত টানাটানি পড়িলে ১০।১৫ দিনের জন্যও ব্যাঙ্ক কর্জ্জ করিয়া থাকে। এমন কি সময় সময় ২৪ ঘণ্টার চিঠিতে পরিশোধ করিবার সর্ত্তেও ব্যাঙ্ককে ধার করিতে হয়।

ব্যাঙ্ক একটা মহাজনী ব্যবসায়ের ব্যবস্থা। তাহাকে সুদে ধার করা টাকা সুদে না খাটাইলে উঠিয়া যাইতে হয়। শুধু তাহা নহে, তাহার টাকা এরূপভাবে খাটাইতে হইবে যে, জমা টাকার উপর কেবলমাত্র সুদ দিলেই চলিবে না, কর্ম্মচারীর মাহিনা, বাড়ী ভাড়া প্রভৃতি নানা খরচ দিয়াও অংশীদারগণকে (Share holders) লাভ দিতে হইবে এবং সর্ব্বোপরি অতিরিক্ত লাভ হইতে ব্যাঙ্কের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য রিজার্ভ ফণ্ড (Reserve Fund) তৈয়ার করিতে হইবে। রিজার্ভ ফণ্ডকে "অবণ্টনীয় গচ্ছিত লভ্যাংশ" বলিলে বোধ হয় চলে। ব্যাঙ্ককে এক দিকে যেমন লাভ করিতে হইবে, অন্য দিকে তেমনি লোকসান এড়াইয়া চলিতে হইবে; কারণ, দশটী লোককে কর্জ্জ দিয়া যে টাকা সুদে লাভ হইবে, একটা কর্জ্জের টাকা মারা গেলে তাহার দ্বিগুণ লোক্‌সান হইয়া যাইবে। ব্যাঙ্ক টাকা লইয়া কারবার করে, প্রত্যেক লোক্‌সানই ব্যাঙ্কের পক্ষে টাকার লোক্‌সান, এ কথা, ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারের সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হয়।

অংশীদারের টাকা বা মূলধন ও জমার অর্থ হইতেই ব্যাঙ্ক ধার দেয়। কিন্তু এই মূলধন ও জমার টাকার সমস্তটা কর্জ্জ দেওয়া চলে না। হাতে কতকটা রাখিতে হয়, কারণ জমার কতক অর্থ যথা চলতি ও উদ্বৃত্ত অর্থের হিসাবের টাকার উপর যে কোন সময়ে চাহিদা আসিতে পারে। যদিও সমস্ত টাকাটাই প্রত্যহ সকলে মিলিয়া চায় না, তথাপি একটা মোটা টাকা হাতে রাখিতে হয়; কারণ, ব্যবসায়ের নাড়ী কিছু সকল সময় ঠিক থাকে না বা ঠিক বুঝিয়া উঠা যায় না। হুসিয়ার বেশী হইলে হয় ত একটু কম টাকা খাটে এবং কম লাভ হয়, কিন্তু উল্টা দিকে ভুল করিলে যে, দিনে লালবাতি জ্বলে তাহাতে অন্ধকার ব্যতীত আলো হয় না। তাই ব্যাঙ্ককে শুধু ভাল বন্ধকী রাখিয়া কর্জ্জ দিলে চলে না হাতে যথেষ্ট পরিমাণ নগদ টাকা রাখিতে হয়; কারণ, সর্ত্তানুযায়ী টাকা না দিতে পারিলেই ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইয়া গেল। পঞ্চনদের পিপ্‌ল্‌স্ ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইলে পর, ইহার সম্পত্তি বেচিয়া দাদনের টাকা আদায় করিয়া গচ্ছিত প্রতি টাকায় ষোল আনার অধিক দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে ব্যাঙ্কের ফেল হওয়া কিছু আটকায় নাই।

ব্যাঙ্কের যিনি ম্যানেজার বা কর্ম্মকর্ত্তা, তাঁহার এই সর্ত্তরক্ষার কথাটী সর্ব্বদা মনে রাখিতে হয়। হাতে উপযুক্ত পরিমাণ নগদ টাকা না রাখিতে পারিয়া ব্যবসায়ের সর্ত্তানুযায়ী চাহিবা মাত্র দেনা পরিশোধ না করিতে পারিলে ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইয়া যায়। তবে কোন্ ব্যাঙ্কের পক্ষে কোন্ সময়ে কি পরিমাণ অর্থ "উপযুক্ত", তাহা দেশকাল অনুযায়ী ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের প্রতিভাই বিচার করিতে পারে, কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম দ্বারা তাহা স্থির করা সম্ভব নহে।

ব্যাঙ্ক কর্জ্জ দেয় নানারূপ দ্রব্য বন্ধক রাখিয়া। সোণার গয়না বাঁধা রাখিয়া কর্জ্জ দেওয়া লোন আফিসের কাজ হইলেও, সাধারণতঃ ব্যাঙ্কের কাজ নহে। বাড়ীঘর বাঁধা রাখিয়াও ব্যাঙ্ক কর্জ্জ দিতে বিশেষ উৎসুক নহে; কারণ তাহাতে টাকাটা আট্‌কা পড়িয়া যায়; এবং অধমর্ণ টাকা পরিশোধ করিতে অক্ষম হইলে, আইন আদালতের সাহায্য লইতে হয় ও তাহাতে অনেক সময় নষ্ট হয়। সাধারণতঃ ব্যাঙ্ক এরূপ সমস্ত দ্রব্য বন্ধক রাখে, যাহা সকল সময় বিক্রয় করিয়া কর্জ্জের টাকা ফিরাইয়া পাওয়া সম্ভব। কোম্পানীর কাগজ (Government Security) বাজারে সব সময়ই বিক্রয় করা চলে; কারণ, ইংরাজ সরকার যতদিন আছেন ততদিন উহার মার নাই। আর সরকারের উঠিয়া যাইবারও ভয় নাই বলিয়া ইহার দরও বিশেষ উঠা নামা করে না। টাকার বাজারে সুদের হার বাড়ে ও কমে; এইজন্যই কোম্পানীর কাগজের দর যাহা একটু পড়ে চড়ে। সুতরাং ব্যাঙ্ক অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া কোম্পানীর কাগজ বন্ধ রাখিয়া কর্জ্জ দেয়।

ইহা ব্যতীত মিউনিসিপালিটীর কাগজ ও পোর্ট ট্রাষ্টের কাগজ বন্ধক রাখিয়াও ব্যাঙ্ক অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া ধার দেয়। ইহাদের ইংরাজি নাম হইতেছে Municipal Loans বা Bonds এবং Port Trust Debenture ইত্যাদি। এগুলি পুরোপুরি সরকারের কাগজ না হইলেও আধা সরকারী ত বটে, এজন্য ভয় নাই বলিলেই চলে। ব্যাঙ্কের নিকট ইহাদের আদর প্রায় কোম্পানীর কাগজের সমান। ইহাদের কেনা বেচা সম্বন্ধেও কোন অসুবিধা নাই, সকল সময়ই বিক্রয় করিয়া অর্থ ফিরাইয়া পাইবার সুবিধা আছে।

কেবলমাত্র কোম্পানীর কাগজ বা মিউনিসিপাল ও পোর্ট ট্রাষ্ট কাগজ বন্ধক রাখিয়া কর্জ্জ দিতে গেলে, ব্যাঙ্কের ব্যবসা চলে না। তাহাকে নানা সমবায় কোম্পানীর অংশ জমা রাখিয়া ধার দিতে হয়। সেয়ার বাজারে পাটের কল, কয়লার খনি, চা

বাগান, রাসায়নিক কারখানা, তৈলের কল, ইঞ্জিনিয়ারিং কারবার প্রভৃতির অংশের কেনা বেচা হয়। ব্যাঙ্ক এই সমস্ত অংশ (shares) জমা রাখিয়াও ধার দেয়। অবশ্য ইহাদের সকলগুলির আদর কিছু ব্যাঙ্কের নিকট সমান নহে। পাটের কলের সবগুলি সমান লাভ করে না বা দেয় না, সকলের আবার সমান "অবণ্টনীয় সঞ্চিত লভ্যাংশ" নাই। তাহার উপর কতকগুলি কোম্পানী আবার নূতন, অংশের মূলধন সমস্ত আদায় হয় নাই। ইহাদের অনেকে আবার যথেষ্ট লাভ করে না বা লভ্যাংশ দেয় না। সুতরাং বাজারে এগুলির দর সুবিধাজনক নহে (কম); কারণ, ইহাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

যে সকল কোম্পানীর অংশ বাজারে সব সময় কাটে এবং যে সকল কোম্পানী বহুদিন পর্য্যন্ত অংশীদারগণকে লাভ দিয়া আসিতেছে, সেই সমস্ত "সেয়ারে" ব্যাঙ্ক বাজার দরের শতকরা কতকাংশ (যথা ৫০) কর্জ্জ দেয়। শতকরা যতটা অংশ ব্যাঙ্ক ধার দেয় না, তাহা হইতেছে হাতের Margin। কোন কারণে বন্ধকী অংশগুলির বাজার-দর কমিতে আরম্ভ করিলে, ব্যাঙ্ক তাগাদা দিয়া অধমর্ণের নিকট হইতে টাকা আদায় আরম্ভ করে এবং যাহাতে হাতের Margin ঠিক থাকে সেইদিকে দৃষ্টি রাখে। এইরূপে ব্যাঙ্ক সেয়ার বাজারের নানারূপ অংশ (shares) রাখিয়া টাকা লগ্নি করে। যে সেয়ার যত নিকৃষ্ট, তাহাতে তত বেশী Margin রাখা হয়। ব্যাঙ্কের কখনও এক প্রকার সেয়ারেই অধিক পরিমাণ কর্জ্জ দিতে নাই; কারণ, বিশেষ কোন কারণে ঐ বিশেষ ব্যবসায়েরই ক্ষতি হইতে পারে; তখন হঠাৎ বাজার দমিয়া গেলে ব্যাঙ্কের বিপদগ্রস্থ হইবার সম্ভাবনা। যে সমস্ত ব্যাঙ্ক বিপদগ্রস্ত হয়, তাহার গোড়ার কারণ, ব্যাঙ্ক অনেক সময় যথেষ্ট Margin রাখিয়া কর্জ্জ দেয় না। যখন বাজার পড়িতে থাকে, তখন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কর্জ্জের পরিমাণ অংশের দামের পরিমাণ ছাড়াইয়া যায়। সেই অবস্থায় বন্ধকী অংশগুলি বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় করিতে গেলে, বাজার আরও দমিয়া যায় ও ব্যাঙ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যথেষ্ট Margin রাখিয়া ব্যাঙ্কের কর্জ্জ দেওয়া উচিত। ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের সর্ব্বদা অংশের বাজার দরের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া অনেক ব্যাঙ্কের দরজা চিরদিনের মত বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

ব্যাঙ্ক কারবার ও কারখানা বন্ধক রাখিয়াও কর্জ্জ দিয়া থাকে। এইরূপ কর্জ্জ দেওয়া ব্যাঙ্কের পক্ষে তেমন নিরাপদ নহে; কারণ কারবার ও কারখানা অপরের হাতে থাকে এবং সর্ব্বদা তাহা পাহারা দিতে হয়। ইহা ব্যতীত ঐ সমস্ত পরিচালন বিষয়ে ব্যাঙ্ক বিশেষজ্ঞ নহে, তাহাকে পরের উপর অতিরিক্ত পরিমাণ নির্ভর করিতে হয়। এই প্রকারের কর্জ্জ প্রায়ই আটকা পড়ে (Locked up) এবং সহজে টাকা ফিরাইয়া পাওয়া সম্ভব হয় না। খুব হুসিয়ার হইয়া ব্যাঙ্ককে এরূপ ভাবে টাকা দাদন করিতে হয়। এই ভাবে টাকা আটকা পড়িয়া যাওয়ায়, অনেক ব্যাঙ্ককে অকালে লীলা শেষ করিতে হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ ব্যবসায়ীগণকে অল্প সময়ের জন্য কর্জ্জ দিয়া থাকে। ব্যবসায়ীগণ যে ব্যাঙ্কের নিকট হুণ্ডী ভাঙ্গাইয়া থাকেন, ইহা আর কিছুই নহে—নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর অর্থ ফিরাইয়া দিবার চুক্তিতে কর্জ্জ করা। হুণ্ডীর উপর টাকা দেওয়ার আর একটা সুবিধা এই যে, একক্রমে কিছুকাল হুণ্ডী ভাঙ্গাইলে পরে, হুণ্ডীগুলির পরিশোধের নির্দ্দিষ্ট দিনে ক্রমশঃই টাকা হাতে আসিয়া পড়িতে থাকে। ব্যাঙ্ক সে টাকা আর খাটাইতে ইচ্ছা না করিলে, আর নূতন করিয়া হুণ্ডী না ভাঙ্গাইলেই হইল। এইরূপে হুণ্ডীর পাওনা সমস্ত টাকা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্কে ফিরিয়া আসে। তবে হুণ্ডীর পক্ষগণকে (Parties) খুব ভাল করিয়া জানা দরকার; কারণ, কেবলমাত্র নামের উপরেই কর্জ্জ দেওয়া হয়। আর এক বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হয় যে, একই মোক্কেলের যেন অনেক হুণ্ডী ভাঙ্গান (Discount) না হয়; কারণ, একটী পক্ষ দেউলিয়া হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাঙ্কের বেশী লোকসান হইলে, তাহার অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন হইবার কথা। এইরূপ ভুল করিয়া অনেক ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে।

বিলাতী হুণ্ডীর (Sterling Bills of Exchange) উপরেও ব্যাঙ্ক ধার দেয়। এইরূপ হুণ্ডীর সুবিধা এই যে ইহার সহিত মাল থাকে। হুণ্ডীর পক্ষেরা দেউলিয়া হইলে বা অর্থ পরিশোধ করিতে অক্ষম হইলে মাল বেচিয়া অনেকটা অর্থের পুনরুদ্ধার হয়। কিন্তু একই সময়ে অনেকগুলি বিলাতী হুণ্ডী অগ্রাহ্য হইলে (Dishonoured) এবং তৎসঙ্গে মালের বাজার দর বেশী রকম পড়িয়া গেলে, ব্যাঙ্কের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়। ১৯২০ সনের শেষে এক্সচেঞ্জ পড়িয়া গেলে কলিকাতার বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি এইরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। এক্সচেঞ্জের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে; সুবিধা হইলে আর একদিন বলিব।

ইহা ব্যতীত ব্যাঙ্ক ব্যক্তি-বিশেষকে বিনা বন্ধকীতে ধার দিয়া থাকে। বড় বড় উকীল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, ব্যবসায়ী প্রভৃতি কেবল মাত্র হাতচিঠা (Fro-note) লিখিয়া দিয়াই কর্জ্জ পাইয়া থাকেন। অধিক পরিমাণে এরূপ কর্জ্জ দেওয়া যে বিপজ্জনক, তাহা বলাই বাহুল্য। একজন উকীল বা ডাক্তারের যত বেশীই আয় হউক, হঠাৎ তাহার মৃত্যু হইলে সেই আয় একেবারেই লোপ পায় এবং টাকা পুনরুদ্ধারের পথ সন্দেহজনক হইয়া পড়ে। এইরূপে বড় বড় কর্জ্জে আসল হারাইয়া অনেক ব্যাঙ্ককে দ্বাররুদ্ধ করিতে হইয়াছে।

দ্রব্যের কেনা-বেচার মধ্যে যাওয়া ব্যাঙ্কের কার্য্য নহে। সেয়ার বাজারের অংশ কেনা-বেচার কার্য্যে ব্যাঙ্কের কখনও যাওয়া উচিত নয়। কারণ, এই সমস্ত কাজ প্রায়ই একটু Speculative হইয়া থাকে। এমন কি ব্যাঙ্ক যখন বুঝিতে পারিবে যে, মোক্কেল তাহার টাকা লইয়া Speculate করিতেছে, তখন তাহার কর্ত্তব্য হইতেছে সেই কার্য্যে বাধা দেওয়া। বিলাতের বাজারের অধিকাংশ রৌপ্য কিনিয়া তাহা বেশী দামে বিক্রয় করিবে—এইরূপ দুরাশা লইয়া ব্যবসা করিতে গিয়া ইণ্ডিয়ান স্পীসি ব্যাঙ্কের যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তাহা ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের স্মরণীয় দুঃখের কাহিনী। ব্যাঙ্কের

কখনই অনিশ্চিত বেশী আশায় ঘোড়দৌড় খেলিতে (Speculate) যাইতে নাই। ব্যবসা বাণিজ্যে লাভ লোকসান অল্পবিস্তর অনিশ্চিতই হইবে। এই অনিশ্চিত ব্যাপারের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা হুসিয়ার হইয়া ব্যাঙ্ককে কাজ করিতে হয়; কারণ একবার ব্যাঙ্ক টলিলে সমস্ত ব্যবসা টলিয়া উঠে। আর একটা ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া গেলে, সেইসঙ্গে পাঁচটা ব্যাঙ্ক কাঁপিয়া উঠে, ও যে বিশ্বাসের উপর সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত ও বর্দ্ধিত হয়, তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়া সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির কণ্ঠরোধ হইতে থাকে।

ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলী অনেকটা উহার কর্ম্মচারীর হস্তে ন্যস্ত। ব্যবসায়ের ইতিহাসে, ডাইরেক্টর ও কর্ম্মচারীগণের অসাধুতার জন্য ব্যাঙ্ক ফেলের সংখ্যা কিছু কম নহে। এই যে নানাপ্রকার দাদন, লগ্নি বা কর্জ্জের কথা বলিলাম, ইহার সহিত ডাইরেক্টরগণ বা ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীগণ নিজেরাই সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারেন। তখন আর margin রাখিবার বা টাকা আটকাইয়া যাইবার কথা স্মরণ না রাখিয়াই ব্যাঙ্ক কর্জ্জ দিয়া থাকে ও তাহার ফল ভোগ করে। এমনও দেখা যায় যে, ব্যাঙ্কের কর্মকর্ত্তাগণ বেশী লাভের আশায় বেশী সুদে অনিশ্চিত স্থানে টাকা ধার দিয়া ব্যাঙ্ককে ডুবাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই মূর্খতা অপেক্ষা অসাধুতা অধিক পরিমাণে দেখা যায়।

ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারের কর্ত্তব্য তত সহজ নহে। এক দিকে তাহাকে যতটা সম্ভব বেশী টাকা খাটাইতে হইবে। এই টাকা আবার যত বেশী সুদে খাটিবে, তত বেশী লাভ। অথচ বেশী টাকা খাটানোর এবং বেশী সুদ খাওয়ার সহিত বিপদের ঘনিষ্ঠতা কিছু কম নহে। বেশী টাকা খাটাইলেই কম টাকা হাতে থাকে, আর কম টাকা হাতে থাকিলেই, হঠাৎ জমা টাকার উপর টান পড়িয়া বিপদের সম্ভাবনা হয়। আর ভাল বন্ধক (Good Security) ও যথেষ্ট margin রাখিয়া কেহ বেশী সুদে টাকা ধার করে না; সুতরাং বেশী সুদে টাকা কর্জ্জ দেওয়ার মানে অনেক সময় বেশী বিপদ ঘাড়ে করিয়া টাকা দাদন দেওয়া। বেশী সুদের পরিবর্ত্তে অনেক সময় আসল লইয়া টানাটানি পড়িতে পারে। এই মোটা কথাটা ভুলিলে ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারের চলে না। সুতরাং মোট টাকার (working capital) কতটা খাটিবে ও কিরূপে খাটিবে এবং কতটা হাতে থাকিবে, এ একটা সহজ সমস্যা নহে। এই সমস্যার সমাধান কর্ম্মক্ষেত্রে বসিয়া, কৃতী ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারকে করিতে হয়।

তবে মোট কথা হইতেছে এই যে, ব্যাঙ্কের পক্ষে হাতের টাকাটাই প্রধান সম্বল। কারণ, দেনা আর কিছু দ্বারাই পরিশোধ করা চলে না। বাড়ী ঘর, কোম্পানীর কাগজ, সোনারূপা, হীরাজহরত, সেয়ার-ডিবেঞ্চার হাজার হাজার হাতে থাকিলেও কোন পাওনাদার ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকার পরিবর্ত্তে তাহা লইতে রাজি হইবে না। টাকা আত্মরক্ষার প্রধান সহায়, এই কথা মনে রাখিয়া ব্যাঙ্কের এরূপ ভাবে ব্যবসা করিতে হইবে যে, খুব সহজে সে বন্ধকী দ্রব্যের সাহায্যে টাকা তুলিতে পারে। যখন ব্যাঙ্কের টাকার উপর টান পড়ে, তখন কিছু এক সঙ্গেই সমস্ত ব্যাঙ্কের টাকাটা কেহ চাহিয়া বসে না।, এই প্রথম টান্‌টা হাতের টাকা দ্বারা যোগাইতে হইবে। তাহাতেও যখন না কুলাইবে, তখন ব্যাঙ্কের নিজ হিসাবের কোম্পানীর কাগজের (Investments) সাহায্যে অন্য স্থান হইতে টাকা ধার করিতে হইবে ও টানে যোগান দিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে নূতন কর্জ্জ দেওয়া একেবারে বন্ধ করিতে হইবে এবং লগ্নির টাকা মোক্কেলগণের নিকট হইতে ফিরাইয়া পাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। এইরূপ দুই একদিন চালাইতে পারিলেই সাধারণতঃ ব্যবসায়ের অবিশ্বাস জন্য টাকার টান (Run) বন্ধ হইয়া যায় ও নূতন জমা সুরু হয়। কিন্তু একসঙ্গে একস্থানে সমস্ত ব্যাঙ্কগুলির উপর টান পড়িয়া কোন একটী ফেল হইয়া গেলে, অবিরাম কয়েকদিন ধরিয়াও টান চলিতে পারে। এইরূপ অবস্থায় অপর ব্যাঙ্কগুলিরও অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইবার কথা। যে সমস্ত ব্যাঙ্কের টাকা অধিক পরিমাণে আটক পড়িয়াছে বা লগ্নিতে মারা গিয়াছে, তাহাদের বিপদের সম্ভাবনা। একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই টানের সময় ব্যাঙ্ক রীতিমত টাকা দিতে পারিলে আর কেহ টাকা উঠাইতে চাহে না। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে উন্মত্ত জনসমূহ টাকা তুলিতে আসিয়া ব্যাঙ্কের জানালায় পুঞ্জীভূত নোটের তাড়া দেখিয়া শান্ত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। আবার এক হাতে টাকা তুলিয়া সেই সময়ই অপর হাতে জমা দিয়া গিয়াছে, ইহা অতি সাধারণ ব্যাপার।

অবশ্য খুব বেশী রকম টান পড়িলে ব্যাঙ্ককে মোক্কেলের বন্ধকী দ্রব্যগুলি আবার বন্ধক রাখিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে হয়। তবে এইরূপ কার্য্য বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িলে, ব্যাঙ্কের অবস্থা আরও সঙ্কটাপন্ন হইবার কথা। মোক্কেলের বন্ধকীগুলি আবার এরূপ হওয়া দরকার যে, সহজে হস্তান্তরিত করা যায় (Negotiable securities); তাহা না হইলে অপর স্থান হইতেও টাকা পাইবার সম্ভাবনা অল্প। এইজন্যই বুদ্ধিমান ব্যাঙ্ক ম্যানেজার কখনও আটক দাদনের (Lock up advance) পক্ষপাতী হইতে পারেন না। যে পিপ্‌লস্‌ ব্যাঙ্কের নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এই দোষে দেউলিয়া হইয়াছিল।

তাহা হইলেই দেখা গেল, ব্যাঙ্কের যথেষ্ট টাকা হাতে রাখা দরকার। হাতে অর্থাৎ নিজেদের সিন্দুকে সমস্ত টাকা রাখিবার দরকার নাই, অপর ভাল ব্যাঙ্কে যেখান হইতে চাহিবামাত্র পাওয়া যাইতে পারে, সেখানে রাখিলেও, তাহা হাতে রাখিবারই সামিল।

তার পর কতকগুলি টাকার কোম্পানীর কাগজ নিজ হিসাবে কিনিয়া রাখা উচিত; কারণ, ইহার সাহায্যে টাকা পাওয়া খুব সহজ।

সর্ব্বশেষে টাকা এরূপভাবে লগ্নি করিতে হইবে যে, সহজে তাহা ফিরাইয়া পাওয়া যায়; এবং যতদূর সম্ভব হস্তান্তরিত করার পক্ষে সুবিধাজনক বন্ধকী যথেষ্ট margin রাখিয়া ধার দিতে হইবে। যদিও ব্যাঙ্কের পক্ষে অনেক সময় শিল্প প্রভৃতির উন্নতির জন্য কতকটা আটক দাদন করিতে হয়, তথাপি তাহার পরিমাণ কোন সময়ই বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। আর বন্ধকী ব্যতীত কর্জ্জ দেওয়া ব্যাঙ্কের পক্ষে

একেবারেই উচিত নহে। কিন্তু ব্যবসাক্ষেত্রে সকল সময় এই নিয়ম মানিয়া চলা সম্ভব নহে। অনেক সময় ব্যক্তিগত নামের (credit) উপর ধার দিতে হয়। কিন্তু এরূপ লগ্নির পরিমাণ যত কম হয়, ততই মঙ্গল, তাহাই বলাই বাহুল্য।

মনে রাখিতে হইবে যে, অনেক প্রকৃতপক্ষে দেউলিয়া ব্যাঙ্কও সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস (confidence) থাকার জন্য অনেক কাল টিকিয়া থাকিতে পারে। আবার অনেক অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যাঙ্কও হঠাৎ বিশ্বাস হারাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও দেউলিয়া হইয়া যায়।

নবযুগ—সমাজ-সমস্যা

শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত বি এ

আজ যুগ-চাঞ্চল্যের একটা দিকের আলোচনা করিব—তাহা সমাজসমস্যা। এইগুলির আলোচনা কালে পুনরুক্তি প্রায় অপরিহার্য্য। কারণ, একটীর সহিত অন্যটী ওতপ্রোত ভাবে জড়িত,—একটীর কথা বলিতে হইলেই অন্যটী আসিয়া পড়ে। পুনরুক্তি পরিহার করিতে যথাসম্ভব চেষ্টা করিব।

সমস্ত পৃথিবীতে আজ এই সমাজ-সমস্যা বর্ত্তমান। আমরা বিশেষ ভাবে আমাদের নিজেদের সমাজের কথারই আলোচনা করিব। অবশ্য আজ আর কেহ শুধু নিজের সমাজ লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে পারে না। ক্রমশঃ সমস্ত জগৎই যেন এক কেন্দ্রাভিমুখে চলিয়াছে। এক দেশের বা সমাজের কথার আলোচনা করিতে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অন্য দেশের কথাও বলিতে হয়। আজ কোন এক বিশেষ সমাজকে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখিবার দিন আর নাই। তবুও যখন আমরা নিজেদের দেশের—নিজেদের সমাজের কথার আলোচনা করিব, তখন আমাদের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রত্যেক মানুষের ন্যায় প্রত্যেক জাতিরই এক একটা নিজস্ব বিশিষ্টতা আছে। যে কোন সামাজিক সমস্যার সমাধান করিতে হইলেই, এই বিশিষ্টতার দিকে আমাদের সর্ব্বাগ্রে মনোযোগ দিতে হইবে। তাহা কি নারী-সমস্যা, কি ব্রাহ্ম সমাজ, কি শিক্ষা-সমস্যা। এই বিশিষ্টতাকে বাঁচাইতে না পারিলে সেই ব্যক্তি বা সমাজের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এখানে এই সম্বন্ধে এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, আজকাল যে মহামানব বা বিশ্বমানবের কথা উঠিয়াছে, তাহাতে যেন এই স্বাতন্ত্র্যকে ছাঁটিয়া কাটিয়া ফেলিবার চেষ্টা দেখা যায়। উহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। আর যদি হয়, তবে মানব-সমাজের গতি প্রতিহত করিয়াই সম্ভব হইবে। মহামানব-সমাজের বা বিশ্বমানব-সমাজের প্রতিষ্ঠা হইবে তখন—যখন ব্যষ্টিগত ভাবে স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র সমাজ নিজেদের বিশিষ্টতার ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, উন্নতির পথে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইবে।

সমাজ-বিজ্ঞানের মোটা কথা

সমাজ-বিজ্ঞানের খুব জটিল তর্ক-বিতর্কের মধ্যে না গিয়া, যদি আমরা ধরিয়া লই যে, মানব আদিম অবস্থায় পরস্পর পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল—অথবা মানুষ কোন না কোনও প্রকারের সমাজ গঠন করিয়া বাস করিত, তাহাতে আমাদের বর্ত্তমান আলোচনার পক্ষে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না। মানুষ আদিতে সমাজবদ্ধ অবস্থায় না থাকিলে, সে অবস্থায় যে বেশী দিন ছিল না—তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। মানুষ প্রথমে যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, সমাজ-গঠনের প্রথম সূত্র হইতেছে সমাজের জন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতার খর্ব্বসাধন, আর তৎপরিবর্ত্তে সমাজের সংহতি-শক্তির আশ্রয়ে ব্যক্তির নিরাপদে বাস। তার পরের কথা এই যে, সমাজ তাহার আশ্রিত ব্যক্তিগণের (members, individuals) মঙ্গলের জন্য প্রয়োজনানুরূপ বিধি-নিয়ম প্রণয়ন করিবে ও ব্যক্তি সমাজের মঙ্গলের জন্য তাহা মানিয়া চলিবে। এই সূত্রে সমাজ ও ব্যক্তির পরস্পর পরস্পরের নির্ভরতার উপর প্রতিষ্ঠিত। উহাতে সমাজ বা ব্যক্তির—কাহারও স্বেচ্ছাচারী হইবার কথা নাই। সমাজ ব্যক্তির সমষ্টি; সুতরাং একের মঙ্গলে অন্যের মঙ্গল—একের পতনে অন্যের পতন। সমাজ-পত্তনের পর হইতেই দেশ কাল ও অবস্থানুযায়ী সমাজ নিয়মের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল—বিভিন্ন আবহাওয়ার মধ্যে পড়িয়া সমাজ বিভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। ক্রমে হাজার হাজার বৎসরের ক্রমানুবর্ত্তিতায় প্রত্যেক সমাজদেহের উপর এমন এক একটী ছাপ পড়িল—যাহা দ্বারা একটীকে অন্যটী হইতে সহজেই পৃথক করা যায়। সেই বৈশিষ্ট্য সমাজের এমন মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে যে, সেই বৈশিষ্ট্যকে নষ্ট করিতে চাহিলে, সমস্ত সমাজ নষ্ট হইয়া যাইবে। তাই যখন কোন সমাজের উত্থান পতনের আলোচনা করিতে যাই, অথবা কোন দোষের সংশোধনের চেষ্টা করি, তখন ঐ বৈশিষ্ট্যের দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার। অবশ্য এমন অবস্থা উপস্থিত হইতে পারে যে, বিকৃত বৈশিষ্ট্যের দোহাই দিয়া সমাজ-অঙ্গে নানাবিধ কুৎসিত ব্যাধি প্রবেশ করে। তখন ঐ বিকৃত বৈশিষ্ট্যকেই আঘাত করিতে হইবে। আর সমাজে যখন কোন বিশেষ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তখন তাহার মূলে প্রায়ই ঐ ব্যাধি বর্ত্তমান থাকে।

অনেকে বলেন, আমি মানুষ,—মানুষ হিসাবে আমার দাবী সর্ব্বাগ্রে। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সমাজ-সম্পর্কহীন মানুষের দাবী কাহার নিকট। দাবী ও কর্ত্তব্য (Right and duty) পরস্পর আপেক্ষিক শব্দ,—একটী থাকিলে অন্যটি থাকিবেই। সুতরাং দাবী করিতে গেলেই তাহার মূল্য দিতে হইবে। সে মূল্য সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য—সমাজের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কিয়দংশ বিসর্জ্জন। সুতরাং কি পুরুষ, কি নারী কেহ যদি এ কথা বলেন যে, আমার ব্যক্তিগত পূর্ণ স্বাধীনতার উপর হাত দিবার কাহারও অধিকার নাই, তবে তাহা ছেলেমেয়ের চাঁদ ধরিয়া দেওয়ার আবদারের মতই শুনাইবে।

পতৃহীনা মিরান্দা', বা কাপালিক পরিত্যক্তা কপালকুণ্ডলা এ কথা বলিতে পারেন, যদিও তাহা অর্থহীন। সমাজের জন্য (অর্থাৎ পরোক্ষভাবে নিজের স্বার্থের জন্য) আমাদিগকে কিছু কিছু স্বাধীনতা ও স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া সমাজের একেবারে দাস হওয়া নয়; কারণ আমিও নিজে সমাজের, অঙ্গ। সমাজ-যদি আমার মনুষ্যত্বের উপর অস্ত্র চালান, তবে নিশ্চয়ই আমি তার বিরুদ্ধে দাঁড়াইব। যেমন ব্যক্তির, তেমনি সমাজের শক্তিও সীমাবদ্ধ। তাই সমাজ যখন ব্যক্তিকে গ্রাস করিতে চায়, মঙ্গলের ভান করিয়া অত্যাচারী হইয়া উঠে, তখনই সমাজে চাঞ্চল্য দেখা দেয়—নিজের বিপথগামী শক্তির আঘাতে সমাজ নিজেই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়।

বর্ত্তমান সমস্যা

আজ স্বাধীনতার জন্য, মুক্তির জন্য মানবের মনে যে আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, তাহা সমাজবিশেষ বা দেশবিশেষে আবদ্ধ নয়। সামাজিক স্বাধীনতার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা, তাহা এই বিশ্বজাগরণের একটা অংশ মাত্র। মানুষ আজ নীরবে উৎপীড়িত লাঞ্ছিত হইতে রাজী নয়। সর্ব্বপ্রকারের অন্যায়ের শৃঙ্খলকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে মানুষ আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সমাজ ত মানুষেই তৈয়ার করিয়াছিল; তবে আজ তাহার বন্ধন হইতে সে মুক্ত হইতে চাহিতেছে কেন? তাহার উত্তর এই যে মানুষ শিব গড়িতে গিয়া বানর গড়িয়া ফেলিয়াছে। অথবা হয় ত সে শিবেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, ক্রমে আজ তাহা অশিবের আগারে পরিণত হইয়াছে। যে মন্দিরের মঙ্গল-শঙ্খ-নিনাদে শান্তি সুখ বর্ষিত হইত, আজ সেই মন্দিরে পিশাচের তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে। যুগ যুগান্তের অশান্তি বুকে বহিয়া আজ তাহার চোখ ফুটিয়াছে। তাই আজ অশিবের ধ্বংসের ও সঙ্গে সঙ্গে শিব-প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষ ব্যাকুল। মানুষ মঙ্গলের জন্য সমাজের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, ভাবিয়াছিল তাহার ন্যায্য অধিকার কেহ খর্ব্ব করিবে না। কিন্তু আজ জাগিয়া দেখে যে, সমাজ তাহার বুকে পিঠে এমন করিয়া নাগপাশ আঁটিয়া দিয়াছে যে, তাহার আর নড়িবার শক্তি নাই। সমাজের হস্তে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় আত্মসমর্পণ করিয়া সে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তাহার বিশ্বাসের মর্য্যাদা রক্ষা করা হয় নাই—সমাজ নামক অশরীরী বস্তুটীর পিছনে দাঁড়িয়ে একদল লোক তাহাদিগকে ধ্বংসের পথে চালাইতেছে। যে সমাজ সে একদিন তৈয়ার করিয়াছিল তাহার মঙ্গলের জন্য, সেই সমাজ তাহার নিজের ঔদাসীন্যে—আজ তাহারই নির্ম্মম শাসন ও শোষণ-কারী মাত্র। সমাজ চালাইবার অজুহাতে একদল লোক তাহাকে ক্রীড়ার পুতুল, স্বার্থসাধনের যন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে। সমাজ-গঠনের সময় মানুষ সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দেয় নাই; দিতে হইলে বোধ হয় সে সমাজ গঠনই করিত না। কিন্তু আজ সে হৃতসর্ব্বস্ব। কিন্তু অত্যাচার অনাচার চিরকাল থাকিতে পারে না। ভগবানের নিয়মই এই যে, যাহা ন্যায় ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তাহা চিরকাল টিঁকিয়া থাকিতে পারে না। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ—এই বর্ত্তমান মুক্তি-আকাঙ্ক্ষা। সমাজকে হয় পরিবর্ত্তিত হইতে হইবে, নয় একেবারে ধ্বংসের পথে যাইতে হইবে।

নর ও নারী

এখন সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার কথার আলোচনা করা যাউক। সমাজবিজ্ঞানের একটা প্রধান কথা বর্ণবিভাগ। ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় সমাজের বর্ণবিভাগ অনেকটা স্বতন্ত্র প্রকৃতির। আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় ভারতীয় সমাজ; আনুষঙ্গিক ভাবে ইয়োরোপীয় সমাজের আলোচনা হইবে মাত্র।

মানব-সমাজ মাত্রেরই সবচেয়ে বড় বিভাগ হইতেছে নর ও নারী। আর কাজে-কাজেই বড় সমস্যার কথা উঠে ঐখানে। গতবারে 'নারী সমস্যায়' মোটামুটি একটা কথা বলিতে চাহিয়াছিলাম যে, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই নর ও নারীর কর্ম্মক্ষেত্র স্বতন্ত্র এবং এই স্বাতন্ত্র্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নারী-সমস্যার আলোচনা করিতে হইবে। এখন আমরা এই প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসরণ করিয়া সামাজিক নারী-সমস্যার আলোচনা করিব। এ বিষয়ে কোন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইতে পারে না,—কালের ও অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সমাজেরও পরিবর্ত্তন হইবে। সুতরাং তার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের প্রত্যেক অঙ্গেরও পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য।

সমাজের অর্দ্ধেক স্থান জুড়িয়া আছেন নারী। পরিবারে যেমন, সমাজেও তেমনি তাঁহার স্থান আছে। সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য সমাজে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকা দরকার। কারণ নারীর সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা নারী যেমন বলিতে পারিবেন, পুরুষ তেমন পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য এ ক্ষেত্রে আমরা নর ও নারীকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখিতেছি—কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এরূপ বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখিবার প্রয়োজন থাকে না। কারণ নারী—মাতা, স্ত্রী, ভগিনী প্রভৃতি রূপে আপনার অস্তিত্ব পুরুষ সমাজের অস্তিত্বে মিশাইয়াছেন। অন্ততঃ ভারতে তাহাই হইয়াছে এবং উহা ভারত নারীর একটী বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। কিন্তু আমরা পরে দেখিব যে, নারীকে পুরুষ হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখিবার প্রয়োজন আছে।

যেমন পরিবারে, তেমনি সমাজে নারীর স্থান থাকা উচিত। কিন্তু সমাজে নারীর স্থান কোথায়? সমাজ-সমস্যায় আজ ইহাই সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন। মানবের সভ্যাবস্থার পর হইতেই (হয় ত বা আদিম অবস্থায়ও) সমাজে নারীর স্থান পুরুষের একটু পশ্চাতে অবস্থিত—ইহাই আমরা দেখিতে পাই। পৃথিবীর সব সভ্যসমাজের ইতিহাসই এই সাক্ষ্য দেয়। এখানে পশ্চাতে বলার অর্থ এই নহে যে, নারী সমাজে পুরুষের চেয়ে সম্মানে হীন। সমাজ চালাইবার কাজে নারী পুরুষের একটু পশ্চাতে—ইহাই আমাদের বক্তব্য। আর মনে হয়, প্রাকৃতিক নিয়মের এবং ঘর ও বাহিরের স্বাভাবিক কর্ত্তব্য বিভাগের জন্যই এই পার্থক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু নারীর সম্মানের বিষয় আলোচনা করিলে, এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সমাজ যে পরিমাণে

উন্নত হইয়াছে, নারীকে সেই পরিমাণ বেশী সম্মান দিয়াছে। এই পার্থক্যের কারণ অনুসন্ধান করিলে নারীর মাতৃত্ব উহার মূলে আছে বলিয়া মনে হয়, অন্ততঃ ভারতের পক্ষে এ কথা সত্য। এবং উহা ভারত সমাজের একটী বিশেষত্ব। নারীর এই সম্মান সমাজের উত্থান-পতন-উন্নতি অবনতির সহিত বৃদ্ধি ও হ্রাস পাইয়াছে।

পাশ্চাত্য সমাজে নারী

এখানে পাশ্চাত্য সমাজে নারীর স্থান ও সম্মান সম্বন্ধে দুএকটী কথা বলিয়া আমাদের নিজেদের সমাজের কথা বলিব। পাশ্চাত্য সমাজের কথা বলিতে গেলেই, প্রথমে ইহাই বলিতে হয় যে, উহা নারী ও পুরুষের সমাজ, শুধু পুরুষের সমাজ নয়। সেখানে পুরুষের মত না হউক, অন্ততঃ কতক পরিমাণে নারীরও সমাজ চালাইবার অধিকার ও শক্তি আছে। তাই সেখানে পুরুষ নারীকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাবাইয়া রাখিতে পারে না। যেখানে পুরুষ এবং নারীর অধিকার ও স্বার্থে সংঘর্ষ বাধে, সেখানে নারীকে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখিবার দরকার হয়, কারণ পুরুষ সেখানে নারীর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ান। সেরূপ ক্ষেত্রে নারীরও সামাজিক ক্ষমতা থাকা দরকার। তাহা না হইলে তাহাকে "কোণ ঠাসা" হইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু নরনারীর পরস্পর অবিচ্ছিন্ন ভাব সেইখানেই সমাজের আদর্শ হইবে, যেখানে পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ স্বার্থ-সংঘর্ষ নাই। পুরুষ যদি নিরপেক্ষ ভাবে নারীর স্বার্থ সমাজে রক্ষা করিতে পারেন, তবেই তাহা আদর্শ হইবে। কারণ তাহা হইলে নারীকে আর কঠোর সংগ্রামের মধ্যে আসিয়া তাহার কোমলতাকে নষ্ট করিতে হয় না।

তার পর পাশ্চাত্য দেশে নারীর সম্মানের কথা। নারীর যথেষ্ট সম্মান আছে স্বীকার করি; কিন্তু আমাদের আদর্শের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। যাক্, সে কথা পরে হইবে। আজকাল নারী-সমাজের গতি দেখিয়া মনে হয় যে, তাঁহারা শুধু-নারী বলিয়াই (womanhood) পূজা পাইতে চান, সমাজের বা পরিবারের নির্দ্দিষ্ট কোন সম্বন্ধের ভিতর দিয়া নয়। তাঁহারা ঠিক মাতা, ভগিনী, পত্নী ইত্যাদি কিছুই নন—স্বাধীনা বন্ধনহীনা শুধু মানবসমাজের অংশমাত্র,—তাঁহারা শুধু নারী। আবার কোন দল নর ও নারীর মধ্যে যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে—তাহাকেই অবিকৃত ভাবে—অর্থাৎ সমাজ বা পরিবারের কোন নির্দ্দিষ্ট বন্ধনের মধ্যে না আনিয়া—সেই নৈসর্গিক সম্বন্ধকে মাত্র স্বীকার করিতে চান। আর এই মতবাদ নানা ভাবে নানা দিক দিয়া প্রচারও করা হইতেছে। উহাতে সমাজের যে খুব মঙ্গল হইবে, এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। উহার প্রধান একটা ফল হইতেছে, বিবাহবন্ধন অস্বীকার ও তাহার আনুষঙ্গিক উপসর্গগুলি। তন্মধ্যে প্রধান একটা unmarried mother's problem (অবিবাহিতা-মাতৃ সমস্যা)। উহা উৎকট স্বাতন্ত্র্য ও ততোধিক উৎকট শিক্ষার ফল। এরূপ নারী সমাজে কতটুকু পূজা পান জানি না। তবে উহা উন্নতির পরিচায়ক কি পশ্চাদনুবর্ত্তন, (Retardation) তাহ বিবেচনা করিবার সময় আসিয়াছে। এই স্বাতন্ত্র্যের আর এক ফল সাফ্রেজেট আন্দোলন। পুরুষের সঙ্কীর্ণতা যে এই উৎকট অবস্থার জন্য কিয়ৎ পরিমাণে দায়ী নয়, তাহা বলা যায় না। কিন্তু সাফারজেটরা যে ভাবে কাজ করেন, তাহা খোদার উপর খোদাকারী বলিয়াই মনে হয়। প্রকৃতি তাহা কতটুকু সহ্য করিবেন, তাহা বিবেচনার বিষয়। জীবনের সুখশান্তির পক্ষে যে তাহা খুব আরামদায়ক, তাহাও ত মনে হয় না। ভারতীয় মহিলারা একটু সবুর করিয়া দেখুন না! সমাজের প্রত্যেকেই সজাগ থাকিবে সত্য, নিজেদের ন্যায্য পাওনা আদায় করিবে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া যে মাতলামি আরম্ভ করিয়া দিবে, এমন কোন কথা নাই। বাস্তব জগতের দিকে লক্ষ্য না করিয়া, শুধু শুষ্ক ন্যায়শাস্ত্রের দড়ি কামড়াইয়া থাকিলে জীবনটা চলে না। জাগরণের মধ্যে, দোষ ত্রুটিকে সংশোধনের মধ্যে, জীবনের প্রতি- বাস্তবের প্রতি—সতর্ক দৃষ্টি রাখা চাই। এত কথা বলিবার দরকার এই যে, পশ্চিম থেকে পুবমুখী হাওয়া বহিতেছে যে! আর চোখ বুজিয়া সেই হাওয়ায় পাল খাটাইয়া দেওয়া আমাদের অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমাদের সমাজে নারী

এখন আমাদের সমাজের অবস্থা দেখা যাউক। ভারতীয় সমাজকে সোজা কথায় পুরুষের সমাজ বলিলে বিশেষ কিছু আপত্তির কারণ নাই। আমাদের বাংলা দেশের ত কথাই নাই,—অন্যান্য যে যে দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতা কিয়ৎ পরিমাণে আছে, সে সব স্থানেও পুরুষেরাই সমাজের শাসনকর্ত্তা। নারীর তাহাতে বিশেষ কোন অংশ আছে বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য সাধারণতঃ সকল দেশেই পুরুষেরা সামাজিক বিধিনিয়ম প্রণয়ন করেন; কিন্তু অন্য দেশে নারীর শক্তি আছে বলিয়া তাঁহারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারেন,- পুরুষের একচ্ছত্র শাসন সেখানে চলে না। কিন্তু আমাদের দেশে পুরুষের পক্ষে এসব কোন আপদ বালাই নাই। আদিকাল হইতে তাঁহারা কতক বা স্বার্থের আর কতক বা প্রেমের খাতিরে যে আইন-কানুন নারীদের জন্য প্রণয়ন করিয়াছেন, নারী তাহা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন। তাই বলিয়া পুরুষ যে সবক্ষেত্রে নারীর আত্ম-বিসর্জ্জনের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, এ কথা বলিতে সাহস হয় না। অনেকে বলিবেন, সে কি কথা! ইহা কি সম্ভব হইতে পারে যে পুরুষ তাহার প্রেমময়ী নারীর স্বার্থে আঘাত করিবে? কিন্তু আমরা বলি সবই সম্ভব—ক্ষমতা-মদিরা বড় শক্ত জিনিস। উহার জন্য মানুষ সব করিতে পারে। আমেজানরা (Amazon) শক্তির জন্য নিজের অঙ্গচ্ছেদ করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। কিন্তু একটা বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ভারতে নর ও নারীর এই পার্থক্য সৃষ্টি হইল কিরূপে এবং কবে? পৃথিবীর অন্যান্য সবদেশ এক দিকে, আর ভারতীয় সমাজ এক দিকে। একটা যেন অদ্ভুত প্রতিবাদস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। ভারতনারী হয় ত তাঁহার স্বাভাবিক কোমলতা বশতঃ কঠোর ক্ষমতা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, অথবা হয় ত কোনও যুগে, কোনও

বিশেষ কারণ বশতঃ নারীর অধিকার খর্ব্ব করা হইয়াছিল; আর সেই অভিসম্পাতের ফল তাঁহার সন্ততিগণ হাজার-হাজার বৎসর ধরিয়া ভোগ করিতেছে।

নারীদের অধিকার খর্ব্ব করা হইলেও তাঁহাদিগকে প্রথমেই একেবারে যে অন্ধ ও পঙ্গু করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা নয়—ভারতের ইতিহাস তাহার সাক্ষী। কিন্তু সমাজ যেমন ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণতার মধ্যে ডুবিতে লাগিল, নারীর অধিকারও তেমনি অধিকতর খর্ব্ব হইতে লাগিল। এই অধঃপতনের জন্য নারীদেরও যে কিছু দায়িত্ব নাই, তাহা নয়। তাঁহাদের নিজের আলস্য ঔদাসীন্যও উহার কারণ বলিয়া মনে হয়। সে যাহা হউক, আজ আমাদের সমাজের যে অবস্থা, তাহাতে নারী-শক্তির অস্তিত্ব আছে কি না সন্দেহ। আর সেই সুযোগে পুরুষ নারীদের উপর যে অত্যাচার করিয়াছেন বা করিতেছেন তাহার ফলে সমাজ আজ অর্দ্ধমৃত—তাহার অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত। এ সম্বন্ধে আজকাল কিছু আলোচনা হইতেছে; সুতরাং বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নাই। তবে দু একটী কথা না বলিয়াও পারিতেছি না—যদিও তাহা ঠিক সামাজিক প্রশ্ন নয়। ঋষি ঠাকুর যে দিন বলিলেন, স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে নাই, সেই দিনই যে স্ত্রীলোকের শুধু কপাল পুড়িল তাহা নয়—তাঁহার জন্য নিত্য ভীম একাদশীরও বন্দোবস্ত হইল। স্ত্রীলোকের অস্বাতন্ত্র্যে সমাজের কতটুকু উপকার হইল, জানি না; কিন্তু অর্দ্ধেক সমাজ—নারীগণ অসহায় হইয়া পড়িলেন। হয় ত তখন সমাজে উদারতা ছিল; কিন্তু আজ পতিপুত্রহীনা নারীর স্থান কোথায়? তিন কালের জন্য তিনজন রক্ষক নির্দ্দেশ করিয়াই ঋষিঠাকুর নিশ্চিন্ত হইলেন,—কিন্তু যম মহারাজ ত আর ঋষি ঠাকুরের হুকুমের চাকর নহেন যে, স্ত্রীলোকের একজন রক্ষক তিনি রাখিবেনই। সুতরাং পুত্রহীনা বিধবার জন্য যে সহমরণই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ব্যবস্থা, তাহা যাঁহারা বর্ত্তমান সমাজের খবর রাখেন তাঁহারাই বলিবেন। দেশের ও সমাজের মঙ্গলকামী নেতৃবৃন্দ যদি নারীদের রাজনৈনিক অধিকার বিধিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের উদরনৈতিক (উদারনৈতিক নয়) অধিকার বিধিবদ্ধ করেন, তবেই সুবুদ্ধির কাজ হইবে বলিয়া মনে হয়।

ভারত-নারীর সম্মান

এখন ভারতের নারীদের সম্মানের কথা। এখানে আমাদের গৌরব করিবার যথেষ্ট আছে—অন্ততঃ ছিল; আর এখনও যে এ একেবারে নাই তাহা বলিতে পারি না। নারীর সম্মান বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা পাশ্চাত্যের তথা-কথিত নারীপূজা হইতে কিছু বিভিন্ন প্রকৃতির জিনিস। ভারতের আদর্শ মহত্ত্ব—এটা মিথ্যা কথা নয়। যাঁহারা চোখ খুলিয়া চলেন, তাঁহারাই দেখিতে পাইবেন যে, ঐ অধঃ-পতনের মধ্যেও ওই মাতৃত্বটুকু নারী-সমাজকে জীবিত রাখিয়াছে। এখানে আঘাত করিলে এখনও প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যায়। এই মাতৃত্বের চরম আদর্শ ঈশ্বরের মাতৃরূপ কল্পনায়—ভারত ইহার অপেক্ষা মহত্তর নারীর মাহাত্ম্য আর কিছু কল্পনা করিতে পারে নাই। সত্যিকার নারীপূজা এইখানে—"যত্র নারী তত্র গৌরী"—এ কথা কথা-কথিত Lady worship নয় প্রাণহীন formality নয়। এই মাতৃত্ব ও নারীত্ব অভিন্ন। এই খানেই ভারত সমাজের বিশেষত্ব ও মহত্ত্ব। ভারত এখানে জাতিধর্ম্মবর্ণ-নির্ব্বিশেষে নারীকে মাতৃত্বের সম্মান দেয়—নিজ সঙ্গিনীর হাত ধরিয়া ভিন্নজাতীয়া নারীর অঙ্গে পদাঘাত করে না। কেহ কেহ অবশ্য দুএকটা উদাহরণ সহ এ কথার প্রতিবাদ করিতে পারেন; কিন্তু ওরূপ উদাহরণ সর্ব্বত্র সর্ব্বসময় থাকিবে। কিন্তু আজ মাতৃত্ব যে ফাঁসীকাঠের আসামী, পশ্চিমের হাওয়া এসে ভারতের এই মহত্ত্বকে সাগরতলে ডুবাইতে প্রয়াসী। তাই আজ তথাকথিত শিক্ষিতা মহিলা (বিশেষতঃ পাশ্চাত্যদেশে) মাতৃত্বের বদলে Ladyshipএর পক্ষপাতী।

নারীর সম্মানের কথায় আর একটী বিষয় আমাদিগকে অনুধাবন করিয়া দেখিতে হইবে। আমরা প্রথমেই শিখি, অবশ্য স্কুল কলেজের কোন কেতাবে নয়—কিন্তু যে প্রকারেই হউক আমরা শিখিয়া ফেলি যে,—ভারতবাসী নারীর সম্মান জানে না। নারীর সম্মান আনিতে হইবে সাগর পার হইতে। সুতরাং নারীর আদর্শও অবশ্য আসিবে সেথান হইতে। তাই আজকাল যে সব উদ্ভট রকমের নারী সম্মান (প্রণয়ীর পক্ষে জুতাত্রাস করা পর্য্যন্ত হয়েছে কি না জানি না—) আমাদের দেশে আমদানী হইতেছে, তাহা দেখিলে হাসিও আসে, দুঃখও হয়। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় হইয়া থাকেই—সুতরাং আমদানী-করা এই আদর্শ ও সম্মানের চোটে দেশটা যে একটু অস্বস্তি বোধ করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। এখানে বাঙ্গালার তথা ভারতের শিক্ষিতা মহিলাদিগকে একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। অবশ্য এ কথায় কাজ কতটুকু হইবে জানি না। তাঁহাদিগকে এ কথাটা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, নিজের ভাণ্ডারে কি আছে আগে তাহা দেখিয়া, তার পর পরের দ্বারে ভিক্ষায় বাহির হইলে ভাল হয়। সত্য সত্যই এই আমদানী-করা Lady's honour কি খুব তৃপ্তিদায়ক—প্রাণস্পর্শী? "মা ঠাকরুণ" এর চাইতে "মেমসাহেব" কি বেশী মিষ্টি? তার পর মহিলারা কি ভাবিয়া দেখিয়াছেন যে ঐ Lady's honour এর ভিতর কি আছে? সাধারণ মানবের সম্মানের দাবী না করিয়া ঐ Lady নামে দাবী কেন? এই সম্মান দেখানোর জন্য যে প্রাণহীন দেঁতোর হাসির অভিনয় ও উদ্বেগ-চাঞ্চল্য দেখান হয় তাহা কতটুকু প্রাণের স্পন্দন হইতে উদ্ভূত, তাহা যে শিক্ষিতা মহিলারা বুঝিতে পারেন না, তাহা মনে করিব কিরূপে? আর কারণে অকারণে (অকারণেই বেশী) শিক্ষিতারা (সকলে নিশ্চয়ই নন) যে অপমানের অভিনয় করেন—(অর্থাৎ "কি, আমায় অপমান করলে!" ইত্যাদি) তাহাতে পুরুষবেচারাদিগকে বড়ই সন্ত্রস্ত থাকিতে হয়। কথাটা সত্য মনে করি বলিয়াই লিখিলাম। এটা দোষ না গুণ, তাহা শিক্ষিতারা নিজেই বিবেচনা করিবেন।

নানা রকম খুটিনাটী বিষয় আলোচনা করিতে গেলে পুথি বাড়ে। হাজার রকমের এরূপ বিষয় আছে—অথচ আমরা নির্ব্বিবাদে দিব্যি আরামে তাহা স্বাভাবিকের মতই মেনে চলে চাই। কোন্ মান্ধাতার যুগে কে কোন্ বিধি তৈয়ার করিয়াছিলেন তাহার টিকা টিপ্পনি ভাষ্য নিয়াই সমাজে মারামারি। হাজার বছরের পুরাতন বিধিনিষেধের চেয়ে যে বর্ত্তমানের একটু অভিজ্ঞতাও ভাল এ কথা আমরা ভুলে যাইতেছি। পরিবর্ত্তনময় জগতের সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে চল্‌তে না পারলে যে আমাদের মৃত্যুকেই বরণ করা হবে, এই সহজ সত্যটী আমরা ভুলে গেছি। সমাজ আজ জীবিত নয় মৃত, তার প্রেতাত্মা আমাদের কাঁধের উপর চড়িয়া আছে—ঐ ভুতের ভয়েই আমরা অস্থির। আজ নূতন প্রাণে নূতন আশা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে পূর্ণতার জন্য—মুক্তির জন্য। মানব মুক্ত হবে পূর্ণ হয়ে—অন্ধ পঙ্গু হয়ে নয়। তার সেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ভূতের সাধ্য নাই যে বাধা দেয়। ঐ মৃতের ভস্মরাশির মধ্য হইতে নূতন তরুণ সমাজ গড়িয়া উঠিবে—যাহার মধ্যে মানব তাহার অন্তরের আদর্শকে মূর্ত্তরূপে দেখিতে পাইবে।

আমরা জানি যে নারী-সমাজের বর্ত্তমান এই অবস্থার নারী ও পুরুষ স্তুতিবাদকের অভাব নাই। আর তাহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। কারণ যুগ-যুগব্যাপী অত্যাচারের ফলে অত্যাচারী ও অত্যাচারিত উভয়েই অবস্থাটাকে সহজ ভাবে গ্রহণ করিয়া লয়, বরং তদ্বিপরীত কিছুকেই অস্বাভাবিক ও অন্যায় বলিয়া মনে করে। পুরুষ যেমন সন্তুষ্ট নারীও তেমনি সন্তুষ্ট। কিন্তু জগতে সন্তোষ বলিয়া জিনিষটাই খুব মূল্যবান নয়। তাহার চেয়েও বড় জিনিষ সত্যিকার মনুষ্যত্ব। সেই মনুষ্যত্বকে জাগাইবার জন্য মুক্তির মন্ত্র যাঁহারা প্রচার করেন তাঁহারা আমাদের নমস্য। নিদ্রিতেরা তাঁহাদিগকে বিদ্রোহী বলিতে পারে শত্রু ভাবিতে পারে, ধ্বংসের অগ্রদূত মনে করিতে পারে, কিন্তু যুগে যুগে তাঁহারাই আসিয়া মানুষকে অমৃতের সন্ধান দেন।

এখানে আর একটী কথা বলা দরকার। প্রপীড়িতদের কোন প্রকার সাহায্য না পাইলে (Co-operation) অত্যাচারী অত্যাচার করিতে পারে না। নারী যে তাহার নিজের পতনের জন্য অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে দায়ী তাহা অস্বীকারের উপায় নাই। পুরুষ যেখানে বলিয়াছে নারীকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবে—সেখানে তিনি নিশ্চিন্ত মনে পা এলাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, হয়ত আলস্য ও ঔদাসীন্য বশতঃ কতক অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছেন। জেগে ওঠা নারীদের এ কথা মনে রাখা দরকার যে তাঁহাদের পতনের জন্য পুরুষ যেমন দায়ী নারীও তদ্রূপ দায়ী। আর গালাগালি দিয়া কাজ হইবে না, কখনও হয় নাই, কখনও হইবে না। জেগে ওঠা নারীরা যদি সত্যসত্যই সমাজের কল্যাণ কামনা করেন তবে স্থিরভাবে কাজ করুন। Constructive theory দেওয়া এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। কি করিলে নারীর সম্যক জাগরণ হয়—কি করিলে প্রকৃতপক্ষে সমাজের মঙ্গল হয়, তাহা মনস্বিনী নারীরা নিজে চিন্তা করুন এবং সেই অনুসারে কাজ করুন। তাঁহাদের নিকট একটা নিবেদন আছে তাহা এই যে তাঁহারা যেন সর্ব্বদা মনে রাখেন যে এই দেশটা ভারতবর্ষ এবং তাহার একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ঠ্য আছে। আমাদের এই চোখ বুঝে অনুকরণ-প্রবৃত্তি ছাড়িতে হইবে এবং তাঁহাদের (শিক্ষিতাদের) বর্ত্তমান যে দোষশূন্য আদর্শ অবস্থা নয় তাহা মনে রাখিতে হইবে।

এখানে আমাদের সমাজ বলিতে আমি ভারতীয় সকল সমাজকেই লক্ষ্য করিয়াছি। কোন না কোন দিক দিয়া গলদ আছেই। সব সমাজ সম্বন্ধে বলিবার অধিকার হয়ত আমার নাই। কিন্তু এ কথা সত্য যে ভারতের মঙ্গল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মঙ্গলের উপর নির্ভর করিতেছে। নারীদের অবস্থা হয়ত ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান সমাজে অপেক্ষাকৃত ভাল—কিন্তু তাহাকে আদর্শ অবস্থা বলা যায় কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। পুরাতন বাঁধা বুলিকে—জীর্ণতাকে বিসর্জ্জন দিয়া নবযুগের ন মহান আদর্শের অনুপ্রেরণায় চালিত হইয়া কাজ করিতে হইবে—লক্ষ্য স্বেচ্ছাচার নয়—মানবের পূর্ণ মুক্তি।

নমস্কার

শ্রীঅজিতনাথ লাহিড়ী

গানের তরী বেয়ে তুমি
এলে সাগর-পারে ;
নাম্‌লে হেথা আজ্‌কে আমার
বিজন বনের ধারে॥
আজ্, ছায়ায় ঘেরা পাতার ফাঁকে,
বিরামবিহীন বিহগ্ ডাকে,
অঙ্গে আজি পুলক্ মেখে,
তোমার অভিসারে।
যদি নাম্‌লে হেথা আজকে আমার
বিজন বনের ধারে॥

সবুজ্ ছাওয়া তরুর শাখে,
ফুল ফুটেছে থরে থরে,
শুকনো পাতা যাচ্ছে ঝরে,
ভিড় জমেছে মাটীর পরে।
আজ্, পেয়ে তোমার সুরের আলো,
হৃদয় আমার পথ হারালো,
অই চরণে লুটায়ে রল,
একটা নমস্কারে।
যদি নাম্‌লে হেথা আজ্‌কে আমার
বিজন বনের ধারে॥

বউ দেখা

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

যামিনী বড়লোকের বাড়ী নিমন্ত্রণ যাইতে বিশেষ অনিচ্ছুক। এমন অনেক কারণ ঘটিয়া গিয়াছে যাহাতে দৈবাৎ কোন বড়লোকের বাড়ী যাইবার নিমন্ত্রণ আসিলে সে শুধু সন্ত্রস্ত হয় না, বিরক্ত হইয়া উঠে। সে কারণগুলি সে প্রকাশ করিতে চায় না, এই মাত্র বলে যে "ও সব আমার পোষায় না।" যখন স্কুল কলেজে পড়িত, তখন দুই চারিটি বড় লোকের ছেলের সহিত তাহার সখ্যতা জন্মিয়াছিল, তাহারা পরে যদি কখন কোন উপলক্ষে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে, যামিনী বরাবর চিঠি লিখিয়া শারীরিক না হয় পরিবারিক অসুস্থতা লিখিয়া অব্যাহতি লইয়াছে। বহুদিন এমনই ভাবে সে কাটাইয়া আসিতে পারিয়াছিল, সম্প্রতি বেচারাকে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িতে হইয়াছে।

তাহাদের আফিসের 'বড় সাহেব' রায় মোহিনীমোহন দত্ত বাহাদুরের জ্যৈষ্ঠপুত্রের বিবাহ উপলক্ষ্যে আফিসের সাহেব, বাবু, বেয়ারা, দরওয়ান সকলের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। বড় সাহেব সকলকে একখানি করিয়া পত্র ত দিয়াছেনই; উপরন্তু আফিসের প্রত্যেক বিভাগের ঘরে ঘরে গিয়া সকলকে নিজের মুখে বলিয়া আসিয়াছেন, যাওয়া চাই-ই। একে ত বড় সাহেব কোনদিন কোন বিভাগের কোন ঘরেই পদার্পণ করেন না, কখন কোন বাবুকে কাজ-কর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কোন কথাই বলেন না, তারপর কেহ কখন আবেদন নিবেদন লইয়াও যাঁহার দর্শন পায় না, তিনি স্বয়ং আসিয়া প্রত্যেককে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন, প্রীতিভোজনের দিন সকলকেই দেখিতে চাহেন বলিয়াছেন, একা যামিনীর নয়, অনেকেরই মাথায় বাজ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

পড়িবার কথা নয় কি? রায় বাহাদুর লোকটি কি যে সে? তাঁহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী এতবড় চাকরী পাইয়াছে? তাঁহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী গবর্ণমেণ্টের আফিসে দুই হাজার টাকা মাস-মাহিনার কল্পনা করিতে পারিত? সহস্র সহস্র কেরাণীর অন্ন-বস্ত্রের, দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইতে কি কোন বাঙ্গালীরই সৌভাগ্য হইয়াছিল? পাঠক স্মরণ রাখিবেন, রায় বাহাদুরের সৌভাগ্য-সূর্য্য যখন মধ্যাহ্নগগনে আরোহণ করিয়াছিল, লর্ড সিংহ হেন ব্যক্তিও তখন দোলনায় শুইয়া দোল খাইতেছিলেন। অর্থাৎ সে অনেক দিনের কথা। সেই রায় বাহাদুরের গৃহে নিমন্ত্রণে যাইতে হইবে—সেই ত সব চেয়ে বড় বিপদ; তার উপর সেখানে হয় ত স্বয়ং ছোট লাট হাজির থাকিবেন, বড় লাটও আসতে পারেন; কম্যাণ্ডার ইন্ চিফ্ হয়ত কামান-বন্দুক সাজাইয়া বিয়ে বাড়ীর শোভা বাড়াইবেন;—মহাবিপদ নয় কি!

শনিবার দেড়টায় আফিসের ছুটি হয়। চিফ্ ক্লার্ক গোবিন্দশঙ্কর বাবু বেয়ারা দ্বারা সব ঘরে বলিয়া পাঠাইলেন, দেড়টার পর সকলে যেন বড় হলে উপস্থিত হন, গোবিন্দশঙ্করবাবু উপদেশ দিবেন। সকলেরই উপস্থিত থাকা কর্ত্তব্য।

তিন চারি শত কেরাণী দেড়টা বাজিতেই বড় হলে হাজির হইলেন। টেঁস-ফিরিঙ্গি, ফিরিঙ্গি, সাদা-চামড়া, কালা-চামড়া সকলেই উপস্থিত, গোবিন্দশঙ্কর বাবু আসিলেই হয়। কয়েকজন বাবু এক-একটি মিনিট যাইতেছে আর কৈ মাছের মত ঝটাপট করিয়া উঠিতেছেন; যাঁহারা উইকলি-প্যাসেঞ্জার, শনিবারে তাঁহারা স্বীয় অথবা পত্নীর আলয়ে গমন করিয়া থাকেন। উৎকণ্ঠা তাঁহাদেরই বেশী, পথে আবার হাট-বাজারও কিছু কিছু করা আছে কি-না। পাঁচ মিনিট কাটিয়া গেল—গোবিন্দশঙ্কর বাবুর আর্দালী আসিয়া জনতাকে স্তব্ধ করিয়া দিল, পরমুহূর্ত্তেই সাহেব-বেশী গোবিন্দশঙ্কর প্রবেশ করিলেন। জনতার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া গোবিন্দ বাবু প্রথমে ইংরেজীতে পরে বাঙ্গালায় বলিলেন—আমাদের বড় সাহেবের বাড়ী সোমবার সকলের নিমন্ত্রণ, মনে আছে ত? বড় সাহেব আমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যাহাতে সকলেই যান, তাহা করিতে। তিনি আরও বলিয়াছেন, কেহ যেন যাইতে কোন কারণেই কুণ্ঠিত না হ'ন। আফিসের বাবুদের জন্য তিনি স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিয়া রাখিবেন; যে যেমন যাইবে, খাইয়া চলিয়া আসিবে।

গোবিন্দশঙ্কর বাবু একটু থামিলেন, তারপর বলিলেন, বিবাহের দিন আপনাদের নিমন্ত্রণ করেন নাই, কারণ বড়-লোকের বাড়ীতে একটু এদিক ওদিক হয়-ই, আপনাদের একটু আধটু অসুবিধা ঘটতে পারে সেইজন্যই তিনি আপনাদের একটি প্রাণীকেও বলেন নাই। কিন্তু প্রীতি-ভোজের দিন যাতে সকলেই যান তার জন্যে বারবার বলে গেছেন। আমাকে আজ আবার দুপুর বেলা টেলিফোঁও করেছেন। কি বলেন সব? যাচ্ছেন ত?

কেহ কেহ সঙ্গেসঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন—যেতে হবে বৈ-কি মশায়! নিজে এসে নাম ধরে ধরে বলে গেলেন।

কেহ কেহ বলিল—বাঘকে চটিয়ে বনে বাস করবে কে—বলুন!

কেহ বা স্পষ্ট খোলাখুলি ভাবেই বলিয়া দিল—ওঁদের কি বলুন, নেমন্তন্ন করলেই লাভ! মারা যেতে আমরা গরীবরাই মারা যাই! বড়লোকের বাড়ী যেতে হবে—কোথায় জামা, কোথায় কাপড়, কোথায় কি!

গোবিন্দশঙ্করকে যাহারা ভগ্নদূত বলিয়া জানিত, তাহারা উপরিউক্ত মন্তব্যের বক্তার দিকে রোষরক্তিম নয়নে চাহিয়া কহিয়া উঠিল—যাব মশাই, যাব।

গোবিন্দশঙ্কর বাবু—তা হ'লেই হল—বলিয়া প্রস্থান করিলেন। সাদা চামড়া, অর্দ্ধ-শ্বেত, অ-শ্বেত সাহেবগণও চলিয়া গেল, কয়েকজন শনিবারের যাত্রীও 'যা হয় হইবে' ভাবিতে ভাবিতে বাহির হইয়া গেলেন, বাকী সকলে হল-ঘরে চেয়ার দখল করিয়া বসিলেন. আমাদের যামিনীকান্ত ভট্টাচার্য্যও তাঁহাদের একজন।

জ্ঞানদা বাবু বয়োবৃদ্ধ লোক, বড় সাহেবের নামে কবে একটা কি কথা বলিয়া ফেলিয়া প্রায় দশ বছর প্রোমোশন পান্ নাই, ষাট টাকাতেই জীবন ব্যয় করিতেছিলেন, তিনিই সর্ব্ব প্রথমে কথাটা তুলিলেন—কে কি দিচ্ছ বল!

এই প্রশ্নটি কাহারই মুখে প্রকাশ্যে বাহির হয় নাই; যে যার বেশভূষা ইত্যাদির সমস্যা-ভঞ্জনেই ব্যস্ত ছিল, জ্ঞানদা বাবুর কথা শুনিয়া সবাই হাঁ করিলেন।

যামিনী বলিল—আমরা গরীব লোক, কি ক্ষমতা যে বড় সাহেবের ছেলের বৌ-কে উপহার দিই।

জ্ঞানদা বাবু মুখখানি হাসি হাসি করিয়া ব্যঙ্গ স্বরে কহিলেন—নেমন্তন্ন করবার কারণটা কিহে ভায়া! ভীম-নাগের সন্দেশ, নবীন ময়রার রসগোল্লা খাওয়াবার লোক নেই আর, না?

বাবুদের শুষ্ক মুখগুলি রৌদ্রদগ্ধ আমের আমসী হইয়া উঠিল।

জ্ঞানদা বাবু কহিলেন—কে কি দিলে না দিলে 'নোট্' করে রাখবে! যে যেমন জিনিষ দেবে, তার ভাগ্যে আফিসের ব্যবহার তেমনি হ'বে—বুঝেছ কি ভায়ারা!

ভায়াদের বুঝিয়া লইবার মত মাথা সাফ তখন ছিল না, তাঁহারা নিঃশব্দে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

জ্ঞানদা বাবু বলিলেন—যে কিছু দেবে না, তার অদৃষ্টে—জ্ঞানদা বাবু বক্তব্য শেষ না করিয়াই এমন এক হাসি হাসিলেন যে, সেটি অতি পরিষ্কার হইয়া গেল।

যামিনী জিজ্ঞাসিল—ঠাকুর্দ্দা, আপনি কি দিচ্ছেন?

জ্ঞানদা বাবুর মুখটা অত নোংরা ও বয়সটা খুব বেশী বলিয়া তিনি বহুদিন যাবত এই আফিসের ছোট বড় সকলের ঠাকুর্দ্দা; ফিরিঙ্গিরাও শুনিয়া শুনিয়া তাঁহাকে ঠাকুর্দ্দ বলিয়া ডাকিতে সুরু করিয়াছে। ঠাকুর্দ্দা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—যা হ'ক একটা কিছু দিতে হবে রে ভাই, দেখি কি দিতে পারি?

যামিনী ত্রিশ টাকা মাহিনায় নতুন ঢুকিয়াছে; অবস্থা তাহার আদৌ সচ্ছল নয়, ভাবনায় তাহার মুখ মলিন হইয়া উঠিয়াছিল। সকলে যখন চিন্তান্বিত মুখে চলিয়া গেল তখন সে জ্ঞানদা বাবুর সঙ্গে সঙ্গে কিয়দ্দূর গিয়া বলিল—আচ্ছা ঠাকুর্দ্দা, এ-কি অন্যায় নয়! বড় সাহেব ত জানেন যে বাবুরা সব গরীব গুর্বো লোক। জেনে শুনে এ-রকম অত্যাচার করা কি তাঁর উচিত?

ঠাকুর্দ্দা হাসিয়া বলিলেন—তিনি ত আর মুখ ফুটে দিতে বলেন নি, অত্যাচার আর তিনি ক'রছেন কৈ ভায়া? দাও, তোমাদের ভাল, না দাও—

যামিনী বলিল—তা হলেই ত' ঠাকুর্দ্দা!

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন—যার যেমন ক্ষমতা, সে তেমনি দেবে, বাড়াবাড়ির দরকার কি! বলিয়া একটা গলিতে ঢুকিয়া পড়িলেন।

যার যেমন ক্ষমতা—এ কথাটা ঠাকুর্দার আদৌ মনের কথা নয়; কারণ ঠাকুর্দার যে অবস্থা, তাহাতে গিনি-সোণার পাঁচভরির হার দেওয়া একরূপ অসম্ভবই কিন্তু সোমবার দিন আফিসে বাবুরা যখন 'কি দিচ্ছেন ঠাকুর্দা' বলিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, তখন ঠাকুর্দা বুক পকেট হইতে সন্তর্পণে সেটি বাহির করিয়া দেখাইলেন। বলিলেন 'গিন্নী দিলে ভায়া!' এ কথাটিও সত্য নয়; হার ছড়াটি গৃহিণীর গ্রাস মুক্ত করিতে ঠাকুর্দা মহাশয় কাল নাস্তানাবুদ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু দশ বছরের রুদ্ধ উন্নতির কপাটখানি যদি এই ফাঁকে খুলিয়া যায়, তাই ঠাকুর্দা গিন্নীকে চোখের জলে ভাসাইয়াও হার আনিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বাবুরা দুপুরে দু' এক ঘণ্টার ছুটি লইয়া বাজারে বাহির হইলেন; অধিকাংশই বৌ-বাজারের স্বর্ণকারদিগের উদ্দেশে ছুটিলেন; কেহ মিউনিসিপ্যাল মার্কেট, কেহ হোয়াইটওয়ে, কেহ লালবাজারের মোড়ে সাহেব ঘড়ি-ওয়ালার দোকানের দিকে চলিলেন। যামিনী সব দেখিল, তাহাদের ডিপার্টমেন্টের ত্রিশখানি চেয়ারের উনত্রিশখানাই খালি; দেখিয়া তাহার আত্মারাম ঢিব্ ঢিব্ করিতে লাগিল। কি একটা কাজে গোবিন্দশঙ্কর বাবুর ঘরে গিয়াছে, সেখানে গিয়া দেখে, রামভরত নামধারী আর্দালী আফিসের বেশ খুলিয়া ঘরোয়া কুর্ত্তা আঁটিয়া ট্রে সাজাই-তেছে। ট্রেতে একখানি বেনারসী কাপড়, জ্যাকেট পিস্, একটি ভেলভেটের বাক্সে একগাছি হীরামুক্তাখচিত টায়েরা, একটি গন্ধ তৈল, একটি এসেন্স ও একটি প্রকাণ্ড ফুলের তোড়া রক্ষিত। গোবিন্দশঙ্কর বাবু একখানি স্লিপে কি লিখিয়া দিয়াছেন, রামভরত আল্‌পিন্ দ্বারা সেইটাই আট্‌কাইতেছিল। যামিনী আলমারিতে নথী খুঁজিতে খুঁজিতে আড় চোখে চাহিয়া দেখিল, কাগজ-টুকরায় লেখা আছে—An humble token of sincere affection from G. S. Roy. অর্থ্যার্থ করিয়া লইতে যামিনীর বিলম্ব হইল না। 'জি. এস, রায়ের অকৃত্রিম স্নেহের ক্ষুদ্র নিদর্শন।'

যামিনী একটা বাজে নথী বগলে করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল। নথীটা টেবিলের উপর ফেলিয়া ভাবিতে বসিল। ক্ষুদ্র নিদর্শনটির মূল্য খুব কম করিয়া ধরিলেও একটি সহস্র মুদ্রা হইবে। ক্ষুদ্রই বটে!

যামিনী নগদ পাঁচটি মুদ্রা পকেটে করিয়া আসিয়াছিল, ভাবিয়াছিল, ইহা দ্বারাই হগ্ সাহেবের বাজার হইতে একটা কিছু কিনিয়া লইবে। অবশ্য মনের কোণে আর একটা চিন্তা তাহার জাগরূক ছিল, তাহা এখন আর না বলাই সঙ্গত। কারণ পাঁচ টাকার নিচে নামিবার সাহস আর তাহার নাই। গোবিন্দশঙ্কর বাবু তিন শো' টাকা মাহিনা পান, তিনি যদি হাজার টাকা মূল্যের ক্ষুদ্র নিদর্শন দেন; সে ত্রিশ টাকা পায়, তাহার দেওয়া উচিত কত? রুল্ অফ্ থ্রি যামিনী ছেলেবেলায় কসিয়াছিল, কিন্তু এখন আর মনে নাই, হিসাব করিতে একটু সময় লাগিল, খান দুই আফিস্-স্লিপ্ও ছিঁড়িতে হইল, শেষে অঙ্ক বাহির হইল, একশত টাকার 'নিদর্শন' তাহায় দেয়! যামিনীর চক্ষু স্থির হইয়া গেল। ঘণ্টা দুই গবেষণা করিয়া যামিনী স্থির করিল, দশটি টাকার কম দামের জিনিষ দেওয়া কখনই উচিত হইবে না। পাঁচ টাকা দামের খেলো জিনিষ দিলে, বড় সাহেব হয়ত বিরক্ত হইবেন, এই সেদিন কর্ম্মে ঢুকিয়াছে, তাহাতে হয় ত খারাপই হইবে। কাজ নাই বাপু বিপদ টানিয়া আনিয়া! এ মাসে ভাবিয়াছিল, নব-বিবাহিতা পত্নী সরযূকে একখানি ঢাকাই কাপড় কিনিয়া দিবে, সেটা স্থগিত রাখিতেই হইবে, আগে সাহেব, পরে স্ত্রী। স্ত্রী চটিলে পার আছে, সাহেব চটিলে পারের নৌকা বাণচাল্!

কিন্তু বাকী পাঁচ টাকা পাওয়া যায় কোথায়? ডিপার্টমেন্টের বড় বাবুটি যে রকম লোক, একটি কপর্দক তাঁহার নিকট হইতে প্রত্যাশা করা চলে না; অন্য বাবুদেরও মাসের পঁচিশে তারিখে হাতে কিছু না থাকাই সম্ভব। যামিনী দুর্ভাবনায় পড়িয়া গেল। শেষে গোবিন্দশঙ্কর বাবুর নামটি তাহার মনে পড়িল। তাঁহার কাছে পাঁচটি টাকা ধার চাহিলে কি পাওয়া যাইবে না? লোক ভাল, দিলেও দিতে পারেন, আর পাঁচটি দিন বাদেই ত সে ফিরাইয়া দিবে। যামিনী তাঁহার ঘরে ঢুকিল। বিনা বাক্যব্যয়ে গোবিন্দ-শঙ্কর বাবু মণি-ব্যাগ খুলিয়া পাঁচ টাকার নোট একখানি যামিনীকে দিলেন। কবে পাইবেন, যেন ভুল না হয়, কোন কথাই তিনি বলিলেন না। যামিনী কি দু' একটা কথা বলিবার জন্য হাঁ করিতেছিল, গোবিন্দবাবু আচ্ছা আচ্ছা করিয়া উঠিলেন।

যামিনী হগ সাহেবের বাজারে গিয়া অনেক জিনিষ

দেখিল, পছন্দ-অপছন্দ করিল, তাহার বাজেট মিলাইল, কেনা কিন্তু কিছুই হইল না যে জিনিস পছন্দ হয়, বাজেটে কুলায় না, যদি বা কোনটির দাম বাজেটের মধ্যেই থাকে, জিনিস জঘন্য। ঘণ্টা তিনেক ঘুরিয়া সে একটি ফাউন্টেন পেন কিনিল—ওয়াটারম্যানের কলম, বেশ জিনিষটি! ভাবিল, জিনিসটি কি বধূকে উপহার দেওয়া অসঙ্গত হইবে? কেন? বধূর কি লেখনীর কোনই প্রয়োজন নাই? অত বড় লোকের বাড়ীর বৌ যখন, নিশ্চয়ই লিখিতে পড়িতে জানে, কলমটি তাহার কাজে লাগিবেই।

দশ টাকা দিয়া কলম কিনিয়া যামিনী আফিসে ফিরিয়া দেখিল, বাবুরা ভবানীপুরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। যামিনী ভিড়ের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল।

অফিসের বাবুদের মধ্যে তাহার মত উপহার কেহই আনে নাই। বধূকে 'উপহার'—কলম একটু অশোভন নয় কি? বাবুরা ধোঁকা লাগাইয়া দিলেন, যামিনী মনে-মনে সেই আলোচনাই করিতে লাগিল।

শীতকাল, সাড়ে পাঁচটাতেই সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, রাস্তায় রাস্তায় গ্যাস জ্বলিয়াছে, বাবুরা লালদীঘির কোণে কালীঘাটের ট্রামে উঠিলেন। শালের মধ্যে সকলেরই হাতে একটি-না-একটি দ্রব্য আছে। কাহারও কাহারও শাল অত্যন্ত ফুলিয়া উঠিয়াছে, কেহ-কেহ-বা 'উপহার' ভারে একটু আধটু অস্বাচ্ছন্দ্যও বোধ করিতেছেন। ভবানীপুর জগু বাবুর বাজারের পার্শ্বে নামিয়া তাঁহারা রায় বাহাদুরের বাড়ীর সম্মুখে আসিতেই দেখিলেন, বড় সাহেব বাঙ্গালী-বেশে পায়চারী করিতেছেন। তিনি তাঁহাদের মহা সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া একেবারে ত্রিতলের ছাদে তুলিলেন। আসন পাতাই ছিল, সকলকে বসিতে বলিয়া একজন কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া কি বলিয়া দিলেন; পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বাবুরা নিবিষ্টচিত্তে উপস্থিত কর্মে নিযুক্ত হইয়া পড়িলেন।

অত লোক খাইতে বসিয়াছে, স্থানটি কিন্তু নিঃশব্দ। মৃদুগুঞ্জন ও মৃদুকণ্ঠে 'এটা দাও, ওটা আন' ছাড়া কোনই শব্দ নাই। কেন? রায় বাহাদুর যে স্বয়ং সামনে দাঁড়াইয়া! কাহার ঘাড়ে দুইটা মাথা আছে, কথা বলিবে! এটা আফিস নয় সত্য, কিন্তু লোকটি ত অন্য নয়!

আধাআধি খাওয়া হইয়াছে, রায় বাহাদুর ভুঁড়ি নাড়িতে নাড়িতে অদৃশ্য হইলেন; বাবুরা ঘাড় তুলিলেন, কথা বলিলেন; খাদ্যগুণ বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন; বহুকাল এমন সুপাচ্য সুখাদ্য খান নাই স্বীকার করিলেন। যাঁহাদের 'উপহার' দৈর্ঘ্য অথবা প্রস্থের বিশালতায় শালের বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল, তাঁহারা নড়িয়া বসিয়া সামলাইয়া লইলেন। হাসিখুসিও সুরু হইবার উপক্রম করিয়াই স্তব্ধ হইয়া গেল, আবার রায় বাহাদুর পরিদৃশ্যমান হইলেন।

সেখান হইতেই সন্ধান লইতেছেন, লুচি দেওয়া শেষ হয়েছে ত হে?

আসিয়াই বলিলেন—এই দেখ হে, আমার বৌ-মা তোমাদের পোলাও পরিবেশন করতে এসেছেন।

বাবুরা সসম্ভ্রমে মুখ তুলিলেন। রূপার একখানি থালা হস্তে এক অনিন্দ্যসুন্দরী কিশোরী ঠিক রায় বাহাদুরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শান্ত-শ্রী বিকীর্ণ করিতেছিল; বাবুরা মনে মনে বলিলেন—হ্যাঁ, বৌয়ের মত বৌ বটে!

রায় বাহাদুর পুত্রবধূর দিকে চাহিয়া স্নেহভরা স্বরে বলিলেন—দাও মা, দাও, এদিক থেকে আরম্ভ কর।

পুত্রবধূ মৃদু হাসিয়া পরিবেশন আরম্ভ করিলেন; দুই জন বাঙ্গালী বামুনঠাকুর পাশে বালতী ভরা পোলাও লইয়া তাঁহার অনুগমন করিল।

রায় বাহাদুর বলিলেন—কেমন বৌ হয়েছে হে?

বেশ! বেশ! চমৎকার, চমৎকার—ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল।

রায় বাহাদুর বলিলেন—মা আমার অন্নপূর্ণা! কি সুন্দর পরিবেশন করছেন দেখ্‌ছ, একটি ভাতও পড়েছে কি?

তা আর বল্‌তে! আপনার ঘরে…ইত্যাদি!

আহার শেষ হইল, আচমন কার্য্যও শেষ, পান বিতরিত হইল। রায়বাহাদুর স্বীয় পুত্রকে ডাকিয়া বাবুদের নীচে লইয়া যাইতে বলিলেন।

বাবুরা শালের মধ্যে হাত পুরিয়া প্রস্তুত হইতেছিলেন, সকলেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন। ঠাকুর্দা বয়সেও বড়, সাহসেও বড়, রায়বাহাদুরের দিকে চাহিয়া বিনীতকণ্ঠে কহিলেন, আজ্ঞে বৌ-মাকে একবার দেখব যে!

ও তুমি বুঝি দেখ-নি, আফিং খাও বুঝি? কি মুস্কিল? ওরে বাবুকে একবার নিয়ে—

আজ্ঞে এঁরা সবাই দেখবেন !

রায় বাহাদুর সাশ্চর্য্যে বলিলেন—সে কি হে ! তোমরাও দেখ-নি নাকি ? এই যে সব বল্লে—

আজ্ঞে তা না—

রায় বাহাদুর হাসিয়া বলিলেন—তা না ত' আবার কি ? মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে এই কথা কয়টি বলিয়া পুত্রের দিকে চাহিলেন বলিলেন—এই দিকের সিঁড়ি দিয়ে নিয়ে যাও এঁদের, ওদিকে শ্যামবাজার থেকে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের পাত হয়েছে।

ঠাকুর্দা আবার কি বলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, রায় বাহাদুর তৎপূর্বেই কহিলেন—নতুন কুটুম-বাড়ী থেকে সব এসেছেন, কিছু মনে কর না তোমরা, তাঁদের দেখতে হবে—বলিয়াই অদৃশ্য হইলেন।

আসুন—বলিয়া রায় বাহাদুর-পুত্র তাঁহাদের নীচে নামাইয়া দিল। ঠাকুর্দাই সকলের খরচ করাইয়া দিয়াছেন, এই বাজারে এতগুলা করিয়া টাকা লোকসান—সকলে ঠাকুর্দাকে ধর ধর ক'রয়া ধরিতে ছুটিলেন, কিন্তু ঠাকুর্দাকে নিকটে বা দূরে কোথাও দেখা গেল না। বাবুরা অনেকক্ষণ ফটকের সামনে জটলা করিয়া ক্রমশঃ ভিড় বাড়িতেছে দেখিয়া স্ব স্ব স্থানে ফিরিলেন। জানি না 'উপহারগুলা' তাঁহারা কি কাজে লাগাইলেন !

যামিনীর খবরটা আমরা জানি, হগসাহেবের বাজারে সেই দোকানটিতে একটি টাকা বাটা দিয়া ফাউণ্টেন পেণটি ফিরাইয়া পরদিনই গোবিন্দশঙ্কর বাবুর কর্জ শোধ করিল।

চা-খোরের গান

শ্রীগোপেন্দ্রনাথ সরকার

কোন্ দেশেতে মানুষগুলো
সকল দেশের চাইতে চা-খোর ?
কোন্ দেশেতে বালক-বুড়ো
ভোগে 'ডিসপেপ্‌সিয়াতে' ঘোর ?
কোন্ দেশেতে হিন্দুবধূ
চা'র টেবিলে জোটেরে—
সে আমাদের বাংলা দেশ
সে আমাদের বাংলা রে !

কোন্ দেশেতে মুটে-মজুর
চা কিনে খায় সকাল সাঁঝে ?
কোথায় চায়ের ফেরিওলার
কণ্ঠধ্বনি উচ্চে বাজে ?
কোথায় এত চায়ের দোকান
গণে' উঠা যায় না রে—
সে আমাদের বাংলা দেশ
সে আমাদের বাংলা রে !

কোন্ দেশেতে পাড়া-গাঁয়ের
রান্নাঘরের উনানে
কোন্ প্রভাতে 'কেট্‌লি' চায়ের
চাপল এসে কে জানে ?
কোথায় চলে নুন্ চা সুধু
দুধ আর চিনি বিনা রে—
সে আমাদের বাংলা দেশ
সে আমাদের বাংলা রে !

কোন্ দেশেতে গোস্বামী-জী
চায়ের প্রিয় ভক্ত গো,
পেতে দেছেন অন্তঃপুরে
চায়ের চির-তক্ত গো।
পল্‌তেয় করে' চা পিয়ান'
বাকি নবকুমারে,
ধন্য হবে বাংলা তবেই
ধন্য হবে বাংলা রে !

অমলা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(৫)

প্রমথ পিতৃমাতৃহীন ধনী যুবক; নিবাস হুগলী জেলার কোন গ্রামে। উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের সহিত অর্থ সংযুক্ত হইলে মানুষ যে পথের পথিক হয়, প্রমথনাথের নিকট সে পথের কোনো সন্ধান-সন্ধি অজ্ঞাত ছিল না। সমঝদার ব্যক্তিরা বলিত, এ বিষয়ে প্রমথ অদ্ভুত কৌশলী; উপমার ভাষায় নারী-মৃগয়ায় সে নিপুণ শীকারী। কোনো চকিতা ত্রস্তা হরিণীকে ধরিতে হইলে, কখন তাহার কর্ণে বংশীর কোন্ রাগিণী বর্ষণ করিতে হইবে, কোন্ পথে তাহার গতি অপ্রতিহত রাখিতে হইবে এবং কোন্ পথে রোধ করিতে হইবে, পদস্খলনের জন্য কখন তাহার পথে প্রচ্ছন্ন গহ্বর প্রস্তুত রাখিতে হইবে, এবং কোন্ পরম এবং চরম অবসরে তাহার চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত জাল ধীরে ধীরে কিম্বা দ্রুতবেগে গুটাইয়া লইতে হইবে, সে সকল কৌশল এ ব্যাধের সম্পূর্ণ আয়ত্ত ছিল। গতিকে সে এমন মন্দ করিতে জানিত যে, দেখিলে তাহাকে গতিহীন বলিয়া ভ্রম হইত, এবং উদ্দেশ্যকে সে এমন প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারিত যে, শীকার তাহার করায়ত্ত হইয়াও তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিত না।

অমলার সহিত প্রমথর একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল বটে, কিন্তু তাহা এতই সুদূর যে, সম্পর্ক অপেক্ষা সম্পর্কের অভাবই তাহার দ্বারা অধিক ব্যক্ত হইত। অমলা প্রমথনাথের দূর সম্পর্কিনী মাসীর ননদ-কন্যা। কিন্তু দূরকে নিকট করিয়া লইবার কৌশল যাহার জানা আছে, তাহার নিকট কোন দূরত্বই দূর নহে। তাই সেদিন যখন হরমোহনের গৃহে উপস্থিত হইয়া অমলাকে সম্মুখে পাইয়া তাহাকে অন্তরালে যাইবার অবসর না দিয়াই প্রমথ বলিয়া উঠিল, "কি অমলা, তোমার প্রমথদাদাকে মনে আছে ত?" তখন অমলার গমনোদ্যত চরণ সহসা গতি হারাইয়া আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারিল না। সম্পর্ক ধরিয়া যে ডাক দিয়াছে, তাহাকে লজ্জা করিতে সঙ্কোচ বোধ করে না, এমন নির্লজ্জ অতি অল্পই আছে।

অমলার মুখে কিন্তু প্রমথর প্রশ্নের কোন উত্তর আসিল না; সে লজ্জারক্তিম মুখে মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

প্রভাবতী হাস্যমুখে কহিলেন, "মনে নিশ্চয়ই আছে, তবে বছর চার পাঁচ তোমার দেখা ত' আমরা পাই নি। প্রমথকে প্রণাম কর অমলা।"

অমলা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রমথকে প্রণাম করিল। প্রমথ অবনতা অমলার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া কহিল, "চিরসুখী হও।" অমলা সরিয়া আসিয়া জননীর পার্শ্বে উপবেশন করিল।

প্রমথর আশীর্ব্বাদ শুনিয়া প্রভাবতী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। "সুখ আর কোথায় বাবা? সুখের পথে ত' বিধাতা চিরদিনের জন্য কাঁটা দিয়েছেন!"

কথাটা প্রমথ ভালরূপই জানিত, কিন্তু তদ্বিষয়ে যেন সে কিছুই জানে না সেইভাবে সবিস্ময়ে বলিল, "কেন বল দেখি? কি হয়েছে?"

প্রভাবতী সংক্ষেপে কিন্তু ধীরে ধীরে প্রায় সব কথাটাই বলিয়া গেলেন। বসিয়া থাকা অপেক্ষা উঠিয়া যাইতেই বেশী লজ্জা করিতেছিল বলিয়া, উঠি উঠি করিয়াও অমলা মাথা নীচু করিয়া বসিয়া নিজের দুরদৃষ্টের কাহিনী শুনিতে লাগিল, এবং সেই সকরুণ কাহিনী শুনিতে শুনিতে ছলনার মধ্যেও প্রমথর মুখে মাঝে মাঝে বিরক্তি ও ঘৃণার অকৃত্রিম চিহ্ন অঙ্কিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

কাহিনী সমাপ্ত হইলে প্রমথ ক্ষণকাল এরূপ নির্ব্বাক হইয়া রহিল যে, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রভাবতীর, এবং ভূমিতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াও অমলার মনে হইল যে দুঃখে, ক্রোধে ও ঘৃণায় তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছে না। অবশেষে দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া চাপা গলায় প্রমথ যখন কয়েকটা দুর্ব্বোধ্য ইংরাজী বাক্য উচ্চারণ করিল, তখন তাহার মর্ম্ম কিছুমাত্র না বুঝিয়াও প্রভাবতী

ও অমলা বুঝিল যে, গোবিন্দনাথ ও বিজয়নাথের প্রতি সেগুলা কঠোর কটূক্তি।

সমবেদনার প্রভাবে প্রভাবতীর চক্ষে জল আসিল। অঞ্চলের প্রান্তে চক্ষু মুছিয়া কহিলেন, "এ যে আমার কি অশান্তি হয়েছে বাবা! এর চেয়ে যদি মেয়েটা—" বাকি কথা মুখেই রহিয়া গেল, এত দুঃখেও কন্যার অকল্যাণের বাক্য মুখ দিয়া বাহির হইল না।

মুখ বিকৃত এবং চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া প্রমথ কহিল, "কি বলব মাসিমা, এর ওষুধ হচ্ছে চাবুক, ঘোড়ার চাবুক!" কিন্তু বক্র কটাক্ষে এক নিমেষে অমলার মুখের ভাবে তাহার মনের ভাব বুঝিয়া লইয়া বলিল, "কিন্তু এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি যে, বিজয়ের এর মধ্যে কোন দোষ নেই, বাপের বর্ত্তমানে সে কি করতে পারে বল? লেখাপড়া শিখে সে যে নিজের ইচ্ছায় এমন জানোয়ারের মত ব্যবহার করবে, এ আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। তুমি ঠিক জেনো মাসিমা, সময়ে এসব ঠিক হয়ে যাবে।"

প্রভাবতী ব্যথিত স্বরে বলিলেন, "এক দিন আমিও এ আশা করতাম। কিন্তু আমার আর সে আশা নেই। তাই যদি তার মনে মনে থাকত তাহলে এই তিন বৎসরে মেয়েটাকে অন্ততঃ একখানা চিঠিও ত দিতে পারত? আচ্ছা, তা না হয় নাই দিলে; কিছুদিন আগে পথে এঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, এঁরা কথা কইতে গিয়েছিলেন, কিন্তু সে কথা না কয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছিল। তবে আর ভাল বলি কাকে বল?"

কথাবার্ত্তার গতি ক্রমশঃ যে রূপ ধারণ করিতে লাগিল, তাহাতে আর কোন প্রকারেই অমলার সেখানে বসিয়া থাকা চলিল না। উঠিবার সঙ্কোচ কোন প্রকারে অতিক্রম করিয়া সে উঠিয়া পড়িতেই প্রভাবতী বলিলেন, "অমলা, প্রমথর জন্যে জলখাবার নিয়ে এস ত মা। এই রোদে বাছার মুখ একেবারে শুকিয়ে গেছে!"

জলখাবারের জন্য মৃদু আপত্তি করিয়া প্রমথ পুনরায় পূর্ব্ব-কথা পাড়িল। অমলা ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার পূর্ব্বেই তাড়াতাড়ি বলিল, "এ সব কথা আমাকে আগে জানাও নি কেন মাসিমা? আমার বিশ্বাস, ব্যাপারটা এতদূর গড়ান সত্ত্বেও আমি মিটিয়ে দিতে পারব।"

কথাটা শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার একটা অধীর আগ্রহ বহন করিয়া, অমলা ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। প্রমথর আশ্বাস-বচন শুনিয়া তাহার অসাড় বিমুখ হৃদয় সহসা যেন বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত চকিত হইয়া উঠিল,—আশার আনন্দে নহে, কৌতূহলের উত্তেজনায়। যে পথের লৌহ-দ্বারে অদৃষ্ট কঠিন অর্গল দিয়া দিয়াছে, সেখানে আর ব্যবস্থা করিবার কি বাকি আছে, তাহাই জানিবার আগ্রহ।

প্রভাবতী কিন্তু আশায় ও আনন্দে একেবারে উদ্বেলিত হইয়া উঠিলেন। কন্যার দুর্ভাগ্যের জন্য তাঁহার মনে একমুহূর্ত্তও সুখ ছিল না। কালের প্রভাবে দুঃখের সে তীব্র ক্লেশ কমিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু একটা বদ্ধ-গভীর বেদনা হৃদয়কে নিরন্তর ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিত। তাই এই দুর্ব্বহ পারিবারিক অমঙ্গল হইতে উদ্ধার পাইবার বিন্দুমাত্র আশ্বাস পাইয়াই তাঁহার মন সম্ভাবনা অসম্ভাবনার বিচার না করিয়াই একেবারে নাচিয়া উঠিল।

"তা যদি পার বাবা, তা হলে, তুমি পেটের সন্তানের তুল্য, তোমাকে আর বেশী কি বলব, পোড়ারমুখীর একটা কিনারা হয়। তা না হলে, মা হয়েও এ কথা আমার মুখে বাধছে না, ওর থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল।"

অমলা যতক্ষণে প্রমথর জন্য জলখাবার লইয়া প্রবেশ করিল, ততক্ষণে প্রমথ আশা ও আশ্বাসের প্রয়োগে প্রভাবতীর মন সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া লইয়াছিল। এই ভাবিয়া প্রভাবতীর অনুশোচনা হইতেছিল যে, মনান্তরের প্রথম সূচনার সময়ে প্রমথ কেন আসে নাই; তাহা হইলে সম্ভবতঃ এই নিদারুণ বিপত্তি ঘটিতেই পারিত না। এত দুঃখের পরও যাঁহার করুণায় পরিত্রাতা রূপে আজ প্রমথ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাঁহার চরণোদ্দেশে প্রভাবতী শত-বার মনে মনে প্রণাম করিলেন।

এক হস্তে একখানা রেকাবে কিছু আহার্য্য ও অপর হস্তে এক গ্লাস জল লইয়া অমলা প্রবেশ করিল, এবং প্রমথর অনতিদূরে একখানি আসন পাতিয়া, আসনের সম্মুখে জল-হাত বুলাইয়া, জলখাবারের পাত্র ও জলের গ্লাস রাখিয়া মুখ তুলিতেই প্রমথর দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি মিলিত হইল। সম্পর্কের হিসাবে প্রমথ অমলার দাদা, তা সে যত সুদূরই হউক না কেন। এ পর্য্যন্ত বাক্যে ও আচরণে প্রমথ সেই সম্পর্কেরই হিসাব রাখিয়া আসিয়াছে, এবং গৃহে পদার্পণ করিয়া অবধি সে অমলার জীবনের সর্ব্বোচ্চ ইষ্টসাধন

করিবার ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়া, অন্ততঃ বাহ্যতঃ অমলার একজন পরম শুভানুধ্যায়ী রূপে নিজেকে দাঁড় করাইয়াছে। প্রমথর স্বপক্ষে এ সকল প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও, মনুষ্য-মস্তিষ্ক-নিহিত আত্মরক্ষার স্বাভাবিক বুদ্ধিবলেই হউক, অথবা অপর যে কারণেই হউক, প্রমথকে ততখানি শুভানুধ্যায়ী বলিয়া অমলার মনে হইল না, যতখানি প্রভাবতীর মনে হইতেছিল। প্রমথর সহিত চোখোচোখি হইতেই অমলার মনে হইল যে, প্রমথর সেই তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মধ্যে যে জিনিসটা সর্ব্বাপেক্ষা প্রকাশমান, তাহা ঠিক করুণা বা উপকার-বৃত্তির মতই স্নিগ্ধ নহে। সে তাড়াতাড়ি দৃষ্টি নত করিল।

অমলা যখন অবনত হইয়া জলখাবার দিতেছিল, তখন তাহার আনত-আরক্ত মুখের উপর প্রমথ ও প্রভাবতী উভয়েরই দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছিল। মানুষের মন হইতে মানুষের মন এত সহজে ও সম্পূর্ণ রূপে প্রচ্ছন্ন থাকে যে, এই দুইটি পরস্পর বিরোধী মন এত কাছাকাছি ও পাশাপাশি থাকিয়াও কোন পকার গোলযোগের সৃষ্টি করিল না। প্রভাবতী নিশ্চিন্ত প্রসন্ন মনে যখন বুঝিয়া রহিলেন যে, প্রমথর পরদুঃখকাতর হৃদয়ে সহানুভূতি ও হিতৈষণার সুধা ক্ষরিত হইতেছে, ঠিক তখন তথায় লালসা ও শঠতার রাসায়নিক ক্রিয়া পূরাদস্তুর চলিতেছিল।

হরমোহন আফিস হইতে আসা পর্য্যন্ত প্রভাবতী প্রমথকে ছাড়িলেন না. এবং প্রমথও সহজেই সে পর্য্যন্ত থাকিয়া গেল।

প্রমথর মুখে সকল কথা শুনিয়া হরমোহন বলিলেন, "আমার ত একটুও মনে হয় না যে, সে পাষণ্ডকে তুমি কোন রকমে রাজি করতে পারবে, তবে বিজয় যখন তোমার বন্ধু বলছ, তখন একটু চেষ্টা দেখতে পার। কিন্তু তার বিষয়েও আমার কোন আশা নেই, সে-ও তার বাপেরই মত বলে আমার মনে হয়।"

কক্ষের বাহিরে দ্বার-পার্শ্বেই যে অমলা ছিল, তাহা প্রমথ, চক্ষে দেখিতে না পাইলেও, অনুমানে বুঝিয়াছিল। ঘরের বাহির হইতেও যাহাতে কথা শুনিতে পাওয়া যায়, এরূপ উচ্চ কণ্ঠে সে বলিল, "গোবিন্দবাবুর বিষয়ে আপনি যাই বলুন মেসোমশায়, আমি তাতে আপত্তি করব না; কিন্তু বিজয় আমার বন্ধু, তাকে ত আমি চিনি। সে কখন নিজের ইচ্ছায় এ ব্যাপার করে নি। সে যখন নিজের ইচ্ছায় চলতে পারবে, তখন নিশ্চয়ই তার ত্রুটি শুধরে নেবে।"

প্রমথর কথা শুনিয়া হরমোহন মনে মনে হাসিলেন; মুখে বলিলেন, "তা বেশ ত, তুমি চেষ্টা করে দেখ। যদি সফল হও ত একটা নিরীহ বালিকার ব্যর্থ জীবন সার্থক করবে। কিন্তু দোহাই বাবা, আমাকে যেন এর মধ্যে টেনো না। আমি আর জীবনে গোবিন্দা হারামজাদার সঙ্গে বাক্যালাপ করব না, তা যদি সে এসে আমার পায়ে ধরে ক্ষমা চায়, তবুও নয়।"

প্রমথ একটু হাসিয়া বলিল, "না, এর মধ্যে আপনার সাহায্য আমি একেবারেই চাইব না। তা ছাড়া, ঠিক অবসর না বুঝলে আমি ত এ বিষয়ে কথা পাড়ব না। দেরী যদি হয়, তাহলে মনে করবেন না যে, আমি নিশ্চেষ্ট রয়েছি বা চেষ্টা নিষ্ফল হোলো।"

হরমোহন বলিলেন, "না, না, সে তুমি যেমন ভাল বুঝবে, করবে। কখনই যে ঘটনা ঘটবে না বলে আমার বিশ্বাস, সে ঘটনা কেন শীঘ্র ঘটছে না বলে আমি কখন অধীর হব না।"

প্রমথ পুনরায় হাসিয়া বলিল, "আপনি যখন আমাকে এমন অবাধ অবসর দিচ্ছেন, আর মনে সফলতার একটুও আশা রাখছেন না, তখন আমার মনে হচ্ছে, আমি নিশ্চয় সফল হব।"

এক পেয়ালা গরম চা নিঃশেষ করিল প্রমথ বাহিরে আসিয়া গৃহকার্য্যরতা প্রভাবতীকে বলিল, "মাসিমা, আজ তাহলে চল্লাম।" তাহার পর অদূরে দণ্ডায়মানা অমলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "অমলা, পাণ থাকে ত দু চারটে দাও ত, অনেকখানি রাস্তা চলতে হবে।"

প্রভাবতী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "অমল, শীগ্‌গির তোমার দাদাকে পাণ দাও; যদি সাজা না থাকে ত সেজে দাও।" প্রমথকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "রাত হয়ে গেছে, দুটি খেয়ে যাও না বাবা?"

প্রমথ স্মিতমুখে বলিল, "এ ত বাড়ীর কথা মাসিমা, দরকার হলে চেয়ে খেয়ে যাব। কিন্তু আজ নয়, আজ আমার একটু বিশেষ দরকার আছে।"

"তবে শীগ্‌গীর আর এক দিন এসো।"

"তা আসব এখন। পাণ সাজা না থাকলে দরকার

নেই অমল, আমি চল্লাম।" বলিয়া প্রমথ প্রস্থানোদ্যত হইল।

"না, না, দেরী হবে না; সেজে দিচ্ছে। পাণ নিয়ে তবে যেয়ো।" বলিয়া প্রভাবতী রন্ধনালয়ের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

পাশের একটা ঘরে অমলা তাড়াতাড়ি পাণ সাজিতে বসিয়াছিল, প্রমথ আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল।

"পাণ সাজতে হোল অমল? মশলা দিলেই ত পারতে? তাই দাও না।"

এই অতি ঘনিষ্ঠতার সম্বোধনে লজ্জিত হইয়া অমলার মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে অবনত মস্তকে বলিল, "দেরী হবে না, একটু দাঁড়ান।"

বিস্ময়াতিশয্যের স্বরে প্রমথ বলিয়া উঠিল, "দাঁড়ান কি রকম কথা অমলা! আপনার লোককে কখন আপনি বলতে আছে? দাঁড়াও!"

এই আত্মীয়তাসূচক ভৎ'সনায় অধিকতর লজ্জিত হইয়া অমলা মাথা নত করিয়া রহিল। তৎপরে চার খিলি পাণ মুড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া নীরবে প্রমথর দিকে আগাইয়া ধরিল।

অমলার হস্ত হইতে পাণ লইয়া স্মিতমুখে প্রমথ বলিল, "আচ্ছা, আজকে ক্ষমা করলাম; কিন্তু ফের যদি কোন দিন এমন অবিবেচনার কাজ কর, তাহলে সকলের সামনে তোমাকে আপনি বলে সম্বোধন করে শাস্তি দোব। আর এমন ভুল হবে না ত?"

অগত্যা অমলাকে মৃদুহাস্য সহকারে বলিতে হইল "না।"

"বেশ!" বলিয়া প্রমথ প্রফুল্লমুখে প্রস্থান করিল।

(ক্রমশঃ)

দারিদ্র্য

শ্রীদেবরঞ্জন গুহঠাকুরতা

হে দারিদ্র্য,

ছিনু যবে মত্ত হয়ে
ঐশ্বর্য্যের মদে,
করিয়াছি দরিদ্রেরে
ঘৃণা প্রতিবাদ,
ক্ষুধাতুরে করি নাই
কভু অন্ন দান,
অতিথি-ব্রাহ্মণ এলে
করি অপমান,
করিয়াছি বিতাড়িত
সহাস্য বদনে,
বিন্দুমাত্র অনুতাপ
লভি নাই মনে।
অহরহঃ মম গৃহে
আসি বন্ধুগণ—
নানা তোষামোদ-বাক্যে
তুষি মোর মন
থাকিত বসিয়া সদা
স্বার্থসিদ্ধি আশে,
ভাবিতাম তারা মোরে
কত ভালবাসে।
পলে পলে সবে মোরে
শক্তিহীন করি,
সর্ব্বস্ব হরিয়া যবে
করিল প্রয়াণ,
তব স্নেহময় অঙ্কে
দিয়াছিলে স্থান।
দেখাইলে বিশ্বমাঝে
কে মোর বান্ধব,
কে আত্মীয়, কেবা পর,
কি তুচ্ছ বিভব,
ফুটাইয়া আঁখি মম
বুঝাইলে সার।
শ্রীহরি চরণ বিনা
গতি নাহি আর।
এ মহান্ তত্ত্ব লভিয়াছি তব কাছে,
হে দারিদ্র্য, তোমা সম বন্ধু কেবা আছে?
ঐশ্বর্য্যের মদে পুনঃ
হারাইলে জ্ঞান,
কাছে আসি তুমি মোরে
কোরো সাবধান;
সতত রক্ষিও মোরে
কাছে কাছে থাকি,
(আজি) তোমার প্রসাদে মম
ফুটিয়াছে আঁখি।

হংস দময়ন্তী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত রামেশ্বরপ্রসাদ বর্ম্মা　　BHARATVARSHA HALFTONE & PRINTING WORKS.

প্রণবাদিতে সকলেরই অধিকার *

সত্যভূষণ শ্রীধরণীধর শর্ম্মা

(প্রতিকূলতা পরিহার)

অনেকে বলিবেন যে, যখন অনির্ব্বচনীয়, নিরঞ্জন সৃষ্টি স্থিতি-লয় কর্ত্তা পরমেশ্বরের উপাসনা অপ্রণব অসাবিত্রী অন্যবিধ অবলম্বনে শাস্ত্রানুসারে অসম্ভব নহে তখন যাহাতে অনেকের বা কাহারও বিপক্ষতা আছে সেরূপ সাধন গ্রহণের প্রয়োজন কি? যাহাতে সর্ব্বদিক রক্ষা হয় তাহাই ত বিধেয়। এখানে প্রথম দ্রষ্টব্য এই যে, প্রস্তাবিত উপাসনার অপরিহার্য্য উপকরণ কি—যাহা না থাকিলে এই উপাসনা অসম্ভব হয়। উপাসনা যে উপায় বা সাধন, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। উদ্দেশ্য বা সিদ্ধি প্রথমতঃ স্থির না করিলে উপায় বা সাধনের হেয়ত্ব বা উপাদেয়ত্ব স্থির করা অসম্ভব। এ সম্বন্ধে কাহারও আপত্তির সম্ভাবনা নাই। কি ব্যবহার কি পরমার্থ উভয়ত্রই এ নিয়ম অব্যাহত দেখা যায়। গন্তব্য স্থান সম্বন্ধে স্থির ধারণার অভাবে যাত্রায় প্রবৃত্তি বাতুলতার পরিচায়ক। উদ্দেশ্যশূন্য উপায় উপায়ই নহে। উপায়কে উদ্দেশ্য বলিয়া ধারণা ভ্রান্তি মাত্র। বিচার-হীন ব্যক্তির এরূপ ভ্রান্তি বহুশঃ লোকদৃষ্ট। ধন সংগ্রহের উদ্দেশ্য না বুঝিয়া ধন সংগ্রহই যাহার উদ্দেশ্য হয়, তাহার

* গত অগ্রহায়ণ মাসের "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত বর্ত্তমান বিষয়ক প্রথম প্রবন্ধে (পৃঃ ৮০, বাম স্তম্ভ) বলা হইয়াছে "তন্ত্র শাস্ত্রে স্ত্রীগণের গায়ত্রীতে অধিকার স্পষ্টাক্ষরে বিহিত হইয়াছে।" কিন্তু সেই স্পষ্টাক্ষর বিধি উদ্ধৃত হয় নাই। এক্ষণে উদ্ধৃত হইতেছে। যথা— শ্রীদেব্যুবাচ।

গায়ত্রী জপকালেতু সাধিকা কিং জপেৎ প্রভো।

শ্রীশিবউবাচ।

গায়ত্রীং অজপাং বিদ্যাং প্রজপেৎ যদি সাধিকা।

পূর্ব্বোক্তেন বিধানেন ধ্যাত্বা কৃত্বা তু পূজনং।

মানসং পরমেশানি জপেৎ তদ্গত মানসা॥

কঙ্কালমালিনী তন্ত্রং। ৫ম পঃ।

অর্থাৎ। শ্রীদেবী বলিলেন। (সাধন প্রণালী ক্রমে) গায়ত্রী জপকালে হে প্রভু সাধিকা কি জপ করিবেক। শ্রীশিব বলিলেন। যদি সাধিকা অজপা বিদ্যা গায়ত্রীকে জপ করে তবে পূর্ব্বোক্ত বিধানে ধ্যান ও পূজা করিয়া, হে পরমেশানি, তদ্গত চিত্ত হইয়া মানস জপ করিবেক।

উদ্বেগ অশান্তি অবশ্যম্ভাবী—ইহা লোকপ্রসিদ্ধ। ইহাদের প্রতি আচার্য্য বাক্য সুপ্রযুক্ত যে,—

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং
নাস্তিততঃ সুখলেশঃ সত্যং।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ
সর্ব্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ॥

বিনা প্রয়োজনে কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না। উপাসনা বা সাধন কার্য্য বলিয়া বিনা প্রয়োজনে ইহাতেও প্রবৃত্তি অসম্ভব। সিদ্ধির প্রয়োজন বলিয়া সাধনে প্রবৃত্তি। সিদ্ধিলাভ উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য পূরণার্থে উপাসনা বা সাধনের অনুষ্ঠান। সিদ্ধি বা উদ্দেশ্য কি, তাহা বুঝিলেই তবে উপাসনা বা সাধনের উপযোগিতা বুঝা যাইবে, নতুবা কোন মতেই বুঝা যাইবে না। প্রস্তাবিত উপাসনার উদ্দেশ্য অথবা অন্য কথায় এ সাধনার সিদ্ধি কি? ব্রহ্ম লাভ, ব্রহ্ম হওয়া, ব্রহ্ম দর্শন, ব্রহ্ম জ্ঞান, ব্রহ্ম নির্ব্বাণ, কৈবল্য প্রভৃতি নানা নামে সেই উদ্দেশ্য বা সিদ্ধি ব্রাহ্মণ-প্রমুখ মনুষ্য-মণ্ডলীর শাস্ত্রে অতিপ্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত। সেই উদ্দেশ্য পূরণার্থে উপায় স্বরূপ যে উপাসনা, তাহাই প্রস্তাবিত। এ উপাসনা যে অনির্দ্দেশ্য প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত ইহা ব্রাহ্মণ-গৃহীত সর্ব্ব শাস্ত্রেই অভিব্যক্ত। ইহার একটী বিশেষত্ব এই যে, ইহার অনুষ্ঠাতা কোন সম্প্রদায়-বিশেষে আবদ্ধ থাকেন না, অথচ কোন সম্প্রদায়েরই সহিত তাঁহার বিরোধ থাকে না। গৌড়পাদাচার্য্য বলিয়াছেন যে,

নামরূপাদি নির্দ্দেশৈ র্বিভিন্নানামুপাসকাঃ।
পরস্পরং বিরুদ্ধৈস্তৈ র্নতৈ রেতদ্ বিরুদ্ধ্যতে॥ *

এই উপাসনার অনুষ্ঠানার্থে প্রয়োজনীয় অবলম্বনের মধ্যে প্রণব, গায়ত্রী সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া, শ্রুতি স্মৃতি-সম্মত। ইহা পূর্ব্ব প্রস্তাবেই দেখা গিয়াছে। এবং জাতি বর্ণ লিঙ্গ নির্ব্বিশেষে সকলেই প্রয়োজন বুঝিলে ইহার অবলম্বনে কৃতার্থ হইতে পারেন, ইহাও দেখা গিয়াছে। এই উপাসনার আর একটী বিশেষত্ব উল্লেখযোগ্য। সাধকের চরিত্রের উপর ইহার একটী বিশেষ প্রভাব আছে। ভগবদ্‌গীতায় জ্ঞাননিষ্ঠের লক্ষণ বহু স্থানে বর্ণিত। বিশেষতঃ ১২শ অধ্যায়ের ১৩ শ্লোক হইতে অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য। "নৈষ্কর্ম্ম সিদ্ধি"তে সুরেশ্বরাচার্য্যপাদ গীতায় এতদ্বিষয়ক উপদেশের সার উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে —

"প্রাপ্ত আত্ম প্রবোধস্যাদ্বেষ্টৃত্বাদয়ো গুণাঃ।
অযত্নতো ভবন্ত্যস্য নতু সাধন রূপিনঃ॥" *

গীতা স্পষ্টরূপে বলিতেছেন,—

"আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমোমতঃ॥"
৬ মঃ।৩২"

সংক্ষেপতঃ যুগপৎ ব্রহ্মনিষ্ঠা ও সর্ব্বজীবহিতে রতি লাভে যত্ন এই উপাসনা ছাড়িয়া সাম্প্রদায়িক উপাসনায় কতদূর সম্ভবপর সকলেই বুঝিয়া দেখিবেন। ইহার আর একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, পূর্ণমাত্রায় সিদ্ধিলাভ না হইলেও ইহা নিষ্ফল হয় না। গীতার উক্তি যে,—

স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥
২।৪৫

এই যোগধর্ম্মের অল্পমাত্র অনুষ্ঠানও মহৎ ভয় হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। পরে ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন,—

"প্রাপ্য পুণ্য কৃতাং লোকা"নুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গৃহে যোগভ্রষ্টো ঽভিজায়তে॥"

(অর্থাৎ) "যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যাত্মাদিগের লোকে গমন করিয়া (সেইখানে) অনেক বৎসর বাস পূর্ব্বক পবিত্র অথচ সম্পন্ন ব্যক্তিগণের গৃহে জন্মলাভ করিয়া থাকেন।"

"অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম॥"

(অর্থাৎ) অথবা ধীমান যোগীদিগের কুলে সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি জন্মলাভ করিয়া থাকেন; মনুষ্যলোকে এই প্রকার যোগিগণের কুলে জন্ম (যোগভ্রষ্টগণের পক্ষে দুর্লভতর।"

* শ্রুতির সম্মত যিনি অনির্ব্বচনীয়, যিনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়-কর্ত্তা, তাঁহাতে নাম রূপাদি নির্দ্দেশ বশতঃ বিভিন্নের উপাসকগণ পরস্পর বিরোধাপন্ন। কিন্তু ইহার অর্থাৎ শ্রুত্যুক্ত উপাসনার সহিত তাহাদের কাহারও বিরোধ হয় না।

* যিনি পরমাত্মা সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট বোধ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার বিনা চেষ্টায় "অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্র করুণ এবচ" প্রভৃতি গীতা-বাক্যে সূচিত গুণসমূহ লাভ হয়। এই সকল গুণ তাঁহার পক্ষে সাধন স্বরূপ নহে। অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠের পক্ষে এ সকল গুণ অযত্নলব্ধ।

"তত্র তং বুদ্ধি সংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥"

(অর্থাৎ) সেই জন্মে (সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি) পূর্ব্বজন্মকৃত বুদ্ধি সংযোগ (অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত যোগ সংস্কার) প্রাপ্ত হয় এবং তাহার পর যোগসিদ্ধি লাভ করিবার জন্য পুনর্ব্বার যত্ন করিয়া থাকে।

"পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপিসঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দ ব্রহ্মাতিবিরিচ্যতে ॥"

(অর্থাৎ) তিনি অবশ হইয়া সেই পূর্ব্বাভ্যাসের দ্বারা যোগ মার্গে প্রবর্ত্তিত হন। যে ব্যক্তি যোগের জিজ্ঞাসু তিনি সমগ্র কর্ম্মকাণ্ডরূপ বেদের ফলকে অতিক্রম করিতে পারেন ; যে ব্যক্তি যোগ করিয়া থাকেন, তাহার ত কথাই নাই।

গীতা ৬ষ্ঠ: ৪১—৪৪ *

হিন্দু মাত্রেই বুঝিয়া দেখুন, এই উপাসনা গ্রহণ মাত্র কর্ম্মবন্ধন ক্ষয় হয় কি না। সুরেশ্বরের পরাম্পরায় শিষ্য শ্রীমৎ বিদ্যারণ্য স্বামীর উপদেশে প্রাপ্ত হয় যে, বিশ্বপ্রেম ও ব্রহ্মজ্ঞান একই বস্তুর নাম ভেদ। যথা,—

"দেহাত্মবৎ পরাত্মত্ব দাঢ্যাৎ বোধ সমাপ্যতে। *

পঞ্চদশী। চিত্রদীপ।

মূল কথা। প্রস্তাবিত উপাসনার উদ্দেশ্য ব্রহ্মনিষ্ঠা ও সর্ব্বভূতে হিতে রতি। অন্য কথায় বক্তব্য যে, উক্ত সাধনে যিনি সিদ্ধ তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ সর্ব্বভূত হিতে রত। সিদ্ধের যাহা স্বাভাবিক লক্ষণ, তাহাই সাধকের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থে যাঁহাদের বাহ্যিক অবলম্বনের প্রয়োজন, তাঁহাদের পক্ষে প্রণব ও গায়ত্রী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন, ইহাই সর্ব্ব হিন্দু-নামধারী মনুষ্যের সমাজে সমাদৃত শাস্ত্রের উপদেশ, ইহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখান গিয়াছে। বাহ্য দৃষ্টিতে ইহার দুইটী অসাধারণ গুণ। একদিকে হিন্দুত্ব রক্ষা, অন্য দিকে সার্ব্বলৌকিকত্ব। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টিয়ান মুসলমান প্রভৃতি মনুষ্য মাত্রেই নিজ নিজ সামাজিক, সাম্প্রদায়িক বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া ইহা গ্রহণ করিতে সক্ষম। পৃথিবীতে সৃষ্টিকর্ত্তা যে ভাবে শীতাতপ, উচ্চ-নিম্নতার বৈচিত্র্য স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে দেশ কাল পাত্র ভেদে আচার ভেদ অবশ্যম্ভাবী। আচার ভেদ সত্ত্বেও বিচার দ্বারা আন্তরিক একতা ও শাসনের পরিবর্ত্তে প্রেমই কর্ত্তব্যের প্রেরক হইতে পারে, এ সম্ভাবনাও সৃষ্টিকর্ত্তা রাখিয়াছেন। সেই সম্ভাবনার ব্যবহারে পরিণতিই মনুষ্য জীবনের চরম সাফল্য কি না ইহাও বিচারশীল ব্যক্তি বুঝিয়া দেখিবেন। অপরন্তু বুঝিয়া দেখিবেন যে, পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায় বাণিজ্য প্রচারাদির আধিক্য ও গতি-সৌকার্য্য বশতঃ জাতি বা উৎপত্তির ভিত্তি বলে মানুষে মানুষে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে দেশ ও আচারগত ভেদ পূর্ব্বের ন্যায় সংরক্ষণ সম্ভবপর নহে। তাহার সাধন-চেষ্টায় দুঃখ ভিন্ন আর কি ফলের প্রত্যাশা যুক্তিযুক্ত হয় ? যদি সাম্প্রদায়িক উপাসনা অবলম্বনে ক্রমে ক্রমে প্রস্তাবিত উপাসনায় প্রবেশাধিকারের জন্য যত্ন করা শ্রেয়ঃ বোধ হয়, তাহা হইলে মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ানের অপেক্ষা হিন্দু সম্প্রদায়ের সুবিধা কি না তাহাও বিবেচ্য। বর্ত্তমান অবস্থায় কোন বিশেষ হিন্দু সম্প্রদায়ের আচারে বদ্ধ মনুষ্যের জীবিকার্জ্জনের কিরূপ সুবিধা ? স্ববৃত্তিস্থ পণ্ডিত-ব্রাহ্মণগণ স্মার্ত্ত "আহ্নিক তত্ত্বে" উপদিষ্ট নিয়মানুষারে চলিয়া কয়জনের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতেছে ? এই নিয়মানুসারে চলিলে রেলে, ট্রামে গমনাগমন প্রায়শ্চিত্তার্হ অপরাধ কি না ? সরকারী বেতনভোগী অধ্যাপক পণ্ডিতের শাস্ত্রানুগত আপদ্ধর্ম্মও রক্ষিত হয় কি না ? এই সকল বিষয়ের আলোচনার ফলে আশঙ্কার কি স্থল নাই যে, প্রকৃত যথেচ্ছাচারই শাস্ত্রীয় আচার, এই মিথ্যা নামে হিন্দুকুলে প্রচলিত। এ দিকে শাস্ত্রের উপদেশ যে আত্মা "সত্যেন লভ্যঃ" অর্থাৎ সত্যের দ্বারাই আত্মলাভ। যদি হিন্দুত্ব রক্ষা করিয়া এরূপ উপাসনা প্রাপ্তব্য হয় যে তাহাতে হিন্দু অহিন্দু মনুষ্য মাত্রেরই হিত ও ধর্ম্ম-বিরোধের চির শান্তি তাহার অনুষ্ঠান ও প্রচার প্রকৃত ধর্ম্ম কি না ? হিন্দুদিগের অন্য সংখ্যাতীত বিষয়ে বিরোধ সত্ত্বেও ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকারে হিন্দু মাত্রেই এক-মত। ব্রাহ্মণ-পরিত্যক্ত হিন্দু আছে কিন্তু ব্রাহ্মণত্যাগী হিন্দু নাই। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে উৎপত্তি কুল

* মহা মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ কৃত অনুবাদ—
স্বদেহ সম্বন্ধীয় আত্মা ও পরদেহ সম্বন্ধীয় আত্মার তুল্যত্ব বোধের দৃঢ়তাই জ্ঞানের সমাপ্তি বা পরাকাষ্ঠা।

ও সম্প্রদায় অনুসারে যতই ভেদ থাকুক না কেন, ওঁকার ও সাবিত্রী গ্রহণে ব্রাহ্মণ নামধারী ব্যক্তি মাত্রেই এক-মত। এ অবস্থায় যদি ব্যবহার ও পরমার্থ সাধনের অক্ষুণ্ণ সহায় প্রণব গায়ত্রী ও তাহার গ্রহণে মনুষ্য মাত্রেরই অধিকার শাস্ত্রসম্মত হয়, তবে তাহার পরিত্যাগী হিন্দু শাস্ত্রানুসারে আত্মহত্যার অপরাধী হন কি না, ইহাও সকলে বিচার করিয়া দেখুন—এই বিনীত প্রার্থনা।

এরূপ আপত্তিও শুনা যায় যে, প্রস্তাবিত উপাসনা শাস্ত্রানুসারে শ্রেষ্ঠ হইলেও গৃহস্থের অনুষ্ঠেয় নহে। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে সচরাচর যাহা প্রমাণ বলিয়া শুনা যায়, তাহা তিন জাতীয়। প্রথম যে, ইহা ঐহিক ফলশূন্য। দ্বিতীয় যে, ইহা গৃহীর অসাধ্য। তৃতীয়, ইহা অন্ততঃ গৃহীর পক্ষে শাস্ত্রনিষিদ্ধ। পর্য্যায়ক্রমে এই তিন জাতীয় আপত্তি বিচার্য্য। প্রথমতঃ দ্রষ্টব্য যে এই উপাসনার বলে যদি মনুষ্য—"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্র করুণ এব চ" এই সকল গুণে অলঙ্কৃত হয়, তাহাতেই কি মনুষ্য-জীবনের সাফল্য নহে? ভোগ কামনার অবধি নাই। কাম্য ভোগে কামনারই বৃদ্ধি। সন্তোষো সুখ মূলং হি। যযাতি রাজার মহাভারতে রক্ষিত বাক্য সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালেই সত্য।

> ন জাতু কামঃ কাম্যানামুপভোগেন শাম্যতি।
> হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাধি বর্দ্ধতে॥

ভোগের দ্বারা কামনা শান্তির চেষ্টা ঘৃতের দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাণের চেষ্টার ন্যায় নিষ্ফল। সুখ সকলেই চাহে, কিন্তু কিসে যে সুখ তাহা কয়জন বুঝে? সুখ কোন বাহ্য পদার্থের নাম নহে। সুখ মনের অবস্থা-বিশেষের নাম। যদি বাহ্য পদার্থের নাম সুখ হইত তাহা হইলে একই পদার্থ সকলেরই সুখের হেতু হইত। কেহ দারা পুত্র রাজ্যের জন্য প্রাণপাত করিতেছে, কেহ বা স্বেচ্ছায় দারা পুত্র রাজ্য ত্যাগ করিতেছেন, সুখ উভয়েরই উদ্দিষ্ট। এই উপাসনার পরিণামে যে কি সুখ তাহা শুনিবার ইচ্ছা হইলে তৈত্তিরীয় উপনিষদের ৮ম অনুবাক দ্রষ্টব্য।

যিনি ঐহিক উন্নতির অভিলাষী তাঁহাকেও এই উপাসনার দ্বার হইতে রিক্ত-হস্তে ফিরিতে হইবে না। এ বিষয়ে সাক্ষাৎ বেদের উক্তি যথা—

"যং যং লোকংমনসা সম্বিভাতি বিশুদ্ধ সত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চকামান্। তং তং লোকং জায়তে তাংশ্চ কামান্। তস্মাদাত্মজ্ঞর্ষ ন চর্চ্চায়ৎ ভূতিকামঃ॥ ইতি মুণ্ডকাপাণিষৎ ৩।১০

দ্বিতীয় আপত্তি যে, প্রস্তাবিত উপাসনা গৃহীর অসাধ্য। এই আপত্তির অনুকূলে যে কি প্রমাণ আছে, তাহা দুর্দ্ধর্নির্ধার্য্য। বেদে দেখা যায় যে বহু গৃহস্থ এ উপাসনার উপদেশ দিয়াছেন। রাজা অশ্বপতি, অজাতশত্রুর এতদ্বিষয়ক উপদেশ বেদে প্রাপ্তব্য। রাজর্ষিগণের মধ্যে পরম্পরা ক্রমে প্রস্তাবিত উপাসনা রক্ষিত হইয়াছিল, ইহা গীতায় (২।৪) ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। যথা,

এবং পরম্পরা প্রোপ্তং ইমং রাজর্ষয়োবিদুঃ অর্থাৎ এইরূপ পরম্পরায় প্রাপ্ত এই যোগ রাজর্ষিগণ পাইয়াছিলেন। গৃহস্থ উদ্দালকের নিজ পুত্র শ্বেতকেতুকে এই উপদেশ দান ছান্দোগ্যে প্রাপ্তব্য। দ্বিপত্নীক যাজ্ঞবল্ক্য কর্ত্তৃক রাজার সভায় দত্ত এই উপদেশ বৃহদারণ্যকে রক্ষিত। কেহ কেহ বলেন যে, যাজ্ঞবল্ক্য গৃহস্থ অবস্থার অপূর্ণ জ্ঞান সম্পূর্ণ করিবার জন্য শেষে প্রব্রজ্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই অপূর্ণ জ্ঞানীর বাক্যই বেদ বলিয়া শিরোধার্য্য। আর প্রব্রজ্যার পরে যদি কোন উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহার কোন নিদর্শন নাই। শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি বুঝিয়া দেখিবেন যে, গৃহী অবস্থায় যাজ্ঞবল্ক্যকে অপূর্ণ জ্ঞানী বলিলে তাঁহার কর্ত্তৃক প্রকাশিত বেদের নিন্দা হয় কি না এবং বেদ নিন্দা নিরপরাধ কি না। অধুনাতন গৃহী বাচস্পতি মিশ্র প্রণীত ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী ভামতীর নামে প্রসিদ্ধ বেদান্ত সূত্রের টীকা সর্ব্বত্র সমাদৃত। তদ্ব্যতীত গৃহী কৃত অপর বৈদান্তিক গ্রন্থেরও প্রচার রহিয়াছে। স্মৃতি ভট্টাচার্য্য কৃত আহ্নিক তত্ত্বানুসারে গৃহস্থের পক্ষে অন্ততঃ মুখে এই উপদেশের সারাংশ প্রত্যহ প্রভাতে বলিবার বিধি আছে।

> "অহং দেবো নচান্যোস্মি ব্রহ্মৈবাহংন শোকভাকং।
> সচ্চিদানন্দ রূপোহহং নিত্যশুদ্ধ স্বভাববান॥"

* নির্ম্মলচিত্ত পরমাত্মা সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানবান পুরুষ যে যে লোক মনের দ্বারা সংকল্প করেন এবং যে যে কাম্যের কামনা করেন সেই সেই লোক ও কাম্য প্রাপ্ত হয়েন। অতএব ঐশ্বর্য্যকামী আত্মজ্ঞে অর্চ্চনা করিবেক।

এ বিষয়ে একই উপদেশ ছান্দোগ্য ও তৈত্তিরীয়ে প্রাপ্তব্য।
ছাঃ ৮অঃ।৪ পাঃ।১ সূ। তৈঃ ব্রঃ বল্লী। ৬অ।

স্ববৃত্তিস্থ* ব্রাহ্মণ মাত্রেরই ইহা অবশ্য গ্রাহ্য। ইহার অর্থ চিন্তাতেই ইষ্টসিদ্ধি ইহা শ্রুতি স্মৃতি সিদ্ধ। ইহা অতিরিক্ত, কিম্বা অন্যথা প্রয়োজনীয় হইলেও পরমার্থ সাধনে নিষ্প্রয়োজনীয়। গৃহীর অসাধ্য হইলে এ বিধি ন্যায়সঙ্গত হইত না।

গৃহীর পক্ষে প্রস্তাবিত উপদেশ প্রাপ্তির শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। উত্তম গৃহবান শৌনক অঙ্গিরসের নিকট এই উপদেশ পাইয়াছিলেন। সেই উপদেশেই মুণ্ডকোপনিষৎ গৃহী অর্জ্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট এই উপদেশ পাইয়াছিলেন। সেই উপদেশেই ভগবদ্গীতা। গৃহী শাক্ত উপাসকগণও সর্ব্বত্র সংস্কার বিষয়ে যে মন্ত্র পড়েন তাহাও এই উপাসনা মূলক।

"একমেব পরংব্রহ্ম স্থূল সূক্ষ্ম ময়ং ধ্রুবং।"

দ্রব্য শোধনের যে মন্ত্র তাহাও উক্তরূপ। কৌলিকার্চণ দীপিকা ধৃত তন্ত্র বচনও উক্তরূপ, যথা —

"কৌলজ্ঞানং তত্ত্ব-জ্ঞানং ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে"।

যস্যানুষ্ঠান মাত্রেন ব্রহ্মজ্ঞানী নরো ভবেৎ। মহা নিঃ সেই কুলাচার এই। (যথা) সথা—

জীবঃ প্রকৃতিতত্ত্বঞ্চ দিককালাকাশমেবচ।
ক্ষিত্যপ্তেজোবায়বশ্চ কুলমিত্যভিধীয়তে॥
ব্রহ্মবুদ্ধ্যা নির্বিশেষং এতোষাচরণঞ্চযৎ।
কুলাচারঃ স এবাদ্যে ধর্ম্মকামর্থমোক্ষদঃ॥

মঃ নিঃ তন্ত্র পউ, ৯৭৭-৯৮

অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টিস্থিতি লয় কর্ত্তার সহিত তাঁহার সৃষ্টি পঞ্চভূত ও দিককালজীব প্রকৃতি এই নয়ভাবে বিভক্ত, তিনি স্বাতন্ত্র্যশূন্য অর্থাৎ তিনি আছেন বলিয়া সৃষ্টি আছে, সৃষ্টি না থাকিলেও তিনি তন্ত্রোক্ত কুলাচারও মূল প্রস্তাবিত উপসনার সহিত এক। অথচ ইহার সংক্রান্ত যে আচার তাহার সর্ব্বভৌমত্ব স্থাপনার সম্ভাবনা দেখা যায় না। কিন্তু সার্ব্বলৌকিক ধর্ম্ম নীতির ও সদাচারের অবিরুদ্ধ বলিয়া প্রস্তাবিত উপাসনা বিশ্বজনীন হইবার যোগ্য। শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধে রক্ষিত উদ্ধবের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ সম্বন্ধেও এই কথা সুপ্রযুক্ত। সংক্ষেপতঃ শাস্ত্রীয় সর্ব্ব প্রকার উপাসনা সম্বন্ধেও পূর্ব্বোক্ত কথাই সুপ্রযুক্ত। সে যাহা হউক, গৃহস্থের পক্ষে প্রস্তাবিত উপাসনা অসাধ্য নহে ইহা নিঃসন্দিগ্ধ। অসাধ্য হইলে কোনও উপাসনাই সাধ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে না। যেহেতু সর্ব্ব উপাসনাই সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎভাবে অনির্ব্বচনীয় জগদীশ্বরের উপাসনা। যিনি নিজের ইষ্টের সে রূপ বা কার্য্য ধরুন না কেন সে স্পষ্টই যে চেতনাচেতন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি স্থিতি লয়ের আশ্রয় অনিত্যের নিত্য ভিত্তি, এক কথার বিষম্বাদী নাই। অথচ প্রত্যেক সম্প্রদায়ভুক্ত মনুষ্যের বিশ্বাস যে সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যযুক্ত উপাসনাই একমাত্র সত্য। সেই বৈশিষ্ট্যই যে চরম সত্য এই অধ্যবসায়ই ধর্ম্ম বিবাদের মূল। আর এই ধর্ম্ম-বিবাদই যে সর্ব্ব ধর্ম্ম-বিনাশী ইহা সর্ব্বদেশের ইতিহাসে প্রাপ্তব্য। প্রস্তাবিত উপাসনা ইষ্ট সিদ্ধির অনুষঙ্গে মনুষ্যের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের সর্ব্বোতোভাবে উপযোগী। এরূপ হিতকর উপাসনা গৃহস্থের অসাধ্য বলিয়া কোন ব্যক্তিরই কেন বিশ্বাস? ইহার এক হেতু সামান্য ও বিশেষ্যের ভেদ বোধের অভাব। আবাস ভূমির শীতাতপ, সমুদ্র হইতে উচ্চতা প্রভৃতি নৈসর্গিক ভেদে আচার ব্যবহারের ভেদ অবশ্যম্ভাবী এই বোধের অভাব। দেশকাল নিরপেক্ষ এ ভাবে ব্যবহার অসম্ভব। এই বোধের অভাব। ব্যক্তিগত প্রকৃতির বৈশ্বরূপ বশতঃ অবান্তর ভেদও সম্পূর্ণরূপে অপরিহার্য্য এই বোধের অভাব মূল কথা। ব্যক্তি জ্ঞান সহজ, অর্থাৎ বহির্দৃষ্টি গ্রাহ্য। সামান্য বা জাতি জ্ঞান অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত বুদ্ধির অন্তর্দৃষ্টি সাধ্য।

প্রস্তাবিত উপাসনায় যাঁহাদের বাহ্যিক কোন অবলম্বনের এমন কি কোন শব্দের ও প্রয়োজন হয় না তাঁহারা জীবকুলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্ব জীবের পূজনীয়, সত্যের উৎস জগদ্গুরু। অবলম্বনের প্রয়োজন হইলে প্রণব ও গায়ত্রীর অর্থযুক্ত অবলম্বনে সার্ব্বভৌমত্বের রক্ষা ও পরিবর্দ্ধন হয়। নিরলম্ব উপাসকের উদ্দেশে ব্রহ্ম শব্দের প্রয়োগ তাঁহাদের এক প্রকার অবমাননা। কিন্তু উক্ত অবলম্বনের প্রত্যেক বা সমবেত আশ্রয়ও সার্ব্বভৌমত্ব রক্ষক। অন্য সর্ব্ব সাম্প্রদায়িক উপাসনার তুলনায় ইহাই ব্রাহ্মণের বিশেষত্ব। এ প্রকার উপাসক নিজের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আনন্দে স্বতঃপ্রণোদিত বিচার পূর্ব্বক নরনামা জীব মাত্রেরই ব্যবহার ও পরমার্থ বিষয়ে হিতসাধনে যত্ন করিতে

* রসিক মোহন চট্টোপাধ্যায় সংস্করণ পৃঃ ৪।

* আমি দেব অন্য নহি, আমি নিশ্চয়ই ব্রহ্ম, শোকভাগী নহি। আমি সচ্চিদানন্দরূপ, নিত্য শুদ্ধ স্বভাববান।

সক্ষম। সম্প্রদায় ও দেশ কাল পাত্রভেদ তাঁহার নিকট হত বল। *

অধিকন্তু ভগবান বেদব্যাস সমগ্র শ্রুতির সার সংগ্রহ করিয়াছেন যে,

"কৃৎস্নভাবাৎ তু গৃহিনোপসংহারঃ।

(শঙ্করাভাষ্য) ব্রঃ সূঃ ৩।৪-৪৮

তু শব্দো বিশেষণার্থঃ। কৃৎস্নভাবোৎস্য বিশিষ্যতে। বহু লায়াসানি হি গৃহস্থাশ্রম কর্ম্মানি যজ্ঞাদীনি তং প্রতি কর্ত্তব্যে তয়োপদিষ্টানি। আশ্রমান্তর কর্ম্মানি চ যথা সম্ভব মহিংসেন্দ্রিয় সংযমাদীনি তস্যাহ্যপি বিদ্যন্তে। তস্মাৎ গৃহমেধিনোপসংহারোন বিরুধ্যতে।।' ৪৮

(কালীবর বেদান্তবাগীশ কৃত অনুবাদ):—"গৃহীর সম্বন্ধে বিশেষ আছে। সে বিশেষ কৃৎস্নভাব (কৃৎস্ন—সমুদায়) গৃহীর যে কৃৎস্নভাব আছে তাহা দেখাইবার জন্য শ্রুতি উপসংহারে গার্হস্থ্যের কথা বলিয়াছেন। বিশদার্থ এই যে, গৃহী সমুদায় বহ্বায়াস সাধ্য যজ্ঞাদি কার্য্য করিবেন ও অন্যাশ্রম বিহিত অহিংসা সংযমাদিও যথাসাধ্য অনুষ্ঠান করিবেন। গৃহীর গার্হস্থ্য বিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্ম কর্ত্তব্য আছে, অধিকন্তু তাহাদের আশ্রমান্তর বিহিত অহিংসা ব্রহ্মচর্য্যাদিও আছে। এই অধিকটুকু বলিবার জন্যই শ্রুতি উপসংহার কালে গৃহস্থের কথা বলিয়াছেন।"

তবে গৃহস্থের সহিত সন্ন্যাসীর ভেদ রক্ষার্থ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য এই উপাসনার যে বিশেষত্ব বা উপাধির বাহুল্য রূপে প্রচার করিয়াছেন তাহা যে গৃহস্থের সুসাধ্য নহে ইহা সুবোধ্য।

সন্ন্যাসীকে গৃহস্থ হইতে ভিন্ন না রাখিলে সন্ন্যাসাশ্রমের রক্ষা হয় না। সন্ন্যাস রক্ষার প্রয়োজন। অতএব এরূপ ভাবে উপাসনা রাখিতে হইলে যে সন্ন্যাসীর সহিত গৃহস্থের মিল না হয়। ভেদ রক্ষা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। ফলে এই উপাধিযুক্ত উপাসনা ও গার্হস্থ্য জল তৈলের ন্যায় বি-মিশ্র। কিন্তু এই উপাধি প্রস্তাবিত উপাসনার স্বরূপ নহে। এ উপাধির বিনাশে এ উপাসনার বিনাশ হয় না, ইহা পূর্ব্বে শাস্ত্রানুসারে দেখা গিয়াছে। আচার্য্য-পাদ সন্ন্যাসীর পক্ষে আত্মানাত্ম বিবেকসাধনের অবশ্য কর্ত্তব্যতা বিধান করিয়াও গৃহস্থকে ইহাতে অনধিকারী করেন নাই। অমুমুক্ষু গৃহস্থের পক্ষে ফলের বি-ভেদ মাত্র বলিয়াছেন। আত্মানাত্ম বিবেকে সৎ সন্ন্যাসীর মুক্তি। অমুমুক্ষু গৃহস্থের কৃচ্ছ্র, অশীতির ফললাভ। যথা, "সাধন চতুষ্টয় সম্পত্ত্যভাবেঽপি গৃহস্থনামাত্মানাত্ম বিচারে ক্রিয়মানেসতি তেন প্রত্যবায়ো নাস্তি কিন্তুতীব শ্রেয়োভবতি, দিনে দিনে তু বেদান্ত বিচারাৎ ভক্তি সংযুতাৎ। গুরু শুশ্রূষয়া লব্ধাৎ কৃচ্ছ্রাশীতি ফলং লভেৎ।। ইতুক্তং।

আচার্য্যপাদোক্ত যে সাধন চতুষ্টয় তাহার অন্তর্গত মুমুক্ষুত্ব। অমুমুক্ষু গৃহস্থের সম্বন্ধেই ফলশ্রুতি, মুমুক্ষুর সম্বন্ধে নহে।

মুমুক্ষু গৃহস্থের মুক্তি অসম্ভব একথা আচার্য্য আদৌ বলেন নাই। সৎ গৃহস্থ যে মুক্তির অধিকারী তাহার অনুকূল শাস্ত্র পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। অধিকন্তু মিতাক্ষরাতেও পাপ্ত হয়ে "শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাদী চ গৃহস্থোঽপি বিমুচ্যতে।" আচার্য্য বাক্যের অনুবাদ।

নিত্যানিত্য বস্তুর বিবেক, ঐহিক পারত্রিক ফলভোগে বিরাগ, নামদি ছয়গুণ এবং মুমুক্ষুত্ব এই চারিটির নাম সাধন চতুষ্টয় সম্পত্তি। ইহার অভাব সত্ত্বেও যদি গৃহস্থগণ আত্মানাত্ম বিচার করেন তাহাতে প্রত্যবায় নাই, কিন্তু অতীব শ্রেয়ঃ আছে। কথিত আছে যে, গুরু সুশ্রূষায় লব্ধ বেদান্ত বিচার প্রতিদিন ভক্তির সহিত অনুষ্ঠিত হইলে অশীতি কৃচ্ছ্রের ফললাভ হয়।—আত্মানত্ম বিবেকঃ।

এই উপাসনা প্রকার ভেদে উপদিষ্ট। যথা—"কুলাচারেন দেবেশি ব্রহ্মজ্ঞানং প্রজায়তে।"

প্রস্তাবিত উপাসনা গৃহস্থের পক্ষে শাস্ত্র নিষিদ্ধ কিনা এখন তাহাই বিশেষরূপে প্রচলিত সংস্কার অনুসারে বিচার্য্য। প্রণব গায়ত্রীতে অধিকার সংকোচের নিয়ামক সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য আশ্রম ভেদ নহে, বর্ণভেদ। অর্থ বোধের প্রতি দৃষ্টিশূন্য হইয়াও উক্ত দুই পরমার্থ—সাধনের অবলম্বন সামাজিক ব্রাহ্মণ্য রক্ষার বর্ত্তমানে একমাত্র উপায়। কিন্তু পরমার্থ রক্ষার একমাত্র উপায় অর্থবোধ। অর্থের সহিত এই উপায় গৃহীতার অন্য উপায় প্রয়োজন শূন্য। বর্ণভেদই অত্র অধিকার সঙ্কোচের নিয়ামক ইহার অবশিষ্ট বিচার

* প্রণবের বিস্তারিত অর্থ মুণ্ডকোপনিষদে প্রাপ্তব্য। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য, ভট্টগুণ বিষ্ণু, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য কৃত গায়ত্রীর অর্থ রামমোহন রায়ের "গায়ত্রীর অর্থ" নামক গ্রন্থে প্রাপ্তব্য।

পরে হইতেছে। গৃহীর পক্ষে প্রস্তাবিত উপাসনা নিষেধের শাস্ত্রীয় প্রমাণ স্থলে নিম্নলিখিত যোগবাষিষ্ঠীয় বচন উদ্ধৃত হয়। যথা ;

সাসার বিষয়া সক্তঃ ব্রহ্মজ্ঞোস্মীতি বাদিনঃ।
কর্ম্ম ব্রহ্মোভয় ভ্রষ্টং তাজেদন্ত্যজেবদ যথা ॥

অর্থাৎ সাংসারিক সুখে আবদ্ধ অথচ আমি ব্রহ্মজ্ঞ এইরূপ ব্যক্ত কর্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয় ভ্রষ্ট চণ্ডালবৎ পরিত্যাজ্য। একথা সত্য যে, যদি আশ্রমী বা অনাশ্রমী কেহ "আমি ব্রহ্মজ্ঞানী" বলিয়া অভিমান করে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই ব্রহ্ম ভ্রষ্ট নতুবা বেদ মিথ্যা। যস্যামতং তস্যমতং মতং যস্য ন বেদসঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতং অবিজানতং॥ এই কেন শ্রুতি। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞকে তাহাও ঐ শ্রুতি বলিয়াছেন। যথা—"নাহং মন্যে সুবেদেতি নোন বেদেতি বেদচ। *

ভগবান বেদব্যাস শ্রুতির মর্ম্ম ব্রহ্মসূত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—"অনাবিস্কুর্ব্বন্"। † ব্রঃ সূঃ ৩।৪।৫০

আর এক প্রকার শাস্ত্রীয় নিষেধের উল্লেখ দেখা যায়। যেমন শাক্ত তন্ত্রের উপদেশ "কলৌ পশুর্ণস্যাৎ" বা বৈষ্ণব পুরাণের উক্তি "কলৌ হরের্নামৈব কেবলংনাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।" এইরূপ নিজ নিজ সম্প্রদায়িক উপাসনার প্রশংসা বাদ যদি যথার্থ বাদ বলিয়া গৃহীত হয় তাহা হইলে পরস্পর বিরোধ বশতঃ প্রত্যেক শাস্ত্রেরই প্রমান্য লুপ্ত হয়। অথচ সর্ব্বসাম্প্রদায়িক পুরাণের একই রচয়িতা বেদব্যাস। অতএব এ প্রশংসা বা অর্থবাদ প্রথম প্রয়াসীর সন্দেহাদি বিক্ষেপ নিবৃত্তির জন্য অত্যুক্তি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সকল শাস্ত্রের প্রামান্য রক্ষাই সমীচীন।

আর একটী আপত্তি এই যে, প্রস্তাবিত উপাসনা যাঁহাদের আশ্রয় তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকের ভিতর এই উপাসনায় যাঁহরা সিদ্ধ তাঁহাদের সদ্‌গুণ সর্ব্বতোভাবে লক্ষিত হয় না। সিদ্ধির জন্য সাধনা। সিদ্ধের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক তাহাই সাধকের সাধন। যদি উভয়ে একই গুণ বর্ত্তাইত তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে সিদ্ধ সাধকের যে ভেদ তাহা অন্তর্হিত হইত। সাধক ও সিদ্ধের ভেদ সর্ব্ববাদি-সম্মত তবে সিদ্ধের গুণ পূর্ণ মাত্রায় না থাকিলে সাধকের সাধকত্ব লুপ্ত হইবে কি ন্যায়ে? শিশুতে যুবাবস্থা নাই বলিয়া কি মনুষ্যত্ব বা শিশুত্ব নাই। মুণ্ডক শ্রুতিতে "ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠ" কথাটী প্রাপ্তব্য। এ কথায় সুচিত যে, ব্রহ্মবিদের মধ্যেও উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট আছে। অপকৃষ্ট ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবিৎ। এইটী বুঝাইবার জন্যই গৌড় পাদাচার্য্য—বলিয়াছেন যে, "আশ্রমা স্ত্রিবিধা-হীন মধ্য-মোৎকৃষ্ট দ্রষ্টয়। ‡

অপর এক আপত্তি এই যে, রসবর্ত্তার অভাবে প্রস্তাবিত উপাসনা গৃহস্থের অনুপযোগী। এ আপত্তি শুনিবামাত্র বিস্ময় জন্মে। যে হেতু উপাস্যের উদ্দিষ্ট তৈত্তিরীয় শ্রুতির উক্তি যে, "রসোবৈসঃ" অর্থাৎ তিনিই রস। এই নিত্যানন্দ এক রস, নিজ অত্যাশ্চর্য্য বিচিত্র শক্তি যোগে জীবের অন্তরে ভিন্ন ভিন্ন রসের আবির্ভাব করিয়াছেন। রস যে, বস্তু তাহার প্রতিদৃষ্টি শূন্য হইয়া তাহারই বিভিন্ন বিশেষের প্রতি বদ্ধলক্ষ্য ব্যক্তির পক্ষেই রস বস্তুর পরমাত্মাতে অভাব বোধ সম্ভব। নতুবা যিনি সকলেরই সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা তিনি কি ঋণগ্রস্থ হইয়া রসকে সৃষ্টি করিয়াছেন? কোন বিশেষ রসে আবিষ্ট হইয়া রস স্বরূপ যে পরমাত্মা তাঁহার সম্বন্ধে ঔদাসীন্য বা অবিশ্বাস সাধনের বিঘ্ন—একথা সত্য। যেমন কাণা কড়ীর লোভে মাণিক ত্যাগ। পরমার্থ সাধনে যে রস বিজ্ঞানের বিনাশ হয় না, এ কথা একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা সুবোধ্য হইতে পারে। ভগবান শঙ্করাচার্য্য প্রস্তাবিত উপাসনায় আদর্শ সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া সাধারণতঃ গৃহীত। যদি তাঁহাতে আলোকসামান্য সকলের পরিচিত রসজ্ঞতা দেখা যায় তাহা হইলেও কি কেহ এই উপাসনাকে রস বিনাশিনী বলিবেন? তৎ প্রণীত, "আনন্দ লহরীতে" পরমাত্মার অনির্ব্বচনীয় শক্তির উদ্দেশ্যে তিনি গাহিতেছেন,

ত্বদীয়ং সৌন্দর্য্যং তুহিন গিরিশৃঙ্গো তুলয়িতুং।
কবীন্দ্রাকল্পন্তেকথমপি বিরঞ্চি প্রভৃতয়ঃ॥...
কবীন্দ্রাণাং চেতঃ কমলবন বালাতপরুচিং।
ভজন্তে যে সন্তঃকতিচিদারুণামেবভবতীং॥
বিরঞ্চি প্রেয়স্যাস্তরুণতর শৃঙ্গার লহরীং।
গভীরাভির্বাগ্ভিবিদধতি সভারঞ্জনময়ীঃ॥

* বর্ত্তমানে ইংরেজির যেরূপ প্রচার তাহাতে শ্রুতির অর্থ ইংরেজি শব্দে সুবোধ্য হইতে পারিবে God can be apprehended but not comprehended.

† জ্ঞানী—দর্প রহিত জ্ঞান ব্যক্তি না করিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিবেন।

‡ হীন দৃষ্টি, মধ্যম দৃষ্টি ও উত্তম দৃষ্টি অধিকারী এই তিন প্রকার। মুণ্ডক কারিকা। ৩য় প্রকরণং।

সেই মহাশক্তিই "প্রণত জন সৌভাগ্য জননী।" মদন তাঁহাকে প্রণাম করেন, "রতি নয়ন লেহ্যেন বপুষা" এবং তিনি "প্রকটিত বরাভীতিরভিনয়া।" অঙ্গ বিশেষ দ্বারা নহে। *

স্থাপত্যবিৎগণ শেষোক্ত কথার ভাব বিশেষরূপে বুঝিবেন। রসজ্ঞ ব্যক্তিগণ কাব্য জগতে উদ্ধৃত রসাত্মক বাক্যের তুলনা আবিষ্কারে সফল যত্ন হইবেন কিনা সন্দেহের বিষয়। যদি ইহাতেও নীরসত্ব অপবাদের পরিহার না হয় তবে নিরুপায়।

শ্রীমদ্ভাগবত যাঁহাদের নিকট রসের খনি তাঁহারা স্মরণ রাখিবেন যে, এই গ্রন্থখানি শাঙ্কর সম্প্রদায়ে সংরক্ষিত এবং শাঙ্কর দণ্ডী শ্রীধর কর্তৃকই পণ্ডিত সমাজে মহাপুরাণ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত।

জ্ঞানানুষ্ঠান ভক্তির বিরোধী ইত্যাকার ধারণা করিলে বক্তব্য যে, যিনি অনেকের নিকট শুষ্ক জ্ঞানের অবতার বলিয়া নিন্দিত সেই শঙ্করাচার্য্যই "বিবেক চূড়ামণিতে" বলিয়াছেন যে, "মোক্ষ সাধন সামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী" অর্থাৎ মোক্ষ সাধনের সর্ব্ব উপকরণ অপেক্ষা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। গীতানুসারে জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ ভক্ত। যথা "প্রিয়োহিজ্ঞানিনো-ঽত্যর্থমহংসচমমপ্রিয়ঃ। অর্থাৎ জ্ঞানীর আমি অত্যন্ত প্রিয় ও জ্ঞানীও আমার প্রিয়। গী ৭।১৭

তথাচ শ্রুতি—যথা—"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়ো অন্যস্মাৎ অন্তরতময় অয়মাত্মা। † বৃহদাঃ ১।৪।৮

ইহারই আনুষঙ্গিক অন্য আপত্তি এই যে, প্রস্তাবিত উপাসনায় সাধন সম্বন্ধে পরমেশ্বরের প্রভাব অস্বীকার বশতঃ তাঁহার মহিমার খর্ব্বতা সংঘটন। তিনিই যে সিদ্ধ দাতা ইহাই শ্রুতির উপদেশ যথা;

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
নমেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষো বৃণুতে তৈনেষ-লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং ॥‡ টও মুণ্ডক,

তিনিই যখন সাধকের আত্মা তখন কি আর আছে যে তাহার নিজস্ব হইবে? আত্মা বলিয়া গ্রহণের তুলনায় প্রেম বা ভক্তি আর অধিক কি হইতে পারে? ইহা দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয় যে, যিনি নিজের স্বাধীনতা তাঁহাতে সমর্পণ করেন তিনি ভক্ত, যিনি বাৎসল্য সমর্পণ করেন তিনি ভক্ত, যিনি মিথুন ভাব সমর্পণ করেন তিনি ভক্ত আর যিনি নিজের সত্তার সহিত সর্ব্বস্ব সমর্পণ করেন তিনি অভক্ত। মধ্যাহ্ণ মার্ত্তণ্ডের খদ্যোতের নিকট উজ্জ্বলতায় পরাভব। হরি! হরি!

শাস্ত্রানুসারে যদি দ্বিজেতরের পক্ষে প্রণয় গায়ত্রী গ্রহণ নিষিদ্ধ হয় তাহা হইলে প্রস্তাবিত উপাসনার সার্ব্বভৌমত্ব নাই—ইহা নিশ্চিত। তাহাই এখন বিচার্য্য।

দ্বিজেতরের প্রণবাদিতে অধিকার শাস্ত্রনিষিদ্ধ, ইহার প্রমাণ স্বরূপ অনেকে বলেন যে, শাস্ত্রানুসারে স্ত্রী শূদ্রের বেদাভ্যাসে নিষিদ্ধ। প্রণব গায়ত্রী বেদের অন্তর্গত অতএব দ্বিজেতরের পক্ষে নিষিদ্ধ। এ যুক্তি যদি ন্যায়সঙ্গত হয় তবে অহং, তং, গচ্ছতি, ইচ্ছতি, তথা, এক, প্রভৃতি শব্দও নিষিদ্ধ হইবে। যদি বলা যায় যে শব্দ নিষিদ্ধ নহে বাক্য নিষিদ্ধ তবে—

"যদিচ্ছান্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি।"

"যত্রনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈমং মন্যতেহতঃ"। ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য যাহা স্ত্রী শূদ্র দ্বিজবন্ধুদিগের অধিকৃত পুরাণাদি স্মৃতি শাস্ত্রে প্রাপ্তব্য তাহাও নিষিদ্ধ হইবে। শ্রুত্যুক্ত উপাসনা স্ত্রী শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ এ সিদ্ধান্তও ক্ষোদক্ষম নহে। শ্রুত্যুক্ত উপাসনা দুই প্রকার—নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা বা ব্রহ্ম জ্ঞান ও সগুণ বা বাহ্য অবলম্বনে উপাসনা। এই দুই প্রকার উপাসনাই গীতা প্রভৃতি স্মৃতি শাস্ত্র ও ব্রহ্মজ্ঞান বিধায়ক তন্ত্র শাস্ত্রের উপদেশে সকলেরই প্রাপ্তব্য। এস্থলে দ্বিজেতরের পক্ষে বেদাভ্যাস নিষিদ্ধ এই জন্য বেদের অন্তর্গত শব্দ, বাক্য বা উপাসনা নিষিদ্ধ হেতুর ব্যাপ্যাসিদ্ধি হয় কিনা পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন। বেদাভ্যাস সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় নিষেধের প্রকৃত মর্ম্মানুসন্ধান বর্ত্তমান ক্ষেত্রে

---

* গ্রন্থ ভঙ্গের ভয়ে অনুবাদ চেষ্টায় বিরতি।

† সেই যে আত্মা তিনি পুত্র অপেক্ষা প্রিয়, বিত্ত অপেক্ষা প্রিয়, অন্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়।

‡ এই আত্মা বহু বেদের অধ্যয়ন দ্বারা কিম্বা অভ্যাস দ্বারা কি বহুবিধ উপদেশ শ্রবণ দ্বারা প্রাপ্ত হয়েন না কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত যে প্রার্থনা করেন সেই প্রার্থনার দ্বারা তাঁহাকে লাভ হয় এবং সেই আত্মা ঐ ব্যক্তির সম্বন্ধে আপন স্বরূপকে স্বয়ং প্রকাশ করেন। (রামমোহন রায়ের অনুবাদ)

অপ্রাসাঙ্গিক। বঙ্গদেশের আচার ব্যবহার যে সকল নিবন্ধ গ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাতে যে যুক্তির বিচার হইল তাহা গৃহীত হয় নাই। তথা সাঙ্গ সাবিত্রী যে বেদ নহে তাহা পূর্ব্বে প্রবন্ধে দেখা গিয়াছে। অধিকন্তু মনুক্ত বিধি অনুসারে যখন বেদাধ্যয়নের আদিতে ও শেষে ওঁকার পঠিতব্য তখন অধ্যয়ন আদ্য ওঁকাব উচ্চারণের পরবর্ত্তী এবং অধ্যয়ন সমাপ্তির পর শেষ ওঁকার পাঠ। ইহাতে স্পষ্টই প্রাপ্তব্য যে ওঁকার বেদাধ্যয়নের অন্তর্গত নহে অধ্যয়নের পরিপোষক।

বঙ্গদেশে বর্ত্তমানকালে যাহা শাস্ত্রীয় আচার বলিয়া প্রচলিত তাহা মহামহোপাধ্যায় শ্রীমৎরঘুনন্দন স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক স্থাপিত। তৎপ্রণীত অষ্টবিংশতি তত্ত্বের অন্তর্গত মলমাস ও দীক্ষা তত্ত্বে ও অন্যত্র এ বিষয়ের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা বিশেষরূপে প্রাপ্তব্য। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সতীর্থ শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মহাশয় কৃত "তন্ত্রসারে"রও দুই স্থানেও এ বিষয়ের ব্যবস্থা আছে। উভয়ে প্রায় একই শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। উভয়ের মধ্যে কেবল একটী তান্ত্রিক বচনের ভিন্ন পাঠ দেখা যায়। আর আগমবাগীশ মহাশয় তন্ত্রান্তর উল্লেখে একটী অতিরিক্ত বচন সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা হোমাধিকারে বিচার্য্য। গৌড়ীয় স্মার্ত্ত ও তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের শিরোভূষণ পণ্ডিতগণ যখন শাস্ত্রীয় প্রমাণান্তর দেখান নাই তখন তাহার অনুসন্ধান বিড়ম্বনা মাত্র। মলমাস তত্ত্বে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য "অথ স্ত্রী শূদ্রয়ো প্রণব যুগ্মন্ত্রাঃ নিষেধঃ। নৃসিংহ তাপনীয়ে, সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রী শূদ্রয়ো নেচ্ছন্তি। সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং যদি শূদ্রো জানীয়াৎ সমৃতো গচ্ছতি। নেবচ্ছন্তি পর্য্যন্তং পরাশর ভাষ্যেপি গোবিন্দ ভট্ট ধৃতং।

স্বাহা প্রণব সংযুক্তং শূদ্রে মন্ত্রং দদাদ্দ্বিজঃ।
শূদ্রো নিরময়াপ্নোতি ব্রাহ্মণঃ শূদ্রতা মিয়াৎ।"

দীক্ষা তত্ত্বে শ্রুতির অংশান্তর সংগৃহীতং যথা, "সাবিত্রীং লক্ষ্মীং যজুঃ প্রণবমিত্যাদি। আগমবাগীশ মহাশয়ের পূর্ব্বোক্ত তান্ত্রিক বচনের শেষ চরণের পাঠ এই। যথা:— "ব্রাহ্মণো যাত্যধো গতিং। অধিকন্তু যজুর্লক্ষ্মী শব্দেরও তিনি অর্থ এইরূপ করিয়াছেন। যথা "যজুর্বেদঃ। লক্ষ্মীঃ শ্রীবীজামিত্যর্থঃ।"

স্মার্ত্ত কৃত যজুর্লক্ষ্মীঃ পদের অর্থ নাই কিন্তু দীক্ষা তত্ত্বে গৃহীত শ্রুত্যাংশ দেখিয়া অনুমান হয় যে, "তন্ত্রসারে"র প্রদত্ত অর্থ তাঁহারও সম্মত। পরাশর ভাষ্য ও গোবিন্দ ভট্টের নামোল্লেখ দেখিয়া আরও মনে হয় যে, নিবন্ধকারদ্বয় মূল গ্রন্থ হইতে শ্রুতিটি সংগ্রহ করেন নাই। মূল গ্রন্থ দেখিলে অবশ্যই বুঝিতেন যে, যজুর্লক্ষ্মীঃ তাপনীয়োক্ত মন্ত্র বিশেষ সে মন্ত্রটী এই যথা:—"ওঁ ভূর্লক্ষ্মী ভুবলক্ষ্মী স্বঃ কালকর্ণী তন্নো মহালক্ষ্মীঃ প্রচোদয়াৎ"। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, নিবন্ধকারদ্বয় মূলশ্রুতি দেখেন নাই। এজন্য মূলশ্রুতি দ্রষ্টব্য মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে এখন এ কার্য্য সহজেই সম্পন্ন হয়। সূত্রপাতে বক্তব্য এই যে, নৃসিংহ তাপনীয় উপনিষৎ দশোপণিষদের অন্তর্গত নহে বলিয়া উহার সার্ব্বভৌমত্ব নাই। ইহা কেবল নৃসিংহ উপাসকদিগেরই অবলম্বনীয়। এ শ্রেণীর উপাসক সম্প্রদায় ভারতবর্ষের কুত্রাপি আছেন বলিয়া অপরিজ্ঞাত। তাহা ছাড়া উদ্ধৃত শ্রুতিতে 'নেচ্ছন্তি' এই ক্রিয়া পদে বিধিসূচক কোন বিভক্তি নাই। অতএব উদ্ধৃত শ্রুতি অন্যত্র শ্রুত বিধির অনুবাদ মাত্র। অথচ কোনও বিধায়ক শ্রুত্যুক্ত প্রমাণ সংগৃহীত হয় নাই এবং শ্রুতি উদ্ধার করিতে উহার অঙ্গচ্ছেদ হইয়াছে। শ্রুতিটির পূর্ণাবয়ব নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা—

"সংহোবাচ প্রজাপতিঃ সবেহবৈতৎ সাবিত্রস্য অষ্টাক্ষরং পদং শ্রিয়াভিষিক্তং তৎ সাম্নোহঙ্গং বেদ শ্রিয়াঃ হৈবা ভিষিচ্যতে, সর্ব্বে বেদাঃ প্রণবাদিকা; তৎপ্রণবং তৎ সাম্নোহঙ্গং বেদ স ত্রিলোকান্ জয়তি। চতুর্বিংশত্যাক্ষরা মহালক্ষ্মী র্যজুস্তৎ সাম্নোহঙ্গং বেদ স আয়ুর্যবীর কীর্ত্তি জ্ঞানৈশ্বর্য্যবান ভবতি। তস্মাদিদং সাঙ্গং সামজানীয়াৎ। যোজানীতে সোহমৃতত্বঞ্চ নিযচ্ছতি। সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রী শূদ্রায় নেচ্ছন্তি। দ্বাত্রিশদক্ষরং সামজানীয়াৎ। যো জানীতে সোহ মৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি সাবিত্রীং লক্ষ্মীঃ যজুঃ প্রণবং যদি জানীয়াৎ স্ত্রী শূদ্রঃ সমৃতোহ ধোঃ গচ্ছতি। সর্ব্বদা নাচষ্টে যস্তাচষ্টে স আচার্য্য স্তেনৈব মৃতো মৃতো ধোগচ্ছতি। ১ম ও ৩য় খণ্ড।

বৈরাগ্যবান দেবতাগণ সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতিকে ছয়টী প্রশ্ন করেন। তাঁহাদের প্রতি প্রজাপতির উত্তর পূর্ব্বোধৃত শ্রুতি। গ্রন্থের উত্তর অংশে পাওয়া যায় যে, 'স্বামী সূর্য্য

আদিত্য," এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র সাবিত্রী, চতুর্বিংশতি অক্ষরা মহালক্ষ্মী যজুঃ পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। নিম্নোক্ত মন্ত্রের নাম শুদ্ধ সাম।

উগ্রংবীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বোতো মুখং।

নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যু মৃত্যুং নমাম্যহং॥

এই মন্ত্রই নৃসিংহ মন্ত্র নামে "সারদা তিলক" ও "তন্ত্র সারে" উদ্ধৃত বলিয়া সকলেরই অধিকারভুক্ত। শ্রীবীজের দ্বারা অভিষিক্ত অষ্টাক্ষর পদ পূর্ব্বোক্ত উগ্রংবীরমিত্যাদি শুদ্ধ সামের অঙ্গ। শ্রীবীজের দ্বারা তাহার অভিষেক কর্ত্তব্য। সর্ব্ব বেদের আরম্ভ যে পণব, সেই প্রণব এই সামের অঙ্গ জানিবে। যিনি জানেন তিনি তিন লোক জয় করেন। চতুর্বিংশতি অক্ষরা যে মহালক্ষ্মী যজুঃ তাহা সেই সামের অঙ্গ জানিবে। যিনি জানেন তিনি আয়ুর্যশ কীর্ত্তি জ্ঞানৈশ্বর্য্যবান হয়েন, অতএব এই সাঙ্গ সাম জানিবে। যিনি জানেন তিনি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েন। পূর্ব্ব কথিত সাবিত্রী, প্রণব ও যজুর্লক্ষ্মী স্ত্রী শূদ্রের পক্ষে অনভিপ্রেত। বত্রিশ অক্ষর সাম। উগ্রবীরমিত্যাদি জানিবে। যিনি জানিবেন তিনি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইবেন। সাবিত্রী প্রণব যজুর্লক্ষ্মী স্ত্রী শূদ্র যদি জানে তাহা হইলে মরণান্তে অধোগামী হয়। সর্ব্বদা বলিবে না। বলিলে তাহাতেই আচার্য্যের মরণান্তে অধোগতি হয়। নৃসিংহ তাপনীয় হইতে উদ্ধৃত শ্রুতির এই অর্থ।

এখানে দ্রষ্টব্য এই যে মুমুক্ষুর পক্ষে শুদ্ধ সাম যাহা নৃসিংহ মন্ত্রের নামান্তর ও সাঙ্গ সাম অর্থাৎ সাবিত্রী প্রণব যজু লক্ষ্মী এই তিনটীই ও নৃসিংহ গায়ত্রী নামক মন্ত্র সমন্বিত নৃসিংহ মন্ত্র এতদুভাই সমাস। যে হেতু উভয়ই অমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তি লাভের হেতু। ঐহিক বিভূতি লাভের হেতু যে তিনটী সামঙ্গ তাহাই স্ত্রী শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ শুদ্ধ সাম তাহাদের পক্ষে অনভিপ্রেত নহে, ইহা প্রথম উপনিষতের ৭ম খণ্ডে স্পষ্টাক্ষরে প্রাপ্তব্য।

এই উপনিষদের ভাষ্য—শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের নামে পরিচিত। তাহাতে তৎপূর্ব্বোক্ত উপদেশের সংক্ষিপ্ত সার নিম্নলিখিত মত প্রদত্ত। যথা—"সাঙ্গং সামচেৎ প্রথম পাদান্তে প্রণবং নিক্ষিপ্য দ্বিতীয় পাদন্তে সাবিত্রীং তৃতীয় পাদান্তে যজু র্লক্ষ্মীং চতুর্থ পাদন্তে নৃসিংহ গায়ত্রীং গায়েৎ। স্ত্রীচেৎ শূদ্রনেৎ এতৎ ত্রিতয়ং বিহায় শুদ্ধ সাম গায়েৎ। অর্থাৎ আদি সাঙ্গ সামের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে নৃসিংহ মন্ত্রের প্রথম চরণের পর প্রণব, দ্বিতীয় চরণের পর সাবিত্রী, তৃতীয় চরণের পর যজুর্লক্ষ্মী এবং চতুর্থ চরণের পর নৃসিংহ গায়ত্রী নিক্ষেপ করিয়া গাহিবে। যদি স্ত্রী বা শূদ্র হয় তাহা হইলে এই তিনটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধ সাম গাহিবে, ভাষ্যের এই অর্থ। এখন পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন যে, প্রদর্শিত প্রমণানুসারে স্ত্রী শূদ্রের পক্ষে নৃসিংহ উপাসনায় ঐহিক ফলার্থী ভিন্ন অন্যের সম্বন্ধে প্রণবাদি নিষিদ্ধ কিনা।

"স্বাহা প্রণব সংযুক্তং" ইত্যাদি যে তান্ত্রিক বচন নিবন্ধকার দ্বয় উদ্ধার করিয়াছেন তাহার উৎপত্তি অবিদিত। যদি কোন কাম্য উপাসনা সম্বন্ধে উক্ত প্রকার মন্ত্র নিষিদ্ধ হয় তাহাতে মুমুক্ষুর কিছুই হানি লাভ নাই। আর যদি ইহা "রুদ্রযামলোক্ত" নিম্নলিখিত বচনের পাঠান্তর মাত্র হয় তাহা হইলেও মীমাংসা দুরূহ হয় না।

প্রণবাদ্যং ন দাতব্যং মন্ত্রং শূদ্রায় সর্ব্বথা।

শূদ্রো নিরয়মাপ্নোতি ব্রাহ্মণো যাতাধো গতিং॥ *

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক দীক্ষা তত্ত্বে ধৃত কূর্ম্মপুরাণীয় বচন এখানে সুপ্রযুক্ত হয় কিনা বিচার্য্য বচনটি এই। যথা—

† "করালভৈরবঞ্চাপি যামলং বামমেবচ এবম্বিধানিচান্যানি মোহনার্থা নীহানিচ ময়া সৃষ্টানি চান্যানি মোহায়ৈষাং ভবার্ণবে॥

নিবন্ধকার দ্বয়ের সংগৃহীত প্রমান আলোচনা করিয়া "শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী" রচয়িতার সিদ্ধান্ত এই যে তান্ত্রিক মন্ত্র সম্বন্ধে উক্ত প্রমাণের প্রয়োগ হয় না বৈদিক মন্ত্রেই উহার প্রয়োগ আবদ্ধ। এমত যদি গ্রাহ্য হয় তবে যখন বর্ত্তমান কালে পরমার্থ সাধনে বৈদিক মন্ত্রের ব্যবহার নাই তখন তাহার বিচার বা আলোচনা শিরোনাস্তি শিরঃপীড়া ভিন্ন আর কি? এই সমস্ত দেখিয়া সিদ্ধান্ত এই হয় কিনা যে, লিঙ্গ বর্ণাশ্রম নিরপেক্ষায় নিরঞ্জন পরমাত্মার উপাসক প্রণবাদির

* রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কৃত সংস্করণ। পৃঃ ১ সুপ্রযুক্ত হয় কিনা বিচার্য্য। বচনটী এই। যথা—

† ইহাদিগের অর্থাৎ অসুরগণের ইহসংসারে মোহের জন্য করাল ভৈরববাম মার্গীয় যামল এইরূপ বহু অন্য শাস্ত্র আমা কর্ত্তৃক ভবার্ণবে মোহনার্থ সৃষ্ট হইয়াছে।

অধিকারী? অধিকন্তু স্ত্রী শূদ্র ও বৈদিক মন্ত্র সাম গাহিতে অধিকারী, যদি নৃসিংহ তাপসীয় উপনিষৎ, সারদা তিলক ও তন্ত্রসার প্রমাণ্য হয়।

উপসংহারে অপর একটী বিষয় আলোচ্য। শ্রুতি স্মৃতি অনুসারে প্রণব গায়ত্রী বা শুদ্ধ প্রণব অবলম্বনেই কৃতার্থতা। অন্য পক্ষে আগমোক্ত বিধানে উপাসনায় কৃতার্থতা। কৃতার্থতার জন্য উভয় সাধনের সংমিশ্রন কোন শাস্ত্রেই উপদিষ্ট নহে। এ অবস্থায় কৃতার্থতার জন্য উক্ত সংমিশ্রণ অশাস্ত্রীয়। প্রয়োজনাভাবে প্রবৃত্তি অসম্ভব। অথচ সামাজিক ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর এ বিষয়ে প্রবৃত্তি প্রত্যক্ষ। সেই প্রবৃত্তির উদ্ভাবক যে প্রয়োজন তাহার অনুসন্ধানে সামাজিক প্রাধান্য রক্ষা ভিন্ন অপর কোন কিছু প্রাপ্তব্য আছে কিনা ইহাই বিবেচ্য। যদি অপর কিছু না থাকে তবে একের লৌকিক হিতার্থে বহু অপরের অনিষ্ট ন্যায়ধর্ম্মসঙ্গত কিনা তাহা বিবেচ্য। যদি বলা যায় যে, প্রচলিত সাম্প্রদায়িক বিধানে সকলেরই কৃতার্থতার দ্বার নির্মুক্ত তখন একেরও প্রাধান্য হানি ন্যায়ধর্ম্মসঙ্গত নহে। ইহাই কি তাহার সদুত্তর নহে যে, বর্ত্তমানে বৈষ্ণব, শাক্ত বা স্মার্ত্ত আচারে সমাজ রক্ষা, বৃত্তি রক্ষা, বিদ্যা বৃদ্ধি রক্ষা, দেশ রক্ষা, সংক্ষেপতঃ আত্মরক্ষা সম্ভবপর নহে। যাহাতে জীবনের অহিত তাহাতে মুখে-ধর্ম্ম রক্ষা ফলতঃ সর্ব্বধর্ম্মের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

কোন সম্প্রদায়ই অন্য সম্প্রদায়ে কৃতার্থতা সাধনের সম্ভাবনা স্বীকার করে না বরং বিনাশ সাধনের প্রত্যেকের যত্ন ইহা প্রত্যক্ষ। অন্যত্র দৃষ্টি শূন্য হইয়া কেবল হিন্দু নামধারী মনুষ্যেরই কি ব্যবহার দেখা যায়? সম্প্রদায় ভেদে মানুষে মানুষে ভেদ। সে ভেদ কেবল ঐহিক বিলাস হইতে নহে। বৈষ্ণবেতরের গোলক হইতে নির্ব্বাসন তথা শাক্তেতরের পার্থিক মনুষ্যগণ বুঝিয়া দেখুন যে, পরমার্থ বর্জ্জিত যে লৌকিক সম্প্রদায় বা একাধিক ব্যক্তির একতা তাহার ভিত্তি ঐহিক পারস্পরিক স্বার্থ। মনুষ্য ও পশুর মধ্যে যে অভাব সমান তাহার পূরণের যে স্বার্থ তাহাই অপর স্বার্থগত একতার অপেক্ষা দীর্ঘজীবী। কিন্তু এখানেও একতার বিরোধ উৎপাদিকা শক্তি মনুষ্য প্রকৃতির অন্তর্গত। ভোগ্য পদার্থের দেশ কাল ঘটিত সীমা অবশ্যম্ভাবী। সন্তোষ ও মনুষ্যের অযত্ন লব্ধ গুণ নহে। এজন্য লৌকিক সম্প্রদায় বিনশ্বর ও পরস্পর প্রতিযোগী। স্থায়ী শান্তির হেতু নহে। কিন্তু অনিত্য জগতের বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত যে নিত্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষা তাহার সম্বন্ধে প্রতিযোগিতা অসম্ভব বরঞ্চ অনুযোগিতাই অবশ্যম্ভাবী। এ আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতার জন্য কাহেকেও কাহারও অংশ ক্ষুণ্ণ করিতে হয় না। একজনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে দেখিলে তাহার সকলের কৃতার্থতার আশা ও যত্ন বৃদ্ধি হয়। প্রাস্তাবিত উপাসনা ঘটিত একতা অবিচ্ছেদ্য। উপাসকের ব্রতই সর্ব্বজীবের হিতসাধন। কোন ধর্ম্মের নিন্দা তাহার পক্ষে অধর্ম্ম। কাহারও বৃত্তিলোপের চেষ্টা অধর্ম্ম।

"বিবেকং কিং সোঽপি রস জনিতা যত্র ন কৃপা
সকিং যোগো যস্মিন্ ন ভবতি পরানুগ্রহ রসঃ।
সকিং ধর্ম্মো যত্র স্ফুরতি ন পরদ্রোহ বিরতি॥
শ্রুতং কি তত্বস্যাৎ উপশম ফলং যন্নভবতি শান্তি শতকং।

সে কি বিবেক যাহাতে সরস কৃপা জন্মায় না। সে কি যোগ যাহাতে পরানুগ্রহ রস জন্মায় না। সে কি ধর্ম্ম যাহাতে পরদ্রোহ বিরতির স্ফুর্ত্তি হয় না। সে শাস্ত্রাভ্যাস কি যাহাতে নিবৃত্তিরূপ ফল জন্মে না।

ষ্টীম-এন্‌জিনের (Steam-engine) ক্রম-বিকাশের ইতিহাস *

শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল এ-এম্-আই-এম্-ই

বাঙ্‌লা সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের একান্ত অভাব। বিজ্ঞানের মধ্যে রসায়নের ও পদার্থ-বিদ্যার কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ আছে ও প্রথম-শিক্ষার্থীর উপযোগী পুস্তক শিল্পশাস্ত্রের (technical subject) মধ্যে নাগরিক

* নিম্নলিখিত তিনখানি পুস্তকের সাহায্যে প্রবন্ধটী লিখিত—

১। A History of the Growth of Steam Engine by Thurston.

২। The Steam Engine and other Heat Engines by Ewing.

৩। Text Book of Steam and Steam Engine by Jainioson.

পূর্ত্তবিদ্যা (Civil Engineering) ও জরিপের দুই-চারখানি পুস্তক লিখিত হইয়াছে। অন্যান্য শিল্পশাস্ত্রেরও এক-আধখানি পুস্তক দেখা যায়। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, যন্ত্র-পূর্ত্ত-বিদ্যার (Mechanical Engineering) কোন পুস্তক এ পর্য্যন্ত লিখিত হয় নাই। এমন কি ঐ বিষয়ে কোন প্রবন্ধও বড় একটা প্রকাশিত হইতে দেখা যায় না। অথচ চারিদিকে শিল্পের উন্নতির সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। এই কলকব্জার যুগে বাঙ্‌লা ভাষায় যন্ত্র-পূর্ত্ত-বিদ্যার আলোচনা হওয়া বিশেষ আবশ্যক। বাল্যকাল হইতে আমরা শুনিয়া আসিতেছি যে, ষ্টীমের চাপে চায়ের কেট্‌লির ঢাক্‌না উঠিতে দেখিয়া, জেম্‌স্‌ ওয়াট ষ্টীম-এন্‌জিন্‌ উদ্ভাবন করেন। ইহা ভ্রান্ত বিশ্বাস। এই ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

সাহায্যে আধুনিক তাদৃশ যন্ত্রের মূলতত্ত্বটী ব্যাখ্যাত হইবে।

১ম চিত্রে ক সিলিণ্ডার, খ ও গ ষ্টীমের আগম-নিগম পথ (steam port), ঘ পিষ্টন, ঙ পিষ্টন-দণ্ড, চ ক্রশহেড, ছ সংযোগদণ্ড (connecting rod), জ ক্র্যাঙ্ক-পিন্‌, ঝ ক্র্যাঙ্ক এবং ঞ ক্র্যাঙ্ক-শ্যাফ্ট। বয়লার হইতে চাপ প্রদানক্ষম ষ্টীম খ পথে সিলিণ্ডারে প্রবেশ করিয়া পিষ্টনের উপর চাপ দিতে থাকে। সুতরাং পিষ্টন বাম হইতে দক্ষিণে সরে। যন্ত্রের নির্ম্মাণকৌশল এরূপ যে, যখন পিষ্টন সিলিণ্ডারের ডানদিকে আইসে, তখন খ পথ দিয়া ষ্টীমের প্রবেশ বন্ধ হইয়া যায়, এবং ঐ পথ বায়ুমণ্ডলের (atmosphere) সহিত সংযুক্ত হয়। আরও গ পথে ষ্টীম প্রবেশ করিয়া পিষ্টনকে বামদিকে সরাইতে থাকে, এবং পিষ্টনের বামদিকস্থ ষ্টীম বায়ুমণ্ডলের সহিত মিলিত হয়। এইরূপে ষ্টীম পর্য্যায়ক্রমে
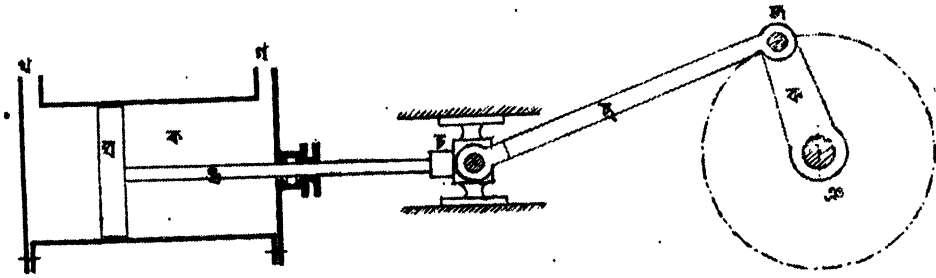
১ নং চিত্র

একটী পাত্রে জল রাখিয়া উহার তলদেশে তাপ প্রয়োগ করিলে জল উষ্ণ হয়। অধিক তাপ প্রয়োগ করিলে উহা হইতে বাষ্প উত্থিত হয়। পাত্রের মুখে ঢাক্‌না চাপা দিলে দেখা যায়, ষ্টীম (অত্যুষ্ণ বাষ্প) উহাকে উপরে ঠেলিয়া বাহিরে আসিতেছে। ঢাক্‌না ময়দা দ্বারা আঁটিয়া দিন, এবং পাত্রকে আর একটু উত্তপ্ত করুন, দেখিবেন জল হইতে উত্থিত ষ্টীম ঢাক্‌নাকে ঠেলিয়া উপরের দিকে উঠাইতেছে। অতএব আমরা বুঝিতে পারি, রুদ্ধ পাত্রে জল গরম করিলে, উহা হইতে যে ষ্টীম উৎপন্ন হয়, তাহা পাত্রের গাত্রে চাপ দিতে থাকে। যে পাত্রে চাপ-প্রদানক্ষম ষ্টীম প্রস্তুত হয়, তাহাকে বয়লার বলে।

ষ্টীম-এন্‌জিনের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, একটী রেখা-চিত্রের (line diagram)

খ ও গ পথে প্রবেশ করাতে পিষ্টনটী দক্ষিণে ও বামে গমনাগমন করে। সিলিণ্ডারে ষ্টীমের প্রবেশ এবং উহা হইতে নির্গমন স্লাইড-ভাল্‌ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। স্থূল কথায় বলিতে গেলে ঘ, ঙ, চ ও ছ পরস্পর সংযুক্ত। তবেই দেখা যাইতেছে, যেমন ঘ বামে ও দক্ষিণে চলাফেরা করিবে ছও সেইরূপ করিতে থাকিবে। সুতরাং জ বৃত্তপথে ভ্রমণ করিবে। জ এবং ঞ ঝ দ্বারা সংযুক্ত। অতএব ঞ ঘুরিতে থাকিবে। ফলে পিষ্টনের ঋজু রেখার গতি ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্‌টের বৃত্তাকার গতিতে পরিণত হইতেছে। ঐ শ্যাফ্‌টের রেল-গাড়ীর চাকাকে ও ষ্টীমারের পাখাকে ঘুরায়।

কোন বৃহৎ আবিষ্কারই এক দিনে একজনের চেষ্টায় হয় না। এই লোকহিতকর যন্ত্রও এক ব্যক্তি উদ্ভাবন করেন নাই। বহু বৈজ্ঞানিক দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ধীরে ধীরে

উহার ক্রমবিকাশ হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই যন্ত্রটী আবার মিস্ত্রিশ্রেণীর লোক দ্বারাই উদ্ভাবিত। তাঁহারাই উহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গড়িয়া ও বেশভূষায় সাজাইয়া উহাকে বর্ত্তমান অবস্থায় আনয়ন করিয়াছেন। কারণ, ইহা সর্ব্বজনবিদিত সত্য যে, ষ্টীভারে খনিতে মালকাটা (খনক) হইয়া জীবন আরম্ভ করেন; নিউকমেন কর্ম্মকার ছিলেন এবং তাঁহার বন্ধু কলে শার্সিতে কাচ লাগাইতেন; ওয়াটের প্রথম অবস্থা বড় সুবিধাজনক ছিল না; তিনিও সাধারণ মিস্ত্রি ছিলেন। মানব-জাতি চিরদিন এই কয়জন মনীষীর নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।
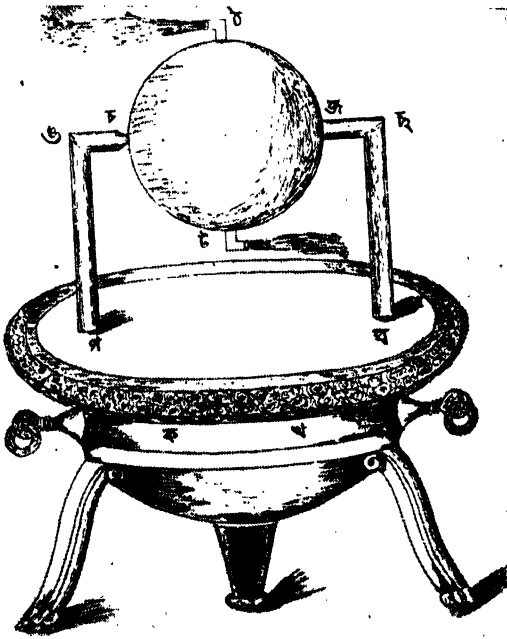
২ নং চিত্র

ইউক্লিডের জন্মস্থান পুণ্যভূমি আলেক্‌জান্দ্রিয়া নগরের এক পুস্তকাগারে একখানি গ্রন্থে ষ্টীম-এন্‌জিনের প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার রচয়িতা হিরো। ইনি আর্‌কিমিডিসের সমসাময়িক ব্যক্তি। এই গ্রন্থে অনেকগুলি যন্ত্রের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু উহাদের মধ্যে কোন্‌গুলি তাঁহার উদ্ভাবিত, তাহার উল্লেখ নাই। গ্রন্থে বর্ণিত প্রথম ষ্টীম-এন্‌জিন্‌টীর বিষয়েই প্রথমে আলোচনা করা যাউক।

২য় চিত্রে ক খ একটী কটাহ, গ ঘ উহার ষ্টীম-নির্গম-রোধক ঢাক্‌না। গ ঙ চ এবং ঘ ছ জ দুইটী নল ঢাক্‌না হইতে উত্থিত হইয়া একটী ফাঁপা গোলককে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। চ প্রান্ত ফাঁপা নহে, সুচাল, এবং বিবর্ত্তন কীলকের (pivot) কাজ করে। জ প্রান্ত দিয়া ষ্টীম গোলকের মধ্যে প্রবেশ করে। ট, ঠ দুইটি বাঁকান নল গোলক হইতে নির্গত হইয়াছে। উহাদের মুখ বিপরীত দিকে আছে। কটাহে জল রাখিয়া উহার নীচে অগ্নি প্রজ্বালিত করিলে, জল হইতে ষ্টীম উত্থিত হইয়া গোলকের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, এবং বাঁকান নল হইতে বেগে বাহিরে আসিতে থাকে। ষ্টীম বাহিরে আসিবার সময় বিপরীত দিকে নলের গাত্রে চাপ দেয়, ইহা সহজেই অনুমেয়। এই অসমতুলিত চাপ দ্বারা গোলকটী ঘুরিবে।

হিরোর পুঁথিতে একটী উষ্ণ-বায়ু-চালিত এন্‌জিনের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। যন্ত্রটী দ্বারা মন্দিরের দরজা খোলা হইত; কিন্তু ষ্টীমের পরিবর্ত্তে উহা উত্তপ্ত বায়ুর সাহায্যে চলিত।

হিরোর সময় হইতে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত যে সমস্ত ষ্টীম-এন্‌জিন্‌ উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে এন্‌জিন্‌ আখ্যা দেওয়া যায় না। উহাদিগকে পরীক্ষাযন্ত্র
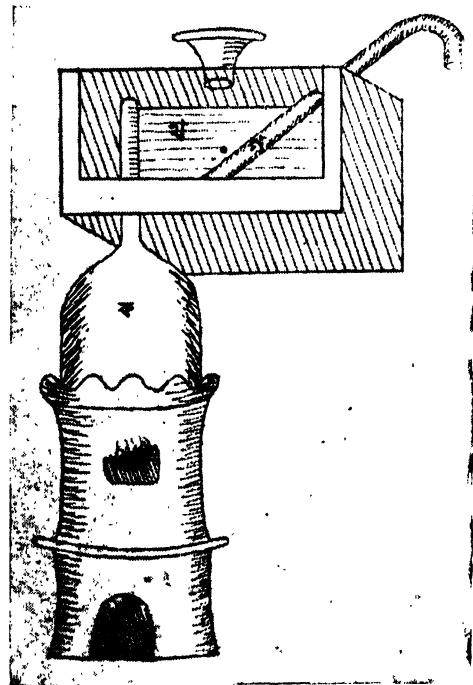
৩ নং চিত্র

(apparatus) বলা চলে। ঐ সময় পর্য্যন্ত ষ্টীম এনজ্জিনকে প্রকৃত কাজে লাগাইবার সমস্ত উদ্যম বিফল হইয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে বৈজ্ঞানিকদিগের চেষ্টা ফলবতী হইবার আশা হয়। ষ্টীম যে প্রভূত চাপ দিতে পারে, এবং ঘনীভূত হইয়া পুনরায় জলে পরিণত হইলে শূন্যস্থান (Vocunm) জন্মায়, তাহা তাঁহারা জানিতেন। ৩য় চিত্র

১৬০১ খৃষ্টাব্দে পর্টা তাঁহার গ্রন্থে ষ্টীমের চাপ দ্বারা জল উত্তোলন করিবার একটা যন্ত্রের বর্ণনা করিয়াছেন। পর্টা নেপলস্‌বাসী। ৩য় চিত্রে তাহার ষ্টীম-এনজ্জিনটী দেখান হইল। চিত্রে ক একটা রিটর্ট্ বা বয়লার, খ জল রাখিবার চৌবাচ্ছা, এবং গ একটি বাঁকা নল। রিটর্টে জল রাখিয়া নিম্নে অগ্নি প্রজ্বালিত করিলে, জল হইতে ষ্টীম উত্থিত হইয়া চৌবাচ্ছায় জলের চাপ দিবে, এবং উহার জল বাঁকা নল দিয়া বাহিরে আসিতে থাকিবে। এই উপায়ে জল অনেক উচ্চে উঠান হইত।

১৬১৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের সলোমন ডিকজ একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। তিনি পূর্ত্তবিৎ ও স্থপতি ছিলেন। তাঁহার পুস্তকে একটী ষ্টীম এনজিনের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। ঐ
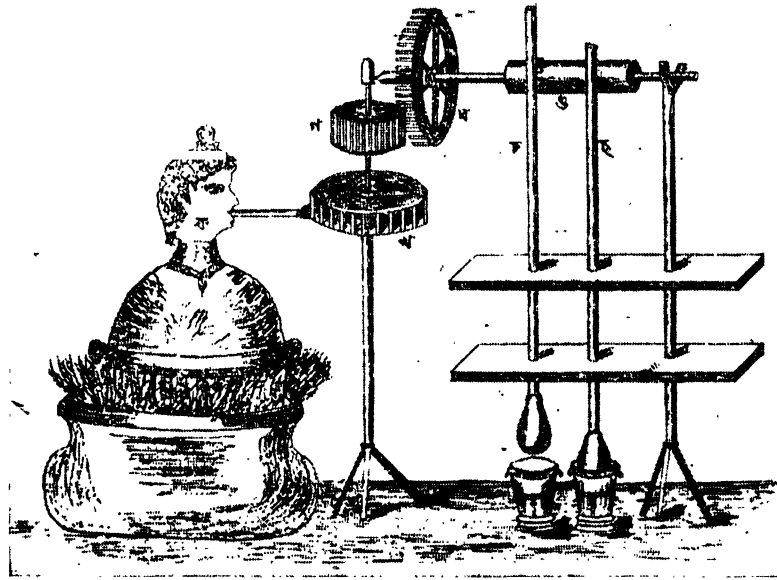
৪ নং চিত্র

যন্ত্রের সাহায্যে অনেক উচ্চে জল উঠান যাইত। তাঁহার যন্ত্রের মূলতত্ত্ব পর্টারই যন্ত্রের অনুরূপ।

ডি কজের পর গিয়োভানি ব্রাঙ্কার নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৬২৮ সালে ঔষধ চূর্ণ করিবার জন্য একটী যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। ৪র্থ চিত্রে ক বয়লার। উহার আকৃতি একজন নিগ্রোর মস্তক সদৃশ। বয়লার হইতে ষ্টীম নির্গত হইয়া জোরে খ চাকার ফলকে লাগে। সুতরাং চাকা ঘুরিতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে গ, ঘ, ঙ ঘুরিবে, এবং চ ও ছ মুষলদ্বয় উঠিতে ও পড়িতে থাকিবে। ব্রাঙ্কা ইটালিবাসী।

ইংলণ্ডনিবাসী ডেভিড র‍্যাম্জে ১৬৩০ সালের ২১শে জানুয়ারি তারিখে অনেকগুলি যন্ত্র পেটেণ্ট করেন। উহার মধ্যে ষ্টীম-এনজ্জিনও ছিল। ইংলণ্ডে শিল্পকার্য্যে ষ্টীমের ব্যবহার বোধ হয় এই প্রথম।

বৃহৎ আবিষ্কারগুলির ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে, অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় উহারা ক্ষুদ্র অবান্তর ঘটনা হইতে উৎপন্ন। কথিত আছে ষ্টীমের চাপে একটী পাত্রের ঢাকনা উত্থিত হইতে দেখিয়া, ঈষ্টার তাঁহার ষ্টীম-এনজিনের কল্পনা করিয়াছিলেন। * ১৬৩৩ সালে প্রকাশিত তাঁহার কৃত Century of Invention নামক পুস্তকে একটী ষ্টীম এনজিনের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। তিনি না কি ঐ যন্ত্রের সাহায্যে ভক্স্‌হলে জল উচ্চে তুলিতে সমর্থ হন। যন্ত্রটি কিরূপ দেখা যাউক।

৫ম চিত্রে ক ও খ পাত্রদ্বয় গ ও ঘ নল দ্বারা একটী বয়লারে সংযুক্ত। একটী ঙ খাড়া নল হইতে চ ও ছ শাখাদ্বয় ক ও খ পাত্রের তলদেশ পর্য্যন্ত গিয়াছে। জ ও ঝ নলের মধ্য দিয়া জল পাত্রদ্বয়ে প্রবেশ করে। উহার অন্য প্রান্ত একটী কূপে ডুবান থাকে। বয়লার হইতে ষ্টীম পর্য্যায়ক্রমে পাত্রদ্বয়ে প্রবিষ্ট হয়। পাত্রে ষ্টীম ঘনীভূত হইয়া জলে পরিণত হইতে থাকিলে শূন্যস্থান উৎপন্ন করিবে, এবং বায়ুমণ্ডলের চাপে জল ঐ শূন্য স্থান

* স্ভাভারে ও ওয়াট সম্বন্ধেও এরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়।

অধিকার করিবার জন্য ধাবিত হইবে। যখন একটী পাত্র জল পূর্ণ হইতে থাকিবে, তখন অন্যটীতে ষ্টীম প্রবেশ করিয়া উহার মধ্যস্থিত জলের উপর চাপ দিবে, এবং জল ঙ নল হইতে ফিন্‌কি দিয়া নির্গত হইয়া ফোয়ারার আকার ধারণ করিবে। একটী পাত্রের জল
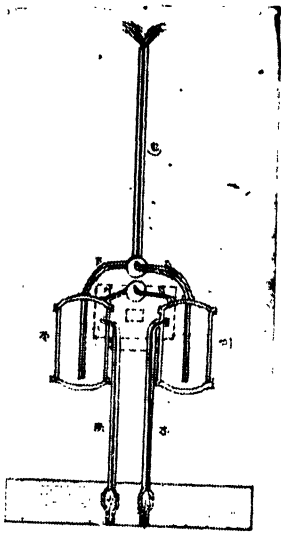
৫ নং চিত্র

ফুরাইলে উহাতে ষ্টীম প্রবেশ বন্ধ করিতে হইবে, এবং বয়লার অন্য পাত্রটীর সহিত সংযুক্ত হইবে।

কে যে ষ্টীমকে প্রকৃত কাজে লাগান সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ বলেন পর্টাই উহা করিয়াছিলেন। আবার কাহারও মত উষ্টারই প্রথম কার্য্যকর ষ্টীম এন্‌জিন উদ্ভাবনে সমর্থ হন। ইটালিবাসীরা দাবী করেন, ব্রাঙ্কাই উহার প্রথম উদ্ভাবক। যিনিই করুন না কেন, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ ভাগ পর্য্যন্ত কেহই ব্যবসা হিসাবে উহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তখনকার পণ্ডিতগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ষ্টীমকে এক দিন না এক দিন নিশ্চয়ই মানুষের ইঙ্গিতে চলিতে হইবে।

ঐ সময়ে বিলাতের খনিগুলির অবস্থা এমন হইয়া পড়ে যে, উহাদের ভিতর হইতে জল বাহির না করিলে কয়লা ইত্যাদি বাহির করা অসম্ভব। 'অভাবই উপায় উদ্ভাবনের মূল'। ফলে তখন বৈজ্ঞানিক-মহলে সাড়া পড়িয়া যায়। ইয়োরোপের প্রত্যেক প্রদেশের বিখ্যাত পণ্ডিতগণ ষ্টীম-এন্‌জিন্ লইয়া গবেষণা আরম্ভ করেন, এবং উহাকে কাজে লাগাইতে চেষ্টিত থাকেন। জয়লক্ষ্মী স্যাভারের গলায় মালাদান করেন। এই মনীষী ব্যক্তি একটী ঘড়ি নির্ম্মাণে সমর্থ হন এবং ক্যাপ্‌ষ্টান্ দ্বারা পাখা ঘুরাইয়া নৌচালনের একটী কৌশলের উদ্‌ভাবন করিয়াছিলেন। তিনি ১৬৯৮ সালের ২৫শে জুলাই খনি হইতে জল উত্তোলনার্থ যে যন্ত্রটী পেটেণ্ট করেন, তাহা ৬ষ্ঠ চিত্রে প্রদর্শিত হইল।
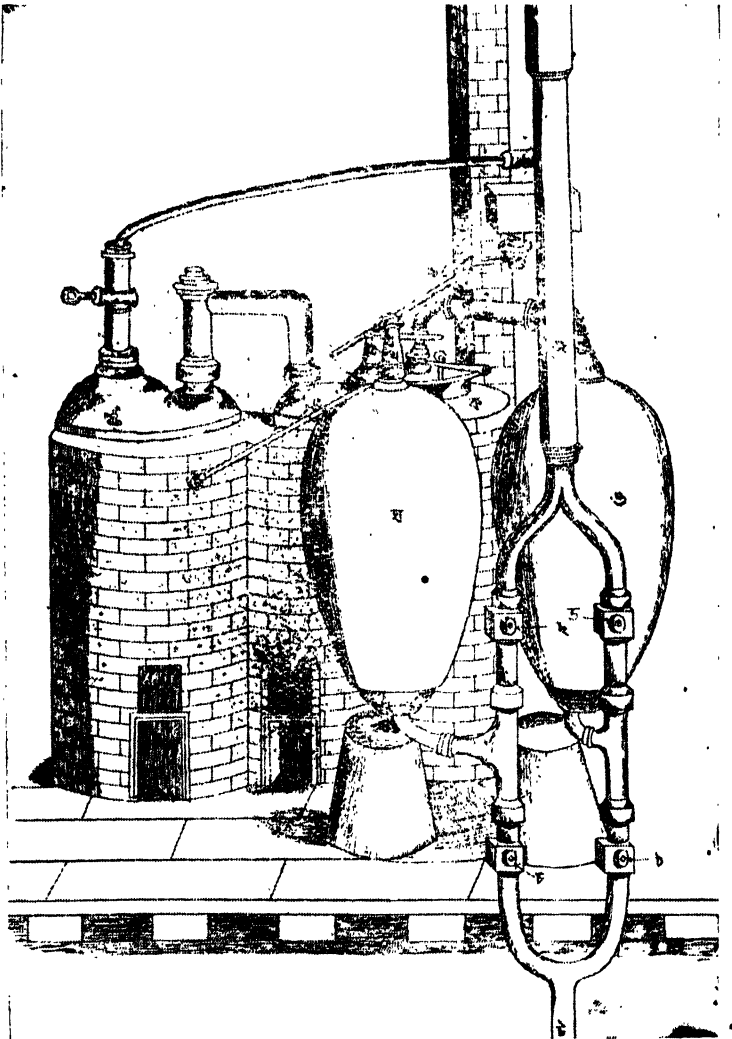
৬ নং চিত্র

ক বয়লার হইতে ষ্টীম উত্থিত হইয়া খ ও গ নলের মধ্য দিয়া পর পর ঘ ও ঙ পাত্রে প্রবেশ করে। যখন

ষ্টীম খ-তে প্রবেশ করে, তখন চ ভাল্‌ব বন্ধ করিয়া ছ খুলিয়া দিলে পাত্রের ভিতরস্থ জল জ নল দিয়া উপরে উঠিতে থাকে। ছ এবং খ নলস্থিত ভাল্ব বন্ধ করিয়া চ খুলিয়া দেওয়া হইল। এখন ঝ কক্ খুলিয়া ঘ এর বহির্ভাগে জল দেওয়া হইতে থাকে। পাত্র শীতল হইলে উহার মধ্যস্থিত ষ্টীম ঘনীভূত হইয়া জলে পরিণত হইবে ও শূন্যস্থান উৎপন্ন করিবে। এখন চ ট পথে জল প্রবেশ করিয়া পাত্র পূর্ণ হইবে। ইতিমধ্যে ঠ বন্ধ করা ও ড খুলিয়া দেওয়া হয়, অপিচ বয়লার হইতে ষ্টীম ঙ পাত্রে প্রবেশ করিতে থাকে। সুতরাং ষ্টীমের চাপে জল জ পথে বেগে বাহিরে আসিবে। এই প্রকারে জল অনেক উচ্চে উঠান যায়।

৭ নং চিত্র

স্যাভারে যদিও ঐ যন্ত্রের নাম "খনির বন্ধু" রাখিয়াছিলেন, তত্রাচ ইহা বহু খনিতে ব্যবহৃত হয় নাই। কারণ, উহাতে নিরাপদ ভাল্‌ব (safety valve) ছিল না। সুতরাং বয়লার ফাটিয়া দুর্ঘটনা হইবার ভয় ছিল, এবং উহাতে অনেক কয়লা লাগিত। আবার, তাঁহার বয়লারে ষ্টীমের চাপ ৮ হইতে ১০ বায়ুমণ্ডলের চাপ (atmospheric) অপেক্ষা অধিক চাপ পাওয়া যাইত না, সুতরাং জলও অল্প উচ্চে উঠিত।

পরবর্ত্তী সময়ে উদ্ভাবিত ষ্টীম-এন্‌জিন্ মাত্রেই নিরাপদ ভাল্‌ব ব্যবহৃত হইত। পেপিন ১৬৮০ সালে ঐ ভাল্‌ব নির্ম্মাণ করিয়া ষ্টীম-এন্‌জিনের ইতিহাসে এক নূতন যুগ প্রবর্ত্তন করেন। ইনি ফ্রান্স দেশীয় লোক। যে যন্ত্রে প্রথম উহা ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম পেপিনের ডাইজেষ্টার (৭ম চিত্র)। উহাতে রন্ধন-কার্য্য হইত। উহা একটী পাত্রবিশেষ। পাত্রের ঢাকনা স্ক্রু দ্বারা আবশ্যকমত জোরে আঁটিয়া দেওয়া হয়। পাত্রের নীচে অগ্নি জ্বালিলে ষ্টীম উত্থিত হইয়া পাত্রের গাত্রে চাপ দিবে। চাপের পরিমাণ একটী লিভারে ওজন ঝুলাইয়া জানা যায়।

আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, আধুনিক এন্‌জিনে পিষ্টন
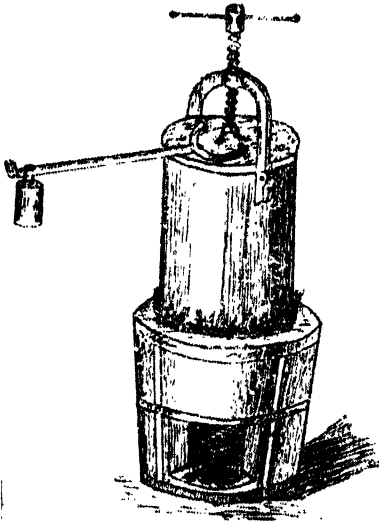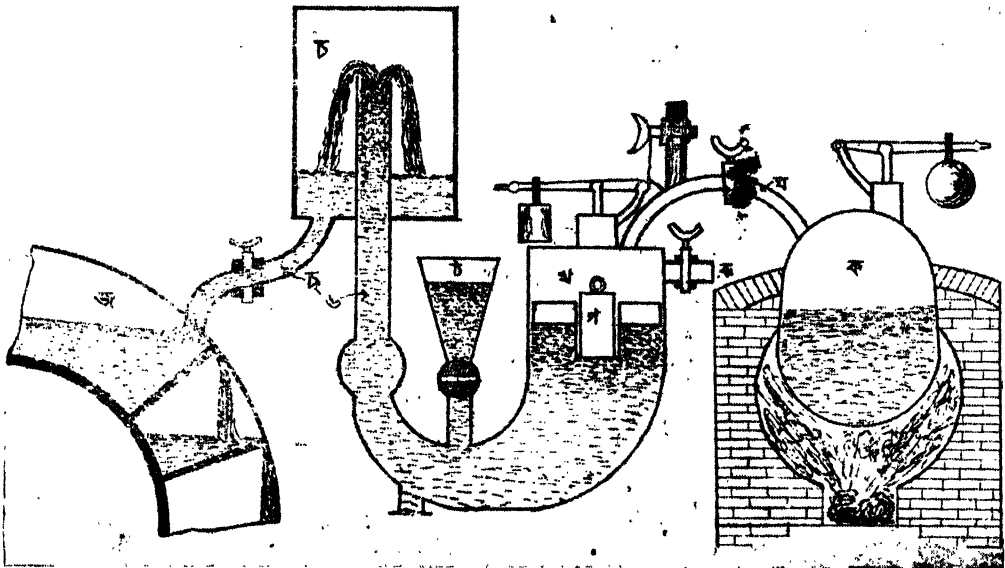
৮ নং চিত্র

ষ্টীমের চাপে অগ্র-পশ্চাৎ গমনাগমন করে। প্রথমে পেপিনই সিলিণ্ডারে ষ্টীমের চাপে পিষ্টন সরাইয়া জল উপরে উঠান। ইহা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। তিনিই প্রথমে অভ্যন্তরে চুলাযুক্ত বয়লার নির্ম্মাণ করেন। বিখ্যাত গণিতবিদ লাইব্‌নিজ্‌ বিলাতে আসিয়া স্তাভারের এন্‌জিন্‌টী দেখিয়া যান, এবং স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া পেপিনকে উহার বিষয় বলেন। পেপিন তখন জার্ম্মাণিতে ছিলেন। তিনি ষ্টীম-এন্‌জিন্‌ লইয়া পুনরায় গবেষণা আরম্ভ করেন, এবং ১৬৯০ সালে পিষ্টন এন্‌জিন্‌ যুক্ত প্রথম ষ্টীম-এঞ্জিন নির্ম্মাণ করেন। ১৭০৭ সালে যে নূতন যন্ত্র দ্বারা জল উঠাইয়া জল-চক্র (water-wheel) চালান, তাহা ৮ম চিত্রে প্রদর্শিত হইল।

চিত্রে ক বয়লার খ শিলিণ্ডার এবং গ পিষ্টন। ক হইতে ষ্টীম ঘ পথে খ এ প্রবেশ করে, এবং উহার উপর চাপ দিতে থাকে। চাপে জল ঙ নল দিয়া চ কক্ষে প্রবেশ করে, এবং ছ পথে নির্গত হইয়া জ জল-চক্র চালায়। এখন ঝ পথ দিয়া ষ্টীম পলায়ন করে, এবং ট ফাঁদল দ্বারা শিলিণ্ডার পুনরায় জলপূর্ণ হয়। আবার খ পথে ষ্টীম প্রবেশ করিয়া ঙ পথে জল উঠায়।

আশার ক্ষীণ আলোক অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উজ্জ্বলতর হয়। ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের অনেকগুলি তথ্য পূর্ব্ববিদগণ জানিতে পারেন। বায়ুমণ্ডলের চাপ, গ্যাসের চাপের ধর্ম্ম, শূন্য স্থানের প্রকৃতি ও তাহা উৎপন্ন করিবার উপায় ইত্যাদি অনেকগুলি বিষয় তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন। পেপিন ও স্তাভারে প্রভৃতি ষ্টীম ঘনীভূত করিয়া বায়ুমণ্ডলের চাপ দূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যন্ত্রনির্ম্মাতা বিপুল চাপ-সহনক্ষম বয়লার নির্ম্মাণ করিয়া বসিয়া আছেন। অপিচ এ পর্য্যন্ত যে সকল এন্‌জিন্‌ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের ত্রুটি অজ্ঞাত নাই। সমস্ত মালমশলা প্রস্তুত। অপেক্ষা কেবল একজন আবিষ্কারকের, যিনি এগুলি একত্র করিয়া কার্য্যকর অথচ কম খরচায় চলে এমন একটী যন্ত্র, নির্ম্মাণ করিবেন। যে ব্যক্তি এই কার্য্য সম্পাদন করেন তাঁহার নাম নিউকমেন। তিনি সাধারণ কর্ম্মকার ছিলেন। ১৭০৫ সালে কলের সহযোগে তিনি যে সুবিখ্যাত যন্ত্র প্রস্তুত করেন, তাহা ৯ম চিত্রে প্রদর্শিত হইল।

ক একটি বয়লার। ষ্টীম খ ককের মধ্য দিয়া গ শিলিণ্ডারে প্রবেশ করিলে ঘ পিষ্টন উঠিবে, এবং ব বীমে (beam) সংযুক্ত পাম্পের দণ্ড ঙ কে নীচে নামাইবে। খ বন্ধ করিয়া চ খুলিয়া দেওয়া হইলে টাঁকি হইতে ছ পথে শিলিণ্ডারের মধ্যে ফিন্‌কি দিয়া জল প্রবেশ করিতে থাকিবে। ষ্টীম ঘনীভূত হইয়া শিলিণ্ডারে শূন্য স্থান সৃজন করিবে। এখন বায়ুমণ্ডলের চাপে পিষ্টন নামিবে, সঙ্গে সঙ্গে পাম্প-দণ্ড উঠিবে। ষ্টীম ঘনীভূত করিবার জল জ পথে নির্গত হইবে। ঝ নিরাপদ ভাল্‌ব, এবং ট ও ঠ দুইটী গেজ-কক। ষ্টীমের পলায়ন নিবারণার্থ ড নল দিয়া পিষ্টনের উপর জল দেওয়া হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, নিউ-কমেনের এন্‌জিন্‌ মূলতঃ পেপিনের শিলিণ্ডার ও পিষ্টন এবং স্তাভারের বয়লার লইয়া গঠিত।
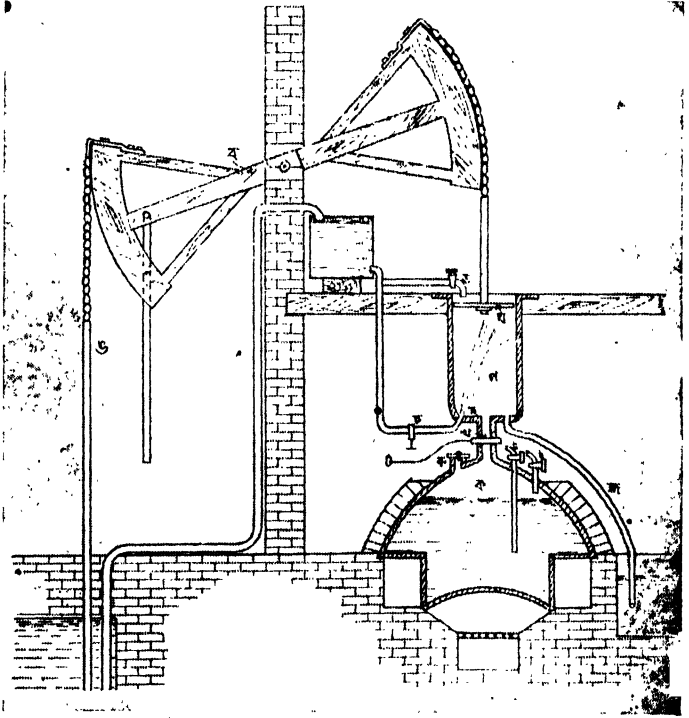
৯ নং চিত্র

ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, এই যন্ত্র চালাইতে হইলে, ককগুলি খুলিতে ও বন্ধ করিতে হইবে। প্রথমে যে যন্ত্রটী নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাতে কক আপনা হইতে খুলিত কিম্বা এক ব্যক্তি সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ঐ কার্য্য করিত, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এ সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত। ১৭১৩ সালে হাম্‌ফ্রে পটার নামক একটী বালক এইরূপ একটী এনজিনের ককগুলি খুলিতে ও বন্ধ করিতে নিযুক্ত হইয়াছিল। চঞ্চলমতি বালকের পক্ষে একস্থানে দাঁড়াইয়া এই কার্য্য করা কিরূপ কষ্টকর, তাহা সহজেই অনুমেয়। বাকল রশি ও ক্যাচের (catch) সাহায্যে বীম দ্বারাই এই কার্য্য করাইয়া লইত; সুতরাং খেলিবারও একটু সময় পাইত। ১৭১৮ সালে হেনরি বেটন তাঁহার এন্‌জিনে পটারের আদিম কৌশলের পরিবর্ত্তে মজবুত ভাল্‌ব-গীয়ার সংযুক্ত করেন।

নিউকমেন ও বেটনের পর স্মীটন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তিনি নিউকমেনের এন্‌জিন্ ও বয়লারের প্রভূত উন্নতি করেন। ঐ যন্ত্র ইংলণ্ডের প্রায় প্রত্যেক খনিতে ব্যবহৃত হইতে থাকে। এমন কি ইংলণ্ডের বাহিরেও তাঁহার যন্ত্র আদৃত হইয়াছিল। ১৭৭৩ সালে সেণ্ট পিটার্শবর্গের বন্দরে ঐ যন্ত্র বসান হয়। হলাণ্ডের সমুদ্র-পৃষ্ঠাপেক্ষা নিম্নস্থানসমূহ হইতে জল নিকাশের জন্য যন্ত্রটী স্থাপিত হয়। তৎকালে তাঁহার সমকক্ষ শিল্পী কেহই ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই অসাধারণ প্রতিভা-শালী ব্যক্তির সহিত পরামর্শ না করিয়া গ্রেট ব্রিটেন দেশে তখন কোন বৃহৎ কারখানা নির্ম্মিত হইত না। উষ্টার যে পথ উন্মুক্ত করেন, স্যাভারে, পেপিন ও নিউকমেন প্রভৃতি দ্বারা যাহার বন্ধুরতা অপনোদিত হয়, স্মীটন তাহার পৃষ্ঠ দৃঢ় করিয়া দেন, এবং অবশেষে ওয়াট আসিয়া সেই পথ সুশোভিত করেন।

জেম্‌স্ ওয়াটের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এন্‌জিনিয়ার-গণ নিউকমেনের উদ্‌ভাবিত এন্‌জিনের বিভিন্ন অংশের অনুপাতের উন্নতি এবং অংশগুলির সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন মাত্র। তাঁহারা এই এঞ্জিনের মূল ত্রুটি সংশোধন করিতে পারেন নাই। নিউকমনের শিলিণ্ডার পর্য্যায়ক্রমে উত্তপ্ত ও শীতল হয়। সুতরাং অনেক উত্তাপ নষ্ট হইয়া যায়; ফলে কয়লা বা কাঠের অপব্যয় হয়। ১৭৬৩ সালে ওয়াট গ্লাস্‌গো বিশ্ববিদ্যালয়ে নিউকমেনের একটি এন্‌জিন্ মেরামতের জন্য নিযুক্ত হন। সেই মুহূর্ত্তে তিনি এন্‌জিনের উপরুক্ত ত্রুটি ধরিয়া ফেলেন। এই ত্রুটি সংশোধন করিতে হইলে শিলিণ্ডারকে ষ্টীমের সমান উত্তপ্ত রাখা আবশ্যক। তজ্জন্য তিনি কন্‌ডেন্‌সার নামক আর একটী পাত্র শিলিণ্ডারে সংযুক্ত করিয়া দেন। শিলিণ্ডার হইতে ঐ পাত্রে ষ্টীম গমন করিবে, এবং জলের সংস্পর্শে ঘনীভূত হইয়া শূন্য স্থান উৎপন্ন করিবে। কন্‌ডেন্‌সার সকল সময়ে শূন্য রাখিবার জন্য তিনি উহাতে একটী পাম্প যোগ করেন। শিলিণ্ডারের চতুর্দ্দিকে ষ্টীমের জ্যাকেট ও উহাতে তাপ অপরিচালক পদার্থের আবরণও তাঁহার আবিষ্কার। যন্ত্রে পিষ্টন-দণ্ড শিলিণ্ডারের উপরিভাগে ষ্টীম-রোধক ষ্টাফিং-বাক্সের মধ্য দিয়া নির্গত। পিষ্টনের উপরিভাগে বায়ুর পরিবর্ত্তে ষ্টীম চাপ প্রদান করে। ১০নং চিত্র

ওয়াট ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে একদিকে-ক্রিয়াশীল (single acting) একটী এন্‌জিন্ (১০ চিত্র) নির্ম্মাণ করেন। শিলিণ্ডারের কেবল নিম্নাংশ কনডেন্‌সারের সহিত সংযুক্ত। যন্ত্রে ক ষ্টীম ভাল্‌ব, খ সাম্য ভাল্‌ব equilibrium valve), এবং গ নির্গম ভাল্‌ব (exhaust valve)। যখন ঘ পিষ্টন নামিতে আরম্ভ করে, তখন উহার নিম্ন শূন্য স্থান উৎপন্ন করিবার জন্য গ খুলিয়া দেওয়া হয়, এবং ক খুলিলে পিষ্টনের উপর ষ্টীম চাপ প্রদান করে। পিষ্টন নীচে নামিলে ক ও গ বন্ধ করিয়া খ খুলিয়া দেওয়া হয়। ফলে, পিষ্টনের উভয় পৃষ্ঠে ভারসাম্য হয়। এখন ঙ পম্পদণ্ডের ভারে পিষ্টন উপরে উঠিবে। চ কন্‌ডেন্‌সার, ছ বায়ুপাম্প। ছ হইতে নির্গত জল ইত্যাদি জ-তে প্রবেশ করে, এবং তথা হইতে ঝ ফিডপাম্প দ্বারা বয়লারে গমন করে।

১৭৮১ সালে নির্ম্মিত যন্ত্রে তিনি ফ্লাই-চাকা (fly-wheel) সংযুক্ত করিয়া দেন। উহাতে পিকার্ডের উদ্ভাবিত ক্র্যাঙ্ক এবং সংযোগ-দণ্ড (connecting rod) ব্যবহৃত হয়। ১৭৮১ সালের যন্ত্রে আরও দুইটী উন্নতি দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ উহা দুইদিকে ক্রিয়াশীল (double acting), অর্থাৎ পর্য্যায়ক্রমে পিষ্টনের উভয় পার্শ্বে ষ্টীম প্রবেশ করে। দ্বিতীয়তঃ, পিষ্টন কিয়দ্দূর গমন করিলে ষ্টীমের প্রবেশ-দ্বার বন্ধ হয়, এবং বাকি পথটা পিষ্টন ষ্টীমের প্রসারণ-শক্তির সাহায্যে চলে। পিষ্টন-দণ্ড যাহাতে ঠিক ঋজুভাবে উঠিতে ও নামিতে পারে,

তজ্জন্য তিনি সমান্তরাল গতি (parallel motion) নামক কৌশলটী উদ্ভাবন করেন।—ষ্টীমের প্রবেশ নিয়মিত করি-

১ নং চিত্র
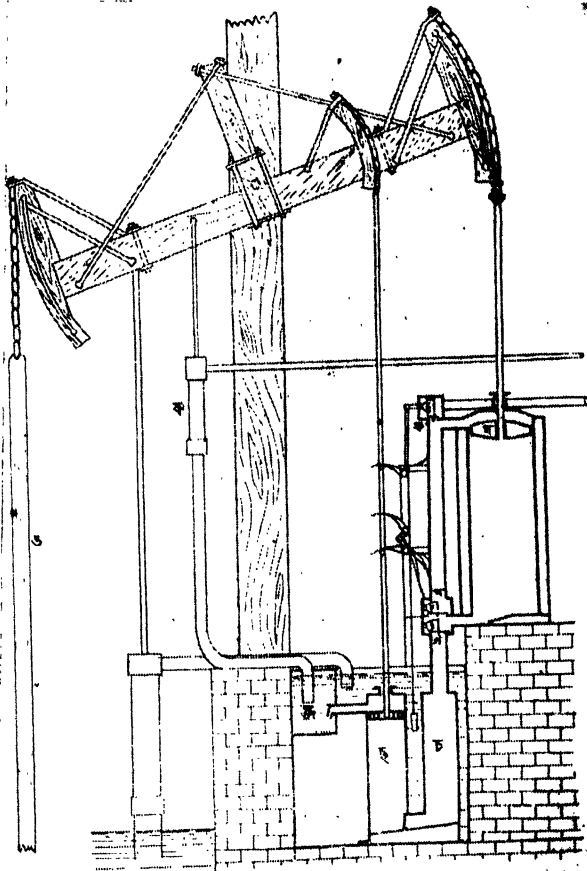
বার নিমিত্ত থ্রট্‌ল-ভাল্‌ব (throttle-valve) গভর্ণরও তাঁহার নির্ম্মিত। ইণ্ডিকেটারও সৃষ্টি। ইহাতে ষ্টীমের

বাষ্প ও পিষ্টনের গতি এই দুইএর সম্বন্ধ আপনা হইতে অঙ্কিত হইয়া যায়।

মার্ডক ওয়াটের সহকারী ছিলেন। উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য। কাহার কথা বলিব? ওয়াট নিজেই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার এন্‌জিনের যে সমস্ত উন্নতি হইয়াছে তাহাতে মার্ডকের অনেক হাত আছে। মার্ডকই স্লাইড-ভাল্‌ব উদ্ভাবন করেন, যদ্দ্বারা সিলিণ্ডারে ষ্টীমের প্রবেশ ও উহা হইতে নির্গমন নিয়ন্ত্রিত হয়।

ওয়াটের জীবনী পাঠে জানা যায়, তিনি ষ্টীম এন্‌জিন্ উদ্ভাবন করিতে গিয়া দুইবার ঋণে জড়িত হইয়া পড়েন, এবং সংসার প্রতিপালন করিবার জন্য অন্য কার্য্য লইতে বাধ্য হন। শুভক্ষণে তিনি বোল্টনকে পেটেণ্টের অংশীদার করেন। এই দুই ব্যক্তি মিলিত না হইলে ষ্টীম-এন্‌জিনের এতটা উন্নতি হইত কি না সন্দেহ। ওয়াটের দেহ দুর্ব্বল ছিল, এবং অনেকবার অকৃতকার্য্য হইয়া তাঁহার মনও দমিয়া গিয়াছিল। অপর পক্ষে শারীরিক শক্তিসম্পন্ন বোল্টনের উদ্যম ও সাহস যথেষ্ট ছিল। বোল্টনের ব্যবসায় বুদ্ধির সহিত ওয়াটের কারিকরী প্রতিভার সংযোগ, এবং সর্ব্বোপরি বোল্টনের আর্থিক অবস্থা সর্ব্বপ্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ওয়াট ও বোল্টনের পর ষ্টীম-এন্‌জিনের আরও উন্নতি হইয়াছে ও এখনও হইতেছে। একটী আধুনিক যন্ত্রের দিকে চাহিলেই উহা পরিস্ফুট হয়।

গান

শ্রীসত্যানন্দ দাশগুপ্ত

আজ অরুণ আলোর কিরণরেখা
পড়্‌ল এসে ভূমিতলে,
অরূপ রূপের হাট বসেছে
ঘাটে, মাঠে, জলে, স্থলে।
প্রভাতে আজ কোন্ পাখীটী
ধর্‌ল তাহার মধুর গান,
বীণাখানির কোন তারেতে
বাজ্‌ল তাহার সুরের তান।

পথিক আজি কোন পথেতে
চল্‌তে গিয়ে পেল বাধা,
কৃষক বধূ কোন্ ঘাটেতে
দেখল আজি অসীম সাদা।
নদীর মাঝে কোন্ তরণী
চলল আজি উজান জলে,
আমার প্রাণের পাগ্‌লা ভোলা
চরণ ফেলে তালে তালে।

এক রাত্রি

শ্রীআশুতোষ ঘোষ বি-এল

এবার যশিদিতে তিন মাসের জন্য বাড়ী ভাড়া করা হয়েছিল, লম্বা ছুটিটা সেইখানেই নির্জ্জনে নিশ্চিন্ত মনে কাটাব মনে ক'রে। "তুমি যাও বঙ্গে কপাল যায় সঙ্গে"—এরি মধ্যে তিন বার কল্‌কাতায় আস্‌তে হয়েছিল, অবশ্য মক্কেলের খরচায়। একটা কমিশন সেরে ফিরছিলুম লক্ষ্মীপূজার আগের দিন,—রাত্রি ১০টা ২৪শের প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে। ভিড় একেবারেই নেই। একখানি গাড়ীতে ছিলাম হাওড়ার আরোহী মাত্র ৪ জন। ২ জন নেমে গেলেন উত্তরপাড়ায়। নীচেকার বার্থে আমি ও আর একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক।

সে দু'জন লোক চলে যাবার পর, আমিই কথা আরম্ভ কল্লুম।

"আপনার কতদূর" ?

"যশিদি"।

"আমিও তাই,—বেশ, গাড়ীতে চাবী বন্ধ করলে আপনার কোন আপত্তি নেই ?"

"একেবারেই না।"

এই বলে আমার সঙ্গে চাবী ছিল, দুদিক দিয়ে বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়লুম।

সে ভদ্রলোকটির একটু বিবরণ দেওয়া দরকার। পায়ে ক্যাম্বিসের জুতা, ঢিলে পায়জামা ও পাঞ্জাবী। একটা ছোট বিছানা, তার ভিতরে একটা পোর্টফোলিও, ও একটা বাদ্য-যন্ত্র। তাঁর বাক্সটা দেখে, বেহালা বা বেঞ্জোর মত একটা কিছু মনে হ'লো। সেটা ছিল বেঞ্চের নীচে।

রাত্রে আর বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটে নাই। খুব সকালে সেতারের মত মৃদু ঝঙ্কারে ঘুম ভাঙ্গলো। বোধ হয়, ষ্টেসন হবে অণ্ডাল। দেখি, ভদ্রলোক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হ'য়ে একটি তারের যন্ত্রে আলাপ কর্চ্ছেন! যন্ত্রটা ব্যাঞ্জোর ছোট সংস্করণ ব'লে মনে হ'লো। মনে মনে অনেক গবেষণা করে ঠিক কর্‌তে না পেরে, জিজ্ঞাসা করলুম,—"মশাই, এটা কি যন্ত্র ?"

"এর নাম গীতার। নামটা বিলাতী বটে, কিন্তু আমার মনে হয় যে, দেশী থেকে নেওয়া। এর মানে হচ্ছে, যে তারের যন্ত্রে,—গীত অর্থাৎ সংগীত সুন্দররূপে ধ্বনিত হয়। এই আপনারা মনে করেন, বেহালা বা ভায়োলিন বিলাতী যন্ত্র। তা একেবারেই নয়—আসল নাম হ'লো বাহুলীন, অর্থাৎ যে যন্ত্র বাহুতে লীন করে বাজাতে হয়।"

আমি—"মশায়, যশিদিতে যাবেন কোথায়" ?

তিনি—"রোহিণী রোডে রেল পার হয়ে বাঁ দিকে মিনিট দশেকের (অবশ্য খুব তাড়াতাড়ি চল্‌লে), তার পর ডানদিকে মিনিট পাঁচেকের রাস্তা,—মনভরণ মাহতোর বাড়ী"—

আমি খানিকক্ষণ ভেবে ভেবে মনভরণ মাহতোর বাড়ী কোন্‌টা, ঠিক করতে পারলুম না, যদিও ওখানে সব বাড়ীই আমার চেনা ও যাতায়াত আছে। বড় মুস্কিলে পড়লাম। লোকটার কাছে ঠকে যাবো!

তিনি আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বল্লেন,—"সে বাড়ী চিন্‌বেন্ কি ক'রে, সে ত পাকা বাড়ী নয়। সে ওখানে চাষ করে। তার খড়ের বাড়ী। সেইখানেই আমি উঠিবো। থাক্‌বো মাত্র কালকের দিনটা। কালই রাত্রের এক্সপ্রেসে ফিরে যাবো।"

লোকটা ক্রমশঃ যেন সমস্যাপূর্ণ হয়ে উঠ্‌লো। তিনি নিজেই বল্লেন,—"আচ্ছা এখন থাক্ ও-সব কথা। সেখানে গিয়ে, কাল সন্ধ্যায়, যেখানে একটা অর্দ্ধ-সমাপ্ত বাড়ী আছে, তার কিছু দক্ষিণে মনভরণের বাড়ী খোঁজ কর্ব্বেন। আর খুব সম্ভব আমাকে সেই বাড়ীর কাছেই পাবেন। অনেক কথা বল্‌বো আপনাকে।" ততক্ষণে তিনি বাজ্‌না আরম্ভ করে দিয়েছেন।

তারপর আমরা বেলা ১১টায় যশিদি পৌঁছে গেলুম।

* * * * * * * *

সন্ধ্যা হয়ে এলো, ছেলেরা তখনও বেড়িয়ে ফেরেনি,—আমি আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়লুম। ঠাকুরকে বলে গেলুম, যদি দেরী হয়, খাবার ঢাকা দিয়ে রেখো।

কোজাগরী পূর্ণিমা; তাতে অল্প অল্প ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। মাঠের উপর দিয়ে সেই বাড়ীটার দিকে চল্লুম। সেটা

ভূতের বাড়ী বলেই প্রসিদ্ধ ছিল। সেখানে পৌঁছে দেখি, তিনি বাড়ীর পাশের মাঠে পায়চারী কচ্ছেন। সেই পোষাক, সেই সব,—বেণীর মধ্যে কপালে এক সিঁদুরের ফোঁটা।

আমি বল্লুম- "এই যে, এরি মধ্যে বৈদ্যনাথ সেরে এসেছেন দেখ্‌ছি।"

তিনি—"পায়ে হেঁটে গেছি, মা কালীর কাছে পাঁঠা বলি দিয়েছি, তার পর পায়ে হেঁটেই এসেছি।"

আমি—"আজই যাবেন ?"

তিনি—"হ্যাঁ, আর থাক্‌বার যো নেই।"

"কেন ?"

"এই আমার মানত।"

"কি সব বলবেন বলেছিলেন যে ?"

"হ্যাঁ, এই যে বলি। চলুন, ওই বেদীটার উপর বসি।"

* * * *

"আমি ছিলাম প্রফেসার,—কলেজের নামটা নাই বা কল্লাম। আমার নাম নির্ম্মল। বাপের অনেক বিষয়ও আছে। উকীল হইনি, কারণ, অনর্থক মিথ্যা কথা বলতে হবে বলে। ডাক্তার হইনি, কারণ, লাইসেন্স নিয়ে মানুষ খুন করতে পারবো না ব'লে। তাই হলুম অধ্যাপক। দুটা বিষয়ে এম-এ-ও পাশ করেছিলাম। বিয়েও হয়েছিল কম বয়সে। আর স্ত্রীর নামও ছিল নির্ম্মলা। বেশ মিল হয়েছিল, না ?—হয়েছিলও সত্য। আর ভালবাসার ভাগ বসাতে ভগবান কোন সন্তানই দেন নাই। চার বৎসর আগে—তখন আমার বয়স ৩২,—আর তাঁর বয়স ২৫, আমার বুকের অসুখ করেছিল। এখানে এসেছিলাম হাওয়া বদল করতে। ঐ যে সোজা গিয়ে বাঁ দিকে দুখানা বাড়ী দেখ্‌ছেন, ওরই একখানা আমি নিয়েছিলাম। ছিলাম আমি, আমার স্ত্রী, পিসিমা, আর লোকজন। সঙ্গের সাথী ছিল রাশীকৃত বই ও ঔষধ। তিন মাসের মধ্যে নির্ম্মলার অক্লান্ত যত্নে ও সেবায়—শরীর বেশ সেরে উঠ্‌লো। এইখানেই বাড়ী করবো ঠিক করে এই জমিটা নিয়েছিলাম, এবং ক্রমে বাড়ীও কতকটা তোলা হয়েছিল, দেখ্‌তে পাচ্ছেন বোধ হয়!

* * *

আমাদের পাশের বাড়ীতে এসেছিলেন এক ভদ্রলোক, জমিদার। বেশ বড়লোক। বাতে ভুগ্‌ছিলেন,—তাঁর স্ত্রী, ভাই ও লোক লস্কর, মায় মোটর গাড়ী। পাশাপাশি থাকার দরুণ বেশ মেশামিশি হয়ে পড়্‌লো। মেয়েদেরও আসা-যাওয়া আরম্ভ হলো। ভদ্রলোকটীর নাম হরেন্দ্র, বয়স চল্লিশ। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র কিছু কিছু পড়া আছে, তাই আমার সঙ্গে মিলেছিল। ছোট ভাইয়ের নাম নৃপেন্দ্র, বয়স প্রায় ২৪।২৫ হবে। এরি মধ্যে নানান দেশ-বিদেশে ঘুরে কৃষি-বিদ্যা, না কি একটা শিখে এসেছে। বড় ভাইয়ের চাইতে ছোটকেই আমাদের বেশী ভাল লাগতো। কারণ, সব বিষয়ে সে বেশ একটা কৃতিত্বের সহিত কথা বল্‌তে পারতো। তা ছাড়া, আমাদের সঙ্গে একটা সম্পর্কও বার করে ফেল্লে। সে না কি আমার মামাতো সম্বন্ধীর মাস্‌তুতো ভাইয়ের শালা। সে আমার স্ত্রীকে বৌদি বলেই ডাক্‌তো।

খাওয়া-দাওয়া, নিমন্ত্রণ, বনভোজন, মোটরে বেড়ান; আজ রোহিনী,—কাল রিখিয়া, পোরশু দুম্‌কা,—এরকম প্রায়ই চল্‌তো। আমি ত শীঘ্রই হাঁফিয়ে উঠলুম। আর বেশী যেতে পারতুম না। আমার স্ত্রীর জন্য যত রকম বাঙ্গলা মাসিক পত্র, ও আধুনিক গ্রন্থমালা সংস্করণের বই সমস্তই আস্‌তো। কিন্তু এদানী আর সেগুলো প্যাকই খোলা হ'তো না।

শেষে এক দিন,—এই কোজাগর পূর্ণিমার দিন,—আমি গিছলাম দেওঘরে। সন্ধ্যার ট্রেণে ফিরে এসে শুনলুম, নির্ম্মলা গেছে পাটি কর্ত্তে, সঙ্গে মাত্র একটা ব্যাগ নিয়ে। আমি স্থির হয়ে শঙ্কর ভাষ্যের এক অধ্যায় শেষ করবার জন্য ইজি চেয়ারে শুয়ে পড়লুম। ঘড়িতে রাত্রে ১০টা টং টং করে বেজে উঠ্‌তে,—হরিয়াকে ডেকে বল্লুম, ওরে, ও বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে আয়,—অনেক রাত্রি হচ্ছে। সে এসে কিছুই বলতে পারলে না। আমি তাকে ধমকে নিজেই গেলুম। কেউ কোন খবর দিতে পার্ল্লে না।

* * *

আরো কয়েক দিন ছিলাম। তার পর চলে এলাম কলকাতায়। নির্ম্মলার কোন সন্ধান পেলাম না। বাড়ী অসমাপ্ত রয়ে গেলো। অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়েছি। এখন বৎসর বৎসর এইখানে এই দিনে এসে মায়ের কাছে নিজে হাতে পাঁটা বলি দিয়ে আসি। দেখি, কত দিনে বাসনার বলি দিতে পারি।" বলেই, একটা বিদায় সম্ভাষণও না ক'রে, তাড়াতাড়ি মনভরণের বাড়ীর দিকে গেলেন। বুঝলাম লোকটার মাথা ঠিক নেই।

অকাল-মৃত্যু ও বাল্য-বিবাহের জের

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

(৩)

আমি বাল্যবিবাহের সপক্ষে লেখায় অনেকেই আমার বিপক্ষে লিখিতেছেন। আমাদের সমাজ-বিধির পক্ষে বাল্যবিবাহ যৌবন-বিবাহাপেক্ষা উপযোগী ছিল বলিয়াই আমার বিশ্বাস। দাম্পত্য-প্রেমের প্রসারও আমার মতে ইহাতে অধিকতরই হইয়া থাকে। অবশ্য সকল নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে, তাহা ভুলিলে চলিবে না। তবে বিচারটা সমষ্টি ধরিয়াই করিতে হয়। যৌবন-বিবাহের ব্যবস্থা যে সকল সমাজ আছে, তাহাদের তুলনায় আমাদের সমাজে যে দাম্পত্য-জীবন অধিকতর সুখের, ইহা অনেকেরই দ্বারা স্বীকৃত সত্য

বাল্য-বিবাহকে অনেকে অকাল মৃত্যুর জনক বলিয়া থাকেন। আমি বলিয়াছি অকাল মৃত্যুর জন্য আমাদের মধ্যে নূতন আমদানী আরও সহস্র কারণ উপস্থিত হইয়াছে। বাল্য-বিবাহ হিন্দু সমাজে সুদূর অতীত কাল হইতেই বর্ত্তমান আছে; কিন্তু অকাল মৃত্যু জিনিসটী যে এ দেশে অনেকটাই নূতন আমদানী, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

সে যাহা হোক, এ দেশে বাল্য বিবাহ দিন দিন হ্রাস ভিন্ন বর্দ্ধিত হয় নাই; কিন্তু দীর্ঘজীবীর সংখ্যা নিত্যই সংক্ষেপ হইতেছে। ইহাতে মনে হয়, বাল্য-বিবাহ অকাল-মৃত্যুর অন্ততঃ মুখ্য কারণ নহে। তবে "নানা কারণে এ দেশীয় নরনারীর স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়া এক্ষণে তাহাদের বিবাহ বয়োবৃদ্ধির প্রয়োজন ঘটিয়াছে"—এ কথা যদি কেহ বলেন ত আমি 'না' বলিতে পারি না, ব এরূপ ক্ষেত্রে উহা বলিও নাই। রুগ্ন ও দুর্ব্বল "নর বা নারী যে আদৌ বিবাহ করিবার উপযুক্তই নহেন" এই কথাই আমি লিখিয়াছি। যদি কেহ বলিতেন, "এখনকার ক'জন ছেলেমেয়ে সবল ও সুস্থ?" তাহা হইলে আমায় বলিতে হইবে "তবে তাহাদের সবল সুস্থ করিয়া তার পর যত বয়সেই হোক বিবাহ দিও। শাস্ত্রেও ইহার বিধি আছে। "ব্যাধিগ্রস্ত বা ব্যাধিগ্রস্ত পাত্র পাত্রী" নির্ব্বাচন কালে তালিকা-বহির্ভূত হইয়াছে।" কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ দেশের ছেলেমেয়েদের নীরোগ ও সবল কারবার জন্য ঔষধ গেলানো ভিন্ন আর কি কোন পথ আছে?

পুরাতন বিধি-ব্যবস্থা মাত্রেই নিন্দনীয় ও সর্ব্বদোষাকর, এমন বিশ্বাস আমার নাই। শাস্ত্র-বিধিসকল যখন প্রবর্ত্তিত হয়, তখন তাহার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা থাকে। কালে হয় ত তাহার সংস্কারের আবশ্যকতা ঘটে; ইহার

প্রশস্ত কারণ দেখাইলে, এ কথা স্বীকার করিতে পারি; কিন্তু তাই বলিয়া পূর্ব্ব বিধি সমস্তই অন্যায় ও ভ্রমপূর্ণ ছিল এবং ঐ সকলের প্রবর্ত্তকগণ একান্ত মূঢ়, অনুদার-চিত্ত ছিলেন, এমন কথা আমার মত লোকের মুখে শুনিলে, নিজেদের বুদ্ধির উচ্চ প্রশংসা করিতে পারিব না; এবং আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদের মুখেও শুনিলে ভয়ে ভয়ে বলিবে, মুনিদেরও কদাচিৎ মতিভ্রম ঘটিয়া থাকে, এরূপ একটা প্রবাদ আছে।

'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র অগ্রহায়ণ সংখ্যায় শ্রীসরসীবালা বসু লিখিয়াছেন, "স্বর্গীয় শ্রদ্ধাস্পদ বিবেকানন্দ ভারতের মঙ্গলের দিকে চাহিয়াই ভারতবর্ষের পুরোহিত-সম্প্রদায়ের কঠোর বিধি-নিষেধের প্রতি তীব্র কটূক্তি করিয়া গিয়াছেন। লেখিকা (অর্থাৎ আমি) যে একস্থানে লিখিয়াছেন, যথার্থ সমাজ-হিতৈষণা ও দেশ হিতৈষণার সহিত ভাবিয়া বলেন না। স্বামীজীর পক্ষেও কি সেই কথা প্রযোজ্য?"

এস্থলে পুরোহিত বলিতে কাঁহাদের বুঝাইয়াছে, ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। যদি আধুনিক "দেবশর্ম্মা" স্বাক্ষরকারী সংস্কৃতভাষাভীত "চালকলাজীবী" জীব-বিশেষকে বুঝায়, তাহা হইলে স্বামীজীর 'কটূক্তি' যত তীব্র হয় আমি ততই খুসী। কিন্তু সে "কটূক্তি" যদি মনুযাজ্ঞবল্ক্যাদি মহর্ষিগণের বিরুদ্ধে করা হইয়া থাকে, এস্থলেও সবিনয়ে বলিব, "মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।" কারণ, উক্ত মহাপুরুষ ও মহাত্মা স্বামীজী মহারাজকে আমি অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়াই সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়া শ্রদ্ধা করিলেও, তাঁহাদেরও তাঁর চেয়ে কোন অংশে, কোন মতে এতটুকু ছোট তো ভাবিতে পারি না, বরং অধিকতর অভ্রান্ত মনে করি।

যাহা হৌক, "বর্ত্তমান কালে অশক্ত শরীর ও অসংযত শিক্ষার মধ্যে থাকিয়া আমাদের ছেলেরা বাল্যবিবাহের পর শাস্ত্রবিহিত ব্রহ্মচর্য্য-পালন পূর্ব্বক সন্তানজননে বিলম্ব করিতে পারিবে না। তার চেয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বয়স্থা কন্যা লাভানন্তর বর্ষ মধ্যে পিতা হওয়াই ভাল" এ কথার উত্তরে আমি বলিব, "যদি সন্তানদের ব্রহ্মচর্য্য পালনের উপযুক্ত করিয়া আমরা গঠিত করিতে না পারি, তবে বার বৎসরের মেয়েকে বিবাহ দিয়া মনোমত শুধু গড়িয়া লওয়ার সাধ মন হইতে বিদায় করিয়া দেওয়াই সঙ্গত।" "শিক্ষিতা মেয়েরা শ্বশুরবাড়ী ভাল ভাবে ঘর করিতে পারে না।" এমন কথা আমি বলি নাই। কিন্তু এ দেশের ক'জন মেয়ে যথার্থ শিক্ষিতা? আমি বলিয়াছি, ১১।১২ বৎসরের মেয়ের বিবাহ দিয়া তার ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শ্বশুরালয়ে নিজ মনোমত করিয়া শিক্ষাদান করা কর্ত্তব্য। ঐ মেয়ের স্বামী ঐ কয়েক বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবেন। আমি জানি, সকল ঘরের পক্ষেই ইহা অসম্ভব ঘটনা নহে। তবে ইহার জন্য শৈশবাবধি "রাঙ্গা বউ"এর ছড়া কাটিয়া ছেলেকে বধূর জন্য লালায়িত রাখিলে চলিবে না। মেয়েদের পিত্রালয়াপেক্ষা শ্বশুরালয়েই প্রধানতঃ শিক্ষা-কেন্দ্র হওয়া কেন এদেশে সঙ্গত তাহার যথেষ্ট কারণও দেখান হইয়াছে। "সকল ঘরের চালচলন ঠিক এক" নহে, যথেষ্ট বিভিন্ন; বিশেষতঃ এই বর্ত্তমান কালে। এখন হিন্দু-সমাজে বৈদিক কালোচিত আচারপরায়ণতা হইতে আরম্ভ করিয়া পূরা ইয়োরোপীয় সমাজোপযোগী আচারসম্পন্ন হিন্দু যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান। শিক্ষা-বভ্রাট মেয়েদের পক্ষে যথেষ্ট ঘটিতে দেখা যায়। তার পরও যখন কোন দেশের কোন শাস্ত্রে নাই বলিয়া ইহাকে উপহাস করা হইতেছে, তখন নাচার।

মেয়েরা বড় হইয়া শ্বশুরবাড়ী গেলেই, শাশুড়ীর সহিত কলহ করিবে এমন কথা বলা হয় নাই। বালিকা বধূর শ্বশুর-বাড়ীর আত্মীয়জনের প্রতি সমধিক ভালবাসা জাত হওয়াই মানব-প্রকৃতি-সঙ্গত। অপর পক্ষ হইতেও ঠিক এই যুক্তিই দেখান যায়। পতি-পত্নী সম্বন্ধেও এই একই কথা। ইহার ব্যতিক্রম যথেষ্ট হয়, কিন্তু সে "সমষ্টি ধরিয়া কথা নয়।" তার পর বয়োধিক বিবাহের সহিত স্বাধীন নির্ব্বাচন অস্বীকার করা চলে না। পরিণত মনোবৃত্তিতে কি অভিভাবকের পছন্দকেই মনের সহিত মানিয়া লওয়া সকলকার পক্ষেই সম্ভব? সংসারে কিন্তু ইহারও ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখিতেছি। আমার একটী কুমারী বান্ধবী,—ইনি জাতিতে বাঙ্গালী, ধর্ম্মে খৃষ্টান, উপাধিতে এম এ বি এল, আমায় বলিয়াছিলেন, "মা-বাপে কম বয়সে দুটীকে মিলাইয়া দেন, একত্র বসবাস করিতে করিতে দুজনের প্রতি দুজনে আকৃষ্ট হইয়া পড়া যায়; তখন রূপ-গুণ বিদ্যা-বুদ্ধি ধন-দৌলতের ফাঁক চোখে-কানে ঠেকে না। কিন্তু যদি নিজেকে পছন্দ করিয়া

বিবাহ করিতে হয়, তবে মন কি সহজে কাহাকেও নিজের যোগ্য বলিয়া স্বীকার করিতে চায়? তা নিজে যেমনই কেন হই না। আবার অপর পক্ষেও এই উপদ্রব আছে। পরিণত বয়সে, উভয়তঃ সর্ব্ব বিষয়ে মনের মিলন মতের মিলন হইয়া যে বিবাহ, সে বড় উচ্চাঙ্গের বিবাহ বিবাহ বটে; কিন্তু সে কি সহজে ঘটে? তাই মনে হয়, আমার বিবাহ করা আর সম্ভব হইবে না। অবশ্য যদি সুযোগের খাতিরে করা যায়, সে স্বতন্ত্র কথা।" ছেলেমেয়েদের বড় করিয়া বিবাহ দিলে তাদের পছন্দর উপর কতকটা আসিয়া পড়িবে বই কি! কিন্তু সেটা এই বাঁধাবাঁধির সমাজ যতক্ষণ আছে, ততক্ষণের জন্য আরও জটিল ব্যাপার। যাই হোক, "তাই বলিয়াই আর কোন্ স্বামী স্ত্রী দাম্পত্য-ধর্ম্ম-পালনে বিরত আছেন?"

এ দেশের লোকের আয়ু গড়পড়তায় ২৩ বৎসর, ইহা বোধ করি আমারই কল্পিত নহে। কিন্তু আমি এমন কথা বলি নাই, যে ২৩ বৎসরের মধ্যেই সকল লোককেই ৪টী সন্তান জন্মাইয়া মরিতে হইবে এবং সকলেই ঠিক ঐ এক সময়েই মরে। আমি বলিয়াছি, অদীর্ঘজীবী জাতি দীর্ঘজীবী জাতির দৃষ্টান্তানুসারে ১৭।১৮।২০ বৎসরে মেয়ের বিবাহ দিলে, তাদের সন্তান-সন্ততি জন্মিবে কবে? তবে সেটা লেখা আমার ভুল হইয়াছে; কারণ, বার বৎসরে বিবাহও ষোড়শে সন্তান জন্ম না হইয়া, সপ্তদশে বিবাহ ও উক্ত বর্ষেই সন্তানের জননী হওয়ায় বিশেষ প্রভেদ নাই, এখন এইরূপই হইতেছে। তাঁরা বধূ জীবনের আনন্দে বঞ্চিত হইয়া একেবারেই প্রমোশন পাইয়া উচ্চপদবীতে আরূঢ়া হইয়া থাকেন।—সেই ভাল। তবে আমার প্রবন্ধে ১৭ বৎসরে তিন-চারিটী ছেলেমেয়ে হওয়া চাই, ইহা কিরূপে বুঝাইল? আমি ১৬, বৎসরের পূর্ব্বে সন্তান হওয়া অনুচিত, এইরূপই ত বলিয়াছি।

বাল্য-বিবাহ পল্লী-সমাজে ও ব্রাহ্মণ-কায়স্থের জাতির মধ্যেও দিন দিন হ্রাস প্রাপ্তই হইতেছে। নানা কারণে হইবেও। একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যেই ইহার আবশ্যকতা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। উহার উচ্ছেদের সহিত ইহার প্রয়োজনীয়তারও দিনে দিনে হ্রাস হইয়া আসিতেছে। সব জিনিসেরই দুইটা দিক আছে; এবং সময় ও অবস্থা নিজেই সবচেয়ে বড় সংস্কারক। যখন যে সমাজের অবস্থা যেরূপ দাঁড়ায়, তখন সেই অনুসারেই সে কতকটা ব্যবস্থা করিয়া দেয়। এ দেশের বর্ত্তমান কালের দুর্ব্বল-শরীর, সঙ্কীর্ণ-চিত্ত, উচ্ছৃঙ্খল শিক্ষার মধ্যে পালিত হইয়া বিবাহের পর ব্রহ্মচর্য্য পালন যখন ছেলের পক্ষে আকাশ কুসুম বলিয়াই তাদের অভিভাবকেরা রায় দিতেছেন, তখন সে আশা করা নিশ্চয়ই ধৃষ্টতা। যুবতী বধূগণ যে শিক্ষায় শিক্ষিতা হইয়া শ্বশুরালয়ে প্রবেশ করিতেছেন, তাহা তাঁদের স্বামী ও পরিজনবর্গের বেশ মনোমত হইতেছে, ইহাও একান্ত সুখের বিষয়। আমরা কিন্তু সর্ব্বদাই ইহার বিরুদ্ধ অভিযোগই শুনিতে পাই। কেহ বলেন "মা বাপ এত বড় ধেড়ে মেয়ে করে রেখে কি একটু লেখাপড়াও শেখাতে পারে নি?" কেহ বলেন "মা বাপ কি কেবল বই পড়তেই শিখিয়েছিল? সংসারের কুটাগাছটী কি কখনও নাড়তে শেখায় নি? মেয়েমানুষে লেখাপড়া করে কি আফিসে যাবে না কি? বাইজী না কি, যে গান শিখেছে।" আবার কাহাকেও দুঃখ করিতে শুনি, "বউমার পেটে ছেলে এলো, নইলে একটু গান বাজনা শেখাই, ইচ্ছা ছিল।"

কেহ কেহ আমার প্রতি অবরোধ প্রথার পক্ষপাতিত্ব আরোপ করিয়া উহা যে দেশের জিনিস নহে, পরন্তু বাহিরের আমদানী, ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমি অবরোধ-প্রথাকে কোথাও সমর্থন করি নাই। বরং বলিয়াছি, বাঙ্গালাদেশের পল্লীগ্রামে অবরোধ-প্রথা নাই, এবং বাস্তব পক্ষে মেয়েরা পুরুষের একান্ত পদদলিত ও অধীন নহেন। শিক্ষিত জনগন মধ্যে নারীর ন্যায্য অধিকার ও স্বাধীনতার সম্বন্ধে খুবই ত্রুটী আছে, তাও আমার মনে হয় না। অর্থাৎ যোগ্যতা দেখাইতে পারিলে উহা অপ্রাপ্য থাকে না। তবে যে দেশের পুরুষজাতিই পরাধীন, অস্ত্র আইন যাদের হাত পা বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সে দেশের মেয়েদের পূর্ণ স্বাধীনতা কেমন করিয়া ঘটিতে পারে? পুরাকালের নারীরা পূর্ণ স্বাধীনাই ছিলেন; বৈদেশিক অত্যাচার আরম্ভ হওয়া অবধি তাদের স্বাধীনতার উপর ক্রমশঃ হস্তক্ষেপ হইয়া আসিয়াছে এবং কতকটা রাজার জাতির অনুকরণের ফলও আছে। আবার যদি কখন তুর্কির অধিকারে আসিতে হয়, তবে আমাদের এই স্বাধীনতার সুর বদ্লাইবে না

ত? বোধ হয়, না। কারণ, তুর্ক নারীও বোর্কা খুলিতেছেন। শাস্ত্রে নারীর স্বাতন্ত্র্য বর্জ্জিত হইলেও, যখন তাঁর স্বামীর সহিত একাত্মতা স্বীকৃত হইয়াছিল, যখন তাঁর সকল ধর্ম্মে ও কর্ম্মে অধিকার জাত হইয়াছিল, তখন পুরুষের সকল উন্নতির সহিত তাঁহার সংযুক্ত থাকাও অবশ্যম্ভাবী, এবং চিরদিন তাহাই হইয়া আসিতেছে। নারী যে চিরদিনই অবলা ছিলেন না, তার সম্বন্ধে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রচুর প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। সেদিন পুরুষের বীর্য্যও তদপেক্ষা হয় ত বা কম ছিল না। আজ পুরুষশক্তি গুহা-নিহিত, তাই নারীও অবলা। পুরুষ যতটুকু পৌরুষ লাভ করিবেন, সঙ্গে সঙ্গে নারীরও ততটুকু উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। যে গৃহের পুরুষ যতটুকু উদার, যতটুকু উন্নত, সে গৃহে নারীও তাহাতে বঞ্চিতা নহেন, এইরূপই যেন মনে হয়।

ভদ্রসমাজে নারীকে ভিতরে ও পুরুষকে বাহিরে রাখা হইয়াছে। কিন্তু দরিদ্র সমাজে সে ব্যবস্থা নাই। নারী সেখানে সমধিক স্বাধীনা। তাই কি সেখানে নারীকে অধিকতর সম্মানের পাত্রী ও সম্পূজিতা মনে করিব? আবার বলি, আমি অবরোধ-প্রথার পক্ষপাতিনী আদৌ নহি; কিন্তু নারীর স্বাতন্ত্র্য বা পুরুষের সহিত সর্ব্বত্রই সমান অধিকারকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু মনে করি।

"পুরাতত্ত্ববিদ ইচ্ছা করিলে প্রাচীন সমাজের" কি কি "উদাহরণ" দিবেন জানি না—তবে আমাদের মনে হয় এদেশে যখন লোকে শতায়ু ছিলেন, তখন ব্রহ্মচর্য্য গৃহস্থাশ্রম বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি আশ্রমের ব্যবস্থা ঐ শাস্ত্রকারগণই করিয়াছিলেন এবং উহা শত শত লোকে মানিয়াও চলিত। এখনকার কালে আর সে আয়ুও নাই, সে আশ্রম-বিভাগও নাই—তবে আর সে সুদূর অতীত কাহিনী স্মরণের লাভ কি? চতুরাশ্রমের পুনঃ প্রবর্ত্তন এ ভারতে আর এখন সম্ভব কি? আহা, তার চেয়ে আর সুখের কথা কি হইতে পারে? বোর্ডিং বাস ছাড়িয়া কি ছেলেরা গুরুগৃহে বাস ধরিবে? অধ্যাত্ম বিদ্যালাভে জন্ম সফল করিবে? ব্রহ্মচর্য্য ও ত্যাগ সংযমে পূত হইয়া কুল পবিত্র ও জননীকে ধন্যা করিবে? মেয়েরা রেশম পশম লেশ—চিকনের শ্রাদ্ধ ছাড়িয়া অজীন-বসনা (বা মোটা খদ্দর) হইবেন? দশের জন্য আত্মবলি দিতে শিখিবেন? এমন দিন কি আসিবে?

আমরা সেকেলে "হিঁদুর" মেয়ে। শিক্ষা, সঙ্গ, আদর্শ সবই আমাদের সঙ্কীর্ণ। তাই শাস্ত্রবিধি ও শাস্ত্রকারগণকে একান্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি, ও তাঁদের বাণীকে অভ্রান্ত মনে করি। দূরদর্শী শাস্ত্রকারগণ সকল স্থলেই সমান ব্যবস্থা খাটাইয়া রাখেন নাই। দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে তাঁরা সকল বিধি-ব্যবস্থারই তারতম্য রাখিয়াছেন। যেদিনে আবশ্যক বোধে বাল্য-বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, তার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য পালনের ব্যবস্থায় অকাল-মাতৃত্ব নিবারণ করিয়াছেন। আবার রুগ্ন, দুর্ব্বল পাত্র পাত্রী, অথবা অক্ষম পিতার কন্যাদের জন্য উহাকে বাধ্যতামূলক করেন নাই। আমি বাল্য-বিবাহের পর ব্রহ্মচর্য্য বিধানের ব্যবস্থা পালিত হইতে দেখিয়াছি; তাই আমার বিশ্বাস ছিল যে, উহা ভদ্র সমাজে অন্ততঃ অসম্ভব নহে; বিশেষ যেদিনের ছেলেরা হাসিমুখে জেলখানার অসংখ্য লাঞ্ছনাকে বরণ করিয়া লইয়া ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে যে সব নজীর দেখা গেল, তাহাতে আমি বলিব, বাল্য-বিবাহে প্রয়োজন নাই। তবে এ কথা এখনও বলিব যে, এই অন্নজীবী জাতির মেয়েদের তথাকথিত "১০।২২শে" বিবাহ হোক। অবশ্য আমার মত পূর্ব্ব প্রবন্ধেই লিখিয়াছি। বিবাহ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বাধ্যতামূলক হওয়া সঙ্গত নহে এবং শাস্ত্রেও সে বিধি নাই। যে মা-বাপ নিজের ছেলেকে ব্রহ্মচর্য্য পালনোপযোগী শিক্ষা দিতে সমর্থ, যাঁর পুত্রবধূটীকে নিজ মনের মত গঠনের সাধ ও সামর্থ্য আছে, তিনি অবশ্যই দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকাকে ঘরে আনিতে পারেন। যাঁরা ও সকল পরিশ্রমে কাতর, তাঁরা দ্বাবিংশবর্ষীয়াই গ্রহণ করুন; রুচি এবং আদর্শ সবারই কখন এক হইতে পারে না। তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আত্ম-পরিজন প্রতিবেশী এবং ঐ কন্যার পরিণেতা নিজের ছেলেটীকে শুদ্ধ যেন ভাল করিয়া বলিয়া দেন যে, তাহারা ঐ মেয়েটীকে তার "ধেড়ে বয়সের" ও অমনোনীত শিক্ষার ত্রুটী ধরিয়া তাহাকে উঠিতে বসিতে সদা সর্ব্বদা খোঁটা দিয়া দিয়া না পাগল করেন।

শেষ কথা, ঠাকুরদাদার ধন-সম্পত্তি ছিল বলিয়া ভিখারী ধনী হয় না বটে, কিন্তু যাদের রক্তে ধনার্জ্জনের শক্তি ছিল, চেষ্টা করিলে আজও তারা নিজেরাও যে ধনী হইতে পারে, অন্ততঃ এ জন্যও তাদের নিজেদের অতীত

ইতিহাসটুকু জানিয়া রাখা মন্দ নয়। চির-ভিখারীর আশয় ও আদর্শ দুই-ই একান্ত ক্ষুদ্র।

যারা শুধু পূর্ব্ব ধনবত্তার বড়াই করে, অথচ নিজেদের বড় করে না, তারা তাদের অতীত ইতিহাসকে নিশ্চয়ই অন্তরের মধ্য দিয়া অনুভব করিতে পারে নাই; মাত্র ভাসা-ভাসা ভাবে পড়িয়াছে বা শুনিয়াছে। জাতীয় মর্য্যাদা-জ্ঞান না থাকিলে জাতি উন্নত হইবে কি দিয়া? তবে সে জাতীয় গৌরব সত্য ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ও খাঁটি জিনিস হওয়া চাই, ইহা নিশ্চিত; এবং কালোচিত সংস্কার উপযুক্ত হস্ত হইতে গ্রহণ করিবার মত উদারতা থাকা প্রকৃত উন্নতি-কামীর পক্ষে একান্তই আবশ্যক, ইহাতেও কোন দ্বিধা নাই

কিন্তু এখন সমাজ-সংস্কারের অধিকার—বিশেষতঃ হিন্দু সমাজের, এমন লোকের উপর অর্শিয়াছে যে, তদনুসারে তাহাদের চলিতে গেলে "জাতীয় আদর্শ" যে কোন পূতি-গন্ধময় পঙ্কের তলায় তলিয়া যায়, তাহা বলা যায় না। যাঁরা আধুনিক বঙ্গীয় "আর্টের" সহিত পরিচিত আছেন, তাঁরা কি পুরাতন শাস্ত্রবিধির চেয়েও উহাকেই উন্নততর আদর্শ মনে করিবেন? বিশেষতঃ নারীর পক্ষে? শাস্ত্র-বিধি সবাই মানে না; ইচ্ছামত বিকৃতার্থেই অধিকতর ব্যবহৃত হয় সত্য, কিন্তু না মানার দলও তো তার চেয়ে কই কোন বড় আদর্শ দেখাইতে পারিলেন না?

পিতৃ-পুরুষের বা মাতৃ মাতামহীর সাহায্যে আত্মশ্লাঘা না করিয়া নারী সমাজ এই নূতন আদর্শকে সম্মান করিবেন কি?

প্রবীণ উপদেষ্টা এ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে হয় ত মন্দ হইত না। তাঁহার উপদেশের মধ্যে আমরা অনেক সময় প্রকৃত চিন্তাশীলতার পরিচয় পাইয়া থাকি।

মানুষ যখন সংশয়ের গোলক-ধাঁধায় আসিয়া পৌঁছায়, তখন তার পরিচিত পুরাতন পথকেই বরং সে কথঞ্চিৎ নিরাপদ মনে করে, যতক্ষণ না যথার্থ বিশ্বস্ত সাহায্য-হস্ত তাহার জন্য প্রসারিত হয়। ইহাতে কিছু বিলম্ব ঘটিয়া যায়, সেও মঙ্গল; তথাপি বারম্বার বিপথে বিড়ম্বিত হওয়া ভাল নয়।

বাংলাদেশের স্ত্রীশিক্ষার শিক্ষয়িত্রী-সমস্যা ও বিধবাদিগের শিক্ষা

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায় এম-এ

স্ত্রী শিক্ষার একটি প্রধান সমস্যা

দেশীয় স্ত্রীশিক্ষার একটী সাধারণ সমস্যা শিক্ষয়িত্রীর অভাব। শিক্ষা অপেক্ষা শিক্ষয়িত্রীর এখানে বিশেষ প্রয়োজন। সমাজে অবরোধ প্রথা প্রচলিত থাকায়, অনেক স্থলে পুরুষের দ্বারা শিক্ষাকার্য্য সম্পাদিত হয় বলিয়া, অনেকেই নিজ নিজ পরিবারের বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে অনিচ্ছুক। শিক্ষার উচ্চতর ও উচ্চতম স্তরগুলিতে এই আপত্তি খুব বেশী। শৈশব-শিক্ষায় বালক-বালিকারা মিলিত হইয়া, একই বিদ্যালয়ে শিক্ষকের নিকট শিক্ষা লাভ করিতে পারে। আপত্তি প্রথম উত্থাপিত হয়, অন্ত-শিক্ষায়। এখানে পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ না হইলেও, শিক্ষয়িত্রীদিগের দ্বারা শিক্ষা পরি-চালনের বন্দোবস্ত হইলে, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তৃতি ঘটিতে পারে। অপরাপর স্তরে, যতদিন পুরুষের সম্পর্ক থাকিবে, ততদিন স্ত্রীশিক্ষা বিস্তৃত হইবে না। অন্তঃপুরে, পুরুষের প্রবেশ নিষেধ, ইহা বলাই বাহুল্য। এরূপ অবস্থায়, শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা-বৃদ্ধি স্ত্রীশিক্ষার সর্ব্বপ্রধান সমস্যা।

শিক্ষয়িত্রী লাভের সম্ভাবনা

এখন দেখা যাক, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায়, শিক্ষয়িত্রী লাভের সম্ভাবনা কিরূপ। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা এরূপ কর্ম্ম দ্বারা সমাজের প্রভূত উপকার করিতেছেন, সেই অগ্রসর সম্প্রদায়ের মহিলারা শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করিতে পারেন। তাঁহাদিগকেই স্ত্রীশিক্ষার নেতৃত্ব করিতে হইবে। ইঁহাদের সংখ্যা খুব কম। সেই জন্য, যেখানে শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন খুব বেশী, কেবল সেই-খানেই, ইঁহাদের স্থান হওয়া উচিত। যখনই সুযোগ ঘটিবে,

মধ্য, অন্ত্য ও অন্তঃপুর-শিক্ষার ভার ইঁহাদের উপর ন্যস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। দেশীয় ফিরিঙ্গি সম্প্রদায় হইতেও শিক্ষয়িত্রী লাভের সম্ভাবনা আছে। এই উদ্দেশ্যে এই সম্প্রদায়ের সহানুভূতি লাভের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যে সকল ফিরিঙ্গি-মহিলা স্ত্রীশিক্ষায় সাহায্য করিবেন, তাঁহাদিগকে বাংলা ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে। ইংরাজী ভাষা অধ্যাপনার ভার ইঁহাদের উপর থাকিতে পারে। য়ুরোপীয় মহিলারাও আমাদের স্ত্রীশিক্ষায় বিশেষ সাহায্য করিতে পারেন। বিজ্ঞান, শিক্ষাতত্ত্ব ও বিভিন্ন য়ুরোপীয় ভাষা শিক্ষায় ইঁহাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিশেষ আবশ্যক হইবে। মন্টেসারীর প্রণালী, বুদ্ধি পরীক্ষা, বা মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যাপনা করিয়া, এবং শিক্ষাতত্ত্ব শিক্ষার বিদ্যালয়গুলির পরিচালনা দ্বারা, ইঁহারা আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদিগকে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন। এরূপ কার্য্যে, ইংলণ্ড অপেক্ষা আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের মহিলারা, বিশেষ ভাবে, আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারিবেন। শিক্ষাতত্ত্বের আলোচনায়, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের বিশ্ব বিদ্যালয়গুলির স্থান ইংলণ্ডের বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির অপেক্ষা অনেক উচ্চে।

এই তিন শ্রেণীর মহিলা শিক্ষয়িত্রীদিগকে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা মানিয়া লইয়া শিক্ষা-কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। তাঁহাদিগকে নিজ নিজ সংস্কার ও ধর্ম্মমত পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিবার অধিকার কাহারো নাই; তবে তাঁহাদের নিকট অনেকখানি সহানুভূতির আশা করিতে হইবে। অনেক ক্ষেত্রেই, শিক্ষার্থিনীদিগের সংস্কার ও অসম্পূর্ণতা স্নেহের চক্ষে দেখা আবশ্যক হইবে, এবং লোক-হিতৈষণা তাঁহাদের কর্ম্মের নিয়ামক না হইলে, তাঁহাদিগের দ্বারা যথেষ্ট সুফল লাভের আশা থাকিবে না। দেশের নৈষ্ঠিক সমাজের, এরূপ মহিলা শিক্ষয়িত্রীদিগের উপর, একটা অবিশ্বাসের ভাব বিদ্যমান। এই ভাবকে সহানুভূতি ও প্রীতি দ্বারা নষ্ট করিতে না পারিলে, স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের সামাজিক বাধা অতিক্রান্ত হইবে না।

কিন্তু উপরিউক্ত তিন শ্রেণীর শিক্ষয়িত্রী দেশীয় স্ত্রীশিক্ষায় যথেষ্ট হইবে না। আমাদের সমাজের ভিতর হইতেই এরূপ শিক্ষয়িত্রী অনুসন্ধান করিয়া, তাঁহাদিগকে শিক্ষা-কর্ম্মের উপযুক্ত করিয়া লইতে হইবে। পর্দ্দা সত্ত্বেও, এ বিষয়ে, আমাদের ভাবিবার ও করিবার কি কিছুই নাই? সধবা স্ত্রীলোকেরা, সাধারণতঃ, শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতে পারিবেন না। তাঁহারা নিজেদের পরিবার ও সন্তান-সন্ততি লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে বিধবাদিগের ভিতর হইতেই শিক্ষয়িত্রী সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইবে।

বিধবাদিগের দুঃখে অসঙ্গত সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে তাঁহাদের অবমাননা করা হইবে। তাঁহাদের পার্থিব দুঃখ, ত্যাগ সেবা ও সংযমের মহিমায়, সমাজে বরণীয় হইয়া আছে। বাহির হইতে, যে দুঃখ অমানুষিক অত্যাচার বলিয়া বোধ হয়, সমাজের অভ্যন্তরে থাকিয়া, সমাজের সহিত একাত্ম জীবন যাপন করিয়া, তাঁহারা সমাজকে মাত্র বাহ্য বস্তু বলিয়া বুঝিতে ও ধারণা করিতে শিখেন নাই। তাই যাহা অপরের দৃষ্টিতে সামাজিক অত্যাচার বা নিষ্পেষণ বলিয়া বোধ হয়, তাহাই তাঁহাদের নিকট পরমার্থ,—অনন্ত পারত্রিক সুখের আকর। সকলেই সজ্ঞান, এই আধ্যাত্মিক শান্তি ও সংযমের পবিত্রতায় মহনীয়া না হইলেও, একটীই যে তাঁহাদের জীবনাদর্শ, এবং এই আদর্শই যে সামাজিক আচার ব্যবহার দ্বারা পরিপুষ্ট এ কথাও খুব সত্য। এই আদর্শ যে সর্ব্বস্থলেই সংগ্রামপূর্ণ জীবনে কার্য্যে পরিণত হয়, এই সংযমের ভিতর, বা অন্য প্রকার দুঃখ যে কাহারো নাই, অসংযমের পিচ্ছিল পন্থা অনুসরণ করিবার অবসর বা কুযোগ যে তাঁহাদের থাকিতে পারে না, অথবা এরূপ পন্থা যে কেহ কখনও অনুসরণ করেন না,—এরূপ কথা বলিবার মত দুঃসাহস কাহারো নাই। সমাজে বিধবাদিগের ভিতর দেবীও আছেন, মানবীও আছেন, এবং পিশাচীরও অভাব নাই। এরূপ সম্ভাবনার ভিতর দিয়াই, শিক্ষার প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং আমাদের বিধবাদিগের ভিতর হইতে, শিক্ষয়িত্রী লাভের আশা বলবতী হইতে থাকে।

বিধবাদিগের শিক্ষার প্রয়োজন

আমাদের সমাজে বিধবাদিগের স্থান, হয় পিতার সংসারে, না হয় স্বামীর গৃহে। সকলেরই আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হইতে পারে না। যেখানে অর্থাভাব, সেইখানেই

তাঁহারা আত্মীয় স্বজনের উপর নির্ভর করেন। কিন্তু নির্ভরতা, ক্ষেত্র-বিশেষে, বিধবাদিগের অনেক দুঃখের ও অনেক লাঞ্ছনার কারণ হয়। অনেকের আবার নির্ভর করার মত স্বজনেরও অভাব হয়। তাঁহাদের আর্থিক অবস্থাও যদি সঙ্গে সঙ্গে হীন হয়, তখন কষ্টের সীমা পরিসীমা থাকে না। এরূপ ক্ষেত্রে যেখানেই দুঃখের আতিশয্য বিদ্যমান, এবং ব্রহ্মচর্য্য সংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় না, সেইখানেই প্রলোভন ও পতনের আশঙ্কাও অধিক। এরূপ লাঞ্ছিতা ও সঙ্গিহীনা বিধবাদিগের উপার্জ্জনের উপযোগী শিক্ষা যে আকর্ষণের বস্তু হইতে পারে, তাহা বলাই বাহুল্য। সমাজের সকল স্তরেই, এরূপ বিধবার সংখ্যা কম হইবে না, এবং সেই কারণে, ইঁহাদের জন্য, উপার্জ্জনোপযোগী শিক্ষার বন্দোবস্ত থাকা বাঞ্ছনীয়। এরূপ ব্যবস্থা থাকিলে সমাজের প্রভূত মঙ্গল হইতে পারে।

বৃত্তি শিক্ষা

উপার্জ্জনের উপযোগী শিক্ষাই বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি শিক্ষা। এরূপ শিক্ষায় দেখিতে হইবে, সমাজে ও দেশে, কিরূপ বৃত্তির পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। যে বৃত্তিগুলি অনায়াসেই অবলম্বিত হইতে পারে, উপার্জ্জনের উপযোগী শিক্ষায়, প্রথমেই সেইদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। আমাদের দেশে উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ উপার্জ্জন করেন না। তাঁহারা নিজ নিজ পরিবার লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। তাঁহাদের জন্য, বৃত্তি অবলম্বনের পথও খুব প্রশস্ত নয়। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শিক্ষা-বিস্তারের জন্য, এবং শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, শিক্ষয়িত্রীর কর্ম্মে বহু স্ত্রীলোকের প্রয়োজন হইবে। সঙ্গীত সম্পন্ন গৃহস্থদিগের সন্তান-সন্ততির অভিভাবিকা (governess) রূপেও, অনেকে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিবেন। বিভিন্ন প্রকার কুটীর-শিল্পও অনেকের অন্ন-সংস্থানের সহায় হইবে, এবং ধাত্রী, শুশ্রূষাকারিণী ও চিকিৎসক রূপেও, অনেকে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করিতে পারিবেন। সমাজের সকল অবস্থাতেই, এই বৃত্তিগুলি গ্রহণ করিবার সুযোগ অনেকেরই ঘটিবে না। তথাপি, স্ত্রীশিক্ষায় এই বৃত্তিগুলি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। এগুলি ব্যতীত, আরো কোন প্রকার বৃত্তি গৃহীত হইতে পারে কি না, তাহাও অনুসন্ধান করিতে হইবে, এবং বিধবাদিগকে সেইরূপ শিক্ষা দিতে হইবে। একটী কথা এখানে বেশ জোর করিয়াই বলা যায়;—শিক্ষয়িত্রীর কর্ম্মে বহু বিধবার প্রয়োজন হইতে পারে, এবং সেই কারণে, উপার্জ্জনোপযোগী শিক্ষায়, এই বৃত্তিটীর উপর, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ দেওয়া উচিত। বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থাতেও, সদ্‌বংশজাতা অনেক বিধবা শিক্ষার অভাবে, ভদ্রপরিবারে, নানা প্রকার কায়িক পরিশ্রম দ্বারা, সামান্য উপার্জ্জন করিতে বাধ্য হন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই, শিক্ষা লাভের সুযোগ পাইলে, শিক্ষয়িত্রীর কর্ম্মে আকৃষ্ট হইতে পারেন, অথবা অন্য প্রকার বৃত্তি দ্বারা, নিজ নিজ ভরণপোষণের উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা করিয়া লইতে অনিচ্ছুক হইবেন না। এই কারণে মনে হয়, বিধবাদিগের জন্য বৃত্তি শিক্ষার বন্দোবস্ত, বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থাতেও ব্যর্থ হইবে না।

পতিতাদিগের শিক্ষা

কিন্তু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায়, সকল শ্রেণীর বিধবারাই শিক্ষয়িত্রী হইবার উপযুক্ত হইবেন না। পতিতা বিধবাদিগকে এই কার্য্যে নিয়োগ করিলে, সমাজ শিক্ষাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিবে। যাহারা নব জীবন লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে উপযুক্ত উৎসাহ প্রদান, যত বড় সামাজিক ও নৈতিক কর্ত্তব্যই হউক না কেন, বর্ত্তমান সমাজে, শিক্ষয়িত্রী রূপে, অথবা অপরাপর বিধবাদিগের সহিত একই শিক্ষাশালায়, তাহাদিগকে স্থান দিলে, শিক্ষা সম্বন্ধে সমাজ বিমুখ হইয়া দাঁড়াইবে, এবং সকল শ্রেণীর বিধবাদিগের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত হইবে না। নিম্ন শ্রেণীর বিধবাদিগের সম্বন্ধেও বোধ হয়, এইরূপ আপত্তি উঠিতে পারে। শিক্ষা-বিস্তারই, সর্ব্ব প্রধান সামাজিক সংস্কার রূপে, গণনীয় হওয়া উচিত; কারণ শিক্ষা সংস্কারের ফলেই, কুসংস্কার ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হয়। তাই এই দুই বা তিন শ্রেণীর বিধবাদিগের শিক্ষার পৃথক বন্দোবস্ত সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক হইবে না;—বর্ত্তমান অবস্থাকে মানিয়া লইয়া, সংস্কারের পথ প্রশস্ত করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য। সেই কারণে উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর

স্বধর্ম্মনিরতা বিধবাদিগের এবং পতিতা নারীদিগের শিক্ষার পৃথক পৃথক ব্যবস্থা করিতে হইবে। নিম্নশ্রেণীর ভিতর যখন শিক্ষা-বিস্তার সম্ভব হইবে, তখন তাহাদের জন্যও, তৃতীয় প্রকার ব্যবস্থা আবশ্যক হইবে।

পতিতাদিগের শিখিবার জন্য, সামাজিক বাধার সম্ভাবনা খুব অল্প। ইহাদিগের শিক্ষা ঠিক শিক্ষা-সংস্কার নয়,—সামাজিক-সংস্কার। সেই নিমিত্ত, পতিতাদিগের শিক্ষা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। এখানকার যা শিক্ষা-সমস্যা, তাহা সাধারণ শিক্ষার সহিত বৃত্তি-শিক্ষার যথোপযুক্ত সংযোগ স্থাপনের সমস্যা। কুটীর শিল্প, ধাত্রী-বিদ্যা, চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয় এখানকার শিক্ষণীয় বিষয় হইতে পারে। সমাজের নিম্নশ্রেণীর বালিকাদিগের শিক্ষয়িত্রী রূপেও, অনেকে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিবে।

বিধবাদিগের শিক্ষার অন্তরায়

বর্ত্তমান সময়ে, উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর বিধবাদিগের শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা-সমস্যা। এই শ্রেণীর বিধবাদিগের শিক্ষায়, একটী বিশিষ্ট অন্তরায় বিদ্যমান। এখনও স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষাকে সৌখীন পদার্থ, বিলাসের জিনিস মনে করা হয় এবং সকল প্রকার বিলাস ও সৌখীনতা বিধবা ব্রহ্মচারিণীগণের পক্ষে বর্জ্জনীয় বলিয়া, যে শিক্ষাটুকু প্রচলিত আছে, তাহাও বিধবাদিগের জন্য নয়। সুচিন্তিত উপায়ে, স্ত্রীশিক্ষা প্রয়োজনীয় শিক্ষায় পরিণত হইলে, এই অবস্থার উন্নতি হইতে পারে। বিধবাদিগের মধ্যে যাঁহাদের উপার্জ্জনের জন্য শিক্ষা আবশ্যক হইবে না, বিভিন্ন স্তরের সাধারণ শিক্ষা তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে সমাজ স্ত্রী-শিক্ষাকে অনেকটা সন্দেহের চক্ষে দেখিতেই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য অনেকগুলি বিধবার পক্ষে যে বিশেষ শিক্ষা অত্যন্ত আবশ্যক, সেই শিক্ষাকেও প্রথম প্রথম এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে। কিন্তু সমাজের মধ্যে, বিদ্রোহের ভাব জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা দ্বারা, এরূপ সামাজিক সংগ্রামে জয়ী হইবার আশা খুব অল্প। এরূপ চেষ্টায়, দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইবে,—শিক্ষা-বিস্তারের যথার্থ উপায় উদ্ভাবিত হইবে না। সেই নিমিত্ত বর্ত্তমান অবস্থা মানিয়া লইয়া, সহায় ও সঙ্গতিহীনা উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর বিধবাদিগের বৃত্তি-শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বিধবা জীবনের বিশেষত্ব

বর্ত্তমান অবস্থায়, বিধবাদিগের শিক্ষার যথার্থ উপায় উদ্ভাবনের জন্য, তাঁহাদিগের জীবনের নিম্নলিখিত বিশেষত্বগুলির দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। প্রথমতঃ হিন্দুসমাজে ব্রহ্মচর্য্যই বিধবাদিগের জীবনের ভিত্তি, এবং ধর্ম্মাচরণ, ত্যাগ, সংযম, ও সেবাই তাঁহাদিগের জীবনাদর্শ। সমাজের যেখানেই এই আদর্শ, সেইখানেই সমাজের ও বিশেষভাবে বিধবাদিগের আকর্ষণ। দ্বিতীয়তঃ সকল শ্রেণীর বিধবাদিগের মধ্যে, পর্দ্দার বন্ধন অপেক্ষাকৃত শিথিল। বিধবারা পিতা ও স্বামীর গৃহে বাহিরে যাইবার যতটুকু স্বাধীনতা পান, সধবারা ততটুকু স্বাধীনতা ও সুযোগ পান না। পিতার সংসারে, তাঁহাদিগের কর্ত্তৃত্ব ও স্বাধীনতা বিশেষভাবেই সুস্পষ্ট। তৃতীয়তঃ আমোদ প্রমোদ অপেক্ষা, ধর্ম্মকর্ম্মে এবং ধর্ম্মশিক্ষার সহিত সংযুক্ত আমোদ উৎসবে, তাঁহাদের স্বাধীনতা অপেক্ষাকৃত অধিক। পুরাণ পাঠ, কথকতা, যাত্রাগান, ইত্যাদিতে বিধবাদিগের প্রায় অমোঘ অধিকার। চতুর্থতঃ কর্ম্মময় জীবনেই তাঁহাদের আনন্দ,—কর্ম্মহীন জীবন তাঁহাদের শোভনীয় নয়। হিন্দু বিধবাদিগের কর্ম্মতৎপরতা ও সেবা হিন্দুর একান্নবর্ত্তী পরিবারের কর্ম্মশক্তি, এবং সেইজন্যই তাহা সমাজের মূল ভিত্তি। উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর হিন্দু বিধবাদিগের জন্য, শিক্ষার বন্দোবস্ত থাকিলেই, দলে দলে শিক্ষার্থিনী লাভ হইবে না তবে ব্রহ্মচর্য্যের ও ধর্ম্মভাবের উপযোগী ব্যবস্থা সম্বলিত বৃত্তি-শিক্ষা, ক্রমে ক্রমে, তাঁহাদিগের একটী আগ্রহের বস্তু হইতেও পারে; এবং তাঁহাদিগের গার্হস্থ্য জীবনের অধিকতর স্বাধীনতা ও তাঁহাদিগের স্বাভাবিক কর্ম্ম-শীলতা, পরোক্ষভাবে, শিক্ষা বিস্তারের সহায় হইতে পারে।

বিধবাশ্রমের প্রয়োজন

মহিলাদিগের বিদ্যালয়ের শিক্ষায়, বৃত্তিশিক্ষার উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত হইতে পারে না। কুটীরশিল্প, শিশু প্রতিপালন, সন্তান শিক্ষা, শুশ্রূষা, সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, প্রভৃতি বিষয় বৃত্তি-শিক্ষার অঙ্গ হইলেও সাধারণ শিক্ষায়, ইহাদের স্থান, কর্ম্মশিক্ষা দ্বারা, প্রশস্ত শিক্ষার উন্নতির জন্য। এই বিষয়গুলিতে, এখানে, উপার্জ্জনের উপযোগী শিক্ষার

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যবস্থা হইতে পারে না। ব্রহ্মচর্য্যও এই বিদ্যালয়গুলির ভিত্তি হইতে পারে না। ব্রহ্মচর্য্য উপদেশের জিনিস নয়,—আচরণের জিনিস। ইহা পালন করিতে হইবে;—একাত্মভাবে সংযুক্ত থাকিয়া, ইহার ভিতর বাস করিতে হইবে। যে স্থানে দৈনিক কয়েক ঘণ্টা মাত্র যাপন করিতে হয়, যে ব্যবস্থা কতকটা জীবনের বাহিরের ব্যবস্থা, সেইস্থানও সেই ব্যবস্থা, ব্রহ্মচর্য্যের ভিত্তিতে গড়িয়া তুলা যায় না,—এখানে ব্রহ্মচর্য্যের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়াও অসম্ভব। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের বস্তু:— যেখানে জীবনযাপন করিতে হইবে, সেইখানেই তাহার সার্থকতা। তাই যদি বিধবাদিগের ভিতর বৃত্তিশিক্ষা আবশ্যক হয়, গৃহে অথবা গৃহের অনুরূপ আশ্রমে ইহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু সাধারণ মহিলাবিদ্যালয়েই, যদি উপার্জ্জনের উপযোগী বৃত্তিশিক্ষা অসম্ভব হয়, অন্তঃপুরে ইহার ব্যবস্থা আরো অসম্ভব হইবে। সেই কারণে, বিধবা-দিগের বৃত্তিশিক্ষার জন্য, বিধবাশ্রমের প্রতিষ্ঠা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

আশ্রম সংগঠন

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে, ব্রহ্মচর্য্যই হইবে এই আশ্রমের ভিত্তি; এবং ধর্ম্ম, ত্যাগ, সংযমও সেবাই হইবে, এখানকার জীবনাদর্শ। বৃত্তিশিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত থাকিবে। কিন্তু সকল প্রকার বৃত্তিশিক্ষা কতকটা সাধারণ শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষাতত্ত্ব শিক্ষায় এরূপ শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। এই কারণে, আশ্রমে, ক্রমে ক্রমে, শৈশব, আদ্য, মধ্য ও অন্ত্যশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আশ্রমের ব্রহ্মচারিণীরা শক্তি ও সামর্থ্যের অনুকূল বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা সমাপন করিয়া, নানা প্রকার বৃত্তিশিক্ষা করিবে। বুদ্ধি পরীক্ষা যথাসময়ে বৃত্তিশিক্ষার কাল নির্দ্দেশ করিয়া দিবে। যাঁহারা শিক্ষাতত্ত্ব শিক্ষা করিবেন, তাঁহারা বিভিন্ন স্তরের বিদ্যালয়ে, ব্যাবহারিক ভাবে, বৃত্তিটী আয়ত্ত করিবেন; এবং যদি একটী বীক্ষণ বিদ্যালয় (Demonstration schane) প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহা হইলে, এই শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত হইবার সুযোগ লাভ করিবে। এই আশ্রমের সন্নিকটে, যদি মহিলাদিগের শিক্ষার জন্য বিভিন্ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহা হইলেও আশ্রমের ব্রহ্মচারিণীরা এই বিদ্যালয়গুলিতেই শিক্ষার অবসর পাইবেন, এবং এরূপ বিদ্যালয় শিক্ষাতত্ত্ব ও অপরাপর বৃত্তি শিক্ষার সহায়তা করিবে। মহিলা-বিদ্যালয় সম্পর্কে, যদি কুমারাগার ও চিকিৎসা-বিদ্যার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে, শিশু প্রতিপালন, শুশ্রূষা প্রভৃতি বিষয়, খুব ব্যাবহারিক ভাবেই, এখানে শিক্ষা হইবে। কুমারাগার পরিচালয়িত্রীরা ব্যাবহারিক শারীরবিদ্যা, ও চিকিৎসা-বিদ্যার অপরাপর অংশ শিক্ষা দিতে পারিবেন। এইরূপে বিধবাশ্রম ও মহিলা বিদ্যালয় একযোগে, শিক্ষা-কর্ম্ম সম্পাদন করিতে থাকিলে, এরূপ শিক্ষার ব্যয়ও অপেক্ষাকৃত অল্প হইবে। আশ্রমের জীবন, গৃহস্থালীর অনুকরণে গঠিত হইবে বলিয়া, সকল প্রকার শিক্ষার্থিনী গৃহকর্ম্ম, রন্ধন ইত্যাদিও, খুব ব্যাবহারিক ভাবেই, শিক্ষা করিবার অবসর পাইবেন। এক কথায়, বিধবাশ্রমটীকে কেন্দ্র করিয়া, একটী পূর্ণাঙ্গ শিক্ষায়তন গঠিত হইয়া উঠিবে।

আশ্রমের অবস্থান

দেশের বর্ত্তমান আর্থিক ও সামাজিক অবস্থায়, এখানে যদি একটীমাত্র এরূপ বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠার উপায় হয়, এবং যদি সমাজের উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর কতকগুলি বিধবা, শিক্ষালাভের জন্য, এই আশ্রমে বাস করিতে সম্মত হয়, তাহা হইলে, দেশীয় স্ত্রীশিক্ষার একটী বৃহৎ সমস্যার সমাধান হইবে। বাংলাদেশের কোন তীর্থ স্থানে, এরূপ আশ্রম স্থাপিত হইলে, অবস্থানের আকর্ষণও বিধবাদিগের ভিতর শিক্ষা বিস্তারের কারণ হইতে পারে। কিন্তু এক নবদ্বীপ ভিন্ন সমস্ত বাংলাদেশের ভিতর এরূপ তীর্থস্থানের একান্ত অভাব। এই নবদ্বীপই বাংলার কাশীধাম, এবং ইহাই বাংলার শ্রীক্ষেত্র। জাতীয় শিক্ষায় ও বিদগ্ধতায়, নবদ্বীপ গৌরবে অদ্বিতীয়। কিন্তু দেশের বিধবাশ্রমটীকে কেন্দ্র করিয়া, ক্রমে ক্রমে একটী সুবৃহৎ শিক্ষায়তন গড়িয়া তুলিতে হইলে, বাংলার রাজধানী কলিকাতা বা কলি-কাতার কোন স্বাস্থ্যকর উপকণ্ঠে, এই বিধবাশ্রমটী স্থাপনের স্বপক্ষে, অনেকেই মত প্রকাশ করিবেন। একাধিক আশ্রম প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইলে, বহু প্রলোভনের কেন্দ্র স্থান, বহু জনাকীর্ণ, কোলাহলময় রাজধানী অপেক্ষা, কোন তীর্থস্থানের নিকটবর্ত্তী একটী স্বাস্থ্যকর পল্লী-অঞ্চলে, আর একটী এরূপ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা খুব বাঞ্ছনীয় হইবে।

স্বখাত সলিল

শ্রীসুখেন্দুবিকাশ দাস

১

তরুণকুমার ও তাপসকুমার উভয়ে খুব অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ট বন্ধু। তরুণ তাপসের অপেক্ষা বৎসর দুই-একের বড়। সে ভাল চিত্রকর এবং সুদক্ষ অভিনেতা। কলেজের থিয়েটারে অভিনয় করিয়া সে রাশি-রাশি প্রশংসাপত্র ও মেডেল পাইয়াছিল। সে ভাবের অভিব্যক্তি খুব ভাল দেখাইতে পারে। তাপস অত্যন্ত দেশ-ভ্রমণ-প্রিয়; এবং সেই অভিপ্রায়েই একটা হ্যাণ্ড-ক্যামেরা কিনিয়াছে। সে খুব ভাল ফটো তুলিতে পারে।

তরুণ একটা ছোট নাটক লিখিয়াছে। তাহার ইচ্ছা, সে নিজে একা তাহার নাটকের সমস্ত ভূমিকার অভিনয় করিয়া, প্রত্যেক দৃশ্যের ফটো তুলাইয়া ছাপাইবে। সে তাহার নিজের বহিখানির নামকরণ করিয়াছে "স্বামীর ভুল"।

নাটকটির 'প্লট্' হইতেছে এই যে, প্রকাশ নামক এক যুবক ইন্দু নাম্নী এক শিক্ষিতা বয়স্কা কন্যার পাণিগ্রহণ ক'রে। ইন্দুর এক পুরুষ বাল্যবন্ধু ছিল; দুজনের মধ্যে অন্য কোন সম্পর্ক ছিল না—যাহা ছিল, ঠিক্ বন্ধুর ও ভাই-বোনের ভালবাসার ন্যায়। ইন্দুর বিবাহের পরও সেই ছোকরাটি ইন্দুর শ্বশুরবাড়ীতে তাহার সহিত প্রায়ই দেখা করিতে আসিত। প্রকাশ সন্দেহ করিল যে, ইন্দু তাহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে এবং করিতেছে। ইন্দুর সহিত ঐ ছোকরাটির, বোধ হয়, বাল্য-প্রণয় হয়; এবং কোন কারণে হয় ত বিবাহ হয় নাই; সেই জন্য ছোকরাটি বন্ধু ও ভাই সাজিয়া প্রায়ই আসিয়া থাকে। কিন্তু ইন্দুর মনে কোন পাপ ছিল না, সে তাহার সহিত ঠিক্ নিজের মা'র পেটের ভাইএর ন্যায়ই মিশিত। প্রকাশ ভুল বুঝিয়া রহিল। কোন বোঝাপড়া হইল না। ক্রমশঃ স্বামী-স্ত্রীর মন পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। শেষে এক দিন প্রকাশের ভুল ভাঙ্গিয়া গেল; ইন্দুর সহিত তাহার আবার মিল হইল, ইত্যাদি ইত্যাদি।

তরুণকুমার প্রথম দৃশ্য হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নাট্যোল্লিখিত পুরুষ ও মেয়ের সাজে সজ্জিত হইয়া দৃশ্যাবলী-অনুযায়ী ফটো তুলাইতে আরম্ভ করিল। প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া সে বেশ সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে ফটো-গুলি তুলাইয়া গেল; কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যে আসিয়া মহা মুস্কিলে পড়িল। এই দৃশ্যে নাটকের প্রধান নায়ক প্রকাশ দেখিতেছে যে, তাহার স্ত্রী ইন্দু তাহার সেই বন্ধুটির সহিত হাস্যালাপে রত! ইন্দুর একটা হাত সেই যুবকের হাতে ধরা রহিয়াছে। তখনই প্রকাশের সন্দেহ বদ্ধমূল হইবে, এবং সে নিঃসঙ্কোচে ধারণা করিয়া লইবে যে, ইন্দু সত্য-সত্যই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। এইখানে প্রকাশ স্বগত বলিয়া উঠিবে—"যা ভেবেছিলাম, তাহাই সত্য। আমারই স্ত্রী আমারই ঘরে ব'সে অন্য এক যুবকের সহিত প্রেমালাপে রত! কি বিশ্বাসঘাতকতা! কি কালসাপই এতদিন বুকে পুষিয়া রাখিয়াছি! উঃ! পৃথিবী এত ঘোরে কেন? পায়ের নীচে হ'তে মাটি স'রে যায় কেন?—"এই বলিয়া প্রকাশ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িবে।

এইখানে তরুণের মহা 'গোল' বাধিল। সে নাটকের নায়ক প্রকাশ সাজিয়া ফটো তুলাইতেছে। স্বামী তাহার স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতা স্বচক্ষে দেখিতেছে—দেখিতেছে যে, তাহার স্ত্রী অন্য এক যুবকের সহিত প্রেমালাপে রত! এইখানে যে মুখের ভাব কিরূপ ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, তাহা সে ভালরূপে মনে-মনে বুঝিতে পারিলেও, মুখে কিছুতেই ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেছিল না।

তাপস সম্মুখে ক্যামেরা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তরুণ একখানা বড় আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নানারূপ মুখের ভাব আনিতেছে,—কিন্তু কোনটাই তাহার মনঃপুত হইতেছে না।

তরুণ বলিল, "আচ্ছা, এইবার দেখ দেখি, ঠিক্ হ'য়েছে

কি না ?” তাপস অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল ; সে বলিল, “ঠিক্ হ'য়েছে। আমি তুলে নি'—Ready !”

তরুণের মনঃপূত হইল না। সে হতাশ ভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিল, “ঠিক্ হ'য়েছে, না, তোর মাথা হ'য়েছে ! কিচ্ছু হয় নি ! ওঃ ! এই একটার জন্যেই সব 'মাটি' হ'য়ে গেল !”

“এটা তা'র চেয়ে সেরেফ্ Omitই ক'রে দাও না ?”

“বাঃ, এইখানটাই হ'ল আসল। স্বামীর মিথ্যা ভুল, মিথ্যা সন্দেহই ত' সব দুঃখের মূল। তা' ছাড়া, স্ত্রী'র বিশ্বাসঘাতকতা স্বচক্ষে দে'খে স্বামীর মুখের ভাব, চোখের ভাব কিরূপ হইয়া গিয়াছে—এই ফটোটাই যদি না দিই, তবে আর বইখানাতে রহিল কি ? এইখানেই art সব চেয়ে বেশী ফুটে উঠ্‌বে। আচ্ছা, রেণুকে ডাক্ দেখি।”

তাপস ভিতরে যাইয়া তরুণের স্ত্রী রেণুকে ডাকিয়া আনিল। রেণুর বয়স ১৬।১৭ ; সদাই হাস্যমুখী ও প্রফুল্ল। দেখিলেই মনে হয়, যেন খানিকটা বসন্তের হাওয়া, এক টুক্‌রা আনন্দ।

তরুণ বলিল, “ওগো শো'ন, এই—এই—তোমার 'গিয়ে'—তুমি একবার এমন ভাব দেখাও দেখি যে, আমাকে মোটেই ভালবাস না, অন্য একজনকে ভালবাস।”

“এই পাগ্‌লামি করতে বুঝি আমাকে ডাকলে ? ছাড়, ছাড়, কাজ রয়েছে।”

তরুণ তাহাকে সমস্ত খুলিয়া বলিয়া, অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া, আয়নার সাম্‌নে উঠিয়া আসিয়া বলিল, “আচ্ছা, শুধু বল দেখি, 'আমি তোমায় ভালবাসি না'—দেখি, মুখের ভাবটা আমার কেমন হয়।”

“আঃ ! কি পাগ্‌লামি ক'র ?”

“তোমার পায়ে পড়ি, রেণু, একবার বলই না ?”

মুখে কাপড় চাপা দিয়া হাসির বেগ সম্বরণ করিতে-করিতে রেণু বলিল, “একেবারে পাগল হ'লে না কি ? আচ্ছা, বল্‌ছি, বল্‌ছি, আমি তোমায় ভালবাসি না। হ'য়েছে ?”

“আঃ, একটু গম্ভীর ভাবেই বল না ছাই।”

“কি বিপদেই পড়্‌লাম, বাপু ! আচ্ছা, বল্‌ছি, বল্‌ছি. তোমায় অমন করতে হ'বে না। এই নাও, খুব গম্ভীর ভাবেই বল্‌ছি, আমি তোমায় ভালবাসি না।” শেষ কথাটা উচ্চারণ করিতে রেণুর গলা কাঁপিয়া গেল।

আয়নায় প্রতিফলিত নিজের মুখের প্রতি একাগ্র-দৃষ্টিতে চাহিয়া তরুণ নাটকের কথাগুলো বলিয়া উঠিল, “উঃ কি বিশ্বাসঘাতকতা ! কি কালসাপকেই বুকে স্থান দিয়েছি ! এ কি ? পৃথিবী এত ঘোরে কেন ? পায়ের নীচে হ'তে মাটি স'রে যায় কেন ?” তরুণ এই কথাগুলো ঠিক্ বলিয়া গেল ; কিন্তু মুখে ভাব ঠিক্ ফুটিয়া উঠিল না। রেণু ও তাপস 'হো' 'হো' করিয়া হাসিয়া উঠিল। তরুণ হতাশ ভাবে বসিয়া পড়িল।

“Art, art, ক'রে তুমি একদিন সত্যসত্যই পাগল হ'য়ে পড়বে দেখছি” বলিয়া রেণু ভিতরে চলিয়া গেল।

তরুণ বলিল, “হাসি, কান্না, চিন্তা, এসব ভাব সহজেই বেশ ফুটিয়ে তুল্‌তে পারা যায় ; কিন্তু যাহা মনে আনিতেও হৃদ্‌কম্প হয়, যাহা ধারণাতেও আনা যায় না, সে ভাব কি ক'রে ফুটিয়ে তুলি ? নাঃ, এ আমার দ্বারা বোধ হয় হ'ল না ভাই।”

তাপস এতক্ষণ কি ভাবিতেছিল। সে বলিল, “আচ্ছা, আমি যদি ঠিক্ এমনি একটা ছবি দিই ? ওঃ, হো,—আমার দেশের বাড়ীতে ঠিক্ এই ধরণের একটা ছবি আছে। আমি—।”

“My God ! আছে না কি ? আজই তুই দেশে চলে যা'। যা', উঠে পড়্।” “এখনই কি ? এতক্ষণে আমার মনে পড়ল, তরুণ'দা, অবিকল এমনি একটা ছবি আছে। স্বামী তাহার স্ত্রীকে অন্যের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী, অন্যের প্রেমাসক্তা জানিয়া, মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছে। ওঃ, সে কি মুখের দৃশ্য ! শিল্পী তা'র ছবিতে কি সুন্দর ভাবেই মুখের ভাবটা ফুটাইয়া তুলিয়াছে। বল্‌লে হয় ত' বিশ্বাস করবে না তরুণদা,—আমার মনে হয়, মুখখানাও অনেকটা তোমারি মত। আচ্ছা, আজই আমি লিখে পাঠাচ্ছি, ছবিটা যেন শীঘ্র পাঠাইয়া দেয়।”

“আঃ, বাঁচালি ভাই। সেটা দেখেও যদি না হয়, তবে সেইখানাকেই আমার মুখের মত যথাসাধ্য ক'রে নিয়ে—।”

“সে'সব আমি ঠিক্ ক'রে দে'ব !”

“আচ্ছা।—তুই এখন বাড়ী যাবি না কি ? একটু ব'স্—

বাদল-সন্ধ্যা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার মজুমদার মহাশয়ের সৌজন্যে
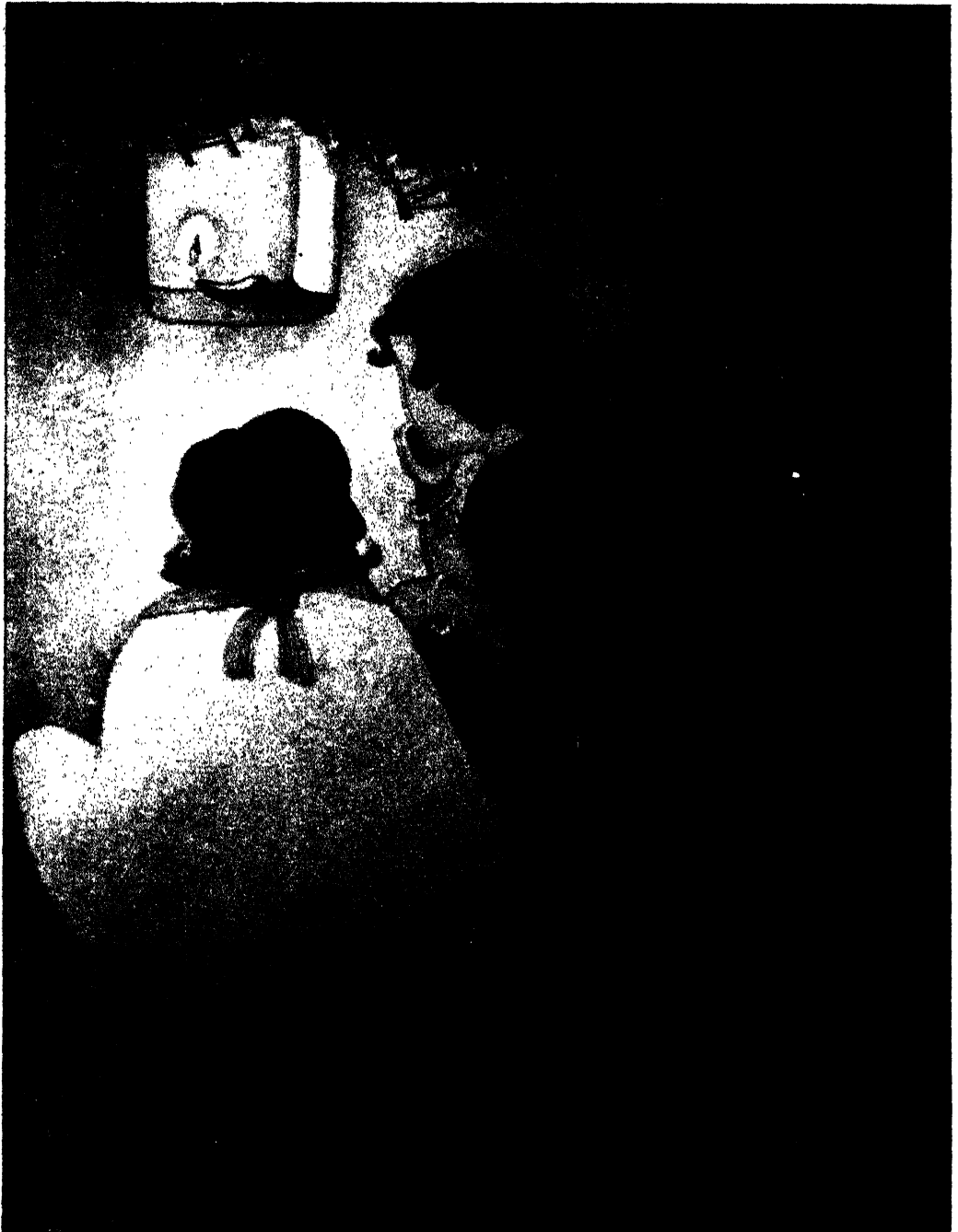
BHARATVARSHA HALFTONE & PRINTING WORKS.

আমি এক্ষুণি একবার Press থেকে ফিরে আসছি," এই বলিয়া তরুণ বাহির হইতেছিল ;—হঠাৎ দরজাতেই নির্ম্মলের সহিত দেখা হইল। নির্ম্মল তরুণের শ্বশুরবাড়ীর লোক ; রেণুর এক দূর-সম্পর্কের ভাই। "নির্ম্মলবাবু যে! এখন হঠাৎ? আসুন, আসুন! সেখানের সব খবর ভাল ত'? বাড়ীর ভিতরে চলুন। সেদিন হঠাৎ এসে, হঠাৎ চলে গিছলেন। এবারে কিন্তু দিন কয়েক থাকতে হ'বে। তাপস! নির্ম্মলবাবুকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে চল্ - আমি এখুনি আস্‌ছি," বলিয়া তরুণ চলিয়া গেল।

নির্ম্মলকে ভিতরে বসাইয়া, তাপস রেণুর নিকট গিয়া কতক্ষণ কি একটা বিষয়ে আলোচনা করিল।

(২)

ঢং ঢং করিয়া ঘড়িতে বারোটা বাজিয়া গেল। রেণু আসিয়া শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিল। তরুণ জিজ্ঞাসা করিল, "এত রাত্রি হ'ল কেন?" রেণু কেমন একটু চমকিত ভাবে বলিয়া উঠিল, "আঁ—কি—তুমি এখনও জেগে আছ না কি? রাত্ একটু বেশী হ'য়েছে বটে! নির্ম্মলদা'র সঙ্গে গল্প করতে করতে একটু দেরী হয়ে গেল।" "রেণু!" "রাত্ হ'য়েছে, ঘুমোও।" "তোমাকে আজ বড় চিন্তিত দেখ্‌ছি? বাড়ীর কি কোনও খবর—?" "না, না, ও কিছু নয়" বলিয়া রেণু শুইয়া পড়িল।

সকালে উঠিয়া তরুণ বারান্দায় চেয়ারে বসিয়া ছিল। এমন সময় তাপস আসিয়া পাশের চেয়ারটার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "নির্ম্মলবাবু আজই চলে গেলেন কেন? আমার সঙ্গে রাস্তাতে দেখা হ'ল ; তিনি বলে গেলেন, হঠাৎ তাঁকে ফিরতে হ'চ্ছে ; তুমি তখনও উঠ নি বলে তোমার সঙ্গে দেখা করে যেতে পারেন নি।" "সে কি? নির্ম্মলবাবু বাড়ী চলে গেছেন না কি? অদ্ভুত ছোকরা! হঠাৎ আসেন, আবার হঠাৎ চলে যান্! আমাকে উঠিয়ে দেখা ক'রে গেলেই পারতেন।"

এমনি সময়ে রেণু চা লইয়া প্রবেশ করিল। তরুণ জিজ্ঞাসা করিল, "নির্ম্মলবাবু এমন হঠাৎ চলে গেলেন কেন বল দেখি? তোমাকে কিছু ব'লে গে'ছেন ?"

"আমি কি ক'রে জানব,—কে কখন আসছে, কে কখন যাচ্ছে? সে কি আমার জন্য এসেছিল না কি, যে আমাকে ব'লে যা'বে? তুমি কি ভাবছ যে—?" তরুণ রেণুর এই অস্বাভাবিক এবং অসংলগ্ন উত্তরে একটু বিস্মিত হইল। বাধা দিয়া বলিল, "না, না, জিজ্ঞেস করছি, যাবার সময় দেখা হ'য়েছিল কি না? সেই সময় যদি কিছু ব'লে গি'য়ে থাকে!"

"না, না, আমাকে কেউ কিছু বলে যায় নি।"

রেণু ফিরিতেছিল, হঠাৎ প্রভাতের খানিকটা সোণালি আলো তাহার উপর পড়িতেই, তাহার গলার নেকলেসের বহুমূল্য পাথরগুলো ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। এটা তরুণের এতক্ষণ নজরে পড়ে নাই। এতক্ষণে সে দেখিল রেণুর গলায় আজ একটা নূতন বহুমূল্য নেকলেস্। তরুণ বলিল, "এই যে, স্যাকরা দিয়ে গেছে দেখ্‌ছি। দেখি, দেখি, বেশ গড়েছে! কি সুন্দর মানিয়েছে তোমাকে! পাথর-গুলো—" রেণু বাধা দিয়া বলিল, "তুমি যেটা' গড়তে দিয়েছ, সেটা নয়। আমার বিয়ের সময় নির্ম্মলদা' অসুখে প'ড়েছিল, তখন কিছু দিতে পারে নি—কাল এইটা আমায় দিয়েছে। আমি অনেক বল্‌লাম, কিন্তু কিছুতেই ছাড়ল্ না,—কাজেই নি'তে হ'ল।"

"তা'তে কি হ'য়েছে? দূর সম্পর্কের হ'লেও দাদা বটে ত? তা'র উপহার নিতে এমন বিশেষ কি দোষ? আমি যে নেক্‌লেসটা তোমার জন্য গড়তে দিয়ে এ'সেছি, সেটাও ঠিক্ এই প্যাটার্ণের হ'চ্ছে—দেখে এসেছি।" রেণু তাপসকে বলিল, "ঠাকুর-পো', তুমি ভিতরে এসেই চা-টা খেয়ে যাও, আমি আর আন্‌তে পারি না।—খেয়ে এ'সেছ? তা' হো'ক্! এস।" "চল বৌদি" বলিয়া তাপস উঠিল।

রেণু ও তাপসের চোখাচোখি হইতেই, দুজনের ঠোঁটেই একটু গোপন হাসি ফুটিয়া উঠিল ; এবং চোখে-চোখে কি একটা কথা হইয়া গেল।

(৩)

বেলা প্রায় তিনটা। তরুণ বাহিরের ঘরে বসিয়া রেণুর কথা ভাবিতেছিল। আজ সারাদিনের মধ্যে যখনই রেণুর সহিত দেখা হইয়াছে, তরুণ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে যে, চুরি করিয়া যেন কিছু করিতেছিল, এইরূপ ভাবে সে চমকিয়া উঠিয়াছে। কাল রাত্রি হইতেই সে রেণুকে কেমন

চিন্তাযুক্ত ও অন্যমনস্ক দেখিতেছে। রেণু যখন হাসিয়াছে, তখন মনে হইয়াছে, যেন সে জোর করিয়া হাসিতেছে—প্রাণের হাসি তা নয়। রেণু ত এমন ছিল না! কাল রাত্রি হইতে তাহার কিসে এত পরিবর্ত্তন হইল? স্বামীকে গোপন করিয়া সে এত কিসের ভাবনায়—? তরুণ এই সমস্ত মনে-মনে আলোচনা করিতেছিল, এমন সময় তাপস তাহার হ্যাণ্ড ক্যামেরা হাতে প্রবেশ করিল।

"কি রে, এমন সময় ক্যামেরা হাতে যে?"

"একটু খারাপ হ'য়েছিল, সারাতে দিয়েছিলুম। তার পর? হ'চ্ছে কি? বড় গম্ভীর দেখ্ছি যে?"

মুখে হাসি ফুটাইয়া তরুণ বলিল, "তোর সামনে গম্ভীর হ'ব না ত' কি? জানিস্, আমি তোর চেয়ে দুবছরের বড়—Senior. আচ্ছা, কালকের সেই বইটার বাকীটুকু পড় দেখি।"

"সে বইটা এখন থাক্;—তুমি এ মাসের 'ভারতবর্ষ'টা পড়েছ? পড়নি? 'ভারতের প্রাচীন শিল্প' নামে খুব একটা সুন্দর প্রবন্ধ বেরিয়েছে।"

শিল্পের নাম শু'নে তরুণ লাফাইয়া উঠিল; যেহেতু সে একজন শিল্পী। বলিল "না, 'ভারতবর্ষ'টা এখনও আমার পড়াই হয় নি; যাই, রেণুর কাছে সেটা আছে, নিয়ে আসি।"

রেণুর ঘরে আসিয়া তরুণ দেখিল, সে তখনও ঘুমাইতেছে। এমন অসময়ে সে কোন দিন ঘুমাইয়া পড়ে না। তরুণ ভাবিল, বোধ হয় রেণুর শরীর খারাপ আছে। তজ্জন্য রেণুকে না উঠাইয়া সে নিজেই টেবিল, দেরাজ প্রভৃতি খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু 'ভারতবর্ষ' কোথাও পাওয়া গেল না। বারান্দা দিয়া সেই সময় তাহার ছোট বোন যাইতেছিল,—তরুণ তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ মাসের 'ভারতবর্ষ'টা কোথায় আছে রে?"

"'ভারতবর্ষ'টা? বৌদিই দুপুরে পড়্ছিল। না, না, পড়েনি ত'—বৌদি ত' চিঠি লিখ্ছিল। ওহো, মনে পড়েছে, 'ভারতবর্ষ'টার উপরেই কাগজখানা রেখে চিঠি লিখ্ছিল। তার পর, সেই তুমি একবার এলে না? সেই সময় বৌদি ট্রাঙ্কে রেখে দিলে। বৌদিকে উঠোব না কি?"

"না, না, থাক্, ওর বোধ হয় শরীর খারাপ আছে, আমিই বে'র ক'রে নি'চ্ছি।"

নিদ্রিত রেণুর অঞ্চল হইতে চাবির গোছাটা খুলিয়া লইতে লইতে তরুণ আপন মনে বলিল, 'ভারতবর্ষটা' ট্রাঙ্কে চাবি দিয়ে রে'খেছে! যত কি সব অদ্ভুত কাজ!"

পত্রিকাখানা বাহির করিয়া তরুণ পুনরায় বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিল। তাপস তখন তা'র ক্যামেরা লইয়া ব্যস্ত। "আমি ছবিগুলো একবার দেখে নি" বলিয়া তরুণ ভারতবর্ষ'টার পাতা উল্টাইতে লাগিল। হঠাৎ তাহার ভিতর হইতে একটা চিঠি পড়িয়া গেল। তরুণ দেখিল, রেণুর হস্তাক্ষর। সে পুনরায় চিঠিখানা পত্রিকার ভিতর রাখিতেছিল, কিন্তু হঠাৎ প্রথমের দুটো কথার উপর চক্ষু পড়িয়া গেল—"নির্ম্মল, প্রিয়তম আমার!"

তরুণের মাথাটা 'চম্' করিয়া উঠিল। রেণু নির্ম্মলকে 'প্রিয়তম আমার' সম্বোধন করিয়া পত্র লিখিতেছে! সে তাহার নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না; সে চিঠিখানা আবার চোখের নিকটে ধরিল। তাহাতে লেখা ছিল—"নির্ম্মল, প্রিয়তম আমার!

একটা বড় ভুল হইয়াছে। সোমবার রাত্রিতে সমস্ত ঠিক্ করিয়াছ; কিন্তু আমার মনে ছিল না, ঐ দিন 'ও'দের' জন্মদিন। রাত্রিতে অনেক বন্ধুবান্ধব থাকিবে, কাজেই ঐ দিনে সম্ভব হইবে না। তুমি তার পর দিন রাত্রি দুইটার সময় বাগানের ওধারে গাড়ী লইয়া অপেক্ষা করিবে।

একটা কথা বলি, হাসিও না। এত দিন আমি রাজী হই নাই কেন, জান? তার কারণ, ও'রা আমাকে খুবই বিশ্বাস করিয়াছিল এবং ভালবাসিয়াছিল। এতটা প্রাণ-ঢালা ভালবাসার পরিবর্ত্তে চিরজন্মের মত ওঁর বংশে কালিমা দি'য়ে, গৃহত্যাগ ক'রে তোমার সঙ্গে চলিয়া যাইতে এত দিন কিছুতেই মন সরিতেছিল না। সেই কারণেই এত দিন তোমার কথায় রাজী হইতে পারিতেছিলাম না, তদ্ভিন্ন অন্য কোন কারণ ছিল না। কিন্তু কাল রাত্রিতে তোমার কথায় আমার সমস্ত ভুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তোমার কথাই ঠিক্—এমন করিয়া ত' জীবনটাকে নষ্ট করা চলিবে না। সত্যই, কেন করিব, কোন্ অপরাধে? একদিন এঁর সঙ্গে জোর করিয়া দুটো হাত বাঁধিয়া দিয়া দু'টো মন্ত্র পড়িয়া দিয়াছিল বলিয়া, সেইটাই জীবনে চরম সত্য—আর বাকী সব মিথ্যা? কখনই না।

দয়িত আমার! আমি কৃতসঙ্কল্প। আমার দিন দিন অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। যা'কে ভালবাসি না, তা'র ঘর করা কি কষ্টকর। মঙ্গলবার রাত্রি দুটোর সময় আসিয়া সেই সঙ্কেত করিবে। আঃ, তার পর! তার পর দুজনে আবার নূতন ক'রে জীবন আরম্ভ করিব। কালের গতি আমাদিগকে একবার পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল; কিন্তু আর ত' জীবনে কেউ পৃথক্ করিতে পারিবে না। আজ এ জগৎ আমার সাম্‌নে—।"

এই পর্য্যন্ত চিঠিতে লেখা আছে, আর কিছুই নাই; বোধ হয়, কোন বাধা পাইয়া চিঠিখানা লেখা এইখানেই হঠাৎ বন্ধ করিতে হয়।

তরুণের মাথাটা ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠিল; কালির অক্ষর-গুলো চোখের সাম্‌নে বৃশ্চিকের আকার ধারণ করিয়া নাচিতে লাগিল। দেহের প্রত্যেক শিরা-উপশিরা সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইতে লাগিল। 'ভারতবর্ষ'টা কোল হইতে পায়ের তলে পড়িয়া গেল। তরুণ নিজের কপালটা টিপিয়া ধরিয়া অপলক দৃষ্টিতে পত্রখানার দিকে চাহিয়া রহিল। মুখ চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, অবর্ণনীয়।

উঃ! পৃথিবী আজ এত ঘোরে কেন? দেওয়ালে বিলম্বিত নারী-চিত্রগুলোর দিকে চাইতে এত ঘৃণা হয় কেন? প্রাণের বন্ধু তাপসের মুখ আজ এত শয়তানের ন্যায় দেখায় কেন? দিনের আলো এত বিশ্রী ঠেক্‌ছে কেন? পায়ের নীচে হ'তে মাটিটা স'রে যায় কেন? তরুণ চেয়ারের হাতল দুটো টিপিয়া ধরিল। পৃথিবী ঘুরিতেছে—ইহা বিজ্ঞান-সম্মত কথা; কিন্তু ইহা বেশী করিয়া, এবং ভাল করিয়া অনুভব করিল আজ এই তরুণ শিল্পী তরুণ রায়।

তাপস এতক্ষণ সাম্‌নের টেবিলে ক্যামেরা লইয়া ব্যস্ত ছিল। কিছুক্ষণ পরে ক্যামেরা হাতে লইয়া বলিল, "তুমি পড়, তরুণদা, আমি এখুনি ফি'রে আস্‌ছি।" এই বলিয়া বাহির হইয়া গেল। সেকথা তরুণের কাণেও গেল না—বিশ্ব-সংসার তখন তাহার মন হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। পত্রখানার প্রত্যেক অক্ষরগুলো সহস্র সহস্র সর্প, বৃশ্চিকের আকার ধারণ করিয়া তাহার বুকে ছোবল মারিতেছিল। উঃ, এ অসহ্য যন্ত্রণা বুকে কোথা হ'তে এ'ল গো? নিঃশ্বাস বুঝি বন্ধ হ'য়ে যায়!—

তরুণ চেয়ারের উপর হেলিয়া পড়িল। গত রাত্রি হইতে সমস্ত তাহার মনে পড়িল—রেণুর ভাবান্তর, নির্ম্মলের হঠাৎ আসা এবং হঠাৎ চ'লে যাওয়া, তাহার নেক্‌লেস উপহার—সমস্তগুলো তাহার মনে একবার বিদ্যুতের ন্যায় খেলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে তরুণ পত্রখানা 'ভারতবর্ষে'র ভিতর রাখিয়া, ট্রাঙ্কে আবার সেইরূপ ভাবে রাখিয়া চাবি দিল এবং অতি সন্তর্পণে চাবিটা রেণুর আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিল।—ইচ্ছা, সে রেণুকে জানিতে দিবে না যে পত্রটা দেখিয়াছে। ঝিএর সহিত বারান্দায় দেখা হইলে, তরুণ তাহাকে বলিল, "আমার রাত্রে নিমন্ত্রণ আছে, বলে দিস্, সেইখান হ'তেই থিয়েটারে যা'ব—আজ আর ফিরব না।"

এই বলিয়া তরুণ বাহির হইয়া গেল,—বোধ হয়, বাহিরে একা ভাল করিয়া ভাবিবার জন্য; এবং বিশেষ কারণ এই যে, বাড়ীতে থাকিলে রাত্রিতে বাধ্য হইয়া রেণুর সহিত এক বিছানায় শুইতে হইবে।

(৪)

পরদিন সকালে তরুণ তাহার বাহিরের ঘরে বসিয়া আছে। মোকর্দ্দমায় সর্ব্বস্ব হারাইয়া মানুষ যখন আদালত হইতে বাহির হইয়া আসে, তখন তাহার যেরূপ চেহারা হয়, তাহা অপেক্ষাও তরুণের চেহারা খুব খারাপ হইয়া গিয়াছে। সমস্ত বিনিদ্র রাত্রির ভীষণ চিন্তায় মুখে, চোখে কালি এবং কপালে রেখা পড়িয়াছে। মুখ-খানা শুষ্ক, কঠিন এবং ভয়ানক; দেখিলেই মনে হয় যেন একটা কিছু করিতে সে কৃতসঙ্কল্প।

তাপস বাড়ীর ভিতর হইতে আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। "এই যে, কতক্ষণ এ'সেছ, তরুণদা? থিয়েটার দেখে বাকী রাতটা বুঝি আর কোথাও ছিলে? কোথায় নিমন্ত্রণ ছিল?" বলিয়া তাপস একটু মুখ টিপিয়া হাসিল।

"ছিল;—ঐ তোর—তা' তুই কতক্ষণ এসেছিস্?"

"অনেকক্ষণ। এই নাও, তরুণদা, তোমার ফটো—সেদিন যা চে'য়েছিলে—এবং যা'র জন্য এই দুদিন এত মিথ্যা অভিনয়।" এখানা তরুণের ফটো। কাল দুপুরে সে যে জামা কাপড় পরিয়াছিল—ফটোর পরণে তাহাই—

একই চেয়ার, একই কক্ষ—পায়ের নীচে একটা 'ভারতবর্ষ' পড়িয়া আছে;—এক হাতে একটা কাগজ এবং অন্য হাতে কপালটা টিপিয়া ধরা! মুখের চোখের ভাব অস্বাভাবিক, অবর্ণনীয়! তাহার নিজের ফটো দেখিয়া তরুণ ভাবিল, জীবনের মধ্যে কেবল কাল দুপুরে আমার এই অবস্থা ছিল। তবে কি তাপস কাল দুপুরে সেই সময় হ্যাণ্ড ক্যামেরাটায় আমার ফটো লইয়াছিল? হাঁ, নিশ্চয়। ধীরে ধীরে, ব্যাপারটা তরুণের নিকট স্বচ্ছ হইয়া আসিল। সে হাঁ করিয়া তাপসের মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। তাপস বলিল, "মাপ্ কর, তরুণদা, অনেক ব্যথা দিয়েছি। শোন। তুমি যেদিন 'প্রকাশ' সাজিয়া ফটো তুলাইতেছিলে, কিন্তু কিছুতেই হইল না; রেণুকে ডাকিয়া পাগ্‌লামি আরম্ভ করিলে, তখন হঠাৎ আমার মনে হইল যে, সত্যই একটু মজা করিলে মন্দ হয় না। তারপর নির্ম্মলবাবু আসিলেন। তখন স্থির করিলাম যে, নির্ম্মলবাবুকে সত্যসত্যই নাটকের ইন্দুর বন্ধু সাজিয়ে এবং তোমাকে 'প্রকাশ' সাজিয়ে, একটা ঠিক্ ফটোই নিতে হ'বে। বৌদিকে যাইয়া সব খুলিয়া বলিলাম। প্রথমে তিনি রাজী হন নাই; কিন্তু তিনি তোমার স্বভাব জানেন ত'—ঠিক্ এমনি ফটোটি না পাইলে তুমি শান্তিতে থাকিবে না—এই ভাবিয়া সম্মত হইলেন। তার পর, দুজনে প্ল্যান ঠিক্ করিলাম। বৌদিকে বলিয়া দিলাম যে তিনি যেন ঐ দিন রাত্রিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া নির্ম্মলবাবুর সহিত গল্প করেন; প্রত্যেক কথাতেই চম্‌কিয়া উঠেন এবং খুব চিন্তাযুক্ত ও অন্যমনস্কতার ভান করেন। নির্ম্মলবাবুকে সকালে উঠিয়াই একদিনের জন্য বৌবাজারে তাঁহার এক বন্ধুর বাড়ীতে চলিয়া যাইতে অনুরোধ করি। বৌদির গলায় যে নেক্‌লেস্ দেখিলে, সেটা নির্ম্মলবাবুর উপহার নয়, তুমি যেটা তৈরী করতে দিয়েছিলে,—সেটাই। তার পর শুনিলাম, তোমার এ মাসের 'ভারতবর্ষ'টা পড়া হয় নাই—বৌদিকে বলিলাম, তিনি যেন ঐরূপভাবে চিঠিখানা লেখিয়া 'ভারতবর্ষে'র ভিতর রাখিয়া ট্রাঙ্কে বন্ধ করিয়া রাখেন, এবং ঘুমাইয়া পড়েন—আমি আসিয়া তোমাকে দিয়াই পত্রিকাটা আনাইব। তাহা হইলেই, বুঝ্‌লে না, তোমাকে নিজে ট্রাঙ্ক হ'তে বের ক'রে আন্‌তে হ'বে? অর্থাৎ সন্দেহটা যাহাতে ভাল রূপে হয়। তার পর তুমি যখন 'ভারতবর্ষ'টা হাতে লইয়া চেয়ারে বসিলে, আমি তখন ক্যামেরায় instant plate দিয়া ঠিক্ করিয়াই রাখিয়াছিলাম। তার পর, বুঝ্‌তেই পারছ।"

অরুণের বুক হ'তে পাষাণের গুরুভার নামিয়া গেল;—একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়িল।

ঠিক্ এমনি সময়ে, "ঠাকুর পো, তোমার বন্ধু রত্নটিকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, আমি হাতে ক'রে চা আন্‌লে তাঁর খাওয়া হ'বে কি না? এবং আজও কোথাও নিমন্ত্রণ আছে কি না?"

তরুণ একবারে রেণুকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিল, "উঃ, এমনি ক'রে জলে ডুবিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে মার্‌তে হয়?"

তাপস উত্তর দিল, "এ' ত তোমারই স্বখাত সলিল—তোমার জন্যই ত'—।"

রেণু বলিল, "অনেক মিথ্যা অভিনয় ক'রে ব্যথা দিয়েছি, মাপ কর।"

"ব্যথা? উঃ, কি যন্ত্রণাতেই যে এই ক'ঘণ্ট কেটেছে, বল্‌তে পারি না। একটু সান্ত্বনা এই যে তা'র বদলে বড় আকাঙ্ক্ষার এই ফটোটা পেয়েছি।—ঠিক্ এমন ফটোটি না পেলে, বোধ হয়—।"

রেণু বলিল, "ঠিক্ এমনি ফটোটি না পেলে, বোধ হয় সকলকে কেন, নিশ্চয়, নিজেকে ও বাড়ী শুদ্ধ অস্থির ক'রে তুল্‌তে—ইহা ভাল করে জানতাম বলেই ত' এই দুদিন ধরে এত মিথ্যা পাপ অভিনয়—আঃ, ছিঃ, ছাড়, ছাড়, ঠাকুর-পো রয়েছে!" বলিয়া জোর করিয়া রেণু নিজের মুখখানি সরাইয়া লইল।

মাস দুই পরে তরুণের 'স্বামীর ভুল' নাটকখানি প্রকাশিত হইল—পঞ্চাশটি দৃশ্যের পঞ্চাশটি ফটো সহিত। সকলেই খুব প্রশংসা করিল এবং যে ফটোটির জন্য এত কাণ্ড, তরুণের সেই ফটোটি দেখিয়া সবাই বলিল, "ভাবের অভিব্যক্তিতে তরুণকুমার অদ্বিতীয়।"

সাইকেলে দিল্লী

ক্যালকাটা টুরিষ্ট্‌স্ ক্লাবের ডায়েরী

১৪ই অক্টোবর।—সেক্রেটারী কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী হইতে ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় রওনা হইয়া বেলা ৫টার সময় বর্দ্ধমান পৌঁছিলাম। বর্দ্ধমান কলিকাতা হইতে ৭৫ মাইল। রাস্তায় চন্দননগর হইতে খাবার লওয়া হইয়াছিল। বর্দ্ধমানে শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে সে রাত্রির জন্য আশ্রয় লইলাম।

একাদশ সাইক্লিষ্ট—বাম দিক হইতে (১) শোভন চট্টোপাধ্যায়; (২) কৃষ্ণকুমার মুখোপাধ্যায়; (৩) বটকৃষ্ণ রায়; (৪) জগদীশচন্দ্র সরকার; (৫) শিবেন্দ্রনাথ বসু; (৬) চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; (৭) বিমল মুখোপাধ্যায়; (৮) সৌরীন্দ্রনাথ বসু (ক্যাপ্টেন); (৯) প্রকাশচন্দ্র দত্ত (১০) কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; (১১) শচীন্দ্রনাথ বসু

১৫ই অক্টোবর।—বর্দ্ধমান হইতে ভোর ৪টার সময় রওনা হইয়া বেলা ৫॥ টার সময় আসানসোলের ১ মাইল আগে কালিপাহাড়ীতে পৌঁছিলাম। রাস্তা খুব ভাল। আসানসোল কলিকাতা হইতে ১৪১' মাইল্। পথে খাইবার অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। সেখানে Messrs Patel & Mukerjee্র এক কুমার ম্যানেজার আমাদের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

১৬ই অক্টোবর।—আসানসোল হইতে সকাল ৬টার সময় বাহির হইয়া সন্ধ্যা ৭॥ টার সময় ডুমরী ডাক বাংলোয় পৌঁছিলাম। রাস্তা ভয়ানক উঁচু-নীচু। সেদিন অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু পরেশনাথের কাছে অতি সুন্দর দৃশ্য। ডুমরী কলিকাতা হইতে ২০৩ মাইল। পথের দুধারে পাহাড় আর জঙ্গল।

১৭ই অক্টোবর।—ডুমরী হইতে সকাল ৭টার সময় বাহির হইয়া রাত্রি ৮টার সময় চৌপারান পৌঁছিলাম। বারহি পৌঁছিয়া খাবার বন্দোবস্ত করিতেই সন্ধ্যা হইয়া

মোটর ভ্রমণকারীদের সহিত সাক্ষাৎ
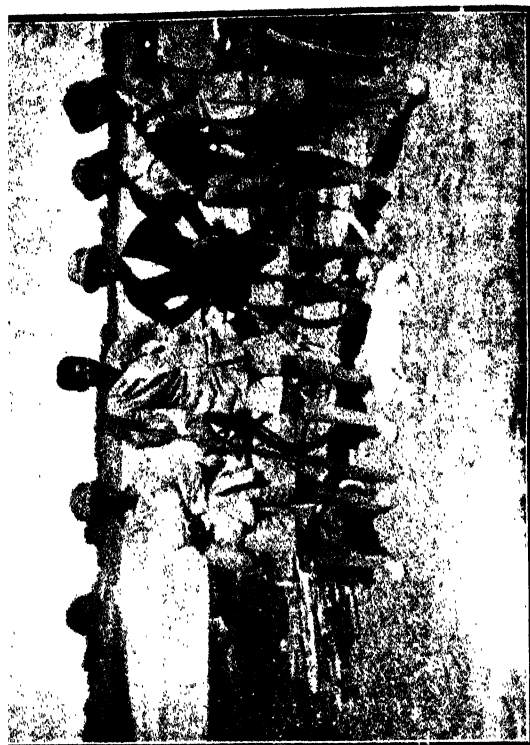
এলাহাবাদ অতিক্রম
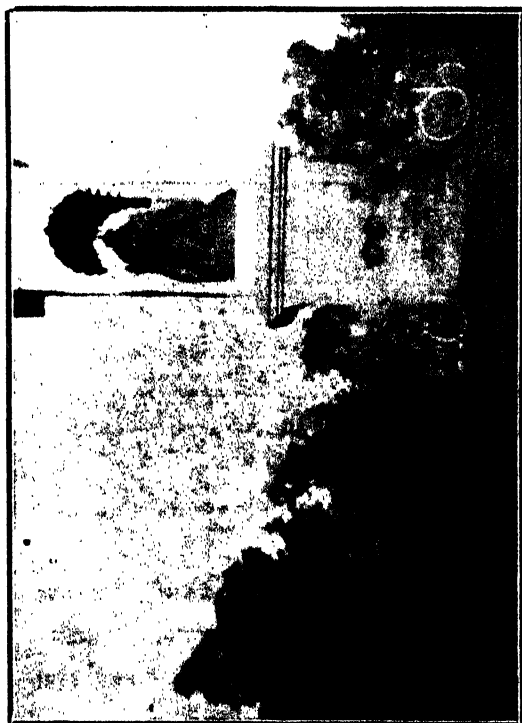
এটা—ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-সান্নিধ্যে

দিল্লী—রাইসিনায়

গেল। তবে সেখানে থাকিবার সুবিধা নাই, সেজন্য সেই রাত্রেই চাঁদের আলোয় চৌপারান যাইতে হইয়াছিল। চৌপারান কলিকাতা হইতে ২৬৪ মাইল। বাংলোর চারিধারে বন জঙ্গল।

১৮ই অক্টোবর।—চৌপারান হইতে সকাল ৭টার সময় বাহির হইয়া বেলা ৫টার সময় আওরঙ্গাবাদ পৌঁছিলাম। রাস্তায় কন্তু নদী পার হইতে হইয়াছিল ; পুল নাই। আওরঙ্গাবাদের স্কুলের হেডমাষ্টার মহাশয়ের বাড়ীতে উঠিয়াছিলাম। আওরঙ্গাবাদ কলিকাতা হইতে ৩২২ মাইল।

১৯শে অক্টোবর।—রাত্রি ১টার সময় আওরঙ্গাবাদ হইতে বাহির হইয়া রাত্রি ১০॥ টার সময় কাশী পৌঁছিলাম। বম্বে মেলে শোন নদী পার হইতে হইয়াছিল। কাশী কলিকাতা হইতে ৪২২ মাইল। সেখানে পার্ব্বতী আশ্রমে ঘর ভাড়া লইয়াছিলাম।

দিল্লী হইতে ২২৮ মাইল অন্তরে

সিপাহী-বিদ্রোহের সময় দিল্লীতে নিহত মিঃ চার্লস টডের স্মৃতিস্তম্ভ

২০শে অক্টোবর।—বিশ্রাম—রাত্রে ৫জন কলিকাতায় ফিরিয়া গেল।

২১শে অক্টোবর।—সকাল সাতটার সময় রওনা হইয়া সন্ধ্যা ৭টার সময় এলাহাবাদ পৌঁছিলাম। গঙ্গা পার হইতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগিয়াছিল। সেখানে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিলাম। এলাহাবাদ কলিকাতা হইতে ৪৯৮ মাইল। রাস্তা খুব ভাল।
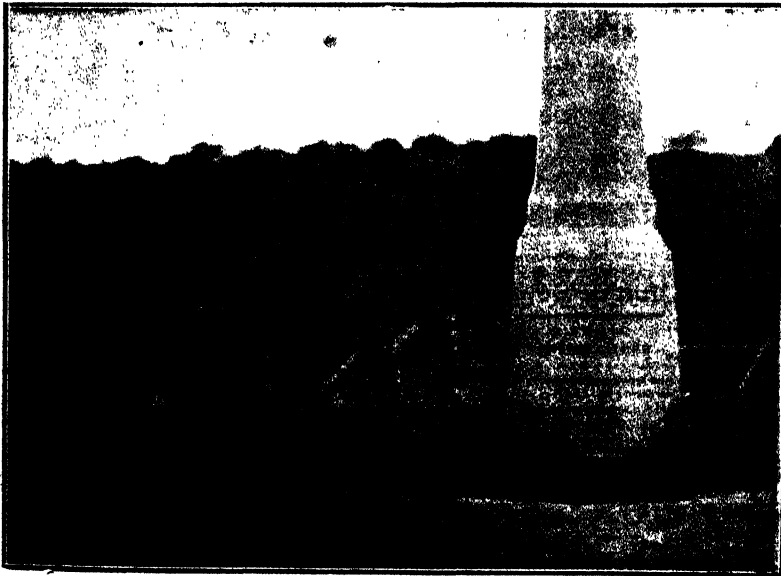
২২শে অক্টোবর।—এলাহাবাদ হইতে বেলা ৯টার সময় বাহির হইয়া বেলা ৩টার সময় মুরাটগঞ্জ পৌঁছিলাম। একজনের সাইকেল খারাপ হওয়ায় তাহার আর যাওয়া হইল না। মুরাটগঞ্জ কলিকাতা হইতে ৫৩০ মাইল।

২৩শে অক্টোবর।—ভোর ৩টার সময় রওনা হইয়া রাত দশটার সময় কানপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। কানপুর কলিকাতা হইতে ৬২৪ মাইল। পথে দেখিবার কিছু নাই। ফতেপুরে একদল

দিল্লী হইতে এক শত মাইল অন্তরে

European motor touristsএর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

২৪শে অক্টোবর।—কানপুর হইতে সকালে বাহির হইয়া রাত্রি ১২টার সময় গুরসাহাইগঞ্জে পৌছিলাম। রাস্তায় একদল ডাকাতের কবল হইতে পলাইয়াছিলাম। গুরসাহাইগঞ্জ কলিকাতা হইতে ৬৯০ মাইল।

২৫শে অক্টোবর।—সকাল ৬টার সময় বাহির হইয়া রাত্রি ১২॥ টার সময় এটাতে পৌছিলাম। এটা কলিকাতা হইতে ৭৩১ মাইল।

২৬শে অক্টোবর।—এটা হইতে রওনা হইয়া বেলা ২টার সময় আলিগড় পৌছিলাম। সেখানে একজনের হাণ্ডেল খুলিয়া পড়িয়া যাওয়ায় সে অজ্ঞান হইয়া গেল। সেদিন আর অগ্রসর হওয়া গেল না। আলিগড় কলিকাতা হইতে ৮৫১ মাইল।

২৭শে অক্টোবর।—সকাল বেলা বাহির হইয়া বেলা পাঁচটার সময় দিল্লী পৌছিলাম। যমুনার পুল পার হইতে হইয়াছিল। দিল্লী কলিকাতা হইতে ৯৩৩ মাইল। সেখানে করোনেশন হোটেলে রাত্রিযাপন করিলাম।
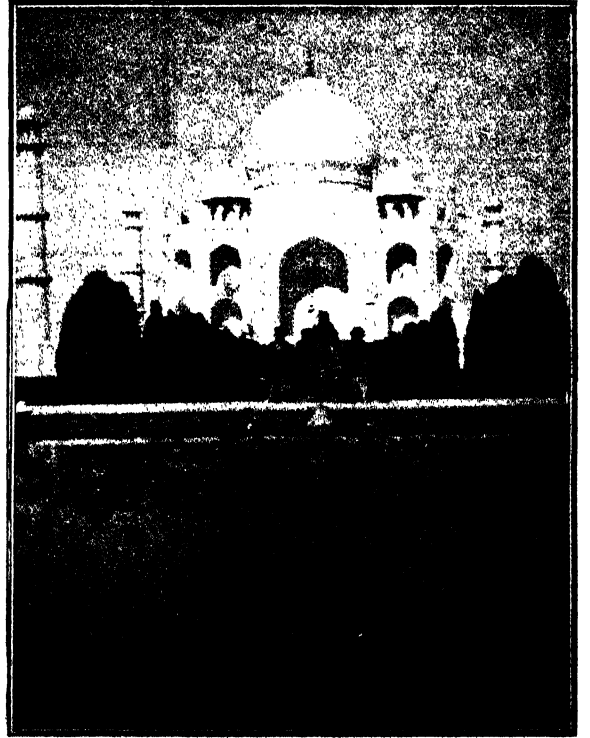
২৮শে অক্টোবর।—ভোর বেলা রওনা হইয়া সন্ধ্যায় কর্ণাল পৌছিলাম। পথে একদল ডাকাতের হাতে পড়িয়াছিলাম। পলাইবার সময় আর সকলে বাঁচিয়া গেল কেবল একজন মাথায় একটা লাঠির ঘা খাইয়াছিল। সকলে অত্যন্ত ভয় পাইয়া গেল এবং সেখান হইতেই কলিকাতা ফিরা সাব্যস্ত হইল। পেশোয়ার যাওয়া আর হইল না। কর্ণাল কলিকাতা হইতে ১০২৮ মাইল। সেই দিনই প্রথম ট্রেণে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

তাজ-ক্রোড়ে

অবৈতনিক আদর্শ ব্যায়াম-সমিতি

আজ চতুর্চত্বারিংশ বৎসর ধরিয়া কলিকাতায় এবং তাহার উপকণ্ঠস্থিত গ্রামসমূহে "গৌরবাবুর আখাড়া" আখ্যায় এই সম্প্রদায় অভিহিত হইয়া আসিতেছে। হাইকোর্টের এটর্ণি বঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ ব্যায়াম-কৌশলবিশারদ আচার্য্য গৌরহরি মুখোপাধ্যায় ইহার প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আচার্য্য মহাশয়ের সুশিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী শিষ্যগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্যায়াম চর্চ্চার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। তাঁহার প্রধান শিষ্য অধুনা গরিফা-নিবাসী প্রসিদ্ধ ডাক্তার বামাচরণ মিত্র মহাশয়ের সুযোগ্য ছাত্র ব্যায়াম-কুশলী শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ১৯০০
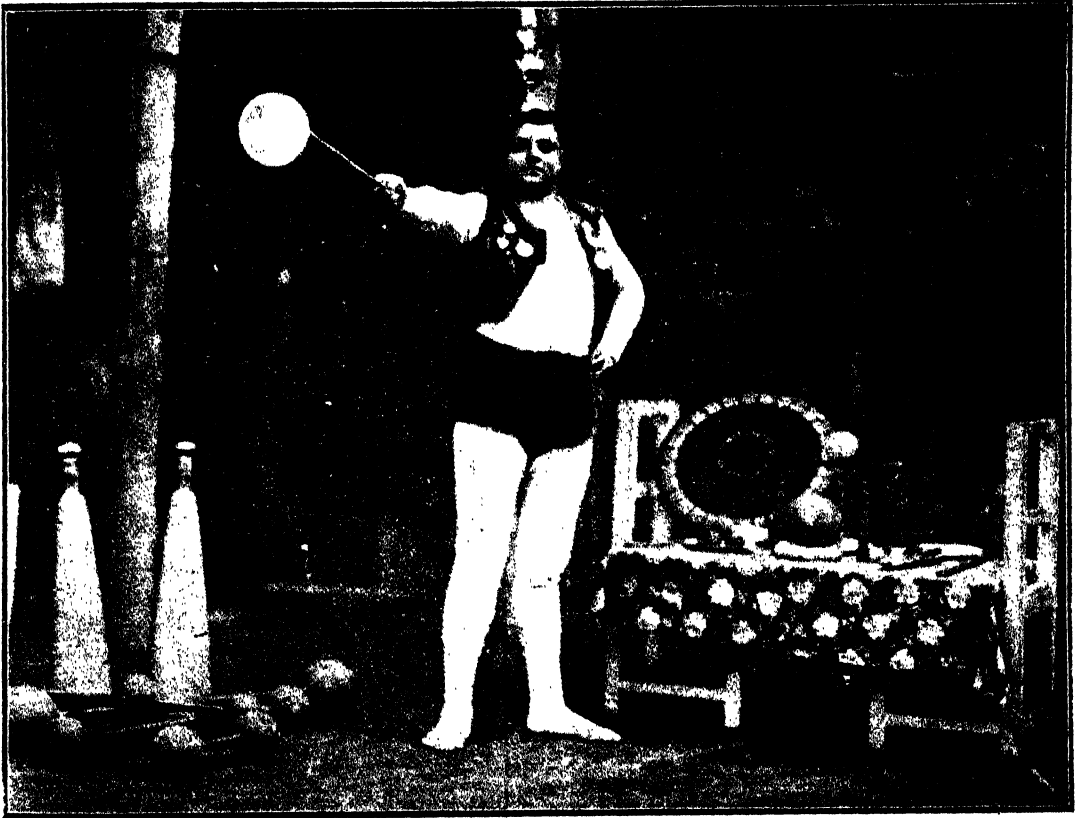
ব্যায়ামবীর শ্রীমান বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সুপ্রসিদ্ধ পল্লী আহিরীটোলায় ইহা প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ইহার বহু শাখা কলিকাতার বিভিন্ন পল্লীতে, ২৪ পরগণার প্রধান প্রধান গ্রামে, ভাগিরথীর পর পারস্থ গ্রাম সমূহে, যশোহর প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের সহরে, সুদূর হায়দ্রাবাদ, মহিশূর, এলাহাবাদ, বেণারস প্রভৃতি নগরে খৃষ্টাব্দে বেনিয়াটোলায় সম্ভ্রান্ত যুবকবৃন্দের সাহায্যে একটী শাখা উক্ত পল্লীতে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার শিক্ষাচাতুর্য্যে, এবং পল্লীস্থ যুবকবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে এই ব্যায়াম সম্প্রদায় আজ বঙ্গে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে। মাষ্টার বসন্ত এই সম্প্রদায়ের উজ্জ্বল নক্ষত্র। বসন্ত আহিরীটোলা
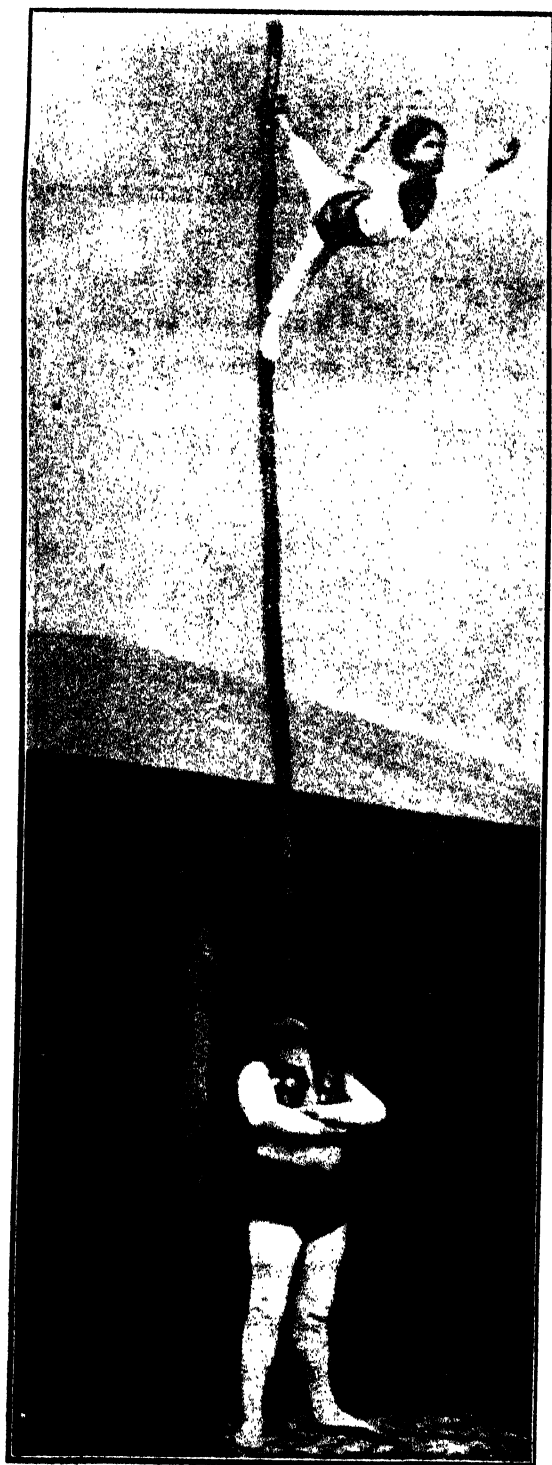
শ্রীমান বসন্তকুমার নাকের উপর বংশদণ্ড ধরিয়া একটী বালককে অৰ্দ্ধ পার্শ্বে স্থির রাখিয়াছেন
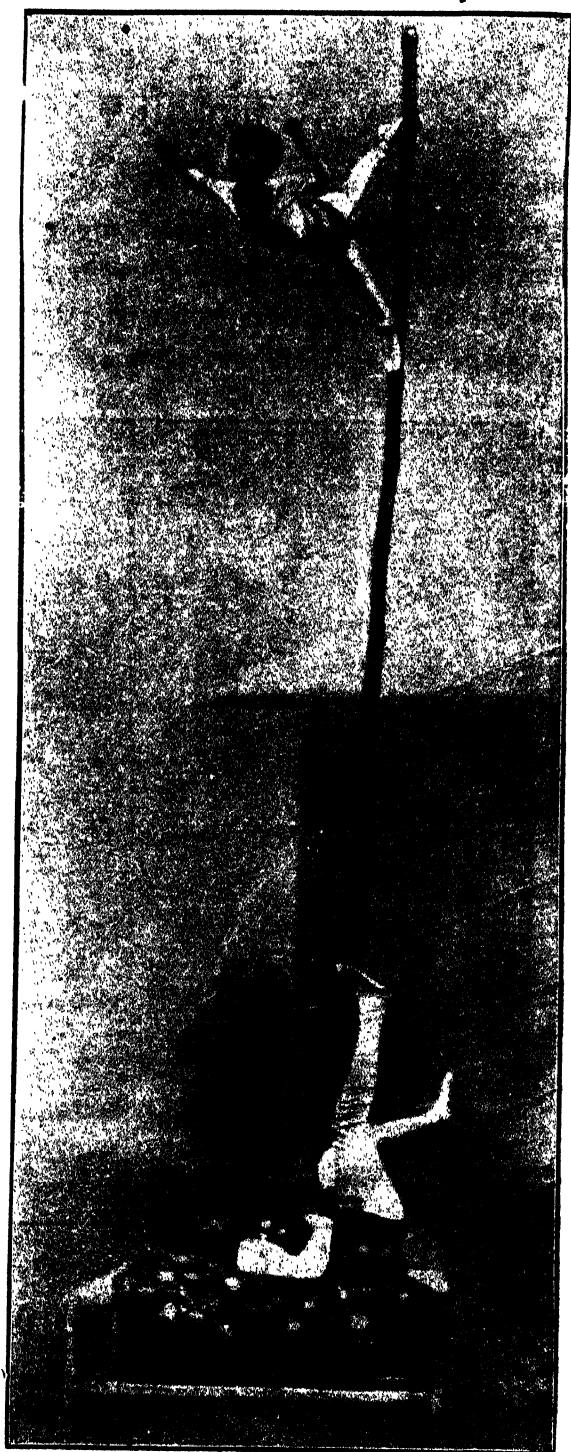
শ্রীমান বসন্তকুমার এক পায়ের উপর বংশদণ্ড ধরিয়া একটী বালককে ঊর্দ্ধ পার্শ্বে স্থির রাখিয়াছেন

নিবাসী হোমিওপ্যাথির ডাক্তার ৺ভগবানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র, ৺হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দৌহিত্র। মাতুল রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে শিক্ষিত হইয়া, বসন্ত আজ যাবতীয় ব্যায়াম-কুশলী বীরগণকে পরাস্ত করিয়াছে। তাহার এক পাদোপরি সুদীর্ঘ বংশদণ্ড সংলগ্ন বালক ক্ষীরোদলালের অদ্ভুত শরীরাবর্ত্তন—এবং সঙ্গে সঙ্গে বসন্তের পদ পরিবর্ত্তনে ভার কেন্দ্রের সাম্যভাব প্রদর্শন—দর্শকের মনে যুগপৎ বিস্ময় ও ভয়ের সঞ্চার করিয়া দিয়া, তাহাদিগকে পুলকিত করিয়া দেয়। কপালের উপর দ্বাদশবর্ষীয় ক্রীড়ক সহ বংশদণ্ডের অত্যদ্ভুত ভার কেন্দ্রের সাম্যভাব একটী বিস্ময়কর দৃশ্য। সোপান সমষ্টির উপর ক্রীড়ক সহ দ্বিপাদ বিশিষ্ট মই বসন্ত এক পদের উপর স্থিরভাবে রাখিয়া যে ক্রীড়া দেখাইয়া থাকে, তাহা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। বেনিয়াটোলা সম্প্রদায় যে কেবলমাত্র ব্যায়ামানুশীলনে প্রবৃত্ত তাহা নহে, এখানে, প্রত্যেক ছাত্রকে বিদ্যাশিক্ষা, নীতিশিক্ষা, ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয়। এই ত্রয়োবিংশ কাল ধরিয়া একাদিক্রমে বহু ছাত্র বাহির হইয়াছে, সকলেই চরিত্রবান ও বহুগুণে বিভূষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী। সম্প্রদায় পল্লীবাসীর বহু উপকার সম্পাদিত করিয়া সগৌরবে অবস্থান করিতেছে ৺ বটকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান হরিশঙ্কর পাল এই সম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধারক। তিনি তাঁহার বাটীর সংলগ্ন একখণ্ড জমী সম্প্রদায়কে ব্যায়ামচর্চ্চার জন্য সমর্পণ করিয়া পল্লীবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার বাটীর বালকগণও এ সম্প্রদায়ের সভ্য। তাঁহার সাহায্যে এবং সম্প্রদায়ের সুযোগ্য সম্পাদক রা বিহারী দে, অধ্যক্ষ গোষ্ঠবিহারী দে এবং পরেশনাথ দাঁ জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুণ্ডু প্রথম কার্য্যাধ্যক্ষের আন্তরিক যত্নে ও উৎসাহে সম্প্রদায় উন্নতিপথে অগ্রসর। ভগবানের কাছে আমরা ইহার চিরপ্রতিষ্ঠ অবস্থান প্রার্থনা করি এবং সম্প্রদায়ের ছাত্রবৃন্দও তাহাদের পরিচালকবর্গের দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

আনন্দের কথা—সুপ্রসিদ্ধ সার্কাসক্রীড়ক বঙ্গের গৌরব শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বসাক সম্প্রতি এই সম্প্রদায়ের শিক্ষাভার গ্রহণ করিয়া সম্প্রদায়কে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীমান বসন্তকুমার এক পায়ের উপর একখানি মই ধরিয়া তদূর্দ্ধ পার্শ্বে একটী বালককে স্থির রাখিয়াছেন

বৌদ্ধ-সাহিত্যে প্রেত-তত্ত্ব

শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম-এ, বি-এল

পেথবত্থু বৌদ্ধ-সাহিত্যের একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। বৌদ্ধ-সাহিত্যে ও ধর্ম্মে প্রেতের ধারণা কিরূপ ভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে, এই গ্রন্থখানিতে তাহাই বিশেষ ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। বিখ্যাত টীকাকার ধর্ম্মপালের 'অত্থকথা' এই গ্রন্থখানির টীকা-ভাষ্যমাত্র। মূল গ্রন্থে যে সব গল্পের আভাসমাত্র দেওয়া হইয়াছে, সে সব গল্পের বিস্তৃত বিবরণ ধর্ম্মপালের এই 'অত্থকথা'তে পাওয়া যায়। সে যুগে সাধারণতঃ গল্পের ভিতর দিয়াই সমাজ, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র প্রভৃতির গোড়াকার কথাগুলি বুঝাইবার চেষ্টা করা হইত। সুতরাং এই বইখানি গল্পের সমষ্টি হইলেও বৌদ্ধধর্ম্ম, সমাজ এবং সাহিত্যের অনাবিষ্কৃত রহস্যের বহু উপাদান এই গ্রন্থখানির ভিতর নিহিত আছে।

প্রেতবত্থু ভাষ্যের এই গল্পগুলি পাঠ করিলে মনে নানারকমের সমস্যার উদয় হয়। প্রথমতঃ দেখা যায় যে, এই গল্পগুলিতে কোথাও প্রেত-পূজা বা পিতৃ-পুরুষের পূজার উল্লেখ নাই। বস্তুতঃ, পালি-ধর্ম্ম-সংহিতায় দক্ষিণাঞ্চলের বৌদ্ধদের ধর্ম্ম-বিশ্বাসে কোথাও কোনও ব্যক্তিবিশেষের পূজারই উল্লেখ পাওয়া যায় না। পিতৃ-পুরুষ প্রেত বা দেবতা, কাহাকেও বৌদ্ধেরা ব্যক্তি হিসাবে কখনো পূজা করে নাই—বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যও এই সত্যেরই সাক্ষ্য প্রদান করে। তাহাতে এমন কি ব্যক্তিগত ভাবে বুদ্ধের উপাসনার পরিকল্পনাও দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র বোধিদ্রুম অথবা ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের সঙ্কেত অর্থাৎ সত্যধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের ব্যাপারটাই দাক্ষিণাত্যের এই উপাসকদিগকে আকর্ষণ করিয়াছিল।

কিন্তু গল্পগুলিতে কোথাও পিতৃ-পুরুষের পূজার উল্লেখ না থাকিলেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উৎকণ্ঠার আভাস বেশ স্পষ্টরূপেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। পুত্র-কন্যা পিতা-মাতার কল্যাণ কামনায় দান ধ্যান করিতেছেন, এবং তাহারই ফলে পিতা-মাতা দুঃখ-দুর্দ্দশার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন—অনেক গল্পেই এই ধরণের ব্যাপারের উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহা হইলেও—পুত্র-কন্যাদের এই সব কাজ কোথাও তাহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম রূপে বর্ণিত হয় নাই। তাহা ছাড়া, প্রেতের এই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের অধিকার যে কেবলমাত্র পুত্র কন্যারই আছে, তাহা নহে। ইহার ব্যবস্থা পুত্র কন্যা ছাড়া অন্য লোকেও করিতে পারে।

পরলোকে দুঃখ-দুর্দ্দশার হাত হইতে মুক্তি লাভের জন্য সাধারণ বৌদ্ধধর্ম্ম-বিশ্বাসীরা এবং উপাসক-উপাসিকারা যাহাতে ইহলোকে পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেই উদ্দেশ্যে গল্পগুলি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের ভিত্তি কর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সব উপদেশ সেই কর্ম্মের স্বাভাবিক এবং আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নহে। এ কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, কর্ম্ম ভালই হোক, আর মন্দই হোক্—তাহার পরিণাম অপরিহার্য্য এবং এই কথাটাই সর্ব্বত্র বৌদ্ধ-বিশ্বাসীদের মনের ভিতর মুদ্রিত করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে।

প্রজ্ঞা, ধ্যান এবং সমাধির দ্বারা যাহারা নির্ব্বাণ লাভের জন্য উন্মুখ, এমন কোনও পাঠকের জন্যই পরমত্থ দীপনীর গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন নাই। চিরন্তন সত্য বা আদিম বাস্তবকে বুদ্ধির দ্বারা আবিষ্কার করিতে চান—তাঁহার মনের সম্মুখে এমন কোনও চিন্তাশীল পাঠকও ছিল না। যাহাদের জন্য তাঁহার এই গ্রন্থ লিখিত, তাহারা সেই সব সাধারণ লোক, যাহারা পৃথিবীতে কেবলমাত্র পার্থিব কল্যাণই কামনা করে,—পান-ভোজন, বংশ-বৃদ্ধি লইয়াই যাহারা মাতিয়া আছে; এবং মৃত্যুর পরেও যাহারা এই সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগের আকাঙ্ক্ষা ছাড়া অন্য কোনও অবস্থার কল্পনাও করিতে পারে না। সুতরাং তাহাদের কাণে বার বার করিয়া একটিমাত্র মন্ত্রই উচ্চারণ করা হইয়াছে; এবং সে মন্ত্রটি এই যে, জীবিত অবস্থায় অকুণ্ঠিত চিত্তে দান করার দ্বারাই কেবলমাত্র

পরলোকে আনন্দের অধিকারী হইতে পারা যায়— মনুষ্য-দেহে যাহারা প্রচুর খাদ্য এবং পানীয় প্রদান করে, মৃত্যুর পর তাহারা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য এবং পানীয় লাভ করিবে।

এই দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে পরমত্থদীপনীর প্রেত এবং প্রেতিনীদের সঙ্গে রক্ত-মাংসের দেহধারী মানুষের কিছুমাত্র তফাৎ নাই। তাহারাও ক্ষুৎ-পিপাসায় পীড়িত হয়। ভালবাসার আসক্তি—পুরুষের প্রতি নারী এবং নারীর প্রতি পুরুষের অনুরাগ—এ জিনিসটাও তাহাদের ভিতর বিদ্যমান আছে। এ সম্পর্কে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, প্রেত বা প্রেতিনীরা মনুষ্য-দেহে জীবিত প্রণয়ীর সঙ্গকেও উপভোগ করে। জীবিতাবস্থায় যে রমণীকে তাহারা ভালবাসিত, প্রেতজন্ম লাভ করিয়া তাহাকে লইয়া উধাও হইয়া গিয়াছে, এবং দীর্ঘকাল তাহাদের সহিত একত্রে বসবাস করিয়াছে—এই ধরণের ঘটনা কতকগুলি গল্পে বর্ণিত হইয়াছে। একটি গল্পে আবার এরূপ ঘটনারও উল্লেখ আছে যে, পাঁচ শত প্রেতিনী বারাণসীর একজন রাজাকেও প্রলুব্ধ করিয়া, তাহাদের উদ্যানে লইয়া গিয়া, তাহার সঙ্গসুখ উপভোগ করিয়াছিল। আশ্চর্য্য এই যে, প্রেত এবং মানুষের এই যে যৌন-সম্মিলন—এ ব্যাপারটাও গল্পগুলির রচয়িতাদের কাছে বিচিত্র বলিয়া মনে হয় নাই।

খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র প্রভৃতি কোনও দ্রব্যই যে প্রেতেরা সোজাসুজি ভাবে গ্রহণ করিতে পারে না—এ কথাটা বহুবার বহু রকমে বলা হইয়াছে। ছলে-বলে তো তাহারা কোনও জিনিস গ্রহণ করিতে পারেই না,—কেহ স্বেচ্ছায় কোনও জিনিস দান করিলেও, তাহা স্পর্শ করিবার অধিকারও তাহাদের নাই। যখন কোন ব্যক্তিকে কোন বস্তু দান করিয়া তাহার পুণ্য প্রেতদের নামে উৎসর্গ করা হয়—কেবলমাত্র তখনই প্রেতদের সেই সব দ্রব্য উপভোগ করিবার অধিকার জন্মে। পরলোক-গত আত্মার দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার এই যে ব্যবস্থা, এ কেবলমাত্র বৌদ্ধদেরই পরিকল্পনা নহে—হিন্দুদের শ্রাদ্ধের মূলেও এই ধারণা বিদ্যমান। বস্তুতঃ, বৈদিক যুগ হইতে যে সব ধারণা ভারতীয় মনে একটা গভীর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, এ ধারণাও তাহাদেরই একটি। হিন্দু মত অনুসারে ব্রাহ্মণ অথবা ব্রাহ্মণের কোনও প্রতিনিধিকে দান করিতে হইবে, এবং পরলোকগত আত্মার নামে যতগুলি লোককে আহার্য্য এবং বস্ত্রদান করা হইবে, তাহারই উপরে দানের পুণ্য নির্ভর করিবে। দানের ফলই কেবলমাত্র প্রেতদের নামে উৎসর্গ করা হয়। হিন্দু শ্রাদ্ধে কোনও কোনও খাদ্য-বস্তু এবং বস্ত্র সোজাসুজি-ভাবে প্রেতের নামে দেওয়া হয় বটে, কিন্তু ঈপ্সিত ফললাভ করিতে হইলে, উপযুক্ত লোকের ভিতর এই সব দ্রব্য বিতরণ করার প্রয়োজন হইবে—এ কথারও উল্লেখ আছে।

পরমত্থদীপনীর গ্রন্থকারের ভিতর সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার পরিচয় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র ভিক্ষু এবং বৌদ্ধ সঙ্ঘে দানের দ্বারাই পুণ্য সঞ্চিত হয়, প্রেত এবং প্রেতিনীদের দুঃখ-দুর্দ্দশার হাত হইতে মুক্ত করিবার জন্য ইহাদিগকে দান করাই একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা—এ কথা তিনি পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। দুই-এক স্থানে অবশ্য শ্রমণ এবং ব্রাহ্মণদিগকেও দান করার কথারও উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহা কেবল সাধারণ দানের প্রসঙ্গে, দাতারা যাহা নিত্যনৈমিত্তিক ভাবে করিয়া থাকেন;—প্রেত বা প্রেতিনীদের দুঃখ-মোচনের প্রসঙ্গে নহে। সে জন্য যে দান, তাহা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, ভিক্ষু, অন্ততঃ পক্ষে একজন উপাসক, অথবা সাধারণ বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বীকেই করিতে হইবে। এমন কি, প্রাত্যহিক দানের সম্পর্কেও তাঁহার পক্ষপাতিত্বের প্রমাণ দুর্লভ নহে। সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন দানের সম্পর্কে তিনি বৌদ্ধেতর ধর্ম্মবিশ্বাসীদের দাবী একেবারে ঝাড়িয়া ফেলেন নাই বটে, কিন্তু অফুরন্ত ধন-ভাণ্ডার পৃথিবীর সাধারণ লোককে দান করিয়া নিঃশেষ করা অপেক্ষা, একজন বিশিষ্ট বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে সামান্য কিছু দান করার পুণ্যকে ঢের বেশী বড়,—অঙ্কুর পেত প্রভৃতি উপাখ্যানের ভিতর দিয়া তাহা স্পষ্টরূপেই দেখাইয়া দিয়াছেন।

প্রেতদের দেহের অবয়বও ঠিক নর-দেহেরই অনুরূপ। কচিৎ কখনও অবশ্য ইহার ব্যতিক্রমও করা হইয়াছে। কখনও তাহাদের দেহকে অস্বাভাবিক দীর্ঘ, কখনও বা পৃথিবীর কর্ম্ম অনুসারে তাহাদের কোনও অঙ্গকে বিকৃত করিয়া দেখানো হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের সাধারণ চেহারার সঙ্গে মানুষের চেহারার কিছুমাত্র অমিল নাই। জড়দেহে মানুষ যে সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে, প্রেতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের

আদর্শও যখন তাহারই অনুরূপ, তখন দেহের সাদৃশ্য অনুরূপ হওয়ার যে আবশ্যকতা আছে, তাহা, বলাই বাহুল্য।

পরলোকে প্রেতদের স্বভাবের গতি সাধারণতঃ ভালর দিকেই পরিবর্ত্তিত হয়। তাহাদের দুঃখ-কষ্ট, তাহাদের পূর্ব্ব-জন্মের দুষ্কৃতির কঠোর অভিজ্ঞতা তাহাদের ভিতর-কার দোষ-ত্রুটিগুলি মুছিয়া দিয়া, তাহাদের স্বভাবকে সরল এবং মনকে কোমল করিয়া তোলে। জীবনে দানের দ্বারা যে পুণ্য সঞ্চিত হয়, পরলোকে তাহাই যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পাথেয়, এ অভিজ্ঞতাও তাহারা অর্জ্জন করে। সুতরাং পরের অপকার করিতে তাহাদিগকে বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ, নিজেদের দুঃখ-দৈন্যের ভারে তাহারা এমনি ভারাক্রান্ত যে, পরের অনিষ্ট করিবার সুযোগ বা সময়ও তাহাদের নাই। দুষ্টবুদ্ধি আখ্যা আর কিছুতেই তাহাদিগকে দেওয়া যায় না—তাহাদিগকে দুঃখ-ভার-পীড়িত প্রেত বলিলেই বরং তাহাদের ঠিক পরিচয় দেওয়া হয়।

পরলোকগত আত্মাদের ভিতর নানারকমের শ্রেণী বিভাগ আছে। এই সব বিভাগের ভিতর প্রেত এবং দেবতা এই দুইটি বিভাগের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; এবং ইহাদের ভিতর পার্থক্যও যথেষ্ট রকমেই সুস্পষ্ট। যে সব আত্মা দেবজন্ম লাভ করে, তাহাদের জীবিতকালের কার্য্যকলাপের ভিতর সাধারণতঃ সৎকার্য্যের সংখ্যাই বেশী। তাহা হইলেও, পাপের চিহ্ন তাহাদের ভিতর, বিশেষ ভাবে নিম্নশ্রেণীর দেবতাদের ভিতর একেবারে দুর্লভ বস্তু নহে। এই দেবতাদের ভিতর শেঠ টী অসৈহ অথবা যুবরাজ অঙ্কুরের মত যাহারা সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর, পৃথিবীতে অপরিমিত দান করার ফলে তাঁহারাই তাবতিংস স্বর্গে জন্মলাভ করার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু এই তাবতিংস স্বর্গেও স্তর বা শ্রেণী-বিভাগের অন্ত নাই। দেবতাদের নিম্নস্তরের ভিতর রুক্ষদেব (বৃক্ষদেব) ভূমিদেব প্রভৃতি নানা শ্রেণীর বিভাগ আছে। যে সব দেবতার পৃথিবীর প্রতি আকর্ষণ মৃত্যুর পরেও শেষ হয় না, সম্ভবতঃ তাহাদিগকেই এই সব নামে সম্বোধন করা হইয়াছে। পেতবথ্থুত বিমান দেবের নামেরও উল্লেখ আছে। ইহারা বিমান অর্থাৎ আকাশের প্রাসাদে বাস করে। বিমানদেব এবং বিমানপ্রেতের ভিতর পার্থক্য বিশেষ কিছুই নাই। যদিও বা থাকে, তবে সে পার্থক্য এতই অল্প যে, তাহা স্বচ্ছন্দেই অবহেলা করা চলে। প্রেতদের ভিতর বিমান প্রেতই অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যবান। তাহাদের পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি থাকিলেও তাহার সহিত দুষ্কৃতিও যথেষ্ট পরিমাণেই মিশ্রিত আছে; এবং তাহারই ফলে তাহাদিগকে দুঃখ-যন্ত্রণাও যথেষ্টই ভোগ করিতে হয়। তাহাদের নীচে প্রেত এবং প্রেতিনীদের সাধারণ স্তর। অসহ্য দুঃখ-যন্ত্রণার ভিতর দিয়া তাহাদিগকে কালাতিপাত করিতে হয়। তাহা-দের শাস্তির বীভৎস এবং বিশ্রী বিবরণ পাঠ করিতে করিতে মন আপনা হইতেই বিরক্তিতে ভরিয়া যায়। কিন্তু তাহাদের দুঃখের ইতিহাস এত জঘন্য হইলেও অতি অকিঞ্চিৎকর। কারণেই তাহারা আবার মুক্তিলাভ করে—তাহাদের নামে সামান্য একটু দান ধ্যান করিলেই, তাহাদের মুক্তির পরোয়ানা আসিয়া হাজির হয়। তাহাদের শাস্তি এবং তাহাদের মুক্তি এই দুইটি জিনিসের ভিতর কিছুমাত্র সামঞ্জস্য নাই।

যে স্থানে অধঃপতিত প্রেতেরা শাস্তি ভোগ করে সে স্থানের সম্বন্ধেও কিছু বলা আবশ্যক। যে সব ক্ষেত্রে অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর, সে সব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ দেখা যায় যে, পাপীরা সহস্র সহস্র বৎসর নরক ভোগের পর পাপের শাস্তির শেষাংশ ভোগ করিবার জন্য প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়। নরকের বিশদ বর্ণনা কোথাও পাওয়া যায় না; এবং নরক-যন্ত্রণার কতকগুলি অস্পষ্ট উল্লেখ মাত্রই আমাদের চোখে পড়ে। নরক হইতে পরলোকগত আত্মা পাপক্ষালনের জন্য পৃথিবীতে আসিয়া প্রেতজন্ম লাভ করে; এবং যে পর্য্যন্ত না কোনও মানুষ দান করিয়া তাহার পুণ্য তাহাদের নামে উৎসর্গ করে, সে পর্য্যন্ত তাহারা এই প্রেত জন্ম হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। তবে অনেক আত্মা নরকে গমন না করিয়া একেবারেই প্রেত-জন্ম লাভ করে।

পেতবথ্থুতে এবং তাহার ভাষ্যে প্রেত এবং প্রেতলোকের ধারণা এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এসব উপাখ্যানের অধিকাংশই অবিশ্বাস্য, এমন কি, অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু তাহা হইলেও, এগুলি বুদ্ধের বাণীতে বিশ্বাসবান বহু ভক্তকে দেহে, কাজে এবং কথায় ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে দেয় নাই; এবং তাহাদিগকে জীবন্ত প্রাণীর প্রতি দয়ায় এবং অহিংসায় অনুপ্রাণিত করিয়াছে।

পল্লীসেবা

শ্রীকালীমোহন ঘোষ

বিশ্বভারতীর পল্লীচর্য্যা বিভাগ হইতে হিন্দু, মুসলমান ও সাঁওতাল, এই ত্রিবিধ গ্রামে কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত করা হইয়াছে।

সাঁওতালগণ সত্যপ্রিয় ও ন্যায়পরায়ণ, অল্পেতে সন্তুষ্ট। ইহাদের স্বভাব কোমল অথচ দৃঢ়। স্বাধীনতাই ইহাদের প্রাণ। ইহারা সর্ব্বদাই বাহিরের অন্য সমাজ হইতে দূরে থাকিয়া নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে স্বাধীন থাকিতে ভালবাসে, কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি ইহাদের মনে কোনও প্রকার বিদ্বেষ নাই। ইহারা চুরি কাহাকে বলে জানে না এবং সর্ব্বদাই শান্তিতে থাকিতে চায়।

ইহারা সাঁওতাল পরগণা হইতে আরম্ভ করিয়া শালবনের ধারে ধারে ছোট ছোট উপনিবেশ স্থাপন করিয়া, জঙ্গল কাটিয়া অনুর্ব্বর কাঁকরময় কঠিন ভূমিকে চাষের উপযোগী করিয়া তুলে। জমির উপর ইহাদের কোনও অধিকার নাই। জমি চাষের উপযোগী হইলেই জমিদার ও জোদ্দারগণ ইহাদের উপর উৎপাত সুরু করে। ইহারা কিছুদিন ধরিয়া অত্যাচার সহ্য করিয়া বেশী বাড়াবাড়ি দেখিলে জায়গা জমি ফেলিয়া দলকে দল সবাই অন্যত্র চলিয়া যায়।

ইহাদের ঘর বাড়ী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চারিদিকের মুক্ত প্রান্তরের মাঝখানে খোয়াইর কাছে—যেখানে ঝরণার পরিষ্কার জল পাওয়া যায়, সেখানেই ইহাদের বসবাস। বিশুদ্ধ জল ও হাওয়া যেখানে নাই সেখানে ইহারা থাকে না। হিন্দু ও মুসলমান-প্রধান গ্রামগুলির ন্যায় সাঁওতালগ্রামে স্বাস্থ্য-সমস্যা গুরুতর নহে।

কঠোর পরিশ্রমের মধ্যেও এমন সদানন্দ জাতি আর বড় বেশি নাই। অত্যধিক অত্যাচারে যেমন ইহারা ভীষণ হইয়া দাঁড়ায়, সামান্য মিষ্টি কথায় তেমনি ইহাদের প্রাণ গলিয়া যায়। নৃত্যগীত ও শিকার প্রভৃতি নিত্য নূতন আমোদপ্রমোদ ইহাদের লাগিয়াই আছে। তাহাতে সকলেরই সমান অধিকার; ইহার ভিতর দিয়া সামাজিক সাম্যভাব ইহাদের মধ্যে জাগ্রত থাকে।

এই জিলায় সাঁওতালদিগের মধ্যে পঞ্চায়েৎ শাসন এখনও বিস্তৃত ভাবে বিদ্যমান আছে। গ্রামের মোড়লকে ইহারা সর্দ্দার মাঝি বলে। কোনও স্থানে নূতন উপনিবেশ স্থাপন করিবার সময় তাহারা এক-জনকে সর্দ্দাররূপে নির্ব্বাচিত করিয়া লয়। সেই সর্দ্দারই জমিদারের নিকট জমি সম্বন্ধে দরবার করে; এবং গ্রামের আভ্যন্তরিক মামলা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়া দেয়। সর্দ্দার গ্রাম্য পেয়াদা "গোরেৎ"কে পাঠাইয়া আসামী ও ফরিয়াদীকে তাহার গৃহে আহ্বান করে। গোরেৎ অন্য অধিবাসীদিগকেও বৈঠকের সংবাদ জ্ঞাপন করে। গ্রামের যে কেহ এই বৈঠকে যোগদান করিতে পারে। সাক্ষ্য দিবার বা আসামী-ফরিয়াদীকে প্রশ্ন করিবার অধিকার সকলেরই রহিয়াছে। সর্দ্দার মাঝি সকলের কথা অবগত হইয়া, সকলের মতামত আলোচনা করিয়া অপরাধীকে দণ্ড প্রদান করেন।

বিভিন্ন গ্রামের সাঁওতালদিগের মধ্যে কোনও বিবাদ হইলে গ্রামের বাহিরে বটগাছতলায় তাহার বিচার হয়। উভয় গ্রামের দুই সর্দ্দার মাঝি ও প্রতি গ্রাম হইতে তাহাদের চারি জন করিয়া সহকারী বিচারের ভার গ্রহণ করে। কিন্তু উভয় গ্রামের যে কোনও লোক

উপস্থিত হইয়া তাহার মতামত প্রকাশ করিতে পারে। তাহাতে মীমাংসা না হইলে ইহারা পঞ্চগ্রাম লইয়া সভা করিয়া থাকে।

ইলামবাজারের নিকটে পাঁচমাইল ব্যাপী একটী বৃহৎ বন আছে। এই বনে ২০৷৩০টি গ্রামের বিশিষ্ট সাঁওতালগণ বৎসরের বিশেষ দিনে শিকার করিতে যায়। ২৷৩ দিন পর্য্যন্ত ইহারা বনেই থাকে। সারাদিন শিকারের পর সন্ধ্যায় ইহাদের মহাসভার বৈঠক হয়। এই বৈঠকে সমগ্র বৎসরে ইহাদের মধ্যে যাহা কিছু গুরুতর অভিযোগের কারণ ঘটে তাহার মীমাংসা হয়। সমগ্র সাঁওতাল সমাজের সাধারণ স্বার্থঘটিত ব্যাপারও এইখানে আলোচিত হইয়া থাকে।

এইরূপে এ প্রান্তরে ক্ষুদ্র বস্তির লোক হইয়াও সুদূর ভিন্-গাঁয়ের স্বজাতির সহিত ইহারা সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। নিজেদের এই বিপুল সমাজের আশ্রয়ে সাঁওতালগণ এতদিন পর্য্যন্ত বেশ ভাল করিয়াই সঙ্ঘবদ্ধ ছিল। ইদানীং আমাদের সংস্পর্শে আসিয়া এই সঙ্ঘবদ্ধভাব ক্রমেই শিথিল হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এখনও কোনও সাঁওতাল যদি গ্রাম্য পঞ্চায়েৎকে উপেক্ষা করিয়া আদালতে অথবা জমিদারের কাছারীতে নালিশ করিতে যায়, তাহা হইলে তাহাকে সমাজের সকলেই অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখে।

প্রতিবেশী হিন্দু-মুসলমান গ্রামগুলির তুলনায় সাঁওতাল গ্রামে মিথ্যা-প্রবঞ্চনা নাই বলিলেই হয়। সাঁওতাল গ্রামে "টদ্রি" আখ্যাধারী উকিল দালালগণের আনাগোনা নাই। তথা-কথিত উচ্চশিক্ষিত আইন ব্যবসায়ীর সহিত পরিচয় অতি অল্প বলিয়াই ইহারা এখনও মিথ্যায় পাকা হইতে পারে নাই।

বর্ত্তমানে দেশে মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা যে কত বাড়িয়া গিয়াছে, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ইহাতে দেশের সমূহ ক্ষতি হইতেছে। একবার কোনও মামলাপ্রিয় মুসলমান গ্রামে হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলাম যে, সমগ্র বৎসরের উৎপন্ন শস্য হইতে যে আয় হয়, তাহার এক তৃতীয়াংশ মোকদ্দমায় ব্যয় হইয়া থাকে। গ্রামের কোনও মঙ্গলকর কার্য্যে তাহারা অর্থ-সাহায্য করিতে পারে না। যখন হিসাব করিয়া দেখা হইল যে, বৎসরে মামলা করিয়া যত অর্থ ব্যয় হয়, তাহার এক-দশমাংশ ব্যয়ের দ্বারা ৫ বৎসরের মধ্যে এই গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি ও শিক্ষাবিস্তার করা যায়, তখন সেই গ্রামের অধিবাসীরা পঞ্চায়েৎ-সালিশী স্থাপন করিতে স্বীকৃত হইল। সালিশী বৈঠকে উপস্থিত হইয়া দেখি, উকীলের দালাল সেখানে উপস্থিত রহিয়াছে। ইহারা সর্ব্বদাই সালিশীর বিরুদ্ধে লোককে উস্কাইয়া দিতে চেষ্টা করে। বহুদিন ধরিয়া উকীল ও তাহাদের দালালের নিকট মন্ত্র করিয়া এই গ্রামের অধিবাসীদের স্বভাবও বিকৃত হইয়া গিয়াছে। উভয় পক্ষই মিথ্যা সাক্ষীর সাহায্যে এমন ভাবে ঘটনা সাজাইয়া আনে, যে সত্য নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়ে।

উকীল ও আদালত কেবল যে পল্লীর আর্থিক দুরবস্থার কারণ, তাহা নহে। ইহাদের কৃপায় পল্লীগুলি নৈতিক অধোগতির চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। যে সত্যনিষ্ঠা ও সহানুভূতির ভিত্তির উপর সমাজসৌধ প্রতিষ্ঠিত, ইহারা সেইখানেই ফাটল ধরাইয়াছেন, মিথ্যার বিষ ছড়াইয়া ইহারা সমাজকে জর্জ্জরিত করিয়াছেন; এই জন্যই মহাত্মা গান্ধী এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আইন ব্যবসায় বর্জ্জন করিতে ও জনসাধারণকে আদালতের ত্রিসীমানায় না যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

মুসলমান গ্রামগুলি মামলাবাজ হইলেও, তাহাদের একটা প্রধান গুণ এই যে, সামাজিক সাম্যভাব তাহাদের মধ্যে এখনও বিশেষরূপে জাগ্রত আছে। মসজিদে তাহারা সমান আসনে উপবিষ্ট হইয়া নমাজ পড়ে। বৈঠকে তাহারা একই চাটাইর উপর ধনী দরিদ্র সকলে সমবেত হয়। ধনী মোড়লের সহিত কৃষাণ মজুরও নির্ভীকভাবে সমানে সমানে তর্ক করে।

কিছুদিন আগে শ্রদ্ধেয় বন্ধু এলমহার্ষ্ট সাহেবের সহিত আমি একটি মুসলমান গ্রামে উপস্থিত হই। দাঙ্গা হাঙ্গামা, মোকদ্দমার জন্য এই গ্রামটির বীরভূমে বড়ই দুর্নাম ছিল। প্রতিবেশী নিরীহ হিন্দুদিগের উপর ইহারা যথেষ্ট অত্যাচার করিত। আমরা যাওয়ার পর সেখানে একটি সভা আহূত হয়। আমরা সভায় গিয়া উপবেশন করিলে একটি বৃদ্ধ মোড়ল আসিয়া একেবারেই সাহেবের পাশে আসন গ্রহণ করিল এবং নির্ভীক ভাবে বলিল,—"সাহেব, তুমি বলছ কি? এই বাবু বলছে বলেই যে আমরা তোমাদের কথামত কাজ করব, তা করব না। আমাদের যদি বুঝিয়ে দিতে পার যে, তোমরা যা' বলছ তাতে আমাদের যথার্থই উপকার হবে, তবেই তোমাদের কথা অনুযায়ী চল্‌ব, নইলে নয়।"

খুব ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া বুঝিয়াছি যে, এই নির্ভীকতাই ইহাদের প্রাণ, আর অসংযমই ইহাদের প্রধান দোষ। সালিশী বৈঠকে বসিয়া হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া হাতাহাতি করিবে; কিন্তু বিচারক যদি তাহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে, তবে পর মুহূর্ত্তেই শত্রুকে দোস্ত বলিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে আলিঙ্গন করিবে। ইহারা সহজেই যেমন আত্মকলহে রক্তারক্তি করে, তেমনি আবার ইহাদের মধ্যে কোনও বড় হৃদয়াবেগ জাগাইয়া তুলিতে পারিলে অতি সহজে ঐক্যবদ্ধ হয়। এই গুণেই হিন্দু অপেক্ষা সংখ্যায় অল্প হইয়াও ইহারা অধিকতর শক্তিশালী।

ইহাদের মধ্যে যাইয়া, ইহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া, কোনও কাজ করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে ইহাদের চরিত্রগত এই বিশিষ্টতা-টুকুকে বেশ ভাল করিয়া ধরিতে ও বুঝিতে হইবে। আর তাহা করিলে, ইহাদের চরিত্রের এই নির্ভীকতাকে বিনষ্ট না করিয়া, যাহাতে প্রেমের দ্বারা, উচ্চ আদর্শের দ্বারা ইহাদিগকে সংযত ও উদ্বুদ্ধ করা যায়, তাহাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হইবে।

হিন্দু গ্রাম সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা কিন্তু বড়ই নিরাশাব্যঞ্জক।

বীরভূম জিলায় অধিকাংশ হিন্দুগ্রামেই প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী অন্ত্যজ। 'ছোটলোক' নামে ইহারা আখ্যাত হয়। এই 'ছোটলোকগুলি' সর্ব্বদাই 'ভদ্রলোকে'র ভয়ে ভীত। উৎসাহ ও উদ্যমের রেখাপাত ইহাদের চোখে, মুখে আদৌ দৃষ্ট হয় না।

এক দিন কোনও হিন্দুগ্রামে 'ভদ্রলোক' ও 'ছোটলোকে'র বালকদের জন্ত একটা ফুটবল লইয়া যাই। 'ছোটলোকে'র ছেলেরা প্রথমটা খেলায় যোগ দিতে অস্বীকার করে; পরে আমার কথায় ভরসা পাইয়া দুটী একটী ছেলে খেলিতে নামে। কিছুক্ষণ পরে দেখি অতি অল্প বয়স্ক একটী 'ভদ্রলোকে'র ছেলে, তাহার সমবয়সী একটী 'ছোটলোকে'র ছেলের গণ্ডে সজোরে এক চপেটাঘাত করিয়া বসিল। আমি তিরস্কার করায় সে উত্তর করিল, "মশায়, আপনি খেল্‌তে বলেছেন, তা খেলুক; কিন্তু তাই ব'লে গায়ে ধাক্কা দিবে কেন? আগে থেকে সাবধান না হলে ছোটলোকের আস্পর্দ্ধা বেড়ে যাবে।" বুঝিলাম এই বালক প্রতিদিন তাহার অভিভাবক ও আত্মীয়দের মুখে যাহা শোনে, এ তাহারই প্রতিধ্বনি মাত্র।

শিক্ষিত ভদ্র বাবুসম্প্রদায় হস্তপদ চালনে একান্ত অক্ষম বলিয়া এই সকল 'ছোটলোকেরা'ই অতি সস্তায় মজুরী করিয়া অথবা মুনিবের জমি চষিয়া তাহাদের অন্নবস্ত্র যোগায়। কিন্তু এই উপকারের পরিবর্ত্তে ইহারা পায় কি? আজ ইহাদের অবস্থাটাই বা কি? বহু শতাব্দীর জাত্যাভিমানের নিষ্পেষণে ইহারা যে একেবারে মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়িয়াছে, এই সকল অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকের দিকে তাকাইলে ইহাই ত বারে বারে চোখে পড়ে।

হাড়ি, বাউরী, বাগ্দী, মাল প্রভৃতি জাতি এক সময় অসাধারণ বাহুবলে বঙ্গের সীমান্ত-দেশ রক্ষা করিয়া আমাদের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। ইহাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ বিষ্ণুপুর রাজ্য স্থাপন করেন। বীরভূম ও বাঁকুড়া একসময় এই রাজ্যেরই অন্তর্গত ছিল। "ধর্ম্মমঙ্গল" বর্ণিত ঈছাই ঘোষ ও লাউসেনের লড়াই হইয়াছিল কেন্দুলীর অপর পারে অজয়ের অনতিদূরে। এই যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি কালুবীরের বীরত্ব কাহিনী এখনও বীরভূমের গৃহে গৃহে শোনা যায়। এই কালুবীর ডোমগণের পূর্ব্বপুরুষ। এখনও বীরবংশী বলিয়া ডোমগণ গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকে। "ধর্ম্মমঙ্গল" ডোম কবির রচনা। বহু গ্রামে ধর্ম্মপূজার পুরোহিত ডোম ছিল। এখন ধীরে ধীরে নানা কৌশলে ব্রাহ্মণগণ সেই পৌরোহিত্য গ্রাস করিয়াছেন। কালুবীর ও রমাই পণ্ডিতের বংশীয় ডোমগণ এবং স্বাধীন রাজ্যস্থাপক বাগ্দী ও মালগণের বংশধরগণ আমাদের বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থার ফলে আজ পৌরুষ ও বীর্য্যহীন হইয়া কাপুরুষতার চরম সীমায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে। তাহাদিগকে শক্তিহীন করিয়া আমরাও শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছি। আমি দেখিয়াছি যে, একটী ক্ষুদ্র দুর্দ্দান্ত মুসলমান পল্লীর ভয়ে ৬।৭টী হিন্দুগ্রাম সততই ভীত। এমনটি হয় কেন? ইহার উত্তরে বলিতে হয়, হিন্দুগ্রামে ভদ্র বাবুগণ বীর্য্যহীন ও অকর্ম্মণ্য। কিঞ্চিৎ কেতাবী বিদ্যার কুবুদ্ধি ও জাত্যাভিমানের অন্ধ গোঁড়ামীই তাঁহাদের একমাত্র সম্বল। প্রাচীন হিন্দুসমাজের সহজ, সরল অথচ সুদৃঢ় নিষ্ঠা ইঁহাদের মধ্যে নাই। অন্ত্যজ জাতির অন্তরেও ইহাদের প্রতি কোনও শ্রদ্ধাভক্তি নাই। কোন ভদ্রনামধারী কুচরিত্র কাপুরুষ যদি ঘরের সঙ্গে সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া রাত্রিগুলা হাড়িপাড়ায় কাটায়, তাহা হইলে সমাজে তাহা লইয়া টুঁ শব্দটিও হইবে না। কিন্তু তিনিই আবার দিবালোকে কেহ 'হাড়ির' জল ছুঁইলে সমাজরক্ষার্থে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অত্যাচারের একশেষ করিবেন। এই অপমান তাহাদের হাড়ে হাড়ে বিঁধে। তাই ভদ্রলোকেরা যখন মার খায়, ঐ তথাকথিত ছোটলোকগুলি তখন ভগবানকে ধন্যবাদ দেয়।

একবার কোনও একটী সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়ীতে পূজার অনিয়ম হওয়ায় পরিবারের স্ত্রী-পুরুষ সকলের মধ্যে একটা আতঙ্কের সঞ্চার হয়। সকলের মনে ভয় হয় যে এ বৎসর তাহাদের সর্ব্বনাশ হইবে। একটী 'ছোটলোক' কথাচ্ছলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আহা, তা কি হবে? ভগবান কি আছেন? আমাদের কান্না কি তিনি শুনেছেন? এরা ধ্বংস হ'লে আমরা বাঁচি।" কথাটা আবেগের মুখে বে-ফাঁস বাহির হইয়া যাইবার পরেই সে ভয়ে ত্রস্ত হইয়া আমার পায়ে ধরিয়া অনুরোধ করিল, আমি যেন কাহারও নিকট এ কথা প্রকাশ না করি।

এইখানেই হিন্দুসমাজ শক্তিহীন। সাঁওতালদিগের উপর বেশী জুলুম চলে না। তাহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে কাজ করিয়া স্বগ্রামে চলিয়া যায়। মুসলমান কৃষকদের বেলাও তাই। তাহারা স্ব স্ব গ্রামে স্বাধীন। আমাদের হিন্দুগ্রামে আমাদের স্বধর্ম্মী ও স্বগ্রামবাসীগণের মনে সাহস নাই। বাবুদের সামনে তাহারা মুখ খুলিয়া কথা বলিতে সাহস পায় না। বাড়ীতে কোনও বাবুকে অযাচিত ভাবে উপস্থিত হইতে দেখিলে, অসময়ে বেগার খাটিতে হইবে মনে করিয়া সে হয় ধানের ডোলে লুকাইয়া থাকে, না হয় মুখ বাঁকা করিয়া, পেটে হাত দিয়া কঠিন রোগের ভান করিতে থাকে।

সমবায় প্রতিষ্ঠানের দ্বারা আর্থিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিবার জন্য আমরা একটি হিন্দুগ্রামে গমন করি। কিন্তু আমাদের সে চেষ্টা বড় সহজে সফল হইবে না; কারণ, সর্ব্ববিধ সমবায় প্রতিষ্ঠানের মূল হইতেছে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও সহানুভূতি; কিন্তু সেখানে তাহার বড়ই অভাব।

মুসলমান পল্লীতে যে প্রাণ ও ঐক্য দেখিতে পাই, হিন্দুপল্লীতে তাহার অত্যন্ত অভাব বলিয়া তথায় সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা অধিকতর কষ্টকর ব্যাপার। সমাজ সংস্কারের দ্বারাই হিন্দুসমাজে প্রাণ সঞ্চার করিতে হইবে। বর্ত্তমানে সর্ব্বপ্রধান কাজ—অস্পৃশ্যতা দূর করা। যাহারা ছুঁৎমার্গ মানিয়া চলিবে, পল্লীসেবায় তাহাদের অধিকার নাই। বঙ্গের সেবক সম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের একান্ত অনুরোধ, তাঁহারা যেন প্রকাশ্যে এই ছুঁৎমার্গের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া অন্ত্যজ জাতির জল গ্রহণ করেন। বাঙ্গালার বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের বাণী স্মরণ করিয়া আমরা যেন এই পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করি। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, "অস্পৃশ্যতা দূর না করা পর্য্যন্ত স্বরাজ-পতাকা স্পর্শ করিবার অধিকার আমাদের নাই।" হিন্দুপল্লীর জটিল সমস্যার সহিত যতই পরিচিত হইতেছি, ততই আমরা তাঁহার এই পবিত্র বাণীর গুরুত্ব উপলব্ধি করিতেছি। (সংহতি)

যখের দেশ

শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

যেখানেই যথেষ্ট ধনের পরিচয় পাওয়া যায়, লোকে সেই ধনের উল্লেখ করিয়া সাধারণতঃ বলিয়া থাকে যেন 'যখের ধন'। এবং যিনি তাহার মালিক তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলে "যেন যক্ষী"। পরিমিত অর্থ বা ধন সম্বন্ধে 'যখের ধন' এ কথাটা বড় কেহ ব্যবহার করে না—ব্যবহার করে যেখানকার ধন সম্পদ অপরিমিত—তাহারই সম্বন্ধে।

কিন্তু তবুও একটু কিন্তু থাকিয়াই গেল। যেখানে সেখানে প্রচুর ধনরাশি থাকলেই তাহাকে যখের ধন বলিয়া অভিহিত করা হয় না। টাকশালে প্রচুর অর্থ আছে। তাই বলিয়া টাকশাল যক্ষাগার নহে। বিজয়ী বিধর্ম্মী বীর যখন তাঁহার অপ্রমেয় শক্তি ক্ষয় করিয়া সোমনাথের প্রাচীন মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, তখন তথায় হিন্দুর সেই পাষাণ মূর্ত্তিমাত্র দেখিয়া যে হৃদয় তাঁহার ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়াছিল তাহা নহে। বরং তাঁহার ঈপ্সিত ধনরাশির পরিবর্ত্তে শুধু সেই পাষাণ মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার সেই ভয়াবহ যুদ্ধের সার্থকতা কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে না পারিয়া একেবারে জ্বলিয়া উঠিয়াছিলেন। ধর্ম্ম-বিদ্বেষ অপেক্ষা সম্ভবতঃ তাঁহার ক্রোধই হিন্দুদের মূর্ত্তিগুলিকে চূর্ণ করিয়াছিল। অপরিমেয় শক্তির পায়বর্ত্তে সে পাষাণ মূর্ত্তি মধ্যে ও পদতলে যে ধন লাভ করিয়াছিলেন তাহা শুধু অপ্রমেয় নহে—অকথিত। যুদ্ধ জয় করিয়া নহে—বিজয়ী সেনানীর বিজয়োল্লাস এই ধন লাভের পরেই আকাশ কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল।

কিন্তু এই যে অপরিমেয় ধনরাশি, ইহাকে কি যখের ধন বলা যায়? —না। একস্থানে যথেষ্ট ধন থাকিলেই তাহাকে যখের ধন বলা যায় না। সে ধনরাশি কাহারও উদ্দেশে প্রচ্ছন্ন থাকা আবশ্যক।

মিশরের প্রাচীন নগরী থিবিসের মৃত্তিকাভ্যন্তরে লর্ড কর্ণারভান্ সেদিন তুতেনখামেনের যে প্রাসাদসমাধি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার অতুল ঐশ্বর্য্যকে বরং যখের ধন বলা যাইতে পারে। মৃত্যুর পরও একটা জীবন আছে এবং সেই জীবনের ব্যবহারোপযোগী যাবতীয় দ্রব্যাদি পূর্ণ প্রাসাদ মধ্যে দেশাচার মতে তুতেনখামেনের মৃতদেহ সমাহিত হয়। সুতরাং সে সমস্তই তুতেনখামেনের প্রেতাত্মার। এ কথার আলোচনাও অনেক হইয়া গিয়াছে। এই আবিষ্কারে সমগ্র জগত চমকিত; কিন্তু এতদপেক্ষাও অনেক অধিক ধন,—শুধু অনেক অধিক নহে, যাহা আবিষ্কৃত হইলে কার্ণারভানের এই আবিষ্কার একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িবে—আজও অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে। সে ধন রত্ন আবিষ্কৃত হয় নাই বটে, কিন্তু তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও কোনই সন্দেহ নাই। তাহা লোক-চক্ষুর অন্তরালে থাকিলেও লোকে তাহাকে দৃষ্টির অভ্যন্তরে আনিতে সদা সচেষ্ট। তাহা যখের ধন ত বটেই, কিন্তু যখের ধন বলিলেই তাহার পূর্ণ পরিচয় হয় না—তাহাকে 'যখের দেশের যখের ধন' এ আখ্যা স্বচ্ছন্দেই দেওয়া যায়। সে দেশটি দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত পেরু। পেরু দেশ, সোণা-রূপাদি মূল্যবান ধাতব পদার্থে পূর্ণ।

সোণা-রূপার চলন যে শুধু আর্য্য সভ্যতার সহিতই জড়িত, তাহা নহে। আর্য্যগণের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী অনার্য্যগণও ইহাদের ব্যবহার ও নিষ্কাশনের সহিত সম্যক্ পরিচিত। রাবণের হৈমলঙ্কা তাহার প্রমাণ। সে হৈমলঙ্কার যে বিবরণ রামায়ণে পাওয়া যায়, তাহা অপূর্ব্ব। স্বর্ণ-শিল্পীর শিল্প-নৈপুণ্যের কলা-কুশলতার বিচিত্র চিত্র। খনি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদির সহিত বর্ত্তমান লেখকের অধিক কার-কারবার। বর্ত্তমান প্রবন্ধে হস্তক্ষেপও সেই খনি-গন্ধাধিক্য হেতু। সিংভূম ও সম্বলপুরের পাহাড় ও জঙ্গলে কিরূপ নিপুণতার সহিত আর্য্য-সভ্যতার আলোক অপ্রাপ্ত আদিম সাঁওতাল ও কোলগণ ঢাঁকনি ও পাতার রস-সাহায্যে স্বর্ণ নিষ্কাশন করে, তাহা অনেক বৈজ্ঞানিকেরও বিস্ময়ের বিষয়। কিন্তু মনে হয়, এ বিষয়ে পেরুর আদিম অধিবাসীরা সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল।

পেরুর বাহিরে পৃথিবী ছিল কি না, তাহা জানা পেরুবাসীদের পক্ষে যেরূপ অনাবশ্যক, জগতের সোণার বাজার সম্বন্ধে সংবাদাদি রাখাও তাহাদের পক্ষে তদ্রূপ ছিল। কাজেই তাহারা শুধু আবশ্যকমত স্বর্ণ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিত, প্রাসাদ ও মন্দিরাদি সুবর্ণ কারুকার্য্যে খচিত করিত, কেবলমাত্র তাহাদের দর্শন-শোভা বৃদ্ধি করিবার জন্য। কারিগরের হাতে পড়িয়া সেই সব সোণা-রূপা নানা আকার প্রকারে ঝক্-ঝক্ তক্-তক্ করিত। রবির কিরণ-সম্পাতে শত সহস্র আভা চারিদিকে প্রতিফলিত হইয়া সমগ্র স্থানটীতে একটা দীপ্তির লেখা ফুটাইয়া তুলিত—ব্যস্ ঐ পর্য্যন্ত। তাহার পর যখন স্পেনবাসীরা দলে-দলে তাহাদের দেশে আসিতে লাগিল এবং তাহাদের দেশের সেই কাঁচা হলুদের বর্ণ বিশিষ্ট ধাতব পদার্থের উপর নজর দিতে লাগিল, তখন তাহারা বিস্মিত হইল, ভাবিল উহারাও বোধ হয় তাহাদেরই মত গৃহ-প্রাঙ্গণ ও মন্দিরাদি সজ্জিত করিতে চাহে। কিন্তু অজ্ঞতা কাটিয়া গিয়া যখন তাহারা স্পেনবাসীদের আগ্রহাতিশয্যের কারণ সম্যক বুঝিতে পারিল, যখন বুঝিল তাহাদের দেশের ঐ ধাতব পদার্থ কি মহামূল্য, জগতে তাহার স্থান কোথায়। তখন তাহারা চকিত, স্তম্ভিত, নির্ব্বাক হইয়া পড়িল।

পেরুর রাজাগণের উপাধি 'ইঙ্কা'। ইঙ্কারা এক একজন কুবের বা যক্ষ। পেরুর নানাস্থানে ইঙ্কাগণের প্রাসাদ বিদ্যমান ছিল। ঐ সকল প্রাসাদের দেওয়াল সাধারণতঃ স্বর্ণ-রৌপ্য-মণ্ডিত হইত এবং প্রাসাদ চূড়া স্বর্ণ ও রৌপ্যের কারুকার্য্যে খচিত হইত। স্নানাগারে স্বর্ণনল দ্বারা জল আসিয়া চৌবাচ্চায় পড়িত। সে চৌবাচ্চা আবার সুবর্ণ ও রৌপ্য-মণ্ডিত। ইঙ্কা তাহাতে অবগাহন করিতেন। মোগল সম্রাটগণের স্নানাগারের কথা অনেক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার নানারূপ সাজ-সরঞ্জামের বিবরণে সাধারণতঃ আমরা চমৎকৃত হই। কিন্তু ইঙ্কাগণের স্নানাগার যে তদপেক্ষাও অধিক আড়ম্বরময় ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইঙ্কাদের বসিবার আসনও সেই অনুপাতেই

নির্ম্মিত হইত। একখানি প্রকাণ্ড পুরু সম-চতুষ্কোণ সুবর্ণ টালির উপর এইখানি সু-উচ্চ সুনিপুণ শিল্প-শোভা-সমন্বিত টুলের স্থায় আকৃতি বিশিষ্ট আসন স্থাপিত হইত। ইঙ্কা তাহাতেই উপবেশন করিতেন। প্রাসাদে ব্যবহারোপযোগী যাবতীয় তৈজস-পত্র সুবর্ণ ও রৌপ্যনির্ম্মিত হইত। তাহা না হইলে ইঙ্কাগণ তাহা স্পর্শ করিবেন কিরূপে? স্বর্ণ-রৌপ্যের মোটামুটি দ্রব্যাদি সাধারণ লোকের গৃহেও থাকিত।

ইঙ্কাদের প্রত্যেক বিভিন্ন প্রাসাদে এইরূপ আসবাব পত্র থাকিত। কারণ, তাহা না হইলে এক প্রাসাদ হইতে অন্য প্রাসাদে গমন করিতে হইলে এ সকল বহন করিয়া লইয়া যাওয়া আবশ্যক, তাহাতে অসুবিধা অনেক। ইঙ্কাগণের মৃত্যু হইলে তাঁহারা যে সকল দ্রব্য ব্যবহার করিতেন তৎসমুদায় তাঁহাদের মৃতদেহের সহিত সমাহিত হইত—যাহাতে প্রেতরূপেও তাঁহারা কোনরূপ অসুবিধা ভোগ না করেন। নূতন ইঙ্কা পুনরায় নূতন দ্রব্যাদি প্রস্তুত করাইয়া লইতেন।

ইঙ্কাগণের ধন-সম্পত্তি সম্বন্ধে নানারূপ কিম্বদন্তী এখনও প্রচলিত। শুনা যায়, কোন ইঙ্কা না কি তাঁহার পুত্রের জন্মোপলক্ষে এত বড় একটী স্বর্ণ-শৃঙ্খল প্রস্তুত করাইয়াছিলেন যে, তাহাতে যে পরিমাণ স্বর্ণ আবশ্যক তত স্বর্ণ বিশেষজ্ঞগণের মতে হঠাৎ কোন এক দেশে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। স্পেনবাসিগণের দৌরাত্ম্য যখন ক্রমশঃই অধিক হইয়া উঠিল, তখন পেরুবাসীরাও চতুর হইতে লাগিল। এবং যখনই তাহারা তাহাদের ধন-সম্পত্তি স্পেনীয় তস্করবর্গের হাতে পড়িবার সম্ভাবনা বুঝিত, তখনই তাহা পর্ব্বতের গুহায় বা হ্রদের গভীর প্রদেশে নিক্ষেপ করিত। প্রবাদ সেই সুদীর্ঘ বিস্ময়কর সুবর্ণ-শৃঙ্খলও নাকি এইরূপে আর্কাস হ্রদের গভীর জলে নিরুদ্দিষ্ট ভাবে লুক্কায়িত রহিয়াছে। পেরুর উত্তরে ইকোয়েডর, কলম্বিয়া ও কষ্টারিকা। এই সকল দেশেও মৃতদেহের সহিত তাহাদের ব্যবহার্য্য স্বর্ণ-রৌপ্যের দ্রব্যাদি সমাহিত হইত। সে সকল অনেক সময় এখন মৃত্তিকা খনন কালে পাওয়া যায়। পেরু ও এই সকল দেশের এক শ্রেণীর লোকের পেশা কেবল পুরাতন গোরস্থান খুঁজিয়া বাহির করা এবং ধনলাভের আশায় তাহা খনন করা। কোন কোন ক্ষেত্রে কেহ কেহ কিছু কিছু প্রাপ্ত হইলেও অপর্য্যাপ্ত ধন-প্রাপ্তির মত কিছু কেহ পাইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। তবে লোকের সাধারণতঃ বিশ্বাস যে ইঙ্কাগণের সমাধি খুঁজিয়া বাহির করা সহজসাধ্য নহে। কিন্তু যদি কেহ কোনরূপে তাহা বাহির করে তাহা হইলে অপর্য্যাপ্ত ধন-রাশির মালিক সে অনায়াসেই হইতে পারিবে। অনেক সময় এই সকল পেশাদার খননকারীগণের এ কার্য্যে আয় অপেক্ষা ব্যয়ই অধিক হইয়া পড়ে। তথাপি অকস্মাৎ ইঙ্কা-ধন-প্রাপ্তির আশায় তাহারা এ কাজ ছাড়িতে না পারিয়া ক্রমশঃই সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া বসে।*

পেরু দেশে অতি প্রাচীন কালে চিমু নামে এক রাজ্য ছিল। সে রাজ্য এখন আর নাই, তাহার সামান্য সামান্য ধ্বংসাবশেষ মাত্র অধুনা বিদ্যমান। সেই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দ্বাদশ প্রকার বিভিন্ন স্বর্ণ দ্রব্য পাওয়া যায়। সেগুলি নিউইয়র্কের যাদুঘরে রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে তিনটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম—একটী জলপাত্র, দ্বিতীয় একটী বক্ষস্ত্রাণ, তৃতীয় একটী শিরোভূষণ। এই শিরোভূষণ যাদুঘরে আরও আছে এবং পূর্ব্বেও সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের কোনটাই আলোচ্যটীর ন্যায় এত বৃহৎ নহে। এই শিরোভূষণ কয়েকটি পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটীর আয়তন সুবৃহৎ—দৈর্ঘে ১৭½ ইঞ্চি ও প্রস্থে ৫½ ইঞ্চি। সুতরাং ইহা যে কত বড় শিরোভূষণ তাহা সহজেই অনুমেয়। একখানি বক্ষস্ত্রাণের উপর বোধহয় সুদৃশ্য করিবার জন্য আবার পর পর হাল্কা ও গাঢ় পীতবর্ণের পটী। তাহাতে দ্রব্যটীকে বাস্তবিকই সুদৃশ্য করা হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু বিশেষজ্ঞগণের হস্তে পড়িলে কোন জিনিষই অল্পে নিস্তার পায় না। এটী যখন বিভিন্ন প্রকার ধাতব পদার্থে সুশোভিত তখন তো আর কথাই নাই। সুতরাং পরীক্ষা আরম্ভ হইল ও দেখা গেল যে গাঢ় পীত অংশে শতকরা ৮০ ভাগ স্বর্ণ, ১৩ ভাগ রৌপ্য ও ৭ ভাগ তাম্র বর্ত্তমান এবং হাল্কা বর্ণের অংশে শতকরা ৪৭ ভাগ স্বর্ণ, ৪৪ ভাগ রৌপ্য ও ৮½ ভাগ তাম্র বর্ত্তমান। এরূপ সংমিশ্রণ হেতু দ্রব্যটীর দৃঢ়তা সাধারণ খাঁটি সোণা অপেক্ষা অনেক গুণে অধিক হইয়াছে। অন্যান্য দ্রব্যাদির বিশ্লেষণ ফল মোটামুটী, সোণা শতকরা ৬০ ভাগ, রৌপ্য ২০।৩০ ভাগ ও তাম্র ৬।২০ ভাগ। এগুলির প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে অনুমিত হয় যে, উত্তপ্ত তরল স্বর্ণ ছাঁচে ঢালিয়া তৎপর হাতুড়ী ও খোদাই কল সাহায্যে ঈপ্সিত আকৃতিতে আনয়ন করা হইত এবং কোন দুই অংশকে একত্রে জুড়িবার প্রয়োজন হইলে অন্য কোন প্রকার কঠিন ধাতুর সাহায্যে প্রস্তুত "ঝাল" ব্যবহৃত হইত। †

আমাদের এদেশে মহানদী ও ইব নদীর তীরে আদিম অধিবাসীগণ যেরূপে স্বর্ণ সংগ্রহ করে পেরুতেও তেমনি সমুদ্রগামিনী নদী-সৈকতে তদ্দেশবাসীরাও স্বর্ণ সংগ্রহ করিত বা এখনও করে। আমাদের দেশ অপেক্ষা তাহাদের দেশে ঐ সকল স্থানে স্বর্ণের পরিমাণ অধিক। রবির কিরণ-লেখায় বালুকা রাশির মধ্যে স্বর্ণকণা ঝলকিত হইয়া পেরুবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত এবং সাধারণ পেরুবাসীরা এই উপায়েই সাধারণতঃ স্বর্ণ সংগ্রহ করিত।

স্বর্ণ-রৌপ্যাদির সহিত পেরুবাসীরা যতই সংস্পর্শে আসিতে লাগিল ততই তাহারা এ সকলের নিষ্কাশন সম্বন্ধে নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। স্পেনবাসিগণ যখন তাহাদের দেশে আগমন করে তখন পেরুবাসীরা অনেক উন্নত প্রণালীতে ধাতুনিষ্কাশনে মনোনিবেশ করিয়াছে। আমাদের দেশের প্রাচীন কালের 'লোহার'গণের স্থায় তখন তাহারা খনিজ ধাতুর পাহাড়ের সানুদেশে তদানীন্তন 'ব্লাষ্ট'

* Mr. Hamilton Bell's "Golden age of Peru" in "Natural History" published by the "American museum of Natural History in New York."

† Mr. Pliny E. Goddard's "Peruvian Gold of the Chimu kingdom" in the "Natural History" published by the American Museum of Natural History in New York.

ফার্নেস্' বসাইয়া ধাতুনিষ্কাশন করিতেছে। সাধারণতঃ দুই প্রকার নিষ্কাশন প্রণালীর তাহারা সাহায্য লইত। প্রথম ধাতু প্রস্তর (যে সকল প্রস্তরে ধাতুর যথেষ্ট সমাবেশ রহিয়াছে) গুলিকে একস্থানে সংগ্রহ করিয়া হাপরে নিক্ষেপ করিত। তৎপর কয়েকজন মিলিয়া তামার নল সাহায্যে অগ্নির অভ্যন্তর ভাগে ফুঁ দিয়া যথাবশ্যক উত্তাপ প্রয়োগে প্রস্তরগুলিকে গলাইয়া তাহা হইতে ধাতু সংগ্রহ করিত। এ প্রণালী যে কোন স্থানেই অবলম্বিত হইত। কিন্তু দ্বিতীয় প্রথা কেবলমাত্র পর্ব্বতের সানুদেশেই অনুষ্ঠিত হইত। এ ক্ষেত্রে উনানগুলি এরূপভাবে বসান হইত যাহাতে তাহাদের উন্মুক্ত বায়ুপথে প্রচুর পরিমাণে পাহাড়ের জোর হাওয়া প্রবেশ করিয়া তাহাই ব্লাষ্টের (blast) কাজ করিতে পারিত। পেরুবাসীরা সে যুগে খনিজ স্বর্ণ, খনিজ রৌপ্য ও খনিজ তাম্রের সন্ধান ও তাহা হইতে ঐ সকল ধাতু সংগ্রহ করিত।

কিন্তু তাহাদের দেশের প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই সব ধন রত্নের পরিণাম কি? বিজিতের ধন বিজয়ীগণ কর্ত্তৃক যাহা হইয়া থাকে কতক তাহাই, কতক বা কালের কবলে ধ্বংস প্রাপ্ত গৃহ বা নগরের মৃত্তিকাভ্যন্তরে এবং কতক বা বিজয়ী দস্যুর হস্তে না দিয়া অধিকারীবর্গ কর্ত্তৃক এরূপভাবে লুক্কায়িত, যাহাতে তাহা একেবারে লোক-চক্ষুর অন্তরালে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

ইঙ্কাগণের প্রাচীন রাজধানী কাজকো নগর প্রান্তবর্ত্তী সাকসাহুয়ামান নামক দুর্গের ধ্বংস স্তূপের নিম্নদেশে নাকি অপরিমেয় স্বর্ণ দ্রব্যাদি গচ্ছিত রহিয়াছে। একটী পাহাড়ের উপর ঐ দুর্গ বিদ্যমান ছিল। এখন সেখানে একটী প্রকাণ্ড গহ্বর দেখিতে পাওয়া যায়। প্রচলিত প্রবাদ এই যে, ঐ গুহা দ্বারা অনেকগুলি পাতাল পথে পৌঁছান যায়। সেই সব পথ প্রায় অর্দ্ধমাইল নিয়ে পাতালপুরে ইঙ্কাগণের বিভিন্ন প্রাসাদে ও তাঁহাদের সূর্য্যমন্দিরে গিয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পেরুর একজন আদিম অধিবাসী সেই গুহার মধ্যে প্রবেশ করে। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস যে, সেই গুহা পথে কেহ প্রবেশ করিলে আর বাহিরে আসিতে পারে না। গুহামধ্যে অন্ধকারময় অসংখ্য পথের গোলকধাঁধায় দিশাহারা হইয়া প্রাণ হারায়। কিন্তু ৪দিন পরে হঠাৎ অনাহারে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় ও শরীরের নানাস্থানে ক্ষত বিক্ষত হইয়া সেই লোকটী একখানি সুবর্ণ গোলক হস্তে লইয়া সহরের এক গির্জ্জার সম্মুখে উপস্থিত হয়। পাতালাভ্যন্তরে লুপ্ত নগরীর প্রাসাদ, ঐশ্বর্য্য ও স্বর্ণাভরণ সম্বন্ধে বিড় বিড় করিয়া নানারূপ বকিতে বকিতে সে তাহার স্বর্ণগোলক গির্জ্জার বেদীর উপর স্থাপনানন্তর উপাসনার জন্য হেঁট হইবার সঙ্গে সঙ্গে ধরাশায়ী হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এই সংবাদ রাষ্ট্র হইবার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই গুপ্ত ধনের অধিকারী হইবার আশায় গুহামুখে ছুটিয়া চলিল এবং সাতজন তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। ইহাদের কেহই অদ্যাবধি ফিরিয়া আসে নাই এবং তাহারা নিঃসন্দেহ সেই পাতালপুরীর গোলক-ধাঁধায় পথ হারাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ইহার পর হইতে সরকারের আদেশে আর কেহ সে গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া গুপ্ত ধনের অধিকারী হইতে চেষ্টা করে নাই। কিন্তু তত্রত্য অধিবাসীগণের দৃঢ় বিশ্বাস যে, অগাধ ঐশ্বর্য্য ঐ স্থানে লুক্কায়িত রহিয়াছে এবং হয় ত কোন সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি কোন দিন তাহার একছত্র অধীশ্বর হইয়া জগতের বিস্ময়-দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

কলম্বিয়াতে গেটেভিটা নামক একটী হ্রদ আছে। আদিম অধিবাসীদিগের চক্ষে উহা পবিত্র। প্রবাদ, উহার অসীম সলিলরাশির মধ্যে পর্ব্বত প্রমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য বিদ্যমান। ঐ সকল ঐশ্বর্য্য নাকি যাহাতে বিজয়ী স্পেনবাসীগণের হস্তে না পড়ে এজন্য তদানীন্তন অধিবাসীগণ ঐ হ্রদ মধ্যে নিক্ষেপ করে। যে সকল স্থানে জল কম তথা হইতে অনেক সময় নানারূপ দ্রব্যাদি পাওয়াও গিয়াছে। এ কারণে কতকটা নিঃসন্দেহ হইয়া স্পেনীয়গণ কয়েকবার হ্রদের জলরাশি বাষ্প সাহায্যে নিষ্কাশিত করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু প্রতিবারেই অকৃতকার্য্য হয়। হ্রদ মধ্যে প্রচুর সলিলোদ্গারী অসংখ্য ঝরণা আছে। বড় বড় পাম্প লাগাইয়া যত জল নিষ্কাশিত করা যাইতে পারে, তদপেক্ষা অনেক অধিক জল ঐ সকল ঝরণা হইতে বাহির হইয়া পুনরায় হ্রদ পূর্ণ করে। কাজেই জল ছেঁচিয়া ফেলা দুঃসাধ্য বোধে তাহারা সে উদ্যম একেবারে ত্যাগ করিয়াছে।

ঐ হ্রদ মধ্যে এইরূপ অসম্ভাবিত ঐশ্বর্য্যের সমাগমের একটা কারণও পাওয়া যায়। শেষ ইঙ্কা আটাহুয়ালপা স্পেনীয় আক্রমণকারীবর্গের সেনাপতি পিজারোর হস্তে বন্দী হইলে ইঙ্কা তাঁহার স্বাধীনতার বিনিময়ে পিজারোকে প্রচুর স্বর্ণ ও রৌপ্য উপঢৌকন দানের অঙ্গীকার করেন। তাহার পরিমাপ এইরূপ স্থিরীকৃত হয় যে, যে ঘরে ইঙ্কা বন্দী অবস্থায় যাপন করিতেছিলেন, সেই ঘর স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা পূর্ণ হইবে এবং তাহাদের উচ্চতা এরূপ হইবে যে, পিজারোর সৈন্য মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘকায় ব্যক্তি যেন উত্তোলিত হস্তে তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা কোন রকমে তাহা স্পর্শ করিতে পারে। নানারূপ যানে বোঝাই হইয়া ঐ সকল স্বর্ণ ও রৌপ্য পিজারোর নিকট প্রেরিত হইল। কিন্তু পথিমধ্যে রক্ষীবর্গ যখন জানিতে পারিল যে পিজারোর আদেশ মত ইঙ্কাকে হত্যা করা হইয়াছে, তখনই তাহারা সেই সমস্ত ঐশ্বর্য্য যে যেখানে পারিল লুকাইয়া ফেলিল। তাহারই এক অংশ গেটেভিটা হ্রদ মধ্যে বিদ্যমান। বাকী অন্যান্য হ্রদমধ্যে ও নানাস্থানে পর্ব্বত গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়। *

যে দেশে এত অধিক এবং এত অসংখ্য প্রকার ঐশ্বর্য্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও লুক্কায়িত এবং যাহা যক্ষ বা প্রহরী বেষ্টিত না থাকিলেও এরূপ ভাবে অবস্থিত তাহাকে "যখের দেশ" না বলিয়া আর কি বলা যাইতে পারে? (বাঁশরী)

* The adventures of a Trophical Tramp by Mr. Harry L. Foster.

ইঙ্গিত

শ্রীবিশ্বকর্ম্মা

দরজীর খড়ি

এই কলিকাতা সহরে হাটে বাজারে এবং পথের ধারে এক শ্রেণীর লোক নানান রকম জিনিসের দোকান খুলিয়া বসে। সে দোকানগুলিকে ঠিক মনোহারী দোকান বলা চলে না; অথচ, অনেক রকম জিনিস তাহাদের কাছে পাওয়া যায়। দোকান দেওয়া ছাড়া তাহারা আর একটা কাজ করে; নিম্নশ্রেণীর পশ্চিমা স্ত্রীলোকদের রূপা ও কাঁসার গহনা তাহারা রঙ্গীন সূতা ও ঝুম্‌কো দিয়া গাঁথিয়া দেয়। এই শ্রেণীর লোকদের বোধ হয় পাটোয়ার বলে। আমি এই পাটোয়ারদের দোকান হইতে একটা জিনিস কিনিয়া আনিয়াছি। জিনিসটির নাম দরজীর খড়ি। ইহার এক একখানির দাম চার পয়সা সবুজ (ঠিক সবুজ নয়, বরং ফিকে নীল বলা চলে) রংয়ের জিনিসটি; ইহার ওজন চার পয়সা ও এক আনি। (প্রায় এক আউন্স) ত্রিকোণ (গোল ভাবযুক্ত) আকারের জিনিসটি মাপে এক কোণ হইতে তাহার বিপরীত পার্শ্ব পর্য্যন্ত প্রায় আড়াই ইঞ্চি। এই রকম চারখানি কি পাঁচখানি খড়ি উপরি-উপরি রাখিলে এক ইঞ্চি হইতে পারে।

জিনিসটি একটা ভদ্রলোকের হাতে দেখিয়া প্রথমে আমার কৌতূহল হয়। আমি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া, কাগজে ও কাপড়ে ঘষিয়া অনুমান করিলাম, ইহা দর্জিদের ব্যবহার্য্য খড়ির মত কোন জিনিস হইতে পারে। পরে জানিলাম, বস্তুতঃ উহা খড়িই, এবং পাটোয়ারদের দোকানে দর্জিদের খড়ি নামে উহা বিক্রীত হয়। তার পর ভাঙিয়া দেখিলাম। এক কোণ একটা দেশলাইয়ের কাটি জালিয়া পোড়াইয়া দেখিলাম। অবশেষে হাতের তালুতে একটু জল রাখিয়া সেই জলে জিনিসটি ঘষিয়া দেখিলাম, ইহা জলে গলিয়া যায়। সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হইল, জিনিসটিতে খড়ির গুঁড়া একটুখানি নীল রং ও সামান্য একটু গঁদ আছে। এই জিনিস কয়টি প্রবল চাপে জমাট বাঁধাইয়া খড়ি তৈয়ার হইয়াছে।

জিনিসটি যদি বাস্তবিক খড়িই হয় (এবং আমার এই আনুমানিক সিদ্ধান্ত খুব সম্ভব ভুল হইবে না), তাহা হইলে ইহার লাভ লোকসান খতাইয়া দেখিলে মন্দ হয় না। বেণের দোকানে খড়ির খুচরা দর প্রতি সের চার পয়সা। পাইকারী দর আরও কম। দরজীর খড়ি এক একখানির ওজন চার পয়সা ও একটা এক আনি। অর্থাৎ প্রায় সওয়া দুই ভরি বা এক আউন্স। তাহা হইলে ফেলিয়া ছড়াইয়াও প্রতি সেরে ঐরূপ খড়ি ৩০।৩২ খানি হওয়া সম্ভব। ইহাতে যেটুকু রং ও গঁদ লাগিয়াছে, তাহা ধরিয়া প্রত্যেকখানি খড়ির পড়তা সিকি পয়সা ধরিলে অন্যায় হয় না। তার উপর মজুরী ও নির্ম্মাতার লভ্যাংশ আরও সিকি পয়সা ধরিলে যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়। কিন্তু খরিদদার উহার জন্য আরও সাড়ে তিন পয়সা অর্থাৎ সাতগুণ বেশী দাম দিতে বাধ্য হইতেছে। তাহার কারণ, উহা বিলাতী জিনিস (Made in England), সাহেবেরা উহা তৈয়ার করিয়াছে; জাহাজে চড়িয়া উহা এ দেশে আসিয়াছে, পাঁচ হাত ঘুরিয়াছে, অনেকে উহার ভিতর হইতে লাভ খাইয়াছে; তার পর উহা খরিদদারের হাতে আসিয়াছে। বিশেষতঃ, ঐ জিনিসটি এখানে তৈয়ার হয় না, এবং দেখিতেও সুন্দর; আর বোধ হয় দর্জিদের পক্ষে বেশ ব্যবহারোপযোগীও বটে। আপনারা দেখিতেছেন, কত সামান্য জিনিসের জন্য নিরুপায় আমরা কত বেশী পয়সা খরচ করিতে বাধ্য হইতেছি। অথচ, এই পয়সা আমাদের দেশেও থাকিতেছে না। উহার প্রায় সবটাই বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। এইরূপ সহস্র সহস্র তুচ্ছ জিনিস অগ্নিমূল্যে আমাদিগকে কিনিতে হইতেছে; আমাদের

দেশও সেইজন্য দিন দিন দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। এই খড়িটি যদি দর্জিদের যথার্থই কাজে লাগে, তবে ইহা এখানে তৈয়ার করিয়া লইলেই ত হয়। কেহ ইহা তৈয়ার করিবার চেষ্টা করিবেন কি ?

বাজারে অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, এ রকম হাজার হাজার তুচ্ছ জিনিস পাইবেন, যাহা না হইলে আমাদের দিন চলে না, অথচ যাহা এখানে তৈয়ার করাও তেমন কঠিন নয়,—একটু চেষ্টা করিলেই আমরা তাহা নিজেরাই তৈয়ার করিয়া লইতে পারি। এই রকম এক একটা জিনিস সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ভাবিয়া দেখুন, কেমন করিয়া, কি প্রণালীতে, কোন্ কোন্ উপাদানে সেই জিনিসটি তৈয়ার হওয়া সম্ভব। জিনিসটিকে ভাঙ্গিয়া, ছিঁড়িয়া, গুঁড়াইয়া, নানা রকমে পরীক্ষা করিয়া দেখুন, রাসায়নিক ভাবে বিশ্লেষণ করাইয়া উহাদের উপাদানের সন্ধান লইবার চেষ্টা করুন, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত প্রণালীর কথাও ভাবিয়া দেখুন, যদি কোন উপায় বাহির করিতে পারেন। এ চেষ্টা, এ ভাবনা, এ পরীক্ষা একেবারে নিষ্ফল হইবে না ; একটা না একটা লাগিয়া যাইবেই। একশোটা নিষ্ফল পরীক্ষার পর অন্ততঃ পাঁচটাতে কৃতকার্য্য হইবেনই। এরূপ চিন্তাশীলতা ও পরীক্ষার ফলে, আর কিছু না হউক, অন্ততঃ আপনার জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে, উদ্ভাবনী শক্তির উন্মেষ ঘটিবে। পরের জিনিসটিকে আয়ত্ত করিতে না পারেন, আপনি নিজেই একটা না একটা উপায় উদ্ভাবন করিয়া লইতে পারিবেন।

চাবি

বাক্স, তোরঙ্গ, সিন্দুকের কল, তালার চাবি হারাইয়া গেলে আপনারা যাহাদের কাছে নূতন চাবি তৈয়ার করাইয়া লন, সে চাবি মেরামতের কাজটা কিরূপে নির্ব্বাহ হয়, তাহা একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন কি ? চাবিওয়ালা আপনার তালা বা কলটি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া তাহার অসংখ্য চাবির ভিতর হইতে একটা বা দুইটা চাবি বাছিয়া বাহির করিয়া লয়, এবং লেভারের সংখ্যা ও মাপ আন্দাজ করিয়া তাহার প্রয়োজনানুসারে চাবিটা মাজিয়া ঘষিয়া খাঁজ কাটিয়া কল তালার উপযোগী চাবিটী তৈয়ার করিয়া দেয়। তাহারা যে সকল চাবি ব্যবহার করে, তাহা খুব সম্ভব বিদেশ হইতে আমদানী ; এখানে কোথাও চাবি তৈয়ার হয় কি না, জানি না। অবশ্য তালা ও কল তৈয়ার করিবার জন্য ভারতবর্ষে কয়েকটা কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা আপনারা জানেন, এবং সেখানে যে সব কল বা তালা তৈয়ার হয়, তদুপযোগী চাবিও তৈয়ার হয়, তাহাও জানা কথা। কিন্তু, কেবল কল তালা মেরামত করিবার জন্য শুধু চাবি প্রস্তুত করিবার কোন বন্দোবস্ত এ পর্য্যন্ত এখানে হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই।

চাবি দুই ধরণের হইয়া থাকে। এক, তালা বা কল তৈয়ার করিবার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক তাহাদের উপযোগী চাবি তৈয়ার করা হয় ; আর, মেরামতের জন্য শুধু চাবিও তৈয়ার হইয়া থাকে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর চাবিতে খাঁজ কাটা থাকে না। প্লেন চাবি তৈয়ার হয়। চাবিওয়ালারা যে কল বা তালা মেরামত করিবার জন্য পায়, প্লেন চাবিতে খাঁজ কাটিয়া দিয়া তাহার উপযোগী চাবি তৈয়ার করিয়া দেয়। তবে যে চাবিওয়ালাদের কাছে খাঁজওয়ালা চাবি পাওয়া যায়, সে পুরাতন কল বা তালার হারানো চাবি। এই সকল চাবি নানা উপায়ে সংগৃহীত হইয়া তাহাদের হস্তগত হয়। নচেৎ, মেরামতের জন্য কারখানায় প্লেন চাবিই (অবশ্য নানা আকারের ও মাপের) তৈয়ার হইয়া থাকে। আমি এই শ্রেণীর প্লেন চাবি তৈয়ার করিবার চেষ্টা করিতে আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি।

এইরূপ চাবি তৈয়ার করিবার কারখানা স্থাপন করিবার পূর্ব্বে, যে সকল তালা চাবির কারখানা আছে, তাহাদের কোনটিতে কিছু দিন শিক্ষানবীশী করিলে ভাল হয়। আপনার কেবল প্লেন চাবি তৈয়ার করিবার উদ্দেশ্য জানিতে পারিলে, কারখানাওয়ালারা বোধ হয় আপনাকে শিক্ষানবীশ রূপে গ্রহণ করিতে আপত্তি করিবেন না ; কারণ, ইহাতে আপনার সঙ্গে তাঁহাদের প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হইবার কোন আশঙ্কা থাকিবে না।

বোধ হয় একটী ছোটখাট ঢালাইয়ের কারখানা করিলেই চাবি তৈয়ার করা যাইতে পারিবে। লোহা ঢালাইয়ের অনেক কারখানাই এ দেশে রহিয়াছে ; তাহাতে অনেক বড় বড় জিনিস ঢালাই হইয়া থাকে। সুতরাং চাবির ন্যায় ছোটখাট জিনিস ঢালাই করিবার কারখানা স্থাপন

করিতে বোধ হয়] খুব বেগ পাইতে হইবে না। বলা বাহুল্য, এই কারখানার ক্রমোন্নতি হইয়া, 'পরে ইহা খুব বৃহৎ ব্যাপারে পরিণত হইতে পারে।

চাবি-তালার কথার আর একটী কথা মনে পড়িতেছে। আজকাল জার্ম্মানীতে ও আমেরিকাতে দিন দিন নূতন ধরণের কল, তালা ও চাবি তৈয়ার হইতেছে। এই সকল চাবিতালা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্ম্মিত এবং প্রায়ই স্প্রিং যুক্ত। জার্ম্মাণ তালাগুলি কিছু সূক্ষ্মতর বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এই শ্রেণীর তালা তেমন মজবুত হয় বলিয়া মনে হয় না। সে যাহা হউক, সস্তা ও দেখিতে সুদৃশ্য বলিয়া বাজারে ইহাদের আদর খুব। আমাদের দেশে এখনও সেই পুরাতন ধরণের তালা চাবিই তৈয়ার হইতেছে। আমার মনে হয়, সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখিবার জন্য আমাদিগকেও বৈজ্ঞানিক ধরণের তালা চাবি তৈয়ার করিতে হইবে

সেলুলয়েড

যাঁহারা শিল্প-চর্চ্চা করিতেছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই এই জিনিসটির নাম শুনিয়া থাকিবেন। বাজারে বিক্রয়ের জন্য সেলুলয়েড এখানে তৈয়ারী হইতে আরম্ভ হইয়াছে কি না, সে খবর এখনও পাই নাই। একবার এ দেশে সেলুলয়েড তৈয়ারী করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছিলাম। একটী ছোট কারখানা গড়িয়া সেলুলয়েডের চিরুণী নাকি তৈয়ার হইতেছে বলিয়াও খবর পাওয়া গিয়াছিল। তার পর কতদূর কি হইল, তাহা শুনি নাই। কারখানা কিম্বা চিরুণী দেখা ভাগ্যে ঘটে নাই। সেলুলয়েড তৈয়ার করিতে আমি আপনাদের পরামর্শ দিই না। কারণ, উহা তৈয়ার করিতে হইলে উচ্চাঙ্গের ফলিত রসায়ন অধ্যয়ন করিয়া কোন বিদেশী কারখানায় কিছু দিন হাতে হেতেরে কাজ না করিলে ইহা প্রস্তুত করা চলে না। আর, সেলুলয়েড স্বয়ং তাদৃশ বিপজ্জনক না হইলেও, কারখানায় যে প্রণালীতে উহা প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা তাদৃশ নিরাপদ নহে। খুব সাবধান না হইলে, এবং রীতিমত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন না করিলে, হঠাৎ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইয়া বিপদ ঘটিতে পারে। তা ছাড়া, ছোটখাট কারখানা তৈয়ার করিয়া সেলুলয়েড প্রস্তুত করিয়া লাভ নাই। প্রথমেই জাপান, ইয়োরোপ প্রভৃতির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইবে, খরচা পোষাইবে না। প্রচুর মূলধনে বড় কারখানা করিয়া জাপান ইয়োরোপে সুশিক্ষিত উচ্চশিক্ষিত অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের সাহায্যে সেলুলয়েড প্রস্তুত করা চলিতে পারে। এখন সেলুলয়েড জিনিসটা কি এবং তাহার ব্যবহার মোটামুটি জানিয়া রাখুন। আমাদের দেশে সেলুলয়েডের সমস্ত উপকরণই আছে; বড় কারখানা বেশ খোলা চলিতে পারে। এদেশে যথেষ্ট পরিমাণে সেলুলয়েড প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইলে, তাহা হইতে অনেক জিনিস তৈয়ার হইতে পারিবে। সেলুলয়েড হইতে নকল হাতীর দাঁতের মত সকল জিনিস তৈয়ার করা যায়। ছুরি, ক্ষুর, ছাতা প্রভৃতির বাঁট, ছড়ি, চিরুণী, বিবিধ খেলানা সেলুলয়েড হইতে প্রস্তুত হইতে পারে। জাপানী সেলুলয়েডের খেলানায় বাঙ্গালার বাজার ছাইয়া গিয়াছে, দেখিতে পাইতেছেন কি ?

সেলুলয়েড জিনিসটি কি ?

সেলুলয়েড জিনিসটি সেলুলোজ নামক পদার্থ হইতে উৎপন্ন। উহার রাসায়নিক গঠন C6 H10 O15; অর্থাৎ সেলুলোজ বিশ্লেষণ করিলে ৬ ভাগ কার্ব্বণ, ১০ ভাগ হাইড্রোজেন ও ৫ ভাগ অক্সিজেন পাওয়া যায়। সেলুলোজ উদ্ভিজ্জ পদার্থ; উদ্ভিদের একটী প্রধান উপাদান সেলুলোজ (cellulose); যেমন তুলা। ইহা প্রায় বিশুদ্ধ cellulose, কেবল সামান্য পরিমাণে ধাতব পদার্থ ইহাতে আছে। Linen, hemp, কাগজ প্রভৃতিও সেলুলোজ। এই সব জিনিস আগুনে পোড়াইলে যে ছাই অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ধাতব পদার্থ, তাহা পোড়ে না; আর সেলুলোজটুকু পুড়িয়া উড়িয়া যায়। সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ সেলুলোজ দরকার হইলে তুলা প্রভৃতিকে hydrofluoric acidএ পোড়াইয়া লইতে হয়। তাহা হইলে ধাতব পদার্থগুলি পুড়িয়া যায়, আর বিশুদ্ধ সেলুলোজ বাকী থাকে।

Cotton wool (পেঁজা, বীজশূন্য তুলা) তিন ভাগ fuming nitric acid ও এক ভাগ তীব্র গন্ধক দ্রাবকের (strong sulphuric acid) মিশ্রণে ২৪ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিলে, তুলার একটা রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হয়। এই তুলা ধুইয়া ধুইয়া এসিডশূন্য করিলে এবং শুষ্ক করিয়া লইলে gun cotton নামক অতীব তীব্র দাহ্য পদার্থে পরিণত

হয়। এই gun cotton এর সহিত কর্পূর মিশাইয়া এবং আরও কোন কোন জিনিস যোগ করিয়া celluloid বা xylonite তৈয়ার হয়। এই জিনিসটির আমাদের বড় দরকার।

সেলুলয়েডের গুণাগুণ

সেলুলয়েডের বর্ণ নাই বলিলেই চলে। পাতলা সেলুলয়েড কাচের মত স্বচ্ছ। নমনীয়; মচকায় তবু ভাঙ্গে না। ইহা সহজে না ভাঙ্গা গেলেও, কাঁচি দিয়া কাগজের মত বেশ সহজে কাটা যায়। খাঁটি সেলুলয়েড কি না তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে, উহার উপর আঙ্গুল দিয়া ঘষিলে কর্পূরের গন্ধ বাহির হয়। অল্প তাপ (১২৫) দিলে ইহা নরম হইয়া যায়; তখন ইহার দ্বারা ছাঁচে নানা জিনিস গড়া যায়, কিম্বা যে কোন আকারে পরিণত করা যায়। বেশী তাপে ইহার অধিকাংশ বায়বীয় আকার ধারণ করে। গরম জলে দিয়া নরম করিয়া লইলেও ইহার দ্বারা নানা আকারের অনেক জিনিস গড়া যায়। আগুনের তাপে নরম করা অপেক্ষা গরম জলে নরম করাই সুবিধা; কেন না, সেলুলয়েড জলে গলিয়া যায় না, ইহার একটুও লোকসান হয় না, অথচ সব রকম আকারের জিনিসই ইহার দ্বারা তৈয়ার করা যাইতে পারে। অগ্নিশিখার উপর সেলুলয়েড ধরিলে উহা জলিতে থাকে, খুব ধোঁয়া হয় ও কর্পূরের গন্ধ বাহির হয়। সেলুলয়েড গান্‌-কটন হইতে তৈয়ার হয় বটে, গান্‌-কটন খুব বিস্ফোরক পদার্থ বটে, কর্পূরও খুব দাহ্য পদার্থ বটে, কিন্তু সেলুলয়েড নিজে বিস্ফোরক নয়; কেবল আগুনের শিখায় ধরিলেই উহা জলিতে পারে; আপনা আপনি জলিয়া উঠিবার ভয় নাই। বেশী তাপ দিলে উহার উপাদানগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া ধোঁয়া হইয়া যায়। সেলুলয়েড জলে গলিয়া যায় না, কিন্তু ঘনীভূত গন্ধক দ্রাবক, ঘনীভূত নাইট্রিক এসিডে,ও ফুটন্ত কষ্টিক পটাশে দ্রব হয়। Acetone, Sulphuric ether alcohol, তারপিন তৈল, benzine, amyl acetate প্রভৃতিও সেলুলয়েডকে গলাইতে পারে।

এই সেলুলয়েডের প্রসঙ্গে এখানে একটা অবান্তর কথা কহিতে হইতেছে। জাপান হইতে আমদানী সেলুলয়েডের খেলানায় এ দেশের বাজার ছাইয়া গিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সে খেলানাগুলি দেখিতে এত সুন্দর যে ছেলেরা একবার তাহা দেখিলে না কিনিয়া কিছুতেই ছাড়িবে না। এই শিল্পটির সম্বন্ধে জাপান বোধ হয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী; কারণ, এই ধরণের পুতুল ও খেলানা জাপান হইতে ইয়োরোপ, আমেরিকাতেও রপ্তানী হয়। সেজন্য সেখানকার শিল্পীরা ও ব্যবসায়ীরা চটিয়া লাল হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছিলাম। কারণ, জাপানী সেলুলয়েডের (শুধু সেলুলয়েড কেন, অন্যান্য জিনিসেরও পুতুল ও খেলানার সম্বন্ধে জাপান খুব উন্নতিলাভ করিয়াছেন; সেই সব-রকম খেলানাই জাপান হইতে ইয়োরোপ ও আমেরিকায় রপ্তানী হয়; সেখানে তাহাদের আদর ও কাট্‌তি খুব।) পুতুল ও খেলানা অত্যন্ত সুন্দর বলিয়া ছেলে-মেয়েরা মুগ্ধ হয়; কাজেই দেশীয় খেলানা বেশী বিক্রী হয় না।

জাপান যে এই শিল্পে বিলক্ষণ উন্নতি করিতে পারিয়াছে, তাহার কারণ, ইহার উপকরণগুলি জাপানেই পাওয়া যায়। বিশেষতঃ কর্পূর ত জাপানের নিজস্ব জিনিস বলিলেই হয়। আমি পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি, প্রত্যেক দেশেই সেই দেশজাত কাঁচামালই প্রধানতঃ সেই দেশের শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত হয়, এবং সেই সেই দেশীয় শিল্পকে বিশেষত্ব প্রদান করে। জাপানে বনজঙ্গলের অভাব নাই; সেলুলোজ সেখানে প্রচুর। আর কর্পূর জাপানের নিজস্ব—আমাদের বাঙ্গালা দেশের যেমন পাট, জাপানের কর্পূরও তেমনি;—কাজেই স্বদেশজাত কাঁচা মালের সুবিধা পাইয়া জাপান এই শিল্পে এতাদৃশ উন্নতি করিতে পারিয়াছে।

এই প্রবন্ধের স্থানান্তরে আমি বলিয়াছি যে, সেলুলয়েডের কারখানা গড়িবার পক্ষে আমাদের দেশেও বিলক্ষণ সুবিধা আছে। আপনারা বলিবেন, কর্পূর আমাদের দেশের জিনিস নয়, আমরা কিরূপে সেলুলয়েডের কারখানা গড়িব? সেলুলয়েডের প্রস্তুত-প্রণালী ও গুণাবলীর আরও একটু পরিচয় লইলে আপনারা তাহার উত্তর পাইবেন।

সেলুলয়েডের অন্যান্য উপকরণ

সেলুলয়েড কেবল জাপান নয়, অন্যান্য দেশেও প্রস্তুত হয়। যে দেশে কর্পূর উৎপন্ন হয় না, সে দেশেও সেলুলয়েড তৈয়ার হয়। কেমন করিয়া হয়? না, কর্পূরের বদলে অন্য জিনিস ব্যবহার করিয়া। ফ্রান্স দেশে কর্পূর বাদ দিয়া ন্যাপ্‌থলিন যোগ করিয়া নাইট্রো-সেলুলোজ

হইতে সেলুলয়েড প্রস্তুত হয়। এই প্রস্তুত-প্রণালী অবশ্য ফরাসীরা গোপনে রাখিয়াছেন। তবে যতদূর জানিতে পারা যায়, ১০০০ ভাগ নাইট্রোসেলুলোজ, ৬০০ ভাগ এলকোহল, ৩০০ ভাগ এসেটোন ও ১০০ ভাগ ন্যাপথালিনের মিশ্রণে ফরাসী সেলুলয়েড তৈয়ার হয়। কর্পূর খুব দামী জিনিস; ন্যাপথালিনের দাম কর্পূরের অপেক্ষা অনেক কম। ফরাসী প্রথায় সেলুলয়েড প্রস্তুত করিতে পড়তা অনেক কম পড়ে। তবে ইহাতে ন্যাপথালিনের দুর্গন্ধ কিছু থাকিয়া যায়। সেলুলয়েড তৈয়ার হইয়া গেলে কিছু দিন তাহা হাওয়ায় রাখিয়া দিলে, উদ্বায়ী ন্যাপথালিনের গন্ধ অনেকটা উড়িয়া যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, কর্পূর যুক্ত সেলুলয়েড অপেক্ষা ন্যাপথালিন যুক্ত সেলুলয়েড গুণে কিছু নিরেস। তথাপি, ইহাতে কাজ বেশ চলে। এই সকল মশলা ছাড়া অন্য মশলা দ্বারাও সেলুলয়েড প্রস্তুত হইতে পারে।

এখন দেখুন, বড় আকারের সেলুলয়েডের কারখানা খুলিতে পারা যায় কি না। সেলুলোজ অর্থাৎ তুলা আমাদের দেশের স্বভাবজাত জিনিস। এলকোহলের কারখানাও এদেশে আছে। বাঙ্গলায় কয়লার খনি আছে; সেই কয়লা হইতে আলকাতরা, এবং আলকাতরা চুয়াইয়া ন্যাপথালিন প্রস্তুত হইতে পারে। তবে কেন এখানে সেলুলয়েডের কারখানা হইতে পারিবে না? এখন, আপনারা যদি একটী লিমিটেড কোম্পানী গড়িয়া বড় রকমের একটী সেলুলয়েডের কারখানা স্থাপন করিতে পারেন, এবং উপযুক্ত লোকের সাহায্যে সস্তায় যথেষ্ট পরিমাণে সেলুলয়েড তৈয়ার করাইতে পারেন, তাহা হইলে সেই সেলুলয়েড হইতে নানাবিধ নূতন নূতন শিল্পের সৃষ্টি হইতে পারে। বড় কারখানায় সেলুলয়েড তৈয়ার হইলে, সেই সেলুলয়েডের সাহায্যে গৃহশিল্পের হিসাবে অনেক ছোট ছোট কারখানা চলিতে পারিবে, বহু বেকার লোকের তাহাতে অন্ন সংস্থানের উপায় হইবে।

সেলুলয়েড সম্বন্ধে অন্যান্য কথা

সেলুলয়েডের নিজের কোন বর্ণ নাই, উহা জলের মত বর্ণহীন। কিন্তু ইহাতে নানা রকম রং মিশাইয়া ইহাকে রঞ্জিত করিতে পারা যায়। কাগজের মত ইহাতে হরপ, ছবি প্রভৃতি ছাপা যায়। সেলুলয়েড প্রায় কাগজের মত পাতলা অবস্থায় পাওয়া যায়। দুই চারিখানি এই রকম পাতলা সেলুলয়েড ঈষৎ গরম করিয়া উপরি উপরি রাখিয়া প্রবল চাপ দিলে উহা জুড়িয়া গিয়া কঠিন পুরু দৃঢ় পাতে প্রস্তুত হয়। সুদক্ষ শিল্পীর হাতে পড়িলে সেলুলয়েড সৌখিন শিল্পে যুগান্তর ঘটাইতে পারে।

মৈত্রেয়ী

শ্রীরাধারাণী দত্ত

যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্।
—উপনিষৎ।

বানপ্রস্থ লিপ্সু স্বামী পত্নীদ্বয়ে তাঁর
আহ্বানি দিলেন বিত্ত বিভাগ করিয়া,
গো, গৃহ পাত্র বা শস্য ধন-রত্ন ভার;
হে মৈত্রেয়ি! তুমি দেবি লহনি বরিয়া।
জ্ঞানের আধার স্বামী ঋষিকুলরাজ,
অমরত্ব-জ্ঞান যাঁর ভারত-বিদিত,
যোগ্যা পত্নী তাঁর তুমি, তাই পেলে লাজ
লইতে নশ্বর বিত্ত;—হয়ে ক্ষুব্ধ চিত
বলেছিলে দীপ্ত তেজে ঋষি-পতি পাশ,
"অমরত্ব যাহে নাই সেই বিত্ত লয়ে,
কি করিব আমি? স্বামি! করহ প্রকাশ
সেই বিত্ত, যাহা রবে চির নিত্য হয়ে।"
কোন্ দেশে কোন্ নারী কহ পতি কাছে,
হেন অভিনব বিত্ত কবে প্রার্থিয়াছে!

ভারতবর্ষের প্রচলিত ভাষা

শ্রীরামানুজ কর

ভারতবর্ষের পরিমাণফল ১৮০৫৩০২ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ৩১৮১৭২৪৮০। ২৫৭টী ভাষা ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। ইহার মধ্যে ভারতীয় ভাষা ২২৮, এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশের ভাষা ১১ এবং ইয়োরোপীয় ভাষা ১৮। কোন্ ভাষায় কত লোক কথা কয়, তাহা নীচের তালিকায় দেওয়া হইল।

ভাষা	লোকসংখ্যা
হিন্দি-উর্দ্দু	৯৬৭১৪৩৬৯
বাঙ্গালা	৪৯২৯৪০৯৯
তেলগু	২৩৬০১৪৯২
মারাঠি	১৮৭৯৭৮৩১
তামিল	১৮৭৭৯৫৭৩
পাঞ্জাবী	১৬২৩৩৫৭৭
রাজস্থানী	১২৬৮০৫৬২
ক্যানারীজ	১০৩৭৪২০৪
উড়িয়া	১০১৪৩১৬৫
গুজরাটী	৯৫৫১৯৯২
বার্মিজ	৮৪২৩২৫৬
মালয়ালম	৭৪৯৭৬৩৮
পশ্চিম পাঞ্জাবী	৫৬৫২২৬৪
খেরয়ারী	৩৫০৩২১৫
সিন্ধি	৩৩৭১৭০৪
ভিল্লী	১৮৫৫৬১৭
আসামী	১৭২৭৩২৮
পশ্চিম পাহাড়ী	১৬৩৩৯১৫
গন্দ	১১১৬৯১১
পস্তু	১৪১৬২৬৭
পূর্ব্ব হিন্দী	১৩৯৯৫২৮
কাশ্মীরী	১২৬২৯৫৯
উরাঁও	৮৬৬০৬৬
তুলু	৫৯২৩২৫
বেলুচী	৪৮৫৪০৮
কন্দ	৪৮৩৬৬৮
শাঙ্গালী	৪৭৪৮৭৮
শ	৩৬৮২৮২
পো	৩৫২৪৬৬
মণিপুরী	৩৪২৭৪৫
শান	৩২৬৫৭৫
ইংরাজি	৩০৮০৭১
আরাকানী	৩০৪৫৪৯
নেপালী	২৭৯৯৭৮
বদো	২৭১৬১২
ইয়াম্বী	২৫০৬১৮
ভুটীয়া	২৩১৮৮৫
গারো	২১৬১১৭
খান্দেশী	২১৩২৭২
টাং খু	২১০৫৩৫
খাসি	২০৪১০৩
পেওয়ান	১৮৯২৬৩
ব্রাহুণী	১৮৪০৬৮
সন্তার	১৬৮৪৪১
মং	১৬০৭২০
কাচীন	১৫০৮৯৬
খেড়িয়া	১৩৭৪৭৬
টাভয়ান	১৩১৭৪৮
চীনা	১২৭৫২৭
কুর্কু	১২০৮৯৩
পালং	১১৭৭৭৩
চীন	১১০৭৮২
মিকির	১০৯১২৩
কারু	৯৮৭২৩
লুসাই	৭৭১৮০
	৭২৯২৫
মাল	৬২৯৬৪
চং	৬৫২৮৯
রামলিংদার	৫৬৩৪২
ইহা	৫৫০০৭
নাগা	৪৩০৫০
আবাহী	৪২৭২৯
কুর্গী	৩৯৯৯৫
মুমী	৩৮৫১২
শেমানাগা	৩৪৮৮৩
কারেমী	৩৪৪৮৮
আখা	৩৪২৬৫

জাংশীন	৩৩২৫৮
থুন	৩২১০
গদাবা	৩৩০৬৬
আওনাগা	৩০১৪২
শিনা	২৮৪৮২
থনী	২৭৩ ৬
লু	২৬১০৮
কুঁকী	২৫০৫২
টাং খুল নাগা	২৪১৭০
কুলাই	২৩১৮১
শান টায়ক	২৩৪৭৩
লাহ	২২৭৪২
লাই	২২৬৬৮
রভা	২২৫৯৫
অশ্রেণীভুক্ত নাগা	২২৪৪১
টীঙ্গীয়ো	২২৩৩২
পার্শীয়ান	২২১৯১
মুলতানী	২২০৯৮
পোক্তী	২১৯ ৯
মারু	২০৫৭৭
লেপ্‌চা	২০৫৬৯
মগাই	২০৫৩৬
কাছু	১৮৫৯৪
লাটানাগা	১৮৪১২
শাগুই	১৮০৭৪
লাশী	১৬৫৭০
কোচ	১৬১৬৫
কালুলনাগা	১৫৬৪৭
জিপশী	১৪৯৩১
ম্রো	১৪৩২৪
পাদং	১৩৭৪৩
ওয়া	১৩৬৪৮
আবোমিনি	১৩৩১৭
লিস্তু	১৩১৫২
মোপিওয়া নাগা	১৩০৯৬
রিসঙ্ক	১২৮৫৮
কারুংবী	১১১৬০
দিনাশা	১১১৪০
বুই	১০৬২৭
জুখাং	১০৫৩১
পৈচী	১০৪৬০
লালুং	১০৩৮৩
নেওয়াই	১০১৩৪
ইপু	১০০৪৫

যে সকল ভাষাভাষীর সংখ্যা ৫ হাজার হইতে দশ হাজারের মধ্যে, সেরূপ ভাষার সংখ্যা ২৫। ৫ হাজারের কম লোক যে সকল ভাষায় কথা কয়, সেরূপ লোকের সংখ্যা ভারতীয় ১২০৮৭০, এশিয়াটীক ১৩৩৮৩, ইয়োরোপীয়। ১১০৪১ বাংলাদেশে ১৭৭৫৮৯৮ জন হিন্দি ভাষায়, ২৯৩৭০০ জন উড়িয়া ভাষায় কথা বলে। ব্রহ্মদেশ ৩০১০৩৯, বিহার ও উড়িষ্যায় ১৫৬৮১৩৮, আসামে ৩৫২৫২২০, বিহার উড়িষ্যা করদ রাজ্যে ৮৮৮৫২ জন বাংলা ভাষায় কথা বলে।

আকাঙ্ক্ষা

কুমারী দাস

লয়ে সুবর্ণের সল্‌মা চুম্‌কি
　　বসাব অনেক যত্নে,
নিবিড় আঁধার ঘুচাতে প্রস্থূণে
　　স্থাপিব বহুল-রত্নে।
দূরিয়া তমসা ভরিয়া বসুধা
　　ছড়াবে আলোক-দীপ্তি,
অলস মদির আবেশে কাটিবে,
　　পলাবে সুদূরে সুপ্তি।
দূর হয়ে যাবে যত ব্যাধি জরা
　　মহেশ-আশীষ বরে,
শান্তি বিরাম লভিবে হৃদয়
　　দান-ডালা ধরি করে।
নীলাচল তুলি চাঁদোয়া গড়িব
　　স্নেহ-সমীরণ সনে,
শ্যাম তৃণাসনে বসা'য়ে তুষিব
　　শ্রান্তকে জীবন দানে।
চারু চন্দ্রাননে তৃপ্ত-প্রীত-হাস,
　　পদ্ম আঁখে কৃতজ্ঞতা,
নেহারিব যবে তাহাদের মাঝে,
　　পাব সুখ, গরবতা।
কোন মাতা দেখে ভাবিবে না তার
　　জীবন সফল হ'ল
শত সন্তানে শীতাংশু-উজল
　　সুদীপ্ত ভানুতে বলো!
হবে কি ভবেশ! সেদিন কখনো
　　ঘরে ঘরে হেন মাতা,
পূ'রিবে কি মোর বাসনার ডালি
　　তব কৃপা-ফুলে পিতা!

স্বপ্ন

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

(৪)

চাঁদনীগঞ্জের প্রান্তে মুস্তাফা মিঞার সরাইখানা দিল্লীর সবাই জানে। মুস্তাফার হাতের কাবাব ও তাহার সুন্দর ছুঁড়ি সহরের মধ্যে প্রসিদ্ধ। দিল্লীতে কোন বিদেশী আসিলে, এই অপরিচিত স্থানে এই সরাইখানায় নির্ভয়ে গিয়া উঠে। মুস্তাফা শুধু সরাইরক্ষক নয়, গুণ্ডাদলের সর্দ্দার বলিয়াও তাহার এক খ্যাতি আছে; তাহার আশ্রয়ে আসিয়া উঠিলে কোন ভয় নাই। শুধু ভাল খাইবার ও থাকিবার ব্যবস্থার জন্য নয়, সরাইখানার সহিত এক মদের দোকান এবং নাচ ও গানের সুন্দর ঘর থাকাতে, মুস্তাফার দোকান দিল্লীর সবাইয়ের প্রিয়।

এই সরাইখানার দোতোলার একটি ছোট ঘরে একটি তরুণ বাঙ্গালী যুবক কয়েক দিন হইল দিল্লীতে আসিয়া জ্বরে পড়িয়া আছে। এই মহা দিল্লী নগরীতে পৃথিবী ও ভারতের নানা সুদূর দেশ হইতে নানা জাতির লোক অর্থ ও মানের সন্ধানে, আপন ভাগ্য পরীক্ষার জন্য লুব্ধ হইয়া আসে। শুধু এসিয়ার নয়, ইয়োরোপের নানা দেশ হইতে কত বণিক, কত সৈনিক, কত গৃহহারা দুর্ভাগা এই এই স্বর্ণভূমি ভারতের স্বর্ণলঙ্কায় কত সৌভাগ্যের স্বপ্নজাল বুনিয়া আসিতেছে। এ বাঙ্গালী যুবক তাহাদের মত অর্থ বা শক্তির মোহে মুগ্ধ হইয়া আসে নাই;—এ পথিক, ভারত ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া পড়িয়াছে। কাশ্মীর ফটক দিয়া ঢুকিতেই, তাহাকে বিদেশী বুঝিয়া, মুস্তাফার একটি চর তাহার সহিত আলাপ করিয়া, মুস্তাফার সরাইখানায় লইয়া আসিয়াছিল। হিন্দু হইলেও মুসলমানের বাড়ীতে থাকিতে তাহার কোন আপত্তি হইল না। শুধু মুস্তাফার সহাস্য অভ্যর্থনা, বিনীত ব্যবহারে ও রান্নাঘর হইতে সুমিষ্ট গন্ধে মুগ্ধ হইয়া নয়, লৌকিক আচার ও ধর্ম্মতত্ত্বের ওপর তাহার কোন বিশ্বাস ছিল না বলিয়াই সে মুসলমানের সরাইখানায় আসিয়া উঠিল। তাহার সাজসজ্জাও অনেকটা মুসলমানী ছিল।

বয়স তাহার চব্বিশের বেশী নয়; কিন্তু এই বয়সেই তাহার জীবনের সুখস্বপ্ন টুটিয়া গিয়াছে। ভোগের পাত্র ভরিয়া সে জীবনের সুখসুধা নিঃশেষে পান করিয়াছে। এখন বৈশাখের খররবি-দীপ্ত মধ্যাহ্ন-আকাশের মত তৃষ্ণার জ্বালা জাগিয়া রহিয়াছে, ভাদ্রের ভরানদীর মত তৃপ্তি নাই। মদ, নারী ও সঙ্গীত, এই তাহার জীবনের তিনটী ক্ষুধা; এই তিন জ্বালাময় পথে সে তাহার অপরিমিত ঐশ্বর্য্য, অসীম যৌবন-শক্তি ও সুন্দর রূপ উজাড় করিয়া দিয়াছে। প্রথম যৌবনের ফাল্গুনে ভোগের বসন্ত-উৎসবে দেউলিয়া হইয়া, শুধু শুষ্কনদীর তৃষ্ণা ও ঝরাপাতার দীর্ঘশ্বাস বক্ষে বহন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

জ্বরের ঘোরে মনের এমন একটা অবস্থা আসে, যখন মন উর্ণনাভের মত আপন উন্মত্ত কল্পনার তন্তুজালে অসংলগ্ন, অদ্ভুত, বিচিত্র, রঙীন জগৎ সৃষ্টি করে। তখন সেই স্বপ্নের জগৎকে সত্য ও সত্যের জগৎকে স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। রাজশেখর জ্বরের ঘোরে চক্ষু বুজিয়া, আপন মনের বাসনার রঙীন জগতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সে দেখিতেছিল,—বসন্তের রঙীন পুষ্পবন, চারিদিকে সুন্দরী অপ্সরীর দল, কেহ নাচিতেছে, কেহ পুষ্প-দোলায় দুলিতেছে, কেহ কত রকম বাদ্যযন্ত্র বাজাইতেছে। কিন্তু সে যে সুন্দরীকে ধরিতে যায়, সে মোহিনী মরীচিকার মত দূরে সরিয়া কোথায় মিলাইয়া যায়। অনেক ঘুরিয়া শ্রান্ত হইয়া সে একটী তরুণীকে ধরিল। সরাবের রংএর ওড়না ধরিয়া, তারার মত তাহার চোখের দিকে চাহিয়া, অধরের কাছে অধর লইয়া গেল। অমনি সে শূন্যে কোথায় হারাইয়া গেল। চিরতৃষিত ওষ্ঠ-প্রান্তে আসিয়া মদের পেয়ালা টুটিয়া খান খান হইয়া গেল,—শুধু ব্যঙ্গ আর জ্বালা! ওঃ, বলিয়া ছটফট করিয়া উঠিয়া রাজশেখর চোখ মেলিয়া শূন্য ঘরের দিকে মাতালের মত চাহিল। সন্ধ্যার আলো মুমূর্ষু পাখীর চোখের মত জানালা দিয়া [illegible] দিকে চাহিয়া

আছে, ঘরের কোণে অন্ধকারে খাটিয়াটা একটা জন্তুর কঙ্কালের মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া। এই খাটিয়ায় সে প্রথম রাত্রি আসিয়া শুইয়াছিল। কিন্তু ভয়ানক ছারপোকা থাকায় টান মারিয়া ফেলিয়া মেজেতে শুইয়াছে। উঃ, তৃষ্ণায় বুক জ্বলিয়া যাইতেছে। রাজশেখর ক্ষুব্ধ স্বরে ডাকিল—কে? কোন হ্যায়? ভৃত্য ইস্মাইল ধীরে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার দিকে ঘোলা চোখে চাহিয়া রাজশেখর বলিল—মদ, মদ লেয়াও, উঃ! ইস্মাইল জানাইল, তাহাকে মদ দিতে বারণ আছে। বারণ! শেখর ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। ইস্মাইল তাহাকে জলের পাত্র দিলে সে সেটি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল,—জল নয়, মদ চাই। ইস্মাইল জানাইল, তাহা অসম্ভব। মুস্তাফা মিঞা তাহাকে মদ দিতে সবাইকে বিশেষ করিয়া মানা করিয়া দিয়াছেন। এ মুস্তাফা মিঞার সরাইখানায় যে আসে, তিনি তার অভিভাবক বলিয়া আপনাকে মনে করেন—তাহার কোন ক্ষতি করিতে দেবেন না। ক্রুদ্ধ স্বরে শেখর বলিল—ভাগো! কিন্তু ইস্মাইল ঘর হইতে বাহির হইতে, আবার তাহার ডাক পড়িল। ইস্মাইল আবার আসিলে, শেখর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, পাশের ঘরে অলিভার সাহেব আছে কি না। যদি থাকে, তাহার কাছে ভাল মদ আছে। এই অলিভার একটি ফরাসী জেনারেল,—সাহসী, সুন্দর, সুপুরুষ। ভারতের অবস্থার কথা শুনিয়া ধনরত্নের আশায় স্বদেশ ছাড়িয়া আসিয়াছে। ইস্মাইল জানাইল, অলিভার সাহেব ঘরে নাই; দোকানে একটি বাইজী বিক্রি হইতেছে, তাহাই দেখিতে গিয়াছে। জাহান্নামে যাও, বলিয়া শেখর ইস্মাইলকে ঘর হইতে তাড়াইয়া দিল। সন্ধ্যার আলো শুকনো ফুলের মত কালো হইয়া আসিতেছে। শেখরের মন বড় উদাস হইয়া গেল। এই অজানা বিদেশে একা আত্মীয়-বন্ধুহীন, রোগ-শয্যায় শুইয়া আছে। কেহ স্নেহ করিবার, কেহ সেবা করিবার নাই। কেবল এ জন্য নহে,—তাহার মনে হইল, পৃথিবী একটা ছায়াবাজী, এ জীবন একটা দুঃস্বপ্ন, মদ ও নারী লইয়া সে দুঃখ ভুলিতে, আপনাকে ভোলাইতে চাহিয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হইল। হায়, একটুকু প্রেম, একটুকু শান্তি সে কোথায় পাইবে? তাহার দেহ জ্বলিতেছে, মন জ্বলিতেছে। তাহার মা নাই, বাবা নাই, ভাই নাই, বোন নাই, আত্মীয় বন্ধু কেহ নাই। উল্কার মত সে আপন কামনার আগুনে জ্বলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে,—এ যাত্রা শেষ হোক।

টলিতে টলিতে শেখর বিছানা হইতে উঠিয়া জানালায় ঠেস দিয়া দাঁড়াইল। রান্নাঘর হইতে মাংস রান্নার সুমিষ্ট গন্ধ, পোলাওর গন্ধ আসিতেছে। নাচগানের ঘর হইতে হাসির ধ্বনি, গানের সুর, সারঙ্গের ঝঙ্কার আসিতেছে, কি একটা ফুলের তীব্র গন্ধ মাঝে মাঝে বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। পথে লোকেরা উন্মত্তের মত অট্টহাস্য করিতে করিতে কোথায় ছুটিয়া চলিয়াছে। এই হাস্য-গীত-মুখর পুষ্প-গন্ধময় ছায়াবাজীর জগৎ তাহার কাছে বড় শূন্য, বড় করুণ বোধ হইল। ধীরে সে আবার শয্যায় আসিয়া শুইল।

সহসা মধুর নূপুর-ঝঙ্কারে সে চমকিয়া উঠিল, আবার বিছানা ছাড়িয়া পথের দিকে জানালায় গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, পথের ওধারে যে পাণ, জর্দা ও আতরের দোকানে আছে, তাহার ভিতরে নাচ হইতেছে। এক সুন্দরী ইরাণী তরুণী নাচিতেছে, আর বহু লোকে তাহাকে ঘিরিয়া লুব্ধ দৃষ্টিতে দেখিতেছে। বিদ্যুল্লতার মত তরুণী নাচিতেছে, তাহার লাল ঘাঘরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া দুলিতেছে, গোলাপী ওড়নার কাঁচগুলি বৃহৎ ঝাড় লণ্ঠনের আলোয় ঝলমল করিতেছে। কিছুক্ষণের জন্য জ্বরের বেদনা, জীবনের ব্যর্থতা ভুলিয়া শেখর নৃত্য দেখিতে লাগিল। নটীর নূপুর-ঝঙ্কার তাহার মাথার শিরায় যেন দপদপ করিয়া বাজিতে লাগিল। নটীর পাশে এক দীর্ঘাকৃতি পাঠান দাঁড়াইয়া নানাপ্রকার হাবভাব দেখাইবার জন্য তাহাকে ইসারা করিতেছিল। তাহার রোষ-দীপ্ত নয়নের কটাক্ষে নটী মাঝে মাঝে ভীত করুণ মুখ হাসির ছটায় উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা করিতেছিল। ওই পাঠান তাহাকে পারস্য হইতে কিনিয়া দিল্লীতে বিক্রি করিতে আনিয়াছে। ক্ষুধিত হিংস্র ব্যাঘ্রের মত তাহাকে ঘেরিয়া মোগল আমীর ওমরাহ,মনসবদার, বেণিয়া, মহাজন, রাজপুত যুবক, বড় লোকের দালাল, এমন কি এক ফরাসী সেনাপতি, কতজন আসিয়া জুটিয়াছে।

নাচ থামিল, শেখরের বুকের জ্বালা আবার যেন ফিরিয়া আসিল। তাহার মনে হইল, অন্তরের সেতারের আর একটা তার আবার ছিঁড়িয়া গেল। একেবারে সব তার ছিঁড়িয়া চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হইয়া যায় না!

ওদিকে ইরাণী নটীর দরদস্তর চলিতেছে। কেহ তাহার হাত টানিয়া, কেহ তাহার মুখ তুলিয়া, কেহ তাহার চুল মেলিয়া দেখিতেছে। মাংস-লুব্ধ শকুনি দলের মত কামার্ত্ত পুরুষগুলি এক পুষ্পের মত কোমল তরুণীকে লইয়া টানাটানি করিতেছে। শেখর একবার সে দিকে চাহিল, আবার ঘরের অন্ধকারের দিকে মুখ ফিরাইল আবার ওদিকে আলোকোজ্জ্বল দৃশ্যটির দিকে চাহিল। চিরন্তনী মায়াবিনী আবার তাহাকে নবরূপে ভুলাইয়া ডাকিতেছে! না, আর নারী নয়, সে রূপবহ্নি চায় না, সে হিমস্নিগ্ধ, স্তব্ধ, শান্তিময় অন্ধকার চায়। কিন্তু শেখর বিছানায় গিয়া শুইতে পারিল না, সে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। দেখিল, এক কামান্ধ মাতাল প্রৌঢ় মুসলমান ইরাণীর বক্ষের কাপড় টানিতে গেল। ইরাণী তাহাকে একটু ধাক্কা দিয়া দূরে স'রয়া গেল। পাঠানটা তাহার গলা ধরিয়া আবার ঘরের মাঝখানে দাঁড় করাইল. সেই মুসলমানটি আবার তাহার দিকে অগ্রসর হওয়াতে, ইরাণী আবার ঘরের কোণে ছুটিয়া সম্মুখে আতরপূর্ণ এক চামড়ার পাত্র তাহার দিকে ছুঁড়িয়া মারিল। চারিদিকে আতর ছড়াইয়া পড়িল। সেই আতরের তীব্র গন্ধে শেখরেরও মাথা যেন রিমঝিম করিয়া উঠিল। আঙুলের হীরকখণ্ড-খচিত সোণার আংটিটির দিকে একবার জ্বলজ্বল চোখে চাহিয়া সে টলিতে টলিতে ঘরের দরজা খুলিয়া বাহির হইল।

সরাইখানা হইতে বাহির হইয়া, পথ পার হইতে যাইয়া, সে থমকিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে কয়েকজন মুসলমান একটি মৃতদেহ নিঃশব্দে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। স্থির হইয়া তৃষিত চোখে সে শুভ্রবসনাবৃত মৃতদেহের দিকে চাহিল। ওই লোকটির জীবনের সকল দাহ, সকল তৃষ্ণা মিটিয়া গিয়াছে,—জীবনের সকল দেনা-পাওনার, সকল ভুল-ভ্রান্তির হিসাব-নিকাশ চুকিয়াছে. সে শান্তি পাইয়াছে। এই ত মূর্ত্তিমান মৃত্যু আসিয়া তাহাকে চিরশান্তির পথ দেখাইয়া দিতেছে। সে আতরের দোকানে যাইবে না, সে যমুনার অতল, স্নিগ্ধ কোলে ঝাঁপাইয়া দেহের সকল জ্বালা মিটাইবে,—তাহার দেহ যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। মৃত-দেহ লইয়া লোকেরা চলিয়া গেল, সে বহুক্ষণ তাহাদের চলিয়া যাওয়ার দিকে চাহিয়া রহিল। সম্মুখের আতরের দোকান হইতে একটা আর্ত্তনাদ কাণে আসিল। সে টলিতে টলিতে দোকানের দিকে চলিল,—নারীর সহিত এই তাহার শেষ খেলা।

দর-কসাকসি বেশ জমিয়াছে। প্রৌঢ় মাতাল মুসলমানটি আতরসিক্ত দাড়ি নাড়িয়া, সবাইয়ের ওপর দর দিয়া চলিয়াছে। তাহার দৌড় কতদূর দেখিবার জন্য, সকলে অসম্ভব রকম উচ্চ মূল্য হাঁকিয়া চলিয়াছে। সহসা রাজশেখরকে টলিতে টলিতে ঢুকিতে দেখিয়া, সকলে একটু স্থির হইয়া, আবার কোন নূতন রঙ্গের আরম্ভের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু সে কাছে যাইতে একটু ভীত হইয়া স্তব্ধ হইল। তাহার জ্বরাতুর মুখ হইতে, রাঙা ঘোলা চোখ হইতে এক অস্বাভাবিক দীপ্তি বাহির হইতেছিল। সেই রক্তিম মুখের চারিদিকে লম্বা, কালো, শুকনো চুল ঝুলিয়া পড়িয়াছে শুধু পা, একটা লাল পাজামা ও একটা কালো ফতুয়া,—সে যেন স্বপ্নের ঘোরে আসিতেছে। শেখর কাহারও দিকে চাহিয়া দেখিল না, সে বরাবর পাঠানের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাত ধরিয়া ঝাঁকুনি দিয়া সোণার আংটিটা ছুঁড়িয়া মারিবার মত তাহাকে দিয়া বলিল—এই নে, ছেড়ে দে ওকে। পাঠানটি আংটির বৃহৎ হীরকখণ্ডের দিকে চাহিল। প্রৌঢ় মুসলমানটি আংটিটি ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিল। শেখরের কাণ্ড দেখিয়া তাহার নেশা ছুটিয়া গেল। সে ব্যবসাদার, সুন্দরীকে অত মূল্যে কিনিতে রাজী নয়। সে আর দাম হাকিল না, শুধু অবাক হইয়া বলিয়া উঠিল, অত বড় হীরে! শেখর তাহার দিকে একবার খর দৃষ্টিতে চাহিয়া তাহার দাড়ি ধরিয়া নাড়িয়া দিল। তার পর পাঠানের দিকে চাহিয়া বলিল—ব্যস, ঠিক হয়েছে। পাঠানটি তাহাকে অতি সবিনয় সেলাম করিয়া, ইরাণীর হাত টানিয়া শেখরের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া বলিল—নিয়ে যান। শেখর একবারও ইরাণীর দিকে চাহিল না। যদি চাহিত, তবে দেখিতে পাইত, সেই শিশুর মত সুকুমার ভীত-করুণ, সরল মুখ কি আনন্দের আভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। ইরাণীর বুকে-জড়ান সাদা পায়রাটির দিকে ভাসাভাসা চোখে এক-বার চাহিয়াই সে ইরাণীর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে, স্বপ্নের ঘোরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দোকান হইতে বাহির হইয়া, পথের মধ্যে আসিয়া, যেন অতি শ্রান্ত হইয়া হাত ছাড়িয়া দিল; ধীরে বলিল, যাও, চলে যাও।

বক্ষের পারাবতটিকে নিবিড় করিয়া জড়াইয়া তরুণী বলিল —কোথায় যাবো ? তাহার স্নিগ্ধ-মধুর কণ্ঠস্বরে শেখর তাহার দিকে চাহিল, সুর্ম্মামাখা দুইটি কালো চোখ অজানা লজ্জা, গোপন বেদনায় কম্পিত হইয়া কি রহস্তে তাহার দিকে মায়াজাল বিস্তার করিতেছে। না, সুর্ম্মামাখা কালো চোখ নয়, নীল স্নিগ্ধ যমুনার জল তাহাকে ডাকিতেছে। মুখ ফিরাইয়া শেখর বলিল—যেখানে খুসী চলে যাও, তোমায় আমি মুক্তি দিলাম। ইরাণী কাতর কণ্ঠে বলিল—কোথায় যাব, আমার ঘর নেই, মা নেই, ভাই নেই, বোন নেই, কেউ নেই। শেখর ক্ষুব্ধস্বরে বলিল—আমারও ঘর নেই, মা নেই, ভাই নেই, বোন নেই, কেউ নেই।

আতরের দোকানে তখন আর এক তাতারিণীর নৃত্য সুরু হইয়াছে। সকলে তাহাতে জমিয়া গিয়াছে, শুধু অলিভার ও ভিক্ষু মির্জ্জা ইরাণীর পেছনে পেছনে দোকান হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। শেখরের কথা শুনিয়া অলিভারও মনে মনে বলিল,—আমারও ঘর নেই, মা-ভাই-বোন—কেউ নেই। মির্জ্জা মৃদু হাসিয়া ভাবিল—আমারও ত এই অবস্থা। রাত্রের অন্ধকারে চারিজন সমাজ-পরিত্যক্ত আত্মীয়-বন্ধুহীন গৃহ-হারা পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল।

ইরাণী ধীরে সরিয়া শেখরের হাত ধরিল। শেখর হাতে ঝাঁকুনি দিল। তার পর মাতালের মত টলিতে টলিতে সম্মুখের পথ দিয়া চলিল। প্রভুভক্ত ভীত জীবের মত ইরাণী তাহার পেছনে পেছনে চলিল। অলিভার তাহাদের পেছনে পেছনে যাইবে ভাবিল; কিন্তু সম্মুখে মির্জ্জা আসিয়া, তাহার দিকে রহস্তের হাসি হাসিয়া চাহিতে, সে আর অগ্রসর হইতে পারিল না, ভিক্ষুকটাকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিয়া সে আপনার ঘরে মদ খাইতে গেল। তরুণীকে মুক্তি দিয়া শেখরের মানসিক অবস্থা আরও অস্বাভাবিক হইয়া উঠিল। তাহার স্বাভাবিক সুখী মন তাহাকে যেমন ইরাণীর দিকে টানিতেছিল, তাহার উন্মত্ত ব্যথা-বিকল মন তাহাকে তেম্নি শান্ত মৃত্যুর দিকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল। এই দুই বিরুদ্ধ স্রোতের ঘূর্ণাবর্ত্তে সে দিশাহারা হইয়া গিয়াছিল। টলিতে টলিতে প্রায় পথে পড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া, তরুণী তাহাকে ধীরে ধরিয়া লইয়া চলিল। তরুণীর স্পর্শ বড় মধুর লাগিল; আবার চমকিয়া উঠিল,—মৃত্যু চাই,—সেই শুভ্রবসনাবৃত শান্ত মৃতদেহের মত। তরুণীর দিকে চাহিয়া সে শিহরিয়া উঠিল, এ কে! এ ত নারী নয়, এ যে নারীর কঙ্কাল! গোলাপী ওড়না লাল ঘাঘরা-চাপা-দেওয়া তাহার সুকোমল সুন্দর মাংসের তলায় একটা কঙ্কালের ছায়া দেখিতে পাইল। স্বাভাবিক মানসিক অবস্থা হইলে সে হয় ত সেখানে মূর্চ্ছা যাইত; কিন্তু বিকল-মস্তিষ্কের অবস্থায় এ কঙ্কাল-সঙ্গিনী তাহাকে ভীত করিল না। সে শুধু ইরাণীর নিকট হইতে একটু সরিয়া প্রখর দৃষ্টিতে তাহার দিকে দেখিল, মৃত্যু মূর্ত্তিমতী হইয়া তাহাকে লইয়া চলিয়াছে। তাহার শ্রান্ত ক্ষীণ দেহ যেন সবল হইয়া উঠিল। প্রচুর মদ খাইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া মাতাল যেমন করিয়া চলে, তেম্নি করিয়া সে পথ দিয়া চলিল। দেখিয়া পথ খুঁজিয়া নয় যেন কোন রহস্যময় শক্তির আকর্ষণে সে যমুনার দিকে চলিল। অসহায় শঙ্কিত ভাবে ইরাণী তাহার পিছন পিছন চলিল।

যমুনার তীরে আসিয়া জলকল্লোলে ও জলসিক্ত বাতাসের স্পর্শে শেখর একটু প্রকৃতিস্থ হইল। আকাশে ঝড়ের মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিতেছে, মেঘের ফাঁক হইতে ঝরা চাঁদের আলো নদীর কালো জলে আলেয়ার মত মাঝে মাঝে ঝলসিয়া উঠিতেছে। শেখর বিমুগ্ধ হইয়া তাহার জ্বরতাপদগ্ধ দেহ নদী জলে শীতল করিতে চলিল। এবার ইরাণীর সত্যই ভয় হইল, এ লোকটা মাতাল না পাগল? পাগল! নদীর জলে ঝাঁপ দিতে যাইতেছে! সে সম্মুখে আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। কাঁচের কাজ-করা তাহার রঙীন ওড়না ক্ষণিক বিদ্যুতের আভায় শেখরের চোখে বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল, দূরে বজ্র গর্জ্জনে সে একটা অট্টহাস্য শুনিতে পাইল, শিহরিয়া উঠিল, এ কে? রঙীন মায়া! এক কঙ্কাল! একবার দেখিল সুন্দরী নারী, আবার দেখিল এক কঙ্কাল। তাহার দেহের, তাহার মনের সকল শক্তি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল, সে মূর্চ্ছিত হইয়া ইরাণীর বুকে পড়িয়া গেল। নারী ও মৃত্যু তাহাকে লইয়া যেন পাশা খেলিতেছিল, নারীরই আবার জয় হইল।

"অকাল-মৃত্যু ও বাল্য-বিবাহ"

(প্রতিবাদ)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম-এ

ভারতবর্ষের বিগত (অগ্রহায়ণ) সংখ্যায় 'শ্রীপদ্মনাভ দেবশর্ম্মা'র লিখিত উপরিউক্ত শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া অনেকে এই অধমকে ইহার লেখক মনে করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা যে আমার লেখা নহে, এবং হইতেও পারে না, প্রধানতঃ ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই ক্ষুদ্র বন্ধটি লিখিত হইল।

প্রথমতঃ আমার নাম 'পদ্মনাভ' নহে—পদ্মনাথ, এবং যদিও আমি "দেবশর্ম্মা" বলিয়া নাম স্বাক্ষর করি, তথাপি "ভারতবর্ষ"-সম্পাদক মহাশয় (বোধ হয় প্রবন্ধের গুরুকরণ কল্পে) আমার উপাধিগুলি যুড়িয়া দিয়া থাকেন। তার পর "পদ্মনাভ" মহাশয় তাঁহার "ইংরাজীতে ভাল জ্ঞান নাই" এ কথা বলিয়াছেন—এ অধম (প্রকৃত পক্ষে ঐরূপ বলিবার অধিকারী হইলেও) এ কথা বলিতে অক্ষম—কেন না একটা এম-এ ডিগ্রীর ছাপ (সেটা আবার ইংরাজী সাহিত্যে) রহিয়াছে। আমি যে এরূপ প্রবন্ধ এ ভাবে লিখিতাম না—তাহা সুহৃজ্জনের "বিস্ময়-প্রকাশেই" সূচিত হইয়াছে। ফলতঃ, তিনি যাদৃশ প্রবন্ধ উপলক্ষ্য করিয়া "বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে ইহা খুবই ভয়াবহ" বলিয়া স্বীয় রচনার উপসংহার করিয়াছেন, আমি তাদৃশ প্রবন্ধ "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া পরম প্রীতিলাভই করিয়াছি। সুশিক্ষিতা জননীরা এ ভাবে সমাজের হিতার্থ লেখনী প্রয়োগ করুন, এই আমার আন্তরিক কামনা।

"পদ্মনাভ" মহাশয়ের প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া বোধ হইল কোনও পাকা লেখক এই ছদ্মনামের মুখস পরিয়াছেন—তবে তাঁহার 'অভিনয়' ভাল হয় নাই—নিজকে "অর্দ্ধ শিক্ষিত" "চালকলা"-ভোজী বলিয়া খ্যাপিত করিলেও তিনি একজন পূর্ণশিক্ষিত ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয় এবং কোনও দিন "চালকলার" আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াও বোধ হয় না। আমার অনুমান যদি ঠিক্ হয়, তাহা হইলে কেন যে তিনি এই নামটি নির্ব্বাচন করিয়া এ অধমকে বিড়ম্বিত করিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

শ্রীযুক্তা অনুরূপা-দেবী লিখিত মূল প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত আমি সম্পূর্ণ একমত—যদিও দুই একটি অবান্তর বিষয়ে যথা, অবস্থা বিশেষেও বালিকাকে চির-অবিবাহিত রাখা, কন্যাকে বিশেষতঃ বিবাহিতাকে—বিদ্যালয়ে প্রেরণ) * তাঁহার সহিত আমার কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। তিনি এইরূপ প্রবন্ধ লিখিয়া "ভারতবর্ষের" 'মাতৃমঙ্গল' বিভাগ সমলঙ্কৃত করুন—এই আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। নারীগণের কথা জননীরাই ভাল বুঝেন—তাঁহারাই এ বিষয়ে বলিবার অধিকারিণী—"পদ্মনাভ" মহাশয় যাই কেন বলুন না। প্রতিবাদ দেখিয়া নারীজন-সুলভ শালীনতাবশতঃ যদি জননীরা এবংবিধ প্রবন্ধ প্রকাশে পশ্চাৎপদ হন, তাহা হইলে সমাজের অত্যন্ত ক্ষতির কারণ হইবে। তাঁহারা যেন মনে রাখেন যে, স্বয়ং

* স্ত্রীজাতির বিবাহই একমাত্র সংস্কার—তাই অন্ধা খঞ্জা রুগ্না কন্যারও এই সংস্কার লোপ করা অনুচিত। তবে ঈদৃশ স্থলে বরের যাহাতে ক্ষতি না হয় তাহার বিধান করা আবশ্যক। এমন কি উহাকে স্থল বিশেষে অন্য বিবাহ করিতেও দেওয়া উচিত। পিত্রালয়ে পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী এবং বিবাহান্তে স্বামী শ্বশ্রূ দেবর ননন্দা প্রভৃতির নিকটেই বালিকাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভ করা উচিত। একে তো বিদ্যালয়ের পাঠ্যাদি প্রায়শঃ কন্যাদের উপযোগী নয়; তার পর স্কুল কলেজে যাহা শিখান হয়, তাহা তো বিলাতী ভাবেরই পরিপোষক; ছেলেরা যে অর্থার্জ্জনার্থ বাধ্য হইয়া বিদ্যালয়ে গিয়া এই ভাবে ভাবিত হইতেছে, সমাজহিতৈষিগণ ইহাতেই সন্ত্রস্ত। আবার মেয়েরাও ঐরূপ হউক, ইহা কদাপি বাঞ্ছনীয় নহে। বিদ্যালয়ে যাতায়াত, অবস্থান ইত্যাদি নানা বিষয়েও মেয়েদের পক্ষে অনিষ্ট সম্ভাবনা আছে। বলা বাহুল্য যে পুস্তকগত বিদ্যা ছাড়া যাহা নারীগণের সমধিক প্রয়োজনীয়, অর্থাৎ 'সুগৃহিণী' হইবার নিমিত্ত যেটুকুর দরকার, তাহার জন্য কোনও বিদ্যালয়ে যাইবার আবশ্যকতা নাই, পিতৃগৃহে ও স্বামি-ভবনেই তাহা সম্যক্ শিক্ষণীয়।

আদ্যাশক্তি ভগবতী (প্রত্যেক জননী যাঁহার অংশভূতা) দানব দলনে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার উপরেও অস্ত্রবর্ষণ হইয়াছিল। কিন্তু শস্ত্রাঘাতে "ন তস্যা বেদনাং চক্রে গদাপাতোঽল্পিকামপি।" আশা করি, ঐ প্রতিবাদও জননীরা তেমনি লঘু মনে করিয়া সহিয়া লইবেন—ভগ্নোৎসাহ হইবেন না।

বাল্যবিবাহের যাঁহারা বিরোধী, তাঁহাদের সর্ব্বদাই ইহাই প্রধান যুক্তি যে, ইহাতে সন্তান-সন্ততি দুর্ব্বল হয় ও অকালে কাল-কবলিত হয়। তাই তাঁহারা আইন করিয়া বালিকাদের বিবাহের বয়স বাড়াইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—তৎফলে ১২৯৭ সালে স্কোবল্ সাহেব সহবাস-সম্মতির বয়স বাড়াইবার জন্য বড়লাটের আইন্ সভায় এক বিল্ উপস্থাপিত করেন। সেই সময়ে সমগ্র হিন্দু-সমাজের উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তিগণ প্রায় এক বাক্যে এই বিলের প্রতিবাদ করেন; এবং তখনকার খবর যাঁহারা রাখেন, তাঁহারা বলিতে পারিবেন যে, বাল্যবিবাহ এ দেশের অনুপযোগী নহে—* এই সিদ্ধান্তই সর্ব্বত্র সমর্থিত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট বিল্ পাস্ করিয়া প্রেষ্টিজ্ রাখিলেন বটে, পরন্তু সর্কুলার প্রভৃতির দ্বারা ইহা 'ডেড্ লেটারে' পরিণত করিয়া দিয়া দেশীয় সমাজের সঙ্গে আপোষ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ইদানীং স্যার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও ৺নরেন্দ্রনাথ সেন ম্যারেজ রিফর্ম্ম লীগ স্থাপন পূর্ব্বক বিবাহের বয়স বাড়াইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন সেই লীগের কথা বড় শোনা যাইতেছে না। বোধ হয়, এতদ্দ্বারা কোনও ফল হয় নাই। সে যাহা হউক, লীগ সংস্থাপনের সময় উদ্‌যোক্তৃগণ এ দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মতামত গ্রহণ করেন—এবং অনুগ্রহপূর্ব্বক এই লেখকেরও অভিমত আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তদুত্তরে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা "ব্রাহ্মণ সমাজ" পত্রের ১ম বর্ষের পৌষ সংখ্যায় (কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিতাকারে) "হিন্দু-বিবাহ সংস্কার" নামে প্রকাশিত হয়; এবং অবশেষে তাহা গৌহাটীস্থ সনাতন ধর্ম্মসভা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত সমাজ-সেবক পুস্তকাবলীর অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া গ্রন্থকারে প্রকাশিত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাহা দেখিবেন। অতএব এস্থানে এ বিষয়ে আলোচনা অনাবশ্যক বিবেচিত হইল।

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর যুক্তিতর্কের সঙ্গে মদীয় উক্ত প্রবন্ধের ভাবগত এত সৌসাদৃশ্য যে, "পদ্মনাভ" মহাশয়ের প্রবন্ধ পড়িয়া, উহা আমার লেখা ভাবিয়া, আমাকে চিনেন এমন কেহ যে বিস্মিত হইতে পারেন, তাহাও বিস্ময়ের বিষয়ই বটে। ফল কথা, বাল্যবিবাহ যে অকাল-মৃত্যুর কারণ, ইহা আমি কদাপি মনে করি না।

তবে অকাল-মৃত্যুর কারণ কি? তদ্বিষয়ে সংক্ষেপতঃ শাস্ত্রের উক্তি এই—

"অনভ্যাসেন বেদানামাচারস্য চ বর্জ্জনাৎ
আলস্যাদন্ন দোষাচ্চ মৃত্যুর্বিপ্রান্ জিঘাংসতি।"

বেদাদি শাস্ত্রের অনধ্যয়ন, সদাচারের বর্জ্জন, অলসতা এবং দূষিত আহার্য্য গ্রহণ এই সকল কারণে মৃত্যু বিপ্র প্রভৃতির হননেচ্ছা করিয়া থাকে।

এখানে 'বিপ্র' পদ (এবং বেদ শব্দ) উপলক্ষণ মাত্র। এখনকার লোক শাস্ত্র শিখে না; সদাচার মানে না, অলসতা বশতঃ অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ, এবং যত তত্র যা তা খায়—তাই অকালে কাল-কবলিত হইয়া থাকে। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীও তদীয় প্রবন্ধে বিস্তারিত ভাবে এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। তবে একটি অত্যাবশ্যক কথা তিনি (বোধ হয় মাতৃজাতিসুলভ সঙ্কোচ বশতঃ) স্পষ্টতঃ বলেন নাই—তাহা 'সদাচারের' অন্তর্ভুক্ত। পূর্ব্বে লোকে শাস্ত্রাচার মানিয়া স্ত্রীসহবাসে সংযত ছিল—ঋতুকালে, তাহাতেও দিনক্ষণ বাছিয়া, দার-সঙ্গত হইত। ফলে স্বয়ং

---

* এতৎ সম্পর্কে এস্থলে আরো একটা পুরাতন কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। যৌবন-বিবাহের ফলে সংস্কারকদের আপন সমাজের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল, "নব্যভারতের" স্পষ্টবাদী সম্পাদক ৺দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় (স্বয়ং ব্রাহ্ম হইলেও) "যৌবন-বিবাহ ও ব্রাহ্ম সমাজ" শীর্ষক প্রবন্ধে তাহা ঘাঁটিয়া দেখাইয়াছিলেন। "পদ্মনাভ" মহাশয় যে বলেন "বিদেশী সমাজের বিশৃঙ্খলার কারণ যৌবন বিবাহ বা স্ত্রীস্বাধীনতা নয়, সমাজের বা বিবাহের আদর্শই তজ্জন্য দায়ী", এ কথার কোনও অর্থ নাই। সামাজিক পদ্ধতির পরিবর্ত্তন ঘটিলে 'আদর্শ'ও যে বদলাইয়া যাইবে—তাহা কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না। গান্ধর্ব্ব বিবাহ হিন্দু-সমাজে ছিল এবং আছে, সন্দেহ নাই—কিন্তু তাহা কাদাচিৎক,—সুপ্রচলিত সামাজিক পদ্ধতি নয়। অপিচ, অভিনিবেশ সহকারে ইতিহাস, পুরাণ, কাব্য, নাটকাদি পড়িলে দেখা যাইবে যে, প্রায়শঃ এরূপ বিবাহের ফলে নানারূপ বিপত্তিও ঘটিয়াছে।

নীরোগ থাকিয়া, দীর্ঘজীবী সন্তান লাভ করিয়া "আচারাল্লভতে হ্যায়ুঃ আচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ" এই শাস্ত্রবাক্যের সার্থকতা প্রত্যক্ষ করিত। এখন যাহা হইতেছে; তাহার ফলে মাতা, পিতা, সন্তান, সকলেরই অকাল মৃত্যুর পথ পরিষ্কার হইতেছে।

অতীব অবান্তর ভাবে 'পদ্মনাভ' মহাশয় 'অবগুণ্ঠনে'র কথা পাড়িয়াছেন—এবং তাহা মোসলমানদের আমদানী বলিয়াছেন। 'অবরোধ' সম্বন্ধেও অনেকের এবংবিধ মত। এই সংস্কারটা ঠিক নয়। 'অবগুণ্ঠন' হিন্দুসমাজে পূর্ব্বাবধিই ছিল, কালিদাসের' শকুন্তলায় "কেয়মবগুণ্ঠনবতী" ইত্যাদির শ্লোক (৫ম অঙ্কে) দেখিতে পাই। মৃচ্ছকটিক নাটকের শেষ অঙ্কে গণিকা বসন্তসেনাকে 'অবগুণ্ঠন' দ্বারা কুলবধূতে পরিণত করা হইয়াছে। 'অবরোধে'র কথাও নাটকাদিতে বহুশঃ আছে। "অসূর্য্যম্পশ্যা" শব্দটি সাধিবার জন্য পানিণিকে একটি পৃথক সূত্র করিতে হইয়াছিল। অতএব "পদ্মনাভ" মহাশয় প্রভৃতি যেন এসব বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের উক্ত সংস্কার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করেন।

ভারতের বিদেশী বাণিজ্য

শ্রীমন্ত সওদাগর

(নভেম্বর, ১৯২৩)

বিগত অক্টোবরের সহিত তুলনায় নভেম্বরের ভারতীয় বাণিজ্যের হিসাবে দেখা যায় যে, আমদানি ও রপ্তানিতে এ মাসে আধিক্য ঘটিয়াছে। বে-সরকারি আমদানির এ মাসের মূল্য ২১,০৯ লাখ টাকা, এবং ইহা গত মাসের অপেক্ষা ৪৯লাখ টাকার অধিক। রপ্তানি ও পুনঃরপ্তানি গত মাস অপেক্ষা ১,৮৬ লাখ ও ২৪ লাখ অধিক হইয়া যথাক্রমে ২৬,৪১ ও ১,২২ লাখ টাকায় পরিণত হইয়াছে। নিম্নে আমদানি, রপ্তানি, ও পুনঃরপ্তানির হিসাব দেওয়া হইল :—

	নভেম্বর ২৩	অক্টোবর ২৩	বেশী (+)	কম —)
	লাখ	লাখ	লাখ	শতক
আমদানি	২১,০৯	২০,৬০	+৪৯	+২·৩
রপ্তানি	২৬,৪১	২৪,৫৫	+১,৮৬	+৭·৩
পুনঃরপ্তানি	১,২২	৯৮	+২৪	+২৪·৫

	নভেম্বর ২৩	নভেম্বর ২২	বেশী (+)	কম(—)
	লাখ	লাখ	লাখ	শতক
আমদানি	২১,০৯	২০,৭০	+৩৯	+১·৯
রপ্তানি	২৬,৪১	২৭০৫	—৬৪	—২·৪
পুঃ রপ্তানি	১,২২	১,৮৪	—৬২	—৩৩·৭

এপ্রিল হইতে নভেম্বর ৮মাস			বেশী (+)	কম(—)
	১৯২৩	১৯২২		
	লাখ	লাখ	লাখ	শতক
আমদানি	১,৫২,২১	১,৫৪,১৬	—১,৯৫	—১·৩
রপ্তানি	২,০৭,৫২	১,৮২,৫৮	+২৪,৯৪	+১৩·৭
পুঃ রপ্তানি	৯,২৬	৯,৮২	—৫৬	—৫·৭

বে-সরকারি হিসাবে এই মাসে কারেন্সি নোট সমেত অর্থাদির আমদানির মূল্য ৩,৭৫ লাখ, এবং ১৯২২ অক্টোবরে ৪,৭২ লাখ ও ১৯২২ নভেম্বরে ২,৯৭ লাখ টাকা। নিম্নে স্বর্ণ ও রৌপ্যের এপ্রিল হইতে নভেম্বর এই আট মাসের আমদানি ও রপ্তানির তালিকা দেওয়া হইল :—

এপ্রিল হইতে নভেম্বর ৮ মাস			বেশী (+)	কম (—)
	১৯২৩	১৯২২		
	লাখ	লাখ	লাখ	শতক
আমদানি সোণা	২১,৮৪	২৩,২৬	—১,৪২	—৬
রপ্তানি ঐ	৫	৫	—	—
আমদানি রূপা	১০,৩৮	১০৮৮	+৩,৫০	+৩২
রপ্তানি ঐ	১,৩০	২,৩০	—৫৪	—২৩

পণ্যদ্রব্য, অর্থাদি, 'কৌন্সিল বিল, কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদির সর্ব্বসমেত হিসাবে দেখা যায় যে, এ মাসে ভারতের দৃশ্যমান ব্যবসার পাল্লা আমাদের অনেকটা অনুকূল হইয়াছে, অর্থাৎ আমাদের এ মাসে বিদেশ হইতে ১,৫৩ লাখ টাকা পাওনা হইয়াছে। ১৯২৩ অক্টোবরে আমাদের দেনা ছিল ৬৬ লাখ টাকা, আর ১৯২২ নভেম্বরে আমাদের পাওনা ছিল ৫,৯৬ লাখ টাকা। ১৯২৩ এপ্রিল হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত এই আট মাসে আমাদের পাওনা দাঁড়াইয়াছে ২৮.২৫ লাখ, এবং বিগত বর্ষের এই সময়ে পাওনা হইয়াছিল ১৪,৭৩ লাখ টাকা।

আমদানি বিভাগে পরিবর্ত্তন—১৯২২ নভেম্বরের সহিত তুলনায় খাদ্য দ্রব্যাদি ও কাঁচা মাল ৫৭ লাখ ও ১৩ লাখ বাড়িয়া যথাক্রমে ৩,১২ লাখ ও ১,৪০ লাখ টাকায় পরিণত হইয়াছে। নির্ম্মিত দ্রব্যাদি ৩১ লাখ কমিয়া ১৬,২১ লাখ, জীবজন্তু ২ লাখ কমিয়া ২ লাখ, ও ডাক-বিভাগের আমদানি ২ লাখ বাড়িয়া ৩৪ লাখে দাঁড়াইয়াছে খাদ্য দ্রব্যাদির মধ্যে চিনি ৫২ লাখ বাড়িয়াছে; কাঁচা মালের মধ্যে কেরোসিন তৈল ১১ লাখ বাড়িয়াছে, তুলা ও রেশম প্রত্যেকে ৪ লাখ বাড়িয়াছে, কিন্তু কয়লা ৪ লাখ কমিয়াছে। নির্ম্মিত দ্রব্যাদির মধ্যে কোরা বস্ত্রাদি ১৩ মিলিয়ন গজ ও ৩৩ লাখ টাকা কমিয়াছে, ধোয়া বস্ত্রাদি ৬ মিলিয়ন গজ ও ২৩ লাখ টাকা কমিয়াছে, রঙ্গিন বস্ত্রাদি ৭ লাখ টাকা বাড়িয়াছে, কিন্তু পরিমাণে ৫৩৯ হাজার গজ কমিয়াছে। কলকব্জা (১৭ লাখ), রেশমী বস্ত্র (৮ লাখ) এবং তৈজসপত্র (৬ লাখ) এইগুলি উল্লেখযোগ্য হ্রাস। লোহার চাদর এবং মোটরগাড়ী যথাক্রমে ৩০ লাখ ও ১০ লাখ টাকা বাড়িয়াছে।

রপ্তানি বিভাগে পরিবর্ত্তন—গত বর্ষের নভেম্বরের সহিত তুলনায় খাদ্যশস্যের বহুল পরিমাণে কমতি রপ্তানির জন্য (১,১৮ লাখ) এ মাসে মোট খাদ্যদ্রব্যাদির রপ্তানির মূল্য ১৪ লাখ কমিয়া ৭,৪৮ লাখে দাঁড়াইয়াছে। খাদ্যশস্যের এত কমতি রপ্তানির ক্ষতি চায়ের দ্বারা পূরণ হইয়াছে। কারণ এ মাসে গত ১৯২২ নভেম্বর অপেক্ষা ৯৬ লাখ টাকার বেশী চা রপ্তানি হইয়াছে। এ মাসে মোট ৪,৩৭ লাখ টাকার চা বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। কাঁচা মাল বা অ-নির্ম্মিত দ্রব্যাদির মূল্য ৩৬ লাখ বাড়িয়া ১২,৫০ লাখ হইয়াছে। ইহার মধ্যে তুলা যদিও ওজনে ৪,০০০ টন কম ছিল, কিন্তু মূল্যে ৫০ লাখ টাকা বাড়িয়াছে। খনিজ তৈল ২৯ লাখ এবং তৈলবীজ ১০ লাখ টাকা বাড়িয়াছে; এবং পাট ও লা যথাক্রমে ৫০ লাখ ও ২১ লাখ কমিয়াছে। মোট ৩৩ হাজার টন তুলা রপ্তানির মধ্যে জাপান ১১,৮০০ টন বা বা ৩৬ শতাংশ, ইটালি ৫,৩০০ টন বা ১৬ শতাংশ, বেল্‌-জিয়াম্‌ ৪,৭০০ টন, যুক্তরাজ্য ৩,৯০০ টন এবং জার্ম্মেনী ১,১০০ টন লইয়াছে। পাট রপ্তানি যদিও পরিমাণে ৮৯,০০০ টন হইতে ১১০,০০০ টনে উঠিয়াছিল, কিন্তু চীনদেশে চাহিদা মন্দা হওয়ায় উহার মূল্য ৩,৩৭ লাখ হইতে ২,৮৬ লাখে নামিয়াছিল। প্রধানতঃ তুলা ও পাট নির্ম্মিত দ্রব্যাদির মূল্য যথাক্রমে ৪৩ লাখ ও ৬৫ লাখ টাকা কম হওয়ায় নির্ম্মিত দ্রব্যাদির মূল্য এ মাসে ১,০১ লাখ কমিয়া ৬,০৭ লাখ টাকা হইয়াছিল। তুলার সূতা ৩ মিলিয়ন পৌণ্ড ও ৩০ লাখ টাকা কম রপ্তানি হইয়াছে। গুণচটের থলে সংখ্যায় ২৪ মিলিয়ন হইতে ৩৮ মিলিয়ন ও মূল্যে ১,১৮ লাখ হইতে ১,৫৭ লাখ টাকায় উঠিয়াছে। অপর দিকে চটের কাপড় ১৪৭ মিলিয়ন গজ হইতে ১১৪ মিলিয়ন গজে ও ২,৯২ লাখ হইতে ১,৮৭ লাখ টাকায় নামিয়াছে। আমেরিকার যুক্ত সাম্রাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও তৎপরে আর্জ্জেন্টিনা, ক্যানেডা, যুক্তরাজ্য, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ভারতীয় চট লইয়াছে।

ব্যবসায়ে বিদেশের সম্বন্ধ—

যুক্তরাজ্য আমদানিতে গত বৎসর নভেম্বর ৬২·২ ও এ বৎসর নভেম্বরে ৫৮·২ ও রপ্তানিতে গত বৎসর ২৮·৩ ও এ বৎসর ৩৩·১ শতাংশ স্থান অধিকার করিয়াছে। জার্ম্মেনী, জাপান ও আমেরিকার যুক্ত সাম্রাজ্যের স্থান আমদানিতে যথাক্রমে ৫·১, ৬·০ ও ৪·৮ এবং রপ্তানিতে ৪·২, ৮·৪ ও ১০·০।

জাহাজের খবর—

এ মাসে ৩১৫ খানি জাহাজ ৩০০ হাজার টন মাল লইয়া ভারতে আসিয়াছিল ও ২৯৭ খানি জাহাজ ভারত হইতে বিদেশে ৬০০ হাজার টন মাল লইয়া গিয়াছিল। পূর্ব্ববৎসর ঐ মাসে ২৬৭ খানি জাহাজ ৫৪১ হাজার টন মাল লইয়া ভারতে আসিয়াছিল, ও ২৭০ খানি জাহাজ ভারত হইতে ৫৫৯ হাজার টন মাল বিদেশে রপ্তানি করিয়াছিল।

শুল্ক—

১৯২৩ নভেম্বরে সরকারের ৯,০৯ লাখ ও ১৯২২ নভেম্বরে ৩,১৭ লাখ টাকা আমদানি শুল্ক, এবং ১৯২৩ ও ১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে ৭১ লাখ ও ৬০ লাখ টাকা রপ্তানি শুল্ক আদায় হইয়াছে।

নিম্নে আমদানি ও রপ্তানি বিভাগের কতকগুলি প্রধান প্রধান দ্রব্যের মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইল। এ মাসে খাদ্য দ্রব্যাদির ও কাঁচা মালের কতক উল্লেখ করিলাম, আগামী বারে নির্ম্মিত দ্রব্যাদির অবশ্য দ্রষ্টব্য তালিকা দিবার ইচ্ছা রহিল।

নভেম্বর ১৯২৩

আমদানি

মাল	টাকা
খেজুর—	২৬,৭১,৮৫৯
স্পিরিট (মদ	১৪,৯৬,৪৪৪
জমাট দুধ	৬ ১৩,৭৬২
সুপারি	১৬,'৮,২৩৭
পরিষ্কৃত চিনি	১,৩২,৫১,৩৮২
লবণ	১০,৮৬,৯৪৯
সিগারেট	১১,৮০,৪৬৮
মণিমুক্তাদি	২২,৯১,৭৭৪
কেরোসিন তৈল	২৪,৮৮,৪৬১
অপর খনিজ তৈল	৩৩,০৬,৮১৫

রপ্তানি

খাদ্য শস্য	২,৭৫,৩১,১১১
চা	৪,৩০,৫৯,১৮২
তামাক	১১,৫২,৬৫৬
গঁদ, রঞ্জন ও লা	৭০,০৪,৬৯৪
চর্ম্ম	৪৭,৪৭,০৪৩
তৈল (সর্ব্ববিধ)	৩৬,২১,৬৭৮
তৈলের খইল	১৪,৪৬,৬৪৫
তৈল-বীজ	২,০২,৬৯,০৪৭
তুলা	৪,৮২,৩৯,৪২৬
পাট	২,৮৬,২৬,৮২৩
পশম	৩০,২৩,৫৫৯

কেন এত মোটা মোটা টাকার জিনিস বিদেশ হইতে আসে বা কেন এত জিনিস বিদেশে যায়, এবং এই আনয়ন বা প্রেরণ ব্যাপারে আমাদের কর্ত্তৃত্ব কতটুকু, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর বা অ-বাঙ্গালীর ইহাতে কতটুকু অংশ, এবং বাঙ্গালীর বা ভারতীয়ের কায অ-বাঙ্গালী বা অ-ভারতীয় কতটা করিয়া দিতেছে, এবং আমরা স্থাণুবৎ কেনই বা বসিয়া আছি,—অথবা অচির-ভবিষ্যতে ইহার সমূল বা কথঞ্চিৎ—প্রতিবিধান হয় কি না, এই সকল চিন্তার উদ্রেক করাইতে—এই ক্ষুদ্র মাসিক নিবন্ধ যদি সক্ষম হয়, এবং এ দেশীয় ব্যবসায়ীগণ যদি প্রতিবিধান কল্পে বদ্ধ পরিকর হন, তাহা হইলেই ইহার উদ্দেশ্যের সার্থকতা।

প্রার্থনা

শ্রীআশুতোষ ঘোষ বি-এল

আমার গর্ব্ব, করিয়ে খর্ব্ব,
রাখহে সর্ব্ব, লোকের তলে।
করহে পূর্ণ, হৃদয় ক্ষুণ্ণ,
তাহারি শূন্য, ভরিবে ব'লে।
হউক ভগ্ন, যতেক স্বপ্ন,
হইয়ে মগ্ন হৃদয় 'পরে,
তোমার হাস্য, আসুক লাস্য,
মম আলস্য হরণ করে।

কুটীর কুঞ্জে, পুষ্প-পুঞ্জে,
আমার প্রাণ যে দেখিতে পাই,
তাহার বার্ত্তা, জানিও ভর্ত্তা,
কোনই সত্তা নাই গো নাই,
তোমার স্পর্শে, জাগিবে হর্ষে,
আমার প্রাণ সে আকাশ পরে,
টুটিয়ে বন্ধ, নাচিবে ছন্দ
মহা আনন্দ হৃদয় 'পরে।

শ্রীনরেন্দ্র দেব

পূর্ব্বেই বলেছি, আষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা এখনও বর্ত্তমান সভ্যতার অনেক পশ্চাতে পড়ে আছে। তারা এখনও জমিতে লাঙ্গল দিতে পর্য্যন্ত শেখেনি। তারা সাপ, কাঠবিড়াল, গিরগিটি, টিকটিকি, কেঁচো শুঁয়োপোকা, 'এমু' পাখী (তিতির জাতীয় একরকম বড় বড় উট পাখীর আকারের পাখী, কেবলমাত্র আষ্ট্রেলিয়াতেই দেখতে পাওয়া যায়) আর সামান্য শাক সব্জী ইত্যাদি খেয়ে জীবন ধারণ করে। তবে আষ্ট্রেলিয়ার কতক প্রদেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শ এসে প্রাচীন জাতির সে আদিম বর্ব্বরতা একেবারে লোপ পেয়েছে। দক্ষিণ আষ্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ প্রদেশ এবং কুইন্স্ল্যাণ্ডের মধ্যে এই আদিম অধিবাসীরা সকলেই আজকাল বেশভূষা ক'র্‌তে শিখেছে, মদ খেতে সুরু করেছে এবং বিবিধ পাশ্চাত্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। যারা আগে জঙ্গলের মধ্যে চারিদিকে ছড়িয়ে বাস ক'রতো, তারা এখন জঙ্গল ছেড়ে পল্লীর মধ্যে এসে একত্রে বসবাস আরম্ভ করেছে।

কার্পেন্টারিয়া উপসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশের আদিম অধিবাসীরা এখনও পাশ্চাত্য বিষের সংস্পর্শে আসেনি। অরুন্তা, বড়মুঙ্গা, বীনবিঙ্গা আর কামীল্‌রোই এই কটা হচ্ছে নিউ সাউথ ওয়েল্‌সের প্রধান আদিম জাতি। বৎসরের মধ্যে আট মাস সেখানে খাদ্য ও পানীয়ের একান্ত অভাব হয়; এই সময় এক একটা কুয়ো বা ঝর্ণার ধারে কুড়ি পঁচিশ থেকে আরম্ভ ক'রে একশ' জন পর্য্যন্ত জংলী এসে দল বেঁধে বাস ক'রে, আবার প্রাচুর্য্যের সময় তাদের দল হাল্‌কা হয়ে যায়। সেই সময় তাদের যে সং জাতীয় উৎসব আছে সেই সকলের অনুষ্ঠান হয়। প্রাচীন আর্য্যদের বৈদিক যাগযজ্ঞের মতো এদেরও আমিষ ও নিরামিষ ভোজ্য দ্রব্যের শ্রীবৃদ্ধি কামনাতেই অধিকাংশ সময় এইসব অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। তা ছাড়া আমাদের দশবিধ সংস্কারের মতো তাদের মধ্যেও পুরুষানুক্রমে কতকগুলো বীভৎস সংস্কার-প্রথা চলে আসছে সে গুলো তারা একেবারে গোঁড়া আচারীদের মতো অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে! 'সাবালক' বলে গণ্য হবার জন্য যুবকদের কতকগুলো ভীষণ পরীক্ষা দেবার রীতি তাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতের মধ্যে এই পরীক্ষার প্রকরণ বিভিন্ন বটে, কিন্তু বীভৎসতায় কোনটাই বিশেষ কম নয়। দেহের নানাস্থানে ছোট-খাটো ক্ষত চিহ্ন করা থেকে আরম্ভ করে 'মাইকা' বলে যে ভীষণ অস্ত্রোপচারের অনুষ্ঠান হয়, তাতে অনেক সময় সাবালক হবার আগেই হতভাগ্য যুবকের প্রাণবিয়োগ ঘটে!

'সাবালক' বা লায়েক হ'তে হ'লে একদিনের একটা

কোড়োবোরেড়ো—(অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা তাদের নৃত্য-গীতের উৎসবকে "কোড়োবোরেড়ী" বলে। যাদুবিদ্যা সংক্রান্ত বিশেষ কোনও উৎসবে স্ত্রীলোকদের যোগ দেওয়া নিষেধ, কিন্তু প্রতিদিনের নৃত্য-গীতের আসরে তারাই প্রধান অংশ গ্রহণ করে। পশুপক্ষীদের ডাক অনুকরণে এবং বীররস, করুণ রস প্রভৃতি ভাবাভিনয়েও এরা সুনিপুণ।)

বড়মুণ্ডো সর্দার—(এরা দাড়ী রাখে কিন্তু গোঁফ ছিঁড়ে ফেলে এবং জ্রদেশের লোম তুলে ফেলে। বীরত্বের চিহ্নস্বরূপ সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতচিহ্ন ধারণ করে।)

মৃত্যু-দণ্ড

পরীক্ষাতেই সেটা সাব্যস্ত হয় না। দীর্ঘকাল ধরে তাকে একটার পর আর একটা ক'রে নূতন নূতন পরীক্ষা দিতে হয়। সমস্ত পরীক্ষা শেষ করে 'লায়েক' পদে উত্তীর্ণ হ'তে তাদের কুড়ি থেকে তিরিশ বছর পর্য্যন্ত লেগে যায়। সাবালক না হওয়া পর্য্যন্ত কতকগুলো জিনিস ছেলেদের খাওয়া একেবারে নিষেধ থাকে, যেমন 'এমুর' চর্ব্বি প্রভৃতি কতকগুলো তাদের শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম খাদ্য। ছেলে যেই কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে যৌবনে পদার্পণ করবার সঙ্গে

সঙ্গে কার্য্যক্ষম হ'য়ে ওঠে, সেই সময় একটা উৎসবের অনুষ্ঠান ক'রে তাকে খাদ্যের নিষেধ-আজ্ঞা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে নিষিদ্ধ খাদ্য সেবনাভিলাষী যুবাকে সেই সব উপাদেয় ভোজ্য বস্তু সংগ্রহ করে এনে তার ভাবী শ্বশুরকে উপহার দিতে হয়। যদি কোনও বালক এই সনাতন নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ ক'রে অসময়ে নিষিদ্ধ ভোজ্য ভক্ষণ ক'রে, তাহ'লে তাকে ভীষণ শাস্তি ভোগ ক'রতে হয়। অন্ধত্ব, খঞ্জত্ব, অঙ্গহানি ও কেশমুণ্ডন প্রভৃতি এই শাস্তির অন্তর্গত। বালকদের পক্ষে কতকগুলি উপাদেয় ভোজ্য নিষিদ্ধ হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে ওই সকল খাদ্য যাতে কেবলমাত্র পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য মজুত থাকে।

এই সকল জাতিগত, বংশানুক্রমিক বা পারিবারিক অনুষ্ঠান বেশীর ভাগ উত্তর প্রদেশীদের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর উৎসব ছাড়া অন্যান্য যা কিছু উৎসব সে সমস্তই "বাঙ্গীরামে" ও "মুঙগাংগাউয়া" প্রভৃতি দেবতার পূজা পার্ব্বণ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সমস্ত আদিম অধিবাসীদের মধ্যেই ঐন্দ্রজালিক যাদু-বিদ্যা ও ভৌতিক ভোজবাজীর প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু এই যাদু-বিদ্যা মন্ত্র তন্ত্র ঝাড় ফুঁক্ প্রভৃতি—তাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোকই জানে। কেবল অরুন্তার ভিন্ন অপর সকল জাতির মধ্যে নারী ও নাবালকদের যাদুবিদ্যা শিক্ষা করা একেবারে নিষেধ। অরুন্তাদের মধ্যেও কতকগুলো এমন সব ভেল্কী আছে, যা তাদেরও মেয়েদের ক'রতে নেই, কেবলমাত্র পুরুষদেরই সে গুলোতে অধিকার থাকে। যেমন 'জোঁক বসানো' কাজ বা 'দৃষ্টি কাটানো' ব্যাপার! আমাদের দেশের

'বোড়া' উৎসব। (শিকার পর্ব্ব)—(ভূমিতে কোনও জীবমূর্ত্তি অঙ্কিত ক'রে সদলে তাকে বর্শা ও ধনুকের দ্বারা বিদ্ধ করা হয়।)
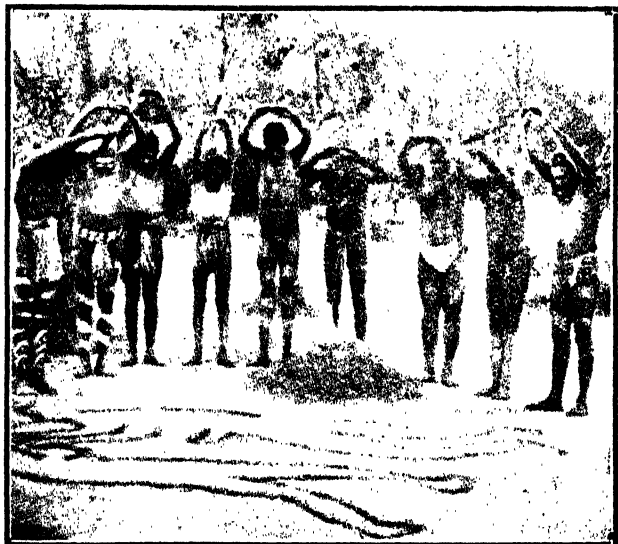
'বোড়া' উৎসব। (মন্ত্র পর্ব্ব)—(ছেলেরা সাবালক হ'লে এদের মধ্যে একটা উৎসবের আয়োজন হয়। তার নাম 'বোড়া' উৎসব। ইংলণ্ডে এখনও এই আদিম যুগের সাবালক হওয়ার উৎসব-রীতি খানিকটা বজায় আছে। এই উৎসব মন্ত্র, ঔষধ, যাদু, অগ্নি, জীব প্রভৃতি কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্বে বিভক্ত।)

সবস্ত্রা নারীবৃন্দ—(এরা সকলেই জঙ্গলী মেয়ে বটে, কিন্তু কেউ বিবসনা নয়। লতা পাতা বা গাছের ছাল কোমরে ঝুলিয়ে এরা আবরু রক্ষা করে।)

ঘোড়া উৎসব। (নৃত্য-পর্ব্ব)—(এই নৃত্যের বিশেষত্ব হ'চ্ছে সকলে কুম্ভীরের মুখোস পরিধান ক'রে লাঠির উপর ভর দিয়ে নাচে।)

ভেল্কীওয়ালারা যেমন একটা চাঁড়ালের হাড় বা আত্মারামের ছড়ি ব্যবহার করে, এরাও তেমনি একখানা হাড় বা মন্ত্রপুত যষ্টিখণ্ড ব্যবহার করে। এদের মন্ত্রও অনেকটা আমাদের দেশের রোঝাদের মতোই কেবল গালাগালি, ভয়প্রদর্শন ও অভিসম্পাতের সমষ্টি মাত্র। শত্রু নিপাতের জন্য এরা এই মন্ত্রপূত অস্থি চালনা করে। এটাকে অনেকটা আমাদের সেই প্রাচীন ঐন্দ্রজালিকদের "মারণ প্রকরণ" বলা যেতে পারে। এদের বিশ্বাস যে এই মন্ত্রপূত অস্থির

পবিত্র উষ্ণীষ—(উৎসব উপলক্ষে যারা পৌরহিত্য করে তাদের সকলকে মাথায় এই পবিত্র উষ্ণীষ পরিধান করতে হয়।)

সাহায্যে শত্রুর নিধন একেবারে অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু যদি নির্দ্দোষীর প্রতি কেউ এই অস্থি 'মারণ' প্রয়োগ ক'রে

'বোড়া' উৎসব। (ঔষধ পর্ব্ব)

মৃত্যুবান—(কোনও শত্রুর মৃত্যু কামনা ক'রে এই অস্থি নির্ম্মিত সুদীর্ঘ বান মন্ত্রপুত করে গোপনে তার দিকে লক্ষ্য ক'রে ধরলেই অবিলম্বে তার মৃত্যু হবেই এইরূপ এদের বিশ্বাস।)

তা'হলে সেই মন্ত্রপূত অস্থি চালকেরই বিরুদ্ধে যায় এবং তার ঘোর অকল্যাণ, এমন কি প্রাণ সংশয় পর্য্যন্ত ঘটায়।

দক্ষিণ আষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে মৃত ব্যক্তিকে কবর দেওয়াই হচ্ছে সাধারণ নিয়ম, কিন্তু এখানকার অন্যান্য প্রদেশের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে তিন রকমের বিভিন্ন অন্ত্যেষ্টি প্রথা প্রচলিত আছে দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম হ'চ্ছে শোকোচ্ছ্বাস এবং মৃতব্যক্তির দেহ সমাধিস্থ করা বা বৃক্ষশাখার কিম্বা কোনও উচ্চ স্থানে রেখে দেওয়া। দ্বিতীয় মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান এবং কে তাকে মারলে সেই হত্যাকারীকে খুঁজে বার করা। কারণ, হঠাৎ কেউ মারা গেলে এরা ধ'রে নেয় যে নিশ্চয় কেউ শত্রুতা ক'রে যাদুবিদ্যার প্রভাবে তাকে হত্যা ক'রেছে। তৃতীয় এবং শেষ নিয়ম হ'চ্ছে, এক বৎসর বা দুই বৎসর পরে মৃত ব্যক্তির আত্মার সদগতির জন্য তার অস্থি সৎকারের অনুষ্ঠান। স্ত্রীপুরুষেরা দল বেঁধে বিকট চীৎকার ও উৎকট বিলাপ ছাড়া এই শোকানুষ্ঠানের আর একটি প্রধান অঙ্গ হ'চ্ছে নিকট আত্মীয়দের আপন হাতে অস্ত্রাঘাতে স্ব স্ব অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করা।

কুইন্‌ল্যাণ্ডের মেয়ে

(আসরে বসে নৃত্য-গীত শুনছে এবং নাচগানের তালে তালে হাততালি দিয়ে ও উরুদেশ চাপড়ে তালমানের অনুসরণ ক'রছে।)

দ্বন্দ্ব যুদ্ধ

শোকোচ্ছ্বাস ঠিক মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠিত হয় —এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না মৃতদেহ ভূসমাধি বা তরু-সমাধি লাভ ক'রে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত চলে। এই শোকোচ্ছ্বাসের সময় দলকে দল স্ত্রী পুরুষ অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য ক'রতে

বোড়া উৎসব। (বৃক্ষ পর্ব্ব)

(যে বৃক্ষতলে এই উৎসবের অনুষ্ঠান হয় সেই বৃক্ষ-কাণ্ডটিকে তারা চিত্রবিচিত্র ক'রে।)

কুইন্‌সল্যাণ্ডের অধিবাসী

(এরা নদীতীরবর্ত্তী উত্তর প্রদেশে বাস করে। অসুরের মত শক্তিশালী এই বর্ব্বরের দল দাঙ্গাহাঙ্গামায় সিদ্ধহস্ত। যুদ্ধের নামে একেবারে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠে, মরিয়ার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে। অধুনা এরা অল্প অল্প চাষবাসে মন দিতে শিখছে।)

মশক-মারক—(শুষ্ক তৃণের তৈরী এই রাক্ষস মূর্ত্তি দগ্ধ ক'রে তারা মশক নিবারণ করে)।

যাদুদণ্ড, অলঙ্কার ও চুরীঙ্গা বিগ্রহ
(দুইপাশে যাদুদণ্ড, মধ্যে ঈগলপাখীর নখের ও ঝালরের কণ্ঠহার এবং নিম্নে চুরীঙ্গা বা দলের শুভ-লিঙ্গ বিগ্রহ।)
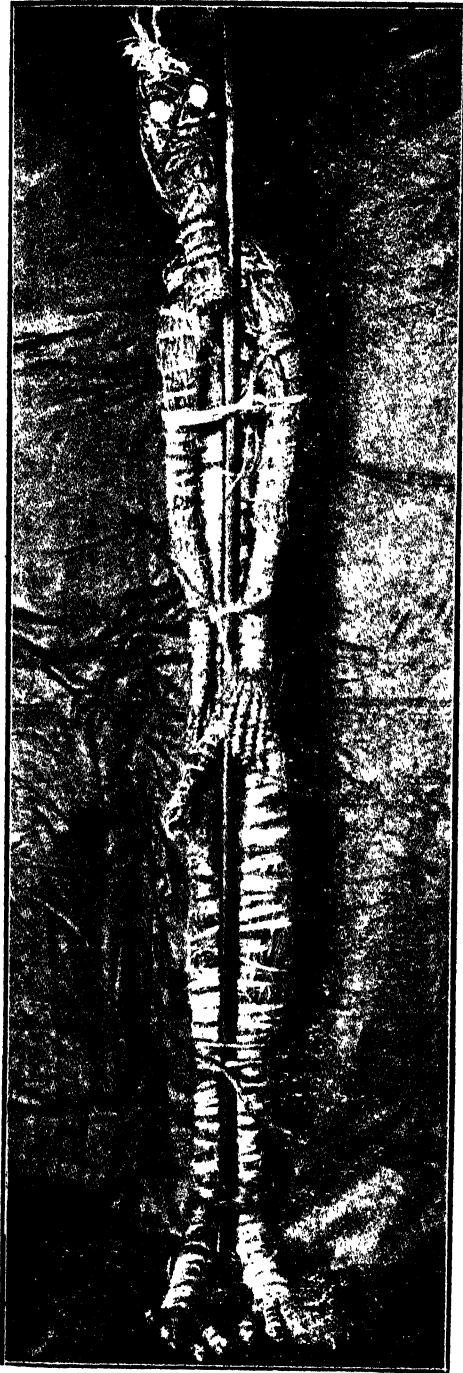
থাকে এবং উন্মাদের মতো পরস্পরকে আঘাত ক'রে আহত ও রুধিরাক্ত হ'য়ে ছুটোছুটি ক'রতে থাকে। যে স্থানে দলের মধ্যে একজন কারুর মৃত্যু ঘটে, অমনি তারা সদলে সে স্থান পরিত্যাগ ক'রে অন্যত্র গিয়ে আড্ডা গাড়ে।
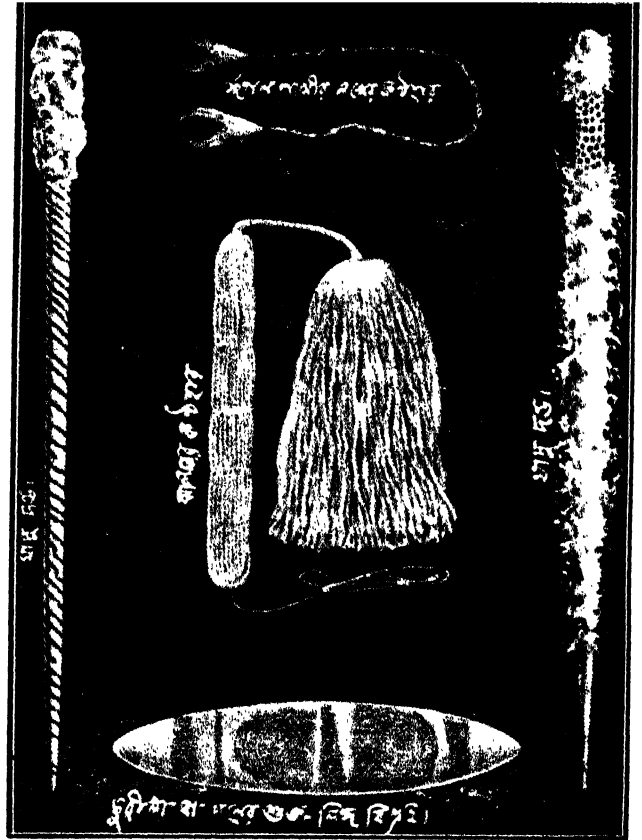
এই মৃত্যুর সময়ে শোকোচ্ছ্বাস আর সমাধি ও অস্থি-সংকার প্রভৃতি—অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানগুলি ছাড়া জংলী আষ্ট্রেলিয়ানদের জীবন প্রায় একরকম একঘেয়ে ভাবেই কেটে যায়; মাঝে মাঝে কেবল যা ঐ ওদের 'কড়োবেয়েড়ী' বা নৃত্য-উৎসব—তাদের সেই একঘেয়ে জীবনের পথে ক্ষণিকের জন্য বৈচিত্র্য এনে দেয়; নইলে তাদের পুরুষদের কাজ হ'চ্ছে সমস্তদিন ধরে পুরোণো অস্ত্র শস্ত্রগুলো মেরামত করা, আর নূতন অস্ত্র-শস্ত্র নির্ম্মাণ করা; মাঝে মাঝে 'ক্যাঙ্গারু' ও 'অপোশুম্' প্রভৃতি জানোয়ার শিকার করা এবং জালের সাহায্যে জীবন্ত 'এমু' পাখী ধরে বেড়ানো! স্ত্রীলোকদের এবং ছোট ছেলে মেয়েদের

মৌন-ভঙ্গ

(সাবালক হওয়ার উৎসব যে কদিন চলে, সে কদিন বালককে মৌনব্রত অবলম্বন ক'রে থাকতে হয়। পরে উৎসব-শেষে একটি সপল্লব বৃক্ষশাখার দ্বারা কোনও প্রবীণের শিরস্পর্শ করলেই তার মৌন-ব্রত উদ্‌যাপন হ'য়ে যায়।)

কাজ হ'চ্ছে গিরগিটি, সাপ, কেঁচো ইত্যাদি এবং সুখাদ্য কীট পতঙ্গ প্রভৃতি সংগ্রহ করে বেড়ানো। এ ছাড়া ঘাসের বীজ-সংগ্রহ করাও তাদের একটা প্রধান কাজ; কারণ এই ঘাসের বীজ গুড়িয়ে নিয়ে তারই চাকাচাকা মোটা রুটি বানিয়ে খেতে তারা অত্যন্ত ভালবাসে। এই রুটী তাদের কাছে যেমনি প্রিয় তেমনি তাদের শরীরের পক্ষেও পুষ্টিকর।

একটা প্রবল উৎসাহ এদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়, যখন এরা নতুন আর একদল স্বজাতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে! দু'মিনিটের মধ্যে এরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে নেয়। পুরুষেরা তাদের 'ধনুশ্চক্র' আর বর্ষা হাতে করে আগে আগে চলে, তাদের পিছনে পিছনে মেয়েরা এক একটা কাঠের ডাবা মাথায় ক'রে তার মধ্যে গৃহস্থালীর আবশ্যক দু'একটা জিনিস ভ'রে নিয়ে বাঁ হাতে কচি ছেলেটাকে ট্যাঁকে করে ডান হাতে এক-গাছা লাঠি নিয়ে চলে। ছোট ছেলে মেয়েদের ব'য়ে নিয়ে যাবার ভার পড়ে নিঃসন্তান যুবতীদের উপর।

দলটি যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায়, তারা যদি দেখে যে সেই অনাহুত অতিথিদের মধ্যে মেয়ে ছেলেরা আছে, তাহ'লে আর তাদের সেই হঠাৎ আগমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তারা কোনও রকম সন্দেহ করে না; কিন্তু আগন্তুকের দলে যদি কেবল-মাত্র পুরুষদেরই দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তাহলে তারা বুঝতে পারে যে, এদের উদ্দেশ্য মন্দ সুতরাং তারাও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়। তবে যুদ্ধটা তাদের মধ্যে কোনও দিনই বিশেষ মারা-ত্মক রকমের হয় না। গোটা-কতক 'ধনুশ্চক্র' আর বর্ষা নিক্ষেপের পরই উভয়

আল্পন—(উৎসব উপলক্ষে আল্পনা দেওয়ার প্রথা এদের মধ্যেও প্রচলিত আছে ; কিন্তু আমাদের দেশে যেমন স্ত্রীলোকরাই কেবল এ কাজ করে, ওদের মধ্যে তেমনি পুরুষদেরই এ কাজ করতে হয়।)
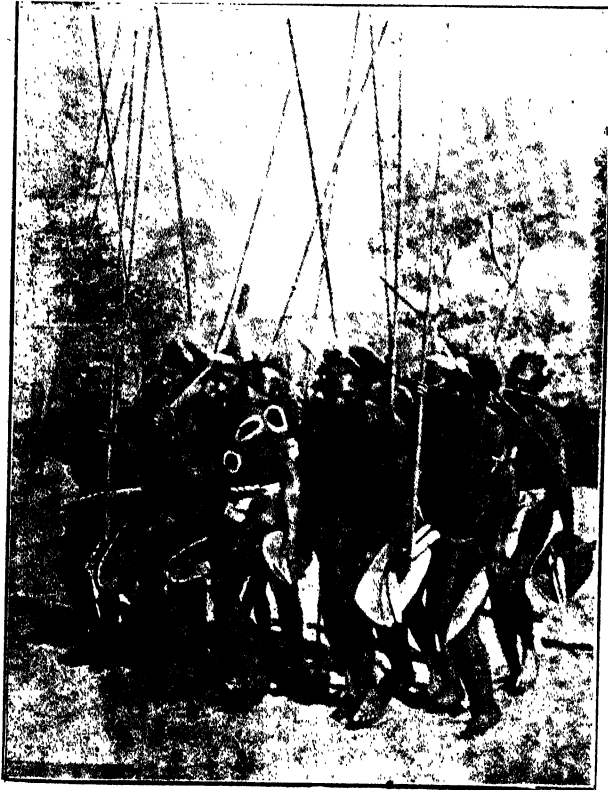
যুদ্ধযাত্রা—(কোনও স্বজাতি বা আত্মীয়ের মৃত্যু হ'লে এরা শত্রুপক্ষকে তার মৃত্যুর জন্য দায়ী করে' তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য সশস্ত্র হয়ে সদলে অভিযান করে।)

দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হ'য়ে যায়। এবং এক-বার সন্ধি হ'য়ে গেলে তখন আর তাদের মধ্যে কোনও প্রকার শত্রুতাই থাকে না।

মেয়েরা সঙ্গে থাকলে যুদ্ধের অনুষ্ঠানটা আর হয় না বটে, কিন্তু তা'বলে অতিথিদের তৎক্ষণাৎ অভিবাদন ক'রে গ্রহণ করাও হয় না। অতিথি-রাও একেবারে অপর দলের আড্ডার মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হয় না। উপযুক্ত অভ্যর্থনার জন্য অদূরে অপেক্ষা ক'রে বসে থাকে। প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা ক'রে বসে থাকবার পর স্থানীয় দলের লোকেরা এসে মহা সমাদরে তাদের আহ্বান ক'রে নিয়ে যায় এবং বিশেষ সমাদরে অতিথি-সৎকার করে।

এদের মধ্যে আর একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে এদের সামাজিক রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার। প্রত্যেকেরই এক একটা নাম আছে বটে, কিন্তু কেউ কারুর নাম ধ'রে ডাকে না, যার সঙ্গে যার যে সম্পর্ক তাকে সে সেই হিসেবে বাবা, মা, ভাই বা বোন বলে ডাকে। আবার মামা, খুড়ো, পিসে, মেসো, ঠাকুর্দ্দা, দাদা মশাই, সবাইকেই এরা 'বাবা' বলে ডাকে এবং ওই সকল সম্পর্কের

মেয়েদের সকলকেই তারা "মা" বলে সম্বোধন করে। আপন আত্মীয় কুটুম্বের মধ্যেই এদের বিবাহ করবার রীতি প্রচলিত ; কেবল সহোদরা ভগিনী, পিতৃব্য, কন্যা এবং মাসীমার মেয়েকে বিয়ে করা একেবারে নিষেধ। মামার মেয়েরা এবং পিসির মেয়েরাই হ'চ্ছে এদের ছেলেদের বিবাহ করবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্তা পাত্রী! বিবাহে যাতে সম্পর্ক নিয়ে কোনও গণ্ডগোল না বাধে, এইজন্যে তারা সম্পর্কটাকে চার শ্রেণীতে ভাগ

সুন্দরী বীভৎসতা—(যুবতীরা কিশোর বয়সেই সর্ব্বাঙ্গে অস্ত্র ক্ষত ক'রে রাখে। অঙ্গের এই অস্ত্র-ক্ষত-চিহ্ন তারা দৈহিক লাবণ্য-বৃদ্ধির সহায়ক বলে মনে করে।)

করেছে এবং কোন্ শ্রেণীর পুরুষ কোন্ শ্রেণীর মেয়েকে বিবাহ করতে পারে এবং সেই বিবাহের ফলে কোন্ শ্রেণীর দল পুষ্ট হবে তার একটি সুন্দর তালিকা করে রেখেছে। এই শ্রেণী চতুষ্টয়ের নাম হ'চ্ছে যথাক্রমে 'বানাকা' 'বুরোং' 'পাল্‌জেরী' আর 'কাইমেরা'।

বানাকার ভাই বোনেরাও 'বানাকা' আর পিতামহের দলও "বানাকা।" কিন্তু বানাকার পুত্র কন্যা ও পিতা পিতৃব্যের দল হ'চ্ছে 'পাল্‌জেরী'। বানাকার মাতা ও মাতুলরা হ'ল 'বুরোং' এবং মাতুল-সন্তানেরা 'কাইমেরা'। সুতরাং যে বানাকা সে ওই 'কাইমেরা' শ্রেণী ছাড়া অপর তিন শ্রেণীর মেয়েকে বিবাহ ক'রতে পারে না। এদের তালিকাটি মনে ক'রে রাখ্‌লে আর কোনও গোল হবে না।

পুং-বানাকা + স্ত্রী-কাইমেরা = পাল্‌জেরী
পুং-বুরোং + স্ত্রী-পাল্‌জেরী = কাইমেরা
পুং-কাইমেরা + স্ত্রী-বানাকা = বুরোং
পুং-পাল্‌জেরী + স্ত্রী-বুরোং = বানাকা

আষ্ট্রেলিয়ার সকল শ্রেণীর আদিম অধিবাসীদের মধ্যে পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণের পূর্ব্বেই তাদের মায়েরা এমন কি দুজন সখীর নিজেদের বিবাহ হবার আগেও তারা পরস্পরের নিকট 'বাগ্‌দত্তা' হ'য়ে থাকে যে তাদের বিবাহের পর তাদের গর্ভে যদি যথাক্রমে পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করে, তবে সেই পুত্র কন্যার মধ্যে বিবাহ-বন্ধন স্থাপিত হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সে দেশের

কুর্দাইছা—(শত্রুকে আক্রমণ করবার পূর্ব্বে এরা মন্ত্র উচ্চারণ ক'রতে ক'রতে গুঁড়ি মেরে অগ্রসর হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম "কুর্দাইছা", এবং এদের বিশ্বাস যে এই অনুষ্ঠান বিজয়ের অব্যর্থ অনুকূল।)

ছেলে মেয়েরা ভূমিষ্ঠ হবার আগেই তাদের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়ে থাকে! পিতামাতা বা অভিভাবকগণের পুত্র কন্যার জন্য পতিপত্নী নির্ব্বাচন ক'রে দেওয়ার রীতি যা এদেশে এখনও চল্‌ছে, এটা সেই প্রাচীন অসভ্য যুগের আদিম সামাজিক প্রথা!

কেবলমাত্র তারাই দুজনে পরস্পরের পুত্র কন্যার সঙ্গে বিবাহ দেবে বলে প্রতিশ্রুত বা' বাগদত্ত হ'তে পারে যাদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে বিবাহ হওয়া সম্ভব হবে; অর্থাৎ সম্পর্কে বাধবে না; যেমন ছেলের বাপের বোন, ছেলের মায়ের মামা তো বোনের সঙ্গে 'বেহান' সম্পর্ক পাতাতে পারে।

এই বাগ্‌দত্ত হ'য়ে থাকার প্রথা প্রচলিত আছে বলে সে দেশের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বয়সের বিভিন্ন পার্থক্য দেখ্‌তে পাওয়া যায়। যেমন দু'জন বাগদত্তা সখীর মধ্যে একজনের হয় ত আগেই কন্যা লাভ ঘটল, কিন্তু অন্যের পুত্র হ'ল বহুদিন পরে; সে স্থলে স্বামীকে সেই বয়োজ্যেষ্ঠা পত্নীই গ্রহণ করতে হয়। আবার যেখানে উভয়েরই পুত্রলাভ ঘটে, সেখানে উভয়ের পুত্রকেই অপেক্ষা ক'রে থা'কতে হয় যে পর্য্যন্ত না আবার তাদের জননীদের পরস্পরের গর্ভে কন্যা জন্মগ্রহণ করে। এরূপ স্থলে অনেক সময় হয় ত দুর্ভাগ্যদের যৌবন-সীমা পার হ'য়ে যাবার পর পত্নীলাভ ঘটে!

তাদের মধ্যে বিবাহের কোনও একটা বিশেষ পদ্ধতি নেই। কন্যা চতুর্দ্দশ বৎসরে পদার্পণ করলেই তাকে স্বামীর সহবাসে সমর্থা বলে বিবেচনা করা হয় এবং কন্যার আত্মীয়ারা গাছের ডালপালা ও লতাপাতার আচ্ছাদন দিয়ে একটি ঘেরাটোপ নির্ম্মাণ করে; একদিন চাঁদনী রাতে ভাবী বরকে তার মধ্যে আহ্বান করে এনে তার হাতে কন্যাকে অর্পণ করে। ব্যস, সেই মধুরাত্রির পর থেকে তারা আজীবন স্বামী স্ত্রী রূপে বসবাস ক'রতে থাকে। নানাপ্রকার সম্পর্কের বাধা ও বিবিধ দৈব বিপত্তির বশে সে দেশের ছেলে মেয়েদের মনের মতো স্বামীস্ত্রী পাওয়া একটা দুর্লভ ব্যাপার। অনেক সময় কোনও কোনও ছেলে মেয়েকে আজীবন অবিবাহিত অবস্থায় যাপন ক'রতে বাধ্য হ'তে হয়। তবে যারা সাহসী পুরুষ তারা জোর ক'রে অন্যের স্ত্রীকে অধিকার ক'রে নেয়, কিন্তু এই জোর ক'রে দখল করার মধ্যে একটা প্রচণ্ড অশান্তি এসে উপস্থিত হয় ব'লে সেটুকু এড়াবার জন্য প্রায়ই দেখা যায় অবৈধ প্রণয় বা গোপন-মিলনের সংখ্যাটাই তাদের মধ্যে বেশী। আবার অনেক সময় বিবাহের পূর্ব্বেই বাগদত্ত পুত্র কন্যারা যেখানে পরস্পরের জন্য নির্দ্ধারিত পতি পত্নীকে পছন্দ না ক'রে অন্য কোনও যুবক বা যুবতীর প্রণয়ে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, সেখানে তারা প্রায়ই ভাবী বিবাহের চুক্তি ভঙ্গ করে' তাদের মনোমত পাত্র পাত্রীর সঙ্গে মিলিত হ'য়ে অন্যত্র পলায়ন করে। তবে পলায়ন করেই যে তারা নিশ্চিন্ত হ'তে পারে তা নয়; কারণ স্ত্রী পাওয়া একটু দুর্লভ বলে ভাবী স্বামীর দল ও তাদের আত্মীয় স্বজন চারিদিকে পলাতকা বধূর অনুসন্ধান করতে থাকে এবং যদি তারা ধরা পড়ে, তাহ'লে সেই কন্যাকে তার নির্দ্দিষ্ট ভাবী স্বামীর নিকট ফিরে আস্‌তে বাধ্য হ'তে হয়; এবং সেই কন্যা-অপহরণকারী উক্ত ভাবী স্বামীর হাতে লাঞ্ছিত হয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে অপহরণ-কারী কোনও সম্পর্ক-বিরুদ্ধ নারীকে নিয়ে পলায়ন করে সে স্থলে অপহরণকারী এবং অপহৃতা উভয়কেই অবৈধ কার্য্যের জন্য ভীষণ দণ্ড ভোগ ক'রতে হয়; বিশেষতঃ যদি ভগ্নীস্থানীয়া কোনও বালিকার সঙ্গে এই অবৈধ প্রেম সংঘটিত হয় এবং তারা যদি উভয়ে পলায়ন ক'রে কোথাও দম্পতীর ন্যায় একত্র বসবাস করে, তা'হলে তাদের উভয়ের প্রাণদণ্ড করা হয়।

বহুবিবাহও তাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। যে অধিক পণ দিতে পারে সে একজনের তিন চারটি কন্যাকেই একত্রে বিবাহ কর'তে পারে। কিন্তু যার বেশী সঙ্গতি নাই তাকে একটীমাত্র স্ত্রী নিয়েই জীবন কাটাতে হয়। যদি কোনও স্বামী তার স্ত্রীর উপযুক্ত ভরণপোষণে অসমর্থ হয় তাহ'লে সে স্ত্রীর তাকে পরিত্যাগ ক'রে পত্যন্তর গ্রহণ করবার অধিকার আছে।

অতিথিকে আপ্যায়িত করবার জন্য আপন স্ত্রীকে পর্য্যন্ত দান করা তাদের একটা অবশ্য পালনীয় প্রথা। স্বামীর অবিবাহিত ভ্রাতাদের সহিত সহবাসও ভ্রাতৃবধূদের পক্ষে কোনও অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না। কোনও কোনও জাতের মধ্যে আবার এরূপ প্রথাও প্রচলিত দেখা যায় যে, স্বামীদের প্রতিবাসী ও বন্ধুবান্ধব যদি ইচ্ছা করে তবে পরস্পরের স্ত্রীকে যে কোনও দিন গ্রহণ ক'রতে পারে। অনেক সময় এই পরিবর্ত্তন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। (ক্রমশঃ)

বঙ্গীয় কাউন্সিলের নির্ব্বাচিত সদস্যগণ

(প্রথম পর্য্যায়)

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু এম এ, বি-এল
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র এম-এ, বি-এল কলিকাতা

মিঃ জে, এম, সেনগুপ্ত বার-এট্-ল
চট্টগ্রাম, অমুসলমান কেন্দ্র

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ব্যার-এট্-ল
মেদিনীপুর (দক্ষিণ) অমুসলমান কেন্দ্র

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী বার-এট্-ল
বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় এম-এ, বি-এল ২৪শ পরগণা

রাজা হৃষীকেশ লাহা
বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স

শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার
নদীয়া, অমুসলমান কেন্দ্র

ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ডি-এস সি
পূর্ব্ব কলিকাতা

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বার এট্-ল
সাউথ সেণ্ট্রাল কলিকাতা

তারকনাথ মুখোপাধ্যায়
হুগলী, অমুসলমান কেন্দ্র

রাজা মণিলাল সিংহ রায়
বর্দ্ধমান, অমুসলমান কেন্দ্র

নব-বিধান

(১)

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এই আখ্যায়িকার নায়ক শ্রীযুক্ত শৈলেশ্বর ঘোষাল পত্নী-বিয়োগান্তে পুনশ্চ সংসার পাতিবার সূচনাতেই যদি না বন্ধু মহলে একটু বিশেষ রকমের চক্ষুলজ্জায় পড়িয়া যাইতেন ত, এই ছোট্ট গল্পের রূপ এবং রঙ বদ্‌লাইয়া যে কোথায় কি দাঁড়াইত তাহা আন্দাজ করাও শক্ত। সুতরাং, ভূমিকায় সেই বিবরণ টুকু বলা আবশ্যক।

শৈলেশ্বর কলিকাতার একটা নামজাদা কলেজের দর্শনের অধ্যাপক,—বিলাতি ডিগ্রি আছে। বেতন আট শত। বয়স বত্রিশ। মাস পাঁচেক পূর্ব্বে বছর নয়েকের একটি ছেলে রাখিয়া স্ত্রী মারা গিয়াছে। পুরুষানুক্রমে কলিকাতার পটলডাঙায় বাস, বাড়ীর মধ্যে ওই ছেলেটি ছাড়া, বেহারা বাবুর্চ্চি, সহিস কোচমান প্রভৃতিতে পায় সাত আট জন চাকর। ধরিতে গেলে সংসারটা এক রকম এই সব চাকরদের লইয়াই।

প্রথমে বিবাহ করিবার আর ইচ্ছাই ছিলনা। ইহা স্বাভাবিক। এখন ইচ্ছা হইয়াছে। ইহাতেও নূতনত্ব নাই। সম্প্রতি জানা গিয়াছে ভবানীপুরের ভূপেন বাঁড়ুয্যের মেজ মেয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছে এবং সে দেখিতে ভাল। এরূপ কৌতূহল ও সম্পূর্ণ বিশেষত্বহীন, তথাপি সেদিন সন্ধ্যাকালে শৈলেশেরই বৈঠকখানায় চায়ের বৈঠকে এই আলোচনাই উঠিয়া পড়িল। তাহার বন্ধু-সমাজের ঠিক ভিতরের না হইয়াও একজন অল্প বেতনের ইস্কুল পণ্ডিত ছিলেন, চা-রসের পিপাসাটা তাঁহার কোন বড়-বেতনের প্রফেসারের চেয়েই ন্যূন ছিলনা। পাগ্‌লাটে গোছের বলিয়া প্রফেসররা তাহাকে দিগ্‌গজ বলিয়া ডাকিতেন। সে হিসাব করিয়াও কথা বলিতনা, তাহার দায়িত্বও গ্রহণ করিতনা। দিগ্‌গজ নিজে ইংরাজি জানিতনা, মেয়ে মানুষে এন্ট্রান্স পাশ করিয়াছে শুনিলে রাগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইত। ভূপেন বাবুর কন্যার প্রসঙ্গে সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, একটা বৌকে তাড়ালেন, একটা বৌকে খেলেন, আবার বিয়ে? সংসার করতেই যদি হয় ত উমেশ ভট্‌চায্যির মেয়ে দোষটা করলে কি শুনি? ঘর করতে হয় ত তাকে নিয়ে ঘর করুন।

ভদ্রলোকেরা কেহই কিছু জানিতেন না, তাঁহারা আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। দিগ্‌গজ কহিল, সে বেচারার দিকে ভগবান যদি মুখ তুলে চাইলেন ত তাকেই বাড়ীতে আনুন,—আবার একটা বিয়ে করবেন না। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ! পাশ হয়ে ত সব হবে! রাগে তাহার দুই চক্ষু রাঙা হইয়া উঠিল। শৈলেশ্বর নিজেও কোনমতে ক্রোধ দমন করিয়া কহিলেন, আরে, সে যে পাগল দিগ্‌গজ।

কেহ কাহাকেও পাগল বলিলে দিগ্‌গজের আর হুঁস থাকিতনা, সে ক্ষেপিয়া উঠিয়া কহিল, পাগল সব্বাই! আমাকেও লোকে পাগল বলে,—তাই বলে আমি পাগল!

সকলেই উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া ব্যাপারটা চাপা পড়িলনা। হাসি থামিলে শৈলেশ লজ্জিত মুখে ঘটনাটা বিবৃত করিয়া কহিল, আমার জীবনে সে একটা অত্যন্ত unfortunate ব্যাপার। বিলাত যাবার আগেই আমার বিয়ে হয়, কিন্তু শ্বশুরের সঙ্গে বাবার কি একটা নিয়ে ভয়ানক বিবাদ হয়ে যায়। তা'ছাড়া মাথা খারাপ বলে বাবা তাঁকে বাড়ীতে রাখতেও পারেননি। ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে এসে আমি আর দেখিনি। এই বলিয়া শৈলেশ জোর করিয়া একটু হাসির চেষ্টা করিয়া কহিলেন, ওহে দিগ্‌গজ! বুদ্ধিমান! তা' না হলে কি তাঁরা একবার পাঠাবার চেষ্টাও করতেননা? চায়ের মজ্‌লিসে গরহাজির ত কখনো দেখ্‌লুমনা, কিন্তু তিনি সত্যি সত্যিই এলে এ আশা আর কোরোনা। গঙ্গাজল আর গোবরছড়ার সঙ্গে তোমাদের সকলকে ঝেঁটিয়ে সাফ

করে তবে ছাড়বেন, এ নোটিশ তোমাদের আগে থেকেই দিয়ে রাখ্‌লুম!

দিগগ্‌জ জোর করিয়া বলিল, কথ্‌খনো না!

কিন্তু এ কথায় আর কেহ যোগ দিলেননা। ইহার পরে, সাধারণ গোছের দুই চারিটা কথাবার্ত্তার পরে রাত্রি হইতেছে বলিয়া সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। প্রায় এম্‌নি সময়েই প্রত্যহ সভাভঙ্গ হয়,—হইলও তাই কিন্তু আজ কেমন একটা বিষণ্ণ, ম্লান ছায়া সকলের মুখের পরেই চাপিয়া রহিল,—সে যেন আজ আর ঘুচিতে চাহিলনা।

(২)

বন্ধুরা যে তাহার তৃতীয়বার দার-পরিগ্রহের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেননা, বরঞ্চ নিঃশব্দে তিরস্কৃত করিয়াই গেলেন, শৈলেশ তাহা বুঝিল। একদিকে যেমন তাহার বিরক্তির সীমা রহিলনা, অপরদিকে তেম্‌নি লজ্জারও অবধি রহিলনা। তাহার মুখ দেখানো যেন ভার হইয়া উঠিল। শৈলেশের আঠারো বৎসর বয়সে যখন প্রথম বিবাহ হয়, তাহার স্ত্রী উষার বয়স তখন মাত্র এগারো। মেয়েটি দেখিতে ভাল বলিয়াই কালিপদবাবু অল্পমূল্যে ছেলে বেচিতে রাজী হইয়াছিলেন, তথাপি ঐ দেনা-পাওনা লইয়াই শৈলেশ বিলাত চলিয়া গেলে দুই বৈবাহিকে তুমুল মনোমালিন্য ঘটে। শ্বশুর বধূকে এক প্রকার জোর করিয়াই বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দেন, সুতরাং পুত্র দেশে ফিরিয়া আসিলে নিজে যাচিয়া আর বৌ আনাইতে পারিলেননা। ইচ্ছাও তাঁহার ছিলনা। ওদিকে উমেশ তর্কালঙ্কারও অতিশয় অভিমানী প্রকৃতির লোক ছিলেন, অযাচিত কোন মতেই ব্রাহ্মণ নিজের ও কন্যার সম্মান বিসর্জ্জন দিয়া মেয়েকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইতে সম্মত হইলেননা। শৈলেশ প্রবাসে থাকিতেই এই সকল ব্যাপারের কিছু কিছু শুনিয়াছিল; ভাবিয়াছিল বাড়ী গেলেই সমস্ত ঠিক হইয়া যাইবে; কিন্তু বছর চারেক পরে যখন যথার্থই বাড়ী ফিরিল, তখন তাহার স্বভাব ও প্রকৃতি দুই-ই বদ্‌লাইয়া গেছে অতএব আর একজন বিলাত-ফেরতের বিলাতি আদপ-কায়দা-জানা বিদুষী মেয়ের সহিত যখন বিবাহের সম্ভাবনা হইল, তখন সে চুপ করিয়াই সম্মতি দিল। ইহার পরে বহুদিন গত হইয়াছে। শৈলেশের পিতা কালিপদ বাবুও মরিয়াছেন, বৃদ্ধ তর্কালঙ্কারও স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এতকালের মধ্যে ও-বাড়ীর কোন খবরই যে শৈলেশের কানে যায় নাই তাহা নহে। সে ভায়েদের সংসারে আছে, জপ-তপ, পূজা-অর্চ্চা, গঙ্গাজল ও গোবর লইয়া দিন কাটিতেছে—তাহার শুচিতার পাগ্‌লামিতে ভাইয়েরা পর্য্যন্ত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কোনটাই তাহার শ্রুতিসুখকর নহে, কেবল, একটু সান্ত্বনা এই ছিল যে, এই প্রকৃতির নারীদের চরিত্রের দোষ বড় কেহ দেয়না। দিলে শৈলেশের কতখানি লাগিত বলা কঠিন, কিন্তু এ দুর্নামের আভাস মাত্রও কোন সূত্রে আজও তাহাকে শুনিতে হয় নাই।

শৈলেশ ভাবিতে লাগিল। ভূপেনবাবুর শিক্ষিতা কন্যার আশা সম্প্রতি পরিত্যাগ না করিলেই নয়, কিন্তু পল্লী অঞ্চল হইতে আনিয়া একজন পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের কুশিক্ষিতা রমণীর প্রতি গৃহিণীপনার ভার দিলে তাহার এতদিনের ঘর-সংসারে যে দক্ষযজ্ঞ বাধিবে, তাহাতে সংশয় মাত্র নাই। বিশেষতঃ, সোমেন। তাহার জননীই যে তাহার সমস্ত দুর্ভাগ্যের মূল এই কথা স্মরণ করিয়া তাহার একমাত্র পুত্রকে যে সে কিরূপ বিদ্বেষের চোখে দেখিবে তাহা মনে করিতেই মন তাহার শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার ভগিনীর বাড়ী শ্যামবাজারে। বিভা ব্যারিষ্টারের স্ত্রী, সেখানে ছেলে থাকিবে ভাল, কিন্তু ইহা ত' চিরকালের ব্যবস্থা হইতে পারে না। দিগগজ পণ্ডিতকে তাহার যেন চড়াইতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। লোকটাকে অনেকদিন সে অনেক চা ও বিস্কুট খাওয়াইয়াছে, সে এম্‌নি করিয়া তাহার শোধ দিল!

শৈলেশ আসলে লোক মন্দ ছিলনা, কিন্তু সে অত্যন্ত দুর্ব্বল প্রকৃতির মানুষ। তাই, সত্যকার লজ্জার চেয়ে চক্ষুলজ্জাই তাহার প্রবল ছিল। বিদ্যাভিমানের সঙ্গে আর একটা বড় অভিমান তাহার এই ছিল যে, সে জ্ঞানতঃ, কাহারও প্রতি লেশমাত্র অন্যায় বা অবিচার করিতে পারেনা। বন্ধুরা মুখে না বলিলেও মনে মনে যে তাহাকে এই ব্যাপারে অত্যন্ত অপরাধী করিয়া রাখিবে ইহা বুঝিতে বাকি ছিলনা,—এই অখ্যাতি সহ্য করা তাহার পক্ষে অসম্ভব।

সারারাত্রি চিন্তা করিয়া ভোর নাগাদ তাহার মাথায় সহসা অত্যন্ত সহজ বুদ্ধির উদয় হইল। তাহাকে আনিতে

পাঠাইলেই ত' সকল সমস্যার সমাধান হয়! প্রথমতঃ সে আসিবে না। যদি বা আসে ম্লেচ্ছর সংসার হইতে সে ছুদিনেই আপনি পলাইবে। তখন কেহই আর তাহাকে দোষ দিতে পারিবে না। এই ছু' পাঁচ দিন সোমেনকে তাহার পিসীর বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া নিজে অন্যত্র কোথাও গা ঢাকা দিয়া থাকিলেই হইল! এত সোজা কথা কেন যে তাহার এতক্ষণ মনে হয় নাই ইহা ভাবিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এই ত' ঠিক!

কলেজ হইতে সে সাতদিনের ছুটি লইল। এলাহাবাদে একজন বাল্যবন্ধু ছিলেন, নিজের যাওয়ার কথা তাঁহাকে তার করিয়া দিল, এবং বিভাকে চিঠি লিখিয়া দিল যে, সে নন্দীপুর হইতে ঊষাকে আনিতে পাঠাইতেছে, যদি আসে ত সে যেন আসিয়া সোমেনকে শ্যামবাজারে লইয়া যায়। এলাহাবাদ হইতে ফিরিতে তাহার দিন সাতেক বিলম্ব হইবে।

শৈলেশের এক অনুগত মামাতো ভাই ছিল, সে মেসে থাকিয়া সদাগরী আফিসে চাকুরি করিত। তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিল, ভুতো, তোকে কাল একবার নন্দীপুরে গিয়ে তোর বৌদিদিকে আন্‌তে হবে।

ভুতনাথ বিস্মিত হইয়া কহিল, বৌদিদিটা আবার কে?

তুই ত বর-যাত্রী গিয়েছিলি, তোর মনে নেই? উমেশ ভট্‌চাযি্যর বাড়ী?

মনে খুব আছে, কিন্তু কেউ কারুকে চিনিনে, তিনি আস্‌বেন কেন আমার সঙ্গে?

শৈলেশ কহিল, না আসে নেই—নেই। তোর কি? সঙ্গে বেহারা আর ঝি যাবে। আস্‌বে না বল্‌লেই ফিরে আস্‌বি।

ভুতো আশ্চর্য্য হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আচ্ছা যাবো। কিন্তু মার-ধর না করে।

শৈলেশ তাহার হাতে খরচ-পত্র এবং একটা চাবি দিয়া কহিল, আজ রাত্রের ট্রেণে আমি এলাহাবাদ যাচ্চি। সাতদিন পরে ফিরবো। যদি আসে এই চাবিটা দিয়ে ওই আলমারিটা দেখিয়ে দিবি। সংসার খরচের টাকা রইল। পুরো একমাস চলা চাই।

ভুতনাথ রাজী হইয়া কহিল, আচ্ছা। কিন্তু হঠাৎ তোমার এ খেয়াল হল কেন মেজ্‌দা? খাল খুঁড়ে কুমীর আন্‌ছনা ত?

শৈলেশ চিন্তিত মুখে খানিকক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আস্‌বেনা নিশ্চয়। কিন্তু লোকতঃ ধর্ম্মতঃ একটা কিছু করা চাই ত! শ্যামবাজারে একটা খবর দিস্‌। সোমেনকে যেন নিয়ে যায়।

রাত্রের পঞ্জাব মেলে শৈলেশ্বর এলাহাবাদ চলিয়া গেল।

(৩)

দিন কয়েক পরে একদিন ছুপুরবেলা বাটীর দরজায় আসিয়া একখানা মোটর থামিল। এবং, মিনিট ছুই পরেই একটি বাইশ তেইশ বছরের মহিলা প্রবেশ করিয়া বসিবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মেঝের কার্পেটে বসিয়া সোমেন্দ্র একখানা মস্ত বাঁধানো এ্যালবাম হইতে তাহার নূতন মাকে ছবি দেখাইতেছিল; সে-ই মহা আনন্দে পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিল, মা, পিসিমা।

ঊষা উঠিয়া দাঁড়াইল। পরনে নিতান্ত সাদা-সিধা একখানি রাঙা-পেড়ে শাড়ী, হাতে এবং গলায় সামান্য ছুই একখানি গহনা, কিন্তু তাহার রূপ দেখিয়া বিভা অবাক হইল।

প্রথমে ঊষাই কথা কহিল। একটু হাসিয়া ছেলেকে বলিল, পিসিমাকে প্রণাম করলেনা বাবা?

সোমেনের এ শিক্ষা বোধ করি নূতন, সে তাড়াতাড়ি হেঁট হইয়া পিসিমার পায়ের বুট ছুঁইয়া কোনমতে কাজ সারিল। ঊষা কহিল, দাঁড়িয়ে রইলে ঠাকুরঝি, বোসো?

বিভা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কবে এলেন?

ঊষা বলিল, সোমবারে এসেছি, আজ বুধবার,—তা'হলে তিন দিন হল। কিন্তু, দাঁড়িয়ে থাক্‌লে হবে কেন ভাই, বোসো।

বিভা ভাব করিতে আসে নাই, বাড়ী হইতেই মনটাকে সে তিক্ত করিয়া আসিয়াছিল, কহিল, বসবার সময় নেই আমার,—ঢের কাজ। সোমেনকে আমি নিতে এসেচি।

কিন্তু এই রুক্ষতার জবাব ঊষা হাসিমুখে দিল। কহিল, আমি একলা কি করে থাক্‌বো ভাই? সেখানে বৌয়েদের সব ছেলেপুলেই আমার হাতে মানুষ। কেউ একজন কাছে না থাক্‌লে ত আমি বাঁচিনে ঠাকুরঝি। এই বলিয়া সে পুনরায় হাসিল।

এই হাসির উত্তর বিভা কটুকণ্ঠেই দিল। ছেলেটিকে ডাকিয়া কহিল, তোমার বাবা বলেছেন আমার ওখানে

গিয়ে থাক্‌তে। আমার নষ্ট করবার সময় নেই সোমেন,—যাও তো শীগ্‌গীর কাপড় পরে নাও; আমাকে আবার একবার নিউমার্কেট ঘুরে যেতে হবে।

দুজনের মাঝখানে পড়িয়া সোমেন ম্লানমুখে ভয়ে ভয়ে বলিল, মা যে যেতে বারণ করচেন পিসিমা? তাহার বিপদ দেখিয়া উষা তাড়াতাড়ি বলিল, তোমাকে যেতে আমি বারণ করছিনে বাবা, আমি শুধু এই বলচি যে, তুমি চলে গেলে একলা বাড়ীতে আমার বড় কষ্ট হবে।

ছেলেটি মুখে ইহার জবাব কিছু দিল না, কেবল অত্যন্ত কাছে ঘেঁসিয়া আসিয়া বিমাতার আঁচল ধরিয়া দাঁড়াইল। তাহার চুলের মধ্যে দিয়া আঙুল বুলাইতে বুলাইতে উষা হাসিয়া কহিল, ও যেতে চায়না ঠাকুরঝি।

লজ্জায় ও ক্রোধে বিভার মুখ কালো হইয়া উঠিল, এবং অতি-সভ্য সমাজের সংস্র উচ্চাঙ্গের শিক্ষা সত্ত্বেও সে আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিল না। কহিল, ওর কিন্তু যাওয়াই উচিত। এবং আমার বিশ্বাস আপনি অন্যায় প্রশ্রয় না দিলে ও বাপের আজ্ঞা পালন করতো।

উষার ঠোঁটের কোন দুটা শুধু একটুখানি কঠিন হইল, আর তাহার মুখের চেহারায় কোন ব্যতিক্রম লক্ষিত হইল না, কহিল, আমরা বুড়োমানুষেই নিজের উচিত করে উঠ্‌তে পারিনে ভাই, সোমেন ত ছেলেমানুষ। ও বোঝেই বা কতটুকু। আর অন্যায় প্রশ্রয়ের কথা যদি তুল্‌লে ঠাকুরঝি, আমি অনেক ছেলে মানুষ করেচি, এ সব আমি সাম্‌লাতে জানি। তোমাদের দুশ্চিন্তার কারণ নেই।

বিভা কঠোর হইয়া কহিল, দাদাকে তা'হলে চিঠি লিখে দেবো।

উষা কহিল, দিয়ো। লিখে দিয়ো যে তাঁর এলাহাবাদের হুকুমের চেয়ে আমার কলকাতার হুকুমটাই আমি বড় মনে করি। কিন্তু দেখ ভাই বিভা, আমি তোমার সম্পর্কে এবং বয়সে দুই-ই বড়, এই নিয়ে আমার উপরে তুমি অভিমান করতে পাবে না। এই বলিয়া সে পুনরায় একটুখানি হাসিয়া কহিল, আজ তুমি রাগ করে একবার বস্‌লে না পর্য্যন্ত, কিন্তু আর একদিন তুমি নিজের ইচ্ছের বৌদিদির কাছে এসে বস্‌বে, এ কথাও আমি তোমাকে বলে রাখলুম।

বিভা এ কথার কোন উত্তর দিল না, কহিল, আজ আমার সময় নেই,—নমস্কার। এই বলিয়া সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। গাড়ীতে বসিয়া হঠাৎ সে উপরের দিকে চোখ তুলিতেই দেখিতে পাইল বারান্দার রেলিঙ ধরিয়া উষা সোমেনকে লইয়া তাহার প্রতি চাহিয়া মূর্ত্তির মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

(৪)

সাত দিনের ছুটি, কিন্তু প্রায় সপ্তাহ দুই এলাহাবাদে কাটাইয়া হঠাৎ একদিন দুপুর বেলা শৈলেশ্বর আসিয়া বাটীতে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখের নীচের বারান্দায় বসিয়া সোমেন্দ্র কতকগুলা কাঠি, রঙ-বেরঙের কাগজ, আঠা, দড়ি ইত্যাদি লইয়া অতিশয় ব্যস্ত ছিল, পিতার আগমন প্রথমে সে লক্ষ্য করে নাই, কিন্তু দেখিবামাত্রই সম্বর্দ্ধনা করিল, এবং লজ্জিত আড়ষ্ট ভাবে পায়ের কাছে ঢিপ্‌ করিয়া প্রণাম করিল। গুরুজনদিগকে প্রণাম করার ব্যাপারে এখনো সে পটুত্ব লাভ করে নাই, তাহার মুখ দেখিয়াই তাহা বুঝা গেল। খুব মন্দ না লাগিলেও শৈলেশ বিস্মিত হইলেন। কিন্তু ঐ কাগজ-কাঠি-আঠা প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি পড়াতেই বলিয়া উঠিলেন, ও সব তোমার কি হচ্চে সোমেন?

সোমেন রহস্যটা এক কথায় ফাঁস করিল না, বলিল, তুমি বল ত বাবা ও কি?

বাবা বলিলেন, আমি কি করে জান্‌ব?

ছেলে হাততালি দিয়া মহা আনন্দে কহিল, আকাশ-প্রদীপ!

আকাশ-প্রদীপ! আকাশ-প্রদীপ কি হবে?

ইহার অদ্ভুত বিবরণ সোমেন আজ সকালেই শিখিয়াছে, কহিল, আজ সংক্রান্তি, কাল সন্ধ্যাবেলায় উই উঁচুতে বাঁশ বেঁধে টাঙাতে হবে বাবা। মা বলেন, আমার ঠাকুর্দ্দাদারা যাঁরা স্বর্গে আছেন, তাঁদের আলো দেখাতে হয়। তাঁরা আশীর্ব্বাদ করেন।

শৈলেশের মেজাজ গরম হইয়াই ছিল, টান মারিয়া পা দিয়া সমস্ত ফেলিয়া দিয়া ধমক দিয়া কহিলেন, আশীর্ব্বাদ করেন! যত সমস্ত কুসংস্কার,—যা' পড়গে যা' বল্‌চি।

তাহার এত সাধের আকাশ-প্রদীপ ছত্রাকার হইয়া পড়ায় সোমেন কাঁদ-কাঁদ হইয়া উঠিল। উপরে কোথা

হইতে অত্যন্ত মিষ্ট কণ্ঠের ডাক আসিল, বাবা সোমেন, কাল বাজার থেকে আমি আরও ভাল একটা আকাশ-প্রদীপ তোমাকে কিনে আনিয়ে দেব, তুমি আমার কাছে এস।

সোমেন চোখ মুছিতে মুছিতে উপরে চলিয়া গেল। শৈলেশ কোনদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া গম্ভীর বিরক্ত মুখে তাঁহার পড়িবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। পরক্ষণেই ছোট্ট ঘণ্টার শব্দ হইল—টুন্ টুন্ টুন্ টুন্! কেহ সাড়া দিল না।

আবদুল?

আবদুল আসিল না।

গিরধারী? গিরধারী?

গিরধারীর পরিবর্ত্তে বাঙালী চাকর গোকুল গিয়া পর্দ্দার ফাঁক দিয়া মুখ বাড়াইয়া কহিল, আজ্ঞে—

শৈলেশ ভয়ানক ধমক দিয়া উঠিলেন, আজ্ঞে? ব্যাটারা মরেচিস্?

গোকুল বলিল, আজ্ঞে না।

আজ্ঞে না? আবদুল কই?

গোকুল কহিল, মা তাকে ছুটি দিয়েছেন, সে বাড়ী গেছে।

ছুটি দিয়েছেন! বাড়ী গেছে! গিরধারী কোথা গেল?

গোকুল জানাইল সেও ছুটি পাইয়া দেশে চলিয়া গেছে। শৈলেশ স্তম্ভিত হইয়া কহিলেন, বাড়ীতে কি লোকজন কেউ আর নেই নাকি?

গোকুল ঘাড় নাড়িয়া বলিল,আজ্ঞে, আর সবাই আছে।

তাই বা আছে কেন? যা দূর হ—

শৈলেশর নিজেই তখন জুতা খুলিল, কোট খুলিয়া টেবিলের উপরেই জড় করিয়া রাখিল; আলনা হইতে কাপড় লইয়া ট্রাউজার খুলিয়া দূরের একটা চেয়ার লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়া ফেলিতে সেটা নীচে পড়িয়া লুটাইতে লাগিল; নেক্‌টাই কলার প্রভৃতি যেখানে সেখানে ফেলিয়া দিয়া নিজের চৌকিতে গিয়া বসিতেই ঠিক সম্মুখেই টেবিলের উপরে ছোট্ট একটি খাতা তাহার চোখে পড়িল, —মলাটে লেখা, সংসার খরচের হিসাব। খুলিয়া দেখিল মেয়েলি অক্ষরের চমৎকার স্পষ্ট লেখা। দৈনিক খরচের অঙ্ক,—মাছ এত, শাক এত, চাল এত, ডাল এত,—হঠাৎ দ্বারের পর্দ্দা সরানোর শব্দে চকিত হইয়া দেখিল কে একজন স্ত্রীলোক প্রবেশ করিতেছে। সে আর যেই হোক দাসী নয়, তাহা চক্ষের পলকে অনুভব করিয়া শৈলেশ হিসাবের খাতার মধ্যে একেবারে মগ্ন হইয়া গেল। যে আসিল সে তাহার পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তুমি কি এতবেলায় আবার চা খাবে না কি? কিন্তু তাহ'লে আর ভাত খেতে পারবে না।

ভাত খাবো না।

না খাও, হাত মুখ ধুয়ে ওপরে চল। অবেলায় স্নান করে আর কাজ নেই, কিন্তু জলখাবার ঠিক করে আমি কুমুদাকে সরবৎ তৈরি করতে বলে এসেচি। চল।

এখন থাক্।

ওগো আমি ঊষা,—বাঘ ভালুক নই। আমার দিকে চোখ তুলে চাইলে কেউ তোমাকে ছি ছি করবেনা।

শৈলেশ কহিল, আমি কি বলেচি তুমি বাঘ ভালুক?

তবে অমন করে পালিয়ে বেড়াচ্চো কেন?

আমার কাজ ছিল। তুমি বিভার সঙ্গে ঝগড়া করলে কেন?

ঊষা কহিল, ও তোমার বানানো কথা। তোমাকে সে কখ্‌খনো লেখেনি আমি ঝগড়া করেচি।

শৈলেশ কহিল, তুমি আবদুলকে তাড়িয়েচ কেন?

কে বলেচে তাড়িয়েচি? সে এক বছরের মাইনে পায়নি, বাড়ী যাবার জন্যে ছট্‌ফট্ করছিল; আমি মাইনে চুকিয়ে দিয়ে তাকে ছুটি দিয়েচি।

শৈলেশ বিস্মিত হইয়া কহিল, সমস্ত চুকিয়ে দিয়েছ? তাহ'লে সে আর আস্‌বেনা। গিরিধারী গেল কেন?

ঊষা কহিল, এ তো তোমার ভারি অন্যায়। চাকর বাকরদের মাইনে না দিয়ে আট্‌কে রাখা—কেন, তাদের কি বাড়ী-ঘর-দোর নেই না কি? আমি তাকে মাইনে দিয়ে ছেড়ে দিয়েচি।

শৈলেশ কহিল, বেশ করেচ। এইবার বশিষ্ঠ মুনির আশ্রম বানিয়ে তুলো। সে হিসাবের পাতার উপরে দৃষ্টি রাখিয়াই কথা কহিতেছিল, হঠাৎ একটা বড় অঙ্ক তাহার চোখে পড়িতেই চমকিয়া কহিল, এটা কি? চারশ ছ' টাকা—

উষা উত্তর দিল, ও টাকাটা মুদির দোকানে দিয়েছি। এখনো বোধ করি শ'ছুই আন্দাজ বাকি রইল, বলেচি আস্‌চে মাসে দিয়ে দেব।

শৈলেশ অবাক হইয়া বলিল, ছ'শ টাকা মুদির দোকানে বাকি?

উষা হাসিয়া কহিল, হবেনা? কখনো শোধ করবেনা, কখনো হিসেব দেখ্‌তে চাইবেনা,—কাজেই দুবচ্ছর ধরে এই টাকাটা জমিয়ে তুলেচ।

শৈলেশ এতক্ষণে মুখ তুলিয়া চাহিল, বলিল, তুমি কি এই দুবৎসরের হিসেব দেখ্‌লে নাকি?

উষা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, নইলে আর উপায় ছিল কি?

শৈলেশ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, কিন্তু তাহার মুখের উপরে যে লজ্জার ছায়া পড়িতেছে, এ কথা এ পাঁচ মিনিটের পরিচয়েও উষার চিনিতে বাকি রহিলনা, জিজ্ঞাসা করিল, কি ভাব্‌চো বল ত?

শৈলেশ হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, ভাব্‌ছি টাকা যা ছিল সব তো খরচ করে ফেল্‌লে, কিন্তু মাইনে পেতে যে এখনো পনর ষোল দিন বাকী?

উষা মাথা নাড়িয়া কহিল, আমি কি ছেলে মানুষ যে সে হিসেব আমার নেই? পনর দিন কেন, এক মাসের আগেও আমি তোমার কাছে টাকা চাইতে আসবোনা। কিন্তু কি কাণ্ড করে রেখেছ বল ত? গোয়ালা বল্‌ছিল তার পায় দেড়শ টাকা পাওনা, ধোপা পাবে পঞ্চাশ টাকার ওপর, আর দর্জ্জির দোকানে যে কত পড়ে আছে সে শুধু তারাই জানে। আমি হিসেব পাঠাতে বলে পাঠিয়েছি।

শৈলেশ অত্যন্ত ভয় পাইয়া বলিল, করেচ কি? তারা হয়ত হাজার টাকাই পাওনা বল্‌বে কি, কি,—দেবে কোথা থেকে?

উষা নিশ্চিন্তমুখে কহিল, একেবারেই দিতে পারবো তা তো বলিনি, আমি তিন চার মাসে শোধ কোরব। আর কারও কাছে ত কিছু ধার করে রাখোনি? আমাকে লুকিয়োনা।

শৈলেশ তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিয়া শেষে আস্তে আস্তে বলিল, গত বৎসর গ্রীষ্মের ছুটিতে সিম্‌লা যেতে একজনের কাছে হ্যাণ্ডনোটে দু-হাজার টাকা ধার নিয়েছিলাম, একটা টাকা সুদ পর্য্যন্ত দিতে পারিনি।

উষা গালে হাত দিয়া বলিল, অবাক কাণ্ড! কিন্তু পরক্ষণেই হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, তুমিও দেখ্‌চি এক বছরের আগে আর আমাকে ঋণমুক্ত হতে দেবে না। কিন্তু আর কিছু নেই ত?

শৈলেশ বলিল, বোধ হয় না। সামান্য কিছু থাক্‌তেও পারে, কিন্তু আমি ত ভেবেচি এ জন্মে ও আর শোধ দিতে পারব না।

উষা কহিল, তুমি কি সত্যিই কখনো ভাবো?

শৈলেশ বলিল, ভাবিনে? কতদিন অর্দ্ধেক রাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়ে যেন দম আট্‌কে এসেচে। মাইনেতে কুলোয় না, প্রতি মাসেই টানাটানি হয়, কিন্তু আমাকে তুমি ভুলিয়োনা। যথার্থই কি আশা কর শোধ করতে পারবে?

উষার চোখের কোন সহসা সজল হইয়া আসিল। যে স্বামীকে সে মাত্র অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বেও চিনিতনা বলিলেও অত্যুক্তি হয়না, তাহারই জন্য হৃদয়ে সত্যকার বেদনা অনুভব করিল, কিন্তু হাসিয়া বলিল, তুমি বেশ মানুষ ত! সংসার করতে ধার হয়েছে, শোধ দিতে হবেনা? কিন্তু এই ক'টা টাকা দিয়ে ফেল্‌তে আমার ক'দিন লাগবে!

সকলের বড় কষ্ট হবে—

উষা জোর দিয়া বলিল, কারও না। তোমরা হয়ত টেরও পাবেনা কোথাও কোন পরিবর্ত্তন হয়েছে।

শৈলেশ স্থিরভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল অনেক দিনের মেঘ্‌লা আকাশের কোন্ একটা ধার দিয়া যেন তাহার গায়ে রোদ আসিয়া পড়িয়াছে। (ক্রমশঃ)

সম্পাদকের বৈঠক

প্রশ্ন

২০। বাতাবী লেবুর দোষ শোধন

আমাদের একটী বাতাবী লেবুর গাছ আছে। তাহাতে যে লেবু হইতেছে উহা কাঠের মত শুক্‌না,—কিছুমাত্র রস নাই।—কিন্তু এদিকে খেতে বেশ মিষ্টি। যদি কেহ অনুগ্রহ করিয়া কি উপায়ে লেবুগুলিকে সরস করা যাইতে পারে তাহা বলিয়া দেন ত বিশেষ উপকৃত হইব।

শ্রীদলীলউদ্দিন মোল্লা

২১। বেদান্ত-বিচার

কাশীধামে অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দের সহিত মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের বেদান্তবিচার হইয়াছিল। ইহা চৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত আছে। এই বিচারের তথ্যসমূহ কোন পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল কি না? হইয়া থাকিলে তাহার নাম কি ও কোথায় পাওয়া যায়?

শ্রীতারাপদ লাহিড়ী

২২। হলুদ প্রস্তুত

বাজারে দুই প্রকার হলদী দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে এক প্রকার হলদীকে পাটনাইয়া হলদী বলা হয়। সেই হলদীই বাজারে বেশী কাটতি। সেই হলদী কি প্রকার তৈয়ার ও রং করিতে হয় ও সেই হলদী লাগাইবার জন্য কোথায়, কত দামে বীজ কিনিতে পাওয়া যায় ও কোন সময় লাগাইতে হয়? শ্রীসুরেন্দ্রকুমার সেন

২৩। প্রত্নতত্ত্ব

ময়মনসিংহ জিলার অন্তঃপাতী পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের তটস্থিত এগার সিন্ধু গ্রাম অবস্থিত। ঐ গ্রামে মুসলমান বাদ্‌শাহদের আমলের একটী কেল্লা আছে। ঐ গ্রামের ঐরূপ নামের অর্থই বা কি এবং গ্রামস্থ কেল্লার প্রকৃত নির্ম্মাতা কে? ঐতিহাসিক যুক্তি দ্বারা উত্তর চাই।

শ্রীমোহাম্মদ দানেশ

২৪। লীলাবতী কে?

চৈত্র সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন, শিবের গাজনের সময়, "লীলাবতী" পূজার বিধি, বঙ্গের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। এই লীলাবতী কে? কেহ বলেন,—ইনি বুদ্ধের একজন শিষ্যা; আবার কেহ বলেন,—গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেনের পত্নী শৈব ধর্ম্মাবলম্বী লীলাবতী। কোন্‌টা সত্য? শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সিংহ রায়

২৫। রম্ভার শুভাশুভ ফল

রম্ভা প্রত্যেক শুভকর্ম্মে আবশ্যক হয়; কিন্তু যখন কোন শুভকার্য্যে কোথায়ও গমন করা হয়, তখন যদি (রম্ভা) শব্দটী উচ্চারণ করা যায়, তাহা হইলে অশুভ ফল হইবে বলিয়া মনে করি কেন?

২৬। কৃষিতত্ত্ব

আজ প্রায় ছয় বৎসর হইল একটী বোম্বাই আমের কলম রোপণ করা হইয়াছে। দুই বৎসর পরে গাছে প্রথম মুকুল ধরিয়াছিল। কিন্তু প্রথম বারে মুকুল ভাঙ্গিয়া দিতে হয় প্রবাদ থাকায়, যথাসময়ে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল তৎপর হইতে এ যাবৎ গাছে আর মুকুল ধরে নাই। ইহার প্রতীকারের ব্যবস্থা কি? নূতন আম গাছে প্রথম বারে মুকুল ধরিলে ভাঙ্গিয়া দিতে হয় কেন? শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ প্রামাণিক

২৭। নির্লোম করিবার উপায় কি?

সর্ব্বাঙ্গে অধিক পরিমাণে লোম থাকা বহু অসুবিধা ও কষ্টের কারণ। বাজারের লোমনাশক বিষাক্ত ও কার্য্যকরী নহে। যাহা দ্বারা চিরকালের জন্য বা অন্ততঃ কতিপয় বৎসরের জন্য লোম সমূলে ধ্বংস করা যায় এরূপ বিষহীন কোন পদার্থ প্রস্তুত করা যাইতে পারে কি?

শ্রীহেমনলিনী বসু

২৮। মিসি বাবার অর্থ কি?

আজকাল বালিকা স্কুল ও কলেজে এবং তথাকার বোর্ডিং সমূহে একটি বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। যে কোন দারবান, বেয়ারা (Bearer), মালী অথবা কোচম্যান, বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের "বাবা" সম্বোধন করিয়া থাকে। "সরযু বাবা" "সুবালা বাবা" "কনকলতা বাবা" ইত্যাদি। ছাত্রীদের নামের পেছনে "বাবা" শব্দ প্রয়োগের স্বার্থকতা কি এবং কখন হইতে, কাহার দ্বারা এই প্রথার প্রচলন হইয়াছে? সাহেব বাড়ীর আয়ারা (খাসিয়া—নেপালী 'ঝি'রা) Baby দের "বাবালোক" বলিয়া থাকে; সেই হইতে, লোকে''র "বাবা" শব্দটুকু মেয়ে ছাত্রীদের নামের সঙ্গে চলিত হইয়াছে কি না?

শ্রীসরলকুমার দাস

২৯। শুভাশুভ লক্ষণ

দৈবাৎ কোনও ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্য হস্তস্খলিত হইলে, বাটীতে আগন্তুক আসিবে বলিয়া ধারণা হয়। এইরূপ ধারণার ভিত্তি কি।

শ্রীআশালতা দেবী।

৩০। দ্বিতীয় পক্ষের দুর্ভাগ্য

১। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর কোন মাঙ্গলিক কার্য্যে যোগদান করিতে নাই কেন? শ্রীফণীন্দ্রনাথ রাহা

৩১। কাঁচা সোণা পাকা করা

১। কাঁচা সোণাকে পাকা করা যায় কিরূপে? স্বর্ণকারগণ যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করে, অর্থাৎ Nitric Acidএ জ্বাল দিয়া পাকা করে,

তাহাতে সোণার কোন ক্ষতি হয় কি না, আর মূল্য কমে কি না। অনেক সময় দেখা যায় নীচে Sediment পড়ে, তন্মধ্যে সোণা থাকে কি না? কোনরূপ ক্ষতি না করিয়া সোণা কিরূপে পাকা করা যায় তাহাই জ্ঞাতব্য। শ্রীসত্যব্রত চৌধুরী

৩২। ক্ষৌর-কর্ম্মের বিধি-নিষেধ

প্রবাদ আছে বিবাহের পূর্ব্বে ক্ষৌর-কর্ম্ম নিষিদ্ধ ও পিতার বর্ত্তমানে শ্মশ্রু মুণ্ডন একেবারে নিষিদ্ধ। কিন্তু নিষ্ঠাবান মহারাষ্ট্রীয় ও মাদ্রাজী ব্রাহ্মণগণকেও পিতার বর্ত্তমানে শ্মশ্রু মুণ্ডন করিতে দেখা যায়। অতএব ইহা কি কেবল দেশাচার? না শাস্ত্রে ইহার কিছু বিধান আছে ও যদি থাকে ত কোন্ শাস্ত্রে আছে? শ্রীঅরুণ বসু

৩৩। সামাজিক আচার ব্যবহার

(ক) এক গৃহে অথবা এক আচ্ছাদনের নীচে 'জল অচল' জাতির কেহ দূরে থাকিলেও পান ভোজন করা নিষিদ্ধ দেখা যায়। ইহার কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে কিনা?

(খ) ব্রাহ্মণ কায়স্থাদির ক্ষৌরকার অহিন্দুর ক্ষৌর কার্য্য করে। কিন্তু হিন্দু-নমঃশূদ্রের ক্ষৌর কার্য্য করে না। এই না করার হেতু সম্বন্ধে কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে কি? যদি কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ না থাকে, তাহা হইলেও নমঃশূদ্রের ক্ষৌর কার্য্যে কাহারও আপত্তি থাকে ত, তাঁহার কি যুক্তি থাকিতে পারে, তাহা কেহ জানাইবেন কি? শ্রীমহাদেব ভট্টাচার্য্য

৩৪। কাঁটায় স্বাস্থ্যনাশ

মেদিনীপুর জেলার কাঁথি সবডিভিসনের অন্তর্গত কতিপয় স্থানের পুষ্করিণীগুলিতে একপ্রকার জলজ উদ্ভিদ্ উৎপন্ন হয়। উহা পুষ্করিণীতে উৎপন্ন হইয়া মৎস্য ও পানীয় জল উভয়ই নষ্ট করে। উহাদের মূল মাটীতে থাকে এবং উহা বর্দ্ধিত হইয়া জলের উপরিভাগ পর্য্যন্ত উত্থিত হয়। এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ উহাকে পানা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেন। উহার চলিত নাম "কাঁটা"। উহা পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য নষ্ট করিবার একটী প্রধান কারণ। উহা নিবারণের উপায় কি?

৩৫। হলুদের ব্যবহার

হিন্দুজাতির বিবাহের সময় হরিদ্রার অতিশয় ব্যবহার দেখা যায়। বলিতে গেলে হরিদ্রা ব্যতীত বিবাহ কার্য্য হইতে পারে না। ইহার কারণ কি? হরিদ্রার ব্যবহার সম্বন্ধে শাস্ত্রকার কিছু বলিয়াছেন কি? উহার কি বৈজ্ঞানিক কোনও গুণ আছে। শ্রীপশুপতি মাইতি

৩৬। বাসীজলের গুণ

গ্রামে কবিরাজগণ অনেক সময় বাসীজল ঔষধের অনুপানরূপে ব্যবহার করেন। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি জল বাসী হইলে কেন তাহার উপকারিতার আধিক্য লক্ষিত হয়, বুঝাইয়া দেন, তবে বিশেষ আপ্যায়িত হইব। মোঃ শাহাবউদ্দিন

৩৭। শিশুর আদর

ঘুমন্ত শিশুকে আদর করিতে নাই কেন? ইহার ভিতর কোন পৌরাণিক বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আছে কি না?

৩৮। আমলকীর কথা

রবিবার ও বৃহস্পতিবারে আমলকি খাইতে বা ছুঁইতে নাই কেন? ইহাতে কোন শাস্ত্রীয় নিষেধ আছে কি না? শ্রীযূথিকা দাশগুপ্তা

৩৯। ধান্যের পোকা নিবারণ

হৈমন্তিক ধান্য পাকিলে বা পাকার পূর্ব্বে একপ্রকার পোকা উহা কাটিয়া নষ্ট করিয়া ফেলে। উক্ত পোকা কলাই, সরিষা প্রভৃতি আরও দুই একটী শস্যও ঐ ভাবে নষ্ট করে। ঐ পোকার উপদ্রব নিবারণের কোনও উপায় আছে কি? একপ্রকার পোকা আছে, উহারা প্রধানতঃ ধান্যক্ষেত্রে থাকে। উহাদের শরীর গ্রন্থিযুক্ত এবং বর্ণ সবুজ। পোকাগুলিকে "নাড়া পোকা" বলে। উক্ত পোকা কাহারও শরীরের সংস্পর্শে আসিলে সংস্পৃষ্ট স্থান ফুলিয়া যায় এবং পরে সেস্থানে ঘা হইয়া মাংস পর্য্যন্ত খসিয়া পড়ে। ঐ পোকার সংস্পর্শ ঘটিলে কি উপায় অবলম্বন দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে! শ্রীপ্রিয়নাথ রাউত

৪০। শৃগালী ও বসুদেব

বসুদেব যখন শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে রাখিতে যান তখন নাকি এক শৃগালী তাহার আগে আগে যমুনা পার হইয়া তাঁহাকে জানাইয়াছিল যে যমুনার জল বেশী নাই। এই শৃগালীর কথা কোন্ পুরাণের কোথায় আছে? চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তর

ভারতবর্ষের সম্পাদকের বৈঠক ৩১নং প্রশ্নে শ্রীযুক্ত গণপতি মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে শ্রীশ্রীনারায়ণ চিত্র কোথায় পাওয়া যায়। "সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী," "সরসিজাসন সন্নিবিষ্ট," 'কনককুণ্ডল' ও 'কেয়ূর' বিশিষ্ট, হিরণ্ময়বপুধৃত, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শ্রীশ্রীনারায়ণের শ্রীমূর্ত্তি বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং'র ১৩২৮ সালের লটকান দিনপঞ্জিকায় (Calender) অতি সুন্দর ও ভক্তিউদ্রেককারী মনোমোহন রূপে অঙ্কিত আছে। শ্রীভূতনাথ দাস অধিকারী

কাশীযোড়া

কবি নিত্যানন্দ, দক্ষিণবঙ্গ মেদিনীপুর জেলার অধিবাসী ছিলেন। কাশীযোড়া নামক স্থানটী এই জেলারই অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব, কিন্তু উহা ঐ জেলার তমলুক মহকুমার বর্ত্তমান কাশীযোড়া হইতে পারে কি না, ইহাই সন্দেহের বিষয়। অদ্য ৮।১০ বৎসর হইল আমি কৃত্তিবাসী রামায়ণের হস্ত-লিখিত প্রাচীন পুঁথির খোঁজ করিতে গিয়া দ্বিজ নিত্যানন্দের—পূজাস্থাপনা পালা, (ইন্দ্র-পূজা) বাল্মীকি পালা, (সীতা-পূজা) পাণ্ডব-পূজা, নিমাজাগাতির পূজা ও বিরাট-পূজার পুঁথীগুলি প্রাপ্ত হই। নিত্যানন্দের ভণিতা-যুক্ত লক্ষ্মীমঙ্গল ও দক্ষিণ রায়ের পালা (কালুরায়ের গীত) ও তৎসঙ্গে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। পুঁথীগুলির সমস্তই তালপত্রে উৎকলাক্ষরে লিখিত ছিল। উহাতে কাশীযোড়া ও তাহার অধিপতি রাজা রাজনারায়ণ এবং কবি নিত্যানন্দের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহা নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

শীতলামঙ্গলের জাগাতি পূজার ৯ম পয়ারের শেষে লিখিত আছে :—

"কাশীযোড়া ষষ্ঠীপাড়া অতি বিচক্ষণ।
রামতুল্য রাজা তাতে রাজনারায়ণ॥"
নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ তাহার সভাসদ।
শীতলা মঙ্গল রচে পানে সুধা মত॥"

বিরাট-পূজার ১৫শ পয়ারেও এইরূপ—

"কাশী যোড়া ষষ্ঠী পাড়া অতি বিলক্ষণ।
রাম তুল্য রাজ্য পালে রাজনারায়ণ॥
নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ রচিল মধুক্ষর।
প্রতিষ্টিল গঙ্গাতটে সিংহ হলধর॥"

লিখিত আছে। সুতরাং কাশীযোড়া স্থানটী যে কোনরূপ ক্ষুদ্র গণ্ড-গ্রাম ছিল, এ কথা বলা যায় না। উহাতে অনেকগুলি গ্রাম এবং উহার অন্তর্গত "ষষ্ঠী পাড়া" গ্রামে রাজা রাজনারায়ণের গড়বাড়ী ছিল। সম্ভবতঃ উহা পরগণা বা তদনুরূপ বহুদূরব্যাপী স্থান ছিল। রাজা রাজনারায়ণ ঐরূপ কয়েকটী পরগণার অধিপতি বা জমিদার ছিলেন। প্রশ্ন-লিখিত "শাটী পরা" শব্দটী "ষষ্ঠী পাড়া" হইবে।

এই রাজনারায়ণের উপাধি "রায়" ছিল, তাহা কবির উক্তি হইতে জানা যায়। যথা :—

"শ্রীকাশীযোড়াতে হরশঙ্করেতে
রাজনারায়ণ রায়।
তস্য পোষ্য জনে নিত্যানন্দ ভণে
পশ্চিম শ্মশান সায়॥"
বিরাট-পূজা ১৮শ পয়ার।

কবি ইঁহাকে রাজা নরনারায়ণ রায়ের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যথা :—

"কাশী যোড়া মহাস্থান মহারাজা নরনারায়ণ
রাজনারায়ণ তাহার নন্দন।
তাহার সভায় রৈয়া শীতলা আদেশ পায়া
দ্বিজ নিত্যানন্দের ভাষণ॥"
বিরাট-পূজা ২২শ পয়ার।

রাজা রাজনারায়ণের বিশেষ বিবরণ সম্বন্ধে এ সকল পুঁথীতে অধিক আর কিছু উল্লেখ নাই। নিত্যানন্দ ইঁহার সভাসদ ও কবি হইলেও হলধর সিংহ নামক জনৈক ব্যক্তি, কিন্তু, ইঁহাকে "গাএন" পদে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উল্লিখিত পুস্তক সমূহের বহুস্থলেই তাহার উল্লেখ দেখা যায়। যথা :—

"নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ রচিল মধুক্ষর।
প্রতিষ্টিল গঙ্গা-তটে সিংহ হলধর॥"

পূর্ব্বে "গাএন" প্রতিষ্ঠা করার প্রথা ছিল। দেবতা প্রতিষ্ঠা, দেবালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির ন্যায়, ব্রাহ্মণ দ্বারা অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়া প্রতিষ্ঠাকারীরা গায়েনকে চামর প্রদান করিতেন। কেহ কেহ বা তৎসঙ্গে হস্তে বলয় এবং কর্ণে কুণ্ডলও প্রদান করিতেন। উক্ত "প্রতিষ্ঠা গাএন" গায়ক সম্প্রদায়দিগের মধ্যে একজন সম্মানিত ব্যক্তি ও জাতি-নির্ব্বিশেষে সকলের বাটীতে গান করিতে সক্ষম হইতেন; তাহাতে কোন প্রকার সামাজিক দোষ ঘটিত না।

সে যাহা হউক, কবি তাঁহার আত্ম-পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন;

"কাসাড়িয়া দিলিসাই গোত্র ভরদ্বাজ।
মহামিশ্র রাধাকান্ত ক্ষেমা ক্ষিতিমাঝ॥
দ্বিতীয় আত্মজ তার দৈব অনুবলে।
দ্বিজ নিত্যানন্দে বলে সাধনার ফলে॥
জাগাতি পূজা ১০শ পয়ার।
"বিশারদ সর্ব্বশাস্ত্র শ্রীযুত ভবানী মিশ্র
তস্য সুত মিশ্র মনোহর।
তস্য সুত চিরঞ্জীব কি গুণে তুলনা দিব
যার সখা দেব গদাধর॥
রাধাকান্ত তস্য সুত অশেষ গুণের যুত
চৈতন্য তাহার নন্দন।
তাহার মধ্যম ভাই শীতলা আদেশ পাই
দ্বিজ নিত্যানন্দের ভাষণ॥" ঐ ১০শ পয়ার।

বাসস্থান সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি এইরূপ যে :—

"ভণে দ্বিজ নিত্যানন্দ গীত মধুক্ষর।
কাশী যোড়া সাকিনে কানাই চকে ঘর॥"
ইন্দ্রপূজা ৭ম পয়ার।

তাহার পর,—শীতলা মঙ্গল রচনার সময় নিরূপণ বিষয়ে আমরা এইরূপ অবগত হইতেছি,—

"মনেতে রাখিয়া মন রসে দিয়া বিধু।
নিত্যানন্দ রচিল অক্ষরে যার মধু॥"

১৬৫৫ শক বা ১৭৩ খৃষ্টাব্দে ইনি শীতলামঙ্গল রচনা আরম্ভ করেন এবং ১৬৫৮ শক বা ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে উহার পরিসমাপ্তি হয়। কেন না, শীতলা মঙ্গলের "পূজাস্থাপনা" বা ইন্দ্র-পূজাই অরিষ্ট পালা এবং বিরাট-পূজা শেষ পালা। বিরাট-পূজার অন্তর্গত জাগাতি পূজার ১২শ পয়ারের ভণিতায় লিখিত আছে :—

"মনেতে রাখিয়া বীর রসে হৈয়া বিধু।
নিত্যানন্দ রচিল অক্ষরে যার মধু॥"

সুতরাং পুঁথীখানি রচনা করিতে কবির ৩ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত "লক্ষ্মী মঙ্গলে" আরও একটী সন-শকাব্দার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়। কোন প্রতিলিপিকার হয় ত তাঁহার নিজের পুঁথী নকলের সময়টী পুস্তকের মূল পয়ারের সহিত গোঁজা মিল দিয়া আপন কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন পুঁথীগুলির বহুস্থলেই প্রতিলিপিকারগণের এইরূপ বহু কীর্ত্তি বিরাজমান। এই সন ও শকাব্দটী এতই আধুনিক যে, উহা মূল কবির রচিত বলিয়া কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। লক্ষ্মী

মঙ্গলের শনি লক্ষ্মীর দ্বন্দ পালার ১৫শ পয়ারের ভণিতায় এইরূপ লিখিত আছে যে :—

"সিন্ধু বামে শর সপ্ত শশী শক হন।
বিধুর দক্ষিণে পক্ষ বেদ পক্ষ সন॥
আরম্ভ হইল অগ্রাণের অষ্ট দিনে।
নিত্য ডাকে লক্ষ্মী মাকে নিতাই ব্রাহ্মণে॥"

এই ভণিতার উক্তি অনুসারে ১৭৫৭ শক বা ১২৪২ সনে রাজা রাজনারায়ণ ও কবি নিত্যানন্দের বিদ্যমানতা সম্ভব কি না, তাহা ঐতিহাসিকগণেরই বিচার্য্য। বিশেষতঃ উক্ত লক্ষ্মী-মঙ্গলের "কৃষ্ণশর্ম্মার পালা" নামক আর একটী পালায় দেখা যায় যে :—

"শিবের মুখে দিয়া সুধা বিষ্ণুর মুখে বিধু।
নিত্যানন্দ রচিল অক্ষরে যার মধু॥" ৬ষ্ঠ পয়ার।

ইহা দ্বারাও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে. কবি ১৬৫৮ শকে শীতলা-মঙ্গল রচনা শেষ করিয়া ঐ বৎসরেই পুনরায় লক্ষ্মী-মঙ্গল রচনা আরম্ভ করেন। কেন না, লক্ষ্মীর জন্মপালা ও কৃষ্ণশর্ম্মার পালা উহার আরম্ভ অংশ এবং শনি-লক্ষ্মীর দ্বন্দপালা শেষ অংশ। সুতরাং প্রথমোক্ত সন-শকাব্দাটী যে প্রকৃতই জাল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপে কত অজ্ঞাত ও অখ্যাতনামা কবি ও লিপিকর যে মূল কবিগণের রচনার অন্তরালে বেমালুম গা-ঢাকা দিয়া রহিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা দুষ্কর। সে যাহা হউক, প্রশ্নোক্ত কাশীযোড়া স্থানের নির্দ্দেশ করিতে হইলে—ষষ্ঠী পাড়া ও কানাইচক নামক গ্রাম দুইখানি যে কাশীযোড়ার অন্তর্গত দেখা যাইবে, তাহাকেই কবি নিত্যানন্দের প্রাগুক্ত কাশীযোড়া বলা অসমীচীন হইতে পারে না। কালক্রমে হয় ত বা ঐ সকল নামের কোনরূপ রূপান্তর বা বিকৃতি ঘটা অসম্ভব নহে। শ্রীকেদারনাথ মণ্ডল

ভাদ্রমাসের ভারতবর্ষের ৩৭ নং প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর

১। কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। এই শ্লোকাংশটী ভাগবতের ১৷৩৷২৮ শ্লোকের এক ভগ্নাংশ। অন্ততঃ অৰ্দ্ধেক শ্লোক উল্লেখ না করিলে ঐ বাক্যাংশটীর তাৎপর্য্য বোধ হওয়া অসম্ভব। তাহা এই "এতেচাংশ কলা পুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" এইটী সমগ্র ভাগবতের পরিভাষা সূত্র।

অবতার সকলের চরিত্র বর্ণন করুন—এই প্রশ্ন দ্বারা সৌনক কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া সংক্ষেপে সুত অবতার সকলের নামাদি উল্লেখ করিলেন। ১ম অবতার কৌমার, ২য় নারদ, ৩য় বরাহ ইত্যাদি কল্কি পর্য্যন্ত ২৫টী প্রাকৃত জগতের অবতার বর্ণন করিলেন। তার পর কহিলেন :— "অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরে সত্ত্ব নিধের্দ্বিজা" হে দ্বিজগণ সত্ত্বনিধি হরির অসংখ্য অবতার। অর্থাৎ সেই অনন্তের অবতার ও অনন্ত প্রধান প্রধান কয়টী বলিলাম মাত্র। এই সকল অবতার বর্ণনের মধ্যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরও বর্ণন সামান্য ভাবে হইয়াছে দেখিয়া, তাঁহাকে পৃথক করিয়া বলিবার উদ্দেশ্যেই বলিলেন :—"এতেচাংশ কলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং"; অর্থাৎ এই যে অবতার সকলের নাম উল্লেখ করিলাম, তাহারা কেহ কেহ পুরুষের অংশ, কেহ কেহ কলা। কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। এই "তু" অব্যয়টী ভিন্ন উপক্রমে দেওয়া হইয়াছে।

সাহিত্য-সংবাদ

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত নূতন নাটক "ইরাণের রাণী" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ১৲ টাকা

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত "হাসির হল্লা" প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ।৵০ আনা

শ্রীযুক্ত মৃণালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নূতন প্রহসন "চাল-বেচাল" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ।৵০ আনা

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত "হতাশ প্রেমিক" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ১৸০ সাতসিকা

শ্রীযুক্ত শৈলজা মুখোপাধ্যায় প্রণীত "লক্ষ্মী" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ৷৷০ আনা

শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার এম-এ প্রণীত "ভাষাতত্ত্ব ও বাংলা ভাষার ইতিহাস" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ২৲ টাকা

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত নূতন উপন্যাস "ভুল ভাঙ্গা," প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ২৲ টাকা

শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত "সতীত্বের মূল্য" উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ১৷০ টাকা

আগামী ১২ই মাঘ শনিবার মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের শত বার্ষিকী জন্মদিন। মহাকবি মধুসূদন উনবিংশ-শতাব্দীতে বঙ্গ দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-রথ ছিলেন। আমরা আশা করি এই উপলক্ষে বঙ্গের যাবতীয় সুধী সাহিত্যিকবর্গ একত্র সমবেত হইয়া মহা কবির স্মৃতি-পূজা করিবেক। সাহিত্য পরিষৎ এই শুভ অনুষ্ঠানের অগ্রণী হইয়া এই মহোৎসব সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

ভ্রম-সংশোধন

পৌষ সংখ্যার 'ভারতবর্ষে'র 'আলোক ও প্রাণ' প্রবন্ধের (১১ পৃষ্ঠা. তৃতীয় পংক্তি)"৫৫৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড"স্থলে "৫৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড" হইবে।

গত মাসের সাহিত্য সংবাদে বাহির হইয়াছিল—"শ্রীযুক্ত সূর্য্যপদ সোম প্রণীত "মন্ত্রদীক্ষা" উপন্যাস বাহির হইয়াছে, মূল্য ২৲ টাকা।" শ্রীযুক্ত সূর্য্যপদ সোমের স্থলে শ্রীযুক্ত সূর্য্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায় হইবে।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Narendranath Kunar,
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street. CALCUTTA.

দোটানা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী
প্রদর্শনীর প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

ফাল্গুন, ১৩৩০

দ্বিতীয় খণ্ড | একাদশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

গীতায় কর্মযোগ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

ঈশ্বর কি বস্তু, কি করিয়া তাঁহাকে পাওয়া যায়—ইহাই গীতার মুখ্য বিষয়। এজন্য গীতাকে ব্রহ্মবিদ্যা এবং উপনিষৎ বলা হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যা,—কারণ ইহাতে ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; উপনিষৎ,—কারণ, ইহাতে ব্রহ্ম লাভের উপায় নির্ণীত হইয়াছে। তাই প্রত্যেক অধ্যায়ের উপসংহারে বলা হইয়াছে—"ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে"। কিন্তু গীতা শুদ্ধ উপনিষৎ এবং ব্রহ্মবিদ্যা নহে; ইহা একটা যোগ-শাস্ত্র। ঠিক মত কর্ম করিবার কৌশল যে শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে তাহাই যোগশাস্ত্র—"যোগঃ কর্মসু কৌশলং"।

কর্ম করা ভাল না খারাপ? এই প্রশ্নের উত্তরে গীতা বলেন, যে ভাবে কর্ম করা হয়, তাহার উপর ইহা নির্ভর করে। আসক্তি এবং ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া, ঈশ্বরে সমর্পণ পূর্বক কর্ম করা ভাল। ইহার বিপরীতভাবে কর্ম করা খারাপ। কর্ম ভালরূপে করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, তাহাতে ঈশ্বর লাভের পথ সুগম হয়। নচেৎ কর্ম ঈশ্বর লাভের পথে প্রতিবন্ধক হয়। ভাল কর্ম ঈশ্বরলাভের সহায়ক বটে; কিন্তু ঈশ্বরলাভের পক্ষে কর্ম অপরিহার্য্য নহে। যাহার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে, তাহার নিজের জন্য সৎকর্ম করিবার কোন প্রয়োজন নাই; কিন্তু জগতে সাধু দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য তাহার কর্ম করা উচিত। গীতা এই সকল কথা বলিয়াছেন—কর্ত্তব্য নির্ণয়ে অসমর্থ অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান সমগ্র জগৎকে উপদেশ দিয়াছেন।

কর্ম করিলেই তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। বীজ যেমন স্বাভাবিক নিয়মে বৃক্ষে পরিণত হয়, সেইরূপ কর্মও স্বাভাবিক নিয়মে কর্মফলে পরিণত হয়। কোন কর্মের ফল তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায়; কোন কর্মের ফল অল্প বিলম্বে দেখা দেয়—যদিও কর্ম এবং কর্মফলের মধ্যে সম্বন্ধ বেশ বুঝিতে পারা যায়; আবার কোন কর্মের ফল অনেক বিলম্বে,—হয় ত জন্মান্তরে—আবির্ভূত হয়, প্রাকৃত দৃষ্টিতে কর্ম এবং কর্মফলের মধ্যে কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না। এইরূপ বীজ হইতেও বৃক্ষের উৎপত্তি কখনও শীঘ্র, কখনও বা বিলম্বে ঘটিয়া থাকে। গত বৎসর পুষ্প-বৃক্ষের বীজগুলি কখন মাটীতে পড়িয়াছিল, কেহ লক্ষ্য করে নাই, প্রবল শীত এবং দারুণ গ্রীষ্মের সময় বীজগুলি মাটীর মধ্যে লুকাইয়া ছিল, আবার এক বৎসর পরে যখন নববারিধারায় ভূপৃষ্ঠ সিক্ত ও শীতল হইল, তখন দেখা গেল ছোট ছোট ফুলগাছের চারায় বাগানটি ভরিয়া গিয়াছে। আমরা প্রতিনিয়ত নানারূপ কর্ম করিয়া থাকি। প্রত্যেক ক্ষুদ্র কর্মের যে ফল ভোগ করিতে হইবে, সে কথা আমাদের তখন মনে থাকে না। উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে সেই সকল কর্মের শুভ বা অশুভ ফল উৎপন্ন হয়। সেই সকল ফল ভোগ করিয়া আমরা অন্যের উপর প্রীত বা অপ্রীত হই। আমরা ভুলিয়া যাই যে, এ সকল ভোগের অন্যে নিমিত্ত মাত্র,—প্রকৃত পক্ষে দায়ী আমরা স্বয়ং। বীজ বহুকাল রাখিয়া দিলেও তাহার বৃক্ষ-উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হয় না। সেইরূপ কর্মের ফলোৎপাদিকা শক্তি দীর্ঘকাল ব্যবধানেও নষ্ট হয় না। এমন কি প্রলয়ের সময়—যখন সূর্য্য, চন্দ্র, আকাশ, পৃথিবী, কিছুই থাকে না,—ব্রহ্মার সেই সুদীর্ঘকালব্যাপী রাত্রির সময়ও কর্মের ফলোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হয় না। প্রলয়কালে এই সকল কর্ম প্রকৃতি বা মায়ার মধ্যে অব্যক্ত ভাবে অবস্থান করে। প্রলয়াবসানে যখন পুনরায় সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন পূর্বকালের কর্মগুলি তাহাদের নির্দ্দিষ্ট ফল প্রসব করে।

কর্মফল এড়াইবার উপায় নাই বলিয়া অনেক বিজ্ঞ-ব্যক্তি কর্মকে মোক্ষমার্গের বিরোধী মনে করেন; এবং বলেন যে, কর্ম মাত্রই ত্যাগ করা উচিত।

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ।১৮।৩

"কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন, দোষ যেরূপ ত্যাগ করা উচিত, সেইরূপ কর্মও ত্যাগ করা উচিত।" ইঁহাদের অভিপ্রায় এইরূপ। কর্মফল ভোগ করিতে হয় বলিয়াই পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। যদি কর্ম না করি, তাহা হইলে কর্মফল ভোগ করিতে হইবে না, আর পুনর্জন্ম হইবে না, অতএব মোক্ষলাভ সহজ হইবে। কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে কর্ম ত্যাগ করা অতি দুরূহ—প্রায় অসম্ভব। প্রথমতঃ শরীর ধারণের পক্ষে কিয়ৎ পরিমাণে কর্ম অপরিহার্য্য।

শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ।৩।৮

"কর্ম না করিলে তোমার শরীরযাত্রা (দেহ রক্ষা করাও) সম্ভব হইবে না।"

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।১৮।১১

"যাহারা দেহ ধারণ করে, তাহারা সকল কর্ম পরিত্যাগ করিতে পারে না।"

যাঁহারা কর্মের বিরোধী, তাঁহারা হয় ত বলিবেন, যে কর্ম না করিলে নয় সে কর্ম্ম না হয় করিলে, কিন্তু তাহার অধিক কোন কর্ম করিও না; জীবন-ধারণের জন্য যে কর্ম অপরিহার্য্য মাত্র, সেইটুকু কর্ম করিলে, তাহার ফলে কেবল জীবন-ধারণই নিষ্পন্ন হইবে, জন্মান্তরে ভোগ করিবার মত কোন কর্মফল অবশিষ্ট থাকিবে না; অতএব মোক্ষপথে বিঘ্ন উপস্থিত হইবে না। কিন্তু তাহা হয় না। এরূপ ভাবে কর্ম করা সম্ভব নহে, যাহার ফলে প্রাণ-ধারণ মাত্র নিষ্পন্ন হইবে। ধরুন, প্রাণ-ধারণের জন্য আহার প্রয়োজন। এই আহার সংগ্রহ করিবার বিভিন্ন উপায় আছে, কিন্তু প্রায় সকল উপায়েই কিছু পরিমাণে হিংসা বিজড়িত আছে। অবশ্য বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে হিংসার তারতম্য আছে, এবং যাহাতে হিংসার আধিক্য (যথা প্রাণিবধ) শাস্ত্রে তাহার নিন্দা আছে। কিন্তু সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ভাবে আহার সংগ্রহ করা সম্ভব নহে। কৃষিকার্য্য অপেক্ষাকৃত নির্দ্দোষ; কিন্তু ইহাতেও প্রাণিহিংসা আছে। ঐ মাঠে চাষ দিবার সময় অনেক প্রাণিহত্যা হয়, মহিষ-বলদকে অত্যন্ত কষ্ট দিতে হয়। সুতরাং জীবন-ধারণের জন্যও কর্ম করিলে জীবন-ধারণ ব্যতীত আরও কর্মফল উৎপন্ন হইবে; তাহার ভোগ কি করিয়া নিরস্ত হয়? তাই শ্রীভগবান বলিয়াছেন,

সহজং কর্ম কৌন্তেয়, সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥ ১৮। ৪৮

"হে অর্জ্জুন, জাতিকুল অনুসারে যে কর্ম্ম স্বাভাবিক, তাহা ত্যাগ করিও না। কারণ, অগ্নিমাত্রেই যেরূপ ধূমের আবরণ আছে, সেইরূপ সকল কর্ম্মই দোষের দ্বারা আবৃত।

আরও কথা আছে। আপনি যে মনে করিতেছিলেন, আমি কেবল জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী কর্ম্ম করিব, আর কিছুই করিব না,—আপনার এ সঙ্কল্প কতদূর কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবেন, তাহাও সন্দেহের বিষয়। কারণ, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেই কর্ম্মবন্ধ হয় না। যতক্ষণ মন সম্পূর্ণ রূপে শুদ্ধ না হয়—সম্পূর্ণ শুদ্ধ মন, যে মনে বাসনার লেশমাত্র নাই, আমাদের কয়জনের আছে?—ততক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেও আমাদের মনে নানাপ্রকার ভোগসুখের বাসনা স্বতঃই উৎপন্ন হইবে। বাসনা উৎপন্ন হইলেই কর্ম্ম করা হইল, এবং তাহার ফলও ভোগ করিতে হইবে। এজন্য শ্রীভগবান বলিয়াছেন,

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥ ৩।৪

"কর্ম্ম আরম্ভ না করিলেই মানুষ কর্ম্মহীন হয় না। কর্ম্ম ত্যাগ করিলেই যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, তাহাও নহে।"

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥ ৩।৫

"কেহ ক্ষণমাত্রও কর্ম্মহীন ভাবে অবস্থান করে না। সকলেই সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা অভিভূত হইয়া (সর্ব্বদাই) কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়।"

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ ৩।৬

"কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া যে মনে ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়ের চিন্তা করে, সেই বিমূঢ় ব্যক্তিকে মিথ্যাচারী বলা হয়।"

আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে ঈদৃশ অবস্থা অতিশয় বিপদজনক। কারণ, আকাঙ্ক্ষা থাকিলেই কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে, এবং অনেক সময় ইন্দ্রিয় দ্বারা ভোগ না করার দরুণ আকাঙ্ক্ষা অধিকতর তীব্র হয়। এজন্য, যাঁহাদের মন সম্পূর্ণ শুদ্ধ না হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে কর্ম্ম ত্যাগ করা অপেক্ষা কর্ম্ম করাই প্রশস্ততর। তাই ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ। ৩।৮

"শাস্ত্রোপদিষ্ট নিত্যকর্ম্ম সম্পাদন করিবে। অকর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ।"

অতএব দেখা যাইতেছে যে, কর্ম্ম ত্যাগ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও কর্ম্ম ত্যাগ করা সহজ নহে। কর্ম্ম যখন না করিয়া উপায় নাই, এবং কর্ম্ম করিলেই যখন তাহার ফল ভোগ করিতে হয়, তখন মোক্ষলাভ কিরূপে সম্ভব হয়? গীতা এই সমস্যার অপূর্ব্ব মীমাংসা করিয়াছেন।

কর্ম্ম করিলে তাহার ফল ভোগ করিতে হয় কেন? কারণ, কর্ম্ম করিলে আমাদের মনে ঐ কর্ম্মের ফলের জন্য আকাঙ্ক্ষা হয়,—অনেক সময় কর্ম্মে আসক্তি জন্মে। এ জন্য আমাদের মনের উপর একটা ছাপ পড়ে, বা মন একটা বিশেষ আকারে আকারিত হয়। ইহাই কর্ম্মফল ভোগের কারণ। অতএব যদি কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা বা কর্ম্মে আসক্তি ত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে কর্ম্ম করিয়াও ফল ভোগ করিতে হয় না। কর্ম্ম করিবার এই কৌশল গীতা শিক্ষা দিয়াছেন। কর্ম্ম কর, কারণ, ইহা তোমার কর্ত্তব্য; কিন্তু কর্ম্মফলের কথা ভাবিও না; উহা তোমার অধিকার-বহির্ভূত।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥২।৪৭

"কর্ম্মেই তোমার অধিকার; কর্ম্মফলে কখনও তোমার অধিকার নাই। কর্ম্মফলের হেতু হইও না; (কিন্তু) কর্ম্মহীন হইয়াও থাকিও না।"

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥২।৪৮

"আসক্তি ত্যাগ করিয়া যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিবে। সফলতা এবং বিফলতাতে একই অবস্থায় থাকিবে। এইরূপ সাম্যাবস্থাকে যোগ কহে।"

কর্ম্মফলে যদি আসক্তি না থাকে, তাহা হইলে সফলতা এবং বিফলতাতে মনের অবস্থার কোন পার্থক্য হইবে না।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥৩।১৯

"এ জন্য সর্ব্বদা অনাসক্ত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিবে। অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে মানব মোক্ষলাভ করে।"

ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।

কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥৪।২০

"কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া, সর্বদা তৃপ্ত থাকিয়া, আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও কোন কর্মই করা হয় না (কর্মফল ভোগ করিতে হয় না)।"

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।

শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষং ॥৪।২১

"নিষ্কাম হইয়া, ইন্দ্রিয় ও মন বশীভূত করিয়া, অপরের দান গ্রহণ না করিয়া, কেবল শরীর দ্বারা কর্ম করিলে কোন পাপ হয় না।"

যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীং।

অযুক্তোকামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥৫।১২

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্য্যং কর্ম করোতি যঃ।

স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ ॥৬।১

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।

সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥১২।১১

শ্রেয়োহিজ্ঞানমভ্যাসাজ্জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।

ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরং ॥১২।১২

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গংত্যক্ত্বা ফলানি চ।

কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমং ॥১৮।৬

[এতান্যপি তু কর্মাণি=যজ্ঞদান তপোরূপাণি]

কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জুন।

সঙ্গংত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥১৮।৯

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তং কর্মাণ্যশেষতঃ।

যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥১৮।১১

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতং।

অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যৎতৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥১৮।২৩

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।

সিদ্ধ্যাসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥১৮।২৬

কর্ম এবং কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিলে কর্মও ভাল করিয়া করা যায়, তাহাতে কার্য্যসিদ্ধিরও সম্ভাবনা বেশী। অতএব গীতোক্ত পদ্ধতিতে কর্ম করিলে এক দিকে কর্মে সফলতার সম্ভাবনা বেশী, অপর দিকে বিফল হইলেও চিত্ত-চাঞ্চল্যের সম্ভাবনা কম। আসক্তির কারণ মোহ বা অজ্ঞান।*

প্রকৃতেগুর্ণসংমূঢ়া সজ্জন্তেগুণকর্মসু ।৩।২৯

"প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন গুণ (সত্ত্ব রজ ও তম) দ্বারা সংমূঢ় হইয়া লোকে গুণ এবং কর্মে আসক্ত হয়।" জগতের যাবতীয় পদার্থ বিনশ্বর; তাহারা কখনও চিরস্থায়ী সুখ দিতে পারে না। মায়ার গুণে আমরা ইহা বুঝিয়াও বুঝি না, এবং যিনি একমাত্র চিরস্থায়ী সুখ দিতে পারেন, সেই পরমেশ্বরকে ছাড়িয়া সংসারে আকৃষ্ট হই। ইহাই কর্ম-ফলে আসক্তির কারণ। অতএব কর্মফল ত্যাগের পক্ষে জ্ঞান খুব সহায়ক। প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইলে আর সংসারের তুচ্ছ পদার্থে আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে না; অতএব কর্মফলের জন্যও আকাঙ্ক্ষা থাকে না। কর্মে আসক্তিও জ্ঞান দ্বারা নিরস্ত হয়। আমি এই সব কার্য্য করিতেছি বা করিব, আমি-ই কর্ত্তা, এই অহংজ্ঞান হইতে কর্মে আসক্তি উৎপন্ন হয়। সৎকর্ম করিতে করিতেও এইরূপ অহংজ্ঞান দ্বারা বিচক্ষণ ব্যক্তিও কর্মে আসক্ত হইয়া দুঃখ পান। যাঁহার প্রকৃত জ্ঞান হইয়াছে, তিনি বুঝিতে পারেন যে, প্রকৃতির গুণ দ্বারা যাবতীয় কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, আত্মা নিষ্ক্রিয় ও সাক্ষীস্বরূপ। এইরূপ জ্ঞান হইলে আর কর্মে আসক্তি থাকে না।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃকর্মাণি সর্বশঃ।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতিমন্যতে ॥৩।২৭

"প্রকৃতির গুণ দ্বারা যাবতীয় কর্ম নিষ্পন্ন হয়। অহঙ্কার দ্বারা বিমূঢ় হইয়া লোক মনে করে আমিই কর্ত্তা"।

তত্ত্ববিৎ তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।

গুণাগুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥৩।২৮

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।

পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্‌জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥৫।৮

প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥৫।৯

প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।

যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥১৩।৩০

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।

হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥১৮।১৭

কর্মে আসক্তি হইবার আর একটি কারণ ইন্দ্রিয় সংযমের অভাব। ইন্দ্রিয়গুলি না সংযত না থাকিলে যে কর্ম ইন্দ্রিয়ের অনুকূল তাহাতে আসক্তি হয়। এজন্য কর্ম করি-

* বাহুল্য ভয়ে সকল শ্লোকের অনুবাদ দেওয়া হইল না।

বার সময় ইন্দ্রিয়-সংযম অতি প্রয়োজনীয়। যাহা ভাল লাগিবে সেইরূপ কর্ম করিলেই হইবে না, যাহা করা উচিত সেইরূপ কর্ম করিতে হইবে।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৩।৭

"হে অর্জুন, যে ব্যক্তি মন দ্বারা ইন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া, অনাসক্ত হইয়া কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ।"

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্বভূতাত্ম ভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥৫।৭

যদি ভগবানের উদ্দেশ্যে কর্ম করা হয় তাহা হইলে কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা থাকে না, কর্মে আসক্তি থাকে না, এবং ইন্দ্রিয়-গুলিও অসংযত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কারণ তখন মনে হয় ভগবান প্রীত হইবেন বলিয়া আমি এই কর্ম করিতেছি, কর্মের ফলভোগ করিবার জন্য নহে, কিংবা বিশিষ্ট কর্ম করিতে ভাল লাগে বা ইন্দ্রিয়ের প্রীতিকর বলিয়া নহে। এজন্য হিন্দুশাস্ত্র সকল কর্ম ভগবানকে সমর্পণ করিতে বলিয়াছে। প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিবার সময় তাহাকে বলিতে হয়,

প্রাতরুত্থায় সায়ান্তং সায়মারভ্য প্রাততঃ।
যৎকরোমি জগন্মাতস্তদেব পূজনং তব ॥

"প্রাতঃকালে উত্থান করিয়া সায়ংকাল পর্য্যন্ত এবং সায়ং-কাল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত, যাহা কিছু করি, সকলি হে জগন্মাতঃ, তোমার পূজা করি মাত্র।"

গীতাতেও এই মর্মের উপদেশ নানা স্থানে দেওয়া হইয়াছে।

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥৩।৯

"যজ্ঞ অর্থাৎ বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে মনুষ্য যে কর্ম করে তদ্ব্যতীত অপর কর্ম করিয়া মানব কর্মফলে বদ্ধ হয়। এজন্য, হে অর্জুন, আসক্তি ত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর নিমিত্ত কর্ম কর।"

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমোভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥৩।৩০

(বাহুল্য ভয়ে সকল শ্লোকের অনুবাদ দেওয়া হইল না)

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ ॥৩।৩১

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥৪।২৩

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্বমদর্পণং ॥ ৯।২৭

শুভাশুভ ফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ৯।২৮

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ১২।৬

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাং ॥১২।৭

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম পরমো ভব।
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১২।১০

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততং।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥১৮।৪৬

চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যস্যমৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥১৮।৫৭

অতএব দেখা যাইতেছে যে, গীতার শিক্ষা এইরূপ,—সকল কর্ম্ম এককালে ত্যাগ করা সম্ভব নহে। এজন্য কর্ম ও কর্মফলের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম করাই প্রশস্ত, কারণ এই ভাবে কর্ম করিলে কর্ম বন্ধনের হেতু হয় না। আসক্তি ত্যাগ করিবার উপায়,—প্রথমতঃ জ্ঞান, আমি কর্ত্তা নহি, প্রকৃতির গুণ দ্বারা কর্ম নিষ্পন্ন হয়, এই ধারণা, দ্বিতীয়তঃ ইন্দ্রিয়-সংযম; তৃতীয়তঃ ঈশ্বরে কর্ম সমর্পণ। এই ভাবে কর্ম করিলে কর্ম মোক্ষলাভের অন্তরায় হয় না। শুধু অন্তরায় হয় না, এমন নহে, এই ভাবে কর্ম করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এজন্য ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পথ সুগম হয়।

প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্মঃ * * ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা অনুষ্ঠীয়মানঃ সত্ত্বশুদ্ধয়ে ভবতি ফলাভিসন্ধিবর্জিতঃ। শুদ্ধসত্ত্বস্য চ জ্ঞান-নিষ্ঠা যোগ্যতা প্রাপ্তিদ্বারেণ জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বেন চ নিঃশ্রেয়সহেতুত্বমপি প্রতিপদ্যতে।

[শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য প্রণীত গীতাভাষ্যের উপক্রমণিকা]

"শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্ম ঈশ্বরকে অর্পণ করিলাম এই বুদ্ধিপূর্ব্বক, এবং ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া অনুষ্ঠান করিলে সত্ত্বশুদ্ধি হয়। সত্ত্বশুদ্ধি হইলে জ্ঞানলাভের উপযোগিতা হয় এবং জ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভের সহায়ক হয়।"

সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত কর্ম দ্বারা কি প্রকারে চিত্তশুদ্ধি

হয়, তাহা শঙ্করাচার্য্য তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ শ্লোকের ভাষ্যে বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম দ্বারা ইহজন্মে এবং জন্মান্তরে অর্জিত পাপসকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এজন্য চিত্ত শুদ্ধ হয়। সহজবুদ্ধিতেও আমরা এই তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিতে পারি। কামনা এবং বাসনাগুলিই আমাদের চিত্তের মলিনতা। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ম করিলে আমাদের বাসনাগুলি ক্ষয় হইতে থাকে, কারণ আমাদের ইচ্ছামত কার্য্য করি না, শাস্ত্রে যাহা বলিয়াছেন, রুচিকর না হইলেও তাহা করিতে হয়। বিশেষতঃ এই কর্ম যদি ভগবানের প্রীত্যর্থ করিতেছি, এই জ্ঞান সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। চিত্ত শুদ্ধ না হইলে তাহাতে ব্রহ্মজ্ঞান পরিস্ফুট হয় না, যেমন মলিন দর্পণে প্রতিবিম্ব সুস্পষ্ট হয় না। শঙ্করাচার্য্য এই প্রসঙ্গে মহাভারতের নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্মণঃ।

যথাদর্পতলপ্রখ্যে পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি॥ শান্তিপর্ব্ব ২ ৪।৮

"পাপকর্মের ক্ষয় হইলে মানবের জ্ঞান উৎপন্ন হয়; তখন দর্পণের মধ্যে প্রতিবিম্বের ন্যায় চিত্তমধ্যে আত্মার (ব্রহ্মের) সাক্ষাৎকার হয়"।

গীতাও বলিয়াছেন,

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।

যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥৫।১১

"যোগিগণ আসক্তি ত্যাগ করিয়া শরীর, মন, বুদ্ধি এবং মমত্ববুদ্ধিবর্জিত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম করিয়া থাকেন।"

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।৬।৩

"যিনি যোগমার্গে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করেন তিনি কর্ম্ম করিয়া এই পথে আরোহণ করিতে সক্ষম হন।"

কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলং।১৪।১৬

"সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম করিয়া নির্দ্দোষ সাত্ত্বিক ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

যজ্ঞোদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।

যজ্ঞো দানংতপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাং॥১৮।৫

"যজ্ঞ দান এবং তপস্যা ত্যাগ করা উচিত নহে, উহাদের অনুষ্ঠান করা উচিত। কারণ যজ্ঞ দান এবং তপস্যা, যাঁহারা ফলাকাঙ্ক্ষায় করেন না তাঁহাদের চিত্ত পবিত্র করে।"

যাঁহাদের চিত্তে মলিনতা আছে, তাঁহাদের পক্ষে কর্ম্ম প্রয়োজনীয়, কারণ কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হয়; অবশ্য শাস্ত্রবিহিত সৎকর্ম্ম হওয়া আবশ্যক এবং তাহা নিষ্কাম ও অনাসক্ত হইয়া ঈশ্বরার্পণবুদ্ধির সহিত অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন। কিন্তু যাঁহাদের চিত্তে মলিনতা নাই, তাঁহাদের কর্ম্ম করিবার কি প্রয়োজন আছে? বলা বাহুল্য ঈদৃশ নির্ম্মলচিত্ত লোক অতিশয় বিরল; প্রায় সকলেরই চিত্তে কামক্রোধাদি মলিনতা অল্লাধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

গীতা বলেন যে ঈদৃশ নির্ম্মলচিত্ত ব্যক্তিগণ কর্ম্ম অনুষ্ঠান না করিয়াও সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন।

যস্ত্বাত্মরতিরেবস্যাদ্ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।

আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥৩।১৭

যিনি আত্মাতেই আনন্দ পান, তৃপ্তি পান এবং সন্তুষ্ট থাকেন [অর্থাৎ যাঁহার চিত্তে কোন বাহ্যবস্তুর জন্য কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা নাই, কারণ আকাঙ্ক্ষা থাকিলেই চিত্ত মলিন হইবে] ঈদৃশ নির্মলচিত্ত ব্যক্তির সিদ্ধিলাভের জন্য কর্মানুষ্ঠান অনাবশ্যক। [কিন্তু তাঁহাদেরও কর্মানুষ্ঠান করিবার অন্য প্রয়োজন আছে—তাহা পরে দেখিতে পাওয়া যাইবে]।"

অসক্ত বুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।

নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥১৮।৪৯

"যাঁহার বুদ্ধি অনাসক্ত, যিনি সর্বদা জিতেন্দ্রিয় এবং কামনাশূন্য, ঈদৃশ নির্মলচিত্ত ব্যক্তি কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক যে ব্রহ্মাত্মবোধ হইলে সকল কর্ম নিরস্ত হয় সেই উৎকৃষ্ট সিদ্ধি প্রাপ্ত হন।"

কিন্তু ঈদৃশ সাধু ব্যক্তির নিজের জন্য কর্ম্মের প্রয়োজন না থাকিলেও তাঁহারা যে সকল কর্ম পরিত্যাগ করিবেন, গীতার এরূপ অভিপ্রায় নহে। গীতা বলেন যে, ঈদৃশ ব্যক্তিও কর্ম করিবেন,—জগতে সাধু দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য।

লোক সংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি॥৩।২০

"সকলকে স্বধর্মে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য তোমার কর্ম করা উচিত।"

কারণ,

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনঃ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥৩।২১

"শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেরূপ আচরণ করে, সাধারণ লোক সেইরূপ আচরণ করে। তাঁহারা যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া প্রমাণ করেন, সাধারণ লোক তাহারই অনুসরণ করে।"

সক্তাঃ কর্ম্মণ্য বিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।

কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহং॥ ৩।২৫

"জ্ঞানহীন ব্যক্তি আসক্তিপূর্ব্বক যে রকম কর্ম করে, জ্ঞানী ব্যক্তি অনাসক্ত হইয়া লোকশিক্ষার্থ সেইরূপ কর্ম করিবেন।"

বস্তুতঃ স্বয়ং ভগবান এই উদ্দেশ্যে কর্ম করিয়া থাকেন। ভগবানের অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই। তথাপি জগতের হিতার্থ তিনি কর্ম করিয়া থাকেন।"

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।

নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥ ৩।২২

"হে অর্জুন, আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই। ত্রিলোকে আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই।"

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং যাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।

মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃপার্থ সর্বশঃ॥ ৩।২৩

"আমি যদি আলস্য ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা কর্ম না করি, তাহা হইলে মনুষ্যগণ আমার পথ অনুসরণ করিবে, (কর্ম ত্যাগ করিয়া আলস্যে কাল কাটাইবে)। আমি যদি কর্ম না করি, তাহা হইলে এই জগৎ নষ্ট হইয়া যাইবে।"

গীতায় ভগবান যেরূপ অনাসক্ত ভাবে কর্ম করিবার উপদেশ দিয়াছেন, তিনি স্বয়ং সেইরূপ অনাসক্ত ভাবেই কর্ম করেন।

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা। ৪।১৪

"কর্ম আমাতে লিপ্ত হয় না; কর্মফলে আমার স্পৃহা নাই।"

ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।

উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু॥ ৯।৯

"সেই সকল কর্ম আমার বন্ধনের কারণ হয় না। কারণ আমি সেই সকল কর্মে আসক্তি ত্যাগ করিয়া উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করি।"

কর্ম কি ভাবে করা উচিত, গীতাতে প্রধানতঃ তাহাই বলা হইয়াছে। কি কর্ম করা উচিত তাহার সংক্ষেপে উল্লেখ আছে। যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা করা উচিত (১৮।৫)। ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের নির্দ্দিষ্ট কর্ম ও সংক্ষেপে বলা হইয়াছে (১৮ অধ্যায় ৪১-৪৪ শ্লোক) এ বিষয়ে বিস্তারিত উপদেশের জন্য অন্য শাস্ত্র আশ্রয় করিতে হইবে। এজন্য শাস্ত্র পাঠ করা কর্ত্তব্য।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।

ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাংগতিং॥ ১৬।২৩

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।

জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥ ১৬।২৪

"যিনি শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া ইচ্ছামত কার্য্য করেন, তিনি সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না, সুখ এবং মোক্ষ প্রাপ্ত হয় না।"

"এজন্য কি কার্য্য করা উচিত কি অনুচিত এ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। শাস্ত্রোক্ত বিধান অবগত হইয়া তদনুসারে তোমার কর্ম করা উচিত।"

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়!।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃসমো ভূত্বাসমত্বং যোগ উচ্যতে॥২।৪৮

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়!

বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥৪৯

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।

তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্॥৫০

কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।

জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥৫১

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।

তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥৫২

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।

সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যতি॥৫৩

দানের মর্য্যাদা

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(৫)

উষা স্বামীর সহিত কলিকাতায় চলিয়া গেল।

বাড়ীটা যেন অন্ধকার হইয়া গেল। একা উষাই বাড়ীটাকে হাসাইয়া রাখিত। ছুটাছুটি করিতে, চীৎকার করিয়া বাড়ীটা সরগরম করিয়া রাখিতে তাহার মত আর কেহই ছিল না। উমা যেমন শান্ত, নম্র ছিল, উষা ঠিক তাহার বিপরীত ছিল উমা সময় সময় তাহার দুর্দ্দান্ততার জন্য তাহাকে তিরস্কার করিত, সেটা কেবল তাহার ভবিষ্যৎ শ্বশুরবাড়ীর ভয়ে। উষা যেদিন রাগ করিয়া মুখ ভার করিয়া থাকিত, সেদিন বাড়ীটা একেবারেই নিস্তব্ধ হইয়া পড়িত। সে নিস্তব্ধতা শুধু উমার নয়, নির্জ্জন স্থানাভিলাষী অমরনাথের পর্য্যন্ত বিসদৃশ বলিয়া ঠেকিত।

উমা গোপনে চোখের জল মুছিয়া বগলা দেবীর কাছে গিয়া হাসিল, "বেশ হয়েছে, না ঠাকুর মা? উষা সেখানে বেশ সুখেই থাকবে।"

ঠাকুরমা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "হুঁঃ, সুখ যে কত হবে তা আমিই জানছি। সেই সব মেলেচ্ছ আচার ব্যবহার—তাদের মধ্যে গিয়ে ও কখনো থাকতে পারবে উমা?"

উমা নিজের দীর্ঘনিঃশ্বাসটা চাপিয়া ফেলিয়া বলিল, "তা আর কি হবে ঠাকুরমা যা হবার তা তো হয়েই গ্যাছে, বিয়েটা তো আর ঘুরোনো যাবে না।"

বগলা দেবী তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "হলেই হত। তোমরা সবাই যে ওই বরই ঠিক করলে—তবে হবে না কেন? বাপের মত হল, বোনের মত হল, অমনি বিয়ে হয়ে গেল। আমি আর কোথাকার কে, একটা দাসী বাঁদি বই তো নই, আমার কথা কি গ্রাহ্য হতে পারে?"

ঠাকুরমায়ের এই উল্টা অভিযোগে উমা যেন আত্মহারা হইয়া গেল, বলিল, "কিন্তু ছেলেটী—"

বাধা দিয়া বগলা দেবী বলিলেন, "জানি বাছা, জানি তা; কিন্তু শুধু ছেলে ভাল নিয়ে কি ধুয়ে খাব? ছেলের রূপ আছে, বিদ্যা আছে, পয়সা আছে, কিন্তু গুণটা আছে কি বল দেখি? বাসরের রাতটায় কি কাণ্ডটা না করলে? মাগো, মেয়েরা সব কি নিন্দেই না করে গেল। করবে নাই বা কেন? বাসরে মেয়েরা বরকে কত ঠাট্টা তামাসা করে,—কিছু বোঝে না, কিছু জানে না, অমনি লাফিয়ে উঠে যায় আর কি? সহুরে ছেলে, বিলেতও গেছল, এমন চাষা কেন?"

উমা একটু হাসিল, বলিল, "সত্যি ঠাকুরমা, চাষার মতই শিক্ষাটা তার,—বাসর কি তা বোঝে না। কে

বোঝে না জানো ? ওরা সব সাহেব-ঘেঁষা লোক কি না,—সাহেবদের মধ্যে তো বাসর নেই, কাজেই বাসর ওরা জানবে কি করে ? রাগ করলেও তার সাজে। কিন্তু দেশের মেয়েরা কেন যে চটেন, তা আমি বুঝতে পারছি নে।"

বগলা দেবী রাগ করিয়া মুখ ফিরাইয়া রহিলেন, কথা কহিলেন না। উমা সেখানে আর কথাবার্ত্তার সুবিধা না দেখিয়া বাহির হইল।

অমরনাথ আজ জমীদারির কাজে হাত দেন নাই। নিজের ঘরে একটা সোফায় বসিয়া একখানা বই দেখিতেছিলেন। মনটা কোথায় ছিল কে জানে, তিনি কেবল পাতা উল্টাইয়াই যাইতেছিলেন।

উমা পিতার পায়ের কাছে নীচে বসিয়া পড়িল। পিতার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল, কোনও কথা বলিল না।

অমরনাথ বইখানা সমীপবর্ত্তী টেবলের উপর রাখিয়া কন্যার পানে চাহিলেন। পাখানা সরাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "থাক মা, পা টিপতে হবে না, তুমি এই চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসো।"

উমা বলিল, "না বাবা, একটুখানি পা টিপে দিই। সকাল বেলায় বলছিলে পা ব্যথা করছে, তাই—"

সস্নেহকণ্ঠে অমরনাথ বলিলেন, "সকালবেলায় ব্যথা করেছিল, এখনও কি তা থাকে মা ? বিকেল হয়ে গ্যাছে যে।"

উমা তথাপি পা ছাড়িল না, নীরবে পদসেবা করিতে লাগিল।

অমরনাথ একটুখানি নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আজকের খবরের কাগজখানা পড়া হয় নি, একটু পড় তো, শুনি মা।"

শ্রান্ত কণ্ঠে উমা বলিল, "আজ কিছু ভাল লাগছে না বাবা।"

কেন যে ভাল লাগিতেছে না পিতা তাহা বেশ জানিতেন। চঞ্চলা যে বালিকাটী ছিল সে আজ নাই, বাড়ীটাতে এত লোক থাকা সত্ত্বেও মনে হইতেছে, কেহ নাই। অমরনাথ প্রাণে ভারি শূন্যতা অনুভব করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে বেদনাটা ফুটিয়া প্রকাশ হইতে পায় নাই।

অমরনাথ বলিলেন, "কেন ভাল লাগবে না মা ? ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, উমা যেন জন্মে জন্মে শ্বশুরঘরই করে, বাপের বাড়ীর সঙ্গে যেন তার সম্পর্ক না রাখতে হয়।"

উমার দুটি চোখ দিয়া গোপনে দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল, সে মুখখানা অবনত করিয়া কোনও ক্রমে সে অশ্রুবিন্দুকে মুছিয়া ফেলিয়া ভারি গলায় বলিল "সে প্রার্থনা তো দিন-রাতই করছি বাবা।"

আজ অমরনাথেরও কোন কথা ফুটিতে চাহিতেছিল না। উমা সেখানেও বেশীক্ষণ থাকিতে পারিল না, একটা ছুতা ধরিয়া খানিক পরেই বাহির হইল।

তাহার স্নেহপ্রবণ হৃদয়খানা আজ কিছুতেই ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছিল না। সে মুক্ত ছাদে গিয়া বসিয়া রহিল। মনে জাগিতেছিল, উমার ছোটবেলা হইতে আজ পর্য্যন্ত সব দিনগুলার কথা।

দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, বিন্দু গোয়ালিনী দেখা করিতে চায়।

বিরক্ত ভাবে উমা বলিল, "কেন ?"

দাসী বলিল, "তা বলছে না।"

উমা একটু ভাবিয়া বলিল, "তার মাসিক বৃত্তি তো তাকে সে দিন দেওয়া হয়েছে, আবার কি দরকার ? আচ্ছা, ডেকে নিয়ে আয় আমার কাছে।"

শুধু বিন্দু গোয়ালিনী নয়, অনেক দীন দরিদ্র উমার নিকট হইতে মাসিক সাহায্য প্রাপ্ত হইত। কেবল অমরনাথ ইহা জানিতেন, আর কেহই জানিত না। কন্যার এই সৎকার্য্যে পিতা বাধা দেন নাই, বরং আরও উৎসাহ দিতেন।

বিন্দু আসিয়া দাঁড়াইল।

উমা জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কি দরকার ?"

বিন্দু কাঁদিয়া বলিল, "দরকার না থাকলে কি আসি দিদিমণি ?"

উমা বিরক্ত হইয়া বলিল, "মর, কেঁদেই মরছেন ; আসল কথাটা কি আগে তাই বল, তার পর যত পারিস কাঁদিস, আমি বারণ করব না। সেদিন গোমস্তা বাবু তোকে টাকা দিয়ে আসেন নি ?"

বিন্দু চোখ মুছিয়া বলিল, "দিয়েছেন।"

উমা বলিল, "তবে আর কি চাস, আবার কাঁদছিস কেন ?"

বিন্দু রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "সব কেড়ে নিয়ে পালিয়েছে সে,—একটা পয়সা ঘরে নেই, যা দিয়ে ছেলেটার খাবারের একটু যোগাড় করি। নিজের কি দিদিমণি, দু' দিন না খেয়েও বেশ কাটিয়ে দিতে পারি ; কিন্তু ছেলেটা"—বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া আকুল হইল। উমা খানিকক্ষণ গম্ভীর ভাবে বসিয়া থাকিয়া বলিল, "তোরই দোষ।"

বিন্দু কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল "কিসে দিদিমণি ?"

জ্বলিয়া উঠিয়া উমা বলিল, "আবার জিজ্ঞাসা করছিস কিসে ? তোর স্বামী এতটা অধঃপাতে গ্যাছে, সেও তোর জন্যে। তুই যদি একটু শক্ত হতিস, তবে এতটা হতে পারত না।"

বিন্দু বলিল, "আর কি করে শক্ত হব দিদিমণি ? যে কিছু বোঝে না, তাকে বুঝাব কি ? প্রথম প্রথম ঝগড়া করতুম, সেবা করতুম না,—ভাবতুম, এমনি করলে সে ঠিক জব্দ হয়ে যাবে, নিজের ওপরে নিজের ঘেন্না হবে। তাতে কোনই ফল পাই নি। তার পরে তোমার কথা শুনে, তোমার উপদেশ মতই চলতে লাগলুম, ঝগড়া করা একেবারেই ছেড়ে দিলুম, প্রাণপণে সেবা যত্ন করতে লাগলুম। এতে সে বেশী সাহস পেয়ে গেল। আগে সে কখনও একটা কথা আমায় বলতে সাহস করে নি,—কিন্তু এখন দিদিমণি, সে আর ভয় করে না,—চক্ষুলজ্জা বলে একটা যে জ্ঞান, সেটাও আর নেই। এই দেখ দিদিমণি, তার কাছে আমার একেবারে নীচু হয়ে থাকার—সেবা-যত্ন করার চিহ্ন আমার গায়েই দেখতে পাবে—।"

সে পিঠের কাপড়খানা তুলিয়া দিল,—বিস্ময়ে উমা চাহিয়া দেখিল, অনেকগুলা প্রহারের চিহ্ন।

অতি কষ্টে চোখের জল প্রশমিত করিতে করিতে বিন্দু বলিল, "আর আমি কি করব দিদিমণি, শক্ত হয়েও দেখলুম, নরম হয়েও দেখলুম। শক্ত হয়ে যে ভয়, যে চক্ষুলজ্জাটা রাখতে সমর্থ হয়েছিলুম, নরম হয়ে তা সবই হারিয়েছি। এখন আমায় কি করতে বল।"

উমা আকাশ পানে চাহিল, সাধ্বী স্ত্রীর এই লাঞ্ছনা, ভগবান, আছ কি তুমি ? চোখ দুইটী সত্যই খাইয়া বসিয়া আছ, না আছে তাহা ?

উমা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া চোখ নামাইয়া বলিল, "সবই দেখছি বিন্দু! কিন্তু তোকে বলছি আমি—হাল ছেড়ে দিস নে, হাল ছাড়লেই তোর নৌকা একেবারে অতল জলে ডুবে যাবে। মনে কর—এইবার তোর স্বামী যথার্থ মুক্তিলাভ করবে। সতী-স্ত্রীর গায়ে হাত তোলা—বড় সহজ কথা মনে করিস নে, এর জন্যে অনুতাপ তাকে করতেই হবে ; সেই অনুতাপের ফলেই তার দানবত্ব ঘুচে যাবে, সে আবার সেই হবে। মনে করে দেখ, গৌর নিতাই যখন নদীয়ার পথে পথে হরিনাম করে বেড়াচ্ছিলেন, তখন পাপিষ্ঠ জগাই মাধাই সে পবিত্র নাম সহ্য করতে না পেরে, কলসীর কানা ছুঁড়ে মেরেছিল, যা মহাপ্রভুর কপালে লেগে রক্তপাত পর্য্যন্ত হয়েছিল। কিন্তু তিনি তখন কি বলেছিলেন জানিস ? তাঁর মহত্ব দেখে পাপী দুভাই যখন তাঁর পায়ের তলে লুটিয়ে পড়ল, কিন্তু সাধারণ যখন তাদের হরিনাম দিতে মহাপ্রভুকে নিষেধ করলে, তখন তিনি চোখের জলে ভেসে বললেন, 'মেরেছে কলসীর কানা, তা বলে কি প্রেম দিব না।' দেখছিস—কত বড় মহান ত্যাগের দৃষ্টান্ত চোখের সামনে! তিনি তাদের দুই হাতে জড়িয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন, তাঁদের নাম দিলেন, তারা মুক্তিলাভ করলে। বিন্দু, তোর স্বামী তোকে মেরেছে, তুই অটুট থাক, তেমনি সেবা যত্ন করে যা, যত বড় মহাপাপী—যত বড় পাপিষ্ঠই হোক না, তাকে ভাল হতেই হবে। কিন্তু তুই যদি এখন কঠিন হয়ে উঠিস, সে অনুতাপ করবে না, সে ভালও হবে না। তাকে ভাল করতে, সৎপথে ফিরাতে, চাই কেবল প্রেম, তা ছাড়া আর কিছু দিয়ে কাজ হবে না। যে মন্দ, তারও পরে কঠিন ব্যবহার করতে গেলে, সে আরও মন্দ হয়ে যায়, তাকে আর ফেরানোর আশা করা যায় না। কিন্তু সৎ ব্যবহারে তাকে অনায়াসে ফেরানো যেতে পারে, এই কথাটা মনে রাখিস।"

বিন্দুর চোখের জল শুকাইয়া গিয়াছিল, আনন্দে তাহার হৃদয়খানা পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সে নত হইয়া উমার পায়ের ধূলা মাথায় দিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিল, "তোমার কথামতই চলব দিদিমণি,—তুমি মানুষ নও, দেবী। কিন্তু আজ কি খেতে দেব ছেলেটাকে ?"

উমা বলিল, "চল, আমি দিচ্ছি।"

নীচে নামিয়া গিয়া নিজের গৃহে সে প্রবেশ করিল; বাক্স খুলিয়া একখানা পাঁচটাকার নোট তাহার হাতে দিয়া বলিল, "এইটে নিয়ে যা। নগদ পয়সা একটাও হাতে রাখিস নে, যা যা দরকার, একেবারে সব কিনে নিয়ে যা।"

বিন্দুর কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ হইয়া গেল। সে নীরবে নোটখানা লইয়া চলিয়া গেল। উমা আবার ছাদে গিয়া বসিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, বাহির-বাটীতে গৃহ-দেবতা গোবিন্দজীর মন্দিরে আরতির উদ্যোগ হইতেছিল। প্রত্যেক দিনই আরতির সময় উমা মন্দিরে উপস্থিত থাকিত, আজ সে গেল না।

আকাশে একটী দুটি করিয়া অসংখ্য তারা ফুটিয়া উঠিতেছিল; ধরণীর গায়ে অন্ধকার ক্রমে নিবিড় ভাবেই নামিয়া আসিতেছিল। অমরনাথের ফুলবাগানের পাশে গোটাকতক শৃগাল খুব চীৎকার করিয়া উঠিতেই, চাকরের দল হৈ-হৈ করিয়া তাড়া দিল; বেচারা শৃগালকুল চীৎকারে বাধা পাইয়া পলাইল। মন্দিরে আরতির শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর বাজিয়া উঠিল।

উমার কোন দিকেই মন ছিল না; সে আকাশের পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল বিন্দুর কথা,—উমার কথাও তখন তাহার মনে ছিল না।

সংসারে এমন ঢের বিন্দু আছে, যাহারা এমনি করিয়া মাতাল স্বামীর হাতে মারই খাইয়া যায়, কেহ নীরবে সহিয়া যায়, কেহ উগ্ররূপ ধরে। সামান্য স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে গিয়া আমাদের দেশের অনেক ছেলেই মাতাল হয়। তাহাদের আত্মীয়-পরিজন অপদস্থ হয়ও তো বড় নয়। তাহার মনে পড়িল, এক দিন তাহাদের বৈঠকখানার সামনে রতন জেলেকে দেওয়ান মতিবাবু উত্তম মধ্যম প্রহার করিয়াছিলেন। পরদিন সে কারণটা শুনিতে পাইয়াছিল। রতন মদ খাইয়া, জ্ঞান হারাইয়া, তাহার মাকে মারিয়াছিল,—তাই তাহাকে শাসন করিয়া দেওয়া হইল।

কারণ শুনিয়া সে বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া পড়িলে, তাহার সম্পর্কীয়া মাসীমা তাহাকে বুঝাইয়াছিলেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই, অনেক শিক্ষিত ভদ্রসন্তানও এরূপ করিয়া থাকে। মদ খাওয়া যে শিক্ষা-দীক্ষাবিহীন ছোটলোকের কাজ, তাহা নহে; অনেক ভদ্রলোকও ইহাকে গৌরবের জিনিস বলিয়া মনে করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি তাঁহার যায়ের পুত্র মনীশের উল্লেখ করিয়াছিলেন। মনীশ ছেলেটীকে উমা চিনিত। সে প্রায়ই এখানে আসা-যাওয়া করিত। সে এম-এ পাশ দিয়াছিল, এবং পরে কলিকাতার কোনও কলেজের প্রফেসার হইয়াছিল।

মনীশ মদ খায়—কথাটা শুনিয়া উমা একেবারে আকাশ হইতে পড়িয়াছিল। সে মনিদার চরিত্রে তো কোন দিনই দোষ দেখিতে পায় নাই। মনিদা এমন জ্ঞানবান ছিল,—এমন বুদ্ধিমান ছিল, যে, উমা তাহার নাগাল পাওয়া অসম্ভব বলিয়াই জানিয়া রাখিয়াছিল। মনিদার মত লোক মদ খায়—একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু পিতা বলিয়াছেন, জগতে কিছুই অসম্ভব নয়, সবই সম্ভব হইতে পারে। পিতার কথা উমার কাছে বেদবাক্য, উমা তাই ভাবিয়াছিল, হইতেও পারে।

আজ বিন্দুর কথা ভাবিতে ভাবিতে এই সব কথাই তাহার মনে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। এই সব স্বামীর স্ত্রী, স্বামীর নিকট উৎপীড়িতা হইয়া মৃত্যুকেই প্রার্থনা করে। হিন্দু-স্ত্রীর স্বামীই দেবতা, দেবতাকে তাহারা অবহেলা করিতে পারে না,—ঘৃণা আসিলেও তাহা চাপিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু এই সব দেবতা—ইহারা পূজা লইতে জানে, পূজারিণীর পানে তাকাইতে জানে না।

জগৎটা এ রকম কেন? এখানে সকলেই লইতে চায়, দিতে কেউ চায় না। যদি আদান-প্রদান সমানই চলিত, তবে জগৎটা যথার্থ স্বর্গ হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। আদান-প্রদান নাই বলিয়াই জগৎ—জগৎ।

মন্দিরের আরতির বাদ্য থামিয়া গেল, দর্শকের কণ্ঠ হইতে যুগপৎ শব্দ উঠিল,—হরিবোল—হরিবোল।

উমা গলায় কাপড় দিয়া নতজানু হইয়া প্রণাম করিল। খানিকক্ষণ প্রার্থনা করার পরে তাহার মনটা অনেকটা পাতলা হইয়া গেল। সে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

দাসী আসিয়া বলিল, "বাবু ডাকছেন।"

তাহার সহিত উমা নামিয়া গেল।

(৬)

শ্বশুরবাড়ী যে কি জিনিস, তাহা বাঙ্গালীর মেয়ে বেশ জানে। জ্ঞান বুদ্ধির সঙ্গেসঙ্গেই শ্বশুরবাড়ী কথাটা তাহার কাণে আসিয়া লাগে, এবং সেই সময় হইতেই তাহাকে শ্বশুরবাড়ীর উপযোগী করিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। সে একটা কিছু অন্যায় কাজ করিলেই তাহাকে তাড়না করা হয়—শ্বশুরবাড়ী গেলে কি উপায় হইবে? প্রতি পদে তাহাকে ধীর, শান্ত, নম্র হইবার উপদেশ দেওয়া হয়, যেন সে শ্বশুরবাড়ীর জীবনটাকে দুঃসহ মনে করিতে না পায়। শ্বশুরবাড়ীর জন্যই মেয়ের জীবন, কারণ মেয়ে শুধু মা, আর কিছুই নয়। এই মাতৃত্বের শিক্ষা অভিভাবিকার কাছে। এইখান হইতে সে যে শিক্ষা লাভ করিবে, তাহাই তাহার জীবনটাকে রমণীয় করিয়া রাখিবে। বাংলার মেয়ে ছোট বেলা হইতে সংযম শিক্ষা করিতে শেখে। নানা ব্রতের মধ্য দিয়া তাহাকে সহনশীলা করিয়া গড়িয়া তোলা হয়; কারণ, মা হইতে গেলে সহনশীলতা আবশ্যক। শ্বশুরবাড়ীতে সকল মেয়েকেই যাইতে হইবে; তাহাদিগকে তাহার উপযোগী শিক্ষালাভ করিতেও হইবে; নহিলে তাহার জীবনটাই খাপছাড়া হইয়া যাইবে; সংসারের কাহাকেও সে সুখী করিতে পারিবে না।

ঊষাও এ শিক্ষার হাত এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। ছোটবেলা হইতে সে বিশেষ করিয়া বগলা দেবীর নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছে। বেশী হাসা, চীৎকার করা, দৌড়াদৌড়ি করা, এ সবই স্ত্রীলোকের নীতিবিরুদ্ধ কাজ। চঞ্চলা ঊষাকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য তিনি তখন যে ভাষা প্রয়োগ করিতেন, তাহা কোনও সভ্যসমাজে উক্ত হইবার নহে। তখন ঊষার নিকট তাহা অত্যন্ত খারাপ লাগিলেও, এখন তাহা কাজে লাগিল।

সে দেখিল, যথার্থই ঠাকুরমা ও দিদি তাহাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য। স্ত্রী-জীবনে শ্বশুরালয় প্রথম সময়ে একটা কারাগার বলিয়াই ঠেকে। ক্রমে সেই কারাগার আবার মুক্ত রাজ্য বিবেচিত হয়, তাহার সকল বন্ধন আলগা হইয়া যায়, এবং সেই রাজ্যের একচ্ছত্রী রাণী হয় সেই ক্ষুদ্র বধূটীই। কিন্তু প্রথম নূতন বধূ, সে না পায় আনন্দ, না পায় স্ফূর্ত্তি। চোখের জলে, আর পুরাতন স্মৃতি মনে করিয়া, অতি কষ্টেই তাহার দিন কাটে।

ঊষা জলের মাছ ডাঙ্গায় গিয়া পড়িল।

অবগুণ্ঠনের আড়ালে যে নিজের চক্ষুজল লুকাইবে, সে যোও ছিল না। অবগুণ্ঠন একটীবারও সে দিতে পারে নাই।

এ বাড়ীর সবই তাহার কাছে নূতন বলিয়া ঠেকিতে লাগিল।

গাড়ী হইতে নামিবামাত্র একটী যুবতী আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া নামাইয়া লইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া সে একেবারে বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল। অত বড় মেয়ে, বোধ হয় তাহার দিদির মত,—তাহার মাথায় সামান্য একটু কাপড় পিন দিয়া আঁটা, সামনেটা সবই খোলা। কাপড় পরার ধরণটাই বা কেমন? পিছনে আবার কাপড় খানিকটা কুঞ্চিত করা, অঞ্চলটা বুকের বামদিকে একটা ব্রোচে আঁটা। পায়ে গোড়ালী উঁচু জুতা, আবার মোজা।

বিস্মিতা ঊষা অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিল, কই, সিন্দূর তো সিঁথিতে নাই। মেয়েরা আবার বাঁকা করিয়া পুরুষদের মত সিঁথা কাটে, এদের যে সবই আশ্চর্য্য।

আরও কয়েকটী মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইল, সকলেরই সেই এক সমান বেশ ভূষা। 'অবগুণ্ঠনাবৃতা' ঊষাকে দেখিয়া তাহারা হাসিয়াই আকুল, একজন বলিল, "সতী, তোর ভাইবউ তো বেশ ঘোমটা দেয়। মৃন্ময় বাবুর খাসা বউ হয়েছে। এত পছন্দ, এ বিয়ে করব না, ও বিয়ে করব না, শেষে পছন্দ হল বুঝি এই তিন হাত লম্বা ঘোমটাবতীটিকে।"

সতী মৃদু হাসিয়া বলিল, "না ভাই, ঠাট্টা করিস নে। দেখিস, এই বউকে কেমন করে তৈরি করে নিই।"

আর একটী মেয়ে—তার চোখে এক জোড়া চশমা, হাতে একটী রিষ্ট ওয়াচ,—সে অগ্রসর হইয়া আসিয়া ঊষার মুখের অবগুণ্ঠন তুলিয়া দিল, "ওগো, তোমায় আর অত ঘোমটা টানতে হবে না। সতী, তোর ভাই-বউ আবার চোখ বুজে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল যে।"

সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

এই সব হাস্য-পরিহাসের মধ্যে ঊষা সত্যই কাঠ হইয়া গিয়াছিল। তাহার চোখ ভরিয়া অনেকখানি জল আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; হঠাৎ কখন তাহা উপছাইয়া গণ্ড বাহিয়া

পড়িয়া গেল। পিতার উপর, দিদির উপর অভিমানে তাহার সারা হৃদয়খানা ভরিয়া উঠিল। তাঁহারা তো সবাই জানিতেন,—জানিয়া শুনিয়া কেন এখানে তাহার বিবাহ দিলেন।

চশমা-চোখে মেয়েটী মৃন্ময়ের পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "সুন্দর স্ত্রী পেয়েছেন মৃন্ময় বাবু, চালিয়ে নিতে পারবেন তো?"

মৃন্ময় ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উষার পানে একবার চাহিল, তার পর আস্তে আস্তে সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

উষা দাঁড়াইয়া কাঁদিয়াই আকুল হইতেছিল। যে দাসীটা তাহার সহিত প্রসাদপুর হইতে আসিয়াছিল, সে এই গোলযোগ দেখিয়া, অনেক দূরে দাঁড়াইয়া, অবাক্ হইয়া চাহিয়া ছিল। সে পল্লীগ্রামের অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক মাত্র। একে সহরে পা দিয়াই সে চমকিয়া গিয়াছিল, তাহার উপর এই আশ্চর্য্য সুন্দরীর দল দেখিয়া সে আর পলক ফেলিতে পারিতেছিল না। উষা তাহাকে কাছে পাইবার আশায় দু'চারবার এদিক ওদিক চাহিল, তাহাকে দেখিতে না পাইয়া তাহার চোখের জল আরও বেশী পড়িতে লাগিল।

"এসো, আমার মা লক্ষ্মী, আমার ঘরে এসো মা—"

উষা মুখ তুলিল। সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে যথার্থই মাতৃ-মূর্ত্তি। চওড়া লালপেড়ে একখানি শাড়ি তাঁহার পরিধানে, একটী সাদাসিদা সেমিস গায়ে, সীমন্তে উজ্জ্বল সিন্দূর-বিন্দু দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছে। হাতে কতকগুলি সোণার চুড়ি। তাঁহার মুখখানায় যথার্থ দেবীর ন্যায় জ্যোতিঃ। তাঁহাকে দেখিলে যথার্থই হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠে।

উষা তাঁহার পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। তিনি অগ্রসর হইয়া উষাকে দুই হাতে জড়াইয়া বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন, তাহার ললাটে একটা স্নেহচুম্বন দিয়া বলিলেন "কান্না কেন মা, আমি যে তোমার মা রয়েছি এখানে। তোমার মা নেই, তাই ভগবান আমায় তোমার মা করে পাঠিয়ে দেছেন। এস মা আমার আনন্দময়ী, আমার ঘর আলো করবে এস, আমার শূন্য ঘর পূর্ণ করবে এস।"

সতীর পানে চাহিয়া ভৎর্সনার সুরে বলিলেন, "ছি সতী, কাজটা তোমাদের মোটেই উচিত হয় নি। পল্লীগ্রামের মেয়ে, কি জানে সে। তোমাদের কথাবার্ত্তা, হাসি দেখে সে কেঁদে ভাসাচ্ছে, দেখছ কি? ছেলে মানুষ, তোমাদের কি বোঝে সে?"

সতী অপ্রস্তুত ভাবে আস্তে আস্তে সরিয়া গেল। উষাকে লইয়া মৃন্ময়ের মা মালতী দেবী বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এই মুহূর্ত্তেই উষার মনটা তাঁহার পদতলে একেবারে লুইয়া পড়িল, সে সজল চোখ মালতী দেবীর মুখের উপর রাখিল।

দাসী শ্যামা এক সময়ে তাহাকে একাকিনী পাইয়া চুপি চুপি বলিল, "কি রকম লোক এরা দিদি? বরণ নেই, আচার নেই, কিছু নেই, আমাদের দেশ ঘরে বিয়ে হলে এতক্ষণ কত কাণ্ড হতো। এ সবই অনাছিষ্টি দেখছি। শুনেছিলুম হিন্দু নয়, বিশ্বাস করিনি, এখন দেখছি ঠিকই।"

উষার মনেও কথাটা ঘুরিয়া ফিরিয়া বাজিতেছিল। সে কত বিবাহ দেখিয়াছে, এমন আশ্চর্য্য কখনও দেখে নাই। প্রতিবেশী রামসদয় বাবুর ছেলে হৃদয় বিবাহ করিয়া আসিল, বধূকে দুধ আলতার পাথরে দাঁড় করানো হইল, বরণ করা হইল, আরও কত কি হইল। কই, তাহার বিবাহে তো সে সব কিছুই হইল না।

সে যত দেখিতে লাগিল, ততই আশ্চর্য্য হইতে লাগিল। এ বাড়ীতে তাহার শাশুড়ী মালতী দেবী ছাড়া আর সকলেই জুতা পায় দেয়, সকলের সম্মুখে বাহির হয়।

ননদিনী সতীর বাল্যসখী কয়টী মেয়ে দুই তিন দিন সে বাড়ীতে ছিল। মালতী দেবীর ভয়ে তাহারা উষাকে আর ঠাট্টা-তামাসা করিতে পারে না, তাহার কাছেও বড় একটা আসে না। ইহাতে উষা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। ইহাদের ঠাট্টা-তামাসার ভয় তাহার বড় বেশী রকম ছিল।

সে দিনে বাড়ীতে একটা সান্ধ্য-সম্মিলন ছিল, ইহাতে বন্ধু-বান্ধব সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বড় হলটা নরনারীতে ভরিয়া গিয়াছিল। মজলিসের হাসি, কণ্ঠ উষার কাণে অপর কক্ষে ভাসিয়া আসিতেছিল। অনভিজ্ঞ বালিকা উষা বসিয়া ভাবিতেছিল—এ আবার কি, এ কাহাদের মধ্যে সে আসিয়া পড়িয়াছে। বাবা দেখিয়া

(৬)

শ্বশুরবাড়ী যে কি জিনিস, তাহা বাঙ্গালীর মেয়ে বেশ জানে। জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গেসঙ্গেই শ্বশুরবাড়ী কথাটা তাহার কাণে আসিয়া লাগে, এবং সেই সময় হইতেই তাহাকে শ্বশুরবাড়ীর উপযোগী করিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। সে একটা কিছু অন্যায় কাজ করিলেই তাহাকে তাড়না করা হয়—শ্বশুরবাড়ী গেলে কি উপায় হইবে? প্রতি পদে তাহাকে ধীর, শান্ত, নম্র হইবার উপদেশ দেওয়া হয়, যেন সে শ্বশুরবাড়ীর জীবনটাকে দুঃসহ মনে করিতে না পায়। শ্বশুরবাড়ীর জন্যই মেয়ের জীবন, কারণ মেয়ে শুধু মা, আর কিছুই নয়। এই মাতৃত্বের শিক্ষা অভিভাবিকার কাছে। এইখান হইতে সে যে শিক্ষা লাভ করিবে, তাহাই তাহার জীবনটাকে রমণীয় করিয়া রাখিবে। বাংলার মেয়ে ছোট বেলা হইতে সংযম শিক্ষা করিতে শেখে। নানা ব্রতের মধ্য দিয়া তাহাকে সহনশীলা করিয়া গড়িয়া তোলা হয়; কারণ, মা হইতে গেলে সহনশীলতা আবশ্যক। শ্বশুরবাড়ীতে সকল মেয়েকেই যাইতে হইবে; তাহাদিগকে তাহার উপযোগী শিক্ষালাভ করিতেও হইবে; নহিলে তাহার জীবনটাই খাপছাড়া হইয়া যাইবে; সংসারের কাহাকেও সে সুখী করিতে পারিবে না।

ঊষাও এ শিক্ষার হাত এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। ছোটবেলা হইতে সে বিশেষ করিয়া বগলা দেবীর নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছে। বেশী হাসা, চীৎকার করা, দৌড়াদৌড়ি করা, এ সবই স্ত্রীলোকের নীতিবিরুদ্ধ কাজ। চঞ্চলা ঊষাকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য তিনি তখন যে ভাষা প্রয়োগ করিতেন, তাহা কোনও সভ্যসমাজে উক্ত হইবার নহে। তখন ঊষার নিকট তাহা অত্যন্ত খারাপ লাগিলেও, এখন তাহা কাজে লাগিল।

সে দেখিল, যথার্থই ঠাকুরমা ও দিদি তাহাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য। স্ত্রী-জীবনে শ্বশুরালয় প্রথম সময়ে একটা কারাগার বলিয়াই ঠেকে। ক্রমে সেই কারাগার আবার মুক্ত রাজ্য বিবেচিত হয়, তাহার সকল বন্ধন আলগা হইয়া যায়, এবং সেই রাজ্যের একছত্রী রাণী হয় সেই ক্ষুদ্র বধূটাই। কিন্তু প্রথম নূতন বধূ, সে না পায় আনন্দ, না পায় স্ফূর্ত্তি। চোখের জলে, আর পুরাতন স্মৃতি মনে করিয়া, অতি কষ্টেই তাহার দিন কাটে।

ঊষা জলের মাছ ডাঙ্গায় গিয়া পড়িল।

অবগুণ্ঠনের আড়ালে যে নিজের চক্ষুজল লুকাইবে, সে যোও ছিল না। অবগুণ্ঠন একটীবারও সে দিতে পারে নাই।

এ বাড়ীর সবই তাহার কাছে নূতন বলিয়া ঠেকিতে লাগিল।

গাড়ী হইতে নামিবামাত্র একটা যুবতী আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া নামাইয়া লইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া সে একেবারে বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল। অত বড় মেয়ে, বোধ হয় তাহার দিদির মত,—তাহার মাথায় সামান্য একটু কাপড় পিন দিয়া আঁটা, সামনেটা সবই খোলা। কাপড় পরার ধরণটাই বা কেমন? পিছনে আবার কাপড় খানিকটা কুঞ্চিত করা, অঞ্চলটা বুকের বামদিকে একটা ব্রোচে আঁটা। পায়ে গোড়ালী উঁচু জুতা, আবার মোজা।

বিস্মিতা ঊষা অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিল, কই, সিন্দুর তো সিঁথিতে নাই। মেয়েরা আবার বাঁকা করিয়া পুরুষদের মত সিঁথা কাটে, এদের যে সবই আশ্চর্য্য।

আরও কয়েকটী মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইল, সকলেরই সেই এক সমান বেশ ভূষা। 'অবগুণ্ঠনাবৃতা' ঊষাকে দেখিয়া তাহারা হাসিয়াই আকুল, একজন বলিল, "সতী, তোর ভাইবউ তো বেশ ঘোমটা দেয়। মৃন্ময় বাবুর খাসা বউ হয়েছে। এত পছন্দ, এ বিয়ে করব না, ও বিয়ে করব না, শেষে পছন্দ হল বুঝি এই তিন হাত লম্বা ঘোমটাবতীটিকে।"

সতী মৃদু হাসিয়া বলিল, "না ভাই, ঠাট্টা করিস নে। দেখিস, এই বউকে কেমন করে তৈরি করে নিই।"

আর একটী মেয়ে—তার চোখে এক জোড়া চশমা, হাতে একটী রিষ্ট ওয়াচ,—সে অগ্রসর হইয়া আসিয়া ঊষার মুখের অবগুণ্ঠন তুলিয়া দিল, "ওগো, তোমায় আর অত ঘোমটা টানতে হবে না। সতী, তোর ভাই-বউ আবার চোখ বুজে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল যে।"

সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

এই সব হাস্যি-পরিহাসের মধ্যে ঊষা সত্যই কাঠ হইয়া গিয়াছিল। তাহার চোখ ভরিয়া অনেকখানি জল আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; হঠাৎ কখন তাহা উপছাইয়া গণ্ড বাহিয়া

পড়িয়া গেল। পিতার উপর, দিদির উপর অভিমানে তাহার সারা হৃদয়খানা ভরিয়া উঠিল। তাঁহারা তো সবাই জানিতেন,—জানিয়া শুনিয়া কেন এখানে তাহার বিবাহ দিলেন।

চশমা-চোখে মেয়েটী মৃন্ময়ের পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "সুন্দর স্ত্রী পেয়েছেন মৃন্ময় বাবু, চালিয়ে নিতে পারবেন তো?"

মৃন্ময় ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উষার পানে একবার চাহিল, তার পর আস্তে আস্তে সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

উষা দাঁড়াইয়া কাঁদিয়াই আকুল হইতেছিল। যে দাসীটা তাহার সহিত প্রসাদপুর হইতে আসিয়াছিল, সে এই গোলযোগ দেখিয়া, অনেক দূরে দাঁড়াইয়া, অবাক্ হইয়া চাহিয়া ছিল। সে পল্লীগ্রামের অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক মাত্র। একে সহরে পা দিয়াই সে চমকিয়া গিয়াছিল, তাহার উপর এই আশ্চর্য্য সুন্দরীর দল দেখিয়া সে আর পলক ফেলিতে পারিতেছিল না। উষা তাহাকে কাছে পাইবার আশায় দু'চারবার এদিক ওদিক চাহিল, তাহাকে দেখিতে না পাইয়া তাহার চোখের জল আরও বেশী পড়িতে লাগিল।

"এসো, আমার মা লক্ষ্মী, আমার ঘরে এসো মা—"

উষা মুখ তুলিল। সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে যথার্থই মাতৃ-মূর্ত্তি। চওড়া লালপেড়ে একখানি শাড়ি তাঁহার পরিধানে, একটা সাদাসিদা সেমিস গায়ে, সীমন্তে উজ্জ্বল সিন্দুর-বিন্দু দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছে। হাতে কতকগুলি সোণার চুড়ি। তাঁহার মুখখানায় যথার্থ দেবীর ন্যায় জ্যোতিঃ। তাঁহাকে দেখিলে যথার্থই হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠে।

উষা তাঁহার পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। তিনি অগ্রসর হইয়া উষাকে দুই হাতে জড়াইয়া বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন, তাহার ললাটে একটা স্নেহচুম্বন দিয়া বলিলেন "কান্না কেন মা, আমি যে তোমার মা রয়েছি এখানে। তোমার মা নেই, তাই ভগবান আমায় তোমার মা করে পাঠিয়ে দেছেন। এস মা আমার আনন্দময়ী, আমার ঘর আলো করবে এস, আমার শূন্য ঘর পূর্ণ করবে এস।"

সতীর পানে চাহিয়া ভৎর্সনার সুরে বলিলেন, "ছি সতী, কাজটা তোমাদের মোটেই উচিত হয় নি। পল্লী-গ্রামের মেয়ে, কি জানে সে। তোমাদের কথাবার্ত্তা, হাসি দেখে সে কেঁদে ভাসাচ্ছে, দেখছ কি? ছেলে মানুষ, তোমাদের কি বোঝে সে?"

সতী অপ্রস্তুত ভাবে আস্তে আস্তে সরিয়া গেল। উষাকে লইয়া মৃন্ময়ের মা মালতী দেবী বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এই মুহূর্ত্তেই উষার মনটা তাঁহার পদতলে একেবারে লুইয়া পড়িল, সে সজল চোখ মালতী দেবীর মুখের উপর রাখিল।

দাসী শ্যামা এক সময়ে তাহাকে একাকিনী পাইয়া চুপি চুপি বলিল, "কি রকম লোক এরা দিদি? বরণ নেই, আচার নেই, কিছু নেই, আমাদের দেশ ঘরে বিয়ে হলে এতক্ষণ কত কাণ্ড হতো। এ সবই অনাছিষ্টি দেখছি। শুনেছিলুম হিন্দু নয়, বিশ্বাস করিনি, এখন দেখছি ঠিকই।"

উষার মনেও কথাটা ঘুরিয়া ফিরিয়া বাজিতেছিল। সে কত বিবাহ দেখিয়াছে, এমন আশ্চর্য্য কখনও দেখে নাই। প্রতিবেশী রামসদয় বাবুর ছেলে হৃদয় বিবাহ করিয়া আসিল, বধূকে দুধ আলতার পাথরে দাঁড় করানো হইল, বরণ করা হইল, আরও কত কি হইল। কই, তাহার বিবাহে তো সে সব কিছুই হইল না।

সে যত দেখিতে লাগিল, ততই আশ্চর্য্য হইতে লাগিল। এ বাড়ীতে তাহার শাশুড়ী মালতী দেবী ছাড়া আর সকলেই জুতা পায় দেয়, সকলের সম্মুখে বাহির হয়।

ননদিনী সতীর বাল্যসখী কয়টী মেয়ে দুই তিন দিন সে বাড়ীতে ছিল। মালতী দেবীর ভয়ে তাহারা উষাকে আর ঠাট্টা-তামাসা করিতে পারে না, তাহার কাছেও বড় একটা আসে না। ইহাতে উষা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। ইহাদের ঠাট্টা-তামাসার ভয় তাহার বড় বেশী রকম ছিল।

সে দিনে বাড়ীতে একটা সান্ধ্য-সম্মিলন ছিল, ইহাতে বন্ধু-বান্ধব সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বড় হলটা নরনারীতে ভরিয়া গিয়াছিল। মজলিসের হাসি, কথা উষার কাণে অপর কক্ষে ভাসিয়া আসিতেছিল। অনভিজ্ঞ বালিকা উষা বসিয়া ভাবিতেছিল—এ আবার কি, এ কাহাদের মধ্যে সে আসিয়া পড়িয়াছে। বাবা দেখিয়া

এ কোথায় তাহাকে নির্ব্বাসিতা করিলেন? দিদি যে বলিয়াছিলেন—

অভিমানে উষার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বাবা—তোমার উষাকে এখান হইতে উদ্ধার কর, তোমার কাছে লইয়া যাও। এখানে থাকিলে উষা বাঁচিবে না, তোমার উষা মরিয়া যাইবে।

সতী দ্বারের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। গৃহের মলিন আলোটার পানে দৃষ্টি করিয়া বলিল, "ঘরের আলোটা এত কম করে দেছে। বললেই পারতে বউদি, আলোটা বাড়িয়ে দিতে। এমন করে আছ, যেন চোর হয়ে এসেছ তুমি। না, অমন করে বসে থাকলে হবে না, চল, তোমায় ওখানে সবাই ডাকছে।"

উষা একেবারে সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িল, সেখানে অত লোক, কেমন করিয়া সে সেখানে গিয়া দাঁড়াইবে? সে মাথা নত করিয়া যেমন বসিয়া ছিল, তেমনিই বসিয়া রহিল।

সতী এত সাধ্য-সাধনা করিল, উষা নড়িল না; পরাভূত হইয়া সতী চলিয়া গেল।

একটু পরেই মালতী দেবী আসিয়া দাঁড়াইলেন। উষার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে সস্নেহে বলিলেন, "ছি মা, অমন একগুঁয়েমী করতে নেই। সবাই তোমায় দেখতে চাচ্ছে। আমাদের বউ-ভাত তো নেই মা, এতেই লোকে তোমায় দেখবে। চল মা লক্ষ্মী, লজ্জা কি? আমার সঙ্গে চল, আমি তোমায় দেখিয়ে আনছি।"

টপ টপ করিয়া দুই ফোঁটা জল উষার চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল। দেখিতে পাইয়া মালতী দেবী তাহা মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "ছি মা, কাঁদছ কেন? বল লক্ষ্মী, আমায় বল, আমার কাছে কোনও কথা লুকিয়ো না।"

উষার চোখের জল শুখাইয়া গেল, একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

মালতী দেবী ক্ষিপ্র-হস্তে তাহার চুলটা ঠিক করিয়া দিয়া, মুখখানায় পাউডার মাখাইয়া, ভাল করিয়া কাপড় পরাইয়া দিলেন। বধূর হাত ধরিয়া চলিতে চলিতে বলিলেন, "লক্ষ্মী মা আমার, ঘোমটা টেনো না যেন, তা হলে লোকে আমায় যা না তাই বলবে। এর পরে তুমি যা খুসি তাই কোরো, আজকার দিনটা আমার মান রক্ষা কোরো।

অবগুণ্ঠনশূন্যা পুত্রবধূর হাত ধরিয়া তিনি হলে প্রবেশ করিলেন। সতী তখন পিয়ানোর কাছে বসিয়া তাহাতে সুর দিয়াছিল, উষাকে আসিতে দেখিয়া থামিয়া গেল।

উষাকে দেখিয়া সকলেই প্রশংসা করিল। ইহারি মধ্য হইতে রেখা চাপা গলায় পার্শ্ববর্ত্তিনী জনৈক বন্ধুকে ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "শুধু দেখতে ভাল, গুণ কিছু নেই। মৃন্ময়-বাবুর কপালে গোলাপ জুটল না, জুটল শিমুল ফুল। বেশী বেছে নিতে গেলে এমনিই হয় বটে।"

একটু আহত ভাবে সতী বলিল, "কিন্তু বউদির বয়েস তো বেশী নয় ভাই, আমরা শিখিয়ে পড়িয়ে দুদিনে ঠিক করে নিতে পারব। এখন তো আর সেখানে যেতে পারবে না, এখানে থেকে লেখাপড়া শিখতে হবে। বছর খানেক পরেই দেখতে পাবে, বউদিকে কি করে তৈরি করেছি। যেমন সুন্দর দেখতে, তাতে শিক্ষার যদি যোগ হয়,—দেখতে পাবে, বস্‌রাই গোলাপ হয়ে দাঁড়াতে পারবে কিনা।"

মৃন্ময়ের বন্ধু জ্যোতিশ উষার সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহাকে ভালরূপে দেখিয়া লইয়া বলিল, "একেবারেই অশিক্ষিতা কি?"

পার্শ্বের চেয়ারখানা হইতে পরিচিত একটা কণ্ঠে উক্ত হইল "না, সে বিষয়ে আমি সাক্ষ্য দিতে পারি। তবে শিক্ষা বলতে তোমরা ইংরাজীটাই বোঝ, এরা সে শিক্ষায় শিক্ষিতা নয়।"

রেখা চশমা খুলিয়া কাঁচ দুইখানা মাজিয়া চোখে দিতে দিতে হাসিয়া বলিল, "কি রকম শিক্ষা মনীশবাবু? পল্লী-গ্রামের মেয়ের শিক্ষা দ্বিতীয়ভাগ পর্য্যন্ত, আর রান্না-ঘর-দোর পরিষ্কার করা, একেই আপনি বলতে চান ইংরাজি ছাড়া শিক্ষা।"

মনীশ নামটা শুনিবামাত্র উষা সচকিতে মুখ তুলিল। সত্যই তো পার্শ্বে তাহারই মনীশ-দা। এতগুলি অপরিচিত নর-নারীর মধ্যে পরিচিত এই একজনকে দেখিবামাত্র উষার প্রাণটা পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠিল, আনন্দাশ্রু-পূরিত নেত্রে সে মনীশ-দার মুখপানে চাহিয়া রহিল। তাহার ইচ্ছা হইল, একবার মনীশ-দাকে আগেকার মতই চাপিয়া ধরে, কাঁদিয়া নিজের ব্যথা জানায়; কিন্তু তখনি মনে

পড়িল, সে শ্বশুরালয়ে বধূ, এখানে তাহার একটুও স্বাধীনতা নাই।

রেখার কথায় উত্তেজিত হইয়া মনীশ বলিল, "শুধু তাই যদি আপনি পল্লীগ্রামের শিক্ষা বলে ধরেন, আমি বলি ইংরাজি শিক্ষার চেয়ে তাই ভাল। ইংরাজি ভাবটা আমাদের দেশে এসে কি লাভ হয়েছে তা জানি নে। লোকে—অর্থাৎ আমার বন্ধুর মত লোকেই বলে, ইংরাজি শিক্ষা খুব ভাল; কিন্তু আমি বলি একেবারেই খারাপ। যেহেতু আমাদের প্রকৃত যা জিনিস, তা আমরা এ শিক্ষায় হারিয়ে ফেলেছি। বাঙ্গালী—অথবা শুধু বাঙ্গালীই বা বলি কেন, ভারতবাসীর আপনার বলে গর্ব্ব করার মত জিনিস আজ কি আছে, বলুন দেখি? আমরা সর্ব্বাংশে বিদেশীর অনুকরণ করতে যাই, আমাদের নিজের যা তা বিসর্জ্জন দিয়েছি। যাক্, আমি সে কথা নিয়ে বেশী আলোচনা করতে চাই নে, তাতে আমাদের এই শান্ত সান্ধ্য-সম্মিলনটায় অশান্তি এসে পড়বে। আমি আপনাদের নিশ্চিন্ত করতে এটুকু বলছি,—অমরবাবু মেয়েদের ইংরাজি ছাড়া আর সব শিক্ষাই দিয়েছেন। মৃন্ময় বোধ হয় উমাকে দেখে এসেছে, তার শিক্ষা যথার্থ প্রশংসনীয়! আমি মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি—উমার মত শিক্ষা এ পর্য্যন্ত কোন মেয়েই পায় নি, উমার মত স্বভাব এ পর্য্যন্ত কোনও মেয়েরই আমি দেখি নি। তারই বোন উষা, সেই বোনের কাছে মানুষ, সেই বাপের শিক্ষায় শিক্ষিতা, এ বাড়ীতে কালী দেয় নি। বরং আমি জানি—সে এ সংসার উজ্জ্বল করতে পারবে।"

চকিতে উমার মূর্ত্তিটা মৃন্ময়ের মনে জাগিয়া উঠিল। সেই অনিন্দ্য-সুন্দরী নারী-মূর্ত্তি—বিবাহের রাত্রে যে এক কথায় তাহার মত লোককেও বসাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল। বিদায়ের সময় স্বামী-স্ত্রীতে যখন তাহার নিকট বিদায় লইতেছিল, কি উদাস-করুণ সে মূর্ত্তিখানা। বড় বড় স্থির চোখের দৃষ্টি আকাশের কোনখানে ন্যস্ত রাখিয়া সে দাঁড়াইয়া, উষার ডাকে জ্ঞান পাইয়া তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া রুদ্ধকণ্ঠে শুধু বলিয়াছিল "যাচ্ছিস—যা ভাই। আশীর্ব্বাদ করি, সারাজন্ম যেন তোর সেখানেই কাটে, আমার মত পোড়াকপাল যেন না হয়।"

তাহার পর মৃন্ময়ের হাতখানা ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়াছিল "দেখো ভাই—আমার জীবন তোমার হাতে দিলুম। ওকে দেখো—"

সৌন্দর্য্য তো অনেকেরই থাকে, কিন্তু অমন দীপ্ত সৌন্দর্য্য তো দেখা যায় না। পবিত্র জ্যোতিতে উমার সর্ব্বাবয়ব উদ্ভাসিত। সর্ব্বাপেক্ষা বড় সুন্দর তাহার সেই চোখ দুইটা। সেই চোখ দুইটাতেই তাহার মনোভাবটা বাহিরে প্রকাশ হইয়া যায়, সে নিজেকে গোপন করিবার চেষ্টা করিলেও গোপন থাকিতে পারে না।

সেই শুভ্র থানখানা—সেই অলঙ্কার-শূন্যতাই তাহাকে বড় চমৎকার মানাইয়াছিল। সাজ-সজ্জা প্রভৃতি অতিরিক্ত বোঝার দরকার তাহার নাই, সে বড় হালকা, বড় ক্ষীণ। মনে হয় অলঙ্কার, সাজ-সজ্জা তাহার উপর চাপাইলেই সে ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

তবু মৃন্ময় তাহার অন্তরটা দেখিতে পায় নাই, শুধু বাহিরটা দেখিয়াই সে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

মনীশের কথাগুলো রেখার মনে বিলক্ষণ জ্বালা ধরাইয়া দিল। কিন্তু সে না কি উমাকে দেখে নাই, তাই চুপ করিয়া গেল; নচেৎ সে মনীশকে বেশ দু' কথা শুনাইয়া দিতে পারিত।

সতীর কাছে সরিয়া গিয়া বলিল, "মনীশবাবুর আত্মীয় কি না—তাই অত প্রশংসা। একবার দেখতে পেলে হত।"

সতী শুষ্ক স্বরে বলিল, "দাদা বলেছেন—অমন সুন্দরী না কি দেখা যায় না। তার না কি একটা গুণ আছে—যে তাকে দেখে, সেই ভালবেসে ফেলে।"

পরিহাসের সুরে রেখা বলিল, "তোমার দাদা ভালবাসায় পড়েন নি তো?"

সতী বলিল, "না। একবার দেখাতেই কি ভালবাসা জন্মায়?"

রেখা গম্ভীর মুখে হাতের ব্রেসলেট ঘুরাইয়া দিতে দিতে বলিল, "জন্মায় বই কি। তার ঢের প্রমাণ আমি দিতে পারি। যাই হোক—সে কথা এখন থাক। আমি এই বলতে চাই, মনীশবাবু নিশ্চয়ই উমাকে ভালবাসেন। ভালবাসা যায় যাকে, লোকে তাকে সব রকমেই বাড়িয়ে তুলতে চায়। মনীশবাবুর কথার ভাবেই জানা যাচ্ছে—"

সতী বাধা দিয়া বলিল, "বেশ তো, ভাল কথাই, তিনি তাকে ভালবাসেন, না ভালবাসেন, সে কথা নিয়ে মাথা

ঘামানোর কি দরকার আমাদের। সকলে গান করতে বলছেন, একটা গান করে ফেলি না।"

রেখা একটু হাসিয়া বলিল, "ঠাট্টা কেন ভাই? যে গান জানে, তার বেশী গর্ব্ব হয় কি না; সে তাই সহজে গান গাইতে চায় না। আমি যদি গাইতে জানতুম, বলতেও হত না, দশটা গান গেয়ে দিতুম। বলে ফেল না একটা গান। অমন তো হাজারটা গান গেয়ে দিস তুই, আজ কি হল?

সতী পিয়ানোতে সুর দিল। রবিবাবুর গান গাহিতে অনুরুদ্ধ হইয়া সে গাহিল—

শুধু তোমার বাণী নয় কো বন্ধু প্রিয়,

শেষ লাইনটা—একলা পথে চলা আমার করব রমনীয়, গাহিতে গাহিতে বাস্তবিকই তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল, কণ্ঠটাও আর্দ্র হইয়া উঠিল। সে সমস্ত মন ঢালিয়া গানটী গাহিতেছিল; তাই গানটা সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল।

গান থামিয়া গেলে—রেখা চুপি চুপি সতীর কাণে কাণে বলিল "কে সে ভাগ্যবান নির্দ্দিষ্ট হয়েছে কি? বল তো ঘটকালি করতে রাজি আছি। একজামিনের এখনও মাস তিনেক দেরী আছে, ঘটকালী করতে এর সাতটা দিন ব্যয় করতে আমি রাজি আছি।"

সতী একটু হাসিল, উত্তর দিল না।

রাত্রে আহারাদি শেষ করিয়া যাইবার সময় মনীশ সতীকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিল, "তোমার বউদির সঙ্গে একটু দেখা করাতে পারবে কি?"

সতী বলিল, "পারব না কেন? কিন্তু দাদার কাছে বললেই তো ভাল ছিল।"

মনীশ একটু হাসিয়া বলিল, "তোমার দাদা? সে তো স্ত্রী বলেই মানতে রাজি হয় না। বললে—যখন বেশ শিক্ষিতা হবে, তখন সে তার বন্ধুদের তার কাছে নিয়ে যাবে আলাপ করাতে, এখন সে কোন মতেই কাউকে নিয়ে যাবে না; কাজেই তুমি ছাড়া আর উপায় নেই।"

যে-কক্ষে উষা চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, সতী সেই কক্ষদ্বারে মনীশকে আনিয়া বলিল, "এই ঘরে বউদি আছে, যান।"

মনীশ দ্বারের উপর দাঁড়াইয়া ডাকিল, "উষা—"

"মনীশ দা!"

উষা ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিল, চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল "মনীশদা।"

মনীশ সস্নেহে তাহার ললাটের অবিন্যস্ত চুলগুলা সরাইয়া দিতে দিতে বলিল, "এই দুদিনেই রোগা হয়ে গ্যাছিস এত? হাঁারে পাগলী, এ রকম করলে এখানে থাকবি কি করে? জন্মটা যে তোর এখানে কাটাতে হবে।"

উষা কাঁদিয়া বলিল, "না মনীশদা, আমি থাকতে পারব না।"

মনীশ বলিল, "থাকবি নে তো কোথা যাবি?"

উষা বলিল "বাবার কাছে থাকব।"

মনীশ রূঢ়কণ্ঠে বলিল, "তা বই কি? একজন রয়েছে তাঁর চোখের সামনে বিধবা হয়ে, তুই গিয়ে না থাকলে চলবে কি করে? পাগলামী করিস নে উষা, ও সব কথা মনে আনিস নে বলছি।"

উষা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "এরা আমায় আর যেতে দেবে না বলছে মনীশদা।"

মনীশ বলিল "যেতে দেবে না কি? আমি মৃন্ময়ের ছোট বেলাকার বন্ধু, আমায় এরা খুব ভালবাসে। আমি তোকে নিয়ে যাব দিন কত পরে। তুই কাঁদাকাটা করিস নে বলছি, যে যা বলবে তাই শুনে যাবি। আমি রোজই আসব তোকে দেখতে। যদি শুনতে পাই, এদের কথা শুনিস নি, তা হলে উমাকে গিয়ে সব বলে দেব।"

উষা বলিল, "না মনীশদা, কিছু বল না দিদিকে। আমি কাঁদব না। কিন্তু বল, তুমি আমায় রোজ দেখতে আসবে তো?"

মনীশ হাসিয়া বলিল, "আসব রে আসব, রোজ আসব, তার জন্যে তোকে ভাবতে হবে না। তোকে না দেখলে তোর দিদির কাছে নিস্তার পাব আমি? নিজের গরজে না এলেও তার গরজে আমায় আসতেই হবে।"

উষা তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া সজল নেত্রে শাসাইল—"যদি না এস মনীশদা, আমি কিন্তু নিশ্চয়ই দিদিকে লিখব।"

মনীশ বাহির হইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

বাল্য-বিবাহ ও যৌবন-বিবাহের সমালোচনা

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন কবি-সম্রাট

যাঁহার "মন্ত্রশক্তি" বঙ্গের নরনারীকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছে, যাঁহার "পথহারায়" পথভ্রষ্টের প্রতি প্রকৃত পথের ইঙ্গিত রহিয়াছে, যিনি "মা" লিখিয়া আদর্শ নরনারীর সৃষ্টি করিয়াছেন, পিতৃ-আজ্ঞায় পুত্রের কি পর্য্যন্ত সংযম করিতে হয়, স্বামি-প্রেমে আত্মহারা পিতার আজ্ঞায় সেই প্রেমময় স্বামি-কর্ত্তৃক চির-উপেক্ষিতা হইয়াও একান্ত দৈন্যে পড়িয়াও স্বামীর প্রতি পত্নীর কি ভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা, প্রেম, রক্ষা করিতে হয়, পুত্রের লালন, পালন, শিক্ষা, দীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়, পুত্রকে ধার্ম্মিক করিতে হয়, পিতৃভক্ত করিতে হয়, সাপত্ন্য ভুলিয়া সপত্নীকে ভালবাসার চক্ষে দেখিতে হয়, সপত্নীর গর্ভজাত পুত্রের প্রতি—নিজের গর্ভজাত পুত্র অপেক্ষা একচুল কম নয়, স্নেহ, মমতা, ভালবাসা কি ভাবে বাড়িতে পারে, পুত্রেরও বিমাতার উপরে জননীর ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হয়,—যাঁহার পবিত্র লেখনীর মুখে এই সকল বিষয়ের নিখুঁত চিত্র ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, যিনি তাঁহার প্রত্যেক উপন্যাসেই প্রত্যেক নায়ক-নায়িকার চরিত্রগুলি স্পষ্ট করিয়া উজ্জ্বল অক্ষরে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতে পারিয়াছেন, সেই মাতার অনুরূপা পূজনীয়া মাতৃদেবী শ্রীমতী অনুরূপা দেবী, বাল্য-বিবাহের সমর্থন করিয়া "ভারতবর্ষে" একটি প্রবন্ধ বাহির করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহার দুইখানি প্রতিবাদপত্র বাহির হইয়াছে। একখানি এই "ভারতবর্ষে" অন্যখানি "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে। প্রথমখানির লেখক শ্রীপদ্মনাভ শর্ম্মা,—পদ্মনাভশর্ম্মাকে চিনি না। দ্বিতীয়খানির লেখিকা শ্রীমতী মাতা সরসীবালা বসু। এই দ্বিতীয় খানিতে যুক্তিতর্ক আছে, লিপি-সৌন্দর্য্য আছে, মর্য্যাদা রক্ষা আছে, শিষ্টতা, সভ্যতা ও নম্রতা আছে; কিন্তু প্রথমখানিতে এই সকল গুণের সম্পূর্ণ অভাব আছে, বিপরীত গুণের সদ্ভাব আছে। নারীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া নারী জাতির সহিত কি ভাবে কথা কহিতে হয়, লেখক তাহাও জানেন না দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। প্রবীণ সম্পাদকের পক্ষে উহা পত্রস্থ করাও সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি না।

যৌবন-বিবাহের প্রবর্ত্তন করিতে হইলে, সঙ্গে সঙ্গে গান্ধর্ব্ব বিবাহের প্রবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির যেমন ভিন্ন ভিন্ন রস ভাল লাগে, রূপ সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ,—এক এক জনের চক্ষে এক একজনের রূপ ভাল লাগে। জিহ্বায় যাহার যে রস ভাল লাগে, তাহার যেমন পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায় না, যৌবনে যাহার চক্ষে যাহার রূপ ভাল লাগে, তাহারও পরিবর্ত্তন করা সেইরূপ মনুষ্য-শক্তির অতীত। সুতরাং যৌবন-বিবাহের

প্রবর্ত্তন করিতে হইলে, পিতা মাতার হাতে বা সেইরূপ অভিভাবকের হাতে বর, কন্যা নির্দ্ধারণের ভার দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। যুবক বর যুবতী পত্নী নির্দ্ধারণের ভার নিজেই গ্রহণ করিবে, যুবতী কন্যা যুবক স্বামি-নির্দ্ধারণের ভার নিজের হাতেই লইবে। পিতা, মাতা বা অভিভাবকের চোখে যে বরের বা কন্যার রূপ ভাল লাগিল, বর বা কন্যার সেই কন্যার বা সেই বরের সেই রূপ ভাল না লাগিতে পারে। গান্ধর্ব্ব বিবাহ এ দেশে ছিল না বলিতে পারি না। পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে এই বিবাহের প্রচলন ছিল। শাস্ত্রকারেরাও ক্ষত্রিয়ের পক্ষেই গান্ধর্ব্ব বিবাহ বিহিত বলিয়াছেন। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও সংস্কৃত কাব্য-গ্রন্থ হইতেই আমরা পূর্ব্ব-প্রচলিত ব্যবহারের নিদর্শন পাই। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ-কন্যাকে গান্ধর্ব্ব-বিধানে বিবাহ করিয়াছে; ইহার উদাহরণ প্রগুক্ত পুস্তকসমূহে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ভগবান্ মনু এই বিবাহকে কামজ ("মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ") বলিয়া এই বিবাহের নিন্দা করিয়াছেন। তিনি আরও নিন্দা করিয়াছেন,—এই বিবাহে যে সকল সন্তান জন্মিবে, তাহারা নিষ্ঠুর, মিথ্যাবাদী, ঈশ্বরদ্বেষী ও ধর্ম্মদ্বেষী হইবে ("নৃশংসানৃতবাদিনঃ—ব্রহ্মধর্ম্মদ্বিষঃসুতাঃ") ইত্যাদি ইত্যাদি বলিয়াছেন। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও সংস্কৃত কাব্য-গ্রন্থেও আমরা গান্ধর্ব্ব-বিবাহের কবি-প্রদর্শিত দোষের ইঙ্গিত দেখিতে পাই। আবশ্যক হইলে আমরা ভবিষ্যতে বিশ্লেষণ করিয়া তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

আমাদিগের দেশে যেমন "রামাদিবৎ প্রবর্ত্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ" ইত্যাদি সচ্ছিক্ষা দিবার জন্যই এক সময়ে সমস্ত কাব্য গ্রন্থ রচিত হইত, ইয়োরোপে কোন দিন সেরূপ ছিল না, এখনও তাহা নাই। ইয়োরোপের কবি ও লেখক কাব্য ও উপন্যাসে সে দেশের সমাজের যথাযথ চিত্র প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইয়োরোপে অন্য বিবাহ নাই, একমাত্র গান্ধর্ব্ব বিবাহ আছে। আমরা ইয়োরোপের শত শত উপন্যাসে দেখিতে পাই, একটি যুবতী একটি যুবকের রূপে বিমুগ্ধ হইয়াছে। যুবক কিন্তু সে যুবতীর রূপে না হইয়া অন্য একটি যুবতীর রূপে আসক্ত হইয়াছে। ভাগ্যক্রমে সে যুবতীর যদি এই যুবকের প্রতি অনুরাগ থাকে, মন্দের ভাল; আর না থাকে তবে এই ভালবাসা কত দূরে গিয়া দাঁড়াইয়া পড়িবে বলিতে পারি না। তাহার ফলে অন্ততঃ দুই একটি যুবক-যুবতীর আত্মহত্যায় লেখক তাহার দুঃখের অবসান করিলেন। আমরা কিন্তু বলি,—দুঃখের অবসান হইল না, দুঃখের আরম্ভ হইল। এ কথাও সত্য, তুমি আমায় ভালবাস বলিয়া আমারও তোমাকে ভালবাসিতে হইবে, এ কেমনতর কথা? তুমি আমায় ভালবাস, এজন্য তোমার নিকটে আমি কৃতজ্ঞ; সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেও আমি কুণ্ঠিত নই। কিন্তু কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা এক নয়; কৃতজ্ঞতা আছে বলিয়া ভালবাসা জন্মিবে তাহাও ঠিক নয়। যৌবনে চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ সমস্তই প্রবল, মনঃ আরও সবল। ইহারা তোমাকে ভালবাসে না, আমি কি করিব?

যৌবনে দুই কারণে ভালবাসা জন্মে, একটি রূপ গুণের প্রত্যক্ষ-জন্য, অপরটি স্বভাব-জন্য। নৈয়ায়িক হয় ত এই দ্বিতীয় ভালবাসাকে স্বভাব-জন্য না বলিয়া অদৃষ্ট-জন্য বলিবেন। এই স্বভাব-জন্য বা অদৃষ্ট-জন্য ভালবাসাও আবার দ্বিবিধ; এক, তোমাকে আমি যেমন হৃদয়, দেহ, আত্মা দান করিয়া ভালবাসিতেছি, তোমারও সেইরূপ হৃদয়, দেহ, আত্মা আমাকে দিয়া ভালবাসিতে হইবে। অন্য কেহ ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারিবে না, অন্য কেহ তোমাকে ভালবাসিতে পারিবে না, তুমিও অন্যকে ভালবাসিতে পারিবে না। ইহার দ্বিতীয়টি হইতেছে এই, তুমি আমায় ভালবাস না বাস, আমি তোমাকে ভালবাসিব, আমি এ ভালবাসার প্রতিদান চাই না, আমি তোমাকে ভালবাসিয়াই বিমল আনন্দ লাভ করি। যৌবনে দেহ, মন, বুদ্ধি সমস্তই পরিপুষ্ট হয়; কি রূপ গুণের প্রত্যক্ষ-জন্য ভালবাসা, কি স্বভাব-জন্য ভালবাসা—এই উভয় ভালবাসাই যৌবনে উৎপন্ন হয়। আমি যাহাকে ভালবাসিলাম, সে আমাকে ভালবাসে উত্তম। আর যদি না বাসে, তবে তাহার মন্দ ফল অনিবার্য্য। ইয়োরোপের কবি যাহা দেখাইয়াছেন, এদেশেও যে তাহার চিত্র চোখের উপরে আমরা দেখিব, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু নাই।

এ দেশে এখনও সমস্ত হিন্দু-সমাজে সেইরূপ বিবাহের প্রচলন হয় নাই, যাহা হইয়াছে,—একান্ত ইংরেজি-ভাবাপন্ন মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সমাজের মধ্যে। এই অল্প সংখ্যক লোক লইয়া যে সমাজ, সে সমাজের দোষ-গুণও

কবির চক্ষু এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ "ঘরে বাহিরে" লিখিয়া ইহার একটি উৎকৃষ্ট চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। রূপের বা গুণের শেষ নাই। একের রূপ বা গুণ দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম; সাময়িক উত্তেজনার বশে তাহার সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইলাম; তাহা অপেক্ষা অধিক রূপ বা গুণ আসিয়া চক্ষের উপরে পড়িয়া আমাকে যে মোহিত না করিবে, কে বলিতে পারে? সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য জানি না, যাহার রূপে বা গুণে মুগ্ধ হইলাম, সেও যদি আমার রূপে বা গুণে মুগ্ধ হইয়া থাকে, আর যদি তাহার সহিত কিছু কাল একত্র বাসের সুবিধা ঘটে, তাহার ফল যে কতদূরে গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। স্বভাব-জন্য ভালবাসা সকলের উপরে,—এ ভালবাসায় রূপ, গুণ কিছুরই অপেক্ষা করে না। সে ভালবাসা কবে কাহার উপরে জন্মিবে, বলিতে পারি না। আজ আমি কাহারও রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে স্বামিত্বে বা পত্নীত্বে বরণ করিলাম, কালান্তরে অন্য কাহারও উপরে আমার স্বভাব-জন্য ভালবাসা আসিয়া পড়িল। তখন যে কি হইবে, একবার ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিবার প্রয়োজন।

উচ্চ-শীর্ষ হিমালয় হইতে জোরে প্রপাত-পীড়নে তাহার মুখে কিছুই টেকে না,—ঐরাবতের মত গজরাজও কোথায় ভাসিয়া যায়,—বড় বড় গাছ, পাথর, প্রকাণ্ড অট্টালিকা চুরমার হইয়া কোথায় যাইয়া নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ করে। স্বভাব-জন্য ভালবাসারও মুখে রূপ-গুণ-জন্য ভালবাসা কোন ক্রমেই টিকিতে পারে না—কোথায় ধসিয়া যায়। যৌবন-বিবাহের ও গান্ধর্ব্ব-বিবাহের এই সকল দোষ অপরিহার্য্য। আমার দু'একটি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সহিত দু'একটি বিদুষী যুবতীর বিবাহের সমস্ত স্থির হইয়াছিল। তাঁহারা উভয়ে উভয়ের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন, আত্মহারা হইয়াছিলেন, প্রেমে বিভোর হইয়াছিলেন; কিন্তু সে বিবাহ কোথায় ভাসিয়া গেল! তাঁহারা অন্যের পাণিগ্রহণ করিলেন; কেহ বা অন্যের পাণিগ্রহণে মর্ম্মাহত হইয়া আজীবন ব্রহ্মচারী হইয়া রহিলেন। আর একটি হিন্দুধর্ম্মে প্রগাঢ় ভক্তিমতী ব্রাহ্মণকুমারী সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিতা বলিয়া জগতে পূজনীয়া, নিজের সংস্কৃত কবিতায় জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া, সংস্কৃতে যাঁহার কোন জ্ঞান ছিল না এইরূপ একটি তাঁহার হইতে নীচ-কুলোৎপন্ন ইংরেজিনবীশের পাণিগ্রহণ করিলেন!!! বলা বাহুল্য, সেই বিদুষীর বিবাহপ্রার্থী ছিলেন,—ব্রাহ্মণ-কুমার আনুষ্ঠানিক হিন্দু সিবিলিয়ান্ যুবক। যুবক ব্রাহ্মণ-কুমারের ও সেই যুবতী বিদুষীর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সংস্কৃত কবিতায় লিখিত অনেকগুলি প্রণয়লিপি সৌভাগ্য-বশতঃ আমার হস্তগত হইয়াছিল। পড়িবার লোভ সংবরণ করিতে পারি নাই, পড়িয়াও দেখিয়াছি। এই নব প্রণয়ের পেষণে, এই অভিনব প্রণয়-ঝঞ্ঝাবায়ুতে সেই পূর্ব্ব-পোষিত প্রণয় চুরমার হইয়া তিল তিল হইয়া কোথায় উড়িয়া গেল, বলিতে পারি না। ইঁহারা উপন্যাসের কল্পিত নায়ক-নায়িকা নহেন, ঘটনাগুলিও উপন্যাসের কল্পিত ঘটনা নয়। যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাই লিখিলাম। নাম করিলে সকলেই চিনিবেন, নাম করিলাম না।

বাল্য-বিবাহে এই সকল দোষের সম্ভাবনা নাই। বাল্যকালের শিক্ষা, বাল্যকালের অভ্যাস সংস্কারে পরিণত হয়। এই সংস্কারই স্বভাবকে আনয়ন করে। বাল্যে বিবাহ দিয়া এই সংস্কার, এই স্বভাবকে প্রস্তুত করা হয়। এই স্বভাব-জন্য ভালবাসা কামজ ভালবাসা নয়। যৌবনে কামের উৎপত্তি, কাম জন্মিবার বহু পূর্ব্বে এই ভালবাসা উৎপন্ন। আবার বাল্যকাল হইতে পিতা-মাতার মুখে, শ্বশুর-শাশুড়ীর মুখে, গুরু-পুরোহিতের মুখে, পুরাণ-ব্যাখ্যাতার মুখে শুনিয়া আসিয়াছি,—পতি-পত্নী এক জন্মের নয়। এই পতিকে লইয়া এই পত্নীকে লইয়া আমরা বহুবার আসিয়াছি; আরও কত জন্ম আসিব তাহার ইয়ত্তা নাই। তখন তর্কশক্তি ছিল না, অবিশ্বাস করি নাই, বিশ্বাস করিয়া গিয়াছি; বিশ্বাসই অভ্যাসকে দৃঢ় করিয়াছে। এই সংস্কার আবার আমাদিগের পুরুষ-পরম্পরা হইতে আগত, বাল্যকালে যদি সেই সংস্কারের অঙ্কুরে জল সেচন করা যায়, তবে সেটি যে জীবিত থাকিবে, বর্দ্ধিত হইবে; সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন এক দিন আমাকে বলিয়াছিলেন,—"পূর্ব্ব-সংস্কারের বিসর্জ্জন করা বড় কঠিন। রাস্তায় চলিবার সময়ে যদি আমার পায়ে একখণ্ড প্রস্তর স্পর্শ হয়, এবং যদি দেখি, সেখানি অন্য প্রস্তর নয়, শালগ্রামচক্র, তা হইলে নিশ্চয় আজও আমার গা কাঁটা দিয়া উঠিবে, আমি ভীত হইব।" ভাল করিয়া বাগানের জমী পরিষ্কার করিতে হয়। অনেক দূর খুঁড়িয়া নীচের জমী

বাছিয়া, তাহা হইতে কঙ্কর প্রভৃতি বাছিয়া দূরে ফেলিতে হয়। নিকটে কোন গাছপালা না থাকে ; থাকিলে, তুলিয়া দূরে ফেলিতে হয়। সেই জমীকে জলার্দ্র করিয়া কাদা করিয়া, তাহাতে কচি গাছ লাগাইলে, সেই গাছ লাগে ; বড় গাছ লাগাইলে কখনই সে গাছ লাগে না। জমী বাছিয়া জলে কোমল না করিলেও লাগে না। নিকটে গাছপালা থাকিলেও, সেই কচিগাছ ভালরূপে বাড়িয়া উঠে না। বাল্য-বিবাহে স্বভাবতঃ দম্পতির হৃদয় কোমল; তাহাতে অন্য ভাব আসিয়াও পড়ে নাই, পার্শ্ববর্ত্তী অন্য গাছপালারও শিকড় প্রবেশ করিতে পারে নাই। কাজে কাজে, তাহাতে কচি বয়সের পরস্পরের কচি ভালবাসাটুকু গাড়িলে ও তাহাতে পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী প্রভৃতির সেই সমস্ত উপদেশরূপ জল-সেচন হইলে, কালে যে সেটুকু পুষ্প, ফল, দল, পল্লবে বিভূষিত হইয়া সুবৃহৎ পকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেক শ্রান্ত ক্লান্ত পথিক আসিয়া সেই বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া শ্রান্তি-ক্লান্তি দূর করিতে পারিবে ; দেহ মনঃ সুশীতল করিতে পারিবে ; পুষ্পের আঘ্রাণে ও ফলের আস্বাদনে কৃতার্থ হইয়া যাইবে, সে বিষয়েও সন্দেহ করিবার কিছু নাই।

যৌবন-বিবাহ কামজ। এ বিবাহে কেবল ভোগ-স্পৃহা বৰ্দ্ধিত হয়, স্বার্থপরতা বাড়িয়া যায়। এই স্বার্থপরতার পায়ে যুবক পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ প্রভৃতিকে অনায়াসে বলিদান করিতে পারে। করিতে পারে কেন বলিতেছি! করিয়া থাকে বলিতেছি। ইহার দৃষ্টান্ত চতুর্দ্দিকে প্রতি-নিয়ত দেখিতে পাওয়া যায়। বাল্য-বিবাহের সময়ে যাহার অণুমাত্র সত্তা ছিল না, আজ তাহা বীভৎস মূর্ত্তিতে সম্মুখে দণ্ডায়মান। দেখিয়া লজ্জায় ঘৃণায় চক্ষুঃ মুদিত করিতে হয়। বাল্যকালে প্রণয়ের বীজ হৃদয়ে উপ্ত হইলে তাহাকে যে যৌবনেও আর উঠাইতে পারা যায় না—এই চিত্র দেখাইবার জন্য সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখরের" সৃষ্টি। শাস্ত্রানুসারে প্রতাপের সহিত শৈবলিনীর বিবাহ হইতে পারে না; বিবাহ হইল চন্দ্রশেখরের সহিত। শৈবলিনী কিন্তু প্রতাপকে ভুলিল না। শৈবলিনী লরেন্স্ ফষ্টরের নৌকায় উঠিল। ভাদ্রমাসের ভরা গঙ্গায় প্রতাপের সহিত ভাসিয়া চলিল। ভাসিতে ভাসিতে নিভৃতে তাহাদিগের প্রণয়ের মর্ম্মকথা হৃদয় ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। তাহার ফলে পতঙ্গের মত প্রতাপ গিয়া প্রোজ্জ্বলন্ত যুদ্ধানলে আত্মাহুতি প্রদান করিল। শৈবলিনীর দৈহিক পাপ ছিল না, কেবল মানসিক পাপ ছিল ; বঙ্কিমচন্দ্র সেজন্যও তাহার উৎকট প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া অবশেষে গুরুদেবের আজ্ঞায় শৈবলিনীকে চন্দ্রশেখরের লইতে হইল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রতাপের হস্তে শৈবলিনীকে দিতে পারিলেন না। যিনি, পতিপ্রেমে আত্মহারা হইলেও বেশ্যা হইয়াছিল বলিয়া, যবনী হইয়াছিল বলিয়া মতি বিবিকে ব্রাহ্মণ নবকুমারের হাতে তুলিয়া দিতে পারেন নাই, তিনি কি করিয়া পরের পরিণীতা পত্নীকে প্রতাপকে দিবেন ? কবি নবীনচন্দ্রও "রৈবতককুরুক্ষেত্রে" বাল্যের শ্রীকৃষ্ণের প্রেম হৃদয়ে লইয়া বর্দ্ধিত ভগিনী জরৎ-কারুকে নাগরাজ বাসুকি দ্বারা দুর্ব্বাসার হস্তে অর্পণ করাইয়াছেন ও সেই জন্য স্বামীর উপরে একান্ত বিরক্ত জরৎ-কারুর হস্তে দুর্ব্বাসাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিয়াছেন। পাঠক, পাঠিকা, বুঝিয়াছেন কি—ইঁহারা কি বলিতে চান ? ইঁহারা বলিতে চান,—বাল্যকালেই বালক-বালিকার প্রণয়ের সূত্রপাত হয়। সেই সূত্র ধরিয়া—সেই বালক আত্মীয় হউক, সগোত্র হউক, জ্ঞাতি হউক,—তাহার হাতেই কন্যারত্নকে অর্পণ করিবে, শাস্ত্রের বাধা, সমাজের বাধা মানিবে না। না করিলে তাহার মন্দ ফল অবশ্যম্ভাবী। আবার কেহ কেহ বলিতেছেন, "বাল্যে বালিকা পতি কি বুঝে না, সে সময়ে বুদ্ধি, জ্ঞান, ভালবাসা কিছুই জন্মে না ; সুতরাং বাল্যে কোন ক্রমেই বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। যৌবনে সকল গুণেরই স্ফূর্ত্তি হয় ; সে সময়ে বালিকার বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য।" আমরা এখন দোটানায় পড়িলাম, কাহার কথা ফেলিয়া কাহার কথা রাখিব ?

আসল কথা, বাল্যবিবাহ লইয়াও নয়, যৌবন-বিবাহ লইয়াও নয়,—যাহা প্রচলিত আছে, তাহা ভাঙ্গিতে হইবে; বৃদ্ধ মৈজেল ঋষিদের কথা দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিতে হইবে। ঋষিরা যে বলিয়াছেন, পিতৃ সগোত্রে ও মাতামহ সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ,—পিতৃকুলে সপ্তমী কন্যা ও মাতামহকুলে পঞ্চমী কন্যা অবিবাহ্যা—এই কথার উপরেই আসল ঝাল। আর যে ঋষিরা বলিয়াছেন,—ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বেই কন্যার বিবাহ দিতে হইবে, তাহার উপরে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অত্যন্ত ঝাল। এই ঝাল ঝাড়িবার জন্যই বাল্যেই বালক-বালিকার প্রণয়ের চিত্র দেখান হইয়াছে, যৌবন বিবাহের

সমর্থন করা হইতেছে। আমার এই প্রবন্ধের এই পর্য্যন্ত লিখিবার পরে পৌষের "ভারতবর্ষ" হস্তগত হইল। তাহাতে "অকাল-মৃত্যু ও বাল্য-বিবাহ" নামক একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। তাহার লেখক প্রোফেসার শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সিংহ বি-এস, এম-এ-জি-এ মহাশয়। তিনি তাঁহার "আমেরিকা ভ্রমণ" হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন,—"মার্কিণ মাতৃগণও আজকাল বেশী বড় করিয়া কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন না।" আরও তিনি লিখিয়াছেন,—"ছোটবেলা হইতে যুবক স্বামী ও বালিকা পত্নীতে একত্র থাকাতে কেমন একটি ভালবাসা জন্মে। সে ভালবাসা বেশ পূর্ণ প্রেমে পরিণত হয়। সে প্রেম এমনি যে, যদি স্বামীর মৃত্যু ঘটে, স্ত্রীর বড়লোক বাপ, মা বা আত্মীয় থাকা সত্ত্বেও সে স্বামীর ভিটেতে দিনাতিপাত করে। সে ভিটা ছাড়িয়া বাপ ভাইয়ের ভিটেতে গিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে না। ঐরূপ জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আমি আমার ঠাকুরমা, মা, ভগ্নী ও বৌদিদির জীবনে দেখিতেছি। (পাঠক পাঠিকারাও নিশ্চয় তাঁহাদের ঈদৃশ আত্মীয়ের জীবনেও দেখিতেছেন। উহাঁদের সকলেরই বাল্য বিবাহ"—"স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে আমার দিদি শাশুড়ী স্বামীর ফটো প্রত্যহ ফুল দিয়া পূজা করেন ও তৎপরে জলস্পর্শ করিয়া থাকেন। আর একটি মহিলা তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইলে স্বামীর পাদুকাদ্বয়কে মাথার বালিসের নীচে রাখিয়া রাত্রে শুইতেন।" "বাল্য-বিবাহে প্রেমের মাধুর্য্য কতখানি তাহার দু' একটি দৃষ্টান্ত দিব।" এইরূপ বলিয়াই তিনি পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। আবার সিংহ মহাশয় যুবতী বিবাহের কুফল দেখাইতে আর একটি দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন ও তাহারও মন্তব্য লিখিয়াছেন। তাহাও আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি—"একটি ডাগর মেয়ে বৌরূপে ঐ [illegible]রিবারে আসে। আমি সেই বৌকে জিজ্ঞাসা করি—তোমার শাশুড়ী কেমন আছে?" তাহার উত্তরে সে [illegible]লে, "শাশুড়ী মরে নাই—এখনও বেঁচে আছে।" এই [illegible]ত্তর হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, শাশুড়ী মরিলে [illegible]জ রোজগা'রে স্বামীকে ভাসুর বা দেবরের নিকট হইতে [illegible]থক্ করিয়া লইয়া অন্যত্র থাকিব বা তাহাদের ভাতে [illegible]রিতে পারিব ইহাই ঐ বৌটীর অভিপ্রায়"।

বাল্য-বিবাহের অনুকূলে ও যৌবন-বিবাহের প্রতিকূলে কয়েকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইলেও সিংহ মহাশয় বাল্য-বিবাহের সমর্থন করেন নাই। প্রত্যুত যৌবন-বিবাহেরই ব্যবস্থায় সম্মতি দিয়াছেন। যে যে কারণে তিনি বাল্য-বিবাহে মত না দিয়া যৌবন-বিবাহে মত দিয়াছেন, প্রথমতঃ সেইগুলি প্রদর্শিত হইতেছে।

১। বাল্য-বিবাহিতার গর্ভজাত সন্তান দীর্ঘায়ুঃ হয় না, দুর্ব্বল-দেহ ও রুগ্ন-দেহ লইয়া তাহাদিগের জীবন-কাল অতিবাহিত করিতে হয়।

২। শারীরিক গঠন সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে গর্ভ-সঞ্চার হইলে, প্রসবকালে প্রসূতির প্রাণ লইয়া টানাটানি ঘটে।

৩। ভারতবর্ষে বাল-বিধবার সংখ্যা বেশী। "দেরী করিয়া বিবাহ দিলে এত অল্প বয়সে বিধবা না হইতে পারিত।" বার বৎসরে বিবাহ দেওয়া হইল। এক বৎসর পার না হইতেই মেয়েটি বিধবা হইল। দুই বৎসর পরে যদি বিবাহ দেওয়া হইত; "তা হইলে সে মেয়েটি আরও দু'বৎসর ত মাছ খাইতে পাইত, সাড়ী গয়না পরিতে পারিত।"

৪। "এইরূপ আক্রাগণ্ডা যুগে যাহার যাহা আছে, তাহাতে আর কুলাইতেছে না। এরূপ ক্ষেত্রে বাল্য বিবাহ করিলে, সংযমী হইবার অভাবে, সন্তানের সংখ্যা এত শীঘ্র বাড়িতে থাকে যে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করা ভিন্ন অন্য উপায় থাকে না।"

৫। "নিতান্ত অল্প বয়সে স্ত্রীলোকের ঋতুমতী হইবার প্রধান কারণ বাল্য বিবাহ।" "অল্প বয়সে সন্তান প্রসব করিলে কেবল যে অল্পজীবী এবং অসুস্থ সন্তান জন্ম-গ্রহণ করে এরূপ নহে, মাতার স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।"

৬। বেদ, স্মৃতি, তন্ত্র সকল শাস্ত্রেই বাল্য-বিবাহের সমর্থন নাই, যৌবন-বিবাহেরই ব্যবস্থা আছে।

সিংহ মহাশয়ের প্রথম আপত্তির উত্তরে আমার আর কিছু না বলিলেও চলে। মাতা অনুরূপা তাঁহার প্রবন্ধে বাল্য-বিবাহের উল্লেখ করিয়া, নিজের বংশের মহাপুরুষ-দিগের নাম কীর্ত্তন করিয়া, তাঁহারা যে দীর্ঘজীবী ছিলেন, বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ ছিলেন—দেখাইয়াছেন; আরও তিনি, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বংশধরদিগেরও সেই ভাবে তালিকা

প্রদর্শন করিয়াছেন। রঙ্গপুরের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট (এক্ষণে বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার) মিষ্টার জে, এন, গুপ্তের অনুরোধে আমার রঙ্গপুরে যাইতে হয়। যে দিন প্রত্যূষে রঙ্গপুরে পঁহুছি, সেই দিন ১টার সময়ে টাউন হলে সভা। সেই সময়ে যাইয়া দেখি, বাগ্মি-প্রবর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত। তিনিই বক্তৃতা দিবেন "বালকদিগের প্রতি উপদেশ দান।" সভ্যদিগের ঐকমত্যে আমারই গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, সভাপতির আসন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার স্বাভাবিক জলদ্-গম্ভীর স্বরে বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিলেন। নানা কথা বলিলেন, অবশেষে বলিলেন, "তোমারা কখনও বাল্য বিবাহ করিও না, পূর্ণ বয়স্ক হইলে বিবাহ করিও। দেখ, আমি কুলীন ব্রাহ্মণ, আমার মাতাও ছিলেন কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা। কুলীন-কুমারীর অল্প বয়সে বিবাহ অসম্ভব। সুতরাং ধরিয়া লও তাঁহার অধিক বয়সে বিবাহ হইয়াছিল। সেই পূর্ণ বয়স্কা মাতার গর্ভে আমার জন্ম। তাহার ফলে কাল আমি কলিকাতায় ট্রেণে উঠিয়াছি, আজ প্রত্যূষে রঙ্গপুরে পঁহুছিয়াছি। তাহার ফলে, এই বৃদ্ধ বয়সে এইরূপ ট্রেণের ক্লান্তির পরে এখানে আসিয়া অনায়াসে ২৷৩ ঘণ্টা ধরিয়া বক্তৃতা করিতেছি।" সভাপতির পক্ষে বক্তার প্রতিবাদ করা সভ্যতা-বিগর্হিত; সেই জন্য সভায় সে কথার উপরে আমি কোন কথাই বলি নাই। পরে যখন তাজহাট-রাজপ্রাসাদের উদ্যানে সান্ধ্য-সম্মিলন হয়, তখন আমি শিক্ষিত-মণ্ডলীর মধ্যে তাঁহাদিগের সম্মুখে সুরেন্দ্রনাথকে বলি—"আমি আপনার ন্যায় কুলীন নই। আমার পিতৃকুল ও মাতামহকুল উভয়েই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। সুতরাং আমার মাতার অল্প বয়সেই বিবাহ হইয়াছিল। সেকালে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলিয়া নয়, অল্প বয়সেই সকলে কন্যার বিবাহ দিত,—বেশী বয়সের প্রতীক্ষা করিত না। আপনার অপেক্ষায় আমার বয়সও কম নয়, বরং অধিক হইবারই সম্ভাবনা। আপনি কাল কলিকাতায় মধ্যাহ্ন-ভোজন করিয়া অপরাহ্ণ পাঁচটার সময়ে ট্রেণে উঠিয়াছেন; রাত্রি-ভোজনও ট্রেণে সম্পন্ন হইয়াছে; আজ সকালেও প্রাতরাশ হইয়াছে। অপরাহ্ণ-ভোজনও হইয়াছে। তৎপরে সভায় আসিয়া বক্তৃতা করিয়াছেন। আর এ দুর্ভাগ্য গত পরশ্বঃ প্রাতে নয়টার ভিতরে কোন রকমে স্নানাহ্নিক সারিয়া নাকে মুখে দুটি ভাত গুঁজিয়া প্রাণপাত করিয়া গাড়ী ধরিয়াছে। তার পর আর সেদিন দিবা-রাত্রির মধ্যে জল-স্পর্শ নাই, পরদিনেও আর দিবা রাত্রির মধ্যে জলস্পর্শ নাই। আজ ভোরে রঙ্গপুরে আসিয়াছি। পথে গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া মাঝে মাঝে ট্রেণের পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। আজ এখানে আসিয়া কর্ত্তব্য সারিতে প্রায় দেড়টা বাজিয়া যায়। পরে সেই ভাবে নাকে মুখে দুটি ভাত দিয়া সভায় আসিয়াছি। এখন আপনার সহিত বাজি রাখিয়া বক্তৃতা করিতে চাই। আপনার জন্য অবশ্য টেবিলে জলপূর্ণ গ্লাস থাকিবে, মাঝে মাঝে টুঁটি ভিজাইতে পারিবেন। আমার পক্ষে ত তাহা একেবারে অসম্ভব। দেখা যাউক, পূর্ণ বয়সে বিবাহিতা নারীর গর্ভজাত কতকাল বক্তৃতা করিতে পারে ও বাল্য-বিবাহে বিবাহিতা নারীর গর্ভজাত কতকাল বক্তৃতা করিতে পারে?"

সেকালে সকলের মধ্যে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের ভিতরে, বাল্যে সকল কন্যারই বিবাহ হইত। সেকালের পণ্ডিতদিগকে অনেকেই দেখিয়াছেন, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, রাখালদাস ন্যায়রত্ন—সকলেই দীর্ঘজীবী ছিলেন। কাহারও আশী বৎসরের ভিতরে দেহান্ত হয় নাই। কেহ বা নব্বই বৎসরও অতিক্রম করিয়াছিলেন। দেহ-পাতের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইঁহারা সকলেই সবল ছিলেন। বিগত ৩০শে অগ্রহায়ণ সংক্রান্তির দিবস দিবা ১ ঘটিকায় পঁচাত্তর বৎসর বয়সে খ্যাতনামা পণ্ডিত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের কাশী-প্রাপ্তি হইয়াছে। সে দিনেও তিনি হরিসভার বার্ষিক উৎসবে নিজের বাড়ী হইতে দূরবর্ত্তী মহারাণী ভবানীর সত্রে খড়ম পায়ে দিয়া অনায়াসে গিয়াছিলেন ও সেই ভাবে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার একটু জ্বর হইয়াছিল। আমি এক দিন সকালে দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, তিনি আসনে বসিয়া পূজা করিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। পূজান্তে কাহারও কাহারও সাহায্য লইয়া শয্যায় গিয়া উপবেশন করিলেন। অনেক কথা হইল, শাস্ত্রীয় কথাও হইল; তার পর দিনেই তিনি কাশীতে দেহ রক্ষা করিলেন।

সে কালের হিসাব ইহাকে দীর্ঘায়ুঃ বলা যায় না। কিছু বেশী বা কিছু কম এই বয়সেই ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্রীধর বিদ্যালঙ্কার, মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি দেহত্যাগ করিয়াছেন। এক বৎসর অতীত হয় নাই, আমার একটি আত্মীয় পণ্ডিত একশ তের বৎসর বয়সে মহানিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সে দিনেও তিনি রাত্রে লুচী খাইয়া শয়ন করেন। একটা রাত্রির সময়ে জাগিয়া পৌত্র ও পুত্রকে ডাকিয়া নিজকে বাহির করিতে বলেন। বঙ্কিমবাবুর পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৮৮ বৎসর বয়সের সময়ে ও তাঁহার পিতৃব্য জয়নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ১০৫ বৎসর বয়সে গঙ্গালাভ করেন। বঙ্কিমবাবুর সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে দেহত্যাগ করেন। ইহাঁদিগের সকলেরই পিতামাতার বাল্যকালে বিবাহ হইয়াছিল। ঐ কাঁঠালপাড়ার রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে,—৮২ বৎসর বয়সে; তাঁহার মাতা অসম্ভব অল্প বয়সে এই পুত্রটিকে প্রসব করিয়াছিলেন। আমার খুল্ল পিতামহ ইন্দ্রেশ্বর চূড়ামণি তাঁহার পূর্ব্ব পক্ষের দুই স্ত্রীর মৃত্যুর পরে ৭৬ বৎসর বয়সে পুনরায় বিবাহ করেন। তাঁহার আশী বৎসর বয়সের সময়ে সেই বিবাহিতা পত্নীর গর্ভে হরকান্ত বিদ্যাভূষণের জন্ম হয়। তিনিও প্রায় ৭৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। আর কত দেখাইব? এক কথায় বলিতে পারি,—সেকালে সকলেই বাল্য-বিবাহ করিতেন; সেকালের সকলেরই দীর্ঘজীবী ও বলিষ্ঠ পুত্রাদি জন্মিত। সেকালে কাহারই ডিস্পেপসিয়া বা ডাইবিটিস ছিল না। একালের লোক সেকালের লোকের ভোজন দেখিলে বিস্মিত, চমৎকৃত ও ভীত হইবেন। মেয়েদের ভিতরেও এত জরায়ুঘটিত ব্যারাম ও হিষ্টিরিয়া ছিল না। প্রসবের জন্যও শিক্ষিতা ধাত্রী, লেডি ডাক্তার, ডাক্তার ও সিবিল সার্জ্জনকে ডাকিয়া টানা-হিচড়া, কাটাকাটি করিয়া বীভৎস কাণ্ডের অবতারণা হইত না, অশিক্ষিতা ধাত্রীর সাহায্যে অনায়াসেই সুখপ্রসব হইয়া যাইত।

বাল্য বিবাহ উঠাইয়া দিবার জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রবন্ধ লিখিয়া আর বেগ পাইতে হইবে না।—বরপণের দায়ে পড়িয়া কন্যাপক্ষের একেবারে অন্ধকার দেখিতে হইতেছে। অল্প মূল্যে বর মিলে কি না তাহার চেষ্টায়, অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় এই ৩০।৪০ বৎসরের ভিতরে ১২ হইতে ক্রমে ১৮।২০ বৎসরে কন্যার বিবাহের বয়স দাঁড়াইয়াছে। পাশের অনুপাতে বরপণ অধিক পাওয়া যাইবে, এই আশায় বরের পিতাও বরের বয়স বাড়াইতে থাকে। সুতরাং শাস্ত্র-বিশ্বাসী ও শাস্ত্রে অবিশ্বাসী উভয়েই, কিসে কল্যাণ হইবে, কিসে অকল্যাণ হইবে, সে চিন্তা না করিয়াও, বর কন্যার বয়স বাড়াইতেছে। সুতরাং সেজন্য আর মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কি ও প্রবন্ধ লিখিয়া পত্রিকার কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া অনর্থক কালি, কলম ও কাগজের অপব্যয় করিবার প্রয়োজন কি বুঝি না।

মাতা অনুরূপা নিজের পরিবারের মধ্যে ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বংশে, বাল্য বিবাহেও দীর্ঘায়ুঃ পুত্র জন্মিয়াছে, দেখাইয়াছেন। তাহা দ্বারা কি তিনি বলিতে চান,—বাল্য বিবাহে জাত সন্তান দীর্ঘায়ুঃ হয়? তা তিনি বলেন নাই। সিংহ মহাশয় যদি সেরূপ বুঝিয়া থাকেন, তবে তিনি ভুল বুঝিয়াছেন বলিব। বাল্য-বিবাহে জাত সন্তান দীর্ঘায়ুঃ হয় না, অল্পায়ুঃ হয়, রুগ্ন হয়—এই সিদ্ধান্তের উত্তরেই অনুরূপা দেবী বলিতেছেন,—আমি দেখাইয়া দিতেছি,—ইহাঁরা বাল্য বিবাহে জাত, অথচ দীর্ঘায়ুঃ হইয়াছেন। অনুরূপা দেবীর প্রদর্শিত গণ্ডী ছোট রকমেরই হউক আর বড় রকমেই হউক, বা গণ্ডী না হইয়া একটিও হউক; দেখাইতে পারিলেই পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত যে অপসিদ্ধান্ত, জোর গলায় ইহা বলিতে পারা যায়। কি দেশীয় ন্যায়-শাস্ত্র, কি বিদেশীয় লজিক,—উভয়েই এই হেত্বাভাসের উল্লেখ করিয়াছেন। সিংহ মহাশয় একজন খ্যাতনামা প্রোফেসার হইয়াও যে অনুরূপা দেবীর প্রদর্শিত বিষয়টিকে লক্ষ্য করিতে পারেন নাই, এজন্য দুঃখিত হইলাম।

২। সিংহ মহাশয়ের দ্বিতীয় সিদ্ধান্তেও আস্থা স্থাপন করিতে পারিলাম না। এই কাশীধামে অনেক বৃদ্ধা কাশীবাস করিতে আসিয়াছেন। তাঁহাদিগের অল্প বয়সে প্রসব করিতে হইয়াছে। প্রসবকালে প্রাণ লইয়া টানাটানি করিতে হয় নাই, এখনও তাঁহারা কুব্জপৃষ্ঠ হইয়াও অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান, বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিয়া স্বহস্তে রন্ধন করেন ও দণ্ডী ভোজন, ব্রাহ্মণ ভোজন

করাইয়া নিজে ভোজন করেন। নিজের পরিবারে ও অন্য পরিবারে ইহার দৃষ্টান্তের অপতুল নাই।

৩। সিংহ মহাশয় বলিতেছেন, বার বৎসরে বিবাহিতা যদি সেই বৎসরে বিধবা হয়, তবে তখন হইতেই তাহার মাছ খাওয়া বন্ধ, সাড়ী ও গহনা পরা বন্ধ। আর যদি চৌদ্দ বৎসরে বিবাহ দেওয়া হয় ও সেই সময়ে সে বিধবা হয়, তবে সে অনায়াসে আরও দুই বৎসর মাছ খাইতে পারে, শাড়ী ও গহনা পরিতে পারে। সিংহ মহাশয় করুণা করিয়া দুই বৎসর (অতি অল্প সময়) মাছ খাওয়াইয়া শাড়ী ও গহনা পরাইয়া বিধবাদিগের কতটুকু আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে পারিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। তাহা না করিয়া যদি বিধবাদিগকে মাছ খাইতে ও শাড়ী গহনা পরিতে চিরদিনের জন্য ব্যবস্থা দিতে পারিতেন, যাহাতে তাহারা মাছ খায় ও শাড়ী গহনা পরে তাহার চেষ্টা যত্ন করিতেন, পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন, পুস্তিকা লিখিয়া বিতরণ করিতেন, তবে বিধবাদিগের চির আশীর্ব্বাদ পাইতেন। তিনি ত আর আমাদিগের মত কুসংস্কারসম্পন্ন নহেন যে, সেকালের অসভ্য ঋষিদিগের প্রদর্শিত জুজুর ভয়ে অধীর হইবেন। যজ্ঞোপবীতের পূর্ব্বে তিন বেলা খাইতাম, কত কি খাইতাম। অষ্টম বা নবম বর্ষে উপনয়ন হইল। সেই দিন হইতে সমস্ত বন্ধ হইল, সেই দিনেই ত একবেলা চরু (কেবল দুগ্ধে সিদ্ধ চাউল, মিষ্টের সম্পর্ক নাই) মাত্র খাইলাম। এ ভাবে বারদিন চলিল। এক বৎসর পর্য্যন্ত অনেক নিয়ম পালন করিলাম। ৮।৯ বৎসরের বালক কি করিয়া এই সমস্ত করিল? পিতামাতার পরলোকের পরে ব্রাহ্মণ বালক ১১ দিন ও কায়স্থ বালক প্রভৃতি ১ মাস পর্য্যন্ত ইহা অপেক্ষার কঠোর নিয়মগুলি পালন করিয়া থাকে। উত্তরাপথে, দক্ষিণাপথে, মথুরা বৃন্দাবনেতে কেহই মাছ খায় না, যুক্তপ্রদেশে ব্রাহ্মণেরা মাছ খান না, ছোট লোকের মধ্যেও অনেক শ্রেণীর লোক মাছ খায় না। সিংহ মহাশয়ের মতে মাছ খাওয়াটাই কি বড় হইল? অভ্যাস-বলেই হউক, শাস্ত্র-বিশ্বাসেই হউক, বিধবারা যে মাছের গন্ধ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারেন না। সিংহ মহাশয় লিখিয়াছেন—"অনেক বাল্য-বিধবা ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে না পারিয়া বা প্রলোভনে পড়িয়া ভ্রষ্টাও হইয়া পড়িতেছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পড়িয়া বন্ধুর ও বন্ধুত্বের খাতিরে অনেকে অনেক দুষ্কার্য্য করিয়া থাকে। বালবিধবাই হউক আর যুবতী বিধবাই হউক, এ ভাবে উভয়েরই পতন হইতে পারে,—শুধু বাল-বিধবা বলিলে চলিবে না। বাল বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করা কঠিন, এ মতের আমি সম্পূর্ণ বিরোধী। যাহার যে বিষয়ে রস বোধ হয় নাই, তাহার সে বিষয়ে প্রলোভন বা আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না। যে হিন্দু-সন্তান কখনও হিন্দুর অখাদ্যগুলি খায় নাই, তাহার সেই অখাদ্য খাইতে প্রবৃত্তি হয় না; বরং দেখিলে ঘৃণা হয়। আবার যাহারা খাইয়াছে, তাহারা ছাড়িতে পারে না। মদ্য পানেও ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। স্ত্রী জাতির পুরুষ অপেক্ষা কাম প্রবৃত্তি অতি কম। ইহার দৃষ্টান্ত, পশু, পক্ষী কীট, পতঙ্গ সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষ পশু প্রভৃতি স্ত্রী পশু প্রভৃতির পাছে পাছে যাইতেছে, আক্রমণ করিতেছে, স্ত্রী পশু প্রভৃতি ছুটিয়া পলাইতেছে, উপেক্ষা করিতেছে, পদাঘাত করিতেছে। তাহার উপর আবার যে নারীর স্বাদগ্রহ হয় নাই, সে ত সহজেই উপেক্ষা করিবে; সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু নাই।

৪। সিংহ মহাশয়ের চতুর্থ আপত্তি বাল্য-বিবাহে সন্তান বৃদ্ধি হইলে, দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করা অনিবার্য্য। উত্তরে বলিতেছি,—সেই জন্যই ত ঋষিরা বিধবা-বিবাহ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। একশ পুরুষের মধ্যে যদি নিরানব্বুই জন পুরুষ সংযমী হয় ও একজন লম্পট হয়, তবে সে একশত স্ত্রীলোকের গর্ভোৎপাদন করিতে পারে। সুতরাং পুরুষকে সংযমী করিলে প্রজাবৃদ্ধির মাত্রা কমিবে না। স্ত্রীলোক হইতেই সন্তান প্রসূত হয়; সেই জন্য তাহাদিগেরই সংযমের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। কুমারী বিবাহ বন্ধ করিলে বিবাহ হইবে কাহার? আইন হয় না; এই জন্য বিধবা বিবাহ বন্ধ করা হইয়াছে। ঋষিরা যে যে জন্য যে যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে অবশ্য তাহার সাধু উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যায়।

৫। অল্প বয়সে স্ত্রীলোকের ঋতুমতী হইবার প্রধান কারণ বাল্য-বিবাহ। বুঝিলাম না। বিবাহের মন্ত্র পাঠ করা মাত্র সেই মন্ত্রশক্তির বলেই বুঝি কন্যা ঋতুমতী হইল? এ দেশে উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ও বিহারে সকল জাতির মধ্যেই বাল্য বিবাহের প্র ; কিন্তু ঋতুমতী না হওয়া

পর্য্যন্ত কন্যা পিত্রালয়ে বাস করে। ঋতুমতী হইলে পুনঃ সংস্কার করিয়া স্বামী পিত্রালয় হইতে পত্নীকে স্বগৃহে লইয়া আসে। মাতা অনুরূপাও এদেশের সেই আচারের উল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্গদেশে এই আচারের প্রবর্ত্তন করিলে দোষ কি? কামরূপে ও উৎকলেও এইরূপ আচার দেখিতে পাই। পূর্ব্বের মাতা প্রভৃতি অভিভাবিকাগণ অল্প বয়সে কখনই ছেলে বৌকে এক ঘরে শুইতে দিতেন না। কলিকাতার মেয়েরা আহ্লাদ করিয়া এই প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তৎপরে তাহার অনুকরণে সমস্ত বঙ্গদেশেই অল্প বয়সে বিবাহিত দম্পতিকে এক ঘরে শোওয়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কন্যাকে হীরা, চুণি, পান্নায় মণ্ডিত নানা অলঙ্কারে ও মুক্তাহারে বিভূষিত করিবার ব্যবস্থা, বরকে বহুমূল্য হীরার আঙটী, হীরার চেন, ঘড়ী ও বহুমূল্য নানাবিধ যৌতুক দিবার ব্যবস্থাও কলিকাতায় প্রথমে আরম্ভ হয়। প্রথমে সুবর্ণ বণিকের ভিতরে, পরে ধনী কায়স্থদিগের ভিতরে প্রতিযোগিতা করিয়া ইহার প্রবর্ত্তন হয়, এমন কি, বন্ধুবর মহামহোপাধ্যায় মহেশ-চন্দ্র ন্যায়রত্ন তাঁহার কন্যা শ্রীমতী মনোরমা দেবীর বিবাহে যৌতুকে রূপোর খাট পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন। আমি তখনই তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "আপনি এ কাজটি ভাল করিলেন না। দিতে ইচ্ছা হয়, যৌতুক বলিয়া বিবাহ সভায় না দিয়া অন্য সময়ে দিলেও চলিত।" পরে বঙ্গদেশের ধনীরা কলিকাতার অনুকরণে কন্যা ও বরকে দানের মাত্রা, তত্ত্বের মাত্রা বাড়াইয়া ফেলেন। ধনীর দেখাদেখি মধ্যবিত্তেরাও অল্পবিস্তর যথাসম্ভব বাড়াইয়া লয়েন। বর-পক্ষীয়েরাও অন্য বর-পক্ষের লাভ দেখিয়া লোভাকৃষ্ট হইয়া নির্লজ্জ ভাবে ক্রমে প্রকাশ্য চুক্তির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এখন সেই চুক্তি বঙ্গদেশময় হইয়া পড়িয়াছে। যাউক, এক কথা বলিতে গিয়া অন্য কথায় আসিয়া পড়িয়াছি। সিংহ মহাশয়ের মতে পড়া শেষ করিবার পূর্ব্বে বিবাহ দিলে বালকের পড়াশুনা মাটী হয়; সে কেবল পত্নীর চিঠী পাইবার জন্য মেসে পড়িয়া দিন-রাত চিন্তা করে। বুঝিলাম। এজন্য সমস্ত পরীক্ষার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বালকের বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। সিংহ মহাশয় বলিতে পারেন কি, পরীক্ষার শেষ হইবে কত দিনে? এম্‌এ দেওয়ার পরেও যে অনেক ছেলে ডাক্তারি শিখিতে যায়, ওকালতি দিতে যায়, এঞ্জিনিয়ারি পড়িতে চায়। আবার পি-আর-এস আছে, রিচার্চ্চ আছে। জন্ম ভরিয়াও যে পরীক্ষার শেষ হয় না; একেবারে বিবাহ বন্ধ করিয়া দিলেই আপদ শান্তি হইয়া যায়।

ইউনিভার্সিটি সৃষ্টির পরে সমস্ত বঙ্গদেশের বালককে যে কলিকাতার মত স্থানে রাখিতে হয়। কলিকাতার মত স্থানে যে চতুর্দ্দিকে প্রলোভন। এখানে বাইস্‌কোপ, সেখানে থিয়াটার, তাতে আবার হাব ভাব প্রদর্শন করিয়া যুবতী কুলটাদিগের নৃত্য ও গান। অন্যখানে আবার নগ্ন ভাবে রমণীদিগের সার্‌কেস্!!! পত্নীর চিঠী বন্ধ করিয়া পাঠার্থী বালকদিগের ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে পারিবেন কি? তবে আর সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠার পরে পৃষ্ঠায় খারাপ রোগের ঔষধের এত বিজ্ঞাপন কেন বাহির হয়? সেই সকল ঔষধেরই বা এত কাটতি কেন? নবদ্বীপের চতুষ্পাঠীর ছাত্রদিগের অবস্থিতির জন্য যে সকল ঘর নির্ম্মিত হইত, সেগুলি অত্যন্ত দীর্ঘ, পাশে ক্ষুদ্র। সেই ঘরে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটরী থাকিত, এক একটি কুটরীতে এক একটী ছাত্র থাকিত। সেই কুটরীগুলিতে বাহিরের দরজা দিয়া ভিন্ন আর প্রবেশের পথ ছিল না। এখনও নবদ্বীপে সে ভাবের চতুষ্পাঠী গৃহ আছে। হষ্টেলে বা মেসে এক একটি ছাত্রের এক একটি ঘরের ব্যবস্থা অদ্যাপি হয় নাই। সিংহ মহাশয় বাল-বিধবার মাছ খাওয়া বন্ধ হয় বলিয়া দুঃখ করিয়াছেন। মাছই কি বড় খাদ্য? বিধবাদিগের জন্য যে দুগ্ধ, ঘৃত, দধি, মাখন, মিছরি, সুপক্ক নানাবিধ ফল, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট খাদ্যের শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে। পূর্ব্বে বিধবাদিগের সেবায় বধূদিগের এই সমস্ত যোগাইতেও হইত। এক্ষণে এ সমস্ত দূরে থাকুক, বিধবার ভাগ্যে ভাগ্যনিয়ন্ত্রীদিগের কৃপায় দিনান্তে এক তোলা দুধও যে মিলে না!

৬। সিংহ মহাশয়ের ষষ্ঠ আপত্তি—বেদ, স্মৃতি, তন্ত্র, পুরাণ সকল ধর্ম্ম-পুস্তকেই যৌবন-বিবাহের সমর্থন আছে, বাল্য-বিবাহের নিষেধ আছে। তিনি বেদ, তন্ত্র, স্মৃতি, পুরাণ সকল গ্রন্থ হইতেই প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমি বাঙ্গালী, বেদ জানি না, বেদের অর্থও বুঝি না। আমি বলিয়া নয়, স্বয়ং বেদব্যাস পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, "মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ" বেদের অর্থে পণ্ডিতগণও মোহপ্রাপ্ত হয়েন।

এইরূপ বলিয়া "বিজ্ঞোন্নপ্ত—শ্রুতাদ বেদঃ" ইত্যাদি বলিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন—বেদের অর্থ কত গভীর, কত কঠিন। আমার মত অল্পজ্ঞ কি তাহার অর্থ বুঝিবে? সুতরাং বেদের কথা লইয়া আমি কিছুই বলিব না। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত আমি শাস্ত্রীয় বিচার করিতেও অসমর্থ। এ কথা আমি অনেকবার বলিয়াছি, সেইরূপ বিচারও আমি কখনও করি না। তবে তিনি উন্নতি যাহা প্রদর্শন করিয়াছেন; শাস্ত্রীয় বিচারের মত নয়, যথাশ্রুত সেই গুলি ঠিক কি না দেখাইব।

১। সিংহ মহাশয় লিখিয়াছেন; "ভাষ্যকার মেধাতিথি ঋষি লিখিয়াছেন, "যৌবন সঞ্চারের (ঋতুমতী হইবার) পূর্ব্বে কন্যাদান অনুচিত।" মেধাতিথি ঋষি নহেন। সিংহ মহাশয়ের পক্ষে সেই সন্দর্ভ উদ্ধৃত করা উচিত ছিল।

২। "কাম সামরর্ণাত্তিথেদ গৃহে কন্যার্ত্তুমত্যপি
নচৌর্বানাং প্রয়চ্ছেত্তু গুণ হীনায় কর্হিচিৎ॥"

(৯+অ, ৮৯) মনু

"গুণহীন পাত্রে পিতা কদাপি প্রাপ্ত-যৌবনা কন্যাকেও অর্পণ করিবে না।" এই অর্থ হইতে কি বুঝা যায় যে, যৌবনে বিবাহ দিবে? বরং বুঝা যাইতেছে যে যৌবন-বিবাহ নিষিদ্ধ হইলেও বরং তাহাও স্বীকার করা কর্ত্তব্য; তথাপি গুণহীন বরে দান করা কর্ত্তব্য নয়।

৩। "ত্রিংশৎবর্ষোবহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকাং।"

৯ অ, ৯৪

সিংহ মহাশয় এই মনু-বচন উদ্ধৃত করিয়া কি প্রমাণ করিবেন, বুঝিলাম না। ত্রিশ বৎসরের বর বার বৎসরের কন্যাকে বিবাহ করিবে; ইহাতে কি যুবতী-বিবাহ হইল? এই বচনেরই অর্দ্ধেক হইতেছে এই,—

"ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্ট বর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ"।

সিংহ মহাশয়ও এই অর্দ্ধাংশ উদ্ধৃত করিয়া তাহার বাঙ্গালা ব্যাখ্যায় এইরূপ লিখিয়াছেন,—২৪ বৎসরের পুরুষ ৮ বৎসরের বালিকাকে বিবাহ করিলে ধর্ম্মে বা উন্নতিলাভের সকল বিষয়ে শীঘ্র শীঘ্র অবসাদ প্রাপ্ত হয়েন।" তিনি তাঁহার এই মনগড়া ব্যাখ্যাটি পূর্ব্বোক্ত বচনার্দ্ধের কোন্ কোন্ শব্দ, কোন্ কোন্ বিভক্তি (সুপ্ ও তিঙ্), কোন্ কোন্ কারণার্থ হইতে পাইলেন? "বিবাহ করিলে" ইহা কোন্ ক্রিয়াপদের অর্থ? কর্ত্তৃপদ কি? "সত্বর" শব্দের শীঘ্র শীঘ্র অর্থ করিলে যে "সত্বরঃ" না হইয়া সত্বরং হইয়া যায়। সংস্কৃতে বড় বাঁধাবাঁধি নিয়ম; যা তা করিবার সম্ভাবনা নাই। এই বচনার্দ্ধে মনু ৮ বছরের মেয়েকে বিবাহ করিবারই ব্যবস্থা দিয়াছেন, অন্যরূপ অর্থ করিবার সম্ভাবনা নাই।

৪। মনু "উৎকৃষ্টায়াভিরূপায়" ইত্যাদি বচন দ্বারা কুলাচারাদিতে শ্রেষ্ঠ বরকে অপ্রাপ্ত-বয়স্কা কন্যাকেও দান করিবে, এইরূপ ব্যবস্থা দিয়া গুণহীন বরকে কখনই কন্যা দান করিবে না, ঋতুমতী হইলেও বরং আমরা কন্যাকে গৃহেই রাখিব, এইরূপ বলিয়াছেন; তৎপরে আবার মনু বলিতেছেন,—

"ত্রীণি বর্ষাণ্যদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী!
উর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্ বিনেত সদৃশং পতিং।"

কুমারী ঋতুমতী হইয়া তিন বৎসর অপেক্ষা করিবে (তাৎপর্য্য—পিতা উৎকৃষ্ট বরের সহিত বিবাহ দেন কি না। এই তিন বৎসরের ভিতরে বিবাহ না দিলে আর অপেক্ষা না করিয়া) ইহার পর আত্মতুল্য জাতি-গুণ-বিশিষ্ট বরকে নিজেই বরণ করিবে। সিংহ মহাশয় এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়া কি বুঝাইতে চান, বুঝিলাম না। মনু যদি ঋতুমতী না হইলে বিবাহ দিবে না বলিতেন, তবে সেই বচনের পরেই,—

"অদীয়মানা ভর্ত্তারমধিগচ্ছেদ্ যদি স্বয়ং।
নৈনঃ কিঞ্চিদবা প্নোতি নচ যং সাধিগচ্ছতি।"

এই বচন বলিয়া পিত্রাদি বিবাহ না দিলে সেইরূপ কন্যা নিজে ঐরূপে আত্মদান করিবে, তাহাতে তাহার কোন পাপ হইবে না, যে বিবাহ করিবে তাহারও কোন পাপ হইবে না, বলিতেন না। ঋতু হওয়া নিবন্ধন যদি কন্যার পাপ না হয়, ঋতুমতী কন্যাকে বিবাহ করা নিবন্ধন যদি বরের কোন পাপ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকিত, তবে কেন পাপ হইবে না, বলিতেছেন?

৪। সিংহ মহাশয় মহাভারত হইতে আর একটি বচনার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন; সেটি এই—

"ত্রিংশদ্ বর্ষঃ ষোড়শাব্দাং কন্যাং বিন্দেত নগ্নিকাং।"

ত্রিশ বছরের বর, ষোল বছরের নগ্নিকা কন্যাকে বিবাহ করিবে। সিংহ মহাশয় "নগ্নিকা" শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"ঋতুমতী"। গৃহ্যসূত্রকার "নগ্নিকা" শব্দের না কি "ঋতুমতী"

অর্থ করিয়াছেন। কোন্ গৃহ্যগ্রন্থে এইরূপ অর্থ আছে? গোভিল গৃহ্যসূত্র, পারস্কর গৃহ্যসূত্র, আশ্বলায়ন সূত্র,—এতগুলি গৃহ্যসূত্র আছে। গৃহ্য গ্রন্থ অভিধান নয় ও টীকাও নয় যে, শব্দের অর্থ করিতে বসিয়াছেন। "নগ্নিকা নাগতার্ত্তবা" এই ত অমরকোষ। যে কন্যার ঋতু হয় নাই, তাহাকেই "নগ্নিকা" বলে। সমস্ত কোষেই এই অর্থ লিখিত। "শব্দকল্পদ্রুম" ও "বাচস্পত্যাভিধান" অনেক পাঠক পাঠিকার গৃহে আছে। তাঁহারা খুলিয়া দেখিলেই বুঝিবেন, আমার অর্থ ঠিক কি সিংহ মহাশয়ের অর্থ ঠিক। বাচস্পত্যাভিধানে আবার মহাভারতের ঐ বচনটি "নগ্নিকা" শব্দের নীচেই প্রদত্ত হইয়াছে; তাহাতে "ষোড়শাব্দাং" নাই "দশবর্ষাং" আছে। "দশবর্ষাং" হইলে অর্থ-সঙ্গতিও হয়। "মহানির্ব্বাণ" তন্ত্রের বচন উদ্ধৃত করা দূরে থাকুক, কোন গ্রন্থকার "মহানির্ব্বাণ" তন্ত্রের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই। এরূপ স্থলে "মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের" বাক্যে কি করিয়া আস্থা স্থাপন করিব?

৫। রামায়ণ দৃষ্টে বুঝিতেছি,—বিবাহকালে রামচন্দ্রের বয়স ছিল, পোনের বৎসর। সীতার বয়স কত ছিল—পাঠক পাঠিকা অবধারণ করিবেন। সিংহ মহাশয় "সীতার" নামোল্লেখ কেন করিলেন, বুঝিলাম না। আর আমি কিছু বলিব না; কেবল একজন খ্যাতনামা চিন্তাশীল সুলেখক ইংরেজ সাহিত্যিকের একখানি পুস্তকের অংশ বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।—

বাঙ্গলায় ভূতপূর্ব্ব কমিশনার ও ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক মিঃ এফ, এইচ্, স্ক্রীন তাঁহার—"An Indian Journalist" পুস্তকে (p. 12-13) লিখিয়াছেন, "His wife was a scion of the Bural family of Jorasanko. This event was far from having the sinister influence on his mental development which is assigned to early marriages by self-styled friends of India. They are stigmatised as the root of the decay which is consuming the country's manhood. That the children of the upper middle classes in many parts of Bengal are mere human weeds is but too evident: but the cause of deterioration must be sought for in adverse physical conditions rather than in a custom which is hallowed by the acquiescence of a hundred generations. Doctrinaire reformers forget that human nature is more powerful than convention, and that the sexual instinct is far stronger and is manifested at an earlier stage of life in the tropics than in temperate regions. The institution of marriage regulates this overwhelming impulse, just as law does the equally powerful craving for revenge. Hence marriages in early life are good in themselves and the cause of good to society: and would-be reformers should ponder well the lessons afforded by countless ruined careers the outcome of an undue postponement of the nuptial rites." *

* বাল্য-বিবাহ ও যৌবন-বিবাহ সম্বন্ধে সপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক আলোচনা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছে। অতঃপর আর এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা আপাততঃ প্রকাশিত হইবে না।—ভারতবর্ষ সম্পাদক

বিপর্য্যয়

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল্

(৪৫)

বিবাহের রাত্রি প্রভাত হইলে মনোরমা অমলকে বলিল, "ওগো, খোকাকে কখন আনবে ?"

তার দৃষ্টির ভিতর এমন একটা কাতরতা ছিল যে তাহাতে অমলের প্রাণ সহানুভূতিতে ভরিয়া গেল। মনোরমাকে বুকের কাছে টানিয়া সে বলিল, "আজই নিয়ে আসবো মনু।"

তাদের বাড়ী ফিরিতে প্রায় দশটা হইয়া গেল। অমল বলিয়াছিল, মনোরমাকে বাড়ীতে রাখিয়াই সে খোকাকে আনিতে যাইবে। কিন্তু বাড়ী গিয়া দেখিল, ইন্দ্রনাথ খোকাকে লইয়া হাজির।

মনোরমা মোটর হইতে লাফাইয়া নামিয়া খোকার কাছে ছুটিয়া গেল। খোকা তার কোলে উঠিয়াই কাঁধে মাথা রাখিয়া ভয়ানক কাঁদিতে লাগিল।

ইন্দ্রনাথ বলিল, "কাল রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে 'মা, মা' বলে কেঁদে উঠলো। সেই থেকে সমানে কাঁদছে। আজ সকালে ওকে কিছু খাইয়েই নিয়ে এসেছি।"

মনোরমা তাহাকে বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিল। আদরে তাহাকে ভরিয়া দিল, তাহারও চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। সে বলিল, "কেঁদো না বাবা, আর তোমাকে ছেড়ে আমি এক দণ্ডও থাকবো না।" বলিয়াই সে অমলের দিকে চাহিল।

অমল ব্যথিত চিত্তে এই করুণ দৃশ্য দেখিতেছিল। সে বলিল, "এতেও কি আমার কথার অপেক্ষা ক'রতে হ'বে, মনোরমা ?"

সে অমলের কাছে ছুটি লইয়া গেল, নিজের ঘরে নিরিবিলি যাইয়া ছেলেকে শান্ত করিতে। অমলের কাছে ছেলেটাকে প্রাণ ঢালিয়া আদর করিতে তার যেন একটু লজ্জা, একটু সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল।

আপনার ঘরে গিয়া সে তাহাকে আদরে সোহাগে ভরিয়া দিল। ছেলে শান্ত হইল, কিন্তু শুব্ধ হইয়া মায়ের বধূবেশের দিকে চাহিয়া রহিল। এ রূপ তাহার অপরিচিত বলিয়াই সে বিস্ময়-স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল; কিন্তু মনোরমা সে দৃষ্টির ভিতর যেন অভিমান ও তিরস্কার দেখিতে পাইল। তাহার মৃত স্বামীর চক্ষু যেন এই শিশুর চোখের ভিতর দিয়া তাহাকে লাঞ্ছনা করিতে লাগিল। তার বুক ঠেলিয়া কান্না পাইল। সে বিছানার ভিতর মুখ গুঁজিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

অমল ঘরে ঢুকিয়া এই অবস্থা দেখিয়া দাঁড়াইল। সে আস্তে আস্তে মনোরমাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া চোখ মুছাইয়া, স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "মনোরমা, আমাকে বিয়ে করে' কি তুমি অসুখী হ'য়েছ ?"

অশ্রুতে মনোরমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়াছিল; সে উত্তর দিতে পারিল না।

অমল আবার বলিল, "যদি তাই হয়, যদি মনে কর, তুমি ভুল ক'রেছ, তবে তাতে দুঃখ করো না মনোরমা। তোমার যাতে সুখ হয় তাই আমার একমাত্র ইচ্ছা, তার জন্যে আমি সবই ছাড়তে পারি। আমার সংসর্গ যদি তোমাকে পীড়া দেয়, তবে, বিয়ে হয়েছে, হোক, কিন্তু তুমি ঠিক যেমনটি ছিলে, তেমনি হ'য়ে স্বতন্ত্র থাকতে পারো। আমি তোমাকে রক্ষা ক'রবো, সেবা যদি চাও ক'রবো। কিন্তু তোমার কাছে এসে বা তোমাকে আমার প্রেম দিতে এসে কষ্ট দেব না। বল, তুমি যা ইচ্ছা ক'রবে, তাই হবে মনোরমা। তোমার দুঃখ আমি দেখতে পারি না।"

মনোরমা স্বামীর বুকের কাছে মাথা লুকাইয়া বলিল, "আজকের দিনেই এমন কথা তুমি আমায় কেমন করে ব'লছো। তোমায় পেয়ে আমি অসুখী হ'ব? হায়! আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে বামন অসুখী হ'বে ?"

"তবে কাঁদছো কেন ?"

"ওগো, তোমার পেয়ে আমি স্বর্গ পেয়েছি; কিন্তু,—

কিন্তু,—আমার ছেলে যে আমার পর হয়ে যাচ্ছে! খোকা যদি আমায় ভাল না বাসে, তবে আমি কেমন ক'রে বাঁচবো?"

"ওঃ, এই কথা?" বলিয়া অমল বলিল, "এস তো বাবা, তোমাকে আমাদের হরিণের পিঠে চড়িয়ে আনিগে।" বলিয়া সে খোকাকে লইয়া নিরুদ্দেশ হইল।

কিছুক্ষণ পরে অনীতা আসিয়া সে ঘরে ঢুকিল; যেন মূর্ত্তিমতী শান্তি ও প্রীতি আসিয়া মনোরমার মনের সব গ্লানি ধুইয়া মুছিয়া লইয়া গেল।

অনীতাকে আনিয়া অমল তাহার ঘরেই তাহাকে অধিষ্ঠিত করিয়াছিল। আর একখানা ঘর তাড়াতাড়ি ঠিক-ঠাক করিয়া মনোরমার জন্য প্রস্তুত করিয়াছিল। অনীতার ঘরখানাই ছিল সব চেয়ে ভাল ঘর।

অনীতা মনোরমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া, তাহার কাপড়-চোপড় ছাড়া হইলে, তাহাকে নিজের ঘরে লইয়া গেল। দেশী বিলাতী নানা আসবাবে, বিলাস ও আয়েসের নানা অপূর্ব্ব আয়োজনে ঘরখানা বোঝাই ছিল। অনীতা সমস্ত জিনিস তন্ন তন্ন করিয়া মনোরমাকে বুঝাইয়া দিল। কোন্‌টা কেমন করিয়া ব্যবহার করিতে হয়, কোন্ যন্ত্রের ভিতর কি কৌশল, তাহাকে সমস্ত শিখাইল।

কিছুক্ষণ পরে মনোরমা বলিল, "এখন থাক ও-সব ভাই, এখন তোমার সঙ্গে একটু গল্প করি—ঠাকুরঝি!"

অনীতাকে এই নূতন সম্বোধন করিয়া সে কৌতুকের হাসি হাসিয়া উঠিল।

অনীতা একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "আর কখন সময় হ'বে কি না কে জানে, এখনি সব বুঝে নাও ভাই!"

বিস্মিত হইয়া মনোরমা বলিল, "কি ব'লছো ভাই, বুঝে নেব কি?"

অনীতা হাসিয়া বলিল, "এই ঘরটি মায় আসবাব আমি তোমাকে প্রণামী দিচ্ছি যে বৌদিদি।"

মনোরমার লজ্জিত গণ্ডে রক্ত-আভা দেখা দিল। সে বলিল, "দাও দেবে, এর পরে বুঝে নেব।" সে মনে মনে ভাবিল, অমলকে না জিজ্ঞাসা করিয়া এত বড় দান কিছুতেই লওয়া হইতে পারে না।

"আর কখন বুঝে নেবে? আমার যে যাবার সময় হ'য়ে এল ভাই!"

শঙ্কিত চিত্তে মনোরমা বলিল, "কোথায় যাবি ভাই? কি ব'লছিস?"

অনীতা মৃদু হাসিয়া চুপি চুপি বলিল, "যাব আমার শ্বশুরবাড়ী।"

হাসিয়া মনোরমা বলিল, "সত্যি, কবে ভাই? কোথায়? কবে বিয়ে হবে?"

"বিয়ে হ'য়ে গেছে।"

"হ'য়ে গেছে? তোর দাদা জানে না, কেউ জানে না?"

"হাঁ ভাই, কেউ জানে না। আমার স্বামীটি গোপন প্রেমের নাগর—দুষ্টের এক শেষ!"

"কে সে? কোথায় সে?"

অনীতা আবিষ্টের মত বলিল, "সে আমার অন্তরে বাহিরে বোন—সে সমস্তটা বিশ্ব ছেয়ে আছে।—তার বাঁশী যুগ-যুগান্তর থেকে লোকের মনকে টেনে এসেছে, সংসারীকে সন্ন্যাসী ক'রেছে, সতীকে কলঙ্কিনী ক'রেছে—সেই আমার স্বামী! সেই আমায় পাগল ক'রেছে।"

মনোরমা এতক্ষণে কথাটা বুঝিল। গম্ভীর হইয়া সে কিছুক্ষণ নীরবে রহিল। অনীতা যে তার যথাসর্ব্বস্ব ছাড়িয়া, তার ঘর দুয়ার ছাড়িয়া সন্ন্যাসিনী হইয়া যাইবে, এ কথা ভাবিতে তার অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ পরে সে ব্যথিত চিত্তে বলিল, "তুই আমাকে এমনি করে' ছেড়ে গেলে ভাই, আমার সব সৌভাগ্য যে শূন্য হ'য়ে যাবে। তুমি যেতে পাবে না।"

অনীতার হাত সে চাপিয়া ধরিল। অনীতা নীরব রহিল।

মনোরমা বলিল, "আমাকে ঘরে তুলে দিয়ে তুমি যদি এ ঘর ছেড়ে যাও, তবে এ ঘর বাড়ী আমার উপর একটা দারুণ বোঝা হ'য়ে উঠবে! আমার অপরাধের সীমা থাকবে না। তোমার সব সুখ কেড়ে নিয়ে আমি সুখী হ'তে পারবো না অনীতা!"

অনীতার চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। সে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বড় মায়ায় বাঁধছিস বোন! কিন্তু উপায় নেই, আমায় যেতেই হ'বে।" বলিয়া সে মৃদুস্বরে গাহিল

"রাই বলে বাজিলে বাঁশী,
আমায় যেতে যে হ'বে গো!"

"কেন যেতে হ'বে? ঘরে বসে কি সাধনা হয় না? ভগবান তো ভাই, মন্দিরে বাস করেন না। তাঁর লীলা-ক্ষেত্র আমাদের অন্তরে। মনকে আপনার ভিতর ডুবিয়ে দিয়ে, তাঁর সান্নিধ্য যত সহজে, যত নিবিড় ভাবে অনুভব করা যায়, আর কিছুতেই তা' হয় না। তপ, জপ আরাধনা, শিব-পূজা সব ক'রে দেখেছি ভাই, কেবল ধ্যানে, কেবল আপনাকে আপনার ভিতর ডুবিয়ে দিয়েই তাঁকে কাছে পেয়েছি। তা' সে কি তুমি এখানে ব'সে পেতে পার না?"

অনীতা হাসিয়া বলিল, "সে হয় না ভাই। সে একরকম হয় বটে, কিন্তু যে ফকীর হ'য়ে আপনাকে বিলিয়ে দিয়েছে, সেই যে কেবল সেই গোপীবল্লভের নিবিড় প্রেমের বন্ধন জানতে পেরেছে। সেই জানতে পেরেছে, তার কাছে আর জগতে কিছুই প্রার্থনীয় নাই! যে অনুভব ক'রেছে, সেই কেবল জানে যে, সে প্রেমের সাগরকে 'প্রেম বিনা নাহি মিলে।' আর সে প্রেমের স্বাদ যে পেয়েছে, তার কাছে আর কিছুই ভাল লাগে না।"

মনোরমা তর্ক করিল না। ব্রাহ্মের মেয়ে হইয়া, দেশী ও বিলাতী শ্রেষ্ঠ শিক্ষা পাইয়াও অনীতার কেমন করিয়া এমন বুদ্ধিভ্রংশ হইল যে, অবশেষে যাহাকে সে অত্যন্ত অশুচিতা ও আবিলতা-পূর্ণ মনে করে, সেই বৈষ্ণব ধর্ম্মে এমন করিয়া আপনাকে ভাসাইয়া দিতে পারিল, তাহা ভাবিয়া তাহার দুঃখ হইল। সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "যাই হোক, আমি তোমাকে এখন কিছুতেই যেতে দেব না। আমাকে এমন করে' ভাসিয়ে দিয়ে তোমার যাওয়া হ'তেই পারে না। যদি যাও, তবে আমিও তোমার সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়ী ছেড়ে যাব।"

নিবিড় স্নেহের সহিত মনোরমার ক্লিষ্ট মুখখানা বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া অনীতা বলিল, "এমন ক'রে আমায় বাঁধিস না বোন। রাখতে আমায় পারবি না, কেবল বাঁধন ভাঙ্গার ব্যথাটাই বেড়ে যাবে।"

অমল খোকাকে কাঁধে করিয়া হাসিতে হাসিতে ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িল। মনোরমা দেখিল, তার ও খোকার দু'জনেরই মুখ আনন্দে উজ্জ্বল!

খোকাকে নামাইয়া দিয়া অমল বলিল, "নেও মনো, তোমাকে একটা নূতন present দিলাম—খোকার হাসিমুখ।"

স্মিত উৎফুল্ল মুখে খোকাকে চুম্বন করিয়া মনোরমা মনে মনে বলিল, "এর চেয়ে দামী তুমি আর কিছুই আমায় দিতে পারবে না।" সে অমলকে এমন একটা কৃতজ্ঞ, স্নিগ্ধ, প্রীত দৃষ্টি উপহার দিল যে, অমল একেবারে ধন্য হইয়া গেল।

খোকা মায়ের চিবুক ধরিয়া, নানা রকমে ঘাড় নাড়িয়া, হরিণের পিঠে চড়ার কথা, মোটর-কারের ভোঁ ভোঁর কথা, বাগানের বড় বড় ফুলের কথা, এমনি কত কথা, অনর্গল বলিয়া গেল। শেষে বলিল, "বাবা আমায় কত মজার গল্প বল্লে! হাঁ মা, ঈশ্বর খুব ভালো; না? বাবা বল্লে, তুমি না কি খালি তাঁর কাছে কাঁদতে, তাই তিনি তোমাকে রাণী করে' দিয়েছেন! আর আমাকে রাজপুত্তুর ক'রে দিয়েছেন।"

"বাবা!" অমল খোকাকে ইহারই মধ্যে এতটা আপন করিয়া লইয়াছে! এ কথা শুনিয়া যেন মনোরমার বুকের উপর হইতে একটা মস্ত বোঝা নামিয়া গেল। সে বালকের মুখে ঘন ঘন চুম্বন করিয়া বলিল, "হাঁ বাবা, ঠিক।" বলিয়া প্রেমপূর্ণ কৃতজ্ঞ দৃষ্টি অমলের দিকে ফিরাইয়া তুষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল, "ওঃ, অভিমান তো কম নয়! তুমি না কি রাজা!"

অনীতা ইতোমধ্যে অলক্ষ্যে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সে দেখিল যে, এই আনন্দ-মিলনের মধ্যে সে একটি সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন আবর্জ্জনা।

অমল নিজের শরীরখানা সটান করিয়া, মাথা উঁচু করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "নই কিসে? হাঁ খোকা, আমি রাজা নই?"

খোকা তার দিকে চাহিয়া বলিল, "ছ্যাৎ! তুমি রাজা কেন হবে? তুমি বাবা।"

"তা তো বটে! তোমার বাবা রাজা নয়?"

"না।"

মনোরমা হাসিয়া বলিল, "দেখলে?"

অমল বলিল, "রাজা নয় তো কি?"

মনোরমাও জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে খোকা? বল্ তো।"

সঙ্কুচিত ভাবে মুখখানা মনোরমার মুখের কাছে ধরিয়া, দুই হাতে মায়ের গাল চাপিয়া ধরিয়া, মৃদুস্বরে খোকা বলিল, "রাজা না, সাহে-এ-ব।"

অমল ও মনোরমা হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল।

(৪৬)

ইন্দ্রনাথের পিতা আর মনোরমার সম্বন্ধে কোনও খোঁজই করিলেন না। তিনি চিরদিনই স্বল্পভাষী, এখন প্রায় সম্পূর্ণ নীরব হইলেন। মনোরমার বিবাহের দিন দুই পরে বলিলেন, "ওগো, এখানে আসবার দরকার তো মিটে গেল, এখন বাড়ী চল।"

তাঁর ক্লিষ্ট, মলিন মুখ দেখিয়া, গৃহিণীর অন্তর কাঁদিয়া উঠিল। তাঁহার হৃদয়ে আর কোনও ক্লেশ ছিল না; অমলের পাশে মনোরমাকে দেখিয়া তিনি তৃপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁর ইচ্ছা হইল, মনোরমার এ সৌভাগ্য-কাহিনী স্বামীর কাছে জানাইয়া, তাঁর দুঃখে শান্তি দেন। কিন্তু তাঁহার সাহস হইল না। কি জানি, যদি হিতে বিপরীত হয়! পরের দিন তাঁহারা দেশে রওনা হইয়া গেলেন।

সেদিন রাত্রিটা সরযূ ছটফট করিয়া কাটাইল। কাল সকালে মনোরমার কাছে গিয়া সে সব শুনিবে! এই প্রতীক্ষায় সে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। মনোরমার আজ এই সৌভাগ্য! সেই দুঃখিনী মনোরমা,—তার কৈশোরের সখী, যৌবনের সঙ্গিনী, তার স্বামীর দুঃখিনী ভগিনীর এত সুখ! ভাবিয়া তার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

সে ইন্দ্রনাথকে বলিল, "হাঁ গো, অমল তাকে নিয়ে কি ক'রছে? খুব আদর ক'রছে, না?"

ইন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিল, "তা কি আর ব'লতে, তার সমস্ত জীবন যেন ধন্য হ'য়ে গেছে।"

সরযূ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, ফট্ করিয়া বলিয়া বসিল, "আমিও আগে ভাবতাম যে, আমাকে পেয়ে যেন তোমার জীবন ধন্য হ'য়ে গেছে!"

ইন্দ্রনাথের মনে কথাটায় বড় আঘাত লাগিল। সরযূ যে জানে ও বিশ্বাস করে যে, ইন্দ্রনাথ তাহাকে আর আগের মত ভালবাসে না, তাহা সে অনেক দিনই বুঝিয়াছে। কিন্তু আর কোনও দিন এত স্পষ্ট করিয়া এ কথা সে প্রকাশ করে নাই। ইন্দ্রনাথের মনে পড়িল অনীতার কথা, তার কাতর অনুরোধ! সে অনুরোধ ইন্দ্রনাথ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। সরযূকে ভালবাসিতে পারিয়াছে কি না, ঠিক বুঝিতে পারি নাই। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ইন্দ্রনাথ বলিল, "আর এখন? এখন তা' তুমি মনে কর না?"

"পোড়া কপাল! আমি কি এখনও জানিনে, আমি কি ছাই একটা! আমি কি, যে, তোমার মত লোককে আমি ধন্য করে দেবো?"

ইন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সরযূকে বুকের কাছে টানিয়া বলিল, "এমন অধর্ম্ম যেন আমি না করি সরযূ, এই প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে করো! তোমাকে পেয়ে যদি আমি ধন্য না হ'তে পারি, তবে আমি মানুষ বলে' ভগবানের কাছে মুখ দেখাতে পারবো না।"

স্বামীর নিবিড় আলিঙ্গনের ভিতর আপনাকে ডুবাইয়া দিয়ে সরযূর সমস্ত সত্তা কৃতার্থতায় ভরিয়া গেল। সে নীরব সন্তোষের আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

অনেকক্ষণ পরে সে জিজ্ঞাসা করিল, "অনীতা এ বিয়েয় আসে নি?"

ঠিক এই কথার পরই অনীতার কথা শুনিয়া ইন্দ্রনাথ একটু ক্ষুব্ধ হইল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হইল যে, সরযূকে সে অমলদের বাড়ীর সকল খবরই দিয়াছে, কিন্তু এ পর্যান্ত অনীতার কথা একটি বর্ণও বলে নাই। যখনি এমন কোনও কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, যাহাতে অনীতার নাম আসিয়া পড়ে, তখনি সঙ্কুচিত হইয়া থামিয়া গিয়াছে। সরযূর কাছে অনীতার নাম করিতে তার এ সঙ্কোচ করা যে ভাল হইতেছে না, তাহা বুঝিতে পারিয়াও ইহা সে ত্যাগ করিতে পারে নাই।

একটু সঙ্কুচিত ভাবেই ইন্দ্রনাথ বলিল, "সে এসেছে; কিন্তু সে থাকবে না।"

"কেন?" সরযূ বিস্মিত হইল।

"সে যেন কেমনধারা হ'য়ে গেছে! সে ভয়ানক বৈষ্ণব হ'য়ে গেছে।" বলিয়া অনীতার বর্ত্তমান অবস্থা ইন্দ্রনাথ বর্ণনা করিয়া গেল। বলিতে বলিতে সে হৃদয়ের বেদনা গোপন করিতে পারিল না। তার চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল।

সরযূও আঁচলে চক্ষু মুছিল। সে ভাবিতে লাগিল। যে দিন ইন্দ্রনাথ অমলদের বাড়ী হইতে অপমানিত হইয়া চলিয়া আসে, সে দিন যে সেখানে ঠিক কি হইয়াছিল, তাহা সরযূ এখনো শুনিতে পায় নাই। কিন্তু শোনা কথার ভিত্তির উপর সে কল্পনার জোরে অনেকটা গড়িয়া তুলিয়াছিল। অমল ইন্দ্রনাথকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল।

ঠিক তার পরই অনীতা রাগ করিয়া সে বাড়ী ছাড়িয়া গিয়া, সুকুমার বাবুর বাড়ীতে ছিল। তার পর সে গৈরিক-ধারিণী সন্ন্যাসিনী। বিবাহে সে আসিয়াছে, কিন্তু থাকিতে নারাজ। এই কয়টা কথা একত্র জুড়িয়া দিয়া সে যে সিদ্ধান্ত করিল, তাহাতে তার মনটা ভার হইয়া গেল। সে মনে মনে ভগবানের কাছে অভিযোগ করিয়া বলিল, "আর কতদিন প্রভু আমায় স্বামীর গলার পাথর ক'রে বাঁচিয়ে রাখবে? স্বামীর ভালবাসা হারিয়ে মেয়ে মানুষকে বেঁচে থাকতে হ'বে, চিরদিন তার নিরাশ ব্যথাভরা মুখ দেখতে হ'বে, এ তোমার কি বিচার নারায়ণ? বাঁচিয়েই যদি রাখলে, তবে আমাকে সম্পূর্ণ রূপে স্বামীর যোগ্য ক'রে তাঁর হৃদয় ভরিয়ে দিলে না কেন? দয়া করে হরি আমায় নেও।"

পরের দিন সরযূ অমলদের বাড়ী গেল। তখনও উৎসবের জের চলিতেছে। অমলের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের অন্ত নাই। তাহাদিগকে দলে দলে নিমন্ত্রণ করিয়া সে মনোরমার সঙ্গে আলাপ করিয়া দিতেছিল এবং দলে দলে পান ভোজনের উৎসব চলিতেছিল।

সরযূ আসিয়াই মনোরমাকে লইয়া ঘরে ঢুকিয়াছিল। তার কাছে খুঁটিয়া খুঁটিয়া কত কথাই যে তার জিজ্ঞাসা করিবার ছিল। কিন্তু ছাই সময় কি সে পায়? দু দণ্ড মনোরমাকে লইয়া নিরিবিলি বসিবার উপায় নাই। দুই মিনিট অন্তর অমল আসিয়া ঘরে উ কি মারিতেছে, আর পাঁচ মিনিট অন্তর মনোরমাকে বগল-দাবা করিয়া লইয়া পাড়ি দিতেছে—কি না, তার কোন এক বন্ধু বা আত্মীয় বা আত্মীয়া আসিয়াছেন। আশ মিটাইয়া ঠাকুরঝির সঙ্গে আলাপটা সে করিয়া উঠিতে পারিল না।

অনীতার কিন্তু অবসরের বিশেষ অভাব ছিল না। সরযূ অনীতার ভিতর বড় বিশেষ কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে পারিল না। সে ঠিক আগেরই মত শান্ত, স্নিগ্ধ, হাস্যময়ী, তেমনি মিষ্টভাষিণী। সে উৎসবের ভিতর প্রাণ ভরিয়া যোগ দিয়াছে; আলাপ-সালাপ, গান-বাজনা করিয়া সে বন্ধু ও অভ্যাগতদের ঠিক আগের মতই আপ্যায়িত করিতেছে। কেবল তার মুখের ভাবটা ফিরিয়া গিয়াছে—সাজ-গোজের ঘটাটা অনেক কমিয়াছে; কিন্তু রূপ যেন আরও উছলিয়া উঠিতেছে। অনীতা আগে ছিল যেন একটা পাথরে খোদাই করা মূর্ত্তি,—এখন সে যেন একটা জীবন্ত নারী। তার চোখের ভিতর একটা কি যেন নূতন কিছু ফুটিয়া উঠিয়াছে। যে নারী ভালবাসিয়া জীবন সার্থক করিয়াছে, তাহার চোখের প্রাণপূর্ণ চাহনী আজ অনীতার শরীরকে সজীব ও একটা অপূর্ব্ব সুষমায় মণ্ডিত করিয়াছে।

অনীতাকে লইয়া সরযূ অনেকটা সময় কাটাইল। তার প্রাণের ভিতর থাকিয়া থাকিয়া একটা কি যেন বিষের মত জ্বলিয়া উঠিতেছিল; কিন্তু তবু সে অনীতার সাহচর্য্যে মোটের উপর বেশ আনন্দই অনুভব করিতেছিল। অনীতার কাছে কয়েকটা কথা জানিবার জন্য সরযূর মনে ভয়ানক আগ্রহ ছিল, কিন্তু সে কথা মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা-করা তো যায় না। ইন্দ্রনাথ ও অনীতার সম্বন্ধটা কি রকম, কি লইয়া ইন্দ্রনাথকে অমল বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল, অনীতাই বা কেন ঘর ছাড়িয়া গিয়াছিল, সে সম্বন্ধে তার অনেকগুলি মনগড়া কল্পনা ছিল। তার মধ্যে কতটা সত্য? স্পষ্টাস্পষ্টি কথাগুলি জিজ্ঞাসা করা অসম্ভব হইলেও, সরযূ সেই সব কথার আশপাশ দিয়া ঘোরাফেরা করিয়া, নানা কথা আলাপ করিয়া ক্রমে আসল কথাটার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতেছিল। আর তার দুই চক্ষু সজাগ করিয়া অনীতার কথাবার্ত্তা, হাবভাব, কাজকর্ম্ম লক্ষ্য করিতেছিল। লক্ষ্য করিয়া সে শীঘ্রই আবিষ্কার করিয়া ফেলিল যে, অনীতা ইন্দ্রনাথকে ভালবাসে। ইন্দ্রনাথ যে অনীতাকে ভালবাসে তা' তো সে অনেক দিনই জানে। কিন্তু, সুধু কি তাই? তা'দের ভিতর ব্যাপারটা কতদূর ঠিক গড়াইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য সরযূ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু সে চক্ষু কর্ণ সর্ব্বদা সজাগ রাখিয়াও কিছুতেই কিছু নির্ণয় করিতে পারিল না। কেবল সে দেখিল যে, ইন্দ্রনাথ ও অনীতা পরস্পরকে বেশ একটু এড়াইয়া চলে। নিতান্তই যেখানে সামনাসামনি আসিতে হয়, সেখানে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত সম্ভাষণ করিয়া তাহারা পাশ কাটাইয়া যায়। অথচ, সরযূ নিজ চক্ষে দেখিয়াছে যে, অন্তরাল হইতে অনীতা ইন্দ্রনাথের দিকে পিপাসিত চক্ষে চাহিয়া আছে। ইন্দ্রনাথকে তেমন করিতে সে কখনও দেখে নাই; কিন্তু ইন্দ্রনাথ যে ঠিক সহজ অবস্থায় নাই, সে ভয়ানক উন্মনা, ব্যাকুল, অথচ মনের ভাব লুকাইতে ব্যস্ত, তাহা সে লক্ষ্য করিয়াছে।

সরযূ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "বেশ!"

তিন দিন ধরিয়া সরযূ ইন্দ্রনাথ ও অনীতাকে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া, এই সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত আপনার কাছে প্রকাশ করিল।

শেষ দিন সরযূ মনোরমাকে লইয়া দুয়ারে খিল দিয়া বসিল। আজ আর কোনও নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ নাই। তা ছাড়া, আজ অমলকে বাধ্য হইয়া একবার হাইকোর্টে যাইতে হইল। কাজেই, দুপুরবেলা সরযূ মনোরমাকে সমস্তক্ষণ একলা পাইল।

জিজ্ঞাসার ঝুড়ি একেবারে উজাড় করিয়া দিয়া শেষে সে মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ ভাই, সে কথা কিছু শুনেছিস? সে দিন অমল কেন তোর দাদাকে বের ক'রে দিয়েছিল?"

মনোরমা অমলের কাছে সব শুনিয়াছিল। ঠিক অনীতা লিওনেলকে যাহা বলিয়াছিল, অমল মনোরমাকে তাহাই বলিয়াছিল। মনোরমা সে কথা সরযূর কাছে বলিল।

সরযূ একটা গভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িল। ইন্দ্রনাথের উপর তার ভক্তি-শ্রদ্ধা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—সে যে এমন মহান্ চরিত্রের উপর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করিয়াছিল, তাহাতে তাহার মন ধিক্কারে ভরিয়া গেল। অনীতার জন্যও তার মনে দুঃখ হইল। সে গভীর ভাবে ভাবিতে লাগিল, এ সম্বন্ধে আর কোনও কথা কহিল না।

(৪৭)

সেই দিন দ্বিপ্রহরে অনীতা আপনার ঘরে চেয়ারে বসিয়া, দুই হাতে মাথাটা ধরিয়া, একাগ্র মনে আরসীর দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল। তার দুই চোখের কোণ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল।

আজ তিন চার দিন হইল সে যাইবার কথা বার বার পাড়িয়াছে, দাদা সে কথাকে আমলই দেন নাই। মনোরমা বার বার অনুরোধ করিয়াছে—এমন কি কাঁদিয়া ভাসাইয়াছে। কিন্তু যাইতে তো হইবেই। কেন হইবে, সে কথা সে ঠিক স্পষ্ট করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া উঠিতে পারিল না। যেতে হবে—এটা যেন তার উপর একটা হুকুমের মত কে জারী করিয়া গিয়াছে। যুক্তি-তর্কে সে দাদা ও বউদিদির কাছে বার বার হটিয়া গিয়াছে; কিন্তু যাওয়া যে অনিবার্য্য, সে কথা সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হয় নাই।

কিন্তু এখন ফিরিতে যে প্রাণ ছিঁড়িয়া যাইতে চায়, বেদনায় বুক ভরিয়া উঠে. অশ্রুসাগর উচ্ছ্বসিত হয়! হায়, কেন সে আসিল? লক্ষ্মীনারায়ণ কেন অভাগীকে এ পরীক্ষায় ফেলিলেন? পায়ের কোণে ঠাঁই দিয়া আবার কেন ঝাড়িয়া ফেলিলেন?

পরীক্ষা বড় ভীষণ! আজন্মের স্নেহনীড়—দাদার অপরিসীম স্নেহ, মনোরমার একাগ্র অনুরাগ, সবই বড় কঠিন বন্ধন। কিন্তু সব চেয়ে বেশী করিয়া বাঁধিতেছিল তাহাকে তাহার নিষিদ্ধ সাধনা—ইন্দ্রনাথ! এই কয় দিন ইন্দ্রনাথ যে কাছে কাছে আছে, এই জ্ঞান তাহার সমস্ত শরীর-মনকে একটা অপূর্ব্ব পুলকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। ইন্দ্রনাথ আগের মত তার কাছে আসে নাই; তাহার সঙ্গে সম্ভাষণ করে নাই; কিন্তু তবু তাহাকে দেখিয়া, তাহার সান্নিধ্য অনুভব করিয়াই সে আনন্দে ভরপূর হইয়া আছে। এ কথা তার বার বারই মনে হইতেছিল যে, এখানে থাকিলে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে তার বার বারই দেখা হইবে,—ভাবিতে প্রাণ নাচিয়া উঠিতেছিল।

পর মুহূর্ত্তে প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল—হায়, লক্ষ্মীনারায়ণকে সে পাইয়া হারাইবে?—তাঁর পদছায়ায় আশ্রয় পাইয়াও কি তা'র দুর্ব্বল চিত্ত এ ছার সংসারের ছোট ছোট ভাল-মন্দ ছাড়িতে পারিবে না? এত দুর্ব্বল, এত হীন, এত অবিশ্বাসী তার হৃদয়! তখন সে করযোড়ে লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া প্রার্থনা করিল, "হে দেব, হে প্রভু, হে স্বামিন্, দয়া কর, এ পরীক্ষায় আমাকে উত্তীর্ণ কর, আমার হৃদয় শান্ত কর! আমি তোমারই, প্রভু, আর কারও নই,—আমার মনের হাত থেকে আমায় রক্ষা কর!"

প্রার্থনা শেষ না হইতেই ইন্দ্রনাথের কমনীয় কঠোর মূর্ত্তি তাহার মনের সম্মুখে জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে প্রলুব্ধ করিল। একবার তাহার মনে হইল "কেন যাব? দাদা, বউদিদি যা ব'লছে, তা' ঠিক নয় কি। আমি আমার বাড়ীতেই তো লক্ষ্মীনারায়ণকে প্রতিষ্ঠা করে' ষোড়শোপচারে তাঁর নিত্য পূজা ক'রতে পারি—তার জন্য যাবার

দরকার কি ?” কিন্তু দরকার আছে—সে কথা তার সমস্ত অন্তরে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। কে যেন তাহাকে বলিয়া দিল যে, সে একটা মহা সন্ধিস্থলে আসিয়া পড়িয়াছে। এখন যদি সে এখানে থাকিয়া যায়, তবে তা'র পরাজয়, তার আত্মার বিনাশ হইবে। যদি জয়ী হইতে হয়, আত্মাকে যদি প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তবে তাহার যাইতেই হইবে !

অন্তরের সহিত দ্বন্দ্বে যখন তার হৃদয় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইতেছে, যখন সে ঘরের বন্ধনের টানে প্রায় সম্পূর্ণ রূপে ঘরের দিকে ফিরিয়া বসিয়াছে, তখন আয়া আসিয়া খবর দিল, গোসাঞি ঠাকুর আসিয়াছেন।

গোস্বামীর কাছে যাইতে অনীতার আজ বড় লজ্জা করিতে লাগিল। অপরাধিনী পত্নী যেমন স্বামীর কাছে যাইতে লজ্জায় ভয়ে পীড়িত হয়, তেমনি পীড়িত হইল অনীতা। সে তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া, বহু কষ্টে সঙ্কোচ জয় করিয়া, গোসাঞিজির সঙ্গে দেখা করিতে গেল।

গোসাঞিজি ততক্ষণে গাড়ী হইতে কতকগুলি বাক্স পেটারা নামাইয়া, হলটা ভরিয়া তাহার মধ্যে দাঁড়াইয়া ছিলেন। অনীতা গলায় আঁচল দিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল, “এ সব কি বাবাজি ?”

“তোমার জিনিস-পত্তর মা। তোমার পিসীমা আমাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।”

“কেন ? আমি যে কালই যাব আবার।”

“তুমি সেখানে আর যাও, সেটা তাঁদের বড় ইচ্ছা নয়। ভট্‌চাজ তো স্পষ্ট করেই ব'লেছে, তোমাকে আর সে সে বাড়ীতে উঠতে দিচ্ছে না।”

অনীতা স্তম্ভিত হইল। সে গোস্বামীকে লইয়া ড্রইং রুমে বসাইয়া বলিল “আমি কিছু বুঝতে পারছি না ঠাকুর ! তাঁদের রাগের কারণ কি ? আমি তো জেনে শুনে কোনও অপরাধ করি নি।”

গো। অপরাধ করেছ বই কি মা, তুমি বেনাবনে মুক্তা ছড়িয়েছ, যে অযোগ্য তাকে দয়া ক'রেছ ; তা'র এ শাস্তি চিরদিনই হ'য়ে আসছে। মহাপ্রভু তাঁর দয়ার জন্যে মার খেয়েছিলেন, আর তুমি এই অপমানটা হ'বে না ?

অনীতা। তবে এখন উপায় ?

গো। কিসের উপায় মা ? তুমি কি অক্ষম, না দীন, যে, তা'দের মুখ চেয়ে বাস ক'রতে যাবে ?

অ। কিন্তু ঠাকুর, আমি এখন কোথায় যাব ?

গো। কেন, এখানেই থাক না।

অনীতার কান্না পাইল। সে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না ; বলিল, “আপনিও এই কথা ব'লছেন ? লক্ষ্মীনারায়ণ কি আমাকে একেবারেই ত্যাগ ক'রেছেন !”

গোস্বামী একটু ভ্যাবাচাকা খাইয়া বলিলেন, “মা, আমি তোমার কথাটা হয় তো বুঝতে না পেরে তোমার মনে ব্যথা দিয়েছি। তুমি এখানে থাকতে চাও না ?”

“না।”

“বেশ তবে অন্য বাড়ী কর। তোমার দাসী সঙ্গিনীর অভাব হবে না।”

“আর লক্ষ্মী-নারায়ণ ?”

“প্রতিষ্ঠা কর, আপনার ঘরে দেবতা প্রতিষ্ঠা করে' নিজের মনের মত করে তাঁর সেবা পূজা কর।”

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অনীতা বলিল, “আচ্ছা ঠাকুর, বৃন্দাবনে একটা আশ্রয় পাওয়া যায় না ?”

গোসাঞি অবাক্ হইয়া বলিলেন, “বৃন্দাবনে ? সে কি মা ?”

“কেন ঠাকুর, আমি কি বৃন্দাবনে ঠাঁই পাব না ?” অনেকক্ষণ একাগ্রচিত্তে অনীতার লজ্জাবনত মুখের দিকে চাহিয়া গোস্বামী বলিয়া উঠিলেন, “তুমি পাবে না তো কে পাবে মা !”

অনেকক্ষণ পরামর্শের পর স্থির হইল যে, দুই দিন পরে গোস্বামীজী আসিয়া অনীতাকে বৃন্দাবনে লইয়া যাইবেন।

সন্ধ্যা-বেলায় অমল ও মনোরমা ড্রইংরুমে বসিয়া ছিল। অনীতা আসিতেই অমল বলিল,—

“অনি, অনেক দিন তোর ইংরাজী গান শুনি নি, একটা গা না ?”

অনীতা স্নিগ্ধ হাস্য করিয়া বলিল, “কি গাইব বল।”

“তোর যা খুসী।”

অনীতা পিয়ানোর কাছে বসিয়া Handel এর Oratoris একটা গাহিল—সে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার ভিতর তার সুমধুর কণ্ঠ ঘুরিয়া ফিরিয়া একটা অপূর্ব্ব অমৃতপ্রাণ রচনা করিল। অমল ও মনোরমা মুগ্ধ হইয়া শুনিল।

তার 'পর মনোরমা' ফরমায়েস করিল একটা বাঙ্গলা গান। অনীতা গাহিল,—

"আমার যেতে যে হ'বে গো
রাই ব'লে বেজেছে বাঁশী, যেতে' যে হ'বে গো।"

গানের ভিতর তীব্র আবেগের উপর একটা স্নিগ্ধ বিষাদের মৃদু প্রলেপ দিয়া অনীতা গাহিল। অমল ও মনোরমার মনটা কি জানি কেন অন্ধকার হইয়া গেল।

গান শেষ হইলে সকলেই কিছুক্ষণ নীরবে রহিল। তার পর অনীতা বলিল, "দাদা, পরশু আমাকে ছুটি দিতে হ'বে।"

অমল বলিল, "সে কি! এই না বলছিলে মনো, অনি তার সব জিনিস-পত্তর আনিয়েছে, আর সে যাবে না?"

অনীতা হাসিয়া বলিল, "বৌদিদি মিথ্যা বলে নি দাদা, আমার জিনিস-পত্তর এসেছে, আমার পরশুই রওনা হ'তে হ'বে।"

মনোরমা বলিল, "অনি ভাই, কেন ওই কথা বার বার ব'লে আমাদের কাঁদাস বল! তুই গেলে আমরা এখানে কেমন করে' থাকবো বল!" তার চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল।

অনীতাও চক্ষু মুছিয়া বলিল, "উপায় নেই ভাই—আমার যেতেই যে হ'বে—আর কাঁদাস নে ভাই, হাসি মুখে যেতে দে।"

অমলের গলাটা বড় ধরিয়া আসিল। সে কষ্টে গলা পরিষ্কার করিয়া বলিল, "আচ্ছা পরশু, সে তো অনেক দিনের কথা—আজ, কাল, তবে না পরশু।—পরশুর কথা ভেবে আজ মন খারাপ করাটা শাস্ত্রসঙ্গত নয়।"

অনীতা একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "শাস্ত্র অশাস্ত্র জানি না দাদা, পরশু আমি যাচ্ছি, বলে রাখলুম।" বলিয়া কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া সে পিছনের বারান্দা দিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

অনীতার বুকের ভিতরটা কাটা পাঁঠার মত ধড়ফড় করিয়া উঠিল। দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া পায়চারি করিতে করিতে সে আসিয়া পড়িল ঠিক সেই খানটায়, যেখানে সে ইন্দ্রনাথকে তা'র প্রেম নিবেদন করিয়াছিল।

তার মনের ভিতর অগ্নিরেখায় চিত্রিত হইয়া উঠিল সেইদিনকার সেই দৃশ্য। সেই প্রেম পূর্ণ শক্তিতে তার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল।

যে চেয়ারখানার পিঠ ধরিয়া ইন্দ্রনাথ নির্ম্মম দেবতার মর্ম্মর মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া ছিল, সেখানা এখনো সেইখানে ছিল। সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক ভাবে সেই চেয়ারের পিঠটা চাপিয়া ধরিয়া, অনীতা তার সেই বেদনাময় স্মৃতি উপভোগ করিতে লাগিল বুকের ভিতর বিষের ছুরির মত বিঁধিতে লাগিল সেদিনকার প্রত্যেকটী কথা ও প্রত্যেকটী ঘটনা; তবু তাহা স্মরণ করিতে কি আনন্দ! ইন্দ্রনাথের স্মৃতি-মাত্রেই যে আনন্দ! তা ছাড়া, সেদিন এক উন্মত্ত আবেগে সে যে ইন্দ্রনাথকে বলিয়াছে যে, সে তাহাকে ভালবাসে। তাতে কি লজ্জা, কি অপমান—কিন্তু কি আনন্দ! অনীতা তন্ময় হইয়া সেই ব্যক্ত প্রেমের উন্মত্ত আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল।

ইন্দ্রনাথ তখন বাগানে পায়চারী করিতেছিল। এবার এখানে আসিয়া সে সুখ পায় নাই। অনীতার মূর্ত্তি দেখিয়া তার মন দারুণ বেদনায় পীড়িত হইতেছিল। তার হৃদয়ের অনুপভোগ্য, নিপীড়িত, নিষ্পেষিত প্রেম তাহাকে বেদনা দিতেছিল। কিন্তু তার বেশী পীড়িত করিতেছিল তাহাকে অনীতার ব্যর্থ জীবন। তার জন্য ইন্দ্রনাথ নিজেই যে সম্পূর্ণ রূপে দায়ী, তাহা তো তাহার অজানা ছিল না। কি অশুভ মুহূর্ত্তে অনীতা ইন্দ্রনাথকে দেখিয়াছিল! যাহার জন্য ইন্দ্রনাথ অনায়াসে জীবন ত্যাগ করিতে পারে, তাহার জীবন সে নিজে মরুময় করিয়া দিল—কি অভাগ্য তাহার!

অনেকক্ষণ একা বাগানে পায়চারী করিয়া এই সব জ্বালাময়ী চিন্তায় আপনাকে পীড়িত করিয়া, শেষে ইন্দ্রনাথ অস্থির হইয়া আপনার চিন্তার হাত হইতে পলাইবার আশায় বাড়ীর দিকে গেল।

বারান্দায় উঠিয়াই সে দেখিতে পাইল অনীতা—অশ্রু-মুখী অনীতা—সেইখানে দাঁড়াইয়া, সেই চেয়ার ধরিয়া সেই কথাই চিন্তা করিতেছে। তার বুকের ভিতর বিষের ছুরী বসিয়া গেল।

অনীতা তাহাকে দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল। ইন্দ্রনাথ এবার অনীতার সঙ্গে কথাবার্ত্তা যথাসম্ভব কম বলিয়াছে—নিভৃতে কখনও তার সঙ্গে কথা বলিতে সাহস করে নাই। কিন্তু এখন কোনও কথা না বলিয়া পলায়ন করাটা কেবল অভদ্রোচিত হইবে না,—এই অবস্থায় অনীতাকে ফেলিয়া যাওয়াটা তাহার পক্ষে নিষ্ঠুরতা হইবে, তাহা সে বুঝিতে

পারিল। তাই দু'টো হাল্কা কথা বলিয়া তার প্রাণটাকে উস্কাইয়া তুলিবার ইচ্ছায় সে চেষ্টা করিয়া বলিল, "কি, দাদার কাছে বুঝি আর এখন ঠাঁই পাও না অনীতা—একেবারে stranded হ'য়ে পড়েছ। এ কিন্তু মনোরমার ভারি অন্যায়।"

অনীতা একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, "না, না, তা নয়, তা'দের কাছেই ছিলাম আমি—আমিই তাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি।"

"কেন, বিয়ে করে কি তারা খুব ভয়াবহ হ'য়ে উঠে'ছ না কি ?"

"হাঁ, কতকটা—অন্ততঃ যারা বিয়ে করেনি, তা'দের পক্ষে।"

"হাঁ ?—এ তো বড় অন্যায়! তা' এর একটা প্রতিকার করে ফেল শিগ্‌গীর! তুমি বিয়ে করে ফেল।"

অনীতা তার বড় বড় ক্লিষ্ট চক্ষু দুটি একবার ইন্দ্রনাথের মুখের উপর রাখিল—তার পর মাটির দিকে চাহিল, আর কিছু বলিল না।

ইন্দ্রনাথের নিজেকে চাবুক মারিতে ইচ্ছা করিল। তাড়াতাড়ি কথাটা ঘুরাইবার চেষ্টায় সে অন্য কোনও একটা বলিবার মত কথা খুঁজিতে লাগিল। খুঁজিয়া পাইল না। যতই সময় যাইতে লাগিল, ততই এই অশোভন নীরবতা তাহাকে পীড়ন করিতে লাগিল। শেষে সে এই অবস্থাটা ভাঙ্গিবার জন্য ধপ করিয়া বলিয়া ফেলিল, "হাঁ অনীতা, তুমি তা হলে এখন এখানেই থাকছ ?"

অনীতা শান্ত ভাবে বলিল, "না, পরশু যাচ্ছি।"

"অ্যাঁ, যাচ্ছ ? মনোরমা বলছিল—যা'ক, এটা কি তোমার উচিত হ'চ্ছে অনীতা? তোমার দাদার মনে এত বড় বেদনা দেওয়াটা কি তোমার উচিত ? তা ছাড়া, মনোরমা, সরযূ, আমি, আমরা সবাই এতে যে কত বড় ব্যথা পাব, তা' কি তুমি বুঝছো না ?"

অনীতা বলিল, "ব্যথা আমিই কি কম পাব ? কিন্তু আমার তো না গিয়ে উপায় নেই।

ইন্দ্রনাথ আরও জোর করিয়া বলিল, "যাতে তুমি ব্যথা পাবে তোমাকে যারা ভালবাসে তারা ব্যথা পাবে, তাই না হ'লেই কি দেবতা তৃপ্ত হ'বেন না অনীতা ? তুমি একদিন ব'লেছিলে আমি তোমার গুরু। গুরু হ'বার স্পর্দ্ধা আমি রাখি না। তবে আমি বয়সে বড়, তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী; আমি বলছি, তুমি ভুল ক'রছো অনীতা। তুমি ঘর ছেড়ে গেলে শান্তি পাবে না। তুমি যেয়ো না।"

অনীতা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "তুমি সত্যিই আমার গুরু। তুমি আমায় অমন করে' বলো না, তুমি বাধা দিলে, আমি যেতে পারবো না। আমায় ক্ষমা করো, আমায় যেতে হ'বেই।"

একটী ক্ষীণ ক্ষুদ্র নারী মূর্ত্তি একটু ছায়ার অন্তরালে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা কেহ লক্ষ্য করে নাই। এই কথা শুনিয়া সে অগ্রসর হইয়া অনীতার হাত ধরিয়া বলিল, "কেন যেতে হ'বে ভাই ?"

ইন্দ্রনাথ ও অনীতা দুজনেই চমকিত হইয়া দেখিল, সরযূ।

সরযূ অনীতার হাতখানা দুই হাতের ভিতর ধরিয়া বলিল. "কিসের জন্য তুমি যাচ্ছ, কি ব্যথা তোমার প্রাণের ভিতর আছে, সে কথা আমার কাছে তুমি লুকোবে কি ক'রে দিদি ? আমরা যে এক ঘাটের মড়া! কার জন্য তুমি সংসার ছেড়ে যাচ্ছ ? সেও যে দিন-রাত তোমার জন্যে সংসার অন্ধকার দেখছে, দিন দিন তিল তিল করে' আমার চক্ষের সামনে ক্ষয়ে যাচ্ছে। আমি কি এত বড় পাপিষ্ঠা যে, তোমাদের দুজনকে এমনি করে তুষের আগুনে পুড়ে মরতে দেব ? তবে আমার বেঁচে থাকায় ধিক্। এসো বোন" বলিয়া অনীতাকে টানিয়া ইন্দ্রনাথের কাছে লইয়া গেল। ইন্দ্রনাথের হাত ধরিয়া অনীতার হাতে দিয়া সরযূ বলিল, "এই নেও বোন, আমার সর্ব্বস্ব আমি নিঃশেষে তোমার হাতে তুলে দিলাম। ভগ্নী বলে স্নেহ কর তো দু বোনে মিলে এঁর সেবা করে কৃতার্থ হ'ব—না হয় আমার বরাতে যা আছে হবে।"

এক মুহূর্ত্ত সকলে স্তব্ধ হইয়া রহিল। ইন্দ্রনাথ ও অনীতার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। ইন্দ্রই প্রথম কথা বলিতে পারিল—সে বলিল, "এ কি করছো সরযূ!"

সরযূ বলিল, "চুপ কর, তোমার আর কিছু বলবার নেই এতে। তুমি বীর, তুমি দেবতা,—বীরের মত, দেবতার মত তুমি এতদিন কর্ত্তব্য পালন ক'রে এসেছ। আজ আমি আমার কর্ত্তব্য পালন ক'রবো, তাতে তুমি বাধা দিও না।

ছোট সোণা মসজিদের সম্মুখের নাম-বিহীন কবর—গৌড়

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

অনীতা, ভাই, তুমি মনে কোনও দ্বিধা করো না। আমার মনে কোনও গ্লানি নেই। আমি তোমাদের দুজনের কথা সব জেনেছি, সব শুনেছি। তোমরা যা' ক'রেছ, তা' তোমাদের যোগ্যই হ'য়েছে। এখন তোমরা আমাকে তোমাদের যোগ্য হবার একটা অবসর দাও ভাই। তুমি এখন ব্রাহ্ম নও, বৈষ্ণব। এখন তো আমার স্বামীর তোমাকে বিয়ে ক'রতে বাধা নেই।"

অনীতা এতক্ষণে কথা কহিল। সে ইন্দ্রনাথের হাত ছাড়িল না। ইন্দ্রনাথ ও সরযূ দুজনের হাত একত্র করিয়া সরযূর হাতের উপর ইন্দ্রনাথের হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "দিদি, তোমার স্নেহের দান আমি অস্বীকার ক'রতে পারি না।" বলিয়া সে ইন্দ্রনাথের হাতের উপর দুইটি চুম্বন দিল। তার পর বলিল, "তোমার দয়ায় আমি আজ অমূল্য সম্পদ পেলাম। এখন আমার সর্ব্বস্ব তোমাকে দিচ্ছি বোন, তুমি গ্রহণ কর।" বলিয়া সরযূর হাতে ইন্দ্রনাথের হাত দিয়া সে হাটু গাড়িয়া বসিয়া তাহাদিগকে প্রণাম করিল। তারপর উঠিয়া বলিল, "এত দিন দেবতাকে একা দেখেছিলাম, আজ তোমাদের যুগল-মূর্ত্তি দেখে ধন্য হ'লাম। নারয়ণ নারায়ণ!"

অনীতা চলিয়া গেল। ইন্দ্রনাথ সরযূকে বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিল। দুজনের চক্ষের জলের ধারা অন্তরের সব গ্লানি, সব অন্ধকার ধুইয়া দিল।

অনীতা বৃন্দাবনে গেল। অমল ও মনোরমা তাহার সঙ্গে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত গিয়া তাহার যথাসম্ভব সুখ-সুবিধার আয়োজন করিয়া দিল।

অমলের আর দেশে ফিরিতে ইচ্ছা হইল না। সে মনোরমা ও টুকুকে লইয়া পৃথিবী পর্য্যটনে বাহির হইয়া গেল। এখন তাহারা আমেরিকায়।

সমাপ্ত

বিফলের সফলতা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

(১)

বিফল তোমারও সফলতা আছে
ম্লান মুখে কেন দাঁড়ায়ে,
তোমার গাছের মধুফল ফলে
তোমার লাগাল ছাড়ায়ে।
যে বীজ ছড়াও তুমি আঁখিজলে
চাপা পড়ে গেছ ভাব ভূমিতলে,
তোমারি চিতায় ঢালে ফুল ছায়া
যায় না সে কভু হারায়ে।

(২)

সাধনায় তুমি নিজে শব হও
এমনি তোমার সুমতি।
আপনারে তুমি পোড়াইয়া হও বিভূতি।
লভিয়া তোমার হৃদয়ের বল
জাগে সে সত্য প্রেম মঙ্গল,
সমাধি তোমার, 'সিদ্ধি'র লাগি
মন্দির দেয় গড়ায়ে।

পাশ্চাত্যে ও আমাদের দেশে চিকিৎসার ব্যবস্থা

ডাক্তার শ্রীপঞ্চানন বসু এম্‌-ডি (বার্লিন)

আজকাল আমরা অনেক বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণ সুরু করিয়াছি। অনুকরণ করা যে সকল সময় ভাল, তাহা বলা যায় না। কিন্তু সদ্‌গুণ বা সৎ বিষয় অনুকরণ বা অনুসরণ করা ভাল বই মন্দ নহে। পূর্ব্বে যখন প্রাচ্য দেশগুলি সভ্যতার শিখরে ছিল, তখন পাশ্চাত্যের লোকেরা প্রাচ্য দেশ হইতে অনেক জিনিস আহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। আজ বহু শতাব্দীর দাসত্বে আমরা নগণ্য হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের যে সকল ভারতীয় প্রতিষ্ঠান (Institution) ছিল, সেগুলি হারাইয়া ফেলিয়াছি। হারাইয়াছি বলিয়া যে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে না এমন নহে। কিন্তু অনেকের যে ধারণা যে, ঠিক দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার মতন অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি পুনরায় প্রচলন করিতে না পারিলে আমাদের উন্নতি হওয়া অসম্ভব, তাহা বিশেষ ভ্রান্ত। কারণ, আমরা আর দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার লোক নই। এখন যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত হওয়াতে অন্যান্য জাতির সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের দৃষ্টি ও অভিজ্ঞান কিছু পরিমাণে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে; এবং আমরা যদি এই আন্তর্জাতিক ঘাত-প্রতিঘাতের হিসাব-নিকাশ না লইয়া, জগতের এই সমবেত সুরের সঙ্গে কণ্ঠ না মিলাইয়া—তাল-মান বজায় না রাখিয়াই, জগতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে চাই, তাহা হইলে এ যুগে তাহা সর্ব্বতোভাবে সম্ভবপর হইবে কি? এখন যুগধর্ম্মানুযায়ী আমাদের জাতীয় উন্নতির পথটি গড়িয়া তুলিতে হইবে।

প্রথমে চিকিৎসার কথা ধরা যাউক। পুরাকালে আমাদের দে[শে] আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসারই প্রাধান্য ছিল। আমাদের দেশের চর[ক] ও সুশ্রুতের চিকিৎসা-প্রণালী যে গ্রীক্ ও রোমান চিকিৎসক-মণ্ডলী[র] উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, সে বিষয়ে এখন কেহই সন্দেহ কর[ে] না। সেকালে আমাদের দেশে হাসপাতাল করিয়াও যে লোক চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল, তাহারও কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় তা' ছাড়া প্রত্যেক কবিরাজ ও বৈদ্য নিয়মিত কিছু না কিছু দাতব্য চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ করিতেন। ধনী রোগীর বা রাজা মহা রাজার অর্থে যে ঔষধ তৈয়ারি হইত, তাহা তাঁহারা অনেক সম[য়] গরীব রোগীদের দান করিতেন। মুসলমানী আমলে হাকিমদে[র] প্রথাও প্রায় হিন্দুযুগের অনুরূপ ছিল। ইংরাজদিগের রাজত্ব সু[রু] হওয়ার পর আমাদের দেশে এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-প্রণালী প্রবেশ করে। তখন হইতে বিদেশীয় মতে ও বিদেশীয় ঔষধ ব্যবহার করিয়া চিকিৎসার সূত্রপাত হয়। আমাদের দেশে এ্যালো-পাথিই এখন গবর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষিত। আমাদের দেশে এখন নূতন ধরণের হাসপাতাল তৈয়ারি হইয়াছে এবং হাসপাতালে যাহাতে ভাল রূপে লোক-চিকিৎসা হইতে পারে, তাহার চেষ্টাও হইতেছে। এই যে নূতন চিকিৎসা-পদ্ধতির আমরা অনুকরণ করিয়াছি, তাহা দ্বা[রা] আমাদের দেশেই বা আমরা লোক-চিকিৎসার ব্যবস্থা কিরূপ করি[তে] সমর্থ হইয়াছি, এবং পাশ্চাত্য দেশেই বা লোক-চিকিৎসার ব্যব[স্থা]

কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে, সে বিষয়েই আমি এই প্রবন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

চিকিৎসার দুইটি দিক আছে—একটা রোগ হইলে রোগের চিকিৎসা করা, আর একটা—যাহাতে রোগ না হয় তাহার ব্যবস্থা করা—যাহাকে ইংরাজীতে Preventive medicine, Community Hygiene বা Public Health এইরূপ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

রোগ হইলে আমাদের দেশে রোগ-চিকিৎসার কি ব্যবস্থা আছে? যাঁহাদের পয়সা আছে, তাঁহারা রোগ হইলেই ডাক্তার ডাকেন। কিন্তু সেটা খুব কম লোকের ভাগ্যেই জোটে। কারণ, প্রথমতঃ, আমাদের দেশে পয়সাওয়ালা লোকের সংখ্যা খুব কম। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের দেশে সকল স্থানেই সুশিক্ষিত ডাক্তার পাওয়া যায় না। এমন অনেক স্থান আছে, যাহার ২০।২৫ মাইলের ভিতর শিক্ষিত ডাক্তার মেলে না। অনেক সময় হাতুড়ের চিকিৎসার উপরই নির্ভর করিতে হয়। গরীব লোক বা মধ্যবিত্ত লোকেরা আমাদের দেশে কিরূপে চিকিৎসিত হয়? বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রোগ খুব বাড়াবাড়ি না হইলে তাহারা চিকিৎসার জন্য যায় না। রোগ বেশী হইলে হয় কোন ডাক্তারের বাড়ীতে গিয়া ব্যবস্থা লইয়া আসা, না হয় হাসপাতালে যাওয়া। হাসপাতালে ভর্ত্তি হওয়াও সকলের ভাগ্যে ঘটে না; কারণ, লোকসংখ্যার অনুপাতে আমাদের দেশে হাসপাতালের সংখ্যা খুব কম। তা'ছাড়া, অনেক লোকেরই হাসপাতালে যাইবার নাম শুনিলেই একটা আতঙ্ক আসে। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের লোকেরাই বা কেন এত সহজে হাসপাতালে যায়? তাহার কারণ অনেক আছে। প্রথমতঃ আমাদের দেশের লোকেরা বাড়ীতে মা স্ত্রী বা ভগিনীর নিকট যেরূপ শুশ্রূষা বা ব্যবহার পায়, হাসপাতালে অনেক সময় সেইরূপ পায় না। অবশ্য বাড়ীতে হয় ত অজ্ঞতাবশঃ বিজ্ঞানসম্মত শুশ্রূষা হয় না, কিন্তু অসুস্থ অবস্থায় লোকে বিজ্ঞানটা ততটা বোঝে না। তাহারা দুইটা মিষ্ট কথা বা একটু স্নেহ ও সান্ত্বনাই সর্ব্বাগ্রে চায়। আমাদের দেশে বড় বড় হাসপাতালে সাদা চামড়ার শুশ্রূষাকারিণীই বেশী। তাহারা অনেক সময় দেশীয় ভাষায় রোগীর সহিত কথাই কহিতে পারে না। এবং তাহাদের ভিতর অনেকে ভাল থাকিলেও, সকলেই যে কাল চামড়ার রোগীর প্রতি দয়ার সহিত ব্যবহার করেন, তাহাও নহে। এক্ষেত্রে যদি আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকেরা আমাদের হাসপাতালে শুশ্রূষাকারিণীরূপে নিযুক্তা হন এবং আমাদের দেশের মা কিংবা ভগিনীর মত স্নেহ ও ভালবাসা দিয়া পীড়িতদের সেবা করেন, তাহা হইলে বোধ হয় হাসপাতালের ভয়টা আমাদের দেশ হইতে অনেকটা চলিয়া যাইতে পারে।

হাসপাতালে না যাওয়ার দ্বিতীয় কারণ অজ্ঞতা, ও অস্ত্রচিকিৎসার ভয়। অস্ত্রচিকিৎসায় ভয়ের যে কারণ নাই, তাহা নহে। কারণ, আমাদের দেশের বড় বড় হাসপাতালে যে সকল ইংরাজ অস্ত্রচিকিৎসক নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারা এই পাশ্চাত্য দেশের অস্ত্রচিকিৎসকদিগের তুলনায় খুব নিকৃষ্ট। রাজার জাত বলিয়াই তাঁহাদের এত পসার ও প্রতিপত্তি. এবং গবর্ণমেণ্ট বড় বড় পদে তাঁহাদেরই নিযুক্ত করেন। এক্ষণে যে সকল ভারতীয় উচ্চশিক্ষিত ছাত্র বিদেশ হইতে অস্ত্রচিকিৎসা-পদ্ধতি শিক্ষা লাভ করিয়া যাইতেছেন, তাঁহারা যদি দেশে গিয়া কোন হাসপাতালের সংস্রবে থাকিয়া কার্য্য করিতে পারেন, তাহা হইলে বোধ হয় আমাদের দেশে অস্ত্রচিকিৎসা বিশেষ উন্নত হইতে পারে; এবং ক্রমশঃ দেশের লোকের ভয়ও ভাঙ্গিতে পারে। অনেক সময় হাতুড়ের পাল্লায় পড়িয়া বিনা অস্ত্রে চিকিৎসা করাইতে গিয়া যে কত লোক মারা পড়িয়াছে. তাহার হিসাব দেওয়া যায় না। তা'ছাড়া, বিনা চিকিৎসায় যে আমাদের দেশে কত লোক মারা পড়িতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা অবশ্য তাহার মূল কারণ।

পাশ্চাত্য দেশে কুকুর ঘোড়াও বিনা চিকিৎসায় মরে না। কিন্তু হায় রে আমাদের দেশ, আমাদের দেশে মানুষের জীবন কুকুর ঘোড়া অপেক্ষাও হেয়! আমাদের দেশে চিরকাল নরনারায়ণের সেবার কথা শুনিয়া আসিয়াছি। এই পীড়িত আর্ত্ত নরনারায়ণদের চিকিৎসার কি আমাদের দেশে কোনই ব্যবস্থা হইতে পারে না? বিলাতে বিশেষতঃ লণ্ডনে সমস্ত হাসপাতালই সাধারণ লোক দ্বারা পোষিত ও পরি-চালিত। সময় সময় অবশ্য তাহারা গবর্ণমেণ্ট হইতে অর্থসাহায্য পাইয়া থাকে। আমাদের দেশের বিদেশীয় গবর্ণমেণ্ট যদি চিকিৎসালয় বা হাসপাতাল স্থাপন বিষয়ে উদাসীন থাকেন, তাহা হইলে কি আমরা অন্য কোন উপায়ে লোক-চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পারি না? এই মীমাংসা করিতে গিয়া আমি জার্ম্মানী, সুইজারল্যাণ্ড ও অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি মধ্যইয়োরোপীয় দেশে যে Kranken Kasse System প্রচলিত আছে, তাহার উল্লেখ করিব।

এখানে বিশেষতঃ জার্ম্মাণীতে বড়লোক ছাড়া বেশীর ভাগ লোকেই একটা-না-একটা kranken kasseর (ক্রাঙ্কেন কাসে) অন্তর্ভুক্ত। ক্রাঙ্কেন কাসে কথাটির ঠিক বাঙ্গালা তর্জ্জমা করা যায় না। ইহাকে একটি কো-অপারেটিভ চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠান বলা যাইতে পারে। যে সকল লোক এই অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত, তাঁহারা ইহা হইতে অসুখের সময় বিনা পয়সায় চিকিৎসিত হইতে পারেন। এখন কিছু বিশদ ভাবে ইহার ব্যাখ্যা করি। ধরুন, আপনি কোন আফিসে বা কাহারও বাড়ীতে কার্য্য করেন। যে দিন হইতে আপনি কার্য্যে ঢুকিবেন, সেই দিন হইতেই আপনাকে সেই স্থানীয় ক্রাঙ্কেন কাসের অন্তর্ভুক্ত হইতে হইবে। মাহিনার অনুপাতে মাসিক ৪-৫ পার্সেণ্ট এই ক্রাঙ্কেন কাসেতে দিতে হইবে। যাহারা খুব কম মাহিনা পায়, যথা, সাধারণ বাড়ীর ঝি, চাকর প্রভৃতি—তাহাদের জন্য তাহাদের মনিব বরাই ক্রাঙ্কেন কাসের অর্থ জমা দেন। এই যে মাসে মাসে টাকা দিয়া যাইবেন, তাহার পরিবর্ত্তে আপনি পাইবেন কি? না—যখনই আপনার কোনরূপ অসুখ হউক না কেন, এই ক্রাঙ্কেন কাসে আপনার সমস্ত চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করিবে। প্রত্যেক সহরে ও প্রত্যেক গ্রামে অনেক চিকিৎসক আছেন, যাঁহারা ক্রাঙ্কেন কাসের রোগী দেখেন। এই সকল চিকিৎসকদিগের ভিতর সাধারণ চিকিৎসকও আছেন এবং বিশেষ বিশেষ রোগের জন্য

বিশেষজ্ঞ(Specialist)ও আছেন। তাঁহাদের ভিতর যাহাকে পছন্দ হয় তাঁহার কাছে যাইয়া বিনা পয়সায় পরীক্ষিত হইয়া ঔষধের ব্যবস্থা লওয়া যাইতে পারে। তা' ছাড়া. সহরময় এমন অনেক ডিস্‌পেন্‌সারি আছে, যেখানে ক্রাঙ্কেন কাসের ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ অনুযায়ী ঔষধ বিনা পয়সায় পাওয়া যাইতে পারে। ইহা কম সুবিধা নহে; ইচ্ছামত ডাক্তার ও ঔষধ দুইই পাওয়া গেল। যদি ব্যারাম শক্ত হয়, তাহা হইলে ডাক্তার এমন কি বিশেষজ্ঞ প্রফেসর আসিয়া বিনা পয়সায় বাড়ীতে দেখিয়া যাইবেন। যদি হাসপাতালে বা স্বাস্থ্য-নিবাসে যাওয়ার প্রয়োজন হয় ত হাসপাতালে ও স্বাস্থ্য-নিবাসে বিনা পয়সায় চিকিৎসিত হইতেও পারা যায়। ডাক্তারের খরচা, হাসপাতালের ও স্বাস্থ্য-নিবাসের খরচা ও ঔষধের খরচা সমস্তই ক্রাঙ্কেন কাসে বহন করিয়া থাকে।

যে সকল স্ত্রীলোক স্বেচ্ছানুবর্ত্তী কাজ-কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদের প্রসবকালেও—দরকার হইলে—প্রসবের আগে ও পরে সাহায্য করিবার যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে। প্রসবকালে হয় বাড়ীতে ধাত্রী-নিয়োগের খরচা যোগাইয়া, না হয় কোন হাসপাতালে পাঠাইয়া দিয়া সেখানের ব্যয়ভার বহন করিয়া, ক্রাঙ্কেন কাসে ইহাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন। প্রসবের পরে দুই মাসকাল যাবৎ এই স্ত্রীলোকগুলি অর্থ-সাহায্য পাইতে পারেন। তার পর যখন তাঁহারা পুনরায় কার্য্যে যোগ দেন, তখন তাঁহারা পুনরায় রোজগার করিয়া নিজেদের ভরণপোষণ করিতে পারেন। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা প্রসবকালে যে কত কষ্ট পাইয়া থাকে এবং তাহাদের মধ্যে কতগুলি যে প্রসবকালে মারা পড়ে কিংবা এরূপ রোগাক্রান্ত হয় যে, প্রসবের পর হইতে চিররোগী হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। প্রসবের সময় এবং প্রসবের পরে উপযুক্ত যত্ন লওয়া হয় না বলিয়া যে আমাদের দেশে কত নবজাত শিশু মরিয়া যায়, তাহা ত আমরা চিন্তা করিয়া দেখি না। ভেড়ার পাল থাকিলে কি আর মরিলেই বা কি,—নিশ্চয় অনেকেই এইরূপ ভাবেন। তা না হইলে এই শিশু-মৃত্যু ও গর্ভিণী-মৃত্যুর প্রতিকারের ত কোনই প্রণালীবদ্ধ আন্তরিক চেষ্টা দেখি না। আমাদের দেশে সুশিক্ষিত ধাত্রীর সংখ্যা কম এবং যেখানে বা সুশিক্ষিত ধাত্রী পাওয়া যায়, সেখানেও অর্থাভাববশতঃ ধাত্রী-নিয়োগ করা সম্ভবপর হয় না। সকল গর্ভিণীকে যে হাসপাতালে স্থান দিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহাও সম্ভব নহে। সেইজন্য গর্ভিণীদিগের বাড়ীতে যাহাতে প্রসবকালে উপযুক্ত সাহায্য দেওয়া যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। কলিকাতা কর্পোরেশন কয়েক জন ধাত্রী নিয়োগ করিয়াছেন বটে, তাঁহারা বস্তিতে গিয়া গরীব স্ত্রীলোকদিগের প্রসবকালে সাহায্য করিয়া থাকেন; কিন্তু এই বন্দোবস্ত যে যথেষ্ট, তাহা বলা চলে না। যাহাদের সাধারণভাবে প্রসব হইয়া যাইবে তাহাদের কোন কষ্টই পাইতে হয় না; কিন্তু যে সব স্থলে প্রসবের সময় কষ্ট হইবে অনুমান করা যায়, সে ক্ষেত্রে হাসপাতালে পাঠাইয়া উপযুক্ত ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা করাই শ্রেয়ঃ। সম্প্রতি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি হইতে এইরূপ একটি গর্ভিণীদের হাসপাতাল খোলার ব্যবস্থা হইতেছে; কিন্তু সেখানে শুনিতেছি না কি, হাজার আবশ্যক হইলেও পুরুষ ডাক্তারের সাহায্য লওয়া হইবে না, যা করেন আমাদের দুই একটী মহিলা ডাক্তার। এই সকল গোঁড়ামীর অর্থ বুঝা ভার। যখন মরণ বাঁচন লইয়া কথা, তখন ছাই পর্দ্দাপ্রথাটাই কি বড় হইল, আর মানুষের প্রাণটা কিছু নহে? আমাদের কুসংস্কার ও ভ্রান্ত লোকাচার যত দিন না দূরীভূত হইতেছে, তত দিন এ সব বিষয়ে কিছু করা বড় শক্ত ব্যাপার। আর যে পর্দ্দা লইয়া আমাদের দেশের লোক বড়াই করিয়া থাকেন, সেটা জগতের কোন আর্য্য সমাজে এত কঠোর ভাবে প্রচলিত নাই, আমাদেরও পুরাকালে ছিল না।* এই ধার করা প্রথার গৌরবে স্ফীত হওয়া অজ্ঞেরই সাজে।

স্ত্রী ও পুরুষদিগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ছাড়া ক্রাঙ্কেন কাসেগুলি অন্য নানা প্রকারে তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকে। অসুস্থতা বশতঃ কেহ কার্য্য করিতে অক্ষম হইলে, তাহাকে মাহিনার অর্দ্ধেক অর্থ দিয়া থাকে। কোন ব্যক্তি মরিয়া গেলে, তাহার স্ত্রী, পুত্র বা অন্য কোন পরিবারের লোককে মাহিনার অনুপাতে একটা মোটা টাকা দিয়া সাহায্য করিয়া থাকে। কোন ব্যক্তিকে হাসপাতালে পাঠাইলে, তাহার সংসার প্রতিপালনের জন্যও মাহিনার অনুপাতে কিছু অর্থসাহায্য করে।

ইংল্যাণ্ডেও প্রায় জার্ম্মানীর ন্যায় লোক-চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে ইংলণ্ডে National Health Insurance Act অনুযায়ী অল্প রোজগারী প্রত্যেক লোকেরই চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। সেখানে এই সকল রোগী দেখিবার জন্য যে সকল চিকিৎসক আছেন, তাঁহাদের Insurance practitioners বা Panel practitioners বলা হয়। এইরূপ প্রত্যেক চিকিৎসকের উপর ২।৩ হাজার লোকের চিকিৎসার ভার থাকে। ইহাদের অসুখ হইলে, তাহারা নিজ চিকিৎসকের কাছে গিয়া যখন ইচ্ছা চিকিৎসিত হইতে পারে। জার্ম্মানীতে অসুখ হিসাবে বিভিন্ন চিকিৎসকের কাছে গিয়া ব্যবস্থা লওয়া যায়; কিন্তু ইংল্যাণ্ডে বিভিন্ন চিকিৎসকের কাছে গিয়া ব্যবস্থা লওয়া তত সহজ নহে। নিজের চিকিৎসকের খাতা হইতে নাম কাটাইয়া তবে অন্য চিকিৎসকের কাছে যাওয়া যায়। এই পদ্ধতির সুবিধাও আছে, অসুবিধাও আছে। কারণ, বরাবর এক চিকিৎসকের নিকট ব্যবস্থা লইলে, তিনি

* পর্দ্দা ও অবগুণ্ঠন-প্রথা আমাদের দেশে মৃদু ভাবে খ্রীষ্টপূর্ব্ব শতক হইতেই প্রচলিত আছে। তবে মুসলমান আমলে ইহার প্রচলন কঠোরতর ভাবে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। হিন্দুযুগে পর্দ্দাপ্রথার রেওয়াজ থাকিলেও অনেক স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যাইত; যেমন—রামায়ণের এক স্থলে আছে—"ব্যসনেষু ন কৃচ্ছ্রেষু ন যুদ্ধেষু স্বয়ম্বরে ন ক্রতৌ ন বিবাহে বা দর্শনং দুষ্যতে স্ত্রীয়ং। অর্থাৎ বিপদ, পীড়া, যুদ্ধ, স্বয়ম্বর, যজ্ঞ ও বিবাহস্থলে স্ত্রীলোক দর্শন দিলে কোন দোষ নাই।

—সম্পাদক—স্বাস্থ্য-সমাচার।

যেরূপ রোগীর ধাত বুঝেন, অপরের নিকট সহজে বোধ হয় তাহা আশা করা যায় না। অসুবিধা এই যে, এক চিকিৎসকই যে সকল ব্যারামের, যথা, নিউমোনিয়া, থাইসিস, হাড়ভাঙ্গা (Fracture) বা অস্ত্র চিকিৎসা এবং স্ত্রীলোকে গর্ভকালীন বিপদের চিকিৎসা বা অন্য কোন স্ত্রীরোগের কিম্বা শিশুরোগের চিকিৎসায় সমান পারদর্শী হইবেন, তাহা বলা যায় না। সেই হিসাবে জার্ম্মানীতে যে বিশেষ বিশেষ রোগের জন্য বিশেষজ্ঞের নিকট যাওয়ার ব্যবস্থা আছে, তাহা লোক-চিকিৎসা হিসাবে অনেকটা সুবিধাজনক বলিয়াই মনে হয়।

এই ত গেল পাশ্চাত্য দেশে লোক-চিকিৎসার ব্যবস্থা। আমাদের দেশে কি এইরূপ কোন লোক-চিকিৎসার ব্যবস্থা হইতে পারে না? আমাদের দেশে কয়েকটা Millএ ডাক্তারের ব্যবস্থা আছে, এবং Factory Act অনুসারে যে সকল ফ্যাক্টরীতে ৭৫জনের অধিক লোক কায করে, যেখানে ১জন ডাক্তার এবং আকস্মিক বিপদের চিকিৎসার জন্য ঔষধ রাখারও নিয়ম আছে। কিন্তু এই নিয়মে যে রীতিমত লোক-চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়, তাহা বোধ হয় না। রীতিমত লোক-চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইলে, আমাদের দেশেও National Health Insurance Actএর মত একটা আইন পাশ হওয়া দরকার; তা না হইলে সকলে চিকিৎসার জন্য মাহিনার কিছু অংশ দিতে রাজী হইবে না। নূতন রিফর্ম হিসাবে Public Health ও Sanitation আমাদের দেশী মন্ত্রীরই তত্ত্বাবধানে। তাঁহারা যদি একটা বড়দরের কেরানীর মতই সই মারিয়া যান বা ditto দিয়া যান, এবং আপনা হইতে দেশের মঙ্গলের জন্য যদি কিছু কায না করেন, তাহা হইলে এইরূপ মন্ত্রী থাকা আর না থাকা, দুই-ই সমান। এই Health Insurance Act সম্বন্ধে যদি আমাদের মন্ত্রী মহাশয়েরা তৎপর হন, তাহা হইলে তাঁহারা দেশের লোকের বিশেষ প্রিয়পাত্রই হইবেন।

অবশ্য এইরূপ আইন যদি পাশ হয়, তাহা হইলে এই অনুযায়ী কায করার জন্য চিকিৎসকের প্রয়োজন হইবে। দেশের মেডিকেল স্কুল-কলেজ হইতে যে সকল চিকিৎসক বাহির হইতেছেন, তাঁহাদের সংখ্যা খুব বেশী না হইলেও, আপাততঃ তাঁহাদের লইয়াই কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে। আর যদি চিকিৎসকের সংখ্যা কম হয়, নূতন দুই চারিটা মেডিকেল স্কুল খুলিলে বোধ হয় সে সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে। কিন্তু জনসাধারণ এবং চিকিৎসক-মণ্ডলীর ভিতর নিয়মমত মধ্যস্থ ভাবে কাজ করিবার জন্য কতকগুলি যৌথ-মণ্ডলী আবশ্যক। ইংল্যাণ্ডে যেমন Insurance Society আছে, আর জার্ম্মানীতে যেমন নানা স্থানে Kranken kasse আছে, আমাদের দেশেও সহরে ও জনবহুল গ্রামে এই জাতীয় যৌথ-মণ্ডলীর অনুষ্ঠান হওয়া উচিত। এই সকল যৌথ-মণ্ডলী স্থানীয় সাধারণ লোক ও চিকিৎসক দ্বারা গঠিত হওয়া উচিত, এবং অন্যান্য যৌথ-মণ্ডলীর ন্যায় রেজিষ্টার্ড হওয়া উচিত। তাহা হইলে তাহাদের টাকাকড়ির হিসাবপত্র যথারীতি রাখা হইবে। আমি ইয়োরোপে ঘুরিয়া এই সম্বন্ধে আমার মতামত প্রকাশ করিলাম বটে; এক্ষণে আমাদের দেশের লোকেরা যদি এই বিষয়ে দেশের আধুনিক অবস্থা হিসাবে আলোচনা করেন ও তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করেন, তাহা হইলে, আশা করি, ক্রমশঃ আমরা আমাদের দেশের উপযোগী একটা Constructive Scheme লইয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিব। (স্বাস্থ্য-সমাচার)

বাংলা দেশ কাহার

বাংলার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া মনে স্বতঃই একটি প্রশ্নের উদয় হয়, বাংলা দেশ কি বাঙ্গালীর, না অন্য কাহারও? ব্যবসা বাণিজ্যই বলুন, কৃষিশিল্পই বলুন, আর কুলীমজুরের কাজই বলুন, যে কোন কর্ম্মক্ষেত্রে যাওয়া যাউক না কেন, সেখানেই বাঙ্গালীর সংখ্যা অধিক দেখা যাইবে না, অবাঙ্গালীতে সমস্ত ছাইয়া ফেলিয়াছে। বাংলায় অবাঙ্গালীর সংখ্যা দিন দিন কিরূপ বাড়িতেছে, তাহা দেখিলে বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাইতে হয়।

বিগত আদম সুমারীর বিবরণ হইতে আমরা বাংলায় অবাঙ্গালীর বর্ত্তমান সংখ্যার একটি হিসাব দিতেছি—

১। বিহার ও উড়িষ্যা—১২২৭৫৭১; ২। যুক্তপ্রদেশ—৩৪৩০১৫; ৩। আসাম—৬৮৮০২; ৪। মধ্যপ্রদেশ ও বেহার—৫৫৮১০; ৫। রাজপুতনা—৪৭৮৬৫; ৬। মাদ্রাজ—৩২০২৪; ৭। পাঞ্জাব ও দিল্লী—১৭৭১৫; ৮। সিকিম—৪০৫৭; ৯। ব্রহ্মদেশ—২৩৬১; ১০। নেপাল—৮৭২৮৫; ১১। য়ুরোপ—১৩৩৫৬; ১২। চীন দেশ—৩৮৫৬; ১১০২৮০৫।

বিগত লোক গণনায় বাংলায় মোট জনসংখ্যা ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ ১১ হাজার ৪ শত ৩১ জন বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে উপরি উক্ত সংখ্যক লোকই অবাঙ্গালী। তারপর বাংলায় যাহারা অবাঙ্গালী আছে, তাহারা কেহই বাঙ্গালীর মত অল্প নিশ্চেষ্ট ভাবে নাই। বাংলায় অর্থোপার্জ্জন করিতেই তাহারা আসিয়াছে, বাংলার অর্থশোষণই তাহাদের কাজ। ফলে বাঙ্গালী আজ অর্থোপার্জ্জনের সকল ক্ষেত্র হইতেই হটিয়া যাইতেছে, নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে কাল কাটাইতেছে।

অবশ্য বাংলা দেশ হইতেও কেহ কেহ যে অর্থোপার্জ্জনের জন্য বিদেশে না গিয়াছে তাহা নহে। কিন্তু বিদেশগামী বাঙ্গালীর সংখ্যা বাংলা দেশে আগত অবাঙ্গালীর সংখ্যা অপেক্ষা অনেক কম। বাংলার বাহিরে কোথায় কত বাঙ্গালী আছে, তাহার হিসাব দেওয়া যাইতেছে—

১। আসাম ৩৭৫৫৭৮

(বেশীর ভাগ ময়মনসিংহ হইতে)

২। ব্রহ্মদেশ ১৪৬০৮৭

(বেশীর ভাগ চট্টগ্রাম হইতে)

৩। বিহার ও উড়িষ্যা ১১৬১২২

বোম্বাই, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানেও কিছু কিছু বাঙ্গালী আছে। তবে বিদেশগামী বাঙ্গালী অধিকাংশই কেরাণী, শিক্ষক,

উকীল বা ডাক্তার। মাড়োয়ারী ভাটিয়া প্রভৃতির মত ব্যবসা করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জন ইহারা কেহই করে না।

তার পর বাংলার রাজধানী কলিকাতার জনসংখ্যার হিসাব করিলে আরও বিস্মিত হইতে হয়। কলিকাতা যে বাঙ্গালীর রাজধানী, তাহা বিশ্বাস হইতে চাহে না।

১৯২১ সালের লোক-গণনায় হাওড়া ও সহরতলীর সহিত সমগ্র কলিকাতা সহরের লোকসংখ্যা ১৩,২৭,৫৪৭ জন। তার মধ্যে খাস কলিকাতার লোকসংখ্যা ৯০৭৮৫১। এই লোকসংখ্যার মধ্যে বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালীর অংশ কত, নিম্নলিখিত তালিকার প্রতি দৃষ্টি করিলে কতকটা বুঝা যাইবে।

খাস কলিকাতা—৯০৭৮৫১

(জন্মস্থান অনুসারে)

কলিকাতা সহর	২৪ পরগণা হাওড়া	ও বাঙ্গলার মফঃস্বল
২০৪৭৭৬	৯৯১২৪	১৭৫৬৬৪
বঙ্গের বাহিরে ভিন্ন প্রদেশ		ভারতের বাহিরে বিদেশ
৩১৪২৩৬		১৪০৫১

অর্থাৎ খাস কলিকাতার সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা প্রায় ৩৫ জন অ-বাঙ্গালী। বাঙ্গলার মফঃস্বল হইতে আগত লোকের সংখ্যা কলিকাতার লোকসংখ্যার শতকরা ১৯·৩৫ ভাগমাত্র; অর্থাৎ কলিকাতার মফঃস্বলবাসী বাঙ্গালী অপেক্ষা অ-বাঙ্গালীর সংখ্যা প্রায় ডবল।

হাওড়ার লোকসংখ্যার শতকরা ৪০·৪৬ ভাগ অ-বাঙ্গালী এবং সহরতলী ও ২৪ পরগণার শতকরা ৩১·৭৫ ভাগ অ-বাঙ্গালী। বাঙ্গলার মফঃস্বলবাসী লোকের সংখ্যা হাওড়া ও চব্বিশ পরগণার সহরতলীতে যথাক্রমে মাত্র শতকরা ১০·৭৪ ভাগ ও শতকরা ১১·১৬ ভাগ মাত্র।

এক বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশের লোকই কলিকাতার লোকসংখ্যার প্রায় পাঁচভাগের এক ভাগ দখল করিয়া আছে। কলিকাতার লোক-সংখ্যার দশভাগের এক ভাগ যুক্তপ্রদেশ হইতে আসিয়াছে। সহরের হাজার করা ২৩ জন রাজপুতানার লোক। ভিন্নপ্রদেশের যে সমস্ত জেলা হইতে বেশী লোক কলিকাতায় আসিয়াছে, তাহার দুই একটা নমুনা নীচে দিলাম :—গয়া—৪৮১১৪, পাটনা—২৮০৩৪, সাহাবাদ—২৬৭৪১, মজফরপুর—২২০৫৩, মুঙ্গের—২০৬৯০, কটক ৪৫১৭৪ বালেশ্বর ১৬৪৯৯, বারাণসী ১৬৬১৫, গাজীপুর ১৫৩৯৯, বালিয়া ১৪০৯৪, আজমগড় ১২০৬২, জোনপুর ১২৩৪০, বিকানীর ১২৫৯৬, জয়পুর ১১৭১৪।

এর সঙ্গে বাঙ্গলার মফঃস্বলের কোন জেলা হইতে কত লোক কলিকাতায় আসিয়াছে, তাহার তুলনা করা যাক। হুগলী—৮৭০৯২, মেদিনীপুর ৬৬০৮২, ঢাকা ৩০৭৬৫। বর্দ্ধমান ২০৬২৭, নদীয়া ১৬৪৩৫, ফরিদপুর ১০৫৮৫, যশোহর ১৫৪৮, বাখরগঞ্জ ৭২১৮, বাঁকুড়া ৭১৭৯ মুর্শিদাবাদ ৬১০১, খুলনা ৫৭৫৪।

এই সকল তালিকার তুলনা করিলে কি মনে হয় না, কলিকাতা বাঙ্গালীর রাজধানী নয়, উহা বিহারী, উড়িষ্যা মাড়োয়ারী হিন্দুস্থানী প্রভৃতির সহর?

তার পর এই সকল বিদেশীরা বাংলার অর্থ যে কি ভাবে শোষণ করিয়া নিতেছে, তাহা একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায়। বাংলা-দেশে অন্যান্য সকল দেশের লোকই অন্নসংস্থান করিতেছে, কেবল বাঙ্গালীর পেটে অন্ন নাই। ব্যবসা বাণিজ্য হইতে আরম্ভ করিয়া বেহারা, চাকর, পাচক, মুচী, মিস্ত্রী, পাটনী, মুটে মজুর, প্রভৃতি সমস্ত কাজেই অ-বাঙ্গালী। বাঙ্গালী কোথায়?

বাঙ্গালী, এখনও সাবধান হও, এখনও ঘর সামলাইতে চেষ্টা কর। বিদেশী পঙ্গপাল আসিয়া তোমার সোণার দেশ লুঠিয়া লইতেছে, আর তুমি এখনও মোহ-শয্যায় শায়িত থাকিবে? "তোমার সাধের ঘুম-ঘোর কভু কি ভাঙ্গিবে না?"

যুগবার্ত্তা

হিন্দুর মৃত্যু গোড়ার কথা

১৯২১ খৃষ্টাব্দের লোক গণনায়, সমগ্র বাঙ্গলার লোকসংখ্যার মধ্যে হিন্দু ২০,৮০৯,১৪৮ জন এবং মুসলমান ২৫,৪৬৮,১২৪ জন; অর্থাৎ হিন্দু, বাঙ্গলার লোকসংখ্যার শত করা ৪৩·৭২ ভাগ এবং মুসলমান শতকরা ৫৩·৫৫ ভাগ; বাকী শতকরা ৪ ভাগের কম খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী লোক। অথচ ৫০ বৎসর পূর্ব্বেই (১৮৭২ খৃষ্টাব্দে) হিন্দুর সংখ্যা মুসলমান অপেক্ষা ৪ লক্ষ অধিক ছিল। গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া মুসলমানের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়াছে এবং হিন্দুর সংখ্যা ধীরে ধীরে কমিয়াছে। আমরা সুবিধার জন্য নীচে হিন্দু-মুসলমানের হ্রাস-বৃদ্ধির একটা তুলনা মূলক তালিকা দিলাম—

খৃষ্টাব্দ	হিন্দুসংখ্যা	মুসলমানসংখ্যা	মন্তব্য
১৮৭২	১৭১ লক্ষ	১৬৭ লক্ষ	হিন্দু ৪লক্ষ বেশী
১৮৮১	১৭২৷০ লক্ষ	১৭৯ লক্ষ	মুসলমান ৬৷লক্ষ বেশী
১৮৯১	১৮০ লক্ষ	১৯৬ লক্ষ	মুঃ ১৬লক্ষ বেশী
১৯০১	১৯৪ লক্ষ	২২০ লক্ষ	মুঃ ২৬ লক্ষ বেশী
১৯১১	২০৬ লক্ষ	২৪২ লক্ষ	মুঃ ৩৬ লক্ষ বেশী
১৯২১	২০৮ লক্ষ	২৫৪ লক্ষ	মুঃ ৪৬ লক্ষ বেশী

উপরের তালিকা দেখিলে বুঝা যাইবে যে, ১৮৭২—১৯১১ এই ৪০ বৎসরে হিন্দুর বৃদ্ধির হার ক্রমে হ্রাস পাইয়াছে এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ গত ১০ বৎসরে (১৯১১—১৯২১) হিন্দুর সংখ্যা প্রকৃত পক্ষে প্রায় ২লক্ষ নামিয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহা একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা নহে। হিন্দুর সমাজ-দেহে এমন কোন ব্যাধির বীজ প্রবেশ করিয়াছে, যাহা তাহাদিগকে নিশ্চিত ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছে।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীর রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে—

The actual number of Hindus has decreased since

1911 and everywhere except in central Bengal, the Hindus have made less progress in numbers or more retrogressoin, than has the population as a whole.

অর্থাৎ একমাত্র মধ্যবঙ্গ ছাড়া সর্ব্বত্রই হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে এবং সমগ্র লোকসংখ্যার তুলনায় তাহারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে।

গত ৪০ বৎসরে (১৮১১—১৯২১) হিন্দু ও মুসলমানের বঙ্গের কোন্ অঞ্চলে কিরূপভাবে হ্রাসবৃদ্ধি হইয়াছে, নিম্নলিখিত তুলনামূলক দুইটী তালিকা হইতে তাহা অনেকটা স্পষ্ট হইবে—

শতকরা হ্রাস-বৃদ্ধির হার

(১৮৮১—১৯২১)

	মুসলমান	হিন্দু
পশ্চিমবঙ্গ	২১·৫	৬·১
উত্তরবঙ্গ	১২·৯	৭·৪
মধ্যবঙ্গ	১০ ৫	১৯·৩

পূর্ব্ববঙ্গের হিসাব ধরিলে এইরূপ দেখা যায়—

শতকরা বৃদ্ধির হার

(১৮৮১—১৯২১)

	মুসলমান	হিন্দু
ঢাকা বিভাগ	৬১·৯	২২ ৪
চট্টগ্রাম বিভাগ	৭৯ ৩	৫৬·০

সমগ্র বঙ্গের শতকরা বৃদ্ধির হার কষিলে দেখা যায় যে, গত ৪০ বৎসরে মুসলমানেরা বাড়িয়াছে শতকরা ৩৮ ৫ ভাগ এবং হিন্দুরা বাড়িয়াছে শতকরা ১৫·২ ভাগ মাত্র, অর্থাৎ হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের বৃদ্ধির হার গড়ে দ্বিগুণেরও বেশী হইয়াছে।

বঙ্গের কোন্ অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানেরা বর্ত্তমান সংস্থান কিরূপ, তাহার তুলনাও করা যাইতে পারে—

(১৯২১)

	মুসলমান	হিন্দু
পূর্ব্ববঙ্গ	৬৯ ৯২	২৮·৪৮
পশ্চিমবঙ্গ	১৩·৪৪	৮২·০৭
উত্তরবঙ্গ	৫৯ ৮২	৩৫·৫২
মধ্যবঙ্গ	৪৭·৭২	৫১·৪৬

অর্থাৎ কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা মুসলমান অপেক্ষা বেশী এবং মধ্যবঙ্গে তাহাদের সংখ্যা প্রায় সমান সমান এবং অন্য দুই অঞ্চলে মুসলমানেরাই সংখ্যায় অত্যধিক। যেরূপভাবে হিন্দুর ক্ষয় হইতেছে, তাহাতে পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ যে শীঘ্রই হিন্দুশূন্য হইবে এবং পশ্চিমবঙ্গ যে জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হইবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

কেহ কেহ বলেন যে, মুসলমানপ্রধান পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ স্বাস্থ্যকর এবং হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গ ও মধ্যবঙ্গ অস্বাস্থ্যকর ও ম্যালেরিয়াগ্রস্ত। তদ্ব্যতীত পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের ভূমির উর্ব্বরাশক্তিও বেশী। অতএব পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা বাড়িতেছে এবং পশ্চিমবঙ্গে ও মধ্যবঙ্গে হিন্দুদের সংখ্যা কমিতেছে এবং তাহার ফলেই সমগ্র বঙ্গে মুসলমান বাড়িতেছে এবং হিন্দু কমিতেছে। কিন্তু আমরা যে সমস্ত তালিকা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে যে, এরূপ ধারণা ভ্রান্ত ও অমূলক। নদীমাতৃক পূর্ব্ববঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর স্থান এবং তাহার উর্ব্বরাশক্তিও বেশী, অথচ পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে, হিন্দু-মুসলমানের বৃদ্ধির হারের এত অধিক অসামঞ্জস্য কেন? পূর্ব্ববঙ্গের স্বাস্থ্যকর স্থানে তো হিন্দুরাও বাস করে এবং তথাকার ভূমির উর্ব্বরাশক্তির সুযোগ সেও পাইয়া থাকে; তবে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে মুসলমানদের বৃদ্ধির হার হিন্দুদের চেয়ে এত বেশী কেন? ঢাকা বিভাগে তো হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের বৃদ্ধির হার প্রায় তিনগুণ। উত্তরবঙ্গ সম্বন্ধেও ঐ কথাই বলা যাইতে পারে। উত্তরবঙ্গে হিন্দুদের বৃদ্ধির হার মুসলমানদের বৃদ্ধির হারের প্রায় অর্দ্ধেক। একমাত্র মধ্যবঙ্গে মুসলমানদেরচেয়ে হিন্দুদের বৃদ্ধির হার অধিক দেখা যাইতেছে। কিন্তু আদমশুমারীর বিবরণেই ইহার কারণ উল্লিখিত হইয়াছে। কলিকাতা সহর মধ্যবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। কলিকাতায় বঙ্গের বাহিরের বহু ভিন্ন প্রদেশ হইতে শ্রমিক, মজুর, ব্যবসায়ী প্রভৃতি বৎসর বৎসর আমদানী হইতেছে। কলিকাতার চতুষ্পার্শ্বস্থ কলকারখানাতেও অসংখ্য অ-বাঙ্গালী শ্রমিক ও মজুরের আমদানী অহরহ হইতেছে। ইহাদের মধ্যে হিন্দুই অধিকাংশ। এই সব কারণে মধ্যবঙ্গে হিন্দুর বৃদ্ধির হার একটু বেশী দেখা যাইতেছে। আসলে মধ্যবঙ্গে 'বাঙ্গালী হিন্দু' যে মুসলমান অপেক্ষা সংখ্যায় বাড়িতেছে, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই।

গত দশ বৎসরে (১৯১১—২১) বাঙ্গলাদেশে হিন্দুর হ্রাস অত্যন্ত শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছে। ঐ দশ বৎসরে সমগ্র বঙ্গে মুসলমান প্রায় ১২ লক্ষ বাড়িয়াছে, আর হিন্দু প্রায় ২ লক্ষ কমিয়াছে। এই দশ বৎসরের হিন্দু-মুসলমানের শতকরা হ্রাসবৃদ্ধির হার তুলনা করিলেও ব্যাপারটী ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম হইবে:—

১৯১১—১৯২১

	মুসলমানের বৃদ্ধির হার	সমগ্র বঙ্গের লোক-সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি
পশ্চিমবঙ্গ	—৪·১	—৪·১
মধ্যবঙ্গ	—১·৮	+০ ৪
উত্তরবঙ্গ	+২·৯	+১·৯
পূর্ব্ববঙ্গ	+৯·১	+৮·৩
সমগ্রবঙ্গ	+৫·২	+২ ৮

	হিন্দুদের বৃদ্ধির হার	সমগ্রবঙ্গের লোক-সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি
পশ্চিমবঙ্গ	—৫·১	—৪·১
মধ্যবঙ্গ	+২·৩	+০·৪
উত্তরবঙ্গ	—৩·২	+১·৯
পূর্ব্ববঙ্গ	+৪·৬	+৮·৩
সমগ্রবঙ্গ	—০·৭	+২·৮

অর্থাৎ বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্র সাধারণ লোকসংখ্যার তুলনায় হিন্দুর

হ্রাস হইয়াছে। সমগ্রবঙ্গে মুসলমান বাড়িয়াছে গত দশ বৎসরে শতকরা ৫·২ ভাগ,—আর হিন্দু কমিয়াছে শতকরা—·০৭ ভাগ।

আনন্দবাজার পত্রিকা

হিন্দুর মৃত্যু ছুঁৎমার্গের পরিণাম

বাঙ্গলার হিন্দুসমাজে, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য এই তিন জাতি 'উচ্চ জাতি' বলিয়া গণ্য। এই উঁচু জাতের' লোকেরা নিজেদের কৃত্রিম সামাজিক মর্য্যাদা ও গৌরবে ধরাকে সরা জ্ঞান করেন। হিন্দুসমাজের তথাকথিত নিম্নজাতির লোকেরাও যে সমাজের একান্ত প্রয়োজনীয় অংশ, এমন কি অনেক স্থলে মেরুদণ্ড স্বরূপ, এ জ্ঞান তাঁহাদের নাই। আজ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া রাজনৈতিক বিপর্য্যয় ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার ফলে এই তিন জাতির হাতে নানা কারণে বহু ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। কিন্তু এই উঁচু জাতের লোকেরা সেই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করেন নাই। বরং তাঁহারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য স্মৃতি-শাস্ত্র ও দেশাচারের দোহাই দিয়া, তথাকথিত উচ্চ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড কৃত্রিম ব্যবধান গড়িয়া তুলিয়াছেন। নিম্নবর্ণের লোকদের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞানবিস্তারের জন্য তাঁহারা কোন চেষ্টাই করেন নাই। সর্ব্বপ্রকার সামাজিক সুবিধা ও সুযোগ পাইয়া যাহাতে তাহারা নিজেদের ও হিন্দুসমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারে, উচ্চজাতির লোকেরা সে পক্ষে কোন উৎসাহ দেন নাই; এবং সর্ব্বোপরি তাহাদের মধ্যে কোন কোন জাতিকে "অস্পৃশ্য জলানাচরনীয়" প্রভৃতি আখ্যা দিয়া পশুবৎ ঘৃণা করিয়া আসিতেছেন। ফলে হিন্দু-ব্যবসায়ী জাতিরা ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইতেছে, কৃষক ও শ্রমিক জাতিরা ক্রমে ক্রমে হীনবল হইয়া পড়িতেছে এবং তাহাদের স্থান মুসলমান প্রভৃতি অন্য সম্প্রদায়ের লোক, এমন কি বাঙ্গলার বাহিরের লোক আসিয়া অধিকার করিতেছে।

সমাজের প্রধান বন্ধন সংহতিশক্তি। যে সাম্যের উপরে সংহতি-শক্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুসমাজে এখন তাহাই নাই। মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে উহা যথেষ্ট পরিমাণে আছে, তাই বাঙ্গলার তথা ভারতের সর্ব্বত্র তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে; আর হিন্দুরা কেবল "ছুঁৎমার্গের" নাগপাশে বদ্ধ হইয়া আত্মহত্যা করিয়া মরিতেছে। সমাজের এই নিম্নবর্ণের প্রতি অবিচার ও অত্যাচারই যে হিন্দুসমাজে বলক্ষয় ও ধ্বংসের অন্যতম প্রধান কারণ, এ কথা আজ বুঝিয়াও কেহ বুঝিতে চাহিতেছে না। অথচ এই তথাকথিত "উচ্চজাতি" হিন্দুসমাজের কতটুকু অংশ? সমগ্র বাঙ্গলার হিন্দুসমাজের লোকসংখ্যা প্রায় ২০৮ লক্ষ। তার মধ্যে ব্রাহ্মণ ১৩ লক্ষ, কায়স্থ ১২ লক্ষ, এবং বৈদ্য ১ লক্ষ—মোট ২৬ লক্ষ মাত্র, অর্থাৎ এই তিন জাতি একত্রে হিন্দু-সমাজের মাত্র শতকরা ১২।০ ভাগ। বাকী শতকরা ৮৭।০ ভাগ তথাকথিত "নিম্নবর্ণের" লোক। যে সমাজের মুষ্টিমেয় শতকরা ১২।০ ভাগ লোক, কতকগুলি কৃত্রিম দেশাচার ও প্রথার বলে সমাজের অপর ৮৭।০ ভাগ লোককে দাবাইয়া রাখিতে পারে, সে সমাজের কখনই মঙ্গল হইতে পারে না।

হিন্দু সমাজের অর্দ্ধেকের বেশী, এবারকার সেন্সাসে Depressed classes অর্থাৎ অস্পৃশ্য জাতি বা অবনত জাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এই সমস্ত জাতিদের মোট সংখ্যা ১ কোটী ১২ লক্ষেরও উপর। কোন্ কোন্ জাতি "অবনত" বা অস্পৃশ্য" বলিয়া গণ্য হইয়াছে, তাহার একটা তালিকা দিতেছি।—বাওরী, বাগ্দী, ভুঁইমালী, ভুঁইয়া, ভুমিজ, চামার ও মুচি, চাষী কৈবর্ত্ত, ডোম, গারো, হদি, হাজঙ্, হাড়ি, জেলে কৈবর্ত্ত, কলু, কেওড়া, কায়রা, কান্দা, খণ্ডায়েত, খেন, কোচ, কৈরী, কোড়া, কুর্ম্মি, লোহার, মাল, মালো, মেচ, মুণ্ডা, নমঃশূদ্র, ভুলিয়া, ওঁরাও, পাটনী, পোদ, পুণ্ডরী, রাজবংশী, রাজু, সাঁওতাল, শুকলী, তিয়র। ইহাদের মধ্যে নমঃশূদ্রদের সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ এবং চাষী কৈবর্ত্তদের সংখ্যা প্রায় ২২ লক্ষ।

হিন্দু সমাজের অর্দ্ধাংশেরও বেশী এই বিরাট অবনত বা অস্পৃশ্য-জাতি, সমাজপতিদের কাছে কি ব্যবহার পাইতেছে? দারিদ্র্য, ব্যাধি ও অজ্ঞতার ঘোর অন্ধকারে কি ইহারা নিমগ্ন হইয়া নাই? ছুঁৎমার্গা-বলম্বী উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্যের ফলে, ইহারা কি দলে দলে মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে না? মুসলমান ও খৃষ্টান হইলে, আর কিছু না হোক, তাহারা একটা উদার সাম্যভাবের আস্বাদ কতকটা পাইয়া থাকে। এ ছাড়া, খৃষ্টান মিশনরীরা স্থানে স্থানে মিশন খুলিয়া তাহাদের মধ্যে যেরূপভাবে শিক্ষা বিস্তার ও সেবাকার্য্য করিতে-ছেন, হিন্দুরা সেরূপ কিছু করিয়াছেন কি?

বাঙ্গলার যেখানে যেখানে অনুন্নত জাতিরা একটু অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে, সেই খানেই 'উচ্চজাতিরা' মিলিয়া তাহাদের বাধা দিতেছেন। ময়মনসিংহ অঞ্চলে, হদি জাতির আন্দোলনের বিরুদ্ধে তথাকার ব্রাহ্মণ জমিদারেরা যেরূপ বৈরভাব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শুনিয়া লজ্জায় ঘৃণায় মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সমস্ত হিন্দু—মুসলমান ও অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকের প্রতি যেটুকু শ্রদ্ধা দেখায়, স্বধর্ম্মীদের প্রতি তাহাও দেখাইতে চায় না। আমরা কিছুদিন পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম যে, ঢাকার স্কুল কলেজের হোষ্টেলে উচ্চ-বর্ণের হিন্দু ছাত্রেরা মুসলমানদের সহিত এক ঘরে থাকিতে পারে; কিন্তু হিন্দু নমঃশূদ্রের সঙ্গে একঘরে থাকিতে গেলেই, তাহাদের জাতি যায়। আরও দুঃখের কথা এই যে, 'উচ্চজাতিদের' কুদৃষ্টান্তের প্রভাব সমাজের সর্ব্বস্তরে সংক্রামিত হইতেছে। প্রত্যেক "জাতিই", তার চেয়ে ঈষৎ 'অনুন্নত' অন্য জাতিকে দাবাইয়া রাখিতে ব্যস্ত। নিজেরা যে অধিকার চায়, অন্যকে তাহা দিতে রাজী নয়। সেন্সাসের রিপোর্টে লিখিত আছে—লোক গণনার সময় প্রত্যেক জাতিই নিজেদের বড় করিতে এবং অন্যকে "হীন ও ছোট" বলিয়া প্রমাণ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে। চাষী-কৈবর্ত্তেরা নিজেরা মাহিষ্য হইবার জন্য ব্যগ্র, কিন্তু জেলে, কৈবর্ত্ত পাটনী প্রভৃতিকে ঐ উপাধি ব্যবহার করিতে কিছুতেই দিবে না।

হিন্দু সমাজের বহু নিম্নজাতি ও অনুন্নত জাতি কিরূপভাবে ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে, আমরা তাহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

শতকরা হ্রাস বৃদ্ধি

জাতির নাম	১৯১১-২১	১৯০১-১১	১৯০১-২২
বাগ্দী	—১১·৮	—০·০	—১১·৯
বারুই	—৪·৩	—৮·৮	—১৩·৫
বাউরী	—৩·৪	—১·২	—২·২
ভুঁইমালী	—১০·৯	৩·০	—৮·২
ভুঁইয়া	—১২·৮	৩৮·৯	২১·১
ভূমিজ	—১২·৩	৭·৭	—৫·৫
চাষাধোবা	—৭৭·৪	৯৫·৩	—৫৫·৮
ধোবা	—০·৩	১·৬	১·৪
ডোম	—১৩ ৬	—৬ ৮	—২৪·৮
দোসাদ	—১২·৫	৪৭·৯	২৯·৪
গোয়ালা	—৯·৭	১·১	—৮·৫
হাড়ি	—১৪·৩	—৩·৮	—১৭·৭
যুগী	১·৩	৫·৩	৬·৮
চাষী কৈবর্ত্ত	৩·৪	৯·৫	১৩·২
জেলে কৈবর্ত্ত	১৭·৬	২৩·১	৪৪·৮
কলু	—১৪·০	—২·৫	—১৬·২
কপালী	—২·৯	—৭·৫	১০·৬
কুমার	—২·১	৪ ২	২·০
কুর্ম্মী	২·৬	১৪·৮	১৭·৯
মালাকার	—১০·৬	৯·২	—২·৪
ময়রা	—৩·৮	—১.৩	—৫·১
মুচি	—৮ ৩	৯·৩	০ ৩
নাপিত	—০·৭	৩ ৬	২·৮
পাটনী	—৩০·৭	০ ১	৩০·৬
পোদ	৯·৭	১৫·৫	২১·৬
সদগোপ	—৩·১	—১·৬	—৪·৬
সাঁওতাল	—৪·২	৯·৯	৫·২
সোণার (স্বর্ণকার)	—১৬·৫	—৫·৪	—২১·০
শূদ্র	—৩৪·১	—১৯·৯	—৪৭·২
সূত্রধর	—৫·৬	৪·৩	—০·৯
তাম্বুলী	—৫·৪	—৭·৬	—১২·৬
তাঁতি	—১·০	৩·২	২·১
তেলী ও তিলি	—১৪·১	৩·৮	—২·০
তিয়র	—১৮·৪	০·৮	—১৭·৭

এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি নিম্নবর্ণের হিন্দুজাতি তাহাদের প্রধান প্রধান বাসভূমিতে কেমন ভাবে কমিয়াছে দেখুন—

		শতকরা হ্রাস
জাতির নাম	বাসস্থান	১৯০১—২১
আগুরী	বর্দ্ধমান-বাঁকুড়া-হাওড়া	—১০·৬
চাঁই	মুর্শিদাবাদ-মালদা-রাজসাহী	—৯·৪
চাসাতী	মালদা	—৩৩ ৩
ধানুক	মুর্শিদাবাদ-মালদা	—২০·৯
গঙ্গাই	মালদা-দিনাজপুর	—৭·০
হদি	ময়মনসিংহ	—১৪·৫
হাজঙ	ঐ	—১০·০
কন্দারা	মেদিনীপুর	—৮·২
ফান্তা	ঐ	—৫৬ ৬
খেন	দিনাজপুর-জলপাইগুড়ি-রঙ্গপুর	—১২·৩
কোনাই	বীরভূম	—১ ৬
কোড়া	বর্দ্ধমান-বীরভূম-বাঁকুড়া	—২১·০
কোটাল	বর্দ্ধমান	—৪১·৬
মেচ	জলপাইগুড়ি	—৫১ ৮
নাগর	মালদা	—১৫·৬
নায়ক	বাঁকুড়া-মেদিনীপুর	—৬২·২
পুণ্ডরী	বীরভূম-মুর্শিদাবাদ-মালদা	—৪০·৪
রাজু	মেদিনীপুর	—১১·৭
সামন্ত	বাঁকুড়া	—১৫·৪

আনন্দবাজার পত্রিকা

বিবিধ-প্রসঙ্গ

মহাকবি কালিদাস কি বাঙ্গালী ?

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম-এ

(পূর্ব্ব প্রবন্ধের অনুবৃত্তি)

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ কবিভূষণ মহাশয়ের উপস্থাপিত পরিপোষক প্রমাণগুলির যথাক্রমে আলোচনা করিব।

(৩) গ্রীষ্মের উপভোগক্ষমত্ব

কবিভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—"কালিদাস যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—সে দেশে উপভোগক্ষম গ্রীষ্ম ঋতু আছে। সে দেশে প্রচণ্ড ও অনুপভোগ্য গ্রীষ্ম নাই। কালিদাসের জন্মভূমিতে গ্রীষ্মের নামে গান বাঁধে, মধুমাসের নামে গান বাঁধে না! সে দেশের লোক 'মধুমাস এল সজনি' বলিয়া পথে পথে গান গাহিয়া বেড়ায় না। শকুন্তলা-প্রণয়নাবস্থায় কালিদাস যে রাজার সভাসদ ছিলেন, তিনি মধু মাসের বা মধুৎসবের বর্ণনার জন্য লালায়িত। জগতের সমুদায় কবি বসন্তকালকে উপভোগের সময় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আলঙ্কারিকগণও বসন্তকালকে উপভোগ্যই বলিয়া কবি-সময়-প্রসিদ্ধি বা অবশ্য বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

গ্রীষ্মকাল সে উপভোগার্হ এ কথা শকুন্তলা ব্যতীত পৃথিবীর কোনও কবির গ্রন্থ হইতে বাহির করিতে পারিবেন না। নীতি শাস্ত্রে পর্য্যন্ত লেখে—বসন্তে ভ্রমণং কুর্য্যাৎ—ইত্যাদি। বসন্তকালে ভ্রমণ করিবে, ঘি দিয়া ভাজিয়া কচি কচি নিমের পাতা খাইবে, ইহা যদি না করিতে পার, তবে তেমন প্রাণ রাখিও না, আগুণে পুড়িয়া মরিও। * * *

"শ্রাদ্ধে—"বসন্তায় নমস্তভ্যং" এই কথা বলিয়া বসন্তকালের প্রাধান্য দিয়াছেন।

"যে দেশে বসন্তের এমন আধিপত্য, সে দেশে কি না তিনি উপভোগক্ষম গ্রীষ্মকালের উল্লেখ করিয়া, নিজে এক ছড়া কাটিলেন এবং তাঁহার প্রিয়তমা নটীও গ্রীষ্ম সময় অধিকার করিয়াই এক গান গাহিলেন। এই "অমার্জ্জনীয়" দোষের জন্য কালিদাসের নাম কবি-সমাজ হইতে কাটিয়া দেওয়া উচিত। অলঙ্কার-শাস্ত্রের দোষ পরিচ্ছেদে, এ কথা বিশেষ ভাবে সমালোচিত হওয়া উচিত। কারণ, তিনি "কবি সময়ের অপ্রসিদ্ধ" বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালী—জগতের মতের বিরুদ্ধে, কেবলমাত্র বাঙ্গালী বিদ্বজ্জনগণের পরিতোষ আকাঙ্ক্ষা করিয়া, অচির-প্রবৃত্ত উপভোগক্ষম গ্রীষ্মকালের বর্ণনা করিয়াছেন।"

কবিভূষণ মহাশয়ের এই একতরফা ডিক্রীর বিরুদ্ধে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, কালিদাসের জন্মভূমিতে প্রচণ্ড ও অনুপভোগ্য গ্রীষ্ম নাই, ইহা তিনি কেমন করিয়া জানিলেন? ঋতু-সংহারের প্রথমেই আছে গ্রীষ্মকাল 'প্রচণ্ড সূর্য্যঃ স্পৃহনীয় চন্দ্রমাঃ' আবার গ্রীষ্মের বর্ণনার শেষে আছে—

> 'পটুতর-দব-দাহাৎ প্লুষ্ট-শস্প-প্ররোহাঃ
> পরুষ-পবন-বেগাৎ ক্ষিপ্ত-সংশুষ্ক-পর্ণাঃ।
> দিনকর-পরিতাপাৎ ক্ষীণ-তোয়াঃ সমন্তাৎ
> বিদধতি ভয়মুচ্চৈর্বীক্ষ্যমানাঃ বনান্তাঃ॥"

যে ঋতু চির-প্রিয় বনভূমির নয়ন-মনঃ-প্রীতিকর সৌন্দর্য্যে দর্শকের হৃদয়ে আনন্দ না জন্মাইয়া, ভীষণতা দ্বারা উৎকট ভয়েরই উৎপাদন করিয়া থাকে, তাহাকে 'প্রচণ্ড' বা 'অনুপভোগ্য' বলা যাইতে পারিবে না—এমন কি কথা আছে? কবিভূষণ মহাশয়েরও বোধ হয় ঋতু-সংহারের গ্রীষ্ম বর্ণনার এই ভাবের শ্লোকগুলি পড়িয়া মনে খট্‌কা লাগিয়াছিল, তাই তিনি এগুলি চাপিয়া যাইয়া তাঁহার চতুর্থ প্রমাণের বিবরণ প্রসঙ্গে "ঋতু-সংহারের প্রথম শ্লোক তাঁহার শ্বশুরালয়ের বর্ণনা, আর শকুন্তলার এই শ্লোক * তাঁহার জন্মভূমির বর্ণনা।"—এইরূপ একটী অমূলক উক্তি করিয়া ঋতু-সংহারের বিরুদ্ধ প্রমাণগুলি উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বস্তুতঃ স্বর্গীয় পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞদিগের মতে ঋতু-সংহার কাব্যখানা কালিদাসের প্রথম রচনা এবং শকুন্তলা নাটক তাঁহার প্রৌঢ় বয়সের রচনা বলিয়াই অনুমিত হইয়াছে। রচনা-গত আভ্যন্তরীণ প্রমাণ-মূলক এই সিদ্ধান্তটী অগ্রাহ্য করিয়া ইহার বিপরীত সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করার উপযুক্ত কোন কারণই আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। শকুন্তলার বঙ্গদেশীয় হস্তলিপি পুথিগুলিতে প্রস্তাবনায় সূত্রধারের উক্তিতে আছে—"আর্য্যে! ইয়ং হি রসভাববিশেষ দীক্ষাগুরোর্বিক্রমাদিত্যস্য অভিরূপ ভূয়িষ্ঠা পরিষৎ।" ইহা দ্বারা কালিদাস যে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ থাকা অবস্থায় শকুন্তলা প্রণয়ন করেন, ইহাই প্রমাণিত হয়। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের হস্তলিপি পুথিগুলিতে এইরূপ পাঠ নাই বলিয়া আপত্তি করা যাইতে পারে; কিন্তু এই পাঠ অস্বীকার

* "সুভগ সলিলাবগাহা" ইত্যাদি ৪র্থ প্রমাণরূপে উপস্থাপিত শকুন্তলা নাটকের সূত্রধারের উক্তি শ্লোক। লেখক

করিলেও বহু প্রমাণসিদ্ধ ঐ বিষয়টী স্বীকার না করিয়া গত্যন্তর নাই। সুতরাং কালিদাস বাঙ্গলা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া যৌবনে বা প্রৌঢ় অবস্থায় মালব-রাজ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ হইয়াছিলেন, কবিভূষণ মহাশয়ের এইরূপ অনুমানের সহিত পূর্ব্বোক্ত বিশেষজ্ঞদিগের সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্য হইয়া পড়ে। কবিভূষণ মহাশয়ের উপস্থাপিত অনেক যুক্তিতেই দেখা যায় যে, তিনি, যাহা যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা আবশ্যক, সেইরূপ সিদ্ধান্তটিকেই প্রথমে স্বীকার করিয়া লইয়া—উহার পোষক এমন সকল প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন, যাহা ঐকান্তিক (irrevertable) বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যাহা হউক, আমরা তর্ক স্থলে কালিদাসের জন্মভূমি বঙ্গদেশ ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াই বলিব যে, কালিদাসের জন্মভূমিতে 'বার-মাস্তা' ব্যতীত শুধু গ্রীষ্মের নামে গান বাঁধে না; কেহ বাঁধিলেও তাহাতে গ্রীষ্মের প্রশংসা—গ্রীষ্মের উপভোগক্ষমত্ব অপেক্ষা গ্রীষ্মের নিন্দা—গ্রীষ্মের বিড়ম্বনাই অধিক ফুটিয়া থাকে। কবিভূষণ মহাশয় 'মধু মাস এল সজনি"—এরূপ গান যে শোনেন নাই, ইহাতে বড়ই আশ্চর্য্য হইয়াছি। আমাদের বাল্যকালে "বসন্ত আগত কেন না লো সজনি!"—এই গানটী আমরা যেখানে সেখানে গাহিতে শুনিয়াছি। ঈশ্বর গুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার কোনও কবি যে কোন না কোন সময়ে মধু মাসের নামে গান না বাঁধিয়াছেন—এমন ত আমরা দেখি নাই। বসন্তকে ঋতুগুলির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিয়াছেন বলিয়াই যে কবিরা গ্রীষ্মের কোনও কদর করেন না,—এক শকুন্তলা ব্যতীত কোন কবির গ্রন্থ হইতে যে গ্রীষ্মকাল উপভোগ্যাহ—এমন কথা বাহির করা যায় না, ইহা দুঃসাহসিকের উক্তি বটে। উত্তাল-তরঙ্গ-সমাকুল ঝটিকা-তাড়িত নীলাম্বুরাশির ভীমকান্ত সৌন্দর্য্যের ন্যায়—দাবাগ্নি-দগ্ধ পত্র-হীন তরু-রাজি বেষ্টিত শূন্য মরুভূমিবৎ দিগন্ত-বিস্তৃত বনভূমিরও একটা রৌদ্র-রসের উদ্দীপক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি আছে; কবির দৃষ্টি উহাতেই বিস্ময়-বিমিশ্র মাধুর্য্য অনুভব করিয়া, উহারই রসাত্মক শব্দ-চিত্র অঙ্কিত করিতে কবিকে অনুপ্রাণিত করিয়া থাকে। তার পরে, দারুণ শীত কিংবা দারুণ গ্রীষ্ম বিলাসী ব্যক্তিদিগের পক্ষে যতই উদ্বেগ-জনক হউক না কেন, পুরুষকারের দ্বারা সেই শীত-গ্রীষ্মের প্রতিকূলতাকে পরাজিত করিয়া, এমন কি, উহাদিগকে উপভোগের যথেষ্ট অনুকূল উপকরণ রূপে পরিণত করিয়া, দুঃখ হইতেও সুখ অনুভব করা মানবের অসাধ্য নহে। কবি-কল্পনাকে এস্থলে বিলাসী-দিগের বিলাস-বাসনা চরিতার্থের পক্ষে অপূর্ব্ব সহায়তা করিতেই দেখা গিয়াছে। অন্য সাহিত্য হইতে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা অনাবশ্যক; কবিভূষণ মহাশয় কালিদাসের 'ঋতু-সংহার' ও ভর্ত্তৃহরির সুপ্রসিদ্ধ 'শৃঙ্গার-শতক' কাব্যেই ইহার অনেক সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবেন। বাঙ্গালা দেশে শীত ও গ্রীষ্ম—উভয়ই অপেক্ষাকৃত মৃদু; কালিদাস বাঙ্গালী হইলে এবং ঋতু-সংহারে বাঙ্গলা দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার বর্ণনা করিয়া থাকিলে, শীত ও গ্রীষ্ম অনুপভোগ্য না হইতে পারে; কিন্তু ভর্ত্তৃহরি ত বাঙ্গালী ছিলেন না; তাঁহার 'শৃঙ্গার-শতক' কাব্যে গ্রীষ্ম এত উপভোগ্য হইল কি প্রকারে? সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই 'উপভোগ্য' বা 'অনুপভোগ্যের' যুক্তিটার উপর বেশী নির্ভর করা চলে না।

কবিভূষণ মহাশয় 'বসন্তে ভ্রমণং কুর্য্যাৎ' ইত্যাদি শ্লোকটার যে অভিনব অর্থ করিয়াছেন—তাহা পরিহাসোক্তি না বাস্তবিক, প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। পরে বুঝিয়াছি—

"বসন্তে ভ্রমণং কুর্য্যাৎ অথবা নিম্ব সেবনম্।
অথবা যুবতী সঙ্গঃ কিংবা বহ্নি নিষেবণম্॥"

এই স্বাস্থ্যরক্ষার আয়ুর্ব্বেদসম্মত উপদেশ-পূর্ণ শ্লোকটার 'বহ্নিনিষেবণম্' কথাটাই এই হাস্যজনক ভ্রমের উৎপাদন করিয়াছে।

শ্লোকটার উদ্দেশ্য উপভোগক্ষমত্ব হিসাবে বসন্তের প্রশংসা নহে,—কেন না তাহা হইলে, আর আর উপভোগ্য বস্তুগুলির কথা যাহাই হউক, নিম্ব-ভক্ষণ যে স্বাস্থ্য-রক্ষা ব্যতীত অন্য কারণে তেমন উপাদেয় নহে, তাহা বোধ হয় কবিভূষণ মহাশয়ও স্বীকার করিবেন। শ্লোকে ঘিয়ে ভাজার কোন কথা নাই—ইহা ব্যাখ্যা-কার কবিভূষণ মহাশয়ের কল্পনা মাত্র। তিনি কি জানেন না—

'ঘিয়ে ভাজ নিমের পাত্,—
তবু না ছাড়ে আপনা জাত্।'

বস্তুতঃ শ্লোকটীতে কফাধিক্য-জনক বসন্ত ঋতুর উপযোগী কয়েকটী সহজ-সাধ্য স্বাস্থ্য-রক্ষার উপায়, যথা—বন-ভ্রমণ, নিম্ব-পত্র ভক্ষণ ও আগুনের তাপ প্রভৃতি লওয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। বৈদ্যক-শাস্ত্রে উল্লিখিত চতুর্ব্বিধ কার্য্যের কোন একটীর ফলেই কফের অপচয় হেতু বসন্তকালে স্বাস্থ্য বর্দ্ধিত হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে।

কবিভূষণ মহাশয় আর একটা কথার অর্থ বড় ভুল বুঝিয়াছেন; আলঙ্কারিকদিগের বর্ণিত 'কবি-সময়-সিদ্ধ' বিষয়গুলির তাৎপর্য্য এই যে, সুন্দরীদিগের চরণ-তাড়নে অশোক-বৃক্ষের অকালে পুষ্পোদ্গম ইত্যাদি ঘটনা প্রকৃত-পক্ষে কোথায়ও সঙ্ঘটিত হইতে দেখা না গেলেও প্রাচীন কবিগণ চিরকাল ধরিয়া ঐ রূপ বর্ণনা করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া কবিদিগের 'সময়' অর্থাৎ 'আচরণ' ("সময়ঃ শপথাচার-কাল-সিদ্ধান্ত-সংবিদঃ") অনুসারে ঐরূপ বর্ণনা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করা আবশ্যক। এইরূপ কাল্পনিক 'কবি-সময়-সিদ্ধ' বিষয়ের সংখ্যা খুব বেশী নহে। এই বিষয়গুলির মধ্যে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ নাই—সেগুলিকে অপ্রকৃত বলিয়া বর্জ্জন করিতে হইবে—ইহা বলিলে উন্মত্তের প্রলাপ হইয়া পড়ে। গ্রীষ্মকে অনুপভোগ্য বলিয়াই বর্ণন করিতে হইবে—কোনও অলঙ্কার-শাস্ত্রেই ইহা বলে না। সুতরাং 'কবি-সময়ের অপ্রসিদ্ধ' (?) গ্রীষ্মের উপভোগক্ষমত্বের বর্ণনা করিয়া কালিদাস কোনও অশাস্ত্রীয় বা অন্যায় কার্য্য করেন নাই। তিনি যে বিক্রমাদিত্যের সভাসদ ছিলেন, তাহা কবিভূষণ মহাশয়ও অস্বীকার করেন নাই—এ অবস্থায় তিনি "কেবলমাত্র বাঙ্গালী বিদ্বৎ (?) গণের পরিতোষ আকাঙ্ক্ষা করিয়া অচিরপ্রবৃত্ত উপভোগক্ষম গ্রীষ্মকালের বর্ণনা করিয়াছেন" ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? শকুন্তলায়

গ্রীষ্ম-কালের যে 'অচিরপ্রবৃত্ত' বিশেষণটী দেওয়া হইয়াছে, আমাদিগের বিবেচনায় উহার তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলেই, এ সম্বন্ধে সকল সন্দেহ দূর হইতে পারে। বয়ঃসন্ধির ন্যায় ঋতুরও সন্ধি আছে। শৈশব ও যৌবনের সন্ধি কৈশোরের মত বসন্ত ও গ্রীষ্মের সন্ধিটাও বেশ রমণীয় বটে। গ্রীষ্ম অধিক অগ্রসর হইলে আর উহার এই রমণীয়ত্ব বা উপভোগক্ষমত্ব তেমন থাকে না, সে জন্যেই বোধ হয় কালিদাস "অচিরপ্রবৃত্তং উপভোগক্ষমং গ্রীষ্মসময়ং" বলিয়াছেন। এই কথাটী বুঝিতে না পারিয়াই কবিভূষণ মহাশয় এই সকল জল্পনা-কল্পনার বিস্তার করিয়াছেন।

শকুন্তলার প্রস্তাবনায় সূত্রধারের উক্তি—

"সুলভ-সলিলাবগাহাঃ
পাটল-সংসর্গ-সুরভি-বন-বাতাঃ।
প্রচ্ছায়-সুলভ-নিদ্রা
দিবসাঃ পরিণাম-রমণীয়াঃ।"

আর্য্যা ছন্দের উৎকৃষ্ট শ্লোকটীকে লক্ষ্য করিয়া, কবিভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—'তিনি * উপভোগক্ষম গ্রীষ্মকালের উল্লেখ করিয়া নিজে এক ছড়া কাটিলেন, এবং তাঁহার প্রিয়তমা নটীও গ্রীষ্মসময় অধিকার করিয়াই এক গান গাহিলেন।'' ভারতের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ কবিকে ছড়া-কাটা কবির সর্দ্দার ও নটীকে তাঁহার "প্রিয়তমা" রূপে বর্ণনা করিয়া কবিভূষণ মহাশয় তাঁহার প্রিয় স্বদেশী কবি-চূড়ামণির কবিত্ব ও চরিত্রের মাহাত্ম্য কতদূর বাড়াইয়াছেন কিংবা কমাইয়াছেন, সে বিচার এখানে করিব না; তাঁহার কথার উত্তরে শুধু এইমাত্র বলিব যে, তিনি গ্রীষ্মের ভক্ত বলিয়া গ্রীষ্মের নামে ছড়া কাটেন নাই, ঘটনা-চক্রে অচির-প্রবৃত্ত গ্রীষ্ম কালে বিক্রমাদিত্যের রাজ-সভায় তাঁহার শকুন্তলা নাটকের প্রথম অভিনয় বোধ হয় প্রদর্শিত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি তিনি 'তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা' স্বরূপ গ্রীষ্মের সময়োচিত বর্ণনা সংযোজিত করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষেই যদি কালিদাস বসন্ত অপেক্ষা গ্রীষ্মেরই অধিক ভক্ত হইতেন, তাহা হইলে কুমারসম্ভব কাব্যের তৃতীয় সর্গে মহাদেবের ধ্যান-ভঙ্গের প্রসঙ্গে আমরা অকালে বসন্তের অবতারণার পরিবর্ত্তে গ্রীষ্মেরই অপূর্ব্ব বর্ণনা দেখিতে পাইতাম। বস্তুতঃ বাঙ্গালা দেশেও গ্রীষ্ম অপেক্ষা পুষ্প-রাজি-সমাকীর্ণ নাতিশীতোষ্ণ বসন্তই যে অধিক রমণীয় ও 'উপভোগক্ষম' ইহা কাহারও অজ্ঞাত নহে; এ অবস্থায় বসন্তকে ছাড়িয়া গ্রীষ্মের পক্ষে ওকালতী গ্রহণ করা যে দুঃসাহসের কার্য্য তাহা বলা বাহুল্য।

"(৪) সুলভ-সলিলাবগাহাঃ
পাটল-সংসর্গ-সুরভি-বন-বাতাঃ।
প্রচ্ছায়-সুলভ-নিদ্রা
দিবসাঃ পরিণাম-রমণীয়াঃ॥

"এই শ্লোকটীতে চারিটী রহস্য আছে। ইহার প্রত্যেক পাদে এক একটী রহস্য আছে। ইহা কালিদাসের জন্মভূমি গ্রীষ্মকালে কিরূপ সৌন্দর্য্য লাভ করে, তাহারই প্রতিচ্ছায়া। ঋতুসংহারের প্রথম শ্লোক তাঁহার শ্বশুরালয়ের বর্ণনা, আর শকুন্তলার এই শ্লোক তাঁহার জন্মভূমির বর্ণনা। মহাকবি কালিদাস যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে দেশে প্রচুর জল পাওয়া যায়, সে দেশের মেয়েরা সমস্ত দিন "পুকুরের" জলে গা ডুবাইয়া দিন কাটায়—সেটা 'পুকুরের' দেশ।

* * * *

"প্রচ্ছায় সুলভ নিদ্রা" এবং "স্নিগ্ধছায়া তরু" বাঙ্গালার নিজস্ব; অবঙ্গ আর্য্যাবর্ত্তে গ্রীষ্মে বৃক্ষ-তলে ছায়া থাকে না এবং তাহার নীচে শুইয়া নিদ্রাও দেখা যায় না। বর্দ্ধমানের জজ Mr. Cammiade আমার এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

"পাটল ফুল বা পারুল ফুল, এই বাঙ্গালাতেই মাত্র পাওয়া যায়। নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী পারুলে স্তূপের নিকটে একটী পারুল বীথি ছিল, তাহারই নামানুসারেই পারুলে বা পাড়ুলে গ্রাম হইয়াছিল। গ্রাম্য ছড়ায় এই ফুলের নাম "পারুলী।"

"দিবসের পরিণাম বা বৈকাল বেলা। তিনি গ্রীষ্মের অপরাহ্নকে বলিয়াছেন "দিনান্তরম্য" "দিবসাঃ পরিণাম রমণীয়াঃ।" এই গ্রীষ্মের দিনান্ত রম্যত্ব এবং পরিণাম রমণীয়ত্ব একমাত্র বাঙ্গালা দেশেই সম্ভবে। ইহা হিন্দুস্থানে সম্ভবে না। সেখানে গ্রীষ্মের দিবসের পরিণামে "লু" চলে। বৈকালে আর গৃহের বাহির হওয়া যায় না।

* * * *

অতএব দিনান্তরম্য বাঙ্গালার গ্রীষ্মকালের বৈকাল বেলা।"

কবিভূষণ মহাশয়ের এই চতুর্থ প্রমাণের সম্বন্ধে প্রথমেই বক্তব্য যে, ঋতুসংহারের প্রথম শ্লোক কালিদাসের শ্বশুরালয়ের † বর্ণনা আর শকুন্তলার 'সুলভ সলিলাবগাহাঃ' ইত্যাদি শ্লোক তাঁহার জন্মভূমির বর্ণনা —এরূপ অনুমান করার কোনই কারণ নাই। বরং তিনি পরিণত বয়সে বিক্রমাদিত্যের রাজ-সভায় অবস্থানকালেই যে শকুন্তলা প্রণয়ন করেন—ইহার স্বপক্ষেই আভ্যন্তরীণ ও অন্তর্বিধ প্রমাণ আছে। আমরা কবিভূষণ মহাশয়ের তৃতীয় প্রমাণের আলোচনা-প্রসঙ্গে এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি, এখানে পুনরালোচনা অনাবশ্যক।

হিন্দুস্থানে কি পুকুর নাই? সেখানে বাঙ্গালা অপেক্ষা গ্রীষ্মাতিশয্যের জন্য স্নান যে অধিক প্রীতিকর হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। অবঙ্গ আর্য্যাবর্ত্তে গ্রীষ্মে বৃক্ষতলে ছায়া থাকে না এবং তাহার নীচে শুইয়া নিদ্রাও দেখা যায় না—এই উক্তি সম্পূর্ণ অমূলক। আর্য্যাবর্ত্তে গ্রীষ্মকালে সকল প্রকার পত্রাভাব ঘটে না; সুতরাং উহার নীচে শুইয়া নিদ্রা অসম্ভব নহে। বঙ্গদেশেও এ সময়ে সকল গাছে সমান পত্র থাকে না; সুতরাং এ দেশেও 'প্রচ্ছায়' অর্থাৎ প্রকৃষ্ট-ছায়া-যুক্ত স্থানেই নিদ্রা সুলভ হয়। হিন্দুস্থানেও আম্র, বট প্রভৃতি 'প্রচ্ছায়'

* অর্থাৎ সূত্রধার-রূপী কালিদাস। লেখক

† অর্থাৎ কিংবদন্তী অনুসারে কালিদাসের শ্বশুরালয় মালব-দেশের। লেখক

বৃক্ষতলে গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে প্রাচীন লোকদিগকে নিদ্রা যাইতে দেখা যায়। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে হিন্দুস্থান-প্রবাসী অনেক বাঙ্গালীই সাক্ষ্য দিতে পারেন; এজন্য বিলাতী সাক্ষী ডাকিবার কোনই প্রয়োজন দেখি না। ভরসা করি, যৌবনে দীর্ঘকাল সুদূর আর্য্যাবর্ত্তের প্রবাসী 'ভারতবর্ষের' সম্পাদক রায় বাহাদুর অনুগ্রহপূর্ব্বক এ সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতার ফল প্রকাশ করিলে, কবিভূষণ মহাশয়ের সন্দেহ দূর হইতে পারিবে।

কালিদাসের বর্ণিত 'পাটল' ফুলকে কবিভূষণ মহাশয় সোজাসুজি 'পারুল' ফুল বলিয়া বুঝিয়াছেন; কিন্তু তাহা নহে। বাঙ্গালায় যাহা 'পারুল' নামে পরিচিত, ঐ ফুল মধুর জন্যে অভিধানে 'অলিপ্রিয়' নামে অভিহিত হইলেও, উহা সুগন্ধের জন্য মোটেই প্রসিদ্ধ নহে। সংস্কৃতের কাব্য-সাহিত্যে 'পাটল' বা 'পাটলা' নামে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা 'পারুল' ফুল নহে; উহা এক জাতী পাটল-বর্ণ সেউতী গোলাপ। সেউতীর সংস্কৃত নাম 'শতপত্রী'; উহা হইতে প্রাকৃত 'সঅবত্তি' ও অপভ্রংশ 'সবতি' 'সেঅতি' সিদ্ধ হইয়াছে। স্যর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের "শব্দ-কল্পদ্রুম" অভিধানে লিখিত আছে—"শতপত্রী (স্ত্রী) পুষ্পবিশেষ; সেউতী ইতি ভাষা। পাটলবর্ণাসৌ গোলাব ইতি বদন্তি।" এই সেউতী গোলাব উত্তর পশ্চিমের দেরাডুন প্রভৃতি কোন কোন অঞ্চলে বন্য-অবস্থায় প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয় ও উহার সুগন্ধে বসন্তকালে বন-ভূমি সুবাসিত হইয়া থাকে—বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি।

বাগ্‌ভট প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ "অষ্টাঙ্গ-হৃদয়" নামক বৈদ্যক-গ্রন্থে ঋতু-চর্য্যা বর্ণন-প্রসঙ্গে গ্রীষ্মে তাপ-শান্তির জন্যে 'পাটলা-বাসিত' জল ব্যবস্থিত হইয়াছে। অদ্যাপি কোনও কোনও স্থলে প্রাচীন প্রথামতে পানীয় জলে গোলাবের পাপ্‌ড়ি ফেলিয়া রাখা হয়; এজন্য গন্ধ-হীন পারুল ফুলের কেহ ব্যবহার করে না; এমনি কি সুগন্ধি বেলা, চামেলিরও করে না; তাহার কারণ বোধ হয় গোলাবের ভৈষজ্য-গুণ। শব্দ-কল্পদ্রুমে লিখিত আছে—"পাটলবর্ণাসৌ 'গোলাব' ইতি বদন্তি। তৎপর্য্যায়ঃ সুমনাঃ, ২ সুশীতা, ৩ শিববল্লভা, ৪ সৌম্যগন্ধী, ৫ শতদলা, ৬ সুবৃত্তা, ৭ শতপত্রিকা, ৮ অস্যাগুণাঃ—হিমত্বম্। তিক্তত্বম্। কষায়ত্বং। কুষ্ঠ-মুখস্ফোট-পিত্ত-দাহ-নাশিত্বম্। রুচ্যত্বম্। সুরভিত্বঞ্চ। ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ।"

সংস্কৃত কবিদিগের কাব্যে এই পাটলা' বা 'পাটল' পুষ্পের যেরূপ বর্ণনা দেখা যায়, তাহাতে উহাকে গোলাপ ব্যতীত আর কিছু মনে করা যায় না। ভর্ত্তৃহরি তাঁহার 'শৃঙ্গার-শতক' কাব্যে বসন্ত-বর্ণনায় লিখিয়াছেন,—

"অপ্যেতে নব-পাটলা-পরিমল-প্রাগ্‌ভার-পাটচ্চরা।
বান্তি ক্লান্তিহরাঃ সুশীতলতরাঃ শ্রীখণ্ড-শৈলানিলাঃ॥"

বসন্তে 'পাটলা' পুষ্পের নূতন বিকাশ; তাই, অচিরপ্রবৃত্ত গ্রীষ্মের বর্ণনায় দেখিতে পাই, পাটল-পুষ্পের সুগন্ধে বন-বায়ু আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে।

কালিদাস রঘুবংশের ঊনবিংশে বিলাসী রাজা অগ্নিবর্ণের বিহার-বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"যৎ স লগ্নসহকার মাসবং
রক্তপাটল সমাগমং পপৌ।
তেন তস্য মধুনির্গমাৎ কৃশঃ
চিত্তযোনিরভবৎ পুনর্নবঃ॥"

আসবের অর্থ 'মদ্য-বিশেষ'। "সীধুরিক্ষুরসৈঃ পক্কৈরপক্কৈরাসবো ভবেৎ"—অর্থাৎ পক্ক ইক্ষু-রস দ্বারা 'সীধু' এবং অপক্ক ইক্ষু-রস দ্বারা 'আসব' প্রস্তুত করা হয়। অপি চ 'আসবস্য গুণা জ্ঞেয়া বীজ দ্রব্যগুণৈঃ সমা' অর্থাৎ আসবের গুণ বীজ-দ্রব্যের (base) গুণের তুল্য। তাই বিলাসী অগ্নিবর্ণের সেবিত আম্রের রস ও গোলাব দ্বারা প্রস্তুত করা আসব পক্কান্নের ন্যায় স্নিগ্ধ ও বাজীকরণ-গুণ-বিশিষ্ট হওয়ায় তদ্দ্বারা উপভোগাতিশয্য ও গ্রীষ্মকালে স্বাভাবিক ধর্ম্ম হেতু ক্ষীণীভূত কন্দর্পও আবার নবীকৃত হইত।

সাতবাহনের সঙ্কলিত সুপ্রসিদ্ধ 'গাথা-সপ্তশতী' কাব্যেও 'রত্ত পাডল' (রক্তপাটল) পুষ্পের মধুর সুগন্ধের বর্ণনা আছে, যথা—

"রন্ধণ-কম্ম-নিউণিএ
মা জুরস্যু রত্ত-পাডল-সুঅন্ধম্।
মুহ-মারুঅং পিঅন্তো
ধূমাই সিহী ণ পজ্জলই॥"

অর্থাৎ—

রাগিও না, হে রন্ধন-কর্ম্ম-পরায়ণে!
তোমার গোলাপ-গন্ধী মুখানিল পানে
লোভাতুর এ যে বহ্নি,—তাই তো না জ্বলে;
উগারিছে ধূম পাছে যাও যদি চ'লে!

কবিভূষণ মহাশয়ের 'পারুল' ফুলকেই যদি গায়ের জোরে এই কবি-বর্ণিত 'পাটল' বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলেও এই পারুল 'বাঙ্গালাতেই' মাত্র পাওয়া যায়, এইরূপ একটা অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করা যায় কি? পক্ষান্তরে সেউতী গোলাপের বন কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ব্যতীত বাঙ্গালার কোথাও আছে বলিয়া শুনি নাই। সুতরাং শব্দকল্পদ্রুম ও অষ্টাঙ্গহৃদয় প্রভৃতির প্রামাণ্য ও কবিদিগের বর্ণনার যথার্থতা স্বীকার করিলে, শকুন্তলা নাটকখানি আর্য্যাবর্ত্তে তদ্দেশীয় কবির দ্বারাই রচিত হইয়াছিল, এরূপই সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

'দিনান্তরম্য' বিশেষণটী যে শুধু বাঙ্গালার পক্ষে নহে—আর্য্যাবর্ত্তের পক্ষেও যে উহা বিলক্ষণ খাটে—তাহা না বলিলেও হইবে। হিন্দুস্থানের সকল স্থলেই গ্রীষ্মের অপরাহ্নে "লু" চলে না; তার পরে কালিদাসের "অচিরপ্রবৃত্ত' বিশেষণ দ্বারাই এই সকল কুতর্ক খণ্ডিত হইয়াছে; সুতরাং এ সম্বন্ধে অধিক বাগাড়ম্বর অনাবশ্যক।

এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে 'স্নিগ্ধচ্ছায়াতরু' (?) বলিতে কবিভূষণ মহাশয় যাহা বুঝিয়াছেন, বস্তুতঃ জিনিসটা তাহা নহে। মেঘদূতের—"স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু" বাক্যের 'স্নিগ্ধ-

চ্ছায়াতরুষু' যার স্নিগ্ধ ছায়া-তরু অর্থাৎ নমেরু বৃক্ষ আছে যাহাতে সেই চিত্র-কূট পর্ব্বতের আশ্রমগুলিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। যদি স্নিগ্ধ-ছায়া-বিশিষ্ট যে কোনও তরু বুঝাইতে এই শব্দটার ব্যবহার হইত, তাহা হইলে পদটী 'স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু' না হইয়া 'স্নিগ্ধচ্ছায়তরুষু' হইত এবং তাহাতে ছন্দঃপতন অনিবার্য্য হইয়া পড়িত। এজন্যই মল্লিনাথ প্রভৃতি টীকাকারদিগকে বাধ্য হইয়া, স্নিগ্ধ 'নমেরু' বৃক্ষ-শোভিত' অর্থ করিতে হইয়াছে। 'নমেরু' একপ্রকার পার্ব্বত্য বৃক্ষ। কুমারের হিমালয়-বর্ণনা প্রসঙ্গে নমেরু বৃক্ষের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার সমতল ভূমিতে এই বৃক্ষ বোধ হয় খুব কমই জন্মিয়া থাকে।

(৫) ঋতুসাম্য

"কালিদাসের "ঋতুসংহার" পড়িলে বুঝা যায়, তিনি কোনও ঋতুকেই প্রাধান্য দেন নাই। তাঁহার যে দেশ জন্মভূমি, সে দেশে ছয় ঋতুই বরণীয়। তিনি হিন্দুস্থানী হইলে শীত ঋতুকে প্রাধান্য দিতেন, মধ্যদেশ বা পশ্চিম ভারতের লোক হইলে গ্রীষ্ম ঋতুকে প্রাধান্য দিতেন, দাক্ষিণাত্যে চির বসন্ত বিরাজমান। বাঙ্গালায় কোনও ঋতুরই প্রাধান্য নাই। এখানে ছয় ঋতু সমানভাবেই বরণীয়। তিনি বাঙ্গালার লোক ছিলেন—তাই ঋতুসংহারের ছয় ঋতুকেই সমানভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন।"

কবিভূষণ মহাশয়ের এই কথার উত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, প্রাধান্য দেওয়া বলিতে তিনি কি বুঝেন? অধিককাল ব্যাপিয়া অবস্থিতি কিংবা প্রকৃতির রমণীয়তা—ইহার কোন্‌টী প্রাধান্যের কারণ ধরিতে হইবে? অধিক-কাল-ব্যাপিত্ব নিশ্চিতই কবির চক্ষে প্রাধান্যের কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। রমণীয়তা হিসাবে ঋতুসংহারে যে গ্রীষ্মের বর্ণনা অধিক মনোরম হইয়াছে, এ কথা বোধ হয় উন্মত্ত ব্যতীত কেহই বলিতে পারিবেন না; সুতরাং ঋতুসংহারে প্রথমে গ্রীষ্মের বর্ণনা থাকিলেও তদ্দারা গ্রীষ্মের প্রাধান্য প্রমাণিত হয় না। ঋতুসংহারে গ্রীষ্মের দ্বারা বর্ষারম্ভ করার কি গূঢ় তাৎপর্য্য ছিল—তাহা আমরা প্রথম প্রবন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি—এখানে পুনরালোচনা অনাবশ্যক।

"(৬) বহুফলদাএ উপভোগক্ষমো * সহআরো। গ্রীষ্মকালে আম্রবৃক্ষের ফলাগমের পরিপূর্ণতা হেতু প্রৌঢ়াবস্থা ইহা কেবল এই নিম্নবঙ্গ বা রাঢ়েই সম্ভবে। কলিকাতায় যাহারা আম্র-ফলের ব্যবসা করেন তাঁহারা বলেন—বাঙ্গালার আমের নাম জ্যাঠো আম—ইহা জ্যৈষ্ঠ মাসের ফল, অথবা ইহা সমগ্র ভারতের আম্র ফল জাতির জ্যৈষ্ঠ আম বা অগ্রিম ফল। মুরশিদাবাদের নবাবদের আনীত আমের নাম—আষাঢ়ে আম। মালদহের আমের নাম শ্রাবুণে আম বা ইহা শ্রাবণ মাসে পাকে। বিহারের আদিম আমের—জঙ্গলী আমের নাম ভাদুই—যাহা ভাদ্র মাসে পাকে; কাশী অঞ্চলে আশ্বিনে আম, পয়রু প্যায়রাফুলী প্রভৃতি, ইহা আশ্বিন মাসে পাকে। মান্দ্রাজে শীতকালে আম পাকে। কাজেই গ্রীষ্মকালে আম্রবৃক্ষের প্রৌঢ়াবস্থা ইহা কেবল একমাত্র নিম্নবঙ্গ বা রাঢ়েই সম্ভবে।"

কবিভূষণ মহাশয়ের এই উক্তিগুলিও তাঁহার অন্যান্য অনেক উক্তির ন্যায় অতিরঞ্জিত। আম্রফলের ব্যবসাদার ও ভোক্তারা সকলেই জানেন যে কেবল বঙ্গের আম নহে,—কয়েক জাতি সুস্বাদু বোম্বাই আমও জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে। বোম্বাই ও মান্দ্রাজে প্রায় বার মাসই কোন না কোন জাতীয় আম পাওয়া যায়। বঙ্গদেশ অপেক্ষা অনেক বিলম্বে বেহার ও কাশী অঞ্চলে বর্ষার বৃষ্টি (Monsoon) আরম্ভ হওয়ায়, সে দেশে আম বিলম্বে পাকে। তবু সেখানে আষাঢ় হইতে পাকা আম পাওয়া যায়। কেবল দুই চারি রকমের আমই ভাদ্র ও আশ্বিন পর্য্যন্ত থাকে। কলিকাতার বাজারে উৎকৃষ্ট আমের মধ্যে বোম্বাই আমই সর্ব্বাগ্রে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠের প্রথম ভাগে পাওয়া যায়;—কবিভূষণ মহাশয় কিন্তু ভারতের প্রায় সকল প্রদেশের আমের বর্ণনা করিতে যাইয়াও যে জন্যেই হউক, বোম্বাই আমের উল্লেখ মাত্রও করেন নাই। যাহা হউক, হিন্দুস্থানে যে আষাঢ়ের প্রথম ভাগেই সুপক্ক আম্রের অভাব ছিল না, তাহা আমরা মেঘদূতের—

"ছন্নোপান্তঃ পরিণত-ফল-দ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈঃ" ইত্যাদি আম্র-কূট নামক পর্ব্বত-শিখরের বর্ণনায়ই দেখিতে পাই। আমরা প্রথম প্রবন্ধে কালিদাসের স্বীকৃত যে প্রসিদ্ধ শাস্ত্র-সম্মত ঋতু বিভাগের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতেই দেখা গিয়াছে যে, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়—এই দুইটী মাস লইয়া গ্রীষ্ম ঋতু গণিত হইয়াছে; সুতরাং গ্রীষ্ম কালে যে আর্য্যাবর্ত্তে সুপক্ক আম্র মিলে না—কেবল বঙ্গদেশেই মিলে এই উক্তির যথার্থতা, প্রাকৃতিক অবস্থা কিংবা কালিদাসের কাব্যের বর্ণনা কিছুর দ্বারাই সমর্থন করা যায় না।

বারান্তরে অন্যান্য প্রসঙ্গের অবতারণা করা যাইবে।

---

* 'উপভোগক্ষমো' নহে 'উঅভোঅক্খমো' প্রকৃত পাঠ বটে। লেখক

ভারতে চিনির ব্যবসায়

শ্রীশচীন্দ্রকুমার সরকার

চিনি কথাটা এখানে একটু ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। সাধারণ ভাষায় চিনি বলিতে শুধু "চিনিই" বুঝায়; গুড়, মিষ্টান্ন প্রভৃতি তাহার মধ্যে আসে না। কিন্তু এখানে চিনির মধ্যে গুড় প্রভৃতিকে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

চিনি পাঁচ প্রকার, যথা—গুড় (molasses), পরিষ্কার চিনি,

পাৎলা গুড় (treacle), চিনির দ্বারা প্রস্তুত মিষ্টান্ন (confectionery), ও স্যাকারিন্ (saccharin)।

আমরা যথাক্রমে এই পাঁচ প্রকার চিনির কথার আলোচনা করিব। প্রথমে আমদানির কথা আরম্ভ করি। পূর্ব্ববৎসরের তুলনায় ১৯২২-২৩ সালে চিনির আমদানি কিছু কম হইয়াছে। ১৯২১-২২ সালে সমস্ত ভারতবর্ষে সকল প্রকার চিনি মিলাইয়া মোট ৭৮২,৬৬৮ টন চিনির আমদানি হইয়াছিল; কিন্তু এ বৎসর (১৯২২-২৩) তাহা কমিয়া ৫০৪,০৯০ টন হইয়াছে। আমদানি কম হওয়ার আনুমানিক কারণ নিম্নে লিখিত হইল—

১। এ বৎসরের প্রথমে পূর্ব্ব বৎসরের দরুণ অনেক মাল মজুত ছিল।

২। গত বৎসর যাভা চিনির দর পড়িয়া যাওয়ায়, মহাজনদিগকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল; কাজেই তাঁহারা লোকসানের ভয়ে এ বৎসর বেশী চিনি কিনিয়া রাখিতে সাহস করেন নাই। কোন রকমে দৈনিক ক্রয়বিক্রয় বজায় রাখিয়া চলিয়াছিলেন।

৩। কিউবার গত বৎসরের প্রস্তুত ১,২৫০,০০০ টন চিনির অধিকাংশই মজুত রহিয়া গিয়াছিল; এবং সমস্ত পৃথিবীতে এ বৎসর গত বৎসর অপেক্ষা ৯৩৪,১৪২ টন চিনি অধিক প্রস্তুত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় আশা হইয়াছিল, এ বৎসর চিনির দর বেশী উঠিবে না; কাজেই মহাজনেরা বেশী চিনি খরিদ করেন নাই।

৪। আমদানি কম হওয়ার আরও একটি কারণ এই যে, এ বৎসর চিনির আমদানি শুল্কের হার শতকরা ১৫৲ হইতে শতকরা ২৫৲ হইয়াছে। বাজার নরম থাকায়, এই শুল্ক-বৃদ্ধির ফল ক্রেতারা তত বুঝিতে পারেন নাই।

এখন বিভিন্ন প্রকার চিনির কথা যথাক্রমে বলা যাক্।

প্রথমতঃ গুড় :—১৯২১-২২ সালে যে গুড় তৈয়ারি হয় ১৯২২-২৩ সালের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত তাহার ব্যবহার চলে; অতএব আমাদের জানিতে হইবে ১৯২১-২২ সালে এদেশে কত গুড় তৈয়ারি হইয়াছিল। আখ ও খেজুর এই উভয় প্রকার মিলাইয়া ১৯২১-২২ সালে মোট ২,৫৩২,০০০ টন গুড় প্রস্তুত হয়। তাহার পূর্ব্ববৎসরের ঐরূপ গুড়ের পরিমাণ ২,৪৪৮,০০০ টন ছিল; আর এবৎসর ১৯২২-২৩ সালে ২,৮৭৫,০০০ টন গুড় প্রস্তুত হইয়াছে, ইহার অধিকাংশই কিন্তু আগামী বর্ষে (১৯২৩-২৪) ব্যবহৃত হইবে। তবে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, এদেশে এত বেশী গুড় প্রস্তুত হওয়ার সম্ভাবনাও চিনির আমদানি কম হওয়ার অন্যতম কারণ। সীমান্ত প্রদেশ হইতে ৫৪১ টন গুড় এবার এদেশে আমদানি হইয়াছিল। গত বৎসর ঐ আমদানির পরিমাণ ৫২৩ টন ছিল। আবার এখানকার গুড় কিছু কিছু করিয়া যুক্তরাজ্য, সিংহল প্রভৃতি দেশে রপ্তানিও হইয়াছে। সীমান্ত প্রদেশগুলিতে এ বৎসর ভারতবর্ষ হইতে ৮,৭৭০ টন চিনি রপ্তানি হইয়াছে। তাহার মূল্য ২৮,১৩,৩১১ টাকা। গত বৎসর উক্ত রপ্তানির পরিমাণ ও মূল্য যথাক্রমে ৮,৮০৩ টন ও ৩০,১১,৬৬১ টাকা ছিল।

দ্বিতীয়তঃ, পরিষ্কৃত চিনি :—এ বৎসর (১৯২২-২৩) যুক্তপ্রদেশে দুইটি চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কিন্তু এবার পরিষ্কার চিনির দর অন্যান্য বৎসরের মত অত অধিক নহে বলিয়া চারিটি পুরাতন কারখানা কাজ বন্ধ করিয়াছে। ভারতবর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ৩১টি চিনির কারখানা আছে। ঐ কারখানাগুলিতে ১৯২১-২২ সালে মোট ৭৭,৬০০ টন পরিষ্কার চিনি তৈয়ারি হইয়াছিল, অর্থাৎ উক্ত বৎসর তৎপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৪,৫০০ টন চিনি বেশী প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৯২১-২২ সালে প্রস্তুত চিনি এই বৎসর খরচ হইতেছে। পুরাতন সেকেলে প্রথায় এবার অনুমান ৪০,০০০ টন চিনি প্রস্তুত হইয়াছিল। হিসাব ঠিক না পাওয়া যাওয়ায় অনুমানিক পরিমাণ দেওয়া হইল। তাহা হইলে মোট ১১৭,৬০০ টন পরিষ্কার চিনি এই আলোচ্য বৎসরের খরচের জন্য এদেশে প্রস্তুত হইয়াছে। তন্মধ্যে কতকাংশ এশিয়ার তুরস্ক, পারস্য, আরব, সিংহল প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হইয়াছে। এই রপ্তানির মোট পরিমাণ ৪৫৬ টন, ইহার মূল্য ২,১২,৫৫৬ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর ইহা অপেক্ষা ৭১৪ টন অধিক রপ্তানি হইয়াছিল। তৎপূর্ব্ব বৎসর অর্থাৎ ১৯২০-২১ সালে মোট রপ্তানির পরিমাণ ৩,৬১৪ টন ও মূল্য ৩১,২৮,০৩৮ টাকা। সমস্ত ভারতবর্ষে যে পরিমাণ পরিষ্কার চিনি প্রস্তুত হয়, তাহাতে এ দেশের সমস্ত খরচ সংকুলান হয় না। কাজেই বিভিন্ন দেশ হইতে চিনি আমদানি করিতে হয়। প্রধানতঃ যাভা মরিসস্ এবং ইয়োরোপ মহাদেশ হইতে এই অভাব পূরণ হইয়া থাকে। ১৯২২-২৩ সালে যত চিনি ভারতে আমদানি হইয়াছিল, তাহার শতকরা ৮৩ ভাগ যাভা, ৭ ভাগ মরিসস্, বাকি ৯ ভাগ ইয়োরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি সকলে মিলিয়া পাঠাইয়াছিল। যাভা হইতে এ বৎসর মোট ৩৭৩,৭০০ টন চিনি ভারতে আসিয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসর ইহা অপেক্ষা ২৫৪,৭০০ টন বেশী আমদানি হইয়াছিল। এই বৎসরে আমদানি চিনির মধ্যে বাংলাদেশ ১৫১,৬৪২ টন, বোম্বাই ১০৪,৫১৪ টন, সিন্ধুপ্রদেশ ৮৬,২০০ টন, ব্রহ্মদেশ ২২,৭০০ টন ও মান্দ্রাজ ৮,৭০০ টন লইয়াছিল। এবার মরিসসের চিনিও কম আমদানি হইয়াছিল। উহার পরিমাণ ৩১,৪০০ টন; আর পূর্ব্ব বৎসরের পরিমাণ ৬১,৬০০ টন। ইহার কারণ বোধ হয় মরিসস্ বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত ও যাভা হইতে ইংলণ্ডের নিকটতর বলিয়া তথাকার চিনি যুক্তরাজ্যে অধিক কাটতি হয়। জার্ম্মেনী, নেদারল্যাণ্ডস্, বেলজিয়ম্ এবং পোল্যাণ্ড হইতে এবার অনেক বীট চিনি এ দেশে আমদানি হইয়াছিল। বোম্বাই বন্দরেই এই চিনি বেশী আসিয়াছিল। কিন্তু সেখানে ভাল কাটতি না হওয়ায় আবার রপ্তানি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। নিম্নে যে হিসাব দেওয়া হইল, তাহাতে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বিভিন্ন বৎসরে এ দেশে পরিষ্কৃত চিনির আমদানির পরিমাণ বুঝা যাইবে—

	১৯১৩-১৪ যুদ্ধের পূর্ব্ব বৎসর	১৯১৯-২০	১৯২ -২১	১৯২১-২২	১৯২২-২৩
	টন	টন	টন	টন	টন
জাভা	৫৮৩,০০০	৩৭৯,৬০০	২০১,৮০০	৬২৩,৩০০	৩৭১,১০০
মরিসস্	১৩৯,৬০০	২০,৫০০	১১,৬০০	৬১,৬০০	৩১,৪০০
ষ্ট্রেটস্ সেটলমেণ্টস্	২,৯০০	১৮,১০০	৯,০০০	৫,১০০	২,৬০০
চীন সাম্রাজ্য	১,৫০০	১২,১০০	৫,৯০০	৪,৪০০	৪,৭০০
ইজিপ্ট	১০০	৩,৩০০	৪,২০০	২০০	১,০০০
জাপান	১০০	১,৪০০	১০০	৬০০	১০০
জার্ম্মানী	৭০০	"	১০০	১০০	৯০০০
অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরী	৭,৪০০	"	"	"	"
নেদার ল্যাণ্ডস্	"	"	১,৬০০	২,০০০	২,৯০০
বেলজিয়াম্	"	৫০০	১.৬০০	১২,৮০০	৪,৯০০
আমেরিকার যুক্তসাম্রাজ্য	"	১০০	২০০	২,৮০০	১০,৩০০
অপরাপর দেশ	১,১০০	১০০	১,০০০	৪,৭০০	৪,৭০০
মোট	৮০৩,০০০	৪০৮,৭০০	২৩৬,৯০০	৭১৭,৬০০	৪৪২,৪০০
দাম (লক্ষ টাকা)	১৪,২৯	২১,৮৪	১৬,৯১	২৬,৭৮	১৪,৮৫

এ বৎসর স্থলপথে আফগানিস্থান হইতে মাত্র ২ টন পরিষ্কার চিনি এ দেশে আসিয়াছিল। এইরূপে যত চিনি এ দেশে আমদানি হইয়াছিল, সব এখানে খরচ হয় নাই, কিছু আবার বিভিন্ন দেশে চালান দেওয়া হইয়াছিল। এ বৎসর এইরূপে মোট ৩২,৯৬২ টন পুনর্ব্বার রপ্তানি (re-exported) হইয়াছিল; ইহার দাম ২,৬২,৩৫,৩৩৮ টাকা। নিম্নে এই পুনঃ রপ্তানির সবিশেষ হিসাব দেওয়া হইল :—

পরিষ্কৃত চিনি পুনঃ রপ্তানির তালিকা

১২ মাস ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত

	পরিমাণ			দাম		
কোথায় রপ্তানি হইয়াছে	১৯২০-২১	১৯২১-২২	১৯২২-২৩	১৯২০-২১	১৯২১-২২	১৯২২-২৩
	টন	টন	টন	টাকা	টাকা	টাকা
যুক্তরাজ্য	২,৮০৮	"	১৫,৭০৮	২৩,৭০,৫৭৮	৫৭	৬৪,৮৫,৮৭৩
বেলজিয়াম	২,১৯১	"	"	১৭,৬৬,১৪৯	"	"
নেদারল্যাণ্ডস্	১,০২০	"	"	১০,৪৪,২৯৮	"	"
আসিয়ার তুরস্ক	১২,৭১৭	৭,০৮২	১৩,০৩০	১,০৮,৮৪,২৭৯	৪১,২৭,৮৮০	৫৯,০৫,৩৫৬
এডেন	১,১২১	৩,৬১৮	৩,২৫১	৮,৪৬,৮০৮	১৮,৫০,২৬২	১২,২০,৪০৫
আরব	১,৬৭৫	৫,৩৬৫	৫,৪৬৩	১২,৭৪,৬৮৭	২৫,৯৯,৪২৪	২১,২৯,৫২৭
পারস্য	৮,২৮৮	৬,১৫৯	৭,৫২১	৭০,০৬,৫৩৮	৩৬,১৪,২৫০	৩৩,৯২,১৬৮
সিংহল	৮৫৭	২,৫৭৩	২,৪৮৫	৬,২২,৮২৮	১৩,১৫,৮০৩	৯,১২,৫৪৫
ইজিপ্ট	২,২৩৮	৩৩৯	"	১৭,৯০,৫৬১	১,২৭,১৭০	"
[illegible]		২,৮১৩	৪,২৭৬	১৬,৪৮,০২৫	১২,১০,০৬৩	১৫,৪৯,২৭৯
আমেরিকার যুক্ত সাম্রাজ্য	৩১,৩৪৮	"	"	৭৭,৮৬,৭৪৯	"	"
অপরাপর দেশ	৬,৯৮৪	৪,৬৪৬	১১,২২৮	৫৪,০৪,৪৫৬	২১,৮৯,৫৮৪	৪৬,৪০,২৬৫
মোট	৭৩,৬৩১	৩২,৫৯৫	৬২,৯৬২	৬,২৮,৩১,৯৫০	১,৭০,৩৪,৪৯৬	২,৬২,৩৫,৩৩৮

এত গেল জলপথে পুনঃ-রপ্তানির হিসাব; ইহা ছাড়া স্থলপথে রপ্তানিও আছে। এ বৎসরও গত বৎসরের ন্যায় ৬,৩০০ টন চিনি স্থলপথে রপ্তানি হইয়াছিল। দামটা কিন্তু দুই বৎসরের দুই রকম—১৯২১ ২২ সালে দাম ছিল ৫০,৬৭,০২১ টাকা আর এবার দাম কমিয়া দাঁড়াইল ৩৫,৬১,২১৯ টাকা। ১৯২২ সালের ১লা এপ্রিল কলিকাতা, বোম্বাই ও করাচি বন্দরে যে চিনি মজুত ছিল, তাহার পরিমাণ ১৪ হাজার টন। আবার ১৯২৩ সালের মার্চ্চ মাসে যে পরিমাণ চিনি ঐসব বন্দরে মজুত রহিয়া গেল, তাহার পরিমাণ ৬৮,৫০০ টন। এবার জমাখরচ হিসাব করিয়া দেখিলে জানা যাইবে, কত চিনি আমরা খরচ করিয়াছি।

জমা—	টন
১৯২২ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে মজুত	৯৪,০০০
এ দেশে প্রস্তুত চিনি মোট	১১৭,৬০০
জলপথে এ দেশে আনীত চিনি	৪৪২,৪০০
স্থলপথে এ দেশে আনীত	২
	মোট ৬৫৪,০০২
খরচ—	
জলপথে পুনঃ রপ্তানির পরিমাণ	৬২,১৬২
„ রপ্তানির	৪৫৬
স্থলপথে রপ্তানির	৬,৬০০
১৯২৩ সালের ৩১এ মার্চ্চ তারিখে মজুত	৬৮,৫০০
	মোট ১৩৮,৫১৮

অতএব দেখা যাইতেছে, সারা বৎসরে মোট ৫১৫,৪৮৪ টন চিনি এ দেশে খরচ হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, পাৎলা গুড়—

এ বৎসর জলপথে ৬০,৮৭১ টন পাৎলা গুড় আমদানি হইয়াছে। ইহার দাম ৪২,৫৭,৬৭২ টাকা। এ দেশে আন্দাজ ১ লাখ টন গুড় এ বৎসর তৈয়ারি হইয়াছিল। এই গুড় মদ তৈয়ারি ও তামাক মাখা প্রভৃতি কার্য্যের জন্য শুধু ব্যবহার হয়।

চতুর্থতঃ, মিষ্টান্ন—

এ দেশে এ বৎসর ৭৩২ টন মিষ্টান্ন আমদানি হইয়াছিল। তাহার মূল্য ১৭,৮৮,৪১১ টাকা। ইহার সমস্তই এ দেশে খরচ হয় নাই। ৫১ টন মাল পুনঃ রপ্তানি হইয়া বিদেশে যায়। এ দেশে জাত মিষ্টান্নও অন্যান্য দেশে রপ্তানি হয়। এ বৎসর ২০ টন মাল রপ্তানি হইয়াছিল। তাহার দাম ৭৫,৬৭১ টাকা।

পঞ্চমতঃ, স্যাকারিণ—

ইহা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হইয়া থাকে। গত তিন বৎসরের আমদানির পরিমাণ ও দাম নিম্নে দেওয়া গেল—

১৯২০-২১	২৫ টন	৭,৪৪,২৬৮
১৯২১-২২	২১ „	৪,১৭,১৬৫
১৯২২-২৩	৪৪ „	৩,৮৬,৭২২

গত মার্চ্চ মাস হইতে ইহার আমদানি শুল্ক পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রতি পৌণ্ডে কুড়ি টাকা হয়, পূর্ব্বে উক্ত হার দাম হিসাবে শতকরা ২৫৲ ছিল

এই ত গেল বিভিন্ন প্রকার চিনির কথা। এখন দেখা যাউক, ভারতের কোন প্রদেশ কত পরিমাণ চিনি ব্যবহার করে। হিসাবে দেখা যায়, বাংলা দেশই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে চিনি আমদানি করে। এ বৎসর কিন্তু গত বৎসর অপেক্ষা বাংলা দেশে কম পরিষ্কৃত চিনি আসিয়াছিল। গত বৎসর আমদানি চিনির পরিমাণ ছিল ৩৪৮,৭২১ টন, এবার তাহা কমিয়া দাঁড়াইয়াছে ১৬০,১৬০ টন; দামও কমিয়াছে। গত বৎসরের দাম ১১,১৩ লাখ টাকা; এ বৎসরের দাম ৫,০১ লাখ টাকা। যাভা চিনির কম আমদানি—এই হ্রাসের কারণ। যাভা এবার অন্যত্র বেশী দর পাইয়াছিল বলিয়া ভারতের বাজারে যাভা চিনি বেশী আসে নাই; আর গত বৎসরের অনেক মজুত থাকায়, এবার বেশী দরে কেহ চিনি কিনে নাই। কাজেই এবারের আমদানি কম হইয়াছে। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করিবার আছে—গত বৎসর চিনির দর বেশী থাকায় এ বৎসর অনেকে আখের চাষ করিয়াছিল। ফলে গত বৎসর বাংলা দেশে যত পরিমাণ জমিতে আখের চাষ হইয়াছিল, এ বৎসর তাহা অপেক্ষা আরও শতকরা ১৪ ভাগ বেশী জমিতে ঐ চাষ হইয়াছিল। সমস্ত ভারতবর্ষে ১৯২১-২২ সালে ২,৩১৫ হাজার একার জমিতে আখের চাষ হইয়াছিল; এ বৎসর তাহা বাড়িয়া ২,৭২১ হাজার একার দাঁড়াইয়াছিল। বাংলা দেশ অপেক্ষা বোম্বাই কম চিনি ব্যবহার করিলেও অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা সে প্রদেশে বেশী চিনি খরচ হয়। তাহার পর সিন্ধু প্রদেশ, তাহার পর ব্রহ্মদেশ, এবং মান্দ্রাজে সব চেয়ে কম চিনি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গত তিন বৎসরে কোন প্রদেশে মোট কত চিনি আমদানি হইয়াছিল, তাহার হিসাব ফুটনোটে দেওয়া গেল।— *

কলিকাতায় সাদা যাভা চিনির দর এই বৎসর কোন্ মাসে কত ছিল, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

কলিকাতার বাজারে সাদা যাভার দর মণকরা

		সর্ব্বাপেক্ষা বেশী	সর্ব্বাপেক্ষা কম
এপ্রিল	১৯২২	১৫৷০	১৪৸৵০
মে	„	১৫৷/০	১৪৷৵০
জুন	„	১৫৷/০	১৫৷০
জুলাই	„	১৫৸/০	১৫৵১০
আগষ্ট	„	১৬৷/১০	১৫৷৵১০
সেপ্টেম্বর	„	১৬৷১০	১৫৵০

*	১৯২০-২১		১৯২১-২২		১৯২২-২৩	
	টন	টাকা	টন	টাকা	টন	টাকা
বাংলা দেশ	১৭৭,৭৫১	৬,৮২,৫৪,২০৫	৪,০৭,৬৭৩	১২,৪৪,৫৬,২২১	২১৯,২৫০	৫,৫৪,৭২,৫৯৭
বোম্বাই	৮২,৫৬৩	৬,৮১,১০,৬৫২	১,৬২,৬৫৮	৬,৭০,৯২,১৯৫	১,৫০,২০৯	৫,১৬,২১,৬০৪
সিন্ধু প্রদেশ	৫০,৫৪৯	৩,৩৪,৯৫,৫৩৬	১,৭৬,৯২১	৭,০০,৪২,৪৮৬	৯৭,৪২৫	৩,৫৫,৭০,৮২২
মান্দ্রাজ	১১,২১১	৬৬,৪৮,৩৫২	১৫,১১১	৬৬,৫৩,৫৯৯	৯,৮৬৪	৪০,১৫,৭২০
ব্রহ্মদেশ	১৩,৬২৭	৮৫,২০,৮৯৯	২০,৩০৭	৭৪,৮৩,৮০৭	২৪,২৫২	৮৬,২৯,১১৫
মোট	৩৪৩,৬৯১	১৮,৪০,২৯,৭৫৪	৭,৮২,৬৬৮	২৭,৫০,২৮,২৫৮	৫,০৪,০৩০	১৫,৩৮,৮৯,৯৬৮

অক্টোবর	„	১৫।১০	১৪৸৶১০
নভেম্বর	„	১৫।৶০	১৪।৶০
ডিসেম্বর	„	১৫৶০	১৪।৶০
জানুয়ারী	১৯২৩	১৪।৵১০	১৪৶০
ফেব্রুয়ারি	„	১৬৸৶০	১৪৶০
মার্চ্চ	„	১৯৸৵০	১৬।/০

এই তালিকা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সাদা বাস্তা চিনির দর গত ফেব্রুয়ারি মাস পর্য্যন্ত মণকরা ১৪৶০ আনা হইতে ১০।/১০ এর মধ্যে ছিল। তাহার পর পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চিনির দর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ দর এখানেও বাড়িয়া গত মার্চ্চ মাসে ১৯৸৵০ দাঁড়ায়। এই সব আলোচনা করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চিনির দর দেখিয়া সুবিধা মত চিনি ক্রয়বিক্রয়াদি করিলে ব্যবসায়ে লাভবান হওয়া যায়।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, উপরিউক্ত বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, ভারতে এই বৎসরে ৪৪২,৭০০ টন চিনি আমদানি হইয়াছে ও তাহার মূল্য ১৪,৮৫,০০,০০০ টাকা; আর এই দেশের কারখানায় ঐ সময়ে প্রস্তুত চিনি মোট ৭৭,৬২৮ টন, কাজেই যত চিনি এই দেশে প্রস্তুত হয়, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী চিনি খরচ হয়। অতএব বর্ত্তমান যুগে যখন সমস্ত বিদেশী দ্রব্য পরিহার করা আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, তখন আমাদিগকে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে, কি উপায়ে দেশের এই অভাব দূর করিতে পারা যায়। চিনি না হইলে চলিবে না। দেশী চিনি না পাইলে লোকে বিদেশী চিনি কিনিতে বাধ্য হইবে। আমাদের ধনী লোকেরা যদি চিনির কারখানা বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকদিগের সাহায্য লইয়া চিনির কারখানা খুলেন, তাহাতে তাঁহাদের অর্থাগমের পথও প্রশস্ত হয়, অথচ প্রতি বৎসর যে প্রায় এক কোটি টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে তাহাও বন্ধ হয়। এ বিষয়ে কৃষকেরও কর্ত্তব্য আছে। আখের চাষ বাড়াইতে হইবে, এবং ভাল আখের চাষ প্রচলন করিতে হইবে। ভারতের উত্তরাংশে এক প্রকার নূতন আখের চাষ পরীক্ষিত হইতেছিল, তাহার ফল খুবই আশাপ্রদ। এই পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে, এক বিঘা জমিতে যে পরিমাণ আখ জন্মে, পরীক্ষিত উপায়ে চাষ করিলে তাহার দেড় গুণ জন্মিতে পারে। ঐ আখের বীজ ঐ প্রদেশের চাষীদিগকে দেওয়া হইতেছে; এবং আশা করা যায়, অদূর-ভবিষ্যতে ভারতীয় কারখানায় আরও ১ লাখ টন চিনি প্রস্তুত হইবে।

এখন চিনির উপর আমদানি শুল্ক খুব বেশী আছে, কাজেই চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া কৃতকার্য্যতা লাভ করিবার ইহাই উপযুক্ত সময়। যাভার সমস্ত ঐশ্বর্য্য তাহার চিনির ব্যবসায়ে ফল, আমাদের সকল সুবিধা থাকা সত্ত্বেও, আমরা আমাদের মুখের অন্ন পরকে তুলিয়া দিতেছি, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে?

বিজ্ঞান ও শিল্প

শ্রীআশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এসসি, (বি-এচ্-ইউ)

এই বৈজ্ঞানিক যুগে বিজ্ঞানের প্রভাবকে স্বীকার করিয়া লওয়া ব্যতী অন্য কোনও উপায় নাই। বর্ত্তমান যুগে জাতীয় উন্নতি করিতে হইলে এই যুগধর্ম্ম বরণ করিয়া লইতে হইবে; নতুবা, অন্যান্য জাতির সহি সামঞ্জস্য থাকে না।

এককালে ভারতবর্ষ ধর্ম্মজগতে অগ্রণী ছিল; কিন্তু আজ তাহা কেবলমাত্র পুরাতনকে ধরিয়া থাকা ও নূতনকে অবজ্ঞা করা চলি না। বিজ্ঞানানুশীলন ব্যতীত এই কঠিন প্রতিযোগিতার দিনে জীবন সংগ্রামে জয়লাভ করা সম্ভবপর নহে।

যেমন সাহিত্য ও কলা-চর্চ্চায় আনন্দলাভ হয়, সেইরূপ বিজ্ঞান চর্চ্চাতেও বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ করা যাইতে পারে। প্রকৃ বৈজ্ঞানিক মাত্রেই এই বিমলানন্দ ভোগের অধিকারী। তিনি আহার নিদ্রা ভুলিয়া গিয়া, স্বীয় পরীক্ষাগারে (laboratory) বৈজ্ঞানি গবেষণায় নিযুক্ত থাকেন। যশ ও অর্থের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার নাই বিজ্ঞান-চর্চ্চাতেই তাঁহার আনন্দ। কথিত আছে, বিখ্যাত গ্রীক বৈজ্ঞানি আর্কিমিডিজ (Archimedes) যখন জলে নিমজ্জিত করিয়া বস্তু গুরুত্ব (Specific gravily) নির্দ্ধারণের তত্ত্ব অবগত হন, তখন তি আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন। সকল গণিতজ্ঞ পণ্ডিত ও ছা কোনও কঠিন সমস্যার সমাধান করিতে পারিলে, বিশেষ আনন্দ লা করিয়া থাকেন।

বিজ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা কিরূপে শিল্পোন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহ বর্ত্তমান সভ্যতা সাক্ষ্য দিতেছে। পদার্থ-বিদ্যার (physics (বিদ্যুদ্বিজ্ঞান ইহার অন্তর্বর্ত্তী) প্রয়োগে, ইঞ্জিন (Engine), মোটা (motor), ডাইনামো (Dynamo) প্রভৃতির সৃষ্টিতে বর্ত্তমা কলকারখানার আবির্ভাব হয়। উদ্ভিদতত্ত্ব (Botany) ও জীবতত্ত্বে (Zoology) বর্ত্তমান চিকিৎসাশাস্ত্রের বিকাশ হয়। রসায়নশাস্ত্রে প্রয়োগ, রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ (Synthesis) দ্বারা বহু নূত বস্তুর সৃষ্টি ও নূতন শিল্পের আবির্ভাব হয়।

হইতে পারে, বিজ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানবদিগের শারীরি পরিশ্রম করিবার শক্তির হ্রাস হইয়াছে, ও কলকারখানার ধূম স্বাস্থ্যে পক্ষে অনিষ্টকর; কিন্তু সেইজন্য কি বিজ্ঞান একেবারেই পরিত্যাজ্য বাষ্পযান, অর্ণবযান ও ব্যোমযান (Aeroplane) আবিষ্কৃত হওয়ায় জল স্থল ও বায়ুপথে গমনাগমন, তৎসঙ্গে বাণিজ্য বিস্তারের কিরূপ সুবি হইয়াছে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। বিদ্যুতের সাহায্যে আমেরিকা রন্ধন, গৃহ-মার্জ্জন, জুতা ব্রুশ প্রভৃতি কার্য্যও অনায়াসে সম্প হইতেছে। বেতার পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে নিমেষে মধ্যে সন্দেশ বহন করে। 'রেডিও' (Radio) সাহায্যে নির্জ্জন গৃ বসিয়া, বহুদূরের গীতবাদ্য, বক্তৃতা, অভিনয় প্রভৃতি শ্রবণ করা, ও এম কি, প্রবাস বন্ধুর সহিত বাক্যালাপ করাও সুসাধ্য। দুঃখের বিষ

উল্লিখিত অত্যাশ্চর্য্য ও উপকারী বস্তুসমূহের অধিকাংশ এখনও এদেশে আসে নাই।

রণ্টজেন (Rontgen) সাহেবের এক্স-রে (X Ray) ও কিউরী-দ্বয়ের (Dr. and Madame Curie) রেডিয়াম আরও আশ্চর্য্যজনক বস্তু। চিকিৎসাশাস্ত্রে উহাদিগের প্রয়োগে অভূতপূর্ব্ব উপকার সাধন হইয়াছে।

অর্গ্যানিক রসায়নের (Organic Chemistry) উন্নতির সহিত এক নূতন জগতের আবির্ভাব হইয়াছে; বহু স্বাভাবিক বস্তু অল্পায়াসেও অল্পমূল্যে রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত হইতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আল্‌কাত্‌রা হইতে প্রত্যহ বহু পরিমাণ রং, সুগন্ধ ও ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। দীনবন্ধুর অমর লেখনী যাহা সাধন করিতে কৃতকার্য্য হয় নাই, জার্ম্মানি বৈজ্ঞানিক কৃত্রিম নীল তৈয়ারী করিয়া বাঙ্গলার সেই নীলের অত্যাচার দূর করিয়াছেন।

রসায়নের উন্নতির সহিত কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইয়াছে। 'সাইণ্টিফিক আমেরিকান' (Scientific American) বলেন যে, জার্ম্মানি বৈজ্ঞানিক প্রণালী দ্বারা একখণ্ড ভূমিতে আমেরিকা হইতে পাঁচগুণ অধিক শস্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইংল্যাণ্ডের 'রোদামষ্টেড' (Rothamstead) নামক স্থানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য্য সাধনের জন্য রীতিমত পরীক্ষা (Experiment) হয়। আজ এই বিশ্বব্যাপী নবজাগরণের দিনে, এই বৈজ্ঞানিক ও শিল্পময় জগতে ভারতকে নিষ্ক্রিয় ও সুপ্ত থাকিলে চলিবে না। তাহাকেও ইয়োরোপ ও আমেরিকার সঙ্গে বিজ্ঞানের ঐকতান বাজাইতে হইবে। তাহাকে জাগিতে হইবে, বাঁচিতে হইবে ও বিশ্ব-সভায় যোগদান করিয়া স্বীয় আসন গ্রহণ করিতে হইবে।

বহু ইয়োরোপীয় ও অনেক এ দেশীয় ব্যক্তিগণের ধারণা, এসিয়া-বাসীগণ স্বভাবতঃ ব্যবসায় করিতে জানে না। কিন্তু এই ধারণা যে কিরূপ অমূলক তাহা ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের শিল্পের ইতিহাস আলোচনা করিলে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। কিরূপে বাঙ্গলার কুটীর-শিল্প ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর (East India Company) অত্যাচারে ধ্বংস হইয়াছে, তাহা স্বদেশ-প্রাণ রমেশ দত্ত মহাশয়ের বিখ্যাত পুস্তক (Economic History of India) পাঠে অবগত হওয়া যায়।

দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের পণ্যদ্রব্য (ঢাকার মসলিন প্রভৃতি) রোমে পরে, ভেনিস ও জেনোয়ায় রপ্তানি হইত (জ্যেষ্ঠ প্লিনী [Pliny] ইহার উল্লেখ করিয়াছেন)। মসলিন, ক্যালিকো (calico) প্রভৃতি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে বিক্রীত হইত। আর আজ ভারতবাসীকে লজ্জানিবারণের জন্য মান্‌চেষ্টার ও ল্যাঙ্কেষ্টরের মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে। এমনই বিড়ম্বনা! ঢাকা মুর্শিদাবাদের সেরূপ শ্রীবৃদ্ধি আর নাই। তন্তুবায়গণ তাহাদের জাতীয় শিল্প ভুলিয়া গিয়াছে।

অধ্যাপক উইলসন বলেন যে, হিন্দুরা প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে লৌহ গলান, ইস্পাত-প্রস্তুত-প্রণালী প্রভৃতি অবগত ছিল। দিল্লীর বিখ্যাত লৌহস্তম্ভ এখনও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। পৃথিবীর কোন বর্ত্তমান বৃহৎ লৌহকারখানাতেও এত লৌহ প্রস্তুত সম্ভব কি না সন্দেহ। ভারতীয় ইস্পাত এককালে ছুরী, কাঁচী ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ইংল্যাণ্ডে পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইত (Ranade's Esacy on Indian Economics)।

অর্ণবযান প্রস্তুত ভারতবর্ষের আর একটি অতি পুরাতন শিল্প ছিল। চট্টগ্রামে এখন জাহাজ প্রস্তুত বিষয়ক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। (শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত History of Indian Shipbuilding দ্রষ্টব্য)। ভারতবর্ষে প্রস্তুত জাহাজ লণ্ডন বন্দরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতীয় পণ্য বহন করিয়া লইয়া যাইত। ডাইরেক্টরগণের অন্যায় আদেশে এই পুরাতন শিল্পও ভারতবর্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে।

ইংল্যাণ্ডের শিল্পের উন্নতির নিমিত্ত যে ভারতীয় শিল্প বলিদান করা হইয়াছে, তাহা ইংরাজ ঐতিহাসিক স্বীকার করিয়াছেন (The Industrial Revolution of the Eighteenth Century—Arnold Toynbee)। ইংরাজ বণিকেরা ভারতবর্ষকেও আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়ার মত একটী উপনিবেশ মনে করিয়া শিল্পের উপাদানের জন্য কেবল কৃষি বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিতেন (Plantation); তুলা, পাট, সিল্ক, প্রভৃতি যাহাতে এ দেশে যথেষ্ট পরিমাণ জন্মে তাহার জন্য চেষ্টা করিতেন। কিন্তু উক্ত উপাদানগুলি হইতে বস্ত্র বয়ন সম্বন্ধে কোনও উৎসাহ দেন নাই; বরং বাধা প্রদান করিয়াছেন। এই জন্য আজ কৃষিই ভারতবাসীদিগের প্রধান অবলম্বন; এবং অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, প্লাবন প্রভৃতি উপলক্ষে প্রায়ই দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পড়িয়া সহস্র সহস্র কৃষক এ ধরাধাম পরিত্যাগ ক'রে।

ভারতবর্ষের কৃষিবিদ্যার সহিত বিজ্ঞানের কোনও সংস্রব নাই। আমেরিকা, জাপান, ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মনি প্রভৃতি দেশে কৃষিতে রসায়নের প্রয়োগ হইতেছে।—রাসায়নিক সার দ্বারা অনুর্ব্বর ক্ষেত্র উর্ব্বর হইতেছে, উর্ব্বরতা ৪।৫ গুণ বৃদ্ধি হইতেছে। ফলে আমাদের সোণার ভারতবর্ষে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অর্দ্ধেক পরিমাণ (Proportion) শস্য উৎপন্ন হয়। সোরার অভাব এ দেশে নাই। অস্থি প্রভৃতি হইতে যথেষ্ট পরিমাণ ফস্ফোরাস (Phosphorus) প্রস্তুত হইতে পারে। নাইট্রোজেন (Nitrogen) ফস্ফোরাস (Phosphorus) ও পোটাসিয়ম (Potassium) যাবতীয় বৈজ্ঞানিক সারের মূল উপাদান। আমরা ইচ্ছা করিলেই রাসায়নিক সার প্রস্তুত ও ব্যবহার করিয়া কৃষিশিল্পের উন্নতি সাধন করিতে পারি।

বিহার, যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব ও বাঙ্গালাদেশে প্রচুর পরিমাণে অপরিষ্কৃত সোরা উৎপন্ন হয় (দেওয়ালের গায়ে 'লোনা' ধরে; এই 'লোনা' আর কিছুই নয়—ইহাই সোরা বা পোটাসিয়ম নাইট্রেট [Potassium Nitrate]। ইহা স্বাভাবিকরূপে উৎপন্ন হয়; কোনও পরিশ্রমের আবশ্যক নাই)। বলিতে গেলে, সোরা ভারতবর্ষের একচেটিয়া। দেশীয় লোকেরাই ইহা পরিষ্কৃত ও বিশোধিত করে। পরে

ইহা বিদেশে চালান দেওয়া হয়। শাস্তিতে ইহা রাসায়নিক সার রূপে ব্যবহৃত হয়, ও যুদ্ধের সময় বারুদ ও অন্যান্য বিদারণক্ষম (Explosive) বস্তু তৈয়ারীর জন্য ইহাই প্রধান উপাদান। এই জন্য গত যুদ্ধের সময়ে ইহা মূল্য অসম্ভব বৃদ্ধি হইয়াছিল। এই সোরা হইতেই পোটাসিয়মের অন্যান্য লবণ (Salt) প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

ম্যাগনেসিয়ম (Magnesuim) লবণের জন্য আমাদের দেশে ম্যাগনেসাইট (Magnesite—Carbonate of Magnesium) ও ডোলোমাইট (Dolomite—Double Carbonate of Magnesium and Calcium) যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। ম্যাগনেসিয়ম লবণ যে কেবল বিরেচক ঔষধ (Purgative) প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়, তাহাই নহে; অদাহ্য (fire-proof) ইট ও নানারূপ মৃত্তিকাজাত বস্তুও (Pottery) উহা হইতে তৈয়ারী হইতে পারে। ইহা একটী প্রকৃত রাসায়নিক শিল্প। সাধারণ লবণের অভাব এ দেশে একেবারেই নাই। লবণ-খনি ও সমুদ্র হইতে প্রয়োজনাতিরিক্ত লবণ তৈয়ারী হইতে পারে; এবং এই লবণ হইতে সোডা, (Sodium Carbonate) ও কষ্টিক সোডা (Caustic সোডা) অনায়াসেই প্রস্তুত হইতে পারে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক লবণ প্রস্তুত নিষিদ্ধ।

যুক্তপ্রদেশে প্রচুর পরিমাণে ও অসম্ভবরূপ সস্তায় 'সাজিমাটী' পাওয়া যায়। রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা দেখা গিয়াছে, ইহার অধিকাংশ ভাগ সোডা (Sodium Carbonate) ও তৎসঙ্গে অল্পবিস্তর পরিমাণ লবণ, সোডিয়ম সালফেট (Sodium Sulphate) ও সোডিয়ম সিলিকেট (Silicate) আছে। সোডিয়ম সিলিকেট ও সোডা উত্তম বস্ত্র পরিষ্কারক। এ দেশীয় রজকেরা ইহা বেশী ব্যবহার করিয়া থাকে। এই সাজিমাটি হইতে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুগুলি পৃথক করা যাইতে পারে ও সোডা (Carbonate) হইতে কষ্টিক সোডা অনায়াসে ও সস্তায় প্রস্তুত হইতে পারে।

পাঞ্জাবের 'খেওরা' খনিতে পোটাস্ ক্লোরাইড (Potassium Chloride) পাওয়া যায়, ও উক্ত উপাদান হইতে পোটাস্ কার্ব্বোনেট (Carbonate) ও কষ্টিক পোটাস (Caustic Potash) প্রস্তুত হইতে পারে। কষ্টিক সোডা ও পোটাস সাবানের জন্য ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে কলাগাছ পোড়াইয়া তাহার ছাই দিয়া কাপড় কাচে। এই ছাইতে পোটাস কার্ব্বোনেট (Carbonete) আছে এবং ইহাই বস্ত্র পরিষ্কারক।

এই ত গেল ক্ষারের (alkali) কথা। এখন অম্ল (acid) বিষয়ে আলোচনা করা যাক। শিল্পে, হাইড্রোক্লোরিক (Hydrochloric), নাইট্রিক (Nitric) ও সালফিউরিক (Sulphuric) এই তিনটী এসিডই (acid) বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রথমোক্ত এসিডটি ও লবণ হইতে অতি সস্তায় হইতে পারে (Le Blancs Process)। দ্বিতীয়টী সোরা হইতে ও তৃতীয়টী গন্ধক হইতে প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষে গন্ধকের অভাব নাই। সেই জন্য বোধ করি যে, আমাদের শিল্পের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সালফিউরিক এসিড (Sulphuric acid) এ দেশেই তৈয়ারী হইতে পারিবে। অধিক মূল্য ও মূল্যের ৪।৫ গুণ ভাড়া দিয়া বিদেশ হইতে আমদানি করিবার আবশ্যক হইবে না। সোহাগা যথেষ্ট পরিমাণ এদেশে পাওয়া যায়; উহা হইতে বোরিক এসিড (Boric acid) প্রস্তুত করাও লাভজনক সন্দেহ নাই।

গালা ও রবার প্রস্তুত শিল্প ভারতবর্ষের একচেটিয়া। গালা হইতে লাল রং (Lac dye) প্রস্তুত করা একটী কুটীর-শিল্প। দুঃখের বিষয়, কিন্তু, ভারতবর্ষে উৎপন্ন যে প্রায় সমস্ত গালা বিদেশে রপ্তানি হয়। ইদানীং মহিশূর গর্ভমেণ্ট একজন শিক্ষিত যুবককে এই শিল্প শিক্ষার নিমিত্ত বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া উক্ত শিল্পের উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করিয়াছেন। রবারের বস্তু তৈয়ারী করিবার প্রণালী আমরা আজ পর্য্যন্ত শিখিয়া উঠিতে পারি নাই বা শিখিতে চেষ্টা করি নাই। রবারের পোষাক (Waterproof) টায়র (Tyre) প্রভৃতি প্রস্তুত করার প্রণালী শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। আশা করি, কোনও বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক বিদেশে (আমেরিকায়) গমন করিয়া উক্ত শিল্পে পারদর্শী হইয়া জাতীয় শিল্প (National Industry) প্রায় রক্ষায় হইবেন।

পৃথিবীর অন্য কোনও স্থানে চন্দনকাষ্ঠ জন্মে না বলিলেই চলে। ভারতীয় চন্দনকাষ্ঠ আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি হয়, ও সেখান হইতে চন্দনের এসেন্স (Essential oil of Sandel wood) এদেশে আমদানি হয়। সুখের বিষয় এই যে, একজন দেশীয় যুবক উক্ত শিল্প বিদেশ হইতে শিক্ষা করিয়া মাদ্রাজের নিকট একটী কারখানা খুলিয়াছেন। মহীশূরের গবর্ণমেণ্টের খাস তত্ত্বাবধানে মহীশূরের সরকারী চন্দন অরণ্য হইতেও চন্দন-তৈল, চন্দন-কাষ্ঠচূর্ণ ও ধূপ প্রস্তুত হইতেছে।

তৈল প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের উদ্ভিজ্জ তৈল বিষয়ে আলোচনা করা আবশ্যক। উক্ত তৈলও ভারতবর্ষের একচেটিয়া বলিলেই হয়। পৃথিবীর অন্য কোনও স্থানে নানা প্রকারের তৈল এরূপ অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অধিকাংশ তৈলবীজই (Oilseed) বিদেশে রপ্তানি হয়; এখানে অত্যন্ত অল্প পরিমাণ বীজ হইতে তৈল নিষ্পেষিত (Expressed) হয়। গত বৎসর ১৭,১৩,৬৩,৭০৪ টাকা মূল্যের (১২৬,৪৮১ টন) তৈলবীজ বিদেশে রপ্তানি হয়, কিন্তু তৈল মোট ৪৮,৩২,৩৩৭ টাকা মূল্যের (৭১১,৩৭২ গ্যালন) মাত্র রপ্তানি হইয়াছিল। কেবল সংযুক্ত প্রদেশে (United Provinces) গড়ে ১২৫ লক্ষ মণ তৈলবীজ উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে মাত্র ৮ লক্ষ মণ বীজ হইতে তৈল বাহির করা (Expressed) হয়। বাঙ্গালা ও বোম্বাইতে অবশ্য কিছু তৈলবীজ হইতে তৈল নিষ্পেষিত হয়। কিন্তু অধিকাংশ তৈলবীজই বিদেশে চালান দেওয়া হয়। ইহার ফল এই হয় যে, এ দেশ হইতে বীজ অত্যন্ত অল্প মূল্যে বিদেশে পাঠান হয় ও সেখানে তৈল নিষ্কাষিত হইয়া আসিয়া এখানে অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। পরন্তু তৈলের খোল (যাহা গরুর খাদ্য এবং কৃষি-ক্ষেত্রের উত্তম সাররূপে ব্যবহার করা যাইতে

পারে) হইতেও আমরা বঞ্চিত হই। তৈল অধিক প্রস্তুত না হওয়ায় তৈল-সংক্রান্ত শিল্পগুলির (Industry of the oil products) যথা, সাবান, বাতি, ভার্ণিস (Varnish) রং (Paint) ইত্যাদি শিল্পের শ্রীবৃদ্ধিসাধনও হয় না।

এদেশে তৈলবীজ হইতে যে তৈল নিষ্কাষিত হয়, তাহা প্রায় কলুরা 'ঘানিতে' করিয়া থাকে। কিন্তু এই অসংস্কৃত (Crude) উপায়ে প্রায় অর্দ্ধেক তৈল নষ্ট হয়। তৈলের কল (যেখানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রেসে (Hydratic press) তৈল নিষ্কাষিত হয়) এদেশে বিরল। কলিকাতা, বোম্বাই, কাণপুরে সামান্ত কয়েকটি কল আছে, কিন্তু সেগুলিতে অন্যান্ত দেশের কথা ত' দূরে থাকুক, স্থানীয় সমস্ত তৈল বীজই ব্যবহৃত হইতে পারে না। দ্রাবক (Solvent) দ্বারা তৈল বাহির করিবারও (Extraction) কোনও ব্যবস্থা নাই। এ বিষয়ে কৃষি ও শিল্প বিভাগ (Agricultural and Industrial Departments) উভয়েই উদাসীন। আমাদের শিল্প বিষয়ে অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। তৈল শিল্পের (Oil Industy) উন্নতি সাধন ও তৎসঙ্গে তৈলসংক্রান্ত অন্যান্ত শিল্পের প্রতিষ্ঠা করা এখন নিতান্ত আবশ্যক।

তৈল বর্ণশূন্য ও নির্গন্ধ করা আর একটী সমস্যা। প্রথমে কষ্টিক সোডা, তৎপরে সালফিউরিক এসিড (Sulphuric acid) দিয়া পরে রাসায়নিক বর্ণশূন্য করার উপাদান (Chemical Bleaching agents), যথা, বাইক্রোমেট (Bichromate of potash), পারমাঙ্গানেট (Permangarate of Potash) প্রভৃতি দিয়া বর্ণশূন্য করিতে হয়। হাড় হইতে প্রস্তুত কয়লা (Bone charcoal) ও এমন কি সাজিমাটী (Fuller's Earth) দিয়াও তৈল বর্ণশূন্য ও নির্গন্ধ করা যাইতে পারে।

তৈল বিশুদ্ধ হইলে, কেশের জন্য গন্ধ তৈল, ঔষধ, উত্তম সাবান, ঘড়ি প্রভৃতি সূক্ষ্ম যন্ত্রের তৈল অতি সহজেই প্রস্তুত হইতে পারে। সাবান ইত্যাদি এদেশে তৈয়ারী হইতে আরম্ভ হইয়াছে ও অনেক কারখানা রাসায়নিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া উত্তরোত্তর বেশ কৃতকার্য্য হইতেছেন। মসিনার তৈল হইতে, ভার্ণিস, রং, তৈল-বস্ত্র (Oil cloth) প্রভৃতি অনায়াসেই প্রস্তুত করা যাইতে পারে। নারিকেল ও অন্যান্য খাদ্য তৈল (Edible oil) হইতে কৃত্রিম মাখন প্রভৃতি আজকাল ইয়োরোপে যথেষ্ট পরিমাণে তৈয়ারী হইতেছে।

সাধারণ তৈলের ন্যায় নানারূপ আতর (Essential oil) তৈয়ারীর সুযোগও অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভারতেই বেশী। জার্ম্মাণী, আমেরিকা ও ফ্রান্স রাসায়নিক উপায়ে কৃত্রিম আতর তৈয়ারী করিতেছে অথচ আমরা স্বাভাবিক আতর তৈয়ারী করিতে অক্ষম!

এককালে ভারতবর্ষের চিনি বিদেশে রপ্তানি হইত, আর আজকাল অধিকাংশ চিনিই মরিসস্ (Mauritius), যাভা (Jāva) ও জার্ম্মাণী (Germany) হইতে এ দেশে আমদানি হয়। এই অবস্থা পরিবর্ত্তনের হেতু কি? ইক্ষু কি এ দেশে আর পূর্ব্বের মত জন্মিতে পারে না? না, তাহা নহে। কৃষিকার্য্যে অবহেলা বশতঃ ইক্ষুর উৎপত্তি কমিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু চেষ্টা করিলেই অধিকতর পরিমাণ ইক্ষু এখনও জন্মিতে পারে। আর এক কারণ, এখানে চিনির কল বেশী নাই। অধিকাংশ ইক্ষুরসই প্রায় গুড়ে পরিণত হয়। আরও দেখা যায় যে, চিনির কল স্থাপিত হইলেও তাহা অধিক দিন টিঁকিতে পারে না। ইয়োরোপ ও অন্যান্য দেশে অপরিষ্কৃত গুড় ও ইক্ষুরস (molasses) হইতে সুরাসার (alcohol) তৈয়ারী হয়, আবগারী বিভাগের কল্যাণে এ দেশে তাহা হইবার উপায় নাই, প্রতিযোগিতায় যে দেশীয় কল বিদেশীয় বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিতেছে না, ইহা তাহার একটী কারণ। আর এক কথা, চিনির কল চালাইবার জন্য এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা (Mechanical Engineering) ও চিনি পরিষ্কার করিবার জন্য (Sugar Refining) অল্পবিস্তর রসায়ন শিক্ষার প্রয়োজন।

চিনির সমস্যা সমাধানের আর একটী উপায় আছে। বাঙ্গলাদেশ ও মধ্য প্রদেশে (Central Provinces) যথেষ্ট পরিমাণ খর্জ্জুর গাছ পাওয়া যায়। উক্ত গাছের রস হইতে গুড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐ গুড় হইতে অনায়াসে চিনি প্রস্তুত হইতে পারে।

সুরাসারের উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে। উহা যে কেবল পানীয় বলিয়া পরিত্যাজ্য তাহা নহে। বহু শিল্পে (যথা, নানা প্রকার ঔষধ তৈয়ারী, কৃত্রিম সিল্ক, ভার্ণিস, রং ইত্যাদিতে উহা দ্রাবক [Solvent] রূপে ব্যবহৃত হয়) উহা অত্যাবশ্যক। সুরাসার ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে ও চাই কি সস্তা হইলে উহা দ্বারা মোটর প্রভৃতি চালান যাইতে পারে। একজন ইংরেজ লেখক লিখিয়াছেন যে, সুরাসার প্রস্তুত করিতে কেবলমাত্র সূর্য্যকিরণ আবশ্যক। শ্বেতসার (Starch) প্রায় সমস্ত ফলেই আছে, আর ইহা হইতেই সুরাসার প্রস্তুত করা যায়। যাহা উচ্ছিষ্ট (Refuse) পড়িয়া থাকে, তাহা উত্তম সার রূপে ব্যবহৃত হয়। জার্ম্মাণীতে অধিকাংশ সুরাসার আলু হইতে ও আমেরিকায় ভুট্টা হইতে প্রস্তুত হয়। আমাদের দেশে ভুট্টার অভাব নাই। রাঙ্গা আলু (বা সাদা মিষ্ট আলু) হইতেও উহা অনায়াসেই প্রস্তুত হইতে পারে। ডি, ওয়াল্ডি (D. Waldie) কোম্পানি ত উহা মহুয়া ফুল হইতে প্রস্তুত করিয়া থাকেন, এইরূপ শুনিয়াছি। মহুয়া ফুলকে চুয়াইয়া (Distil) লইলেই সুরাসার পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষ হইতে বহু পরিমাণ কাঁচা চামড়া (Raw hides) বিদেশে (অধিকাংশ জার্ম্মাণীতে) চালান যায়, ও জুতা তৈয়ারীর উপযোগী চামড়া (Tanned Leather) বা জুতা তৈয়ারী হইয়া, এ দেশে আমদানি হয় এবং তখন তাহার মূল্য দশগুণ মূল্য বর্দ্ধিত হয়। ১৯২০-২১ সালে প্রায় ২১,১০০ টন কাঁচা চামড়া বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। অবশ্য ভারতবর্ষের সমস্ত কাঁচা চামড়া হইতে পাকা চামড়া (Leather) প্রস্তুত করা সময়-সাপেক্ষ; কিন্তু অধিকাংশই এখানে প্রস্তুত হইতে পারে। দেশীয় চর্ম্মকারেরা এই শিল্পে একেবারে অজ্ঞ এবং প্রায়ই তাহারা "ভাল কাঁচা চামড়া হইতে খারাপ পাকা চামড়া তৈয়ারী করিয়া থাকে" (making a good hide into bad leather)। ইহার একমাত্র

কারণ, তাহাদের শিক্ষার অভাব। শিক্ষিত লোকদিগকে তাহাদের শিক্ষা দিতে হইবে। ক্রোম প্রণালী (Chrome Tanning) শিক্ষার জন্য রসায়ন শিক্ষা আবশ্যক। এখানকার দেশীয় চর্ম্মকারেরা বাব্‌লা, হরিতকী প্রভৃতি বৃক্ষের ছাল ব্যবহার করে (Vegetable tanning), কিন্তু তাহারা প্রায় অর্দ্ধেক ট্যানিন (Tannin) নষ্ট করে।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, আমাদের দেশে কাচ প্রস্তুত হইতে পারে না। হইতে পারে যে, অতি উৎকৃষ্ট রাসায়নিক জেনা কাচ (Jena Glass for chemical wares, optics) এখানে তৈয়ারী করা শক্ত, কারণ বিশুদ্ধ বালুকা (quartz) পাওয়া যায় না। কিন্তু সাধারণ কাচ তৈয়ারীর উপযোগী বালি, চুণ, সোহাগা, সোরা ও লেড অক্সাইড (Lead oxide or carbonate) ইত্যাদির অ[illegible] নাই। অভাব কেবল শিক্ষার ও সুশৃঙ্খলার সহিত অনুসন্ধান এবং ক[illegible] পরিচালনের। সুখের বিষয় যে, কলিকাতা, জব্বলপুর, নৈনী প্রভৃতি স্থানে বোতল ও চিমনীর উপযোগী কাচ (Bottle and chimney glass) তৈয়ারী হইতেছে। তবে আরো কুঠি ও কারখানা স্থাপন করা আবশ্যক, যাহাতে আমাদের জাপান কিংবা জার্ম্মাণী বা অষ্ট্রিয়ার কাছে ভিক্ষা না করিতে হয়। ১৯১৩-১৪ সালে প্রায় ১৬৪ লক্ষ টাকার কাচ আমদানি হইয়াছিল।

মাদ্রাজ, বুঁদি, কাট্‌নি প্রভৃতি স্থানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সিমেণ্ট তৈয়ারীর জন্য কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। তথাপি ৬০ লক্ষ টাকার উপর সিমেণ্ট বিদেশ হইতে আমদানি হয়। অথচ পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্টের (Portland cement) উপযোগী চুণ, মাটী (Shale or slag) প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে এ দেশে পাওয়া যায়।

মাটীর পাত্র একটী অতি সাধারণ বস্তু। কিন্তু চীনা মাটী বা পোর্সিলেনের (Porcelain) পাত্র ইত্যাদি অতি মূল্যবান, এবং তাহা এদেশে এখন পর্য্যন্ত অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে না। বম্বে স্কুল অব্ আর্টসে (Bombay School of Arts) এ বিষয়ে পরীক্ষা (Experiments) চলিতেছে। বেঙ্গল পটারী ওয়ার্কস্ (Bengal Pottery Works)ও কিছু কৃতকার্য্য হইয়াছেন। কিন্তু এখনও আমাদের অভাব দূর হয় নাই। পোর্সিলেন তৈয়ারীর জন্য ভাল পাঁজার আবশ্যক, যাহাতে ১২।১৩০০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত টেম্পারেচার (Temperature) উঠিতে পারে। চক্‌চকে (Glaze) করাও একটী শিল্প; কিন্তু ইহাতে বিশেষ নৈপুণ্যের আবশ্যকতা নাই। বর্ণশূন্য পাত্র তৈয়ারী উচ্চ টেম্পারেচার ভিন্ন সম্ভব নহে। জাপান এই শিল্পে অগ্রণী। এনামেলও (Enamal) এই জাতীয় শিল্প; ইহার সহিত তাহার বিশেষ প্রভেদ নাই।

১৯১৫-১৬ সালে ২৪৯,০০০ বর্গ মাইল অরণ্য গভর্মেণ্টের অরণ্য বিভাগের (Forest Department) অধীন ছিল; তাহাতে ২৪৬০ লক্ষ ঘন ফুট (Cubic feet) কাঠ ও ১১৬ লক্ষ টাকার অন্যান্য বস্তু উৎপন্ন হয়। এখনও গভর্মেণ্ট তত্ত্বাবধান করেন না, এরূপ আরও অনেক অরণ্য আছে। গালা ও রবারের বিষয় পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এখন কেবল মাত্র কাঠ হইতে কোন্ কোন্ রাসায়নিক শিল্পের উন্নতি সাধন হইতে পারে, তাহার আলোচনা করা যাউক।

দেশলাই ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেরই নিত্য প্রয়োজনীয়; অথচ কিছুদিন পূর্ব্বে ইহা একেবারেই এ দেশে তৈয়ারী হইত না। অধিকাংশ দেশলাই সুইডেন (Sweden) হইতে আসিত। যুদ্ধের সময়ে ইয়োরোপ হইতে দেশলাইয়ের আমদানি বন্ধ হইলে, ভারতবর্ষের দেশলাই ব্যবসা জাপানের একচেটিয়া হয়। গত পঞ্চদশ বৎসরের মধ্যে এ দেশে বহু দেশলাইয়ের কল স্থাপিত হয়, কিন্তু প্রায় কোনটীই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। আজকাল গুজরাট ইসলামিয়া দেশলাইয়ের কারখানা (Ahmedabad) সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আমাদের দেশে যে ভাল দেশলাই তৈয়ারী হয় না, তাহার একটী প্রধান কারণ সুইডেন ও নরওয়ের এসপেন (aspen) ও পপ্‌লার (Poplar) এ দেশে পাওয়া যায় না। তবে হিমালয়ের পার্ব্বত্য অরণ্যে দেশলাই তৈয়ারীর উপযোগী অনেক কাঠ পাওয়া যায়। এখন বাঙ্গলাদেশে হস্তপরিচালিত দেশলাই তৈয়ারীর যন্ত্র হওয়াতে, দেশের একটী অভাব দূর হইয়াছে। অবশ্য বিদেশী বৈজ্ঞানিক বৃহৎ যন্ত্র শোভিত দেশলাইয়ের কারখানার সহিত প্রতিযোগিতায় ইহারা সমর্থ হইতে পারে না; তবে দেশলাই তৈয়ারী কুটীর-শিল্পে পরিণত হইলে স্থানীয় অভাব দূর হইবে। আজকাল বিদেশী দেশলাইয়ের উপর শুল্ক এত অধিক যে, বিদেশী বণিক এই কুটীর-শিল্পীগণের ব্যবসা নষ্ট করিতে পারিবে না। আর এক কথা এই, ছোট ছোট যন্ত্রে অনেক সাধারণ কাঠ—যথা,—কদম, ছাতিয়ান, শিমুল, দেবদারু, ষেড়া প্রভৃতি যাহা ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানেই পাওয়া যায়—ব্যবহার করা যাইতে পারে। বালক ও স্ত্রীলোকগণও উক্ত যন্ত্র পরিচালনা করিতে পারে। আর মূলধনও অল্প হইলেই চলিতে পারে।

এ দেশে বৎসরে প্রায় ২০০ লক্ষ গ্রোস পেন্সিল ব্যবহৃত হয়; কিন্তু কেবলমাত্র কলিকাতার স্মল ইণ্ডষ্ট্রিজ ডেভেলপমেণ্ট কোং (Small Industries Development Co) পেন্সিল তৈয়ারী করিয়া থাকেন, ও বাকী পেন্সিল বিদেশ হইতে ক্রয় করা হয়। এ দেশে অন্ততঃপক্ষে ৪০টী ছোট পেন্সিলের কারখানা চলিতে পারে। কাঠের অভাব নাই। সিংহল ও ভারতের দক্ষিণাংশে অতি উৎকৃষ্ট গ্রাফাইট (Graphite) পাওয়া যায়। আর মাটীও সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। উক্ত তিনটী বস্তুই পেন্সিলের উপাদান। অভাব কেবল শিক্ষার ও কার্য্যকারিতার।

কাগজ আর একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তু। আমাদের প্রতি বৎসর প্রায় ৭৫,০০০ টন কাগজ আবশ্যক হয়। আজকাল এদেশে কয়েকটী কাগজের কল হইয়াছে; কিন্তু ঐগুলিতে মাত্র ৩০,০০০ টন কাগজ প্রস্তুত হয়। প্রায় ১৩,০০০ টন কাঠের শাঁস (Wood pulp) বিদেশ হইতে আমদানি হয়। এ দেশে কি কাঠের অভাব? না, তাহা নয়; কিন্তু কাঠের শাঁস প্রস্তুত করা হয় না। এই জন্য বিদেশ হইতে আমাদের উহা ক্রয় করিতে হয়। ভারতবর্ষে

অধিক কাগজ প্রস্তুত হয় না বলিয়া যুদ্ধের সময়ে কাগজ অত্যন্ত মহার্ঘ্য হইয়াছিল। কাগজ হইল সভ্যতার দীপ। কাগজ হইতে পুস্তক মুদ্রিত হয়। পুস্তক পাঠে জ্ঞান ও তৎসঙ্গে সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি হয়। কাগজের সৃষ্টি না হইলে, মুদ্রাযন্ত্রের এত উন্নতি সত্ত্বেও আমাদের যে তিমিরে সেইতিমিরেই থাকিতে হইত। কাগজ তৈয়ারীর অন্যান্য উপাদান ছিন্ন বস্ত্র, রজ্জু, পাটের আঁশ (fibre), এসপার্টো ঘাস, খড়, বংশ প্রভৃতিরও অভাব এ দেশে নাই ; এগুলি অত্যন্ত সুলভ। তবে শাঁসকে (pulp) বর্ণশূন্য করা এই শিল্পের একটী প্রধান অঙ্গ। উত্তম কাগজ প্রস্তুত করিতে হইলে, এ দিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

কাষ্ঠ আরও অন্যান্য কার্য্যেও ব্যবহার করা যায়। কাষ্ঠ চুয়াইয়া (Distill), স্পিরিট (Methyl alcohol), এসেটিক এসিড (acetic acid), এসিটোন (acetons) ও কয়লা পাওয়া যায়। উক্ত রাসায়নিক দ্রব্যগুলি বহু শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

রঞ্জনশিল্প এককালে ভারতবর্ষে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল। এ দেশে রঞ্জিত কাপড়, ক্যালিকো (Calico) প্রভৃতি ইংল্যাণ্ড ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় দেশে বিশেষরূপে আদৃত হইত। চেষ্টা করিলে এখনও সেই লুপ্ত শিল্পের পুনরুদ্ধার সাধিত হইতে পারে। উদ্ভিজ্জ রঙ্গের অভাব এ দেশে নাই। সেগুলি দিয়া যে বস্ত্র উত্তম রূপে রঞ্জিত হইতে পারে, তাহা আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র তাঁহার "দেশী রং" পুস্তকে দেখাইয়াছেন। তবে রাসায়নিক রং প্রস্তুত ও তাহার ব্যবহার শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

বস্ত্র রঞ্জিত করিবার পূর্ব্বে প্রথমে উহাকে বর্ণশূন্য (bleach) করা আবশ্যক। এই বর্ণশূন্য করিবার শিল্প (Bleaching Industry) আমাদের দেশে নাই বলিলেই হয়। অথচ ইহা বিশেষ কঠিন নহে। তবে সেজন্য এ দেশে ব্লিচিং পাউডার তৈয়ারী করার প্রয়োজন।

শীতবস্ত্র, কম্বল প্রভৃতি জল লাগিলে নষ্ট হইয়া যায়। ইয়োরোপ ও আমেরিকায় উহাদিগকে পেট্রল বা গ্যাসোলিন (Gasolene) দ্বারা বিনা জলে পরিষ্কৃত করে (Dry cleaning)। ময়লা, তৈল প্রভৃতি পেট্রলে দ্রব হইয়া যায়। তবে বস্ত্রগুলি শুষ্ক করিবার সময়ে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন, নচেৎ আগুণ লাগিয়া যাইতে পারে।

মানুষের জীবনরক্ষা ও রোগমুক্তির জন্য ঔষধ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বহু রাসায়নিক ঔষধ যে আমাদের দেশে প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা সুপ্রসিদ্ধ বেঙ্গল কেমিক্যাল (Bengal Chemical and Pharmaceutical Works) এবং বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং (B. K. Paul & Co.) প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। তবে মাত্র দুইটী কারখানা এই মহাদেশের পক্ষে যথেষ্ট নহে। এখানে ঔষধের উপাদানের অভাব যে নাই, তাহা সকলেই অবগত আছেন। কবিরাজি ঔষধ প্রস্তুত করাও আবশ্যক। বহু কবিরাজি উদ্ভিদ্ ডাক্তারী ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিমিত্তও যে ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। আর বলিতে গেলে ভারতবর্ষই কুইনাইনের একমাত্র জন্মভূমি।

কোন প্রকার শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে, উপাদান-বস্তুর মূল্যের দিকে ব্যবসায়ীর মাত্রকেই লক্ষ্য রাখিতে হয়। যে উপায়ে সর্ব্বাপেক্ষা সহজে ও সুলভে দ্রব্য প্রস্তুত করা যাইতে পারে, শিল্পীকে সেই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। সেইজন্য এইস্থানে বৈদ্যুতিক শক্তির (Electric Power) বিষয়ে কিছু আলোচনা করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আজকাল বহু রাসায়নিক শিল্পে, ধাতু পরিষ্কারক বিদ্যা (Metallurgy) প্রভৃতিতে রাসায়নিক শক্তির প্রয়োগ আবশ্যক হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, এলুমিনিয়ম (aluminium) তৈয়ারী, সোডা কষ্টিক (Caustic Soda manufacture) কৃত্রিম উপায়ে সোরা (Nitric) তৈয়ারী, কার্ব্বাইড (Calcium Carbide) প্রভৃতিতে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

আর এক দিকে আটার কল, বস্ত্রের কল প্রভৃতিও আজকাল বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। আমেরিকায় বৈদ্যুতিক রেলগাড়ী চ'লে। সে দেশে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যতীত অন্য কোন প্রকার (কয়লা বা তৈলের) শক্তির ব্যবহার নাই বলিলেই চ'লে। এখন দেখা যাউক এ দেশেও বৈজ্ঞানিক শক্তির উৎপত্তি হইতে পারে কি না।

অবশ্য বাষ্পীয় এঞ্জিনের সাহায্যে ডাইনামো (Dynamo) চালাইয়া কয়লার শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করা যাইতে পারে ; কিন্তু তাহা একেবারেই সুলভ নহে। যদি জলশক্তিকে (Water power) বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করা যায়, তবেই উহা ব্যবহারোপযোগী হইতে পারে। নরওয়ে (Norway) ও সুইডেন (Sweden) প্রভৃতি পার্ব্বত্যদেশে বৈদ্যুতিক শক্তি এই জন্য অতি সুলভ। ভারতবর্ষের সমস্ত অংশ পার্ব্বত্য নহে, তবে পার্ব্বত্য প্রদেশেরও অভাব নাই।

টাটা মহোদয় পশ্চিম ঘাটের (Western Ghats) পার্ব্বত্য নদীর জলপ্রপাতের শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন (Tata Hydro-Electric Scheme)। ইহা পৃথিবীর একটী আশ্চর্য্যের বস্তু। এই বৈদ্যুতিক শক্তি বোম্বাইয়ে প্রেরণ করিয়া (১৩ ঘণ্টার জন্য ৪০,০০০ অশ্ব শক্তি (Horse power) প্রেরিত হয়) সেখানকার বস্ত্রের কল ও অন্যান্য অনেক কারখানা চালাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। টাটার নাম এজন্য অমর হইয়া থাকিবে।

কাশ্মীরে (শ্রীনগরে) এইরূপে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপত্তি হয়। হিমালয়ের পার্ব্বত্য নদীর জলপ্রপাত হইতে আরও অধিক বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চয় করা যাইতে পারে। তদ্দ্বারা উত্তর ভারতের অনেক শিল্প ও কারখানার উন্নতি হইতে পারে। চেষ্টা করিলে, এমন কি টাটার কারখানা অপেক্ষা অধিক শক্তি পাওয়া যাইতে পারে।

এমন কি, কৃত্রিম জলপ্রপাত দ্বারাও বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চিত হইতে পারে। মহীশূর হাইড্রো-ইলেকট্রীক্ স্কীম (Mysore Hydro-Electric Scheme) কাবেরীর বর্ষা ঋতুর জল উচ্চ প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ করিয়া, পরে একটী অতি নিম্নস্থানে পড়িবার উপায় করিয়াছেন ; এবং এই কৃত্রিম জলপ্রপাতের দ্বারা ১৩০০০ অশ্ব শক্তি সম্পন্ন বৈদ্যুতিক

শক্তি উৎপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই শক্তি ৯০ মাইল দূরে কোলহারের স্বর্ণখনিতে প্রেরিত হয়। ইহার ভোল্টেজ (Voltage) অত্যন্ত অধিক (৭০,০০০)।

এইরূপে স্বাভাবিক ও কৃত্রিম জলপ্রপাতের শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করিতে সমর্থ হইলে যে ভারতের প্রায় সমস্ত শিল্পের উন্নতি সাধিত হইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতের শিল্পের দুরবস্থা সর্ব্ব প্রথম গভর্মেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও ১৯০৫ সালে একটী সভা আহূত হয় (Indian Industrial Conference)। তাহার পরে গত যুদ্ধের সময়ে ইংরাজ গভর্ণমেন্ট ভারতীয় শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে উৎসাহ দান না করার ভ্রম মর্ম্মে মর্ম্মে হৃদয়ঙ্গম করেন। ১৯১৬ সালে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্রিয়ল কমিশন (Indian Industrial Commission) বসে ও তাহার রিপোর্ট বাহির হয় ১৯১৮ সালে। ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল (ক) ভারতবর্ষের মূলধন কোনও নূতন শিল্প ও বাণিজ্যসমূহে ব্যবহৃত হইতে পারে কি না; ও (খ) গভর্ণমেন্ট কিরূপে শিল্পের উন্নতির জন্য উৎসাহ দান করিতে পারেন তাহা নির্ণয় করা।

তার পর নিখিল-ভারত শিল্প-বিজ্ঞান (Imperial Industrial Department) ও প্রাদেশিক শিল্প বিভাগসমূহ স্থাপিত হইল। তবে তথাকথিত রাজকীয় শিল্প বিদ্যালয় (Imperial Polytechnical Institute) আজ পর্য্যন্ত স্থাপিত হয় নাই। গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ভারতবাসীদিগের উৎসাহ ও সাহায্যের নিমিত্ত কোনও নূতন কারখানাও স্থাপিত হয় নাই। বস্তুত আজ পর্য্যন্ত, গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক কোনও বিশেষ উৎসাহদান ("direct encouragement") হইয়া উঠে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। বিদেশী বণিকে দেশের অর্থ লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইতেছে; আর দেশবাসিগণ দিনে দিনে নিঃস্ব ও নির্জ্জীব হইয়া পড়িতেছে। আর কত কাল আমরা "নিজ বাসভূমে পরবাসী" হইয়া রহিব? এরূপ ভাবে পরমুখাপেক্ষী হইয়া একবেলা অর্দ্ধেক আহার করিয়া এই ভারতবাসী আর কত দিন জীবন-সংগ্রাম করিয়া সমর্থ হইবে?

ভারতে অর্থ-সমস্যা ও অন্ন-সমস্যার সমাধান একমাত্র শিল্প সাধনার দ্বারা হইতে পারে। অন্য পন্থা নাই। শিল্প সাধনার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা—বৈজ্ঞানিক ও শিল্প শিক্ষা (Technical Education), অর্থনীতি (Economics) শিক্ষা, মহাজনী শিক্ষা (Banking and Commerce)।

শিল্প শিক্ষার বিষয়ে জার্ম্মাণী ও জাপান (বিশেষতঃ জাপান) ভারতবর্ষের গুরুর স্থান অধিকার করিতে পারে। জার্ম্মাণী কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক (প্রধানতঃ রাসায়নিক) শিক্ষা ও শিল্পে তাহার প্রয়োগের বলেই আজ বিশ্বের নিকট বরেণ্য। অন্য দিকে নির্জ্জীব, রক্ষণশীল (Conservative) এসিয়ার বক্ষে জাপান কর্ম্মের জোয়ার আনয়ন করিয়াছে। আজ জাপান সভ্য জগতে অন্যান্য উন্নতিশীল পাশ্চাত্য জাতির সহিত এক পংক্তিতে আসন গ্রহণ করিয়াছে। অথচ এই জাপান অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতের অপেক্ষা কোনও অংশে শ্রেষ্ঠ ছিল না। জাপানের এই উন্নতির একমাত্র কারণ এই যে, শতকরা ৯৮ জন জাপানি শিক্ষিত। আর আমাদের দেশে মাত্র মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ভদ্রলোক; আর তাঁহারাও কেরাণীগিরি, শিক্ষকতা, অধ্যাপনা প্রভৃতি "চাকরীর" মরীচিকার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া থাকেন। কয়জন শিক্ষিত ভদ্রলোক ব্যবসায়ে মনোযোগ দিয়া থাকেন? জাপান এই পঞ্চদশ বৎসরের মধ্যে শিল্প শিক্ষার (Technical Education) বিপুল আয়োজন করিয়াছে। জাপানি গভর্মেন্ট, সর্ব্বতোভাবে শিল্পোন্নতির জন্য উৎসাহ দান করিয়া থাকেন।

সমস্ত লোকেরই প্রাথমিক শিক্ষা অবশ্য করণীয় (Compulsory) হওয়া উচিত। কৃষক ও শ্রমজীবিদিগের নিমিত্ত নৈশ বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা, কৃষিশিক্ষা ও অল্পবিস্তর শিল্প শিক্ষাদানের বিশেষ প্রয়োজন; স্ত্রীলোক ও বালকগণকে কুটীর শিল্প বিষয়ক শিক্ষাদান আবশ্যক। সর্ব্বপ্রকার প্রাথমিক শিক্ষায় (Primary Education) দৈনন্দিন বিজ্ঞান শিক্ষাদান অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিজ্ঞান ও কোনও একটী শিল্প (যথা, সূত্রধরের কার্য্য, বস্ত্রবয়ন ইত্যাদি) অবশ্য পাঠ্য হইবে। রসায়ন ও রাসায়নিক শিল্প (Industrial Chemistry) বিষয়ে উচ্চশিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বুদ্ধিমান যুবক ছাত্রদিগকে উক্ত বিষয়ক শিক্ষার নিমিত্ত জাপান, জার্ম্মানী, ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি বিদেশে বৃত্তি দিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার উন্নতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। শিল্প শিক্ষার সহিত অর্থনীতিশিক্ষা, কুঠি পরিচালনা (Factory management), তৈয়ারী বস্তু বিক্রয় করা (Salesmanship) প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমেরিকায় এইরূপ বন্দোবস্ত আছে।

প্রত্যেক স্বদেশভক্ত ভারতবাসীর স্বদেশী শিল্প সাধনায় উৎসাহদান ও স্বদেশী বস্তুর আজীবন ব্যবহার, এই ব্রতপালন করিতে হইবে। ভারতের সমস্যা ভারতবাসীকেই পূরণ করিতে হইবে; উহা বিদেশীর কার্য্য নহে। বিশ্বসভায় ভারতবাসীকে অন্যান্য সভ্য জাতির মধ্যে স্বীয় উচ্চ আসন গ্রহণ করিতেই হইবে।*

---

* জেমসেদপুর সাহিত্য সভার অগ্রহায়ণ অধিবেশনে পঠিত।

বাড়ীর বৌ

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

নাটোরের সুকুলদের ঘড়ীতে ঢং ঢং করে' ছ'টা বাজল। পৌষের শীতের রাত তখনো ভালো করে' পোহায় নি। ভারি কন্‌কনে শীত পড়েচে! কর্ত্তা গিন্নীর ঘুম ভাঙ্‌বার দেরি আছে।* সে বাড়ীর আর-কেউ তখনো শয্যা-ত্যাগ করে নি—বাড়ীর বৌটি ছাড়া।

বৌটি গায়ে শুধু কাপড়ের আঁচল জড়িয়ে বাঁ হাতে একটা কেরোসিনের 'কুপি'-বাতি নিয়ে রান্না-ঘরের বারান্দায় উঠ্‌ল। বারান্দায় উঠে একটা তক্তার ওপর থেকে কতকগুলি শুক্‌ন কাঠের টুক্‌রা বেছে' নিয়ে, বারান্দার উনুনটায় আগুন দিয়ে, শিকল খুলে' ঘরের মধ্যেকার মাটির কলসী থেকে ভালো জল গড়িয়ে এনে, উনুনে চা'র জল চড়িয়ে দিলে। বাড়ীর কর্ত্তা—বউটির শ্বশুরের, শয্যা-ত্যাগের পূর্ব্বেই এক পেয়ালা গরম চা চাই-ই।

চা তৈরি কর্‌তেই চারদিক বেশ পরিষ্কার হ'য়ে উঠ্‌ল। রাস্তায় মেথরদের রাস্তা ঝাঁট দেবার শব্দ শোনা যেতে লাগ্‌ল। কর্ত্তার ঘরে কর্ত্তার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। একটু পরেই গিন্নী দরজা খুলে' বাইরে এলেন।

বৌ চা নিয়ে তার শ্বশুরের ঘরে ঢুক্‌ল। কর্ত্তাকে চা দিয়ে বেরিয়ে এসে বারান্দার চা'র উনুনটা ভালো করে' পুঁছে' ঘরের মধ্যে গিয়ে এক পাশে জড়ো-করা রাতের এঁটো বাসনগুলো উঠিয়ে নিয়ে বাইরে উঠানে রেখে' কুয়ো-তলায় গেল স্নান কর্‌তে—খাবারের ঠাঁই রাত্তিরেই সে নিকিয়ে রেখেছিল।

স্নান করে' এখনি তাকে শাশুড়ীর শিব-পূজার জন্যে ভিজে কাপড়ে উঠানের কোণের ফুলগাছ ক'টা থেকে ফুল তুল্‌তে হবে, ঠাকুর-ঘরের এঁধো কুটুরীতে গিয়ে চন্দন ঘষ্‌তে হবে,—সজ সাজাতে হবে।

সজ সাজিয়ে অনেকক্ষণ পরে বৌ যখন ঠাকুর-ঘর থেকে বেরুল, তখন বাড়ীর সকলেই উঠেচে। ছেলেরা পড়্‌বার ঘরে পড়্‌তে আরম্ভ করেচে; কর্ত্তা উঠানে কেদারায় বসে' আরাম করে' রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে ফরসী টান্‌চেন; গিন্নী তাঁর শোবার ঘরের বারান্দায় বসে' তেল মাখ্‌তে মাখ্‌তে কর্ত্তার সঙ্গে মাঝে-মাঝে সাংসারিক দু' একটি কথা কচ্চেন।

ছেলেদের ইস্কুল আছে, কর্ত্তার কাছারি আছে,—তার পর তাঁর স্নানের জন্যে জল গরম করা আছে; বৌ তাড়াতাড়ি রান্না-ঘরে গিয়ে, কয়লার উনুনে কয়লা দিয়ে, কয়লার ধুঁয়ায় চোখ-মুখ রাঙা করে' উনুন ধরালে। ততক্ষণে বাড়ীর হাড়ীর মেয়ে দাসীটি এসে উঠান ঝাঁট দেওয়া সারা করে' উঠানের এঁটো বাসনগুলো নিয়ে মাজ্‌বার জন্যে তাড়াতাড়ি খিড়্‌কীর পিছনের 'লাল দীঘি'র ঘাটে গেল।

জল গরম করে' গরম জলের হাঁড়ীটা কর্ত্তার ঘরের বারান্দার র'কে রেখে' এসে বৌ ভাত তুলে' দিল। ভাত হ'লে ভাত নামিয়ে দা'ল তুলে' দিয়ে বৌ যখন তরকারীর ডালা এগিয়ে তার থেকে কয়টি ভালো দেখে' বেগুন বেছে' নিয়ে ভাজ্‌বার জন্যে বঁটিতে ছোট ছোট করে' বানাতে বস্‌ল, দাসী তখন নিকটের বাজার থেকে বাজার সেরে' ফিরেচে। বাজারের ঝাঁকা বারান্দায় নামিয়ে রেখে' সে উঠানে বসে' মাছ কুট্‌তে লাগ্‌ল।

রাস্তায় নতুন জলের কল থেকে স্নান করে' ফিরে' এসে ছেলেরা যখন কলরব করে' এক সঙ্গে রান্না ঘরে ঢুক্‌ল, বৌ তখন মাছের তরকারীতে সম্বরা দিচ্চে।

"বৌ'ঠান—আমাদের শীগ্‌গির ভাত দাও।"

"আঃ! মাছের তরকারী এখনো হয় নি?—ন'টা অনেকক্ষণ বেজে' গেছে যে!"

বৌ তাড়াতাড়ি তাদের ঠাঁই করে' দিলে তারা খেতে বস্‌ল। দা'ল, বেগুন ভাজা দিয়ে খেতে খেতেই বৌ মাছ রেঁধে' নামাল। ছেলেরা মাছের জন্যে তাগিদ কর্‌ছিল—

তাড়াতাড়ি তাদের পাতে মাছের তরকারী দিল।

ছেলেরা খেয়ে গেলে বৌ শ্বশুরের জন্যে আলু দিয়ে একটা মাছের অম্বল রেঁধে' নামিয়ে তাঁর খাবারের ঠাঁই করে' রাখ্‌লে। একটু পরেই শ্বশুর এসে পিঁড়িতে বস্‌লেন।

শ্বশুর খেয়ে উঠে পান-তামাক খেয়ে যখন সুকুল-জমিদারদের কাছারিতে গেলেন, তখন শাশুড়ী এসে খেতে বস্‌লেন।

শাশুড়ী খেয়ে উঠে বাইরে যেতেই বাইরে দাসীর গলা শোনা গেল—"বৌমা, আমায় কখন ভাত দেবে গো? দুপুর যে গড়ে' গেল।"

বৌ দাসীকে ভাত দিলে ভাত নিয়ে; দাসী তার বাড়ী চলে' গেল। বৌ রান্না-ঘরের মেঝে পরিষ্কার করে' রান্না-ঘর বন্ধ করে' বেরিয়ে এল। শাশুড়ী তখন তাঁর শোবার ঘরে একটু গা-গড়িয়ে নিচ্চেন।

বৌ কুয়ো-তলায় গিয়ে আবার স্নান কর্‌ল। ঢং—সুকুলদের বাড়ীতে ১টা বাজ্‌ল। সে দিন একাদশী। বিধবা বৌ 'হবিষ্যি'—ঘরের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল। তার পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে' বারান্দার ওপর ছল্ ছল্ চোখে মলিন মুখে গালে হাত দিয়ে কি ভাব্‌তে বস্‌ল!

পল্লী সঙ্গীত-সংগ্রহ *

সংগ্রাহক—মোহাম্মদ মন্‌সুরউদ্দিন

(ক)

আমি কোন্ সাধনে তারে পাই,
আমার জীবনের জীবন সাঁই ॥
সাধিলে সিদ্ধির ঘরে,
শুনেছি সেও পায় না তারে,
সাধু যে ব্যক্তি,
পেলে যে মুক্তি,
ও কে যাবে অমনি শুনিরে ভাই ॥

(খ)

শাক্ত, শৈব্য, বৈরাগ্য ভাব
তাতে যদি হয় চরণ-লাভ,
তবে দয়াময়,
কেন সর্ব্বদায়,
বিধি বলে দুষিবে তাই ॥

(গ)

গেল নারে মনের ভ্রান্ত
পেলেম না সে ভাবে অন্ত
কয় মূঢ় লালন,
ভবে এসে মন,
কি করিতে ওরে কি করে যাই ॥

সামান্য জ্ঞানে কি মন তুই পারবিরে
বিষ ছুঁড়া করিয়ে সুধা রসিকজনা পান করে ॥
কতজন সুধার আশায়,
ফণীর মুখে হাত দিতে যায়
বিষের আতস লেগে গায়,
শেষে তার মরণদশা হয় রে ॥
মন তুমি কি ইহাই ভাব,
সুধা খেয়ে অমর হব,
পার যদি ভালই ভাল,
তাই লালন ফকির কয় রে ॥

জানি মোর প্রেমের প্রেমিক কাজে পেলে
পুরুষ প্রকৃতি স্বভাব থাক্‌তে কি তায় রসিক বলে।
মদন জ্বালায় ছিন্নভিন্ন,
প্রেম, প্রেম বলে জাঁক লাগানো,
ঐহিক দ্বারে রসিক মান্য
"খুকুমী" জারি প্রেম টাকশালে ॥
প্রেমের প্রেমিক রসিকজনা,
'শোবায়' শোষে বাণ ছাড়ে না,
সেই প্রেমের সন্ধি জানা,
যে জন বাঁচাতে পারে মরিলে ॥
তিন রতি রস সাধ্‌লেন হরি,
শ্যামাঙ্গ, গৌরাঙ্গ তারই,
ফকির লালন বলে বিনয় করি,
সে প্রেমেতে রসিক খেলে ॥

---

* এই গান কয়েকটি নদীয়া জিলার সদ্ধা গ্রামনিবাসী বন্ধুবর মৌলবী আহ্‌মদ হোসেন সাহেবের সাহায্যে সংগৃহীত।—সংগ্রাহক।

নর্ম্মদার দেশে

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র বসু বি-এ

শরতের কনক-কিরণোজ্জ্বল উষায় শিশুপালের রাজ্যে সেই প্রথম পদার্পণ করিলাম। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ না কি স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান জব্বলপুর অতীতের সেই মহাভারত-প্রখ্যাত চেদীরাজ্য। যাহা হউক, অতীত যুগের চেদীরাজ্যের কীর্ত্তিকাহিনী যতই বিপুল-প্রসারিণী হউক না কেন—অধুনাতন জব্বলপুরও গরিমা, সম্পদে বা শ্রীসৌভাগ্যে কিছু কম নয়। জব্বলপুর মধ্য প্রদেশের দ্বিতীয় সহর—ইষ্ট ইণ্ডিয়ান, গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্‌সুলার এবং বেঙ্গল নাগপুর —এই তিনটি সুপ্রসিদ্ধ রেলওয়ের জংশন স্থান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-সুষমায়ও জব্বলপুর ভারতের অন্য কোন নগর অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়। অদূরে কলনাদিনী নর্ম্মদা দুই পারের তটভূমি সজাগ করিয়া প্রমত্ত তরঙ্গভঙ্গে প্রবহমানা; সমগ্র নগরের চতুষ্পার্শ্ব বেষ্টিত করিয়া গ্রেনাইট প্রস্তরের অতুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী;—তাহার কোনটি বা লতাগুল্মবিবর্জ্জিত কঙ্কর-ধূসর, কোনটি বা পত্রপল্লববিভূষিত শ্যামল-সুন্দর। সৌন্দর্য্যের সর্ব্ব অঙ্গ পূরণের জন্য সহরের মধ্যস্থলে একটি অত্যুচ্চ পাহাড়ের পদচুম্বী একটি সুন্দর হ্রদও বিরাজমান।

গান গেট কামান গাড়ীর কারখানা—জব্বলপুর

যাক্ সে কথা—ট্রেণ হইতে ত নামিলাম; এখন যাই কোথা? এইখানে বলিয়া রাখি, আমরা পাঁচজন বন্ধু একত্র কলিকাতা হইতে আসিতেছি। আগে হইতে চিঠিপত্র লিখিয়া থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া রাখি নাই; সুতরাং বলা বাহুল্য, স্থানীয় বন্ধুবান্ধবেরা কেহই আমাদের আগমন অপেক্ষায় ষ্টেশনে আসেন নাই। বয়োজ্যেষ্ঠ আশুবাবু পরামর্শ দিলেন, "চল ধর্ম্মশালায় যাই।" বিপত্তিকালে বৃদ্ধের বচন অবশ্য গ্রহণীয় ভাবিয়া তদনুযায়ী কুলির মাথায় জিনিস-পত্র চাপাইয়া ধর্ম্মশালা অভিমুখে রওয়ানা হওয়া গেল। ধর্ম্মশালা ষ্টেশনের নিকটেই—মাত্র ৪।৫ মিনিটের

পথ। এখানকার সুবিখ্যাত ধনী ও সকল সৎকার্য্যের অগ্রণী রাজা গোকুলদাসের "জব্বলপুর ওয়াটার ওয়ার্কস" নির্ম্মাণকল্পে মুক্তহস্তে দানের স্মারক চিহ্নস্বরূপ এই সুবৃহৎ অট্টালিকা ১৯১১ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। তাই ইহার নাম রাজা গোকুলদাস ধর্ম্মশালা। ইহার পরিচালনের ব্যবস্থাভার মিউনিসিপ্যালিটির হস্তে। ধর্ম্মশালার সম্মুখস্থ পুষ্পপ্রাঙ্গণে এই মহামনা মহাপুরুষের অমল-ধবল মর্ম্মরমূর্ত্তি অবলোকন করিলাম।

প্রাঙ্গণ। এতদ্ব্যতীত দ্বিতলে কয়েকটি জলের কল ও পায়খানা রহিয়াছে। নিম্নস্থিত প্রাঙ্গণে একটি চায়ের ও একটি মিষ্টান্নের দোকান রহিয়াছে দেখিলাম। এই দোকান দুইটি ব্যতীত আর একটি হোটেলও রহিয়াছে,—যে সকল যাত্রী রন্ধনের কষ্ট সহ্য করিতে অপারগ, তাঁহারা এই হোটেলের আশ্রয় লইয়া থাকেন।

দোকান হইতে চা ও গরম গরম জিলাপী আনাইয়া সেবন করিয়া প্রাণটা কিছু ধাতস্থ হইলে, স্নান ও ক্ষৌরকার্য্যে মনোনিবেশ করিলাম। এদিকে হোটেলেও পাঁচ

কামানিয়া গেট—জব্বলপুর

জনের উপযোগী ভাতের জন্য বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যথাসময়ে খাইবার ডাক আসিল। কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের নমুনা যা দেখিলাম, তাহাতে আর মুহূর্ত্ত মাত্রও জব্বলপুরে থাকিবার বাসনা রহিল না। আহারের উপকরণ কঙ্কর-সঙ্কুল, জবাকুসুম-সঙ্কাশ-বর্ণ অর্দ্ধদগ্ধ তণ্ডুল, খোসা-সংযুক্ত মসীবিনিন্দিত-কান্তি জলবৎ তরল কলায়ের ডাল এবং লবণ-পরিশূন্য অথচ লঙ্কা-পরিপূর্ণ আলুর ব্যঞ্জন। সবশেষে কিঞ্চিৎ বহু পুরাতন তিন্তিড়ী বিতরণ করিয়া হোটেলের অধিপতি মহাশয় অন্নমধুরেণ সমাপয়েৎ করিলেন। তিন্তিড়ীর উপরিভাগস্থ শ্বেতবর্ণ আবরণ দর্শনে বন্ধুবর

নিম্নে বারান্দার এক ধারে খাতাহস্তে ম্যানেজার সাহেব বিরাজ করিতেছিলেন। নাম, ধাম, পেশা ও জব্বলপুরে আসিবার উদ্দেশ্য প্রভৃতি সেই খাতায় লিপিবদ্ধ করাইয়া দ্বিতলের একটি গৃহে কয়জনে আশ্রয় লইলাম। ধর্ম্মশালার বন্দোবস্ত অতি সুন্দর। বাড়ীটিতে অনেকগুলি শয়নকক্ষ আছে। যে কোন ভারতীয় ভ্রমণকারীকে সাতদিন এই সকল কক্ষে বিনাভাড়ায় থাকিতে দেওয়া হয়। সপরিবারে থাকিবারও সুন্দর বন্দোবস্ত আছে দেখিলাম। প্রত্যেক ভদ্রপরিবারের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য আলাদা আলাদা রান্নাঘর, স্নানের কল ও তৎসংলগ্ন একটি করিয়া চতুষ্পার্শ্বাবৃত ক্ষুদ্র

বেলা প্রায় ১১টা। এই ফ্যাক্টরী ১৯০৪ অব্দে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। এখানে Gun Carrigeএর যাবতীয় উপাঙ্গনিচয় প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রায় তিন সহস্র লোক এই কার্য্যে নিযুক্ত আছে। ফ্যাক্টরীর সম্মুখস্থিত তোরণোপরি প্রকাণ্ড ক্লক টাওয়ার বিরাজমান। তাহারই ঠিক নীচে দিয়া যাতায়াতের দুইটি পথ বিদ্যমান। প্রবেশ-তোরণের একটি আলোক-চিত্র এই প্রবন্ধে প্রদত্ত হইল। ফ্যাক্টরীর চতুষ্পার্শ্বে চারিটি পাহাড়ের চূড়ায় চারিটি গৃহ° দেখিলাম। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, উহাই Factory defence ;—বিগত মহাযুদ্ধের সময় বিমানচারী আক্রমণকারীর প্রতিরোধকল্পে নির্ম্মিত। যুদ্ধের সময় ওখানে কামান প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র সদাসর্ব্বদা সজ্জিত করিয়া রাখা হয়।

ফ্যাক্টরীতে প্রবেশ করিয়া অনেকগুলি পরিচিত সুহৃদের সাক্ষাৎ পাইলাম, ইঁহারা জব্বলপুর-প্রবাসী বাঙ্গালী। ধর্ম্মশালায় উঠিয়াছি জানিয়া সকলেই ত রাগিয়া আগুন। ইঁহারা সকলেই ফ্যাক্টরী কোয়াটারে থাকেন ; সুতরাং আমাদের সকলকেই সেখানে লইয়া যাইবার জন্য জিদ করিতে লাগিলেন। ফ্যাক্টরী কো-অপরাটিভের ম্যানেজার সমিতিঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ত আমাদিগকে এক রকম জোর করিয়া তাঁহার বাসায় টানিয়া লইয়া চলিলেন। তাঁহার প্রতিবাসী শান্তিবাবু ধর্ম্মশালা হইতে আমাদের জিনিসপত্র আনিবার জন্য তৎক্ষণাৎ টোঙ্গা লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। আমরাও গত্যন্তর না দেখিয়া "কুলীন ব্রাহ্মণের বাড়ী জাত দিতে" স্বীকৃত হইলাম। দলের নেতা বনবিহারী বাবু ত আগেই একটি খাটিয়া অধিকার করিয়া শুইয়া পড়িয়াছিলেন ; ভাবটা—"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকম্ ন গচ্ছামি।" আলাপে প্রলাপে হাস্য পরিহাসে জব্বলপুরে প্রথম রাত্রি বেশ ভালভাবেই কাটিল।

জলাধার—জব্বলপুর

পরদিন অপরাহ্ণে কয়েকখানি টোঙ্গা ভাড়া করিয়া সদলবলে সহর দর্শনে চলিলাম। জব্বলপুরে দর্শনযোগ্য দৃশ্য অনেক আছে। তন্মধ্যে যে কয়টি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হইল, তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ কয়েকখানি আলোকচিত্র এখানে প্রকাশ করিলাম। প্রথম, "কামিনিয়া ফটক"। এই তোরণ দ্বারের সহিত ভারত ইতিহাসের অনেক অতীত-সুরভি-স্মৃতি বিজড়িত আছে। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের শাসনকালে ১৭৭৯ অব্দে নাগপুর এবং সাগর রাস্তা রক্ষার জন্য

বনবিহারীবাবু সভয় অন্তঃকরণে বলিয়া উঠিলেন,—"তেঁতুল এত পুরাতন যে ইহা ভারতবর্ষের যে কোন প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়ীভূত হইতে পারে।" যদিও এই হোটেলটি মধ্যপ্রদেশের আচারপূত নিষ্ঠাসম্পন্ন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পরিচালিত, তবু আমাদের আহারে আমিষের সংস্রব যে একেবারেই ছিল না, ইহা হলপ করিয়া বলিতে পারি না। কেননা সুহৃদ্বর অনাথের পাত্রোপরি সযত্নে রক্ষিত সেই তিন্তিড়ীখণ্ডের মধ্যে দুইটি নাতিদীর্ঘ শ্বেতবর্ণ কীট দর্শন করিয়াছিলাম। ভোজনের এমন সুন্দর ও সুপ্রচুর আয়োজন দর্শনে আমরা ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলাম। রাঢ়দেশবাসী নারায়ণচন্দ্র কিন্তু হটিলেন না,—একে কলায়ের ডাল তদুপরি তেঁতুলের টক,—সোনায় সোহাগা আর কি? অর্দ্ধসের তণ্ডুল স্বল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া গেল। বাস্তবিকই যে রেটে গ্রাসের পর গ্রাস তাঁহার বদনবিবরে প্রবিষ্ট হইতেছিল, তাহা হোটেল-স্বামীর পক্ষে ত বটেই, এমন কি আমাদের পক্ষেও বিভীষিকাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শেষটা বিদেশে না বিপদে পড়িতে হয়। জব্বলপুরের জলবায়ুর গুণেই হউক কিম্বা আমাদের সৌভাগ্যবশতঃই হউক, বন্ধুবরের জঠরাগ্নি সেই অর্দ্ধদগ্ধ তণ্ডুলরাশি ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই পরিপাক করিয়া ফেলিতে সমর্থ হইয়াছিল।

বেলা প্রায় দশটার সময়ে Gun carriage Factoryর অভিমুখে চলিলাম। সহর দিয়া যাইতে হইলে অনেকটা ঘুরিতে হয় বলিয়া পথ সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে আমরা রেল লাইন ধরিয়া চলিলাম। বামে বার্ণ কোম্পানীর সুপ্রসিদ্ধ টালির কারখানা দৃষ্ট হইল। কলিকাতা অঞ্চলে ব্যবহৃত রাণীগঞ্জের টালি অপেক্ষা এই টালি অনেক বেশী মজবুত ও দেখিতেও সুন্দর। এখানকার মাটির এই বিশেষত্ব আবিষ্কার করিয়া ইঁহারা এ প্রদেশে এক প্রকাণ্ড কারখানা বসাইয়াছেন। এই টালি ব্যতীত নানাবিধ সুন্দর সুন্দর মাটীর পাত্র এখানে প্রস্তুত হইয়া দেশবিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। কারখানাটি সুবিস্তৃত। ইহার সীমান্ত ভাগে কারখানার কর্ম্মচারীদের এবং কিছুদূরে কুলী মজুরদের থাকিবার স্থান। মাঝে মাঝে চূণের পাহাড় দেখিলাম। সেই পাহাড়ের মধ্যে স্থানে স্থানে বর্ষার জল জমিয়া চূণ ও মাটির সংমিশ্রণে গগন নিলীম বর্ণ ধারণ করিয়াছে। দেখিতে বড়ই সুন্দর।

ওয়াটার ফাউনটেন রোড—জব্বলপুর

Gun Carriage Factoryতে যখন পৌঁছিলাম, তখন

বেলা প্রায় ১১টা। এই ফ্যাক্টরী ১৯০৪ অব্দে গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নির্ম্মিত হয়। এখানে Gun Carrigeএর যাবতীয় উপাঙ্গনিচয় প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রায় তিন সহস্র লোক এই কার্য্যে নিযুক্ত আছে। ফ্যাক্টরীর সম্মুখস্থিত তোরণোপরি প্রকাণ্ড ক্লক টাওয়ার বিরাজমান। তাহারই ঠিক নীচে দিয়া যাতায়াতের দুইটি পথ বিদ্যমান। প্রবেশ-তোরণের একটি আলোক-চিত্র এই প্রবন্ধে প্রদত্ত হইল। ফ্যাক্টরীর চতুষ্পার্শ্বে চারিটি পাহাড়ের চূড়ায় চারিটি গৃহ দেখিলাম। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, উহাই Factory defence ;—বিগত মহাযুদ্ধের সময় বিমানচারী আক্রমণকারীর প্রতিরোধকল্পে নির্ম্মিত। যুদ্ধের সময় ওখানে কামান প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র সদাসর্ব্বদা সজ্জিত করিয়া রাখা হয়।

ফ্যাক্টরীতে প্রবেশ করিয়া অনেকগুলি পরিচিত সুহৃদের সাক্ষাৎ পাইলাম,- ইঁহারা জব্বলপুর-প্রবাসী বাঙ্গালী। ধর্ম্মশালায় উঠিয়াছি জানিয়া সকলেই ত রাগিয়া আগুন। তাঁরা সকলেই ফ্যাক্টরী কোয়াটারে থাকেন ; সুতরাং আমাদের সকলকেই সেখানে লইয়া যাইবার জন্য জিদ করিতে লাগিলেন। ফ্যাক্টরী কো-অপরাটিভের ম্যানেজার সমিতিঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ত আমাদিগকে এক রকম জোর করিয়া তাঁহার বাসায় টানিয়া লইয়া চলিলেন। তাঁহার প্রতিবাসী শান্তিবাবু ধর্ম্মশালা হইতে আমাদের জিনিসপত্র আনিবার জন্য তৎক্ষণাৎ টোঙ্গা লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। আমরাও গত্যন্তর না দেখিয়া "কুলীন ব্রাহ্মণের বাড়ী ভাত দিতে" স্বীকৃত হইলাম। দলের নেতা বনবিহারী বাবু ত আগেই একটি খাটিয়া অধিকার করিয়া শুইয়া পড়িয়াছিলেন ; ভাবটা—"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকম্ ন গচ্ছামি।" আলাপে প্রলাপে হাস্য পরিহাসে জব্বলপুরে প্রথম রাত্রি বেশ ভালভাবেই কাটিল।

জলাধার—জব্বলপুর

পরদিন অপরাহ্নে কয়েকখানি টোঙ্গা ভাড়া করিয়া সদলবলে সহর দর্শনে চলিলাম। জব্বলপুরে দর্শনযোগ্য দৃশ্য অনেক আছে। তন্মধ্যে যে কয়টি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হইল, তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ কয়েকখানি আলোকচিত্র এখানে প্রকাশ করিলাম। প্রথম, "কামিনিয়া ফটক"। এই তোরণ দ্বারের সহিত ভারত ইতিহাসের অনেক অতীত-সুরভি-স্মৃতি বিজড়িত আছে। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের শাসনকালে ১৭৭৯ অব্দে নাগপুর এবং সাগর রাস্তা রক্ষার জন্য

বনবিহারীবাবু সভয় অন্তঃকরণে বলিয়া উঠিলেন,—"তেঁতুল এত পুরাতন যে ইহা ভারতবর্ষের যে কোন প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়ীভূত হইতে পারে।" যদিও এই হোটেলটি মধ্যপ্রদেশের আচারপূত নিষ্ঠাসম্পন্ন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পরিচালিত, তবু আমাদের আহারে আমিষের সংস্রব যে একেবারেই ছিল না, ইহা হলপ করিয়া বলিতে পা'র না। কেননা সুহৃদ্বর অনাথের পাত্রোপরি সযত্নে রক্ষিত সেই তিন্তিড়ীখণ্ডের মধ্যে দুইটি নাতিদীর্ঘ শ্বেতবর্ণ কীট দর্শন করিয়াছিলাম। ভোজনের এমন সুন্দর ও সুপ্রচুর আয়োজন দর্শনে আমরা ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলাম। রাঢ়দেশবাসী নারায়ণচন্দ্র কিন্তু হটিলেন না,—একে কলায়ের ডাল তদুপরি তেঁতুলের টক,—সোনায় সোহাগা আর কি? অর্দ্ধসের তণ্ডুল স্বল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া গেল। বাস্তবিকই যে রেটে গ্রাসের পর গ্রাস তাঁহার বদনবিবরে প্রবিষ্ট হইতেছিল, তাহা হোটেল-স্বামীর পক্ষে ত বটেই, এমন কি আমাদের পক্ষেও বিভীষিকাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শেষটা বিদেশে না বিপদে পড়িতে হয়। জব্বলপুরের জলবায়ুর গুণেই হউক কিম্বা আমাদের সৌভাগ্যবশতঃই হউক, বন্ধুবরের জঠরাগ্নি সেই অর্দ্ধদগ্ধ তণ্ডুলরাশি ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই পরিপাক করিয়া ফেলিতে সমর্থ হইয়াছিল।

বেলা প্রায় দশটার সময়ে Gun carriage Factoryর অভিমুখে চলিলাম। সহর দিয়া যাইতে হইলে অনেকটা ঘুরিতে হয় বলিয়া পথ সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে আমরা রেল লাইন ধরিয়া চলিলাম। বামে বার্ণ কোম্পানীর সুপ্রসিদ্ধ টালির কারখানা দৃষ্ট হইল। কলিকাতা অঞ্চলে ব্যবহৃত রাণীগঞ্জের টালি অপেক্ষা এই টালি অনেক বেশী মজবুত ও দেখিতেও সুন্দর। এখানকার মাটির এই বিশেষত্ব আবিষ্কার করিয়া ইঁহারা এ প্রদেশে এক প্রকাণ্ড কারখানা বসাইয়াছেন। এই টালি ব্যতীত নানাবিধ সুন্দর সুন্দর মাটীর পাত্র এখানে প্রস্তুত হইয়া দেশবিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। কারখানাটি সুবিস্তৃত। ইহার সীমান্ত ভাগে কারখানার কর্ম্মচারীদের এবং কিছুদূরে কুলী-মজুরদের থাকিবার স্থান। মাঝে মাঝে চুণের পাহাড় দেখিলাম। সেই পাহাড়ের মধ্যে স্থানে স্থানে বর্ষার জল জমিয়া চুণ ও মাটির সংমিশ্রণে গগন নিলীম বর্ণ ধারণ করিয়াছে। দেখিতে বড়ই সুন্দর।

ওয়াটার ফাউনটেন রোড—জব্বলপুর

Gun Carriage Factoryতে যখন পৌঁছিলাম, তখন

হাট। হাটে শশা ও জ্বালানীকাষ্ঠ ব্যতীত অন্য কোন পণ্য দ্রব্য বড় বেশী দেখিলাম না। Central bank Robertson Muslim High School, George Town High School প্রভৃতির পার্শ্ব দিয়া গাড়ী ধীর-মন্থর গতিতে চলিল। ক্রমে বসতিবিরল সহর সীমান্ত পরিত্যাগ করিয়া গাড়ী তিলওয়ার ঘাটের রাস্তায় আসিয়া পড়িল। এখান হইতে মর্ম্মর পাহাড় আট মাইল দুর।

পথের দুইধারে দৃশ্যবৈচিত্র্য বড় দেখা যাইতেছিল না। কেবলি উষর-ধূসর মাঠ;—কচিৎ কোথাও স্নিগ্ধ-শ্যামল ভুট্টাক্ষেত্র। শস্যপুষ্প-বিভূষিতা বঙ্গজননীর সেই মনোরম শোভা এসব অঞ্চলে বড় দেখা যায় না। সহরের প্রায় ৪ মাইল পশ্চিমে গরহা গ্রামের নিকট একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর সুপ্রসিদ্ধ Poised rock দর্শন করিলাম। ইহার বিবরণ পূর্ব্বে কোন একটি মাসিক পত্রিকায় পড়িয়াছিলাম: দেখিলাম, একটি সুবৃহৎ শৈলখণ্ড প্রায় নিরালম্বভাবে একটি পাহাড়ের উপর বিরাজমান। শুনিলাম একবার হস্তী সাহায্যে পাথরটিকে স্থানচ্যুত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই।

তাহারই কিয়দ্দূরে দৃষ্ট হইল "মদনমহল"। একটি অনতিউচ্চ পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত এক সুপ্রাচীন ইমারত। এই ইমারত ১১০০অব্দে সেনাপতি মদনসিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয় স্থানীয় জনপ্রবাদ এই যে, ইহা পরে ইতিহাস-প্রখ্যাতা রাণী দুর্গাবতী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক নহি,—কাজে কাজেই এই প্রবাদের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইলাম। আশা করি, কোন ঐতিহাসিক "ভারতবর্ষের" মারফৎ এ সম্বন্ধে তাঁহার বিস্তারিত অভিমত জানাইয়া আমার অনুগৃহীত করিবেন।

শেষ

শ্রীচারুলতা রায়

ওগো, খেয়া-ঘাটের মাঝি!
বুঝি, পরপারে পাড়ি দিতে
সময় হল আজি!
তাই, দিনের আলো ঝিমিয়ে আসে,
নাম্‌ছে আমার চোখের পাশে,
সাঁঝের সুরে মরম-তারে
মরণ ওঠে বাজি!
ওগো খেয়া তরীর মাঝি!

জীবন যখন হল সুরু
তোমায় পেনু দেখা,
যাত্রা-শেষে পুনর্ম্মিলন
ভাগ্যে ছিল লেখা।—
সাঁঝের আলো ভাঙ্গা হাটে,
পারে যাবার খেয়া-ঘাটে,
বিদায় সুরে মরণ-বীণা
উঠবে যবে বাজি!
ওগো, জন্ম-তরীর মাঝি!
বুঝি, এম্‌নি করে সাঁঝ সকালের
কাটাও দিবস্ রাজি!

অবস্থিত। ছাত্রাবাস ও Play Ground দুই-ই কলেজ-সংলগ্ন। এখানে একটি বাঙ্গালী অধ্যাপক আছেন। তাঁহার নাম মিঃ বক্সী। তিনি Imperial Educationel Serviceএর অন্তর্গত একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলাম। মিঃ বক্সী যেমন অমায়িক, তেমনি অতিথিবৎসল। মিষ্ট ভাষা ও বিনয় যেন তাঁর সহজাত প্রবৃত্তি। তাঁহার কথা ভাবিতে ভাবিতে পরিতৃপ্ত অন্তঃকরণে গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন রবিবার। মার্ব্বেল-রক দেখিবার প্রোগ্রাম শিখর দৃষ্ট হইল। প্রাণীবিদ্যার আবিষ্কারের সহিত এই পাহাড়ের একটি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। বিগত ১৯১৯ সালে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মিঃ ম্যাটানী Gun Carriage Factoryর হিসাব পরীক্ষা করিতে আসিয়া এই পাহাড়ের গর্ত্ত হইতে একটি বৃহৎ ম্যামথের অস্থিকঙ্কাল আবিষ্কার করেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগের সেই নিদর্শন পণ্ডিতপ্রবর ম্যাটানী সাহেবের অনুসন্ধিৎসার সাক্ষী রূপে কলিকাতার যাদুঘরে বিরাজমান। শুনিয়াছিলাম এই আবিষ্কার-প্রসঙ্গে অডিটের নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিঞ্চিদধিককাল জব্বলপুরে অতিবাহিত করার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তাঁহার কৈফিয়ৎ তলব

জলপ্রপাত (মার্ব্বেল পাহাড়ের নিকট)—জব্বলপুর

দুইখানি টোঙ্গা ভাড়া করিয়া আমরা ছয় জনে রওয়ানা হইলাম। একটি টোঙ্গায় কলিকাতা হইতে নবাগত Factory Accounts Audit Officer রায়সাহেব জানকীপ্রসাদ দত্ত, তাঁহার পার্শন্যাল এ্যাসিষ্টেণ্ট মিঃ মুখার্জ্জী এবং স্থানীয় ফ্যাক্টরীর একাউণ্টেণ্ট গোলাম রসুল সাহেব; আর অন্যটীতে আমরা তিনটী সহযাত্রী সুহৃদ,—বনবিহারী বাবু, অনাথবাবু ও আমি। দশটার সময় টোঙ্গা ছাড়িল। এখান হইতে মার্ব্বেল রক প্রায় ১৬ মাইল দূর। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই বামে ছোট সিমলা পাহাড়ের অনতিউচ্চ করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও না কি এই মনস্বী পণ্ডিতের অনুসন্ধিৎসা-স্পৃহা বিন্দুমাত্র কমে নাই। ইনি আমাদের এক ডিপার্টমেণ্টের লোক বলিয়া মনে মনে কিঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদ অনুভব করিলাম।

দেখিতে দেখিতে টোঙ্গা সহরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দক্ষিণে এক বিস্তীর্ণ ময়দানে অসংখ্য জনসমাগম দেখিলাম। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, ইহাই এতদঞ্চল-প্রসিদ্ধ গ্রাম্বির হাট। প্রতি রবিবার এখানে হাট বসে এবং চারিধারের ১০।১৫ মাইলের মধ্যবর্ত্তী গ্রামসমূহের ক্রয়বিক্রয়ের ইহাই একমাত্র

হাট। হাটে শশা ও জ্বালানীকাষ্ঠ ব্যতীত অন্য কোন পণ্য দ্রব্য বড় বেশী দেখিলাম না। Central bank Robertson Muslim High School, George Town High School প্রভৃতির পার্শ্ব দিয়া গাড়ী ধীর-মন্থর গতিতে চলিল। ক্রমে বসতিবিরল সহর সীমান্ত পরিত্যাগ করিয়া গাড়ী তিলওয়ার ঘাটের রাস্তায় আসিয়া পড়িল। এখান হইতে মর্ম্মর পাহাড় আট মাইল দূর।

পথের দুইধারে দৃশ্যবৈচিত্র্য বড় দেখা যাইতেছিল না। কেবলি উষর-ধূসর মাঠ;—কচিৎ কোথাও স্নিগ্ধ-শ্যামল ভুট্টাক্ষেত্র। শস্যপুষ্প-বিভূষিতা বঙ্গজননীর সেই মনোরম শোভা এসব অঞ্চলে বড় দেখা যায় না। সহরের প্রায় ৪ মাইল পশ্চিমে গরহা গ্রামের নিকট একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর সুপ্রসিদ্ধ Poised rock দর্শন করিলাম। ইহার বিবরণ পূর্ব্বে কোন একটি মাসিক পত্রিকায় পড়িয়াছিলাম; দেখিলাম, একটি সুবৃহৎ শৈলখণ্ড প্রায় নিরালম্বভাবে একটি পাহাড়ের উপর বিরাজমান। শুনিলাম একবার হস্তী সাহায্যে পাথরটিকে স্থানচ্যুত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই।

তাহারই কিয়দ্দূরে দৃষ্ট হইল "মদনমহল"। একটি অনতিউচ্চ পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত এক সুপ্রাচীন ইমারত। এই ইমারত ১১০০ অব্দে সেনাপতি মদনসিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। স্থানীয় জনপ্রবাদ এই যে, ইহা পরে ইতিহাস-প্রথ্যাতা রাণী দুর্গাবতী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক নহি,—কাজে কাজেই এই প্রবাদের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইলাম। আশা করি, কোন ঐতিহাসিক "ভারতবর্ষের" মারফৎ এ সম্বন্ধে তাঁহার বিস্তারিত অভিমত জানাইয়া আমার অনুগৃহীত করিবেন।

শেষ

শ্রীচারুলতা রায়

ওগো, খেয়া-ঘাটের মাঝি!
বুঝি, পরপারে পাড়ি দিতে
সময় হল আজি!
তাই, দিনের আলো ঝিমিয়ে আসে,
নাম্‌ছে আমার চোখের পাশে,
সাঁঝের সুরে মরম-তারে
মরণ ওঠে বাজি!
ওগো খেয়া তরীর মাঝি!

জীবন যখন হল সুরু
তোমায় পেনু দেখা,
যাত্রা-শেষে পুনর্ম্মিলন
ভাগ্যে ছিল লেখা।—
সাঁঝের আলো ভাঙ্গা হাটে,
পারে যাবার খেয়া-ঘাটে,
বিদায় সুরে মরণ-বীণা
উঠ্‌বে যবে বাজি!
ওগো, জন্ম-তরীর মাঝি!
বুঝি, এম্‌নি করে সাঁঝ সকালের
কাটাও দিবস্ রাজি!

অবস্থিত। ছাত্রাবাস ও Play Ground দুই-ই কলেজ-সংলগ্ন। এখানে একটি বাঙ্গালী অধ্যাপক আছেন। তাঁহার নাম মিঃ বক্সী। তিনি Imperial Educationel Service-এর অন্তর্গত একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলাম। মিঃ বক্সী যেমন অমায়িক, তেমনি অতিথিবৎসল। মিষ্ট ভাষা ও বিনয় যেন তাঁর সহজাত প্রবৃত্তি। তাঁহার কথা ভাবিতে ভাবিতে পরিতৃপ্ত অন্তঃকরণে গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন রবিবার। মার্ব্বেল-রক দেখিবার প্রোগ্রাম দুইখানি টোঙ্গা ভাড়া করিয়া আমরা ছয় জনে রওয়ানা হইলাম। একটি টোঙ্গায় কলিকাতা হইতে নবাগত Factory Accounts Audit Officer রায়সাহেব জানকীপ্রসাদ দত্ত, তাঁহার পার্শ্বন্যাল এসিষ্টেন্ট মিঃ মুখার্জ্জী এবং স্থানীয় ফ্যাক্টরীর একাউন্টেন্ট গোলাম রসুল সাহেব; আর অন্যটীতে আমরা তিনটী সহযাত্রী সুহৃদ,—বনবিহারী বাবু, অনাথবাবু ও আমি। দশটার সময় টোঙ্গা ছাড়িল। এখান হইতে মার্ব্বেল রক প্রায় ১৬ মাইল দূর। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই বামে ছোট সিমলা পাহাড়ের অনতিউচ্চ শিখর দৃষ্ট হইল। প্রাণীবিদ্যার আবিষ্কারের সহিত এই পাহাড়ের একটি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। বিগত ১৯১৯ সালে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মিঃ ম্যাটানী Gun Carriage Factoryর হিসাব পরীক্ষা করিতে আসিয়া এই পাহাড়ের গর্ত্ত হইতে একটি বৃহৎ ম্যামথের অস্থিকঙ্কাল আবিষ্কার করেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগের সেই নিদর্শন পণ্ডিতপ্রবর ম্যাটানী সাহেবের অনুসন্ধিৎসার সাক্ষী রূপে কলিকাতার যাদুঘরে বিরাজমান। শুনিয়াছিলাম এই আবিষ্কার-প্রসঙ্গে অডিটের নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিঞ্চিদধিককাল জব্বলপুরে অতিবাহিত করার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তাঁহার কৈফিয়ৎ তলব করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও না কি এই মনস্বী পণ্ডিতের অনুসন্ধিৎসা-স্পৃহা বিন্দুমাত্র কমে নাই। ইনি আমাদের এক ডিপার্টমেণ্টের লোক বলিয়া মনে মনে কিঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদ অনুভব করিলাম।

জলপ্রপাত (মার্ব্বেল পাহাড়ের নিকট)—জব্বলপুর

দেখিতে দেখিতে টোঙ্গা সহরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দক্ষিণে এক বিস্তীর্ণ ময়দানে অসংখ্য জনসমাগম দেখিলাম। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, ইহাই এতদঞ্চল-প্রসিদ্ধ গ্রন্থির হাট। প্রতি রবিবার এখানে হাট বসে এবং চারিধারের ১০।১৫ মাইলের মধ্যবর্ত্তী গ্রামসমূহের ক্রয়বিক্রয়ের ইহাই একমাত্র

তখন উঠানে কলতলায় দাঁড়াইয়া গা হাত ধুইতেছে। শ্যামা সাহস করিয়া কহিল—"মাইনে পেয়েচ বোধ হয়?"

সুধীর গম্ভীর কণ্ঠে কহিল "হুঁ।"

শ্যামা কহিল—"খুকীর জন্যে দুটো জামা কিনে দিও।"

সুধীর কহিল—"এ মাসে হবে না; কুড়ি টাকা দেনা আছে, সেটা শোধ করতে হ'বে। ভারী আমার মেয়ে, তার আবার তিন সন্ধ্যে জামা, জুতো। তবু যদি মার মতন কালিন্দী না হয়ে সুন্দরী হোতো।"

শ্যামার সাহস হইল না যে বলে, চামড়া কটা ও কালোর জন্য সন্তানের প্রতি বাপ-মার ভালবাসার তারতম্য হওয়া হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নয়। আজই জগতে শ্যামাকে স্নেহ যত্ন করিতে কেহ নাই,—শৈশবে সে এমন দুর্ভাগিনী ছিল না। দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিলেও পিতা মাতা তাঁহাদের এই কালো মেয়েটিকে হৃদয়ের অনাবিল স্নেহ-সুধা ঢালিয়াই মানুষ করিয়াছিলেন। তাহার দুটি ভাইএর সহিত সমান আদরেই সে বাপ-মার আশ্রয়ে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। স্নেহ-ভালবাসার প্রাচুর্য্য সাংসারিক অভাব-অনাটনকে সম্পূর্ণ রূপে ঢাকা দিয়াছিল। তার পর হঠাৎ সে কি দুর্দ্দৈব! প্লেগে দুটি ভাই মারা গেল, শোকে মা মারা গেলেন। কিছু দিন পরে বাবাও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। মাসী তখন আদর করিয়া শ্যামাকে আশ্রয় দিলেন। সুধীরের কোন আত্মীয়-স্বজন ছিল না। সুদূর বঙ্গদেশ হইতে সে এলাহাবাদে চাকুরী করিতে আসিয়াছিল, এবং বুদ্ধি ও কর্ম্ম-দক্ষতার গুণে চাকুরীও ভাল পাইয়াছিল। কিন্তু ক্রমেই অসৎসঙ্গে তার চরিত্রদোষ ঘটে। মাসী ইহা জানিয়াও বড় গ্রাহ্য করেন নাই। বয়স্থা শ্যামাকে আর ঘরে রাখা চলে না; অথচ মুখ-চোখ সুন্দর হইলেও, কালো রঙের জন্য তার বিবাহ হইতেছে না; বিশেষ আবার যৌতুকের অভাব। এ অবস্থায় জোগাড়-যন্ত্র করিয়া সুধীরের সহিত তিনি শ্যামার বিবাহ ঘটাইলেন। অতঃপর বয়স্থা বধূর পাহারায় সুধীর যে শীঘ্রই সচ্চরিত্র হইয়া উঠিবে, এই বিশ্বাসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। পুরুষের চরিত্রদোষ,—সুরাপান, ব্যভিচার—এ কি আর ধর্ত্তব্যের মধ্যে? বিশেষ আবার প্রথম যৌবনে।

সুধীরের চারিপাশে অনেকগুলি মোসাহেব জুটিয়াছিল। শ'খানেক টাকা ছিল তার মাহিনা। এত দিন না ছিল তার পোষ্য, না ছিল কেহ তাগিদদার (অবশ্য পেটের তাগাদা ছাড়া)। সুতরাং মোসাহেবের দল তার সঞ্চয়ের যাহা কিছু মধু সবটুকু নিঃশেষে পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইত। সুধীরের বিবাহের সময়ও সকলে সুধীরের পয়সার খুব স্ফূর্ত্তি করিল। ইংরাজী বাঙলায় পদ্য বা ছড়া লিখিয়া সুধীরকে প্রীতি-উপহার দিল; আর বারবার করিয়া এ কথাটাও আবৃত্তি করিল—"আর এই শেষ দাদা! এর পর বৌ ঠাক্‌রুণের রাঙা পায়ে জন্মের মত দাসখত লিখে দেবে।" সুধীর পুরুষবাচ্ছা,—সে সগর্জ্জনে প্রতিবাদ করিল, "কক্ষনো না, কক্ষনো না, দেখে নিও তোমরা, দাসখত আমি লিখব না, বরং লিখিয়ে নেবো। আমি মরদ, মেয়ে নই।" তার পর তার বিবাহিত জীবনের কথা। বন্ধু বান্ধবদের কাছে সত্যই সে মাথা উঁচু করিয়া চলে। সে যে স্ত্রীর "ভেড়ুয়া" নয়, এ কথা প্রমাণ করিবার জন্য, মাহিনা পাইলেই সেই দিনই সে বন্ধুদের লইয়া জুয়া খেলিতে যায় বা শুঁড়ীর দোকানে দেনা দিয়া ও নূতন করিয়া ধার লিখাইয়া আসে। সময়ে সময়ে বাহিরেই রাত্রিযাপন করে। বন্ধুরা তখন তাহাকে 'বাহবা' দেয়, 'সাবাস্' বলে। এর পরে আর কি বলিবার আছে?

দুই

রাত্রি তখন দশটা বাজিয়া গিয়াছে। বধূ নীলিমা জানালার কাছে আসিয়া চাপা গলায় ডাকিল—"রাণুর মা, অ—রাণুর মা, ঘুমুলে না কি?"

অন্ধকার ঘরে বিছানার উপর ঘুমন্ত মেয়েটির পানে তাকাইয়া চুপ করিয়া শ্যামা বসিয়া ছিল; চমকিয়া উঠিয়া আসিয়া জানালার গরাদেয় হাত রাখিয়া সাড়া দিল—"না দিদি, যে গরম ঘরের ভিতর—শুয়ে চোখ বোজবার সাধ্যি কি, ছট্‌ফটিয়ে মরচি।"

নীলিমা কহিল,—"তোমার জন্যে বড় দুঃখ হয় ভাই। একলাটি,—ঘরে দোসর কেউ নেই যে মুখ চাইবে। একলাটি বুঝি বাইরে শুতে পারলে না? তা ছেলেমানুষ, ভয় করে বৈ কি।" শ্যামা উত্তর দিল না, নিঃশ্বাস ফেলিল। নীলিমা আবার কহিল—"তিনি বুঝি বাইরে চলে গেলেন? আচ্ছা মানুষ তো! তুমি নেহাৎ ভালমানুষ, কিছু বল না, তাতেই বোধ হয় আরও তোমায় গ্রাহ্য করেন না।" হায় হায়,

দাসী যাইবে প্রভুকে বুঝাইতে ? দিন রাত্রি যে মানুষ প্রতি কথায় প্রতি চরণক্ষেপে শক্তির অহঙ্কার, অর্থের গর্ব্ব প্রচার করিয়া স্ত্রীর ক্ষুদ্রত্ব প্রমাণ করিবার জন্য সচেষ্ট,—কোন্ স্পর্দ্ধায় বেচারী শ্যামা তাহার মুখের উপর গিয়া বলিবে যে "এ কাজ আমি ভালবাসি না, তুমি করিও না !"

এবারেও শ্যামার উত্তর না পাইয়া বধূ কহিল—"কিছু খেলে না, উপোস করে রইলে ? কর্ত্তা তো বাজারে গিয়ে নানা জিনিষ খেয়ে পেট ভরাবেন। তুমি যদি ঘরে কিছু না খেয়ে উপোস করে থাক, নিজেই ঠক্‌বে।"

ম্লান হাসি হাসিয়া শ্যামা কহিল—"জিতেই বা কি লাভ দিদি, এ প্রাণ কি সহজে বেরুবে ?"

"ওগো, এ দিকে এস" স্বামীর আহ্বান শুনিয়া চঞ্চল চরণে নীলিমা চলিয়া গেল। শ্যামা জলভরা চোখে আবার ঘুমন্ত রাণুর কাছে আসিয়া বসিল। অসহ্য জ্যৈষ্ঠ মাসের গ্রীষ্মে ঘরের বদ্ধ বাতাস যেন আগুন হইয়া উঠিয়াছিল। মাত্র অপরিসর দুটি জানালা—বাহিরের বাতাসের সাধ্য নাই তার মধ্য দিয়া অবাধে যাওয়া আসা করে। খোলা আঙিনায় মুক্ত বাতাস তখন দাবদগ্ধ ধরণীর গায়ে মৃদু বীজন সুরু করিয়াছে। মনের ভিতর যত জ্বালাই থাক্, আপাততঃ দেহের জ্বালা জুড়াইবার জন্য শ্যামার লুব্ধ দৃষ্টি বার কয়েক আঙিনার দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিল; কিন্তু একা একা বাহিরে শয়ন করিতে তার সাহসে কুলাইল না। সারা দিনের কর্ম্ম-শ্রান্ত দেহ-মন লইয়া অভাগিনী তখন মেয়েটির পাশেই শুইয়া পড়িল। উদরে অন্ন নাই। যত্নাভাবে কেশ বেশ শ্রীহীন। পরিধানের সাড়ী-খানিও ছিন্ন। আর চক্ষে তার অশ্রুর ঝরণা। হায় নারী ! ভাগ্য-বিধাতা পতি-দেবতা তার সেই সময় সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া হোটেলে গিয়া চপ্ কাট্‌লেট্ প্রভৃতি মুখরোচক জিনিসগুলি লইয়া বোতল দেবীর আরাধনায় নিযুক্ত। শাস্ত্র, সমাজ, সকলের স্বাক্ষরিত ছাড়পত্র হাতে লইয়া অস্থান কুস্থান সর্ব্বত্রই তার অবাধ গতিবিধি। সে যেখানেই যাক্, যেস্থানেই বিচরণ করুক, অন্তঃপুরে নারী তার দুটি চক্ষে আরতির দীপশিখা জ্বালিয়া, সতী-মহিমায় মহিমান্বিতা হইয়া, একান্ত মন-প্রাণে তারই আশায় পথ চাহিয়া আছে। অবসর সময়ে দেখা দিয়া সে তাহার নারীজন্মকে সার্থক করিবে বৈ কি !

তিন

বেলা তখন চারটা। রাণুর শরীর কাল হইতে ভাল নাই। একটু জ্বরভাব হইয়াছে। কয়েক দিন অসহ্য গুমোটের পর আজ বেলা তিনটার সময় হঠাৎ এক পসলা বৃষ্টি হইয়াছিল। রাণু কান্না ভুলিয়া এতক্ষণ চুপচাপ বসিয়া তাহা দেখিতে-ছিল। সেই অবসরে শ্যামা তাহার অনেকগুলি কাজকর্ম্ম সারিয়া লইয়াছে। এইবার সে উনান ধরাইয়া রাঁধিবার উদ্যোগ করিতেছিল,—বৃষ্টি থামিয়া গেল, রাণুও বাহানা জুড়িয়া মার কোলে আশ্রয় লইল। শ্যামা অগত্যা মেয়েকে কোলে লইয়াই সাধ্যমত কাজ করিতে লাগিল।

রাত্রে সুধীর বাড়ী আসে নাই। সকালে উচ্ছৃঙ্খল বেশ-ভূষা লইয়া রক্ত চক্ষে যখন সে বাড়ী ফিরিল, তখন স্বামীর দিকে চাহিয়া শ্যামার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল। কিন্তু যাক্ সে কথা, এ কিছু নূতন দৃশ্য নয়। তিন বৎসরের বিবাহিত জীবনে এ দৃশ্য তার কাছে দিনের পর দিন পুরানো পাঠের মতই অভ্যাস হইয়া গিয়াছে।

স্নান করিয়া সুধীর খাইতে বসিয়াছিল; কিন্তু আঁকা ভাত তরকারী অখাদ্য হইয়াছে বলিয়া এক গ্রাস মুখে দিয়াই ইতি করিয়া উঠিয়া পড়িয়াছিল। এ বেলা তাই শ্যামা ভয়ে ভয়ে রান্নার ব্যবস্থা করিতেছে, স্বামী-দেবতা এখন প্রসন্ন হইলে হয়। চারটা বাজিবার পরই সুধীর বাড়ী আসিল,—হাতে একটি ছোট পুঁটুলী। রান্নাঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া কহিল—"কি রাঁধ্‌চ এ-বেলা ?" শ্যামা ভয়ে ভয়ে কহিল—"ডিমের তরকারী আর রুটি করচি।"

সুধীর কহিল—"আচ্ছা। আর দেখ, বেশ ভালো মাংস এনেছি, মাংস চাপিয়ে দাও। আর খানিকটা চপের মাংস এনেছি, খানকতক গরম গরম চপ ভেজে দাও,—গণেশ, বিমলেন্দু, শরৎ এখুনি আস্‌চে। তারা তোমার হাতের চপ-ভাজা খেয়ে খুব প্রশংসা করে।"

আদেশসহ সার্টিফিকেটের সংবাদেও শ্যামার মন বড় প্রসন্ন হইল না। সারারাত্রি অনিদ্রায় আর সমস্ত দিন রুগ্ন শিশুর আব্দার সহিয়া শরীর তার বড় বেশী ক্লান্ত হইয়াছিল, এখনও মেয়েকে কোলে লইয়াই সে কাজ করিতেছে। রান্না শেষ হইলে সে তবু তাহাকে লইয়া একটু বসিয়া বিশ্রাম করিতে পায়। যাহা হউক, স্বামীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সে মাংস রান্নার জোগাড় করিতে লাগিল। সুধীর

জামাজোড়া খুলিয়া, মুখ হাত ধুইয়া শ্যামার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"খুকী কেমন আছে ?"

শ্যামা কহিল—"ভারী কাঁদ্‌চে, কাজকর্ম্ম কিছু করতে দিচ্ছে না।" সুধীর খুকীর দিকে হাত বাড়াইয়া কহিল—"আয় খুকী, আমরা বাইরে যাই।"

মেজাজ ভাল থাকিলে সুধীর খুকীকে লইয়া আদর যত্ন করিত। খুকীও বাবার কোলে থাকিতে ভালবাসিত। এখন সে হাত বাড়াইয়া বাবার কোলে গেল। সুধীরও তাহাকে কোলে লইয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিল। একটু পরেই প্রতিশ্রুত বন্ধুগণের শুভাগমন হইল। সুধীর অভ্যর্থনা করিয়া কহিল—"এসেচ—আমি মনে কর্‌ছিলাম, ফাঁকী দিলে বুঝি।"

গণেশ কহিল—"ফাঁকী কি রকম ? পাঁচটা টাকা হেরেছি তা আর দেব না ? এ শরৎ নই, যে, পরিবারেরই কথায় ওঠ্ বস্—আমি দাদা তোমারি ভাই।"

শরৎ কহিল—"তা আমিই বা কবে বাজী হেরে টাকা দিই নি বল। তবে বে-থা হয়ে দু পাঁচ টাকার বাজী রাখিও না, দিইও না। তোমাদের মত দেনদার হয়ে ফূর্ত্তি ওড়াবার বান্দা আমি নই। যা পয়সায় কুলোয় তাই করব।"

গণেশ তাচ্ছল্যভরে কহিল—"আরে যা যা, তোর যা মুরোদ, এক বচ্ছর বিয়ে করেই তা জানিয়েছিস্। পুরুষ মানুষ হয়ে মেয়ে মানুষের নাকি কান্নাকে এত ভয় ?"

শরৎ কিছু না হটিয়া কহিল—"আর তুমি বুঝি ভয় খাও না ? মনে আছে সে-দিন সোণীয়া বাইজীর কান্না ? চোখে একটু রুমাল তুলে দিয়েচে, আর তুমি তাকে তোমার আঙটিটা দিয়ে দিলে, মনে আছে কি ? আমি না হয় ঘরের বউএর কান্নাকে ভয় পাই ; আর তুমি ?"

গণেশকে অপ্রস্তুত দেখিয়া বিমলেন্দু কহিল—"রাখ তোমাদের কচকচি, বের কর বোতল। সুধীর দা, তোমার গেলাস নিয়ে এস। বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়েচে। অনেক দিনের গুমোট গরমের পর এমন ঠাণ্ডা দিনটি—একে মাটি হতে দিও না বাবা।"

শরৎ কহিল—"আমি ভাই তোমাদের বোতল ছুঁচ্ছি না। খানকতক চপ আর খাবার টাবার যা দেবে খাব।"

গণেশ নাকি সুরে কহিল—"বউ বঁক্‌বে বুঁঝি ?"

শরৎ কহিল—"বক্‌বে না তো কি পুজো করবে ? কাল তোমাদের পাল্লায় পড়ে যে বকুনি খেয়েচি। মা কত গাল-মন্দ করেছেন। আজ সকালে সকালে বাড়ী ফিরব।"

ইতিমধ্যে রাণু কান্না জুড়িয়া দিল। সুধীর তাহাকে শ্যামার কাছে দিবার জন্য বাড়ীর মধ্যে আসিয়া, রান্নাঘরে উঁকি দিয়া দেখিল, শ্যামা মাংস চাপাইয়া রুটি বেলিতেছে। মাকে দেখিয়াই রাণু বাবার কোল হইতে নামিয়া মার কোলে আশ্রয় লইল। শ্যামা বিরক্ত হইয়া মেয়েকে ঠেলা দিয়া কহিল—"তোকে কোলে নিয়ে আমি রুটি বেল্‌ব কি করে, সরে যা।"

খুকী মাতার আদেশ পালনে কিছুমাত্র অনুরাগ না দেখাইয়া, ভাল রকমে কোলটি জুড়িয়া বসিল। এদিকে সুধীর প্রশ্ন করিল—"চপের জোগাড় করেচ ?"

নতমুখে শ্যামা কহিল—"করব।"

সুধীর এ উত্তরে আদৌ সন্তুষ্ট হইল না। সন্ধ্যা আসন্ন-প্রায়, বন্ধুরা বোতল খুলিয়া গরম গরম চপ-ভাজার মুখ চাহিয়া বসিয়া আছে। ভদ্রলোকদের কতক্ষণ এভাবে বসাইয়া রাখা যায় ? সে কহিল—"অন্ধকার হয়ে এলো যে, একটু চট্‌পট্ নাও না, ওরা আর কতক্ষণ বসে থাক্‌বে।"

তার পর সে বন্ধুদের আশ্বস্ত করিবার জন্য আবার বাহিরের ঘরে গিয়া দেখা দিল। গণেশ বলিয়া উঠিল—"কতক্ষণ আর বসিয়ে রাখ্‌বে দাদা ? এর চাইতে তোমার হোটেলে গেলে যে ভাল ছিল।"

বিমলেন্দু কহিল—"সেখানে কিন্তু বউদিদির মতন ওস্তাদী হাতের সোয়াদ মিল্‌ত না।"

শরৎ কহিল—"ততক্ষণে একটু গান টান গাই-এস হে, নেহাৎ চুপ্ চাপ—"

বাধা দিয়া সুধীর কহিল—"না হে, গান টান গেয়ো না। সেদিন সাম্‌নের ডাক্তার ভারী বকাবকি করেছিল। লোকটা বড় সুবিধের না।"

গণেশ কহিল—"বাঃ, এ ত ভারী মজার কথা। হরিনাথ ডাক্তার ভারী কড়া লোক ত! তোমার বাড়ীতে তুমি গান করবে, নাচবে, তা ওর তাতে চোখ টাটায় কেন ? টাটায় ত চোখে ঠুলি দিয়ে থাকুক না।"

সুধীর কহিল—"তোমরা সে দিন নেশার ঝোঁকে যা তা গান গাইতে শুরু করেছিলে, তা বক্‌বে না ? ভদ্র-লোকের বাড়ী—ও সব ঠিক নয় ভাই।"

গণেশ কহিল—"আরে তোমার ভদ্দর লোক! ফুর্ত্তি বুঝি ছোট লোকেরই একচেটে? একে তো দেশে কোথাকার কে এক গান্ধীর হুজুগ উঠেচে 'মদ খেয়ো না, হেন কোরো না, তেন কোরো না'—তার পর হুকুম জারী হবে এখন,'থুতু ফেলো না, চোখ চেয়ে দেখো না, নাকে শুঁকো না'।"

বিমলেন্দু কহিল—"পেটে না পড়্তেই যে তোমার বোল্চাল ফুট্তে সুরু হ'লো হে, গতিক তো ভাল নয়।"

গণেশ সুধীরকে ঠেলা দিয়া কহিল—"যাও দাদা, দয়া করে শ্রীহস্তের প্রসাদ নিয়ে এসো গিয়ে।"

সুধীর আবার তখন আসিয়া রান্নাঘরে উঁকি দিল। রাণু তখন বিষম কান্না জুড়িয়াছে। কাঁচা লঙ্কার রসাস্বাদন করিতে গিয়া বেচারী বড়ই দাগা পাইয়াছে। সেই লঙ্কার হাত চোখে মুখে লাগাইয়া যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। শ্যামা রান্না ফেলিয়া মেয়েকে লইয়া উঠানে আসিয়া শান্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিল। সুধীর তখনো চপ ভাজিবার উদ্যোগ হয় নাই দেখিয়া প্রসন্ন হইল না। ঝাঁজের সহিত কহিল—"অন্ধকার হয়ে গেল, এখনো আলো জ্বলল না, মেয়ে নিয়েই সোহাগ হচ্ছে, রান্না শেষ হবে কখন?" শ্যামার নিজের শরীর ভাল ছিল না। তার উপর অসুস্থ মেয়ে লঙ্কা খাইয়া এক ফ্যাসাদ বাধাইয়াছে। স্বামীর ইহাতে সহানুভূতি দূরে থাকুক, বন্ধুদের "মদের চাট" জোগাইবার তাগিদের আর অন্ত নাই। এ হেন অবিবেচনার ব্যাপারে তার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। সে বলিয়া ফেলিল—"দুটো হাত নিয়ে কত কি করব, আলো জ্বাল্ব, না মেয়ে ভোলাব, না রাঁধ্ব।"

সুধীর তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া হ্যারিকেনটি টানিয়া জ্বালিবার উদ্যোগ করিতে করিতে উত্তর দিল, "আলো আমি জ্বেলে নিচ্ছি, তুমি প্যান্‌পেনে মেয়েকে নামিয়ে ফেলে রেখে রান্না দেখ গে। এই খুকী, ফের কাঁদ্‌বি তো মেরে হাড় ভাঙ্‌ব।" বাবার বকুনির সঙ্গে সঙ্গেই খুকীর কান্না সপ্তমে চড়িল। সুধীর রাগিয়া কহিল—"মরুক কেঁদে, দাও নামিয়ে।"

শ্যামা কহিল—"ওকে চুপ না করিয়ে আমি কিছু কর্‌তে পার্‌ব না।"

সুধীর হুঙ্কার করিয়া কহিল—"কি বল্লে, পারবে না? পার্‌তে হবে।"

শ্যামা উত্তর দিল না, আপন মনে খুকীকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এদিকে হ্যারিকেন জ্বালিতে গিয়া, উহা তৈলশূন্য দেখিয়া সুধীর কেরোসিনের বোতল সংগ্রহ করিয়া, বকিতে সুরু করিল—"এমন সব হতভাগা যে, ঠিক সময় তেলবাতীটুকুও করে রাখ্‌তে পারে না। মুখে আগুন এমন কুড়েমীর। মাসীর ঘরে খেটে খেটে শুকিয়ে মর্‌তে, সেই ছিল ভাল। এখানে এসে দিন দিন বিবি হয়ে উঠেচেন।"

শ্যামার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। সে কহিল—"বড় সুখেই রেখেচ কি না,—এর চাইতে মরণ হলেই বাঁচতাম।" সুধীর স্ত্রীর মুখে এতখানি স্পর্দ্ধার উত্তর কোন দিন শোনে নাই। প্রথমটা শুনিয়াই সে চম্‌কিয়া উঠিল, কি সর্ব্বনাশ! যে মানুষ 'সাত চড়ে রা' দিত না, আজ সে এমন কথা বলিতেছে? না জানি, প্রশ্রয় পাইলে এর পরে আরও না কি বলিয়া বসিবে। সে তখনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"কি, এত বড় স্পর্দ্ধা! নেহাৎ দয়া করে বিয়ে করে এনেচি, তাই না? মাসী মেসো পায়ে কত তেল মালিস করেছিল, মনে আছে? অই তো কালো বউ, কেউ তো কাছে ঘেঁসে নি, ভাগ্যিস্ উদ্ধার করেছিলাম।"

শ্যামার চোখ ফাটিয়া জল আসিয়াছিল। সে রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—"এ উদ্ধার করা নয়, জ্যান্তে খুঁচিয়ে মারা—এ যে আর রাত দিন সহ্য হয় না গো" খুকীকে নামাইয়া দিয়া শ্যামা চলিয়া যাইতেছিল, সুধীর পথ আগুলিয়া কহিল—"আবার ঐ সব প্যানপ্যানানি? বল্‌চি, ভাল চাও তো রান্নাঘরে গিয়ে রান্না শেষ কর। তার পর তোমার ব্যবস্থা আমি কর্‌চি।"

শ্যামা রুক্ষ কণ্ঠে কহিল—"আমি কিচ্ছু করতে পারব না, আমার মাথা ব্যথা কর্‌চে।"

সুধীর কহিল—"নেহাৎ মার খেয়ে মরবে কেন, এখনো বল্‌চি—"

স্বামীর হাতের প্রহার-সুখেও মধ্যে মধ্যে শ্যামা বঞ্চিত ছিল না। তবে খুব সাবধানে চলিত বলিয়া, সুধীর তাহাকে বকাবকি করিয়াই ক্ষান্ত দিত। আজ শ্যামার মাথায় যেন ভূত চাপিয়াছিল। সে জবাব দিল—"মেরে ফেল্‌লেও কিছু পার্‌ব না।"

"বটে? এত বড় আস্পর্দ্ধা? মর তবে পুড়ে।"

শিল্পী—শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

রত্নাকর

বলিয়াই সুধীর হাতের কেরোসিন-পূর্ণ বোতল স্ত্রীর গায়ে নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া, দেশলাই জ্বালিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গেই আগুন লকলক্ জিহ্বা মেলিয়া শ্যামার তরুণ দেহখানি সাপটিয়া ধরিল। শিশু রাণু আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল। শ্যামারও করুণ কণ্ঠের আর্ত্তনাদ বাতাসে ভাসিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত সাড়া পৌছাইয়া দিল।

চার

রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। নীলিমা ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়াইয়া, নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে ডাক্তার স্বামীর প্রত্যাগমন-পথ চাহিয়া আছে। জানালায় মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া, শ্যামার শয়ন গৃহের দিকে তাকাইয়া, ঘরের খবর কিছু কিছু জানিবার জন্য কৌতূহলের তার আর অন্ত নাই। কিন্তু কিছুই বুঝা যাইতেছে না। সন্ধ্যার সময় শ্যামার আর্ত্তনাদ কাণে আসিবামাত্র, তার মনে হইয়াছিল, ছুটিয়া গিয়া শ্যামার কাছে দাঁড়াইয়া, তাহাকে বুকের মধ্যে জাপটিয়া ধরে। কিন্তু বধূ সে, বিশেষ শ্বশুর শাশুড়ীর বধূ। সুধীর মাতাল বলিয়া হরিনাথ স্ত্রীকে তাহার বাড়ী যাইতে দিতেন না। হরিনাথের পিতা মাতারও আপত্তি ছিল। তবে শ্যামা অবসর মত ইহাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিত, তাহাতে কাহারও আপত্তি ছিল না। নীলিমা অল্প দিনের পরিচয়েই তার এই অবসর-সঙ্গিনীটিকে ভালবাসিয়াছিল। মাতৃপিতৃহীনা স্বামী-স্নেহ-বঞ্চিতা শ্যামার প্রতি মনের টান তার কতকটা করুণা মমতাতে পরিপূর্ণ ছিল। শ্যামার আর্ত্তনাদ কাণে আসিয়া পৌছিতেই, সেই সর্ব্ব প্রথমে ঝিকে খবর লইতে পাঠাইয়াছিল। শাশুড়ী বরং বধূর অত্যন্ত ব্যস্ততায় বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—"মাতাল মানুষ, নিজের পরিবারকে নেশার ঝোঁকে হয় তো মার ধোর কিছু করছে,—তাতে তোমারি বা কি, আমারি বা কি। তুমি বউ মানুষ, চুপ চাপ করে ঘরের কোণে আছ তাই থাক,—পাড়ার কে কি করচে সে খোঁজে মাথা ব্যথার দরকার কি?" যাহা হউক, ঝি আসিয়া যে সর্ব্বনাশের সংবাদ দিয়াছিল, তাহাতে নীলিমা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। তার পর সুধীর নিজেই পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া ডাক্তার হরিনাথকে ডাকিয়া লইয়া যায়। হরিনাথ সেই সময় হইতে সেইখানেই রহিয়াছেন। নীলিমা শ্যামার সবিশেষ সংবাদ জানিবার জন্য উৎকণ্ঠায় অধীর হইয়া উঠিয়াছে।

সহসা পদশব্দে নীলিমা বুঝিল, স্বামী আসিতেছেন। সে সত্বর দ্বারের কাছে গিয়া হরিনাথের মুখোমুখি হইতেই জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন আছে গা? বাঁচবে তো?" হরিনাথ চেয়ারে বসিয়া জামা জুতা খুলিতে লাগিলেন। নীলিমা পাখা লইয়া বাতাস করিতে করিতে স্বামীর উত্তর শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিল। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া হরিনাথ কহিলেন—"মানুষ না পশু,—কাণ্ড দেখে আমি অবাক্। স্বামী স্ত্রীতে কি বচসা হয়েচে, আর তার গায়ে তেল ঢেলে আগুন জ্বেলে দিয়েচে। বউটার অবস্থা কি ভয়ানকই হয়েচে। বাঁচবে না বলেই মনে হয়। আর যে যাতনা—না বাঁচাই ভাল।"

নীলিমাও এ কথা অস্বীকার করে না। কিন্তু অভাগিনী শ্যামার জন্য তার প্রাণ যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। দুটি চোখে তার মুক্তাধারা ঝরিতে লাগিল। হরিনাথ স্ত্রীকে সাদরে বুকের উপর টানিয়া লইয়া কহিল—"তুমি কেন কাঁদচ নীলা, তোমার সে তো কেউ নয়!" নীলিমা উত্তর দিল না, তার অশ্রু উথলিয়া আসিতে লাগিল। হরিনাথ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন—"বউটিকে তুমি একবার দেখতে যাবে নীলা? জ্ঞান আছে, মানুষ চিনতে পারচে। মুখ ছাড়া সর্ব্বাঙ্গ ঝলসে গেছে। একটু একটু কথাও কইতে পারচে। তোমায় হয় তো চিনতে পারবে।" নীলিমা কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া কহিল—"যাব আমি, কিন্তু বাবা মা বকাবকি করবেন,—দোহাই তোমার, যদি মত করাতে পার।" তার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "তুমি বল্‌চ সে আমার আপনার কেউ নয়। আচ্ছা, বল দেখি, আপনার না হলে কি কষ্ট দেখে কষ্ট হতে নেই? তুমি যে ডাক্তার মানুষ, তোমারও তো দেখে কষ্ট হচ্ছে? আর আমি একজন স্ত্রীলোক হয়ে স্ত্রীলোকের কষ্টের কথা শুনে স্থির থাকতে পারি?" হরিনাথ নীরবে স্ত্রীর এই সহানুভূতির অনুমোদন করিলেন। আহারান্তে হরিনাথ বিশ্রাম শয্যায় শয়ন করিয়া শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িলেন। নীলিমা আহার নিদ্রা ভুলিয়া অধীর উৎকণ্ঠায় জানালায় বসিয়া একমনে ভগবানের নিকট শ্যামার আরোগ্য কামনার সহিত উষালোক ভিক্ষা করিতে লাগিল। কতক্ষণে রাত্রি প্রভাত হইবে, সে একবার শ্যামাকে দেখিতে পাইবে।

পাঁচ

সদ্যঃ-জাগ্রত পাখীর কাকলি তখন সবেমাত্র প্রভাত-পবনকে মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। কনক উষার রক্তিম রাগ মেঘহীন নীলাম্বরকে আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে মাত্র। সেই আলোকের একটি রেখা স্বল্প পরিসর ক্ষুদ্র জানালার পথে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া নিশার প্রদীপের সহিত কোলাকুলি করিতেছে। সেই সময় মৃত্যু-পথ-যাত্রিনীর পাণ্ডুর ললাটের উপর কম্পিত অধর রাখিয়া কান্নাভরা কণ্ঠে নীলিমা ডাকিল —"শ্যামা, বোনটি, একবার চেয়ে ছাখ্ বোন্", শ্যামা স্তিমিত দৃষ্টি মেলিবার চেষ্টায় সফলকাম হইল না, সে আধখোলা চোখেই নীলিমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—"কে, দিদি, এসেছ ?"

তার পর দুইজনেই নীরব। অভাগিনীর বিবর্ণ দেহের দিকে চাহিয়া নীলিমার মনের যে অবস্থা হইতেছিল, তাহা বর্ণনার বিষয় নয়। মৃত্যুর নীল ছায়া যার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া ফেলিতেছে,—চক্ষের শেষ জ্যোতিঃটুকু নিভাইবার অপেক্ষা মাত্র, তাহাকে সে আর প্রশ্নের খোঁচা কি দিবে ? আর সান্ত্বনা দিবারও তো কিছুই নাই। একান্ত সম্বল আঁখিজল— তাই লইয়া নীরবেই শ্যামার মুখের দিকে চাহিয়া নীলিমা বসিয়া রহিল। ওদিকে সদ্য নিদ্রাভঙ্গে রাণু ওঘর হইতে এঘরে আসিয়া দাঁড়াইতেই, নীলিমা হাত বাড়াইয়া ডাকিল —"রাণু, কোলে এস মা—"

রাণুর শিশু-হৃদয় পূর্ব্ব দিনের ঘটনায় স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। ঘটনার পর সুধীরের বন্ধুগণেরও নেশা ছুটিয়া গিয়াছিল ; সকলেই তৎপর হইয়া সময়োচিত ব্যবস্থায় লাগিয়া গিয়াছিল। সুধীর মেয়েকে কোলে কোলেই রাখিয়াছিল। যাহা হউক, রাণু মাকে অচৈতন্য অবস্থায় শয়ান দেখিয়া, কিছুতেই যেন স্থির থাকিতে পারিতেছিল না। অনেক কান্নাকাটির পর সে রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। এখন উঠিয়াই মাকে দেখিতে আসিয়াছে। সে নীলিমার কোলে গিয়া বসিলে, নীলিমা ডাকিল, "শ্যামা, রাণুকে দেখ্‌বে ?"

ক্লান্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া শ্যামা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার ক্ষীণকণ্ঠে কহিল—"চল্‌লাম তাতে দুঃখ নেই দিদি, মেয়েটাকে দেখবার কেউ রইল না, এই দুঃখু। তবে মরে যায় সেও ভাল। নইলে যদি আমারি মতন—" কথা তার শেষ হইল না। জীবনের দুঃসহ দুঃখের হাত হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য মৃত্যুর কামনা নিজের জন্য বাঞ্ছনীয় হইলেও সন্তানের জন্য যে কোন অবস্থাতেই মৃত্যু-কামনা করা মাতার পক্ষে বড় নিদারুণ ক্ষোভের কথা। শ্যামা তাই সে কথা শেষ করিতে পারিল না। চোখের জলে তার ক্ষীণ দৃষ্টি আরও ঘোলাটে হইয়া গেল।

* * * * * *

তার পর ? তার পর যথাসময়ে সব শেষ হইয়া গেল। শ্যামার ক্ষুদ্র জীবন-দীপ নিভিবার সবিস্তার কথা লিখিবার প্রয়োজনই বা কি। তবে এইটুকু লেখা দরকার যে, সুধীরের বন্ধুগণ মৃতদেহ সৎকার করিতে যাইবার সময় ডাক্তারের সার্টিফিকেট লইতে বিশেষ বেগ পাইয়াছিল। "সহজ মৃত্যু" বলিয়া সার্টিফিকেট দিতে হরিনাথ কিছুতেই রাজী হন নাই। অগত্যা পাড়ার আরও কয়েকজন বাঙ্গালী ভদ্রলোককে আনিয়া তাঁহার নিকট হইতে "স্বাভাবিক মৃত্যু"র সার্টিফিকেট আদায় করিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের সহিত হরিনাথ বাবুর কথাবার্ত্তা হয় এইরূপ,—যথা—

১ম ভদ্রলোক—আপনার কথা মান্‌চি ডাক্তার বাবু, লোকটা কাজ যা করেচে তা খুবই অন্যায়। কিন্তু—"

হরিনাথ (উত্তেজিত ভাবে) অন্যায় ? শুধু অন্যায় ? যাকে বলে murder, তাই নয় কি ? এর শাস্তি কি জানেন—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর কিম্বা ফাঁসী।

২য় ভদ্রলোক—সে তো বটেই মশাই ! তবে লোকটা সহজ অবস্থায় এ কাজ করে নি,—নেশায় ওকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, নইলে—

হরিনাথ (রাগিয়া)—বেশ তো মশাই, আদালতে জেরায় আপনারা ঐ কথা বলে লোকটাকে বাঁচিয়ে দেবেন। আমি তা বলে false certificate দিতে রাজী নই। দোষীর শাস্তির বিধান কর্‌বই।

৩য় ভদ্রলোক—রাগ্‌চেন কেন মশাই, একটু ঠাণ্ডা হয়েই কথাটা বুঝুন না। ও কিছু আমাদেরও আপন কুটুম্ব নয়, আপনারও নয়। তবে বাঙালী হয়ে বাঙালীর আপ্তজন বটে। হোতো বাঙ্‌লা দেশ, যা ইচ্ছে করা যেতো। একে এই পশ্চিমে বাঙালীর সংখ্যা অল্প, তার ওপর জানেন তো হিন্দুস্থানীরা কথায় কথায় খোঁটা দেয়—বাঙালী বাঙালী ভাই ভাই লড়্‌তে রহে। তার ওপর গান্ধী মহারাজের হুজুগ চলেছে। এখন যদি আমরা ঘরে ঘরে নন-কো-অপা-

রেশন চালাই, তা হ'লে বাঙালীর নিন্দেয় কি সুখ পাওয়া যাবে? আজ যদি এই কেলেঙ্কারী ঘটনা প্রকাশ পায়, কাল সহরে—আপনিও তো একজন্ পদস্থ বাঙালী,—আর কি মাথা উঁচু করে চল্‌তে পারবেন? পারবেন না, কি বলেন?

কথাগুলি এবার হরিনাথকে একটু খোঁচা দিল। সত্যই ঘটনাটি প্রকাশ হইলে প্রবাসী বাঙালীর দুর্নামে সহরের সর্ব্বস্থান ভরিয়া যাইবে। যাহা হউক, সে কণ্ঠের তেজ মৃদু করিয়া উত্তর দিলেন—"তা হ'লে আপনারা কি বলেন দোষীর শাস্তি হবে না? আবার ও সবার মধ্যে বুক চিতিয়ে চলা-ফেরা করবে। তার পর মাস না যেতে যেতে আবার একটি মেয়েকে বিয়ে করে আন্‌বে। তার পর তাকেও আবার একদিন পুড়িয়েই হোক, আর ছুরি মেরেই হোক, খুন করবে। এই তো? ইচ্ছে ক'রে এই সব হত্যাকে প্রশ্রয় দেবো,—একি conscience সায় দেয় মশাই?

৪র্থ ভদ্রলোক কহিলেন—বারে বারে কি আর তাই করে মশাই,—এবারেই ওর চৈতন্য হয়েছে,—নেড়া ক'বার বেলতলায় যায়?

ইহার উপর আর তর্ক চলে না। অগত্যা হরিনাথকে সুবোধ বালকের ন্যায় সাটিফিকিটখানি "natural death" বলিয়াই লিখিয়া দিতে হইল। নহিলে অবাঙালী সমাজে বাঙালীর সহযোগিতার সম্মান রক্ষা হয় কি করিয়া?

মৃতার অতিশপ্ত জীবনের তপ্ত দীর্ঘশ্বাস সেই সহযোগিতার উপর কিসের স্পর্শ বুলাইয়াছিল, কোন্ সর্ব্বদর্শী তাহা আমাদের বলিয়া দিবে? অনুমানের অপেক্ষা কিছুই থাকে কি?

নব্যা

শ্রীকালিদাস রায় বি-এ, কবিশেখর

বিশ্রামটাও কাজের অঙ্গ
সেটাই বড় কাজ,
তোমার—বাজে কাজের জন্য আছে
মা ভগিনী ভাজ।
কুলীর দ্বারা যে কাজ চলে
আমায় সে কাজ করতে বলে?
পত্নী তোমার ক্রীতদাসী?
হয় না মনে লাজ?
কাপড় কাচো বাসন মাজো,
এঁটো ঘুচোও, বাপ্!
দুদিন পরে বল্‌বে, করো
পায়খানাটাও সাফ্।
ঘটর ঘটর বাটনা বাঁটো,
আলুর সঙ্গে আঙুল কাটো,
রান্নাঘরে ধোঁয়ায় কেশে,
মাথায় হানো বাজ।

চিঠি লেখা গল্প করা
নভেল পড়ে বোঝা,
মুর্খেরা সব মনে ভাবে
যেন বড়ই সোজা।
দেশের দশের খবর রাখা,
বাজে ভাব, সাবান মাখা,
উলের লেসের কাজগুলো আর
নারী-দেহের সাজ।
চাকর বাকর রাখতে নারো
মিছে আমায় দোষো,
দুজন না হয় মাসী পিসি
নীচের ঘরে পোষো।
বুঝেছি ত তোমার ওজন
না হয় বলো, দাসী দুজন
মাইনে দিয়ে পাঠিয়ে দিতে
লিখছি বাবায় আজ।

ভ্রাম্যমানের দিন-পঞ্জিকা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

প্রায় সকলেই ভ্রমণ কর্ত্তে বাহির হয় কোনও একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। আমারও পাঁচ ছয় মাস ধরে ভারত-ভ্রমণে বাহির হওয়ার দুই একটা উদ্দেশ্য ছিল। তার মধ্যে প্রধান উদ্দেশ্যটা শুন্‌লে কিন্তু সম্ভবতঃ অনেকেরই বিস্ময়ে বাক্‌রোধ হবার সম্ভাবনা। সে উদ্দেশ্যটি হচ্ছে, ভারতের শ্রেষ্ঠ গায়ক-গায়িকাদের গান শোনা—অবশ্য গানের মধ্যে বাজনাও বুঝে নিতে হবে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি ছিল, নানারকম চিত্তাকর্ষক লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করা; ও তৃতীয় উদ্দেশ্য—দেশ দেখা। অবশ্য "দেশ দেখা" বল্‌তে সকলের মুখেই একরকম শোনালেও, প্রত্যেকের দেশ দেখার মধ্যে তার বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ পাবেই। আপিসের কাজে আমাদের প্রায় কারুরই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় না। তার কারণ, সে কাজটার মধ্যে কোনও সহজ স্ফূর্ত্তি বা প্রেরণা নেই, সেটা বাধ্যতামূলক। কিন্তু ভ্রমণটা অন্ততঃ অধিকাংশ লোকেই আনন্দের প্রেরণাতেই করে থাকে—এক আমেরিকান touristরা ছাড়া অবশ্য। তবে তাদের ক্ষেত্রে এরূপ হওয়ার কারণ এই যে, তাদের উদ্দেশ্য ভ্রমণ করা নয়—তাদের উদ্দেশ্য ইংরাজীতে যাকে বলে "Doing it"। বার্লিনে আমার পরিচিতা এক সুরসিকা সম্ভ্রান্ত জার্ম্মাণ মহিলা এ সম্পর্কে আমাকে বেশ একটি গল্প বলেছিলেন। তাঁর পরিচিত একটি আমেরিকান মেয়ে দেশভ্রমণে বেরিয়ে তাঁকে এসে বলে'ছিলেন যে, লণ্ডনে দ্রষ্টব্য কি কি স্থান আছে, সেগুলি তাঁর guide-bookএ তিনি যেন দাগ দিয়ে দেন—কারণ তিনি তার পর দিন লণ্ডন ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবেন। এ কথা শুনে জার্ম্মাণ মহিলাটি সবিস্ময়ে বলেছিলেন, "কিন্তু এক দিনে তুমি সব দেখবে কেমন করে?" তিনি প্রশান্ত ভাবে উত্তর দিলেন, "দেখার ত আমার দরকার নেই মাদাম! আমার দরকার শুধু আমেরিকা ফিরে কেবল দ্রষ্টব্য জায়গাগুলির নাম কর্ত্তে জানার।" আমাদের মধ্যেও এ রকম লোক আছেন সন্দেহ নেই, যাঁরা নানা স্থান দেখতে চান শুধু বাড়ী ফিরে "অমুক অমুক জায়গা দেখেছি" বলার গৌরব (?) ভোগ কর্ত্তে। কিন্তু এরূপ পরিচিত type ছেড়ে দিলে বোধ হয় এ কথা বলা যেতে পারে যে, প্রত্যেকেই তাঁর ভ্রমণের মধ্যে থেকে কেবল সেই সব ঘটনা বা বস্তুই লক্ষ্য করেন, যাতে তাঁর মন প্রাণ সাড়া দিয়ে ওঠে। তাই আমি বলে রাখতে চাই যে, আমার ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে এক দিকে যেমন কোনও ধারাবাহিকতা বা পর্য্যায় খুঁজে পাবার সম্ভাবনা নেই, তেম্‌নি অপর দিকেও ভ্রমণসংক্রান্ত নানান অত্যাবশ্যক detailএর আশাও যেন কেউ না করেন। কারণ, আমি কি উদ্দেশ্যে ভ্রমণে বাহির হয়েছিলাম, তা পূর্ব্বেই বলে সাফাই গেয়ে রেখেছি। অতএব এবার নারায়ণং নমস্কৃত্য সুরু করা যাক্।

লক্ষ্ণৌয়ে এবার অনেক দিন থেকে গিয়েছিলাম। তার প্রধান কারণ এই যে, গান শোনার জন্য ভারত ভ্রমণ কর্ত্তে গিয়ে, প্রথমেই সেখানে বেশ উচ্চশ্রেণীর গান শুন্‌বার সুযোগ যেন হঠাৎ উপস্থিত হ'ল বল্‌লেই চলে। তা ছাড়াও অবশ্য অন্য কারণও ছিল। লক্ষ্ণৌয়ের প্রবাসী বাঙালীর মধ্যে অনেকেই বেশ মিশুক দেখা গেল। লক্ষ্ণৌ ছাড়ার কয়েক মাস পরে হঠাৎ ট্রেণে এক বৈজ্ঞানিক বাঙালীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি য়ুরোপের Specializationএর পক্ষপাতী—মেলামেশার ক্ষেত্রেও। যথা, তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, বৈজ্ঞানিক ছাড়া অন্য কারুর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে তাঁর মনে আগ্রহ অত্যন্ত কম। (পরে আরও জানা গেল যে তাঁর অসাধারণ শিক্ষার ফলে তিনি আরও আবিষ্কার করেছেন যে, সঙ্গীতের রসোদ্রেকের চর্চ্চায় বিশেষ লাভ নেই, আছে কেবল তার শব্দবিজ্ঞানের (acoustics) চর্চ্চায়। আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অনেক রকম চীজ্‌ই জন্মায় বটে!) কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে লক্ষ্ণৌয়ের বাঙালীর ও অবাঙালীর মধ্যেও এমন লোক খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল যাঁরা মেলামেশার ক্ষেত্রে এ specialisation কে খুব আমল দিতেন না।

অর্থাৎ তাঁরা নিজেদের বিশেষ চর্চ্চার বিষয় ছাড়াও, সামাজিক মেলামেশাতে একটা উদারতন্ত্রতায় বিশ্বাস কর্ত্তেন ও নানান্ সাধারণ বিষয়ের আলোচনায় যোগদান কর্ত্তেন। পরে অন্য দুচারটি বড় বড় সহরের মান্যগণ্য বাসিন্দাদের মধ্যে এগুলির একটু অভাব আমার বিশেষ করেই মনে হয়েছিল। এলাহাবাদে একজন বড় প্রফেসর ছিলেন;—তাঁর দর্শনলাভের সৌভাগ্য আমার বড় একটা হয় নি, কারণ তিনি তাঁর বিশেষ বিষয়টি ছাড়া অন্য কোনও বিষয়ের চর্চ্চায় সময়ক্ষেপ করাটা একান্তই বাজে কাজ মনে করতেন। তাঁর কোনও আত্মীয় তাঁকে কোনও public-hallএ গান শুন্‌তে যাবার জন্য অনুরোধ করাতে, তিনি বিজ্ঞ ভাবে হেসে বলেছিলেন, "গানবাজনা শুন্‌তে যাওয়া যেত একসময়ে—তবে তখন আমি ছেলে-মানুষ ছিলাম।" লক্ষ্ণৌয়ের বাঙালী প্রফেসরদের মধ্যে কিন্তু তাঁদের বয়সের বিকাশের ফলে তাঁদের মনের বিকাশটির গতি ঠিক্ এঁর মতন হয় নি। ফলে তাঁদের সঙ্গে গল্পালাপে সময়টি বেশ কাটত। বর্ত্তমান সভ্যতার যে একটা প্রবণতা আছে মানুষকে বেশ পরিপাটি ভাবে অঙ্গহীন করে ফেলার দিকে—সেটা উপরিউক্ত দুই অধ্যাপকের ন্যায় লোকের সংস্পর্শে এসে যেন একটু বেশি প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করা যায়।

লক্ষ্ণৌ নগরী পুরাকালে গানের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বর্ত্তমান সময়ে এরূপ অনেক সমৃদ্ধিশালী নগরীতেই সঙ্গীতের চর্চ্চা একেবারে নিভে গেছে। তবে লক্ষ্ণৌয়ে এখনও দুই একজন ভাল গায়ক-গায়িকা আছেন—যাঁদের গান-বাজনা শুনে মনে ভারি তৃপ্তি পাওয়া গিয়েছিল। বাজনার মধ্যে সবচেয়ে ভাল যন্ত্রী ঠাকুর নবাবালি। এমন সুন্দর হার্মোনিয়াম আমি আর একবার মাত্র শুনেছি—গয়ার বিখ্যাত গায়ক হনুমান দাসের পুত্র শোনির কাছে। কিন্তু ঠাকুর নবাবালির হাত বোধ হয় আরও মিষ্ট। ইনি গানবাজনার যাতে আবার উন্নতি হয় সেজন্য যথেষ্ট চেষ্ট। কাজেই এঁর গানবাজনার অনুরাগের প্রশংসা কর্ত্তে হয়। ইনি আমাদের উত্তর ভারতের সঙ্গীত সম্বন্ধে একখানি বই লিখেছেন। শুনেছি বইখানি ভাল।

গায়কদের মধ্যে একজন মাত্র ভাল গুণীর পরিচয় পাওয়া গেল। তাঁর নাম আবদুল রশিদ। মধুর কণ্ঠস্বর ও গলায় modulation অল্প থাকার দরুণ এঁর গানে একটা বিশেষত্ব খুঁজে পাওয়া গেল। আমাদের ওস্তাদদের মধ্যে খুব কম লোকের গলায়ই modulation (সুরের ওজনের হ্রাসবৃদ্ধি) আছে। এটা আমি দুঃখের বিষয় বলে মনে করি। Modulationএ গানের সৌন্দর্য্য যে কতটা বাড়ে, তা লক্ষ্ণৌয়ের বিখ্যাত গায়িকা অচ্ছন বাইয়ের গান শুন্‌লে অনেকটা বোঝা যায়। অচ্ছন বাইয়ের কণ্ঠস্বর এলাহাবাদের বিখ্যাত জানকী বাইয়ের চেয়ে কম মিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও, অচ্ছন বাইয়ের গানের মাধুর্য্য যে অনেক বেশি, তার একটা প্রধান কারণ তাঁর modulationএ কৃতিত্ব। তা ছাড়া এঁর গানের মধ্যে এমন একটা dignity আছে ও প্রশান্তি আছে এবং সবচেয়ে বড় জিনিস দরদ আছে, যা সঙ্গীতানভিজ্ঞকেও অনেকটা আনন্দ দেয় বলে মনে হ'ল।

আর একজন গায়কের গান শোনা গেল। তাঁর নাম আহম্মদ খাঁ, কিন্তু তাঁর গান শুনে তাঁর নামের শেষের "দ"র স্থলে "ক" বসিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়। ওস্তাদ-সুলভ অঙ্গবৈচিত্র্যের তাঁর অভাব নেই এবং আর্টিষ্ট-সুলভ দরদের তাঁর বালাই নেই।

এলাহাবাদে বিখ্যাত জানকী বাই এবার আবার গান শুনিয়েছিলেন। কণ্ঠস্বর অতি মধুর ও গলার তানকর্ত্তব অতি পরিষ্কার।' তবে এঁর গানের মধ্যে খুব একটা dignity নেই যেটা অচ্ছন বাইয়ের গানের মধ্যে পাওয়া যায়। লক্ষ্ণৌয়ে একটি এগার বার বছরের ছেলের গান অত্যন্ত ভাল লেগেছিল। বালকটির নাম চন্দ্রশেখর পন্থ। তার মামা সত্যানন্দ যোশী তাকে বেশ ভাল শ্রেণীর হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ শিখিয়েছেন। এলাহাবাদে এসে সেখানকার Muir College hostelএর ছাত্রদের ধ'রে আমি এই ছেলেটির গান সেখানে করিয়েছিলাম। তারা এর গান শুনে খুব তৃপ্ত হবার পর আমি যখন বল্লাম যে ছেলেটি যা গাইল তার নাম সেই শ্রোতৃবর্গের ভীতি-উৎপাদনকারী ও অবলা রমণীর হিষ্টিরিয়ার-জনক ধ্রুপদ সঙ্গীত, তখন, বোধ হয় অনেকে আমার সংজ্ঞার যাথার্থ্য সম্বন্ধে সংশয়াকুল হয়েছিলেন। সেজন্য আমাকে বল্‌তে হয়েছিল যে ধ্রুপদের মাধুর্য্য সত্যই তার ধনুষ্টঙ্কার-উৎপাদিকা শক্তির ওপর নির্ভর করে না, করে—তার প্রশান্তি (repose), গাম্ভীর্য্য

ও সুরের সুমিষ্টতার উপর। তখন বোধ হয় অনেকে একটু আশ্বস্ত হয়েছিলেন। ধ্রুপদ সম্বন্ধে লোকের ভুল ধারণার মূল কারণ বোধ হয় এই যে, অধিকাংশ ধ্রুপদ-গায়কই স্বরমাধুর্য্যের দিকে যথেষ্ট দৃষ্টি দেন না। মিষ্ট স্বর হলে ধ্রুপদ যে কত মনোহর হয়, তার প্রমাণ যদি কেউ চান তবে যেন তিনি এলাহাবাদে এই বালকটির গান শোনেন। এই ছেলেটি অবিশিষ্ট ভদ্র পরিবারভুক্ত—সেজন্য আমার এর সম্বন্ধে যথেষ্ট আশা হয়। এর মাতুল যোশী মহাশয় রীতিমত সঙ্গীতজ্ঞ ও খুব ভাল প্রণালীতেই একে শেখাচ্ছেন, যার জন্য বম্বের বিখ্যাত ভাতখণ্ডে মহোদয় ধন্যবাদার্হ। তবে তাঁর সম্বন্ধে পরে লিখব।

লক্ষ্ণৌয়ে এক তালুকদারের বাড়ীতে দেওয়ালি উপলক্ষে আর একজন গায়িকার গান শুনেছিলাম, যার নাম উল্লেখ-যোগ্য। এ গায়িকাটির নাম ইন্দর বাই; লক্ষ্ণৌয়ের কাছে কোথায় থাকে। প্রথমে এর বয়স অপেক্ষাকৃত কম দেখে মনে হয়েছিল যে এ কখনই ভাল গাইতে পারবে না। কারণ আমাদের গান এমন দুরূহ জিনিস যে অল্প বয়সে তাতে বিশেষ পারদর্শী হওয়া বাস্তবিকই অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু, সে রাত দশটায় আরম্ভ করল, ও রাত বারটা থেকে তিনটে অবধি এমন গান গাইল যে, শুধু আমি নয়, আমার সঙ্গে দু তিন জন গম্ভীরানন প্রফেসর ছিলেন, তাঁদের গম্ভীর আননও একটু তরল হয়ে এল বলে মনে হয়েছিল। এর গলাটি মধুর হলেও খুব অসাধারণ রকমের মধুর নয়। কিন্তু গলায় একটা মস্ত জিনিস, দরদ, ছিল। বিশেষতঃ খান কয়েক গজল এত সুন্দর গাইল যে গজলের উপর আমার ভক্তি বেড়ে গেল। এর খেয়াল খুব ভাল নয়, তবে দাদ্‌রা ও গজল এর অতি সুন্দর। আমাদের এই আসরে এক নবাব ছিলেন—খুব মূর্খের মত জরীর পোষাক পরা, যেমন নবাবদের সচরাচর হয়ে থাকে। লোকটি কিন্তু একজন রসিক লোক, কারণ, সুরের যে সব মোচড়ের যায়গায় তিনি আমাদের ধারে অষ্টমীর ছাগশিশুর ন্যায় করুণ নয়নে চাইছিলেন, সে সব যায়গায় সুরের মাধুর্য্য বাস্তবিকই বেশি ছিল। বে-সমজ্‌দার লোক কখনও ঠিক যায়গায় মাথা নাড়তে পারে না বা আহা উহু বল্‌তে পারে না, এ কথা সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। কিন্তু এর তারিফ-ব্যঞ্জক অব্যক্ত চাহনি যথাস্থানে প্রযুক্ত হলেও তার মধ্যে একটা কেমন যেন হাস্যকর উপাদান ছিল। বোধ হয় সেটা ইনি নবাব বলে। কিন্তু সে যাই হোক, এঁর সেই করুণ "আহা-উহুর" মজ্জা-মাখা চাহনি যে গায়িকার পক্ষে একটা মস্ত প্রেরণা ছিল, তাতে আমাদের কারুরই সন্দেহ ছিল না। বাই সাহেবার সঙ্গে ইনি উর্দ্দু ভাষায় যে সব কথা বল্‌ছিলেন তার মধ্যে লক্ষ্ণৌয়ের চিরপরিচিত কপট অত্যুক্তির রেশ বিলক্ষণ ছিল। কিন্তু কপট উক্তি যে শ্রুতিমধুরতায় খাটো হয় না, তা বুঝ্‌তে হলে একবার লক্ষ্ণৌ যাওয়া দরকার।

লক্ষ্ণৌয়ে এ সব বিভিন্ন গায়ক গায়িকার মধুর কণ্ঠে গীত হিন্দুস্থানী গান উপভোগ করতে করতে আমাদের সঙ্গীতের মাধুর্য্যের চরম বিকাশের পক্ষে কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্যের মূল্য যে কতখানি, তা যেন আমি আবার নতুন করে উপলব্ধি করেছিলাম। এবং এ সূত্রে আমার আবার মনে হয়েছিল যে, গানের গভীর আনন্দ দানের পক্ষে মধুর স্বরের আমরা যথেষ্ট দাম দিতে শিখি নি। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে পরে লেখার ইচ্ছে আছে—তাই এখানে শুধু এই কথাটি মাত্র বলে রাখি যে, কণ্ঠ-সঙ্গীতে রাগালাপের চরম মাধুর্য্য কখনই কর্কশ গলায় তেমন বিকাশ পেতে পারে না। আমি কাশীতে ও গোয়ালিয়রে দু জন বিখ্যাত গায়িকার গান শুনেছিলাম। তাদের নাম মঙ্গু বাই ও হুশ্‌না জান। একজনের বয়স প্রায় ৭০, অপর জনের ৬।৬৫। গানে এদের দুজনেরই অসাধারণ দখল দেখে অবাক্ হয়েছিলাম সন্দেহ নেই—কিন্তু বয়সের দরুণ তাদের কারুরই কণ্ঠস্বর তেমন মিষ্ট ছিল না বলে তাতে ততটা তৃপ্তি পাই নি, যতটা তাদের গলা মিষ্ট হলে পেতাম। পক্ষান্তরে পূর্ব্বোক্ত বার বছরের ছেলেটির গান শুনতে আমি যতটা কষ্ট করতে রাজী আছি, এঁদের দুজনের গান শুন্‌তে যে সে কষ্ট স্বীকার কর্ত্তে মনকে সম্মত করতে পারব না, তার প্রধান কারণ, ছেলেটির গলার অপূর্ব্ব মিষ্টতা। আমাদের উচ্চশ্রেণীর গানে কণ্ঠস্বরের মিষ্টতার দাম কতখানি, আর রাগালাপের ক্ষমতার দাম কতখানি, সে দুরূহ সমস্যাটির সমাধান স্থগিত রেখে, আপাততঃ এইটুকু বোধ হয় বলে রাখা যেতে পারে যে, আমাদের ওস্তাদী সঙ্গীতের পতনের জন্য অধিকাংশ স্থলেই কণ্ঠের কর্কশতা অনেকটা দায়ী।

এলাহাবাদ, কাশী ও লক্ষ্ণৌ হয়ে মোরাদাবাদে ছিলাম দিন সাতেক। মোরাদাবাদেও আগে সঙ্গীতের চর্চ্চা

যথেষ্ট ছিল, এখন সেখানে মাত্র একটি হার্ম্মোনিয়াম-বাদক ও একটি গায়ক আছেন যাঁদের মধ্যে সঙ্গীত সম্বন্ধে কোনও অন্তর্দৃষ্টি থাকুক বা না থাকুক—অঙ্গভঙ্গীতে উৎকট হাস্য-করতার অভাব ছিল না। শুন্‌লাম পূর্ব্বোক্ত গায়কটি না কি গত বৎসর জলন্ধরে সঙ্গীত-সম্মিলনীতে দুবার গাইতে অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন। এ কথা শুনে জলন্ধরের সঙ্গীত-পরিষদের বিচারশক্তি সম্বন্ধে একটু সন্দিহান হয়ে পড়তে হয়েছিল মনে আছে।

রামপুরে অনেকগুলি ভাল গায়ক ও বাদক নবাবের পৃষ্ঠপোষকতায় গঞ্জিকা সেবন করে' সুখে কালাতিপাত করেন শুনে সেখানে গেলাম। সেখানে গিয়ে দুই এক জনের সুপারিশে নবাব সাহেবের "মেহমান" (অতিথি) হয়ে মহা মুস্কিলে পড়তে হয়েছিল। নবাব সাহেবের সেক্রেটারী মহাশয় ষ্টেশনে গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাকে ধুতি পরা দেখেই কি না জানি না, প্রথমটা তারা বিশ্বাসই করে নি যে, এক বাঙালী বাবু নবাব সাহেবের মত হোমরাও চোমরাও লোকের অতিথি হতে পারে। কিন্তু ট্রেণ থেকে অন্য কোনও ভদ্র-লোককে সেই পাণ্ডব-বর্জ্জিত স্থানে নামতে দেখ্‌তে না পেয়ে তারা সিদ্ধান্ত করল যে আমিই নিশ্চয় নবাবসাহেবের মেহমান হব। ইতিমধ্যে রামপুরের টঙ্গাওয়ালারা নষ্টনীড় মৌমাছির মত আমাকে ছেঁকে ধরে প্রায় বিহ্বল করে ফেলেছিল। আমার বিছানা এক টঙ্গায় ও তোরঙ্গ অপর টঙ্গায় দেখে এবং কুলি ও বিভিন্ন টঙ্গাওয়ালাদের মধ্যে বিবাদের দৃশ্য দর্শন করে আমি যখন প্রায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছি, তখন নবাবসাহেবের সারথি আমাকে প্রচুর ব্যাখ্যা সহকারে তাঁদের আমাকে খুঁজে পেতে দেরী হবার অগণ্য কারণ জ্ঞাপন কর্লেন। আমি আগে থেকেই রামপুরে এক বাঙালী ডাক্তার ভদ্রলোকের ওখানে আমার থাকার বন্দোবস্ত করেছিলাম। কিন্তু নবাবের সারথি-পুঙ্গব আমাকে সটাং এক হোটেলে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন। আমি ডাক্তার বাবুর ওখানে যাব বলাতে, সকলেই এক-বাক্যে আমাকে জানালেন যে, সেটা অসম্ভব; যেহেতু আমি এবার নবাব সাহেবের মেহমান (অতিথি)। নবাব সাহেবের মেহমান হলেই আমার বন্ধু সত্ত্বেও হোটেলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হওয়া কোন তর্কশাস্ত্রসিদ্ধ জিজ্ঞাসা করাতে, তাঁরা সকলেই আমাকে এক-বাক্যে উপদেশ দিলেন যে, সেইটেই হচ্ছে সেখানকার অতিথি-সৎকারের কেতা। আমি মাছ মাংস খাই না বলাতে, তারা বল্‌ল, "বেশ ত, সিধে আস্‌ছে, যা চান তাই পাবেন, ও রেঁধে খেয়ে নেবেন।"

ক্ষুধাশান্তির এরূপ সহজ উপায়ে আমার প্রায় বাক্‌রোধ উপস্থিত হওয়াতে, তারা আমার রন্ধননৈপুণ্যের অভাব সিদ্ধান্ত করে বল্‌লে, "রাঁধতে না জান্‌লেও ভাবনা নেই। সিধে রেঁধে দেবার লোকও আছে।" সেই রাত্রে আবার নবাব সাহেবের সিধে এনে তার পর তাকে রাঁধিয়ে খেতে হবে, (যখন ডাক্তার সাহেবের ওখানে তাঁর স্ত্রী স্বহস্তে আমার জন্যে রেঁধে অপেক্ষা করে বসে আছেন) এ কথা ভেবে মনে হ'ল, কুক্ষণে নবাব সাহেবের অতিথি হতে সাধ গিয়েছিল। কিন্তু অবশেষে প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের সহিত হঠাৎ পুরুষোচিত উদ্দীপ্ত ক্রোধে তাদের তারস্বরে জ্ঞাপন কর্‌লাম যে, আমি যে ডাক্তার সাহেবের ওখানে উঠ্‌ব তা নবাব সাহেব জানেন। এ কথায় তারা একটু থতমত খেয়ে গেল, ও অনেক জল্পনার পর বল্‌ল, "আচ্ছা, আপনি ডাক্তার সাহেবের ওখানেই থাক্‌তে পারেন; কিন্তু "মেহমান" আপনি নবাব সাহেবের, আর কারো নন্।" আমি সানন্দে বল্লাম "তথাস্তু।" অতি কষ্টে নবাব সাহেবের আতিথ্যের হাত হতে পরিত্রাণ পেয়ে, কোনও মতে ডাক্তার সাহেবের ওখানে গিয়ে আমার নবাবী আতিথ্য-সৎকারের বিড়ম্বনার কাহিনী খুলে বল্‌লাম। আমার গৌরবময় লাঞ্ছনার কাহিনী শুনে তাঁদের কৌতুক-হাস্য কতক্ষণ স্থায়ী হয়েছিল, তা বোধ হয় বর্ণনা করার চেয়ে অনুমান করতে ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

সে রাত্রে ত পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে ডাক্তার মহাশয়ের ওখানে কাটানো গেল। তার পর দিন সকাল বেলা ডাক্তার সাহেবের স্ত্রী আমাকে হেসে বল্লেন, "নবাব সাহেব আপনার জন্য যে সিধে পাঠায়েছেন ভার ক'রে, একবারটি দেখে যান।" গিয়ে দেখ্‌লাম যে সে এলাহী কাণ্ড—চাল্ ডাল, নুন, তেল, ঘি, কপি, মাংস, চিনি ইত্যাদি ইত্যাদি, মায় কয়লা পর্য্যন্ত। তাতে অন্ততঃ ৩৷৪ জনের দুবেলা খাওয়া হ'তে পারে। অথচ আমার না কি সে সব এক বেলায় খেয়ে ফুরিয়ে দেবার কথা। তার ওপর নবাব সাহেব এক পরিচারক পাঠিয়েছিলেন। আমি তাকে

বল্লাম "নবাব সাহেবকে আমার অনেক সেলাম জানিও; কিন্তু তোমার সেবা গ্রহণ করার আমার কোনও দরকার নেই; যেহেতু আমি ডাক্তার সাহেবের অতিথি।" সে কিন্তু নাছোড়বন্দ্। বল্ল, "আপনার সেবা আমি করবই। কারণ তা না হলে আমার নিস্তার নেই।" আমি তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা কর্‌লাম যে, অধম নিস্তারণের ভার আমার নয়, সে ভার—কল্কি দেবের; কিন্তু উত্তরে সে আমাকে বিশদ ভাবে বুঝিয়ে দিল যে, যেহেতু আমি technically নবাব সাহেবের মেহমান, সেহেতু আমার সেবা করার অধিকার তার মারে কে? বুঝলাম যে "হাঁ, সনাতন নবাবী অতিথি-সৎকার বটে!" এ সম্বন্ধে নবাবের ধারণা অভ্রভেদী। তিনি কোনও উৎসব উপলক্ষে রামপুর ষ্টেশনের প্রতি ট্রেণের যাত্রীদের উৎকৃষ্ট থলি-ভরা মিষ্টান্ন উপহার দিয়েছিলেন, তা আবার এক দিন নয় তিন দিন ধরে। অতএব আমি দেখলাম যে resignation রূপ গুণটির চর্চ্চা করাই শ্রেয়! নবাব সাহেবের আতিথ্য পাছে আমাদের দেশের আর কেউ গ্রহণ করেন, সেই আশঙ্কায়ই আমি এত কথা লিখ্‌তে বাধ্য হলাম।

সে যাই হোক্, রামপুরের একজন বড় ওস্তাদ মুস্তাক হুসেনের গান শুন্‌লাম, আর বিখ্যাত স্বনামধন্য উজীর খাঁর বীণা শুন্‌লাম। গান বিশেষ ভাল লাগ্‌ল না—কারণ (১) গায়কের গলা ভাল নয় (২) গায়কের গানের মধ্যে কোনও dignityর অস্তিত্ব খুঁজে পেলাম না। শুধুই তান দেওয়া যে বড় আর্ট নয় ও অত্যন্ত শ্রান্তিকর, তার যদি কেউ প্রত্যক্ষ প্রমাণ চান, তবে যেন তিনি অন্ততঃ একবার রামপুরের মুস্তাক হুসেনের কিম্বা বম্বের বাসগন্ধর্ব্বের গান শোনেন। উজীর খাঁ সাহেবের বীণা কিন্তু ভারি ভাল লাগ্‌ল। সেদিন বেশিক্ষণ শোনা হয়ে উঠ্‌ল না, কিন্তু একটি গৌড় সারঙ্গের আলাপেই খাঁসাহেবের অসাধারণ মিষ্ট হাতের পরিচয় পাওয়া গেল। তার পর বম্বেতে খ্যাতনামা তিলঙের বীণা শুনেছিলাম; কিন্তু খাঁ সাহেবের পর বড়ই সাধারণ লেগেছিল। সঙ্গীতের আর্ট ঠিক্ কোথায়, সে সম্বন্ধে মুসলমানদের মধ্যে বোধ হয় কারুর কারুর একটু অন্তর্দৃষ্টি আছে, যদিও শিক্ষার অভাবে সেটা প্রায়ই তারা ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করে বোঝাতে পারে না।

রামপুরে কোনও ধনী শিক্ষিতা (?) মুসলমান মহিলার সঙ্গে আলাপ হ'ল। এ রকম type সচরাচর চোখে পড়ে না; তাই এঁর সম্বন্ধে দুচারটি কথা লিখ্‌ব। ১৯১৬ সালে বরোদায় একটি সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। তাতে ইনি একটি ছোট প্রবন্ধে দেখিয়েছিলেন যে, মাত্র ২৫ লক্ষ টাকায় কেমন করে একটি চলনসই রকমের সঙ্গীত-মন্দিরের (Musical Academy) গোড়া পত্তন করা যেতে পারে। তাতে বিদ্যালয়ের কি রকম ঘর হবে, কি রঙের পাথর হবে, কি ভাবের কারুকার্য্য হবে ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় তথ্যের কোনই অভাব ছিল না—কেবল অন্ন বস্ত্রের অভাব ছাড়া; অর্থাৎ কেমন করে এই যৎসামান্য ২৫ লক্ষ টাকা যে সংগ্রহ করা হবে, সেই সম্বন্ধে কোনও সন্তোষজনক সমাধান ছাড়া অন্য সব সমস্যারই সমাধান তিনি লিখেছিলেন। তিনি "বৎসরে অন্ততঃ চার মাস পর্ব্বতবাস না কর্লে চলে না" এরূপ ইঙ্গবঙ্গ সুলভ মনোভাব প্রকাশ করে'ও, সে প্রবন্ধটিতে "The West has been proved to possess no real culture" রূপ কথা লিখে নিজের গভীর দেশভক্তির প্রমাণ দিতে ছাড়েন নি। আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা কর্লেন, কি ভাবে আমি সঙ্গীতের কাজ কর্ত্তে চাই। আমি উত্তর দিতে না দিতেই তিনি আমার মতটি ভ্রান্ত প্রমাণ করে দিলেন। আমি দুই একবার তাঁর আরও দুই একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ-প্রয়াস হয়ে শেষে তাঁর তেজোগর্ভ বাণী শুন্‌তেই মনো-নিবেশ করা শ্রেয়ঃ মনে করলাম। তিনি আমাকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন যে, সঙ্গীতের কোনও academy কর্ত্তেই হবে এবং তদর্থে অভাব কেবল দুইজন নিঃস্বার্থ কর্ম্মীর। আমি টাকার কথা উল্লেখ কর্ত্তে না কর্ত্তে তিনি বল্লেন যে, টাকা কিছুই নয়, তিনি গাইকবাড়ের কাছ থেকে এক লাখ, মহীশূরের কাছ থেকে এক লাখ, রামপুরের কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার ইত্যাদি বিস্তর টাকা যোগাড় কর্ত্তে পারেন। আমি তার পর বল্লাম ভাল গায়ক পাওয়া সম্বন্ধে। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর ওজস্বিনী ভাষায় ব্যাখ্যা করে দিলেন যে, তিনি উদয়পুরের কাছ থেকে জাকরুদ্দিন, রামপুরের কাছ থেকে উজীর খাঁ, আলওয়ারের কাছ থেকে অল্লাবন্দে খাঁ প্রভৃতিকে শিক্ষার্থে যোগাড় করে আন্‌তে পারেন। ইত্যাদি নানান্ অকাট্য যুক্তিবলে তিনি প্রমাণ করে দিলেন যে, শিক্ষক ও টাকা দুইয়েরই যোগাড় অত্যন্ত সহজ।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সঙ্গীত বিদ্যালয় কেন স্থাপিত হচ্ছে না—বিশেষতঃ তাঁর মতন পৃষ্ঠপোষক থাক্‌তে—এই সামান্য সমস্যাটির খুব সন্তোষজনক সমাধান যেন পাওয়া গেল না—যদিও তাঁর কাছে নিশ্চয়ই অন্যান্য বিষয়ের মতন এ সমস্যার সমাধানটিও জলের ন্যায় সোজা ছিল।

তিনি আমাকে বল্লেন যে, জগতে এখন একমাত্র উজীর খাঁ আছেন, যিনি আমাদের সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু জানেন। আমি জাকরুদ্দিন, আবদুল করিম, অল্লাদিয়া খাঁ কেমন গান করেন জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি অবজ্ঞার সহিত হেসে বল্লেন "গায় বটে, কিন্তু উজীর খাঁর কাছে তারা গড় হ'য়ে যায়।" উজীর খাঁর কাছে তাদের এরূপভাবে সাষ্টাঙ্গ হওয়া সম্বন্ধে আমার মনে যথেষ্ট সংশয় থাক্‌লেও (কারণ আমাদের দেশের গায়ক-বাদকদের পক্ষে একের অপর কারুর গানবাজনার সুখ্যাতি করার সম্ভাবনা যে, কতদূর তা আমার অগোচর ছিল না) আমি সে সম্বন্ধে কোনও প্রতিবাদ না করে ধীরে ধীরে বল্‌লাম যে, আমি গায়কদের কথা জিজ্ঞাসা কর্চ্ছিলাম —বাদকদের নয়। উজীর খাঁ যন্ত্রী বটে কিন্তু গায়ক নন। এবং তাঁর গান আমার বিশেষ ভাল লাগেনি। এ কথা বল্‌বা মাত্র ভদ্র-মহিলা মহা উত্তেজিত হয়ে বলে উঠ্‌লেন, যেন আমি ওরূপ মত ভবিষ্যতে না প্রকাশ করি। তা কর্‌লে আমার জীবন সংশয় হবার সম্ভাবনা আছে কি না জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি বল্লেন, পরিহাস প্রবৃত্তির স্থান অস্থান আছে; এবং সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু না জান্‌লে "তাবচ্চ শোভতে অজ্ঞো যাবৎ কিঞ্চিন্নভাষতে।" আমি সঙ্গীত সম্বন্ধে আশৈশব যৎসামান্য চর্চ্চা করেছি, এ কথাটি তাঁর কাণে পৌছল কি না জানি না; কিন্তু তিনি পূর্ব্ববৎই সোৎসাহে আমাকে তাঁর জলন্ত বক্তৃতা দ্বারা উদ্দীপ্ত করে তুল্‌বার চেষ্টায় বিরত হলেন না। পরিশেষে কিন্তু আমার নীরব মনোযোগে আমার প্রতি একান্ত তুষ্ট হয়ে আমাকে এই বর দিলেন যে, এক দিন আমি তাঁর ওখানে চা খেতে আস্‌তে পারি। আমি আমার জীবনের সে গৌরবময় মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় থাক্‌ব, এ কথা জানিয়ে বিদায় গ্রহণ কর্‌লাম। শেক্সপীয়র বলেছেন যে দুঃখ না কি আমাদের অপ্রত্যাশিত শয়নসঙ্গীর সঙ্গে পরিচিত করে থাকে *। আমার যদি কখনও দিন আসে, তবে আমি প্রমাণ করতে চেষ্টা পাব যে, সঙ্গীত সম্বন্ধে এ কথা আরও বেশি খাটে যদি "শয়নসঙ্গী" কথাটির স্থলে "তর্কালাপসঙ্গী" কথাটি বসিয়ে দেওয়া যায়।

রামপুরের নবাবের আতিথ্য যেন আমি পুনরায় স্বীকার করি এই সর্ত্ত করে আমি রামপুর পরিত্যাগ কর্‌লাম।

বেরিলিতে কয়েক ঘণ্টার জন্য ছিলাম; কিন্তু যেদিন আমি সেখানে গিয়াছিলাম, ঠিক্ সেদিনই সেখানকার কয়েকজন প্রবাসী বাঙালী মিলে এক গানবাজনার আসর করে তুলেছিলেন। সেখানে বাংলাদেশ থেকে অত দূরে কীর্ত্তন শুন্‌তে শুন্‌তে বেশ লাগ্‌ছিল ও মনে হচ্ছিল যে কীর্ত্তনের মধ্যে 'লম্ফঝম্পে'র অতিচার, খর্ত্তালের অত্যাচার ও গলাবাজির অনাচার কমিয়ে দিয়ে দরদ দিয়ে গাইলে তাতে রস নিতান্ত কম পাওয়া যায় না। মনে আছে একবার কোনও গণ্যমান্য লোকের বাড়ী একজন খুব বড় কীর্ত্তনিয়ার পালা শুন্‌তে গিয়েছিলাম। দোয়াররা ভগ্ন স্বরে দুরারোহ উচ্চ পর্দ্দায় আরোহণ করা রূপ অসাধ্য সাধনের এমন দুর্দ্ধর্ষ চেষ্টা কর্চ্ছিল ও তদুপরি খর্ত্তালের অত্যন্ত বেসুরো আর্ত্তনাদ এতই দুঃসহ হয়ে উঠেছিল যে, আমি আমার কর্ণপটহে রীতিমত যন্ত্রণা বোধ করছিলাম। এমন কি শেষে আমার সত্যসত্যই কাণে কাগজের ছিপি এঁটে বসে থাক্‌তে হয়েছিল; কারণ প্রকাশ্য সভায় কাণে আঙুল দিয়ে বেশীক্ষণ বসে থাকা যেমন অসম্ভব, তেম্‌নি দৃষ্টিকটু। তখন আমার মনে হয়েছিল যে যদি কোনও সঙ্গীতজ্ঞ য়ুরোপীয় সেদিন সে আসরে উপস্থিত থাক্‌তেন, তবে সেদিনকার ভারতীয় সঙ্গীত হতে তাঁর মতামত লিখ্‌তে হলে তিনি বোধ হয় লিখতেন:—"It is a popular error among us, Westerners, to think of Indian Music as purely melodic in contra-distinction to harmonic, for it is undoubtedly as far removed from any suspicion of melody as from harmony." অন্ততঃ এ কথা লিখ্‌লে আমি ত তাঁকে বিশেষ দোষ দিতে পারতাম না। কিন্তু কীর্ত্তন যে বাস্তবিকই কতটা melodic হতে পারে, তা এই সব আনুষঙ্গিকের অত্যাচার দূর কর্‌লে এক মুহূর্ত্তেই আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়।

* Misery acquaints a man with strange bed-fellows—Shakespeare.

বেরিলিতে এই আসরে আমার অনুরোধে ঘুরণ বলে সেখানকার একজন বড় মুসলমান গায়ককে আনা হয়েছিল। এমন চমৎকার টপ্পা বড় শোনা যায় না—বিশেষতঃ এমন সুন্দর টপ্পার দানা। আমাদের গিট্‌কারীর বা মূর্চ্ছনার সৌন্দর্য্য নির্ভর করে তার পরিষ্কার হওয়ার উপর। ঘুরণের গিট্‌কারী শুন্‌লে এ কথার যাথার্থ্য আরও উপলব্ধি হবে।

আগ্রার তাজমহল যে কতখানি ভাল লাগ্‌ল তা বলে শেষ করে ওঠা কঠিন। তাজমহল দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রায়ই কবিবরের অমৃতময়ী বর্ণনার কথা মনে হ'ত। তাতে তাজমহল-উপভোগের রস যেন আরও মধুর হয়ে ধরা দিত। এক শিল্পকলার উপভোগ অপর কোন কলার মধ্য দিয়ে যে কত সমৃদ্ধতর হয়ে ওঠে, তা "সৌন্দর্য্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে"—রূপ এক ছত্রের বর্ণনায় মুহূর্ত্তের মধ্যে উপলব্ধি করা যায়। এই সূত্রে আমার মনে হয়েছিল যে, বিভিন্ন শিল্পকলার মধ্যে techniqueএর আকাশ-পাতাল প্রভেদ থাক্‌লেও তাদের মধ্যে একটা সত্য মিলনের চিত্র আছে।

কিন্তু সে কথা থাকুক। তাজমহলের নানান সময়ে নানান্ রূপ। আকাশে অনুদিত অরুণচ্ছটার আলোয় তাজমহল এক রকম; উদীয়মান রক্ত-রবির রঙীন আলোয় এক রকম; দ্বিপ্রহরের উজ্জ্বল রূপালি আলোয় এক রকম; আবার সন্ধ্যায় চন্দ্রালোকের ম্লানমৌন গরিমায় অন্য এক রকম। নানান্ আলোয় যে কোনও মানুষী কীর্ত্তির রূপেরও এত রকম প্রকৃতিভেদ হতে পারে, তা আমার জানা ছিল না। পারিসের Notre-dame, মিলানোর Cathedral, রোমের Vatican, পিসার Leaning tower...এ সবের কোনও কিছুই তাজমহলের মত বহুরূপী নয়।

সাগর যায়গাটিতে আমার এক বন্ধু তাঁহাদের বাড়ীতে ধরে নিয়ে গেলেন। এমন সুন্দর ছোট্ট সহর আমি খুব কমই দেখেছি। আমার বন্ধুবরের বাড়ীটি একেবারে একটি বিশাল নীলহ্রদের উপরে। সময়ে সময়ে হ্রদটির বক্ষে এমন চমৎকার নীল রঙ্ ফল্‌ত, যা দেখে আমার সুইজলণ্ডের হ্রদের কথা মনে হ'ত। অবশ্য সুইজর্লণ্ডের হ্রদগুলির মধ্যে অধিকাংশই ২০।২৫ মাইলেরও বেশি লম্বা, এবং সেখানকার তীরবর্ত্তী ঘরবাড়ীও অনেক বেশি সুন্দর। কিন্তু আমার মনে হ'ত যে সাগরের হ্রদটিও যদি তেমন শিল্পীর হাতে পড়ে, তবে সে এর রূপ শতগুণে বাড়িয়ে দিতে পারে। সাগরে ডিসেম্বর মাসের শেষেও শীত খুবই কম—বিশেষতঃ লক্ষ্ণৌ আগ্রার তুলনায়। সাগরের জলবায়ু তাই একটা মস্ত আকর্ষণ। সেখানে সুন্দর সুন্দর বনপথও আছে। শুন্‌লাম সেখানে বাঘও পাওয়া যায়। তবে এ তথ্যটিতে আমার মনে যে খুব গভীর হর্ষের উদয় হয়নি তা বলাই বেশি।

সেখান থেকে বেরারে আমার এক বন্ধুর ওখানে নিমন্ত্রণ ছিল। বেরার প্রদেশটি বেশ শৈলময়। কাজেই দেখ্‌তেও মনোহর। পথঘাটের উচ্চ নীচতা আমাদের কাছে সমতলতার চেয়ে বেশি তৃপ্তিদায়ক কেন, এ সম্বন্ধে মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা ভাবেন না কেন বোঝা যায় না, বিশেষতঃ যখন তাঁরা প্রত্যহই "আমার আঙুলটা আছে কি নেই", "বিছানার চাদরটার রং সাদা কি না" এরূপ বিষয় নিয়েও আহার নিদ্রা পরিত্যাগ কর্ত্তে পশ্চাৎপদ হন না! বেরারের লোকে দেখা গেল তুলো ছাড়া অন্য কোনও বিষয়ে কথা কয় না। কারণ জিজ্ঞাসা কর্লে বলে "Nothing like তুলো"। আমার বন্ধুবর এমন তুলোধ্যান-তুলোজ্ঞান দেশে আছেন কেমন করে জিজ্ঞাসা করাতে এমন একটা উত্তর পাওয়া গেল যাকে তিনি ছাড়া অপর কারুরই একটা পরিচারু উত্তর বলে মনে করার সম্ভাবনা নেই। আমরা সকলে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের উপদেশ অনুযায়ী মাড়োয়ারী হলে আমাদের কথাবার্ত্তা কি রকম প্রণালীতে প্রবাহিত হবে, তা যদি কেউ জান্‌তে চান, তবে যেন তিনি একবার বেরারের মান্যগণ্য লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা করে আসেন। একদিন সেখানে দুজন বেশ সুশ্রী ইংরাজকে ষ্টেশনে দেখ্‌লাম। দুচারজন বেশ গণ্যমান্য ভারতীয় ব্যবসায়ী তাঁদের ষ্টেশনে তুলে দিতে এসেছিলেন। কিন্তু ইংরাজ ভদ্রলোক দুটি বেশ সুদর্শন ও refined মনে হ'লেও তাঁদের মুখেও অনর্গল কেবল তুলোর মহিমাকীর্ত্তন ছাড়া অন্য কিছুই শোনা গেল না। আমার মনে হ'ল সেই কবির কথা, যিনি বলেছিলেন "Of all the saddest thought the saddest is, what we might have been!" বেরারের আপামর সাধারণের কথাগুলি ও পরে বম্বের ভাটিয়াদের দেখে

আমার উপরিউক্ত কবির কথা মনে হয়েছিল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে সংশয়ও জেগেছিল যে সব সময়েই "কি হতে পার্ত্তাম কিন্তু হই নি" চিন্তাটি দুঃখময় কি না।

বোম্বাইয়ে সব চেয়ে চিত্তাকর্ষক লোক—যার সঙ্গে আলাপ হ'ল, তাঁর নাম বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে। এঁর সম্বন্ধে দুচারটে কথা বিস্তারিত ভাবেই লেখা দরকার মনে করি। কারণ এঁর মতন আমাদের সঙ্গীতের সাধক ও পণ্ডিত ভারতবর্ষে আর নেই বল্‌লেও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সঙ্গীতের ব্যবহারিক ও থিওরেটিকাল দিকের চর্চ্চায় কোনও শিক্ষিত লোকই বোধ হয় এঁর মতন একান্তভাবে জীবন উৎসর্গ করেন নি। প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষেই এঁর নাম সঙ্গীতজ্ঞদের কাছে বিদিত; ও এঁর পাণ্ডিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ নয় এমন কোনও অভিজ্ঞ লোক আমি খুঁজে পাই নি। ইনি বাল্যে দারিদ্র্যের কোলেই মানুষ হওয়া সত্ত্বেও ১৮৭৬ সাল হতে গান বাজনা শিখ্‌তে আরম্ভ করেন। কঠোর জীবন-সংগ্রামের মাঝেও ইনি সঙ্গীতচর্চ্চা পরিত্যাগ করেন নি। এঁর জীবনের অনেক কাহিনীই আমি এঁর কাছে শুনেছিলাম—কারণ আমি বম্বে অবস্থানকালে প্রায়ই এঁর সঙ্গে সঙ্গীত সম্বন্ধে নানা বিষয় শিখ্‌তে যেতাম এবং সেই সূত্রে এ-কথায় ও-কথায় তিনি তাঁর সঙ্গীত-সাধনার অনেক গল্পই আমার কাছে করেছিলেন। ইনি পঞ্চাশ বৎসর ধরে ওকালতী করে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যৎসামান্য কিছু সঞ্চয় করে শেষ জীবনটা সম্পূর্ণ সঙ্গীতের সেবায় উৎসর্গ করবেন ঠিক করেছিলেন এবং পঞ্চাশ বৎসর বয়সে সে সঙ্কল্প কাজেও পরিণত করে গত ১৪।১৫ বৎসর একটানাভাবে সঙ্গীত-সাধনা করে আস্‌ছেন। অশিক্ষিত ওস্তাদদের কাছে যে সঙ্গীত-শিক্ষার্থীর কত লাঞ্ছনা সহ্য কর্ত্তে হয় ও কত সময় যে অপব্যয় কর্ত্তে হয়, সে বিষয়ে স্বয়ং ভুক্তভোগী হওয়ার দরুণ ইনি সঙ্গীত-শিক্ষার্থীর জন্য যথাসাধ্য সমস্ত রাগরাগিনীর স্বরলিপি ছাপিয়ে এসেছেন। প্রত্যেক রাগরাগিনীর রূপ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা সমেত ৩০০।৪০০ গান ইনি নিজে রচনা করে ছাপিয়াছেন। এ সব গানের নাম "লক্ষণ গীত"। একটা উদাহরণ দিলে এঁর এ পদ্ধতির কৌশলটি বিশদ হবে বোধ হয়। ধরুন, রাগ বাগশ্রী। ইনি লিখ্‌ছেন—

বাগশ্রী—ঝাঁপতাল।

গাওয়ে বাগেশ্বরী, মধু লগত সুর গ নি
থর হার প্রিয়া ঠাঠ তীবর করত ধ রি
মধ্যম করে জান সম্বাদী সামান

ব ব
))
পঞ্চম করে অলপ সা সা নি ধা নি সা সা

ব ব ব ব
))))
মা মা গা মা ধা নি ধা মা পা গা গা রে সা

শিক্ষার্থীর পক্ষে এসব গান শেখা যে তার স্মৃতির কতটা সহায়তা করে, তা সকল শিক্ষার্থীই জানেন। ভাতখণ্ডে মহোদয়ের উদ্যমে স্থাপিত অধুনাতন বিখ্যাত গোয়ালিয়র স্কুলে এঁর পদ্ধতি অনুসারেই শিক্ষার্থীদের গান শেখান হয়। সেজন্য ইনি সেখানকার ৫।৬ জন শিক্ষককে স্বয়ং শিক্ষা দিয়ে তৈরি করেন। সেখানে ছেলেদের গান বাজনায় পারদর্শিতা আমি নিজে মাস চারেক আগে দেখে এসেছিলাম এবং তখনই প্রথম ভাতখণ্ডের শিক্ষাপ্রণালী দেখে অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ করেছিলাম মনে আছে। গোয়ালিয়র স্কুলে ভাতখণ্ডে মহোদয় বছরে বার দুই স্বয়ং সেখানকার কার্য্য-প্রণালী পরিদর্শন কর্ত্তে যান এবং সেই সময়ে রাজপুতানায় দুচারজন বড় বড় গায়কের কাছ থেকে পুরাতন গানের স্বরলিপি করে নিয়ে আসেন। এঁর স্বরজ্ঞান এত অদ্ভুত যে, একবার শোনামাত্র ইনি যে কোনও তান বা আলাপের স্বরলিপি লিখে নিতে পারেন। তা না কর্ত্তে পারলে তিনি এত অগণ্য ধ্রুপদ খেয়াল সংগ্রহ কর্ত্তে পার্ত্তেন না। গোয়ালিয়র স্কুলে এঁর ছাত্রদেরও এঁর পদ্ধতি অনুসারে এমন সুন্দরভাবে স্বরলিপি শেখানো হয় যে, তারাও একটা নূতন গান শুন্‌লে প্রায়ই তার স্বরলিপি লিখে নিতে পারে। আমি সেখানে একটি ছোট ছেলেকে আমার কোনও ইতালিয়ান গানের দ্রুত-হস্তে স্বরলিপি লিখে নেওয়া দেখে ভারি খুসি হয়েছিলাম মনে আছে। ভাতখণ্ডে মহাশয় সমস্ত উত্তর ও দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করে কত যে দুর্লভ সংস্কৃত সঙ্গীত-শাস্ত্র-গ্রন্থ সংগ্রহ করেছেন, তার আর সীমা নেই। আমাদের সঙ্গীতের সংস্কৃত শাস্ত্রসম্বন্ধে এঁর চেয়ে বড় authority ভারতে কেউ নেই, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। ইনি সে সব বইয়ের অনেকগুলিই

প্রকাশ করেছেন। তার মধ্যে কতকগুলির নাম যথা, শ্রীমদ্রাগকল্পদ্রুমাঙ্কুর, রাগচন্দ্রিকা, সঙ্গীতসুধাকর, অষ্টোত্তরশতরাগলক্ষণম্, রাগতরঙ্গিণী, রাগতত্ত্ববোধ, চতুর্দণ্ডিপ্রকাশিকাসার ইত্যাদি ইত্যাদি। ইনি এ ছাড়াও অন্ততঃ ২০৷২৫ খানা বই লিখেছেন, কিন্তু এ সমস্ত বইয়ের কাটতি খুব কম হওয়া সত্ত্বেও তার লাভের এক পয়সাও নিজে গ্রহণ করেন না—বহুল প্রচারের জন্য সব বই-ই cost-priceএ বিক্রয় করেন। গোয়ালিয়রের মহারাজা যখন গোয়ালিয়রে স্কুল করবার জন্য ভাতখণ্ডেকে মোটা মাহিনার প্রলোভন দেখিয়ে তাঁকে বম্বে সহর ছেড়ে গোয়ালিয়রে বাস করার জন্য নিমন্ত্রণ করেন, তখন ভাতখণ্ডে মহাশয় উত্তর দেন, "আমি বম্বেতে ১০০৷১৫০ ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষার ভার নিয়ে একটা স্কুল চালাচ্ছি, তাই গোয়ালিয়রে গিয়ে বসবাস কর্ত্তে পারি না। তবে আমি সেখানকার স্কুল Organize ও মাঝে মাঝে পরিদর্শন করার ভার নিতে খুবই রাজী আছি, এবং সেজন্য শিক্ষকদের তৈরি করে নেওয়া, text-book প্রণয়ন করা সবই কর্ত্তে সম্মত আছি। তবে এ সব কাজের জন্য আমি একটি পয়সাও চাই নে, কারণ আমার যৎসামান্য যা আছে তা আমার পক্ষে যথেষ্ট। তবে আপনি হাজার টাকা মাহিনা দিলেও আমি আমার বম্বের কাজ ত্যাগ করে গোয়ালিয়রে যেতে পারব না।" ইনি ব্রাহ্মণ এবং সত্যকার ব্রাহ্মণ, জ্ঞানসাধক, নির্লোভ ও নিষ্কাম কর্ম্মী। আমাদের গৌরবের দিনে বোধ হয় এরকম ব্রাহ্মণের সংখ্যাই বেশি ছিল। য়ুরোপে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় সঙ্গীতের জন্যও এরূপ অক্লান্ত সাধক আছেন, কিন্তু আমাদের দেশে বোধ হয় ভাতখণ্ডেই একমাত্র এ বিষয়ে অগ্রণী। অন্ততঃ আমি ত বিস্তর সঙ্গীতজ্ঞ লোকের সঙ্গে সংস্পর্শে এসেছি, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কাউকে সঙ্গীতের জন্য এরূপ যথার্থ সাধকের মতন জীবন উৎসর্গ করতে দেখি নি।

বম্বেতে ভাতখণ্ডে মহোদয়ের এক তরুণ শিষ্যের গান শুনলাম। যুবকের নাম রতনজনকর। আই-এ পড়ে। বয়স ২০৷২১ বৎসর। একে ভাতখণ্ডে মহোদয় নিজে খুব ভাল দরের তিন চার শ' খেয়াল শিখিয়ে বরোদার মহারাজাকে বলে কয়ে সেখানকার বিখ্যাত খেয়ালী ফৈয়াস খাঁর কাছে তানকর্ত্তব ভাল করে শিখবার জন্য পাঁচ বৎসরের জন্য বরোদায় পাঠায়ে দেন। কিন্তু অশিক্ষিত গাইয়ের শিষ্যত্ব কর্ত্তে হ'লে যে লাঞ্ছনা সহ্য কর্ত্তে হয়, রতনজনকরের তার চেয়ে ঢের বেশি সহ্য কর্ত্তে হওয়া সত্ত্বেও পাঁচ বৎসরে ফৈয়াস খাঁ তাকে মোটে ২৫খানি খেয়ালের বেশি শেখান নি। রতনজনকর শেষে বিরক্ত হয়ে চলে আসে ; ও আমাকে বলেছিল তাকে এজন্য কত কষ্ট সহ্য কর্ত্তে হয়েছে—কতদিন কত ঘণ্টা অপেক্ষা করেও কিছু শিখবার সুযোগ পায় নি ইত্যাদি ইত্যাদি। সে আমাকে আরও বলে "পাঁচ বৎসরে আমাকে মোটে পঁচিশখানি গান আদায় করে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে, যেখানে আমার ক্ষমতা ছিল সপ্তাহে অন্ততঃ পক্ষে একটি করে খেয়াল শেখবার।" বাস্তবিক এর গান অতি চমৎকার। আর খুব উচ্চ চালের গান। এমন সুন্দর ঢঙের খেয়াল খুব কমই শোনা যায়। তাছাড়া গলার তানকর্ত্তব অতি অসাধারণ। এক একটি রাগ এ ঘণ্টা দুই ধরে আলাপ কর্ত্তে পারে। এত অল্প বয়সে এরূপ অসামান্য কৃতিত্ব দুর্লভ। আর ভাতখণ্ডে মহোদয়ের শিক্ষা-পদ্ধতি-গুণে এর স্বরজ্ঞানও অতি চমৎকার। প্রত্যেক দুরূহ তান নিয়েই এ তার সার্গম করে শোনাতে পারে। ভাতখণ্ডের কাছে এ যা শিখেছে, ধর্ত্তে গেলে ফৈয়াস খাঁর কাছে তার চেয়ে বিশেষ বেশি শেখবার সুযোগ পায় নি। এর গান শুনে ভাতখণ্ডের শিক্ষা-পদ্ধতির মহিমা আরও উপলব্ধি করা গেল।

ভাতখণ্ডে আবার এই মার্চ্চ মাসে জয়পুরে অনেকগুলি ধ্রুপদ গান সংগ্রহ কর্ত্তে সেখানে মাসাধিককাল কাটিয়ে, গোয়ালিয়রের সঙ্গীতবিদ্যালয় পরিদর্শন করে, এপ্রিল মাসে রামপুরের গাইয়েদের কাছে আরও কিছু গান সংগ্রহ কর্ত্তে যাবেন। ৬৪৷৬৫ বৎসর বয়সে সঙ্গীতের উদ্ধারের জন্য এই অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও পর্য্যটন করার উৎসাহের জন্য এঁর প্রতি ভক্তি না হয়েই পারে না। কলকাতায় আসবেন কি না জিজ্ঞাসা করাতে আমাকে বললেন যে, যদি কলকাতার কোনও বড় গাইয়ের কাছে খান পঞ্চাশেক ধ্রুপদ সংগ্রহ করার সুযোগ পান, তবে সেখানে যেতে পারেন। আমি বাংলার ধ্রুপদীশ্রেষ্ঠ শ্রীরাধিকা গোস্বামী মহাশয়ের কথা বলাতে ভাতখণ্ডে মহাশয় জিজ্ঞাসা কলেন যে, তাঁর ধ্রুপদ তিনি বম্বের এদিকে প্রচলিত করার জন্য স্বরলিপি করে ছাপাতে চান। অবশ্য এজন্য তিনি গোঁসাইজীর

ঋণ ভূমিকাতেই স্বীকার করেছেন। গোঁসাইজী অত্যন্ত মহাশয় লোক, এ কথা বলাতে ভাতখণ্ডে মহাশয় এপ্রিল মাসে কলিকাতায় আস্তে স্বীকৃত হয়েছেন। তাঁর অসাধারণ সঙ্গীতানুরাগের সম্বন্ধে আমাদের দেশের সঙ্গীতানুরাগীদের কারুর কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই আমি এত কথা লিখলাম। সত্যকার জ্ঞানী যে কত নম্র হন, তিনি যে নূতন তথ্যের জন্য কারুর কাছেই নত হতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, তা এঁর মতন লোককে দেখলে বোঝা যায় বটে।

আমাদের দেশের অশিক্ষিত গায়ক-বাদকদের সঙ্গে যাঁরই পরিচয় আছে, তিনিই জানেন, তাঁরা সচরাচর কিরূপ সঙ্কীর্ণচিত্ত, নির্ব্বোধ ও সঙ্গীতের রাগ সম্বন্ধে একান্ত অজ্ঞ। আমাদের দেশে ওস্তাদগণ সহজে নিজের পরিবারভুক্ত দুচারজনকে ছাড়া অপর কাউকে শিক্ষা দিতে চান না। এর ফলে এক একজন গুণীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যে কত সুন্দর রাগ রাগিনীর আলাপ চিরকালের জন্য লুপ্ত হয় তার ইয়ত্তা কে করবে! এটা যে কত বড় আক্ষেপের বিষয় তা সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব করেন। কত গভীর অজ্ঞতার ফলে যে সঙ্গীতজ্ঞ লোকের দ্বারাই সঙ্গীতের এ ভাবে বিলোপ সাধন সম্ভব, তা বোধ হয় সহজেই অনুমেয়। তাছাড়া এরূপ অজ্ঞ ও মূঢ় গায়ক যে গর্ব্বোন্মত্ত হবেন, সেটাও কিছু বিচিত্র নয়। আমার এক সঙ্গীতজ্ঞ বন্ধু আগাতে এবার "সঙ্গীতের ইতিহাস" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাতে তাঁর শেষ কথা এই ছিল যে, আমাদের সঙ্গীতের লুপ্ত গৌরব যদি আবার ফিরিয়ে আনতে হয়, তবে অশিক্ষিত পেশাদার সম্প্রদায়ের হাত হতে তার উদ্ধারের ভার উদার শিক্ষিত লোককেই নিতে হবে। একজন শিক্ষিত সঙ্গীতজ্ঞের দ্বারা এ পক্ষে কতখানি কাজ হওয়া সম্ভব, বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডের মতন লোকই তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। (আগামীবারে সমাপ্য)

চির-কুমার

বিবাহ করিব না, এ প্রতিজ্ঞা তত দিন দৃঢ় থাকে, যত দিন না সন্তোষজনক পণের সঙ্গে সালঙ্কারা সুন্দরী কন্যা পাওয়া যায়।

শিল্পী—শ্রীমণীন্দ্রনাথ নাগ

রাইন প্রপাত (শাফাউজেনের নিকট) [ফটো :—Wehrli, Zurich]

সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড

(১)

ষ্টুটগার্টের পথে সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে পৌছিলাম। এই সহর দক্ষিণ-পশ্চিমে জার্ম্মাণির এক বিপুল গৌরব-কেন্দ্র। মিয়ুন্‌থেন, ড্রেস্‌ডেন, কোলন্‌ ইত্যাদি সহরের মত ষ্টুট-গার্টকে জার্ম্মাণ "কুল্‌টুরের" পীঠস্থান বিবেচনা করা চলে।

রঙ্গালয়, সঙ্গীত-ভবন ইত্যাদি ত আছেই। সুকুমার শিল্পের সংগ্রহালয় এবং অন্যান্য মিউজিয়াম ষ্টুটগার্টে কয়েক গণ্ডা। বার্লিনের শিল্পরসিকেরা জার্ম্মাণ শিল্প-কেন্দ্রের তালিকায় ষ্টুটগার্টকে কোনো মতেই ভুলে না। এখান-কার "টেক্‌নিশে হোখ্‌শুলে" বা টেক্‌নিক্যাল কলেজে হাজার হাজার দেশী বিদেশী ছাত্র উচ্চতম অঙ্গের এঞ্জিনি-য়ারিং এবং ফলিত-রসায়ন শিক্ষা করিতে পারে। অধিকন্তু কেতাব ছাপা এবং প্রকাশের ব্যবসায় ষ্টুটগার্টকে লাইপৎ-সিগ, মিয়ুনথেন ইত্যাদি সহরের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি।

অতি সুরম্য প্রাকৃতিক আবেষ্টনের ভিতর সহরের অবস্থান দেখিতে পাইলাম। জনপদকে "শোহ্বার্ট্‌স্‌হ্বাল্ড" বা কৃষ্ণবন বলে। পাহাড়ী অঞ্চল। গাছের ভিতর পাইনের সংখ্যা বেশী; গাঢ় সবুজের আওতা চোখে পড়ে বলিয়া বোধ হয় গোটা জনপদকে "শোহ্বার্ট্‌স্‌" বা কৃষ্ণবর্ণ বলা হইয়া থাকে।

প্রকৃতপক্ষে আল্‌প্‌স পাহাড়ের উত্তর কোমরের অথবা পায়ের উপর দিয়া গাড়ী চলিতেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম জার্ম্মাণিকে উত্তর সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের জের বিবেচনা করা সঙ্গত। জার্ম্মাণ নরনারীরা শোহ্বার্টস্‌হ্বাল্ড অঞ্চলে গ্রীষ্ম কাটাইতে আসিয়া সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে প্রবাসের আনন্দই উপভোগ করিয়া থাকে।

(২)

নবেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ। এবার কিছু তাড়াতাড়ি বরফ পড়া সুরু হইয়াছে। "কৃষ্ণবন" আগাগোড়া সাদা দেখিতেছি। কয়েক ঘণ্টায় শাফ্‌হাউজেনে আসিয়া গাড়ী ঠেকিল। এইখানে সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের সীমানা। ষ্টেশন ছাড়িবামাত্রই গাড়ী হইতে দেখা গেল "রাইনফাল" বা রাইন-প্রপাত। নায়গ্রা প্রপাতের দৃশ্য স্মরণে আনিবার কোন কারণ পাইলাম না। কিন্তু কয়েক মিনিট ধরিয়া দেখিবার মতন একটা জলপ্রপাত বটে।

গাড়ীর ভিতর সহযাত্রী একজন প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ অভিনেতা। সুইটসার্ল্যাণ্ডের নানা থিয়েটারে অভিনয়

করিবার জন্য ইনি নিমন্ত্রিত হইয়া জুরিখে চলিয়াছেন। ইনি বলিতেছেন :—"সুইস গবর্মেণ্ট জার্ম্মাণ পর্য্যটকদিগকে কোনো মতেই পাসপোর্ট দিতে চায় না। জার্ম্মাণরা সুইট্সার্ল্যাণ্ডে গণ্ডায় গণ্ডায় আড্ডা গাড়িতে থাকিলে, সুইস নরনারীর কর্ম্মাভাব ঘটিবার সম্ভাবনা। এই ভয়ে জার্ম্মাণদের বিরুদ্ধে কড়া নিয়ম জারি করা হইয়াছে।"

একজন সুইস্ ব্যবসায়ী সপরিবারে বার্লিন হইতে দেশে ফিরিতেছেন। ইনি নিজে ফরাসী নারীর সন্তান। ইঁহার পত্নীর জনক জননী জার্ম্মাণ। ব্যবসায়ী মহাশয় অভিনেতাকে বলিলেন :—"সুইটসার্ল্যাণ্ড জার্ম্মাণিকে ভালবাসিবে কি করিয়া? জার্ম্মাণদের ভয়ে-ভয়ে আমাদিগকে জীবন ধারণ করিতে হয় যে। প্যারিসের অবস্থান যদি লিঅঁ শহরের ঠাঁইয়ে থাকিত, তাহা হইলে ১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসে জার্ম্মাণ পল্টন সুইটসার্ল্যাণ্ডের বুকের উপর দিয়া ফ্রান্স আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইত না কি? তাহা হইলে আমাদের কপালে জুটিত ঠিক বেলজিয়ানদের দুর্দ্দশা। এই কারণেই সুইস সমাজে জার্ম্মাণদের আদর নাই।"

(৩)

গাড়ী চলিতেছে পাহাড়ের পায়ে পায়ে,—উপত্যকার উপর দিয়া। দুই ধারে বিশেষ কোনো বস্তি, পল্লী চোখে পড়িল না। জমিন বরফে ঢাকা। চাষবাসের কোনো লক্ষণ নাই। অধিকন্তু শরৎ হেমন্তের শস্য কাটা হইয়া গিয়াছে। কাজেই রেলে বসিয়া এখন আর কোনো মতেই কিষাণ জীবনের চিহ্ন দেখা যাইতে পারে না। পল্লীকুটীরের গড়নে কোনো বিশেষত্ব নাই। গির্জ্জার চূড়াও চোখে পড়িল না।

জুরিখ শহর

[ফটো :—Wehrli, Zurich]

জুরিখে পৌছিতে পৌছিতে এক বড় গোছের নগরজীবনের সমীপবর্ত্তী হইলাম। কিন্তু শহরের ভিতর জনসমাগমের অথবা অন্য কোনো প্রকার বিপুলতার প্রভাব নাই। প্যারিস, বার্লিন, ভিয়েনা ইত্যাদির তুলনায় জুরিখ নেহাৎ ছোট সন্দেহ নাই।

শহরটার ঠিক খাঁটি জার্ম্মাণ উচ্চারণ ভারত সন্তানের পক্ষে রপ্ত করা কঠিন। "জু"র স্থানে "ৎস্যি" এবং" ৎস্যু"

এই দুই আওয়াজের মাঝামাঝি একটা আওয়াজ অভ্যাস করা আবশ্যক। জার্ম্মাণরা ছাড়া আর কোনো জাতি এই উচ্চারণের জন্য মাথা ঘামায় না। ভারতবাসীও শহরটাকে সোজাসোজি জুরিখ বা এমন কি জুরিচ বলিয়া জানিলে মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইবে না।

(৪)

দেশটার নামই বা কি সোজা? এখানে তিন তিনটা ভিন্ন ভিন্ন জাতির "স্বদেশ"। প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অনুসারে বিদেশের শহর, পল্লীপ্রদেশ গুলির নাম গড়িয়া লয়। এই ধরণের নাম গড়িয়া লওয়া স্বাধীনতার এবং স্বতন্ত্র জীবনবত্তার এক মস্ত চিহ্ন। কেবল নাম সৃষ্টি করা মাত্র নয়। বিদেশী নামের উচ্চারণেও স্বরাজ চলিতেছে জগতের সকল স্বাধীন দেশে।

বিলাতী "লণ্ডোন"কে জার্ম্মাণরা জানে "লণ্ডন" বলিয়া। ইতালীয়ানদের ভাষায় বিলাতী শহরটা "লোন্দ্রা"। ফরাসী নাম "লোঁদ"। অতএব কোনো বিদেশী মুলুকের

"ফিয়ার হ্বাও্ স্ট্যেটার" হ্রদ (হ্বিলহেল্মটেলের কাহিনীতে সুপ্রসিদ্ধ)
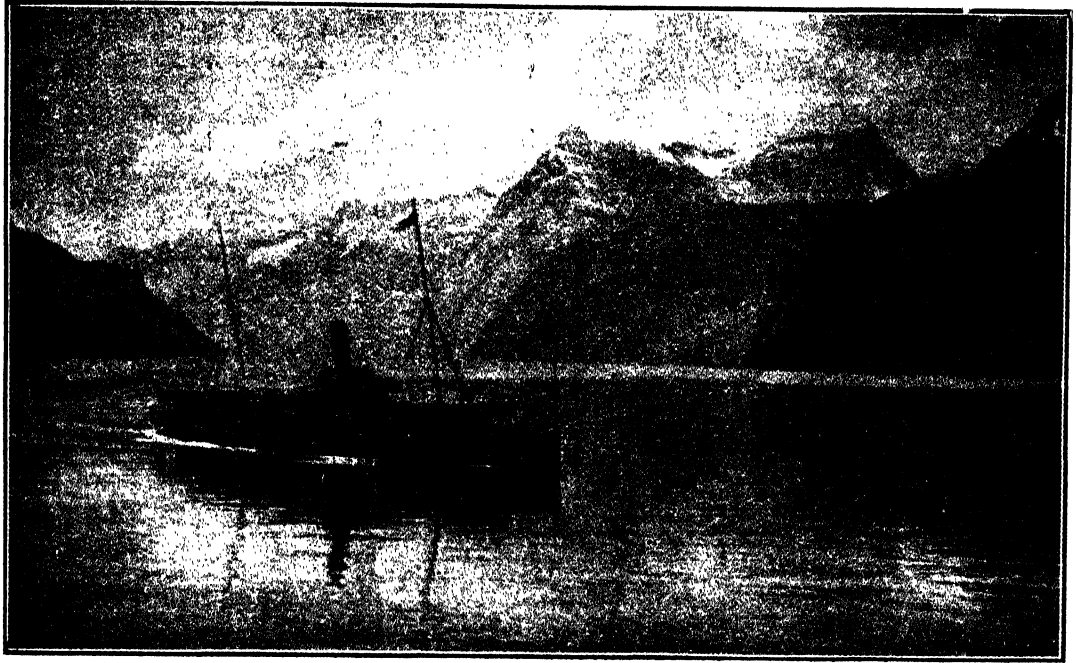
[ফটো :—Wehrli, Zurich]

স্বদেশকে ডাকিয়া থাকে। জার্ম্মাণরা বলে "শোহ্বাইট্স্" ফরাসী নাম "সুইস্," আর ইত্যালীয়ান ভাষায় এই দেশ "স্হ্বিট সেরা"।

ভারতীয় ভাষায় এই দেশের নাম করণ কিরূপ হইবে, কোনো ভারতীয় ভূগোল-লেখক তাহার আলোচনা করেন নাই। আমরা বিলাতী নামটাই ইস্কুলে মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছি। ভারতীয় ভাষা যথার্থরূপে সজীব ভাষা হইলে, এই দেশের নামকরণে আমরা খাঁটি স্বরাজ রক্ষা করিতে পারিতাম।

প্রত্যেক জাতিই নিজ নিজ মাতৃ ভাষার "ধাতু" নাম করিতে হইলে ভারতবাসীকে ঠিক বিদেশী উচ্চারণটা জাহির করিতেই হইবে, এইরূপ ভাবা অসঙ্গত।

(৫)

ভারতে আমরা জানি, "গোআলিনী মার্কা গাঢ় দুগ্ধ" আসে সুইট্সার্ল্যাণ্ড হইতে। হোটেলে সকাল বেলা খাইতে বসিয়া দেখি, টেবিলের উপর প্রকাণ্ড এক ভাঁড় বিশেষ দুধে ভরা। ভাবিলাম, দুধের বাথানে যখন আসিয়াছি, তখন দুধ জলের মতনই বোধ হয় সস্তা। অধিকন্তু বার্লিনে কিম্বা জার্ম্মাণির অন্যান্য শহরে দুধের দেখা পাওয়া এক প্রকার অসাধ্য ছিল। কাজেই সুইস জাতিকে

গোআলা জাতিরূপে বিবৃত করিতে সহজেই প্রলুব্ধ হইতেছি। এমন সময়ে একজন জার্ম্মাণ ভদ্রলোক বলিলেন :—"দুধ, মাখন, পনির ইত্যাদির দাম সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে খুব বেশী। দেশদেশান্তরে এত রপ্তানি হয় যে, সুইসরা অনেক সময় দুধের চেহারা দেখিতে পায় কি না সন্দেহ। অধিকন্তু, দুধের চাষ হয় সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের পশ্চিম জনপদে। জুরিখ ইত্যাদি অঞ্চলে গোআলার ব্যবসা বড় ব্যবসা নয়।"

নেস্‌লে কোম্পানীর "কন্‌ডেন্‌স্‌ড্‌" দুধ ভারতে সুপ্রসিদ্ধ! নেস্‌লে একজন ফরাসী জাতীয় সুইস। পশ্চিম সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের এক পল্লীতে বা ছোট শহরে নেস্‌লের কারখানা অবস্থিত।

কায়রোর হোটেলে এবং মিশরের অন্যান্য হোটেলে বসবাস করিবার সময় সুইস জাতিকে বাবরচি রূপে প্রথম চিনি। তখন ধারণা জন্মিয়াছিল যে, সুইসরা রাঁধে ভাল। জুরিখে আসিয়া বুঝিতেছি, সুইসদের এই যশটা একমাত্র বিদেশেই আবদ্ধ থাকিবার জিনিস নয়।

(৬)

এক জার্ম্মাণ পরিবার আট দশ বৎসর জুরিখে আছেন। ইঁহারা বলিতেছেন :—"জুরিখে জার্ম্মাণ ভাষী সুইসদের জীবন-কেন্দ্র বটে। কিন্তু খাঁটি জার্ম্মাণ সমাজকে এই সকল সুইসরাও ভাল চোখে দেখে না। আমরা এ দেশে নেহাৎ বিদেশী রূপে চলাফেরা করি। সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড-প্রবাসী জার্ম্মাণ নরনারীরা নিজেদের ভিতর লেনদেন আলাপ আপ্যায়ন আবদ্ধ রাখিতে বাধ্য। আমাদের সঙ্গে সুইস-জার্ম্মাণদের সামাজিক আসা-যাওয়া এক প্রকার নাই বলিলেই চলে।

এঙ্গেলবার্গ শহর (সুইটসার্ল্যাণ্ডে প্রসিদ্ধ)
[ফটো :—Wehrli, Zurich]

জুরিখে এক মাঝারি গোছের দোকানে স্যাক্‌সনির এক জার্ম্মাণ যুবা উচ্চতর পদে চাকরী করিতেছেন। ইঁহাকে দোকানের অন্যান্য কর্ম্মচারীরা—বলা বাহুল্য, ইহারা সকলেই সুইস—চক্ষুঃশূল বিবেচনা করিয়া থাকে। কথা-বার্ত্তায় বুঝা গেল যে, জার্ম্মাণির লোকেরা উত্তর সুইট্‌-সার্ল্যাণ্ডের নানা সুইস কারবারে মোটা মাহিয়ানা ভোগ

করিয়া আসিতেছে। সুইসরা জার্ম্মাণদের হুকুম তামিল করিয়া চলে। ইহাও এক প্রকার "নিজ বাসভূমে পরবাসী হ'লে," এবং অনেকটা "পরদীপশিখা নগরে নগরে, তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।"

জার্ম্মাণির জার্ম্মাণদের বিরুদ্ধে সুইস-জার্ম্মাণদের "স্বদেশী" আন্দোলন বুঝিয়া উঠা যে-কোনো রক্তমাংসের মানুষের পক্ষেই অতি সোজা কথা।

(৭)

সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের নরনারী ফরাসী গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। কয়েক মাস ধরিয়া পঁয়কারের সঙ্গে সুইস দরবারের চিঠি-পত্র চলিতেছিল। একটা সমঝোতা কায়েম হইবার আশা করা হইতেছিল। কিন্তু ফ্রান্স কড়া মেজাজের নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। কাজেই ঝগড়া পাকিয়া উঠিতে চলিল।

ঝগড়াটা চলিতেছিল জেনেহ্বা শহরের পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমানার নিকটবর্ত্তী ফরাসী জনপদের বাণিজ্য-পথ লইয়া। জনপদটা দুই জেলায় বিভক্ত:—তৎ সাহ্বোআ এবং গেক্‌স্‌। জেলা দুইটা ফ্রান্সের অন্তর্গত। জেনেহ্বা অবশ্য সুইস রিপাব্লিকের অন্তর্গত নগর। এখানে ফরাসী ভাষার রেওয়াজ। জুরিখ যেমন সুইস সমাজে জার্ম্মাণ "কুল্‌টুরের" কেন্দ্র, জেনেহ্বা সেইরূপ সুইটসার্ল্যাণ্ডের ফরাসী সভ্যতার পীঠস্থান। জেনেহ্বার জার্ম্মাণ নাম গেনফ্‌। ফরাসীরা ইহাকে বলে জেনেহ্ব।

১৮১৫-১৬ খৃষ্টাব্দে সুইস এবং ফরাসী রাষ্ট্রে একটা সন্ধি পত্র সহি করা হয়। শর্ত্ত ছিল এই যে, জেনেহ্বার সুইস-ফরাসীরা ফ্রান্সের জেলা দুইটায় বিনা শুল্কে কেনা-

লুৎসার্ণ শহর

[ফটো:—Wehrli, Zurich]

বেচা করিতে পারিবে। দুই দেশের ভিতর যে রাষ্ট্রীয় সীমানা আছে, ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে সেই সীমানা স্বীকার করা হইবে না।

এই অবাধ বাণিজ্যের সুযোগে সুইস নগরটা সমৃদ্ধি-শালী হইতে পারিয়াছে। তৎ সাহ্বোআ এবং গেক্‌স্‌ জেলা দুইটার ফরাসী প্রজারাও শস্তায় সুইস মাল খরিদ করিতে পারিয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার তরফ হইতে ফরাসী জাতিকে অনেকটা খর্ব্বতা স্বীকার করিয়া চলিতে

হইয়াছে। ফ্রান্স একশ' বৎসর ধরিয়া নিজ স্বাধীনতার আংশিক লোপ সহ্য করিয়াছে। পঁয়কারে এই অবস্থা আর বেশী দিন টিকিতে দিতে রাজি নন। বাণিজ্যের সীমানাকে রাষ্ট্রীয় সীমানায় না ঠেকাইয়া ইনি শান্ত হইবেন না।

সুইট্সার্ল্যাণ্ড ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। ক্ষমতা অতি অল্প। ১৮১৫-১৬ সালের সন্ধিপত্র ছাড়া সুইস্ জাতির স্বপক্ষে কোনো যুক্তিও বাস্তবিক পক্ষে ঢুঁড়িয়া পাওয়া যাইবে না। কিন্তু জেনেহ্বার আর্থিক অবস্থায় বিশেষ দুর্গতি জেনেহ্বার দুয়ারে বসানো হইয়াছে। জেনেহ্বা হইতে তৎ সাহ্বোআ জেলায় সওদা কেনা বেচা করিবার উপর মাশুল চড়ানো হইয়াছে। এমন কি সাইকেল, অটো-মোবিল ইত্যাদি যান ব্যবহারের জন্যও "পাশ" অর্থাৎ ট্যাক্স আবশ্যক। সুইস জাতি ফ্রান্সের জুলুম কতখানি সহ্য করিবে, সর্ব্বত্র তাহার আলোচনা চলিতেছে।

(৮)

জেনেহ্বা ফরাসী-সুইট্সার্ল্যাণ্ডের এক জগৎ-প্রসিদ্ধ নগর। দুনিয়ার ইতিহাসে এই নগরে অনেক স্মরণীয়
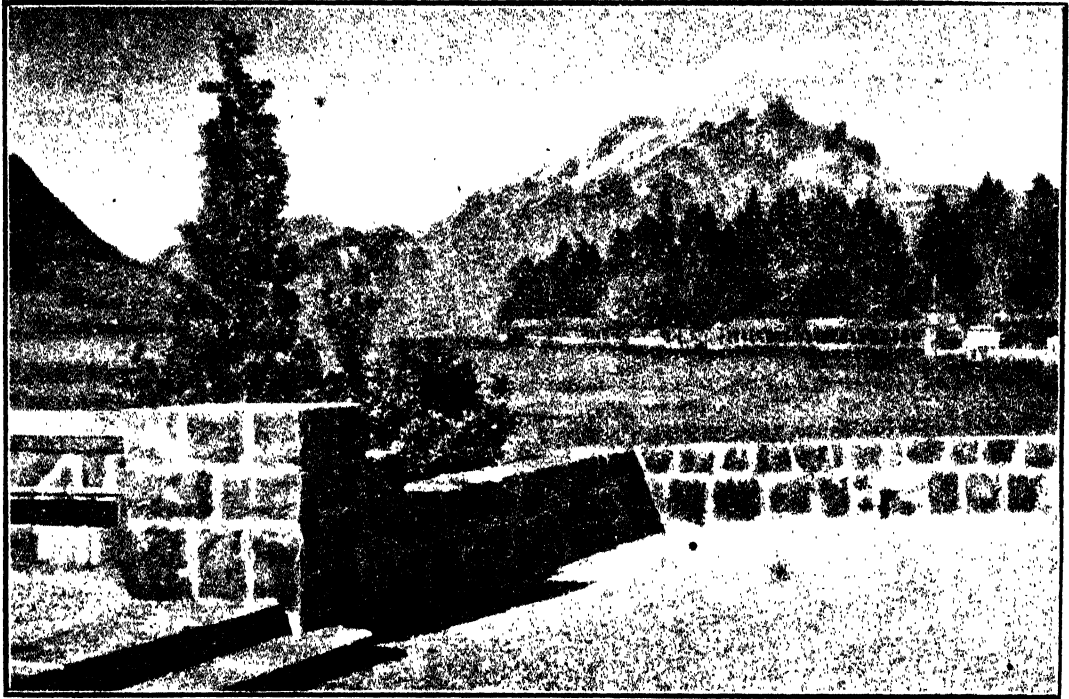
পিলাটুস্ (সুইস্ আল্পসের প্রসিদ্ধ গিরিশৃঙ্গ। লেুৎসের্ন্ শহর হইতে ছবি তোলা হইয়াছে)

[ফটো :—Gaberell, Zurich]

ঘটিবার সম্ভাবনা। কাজেই সুইট্সার্ল্যাণ্ডের পল্লীতে পল্লীতে যতগুলা পঞ্চায়ৎ আছে, সর্ব্বত্র মজলিস্ বসিয়াছিল। সকলে মিলিয়া একস্বরে বার্ণ্ শহরের যুক্তরাষ্ট্রের দরবারকে জানাইয়াছিল যে, পঁয়কারের প্রস্তাব কোনো মতেই গ্রাহ্য করা হইবে না। ফেডার্যাল দরবার ফরাসী গবর্মেণ্টকে সুইস নর-নারীর মত জানাইয়া দিয়াছেন।

কিন্তু পঁয়কারে কথা কাটাকাটিতে সময় নষ্ট করিবার পাত্র নন। ১০ নবেম্বর তারিখে ফরাসী শুল্ক-আফিস ঘটনা ঘটিয়াছে। স্বাধীনতার আশ্রয় স্থান রূপে বহু নির্য্যাতিত নর-নারী এই নগরে আড্ডা গাড়িয়াছেন। কাজেই জেনেহ্বা ভারতেও অপরিচিত নয়।

সম্প্রতি সুইট্সার্ল্যাণ্ডের আর এক ফরাসী কেন্দ্র ভারতে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তাহার নাম লোজান (জার্ম্মাণ উচ্চারণ লাওজান)। এই শহরেই আঙ্গোরার যুবকতুর্ক তাহার বিজয়লাভের সার্টিফিকেট লাভ করিয়াছে।

আজকাল লোজানে এক মস্ত বড় মোকদ্দমা চলিতে-

ছিল। সোভিয়েট রুশিয়া শ্রীযুক্ত ভোরোবস্কিকে সুইট্সার্ল্যাণ্ডের জন্য প্রতিনিধি স্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন। কন্রাড়ি নামক একজন সুইস তাহাকে হত্যা করে। বিচারে প্রকাশ যে, সোভিয়েট গবর্মেণ্ট বহু ধনী সুইসের সম্পত্তি বাজেআপ্ত করিয়াছে। অনেক নির্দ্দোষ সুইস নরনারী মস্কো শহরে বোলশেভিকদের হাতে অমানুষিক অত্যাচার সহিতে বাধ্য হইয়াছে। কন্রাড়ি নিজে একজন ধনী লোক। রুশিয়ায় ইঁহার বড় ব্যবসা ছিল। ইনিও সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। এই সকল জুলুম ও অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য কন্রাড়ি রুশ প্রতিনিধিকে খুন করিয়াছে। আদালতের রায়ে কন্রাড়ি খালাশ হইল।

সুইসরা খুসী। সকলে বলাবলি করিতেছে—"এইবার রুশিয়া সুইট্সার্ল্যাণ্ডকে যমের মতন শত্রু বিবেচনা করিবে।" কিন্তু কোনো কোনো সুইসের মুখে শুনিতেছি:—"রুশ গবর্মেণ্ট সরকারী হিসাবে সকল রাষ্ট্রের উপরই জুলুম চালাইয়াছে। কিন্তু তাহার জন্য কোনো রুশ ব্যক্তিকে দোষী বিবেচনা করা যায় কি? ভোরোবস্কিকে কন্রাড়ি খুন করিয়াছে, ইহা একটা ব্যক্তিগত খুনাখুনির মামলা। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রনীতির আড়াআড়ি ঢুকানো বে-আইনি। সুইস আদালতের বিচারকে ন্যায়সঙ্গত বলা চলে না। কন্রাড়িকে দোষী সাব্যস্ত করাই উচিত ছিল।" বাজেল শহরের "নাট্সিওনাল ৎসাইটুঙ্" এই অবিচারের জন্য সুইস জুরির এবং সুইস আদালতের যারপর নাই নিন্দা করিতেছে। কাগজটা সুইট্সার্ল্যাণ্ডের এক উদারপন্থী দৈনিক।

বস্তুতঃ জুরির ভিতর মাত্র চারজনের মত ছিল কন্রাড়ির স্বপক্ষে। পাঁচজন মত দিয়াছিল বিরুদ্ধে। অন্ততঃ ছয়জন তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে তাহার সাজা হইত। জুরির দুই-তৃতীয়াংশ একমত না হইলে সুইট্সার্ল্যাণ্ডের কোনো কোনো অঞ্চলে আসামীর সাজা হয় না।

(৯)

জুরেখের "ক্যাণ্টন" সভায় ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে বাদানুবাদ চলিতেছে। ক্যাণ্টন শব্দে জেলা বুঝিতে হইবে।

সুইসরা প্রধানতঃ ৎসুইংলি-পন্থী ধর্ম্ম-সংস্কারের মত মানিয়া চলে। জার্ম্মাণিতে লুথারের যে ঠাঁই, ফ্রান্সে ক্যালভিনের যে ঠাঁই, সুইস সমাজে ৎসুইংলির সেই ঠাঁই। এই তিন ধর্ম্ম প্রচারকই কাথলিক মতের বিরুদ্ধে দল গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। সুইস নরনারীর ভিতর—অন্ততঃ জার্ম্মাণ-সুইস সমাজে ৎসুইংলির প্রভাব প্রবল। ক্যাথলিক মতের লোক, গির্জ্জা এবং পুরোহিতের সংখ্যাও মন্দ নয়।

ক্যাণ্টন-সভায় একজন ক্যাথলিক পুরোহিত বলিয়াছেন:—সরকারী অবৈতনিক পাঠশালায় প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীর পক্ষে ধর্ম্মশিক্ষা অবশ্য-গ্রহণীয় রূপে নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। তবে ক্যাথলিক পরিবারের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। তাহা না হইলে ৎসুইংলি-পন্থীদের আওতায় ক্যাথলিক নর-নারীর ধর্ম্ম-বিশ্বাস বাধা প্রাপ্ত হইবে।"

এই বিষয়ে "ক্রশচিয়ান-সোস্যালিষ্ট"দের সঙ্গে ক্যাথলিকরা একমত। কিন্তু "এভাঙ্গেলিষ্ট" নামক ধর্ম্ম-সংস্কারকেরা একদম উল্টা কথা বলেন। ইঁহাদের এক পুরোহিত সভায় বলিয়াছেন:—"পাঠশালায় ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা না করাই যুক্তিসঙ্গত। কেন না, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত ভিন্ন ভিন্ন। এই সকলগুলার প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া কোনো ধর্ম্মশিক্ষক মত প্রচার করিতে পারিবেন বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। সম্প্রদায়গুলার বহির্ভূত একটা তথাকথিত খৃষ্টধর্ম্ম আবিষ্কার করা অসম্ভব।" একজন "ডেমোক্র্যাটিক" প্রতিনিধি এবং একজন কিষাণ প্রতিনিধি এভাঙ্গেলিষ্ট পাদ্রীর মতে সায় দিয়াছেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন,—"ধর্ম্মশিক্ষার বদলে নীতি শিক্ষা কায়েম করা হউক।" এই সম্বন্ধে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর বলেন:—"ধর্ম্মের সঙ্গে সম্বন্ধ না রাখিয়া নীতি শিক্ষার ব্যবস্থা করা অসাধ্য।"

জুরিখের জেলা-সভায়ও কমিউনিষ্ট মতের প্রতিনিধি আছে। ইঁহারা বলেন:—"জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম্ম-বিভাগটা এখনই উঠাইয়া দেওয়া হউক। এই বিভাগে ছাত্র-সংখ্যা যারপরনাই কম। অনর্থক খরচ। অধিকন্তু এই বিভাগের সাহায্যে মজুর ও কিষাণদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান কোনো মতেই সহজ-সাধ্য হয় না।"

(১০)

বার্ণ শহর সুইট্সার্ল্যাণ্ডের প্রায় মধ্যস্থলে কিছু পশ্চিম-ঘেঁসা। এইখানে ফেডার‍্যাল দরবারের সরকারী কেন্দ্র। আমেরিকার ওয়াশিংটনের মতন সুইস রাষ্ট্র-

কেন্দ্রের নামও জগতে বেশী সুপরিচিত নয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের মত এখানকার জুরিখই প্রায় সকল কর্ম্মক্ষেত্রে রাজধানী বিশেষ।

"বুন্ড্‌" নামক একটা দৈনিক প্রকাশিত হয় বার্ণ শহরে। এইটাকে সরকারী ইস্তাহারের গেজেট বলা চলে। বেশী লোকে পড়ে না।

সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের বড় বড় কাগজ বলিলে জুরিখের "নয়ে ৎসিয়ুর্খার ৎসাইটুঙ" অথবা জেনেহ্বার "জুর্ণাল দ' জেনেহ্ব" ইত্যাদি দৈনিক বুঝিতে হইবে। বলা বাহুল্য, "ৎসাইটুঙ"টা ছাপা হয় জার্ম্মাণ ভাষায়। দিনে এইটার তিন সংস্করণ বাহির হয়। "জুর্ণাল" ফরাসী ভাষার কাগজ। দুইবার করিয়া ছাপা হয়। দৈনিক দুইটাই শিল্প ও ব্যবসায়ওয়ালাদের মুখপত্র। বার্লিনের "টাগেব্লাট" ও "ডয়েচে আল্‌গে মাইনে ৎসাইটুঙ" অথবা ফ্রাঙ্কফুর্টের "ফ্রাঙ্কফুর্টার ৎসাইটুঙ" ইত্যাদি কাগজের মতন ইহাদের প্রভাব। রাষ্ট্র-নীতি সম্বন্ধে অবশ্য কিছু কিছু প্রভেদ আছে। ফ্রান্সে এবং জার্ম্মাণিতে যে প্রভেদ, সুইস সমাজের জেনেহ্বায় এবং জুরিখেও প্রায় সেইরূপ প্রভেদ ধরিয়া লওয়া চলিতে পারে।

(১১)

জুরিখে পৌঁছিয়া ভাবিলাম, শহরের অলিতে গলিতে গণ্ডা গণ্ডা ঘড়ির কারখানা অথবা ঘড়ির দোকান দেখিব। কেন না, ছেলেবেলা হইতেই সুইস ঘড়ির নাম ভারতের সকলেই জানে! "নেস্‌লের" দুধের মতন "কুরহ্বোআজে" কোম্পানীর ঘড়িও আমাদের দেশে সুইস জাতির প্রতিনিধি-বিশেষ।

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, ঘড়ির দোকান জুরিখে চোখেই পড়িতেছে না বলা চলে। কথাবার্ত্তায় বুঝা গেল, ঘড়ি তৈয়ারি হয় সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের ফরাসী অঞ্চলে,—অর্থাৎ পশ্চিম জেলাগুলায়। ফরাসী-সুইসরাই সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের গোআলা এবং ঘড়ির কারিগর। জুরিখে এঞ্জিনিয়ারিং ঘটিত যন্ত্রপাতি, তড়িতের কারখানার আসবাব ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে একটা মাত্র টেক্‌নিক্যাল কলেজ,—সেইটা জুরিখেই অবস্থিত।

নয়শাতল জেলাটার প্রত্যেক পল্লীই ঘড়ির কারখানায় এবং ঘড়ির দোকানে ভরা। এই জেলার অন্তর্গত লাশো-দর্ফো গ্রামকে ঘড়ি-শিল্পের উৎপত্তি স্থান এবং বর্ত্তমান কেন্দ্ররূপে বর্ণনা করা হয়। এই গ্রামের প্রত্যেক পরিবারই ঘড়ির কাজে নিযুক্ত।

সুইটসার্ল্যাণ্ড হইতে প্রতি বৎসর বিস্তর ঘড়ি দেশ বিদেশে রপ্তানি হয়। এই বৎসরের প্রথম ছয় মাসে ৫, ৫১৩, ২৫৫টা ঘড়ি বিদেশে গিয়াছে। এই গুলার সমবেত দাম ৭৮,০২০,০০০ সুইস ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ প্রায় সাড়ে চার কোটি ভারতীয় টাকা।

নয়শাতল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক বলিতেছেন:—"এমন কি দশ পনর বৎসর পূর্ব্বেও সুইসরা নিজ নিজ ঘরে বসিয়া সপরিবারে ঘড়ি নির্ম্মাণ করিত। ক্রমশঃ মার্কিণ ব্যবসায়ীদের প্রভাবে বড় বড় কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। আগেকার স্বাধীন শিল্পীরা আজকাল ফ্যাক্টরিতে মজুর মাত্র রূপে কাজ করিতেছে। সুইসরা এই শিল্প-বিপ্লব পছন্দ করে না।" অবশ্য "কুটীর-শিল্প" একদম উঠিয়া যায় নাই।

(১২)

সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড বর্ত্তমান জগতের সর্ব্ব পুরাতন "স্বরাজ"। জনসাধারণের ক্ষমতা, গণতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসন, প্রজাশক্তি ইত্যাদি বস্তু সুইস সমাজে ছয় শত বৎসর ধরিয়া ধারা-বাহিক ভাবে চলিয়া আসিতেছে। রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে এতদূর স্বাধীনতা এবং আত্ম-কর্ত্তৃত্ব থাকা সত্ত্বেও সুইট্‌-সার্ল্যাণ্ডে নারী স্বাধীনতার আন্দোলন বিশেষ প্রবল নয়। মার্কিণ মহিলা-পরিষদের এক প্রতিনিধি সুইস সমাজের এই অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত।

সুইস মহিলা-পরিষদের এক ধুরন্ধর শ্রীমতী এমিলিন গুর মার্কিন মহিলাকে বলিয়াছেন:—"আমেরিকা এবং ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে অতি সামান্য ক্ষমতার জন্যও নারী জাতিকে পুরুষের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইয়া একটু একটু করিয়া অধিকার লাভ করিতে হইয়াছে। কিন্তু সুইটসার্ল্যাণ্ডের আটপৌরে আইনগুলায় নারী জাতির জন্য সেই সব ক্ষমতা দেওয়া আছে। কাজেই রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের হুজুগে মাতিবার দিকে সুইস মেয়েরা বিশেষ ব্যস্ত হয় না।"

ধন-সম্পত্তির ভোগ, দান, বাটোআরা ইত্যাদি সম্বন্ধে এদেশে মেয়ে পুরুষদের সমান ক্ষমতা। স্ত্রী-বর্জ্জন বিষয়ে পুরুষের পক্ষে যে নিয়ম, স্বামী-বর্জ্জন বিষয়ে স্ত্রীর পক্ষেও সেই নিয়ম খাটে। সন্তানের উপর পিতার যতটা অধিকার, আইনতঃ মাতার অধিকারও ততটা! এই সকল ক্ষমতা বা অধিকার সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে মামুলি কথা। বলা বাহুল্য, অন্যান্য "সভ্য" দেশে বহু কষ্ট-কল্পনার ফলে এই সব এক্তিয়ার আটপৌরে আইনে ঠাঁই পাইয়াছে।

কিন্তু সুইস মেয়েরাও "অগ্রসর" হইতেছে। পল্লী-পঞ্চায়তে, শহর-"রাটে", কান্টন সভায় এবং "বুন্ড্"-সভায় সভ্য হইবার ক্ষমতা লাভ করিবার জন্য সুইটসার্ল্যাণ্ডের নানা স্থানে সমিতি কায়েম হইয়াছে। এই ধরণের বাইশটা সমিতির মাথায় শ্রীমতী গুর প্রতিষ্ঠিত। ইঁহার বড় আফিস জেনেহ্বা শহরে।

বাজেল শহরের একজন পোষ্টমাষ্টার এবং তাঁহার পত্নী বলিলেন:—"সুইস পরিবারের পুরুষেরা করে বাহিরের কাজ, মেয়েরা করে ঘরের কাজ। ইহাই আমাদের সনাতন রীতি। এই রীতি ভাঙিয়া মেয়েদের বাহিরের কাজে টানিয়া আনা সুইস মেজাজে সহিবে না।"

(১৩)

একজন জীবন-বীমা কোম্পানীর বড় কর্ম্মচারীর সঙ্গে আলাপ হইল। ইঁহার নিকট শুনিলাম সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে, আজকাল ৬৫ বৎসরের উপর বুড়া ৫০,০০০ নর নারীর আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। গবর্মেণ্ট খোঁজ করিয়া বুঝিয়াছেন যে, অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিবার কোনো উপায় ইহাদের নাই। কাহারো কাহারো হয়ত বা আয়ের পথ কিছু কিছু আছে। কিন্তু তাহাদের আয়ও বৎসরে ৮০০ ফ্রাঙ্কের অর্থাৎ ৪৮০ টাকার কম।

সুইস গবর্মেণ্ট দুস্থ বুড়াদের জীবন ধারণের জন্য সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেছেন। একজন লোকও যাহাতে খাওয়া পরার অভাবে কষ্ট না পায়, সেইদিকে গবর্মেণ্টের দৃষ্টি রহিয়াছে। জার্ম্মাণিতে, ফ্রান্সে, ইংল্যাণ্ডেও এই নীতি চলিতেছে। ভারতবাসী এই নীতির মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছেন কি?

আর এক কথা, ৪৮০র কম যাহার বার্ষিক আয় তাহাকেও সুইস গবর্মেণ্ট সাহায্য করিতে সচেষ্ট। অর্থাৎ মাসিক ৪০৲র আয়কে সুইস সমাজে দরিদ্রতম বিবেচনা করা হয়। এই তথ্য হইতেই সুইস নরনারীর আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং সুখ-স্বচ্ছন্দতার মাত্রা ও পরিমাণ আন্দাজ করা যায়।

এই উপলক্ষে সুইস গবর্মেণ্ট জার্ম্মাণ আদর্শের "সরকারী" বীমার নিয়ম কায়েম করিতে যত্ন লইতেছেন। বুড়াদিগকে টাকা সাহায্য করাটা ভিক্ষা দেওয়ার সামিল। ভিক্ষা দেওয়া আর ভিক্ষা লওয়া দুইই মানুষের পক্ষে নিন্দাজনক। ইহাতে চরিত্রের অবনতি ঘটে। কাজেই যাহাতে কোনো লোককে কোনো বয়সে ভিক্ষা করিয়া খাইতে না হয় তাহার ব্যবস্থা করা যুক্তিসঙ্গত। এইজন্যই সকল দেশে—অন্ততঃপক্ষে উন্নত দেশে, বিশেষ ভাবে জার্ম্মাণিতে,—"বার্দ্ধক্য বীমার" প্রথা জারি হইয়াছে!

প্রত্যেক লোক সাপ্তাহিক বা মাসিক রোজগারের কিছু কিছু অংশ বীমা-অফিসে জমা রাখিতে বাধ্য হয়। মনিবও মজুর বা কর্ম্মচারীর নামে বীমা-আফিসে কিছু কিছু চাঁদা দেয়। অধিকন্তু গবর্মেণ্ট এই বীমা ভাণ্ডারে প্রত্যেকের নামে একটা সাহায্য জমা করে। এই "সরকারী" বীমা প্রথার ব্যবস্থাগুলা যুবক ভারতের পক্ষে তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিবার ও আলোচনা করিবার সময় আসিয়াছে।

অমলা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(৬)

পরদিন প্রাতে প্রমথ তাহার এক বিশেষ অনুগত বন্ধুর গৃহে উপস্থিত হইল। বন্ধুর নাম মাণিকলাল মুখোপাধ্যায়।

মাণিক গৃহেই ছিল, বাহিরে আসিয়া প্রমথকে দেখিয়া হাস্যমুখে বলিল, "কি প্রমথ, এত সকালে কি মনে করে ?"

পমথ হাসিয়া বলিল, "তোমাকে মহাজন করতে !"

"মহাজন করতে ? কার মহাজন হে ?"

প্রমথ ইতস্ততঃ দেখিয়া লইয়া মাণিকলালের কর্ণে মৃদুস্বরে কথা বলিল।

"কি রকম ?" বলিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে মাণিক প্রমথর প্রতি চাহিয়া রহিল।

"সব না শুনলে বুঝতে পারবে না। তোমার সঙ্গে বিশেষ একটু পরামর্শ আছে। কোথায় বসবে বল ?"

"এইখানেই বোস না। এখানে এখন কেউ আসবে না।"

অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে সমস্ত পরামর্শ স্থির হইয়া গেল। প্রমথ বলিল, "কি হে, পারবে ত ?"

প্রমথর কথা শুনিয়া মাণিক শুধু ঈষৎ হাস্য করিল, প্রশ্নের উত্তরে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করিল না।

প্রমথ বলিল, "তা হলে আর দেরী করে কাজ নেই, এখনই বেরিয়ে পড়। আমি সন্ধ্যার সময়ে আবার আসব। নাম আর ঠিকানাটা কাগজে লিখে নাও।"

প্রমথ চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরে মাণিক গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইয়া বহুবাজার অঞ্চলে এক গৃহে উপস্থিত হইল।

বহির্বাটীতে একটি বালক পাঠাভ্যাস করিতেছিল। মাণিক তাহাকে বলিল, "এই কি প্রিয়নাথ বাবুর বাড়ী ?"

"হ্যাঁ।"

"তিনি বাড়ী আছেন ?"

"আছেন।"

"একবার ডেকে দাও, আমি দেখা করব। নাম জিজ্ঞাসা করলে বোলো মাণিকলাল মুখোপাধ্যায়।"

ক্ষণকাল পরে প্রিয়নাথ বাবু আসিলেন।

মাণিক নমস্কার করিয়া কহিল, "মাফ করবেন, আপনাকে একটু কষ্ট দিলাম।"

প্রিয়নাথ মাণিকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "কি আপনার প্রয়োজন, বলুন।"

মাণিক বলিল, "বসুন আপনি ; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হবে না। আমি যা নিবেদন করব, তাতে একটু সময় লাগবে।"

প্রিয়নাথ আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "বলুন। তবে একটা কথা আপনাকে গোড়াতেই বলে রাখি, লাইফ-ইনসিওর আমি কিছুতেই করব না, আর কন্যাদায়-গ্রস্তের সঙ্গে আমি কোন সম্পর্ক রাখিনে। অতএব ও দুটো প্রসঙ্গের মধ্যে যদি আপনার কোনটা হয়, তা হলে প্রসঙ্গ না তোলাই ভাল।"

মাণিক অল্প হাসিয়া বলিল, "লাইফ-ইনসিওর আপনার আমি করাব না, সে বিষয়ে অঙ্গীকার করছি ; কিন্তু কন্যাদায়গ্রস্তের সঙ্গে আপনি কোন সম্পর্ক রাখেন না, সে কথাটা ভুল।"

প্রিয়নাথ বাবু বিরস মুখে বলিলেন, "আপনি কি তবে—?"

মাণিক প্রিয়নাথের কথা শেষ না হইতেই বলিয়া উঠিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, কন্যাদায়-গ্রস্ত ; কিন্তু আশ্বস্ত হোন, সে দায় থেকে আপনার দ্বারা উদ্ধার হতে আসি নি। আপনাকেই একটা বিপদ থেকে উদ্ধার করতে এসেছি।"

"কি রকম?" বলিয়া ঔৎসুক্যের সহিত প্রিয়নাথ মাণিকলালের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"শ্যামবাজারের হরমোহন মুখোপাধ্যায়কে আপনি নিশ্চয়ই ভুলে যান নি?"

"না।"

"তিন চার বৎসর আগে তিনি যথন কন্যাদায়গ্রস্ত হয়েছিলেন, তখন বন্ধুত্ব ছাড়া তাঁর সঙ্গে আপনার আর একটা সম্পর্ক হয়েছিল, মহাজন আর খাতকের,—সে কথাও বোধ হয় আপনার মনে আছে?"

"খুব আছে। তার পর?"

"তার পর তিন হাজার আসল টাকা, যা আপনি তাঁকে ধার দিয়েছিলেন, এখন সুদে আসলে চার হাজারের ওপর দাঁড়িয়েছে। টাকাটা আপনার এখন বিশেষ প্রয়োজন; অথচ হাতে হাতে আদায়ের কোন সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছেন না; কাজেই মনে মনে ভাবছেন, আদালতের আশ্রয় নিতে হবে। কিন্তু আদালতের কথা মনে ভেবে গায়ে জ্বর আসছে। প্রথমতঃ উকিলের বাড়ী দৌড়োদৌড়ি, তার পর আদালতে ছুটোছুটি, তার পর জলের টাকা তোলবার জন্যে হালফেল ঘরের একরাশ টাকা জলে ফেলা। তার পর সমন ধরাবার জন্যে পেয়াদার কাছে খোসামুদী, তার পর এত কষ্টে যদি মামলা ডিক্রী হোল ত' সানি বিচার, আপীল। সে সব থেকে রক্ষা পেলেন ত' ডিক্রীজারীর ব্যবস্থা, বাড়ী ক্রোক করান, নিলামী ইস্তাহার বার করা, নিলাম করান। তার পর আপনার হ্যাণ্ডনোটের টাকা, বাড়ীখানি যদি কোথাও বাঁধা থাকে, তা হলে—"

প্রিয়নাথ চিন্তিত মুখে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "আস্থন মশায়, আস্থন; আমি এত কথা না ভেবেই চিন্তিত হয়ে আছি, আমাকে আর বেশী ভয় দেখাবেন না! এখন উপায় কি বলুন দেখি?"

মাণিক গম্ভীর মুখে বলিতে লাগিল, "বাড়ী যদি বাঁধা থাকে ত আপনার টাকা ঘুঘুড়ীর ট্যাঁকে গেল। তার পর আপনি যদি নিতান্ত চক্ষুলজ্জাহীন হন ত' বন্ধুর বিরুদ্ধে দেহ গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা, বন্ধুকে জেলে দেওয়া; তার পর তাকে বসিয়ে ছ' মাস ধরে খাওয়ান (তর্জ্জনী হেলাইয়া) আপনার নিজের খরচে!"

মাণিককে আর অধিক বলিবার অবসর না দিয়া ঈষৎ ক্রুদ্ধভাবে প্রিয়নাথ কহিলেন, "তা'হলে আপনি বলতে চান কি? আমি হ্যাণ্ডনোটখানার টিকিট ছিঁড়ে আপনাকে দিয়ে দোব, আর আপনি গিয়ে সেখানা হরমোহনকে ফেরৎ দেবেন?"

মাণিক মুচকিয়া হাসিয়া জিভ কাটিয়া বলিল, "রামচন্দ্রঃ! তা'হলে আপনার আর উপকার করলাম কি? আপনি কতকটা ঠিক বলেছেন, আমি আপনার হ্যাণ্ডনোটখানা নিয়ে যেতে চাই বটে, কিন্তু সুদে আসলে আপনার সব টাকাটা শোধ করে দিয়ে তবে!"

"কি রকম?" প্রিয়নাথের চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

মাণিক ধীর গম্ভীর সুরে বলিল, "ঠিক যে রকম বলছি। আপনি যদি রাজি থাকেন, আজ বৈকালেই হ্যাণ্ডনোটখানা কিনে নিতে রাজি আছি।"

"কিনে নিতে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"সত্যি কথা?"

"সত্যি কথা।"

"পরিহাস করছেন না?"

"পরিহাস করছি নে। পরিহাস করবার মত আপনার সঙ্গে কোন সম্পর্ক আমার জানা নেই।"

প্রিয়নাথের মুখ দিয়া আর কোন বাক্য বাহির হইল না, শুধু বিস্ময়-বিমূঢ় দুটি চক্ষু মাণিকের মুখে নিক্ষেপ করিয়া নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন।

মাণিক বলিল, "আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন, এত বিপদের ভয় দেখিয়ে এ লোকটি স্বেচ্ছায় সেই বিপদে নিজেকে কেন বিপন্ন করতে চাচ্ছে। কেমন, ঠিক নয়?"

প্রিয়নাথ ইতস্ততঃ করিয়া দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "না, ঠিক তা নয়। তবে হ্যাঁ, আচ্ছা ওই কথাটারই জবাব দিন না।" তাহার পর হঠাৎ পশ্চাৎ দিকে মুখ ফিরাইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "ওরে খোকা! শীগ্গীর একডিবে পাণ নিয়ে আয়!"

মনে মনে হাসিয়া, প্রকাশ্যে ঈষৎ চিন্তার ভাব দেখাইয়া, মাণিক কহিল, "কথাটা আপনাকে বলতে পারি, যদি এই আশ্বাসটুকু পাই যে, কথাটা আর কেউ জানবে না।"

যশোদার বিশ্বরূপ দর্শন

শিল্পী—দর্পনারায়ণম্
অন্ধ্র জাতীয় কলাশালা

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

প্রিয়নাথ ব্যস্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আজ্ঞে না, কিছুতেই নয়, কোন মতেই নয়! তবে যদি আপনার দ্বিধা হয়, কাজ কি, নাই শুনলাম! নিশ্চয়ই একটা সঙ্গত কারণ আছে; আর যদি নাই থাকে, তাতে আমার কি এসে গেল!"

মাণিক বলিল, "বিলক্ষণ! আপনি যখন কথা দিচ্ছেন, তখন আবার দ্বিধা কি? তবে আপনি যখন বলছেন, সঙ্গত কারণ আছেই, আর না থাকলেও আপনার কিছু এসে যায় না, তখন না হয় নাই বললাম। কি বলেন?"

প্রিয়নাথ ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, "বলবেন না, কখন বলবেন না! নিজের গুপ্ত-কথা কখন কাউকে বলতে নেই। কখন কার মুখ দিয়ে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় বার হয়ে যায় বলা যায় না ত!" তাহার পর কণ্ঠস্বর সহসা গম্ভীর করিয়া কহিলেন, "দেখুন মাণিকবাবু, কথাটা যখন তুললেন, তখন দেরী না করে সেরে ফেলাই ভাল। মানুষের মনের কথা ত' বলা যায় না। সাত পাঁচ ভেবে যদি পেছিয়েই পড়ি, সে ভাবনাও আছে ত?"

মাণিক সবিনয়ে কহিল, "আজ্ঞে হাঁ, সে ভাবনা ত' আছেই, তার চেয়ে গুরুতর ভাবনাও আছে।"

চিন্তিত হইয়া প্রিয়নাথ কহিলেন, "কি বলুন দেখি?"

মাণিকলাল তেমনি নিরীহভাবে কহিল, "সাত পাঁচ ভেবে আমরাই যদি পেছিয়ে পড়ি!"

মাণিকলালের কথা শুনিয়া মনে মনে বিশেষরূপ চিন্তিত হইয়া প্রিয়নাথ উক্ত বিষয়ে আর কোন কথা না কহিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওরে ও খোকা, পাণ নিয়ে আয় না রে!"

কয়েক দিনের মধ্যে যথাবিধি নোটিস আদি জারি হইয়া হরমোহনের হ্যাণ্ডনোট মাণিকলালের নামে বিক্রয় হইয়া গেল।

(৭)

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালিবার কোনও উদ্যোগ নাই। ঘনায়মান অন্ধকারে বারাণ্ডায় বসিয়া প্রভাবতী বিমর্ষ মুখে নিজের দুরদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতেছিলেন, এবং ঘরে শয্যার উপর বালিসে মুখ গুঁজিয়া অমলা অসাড় হইয়া পড়িয়া ছিল। আজ গৃহে নূতন মহাজন মাণিকলাল আসিয়া হাঙ্গামা বাধাইয়াছে, পরদিন সুদে আসলে সমস্ত টাকা পরিশোধ না করিলে নালিশ করিবে।

অমলা যে আর্ত্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা কেবল মাত্র নালিশ হইবার ভয়ে বা ভাবনায় নহে। যে তীক্ষ্ণ বেদনায় তাহার চিত্ত নিপীড়িত হইতেছিল, তাহার জন্য মহাজনের পরিবর্ত্তে খাতকই প্রধানতঃ দায়ী ছিল। টাকার জন্য মাণিকলালের নিকট দুঃসহ অপমান-বাণী শুনিয়া ভিতরে আসিয়া হরমোহন অল্প যে দুই একটি কথা বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া অমলার পুনঃ পুনঃ ইহাই মনে হইতেছিল যে, তাহার বিড়ম্বিত জীবন লইয়া সে নিজে যত না কষ্ট পাইয়াছে, তাহার দশগুণ কষ্ট অপরকে দিয়াছে, এবং ভবিষ্যতে সে তাহার দুরদৃষ্ট লইয়া নিজে যত না অসুখী হইবে, তাহাকে লইয়া তাহার দশগুণ অপরে অসুখী হইবে! তাহার মনে হইতেছিল, এমনই অশুভ মুহূর্ত্তে সে এই বহু দিবসের পৈত্রিক গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল যে, গৃহখানি অপরের হস্তে তুলিয়া দিয়া তাহার একমাত্র সহোদরকে গৃহহীন না করিয়া সে নিরস্ত হইবে না!

যাহা হইবার তাহা ত হইয়াই গিয়াছে, তাহার আর কোনও উপায় ছিল না, অমলা ভাবিতেছিল ভবিষ্যতের কথা। এই দুঃখ ও অপমানের হাত হইতে নিজেকে বাঁচাইবার উপায় ত সর্ব্বদাই তাহার হাতে রহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে ত বিপন্ন সংসারের কোনও উপকার হইবে না। তাহারই জন্য যে নিষ্ফল অসার্থক ঋণ কালসর্পের মত তাহার পিতার বর্ত্তমান ও তাহার সহোদরের ভবিষ্যৎকে কঠিন ভাবে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে, তাহার দৃঢ় পাশ হইতে কি প্রকারে মুক্তি লাভ করা যায়, অমলা তাহাই ভাবিতেছিল। সে বিষয়ে কোন প্রকার উপায় করা তাহার পক্ষে অসম্ভব, সে জ্ঞান মনে মনে সম্পূর্ণ থাকিলেও, নিজের জীবনটাকে তাহার আজ এমনই এক অক্ষমনীয় অপরাধের মত মনে হইতেছিল যে, নিজের উপর দিয়া এমন একটা নিদারুণ কল্পনা করিয়াও সে একটু তৃপ্তি পাইতেছিল। বিপদের দিনে মানুষে যেমন শত্রুরও হাত চাপিয়া ধরে, আজ এই মহা অপমানের দিনে তেমনি অমলার মুহূর্ত্তের জন্য বিজয়নাথকে মনে পড়িল। পত্র লিখিয়া তাহাকে তাহার এই বিপদের কথা জানাইলে কি হয়? সে ত

তাহারই স্বামী! কিন্তু স্বামী কথাটা মনের মধ্যে আসিতেই মুহূর্ত্তের মধ্যে অমলার চিত্ত বিরক্তি ও ঘৃণায় একেবারে বিরূপ হইয়া দাঁড়াইল! ছি ছি! তদপেক্ষা এখনি বাহিরে ছুটিয়া গিয়া মহাজনের পা জড়াইয়া ধরাও ভাল! তাহার মনে করুণা হইতে পারে, সে আর কিছুদিন সময় দিতে পারে!

বাহিরে তখন হরমোহনের সহিত মহাজনের সেই কথাই হইতেছিল। মাণিকলাল বলিতেছিল, "এই কথাটা আপনি আমাকে বুঝিয়ে দিন যে, যে মানুষ তিন বছরে সুদে আসলে এক পয়সা শোধ করলে না, তাকে আরও দু বছর সময় দিলে সে কেমন করে সমস্ত টাকা শোধ ক'র্‌বে?"

কথাটা প্রকাশ করিয়া বলিবার ইচ্ছা না থাকিলেও অগত্যা হরমোহন বাধ্য হইয়া বলিলেন, "দু বছর পরে আমি লাইফ্‌ ইন্‌সিওরের টাকা পাব।"

"কত টাকা?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া হরমোহন বলিলেন, "প্রফিট্‌ নিয়ে প্রায় পাঁচ হাজার হবে।"

একটু চিন্তা করিয়া মাণিকলাল বলিল, "ও সব আমি বুঝিনে মশায়, লাইফ্‌ ইন্‌সিওরান্স্‌ বড় গোলমেলে ব্যাপার। কোথায় কি গলদ আছে, ঠিক সময়ে পাবেন কি পাবেন না, তা কিছুমাত্র বলা যায় না। টাকা পাওনা হলে পাবার জন্যে যে লড়ালড়িটা করতে হয়, তা একটা মামলা মকর্দ্দমার সমান। তার পর আপনার পলিসি কোথাও বাঁধা আছে কি না তা জানিনে; না থাকলেও বাঁধা দিতে কতক্ষণ লাগে বলুন? আর কোন বার যদি প্রিমিয়ম্‌ না দিলেন ত সমস্ত পরিষ্কার হয়ে গেল! ও সব সাত শ' হাঙ্গামার মধ্যে আমার যাবার দরকার নেই, আমি সোজাসুজি নালিশ করে ডিক্রি করিয়ে নিই।"

মাণিকলালের কথা শুনিয়া হরমোহন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। বায়োস্কোপের নিঃশব্দ অভিনয়ের মত অদূর-ভবিষ্যতের নির্য্যাতন ও অপমানের দৃশ্যগুলি তাঁহার মানস নেত্রের সম্মুখে মুহূর্ত্তের মধ্যে খেলিয়া গেল। ক্ষণকাল বিমূঢ় ভাবে অবস্থান করিয়া হরমোহন মিনতিপূর্ণ স্বরে কহিলেন, 'দেখুন, অফিসে আমার ক্যাস নিয়ে কাজ, আপনি যদি আমার নামে নালিশ করেন, তাহলে আমার চাকুরী পর্য্যন্ত যেতে পারে! ছা-পোষা গরীবের ঞ্জাত বড় সর্ব্বনাশটা করার চেয়ে আর দু-বছর সময় দেওয়া উচিত নয় কি? প্রিয়নাথ বাবু তিন বছর অপেক্ষা করেছেন, আপনি কি দু-বছরও পারেন না?"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া শ্লেষ-মিশ্রিত কণ্ঠে মাণিক বলিল, "দেখুন হরমোহন বাবু, সব সহ্য হয়, ন্যাকামী সহ্য হয় না। আপনি কি বাস্তবিকই বলতে চান যে, আপনি বুঝতে পারছেন না এ নালিশটা প্রকৃতপক্ষে আমার নাম দিয়ে প্রিয়নাথ বাবুই করছেন? আমি কি উন্মাদ হয়েছি যে আপনাকে জানি নে শুনি নে—কতকগুলা ঘরের টাকা দিয়ে আপনার এই পচা হ্যাণ্ডনোট কিনব? প্রিয়নাথ বাবু আপনার বন্ধু, তাই চক্ষুলজ্জার খাতিরে আমাকে আড়াল করে তিনি এই নালিশ করছেন। নালিশ না হয় তাই যদি আপনার ইচ্ছা, বেশ ত, টাকাটা ফেলে দিন।"

হরমোহন কহিলেন, "টাকা দিতে পারলে সময়ের জন্য আপনাকে এত পীড়াপীড়ি করব কেন? তা হলে কালকের জন্যে অপেক্ষা না করে আজই আপনার টাকা ফেলে দিতাম।"

এ কথার কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই প্রমথ ঘরে প্রবেশ করিল, এবং মাণিকলালের প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দিয়া হরমোহনকে কুশল প্রশ্ন করিল। প্রমথর সম্মুখে মাণিকলালের সহিত দেনা পাওনা সম্বন্ধে কোন কথা যাহাতে না হয় তদুদ্দেশ্যে হরমোহন প্রমথকে কুশল প্রশ্ন করিয়া ভিতরে যাইতে অনুরোধ করিলেন।

প্রমথ কিন্তু 'হ্যাঁ যাই' বলিয়াই টেবিল হইতে সে দিনের খবরের কাগজখানা উঠাইয়া লইল এবং সহসা এমন একটা কৌতুহলোদ্দীপক সংবাদের প্রতি তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল যে, তাহার উৎসুক নেত্র সেই সাংবেদর দেহে সংলগ্ন রাখিয়াই সে ধীরে ধীরে নিকটস্থ একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল।

মাণিক পুনরায় পূর্ব্ব প্রসঙ্গের অবতারণা করিল। কহিল, "আপনি বলছেন আপনার টাকা নেই। এ কথা যে সত্যি নয়, তা আমি সে দিন প্রমাণ করে দোব, যে দিন ডিক্রীজারীতে দেহ গ্রেপ্তারের ওয়ারেণ্ট নিয়ে আপনার কাছে উপস্থিত হব। তখন আপনি বাধ্য হয়ে যে টাকা

বার করে দেবেন সে টাকা আপনি ইচ্ছা করলে আজই দিতে পারেন।"

মাণিকলালের কথার উত্তর দিতে হরমোহন ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন; তিনি ইচ্ছা করিয়াই ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন, যদি সেই ইঙ্গিতে প্রমথ সেখান হইতে উঠিয়া যায়। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, উঠিবার কোন লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া, কাগজের উপর গভীর মনোনিবেশ সহকারে প্রমথ বসিয়াই রহিল, তখন অগত্যা হরমোহন বলিলেন, "আমার কথা বিশ্বাস করা ছাড়া এ বিষয়ে আমি আর কোনও প্রমাণ দিতে পারি নে। ভদ্রলোকের কথায় অবিশ্বাস করতে আপনার ভদ্রতায় যদি একটুও না বাধে তা হলে আমি নিরুপায়!"

হরমোহনের এই সবিদ্রূপ অপমানসূচক বাক্য শুনিয়া মাণিক ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর মৃদু হাস্য করিয়া কহিল, "না, আমার ভদ্রতায় কিছুই বাধে না। কাল আপনার নামে নালিশ করতেও বাধবে না; পরন্তু আপনার অফিস-মাষ্টারের মারফৎ সমন ধরাতেও বাধবে না। তার পর ডিক্রী হলে মায় খরচা হাজার পাঁচেক টাকা আদায় করবার জন্য ডিক্রীদার যত রকম নির্য্যাতন করতে পারে, তার কোনটা করতেও বাধবে না। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনার কথায় অবিশ্বাস করছি বলে আপনি যে আমাকে যথেচ্ছা দুর্বাক্য বলছেন, আপনার লেখা হাণ্ডনোটখানা যদি পকেট থেকে বার করে আপনার সম্মুখে ধরি, তা হলে তার উত্তরে আপনি কি বলবেন? সেখানে শুধু মুখের কথা নয়, আপনি নিজের হাতে লিখে দস্তখত করে দিয়েছেন যে চাইলেই টাকা ফেরত দেবেন। টাকা চেয়ে চেয়ে ত' অভদ্র-লোকের প্রাণান্ত হয়েছে, কিন্তু ভদ্রলোকের ত' তাতে কিছুমাত্র করুণা হোল না! ক্ষমা করবেন হরমোহন বাবু, ভদ্রলোকের কথায় আমার একটুও শ্রদ্ধা নেই, বরং আপনারা যাদের ছোট-লোক বলেন তাদের কথায় আছে।"

মহাজনকে অনুরোধ করিবার কথা চিন্তা-সূত্রে মনে হইতেই অমলা শয্যাত্যাগ করিয়া বৈঠকখানার দ্বার-পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মহাজনকে কোন প্রকার অনুরোধ করিতে নিশ্চয়ই নহে,—তাহার পিতার সহিত মহাজনের অবশেষে কি ব্যবস্থা হয় তাহাই শুনিবার জন্য। মাণিক-লালের কথা শুনিয়া দুঃখে, ভয়ে ও অপমানে অমলা কাঠ হইয়া গেল! কাল হইতে নিগ্রহ ও নিপীড়নের যে অভিনয় আরম্ভ হইবে, তাহার একমাত্র কারণস্বরূপ হইয়া সে কিরূপে নিজের কুণ্ঠিত দেহকে পিতামাতার সম্মুখে বাহির করিবে, তাহা ভাবিয়া তাহার মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করিতে লাগিল। নিজের অবসন্ন দেহকে দ্বারগাত্রে কোন প্রকারে সংলগ্ন রাখিয়া, মাণিকলালের অপমান-বাণীর উত্তরে হরমোহন কি বলেন তাহা শুনিবার জন্য সে উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কথা কহিল এবার প্রমথ। সংবাদপত্রের উপর হইতে দৃষ্টি উঠাইয়া লইয়া সে ধীরে ধীরে মাণিকলালের দিকে ফিরিয়া বসিল। তাহার পর দৃঢ় কিন্তু শান্তকণ্ঠে বলিল, "আমি যদি এ বিষয়ে দু একটা কথা কই, তা হলে আমাকে মাপ করবেন। আপনার খাতক যদি আমার নিকট-আত্মীয় না হতেন, তা হলে আমি কিছুতেই অনধিকার-চর্চ্চা করতাম না।"

অভিনয়ের কৌতুকে সতর্ক মাণিকলালেরও অধর-প্রান্ত মৃদু হাস্য-রেখায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার সেই-টুকু অসাবধানতা হাস্যের দ্বারাই সামলাইয়া লইয়া সে বলিল, "বলুন। খাতকের নিকট থেকে ত অভদ্র আখ্যা পেয়েছি, এখন নিকট-আত্মীয়ের কাছ থেকে বাকীটুকু লাভ করে বাড়ী ফিরি!"

প্রমথ বলিল, "লক্ষ্মীর দরবারে যাঁর নাম মহাজন, তাঁকে অভদ্র বলবে এমন দুঃসাহস কারো নেই; তবে মহাজনেরও ব্যবহারটা এমন হওয়া উচিত, যাতে নিন্দুকেও তাঁকে দুর্জ্জন না বলতে পারে। মহাজনের আচরণ মহৎ না হলে শব্দের অর্থ বদলে যায়।"

মাণিকলাল একটু ভাবিয়া বলিল, "সে ঠিক কথা। কিন্তু খাতক যদি ঘাতক হয়ে উঠেন, তা হলে মহাজনকে বাধ্য হয়ে দুর্জ্জন হতে হয়। কিন্তু এ সব বাজে কথা-কাটাকাটি করে ত' কোন লাভ নেই, কাজের কথা যদি কিছু থাকে ত' বলুন।"

প্রমথ কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া কহিল, "হ্যাঁ, কাজের কথা আছে। আপনার উদ্দেশ্য যদি শুধু টাকা আদায় করাই হয়, আমাদের বিপন্ন করা না হয়, তা হলে আমাদের

আরও কিছুদিন সময় দিতেই হবে, কারণ কাল আমরা টাকা আপনাকে দিতে পারি নে। (হরমোহনকে সম্বোধন করিল) পারি কি মেসো মশায় ?"

হরমোহন বিহ্বলভাবে কহিলেন, "না।"

মাণিকলালকে লক্ষ্য করিয়া প্রমথ বলিল, "তা হলে সময় আপনাকে দিতেই হবে, কারণ, আমাদের পক্ষে যতই ভয়ানক হোক না কেন, নালিশটা আপনার পক্ষেও বিশেষ রুচিকর হবে না।"

মাণিকলাল সহসা মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, "রুচিকর নিশ্চয়ই হবে না। ম্যালেরিয়া রোগীর কাছে কুইনীন্ রুচিকর নয়। তবুও তাকে কুইনীন্ খেতেই হয়। আপনাদের যদি কৌতূহল থাকে ত' চারু চৌধুরী উকিলের বাড়ী গিয়ে দেখতে পারেন যে, এই অরুচিকর ব্যাপারটা এতদূর এগিয়ে গিয়েছে যে, আপনাদের এখান থেকে গিয়ে প্লেণ্টে সই করে হ্যাণ্ডনোটখানা তাঁর জিম্মা করে দিলেই, কাল সাড়ে দশটার পর এটা আদালতের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। চারুবাবুর বাড়ী থেকেই এখানে আসছি, আর এসেই এঁকে বলেছি যে, শুধু হাতে আর একদিনও সময় দোব না। দোব না যে তা নিশ্চয়ই, কারণ এঁর সঙ্গে আমার কোন খাতির বা চক্ষুলজ্জার কারণ নেই। অতএব আপনার যদি আর কিছু বলবার না থাকে ত আমাকে বিদায় দিন, কারণ খুব কাজের লোক না হলেও ঠিক এম্নি করেই আমি সময় নষ্ট করিনে।"

একমুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া প্রমথ বলিল, "সময় আমাদের চাই-ই ; আর আপনি যখন মহাজন তখন যথাশক্তি আপনার আদেশ পালন করতেও আমরা বাধ্য, অতএব—" প্রমথ পকেট হইতে মণিব্যাগ বাহির করিয়া তন্মধ্য হইতে একখানা নোট বাহির করিয়া মাণিকলালের সম্মুখে ধরিল।

প্রসন্ন মূর্ত্তিতে নোটখানা খুলিয়া দেখিয়া মাণিক বলিল, "মোটে একশ' টাকা ?"

প্রমথ বলিল, "হাঁ, মোটে। কিন্তু তবুও ত' শুধু হাতে নয়। আমাদের কর্ত্তব্য আমরা করলাম, এখন আপনি এই একশ' টাকার বদলে আমাদের ক'দিন সময় দিতে পারেন বলুন ?"

"কি জন্য সময় ?"

"আপনার টাকা পরিশোধ করবার একটা ব্যবস্থা করবার জন্য। সে ব্যবস্থা যদি আপনার পছন্দ না হয়, তখন আপনার যা অভিরুচি হয় করবেন।"

মাণিকলাল বলিল, "এ ভাল কথা ; এ কথার অর্থ আমি বুঝি। আপনি আমাকে টাকা দিন, আমিও নিশ্চয়ই আপনাকে টাকা শোধ করবার অবসর দোব। তা নয়, শুধু মুখের কথায় ক'দিন চলে বলুন ? আমি আবার সাত দিন পরে আসব ; আপনারা যা ব্যবস্থা করেন, সে দিন আমাকে জানাবেন।"

প্রমথর অনুরোধে মাণিকলাল দশ দিন সময় দিতে স্বীকৃত হইল, এবং হ্যাণ্ডনোটের পশ্চাতে হরমোহনের দ্বারা একশত টাকার উশুল লিখাইয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

মাণিকলাল প্রস্থান করিলে আর একমুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করিয়া অমলা নিঃশব্দে ত্বরিত বেগে প্রস্থান করিল।

হরমোহন দুই হস্তে প্রমথর দুই হস্ত দৃঢ় বলে চাপিয়া ধরিয়া ভগ্ন কণ্ঠে কহিলেন, "প্রমথ, তোমাকে কি বলে আশীর্ব্বাদ করব বাবা, তা বুঝতে পারছি নে ! তুমি আজ শুধু আমার মান বাঁচালে না,—এই দরিদ্র অক্ষম পরিবারকে মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করলে !"

প্রমথ মৃদু হাস্য করিয়া কুণ্ঠিতভাবে কহিল, "আমাকে এই আশীর্ব্বাদ করুন মেসো মশায়, যে, আমার প্রতি আপনার স্নেহ যেন এত গভীর হয় যে এই রকম সব ছোট-খাট কথায় এমন করে আমাকে লজ্জিত না করেন ! সব টাকা মিটিয়ে দেবার মত টাকা যদি আমার কাছে আজ থাকত, তা হলে ছোট লোকটা যখন আপনাকে কড়া কথা শোনাচ্ছিল তখন কি তার মন ভিজিয়ে কথা কইতাম ? তা হলে হাতে টাকা আর গলায় হাত দিয়ে বার করে দিতাম। কি করব, দায়ে পড়লে শত্রুকেও সেলাম করতে হয়।"

হরমোহন একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "কিন্তু বাবা, একটা কথা তখন থেকে আমি ভাবচি,—টাকাটা চট্ করে তুমি দিয়ে দিলে, তোমার হয়ত দরকারের টাকা—"

প্রমথ তাড়াতাড়ি বলিল, "আমার দরকারের টাকা নিশ্চয়ই, কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশী দরকারে খরচ করেছি। সে জন্যে আমার মনে একটুও দুঃখ নেই।"

হরমোহন কুণ্ঠিত স্বরে কহিলেন, "কিন্তু টাকাটা তোমাকে দিতে যদি একটু দেরী হয়ে যায়—"

প্রমথ মৃদু হাসিয়া বলিল, "টাকাটা যদি আমাকেই শীঘ্র দিতে পারেন, তা হলে ত আপনার মহাজনকেই সেই টাকাটা দিতে পারতেন।" আমি বলি মেসো মশায়, এ সব বাজে কথার কোন দরকার নেই। টাকাটা আমি আপনার অনুরোধে পড়ে দিই নি যে সঙ্গে সঙ্গে সেটা ফেরত নেবার একটা ব্যবস্থা করে নোব। আপনি আমার আপনার লোক; আপনার বিপদ ও অপমান দেখে আমি নিজেকে বিপন্ন ও অপমানিত মনে করে দিয়েছি, এবং ভবিষ্যতে যদি এমন আবার দিতে হয় তাও দিতে পারি। এর মধ্যে যদি আপনি ভদ্রতার কথাবার্ত্তা নিয়ে আসেন, তা হলে আমার এই মনে হবে যে, যে অধিকারের জোরে আমি টাকা দিয়েছি, সে অধিকার আমার বাস্তবিক নেই।"

হরমোহন তাড়াতাড়ি দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "না, না, প্রমথ, সে কথা বোলো না, সে অধিকার তোমার সুরেশের চেয়ে এক বিন্দু কম নেই।"

সুরেশ হরমোহনের সপ্তম বর্ষীয় একমাত্র পুত্র।

হরমোহনকে আর কিছু বলিবার অবসর না দিয়া প্রমথ বলিল, "তাই যদি, তবে এ বিষয়ে আপনার কোন ভাবনার দরকার নেই। এখন একমাত্র কথা হচ্ছে, দশ দিন পরে কি ব্যবস্থা করা যাবে।"

চিন্তিত মুখে হরমোহন কহিলেন, "প্রাণপণ চেষ্টা করে দেখি, যদি এই দশদিনের মধ্যে কোথাও থেকে টাকাটা কর্জ্জ নিতে পারি। কিন্তু তার আশা বড়ই অল্প। শুধু হাতে টাকা ধার পাওয়া আজকাল এক রকম অসম্ভব। সম্পত্তির মধ্যে ত' এই বাড়ীখানা, তা-ও চাকরীর সিকিউরিটিতে বাঁধা রয়েছে।"

একটু ভাবিয়া প্রমথ বলিল, "সে ভেবে চিন্তে যা হয় একটা উপায় করা যাবে। আজ অনেক ভাবা গেছে, আজ আর থাক্।" বলিয়া প্রমথ উঠিয়া পড়িয়া বিদায় প্রার্থনা করিল।

হরমোহন ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "না, সে কিছুতেই হতে পারে না। ভিতরে গিয়ে দেখাশুনা করে না গেলে, তোমার মাসীমা অতিশয় দুঃখিত হবেন। আর আমার ওপর রাগ করবেন।"

প্রমথ বলিল, "আজ রাত হয়ে গেছে, ভিতরে গেলেই দেরী হয়ে যাবে। আজ থাক্, পরশু না হয় আবার আসব।"

হরমোহন সে কথা শুনিলেন না। প্রমথকে সঙ্গে লইয়া ভিতরে আসিলেন। প্রভাবতী তখন রন্ধনালয়ে রন্ধনের ব্যবস্থা করিতেছিলেন।

স্বামীর আহ্বানে প্রভাবতী বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে, হরমোহন বলিলেন, "আজ থেকে তুমি জেনে রাখ যে, সুরেশই তোমার একমাত্র ছেলে নয়; তোমার দুই ছেলে, প্রমথ সুরেশের দাদা।"

কথাটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া একবার প্রমথর মুখের দিকে ও একবার হরমোহনের মুখের দিকে চাহিয়া প্রভাবতী কহিলেন, "সে ত' সত্যি কথা; কিন্তু এ কথা বলবার কারণ কি হোল।"

হরমোহন কথা কহিবার পূর্ব্বে প্রমথ সহাস্যমুখে কহিল, "কারণ জেনে কি হবে মাসীমা, কথাটা জেনে রাখ, তা হলেই হ'ল। আমি যে সুরেশের দাদা তার বিরুদ্ধে আমার কিছুমাত্র বলবার নেই।"

হরমোহন প্রভাবতীকে কথাটা সবিস্তারে শুনাইলেন।

হরমোহনের কথা শেষ হইলে প্রমথ বলিল, "এই ত শুনলে মাসীমা, কত সামান্য একটা ব্যাপার, এর জন্যে তখন থেকে মেসোমশায় যা' তা' কথা বলে আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন।"

দুরূহ এবং সমূহ বিপদ হইতে অকস্মাৎ এরূপে উদ্ধার পাওয়ার সংবাদ পাইয়া প্রভাবতীর উদ্বেগ-ব্যাকুল হৃদয় আশ্বাসে ও আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া গেল। অমলার দুরদৃষ্ট সংস্কারের প্রতিশ্রুতির দ্বারা প্রমথ প্রভাবতীর হৃদয়ের অনেকখানি অধিকার করিয়া লইয়াছিল, অদ্যকার এই ঘটনার পর তথায় অধিকার করিবার জন্য অবশিষ্ট আর কিছুই রহিল না। উৎকট চিন্তা ও দুর্ভাবনা হইতে সহসা মুক্তি লাভ করিয়া প্রভাবতীর মন এমন শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল যে প্রমথর কথার উত্তরে "বাবা প্রমথ—" মাত্র এই দুইটি শব্দ উচ্চারণ করিয়াই তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, এবং তৎপরে, মুখ হইতে বাক্যের পরিবর্ত্তে, চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল।

প্রমথ একটু থমকিয়া গিয়া তাহার পর ঝুঁকিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "নাঃ, তোমাদের কারোর সঙ্গে আমার পোষাল না। আমি চল্লাম সুরেশের সঙ্গে আলাপ করতে।" বলিয়া সে সুরেশের উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

সুরেশ তখন দ্বিতলের কোন কক্ষে সমুচ্চস্বরে পাঠাভ্যাস করিতেছিল।　　　　[ক্রমশঃ]

কড়োবড়ি ! (নৃত্যগীত ও অভিনয়কে অরুন্তারা কড়োবড়ি বলে। পাতা ঢাকা সাজঘরের ভিতর থেকে একে একে বেশভূষা করে অভি-নেতারা দর্শকদের সম্মুখে বেরিয়ে আসে এবং এক এক পালা নেচেগেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য আবার সাজঘরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে।)

(শেষাংশ)

আষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে, নিঃসন্দেহ বলা যায় যে, সভ্য জগতে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম্ম-পথ-গুলির কোনটাই তারা অনুসরণ করে না। অথচ তাদের নাস্তিক বলাটাও হিসাব মতো ঠিক খাটে না। কারণ তারা প্রকৃতির পূজারী! তারা ঈশ্বরকে জান্‌তে না পারলেও তাঁর সৃষ্টিকে মান্‌তে পেরেছে! আমাদের দেশের দক্ষিণী মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে যেমন বনস্পতি প্রভৃতি 'দেবকের' উপাসনা প্রচলিত আছে, এই বর্ব্বর
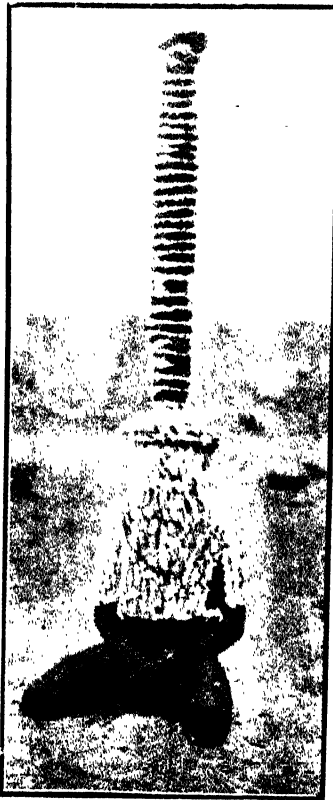
ব্যাঙ্‌ পর্ব্ব। '(ব্যাঙ্‌-দেবকদলের পুরোহিতের মস্তকাচ্ছাদন একটি বৃক্ষকাণ্ডের প্রতিরূপ এবং অঙ্গাচ্ছাদন উক্ত বৃক্ষের মূলাবলির প্রতিরূপ ।)

অসভ্য জাতির মধ্যেও তেমনি জীব-জন্তু ও বৃক্ষলতা, অগ্নি প্রভৃতির উপাসনা প্রচলিত আছে। তাদের বিশ্বাস যে ওই জীবজন্তু বৃক্ষ লতা অগ্নি প্রভৃতি তাদেরই পূর্ব্বপুরুষ। তারা সকলেই ওদের কারুর না কারুর বংশসম্ভূত, তাই মহাসমারোহে তারা ওই সব পূর্ব্বপুরুষদের পূজা অর্চ্চনার অনুষ্ঠান করে এবং এই সকল অনুষ্ঠান উপলক্ষে রীতিমত উৎসবের আয়োজন হয়।

এদের এই দেবকোপাসনা বা আদি জনকের পূজাটাকেই এদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। ইতর প্রাণী ও জড়-প্রকৃতি প্রভৃতির পূজাকে ইংরাজীতে "টটেমি-জম্" (Totemism) বলে। এই 'টটেমিজম'ই হচ্ছে আদিম অধিবাসীদের প্রধান ধর্ম্ম। প্রত্যেক দলের এক একটী ক'রে দেবক নির্দ্দিষ্ট থাকে। এবং সেই দেবকের পূজার দ্বারা তারা পিতৃলোকের সন্তোষ সাধন ক'র্‌তে চেষ্টা করে। কারণ, আদি জনক পরিতুষ্ট হ'লে, তাদের বিশ্বাস যে, দেশে আর কোন অভাব থাকবে না।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, প্রত্যেক দলের এক একটি বিভিন্ন 'দেবক' নির্দ্দিষ্ট আছে, এবং এই 'দেবক' সাধারণতঃ কোনও ইতর প্রাণী বা জড়পদার্থ মাত্র। যেমন একদলের দেবক' হয়ত 'এমু' পাখী, আর এক দলের ঘাসের শীষ, আর এক দলের বৃষ্টি-ধারা! প্রত্যেক দল তাদের এই 'দেবক'-গুলির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবান। খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী সুসভ্য

য়ুরোপ আজ প্রভু খৃষ্টের যে অবমাননা ক'রছে, এই অসভ্য আদিম বর্ব্বরেরা তাদের 'দেবক' সম্বন্ধে সেরূপ কোনও দিন কল্পনাও ক'রতে পারবে না। দেবকের অপমান তো দূরের
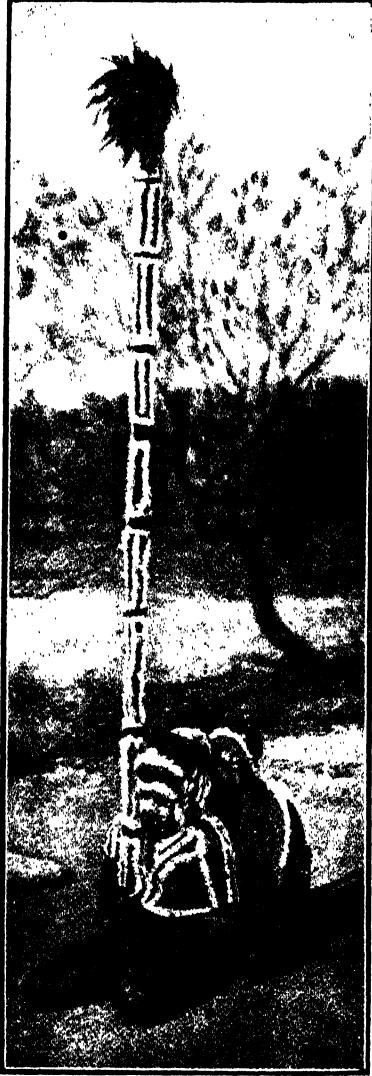
পিপীলিকা পর্ব্ব।

(পিঁপড়ে আর পিঁপড়ের ডিম 'অরুন্তা' সম্প্রদায়ের একটি প্রিয় খাদ্য। পিঁপড়েযখন বিরল হয়ে ওঠে, সেই সময় পিপীলিকা-দেবক-দলের লোকেরা সডিম্ব পিপীলিকা বৃদ্ধির জন্য এই উৎসবের আয়োজন করে। পাখীর পালকে আবৃত হ'য়ে দুজন পুরুষ স্ত্রীলোকের বেশে একটি কল্পিত নকল বৃক্ষকাণ্ডের মূলে পিপীলিকার আরাধনা করে।)

কথা, তারা অনেকেই বরং তাদের নির্দ্দিষ্ট দেবকটীকে সকলের চেয়ে মাননীয় বলেই মনে করে, এবং কোনও দিন তার এতটুকু অসম্মান করে না। কোনও একটা ভক্ষ্য বস্তু যাদের 'দেবক', তারা অনেকেই জীবনে কখনও সে বস্তুর আস্বাদ গ্রহণ করে না। যেমন, এমু পাখী যাদের দেবক, তারা তাদের 'দেবকের' সম্মানার্থ সেই সুস্বাদু-শ্রেষ্ঠ খাদ্যটির প্রলোভনও অনায়াসে পরিত্যাগ ক'রেছে। তবে এমু পাখী যাদের পূর্ব্ব পুরুষের জনক নয়, তারা এর মাংসটাই খেতে ভালবাসে সব চেয়ে বেশী। অর্থাৎ একদল অন্য দলের দেবকের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। খাতিরে প'ড়ে বা চক্ষুলজ্জাতেও অন্যের দেবকটিকে মান্য করা তাদের মধ্যে প্রচলিত নেই; এবং একদল অন্য দলের কাছ থেকে সে সম্মান দাবী ক'রে কোনও দিনই দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধায় না! গোমাতা যাদের কাছে দেবী ভগবতী তুল্য, এবং গো-মাংস যাদের কাছে খাদ্য হিসাবে অমৃত তুল্য, তারা পরস্পরেই উভয়ের স্বাধীন রুচি অনুসারে কাজ ক'রে যায়; এবং তাদের সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ থাক্‌বার পক্ষে এই রুচি-ভেদ ও মত-পার্থক্য কোনও দিনই বাধা স্বরূপ হ'য়ে দাঁড়ায় না।

প্রত্যেক দলই তাদের 'দেবক'কে 'ভাই' ব'লে উল্লেখ

মৌনব্রত উদ্‌যাপন।

(সাবালকত্ব প্রাপ্তি কামনায় যুবকদের সাড়ে তিনমাস বাক্য-সংযম ব্রত পালন করতে হয়। যে এই পরীক্ষায় যখন উত্তীর্ণ হয়, অর্থাৎ এই সাড়ে তিনমাসের মধ্যে একটী কথাও না ক'য়ে থাকতে পারে, তাকে, দলের যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনি একটী ক্যাঙারুর বাচ্ছা উপহার দিয়ে, তার মুখস্পর্শ করে তাকে কথা কইতে অনুমতি দেন।)

করে। কোনও কোনও দল তাদের জান্তব দেবকের মাংস ভক্ষণেও কোনও দ্বিধা বোধ করে না। অর্থাৎ গোঁড়ামী বলে জিনিসটা তাদের মধ্যে একেবারেই নেই।

প্রত্যেক দলের সঙ্গে তাদের দেবকের যে একটা বংশগত সম্বন্ধ আছে, এটা তারা সকলেই বিশ্বাস করে ; এবং তাদের প্রভৃতি অনুষ্ঠানের দ্বারা দেবক উপাসনা ক'রে তাদের স্ব স্ব দেবকের বংশ বৃদ্ধি ক'রতে পারে। যেমন, এমু পাখীর

অগ্নি-পরীক্ষা। (সাবালক ব'লে-সমাজে গৃহীত হবার পূর্ব্বে বড়মুণ্ডা যুবকদের এই শেষ পরীক্ষা দিতে হয়—জ্বলন্ত চিতানলের উপর অন্ততঃ পাঁচ মিনিট কাল গড়াগড়ি দিয়ে।)

বংশধরেরা এমু পাখীর সংখ্যা বাড়াতে পারে, কাঙারুর বংশধরেরা কাঙারু বৃদ্ধি ক'রতে পারে, বৃষ্টি-র শীয়েরা বর্ষা সৃষ্টি ক'রতে পারে ইত্যাদি ; কিন্তু এমুর বংশধর যে বৃষ্টি সৃষ্টি করতে পারে না এবং কাঙারুর বংশধর যে এমুর সংখ্যা বাড়াতে পারে না, এ কথাটাও তারা মানে। অর্থাৎ যাদের যা দেবক তারা কেবল সেই বিষয়েই কৃতিত্ব দেখাতে পারে, অন্য বিষয়ে নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পশ্চিম আষ্ট্রেলিয়াবাসীদের বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। তাদের দেবক হচ্ছে অগ্নি। অনেকের বিশ্বাস যে আগুনের জন্য তাদের চকমকি বা দীপশলাকার প্রয়োজন হয় না। তারা দৈব প্রভাবে বা ভৌতিক বলে ইচ্ছামত অগ্নি প্রজ্জ্বলিত ক'রতে পারে। কোনও

মহীলতা তীর্থ। (এই স্থানে মহীলতা-দেবকদলের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এইরূপ এক একটী বিশেষ বিশেষ স্থানে যে যে বিশেষ দেবকের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়—সেই সেই স্থান উক্ত একটি দেবক সম্প্রদায়ের নিকট তীর্থ স্বরূপ গণ্য হয়।)

...ও খুব প্রবল দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, ...পূজা অর্চ্চনা, মন্ত্রোপচার

কোনও দিন আবার এ কথাও বলে যে তারা নাকি ইচ্ছামত তাদের জান্তব দেবকের রূপ ধারণ ক'রতে পারে! যেমন নাগ-বংশীয়েরা ইচ্ছামাত্র সর্প-রূপ ধারণ করতে পারে! এবং এ বিশ্বাসও তাদের মধ্যে খুব প্রবল যে, যে জন্তু যাদের দেবক সে জন্তুর দ্বারা কখনই

"এমু" পর্ব্ব।

(এমু-দেবকদলের সাধক এমুর চঞ্চু ও গ্রীবার প্রতিরূপ মস্তকাচ্ছাদন পরিধান ক'রে এমু বৃদ্ধির জন্য সাধনা ক'রছেন।)

তাদের কোনও অনিষ্ট হ'বে না! অর্থাৎ নাগবংশীয়েরা কেউ কখনও সর্পাঘাতে মরবে না। অগ্নি ভ্রাতাদের কোনও দিন অনলে অনিষ্ট হবে না ইত্যাদি।

দেবকের পূজা অর্চ্চনার কথা যা পূর্ব্বে উল্লেখ করিছি তা থেকে কেউ যেন মনে করবেন না যে আমাদের দেশের দেবদেবী পূজার মত তারা এই দেবকের অর্চ্চনা করে! তাদের এই দেবকের আরাধনা একেবারেই সে রকমের কিছু নয়। যদিও কোনও কোনও দলের মধ্যে দেবক উপাসনার একটা বিধিবদ্ধ ধারা প্রচলিত হ'য়েছে দেখা যায় বটে, কিন্তু সেটাকে কেবলমাত্র একটা কৌলিক প্রথা বা আচার হিসাবেই ধ'রতে হবে; কারণ তার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার লেশ মাত্র নেই—অথচ নিয়ম যথেষ্টই আছে।

প্রত্যেক দলের দেবক উপাসনার জন্য পল্লীর মধ্যেই বা পল্লীর বাইরে কোথাও একটা উপযুক্ত স্থান নির্দ্দিষ্ট করা থাকে। যেমন নাগবংশীয়েরা জঙ্গলের এমন একটা জায়গা তাঁর আরাধনার যোগ্য ব'লে নির্দ্ধারিত ক'রে রেখেছে যে, জন্মেজয় যতবারই সেখানে সর্প-যজ্ঞ করুন না কেন, তবু সেস্থানটিকে ভুজঙ্গ বিরল ক'রে তুলতে কোনও দিনই পারবেন না। সেই রকম এমু বা কাঙারুর দলও সেই রকম জায়গাই বেছে নিয়েছে, যেখানে তাদের দেবকের বংশ একেবারেই অপ্রতুল নয়।

অগ্নি পর্ব্ব।

(অগ্নি দেবের দণ্ড সম্মুখে স্ত্রীলোকদের সদলে নৃত্যগীত ক'রতে হয়।)

এদেশে বিবাহের পর স্ত্রী যেমন স্বামীর গোত্রের অন্তর্গত হ'য়ে যায়, এদের মধ্যে সেই রকম স্ত্রীকে স্বামীর দেবকই গ্রহণ ক'রতে হয় এবং এক দেবকের বংশ সম্ভূত স্ত্রী পুরুষের মধ্যে বিবাহ বন্ধনও নিষিদ্ধ। কিন্তু সন্তান সন্ততিদের পক্ষে 'দেবক' সম্বন্ধে বিভিন্ন দলের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম প্রচলিত দেখা যায়। যেমন, কোনও দলের মধ্যে নিয়ম

আছে, পুত্র কন্যা উভয়েই পৈতৃক দেবকের অধিকারী; কোথাও পুত্র পিতার দেবকের উত্তরাধিকারী এবং কন্যা মাতার দেবকের অধিকারী! অরুন্তাদের মধ্যে নিয়ম হ'চ্ছে যে,যে স্থানে মাতার গর্ভ-সঞ্চার হয়, সেই স্থান যে দেবকের চৌহুদ্দির মধ্যে, স্ত্রীর গর্ভজাত
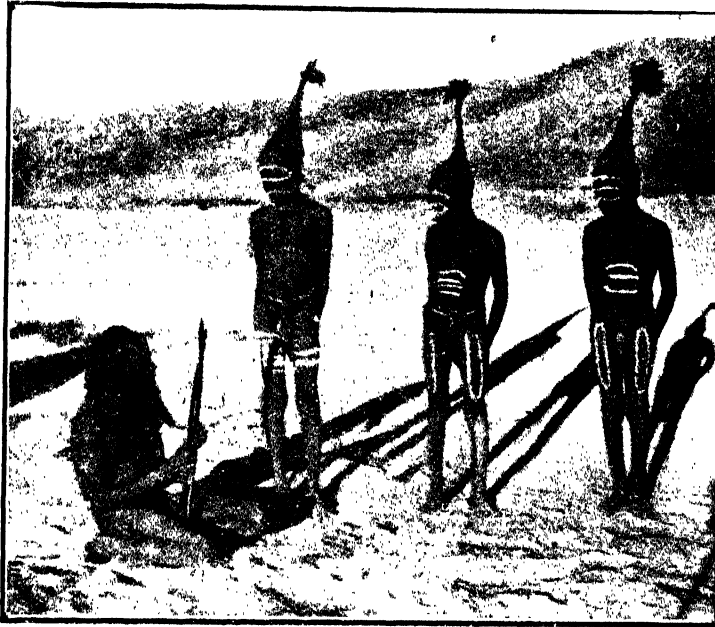
কড়োবড়ির মহলা। (বৃদ্ধ নাট্যাচার্য্য অপরিণত বয়স্কদের নৃত্যাভিনয় শিক্ষা দিচ্ছেন।)

হয়েছে এবং সেই স্থানের সন্নিকটে কোথাও যদি এমু জাতীয় দেবকের কোনও আসন থাকে, তবে সেই গর্ভিণীর গর্ভজাত পুত্র বা কন্যা এমু বংশীয় বলেই পরিচিত হবে,—তার পিতামাতার দেবকের উত্তরাধিকারী হবে না।

দেবক আরাধনার বিবিধ

ভুজঙ্গ পর্ব্ব। (সর্পবৃদ্ধি কামনায় এই উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। কারণ সর্প, ওদের একটা প্রধান খাদ্য। কিন্তু যে পুরোহিত এই যজ্ঞের অধিনায়কত্ব করেন, তাঁর পক্ষে সর্প ভোজন একেবারে নিষেধ! উরাবুন্না জাতির মধ্যেই এই সর্প দেবকের দল বেশী। এদের পুরোহিতেরও মাথায় সেই সুপবিত্র 'বানীংগা' বাঁধা রয়েছে।)

পুত্র বা কন্যা সেই দেবকেরই উত্তরাধিকারী হবে। অর্থাৎ নাগ বংশীয়া কোনও গর্ভিণী যদি মনে করে যে, অমুক স্থানে অবস্থান কালীন স্বামী সহবাসের ফলে তার এই গর্ভ'সঞ্চার

বিভিন্ন প্রথা ভিন্ন ভিন্ন দলের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। তবে প্রত্যেক অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই এক; অর্থাৎ উপাস্য দেবকের দল বৃদ্ধি করা।

যখন দেখা যায় যে, এমু পাখীর আমদানী বড় কম প'ড়ে গেছে, বা খাদ্যোপযোগী সর্প একেবারে দুর্লভ হয়ে এসেছে, তখনই এমু বংশীয়েরা এমুর বৃদ্ধি কামনায় এবং নাগ-বংশীয়েরা সর্প-কুলের সংখ্যা বাড়াতে স্ব স্ব দেবক আরাধনার অনুষ্ঠান করে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের যারা সর্দ্দার, দেবক আরাধনায় তাদেরই পৌরোহিত্য ক'রতে হয়। সর্ব্বাঙ্গে রক্ত ও পীত গৈরিক মৃত্তিকার তিলক সজ্জা করে মাথায় একটি 'বাণীঙ্গা' বা টোপর পরে তাঁকে এই অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করবার জন্য প্রস্তুত হ'তে হয়। সর্প বৃদ্ধির জন্য নাগ দেবকের আরাধনায় পুরোহিতকে মাটিতে নতজানু হ'য়ে বসে উভয় হস্ত যথাসম্ভব প্রসারিত করে দিতে হয়। প্রত্যেক হস্তে ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ এক একখানি খর শাণিত অস্থি থাকে। তার দক্ষিণ ভাগে একজন নতজানু হ'য়ে বসে সেই অস্থি গ্রহণ করে' বাহু দেশের ত্বক ছেদন করে এবং পুরোহিত স্বয়ং বামহস্তে অপর অস্থি দ্বারা আপন চর্ম্ম ভেদ করেন। তার পর পুরোহিতের বাম পার্শ্বস্থ অপর একজন বাহুদেশের ছিন্ন চর্ম্ম টেনে তুলে ধরে, এবং পুরোহিত দ্বিতীয় অস্থি খানি সেই স্থানে বিদ্ধ ক'রে দেন, পরে সেই অস্থি বিদ্ধ উভয় হস্ত প্রসারিত করে পুরোহিত একটি মন্ত্র উচ্চারণ করেন। মন্ত্র পাঠ শেষ হলে তিনি বাহুদেশ হ'তে অস্থিদ্বয় উৎপাটন ক'রে ফেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভুজঙ্গ-আরাধনা উৎসব শেষ হয়ে যায়।

কড়োবড়ি। (এই অভিনয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় হ'চ্ছে অতি-প্রাকৃত জীবেরা কিরূপ অসাধারণ বিভূতি প্রকাশে সক্ষম!)

এই উৎসবের কিছুদিন পরেই যখন দেখা যায় যে, সর্প-কুল বেশ বৃদ্ধি লাভ করেছে, তখন সর্প যাদের দেবক নয়, এমন দলের দু'একজন গোটা-কয়েক সাপ মেরে পূর্ব্বোক্ত পুরোহিতের কাছে নিয়ে আসে এবং বলে "এই দেখুন আপনার অনুগ্রহে আমরা সর্প লাভ করিছি!" পুরোহিত সেই সর্পের কিয়দংশ চর্ব্বি নিয়ে বলেন "যাও তোমরা সবাই মিলে পেট ভ'রে খাও!" এবং সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা গর্ব্বিত ভাব প্রকাশ করেন, যার অর্থ এই যে, দেখ, তোমাদের আহার যোগাবার জন্য আমি কেমন সর্পকুল বৃদ্ধি করিছি!

বিভিন্ন দেবক আরাধনার ভিন্ন ভিন্ন প্রথা প্রচলিত

আছে। শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই তিনটি ঋতুও কোনও কোনও দলের দেবক স্বরূপ হ'য়ে গেছে। এরা ইচ্ছামতো শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষার হ্রাস বৃদ্ধি ক'রতে পারে! শীত আবাহনের উৎসবে 'হিম-দেবক' দলের লোকেরা নিজেদের চিত্রবিচিত্র ক'রে সাজায়; একটি বায়ু নিশান খাটিয়ে বৃক্ষপল্লবের ছাউনীর মধ্যে হোমাগ্নি প্রজ্জলিত ক'রে যেন দারুণ শীতে কম্পিত কলেবরে আগুন পোয়াচ্ছে, এইরূপ অভিনয় ক'রে! তাদের বিশ্বাস যে, এই উৎসবের পর হিম ঋতুর আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী! কোন কোনও দলের আবার 'শিশু দেবক'ও আছে দেখ্‌তে পাওয়া যায়! তারা ইচ্ছামাত্র শিশুর জন্মহার বৃদ্ধি ক'রতে পারে এ বিশ্বাস তাদের সকলেরই মনে দৃঢ় বদ্ধ। শিশু দেবকের আরাধনায়ও বিরাট উৎসবের আয়োজন হয়।

ইতিহাসের দিক থেকে আষ্ট্রেলিয়ার সম্বন্ধে লেখবার বিশেষ কিছু নেই। আষ্ট্রেলিয়ার ছোড়-ভঙ্গ আদিম অধিবাসীরা সভ্যতার এত পশ্চাতে পড়েছিল এবং এখনও আছে যে, তারা তাদের দেশে শেতাঙ্গদের অনধিকার প্রবেশে কোনও রকমসঙ্ঘবদ্ধ বাধা দেবার চেষ্টাই করেনি। সুতরাং উপনিবেশ স্থাপন কর্‌বার জন্য সেখানে অন্য দেশের মতো কোনও যুদ্ধ বিগ্রহও হয়নি। আষ্ট্রেলিয়ার ইতিহাসের কথা বলিতে গেলে উপনিবেশেরই ইতিহাস আবৃত্তি ক'রতে হবে এবং

'প্রিন্স্‌' দ্বীপের লোক।

(এরা সুসজ্জিত হ'য়ে হাতে একটি পুষ্প-শোভিত দণ্ড ধারণ করে। সেই দণ্ডশীর্ষে সুপবিত্র 'বানীঙ্‌গা' সংযুক্ত থাকে। কুইন্স্‌ল্যাণ্ডের উত্তর দেশ থেকে পশ্চিম আষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত এই 'বানীঙ্‌গা' জিনিসটা অত্যন্ত পবিত্র বস্তু বলে পরিগণিত।)

কড়োবড়ীর মহলা। (কড়োবড়ীর জন্য একদল উৎসাহী "অরুন্তা" প্রস্তুত হ'চ্ছে।)
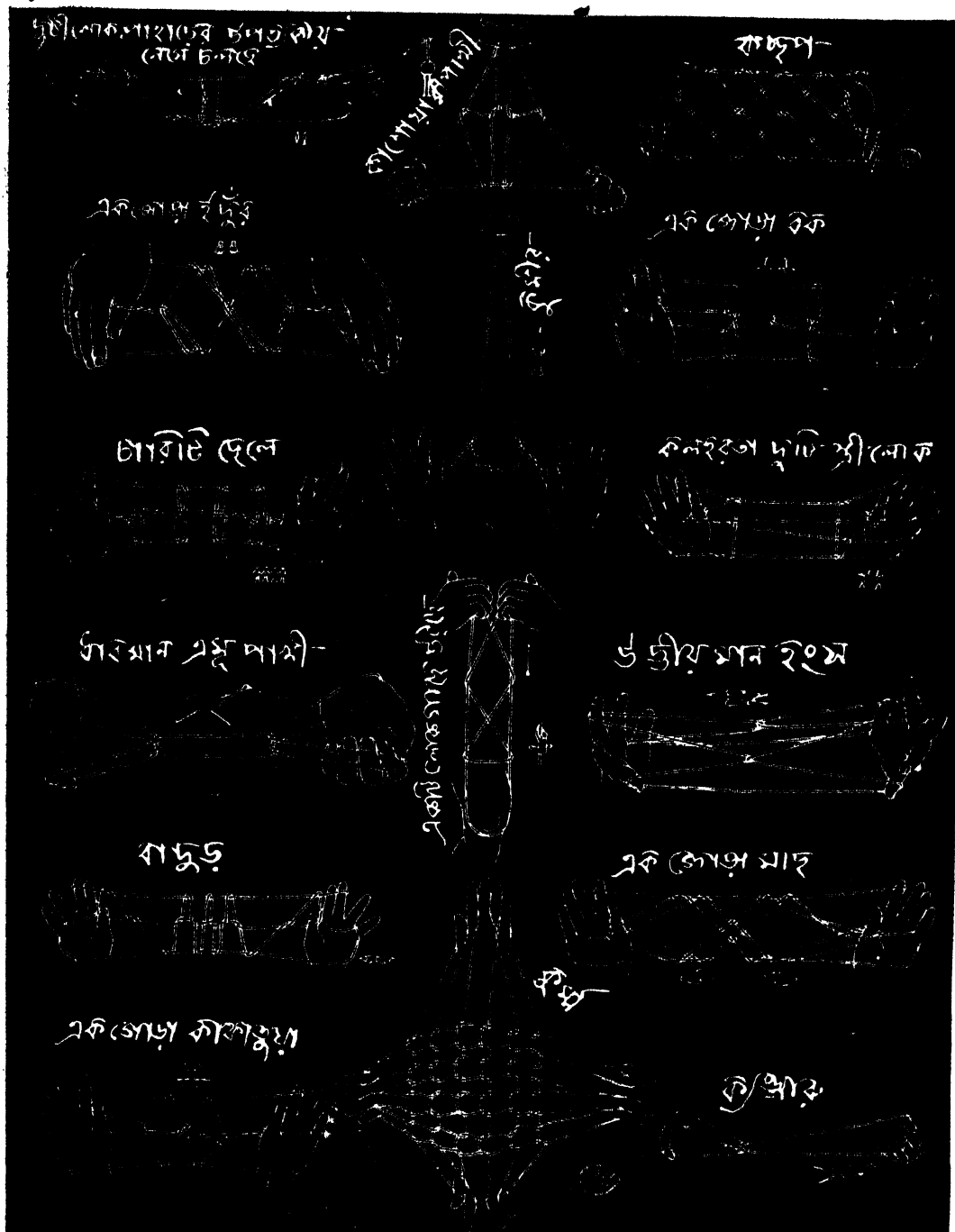
দড়ীর খেলা। (কুইন্সল্যাণ্ডের উত্তরাঞ্চলের আদিম অধিবাসীরা—আঙুলের ফাঁকে দড়ি গলিয়ে নানারকমের প্রতিকৃতি তৈরি ক'রে অবসর কালে আত্ম-বিনোদন ক'রে। এই দড়ীর খেলাগুলি থেকে বেশ বোঝা যায় যে এই নগ্ন বন্য বর্ব্বরদের মধ্যেও অনাদি শিল্পীর প্রাণ আপনাকে প্রকাশ করবার চেষ্টা ক'র্‌ছে।)

সেটা এত আধুনিক ব্যাপার যে তার কোনও প্রয়োজনই নেই। আষ্ট্রেলিয়া আজ ইংরেজেরই উপনিবেশ বটে কিন্তু পোর্ত্তুগীজরাই সর্ব্ব প্রথম আষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কার করে। ১৬১০ খ্রীঃ অব্দে 'ফার্ণাণ্ডে ডিঃ কুইরো' নামে একখানি স্পেনীয় অর্ণবযানের একজন পোর্ত্তুগীজ নাবিক আষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কার করেন এবং তিনিই সর্ব্ব প্রথম শ্বেতাঙ্গ যিনি এই দ্বীপে অবতরণ ক'রে চার বৎসর বাস ক'রে ছিলেন। তিনিই এই দ্বীপের প্রথম নামকরণ ক'রেছিলেন "আষ্ট্রিয়ালিয়া"। তারপর একে একে আরও অনেক পোর্ত্তুগীজ, স্পেনীয়, ওলন্দাজ, ইংরাজ ও ফরাসী ভ্রমণকারী এখানে ঘুরে গেছেন। কিন্তু ১৭৭০ সালে ইংরেজ কাপ্তেন জেমস্ কুক্ এই দ্বীপটাকে অধিকার ক'রে আপনাদের সাম্রাজ্যভুক্ত ক'রে নেন। ১৭৮৬ সালে লর্ড সিডনী

অভিনেতার দল—(এই সুসজ্জিত দলটি অনেকক্ষণ ধরে—পাখীর পালক প'রে ও রং চং মেখে "কড়োবড়ীর" অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হ'য়েছে।)

দ্বীপান্তরে দণ্ডিত অপরাধীদের আষ্ট্রেলিয়ায় পাঠানর ব্যবস্থা করেন এবং ১৭৮৮ সালে আর্থার ফিলিপ্ সর্ব্ব প্রথম এখানে উপনিবেশ স্থাপনের সূত্রপাত ক'রেছিলেন।

গত ১৯২০ সালের আদম-সুমারী বিবরণ থেকে জানা যায় যে আষ্ট্রেলিয়ার উপনিবেশিকদের সংখ্যা উপস্থিত প্রায় বায়ান্ন লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার এবং দ্রুত-লুপ্তমান আদিম অধিবাসীদের সংখ্যা মোটে নব্বুই হাজার মাত্র। আষ্ট্রেলিয়ার পরিমাপ উনত্রিশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার পাঁচশত একাশী বর্গ মাইল। আষ্ট্রেলিয়ার অর্দ্ধেকেরও অধিক অংশ এখনও অনধিকৃত প'ড়ে আছে, লোকের বসবাস হয়নি।

(এই শিলাখণ্ডকে আদিম বাসীরা দেবতার মত ভক্তি ক'রে তাদের বিশ্বাস যে এই প্রস্তর দেবতাকে পরিতুষ্ট ক'রতে পারলে যে কোনও বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী হ'তে পারবে। যে স্বামী এই দেবতার কণ্ঠে তার কটিবন্ধ বেঁধে দিয়ে যায় তার স্ত্রীর অচিরে গর্ভসঞ্চার হয়।)

প্রস্তর দেবতা

ভুশণ্ডীর মাঠে

পরশুরাম-রচিত

নারদ-বিচিত্রিত

(১)

শিবু ভট্টাচার্য্যের নিবাস পেনেটী গ্রামে। একটি স্ত্রী, তিনটি গরু, একতলা পাকা বাড়ী, ছাব্বিশ ঘর যজমান, কিছু ব্রহ্মোত্তর জমী, কয়েক ঘর প্রজা,—ইহাতেই স্বচ্ছন্দে সংসার চলিয়া যায়। শিবুর বয়স বত্রিশ। ছেলেবেলায় স্কুলে যা একটু লেখাপড়া শিখিয়াছিল এবং বাপের কাছে সামান্য যেটুকু সংস্কৃত পড়িয়াছিল তাহা সম্পত্তি এবং যজমান রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু শিবুর মনে সুখ ছিল না। তার স্ত্রী নৃত্যকালীর বয়স আন্দাজ পঁচিশ, আঁটো-সাঁটো মজবুত গড়ন, দুর্দ্দান্ত স্বভাব। স্বামীর প্রতি তার যত্নের ত্রুটি ছিল না, কিন্তু শিবু সে যত্নের মধ্যে রস খুঁজিয়া পাইত না। সামান্য খুঁটিনাটি লইয়া স্বামী স্ত্রীতে তুমুল ঝগড়া বাধিত। পাঁচ মিনিট বকাবকির পরেই শিবুর দম ফুরাইয়া যাইত, কিন্তু নৃত্যকালীর রসনা একবার ছুটিতে আরম্ভ করিলে সহজে নিরস্ত হইত না। প্রতিবারে শিবুরই পরাজয় ঘটিত। স্ত্রীকে বশে রাখিতে না পারার জন্য পাড়ার লোকে শিবুকে কাপুরুষ, ভেড়ো, মেনীমুখো প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছিল। ঘরে বাহিরে এইরূপে লাঞ্ছিত হওয়ায় শিবুর অশান্তির সীমা ছিল না।

একদিন নৃত্যকালী গুজব শুনিল তার স্বামীর চরিত্র-দোষ ঘটিয়াছে। সেদিনকার বচসা চরমে পৌঁছিল,—নৃত্যকালীর ঝাঁটা শিবুর পৃষ্ঠ স্পর্শ করিল। শিবু বেচারা ক্রোধে, ক্ষোভে, কষ্টে চোখের জল রোধ করিয়া কোনো-গতিকে রাত কাটাইয়া পরদিন ভোর ছটার ট্রেনে কলিকাতা যাত্রা করিল।

সেয়ালদহ হইতে সোজা কালীঘাটে গিয়া নানা উপচারে সওয়া পাঁচ টাকার পূজা দিয়া মানত করিল—"হে মা কালি, মাগীকে ওলাউঠায় টেনে নাও মা। আমি জোড়া পাঁঠার নৈবিদ্যি দেব। আর যে বরদাস্ত হয় না। একটা সুরাহা করে দাও মা যাতে আবার নতুন করে সংসার পাত্‌তে পারি। মাগীর ছেলেপুলে হল না, সেটাও ত দেখতে হবে। দোহাই মা।"

মন্দির হইতে ফিরিয়া শিবু বড় এক ঠোঙ্গা তেলেভাজা খাবার, আধ সের দই এবং আধ সের অমৃতি খাইল। তার-পর সমস্ত দিন জন্তুর বাগান, যাদুঘর, হগ সাহেবের বাজার, হাইকোর্ট ইত্যাদি দেখিয়া সন্ধ্যাবেলা বীডন ষ্ট্রীটের হোটেল-ডি-অর্থোডক্সে এক প্লেট কারী, দু প্লেট রোষ্ট ফাউল এবং আটখানা ডেভিল জলযোগ করিল। তারপর সমস্ত রাত থিয়েটার দেখিয়া ভোরে পেনেটী ফিরিয়া গেল।

মা কালী কিন্তু উল্টা বুঝিয়াছিলেন। বাড়ী আসিয়াই

শিবুর ভেদবমী আরম্ভ হইল। ডাক্তার আসিল, কবিরাজ আসিল, ফলে কিছুই হইল না। আট ঘণ্টা রোগে ভুগিয়া স্ত্রীকে পায়ে ধরাইয়া কাঁদাইয়া শিবু ইহলোক পরিত্যাগ করিল।

(২)

গ্রামে আর মন টিকিল না। শিবু সেই রাত্রেই গঙ্গা পার হইল। পেনেটীর আড়পার কোন্নগর। সেখান হইতে উত্তর মুখ হইয়া ক্রমে রিশ্‌ড়া, শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটীর হাট, চাঁপদানীর চটকল ছাড়াইয়া আরো দু তিন ক্রোশ দূরে ভূশণ্ডীর মাঠে পৌঁছিল। মাঠটি বহুদূর বিস্তৃত, জনমানব-শূন্য। এককালে এখানে ইঁট-খোলা ছিল সেজন্য সমতল নয়, কোথাও গর্ত্ত, কোথাও মাটির ঢিবি। মাঝে মাঝে আস্‌শেওড়া ঘেঁটু, বুনোওল, বাবলা প্রভৃতির ঝোপ। শিবুর বড়ই পছন্দ হইল। একটা বহুকালের পরিত্যক্ত ইঁটের পাঁজার এক পাশে একটা লম্বা তালগাছ সোজা হইয়া উঠিয়াছে, আর একদিকে একটা নেড়া বেলগাছ ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। শিবু সেই বেলগাছে ব্রহ্মদৈত্য হইয়া বাস করিতে লাগিল।

বেলগাছে ব্রহ্মদৈত্য হইয়া বাস করিতে লাগিল

যাঁরা স্পিরিচুয়ালিজম্‌ বা প্রেততত্ত্বের খবর রাখেন না তাঁহাদিগকে ব্যাপারটা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিতেছি। মানুষ মরিলে ভূত হয় ইহা সকলেই শুনিয়াছেন। কিন্তু এই থিওরীর সঙ্গে স্বর্গ, নরক, পুনর্জ্জন্ম খাপ খায় কিরূপে? প্রকৃত তথ্য এই।—নাস্তিকদের আত্মা নাই। তাঁরা মরিলে অম্লজান, উদ্‌জান, যবক্ষারজান প্রভৃতি গ্যাসে পরিণত হন। সাহেবদের মধ্যে যাঁরা আস্তিক, তাঁদের আত্মা আছে বটে, কিন্তু পুনর্জ্জন্ম নাই। তাঁরা মৃত্যুর পর ভূত হইয়া প্রথমতঃ একটি বড় ওয়েটিং রুমে জমায়েৎ হন। তথায় কল্পবাসের পর তাঁদের শেষ বিচার হয়। রায় বাহির হইলে কতকগুলি ভূত অনন্ত স্বর্গে এবং অবশিষ্ট সকলে অনন্ত নরকে আশ্রয়লাভ করেন। সাহেবরা জীবদ্দশায় যে স্বাধীনতা ভোগ করেন, ভূতাবস্থায় তাহা অনেকটা কমিয়া যায়। বিলাতী প্রেতাত্মা বিনা পাশে ওয়েটিং রুম ছাড়িতে পারে না। যাঁরা seance দেখিয়াছেন তাঁরা জানেন বিলাতী ভূত নামানো কি রকম কঠিন কাজ। হিন্দুর জন্য অন্যরূপ বন্দোবস্ত, কারণ আমরা পুনর্জ্জন্ম, স্বর্গ, নরক, কর্ম্মফল, স্বয়ং হৃষিকেশ, নির্ব্বাণ, মুক্তি, সবই মানি। হিন্দু মরিলে প্রথমে ভূত হয় এবং যত্র তত্র স্বাধীনভাবে বাস করিতে পারে,—আবশ্যক মত ইহ-লোকের সঙ্গে কারবারও করিতে পারে। এটা একটা মস্ত সুবিধা। কিন্তু এই অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী নয়। কেহ কেহ দু চার দিন পরেই পুনর্জ্জন্ম লাভ করে, কেউ বা দশ বিশ বৎসর পরে, কেউ বা দু তিন শতাব্দী পরে। ভূতদিগকে মাঝে মাঝে চেঞ্জের জন্য স্বর্গে ও নরকে পাঠানো হয়। এটা তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল, কারণ স্বর্গে খুব ফুর্ত্তিতে থাকা যায় এবং নরকে গেলে চিরেতা খাওয়ার কাজ হয়, অর্থাৎ পাপ ক্ষয় হইয়া সূক্ষ্ম শরীর বেশ হাল্‌কা ঝর্‌ঝরে হয়। কিন্তু যাঁদের ভাগ্যক্রমে ৺কাশীলাভ হয়, অথবা নেপালে পশুপতি নাথ বা রথের উপর বামন দর্শন ঘটে,—কিম্বা যাঁরা স্বকৃত পাপের বোঝা হৃষিকেশের উপর চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন,—তাঁদের পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে—একবারেই মুক্তি।

(৩)

দু তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে। শিবু সেই বেলগাছেই থাকে। প্রথম প্রথম দিনকতক নূতন স্থানে নূতন অবস্থায় বেশ আনন্দে কাটিয়াছিল, কিন্তু এখন শিবুর বড়ই ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। মেজাজটা যতই বদ্‌ হোক, মৃত্যুর

একটা আন্তরিক টান ছিল, শিবু এখন তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছে।' একবার ভাবিল—দূর হোক্, না হয় পেনেটীতেই আড্ডা গাড়ি। তারপর মনে হইল—লোকে বলিবে বেটা ভূত হইয়াও স্ত্রীর আঁচল ছাড়িতে পারে নাই। নাঃ, এইখানেই একটা পছন্দমত উপদেবীর যোগাড় দেখিতে হইল।

ফাল্গুন মাসের শেষবেলা। সূর্য্যদেব জলে হাবুডুবু খাইতেছেন। গঙ্গার বাঁকের উপর দিয়া দক্ষিণা হাওয়া ঝির ঝির করিয়া বহিতেছে। ঘেঁটুফুলের গন্ধে ভুশণ্ডীর মাঠ ভরিয়া গিয়াছে। শিবুর বেলগাছে নূতন পাতা গজাইয়াছে। দূরে শিমুলগাছে গোটা-কতক পাকা ফল ফট্ করিয়া ফাটিয়া গেল, একরাশ তুলার আঁশ হাওয়ায় উড়িয়া তারার মত ঝিক্‌মিক্ করিয়া শিবুর গায়ে পড়িতে লাগিল। একটা হলদে রঙের প্রজাপতি শিবুর সূক্ষ্ম শরীর ভেদ করিয়া উড়িয়া গেল। একটা কালো গুবরে পোকা ভরর্ করিয়া শিবুকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। অদূরে বাবলা গাছে এক জোড়া দাঁড়কাক বসিয়া আছে। কাক গলায় সুড়সুড়ি দিতেছে, কাকিনী চোখ মুদিয়া গদগদ স্বরে মাঝে মাঝে ক-অ-অ করিতেছে। একটা কট্‌কটে ব্যাং সদ্য ঘুম হইতে উঠিয়া গুটিগুটি পা ফেলিয়া বেলগাছের কোটর হইতে বাহিরে আসিল, এবং শিবুর দিকে ড্যাব্‌ডেবে চোখ মেলিয়া টিট্‌কারী দিয়া উঠিল। একদল ঝিঁঝিঁ-পোকা সন্ধ্যার আসরের জন্য যন্ত্রে সুর বাঁধিতেছিল, এখন সমস্ত ঠিক হওয়ার সমস্বরে রি-রি-রি-রি করিয়া উঠিল।

শিবুর যদিও রক্ত-মাংসের শরীর নাই,' কিন্তু „মরিলেও স্বভাব যাইবে কোথা।' শিবুর মনটা খাঁ খাঁ করিতে লাগিল। যেখানে হৃৎপিণ্ড ছিল সেখানটা ভরাট হইয়া ধড়াক্ ধড়াক্ করিতে লাগিল। মনে পড়িল,—ভুশণ্ডীর মাঠের প্রান্তস্থিত পিটুলী বিলের ধারে শ্যাওড়া গাছে একটি পেত্নী বাস করে। শিবু তাকে অনেকবার সন্ধ্যাবেলা পলো হাতে মাছ ধরিতে দেখিয়াছে। তার আপাদমস্তক ঘেরাটোপ দিয়া ঢাকা, একবার কেবল সে ঢাকা খুলিয়া শিবুর দিকে চাহিয়া লজ্জায় জিভ কাটিয়াছিল। পেত্নীর বয়স হইয়াছে, কারণ তার সমুখের ৩টা দাঁত নাই, আর গালও একটু তোবড়াইয়াছে। তার সঙ্গে ঠাট্টা চলিতে পারে, কিন্তু প্রেম হওয়া অসম্ভব।

লজ্জায় জিভ কাটিয়াছিল

একটি শাঁকচুন্নী কয়েকবার শিবুর নজরে পড়িয়াছে। সে একটা গামছা পরিয়া আর একটা গামছা মাথায় দিয়া এলোচুলে বকের মত লম্বা পা ফেলিয়া হাতের হাঁড়ি হইতে গোবর-গোলা জল ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়া যায়। তার বয়স তেমন বেশী বোধ হয় না। শিবু একবার রসিকতার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু শাঁকচুন্নী ক্রুদ্ধ বিড়ালের মত ফাঁচ্ করিয়া উঠে, অগত্যা শিবুকে ভয়ে চম্পট দিতে হয়।

শিবুর মন সবচেয়ে হরণ করিয়াছে এক ডাকিনী। ভুশণ্ডীর মাঠের পূর্ব্বদিকে গঙ্গার ধারে ক্ষীরি-বামনীর পরিত্যক্ত ভিটায় যে জীর্ণ ঘরখানি আছে, তাহাতেই সে অল্পদিন হইল আশ্রয় লইয়াছে। শিবু তাকে মাত্র একবার দেখিয়াছে এবং দেখিয়াই মজিয়াছে। ডাকিনী তখন একটা খেজুরের ডাল দিয়া র'ক ঝাঁট দিতেছিল। পরনে সাদা থান। শিবুকে দেখিয়া নিমেষের তরে ঘোমটা সরাইয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়াই সে হাওয়ার সঙ্গে মিলাইয়া যায়। কি দাঁত! কি মুখ! কি রঙ! নৃত্যকালীর রঙ ছিল পানতুয়ার মত। কিন্তু এই ডাকিনীর রঙ যেন পানতুয়ার শাঁস।

(৪)

শিবু একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া গান ধরিল—

আহা, শ্রীরাধিকে চন্দ্রাবলী
কারে রেখে কারে ফেলি।

সহসা প্রান্তর প্রকম্পিত করিয়া নিকটবর্ত্তী তালগাছের মাথা হইতে তীব্রকণ্ঠে শব্দ উঠিল—

চা রা রা রা রা রা
আরে ভজুয়াকে বহিনিয়া ভগ্‌লুকে বিটিয়া
কেক্‌রাসে সাদিয়া হো কেক্‌রাসে হো-ও-ও-ও—

শিবু চমকাইয়া উঠিয়া ডাকিল—"তালগাছে কে রে?"

উত্তর আসিল—"কারিয়া পিরেত বা।"

শিবু।—কেলে ভূত? নেবে এস বাবা।

মাথায় পাগ্‌ড়ি, কালো লিক্‌লিকে চেহারা, কাঁকলাসের মত একটি জীবাত্মা সড়াক্‌ করিয়া তালগাছের মাথা হইতে নামিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—"গোড় লাগি বরম্‌দেও জি।"

শিবু।—জিতা রহো বেটা। একটু তামাক খাওয়াতে পারিস?

কারিয়া পিরেত।—ছিলম্‌ বা?

গোবরগোলা জল ছড়াইয়া চলিয়া যায়

শিবু।—তামাকই নেই তা ছিলিম। যোগাড় কর না।

প্রেত ঊর্দ্ধে উঠিল এবং অল্পক্ষণমধ্যে বৈষ্ণবাটীর বাজার হইতে তামাক, টিকা, কলিকা আনিয়া 'আগ্‌ শুল্‌গাইয়া' শিবুর হাতে দিল। শিবু একটা কচুর ডাঁটার উপর কলিকা বসাইয়া টান দিতে দিতে বলিল—"তারপর, এলি কবে? তোর হাল-চাল সব বল্‌।"

কারিয়া পিরেত যে ইতিহাস বলিল তার সারমর্ম্ম এই।—তার বাড়ি ছাপরা জিলা। দেশে এককালে তার জরু, গরু, জমী, জেরাৎ সবই ছিল। তার স্ত্রী মুংরী অত্যন্ত মুখরা ও বদমেজাজী, বনিবনাও কখনো হইত না। একদিন প্রতিবেশী ভজুয়ার ভগ্নীকে উপলক্ষ করিয়া স্বামী-স্ত্রীতে বিষম ঝগড়া হয়, এবং স্বামী দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া আসে। সে আজ ত্রিশ বৎসরের কথা। কিছুদিন পরে সংবাদ আসে মুংরী বসন্ত রোগে মরিয়াছে। স্বামী আর দেশে ফিরিল না, বিবাহও করিল না। নানা স্থানে চাকরী করিয়া অবশেষে চাঁপদানীর মিলে কুলীর কাজে ভর্ত্তি হয় এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে সর্দ্দারের পদ পায়। কিছুদিন পূর্ব্বে একটি লোহার কড়ি 'হাফিজ' অর্থাৎ কপিকলে উত্তোলন করিবার সময় তার মাথায় চোট লাগে। তারপর একমাস হাঁসপাতালে শয্যাশায়ী হইয়া থাকে। সম্প্রতি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রেতরূপে এই তালগাছে বিরাজ করিতেছে।

শিবু একটা লম্বা টান মারিয়া কলিকাটি কারিয়া পিরেতকে দিবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় মাটির ভিতর হইতে ভাঙা কাঁসরের মত আওয়াজ আসিল—"ভায়া, কল্‌কেটায় কিছু আছে না কি?"

বেলগাছের কাছে যে ইঁটের পাঁজা ছিল তাহা হইতে খানকতক ইঁট খসিয়া গেল এবং ফাঁকের ভিতর হইতে হামাগুড়ি দিয়া একটি মূর্ত্তি বাহির হইল। স্থূল খর্ব্ব দেহ, থেলো হুঁকার খোলের উপর একজোড়া পাকা গোঁফ গজাইলে যে রকম হয় সেই প্রকার মুখ, মাথায় টাক, গলায় তুলসীর কণ্ঠি, গায়ে ঘুন্টি-দেওয়া মের্জাই, পরনে গরদের ধুতি, পায়ে তালতলার চটি। আগন্তুক শিবুর হাত হইতে কলিকাটি লইয়া বলিলেন—

"ব্রাহ্মণ? দণ্ডবৎ হই। কিছু সম্পত্তি ছিল, এইখানে পোঁতা আছে। তাই যক্ষি হয়ে আগ্‌লাচ্চি। বেশী কিছু নয়—এই দু পাঁচশো। সব বন্ধকী তমসুক দাদা,—ইষ্টাম্বর কাগজে লেখা,—নগদ সিক্কা একটিও পাবে না।

খবরদার; ওদিকে নজর দিও না—হাতে হাতকড়ি পড়বে। থুঃ থুঃ।”

শিবুর মেঘদূত একটু আধটু জানা ছিল। সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল—“যক্ষ মশায়, আপনিই কি কালিদাসের—”

যক্ষ।—ভায়রাভাই। কালিদাস আমার মাস্তুতো শালীকে বে করে। ছোকরা নিমকির গোমস্তা ছিল, অনেক দিন মারা গেছে। তুমি তার নাম জানলে কিসে হ্যা?

শিবু।—আপনার এখানে কতদিন আগমন হয়েচে?

যক্ষ।—আমার আগমন? হ্যা, হ্যা। আমি বলে গিয়ে সাড়ে তিন কুড়ি বচ্ছর এখানে আছি। কত এল দেখলুম, কত গেল তাও দেখলুম। আরে তুমি ত সে দিন এলে, কাট-পিঁপড়ে তাড়িয়ে তিনবার হোঁচট্‌ খেয়ে গাছে উঠলে। সব দেখেচি আমি। তোমার গানের সক আছে দেখচি,—বেশ বেশ। ক্যালোয়াতি শিখতে যদি চাও ত আমার সাকরেদ হও দাদা। এখন আওয়াজটা যদিচ একটু খোনা হয়ে গেছে, তবু মরা হাতি লাখ টাকা।

শিবু।—মশায়ের ভূতপূর্ব্ব পরিচয়টা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

যক্ষ।—বিলক্ষণ। আমার নাম ৺নদেরচাঁদ মল্লিক, পদবী বসু, জাতি কায়স্থ, নিবাস রিশ্‌ড়ে, হাল সাকিন এই পাঁজার মধ্যে। সাবেক পেশা দারোগাগিরি, এলাকা রিশ্‌ড়ে ইস্তক ভদ্রেশ্বর। জর্জ্জটি সাহেবের নাম শুনেচ? হুগলীর কালেক্টার,—ভারি ভালবাসত আমাকে। মুল্লুকের শাসনটা তামাম আমার হাতেই ছেড়ে দিয়েছিল। নাদু মল্লিকের দাপটে লোকে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ত।

শিবু।—মহাশয়ের পরিবারাদি কি?

যক্ষ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—“সব সুখ কি কপালে হয় রে দাদা। ঘর-সংসার সবই ত ছিল, কিন্তু গিন্নিটি ছিলেন খাণ্ডার। বলব কি মশায়, আমি হলুম গিয়ে নাদু মল্লিক,—কোম্পানীর দেওয়ানী, ফৌজদারী, নিজামৎ আদালত যার মুঠোর মধ্যে,—আমারই পিঠে দিলে কিনা এক ঘা চেলা কাঠ কসিয়ে। তার পরেই পালালো বাপের বাড়ী। তিনশ চব্বিশ ধারায় ফেলতুম, কিন্তু কেলেঙ্কারীর ভয়ে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আর ছাড়লুম না। কিন্তু যাবে কোথা? গুরু আছেন, ধর্ম্ম আছেন। সাতচল্লিশ সনের মড়কে মাগীকে সরতে হল। তারপর আর সংসার ধর্ম্মে মন বসল না। জর্জ্জটি সাহেব বিলেত গেলে আমিও পেনসন্‌ নিয়ে এক সখের যাত্রা খুললুম। তারপর পরমাই ফুরুলে এই হেথা আড্ডা গেড়েচি। ছেলে-পুলে হয় নি তাতে দুঃখু নেই দাদা। আমি করব রোজগার, আর কোন্‌ আবাগের বেটা ভূত মানুষ হয়ে আমার ঘরে জন্ম নিয়ে সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে—সেটা আমার সইত না। এখন তোফা আছি, নিজের বিষয় নিজে আগলাই, গঙ্গার হাওয় খাই আর কৃষ্টিয়-রাধার নাম করি। যাক্‌, আমার কথা ত সব শুনলে, এখন তোমার কেচ্ছা বল।”
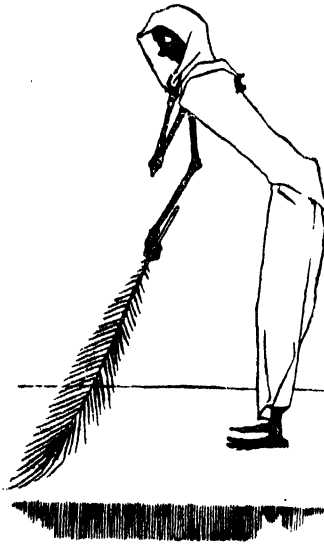
খেজুরের ডাল দিয়া রক ঝাঁট দিতেছিল

শিবু নিজের ইতিহাস সমস্ত বিবৃত করিল, কারিয়া পিরেতের পরিচয়ও দিল। যক্ষ বলিলেন—“সব স্যাঙাতের একই হাল দেখ্‌চি। পুরানো কথা ভেবে মন খারাপ করে ফল নেই, এখন একটু গাওনা বাজনা করি এস। পাখোয়াজ নেই,—তেমন জুৎ হবে না। আচ্ছা, পেট চাপড়েই ঠেকা দিই। উহুঁ—চন্‌ চন্‌ কচ্চে। বাবা ছাতুখোর, একটু এঁটেল-মাটি চট্‌কে এই মধ্যিখানে থাবড়ে দে ত। ঠিক হয়েচে। চৌতাল বোঝো? ছ মাত্রা, চার তাল, দুই ফাঁক্‌। বোল্‌ শোনো—

‘ধা ধা ধিন্‌ তা কৎ তা গে, গিন্নি ঘা দেন কর্ত্তা কে।
ধরে তাড়া কোরে খিটখিটে কথা কয়
ধূর্ত্তা গিন্নি কর্ত্তা গাধা রে।
ঘাড়ে ধরে ঘন ঘন ঘা কত ধুম্‌ ধুম্‌ দিতে থাকে
টুঁটি টিপে ঝুঁটি ধরে উল্টে পাল্টে ফ্যালে
গিন্নি ঘুঘুটির ক্ষমতা কম নয়।
ধাক্‌কা ধুক্কি দিতে ত্রুটি ধনি করে না
নগণ্য নির্ধন কর্ত্তা গাধা—’

'ধা' এর ওপর সোম। ধিন্ তা তেরে কেটে গদি ঘেনে ধা। এই 'ধা' কস্‌কালেই সব মাটি। গলাটা ধরে আস্‌চে। বাবা খোট্টাভূত, আর এক ছিলিম সাজ্ বেটা।"

(৫)

উদ্যোগী পুরুষের লক্ষ্মীলাভ অনিবার্য্য। অনেক কাকুতি মিনতির পরে ডাকিনী শিবুর ঘর করিতে রাজি হইয়াছে। কিন্তু সে এখনো কথা বলে নাই, ঘোমটাও খোলে নাই, তবে ইসারায় সম্মতি জানাইয়াছে। আজ ভৌতিক মতে শিবুর বিবাহ। সূর্য্যাস্ত হইবামাত্র শিবু সর্ব্বাঙ্গে গঙ্গা মৃত্তিকা মাখিয়া স্নান করিল, গাবের আঠা দিয়া পৈতা মাজিল, ফনিমনসার বুরুষ দিয়া চুল আঁচড়াইল, টিকিতে একটি পাকা তেলাকুচা বাঁধিল। ঝোপে ঝোপে বন-জঙ্গলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এক রাশ ঘেঁটুফুল, বৈঁচি, কয়েকটি পাকা নোনা ও বেল সংগ্রহ করিল। তারপর সন্ধ্যায় শেয়ালের ঐক্যতান আরম্ভ হইতেই সে ক্ষীরি-বাম্‌নীর ভিটায় যাত্রা করিল।

সেদিন শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশী। ঘরের দাওয়ায় কচুপাতার আসনে ডাকিনীর সম্মুখে বসিয়া শিবু মন্ত্রপাঠের উদ্যোগ করিয়া উৎসুক চিত্তে বলিল—"এইবার ঘোম্‌টাটা খুল্‌তে হচ্চে।"

ডাকিনী ঘোমটা সরাইল। শিবু চমকিত হইয়া সভয়ে বলিল—"অ্যাঁ! তুমি—নেত্য?"

নৃত্যকালী বলিল—"হ্যাঁরে মিন্‌সে। মনে করেছিলে মরে আমার কবল থেকে বাঁচ্‌বে। পেত্নী শাঁকচুন্নীর পিছু পিছু ঘুরতে বড় মজা, না?"

শিবু।—এলে কি করে? ওলাউঠোয় নাকি?

নৃত্যকালী।—ওলাউঠো শত্তুরের হোক্। কেন, ঘরে কি কেরাসিন ছিল না?

শিবু।—তাই চেহারাটা ফর্‌সাপানা দেখাচ্চে। পোড় খেলে সোনার জলুস বাড়ে। 'ধাত'টা একটু নরম হয়েচে নাকি?

শুভকর্ম্মে বাধা পড়িল। বাহিরে ও কিসের গোলোযোগ? যেন একপাল শকুনি গৃধিনী ঝুটোপটি কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছিঁড়ি করিতেছে। সহসা উল্কার মত ছুটিয়া আসিয়া পেত্নী ও শাঁকচুন্নী উঠানের বেড়ার আগড় ঠেলিয়া ভীষণ চেঁচামেচি আরম্ভ করিল। (ছাপাখানার দেবতাগণের সুবিধার জন্য চন্দ্রবিন্দু বাদ দিলাম, পাঠকগণ ইচ্ছামত বসাইয়া লইবেন।)—

সড়াক করিয়া নামিয়া আসিল

পেত্নী।—আমার সোয়ামী তোকে কেন দেব না?

শাঁকচুন্নী।—আ মর বুড়ি, ও যে তোর নাতির বয়সি।

পেত্নী।—আহা, কি আমার কনে বউ গা!

শাঁকচুন্নী।—দূর্ মেছোপেত্নী, আমি যে ওর দুজন্ম আগেকার বউ।

পেত্নী—দূর্ গোবরচুন্নি, আমি যে ওর তিনজন্ম আগেকার বউ।

শাকচুন্নী।—মর্ চেঁচিয়ে, ওদিকে ডাইনী মাগী মিন্সেকে নিয়ে উধাও হোক্।

তখন পেত্নী বিড়্ বিড়্ করিয়া মন্ত্র পড়িয়া আগড় বন্ধ করিয়া বলিল—"আগে তোর ঘাড় মট্‌কাবো তারপর ডাইনী বেটীকে খাবো।"

কাম্‌ড়া কাম্‌ড়ি চুলোচুলি আরম্ভ হইল। একা নৃত্যকালীতেই রক্ষা নাই, তার উপর পূর্ব্বতন দুই জন্মের আরো দুই পত্নী হাজির। শিবু হাতে পৈতা জড়াইয়া ইষ্টমন্ত্র জপিতে লাগিল। নৃত্যকালী রাগে ফুলিতে লাগিল।

এমন সময় নেপথ্যে যক্ষের গলা শোনা গেল—

ধনি, শুনচ কিবা আনমনে
ভাবছ বুঝি শ্যামের বাঁশী ডাক্‌চে তোমায় বাঁশবনে।
ওটা যে খ্যাঁক্‌শেয়ালী, দিওনা কুলে কালি
রাত-বিরেতে শ্যাল্‌কুকুরের ছুঁচোঁপ্যাঁচার ডাক্‌ শুনে।

যক্ষ বেড়ার কাছে আসিয়া বলিলেন—"ভায়া এখানে হচ্চে কি? অত গোল কিসের?"

কারিয়া পিরেত হাঁকিল—"এ বরম্‌ পিচাস, আরে দর্‌বাজা ত খোল।" শিবুর সাড়া নাই।

প্রচণ্ড ধাক্কা পড়িল, কিন্তু মন্ত্রবদ্ধ আগড় খুলিল না, বেড়াও ভাঙিল না। তখন কারিয়া পিরেত তারস্বরে উৎপাটন-মন্ত্র পড়িল—

মারে জ্‌ জুয়ান—হেঁইয়া
আউর ভি থোড়া—হেঁইয়া
পর্ব্বত তোড়ি—হেঁইয়া
চলে ইঞ্জন—হেঁইয়া
ফটে বয়লট্‌—হেঁইয়া
খবরদার—হা-ফিজ্‌।

সব বন্ধকী তমসুক দাদা

মড় মড় করিয়া ঘরের চা'ল, দেওয়াল, বেড়া, আগড় সমস্ত আকাশে উঠিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইল।

ডাকিনী, অর্থাৎ নৃত্যকালীকে দেখিয়া যক্ষ বলিলেন—"একি, গিন্নি এখানে! বেম্মদত্যিটার সঙ্গে! ছি ছি—লজ্জার মাথা খেয়েচ?" ডাকিনী ঘোমটা টানিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

কারিয়া পিরেত বলিল—"আরে মুংরি, তোহর্‌ সরম নেহি বা?"

* * * * * *

তারপর যে ব্যাপার আরম্ভ হইল তাহা মনে করিলেও কলমের কালী শুখাইয়া যায়। শিবুর তিন জন্মের তিন স্ত্রী এবং নৃত্যকালীর তিন জন্মের তিন স্বামী,—এই ডবল ত্র্যহস্পর্শযোগে ভুশণ্ডীর মাঠে যুগপৎ জলস্তম্ভ, দাবানল ও ভূমিকম্প সুরু হইল। ভূত, প্রেত, দৈত্য, পিশাচ, তাল, বেতাল প্রভৃতি দেশী উপদেবতা যে যেখানে ছিল, তামাসা দেখিতে আসিল। স্পুক, পিক্সি, নোম, গবলিন প্রভৃতি গোঁফ-কামানো বিলাতী ভূত বাঁশী বাজাইয়া নাচিতে লাগিল। জিন, জান, আফ্রিদ, মারীদ প্রভৃতি লম্বা দাড়িওয়ালা কাবুলী ভূত দাপাদাপি আরম্ভ করিল। চিং, চ্যাং, ক্যাচাং ইত্যাদি ঝাকুন্দে চীনে-ভূত ডিগবাজী খাইতে লাগিল।

রাম রাম রাম। জয় হাড়িঝি চণ্ডি, আজ্ঞা কর মা! কে এই উৎকট দাম্পত্য সমস্যার সমাধান করিবে? আমার কর্ম্ম নয়। ভূত জাতি অতি নাছোড়বান্দা,—ন্যায্যগণ্ডা ছাড়িবে না। পুরুষের পুরুষত্ব, নারীর নারীত্ব, ভূতের ভূতত্ব, পেত্নীর পেত্নীত্ব,—এ সব তারা বিলক্ষণ বোঝে। অতএব সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি—শ্রীযুক্ত শরৎ চাটুয্যে, চারু বাঁড়ুয্যে, নরেশ সেন এবং যতীন সিংহ মহাশয়গণ যুক্তি করিয়া একটা বিলি ব্যবস্থা করিয়া দিন যাতে এই ভূতের সংসারটি ছারেখারে না যায় এবং কোনোরকম নীতি-বিগর্হিত বিদ্‌কুটে ব্যাপার না ঘটে। নিতান্ত যদি না পারেন, তবে চাঁদা তুলিয়া গয়ায় পিণ্ড দিবার চেষ্টা দেখুন, যাতে বেচারারা অতঃপর শান্তিতে থাকিতে পারে।

ভারতের বিদেশী বাণিজ্য

শ্রীমন্ত সওদাগর

(ডিসেম্বর ১৯২৩)

১৯২৩ সালের নভেম্বর মাসের সহিত তুলনায় ডিসেম্বরে রপ্তানি বাণিজ্যে আধিক্য ও আমদানি ও পুনঃরপ্তানিতে হ্রাস দেখিতে পাওয়া যায়। বে-সরকারি আমদানির মূল্য ১৫,৪২ লাখ টাকা, এবং ইহা নভেম্বর অপেক্ষা ৫,৬৭ লাখ টাকা কম। রপ্তানি অর্থাৎ খাঁটি ভারতীয় জিনিষের রপ্তানি গত মাস অপেক্ষা ৩,৫৭ লাখ টাকা অধিক, অর্থাৎ ২৯,৯৮ লাখ টাকা; এবং পুনঃরপ্তানি, অর্থাৎ বিদেশী মাল ভারতে একবার আমদানি হইয়া যাহা আবার অন্যান্য বিদেশে রপ্তানি হয়, ২৭ লাখ কমিয়া ৯৫ লাখ টাকায় পরিণত হইয়াছে। নিম্নে ডিসেম্বর ১৯২৩ এবং এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর এই নয় মাসের বাণিজ্যের মোট হিসাব দেওয়া হইল :—

	ডিসেম্বর ২৩	নভেম্বর ২৩	বেশী(+) কম (−)	
	লাখ	লাখ	লাখ	শতক
আমদানি	১৫,৪২	২১,০৯	−৫,৬৭	−২৬.৯
রপ্তানি	২৯,৯৮	২৬,৪১	+৩,৫৭	+১৩.৫
পুঃরপ্তানি	৯৫	১,২২	−২৭	−২২.১

	ডিসেম্বর ২৩	ডিসেম্বর ২২	বেশী(+) কম (−)	
	লাখ	লাখ	লাখ	শতক
আমদানি	১৫,৪২	১৯,২০	−৩ ৭৮	−১৯.৭
রপ্তানি	২৯,৯৮	২৬,৫৯	+৩,৩৯	+১২.৭
পুঃরপ্তানি	৯৫	১,৫০	−৫৫	−৩৬.৭

	এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর		বেশী(+) কম (−)	
	১৯২৩	১৯২২		
	লাখ	লাখ	লাখ	শতক
আমদানি	১,৬৭,৬৩	১,৭৩,৩৬	−৫,৭৩	−৩.৩
রপ্তানি	২,৩৭,৪৯	২,০৯,১৭	+২৮,৩২	+১৩.৫
পুঃরপ্তানি	১০,২১	১১,৩২	−১,১১	−৯.৮

বে-সরকারি অর্থাদির আমদানির মূল্য মোট ৫৭ লাখ টাকা, এবং নভেম্বরে ৩,৭৫ লাখ ও ১৯২২ ডিসেম্বরে ৩,৪৮ লাখ টাকা। নিম্নে স্বর্ণ ও রৌপ্যের আমদানি ও রপ্তানির হিসাব দেওয়া গেল—

	এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর		বেশী(+) কম (−)	
	১৯২৩	১৯২২		
	লাখ	লাখ	লাখ	শতক
আমদানি স্বর্ণ	২২,৮৪	২৪ ৮১	−১,৯৭	−৮
রপ্তানি ঐ	৬	৫	+১	+২০
আমদানি রৌপ্য	১৫,৩৯	১২,৬৩	+২,৫৬	+২০
রপ্তানি ঐ	৩,২৬	২,৩৫	+৯১	+৩৯

১৯২৩ ডিসেম্বরে আমাদের বিদেশ হইতে ১২,২৭ লাখ টাকা পাওনা দাঁড়াইয়াছে, এবং নভেম্বরে ১,৫৩ লাখ টাকা পাওনা হইয়াছিল, ও ১৯২২ ডিসেম্বরে ৫,৯০ লাখ টাকা পাওনা ছিল; অধিকন্তু এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর এই নয় মাসে ৪০,৫০ লাখ, এবং ১৯২২ সালে ঐ নয় মাসে ২০,৬৩ লাখ টাকা পাওনা হইয়াছিল। অর্থাৎ ঐ ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ে পণ্যদ্রব্য, অর্থাদি, কৌন্সিলবিল, কোম্পানির কাগজ ইত্যাদি সকলের সম্মিলিত মূল্য রপ্তানিতে আমদানি অপেক্ষা উল্লিখিত পরিমাণে অধিক হইয়াছিল।

আমদানিতে পরিবর্ত্তন—১৯২২ ডিসেম্বরের সহিত তুলনায় খাদ্য দ্রব্যাদির মূল্য ৩৯ লাখ বাড়িয়া ২,২৫ লাখ টাকা হইয়াছে, এবং কাঁচামাল ও নির্ম্মিত দ্রব্যাদির মূল্য যথাক্রমে ৪০ লাখ ও ৩,৭৯ লাখ কমিয়া ১,২৩ লাখ ও ১১,৬০ লাখ টাকায় পরিণত হইয়াছে। খাদ্য দ্রব্যাদির মধ্যে বিশুদ্ধ চিনি ১৩,৬০০ টন ও ৫৬ লাখ টাকা বাড়িয়াছে। কাঁচা মালের মধ্যে রেশম ১৭ লাখ, কয়লা ১৫ লাখ এবং কেরোসিন তৈল ৯ লাখ কমিয়াছে। নির্ম্মিত দ্রব্যাদির মধ্যে তুলার সর্ব্ববিধ বস্ত্রাদি পরিমাণে ও

মূল্যে কমিয়াছে। কোরা বস্ত্রাদি ৮৫ মিলিয়ন গজ ২৬৯ লাখ হইতে ৭০ মিলিয়ন গজ ও ১,৬৬ লাখ টাকায়, ধোয়া বস্ত্রাদি ৫১ মিলিয়ন গজ ও ১ ক্রোর হইতে ২৬ মিলিয়ন গজ ও ৮১ লাখ টাকায়, এবং রঙ্গিন বস্ত্রাদি ২৯ মিলিয়ন গজ ও ১,৪১ লাখ হইতে ১৮ মিলিয়ন গজ ও ৯৪ লাখ টাকায় পরিণত হইয়াছে। আমদানি বিভাগে বিলাতী বস্ত্রই প্রথম ও প্রধান; এই কমতি আমদানি দেশীয় বস্ত্র ব্যবসায়ীগণের লক্ষ্য করা উচিত। অপর উল্লেখযোগ্য হ্রাসের মধ্যে কলকজা (–৭১ লাখ), তুলার সুতা (–২৬ লাখ) এবং তৈজসপত্র (hardware) ও রেলের গাড়ী ইত্যাদি প্রত্যেকে ৮ লাখ টাকা। লোহার চাদর ও মোটর গাড়ী যথাক্রমে ১৪ লাখ ও ৮ লাখ বাড়িয়াছে।

রপ্তানিতে পরিবর্ত্তন—

খাদ্যদ্রব্য রপ্তানির মূল্য ৬১ লাখ বাড়িয়া ৭,৩৪ লাখ টাকায় উঠিয়াছে,—ইহার মধ্যে দুইটি উল্লেখযোগ্য বস্তু আছে। প্রথম চা (+৭৫ লাখ) ও দ্বিতীয় খাদ্যশস্য (–২১ লাখ)। কাঁচা মালের মূল্য ২,৭২ লাখ বাড়িয়া ১৬,০৪ লাখ টাকায় পরিণত হইয়াছে। ইহার মধ্যে তুলা (+১,৫৬ লাখ) চামড়া (+২৩ লাখ) এবং তৈলবীজ (+২০ লাখ), ও লা (–৩২ লাখ) এবং পাট (–১৬ লাখ), এইগুলি উল্লেখযোগ্য হ্রাস ও বৃদ্ধির দৃষ্টান্ত। মোট ৪৮ হাজার টন রপ্তানি তুলার মধ্যে ইটালি ১৪,৩০০০ টন বা ২৯ শতাংশ, জাপান ১২,৭০০ টন বা ২৬ শতাংশ, বেল্‌জিয়ম্ ৫,৮০০, টন, যুক্তরাজ্য ৪,৭০০ টন এবং জার্ম্মেণী ২,৫০০ টন লইয়াছে। রপ্তানি পাট ৮৩ হাজার টন হইতে ১১৪ হাজার টনে উঠিয়াছে, কিন্তু ইহার মূল্য ৩,৫২ লাখ হইতে ৩,৩৬ লাখ টাকায় নামিয়াছে। নির্ম্মিত দ্রব্যাদির মূল্য ১১ লাখ বাড়িয়া ৬,২০ লাখ টাকায় পরিণত হইয়াছে। তুলার সুতা পরিমাণে ২ মিলিয়ন পৌণ্ড ও ২২ লাখ টাকা কম রপ্তানি হইয়াছে। চটের থলে সংখ্যায় ৩৫ মিলিয়ন হইতে ৪১ মিলিয়ন ও মূল্যে ১,৬৪ লাখ হইতে ১৮৩ লাখ টাকায় উঠিয়াছে। গুণচট যদিও ১০৪ মিলিয়ন গজ হইতে ১১৯ মিলিয়ন গজে উঠিয়াছে, কিন্তু ইহার মূল্য ১৬ লাখ কমিয়া ২ ক্রোর টাকায় নামিয়াছে। আমেরিকার যুক্তসাম্রাজ্য যথারীতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চট আমদানি করিয়াছে, এবং তৎপরে ক্যানাডা, যুক্তরাজ্য ও অষ্ট্রেলিয়া ইত্যাদি।

বিদেশের সহিত সম্বন্ধ—ডিসেম্বর ১৯২৩:—

	আমদানি	রপ্তানি
যুক্তরাজ্য	৮,৫৩,০৮,২০০ = ৫৫·৩°/০	৮,৬৭,৬৫,৭১৫ = ২৯°/০
জার্ম্মেণী	৭৫,৷০,১৩৩ = ৫°/০	১,৪৩,৭২,৯৮৯ = ৫°/০
বেল্‌জিয়াম্	৪৮,৩২,৬০৬ = ৩°/০	১,৫০,৬২,৯১৩ = ৫°/০
ফ্রান্স্	২৪,৯৩,০৭৩ = ২°/০	১,৪৫,৭৪,৫৯৬ = ৫°/০
যাভা	৮০,৩৫,০১৪ = ৫°/০	
চায়না	৩৯,৫৫,২৪৯ = ২°/০	৩১,৯০,৭৮২ = ১°/০
জাপান	৭৮,২১,৭৩০ = ৫°/০	২,৬৪,১৩,৭২৯ = ৯°/০
আমেরিকার যুক্তসাম্রাজ্য	৯৪,০৪,০৩৭ = ৬°/০	৩,০৮,৮০,৭৩৭ = ১০°/০

জাহাজের খবর—এ মাসে ২৭৯ খানি জাহাজ ৫২৭ হাজার টন মাল লইয়া ভারতে আসিয়াছে ও ৩২০ খানি জাহাজ ৬৪৭ হাজার টন মাল লইয়া ভারত হইতে বিদেশে গিয়াছে। এ মাসে পূর্ব বৎসরে ৫৩৪ হাজার টন মাল আমদানি হইয়াছিল ও ৬৩৯ হাজার টন মাল রপ্তানি হইয়াছিল, এবং ঐ পূর্ব্ব বৎসরের জাহাজের আনুক্রমিক সংখ্যা ২৪৬ ও ৩৭২।

শুল্ক—এ মাসে সরকারের ২,৩৪,৬৮,১২০ টাকা আমদানি শুল্ক ও ৬০,৭১,৮০৪ টাকা রপ্তানি শুল্ক আদায় হইয়াছে; পূর্ব্ববৎসর ডিসেম্বরে আমদানি ও রপ্তানি শুল্কের পরিমাণ যথাক্রমে ২,৯০,৭৩,৮০৪ ও ৪৩,০৫,০২৪ টাকা।

গত মাসের প্রতিশ্রুতি অনুসারে এ মাসে নির্ম্মিত দ্রব্যাদির আমদানি ও রপ্তানির একটি তালিকা দিলাম, তাহা হইতে বুঝা যাইবে ভারতে কি জাতীয় দ্রব্যের চাহিদা আছে এবং কি জাতীয় দ্রব্য ভারতে প্রস্তুত হয় না বা কম

প্রস্তুত হয়, এবং কি কি দ্রব্যাদি ভারতবর্ষে প্রস্তুত করিয়া বিদেশে পাঠান হইয়া থাকে।

ডিসেম্বর ১৯২৩

আমদানি

কাচের দ্রব্য	১৩,৭৬,৬৯৪
বৈদ্যুতিক কলকব্জা	১৭,৪৫,৭৩৯
কাপড়ের কারখানা ঐ	২৪,৯৩,৫০৭
ইস্পাতের চাদর	৭৩,০৩,৫৯৮
„ বার	২৬ ৬৪,৩১৬
কাগজ	১৪,৪৪,০৩৭
রেলের গাড়ী	৪১,৯৬,২০২
ঐ এঞ্জিন	১৪,০৭,১০১
ঐ উপাদান	২২,৩৬,৭৯২
মোটর গাড়ী	২০,২১, ৭৬
তুলা—সূতা	৪৮,৩৮,৮১৬
ঐ কোরা বস্ত্র	১,৬৬,০৩,৯৬৩
ঐ ধোয়া „	৮১,২৩,৫৫০
তুলা রঙ্গিন বস্ত্র	৯৩,৫৩,৫৮৩
রেশমের বস্ত্র	২১,৪৪,৬৩৮
দিয়াশলাই	১১,৬৩,৮৯৪
সাবান	৯,৫৯,৫৭৬

রপ্তানি

আফিম	১৮,৬১,১৭৫
চামড়া বড়	২৪,৬৮,৫৮৮
ঐ ছোট	২৬,৩৩,৩০৩
তুলার সূতা	২৪,৭২,৭৫১
ঐ বস্ত্রাদি	৫৪,০৩,০৪২
শুণচটের থলে	১,৮২,৯৬,৪৪৪
শুণচট	২,০০,৩৯,১২৩
পশমী কার্পেট	৯,১৪,৫১৬
নারিকেল দড়ি	৭,৫৮,৫১৫
খনিজ মোম	৯,৯২,৩৩৭

বিরাট মূর্ত্তি

শ্রীবিভূতিভূষণ দাস

আপনার মাঝে ঘিরিয়া আমারে পাই না ত কই তৃপ্তি,
রুদ্ধ-দুয়ার বসিয়া, যখন বাহিরে উষার দীপ্তি।
নিজেরে করেছি বঞ্চিত আমি, আপনার মাঝে ঢেকে,
বাঞ্ছিত মোর আর্ত্তের বেশে চলে গেছে ডেকে ডেকে।
আপনার হাতে চোখ ঢেকে রেখে খুঁজিয়াছি আমি কো া,
এতকাল মোর এমনি করিয়া কাটিয়াছে হায় বৃথা।
প্রভাত-বায়ুর পেয়েছি পরশ, নয়নে নবীন আলো,
সকলের মাঝে রয়েছে নিহিত যা কিছু আমার ভাল।
বিশ্ব-মানব হইতে ছিনায়ে চেয়েছিনু বাঁচিবারে,
তুষার-শীতল মরণ আঁকাড়ি' ব্যর্থতা হাহাকারে।
সকলে যেখানে মিলিত আজিকে যেথা আছে মোর কাজ,
'ভাঙ্গরে দুয়ার, বাহিরিয়া পড়' কহিছে বিশ্বরাজ।
কত অসারতা, কত বিফলতা, অস্ফুট কত গান,
অনাহত কত জীবন-তন্ত্রী পেয়েছে আজিকে প্রাণ।
দ্বিধা-সঙ্কোচ, মিছে অভিযোগ, সংসার-বন্ধন
লীন হ'য়ে যাক্, উঠেছে যেখানে ব্যথিতের ক্রন্দন।
দীন ও মলিন অনাহারে মরে যেথায় দেশের ভাই,
শূন্য এ বুকে তা'রা কি আমার পাবে না একটু ঠাঁই?
মন্দিরে নাই দেবতা রে তোর,—ডুবে যা সবার মাঝে,
বিধাতার শুভ বিরাট-মূর্ত্তি ওইখানে সে ত' রাজে।

স্বপ্ন

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

(৫)

স্তব্ধ গভীর রাত্রির আকাশের তারাগুলি যেন কিসের প্রতীক্ষায় পৃথিবীর দিকে চাহিয়া আছে। ক্ষীণ জ্যোৎস্না-লেখা যমুনার জলে ঝিকিমিকি করিতেছে। যমুনার জলের দিকে চাহিয়া শিরিণ তাহার দাদার কথা ভাবিতেছিল, এখনও তিনি আসিলেন না। তাহার প্রিয় কবি হাফেজ পড়িতে ততক্ষণ সে মগ্ন ছিল, পাঠশ্রান্তা হইয়া সে ঘরের সম্মুখে বারান্দায় আসিয়া বসিল। হাফেজ পড়িয়া উঠিলে তাহার মন কি গোপন তৃষ্ণা অজানা বেদনায় ভরিয়া ওঠে, হৃদয় সেতারের তারের মত কাঁপে, ইচ্ছা হয় এ জ্যোৎস্নারাত্রে রহস্যময় পথে কোন প্রিয়ের সন্ধানে বাহির হইয়া যায়। কিন্তু সে প্রিয় বন্ধুকে কি সহজে লাভ করা যায়? কত সাধু ভক্ত কত ত্যাগ কত সাধনা করিয়া তাঁহাকে পান নাই,—ধন ঐশ্বর্য্যের মধ্যে, এ সুখ সম্ভোগের মধ্যে সে কি তাঁহাকে লাভ করিতে পারিবে? সে যদি তপাস্বনী রাবেয়ার মত ধর্ম্মসাধনা করিতে পারিত!

ছেলেবেলা হইতেই শিরিণ অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণা; বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার এ ধর্ম্মভাব বাড়িয়া চলিয়াছিল। সে ঠিক করিয়াছিল, অবিবাহিতা থাকিয়া ধর্ম্মসাধনা ও লোক সেবা করিয়াই জীবন কাটাইবে। পুরুষদের মত সে স্বাধীনা নয় বলিয়া তাহার মাঝে মাঝে বড় বেদনা বোধ হইত। সে যদি পথে বাহির হইতে পারিত, কত রোগীর সেবা করিয়া, কত অনাথকে সাহায্য করিয়া, সে তাহার প্রিয়বন্ধুর মিলন-মন্দিরের পথে অগ্রসর হইতে পারিত। সেবা করিবার কোন সুযোগ পাইলে সে পর্দ্দার শাসনও মানিত না। সেইজন্য সন্ধ্যাবেলায় বারান্দা হইতে করুণ আর্ত্তনাদ শুনিয়া সে স্থির হইয়া থাকিতে পারে নাই, চপলপদে পথে বাহির হইয়া গিয়াছিল। অন্ধকার নদীতীরে এক অসহায়া নারী এক মূর্চ্ছিত যুবককে লইয়া বসিয়া আছে দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। তাহাকে প্রশ্ন করিয়া ব্যথা দিতে বেদনা বোধ হইল। খোঁজা ভৃত্য ডাকিয়া অসুস্থ যুবকটিকে সে বাড়ীতে আনাইয়া রাখিয়াছে।

যুবকটির কথা মনে পড়াতে ধীরে শিরিণ পাশের সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল। দ্বারের কাছে খোজা ঘুমে ঢুলিতেছে, তাহার পাশ দিয়া ধীরে ঘরে ঢুকিল। খাটিয়ার ওপর যুবকটি মূর্চ্ছিতের মত ঘুমাইতেছে। লোকসেবা করিবে বলিয়া শিরিণ চিকিৎসাবিদ্যা কিছু আপন চেষ্টায় শিখিয়াছিল। তাহার ঔষধে কিছু ফল হইয়াছে দেখিয়া একটু আনন্দিত হইল। নীচে গালিচায় বসন্তের ছিন্ন পুষ্পবল্লরীর মত ইরাণী ফতেমা নিদ্রিতা। তাহাকে সে নিজের ঘরে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু এ পাগলিনী এ যুবককে ছাড়িয়া কিছুতেই যাইতে চায় নাই। নিদ্রিত যুবকটির দিকে শিরিণ মুগ্ধব্যথিত চোখে চাহিয়া রহিল। হয় ত তাহার বোন তাহারি মত দাদার জন্য চিন্তিত হইয়া বিনিদ্র বসিয়া আছে। বাহিরে একটু শব্দ হওয়াতে সে চমকিয়া বাহির হইয়া সিঁড়ি দিয়া আপন ঘরে চলিয়া গেল। হাফেজ লইয়া আবার পড়িতে বসিল।

যমুনাও তাহার দাদা শঙ্করের জন্য জাগিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল, কিন্তু সে দাদার জন্য যে জাগিয়াছিল বলিলে ঠিক হইবে না। উজ্জ্বল যৌবনের অকারণ পুলকে এ জ্যোৎস্নারাত্রি বিনিদ্র স্বপ্নময় কাটাইতে তাহার বড় সুখ হইতেছিল। এক তরুণ সুন্দর মুখ বার বার তাহার মনের পটে ভাসিয়া উঠিতেছিল, তাহাকে ঘিরিয়া কত স্বপ্নজাল বুনিতেছিল। হউক সে যুবক মুসলমান, তাহাকে ত সত্যই সে জীবনে লাভ করিতে পারিবে না। তাই বলিয়া তাহাকে মনের স্বপ্নজগৎ হইতে কেন নির্ব্বাসিত করিবে। যাহা অসম্ভব, যাহা দুর্লভ, তাহাকে লইয়া মন এম্নি রঙীন মায়ার খেলা খেলিতে চায়, সত্যের জগতে যাহাকে না পায় স্বপ্নের জগতে তাহাকে লইয়া মনের মত সাজাইয়া খেলা করে।

যমুনা ভাবিতেছিল, হয়ত ওই যুবক সত্যই কোন নবাবের পুত্র। কে বলিতে পারে, ওই যুবক একদিন দিল্লীর বাদশা হইবে না। দিল্লীর বাদশাহেরা ত রাজপুত নারীদের বিবাহ করিয়াছে, তাহারা ত হিন্দু, তবে—থাক সে কথা। কিন্তু যুবকটি কি সুন্দর, চাহিয়া কি অপ্রতিভ ভাবে চলিয়া গেল—বস্তুতঃ যমুনা তাহার মনকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। সে যাহা খুসি ভাবুক, প্রতি দিনের জীবনে সমাজে সংসারের চারিদিকেই বন্ধন অবরোধ, এ জ্যোৎস্নারাত্রে মন একটু মুক্তি পাক্। স্বপ্ন বুনিতে বুনিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

যমুনার যখন ঘুম ভাঙিল, তখন চারিদিকে প্রভাতের প্রখর আলো। তাড়াতাড়ি সে উঠিয়া দাদার ঘরের দিকে চলিল। কিন্তু চকিত পদে ঘরে ঢুকিয়াই চমকিয়া দাঁড়াইল, যাহাকে সে এতক্ষণ স্বপ্নে খুঁজিতেছিল সে কি সত্যই রূপ ধরিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! দাদা একখানি গ্রন্থের ওপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন, আর তাহার পাশে যে রাজপুত যুবকটি দাঁড়াইয়া আছে, তাহার মুখ দেখিয়া সে বিস্মিত মুগ্ধ হইল। পূর্ব্বদিন প্রভাতে যে মুসলমান তরুণ যুবক স্বপ্নের মত আসিয়া চলিয়া গিয়াছিল, ঠিক তাহারি মত ইহার মুখ, সে যেন বেশ বদলাইয়া আসিয়াছে। যুবকটি তাহার সদ্যজাগরণফুল্ল মুখের দিকে প্রদীপ্ত নেত্রে চাহিল, সেই তরুণ বাদশাহের পুত্র আসিয়াছিল যেন প্রেমিক রূপে, আপন প্রেম নিবেদন করিতে; আর এ রাজপুত যোদ্ধা, এ যেন জয় করিয়া লইবে। মুখ রাঙা করিয়া যমুনা তাহার দিকে চাহিল। যুবকের তেজোজ্জ্বল মুখখানি ভারি করুণ বোধ হইল। শুধু নিশিজাগরণ ক্লান্ত নয়, যেন কোন অসীম অজানা বেদনার আভায় মণ্ডিত। মুখ নত করিয়া যমুনা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল, দ্বারের পাশে আড়ালে দাঁড়াইল। দাদা ও রাজপুতটির কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিল।

শঙ্কর বই বন্ধ করিয়া যুবকটির হাত ধরিয়া বলিল,—দেখ ভাই ভারত, এই সব আমার জ্যোতিষশাস্ত্রের বই, এই জ্যোতির্ব্বিদ্যা নিয়ে আমি শান্তিতে আছি। তোমরা আবার আমায় রাজনীতি চর্চ্চা করতে ডাকছ, বড় অশান্ত বড় কঠোর সে পথ, কিন্তু আমি বুঝছি, ঈশ্বর আমাকে কিছুদিন তোমাদের সঙ্গে আবার আগুনের লীলায় মাততে ডাকছেন। তা না হলে তোমার সঙ্গে এমন আশ্চর্য্য ভাবে দেখা হত না। তোমাদের আশা, তোমাদের উৎসাহ দেখে, একবার তোমাদের সঙ্গে যেতে যেতে ইচ্ছে করছে—কিন্তু পারবে কি, লক্ষ্য ঠিক রেখে চলতে পারবে কি? শক্তির মদে মাতাল হয়ে উঠবে না?

ভারতসিংহ ধীরে উত্তর দিল—আপনি সহায় থাকলে—শঙ্কর একটু উদ্দীপ্ত হইয়া বলিতে লাগিল—দেখ যখন তুমি ভগ্নস্তূপের মধ্য সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে তোমাদের গুপ্ত সভার স্থানে নিয়ে গেলে, আমি শুধু বিস্মিত নয়, আমি মোহিত হলুম—তোমরা যে ভ্রাতৃদল গঠন করছ তা সত্যই আশ্চর্য্য। এক যায়গায় শিখ, রাজপুত, মারাঠা, বাঙ্গালী ভারতের সকল দেশের তরুণ প্রাণ মিলনের স্বপ্নে এসে জুটেছে—চারিদিকে বিচ্ছেদ বিদ্বেষ হীনতা ঈর্ষা লোভ, দলের সঙ্গে দলের জাতির সঙ্গে জাতির সংঘর্ষ, এর মাঝে দিল্লীর ভগ্নস্তূপের মধ্যে চিরনবীন প্রাণের মিলন-কল্লোল-ধ্বনি শুনতে পেলুম, তোমাদের স্বপ্নপ্রাসাদ দেখে আমি ধন্য হয়েছি—

আপনাকে পেয়ে আমরাও ধন্য হলুম—

আচ্ছা, আমায় এক দিন ভাববার সময় দাও। এ দল অতি বৃহৎ করে গড়তে হবে, এর কাজ অসীম। কিন্তু শুধু সৈনিক দিয়ে ত হবে না, সন্ন্যাসী চাই, ভারতের প্রতি নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে এর কেন্দ্র চাই। শুধু শক্তিলাভ করতে চাইলে হবে না, শক্তি বড় লোভী বড় ক্রূর—ওই দেখ, নাদির পারস্যের সিংহাসন পেয়েই ভারত জয়ের জন্য লুব্ধ হয়ে উঠল, তারি ওপর এখন ভারতের ভাগ্য নির্ভর করছে—

হাঁ, নাদির শা' ত লাহোর অধিকার করেছে শুনলুম, বোধ হয় এবার দিল্লীর দিকে আসবে—

ও লুণ্ঠনকারীর জন্য ভাবি না, ও শুধু একটা ঝঞ্ঝার মত এ ভগ্ন মোগলসাম্রাজ্য আরও চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়ে যাবে—কিন্তু এ ভগ্নস্তূপের ওপর নতুন সাম্রাজ্য গড়ে তোলাই ত আমাদের কাজ—তার সাধনা কঠোর,—কিন্তু দেখ, তোমরা স্বপ্ন দেখছ, মারাঠা আজ শক্তিলুব্ধ, রাজপুত আজ রাজ্যলোলুপ—হিন্দুশক্তি সব মিলবে কি? তোমরা হিন্দু-সাম্রাজ্য চাও? কিন্তু মুসলমান রয়েছে, মুসলমান—দাক্ষিণাত্যে, বাংলায়, দিল্লীর সিংহাসনে—

যুবকটি ধীরে বলি , আমি মুসলমান—

রসিকতা করিতেছে ভাবিয়া মৃদু হাসিয়া শঙ্কর বলিল, —তোমাদের দলে ত মুসলমানের স্থান দাও নাই, তাহাদেরও ত চাই—

সত্যই আমি মুসলমান, এ আমার ছদ্মবেশ—

আশ্চর্য্য ক্রুদ্ধভাবে শঙ্কর বলিল—তুমি মুসলমান ? দলে আরও মুসলমান আছে ? সকলে ছদ্মবেশে থাকে কেন ?

দলে আমিই একমাত্র মুসলমান আছি, আজ যাদের দেখলেন সব হিন্দু—

দলের সবাই জানে তুমি মুসলমান ? জেনে তোমায় তারা দলপতি করেছে ?

না, তারা জানে না, কিন্তু আপনি তাদের জানাবেন—

বৈশাখী ঝড়ের আকাশের মত রোষ-ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ নয়নে চাহিয়া শঙ্কর দাঁড়াইয়া উঠিল, ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে বলিল—তুমি তাদের প্রতারণা করেছ, ভণ্ড ! তুমি—তুমি দূর হও—

ক্ষুব্ধ তেজস্বী ব্রাহ্মণের সম্মুখে যুবকটির ভয় করিল,—আপনি এ দলের ভার নিন, আমাকে—

তুমি—যাও !

যুবকটি আর অপমান সহ্য করিতে পারিল না, সে নত মস্তকে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল, কিন্তু বাহিরে যাইতে পারিল না, দ্বার রোধ করিয়া একটি নারী দাঁড়াইয়া, বিদ্যুৎলতার মত কাঁপিতেছে।

দাদা !

শঙ্কর চমকিয়া চাহিল।

দাদা, তোমার ভারতে কি মুসলমানের স্থান নেই !

শঙ্কর একবার যমুনার দিকে একবার ভারতসিংহের দিকে চাহিল। তাহার সুঠাম বলিষ্ঠ দেহ, তেজোজ্জ্বল মুখশ্রীর দিকে চাহিল। হউক সে মুসলমান, তাহাকে ত সে ভাই বলিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। আপনাকে শান্ত করিয়া শঙ্কর বলিল—দেখ ভারত, তুমি মুসলমান বলে নয়, তুমি প্রতারণা করেছ বলে আমি রেগে উঠেছিলুম—

এ প্রতারণা নয়, এ ছদ্মবেশ, একই ভাইয়ের দুই রূপ—

আমি বুঝি, জাতিবিদ্বেষ দূর করবার জন্যে তোমাকে ছদ্মবেশ নিতে হয়েছে, কিন্তু সত্যের ওপর সব প্রতিষ্ঠা করতে হবে—

তাই আপনার কাছে এসেছি—

কিন্তু, কে তুমি—

আমি ? আমি আলি মহম্মদ—

আলি মহম্মদ ! যার নামে এত গল্প শুনেছি—

হাঁ, আমি—

তুমি ! কখন শুনেছি আলি মহম্মদের মত ভোগ-বিলাসী সৌখীন যুবক আর দিল্লীতে নেই, কখন শুনেছি তার মত বীর কৌশলী যোদ্ধা মোগল সভায় নাই, কখন শুনেছি সে দস্যুর মত তার সেনাদল নিয়ে নগর গ্রাম লুণ্ঠন করে বেড়ায়, কোন বনে পর্ব্বতে সে নতুন রাজ্য স্থাপনা করছে, তার দলে মোগল পাঠান তাতার সব দলের সেনা আছে, কখন শুনেছি সদৎ খাঁর সঙ্গে দিল্লীর সিংহাসন লাভের জন্য চক্রান্ত করছে, সৈয়দরা তাকে গুপ্ত হত্যা করছে—

হাঁ, সে আলি মহম্মদ মরে গেছে, তার ভোগের জীবন শেষ হয়েছে, এ তার স্বপ্নের জীবন—

বেশ, তোমার নবজীবনই আরম্ভ হোক—কিন্তু তোমায় দীক্ষা নিতে হবে—

সেই জন্যেই আপনার কাছে এসেছি—

আমার কাছে না, আল্লার কাছে, যাও মসজিদে যাও, ঈশ্বরের কাছে প্রতিজ্ঞা কর, সমস্ত ভোগবিলাস ছাড়বে, সত্যপথে চলবে, ন্যায় বিচার করবে, আপন আদর্শের জন্য প্রাণ দেবে, আর—বিবাহ করেছ ?

না,

চিরজীবন অবিবাহিত থাকবে, সন্ন্যাসী চাই—কখনও কোন নারীর মুখ ভাববে না—

প্রভু, যাহাকে ভালবাসি—

একমাত্র দেশকে তুমি ভালবাস—

যমুনা দরজার গোড়ায় যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, ক্ষণিকের জন্য সেদিকে চাহিয়া ভারত মাথা নত করিল। যমুনা দরজা হইতে সরিয়া কোথায় চলিয়া গেল, চারিদিকের প্রভাতের আলো তাহার কাছে বড় করুণ বোধ হইল।

শঙ্কর ধীরে বলিল, তোমার দলকে আমি বুঝিয়ে বলব,

কোন ভাবনা নেই, চল, তোমায় মসজিদ পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি।

শঙ্করের পেছন পেছন আলি মহম্মদ পথে বাহির হইল। তাহার পেছনে যে দুইটি সুন্দর নয়ন চাহিয়া আছে, সেই করুণ ব্যাকুল দৃষ্টি সে সমস্ত দেহ দিয়া অনুভব করিতে লাগিল, কিন্তু একবার ফিরিয়া চাহিল না।

(৬)

রাজশেখরের যখন ঘুম ভাঙিল, তাহার প্রথমে মনে হইল, সে যেন মুস্তাফা মিঞার সরাইখানার ঘরে শুইয়া আছে, কিন্তু ভাল করিয়া চারিদিকে চাহিয়া সে অবাক হইল, এক সুন্দর ঘরে সুকোমল শুভ্র শয্যায় সে শুইয়া, তাহার দেহে জ্বরের জ্বালা নাই, তাহার মন অতি হাল্কা। গত রাত্রির ঘটনা অতি অস্পষ্ট ভাবে তাহার মনে পড়িল, সে যেন এক নর্ত্তকীর অপমান দূর করিতে গিয়াছিল, তার পর? তার পর—সে যেন বিকারের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছে, এ কি সরাইখানার অন্য কোন ঘর? ধীরে সে বিছানায় উঠিল বসিল। অতি মধুর গানের সুর তাহার কাণে আসিয়া বাজিতে লাগিল, ধীরে সে উঠিয়া দাঁড়াইল, এ বাস্তব না স্বপ্ন তাহা যেন সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। নটীর যে নূপুর নিক্কণ শুনিয়া সে উতালা হইয়া বাহির হইয়াছিল, সে সুর ছিল জ্বালাময় মাদকতায় ভরা; কিন্তু এ সুর চন্দন-প্রলেপের মত স্নিগ্ধ, পুষ্পগন্ধের মত মধুর। সুর-মুগ্ধ সুর-চালিত হইয়া সে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইল, ধীরে ধীরে সম্মুখের সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া চলিল, গানের সুরের সোণার কাটিতে তাহার মন জাগিয়া উঠিল, সুর-গন্ধে উন্মনা হইয়া সে যেন কোন পুষ্পের সন্ধানে চলিয়াছে। সিঁড়ির শেষ পর্য্যন্ত উঠিয়া রাজশেখর স্তব্ধ শান্ত হইয়া দাঁড়াইল, সম্মুখে ঘরের কোণে একটি নারী চক্ষু বুজিয়া এক উর্দ্দু গান মৃদুস্বরে গাহিতেছে। সম্মুখে পাথরের জালতির ফাঁক দিয়া প্রভাতের আলো তাহার ভক্তিনত পবিত্র মুখে আসিয়া পড়িয়াছে, যেন উষার শ্বেতপদ্ম আলোর দিকে চাহিয়া প্রার্থনা করিতেছে। গানের সুর রাজশেখরকে চিরকাল মত্ত করিয়া তোলে, সঙ্গীত সুধার জন্য তাহার হৃদয় চির-তৃষিত, কিন্তু এ ঈশ্বর-বন্দনায় গানের মধুর সুরে সে শান্ত তৃপ্ত হইয়া দাঁড়াইল; নারীকে সে চিরকাল মোহিনী, আলেয়ার আলো রূপে দেখিয়াছে, নারীর এ রূপের সম্মুখে সে মাথা নত করিয়া প্রার্থনা-বেদনা-মণ্ডিত ভক্তি-উজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার সম্মুখে যেন কোন নব-জগতের রহস্যময় পট উদ্ঘাটিত হইয়া গিয়াছে।

পিছন হইতে কে শেখরের হাত টানিল, চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, দুইটি জ্বলন্ত চোখ তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। এ নারীর মুখও ত ওই প্রার্থনারতা ভক্তিমতীর মত কোমল সুকুমার; কিন্তু যেন কিসের ব্যথায় এ ক্ষুব্ধ, ইহার চোখে কিসের আগুন জ্বলিতেছে। ইরাণী নর্ত্তকীর দিকে চাহিয়া শেখর একটু অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, গত সন্ধ্যার সমস্ত ঘটনা বিদ্যুৎশিখার মত তাহাকে যেন নিমেষে দগ্ধ করিয়া গেল, সম্মুখের স্বপ্নজাল টুটিয়া গেল, নর্ত্তকী আবার তাহার হাত ধরিয়া টানিল।

বস্তুতঃ, ফতেমার এ বেদনা-জ্বালা তাহার নিজেরও সম্পূর্ণ অজানা। সে এত দিন পুরুষের ভোগবিলাসের পণ্য-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, কেহ তাহাকে ভালবাসে নাই, সে কাহাকেও ভালবাসে নাই। কিন্তু গত সন্ধ্যায় এই অজানা রহস্যময় যুবকটি তাহাকে উদ্ধার করিল, মুক্তি দিল, তার পর মৃত্যুর অতলস্নিগ্ধ অন্ধকারে ছুটিয়া চলিল। সে এই উন্মত্ত, অসহায়, জ্বরাতুর যুবকের সঙ্গ ছাড়িতে পারে নাই, মনে হইতেছে যেন তাহাকে ছাড়িতে পারিবে না। এ যুবক ত তাহাকে ক্রয় করিয়াছে, এ তাহার। সে যে আর কোন নারীর প্রতি বিমুগ্ধভাবে চাহিয়া থাকিবে, আর কাহারও গান শুনিবে, ফতেমা যেন তাহা সহিতে পারিতেছিল না। সে বুঝিতে পারিতেছিল না—তাহার মন প্রেমের আগুনে, ঈর্ষায় জ্বলিতেছে। উনি তাহাদের আশ্রয়দায়িনী হউন, উনি যদি এ যুবককে তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে চান, সে তাঁহার টুঁটি চাপিয়া ধরিবে। জোরে সে শেখরের হাত ধরিয়া টানিয়া ঘরে লইয়া গেল। শেখর কিছু বুঝিতে পারিল না, বুঝিতে চাহিল না, সে শ্রান্ত হইয়া শয্যায় গিয়া শুইল। ফতেমা তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, গান শুনবে? শিশুর মত সরল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া শেখর কিছু বলিতে পারিল না। ফতেমা একটি গজল গাহিতে আরম্ভ করিল। শেখরের চোখে ভজন-সুর-দীপ্ত একখানি পবিত্র মুখ ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

শিরিণ গান শেষ করিয়া ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতে সুরু করিল। প্রতি সকালেই সে আল্লার নাম গান করে ; কিন্তু আজ সে বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করিতেছিল, তাহার দাদার জন্য তাহার মন বড় বিচলিত ছিল। গত বৎসর শত্রুরা তাহার দাদাকে গুপ্তহত্যা করার চেষ্টা করে। তার পর শিরিণকে জোর করিয়া এক লম্পট ওমারের সহিত বিবাহ দিবার চক্রান্ত হয়। তখন তাহারা দু'জন ছদ্মবেশে দিল্লী হইতে পলায়ন করে। ভারতের নানা স্থান ঘুরিয়া আবার তাহারা দিল্লীতে ফিরিয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও ছদ্মবেশে লুকাইয়া বাস করিতেছে। হয়ত দাদাকে আলি মহম্মদ বলিয়া কেহ চিনিতে পারিয়াছে, তাঁহার আবার কোন বিপদ হইয়াছে, এই ভাবিয়া শিরিণ চিন্তিত ছিল। সে প্রার্থনা করিতেছিল, আল্লা, আমাদের মনে তুমি যে স্বপ্ন জাগাও, তুমি তা সফল কর না কেন, যে সব সৎ ইচ্ছা দাও, তা পূর্ণ করবার শক্তি দাও না কেন, কেন তোমার পৃথিবীতে এত দুঃখ এত দ্বন্দ্ব এত অশান্তি ? প্রেম দাও, আমাদের প্রত্যেকের মনে তুমি প্রেম দাও—

তাহার চোখ দিয়া অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, সে আবার এক হিন্দি ভজন গাহিতে আরম্ভ করিয়া তাহার ব্যথাভারাক্রান্ত মন একটু শান্ত করিতে চেষ্টা করিল। সে দুর্ব্বলা বন্দিনী নারী, তাহার দাদার উদ্যমে, দাদার বিপদে কি সাহায্য করিতে পারে। ভগবানের নাম গান করিয়া সে দাদার স্বপ্ন সফল করিবে, এই তাহার আশা।

হায় আশার স্বপ্ন! এই স্বপ্নে মাতোয়ারা হইয়া এ পৃথিবীতে প্রতিজন আপন আপন জীবনের গল্পজাল বুনিতেছে। এ গল্পটিতেও সকলে স্বপ্নের ঘোরে চলিয়াছে— আলি মহম্মদ ভাবিতেছে, হয়ত সে এক দিন ভারতের সকল জাতি মিলাইয়া এক শান্তির সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারিবে। ওই ত নাদির, খোরাসনের এক দরিদ্র দরজীর পুত্র, পারস্যের সিংহাসনে বসিয়াছে। শঙ্কর ভাবিতেছে, তাহার বিদ্যাবুদ্ধি রাজনৈতিক প্রতিভা দিয়া সে এক নবশক্তি নবরাজ্য গড়িবে। ওই ত রামদাস, ওই ত গুরু গোবিন্দ নব নব শক্তির সৃষ্টি করিলেন! যমুনা স্পষ্ট কিছু ভাবিতেছে না, একটি তরুণ সুন্দর মুখের স্বপ্নে তাহার মন রঙীন, যাহা সুদূর যাহা অসম্ভব তাহারি স্বপ্ন তাহাকে মুগ্ধ চঞ্চল করিতেছে।

শিরিণ নিজের জন্য কিছু চাহিতেছে না বটে, সে সুখ ঐশ্বর্য্য চায় না ; সে শুধু আল্লার চরণে পড়িয়া থাকিতে চায়, কিন্তু তাহার দাদার স্বপ্নমরীচিকায় সেও দিশাহারা, তাহার দাদার উদ্যম সফল হোক ওই তাহার প্রার্থনা। নর্ত্তকী ফতেমা, সেও ভাবিতেছে স্রোতের ফুলের মত আর তাহাকে গৃহহারা ঘুরিতে হইবে না, হয়ত শান্তির প্রেমের আশ্রয় সে পাইল। বাইজী জামেলা, সেও ভাবিতেছে, তাহার শূন্য জীবন হয়ত চিরকাল এম্নি শূন্য চিরতৃষ্ণা-জ্বালাময় থাকিবে না, কোন শুভ প্রভাতে কোন প্রেমিক পুরুষের চরণপাতে পুষ্পময় হইয়া উঠিবে।

আর রাজশেখর, সে ত জীবনভারে শ্রান্ত হইয়া মরিতে গিয়াছিল, আবার কেন আশার স্বপ্নে সে বাঁচিতে চায় ; চরিত্রহীন লম্পট যুবক যখন কোন সতী সাধ্বীকে ভালবাসে, তাহার কাম-পঙ্কিলতার অন্ধকারে সেই প্রেম প্রদীপের শিখায় সে একটি আনন্দ-পথ দেখিতে পায়, সে বোঝে সে কাহারও প্রেমের যোগ্য নয়, তবু মনে আশা জাগে, শান্তি আসে। রাজশেখরও তাই ভাবিতেছিল, এ পৃথিবীতে এমন সুন্দর স্বর এমন পবিত্র মুখ এমন সেবিকা নারী আছে, আবার নতুন জীবন আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করে। তাহার মন যে কি চাহিতেছিল, তাহা সে নিজেও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, আবার জীবনের অজানা তৃষ্ণা জাগিয়া উঠিয়াছে। ফতেমার যখন গান শেষ হইল, শেখর ধীরে শয্যা হইতে উঠিল। প্রার্থনারতার মূর্ত্তি আবার সে দেখিতে চায়, অশ্রুসজল করুণ সুর আর একটু শুনিতে চায়। ধীরে সে ঘর হইতে বাহির হইল, ফতেমা তাহাকে বাধা দিল না, তাহার পেছন পেছন চলিল। সিঁড়ির কাছে আসিয়া শেখর আবার দাঁড়াইল, এ ত কামের আহ্বান নয়, এ তার আত্মার জাগরণ, লালসাকলুষিত হইয়া সে ত নারীর পবিত্র মন্দিরে যাইতে পারিবে না, ওই তরুণী যে ঘরে থাকে যে পথ দিয়া চলে যেখানে গান গায়, সব পবিত্র, সেখানে তাহার যাইবার অধিকার নাই। তাহার এই নবজাগ্রত মন তাহার গতজীবনের মানুষটিকে ঘৃণা করিতে লাগিল। করুণ চোখে সে ফতেমার ঈর্ষা-ব্যথিত মুখের দিকে চাহিল। ফতেমা চমকিয়া উঠিতে শেখর মুখ ঘুরাইয়া দেখিল, সিঁড়ির ওপর তাহার দেবী শুভ্রবসনমণ্ডিতা স্বপ্নের মত

দাঁড়াইয়া। সে চাহিয়া থাকিতে পারিল না, ধীরে মাথা নত করিয়া ফতেমার দিকে চাহিল। এ মুখও সহসা যেন বদলাইয়া গেল, সে কি নবদৃষ্টি লাভ করিয়াছে! এ লালসাজ্বালাময় মুখের মধ্যে কল্যাণী নারীকে স্নেহময়ী সেবিকাকে দেখিতে পাইল, তাহার দেবীর কল্যাণ-জ্যোতি ইহার ওপরও আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাকে সে সত্যরূপে পাইল।

স্বপ্ন মিলাইয়া গেল। ধীরে ফতেমার হাত ধরিয়া শেখর বাহিরের দরজার দিকে চলিল। যে খোজা ভৃত্যেরা গতরাত্রে তাহাকে লইয়া আসিয়াছিল, তাহারা তাহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

সম্মুখে নীল যমুনা কলোচ্ছ্বাসে বহিয়া যাইতেছে, সম্মুখে অজানা দীর্ঘ জীবনপথ। প্রভাতালোকে যমুনাতীরে ফতেমার পাশে দাঁড়াইয়া শেখরের মনে হইল, এ নর্ত্তকী সখীর হাতে ধরিয়া সম্মুখের পথ দিয়া সে আনন্দে চলিয়া যাইবে, এই ভগ্নভ্রষ্ট জীবন এক কল্যাণী নারীর হাতে দিয়া সে শান্তি পাইবে, সে আবার সুখ-জীবনের স্বপ্ন দেখিল।

সহধর্ম্মিণী, না দাসী?

বর বিবাহ করিতে যাইতেছেন। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, কি আন্‌তে যাচ্ছ?" বড়দিদি বলিয়া দিলেন, "বল, মা, তোমার দাসী আন্‌তে যাচ্ছি।" বর উত্তর করিলেন, "তোমার দাসী আন্‌তে যাচ্ছি।"

শিল্পী—শ্রীমণীন্দ্রনাথ বাগ

বঙ্গীয় কাউন্সিলের নির্ব্বাচিত সদস্যগণ

(দ্বিতীয় পর্য্যায়)

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ

শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়, বাঁকুড়া

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বাগচি, মালদহ

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, মৈমনসিংহ

শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ দে, চুঁচুড়া

খাঁ বাহাদুর মৌলবী মুসরফ হোসেন, জলপাইগুড়ি

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, বর্দ্ধমান

শ্রীযুক্ত শৈলজানাথ রায় চৌধুরী, খুলনা

শ্রীযুক্ত সুদর্শন চক্রবর্ত্তী, রাজসাহী

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায়, ২৪ পরগণা
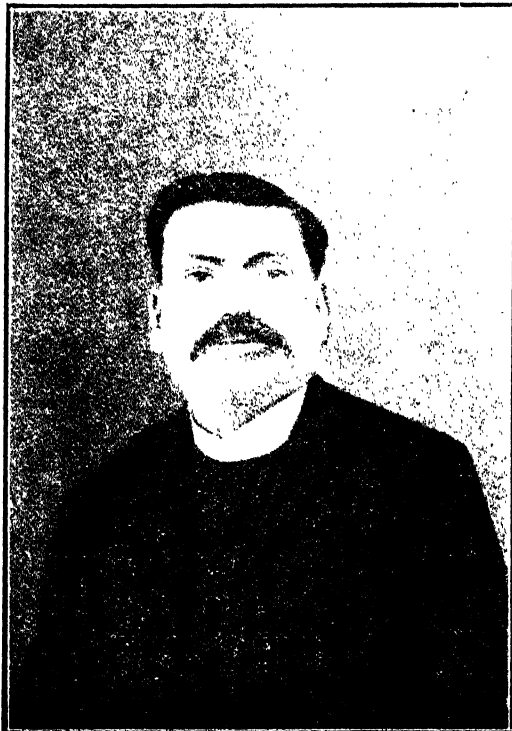
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হাবড়া

মহারাজ-কুমার শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী, মুর্শিদাবাদ

ইঙ্গিত

শ্রীবিশ্বকর্ম্মা

ধাতুশিল্প

পিতলের চাদর হইতে ডাইসের সাহায্যে গোল চাকতি কাটিয়া চারিটী ছিদ্র করিয়া এবং মাঝখানটি গভীর করিয়া ইজেরের বোতাম প্রস্তুত করিবার কথা পূর্ব্বে একবার হইয়া গিয়াছে। ঐ পিতলের চাদর হইতে ঐরূপ ডাইসের সাহায্যে আরও অনেক জিনিস আপনারা তৈয়ার করিতে পারিবেন। পিতলের মুখওয়ালা ও চিমনীযুক্ত দেওয়ালে আটকানো টীনের ল্যাম্প আজকাল প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থ ঘরেই দুইচারিটা করিয়া পাওয়া যায়ই। এইরূপ একটী আলো লইয়া তাহার গঠনপ্রণালী লক্ষ্য করিয়া দেখুন। আলোটির যে অংশ টীনের, সেটী টীনের চাদর হইতে এখানে প্রস্তুত হইতেছে। এই টীনের খোলটি কয়েকটি অংশে বিভক্ত। এক একটী অংশ এক এক আকারের ডাইসের সাহায্যে কাটিয়া কলে মুড়িয়া ঝাল দিয়া টীনের খোলটি প্রস্তুত হয়। এই ডাইস ও তাহার কল হাতেই চলে। একেবারে কয়েকখানি টীন উপরি উপরি রাখিয়া কলের ভিতর ফেলিয়া punch করিয়া লওয়া হয়। তার পর সেগুলিকে ঝাল দিয়া জুড়িয়া লওয়া হয়। এই আলোর পিতলের মুখগুলি এখনও বিদেশ হইতে আসে। কিন্তু পিতলের চাদরও যখন আমদানী হয়, তখন ডাইসের সাহায্যে এটীও এখানে তৈয়ার করিয়া লওয়া যায়। পিতলের মুখটির এক প্রান্ত টীনের খোলটির সঙ্গে ঝাল দিয়া জুড়িয়া দেওয়া হয়। এইরূপ মুখ রাধাবাজারে, এবং সহরের নানা স্থানে মনোহারী দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়। এই রকম মুখ আমি আপনাদের এখানে তৈয়ার করিয়া দিতে বলিতেছি।

দুই একটী এই রকম মুখ বাজার হইতে কিনিয়া আনুন; আনিয়া বেশ করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখুন, উহার গঠন কি রকম। দেখিবেন, উহার প্রধানতঃ দুইটী অংশ আছে। সেই দুইটী অংশ প্যাঁচ দিয়া পরস্পরের সঙ্গে জোড়া যায়, আবার খোলা যায়। এই দুইটী অংশের মধ্যে একটী অংশ টীনের খোলের সঙ্গে ঝাল দিয়া জোড়া থাকে। অপর অংশটীতে পলিতা পরাইয়া, খোলের ভিতর কেরোসিন তেল ঢালিয়া প্যাঁচ কসিয়া দিলেই আলোটী সম্পূর্ণ হইল। যে অংশটী খোলের সঙ্গে ঝাল দিয়া জোড়া থাকে, সেটী একটী ডাইসের সাহায্যে প্রস্তুত হইবে। এটী একটী অখণ্ড অংশ। অপর অংশটি আবার আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত। কিন্তু সেই সকল খণ্ড পরস্পরের সঙ্গে জুড়িবার জন্য কোথাও ঝাল দিতে হয় না। আর এখানে ঝাল দেওয়া চলেও না; কারণ, ল্যাম্প জ্বালিলে এটী এমন উত্তপ্ত হইয়া উঠে যে, ঝাল গলিয়া গিয়া জোড় খুলিয়া যাইতে পারে। সেইজন্য এই ছোট ছোট অংশগুলি এমন কৌশলে ডাইসের সাহায্যে কাটা হয় যে, সেগুলি কেবলমাত্র মুড়িয়া (বিনা ঝালে) পরস্পরের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া যায়। মুখটির অংশগুলির জোড় খুলিয়া একটু মনোযোগ দিয়া দেখিলেই আপনারা সেই কৌশলটি বুঝিতে পারিবেন।

এখন, একটী মুখের সকল জোড় একখানি ছুরীর সাহায্যে খুলিয়া ফেলিয়া খণ্ডগুলি বিচ্ছিন্ন করুন। তার পর দেখুন, সেইগুলি প্রস্তুত করিতে কয়খানি কি কি রকমের ডাইস দরকার। খণ্ডগুলি আলাদা করিলে দেখিবেন, সমস্ত অংশই ডাইসের সাহায্যে প্রস্তুত হইতে পারিবে। এমন কি, পলিতা উস্কাইবার স্ক্রুটি পর্য্যন্ত। স্ক্রুটি যদি ডাইসের সাহায্যে প্রস্তুত করিবার সুবিধা না হয়, তবে উহা ঢালাই করিয়াও লইতে পারা যায়। তবে সকল অংশ একই পিতলের চাদরে প্রস্তুত হইবে না। দুই তিন রকম বেধের পিতলের চাদর দরকার হইবে।

টীনের ভিন্ন ভিন্ন বেধের চাদর আমদানি হয়; পিতলেরও ভিন্ন ভিন্ন বেধের চাদর আমদানি হয়। টীনের চাদর হইতে যেমন খোলটি প্রস্তুত হইতেছে, আমার মনে

হয়, পিতলের চাদর হইতে সেইরূপ মুখটিও এখানে তৈয়ার করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আরও একটী নূতন industryর পথ এ দেশে খুলিয়া যাইবে। আপনারা দেখিবেন, একটু চেষ্টা করিলেই এইটী তৈয়ার করিয়া লওয়া যায়; ইহা একটুও অসম্ভব ব্যাপার নহে। ইহার জন্য খুব দামী ও খুব জটিল কল-কব্জার দরকার হইবে না; দু' দশ লাখ মূলধনও দরকার হইবে না। কল-কব্জাগুলি বোধ হয় বাজারে পাওয়া যায়; কেন না, সে রকম অনেক কল অন্য উদ্দেশ্যে বাজারে চলিতেছে। যদি না পাওয়া যায়, তবে যে কোন কারখানায় (workshop এ) উহা অর্ডার দিয়া তৈয়ার করিয়া লওয়া যাইবে। কারখানায় গিয়া আপনার উদ্দেশ্যের কথা বুঝাইয়া বলিলেই কারখানাওয়ালারা আপনাকে যথামূল্যে কল তৈয়ার করিয়া দিবে।

টীনের জার্ম্মাণ খেলানা

মুর্গিহাটা, রাধাবাজার এবং অধিকাংশ সাধারণ মনোহারী দোকানে জার্ম্মাণী হইতে আমদানি বিবিধ মনোহর টীনের খেলানা পাওয়া যায়। কলের গাড়ী (রেলওয়ে ট্রেণ, এঞ্জিন বাদে), মোটর, এরোপ্লেন, মানুষ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি অনেক রকম সুন্দর সুন্দর টীনের খেলানা জার্ম্মাণী হইতে আমদানি হইয়া এদেশে খুব বিক্রী হয়। জিনিসগুলি খুব সুন্দর দেখিতে ও খুব মজবুত বলিয়া তাহাদের দামও খুব বেশী। তাহাদের ক্রেতারও অভাব নাই। ইহাদের প্রচুর আমদানিই তাহার প্রমাণ।

রাধাবাজার হইতে কতকগুলি এইরূপ খেলানা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন; দেখিবেন, ইহাদের অনেকগুলি অংশ আছে। সেগুলি ঝাল দিয়া জোড়া হয় না, মুড়িয়া জুড়িয়া দেওয়া হয়। জোড়গুলি খুলিয়া অংশগুলি স্বতন্ত্র করিলে দেখিবেন, পূর্ব্বোক্ত চিমনীর ল্যাম্পের পিতলের মুখের মত, এগুলিও পূর্ব্বোক্ত যন্ত্র ও ভিন্ন ভিন্ন আকারের ডাইসের সাহায্যে প্রস্তুত হইতে পারে।

কিন্তু ইহাদের রং দিয়া সজ্জিত করা একটু কঠিন। রং খুব বিচিত্র ও উজ্জ্বল হওয়া চাই; এবং খুব সতর্কতা ও কৌশল সহকারে রং লাগানো চাই। এই রং বোধ হয় ছাপা যাইতে পারে। এবং টীনের উপর ছাপিবার কারখানাও বেলেঘাটায় খোলা হইয়াছে। মোট কথা, ছেলেমেয়েরা ইহার খরিদদার। তাহারা প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ রং দেখিয়া ভুলিবে, এবং কিনিতে চাহিবে। তার পর ইহার অন্য গুণের বিচার করিবে।

আর এক রকম খেলানা

শিশুদের ক্রীড়নক নির্ম্মাণ শিল্পে জাপান দেখিতেছি যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। সেদিন এক ফেরিওয়ালার কাছে দুই একটা নূতন রকমের খেলানা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। সে খেলানাগুলি দেখিলেই জাপানী হাতের শিল্প কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। খেলানাগুলি বিশেষ কিছু নয়—একটী কুকুর ও একটী কাঠের হাত-পা-ওয়ালা বানর। কাঠের উপর লোমযুক্ত কোন পশুর কাঁচা চামড়া লাগাইয়া পুতুলগুলি প্রস্তুত হইয়াছে। সেগুলি দেখিতেও খুব সুন্দর এবং লোমগুলি ও চামড়া অতি নরম। সে কোন পশুর চামড়া ও লোম তাহা আমি ঠাহর করিতে পারিলাম না। লোমশ কুকুর এদেশেও তৈয়ার হয়, এবং এক পয়সায় একটী বিক্রী হয়। ভেড়ার লোম দিয়া বোধ হয় সে কুকুরগুলি প্রস্তুত হয়। কিন্তু তাহা দেখিতে তাদৃশ সুন্দর নহে। কিন্তু এই জাপানী পুতুলগুলি দেখিতে এমন সুন্দর যে তাহা দেখিয়াই আমার এবং আরও দুই একজন পথিকের কিনিতে লোভ হইল। কিন্তু দাম শুনিয়াই চক্ষু স্থির। এক একটী ছয় আনা। পাঁচ আনায় কমে সে কিছুতেই তাহা বিক্রী করিবে না। তাই দিয়াই দুইটা কেনা হইল। পুতুলগুলি দেখিতে যেমন সুন্দর, তেমন মজবুত বলিয়া বোধ হইল না। ছেলেদের হাতে পড়িলে তাহাদের পুতুল লীলার অবসান হইতে এক দণ্ডও লাগিবে না। অথচ পুতুলগুলি দেখিতে এমন সুন্দর যে, কম মজবুত হইলেও, এ দেশে ঐরূপ উচ্চ মূল্যে তাহাদের খরিদদারের অভাব হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

আমাদের দেশেও ত অনেক রকম জীব জন্তু আছে। তাহাদের লোম ও চর্ম্ম শিল্পে প্রয়োগ করিতে পারা যায় কি না, তাহা দেখা উচিত। যাঁহারা জীবহিংসায় নারাজ, তাঁহাদের অবশ্য এ অনুরোধ করা চলে না। কিন্তু যাঁহাদের জীবহিংসায় কোন আপত্তি নাই, তাঁহারা

স্বচ্ছন্দে এ বিষয়ে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিতে পারেন। আর একটা কথা মনে রাখিবেন, জাপানীরা প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। অথচ, তাহারাই পশু লোম ও পশুচর্ম্ম হইতে খেলানা প্রস্তুত করিয়া এ দেশে পাঠাইতেছে! খরগোস, গিনি পিগ, কাঠবিড়াল, বেজী, ভোঁদড়, খটাশ, প্রভৃতি জন্তুর চর্ম্ম ও লোম বোধ হয়, এইরূপ শিল্পের উপযোগী হইতে পারে। বিশেষতঃ, যে সকল প্রাণী মানুষের ক্ষতি করে, তাহাদিগকে ফাঁদ পাতিয়া ধরিয়া এই কাজে লাগাইতে পারিলে আহার ঔষধ দুইই হইবে—ক্ষতি নিবারণও হইবে, অর্থাগমও হইবে।

Paper clip

অফিস অঞ্চলে ব্যবহারের জন্য Paper clip আপনাদের নিজেদের কাছেও দুই চারিটা থাকা অসম্ভব নহে। লেখাপড়ার কাজে নিযুক্ত থাকিলে প্রায় এই জিনিসটির দরকার হয়। যখন আপনারা এই জিনিসটি ব্যবহার করেন, তখন এই জিনিস—এমন দরকারী জিনিস—এখানে তৈয়ার করিতে পারা যায় কি না, তাহা কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, ইহা তৈয়ার করা খুব কঠিন কাজ নয়। অথচ, আপনারা যাহা ব্যবহার করিতেছেন, তাহা বিদেশ হইতে আমদানী। অথচ, দেখুন, আপনারা যদি চিমনীর আলোর মুখ বা টীনের খেলানার কারখানা খোলেন, তাহা হইলে সেই কারখানাতেই সেই সকল জিনিসের সঙ্গে এটাও তৈয়ার হইতে পারিবে। যে যে যন্ত্রের সাহায্যে চিমনীর আলোর মুখ ও টীনের খেলানা তৈয়ার হইবে, তাহারই দুই একটীতে ইহারও কতক অংশ তৈয়ার হইবে। Paper clipএর কয়েকটি অংশ আছে দেখুন। প্রথমতঃ যে দুইটী আঙ্গুলের মত অংশের দ্বারা কাগজগুলিকে টিপিয়া ধরিয়া রাখিতে হয়। পিতল, টীন বা লোহার চাদর পাঞ্চ করিয়া এই দুইটী জিনিস তৈয়ার হইবে। দ্বিতীয়তঃ Springটি। ইস্পাতের তার বাজারে পাওয়া যাইবে। তাহাকে লোহার খিলের গায়ে জড়াইয়া লইলে স্প্রিং তৈয়ার হইবে। স্প্রিংটি একটী যন্ত্রের সাহায্যে তৈয়ার করিতে হইবে। এই যন্ত্রের দাম বেশী নয়, ২১।৩০ টাকার মধ্যে হওয়াই সম্ভব—যে কোন Work shopএ অর্ডার দিয়া ইহা তৈয়ার করিয়া লওয়া যায়। তার পর খিল। লোহার মোটা তার উপযুক্ত মাপে কাটিয়া লইয়া খিল তৈয়ার করিতে হইবে। তার পর অংশগুলি ঠিক ভাবে সংযুক্ত করিয়া, যাহাতে খিল হইতে অংশগুলি খুলিয়া না যায়, সেই জন্য খিলটির দুই প্রান্ত একটু একটু পিটিয়া দিতে হইবে। তার পর কার্ড বোর্ডের উপর কারখানার নাম ছাপিয়া এক ডজন হিসাবে ক্লিপ তাহাতে সেলাই করিয়া হউক অথবা রবারের সুতার দ্বারা হউক, আটকাইয়া বাজারে পাঠাইয়া দিন। একই শ্রেণীর জিনিসগুলি এক কারখানাতে তৈয়ার হইলে কাজের বিস্তর সুবিধা হইতে পারে।

ফিতা-বোনা কল।

যশোহরের চিরুণীর কারখানায় প্রতিষ্ঠাতা জাপান প্রত্যাগত বিখ্যাত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এম সি ই
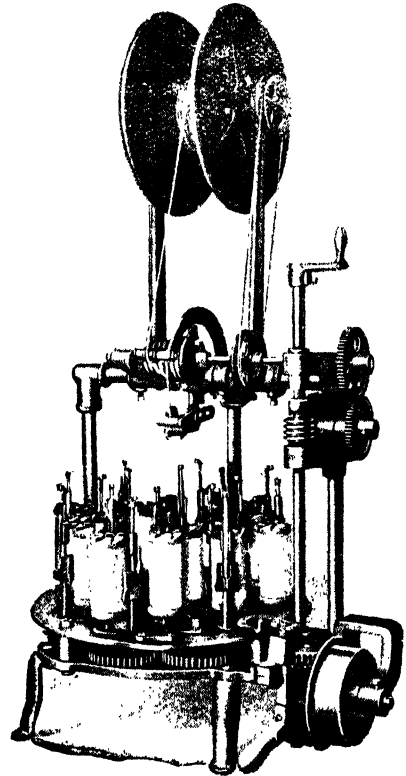
ফিতা-বোনা কল

(জাপান), এম-আর-এ-এস (লণ্ডন) মহাশয় আপনাদের সুবিধার জন্য কি ব্যবস্থা করিয়াছেন দেখুন। তিনি গৃহ

শিল্পের উপযোগী তাঁত ও অন্যান্য কম দামের ছোট ছোট কল ইয়োরোপ, আমেরিকা, জাপান হইতে আমদানী করিয়া থাকেন। সম্প্রতি তিনি ফিতা বোনা কল আনাইয়া, তাহার বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। দেখুন, আপনারা তাহা হইতে কিছু সুবিধা করিতে পারেন কি না।

জুতার, ও বুটের ফিতা, মোমবাতির ফিতা, ঘড়ির কার প্রভৃতি, আজকাল আমাদের দেশে আদৌ প্রস্তুত হয় না বলিলেই হয়। আমাদের অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতাই ইহার একমাত্র কারণ। এই সমস্ত ব্যবসায়ে যে খুব বেশী মূলধনের আবশ্যক হয় এমন নহে। এই সঙ্গে যে কলের চিত্র দেওয়া হইয়াছে, এই প্রকার কলেই উপরিউক্ত চওড়া এবং গোল সর্ব্বপ্রকার ফিতা প্রভৃতিই, সূতা, রেশম বা নকল রেশম হইতে প্রস্তুত হইতে পারে। এই কলগুলি সাধারণতঃ ছোট ইলেকট্রিক মোটর বা অয়েল ইঞ্জিনে চালাইবার উপযোগী করিয়াই প্রস্তুত করা হয়। এক ঘোড়া (1 H. P.) ইঞ্জিনে এইরূপ ৫টী কল চলে। এত কম Power আবশ্যক হয় বলিয়া ইচ্ছা করিলে এই কল হাতে চালাইবার বন্দোবস্তও করিয়া লওয়া যায়, অবশ্য তাহাতে কলের কার্য্য অপেক্ষাকৃত কম হয়। এঞ্জিনে চালাইলে ফিতার বিভিন্নতা অনুযায়ী একটী কলে, দৈনিক ৮ ঘণ্টায় ৮০০ হইতে ১০০০ ফিট ফিতা প্রস্তুত করা যায়। একটা কলে একই মাপের ফিতা প্রস্তুত হয়। তবে একটু স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিয়া লইলে একই কলে চওড়া এবং গোলফিতা তৈয়ারী করা চলে। জুতার ফিতা সাধারণতঃ দুই প্রকার হয়। "ডারবী সু" প্রভৃতিতে যে ফিতা ব্যবহৃত হয়, উহাতে ৬৫টী সূতা থাকে এবং তাহা প্রস্তুত করিতে হইলে ৬৫ ববিণযুক্ত কল আবশ্যক। অপেক্ষাকৃত সরু আর এক প্রকার ফিতা আছে, তাহাতে ৪৯টী সূতা থাকে। উহা ৪৯ ববিণ যুক্ত কলে প্রস্তুত হয়। এই দুই প্রকার কলের দাম যথাক্রমে ৭৫০৲ এবং ৬৫০৲ টাকা মাত্র।

বাজারে যে বুটজুতার ফিতা বিক্রয় হয়, উহাতে সাধারণতঃ ২৪টী সূতা থাকে। ঐরূপ গোলফিতা প্রস্তুত করিতে ২৪ ববিণযুক্ত কল আবশ্যক। উহার মূল্য ২৭৫৲ টাকা মাত্র। এতদ্ব্যতীত জুতার ফিতার অগ্রভাগে যে টীনের পাত দ্বারা আটকান থাকে, উহা লাগাইবার জন্য একটী "টিপিং" মেশিন আবশ্যক। ইহা পায়ে চলে এবং ইহার দ্বারা ঘণ্টায় প্রায় ৫ গ্রোস ফিতায় টীনের বা পিতলের পাত লাগাইয়া লওয়া যায়। ইহার মূল্য মাত্র ১৮৫৲ টাকা।

ফিতায় লাগাইবার উপযোগী পাত এখানে কাটিয়া করিয়া লওয়া যায়, অথবা বিদেশ হইতেও আনাইয়া লওয়া যায়। প্রতি পাউণ্ড প্রায় ৪৲ টাকা খরচ পড়ে।

একই প্রকার মেসিনেই অন্য অনেক প্রকার ফিতা, ঘড়ির কার প্রভৃতি প্রস্তুত করা যায়। জুতার ফিতা প্রস্তুত করিতে কিরূপ খরচ পড়িতে পারে, তাহার একটা মোটামুটী হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

২০০ জোড়া বুটের ফিতা প্রস্তুত করিতে হইলে সূতা ছিঁড়িয়া যাওয়া ইত্যাদি কারণে নষ্ট হওয়া সমেত—

৩ পাউণ্ড—প্রতি পাউণ্ড ১৷৷০ হিঃ—৪৷৷০

টীনের পাত অর্দ্ধ পাউণ্ড—প্রতি পাউণ্ড ৪৲ টাকা হিঃ—২৲

মজুরী—২ জন লোক—দৈনিক ১৲ টাকা হিঃ—২৲

প্যাকিং ও অন্যান্য ব্যয় ৷৷০

মোট ৯৲

২০০ জোড়া ফিতা—পাইকারি হিসাবে প্রতি জোড়া ৴০ আনা করিয়া বিক্রয় করিলেও ন্যূনকল্পে ১২৷৷০ টাকার বিক্রয় হইবে। তাহাতে মোট লাভ দৈনিক—অন্ততঃ ৩৷৷০ থাকিতে পারে।

আবহাওয়া

হোদি জাতি।—সমগ্র ময়মনসিংহ জেলায় হোদী জাতির সংখ্যা ২২২৪৬ জন। ইহারা অশিক্ষিত ও নিরীহ। বহু দিন যাবৎ ইহারা জমিদার ও হিন্দুজাতির দ্বারা নির্য্যাতিত হইয়া আসিতেছে। হিন্দু সমাজ হইতে এইরূপে ঘৃণ্য ও পরিত্যক্ত হওয়ায় ইহাদের মধ্য হইতে বহু লোক খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে এবং হইতেছে।

টাঙ্গাইলের উপকণ্ঠস্থ আশকপুর গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদের হাত হইতে উঁহাদিগকে রক্ষা করিতে গিয়া নানা রূপে লাঞ্ছিত ও নির্য্যাতিত হইয়াছেন। অদূরদর্শী, কর্ম্মে শক্তিহীন কতকগুলি লোক, কেদার বাবু স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া এই কার্য্যে গিয়াছেন অজুহাতে তাঁহার আরব্ধ কার্য্যে বাধা দিয়া হিন্দু সমাজের কি ক্ষতি করিয়াছেন, তাহা কি তাঁহারা একবার চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন বা চিন্তা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন?

আজ এই জাতিটাকে গ্রাস করিবার জন্য মুসলমান সম্প্রদায় তাঁহাদের সম্পাদিত কাগজে কি ভীষণ আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন, উক্ত হোদী সুহৃদগণ একবার ঐ সমস্ত কাগজ পড়িতেছেন কি? পড়িয়া থাকিলেও আজ আর বন্ধু হইবার ইচ্ছা রাখেন না, কারণ এ স্থান বড় ভয়ানক।

আমরা টাঙ্গাইলের "হিন্দু সংরক্ষিণী" সভাকে অনুরোধ করি, সময় থাকিতে তথায় প্রচারক পাঠাইয়া যাহাতে জাতিটা আমাদের মধ্য হইতে বাহির হইয়া না যাইতে পারে তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

জামালপুর ও সেরপুরবাসী হিন্দু সমাজরক্ষক বন্ধু যাঁহারা আছেন, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারাও যেন এই জাতিটা যাহাতে রক্ষা পায়, হিন্দু সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া যাইতে না পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখেন। হিন্দু দিন দিন যেরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে ঐরূপ একটী জনবহুল সম্প্রদায়কে আমাদের তাচ্ছিল্যে—ঔদাসীন্যে বিচারহীন রক্ষণশীলতার ভণ্ডামিতে যদি পর করিয়া দিই, তবে ইহার অধিক দুর্ভাগ্য আমাদের আর কি হইতে পারে?

(টাঙ্গাইল হিতৈষী)

কলিকাতায় কুষ্ঠ রোগী।—কলিকাতার রাজপথে যেখানে সেখানে কুষ্ঠরোগ সংক্রান্ত বহু লোককে অসহায় অবস্থায় দেখা যায়। ইহাদিগকে কোনরূপ সাহায্য করা যায় কি না, তৎসম্বন্ধে সে দিন কলিকাতায় রোটারী ক্লাবের এক সভায় আলোচনা হইয়াছিল। ডাক্তার মুর, ডাক্তার হোমস এবং শ্রীযুক্ত পি এ সেনের সমবায়ে কুষ্ঠ সমস্যা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে একটা সব কমিটি গঠিত হইয়াছিল। এই সাব কমিটির তদন্তের ফলও সভায় বিবেচিত হয় এবং স্থির হয় যে, কলিকাতা সহরের জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সমূহের নিকট কুষ্ঠ সমস্যার সমাধান কল্পে সাহায্যের জন্য আবেদন করা হইবে। স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ ডবলিউ এইচ ফেলপস্‌ ডাক্তার মুর প্রভৃতি সভায় উপস্থিত ছিলেন। স্যর সুরেন্দ্রনাথ বলেন, প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টরের পরিদর্শন উপলক্ষে কলিকাতায় অধিবাসীবর্গ আলোক সজ্জা প্রভৃতির জন্য ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু তিনি টাউন হলে এক সভা করিয়া কলিকাতার কুষ্ঠ সমস্যা সম্বন্ধে বলেন এবং প্রিন্সের পরিদর্শনের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একটী কুষ্ঠ আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য উহা হইতে পঁচিশ হাজার টাকা মঞ্জুর করাইয়া লন। তাহার পর কুষ্ঠ আইন হয়। স্বায়ত্ত-শাসন-বিভাগের মন্ত্রীরূপে তিনি মেদিনীপুরে একটী কুষ্ঠ চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য ৫০,০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু গবর্ণমেন্টের অর্থাভাবে সে টাকা প্রদত্ত হয় নাই। কলিকাতা কর্পোরেশনের হেলথ কমিটির অন্যতম সদস্য মিঃ ডবলিউ এইচ ফেলপস বলেন, কমিটি কুষ্ঠ সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, কিন্তু অর্থাভাবে পদে পদে বাধা পাইতেছেন। তিনি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণের মঙ্গলের জন্য জোর প্রচার-কার্য্য চালাইতে এবং একটী ফণ্ড খুলিতে বলেন। রোটারী ক্লাবের অন্যতম সভ্য মিঃ হয়লক বলেন, কুষ্ঠ চিকিৎসালয় খুলিবার জন্য গবরমেন্টের টাকা মঞ্জুরীতে ব্যয় সঙ্কোচ কমিটির কুড়ুল পড়িয়াছে। কুষ্ঠ সমস্যার সমাধান জন্য বহু লক্ষ টাকার প্রয়োজন এবং কলিকাতার সমুদায় জনহিতকর প্রতিষ্ঠানকে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত রোগীদের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিতে হইবে। রোটারী ক্লাবের অন্যতম সদস্য মিঃ হবস্‌ প্রস্তাব করেন যে, কর্তৃপক্ষের নিকট কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের একটী ডেপুটেশন প্রেরণ করিতে হইবে। আলোচনার উপসংহারে সভাপতি মিঃ ডবলিউ রীড বলেন, কলিকাতার কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ভিক্ষুকগণের সমস্যা সমাধানের জন্যও কিছু করা অত্যাবশ্যক।

(নায়ক)

বাংলার খাদি কর্ম্মীর জ্ঞাতব্য বিষয়।—বীজ সমেত তুলার নাম কাপাস। কাপাস কথার ইংরাজী নাই। ইংরাজী ভাষাতেও এখন কাপাস কথাটী বীজ সমেত তুলা অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র কাপাস কথাটী প্রচলিত। জাত অনুসারে কাপাস হইতে উৎপন্ন তুলা বেশী কম হয়। বাংলা দেশের গাছ কাপাসে চারি ভাগের একভাগ তুলা পাওয়া যায়। জটা কাপাস এবং বুড়ী কাপাস বা দেব কাপাস হইতে কখন এক চতুর্থ কখনও তদপেক্ষা কম হয়। বাংলার ক্ষেত কাপাস কয়েক রকম চলিত আছে। চট্টগ্রামে যে কাপাস হয় তাহাতে এক মণ হইতে বোলসের অথবা /২।০ সেরে এক সের তুলা হয়। কুমিল্লা জাত কাপাসেও ঐ প্রকার। ভারতবর্ষের অন্যত্র হইতে বীজ আনাইয়া বাংলায় যে কাপাস উৎপন্ন করা হইতেছে, উহা হইতে

এক মণে ৩৩ সের তুলা হয়। গারো কাপাসের জাত অনুসারে একমণ কাপাস হইতে ১৬ সের হইতে ২০ সের পর্য্যন্ত তুলা হয়। ব্যবসায়ের জন্য কাপাস বাংলা দেশে এক চট্টগ্রাম ও কুমিল্লাতেই পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ময়মনসিংহ জেলার উত্তরস্থ গারো পাহাড়ে কাপাস জন্মে, তাহাও বাংলাদেশের উপর দিয়া রপ্তানী হয়। অনেক লক্ষ টাকার কাপাস এই সকল বাজারে প্রতিবৎসর কেনা বেচা হয় এবং সমস্তটাই রপ্তানী হইয়া থাকে। বাংলার অন্যান্য জেলায় এবং অজ্ঞাত পল্লীতেও তুলার চাষ এখনও আছে এবং হইতেছে; কিন্তু কাপাসের বড় ব্যবসাদারেরা সেখানে নাই। সে সকল স্থান সম্বন্ধে অল্প সংবাদই সাধারণে পরিজ্ঞাত আছে। ইংরাজী ১৮৬২ সালে প্রকাশিত "কটন হ্যাণ্ডবুক" নামক পুস্তকে বাংলাদেশে ঐ সময় কোন জেলায় কত তুলার চাষ হইত তাহার বিবরণ আছে। যে সকল স্থানে তুলার চাষ ছিল, এখন নষ্ট হইয়াছে অথবা উঠিয়া গিয়াছে, চেষ্টা করিলে, সেই সেই স্থানে পুনরায় তুলার চাষ আরব্ধ হইয়া বাংলার পল্লীতে খাদি প্রচলনের পথ সুগম হইতে পারে।

গারো কাপাস।—এই বৎসর কয়েকজন খাদি কর্ম্মী যাহাতে সময় থাকিতে বাংলার খাদির জন্য কিছু কাপাস কিনিয়া রাখা যায় সে চেষ্টা করিয়াছিলেন। খাদি প্রতিষ্ঠান হইতে কয়েক শত মণ গারো কাপাস জোগাড় করা হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীরে রউমারী ষ্টিমার ষ্টেশন। সেই স্থান হইতে প্রায় সাত মাইল দূরে মাণিকারচর গ্রাম অবস্থিত। মাণিকারচরেই গারো কাপাসের বাজার। কয়েকটী বিভিন্ন স্থান হইতে মাণিকারচরে কাপাস আইসে; যথা:—গারোবাদা রাজবালা, দামালগিরি এবং তুরা। তুরের কাপাস এই অঞ্চলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। উহার আঁশ ভাল এবং তুলা বেশী হয়। তুরা পাহাড় তিন হাজার ফিট উচ্চ। তুরায় সপ্তাহে একবার হাট বসে। তুরা পাহাড়ে দালাল এবং ব্যাপারীরাই গিয়া থাকেন। মাণিকারচর হইতে সেখানে ৩২ মাইল পার্ব্বত্য পথে তুরায় যাইতে হয়। গারোরা তুলা লইয়া আসে। নভেম্বরের মধ্যভাগ হইতে ডিসেম্বরের শেষ এই ছয় সপ্তাহে ছয়টী হাটে তুলার কাজ শেষ হয়। ডিসেম্বরের পর নিকৃষ্ট তুলা অল্প পরিমাণে আমদানী হইতে থাকে। এই ব্যবসায় সম্পূর্ণরূপেই ইংরাজ ক্রেতা মাড়োয়ারী মধ্যবর্ত্তী ব্যাপারী এবং দালালের হাতে। বাঙ্গালীর স্থান নাই বলিলেই চলে। গারো কাপাসের এক মণ হইতে আধমণ তুলা হয়।

ডলাই।—মাণিকারচর এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে অনেক কেরকী প্রচলিত আছে। তাহা দ্বারা কাপাস ডলাই করা হয়। আমেদাবাদ সত্যাগ্রহাশ্রমে এক প্রকার কেরকী ব্যবহৃত হয়। উহাতে একটী লোহার রোলার আছে। সমস্ত দিনে ৬ হইতে ৮ সের গারো কাপাস এই কেরকীতে ভাঙ্গা যায়। দুই প্রকার কেরকীই খাদি প্রতিষ্ঠানে বিক্রয়ার্থ আছে। ছোটর দাম ১।০ পাঁচসিকা, বড়র দাম ১০৲ টাকা। ডলাই করিবার পূর্ব্বে কাপাস রৌদ্রে দিয়া বাছিয়া লইতে হইবে। দাগী ও অপুষ্ট বীজযুক্ত কাপাস সহজেই ধরা যায়। উহা বাছিয়া পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে। তিন দিন রৌদ্রে দিয়া কাপাস ডলাই করিতে হইবে। কেরকীটীও রৌদ্রে তপ্ত থাকিলে কাজ ভাল হয়। রৌদ্রে দেওয়া আছে এমন কাপাস রৌদ্রে রাখিয়া তপ্ত কেরকীতে ডলাই করা বিধেয়। ঠাণ্ডা হইলে বা সেঁতিয়া গেলে বীজ রোলারের চাপে ভাঙ্গিয়া যায়। ভাঙ্গা বীজসহ তুলা সর্ব্বকর্ম্মের পক্ষে নিকৃষ্ট। যাহাতে ডলাই করিবার সময় বীজ না ভাঙ্গে সেদিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। অপুষ্ট ও কীটদষ্ট বীজ রৌদ্রে দিলে ও ডলাই করিবার সময় কিছু ভাঙ্গিবে। এইজন্য তুলার নিকৃষ্টাংশ বাছিয়া স্বতন্ত্রভাবে ডলাই করা আবশ্যক। নিকৃষ্ট তুলা সূতা কাটার জন্য ব্যবহার না করিয়া অন্য কাজে ব্যবহারের জন্য বিক্রয় করা ভাল।

কাপাস এবং তুলার মূল্য।—খদ্দর উৎপাদনের নিমিত্ত যে তুলা আবশ্যক,তাহা দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। বাংলার যে সকল স্থলে চরকা চলিতেছে,সেই সকল স্থলে তুলার অভাবে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় যে তুলার মূল্য৪০৲টাকা মণ ছিল,এ বৎসর তাহার মূল্য ৬০৲ টাকারও অধিক। এই দর পাইকারী। আজকাল চরকায় সূতা কাটা যায় এমন তুলা পৌনে দুই হইতে দুই টাকা সের হিসাবে খুচরা বিক্রয় হইতেছে। ঐ দরে তুলা কিনিয়া সূতা কাটিলে সূতা এবং তদুৎপন্ন খাদির মূল্য অত্যন্ত বেশী পড়িবে। কোন কোন স্থলে মজুরী না দিয়া, দেড় সের তুলা দিয়া একসের সূতা লইবার প্রথা আছে। সে স্থলে একসের সূতার দাম প্রায় পৌনে দুই টাকা পড়িয়া যায়। খাদি প্রতিষ্ঠান হইতে কেবলমাত্র চরকার সূতা কাটার জন্য গারো কাপাস বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মূল্য এক মণ কাপাস ২৪৲চব্বিশ টাকা। অন্যত্রও কাপাস কিনিবার ব্যবস্থা হইতেছে। যদি কম মূল্যে কেনা যায়, খাদিকর্ম্মীরা তাহার সুবিধা পাইবেন।

খাদি প্রতিষ্ঠান।—খাদি সম্বন্ধে কাহারও কিছু জ্ঞাতব্য থাকিলে খাদি প্রতিষ্ঠানে অনুসন্ধান করিবেন। খাদি প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা:—৩১ নং চড়কডাঙ্গা রোড, নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা। ফোন নং ৩১৪ বড়বাজার। টেলিগ্রামের ঠিকানা:—"খাদিস্থান"

(আলোক)

বয়ন বার্ত্তা।—১৯২৩ সালের জুলাই মাসে ভারতীয় কল সমূহে উৎপন্ন সূতার পরিমাণ ২,৫০,০০০০০ পাউণ্ড এবং বস্ত্রের পরিমাণ ৩৪০০০০০০ পাউণ্ড। গত বৎসর ঐ মাসে এই হিসাবে যথাক্রমে ছিল ২৯০০০,০০ পাউণ্ড এবং ৩৩০০০,০০০ পাউণ্ড—অর্থাৎ তুলনায় বুঝা যাইতেছে—সূতার উৎপাদন শত করা ৬ পাউণ্ড কমিয়াছে, এবং বস্ত্রের পরিমাণ ২ পাউণ্ড বাড়িয়াছে। ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯২৩ সালের জুলাই পর্য্যন্ত ১১ মাসে সূতা প্রস্তুত হইয়াছে ৬১৩০০০,০০ পাউণ্ড এবং বস্ত্র হইয়াছে ৩৬৬০০০,০০ পাউণ্ড—তৎপূর্ব্ব বৎসরে ঐ সময়ের হিসাব হইতেছে যথাক্রমে ৬৪০০০,০০ পাউণ্ড ও ৩৬৬০০০,০০০ পাউণ্ড। ১৯২৩ এপ্রিল হইতে জুলাই পর্য্যন্ত ব্রিটিশ ভারত হইতে রপ্তানি ভারতীয় সূতার পরিমাণ—১৪০০০,০০ পাউণ্ড পূর্ব্ব বৎসরের হিসাবে উহা ছিল ২৫০০০,০০০। ঐ জুলাই মাসের মধ্যে

সরু মোটা ও মধ্য ভারতীয় সূতা যেমন হইয়াছে পাঁচ কোটী পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড, তেমনি বিদেশ হইতে আমদানি সূতা হইতেছে ২ কোটি ৮ লক্ষ পাউণ্ড। ভারতীয় কলে প্রস্তুত বয়ন পণ্যের মূল্যের এইরূপ অনুপাত পাওয়া যায়—৪,৪৩ লক্ষ টাকা (জুলাই ১৯২৩) ও ৪,৯১ লক্ষ টাকা ও ১৯২৩ সালে হইয়াছে ৪,০৬ লক্ষ টাকা এই সমস্ত জিনিষের উপর আদায় শুল্ক ২২ সালে ১০ লক্ষ টাকা ও ২৩ সালে ১৪ লক্ষ টাকা জানা যায়।

গত ১লা জুলাই হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত নিখিল-ভারতীয় খদ্দর বিভাগের আয় ও ব্যয় গত বৎসরের তহবিল ৬৭৩০৮৪৵৭ পাই, খদ্দর তহবিল ১০৫৭৲২ পাই, দালালী ৩৩৮৶৫ পাই, অগ্রিম দাদন আদায় ২৩৯৫/৯ পাই ; মোট ৫৮৩২২৪৷৭ পাই। ব্যয় খদ্দর উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে ধার দেওয়া যায় (কেবল ১০০০০৲ বিহার ৫০০০৲) মোট ১৫০০০৲। সাধারণ বিভাগের ব্যয় ৩৪৩৵৬ পাই, খদ্দর তৈয়ার বিভাগের ব্যয় ৩১০০৲ খদ্দর ফিরির খরচ ১৬২০৶ মজুদ মাল ১৮৬।০ ; অগ্রিম দাদন ৬৪৬৯৸/৫ পাই, মজুত তহবিল ৫৫৬০৯০৸৶৮ পাই, মোট ৫৮৩২২৪৷৭ পাই।

(নবসঙ্ঘ)

বাঙ্গালীর জীবনী-শক্তি।—বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য-বিভাগে ডিরেক্টর ডাঃ বেণ্টলী, ১৯২১ ও ১৯২২ খৃষ্টাব্দের স্বাস্থ্যবিবরণীর সার সংগ্রহ করিয়া একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তিকায় বাঙ্গালাদেশের গত কয়েক বৎসরের শিশু-মৃত্যু, কৌমার মৃত্যু ও প্রসূতি মৃত্যু সম্বন্ধে যে তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে বাঙ্গালী জাতির জীবনীশক্তি নানা দিক দিয়া ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে, দারিদ্র্য, ব্যাধি ও অকাল মৃত্যুতে মিলিয়া বাঙ্গালী জাতিকে দ্রুত ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে। বোধ হয় অনেকেই শুনিয়া চমকিত হইবেন যে, বাঙ্গালী বালক-বালিকাদের শতকরা ৫০ জন আট বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে মারা যায় এবং মাত্র শতকরা ২৫ জন, ৪০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পৌঁছায়। ১৯১৮—২০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালাদেশে কৌমার মৃত্যুর সংখ্যা এত বেশী হইয়াছিল যে, তাহার ফলে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে বালক-বালিকাদের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। জীবনীশক্তি-ক্ষয়ের ফলে, জাতির জন্মের হারও অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। এই দুই কারণে ১০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে বালক-বালিকাদের সংখ্যা যত ছিল, তাহা অপেক্ষা এখন অনেক হ্রাস হইয়াছে :—

বয়স	১৯১১	১৯২১	শতকরা হ্রাস
১ বৎসরের কম	১৪২৬৪১৬	১৩৭০০৬৬	—৩৯৫
১—৫	৫ ১২২০৬	৪৬০৬৪৬১	—৮০৫।

বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন বয়সের স্ত্রী-পুরুষের মৃত্যুর হারের তুলনা করিলে অনেক রহস্য প্রকাশ পাইবে—

১৯২১ খৃষ্টাব্দ—হাজারকরা মৃত্যুর হার।

বয়স	পুরুষ	স্ত্রী
১ বৎসরের নীচে	২১১'৪	২০০'৫
১—৫	৪০'৪	৩৬'৯
৫—১০	১৭'০	১৪'৫
১০—১৫	১২'৬	১১'৯
১৫—২০	১৭'৫	২০'০
২০—৩০	১১'৯	২১'৯
৩০—৪০	২২ ৭	২৩'২
৪০—৫০	২৮'৮	২৬ ৬
৫০—৬০	৪৩'৮	৩৯ ৭
৬০ এর উপরে	৮৪'৬	৭৪'৮

ঐ তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, প্রায় সকল বয়সের পুরুষের মৃত্যুর হার স্ত্রীলোকের মৃত্যুর হারের তুলনায় বেশী;—কেবল ১৫—৪০ এই বয়সের মধ্যে স্ত্রীলোকদের মৃত্যুর হার পুরুষদের চেয়ে বেশী। বলা বাহুল্য, এই বয়সেই স্ত্রীলোকেরা সন্তানের জননী হইয়া থাকেন।

প্রসূতির মৃত্যু

অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে, বাঙ্গালাদেশে প্রসূতি মৃত্যুর সংখ্যাও ভয়াবহ। মোটের উপর সন্তান-প্রসবক্ষমা স্ত্রীলোকদের মধ্যে শতকরা ৮ হইতে ১০ জনের মৃত্যু সন্তান প্রসবের ফলেই ঘটিয়া থাকে। মৃত-প্রসূতিদের মধ্যে, শতকরা ৫০ জনের বয়স ১৫ বৎসরের নীচে, শতকরা ৫০ হইতে ৬০ জনের বয়স ১৫ হইতে ২০ এর মধ্যে, শতকরা ৩৩ জনের বয়স ২০ হইতে ৩০এর মধ্যে এবং শতকরা ৩ হইতে ৫ জনের বয়স ৪০এর উপর। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের হিসাব ধরিলে মোটের উপর প্রায় ৬০ হাজার স্ত্রীলোকের মৃত্যু সন্তান প্রসব করিতে গিয়াই ঘটিয়াছে। যাহাকে সাধারণ ভাষায় সূতিকারোগ বলে, তার ফলে এইরূপে কত বালিকা ও যুবতীর যে অকাল-মৃত্যু হইতেছে, তাহা ভাবিলে মন বিষাদে ভরিয়া উঠে। অকাল-মাতৃত্ব, ধাত্রীবিদ্যার অনভিজ্ঞতা, চিকিৎসা ও শুশ্রূষার অভাব, দারিদ্র্য তথা পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবই যে এই সকল শোচনীয় অকালমৃত্যুর কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শিশু-মৃত্যু

১৯২১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালাদেশে মোট ২৬৮১৬২ জন শিশুর মৃত্যু হইয়াছিল। গত কয়েক বৎসরের শিশু-মৃত্যু হারের তুলনামূলক একটা তালিকা নীচে দেওয়া গেল :—

	জন্মসংখ্যা	হাজারকরা মৃত্যুর হার।
১৯১৭	১৬২৭৮৭৩	১৮৫
১৯১৮	১৪৮৯১৩৫	২২৮
১৯১৯	১২৪৫৩৯২	২২৮
১৯২০	১৩৫৯৯১৩	২০৭
১৯২১	১৩০১০০১	২০৬

এই তালিকা হইতে দেখা যায় যে, ১৯২১ খৃষ্টাব্দে, পূর্ব্ব তিন বৎসর অপেক্ষা শিশু মৃত্যুর হার একটু কম হইয়াছে। কিন্তু ডাক্তার বেণ্টলী বলিতেছেন যে, ইহা প্রধানতঃ জন্ম-সংখ্যা হ্রাসের ফলেই ঘটিয়াছে।

কেন না, যদিও ১৯১৯ ও ১৯২০ খৃষ্টাব্দ অপেক্ষা শিশু-মৃত্যুর হার ১৯২১ খৃষ্টাব্দে শতকরা ৯০ভাগ কমিয়াছে, তবুও ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তুলনায় শিশু-মৃত্যুর হার এখনও শতকরা ১২ ভাগ বেশী। ডাঃ বেণ্টলী আরও বলেন যে, তালিকায় যে শিশুমৃত্যুর হার ধরা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গলার শিশু-মৃত্যুর হার তার চেয়ে বেশী,—বোধ হয় হাজারকরা ১৯০ হইতে ২৫০এর মধ্যে। স্থল বিশেষে এই হার ৭০০ পর্য্যন্ত উঠিতে দেখা গিয়াছে। জন্ম-সময়ের বিকলতা দোষে প্রায় শতকরা ৫০ জন শিশুর মৃত্যু হয় এবং এক ধনুষ্টঙ্কারেই শতকরা ১১·৪ জন শিশু মরে। এই হিসাব অনুসারে ১৯২১ খৃষ্টাব্দেই ধনুষ্টঙ্কার রোগে প্রায় ৩০ হাজার শিশু বাঙ্গালাদেশে মরিয়াছে। বাঙ্গালাদেশের সমগ্র মৃত্যু-সংখ্যার তুলনায় শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা শতকরা প্রায় ২৯ ভাগ!

বাঙ্গলার কোন্ বিভাগে শিশু-মৃত্যুর হার কত, তাহার একটা তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

শিশু-মৃত্যুর হার

বিভাগ	হাজার করা মৃত্যুর হার	বাঙ্গালার সমগ্র মৃত্যু-সংখ্যার তুলনায় শতকরা শিশু-মৃত্যুর অনুপাত	প্রতি বিভাগে সমগ্র শিশু-মৃত্যুর অংশ শতকরা
বর্দ্ধমান	২২০	১৮৪	১৮৬
প্রেসিডেন্সী	২১৮	১৮ ৪	১৮ ৬
রাজসাহী	২১০	২০·৩	২৫ ৬
ঢাকা	২০৬	১৯·৮	২৬·৪
চট্টগ্রাম	১৪৯	১১·১	৮৬

বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগ সর্ব্বাপেক্ষা ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ও অস্বাস্থ্যকর, সুতরাং এই দুই বিভাগের শিশু-মৃত্যুর হার বেশী। কিন্তু বাঙ্গলার সমগ্র মৃত্যুর হারের তুলনায় শতকরা শিশু-মৃত্যুর অনুপাত ঐ দুই বিভাগে অপেক্ষাকৃত কম। ডাঃ বেণ্টলী বলেন, ইহার দুইটী কারণ আছে—প্রথম, ঐ দুই বিভাগে জন্ম-সংখ্যার হ্রাস; দ্বিতীয়, বঙ্গের বাহির হইতে এই অঞ্চলে বৎসর বৎসর নূতন লোকের আমদানী।

বিভিন্ন বয়সের শিশুদের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা শতকরা কত, তাহারও একটা তালিকা দেওয়া যাইতে পারে।

বিভাগ	এক মাসের কম বয়সের	ছয় মাসের কম বয়সের	৬ হইতে ১২ মাস বয়সের
বর্দ্ধমান	৫১·৮	৩৬·৯	২১·২
প্রেসিডেন্সী	৪০·০	৩৭·৮	২২·১
রাজসাহী	৩১·৪	৩৬·৫	২৪·১
ঢাকা	৩৫·৮	৪৫·৮	১৯·০
চট্টগ্রাম	৩৫·২	৪২·৯	২১·৮

উপরের তালিকায় দেখা যায় যে, বর্দ্ধমান, প্রেসিডেন্সী ও রাজসাহী বিভাগে একমাসের কম বয়সের শিশুদের মধ্যেই মৃত্যুসংখ্যা বেশী এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে ৬মাসের ঊর্দ্ধ বয়সের শিশুদের মধ্যেই মৃত্যু-সংখ্যা বেশী; অথচ ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগই সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর স্থান। ইহার কারণ নির্ণয় করিতে যাইয়া ডাঃ বেণ্টলী বলেন,—প্রেসিডেন্সী, বর্দ্ধমান ও রাজসাহী বিভাগের অস্বাস্থ্যকর স্থানে রুগ্ন প্রসূতিদের দোষে অধিকাংশ শিশু জন্মগ্রহণ মাত্রই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়; সেই জন্যই ঐ অঞ্চলে ১ মাসের অনধিক শিশুদের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা বেশী।

বাঙ্গলার সহরগুলির মধ্যে রাজধানী কলিকাতাতেই শিশু-মৃত্যুর হার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী—হাজার করা ৩৩১। অন্যান্য সহরের নমুনা এই;—নদীয়া—২৫৫, বীরভূম—২৪৬, রাজসাহী—২৪৫, বর্দ্ধমান—২৩৭, বাঁকুড়া—২২৯, দিনাজপুর—২২৭, ফরিদপুর—২২৭, বগুড়া-২২৪।

কৌমার মৃত্যু

১ বৎসর হইতে ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কৌমার কাল ধরা যাইতে পারে (বালক-বালিকা উভয়ের)। বাঙ্গলাদেশে এই কৌমার মৃত্যুর হারও অত্যধিক, এমন কি এক হিসাবে শিশু-মৃত্যু অপেক্ষাও উদ্বেগের কারণ। সমগ্র মৃত্যু-সংখ্যার মধ্যে শতকরা ২৬ ভাগ বালকদের ও শতকরা ২৫·১ ভাগ হইয়াছে বালিকাদের মৃত্যু। নীচে বাঙ্গলার কৌমার মৃত্যুর একটী তালিকা দিলাম:—

শতকরা কৌমার মৃত্যুর অনুপাত

১—১৫ বৎসর বয়স

বিভাগ	বালক	বালিকা
বর্দ্ধমান	১৯·৪	১৯·২
প্রেসিডেন্সী	২৪·৩	২৪·০
রাজসাহী	২৭·৫	২৬·৫
ঢাকা	৩০·৩	২৮·৪
চট্টগ্রাম	২৮·২	২৮·৪

বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী সর্ব্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর হইলেও এখানে বালক-বালিকাদের মৃত্যুর অনুপাত কম। তাহার কারণ এই অঞ্চলে জন্মসংখ্যার হ্রাস ও অ-বাঙ্গালীদের আমদানী। ঢাকা ও চট্টগ্রামে লোকদের উৎপাদিকা শক্তি বেশী; সুতরাং লোকসংখ্যার তুলনায় বালক-বালিকাদের মৃত্যুর অনুপাতও বেশী হইয়াছে।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের স্বাস্থ্য বিভাগের প্রদত্ত হিসাব হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, কি শিশু মৃত্যু, কি কৌমার মৃত্যু, কি প্রসূতি মৃত্যু—সব দিক দিয়াই বাঙ্গালী জাতির অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাঁহাদের কিছুমাত্র চিন্তাশক্তি আছে এবং স্বজাতির কল্যাণের কথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও যাঁহাদের মনে উদয় হয়, তাঁহারাই বুঝিবেন, বাঙ্গালী জাতির জীবনীশক্তি কিরূপে দ্রুত ক্ষয় পাইতেছে। এই মৃত্যুর আক্রমণ রোধ করিতে না পারিলে ধরাপৃষ্ঠে আমাদের চিহ্নমাত্র থাকিবে না। শিশু ও কুমারেরাই ভবিষ্যৎ জাতির বীজ, প্রসূতিরাই জাতির জন্মদাত্রী। বাঙ্গালী জাতির ক্ষয় নিবারণ করিতে

হইলে, সকলের পূর্ব্বে শিশুমৃত্যু ও প্রসূতি মৃত্যু রোধের চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু এই শক্তিহীন, উৎসাহহীন, জীবন্মৃতবৎ জাতির কে বা কাহারা এই চেষ্টা করিবে? (আনন্দবাজার পত্রিকা)

(২)

বাঙ্গালীর জীবনী-শক্তি।—আমরা পূর্ব্ব-প্রবন্ধে ১৯২১ সালের স্বাস্থ্যবিবরণীর কথা লইয়া আলোচনা করিয়াছি। ১৯২১ সালের বিবরণে দেখা যায় যে, সমগ্র বাঙ্গালাদেশে ১৯২১ সাল অপেক্ষা মৃত্যুসংখ্যা মোটের উপর ২ লক্ষ ৩০ হাজার কমিয়াছে। কিন্তু ৬ মাসের অনধিক বয়স্ক শিশুদের মৃত্যুসংখ্যা ১৯২২ সালে আরও বাড়িয়াছে।

(১৯২২ সালের মৃত্যুর হার)

বয়স	১৯২১ সাল হইতে শতকরা হ্রাসবৃদ্ধি
এক মাসের কম	+৫·১
ছয় মাসের কম	+·৫
৬—১২ মাস	—৩৩ ৮
এক বৎসরের কম	—১১ ১
১—৫ বৎসর	—১৭·৪
৫—১০ বৎসর	—১৮·৪
১০—১৫ বৎসর	—১৩·৮
১৫—২০ বৎসর	—১৩·৪
২০—৩০ বৎসর	—১৮·০
৩০—৪০ বৎসর	—১৮·১
৪০—৫০ বৎসর	—১৮·৮
৫০—৬০ বৎসর	—১৯·৯
৬০ এর উপর	—১৭·০

এক বৎসরের অনধিক বয়স্ক শিশুদের মধ্যে, মৃত্যুসংখ্যা মোটের উপর ১৯২১ সাল হইতে শতকরা ১১·১ ভাগ কমিয়াছে এবং দশ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের শিশুদের মধ্যে, মৃত্যুসংখ্যা ১৯২১ সাল হইতে মোটের উপর শতকরা ১৮ ভাগ কমিয়াছে। কিন্তু ইহার জন্য হঠাৎ উল্লসিত হইবার কোন কারণ নাই। ডাঃ বেণ্টলী বলেন যে, এই মৃত্যুসংখ্যা হ্রাসের কারণ প্রধানতঃ দুইটী :—(১) ১৯১৭—১৯২১ এই চারি বৎসরে জন্মসংখ্যার অত্যধিক হ্রাস—তথা জাতির জীবনীশক্তি হ্রাসই ইহার কারণ। (২) ১৯১৮—১৯২০ সালে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় ১ বৎসর হইতে দশ বৎসর বয়সের বালক-বালিকাদের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা খুবই বেশী হইয়াছিল এবং তাহার ফলে ঐ বয়সের বালক-বালিকাদের সংখ্যা দেশের সর্ব্বত্র কমিয়া গিয়াছে। ১৯২২ সালে, এই দুই কারণে, দশ বৎসর পর্য্যন্ত কৌমার-মৃত্যুর হার বাঙ্গলাদেশে অপেক্ষাকৃত কম বোধ হইতেছে।

ডাঃ বেণ্টলী এই প্রসঙ্গে একটী বিস্ময়কর তথ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। বাঙ্গলার বিভিন্ন বিভাগের শিশুমৃত্যু ও কৌমারমৃত্যুর হারের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, একমাসের অনধিক বয়স্ক পর্য্যন্ত কৌমারমৃত্যুর হারের অনেকটা বিপরীত সম্বন্ধ; অর্থাৎ শিশু-মৃত্যুর হারের সঙ্গে ১ বৎসর হইতে দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কৌমার মৃত্যুর তুলনায় শিশু-মৃত্যুর হার যখন বাড়ে বা কমে, কৌমার-মৃত্যুর হার সেই অনুপাতে হ্রাস হয় বা বৃদ্ধি পায় :—

১৯২২ সাল

সমগ্র মৃত্যুসংখ্যার সঙ্গে শিশু-মৃত্যু বা কৌমারমৃত্যুর অনুপাত

বিভাগ	পুরুষ		স্ত্রী	
	১মাসের কম	১ হইতে ১০ বৎসর	১ মাসের কম	১ হইতে ১০ বৎসর
বর্দ্ধমান	১৪·১	১৯·৬	১৩·০০	১৫ ৪
প্রেসিডেন্সি	১০·২	১৭·১	৯·৫	১৮ ৭
রাজসাহী	৯·৩	২০·১	৯·১	২১·১
ঢাকা	৯·২	২৩·৮	৮·৯	২৩·২
চট্টগ্রাম	৫·৪	২৫·৮	৪·৮	২৬·২

ইহা হইতে মনে হয়, যে সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে সদ্যোজাত শিশুদের মৃত্যুসংখ্যা বাড়ে, সেই সকল অবস্থা, অধিক বয়স্ক বালক বালিকাদের বাঁচিবার পক্ষে অনুকূল। সম্ভবতঃ আর্থিক স্বচ্ছলতা ও পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা প্রভৃতি, একদিকে যেমন জন্ম-সংখ্যা এবং সঙ্গে সঙ্গে শিশুমৃত্যুর হার বৃদ্ধি করে, অন্যদিকে তেমনি কৌমার মৃত্যুর হার কমাইয়া দেয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, ১৯২২ সালে বর্দ্ধমান বিভাগে জন্মসংখ্যা বাড়িয়াছে এবং তাহার ফলে একপক্ষে এক মাসের কম বয়সের শিশুদের মৃত্যু যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে, অপর পক্ষে ১—১০ বৎসর বয়সের বালক বালিকাদের মধ্যে মৃত্যু-সংখ্যা তেমনি হ্রাস পাইয়াছে। নীচে বিভিন্ন বিভাগের কয়েকটী জেলার হিসাব হইতে আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল :—

শতকরা মৃত্যুর অনুপাত

জেলার নাম	১ মাসের কম বয়স	১—১০ বৎসর বয়স
নোয়াখালি	৫·৫	২৮·৪
চট্টগ্রাম	৫·১	২৭·৫
ফরিদপুর	৪·৫	২৬·১
বাঁকুড়া	১৭·৮	১৪·৬
বীরভূম	১৭·৭	১৫·৮
বর্দ্ধমান	১৫·৬	১৩·২

উপরের হিসাব হইতে অনুমান হয় যে, স্বাস্থ্যকর জেলা সমূহে শিশুমৃত্যুর হার কম, কিন্তু কৌমার মৃত্যুর হার বেশী; এবং অস্বাস্থ্যকর জেলা সমূহে শিশুমৃত্যুর হার যেমন বেশী, কৌমার মৃত্যুর হার তেমনই কম। যাহা হউক, বিষয়টী এত জটিল যে, এ বিষয়ে সহসা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে আরও বহু তথ্যের অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

শিশু-মৃত্যু

১৯২১ সাল অপেক্ষা ১৯২২ সালে শিশু-মৃত্যুর হার শতকরা ১১ ভাগ কমিয়াছে। ১৯১৮ সালের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যায় যে, যদিও গত ৩ বৎসরে শিশু-মৃত্যুর হার কিছু কমিয়াছে, তথাপি ১৯১৭ সালের তুলনায় এখনও উহা বেশী :—

সাল	হাজার করা শিশু-মৃত্যুর হার
১৯১৭	১৮৫
১৯১৮	২২৮
১৯১৯	২২৮
১৯২০	২০৭
১৯২১	২০৬
১৯২২	১৮৮

কিন্তু ১৯২১ সাল অপেক্ষা ১৯২২ সালে জন্মসংখ্যা শতকরা প্রায় ২২ ভাগ কম। বাঙ্গালী জাতির জীবনী-শক্তি হ্রাসের ইহা একটা প্রধান লক্ষণ।

বাঙ্গলার বিভিন্ন সহর ও জেলার শিশু-মৃত্যুর হারের তুলনা করিলে দেখা যায় যে ১৯২১ সাল অপেক্ষা ১৯২২ সালে অনেক স্থানে শিশু-মৃত্যুর হার একটু কমিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই ঘটনার আসল কারণ ১৯২১ ও ১৯২২ সালে জন্ম সংখ্যার অত্যধিক হ্রাস। নিম্নে কতকগুলি জেলার শিশু-মৃত্যু হারের তালিকা দেওয়া গেল—

জেলা	হাজারকরা শিশু-মৃত্যুর সাধারণ হার	১৯২২ সালে শিশু-মৃত্যুর হার
কলিকাতা	৩১৯	২৮৭
বীরভূম	২৮৬	২০৬
বর্দ্ধমান	২৭২	২১১
নদীয়া	২৪৬	১৯০
দিনাজপুর	২৪২	২১৩
খুলনা	২৪১	১৯৫
মুরশিদাবাদ	২৩৪	১৮৫
বাঁকুড়া	২৩৩	১৯০
হুগলী	২২৮	১৯২
বাখরগঞ্জ	২২৬	২০৬
জলপাইগুড়ি	২২৫	২০০
রাজসাহী	২২২	২১৯
মেদিনীপুর	২২০	১৭৯
রঙ্গপুর	২১৮	২২৭
বগুড়া	২১৩	২১১
হাওড়া	২১০	২০২
দার্জ্জিলিং	২০৬	২১৫
ফরিদপুর	২০৬	১৫৬
ময়মনসিংহ	১৯৩	২০৭
চব্বিশ পরগণা	১৯২	১৯৮
ঢাকা	১৯২	১৭৬
পাবনা	১৮৯	১৫৫
যশোহর	১৮০	১৬১
মালদহ	১৭৯	১৩৭
চট্টগ্রাম	১৭২	১৯০
নোয়াখালি	১৭০	১৩৫
ত্রিপুরা	১৫৯	১৩০

রঙ্গপুর, দার্জ্জিলিং, ময়মনসিংহ এবং চট্টগ্রাম,—১৯২২ সালে এই চারিটী জেলায় শিশু-মৃত্যুর হার বাড়িয়াছে।

কৌমার মৃত্যু

আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে বলিয়াছি যে, শিশুমৃত্যু অপেক্ষা কৌমার মৃত্যু এক হিসাবে অধিক আশঙ্কাজনক, কেন না ইহারাই ভবিষ্যৎ জাতি-গঠনের মূল। দুঃখের বিষয়, বাঙ্গলাদেশে কৌমার মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। ১৯২২ সালে ১—৫ বৎসর বয়সের ১৪৬৬৮২ জন, ৫—১০ বৎসর বয়সের ৯১১১২ জন, এবং ১০—১৫ বৎসর বয়সের ৫৬৬৫৪ জন বালকবালিকা মরিয়াছে; অর্থাৎ কৌমার মৃত্যুর সংখ্যা ১৯২২ সালে মোট প্রায় তিন লক্ষ! সমগ্র বাঙ্গলার মৃত্যুসংখ্যার শত-করা ২৫ ভাগই কৌমার মৃত্যু হইয়াছে। নীচে বিভিন্ন বিভাগের কৌমার মৃত্যুর একটা হিসাব দেওয়া গেল :—

সমগ্র মৃত্যুসংখ্যার তুলনায় কৌমার মৃত্যুর শতকরা

বিভাগের নাম	১৯২১	১৯২২
বর্দ্ধমান	১৯·৩	১৯·৫
প্রেসিডেন্সী	২৩·৬	২০·৪
রাজসাহী	২৬·৯	২৫·৯
ঢাকা	২৯·৪	২৮·৩
চট্টগ্রাম	২৮·২	৩০·৬

বাঙ্গলার বিভিন্ন সহরে ও জেলায় ১৯২২ সালে সমগ্র মৃত্যুসংখ্যার তুলনায় কৌমার মৃত্যুর অনুপাত (শতকরা) কিরূপ হইয়াছে, তাহার হিসাব দেখিলে ব্যাপারটী আরও স্পষ্ট হইবে :—নোয়াখালি—৩৪·১ ; চট্টগ্রাম—৩১·৩ ; ফরিদপুর—৩০·২ ; পাবনা—৩০·১ ; মালদহ—২৯ ৮; দার্জ্জিলিং—২৯ ৫ ; বগুড়া—২৮·২ ; ময়মনসিংহ—২৮·২ ; ঢাকা—২৭ ৬ বাখরগঞ্জ—২৭·৫ ; মুর্শিদাবাদ—২৭·৩ ; ত্রিপুরা—২৭·২ ; রঙ্গপুর—২৬·৫ ; ২৪ পরগণা—২৪·৫ ; রাজসাহী—২৪·০ ; দিনাজপুর—২৪·০ ; যশোহর—২৩·৮ ; নদীয়া—২০·৬ ; হাওড়া—২২·৩ ; খুলনা—২১ ৬ ; হুগলী—২০·৮ ; জলপাইগুড়ি—২০·৮ ; বীরভূম—২০·১ ; মেদিনীপুর—১৮·৯ ; বাঁকুড়া—১৮ ৫ ; বর্দ্ধমান—১৮·০ ; কলিকাতা—১৬·৭।

বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ জাতির মূল—বালক বালিকাদের মধ্যে অকাল-মৃত্যু কিরূপ ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে, উপরের তালিকা দেখিলে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। এই অকালমৃত্যু নিবারণের চেষ্টা যদি আমরা না করি, তবে আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ শোচনীয় হইয়া উঠিবে। (আনন্দবাজার পত্রিকা)

সম্পাদকের বৈঠক

প্রশ্ন

৪১। বসুদেবের আট পুত্র

বসুদেব পত্নী দেবকী যে আটটী পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন সেই পুত্র কয়েটীর নাম কি ছিল? শ্রীগোপালচন্দ্র সেন

৪২। লাঙ্গল দেয়া

যে ভিটায় বাস করা যায় সেই ভিটায় লাঙ্গল দিতে নাই কেন?

৪৩। ক্যামেরার আবিষ্কারক

ক্যামেরার আবিষ্কারক কে? তাঁহার নাম কি এবং কোন দেশের লোক। শ্রীসরযূ রায়

৪৪। "সবুজ আলু"

আলুর মধ্যে, বিশি আলুর ভিতর যে একপ্রকার সবুজ রংয়ের আলু দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ হবার কারণ কি? এবং তাহা নিবারণ করিবার উপায় কি? শ্রীশোভারাণী রায়

৪৫। ধূপ

পূজার্চ্চনায় যে ধূপ ব্যবহৃত হয় উহা প্রস্তুত করিবার কি কি প্রণালী এখনও প্রচলিত আছে? তন্মধ্যে কোন্ প্রক্রিয়া অনুসারে এখনও ভাল ধূপ অনায়াসেই প্রস্তুত করা যায়? সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ধূপেরই বা কি প্রস্তুত প্রণালী?

এখন যে সকল সুগন্ধ ধূপ "মাদ্রাজী ধূপ" নামে কলিকাতায় ব্যবহৃত হইতেছে উহা কি কি দ্রব্যে কি প্রকারে প্রস্তুত করা হয়? "জিজ্ঞাসু"

৪৬। পূজায় কলার ব্যবহার

কাঁচা কলা, জিনকলা ইত্যাদি পূজায় লাগে এবং সাধারণতঃ অন্যান্য কাজে লাগে, কিন্তু "সৌরী"কলা খাওয়া ব্যতীত কোনও দৈব বা অন্য কাজে লাগে না। ইহার তাৎপর্য্য কি?

৪৭। সমাজতত্ত্ব

অনেক সময় শুনা যায় এবং দেখিয়াছি যে ব্রাহ্মণের পৈতা হইবার পূর্ব্বে যদি পিতা বা মাতা স্বর্গগত হয়েন, তবে তাহাদের মস্তক মুণ্ডন নিষেধ। কিন্তু পিতা এবং মাতা এ পৃথিবীতে সাক্ষাৎদেবতা স্বরূপ। তাঁহাদের মৃত্যুতে মস্তক মুণ্ডনে কি দোষ আছে আমি জানিতে ইচ্ছা করি।

৪৮। কৃষিতত্ত্ব

আমাদের বাটীতে একটী নারিকেল গাছের 'লাল' নারিকেল হয়। কিন্তু তাহার সমস্ত নারিকেলই 'ঝেঁঝে' পড়ে যায়, অর্থাৎ তাহার মধ্যে নারিকেল থাকে না। যদি কেহ অনুগ্রহ পূর্ব্বক, কি উপায়ে এই গাছটীর নারিকেল ভাল করা যায় বলিয়া দেন তবে বিশেষ উপকৃত হইব। শ্রীশঙ্করাচার্য্য চক্রবর্ত্তী

৪৯। প্রবাদ-প্রসঙ্গ

১৩২২ সালের "ভারতবর্ষে" কার্ত্তিকের সংখ্যায় শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী "মেয়েদের যন্ত্র-তন্ত্র ও প্রবাদমালা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন এবং পরিশেষে বলেন যে "ডাকের কথা বা প্রবাদ-বাক্য এ পর্য্যন্ত পুঁথী কেতাবে বহুসংখ্যকই প্রকাশিত হইয়াছে।" সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার মধ্যে কেহ যদি এ সম্বন্ধে কি কি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে ও তাহাদের কি নাম এবং সেগুলি কোথায় পাওয়া যাইবে, তাহা জানান তাহা হইলে বিশেষ উপকৃত হইব। শ্রীমনোরঞ্জন অধিকারী

৫০। এণ্ডি গুটির সূতা

আমরা কতকগুলী এণ্ডি পোকার গুটী তৈয়ার করিয়াছিলাম এবং আপনাদের ভারতবর্ষের লিখিত নিয়ম অনুসারে সোডা দ্বারা সিদ্ধ করিয়া চরকায় কাটাতে সূতাই বাহির হইল না। আমাদের দেশীয় কোন একটী লোক আসামে কিছুদিন ছিল। সে বলিল কার্পাস তূলার ন্যায় ইহা ধুনিয়া লইতে হয়। এ বিষয় আমরা সঠিক খবর যাহাতে পাইতে পারি অনুগ্রহ করিয়া জানাইয়া বাধিত করিবেন। এবং এণ্ডির গুটী কোথায় কত দরে বিক্রয় হয় তাহাও জানাইবেন।

শ্রীকুমুদিনী দেবী

৫১। বৈষ্ণব-সাহিত্য

ক। শ্রীললিতা সখীর এক চক্ষু হীন (কাণা) কেন হইল? এবং কোন্ চক্ষু হীন?

খ। কোন্ সখীর বক্ষে রাধা নাম লেখা?

গ। কোন্ সখীর দক্ষিণ হস্তে রাধা নাম লেখা?

ঘ। স্ত্রী এবং পুরুষের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের স্তনের অগ্রভাগ কাল কেন? শ্রীপুলিন চন্দ্র চাকী

৫২। উত্তর শিয়রে শয়ন

উত্তর শিয়রে শয়ন করিলে নাকি স্বাস্থ্য হানি ঘটে। এতদিন এইরূপই শুনিয়া আসিতেছি। কারণ জানিতে চেষ্টা করিয়া দুইজন বহুদর্শী ডাক্তারের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, magnet ঘটিত কি ব্যাপার আছে। রোগীকে ত তার আত্মীয়-স্বজন কিছুতেই উত্তর শিয়রে শয়ন করিতে দেন না—কারণ ওটা নাকি "যম শিয়রী"।

সম্প্রতি জিজ্ঞাসিত হইয়া অনেক বিজ্ঞ কবিরাজ মহাশয়ও শয়ন অনুচিত বলিয়াই মত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু কার্ত্তিক সংখ্যা স্বাস্থ্য-সমাচারে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দাস মহাশয় লিখিয়াছেন—"Professor Le Duc states that a person should always sleep with the head towards the north, as the magnetic currents take the same direction and by doing so favourably affect the organic functions which the base of the brain presides over; and I have no doubt myself but such is the case." ইহার মীমাংসা কি?

এইরূপ উক্তির শিয়রে শয়নের ঘোর আপত্তি না করিলেও, অনেকে পশ্চিম শিয়র অপেক্ষা পূর্ব্ব শিয়রে শয়ন অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করেন। ইহারই বা কারণ কি? শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার

উত্তর

কালরাত্রি

রাজা দশরথের তিন মহিষীর মধ্যে সুমিত্রা দেবী পরমা রূপসী ছিলেন। তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া রাজা দশরথ তাঁহাকে বিবাহ করেন, এবং বিবাহের পর দিবস রাত্রিতে পত্নী সন্দর্শন ও সম্ভাষণ করেন। এই ঘটনার পর হইতেই সুমিত্রা দেবী তাঁহার বিষ-দৃষ্টিতে পড়েন। এই জন্যই বিবাহের পর দিবস রাত্রিকে লোকে কালরাত্রি বলে।

শ্রীমালতীমালা দেবী।

নীরস লেবুতে রসসঞ্চার

আমাদের একটি বাতাবী লেবু গাছের ঠিক ঐরূপ অবস্থা ছিল, অধিকন্তু তাহার কোয়াগুলির সাদা রং ছিল। কয়েক বৎসর যাবৎ তাহার গোড়ায় গোবর এবং গোয়াল-ঘর পরিষ্কার করা জঞ্জাল ফেলিতে থাকায়, উহার লেবু এখন উৎকৃষ্ট রসাল এবং কোয়াগুলি লাল বর্ণের হইতেছে। এবং একটি লিচু গাছের ফল একরূপ অখাদ্য ছিল; তাহার প্রায় শাঁস হইত না। কেবল আঁঠি এবং টক ছিল। পরে ঐরূপ গোয়াল পরিষ্কৃত জঞ্জাল ও গোবরের সার ২।৩ বৎসর দেওয়ায় সে গাছটিতেও এখন উৎকৃষ্ট লিচু হইতেছে।

পাটনাই হলুদ

পাটনাই হলুদ সম্ভবতঃ পাটনা বা বিহারাঞ্চলের আমদানি হলুদকে বলে। কিন্তু এই দেশী হলুদ ভাল দোআঁশ মাটী (যাহাতে বালির অংশ থাকে) এবং ফাঁকা জমিতে চাষ করিলে, ঐরূপই মোটা এবং সুন্দর রং হয়। আমাদের দেশে সাধারণতঃ বাগানের মধ্যে আওতায় চাষ করা হয় বলিয়া হলুদ ভাল হয় না।

কৃষিতত্ত্ব

কলমের আম গাছে পুরাতন গাছের ডাল থাকায় সেই বৎসরই প্রায় মুকুল হয়; কিন্তু ২।৩ বৎসর পর্য্যন্ত, অর্থাৎ গাছ বেশ বলবান না হওয়া পর্য্যন্ত, মুকুল ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। নচেৎ গাছ দুর্ব্বল হইয়া বাড়িবে না, বা মরিয়া যাইতে পারে। এই জন্য মুকুল ভাঙ্গার রীতি প্রচলিত। কলমের গাছে ভাল করিয়া সার জল দিবার ব্যবস্থা করিলে এবং পরিষ্কার রাখিলে সুফল হইবে। অফলা হওয়ার অন্য কারণ থাকিতে পারে।

পাঁকুই ঘা

এদেশে বর্ষাকালে কৃষকদিগের পায়ে একরূপ ঘা হইতে দেখা যায়, তাহাকে পাঁকুই পোকার ঘা বলে। তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ, মসিনার তৈল গরম করিয়া লাগান। (মসিনার তৈল Linseed oil)। ঐ তৈল ব্যবহারে নাড়া পোকার ঘাও সারিতে পারে।

৺কাশীধামে ভূমিকম্প

গত পৌষ মাসের 'ভারতবর্ষে' সম্পাদকের বৈঠকে শ্রীযুক্ত নিশাকান্ত রায় ৺কাশীধামে ভূমিকম্প হয় কি না, জানিতে চাহিয়াছেন। উত্তরে আমি জানাইতেছি, অন্ততঃ একবার হইয়াছিল, তাহা আমার জানা আছে। গত ইং ১৮৯৭ সালের জুন মাসে যে ভীষণ ভূমিকম্প হইয়াছিল সেই সময় আমার খুল্লপিতামহী কাশী হইতে আমাকে পত্র দিয়াছিলেন সে পত্র অদ্যাপি আমার নিকট আছে।

শ্রীযুক্ত তারাপদ লাহিড়ী যেরূপ আম ও টমাটোর আচার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, ঐরূপ ওলের আচার আমার খুল্লপিতামহী করিতেন। সেই সময় পত্র মধ্যে তাহার প্রস্তুত করিবার প্রণালী আমাকে দিয়াছিলেন। নিম্নে প্রস্তুত প্রণালী লিখিত হইল—

প্রথমে ওল ছাড়াইয়া পাতলা এবং ছোট ছোট করিয়া কুটিবেন। তাহার পরে কাঁচা জলে সেই কোটা ওলকে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিবেন। পরে মাটীর নূতন হাঁড়িতে সেই ওলকে সিদ্ধ করিতে দিবেন। যখন দেখিবেন, টিপিলে বেশ গলিয়া যায়, তখন তাহাকে নামাইয়া জল ঝরাইতে দিবেন। তাহার পরে সেই হাঁড়িতে ওলের পরিমাণ অনুসারে খাঁটি সরিসার তৈল জ্বালে চড়াইয়া, তৈল অল্প তাতিয়া উঠিলে, উক্ত সিদ্ধ ওল তাহাতে দিয়া কাটি দিয়া ঘন ঘন নাড়িতে থাকিবেন (তৈল খুব মৃদু জ্বালে থাকে যেন)। এইরূপে ওলগুলি বেশ ভাজা হইলে যখন ২।১ খানি ভাঙ্গিতে থাকিবে, তখন ওলের পরিমাণ অনুসারে পাকা তেঁতুল গোলা, হলুদ ও সরিসা বাটা, লবণ ও আখের গুড় দিয়া, পুনরায় কিঞ্চিৎ কাঁচা তৈল তাহাতে দিবেন। যদি ঝাল করিবার ইচ্ছা থাকে, কিঞ্চিৎ লঙ্কা-বাটা বা আস্ত লঙ্কা ছাড়িয়া দিবেন। কিছুক্ষণ পরে নামাইয়া ভাজা সরিসার গুঁড়া, ভাজা মেথির গুঁড়া, এবং ভাজা পাঁচ-ফোড়নের গুঁড়া উহার উপর দিয়া সরা ঢাকা দিয়া রাখিবেন। ২।১ দিন পরে ব্যবহার করিলে ইহা এক উপাদেয় আচার হয়।

শ্রীকালিদাস গঙ্গোপাধ্যায়

অনাদি শিবলিঙ্গ

কোন কোন পণ্ডিতের মতে পুরাণ-ভারতাদি প্রসিদ্ধ লিঙ্গ মাত্রই অনাদি। এই মতে অনাদি লিঙ্গের সংখ্যার ইয়ত্তা করা যায় না। আর যদি অনাদি শব্দের 'স্বয়ম্ভু' অর্থ লওয়া হয়, তাহা হইলেও অনাদি লিঙ্গের

সংখ্যা দ্বাদশের অধিক হইয়া পড়ে। আমার বোধ হয়, প্রশ্ন-কর্ত্তা দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের নাম, অবস্থিতি ও বিশেষত্ব জানিতে চাহিয়াছেন। অনাদি লিঙ্গ সমূহের মধ্যে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ প্রধান। সেগুলি এই :—

(১) সৌরাষ্ট্র দেশে 'সোমনাথ'। কাঠিয়াবাড় প্রদেশে জুনাগড় রাজ্যে প্রভাসক্ষেত্রে সোমনাথের মন্দির অবস্থিত। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহমুদ গজনী এই মন্দির ও লিঙ্গ ধ্বংস করেন। (২) শ্রীশৈলে 'মল্লিকার্জ্জুন'। মান্দ্রাজ প্রদেশে কৃষ্ণা জেলায় কৃষ্ণা নদীর তীরে পর্ব্বতের উপর মহাদেবের বিশাল মন্দির অবস্থিত। পথ জঙ্গলময় ও বন্য-জন্তুসঙ্কুল। (৩) উজ্জয়িনীতে 'মহাকাল'। (৪) অমরেশ্বরে 'ওঙ্কারনাথ'। মধ্যপ্রদেশে নীমার জেলার অন্তর্গত নর্ম্মদানদীর মধ্যবর্ত্তী এক দ্বীপে মন্দির অবস্থিত। (৫) হিমালয়ে 'কেদারনাথ'। (৬) ডাকিনীতে 'ভীমশঙ্কর'। দাক্ষিণাত্যবাসীদিগের মতে বোম্বাই প্রদেশে অবস্থিত। শিবপুরাণের মতে আসাম কামরূপে। (৭) বারাণসীতে 'বিশ্বেশ্বর'। (৮) গৌতমী তটে 'ত্র্যম্বক'। বোম্বাই নাসিক জেলায় গোদাবরী তটে ত্র্যম্বক গ্রামে অবস্থিত। (৯) চিতাভূমিতে 'বৈদ্যনাথ'। সাঁওতাল পরগণাস্থিত এই লিঙ্গ প্রসিদ্ধ। বোম্বাই প্রদেশে মুদ্রিত স্তোত্র গ্রন্থ সমূহে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের একটী স্তব আছে। তাহাতে 'পরল্যাং বৈদ্যনাথঞ্চ' এইরূপ লেখা আছে। সুতরাং দাক্ষিণাত্যবাসীদের মতে বৈদ্যনাথ হায়দ্রাবাদ রাজ্যে পরলী গ্রামে অবস্থিত। কিন্তু এই স্তব কোন্ গ্রন্থের, বুঝা যায় না। (১০) দারুকাবনে 'নাগেশ'। হায়দ্রাবাদ রাজ্যে স্থিত। (১১) সেতুবন্ধে 'রামেশ্বর'। (১২) শিবালয়ে 'ঘৃশ্মেশ্বর', 'ঘুস্‌ণেশ', বা 'ঘুস্রেশ্বর'। হায়দ্রাবাদ রাজ্যে দৌলতাবাদের নিকট।

জ্যোতির্লিঙ্গ সমূহের পূজায় চারি বর্ণেরই অধিকার আছে; এবং নৈবেদ্য ভোজনে পাপ নাশ হয়। নীচ জাতীয় মনুষ্যও জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনে পর জন্মে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং মৃত্যুর পর মুক্তিলাভ করে। জ্যোতির্লিঙ্গ সমূহের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য শিবপুরাণ, জ্ঞান-সংহিতায় বিশদ ভাবে বর্ণিত আছে। বোম্বাই মুদ্রিত স্তোত্র-গ্রন্থগুলিতে জ্যোতির্লিঙ্গের দুইটী স্তব আছে; তন্মধ্যে একটী অতি সুমধুর।

বসুদেব ও শৃগালী

যে কয়খানি পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্মকথা পাঠ করা গিয়াছে, সেগুলিতে শৃগালীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাই। তবে যে যে পুস্তকে জন্মাষ্টমী ব্রত-কথা দেওয়া আছে, তাহার মধ্যে কোন পুস্তকে হয় ত লেখা আছে, "ততঃ সোঽপি পুরো দৃষ্ট্বা ধাবন্তং খলু জম্বুকম্।" না হয় লেখা আছে "শিবারূপেণ গচ্ছন্তী দেবী তু যমুনাজলে"। আর এই জন্মাষ্টমী ব্রত-কথা ভবিষ্যপুরাণের বলিয়াই প্রসিদ্ধ। মূলগ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত নাই, অন্য প্রদেশে মুদ্রিত হইয়াছে কি না জানি না, সম্ভবতঃ হয় নাই। জন্মাষ্টমীব্রতকথায় এত পাঠান্তর দৃষ্ট হয় যে, মূল গ্রন্থে কি ছিল বা আছে, তাহা বুঝা দুষ্কর। শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তী

ভারতবর্ষের মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্র

গত ১৯২০-২১ সালে ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র, সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র এবং ইংরাজি ও দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল।

প্রদেশ	মুদ্রাযন্ত্রের সংখ্যা	সংবাদপত্রের সংখ্যা	সাময়িক পত্রের সংখ্যা	ইংরাজি পুস্তক	দেশীয় ভাষায়
মান্দ্রাজ	৮৭৫	২৭৭	৬৬৪	৪১৮	১৯৭৫
বোম্বাই	৬১২	১৮৬	৮২৯	১৬৩	১৩৬১
বঙ্গদেশ	৮৫২	১৪৫	২১১	৫৩১	১৮৮৫
যুক্তপ্রদেশ	৫৬৭	১২১	২৬৪	২.৩	১৮২৬
পাঞ্জাব	২৬৬	১১৬	১৬১	১৮৫	১৬৬৩
ব্রহ্মদেশ	২১২	৬২	১০০	১৪	২৯০
বিহার ও উড়িষ্যা	১৪৩	২৭	৩৫	১০৮	৭০১
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১১১	৪৭	৪	২১	৯৫
আসাম	৪১	১৩	৯	৩	২৯
উত্তর পশ্চিম সীঃ প্রঃ	২৪	১	১		
আজমীর-মাড়য়ার	১৬	৪	৩	৬	৬৩
কুর্গ	২				
দিল্লী	৭৪	১৮	১০		
মোট	৩৭৯৫	১০৯৭	২২৯৭	১৬৯০	১০১০৫

উপরের তালিকায় দৃষ্ট হইবে, ১৯২০—২১ সালে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশে বেশী সংখ্যক ইংরাজি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরাজি পুস্তক প্রকাশ ব্যতীত অন্য সকল বিষয়েই বঙ্গদেশ অন্য প্রদেশের পশ্চাতে পড়িয়া আছে। বঙ্গদেশে যত লোকের বাস, ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে তত লোকের বাস নাই। সাময়িক পত্র প্রকাশে বঙ্গদেশ তৃতীয় স্থানীয়। ভারতবর্ষের নানা ভাষায় যতগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, এক ইংরাজি ভাষায় তাহার প্রায় দেড় গুণ পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতা সহরে মুদ্রাযন্ত্র ৫২৫, দৈনিক পত্র ৩৫, দ্বিসাপ্তাহিক ৪, সাপ্তাহিক ৬১, পাক্ষিক ৫, মাসিক ১১৫, ত্রৈমাসিক ২২টি পত্র প্রকাশিত হয়। শ্রীরামানুজ কর

পেঁপে গাছে অমঙ্গল

পেঁপে গাছ ও ডালিম গাছ বাড়ীতে থাকিলে, গৃহস্থের সন্তানাদি হয় না বা অকালে মরিয়া যায়—কথাটী ঠিক নয়। কারণ আমি দেখিয়াছি—অনেক গৃহস্থের বাড়ীতে উক্ত দুই প্রকার গাছই আছে; অথচ তাহাদের সন্তানাদি যথেষ্ট ও দীর্ঘজীবী।

পাঁচথুপী

মহাত্মা বুদ্ধদেবের পঞ্চস্তূপই ছিল, এবং সেই নামানুসারে পাঁচথুপী নাম হইয়াছে। বর্ত্তমান যে ভগ্ন স্তূপ দেখা যায়, সেটাও উক্ত মহাত্মার স্তূপেরই নিদর্শন। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়

শনির স্তব

শ্রীউষারাণী ঘোষ শনির স্তব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "দশরথ কৃত শনি স্তব যেটি আছে তাহা রামায়ণের রাজা দশরথ নহে, দশরথ নামে একজন মুনি ঐ শনি স্তবটী রচনা করিয়াছিলেন।" লেখিকা দশরথের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহার প্রতিবাদ করাই আমার উদ্দেশ্য। স্কন্দ পুরাণে দশরথ কৃত শনৈশ্চর স্তব হইতে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠকগণ তাহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, লেখিকার উক্তি নিতান্তই ভিত্তিহীন।

"শ্রীকৃষ্ণ উবাচ :—রঘুবংশেঽতিবিখ্যাতো রাজা দশরথঃ পুরা
চক্রবর্ত্তী স বিজ্ঞেয়ঃ সপ্তদ্বীপাধিপোঽভবৎ।"
"এতচ্ছ্রুত্বা ততো বাক্যং মন্ত্রিভিঃ সহপার্থিবঃ
দেশশ্চ নগরগ্রামা ভয়ভীতাঃ সমন্ততঃ।"
"পপ্রচ্ছ প্রযতো রাজা বশিষ্ঠ প্রমুখান্দ্বিজান্।"
"বশিষ্ঠেনৈবমুক্তস্তু রাজা দশরথ স্বয়ম্
তদা সংচিন্ত্য মনসা সাহসং পরমং যযৌ।"
"শনৈশ্চর উবাচ :—পৌরুষং তব রাজেন্দ্র"—ইত্যাদি
"তুষ্টোঽহং তব রাজেন্দ্র! স্তোত্রেণানেন সুব্রত
দদামিতে বরং ব্রুহি স্বেচ্ছয়া রঘুনন্দন!"
"এষ দত্তো ময়া তুভ্যং বর ইক্ষ্বাকুনন্দন।"
ইত্যাদি ইত্যাদি—।

উদ্ধৃত অংশ সমূহ পাঠেও কি কাহারো সন্দেহ থাকিতে পারে যে ঐ দশরথই রামায়ণের দশরথ?

শ্রীশশীভূষণ বাগচী

বয়ন বিস্তার

উত্তরবঙ্গস্থিত পাবনা সদরে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সম্প্রতি একটী বয়ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথায় ২০।২৫টী ছাত্র গভর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত মাসিক বৃত্তিতে বয়ন বিষয়ক শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। বৃত্তির হার মাসিক ৮৲ টাকা। এতদ্ভিন্ন প্রস্তুত বস্ত্রাদি বিক্রয় করিয়া যাহা লাভ হয়, তাহা ছাত্রদেরই প্রাপ্য। উক্ত বৃত্তির টাকা হইতে মাসিক এক টাকা করিয়া কাটিয়া স্কুল ফণ্ডে জমা রাখা হয়। শিক্ষার্থীগণের শিক্ষা অন্তে, যখন তাহারা চলিয়া যাইবে, তখন ঐ টাকা দ্বারা তাহাদের প্রত্যেককে একখানি করিয়া তাঁত ও তৎসংক্রান্ত যাবতীয় সরঞ্জাম কিনিয়া দেওয়া হইবে। যাহারা তাঁত লইতে অনিচ্ছুক, তাহাদিগকে গচ্ছিত টাকাই ফেরত দেওয়া হইবে। উপরিউক্ত এক টাকা বাদে বক্রী টাকা এবং লভ্যাংশ দ্বারা ছাত্রেরা মেস্ করিয়া থাকিলে বেশ চলিয়া যায়, ও কিছু উদ্বৃত্তও থাকে। বৃত্তি পাইবার সম্ভাবনা যাহাদের নাই, তাহারা নিজ ব্যয়েও শিক্ষালাভ করিতে পারে। মেস্ করিয়া থাকিলে ৭৷৮ টাকায় চলিয়া যায়। এই স্কুলে একজন বেশ সুদক্ষ বয়ন-শিক্ষক রাখা হইয়াছে। এখানকার শিক্ষা সমাপ্ত হইলে যাহারা কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইতে পারিবে, তাহাদিগকে গবর্ণমেণ্ট হইতে বৃত্তি দিয়া শ্রীরামপুর বয়ন বিদ্যালয়ে বয়ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হইবে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানিতে হইলে উক্ত স্কুলের শিক্ষক মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিলে জানা যাইতে পারে।

পাবনা জেলাস্থিত সিরাজগঞ্জ মহকুমার এলাকাধীন স্থল গ্রামের পাকড়াশী বাবুদের উদ্যোগে তথায় একটী বয়ন-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। সেখানে ৮৷১০ খানা তাঁত চলিতেছে, এবং অনেকগুলি শিক্ষার্থী বিনা ব্যয়ে বয়ন শিক্ষা করিতেছে। দূরবর্ত্তী শিক্ষার্থিগণের জন্য উক্ত পাকড়াশী বাবুরাই আহারাদির সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া জনহিতকর কার্য্যের নিদর্শন দেখাইতেছেন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার

পিপীলিকার উৎপাত

পৌষ মাসের 'ভারতবর্ষে' এল, এম, ভাদুড়ী মহাশয় যে পিপীলিকার কথা লিখিয়াছেন, তাহা দূর করা কর্পূর, কেরোসীন ইত্যাদির কর্ম্ম নহে। যখন পিপীলিকারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতে থাকে, তখন তাহাদের গর্ত্ত দেখিয়া রাখা উচিত। বাড়ীতে যতই পিপীলিকা হউক না কেন, ৩৷৪টার বেশী গর্ত্ত থাকে না। সেই গর্ত্তে একটি খড়িকা কাঠি প্রবেশ করাইয়া দিন। তারপর ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ফিনাইল (concentrated, জলে গোলা নহে) খড়িকার গা বহাইয়া দিতে থাকুন। অর্থাৎ যে কোন প্রকারে গর্ত্তের মধ্যে খানিকটা নির্জ্জলা ফিনাইল ঢালিয়া দিন। ইহাতে এক দিনেই পিপীলিকার উপদ্রব নিবারিত হওয়া উচিত। যদি না হয়, ২।৩ দিন ধরিয়া এইরূপ করিতে থাকুন। ভাদুড়ী মহাশয়ের মত আমরাও কষ্ট ভোগ করিয়াছিলাম; কিন্তু এই উপায়ে নিস্তার পাইয়াছি।

শ্রীইন্দুকুমার রায়

সাময়িকী

অনেক কাণ্ডকারখানার পর, অনেক আলোচনার পর বাঙ্গালায় যে নূতন ব্যবস্থাপক সভা গড়িয়া উঠিয়াছে, যে ব্যবস্থাপক সভার চতুর্বিংশতি জন সদস্যের চিত্র দুই মাস ধরিয়া "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত হইল, পূর্ণোদ্যমে তাহার কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। গত ২১শে জানুয়ারী মঙ্গলবার অপরাহ্নে সেই নূতন ব্যবস্থাপক সভার প্রথম বৈঠক হয়। অধিকাংশ সদস্যই নানা বিচিত্র রকমের পোষাক পরিয়া সভায় দর্শন দিয়াছিলেন। এই দিন বিশেষ কোন কাজ হয় নাই, কেবল সদস্যগণকে শপথ গ্রহণ করানো হয়। তৎপর দিন বুধবার হইতে সভার প্রকৃত কার্য্যারম্ভ হয়। এই দিন বাঙ্গলার শাসন-কর্ত্তা লর্ড লীটন বাহাদুর সভার উদ্বোধন করেন। এতদুপলক্ষে

তিনি একটী সুদীর্ঘ অভিভাষণে বাঙ্গলায় বিপ্লববাদের পুনরাবির্ভাবের উল্লেখ করেন। বলেন, গবর্মেণ্ট কঠোর ভাবে এই বিপ্লববাদ দমন করিবেন। প্রচলিত আইনগুলি এ পক্ষে পর্য্যাপ্ত বিবেচিত না হইলে, নূতন আইন-রচনা করিয়াও বিপ্লববাদ দমন করা হইবে। বুধবার লাট বাহাদুরের বক্তৃতার পর সভার ডেপুটী প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়া সে দিনের মত সভার কার্য্য শেষ হয়।

—

পর দিন বৃহস্পতিবার পুনরায় সভার কার্য্যারম্ভ হইলে, মিঃ জে. এন, সেনগুপ্ত প্রস্তাব করেন যে, ১৮১৮ সালের তিন নং রেগুলেশন অনুসারে যাহাদিগকে আটক রাখা হইয়াছে, তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করা হউক। এই দিন প্রস্তাবটির সম্বন্ধে কোন মীমাংসা না হওয়ায় পর দিন শুক্রবার আবার প্রস্তাবটির সম্বন্ধে আলোচনা হয়। অবশেষে অনেক বাদানুবাদের পর অধিকাংশ সদস্যের ভোটের জোরে প্রস্তাবটি সভায় পাশ হইয়া যায়। এই প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইবার পর সেন গুপ্ত মহাশয় দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থাপন করেন যে, বাঙ্গলার সমস্ত রাজনীতিক বন্দীকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদান করা হউক। এ প্রস্তাবটিও অধিকাংশ সদস্যের ভোটের জোরে সভায় গৃহীত হয়।

—

তৎপরে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু তৃতীয় প্রস্তাব উপস্থাপন করেন যে, রাজদ্রোহসূচক সভাবন্ধের আইন, ভারতীয় ফৌজদারী আইন সংশোধক আইন, ১৮১৮ সালের তিন নং রেগুলেশন ও পুলিশ আইনের পঞ্চদশ ধারা তুলিয়া দেওয়া হউক। শুক্রবারে প্রস্তাবটীর সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা না হওয়ায়, সোমবারের বৈঠকে উহা পুনরায় উত্থাপিত হয়। পরে প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হইলে অধিকাংশ সদস্য ইহার সমর্থন করেন। কাজেই প্রস্তাবটি সভায় গৃহীত হয়. আগামী তিন বৎসর ধরিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য কি ভাবে চলিবে, এই কয়দিনের অধিবেশনে তাহার কতকটা আভাষ পাওয়া গেল। এই ত সবে সূচনা। ইহার পর আরও কত ব্যাপার যে দেখা যাইবে, এখন তাহার কল্পনাও করা যায় না। যাহা হউক, প্রস্তাব ত পাশ হইল; অতঃপর প্রস্তাব অনুসারে কাজ কতদূর হয়, তাহা দেখিবার জন্য দেশবাসী উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন। প্রস্তাব পাশের ফলাফল দেখিলে, শাসন-সংস্কার আইন অনুসারে আমরা কতখানি অধিকার পাইয়াছি, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝা যাইবে।

—

কলিকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের পদে আর একজন বে-সরকারী দেশীয় ভদ্রলোককে নিযুক্ত হইতে দেখিয়া আমরা যথার্থই প্রীতিলাভ করিয়াছি। স্বায়ত্ত-শাসনের ভার-প্রাপ্ত ভূতপূর্ব্ব স্বাস্থ্য-মন্ত্রী সার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিদায়ের অব্যবহিত

রায়বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিধন দত্ত (কলিকাতা কর্পোরেশনের বর্ত্তমান চেয়ারম্যান)

পূর্ব্বে রায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিধন দত্ত বাহাদুরকে কলিকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের পদে নিযুক্ত করিয়া সহরবাসীর প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই পদে রায় বাহাদুরের কার্য্যকাল তিন মাসের অধিক নহে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনাররূপে ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিধন দত্ত দেশবাসীর যথেষ্ট প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় যেরূপ যোগ্যতা সহকারে কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে, দেশীয়

যে সরকারী চেয়ারম্যানের দ্বারা কলিকাতা কর্পোরেশনের কার্য্য যে সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে, তাহা সুন্দর ভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিধন দত্ত মহাশয়ও পূর্ণ উৎসাহে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাকে এই পদে স্থায়ী হইতে দেখিলে সকলেই সুখী হইবেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশন এবার রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি রাধানগরে হইবে। মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছেন। সম্মেলনের সভাপতির পদে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বৃত হইয়াছেন। আর শাখা-সভাগুলির পদে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন; যথা, সাহিত্য-শাখা—রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, ইতিহাস-শাখা—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি-এল, বিজ্ঞান-শাখা—শ্রীযুক্ত বনওয়ারী লাল চৌধুরী ও দর্শন-শাখা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ মহাশয়। বাঙ্গলা সাহিত্য গঠনে রাজা রামমোহন রায়ের অংশ সামান্য নহে। তাঁহার জন্মভূমিতে সাহিত্য সম্মেলনের ব্যবস্থা হওয়ায় স্থান-নির্ব্বাচন উত্তম হইয়াছে বলিতে হইবে। রাধানগরের সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোক্তৃগণ—সর্ব্বাধিকারী গোষ্ঠিও বাঙ্গলা সাহিত্যের পরম অনুরাগী। অভ্যর্থনা-সমিতি, সম্মেলন ও শাখাগুলির সভাপতিত্বের ভারও যোগ্য হস্তে অর্পিত হইয়াছে। এবারকার সাহিত্য-সম্মেলনের সফলতা সম্বন্ধে আমরা পরম আশান্বিত হইয়াছি।

গত ১২ই মাঘ বাঙ্গলায় মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মদিন গিয়াছে। শত বর্ষ পূর্ব্বে ১২৩০ সালের ১২ই মাঘ বঙ্গভূমি মহাকবি মাইকেলকে ক্রোড়ে পাইয়া ধন্যা হইয়াছিলেন। এবার বাঙ্গলার নানাস্থানে মাইকেলের শত বার্ষিক জন্মতিথির উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু উৎসবের ধরণ দেখিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিতে পারি নাই। মহাকবির শত বার্ষিক জন্মোৎসব যে ভাবে সম্পন্ন হওয়া উচিত ছিল, তাহার কিছুই হয় নাই। মাইকেল জাতীয় কবি। তাঁহার শতবার্ষিক জন্মোৎসব স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন ভাবে না হইয়া, হয় সাগরদাঁড়ীতে তাঁহার জন্মক্ষেত্রে, না হয় খিদিরপুরে তাঁহার বাসস্থানে, না হয় কলিকাতায় তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে সমগ্র বাঙ্গলার সমবেত উদ্যোগে সম্পন্ন হওয়া উচিত ছিল। মাইকেলের অমিত্র ছন্দ বাঙ্গলা সাহিত্যে মাইকেলের অপূর্ব্ব দান। (সেইজন্য ইহার নামই হইয়াছে মাইকেলী ছন্দ)। ইহার সঙ্গে তুলনা করা যায়, বাঙ্গলা সাহিত্যে এমন কিছুই নাই। বাঙ্গালী জাতি সেই দানের কি উপযুক্ত প্রতিদান করিতে পারিয়াছে—কবির উপযুক্ত স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা কি করিতে পারিয়াছে? মহাকবি স্বয়ং তাঁহার কাব্যে ও খণ্ডকাব্যে পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালী কবিগণের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন; বাঙ্গালী জাতি কি কবির কাছে তাঁহাদের কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন? প্রবাস যাত্রার প্রাক্কালে কবি তাঁহার জন্মভূমির কাছে যে কবিতায় বিদায় লন, মা প্রিয় কবির এই মিনতির অপমান করেন নাই, তিনি দাসেরে মনে রাখিয়াছেন বটে, কবির মনঃ-কোকনদকে মধুহীন করেন নাই বটে, কিন্তু মায়ের সাত কোটী সন্তান কি তাঁহাদের কবি-ভ্রাতার উপযুক্ত সম্মান রাখিতে পারিয়াছেন? কবির কাব্য এখন আর তেমন পড়া হয় না; শিক্ষা-বিভাগে কবি বিস্মৃতপ্রায়; তাঁহার কাব্য ঠিক মত আবৃত্তি করিতেও অনেকে সমর্থ নহেন। কবি তাঁহার চিত্ত ফুল-বন-মধু লইয়া যে মধুচক্র রচনা করিয়াছেন, গৌড়জন আনন্দে নিরবধি সেই সুধা পান করিতেছেন বটে, কিন্তু মধুচক্রের রচয়িতার প্রতি কি তাঁহাদের কিছুই কর্ত্তব্য নাই?

বার্ষিক ও শতবার্ষিক উৎসব ত ফাঁকা আওয়াজ! বৎসরের মধ্যে এক দিন, কিম্বা শতবর্ষ পরে এক দিন জনকয়েক সাহিত্যসেবী একস্থানে সমবেত হইয়া কিছু বক্তৃতা, আবৃত্তি ও অন্যান্য অনুষ্ঠান করিয়া কবির স্মৃতি-পূজার ব্যবস্থা করিলেন,—তাহাই কি যথেষ্ট হইল? মাইকেলের সময়ে, তাঁহার সম-সাময়িকগণের মধ্যে তাঁহার কাব্য, তাঁহার নাটক, তাঁহার খণ্ডকাব্য, তাঁহার চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, তাঁহার ধর্ম্মান্তর গ্রহণ, তাঁহার সমাজ-বিরোধী আচার-অনুষ্ঠান, তাঁহার ইয়োরোপীয় পত্নী গ্রহণ, তাঁহার অখাদ্য ভোজন ও কারণ-সেবন প্রভৃতি

ব্যাপার লইয়া তাঁহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যেরূপ উত্তেজনা, আন্তরিকতা, উন্মাদনা দেখিয়াছি, এখন তাহার কিছুই দেখিতে পাই না কেন? মাইকেলের সময়ে যাঁহারা বর্ত্তমান ছিলেন, যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়াছেন, তাঁহার সহিত বন্ধুতা ও শত্রুতা করিয়া গৌরব বোধ করিয়াছেন, এমন লোকও বাঙ্গলা দেশে এখনও একেবারে দুর্লভ হয় নাই। মাইকেলের সময়কার উত্তেজনা, উন্মাদনা, সামাজিক আন্দোলনের কথা তাঁহারা একেবারে বিস্মৃত হন নাই; সে সময়কার কতক কতক কথা তাঁহারা বলিতে পারিতেন বোধ হয়। কিন্তু মাইকেলের শত বার্ষিক জন্মোৎসব যেন দৈনন্দিন গার্হস্থ্য ব্যাপারের মত নিতান্ত চুপি চুপি শেষ হইয়া গেল। দেশের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল না। মাইকেলের জন্মভূমি সাগরদাঁড়ীতে তাঁহার পৈত্রিক ভিটা ভগ্নপ্রায়। তাঁহার সমাধিক্ষেত্রে সামান্য একটী স্মৃতিচিহ্ন ছাড়া আর কিছুই নাই। তাহাও কবির উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন নয়। আমরা বলি, সমগ্র বাঙ্গলার সমবেত ভাবে মহাকবির উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করা কর্ত্তব্য। দেশ-বিদেশের লোকের কাছে সে স্মৃতিচিহ্ন যেন গৌরব করিবার উপযুক্ত হয়। তাঁহার জন্মভূমি সাগরদাঁড়ী, তাঁহার বাল্যের লীলাক্ষেত্র কপোতাক্ষ যেন তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়।

গত ১৭ই মাঘ অপরাহ্ণ-কালে সংস্কৃত কলেজের শত বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। লর্ড লীটন এই উৎসবে সভাপতির পদে বৃত হইয়াছিলেন। ইংরেজের আমলে সংস্কৃত কলেজ আধুনিক ধরণের আদি বিদ্যা-প্রতিষ্ঠান। সেই সংস্কৃত কলেজের বয়স শত বৎসর পূর্ণ হওয়া বড় সাধারণ ঘটনা নহে। সভাপতি গবর্ণর বাহাদুরও বলিয়াছেন, এক শত বৎসর অস্তিত্ব বহন করা এই বিদ্যালয়ের পক্ষে বিলক্ষণ গৌরবের বিষয়। এই সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে বাঙ্গলায় শিক্ষাসংক্রান্ত অনেক গৌরবময় স্মৃতি বিজড়িত। সাধারণ শিক্ষা-বিস্তারের উদ্দেশ্যে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্যামন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রধানতঃ সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শিক্ষার জন্যই কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সে শিক্ষার আবশ্যকতা যে এখনও বিদ্যমান, কলেজটির অস্তিত্বই তাহার প্রমাণ। মধ্যে ব্যয়সঙ্কোচের জন্য কলেজটি তুলিয়া দিবার জনরব রটিয়াছিল; কিন্তু সভাপতি মহোদয় বঙ্গবাসিগণকে আশ্বস্ত করিয়াছেন যে, কলেজটি তুলিয়া দেওয়া হইবে না; কারণ, সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এখনও অন্তর্হিত হয় নাই। এ কথায় সকলেই যে আশ্বস্ত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সংস্কৃত কলেজের পরিচালনব্যবস্থা এবং তাহার ভাবী অধ্যক্ষ নিয়োগ সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ ও আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে। সংস্কৃত কলেজটি যাহাতে সুপরিচালিত হয়, যোগ্য অধ্যক্ষের হস্তে যাহাতে ইহার ভার অর্পিত হয়, সকলেই এইরূপ ইচ্ছা করেন। এ বিষয়ে একটা সুব্যবস্থা হইলে ভাল হয়।

গত ২৭শে পৌষ (ইংরেজী ১২ই জানুয়ারী) শনিবার অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের রাজসম্মান লাভ উপলক্ষে দিল্লী-প্রবাসী বঙ্গ-সন্তানগণ মাননীয় শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ফ্লাগষ্টাফ রোডস্থ ভবনে মিত্র মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করিয়াছিলেন। উচ্চ ও নিম্ন পদস্থ সকল শ্রেণীর প্রায় সাতশত বাঙ্গালী এই সম্বর্দ্ধনা সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রবাসে এরূপ আনন্দ-সম্মিলন বড়ই সুখের, বড়ই আনন্দের কথা! গৃহস্বামী মাননীয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সমবেত সকলের যথোচিত সমাদর করিয়াছিলেন। এই সম্বর্দ্ধনা-অনুষ্ঠানের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয়—ইহা সম্পূর্ণ দেশীয় ভাবে নির্ব্বাহ হইয়াছিল। বঙ্গবাসী ছাড়া, অন্যান্য প্রদেশবাসীও নিমন্ত্রিত অভ্যাগত অতিথি রূপে সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসীর এরূপ প্রীতি-সম্মিলন, বাস্তবিকই অতি আনন্দের কথা। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সাধারণ কেরাণী রূপে কর্ম্মজীবন আরম্ভ করিয়া ১৯২০ খৃষ্টাব্দে স্থায়ী ভাবে Military Financial Adviserএর উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন। সাধারণ কেরাণী হইতে ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে এই উচ্চ পদে স্থাপিত করিয়া গবর্মেণ্ট যেমন গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাকে 'সার' উপাধিতে ভূষিত করিয়া সেইরূপ গুণের উপযুক্ত সম্মান ও সমাদরও করিয়াছেন।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও কলিকাতা হগ ষ্ট্রীটে, সমবায় ম্যান্সন্ নামক প্রকাণ্ড ভবনে ভারতীয় প্রাচ্যকলা সমিতির একটী প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। এবারকার প্রদর্শনী সমিতির পঞ্চদশ বার্ষিক প্রদর্শনী। বহু সুন্দর সুন্দর চিত্র, প্রস্তর ও কাষ্ঠের প্রতিমূর্ত্তি এই প্রদর্শনীতে সংগৃহীত হইয়াছে। বাঙ্গলার অনেক খ্যাতনামা শিল্পীর কলা-কৌশলের নিদর্শন এখানে পাওয়া যায়। কেবল যে বঙ্গদেশ হইতেই দ্রষ্টব্য চিত্রগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা নহে; বাঙ্গলার বাহিরে সুদূর প্রবাসে অবস্থিত বাঙ্গালী শিল্পীরাও এই প্রদর্শনীতে তাঁহাদের অঙ্কিত চিত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রবাসী বাঙ্গালী চিত্রকরগণের মধ্যে অন্ধ্র জাতীয় কলাশালার শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রমোদ-কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্রগুলি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে মসলিপত্তনের অন্ধ্র জাতীয় কলাশালায় কর্ত্তৃপক্ষ আধুনিক ভারতীয় শিল্পের আলোচনার জন্য উক্ত কলাশালার সংস্রবে একটী নূতন শাখা খুলিবার কল্পনা করেন, এবং শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র-নাথ ঠাকুর সি-আই-ই মহাশয়ের নিকট একজন যোগ্য শিল্পী চাহিয়া পাঠান। তদনুসারে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে এই কার্য্যের যোগ্য বিবেচনা করিয়া তাঁহাকেই নির্ব্বাচিত করেন। শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার এই ভার গ্রহণপূর্ব্বক মসলিপত্তনে গিয়া অন্ধ্র জাতীয় কলাশালার সংস্রবে নূতন ক্লাসের পত্তন করেন। এ যাবৎ তিনি সেখানে ছাত্রগণকে শিক্ষাদান কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তিনি তাঁহার ছাত্র-গণের ও তাঁহার নিজের অঙ্কিত প্রায় পঁয়ত্রিশখানি চিত্র ভারতীয় প্রাচ্যকলা-সমিতির শিল্প প্রদর্শনীতে পাঠাইয়া-ছেন। তন্মধ্যে প্রমোদকুমারের বিশ্বকর্ম্মা, মনসা, ষষ্ঠীমাতা ও শ্রীচৈতন্য—এই চারিখানি চিত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ও শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কলা নৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়া অন্ধ্র জাতীয় কলাশালার অধ্যক্ষের নিকটে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। আমরা এই তরুণ প্রবাসী বাঙ্গালী শিল্পীকে "ভারতবর্ষে"র পাঠক-পাঠিকাগণের নিকটে পরিচিত করিয়া দিতেছি।

শ্রীমতী লেডী রেডিং সাহেবার আগ্রহে গত ২৮শে জানুয়ারী হইতে এক সপ্তাহকালের জন্য কলিকাতার ইডেন গার্ডেনে একটী শিশু-মঙ্গল প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। বঙ্গের নানা স্থানে এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও ঐ সময়ে শিশু-মঙ্গল সপ্তাহের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। শিশুদিগের অকাল-মৃত্যু নিবারণ, ও তাহাদিগকে সুস্থ রাখিয়া লালন-পালন করিবার প্রণালী সম্বন্ধে প্রসূতি ও শিশুর অভি-ভাবকগণকে জ্ঞান দান করাই এইরূপ শিশু মঙ্গল সপ্তাহের ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর যত শিশুর মৃত্যু হয়, এত আর অন্য কোন দেশেই হয় না। শিশুর জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে জনকজননীগণকে কিরূপ আচারনিষ্ঠ হইয়া থাকিতে হয়, পূর্ব্বে আমাদের দেশে সে সম্বন্ধে অনেক নিয়ম ছিল। আজকাল যে কারণেই হউক, লোকে আর সেই সকল নিয়ম পালন করেন না। এ দিকে বর্ত্তমান কালে পাশ্চাত্য সমাজে শিশু-রক্ষার যে সব ব্যবস্থা আছে, তাহাও এ দেশে অবলম্বিত হইতেছে না। কাজেই, শিশুরা অবাধে ইহলোক হইতে বিদায় লইতেছে।

এ দেশে শিশু-মৃত্যুর কারণগুলি অতি স্পষ্ট। প্রধানতঃ জনক-জননীর অজ্ঞতা, ধাত্রীগণের অনভিজ্ঞতা ও শিক্ষার অভাব, খাদ্যাভাব, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, এই সকল কারণে এ দেশে অধিক সংখ্যক শিশুর মৃত্যু হয়। শিশু-মঙ্গল সপ্তাহের যদি কোথাও সার্থকতা থাকে, তবে তাহা এই ভারতবর্ষ। শুনিতে পাই, ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে ইংল্যাণ্ডেও বড় বেশী পরিমাণে শিশুদের মৃত্যু হইত। তাহা দেখিয়া সেখানকার চিকিৎসকগণ ও জনসাধারণ বিলক্ষণ বিচলিত হইয়া উঠেন। শিশু রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য তথায় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। ফলে লোকশিক্ষার জন্য শিশুমঙ্গল সপ্তাহের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। এই অল্প সময়ের মধ্যে তাহার ফলও খুব ভাল হইয়াছে, শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা খুব কমিয়া গিয়াছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। বিলাতে যে ব্যবস্থায় এমন সুফল ফলিয়াছে, সেই ব্যবস্থা যে এ দেশেও সুফলপ্রসূ হইবে, ইহাই অনেকের বিশ্বাস। লেডী রেডিং সাহেবা এতদ্দেশে শিশু-মঙ্গল সপ্তাহের প্রবর্ত্তন করায় আমরা সেইজন্য তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

কিন্তু একটী কথা আছে। বিলাতে শিশু-মঙ্গল সপ্তাহে যেরূপ সুফল প্রদান করিয়াছে, এ দেশেও যে তাহা ঠিক সেইরূপ সুফল প্রদান করিবে, সে বিষয়ে একটী প্রবল অন্তরায় রহিয়াছে। তাহার কারণ এতদ্দেশে সাধারণ শিক্ষার একান্ত অভাব। বিলাতে প্রায় সকল নরনারী এক রকম শিক্ষিত; প্রাথমিক শিক্ষা সেথানে সর্ব্বত্র বাধ্যতামূলক। শিশুমঙ্গল সপ্তাহের অনুষ্ঠানের দ্বারা যে শিক্ষাবিধানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, বিলাতের শিক্ষিত নরনারীর পক্ষে তাহার মর্ম্ম অনুধাবন করা সহজ। কিন্তু এ দেশে শতকরা ৯৫ জন লোক অশিক্ষিত। কাজেই শিশুমঙ্গল সপ্তাহের বা প্রদর্শনীর শিক্ষনীয় বিষয়গুলি অধিগত করা এ দেশের নরনারীগণের পক্ষে তাদৃশ সহজ নহে। সেইজন্য আমাদের বিশ্বাস, প্রথমে সাধারণ শিক্ষার বিস্তার না করিলে শিশুমঙ্গল সপ্তাহ এ দেশে তাদৃশ সুফলপ্রদ হইবে না। বস্তুতঃ, লোকহিতকর যে কোন অনুষ্ঠানই এ দেশে করা হউক না কেন, সাধারণ শিক্ষার অভাবে, তাহা তেমন ফলপ্রসূ হইতে পারে না। শিক্ষার অভাব হেতু পাশ্চাত্য-প্রণালীসম্মত অনেক সদনুষ্ঠান পণ্ড হইতে দেখিয়া এ্যাঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলিও মধ্যে মধ্যে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া এ দেশের লোকের মূর্খতার নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহারা কখনও সরকারকে কিম্বা দেশের লোককে শিক্ষার বিস্তৃতি সাধনের ব্যবস্থা করিবার জন্য পরামর্শ দেন না। হয় ত ভাবেন, পরামর্শ দিয়াই বা কি হইবে,—শিক্ষার বিস্তার সাধন করিতে হইলে যে অর্থের প্রয়োজন হইবে, তাহার সংস্থান হইবে কোথা হইতে? সেইজন্য তাঁহারা কেবল দেশের লোকের শিক্ষা-হীনতার নিন্দা করাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করেন।

—

বাঙ্গলা দেশে খদ্দর প্রচারের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সার শ্রীযুক্ত পি, সি, রায় মহাশয় তাঁহার আজীবনের সঞ্চয় দান করিয়াছেন। এই অর্থের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার টাকা। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু প্রমুখ তিনজন ট্রাষ্টীর হস্তে টাকাটি ন্যস্ত হইয়াছে। ইহার সুদ হইতে দেশে খদ্দর প্রচারের চেষ্টা হইবে। প্রয়োজনের পক্ষে এই টাকা হয়ত পর্য্যাপ্ত না হইতে পারে; কিন্তু এখানে টাকার পরিমাণই বড় কথা নহে—ইহাতে দাতার মহৎ হৃদয়ের যে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহাই সকলের অনুকরণযোগ্য। আজীবন-সন্ন্যাসী সার শ্রীযুক্ত পি, সি, রায় মহাশয়ের নিজের ব্যক্তিগত ব্যয় অতি সামান্য; অথচ তিনি যাহা উপার্জ্জন করেন, তাহার প্রায় সবটাই দান-ধ্যানে খরচ হইয়া যায়। তার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই তাঁহার সঞ্চয়। সেই টাকাই এতদিনে পঞ্চাশ হাজারে পরিণত হইয়াছিল। পরিণত বয়সে জীবনের একমাত্র অবলম্বন এই টাকাটিও তিনি দেশ-সেবার্থ দান করিলেন। কত বড় মহৎ হৃদয়ের পরিচয় ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা সম্যক উপলব্ধি করিয়া দেশবাসী যদি খদ্দর ব্যবহারে উৎসাহী হন, তবেই তাঁহাদের যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইবে। খদ্দরের প্রচার যেমন আবশ্যক, কাজটি সেইরূপ ব্যয়-সাধ্য। সার শ্রীযুক্ত রায় মহাশয়ের এই দান উপলক্ষ করিয়া দেশের অন্যান্য বদান্য ব্যক্তিগণ যদি তহবিলটির পুষ্টিসাধন করিয়া খদ্দর প্রচার কার্য্যে সহায়তা করেন, তাহা হইলে একটা কাজের মত কাজ করিতে পারিবেন।

—

আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট ডাক্তার টমাস উডরো উইলসন গত ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে লোকান্তরিত হইয়াছেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়; সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৬৮ বৎসর হইয়াছিল। ছাত্রাবস্থা হইতেই তিনি প্রতিভার পরিচয় দিয়া আসিতে-ছিলেন। অধ্যয়ন শেষ করিয়া কিছুদিন তিনি আইন ব্যবসায় অবলম্বন করেন; তার পর কিছুদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকতা করিয়াছিলেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তিনি নিউ জার্সির শাসনকর্ত্তা হন। তাহার দুই বৎসর পরেই তিনি যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন। তাঁহার সময়ে ইয়োরোপে মহাসমর উপস্থিত হয়। এ যাবৎ যুক্তরাষ্ট্র ইয়োরোপীয় রাজনীতি হইতে নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থান করিতেছিল। প্রেসিডেণ্ট উইলসনও সেই প্রণালীই অবলম্বন করিয়া চলিতেছিলেন। কিন্তু অবশেষে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা কল্পে তিনি ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য হন, এবং তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত চৌদ্দটি দফা শান্তি-প্রস্তাব করেন। যুদ্ধ-বিরামের পর তিনি ইয়োরোপে ভ্রমণ করিতে যান, এবং সর্ব্বত্র রাজসম্মানের সহিত গৃহীত

হন। সেই সময়ে প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় জাতি-সঙ্ঘ গঠিত হয়। সেই জাতি-সঙ্ঘ ডাক্তার উইলসনের অভিপ্রায়ানুসারে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনে নিযুক্ত আছেন।
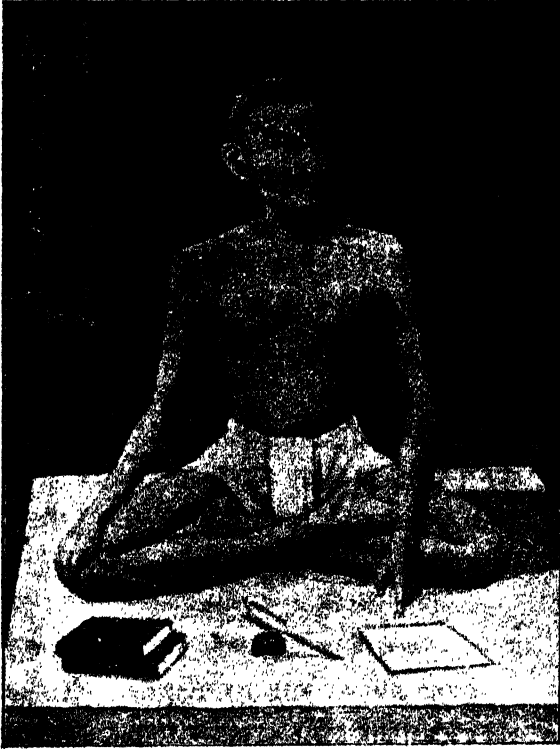
মহাত্মা গান্ধী

সর্ব্বজনবরেণ্য মহাত্মা গান্ধী মহোদয় বিগত ২২শে মাঘ কারামুক্ত হইয়াছেন। মহাত্মাজীর নামে রাজ-দ্রোহের অভিযোগ হয়। তিনি অপরাধ স্বীকার করেন। ১৯২২ সালের ১৮ই মার্চ্চ তাঁহার ছয় বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়। মুক্তির কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি পীড়িত হন, তাঁহার দেহে অস্ত্রোপচার করা হয়। অস্ত্রের ক্ষত শুকাইয়া আসিয়াছিল, তাঁহার জীবনের আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু তাঁহার চিকিৎসকেরা বলেন, তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে, অন্ততঃ ছয় মাস কাল তাঁহাকে সমুদ্রতীরে বাস করিতে হইবে। মুক্তির কয়েকদিন পূর্ব্বে তাঁহাকে বোম্বায়ের সাসুন হাসপাতালে আনা হয়। এখনও তিনি সেখানে আছেন, এবং আরও কিছুদিন সেখানে থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ৫ই ফেব্রুয়ারী সকাল ৭॥০টার সময় তাঁহাকে মুক্তি লাভের সংবাদ দেওয়া হয়; এবং ৭-৫৫ মিনিটের সময় মুক্তি দেওয়া হয়। সাসুন হাসপাতালে তিনি নাম মাত্র বন্দী ছিলেন—কারাগারের নিয়ম রক্ষার্থ হাসপাতালের বাহিরে কয়েকজন পুলিশ প্রহরী থাকিত। দর্শনপ্রার্থী মাত্রকেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইত। ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৪০১ ধারা অনুসারে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

নব-বিধান

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(৫)

খাম ও পোষ্টকার্ডে বিস্তর চিঠি-পত্র জমা হইয়াছিল, সেই সমস্ত পড়িয়া জবাব দিতে, সাময়িক কাগজগুলি একে একে খুলিয়া চোখ বুলাইয়া লইতে, আরও এমনি সব ছোট খাটো কাজ শেষ করিতে শৈলেশের সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার কর্ম্ম-নিরত, একাগ্র মুখের চেহারা বাহিরে হইতে পর্দ্দার ফাঁক দিয়া দেখিলে, এই কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা ও একান্ত মনঃসংযোগের প্রতি আনাড়ি লোকের মনের মধ্যে অসাধারণ শ্রদ্ধা জন্মাইবারই কথা। অধ্যাপকের বিরুদ্ধে শ্রদ্ধার হানি করা এই গল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয়, এ ক্ষেত্রে এইটুকু বলিয়া দিলেই চলিবে যে, অধ্যাপক বলিয়াই যে সংসারে ছলনা করার কাজে হঠাৎ কেহ তাঁহাদিগকে হটাইয়া দিবে এ আশা দুরাশা। হাতের কাজ সমাপ্ত করিয়া শৈলেশ্বর নিজেই সুইচ্ টিপিয়া লইয়া আলো জ্বালাইয়া মস্ত মোটা একটা দর্শনের বই লইয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। যেন, তাঁহার নষ্ট করিবার মুহূর্ত্তের অবসর নাই, অথচ সন্ধ্যার পরে এরূপ, কুকর্ম্ম

করিতে পূর্ব্বে তাঁহাকে কোন দিন দেখা যাইত-না।

এইরূপে যখন তিনি অধ্যয়নে নিমগ্ন, বাহিরে, পর্দ্দার আড়াল হইতে কুমুদা ডাকিয়া কহিল, বাবু, মা বলে দিলেন আপনার খাবার দেওয়া হয়েছে, আসুন।

শৈলেশ্বর ঘড়ির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, এ তো আমার খাবার সময় নয়। এখনো প্রায় পঞ্চাশ মিনিট দেরি।

কুমুদা জিজ্ঞাসা করিল, তা'হ'লে তুলে রাখতে বলে দেব?

শৈলেশ্বর কহিলেন, তুলে রাখাই উচিত। আবদুল না থাকাতেই এই সময়ের গোলযোগ ঘটেছে।

দাসী আর কোন প্রশ্ন না করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, শৈলেশ ডাকিয়া বলিলেন, সমস্ত তোলা-তুলি করাও হাঙ্গামা, আচ্ছা, বলগে আমি যাচ্চি।

আজ খাবার ঘরে টেবিল-চেয়ারের বন্দোবস্ত নয়, উপরে আসিয়া দেখিলেন তাঁহার শোবার ঘরের সম্মুখে ঢাকা বারান্দায় আসন পাতিয়া অত্যন্ত স্বদেশী প্রথায় স্বদেশী আহারের ব্যবস্থা হইয়াছে, সাবেক দিনের রেকাবি গেলাশ বাটি প্রভৃতি মাজা-ধোয়া হইয়া বাহির হইয়াছে,—থালার তিন দিক ঘেরিয়া এই সকল পাত্রে নানাবিধ আহার্য্য থরে থরে সজ্জিত, অদূরে মেঝের উপর বসিয়া ঊষা, এবং তাহাকে ঘেঁসিয়া বসিয়াছে সোমেন।

শৈলেশ আসনে বসিয়া কহিলেন, তোমাকে ত সঙ্গে খেতে নেই আমি জানি, কিন্তু সোমেন? তাকেও খেতে নেই নাকি?

ইহার উত্তর ছেলেই দিল, কহিল, আমি রোজ মার সঙ্গে খাই বাবা।

শৈলেশ আয়োজনের প্রাচুর্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এত সব রাঁধলে কে? তুমি নাকি?

ঊষা কহিল, হাঁ।

শৈলেশ কহিলেন, বামুনটাও নেই বোধ হয়। যতদূর মনে আছে তার মাইনে বাকি ছিলনা,—তাকে কি তা'হলে এক বছরের আগাম দিয়েই বিদেয় করলে?

ঊষা মুখের হাসি গোপন করিয়া কহিল, দরকার হলে আগাম মাইনেও চাকরদের দিতে হয়, কেবল বাকি রাখলেই চলেনা। কিন্তু সে আছে, তাকে ডেকে দেব নাকি?

শৈলেশ তাড়াতাড়ি মাথা নাড়িয়া কহিলেন, না না, থাক্। তাকে দেখ্বার জন্যে আমি ঠিক উতলা হয়ে উঠিনি, কিন্তু তাকেও মাঝে মাঝে রাঁধ্‌তে দিও, নইলে যা কিছু শিখেছিল ভুলে গেলে বেচারার ক্ষতি হবে।

আহার করিতে বসিয়া শৈলেশের কত যে ভাল লাগিল তাহা সেই জানে। মা যখন বাঁচিয়া ছিলেন হঠাৎ সেই দিনের কথা তাহার মনে পড়িল। পাশের বাটিটা টানিয়া লইয়া কহিলেন, দিব্যি গন্ধ বেরিয়েচে। গোঁসাইরা মাংস খায়না, তারা কাঁঠালের তরকারিতে গরম মসলা দিয়ে গাছ-পাঁটা বলে খায়। আমার রুচিটা ঠিক অতখানি উচ্চ জাতীয় নয়। তাই কাঁঠাল বরঞ্চ আমার সইবে, কিন্তু গাছ-পাঁটা সইবেনা।

ঊষা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। সোমেন হাসির হেতু বুঝিলনা, কিন্তু সে মায়ের কোলের উপর ঢলিয়া পড়িয়া মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, গাছ-পাঁটা কি মা?

প্রত্যুত্তরে ঊষা ছেলেকে আরও একটু বুকের কাছে টানিয়া লইয়া স্বামীকে শুধু কহিল, আগে খেয়েই দেখ।

শৈলেশ একটুকরা মাংস মুখে পুরিয়া দিয়া কহিলেন, না, চার-পেয়ে পাঁটাই বটে। চমৎকার হয়েছে, কিন্তু এ রান্না তুমি শিখ্‌লে কি করে?

ঊষার মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল, রান্না কি শুধু তোমার আবদুলই জানে? আমার বাবা ছিলেন সিদ্ধেশ্বরীর সেবায়ৎ, তুমি কি ভেবেচ আমি গোঁসাই-বাড়ী থেকে আস্‌চি।

শৈলেন কহিলেন, এই এক বাটি খাবার পরে সে কথা মুখে আনে কার সাধ্য। কিন্তু আমার ত সিদ্ধেশ্বরী নেই, এ কি প্রতিদিন জুটবে?

ঊষা বলিল, কিসের অভাবে জুটবে না শুনি?

শৈলেন কহিলেন, আবদুলের শোক ত আমি আজই ভোল্‌বার যো করেচি, দেনা—

ঊষা রাগ করিয়া বলিল, আমি কি তোমাকে বলেচি যে স্বামি-পুত্রকে না খেতে দিয়ে আমি দেনা শোধ করব? দেনার কথা তুমি আর মুখেও আনতে পাবে না বলে দিচ্চি।

শৈলেশ কহিলেন, তোমাকে বলে দিতে হবেনা, দেনার কথা মুখে আনা আমার স্বভাবই নয়। কিন্তু—

উষা বলিল, এতে কোন কিন্তু নেই। খাবার জন্যে ত দেনা হয়নি।

কিসের জন্ত যে হ'ল কিছুই ত জানিনে উষা—

উষা জবাব দিল, তোমার জেনেও কোন দিন কাজ নেই। দয়া করে এইটি শুধু কোরো পাগল বলে আবার যেন নির্ব্বাসনে পাঠিয়োনা।

শৈলেশ নিঃশব্দে নতমুখে আহার করিতে লাগিলেন। সোমেন কহিল, খাবে চলনা মা। কালকের সেই জটাই পক্ষীর গল্পটা কিন্তু আজ শেষ করতে হবে। জটাইয়ের ছেলে তখন কি করলে মা?

শৈলেশ মুখ তুলিয়া কহিলেন, জটাইয়ের ছেলে যাই করুক, এ ছেলেটি ত দেখ্‌চি তোমাকে একেবারে পেয়ে বসেচে।

উষা ছেলের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে চুপ করিয়া রহিল।

শৈলেশ কহিলেন, এর কারণ কি জান?

উষা কহিল, কারণ আর কি। মা নেই, ছেলেমানুষ একলা বাড়ীতে—

তা' বটে, কিন্তু মা থাক্‌তেও এত আদর বোধ হয় ও কখনো পায়নি।

উষার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, কহিল, তোমার এক কথা। আর একটু মাংস আন্‌তে বলে দি। আচ্ছা, না খাও,—আমার মাথা খাও, মেঠাই দুটো ফেলে উঠোনা কিন্তু। সমস্ত দিন পরে খেতে বসেচ এ কথা একটু হিসেব কর।

শৈলেশ হাঁ করিয়া উষার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। খাবার জন্ত এই পীড়াপীড়ি, এম্‌নি করিয়া ব্যগ্র-ব্যাকুল মাথার দিব্য দেওয়া—যেন বহুকালের পরে ছেলেবেলার শোনা গানের একটা শেষ চরণের মত তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিল। সে নিজেও তাহার মায়ের একছেলে,—অকস্মাৎ সেই কথা স্মরণ করিয়া বুকের মধ্যে যেন তাহার ধড়ফড় করিয়া উঠিল। মেঠাই ফেলিয়া উঠিবার তাহার শক্তিই রহিলনা। ভাঙিয়া খানিকটা মুখে পুরিয়া দিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, কোন দিকের কোন হিসেবই আর আমি কোরবনা উষা, এ ভারটা তোমাকে একেবারে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই। এই বলিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিলেন।

(৬)

একটা সপ্তাহ যে কোথা দিয়া কেমন করিয়া কাটিয়া আবার রবিবার ফিরিয়া আসিল শৈলেশ ঠাহর পাইলনা। সকালে উঠিয়াই উষা কহিল, তোমাকে রোজ বল্‌চি কথা শুন্‌চোনা—যাও আজ ঠাকুরঝির ওখানে। সে কি মনে করচে বল ত? তুমি কি আমার সঙ্গে তার সত্যি সত্যিই ঝগড়া করিয়ে দেবে না কি।

শৈলেশ মনে মনে অতিশয় লজ্জা পাইয়া বলিলেন, কলেজের যে রকম কাজ পড়েচে—

উষা বলিল, তা' আমি জানি। কলেজ থেকে ফেরবার মুখেও তাই একবার গিয়ে উঠ্‌তে পারলেনা।

কিন্তু কি রকম শ্রান্ত হয়ে ফির্‌তে হয় সে তো জানোনা? তোমাকে ত আর ছেলে পড়াতে হয়না।

উষা হাসিয়া ফেলিল, কহিল, তোমার পায়ে পড়ি, আজ একবার যাও। রবিবারেও ছেলে পড়ানোর ছল করলে বিভা জন্মে আর আমার মুখ দেখ্‌বেনা। এই বলিয়া সে সহিসকে ডাকাইয়া আনিয়া গাড়ী তৈরী করিবার হুকুম দিয়া কহিল, বাবুকে শ্যামবাজারে পৌঁছে দিয়েই তোরা ফিরে আসিস্। গাড়ীতে আমার কাজ আছে।

যাইবার সময় শৈলেশ ছেলেকে সঙ্গে লইবার প্রস্তাব করিলে সে বিমাতার গায়ে ঠেস দিয়া মুখখানা বিকৃত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পিসিমার কাছে যাইতে সে কোন দিনই উৎসাহ বোধ করিতনা, বিশেষতঃ, সেদিনের কথা স্মরণ করিয়া তাহার ভয়ের অবধি রহিলনা। উষা ক্রোড়ের কাছে তাহাকে টানিয়া লইয়া সহাস্যে বলিল, সোমেন থাক্, ও না হয় আর একদিন যাবে।

শৈলেশ কহিলেন, বিভার ওখানে ও যে যেতে চায়‌না সে দেখ্‌চি তুমি টের পেয়েছ।

তোমাকে দেখেই কতকটা আন্দাজ করচি, এই বলিয়া সে হাসিমুখে ছেলেকে লইয়া উপরে চলিয়া গেল।

স্নানাহার সারিয়া শ্যামবাজার হইতে বাড়ী ফিরিতে শৈলেশের বেলা প্রায় আড়াইটা হইয়া গেল। বিভা, ভগিনীপতি ক্ষেত্রমোহন এবং তাঁহার সতেরো আঠারো

বছরের একটি অনূঢ়া ভগিনীও সঙ্গে আসিলেন। বিভাকে সঙ্গে আনিবার ইচ্ছা শৈলেশের ছিলনা। সে নিজে ইচ্ছা করিয়াই আসিল। উষার বিরুদ্ধে তাহার অভিযোগ বহুবিধ। কেবলমাত্র দাদাকেই বাঁকা বাঁকা কথা শুনাইয়া তাহার কিছুমাত্র তৃপ্তিবোধ হয় নাই; এখানে উপস্থিত হইয়া এতগুলি লোকের সমক্ষে নানাপ্রকার তর্ক-বিতর্কের মধ্যে ফেলিয়া পল্লী-গ্রামের কুশিক্ষিতা ভ্রাতৃবধূকে সে একেবারে অপদস্থ করিয়া দিবে এই ছিল তাহার অভিসন্ধি। দাদার সহিত আজ দেখা হওয়া পর্য্যন্তই সে অনেক অপ্রিয় কঠিন অনুযোগের সহিত এই কথাটাই বারম্বার সপ্রমাণ করিতে চাহিয়াছে যে, এতকাল পরে এই স্ত্রীলোকটিকে আবার ঘরে ডাকিয়া আনায় শুধু যে মারাত্মক ভুল হইয়াছে তাহাই নয়, তাহাদের স্বর্গগত পিতৃদেবের স্মৃতির প্রতিও প্রকারান্তরে অবমাননা করা হইয়াছে। তিনি যাহাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাহাকে পুনরায় গ্রহণ করা কিসের জন্য? সমাজের কাছে, বন্ধু-বান্ধবের কাছে যাহাকে আত্মীয় বলিয়া পরিচিত করা যাইবেনা, কোথাও কোন সামাজিক ক্রিয়া-কর্ম্মে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া যাহাকে চলিবেনা, এমন কি বড় ভাইয়ের স্ত্রী বলিয়া সম্বোধন করিতেই যাহাকে লজ্জাবোধ হইবে, তাহাকে লইয়া লোকের কাছে সে মুখ দেখাইবে কি করিয়া?

অপরিচিত উষার পক্ষ লইয়া ক্ষেত্রমোহন দুই একটা কথা বলিবার চেষ্টা করিতেই স্ত্রীর কাছে ধমক খাইয়া সে চুপ করিল। বিভা রাগ করিয়া বলিল, দাদা মনে করেন আমি কিছুই জানিনে, কিন্তু আমি সব খবর রাখি। বাড়ী ঢুক্‌তে না ঢুক্‌তে এতকালের খানসামা আবদুলকে তাড়ালেন মুসলমান বলে, গিরধারীকে দূর করলেন ছোট জাত বলে।—এত যাঁর জাতের বিচার তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ রাখাই ত আমাদের দায়। আমি ত এমন বউকে একটা দিনও স্বীকার করতে পারব না তা' যিনিই কেননা যত রাগ করুন।

এ কটাক্ষ যে কাহাকে হইল তাহা সকলেই বুঝিলেন। শৈলেশ আস্তে আস্তে বলিতে গেল যে ঠিক সে কারণে নয়, তাহারা নিজেরাই বাড়ী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এই কথায় বিভা দাদার মুখের উপরেই জবাব দিল যে, বউদিদির আমলে তাহাদের এতখানি ব্যগ্রতা দেখা যায় নাই, কেবল ইনি ঘরে পা দিতে-না-দিতেই তাহারা পালাইয়া বাঁচিল।

এই শ্লেষের আর উত্তর কি? শৈলেশ মৌন হইয়া রহিল।

বিভা জিজ্ঞাসা করিল, চাকর-বাকর ত সব পালিয়েছে, তোমার এখন চলে কি করে?

শৈলেশ নিস্পৃহ কণ্ঠে কহিলেন, অম্‌নি একরকম যাচ্চে চলে।

বিভা কহিল, যারা গেছে তারা আর আস্‌বে না আমি বেশ জানি। কিন্তু বাড়ী ত একেবারে ভট্‌চাষ্যি বাড়ী করে রাখ্‌লে চল্‌বেনা, সমাজ আছে। লোকজন আবার দেখে শুনে রাখো,—মানুষে বল্‌বে কি?

শৈলেশ কহিলেন, না চল্‌লে রাখ্‌তে হবে বই কি!

বিভা বলিল, কি করে যে চল্‌চে সে তোমরাই জানো, আমরা ত ভেবে পাইনে। এই বলিয়া সে কাপড় ছাড়িবার জন্য উঠিতে উদ্যত হইয়া কহিল, বাপের বাড়ী না গিয়েও পারিনে, কিন্তু গেলে বোধ করি এক পেয়ালা চাও জুটবেনা।

ক্ষেত্রমোহন এতক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়াই ছিলেন, ভাই-বোনের বাদ-বিতণ্ডার মধ্যে কথা কহিতে চাহেন নাই, কিন্তু আর থাকিতে না পারিয়া বলিলেন, আগে গিয়েই ত দেখ, চা যদি না পাও তখন না হয় বোলো।

বিভা কহিল, আমার দেখাই আছে। প্রথম দিন তাঁর ভাব দেখেই আমি বুঝে এসেছি। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। তাহার অনুযোগ যে একেবারেই সত্য নয়, বস্তুতঃ, সেদিন কিছুই দেখিয়া আসিবার মত তাহার সময় বা মনের অবস্থা কোনটাই ছিলনা তাহা উভয়ের কেহই জানিতেননা, ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, বাস্তবিক শৈলেশ ব্যাপার কি তোমাদের? চাকর বাকর সমস্ত বিদায় করে দিয়ে কি বোষ্টম বৈরাগী হয়ে থাকবে না কি? আজকাল খাচ্চো কি?

শৈলেশ কহিলেন, ডাল ভাত লুচি তরকারি—

গলা দিয়ে গল্‌চে ওগুলো?

অন্ততঃ গলায় বাধ্‌চেনা এ কথা ঠিক।

ক্ষেত্রমোহন হাসিয়া কহিলেন, ঠিক তা' আমিও জানি। এবং আমারও যে সত্যিসত্যিই বাধে তা'ও নয়—কিন্তু মজা এম্‌নি যে সে কথা নিজেদের মধ্যে স্বীকার করবার যো

নেই। তুমি কি এমনিই বরাবর চালিয়ে যাবে স্থির করেচ না কি?

শৈলেশ ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, দেখ ক্ষেত্র. যথার্থ কথা বল্‌তে কি স্থির আমি নিজে কিছুই করিনি, করবার ভারও আমার পরে তিনি দেন্‌নি। শুধু এইটুকু স্থির করে রেখেচি যে তাঁর অমতে তাঁর সাংসারিক ব্যবস্থায় আর আমি হাত দিচ্চিনে।

ক্ষেত্রমোহন দ্বারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চুপি চুপি কহিলেন, চুপ্‌, চুপ্‌, এ কথা তোমার বোনের যদি কানে যায় ত আর রক্ষা থাক্‌বেনা তা বলে দিচ্চি।

শৈলেশ কহিলেন, এ দিকে যদি রক্ষা নাও থাকে, অন্যদিকে এটুকু রক্ষা বোধ হয় পেয়েচি যে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি এ দুশ্চিন্তা আর ভোগ করতে হবেনা। বল কি হে, অহর্নিশি কেবল টাকার ভাব্‌না, মাসের পোনর দিন পার হলেই মনে হয় বাকি পোনরটা দিন পার হব কি করে,—সে পথে আর পা বাড়াচ্চিনে। আমি বেঁচে গেছি ভাই,—টাকা ধার করতে আর যেতে হবেনা। যে কটা টাকা মাইনে পাই, সেই আমার যথেষ্ট,—এ সুখবরটা এঁর কাছে আমি পেয়ে গেছি।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, বল কি হে? কিন্তু টাকার দুর্ভাবনা কি একা তোমারই ছিল না কি? আমি যে একেবারে কণ্ঠায় কণ্ঠায় হয়ে উঠেচি সে খবর তো রাখোনা!

শৈলেশ বলিতে লাগিলেন, এলাহাবাদে পালাবার সময় পুরো একটি মাসের মাইনে আলমারিতে রেখে যাই। বলে যাই একটি মাস পুরো চলা চাই। আগে ত কোনকালেই চলেনি, সোমেনের মা বেঁচে থাক্‌তেও না, তাঁর মৃত্যুর পরে আমার নিজের হাতেও না। ভেবেছিলাম এঁর হাত দিয়ে যদি ভয় দেখিয়েও চালাতে পারি ত তাই যথেষ্ট। যাদের তাড়ানো নিয়ে বিভা রাগ করছিলেন, তাদের মুসলমান এবং ছোট জাত বলেই বাস্তবিক তাড়ানো হয়েছে কি না আমি ঠিক জানিনে, কিন্তু এটা জানি যাবার সময়ে তারা একবছরের বাকি মাইনে নিয়ে খুব সম্ভব খুসি হয়েই দেশে গেছে। মুদির দোকানে চারশ টাকা দেওয়া হয়েছে, আরও ছোটখাটো কি-কি সব সাবেক দেনা শোধ করে ছোট্ট একখানি খাতায় সমস্ত কড়ায় গণ্ডায় লেখা,—ভয় পেয়ে জিজ্ঞেসা করলুম এ তুমি কি কাণ্ড করে বসে আছো, ঊষা, অর্দ্ধেক মাস যে এখনো বাকি,—চল্‌বে কি করে? জবাবে বল্‌লেন, আমি ছেলে মানুষ নই, সে জ্ঞান আমার আছে। খাবার কষ্ট ত আজও তাঁর হাতে একতিল পাইনি ক্ষেত্র, কিন্তু ডাল-ভাতই আমার অমৃত,—আমার দর্জ্জি ও কাপড়ের বিল এবং হ্যাণ্ডনোটের দেনাটা শোধ হয়ে যাক্ ভাই, আমি নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি।

ক্ষেত্রমোহন কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু স্ত্রীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চুপ করিয়া গেলেন।

মোটর প্রস্তুত হইয়া আসিলে তিনজনেই উঠিয়া বসিলেন। সমস্ত পথটা ক্ষেত্রমোহন অন্যমনস্ক হইয়া রহিলেন, কাহারও কোন কথা বোধ করি তাঁহার কানেই গেলনা।

(৭)

অল্প কিছুক্ষণেই গাড়ী আসিয়া শৈলেশ্বরের দরজায় দাঁড়াইল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই সাক্ষাৎ মিলিল সোমেনের। সে কয়লা-ভাঙা হাতুড়িটা সংগ্রহ করিয়া লইয়া চৌকাটে বসিয়া তাহার রেল-গাড়ীর চাকা মেরামত করিতেছিল—তাহার চেহারার দিকে চাহিয়া হঠাৎ কাহারও মুখে আর কথা রহিলনা। তাহার কপালে, গালে, দাড়িতে, বুকে, বাহুতে,—অর্থাৎ দেহের সমস্ত উপরার্দ্ধটাই প্রায় চিত্র-বিচিত্র করা। গঙ্গার ঘাটের উড়ে পাণ্ডা শাদা, রাঙা, হলুদ রঙ দিয়া নিজের দেশের জগন্নাথ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমের রাম-সীতা পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার দেব-দেবীর অসংখ্য নাম ছাপিয়া দিয়াছে।

বিভা শুধু একটু মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, বেশ দেখিয়েছে বাবা, বেঁচে থাকো!

শৈলেশের এই দুজনের কাছে যেন মাথা কাটা গেল। স্বভাবতঃ, সে মৃদু-প্রকৃতির লোক, যে-কোন কারণেই হৌক হৈ-চৈ হাঙ্গামা সৃষ্টি করিয়া তুলিতে সে পারিতনা, কিন্তু ভগিনীর এই অত্যন্ত কটু উত্তেজনা হঠাৎ তাহার অসহ্য হইয়া পড়িল। ছেলের গালে সশব্দে একটা চড় কসাইয়া দিয়া কহিল, হতভাগা পাজি! কোত্তা থেকে এই সমস্ত করে এলি? কোথা গিয়েছিলি?

সোমেন কাঁদিতে কাঁদিতে যাহা বলিল তাহাতে বুঝা গেল আজ সকালে সে মায়ের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে গিয়াছিল।

শৈলেশ তাহার গলায় একটা ধাক্কা মারিয়া ঠেলিয়া দিয়া বলিল, যা সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেল্‌গে যা বল্‌চি!

তিনজনে আসিয়া তাহার পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিল। ভাই-বোন উভয়েরই মুখ অসম্ভব রকমের গম্ভীর, মিনিট খানেক কেহই কোন কথা কহিলনা, শৈলেশের লজ্জিত বিরস মুখে ইহাই প্রকাশ পাইল যে এতটা বাড়াবাড়ি সে স্বপ্নেও ভাবে নাই, কিন্তু বিভা কথা না কহিয়াও যেন সগর্ব্বে বলিতে লাগিল, এসব তার জানা কথা। এইরূপ হইতেই বাধ্য।

কথা কহিলেন ক্ষেত্রমোহন। তিনি হঠাৎ একটুখানি হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, শৈলেশ, তুমি যে একেবারে চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলে ফেল্‌লে হে! ছেলেটাকে মারলে কি বলে?—তোমাদের সঙ্গে ত চলা-ফেরা করাই দায়।

স্বামীর কথা শুনিয়া বিভা বিস্ময়ে যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেল, মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, চায়ের পেয়ালায় তুফান কি রকম? তুমি কি এটাকে ছেলে-খেলা মনে করলে না কি?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, অন্ততঃ, ভয়ানক কিছু একটা যে মনে হচ্চেনা তা অস্বীকার করতে পারিনে।

তার মানে?

মানে খুব সহজ। আজ নিশ্চয় কি একটা গঙ্গাস্নানের যোগ আছে, সোমেন সঙ্গে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে স্নান করেছে। একটা দিন কলের জলে না নেয়ে দৈবাৎ কেউ যদি গঙ্গায় স্নান করেই থাকে ত কি যে মহাপাপ হতে পারে আমি ত ভেবে পাইনে।

বিভা স্বামীর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, তার পরে?

ক্ষেত্রমোহন জবাব দিলেন, তার পরের ব্যাপারও খুব স্বাভাবিক। ঘাটে বিস্তর উড়ে পাণ্ডা আছে, হয়ত কেউ দুটো একটা পয়সার আশায় ছেলেমানুষের গায়ে চন্দনের ছাপ মেরে দিয়েছে। এতে খুনোখুনি কাণ্ড কর্‌বার কি আছে!

বিভা তেমনি ক্রোধের স্বরে প্রশ্ন করিল, এর পরিণাম ভেবে দেখেচ?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, বিকালবেলা মুখ হাত ধোয়ার সময় আপনি মুছে যায়—এই পরিণাম।

বিভা কহিল, ওঃ—এই মাত্র! তোমার ছেলেপুলে থাক্‌লে তুমিও তা'হলে এই রকম করতে দিতে?

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, আমার ছেলে-পুলে যখন নেই, তখন এ তর্ক বৃথা।

বিভা মনে মনে আহত হইয়া কহিল, তর্ক বৃথা হতে পারে, চন্দনও ধুয়ে ফেল্‌লে উঠে যায় আমি জানি, কিন্তু এর দাগ হয়ত অত সহজে নাও উঠ্‌তে পারে। ছেলে পুলের ভবিষ্যৎ জীবনের পানে চেয়েই কাজ কর্‌তে হয়। আজকের কাজটা যে অত্যন্ত অন্যায় এ কথা আমি একশ বার বোল্‌ব, তা তোমরা যাই কেননা বল।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, তোমরা নয়—একা আমি। শৈলেশ ত চড় মেরে আর গলাধাক্কা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌লেন,—আমি কিন্তু এ আশা করিনে যে অধ্যাপকবংশের মেয়ে এসে একদিনেই মেম সাহেব হয়ে উঠ্‌বে। তা' সে যাই হোক্, তোমরা দু ভাই বোনে এর ফলাফল বিচার করতে থাকো, আমি উঠ্‌লুম।

শৈলেশ চুপ করিয়াই ছিল, তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, কোথায় হে?

ক্ষেত্র কহিলেন, উপরে। ঠাক্‌রুণের সঙ্গে পরিচয়টা একবার সেরে আসি। কথা ক'ন কিনা একটু সাধ্য-সাধনা করে দেখিগে। এই বলিয়া ক্ষেত্রমোহন আর বাক্য ব্যয় না করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

উপরে উঠিয়া শোবার ঘরের দরজা হইতেই ডাক দিয়া কহিলেন, বৌ-ঠাকরুণ নমস্কার।

ঊষা মুখ ফিরাইয়া দেখিয়াই মাথার কাপড় তুলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সোমেন কাছে বসিয়া বোধ করি মায়ের কাজ বাড়াইতেছিল, কহিল, পিসেমশাই।

ঊষা অদূরে একটা চৌকি দেখাইয়া দিয়া আস্তে আস্তে বলিল, বসুন। তাহার সম্মুখের গোটা দুই আলমারির কপাট খোলা, মেঝের উপর অসংখ্য রকমের কাপড় জামা শাড়ী জ্যাকেট কোট পেন্টুলান মোজা টাই কলার—কত যে রাশিকৃত করা তাহার নির্ণয় নাই, ক্ষেত্রমোহন আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন, আপনার হচ্চে কি?

সোমেন স্তূপের মধ্যে হইতে একজোড়া মোজা টানিয়া

বাহির করিয়া কহিল, এই আর একজোড়া বেরিয়েচে। এইটুকু শুধু ছেঁড়া,—চেয়ে দেখ না ?

উষা ছেলের হাত হইতে লইয়া একস্থানে গুছাইয়া রাখিল। তাহার রাখিবার শৃঙ্খলা লক্ষ্য করিয়া ক্ষেত্রমোহন একটু আশ্চর্য্য হইয়াই প্রশ্ন করিলেন,এ কি অনাথ আশ্রমের ফর্দ্দ তৈরি হচ্চে, না জঞ্জাল পরিষ্কারের চেষ্টা হচ্চে ? কি করচেন বলুন ত ? তিনি ভাবিয়া আসিয়াছিলেন পল্লী অঞ্চলের নূতন বধূ তাঁহাকে দেখিয় হয়ত লজ্জায় একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িবে, কিন্তু উষার আচরণে সেরূপ কিছু প্রকাশ পাইলনা। সে মুখ তুলিয়া চাহিলনা বটে, কিন্তু কথার জবাব সহজ কণ্ঠেই দিল, কহিল, এগুলো সব সারতে পাঠাবো ভাবছি। কেবল মোজাই এত জোড়া আছে যে বোধ করি দশ বচ্ছর আর না কিনলেও চলে যাবে।

ক্ষেত্রমোহন এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া কহিলেন, বৌ-ঠাকরুণ, এখন কেউ নেই, এই সময়ে চট্ করে একটা কথা বলে রাখি। আপনার ননদটিকে দেখে তার স্বামীর স্বরূপটা যেন মনে মনে আন্দাজ করে রাখবেননা। বাইরে থেকে আমার সাজসজ্জা আর আচার ব্যবহার দেখে আমাকে ফিরিঙ্গি ভাববেননা, আমি নিতান্তই বাঙালী। কেউ গঙ্গাস্নান করে এসেচে শুনলে তাকে আমার মারতে ইচ্ছে করেনা এ কথাটা আপনাকে জানিয়ে রাখ্লাম।

উষা চুপ করিয়া রহিল। ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, আরও একটা কথা নিরিবিলিতেই বলে রাখি। সোমেনের মারটা নিজের গায়ে পেতে নিলে শৈলেশ বেচারার প্রতি কিন্তু অবিচার করা হবে। এত বড় অপদার্থ ও সত্যি-সত্যিই নয়।

উষা এ কথারও কোন জবাব দিলনা, নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, এখন আপনি বসুন, আমার জন্যে আপনার সময় না নষ্ট হয়। একটু মৌন থাকিয়া বলিলেন, আপনার লক্ষ্মী-হাতের কাজ করা দেখে আমিও গৃহস্থালীর কাজ-কর্ম্ম একটু শিখে নিই।

উষা মেঝের উপর বসিয়া, মৃদু হাসিয়া বলিল, এ সব মেয়েদের কাজ আপনার শিখে লাভ কি ?

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, এর জবাব আর একদিন আপনাকে দেব, আজ নয়।

উষা নীরবে হাতের কাজ করিতে লাগিল। কিন্তু একটু পরেই কহিল, এ সব ত গরীব দুঃখীদের কাজ, আপনাদের এ শিক্ষার ত কোন প্রয়োজনই হবেনা।

ক্ষেত্রমোহন একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, বৌ-ঠাকরুণ, বাইরের চাকচিক্য দেখে যদি আপনারও ভুল হয় ত, সংসারে আমাদের মত দুর্ভাগাদের ব্যথা বোঝবার আর কেউ থাক্‌বেনা। ইচ্ছে করে আমার ছোট বোন-টিকে আপনার কাছে দিনকতক রেখে যাই। আপনার লক্ষ্মীশ্রীর কতকটাও হয়ত সে তা'হলে শ্বশুর বাড়ীতে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে।

উষা চুপ করিয়া রহিল। ক্ষেত্রমোহন পুনরায় কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সহসা অনেকগুলি জুতার শব্দ সিঁড়ির নীচে শুনিতে পাইয়া শুধু বলিলেন, এঁরা সব উপরেই আস্‌চেন দেখ্‌চি। শৈলেশের বোন এবং আমার বোনের বাইরের বেশভূষার সাদৃশ্য দেখে কিন্তু ভিতরটাও এক রকম বলে স্থির করে নেবেননা।

উষা শুধু একটুখানি হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আমি বোধ হয় চিনতে পারবো।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, বোধ হয় ? নিশ্চয় পারবেন এও আমি নিশ্চয় জানি। (ক্রমশঃ)

শোক-সংবাদ

৺পার্ব্বতীনাথ বসু

প্রবীণ সাহিত্য-সেবী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের একমাত্র পুত্র পার্ব্বতীনাথ অনেক দিন রোগ ভোগ করিয়া অকালে পরলোকগত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র বাবুর সংসারের বন্ধন ঐ একমাত্র পুত্রটীই ছিলেন; ক্রমে ক্রমে সকলকে বিসর্জ্জন দিয়া পার্ব্বতী নাথকেই তিনি বৃদ্ধ জীবনের একমাত্র অবলম্বন করিয়াছিলেন। পার্ব্বতীনাথও পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল; পিতার ন্যায় তিনিও সাহিত্য-সেবায় অবহিত ছিলেন। আমরা বৃদ্ধ দেবেন্দ্র বাবুকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব ?

৺রাখালরাজ রায়

"ভারতবর্ষে"র অন্যতম লেখক, ৺রাখালরাজ রায় মহাশয় বিগত ২রা পৌষ তারিখে ৫৩ বছর বয়সে, মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে বি-এ

৺রাখালরাজ রায়

পাশ করিয়া তিনি শিক্ষকতা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। ৫০ বৎসর বয়সে তিনি বাঙ্গালা ভাষায় এম-এ পরীক্ষা পাশ করেন। ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব প্রাচীন, বাঙ্গালা ভাষা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার গবেষণামূলক বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইত।

৺লেনিন

সোভিয়েট রুষিয়ার ভাগ্যনিয়ন্তা বোলশেভিক তন্ত্রের প্রবর্ত্তক লেনিন লোকান্তরিত হইয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে বহুবার লেনিনের মৃত্যু-সংবাদ রটিয়াছিল; কিন্তু আবার তিনি বাঁচিয়া উঠিয়াছিলেন।
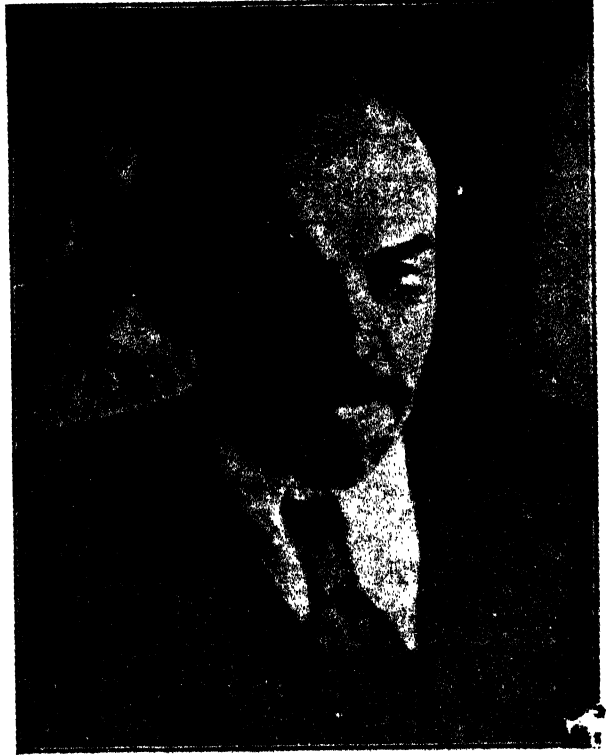
লেনিন

কিন্তু এবার শুধু তাঁহার মৃত্যু সংবাদ নয়—মহাসমারোহে তাঁহার সমাধির খবরও এদেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত নূতন উপন্যাস "পতিতার সিদ্ধি" প্রকাশিত হইল ; মূল্য ২।০।

।০ সংস্করণের ১৫ সংখ্যক গ্রন্থ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত "ঋণমুক্তি" ও ১৬ সংখ্যক গ্রন্থ রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর প্রণীত "মুসাফির মঞ্জিল" প্রকাশিত হইল।

শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রণীত "কণ্ঠকৌমুদী" গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল ; মূল্য ৩৲।

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় প্রণীত "আঁধারে আলোকে" প্রকাশিত হইল ; মূল্য ১৷০।

শ্রীপ্রভাবতী দেবী-সরস্বতী প্রণীত "বিজিতা" উপন্যাস পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল ; মূল্য ২।০।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত "সোণার পেয়ালা" ও "ছুঁচোর কীর্ত্তি" প্রকাশিত হইল ; মূল্য প্রত্যেক খানি ৸০।

দার্শনিক পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত "নিত্যকর্ম্ম কৌমুদীর" দ্বিতীয় সংস্করণ সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রকাশিত হইল ; মূল্য ১৲।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "বামুনের মেয়ে" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল ; মূল্য ১৲।

শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ প্রণীত "স্কন্দ গুপ্ত" প্রকাশিত হইয়াছে ; মূল্য ১৲।

বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত প্রথম বহুবর্ণ চিত্র "দোটানা" নামক আলেখ্যের স্বত্বাধিকারী—শ্রীহিরণ্ময় রায়চৌধুরী।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA

Printer—Narendranath Kunar,
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street. CALCUTTA

জীবনের পথে

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বাগচী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

ভারতবর্ষ

চৈত্র, ১৩৩০

দ্বিতীয় খণ্ড | একাদশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

প্রণবাদিতে সকলের অধিকার

সত্যভূষণ শ্রীধরণীধর শর্ম্মা

(তৃতীয় প্রস্তাব)

হোমাধিকার

এখন হোম সম্বন্ধে অধিকার বিচার্য্য। সম্যকরূপে অনুষ্ঠিত হোম-কার্য্যে জীবের বিশেষ উপকার। পোড়া ঘৃত যে গলদ্ ক্ষতের ঔষধ, ইহা সকলেই জানেন। চিনি প্রভৃতি মধুর পদার্থ অগ্নিসংযোগে যে বাষ্পে পরিণত হয়, তাহার বৈজ্ঞানিক নাম ফর্মিক আলডেহাইড। ইহার ন্যায় রোগের বীজনাশিকা শক্তি অপরত্র অপ্রাপ্য। হোমের অন্য বিশেষত্ব এই যে, ইহার অনুষ্ঠান ও ব্যয়ে নির্ব্বাহ-কর্ত্তার যে হিত, অপরেরও সেই হিত। এই তত্ত্ব উত্তমরূপে বুঝিলে, সর্ব্ব সৎ ব্যবহারের মূল তত্ত্বের জ্ঞান হয় যে, যাহাতে সকলের হিত, তাহাতেই প্রত্যেকের হিত; যাহাতে অপর সকলের অহিত, তাহাতে কাহারও হিত নাই। তাহাই যথার্থ হিত, যাহাতে আত্মপর সকলেরই হিত; কাহারও অহিত নাই।

হোমানুষ্ঠানের জন্য যাঁহারা একত্র মিলিত হয়েন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য একই। আত্মপর সকলের সর্ব্বাঙ্গীণ হিতই সেই এক উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে স্বার্থ ও পরার্থ সমভাবে সম্মিলিত। কোন বিরোধ নাই। এইরূপ উদ্দেশ্যের মিলই প্রকৃত মিল। কোন কালে কোন ভাবে ইহাতে বিরোধের সম্ভাবনা নাই। মনুষ্য এই ভাবে পরস্পর মিলিতে শিখিলে ধর্ম্মগত, সমাজগত, রাজনৈতিক হিতের

পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তি হয় কি না, সকলে বুঝিয়া দেখুন, এই প্রার্থনা।

পরমার্থ সাধন বিষয়েও হোমের উপযোগিতা যথেষ্ট। কার্য্য দেখিয়া তবে কর্ত্তার অনুসন্ধান ও সমাদর। শিল্প না চিনিয়া শিল্পীর সুখ্যাতি যে অন্তঃশূন্য মৌখিক চাটুক্তি, ইহা সামান্য বুদ্ধিতেও সুবিদিত। বিশ্বের জ্ঞান-বর্জ্জিত বিশ্বকর্ত্তার স্তব-বৈপুল্যও সেইরূপ। সমগ্র বিশ্বও বোধায়ত্ত নহে। বিশ্বের বোধায়ত্ত অংশ বা ভাব লইয়াই সাধ্য সাধনের সম্ভাবনা। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অনুমোদিত কোন্ ভাব বা অংশ গ্রহণে সাধনের সুবিধা, তাহা সাধারণ রূপে নির্দ্ধারণ সুসাধ্য নহে। তবে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই বাহ্য পদার্থের উপলব্ধি হয়। মনুষ্যের ইন্দ্রিয় পাঁচটী। সেই জন্য ব্রহ্মাণ্ডও পাঞ্চভৌতিক। এই পঞ্চ ভূতের শেষ ভূত আকাশ যে কি পদার্থ, তাহার নির্দ্ধারণ মনের অল্পাধিক পরিশ্রম-সাধ্য। তারকাদি-খচিত ব্রহ্মকটাহ আকাশ নহে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসম্মত অপ্রত্যক্ষ ঈথরও নহে। প্রথমে পরিষ্কার রূপে শ্রুত কোন শব্দ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া ক্রমশঃ মিলাইয়া যায়। সেই শব্দের আরম্ভ ও শেষের মধ্যে যাহা সংযোজক বলিয়া বোধ হয়, তাহাই যথাসম্ভব শুদ্ধ আকাশ। সেই আকাশ অন্যান্য ভূতের সহিত মিলিত হইয়া সান্নিধ্য দূরত্ব প্রভৃতিরূপে বোধায়ত্ত হয়।

মহাদেবের হস্তের ডমরু, এই পঞ্চ তত্ত্বের রূপক। উপরের অংশ বায়ু ও আকাশ, নীচের অংশ জল ও পৃথিবী; ক্ষীণ মধ্যস্থান অগ্নি। স্থূল হইতে সূক্ষ্ম ও পুনরায় সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে পরিণতিই জীবন-চক্র। এই চক্র অবিরত-গতি। এই চক্রের প্রত্যক্ষ পরিচালক অগ্নি। পৃথিবী-তত্ত্ব অগ্নি সংযোগে জলে পরিণত হয়। সেই প্রণালীতে জলের অগ্নি, অগ্নির বায়ু, বায়ুর আকাশ-তত্ত্বে পরিণতি প্রত্যক্ষ। পৃথিবী তত্ত্বরূপ উদ্ভিজ্জাদি দেহে কেরোসীন তৈল হয়। কেরোসীন আভ্যন্তরিক তাড়নায় জলিয়া অগ্নি, অগ্নি নির্ব্বাণে বায়ু, বায়ু স্পন্দন-শূন্য হইলেই আকাশ হয়। এই প্রণালী সাধারণ ও নৈসর্গিক বলিয়া সর্ব্বজনবিদিত। এইরূপ ভাবনায় বিষয়টী সুগম হয়। নতুবা জটিলতাবশতঃ নৈসর্গিক প্রণালী বিভ্রান্তির হেতু হইয়া পড়ে।

এই অগ্নিই আকাশে রবি-শশী রূপে প্রকাশমান। সেই অগ্নি দিবসে সমুদ্রের লবণাক্ত জল, গলিত মৃতদেহাদির রস ও সেই জাতীয় অন্যান্য তরল পদার্থ আকর্ষণ করিয়া উর্দ্ধে বহন করিতেছেন। সেখানে বৈদ্যুতাগ্নি সেই আকৃষ্ট জলীয় পদার্থকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, মলশূন্য করিয়া বৃষ্টি-বারি উৎপন্ন করে। সেই বারিতেই পৃথিবীর জীবন-সঞ্চার। সেই অগ্নিই চন্দ্রমারূপে জোয়ার ভাটা খেলাইয়া জলকে সজীব রাখিতেছেন, উদ্ভিজ্জের রস বৃদ্ধি করিতেছেন। নতুবা সৌর-তেজে জীব-শরীর, বৃক্ষলতা শস্যাদির শুষ্কতায় জগৎ প্রাণশূন্য হইত।

অগ্নির স্বভাব চিন্তায় জগতে অতি বিস্ময়কর শক্তি-সন্নিপাত লক্ষিত হয়। অগ্নির তেজের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া স্থূলের সূক্ষ্মে পরিণতি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ প্রণালীর শাস্ত্রীয় নাম বিলোম বা প্রতিলোম। ইহার বিপরীত অনুলোম প্রণালীতে অগ্নির উত্তরোত্তর পরিমাণ ক্ষয়বশতঃ সূক্ষ্ম তত্ত্ব স্থূলে পরিণত হয়। যেমন বরফের আধার পাত্রের পৃষ্ঠে উদিত জলবিন্দু। এইরূপ ভাবে বিচারের ফলে এইটি প্রাপ্তব্য যে, তত্ত্বের পরিবর্ত্তন বস্তুর পরিবর্ত্তন নহে, শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি। বস্তুর পরিবর্ত্তন হইলে জলের বাষ্পাকারে পরিণতি বিনাশেরই নামান্তর হইত। সে বাষ্প আর জল হইতে পারিত না। এইরূপ চিন্তার ফলে আরও প্রাপ্তব্য, বৈচিত্র্যময় প্রকাশ-অপ্রকাশাত্মক জগতের মূলে জগতের বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত সত্তার সংবাদ। সেই জগদ্বিলক্ষণ সত্তার অনুসন্ধান পরমার্থ সাধনের বিষয় বলিয়া তাহার আলোচনা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে পরিত্যাজ্য।

এমন কোন স্থান বা কাল নাই, যেখানে বা যখন কেবল একটী মাত্র তত্ত্ব অপরাপর তত্ত্ব হইতে বিভিন্ন ভাবে অবস্থিত। যেখানে যখন যাহাতে অপরাপরের তুলনায় যে তত্ত্বের পরিমাণাধিক্য লক্ষিত হয়, সেখানে তখন তাহা সেই তত্ত্ব বলিয়াই গৃহীত হয়। অন্যথা তত্ত্ব গ্রহণের বা ব্যবহারিক ফলোৎপত্তির অবসর থাকে না। সমগ্র জগতের সৃষ্টি ও লয় প্রত্যক্ষ-গোচর নহে। অথচ বিবেক নামক বুদ্ধি-বৃত্তি দ্বারা তত্ত্ব-পঞ্চককে শুদ্ধ ও ভিন্ন ভিন্ন করিয়া না ধরিলে এ বিষয়ক চিন্তাই অসাধ্য। ব্যবহার বিনা বিচার হয়, কিন্তু স্থির ধারণা হয় না; অর্থাৎ জ্ঞান বিজ্ঞান রূপে পরিপক্ক হয় না। ইহাই সাধারণ নিয়ম।

এই পঞ্চভূত বা তত্ত্বের মধ্যে পৃথিবী ও জল-তত্ত্ব অপেক্ষাকৃত স্থূল অর্থাৎ চেতনের অধিক সংখ্যক ইন্দ্রিয়ের

গ্রাহ্য। অবশিষ্ট তিনটীর লক্ষণ ভিন্ন, তত স্থূল নহে। বায়ু ও আকাশ-তত্ত্ব সূক্ষ্ম অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। অগ্নি এই স্থূল ও সূক্ষ্মের মধ্যবর্ত্তী।

সত্তা অপরিবর্ত্তিত সত্তা। বৈচিত্র্যের উৎপত্তি স্থিতি লয় শক্তির কার্য্য—এই বোধও শক্তির কার্য্য। শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধিতে স্থূল-সূক্ষ্মের চক্রাকার আবৃত্তি অগ্নির স্বভাব-চিন্তায় প্রত্যক্ষ। কিন্তু সেই হ্রাস বৃদ্ধির মূল কারণ প্রত্যক্ষের অগোচর। কারণ আছে এই পর্য্যন্ত অনুমান-গম্য। সেই কারণের বিবরণ, অর্থাৎ তাহা কি বা কেমন, ইহা অনুমানের অতীত। এই পর্য্যন্ত বোধই পরমার্থ-সংবাদ। পরমার্থের অনুসন্ধান বা সাধন আপ্তবাক্যাধীন বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে অনালোচ্য।

ব্যবহার-দৃষ্টিতে সর্ব্বপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ অগ্নি-সংযোগে অগ্নিরূপ হইয়া চক্ষুর অগোচর হয়, ইহা প্রত্যক্ষ; কিন্তু বিনষ্ট হয় না, ইহা বুদ্ধিসম্মত। কেননা উপায়-বিশেষে তাহা পুনরায় অন্য আকারে প্রত্যক্ষ-গোচর হয় বা হইতে পারে। এ ভাবেও সত্তার সংবাদ প্রাপ্তব্য। অনন্তর পরমার্থ সাধন।

অগ্নি সম্বন্ধে যাহা ইন্দ্রিয়-গোচর, যদি তাহারই প্রতি মনোযোগ আবদ্ধ রাখা যায়, তাহা হইলে কি বলিতে বাধ্যতা ঘটে? চক্ষে চক্ চক্, চর্ম্মে তাপ, দৃশ্য পদার্থের অদর্শন ও অবস্থা বিশেষে দাহন কার্য্যের শব্দ কর্ণগোচর হয়। এই পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয়গোচর। অথচ অগ্নি একই পদার্থ—এই ভাব বুদ্ধিতে আরূঢ়। যাহা যাহা ইন্দ্রিয়-গোচর বলিয়া বোধ হয়, তাহা একটী বাহিরের শক্তির সহিত ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে উৎপন্ন ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য। অথচ সেই বাহিরের শক্তি একই, ইহাও বোধ হয়; কেন না যে শক্তির সংঘাতে চক্ষে চক্ চক্ অনুভূত হয়, আর যাহার সংঘাতে ত্বগেন্দ্রিয়ে তাপ অনুভূত হয়, তাহার মধ্যে দেশ বা কালের ভেদ অনুভূত হয় না, একই শক্তির বলিয়া অনুভূত হয়। কার্য্য না হইলে শক্তি আছে এ বোধ থাকে না, কার্য্য-কালে সেই বোধ উৎপন্ন হয়। কার্য্যে শক্তিবোধের উৎপত্তি শক্তির উৎপত্তি নহে। শক্তি কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্ববর্ত্তিনী; এ জন্য জিজ্ঞাস্য হয় যে, নিষ্ক্রিয় শক্তির ভাব কি? শক্তি মাত্রেই নিষ্ক্রিয় অবস্থায় তাহার আধারের অর্থাৎ শক্তিমানের সহিত অভিন্ন ভাবে থাকে। যেমন উপবিষ্ট মনুষ্যের চলিবার শক্তি তাহার সহিত অভিন্ন ভাবে থাকে। এখন জিজ্ঞাসা উঠে এই যে, যে শক্তির নাম অগ্নি, যাহার অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়ের সহিত পূর্ব্বোক্ত রূপ সংঘাতে অনুভূত হয়, তাহা দাহনাদি কার্য্যের পূর্ব্বে ও পরে কাহার সহিত অভিন্ন ভাবে থাকে? সেই সত্তা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাই পরমার্থ-জিজ্ঞাসা।

সামান্য এক কড়ার দিয়াশলাই হইতে লব্ধ প্রকাশ-শক্তি, অগ্নি যাহার নাম, সেই শক্তি অবাধে পরিবর্দ্ধিত হইলে ঘর বাড়ী, গ্রাম নগর, প্রদেশ দেশ, পৃথিবী এমন কি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংসিনী। তবে তাহা এই অনাদি কালেও কেন ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ না করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্নেহময়ী জননীর ন্যায় জগৎ রক্ষা করিতেছেন? রসজ্ঞ ব্যক্তি এই চিন্তার ফলে কাব্য-সিংহাসনের অধীশ্বর হইতে পারেন।

দেখুন, জল ও অগ্নি পরস্পর বিরুদ্ধ বৃত্তি। একের বৃত্তি অপরের বিনাশিনী। অথচ আবহমান কাল কেহই কাহারও বিনাশ করেন নাই। এরূপ সতীনের সংসারের শান্তিরক্ষক কে? এইরূপ ভাবনা কি পরমার্থ-সংবাদী নহে।

তত্ত্ব সকলের মর্য্যাদা-রক্ষায় জীবন-রক্ষা। জীব-দেহের-রক্ষার্থ একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অগ্নির প্রয়োজন। দেহস্থ অগ্নির অন্য কার্য্য চক্ষের আড়াল করিয়া দুইটী কার্য্যের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ প্রয়োজনীয়। যথা প্রমাণ দেহস্থ অগ্নি যকৃতাদি যন্ত্রের চালনা দ্বারা আগ্নেয় দ্রাবক পদার্থ উৎপন্ন করিয়া স্থূল অন্নকে পরিপাক করেন। অন্যদিকে শ্বেত ও পিঙ্গল বর্ণের মস্তিষ্ক ও স্নায়বীয় পদার্থের উজ্জ্বলতা রক্ষাই শরীর ও বুদ্ধির কার্য্যরক্ষা। অগ্নির হ্রাস-বৃদ্ধিতে শরীর ও বুদ্ধির বিকৃতি প্রত্যক্ষ। বুদ্ধির সহিত সোম সূর্য্যাগ্নিরূপিনী শক্তির সম্বন্ধ চিন্তা পরমার্থ-সাধনের অন্তর্গত বলিয়া শাস্ত্রোক্তি। এজন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধের অন্তর্গত নহে।

ব্যবহার-ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অগ্নির বাহ্যিক গুণের অবলম্বনে মনুষ্যের সভ্যতা। অগ্নির ব্যবহার না জানিলে মনুষ্যে ও বানরে বিশেষ প্রভেদ থাকে না। অনগ্নি-পক্ক অন্ন আহার, নগ্নাবস্থায় বিচরণ, গিরিগুহা বৃক্ষাদিতে বাস, গাছ পাথর ভিন্ন অস্ত্রহীন—এরূপ মনুষ্য মনুষ্যনামের বাচ্য কি না বিবেচ্য। সংক্ষেপতঃ অগ্নি-শক্তিই সভ্যতার

জননী—ইহা অসন্দিগ্ধ প্রত্যক্ষ। সভ্য মনুষ্যেরও সর্ব্ব বিষয়ে অগ্নিশক্তি উন্নতি-সাধিকা, এইটীও উত্তমরূপে ধারণার যোগ্য। হোম কার্য্য অগ্নির স্বভাব জ্ঞানের উপায়। ঐ জ্ঞানোৎপন্ন অগ্নির সদ্ব্যবহার উন্নতির দ্বার। অগ্নির স্বভাব জ্ঞান ব্যবহার ও পরমার্থ সিদ্ধির সহায় বলা অযুক্ত নহে। অবশ্য নীচ স্বার্থ বা পরানিষ্ট উদ্দেশ্যে অগ্নি-শক্তির অপব্যবহার অনিষ্টের হেতু। মন অনুসারে ফল, এ নিয়ম অলঙ্ঘনীয়। এ অবস্থায় যে কোন মনুষ্যের আন্তরিক প্রেরণায়, অকৃত্রিম ইচ্ছায় হোম কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় তাহাকে নিবারণ করা ক্ষুধিতের অন্ন, রোগীর ঔষধ অপহরণের সমান অত্যাচার কি না? যদি শাস্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে অবিমিশ্র বাক্যে দ্বিজেতরের সম্বন্ধে সর্ব্বাবস্থায় হোমানুষ্ঠানের নিষেধ থাকে, তাহা হইলে সেই শাস্ত্রকে যাঁহারা ব্যবহার ও পরমার্থের একমাত্র সহায় বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে নিষেধ করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই, ইহাও নিঃসন্দিগ্ধ। এজন্য এ নিষেধ প্রামাণ্য শাস্ত্রসম্মত কি না, বিশেষ সাবধানে বিচার্য্য। এমন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বিরল, যাহাতে অগ্নি-শিখায় হবন বা বিশিখ অগ্নিতে সুগন্ধ সংযোগ অপ্রচলিত।

স্ত্রী শূদ্রের পক্ষে হোম নিষিদ্ধ কি না, এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয়-বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে পরিষ্কার ভাবে বলা উচিত যে, হোম না করিলেও পরমার্থ সিদ্ধি হয়, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত। বর্ণাশ্রম নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মজ্ঞান লাভে মুক্তি হয়, ইহা শাস্ত্র-সম্মত। "অন্তরাচাপিতুতাদ্দৃষ্টঃ"—এই সূত্রে ব্যাসোক্তি পূর্ব্বে দর্শিত। মনুসংহিতায় প্রাপ্তব্য যে,

> এতানেকে মহাযজ্ঞান যজ্ঞ শাস্ত্রে বিদোজন।
> অনীহমানাঃ সতত মিন্দ্রিয়েষ্বেচজুহ্বতি॥
> বাচ্যে জুহ্বতি প্রাণংপ্রাণে বাচঞ্চ সর্ব্বদা।
> বাচি প্রাণেচ পশ্যান্তো যজ্ঞনিবৃত্তিমক্ষয়াং॥
> জ্ঞানেনৈবা পরে বিপ্রাকুর্ব্বজন্ত্যেতৈ সথৈঃ সদা
> জ্ঞান মূলাম ক্রিয়া মেষাং পশ্যান্তোজ্ঞান চক্ষুষা॥
>
> ৪।২২।২৪

"কোন কোন বাহ্যান্তর যজ্ঞানুষ্ঠান শাস্ত্রজ্ঞ বাহ্য চেষ্টা সমুদায় হইতে উপরত হইয়া বিষয় হইতে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার দ্বারাই এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ সম্পাদন করেন। ২২। কোন কোন জ্ঞানী গৃহস্থ বাক্য এবং প্রাণবায়ুতে যজ্ঞ নিষ্পাদনের অ ফল জানিয়া সর্ব্বদা বাক্যে প্রাণবায়ু এবং প্রাণবায়ুতে বাক্য আহুতি প্রদান করেন অর্থাৎ কথা কহিবার সময়ে "বাচি প্রাণং জুহোমি" চিন্তা করেন, আর কথা না কহিবার সময়ে "প্রাণে বাচং জুহোমি" চিন্তা করেন। ২৩। অন্য কতিপয় ব্রহ্মবেত্তা ব্রাহ্মণ সতত ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা এই সমুদায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহারা উপনিষদ চক্ষু দ্বারা দেখেন যে, জ্ঞানই সমুদায় যজ্ঞের মূল কারণ।" শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন কৃত অনুবাদ।

টীকায় কুল্লুক ভট্ট বলিতেছেন, "শ্লোক ত্রয়েন ব্রহ্ম নিষ্ঠানাং বেদ সন্ন্যাসি নাম অমীবিধয়ঃ।" এই তিন শ্লোকে বৈদিক কর্ম্মত্যাগী গৃহস্থের পক্ষে এই সকল বিধি কথিত। যে শ্রুতি স্মরণে মনুর বাক্য তাহা কল্লূক টীকায় উদ্ধৃত। সে শ্রুতি এই, যথা—

"যাবদ্বৈ পুরুষো ভাষতে তবেৎ প্রাণিতুং শক্নোতি প্রাণং তদা বাচিজ হোতি। যাবদ্বৈ পুরুষঃ প্রাণিতি ন তাবৎ ভাষিতুং শাক্মাতৈ। বাচং তদা প্রাণে জু হোতি।" কৌষিতকী উপঃ (অঃ ৩।৪ বিদ্বাং সোগ্নিহোত্রং ন জুহ্বাং।

যাবৎ কাল পুরুষ কথা কহেন, তাবৎ কাল শ্বাসের কার্য্যে অশক্ত। তখন প্রাণ বাকে হবন করেন। যাবৎ কাল পুরুষ শ্বাসের কার্য্য করেন, তাবৎ কাল বাক্যোচ্চারণে অশক্ত। তখন বাক্য প্রাণে হবন করেন। জ্ঞানীরা অগ্নিহোত্র করিয়াছিলেন না।

আবার বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায় যে, "জনকো বৈদেহো বহু দক্ষিণেন যজ্ঞেনেজে।" বিদেহরাজ জনক বহু দক্ষিণা-যুক্ত যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এইরূপ শাস্ত্র দেখিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, হোম পরামর্থ সাধনের সহিত অবিনা ভাবে সংযুক্তা নহে। এজন্য ভগবান বেদব্যাসের উক্তি—'তুল্যন্তু দর্শনাৎ।' ব্রুঃ সূঃ ৩।৪ ৯

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি স্মরণে ভগবদ্ গীতার উক্তি; যথা—

> ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ।
> যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে॥ গীঃ ১৮।৩

কতকগুলি মনীষী বলিয়া থাকেন যে—কর্ম্ম সদোষ, এই কারণে উহা পরিত্যাজ্য। আবার কেহ কেহ বলেন যে যজ্ঞ দান এবং তপস্যারূপ কর্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে।

(শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ)

যজ্ঞো দানং তপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেবতৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিনাম॥ গীঃ ১৮।৫

"যজ্ঞ দান এবং তপস্যারূপ ত্রিবিধ কর্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে; কিন্তু কর্ত্তব্য। কারণ, এই ত্রিবিধ কর্ম্ম মনীষিগণের পবিত্রতার প্রতিহেতু॥" (পূর্ব্বোক্ত অনুবাদ)

এইরূপ মনীষীত্ব বর্ণাশ্রমের অপেক্ষা করে না। রৈক্য, সম্বর্ত্ত, জড়ভরত, ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতি মনীষী হইয়াও বর্ণাশ্রমের বাহির। কিন্তু এখানে মনীষী শব্দে সাংখ্যাচার্য্যই বিশেষ রূপে উদ্দিষ্ট। তাঁহাদের মতে বৈদিক কর্ম্ম অবিশুদ্ধ, ক্ষয়াতিশয্য দোষযুক্ত বলিয়া পরিত্যাজ্য। যে সাতজন ঋষির তৃপ্ত্যর্থে ঋষি-তর্পণ তাঁহাদের মধ্যে চারিজন সাংখ্যাচার্য্য। যথা—

"কপিলশ্চা সুরিশ্চৈব বোঢ়ু পঞ্চশিখস্তথা।"

সাংখ্য কারিকায় প্রাপ্তব্য যে, ভগবান কপিলের শিষ্য আসুরি, পঞ্চশিখ তাঁহারই শিষ্য। বোঢুর নামোল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ ইনি পঞ্চশিখের সতীর্থ।

গীতা মোক্ষ-শাস্ত্র, বর্ণাশ্রমের সহিত মুখ্য সম্পর্ক রহিত। মুমুক্ষু মাত্রেই ইহার অধিকারী। গীতা শুনিয়া পিশাচের মুক্তি হইয়াছিল এরূপ কিম্বদন্তি আছে। বর্ণাশ্রম নির্ব্বিশেষে যে কোন মুমুক্ষুকে যজ্ঞাদিতে অনধিকারী বলিবার পূর্ব্বে গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি বিচারনীয়। যথা—

সহ যজ্ঞঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্ঠ কামাধুক্॥ ৩।১০

পূর্ব্বে প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃষ্টি করিয়া (তাহাদিগকে) বলিয়াছিলেন যে, তোমরা এই যজ্ঞের দ্বারা বৃদ্ধি লাভ কর। এই যজ্ঞই তোমাদের অভিলষিত ফল সকল প্রদান করিতে সমর্থ হউক। পূর্ব্বোক্ত অনুবাদ।

তদকরণে নিন্দা, যথা—

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ সজীবতি॥ ৩।১৬

এই প্রকার পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত দেবযজ্ঞ অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সংসার চক্রের যে ব্যক্তি অনুবর্ত্তন না করে, তাহার জীবন পাপময়, সে ব্যক্তি কেবল ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকামী। (অতএব) তাহার বাঁচিয়া থাকা নিস্ফল।

(পূর্ব্বোক্ত অনুবাদ)

গীতা শাস্ত্র আচার্য্য-সম্মত প্রস্থান ত্রয়ের অন্যতম। মোক্ষ-শাস্ত্রের সহিত ধর্ম্মার্থকাম এই ত্রিবর্গ বিধায়ক শাস্ত্রের বিরোধে সেই সেই শাস্ত্রই অগ্রাহ্য হইবে। কেন না ভগবানের গীতার আজ্ঞা যে—

সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহংত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যাগিমা শুচঃ॥

১৮।৬৬

তুমি সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই আশ্রয় কর, তুমি শোক করিও না, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব।

(পূর্ব্বোক্ত অনুবাদ)

মহাভারতের অন্যত্র প্রাপ্ত ভৃগু ঋষির উপদেশ প্রাসঙ্গিক বোধে নিম্নে উদ্ধৃত হইল যথা—

ভৃগুরুবাচ

নবিশেষোঽস্তিবর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্ম মিদং জগৎ।
ব্রহ্মণো পূর্ব্বসৃষ্টংহিকর্ম্মভিবর্ণতাং গতং॥
কামভোগপ্রিয়াস্তক্ষ্ণোঃ ক্রোধনাঃ প্রিয় সাহসাঃ।
ত্যক্তা স্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গসি দ্বিজক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যোবৃত্তিং সমাস্থায় গীতা কুর্য্যন জীবিনং।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তিতে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিয়ালুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তেদ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তো দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ।
ধর্ম্মো যজ্ঞক্রিয়াস্তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিদ্ধ্যতে॥
শান্তিপঃ। মোক্ষধর্ম্মপঃ। অঃ ১১৮।১০-১৪।

ভৃগু বলিলেন—

বর্ণদের মধ্যে কোন ভেদ নাই; কেন না, এই সমস্ত জগৎই ব্রাহ্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জাতি। পূর্ব্বে ইহা ব্রহ্ম কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া পরে কর্ম্মবশতঃ বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যাঁহারা কামভোগ প্রিয়, তীক্ষ্ণ, ক্রোধী, সাহসপ্রিয় আর যাঁহারা নিজেদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং যাঁহাদের শরীর রক্তবর্ণ সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। সে সমস্ত ব্রাহ্মণ গোপালন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কৃষিজীবী হইয়া স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন নাই এবং যাঁহাদের শরীর পীতবর্ণ সেই সমস্ত ব্রাহ্মণে বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এবং যে সমস্ত ব্রাহ্মণ হিংসা ও অনৃতপ্রিয়লোভী

এবং সর্ব্বকর্ম্ম উপজাবী ও লোকভ্রষ্ট এবং যাঁহাদের শরীরের বর্ণ কৃষ্ণ তাঁহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সমস্ত কর্ম্মের দ্বারা বিভক্ত হইয়া ব্রাহ্মণেরা বর্ণান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের যে যজ্ঞ-ক্রিয়া ধর্ম্ম তাহা নিয়মতঃ নিষিদ্ধ নহে। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী কৃত অনুবাদ।—

শেষ শ্লোকার্দ্ধ বিশেষরূপে চিন্তনীয়।

এখন প্রতিকূল শাস্ত্রের অনুসন্ধান কর্ত্তব্য। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সতীর্থ মহামহোপাধ্যায় শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ কৃত "তন্ত্রসারে" বিরুদ্ধ মত প্রতিষ্ঠিত। আগমবাগীশ মহাশয় "মুণ্ডমালা তন্ত্র" ও কুল প্রকাশ" নামক সংগ্রহ গ্রন্থ হইতে প্রত্যেক বর্ণের অনুষ্ঠেয় হোমের নির্ণায়ক বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন যে, "এতেন স্ত্রী শূদ্রাণাম হোমাধিকারঃ।" ৩২॥ অনন্তর কান্যকুব্জবাসী শাক্ত সম্প্রদায়ে বিশ্বগুরু বলিয়া বিখ্যাত লক্ষ্মণাচার্য্যকৃত "সারদা তিলক" হইতে অনুকূল প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছেন। যথা—"তথাচ শূদ্রাণাং ত্র্যস্রমীরিতমিতি কুণ্ড প্রকরণে সারদায়াং। স্ত্রীনাম হোমাধিকারশ্চত ত্রৈব।"

লাজৈস্ত্রি মধুরোপেতৈর্হোমংকন্যা প্রযচ্ছতি।
অনেন বিধিনা কন্যা বরমাপ্নোতি বাঞ্ছিতং॥

অতএব "স্ত্রীণাং হোমাধিকারঃ।" তাহার পর বলিতেছেন, "সচ ব্রাহ্মণ দ্বারা অর্থাৎ তাহাও ব্রাহ্মণ দ্বারা এই স্বকৃত বিশেষ বিধির অনুকূলে প্রমাণ দিতেছেন। "তথাচ তন্ত্রান্তরে—

ওঁকারোচ্চারণাৎ হোমাৎ শালগ্রাম শিলার্চ্চনাৎ।
ব্রাহ্মণী গমনাচ্চৈব শূদ্র চণ্ডালতাং ব্রজেৎ॥

ইতি সাক্ষান্নিষেধঃ। তথা স্ত্রীনামপি সর্ব্ব বৈদিক কর্ম্ম শূদ্রতুল্যত্ব প্রতিপাদন স্বাৎ।" তাহার পর শূদ্রের শালগ্রাম-অর্চ্চনা নিষেধের প্রমাণান্তর। ৩৪॥ তদনন্তর নৃসিংহ তাপনীয় প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত বচনে দেখাইতে সচেষ্ট যে স্ত্রী শূদ্রের প্রণবাদি কতকগুলি মন্ত্রে অনধিকার। "ইতি সর্ব্ব স্ত্রীণাং শূদ্রবদ্ব্যবহার।" ৩৬॥ অর্থাৎ স্ত্রী সকলের শূদ্রবৎ ব্যবহার। সত্যপ্রিয় আগমবাগীশ মহাশয় অব্যবহিত পরেই বলিতেছেন, "শূদ্রস্যাপি হোম কর্ম্মাণি স্বকর্ত্তৃক হোম ইতি কেচিৎ।"

'সারদা তিলকের' কুণ্ড প্রকরণে শূদ্রদিগের ত্রিকোণ কুণ্ডের উল্লেখ আছে। সেইখানেই স্ত্রীগণের হোমাধিকার প্রাপ্তব্য। খই দুগ্ধ চিনি মধু হোমে প্রদান করিলে কন্যা বাঞ্ছিত পতিলাভ করে। অতএব স্ত্রীদিগের হোমে অধিকার।

কাহার কাহার মতে শূদ্রেরও হোম কার্য্যে স্বকর্ত্তৃক হোম।

তথাচ বারাহী তন্ত্রে,

যদি কামীভবত্যত্র শূদ্রোপি হোমকর্ম্মণি।
বহ্নি জায়াং পরিত্যজ্য হৃদয়ান্তেন হোময়েৎ॥৩৭॥

এই হোম-কার্য্যে শূদ্রের কামনা হইলে স্বাহা মন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নমঃ বলিবে।

বিশেষ বিশেষ মন্ত্রে স্ত্রী শূদ্রের অধিকার বা অনধিকার, তাহা এখানে বিচার্য্য নহে। হোমে অধিকার আছে কি না ইহাই বিচার্য্য। হোমে অধিকার আছে ইহা সকলেরই মত। আগমবাগীশ মহাশয়ের মতে স্ত্রী শূদ্রের স্বকর্ত্তৃক হোমে অনধিকার। বারাহীতন্ত্রে প্রকাশিত শিববাক্য তাঁহার মতের প্রত্যক্ষ বিরোধী। তাঁহার মতের অনুকূল প্রমাণ যে তন্ত্রের বচন তাহার নামোল্লেখ নাই। এ জন্য প্রকরণচ্যুত বাক্যের প্রকৃত প্রয়োগস্থল কি নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। যে হোম শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ, অর্থাৎ যে হোম করিলে শূদ্রের সামাজিক অবনতি মাত্র ঘটে, তাহা যদি আসন্ন পরবর্ত্তী শালগ্রাম শিলা সম্বন্ধীয় হয়, তবে আগম-বাগীশ মহাশয়ের উক্ত বিশেষ বিধি যে, ব্রাহ্মণ দ্বারা শূদ্রের সর্ব্বপ্রকার হোম, তাহা স্থাপিত হয় কি না, পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন। আরও দেখিবেন, তন্ত্রান্তর নাম মাত্রে উল্লিখিত তন্ত্র বাক্যের দ্বারা প্রসিদ্ধ তন্ত্রের বাক্য ব্যবহৃত হইবে কি না? "সম্ভবত্যেক বাক্যত্বে বাক্য ভেদোন যুজ্যতে" এই ন্যায়ানুসারে দ্রষ্টব্য যে, বিচারে আরোপিত শাস্ত্র সকলের এক বাক্যত্ব রক্ষা হয় কি না।

তন্ত্রান্তরের বচন অনুসারে শূদ্রের পক্ষে এই চারিটী নিষিদ্ধ যথা—

(১) ওঁকার উচ্চারণ (২) হোম (৩) শালগ্রাম শিলার অর্চ্চনা (৪) ব্রাহ্মণী গমন। উক্ত বচনানুসারে যদি সর্ব্বাবস্থায় ওঁকার উচ্চারণ শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ হয়, তাহা হইলে "শাক্তনন্দ তরঙ্গিণী" ধৃত "তন্ত্রোক্তং প্রণবাদি" ইত্যাদি ভূতশুদ্ধির বাক্য ব্যবহৃত হয়। (২) হোম নিষিদ্ধ হইলে আগমবাগীশ মহাশয় ধৃত বহু তন্ত্র বাক্য-ব্যাহত হয়। (৩) শালগ্রাম শিলার অর্চ্চনা সর্ব্ব-তান্ত্রিক শাস্ত্রে বিহিত নহে।

ইহা বীরাচারী শাক্ত সাধনের বহির্ভূত বলিয়াই দেখা যায়। আগমবাগীশ মহাশয়ের গ্রন্থ দধিবামন মন্ত্র ভিন্ন শালগ্রামার্চ্চনার সহিত সম্পর্কশূন্য। তন্ত্র বিশেষে শালগ্রাম অর্চ্চনায় নিষেধও দেখা যায়। যথা, কুলাবলীতন্ত্রে :—

"বেদাঃ বিনিন্দিতাঃ যস্মাৎ বিষ্ণুনা বুদ্ধ রূপিণা
হরের্ণাম ন গৃহ্নীয়াৎন স্পৃশেৎ তুলসীদলং।
নস্পৃশেৎ তুলসী পত্রং শালগ্রামঞ্চ নার্চ্চয়েৎ ॥

বুদ্ধরূপী বিষ্ণু কর্ত্তৃক বেদ সকল বিশেষ ভাবে নিন্দিত। এজন্য হরির নাম গ্রহণ করিবে না, তুলসীদল ও পত্র স্পর্শ করিবে না এবং শালগ্রাম শিলার অর্চ্চনা করিবে না।

(৪) ব্রাহ্মণী-গমন সর্ব্বতন্ত্রে নিষিদ্ধ নহে। শ্যামা বিষয়ক স্ত্রীমন্ত্র অর্থাৎ স্বাহোন্তক মন্ত্র সাধনে ব্রাহ্মণী গমন অবশ্য কর্ত্তব্য। যেহেতু শ্যামা বিদ্যা ন সিদ্ধেত ব্রাহ্মণী গমনং বিনা।

প্রাণতোষিণী ধৃত। ১২৬৬ সালের সংস্করণ পৃঃ ৬২৩। এই গ্রন্থের সংগ্রহকার রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার, আগমবাগীশ মহাশয়ের অধস্তন একাদশ পুরুষ বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। "নিরুত্তরতন্ত্র" আগমবাগীশ মহাশয়ের অপরিজ্ঞাত ছিল না, এ অনুমান অযুক্ত নহে। শ্যামা বিদ্যা ও প্রয়োগে "তন্ত্রসারে" প্রাপ্তব্য।

এ অবস্থায় তন্ত্রান্তরের বচনের সহিত অন্য শাস্ত্রের বিরোধ পরিহার না করিলে সকল শাস্ত্রেরই প্রামাণ্য লোপ হইবে। এখন ইহাদের একবাক্যত্ব রক্ষার উপায় কি? যদি তন্ত্রান্তরের বচনের এইরূপ অর্থ করা যায় যে, উপাসনা বিশেষেই উহা প্রযোজ্য, অন্যত্র নহে। যে উপাসনার অন্তর্গত শালগ্রাম অর্চ্চনা, তাহাতেই হোমাদি শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ। বামদেব্য সাম যে উপাসকের অবলম্বন তাহারই পক্ষে বিধি যে—

"ন কাঞ্চন পরিহরেৎ তদ্‌ব্রতং' (ছা ২।১৩২) ভাষ্যে ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন "কাঞ্চিদপি স্ত্রিয়ং স্বাত্মতল্প প্রাপ্তং ন পরিহরেৎ সমান মার্থিনীং। বামদেব্য সামোপসনাঙ্গত্বেন বিধানাৎ। এতস্মাদন্যত্র প্রতিষেধ নস্মৃতয়।" সেইরূপ শালগ্রামার্চ্চনাত্মক উপাসনায় শূদ্রের স্বকর্ত্তৃক হোম নিষিদ্ধ, অন্য সর্ব্বত্র প্রশস্ত। এইরূপ সিদ্ধান্তেই সর্ব্বশাস্ত্রের প্রামাণ্য রক্ষা হয়। আর এক কথা—আগমবাগীশ মহাশয়ের মতে "স্ত্রীণামাপি সর্ব্ব বৈদিক কর্ম্মসু শূদ্র তুল্যত্ব প্রতিপাদনাৎ।"

প্রস্তাবিত বিষয় হইতেছে তান্ত্রিক কর্ম্মের অন্তর্গত হোম। "তন্ত্রসারে" কোন বৈদিক হোমের কথাই নাই। তবে বৈদিক কর্ম্ম সম্বন্ধে স্ত্রী-শূদ্রের তুল্যত্ব সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক কি না, ইহাও সত্যপ্রিয় পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন।

পক্ষান্তরে ইহাও দ্রষ্টব্য যে, স্ত্রী জাতির হোমাধিকার যদি বৈদিক বিধি-বিরুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে স্ত্রী শূদ্রের তুল্যত্ব বশতঃ শূদ্রের পক্ষেও হোমাধিকার নিষিদ্ধ হইবে না—ইহা যুক্তিযুক্ত। প্রথমতঃ ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে মহিষীবিধুরা মহারাজা বহু যজ্ঞে অনধিকারী। সীতা-বিরহিত রামচন্দ্রের স্বর্ণ-সীতা ব্যতীত অশ্বমেধ যজ্ঞে অনধিকার শাস্ত্রে বর্ণিত। সাগ্নিক দ্বিজের প্রবাসকালে তাঁহার সহধর্ম্মিণী হোমে অনধিকারিণী হইলে যাজ্ঞবল্ক্যাদি অপুত্রক দ্বিজের অগ্নিত্যাগ অবশ্যম্ভাবী হইত। নতুবা স্বগৃহে বন্দী হইয়া রাজার অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদিতে বিরাজ করিতে অসমর্থ হইতেন। ব্রাহ্ম-বিধানে বিবাহিত দ্বিজকে প্রতিজ্ঞা করিতে হয় যে, তিনি ধর্ম্ম অর্থ ভোগ বিষয়ে পত্নীকে অতিক্রম করিবেন না। তদ্বিষয়ক মন্ত্র যথা—'ধর্ম্মেচ অর্থেচ কামেচ নাতিচরিতব্যা ত্বয়েমং।" অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থও কাম বিষয়ে তুমি ইহাকে অতিক্রম করিবে না। যদি হোমানুষ্ঠান ধর্ম্ম হয় তাহাতে স্ত্রীকে অনধিকারিনী করিলে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ হয় কি না, ইহাও বিচার্য্য। প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ যে ধর্ম্ম নহে, ইহা ত সর্ব্ববাদি সম্মত।

"বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু" বিদায়কালে এই ভগবদ্বাক্য স্মরণান্তে প্রার্থনা—ইদং ব্রহ্মার্পণমস্তু।

দানের মর্য্যাদা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(৭)

দিন চলিয়া যাইতেছে। মাঘ মাসের মাঝামাঝি উমার বিবাহ হইয়াছে, সে মাস গেল, ফাল্গুন মাসও শেষ হইয়া আসিল; উমা আসিল না। তাহাকে আনিবার জন্য দুইবার লোক পাঠানো হইল। প্রথম তাঁহারা বেশ ভদ্রতার সঙ্গেই ফিরাইয়া দিয়াছিলেন; দ্বিতীয়বারে স্পষ্ট বলিয়া পাঠাইলেন, তাঁহারা এখন উমাকে পাঠাইবেন না; কিছু দিন পরে তাহার শিক্ষা সমাপ্ত হইয়া গেলে পাঠাইবেন।

উমা খুব গোপনে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। থাক, সেখানেই সে সুখে থাক, স্বামীর আদরিণী হইয়া সে যদি চিরজন্মও স্বামীর আলয়ে থাকে, তাহাও প্রার্থনীয়।

অমরনাথের আকারে প্রকারে কিছুই বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। দিনগুলা তাঁহার কাছে যেমন আসিতেছিল, তেমনই আসা-যাওয়া করিতে লাগিল। মনের মধ্যে কষ্ট হইলেও তিনি সেটা প্রকাশ্যে বাহির হইতে দিতে পারিলেন না।

হাত পা আছড়াইতে লাগিলেন বগলা দেবী;—"তখনই বলেছিলুম—অমর, ওখানে মেয়ের বিয়ে দিস নে। ওখানে মেয়ে কখনই সুখে থাকতে পারবে না, পারবে না; তা আমার কথা শোনা হবে কেন? আমার কথায় কি ওরা প্রথমে কান দেয়? যখন কান দেয়, তখন সব শেষ হয়ে যায়। এই যে মেয়েটার বিয়ে হল, একটী দিনের জন্যে তারা আর পাঠালে না, একটীবার দেখতেও দিলে না। এতে সুখটা কি হল? ছেলেমানুষ মেয়েটারও কপালে কষ্ট, নিজেদেরও মনে কষ্ট।"

উমা শান্তকণ্ঠে বলিল, "কষ্ট কিসের ঠাকুর-মা? মেয়ে-মানুষ স্বামীর ঘর করে, এর বেশী প্রার্থনার বিষয় ভগবানের কাছে আর কিছু নেই। না এল, নাই আসবে। আমরা এই ভেবে সুখে থাকব সে শ্বশুর-ঘর করছে, স্বামীর সেবা করছে। সেও মনে ভেবে সুখে থাকবে, সে স্বামী-সেবা করতে জন্মেছে, স্বামী সেবাই করে যাচ্ছে।"

বগলা দেবী মুখখানা বাঁকাইয়া বলিলেন, "তোর কথা রাখ্ উমা; যদি নিজে সব জেনে উপদেশ দিতিস, তাতে বরং কাজ হতো। মেয়েদের প্রথম দু' একবার শ্বশুরবাড়ী যাওয়া কি, তা তো জানিস নে,—ভগবান তোকে এ জন্মে তেমন দিন দিলেনও না। তারা বাপ মা, ভাই বোন, ছোটবেলা হতে যাদের দেখে আসছে, তাদেরই চেনে, তাদেরই ভালবাসে। হঠাৎ একরাত্রে একটা অচেনা লোক, কস্মিনকালে যাকে কখনও চোখে দেখেনি, সে এসে গোটাকত মন্ত্রের জোরে তার প্রভু হয়ে দাঁড়ায়।

হঠাৎ তাঁকে দেখে ভালবাসা তো চুলোয় যাক, ভয়ই করে,—কোথায় নিয়ে যাবে, এই কথা ভেবে। তার পর শ্বশুরবাড়ী যে সে যাবে, সেখানেও তো সবই পর, কেউ আপনার লোকটী নেই। সেই সব অচেনা লোকের মধ্যে প্রাণটা তার কি রকম করে, বল্ দেখি? ছেলেমানুষ বউদের এই মনের কষ্টটা যারা বোঝে না—তারা কি মানুষ? একেবারে কি পোষ মানানো যায় মানুষকে? অতিরিক্ত জোর চালাতে গেলে যে তার মনটা একেবারেই বিদ্রোহী হয়ে যায়। সেই তিক্ত মন নিয়ে সে যে কাজ করে, সবই যে তিক্ত হয়ে যায়। ছেলেমানুষকে কি একেবারেই আটক করতে আছে? বিয়ে যখন হয়েছে, তখন সে পরেরই হয়ে গ্যাছে, বাপ মায়ের তার উপরে আর কোন দাবী দাওয়াই থাকতে পারে না। এইটেই না বড় কষ্টের কথা যে, ছেলেমানুষ বউটার পানে তাকাতে অনেক শ্বশুর-বাড়ীর লোকই উদাসীন হয়।"

উমা একটু নীরব থাকিয়া বলিল "এমনি তো সবারই হয়ে থাকে ঠাকুর-মা। লোকে এটা জানে, জেনে-শুনেও কেন এমন করে? সবারই তো মেয়ে হয়, ব্যথাটা সবাই পায়,—তারা তবে বোঝে না কেন?"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ঠাকুর-মা বলিলেন, "কেন বোঝে না, তার উত্তর আমি কি দেব দিদি? তার উত্তর তাদের কাছেই পাবে।"

উমা আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

নিজের গৃহে প্রবেশ করিয়া অনাবশ্যক সে এটা ওটা নাড়াচাড়া করিতে লাগিল,—কি করিবে তাহা মোটে ঠিক করিতে পারিতেছিল না। মনের মধ্যে ঠাকুর-মায়ের কথাগুলো ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, সে কথাগুলোকে সে কোনও মতে হৃদয় হইতে তাড়াইতে পারিতেছিল না।

অমরনাথের কক্ষ হইতে তাঁহার আহ্বান শুনা গেল—"উমা!"

"যাই বাবা।"

তাড়াতাড়ি সে বাহির হইল। আজ দু' তিন দিন অমরনাথের শরীরটা তত ভাল যাইতেছিল না, সেজন্য তিনি গৃহেই ছিলেন।

অমরনাথ দুখানা পত্র উমার হাতে দিয়া বলিলেন "এই পত্র দুখানা পড়তো মা।"

একখানা পত্র উষা লিখিয়াছে। বেশী কথা সে কিছুই লিখিতে পারে নাই, নিজের শারীরিক অবস্থার কথা জানাইয়া সে এখানকার সকলের কুশল চাহিয়াছে।

অপর পত্রখানার খাম ছিঁড়িয়া ফেলিয়া উমা আগেই উল্টাইয়া দেখিল, সেখানা মনীশ লিখিয়াছে। সে গুড্-ফ্রাইডের ছুটিতে আসিবে, আসিয়া উষার কথা সব জানাইবে। উষা বেশ ভালই আছে, তবে একটু রোগা হইয়া গিয়াছে। প্রথম দুই তিন দিন কাঁদিয়াছিল, আর কাঁদে না। মনীশকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছে; সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য মনীশকে প্রত্যহই তাহাদের বাড়ী যাইতে হয়,—এটার ব্যতিক্রম করিবার যো কিছুতেই নাই।

পত্রখানা পড়িয়া উমা আশ্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "মনীশদা আছেন সেখানে, তা হলে বিশেষ কোনও ভাবনার কারণ নেই, না বাবা?"

অমরনাথ একটু হাসিয়া বলিলেন, "ভাবনার কারণ থাকলেই বা কি হত উমা, ভেবেই বা কি করতে পারতুম। মেয়ে যখন দান করেছি, তখন তার পরে আমাদের কি অধিকার আছে? ভাববার অধিকারটুকু আছে বটে, কিন্তু সেটা জ্বালা কেবল বাড়ায়, কমাতে পারে না। মনীশ আছে বলে একটু সান্ত্বনা যে, সে তার বাপের বাড়ীর একটা চিহ্ন দেখতে পাচ্ছে। পত্রে আর কিছু লেখা আছে কি মা?"

উমা আবার পড়িল—মনীশ লিখিয়াছে উষাকে তাহারা এখন পাঠাইবে না। সে উষাকে পাঠানোর সম্বন্ধে বলায় উষার শাশুড়ি বলিয়াছেন, এখন কিছু দিন তাঁহারা পাঠাইবেন না। আর সে পল্লীগ্রামে পাঠাইতেও তাঁহাদের কাহারও ইচ্ছা নাই। তাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা শিখাইয়া পড়াইয়া যেটুকু শিক্ষিতা করিতে পারিবেন, পল্লীগ্রামের সেই সব কুসংস্কারের মধ্যে গিয়া পড়িলে তাহার সে শিক্ষা সবই দূর হইয়া যাইবে, সে আবার কতকগুলা কুসংস্কারের বোঝা মাথায় লইয়া আসিবে। উষার পিত্রালয়ের দাসীটিকে তাঁহারা বিদায় দিতেছেন, কারণ, সে থাকিলে উষার শিক্ষা হয় না, সে কেবল তাহার কাছেই পড়িয়া থাকে। তাঁহারা ইচ্ছা করেন, সেখানকার আর কোনও লোক অযাচিত ভাবে আসিয়া উষার মনকে কাঁচাইয়া না দেয়। তাঁহারা জানেন, এ ভিত এখন পাকা নহে, কাঁচা,—বাপের বাড়ীর

ধাক্কা আসিলেই এ ইরামত ভাঙ্গিয়া পড়িবে। তবে অমরনাথ নিজে যদি দেখা করিতে আসেন, তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার কন্যার সহিত দেখা করিতে পারিবেন।

অমরনাথের ললাটে দুই তিনটী রেখা ফুটিয়া উঠিল, তিনি অধর দংশন করিলেন, পরক্ষণে একটু হাসিলেন।

উমা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "হাসলে যে বাবা। উষার এ বন্দিনীত্ব শুনে তোমার মনে একটুও কষ্ট হল না?"

অমরনাথ শান্তস্বরে বলিলেন "দুঃখ? কি লাভ মা দুঃখ করে? আমরা দুঃখ করলেই যদি কাজ হতো, তবে তো ভাবনাই থাকত না। সংসারে এসে হেরে যাব কি বারেবারেই, একবারও কি দুঃখকে জয় করতে পারব না; প্রত্যেকবারই তাকে বিজেতার আসন দিয়ে তার পায়ের ওপর পড়ে থাকব? সে আমাদের দলবে পিষবে, আমরা কেবলই কাঁদব?"

উমা পত্রখানার উপর দৃষ্টি রাখিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার মলিন মুখখানার উপরে দৃষ্টি রাখিয়া অমরনাথ বলিলেন "এত মলিন হয়ে পড়লে মা? সুখ দুঃখ যদি তোমায় তাদের মতে চলতে বাধ্য করে, তবে তুমি যথার্থ মানুষ হবে কি করে? যথার্থ মানুষ সেই—যে সুখ দুঃখকে সমান ভাবে বরণ করে নিতে পারে। যখন সুখ আসবে তখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে অগ্রসর হয়ে তাকে সম্বর্দ্ধনা করে নেবে, যখন দুঃখ আসবে তখন তার দিকে চেয়ে মাটীতে লুটিয়ে পড়ে চীৎকার করবে—না না, আমি তো এ চাই নি, তবে কেন এল? হ্যাঁ মা, আমরা কি এ ইচ্ছা প্রবৃত্তি দমন করতে পারি নে? সুখ দুঃখ, এ ত আসবেই মা। সুখের পরে দুঃখ, দুঃখের পরে সুখ ঘুরছে, এ আসবেই। আর এ কি দুঃখ মা? সামান্য একটুতেই যদি এতটা বিহ্বল হয়ে পড়, এর পর দাঁড়াবে কি করে?"

উমা কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল "তোমার মত জ্ঞান যদি পেতুম বাবা, তবে তো যথার্থ একটা মানুষ হয়ে যেতুম। আমরা যে মেয়েমানুষ বাবা, অল্পেতেই আমাদের ঘা লাগে বেশী যে।"

অমরনাথ বলিলেন "তা আমি জানি মা। মেয়েদের মনটা স্বভাবতঃই ভারী নরম কারণ, তারা জগতে এসেছে শুধু ভালবাসতে। আমি তোমায় তো অন্য মেয়ের মত শিক্ষা দিই নি উমা, তবে তোমার মনটাই বা কেন তাদের মত হবে? তুমি ভালবাসতে এসেছ, কিন্তু তাতে আপনার সর্ব্বস্ব ভাসিয়ে দিতে ত এস নি।"

উমা একটু হাসিল, বলিল "সেটা আমিও ভাবি বাবা। কিন্তু তুমি যতই শিক্ষা দাও, তবু তোমাদের মত দৃঢ়-চিত্ত আমাদের কখনই হবে না। তোমাদের পথে আমরা চলতে যাব বাবা, কিন্তু তোমাদের মত একেবারেই চলে যেতে পারব না,—নানা দিককার আকর্ষণ আসবেই। মেয়েকে পুরুষ প্রকৃতি দেওয়া চলবেই না। কখন না কখনও তার ভেতরের নারী-শক্তি বেরিয়ে পড়বেই। তার দৃষ্টান্ত ঢের রয়েছে বাবা। ঢের পড়েছি, নিজের মন দিয়েও বুঝে দেখেছি। মনে ভাবি, কে কার, কেউ তো আমার না, আমি নিজেই যখন আমার নই, তখন পরের জন্যে ভাবতে যাই কেন? মনকে খুব শক্ত করে আনি, কিন্তু কোথা হতে একটা কথা মনে ভেসে ওঠে, আমি আত্মহারা হয়ে যাই; তার কথা ভাবতে আমার চোখ ভরে জল আসে।"

অমরনাথ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া খানিকটা চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন "কলকাতায় কিছু-দিনের জন্যে যাবে মা?"

উমা বলিল "কেন বাবা, উষাকে দেখতে?"

অমরনাথ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "না, তার শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী—সেবাই যখন তার বাপের বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়িয়ে তাকে নিতে চান, আমরাই বা কেন সম্পর্ক রাখতে যাব? জেনে সুখী থাক—সে ভাল আছে, সে সভ্য সংসারে গ্যাছে, কুসংস্কারীদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক এক দিন সে নিজেই রাখতে চাইবে না, এক দিন আমাদের দেখেই সে সরে দাঁড়াবে।"

উমা মাথা নাড়িয়া বলিল, "না বাবা, তা কখনও হতে পারে?"

উত্তেজিত কণ্ঠে অমরনাথ বলিলেন, "ঠিক হতে পারে। অনেক শিক্ষিত যুবক যে সভ্যতা দেখে মুগ্ধ হয়, সে বালিকা তাতে ভুলবে না, এও কি কথা হতে পারে? এই বিজাতীয় শিক্ষায় সার বস্তু কিছু নেই মা, কিন্তু বাহ্যিক

চাকচিক্য এমন যে, লোকে দেখেই মুগ্ধ হয়ে যায়; আর তা পাবার জন্যে লালায়িত হয়। উমার কথা ছেড়ে দাও। যখন তাকে দেখবে—যে রূপে পাঠিয়ে দিয়েছ, সে রূপে আর তাকে দেখতে পাবে না, নূতন রূপে দেখতে পাবে।"

উমা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল।

অমরনাথ চুপ করিয়া শুইয়া পড়িয়া উমার কথা ভাবিতে লাগিলেন।

এই মেয়েটীর প্রকৃতি অন্য মেয়েদের হইতে অনেকটা পৃথক। সাধারণের চেয়ে সে অনেক বেশী জ্ঞান এই বয়সেই লাভ করিয়াছিল। তর্ক তাহার সহিত চলিত না,—একটা কথাতেই সে প্রতিপক্ষকে নীরব করিয়া দিত। কিন্তু উমা পিতার কাছে আসিলে ছোটবেলাকার মতই জ্ঞানহীনা হইয়া যাইত। পিতার কথার উপরে একটা কথাও সে কহিতে পারিত না। পিতা যাহা বলিতেন, সে নীরবে মাথা পাতিয়া তাহাই গ্রহণ করিত।

উমার মন জানিতে অমরনাথের বাকি ছিল না। তাহার মনখানা শুভ্র যুঁই ফুলটীর মত পবিত্র, বড় সরল,—দেবতার পায়ে উৎসর্গ করিয়া দিবার মত জিনিস। সংসারের কোনও ছলনা, কুটিলতা উমার মনে স্থান পায় না। তাহার সহিত লজ্জাবতী লতার তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। সংসারের পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে গেলেই সে সঙ্কুচিতা হইয়া মাটীতে মিশাইবে। অমরনাথ উমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাহাকে কোনও জটিলতার মাঝে তিনি টানিতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

উমার বড় স্নেহপ্রবণ হৃদয়। সে জগতে সকলকেই বড় ভালবাসে। কেহই তাহার চোখ এড়াইয়া যাইতে পারে না। সে নিজেকে দূর্ব্বার চেয়েও নত বলিয়া মনে করে। সকলের নীচে সে তাহার আসন স্থির করিয়া লইয়াছিল। জগৎকে ভালবাসিয়া, স্নেহ করিয়া সে প্রাণে বড়ই শান্তি লাভ করিয়াছিল।

বহুদিনকার অতীত একটা কথা তাঁহার মনে পড়িল,—উমার বিবাহের কথা। আবার কি তাহার বিবাহ দেওয়া যায় না?

কথাটা মনে করিতে বেদনাও বুকে বাজে, আবার আরামও বোধ হয়। তাঁহার উমা জগতের উপর হইতে এই ছড়ানো ভালবাসা গুটাইয়া আনিয়া একটীতেই অর্পণ করিবে, তাঁহার চেয়েও তাহাকে ভালবাসিবে, এ কল্পনা যেন অসহ্য বলিয়াই ঠেকে। কিন্তু উমা সুখী হইবে, উমা আনন্দ পাইবে, এই কথাটা ভাবিতেও হৃদয় পুলকে ভরিয়া উঠে। উমা স্বামীর স্ত্রী হইবে, সন্তানের মা হইবে, তাহার নারীজন্ম সার্থক হইবে।

স্বামীর স্ত্রী হওয়া, সন্তানের মা হওয়া কোন্ নারীর আকাঙ্ক্ষিত নয়? উমার মনের মধ্যে অতি গোপনে কি এই আকাঙ্ক্ষাটা জাগিয়া নাই? সে সংসারের কি বুঝিয়াছে? অতি শিশুকালেই সে যে বিধবা হইয়াছে, সধবা বা বিধবা—ইহার কি জানে সে? লোকাচারের বশবর্ত্তিনী হইয়া সে চলিতেছে মাত্র। এ লোকাচারের বেড়া ভাঙ্গিয়া তাহাকে মুক্ত করা স্নেহময় পিতার কার্য্য, আর কাহারও নহে।

শিশু যে কচি মুখে হাসিয়া মা বলিয়া ডাকে, সেই মা ডাকটী শুনিতে সকল নারীই চায়। কারণ জগতে নারীর পূর্ণ বিকাশ জননীতে,—আর কিছুতেই কোনও রূপে সে নিজের বিকাশ এরূপ ভাবে করিতে পারে না।

অমরনাথ দু হাতের উপর মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিলে । উমার সংস্কার ত্যাগ করানো যাইবে তো? তা যাইবে বৈ কি। তাহার নিজের মধ্যে একটা যে অভাব লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া বুভুক্ষুর ন্যায় বসিয়া আছে, তাহাকে দলিয়া ফেলিতে সে সংস্কারের বোঝা বহন করিতেছে। সংস্কারবশে সে আপত্তি করিবে, কিন্তু আপনিই নিজের ভাল বুঝিয়া সম্মত হইবে।

আর সমাজ?

উমার বিবাহের পূর্ব্বে উমার বিবাহ দিবার কল্পনা একবার তাঁহার মাথায় আসিয়াছিল, সমাজের কথাটাও সেই সঙ্গে তাঁহার মনে পড়িয়াছিল।

সমাজ? সমাজ তাঁহার কে? সমাজের পানে চাহিয়া তিনি জীবন-সর্ব্বস্ব কন্যার কষ্ট সহ্য করিবেন কেন? সমাজ তাঁহাকে কি দিয়াছে, ভবিষ্যতে কি দিতে পারিবে? সমাজের জন্য নিজেকে সকল রকমে হতভাগ্য করিয়া রাখিতে তিনি কিছুতেই প্রস্তুত নহেন।

মণীশ গুড্-ফ্রাইডের ছুটিতে আসিবে লিখিয়াছে। সে আসিলে, তাহা[illegible] সহিত পরা[illegible] দেখা যাইবে, সে কি বলে। সে [illegible]ক্ত, কলিকাতাতেই থাকে, পল্লীর সমাজের [illegible]

সহিত অতটা সম্পর্ক রাখে না। এ সব কাজে তাহার উৎসাহ খুব, রীতিমত সে যুক্তি দিয়া বিরুদ্ধ মতকে হার মানাইতে পারে।

মণীশের প্রতীক্ষায় অমরনাথ দিন গণিতে লাগিলেন। সেই দিনই তাহাকে একখানা পত্র দিলেন,—গুড্-ফ্রাইডের ছুটিতে সে আসিবে বলিয়াছে, আসা চাই-ই; কারণ, তাঁহার দরকার।

(৮)

গুড্-ফ্রাইডের ছুটিতে সকাল বেলাই মণীশ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার সঙ্গে তাহার বন্ধু প্রভাস আসিয়াছিল।

প্রভাস বড়লোকের ছেলে, মণীশের সহিত একত্র কলেজে পড়িয়াছিল। এক সঙ্গেই দুজনে এম-এ পাশ করিয়াছিল। মণীশ তাহার পর প্রফেসর হইয়াছিল, প্রভাস বেড়াইয়া বেড়াইতেছিল। মণীশ এ জন্য তাহাকে অনেক কথা শুনাইয়া দিত; কারণ, বসিয়া থাকা সে মোটেই পছন্দ করিত না। তাহার নিজের গৃহে অভাব ছিল না, বসিয়া থাকিলে সেও বেশ পারিত। কিন্তু বেকার বসিয়া থাকা তাহার মত চঞ্চল প্রকৃতির লোকের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ ছিল। প্রভাস তাহার তিরস্কার কাণেও তুলিত না; কারণ কাজ করাকে সে অত্যন্ত ডরাইত। নানা দেশ বেড়াইয়া সে যতটা আনন্দ লাভ করিত, এত আনন্দ আর কিছুতেই সে পাইত না।

অনেক দিন হইতেই সে মণীশের এই আত্মীয়টির কথা শুনিয়া আসিতেছে, কিন্তু এখানে আসিবার আগ্রহ কখনই তাহার হয় নাই। বাংলার পল্লীর সম্বন্ধে সে একেবারেই উদাসীন ছিল;—দেখিবার মত তাহাতে যে কিছু থাকিতে পারে, এ ধারণা সে কখনও করে নাই।

ধরিতে গেলে মনীশ এবার তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া আনিয়াছে। শিকারের প্রলোভনও যথেষ্ট দেখাইয়াছে, এবং দুইটা দিন পরেই সে কলিকাতা ফিরিতে পারিবে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।

মণীশের সঙ্গে অমরনাথের সম্পর্ক অনেকটা দূর ছিল। তাহা সত্ত্বেও এতটা নি[illegible]ভাব যে ছিল, [illegible]র কারণ, মণীশের পিতা অমরনাথের বন্ধু [illegible]। সম্পিতে

আমরা যেরূপ বুঝি, মণীশের পিতা যতীশ বাবু অমরনাথের সেরূপ বন্ধু ছিলেন না। তিনি অমরনাথকে ভাইয়ের মত ভাল বাসিতেন, স্নেহ করিতেন, অমরনাথও তাঁহাকে ভালবাসিতেন, ভক্তি করিতেন। যতীশবাবু যখন মারা যান, তখন পুত্র মণীশকে দেখিবার জন্য অমরনাথকে বার বার বলিয়া গিয়াছিলেন।

সংসারে ছিলেন মণীশের মা ও একটী ভাই দানীশ। মণীশ মা ও ভাইকে নিজের কাছে লইয়া গিয়াছিল; তাহার পিতার যে জমীদারি ছিল, তাহা অমরনাথ দেখাশুনা করিতেন। মণীশ জমীদারির কিছুই বুঝিত না, কিন্তু মা সব বুঝিতেন। অমরনাথ বৎসরান্তে একবার কলিকাতায় গিয়া তাঁহাকে হিসাব-নিকাশ দিয়া আসিতেন। উমাও একবার দুইবার গঙ্গাস্নান উপলক্ষে কলিকাতায় মণীশের বাসায় গিয়াছিল।

অমরনাথ তখন প্রভাত-ভ্রমণ শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন, পথেই মণীশ ও প্রভাসের সহিত তাঁহার দেখা হইয়া গেল।

সহাস্যে মণীশের পিঠ চাপড়াইয়া তিনি বলিলেন, "এই যে তুমি এসেছ, আমি ভেবেছিলুম দুপুরের ট্রেণে আসবে। এটী কে?"

মণীশ প্রণাম করিল, দেখাদেখি প্রভাসও কোন মতে প্রণামটা সারিয়া মণীশের পিছনে গিয়া দাঁড়াইল। মণীশ বলিল, "আমার একটী বন্ধু, যশোরের একটী জমীদার, গোবিন্দপুরের নাম শুনেছেন বোধ হয়—"

অমরনাথ হাসি মুখে বলিলেন "বিলক্ষণ শুনেছি। এস, বাড়ী যাওয়া যাক্। উমাকে আগে খবর দিতে না পারলে, সে কিছুই ঠিক করতে পারবে না, আজকাল বাড়ীর গিন্নি যে আমার উমা মা,—পিসীমা সব ছেড়ে দিয়ে কাশী যাচ্ছেন।"

তিনি অগ্রসর হইলেন। প্রভাস মণীশের পাশে পাশে চলিতে চলিতে বলিল, "মৃন্ময়ের শ্বশুর না?"

মণীশ উত্তর করিল, "হাঁ। মৃন্ময়ের অদৃষ্ট—সে এমন রত্ন চিনতে পারেনি, কাচ ভেবে অগ্রাহ্য করছে। কিন্তু এ ভুল তার শোধরাতেই হবে, সেদিন মানতেই হবে সে যথার্থ হীরা পেয়েছিল।"

প্রভাসকে অমরনাথের কাছে বসাইয়া মণীশ বলিল,

"উমাকে আমিই গিয়ে খবর দিচ্ছি, আপনাকে যেতে হবে না কাকা। আপনি ততক্ষণ প্রভাসের সঙ্গে গল্প করুন।"

সে যে হঠাৎ গিয়া উমাকে বিস্ময়ে চমকিত করিয়া তুলিতে চায়, তাহা বুঝিয়া অমরনাথ হাসিলেন, বলিলেন, "বেশ তো, যাও।"

পা টিপিয়া টিপিয়া মনীশ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

পূজার ঘরের সামনেই উমা। সে পূজা সারিয়া তখন বাহির হইতেছিল। তাহার সিক্ত কেশ-দাম আলুলায়িত ভাবে পৃষ্ঠে লুটাইতেছে। গরদের কাপড় তাহার পরনে। মাথায় সামান্য একটু কাপড়, গলে তখনও অঞ্চল বেষ্টিত। দুই ভ্রূর মাঝখানে শ্বেত চন্দনের ফোঁটা, ঈষল্লাল মুখ খানার মধ্যে স্পষ্ট ফুটিয়া আছে। ললাটে প্রণামের চিহ্ন ধূলা তখনও বিদ্যমান।

মনীশ মুগ্ধ নেত্রে তাহার সেই অনিন্দ্য সুন্দর মুখ-খানার পানে একটীবার চাহিয়াই চোখ নামাইল, তখনি একটা বড় গোছের শব্দ করিয়া ঝুপ করিয়া তাহার সামনে গিয়া পড়িল।

চমকাইয়া উমা এক পা পিছনে সরিয়া গেল। মুহূর্ত্ত পরেই হাসিয়া বলিল, "তাই তো বলি, মণিদা ভিন্ন এমন করে ভয় দেখাতে পারবে কে?"

মনীশ হাসিয়া উঠিল, "আর কেউ নেই?"

উমা বলিল, "আর একজন ছিল, সে তো এখানে নেই মণিদা, শ্বশুর-বাড়ী গ্যাছে। এখন তুমি বই আর কে ভয় দেখাবে?"

মনীশ বলিল, "আমি কি দাঁড়িয়েই থাকব না কি? বসবার একটা জায়গা-টায়গা—কিছুই তো দেবে না দেখছি। তবে এইখানেই বসে পড়া যাক।"

সে ক্ষিপ্রহস্তে একখানি তক্তা টানিয়া লইয়া বসিতে যাইতেছিল, উমা শশব্যস্তে বলিল, "বাঃ, তুমি তো এই এসে দাঁড়ালে মাত্র। চল ঘরে বসবে।"

উমা ক্ষিপ্রপদে গিয়া গৃহের দ্বার খুলিয়া দিল, মনীশ গৃহে প্রবেশ করিয়া তক্তাপোষের উপর বসিয়া পড়িল। একটু হাসিয়া বলিল, "কিন্তু উমা, আমি ট্রেনে এসেছি, কত জাতকে ছুঁয়ে এসেছি তার ঠিক নেই। তোমার বিছানাটা যদিও গুটানো রয়েছে, তবুও ছোঁয়া গেল। হয় তো এতে তোমার অনেকটা কষ্ট হবে আবার ঐগুলো কাচতে।"

সঙ্কুচিতা উমা বলিল, "কাচব কেন, বাঃ। তুমি তো বেশ কথা বল মণিদা। আমার মধ্যে ওই স্পৃশ্যাস্পৃশ্য ভাবটা মোটেই নেই, তা জেনে রেখো। মানুষ মাত্রই আমার কাছে সমান, এর মধ্যে জাত-বিচার করা চলে না, কাউকে ঘৃণা করে তফাৎ রাখাও চলে না। তুমিও যা, আমিও তাই, বাহ্যিক স্নান করলেই কি সব ময়লা কেটে যায় মণিদা, আমি তো তা বিশ্বাস করিনে। আমি জানি, মন পরিষ্কার থাকলেই হল, দেহ পরিষ্কার হোক বা নাই হোক।"

মণীশ হাসিমুখে মাথা দুলাইয়া বলিল, "আর আমার মন যদি অপরিষ্কার থাকে উমা—"

উমা বলিল, "সে তুমি জানো মণিদা, আমি তোমার মনের খবর কি করে পাব? আমি জানছি, আমার মধ্যেও যে ভগবান আত্মারূপে বিরাজ করছেন, তোমার মধ্যেও সেই ভগবান আত্মারূপে বিরাজ করছেন। গঙ্গাজলে যে সূর্য্য প্রতিবিম্বিত হয়, ময়লাধোয়া ড্রেনের জলেও সেই সূর্য্য প্রতিবিম্বিত হয়। জগতে কিছুই ঘৃণ্য নয় মণিদা, সবই পূজ্য। তুমিও যাই হও, আমি তোমায় চিরকালই প্রণাম করব।"

কথাটা শেষ করিবার সঙ্গেসঙ্গেই উমা নত হইয়া নিমেষে মনীশের পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল, এত তাড়া-তাড়ি যে, মনীশ বাধা দিতেও পারিল না। মনীশের মুখ-খানা বিবর্ণ হইয়া উঠিল। তখনি সে ভাব সামলাইয়া সে শুধু হাসিল মাত্র।

বিছানাটার ভিতর হইতে একটা বালিশ টানিয়া লইয়া বেশ আরামে কাত হইয়া পড়িয়া সে বলিল, "তবে আর কি! বিনা সঙ্কোচেই এখানে শুয়ে পড়া যাক। কাল রাতটায় মোটেই ঘুম হয় নি, ভারি ঘুম আসছে।"

উমা বলিল "তা তুমি ঘুমাও, আমি ততক্ষণ তোমার খাবারের জোগাড় করে দিয়ে আসি।"

সে পা তুলিতেই মনীশ উঠিয়া বসিল "বিলক্ষণ, আমি একা বসে থাকি এই ঘরের মধ্যে? আমার এক বন্ধু এসেছে সঙ্গে, তার কাছে তবে যাওয়া যাক। সে বেচারা এতক্ষণ কত কি ভাবছে। ভাবছে—তাকে আমি নিয়ে এসে কোথায় ফেলে অন্তর্ধান হলুম।"

উমা বলিল "তোমার বন্ধু এসেছেন—এখানে ?"

মনীশ বলিল "হ্যাঁ, বেচারা শিকার করতে এই পাড়া-গাঁয়ে এসেছে।"

উমা পূর্ব্বেই মনীশের এই অভিন্নহৃদয় বন্ধুটার খুঁটিনাটি সব কথাই মনীশের কাছে অবগত হইয়াছিল। তাই একটু হাসিয়া বলিল,"তবে তাঁকে একা ফেলে রেখে আসা তোমার ভারী অন্যায় হয়েছে মণিদা। তুমি তো আমাদের ঘরের ছেলে, এ তো তোমার ঘর বাড়ী। তিনি যখন অতিথি হয়ে এসেছেন, তাঁর সম্বর্দ্ধনাটা তোমাকেই ভাল করে করতে হবে। বাবা কি তোমাদের মত কলকাতার বাবুদের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন ?"

মনীশ গম্ভীর হইয়া বলিল "ওই দেখ, মেয়েরা যে কথা বলে, তার মধ্যে কাঁটা থাকবেই। আমায় শুদ্ধ জড়াচ্ছো কেন উমা, আমি কি দোষ করেছি? ছুটি পেলেই চলে আসি এই পাড়াগাঁয়ে। যদি ঘৃণা করতুম, তা হলে কি আসতুম ?"

উমা বলিল, "ওটা ভুল বেরিয়ে গ্যাছে মণিদা! আমার মোটেই ইচ্ছে ছিল না তোমাকে এ অপবাদটার মধ্যে জড়িয়ে ফেলতে। যাক্, তোমায় আর বেশীক্ষণ আটকে রাখব না, তোমার বন্ধু ওদিকে চোখ কপালে তুলছেন। আমারও ঢের কাজ আছে, তোমাদের খাওয়া দাওয়া দেখতে হবে, আমাদের দু'জনের রান্না আছে—"

মনীশ বিস্ময়ের সুরে বলিল, "তুমি রাঁধবে ?"

উমা হাসিয়া বলিল, "কেন, রাঁধতে নেই নাকি ?"

মনীশ বলিল "তা বলছিনে, আগে তো ঠাকুরমাই ওদিককার সব দেখাশুনা করতেন।"

উমা বলিল, "ঠাকুরমা চিরকালই করবেন? যত দিন জ্ঞান ছিল না, তত দিন বাধ্য হয়ে তাঁর সেবা নিতে হয়েছে। কিন্তু আমরা এখন বড় হয়েছি, জ্ঞান হয়েছে, এখনও কি তাঁকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেব? আমার যা কর্ত্তব্য কাজ, আমি এখন তাই করছি, তিনি এখন বিশ্রাম করুন।"

উমা চলিয়া গেল।

মনীশ চুপ করিয়া খানিকটা শুইয়া রহিল, তাহার পর উঠিয়া পড়িল। টেবিলের উপর একখানা বই পড়িয়াছিল, সেখানা টানিয়া লইয়া দেখিল—গীতা। প্রথম পৃষ্ঠা উল্টাইতেই উমার হাতের লেখা—"তুমি যাহা করাইবে আমি তাহাই করিব। অতএব হে প্রভু, তুমি আমার সকল ভার গ্রহণ কর।"

একান্ত অনুগত ভক্তের কথাই এ'। মনীশ নিষ্পলক নেত্রে সেই লেখাটার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বইখানা টেবিলে নামাইয়া রাখিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

বাহিরে বসিয়াই মনীশ জলখাবার তৈল ইত্যাদি সবই দাসী-ভৃত্যের হাতে পাইল। সে প্রভাসকে বলিল, "যাই বল, এমন নিপুণ শিক্ষা কাকার, যে, মেয়েগুলি ঠিক তেমনি হয়েছে যেমনটী আশা করেছিলেন। যে যেখানেই আসুক, উমার চোখ এড়িয়ে যাবে না। সে যেটী ভালবাসে, উমা ঠিক তাই করবে। আমি এই জন্যেই উমাকে বড্ড ভালবাসি, স্নেহ করি।"

স্নান সারিয়া সে একবার বাড়ী মধ্যে প্রবেশ করিল। উমা তখন নিজের ও ঠাকুরমায়ের জন্য রাঁধিতেছিল। চৈত্রমাসের অসহ্য গ্রীষ্ম, তাহার উপর অগ্নির উত্তাপ, উমার স্বভাবতঃ ঈষৎ আরক্ত মুখখানা গাঢ় আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; ললাট হইতে ঘর্ম্মধারা পড়িতেছিল।

মনীশকে দেখিয়া সে বলিল,"এই যে মণিদা, তোমাদের স্নান হয়ে গ্যাছে দেখছি। বামুন ঠাকরুণকে বলি তবে ভাত বাড়তে ?"

সে হাত ধুইয়া বাহির হইয়া ভাত বাড়িতে আদেশ দিয়া ফিরিয়া আসিল। মনীশ তখন সেই গৃহের দ্বারের কাছে একখানা পিঁড়ি টানিয়া লইয়া বসিয়া উনানে কাঠখানা ঠেলিয়া দিতেছিল। বাতাসে একরাশি ধোঁয়া তাহার নাকে চোখে লাগিতেই, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া নাক মুখ ডলিতে লাগিল।

উমা হাসিয়া বলিল, "যার কাজ তারে সাজে মণিদা! এ সব কাজ কি তোমাদের? যার যা কাজ সে তাই করবে, বিপরীত করতে গেলেই এমনি হবে।"

মনীশ বলিল "তা বই কি? আমি বুঝি এ সব কাজ পারি নে, তাই ভাবছ ?"

উমা বলিল "তা তো চোখে দেখতেই পাচ্ছি। মুখখানা কি রকম লাল হয়ে উঠেছে একবার আয়নাখানা দিয়ে দেখে এসো তো।"

মনীশ ক্ষুণ্ণ ভাবে বলিল,"অপদার্থ আমি নই উমা, অপদার্থ বলতে পার বরং প্রভাসকে। সেটা কোন কাজেরই না,

একটু বেশী হাঁটলে হাঁপিয়ে পড়ে কিন্তু আমি শুধু ছেলে পড়াতেই যে পারি তা নয়,—মার যখন অসুখ বিসুখ হয় তখন তো আমাকেই সব করতে হয়। দানীশ কিছুই জানে না, বাধ্য হয়ে আমাকেই তখন কোনও ক্রমে রেঁধে খেতে হয়।"

উমা কষ্টে গম্ভীর হইয়া বলিল "যারা কৃপণ তাদের অমনিই হয়ে থাকে।"

মনীশ উত্তেজিত হইয়া বলিল, "কৃপণ কিসে?"

উমা বলিল "কৃপণ নও? মাসে দুশো আড়াইশো টাকা মাইনে পাও প্রফেসারী করে, জমীদারি থেকে খাজনাও পাও বড় কম নয়, তবু একটা বামন রাখতে পার না। লোকে তোমায় কৃপণ বলবে না তো কি দাতাকর্ণ বলবে না কি?"

কথাটা শেষ করিয়াই হাসিয়া ফেলিল, আর সে গম্ভীরতা বজায় রাখিতে পারিল না।

মনীশ বলিল, "বলবে না তা জানি, কিন্তু যদি আসল কারণটা জানতে পারে, তবে মাঝামাঝি জায়গাতেই রাখবে, দাতা বলে স্বর্গেও উঠাবে না, কৃপণ বলে নরকেও ফেলবে না।"

উমা তরকারী নামাইতে নামাইতে বলিল"কারণটা কি?"

মনীশ বলিল "কারণটা—আমি আর কারও হাতে খেতে নারাজ। বিশেষ সহরে যে সব বামন বামনী পাওয়া যায়, তাদের চরিত্র প্রায়ই ভাল নয়। সেই সব অসৎ চরিত্র লোকদের হাতে খেয়ে অনর্থক শরীরটাকে খারাপ করতে চাই নে। নিজের লোক যদি কেউ থাকে, রেঁধে দেয় খাব, না হয় নিজের হাতে রেঁধে খাব সেও ভাল। এমন কিছু বেশী কষ্টের কাজ নয় এটা, ইচ্ছে করলে সবাই পারে। কিন্তু সহরে গিয়ে বাবু হয়ে লোকে রান্নাঘরের দিকে পর্য্যন্ত যায় না, পাছে ধোঁয়া লেগে অসুখ করে। কিন্তু এই রান্নাঘরই যে আমাদের জীবন, তারা সেটা বুঝতে চায় না। যে রাঁধে, সে কি রকম ভাবে রাঁধে, এটা আগে দেখা উচিত। তার স্বাস্থ্য কেমন, তার কোনও সংক্রামক ব্যারাম আছে কি না, তার খোঁজ নেওয়া উচিত। আমি সেই সব জন্যেই বামন ঠাকুর, বামন ঠাকরুণ কাউকেই রাঁধবার কাজে রাখতে চাই নে।"

উমা বলিল, "তা জেঠিমা যে চিরকালই তোমায় রেঁধে খাওয়াবেন, এমন কোনও মানে নেই। তিনিও তো বুড়ো হয়েছেন, কতদিন আর এ জোয়াল ঘাড়ে করে রাখবেন? তুমি একটা বিয়ে কর না মণিদা, সব আপদ চুকে যাবে। এ সময় মাকে বসিয়ে রাখাই কর্ত্তব্য। এই বুড়ো হয়েছেন, এখনও কি সংসার নিয়ে জড়িয়ে থাকবেন?"

মনীশ পরিহাসের সুরে বলিল, "বউ এসে রেঁধে খাওয়াবে, না?"

উমা বিস্ফারিত চোখে বলিল, "রাঁধবে না?"

মনীশ বলিল "রক্ষা কর। সে কাজ করা তো চুলোয় যাক, বউকে বোলো তো একটু রান্নাঘরে যেতে, কি একখানা কাজ করতে, রান্নাঘরে গেলেই তার মান গেল, তা বুঝি জানো না? বাবু হবে যে—অর্থাৎ যার দু পয়সা আছে, তাকে যেমন করেই হোক বামুন রাখতেই হবে। নচেৎ বাবু যে হওয়া যায় না। আমি তো এই পাড়াগাঁয়ে এসে বাস করব না যে বউ এখানকার শিক্ষা নেবে? সহরে থাকবে সে, কাজেই সহরের চালে চলবে।"

উমা বলিল, "তা কোনও পাড়াগাঁয়ের মেয়ে নিলেই হয়। উষার সঙ্গে বাবা যখন তোমার বিয়ে দেবার কথা বললেন—"

ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া মনীশ বলিল "ছিঃ, তা কখনো হতে পারে উমা? সেই উষা—যাকে চিরটা কাল কোলে পিঠে করেছি, যে আমার নিজের বোনের মতই, তার সঙ্গে বিয়ে? স্বপ্নেও যা ভাবা যায় না, বাস্তবিক তা কি হতে পারে? নাঃ, ও সব আমার দ্বারা হবে না। বিয়ে যদি করবার হোতো, অনেক দিন আগেই করতুম।"

উমা বিস্ময়ে বলিল "বিয়ে, করবে না?"

মনীশ হাসিয়া বলিল, "নাঃ।"

উমা বলিল, "দেখা যাবে। চল এখন, জায়গা হয়ে গ্যাছে, ভাত বাড়াও হয়ে গ্যাছে। বাবাকে আর তোমার বন্ধুকে ডাকতে পাঠাই।"

দালানে জায়গা করা হইয়াছিল। অমরনাথ প্রভাসকে লইয়া মনীশকে ডাকিয়া আহারে বসিলেন।

উমাকে উদ্দেশ করিয়া অমরনাথ বলিলেন "তোমার তরকারী নিয়ে এসো মা, নইলে আমার খাওয়া হবে না। প্রভাসকে দেখে লজ্জা করতে হবে না, মনীশও যেমন তোমার ভাই, প্রভাসও তেমনি।"

উমা নত মুখে পিতার আদেশে আসিয়া নিজের তরকারী পরিবেশন করিয়া গেল।

অমরনাথ একটু হাসিয়া প্রভাসের পানে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার খাওয়ার বড় কষ্ট হচ্ছে বাবা। মণীশের তবু অভ্যাস আছে, সে মাছ মাংস না হলেও বেশ খেতে পারে, কিন্তু তুমি—"

লাজুক প্রভাস নত মুখে হাসিয়া বলিল "না, কিছু কষ্ট হচ্ছে না, এ রকম তরকারী আমি কখনও খাই নি ; তাই নিরামিষাহারীকে অপদার্থ বলেই ভাবতুম। এখন দেখছি আমিষের চেয়ে নিরামিষ জিনিসটাই লাগে খুব ভাল।"

বাস্তবিক সে একটু তরকারীও উঠিবার সময়ে পাতে ফেলিয়া উঠে নাই। (ক্রমশঃ)

কৃষিজীবী ও মসীজীবী

সফিয়া খাতুন বি-এ

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী চাষার মুখ দিয়ে গাহিয়ে গিয়েছেন—

"অট্টালিকা নাহি মোর, নাহি দাস দাসী,
ক্ষতি নাই—নহি আমি সে সুখ প্রয়াসী।
আমি চাই—ছোট ঘরে বড় মন লয়ে,
নিজের সুখের অন্ন খাই সুখী হয়ে।"

এই কয়টী কথা সে দিন আসামের সেনসাস্ রিপোর্ট পড়ে, আমার বারবারই মনে পড়ছিল। সেই রিপোর্টে দুটী লোকের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসেব দেখতে পেলাম। তাদের একজন হচ্ছেন চাষা, আর একজন হচ্ছেন কেরাণী। চাষীটী শ্রীহট্ট জিলার বিশ্বনাথ থানার অন্তর্গত দিগবন্ধ গ্রামের জনৈক মুসলমান, আর কেরাণীটী শ্রীমঙ্গলের সরকারী মোহরের।

কৃষকটীর পরিবারে ৮ আটটী লোক। স্বামী স্ত্রী দুজন, ছেলে তিনটী, মেয়ে তিনটী। তার বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের তালিকা দেওয়া গেল।

জমা		খরচ	
ধান বিক্রয়	২৫২৲	চাউল	২২৮৲
দিনমজুরী	১০০৲	লবণ	৫৲
ঋণগ্রহণ	১৫০৲	তেল	১০৲
		মসলা	৫৲
মোট	৫০২৲	মাছ	১২৲
			২৬০৲
		জের	২৬০৲
		ডাল	৫৲
		তরকারী	৩৲
		দুধ এবং ঘি	৮৲
		সুপারি	৫৲
		কেরসিন	৬৲
		তামাকু	৮৲
		কাপড়	২০৲
		বাসনপত্র	৫৲
		গৃহের আসবাব	৩৲
		রাজস্ব ও খাজনা	২০৲
		ট্যাক্স	১৲
		মোট	৪০৪৲

জমা—৫০২৲
খরচ—৪০৪৲

তহবিল—৯৮৲

এই গেল কৃষকটীর বাৎসরিক আয়-ব্যয়। এখন কেরাণী বাবুটীর অবস্থাটা একবার দেখা যাক্। এই মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকটীর পরিবারে পাঁচজন লোক। স্বামী স্ত্রী দুজন, ছেলে দুটী, মেয়ে একটী। ভদ্রলোকটীর মাসিক বেতন ৩০৲ ত্রিশ টাকা। কাজেই তাহার বাৎসরিক আয় হল ৩৬০৲ টাকা।

জমা	খরচ
বার্ষিক বেতন—৩৬০৲	চাউল—১২০৲
	/১৫ লবণ—৸৵০
	/১২ তেল—৯৲
	মসলা—১৫৲
	মাছ—৩০৲
	ডাল—৫৷৵০
	তরকারী—১০৲
	চা ও চিনি—১৫৲
	পান সুপারী—১২৲
জমা—৩৬০৲	কাপড়—৪৮৲
খরচ—৩৩৪৸০	বাড়ী মেরামত—২৪৲
——————	কেরসিন—৭৲
২৫।০	তামাক—১৫৲
	কাপড়—৪৮৲
	বাসন—৪৲
	গৃহের আসবাব—৪৲
	চিকিৎসা খরচা—১০৲
	উৎসব—২৲
	খাজনা—২।০
	——————
	মোট——৩৩৪৸০

সরকার পক্ষ কেরাণীটির আয় ব্যয়ের যে হিসেব দেখিয়েছেন, তা একটী পরিবারের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে যে নিতান্ত অপ্রচুর, তা যে ব্যক্তির একটু সামান্য বুদ্ধি আছে, তিনিই অনায়াসে বুঝিতে পারেন। ছেলে মেয়েদের দুধের খরচ লেখা হয় নাই। উৎসব খরচ ২৲ লেখা হয়েছে। রাজ-সরকার বিদেশী,—একটী হিন্দু পরিবারের উৎসব খরচ যে কত হয়, তা তাঁহাদের জানা নাই। হিন্দুর এক "শুভ-চণ্ডী" ব্রতে লম্বা টিকিওয়ালা বামুন ঠাকুর একখানা পা ধুয়েই বলেন "দক্ষিণা ৩৲ তিনটাকা দাও; তা নইলে তোমার ফুল বেলপাতা রইল, আমি চল্লুম।" হিন্দুর বার মাসে তের পার্ব্বণ লেগেই আছে। মেয়েদের কত যে ব্রত আছে, তা বলেই শেষ করা যায় না। লক্ষ্মী ব্রত, কার্ত্তিক ব্রত, মঙ্গল চণ্ডীর ব্রত, দুর্ব্বাষ্টমী, রাধাষ্টমী, অনন্তচতুর্দ্দশী, শিবচতুর্দ্দশী—এসব কত আর লিখিব। অবশ্য আমার ন্যায় অনভিজ্ঞ একটী মুসলমান বালিকার পক্ষে হিন্দুর সকল ব্রতের নাম করা অসাধ্য। কিন্তু এটা জানি যে, হিন্দুর এসব মেয়েলী ব্রত বহাল না রাখতে পারলে তাকে হিন্দুই বলে না।

কেরাণীটীর দুটী ছেলে। এদের লেখা পড়ার খরচার কথা সরকার পক্ষ ভুলে গেছেন।

মেয়েটীকেও আজকাল দুকলম লেখাপড়া অর্থাৎ অন্ততঃ চিঠিপত্র লেখা শিখাতে না পারলে, কোন ছেলেই তাকে বিয়ে করতে চাইবে না। জানি না, মেয়েটীর বয়স কত। যদি দশ বৎসরে পা দিয়ে থাকে, তাহলে ত মা-বাবার গলায় কাঁটা লেগে যাবে। কি করে মেয়েকে তাড়িয়ে দিতে পারবেন, সেই চিন্তায় দিনরাত তাঁদের ঘুমই আসবে না। এ অবস্থায় ভদ্রলোকটীর বাড়ী ঘর বিক্রি করবার উপক্রম নয় কি? বৎসরের শেষে ত হাতে ২৫।০ আনা থাকে। মেয়ের বিয়ে হবে কি করে? এই সমস্যাটা সরকার পক্ষ খণ্ডন করে দিবেন কি?

চিকিৎসা খরচ দেখান হয়েছে ১০৲ টাকা। হাসি পায় শুনে। আসাম ত আর "স্বর্গ" নয় যে, সেখানে কোন রোগ হতেই পারে না। সারা দেশ ম্যালেরিয়া ও কালা-জ্বরে ছেয়ে গেছে। তার প্রতিকারে সরকার পক্ষ উদাসীন বলে কি লোকটীর চিকিৎসা খরচও দশটাকা দেখান হয়েছে? আরে বাবু, একটা যেমন-তেমন ডাক্তারের ভিজিটই ত আজ কাল ১০৲টাকা। তার উপর ঔষধের দাম কি ফাওয়ে গেল? পাড়াগাঁয়ে আর কটা হাঁসপাতাল আছে শুনি? এরকম যে কত খরচা বাদ দেওয়া হয়েছে, তা আর কত লিখব।

যাক্‌, এ সব সমালোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। কথা হচ্ছে, আমরা এই প্রবন্ধে দেখাতে চাই, সংসারে প্রকৃত সুখী কে? চাষী, না কেরাণী?

এই দুটী লোকের আয়-ব্যয়ের হিসেব পরীক্ষা করে দেখা যায়, ঋণ ব্যতীত কৃষকের আয় ৩৫২৲ টাকা, আর কেরাণীর ৩৬০৲ টাকা। বৎসরের শেষে চাষী ৯৮৲ টাকা তহবিল রাখে, আর সেই যায়গায় কেরাণীটী ২৫।০ রাখেন। কেরাণীর পোষ্য ৫ জন, আর কৃষকের পোষ্য ৮ জন। শুধু চা ও পান-তামাকের খরচা ছেড়ে দিয়ে, অন্যান্য সব খরচাই কৃষকের অপেক্ষা কেরাণীর অল্প।

আসামের প্রসিদ্ধ পত্রিকা "জনশক্তি" এই আয়-ব্যয়ের হিসেব দেখে বড় দুঃখ করে বলেছেন, "তবুও একটী ২৫৲ বেতনের চাকুরী খালি পড়িলে, হাজার হাজার দরখাস্ত পড়ে। অথচ সচ্ছল ভাবে স্বাধীন জীবিকা নির্ব্বাহের কত পন্থা পড়িয়া রহিয়াছে।"

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় কি ভুলে গেলেন যে, সবই দোষ সেই নন্দ ঘোষ—কলেজ-স্কোয়ারের সাদা দালানটীর ? এক দিন ইহার হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা যিনি ছিলেন, তিনিও নিজের ভুল বুঝতে পেরে একদিন বলেছেন, ' You give slavery in one hand and money in other" অর্থাৎ তুমি এক হাতে দিচ্ছ টাকা, আর এক হাতে দিচ্ছ দাসত্ব।

কাজেই, সেথানকার শিক্ষা দাসত্ব ছাড়া আর কি হতে পারে ? সেখানে ছেলেরা মাথামুণ্ডু কতকগুলি Text book পড়েই সময় পায় না। অন্য চিন্তা কি করবে ? একবার পাঞ্জাবের কোন স্কুল দেখতে গিয়ে আমি সেই স্কুলের ছেলেদের জিজ্ঞাসা করলাম, তারা ভবিষ্যতে কে কি হতে আশা করে। সে স্কুলে ছেলে প্রায় পাঁচ শত। আশ্চর্য্যের বিষয়, এমন একটীও ছেলে পেলাম না যে লিখলে, "আমি বাণিয়া হতে চাই।" সবই ডেপুটী, জজ, ব্যারিষ্টার, মুন্সেফ ইত্যাদি।

আধুনিক শিক্ষায় আমাদের ছেলেরা প্রথমেই শিখে, কি করে চাকর হওয়া যায়। কেরাণীগিরিতে মাসের শেষে সাদা সাদা ৫০৲টী টাকা পাওয়া যাবে। আর কি চাই ! বাণিয়াগিরী করে যে সেই যায়গায় ২০০ টাকা পাওয়া যায় সে বিষয়ে একটু চিন্তা করাকে তাহারা বৃথা সময় নষ্ট করা মনে করে।

ইয়োরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আমাদের দেশের ন্যায় ছেলেদের চাকুরীর দিকে টেনে নিতে ঘৃণা করে। সেথানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছাত্রদের স্বাধীন জীবিকার জন্য অনেক বন্দোবস্ত করেছে। মেকানিক্যাল ও টেক্নিক্যাল শিক্ষার কত যে সুযোগ ছেলেদের জন্য করে দিয়েছে, তার ইয়ত্তা নাই। আমাদের দেশে কি আছে ? এক শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। সেখানেও অনেক 'হাঁ হুজুর' না করে ঢোকা যায় না। গণা বাছা কয়টী ছেলে লওয়া হয়। তার বেশী হলেই বলেন "No seat." এই ত অবস্থা।

Commercial, Industrial ও Agricultural শিক্ষায় ছেলেদের কোন দিনই উৎসাহ দেওয়া হয় না। Carpentryতে আমাদের দেশে কত টাকা জমান যায়। আমাদের ছেলেদের সে সব জানতে দেওয়া হয় না।

স্বাধীন জীবিকা-নির্ব্বাহের যত সুবিধা পন্থা আমাদের দেশে আছে, পৃথিবীর আর কোন দেশে তার শতাংশের একাংশও নাই।

আমেরিকান গ্লোব-ট্রটার মিঃ ষ্টেফোর্ড ভারতের নানা স্থান ভ্রমণ করে বলে গেছেন "It is true that India is a country of Gold, because all its treasures lie in its earth." অর্থাৎ ভারত যে সোণার ভারত তার ভুল নাই। তাঁর ধনরত্ন সবই মাটীতে।

কথায় বলে, জহুরী জানে জহরতের মর্ম্ম। আমাদের দেশে যে কি আছে না আছে, তা আমরা জানি না। বিদেশীরা এসে আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে তা দেখিয়ে দেয়। তাই সারা ভারত জুড়ে কত কল-কারখানা, চা-কর, নীল-কর, ইত্যাদি সবই সাদা মানুষদের হাতে। সে সব লোক প্রথমে আমাদের দেশে আসবার সময় লোটা-কম্বল হাতে নিয়ে আসে। তার পর যাবার সময় সেই লোটা-কম্বল আমাদের হাতে দিয়ে, জাহাজ ভরে সোণারূপা নিয়ে যায়। আমাদের ছেলেরা দেশের কুড়ে—পরিশ্রমে ভীতু বলে আজ আমাদের এই দশা। আমাদের ছেলেরা জানে যে, একটু পরিশ্রম করলে ৫০৲ টাকার জায়গায় ২০০ টাকা পাওয়া যায়। তা জেনে শুনেও সেই ৫০৲ টাকার কেরাণীগিরি করতে যায়। কারণ, এ যে গণা বাচা ৫০৲ টাকা। কে জানে, ২০০৲ টাকার আশায় যদি সেই ৫০৲ টাকাও যায়। এই ভয়ে সহজ পথেই তারা যেতে চায়। এর কারণ, আমাদের ছেলেদের মনের বল নাই। নিজকে নিজে বিশ্বাস করিতে পারে না। চরিত্র-বলের অভাবেই আমাদের ছেলেদের এই অবস্থা। অবশ্য এসব কতকটা দীনতা হতেও আসে। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, আমাদের শিক্ষার দোষ। ছেলেবেলা হতেই আমাদের ছেলেরা স্বাধীনতা কি তা জানে না। এর জন্য আমরাই দায়ী। শিশুকে নিজ হাতে কোন দিন কিছু করতে দেই না পাছে "সোণার চাঁদের" কোন অসুখ হয়। প্রথম ছেলে

হলে আমরা ভাবি, পাছে ছেলেকে মাথায় রাখলে উকুনে খায় কি মাটীতে রাখলে পিঁপড়ে খায়।

এমন সব ছেলে দেখতে পেয়েছি—ষোল সতর বৎসর বয়সেও সে বলতে পারে না—এ বেলায় সে কতটা ভাত খাবে। তাও মাকে বলে দিতে হয়। অথচ ছেলের এই লজ্জাকর নিঃসহায়তা দেখে পিতা-মাতা খুব আমোদ-আহ্লাদ করে থাকেন। কাজেই সেই আদুরে ছেলে বড় হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবে কি করে?

ছেলের বাবা যদি কোন সাহেবের বড়বাবু হন, তাহ'লে আর কথাই নাই। সে ছেলে যে বি-এ পাশ করে সাহেবের ছোটবাবু হবে, তার কোন ভুল নাই।

আমাদের ছেলেরা লেখাপড়া শিখে ব্যবসা-বাণিজ্যকে নেহাইত ছোটলোকের কাজ মনে করে। ছেলেদের যে বড় একটা দোষ, তা বলা যায় না। সব দোষ এই বুড়োদের। যদি বা কোন ছেলে বি-এ পাশ করে একটা দোকান দেয়, তা'হলে বুড়ো সমাজপতিরা গাঁজাখুরী আড্ডা দিয়ে বলেন, "হাঁ, ওটা বি-এ পাশ দিয়ে একেবারে গণ্ডমূর্খ হয়েছে দারগা হতে পারল না ত কি ছাই তিনটে পাশ দিলে।"

ব্রাহ্মণের ছেলে যদি জুতার দোকান দেয়, তাতে তার হাতের জল কেহ পান করবে না। অথচ হাজার হাজার ব্রাহ্মণের ছেলে জুতা বা চামড়ার দোকানে কেরাণীগিরি করে থাকেন। সকালবেলা দোকানে এসে সেই চামড়া-বিক্রেতাকে বলে থাকেন, "সেলাম খাঁ সাহেব।" চামড়া বিক্রি করলে জাত যায়—কিন্তু চামড়াওয়ালার চাকর হলে জাত যায় না! এই ত দেশের অবস্থা!

ইয়োরোপে চাষী ও বাণিয়াদের বিশেষ সম্মান। কারণ তারা কারো চাকর নয়। সে দেশের লোক চাকর হওয়াকে ঘৃণা করে। তারা মানুষের ব্যবসা দেখে সম্মান করে না; তার আত্মা দেখে সম্মান করে। আর আমাদের দেশে ঠিক তার উল্টা ব্যবস্থা।

সে সব দেশের ছেলে মেয়েরা স্কুল কলেজে শিক্ষা করে—"Try to stand on your own legs." আর আমাদের ছেলে মেয়েরা শিক্ষা করে—"Try to be a burden to your own parents." তাই আমাদের ছেলেদের স্বাধীন জীবিকার নামে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়।

এসব অসুবিধার উপর সব চাইতে বড় অসুবিধা হয়েছে, আমাদের ছেলেদের অল্প বয়সে বিবাহ। আমাদের ছেলেরা মেট্রিক পাশ দিতে না দিতেই তিনটী সন্তানের পিতা সাজে। মা বাবা, পুত্রবধূ এমন কি পৌত্রমুখ দেখবার জন্য ছেলেদের এই সর্ব্বনাশ করে থাকেন।

ছেলে যুবতী স্ত্রী পেয়ে পুথিপত্রের সঙ্গে Non-co-operation করে। দিন রাত কিশোরী পত্নীর কথাই ভাবে; আর দিনের ভেতর সাতখানা চিঠি লিখে সময়ের সদ্ব্যবহার করে।

এদিকে পিতাও বৃদ্ধ হয়ে গেছেন,—হঠাৎ দুচোখ বুজে ফেল্লেন। তখন উপায়?

এক ফুৎকারে ছেলের সিল্ক ড্রেস্, সোণার ঘড়ী, মাথার টেরী, নাকের চসমা, যে কোথায় উড়ে গেল, তা আর বলা যায় না। একেবারে পথের ভিখারী। বাধ্য হয়ে ২৫৲ টাকার কেরাণীগিরি খুঁজতে বেরুতে হয়। কারণ, তা নইলে যে হাঁড়ীতে চাল উঠবে না। স্ত্রীকে ও ছেলে মেয়েদের খেতে দেবে কি? পাঠক! এই ছেলে কি করে ব্যবসা-বাণিজ্য করবে? আজ যদি সেই ছেলেটী বিবাহিত না হত, তা হলে কি তার কোন চিন্তা ছিল? অনায়াসে সে কোন স্বাধীন পথ খুঁজে নিতে পারত; কারণ, শুধু এক উদরের জন্য কেহই ভাবে না।

ইয়োরোপের মাতা পিতা আমাদের ন্যায় নয়। ছেলে মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে নিজ নিজ পথ দেখতে বলেন। কেহ মনে করবেন না যে, সে সব পিতা মাতা শিশুদের প্রতি স্নেহশীল নয়। বরং আমরাই আমাদের ছেলে মেয়েদের প্রতি স্নেহশীল নই।

সে সব ছেলে মেয়েরা নিজ হাতে যথেষ্ট টাকা পয়সা সঞ্চয় না করে কোনদিন বিয়ে করতে চায় না। তাই তারা বড় একটা দুঃখ-দৈন্যের সঙ্গে কোন দিন পরিচিত হয় না।

আজ ইংরেজ এত ধনী কেন? তার মূলে বাণিজ্য। সারা জগত জুড়ে এরা ব্যবসা করে ঘুরছে। ব্যবসায়ে যে আমাদের দেশেও কত লোক বড় হয়ে গেছেন, তার প্রমাণ জেমশেদপুরের মিঃ টাটা।

আমি নিজ চোখে যা দেখেছি, সে রকম দুটী ছেলের কথা আমি বলব। Non-co-operation যখন পুরাদমে

চলছিল, সে সময় একদিন পূর্ব্ববঙ্গের একটী ছেলের সঙ্গে আমার দেখা হয়। ছেলেটীর বয়স ১৭।১৮ বৎসর হবে। ছেলেটীর পরিধানে মাত্র একখানা কাপড় ছিল। কিন্তু বেচারাকে দেখলে ভদ্রলোকের ছেলে বলেই মনে হয়। ছেলেটী অনাহারে নগ্নপদে একটী গাছের নীচে বসে ছিল। ক্ষুধার জ্বালায় এক একবার রাস্তার কলের জল পান করছিল। এ দৃশ্য দেখে আমি আর বসে থাকতে পারি নাই। আমি তার কাছে গিয়ে তার বাড়ী ঘর সব জিজ্ঞেস করলাম। সে প্রথমতঃ নিজ প্রকৃত পরিচয় দেয় নাই। নিজেকে অশিক্ষিত পাচক ঠাকুর বলে পরিচয় দিয়ে, তাকে কোন কাজ দিতে পারি কি না, তা জিজ্ঞেস করল। ছেলেটী জাতিতে ব্রাহ্মণ। মহা মুস্কিলে পড়ে গেলাম। মুসলমান হয়ে তার কি করতে পারি। অথচ টাকা দিয়ে যে তার কোন উপকার করা যায়, সে অবস্থা তার ছিল না। অনাহারে সে এতই জীর্ণ শীর্ণ হয়েছিল যে, তাকে অন্ততঃ মাস কয়েক সেবা-শুশ্রূষা না করলে ও ভাল আহার না দিলে, সে ছেলেকে বাঁচানই মুস্কিল।

ছেলেটী সমস্ত দিন কিছুই খেতে পায় নাই। তাড়াতাড়ি তাকে বাড়ী নিয়ে এলাম। সেদিন তাকে আর কিছুই জিজ্ঞেস করলাম না। পর দিন আমাদের বাড়ীর সবাই তাকে অনেক প্রশ্ন করার পর জানা গেল, সে আই-এ পড়ত। অসহযোগ করে জেলে যায়। মা-বাবা খরচা বন্ধ করে দিয়েছেন। জেল হতে বেরিয়ে সে কোথায় যাবে তারই ঠিকানা নাই।

বাড়ীর ছেলে-মেয়ে সকলের বিশেষ যত্ন ও সেবায় ছেলেটী সহজেই তার স্বাস্থ্য পুনঃ লাভ করে। কিন্তু এ ভাবে থাকতে সে রাজী হয় না। কি করি, অনেক চিন্তা করে তাকে একটী দোকান করতে বলি। তখন ঠিক পূজার সময়। ২৫৲ টাকা তাকে দিই। তা দিয়ে সে প্রথমে শুধু সাবান কিনে রাস্তায় রাস্তায় বিক্রি করে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এক মাসে তার ৩০৲ টাকা লাভ হয়।

তার পর আমি তাকে আরও ২০০৲ টাকা দিই। সে আজ ছয় মাসের কথা। আজ কয় দিন হল ছেলেটীর একখানা পত্র পেয়েছি। সে লিখেছে—

"আমি ছোট একখানা কুঠা ভাঁড়া নিয়েছি, কাজ এত বেশী যে একা আর পারি না। দুটী ছেলে রেখেছি। তাদের ১৫৲ টাকা করে বেতন দিই।" পাঠক! এই ছেলের অবস্থা একবার ভেবে দেখুন। সে যদি এই স্বাধীন পথ না নিয়ে কেরাণী সাজত, তাহলে বড় জোর ৩০৲ টাকা বেতন পেত। কিন্তু আজ সে ১৫৲ টাকা বেতনের দুটী চাকর খাটাচ্ছে। অবশ্য তার কারণ সে আত্মাভিমান একেবারে ভুলে গেছে। নিজ হাতে পাল্লা পাথর ধরে জিনিস বিক্রি করেছে। সে প্রথমেই টেবিল চেয়ার নিয়ে বসে নাই; বা ম্যানেজার অমুক, অডিটার অমুক, কি প্রপ্রাইটার অমুক বলে "হামবাগের" ন্যায় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন করে নাই। তাই এত অল্প সময়ে সে এত উন্নত হয়েছে।

আর একটী ছেলের কথা বলছি। তিনি আমার আপন "বোনপো।" ছেলেটী বি-এ পড়ছিলেন। তিনি এক দিন এসে আমাকে বল্লেন, "খালাজান (মাসীমা), Universityকে তালাক দিয়ে এসেছি।" আমি হেসে বল্লাম, "বাপু, বেশ করেছ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর মায়া যে ছাড়তে পেরেছ, তাতেই তোমাকে শত ধন্যবাদ।" তার পর তিনি পরামর্শ চাইলেন, এখন কি করবেন। অসহযোগ করা ত আর সোজা নয়? খাওয়া-পরা, চলা-ফেরা ইত্যাদি সব বিষয়েই নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে।

ছেলের বাবার যথেষ্ট জায়গা-জমি আছে। কিন্তু তাহলে কি হয়। মা-বাবার ইচ্ছা ছিল ছেলে বিলেত যাবে, ব্যারিষ্টার হবে, ইত্যাদি কত কি। তাই মা-বাবা তাকেত বাড়ী হতে তাড়িয়েছেন।

ভাগ্যে ছেলের শ্বশুর ছিলেন ধনী মহাজন। তিনি নিজ জামাতাকে কোন ব্যবসা করবার জন্য কয়েক হাজার টাকা দিতে রাজী হলেন। তাই নিয়ে ছেলেটী তার আর তিনটী পাঞ্জাবী বন্ধু নিয়ে মান্দ্রাজের "বাংলোর" নামক স্থানে কোন জমিদারের নিকট হতে কয়েক বিঘা জমি "লিজ" নেয় ও তাতে কার্পাসের চাষ আরম্ভ করে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকখানা "অটমেটিক" তাঁত নিয়ে কাপড় বোনারও বন্দোবস্ত করে। আমি গেল মাসে তাদের "ফার্ম্মের" জন্মোৎসব দিনে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম। গেল বছরের আয়-ব্যয়ের হিসেব দেখলাম। কুলী, চাকর ও নিজেদের খোরাক পোষাকের

খরচা বাদ দিয়ে প্রত্যেক ছেলে তিন হাজার টাকা নগদ হাতে করেছে। তাদের ফার্ম হতে সুন্দর সুন্দর খদ্দর, সাড়ী, কাপড়, জামা, আলোয়ান ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে। অথচ ভারি সস্তা। ছেলেরা সম্প্রতি আর একটা নূতন কারবার চালাচ্ছে। সেখানকার একটী প্রকাণ্ড জঙ্গল "লিজ" নিয়ে, তা হতে টিম্বার কাটা সুরু করেছে। এ বছর ই, আই, আর এর রাস্তার স্লিপারের জন্য তারা কন্‌ট্রাক্ট নিতে চাচ্ছে। তা ছাড়া, অনেক ভাল মিস্ত্রী নিয়ে নানা রকমের চেয়ার, ইজিচেয়ার, খাট, পালং, ডেস্ক, ড্রয়ার ইত্যাদি নানা প্রকারের সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরী করে নানা জায়গায় চালান দিচ্ছে।

ব্যবসায়ে যে কি করে মানুষ ধনকুবের হয়ে গেছেন, তার আর কত উদাহরণ দিব। তাই আমাদের দেশের অন্নাভাবের কথা শুনে বিদেশীরা হাসে।

আমাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য যা কিছু দরকার, তা সবই আমরা আমাদের মাটির কাছে পেতে পারি। আমাদের কিছুই কিনবার দরকার হয় না। আমাদের যা কিছু খাদ্য—ভাত, ডাল, তরকারী, মাছ, মাংস, ঘি দুধ, ইত্যাদি সবই বিনা পয়সায় পাওয়া যায়—যদি একটু পরিশ্রম করা যায়। আর যদি বল যে,—ইংলিস হেম, বেকন, Cream Dutch Ganda cheese, Dutch Edam Ball, Pubis, Patum, Pepperium, Huntley and Palmer's বিস্কুট না হলে খাওয়া চলে না। তা'হলে যাও বিলেতে। এ দেশে নয়। এ দেশের লোক যারা, তাদের খাদ্য একমাত্র ডাল ভাত। আমাদের নিজ হাতে চাষবাস করতে পারলে কিছুই কিনতে হয় না। ক্ষেতে ডাল চাউল পাওয়া যায়। বাগান করলে, যত প্রকারের তরকারী আছে, তা পাওয়া যায়। দুচারটা গাভী রাখলে যথেষ্ট দুধ ঘি পাওয়া যায়। তবে কাপড়;—অবশ্য চরকায় কেটে যে সুতা হয়, তা দিয়ে একটী পরিবারের কাপড়ের খরচ চলে না। সে এক দিন ছিল, যখন অবশ্য মেয়েরা সুতা কেটে পুরুষদের কাপড় তৈরী করে দিতেন। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার কৃপায় আমরা এমন স্তরে এসে দাঁড়িয়েছি যে, সে সব মোটা কাপড় পরলে নাকি আর সভ্যতা রক্ষা পায় না। অথচ এই কচুপাতার জল—সভ্যতা রক্ষা করার জন্য সবাইকে মাঞ্চেষ্টারের দিকে চেয়ে থাকতে হয়। তা সত্যি কি মিথ্যা, গত ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধে দেখা গিয়েছিল। যেই বিদেশীরা মাল বন্ধ করে দিল, অমনি বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে মা ভাই বোন নগ্ন হতে লাগলেন।

কিন্তু সে সময় কে আপন মা ভাই বোনকে উলঙ্গ ও অনাহারী দেখে নাই? তারা হচ্ছে, জংলী সাঁওতাল, উরাঁও, ভীল, কোল ইত্যাদি, যাদের আমরা অসভ্য বলে থাকি। কারণ এ সব জাতি কোন দিনই পরমুখাপেক্ষী নয়। তারা কাপড়ের জন্য মাঞ্চেষ্টারের আশা করে না, লবণের জন্য লিবারপুলে যেয়ে হত্যা দেয় না, বা কাউন্সিলে যেয়ে লবণ শুল্কের জন্য হাঁ হুজুরী করে না। তারা নিজ হাতেই সব করে নেয়। আমি একটী পাহাড়ী উরাঁও পরিবারের কথা এখানে বলব।

রাঁচী হতে কিছু দূরে "বারওয়ে" বলে একটা যায়গা আছে। সেখানকার অধিবাসী সবই "উরাঁও"। তাদের একমাত্র ব্যবসা কৃষি। সেখানে একটী কৃষক দেখতে পেলাম। তার ছয়টী ছেলে। মস্ত বড় কৃষাণ। একখানা ঘর দেখলাম, শুধু ধান চালে পূর্ণ। তার বাড়ীতে কোন জিনিসের অভাব নাই। ৮০।৯০টী, গরু ও মহিষ। শূকর অন্ততঃ দুই শত। ছাগল ৬০।৭০টী। বৎসরে সে নিজ খোরাকীর ধান রেখে ২০০ শত টাকার ধান বিক্রী করে। ডাল ৩০।৪০ টাকার; আলু, বেগুণ, কলা, পেঁপে, মরিচ, সিম, মূলা, সালগম ইত্যাদি, প্রতি বাজারে অন্ততঃ ২৲ টাকা করে বিক্রি করে।

পাঠক! এখন ভাবুন, সংসারে আমরা সুখী, না এই পাহাড়ী? সে কাহারও ধার ধারে না। ভয়ঙ্কর স্বাধীন। ভাবুন, মানুষ সে, না আমরা, যারা সহরবাসী!

তার বাড়ীর ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য দেখে আমি ও আমার আর তিনটী বন্ধু নানা কথা বলছিলাম। বৃদ্ধ তা বুঝতে পেরে আমাদের বল্ল, "মুর ছউরা পুতা এতনা জুয়ান কাহে নেই হোগে মেম সায়বান! দিনরাত এতনা' এতনা বাদিয়া কা গোস্ত আর হাঁড়ী হাঁড়ী দুধ ঘি খাওয়ালে কমজোর কাঁহে হোগে!"

ঠিক সেই সময় আমি আমার কলিকাতা সহরে ছেলেদের কথা ভাবছিলাম। হায়! এই পাহাড়ী জংলী ছেলেরা যা খেতে পায়, আমাদের ছেলেরা তার শতাংশের একাংশও চোখে দেখতে পায় না। এরা অন্নাভাব যে

কি, তা জানে না। নিজ হাতে তৈরী মোটা চেলীর কাপড় পরছে। তাতেই তারা ভারি খুসী ও সন্তুষ্ট। জানি না, অমর কবি রজনী সেন এদেরে দেখেই কি গেয়ে গেছেন :—

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়,
মাথায় তুলে নেরে ভাই।
দীন দুখিনী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।"

এ সব পাহাড়ীকে ফরাসডাঙ্গার ধুতি এনে দেও, দেখবে, সে কাপড়কে তারা কত ঘৃণা করে' দূরে ফেলে দিবে। আর তাদের তৈরী সেই চেলী এনে দাও, দেখবে মাথায় তুলে নিবে। এরা তাদের ছোট্ট ঘরে বড় মনটী নিয়ে নিজের পরিশ্রমের অন্ন খেয়ে নিজকে বড় ধন্য মনে করে। তাই তাদের ছেলেমেয়ের মুখে হাসি, আনন্দ চিরবিরাজমান। তাদের যুবক যুবতীদের দেখলে প্রকৃত যৌবনের আভাস পাওয়া যায়।

যুবতী মেয়েরা "জটলি" ফুল দিয়ে কেশের গোঁপা সাজিয়ে দল বেঁধে গলাগলি করে' পাহাড়ের উপর দিয়ে গান গেয়ে গেয়ে চলছে। তাদের কপোলে কোন দিন চিন্তার রেখা পড়তে পারে না। এদের পারিবারিক জীবন কি সুন্দর; কেহই কাহারও মুখ চেয়ে থাকে না। স্বামী স্ত্রী উভয়েই কাজ করে। মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে ক্ষেতে বাঁধ করছে, ধান বুনছে, ধান কাটছে, গরু চরাচ্ছে, জঙ্গল হতে স্বামীর সঙ্গে জ্বালানি কাঠ আনছে। পুরুষ যা করছে, মেয়েরাও তাই করছে। তাই তাদের পরিবারে কোন কলহ বিবাদ নাই। স্বামীও বলতে পারছেন না যে, বসিয়ে বসিয়ে এক পালের আহার জুটাচ্ছেন। কারণ, সবাই নিজে পরিশ্রম করে খাচ্ছে।

এদের মেয়েরা বেশ স্বাধীন। এ সব মেয়েরা কোন দিনই ভাবে না যে, স্বামীর পরিশ্রমের উপর তাদের জীবন-যাত্রা নির্ভর করে।

তাই বলি, যেদিন হতে আমরা লাঙ্গল ছেড়ে কলম ধরেছি, সেদিন হতে লক্ষ্মীও আমাদের ছেড়ে গেছেন। ভারত যেদিন স্বাধীন ছিল, সেদিনকার লোক লাঙ্গলকেই বড় ভালবাসত। তাই রাজারা যজ্ঞ করবার সময় নিজ হাতে যজ্ঞ স্থান চাষ করতেন।

আমাদের অধঃপতন সেদিন হতে এসে দেখা দিয়েছে, যেদিন হতে আমরা বিলাতি কায়দায় সহর তৈরী করে' বিলাতি কায়দায় চাল-চলন ও খাওয়া-পরা চালাতে গিয়েছি।

আরে বাপু, এই যে সাহেব সাজতে চাও, হেট কোট নেকটাই লাগাতে চাও, তাতে যে অনেক মাল মসলার দরকার। একটী বাঙ্গালী বি-এর মূল্য ৫০৲ টাকা; আর সেই যায়গায় একটী ইংরেজ বি-এর মূল্য যে এক হাজার। কত তফাৎ। অথচ এই আয় নিয়ে তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে চাই। এ সব কি নেহাৎ পাগলামী নয়?

তাদের ন্যায় চলা-ফেরা করতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু টাকা রোজগার করে' কর। কেরাণী পেশা ছাড়। প্রকৃত মানুষ হও। চাষী কি দোকানী সাজ। তবেই তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে। তা নইলে নয়।

ওদের ভাল গুণটি যা আছে, তা নকল কর। তা না করে' সাহেবরা কি করে Champagne মদ খায়, কি করে গো মাংসের তৈরী বেকন খায়, কি করে তারা হেট কোট নেকটাই লাগায়—এ সব শিক্ষা ছেড়ে দাও। তাদের মত সময়ের সদ্ব্যবহার করা কয়জন বাঙ্গালী সাহেব শিখেছেন, শুনি। আমি পাটনায় একজন বৃদ্ধ আইরিস আই-সি-এসকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি এখন দেশে যেয়ে কি করবেন। তিনি বল্লেন, "দেখ, বুড়ো হয়েছি বলে আমাকে কুড়ে মনে কর না। Retired হয়ে যদি ঘরে বসে থাকি তাহলে ছয় মাসের ভিতরই আমি মরে যাব। সারাজীবন এত কাজ করেছি। তাই কর্ম্মহীন হয়ে বসে থাকতে পারব না। দেশে যেয়ে কয়েকটী গরু ও ভেড়া কিনে চাষবাস করব। আমি ভাল চাষ করতে জানি। আমাদের দেশ ত আর ইণ্ডিয়া নয় যে সামান্য ২৫৲ টাকার কেরাণীও চাষ করতে ঘৃণা করবে। বরং বসে থাকলে কেহ তাকে ভাল বাসে না।"

আমি বলতে চাই, যে-সব বিলেত-ফেরতা বাঙ্গালী সিবিলিয়ান আমাদের দেশে আছেন, তাঁরা বুড়ো বয়সে হাতে লাঙ্গল নিতে রাজী আছেন কি?

আজকাল অনেক বিলেত-ফেরতা বারিষ্টার নিজ স্ত্রীকে পর্য্যন্ত মেমসাহেব তৈরী করবার জন্য স্ত্রীকে "হুইস্কি" ও বিলাতী সিগারেট সেবন করা শিখাচ্ছেন। আমি তা

স্বচক্ষে দেখেছি। কিন্তু মেমরা যত বড় ঘরেরই হউন না, নিজের ছেলেমেয়েদের ভেলভেট জুতা, মোজা ফ্রক প্রভৃতি যাবতীয় পোষাক পরিচ্ছদ নিজ হাতে তৈরী করে দেন।

আমি বলিতে চাই—এই মেম-সাজা কয়টী বাঙ্গালী স্ত্রী সে সব করছেন? মেমরা যেখানেই যাক না কেন, তাদের হাতে একটা না একটা কাজ আছেই। বাগানে ছেলেমেয়েদের খেলতে দিয়ে নিজেরা বসে বসে একটা না একটা সেলাই করছেই। বাঙ্গালী মেমরা তা করেন কি?

তাই বলি, এ সব না ছাড়তে পারলে, দেশের কোন দিনই মঙ্গল হবে না; তা হাজার Non-co-operationই কর, আর কাউন্সিলার সেজে বিলেতে ডেপুটেসন পাঠাও। যে দেশের হাত পা বদ্ধ, সে দেশের লোকদের প্রথমে দেশ তৈরী করতে হবে সমাজের নৈতিক চরিত্রের ভিতর দিয়ে। তা নইলে নয়।

নটবর

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল

(১)

নটবর দাস কংশাই গ্রামের একজন পতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। তার ধন-সম্পত্তি এক রকম কিছুই নাই। জাতিতে সে কায়স্থ, সুতরাং বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের আধিপত্যও তার নাই। এক রকম কোনও কিছুই নাই—তার প্রতিষ্ঠা কেবল জিহ্বার জোরে। সে খুব বেশী বলিত না, কিন্তু যা বলিত তা সত্য আর ভয়ানক সরল। লোকে সে কথায় না হাসিয়া পারিত না—কেবল সেই ছাড়া, যার আঁতের ভিতর গিয়া কথাটা ছুরির মত বসিয়া পড়িত।

বলা বাহুল্য, নটবরের লেখাপড়া বেশী কিছু হয় নাই। নতুবা সে গ্রামে বসিয়া থাকিত না। একটা ডেপুটী, কি মুন্সেফ, কি উকীল, কি ডাক্তার, কি মাষ্টার, কি নিদান একটা উকীলের মুহুরী হইয়া গ্রামের পাপ সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিত। লেখাপড়া বিশেষ হয় নাই, গ্রামে একখানা ভদ্রাসন ও যৎকিঞ্চিৎ জোতজমা ছিল; তাই সে গ্রামেই পড়িয়া রহিল। তার ভদ্রাসন—তা' সেটা যে খুব ভদ্র ছিল এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। বিঘা দুই জমী তার ভদ্রাসন, তার বেশীর ভাগই আম কাঁটালের বাগান বা জঙ্গল; তার মধ্যে মরুভূমে ওয়েসিসের মত দুই-খানি খড়ের ঘর—একটা শুইবার, আর একটা রাঁধিবার। ইহার মধ্যে বাস করে দুটি প্রাণী—নটবর এবং তার গৃহলক্ষ্মী অম্বিকা।

অম্বিকা ঠাকুরাণীকে নটবর সময়ে অসময়ে সর্ব্বদাই গৃহলক্ষ্মী বলিত,—সেটা ঠাট্টা করিয়া কি না, বোঝা কঠিন। কেন না অম্বিকার চেহারার মধ্যে লক্ষ্মীশ্রীর অংশও ছিল না। কালো রং, দোহারা গড়ন—বেঁটে বলিয়া তার দোহারা চেহারা একটু বর্ত্তুলাকারের মতই দেখাইত। মুখের কোনও অংশেই সৌন্দর্য্যের ছায়াপাতও হয় নাই। তদুপরি তার বেশ একজোড়া চলনসই রকম গোঁফের রেখা ছিল।

এই তো গেল চেহারার লক্ষ্মীশ্রী। গৃহিণী হিসাবেও তাঁর লক্ষ্মীত্বের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। তিনি নটবরের ঘরে কেমন করিয়া আসিলেন, সে তথ্য সুদূর অতীতের গর্ভে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কংশাই গ্রামে প্রত্নতাত্ত্বিকের অভাবে তার উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা নাই। কেবল এইটুকু লোকমুখে চলিয়া আসিয়াছে যে, তখন নটবরের বয়স ছিল সাত বৎসর, আর অম্বিকার পাঁচ (কিম্বা ছয়) বৎসর। কিন্তু অম্বিকা আসিয়া নটবরের ঘর যে ধনধান্যে ভরিয়া দেন নাই, সে নিশ্চয়। নটবর চিরদিনই অভাবের মধ্যেই দিন কাটাইয়াছে। আর যাও কিছু নটবর উপার্জ্জন করে, তাও শ্রীমতী অম্বিকা গুছাইয়া খরচ করিতে পারেন না। সংসারে—গৃহস্থালীতে অম্বিকার শৃঙ্খলা, বা হিসাব-কিতাব, বা কোনও রকম ভাবনা-চিন্তা করিয়া কিছু

করিবার অভ্যাস ছিল না। সে যখন যে কাজটা হাতের গোড়ায় পাইত, করিত; যখন যেটা পাইত, খাইত; যখন যা খুসী করিত। তাই তার ঘর-দুয়ার আবর্জ্জনায় ভরা, তার কাপড়-চোপড় সর্ব্বদাই ময়লা ও ছেঁড়া, তার রান্নাঘরের সঙ্গে পায়খানার বড় বেশী তারতম্য নাই। তাই নটবরের সংসারে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী মাঝে মাঝে উঁকি ঝুঁকি মারিলেও, কোনও দিনই পা বসাইতে পারেন নাই।

চঞ্চলা লক্ষ্মী এদিক ওদিক ঘুরিয়া-ফিরিয়া এক আধবার এক আধটুকু উঁকি ঝুঁকি মারিতেন নটবরের আঙ্গিনায়। এক একবার তিনি একটু বেশী হাতেই কিছু নটবরকে পাওয়াইয়া দিতেন। তার পর হইতে নটবর ও অম্বিকার হাত চুল্‌বুল করিত,—তারা অস্থির হইয়া যাইত সেই টাকাটা যেন তেন প্রকারেণ খরচ করিয়া লক্ষ্মী ঠাকুরাণীকে গলহস্ত দিয়া বিদায় করিতে।

একবার নটবর থোকে ৫০০৲ টাকা পাইয়া গেল একটা সাক্ষ্য দিয়া। গরীব হইলেও নটবরের সর্ব্বত্র আদর ছিল—বিশেষতঃ বড়লোকের বৈঠকখানায়। সে বেশীর ভাগ সময় এ তল্লাটের সব বড়লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়াই কাটাইত। ছিদামপুরের জমীদারদের একটা প্রকাণ্ড মামলা বাধিল মহেশগঞ্জের সাহাদের সঙ্গে,—সে মোকদ্দমার তায়দাদ প্রায় তিন লক্ষ টাকা। ছিদামপুরের বাবুরা নটবরকে মানিলেন সাক্ষী—সেই হইল প্রধান সাক্ষী, তার উপর মোকদ্দমা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। বাবুদের মোকদ্দমা দাঁড় করাইতে গেলে নটবরকে নির্জ্জলা মিথ্যা বলিতে হয়। তবু নটবর তাহাতে রাজী হইল, কেন না তখন তার সংসার একেবারে অচল।

ঢাকায় মোকদ্দমার সাক্ষ্য দিতে গিয়া নটবর মনে মনে নানা রকম চিন্তা করিল। সে টাকার খাতিরে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে রাজী হইয়াছে বটে, কিন্তু—মিথ্যা কথাটা বলিয়া উঠিতে পারিবে কি না, সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ হইল। অনেক সময় সে মিথ্যা কথা বলিতে চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছে, কেমন গোলমাল হইয়া শেষ পর্য্যন্ত সত্য কথাটা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে। তাই এবার মিথ্যা সাক্ষ্যটা দিয়া উঠিতে পারিবে কি না, সে সম্বন্ধে মনে সন্দেহ হইতেছিল। না পারিলে বড় বিপদ! বাবুদের সঙ্গে কথা রহিল যে, সাক্ষ্য দিলে সে ৫০০৲ টাকা পাইবে—তাঁরা নগদ ১০০৲ দিয়াছেন, বাকী সাক্ষ্য হাসিল হইলে ঘরে উঠিবে। যদি সাক্ষ্য ঠিক মত দিয়া উঠিতে না পারে, তবে এ টাকা বেবাক লোকসান হইবে। যে ১০০৲ টাকা হাতে আসিয়াছে তাহা বাবুরা কিছুতেই আদায় করিয়া উঠিতে পারিবেন না সত্য—কিন্তু চিরদিনের একটা সম্বল যাইবে; কেন না, এই বাবুদের কাছে দশ রকমে নটবর এটা ওটা সেটা পাইত। তাই সে মহা ভাবিত হইল।

এই ভাবনাই তাহার কাল হইল। না ভাবিয়া চিন্তিয়া সে হয় তো চট করিয়া শিক্ষা অনুযায়ী সাক্ষ্য দিয়া আসিতে পারিত; কিন্তু যতই সে ভাবিতে লাগিল, ততই তার বুক দমিয়া যাইতে লাগিল। তাই তো—যদি না পারে! শেষ পর্য্যন্ত সাক্ষীর কাটগড়ায় দাঁড়াইয়া নির্জ্জলা মিথ্যা বলিবার সংকল্প করিয়া গিয়া সে নির্জ্জলা সত্য বলিয়া আসিল। কাটগড়া হইতে নামিয়া সে মাথা গুঁজিয়া ছুটিল, আর এদিক ওদিক চাহিল না। সোজা ঘাটে গিয়া একখানা "গয়নার নৌকায়" গিয়া বসিয়া রহিল। তার সব গেল!

সন্ধ্যার সময় সে নৌকা ছাড়িল। ঠিক ছাড়িবার পরে একটি লোক মহা ডাকাডাকি করিয়া নৌকা ফিরাইয়া তাহাতে উঠিল। লোকটির গা খোলা, গলায় কাঠের মালা, এবং সূক্ষ্ম সোণার একটা হার, বেশ জুতসই একটি ভুঁড়ি এবং হাতে একটা চামড়ার ব্যাগ ছিল। লোকটি বসিয়াই চাদরের খুঁট দিয়া ঘাম মুছিয়া প্রচণ্ড বেগে চাদর ঘুরাইয়া আপনাকে ব্যজন করিতে লাগিল। তার ভুঁড়ির তাণ্ডব নর্ত্তন কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে, সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "ওর বড় দৌড়"।

নটবর এতক্ষণ একাগ্রচিত্তে এই ব্যক্তিকে দেখিতেছিল। ইহার সঙ্গে তার দেখা-শুনা ছিল না। তবে সে আন্দাজ করিতেছিল যে ইনিই বোধ হয় মহেশগঞ্জের সেই সাহা মহাজন। লোকটাকে দেখিয়াই তার ভারি কৌতুক বোধ হইল। সে একাগ্রচিত্তে এই ব্যক্তির ভুঁড়ির প্রচণ্ড বিক্ষোভ লক্ষ্য করিতে লাগিল। যেই ভদ্রলোক মুখ খুলিয়াছে অমনি সে বলিয়া উঠিল, "আহা হা থামুন, ফাটবে।"

ভদ্রলোক চমকিত হইয়া সেদিকে চাহিলেন, বলিলেন, "কি ফাটবে?"

নটবর বলিল "দম।"

লোকটি একটু হাসিলেন। এতক্ষণে তিনি নটবরকে চিনিয়া বলিলেন, "আপনি কংশাইর নটবর দাস না?"

নটবর বুঝিল, ধরা পড়িয়া গিয়াছে। বুঝিয়া সুখী হইতে পারিল না। তার নিজের মনে বিশ্বাস হইয়াছিল যে, সে আজ একটা দারুণ অপকর্ম্ম করিয়াছে—কেন না সে বোকা বনিয়াছে। রাম শ্যাম যদু প্রভৃতি রাশি রাশি লোক রোজ রোজ আদালতে দাঁড়াইয়া কাঁড়ি কাঁড়ি মিথ্যা বলিয়া যাইতেছে, আর সে এই সোজা একটা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া টাকাগুলি রোজগার করিয়া উঠিতে পারিল না, এ কি কম কলঙ্কের কথা! নটবর দাস সাধারণ কলঙ্ক গ্রাহ্য করে না। তার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে লোকে সত্য-মিথ্যা নানা কথা বলে, তা সে হাসিয়া উড়ায়। সে কাকে ঠকাইয়া টাকা লইয়াছে বলিয়া একটা মিথ্যা অপবাদ তার নামে রটিয়াছিল; তাহাতে সে রীতিমত গর্ব্ব অনুভব করিয়াছিল। কিন্তু বেকুবীর অপবাদ সে সহ্য করিতে পারে না। আজ সে যে কাজ করিয়াছে, তাহাতে লোকে তাকে এক নম্বর বেকুব বলিয়া সাব্যস্ত করিবে, এইটাই ছিল তার সব চেয়ে বেশী চিন্তা। তাই সে ধরা পড়িয়া যাইবার আশঙ্কায় বড় বেশী ব্যস্ত ছিল। আর সে হাতে নাতে ধরা পড়িয়া গেল ঠিক তারই কাছে, যে নিজে স্বতঃ পরতঃ তাকে এমনি বেকুব বানাইয়াছে।

কিন্তু উপায় নাই। তার পিতৃদত্ত নাম এবং পৈত্রিক বাসস্থান উভয়ই স্বীকার করিয়া লইতে হইল। সে অত্যন্ত ম্রিয়মান হইয়া পড়িল।

"আমার নাম কুঞ্জলাল সাহা—প্রাতঃ প্রণাম।" নটবর এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল; তার পর বলিল, "আজ্ঞে না, ভোর হ'তে এখনো বাকী আছে।" তখন সবে সন্ধ্যা।

এ রহস্যটা কেহ বুঝিয়া উঠিল না। কুঞ্জলাল নটবরকে বড় আপ্যায়িত করিলেন, এবং শেষে তাঁর বাড়ীর ঘাটে তাহাকে এক রকম জোর করিয়া নামাইয়া লইলেন। সাহা মহাশয় তাহাকে লইয়া সোজা গদীতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কি না, "দাস মশাই, ওরা আপনাকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার জন্য কত দিতে চেয়েছিল?"

কি অন্যায় উদ্ধত প্রশ্ন! নটবর সত্য-সত্যই চটিয়া গেল। সে বলিল, "যদি টাকাই তারা দিতে চাইবে, তবে আমি তো তাদের পক্ষেই সাক্ষ্য দিতাম।"

কুঞ্জলাল হাসিয়া বলিল, "আর যদি টাকাই না দিতে চাইবে, তবে আপনিই বা এত রাস্তা কষ্ট করে যাবেন কেন? আর তারাই বা আপনাকে এত তোয়াজ করে নিয়ে যাবে কেন—যদি আপনি এই সাক্ষ্যই দিতে গিয়াছিলেন?"

এ কথার জবাব নাই। নটবর দেখিল যে, মিথ্যা কথা বলাটা তার আসে না। তাই সে ব্যর্থ চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া স্পষ্ট বলিল, "পাঁচশো টাকা।" কুঞ্জলাল তখন তাঁর সিন্দুক খুলিয়া কাগজপত্র, টাকাকড়ি রাখিতেছেন, এবং সিন্দুক নাড়া-চাড়া করিতেছেন। নটবর লুব্ধ দৃষ্টিতে সিন্দুকের ভিতরকার নানা বিচিত্র মোড়কে ঢাকা জিনিসগুলি দেখিতে লাগিল।

একটা থাড়ুয়া-বাঁধা মোড়ক খুলিতে খুলিতে কুঞ্জলাল বলিলেন, "তাই তো, আপনার তো তবে বড় লোকসান গেছে।"

নটবর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। থাড়ুয়ার মোড়ক খুলিয়া একটা মোটা নোটের তাড়া বাহির হইলে, সে আর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

কুঞ্জলাল কয়েকখানা নোট বাহির করিয়া সম্মুখে রাখিয়া, বাকী নোট আবার থাড়ুয়ায় জড়াইতে জড়াইতে বলিলেন, "তা ছাড়া, বাবুরা তো এখন আপনাকে হয়রাণ ক'রতে ছাড়বেন না।"

এতগুলি টাকা নাড়া-চাড়া করিতে দেখিয়া সদ্য-বঞ্চিত নটবরের বুদ্ধিশুদ্ধি গুলাইয়া গিয়াছিল, সে কিছু বলিল না।

তার পর—নটবর ঢোঁক গিলিয়া বড় বড় চোখ মেলিয়া চাহিল। তার পর সত্যসত্যই কুঞ্জলাল বাবু সেই বাইরে-রাখা নোটের তাড়া লইয়া নটবরের হাতে দিয়া বলিলেন, "তা' আপনি আমার আজ যা উপকার ক'রেছেন, তাঁর জন্য এই যৎকিঞ্চিৎ দিলাম। এর পর যদি কোনও বিপদ আপদে পড়েন, আমাকে খবর দেবেন।"

নটবর হাঁ করিয়া চাহিল—পাঁচশো টাকার নোট! অ্যাঁ! তার পর সে আর কোনও কথা না বলিয়া চোঁ চোঁ ছুট দিল। তার কেবলি ভয় হইতে লাগিল যে, সে আর দেরী করিলে হয় তো কুঞ্জলালকে বলিয়া বসিবে যে, একশো

টাকা সে আগাম পাইয়াছে, এবং তাহা হইলে কুঞ্জলাল ১০০৲ টাকার নোট ফিরাইয়া লইবে। তাই সে চোঁচা ছুট দিয়া একেবারে অম্বিকার কাছে গিয়া পাঁচশত টাকার নোট তার সামনে ফেলিয়া দিল।

অম্বিকা অবাক্ হইল না। এ যে পাওয়া যাইবে, তা তো তার জানাই ছিল। এমন কি, এ টাকা দিয়া যে কি কি করিতে হইবে, তাহাও সে মনে মনে আঁটিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু যখন নটবর সব কথা তাহাকে খুলিয়া বলিল, তখন সে ধীরে সুস্থে অবাক্ হইল। নোটগুলি বাক্সে তুলিতে তুলিতে সে বলিল, "আচ্ছা বেকুব তুমি তো! পাঁচশো টাকার গলায় দড়ি দিয়েছিলে আর কি? ভাগ্যে কুঞ্জলালটা পাঁটা, তাই রক্ষে।"

যা' এতক্ষণ নটবর ভয় করিতেছিল, তাই হইল। বেকুব বলিয়া তার গাল খাইতে হইল, তবে কি না গিন্নীর কাছে!

ছয়শো টাকা ফুঁয়ে উড়িয়া গেল। নটবর ও অম্বিকা দুজনে মিলিয়া লক্ষ্মীকে ঠেলিয়া তাড়াইল।

অম্বিকা আগে হইতেই ঠিক করিয়াছিল যে, এই টাকা পাইলে সে এক জোড়া বালা গড়াইবে, এবং নটবর ঠিক করিয়াছিল যে, ঘরখানায় টিনের চালা করা হইবে। সেই রাত্রে ঠিক হইয়া গেল যে দুই-ই করা হইবে। বালার দাম পড়িবে দুই শো টাকা; তাহা বাদে যে ৪০০৲ টাকা থাকিবে, তাহাতেই টিনের ঘর হইবে।

পরের দিন নটবর নিজেই একটা হিসাব করিতে বসিল যে, কি পরিমাণ টিন দরকার হইবে। তখন অম্বিকা বলিল, "ঘরখানা ক'রছো, একটু বড় ক'রেই করো।"

নটবরও তাই ঠিক করিয়াছিল। তার শুইবার ঘরখানা অত্যন্ত ছোট, তা' ছাড়া তার বসিবার একখানা ঘর নাই। আর তার ছেলে অবশ্য দেশে থাকে না, ঢাকায় দূরসম্পর্কীয় এক আত্মীয়ের বাড়ী থাকিয়া ঢাকার স্কুলে পড়ে। তা' সেও বড় হইতেছে, বাড়ীতে আসিলে তার শুইবার একটা আলাদা ঘর দরকার। এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া সে ব্যবস্থা করিল যে, একখানা বড় গোছের আটচালায় চার পাঁচটা প্রকোষ্ঠ করিয়া সব কাজ চালাইবে। সেই হিসাবে ঘরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ঠিক করিয়া সে পরের দিন ঢাকায় চলিল।

প্রথমেই সে সোণা কিনিয়া স্যাকড়া-বাড়ী স্ত্রীর বালা গড়িতে দিল। তার পর অবশিষ্ট টাকা লইয়া সে টিন কিনিতে গেল। সে দোকানদারের কাছে ঘরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের পরিমাণ জানাইলে, তাহারা হিসাব করিয়া যাহা বলিল, তাহা নটবরের নিজের হিসাবের অনেক বেশী। নটবর দেখিল যে, তার যে টাকা আছে, তাতে টিন কেনা যায় বটে, কিন্তু সেই টিন কায়-ক্লেশে বাড়ীতে পৌঁছান ছাড়া আর কিছু করা যায় না। কাঠ কিনিয়া ঘর তুলিবার খরচ আর হাতে থাকে না। ভাবিল, আগেই বালাটা না গড়াইলেই হইত।

দোকান হইতে ফিরিয়া সে নানা রকম চিন্তা করিয়া ঘরের পরিমাণ কমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে সে সংবাদ পাইল যে, একজন ঠিকাদার পুরাতন টিন বিক্রয় করিবেন। সে গিয়া দেখিল, দর নতনের চেয়ে কিছু সস্তা; সে আবশ্যক মত টিন কিনিয়া ফেলিল। ঝরঝরে পুরানো কতকগুলি টিন আসিয়া আমবাগানে মজুত হইল। কাঠের জন্য বাকী টাকা সে একটী লোককে দিল। সে লোক কাঠ কিনিতে গিয়া আর বাড়ী ফিরিল না।

টাকাগুলি নিঃশেষ করিয়া দিয়া নটবর নিশ্চিন্ত হইয়া বসিল। টিনগুলি পড়িয়া রহিল। কাঠ আসিল না। বালা তৈয়ার করিয়া স্যাকরা তাড়ার পর তাড়া দিতে লাগিল, কিন্তু মজুরীর টাকা হাতে নাই বলিয়া বালা আনা হইল না। বৎসর খানেক বাদে স্বর্ণকার খবর দিল যে, নটবরের বালা সে ভাঙ্গিয়া সোণা বিক্রী করিয়াছে, তাহাতে স্বর্ণকারের মজুরী বাদে ৪০৲ টাকা উদ্বৃত্ত আছে, নটবর যেন তাহা লইয়া যান। এত বড় বেকুব বনিয়া আর নটবর কেমন করিয়া সেদিকে ভিড়িবে? তাই সে ও-অঞ্চলে গেল না, টাকাও আদায় হইল না।

অনেক দিন পরে কতকগুলি পাওনাদারের উৎপীড়নে নটবর রাগ করিয়া তাহাদিগকে টিনগুলি জলের দরে বিলাইয়া দিল।

(২)

টিনগুলি বিদায় হইলে নটবর বলিল, "বাঁচা গেল! গরীবের ঘোড়া রোগ, এত অল্পে যে নিষ্কৃতি হ'ল তাই ভাল।"

অম্বিকা বলিল, "হাঁ! টিনের ঘরও হ'ল, গয়নাও হ'ল। এখন আমার আঁস্তাকুড়ের জঞ্জাল যে দূর হ'ল, তাতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। ওগুলোর দিকে চাইলে আমার প্রাণটা অস্থির হ'য়ে উঠতো।"

"যা' ব'লেছ। টক ফল খেতে নেই। তা ছাড়া, খড়ের ঘর দিব্য ঠাণ্ডা, টিনের ঘর তো নয়, যেন আগুন।" কাজেই :সুস্থ সাব্যস্ত চিত্তে তারা মনের আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিল।

নটবরের ঘরে অনেক জিনিসেরই অভাব ছিল, ছিল না কেবল আনন্দের। হাসি তাদের মুখে লাগিয়াই আছে। ভারী ভারী শক্ত শক্ত কথা লইয়াও নটবর রহস্য না করিয়া পারিত না; ভারী দুঃখের ভিতরও একটা হাসির কথা মনে হইলে সে না বলিয়া পারিত না। তাই অম্বিকা দিন রাত হাসিমুখেই থাকিত। স্বামীর উপর কোন দিন রাগ করিতে পারিত না।

এমন দিন গিয়াছে, যে দিন চালের ডোলে হাত দিয়া অম্বিকার চক্ষে জল আসিয়াছে। বড় দুঃখ সে নটবরের কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিয়াছে, "থাক, এমনি বসে' থাক; রোজগারে কাজ নেই। আজ কি গিলবে গেল গে দেখি।"

নটবর ব্যাপার বুঝিয়া হাসিয়া বলিল, "দেখ প্রেয়সী, মান্যের অপমান করো না!"

"কি আমার মান্য রে! যে খেতে পায় না, তার আবার মান কি?"

"আহা, তার কথা বলছি না! আমি! আমার কথা চুলোয় যা'ক, কিন্তু ওই যে আহার ব্যাপারটা, যাতে করে আমাদের জীবনধারণ হয়, তাকে বল্লে কি না গেলা—এমন অসম্মান করো না দেবি!"

"আহা, উনি এখন নাটক ক'রতে ব'সলেন।" বলিয়া অম্বিকা হাসিল। নটবরের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া, তার মনের মেঘ কাটিয়া গেল। যে দুটী চাল ছিল, সে তাই হাসিমুখে চড়াইল। দুই জনে দুই গ্রাস খাইয়া মনের আনন্দে গল্প করিতে লাগিল।

এ আনন্দ কিছুতেই টুটে না। নটবরের স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়—বেশ একটু খারাপ। লোকের মুখে সে কথা শুনিয়া অম্বিকা একটু রাগ করিল। স্বামী বাড়ী আসিলে অনুযোগ করিল, কিন্তু রাগ রাখিতে পারিল না। নটবর তাহাকে এমন করিয়া ঠাণ্ডা করিয়া দিল যে, অম্বিকা একেবারে গলিয়া গেল। ইহার পর অন্য কোনও স্ত্রীলোক তাহাকে এ সম্বন্ধে কোনও কথা বলিলে, সে বলিত, "পুরুষ মানুষ, ওতে আর কি হ'য়েছে।"

প্রতিবেশিনী আরও বুঝাইলে বলিত, "আরসীর ভিতর আমার মুখ এক-আধ দিন দেখেছি দিদি; বলতে কি, আমারই তাতে প্রাণ আঁৎকে উঠে। তাও তো উনি আমার কাছে আসেন!"

আসল কথা, নটবরের উপর রাগ করা অম্বিকার পক্ষে অসম্ভব ছিল। খুব রাগের মুখে নটবর এমন একটা হাসির কথা বলিত, বা এমন একটা হাসির কাণ্ড করিত, যে, না হাসিয়া তার উপায় থাকিত না।

কাজেই দারুণ অভাবের ভিতর থাকিয়াও নটবর ও অম্বিকা হাসিয়াই দিন কাটাইত। কিছুতেই তাদের মনের ভিতর দাগ বসাইতে পারিত না।

একখানা ছেঁড়া ময়লা ঢাকাই শাড়ী পরিয়া অম্বিকা তার শুইবার ঘরের দাওয়ায় মাছ কুটিতে বসিয়াছিল। নটবর বাড়ী আসিয়া তাই দেখিয়া বলিল, "যা'ক, বেশ সুবিধা ক'রেছ, এর পর বিছানায় শুয়েই সব কাজ কর্ম্ম খাওয়া দাওয়া হ'বে। কষ্ট করে আর উঠতে হ'বে না।"

অম্বিকা বলিল, "আহা! এতে কিই বা হ'য়েছে। দুটো এই মাছ কুটতে হ'বে, দা'খানা এখানে র'য়েছে, আবার ওইখানে টেনে নিয়ে যাব, তা' এখান থেকে কুটে নিচ্ছি।"

"না, না, ঠাট্টা নয়, আমরা এখন যে রকম বড়মানুষ হ'তে যাচ্ছি, তা'তে খাটে শুয়ে না খেলে মানাবে কেন? জান কি হ'য়েছে?"

অম্বিকা। কি?

চোখমুখে গম্ভীর একটা ভঙ্গী করিয়া নটবর বলিল, "হাজার টাকা।"

হাসিয়া অম্বিকা বলিল, "আবার কি মিথ্যা সাক্ষী না কি? সে কাজ—"

"আরে না না, লক্ষ্মী কি দুইবার এক রকমে দেখা দেন? তাঁর বেশ একটু মৌলিকতা আছে।"

"তবে এবার তাঁর কি রূপ?"

নটবর হাসিয়া বলিল, "বিয়ে।"

অম্বিকার প্রাণটা চমকিয়া উঠিল; তবু সে হাসিয়া বলিল, "আ মরণ? কুষ্টিখানা আন্ধকালের মধ্যে দেখেছিলে? বয়সের হিসাব খেয়াল আছে?"

নটবর হাসিয়া বলিল, "এই নাও! এতেই হিংসেয় পেট ফাটে। আরে শোনই আগে, কার বিয়ে!"

"কার?"

"তোমার ছেলের! সতীশের।"

অম্বিকার মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তাই না কি? কোথায়? বল আমায়। হাজার টাকা দেবে?"

তখন নটবর ক্রমে খুলিয়া বলিল। মেয়ের বাপের বাড়ী ঢাকা সহরে। সেখানে সে কি একটা চাকরী করে। তা ছাড়া, বিষয় সম্পত্তি আছে, অবস্থা বেশ ভাল। তার একটি মেয়ে আছে, ভদ্রলোক সতীশের সঙ্গে তার বিবাহ দিতে চান। বিবাহের ব্যয়, গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতি বাবদ তিনি নগদ হাজার টাকা দিবেন, তা ছাড়া কিছু দানও দিবেন, মেয়ের গায়ও তু'খানা গহনা দিবেন। তা ছাড়া, সতীশের সমস্ত পড়ার ভার তিনি গ্রহণ করিবেন, সে শ্বশুরালয়ে থাকিয়া পড়িবে।

অম্বিকা লুব্ধ হইয়া উঠিল। তার কাঙ্গাল ছেলের এমন বিবাহ! তার মনে হইল, এইবার তাদের দুঃখের দিন শেষ হইল। হাজার টাকায় তাহাদের জন্মের মতন স্বচ্ছলতা লাভ হইবে, আর ছেলে বউ বড়মানুষ শ্বশুরের বাড়ীতে পায়ের উপর পা দিয়া বাস করিবে। আর চাই কি?

কিন্তু হাঁ্যা, একটা কথা, মেয়েটি দেখিতে কেমন?

সে বিষয়ে নটবরের কোনও নিরপেক্ষ অভিমত দেওয়া অসম্ভব। মেয়ে সে দেখিয়াছে, কিন্তু ঐ হাজার টাকা এবং ছেলের পড়ার খরচ প্রভৃতি তার চারিধারে এমন একটা মায়ারাজ্য সৃষ্টি করিয়াছিল যে, তার ভিতর দিয়া সে কিছুই দেখিতে পারে নাই; তার মনে চাপিয়া বসিয়াছিল এই ধারণা, যে মেয়েটি সুন্দরী। কিন্তু বাস্তবিক সে সুন্দরী নয়। মাত্র তেরো বছরের মেয়ে, নিতান্ত কচি, তাই তার ভিতর কৈশোর সুলভ লাবণ্য একেবারে না আছে তা নয়; কিন্তু তার রং কালো এবং মুখ চোখ ভালো নয়। তার শরীর এখনো গড়িয়া ওঠে নাই। কাজেই শরীরের গড়ন বিষয়ে কোনও মতামত এখন দেওয়া চলে না।

কিন্তু নটবর অম্লান বদনে বলিল, "মেয়ে যেমন ভদ্র-লোকের ঘরে হ'য়ে থাকে।"

কথাটা অম্বিকার মনঃপূত হইল না। সে বলিল, "তার মানে সুন্দরী নয়।"

"হাঁ, তেমন কি একটা ডানা-কাটা পরী?—এই যেমন ভদ্রলোকের ঘরে হ'য়ে থাকে।"

"ভদ্রলোকের ঘরে তো কত রকমই হয়। ভট্চাজ বাড়ীর নতুন বৌও হয়, আর আমার মতন রূপসীও হয়। তা ছাড়া, ডানা-কাটা পরী যদি হয় তো সে ভদ্র ঘরেই হয়, সে কিছু মাঝি মালীর মধ্যে হয় না।"

কথাটা শুনিয়া নটবর একটু খোঁচা খাওয়া মত করিয়া একবার চাহিল। তার মনে হইল যে, কথার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে। মাঝিপাড়ার কোনও বিশেষ ঘরে তার একটু অবৈধ গতিবিধি আছে, সে কথা সবাই জানিত। কিন্তু কথাটা অগ্রাহ্য করিয়া নটবর বলিল,

"কেন, তোমার রূপ কম কিসে ছোট বৌ?"

একটু হাসিয়া অম্বিকা বলিল, "আ মরণ! ঠেকার করে কথা চাপা দিতে হবে না। আমার যা রূপ, তা' আরসীর দিকে চাইলেই আমি দেখতে পাই। তা' এখন এ মেয়ে কেমন তাই বল। রং কেমন?"

"আরে রঙের মধ্যে আছে কি? কতকগুলো ফরসা রঙ হ'লে কি পরমার্থ হয়? ওই তো রং আছে প্রাণ-কুমারের বউর, সে কি রং নিয়ে ধুয়ে খাচ্ছে? চাই লক্ষ্মী-শ্রী। তোমার যে রং ময়লা, তা কি তুমিই কিছু কষ্টে আছ, না, আমারই রোজ বুক ফেটে যাচ্ছে?"

"আচ্ছা, বোঝা গেল রং ফরসা নয়। তবু কেমন কাল, আমার মত, না পাঁচীর মত, না"—

"আরে না না, এই ভদ্রঘরে যেমন হ'য়ে থাকে—এই ধর আমার মতন।"

নটবরের রং অম্বিকার চেয়ে ফরসা কি কালো, সে সম্বন্ধে মতভেদ ছিল। অবস্থা-বিশেষে নটবর মনে করিত, তার রং অন্ততঃ অম্বিকার চেয়ে একটু ফরসা, এবং অম্বিকা মনে করিত ঠিক উল্টা। কিন্তু যখন মেজাজটায় প্রেমের মাত্রা একটু চড়িয়া থাকিত, তখন নটবর মনে করিত

অম্বিকা অন্ততঃ তার চেয়ে ফরসা, আর অম্বিকা ভাবিত যে নটবর স্বর্ণকান্তি সুপুরুষ। বর্ত্তমান সময়ে অম্বিকার সে অবস্থা ছিল না। কাজেই অম্বিকা বলিল, "বুঝলাম, তুমিই যখন এ কথা ব'লছো, তখন সে মেয়ে পাঁচীর চেয়েও কালো না হ'য়ে যায় না। আমি কালো বউ আর এ বাড়ীতে আনাবো না।"

যেদিন সতীশের জন্ম হয়, সেই দিন হইতে অম্বিকা স্বপ্ন দেখিতেছিল একটি ফুটফুটে বউ তার আঙ্গিনায় ঘুর ঘুর করিয়া কাজ করিতেছে। সেই স্বপ্নটা এখন খুব জোর করিয়া তাহার অন্তরকে এই প্রস্তাবে বিদ্রোহী করিয়া তুলিল।

নটবর তার অভ্যস্ত রসিকতার সহিত নানা কথার অবতারণা করিয়া অম্বিকার এ বিদ্রোহ জল করিয়া দিল। বিশেষ করিয়া এই হাজার টাকায় যে কত কি অসম্ভব কার্য্য করা যাইবে, তাহার কল্পনায় অম্বিকা গলিয়া গেল। শেষ পর্য্যন্ত অম্বিকা সম্মত হইল।

সতীশকে লইয়া প্রথম একটু বেগ পাইতে হইল। সে সবে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া আই-এ পড়িতেছে। তার এখন বিবাহ করিবার মোটেই গরজ ছিল না। তার আশা ছিল যে, সে বি-এ, এম-এ পাশ করিয়া একটা মস্ত বড় চাকরী করিবে, এবং সময়ে উপাখ্যানের রাজকন্যা ও অর্দ্ধরাজ্য যৌতুক লইয়া বিবাহ করিবে। সে বলিল, চাকরী না করিয়া সে কিছুতেই বিবাহ করিবে না। তার শ্বশুর বাড়ীর পক্ষের লোক তাহাকে বুঝাইল যে, ভাল চাকরী করিতে হইলে তার পড়াশুনা শেষ করা দরকার। বিবাহ না করিলে তার পড়ার খরচ চলিবার কোনও সম্ভাবনাই নাই। কাজেই তাকে পড়া ছাড়িয়া এখনি চাকরীর চেষ্টা করিতে হইবে। বরাতের খুব বেশী জোর থাকিলে, সে যে চাকরী পাইতে পারে, তার মুনাফা ১০৲ টাকার বেশী হইবে না। পক্ষান্তরে, তাহার শ্বশুর তাহাকে যতদূর ইচ্ছা পড়াইবেন। কালে পাশ করিয়া সে ডেপুটী, মুন্সেফ, উকীল, ডাক্তার প্রভৃতি যা' ইচ্ছা তাই হইতে পারিবে।

সতীশ টলিল না।

তার পর একটু গোল হইল। যে ভদ্রলোকের বাড়ীতে থাকিয়া সতীশ পড়িত, তাঁর একটি নিকটতর আত্মীয় ঢাকায় পড়িতে আসিল। তাই তিনি প্রথমে সতীশকে বিবাহ করিতে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তার পর কিছু করিতে না পারিয়া পরিষ্কার বলিলেন যে, সতীশকে আর তিনি রাখিতে পারিবেন না।

সতীশ চক্ষে অন্ধকার দেখিল। সে বাপের কাছে এক পয়সাও সাহায্য পায় না। এই বাড়ীতে থাকিয়া সে খায়, আর এক বাড়ীতে ছেলে পড়াইয়া তার নিতান্ত আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ করে। এমনি করিয়া সে হাতে কিছু টাকা জমাইয়াছিল; তাহা সে নিঃশেষ করিয়াছে পরীক্ষার ফিস দিতে এবং একান্ত দরকারী খান কয়েক বই কিনিতে। এখন এ বাড়ী ছাড়িতে গেলে তার পড়া বন্ধ করিতে হয়। সে ভয়ানক ছুটাছুটি করিতে লাগিল। এ-দিক সে-দিক ঘুরিয়া সে মাসিক পাঁচ টাকা সাহায্যের জোগাড় করিল, কিন্তু তাতে তো কোথাও থাকা আর খাওয়া কুলায় না। কলেজের প্রিন্সিপালের কাছে অনেক প্রকারে দরবার করিয়া একটা বৃত্তির চেষ্টা করিল, অনেক ঘোরাঘুরির পর প্রিন্সিপ্যাল অস্বীকার করিলেন।

হতাশ হইয়া সতীশ রমণার মাঠে গিয়া কাঁদিতে বসিল। অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া সে মন স্থির করিয়া পিতার কাছে চিঠি লিখিল যে, তার পড়ার ব্যবস্থা হইলে সে বিবাহ করিতে প্রস্তুত।

বিবাহ হইয়া গেল। নটবর হাজার টাকার মধ্যে ৫০০৲ টাকা অগ্রিম লইয়া বাড়ীতে তার পূর্ব্ব প্রস্তাবিত টিনের ঘর বেড়া ইত্যাদি করিল। রান্নাঘরটা নূতন করিয়া বাঁধিল, বাড়ী-ঘর-দুয়ারের সংস্কার করিল। তার পর প্রায় তিন শত টাকা ঋণ করিয়া সে বেশ সমারোহ করিয়া বিবাহ ব্যাপার নিষ্পন্ন করিল। বিবাহের সময় বৈবাহিক তাহাকে নগদ তিন শত টাকা দিয়া অবশিষ্ট টাকা সতীশের নামে সেভিং ব্যাঙ্কে জমা দিবেন বলিলেন। আমরা সংবাদ পাইয়াছি, সে টাকা সেভিং ব্যাঙ্কে এখনো জমা হয় নাই।

বাড়ীতে ফিরিয়া নটবর তিনশো টাকা শেষ করিয়া দেওয়া সঙ্গত মনে করিল না। এখন বউ লইয়া ঘর করিতে হইবে, তার কাছে নিত্য নিত্য অভাব অনাটন দেখানটা সঙ্গত হইবে না,—কেন না বউ সঙ্গতিপন্ন ঘরের মেয়ে। কাজেই এ তিনশো টাকা হাতে রাখা ভাল। হাওলাতি তিনশো টাকার জন্য সে দুখানী ক্ষেত বন্ধক দিয়া তমঃশুক দিল। (ক্রমশঃ)

জাপানী আর্টের যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীমনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

মস্ত বড় একটা গাছের গুঁড়ি, তার উপর একটা ফড়িঙ্ বসে—এ একটা জাপানী ছবি, বর্ত্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের আঁকা। আমাদের এ ছবি দেখে সাধারণতঃই এ প্রশ্ন মনে উঠবে—"একটা গাছ আর একটা ফড়িঙ নিয়ে আবার ছবি! এর মধ্যে কি আর্ট আছে?" কিন্তু আমরা যদি জাপানী আর্ট বুঝ্তে চেষ্টা করি, তবে এ প্রশ্ন আমাদের মনে উঠবে না।

জাপানীরা কিছুকে ছোট বলে অবহেলা করে না; সমস্ত জিনিসের মধ্যে তারা এক মহা সৌন্দর্য্য অনুভব করে। নর নারীর মধ্যে স্রষ্টার যে মহিমা প্রকাশিত হয়েচে, তা পশু-পক্ষী বা ছোট-ছোট কীট-পতঙ্গতেও প্রকাশিত হয়েচে। ছোট, বড়, সুন্দর, অসুন্দর, জাপানী আর্টিষ্টের কাছে সমান। শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ লিখেচেন—"জাপানী শিল্পীর কাছে সুন্দর-অসুন্দর, স্বর্গমর্ত্ত্য সকলি সমান। গোচর, অগোচর সমস্ত পদার্থের মর্ম্ম গ্রহণ কর, এবং সেই মর্ম্ম-কথা সহজে, সুসংযত ভাবে পরিষ্কাররূপে প্রকাশ কর।" তাদের রেখাঙ্কণের একটা ভাষা আছে। পাহাড়, নদী, সমুদ্র, গাছ, পাথর প্রভৃতি বিভিন্ন জিনিসের character বা বিশেষত্ব প্রকাশ করার জন্য তারা বিভিন্ন প্রথা অবলম্বন করে। ইহাকে ইংরাজিতে বলা হয়, calli-graphy' জাপানী আর্টিষ্টের তুলির টানে যেন একটা ঐন্দ্রজালিক মোহ আছে। তারা তুলির দুই এক টানেই নিতান্ত নগণ্য বস্তুতে—যা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, তাতে—অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তোলে। এ জিনিসটা পৃথিবীর অন্যান্য আর্টিষ্ট-দের কাছে পাওয়া যাবে না। অন্যান্য দেশের আর্টে একটা Psychology আছে; তাদের আর্টে তেমন কোনো একটা তত্ত্ব পাওয়া যেতে পারে না। তারা একটা কিছু তত্ত্ব হিসাবে আঁকে না। আঁকা বস্তুকে তারা ভালবাসে, এবং আঁক্তে ভালবাসে তাই আঁকে।

হাইজিন

(আঠারো শতাব্দীর হকুসাইয়ের আঁকা। হাইজিন বা হাইকাই লেখক (ছোট কবিতা লেখক) রাস্তায় বা বাজারে ছোট ছোট কবিতা লিখে বিক্রী করে। আর্টে হকুসাইয়ের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল। সব বিষয়েই তিনি ছবি এঁকেছেন। জাপানী সাংসারিক জীবনের ছবি. ব্যঙ্গ চিত্র, সাধু, দেবতা, বীর প্রভৃতির ছবি তিনি এঁকেছেন। প্রাণী-চিত্রে তাঁর খুব হাত ছিল। তাঁর অসংখ্য দৃশ্য-চিত্র আছে।)

জাপানী আর্টের এই তত্ত্বটি তাওপন্থীদের এক গল্পে সুন্দর বুঝিয়ে দিয়েছে।

অনেক প্রাচীন কালে লাংমেন পাহাড়ের খাদে কিরি নামে এক বনস্পতি বনের সমস্ত গাছকে ছাড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মেঘলোকে তার মাথা ঠেকেছিল—

অনেক নীচে পাহাড়ের গুহায়, যেখানে রূপালী-রংয়ের ড্রাগন ঘুমাত, সেখানে তার শিকড় পৌঁছেছিল। একবার এক বড় ঐন্দ্রজালিক তা দিয়ে একটা বীণা তৈরী করল। এমনি বীণা তৈরী হল যে, কোন বড় ওস্তাদও সেটা বাজাতে পারবে না। চীনের সম্রাট সেটাকে যত্ন করে রেখে দিলেন। নানা দেশ থেকে বিখ্যাত বিখ্যাত বীণকার এল, সেই বীণা

বাঘের ছবি

(পনেরো শতাব্দীর নোয়ামির আঁকা। তুলির বাঁকা লাইনের টানে বাঘের হিংস্র ভাব ফুটে উঠেছে। বাঘ স্বাভাবিক নয়, কিন্তু তার স্বভাব সুস্পষ্ট।)

থেকে সুর বার করতে। বীণা পোষ মান্‌ল না,—কেবল একটা কর্কশ এবং ধিক্কারজনক ধ্বনি বেরুল। তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হল, তারা মাথা নীচু করে চলে গেল। সকলের শেষে এল পীউ—বীণকারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণী। যেমন অশান্ত ঘোড়াকে পোষ মানায়, তেমনি সে বীণাকে কোমল হস্তে স্পর্শ করল, এবং তার তারে ঘা দিল। সে বাজাল প্রকৃতির গান, ঋতুর গান, গিরি-কন্দরের গান, আর নির্ঝরের গান। বীণার পূর্ব্ব জন্মের বৃক্ষ-জীবনের স্মৃতি

মিচিজানের ছবি

(সিল্কের উপর আঁকা। শিল্পী—নবম শতাব্দীর বিখ্যাত কানোকা। মিচিজান সম্রাটের মন্ত্রী ছিল। তাকে নির্ব্বাসিত করা হয়। বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় নিজের বাগানে গিয়ে পুষ্পিত প্লামগাছের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে যায়; সে সময়ের তার বিখ্যাত কবিতা "প্লাম, তোমার প্রভু যদিও দূরে চলে যাচ্ছে, তবুও তুমি বসন্তকে ভুলো না।")

জেগে উঠল। বসন্তের নিঃশ্বাস যেন গাছের শাখায়-শাখায় বয়ে গেল, নির্ঝর ঝরঝর করে শিলায়-শিলায় ঘা খেয়ে

ছুটে চল্লো, গিরি উপত্যকায় ফুল ফুটে উঠল। তার পর, পর পর, গ্রীষ্ম, বর্ষা, হেমন্ত ও শীতের গান বাজাল।

শেষে বাজাল ভালবাসার গান। বনের শাখা-প্রশাখা দুলতে লাগ্‌ল, সুন্দরীর মত এক খণ্ড হালকা মেঘ আকাশে ভাস্‌ল। সকলের শেষে যখন যুদ্ধের গান বাজাল, তর-

বানরের ছবি

(আঠারো শতাব্দীর সোসেনের আঁকা। সোসেন, জন্তু, বিশেষ ভাবে বানর আঁকার জন্ম সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ওসাকার বনে সোসেন অনেক দিন ফল মূল খেয়ে কাটিয়েছেন। সেখানে তিনি বানরের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করতেন।)

বারির ঝনঝনি, এবং ঘোড়ার খুড়ের শব্দ যেন শোনা গেল। লাংমেনের ড্রাগন তার তন্দ্রা থেকে জেগে উঠল, বিদ্যুত চম্‌কাল, মেঘ গর্জ্জিল। বন জঙ্গল ভেঙে, বরফের প্রবাহ ভেঙ্গে পড়ল।

মোহাবিষ্ট সম্রাট পীউকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, সে যে বীণা জয় কর্‌ল, তার রহস্য কোথায়? পীউ বল্ল, "মহারাজ,

দৃশ্য চিত্র

(বর্ত্তমানের কোনো চিত্রকরের আঁকা। এ ছবি খুব উঁচু দরের নয়। পুরানো ছবিতে লাইনের যে জোর আছে, এ চিত্রে সে জোর নাই। হকুসাই, কোরিন প্রভৃতি পুরানো চিত্রকরের ছবির সঙ্গে তুলনা কর্‌লেই সেটা বোঝা যাবে।)

অন্যেরা বীণা বাজাতে ব্যর্থ হয়েছে, কেন না, তারা নিজেদের কথা বলতে চেষ্টা করেছে। আর আমি বীণাকেই দিয়েছি তার গান বেছে নিতে; বাজাবার সময় আমার

খেয়াল ছিল না, যে বীণাটাই পীউ, কিংবা পীউ হচ্চে বীণা।"

জাপানীরা আর্টকে সাম্‌নে ধরে, নিজেকে আর্টের মধ্যে এগিয়ে দেয় না। এই গল্প থেকে সেটা বেশ সুন্দর বোঝা যায়।

তাদের মধ্যে একটি মৈত্রীভাব আছে, যা দিয়ে তারা বিশ্বের সমস্ত পদার্থকে সুন্দর করে তুলেচে। জাপানীরা প্রকৃতই সৌন্দর্য্য-উপাসক। প্রাচীন গ্রীক্‌দের মধ্যে কেবল সেই সৌন্দর্য্যের উপাসনা দেখতে পাই; তারা বল্‌ত—"gymnastic for the body and music for the soul"। তাদের আদর্শ ছিল, ভিতর ও বাহিরকে আনন্দ ও সৌন্দর্য্য দিয়ে গড়ে তোলা। প্রাচীন ভারতও খুব সৌন্দর্য্য-প্রিয় ছিল। গিরি-গুহার ভাস্কর্য্য ও চিত্র এবং কাব্য-নাটকাদির ভিতর দিয়ে, সেটা প্রকাশ পেয়েচে। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে বোধ হয় সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা তেমন গভীর ভাবে প্রকাশ পায় নি। যা পেয়েচে, সেটা একটা ধর্ম্ম-বোধের অঙ্গ হিসাবে।

দরুম (ধর্ম্ম)

(পনেরো শতাব্দীর সোয়ামীর আঁকা। দরুম তাঁর চোখের পাতা কেটে ফেলেছিল। সোয়ামী পাকা ছিল) কালীর কাজ (ink Sketch)

জাপান দেশটা জাপানীদের সৌন্দর্য্যপ্রিয় করে তুলেচে। জাপান যেন একটি ছবির album। জাপানের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাও, মনে হবে, যেন ছবির পাতা উল্টিয়ে যাচ্চ। উঁচু-নীচু জমির উপর আঁকা-বাঁকা রাস্তা, পাইনের বন, ঝরণা, ছোট ছোট পাহাড়, পাহাড়ের নীচে কুটীর, কুটীরের পাশে ছোট একটি বাগান; সমস্তই ছবির মত দেখায়। অনন্ত সৌন্দর্য্য এবং মহিমা নিয়ে ফুজিসান গিরি-পদ্মের মত উঠেচে। ফুজিসান আমাদের "দেবতাত্মা হিমালয়ের" মত জাপানীদের মন অধিকার করেচে। কত কবির কাব্য, কত চিত্রকরের চিত্র ফুজিসান্‌কে অমর করেচে।

চন্দ্রমল্লিকায় যখন মাঠ ছেয়ে ফেলে, তখন জাপানীদের দেখা যাবে, নিস্তব্ধ ভাবে সবাই প্রকৃতির উৎসব দেখ্‌তে মিলিত হয়েচে। ধনী দরিদ্র সকলেই এই উৎসবে যোগ দেয়। এই দেখাটা যেন তাদের কাছে আহারেরই সামিল। তাদের জীবন-যাত্রার মধ্যে সহজ এবং সুসংযত ভাব আছে। তাদের গৃহ-সজ্জায় কোনো আড়ম্বর নাই, ঘরের সমস্ত মেঝেতে মাদুর পাতা, দেওয়ালে কেবল একটি ছবি টানানো, এবং কুলুঙ্গির মধ্যে একটি ফুলদানি। এমন কি, যারা খেতে পায় না, তাদেরও ফুল রাখা চাই। আর্টিষ্টদের তারা খুব আদর করে। তারা আমাদের দেশের আর্টিষ্টদের মত ভাতে মরা নয়। জাপানে অসংখ্য চিত্রকর বর্ত্তমান। এক টোকিও সহরেই আটশত চিত্রকর আছে।*

সমস্ত প্রকৃতির সহিত এই মৈত্রীভাব জাপানীরা শিখ্‌ল কোথা থেকে? বুদ্ধদেব এই মৈত্রীভাব প্রচার করেছেন, আর তাদের দেশের আবহাওয়াও তাদের এই ভাব পুষ্ট করেচে।

---

* ভূমিকম্পের আগের কথা বলা হইতেছে।

তৃতীয় শতাব্দীতে চীনের পরিব্রাজকেরা জাপানে কনফুসিয়াসের ধর্ম্ম প্রচার করে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। সেই সময় থেকেই জাপানী আর্টের আরম্ভ।

জাপানের প্রাচীন চিত্রকরদের মধ্যে অনেক কোরিয়ান শিল্পীর নাম পাওয়া যায়। সে সময় রাজকুমার শোটোকু (Slaotoku) তাদের যথেষ্ট উৎসাহ দেন। তিনি নিজের portrait আঁকিয়েছিলেন। নারাযুগে ৭০৯ খৃঃ হইতে ৭৮৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত অনেক সুন্দর চিত্র হয়েচে। হরিউজি মন্দিরে এ সময়ে অনেক frescoe painting হয়েছিল। এগুলি আমাদের অজন্তার চিত্রের মত। অজন্তার ১নং কুঠরীতে ঢোকবার দরজার বাঁদিকে বোধিসত্ত্বের যে মূর্ত্তি আছে, তার সঙ্গে হরিউজি মন্দিরের বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তির সাদৃশ্য আছে। জাপানী পত্রিকা কোকা এ সম্বন্ধে লিখেচে, "আমাদের হরিউজির বোধি-সত্ত্বের সহিত অজন্তার বোধিসত্ত্বের এত সাদৃশ্য আছে যে, আমাদের মূর্ত্তির আদর্শ অজন্তা থেকে নেওয়া হয়েচে; কিন্তু আমাদের মূর্ত্তির বর্ণ-সমাবেশ অজন্তার মূর্ত্তির বর্ণসমাবেশ অপেক্ষা অনেক নীচু রকমের।"

সমুদ্রের ঢেউ

(সতেরো শতাব্দীর কোরিনের আঁকা। কোরিনের সময় জাপানী আর্ট বিশেষ ভাবে জাপানের বিশেষত্ব পেয়েছিল। কোরিন অলঙ্কারিক শিল্পে (Decorative art) নূতনত্ব দিয়েছিল। এ ছবিতে পাহাড় এবং ঢেউয়ের অলঙ্কারিক দিকটা (Decorative Side) লক্ষ্য করার বিষয়।)

নারাযুগ বা বৌদ্ধযুগের পর আসল ইয়মাটো চিত্রকরদের যুগ। জাপানীরা প্রাচীন জাপানকে ইয়মাটো বলে থাকে। এই চিত্রকরদের মধ্যে সব চেয়ে বিখ্যাত হল কানোকা, তিনি নবম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি অনেক portrait এবং দৃশ্য-চিত্র এঁকেছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবি "নাচির জলপ্রপাত।"—পর্ব্বত-শিখরের উপর শর্ব্বরী মেঘমগ্ন, ঝরণার জল, অনেক উঁচু থেকে ঝরঝর করে ঝরে পড়চে। নীচে পাইন বন।

তার পর টোসা চিত্রকরদের যুগ। এরা প্রধানতঃ দরবারের দৃশ্য ও সম্রাট ও ওমরাহদের ছবি আঁকত।

এর পর আসল সেস্‌শু ও অন্যান্য চিত্রকরদের পালা। সেস্‌শু একজন প্রতিভাবান এবং উঁচুদরের দৃশ্য-চিত্রকর ছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে বিখ্যাত কানো চিত্রকরদের পালা আরম্ভ হয়। এই সম্প্রদায় স্থাপন করেন বিখ্যাত শিল্পী কানো। এই শিল্পীরা জাপানের চিত্তকে একেবারে হরণ করে নেয়,—আজ পর্য্যন্তও এদেরই ঢেউ চলেচে। এই চিত্রকরদের বিশেষত্ব হ'ল রেখার দৃঢ়তা, বর্ণের উজ্জ্বলতা, এবং আলো-ছায়ার খেলা। এই তিনটা বিশেষত্বই হল জাপানীদের কাছে তাদের আর্টের বিশেষত্ব। তাদের ভাষায়, এই তিন বিশেষ অঙ্গকে বলে Fude no chicara tsuya ও suni।

কানোরা প্রথম চীনে ধরণে দৃশ্য-চিত্র আঁকত।

কানোদের মধ্যে কোরিন, ওকিও প্রভৃতি আরও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। কোরিন চিত্রকরেরা লাক্ষার উপরে (Lacquer work) ছবি আঁকার জন্য বিখ্যাত। ওকিও চিত্রকরেরা খুব স্বাভাবিক করে ছবি আঁকতে পারত। এদের নাম জাপানীদের ঘরে ঘরে বিরাজ করচে। এদের মধ্যে সোসেন বানর আঁকার জন্য বিখ্যাত, আর ছিকাদো বাঘ আঁকার জন্য।

জাপান যখন প্রথম ইয়োরোপের সংস্পর্শে এসেছিল, তখন জাপানীরা ইয়োরোপের চাক্‌চিক্যে এত মুগ্ধ হয়েছিল যে, তারা নিজের শিল্পকে অবহেলা করে ইয়োরোপের শিল্পকে বরণ করে নিয়েছিল। এদের মধ্যে গাহো হলেন প্রধান। তিনি ইয়োরোপে গিয়েছিলেন পাশ্চাত্য শিল্প শেখার জন্য। ১৯০৮ খৃঃ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি দৃশ্য চিত্র আঁকতেন। The spirit of Japanese artএ অধ্যাপক ইওন নোগুচি তাঁর চিত্রকে ইংলণ্ডের দৃশ্য-চিত্রকর টার্ণারের চিত্রের সহিত তুলনা করেছেন।

ভারতীয় চিত্রে কোথাও দৃশ্য-চিত্রের স্থান নাই। কেবল রাজপুত চিত্রাঙ্কনে আছে—তা কেবল কোনও চিত্রের পশ্চাদ্ভাগ (background) রূপে অঙ্কিত হয়েচে। তার কারণ, আমরা আমাদের আর্টকে নরনারীর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছি, আর জাপানীরা করেছে প্রকৃতির ভিতর দিয়ে। আমাদের মানুষ সামনে, প্রকৃতি পিছনে; আর জাপানীদের প্রকৃতি সামনে, মানুষ পিছনে। মানুষের দৈহিক সৌন্দর্য্যে তাদের কল্পনা কথনো উদ্বুদ্ধ হয় নি। মানুষের দেহ সম্বন্ধে তাঁদের কোনো মোহ নেই, সেজন্য জাপানী চিত্রে বা ভাস্কর্য্যে নগ্ন নরনারীর মূর্ত্তি নাই।

শঙ্করের গৃহস্থালী

(রাজপুত ছবি (কাংরা স্কুল।)

জাপানী চিত্র বিশেষ ভাবে folk art বা জনসাধারণের চিত্র হয়েছিল উকিওচিত্রকরদের সময়ে। ভারতবর্ষে এত বড় folk art কথনো হয় নি। অজন্তার চিত্র ত মোটেই folk art ছিল না, তবে রাজপুত্র চিত্র folk art ছিল। মোগল চিত্রকে folk art বলা চলে না; কারণ, তাতে দরবারী গন্ধ আছে। কেবল বাংলা দেশের পটুয়াদের চিত্র খাঁটি folk art।

উকিও সম্প্রদায় স্থাপন করেন মাতাহেই। উকিও সম্প্রদায় টোসা চিত্রকরদের সমসাময়িক। উকিওরা কাঠের ব্লকে ছবি ছেপে পয়সা পয়সা হিসাবে এক একখানা বেচ্‌তেন। বিষয় হল, দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট ব্যাপার, নাটকের অভিনেতা এবং সুন্দরী রমণীদের মূর্ত্তি। এ সব ছবি মুটে, মজুর, কৃষক প্রভৃতি সাধারণ লোকেরা কিন্‌ত। পশ্চিমে উকিওদের কল্যাণে জাপানী চিত্র যথেষ্ট প্রচারিত হয়েচে। জাপানের শিল্পী মহলে উকিওদের বিশেষ আদর নাই, তারা বলে এগুলি ছাপা জিনিস, আর্টের খাঁটি জিনিস নয়।

এখন জীবিত শিল্পীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চিত্রকর হচ্ছেন, টাইক্কন সান্। তিনি ভারতবর্ষে একবার বেড়াতে এসেছিলেন। আমাদের শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের সহিত তাঁর বন্ধুত্ব আছে। টাইক্কন সান্ অবনীন্দ্র নাথের বাড়ীতে অনেক দিন কাটিয়ে গিয়েছেন। তাঁর শিল্পই জাপানী শিল্পকে ইয়োরোপের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছে। তাঁর কাছে অনেক শিল্পী শিক্ষা পাচ্চে। ইয়োরোপের প্রভাবে আচ্ছন্ন জাপানের সাম্‌নে যিনি প্রথম জাপানী শিল্পের মহিমা কীর্ত্তন করে, তার আদর্শকে উঁচু করে ধরেছিলেন, যাঁর উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে টাইক্কন সান্ প্রভৃতি জাপানী প্রথায় আঁকতে থাকেন, তিনি হলেন বিখ্যাত পণ্ডিত কাউন্ট ওকাকুরা। জাপানী আর্ট সম্বন্ধে তাঁর বই হল "Ideals of the East" এবং "The book of ten"। বছর কয়েক হবে এই মহাত্মার মৃত্যু হয়েচে। জাপানের আর্টের এই নূতন আন্দোলনের সঙ্গে, আমাদের বাঙ্গালা দেশের আর্টের যে নূতন আন্দোলন সুরু হয়েচে, তার তুলনা চলে। ওকাকুরা ও টাইক্কন সানের ন্যায় আমাদের ইয়োরোপীয় প্রভাবিত বাংলার সাম্‌নে যাঁরা ভারতীয় আর্টের মাহাত্ম্যকে দাঁড় করিয়েছেন, তাঁরা হলেন শ্রীযুক্ত হ্যাভেল সাহেব ও আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ।

একদল ইয়োরোপীয় চিত্রকরের উপর জাপানী আর্টের প্রভাব পড়িয়াছে। এই সম্প্রদায়কে Impressionist বলা হয়। এই সম্প্রদায়ের একজন জগৎ-বিখ্যাত শিল্পী হলেন Whistler। জাপানী আর্টে এই Impressionism খুব বড় একটা দিক। এর মানে হচ্চে, কোনো জিনিষ দেখে আমাদের মনে যে ভাব হয়, তার impression বা ছাপ দেওয়া। গাছ বা একটা কিছু সাম্‌নে দেখ্‌ছি, সেটাকে ঠিক নকল করে আঁকাকে impression বলে না, সেটাকে হয় ত বিশেষ কোনো একটা ভাবে দেখ্‌ছি, সেই ভাবটাকে আঁকা। যেমন মনে করুন, গাছটাকে দেখ্‌চি যেন একটা পাখীর মতন, তখন গাছের সমস্ত details বা খুঁটি নাটি সব কমিয়ে দিয়ে সহজে সংক্ষেপে সেই দেখাটাকে আঁকতে হবে। একজন লেখক impressionismএর মূল তত্ত্বটিকে এই বলে ব্যাখ্যা করেছেন :—"L' art d' ennuyer est de tout dire" অর্থাৎ সমস্ত জিনিস বলতে গেলে আমাদের মন ক্লান্ত হয়, তাই অপ্রধান অংশ চেপে গিয়ে মূল কথাটি কেবল প্রকাশ করতে হবে। জাপানী কবিতার মধ্যেও এই Impressionism পাওয়া যায় ; যেমন একটি জাপানী কবিতা :—

Asagoo
Tswmbe torarete
Morai midza
আশাগাও মোর,
ঢাকিল গাগরী,
আমি জল মাগি ফিরি।

একটি মেয়ে ভোর বেলায় কূয়া থেকে জল তুলতে গিয়েছে ; গিয়ে দেখে জল তোলার পাত্রটি আশাগাও নামে ফুলের লতা ঢেকে ফেলেছে। সে আর ফুল লতা পাতা ছিঁড়ে ফেলে, কলসীটাকে তা থেকে বাঁচিয়ে জল তুল্‌তে গেল না, অন্য যায়গা থেকে জল যোগাড় করে নিল। এই উপলক্ষে সে এই কবিতাটি লিখ্‌ল। এ ধরণের ছোট কবিতাকে হাইকাই বলে। যারা হাইকাই লেখে, তাদের বলা হয় হাইজিন। সমস্ত ভাব এবং রস গ্রহণ করতে জাপানীদের পক্ষে ছোট ছোট দু চারটি কথাই যথেষ্ট। সমস্ত ভাব, এই অল্প কথার মধ্যেই তারা দেখ্‌তে পায়। তাদের ভাষায় এই যে সংযম,—চিত্রেও সেই সংযম, চরিত্রেও সেই সংযম।
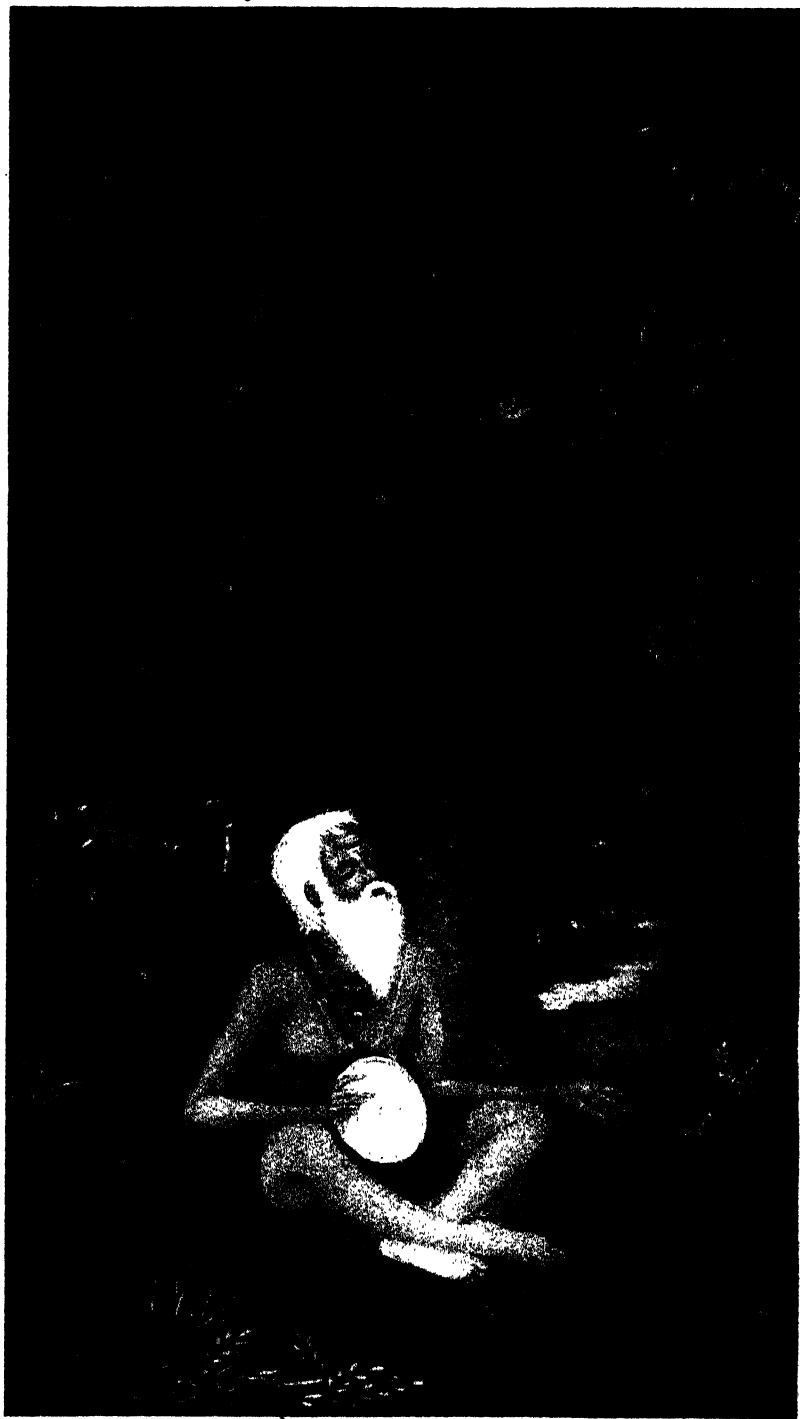
আরাধনা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

বিবিধ-প্রসঙ্গ

শিবপুর এন্‌জিনিয়ারিং কলেজের খনি-বিভাগ ও উহার অধ্যাপক রবার্টস্‌

শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল এ-এম, আই-এম্‌-ই

শিবপুর কলেজের খনি-বিভাগ ইংরাজী ১৯০৫ সালে প্রথম খোলা হয়; উদ্দেশ্য, খনিবিদ সৃজন করা। ফলে, ভারতবর্ষের খনিগুলি, বিশেষতঃ কয়লার খনিগুলি, সুপদ্ধতিমত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিঃশেষিত হইবে। সুশিক্ষিত কার্য্যক্ষম ম্যানেজারের অভাবে একটী কয়লার খনি হইতে সমস্ত কয়লা উত্তোলন করা অসম্ভব; কাঁথি ইত্যাদিতে অনেক কয়লা থাকিয়া যায়। অপিচ, খাদ বসিয়া যাওয়া বা উহাতে আগুন লাগা হেতু অকালে খনিটিকে বন্ধ করিতে হয়। ইহাতে যে কেবল খনির স্বত্বাধিকারীর ক্ষতি তাহা নহে, ইহা জাতীয় ক্ষতি। কারণ, কোন এক দেশে উহার খনিজ সম্ভার মাত্র একবার উত্তোলিত হইয়া থাকে। জমির উর্ব্বরতা হ্রাস হইলে উহাতে সার দিয়া প্রতি বৎসরে সমপরিমাণ ফসল উৎপত্তি সম্ভব। কিন্তু কোনরূপ সার প্রয়োগে দেশের খনিজ পদার্থ বৃদ্ধির চেষ্টা বাতুলতা। দেশের খনিজধন উহার জাতীয় ইতিহাসে একবার, মাত্র একবার, ব্যবহৃত হইতে পারে। ফুরাইলে পুনঃপ্রাপ্তির আশা বৃথা।

চরনপুর কয়লাখনিস্থ আপকার চানকের নিকটে অধ্যাপক রবার্টস্‌ ও তাঁহার ছাত্রবৃন্দ

উদ্ভিদ চাপা পড়িয়া কয়লার উৎপত্তি। খনিবিদেরা স্থির করিয়াছেন, ১ ফুট কয়লাস্তর উৎপাদনোপযোগী উদ্ভিদ জন্মিতে ৫০০ বৎসর সময়ের প্রয়োজন এবং উহা বহুকাল ভূগর্ভে থাকিলে তবে কয়লাতে পরিণত হয়। প্রকৃতি ঠাকুরাণী মানবের হিতার্থ কতকাল ধরিয়া কত আয়াসে একটী কয়লারখনি সৃজন করেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। অনভিজ্ঞ ম্যানেজারের দোষে ঠাকুরাণীর এত চেষ্টা মুহূর্ত্তে ব্যর্থ হয়। সুতরাং খনি-নিঃশেষের সময় যাহাতে খনিজ পদার্থ একটুও নষ্ট বা উহার একটুও অপব্যয় না হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা সকলের কর্ত্তব্য।

Coal Distillation Plant.

অতএব ম্যানেজারের খনিবিদ্যার জ্ঞান থাকা দরকার। এতন্নিমিত্ত সরকার ১৯০৫ সালে শিবপুর কলেজে কয়লার খনি ও অন্যান্য

ধাতুর খনি বিষয়ে শিক্ষা দিবার একটী বিভাগ খোলেন, এবং রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ার কয়লাভূমিতে প্রথমোক্ত খনি সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। পণ্ডিত ই, এইচ্, রবার্টন্ শিবপুর কলেজস্থ খনি বিভাগের প্রথম অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি ঐ আসন গত ১৭ বৎসর অলঙ্কৃত করিয়া, গত ২রা জানুয়ারি পরিত্যাগ করিয়াছেন।

খনিবিদ্যা ও ভূবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য আরও কলেজ স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। ধানবাদে এরূপ একটী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবে অনেকদিন হইতে শোনা যাইতেছে। ভাবী কলেজের অধ্যক্ষও বিলাত হইতে আসিয়াছেন।

অধ্যাপক রবার্টন্ যদিও ইংলণ্ডে ইয়র্কশায়ারে জন্মগ্রহণ করেন, তত্রাচ তাঁহার বাল্যজীবন ও যৌবনের অধিকাংশকাল বারমিংহামে

অধ্যাপক ই, এইচ্, রবার্টন্, বি,এ, (অক্সন) ; এম্, এস্‌সি (বারমিং) ; এম্, আই, এম্, ই ; এফ্, জি, এস্

অতিবাহিত হয়। কারণ, তাঁহার পিতা স্থানীয় একটী বৃহৎ যাজকপল্লীর পাদ্‌রী ছিলেন। পল্লীর অধিকাংশ অধিবাসী খনক-শ্রেণীর (Miners) লোক। তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা লিণ্ স্কুলে সম্পন্ন হয়। ঐ স্কুল হইতেই তিনি গণিতবিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য বৃত্তি পান। উহা পাইবার জন্য নিকটবর্ত্তী অনেকগুলি স্কুলের বালকেরা প্রতিযোগিতা করিয়াছিল। স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করিয়া তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন, এবং উহার B. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অক্সফোর্ড হইতে তিনি বারমিংহামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, ও উহার বিশ্ববিদ্যালয়ের খনিবিভাগে শিক্ষার্থী রূপে প্রবিষ্ট হন, এবং তথাকার M. Sc উপাধি পান। তিনি বিখ্যাত সিটনডেলাভেল খনিতে শিক্ষানবীশ ছিলেন। সুবিখ্যাত অধ্যাপক রেডমেন তখন ঐ খনির পরিচালক। যখন অধ্যাপক রেডমেন বারমিংহামে গমন করেন, তখন তিনি তাঁহার প্রিয়শিষ্য রবার্টন্‌কেও ঐ বিদ্যালয়ের Lecturer Demonstrator রূপে লইয়া যান। বারমিংহাম হইতে রবার্টন্ সাহেব শিবপুর কলেজে অধ্যাপক রূপে আগমন করেন।

শঙ্করপুর খনিবিদ্‌গণের তাঁবু ১৯২৩

তিনি কলেজে ব্যায়ামপটু ছিলেন। অক্সফোর্ডে অবস্থান কালে কলেজের জন্য সর্ব্বদা খেলিতেন, এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যও অনেকবার খেলিয়াছেন; যদিও অল্পের জন্য তিনি অক্সফোর্ডের পরিচয়-ব্যঞ্জক নীলবর্ণের চিহ্ন পরিধান করিবার অধিকার পান নাই। শিবপুর কলেজে অধ্যাপনা কালেও তিনি কলেজের হইয়া কয়েকবার খেলিয়াছেন।

১৯০৫ সালে তিনি শিবপুর কলেজে B. E. College Mining Society নামে একটী সমিতি স্থাপন করেন। প্রথমে মাত্র উহার ১৫ জন সভ্য ছিল। এখন কলেজের খনিবিভাগের বর্ত্তমান ও পুরাতন ছাত্রগণের অধিকাংশই উহার সভ্য। তা' ছাড়া কয়লাকুঠীর অনেক ম্যানেজারও ইহার সভ্য। অধ্যাপক রবার্টন্ ১৮বৎসর ধরিয়া এই সমিতির সভাপতি ছিলেন। তিনি ইহার জন্য কিরূপ যত্ন লইতেন, তাহা যাঁহারা একবার ইহার কোন একটী সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন। প্রতি বৎসর ছাত্রেরা কয়লাভূমিতে তাঁবুতে অবস্থান কালে খনির কলকব্জা ও পরিচালন-পদ্ধতি দেখিয়া প্রত্যেকে নোট-বই লিখে। উৎকৃষ্ট নোট-

বই লেখককে সমিতির তরফ হইতে প্রতি বৎসর ৫০৲ টাকা পারিতোষিক দেওয়া হয়। এই টাকা অধ্যাপক রবার্টন্ দান করেন। ঐ সমিতি হইতে আরও তিনটি পারিতোষিক দেওয়া হয়।

সমিতি একটী ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটী ১৮ বৎসর ধরিয়া নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমান ও পুরাতন ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকেই পত্রিকায় লিখিয়া থাকেন। উহা ছাত্রদিগের দ্বারাই পরিচালিত। এটা কম কথা নয়।

অধ্যাপক রবার্টন্ ভারতবর্ষে আসিয়াই Transactions of the Mining and Geological Institute of India নামক বিখ্যাত পত্রিকার Editor নিযুক্ত হন। পরে ৫ বৎসর ঐ Instituteএর Secretary ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি উহার সহকারী সভাপতি। প্রবন্ধ লেখার জন্য ঐ Institute তাঁহাকে দুইবার স্বর্ণ পদক দান করেন।

তিনি নিম্নলিখিত প্রবন্ধ ও পুস্তকগুলি লিখিয়াছেন :—

'The Action Influence and Control of the root in Longwall Workings." (Prize from the North of England Institute of Mining Engineers).

"The Problem of Dynamic Balance".

"The Experimental Mine at Birmingham University".

"The Development of Machinery in Mining".

"The Problem of Deep Mining".

"Methods of Working Coal".

"The Cementation Process of Shaft Sinking".

"Notes on the Manufacture of Briquettes." (Gold Medal, Mining and Geological Inst. of India).

"A Method of Working a thick steep Coal Seam". (Gold Medal, Mining and Geological Inst. of India.)

"Coal Mining" (শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত)।

"Mine Surveying"   ঐ

চানকের কাঁধির (Shaft pillar) পরিমাণ নির্ণয় করিবার জন্য তাঁহার কৃত একটী সূত্র আছে, নাম রবার্টনের সূত্র। সূত্রটী সুফলপ্রদ।

শিবপুর কলেজের খনিবিভাগ হইতে এ পর্য্যন্ত ২৪৮ জন ছাত্র বাহির হইয়াছেন, তন্মধ্যে ৩১জন Colliery Managers, 1st Class Certificate এবং ৭৩ জন 2nd Class Certificate পাইয়াছেন। সকলেই তাঁহার ছাত্র।

তাঁহার অধ্যাপনার প্রশংসা এক মুখে করা যায় না। বোর্ডে নানা বর্ণের খড়িমাটী দ্বারা দ্রুত সুন্দর চিত্র অঙ্কনে তিনি সিদ্ধহস্ত। একক তিনি Coal Mining, Mining Engineering, Metal Mining, Geology এবং Mineralogy এই এতগুলি বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। খনি-বিদ্যার জটিল তত্ত্বগুলি অতি সহজ ভাষায় বুঝাইতে তিনি অদ্বিতীয়। Laboratoryর অনেক কাজ তিনি ছাত্রদিগের দ্বারা করাইয়া লইতেন। Mining Shed ছাত্রদিগের দ্বারা নির্ম্মিত; Baring Plant টীও তাহারা খাড়া করিয়াছে। একটী Coal Distillation Plant আছে, তাহার প্রায় সমস্তটী ছাত্রেরা গড়িয়াছে, যার বনিয়াদ কাটা, কন্‌ক্রীট করা পর্য্যন্ত। কোন একটী যন্ত্র ভাঙ্গিলে উহা মেরামত করিবার জন্য হঠাৎ তিনি কারখানায় পাঠাইতেন না, আগে শিক্ষার্থীদিগকে মেরামত করিতে বলিতেন। Shed এর দুইদিকের তারের বেড়া ছাত্রদিগের দেওয়া।

অধ্যাপক রবার্টন্ ও তাহার ১৯২৩ সালের ছাত্রবৃন্দ

যে দুইমাস ছাত্রেরা জরিপ শিক্ষা করিবার জন্য কয়লাভূমিতে তাঁবুর মধ্যে বাস করে, সেই সময়ে প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় তিনি ছাত্রদিগের তাঁবুতে আসেন, এবং হয় তাহাদের তাস পাশা খেলা দেখেন, না হয় একটু হারমোনিয়াম বা বেহালা বাজান। তাঁহার স্ত্রী মধ্যে মধ্যে ছাত্রদিগের তাঁবুতে সিগারেট ও বহু মাসিক পত্রিকা পাঠাইয়া দেন। তাঁবুতে অবস্থান কালে প্রায়ই ছাত্রবৃন্দকে চার পাঁচ মাইল দূরে কোন

কয়লাখনি দেখিতে যাইতে হয়। ঐ স্থানে গমনের প্রারম্ভে তিনি মানচিত্র দেখিয়া যাইবার একটী দিক স্থির করিয়া লন, তার পর সেই দিকে চলিতে আরম্ভ করেন; তা' নদীই থাকুক বা নালাই থাকুক অথবা জঙ্গলই সম্মুখে পড়ুক, উহা অতিক্রম করিয়া চলাই তাঁহার অভ্যাস। তাঁহার Geological excursion একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য। প্রায় ৬০জন যুবকের অগ্রে অগ্রে অধ্যাপক দ্রুত গতি চলিয়াছেন, এবং যেখানে বুঝাইবার আবশ্যক তথায় দাঁড়াইয়া শিক্ষার্থীদিগকে বুঝাইতেছেন। অতি কম ছাত্রই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পারিত, এত দ্রুত তিনি হাঁটিতেন। কাঁটা বা জঙ্গল কিম্বা জল অথবা নদী কিছুতেই তাঁহার ঈপ্সিত স্থানে গমনে বাধা দিতে পারিত না। লেখক প্রায় সকলের পশ্চাতে চলিত। একদা তিন চার বার লেখকের জন্য অপেক্ষা করিয়া হতাশভাবে ছাত্রদিগের নিকট বলিয়াছিলেন "Mr. Mondol has many things to carry"। লেখকের শরীর একটু স্থূল। অধ্যাপকের কথা সদাই রসিকতাপূর্ণ।

১৬ই জানুয়ারি খনিবিভাগের পুরাতন ছাত্র এবং কলেজের সমস্ত বিভাগের ছাত্রেরা মিলিত হইয়া তাঁহাকে বিদায়-অভিনন্দন দান করেন। কলেজের প্রায় প্রত্যেক ছাত্রই উপস্থিত ছিলেন, এবং কয়েকজন পুরাতন ছাত্রও আসিয়াছিলেন। বাহিরের কয়েকটি ভদ্রলোক আগমন করিয়াছিলেন। সভায় অধ্যাপক বলিয়াছেন যে, যদিও তিনি কলেজ হইতে চলিয়া যাইতেছেন, তত্রাচ তিনি মধ্যে মধ্যে আসিবেন, এবং Mining Societyর কাজে যোগদান করিবেন। এখন তিনি Messrs. Anderson Wright নামক কোম্পানির অধীনে কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন এবং ভারতবর্ষেই থাকিবেন। কলেজে অধ্যাপকের একটী তৈলচিত্র রাখিবার প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়, এবং তাঁহার পুরাতন ছাত্র বাগডিহি খনির ইন্‌জিনিয়ার শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন গুপ্ত মহাশয় টাকা সংগ্রহ করিবার ভার গ্রহণ করেন। আশা করি তাঁহার পুরাতন ছাত্রেরা গুপ্ত মহাশয়ের নিকট অর্থসাহায্য পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

রবার্টন্ সাহেবের কলেজ পরিত্যাগে শিক্ষা-বিভাগের ক্ষতি হইল বটে, কিন্তু খনি ব্যবসায় একজন বিচক্ষণ কর্ম্মকুশল ব্যক্তি পাইল।

মহাকবি কালিদাস কি বাঙ্গালী?

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম-এ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"(৭) শরৎ বর্ণনা। কালিদাসের "শরৎ বর্ণনা" এবং রবীন্দ্রের "বঙ্গে শরৎ" শীর্ষক কবিতা একই ভাব-দ্যোতক। আপনারা "হে মাত বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ তোমার বিমল প্রভাতে" ইত্যাদি রবি বাবুর কবিতা কালিদাসের "শরৎ বর্ণনা"'র সহিত মিলাইয়া দেখিবেন, উভয়ে এক প্রকৃতিই চিত্রিত করিয়াছেন।"

কবিভূষণ মহাশয়ের কথার উত্তরে বক্তব্য এই যে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে প্রাকৃতিক বৈষম্য থাকিলেও—সৌসাদৃশ্যও যথেষ্ট আছে। তাই বিভিন্ন প্রদেশের কবিরা একই ঋতুর বর্ণনা করিলেও—উহাতে যথেষ্ট সাদৃশ্য দৃষ্ট হইবে, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এইরূপ বর্ণনার সাদৃশ্য দর্শনেই যদি ঐ কবিদিগের সকলকেই এক দেশীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়,—তাহা হইলে ভারবি, ভর্ত্তৃহরি, ভট্টি প্রভৃতি শরৎ-বর্ণনা-কারী কবিগণকে বাঙ্গালী বলিয়া, কিংবা রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে হিন্দুস্থানী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

অতঃপর কবিভূষণ মহাশয় নিম্নলিখিত দুইটী "ভৌগোলিক" প্রমাণও দর্শাইয়াছেন—

"(১) সেই দেশই মহাকবি কালিদাসের জন্মভূমি, যে দেশের উল্লেখ তিনি তাঁহার গ্রন্থে প্রথমেই করিয়াছেন, যে স্থানকে স্মৃতিপথে রাখিয়া তাঁহার কবিত্বের উৎস প্রথম প্রস্ফুরিত হইয়াছে।

"কবিদের ইহা বিশ্বজনীন রীতি যে, তাঁহারা আত্মবৎ রচনা করিয়া থাকেন—নিজের বাসস্থানই নায়কের বাসস্থান। অথবা নিজের বাসস্থান বা তন্নিকটবর্ত্তী প্রধান নগরের ছায়াই নায়কের বাসস্থান, এবং নিজের জীবন চরিত্রের ছায়াই নায়কের চরিত্রের কায়া করিয়া থাকেন। ইহার ইংরাজি নাম—Transfiguration of the Aunhor.

"কবি কালিদাস তাঁহার কাব্যে অযোধ্যার বর্ণনা না করিয়া বশিষ্ঠাশ্রমেরই প্রথম বর্ণনা করিয়াছেন; বশিষ্ঠাশ্রমকে স্মরণ করিয়াই তাঁহার কবিত্বের উৎস প্রথম বিচ্ছুরিত হইয়াছিল। বশিষ্ঠাশ্রমের বর্ত্তমান নাম রামপুরহাটের নিকটবর্ত্তী—৺তারাপীঠ। এই স্থান ব্যতীত ভারতের কুত্রাপি "ঘোষবৃদ্ধ" ও "শালিগোপ" নামক গোপজাতিদ্বয় পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় কপিলাশ্রম—বর্ত্তমান নাম চাকটা—চক্রতীর্থ ও কপিলেশ্বর শিবলিঙ্গ সিঙ্গড়ি গড্ডা পাঁচথুপির নিকট। তৃতীয় কর্ণমুনির আশ্রম—বর্ত্তমান নাম কাণসোণা, কাটোয়ার উত্তর। চতুর্থ সোমতীর্থ—চক্রতীর্থের নামান্তর, এখানেই পূর্ব্বে কামনাসাগর ছিল। পঞ্চম মেধস মুনির আশ্রম (ত্রিকাণ্ডশেষ অভিধানের মতে রঘুকার কালিদাসের নামান্তর মেধস মুনি) বোলপুর ষ্টেসনের নিকট। এইরূপে পাওয়া গেল—রামপুরহাট, কাণসোণা, চাকটা, বোলপুর—এই চতুষ্কোণ ভূভাগের মধ্যে—মহাকবি কালিদাসের জন্মভূমি ছিল।"

কবিভূষণ মহাশয় কবিদিগের সে বিশ্বজনীন (?) রীতির কথা লিখিয়াছেন, উহার যদি কোনও অর্থ থাকে, তাহা বোধ হয় এই হইবে যে, কবির বর্ণিত মনোরম্য স্থানসমূহে তাঁহার 'স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি'র এবং তাঁহার বর্ণিত মহনীয় নায়ক-চরিত্রে তাঁহার নিজ চরিত্রের অল্লাধিক ছায়া-পাত না হইয়া যায় না। কিন্তু ইহাও সত্য যে, সুবিধা বা সুযোগ না ঘটিলে এরূপ করা যায় না। কুমারসম্ভব বা মেঘদূত কাব্যে কালিদাসকে বাধ্য হইয়াই যথাক্রমে হিমালয় ও রাম-গিরির বর্ণনা দ্বারা গ্রন্থারম্ভ করিতে হইয়াছে। তিনি বাঙ্গালী হইয়া থাকিলেও, ঐ দুই কাব্যে তিনি ঘুণাক্ষরেও বঙ্গদেশের কোনও প্রসঙ্গ উল্লেখ করার

সুযোগ পান নাই। রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয় এবং ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর সভায় সমাগত রাজগণের বর্ণন প্রসঙ্গে তিনি বহু দেশেরই নামোল্লেখ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। তিনি এ ক্ষেত্রে কোনও দেশের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করিয়া, নিজের জন্মভূমি সূচিত করিয়াছেন কি না, তাহা বিচার্য্য বটে। কবিভূষণ মহাশয় তাঁহার ২নং ভৌগোলিক প্রমাণে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন; সুতরাং আমরাও সেখানেই আমাদিগের বক্তব্য বিবৃত করিব। এখানে এইমাত্র বলিতে চাহি যে, আমরা পুরাতত্ত্ববিৎ নহি; বরং পুরাতত্ত্বের নাম শুনিলে একটু ভয়ই পাইয়া থাকি। কবিভূষণ মহাশয় একটি ক্ষুদ্র প্যারার মধ্যে, কোনও রূপ প্রমাণ প্রয়োগ না করিয়াই, এক নিশ্বাসে পাঁচ-পাঁচটী প্রাচীন ও অজ্ঞাত আশ্রমের যে স্থান-নির্দ্দেশ করিয়া ফেলিয়াছেন, আমরা উহা পড়িয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছি। যাহা হউক, কোন মতেই অনধিকার চর্চ্চা কর্ত্তব্য নহে মনে করিয়াই, কবিভূষণ মহাশয়ের এই সেনাক্ত-কার্য্যের (identification) দোষ-গুণের বিচার ভার বিশেষজ্ঞদিগের প্রতি অর্পণ করিয়া, তর্ক স্থলে কবিভূষণ মহাশয়ের অন্যান্য সেনাক্তগুলি যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া, 'পঞ্চম মেধস মুনির আশ্রম' সম্বন্ধে বলিতে চাহি যে, ত্রিকাণ্ডশেষ অভিধানে রঘুকার কালিদাসের নামান্তর 'মেধারুদ্র' বলিয়া কথিত হইয়াছে। কবিভূষণ মহাশয়ের পুস্তিকার প্রারম্ভে "মহাকবি কালিদাসের সন্ন্যাসাবস্থা" নাম দিয়া প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তির যে চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে, উহার নিম্নের বিবরণেও 'ত্রিকাণ্ডশেষের মতে কালিদাসের নামান্তর মেধারুদ্র।"—এইরূপই লিখিত হইয়াছে। এ অবস্থায় এখানে 'মেধারুদ্র' নামের পরিবর্ত্তে 'মেধস মুনি' লিখিত হইল কেন? 'মেধারুদ্র'ই যে 'মেধস মুনি' ইহার অনুকূলে কি প্রমাণ আছে? বলা বাহুল্য যে, অন্যান্য স্থানগুলির পূর্ব্বোক্ত সেনাক্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও, তদ্দ্বারা কালিদাসের বাঙ্গালীত্ব প্রমাণিত হয় না। কালিদাস ইচ্ছা করিলেই রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন আকর গ্রন্থের উক্তির ব্যতিক্রম করিয়া বশিষ্ঠ, কণ্ব মুনি প্রভৃতির সংস্রব পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না; এ অবস্থায় যদিই বা তাঁহাদিগের আশ্রম বঙ্গদেশের চতুঃসীমার মধ্যে পতিত হইয়া থাকে,—তাহা হইলে তিনি তাহা এড়াইবেন কি প্রকারে? কিন্তু যে পর্য্যন্ত "মেধারুদ্র'ই 'মেধস মুনি' বলিয়া নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত না হইবেন, এবং ত্রিকাণ্ডশেষের উল্লিখিত 'মেধারুদ্র' নামটী মহাকবি কালিদাসের নামান্তর বলিয়া চূড়ান্তরূপে প্রমাণিত না হইবে—সে সময় পর্য্যন্ত কবিভূষণ মহাশয়ের এই উক্তি-মূলে কোনরূপ অনুমান করাই সঙ্গত হইবে না। আরও একটা কথা এই যে, এক দেশীয় লোকের সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া অন্য দেশে যাইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করা এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে তথায় তাঁহার স্মরণার্থ প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব নহে। কাশীতেও ত শঙ্করাচার্য্যের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে; তাই বলিয়া তাঁহাকে হিন্দুস্থানী মনে করিতে হইবে কি? কালিদাসের ন্যায় মহাকবি সর্ব্বত্রই পূজ্য। তাই, তর্কস্থলে উক্ত প্রতিমূর্ত্তি কালিদাসের সন্ন্যাসাবস্থার মূর্ত্তি বলিয়া মানিয়া লইলেও তদ্দ্বারা কালিদাসের বাঙ্গালীত্ব প্রমাণিত হয় না। ইহা দ্বারা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার সময়ে তদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত মহাত্মার অসাধারণ গুণবত্তা স্বীকৃত হইয়াছিল—কেবল এইমাত্রই অনুমান করা যাইতে পারে।

কবিভূষণ মহাশয় রামপুরহাটের নিকটবর্ত্তী স্থানে "ঘোষবৃদ্ধ" ও 'শালিগোপ' নামক গোপ জাতিদ্বয় বর্ত্তমান আছে বলিয়া লিখিয়াছেন! তিনি ইহাদিগের বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিলে, এই গোপজাতিদ্বয়ের ঐরূপ বিচিত্র নাম ধারণের রহস্য জানা যাইতে পারিত। এই ঘোষবৃদ্ধ গোপজাতির সহিত রঘুবংশের ১ম সর্গের "হৈয়ঙ্গবীনমাদায় ঘোষবৃদ্ধানুপস্থিতাং। নামধেয়ানি পৃচ্ছন্তৌ বন্যানাং মার্গশাখিনাম্॥" শ্লোকের বর্ণিত 'ঘোষবৃদ্ধ'দিগের কি সম্পর্ক আছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সংস্কৃত 'ঘোষ' শব্দের অর্থ 'আভীর-পল্লী' অর্থাৎ গোয়ালাদিগের পাড়া। ঐ পাড়ার বৃদ্ধ ও বহুদর্শী গোপদিগকে লক্ষ্য করিয়াই কালিদাস 'ঘোষবৃদ্ধান্' পদটীর প্রয়োগ করিয়াছেন। রাজা, জমিদার প্রভৃতি মাননীয় ব্যক্তিদিগকে ভেট দিতে হইলে, স্বভাবতঃ গ্রাম-বৃদ্ধেরাই ঐ কার্য্যে অগ্রণী হইয়া থাকেন। পক্ষান্তরে অজ্ঞাত বৃক্ষাদির নাম জানিতে হইলে, এই বৃদ্ধদিগের নিকটেই উহার জিজ্ঞাসা সঙ্গত ও স্বাভাবিক। এই উভয় কারণেই কালিদাস 'ঘোষবৃদ্ধান্' এই সুপ্রযুক্ত শব্দটীর ব্যবহার করিয়াছেন। এ স্থলে কোনও 'গোপজাতি-বিশেষ' অর্থ কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে কালিদাস লিখিয়াছেন—"ইক্ষুচ্ছায়নিষাদিন্যস্তস্য গোপ্তুর্গুণোদয়ং। আকুমার কথোদ্ঘাতং শালিগোপ্যো জগুর্যশঃ॥" এস্থলে 'শালিগোপ্যঃ' পদটী "শালীগোপী" এই স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের প্রথমার বহুবচনের পদ। উহার অর্থ—শালি-ধান্য-ক্ষেত্রের রক্ষাকর্ত্রী নারীগণ। 'গাথা-সপ্তশতী' 'আর্য্যা-সপ্তশতী' প্রভৃতি বাস্তব (realistic) কাব্যগুলিতে বহু স্থলেই এই ক্ষেত্র-রক্ষা-কর্ত্রী নারীদিগের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্যাপি ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র এই কার্য্যে নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগকে নিযুক্ত থাকিতে দেখা যায়। ইহাদিগের সহিত 'গোপ' বা 'গোপী' অর্থাৎ 'গয়লা' বা 'গোয়ালিনী'-দিগের কোনই সম্পর্ক নাই। কবিভূষণ মহাশয় বোধ হয় শুধু নাম-সাদৃশ্য দর্শনে ভ্রান্ত হইয়াই 'ঘোষবৃদ্ধ' ও 'শালিগোপ' (?) শব্দ দুইটীকে গোপজাতিদ্বয় বলিয়া স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। যাহা হউক, 'ভারতবর্ষে'র কোনও পাঠক যদি রামপুরহাট অঞ্চলের 'ঘোষবৃদ্ধ' ও 'শালিগোপ' নামক গোপজাতিদ্বয়ের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন, তাহা হইলে ঐ বিচিত্র নামের রহস্য জানা যাইতে পারিবে।

"(২) কোনও কবি, কোনও লেখক, কোনও ঐতিহাসিক কখনও নিজের জন্মভূমি শত্রুতে জয় করিতেছে, এ কথা লিখিতে পারেন না। অতএব সেই দেশই মহাকবি কালিদাসের জন্মভূমি, যে দেশের উল্লেখ তিনি রঘুর দিগ্বিজয়ের মধ্যে করিয়াছেন, অথচ সেই দেশে রঘু কর্ত্তৃক বিজয় বর্ণনা তিনি করেন নাই।"

কবিভূষণ মহাশয় তাঁহার এই প্রমাণ সূত্রটীর প্রয়োগ দেখাইতে যাইয়া লিখিয়াছেন—"কালিদাস নিজেই "কুমারে" হিমালয়ের বর্ণনা

করিয়াছেন, মেঘদূতেও রামগিরির বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু রঘুবংশে অযোধ্যার কোনও বর্ণনা করেন নাই কেন? এমন কি, প্রথম চারি সর্গের মধ্যে রঘুর রাজ্য যে কোন দেশে ছিল—তাহা বুঝিবার পর্য্যন্ত উপায় নাই।" কবিভূষণ মহাশয় এই দুর্বোধ্য রহস্যের কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—"এই অবশ্য বর্ণনীয় বিষয় জানিয়া বর্ণনা না করাতে মনে হয়, কালিদাসের আশ্রয়দাতা বিক্রমাদিত্য একজন অজ্ঞাতনামা দেশের অধিপতি, তাঁহার রাজধানী প্রখ্যাতনামা নগর নহে। ইহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—'স গুপ্তমূল প্রত্যন্তঃ শুদ্ধ পার্ষ্ণিরথান্বিতঃ। ষড়্‌বিধং বলমাদায় প্রতস্থে দিগ্‌জিগীষয়া॥" গুপ্তমূলঃ—অজ্ঞাতনামা (?) দেশোদ্ভবঃ স রঘুঃ প্রত্যন্তঃ—প্রত্যন্ত-দেশবাসী, গুপ্ত বংশের রঘু তাঁহার ম্লেচ্ছ দেশীয় রাজধানী হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হইলেন। ইহাতে বুঝা গেল, ম্লেচ্ছ জাতির অধ্যুষিত কোনও অবিখ্যাত দেশে গুপ্তবংশের দিগ্‌বিজয়ী সম্রাটের মূল রাজধানী ছিল। তিনি সেখান হইতে সেই প্রত্যন্ত জাতিকে সমরপরায়ণ করিয়া দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হইলেন। রঘু প্রথমে প্রত্যন্ত দেশ হইতে পূর্ব্বদিকে বহির্গত হইলেন—পথে অনেক জনপদ জয় করিয়া তিনি তালীবনশ্যাম সমুদ্রের উপকণ্ঠস্থিত দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, "পৌরস্ত্যানেবমাক্রামংস্তান্ তান্ জনপদান জয়ী। প্রাপ তালীবন শ্যামমুপকণ্ঠং মহোদধেঃ॥" কালিদাসের মত ভৌগোলিক রাজস্তুতি গাহিতে বসিয়াছেন, এই সব বিজিত জনপদের নামোল্লেখ কেন করিলেন না? তিলকে তাল করিয়া বর্ণনা করাই ত রাজস্তুতি। রাজপুতনার ভাটেরা, যে যুদ্ধে রাজা হারিয়া গিয়াছেন, সেই যুদ্ধেও রাজা জিতিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি জ্ঞাতসারে এই বর্ণনা না করায় বুঝা যাইতেছে—প্রত্যন্ত দেশ ও পূর্ব্ব সমুদ্রের উপকণ্ঠস্থিত তালীবন-শ্যাম দেশের মধ্যস্থলে তদানীং কোনও বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রাম বা নগর ছিল না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল।

"প্রত্যন্ত দেশের পূর্ব্বে ক্ষুদ্র জনপদ, তাহার পূর্ব্বে পূর্ব্বসাগর-তীরবর্ত্তী তালীবনশ্যাম দেশ, তাহার পূর্ব্বে বেতবনসমন্বিত সুহ্ম-দেশ, তন্নিকটেই বঙ্গদেশ।

"এক্ষণে এই সুহ্ম দেশ কোথায়, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেই, কালিদাসের বাসস্থান নির্ণয় হইল। হিয়ানথসাঙ্গের মতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও তাম্রলিপ্তির মধ্যস্থলে বহু বৌদ্ধবিহার শোভিত সমটাটা নগর। এই সমতটকে আমি সুহ্ম দেশ মনে করিয়া বর্ত্তমান পাটুলি বা "পাড়ুলে" স্থানকে সেই সমতটরূপে নির্ণয় করিলাম। সুহ্ম যে গঙ্গার চড়া তাহা সর্ব্ব ঐতিহাসিক-বিদিত। কাণসোণার দক্ষিণ হইতে তমলুকের উত্তর পর্য্যন্ত এই সমুদয় স্থানকেই সমতট বলিয়া লইলে আর কোন বিরোধ নাই। 'সুহ্মো রাঢ়ঃ' মহাভারতের টীকায় নীলকণ্ঠ।

"এক্ষণে আমার আপত্তি—অযোধ্যা হইতে সুহ্মদেশ পূর্ব্ব নহে,—দক্ষিণ বা দক্ষিণ পূর্ব্ব। এই উভয় স্থানের মধ্যস্থলে অনেক প্রধান নগর ও রাজা ছিলেন। তাঁহাদের নাম, যশোবর্ণনা ও শৌর্য্যবীর্য্য বর্ণনা কালিদাস মুক্তকণ্ঠে করিয়াছেন। সেই সকল দুর্দ্দান্ত রাজা ও সম্রাট্‌-গণের রাজ্য রঘু জয় করিলেন, তখন তাহা কালিদাসের মত স্তুতিপাঠক বর্ণনা না করিয়া, সুহ্ম ও বঙ্গদেশের জয়ের বর্ণনা তিনি করিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভবে? যাহাদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রতম অস্তিত্ব কালিদাস ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর-সভায় দেখান নাই, সেই দেশজয়ের বর্ণনা তিনি উচ্চকণ্ঠে করিলেন, অথচ তদপেক্ষা মহা মহা সমৃদ্ধিশালী জনপদ রঘু কর্ত্তৃক জয়ের নামোল্লেখ তিনি করিলেন না, কিরূপে এ কথা আমার সিদ্ধান্ত হইতে পারে?

"নিজের স্বদেশ অন্য জাতি আসিয়া জয় করিল, এ কথা কোনও কবি কখনও বর্ণনা করিতে পারেন না। কালিদাস সুহ্ম বা পাড়ুলে জয় করা লিখিলেন, বঙ্গ বা নবদ্বীপ জয় করা লিখিলেন, কিন্তু রঘু যে তালীবনশ্যাম দেশ বা রাঢ় জয় করিলেন, তাহা লিখিলেন না। "পৌরস্ত্যানেবমাক্রামংস্তান্ তান্ জনপদান্ জয়ী। প্রাপ তালীবন শ্যামমুপকণ্ঠং মহোদধেঃ॥" তিনি অনেক জনপদ আক্রমণ করিয়া জয় করিয়া তালীবন শ্যাম দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তালীবন শ্যাম দেশ আক্রমণও করিলেন না এবং জয়ও করিলেন না। জয়স্তম্ভও নিখাত করিলেন না, দিলেন দুটো যূপ চিহ্ন দেওয়া—তাহাও করিলেন না। তালীবন শ্যাম দেশে কি মানুষ ছিল না? তাহার পার্শ্ববর্ত্তী জন-পদে মনুষ্য ছিল, আর মধ্যবর্ত্তী জনপদে—তালীবনশ্যাম দেশে মনুষ্য ছিল না—এইরূপ হইতে পারে না। রঘু কি দিগ্‌বিজয়ী আলেক্‌-জাণ্ডারের মত, মগধের দ্বারে আসিয়া মগধ জয় না করিয়া অঙ্গদেশ জয় করিতে চলিয়া গেলেন? এই তালীবনশ্যাম দেশই মহাকবি কালিদাসের জন্মভূমি। তালীবনশ্যাম—এই ছয়টী অক্ষরের মধ্যে মহাকবি কালিদাসের স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির অনন্ত আত্মীয়তা ঢালা আছে।"

কবিভূষণ মহাশয়ের এই সকল সিদ্ধান্তের আমরা সমর্থন করিতে করিতে পারিতেছি না। আমাদের প্রথম বক্তব্য এই যে, 'কোনও কবি, কোনও লেখক, কোনও ঐতিহাসিক নিজের জন্মভূমি শত্রুতে জয় করিতেছে এ কথা লিখিতে পারেন না—কবিভূষণ মহাশয়ের এই উক্তিটীকে স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না; সুতরাং এই অমূলক স্বতঃসিদ্ধের উপর নির্ভর করিয়া তিনি যে কল্পনার সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাও ঐ স্বতঃসিদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই বিলীন হইয়া যায়। তার পরে বক্তব্য এই যে, কবিভূষণ মহাশয়ের এই সূত্র সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও, কালিদাসের পক্ষে রাঢ় দেশের পরাজয় বর্ণনা না করার আরও অনেক কারণ থাকিতে পারে। দিগ্‌বিজয়ী রঘু অযোধ্যা হইতে (কবিভূষণ মহাশয়ের কাল্পনিক মতে 'প্রত্যন্ত (?) দেশ হইতে') পূর্ব্বদিকে বহির্গত হইয়া, বা পূর্ব্বদিকের যে সমস্ত দেশ জয় করিয়াছিলেন; উহাদিগের মধ্যে রঘুবংশে শুধু 'সুহ্ম' ও 'বঙ্গ' দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরে বর্ণিত পরাক্রান্ত অঙ্গ (বর্ত্তমান ভাগলপুর) রাজ্যেরও এখানে উল্লেখ দেখা যায় না। সুহ্ম দেশের রাজার বিষয় ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরে উল্লেখ নাই। রঘুর দিগ্‌-

বিজয়ে অঙ্গ দেশের পরাজয় বর্ণিত হয় নাই বলিয়া, কবিভূষণ মহাশয়ের এই যুক্তি অনুসারে অঙ্গদেশকেও ত কালিদাসের জন্মভূমি মনে করা যাইতে পারে। পৌণ্ড্র, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, সমতট প্রভৃতি দেশও এই যুক্তি অনুসারেই প্রত্যেকেই কালিদাসের জন্মভূমি বলিয়া দাবী করিতে পারে। বস্তুতঃ, রাঢ় দেশ * কর্ণসুবর্ণের পূর্ব্ব ও দক্ষিণে এবং পূর্ব্ব সমুদ্রের (বঙ্গোপসাগর) কূল পর্য্যন্ত সুহ্ম দেশের উত্তরে অবস্থিত বলিয়া, অযোধ্যা হইতে বহির্গত হইয়া পূর্ব্ব-দক্ষিণে সুহ্ম দেশের মধ্য দিয়া সমুদ্রের তীর পর্য্যন্ত যাইতে রাঢ় দেশে পদার্পণ না করিলেও চলে। রঘু সুহ্ম ও বঙ্গদেশের সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত যাইয়াই ফিরিয়া হইয়াছিলেন, রাঢ়, পৌণ্ড্র, প্রাগ্‌-জ্যোতিষ রাজ্যে গমন করেন নাই; কিংবা ঐ দেশগুলি জয় করিয়া থাকিলেও, কবি বাহুল্য বোধে উহার বর্ণনা করেন নাই—অনুল্লেখের নানা কারণই অনুমান করা যাইতে পারে। ইহা দ্বারা কালিদাসের জন্মভূমির কোনই ইঙ্গিত পাওয়া যায় না।

কবিভূষণ মহাশয় 'তালীবনশ্যাম' এই বিশেষণটীর দ্বারা মহাকবির প্রিয় জন্মভূমি 'রাঢ় দেশ' বুঝিয়াছেন; বস্তুতঃ কালিদাস ঐ পদটীকে সমুদ্রের উপকণ্ঠ বা তীরবর্ত্তী দেশের বিশেষণ রূপে প্রয়োগ করিয়াছেন। রাঢ় দেশ সমুদ্রের উপকণ্ঠবর্ত্তী নহে—'সুহ্ম' ও বঙ্গের অন্তর্গত 'সমতট'ই সমুদ্রতীরবর্ত্তী। কালিদাস অন্যত্রও সমুদ্রতীরের বর্ণনায় তালী-বনের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

"দূরাদয়শ্চক্র-নিভস্য তন্বী তমাল-তালী-বন-রাজি-নীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশেধারা নিবদ্ধেব কলঙ্ক-রেখা॥"
(রঘু ১৩।১৫)

"অনেন সার্দ্ধং বিহরাম্বুরাশেস্তীরেষু তালী-বন-মর্ম্মরেষু॥"
(রঘু ৬।৫৭)

জন্ম-ভূমির সাদৃশ্য দর্শনে নহে, ঘন-সন্নিবিষ্ট তাল-বৃক্ষ-রাজির শ্যামল শোভা স্বভাবতঃ প্রীতিকর এবং ভারতের পূর্ব্ব সমুদ্রতীরে তাল-বনের বাহুল্য বর্ণনীয় মনে করিয়াই তিনি এ সকল বর্ণনা করিয়াছেন; ইহা হইতে তাঁহার জন্ম-ভূমির প্রাকৃতিক দৃশ্যের অনুমান শুধু কল্পনা মাত্র।

কবিভূষণ মহাশয় এক স্থলে টীকাকার নীলকণ্ঠের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—'সুহ্মো রাঢ়'; আবার সমতট দেশকেই প্রসিদ্ধ ভৌগোলিকদিগের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুহ্ম স্থির করিয়াছেন। বস্তুতঃ এ সকল বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত তর্ক করা নিষ্প্রয়োজন। সুহ্ম, বঙ্গ প্রভৃতি জনপদ যেখানেই হউক না কেন, যদি নীলকণ্ঠের মতে সুহ্মকে রাঢ় বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে রঘুতে সুহ্ম জয়ের উল্লেখ থাকায়, কবিভূষণ মহাশয়ের এই তর্ক অচল হইয়া পড়ে। আর যদি সুহ্ম শশীবাবুর মান-চিত্র অনুসারে রাঢ়ের দক্ষিণ পশ্চিম-বর্ত্তী স্বতন্ত্র প্রদেশ হয়, তাহা হইলেও রাঢ়-বিজয়ের অনুল্লেখ হইতে পূর্ব্ব-বর্ণিত কারণ বশতঃ রাঢ়কে কালিদাসের জন্মভূমি বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না।

ইদানীং প্রতীচ্য ও প্রাচ্য অনেক পুরাতত্ত্ববিৎ কাল্পনিক যুক্তির বলে উজ্জয়িনী-পতি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের অস্তিত্ব উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকের মতেই কালিদাস পঞ্চম শতকের প্রথম ভাগে মগধের গুপ্তবংশীয় নরপতি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে বর্ত্তমান ছিলেন। ইঁহারই না কি বিক্রমাদিত্য উপাধি ছিল। যাহা হউক—ইঁহারা কিন্তু কেহই এই গুপ্তবংশের রাজধানী 'ম্লেচ্ছজাতির অধ্যুষিত কোনও অবিখ্যাত দেশে' ছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন নাই। কবিভূষণ মহাশয় কিন্তু 'স গুপ্তমূল প্রত্যন্ত' ইত্যাদি শ্লোকের একটা মন-গড়া অর্থ কল্পনা করিয়া লইয়া, প্রশংসিত রাজার নগণ্য ম্লেচ্ছ-প্রধান রাজধানীতে অবস্থান রূপ—অসঙ্গত ও অশিষ্ট ইঙ্গিত—এই শ্লোকের তাৎপর্য্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। রঘুর দিগ্‌বিজয়-বর্ণনা-প্রসঙ্গে মহাকবি কালিদাসের দ্ব্যর্থক বাক্য * দ্বারা নিজের প্রতিপালক গুপ্ত-নরপতি চন্দ্রগুপ্তাপর-নামা কুমার গুপ্তের উৎকর্ষ সূচক ইঙ্গিত সম্ভবপর হইলেও হইতে পারে; কিন্তু এইরূপ নিন্দা সূচক ইঙ্গিত কোন মতেই সম্ভবপর হইতে পারে না। কবিভূষণ মহাশয় নিজে সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে অভিজ্ঞ হইয়া, পুরাতত্ত্বের নবীন আবিষ্কার দ্বারা বাহাদুরী লইতে ইচ্ছুক অনভিজ্ঞ অথচ সর্ব্বজ্ঞ পুরাতত্ত্ব-বিৎদিগের চর্ব্বিত-চর্ব্বণের এরূপ অজীর্ণ উদ্গার করিয়াছেন, ইহাতে আমরা নিতান্তই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি।

অতঃপর কবিভূষণ মহাশয় "অনুকূল অনুসন্ধান ও বাহুল্যাংশ" নাম দিয়া নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি উপস্থাপিত করিয়াছেন, যথা—"(১) মাণিক্যহার (শাক্তপুর) নিবাসী বিখ্যাত সাহিত্যসেবী প্রভুপাদ শ্রীমৎ মহেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের নিকট সন্ধান পাইলাম যে—মাণিক্যহারের ৩॥০ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, চণ্ডীদাসের জন্মভূমি নান্নুর হইতে এক ক্রোশ পথ পশ্চিমে রায়ান বেলুটি গ্রামে মহাকবি কালিদাসের সারস্বত কুণ্ড ও সরস্বতী প্রতিমা রক্ষিত আছে।"

"(২) বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানী শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় M. A. Lecturer Government Commercial Institution মহাশয়ের নিকট সন্ধান পাইলাম (মাঘ সংখ্যা ১৩২৭ "উপাসনা") রামজীবনপুর (A. K. Ry.র) ষ্টেসন হইতে ২ ক্রোশ দূরে কলোমোর গ্রামে প্রবাদ—মহাকবি কলোমোর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উজানির রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহার ভৃত্য রঙ্গনাথকে প্রত্যহ তাঁহার নিকট পাঠাইতেন; তাঁহার নামানুসারে উজানি বা উজ্জয়িনি হইতে মোর গ্রাম পর্য্যন্ত রাস্তা হইয়াছে। রঙ্গনাথ শব্দে Stage Manager"।

* প্রসিদ্ধ ভৌগোলিক শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় এম্-আর-জি-এস্ মহোদয়ের বঙ্গদেশের মানচিত্রে ঐতিহাসিক দেশ-বিভাগ দ্রষ্টব্য।—লেখক

* "আকুমার কথোদ্‌ঘাতং শালিগোপ্যো জগুর্যশঃ" (রঘু ৪।২০) "কুমার কল্পং সুষুবে কুমারং" (রঘু ৫।৩৬) ইত্যাদি।—লেখক

"(৩) "সাহিত্য সংবাদ" জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ১৩২৮, "ভারতবর্ষ" আষাঢ় সংখ্যা, ঐ সাল এবং অনেক ইংরেজি ও বাঙ্গালা সংবাদপত্রে লিখিলাম যে বলোমোর গর্ত—মহাকবি কালিদাসের জন্মভূমি ছিল।"

"তাহার পরে পুনরায় আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য অনুসন্ধানে জানিলাম—কালিদাসের জন্মভূমি ময়ূরাক্ষীর দক্ষিণ তীরে নহে, ইহার উত্তর তীরে এবং সিংহের গর্ত্ত নামক গ্রামে। এই সিংহের গর্ত্ত নামক গ্রামই বর্ত্তমানে "সিঙ্গড়ী গড্ডা"—ইহাই বাহ্য সাক্ষ্যে এবং আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যে কালিদাসের জন্মভূমি।"

"(৪) ৺ব্রহ্মাণীতলা—এই স্থানে কবি কালিদাস যৌবনে প্রথমা স্ত্রী বিদ্যুম্মালার সহিত বাস করিয়াছিলেন।"

"(৫) শ্রীপাট দোগাছিয়া (কৃষ্ণনগর)—এই স্থান কালিদাসের দ্বিতীয় সংসার স্থল, এখানে কালিদাস তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর সহিত বাস করিয়াছিলেন এবং পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। এই স্থানের নিকটেই যোয়ানিয়া তালুকা গ্রামে কালিদাসের সন্ন্যাসাবস্থায় প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে।"

"(৬) রামগিরি বা রামগড়—ইহা সুরগুজা রাজ্যান্তর্গত ভীষণ অরণ্য-বেষ্টিত স্থান। রাজধানী হইতে ৩০ মাইল অরণ্য মধ্যগত। এখানে কালিদাস এক বৎ নির্ব্বাসিত ছিলেন।"

"(৭) শ্রীনগর (কাশ্মীর)—এই স্থানে কালিদাস স্বীয় "শাস্ত্রেদ-কুণ্ঠিতা বুদ্ধিঃ মৌর্ব্বী ধনুষি চাততা" এই উভয় বিদ্যার বলে কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তৃত্বপদ পান। এখানে তিনি তৃতীয়বার "তারা" নাম্নী টগর ফুলের মত শুভ্র-বর্ণা কন্যাকে বিবাহ করেন, তাহার নামানুসারেই সিঙ্গড়ীগড্ডার নিকটবর্ত্তী তারাপুরের ঘাট এবং তারা পীঠ হইয়াছে।"

"(৮) পাটলিপুত্রের এক শিবের মন্দিরে এক প্রস্তর-ফলক আছে। তাহাতে জানা যায়, কালিদাস সন্ন্যাসী হইয়া ৩২০ খৃষ্টাব্দে তথায় ছিলেন।"

"(৯) শান্তিপুরের ৺বাগ্‌দেবী তলা—কালিদাসের প্রথম নাটক লিখিবার স্থান।"

এই সকল সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কবিভূষণ মহাশয় স্থানীয় কিংবদন্তী ব্যতীত আর কোনও প্রমাণ দিতে পারেন নাই। তাঁহার এজন্য পরিশ্রম ও গবেষণা খুব প্রশংসনীয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, অন্য পোষক প্রমাণের অভাবে এরূপ কিংবদন্তী বা জন-শ্রুতি ঐতিহাসিক প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে না। "নহ্যমূলা জন-শ্রুতিঃ—এই প্রাচীন সূক্তিটী আমাদের অজ্ঞাত নহে; কোনও একটা কিছু মূল না থাকিলে এরূপ জন-শ্রুতি হয় না,—ইহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, কালিদাসের ন্যায় একজন মহাকবির জন্মভূমি বলিয়া গৌরব অর্জ্জন করিতে অনেক দেশেরই আগ্রহ হইতে পারে। বেহার প্রদেশেরও কোনও কোনও স্থান কালিদাসের জন্ম-স্থল ও সিদ্ধি-পীঠ বলিয়া অদ্যাপি প্রদর্শিত হইয়া থাকে—বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে। কালিদাস নামে যে অন্য কোনও কবি বা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত প্রাদুর্ভূত হন নাই—এ কথা কেহই হলপ করিয়া বলিতে পারিবেন না। সংস্কৃতে "কালিদাসত্রয়ী অর্থাৎ তিনজন কালিদাস ছিলেন—এ কথা প্রসিদ্ধই আছে। আমরা প্রথম প্রবন্ধে লিখিয়াছি—"জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" নামক জ্যোতিষ-গ্রন্থের প্রণেতা একজন কালিদাস ছিলেন;—তিনি নিজকে ৫৭ পূঃ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান বিক্রমাদিত্য নৃপতির সভায় নব-রত্নের অন্যতম রত্ন বলিয়া পরিচিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু পরীক্ষক প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের নিকট তাঁহার জালিয়াতী ধরা পড়িয়া গিয়াছে, ইহা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি। ইদানীং প্রত্নতত্ত্ববিৎ অনেক পণ্ডিতই মনে করেন যে, বারাঙ্গণা-প্রেমিক বর্ণিত কালিদাস—এই তিন কালিদাসের কোনও এক কালিদাস ছিলেন। কবিভূষণ মহাশয়ের বর্ণিত কিংবদন্তীর মূলেও এইরূপ কোনও এক কালিদাস থাকিতে পারেন। বলা বাহুল্য যে, জন-শ্রুতি উহাদিগকে মিশাইয়া এক করিয়া ফেলিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য-জনক এই যে, ভারতবিখ্যাত রাজধানী উজ্জয়িনীর রাজ-চূড়ামণি বিক্রমাদিত্য এই কিংবদন্তীতে উজানি নামক একটা নগণ্য স্থানের ভূস্বামী অজ্ঞাতনামা বিক্রমাদিত্যে পরিণত হইয়াছেন! যাহা হউক—এইরূপ অনুসন্ধান ও গবেষণা দ্বারা মহাকবি কালিদাসের বাঙ্গালীত্ব প্রমাণিত না হইলেও—কালিদাস সমস্যার মীমাংসা বিষয়ে অনেক পরিমাণে সাহায্য করিতে পারে, এজন্য কবিভূষণ মহাশয় ও তাঁহার স্বপক্ষদিগের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন নিরপেক্ষ-ভাবে আরও অনুসন্ধান করিয়া উল্লিখিত কিংবদন্তীগুলির আরও বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করেন; তদ্দারা তাঁহাদিগের নূতন একটি উদ্ভট তথ্য আবিষ্কারের অচিরস্থায়ী বাহাদুরী লাভ না ঘটিলেও সত্য নির্ণয়ের সহায়তা করার জন্য বাঙ্গালা সাহিত্যে একটা চিরস্থায়ী কৃতিত্ব লাভ ঘটিবে।

আমরা আগামী সংখ্যায় কবিভূষণ মহাশয়ের লিখিত (নবপর্য্যায়) "সাহিত্য-সংহিতা" পত্রিকার ১৩২৭ সালের মাঘ—চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত "মহাকবি কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন" শীর্ষক প্রবন্ধের ভাষা-তত্ত্বমূলক প্রমাণগুলির আলোচনা এবং উপসংহারে কালিদাসের জন্মভূমি সম্বন্ধে আমাদিগের নিজের মতামত ব্যক্ত করিব।

বঙ্কিম-সাহিত্যে নৌকা-যাত্রা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু বিদ্যাবিনোদ

বহু শত বৎসরের বহু শত কারণ-পরম্পরায় বাঙ্গালীর সমুদ্র-যাত্রা আজ স্বপ্ন-কাহিনীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু এমন এক দিন ছিল, যে দিন বাঙ্গালীর বাণিজ্য-পোত মন্দ পবনে কেতন উড়াইয়া যাত্রী ও পণ্য দ্রব্য লইয়া দেশ-বিদেশে যাত্রা করিত। বাঙ্গালীর বৃহৎ অর্ণবযান-সমূহ কত দেশের রত্ন-ভাণ্ডার স্বদেশে বহন করিয়া আনিত। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠিসম্প্রদায় শত সৌধ-চূড়ায় সে বিত্তচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া বাঙ্গালীর পুরুষকার ঘোষণা করিত।

বাঙ্গালার বন্দর তখন বাঙ্গালীর পোতারোহণ-কোলাহলে নিয়ত

কলকলায়মান রহিত। বাঙ্গালার বন্দরেই তখন বাণিজ্যপোত ও রণতরীসমূহ নির্ম্মিত হইত, আর বাঙ্গালী শিল্পী তাহা নির্ম্মাণ করিত। বাঙ্গালার রাজপুত্র ও সদাগরপুত্রের জন্য তখন তুল্য আসন নির্দ্দিষ্ট হইত। বাঙ্গালার সাহিত্য তখন সেই সকল সদাগরের বাণিজ্য-কাহিনী কীর্ত্তন করিত, আর বাঙ্গালার নরনারী বিমুগ্ধ চিত্তে তাহা শ্রবণ করিত।

তার পর ধীরে ধীরে বাঙ্গালার সেই বাণিজ্য-খ্যাতি কোথায় লুপ্ত হইয়া গেল। বাঙ্গালার রণতরীসমূহ বঙ্গোপসাগরের কোন্ অতল জলে তলাইয়া গেল। বাঙ্গালীর বাণিজ্যপোত আর সেই অনন্ত নীল জলরাশি ভেদ করিয়া ছুটিল না। বাঙ্গালী শিল্পী আর সেই শত দাঁড়যুক্ত তরণী নির্ম্মাণ করিল না। কালচক্রে সকলই পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ইতিহাসে কেবল তার একটা ক্ষীণ স্মৃতি রাখিয়া গেল। আর অলক্ষিতে বাঙ্গালীর মনের পাতে একটা দাগ দিয়া গেল। বাঙ্গালার সাহিত্যিকগণ আজও সেই দাগ লুপ্ত করিতে পারিলেন না।

সেই প্রাচীনের স্মৃতি আজও চাঁদ সদাগর, ধনপতি, শ্রীমন্ত প্রভৃতি বণিকের বাণিজ্য-যাত্রার কাহিনীগুলি বহন করিয়া আসিতেছে। কত কবি যে সে কাহিনী ছোট বড় কত কাব্যে কত রকমে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। ঐ সকল সাহিত্যে নৌকা-যাত্রার মধ্যে তাঁহারা কি যে মাদকতা দিয়া গিয়াছিলেন,—বঙ্গের স্বনাম-খ্যাত সাহিত্যিকগণ আজও তার মোহ কাটাইতে পারিলেন না। তাঁহাদের লিখিত একটা না একটা গানে, গল্পে, কাব্যে বা উপন্যাসে তাই আজও নৌকা-যাত্রার চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে, বাঙ্গালার আধুনিক সাহিত্যের যুগপ্রবর্ত্তক সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে এই নৌকা-যাত্রা কতখানি স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহারই আলোচনা করিব।

তবে সে যুগের নৌকা-যাত্রার সঙ্গে এ যুগের নৌকা-যাত্রার প্রভেদ এই যে, তখন সে সকল নৌকা পণ্যের বাণিজ্যে যাত্রা করিত, আর এ গুলি যাত্রা করে প্রেমের বাণিজ্যে। কারণ? কারণ, ঐ বঙ্কিম-চন্দ্রের গ্রন্থের মধ্যেই পাই—"বাঙ্গালী অবস্থার বশীভূত, অবস্থা বাঙ্গালীর বশীভূত হয় না।" টীকা অনাবশ্যক।

বঙ্কিমচন্দ্র চৌদ্দখানি উপন্যাস লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে দুর্গেশ-নন্দিনী ও রাজসিংহ ব্যতীত অন্য বারখানিতে নৌকা যাত্রার উল্লেখ আছে। এই বারখানির মধ্যে আবার কয়েকখানিতে নৌকা-যাত্রা এরূপ স্থান অধিকার করিয়া আছে যে, গ্রন্থের মধ্য হইতে সেই ঘটনাগুলি বাদ দিলে গ্রন্থের আর কিছুই থাকে না। সে গুলিকে হয় নূতন করিয়া লিখিতে হয়, না হয় ঢালিয়া সাজিতে হয়। পরে তাহা দেখাইতেছি।

(১) দুর্গেশনন্দিনী

বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত প্রথম উপন্যাস। কিন্তু এই উপন্যাসখানি লিখিয়া তিনি যশ অর্জ্জন করিতে পারেন নাই; অধিকন্তু বিলক্ষণ নিন্দাভোগ করিয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহার সহোদরগণও প্রথমে এই গ্রন্থখানির প্রশংসা করেন নাই। ইহার কারণটা যে কি, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য গত ষাট বৎসরের মধ্যে ছোট-বড় অনেক সমালোচকই চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু কেহই যে সঠিক কারণটা ধরিতে পারেন নাই, তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধে বেশ বড় গলাতেই বলিতে পারা যায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, দুর্গেশনন্দিনীতে 'নৌকা-যাত্রা'র কোন উল্লেখ নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধের নির্দ্ধারণ মতে দুর্গেশনন্দিনীর অখ্যাতির ইহাই মূল কারণ। কেহ এ কথা স্বীকার করুন, আর নাই করুন, লেখকের তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র যদি গ্রন্থের নায়ক জগৎসিংহকে সে দিন বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে অতবড় একটা তেজস্বী অশ্বে আরোহণ না করাইয়া, যেমন তেমন একখানা পান্‌সীতে উঠাইয়া, কোন রকমে শৈলেশ্বরের মন্দিরে হাজির করাইতে পারিতেন, অথবা পরেও (সপ্তম পরিচ্ছেদ) 'দুর্গের যে ভাগে দুর্গমূল বিধৌত করিয়া দামোদর নদ কলকল রবে প্রবহন করিতেছিল, সেই অংশে এক কক্ষ বাতায়নে বসিয়া তিলোত্তমা যখন নদী-জলাবর্ত্ত নিরীক্ষণ করিতেছিলেন,' সে সময়েও যদি কোন রকমে জোগাড় করিয়া 'নীলাম্বর প্রতিবিম্বিত স্রোতস্বতীর কোন স্থানে জগৎসিংহকে বসাইয়া রাখিতে পারিতেন, তাহা হইলে গ্রন্থের ঐ অপযশটুকু হইতে পারিত না, আর গ্রন্থকারকেও মনঃকষ্ট ভোগ করিতে হইত না।

বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনীতে মোগল, পাঠান ও রাজপুত নরনারীর কীর্ত্তি-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিলেও, তাহাদের লীলা-খেলা সকলই যখন বাঙ্গালার মাটীর উপরেই হইয়াছিল, তখন বাঙ্গালার মাটীর মর্য্যাদা রক্ষা করাই তাঁহার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু তাহা না করাতে তাঁহাকে তাহার ফলভোগ করিতে হইয়াছিল। তীক্ষ্ণদর্শী সুচতুর গ্রন্থকার তাহা বুঝিয়াছিলেন। সেইজন্য গ্রন্থখানি সম্বন্ধে যখন নানা লোকে নানা কথা বলিতেছিল, তখন তিনি নিজে দু'একটী কথা ব্যতীত আর বেশী কিছুই বলেন নাই। পরবর্ত্তী গ্রন্থে তিনি তাঁহার ভুল সংশোধন করিয়া লইয়াছিলেন।

(২) কপালকুণ্ডলা

দুর্গেশনন্দিনীর পরেই এই গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছিল। কপাল-কুণ্ডলা প্রকাশিত হইবামাত্রই বঙ্কিমচন্দ্রের যশের বিমল রশ্মি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার স্থান অনেক ঊর্দ্ধে উঠিয়া গেল। সমালোচকগণ বলেন যে, তিনি আর কোন গ্রন্থ না লিখিলেও, এই একখানি গ্রন্থই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিত। কপালকুণ্ডলা বঙ্কিম-চন্দ্রের অমর কীর্ত্তি।

কপালকুণ্ডলার সূচনাতেই বঙ্কিমচন্দ্র নৌকা যাত্রার একখানি চিত্র দিয়াছেন। তিনি প্রথমেই আরম্ভ করিয়াছেন, 'প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এক দিন মাঘ মাসের শেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল। পর্ত্তুগিজ ও অন্যান্য নাবিক দস্যুদিগের

ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালের প্রথা ছিল। কিন্তু এই নৌকারোহীরা সঙ্গীহীন। তাহার কারণ এই যে, রাত্রিশেষে ঘোরতর কুজ্ঝটিকা দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল; নাবিকেরা দিঙ্ নিরূপণ করিতে না পারিয়া বহর হইতে দূরে পড়িয়াছিল। এক্ষণে কোন্ দিকে কোথায় যাইতেছে, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা ছিল না। নৌকারোহীগণ অনেকেই নিদ্রা যাইতেছিলেন। একজন প্রাচীন এবং একজন যুবা পুরুষ এই দুইজন মাত্র জাগ্রত অবস্থায় ছিলেন। প্রাচীন যুবকের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন।' ঐ যুবক গ্রন্থের নায়ক নবকুমার। ইহার পরের ঘটনা—মাঘ মাসের সেই তুষার-শীতল-বায়ু সঞ্চারিত-নদী-তীরে হিমবর্ষী আকাশতলে নবকুমারকে নিরাশ্রয়ে নিরাবরণে পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গীগণের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন।

গ্রন্থের নায়িকা কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধেও গ্রন্থকার জানাইয়াছেন, 'ইনি বাল্যকালে দুরন্ত খ্রীষ্টান তস্কর কর্তৃক অপহৃত হইয়া যানভঙ্গ ও তাহাদিগের দ্বারা কালে এই সমুদ্রতীরে ত্যক্ত হয়েন।' (সপ্তম পরিচ্ছেদ।) তার পর হিজলীর সমুদ্রতীরবর্তী অরণ্য মধ্যে যথা সময়ে সেই আত্মীয় স্বজন পরিত্যক্তা বালিকা কপালকুণ্ডলার সহিত নিরাশ্রয় যুবক নবকুমারের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। আর সেদিনও—গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন,—'সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে' যখন তাহাদের প্রথম মিলন হইয়াছিল, তখনও 'অনতিদূরে কোন ইউরোপীয় বণিক জাতির সমুদ্রপোত শ্বেত-পক্ষ বিস্তার করিয়া বৃহৎ পক্ষীর ন্যায় জলধি হৃদয়ে উড়িতেছিল। (পঞ্চম পরিচ্ছেদ)

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের কেন এত সুখ্যাতি হইয়াছিল, সে কথা বুঝিতে হইলে, নায়ক নায়িকার জীবনের পূর্বোক্ত তিনটী ঘটনার কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র নৌকা-যাত্রাকে ভিত্তি করিয়াই কপালকুণ্ডলা লিখিয়াছিলেন। নবকুমার যদি নৌকা-যাত্রা না করিতেন, বা খ্রীষ্টান তস্কর যদি কপালকুণ্ডলাকে অপহরণ করিয়া জল পথে লইয়া না যাইত, তাহা হইলে গ্রন্থকারকে আর কপালকুণ্ডলা লিখিতে হইত না। তিনি হিজলীর সেই ভীষণ-দর্শন নররাক্ষস কাপালিকের 'কটিদেশ হইতে জানু পর্যন্ত শার্দ্দূল চর্ম্মে আবৃত, গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা ও আয়ত মুখমণ্ডল শ্মশ্রুজটা পরিবেষ্টিত মূর্ত্তির বা 'কুসুমে কুসুমে বিহারিণী' পদ্মাবতীর 'বিলাস-লালসা পরিতৃপ্তির' চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিতেন। কিন্তু কয়জন সে চিত্র দেখিত?।

(৩) মৃণালিনী

কপালকুণ্ডলার পরে এই উপন্যাস লিখিত হইয়াছিল। মৃণালিনীর পূর্ব্ব সংস্করণে গ্রন্থকার প্রথম পরিচ্ছেদে এক হস্তী যুদ্ধের অবতারণা করিয়াছিলেন। 'মহম্মদঘোরির প্রতিনিধি তুর্কস্থানীয় কুতবউদ্দীনের সেনাপতি' মগধ-বিজেতা বখ্‌তিয়ার খিলিজি তাহার 'বানরের ন্যায় শরীর' লইয়া এক মত্ত হস্তীর সঙ্গে যুদ্ধে রঙ্গাঙ্গনে নামিয়াছিলেন। কিন্তু সেই 'দুর্দ্দান্ত বারণ তাহার বিশাল চরণের চাপে' বখ্‌তিয়ারকে যে মুহূর্তে 'কর্দ্দম-পিণ্ডবৎ দলিত' করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সেই সময় এক হিন্দু যুবার নিক্ষিপ্ত শরাঘাতে যূথপতি স্খলিত মূল অট্টালিকার ন্যায় সশব্দে রক্ত উৎকীর্ণ করিয়া অকস্মাৎ ভূতলে পড়িয়া গেল। অমনি তাহার মৃত্যু হইল।' বখ্‌তিয়ারও বাঁচিয়া গেল। কিন্তু এই ঘটনা হইতেই মগধ-বিজেতা বখ্‌তিয়ারের সঙ্গে মগধ রাজপুত্র হেমচন্দ্রের বিবাদের আর এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। সে দিনের সেই গজহন্তা হিন্দু যুবাই 'মৃণালিনী' গ্রন্থের নায়ক মগধ রাজপুত্র হেমচন্দ্র।

হস্তী দর্শন হিন্দুর কাছে মঙ্গলদায়ক। গ্রন্থকার ভাবিয়াছিলেন, দেখা যাক্, এই শুভ দর্শন জন্তুটীকে পাঠক পাঠিকার কাছে প্রথমে হাজির করিতে পারিলে গ্রন্থের আদরটা কিন্তু বাড়ে কি না—নৌকা যাত্রার চেয়ে এটা অধিক পয়মন্ত হয় কি না। তাই এই পরীক্ষাটা করিয়াছিলেন। কিন্তু ফলটা সুবিধাজনক হইল না। বুঝিলেন—প্রেমের রাজ্যে নৌকা-যাত্রারই প্রাধান্য। গ্রন্থের প্রথম অংশটা আবার তাঁহাকে ঢালিয়া সাজিতে হইল। মৃণালিনীর পরবর্ত্তী সংস্করণ প্রকাশিত হইলে দেখা গেল, গ্রন্থকার এবার প্রথম পরিচ্ছেদে একখানি নৌকা যাত্রার চিত্র দিয়াছেন। বখ্‌তিয়ারের সাক্ষাৎ যম সেই প্রকাণ্ড হস্তীটী মৃণালিনীর মধ্য হইতে সরিয়া পড়িয়াছে।

প্রথম পরিচ্ছেদেই গ্রন্থকার আরম্ভ করিয়াছেন, 'একখানি ক্ষুদ্র তরণীতে দুইজন মাত্র নাবিক। তরণী অসঙ্গত সাহসে সেই দুর্দ্দমনীয় যমুনার স্রোতোবেগে আরোহণ করিয়া' প্রয়াগের ঘাটে আসিয়া লাগিল। একজন নৌকায় রহিল, একজন তীরে নামিল। যে নামিল, তাহার নবীন যৌবন, উন্নত বলিষ্ঠ দেহ, যোদ্ধৃবেশ। মস্তকে উষ্ণীষ, অঙ্গে কবচ, করে ধনুর্ব্বাণ, পৃষ্ঠে তূণীর, চরণে অনুপদীনা। এই বীরাকার পুরুষ পরম সুন্দর। ঘাটের উপর সংসার-বিরাগী পুণ্য-প্রয়াসীদিগের কতকগুলি আশ্রম আছে। তন্মধ্যে একটী ক্ষুদ্র কুটীরে যুবা প্রবেশ করিলেন। ঐ যুবাই হেমচন্দ্র, আর যে বসিয়া থাকিল, সে তাঁহার ভৃত্য দিগ্বিজয়।

হেমচন্দ্র তাঁহার গুরু মাধবাচার্য্যের নিকট আসিয়াছিলেন। মাধবাচার্য্য হেমচন্দ্রের প্রণয়িনী মৃণালিনীকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর মাধবাচার্য্য বলিলেন, 'গৌড়রাজ্যে গিয়া তুমি অস্ত্রধারণ করিলেই যবন নিপাত হইবে। তুমি আমার নিকট প্রতিশ্রুত হও যে, কাল প্রাতেই গৌড়ে যাত্রা করিবে। যে পর্য্যন্ত সেখানে না যবনের সহিত যুদ্ধ কর, সে পর্য্যন্ত মৃণালিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবে না।' হেমচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, 'তাহাই স্বীকার করিলাম।' তার পর, আচার্য্যের কাছে বিদায় লইয়া ঘাটে আসিয়া পুনরায় সেই ক্ষুদ্র তরণীতে আরোহণ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নায়িকা মৃণালিনীর প্রথম সাক্ষাৎ পাই। মাধবাচার্য্য মৃণালিনীকে গৌড়নগরের যে ব্রাহ্মণের বাটীতে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মণের কন্যা মণিমালিনী মৃণালিনীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'কেন তুমি মাধবাচার্য্যের কথায় পিতৃগৃহ ত্যাগ করিলে?'

ইহার উত্তরে মৃণালিনী যাহা বলিয়াছিলেন তাহাও নৌকাযাত্রার কথা। মৃণালিনী কহিতেছেন, মাধবাচার্য্যের কথায় আসি নাই। মাধবাচার্য্যকে আমি চিনিতাম না। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বকও এখানে আসি নাই।....... আমি হেমচন্দ্রের আঙ্গটী দেখিয়া তাঁকে দেখিবার ভরসায় বাগানে আসিলে দূতী কহিল যে রাজপুত্র নৌকায় আছেন, নৌকা তীরে লাগিয়া আছে। আমি 'অনেক দিন রাজপুত্রকে দেখি নাই, বড় ব্যগ্র হইয়াছিলাম, তাই বিবেচনাশূন্য হইলাম, তীরে আসিয়া দেখিলাম যে, যথার্থই একখানি নৌকা লাগিয়া রহিয়াছে, তাহার বাহিরে একজন পুরুষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মনে করিলাম যে, রাজপুত্র দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমি নৌকার নিকটে আসিলাম। নৌকার উপর যিনি দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি আমার হাত ধরিয়া নৌকায় উঠাইলেন। অমনি নাবিকেরা নৌকা খুলিয়া দিল। কিন্তু আমি স্পর্শেই বুঝিলাম যে, এ ব্যক্তি হেমচন্দ্র নহে। প্রথমেই সে ব্যক্তি আমাকে 'মা' বলিয়া বলিল, "আমি তোমার পুত্র, কোন আশঙ্কা করিও না। আমার নাম মাধবাচার্য্য; আমি হেমচন্দ্রের গুরু।...আমি এখন কোন দৈবকার্য্যে নিযুক্ত আছি, তাহাতে হেমচন্দ্র আমার প্রধান সহায়; তুমি তাহার প্রধান বিঘ্ন।...এক বৎসর পরে আমি তোমাকে তোমার পিতার নিকট আনিয়া দিব। আর সে সময়ে হেমচন্দ্র যে অবস্থায় থাকেন, তোমার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেওয়াইব, ইহা সত্য করিলাম।"..এই কথাতেই হউক, আর অগত্যাই হউক, আমি নিস্তব্ধ হইলাম। তাহার পর এইখানে আসিয়াছি।'

বঙ্কিমচন্দ্র নায়ক-নায়িকার জীবনের পূর্ব্বোক্ত ঘটনা হইতে গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার বহু পূর্ব্বেই তাহাদের মিলন হইয়াছিল। বিবাহও হইয়া গিয়াছিল। মাধবাচার্য্য বা হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর কাহারই পিতামাতা এ কথা অবগত ছিলেন না। ঐ বিবাহের মূলেও নৌকাযাত্রা। গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে "পূর্ব্ব পরিচয়" শীর্ষক পরিচ্ছেদে সে কথার উল্লেখ আছে। মৃণালিনী বলিতেছেন, '...আমি একদিন মথুরার রাজকন্যার সঙ্গে নৌকায় জলবিহারে গিয়াছিলাম। তথায় অকস্মাৎ প্রবল ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায়, নৌকা জল মধ্যে ডুবিল। রাজকন্যা প্রভৃতি অনেকেই রক্ষক ও নাবিকের হাতে রক্ষা পাইলেন। আমি ভাসিয়া গেলাম। দৈবযোগে এক রাজপুত্র সেই সময় নৌকায় বেড়াইতেছিলেন। তাঁহাকে তখন চিনিতাম না—তিনিই হেমচন্দ্র। তিনিও বাতাসের ভয়ে নৌকা তীরে লইতেছিলেন। জলমধ্যে চুল দেখিতে পাইয়া স্বয়ং জলে পড়িয়া আমাকে উঠাইলেন। আমি তখন অজ্ঞান। হেমচন্দ্র আমার পরিচয় জানিতেন। তিনি তখন তীর্থ দর্শনে মথুরায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার বাসায় আমায় লইয়া গিয়া শুশ্রূষা করিলেন।...আমার জ্ঞান হইলে...উভয়ে উভয়ের পরিচয় পাইলাম। কেবল কুল পরিচয় নহে—উভয়ের অন্তঃকরণের পরিচয় পাইলাম।...তীর্থ পর্য্যটনে রাজপুত্রের কুলপুরোহিত সঙ্গে ছিলেন, তিনি আমাদিগের বিবাহ দিলেন।...বিবাহের পর বাড়ী গেলাম। কল কথা সত্য বলিয়া কেবল বিবাহের কথা লুকাইলাম।...আমার সহিত সাক্ষাতের জন্য হেমচন্দ্র মথুরায় এক দোকান করিয়া আপনি তথায় রত্নদাস বণিক বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। বৎসরে একবার করিয়া তথায় বাণিজ্য করিতে আসিতেন।' সেই সময় একদিন মাধবাচার্য্য মৃণালিনীকে সরাইয়াছিলেন।

হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর জীবনের পূর্ব্বোক্ত ঘটনাগুলির আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই গ্রন্থখানির মূলেও নৌকাযাত্রা। গ্রন্থ মধ্যে আরও দু'একটী স্থানে নৌকাযাত্রার উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে দ্বিতীয় খণ্ডের—"নৌকাযানে" শীর্ষক পরিচ্ছেদটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থকার এ পরিচ্ছেদে যে চিত্রটী আঁকিয়াছেন, তাহা মনোরম। ক্ষুদ্র একখানি তরণী, দুইটী মাত্র আরোহী। দুই জনেই তরুণী—একজন নির্ব্বাসিতা মৃণালিনী, আর একজন গিরিজায়া ভিখারিণী। 'রজনীদত্ত তিমিরাবরণে গঙ্গার বিশাল হৃদয় অস্পষ্টীকৃত।' 'প্রায়ান্ধকার নদীহৃদয়ে নৈশ সমীরণ খরতর বেগে প্রবাহিত'। সেই সময় গিরিজায়া গান ধরিয়াছে—

'সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে।
কে আছে কাণ্ডারী হেন কে যাইবে সঙ্গে।
ভাসল তরী সকাল বেলা,
ভাবিলাম এ "জল খেলা"
মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে।
এখন—গগনে গরজে ঘন,
বহে খর সমীরণ
কূল ত্যজি এলাম কেন মরিতে আতঙ্গে।
মনে করি কূলে ফিরি,
বাহি তরী ধীরি ধীরি,
কূলেতে কণ্টক তরু বেষ্টিত ভুজঙ্গে॥
যাহারে কাণ্ডারী করি,
সাজাইয়া দিনু তরী,
সে কভু না দিল পদ তরণীর অঙ্গে'

গিরিজায়ার এই সঙ্গীতটী শুনিলে মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র সমগ্র মৃণালিনী গ্রন্থখানি এই গানের সঙ্গে একই সুরে বাঁধিয়াছেন।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে দেখা গিয়াছিল, একদিন ক্ষুদ্র একখানি তরণীতে আরোহণ করিয়া হেমচন্দ্র ও তাহার ভৃত্য দিগ্বিজয় যমুনার দুর্দ্দমনীয় স্রোতোবেগে ভাসিয়া চলিয়াছিলেন। আর একদিন দেখা গেল ঐরূপ ক্ষুদ্র একখানি তরণীতে আরোহণ করিয়া মৃণালিনী ও গিরিজায়া গঙ্গার বিশাল হৃদয়ে ভাসিয়া চলিয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে পাইয়াছিলেন—উভয়ে মিশিয়া এক সোণার সংসার পাতিয়াছিলেন। কিন্তু এক যাত্রার কেন পৃথক ফল ফলে, তাই ভাবিয়া গ্রন্থকার শেষে দিগ্বিজয়ের সঙ্গে গিরিজায়াকেও মিশাইয়া দিয়াছেন। পরিশিষ্টে তাদের সুখের সংসারেরও একটী চিত্র আছে। 'কথিত আছে যে, বিবাহ অবধি এমন দিনই ছিল না, যেদিন গিরিজায়া এক আধ ঘা ঝাঁটার

আঘাতে দিগ্বিজয়ের শরীর পবিত্র করিয়া না দিত। ইহাতে যে দিগ্বিজয় বড়ই দুঃখিত ছিল, এমন নহে; বরং একদিন কোন দৈব কারণবশতঃ গিরিজায়া ঝাঁটা মারিতে ভুলিয়াছিলেন, ইহাতে দিগ্বিজয় বিষণ্ণ-বদনে গিরিজায়াকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "গিরি, আজ তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ না কি?" বস্তুতঃ ইহারা যাবজ্জীবন পরম সুখে কালাতিপাত করিয়াছিল। ইহা নৌকা-যাত্রার ফল।

(৪) চন্দ্রশেখর

'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনীর' ন্যায় এই গ্রন্থখানির মূলেও নৌকা-যাত্রা। প্রথম পরিচ্ছেদেই নৌকা-যাত্রার চিত্র। প্রতাপ ও শৈবলিনী যখন ছেলেমানুষ, নিজেদের নৌকা বাহিয়া যাইবার যখন সামর্থ্য হয় নাই, তখন তাহারা নদীর তীরে বসিয়া অপরের নৌকা যাত্রা দেখিতেছে আর পরস্পর বলাবলি করিতেছে—'নৌকা গণ। কয়খানা নৌকা যাইতেছে, বল দেখি? ষোলখানা? বাজি রাখ, আঠারখানা। শৈবলিনী গণিতে জানিত না, একবার গণিয়া নয়খানা হইল। আবার একবার গণিয়া একুশখানা হইল। তার পর গণনা ছাড়িয়া উভয়ে একাগ্র চিত্তে একখানি নৌকার প্রতি দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিল। নৌকায় কে আছে—কোথায় যাইবে? কোথা হইতে আসিল? দাঁড়ের জলে কেমন সোণা জ্বলিতেছে।'

গ্রন্থকার বলিয়াছেন 'এইরূপে ভালবাসা জন্মিল। প্রণয় বলিতে হয় বল, না বলিতে হয়, না বল। ষোল বৎসরের নায়ক—আট বৎসরের নায়িকা।' সেদিনের ঐ বালক বালিকার ভালবাসাই গ্রন্থের প্রধান কথা। যৌবনে ঐ ভালবাসাই তাদের 'কাল' হইয়াছিল। 'শৈবলিনী প্রতাপের জ্ঞাতি-কন্যা।' একটু 'জ্ঞান জন্মিলেই' তারা যখন বুঝিল যে, দু'জনের বিবাহ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, তখন 'দুজনে পরামর্শ করিয়া নদীতে ডুবিয়া মরিতে গেল।' প্রতাপ বলিল "শৈবলিনী এই আমাদের বিয়ে।" তারপর 'প্রতাপ ডুবিল।' 'শৈবলিনী ডুবিতে পারিল না—সন্তরণ করিয়া কূলে ফিরিয়া আসিল।'

'যেখানে প্রতাপ ডুবিয়াছিল, তাহার অনতিদূরে একখানি পানসী বাহিয়া যাইতেছিল। নৌকারোহী একজন দেখিল, প্রতাপ ডুবিল। সে লাফ দিয়া জলে পড়িল। নৌকারোহী চন্দ্রশেখর শর্ম্মা। চন্দ্রশেখর সন্তরণ করিয়া প্রতাপকে ধরিয়া নৌকায় উঠাইলেন। তাহাকে নৌকায় লইয়া তীরে নৌকা লাগাইলেন। সঙ্গে করিয়া প্রতাপকে তার গৃহে রাখিতে গেলেন।...শৈবলিনী প্রতাপকে আর মুখ দেখাইলেন না, কিন্তু চন্দ্রশেখর তাহাকে দেখিলেন।—দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলেন।... সংযমীর ব্রত ভঙ্গ হইল। ভাবিয়া চিন্তিয়া, কিছু ইতস্ততঃ করিয়া, অবশেষে চন্দ্রশেখর আপনি ঘটক হইয়া, শৈবলিনীকে বিবাহ করিলেন। সৌন্দর্য্যের মোহে কে না মুগ্ধ হয়?' উপক্রমিকার প্রথম তিন পরিচ্ছেদে ঐ কথারই বিশদ বিবৃতি আছে। তার পর গ্রন্থের আখ্যায়িকা আরম্ভ হইয়াছে।

গ্রন্থের মধ্য হইতে উপক্রমণিকায় উল্লিখিত নৌকাযাত্রার বিবরণ-টুকু বাদ দিলে গ্রন্থের মধ্য হইতে প্রতাপকেও বাদ দিতে হয়। কারণ যেদিন প্রতাপ নদীতে ডুবিয়াছিল, সেদিন সে সময়ে যদি চন্দ্রশেখর শর্ম্মা সে পথে নৌকা-যাত্রা না করিতেন, তাহা হইলে কে তাঁহাকে উদ্ধার করিত? ভাগীরথীর সলিলগর্ভেই সেদিন প্রতাপের মরদেহ সমাহিত হইত। চন্দ্রশেখর গ্রন্থে আর প্রতাপের নাম গন্ধও থাকিত না। কিন্তু প্রতাপকে বাদ দিলে গ্রন্থের আর কতটুকু থাকিত? যেটুকু থাকিত তারও আবার প্রায় পনর আনাই নৌকা-যাত্রার কাহিনী।

চন্দ্রশেখর গ্রন্থখানি মোট ছয় খণ্ডে বিভক্ত। কিন্তু উহার মধ্যে এমন একটী খণ্ড নাই, যার মধ্যে নৌকা যাত্রার চিত্র নাই। লরেন্স ফষ্টর চন্দ্রশেখরের গৃহে ডাকাইতি করিয়া শৈবলিনীকে লইয়া গিয়া নৌকায় তুলিল। 'প্রভাতবাতোত্থিত ক্ষুদ্র তরঙ্গমালার উপর আরোহণ করিয়া শৈবলিনীর সুবিস্তৃতা তরণী উত্তরাভিমুখে চলিল—মৃদুনাদী বীচিশ্রেণী তর তর শব্দে নৌকাতলে প্রহত হইতে লাগিল।' বঙ্কিমচন্দ্র সে দৃশ্যের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা যেমন পরিপাটী তেমনই মনোরম। (প্রথম খণ্ড—চতুর্থ পরিচ্ছেদ।)

চন্দ্রশেখর গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে মনে হয়, গ্রন্থের প্রত্যেক নরনারীর সঙ্গে যে নৌকা-যাত্রায় একটা ঘনিষ্ট যোগ ছিল, তাহা দেখানই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। তাই সেদিন যখন নূতন জীবন লইয়া শৈবলিনী গুহার বাহিরে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে চন্দ্রশেখরের চরণে পতিত হইল, তখন সেখানে নৌকার চিহ্নমাত্র না থাকিলেও বা নৌকা-যাত্রায় কোন কথা না উঠিলেও গ্রন্থকার কিন্তু সে পরিচ্ছেদটীর নাম দিয়াছেন "নৌকা ডুবিল।" (চতুর্থ খণ্ড—চতুর্থ পরিচ্ছেদ।) সেদিনের সেই আট বৎসরের বালিকা শৈবলিনী ভাগীরথীর তীরে প্রতাপের পার্শ্বে বসিয়া কল্পনারাজ্যে যে জীবনতরী ভাসাইয়াছিল, এত দিনে সেই তরীই ডুবিল। গ্রন্থকার ইঙ্গিতে সেই কথাই জানাইয়াছেন। চন্দ্রশেখরের ইহাই মূল কথা।

(৫) বিষবৃক্ষ

এই গ্রন্থখানির মূলেও নৌকা-যাত্রা। প্রথম পরিচ্ছেদটীর নাম "নগেন্দ্রের নৌকাযাত্রা।" গ্রন্থকার আরম্ভেই লিখিয়াছেন,—'নগেন্দ্র দত্ত নৌকারোহণে যাইতেছিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাস, তুফানের সময়; ভার্য্যা সূর্য্যমুখী মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছেন, "দেখিও, নৌকা সাবধানে লইয়া যাইও, তুফান দেখিলে লাগাইও। ঝড়ের সময় কখন নৌকায় থাকিও না।" নগেন্দ্র স্বীকৃত হইয়া নৌকারোহণ করিয়াছিলেন, নহিলে সূর্য্যমুখী ছাড়িয়া দেন না। কলিকাতায় না গেলেও নহে, অনেক কাজ ছিল।'

নগেন্দ্র আপনার বজরায় যাইতেছিলেন। তাঁহার বজরা ব্যতীত নদীতে আরও অনেক নৌকা যাতায়াত করিতেছিল। গ্রন্থকার সে সকলের কথায় বলিতেছেন, 'হাটুরিয়া নৌকা হটর হটর করিয়া যাইতেছে আপনার প্রয়োজনে। খেয়া নৌকা গজেন্দ্রগমনে যাইতেছে—

পরের প্রয়োজনে। বোঝাই নৌকা যাইতেছে, না—তাহাদের প্রভুর প্রয়োজন মাত্র।' নগেন্দ্র দত্তের নৌকা প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে চলুক বা নাই চলুক, তিনি যদি সূর্য্যমুখীর মাথার দিব্য মাথায় রাখিয়া সেই তুফানের দিনে নৌকারোহণে কলিকাতা যাত্রাটা একেবারেই বন্ধ করিয়া দিতেন, তাহা হইলে আর বিষবৃক্ষের বীজ বপন হইত না—ফুলও ফুটিত না—ফলও ফলিত না।

সেদিন নৌকাযাত্রা করিয়াই নগেন্দ্র মন্দভাগিনী কুন্দনন্দিনীকে পাইয়াছিলেন। তাহাকে গৃহে লইয়া আসিয়াছিলেন। তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ফলে তাঁহার সোণার সংসার উলট-পালট হইয়া গিয়াছিল, তিনি নিজে অন্তরে বৃশ্চিক-দংশনের যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছিলেন, ভার্য্যা সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, চিরদুঃখিনী কুন্দনন্দিনী আত্মঘাতিনী হইয়াছিলেন। 'নবীন যৌবনে কুন্দনন্দিনী প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।' 'অপরিস্ফুট কুন্দকুসুম অকালে শুকাইয়া গিয়াছিল।' নগেন্দ্র কুন্দকে লইয়া না আসিলে অভাগিনী হয় ত সেই রাত্রেই 'জ্যোৎস্নাময়ী উজ্জ্বল নীল আকাশে জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল মধ্যশোভিনী আলোকময়ী কিরীটকুণ্ডলাদি ভূষণালঙ্কৃতা তাহার স্বর্গগতা মাতৃদেবীর'আহ্বানে তাঁহারই কাছে চলিয়া যাইত। পর দিন প্রভাতে আসিয়া গ্রামবাসিগণ পিতা ও পুত্রীর এক সঙ্গেই সৎকার করিত; নয়, পিতৃমাতৃহীনা কুন্দনন্দিনীকে কাহারও বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করিয়া খাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিত। নগেন্দ্রের সংসারে তাহা হইলে আর বিষবৃক্ষের বিষময় ফল ফলিত না—গ্রন্থকারকেও আর বিষবৃক্ষ লিখিতে হইত না। কিন্তু পাঠক-পাঠিকা এই বিষবৃক্ষের মধ্যে যে অমৃতের স্বাদ পাইয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত হইতে হইত। বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাণ্ডারেও এই অমূল্য রত্নটীর অভাব থাকিয়া যাইত। বিষবৃক্ষ বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। কেহ কেহ বলেন ইহাই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

(৬) কৃষ্ণকান্তের উইল

বিষবৃক্ষের ন্যায় কৃষ্ণকান্তের উইল বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য রত্ন। এই গ্রন্থখানিতেও গ্রন্থকার নায়ক-নায়িকার সহিত নৌকাযাত্রার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন। গোবিন্দলাল ও ভ্রমর স্বামী-স্ত্রীতে বড় সুখে, বড় আনন্দেই দিনগুলা কাটাইতেছিল। উভয়ের প্রেমে উভয়েই বিভোর হইয়াছিল। এমন সময় ঘটনা চক্রে কোথা হইতে এক রোহিণী আসিয়া জুটিল। রোহিণীর আবার এক বিষম রোগ ধরিল—সে গোবিন্দলালকে ভালবাসিয়া ফেলিল। ভ্রমর সে কথা শুনিয়া ব্যবস্থা দিল—"বারুণী পুকুরে সন্ধ্যা বেলা—কলসী গলায় দিয়ে—" তাহা হইলেই রোগ সারিবে। রোহিণী ভাবিল, গোবিন্দলালকে পাইবার যখন কোন সম্ভাবনাই নাই, তখন এ ব্যবস্থাই ভাল।

গোবিন্দলাল উদ্যান ভ্রমণে আসিয়া বারুণী পুষ্করিণীর ঘাটে দাঁড়াইয়া দেখিলেন, 'জল কাচতুল্য স্বচ্ছ—সেই জলতলে স্বচ্ছ স্ফটিক-মণ্ডিত হৈম প্রতিমার ন্যায় রোহিণী শুইয়া আছে। অন্ধকার, জলতল আলো করিয়াছে।' গোবিন্দলাল তৎক্ষণাৎ জলে নামিয়া রোহিণীকে তুলিলেন। সে সংজ্ঞাহীনা, নিশ্বাসপ্রশ্বাসরহিতা। কৃত্রিম নিশ্বাস-প্রশ্বাস বাহিত করাইতে করাইতে সহজ নিশ্বাস প্রশ্বাস আনাইবার জন্য গোবিন্দলালের উড়ে মালি রোহিণীর বাহুদ্বয় উঠাইতে ও নামাইতে লাগিল, আর স্বয়ং গোবিন্দলাল সেই 'ফুল্লরক্ত কুসুমকান্তি অধর যুগলে ফুল্লরক্ত কুসুমকান্তি অধর যুগল স্থাপিত করিয়া রোহিণীর মুখে ফুৎকার দিতে লাগিলেন। সেই সময় ভ্রমর একটা বিড়াল মারিতে যাইতেছিল। বিড়াল মারিতে লাঠি বিড়ালকে না লাগিয়া, ভ্রমরেরই কপালে লাগিল।' (ষোড়শ পরিচ্ছেদ) রোহিণীর নিশ্বাস বহিল। রোহিণী বাঁচিল।

গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপে মুগ্ধ হইলেন। নিদাঘের নীল-মেঘমালার মত রোহিণীর রূপ এই চাতকের লোচন-পথে উদিত হইল—প্রথম বর্ষার মেঘদর্শনে চঞ্চলা ময়ূরীর মত গোবিন্দলালের মন রোহিণীর রূপ দেখিয়া নাচিয়া উঠিল। গোবিন্দলাল তাহা বুঝিয়া মনে মনে শপথ করিয়া স্থির করিলেন, মরিতে হয় মরিব, কিন্তু তথাপি ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী বা কৃতঘ্ন হইব না। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, 'বিষয়কর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়া রোহিণীকে ভুলিব—স্থানান্তরে গেলে নিশ্চিত ভুলিতে পারিব।' (ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।) এই মনে করিয়া তিনি জমিদারী দেখিতে যাওয়াই স্থির করিলেন। ভ্রমরও সঙ্গে যাইবে বলিয়া অনেক কাঁদাকাটি করিল, কিন্তু ভ্রমরের শাশুড়ী কিছুতেই যাইতে দিলেন না। তখন তরণী সজ্জিত করিয়া, ভৃত্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া, ভ্রমরের মুখচুম্বন করিয়া গোবিন্দলাল দশ দিনের পথ বন্দরখালী যাত্রা করিলেন। অনুকূল পবনে চালিত হইয়া গোবিন্দলালের তরণী তরঙ্গিনী-তরঙ্গ বিভিন্ন করিয়া চলিল।' এইখানে ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ শেষ হইল।

গ্রন্থের বিংশ পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইল, আর এ দিকে গ্রন্থের সমস্ত পাত্র পাত্রীগুলির অন্তরেও বিষক্রিয়া আরম্ভ হইয়া গেল। গোবিন্দলালের নৌকা যাত্রার পরেই গোবিন্দলাল ও রোহিণাকে লইয়া নানা জনে নানা প্রকার মিথ্যা কথা রটাইতে লাগিল। ভ্রমরের কাণেও সে কথা আসিল। ভ্রমর সে কথা প্রথমে বিশ্বাস করিল না। তার মনের ভিতর যে মন, হৃদয়ের যে লুকায়িত স্থান কেহ কখনও দেখিতে পায় না—যেখানে আত্মপ্রতারণা নাই, সেখান পর্য্যন্ত দেখিল, স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস নাই। অবিশ্বাস হয় না।'

রোহিণীও শুনিল, গ্রামে তাহার নামে অনেক কুৎসা রটিয়াছে। গোবিন্দলাল তাহার গোলাম, তাহাকে সাত হাজার টাকার গহনা দিয়াছে। রোহিণী বিনা অনুসন্ধানেই স্থির করিয়া ফেলিল, এ মিথ্যা কলঙ্ক ভ্রমর ভিন্ন আর কেহ রটাইবে না। কাহার গায়ের এত জ্বালা? তাই রোহিণী এক দিন ভ্রমরের কাছে গিয়া তার বড় সর্ব্বনাশ করিয়া আসিল। রোহিণী ভ্রমরকে জানাইয়া আসিল; যাহা রটিয়াছে তাহা সত্য—সে এখন গোবিন্দলালের আশ্রিতা। ভ্রমর এখন সে কথা বিশ্বাস করিল। মেয়েমানুষ যত বড় মিথ্যাবাদিনীই হউক, এ

বিষয়ে সে যে অতবড় একটা মিথ্যা কথা বলিতে পারে, ভ্রমরের সে বিশ্বাস ছিল না। তাই ভ্রমর রোহিণীর কথায় বিশ্বাস করিল। ভ্রমর সে কথা শুনিয়া গোবিন্দলালকে সবিশেষ জানাইয়া শেষে লিখিল 'এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার সুখ নাই।' গোবিন্দলাল ঐ পত্র পাইয়া বিস্মিত হইলেন, পরদিনেই নৌকারোহণে বিষণ্ণ মনে গৃহে যাত্রা করিলেন।

গোবিন্দলাল গৃহে আসিয়াই শুনিলেন, ইতঃপূর্ব্বে ডাকের পত্রে তাঁহার বাটী আগমনের সংবাদ পাইয়াই ভ্রমর পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছে। গোবিন্দলালের বড় অভিমান হইল—'এত অবিশ্বাস? না বুঝিয়া, না জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল? আমি আর সে ভ্রমরের মুখ দেখিব না। যাহার ভ্রমর নাই, সে কি প্রাণধারণ করিতে পারে না?' (চতুর্বিংশতিতম পরিচ্ছেদ।) ইহার পর রোহিণী তার অতুল্যরূপরাশি লইয়া গোবিন্দলালের সম্মুখে উপস্থিত হইল। গোবিন্দলাল ধীরে ধীরে ধাপের পর ধাপ নামিয়া অবনতির শেষ সোপানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ফলে দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত রায়ের সেই সোণার সংসার ছারখার হইয়া গেল। ভ্রমর মরিল, রোহিণী মরিল, গোবিন্দলাল উদ্দেশ্যবিহীন অশান্তিময় জীবন লইয়া দীন ভিক্ষুকের মত দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সাজান বাগান অকালে শুকাইয়া গেল।

সে দিন যদি গোবিন্দলাল নৌকাযাত্রা না করিতেন, তাহা হইলে আর এরূপ সর্ব্বনাশ হইত না। কৃষ্ণকান্ত রায়ের প্রাণাধিক ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দলালের ও প্রাণাধিকা ভ্রাতঃপুত্রবধূ ভ্রমরের এরূপ শোচনীয় পরিণাম ঘটিত না। গ্রন্থকার নিজেও তাই বলিয়াছেন, 'যাহাকে ভালবাস, তাহাকে নয়নের আড় করিও না। যদি প্রেম বন্ধন দৃঢ় রাখিবে, তবে সূতা ছোট করিও। বাঞ্ছিতকে চোখে চোখে রাখিও; অদর্শনে কত বিষময় ফল ফলে। যাহাকে বিদায় দিবার সময় কত কাঁদিয়াছ, মনে করিয়াছ, বুঝি তাহাকে ছাড়িয়া দিন কাটিবে না—কয় বৎসর পরে তাহার সহিত আবার যখন দেখা হইয়াছে, তখন কেবল জিজ্ঞাসা করিয়াছ, "ভাল আছ ত?" হয় ত সে কথাও হয় নাই—কথাই হয় নাই—আন্তরিক বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। হয় ত রাগে অভিমানে আর দেখাই হয় নাই। তত নাই হউক, একবার চক্ষের বাহির হইলেই, যা ছিল তা আর হয় না; যা যায় তা আর আসে না; যা ভাঙ্গে তা আর গড়ে না। মুক্তবেণীর পর যুক্তবেণী কোথায় দেখিয়াছ?'

'ভ্রমর গোবিন্দলালকে বিদেশে যাইতে দিয়া ভাল করে নাই। এ সময়ে দুইজনে একত্রে থাকিলে এ মনের মালিন্য বুঝি ঘটিত না। বাচনিক বিবাদে আসল কথা প্রকাশ পাইত। ভ্রমরের এত ভ্রম ঘটিত না।' 'এত রাগ হইত না।' (চতুর্বিংশতি পরিচ্ছেদ) এ কথা স্বীকার করি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলে গ্রন্থকারের কি 'কৃষ্ণকান্তের উইল' পুস্তকখানা লেখা হইত? অবশ্য দেওয়ান কৃষ্ণকান্তের উইলখানা লেখা সে জন্য বন্ধ থাকিত না। কিন্তু তাহাতে হরলালের ভাগ্যে তিন আনাই পড়ুক, কি এক আনাই পড়ুক বা শূন্যই পড়ুক তাহাতে গোবিন্দলাল বা ভ্রমরের, কি তোমার-আমার কি ক্ষতি-বৃদ্ধি হইত? (ক্রমশঃ)

বন্ধন-মুক্তি

শ্রীভূপতি চৌধুরী

অনেক সময় মানুষ তার জীবনে এমন অবস্থায় এসে পড়ে, যখন সে তার উদ্ধারের উপায় অবলম্বন করতে গিয়ে, সৎ অসৎ বিচার কর্ব্বার সময় বা সুযোগ পায় না, কিম্বা, পেলেও সে বিচার কর্ত্তে চায় না। এ অবস্থা খুব বেশী ভাবে উপলব্ধি করা যায় দরিদ্র জীবনে। অতি দরিদ্র রামগতি তার জীবনে ঠিক সেই অবস্থায় এসে পড়েছিল। এই কলকাতা সহরে ট্রামের লাইনের ধারে "জাপানি পেন্সিল" "জার্ম্মাণ সূচ" ইত্যাদি বিক্রী করে কোনো রকমে সে জীবন ধারণ করে আসছিল; কিন্তু আজ কয়েক দিন হ'ল তার রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। জিনিস পত্র আর বড় কেউ কেনে না। অথচ এই বেচা-কেনার উপর নির্ভর করছে তার জীবন। শুধু তার জীবন, এ কথা বলা ভুল হবে; কারণ, এ সংসারে সে একলা নয়। তার স্ত্রী ও এক শিশুপুত্র তার উপার্জ্জনের অংশ গ্রহণ করে। এই তিনের ভরণপোষণ বড় সহজ ব্যাপার নয়। অথচ আজ সাতদিনেও যখন তার এক পয়সারও জিনিস বিক্রি হ'ল না, তখন একটা গভীর নিরাশায় তার বুক হ'তে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ঝরে পড়ল। কয়েক দিনের অনাহারের ফলে তার শরীর অবশ হয়ে আসছিল। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না, তার জিনিস-পত্তরের বাক্সটা

নিয়ে, সে এক বাড়ীর বারান্দার উপর বসে পড়ল। সন্ধ্যার ম্লান আলো তার চোখের উপর ম্লানতর হয়ে আসতে লাগল।

ঠিক এমনি সময় চৈতন এসে ডাকলে—রামগতি যে, বসে পড়লি কেন? মুখ বড় শুকনো দেখাচ্ছে যে। ক'দিন খাওয়া হয় নি না কি?

রামগতির মুখ থেকে কোনো উত্তর এ'ল না।

চৈতন বলে চলল—তা বলছি, আমাদের দলে আয়। খাওয়া পরার কোনো ভাবনা থাকবে না।

রামগতি চৈতনের কথায় চঞ্চল হয়ে উঠল। এই আজ প্রথম দিন নয়, এর পূর্ব্বেও বহুবার এমিতর আহ্বান তার কাণে এসেছে; কিন্তু আজ এ আহ্বান তাকে যতটা চঞ্চল করে তুলেছে এর পূর্ব্বে কখনও এতটা চাঞ্চল্য তার মনেও জাগে নি। কিন্তু আজ যে এই চাঞ্চল্য; এ ত অকারণে নয়। এর পূর্ব্বে যখন এমন আহ্বান তার কাণে এসেছে, তখনকার অবস্থার সঙ্গে আজকের অবস্থার তফাৎ অনেক। আজ ক'দিন খাওয়া হয় নি; কাছে একটা পয়সাও নাই। ঘরে ক্ষুধা-কাতর সন্তানের করুণ দৃষ্টি ও চিন্তা-ক্লিষ্ট পত্নীর মূকবুভুক্ষু ব্যথা কল্পনা করতেই সে তার মনের সকল স্থৈর্য্য হারিয়ে ফেল্লে। একটা উত্তেজনার মাথায় সে উঠে দাঁড়াল।

চৈতন অল্প হেসে, তার ফেরি-করে-বেড়ানর বোঝাটা নিজে নিয়ে বললে—তোর কষ্ট হবে আমিই না হয় এটা নিয়ে যাই।

চৈতনের কথায় তার মনটা সমবেদনার প্রলেপে অনেকটা নরম হয়ে এল। সত্যই তখন ও বোঝা ব'য়ে নিয়ে যাওয়া তার পক্ষে কষ্টকর হত। কাজেই চৈতনের কথায় কোনো বাধা না দিয়ে, তার দিকে একবার কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চেয়ে সে তার সাথী হ'ল।

বড় রাস্তা ছেড়ে, চৈতন একটা সরু গলিপথের এক ভাঙা বাড়ীর সাম্নে এসে, ভাঙা একটা কবজার উপর আটকান একটা দরজার মধ্যে ঢুকে পড়ে রামগতিকে ইসারা করে ডাকলে। রামগতি ধীরে ধীরে তার অনুসরণ করলে। অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে কিছুক্ষণ ঘোরার পর একটা মোড় ফিরতেই একেবারে দিনের আলোর মত আলোকিত এক কক্ষে এসে উপস্থিত হ'ল।

এতক্ষণ অন্ধকারে ঘুরে হঠাৎ আলোর সাম্নে এসে পড়তেই রামগতি চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল। তার পর ধীরে ধীরে আলো ও চোখের সহ্য-শক্তির সমতা ঘটিয়ে সে সর্দ্দারের সাম্নে গিয়ে দাঁড়াল।

অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তার পর সর্দ্দার তার হাতে একটা দশ টাকার নোট দিয়ে বললে—আজকের মত তুমি যেতে পার।

রামগতি হাত পেতে নোটটা নিতেই, তার সারা শরীরের মধ্য দিয়ে একটা কম্পনের প্রবাহ ছুটে গেল। মুহূর্ত্তের জন্য যেন তার হাতটা ভারী বোধ হল। অন্যপথে পা দেবার সময় সকল যুগের মানুষের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন—ক্ষণিক কি স্থায়ী—ঘটে যায়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে হয় ত সেটা এক মুহূর্ত্তেই কেটে যায়। রামগতি তার ভাব দমন করে শুষ্ককণ্ঠে নমস্কার জানিয়ে ঘর হতে বার হয়ে এল।

দুই

রাতে খাওয়ার পর রামগতি বিছানায় শুয়ে পড়েছিল; চোখে তার ঘুম আসছিল না। সেই যে দশটাকা লওয়ার পর তার মধ্যে একটা স্পন্দন এসেছিল, তার ধাক্কার ফলে এখনও তার চিত্ত-দোলার দোলা থামে নি।

ঘরে ঢুকেই কোন কথা না বলে রামগতি তার স্ত্রীকে দশটাকার নোটখানা গম্ভীরভাবে দিলে। স্ত্রী আনন্দোৎফুল্ল কণ্ঠে বল্লে—আজ দশটাকা পেয়েছ। ভগবান আজ মুখ তুলে চেয়েছেন; নইলে—কথা শেষ হবার পূর্ব্বেই স্বামীর ভ্রূকুটী কুটিল বিকৃত মুখের দিকে চেয়ে সে আর তার কথা সমাপ্ত করতে সাহস করলে না। রামগতি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। তার পর যথা-সময়ে খাওয়া শেষ করে সে শুতে এসেছিল। সারা দিনের ক্লান্তিতে তার সর্ব্বাঙ্গ এলিয়ে পড়েছিল বটে, কিন্তু মনের ক্রিয়া তখনও একেবারে স্থির হয়ে যায় নি।

এ কি উচিত হল? কিন্তু এ পথে না গিয়ে উপায়? তাকে বাঁচতে হবে ত! এত দিন যে পথ ধরে সে চলে এসেছে, সে পথ দিয়ে আর চলা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং বাধ্য হয়ে তাকে অন্য পথ অবলম্বন করতে হয়েছে। কিন্তু এ পথে আসবার কারণ কি? অন্য অনেক পথ ত আছে। পথ ত আছে; কিন্তু সন্ধান ত সে জানত না। কাজেই তখন চৈতনের আহ্বান মত সে তার অনুসরণ করেছে। সে এ পথে যাওয়ার সমর্থনের

জন্য নানা দিক হতে যুক্তি সংগ্রহ কর্ব্বার চেষ্টা করলে। এত দিন পর্য্যন্ত সে ধর্ম্মপথে জীবন ধারণ কর্ব্বার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে চেষ্টা তার সফল হল কই? কি লাভ করেছিল সে তাতে? দিনে দুবেলা পেটপোরা ভাতও তার জুটত না। কিন্তু এ পথে ও সম্বন্ধে তার বিশেষ চিন্তার কারণ নাই, এ কথা ত সে চৈতনের কাছ থেকেই শুনেছে। এবং আজকের সর্দ্দারের ব্যবহারেও সে এ কথার সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েছে।

কিন্তু কি কাজ তাকে এ পথে করতে হবে, সে সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণা তার ছিল না। "লোককে ঠকিয়ে, তার পকেট কেটে বেড়াতে হবে" এই ধরণের কথা সে শুনেছিল। কথাটা ভাবতে সে শিউরে উঠেছিল সত্য, কিন্তু আর কোন উপায় নেই। তাকে ও দলে যেতেই হবে—দলের টাকা পেয়ে আজ অনাহারে মৃত্যু থেকে সপরিবারে সে রক্ষা পেয়েছে। কাজেই কৃতজ্ঞতার খাতিরে তাকে তাদের আজ্ঞা বহন করতে হবে। কিন্তু তবুও সে যেন কিছুতেই তৃপ্ত হতে পাচ্ছিল না। সকল যুক্তি তার কাছে অসার বোধ হচ্ছিল। আর তার স্বপক্ষে যুক্তি কি আছে? হঠাৎ একটু দূরে বিছানার উপর ঘুমন্ত খোকার দিকে দৃষ্টি পড়তেই, সে ধীরে ধীরে তার বিছানা ছেড়ে উঠে ঘুমন্ত ছেলের মুখে অজস্র চুমু দিয়ে তার দিকে চেয়ে একটা যেন বিহ্বলতার আবেশে অস্ফুট কণ্ঠে বল্লে—তোদের জন্যে রে খোকা, আমি তোদের জন্যে, এতদিনের সব পুঁজি আজ খুইয়ে এলাম।

তার পর ধীরে ধীরে বহুক্ষণ সে তার ছোট্ট ঘরখানার মধ্যে পায়চারি করে বেড়াতে লাগল। সত্যই এত দিনের পুঁজি ধর্ম্মের বা শান্তির, আজ সে হারিয়ে ফেলেছে। তাই আজ সারাদিনের শ্রমশ্রান্ত শরীরের উপর অশান্তির ভার বহন করে, বিনিদ্র নয়নে পায়চারি করে মুহূর্ত্তগুলোকে অতিক্রম কর্ব্বার ব্যর্থ চেষ্টা করতে হচ্ছে। কিন্তু সময় যে কাটতে চায় না। অন্তরের রত্ন এমন ভাবে হারিয়ে ফেললে মানুষ এমনি অস্থির হয়ে পড়ে বটে।

তিন

এইভাবে কিছুদিন গেলে কলেরার এক ঝাপটে রামগতির স্ত্রী ও পুত্র যখন একসঙ্গে মারা পড়ল, তখন রামগতি তাদের সৎকার করে এসে প্রথমটা বেশ স্থির হয়ে বসে রইল। তার চোখ থেকে একফোঁটাও জল বার হয়ে এল না। তার পর হঠাৎ তার সমস্ত গাম্ভীর্য্য ভেদ করে সে পাগলের মত হয়ে, তার সামনে যা কিছু ছিল—কাপড়, ঘটী, বাটী প্রভৃতি—সব ছুড়ে ফেলে দিয়ে একটা বুকভাঙা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে, আবার অবসন্নের মত বসে পড়ে বিকৃত অস্পষ্ট কণ্ঠে বলতে লাগল—এ সব কি আমার জন্যে? এ সব ত তোদের জন্যে, আমার পুঁজি খুঁইয়ে এনেছিলাম। তোদের জন্যে কি না করলাম; আর তবুও তোরা থেকে যেতে পারলি না; চলে গেলি? অকৃতজ্ঞ, বেইমানের দল।—দরদর অশ্রুধারায় তার দৃষ্টি রোধ হয়ে গেল। শোকের অবসন্নতায় সে মেঝের লুটিয়ে পড়ল।

দলের সর্দ্দার এসে তাকে বোঝাতে বসল। তাকে শান্ত কর্ব্বার ব্যর্থ চেষ্টা করলে। অবশেষে কোনও উপায় না দেখে, তাকে খানিকটা ঘুমের ঔষধ মেশানো মদ খাইয়ে দিলে। রামগতি অচৈতন্য হয়ে পড়ল।

পরের দিনে প্রতি দিনের মত ভোর হতেই তার ঘুম ভেঙে গেল। শোকে ও মাদকের প্রভাবে অবসাদ তখনও তার কাটেনি। তাই চোখ চাইতেই আবার সেই ঘরের শূন্যতা তার মনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিছু সে ভাবতে পাচ্ছিল না; কিন্তু বুকের মধ্যে একটা শূন্যতার বিরাট হাহাকার ব্যথার আকারে প্রকাশ পাচ্ছিল। শ্রাবণের ধারার মত সেই বুকের ব্যথা অবিরাম অশ্রুধারায় গড়িয়ে পড়তে লাগল। হাত দিয়ে সে চোখের জল মুছবার চেষ্টাও করলে না। চুপ করে স্থির নিশ্চেষ্ট ভাবে সে বসে রইল।

চৈতন তার ঘুম ভাঙাতে এসে, তাকে এমন ভাবে দেখে, সান্ত্বনার সুরে বল্লে দেখ রামগতি, ঘরে বসে খালি চোখের জল ফেলবি ত? সব খালি খালি ঠেক্‌বে, বুকের মধ্যে হুহু কর্ব্বে। তার চেয়ে একটু আমার সঙ্গে ঘুরে আসবি আয়। তাতে তবু দুদণ্ড মন একটু আনমনা হতে পারে। আয়।—চৈতন তার হাত ধরে মৃদু আকর্ষণ করলে।

একটা ঢোঁক গিলে, একটু ভেবে, চৈতনের দিকে তার বিষাদ-ভরা চোখ তুলে চেয়ে, যেন কত ক্লান্তের মত, সে বল্লে—আচ্ছা চল। তার কথার সুরে যেন তার বুকের জমাট বাঁধা কান্না গলে পড়ল।

কিছুদূর গিয়ে তার মনে হল—আর কেন? আর অধর্ম্ম পথে থেকে লাভ কি? তার আর অর্থের প্রয়োজন কি? যাদের জন্য সে উপার্জ্জন করতো, তারা ত সব চলে গিয়েছে। এইবার ত তার ছুটী। সর্দ্দারকে বল্লে হয় না যে, সে আর এ পাপ ব্যবসায়ে থাকতে চায় না। পাপ করে যথেষ্ট দণ্ড সে পেয়েছে। এইবার না হয় সে আবার পূর্ব্বপথে ফিরে যাক।

এমনি কত কি ভাবতে ভাবতে সর্দ্দারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সর্দ্দার তাকে সাদরে বসিয়ে বোঝাতে লাগল। সেই কথাবার্ত্তার ফাঁকে একবার রামগতি অতি কুণ্ঠিতভাবে বল্লে, আর কিছু ভাল লাগছে না।—

যেসব কথা যেমন ভাবে সে বলবে ভেবেছিল, তার কিছুই সে বলতে পারলে না। এমন কি, সে যে আর এ দলে থেকে অধর্ম্ম করতে চায় না, এ কথাও যেন সে বলতে ভুলে গেল।

সর্দ্দার তার কথা শুনে সান্ত্বনার মধুর কণ্ঠে বললে—সব বুঝি ভাই, কিছু ভাল লাগবেও না এখন। কিন্তু এমন ভাবে কেঁদে শরীর নষ্ট করলে চলবে কেন ভাই? ঘরে বসে থাকলেই শূন্য ঘর দেখবে আর কান্না আসবে। কাজ কি আর করতে পার্ব্বে? তবে মনে যেটুকু বাঁধা পড়ে, এই লাভ। তার পর সর্দ্দার কোমল কণ্ঠে হাঁকলে—চৈতন, যাও তুমি রামগতির সঙ্গে বেড়াতে যাও।

রামগতি মুখে কোন কথা না বলে, ধীরে ধীরে চৈতনের সঙ্গে চলে গেল। যাবার সময় সর্দ্দার তার হাত ধরে তাকে বিদায় দিলে, যেমন করে বাপ তার ছেলেকে বিদেশে পাঠাবার সময় বিদায় দেয়।

সন্ধ্যায় রামগতি যখন চৈতনের সঙ্গে ফিরে এল, তখন তার শোকের শান্তি না হলেও, তার মনের ব্যথার তীব্রতা কমে গিয়েছিল। সর্দ্দার তাকে বল্লে—তুমি আমার এখানেই থাক। আর সেখানে গিয়ে কি হবে বল? আমি বাড়ীওয়ালার পাওনা চুকিয়ে দিয়ে এসেছি। এই পাশের ঘরটায় তোমার শোবার বন্দোবস্ত করে দিয়েছি।

রামগতি সর্দ্দারের দিকে নিষ্প্রভ চোখে তাকালে। এর অর্থ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হলেও, সে দৃষ্টিতে কোন বিশেষ ভাব ফুটে উঠেনি। তার পর ধীরে ধীরে তার চোখ নামিয়ে, কোন কথা না বলে, ক্লান্তপদে সে নিজের ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ল। নিদ্রার মাঝে মাঝে শোকার্ত্ত হৃদয়ের জমাট ব্যথা দীর্ঘনিঃশ্বাসরূপে প্রকাশিত হয়ে পড়ছিল।

চার

ফেরা তার হল না। যে পথের দিকে সে পা বাড়িয়েছিল, সেই পথেই তার চলা সুরু হল। এক নূতন জীবন আরম্ভ হল। কিন্তু ভাবপ্রবণ মন তার এই নূতন জীবনের চলার ফাঁকে ফাঁকে তার গত জীবনের কথা মনে করিয়ে দিত। বহু দিন পর্য্যন্ত সহকারী রূপে কাজ করার পর প্রথম যে দিন সে একজন লোকের পকেট কেটে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছিল, সেই দিন আবার তার সেই পূর্ব্বজীবনের শান্তিময় দিনের কথা নূতন ভাবে নব তেজে তার মনের মধ্যে উদয় হয়ে তাকে' তার অন্তরের মানুষটাকে জাগিয়ে তুলেছিল।

পকেট-কেটেই নিজেকে বাঁচাবার জন্যে কি দৌড়ই না তাকে দিতে হয়েছিল। দৌড়ে এসে আড্ডা ঘরে ঢুকেই মণিব্যাগটা সর্দ্দারের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিতেই, সর্দ্দার প্রশ্ন করলে—এ রকম ভাবে দৌড়ে আসবার মানে কি? কিন্তু তখন সে-কথার উত্তর দেবার ক্ষমতা তার ছিল না। কোন কথা না বলে সে অবসন্ন ভাবে ঘরের কোণে বসে হাঁপাতে লাগল। ইত্যবসরে তার দলের যারা সেখানে ছিল তারা এসে পড়ল। তাদের মুখে সকল কথা শুনে সর্দ্দার বললে—এত বড় বোকামি তুমি কর্ব্বে তা আমি ভাবতেও পারিনি। কথা শেষ করে সর্দ্দার একটা বিরক্তিভরা দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলে। রামগতি একবার সঙ্কোচভরা বিস্মিত নয়নে তার দিকে চেয়ে মাথা নত করে ফেললে।

চৈতন সব শুনে তাকে একটা মৃদু ঝাঁকানি দিয়ে বললে—আরে এতদিনেও কিছু শিখতে পাল্লি না, এর চেয়ে আফশোষ আর কি হতে পারে। পকেট কেটে কখনও দৌড়তে হয়? একটা লোক যদি বেশ সহজ ভাবে যেতে-যেতে থামকা দৌড়তে আরম্ভ করে ত সবাই তার দিকে চেয়ে থাকবে না? গম্ভীর ভাবে পকেট থেকে নিয়ে নিজে না রাখতে পারিস চালান করে দিবি। সেখানে ত আমাদের ঢের লোকই থাকে। আজ যদি

আমরা গোলমাল করে ভিড় জমিয়ে না দিতাম, তা'হলে তুই ত ধরাই পড়ে যেতিস্।—এমনি সব কত কি সে বলে চলল। কিন্তু এর পর আর একটা বর্ণও তার কাণে যায় নি। একটা দুর্জ্জয় অভিমানে তার সকল বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কি একটু ভুল হয়ে গিয়েছে, তার জন্যে সকলে, এমন কি চৈতনও—তাকে বক্‌তে আরম্ভ করলে; কিন্তু এতটা টাকা যে সে উপার্জ্জন করে আনলে, এর জন্যে একটা মিষ্ট কথাও কেউ বললে না। অথচ এই টাকাটা হস্তগত করবার জন্যে কতটা কষ্ট তাকে স্বীকার করতে হয়েছে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে কতক্ষণ, কতবার সে লোকটার পাছু পাছু ঘুরেছে, পকেটে কতবার হাত ঠেকিয়েছে; কিন্তু বুকের হৃৎপিণ্ডটা ঠিক সেই সময় কি ভীষণ বেগে স্নায়ুর মধ্যে রক্তবাণ নিক্ষেপ করতে লাগল। সেই আঘাত সহ্য করতে তার জ্ঞান লোপ পাবার উপক্রম হয়েছিল। মণিব্যাগ হস্তগত করতেই তার শরীর হতে যেন উত্তাপের প্রবাহ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে তাকে ছুটতে হল। তার পর সে কি অবসন্নতা! মনের মধ্যে কি অশান্তি! কি বিশ্রী জীবন এ! এর তুলনায় গত জীবন, তার শান্তি, তার আনন্দ, সে এখন কল্পনার রাজ্যে। স্ত্রী, পুত্র—তাদের প্রীতি, তাদের ভালবাসা, তাদের স্নেহাদর,—এ সব স্মৃতি তাকে উন্মনা করে তুললে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস তার বুক থেকে নেমে এল। তার মনে হল, যে দিন হতে এ পথে সে এসেছে, সে দিন হতে সে একে একে সব হারাতে বসেছে। প্রথম সে হারিয়েছে মনের শান্তি। প্রথম যে দিন সে সর্দ্দারের কাছ থেকে টাকা নিয়ে যায়, সেই দিন কেমন করে অনিদ্রায় তার রাত কেটেছে, তা তার মনে পড়ল। তার দুদিন পরে হারালে সে তার স্ত্রী ও পুত্র। তার পর ধীরে ধীরে সঙ্গপ্রভাবে সে তার সত্বা, ব্যক্তিত্ব হারাতে বসেছে। পুরানো দিনের 'তার' সঙ্গে আজকে সে যা হয়েছে 'তার' কি তফাৎ। এ ব্যবধান অতিক্রম করে কি সে তার পূর্ব্বজীবনে ফিরে যেতে পারে না? এ জীবন হতে মুক্তি চাই, কিন্তু মুক্তির উপায় কি? কোন পথই সে খুঁজে পাচ্ছিল না। নিরুপায় হয়ে তার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা কচ্ছিল; কিন্তু তাও সে পাচ্ছিল না। ছোট ছেলেরা যেমন রাগে, অভিমানে, ক্ষোভে নিজেকে নিপীড়িত করে, সেও ঠিক সেই ভাবে তার মাথাটাকে হাত দুটোর মধ্যে চেপে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। সেই ভাবেই তার রাত কেটে গেল। কিন্তু কাঁদতে কাঁদতে কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তা সে টেরই পেলে না। যখন তার ঘুম ভাঙল, তখন প্রভাতের আলো জানালার ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

পাঁচ

প্রভাতের নবোদ্ভাসিত সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোক, নির্ম্মল, শীতল, স্নিগ্ধ বাতাস তার প্রাণে, তার হৃদয়ে যেন শক্তি-সঞ্জীবনীর বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহিয়ে দিলে। সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল; তার মনে হল এই আলো, এই বাতাস, এই প্রভাত, এরা তাকে মুক্তির আনন্দ দান করতে এসেছে। মুক্তি,—মুক্তি তার চাই। ব্যক্তিত্ব-হীন দাস-মনোভাবের বন্ধন-শৃঙ্খল সে ছিঁড়ে ফেলবে। অমিত তেজে পূর্ণ হৃদয় নিয়ে সে একেবারে সর্দ্দারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

সর্দ্দার তখন সারারাত্রির ব্যাহত নিদ্রার পর সবে বিছানা হ'তে উঠেছে। মন তার একটা দুঃসংবাদে বিচলিত। এমন সময় রামগতি উন্নত শিরে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তার কথা—সে মুক্তি চায়। সর্দ্দার প্রথমে তার সে কথা বুঝতে পারলে না। একবার রুক্ষ জিজ্ঞাসু-নেত্রে রামগতির দিকে চেয়ে, ভ্রূ কুঞ্চিত করে বল্লে—কি বল্‌ছ।

তার ভ্রূকুটীতে রামগতি প্রথমটা একটু থতমত খেয়ে দাঁড়াল। ঠিক সেই সময় প্রভাতবায়ুর একটা স্নিগ্ধ ঝাপটা এসে তার হৃদয়ে বল সঞ্চার করে গেল। সে সংযত হয়ে স্থির নির্ভীক কণ্ঠে বললে—আমি চললাম; এ কাজ আর আমার ভাল লাগে না। এ আমি কর্ব্ব না।

সর্দ্দার তিক্ত স্বরে বল্লে—কর্ব্ব না বল্‌লেই হয় না। এত দিন তোমায় খাবার যে যুগিয়েছি, তার খরচ দেবে কে? দাম চাই তার।

রামগতি তার দৃষ্টির সকল তীব্রতা দিয়ে একবার সর্দ্দারের মুখের দিকে চেয়ে গর্ব্বোন্নত মস্তকে বীরের মতো বার হয়ে গেল। যাবার সময় একটা কথা তার মুখে এসেছিল—সয়তান, তোর মিথ্যা ছলনাময় মিষ্ট কথায়

আমায় মোহগ্রস্ত করে বিপথে নিয়ে গিয়ে, আহার দিয়ে আমার অমূল্য ধর্ম্ম কিনেছিস্। কিন্তু সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন ভেবে, কিছু না বলেই সে নীরবে বেরিয়ে গেল।

রামগতির তীব্র দৃষ্টিতে সর্দ্দার একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল; তার পর মুহূর্ত্তে আত্মস্থ হয়ে, এই অপমানে ক্ষিপ্ত-প্রায় হয়ে, বিছানা ছেড়ে জুতোটা পায়ে গলিয়ে হনহনিয়ে রাস্তায় বার হয়ে পড়ল। ঠিক সেই সময় কোথা হতে এসে চৈতন বললে—সর্দ্দার, রামগতির হল কি? দেখলাম, সে হাসতে হাসতে চলেছে। কাজে যেতে ডাকলাম, বললে—মুক্তি পেয়েছি; আর নয়।

"মুক্তি" এই কথাটা সর্দ্দারের কাণে এসে বাজতেই, একবার মুখখানা বিকৃত করে অস্ফুট স্বরে সর্দ্দার বলে উঠল—মুক্তি!—চৈতন, যে করে পারিস, ওকে ধরিয়ে দিগে যা!

চৈতনকে তার দিকে বিস্মিত ভাবে চেয়ে থাকতে দেখে, তাকে এক ধমক দিয়ে সর্দ্দার বললে— চেয়ে আছিস্ কি? যা বললাম, করগে যা।

সর্দ্দার আর কোন কথা না বলে তার ঘরের মধ্যে চলে গেল। আর চৈতন সে ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারলে না। রামগতির কথা ও সর্দ্দারের আদেশে তার বিস্ময় উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছিল। কিন্তু তবুও, কিছু না বুঝেই, বিক্রীত দাস যেমন তার প্রভুর হুকুম পালন করে, সেইভাবে সেও হুকুম তামিল করতে চলে গেল।

খানিকটা পা চালিয়ে গিয়ে এক চেনা পাহারাওয়ালার সঙ্গে দেখা হতে, চৈতন অদূরাগত রামগতিকে দেখিয়ে মৃদু স্বরে অনেক কিছু বললে। ইতিমধ্যে রামগতি সে স্থানের কাছাকাছি এসে পড়তেই, চৈতন তাড়াতাড়ি সরে পড়ল। পাহারাওয়ালা রামগতিকে হাঁক দিয়ে ডেকে তাকে গ্রেপ্তার করলে। পাহারাওয়ালা এবং চৈতনের কথাবার্ত্তা রামগতির চোখ এড়ায় নি। এই গ্রেপ্তার তারই ফল ভেবে, রামগতি কোন বাধা না দিয়ে পাহারাওয়ালার সঙ্গে থানায় চলল।

ছয়

কোন প্রকারের বাধা না দিতে দেখে পাহারাওয়ালা বেশ একটু বিস্মিত হয়ে পড়েছিল। কিছু দূর যাওয়ার পর, একটা কিছু বলতে গিয়ে, রামগতির মুখের দিকে চেয়ে, কয়েকবার থেমে, অবশেষে আর তার মুখের দিকে না চেয়ে তার স্বভাব-সুলভ রুক্ষতালে বললে—এই দেখো—তার পর সে যা বললে, তার মোট কথা হচ্ছে, থানা পর্য্যন্ত গিয়ে কি হবে। সেখানে গেলে তাকে নির্ঘাত হাজতে যেতে হবে। কিন্তু ইচ্ছা করলেই সে তাকে ছেড়ে দিতে পারে, যদি সে তাকে সন্তুষ্ট করতে পারে।

রামগতি বেশ স্থির ভাবে তাকে শুনিয়ে দিলে যে তাকে একটা পয়সাও সে দিতে রাজী নয়; তাতে তার যাই হোক।

রামগতির একটা ঘৃণা-ভরা তীব্র দৃষ্টিতে বিদ্ধ হয়ে ক্রুদ্ধ পাহারাওয়ালা তাকে বর্ব্বর ভাবে টানতে টানতে নিয়ে চলল। এ অপমানের জন্য রামগতিও প্রস্তুত ছিল। কোন কথা না বলে নির্ব্বিকার ভাবে সে তার সঙ্গে গেল।

তার পর যথা নিয়মে থানার হাজতে বাস করার পর তাকে কোর্টে হাজির হতে হ'ল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ—সন্দেহজনক ভাবে বিচরণ করা ও অসৎ উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করা। পাহারাওয়ালা ও তাদের দলেরই একজন লোকের সাক্ষ্যে তার অপরাধ প্রমাণিত হ'ল। বিচারক রামগতিকে প্রশ্ন করলেন—তোমার কিছু বলবার আছে?

রামগতি এতক্ষণ মাথা হেঁট করে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল। বিচারকের কথায় চমক ভেঙে সে একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলে, সর্দ্দার চৈতন প্রভৃতিকে নিয়ে প্রহসন দেখতে এসেছে। তাড়াতাড়ি তার চোখ ফিরিয়ে নিয়েই, কোন দিকে না চেয়ে সে বললে—না, আমার কিছু বলবার নেই।

হাকিমের হুকুমে রামগতির তিনমাস কারাদণ্ড হল।

দণ্ডাদেশ শুনে সর্দ্দার তার দিকে একটা ব্যঙ্গের হাসি হেসে চাইলে।

সর্দ্দার ও চৈতনকে দেখে মুহূর্ত্তের জন্য সে বিচলিত হয়ে পড়েছিল; কিন্তু পরক্ষণেই দণ্ডাদেশের মধ্যে তার মুক্তির বার্ত্তা শুনে, তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সর্দ্দারের ব্যঙ্গ-দৃষ্টির উত্তরে উপেক্ষা-বিষ হেনে প্রফুল্ল চিত্তে সে কয়েদীদের মোটার-বাসে গিয়ে উঠল। তার বন্ধনের শৃঙ্খল ঝন্ ঝন্ শব্দে বেজে উঠল। সে ঝনঝনানিতে সে তার মুক্তির সুর খুঁজে পেলে।

শিশুমঙ্গল

শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল্‌-এম্‌-এস্‌

(১) "শিশু-সপ্তাহ"

যে তারিখে মহাত্মা গান্ধী কারারুদ্ধ হন, সেই ইংরাজী মাসের ১৮ তারিখকে "গান্ধী পুণ্যাহ" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। প্রত্যেক মাসে, যাহাতে আমরা তাঁহার কথা, সমবেত ভাবে আলোচনা করিতে পারি, এই উদ্দেশ্যেই, ঐ তারিখটিকে বাছিয়া ঐ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, নির্দ্দিষ্ট দিনে বা তিথিতে সমস্ত জাতিটা একই ভাবে প্রণোদিত হইলে, জাতীয়তার শ্রীবৃদ্ধি হয়, জাতীয় একতা বদ্ধমূল হয়। ভাদ্র মাসে কৃষ্ণাষ্টমীতে যখন হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত হিন্দুই শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি উৎসবে যোগদান করেন, তখন, মুখে সে কথা বলুন আর না বলুন, প্রত্যেক হিন্দুই জাতি-মাহাত্ম্য, এক প্রাণতা নিশ্চয়ই অনুভব করেন। ফল কথা, নির্দ্দিষ্ট দিনে, সপ্তাহে বা মাসে, কোনও একটি কার্য্যে সমগ্র জাতি মনোনিবেশ করিলে, তাহার ফল অনেক দূর পর্য্যন্ত গড়ায়।

কতকটা এই উদ্দেশ্যে, লেডি রেডিং, এই ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২৮এ জানুয়ারি হইতে ২রা ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত, এই ছয়টি দিনকে "শিশু-সপ্তাহ" নাম দিয়া, সমগ্র ভারতে যাহাতে শিশু-মঙ্গল সংক্রান্ত কায হয়, তাহারই আদেশ দিয়াছিলেন। সেই ইচ্ছানুযায়ী সমগ্র ভারতের প্রধান প্রধান সকল সহরেই শিশু-প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। কলিকাতায় ইডেন উদ্যানে ঐ প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল।

(২) শিশু-সপ্তাহের প্রদর্শনী

ঐ প্রদর্শনীতে কি কি দেখান হইয়াছিল? ঐ প্রদর্শনীতে পাঁচ শ্রেণীর জিনিষ দেখান হইয়াছিল, যথা—

(ক) বাঙ্গালাদেশে মৃত্যুর তালিকা।

(খ) ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, হুকওয়ার্ম (বক্র ক্রিমি), বসন্ত, ক্ষয়কাশ প্রভৃতি নিবার্য্য ব্যাধিগুলির কারণ ও নিবারণের উপায়।

(গ) আঁতুড় ঘর এদেশে কি জঘন্য ভাবে নির্ম্মাণ করা হয়; এবং অতি সামান্য চেষ্টায় কি সুন্দর ভাবে তাহা নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে।

(ঘ) শিশুকে রীতিমত ওজন করার প্রয়োজনীয়তা।

(ঙ) কলিকাতায় যে ৪।৫টি বেবি-ক্লিনিক (baby clinic) স্থাপিত হইয়াছে, সেই সেই শিশু-হাসপাতালে, কি কি করা হয়, তাহা দেখান হয়।

(৩) শিশুদিগের জন্য হঠাৎ এত চেষ্টা কেন ?

নন্দের দুলাল, বংশধর, সৃষ্টিধর, গোপাল, যাদুমণি ভৃতি গালভরা, প্রাণমাতান নামে যাহাদের জন্মগত ধিকার, তাহাদের জন্য এ জাতিটা কি না করিয়াছে ও না করিতে প্রস্তুত আছে ? স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই যে শুদিগের আদর্শ ও প্রতীক, তাহাদিগকে হিন্দুরা যে চক্ষে দেখে, তাহা কি আজ বুঝাইয়া দিতে হইবে ?

আমরা বড় গলায় আজ বলিব—হাঁ, আজ বুঝাইয়া ত হইবে—অন্ততঃ আজ। আমরা মানি যে, হিন্দুরা ছেলেপুলের" জন্য সমস্ত ত্যাগই স্বীকার করিতে সদাই স্তুত—কিন্তু আজ হিন্দুরা নামে হিন্দু থাকিলেও প্রকৃত দুর আদর্শ হইতে বহু দূরে গিয়া পড়িয়াছেন। যে হিন্দু, ান জন্ম দিবার জন্য, কত যাগ-যজ্ঞ করিতেন, কত স্যা করিতেন, কত পাজিপুঁথী ধরিয়া গর্ভাধান করিতেন, সংযম করিতেন ; (বর্ত্তমান কালের eugenics ছাড়া আর কি ?) যে হিন্দু ধাত্রীকে মাতৃত্বের গৌরবে ভূত করিয়াছেন ; যে হিন্দুর কৌমারতন্ত্র, অষ্টাঙ্গহৃদয়-হতা আজিও বর্ত্তমান ; যে হিন্দু শিশুকে সজীব শ্রীকৃষ্ণ প দেখিতেন ; যে হিন্দু পুত্রোৎপাদন না করাটা অধর্ম্ম করিতেন, এবং অপুত্রক লোককে ঘৃণার চক্ষে খতেন ; যে হিন্দু স্ব স্ব পুত্রকন্যাকে দেশের ও সমাজের ত্তি মনে করিয়া সেইভাবে লালন পালন করিতেন ; জ সে হিন্দু কোথায় ?

আজ আমরা হিন্দুনামধারী কামাতুর, বাসনবিলাসী, জীববিশেষে পরিণত হইয়াছি। আজ আমরা হিন্দু-গর আচার-ব্যবহারের অর্থ না বুঝিয়া, পাদরীদের পড়ান শুনিয়া, হিন্দুদিগের eugenics বা সুপ্রজনন বিদ্যা-ত আচার-ব্যবহারকে নিরর্থক বোধ করিয়া অগ্রাহ্য রয়া, শৈশবকাল হইতেই পুত্রকন্যাকে ভোগেরই পথে শঃই ঠেলিয়া দিতেছি ; আজ তাই এদেশে—

(ক) অকাল—শিশু-মৃত্যু।

(খ) শিশুদিগের স্বাস্থ্যহীনতা ও রোগপ্রবণতা।

(গ) শিশুদিগের শ্রী ও বুদ্ধির হ্রাস।

(ঘ) বিকলাঙ্গ, জন্মজড়, হীনবুদ্ধি, বুদ্ধিহীন শিশুর ল্য।

আমরা, জাতি-হিসাবে, এই বিষয়গুলির সংবাদ রাখি কি ? উত্তরে বলিব—আজ আমরা মুখে "নেসন" (জাতি ?) বলিয়া যত চেঁচাই না কেন, আজ জাতি হিসাবে, আমরা মরিয়াছি। যদি না মরিতাম, তাহা হইলে, বাঙ্গালাদেশে যে ভীষণ হারে শিশু-মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, তাহা দেখিলে কখনো স্থির থাকিতে পারিতাম না ! আজ আমরা স্বার্থপর, খবুদ্ধিসম্পন্ন ও মৃতকল্প না হইলে, নিম্নলিখিত শিশু-মৃত্যুর হার দেখিয়া যে যার সকলেই কাজকর্ম্ম ফেলিয়া, ইহার প্রতিবিধানার্থ উন্মত্তপ্রায় নিশ্চয়ই হইতাম ! কিন্তু কৈ, এই বাঙ্গালা দেশ আজ নীরব—যেন এখানে কিছুই হয় নাই। এই বাঙ্গালী আজও পঙ্গপালের ন্যায় চাকুরী করিতে ছুটিয়াছে ! এই বাঙ্গালী আজও মুখে গ্রাস তুলিয়া নিশ্চিন্ত মনে খাইতেছে ! এবং সব্বা পেক্ষা দুঃখ ও নিরাশার কারণ এই যে, এই বাঙ্গালার মাতৃকুল আজও রাত্রিতে সুখশয্যায় শুইয়া ঘুমাইতে পারিতেছেন ! এই দুর্ভাগা বাঙ্গালার প্রত্যেক ২ মিনিট অন্তর যে একটি করিয়া শিশু তাহার মায়ের কোল ছাড়িয়া যাইতেছে—এ বাঙ্গালায় বৎসরে যত শিশু জন্মায়, তাহার অর্দ্ধেকই যে মারা পড়ে—এ কথাগুলি কি বাঙ্গালার মর্ম্মে শেল হইয়া বিঁধে না ? বাঙ্গালী ও বিশেষ করিয়া বঙ্গ-রমণীরা কি এতটাই হৃদয়হীন হইয়াছেন ? তবে শোন মা বঙ্গ-নারিগণ :—

বঙ্গদেশে শিশুমৃত্যুর তালিকা—

(ক) প্রত্যেক ২ মিনিট অন্তর ১টি শিশু মারা পড়ে।
(খ) শতকরা ৫০টি শিশু মারা পড়ে।
(গ) এই বাঙ্গালাদেশে প্রত্যহ

১	দিন	বয়স্ক	২৪৫টি	শিশু	মরিতেছে।
৭	"	"	১৩৯টি	"	"
১৪	"	"	৯৬	"	"
১	মাস	"	৮৫	"	"
২	"	"	৫৭	"	"
৩	"	"	৪১	"	"
৪	"	"	৩৬	"	"
৫	"	"	২৬	"	"

মাস	বয়স্ক			শিশু	মরিতেছে
৬	,,	,,	২২	,,	,,
৭	,,	,,	১৭	,,	,,
[illegible]	,,	,,	১৬	,,	,,
৯	,,	,,	১৫	,,	,,
১০	,,	,,	১০	,,	,,
১১	,,	,,	৮	,,	,,
১২	,,	,,	৬	,,	,,

অর্থাৎ এই বাঙ্গালা দেশে—

প্রত্যহ		৮১৬টি	শিশু	মারা পড়িতেছে
প্রত্যেক মাসে		২৪৪৮০	,,	,,
,,	বৎসরে	২৯৩৭৬০	,,	,,
,,	১০ ,,	২৯৩৭৬০০	,,	,,
,,	২০ ,,	৫৮৭৫২০০	,,	,,

যদি এই ৫৮৭৫২০০ শিশু না মারা পড়িত, এবং গড় পড়তা তাহারা মাসিক ১০৲ টাকা উপার্জ্জন করিত, এবং তাহারা ৩০ বৎসর ধরিয়া এই ১০৲ টাকা উপার্জ্জন করিত, তবে এদেশে অন্ততঃ

২১,১৫০,৭২০ ০০০ টাকা থাকিত!!!

(৪) শিশুরা এত মারা পড়ে কেন?

শুধু মায়া-মমতার হিসাবে নয়, আর্থিক হিসাবেও, শিশু-মৃত্যু কত ক্ষতিকর, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। এখানে প্রশ্ন হইতেছে—প্রথমতঃ, এ দেশের শিশু মৃত্যুরই হার কি বেশী, না অপর দেশেও তাই? এবং দ্বিতীয়তঃ, এ দেশে শিশু-মৃত্যুর কারণ কি?

প্রথমতঃ অন্যাপর দেশের শিশু-মৃত্যুর হার কত, তাহা দেখা যাউক :—

১০০০টি শিশুর মধ্যে, বৎসরে,

ভারতবর্ষে	২০৬ টি শিশু মরে	
বাঙ্গালায়	১৮৫	,,
বিহার উড়িষ্যায়	১৮০	,,
ইংলণ্ডে	৯১	,,
অষ্ট্রেলিয়ায়	৭১	,,
নিউজিলণ্ডে	৫১	,,

যদি শুধু কলিকাতার হিসাব লওয়া যায় তবে দেখা যায়,—

খৃঃ অঃ	জন্ম	মৃত্যু	মৃত্যুর হার
১৯১৭	১,৬২৭,৮৭১	৩০০৫১৪	১৮৫
১৯১৮	১,৪৮৯,১৩৫	৩৩৯৬৪৯	২২৮
১৯১৯	১২৪৫৩৯২	২৮৫২৯৪	২২৮
১৯২০	১৩৫৯৯১৩	২৮২০৯০	২০৭
১৯২১	১৩০১০০১	২৬৮১৬২	২০৬

এইবার দেখা যাউক, এত শিশু মৃত্যুর কারণ কি? এই কথার উত্তরে সর্ব্বাগ্রেই বলা উচিত যে, কোনও কায করিয়া সাফল্য লাভ করিতে হইলে, তদ্বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকা চাই। অভিজ্ঞতা জ্ঞানসাপেক্ষ। যে কয়টি মানব-জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও চরম কায, যে কার্য্যের ফল সমস্ত বংশ ও জাতিটাকে ভোগ করিতে হইবে, যে কার্য্যের ফলের উপরে উত্তরকালের জগতের সুখ-দুঃখ নির্ভর করিতেছে,—কি পরিতাপের বিষয়, সেই কার্য্য সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দূরে থাকুক, জ্ঞানলাভের এতটুকু চেষ্টাও নাই—বরং স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরাচারের বাহুল্যই দেখা যায়। হিন্দু কখনো এ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না; তাঁহার শাস্ত্রে 'ইউজেনিক্‌স্' (বা সু-প্রজনন বিদ্যার) নামোল্লেখ না থাকিলেও, নিত্য শাস্ত্রানুশাসনের ভিতর দিয়া হিন্দু এই মহৎ কার্য্য সাধিত করিয়া লইতেন। আর আজ পাশ্চাত্য জগৎ "ইউজেনিক্‌স্" বলিয়া চীৎকার করিতেছে মাত্র, দৈনন্দিন জীবনে, ছাগ, কুকুর, চটকপক্ষীর সদৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতেছে।

জ্ঞানের অভাবই এদেশের প্রধান অভাব। আমাদের দেশ অতীব দরিদ্র, এ কথা মানি; কারণ, জন-পিছু বৎসরে আয়—

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে—৭২ পাউণ্ড			
অষ্ট্রেলিয়ায়	৫৪	,,	
ইংলণ্ডে	৫০	,,	
ক্যানেডায়	৪০	,,	১ পাউণ্ড
ফ্রান্সে	৩৫	,,	=১৫৲ গড়ে।
জার্ম্মাণীতে	৩০	,,	
ইতালিতে	২৩	,,	
জাপানে	৬	,,	

ভারতবর্ষের জন-পিছু বাৎসরিক আয় :—

দাদাভাই নওরোজীর মতে	২০৲ টাকা
লর্ড কার্জ্জনের মতে	৩০৲
ডাইরেক্টর্ অফ ষ্টাটিস্‌টিক্‌স্ মতে	৫৩৲
মিঃ রাধালকারের মতে	৪১৲

এত ভীষণ দারিদ্র্য এদেশে, তাহা খুব মানি ; কিন্তু তাহার চেয়ে ভীষণতর যে অজ্ঞতা। ইংরাজী অর্থে literate (অর্থাৎ বর্ণজ্ঞান মাত্র আছে) এই সংকীর্ণ অর্থেও যদি লই, তবে এ দেশের অবস্থা একবার ভাবিয়া দেখুন :—

কোন্ দেশে শতকরা কতগুলি শিশু বর্ণপরিচয় করিতেছে—

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে	১৯.৮৭
ইংলণ্ডে	১৬.৫২
জার্ম্মাণীতে	১৬.৩০
ফ্রান্সে	১৩.২০
সীলোনে	৮.৯৪
রুসিয়ায়	৩.৭৭
ভারতবর্ষে	২.৩৮

শিক্ষা বাপদেশে ব্যয়ের তালিকাটা দেখুন :—

দেশের নাম	জনসংখ্যা	বাৎসরিক শিক্ষা বাবদে ব্যয়
আমেরিকার যুক্তরাজ্য	১০ ক্রোর	১৬৭ ক্রোর
ভারতবর্ষ	৩০ "	১২৷৷০ "

এত গেল ইংরাজী মতে শিক্ষার কথা—যে শিক্ষা মানুষের মনুষ্যত্বকে ফুটায় না, শুধু রাজকার্য্য চালানর উপযোগী কেরাণী, ডাক্তার, উকীল প্রভৃতির সৃষ্টি করে। প্রকৃত জ্ঞানের চর্চ্চা একরকম নাই বলিলেও হয়—তাই বলিতেছিলাম যে, এদেশে অর্থের অভাবের চেয়েও বহু গুণে জ্ঞানের অভাবটাই প্রকট।

প্রাচীন হিন্দুরা অতীব দূরদর্শী ছিলেন। সেই দূরদর্শিতার ফলে তাঁহারা যে ভাবে সমাজ-বন্ধন করিয়া গিয়াছিলেন, আজ সে সমাজ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। তৎকালের সমাজে, "বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে" ছিল ; গর্ব্বোন্নতশির মহারাজ-চক্রবর্ত্তীও দীন ভিখারীর পায়ে মস্তক লুণ্ঠিত করিতেন—যদি সে ভিখারী জ্ঞানে ধনী হইতেন। সে কালের হিন্দুসমাজে যতটা democracy বা গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল, কোনও কালে কোনও দেশে এখনো তাহা হয় নাই। হিন্দুসমাজের বারো মাসে তের পার্ব্বণের সময়গুলি ইতর-ভদ্র-নির্ব্বিশেষে মেলামেশার সুযোগ প্রদান করিত। কথকতা, যাত্রা, পাঠ প্রভৃতি জনশিক্ষার আয়োজন ছিল। সমাজ সর্ব্বতোভাবে শিক্ষক-প্রাধান্যকে নিঃশঙ্ক করিত—ব্রাহ্মণেরা তৎপরিবর্ত্তে লোক শিক্ষার ভার লইতেন। এই ভাবে, হিন্দুসমাজে, 3 R's (অর্থাৎ ইংরাজী মতে কেতাবতী শিক্ষার) এর প্রচলন না থাকিলেও, হিন্দুমাত্রেই দেশের পুরাতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি অবগত ছিলেন ; এবং বৈদ্যকুল রাজন্যবর্গ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হওয়ায়, বিনাব্যয়ে এ দেশে চিকিৎসা চলিত। এবং সব চেয়ে বড় কথাটা এই ছিল যে,—তখন সমাজদেহে প্রাণ থাকায়, অন্যোন্য সহানুভূতিশীল সকলেই ছিল। তাই তখন কাহারো একটুকু মাথা ধরিলে সমস্ত সমাজ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িত। আর এখন—যে যার শুধু নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত। তাই আজ এদেশে—

(ক) জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা হইল না।

(খ) ভ্রাতৃ-ভাবের, পরার্থপরতার প্রসার হইল না।

(গ) অজ্ঞানতা গাঢ় হইতে

(ঘ) বর্ত্তমানের বিপদ।

আমরা যদি খাঁটি হিন্দুর বা মুসলমানের দিক দিয়া দেখি, তবে বলিব যে, আমরা ইংরাজী অর্থে "নেশন" না থাকিলেও, আমরা একটা "জাতি" ছিলাম, আমাদের সমাজ, শিক্ষার প্রতিষ্ঠান, জাতীয়তার অনুকূল বিধি সকলই ছিল। কিন্তু আজ সে সকলই একে একে লোপ পাইয়াছে।

লিখিত-পঠিত ভাবে হিন্দু-চিকিৎসা-শাস্ত্রের ভিতর "স্বাস্থ্যতত্ত্ব"—বিষয়ক কোনও পুস্তক না থাকিলেও, ধর্ম্ম ও আচারের অনুশাসনের প্রত্যেক গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে স্বাস্থ্য-তত্ত্ব ওতঃপ্রোত ভাবে বিদ্যমান ছিল এবং এখনো আছে—আমরা তাহা বুঝিতে চেষ্টা করি না। যদি habit is second nature (অভ্যাসই প্রকৃতির তুল্য) কথাটা সত্য হয়,—তবে হিন্দুদের দূরদর্শিতার প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না ; যে হেতু তাঁহারা প্রত্যেক হিন্দুর দৈনিক জীবনের প্রত্যেক পাদবিক্ষেপে, এবং সামাজিক প্রত্যেক অনুষ্ঠানের ভিতরে পূর্ণমাত্রায় স্বাস্থ্যানুকূল বিধি

জড়াইয়া রাখিয়া গিয়াছেন—ধর্ম্মের সঙ্গে শরীরের সুস্থতা-মূলক বিধি একই সূত্রে গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন।

এখন আমাদের মুস্কিল হইয়াছে এই যে, আমরা দেশ ও দেশের সকল জিনিসকে ছোট করিয়া দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি, এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় পূর্ণ অধিকারী হইতে পারি নাই। যাঁহারা সংবাদপত্রাদি রীতিমত পাঠ করেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, পাশ্চাত্য জাতিরা ইতিহাস-তৈয়ার কার্য্যে সিদ্ধহস্ত। অর্থাৎ তাঁহারা ইচ্ছামত "লেজা-মুড়া" বাদ দিয়া স্থানে-স্থানে ইচ্ছামত ও স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনানুযায়ী রং ফলাইয়া ঘটনাগুলিকে প্রকাশিত করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান শিক্ষার ও পাশ্চাত্য সংস্রবের ফলে, আমাদের দেশের যাহা কিছু তদ্বিষয়ে আমাদের ঘৃণা জন্মিয়াছে; আমাদের দেশকে, সমাজকে, ধর্ম্মনীতিকে, আচারব্যবহারকে, শিক্ষার বিষয়গুলিকে হেয় ও হীন বিবেচনা করাইবার জন্য অনেক প্রকার চেষ্টা করার ফলে, শৈশব হইতে জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে, পরের শিখান বুলি আবৃত্তি করিবার সঙ্গে সঙ্গে এ দেশ অসভ্যদেশ, এ দেশে প্রশংসার কিছুই নাই, ইত্যাকার সংস্কারগুলিকে মগজে ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার ফলে তিনটি বিষম জিনিস গজাইয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে; যথা—

(ক) Change of mentality অর্থাৎ আমাদের ভাবনার ও চিন্তার ধারা উল্টাইয়া গিয়াছে—আমরা সাহেবদিগের মুখে ঝাল খাই, সাহেবেরা যে রঙ্গীন্ কাচ আমাদের চক্ষের সম্মুখে ধরেন, সেই রঙ্গে সকল জিনিসই রঞ্জিত দেখি এবং সেই মতই কথা বলি; "নিজেদের" বলিতে যাহা কিছু, সে সকলকেই ঘৃণা করি; আর পাশ্চাত্যদের ময়লাকেও চন্দন বলি।

(খ) ভারতসাম্রাজ্য চালনার উপযোগী শিক্ষাদানের ফলে কতকগুলি অপক্ক ডাক্তার, উকীল, হাকিম, কেরাণী প্রভৃতি সৃষ্টি হইতেছে; ঠিক্ যেটুকু বিদ্যা হইলে দিনগত পাপক্ষয় করা চলে, সেইটুকু ভাসা-ভাসা জ্ঞান লইয়া ইহারা সমাজে "শিক্ষিত" নামে পরিচিত হইতেছে এবং প্রকৃত "শিক্ষা" বস্তুটি যে কি তাহার সংজ্ঞাকে লোপ করিতে বসিয়াছে।

(গ) এদেশে "শিক্ষিত" বলিতে, বর্ত্তমানকালে, বর্ণ-পরিচিতকেও বুঝায় (merely literacy); সে হিসাবে, ইংরাজদিগের দেড়শত বৎসর রাজত্বের ফলে এ দেশে শতকরা মাত্র ৪ জন "শিক্ষিত"; কিন্তু এ দেশের আপামর সাধারণ সকলেই নিজ নিজ কৌলিক আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, সমাজ-নীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে যথেষ্টই জ্ঞানী ছিল—তাহাদের বর্ণজ্ঞান না থাকিলেও, হিসাব-নিকাশ, ব্যবসায় বুদ্ধি, লোক-ব্যবহার-জ্ঞান প্রভৃতি যথেষ্টই ছিল। আজ আমরা তাহাও খোয়াইতে বসিয়াছি—ইংরাজের প্রদত্ত কেতাবতী বর্ণ-জ্ঞানের খোঁটা ধরিয়া বসিয়া আছি!

এই বিষম বিপাক হইতে এ জাতিটাকে উদ্ধার করিতে হইলে, জাতীয় শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে—যে ধর্ম্ম, যে আচার, যে রীতি-নীতি এদেশে প্রচলিত ছিল, সেই ছাঁচে বর্ত্তমান সময়োপযোগী অদলবদল করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে—তবে যদি এ জাতিটা আবার জীবন্ত হইয়া উঠে।

(৫) জাতীয় অবনতির হিসাব।

জাতি হিসাবে আমরা যে কতটা ক্ষীণ ও হীনবীর্য্য এবং রোগপ্রবণ হইয়াছি, একবার তাহা দেখা যাউক। কোন্ দেশের লোক গড়ে কত বৎসর বাঁচে, একবার সেইটা আলোচনা করা যাউক :—

দেশের নাম	পুরুষ	স্ত্রী
নিউজিলাণ্ড	৫৯·১৭	৬১·৭৬
অষ্ট্রেলিয়া	৫০·২০	৫৮·৮৪
ডেনমার্ক	৫৪·৯০	৫৭·৯০
নরওয়ে	৫৪·৮৪	৫৭·৭২
সুইডেন	৫৪·৫৩	৫৬·৯৮
হল্যাণ্ড	৫১·০০	৫৩·৪০
আমেরিকা যুক্ত রাজ্য	৪৯·৩২	৫২·৫৪
সুইজারল্যাণ্ড	৪৯·২৫	৭২·১৬
ইংলণ্ড	৪৬·৫৩	৫২·৩৮
ফ্রান্স	৪৫·৭৪	৪৯·১৩
জার্ম্মানী	৪৪·৮২	৪৮·৩৩
ইটালী	৪৪·২৪	৪৪·৮৩
জাপান	৪৩·৯৭	৪৪·৮৫
ভারতবর্ষ	২২·৫৯	২৩·৩১

এইবার দেখা যাউক, এ দেশের গত আদমসুমারীতে (১৯২১) লোক সংখ্যার হার কত :—

বাল্মীকি বলেন মাতা প্রাণ ত্যজ নাই।
বাঁচিবেন এখনি রাঘব চারি ভাই॥

শিল্পী—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

বঙ্গদেশের মোট আয়তন	৮২,২৭৭ বর্গমাইল।	
বৰ্দ্ধমান বিভাগের লোক সংখ্যা	—৪.৯ (হ্রাস)	শতকরা
প্রেসিডেন্সী বিভাগের "	+ ০.৪ (বৃদ্ধি)	"
রাজসাহী " "	+ ১.৯ (")	"
চট্টগ্রাম " "	+ ১০.৭ (")	"
ঢাকা " "	+ ৭.১ (")	"
সমস্ত বাঙ্গালাদেশে লোকসংখ্যা	+ ২.৮ (")	"

বাঙ্গালাদেশে জন্মের হার কি হারে কমিতেছে, তাহা এইবার তুলনা করিয়া দেখুন :—

	শতকরা
১৮৭২—১৮৮১ আদমসুমারীতে হার ছিল	১১.৪ +
১৮৮১—১৮৯১ " "	৭.৩ +
১৮৯১—১৯০১ " "	৫.১ +
১৯০১—১৯১১ " "	৮.০ +
১৯১ —১৯২১ " "	২.৮ +

(৭) দেশের লোক মরে কিসে ?

(ক) প্রথমতঃ ব্যারামে এদেশের লোক মরে। তাহার হিসাব লউন :—

এই বাঙ্গালাদেশে, প্রত্যহ,

১২ মিনিট অন্তর ১টি লোক ম্যালেরিয়ায় মারা পড়িতেছে।

৩ " " "	নিউমোনিয়ায়	"
৪ " " "	ওলাউঠায়	"
৪ " " "	আমাশয়ে	"
৫ " " "	ক্ষয়রোগে	"
৮ " " "	সূতিকা	"
১৫ " " "	ধনুষ্টঙ্কারে	"
৩০ " " "	কালাজ্বরে	"
২৪ ঘণ্টা " "	টাইফয়েড্ জ্বরে	"

এই বাঙ্গালাদেশে

জন্মের হার ৪৬.৭

মৃত্যুর হার ৪০.০

দ্বিতীয়তঃ, যথোপযুক্ত খাদ্যের অভাবে এ দেশে লোক মরে। দুধ ও ঘি আর পাইবার উপায় নাই; অথচ, এদেশে হিন্দু নামধেয়ী এমন কেহই ছিলেন না, যাঁহার ঘরে দশ বিশটা দুগ্ধবতী গাভী না থাকিত; আর এখন - প্রতি একশত লোক পিছু কোন্ দেশে কতগুলি গাভ আছে, তাহা দেখুন :—

অষ্ট্রেলিয়ায়	২৫৯টা গরু
নিউজীলণ্ডে	১৫০ "
কেপ-কলোনীতে	১২০ "
ক্যানাডায়	৮০ "
আমেরিকার যুক্তরাজ্যে	৭৯ "
ডেন্মার্কে	৫০ "
ভারতবর্ষে	৫০ "

তাহার পর, ধান-শস্যের উৎপন্নের হার লউন :—

সমগ্র ভারতে ৩৫ ক্রোর লোকের বাস। অতি কম করিয়া ধরিলেও, এই ভারতবর্ষে

আবশ্যক হয়, পুরা—৭৯০০০০০০ টন

কিন্তু জন্মায় চাউল——৬৪,০০০০০০ "

শস্য ও খড় ইত্যাদি ১৫,০০০,০০০ "

তৃতীয়তঃ, বিনা চিকিৎসায় বা অচিকিৎসায় লোক মরে :—

এই বাঙ্গালাদেশে

লোকের বাস ৪৬০০০০০০

সুশিক্ষিত চিকিৎসক আছেন ৩৫৩৮

হাতুড়ে আছেন ১৭০০০

অর্থাৎ প্রত্যেক ১২৫০০ লোক পিছু ১ জন সুচিকিৎসক এবং " ২২৪০ " " ১ " যে কোনও রকমের চিকিৎসক আছেন।

(৮) উপসংহার।

প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত বেশী হইয়া গেল বলিয়া সংক্ষেপে সকল কথার সার গুলি এইখানে একত্রিত করিয়া দিলাম।

১। শিশুরাই ভাবী বংশধর—দেশের আশা ভরসা।

২। এ দেশে, ব্যক্তিগত অজ্ঞতা ও জাতিগত ঔদাসীন্যই প্রাত্যহিক ৮১৬টি শিশুর মৃত্যুর কারণ।

৩। "দেশ" বা গ্রামগুলি এখন রোগের আকর; দেশব্যাপী দৈন্য; আমরা চাকুরী-জীবি; প্রকৃত শিক্ষার পরিবর্ত্তে দেহ ও মন ধ্বংসকারী বিজাতীয় শিক্ষার অতি প্রসার; এই সকল কারণে, আমাদের জীবনী-শক্তির অপচয় ও হ্রাস ঘটিতেছে।

৪। খাদ্য সম্বন্ধে আমরা যেমন অজ্ঞ, তেমনি

উদাসীন। এখন সর্ব্বভুক হইয়াছি বটে, কিন্তু পর্ব্বত প্রমাণ ভেজাল দেখিয়াও বিচলিত হই না। গরুকে মাতা বলি বটে, কিন্তু গরুর যেরূপ দুর্দ্দশা আমরা ঘটাইয়াছি, তেমনটি গোখাদক জাতিরাও করে নাই।

৫। এক্ষণে কর্ত্তব্য কি?—

প্রথম কর্ত্তব্য।—মৃত্যুর হারটি সকলকে জানান।

দ্বিতীয় কর্ত্তব্য।—স্বাস্থ্য-তত্ত্ব, মাতৃত্ব-তত্ত্ব, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান বিস্তার করা ও জাতীয় বিদ্যালয়ের বহু প্রসার ঘটান।

তৃতীয় কর্ত্তব্য।—ধাত্রী, আঁতুড় ঘর প্রভৃতির উন্নতি সাধন করা।

চতুর্থ কর্ত্তব্য।—গো জাতির উন্নতি করা; আইন দ্বারা উৎসর্গীকৃত বৃষকে মিউনিসিপ্যালিটির কবল হইতে উদ্ধার করা। গোচারণ ভূমির পরিসর বৃদ্ধি করা। গো-পালন, গো-সেবা ও গো-চিকিৎসার বহুল ভাবে প্রসার ঘটান। দেশ বিদেশ হইতে উৎকৃষ্ট বৃষ আনাইয়া গো-জাতির উন্নতি সাধন করা।

পঞ্চম কর্ত্তব্য।—ছেলেদের স্কুলের মত, "বাবা-বিদ্যালয়" স্থাপন করা—জ্ঞান ও বিজ্ঞান চর্চ্চায় পিতামাতার ও অভিভাবকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। যত দিন অভিভাবকেরা ছেলেদের স্কুলের বেতন ও গৃহ-শিক্ষকের বেতন যোগাইয়া কর্ত্তব্যের চূড়ান্ত করিতেছেন মনে করিবেন; যত দিন জনসাধারণ ডাক্তারগণকে দূরে রাখিবেন,—যত দিন জনসাধারণ শিক্ষার দিকে মনোনিবেশ না করিবেন, তত দিন আমাদের দুরবস্থা কমিবে না।

ষষ্ঠ কর্ত্তব্য।—জাতীয়তাব্যঞ্জক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। ইংরাজদিগের অনুকরণে আতুরাশ্রম, সেবাশ্রম, খোকা-হাসপাতাল সুধু করিলে চলিবে না। শিশু-লালন পালনার্থ সমস্ত দেশের লোককে অবহিত হইতে হইবে। ষষ্ঠী উৎসব, নন্দোৎসব, গোপাষ্টমী প্রভৃতি ধাঁজের উৎসব-গুলি যাহাতে সারা জাতির মধ্যে প্রাণের সাড়া আনিয়া দেয়—ধর্ম্ম, বর্ণ, জাতি নির্ব্বিশেষে সকলকেই তাহা করিতে হইবে। তবে যদি শিশুকুলের আবার উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে!!!

শিশুশিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ গুহ, বি-এ

(১)

মধ্যযুগের ইয়োরোপে শিক্ষক-সম্প্রদায়ের ধারণা ছিল যে, শিশুদের মন নরম মাটির মত, উহাকে যেরূপ ইচ্ছা সেরূপ আকারে গড়িয়া তোলা যায়। কেহ কেহ মনে করিতেন, শিশুদের মন রেখাবিহীন শ্লেট (tabula rasa), উহাতে শিক্ষক যাহা ইচ্ছা অঙ্কন করিতে পারেন। কিন্তু, আধুনিক যুগের শিক্ষাবিজ্ঞানবিৎগণের মত এই যে প্রত্যেক শিশুর একটা স্বতন্ত্র স্ব-ভাব (individuality) আছে · সেই স্ব-ভাবের বিকাশই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। "Education" শব্দের বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যায়,—e, বহিঃ, এবং ducere, গতিপথ নির্দ্দেশ করা, স্ফুরণে সহায়তা করা; 'education' শব্দের মৌলিক ভাব স্ব-ভাবের স্ফুরণ বা বিকাশ। শিক্ষকের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক বিশেষত্বের অনু-সন্ধান করা, ও সেই বিশেষত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিভিন্ন পাঠ্যতালিকা ও কার্য্যতালিকার নির্দ্ধারণ করা। একই পাঠ্যতালিকা বা কার্য্যতালিকা অনেকগুলি বালকের জন্য ব্যবস্থা করিলে, কখনও তাহা কাহারও বিশেষত্বের স্ফুরণে সহায়তা করে না; সকলে একই বিধানে অনুশাসিত হইলে, প্রত্যেকের বিশেষত্ব নষ্ট হইয়া যায়। বিশেষত্বের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া পাঠ্যতালিকায় যে নির্দ্দেশ, তাহাকে "education" শব্দের দ্বারা অভিহিত করিলে, "education" শব্দটীর অপব্যবহার হইবে; ঐ প্রকার নির্দ্দেশকে "Super-

imposition" বা শিক্ষকের স্বেচ্ছানুশাসন বলা যাইতে পারে, অথবা আধ্যান্তর ব্যবহার করা যাইতে পারে; কিন্তু তথায় "education" শব্দটীর ব্যবহার যুক্তিযুক্ত নহে।

রুশো (১৭১২—৭০) ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে "Emile" নামে শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে তিনি শিক্ষকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে মতের প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা অল্প কথায় এই—শিক্ষকের কর্ত্তব্য, শিশুর প্রকৃতিগত বৃত্তিসমূহের অনুশীলন এবং ক্রমবিকাশের সহায়তা করা; শুধু কতকগুলি ঘটনা, আখ্যান বা তথ্যের সহিত পরিচিত করা নয়। রুশোর কিছুদিন পরে, Pestalozzi (১৭৪৬—১৮২৭) শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে বহু দিন ধরিয়া গবেষণা করেন, এবং "How Gertrude teaches her children" নামে অনুবাদিত মূল্যবান গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। ঐ গ্রন্থে তিনি অনেকগুলি শিশুকে একই ক্লাসে রাখিয়া শিক্ষা দিবার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক শিশু এক একটি স্বতন্ত্র ক্লাস। শিক্ষকের কর্ত্তব্য প্রত্যেক শিশুকে একটি প্রাণবাণ সত্ত্বা মনে করা, এবং তাহার বৈশিষ্ট্যের সহিত পরিচিত হওয়া। তাহাকে ক্লাস-রূপ জড় পদার্থের অণুর তুল্য মনে করিলে বিশেষ ভুল করা হইবে। তাঁহার মতে শিশুশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ব্যাকরণ বা গণিতের চর্চ্চা নয়, শিশুর মনোবৃত্তির বিকাশের চেষ্টাই শিক্ষকের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তিনি বলেন, জীবনের চরিত্রবত্তা, শৈশবের প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি ভাবের অনুশীলনের ফলেই পাওয়া যায়। শিশুর ঐ সব মনোবৃত্তির পর্য্যবেক্ষণ ও অনুশীলন করাই শিক্ষকের কর্ত্তব্য। Pestalozzi'র কিছুদিন পরে Froebel (১৭৮২-১৮৫২) Kindergarten পদ্ধতির প্রচার করেন। তিনি তাঁহার "Education of Man" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—"The purpose of teaching is to bring ever more *out of* man rather than to put more and more *into* him (Froebelএর "Education of man," W. N. Hailmann কৃত অনুবাদ, ২৭৯ পৃষ্ঠা)। তিনি আরও বলিয়াছেন—"the function of the teacher is that of benevolent Superintendence"; অর্থাৎ, তাঁহার মতে, শিক্ষকের কার্য্য প্রধানতঃ অন্তর্নিহিত শক্তি ও বৃত্তির উন্মেষে সাহায্য করা এবং গৌণ উদ্দেশ্য বাহ্য অনুশাসনাদির বিধান। বর্ত্তমান শতাব্দীতে আচার্য্য Maria Montessori শিশুশিক্ষা পদ্ধতির প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছেন। Montessori-পদ্ধতিতে পরিচালিত বিদ্যালয় সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ লিখিয়াছেন—"The teacher here is expected to observe and direct the activities of the child rather than to control them. The large degree of freedom allowed and the individual treatment are features which differentiate these schools from what are customarily found elsewhere"......... "courts and gardens are connected with these schools and these are used in training children to observe flowers and plants as well as birds and small animals kept as pets" অর্থাৎ, এই সকল শিক্ষাগারে শিক্ষকের কর্ত্তব্য শিশুদের কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ এবং তাহাতে যতদূর সম্ভব বাধা না দিয়া পরিচালিত করা। সাধারণ শিক্ষাগার হইতে এই সকল শিক্ষাগারের বিশেষত্ব এই যে, এখানে শিশুদের কার্য্যের স্বাধীনতা অনেকটা বেশী, এবং শারীরিক এবং মানসিক বৃত্তির তারতম্য অনুসারে এখানে বিভিন্ন প্রকারে লালন পালনের ব্যবস্থা এবং পাঠ্যতালিকার নির্দ্দেশ করা হয়।.........এই সকল শিক্ষাগারের সঙ্গে খেলার জায়গা এবং বাগান সংলগ্ন থাকে। এখানে শিশুদের গাছপালা, ফলফুল, পোষা পশুপক্ষীর সহিত পরিচিত করিবার সুব্যবস্থা আছে।

(২)

এখানে দুর্ব্বল, বিকৃতবুদ্ধি এবং রোগগ্রস্ত শিশুদের সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। শিশুদের মধ্যে দৈহিক এবং মানসিক তারতম্য থাকিলেও, এমন শিশুর সংখ্যা খুবই অল্প, যাহাদিগকে উপযুক্ত ব্যায়াম চিকিৎসা প্রভৃতি দ্বারা সমাজের উপকারী, কার্য্যক্ষম ব্যক্তিতে পরিণত করা যায় না। দুর্ব্বল, বিকৃতবুদ্ধি ও রোগগ্রস্ত শিশুদের জন্য এদেশে এখনও সমাজ কোন প্রকার ব্যবস্থা করে নাই। কতকগুলি শিশু দেখা যায়, পড়া মনে রাখিতে পারে না, শুধুই

বদ্-খেয়াল, কু-কাজে ব্যাপৃত। এই প্রকার শিশুদের লইয়া গবেষণা, ঐ প্রকার শারীরিক ও মানসিক অস্বাস্থ্যের কারণ নিরূপণ ও নিরাকরণের উপায় উদ্ভাবন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে (United States of America) অনেক পরিষৎ (Bureau) এবং চিকিৎসালয় (Hospital) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; অনেক শিক্ষাবিজ্ঞানবিৎ ও চিকিৎসক ইহাদের তত্ত্বাবধান কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। এই প্রকারের Bureau বা পরিষৎকে Research Bureau of Juvenile Delinquency, অর্থাৎ শিশুদের কু-কাজ সম্বন্ধে গবেষণার সমিতি বলা হয়। গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে, অধিকাংশ কু-কাজের মূলে শিশুর শারীরিক বা মানসিক অস্বাস্থ্য বর্ত্তমান থাকে। নিম্নে ঐ প্রকারের একটি পরিষৎ হইতে প্রকাশিত একখানি পুস্তক হইতে দুইটি উদাহরণ ভাষান্তরিত করিয়া উদ্ধৃত করিতেছি।

(১) W. Colman, বয়স ১৩ বৎসর, ৭ মাস। জিনিসপত্র ভাঙ্গে, অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দৌরাত্ম্য করে, ইত্যাদি। আটবার হাসপাতালে গিয়াছে।

মে মাস, ১৯১৯ তাহাকে এই হাসপাতালে দেওয়া হয়। মস্তিষ্কের পরীক্ষায় শক্তিহীনতা ও মানসিক বিকারের পরিচয় পাওয়া যায়। শরীরের পরীক্ষায় পাওয়া যায়, আটটি দাঁত খারাপ এবং Kidney অসুস্থ। চিকিৎসক Kidneyর চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। উপযুক্ত পথ্যাদির ব্যবস্থা হইল। ছয় সপ্তাহ পরে সে সুস্থ হইল এবং উপযুক্ত পরীক্ষার পর তাহাকে বাড়ীতে ফিরাইয়া দেওয়া হইল। তার পর তার বাড়ী হইতে কয়েকখানা চিঠি পাওয়া গিয়াছে। এখন তাহার অবস্থা ভালই চলিতেছে।

(২) P. Kathryn, বয়স ১৬ বৎসর। স্কুল হইতে পলাইয়া যায়। অত্যন্ত দুরন্ত। ইত্যাদি।

তাহাকে এখানে আনা হইল। পরীক্ষায় দেখা গেল, বুদ্ধি বেশ আছে, কিন্তু মস্তিষ্কের কাজ (function) বিকৃত। তাহার পূর্ব্বের ইতিহাস লওয়া হইল। তাহাকে যতদূর সম্ভব সুখী করিতে চেষ্টা করা হইল; আনন্দজনক খেলা-ধূলার ব্যবস্থা করা হইল। কিছুদিন পরে মস্তিষ্কের বিকার চলিয়া গেল। তাহাকে বিদ্যালয়ে পাঠান হইল। এখন হইতে সে ভাল করিয়া পড়াশুনা করিতে লাগিল। অল্প দিন হইল খবর পাওয়া গিয়াছে যে, সে নিজের জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে। এখন সে আত্মসম্মান বুঝিতে পারে, এবং সম্পূর্ণ সৎপথে চলিতেছে।

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যে সকল শিশু লেখাপড়ায় বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, তাহার মূলে তাহাদের শারীরিক অস্বাস্থ্য বা দুর্ব্বলতা আছে। তাহাদের এই অস্বাস্থ্য বা দুর্ব্বলতা দূর করিলেই তাহারা অন্যান্য সাধারণ শিশুর মত লেখাপড়ায় বেশ ভাল হইতে পারে। অস্বাস্থ্যের প্রাদুর্ভাব শিশুদের মধ্যে কত, নিম্নে অনুবাদিত যুক্তরাজ্যের ওহিও প্রদেশের শিশুমঙ্গল পরিষদের। (Ohio Bureau of Juvenile Research, U. S. A.) প্রকাশিত সেনসাস হইতে গৃহীত একটি নমুনা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে:—

৪৬০টি বালকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হইল।
১৭৭ জনের খাদ্যের অভাবে শরীর অপুষ্ট।
১৭৫ জনের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ।
২৮ জনের শ্রবণশক্তি ক্ষীণ।
৬ জন সম্পূর্ণ বধির।
২৪৩ জনের দাঁত দূষিত।
১৭৪ জনের টন্সিল রোগগ্রস্ত।
৯ জনের পেশীবিশেষ ক্ষয় রোগগ্রস্ত।
৯৮ জনের থাইরইড্ স্ফীত।
৯ জনের হৃদরোগ।
৩৬ জনের শ্বাসনালীর রোগ।
৬ জনের ক্ষয়রোগ আরম্ভ হইয়াছে।
১০ জনের ক্ষয়রোগের পূর্ব্বাবস্থা।
৫ জনের হার্ণিয়া।
১ জনের মস্তিষ্কে স্ফোটক।

এই অদৃষ্টবাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রে শিশুদের অক্ষমতা অদৃষ্টের দোষ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। এদেশে এখন নিতান্ত দরকার যে, একদল লোক এই সকল দিকে দৃষ্টিপাত করেন, অদৃষ্টের উপর ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না। এই স্বাস্থ্যহীনতার দেশে শিশুদের স্বাস্থ্যের সেনসাস প্রস্তুত করিলে, তাহা উপরে উদ্ধৃত সেনসাস হইতে কম বীভৎস হইবে বলিয়া মনে হয় না।

(৩)

শিশুদের পাঠ্যতালিকা বা কার্য্যতালিকা প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে মনে রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক শিশু এক একটী ভিন্ন শ্রেণী ; অনেকের জন্য একই তালিকা নির্দ্ধারিত হইলে, কাহারও পক্ষে তাহা সবিশেষ উপযোগী হইবে না ; একই তালিকা পালনের ফলে কাহারও বিশেষত্বগুলি ফুটিবে না। কাহারও হয় ত সাহিত্য বা চিত্রশিল্পের দিকে বিশেষ ঝোঁক, কাহারও হয় ত মিস্ত্রির কাজে বা বয়নাদি কর্ম্মে বিশেষ পটুতা। যতদূর সম্ভব, তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া বিভিন্ন কার্য্যতালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহা না হইলে সকলেই বিশিষ্টতাহীন, একঘেয়ে, এক ছাঁচের হইয়া যাইবে। অথবা অনেকে একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। এই সমস্ত কষ্টসাধ্য কর্ত্তব্য আছে বলিয়াই ত শিক্ষকের আবশ্যকতা। শুধু ব্যাকরণ বা পুস্তক বিশেষ হইতে কতকগুলি কথা আবৃত্তি করাই যদি শিক্ষকের একমাত্র কার্য্য হইত, তাহা হইলে ত শিক্ষকের পরিবর্ত্তে গ্রামোফোন ব্যবহার করিলেই চলিত। Froebel অনেক স্থানে শিশুকে চারাগাছ এবং গুরুমহাশয়কে মালীর (Gardener) সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। একস্থানে বলিতেছেন—"The educator should be called not a teacher but a gardener। ইহার তাৎপর্য্য এই। গুরুমহাশয়কে শিক্ষক না বলিয়া মালি (Gardener) বলা উচিত। চারাগাছগুলিকে রক্ষা করিতে হইলে এবং তাহাদিগের বৃদ্ধির সহায়তা করিতে হইলে, মালির যেমন প্রত্যেক চারাগাছটির সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক, এবং তদনুযায়ী প্রত্যেকটীর প্রতি বিশেষ বিশেষ প্রকারে যত্ন করা আবশ্যক, গুরুমহাশয়ের কর্ত্তব্য সেইরূপ ; এবং সেইখানেই তাঁহার সহিত গ্রামোফোনের তফাৎ। শৈশব-শিক্ষকের দায়িত্ব খুব বেশী। Froebel একস্থলে বলিয়াছেন—"As the beginning gives a bias to the whole after-development so the early beginnings of education are of most importance" ; অর্থাৎ, একটা জিনিস যে ভাবে আরম্ভ করা যায়, তা'র একটা বিশেষ প্রভাব সে জিনিসটার ভবিষ্যৎ গঠনের উপর থাকিয়া যায় ; সেইরূপ শৈশবের শিক্ষার জীবন গঠনে একটা বিশেষ প্রভাব আছে।

শিশুশিক্ষায় তাহাদের ইচ্ছামত আমোদ প্রমোদের ও খেলার বিশেষ উপকারিতা আছে। রুশো এতদ্ প্রসঙ্গে তাহার "Emile" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—"The lessons that boys get from each other in playing fields are a hundred times more useful to them than the lessons given in school" ; অর্থাৎ, "বালকেরা একসঙ্গে খেলা করিতে করিতে যে জ্ঞান লাভ করে, তাহা স্কুলের দেওয়া জ্ঞানের চেয়ে শতগুণ বেশী মূল্যবান।" তা ছাড়া, শিশুদের খেলার দিকে দৃষ্টি রাখিলে, কা'র কোন দিকে ঝোঁক, শিক্ষকের পক্ষে তাহা বুঝিতে পারা সহজ হইবে। জার্ম্মাণীর Koenigsberg বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, আচার্য্য Rosenkranz তাঁহার Philosophy of Education" নামক গ্রন্থে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন—"Play is of great importance in helping one to discover the true individualities of children, because in play they may betray thought-lessly their inclinations" অর্থাৎ, খেলার সময় শিশুদের বিশেষত্ব বুঝিবার বিশেষ সুবিধা ; খেলার সময় অজ্ঞাতসারে তাদের প্রবৃত্তি প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

(৪)

শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গীন হওয়া দরকার। শিশুর শরীর, মন, এবং নৈতিক জীবন তিনটির দিকেই দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। Froebel বলিয়াছেন—"Education is the development of man in the totality of his powers as a child of Man, as a child of Nature, as a child of God ;" অর্থাৎ, "শিক্ষা মানুষের সবগুলি শক্তির বিকাশ ; সে মানুষের, প্রকৃতির, এবং ঈশ্বরের সন্তান ; তাহার এই ত্রিবিধ সত্তার বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য।" শরীরকে বাদ দিয়া শিক্ষা ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাংলাদেশে, ত ভীষণ কুফল ফলাইতেছে ; এখানকার চিন্তাশীল, মনীষী ব্যক্তিগণ অকালে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইতেছেন ; আজীবন কর্ম্ম ও চিন্তার ফল জগৎকে দিবার পূর্ব্বে এবং জীবনের শ্রেষ্ঠতম কার্য্যাবলী সম্পাদনের পূর্ব্বেই শরীর তাঁহাদের ভাঙ্গিয়া যাইতেছে।

কোষ্ঠীর ফলাফল

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১০)

যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন বেলা সাড়ে সাতটা। "নিদ্রা ভঙ্গ হইল" ঠিক নহে, ঠাঠালাঠি করিয়া তাহা ভাঙা হইল বলিলেই সত্য অক্ষুণ্ণ থাকে।

দেখি, বাড়ীর সকলের মুখেই হাসি। তাহাতে শব্দের সংমিশ্রণ না থাকিলেও, বেশ eloquent (সুপ্রকট)। কারণটা পরে প্রকাশ পাইল—জয়হরির নাসিকা-ধ্বনির তাড়নায় বাড়ীর কেহই ঘুমাইতে পারেন নাই। বাড়ীর কৃতজ্ঞ কুক্কুরটা এই আকস্মিক উৎপাতের কারণ আবিষ্কার করিতে না পারিয়া, প্রভুদের সজাগ রাখিবার জন্য যথাশক্তি চীৎকার করিয়াছে। অবশেষে স্বয়ং ভয় পাইয়া কোন প্রকারে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক কোথায় যে পলাইয়াছে, তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না; প্রাণভয়ে পলায়নের সুদীর্ঘ নখ চিহ্ন সকল প্রাচীর-গাত্রে প্রমাণ স্বরূপ রাখিয়া গিয়াছে মাত্র। আরো শুনিলাম—সেই নাসিকা-ধ্বনির মধ্যে বাড়ীর সকলেই সারারাত্রি ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর পরিচয় পাইয়াছেন। এ স্থলে একটা জ্ঞাতব্য কথা আছে—বাড়ীর কর্ত্তা বা বৈবাহিক মহাশয় স্বয়ং সুরজ্ঞ লোক,—প্রত্যহ প্রত্যুষে পুত্রকন্যাদিগকে লইয়া সঙ্গীত-চর্চ্চা করেন, এবং সে সম্বন্ধে তাহাদের তালিম্ দিয়া থাকেন।

বাহিরে আসিয়া রোয়াকে দাঁড়াইতেই, নির্ম্মল আকাশ-তলে সূর্য্যালোক-সমুজ্জ্বল যেন একখানি নূতন ছবি দেখিলাম। ঠাণ্ডা থাকিলেও, শীতের হাওয়া বেশ সুমিষ্ট ও উপভোগ্য বোধ করিলাম; (moist) স্যাঁৎসেঁতে ভাব নাই, বেশ ঝরঝরে। পা বাড়ালেই পথ, বিশ গজের মধ্যেই ইষ্টেসন্—ট্রেণ দাঁড়াইয়া রোদ পোয়াইতেছে, মধ্যে মধ্যে শিস্ দিয়া যেন সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িতেছে। ছুটিয়া বাহির হইতে ইচ্ছা হইল। সঙ্গে-সঙ্গে পূর্ণিয়ার কথাটাও মনে-পড়িল—নিরুদ্যম আর অবসাদের আড্ডা; হাত-পায়ে যেন পাথর বাঁধিয়া পঙ্গু করিয়া রাখে। হচ্চে—হবে—থাক্,—এই ভাব। কাজেই লোক বিজ্ঞ হইতে বাধ্য; কারণ—"কি হবে!" "কি লাভ?" অর্থাৎ, সব তাতেই লাভের দিক দিয়া কিছু হওয়াটা চাই,—এবং সেটা কাজের পূর্ব্বেই চাই; নচেৎ নড়াচড়াটা সেরেফ্ নির্ব্বুদ্ধিতা। ফল কথা—মাটির গুণ,—জলবায়ুর প্রভাব।

গরম জল, (tooth powder) দন্ত-মঞ্জন, তোয়ালে, সাবান্, অর্থাৎ সভ্যযুগের ভব্য সরঞ্জাম সবই হাজির ছিল। সত্বর কাজ সারিয়া, কাপড় না ছাড়িতেই,—শুভ সন্দেশ ও চায়ের প্রবেশ।

শ্রীমান নাতজামাই বলিলেন,—"বাবা এখনো বাজার থেকে ফেরেন নি।" অর্থাৎ এখন সন্দেশেই কাজ চালাইয়া লইতে হইবে। বলিলাম,—"তাই ত, বড় ত্রুটি হয়ে গেল,—তা হোক্।—আমরা পরে সামলাইয়া লইব; তোমাদের কোনরূপ দুঃখের কারণ রাখিতে আমরা আসি নাই, এবং তাহা থাকিতে ফিরিবও না।"

বৈবাহিক মহাশয় গত রাত্রে আমাদের vitality (জীবনীশক্তি) বজায় রাখিবার ভিত্তি-স্থাপনা দেখিয়া নিশ্চয়ই একটু ভাবিত হইয়া থাকিবেন; তাই ভোরেই বাজারে ছুটিয়াছিলেন।

এ বাটীতে বিংশ শতাব্দির ব্যতিক্রমের মধ্যে পাইলাম—চায়ের অ-চর্চ্চা। যাহা প্রস্তুত হইয়াছিল, এবং অর্দ্ধসের পরিমাণে এক-একটি অ্যালুমিনিয়মের পাত্রে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা চা নহে,—দুগ্ধ-সংযুক্ত গরম চিনির পানা। অবশ্য তাহাকে "বামনবাড়ীর চা" আখ্যা দিয়া গৌরব করা চলে।

বহু দিন যাবৎ একটি রোগ ভোগ করিয়া আসিতেছি। তিনি আমার মাথাটি দখল করিয়া, পাকা আশ্রয় লইয়াছেন, ও সেটিকে কৃপণের ধনাগার বানাইয়া বসিয়াছেন। যিনি একবার সেখানে ঢোকেন, তাঁহার অগস্ত্য-গমন ঘটে,—তিনি থাকিয়াই যান; এবং মনটিকেও তাঁহার অনুচর করিয়া রাখেন। রাজ-বৈদ্যেরা রায় দিয়াছেন—"নার্ভাস্ ডিবি-

লিটি"—বা "Nervous devil ইটি"। সোজা কথায়—"ভূতে পাওয়া"!

এক চুমুক চা মুখে দিয়াই মনে পড়িল—"আচ্ছা,—আমি এখন কোথায়,—দেওঘরে না বৈদ্যনাথে?" শ্রীমানকে প্রশ্ন করিলাম—"এ স্থানটির নাম কি?"

উত্তর পাইলাম—"ক্রাডক্ টাউন্"! নাও কথা! সে আবার কি? আবার তেরোস্পর্শ জোটে যে! অন্যমনস্ক অবস্থায় আস্তো একটা সন্দেশ মুখে দিয়েছিলাম, —সে আর নাবে না,—হাঁ করিয়াই রহিলাম।

শ্রীমান বলিলেন—"কি হোলো? চা যে জুড়িয়ে যায়।"

বোধ হয় সন্দেশটা টোল্ খাইয়া, কোথায় একটু ফাঁক রহিতেছিল, তাহারি সাহায্যে, কোন প্রকারে বলিলাম,—"কি যে হ'ল, তুমি তা বুঝবে না বন্ধু,—আমাকেও জুড়িয়ে আন্চে।"

শুনিয়া জয়হরি বেশ সহজ ভাবেই বলিল—"তবে আর আপনি খেয়েচেন,—উচিতও নয়!" (শেষ মন্তব্যটা বোধ হয় ডাক্তারি হিসাবেই উচ্চারিত হইল।)—যে বলা সেই কাজ! পরে জানিলাম, বাকি সন্দেশ তিনটী তাঁরই গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে!

শ্রীমান বলিলেন—"বেশ এক চুমুক চা খান দিকি, নেবে যাবে!" চিকিৎসা-বিভ্রাট একেই বলে।

"এই নাও" বলিয়া, রোগমুক্ত হইলাম, ও বলিলাম—"রোগ ত ওখানে ছিল না, তিনি এখনও মাথায় মজুদ্। আসিতেছিলাম দেওঘরে, পথে দাঁড়াইল বৈদ্যনাথ, পৌঁছে শুনচি—ঐ যে কি সুমধুর নামটা শোনালে?"

শ্রীমান—"ক্রাডক্ টাউন্"।

"বেশ—তাই না হয় হল; কিন্তু আমি ত বৈবাহিক বাড়ী "অমরকোষ" আয়ত্ত করতে আসিনি, এখন ঠিক্ নামটা বাত্লাও বন্ধু।"

শ্রীমান হাসিয়া বলিলেন, "But what is there in name!" (নামে কি আসে যায়)।

বলিলাম—"তবে কন্যার নাম "নিকষা" কি "মন্থরা" না রেখে, রবিবাবুকে বিরক্ত করে 'নূপুর' নাম আমদানী করতে ছোটা হয় কেন? এ স্থানটিকে লণ্ডন্ বল্লে মন ওঠে কি? রায় মহাশয়ও—"বিলেত দেশটা মাটির—সেটা সোণার রূপোর নয়।" ব'লে সাপ্টায় সেরেছেন,—"

শ্রীমান—"কেন? মাটি মাটিই, তা যেখানকারই হোক্।"

"তা ঠিক্ বটে, কিন্তু কাবুলের মাটিতে মেওয়া পাই, বাংলার মাটিতে লাউ কুমড়োরই প্রাচুর্য্য! শাক্, কই, সব মাটীতে "ত্রেদম্" হয় এমন কথা ত' কোথাও বলে না বন্ধু। শচীর দুলাল শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়ার প্রেমতরঙ্গ এনে সেই বন্যার মুখে সকল বাঁধ ভেঙ্গে যখন আচণ্ডালকে এক করে দিয়েছিলেন, তখন কোন প্রেমোন্মত্ত পোলিটিসন্ ভাবের নেশায় নদীয়ার মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে বলেছিলেন —"এই মাটিতে 'ত্রেদম্' হয়।" নেশার জড়তায় "ফ্রিডম্" (freedom) কথাটা স্পষ্ট না বেরিয়ে "ত্রেদম্" শুনিয়েছিল মাত্র। অর্থাৎ সেই অবস্থা যে মাটিতে আসে বা আনে, সেই মাটিতেই 'ফ্রিডম্' (স্বাধীনতা) ফলে। তোমাদের মহারাজজি নূতন কিছু শোনাননি। সব মাটি এক নয় বন্ধু! এখন আসল নামটা শোনাও।"

শ্রীমান—কি মুস্কিল্! প্রায় সকলেই বলেন দেওঘর। দশবার দেওঘর বল্তে গিয়ে একবার বৈদ্যনাথও বেরিয়ে যায়। ক্রাডক্-টাউন্টা উহারই অংশবিশেষ। এখন বেড়াতে বেরুবেন ত' চলুন; ও নিয়ে মাথা ঘামানো কেন?"

বলিলাম,—"সে বহুৎ কথা, তার ছোট একটা বলি। স্থাখো—ক্রাডক্ টাউনে বেড়াতে হ'লে, কাটা আর আঁটা পোষাকে এড়ি থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত খাড়া সরল রেখায় straight and erect (সোজা) রেখে, সম-পদক্ষেপে পা-ঠুকে চলতে হয়,—এদিক-ওদিক হেলবে দুলবে না; চক্ষু horizon-এর (দিগন্ত-বৃত্তের) সঙ্গে parallel (সমান) রাখতে হবে। কিন্তু দেওঘরে বেড়াতে হ'লে, পম্শু, ফুল-মোজা, আর কালাপাড়ের উপর পলেস্তারা (অল্ষ্টার্) চড়িয়ে, মঙ্কি-ক্যাপ্ মাথায় দিয়ে জরদাসংযুক্ত পাণ চিবিয়ে, সিগারেট্ মুখে—ভাইন্ ষ্টিক্ হাতে বেরুনো চাই। চলনে—পায়ের গায়ের কোন নিয়ম নেই, বরং অনিয়মই শোভন। সকলে উচ্চহাস্যে এক যোগে কথা কইতে হবে; মাঝে মাঝে থেমে পোড়ে, semi-circle-এ (অর্দ্ধচন্দ্রাকারে) বক্তৃতাকে বেগবান ক'রে নেওয়া চাই, আর বারবার সিগারেট্ ধরানো চাই; অর্থাৎ রাস্তা মাথায় ক'রে চলা চাই,—এটা যেন আমাদের রাজত্বি, এই ভাব।

আর বৈষ্ণনাথে চলতে হ'লে নগ্ন-পদে, সংযত আর ভক্তি-আনত ভাবে, সকলকে পথ ছেড়ে দিয়ে এক-পাশ ধ'রে নীরবে একাগ্র-পবিত্র মনে, দীনের মত ধীরে ধীরে চলতে হয়। বুঝলে বন্ধু মাথা ঘামে কেন ?"

শ্রীমান হাসিয়া বলিলেন—"না মশায়, ও সব বাজে চিন্তার দরকার ত' বুঝলাম না।"

শ্রীমানের মুখে খাঁটি সত্য কথাটা শুনিয়া সুখী হইলাম,—ভাবিলাম, তাহা হইলে এখনো আশা আছে। "আজ্ঞে হাঁ" বলিয়া ঝেড়ে-কোপ্ মারেন নি।

বলিলাম—"বন্ধু, জান না ত'—ওই জন্যেই এখন বাঁচা বা বাহাল থাকা। সুতরাং আর একটু সইতে হবে। শুনে থাকবে—বানরের ভাষাটা আদায়ের জন্যে বড় বড় ওস্তাদ (expert) আফ্রিকার জঙ্গলে খাতা-বেঁধে খাঁচায় বাস করচেন। আবার পাখীর জাতি আর গোত্র নির্ণয়টা, আজ কয়েক শতাব্দি ধ'রে চোলচে;—কত মাথা কত অর্থ তার পশ্চাতে খাড়া। জগতে ত' ভাষার, কি পাত্র-পাত্রীর অভাব হয়নি! কই, এগুলোকে ত' বাজে ব'লতে যাও না! অথচ—আমাদের জাতিভেদটা না কি যত নষ্টের গোড়া; সেটা, মারবার উপদেশ বেশ উদার ভাবেই দাও! পাখীর জাত খোঁজা আর তা রক্ষা করা চাই, আর আমাদের জাত মোছা আর জাত মারা চাই! মন্দ নয়! তাই বাজেতে আর কাজেতে গুলিয়ে ফেলি; অপরাধ নিও না।"

শ্রীমানের ওইটুকুতেই over-dose (মাত্রাধিক্য) দাঁড়িয়েছিল, তিনি বলিলেন—"ও সব ঘুমের ওযুধ রাত্রে দেবেন।" কথাটা ঠিক্, তার প্রমাণও কোন কোন যুবকের কাছে পাই। বাজে কথা পাড়িলেই তাদের নাসিকাধ্বনি হয়। দেশে এই প্রিয় বস্তুগুলি কেবল কাজের কথায় কাণ দেন যাতে সমর-সুল কিছু আছে; যথা—কোন্ দরজী ভাল কটার (cutter), কোন্ নাপিত ভাল 'ছাঁটার্', কোন্ মিঞা ভাল chopper (চপ বানাতে পারে); ফুটবল সংগ্রামে, কে ভাল কিকার্, কে সঙ্গীন্ শুটার (shooter), ঘোড়-দৌড়ে কোন্ ঘোড়া ধরতে পারলে বে ওজর বিজয়লক্ষ্মী চার পায়ে ললাটে লাফ্ মেরে উঠবেন; ইত্যাদি ইত্যাদি দেশ রক্ষার রিহার্সেল, লইয়াই কাজ-প্রিয়রা উন্মত্ত। প্রারম্ভ যে আশাপ্রদ, তা স্বীকার করতেই হবে।

বলিলাম—"বেশ, এখন কি করতে হ'বে বল', প্রস্তুত আছি।"

এতক্ষণ শ্রীমুখ চাহিয়াই ছিলাম। আর সময় নাই বুঝিয়া, কথা কহিতে কহিতে নীচে রেকাবীখানা হাতড়াইয়া দেখি—সর্ব্বত্রই সমতল! জয়হরি অপ্রতিভ ভাবে বলিল—"আপনি আর খেতেন্ না কি ? আমি যে—"

বাধা দিয়া বলিলাম—"বেশ করেছ; তোমার হাতে তুলে দেবার তরেই খুঁজছিলাম।" মনে মনে শাস্ত্রকারদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। তাঁহারা না কি উপদেশ দিয়াছেন,—আহারের সময় ভোজনপাত্র বাম-হস্তে স্পর্শ করিয়া থাকিবে, এবং মাথা হেঁট্ করিয়া ও-কাজটি সারিবে। আহা, তাঁরা সব কি বিচক্ষণই ছিলেন!

শ্রীমান ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"আপনার খাওয়াই হ'ল না, দু'চারখানা আনি।" তাহাকে অনেক করিয়া নিরস্ত করিলাম ও "এখন কোথায় যাবে চলো," বলিয়া উঠিয়া পড়িলাম।

(১১)

বাহিরে পা বাড়াইতেই সম্মুখে দেখি—বেশ সুউচ্চ এক দ্বিতল বাড়ী, গেটের দুই পার্শ্বে দৌড়দার রোয়াক। রৌদ্র, আলোক, বায়ু, তিনই বাধামুক্ত। শুনিলাম, এটি একটি ধর্ম্মভীরু মাড়োয়াড়ি মহাজনের কীর্ত্তি—ধর্ম্মশালা। ইষ্টেসন ও ধর্ম্মশালাটির মধ্যে রাজপথের প্রশস্ততাটুকু মাত্রই ব্যবধান,—এইটিই ইহার শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য। গতরাত্রের অনিশ্চিত ও অসহায় অবস্থার কথা মনে হইয়া—এই সহজলভ্য আশ্রয়টি আমার কাছে অমূল্য বস্তু বলিয়া বোধ হইল। বিদেশী আশ্রয়হীন যাত্রী বা পথিক এখানে তিন দিন আরামে অতিবাহিত করিতে পারেন; তদধিক কালের অবস্থান অনুমতি-সাপেক্ষ। কাল রাত্রে নন্দকিশোর এই ধর্ম্মশালার কথাই কহিয়াছিল। সে যে বলিয়াছিল—"কুছু চিন্তার কারণ নেই বাবুজি—আরামসে থাকবেন," তা ঠিক। কেবল ভাইটালিটি বজায় রাখিবার (আহারের) ব্যবস্থাটা নিজের। হিন্দুর দেশ না হইলে, অর্থাৎ একজাত—৩২ চুলো আর ৩৬ ফ্যাঁসাদ্ বা ফোঁস্ না থাকিলে, পেটের ভারও সম্ভবতঃ শেঠেরা নিতেন।

গত রাত্রে অন্ধকারে দেখিতে পাই নাই যে, আমাদের

জন্য ষ্টেসনের পশ্চাতেই (ধর্ম্মশালা হইতে দশ গজের মধ্যেই) কোম্পানী অনুকম্পাবশে waiting shade (বিশ্রামাচ্ছাদন) বানাইয়া রাখিয়াছেন। তাহা হাত কয়েক লম্বা বেড়াশূন্য ন্যাড়া, করোগেটের (?) একটি আচ্ছাদন। এখানেও রৌদ্র, বায়ু, আলোক (দিবাভাগে) প্রচুর পরিমাণেই উপভোগ করা যায়; অধিকন্তু—বৃষ্টির ছাট্ বাহিরে অল্পই অপব্যয় হয়। আমরা যেমন দেবতা তার উপযুক্ত একখানি নৈবেদ্য বিশেষ; সুতরাং আক্ষেপের কোন কারণই নাই। রাত্রে (দিনেও দেখিলাম) নিজেদের সম্পত্তি ভাবিয়া গরু, বাছুর, ছাগল, কুকুর, যায় বেতো-ঘোড়ায়, সেটি দখল করিয়া থাকে। তাহাদের এরূপ ভাবিবার এবং এরূপ কার্য্যের বিরুদ্ধে, বিশেষ আপত্তিকর কিছু পাইলাম না। কেবল যে তাহারা থাকে তাহাই নয়,—ধর্ম্ম রক্ষাও করে, কারণ, থাকিতে হইলে, শরীর-ধর্ম্ম রক্ষা করিতেই হয়, এবং তাহা উচিতও। Floor বা মেঝে, মনে হয় কাঁচা, কারণ বেশ উচ্চাব; আনন্দ মঠের পদচিহ্ন বলিয়াই অনুমান করি। উল্লেখ না করিলেও চলিত, তবে ধর্ম্মশালাটির এতটা সান্নিধ্যে বিশিষ্ট relief রূপে (সোয়াস্তির অবকাশ স্বরূপ) দণ্ডায়মান বলিয়াই, করিতে হইল।

বিশ-ত্রিশ পা অগ্রসর হইয়া শ্রীমান—একটু রোয়াক-সংযুক্ত দুইখানি একত্র সংলগ্ন সাধারণ কুটুরি দেখাইয়া বলিলেন—"এইটি ব্রাহ্ম-মন্দির।" চমকিয়া উঠিলাম। মন্দির হইলেই তাহার চূড়া চাই; তাহাও আছে। ইভ্‌নিং-ক্যাপের কার্ণিস্ উর্দ্ধে উল্‌টাইয়া রাখার মত, ছাদের সম্মুখস্থ আলিসার উপর ক্রাউন্ বা মুকুট হিসাবে তাহা বর্ত্তমান। বেশ সাদাসিদে। আবার বাড়ীটি অপেক্ষাকৃত অনেকটা নিম্নভূমিতে থাকায়—বিনয়ব্যঞ্জকও।

শ্রীমান না বলিলে বুঝিতেই পারিতাম না যে, এইটি ব্রাহ্ম-মন্দির। পরে বুঝিলাম, ভুলটা আমারি, প্রতিষ্ঠাতারা এত বড় ভুল করিতেই পারেন না। উক্ত চূড়ার ও-পিঠে বা ছাদ্‌ পিঠে "ব্রাহ্ম-মন্দির" বলিয়া বড় বড় হরপে লেখা আছে। কারণ?

মন্দিরটির গা-ঘেঁশিয়াই রেল্‌লাইন্, ষ্টেসনে গাড়ী দাঁড়াইলে, যাত্রীরা বৈদ্যনাথের মাটি মাড়াইবার পূর্ব্বে এই ধর্ম্ম-মন্দিরটির সংবাদ ও অবস্থিতি-স্থান বিনা আয়াসেই জানিতে পারেন,—উদ্দেশ্য বোধ হয় এই। যাহা হউক, ইহা কম লাভ নয়। বুঝিলাম, এই বৈপরীত্যের পশ্চাতে যথেষ্ট সদিচ্ছা ও বুদ্ধি খরচ বর্ত্তমান। তবে আমার মত যাঁরা রাত দুপুরের আগন্তুক, তাঁহাদের জন্য এ পিঠে একটা P. T. O. (পশ্চাৎভাগ দেখহ) দাগা থাকিলে যেন আরো ভাল হইত। মানুষের কিছুতেই মন উঠে না।

মন্দিরের position (স্থিতি স্থান) বেশ strategic (সামরিক কৌশলানুকূল) হইলেও, দেয়ালগুলি "এণ্ড কোং" মহাশয়দের আক্রমণে রক্তরঞ্জিত। ইঁহাদের range (দৌড়্) ত' কম নয়—২০৫ মাইল! জানি না ইঁহারা কি কারণে অনুমান করিয়া লইয়াছেন যে, এখানে যাঁহারা আসেন, নিশ্চয়ই তাঁহাদের অন্ন-চিন্তা নাই,—বস্ত্র আর অলঙ্কারই আবশ্যক।

বলিলাম—"চল' ফেরা যাক্।"

শ্রীমান আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"সে কি মশাই, এখনো ত' বাসা থেকে দুশো গজের মধ্যেই আছি!"

বলিলাম—"আমি যে অনেক এগিয়ে পড়েছি হে।"

শ্রীমান। আপনার এগুনো-পেছুনোর rateটা (হারটা) আমাদের বুদ্ধির বার্। কিন্তু পোষ্ট্ আপিস্ হ'য়ে যে যেতেই হবে। দশটা বাজে, window delivery (জান্‌লা বিদেয়) না নিলে, চিটি পেতে সেই দুটো তিনটে।"

বলিলাম—"তাড়ার কিছু আছে না কি? না—"কেমন আছ" আর "কেমন আছির" আদান প্রদান?"

শ্রীমান—সকলে কেমন আছে, সেটা জানবার একটা ব্যাকুলতা থাকে না?

বলিলাম—"কিছু না, আমাদের আবার কেমন থাকা-থাকির এত খোঁজ কেন? সব বেশ আছে। বড় জোর জ্বর, না হয় সর্দ্দি-কাসি। শাক্‌পাতাড় খেয়ে বাঁচতে হ'লে দু'বারের জায়গায় না হয় চারবার দাস্ত। আজো এসব স্বাভাবিক ব'লে ভাবতে শিখলে না—এই আশ্চর্য্য। ক'দিন অন্তর এই পত্র-বেদনা চাগায়?"

শ্রীমান—বাবার হুকুম,—রোজ পত্র যাওয়া চাই, আর রোজ পত্র পাওয়া চাই। না পেলেই অধীর হন, টেলিগ্রাফ্ করেন।

বলিলাম—"বেশ স্বস্তির পথ খুঁজে নিয়েছেন ত'!

হেলিসাহেব বিচক্ষণ লোক বটে, তিনি এঁদের ভরসাতেই বজেট্ বানিয়েছিলেন দেখছি। যাক্,—বৈবাহিক মহাশয়ের যখন delivery pain এর (বেদনার) আশঙ্কা রয়েছে,—চলো।"

(১২)

একটু এগিয়েই বন্ধু বলিলেন—"এই দেওঘর পুলিস্ ষ্টেসন।"

"বেশ—এঁরা দেশের শান্তি রক্ষা করেন, এঁদের এখান হইতেই নমস্কার করি। বোবার শত্রু নাই, চলো। এইবার বোধ হয় জেল্খানা ?"

জয়হরি এতক্ষণ একটিও কথা কহে নাই, কিন্তু আর সে থাকিতে পারিল না ; সহসা বলিয়া উঠিল,—"সে এখন থাক্ মশাই, ওটা খাওয়া-দাওয়ার পরই ভাল।"

আমি চিরদিনই কথার কাঙ্গাল্—ইচ্ছা হইল জয়হরিকে আলিঙ্গন করি।

শ্রীমান বলিলেন—"আমি এইবার short-cut, অর্থাৎ আনাচ্ কানাচ্ ধরিলাম ; ও সব দেখতে গেলে delivery (পত্র বিলি) শেষ হ'য়ে যাবে।"

জয়হরি বলিল—"আঃ, জগদম্বা মালিক্,—চলুন,—সেই ভাল।"

অদূরে একটা জনতা দেখা গেল। ধূম-বাহুল্য লক্ষ্য করিয়া ভাবিলাম, আগুন লাগিয়া থাকিবে। জোর-কদমে যত নিকট হইতে লাগিলাম, ততই ইংরাজি বাঙ্গলা মিশ্রিত কলরব কাণে পৌঁছিতে লাগিল। দেখি, নানা বয়সের, নানা বেশের ৩০।৪০ জন বাঙ্গালী, কেহ পথে, কেহ বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া, একত্রে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া হাস্যালাপ করিতেছেন।

শ্রীমান কথাটা ভাঙেন নাই, আমাদের দৌড় করিয়া লইয়া চলিয়াছিলেন। নিকটে আসিয়া মৃদুহাস্যে বলিলেন—"এইটি দেওঘর পোষ্ট আফিস্, উপস্থিত সকলেই পত্র-প্রাপ্তির উমেদার !"

বলিলাম—"বহুৎ ধন্যবাদ !" কেই বা শোনে,—শ্রীমান তখন বেগে "বিতরণ বাতায়নে" হাজির।

দেখি,—তরুণ, যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ—নিজের নিজের দল বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। বিশ্বের অণু পরমাণু হইতে জীব-জগৎ এ কাজটিতে ভুল করে না ; কাহারো জাতি বা শ্রেণী বিভাগ করিয়া দিতে হয় না, আপনারাই খুঁজিয়া লয় ও দানা বাঁধে। সম্প্রতি কেবল আমরাই এই শাশ্বত নিয়ম ভাঙ্গিয়া এক করিতে বসিয়াছি। তেলে জলে এক করিয়া বোধ হয় "তেজলো" হইতে পারিব ; এরূপ নামের নজিরও রহিয়াছে। দেখা যাউক্। এ মনোরথে পথ যদি চলে ত' অমত নাই।

ইতিপূর্ব্বেই পত্র-বিলি সুরু হইয়াছিল। সেখানে তৃতীয় শ্রেণীর ট্রেণ-যাত্রীদের টিকিট্ কিনিবার মত হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্য এই, আজিও পিক্-পকেট্ বা গাঁট্‌কাটারা, এ শুভ সংবাদটি পায় নাই। কেহ পত্র পাইয়াই পাঠ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, কেহ পকেটে পুরিতেছেন (সম্ভবতঃ সেগুলি মহিলাদের নামাঙ্কিত)। কাহারো মুখে আনন্দ বা আরাম আভা দিতেছে, কাহারো বদন বিবর্ণ হইয়া উঠিতেছে, যেন মেঘ ও রৌদ্রের খেলা। কেহ তখনি পোষ্টকার্ড লইয়া লিখিতে লাগিয়া গেলেন ; কেহ টেলিগ্রাফ্ করিবার জন্য অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন।

পত্রের প্রাপ্য বিষয়-বস্তু, আমাদের প্রায় একই রূপ ; সাধারণতঃ—ভাল আছি, অমুকের অসুখ, শোবার ঘরে সিঁদ, খুড়োর গঙ্গালাভ, পৌষের তত্ত্বের ফর্দ্দ, আর টাকা চাই। বড়লোকের মালগুজারি, মকর্দ্দমা, আর মোটারের অবস্থা, এবং গ্রে-হাউণ্ড্‌টা আপনার বিরহে বিমর্ষ থাকে। আর তা-বড় লোকের অধিকন্তু,—সশস্ত্র ডাকাতিতে ষাট হাজার টাকার সদ্গতি লাভ ;—ও একটা গরীব কেরাণীকে মোটর চাপা দিয়া, ছোটবাবু সে লোকটার শান্তির উপায় করিয়া দিলেও, স্বয়ং নিজের উপর অশান্তি আনিয়াছেন, এবং দশ হাজার টাকার জামিনে খালাস আছেন। হয়কে নয় করিতে পারেন, সত্বর এমন একটি সেরা ব্যারিষ্টারের ও ২।৩টি ভকিলের 'ফীস্' ব্যবস্থা করিবেন ;—মামলার তারিখ ১৩ই পৌষ। এই সংশ্রবে দুইটা টায়ার burst করিয়াছে (ফাটিয়া গিয়াছে) ও পেট্রল্-ট্যাঙ্ক্ তেউড়িয়া গিয়াছে ইহা অবশ্য উল্লেখযোগ্য নয়,—ক্ষমা করিবেন। নিবেদন ইতি, চিরদাস শ্রীভজহরি হাজরা। ইত্যাকার। কোন পত্রেই ত' দেখি না,—ছেলে মেয়ের রং সাহেব মেমের মত হইয়া গিয়াছে, অথবা বাতগ্রস্ত পঙ্গু বৃদ্ধ কর্ত্তা সহসা যৌবন ফিরিয়া পাইয়াছেন,—টাকাগুলার সদ্ব্যবহারের সুরাহা হইল

এই পত্রের জন্য এই ভিড়,—এই ব্যাকুলতা। অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলাম।

যাহা হউক, একটা মস্ত মুস্কিল্ হইল—আমার সমবয়স্কের দল বাছিয়া লইয়া দুইটা বাক্যালাপের। আমি দাগী আসামী, মুখের উপর বয়সটা দাগা রহিয়াছে,—গোঁফ পাকিয়াছে!) এই দুর্দ্দৈবের সূত্রপাতেই স্থির করিয়াছিলাম, এ বালাই আর রাখা নয়; কিন্তু ভৈরব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখখানা মনে পড়ায় শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম। সাহসে আর কুলায় নাই; অর্থাৎ সে মূর্ত্তি আর বাড়ানো কেন! ক্রমে সেই পাকধরা গোঁফ্ অধুনা বেশ সুপক্ব। এ জমায়েতে প্রায় সকলেই গোঁফ্‌শূন্য। যাঁহাকে ষাটের উপর বলিয়া সন্দেহ হয়, তাঁহারো এমন সাফ্ শেভিং (কামানো) যে একটু ঝুঁপি পর্য্যন্ত দর্শনেন্দ্রিয়ের গোচর নহে,—ব্রহ্ম বলিলে হয়,—আছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু অগোচর! ফ্যাসাদ্ এই, আবার আইনে বলে না কি—বয়স আর বেতন জিজ্ঞাসা করাটা অসভ্যতার চরম্!

এ সম্বন্ধে একটু পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতাও ছিল। তিনি একজন ভাল উকীল, বয়স ৬০।৬২, কিন্তু আমদানীর আতিশয্য—তাঁর উৎসাহ উদ্যমটাকে চাড়া দিয়া উঁচু করিয়া রাখিয়াছিল। আমার বয়স জিজ্ঞাসা করায় বলি ৫১; তখন তিনি দুই কক্ষে হাত দিয়া, যথাসম্ভব erect (খাড়া) হইয়া, নিজেই প্রশ্ন করেন,—"আমার কত আন্দাজ কর?" বলিলাম—"পঞ্চাশ এখনো হয় নি।" তিনি ভ্রূদ্বয় কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত করিয়া—স্মৃতি সানাইয়া লইয়া বলিলেন—"হ্যাঁ—প্রায় তা হোলো বই কি; ৫।৭ বছর আর ক'দিন,—ও হওয়াই ধরো!"

বেতন সম্বন্ধেও আমাদের দোয়ারিবাবু বেশ এক টোট্‌কা আবিষ্কার করিয়া বরাবর ব্যবহার করিয়াছিলেন, এবং বেশ সুফলও পাইয়াছিলেন। বেচারী—বাবুও ছিলেন, এবং বড় বংশেরও ছিলেন,—বেতনটি কেবল 'ছোট' ছিল। সেকালে বেতন জিজ্ঞাসা করিতে কাহারো বাধিত না, এমন কি সর্ব্বাগ্রে 'ব্যাতন'টাই যেন জিজ্ঞাস্য ছিল। দোয়ারি বাবুর বেশভূষা দেখিয়া ও প্রশ্নটা অনেকেই করিতেন। তিনিও—"সেই পাঁচ কম্ ছে". বলিতে বলিতে দ্রুত চলিয়া যাইতেন;—বড় জোর বলিতেন—"বেটাদের কি আর বিচার আছে।"—ব্যস।

কাজেই সন্দেহের উপর কোন কিছু করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। মধুসূদন রক্ষা করিলেন। সম্ভবতঃ আমার দু'এক কেলাস্ (class) উপরের, একটি প্রবীণ ভদ্রলোক অগ্রসর হইয়া হাস্য-বিজড়িত বদনে বলিলেন—"মশাইকে নূতন লোক দেখছি।" আমি সেই ভাবে উত্তর করিলাম "আজ্ঞে, লোক আমি খুব পুরাতন, এখানে নূতন আসিয়াছি।"

এটা অবশ্য জানা ছিল—গড়ের মাঠে নূতন ঘোড়ার আমদানী হইলে—আজকাল ঘোঁড়াও তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ছোটে,—"পঙ্গু লঙ্ঘয়তে গিরিম্!" এ সব ভগবৎ কৃপা-সাপেক্ষ।

যেই কথা কহিয়াছি, দেখি দশজনের মধ্যে বেশ একটা সহাস-সমালোচনার সাড়া পাইলাম, গণ্ডীও গাঢ় হইয়া ঘেঁসিয়া আসিল! কারণটা বুঝিলাম না! দেবযানীর অভিশাপটা যে কচের মারফৎ সকল ব্রাহ্মণের মধ্যেই সংক্রামিত হইয়াছে, এরূপ সন্দেহ কখন করি নাই; এখন আর সে সন্দেহ নাই। তাই সেদিন কার্য্যকালে ভুলিয়া গেলাম "—যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে"; তাবৎটা নাই বা বলিলাম।

প্রবীণ ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন দিন কতক থাকবেন ত?" বলিলাম—"সঙ্কল্প সেইরূপই ছিল, কিন্তু অদৃষ্ট সেরূপ নয় দেখছি—" কথা শেষ করিতে না দিয়াই, প্রৌঢ় গোছের একটি রোগা ভদ্রলোক বলিলেন—"কেন!—এই ত' চেঞ্জের সময়; এখন এখানকার জলহাওয়া খুবই ভাল, খুব ঘুরে বেড়াবেন,—যা, আর যত, খান্ না, দুঘণ্টায় হজম্! দু'দিন থাকলেই বুঝতে পারবেন।"

বুঝিলাম লোকটি থামিবার পাত্র নন,—শুদ্ধ ডিস্‌পেপ্‌টিক্‌ই (অজীর্ণ রোগী) নহেন,—বক্তারও; এখনো অনেক কথা বলিবেন। তাই বাধা দিয়া বলিলাম—"মাপ করিবেন,—আপনার কথায় আরো দমিয়া গেলাম।" পাছে আবার "কেন?" বলিয়া সুরু করেন, তাই দম না লইয়াই বলিতে লাগিলাম,—"আপনি ক্ষুণ্ণ হবেন না, কিন্তু ঐ যে বলিলেন "জল-হাওয়া খুবই ভাল" ঐখানেই খট্‌কা,—আমার এমনি কপাল—"ভাল" কোন কিছু আমার কস্মিন-কালে সহে না। আর "খোরা" সম্বন্ধে আমার নিজের কোন

ওজর-আপত্তি চলিতে পারে না,—কারণ ওটি আমার কোষ্ঠীর ঢালা হুকুম; আমি ঘুরিতে না চাহিলেও সে আমাকে ঘুরাইবে। ও-সম্পর্কে আমি সৌরজগতের গ্রহবিশেষ। কিন্তু ওই যে শুনাইলেন—'যত খান্ না—দু'ঘণ্টায় হজম'; ঐটিই দেখিতেছি থাকা সম্বন্ধে প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে।"

প্রাণায়াম-সিদ্ধ নহি,—দম না লইয়া মানুষ কতক্ষণ কথা কহিবে! লোকটি একটু অপ্রতিভ হইবার মত হইয়া গেলেও, যেই শ্বাস লইব, অমনি আরম্ভ করিলেন,—"কেন? এখানে মানুষ আসে আর কিসের জন্যে"! তাড়াতাড়ি বলিলাম—"আপনি উত্তম আজ্ঞাই করেচেন,—তবে দেশের এই দুর্দ্দিনে "যতই খান না—দু'ঘণ্টায় হজম" হইয়া গেলে,—বোধ হয় ইহাই দাঁড়ায় যে, ভোজনে ভিটেমাটি ফুঁকিয়া ফকিরি লইবার জন্যই এখানে আসা। এ অধিকারটা নিজের নিজের সম্পত্তিতে সকলেরি থাকিতে পারে, কিন্তু আমি যে একটি নিরীহ ভদ্রলোকের বাসায় আসিয়াছি,—আবার একা নই—সঙ্গে একটি বিরাট দোসর।"

ইতি মধ্যে পত্রাদি পকেটে পুরিয়া, দল ক্রমে বেশ পুষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে, কি কারণে হাসির একটা ঘূর্ণী বহিয়া গেল। রোগা, প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিও এবার সে হাসিতে যোগ দিলেন। বোধ হয় এতক্ষণে তাঁহার রহস্যানুভূতি হইল।

প্রবীণ ভদ্রলোকটি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"আর "ভাল" বলিব না, তবে এখানকার জলহাওয়াটা প্রকৃতই স্বাস্থ্যকর,—আমার caseএ দেখচি খুবই suit করেচে।"

বলিলাম—"আপনার আমার প্রায়ই same case (একই হাল্) আমাকেও suit করা (সওয়া) সম্ভব।"

প্যাণ্ট্-অলষ্টার-পরা, হ্যাট্-হাতে, যুবাও-নন্-প্রৌঢ়ও-নন এমন একটি ভদ্রলোক বলিলেন—"তা বলা যায় না, ওঁর আর আপনার constitution (শারীরিক ও মানসিক গঠন বা ধাত) এক না হতেও পারে।" চাহিয়া দেখি, পকেট হইতে সানায়ের শেষ ভাগটা উঁকি মারিতেছে। এ পোষাকের সানাইওলা দেখি নাই, অতএব নিশ্চয়ই ডাক্তার। সানাই সুর শোনায়,—এ যন্ত্রে সুর শুনিতে হয়, প্রভেদ অল্পই। বলিলাম—"ডাক্তার বাবু, স্বদেশীর সময়ে অনেকেই তর্জ্জন গর্জ্জন সহ নামে মাত্র অনেক কিছু বর্জ্জন করিয়াছিলেন, পরে মায় সুদ্ সে সব পুনরর্জ্জন করিয়াছেন। কর্ত্তা ও অধীন উভয়েই বোধ হয় সেই সময় হইতেই দন্ত-বর্জ্জন সুরু করিয়াছি, এবং তাহা আর পুনর্গ্রহণের নামটি করি নাই। বরং এক্ষণে সমগ্র বর্জ্জনের প্রায় শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছি। এ বর্জ্জনে আসল বস্তুর ফাঁক্ ছাড়া, ফাঁকির ফাঁক্ নাই, স্বদেশীর ছাপ মারা রুচিকর লুকোচুরি চলে না। সুতরাং "জল-হাওয়ার" মত suitable (সুবিধার) জিনিস এখন আর আমাদের কি আছে—তা এখানেই কি আর অন্যত্রেই কি;—চর্ব্বণের চর্চ্চা ত' উভয়েই একদম চুকিয়ে দিয়েছি! আমাদের same case হ'ল না কি ডাক্তার বাবু! তা না ত' কালীঘাটেই স্বাস্থ্য সঞ্চয় করিতে যাইতাম, এখানে কেন! কি বলেন?" এই বলিয়া প্রবীণ ভদ্রলোকটির দিকে চাহিতেই তিনি যুবকের মত ডিঙ্গি মারিয়া সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন—"very true" (ঠিক্ বলেছেন), এবং এতক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়ের নিবাস?" সকলে উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন।

বলিলাম—"পরিচয়ের আদান প্রদান, কোথাও বসিয়া ধীরে-সুস্থিরে হইলেই ভাল হয়, আজ থাক্; বেলাও বাড়িতেছে—আমার সঙ্গীটি বোধ হয়, এতক্ষণে আধমরা হইয়া পড়িল;—কারণ—হজমের মেয়াদ (দুই ঘণ্টা) অনেকক্ষণ অতীত হইয়া গিয়াছে। কোন একটি জীবহত্যার পাপ সংগ্রহ করাও—আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য নয়।"

জন-দশেক বন্ধু-পরিবৃত একটি লক্ষ্মীমন্ত ডউলের যুবক বলিয়া উঠিলেন—"সেই কথাই ভাল মশাই—এখন থাক্। বেলা তিনটে নাগাদ্ যদি অনুগ্রহ করে সকলে একবার বম্পাস্ টাউনের (Bompas townএর) দিকে বেড়াতে আসেন ত' বড়ই আনন্দ হয়। আমাদের "***সদন" রাস্তার উপরেই।" পরে আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"আপনি চা খান ত?"

বলিলাম—"বড় বড় ডাক্তারেরা দয়া করে নিষেধ করেছেন বটে,—কিন্তু খেতেই হয়।"

ডাক্তার বাবুটি ইকুইলিপটস্-মাখানো রুমালে মুখ মুছিতেছিলেন, একটু যেন আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন—"কেন?"

বলিলাম—"কারণ, যাঁরা নিষেধ করেন, তাঁরা সকলেই ওটা খান।"

ডাক্তার ছাড়িবার পাত্র নন, বলিলেন—"কিন্তু আপনার ধাতে চা নিষিদ্ধ হ'তে পারে। আপনার ডিসপেপ্‌সিয়া থাকে ত' ওটা আপনার পক্ষে বিষ।"

বলিলাম—"আপনি উত্তম আজ্ঞা করেছেন, সে জন্য ধন্যবাদ,—কিন্তু যাচায়ে তা পেলাম কই! আমার তিনটি সহ-রোগী ও সম-রোগী, তাঁদের কথায় চা ত্যাগ ক'রে, অল্পদিনেই দেহটাশুদ্ধ ত্যাগ করে গেছেন। অপরাধ মাপ করবেন—আমিই কেবল ওটা ত্যাগ করিনি,—উপায়ও ছিল না; কিন্তু তার পর এই সুদীর্ঘ ৭ বৎসর—চা এবং শরীর দুই-ই যে আমার বজায় আছে, সেটা অস্বীকার করি কি ক'রে!"

একটি গাল-চড়ানো বাঁকারি-প্যাটার্নের কেশ-বিলাসী আপাদ-লম্বিত পাঞ্জাবী-পরা ভদ্রলোক, আমাকে সমর্থন করিয়া বলিলেন—"ডাক্তার বাবুদের কথা বলবেন না মশাই, ওঁরা পরের গায়ে অস্ত্র চালাতে দশভুজা,—নিজের বেলায় জগন্নাথ! চা এক চিজই আলাদা; তা না ত galloping (লাফমারা) থাইসিসের (রাজযক্ষ্মার) মত এত দ্রুত promotion (উন্নতি) পেয়ে চোল্‌তো না। ভট্টপল্লীর সরসী স্মৃতিরত্ন মশাই তাঁর জামাতাকে পোষড়ার তত্ত্বের সঙ্গে তিন্ টিন লিপটন্ আর তিন্ টিন্ ব্রুকবণ্ড পাঠিয়েছেন—স্বচক্ষে দেখেছি। অতঃপর কে ব'ল্‌বে যে চা শাস্ত্রীয় উপকরণ নয়! কিন্তু আপনি ঐ যে দুটি কথা বল্‌লেন—"কিন্তু খেতেই হয়," আর "ছাড়বার উপায়ও ছিল না" এতে একটু ধোঁকায় পড়ে গেছি,—আপনার আপত্তি না থাকে ত'—

বলিলাম—"কিছু নাঃ—একটু আধ্যাত্মিক অন্তরায়ের কথা। কি জানেন, বরাবরই ঐ উপাদেয় পানীয়টা গোবিন্দকে নিবেদন কোরে—"

তিনি হাসিয়া বলিলেন—"ওঃ, মহাশয়ের নামটি তা'হলে—"

বলিলাম—"আজ্ঞে না, আমি প্রভু শ্রীগোবিন্দের কথাই বলচি। চা জিনিসটি চট্ করিয়া অভ্যাসের মধ্যে আসিয়া যায় কি না, সুতরাং বহুদিনের নিবেদনে যদি গোবিন্দের অভ্যাস হইয়া গিয়া থাকে—এখন প্রভুকে বঞ্চিত করি কোন্ অধিকারে?—এমন কাজ চণ্ডালেও পারে কি?"

"কখনই না, কখনই না, কে এমন নরাধম আছে" ইত্যাদি ইত্যাদি, সহাস-উচ্ছ্বাসের ধুম পড়িয়া গেল।

এইরূপ বহু আধ্যাত্মিক আলোচনায়, সেদিনকার দাঁড়া দরবার ভঙ্গ হইল।

অবসান

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বাক্‌চি

মুক্ত কুসুম বিতরে গন্ধ মেলি' ওগো তার নব-পল্লব-আঁখি
করিতে পূর্ণ তব মহা-অভিলাষ,
শুকায়ে যায় গো দিবসের শেষে আপন করুণ স্মৃতিটি রাখি
ভরিয়ে বাতাসে মৃদুল পুষ্পবাস।
তেমনি এ শিশু লভিয়ে জনম অজানা ঐ কুসুমেরি প্রায়
করিতে পালন তোমারি মহান্ মন্ত্র।
দিবা-অবসানে মুদিল গো আঁখি, ফুরালো তাহার মৃদুল জীবন বায়,
শেষ হ'ল তার অশেষ দুঃখ-তন্ত্র।

ধ্যান

শ্রীসীতেশচন্দ্র সান্যাল

চঞ্চল চিত্তকে স্থির করিতে হইলে, স্থির পদার্থের আশ্রয় লইতে হইবে। যাহা স্থির, অচল, অটল, অবিকারী; যাহা নিত্য, সত্য, এক, সেই পদার্থের প্রতি একাগ্রচিত্ত হইলে, চঞ্চলতা থাকে না, দূর হয়। চঞ্চল পদার্থই চঞ্চলতার সৃষ্টি করে, স্থির পদার্থ চঞ্চলতা নাশ করে। যাহার আশ্রয় বা সঙ্গ অবলম্বন করিবে, তাহারই ধর্ম্ম, তাহারই গুণ-দোষ তোমাতে আসিবে। অহিংসার সংসর্গে বন্য পশুগণও হিংসা পরিত্যাগ করিয়া অহিংস্রক হয়। হিংসাবৃত্তিপরিশূন্য ভগবদ্ধ্যাননিমগ্নচিত্ত বালক ধ্রুবের নিকট ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সর্পাদি জন্তুগণ আসিয়া হিংসাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছিল, মনে আছে ত?

অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ।

পাতঞ্জল। সাধনপাদঃ। ৩৫।

অহিংসার প্রতিষ্ঠা হইলে অর্থাৎ অহিংসার উদয় হইলে শত্রু শত্রুতা পরিত্যাগ করে।

সুতরাং সতের সঙ্গ করিলে, স্থির পদার্থের আশ্রয় লইলে, চঞ্চলতা থাকে না, চিত্ত স্থির হয়।

বিষয় জড়, অনিত্য, চঞ্চল; বিষয়ী চেতন, নিত্য, স্থির। বিষয়কে বিষবৎ জ্ঞান করিবে—বরং বিষ হইতেও বিষয় আরও অধিকতর ভয়ঙ্কর, অধিকতর অনর্থকারী। বিষপান করিলে মৃত্যু, বিষয় দর্শন করিলেই মৃত্যু। তবে বিষয়ের মধ্যে বিষয়ীর যদি দর্শন পাও, বিষয়ের মধ্যে বিষয়ীকে যদি দেখিতে পাও, তবে বিষয় অমৃত। পদার্থের বাহ্য দেখিয়া ভুলিও না, ভিতরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিও। ভিতরে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাইবে, বাহ্যাভ্যন্তর সমস্তই অমৃত। অমৃত হইতে বিষ কখনও উৎপন্ন হয় না, অমৃতে গরল কখনও থাকে না—বিষয় বিষয়ী ছাড়া নয়। যাবৎ এই জ্ঞানের উদয় না হইবে, অর্থাৎ যাবৎ বিষয়কে ব্রহ্মসত্তা হইতে স্বাধীন, স্বতন্ত্র সত্তা-বিশিষ্ট বলিয়া বোধ থাকিবে, তাবৎ বিষয় চঞ্চল, হেয়, বিষবৎ পরিহর্ত্তব্য।

শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের পর সুগ্রীব, অঙ্গদ প্রভৃতি ছত্রিশ কোটি সেনা শ্রীরামচন্দ্রের নিকট হইতে দান পাইয়া ধন্য হইলেন। সীতাদেবী তাঁহার বহু মূল্যবান গলার

রত্নহার স্বয়ং পবন-নন্দনকে প্রদান করিলেন। হনুমান তাহা তখনই ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। ঠাকুর লক্ষ্মণ তাহাতে ক্রুদ্ধ হইলেন। ছিঁড়িবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে—

হনুমান বলে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বহু মূল্য বলি হার করিনু গ্রহণ॥
দেখিলাম বিচার করিয়া তার পরে।
রামনাম নাহি এই হারের ভিতরে॥
রামনাম হীন যাতে এমন যে ধন।
পরিত্যাগ করা ভাল নাহি প্রয়োজন॥

রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রত্নহারের মধ্যে ব্রহ্মসত্তার অনুভূতি না হওয়া পর্য্যন্ত—বিষয়ের মধ্যে বিষয়ীকে না দেখা পর্য্যন্ত, রত্ন বল, বিষয় বল, "পরিত্যাগ করা ভাল নাহি প্রয়োজন"—কেবল বাক্যে নয়, কার্য্য দ্বারা এই শিক্ষা শ্রীরামভক্ত মহাবীর মারুতি জগতে বিস্তার করিয়া দিলেন।

এইখানে একটী কথা। হনুমান কি রত্নহারে ভগবৎ-সত্তা অনুভব করিতে পারেন নাই? যিনি নিজের জড়দেহ বিদারণ করিয়া তাহাতে ভগবৎসত্তা দেখাইয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, তিনি কি জড় রত্নহারে ভগবৎসত্তা দেখিতে পান নাই? অবশ্যই পাইয়াছিলেন, কেবল লোক-শিক্ষার্থ তিনি একটী রত্নহার ছিন্নভিন্ন করিয়া জগৎকে তৎপরিবর্ত্তে আর একটী রত্নহার দিলেন—

রামনামহীন যাতে এমন যে ধন।
পরিত্যাগ করা ভাল নাহি প্রয়োজন॥

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচটী বিষয়। শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, রসন, ঘ্রাণ এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়। এই পঞ্চ বিষয় এবং পঞ্চেন্দ্রিয়ের মূলে যিনি অবস্থিতা, আত্মশক্তি নামে তিনি অভিহিতা। এই আত্মশক্তির প্রেরণায় ইন্দ্রিয়গুলি ক্রিয়াশীল। তাঁহার প্রেরণা ভিন্ন কোন ইন্দ্রিয়েরই স্বাধীনভাবে কোন ক্রিয়া করিবার শক্তি নাই, কারণ ইন্দ্রিয়গুলি জড়। ফলতঃ এই আত্মশক্তিই জড় ইন্দ্রিয়গুলির শক্তি, এই আত্মশক্তিতেই জড় ইন্দ্রিয়গুলি শক্তিযুক্ত। এই আত্মশক্তি ব্রহ্ম পদার্থ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধে; শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, রসন, ঘ্রাণে—এই ব্রহ্ম পদার্থই অনুভূত হইয়া থাকেন, অথচ তাঁহাকে আমরা জানি না। শব্দে শ্রোত্র জুড়াইয়া যায়, স্পর্শে ত্বক জুড়াইয়া যায়, রূপে চক্ষু জুড়াইয়া যায়, রসে রসনা জুড়াইয়া যায়, গন্ধে নাসিকা জুড়াইয়া যায়, আনন্দ অনুভব করে। কিন্তু এই আনন্দ কোথা হইতে আসে, এই আনন্দের মূল কোথায়, তাহা কি আমরা জানি, না, জানিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা করি?

ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না নাড়ীত্রয়ের অবিরাম স্পন্দন অনুভব করিতেছি—জাগরণ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি তিন অবস্থাতেই নাড়ীত্রয় স্পন্দিত হইতেছে। কিন্তু এই স্পন্দনের মূলে কে আছেন, কাহার শক্তিতে নাড়ীত্রয় স্পন্দিত হইতেছে, তাহার কি আমরা কোন তত্ত্ব বা অনুসন্ধান রাখি? অর্থ না বুঝিয়া, ভাব গ্রহণ না করিয়া, ভাবের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া না দিয়া, সর্ব্বদা কেবল বলি—

ইড়া পিঙ্গলা ত্বং সুষুম্না চ নাড়ী
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।

সেই আনন্দময়ী মা, সেই আত্মশক্তি ঐ নাড়ীত্রয়ের মূলে অবস্থিতা, তাঁহারই শক্তিতে নাড়ীত্রয় স্পন্দন শীলা। কিন্তু আমরা কি তাহা জানি, না, জানিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা করি? কেবল স্পন্দন অনুভব করি, কিন্তু ঐ স্পন্দনের মূলে যিনি অবস্থিতা, সেই মূলাধারা, সারাৎসারা, পরাৎপরা মাকে, সেই আত্মশক্তিকে, সেই ব্রহ্মসত্তাকে আমরা জানি না।

যাহা আছে তাহাই ত অনুভব করিতে পারি, যাহা নাই, তাহা কেমন করিয়া অনুভব করিব? সুতরাং বিষয়ে আনন্দ যখন অনুভব করিতেছি, তখন বিষয়ের মধ্যে আনন্দ অবশ্যই আছে। বারিপানে প্রাণ যখন শীতল হয়, তখন বারিতে শীতলতা অবশ্যই আছে, না থাকিয়া পারে না। কোথায় সে আনন্দ? বারি মূলে যাও, দেখিতে পাইবে শীতলতা—বিষয়মূলে যাও, দেখিতে পাইবে আনন্দ। এই আনন্দই সেই ব্রহ্মপদার্থ, সেই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম। শব্দে ব্রহ্ম, স্পর্শে ব্রহ্ম, রূপে ব্রহ্ম, রসে ব্রহ্ম, গন্ধে ব্রহ্ম—সকলের মূলেই ব্রহ্ম; অথবা সমস্তই ব্রহ্মের—শব্দ ব্রহ্মের, স্পর্শ ব্রহ্মের, রূপ ব্রহ্মের, রস ব্রহ্মের, গন্ধ ব্রহ্মের। ভগবদ্বাক্য স্মরণ আছে ত?—

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু॥
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম। (১)
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম ॥

গীতা—৭৮,৯,১০

আবার ঐ শোন একজন আত্মদর্শী মহাপুরুষের বাক্য—

ব্রহ্মণঃ সর্ব্বভূতানি জায়ন্তে পরমাত্মনঃ।
তস্মাদেতানি ব্রহ্মৈব ভবন্তীত্যবধারয়েৎ ॥
ব্রহ্মৈব সর্ব্বনামানি রূপাণি বিবিধানি চ।
কর্ম্মণ্যাপি সমগ্রাণি বিভর্ত্তীতি শ্রুতির্জগৌ ॥ (২)

শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতি। ৪৯.৫০

তাই বলিতেছিলাম, বিষয়ের মধ্যে বিষয়ীকে ধরিতে পারিলে, বিষয় অমৃত—বিষয়ীকে ধরিতে না পারিলে, বিষয় বিষ। কিন্তু শীতলতা ছাড়া যেমন বারির কল্পনা করিতে পার না, তদ্রূপ বিষয়ী ছাড়া বিষয়ের কল্পনা হইতে পারে না। সুতরাং বিষয় বিষ নয়, অমৃত—বিষয় ব্রহ্ম।

(১) হে কৌন্তেয়! জল পদার্থের মধ্যে সারভূত যে রস আমাকে সেই রস বলিয়াই জানিবে; অর্থাৎ আমিই রসতন্মাত্ররূপে জলের আশ্রয় হইয়া অবস্থান করি। এইরূপ চন্দ্র সূর্য্যে আমি প্রভারূপে, সর্ব্ববেদে প্রণব (ওঁ) রূপে, আকাশে শব্দরূপে, নরে পৌরুষরূপে, পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধরূপে, অগ্নিতে তেজোরূপে, সর্ব্বভূতে, জীবনরূপে এবং তপস্বিগণে তপোরূপে অবস্থিতি করি। হে পার্থ! আমাকেই চরাচর সমস্ত ভূতের সনাতন বীজ বলিয়া জানিবে। আমি বুদ্ধিমদদিগের বুদ্ধি, তেজস্বিগণের তেজঃ। গীতা—৭।৮,৯,১০

(২) ব্রহ্ম হইতেই সমস্ত সঞ্জাত, অতএব সমস্তই ব্রহ্ম, এইরূপ নিশ্চয় করিবে। ব্রহ্মই সকল প্রকার নাম, বিবিধ প্রকার রূপ ও সমগ্র কর্ম্ম ধারণ করিতেছেন, ইহা স্বয়ং শ্রুতি কহিয়াছেন।

শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতি। ৪৯,৫০।

অনুভব

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ

ধরায় বসন্ত নাহি, হৃদয়ে বসন্ত মোর,
কুসুমে কুসুমে প্রাণে কে রচিল ফুল নীড় ?
প্রাণে প্রাণে এ কি স্পর্শ—সুখময়-সুনিবিড়
হৃদয়ে হৃদয়ে কেবা বাঁধিল এ ফুলডোর ?
অনন্ত বসন্ত যেন,—সে অনন্ত মধুরতা,
মূর্ত্তি ধরিয়াছে যেন আমার আনন্দ-গান,
দু'জনায় নিরিবিলি—যেন সুখ-সুধাপান
মরমে মরমে ভাসে কত মধুমাখা কথা।
কত জীবনের স্মৃতি, কত জীবনের ব্যথা,
ঘুচে গেল, মুছে গেল—গেল মর্ম্ম-কাতরতা।
এ যেন প্রাণের রাস,—চির-নিবৃত্তির মাঝে,
বাহু পাশে বাঁধাবাঁধি, দেখাদেখি চোখে চোখে,
যারে চাওয়া, তারে পাওয়া পরিপূর্ণ প্রেমালোকে,
আঁখি মুদে মুদে আসে মধুর প্রণয়-লাজে।

পুনর্ম্মিলন

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ

তুমি ছিলে দেবলোকে আমি হেথা ধূলি মাঝে,
তুমি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী আলোক-মণ্ডলে দূরে,
দেবের আনন্দ-গীতি যেখানে নিরত স্ফুরে,
আর্ত্ত হৃদয়ের ব্যথা যেখানে করুণা যাচে।
কবে হয়েছিল, দেবি, ছাড়াছাড়ি দু'জনায়,
আপনা বিস্মৃত আমি ভুলেছিনু একেবারে,
তবু ঊর্দ্ধলোক হতে বাঁধি জ্যোতির্ম্ময় হারে
কবন্ধ অন্ধতা মোর ঘুচাইলে করুণায়!
ফুটিল মানস-পদ্ম—শতদল—শতশিখা,
শুচিশোভা মাখামাখি অমিয় সুবাস রসে
ধরে না হৃদয়ে সুধা পরাণ রহে না বশে
সাবিত্রী গায়ত্রী তুমি শিরে ছটা মুকুটিকা।
সর্ব্ব তপস্যার তীর্থ—বুকে নিয়ে পদ দু'টী,
পরম আনন্দ-নিধি—সুধার ভাণ্ডার লুটি' ॥
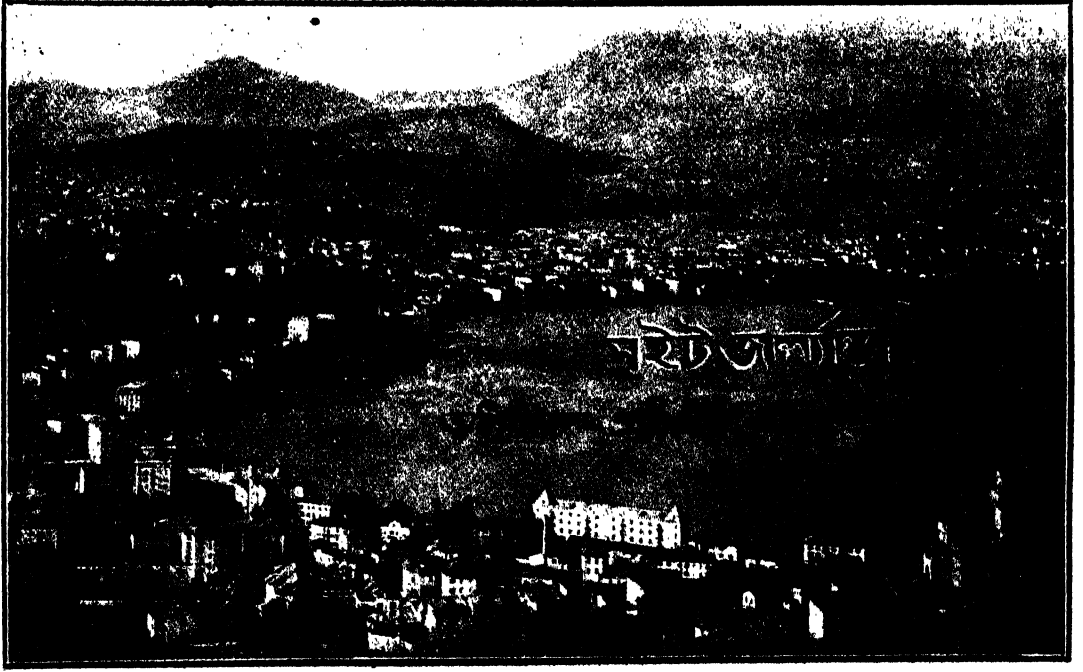
(১৪)

বিদেশী মাল আমদানির বিরুদ্ধে সুইট্সার্ল্যাণ্ডে কড়া আইন জারি আছে। কোন্ জিনিসটাকে কোন্ দেশ হইতে আসিতে দেওয়া হইবে, এই দিকে সুইস গবর্মেণ্টের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। আমরা ভারতে যাহাকে বয়কট বলি, এ দেশে তাহা অতি সহজে বিনা গণ্ডগোলে মামুলি আইনের সাহায্যে সাধিত হয়।

সম্প্রতি জার্ম্মাণ মালের বিরুদ্ধে সুইসদের নজর খুব বেশী। শস্তায় জার্ম্মাণ জিনিস সুইট্সার্ল্যাণ্ডে প্রবেশ করিলে সুইস কারখানার মাল বেচা কঠিন হইবে। তাহা হইলে কারখানায় মাল তৈয়ারি বন্ধ হইবে এবং অনেক মজুর বেকার বসিয়া থাকিবে। এই ভয়ে সুইস গবর্মেণ্ট কয়েক বৎসর হইল জার্ম্মাণির বিরুদ্ধে চড়া হারে শুল্ক বসাইয়াছে।

আজকাল সুইট্সার্ল্যাণ্ডের নানা স্থানে বেকার সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। কাজেই বিদেশী মাল বয়কটের দিকে গবর্মেণ্ট উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। জার্ম্মাণ সীমানায় কাষ্টম আফিসের কর্ম্মচারীরা যাহাতে কড়া পাহারা জারি রাখে তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

সুইসরা মহা স্বদেশ-ভক্ত জাতি। বিদেশী লোক আসিয়া সুইট্সার্ল্যাণ্ডের টাকা লুটিবে, এই দৃশ্য ইহাদের চক্ষুঃশূল। বিদেশী বয়কট এবং স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনা এক্ষণে বিলাতে যে আকারে দেখা দিতেছে, তাহার ফলে, ক্ষুদ্র সুইস জাতি "চাচা আপন বাঁচা" নীতি অবলম্বন করিবে, সহজেই ইহা বুঝিতে পারা যায়।

(১৫)

লোকার্ণো হইতে প্রকাশিত "স্যিড-শোআইট্স্" (অর্থাৎ "দক্ষিণ সুইট্সার্ল্যাণ্ড") নামক কাগজের সম্পাদক লিখিয়াছেন :—লড়াইয়ের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত সুইস জাতিকে অন্যান্য দেশের জন্য অজস্র টাকা খরচ করিতে হইতেছে। কোথায় হাঙ্গারি, কোথায় রুশিয়া,—ইহারা সকলেই সুইস দানশীলতার উপর দাবী বসাইয়াছে। ফ্রান্সের জন্য, জার্ম্মাণির জন্য, অষ্ট্রিয়ার জন্য সাহায্য-ভাণ্ডার

সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের কোন নগরেই বন্ধ হয় নাই। অথচ আজ জার্ম্মাণি-প্রবাসী বহুসংখ্যক সুইস নর-নারী অন্ন-কষ্টে ভুগিতেছে। তাহাদের জন্য সুইস-সমাজের কোথায়ও সাহায্য-সমিতি কায়েম করা হইতেছে না কেন ?"

দেখিতে দেখিতে জার্ম্মাণি-প্রবাসী দুঃস্থ সুইস পরিবারের জন্য ধন-ভাণ্ডার খোলা হইল। বার্লিনের সুইস দূত স্বয়ংই এই সাহায্য কাজের একজন প্রবর্ত্তক।

এ দেশের বেকার সমস্যার মীমাংসা করিবার জন্য কোনো কোনো কাণ্টন নয়া সরকারী কাজ সুরু করিতেছে। আর একটা পথ দেখা যাইতেছে, বিদেশে মজুর চালান করা। উত্তর আমেরিকার কানাডা দেশে চাষ-আবাদের জন্য অনেক লোক দরকার। কানাডার গবর্মেণ্ট সুইস চাষী চায়। গবমেণ্টে-গবর্মেণ্টে কথাবার্ত্তা ঠিক হইয়া গিয়াছে। আজকাল সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের ফরাসী এবং জার্ম্মাণ দৈনিক পত্রে রোজই কানাডা সম্বন্ধে সকল প্রকার খবর ছাপা হইতেছে। বিদেশে মজুর চালান করিবার প্রয়াসে গবর্মেণ্ট স্বয়ংই উদ্যোগী। কাজেই প্রয়োজন হইলে জাহাজ ভাড়া দিয়া সাহায্য করিতেও গবমণ্ট প্রস্তুত আছে।

গোটহার্ড পাসের রেলপথ—(ফটো :—Ryffel, Zurich)

(১৬)

জুরিখের রেলওয়ে ষ্টেশনের সম্মুখ দিয়া যে বড় রাস্তাটা গিয়াছে, সেটার নাম বানহোফ্‌ ষ্ট্রাসে। শহরের নামজাদা বড় বড় হোটেল,ব্যাঙ্ক, দোকান, কাফে ইত্যাদি এই সড়কে অবস্থিত। সুইসরা এই পাড়াটার জাঁক করিয়া থাকে।
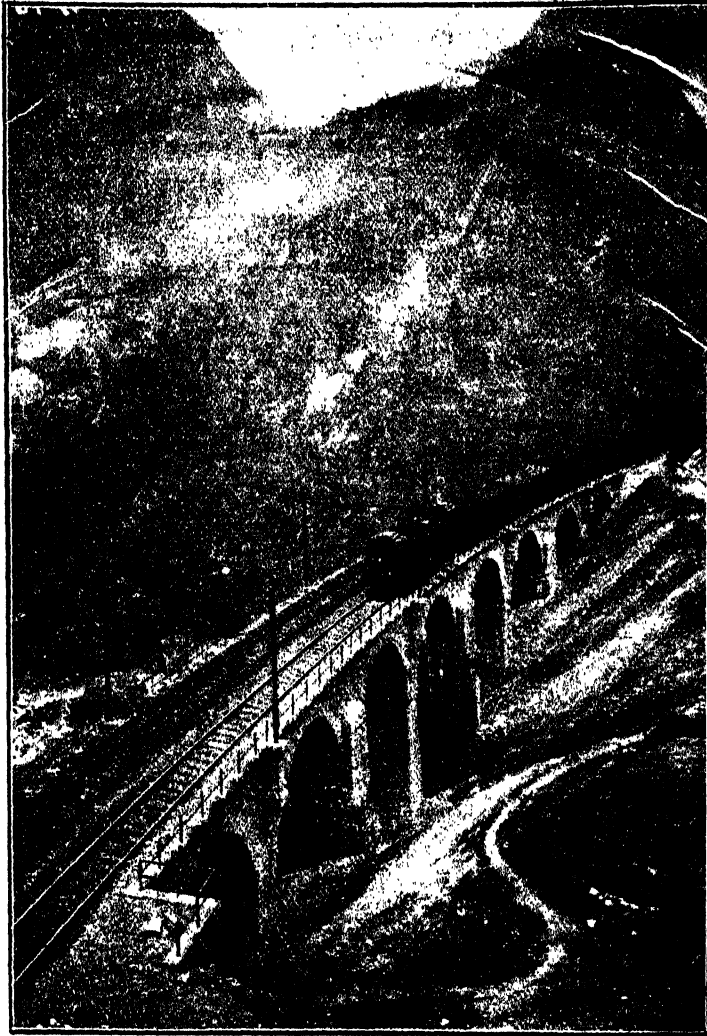
কিন্তু এক স্বদেশ-ভক্ত সুইস পরিবার বলিতেছেঃ—"মহাশয়, বড়ই দুঃখের কথা। এই যে সুন্দর সুন্দর রেষ্টরাণ্ট, দোকান ইত্যাদি দেখিতেছেন, এইগুলায় একটাও সুইস নর-নারী চোখে পড়ে না। বিদেশীরা জুরিখ ছাইয়া ফেলিয়াছে। এই বিদেশী উৎপাত না তাড়াইতে পারিলে সুইস সমাজে শান্তি আসিবে না।"

বলা বাহুল্য, এই বিদেশীদের মধ্যে জার্ম্মাণদের সংখ্যা বেশী। আরও শুনিলাম, "জার্ম্মাণির ইহুদিগুলা জার্ম্মাণজাতির রক্ত শোষণ করিয়া দেশটাকে জাহান্নমে পাঠাইয়াছে। খাঁটি জার্ম্মাণ নরনারী অনাহারে মরিতেছে। আর এই ইহুদি বাটপার দালাল ব্যবসাদারেরা বিদেশী টাকার পুঁজি ট্যাকে গুঁজিয়া সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে বসিয়া মজা মারিতেছেন !"

বিদেশী আক্রমণ হইতে সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডকে বাঁচাইবার জন্য জুরিখ কাণ্টনের লোকেরা গ্রামে-গ্রামে সভা করিতেছে। এই সকল পঞ্চায়তে ঠিক হইয়াছে যে, বিদেশীদের উপর একটা ট্যাক্স বসাইতে হইবে।

(১৭)

সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের বাইশ কাণ্টন মার্কিণ মুল্লুকের ষ্টেটগুলার মতন স্বাধীন। আবার সুইস কেন্দ্র-গবর্মেণ্ট আমেরিকার ফেডারল দরবারের ক্ষমতাগুলাই ভোগ করে। বস্তুতঃ সকল বিষয়েই সুইস-যুক্তরাষ্ট্র মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-পদ্ধতি নকল করিয়াছে।

সুইস জাতিকে বর্ত্তমান জগতের সর্ব্ব পুরাতন গণতন্ত্রী বা স্বরাজ-পন্থী বলা হইয়া থাকে। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। কেন না আমেরিকায় ১৭৮৯ সালে যে গণতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছিল, সেই শাসন-প্রণালীর আদর্শে সুইস জাতি ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে এবং পরে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে নিজেদের কন্‌ষ্টিটিউশন গড়িয়াছে। অতএব বলিতে হইবে যে, মার্কিণরাই সুইসদের শিক্ষা-গুরু।

কিন্তু সুইস গণতন্ত্রের দুইটা বিশেষত্ব আছে। মার্কিণরা সুইসদের নিকট এই দুই রীতি শিখিয়াছে। জগতের অন্যান্য জাতি এই দুই সুইস "আবিষ্কার" শাসন প্রণালীতে কায়েম করে নাই।

(১৮)

প্রথম সুইস রীতির নাম "রেফারেণ্ডাম।" কেন্দ্র-গবর্মেণ্ট অনেক বড় বড় প্রশ্নের মীমাংসা করিবার সময় একমাত্র সরকারী সভা পরিষৎ ইত্যাদির আলোচনার উপর নির্ভর করে না। সমস্যাগুলা একদম হাটে বাজারে পাড়াগ্রামে মফঃস্বলে হাজির করা হয়। জনসাধারণ যে যেখানে আছে, দল বাঁধিয়া প্রশ্নগুলা আলোচনা করে এবং সেই সম্বন্ধে মত দেয়। এই মতামত কেন্দ্র-গবর্মেণ্ট মানিয়া চলিতে বাধ্য। বর্ত্তমান জেনেহ্বা শহরের লাগা ফরাসী জেলা দুইটা লইয়া সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের যে ঝগড়া চলিতেছে, এই ঝগড়াটা "জনসাধারণের নিকট বিচারের" জন্য পাঠানো হইয়াছিল। জনসাধারণ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে রায় দিয়াছে।

গোটহার্ড পাসের উপর মোটর-পথ—(ফটোগ্রাফার :—Anton Krenn)

দ্বিতীয় সুইস বিশেষত্বকে বলে "ইনিশিয়েটিভ" বা আইন সুরু করা। জগতের অন্যান্য দেশে পার্লামেন্ট ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি সরকারী পরিষৎ সমূহই পুরানা আইন বদলাইবার অথবা নয়া আইন কায়েম করিবার ব্যবস্থা করে। কিন্তু সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের লোকেরা একমাত্র এই মামুলি পথ ধরিয়াই চলে না। ইহারা একধাপ আগাইয়া গিয়াছে।

সুইস নরনারী ইচ্ছা করিলে যখন তখন সুইস শাসন-প্রণালী বদলাইবার জন্য গবর্মেণ্টকে তলব করিতে পারে।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে রেফারেণ্ডাম বা ইনিশিয়েটিভ সুইস স্বরাজে ছিল না। সেই বৎসর এই দুই রীতি সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে প্রথম জারি হয়। পরে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ইয়াঙ্কিস্থানের কোনো কোনো রাষ্ট্রে এই দুইটা প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই দুই ক্ষমতায়ই জনসাধারণ গবর্মেণ্টকে সর্ব্বদা স্ববশে রাখিতে পারে।

(১৯)

বাজেল শহরে সুইস মজুরদের দুইটা দৈনিক কাগজ চলিতেছে। একটা কাগজ মামুলী সোশ্যালিষ্টপন্থী।

লোকার্ণো (ইতালির সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের নগর)—(ফটো :—Wehrli, Zurich)

এই জন্য দেশের শহরে পল্লীতে সর্ব্বত্র জনসাধারণ সভা ডাকিয়া পরামর্শ করে। একমাত্র শাসন-প্রণালীটার পরিবর্ত্তন বা সংশোধনই এই পরামর্শের বিষয় নয়। নয়া নয়া কানুন কায়েম করাও এই সকল সভায় সাব্যস্ত হইতে পারে। পরে কেন্দ্র-গবর্মেণ্টকে প্রস্তাবগুলা পাঠানো হয়। বর্ত্তমানে জুরিখ জেলার লোকেরা যে বিদেশীদের উপর আইন বসাইতে চাহিতেছে, তাহা এই ইনিশিয়েটিভের ক্ষমতায়ই সম্ভব হইয়াছে।

"আরবাইটার্‌ৎসাইটুঙ্‌।" আর একটা বোলশেভিক বা কমিউনিষ্ট পন্থী। নাম "ফোর্‌হ্বার্ট্‌স্‌"।

"আরবাইটার্‌ৎসাইটুঙ্‌" একটা লটারির বন্দোবস্ত করিয়া পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। এই টাকার সুদ দিয়া প্রত্যেক বৎসর কয়েকজন মজুরকে গ্রীষ্মকালে ছুটির সময় স্বাস্থ্যকর জায়গায় পাঠানো হইবে, এইরূপ বলা হইয়াছে।

বোলশেভিক "ফোর্‌হ্বার্ট্‌স্‌" বলিতেছে,—"সোশ্যা-

লিষ্টরা জুয়াচোর। দেশের টাকা মারিয়া খাইবার জন্য "আরবাইটার ৎসাইটুঙ্" একটা ফন্দি আঁটিয়াছে মাত্র। কোনো মজুর এই ধাপ্পায় ভুলিবে না।"

"আরবাইটার ৎসাইটুঙ্" এক পাল্টা জবাব ছাপিয়া বলিতেছে:—"সোশ্যালিষ্টদিগকে জুয়াচোর বলিতেছেন কাহারা? বোলশেভিকরা! রুশ গবর্মেণ্টের অনেক টাকা ফোরহ্বার্ট্‌সের হাতে ছিল। সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের প্রবাসী রুশ কমিউনিষ্টগণকে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য ফোরহ্বার্ট্‌সের সম্পাদক মস্কো হইতে এই টাকা পাইয়াছিলেন। অথচ তিনি সব টাকা গাপ করিয়াছেন। আমার হাতে সকল প্রমাণ আছে।"

ইতালিয় সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের পল্লী—গাণ্ডিয়া—(ফটো :—Wehrli, Zurich)

ফোরহ্বার্ট্‌সের সম্পাদক বলিতেছেন:—"রুশিয়ার নিকট হইতে আমি এক দামড়িও পাই নাই।"

(২০)

জুরিখ শহরটা ইন্‌সব্রুকের মতন সমতল ভূমির উপরই অবস্থিত। কিন্তু এখানেও ইন্‌সব্রুকের মতনই পাহাড়ী অংশের উপর নগর গড়িয়া উঠিয়াছে। এই শহরের "ইস্কুল পাড়াটা"কে প্যারিসের নকলে "কার্তিয়ে ল্যাতাঁ"—ল্যাটিন পাড়া বা "ভট্টপল্লী" বলা হয়। টেকনিক্যাল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, চিকিৎসা বিদ্যালয় ইত্যাদি সবই পাহাড়ের উপর। ইস্কুল-পাড়ার ঘরবাড়ীগুলো জুরিখের সুইসদের এক গৌরব বিশেষ।

পাহাড়ের সৌন্দর্য্য আর পাহাড়ী দরিয়ার-সৌন্দর্য্য দুই-ই জুরিখবাসীরা ভোগ করে। কিন্তু বোধ হয় বিদেশীরা প্রথমেই জুরিখের হ্রদ দেখিয়া মুগ্ধ হইবে। এইখানেই ইন্‌সব্রুক হইতে জুরিখের প্রভেদ। আল্পস্ পাহাড়ের এই দুই রত্নের ভিতর সৌন্দর্য্যের তরফ হইতে কোনো একটাকে বাছিয়া লওয়া কঠিন।

হ্রদের নীল জল জুরিখকে যার পর নাই চিত্তাকর্ষক করিয়া রাখিয়াছে। পর্য্যটক মাত্রেই টিরোলী আর সুইস্ শহরের তুলনা করিতে যাইয়া এই মত প্রচার করিতে বাধ্য হইবেন। তবে ইন্‌সব্রুকের যে কোনো বাড়ী অথবা যে কোনো রাস্তা হইতে আকাশস্পর্শী পর্ব্বতের মাথার মালা দেখিতে পাওয়া যায়। জুরিখে আল্পস্ অত উঁচু নয়। কাযেই প্রাকৃতিক গরিমা এখানে কিছু কম।

(২১)

জুরিখের "পুরানা শহরটা"য় মধ্যযুগের সুইস জীবন দেখিতেছি—অথবা আন্দাজ করিতেছি। ছোট ছোট

গলি ও ঘর-বাড়ীর আওতায় সুকুমার শিল্পের আওতা পাইতেছি।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর একটা গির্জ্জা বিদেশীরা সকলেই দেখিয়া যায়। নাম "গ্রোসমিন্‌ষ্টার"। "রোমানেস্ক" এবং "গথিক" এই দুই বাস্তু রীতির খিচুড়ি শিল্প-রসিকদের নিকট রসের রসদ বটে। এই গির্জ্জাতেই সুইটসার্ল্যাণ্ডের লুথার স্বরূপ ধর্ম্ম-সংস্কারক ৎসুইংলি দশ-বারো বৎসর ধরিয়া পুরোহিত ছিলেন। সে ১৫১৯ সালের কথা।

জুরিখে লোকেরা স্বাস্থ্যের জন্যও আসে না অথবা সুকুমার শিল্পের জন্যও আসে না। অবশ্য জার্ম্মাণিতে সাহিত্য, নাটক, অপেরা, কনসার্ট ইত্যাদি যা কিছু জন্মে, মাত্র একটা। সেইটা এই স্থান মাহাত্ম্যের জন্য জুরিখেই কায়েম করা হইয়াছে। কলেজটা চলে জুরিখ জেলার খরচে নয়, সুইস কেন্দ্র-গবর্মেণ্টের খরচে ও শাসনে।

(২২)

ভারতবর্ষের যে সকল ছাত্র ইয়োরোপে আসে, তাহারা জুরিখের টেক্‌নিক্যাল কলেজ সম্বন্ধে বোধ হয় বেশী খবর রাখে না। কিন্তু বার্লিন, মিউনিক ইত্যাদি শহরের তুলনায় জুরিখের "টেক্‌নিশে হোখশুলে"টা খাটো বিবেচিত হইবে না। বলা বাহুল্য, দুচার দশজন ভারতীয় ছাত্র এখানকার ধরণ-ধারণের সহিত পরিচিত হইবার পূর্ব্বে কোনো মত
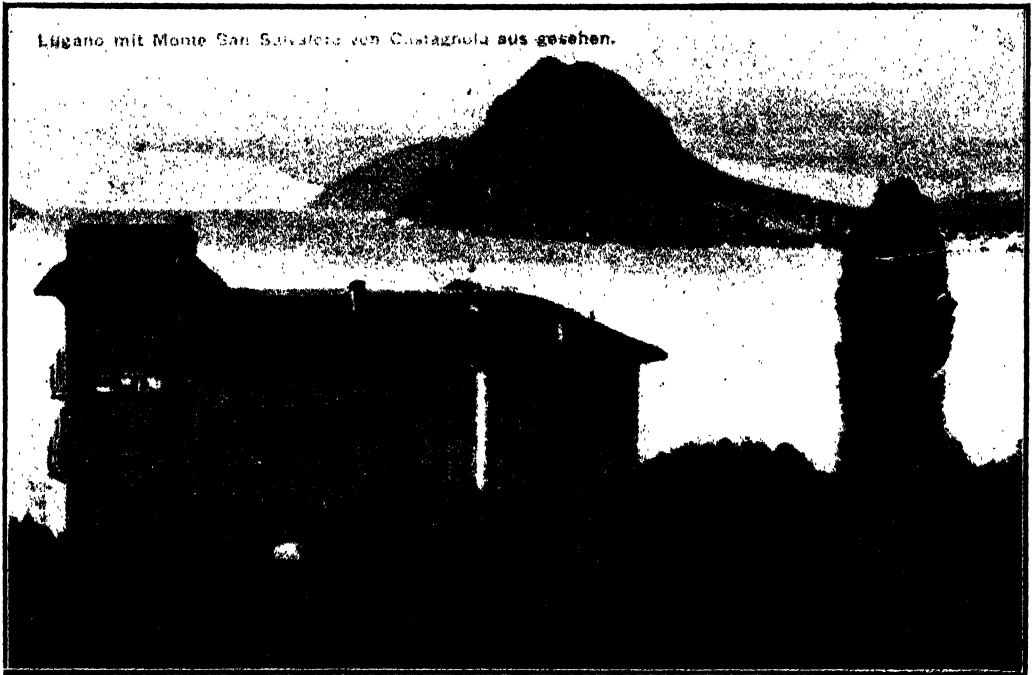
লুগানো হ্রদের পাহাড়ী উষা

জুরিখে সবই চালান আসে। এখানকার "টোনহালে" বা সঙ্গীতভবন সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের বাহিরেও নামজাদা; মিউজিয়াম, আর্ট-গ্যালারি ইত্যাদিও আছে। কিন্তু মোটের উপর জুরিখ একটা বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে সুইস সমাজে পরিচিত। ইয়োরোপের সর্ব্বত্রই এই হিসাবে জুরিখের ইজ্জত। জুরিখ জেলায় এবং আশেপাশে এঞ্জিনিয়ারিং লাইনের কারবার অনেক।

উচ্চাঙ্গের টেক্‌নিক্যাল কলেজ সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে আছে জাহির করা উচিত নয়। তাড়িতের বিদ্যা, যন্ত্রপাতির বিদ্যা, রসায়ন ইত্যাদি বিভাগে জুরিখের শিল্প-কলেজের নাম আছে।

জুরিখের "নয়ে ৎস্যুরিখার ৎসাইটুঙ্" কাগজ প্রতি দিন তিনবার করিয়া বাহির হয়। প্রত্যেক সংখ্যায়ই কল কার-খানা, ফ্যাক্টরি, ব্যাঙ্ক, ব্যবসা, বৈজ্ঞানিক গবেষণার সংবাদ প্রচুর থাকে। এইগুলা রোজ রোজ পড়িয়া গেলে, সুইস জাতির বিপুল শিল্প-প্রয়াসের পরিচয় পাই। কাগজটাকে

ত জার্ম্মাণির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাগজগুলার সমান বিবেচনা করিতেছিই ! এমন কি, সঙ্গে-সঙ্গে ফ্যাক্টরি-শিল্পের আসরে, সুইটসার্ল্যাণ্ডকে একটা ছোটখাটো জার্ম্মাণি বিবেচনা করিতে প্রলুব্ধ হইতেছি। এই হিসাবে সুইস-সমাজকে যুবক ভারতের এক কর্ম্মক্ষেত্র বিবেচনা করা উচিত।

একটা লজ্জার কথা প্রত্যেক ভারত-সন্তানেরই মনে আসিবে। সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের লোক-সংখ্যা মাত্র চল্লিশ লাখ। অর্থাৎ ভারতের যে-কোনো তিন জেলার গোটা সুইস জাতি বাস করিতেছে, এইরূপ বুঝিতে হইবে। আর সেই সুইস জাতির নিকট—বিশাল—পুরোপুরি একশগুণ বিশাল—ভারত-সমাজ সাগ্‌রেতি করিতে বাধ্য !

ভারতে আমরা শিক্ষাপ্রচারক পেষ্টালোট্‌সির (১৭৪৬-১৮২৫) মতামত আলোচনা করিয়া থাকি। ইনি জগৎ-প্রসিদ্ধ, সন্দেহ নাই। ইনি জুরিখে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের আর এক মনীষী জগৎ-প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার নাম রুশো। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে জেনেহ্বায় তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। রুশোর "এমিল" গ্রন্থে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রকৃতি-পূজা প্রবর্ত্তিত হয়। পেষ্টালোট্‌সি রুশোপন্থী রূপেই শিক্ষার আসরে সম্মান পাইয়া আসিতেছেন। ফরাসী সাহিত্যে ও জীবনে—সমগ্র ইয়োরোপীয় চিন্তাধারায়ই রুশোর প্রভাব বিপুল আকার ধারণ করিয়াছিল।

(২৩)

ভারতে বসিয়া আমরা মনে করি যে সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের শহরগুলা সবই উঁচু উঁচু পাহাড়ের মাথায় অথবা উপত্যকায় অবস্থিত। এই ধারণা ভুল। নামজাদা সুইস শহরের কোনটাই ১৮০০ ফিট পার হয় না।

জুরিখ মাত্র ১৪০০ ফিট উঁচু। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের জেনেহ্বা শহরের অবস্থান ইহার চেয়েও নীচু। বাজেল সহর জার্ম্মাণি, সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের সীমানায় অবস্থিত। শিল্প, বাণিজ্যে এই শহর জুরিখেরই সমান। শিক্ষা, সাহিত্য ইত্যাদির তরফ হইতে অনেকে বাজেলকে জুরিখের চেয়ে বড় মনে করে। সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের সর্ব্বপুরাতন বিশ্ববিদ্যালয় বাজেল সহরেই গড়িয়া উঠিয়াছে। সে প্রায় চার পাঁচশ' বৎসরের কথা। বাজেল মাত্র ৮০০ ফিট উঁচু।

সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের বাহিরে আর যে কয়টা শহরের নাম সুপরিচিত, তাহার ভিতর লুৎসার্ণ প্রায় ১৫০০ ফিট উঁচু। লুৎসার্ণ জার্ম্মাণ সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের এক বড় কেন্দ্র। লোজানের নাম শিক্ষা-সাহিত্যের আসরে কথঞ্চিৎ পরিচিত। ফরাসী সভ্যতার এক খুঁটা রূপে লোজান সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। এই শহরে একটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এই কারণেও জগতে ইহার নাম রটিয়াছে। লোজান প্রায় ১৭০০ ফিট উঁচু।

সুইস যুক্তরাষ্ট্রের ফেডার্যাল দরবার বসে বার্ণ শহরে। এই নগর জুরিখ, বাজেল, লুৎসার্ণের মতনই জার্ম্মাণ-সুইস-কেন্দ্র। বার্ণের নাম পাঠশালার ভূগোল ছাত্রেরাও মুখস্থ করিয়া থাকে। এই শহরটা উচ্চতায় লোজানের কিছু বেশী।

অর্থাৎ হিমালয়ের শহরগুলার তুলনায় নামজাদা সুইস শহরগুলা সবই নেহাৎ নীচু। শিমলা, নৈনিতাল, আলমোড়া, দার্জ্জিলিঙ এবং এমন কি টিণ্ডারিয়া, এই সব শহরের সঙ্গে কোনো প্রসিদ্ধ সুইস শহরই উচ্চতা হিসাবে টক্কর দিতে পারে না।

(২৪)

আল্‌প্‌স্‌ পাহাড়ের দেশগুলা সম্বন্ধে ভারতবাসীর জ্ঞান বিশেষ স্পষ্ট নয়। একটা কথা মনে পড়িতেছে। কি সুইট-সার্ল্যাণ্ড, কি টিরোল—দুই প্রদেশই বহুসংখ্যক হ্রদে ভরা। হ্রদগুলা সাগর বিশেষ। এই পাহাড়ী সাগর গোটা আল্‌প্‌স্‌ জনপদের প্রাকৃতিক বিশেষত্ব। অধিকন্তু এক দিকে হ্রদগুলার কিনারা চাষ আবাদ, পশু পালন এবং বস্তি কায়েমের সুযোগ দিয়াছে। অপর দিকে দেশটা নীল জল এবং নীল আকাশের প্রভাবে সৌন্দর্য্যের খনিতে পরিণত হইয়াছে

জুরিখের হ্রদ ছাড়িয়া দক্ষিণে যাইতে না যাইতেই রেলে ফিয়ারহ্বাল্ডষ্টেটার হ্রদ পাওয়া গেল। হ্রদের কিনারার কুঁড়েগুলা ছবিতে আঁকা দৃশ্যের মতন দেখাইতেছে। শাফহাউজেন হইতে সুরু করিয়া রেলপথের দুই ধারে লাল টালির মতন ছাদওয়ালা কাঠের দেওয়ালযুক্ত শান বাঁধান ঘর দেখিতেছি। সাগরের ঘাটে ঘাটে নাওয়া, মাছ ধরার ব্যবস্থা আছে। ষ্টীমারে নৌকায় যাতায়াতের আয়োজনও দেখিতেছি। আকাশে মেঘ নাই। মাঠগুলা

বরফে ভরা। তরুহীন বরফ-ঢাকা সাদা পাহাড়-চূড়াগুলা হ্রদের দুই কিনারায় খাঁড়া হাতে করিয়া যেন আকাশের দিকে তাকাইয়া আছে।

(২৫)

পথে পড়িল উরি, সুইটস্ ইত্যাদি পল্লী সন্নিহিত অঞ্চল। এই জনপদ জার্ম্মাণ নাট্যকার শিলার বিবৃত বীর হ্বিল্‌হেল্ম টেলের কর্ম্মক্ষেত্র। একজন সহযাত্রী বলিতেছেন:—"টেল নামক কোনো সুইস ছিল কি না সন্দেহ। গল্পটা একটা কাহিনী মাত্র। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অষ্ট্রিয়ার অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এই জনপদের তিন জেলার চাষী মেষপালকেরা যে লড়াই চালাইয়াছিল, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

সেই ঘটনাই সুইস স্বরাজের এবং সুইস স্বাধীনতার সূত্রপাত করিয়াছে। তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত কোনো দিন সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের লোকেরা অপর কোনো জাতির অধীনতা স্বীকার করে নাই। বরং উরি, সুইট্‌স্ এবং উণ্টার হ্বাল্‌ডেন এই তিন পল্লীকে কেন্দ্র করিয়া আ্যল্পস্ পাহাড়ের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা বাইশটা সুইস কাণ্টন বা জেলা গড়িয়া তুলিয়াছে। হ্বিল্‌হেল্ম টেলের "বাস্তুভিটা" এই অঞ্চলের ফিয়ারহ্বাল্ডষ্টেটার হ্রদকে সুইস সমাজে এবং পর্য্যটক মহলেও প্রসিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। রেলে বসিয়াও হ্রদের এবং পাহাড়ের অপূর্ব্ব শোভা উপলব্ধি করিতেছি।

(২৬)

বরাবর দক্ষিণ দিকে চলিতেছি। পাহাড়ী রেলপথ। পাহাড়ে গাছ-গাছড়ার আওতা বেশী নাই। সুড়ঙ্গ ফুঁড়িয়া যাইতেছি—কতগুলা তাহার হিসাব নাই। একটা সুড়ঙ্গ পার হইতে লাগিল পনর মিনিট। গাড়ী চলিতেছিল পুরা দমে। গোটহার্ড পাহাড়ের সুড়ঙ্গ নামে এইটা জগতে প্রসিদ্ধ।

গোটহার্ড ছিল পুরানা আমলে উত্তর-ইতালীর নবাব-জমিদারদের সীমানা। এই জমিদারদের সঙ্গে সুইস চাষীরা অনেক লড়িয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত উনবিংশ শতাব্দীতে একটা জেলা ইতালীর খপ্পর ছাড়াইয়া সুইস কাণ্টনগুলার সামিল হইয়াছে। এই জেলার অধিকাংশ লোক আজও ইতালীয় ভাষায় কথা বলে। সভ্যতা, রীতিনীতি, কুসংস্কার, চালচলন সবই এখানে ইতালীয়ান্। জেলাটার নাম টেসিন (জার্ম্মাণে), তেসাঁ (ফরাসীতে), টিসিনো (ইতালীয়ানে)।

গোটহার্ড পর্য্যন্ত রেলপথ ক্রমে উঁচাইয়া চলিতেছিল। এইবার নামিতে লাগিল। এঞ্জিন চলিতেছে তাড়িতের জোরে। সুইটসার্ল্যাণ্ডে শীঘ্রই বাষ্পের ঠাঁইয়ে সর্ব্বত্র তাড়িৎ প্রভাব বিস্তার করিবে। বেলিন্‌ৎসোনা শহরে গাড়ী একদম যেন সমতল ভুঁয়ে আসিয়া ঠেকিল বোধ হইতেছে। এই শহর টেসিন জেলার শাসন-কেন্দ্র। কারখানার ধুমধাম কিছু কিছু দেখিতেছি। গাড়ীতে বসিয়া যে সকল বাড়ী ঘর দেখিতেছি, তাহার বিজ্ঞাপনে জার্ম্মাণ বা ফরাসী ভাষার রেওয়াজ দেখিতেছি না। লোকজনের কথাবার্ত্তায় শুনিতেছি অপরিচিত আওয়াজ। বুঝিতেছি, ইতালীয়-সুইস মণ্ডলে আসিয়া পড়িয়াছি।

(২৭)

টেসিন কাণ্টনের চাষ-আবাদে লক্ষ্য করিতেছি নয়া নয়া দৃশ্য। বরফের প্রভাব এই অঞ্চলে নাই। জুরিখে ছিল শীত। এখানে গরম। দুই ধারের ক্ষেতে আঙুরের চাষের জন্য মাচাঙ দেখিতেছি। ফসল কাটা হইয়া গিয়াছে। পাহাড়ের গায়ে-গায়ে অথবা সমতল মাঠেই সারি-সারি মাচাঙ-শ্রেণী এক অভিনব সমাজের পরিচয় দিতেছে।

একদম হ্রদের কিনারায় আসিয়া পৌঁছিলাম। নগরের নাম লোকার্ণো। মাত্র সাত শ ফিট উঁচু। নবেম্বর মাসের মাঝামাঝি। অথচ শীত একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে শীতকালেও গরম। এ কথা বিশ্বাস করা সম্ভব কি? বস্তুতঃ লোকার্ণোর মতন দক্ষিণ-সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের ইতালীয় শহরগুলা নরম শীতের জন্যই বিখ্যাত। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি অর্থাৎ উত্তর-ইয়োরোপের যে সব নরনারী কড়া শীত সহ্য করিতে অপারগ, তাহারা লোকার্ণোর মত সুইস আড্ডায় বস্তি গাড়ে। এই হিসাবে লুগানো শহর টুরিষ্ট মহলে এবং স্বাস্থ্যান্বেষী মহলেও নামজাদা।

পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে হোটেল এবং পাংসিওন-গুলা উঠিয়াছে। সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের ধাপে-ধাপে সিঁড়ি-

কাটা শহর-বিন্যাসের নমুনায়ই সিমলা দার্জ্জিলিঙের নগর-গঠন সাধিত হইয়াছে। বাড়ীগুলার বাগানে-বাগানে ফুল ফুটিয়াছে। সন্ধ্যা কালে বেড়াইতে বাহির হইয়া দেখি, প্রত্যেক রাস্তায়ই জুঁই গোলাপ চামেলীর গন্ধই যেন পাইতেছি। গাছে গাছে কমলা লেবু দেখিতেছি। কলা গাছও বিরাজমান,—যদিও সেগুলা বেঁটে। হ্রদের নীল জলে দুএকটা নৌকা চলাফেরা করিতেছে। আকাশে চাঁদ উঠ'উঠ'। লাগো দি মাজিওরে নামক, আধা-ইতালির আধা-সুইস হ্রদের সৌন্দর্য্যকাহিনী ইয়োরোপের বালক-বালিকারা ঠাকুরমার ঝুলিতেই পাইয়া থাকে।

পদার্থের ধর্ম্ম

(রঙ্গ রস)

অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ এম-এস্‌সি

সংজ্ঞা (Definition)

পদার্থ কাহাকে বলে? পদার্থের definition দেওয়া কঠিন। তবে মোটা কথায়, যাহার 'ওজন' বা ভার' আছে, তাহাই পদার্থ। ছায়ার ওজন নাই বলিয়া, ছায়া পদার্থ নহে। [পত্নীকেও 'ছায়া' বলা হয়, তবে পত্নীও কি অপদার্থ!]

মানুষের মধ্যেও তাহাদেরই 'পদার্থ' আছে, যাহাদের চালচলন ভারী, মেজাজ ভারী, দেমাক ভারী, আওয়াজ ভারী, এমন কি অধিকাংশ সময়েই ভুঁড়িরও যথেষ্ট 'ভার' লক্ষিত হয়।

পদার্থের তিন রূপ [Three states of matter]

[শুধু যে পদার্থেরই তিন রূপ তাহা নহে, পদার্থ অপদার্থ, বস্তু অবস্তু, গুণ দোষ, ধর্ম্ম অধর্ম্ম,—মোট কথা, সকলেরই তিন অবস্থা! 'সন্তার তিন অবস্থা,' 'বিরহিনীর তিন দশা', ভগবানের তিন রূপ,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর; খৃষ্টানদেরও Trinity, গুণেও 'সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ', পরীক্ষাতেও তিন স্তর—আদ্য, মধ্য, উপাধি। ব্যাকরণে ত ভুরী ভুরী—Present, past, future; masculine, feminine, neuter; positive, comparative, superlative; indicative, imperative, subjunctive; স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল; দেব, মানব, দানব; কবি, সমালোচক, পাঠক—অলমতি বিস্তারেণ।]

জড়—Solid.

একের নম্বর—জড় বা নিরেট, solid; তাহাদের নিজের এক একটা চেহারা বা আকৃতি আছে। জড়-উপাসক সাহেবরা solid—তাহাদের কথা এমন শক্ত যে নড়চড় হয় না, কাজ এমন নিরেট, যে কিছুতেই তার মধ্যে ত্রুটী বা 'ফাঁক' পাওয়া যায় না। মত এত জড়, যে সহজে পরিবর্ত্তন হয় না, আর হৃদয়—সে তো ভয়ানক কঠিন। হনলুলু, কামস্কাটকা, টিম্বাকটু—যেখানেই তাঁহারা যান না কেন, পোষাকে পরিচ্ছদে, আহারে বিহারে, আচারে ব্যবহারে, সাহেবরা সর্ব্বদাই সাহেব,—একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।

তরল—Liquid.

দুইয়ের নম্বর—তরল পদার্থ। তাহাদের নিজস্ব কোন আকৃতি নাই। ঘটী, বাটী, গ্লাসে যেখানে রাখা যাইবে, সেই পাত্রের চেহারার অনুযায়ী হইবে তাহাদের চেহারার পরিচয়।

এই দলে পড়িয়াছেন ভারতবাসী, যখন যে রকম প্রয়োজন বা অবস্থা, সেই রকম ভাবেই তাহাদের চেহারার বা 'ভোলের' বদল হইয়া থাকে। তাহাদের মতের, কার্য্যের, কিম্বা কথার কোন 'স্থিরতা' 'দৃঢ়তা' বা 'জড়তা' নাই। সবই 'শিথিল'। অর্থাৎ তাহাদের নীতি—যস্মিন্

দেশে যথাচারঃ। এই ফোঁটা তিলক আঁকিয়া হরিনামে মত্ত হইয়া, বৈষ্ণব চূড়ামণিরা "হিন্দুধর্ম্ম করিছে রক্ষা, খৃষ্টানী হো'ল মাটী" কিন্তু যেই পুলিস গুঁতা উঁচাইয়া আসেন, তখনই তাঁহারা দেন "চম্পট পরিপাটী।" তাঁহারা সাহেবের দলে সাহেব, হিন্দুর দলে টিকীধারী, মুসলমানের মধ্যে খিলাফৎকর্ম্মী, এবং ইলেকসনের সময় খদ্দর-প্রচারক; বাড়ীতে কিম্বা বৈঠকখানায় গরমপন্থী, সভাসমিতিতে নরমপন্থী এবং হুজুর সমীপে শ্রীচরণ-বন্দী। ইহাদের যে কোন নিজস্ব স্বরূপ আছে, এ কথা শত্রুতেও বলিতে পারিবে না।

বাষ্প—Gas.

তবে সুখের বিষয় এই যে, বাঙ্গালী ভিন্ন ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীরা 'তরল' হইয়াছে, আশা আছে কোন দিন 'জড়'ও হইতে পারে। [পাটিতে বাঙ্গালীকেও অনেক সময় তরল-অবস্থায় দেখা যায়; এবং তাঁহারা নিজেরা 'জড়' না হইলেও, অন্যের চেয়ে তাহাদের বেশী 'জর' হইয়া থাকে, এবং কাজেই তাহাদের তনুও 'জর-জর'।]

বাঙ্গালীরা হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হইয়া মিশিয়া আছেন। তাহাদের স্বভাবধর্ম্ম, আচার ব্যবহার ভয়ানক রকম volatile। বায়বীয় পদার্থের প্রধানতম গুণ—অত্যধিক 'বিস্তৃতি'। বাঙ্গালীরও কি সর্ব্বদিকে বিশেষ বিস্তার হইতেছে না? বংশে [যদিও কর্ণেল মুখার্জ্জী স্বীকার করেন না] বিস্তার, (অন্ততঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজে) খেতাবে, বাক্যে—তাহাদের মত 'বিস্তার' আর কোন্ জাতির?

ত্রিরূপ

একই পদার্থ, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায়, ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়া থাকে, যেমন একই জলের তিন অবস্থা—বাষ্প, জল, বরফ।

তেমনি একই রমণীর তিন অবস্থা—বালিকা, তরুণী ও বৃদ্ধা। বালিকারা বায়ুকণিকার মত দিন রাত ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিতেছে—মুহূর্ত্তের জন্যও 'নিশ্চল' নয়—ইহাই যে Kinetic theory of Gases.

সংসারের কথঞ্চিৎ 'শৈত্যে' এবং কথঞ্চিৎ বয়সের চাপে', এই বালিকাই যে তরুণীতে পরিণত হন; তাঁহারা য অনেকেই 'উর্ম্মিলা', 'তরঙ্গমালা'। তাঁহারা 'হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যান,' কুলুকুলু কল নদীর স্রোতের মত'—'এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?' তখন তাঁহাদের বালিকাসুলভ সেই উদ্দাম 'চাঞ্চল্য' আর থাকে না,—তখন জলের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে। অত্র প্রমাণং যথা—

(১) তরল পদার্থের প্রধান ধর্ম্ম এই যে, ইহার যে কোন স্থানে একটু 'চাপ' দিলে, সর্ব্বত্রই সেই 'চাপ' 'সমান' ভাবে পরিদৃষ্ট হইবে। ইহাই Pascalএর সূত্র। কোন অপরিণামদর্শী স্বামী ভুলক্রমে যদি কোন দিন গৃহিণীর উপর মৃদু ভর্ৎসনার 'চাঁপ' প্রয়োগ করেন, তিনি তখনই Pascalএর সিদ্ধান্ত হাড়ে হাড়ে অনুভব করিবেন। তৎক্ষণাৎ সেই 'চাপে'র ফল, তরুণীর প্রতি অঙ্গে, চোখে মুখে, হাবে ভাবে, এমন কি চাবীর ঠুনঠুনিতে পর্য্যন্ত পরিষ্কার রূপে পরিলক্ষিত হইবে। [অবিশ্বাসী Experiment করিয়া দেখিতে পারেন।]

(২) Perfect fluidএর গতি অবাধ—এবং perfect নারীর স্বভাবও অবিকল তাহাই। "Her household motions light and free"। তবে যেমন viscous liquidএরও অভাব নাই, তেমনি অনেক 'মাথার রতন'ই যে আবার 'লেপ্টে থাকেন আঠার মতন'। [বিছানার সঙ্গে কি?—কাজেই অনাবশ্যক দাসদাসীর প্রয়োজন।]

(৩) তরল পদার্থ মাত্রেরই 'চাপ' আছে—তবে তাহা 'normal'.

তরুণীরাও যে স্বামীকে 'চাপ' দেন—সাড়ী ব্লাউজ গহনার তাগাদার চাপ—তাহা বাহ্যদৃশ্যে অনেকেই abnormal মনে করেন। কিন্তু কোন স্বামীই কি এ কথা স্বীকার করিবেন? যাহাদের উপর চাপ, তাহারাই যখন normal বলিতেছেন, তখন ঝগড়ার ফল কি?

(৪) তরল পদার্থের মধ্যে কোন বস্তু 'নিমজ্জিত' করিলে, পদার্থটীর ওজন (apparent weight) কমিয়া যায়—অর্থাৎ পদার্থটী সাময়িক ভাবে 'লঘু' হইয়া পড়ে। ইহাই Archimedesএর সিদ্ধান্ত।

অমন যে 'গুরু' গম্ভীর সত্তঃ—দিলদরিয়া এম্-এ পাস বর—সেও যখন বাসর ঘরে তরুণী-সমাজে নিমজ্জিত হয়, তখন কি তাহার স্বভাবে একটা সাময়িক লঘুতা আসিয়া

পড়ে না ? যে সমস্ত ব্যক্তি সর্ব্বদা তরুণী-সমাজে 'ডুবিয়া' থাকে, তাহাদিগকে আমরা 'হাল্কা' জ্ঞান করি। বাস্তবিকই কি তাহারা 'হাল্কা' ?—Archimedesএর Law অনুসারে এরূপ ঘটে না ত ?

[যাঁহারা 'গুরু' হইতে বাসনা রাখেন, তাঁহারা যেন সর্ব্বদা 'গুরুত্ব' বজায় রাখেন—এই জন্যই কি 'কামিনী-কাঞ্চন' ত্যাগের ব্যবস্থা ? 'কাঞ্চন' কেন ?—বোধ হয় অনুপ্রাসের অট্টহাস !]

অতএব প্রমাণ হইল তরুণীরা 'তরল'। Q. E. D.

শোক দুঃখের 'শৈত্যে', বয়সের নিদারুণ 'চাপে', এই সমস্ত তরুণীরাই 'জমাট' বৃদ্ধায় পরিণত হন। রেলে ষ্টীমারে যাতায়াত কালে, সকলেই দেখিয়াছেন যে তাঁহাদের বৃদ্ধা দিদিমা ঠাকুরমারা, বাক্স পেটারার মত এক একটা বিরাট 'জড়' পিণ্ড—এক একটা অনাবশ্যক অতিরিক্ত বোঝা মাত্র !

Impenetrability—অবিভেদ্যতা

বস্তুর সেই গুণকে impenetrability বলা হয়, যে গুণবশতঃ ঠিক একই সময়ে দুইটী বস্তু একই স্থান অধিকার করিতে পারে না। কলসীতে জল ভরিতে গেলে, আগে বক্‌বক্ করিয়া ভিতরের বায়ু বাহির হইয়া যাইবে, পরে জল তন্মধ্যে প্রবেশের অধিকার পাইবে।

এই নিয়মের গুণেই খেলা ও পড়া একই সময়ে চলে না। "One thing at a time." 'রথদেখা ও কলাবেচা' কথাটা চলিয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু দুইটী কাজই সমানে চলিতে পারে কি না, সন্দেহ। Impenetrabilityর দরুণ লক্ষ্মী ও সরস্বতী একই গৃহে একই সময়ে স্থান পাইতে পারেন না। যে গৃহে কমলা বন্দী, বাগ্‌দেবী সে দিকে বড় একটা যাতায়াত করেন না।

বাল্যকালে প্রত্যেক পুত্রের মন জুড়িয়া বসিয়া থাকেন তাহার মা। তখন দুনিয়ার আর কেহ সেখানে স্থান পায় না। কিন্তু যেই নোলক-পরা, ঘোমটা-ঢাকা বধূটী আসিয়া উপস্থিত হন, তখনই এক ফ্যাসাদের সৃষ্টি হয়; একজন না সরিলে যে আর একজনের স্থান নাই। পুত্রকে দোষ দিলে চলিবে না, ইহাই যে বিজ্ঞানের বিধান।

বিজ্ঞানের এই সত্যটী হাড়ে হাড়ে বুঝিতে পারিয়াই, আজকালকার বাপ মা, ছাত্রাবস্থায় পুত্রদের বিবাহ দিতে বড়ই নারাজ। 'শ্যাম ও কুল' দুইই এক সঙ্গে রাখা চলে না। ছাত্রাবস্থায় বিবাহ হইলে, বিদ্যা-অর্জ্জন এবং প্রণয়-বর্জ্জন, অথবা প্রেম চর্চ্চা এবং পড়াশুনাটা খরচার মধ্যেই রাখিতে হইবে।

এই নিয়মের গুণেই, একই লোক, একই সময়ে, দুইজন নারীকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারেন না। কাজেই কেহ আদৃতা, কেহ অনাদৃতা হইয়া পড়েন, দুয়োরাণী সুয়োরাণী হইয়া থাকেন। কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর সঙ্গেই, তাঁহার স্মৃতি হৃদয় হইতে লোপ পাইয়া থাকে, তখন সেখানে নূতনকে বরণ করা কিছুই কঠিন নহে। [সাহেবরা অতিরিক্ত materialistic অর্থাৎ matter বা পদার্থের ধর্ম্মে সবিশেষ অভিজ্ঞ, কাজেই তাহাদের শাস্ত্রে এক স্ত্রী বর্ত্তমানে বিবাহ নিষিদ্ধ।]

Porosity—সচ্ছিদ্রতা।

পদার্থের আরও একটী বিশেষ গুণ এই যে, ইহা সচ্ছিদ্র অর্থাৎ ছিদ্রবিশিষ্ট। অমন যে নিরেট কাঠ, তাহাও যে ছিদ্রে পরিপূর্ণ, তাহা টের পাওয়া যায় তখন, যখন তাহাতে পেরেক প্রবেশ করান হয়।

মানুষ মাত্রেরই ছিদ্র আছে। অমন যে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, তাঁহারও 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ' এই ছিদ্রটী সুপরিচিত। মানুষের ছিদ্রান্বেষণ করিতে আমাদের প্রবৃত্তি নাই, কারণ "সজ্জনাঃ গুণমিচ্ছন্তি ছিদ্রমিচ্ছন্তি দুর্জ্জনাঃ"

Hardness—কাঠিন্য।

বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা অনুসারে, একটী বস্তু অপর বস্তু হইতে কঠিন (hard), যদি ইহা অপরটীর উপর 'দাগ' কাটিতে পারে। হীরা জগতে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন, কারণ পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর উপরে হীরা অতি সহজেই আঁচড় কাটিয়া থাকে (Scratch)। [বিষবৃক্ষের হীরাও দেবেন্দ্রের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত করিয়াছিল। বিদ্যাসুন্দরের হীরা, তাহার তো কথাই নাই—"কথায় হীরার ধার, হীরা যার নাম"।]

কাঠিন্যের এই সংজ্ঞা অনুসারে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়,যে, নারীই কঠিন, পুরুষ কোমল। কয়জন পুরুষ নারীর হৃদয়ে আঁচড় বসাইতে সক্ষম হইয়াছেন ? কিন্তু নারী পুরুষ-হৃদয়ে নিরন্তরই 'দাগা' দিতেছে।

অমন যে বক্তিয়ার, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী তাহার বক্তিয়ার,—

"——দেখ কার ছবি আঁকা
পরতে পরতে তার।"

কাণাছেলের নামও যদি পদ্মলোচন হইতে পারে, সদা হর্ষোৎফুল্ল বালকের নামও যদি অশ্রুমান হয়, তবে 'বজ্রাদপি কঠিনা' যে নারী, তাহার পরিচয় হইবে 'শিরীশাদপি কোমলা'—ইহা আর বিচিত্র কি?

Compressibility—সঙ্কোচনীয়তা।

চাপ দিলে বস্তুমাত্রেরই সঙ্কোচন হয়।

আফিসের কাজের চাপে কেরাণীবাবুরা কাবু, সমালোচনার চাপে কবিপ্রতিভা ক্ষুব্ধ, পরীক্ষার চাপে ছেলেরা রোগা, শাশুড়ীর চাপে বধূ অস্থিচর্ম্মসার, বিরহের গুরু চাপে বিরহিনী কৃশ।

এক কথায়, চাপ সবাইকে সঙ্কুচিত করে। কেবল এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়, তরল পদার্থ সম্বন্ধে,—চাপে তাহাদের আয়তন ছোট হয় না। হাজার চাপ দিলেও এক বাটী জল তিল পরিমাণেও কমিবে না। কোনও কোনও বালকেরও যে সেই অবস্থা। তাহাদিগকে "বকো আর ঝকো", যতই রাগো না কেন, যতই চাপ দেও না কেন, কিছুতেই তাহাদের পরিবর্ত্তন বা নড়-চড় হইবে না—তাহারা যে বেজায় 'তরল'।

Malleability—পাতনীয়তা।

পদার্থকে পিটাইয়া পাত করা যায়, যেমন সোণার পাত, তামার পাত, লোহার পাত। বাহ্যিক আঘাতে একরূপ আকৃতি হইতে অন্যরূপ আকৃতিতে পরিবর্ত্তিত হওয়া পদার্থের একটা স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

গাধা পিটাইয়া মানুষ করার কথা শুনিয়াছি বটে, কিন্তু দেখি নাই। তবে গুরুমহাশয়ের অত্যধিক পিটুনীর চোটে, অনেক মানুষ যে গাধা হইয়াছে, ইহা অনেকেরই প্রত্যক্ষীভূত। আর আফিসের খাটুনীর চোটে—'পিটুনীর'ই নামান্তর মাত্র—কেরাণীবাবুদের দেহ যে 'পাত' হইতেছে, এ কথা তাহাদের গৃহিণীরা প্রতিদিনই বলিতেছেন। 'দেহ পাত করিয়া', 'প্রাণ পাত করিয়া', এ গুলি তো সাধারণ কথা। [গৃহিণীদের মুখে এ কথা সর্ব্বদাই শুনেন না কি?]

Brittleness—ভঙ্গপ্রবণতা।

আঘাতে যে বস্তু মাত্রেরই 'পাত' হইবে, তাহা নহে, অনেক সময় ভাঙ্গিয়াও যায়—যেমন কাচ। কথার আঘাতে মন ভাঙ্গে, শোকের আঘাতে বুক ভাঙ্গে, পড়াশুনার চাপে বুদ্ধির জড়তা ভাঙ্গে, গহনার চাপে মান ভাঙ্গে, কন্যাদায়ের চাপে কুল ভাঙ্গে, সমালোচনার চাপে ভুল ভাঙ্গে।

Ductality—সূত্রপ্রবণতা।

অনেক পদার্থকেই টানিয়া সরু 'তারে' পরিণত করা যায়। তামার তার, লোহার তার, সোণার তার, এ তো আমরা দিনরাতই দেখিতেছি।

ঘটনাচক্রের আকর্ষণে মানুষ যে 'সরু' হইয়া যাইতে পারে, তাহা রাম রণে দেখিয়াছি,—লক্ষ্মণ যখন 'সূক্ষ্ম' শরীরে ইন্দ্রজিতের উপাসনা-গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইহাই যে একক দৃষ্টান্ত তাহা নহে, কারণ অনেকেই 'সূচ' হইয়া ঢুকিয়া ফাল হইয়া বাহির হন।

Elasticity—স্থিতিস্থাপকতা।

বলপ্রয়োগ করিলে, বস্তুর স্বাভাবিক অবস্থার ব্যতিক্রম হয় বটে, কিন্তু বল তুলিয়া লইবা মাত্র, তাহা পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইতে চেষ্টা করিবে। বস্তুর এই ধর্ম্মকে Elasticity বা স্থিতিস্থাপকতা বলে।

বায়ুকে চাপ দিলে, তাহার আয়তন ছোট হয়। কিন্তু চাপ অন্তর্হিত হইবামাত্রই বায়ু নিজেকে পূর্ব্ববৎ ফুলাইয়া তোলে। 'বুক ফুলাইয়া' চলাই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, কিন্তু উপরিওয়ালার চাপে তাহা বিশেষভাবে সঙ্কুচিত থাকে; কিন্তু উপরিওয়ালার অসাক্ষাতে অর্থাৎ চাপের অবর্ত্তমানে, বন্ধুবান্ধব এবং বিশেষতঃ গৃহিণীদের নিকট 'বুক ফুলাইয়া' 'ডোণ্টকেয়ার' ভাবে চলার কোনরূপ ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

ক্লাসে ছাত্রদের দৃষ্টি যে কোন্ দিকে থাকে, তাহা ঠিক ভাবে বলা কঠিন, পাঠ্য পুস্তকে যে নয় তাহা নিশ্চিত। ইহা তাহাদের normal state বা স্বাভাবিক অবস্থা। কিন্তু যেই শিক্ষক মহাশয় বজ্রনিনাদে গর্জ্জন করিয়া, বেত্রাস্ফালন পূর্ব্বক 'বলপ্রয়োগে' উদ্যত হন, অমনি সকলে কত মনোযোগীর ন্যায় পাঠ্য পুস্তকে দৃষ্টি-নিবদ্ধ করে। কিন্তু এই 'আশঙ্কার চাপ' দূর হইবামাত্রই—অবস্থা পূর্ব্ববৎ।

কেহ গল্পে, কেহ উপন্যাসে, কেহ মাসিক পত্রিকায়, কেহ বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে বিশ্রম্ভ আলাপে—অর্থাৎ যে যে অবস্থায় ছিল, সে সেই অবস্থায় ফিরিয়া যাইবে।

দুই হাত উঁচু হইতে একটা হাতীর দাঁতের বল ফেলিয়া দিলে, স্থিতিস্থাপকতার গুণে, উহা তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বস্থানে লাফাইয়া উঠে। কিন্তু এই স্থিতিস্থাপক বলকেও হার মানিতে হয় মোসাহেবদের কাছে। দিনের মধ্যে শতবার জমীদারের পদাঘাতে দশ হাত দূরে ছিটকাইয়া পড়িলেও, তাঁহারা তৎক্ষণাৎই সেই চরণতলে লুটাইয়া পড়িতেছেন।

রবার টানিলে তাহা 'লম্বা' হয়, কিন্তু টান ছাড়িয়া দিলেই, তাহা পূর্ব্বাবস্থা অর্থাৎ সেই ক্ষুদ্রত্বই প্রাপ্ত হয়। সময় সময় আফিসের বড় সাহেবের অনুকম্পার 'আকর্ষণে', দুই একজন ভাগ্যবান পেয়ারের লোক, বেশ একটু লম্বা হইয়া পড়েন, কিন্তু সাহেবের বদলীর সঙ্গে সঙ্গেই—অর্থাৎ আকর্ষণের তিরোভাবেই—'পুনর্মুষিকো ভব'।

Divisibility—বিভাজ্যতা।

বস্তুমাত্রকেই ছোট ছোট অংশে ভাগ করা চলে, কিন্তু তাহাতে ভগ্নাংশগুলির গুণের কোন তারতম্য হয় না। এক খণ্ড পাথরের যে ধর্ম্ম, যে গুণ, তাহার একটা কণিকারও সেই ধর্ম্ম, সেই গুণ।

সতীদেহ যে বিভিন্ন একান্ন স্থানে পড়িয়া ছিল, প্রত্যেকটীতেই যে সতীর পূর্ণ মাহাত্ম্য বিরাজমান। প্রত্যেকটী পীঠই যে এক একটী মহাতীর্থ; দেহের ভগ্নাংশ বলিয়া গুণের কোন তারতম্য হইয়াছে কি ?

এক কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া, 'কংগ্রেস', 'মডারেট কনফারেন্স' 'হোমরুল লীগ', 'ন্যাশনাল লিবারেল লীগ' 'স্বরাজ্যপার্টি' কত কি হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহাদের 'গুণের' বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে ? কেউ কি 'মেও' ছাড়িয়াছে ? সকলেই যে স্বরাজ চায়।

Boyle's Law

Boil বা ফোড়ায় চাপ (Compress) দিলে, ফোড়া বসিয়া যায়, অর্থাৎ তাহার আয়তন ছোট হয়, এ কথা কাহারো অজ্ঞাত নাই। ইহাই হইল Boil's law বা ফোড়ার ধর্ম্ম। কিন্তু এই কথাটার, এই সহজ সত্যটার গুরুত্ব বাড়াইবার জন্য, মুরুব্বি খাড়া করা হইয়াছে একজন সাহেবকে। [কারণ তাহাদের বাক্যই বেদবাক্য] বিদ্যা-জাহির-কারী পণ্ডিতেরা প্রচার করিয়াছেন যে, Boyle সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, "চাপ যে পরিমাণে বাড়িবে, বায়বীয় পদার্থের আয়তন সেই পরিমাণে কমিবে, এবং চাপ কমিলে আয়তনও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইবে।" Boyle সাহেব মনে করিয়াছিলেন যে, বায়ুর অবতারণা করিয়া বুঝি মস্ত একটা বাহাদুরী করিলেন, একেবারে 'টেক্কা' দিলেন। কিন্তু Boilও যে বায়ুর সঙ্গে বিশেষরূপে জড়িত, সে কথা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন ; কারণ, কবিরাজী মতে কুপিত বায়ুর নামই যে ফোড়া।

বিদ্যা নিশ্চয়ই বায়বীয়, তা না হইলে 'উবিয়া' যায় কেন ? কাজেই বিদ্যাকে Boyle's Law মানিতেই হইবে। পাণ্ডিত্যের চাপ যত বেশী, বিদ্যার জাঁক তত কম, কিন্তু যে পরিমাণে পাণ্ডিত্যের অভাব হইবে, সেই পরিমাণে অহঙ্কার ও বিদ্যার জাঁক ফাঁপিয়া উঠিবে।

Indestructibility of matter—জন্মান্তরবাদ।

পদার্থের ধ্বংস নাই। একটী মোম বাতি পুড়িয়া নিঃশেষ হইল, কিন্তু ধ্বংস হইল না। বিজ্ঞান বলে, তখন তাহা জল ও অঙ্গারাম বাষ্পে পরিণত হয়। ইহাই বিজ্ঞানের conservation of matter.

যাহা পদার্থের বেলায় সত্য, আত্মার সম্বন্ধেও তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রযুজ্য। দর্শন শাস্ত্রে ইহারই অনুরূপ তত্ত্ব হইল জন্মান্তরবাদ। আত্মার ধ্বংস নাই—তবে রূপান্তর হইতে পারে, এই মাত্র।

Dalton's atomic theory—আণবিক তত্ত্ব।

বিজ্ঞানের atom আর দর্শনের 'আত্মা' কি identical ? শব্দ-সাদৃশ্যে ত তাহাই মনে হয়। আত্মন্ = আত্মম্ = atom [মনর্ণভেদঃ ইতি 'মানিণি'—অর্থাৎ কোন সূত্রই মানি নি] Dalton এর আণবিকতার আলোচনা করিলে, এ সন্দেহ আরও দৃঢ়ীভূত হইবে।

(১) atom অবিনশ্বর।

আত্মাও ধ্বংসবিহীন।

(২) atom অবিভাজ্য, আর তাহাকে ভাগ করা চলে না।

আত্মাকেও বিভাগ করা চলে না।

(৩) বিভিন্ন পদার্থের atomএ atomএ মিলনের

(combination এর) ফলে বিভিন্নরূপ পদার্থের সৃষ্টি হয়।

বিবাহও 'আত্মায়' 'আত্মায়' মিলন। "তোমার আত্মা আমার হউক, আমার আত্মা তোমার হউক"—"union of hearts"। এই বিভিন্ন আত্মার সংমিশ্রণে তেত্রিশ কোটী বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি হইয়াছে। 'পাটেল' কিম্বা 'গৌর' এর 'বিল', নামে না চলিলেও কাজে আবহমান কাল চলিতেছে।

(৪) একটী মৌলিক পদার্থের atom অন্য একটী পদার্থের atom হইতে ওজনে, ধর্ম্মে ও গুণে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রত্যেক বিভিন্ন পদার্থের atom বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, স্বতন্ত্র।

ব্রাহ্মণের আত্মা শূদ্রের আত্মা হইতে ভিন্ন। "পঞ্চবর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্মবিভাগশঃ'। সাহেবের আত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইল নেটিভের আত্মা—তাহা না হইলে Criminal Procedureএ ভিন্ন নিয়ম কেন ?

Electron Theory—সূক্ষ্মাণুবাদ।

বর্ত্তমান ইলেকট্রণ-তত্ত্ব Daltonএর আণবিক সিদ্ধান্তকে সজোরে উড়াইয়া দিতেছে। ইলেকট্রন-বাদীরা বলেন যে, মূলতঃ সমস্ত বস্তুই এক electronএর সমষ্টি। সীসা, সোণা প্রত্যেকেরই electron এক ধর্ম্মাবলম্বী। [মুড়ি মিছরীর এক দর!] তবে কাহারো atomএ বেশী ইলেকট্রন, কাহারো atom এ কম, এই যা তফাৎ।

তাই বুঝি আজকাল মানুষেরও সুর বদ্‌লাইয়াছে, ব্রাহ্মণ শূদ্র, ধনী, নির্ধন, সাহেব নেটিভ নাই—আছে মানুষ, আছে elector [যাহার পক্ষে বেশী electer তাহারই যে জিত—এ যে democracyর দিন]

তাই বুঝি আজ বিশ্বব্যাপী রব উঠিয়াছে, তুমি ধনী, তোমার অর্থবল আছে, লোকবল আছে, প্রভুত্ব আছে, ক্ষমতা আছে, তোমার মধ্যে না হয় কয়েকটা electron বেশী, তাই বলিয়াই কি তুমি চিরদিনই আমা অপেক্ষা বড়! তুমি ব্রাহ্মণ, তুমি না হয় দশটা বেশী electronএর অধিকারী, কিন্তু তাই বলিয়াই কি চিরদিন আমাকে পদদলিত করিয়া রাখিবে? সীসাও যে কালে সোণা হইতে পারে—তবে আমিই চিরদিন ছোট থাকিব কেন? এ কি 'ইলেকট্রনবাদ'—না 'বলসেভিক সংবাদ'!

Vortex—ঘূর্ণীতত্ত্ব।

স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক Helmoltz সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইথারের (ether) ঘূর্ণীচক্র বা vortex হইতেই বিভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি হয়।

কথাটা মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না। হৃদয়ে যখন প্রবল ঘূর্ণী বহিতে থাকে, তখনই প্রেমের সৃষ্টি হয়। Irelandএর বিপ্লবের whirlpool হইতে Homeruleএর উদ্ভব। ছাত্রমহলে 'চাঞ্চল্য' বা 'আন্দোলন আলোড়নে'র ফলে ছুটীর সৃষ্টি! [প্রত্যক্ষ প্রমাণ, নন্-কো-অপারেসন মুভমেণ্ট] এমন কি দশচক্রের 'আবর্ত্তে' ভগবান হইতেও না কি ভূতের সৃষ্টি হইয়া থাকে! অধিক কথায় নিষ্প্রয়োজন, অজীর্ণ বিদ্যা মাথার মধ্যে ঘূর্ণাবর্ত্ত সৃষ্টি করিতেছে বলিয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধের জন্ম !!

গার্গী

শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত

স্বর্ণ মুদ্রা যুক্তা শত গাভীদল যবে
রক্ষিয়া সভা'র মাঝে রাজর্ষি জনক,
ঘোষিলা, ব্রহ্মিষ্ঠতম দ্বিজ যেই হবে,
গাভী সহ গ্রহণিবে সহস্র কনক।
বিরাট মহতী সভা নিস্তব্ধ নীথর
লক্ষাধিক পণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ বিজ্ঞ জ্ঞানী,
কেহ না স্পর্শিল গাভী, হেরি অতঃপর
যাজ্ঞবল্ক্য গ্রহণিলা, শিষ্যে আজ্ঞা দানি।
মুহূর্ত্তে বিক্ষুব্ধ হ'ল স্তব্ধ সভাতল
দাঁড়াইলা তর্করণে শ্রেষ্ঠ সুপণ্ডিত,
'অশ্বল' ও 'আর্ত্তভাগ' বিদ্বান্ 'কহোল'
ক্রমে যবে জ্ঞানীত্রয়ী হ'লো পরাজিত,
উঠেছিলে জ্ঞান-তেজে নারী একাকিনী
'বচক্ন'-দুহিতা গার্গী, হে ব্রহ্মবাদিনি!

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীনরেন্দ্র দেব

সমুদ্রগর্ভে রেলপথ

ইংলণ্ডের ডোভার বন্দর থেকে ফরাসীর ক্যালে বন্দরের মধ্যে সমুদ্রের ব্যবধান একস্থানে মাত্র একুশ মাইল। আজ প্রায় একশ' কুড়ি বছর ধরে উভয় দেশের লোক জল্পনা কল্পনা ক'রছিল যে কেমন করে এই অল্প সমুদ্র পথটুকু বেঁধে ফেলে রেল পথে সত্বর আসা যাওয়া করা যায়। এতাবৎকাল ধ'রে অনেকে অনেক রকম উপায় উদ্ভাবন ক'রছিলেন, তার মধ্যে একটা প্রস্তাব ছিল এই 'টিউব রেলপথ'
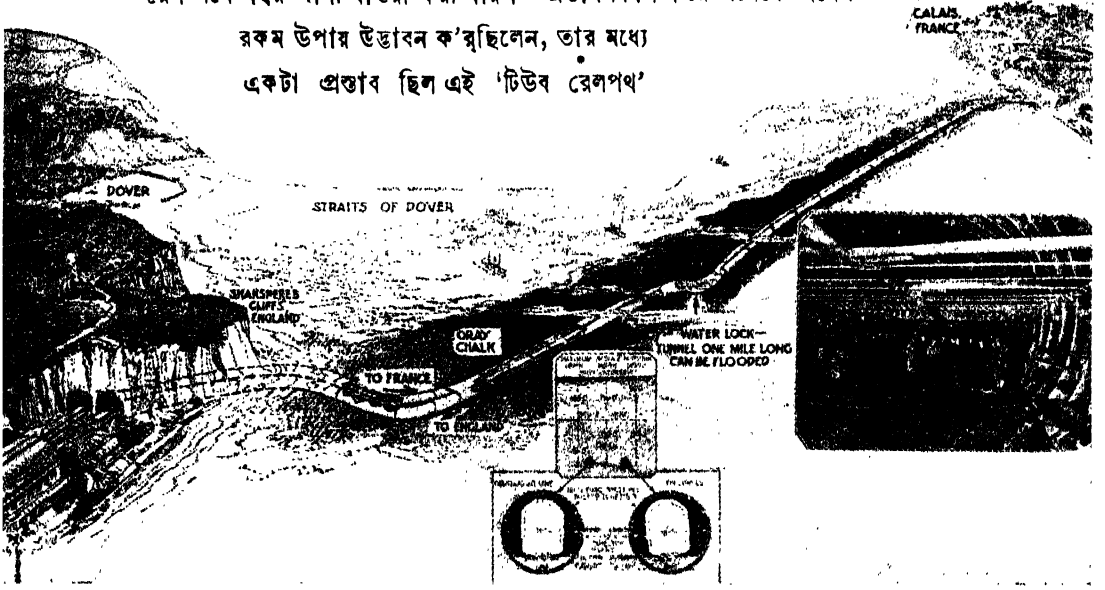
সমুদ্রগর্ভে রেলপথ

→জলের দরজা—এই দরজা খুলিয়া দিলে এক মাইল দীর্ঘ সুড়ঙ্গ জলে পূর্ণ হইবে। এই দরজা আর সুড়ঙ্গের যে দুই প্রান্ত জলের নীচে থাকিবে, তাহার সাহায্যে ফ্রাঙ্কো-বৃটিশ যুদ্ধ বাধিলে সুড়ঙ্গটিকে অব্যবহার্য্য করা চলিবে।

যে দুইটী টিউবের দ্বারা সুড়ঙ্গটি নির্ম্মিত হইবে, সেই টিউব দুইটী কিভাবে নির্ম্মিত হইবে, এবং প্রণালীর নিম্নে তাহারা কিভাবে অবস্থিত হইবে তাহার নক্সা। যেখানে জলের গভীরতা অধিক তথায় সুড়ঙ্গের গভীরতা কম। এইরূপে ঙ্গ ও সমুদ্র-পৃষ্ঠের ব্যবধান সর্ব্বত্র ২৬০ ফিট থাকিবে। এই গভীরতাই সুড়ঙ্গটি নিরাপদে রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট।

বিস্তার করবার কথা। এতদিনে সেই পুরাতন স্বপ্ন সফল হ'তে বসেছে। স্থির হ'য়ে গেছে যে সমুদ্রগর্ভে প্রকাণ্ড লোহার টানেল্ বসিয়ে তার মধ্যে ৩১ মাইলব্যাপী টিউব রেলপথ বিস্তার করা হবে। এই পথে হিসাব করে দেখা হয়েছে যে লণ্ডন থেকে প্যারিস যাতায়াত করতে মাত্র ছ'সাত ঘণ্টা সময় লাগবে। চিত্রে উক্ত টানেল্ ও টিউব রেল-পথের একটি চমৎকার নক্সা দেওয়া হয়েছে এ থেকে অনেকেই ব্যাপারটা কি রকম হবে তা বেশ বুঝতে পারবেন।
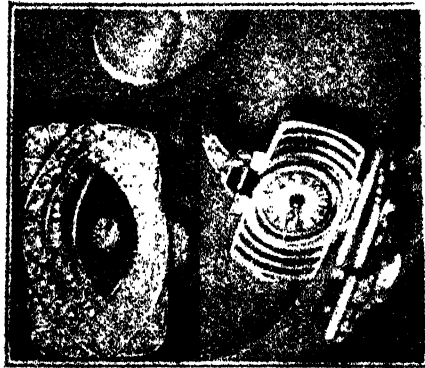
আংটী ঘড়ী

আংটি ঘড়ী

পকেট থেকে বেরিয়ে এসে ঘড়ী এতদিন পুরুষের হাতের কব্জীতে ও মেয়েদের ব্রেসলেট বা ব্রূচের মধ্যে শোভা পাচ্ছিল, এইবার তাকে সেখান থেকেও স'রতে হোল। এখন থেকে ঘড়ীকে চম্পকাঙ্গুলীর অঙ্গুরীয়কের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে

হবে। আংটি ঘড়ীর রেওয়াজ বিলেতে খুব চলেছে, এ দেশের কাপ্তেন বাবুদের মধ্যে এটা এখনও ছোঁয়াচে হ'য়ে উঠতে পারেনি। দাম বেশী বলে বোধ হয়!

মানুষ তার ঘরকন্নার জন্য মাত্র কয়েক হাজার বৎসর পূর্ব্বে যেসব যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ক'রেছে, প্রকৃতি তাঁর কীট পতঙ্গের ব্যবহারের জন্য সৃষ্টির প্রথম যুগ থেকেই তার চেয়েও বহুগুণে সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ ও কর্ম্মক্ষম যন্ত্রপাতি তৈরী ক'রে দিয়েছেন। এই সব যন্ত্রপাতি সদাসর্ব্বদা ব্যবহারের সুবিধার জন্য তিনি কীট-পতঙ্গের অঙ্গে সংযোগ ক'রে দিয়েছেন, এবং এমন ভাবে দিয়েছেন যে, সেসব যন্ত্র বহন ক'রে নিয়ে বেড়াতে তাদের কিছুমাত্র অসুবিধা না হয়। মানুষের তৈরী যন্ত্র অপেক্ষা এ যন্ত্রগুলি দীর্ঘকাল স্থায়ী। এসব যন্ত্রে কখনও জঙ ধরে না, মর্চ্চে পড়ে না বা ধার ক্ষয়ে যায় না। ব্যবহার ক'রতে গিয়ে ভেঙ্গে যাবার বা বিগড়ে যাবার আশঙ্কা নেই। প্রকৃতি প্রদত্ত কীট-পতঙ্গের যন্ত্রপাতির মধ্যে করাত আছে, সাঁড়াশী আছে, তুরপুন আছে, আঁকশী আছে, ছুরী আছে, বঁড়শী আছে, ফোঁড় আছে, হাতুড়ী আছে, ব্রুশ আছে, শলা আছে, চোঙ আছে, ছুঁচ আছে আরও কত যে অসংখ্য যন্ত্র আছে তার ইয়ত্তা হয় না।

কীট-পতঙ্গের যন্ত্রপাতি

তুরপুন — বোলতার যন্ত্র

চিরুনী — মাকড়সার যন্ত্র

ছুঁচ — পিঁপড়ের যন্ত্র

করাত — মাছির যন্ত্র

অতুল আবাস

ভীষণ ভূমিকম্পে টোকিয়ো ও ইয়োকোহামার যে নিদারুণ সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে, সংবাদপত্র-

পাঠকমাত্রেই তা অবগত আছেন। এই প্রবল ভূকম্পের অপরিমেয় ক্ষতি সম্পূর্ণ ভাবে নির্দ্ধারিত হবার আগেই আবার জাপানে আর একটা ভূমিকম্প হয়ে গেল! ভূমিকম্প যে কেবল জাপানেই হ'চ্ছে তা নয়, পৃথিবীর নানা স্থানে প্রতি বৎসর কম বেশী অন্ততঃ চার হাজারবার ভূমিকম্প হয়। এক জাপানেই আজ পর্য্যন্ত একলক্ষ ষাট হাজারবার-ভূমিকম্প হ'য়ে গেছে! এইরূপ ঘন ঘন ভূমিকম্পের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য জাপান এবার উঠে পড়ে লেগেছে। প্রফেসার মানো ও ইনোকুচী নামে দু'জন বড় বড় জাপানী ইঞ্জিনীয়ার এবার অনেক মাথা খাটিয়ে এমন প্ল্যানে বাড়ী করবার উপায় উদ্ভাবন করেছেন যে, যত বড় ভীষণ ভূমিকম্পই হোক্ না কেন, তাতে বাড়ীখানির কোনও ক্ষতিই ক'রতে পারবে না। ভূমিকম্প দীর্ঘকাল স্থায়ী হ'লেও এই নূতন কৌশলে নির্ম্মিত আবাস অটল অচল ভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে! মানো ও ইনোকুচীর প্ল্যানে তৈরী প্রত্যেক বাড়ীখানি কৃত্রিম ভূমিকম্পের মধ্যে রেখে তার অটলত্ব পরীক্ষা ক'রে গ্যারান্টি দেওয়া হবে যে, মৃত্তিকা দ্বিধা বিভক্ত হ'য়ে গৃহখানির যদি পাতালে প্রবেশলাভ না ঘটে, তাহ'লে যত বড় বা যে রকম ভূমিকম্পই হোক্ না কেন, প্রত্যেক বাড়ীখানি অক্ষত অবস্থায় বিরাজ ক'রবে।
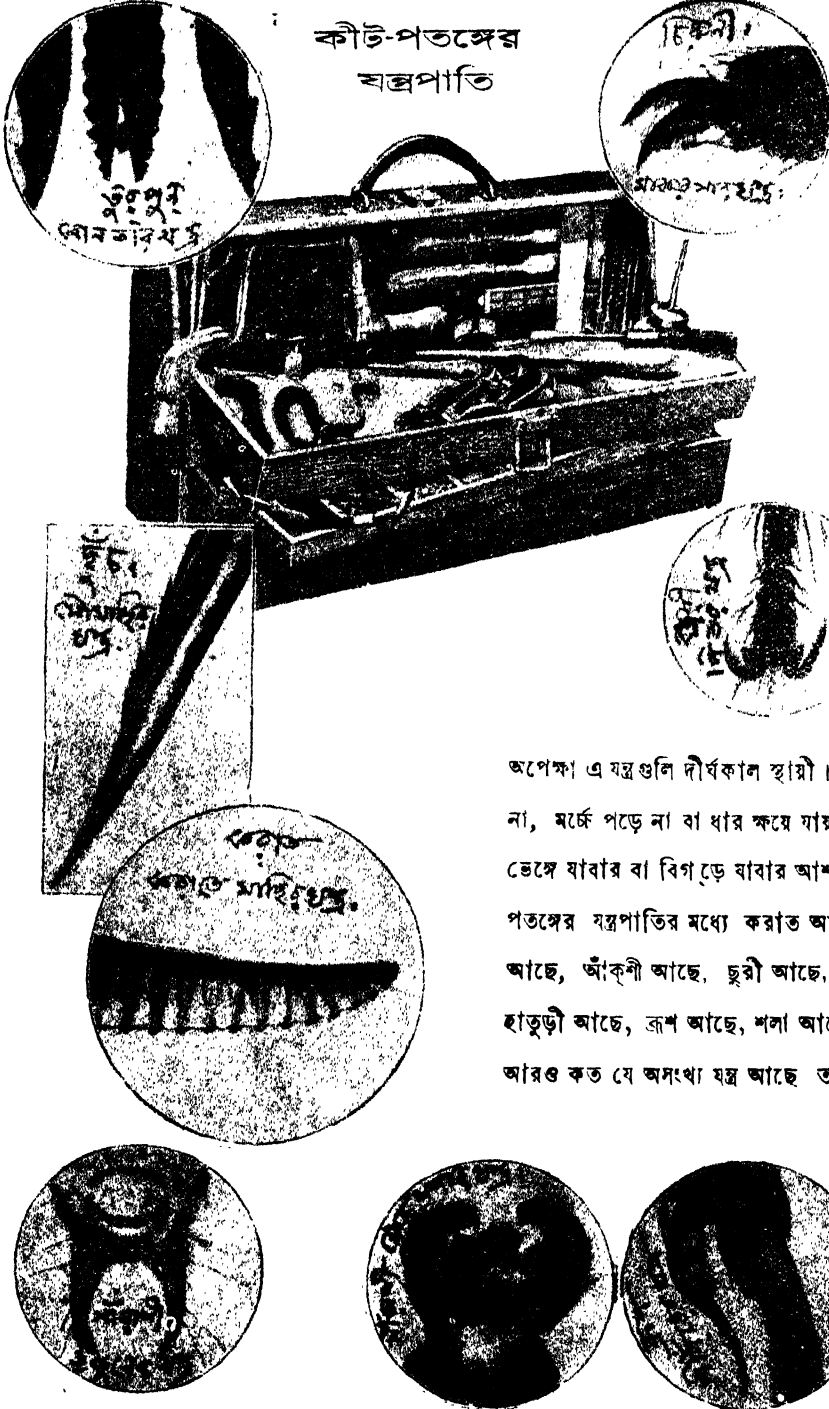
টোকীয়ো রাজপথের দুরবস্থা

হাওয়ার হাল

জার্ম্মানীর রূঢ় প্রদেশ বিজয়ী ফরাসী কর্ত্তৃক অধিকৃত হওয়ার পর থেকে জার্ম্মানীতে ভীষণ কয়লার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। কারণ জার্ম্মানীর কয়লার খনিগুলি সব ঐ অঞ্চলেই আটকে পড়েছে। কয়লার অভাবে জার্ম্মানীর কলকারখানা প্রায় বন্ধ হ'তে ব'সেছে দেখে, এই বিপদ থেকে স্বদেশকে রক্ষা করবার জন্য জার্ম্মানীর বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা বিনা কয়লায় কল চালাবার একটা উপায় চিন্তা ক'রে, শেষে হাওয়ার শরণাপন্ন হ'য়েছেন। কারণ বিজ্ঞানের প্রথম যুগ থেকেই যখন বায়ুর শক্তি সাহায্যে ছোট-খাট হাওয়ার কল (Wind-Mill) চলে আসছে, তখন তাঁরা স্থির করলেন যে, বড় বড় কলকারখানাও হাওয়ার জোরে চালানো সম্ভব হ'তে পারে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে তাঁরা
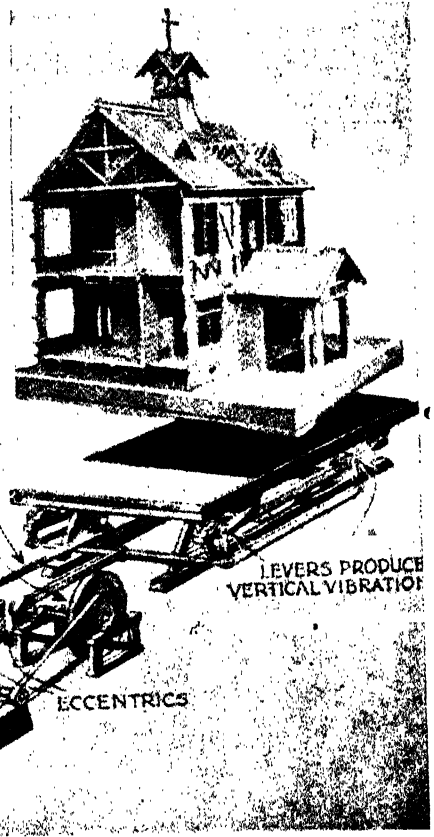
অটল আবাস

ইয়োকাহামা বন্দরের দুরবস্থা

হাওয়ার শক্তিকে নিজেদের কাজে লাগাবার চেষ্টা ক'রতে সুরু করেন এবং অনতিবিলম্বে বায়ুর প্রচণ্ড শক্তিকে

হাওয়ার কল

আপনাদের আয়ত্তাধীন ক'রতে সক্ষম হন। উপস্থিত প্রাশিয়ার পূর্ব্বাঞ্চলে এগারোটি বড় বড় কলকারখানা কেবল মাত্র এই বায়ুর শক্তি সাহায্যে পরিচালিত হ'চ্ছে। ইচ্ছামত হাওয়ার জোরে ইঞ্জিন চালানো ব্যাপারটা জার্ম্মানীতে এখন এমন সহজ ও সম্ভবপর হ'য়ে উঠেছে যে, অতঃপর সেখানে বাষ্পীয়যান অর্থাৎ রেলগাড়ী পর্য্যন্ত এই বায়ুচালিত ইঞ্জিনের সাহায্যেই চালাবার জল্পনা-কল্পনা চল্‌ছে। এই বায়ুশক্তিকে করতলগত ক'রতে পারায়, জার্ম্মানী শুধু কয়লার অভাব থেকেই মুক্ত নয় কয়লা কেনার অত্যাধিক ব্যয় থেকেও অব্যাহতি পেয়েছে, কারণ হাওয়ার কোনও সাকার মহাজন না থাকায়, ও জিনিসটা তারা সব এখন বিনামূল্যেই পাচ্ছে!

অতলের ফুল

গভীর সমুদ্রগর্ভের তলদেশে এক প্রকারের পদার্থ জন্মাতে দেখা যায়, যাদের বহিরাকৃতি একেবারে হুবহু প্রস্ফুটিত পুষ্পের মতো! কিন্তু পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে আকৃতিতে তারা ফুলের মতো হ'লেও প্রকৃতি তাদের একেবারেই ফুল ক'রে গড়েন নি। সমুদ্রগর্ভের এই অদ্ভুত পদার্থকে উদ্ভিদ বলা চল্‌বে না এবং এরা অচেতনও নয়—এরা সব চেতন! অতএব এই চেতন পদার্থকে প্রাণী পর্য্যায় ভুক্ত করে নেওয়াই সমীচীন। কেবল বিস্ময় এই যে, মানুষের সযত্ন রচিত পুষ্পোদ্যানে যে সব বচি বর্ণের

অতলের ফুল (ক)

(সাদা ধূসরবর্ণ এবং ফিকে লাল রঙের ফুলের মতো দেখ্‌তে সমুদ্রগর্ভের এই সজীব প্রাণীগুলি যখন উপরে ভেসে উঠে, তখন মৌমাছিরাও ফুল বলে ভুল ক'রে এদের গায়ে উড়ে বসে।)

বিচিত্র শোভার মনোহর কুসুম-রাজি বিকশিত হয়,—অতলের গভীরতলের এই সজীব ফুলবেশী প্রাণীগুলি শোভায় সৌন্দর্য্যে বর্ণ বৈচিত্র্যে তাদের সকলকে পরাস্ত করে দিয়েছে!

অতলের ফুল (খ)

(এটিকে হঠাৎ পলাণ্ডু বলে মনে হয় কিন্তু এটা হচ্ছে বিচিত্র বর্ণের অতি সুন্দর একটি সমুদ্রের 'জেলীফিস্'।)

অতলের ফুল (গ)

(এই তারা ফুল বকফুলের মত পদার্থ দুটী সমুদ্রগর্ভের আর এক জাতীয় সজীব প্রাণী।)

অতলের ফুল (ঘ)

(এই যে রেশমী চামরের মতো একটি সুন্দর ফুলের ফোয়ারা দেখছেন এটাও ফুল নয়—সামুদ্রিক জীব।)

পীড়িতের আরাম

চিকিৎসা-বিজ্ঞান যে প্রতিদিন নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবনের দ্বারা উন্নতির পথে অগ্রসর হ'চ্ছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিকরা সম্প্রতি যে তিনটী নূতন জিনিস নিখিল রোগীর কল্যাণ কামনায় উদ্ভাবন করেছেন, সে তিনটিই পীড়িতজনের বিশেষ উপকারে লাগবে। প্রথমতঃ অস্ত্রোপচার ও অস্থিসংস্কারার্থ যে নূতন ধরণের টেবিল তৈরি হ'য়েছে, সেটি পৃথিবীর সমস্ত হাসপাতালে রাখা দরকার হবে। টেবিলটি এমন ভাবে তৈরি যে, রোগীকে তার উপর একটী দীর্ঘ কোমল দোল শয্যায় (Hammock) শুইয়ে তার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরে অথবা শরীরের যে কোনও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ব্যাণ্ডেজ করা বা প্ল্যাষ্টার লাগানো চ'ল্‌বে, অথচ রোগীর তাতে বিন্দুমাত্র কষ্ট বা অসুবিধা হবে না। এ ছাড়া রোগী এই দোলশয্যার কোমল ক্রোড়ে অতি আরামে সুশায়িত থাকতে পারবে। একটিবারও নড়বার-চড়বার বা পাশ ফেরবার মতো কোনও অস্বস্তি বোধ ক'র্‌বে না। দ্বিতীয় জিনিসটি হ'চ্ছে উষ্ণ জলের ভাপ্‌রা নেবার একটি সরঞ্জাম। গরমজলের দীর্ঘ নলযুক্ত কেটলি, বাষ্পরেণুকার, (Steam Atomizer) শ্বাসসহায়ক যন্ত্র (Inhalers) প্রভৃতি যে সব জিনিস এতাবৎ কাল চল্‌ছিল এই নূতন যন্ত্রটির সঙ্গে সে সবের তুলনা হয় না। এই নব উদ্ভাবিত বাষ্পাধারের (Vaporizer) জলীয় পদার্থ বস্ত্রাবরণের ভিতর দিয়ে উত্তপ্ত বৈদ্যুতিক বাতির সংস্পর্শে এসে বিশুদ্ধ ও স্নিগ্ধ বাষ্পাকারে পরিণত হয়। তৃতীয়টি হ'চ্ছে অক্ষম ও দীর্ঘভোগী রোগীর আরামদায়ক শয্যা। রোগীর সুবিধা অসুবিধার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে এই যে নূতন ধরণের পীড়িতের পালঙ্ক নির্ম্মিত হ'য়েছে, এই পালঙ্ক-শায়ী রোগীর কোনও দিন শয্যাক্ষত (Bed-sore) হবে না। শরীর সর্ব্বদা যাতে বায়ু স্পর্শে সুশীতল থাকে, তার সুব্যবস্থা আছে। রোগীকে শায়িত অবস্থাতেই শয্যাসমেত তুলে বসাবার বন্দোবস্ত আছে। মলমূত্র ত্যাগ করাবার জন্য রোগীকে বিরক্ত না ক'রে শয্যার স্থান বিশেষ খুলে নিয়ে সেখানে মলভাণ্ড বা মূত্রাধার স্থাপন করবার অতি সুন্দর কৌশল করা আছে। রোগীকে কিছুমাত্র ক্লেশ না দিয়ে প্রতিদিন তার শয্যা পরিবর্ত্তন ক'রে দেবার এমন চমৎকার উপায় করা আছে যে কেবল এই শয্যার গুণেই বহু রোগীকে অল্প দিনের মধ্যে আরাম হ'য়ে উঠতে সাহায্য ক'রবে।
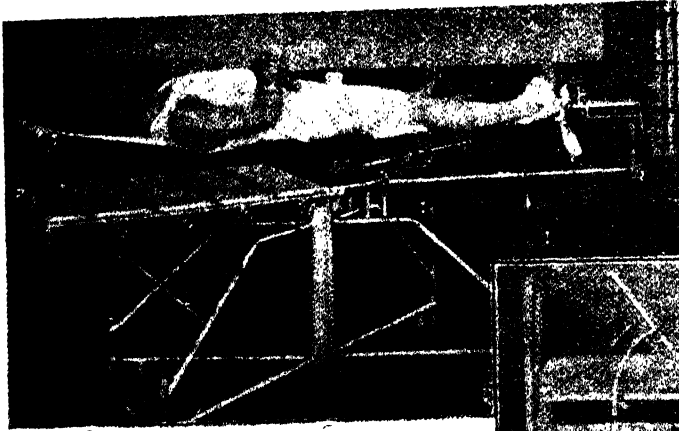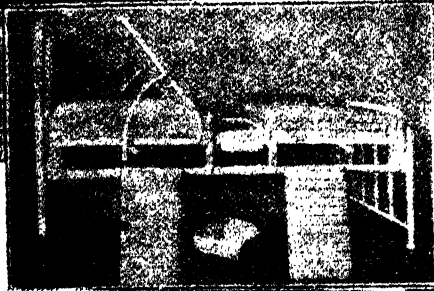
অস্ত্রোপচার টেবিল

পীড়িতের পালঙ্ক

বাষ্পাধার যন্ত্র

দৃষ্টিদোষ

চল্লিশে চ'খে চাল্‌শে ধরার যে প্রবাদটা আমাদের দেশে অনাদি কাল থেকে চলে আস্‌ছে,—য়ুরোপের বড়

বড় বৈজ্ঞানিকেরা আজ সে কথাটাকে খুবই খাঁটি কথা ব'লে ঘোষণা ক'রেছেন। তাঁদের মতে একুশ বছর বয়স থেকেই মানুষের চোখ কাহিল হ'তে আরম্ভ হয়, এবং চল্লিশ বছরে এমন কোনও নরনারী দেখতে পাওয়া যায় না, যার চ'খের একটা না একটা কিছু দোষ হয়নি! যাঁদের এখনও চশমা নিতে হয় না এবং খালি চোখে লেখাপড়া ক'রতেও যাঁরা এখনও কোনও কষ্ট বোধ করেন না,—তাঁরা হয়ত' জোর ক'রে এ কথায় প্রতিবাদ ক'রে বলবেন যে তাঁদের চোখের কোনও দোষই এখনও হয়নি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তাঁরা জানতে পারেন না যে, তাঁদের চোখ এখনও অনেকটা ঠিক কাজ দিলেও, সে জরাজীর্ণ হ'য়ে পড়েছে, এবং ভিতরে তার গলদও হ'য়েছে! কোনও দৃষ্টি-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের

দৃষ্টি পরীক্ষা

দ্বারা পরীক্ষা করালেই তাঁদের চোখের দোষ ধরা পড়ে যাবে। তাঁরা আরও বলেন যে ২১ বছরের পর থেকে প্রত্যেক লোকের মাঝে মাঝে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা দৃষ্টি পরীক্ষা করানো উচিত এবং কোনও সামান্য দোষ হবার উপক্রম মাত্রই উপযুক্ত চশমা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য; কেন না, চশমা হ'চ্ছে অধিকতর অধঃপতনের হাত থেকে চক্ষুকে রক্ষা করবার একমাত্র দৃষ্টিকবচ!
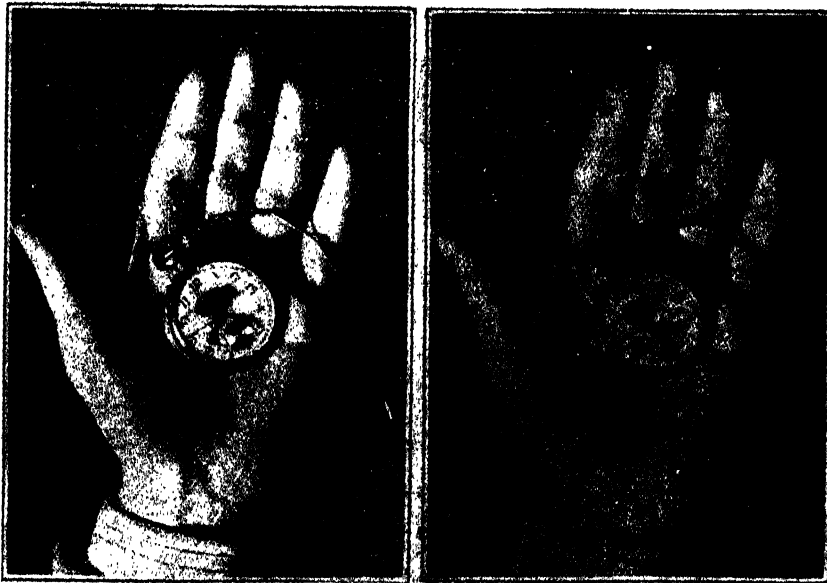
দৃষ্টি দোষ—(এই দু'টী ঘড়ীর মধ্যে একটী যদি পাঠক পাঠিকারা বেশ স্পষ্ট দেখতে পান এবং অপরটি ঝাপ্সা মনে হয়, তা'হলে দৃষ্টি ঠিক আছে জানবেন; কিন্তু যদি দু'টাই ঝাপ্সা মনে হয়, তাহ'লে অনতিবিলম্বে চশ্মা নেবার ব্যবস্থা করিবেন।)
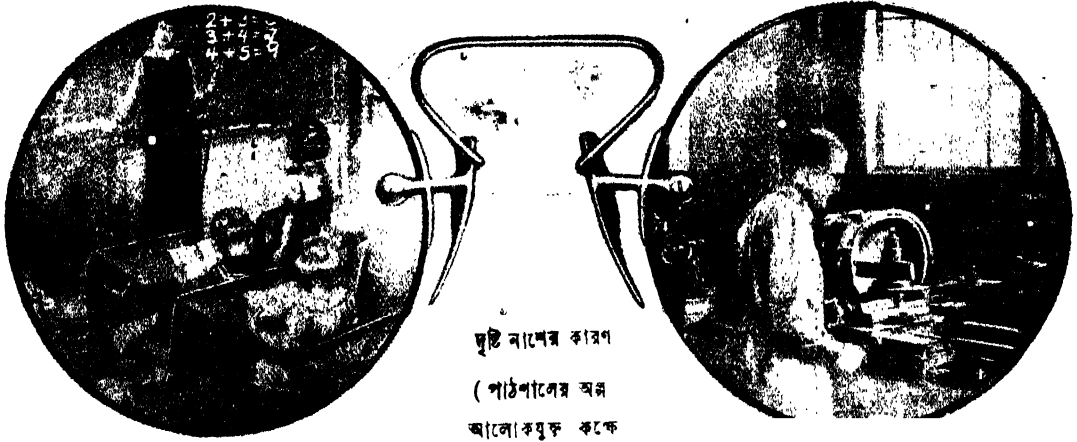
দৃষ্টি নাশের কারণ (পাঠশালের অল্প আলোকযুক্ত কক্ষে ছেলেদের পাঠাভ্যাস এবং কারখানার অল্প আলোকযুক্ত গুদামে কারিগরদের কাজ ক'রতে হয় ব'লে তারাই বেশী ভোগে।)

১। এক্স-রে ও ক্যান্সার

ক্যান্সার রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সুপ্রসিদ্ধ রেডিয়ো-বৈজ্ঞানিক ডাক্তার লুইস্ ফ্রায়েড্‌ম্যান্ সম্প্রতি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে দুরারোগ্য ক্যান্সার ব্যাধি'এক্স-রে' চিকিৎসার দ্বারাও আরাম হওয়া সম্ভব। তবে বর্ত্তমানে যে পরিমাণ তাড়িত-শক্তির প্রয়োগে এই ব্যাধি আরোগ্য করবার চেষ্টা চল্‌ছে, তাতে কৃতকার্য্য হবার সম্ভাবনা খুবই অল্প। কর্কট রোগের ক্ষত যদি পুরাতন হয়ে যায়, তাহ'লে, অল্প শক্তি-সম্পন্ন এক্স রে আলোকে-রোগীর কোনও উপকারই হয় না। সেরূপ স্থলে রোগীকে অন্ততঃ আড়াই লক্ষ 'ভোল্টেজের' আলোয় চিকিৎসা করা দরকার। তিনি বলেন, এই রকম 'এক্স-রে' চিকিৎসায় 'রেডিয়ম' চিকিৎসার চেয়েও সুফল পাওয়া যায়।

এক্সরের দ্বারা ক্যান্সার চিকিৎসা

তর্কে

কবিগুণাকর শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ

নানা ধর্ম্ম আলোচনে তর্কে মীমাংসায়
শুধু সন্দেহের স্তূপ বেড়ে বেড়ে যায়।
প্রকৃত ঈশ্বর কোথা পড়ে থাকে চাপা—
ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব বাক্য দিয়ে মাপা—
জ্ঞানীরে অজ্ঞান করে পুণ্যাত্মায় পাপী,
সত্যের সরল পথ দেয় শেষে ছাপি।

সুনীল

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়

আজও যে কোনও ত্যাগের কথা শুনিলেই তাহার মুখ মনে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যথায়, বেদনায় মন ভরিয়া ওঠে। সে দুঃখ পাইয়াছে বলিয়া সমবেদনায় নয়, আমি পরমাশ্চর্য্য সম্পদ হারাইয়াছি বলিয়া।

হাঁ, প্রথম পরিচয়ের কথা আজও মনে আছে। আমরা দুজনেই তখন ফোর্থ ইয়ারে পড়ি। তাহার সুন্দর মুখ প্রথমেই ভাল লাগিয়াছিল, কিন্তু এই ভাল লাগা স্থায়ী হয় তাহার মনের সন্ধান পাইয়া। সেই প্রথম দিনটীর কথা আজও মনে পড়ে। মনের উপর অনেক ধুলামাটী জমিয়া অনেক জিনিস অস্পষ্ট, ঝাপসা হইয়া যায়; কিন্তু কই, এ দিনটী তো এতটুকু মলিন হয় নাই! সেদিন অনার্স ক্লাশে এক স্কচ্ মিশনারী অধ্যাপক শেলীর একটী কবিতার ব্যাখ্যায় কয়েকটী লাইনকে mystic আখ্যা দিলেন, এবং তাহার ব্যাখ্যা করিলেন না; কিন্তু সেই প্রসঙ্গে শেলীর নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে মিশনারীর মতই কি কি বলিলেন। আমার তরুণ বন্ধুটীর ইহা ভাল লাগে নাই। সে সেদিন আমার পাশেই বসিয়া ছিল। সে অত্যন্ত ব্যথিত স্বরে আমাকে বলিল, অন্যায় বল্লে ভাই—শেলী যে Platonic ছিলেন, এ কথাটী প্রফেসরের ভুল করা উচিত হয় নি। ইহার পর হইতেই আলাপ-পরিচয়ের ভিতর দিয়া আমাদের ঘনিষ্টতা ও সৌহৃদ্য বাড়িয়া যায়। ঝামাপুকুরের এক মেসে সে থাকিত। প্রথম দিন বিনা আহ্বানে যাইয়া দেখি, সে রাশিকৃত কাপড়, জামা, তোয়ালে লইয়া কলতলায় সাবান মাখাইতেছে,—পরিষ্কার করিতে হইবে। আমাকে দেখিয়া সাবানমাখা ফেনা-শুদ্ধ হাতে তাহার আশ্চর্য্য চক্ষু দুটী তুলিয়া হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিল। প্রথম দিনটাতেই এমন অসময়ে আসিয়া পড়িয়া, আমি নিজেই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার কুণ্ঠিত ভাব দেখিয়া সে হাসিয়া বলিল, আমি নিজে যখন লজ্জা পাই নে, তোমার লজ্জার কি আছে? আমার বেশী কাপড়-জামা নেই, সব সময়ে ধোপাবাড়ী দেওয়া হয়ে ওঠে না—নিজে অনেক সময়ে কাচতে হয়। একটু থামিয়া—কষ্ট? তা কষ্ট হয় বৈকি একটুখানি—বলিয়া তাহার সুন্দর মোমের মত আঙুলের ডগা দেখাইল। দেখিলাম, শানের সঙ্গে ঘষা লাগিয়া এম্‌নি হইয়াছে যে, আর একটুকু হইলেই রক্ত বাহির হইবে। কি আশ্চর্য্য গরীব সে, তাহা তো জানিতাম না। রূপ দেখিয়া তো মনে হয় যে, বহু-পুরুষের সযত্ন-বৰ্দ্ধিত ও লালিত রূপের উত্তরাধিকারী সে। দেহ তো নয়, যেন একগোছা অশোকফুল। ক্রমে তাহার যত পরিচয় পাইতে লাগিলাম, বড় ভাল লাগিল,—প্রাণটী এত কোমল! পড়াশুনা? পড়াশুনা তার অনেক ছিল। এই বিশ-একুশ বছর বয়েসে কখন সে এত পড়িয়াছিল, তাই ভাবিয়া আমি আজও আশ্চর্য্য না হইয়া পারি না। তাহাকে সুকুমার সাহিত্যের সঙ্গে বার্টনের Anatomy of Melancholy যেমন পড়িতে দেখিয়াছি, বাণভট্টের শ্রীহর্ষচরিতও তেমনি আগ্রহে পড়িতে দেখিয়াছি। তবে ইংরেজী নভেলই সে বেশী পড়িত বলিয়া যেন মনে হয়। পড়ার জন্য পড়া নয়, রসবোধের জন্য পড়া।

আজ তাহার জীবনের খাতা খুলিয়া বসিলে, লোক-সানের অঙ্কই চোখে পড়ে। আহা, শুধু দারিদ্র্যই তাহাকে নিপীড়ন করে নাই,—ভাগ্যও বঞ্চনার ভিতর দিয়া পীড়ন করিয়াছে।

সেবার কলিকাতায় গরমটা খুব পড়িয়াছিল। দুপুরে বাসন-বিক্রেতার হাঁক নাই; চিলের কণ্ঠস্বরও বড় একটা শোনা যায় না। দুপুর বেলাটায় যেন মনে হইত, কলিকাতা জনমানবশূন্য—কেবল মরুভূমির কোন্ রক্তচক্ষু দেবতা এখানে তাহার উৎসবের বাতি জ্বালিয়াছেন। এমনি এক দিনে সুনীলের মেসে যাইয়া দেখি, সে বসিয়া বিলাতী চুরুট টানিতেছে। ঘরের এক কোণে তাহার অর্দ্ধভুক্ত শ্রীহীন অন্ন-ব্যঞ্জনের থালা পড়িয়া আছে। তাহার ঘরে তক্তাপোষ বা খাটের বালাই ছিল না,—টেবিল চেয়ার কিছুই ছিল না। মেঝেতে অত্যন্ত সাদাসিধা রকমের বিছানা,

—যাহা না হইলে নয় তাহারও কম, কিন্তু পরিষ্কার। ঘরে অনেক বই—দুচারখানা বিছানার পাশে; আর অধিকাংশ মেঝেতে খবরের কাগজ পাতিয়া তাহার উপরে রক্ষিত। একটা জিনিস তাহার সাহচর্য্যে আমি বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি যে, তাহার যখন কোনও চিন্তার কারণ ঘটিত, তখন সে চুরুট টানিতে থাকিত। চুরুট খাওয়াটা আমি আজও পর্য্যন্ত দেখিতে পারি না,—দেখিলে বিরক্ত হই; কিন্তু তাহাকে এ বিষয়ে কিছু বলি নাই। মানুষের নানা বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা থাকে; সুনীলের অন্য কিছুই দেখিতাম না; তাই অন্ততঃ এই চুরুট খাওয়া লইয়া সে যে অপর দুদশজন সাধারণ মানুষের মত, এই চিন্তা আমাকে সে সময়ে আনন্দ দিত। নহিলে সর্ব্বদা মনে হইত, সে যেন দূরের জিনিস—ততোধিক দূরের জিনিসের দিকে তাকাইয়া আছে। সেদিন যে সব কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বেশ হাসিমুখেই সে তাহার উত্তর দিল। সে জর্জ্জ ইলিয়টের কি একখানা বই পড়িতেছিল। তখনও জর্জ্জ ইলিয়টের যুগ শেষ হয় নাই;—বাংলা দেশের ইংরেজী-পড়া ছেলেরা তখনও জর্জ্জ ইলিয়টের নাম লইয়া শপথ পর্য্যন্ত করিত—"আই সোয়ার আপন্ জর্জ্জ ইলিয়ট"—এ কথাও শুনিয়াছি। সুনীল বই পড়িতেছে, চুরুট টানিতেছে, হাসিমুখে কথাও কহিতেছে, কিন্তু চোখ দেখিলাম সজল। তার পর সে সজল চোখ বহুবার দেখিয়াছি। আকাশে সজল মেঘ দেখিলে বারিপাতের সম্ভাবনা হয়, বারি বর্ষণও হয়; কিন্তু তাহার বাহিরে, কই, এক ফোঁটা চোখের জল পড়িল না—হৃদয় যখন রক্তে রাঙা হইয়া গিয়াছিল তখনও! আমার মনে আছে, আমি সেদিন বলিয়া ফেলিয়াছিলাম, তুমি বাজে জিনিস পড়ে—নভেল পড়ে সময় নষ্ট কর্চ্ছ কেন? সে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, নভেল বাজে জিনিস—এ তোমায় কে বল্লে? যদি কেউ বলে থাকে, নিশ্চয়ই সে লবণের দালাল, নয় ত পাঠশালার গুরুমশাই। উত্তরে আমি কি বলিয়াছিলাম, আজ মনে পড়িতেছে না; কিন্তু সে কি বলিয়াছিল, ভুলি নাই। সে দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, নভেল ও নাটক—এই তো সাহিত্যের দুটী বিরাট রূপ—যেন যমজ দুই ভাই। সমীপবর্ত্তী ভবিষ্যতে এই কথা-সাহিত্যের যুগই চল্‌বে—এরই প্রসার দেখতে পাবে। স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ নানা রূপে নানা অবস্থায় নানা রংএ দেখা দেবে। শ্রমজীবী-সমস্যা, প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন আকারে সব আগামী কথা সাহিত্যের বিষয় হবে। তখন Blank Verseএ কবিতা কেউ পড়তে চাইবে না, এ তুমি নিশ্চয় জেনো। স্বল্পাবশিষ্ট চুরুট ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সে বলিল, এও আজ বলি তোমায়, যে, কথা-সাহিত্যের লেখককে খুব প্রাণবন্ত হতে হবে, যাতে তিনি সজীব সাহিত্য সৃষ্টি কর্ত্তে পারেন। এ তো কঙ্কাল নিয়ে খেলা নয়—রক্তমাংসের জীব নিয়ে কারবার। যার কিছু বলবার নেই, সে কবিতা লিখ্‌লেও লিখতে পারে, কি অন্য কিছু লিখ্‌তে পারে; কিন্তু ভাই কথা-সাহিত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠাই হবে না, যদি না তোমার বলবার বিষয় সজীব উপাদানে গড়া হয়। এ বড় শক্ত ঠাঁই। কিছুকাল পরে সে আবার বলিল, প্রাণস্পর্শী অনুভূতি চাই। অনুভূতির চাইতেও বড় কথা উপলব্ধি—সেই উপলব্ধি চাই। যার পেছনে অনেক চিন্তা, অনেক অভিজ্ঞতা আছে, সে-ই এ কাজ পার্ব্বে। তার সে দিনের এই কথাগুলির মধ্যে কতখানি সত্য ছিল, তাহা আমি যাচাই করি নাই; কারণ সাহিত্যের জহুরী আমি নই। তবে তাহার মুখ-নিঃসৃত দীপ্ত কথাগুলি আমার ভাল লাগিয়াছিল, ইহাই আজ বলিতে পারি। সে যখন কথা বলিত, তখন একটা মোহাবেশের সঞ্চার করিত। যে শুনিত, সে-ই যেন ক্ষণিকের জন্য মাতাল হইয়া পড়িত।

ইহার পর কিছু দিন তাহার কাছে যাইতে পারি নাই। কলেজে দেখা হইত, মাঝে মাঝে আবার সে কামাইও করিত। কি একটা কাজে আমাকে সেদিন সন্ধ্যার ঠিক পরেই নিউমার্কেটে যাইতে হইয়াছিল। দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে, সুনীল একটী সুদর্শনা তরুণীর সঙ্গে নিকটে দণ্ডায়মান একখানা ভাড়াটীয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। আমার সঙ্গে কথা কহিবার অবসর তাহার ছিল না। সে শুধু আমাকে দেখিয়া দূর হইতে মাথা নোওাইল, ও মিষ্টি হাসি হাসিল। গাড়ীখানা চলিয়া গেলে, আমার মনে হইয়াছিল, এ আবার কি? এখানে সুনীলের কোনও আত্মীয় আছেন বলিয়া তো শুনি নাই! এক দিদি ছিল,—সুনীল বলিয়াছিল যে তিনি গৌহাটীতে থাকেন। যাঁহাকে দেখিলাম, ক্ষণকালের জন্য হইলেও ইহা বুঝিয়াছি যে, তাঁহার বয়েস বেশী হয় নাই, এবং আজকালকার মেয়েদের

চালচলনগুলিও তাঁহার অনায়ত্ত বা অজ্ঞাত নয়। ইনি অন্য কোনও আত্মীয় হইবেন, যাঁহার কথা আমি জানি না,—আমার সঙ্গে এই কটা দিনের পরিচয় বই তো নয়!

ইহার পর পরীক্ষা আসিয়া পড়িল। চা-কোকোর শরণ লইয়া যেমন রাত জাগিতে হয়, জাগিলাম; নোট করিতে হয়, করিলাম। ইহার মধ্যে সুনীলের খবর বড়-একটা লইতে পারি নাই। এক দিন মাত্র আসন্ন সন্ধ্যায় তাহার মেসে গিয়াছিলাম। যাইয়া দেখিলাম, ঘর খোলা। আঁধার ঘরে কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। ডাকিলাম 'সুনীল'। প্রথম ডাকে কোনও সাড়া পাইলাম না। দ্বিতীয় বার ডাকিতে, সে অতি ধীরে বলিল, ভেতরে এসো ভাই। কিন্তু কণ্ঠস্বর কেমন বিকৃত বোধ হইল। আমি ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলাম, আঁধারে চুপচাপ বসে যে? সে একটু থামিয়া উত্তর দিল, ভাল নেই ভাই। আমি অন্ধকারেই আন্দাজ করিয়া তাহার গা ঘেঁসিয়া বসিলাম, ও তাহার হাতখানি আমার হাতে তুলিয়া লইয়া বলিলাম, কেন ভাই? সে কিছুক্ষণ থামিয়া অন্যমনস্ক ভাবে বলিল 'এম্‌নি'—তখনও তার হাত আমার হাতের মধ্যে। আমি তাহাকে আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। আমি তাহার মরমী বন্ধু, এ কথা বলিয়া আজ গৌরব অর্জ্জন করিতে চাই না; কারণ তাহাকে ভাল করিয়া বুঝি নাই,—বোধ হয় ভাল করিয়া তাহাকে বোঝা যায়ই না। তবুও যেন আজ মনে হইতেছে, সেদিন অন্য কিছু না বুঝিলেও, এইটুকু বুঝিয়াছিলাম যে, এই তরুণ সতেজ প্রাণটী যেন কোনও নির্ম্মম হস্তের অকরুণ স্পর্শে কেবলি নিপীড়িত হইতেছে। কিছুকাল এই ভাবে অতিবাহিত হইলে, সে কি ভাবিয়া শয্যাপার্শ্বে রক্ষিত আলো জ্বালিল। এবং অত্যন্ত বেদনাহত মুখে এক ঝলক হাসি আনিল। অতি জীর্ণ অট্টালিকা-বক্ষে আলো জ্বালিলে যেরূপ দেখায়, এ হাসি তারই ছোট ভাই। সে বলিল, আজ এক নতুন বই এনেছি, পড়ি শোনো। বইখানা দেখিলাম, অন্য কিছু নয়—'শ্রীকৃষ্ণের শত নাম'। আমি দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম বৈ কি! আমি ভাবিয়াছিলাম, না জানি কোন্ বিখ্যাত ইংরাজী বইএর আলোচনা সে সুরু করিবে, যার কতক আমি বুঝিব, কতক বুঝিব না। তাহা যদি না হয়, বাংলা অথবা সংস্কৃত বড়-গোছের কিছু—তাও নয়। সে শত নাম প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পড়িল—পড়িয়া বলিল 'চমৎকার'! এ কথাটী অকৃত্রিম ভাবে সে উচ্চারণ করিল বটে, কিন্তু তাহার দেহে ও মনে যে বেদনা অহরহঃ ক্রীড়া করিতেছিল, তাহার আভাস গোপন রহিল না। সে বলিল, দেখ ভাই, শ্রীকৃষ্ণের এত নাম ছিল কি না, কেহ সত্যি সত্যি রেখেছিলেন কি না, সে নিয়ে মাথা ঘামাতে আমি চাইনে—এর সরল মধুর অথচ সরস কবিত্বই শুধু আমাকে আকর্ষণ করে। সে আবৃত্তি করিতে লাগিল—নন্দ রাখিল নাম শ্রীনন্দের নন্দন, যশোমতী নাম রাখে যাদু-বাছাধন। আবার দেখ, অনন্ত রাখিল নাম অন্ত না পাইয়া, কৃষ্ণ নাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া। কই, গর্গ, তিনি তো 'যাদু-বাছাধন' কি 'রাখাল-রাজা ভাই' নাম রাখেন নি। তাপস তিনি, ধ্যানে কৃষ্ণকে জেনে, তিনি তাঁর সত্য নামেই তাঁকে আহ্বান করেছেন। এ দিকে দেখ কি চমৎকার—ননীচোরা নাম রাখে যতেক গোপিনী, কালসোণা নাম রাখে রাধা বিনোদিনী। দেখ এই ননী-চোরা নাম গোপিনীদের সোহাগের স্নেহের দেওয়া নাম। কিন্তু শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের সখী বল, প্রণয়িনী বল, কি দয়িতাই বল,—তিনি তাঁর প্রেমাস্পদ কে ডাকলেন 'কাল সোণা'। আর কেউ এ নামে ডাকলে মানাত না; সেই জন্যই বোধ হয় কবি আর কাউকে এ অধিকার দিতে কার্পণ্য করেছেন। কিছুক্ষণ থামিয়া পুনরায় বলিল, কবিত্বের মাধুর্য্যই এখানে শুধু আমার মনে হয় না ভাই,—এ-ও মনে হয় যে, আমাদের প্রত্যেকের নাম অনেক সময়েই প্রত্যেকের যোগ্য হয় না। এর মানে এই যে, প্রতি নামের একটা বৈশিষ্ট্য আছে, ইতিহাসও বোধ হয় আছে,—যেমন শব্দমাত্রেরই আছে। আহা, আমাদের দেশের প্রাচীন, কাব্যের নামগুলি কি মধুর! নামটী উচ্চারিত হলেই, নামের পেছনের ছবিটী ভেসে ওঠে। আচ্ছা বল, তাই নয় কি? ইহার পর সে আবার বিমনা হইল। তার পর বলিল, আচ্ছা, আমার সুনীল নামটী কেমন ভাই? বলিয়া জিজ্ঞাসু ভাবে আমার মুখের উপর দৃষ্টি রাখিল। তাহার মন ভাল নাই, ইহা আমার বুঝিতে বাকী ছিল না। আমি ভয়ে ভয়ে বলিলাম, বেশ। সে বলিল, দূর! এ তোমার মন-রাখা কথা ভাই, এত ভাল নাম আমার মানায় নি। তাহার হাত আমার হাতে চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, আজ তোমার কি হয়েছে সুনীল? সে ধীরে হাত টানিয়া লইয়া বলিল, ওই

যে গোড়াতেই বল্লুম, ভাল নেই। আমি একটুকু জোর দিয়াই বলিলাম, ভাল নেই কেন? আবার সেই উত্তর দিল, কেন? এম্‌নি,—না ভাই, অসুখ করেছে। আমি তাহার মন অন্যদিকে লইবার জন্য বলিলাম, তোমার কেমন তৈরি হল সেকেণ্ড পেপারটা? সে এ কথার কাছ দিয়া গেল না। সে বলিল, আচ্ছা ভাই, একটা কথা বলি। আমার মনে হইল, যেন সে তাহার হৃদয়ের সতত সঞ্চরমান বেদনা ও কণ্ঠের আগন্তুক রোদন—এক কালেই দুইটীকে উপেক্ষা করিয়া কি যেন বলিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু বিবর্ণ বেদনাহত মুখে ঢলিয়া পড়িল। আমি তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িতেই, সে বলিল, সেই ব্যথাটা—

আজও ঠিক মনে পড়িতেছে, যখন আমি ফিরিলাম, তখন বেলফুল ও কুল্‌পি বরফ পথে পথে হাঁকিতেছিল, যেমন রোজ হাঁকিয়া থাকে; এবং পথের জন-বিরলতা রাত্রির গভীরতাই নির্দ্দেশ করিতেছিল। আজও ঠিক মনে আছে যে, সেদিন বাড়ী ফিরিয়াও আমার এই তরুণ বন্ধুটীর কথা মনে পড়িতেছিল; এবং এক অতীত সন্ধ্যায় দৃষ্ট মেয়েটীর সহিত আজকার এ ঘটনার কোনও সংস্রব আছে কি না, ইহাও মনে জাগিতেছিল।

সেনেটে পরীক্ষা-হলে সুনীলকে না দেখিয়া দুঃখিত কিছু হইলেও আশ্চর্য্য হই নাই। আমার কেমন সন্দেহ হইয়াছিল যে, সে আর পরীক্ষা দিবে না। তাহার অনুপস্থিতি তাহার এক প্রতিযোগী ছাত্রকে উৎফুল্ল করিয়া তুলিয়াছিল, এ কথা বেশ মনে আছে। পরীক্ষা যে দিন শেষ হইল, সে দিন পরীক্ষা-গৃহ হইতে বাহির হইয়া সুনীলের ঝামাপুকুরের বাসায় উপস্থিত হইলাম। তাহাকে দেখিলাম না,—দেখিলাম, তাহার ঘরে অন্য লোক। শুনিলাম, অনেক দিন হইতেই সুনীল জ্বরে ভুগিতেছিল; কিন্তু কিছু দিন হইতে খুবই অসুস্থ বোধ করায়, মেসের প্রাপ্য সব চুকাইয়া দিয়া সে চলিয়া গিয়াছে—কোথায়, তাহারা জানে না। খুব অসুস্থ বোধ করিতেছিল! আহা! ব্যাধিক্লিষ্ট দেহ—কোনও নিকটতম আত্মীয়ের আশ্রয়ে সেবা ও স্বস্তি পাক,—সে ভাল হোক, ভাল হোক। তাহার ঠিকানা জানিতাম না, জানিবার চেষ্টাও করি নাই। সেই জন্য নীরবে দিন গুণিয়া চলা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। মাঝে মাঝে মনে হইত যে, কলিকাতার জনবহুল পথে অভূতপূর্ব্ব ভাবে কোনও দিন তাহার সঙ্গে দেখা হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহা আর হয় নাই। আর একদিন তাহার সেই মেসে খোঁজ করিলাম, তাহারা নতুন কিছুই বলিতে পারিল না। এমনও হইতে পারে তো যে, সে ফিরিয়া আসিয়াছে, কিংবা অন্য কোথাও আছে, যে ঠিকানা আমি জানি না। পুরানো বইএর দোকানে বিকালে একবার নজর রাখিলে হয় না? অজ্ঞাত কবি বা লেখকের রচনা সংগ্রহের আগ্রহ তাহার ছিল।

কিছু দিন এইরূপে কাটিয়া গেলে, এক দিন সকালে আমার ডাক আসিল তারের মারফত গৌহাটী হইতে—"সুনীল অত্যন্ত পীড়িত, সুনীলের দিদি"—বুঝিলাম, সুনীলই ডাকিয়াছে দিদিকে দিয়া। কলিকাতায় অবস্থান কালে সে কোনও দিন আমাকে তাহার মেসে ডাকে নাই—আমি নিজেই বিনা আহ্বানে গিয়াছি। সেই জন্য এই ডাকে চঞ্চল না হইয়া পারিলাম না। গৌহাটীতে সুনীলের দিদির বাড়ী আসিলাম। সুনীলকে প্রথমে বাহিরের চেহারা দেখিয়া চিনিতে আমার কষ্ট হইয়াছিল—সুনীল আমার বিহ্বলাবস্থা দেখিয়া হাসিল—সেই হাসি, সেই চক্ষু! যে তাহা একবার দেখিয়াছে, সে ভুলিবে না। দুস্তর মরু-প্রান্তে, ব্যোম-পথে, সাগর-বক্ষে সেই হাসি, সেই চক্ষুই তাহাকে চিনাইয়া দিবে। ডাক্তার বলিয়াছেন হৃদরোগ—সুনীলের দিদি যেন দিনের পর দিন ভাইকে লইয়া মৃত্যুর সঙ্গে হাতাহাতি করিতেছেন। সেদিন ডাক্তার সুনীলের অসাক্ষাতে তাহার দিদিকে সুনীলের মৃত্যুর নিশ্চয়তা সম্বন্ধে সন্দেহ ত্যাগ করিতে বলিয়া গিয়াছেন। ইহার দিন দুই পরে সুনীল নিজে দিদিকে ডাকিয়া, আমার ঠিকানা দিয়া, আমাকে টেলিগ্রাম করিতে বলিয়াছিল। এ যেন তাহার নিজের তাগিদ। আমি যে দিন পৌঁছিলাম, সেই দিনই রাত্রিতে সুনীল আমার হাত তাহার মুঠার মধ্যে লইয়া অনেকক্ষণ নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল। তার পর বলিল, আমার সঙ্গে শেষ দেখার জন্য ডাকিয়েছি—তোমাকে কত না কষ্ট পেয়ে এতদূর আসতে হ'য়েছে। আমাকে তো যেতেই হবে—যাবার সময়েও কি তোমাদের কাউকে দেখ্‌তে পাবো না? আর দেখ, তুমি এক দিন আমার সঙ্গে মালতীকে দেখেছিলে—ওই যে আমরা নিউ মার্কেটের ফেরত; তুমি—

বলিয়া সে চুপ করিল। তার পর বলিল, আমার মৃত্যু-সংবাদ দিদি তাকে দেবেন। তার খুব কষ্ট হবে। তার পড়ার খরচও দিদি নিয়মিত পাঠাবেন। দিদি তার বিয়ে দেবারও চেষ্টা কর্ব্বেন। দিদি একা, আর অজয় (সুনীলের ভাগ্নে) তো ছেলে মানুষ—এসব কাজে পুরুষ মানুষের সহায়তা দরকারও হতে পারে। তুমিই তা দিতে পার্ব্বে। আমার মৃত্যু-সংবাদ তাকে বড় বাজবে; কিন্তু কি কর্ব্ব, মৃত্যু আমাকে টেনে নিলে। সুনীল আর কিছু বলিল না। কিন্তু এমন আর্ত্ত কণ্ঠস্বর, এমন বেদনাহত মুখ আমি কোনও মানুষের দেখি নাই। তার পর সে দিদিকে বলিল, মালতী তার শরীর ভাল নেই লিখেছে না? ঐ খানটায় পড়তো।

এর পাঁচ দিন পরে এক সন্ধ্যায় সুনীল মারা গেল সেই সময়টায়, যখন কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় গ্যাস জ্বলিয়া উঠে, আর চায়ের দোকানে ভিড় লাগিয়া যায়! সুনীলের অকাল-মৃত্যু সম্বন্ধে ডাক্তার বলিলেন, হার্ট গোড়া থেকেই দুর্ব্বল, নইলে এত শিগ্‌গির—যাক সে কথা। দিন তিনেক পরে দিদি চোখের জলে ভাসিয়া এক নতুন কথাই বলিলেন, বোধ হয় বা আসল কথাই বলিলেন—মালতী আমাদের দূর সম্পর্কের দরিদ্র আত্মীয়-কন্যা, সে ঢাকা ইডেন স্কুলে পড়ত। আমার দেওরের বিয়েতে মালতী তার বাপ মায়ের সঙ্গে এই বাড়ীতে আসে। বিয়ে যে তারিখে হবার কথা, সে তারিখে কি একটা প্রতিবন্ধক পড়াতে বিয়ে পেছিয়ে যায়। সেজন্য মালতীদের এখানে কিছুদিন থাকতে হয়—সুনীল তখন সবে মাত্র কলেজে ঢুকেছে। গরমের ছুটীতে এখানে এসেছে। সেই থেকে তাদের পরিচয়। সেবার মালতীর বাপ মারা যান। মালতীরা কিছু অসহায় হয়ে পড়ে। তার পড়াশুনা চলবার আর উপায় থাকে না। সুনীল এ সংবাদ মালতীর এক পত্রে জানতে পেরে, তার মাকে বুঝিয়ে, আমাকে বুঝিয়ে—জানো তো ভাই সে কি রকম জেদী ছিল—তাকে কলকাতায় নিয়ে যায়। সুনীলের টাকা কোথা? বাবা তো বেশী কিছু রেখে যেতে পারেন নি। যা ছিল, তার সুদ থেকে তার মাসে মাসে খরচ পাঠাতুম। কলকাতা থেকে সে আমায় এক পত্রে জানায় যে, এক নিঃসন্তান প্রৌঢ়া শিক্ষয়িত্রী মালতীকে নিজের কাছে রেখে পড়াবেন—খুব স্নেহ করেন, খরচপত্র তিনিই সব দেবেন। হা রে আমার প্রৌঢ়া শিক্ষয়িত্রী আর তার স্নেহ! আমরা এই কথাই বিশ্বাস করে এসেছি। এক দিন নয়, দু'দিন নয়, চার বছর। মালতী এবার এফ্-এ দেবে। এক শিক্ষয়িত্রীর কাছে সে ছিল ঠিক, কিন্তু সুনীল এখানে এসে স্বীকার করেছে এই ক'দিন আগে, যে, সে-ই এ পর্য্যন্ত তাকে সব খরচ দিয়ে পড়িয়েছে। মালতী কোনও দিন এ কথা প্রকাশ করে নাই, বোধ হয় সুনীলের নিষেধ ছিল। তুমি জান সুনীল জলপানি পেত—তাকে তার জলপানির টাকা তুলে রাখতে বলে, আমি নিজে মাসে মাসে খরচ পাঠিয়েছি। দিদির চক্ষে তখন শ্রাবণের ধারা বহিতেছিল, তবুও তিনি থামিবার চেষ্টামাত্র করিলেন না। নিজে না খেয়ে তাকে পড়িয়েছে তা কি আগে জানি—শুধু কি জলপানির টাকা দিয়ে? উদরান্নের টাকা দিয়েও। শুধু কি তাই,—ফি ছুটিতে দারজিলিং, মধুপুর এ সব খরচও সুনীল জুগিয়েছে। যাবার সময়েও দেখলে তো তারই কথা—তারই জন্যে ব্যাকুল—দিদি, ঠিক সময়ে আমাকে যেমন টাকা দিতে, তাকেও পাঠিও—আরোও কিছু বেশী দিও। জানো তো, মেয়েদের কত বেশী কাপড় চোপড় দরকার হয়—খরচ বেশী হয়। বিয়ে হয়ে গেলে আর বোধ হয় টাকা দিতে হবে না। তোমায় যদি লেখে, তুমি বিয়েতে যেও, উদ্যোগী হয়ে বিয়ে দিও—এমনি সব কথা। তিনি চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, সুনীল খরচ দিচ্ছে, এ কথা যদিও জানতুম না, তবুও বছর খানেক থেকে এ বুঝেছিলুম যে, সে মালতীকে ভাল চোখে দেখেছে। এও জানতুম যে, সুনীলের এ মনোভাব মালতীর অগোচর নয়। কিন্তু তাকে এমন করে যে গড়ে তুলেছে, তাকে সে কি আঘাতটাই দিলে—মেয়ে বলেই বোধ হয় এত নির্ম্মম হতে পেরেছে, ছেলে হলে লজ্জায় বাধত। এক ধনীর ছেলের সঙ্গে কেমন করে যে তার পরিচয় হয়, তা সুনীলও ঠিক জানত না। সেই ছেলেটীর বোন মালতীর সঙ্গে পড়ত; বোধ হয় সেই থেকে সূত্রপাত। এ আঘাত তার দুর্ব্বল দেহ সহ্য কর্ত্তে পারেনি, মনও না।

* * * মৃত্যুর দিন সকালে সুনীল তাহার নতুন-কেনা দুই খণ্ডে সমাপ্ত টলষ্টয়ের Anna Kerina খানা আমাকে দিয়াছিল। আমি ও দিদি পাশেই রহিয়াছি, তবুও ঘন ঘন আমাদের ডাকিতেছিল। আহা, পরপারের যাত্রীর সংসারের প্রতি এ কি আকর্ষণ! তার দেওয়া Anna Kerina

খানার প্রথম পৃষ্ঠার এক পাশে তার নিজের হাতে বাংলায় লেখা তিনটী অক্ষর 'সুনীল'। ইংরেজী বইতেও সে বাংলায় নাম লিখিতে ভালবাসিত। এর কারণ এক দিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করায়, সে, মনে পড়ে, বলিয়াছিল, আমি বাঙালী, বাংলায় লিখবো এই তো স্বাভাবিক। ফার্সী কেতাবে ফার্সী নাম, ফ্রেঞ্চ বইএ ফরাসী ভাষায় নাম লিখতে যাবো কেন, আমি তো ভেবেই পাই নে।

আজকার দিনে যখন শুনি, অমুক ছেলে এমনি ত্যাগ করিয়াছে, অমুকে এতখানি মহত্ত্ব দেখাইয়াছে, তখন আমার সামনে সুনীলের দুটী চক্ষু ভাসিয়া ওঠে—তাতে সাগরের রংটা আঁকা। সংসারে যাহারা ত্যাগ করে, তাহারা ত্যাগের মধ্য দিয়া কোনও না কোনও আকারে সান্ত্বনা পায়—সে কি কোনও প্রকার সান্ত্বনা পাইয়াছিল, জানিতে বড় ইচ্ছা হয়।

সুনীলের পিতামাতা ছিলেন না, বিশেষ করিয়া সেইজন্য এই একমাত্র ভ্রাতৃবিয়োগ সুনীলের দিদিকে বড়ই আঘাত দিয়াছিল। চিতাগ্নিতে তাহার অনেক বই দিয়াছিলাম—বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত। সুনীল তার মৃত্যুর তিন দিন আগে করুণ হাসি হাসিয়া বলিয়াছিল সঙ্গে বইটই দিও হে, একেবারে সম্বলহীন যাত্রী—আর বেশী খুঁচিও টুচিও না—এ কথার কোনও উত্তর দেওয়া আমার সাধ্যে কুলায় নাই। তাই সে আমাকে দুঃখিত দেখিয়া বলিয়াছিল, রাগ কর্লে না কি? তোমাকেও যদি না বলি, তবে কাকে বলি বল তো?

বৈষ্ণব পদাবলী সুনীলের বড় প্রিয় ছিল। সেখানা যখন আগুনে তুলিয়া দেই, তখন একটা জায়গা চোখে পড়িল "কি কহব রে সখি আনন্দ ওব। চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।"

দিন পাঁচেক পরে সুনীলের দিদিকে প্রণাম করিয়া চোখের জলে বিদায় লইলাম। বিদায়ের সময় তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না, ঠোঁট বার-দুই কাঁপিয়া উঠিল এবং আমার মাথায় হাত রাখিয়া নীরব অশ্রু ত্যাগ করিতে লাগিলেন। এই স্বল্পভাষিনী শোকাকুলা নারীকে আমি সান্ত্বনা দিবার বৃথা চেষ্টা করি নাই। কলিকাতায় ফিরিয়া কয়েক দিন আমার আড়ষ্ট ভাবে কাটিল। সুনীল আমার আত্মীয়-পরিজন নয়; কিন্তু এই একটা বছরের পরিচয় নিকটতম আত্মীয়তাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে।

সুনীল সম্পর্কে মালতী দোষী ছিল কি না, সে বিচারে আজ প্রবৃত্তি নাই, সে চেষ্টাও করিব না। আঘাত সুনীল পাইয়াছিল, ইহা ঠিক। তাহা যে আকারেই আসিয়া থাকুক, তাহা মালতীর ইচ্ছাকৃত কি না, সে কথা তুলিয়াও আজ লাভ নাই।

সুনীল ও মালতীর ব্যাপার কতকটা ঝাপসা হইয়া আছে, তাহাই থাকুক। কিন্তু মন হইতে এ কথাটী আজ এই পনেরো বছরেও দূর করিতে পারি নাই যে, সুনীল গুরুতর আঘাত পাইয়াছিল, যাহা তাহাকে অকাল-মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। মালতী বিবাহ করিয়াছে, বোধ করি ভালই আছে—তাহার সংবাদ আর কিছু জানিবার চেষ্টা করি না। ইহার মধ্যে শিলং যাইবার পথে গৌহাটীতে তিনবার দিদির সঙ্গে দেখা করিয়াছি, মাঝে মাঝে পত্রও লিখি। পতি বৎসর তাঁহার নিকট হইতে ভাইফোঁটার কাপড়ও আমার কাছে আসে। কিন্তু ইহাতে সুনীলের কি আসিল গেল?

স্ত্রী পুরুষের সমস্যার কথা আজকাল যখন শুনি, তখন দু' একবার এ কথাও মনে জাগে যে, সুনীল উপকার করিয়াছিল, মালতীর মনে পায় নাই বলিয়াই যদি চলিয়া যাইয়া থাকে, তবে উপায় কি? তখন এ-ও মনে হয় যে, সুনীল কি শুধু উপকারী? সে যে তার চাইতে অনেক বড়।

আজ সে কোথায় আছে? পনেরো বছর সে লোক-চক্ষুর অতীত—পুনর্জন্ম থাকিলে সে নিশ্চয়ই আবার বাংলা দেশের শ্যামল ক্রোড়ে জন্মিয়াছে, ইহা আমার মন বলিয়া দেয়। সেই সৌন্দর্য্য, সেই প্রতিভা লইয়া জন্মিয়াছে তো,—এখন কত বড়টী হইয়াছে? সেই দীপ্ত মুখ, সেই কথা কওয়ার ভঙ্গি, সেই চোখ? আহা, এক জন্ম তার বৃথা গিয়াছে, এ জন্মে যেন সে সুখী হয়, স্বস্তি পায়।

চিরদিন শুনিয়াছি ও পড়িয়াছি যে, পুরুষ কত না নির্ম্মমভাবে নারী-পীড়ন করিয়াছে,—ভালবাসার অভিনয়ে কত না যন্ত্রণা, কত না মর্ম্মপীড়া দিয়াছে; নারীর চিত্তের দিকে, নারীর অধিকারের দিকে তাকায় নাই। পৃথিবীতে আজও পর্য্যন্ত পুরুষের এই Exploitation চলিয়া আসিতেছে, যেমন করিয়া কলের মালিক কলের কুলীকে চালায়। এ নরমেধের বুঝি আর নিবৃত্তি নাই,—আদিতেও

যেমন, মধ্যেও তেমনি, বর্ত্তমানেও সেই একই মূর্ত্তি, কিন্তু সেই সঙ্গে এই একটা সামান্য অনাবশ্যক কথাও মনে হয় যে, যুগ যুগান্তের ক্ষুব্ধ ব্যথিত নারী-চিত্ত একটা নারী-রূপ ধরিয়া সুনীলের উপর যে অত্যাচার করিয়াছে, তাহার বুঝি আর তুলনা নাই!

ত্যাগী ছেলে দেখিলে, সুকুমার মূর্ত্তি চোখে পড়িলে, কাব্যপ্রিয় সাহিত্যরত সুন্দর ছেলে দেখিলে তাহার কথাই মনে পড়ে, আর চোখ জলে ভরিয়া ওঠে, মন তখন রেলপথ বাহিয়া ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া সেখানটিতে উপস্থিত হয়, যেখানে সুনীল তাহার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিল।

অচির-বিধবা

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি-এ

(১)

বাঞ্ছিত-বঞ্চিত হৃদিখানি চঞ্চল,
রুক্ষ সে কেশপাশ—লুণ্ঠিত অঞ্চল,
গর্ব্বিত চিত্ত আজি মর্দ্দিত নিমেষে!
সঞ্চিত সুধাটুকু কেড়ে নিল কে এসে?

(২)

বসন যে স্রস্ত ; এলায়িত কবরী ;
লুণ্ঠিত দেবতায় তার নিল কে হরি?
অতীতের স্মৃতিটুকু সম্বল তার শুধু ;
দুর্ম্মদ কোন্ রাহুগ্রস্ত রে তার বিধু?

(৩)

স্বিন্ন যে তনুখানি খিন্ন শোকের ভারে,
বিকলিত চিত্ত যে পূর্ণ রে হাহাকারে।
ক্লান্ত সে আঁখি তবু শান্ত সে দৃষ্টি,
ধরণীর পরে করে মঙ্গল বৃষ্টি।

(৪)

দুর্জ্জয় সিন্ধুর উর্ম্মির লহরে,
বালুময় সৈকত কেমনে বা নিবারে?
দুর্দ্দম আঁখি জল তাই বহে হুতাশে ;
সংসার-শৃঙ্খল-মুক্তি-ভিখারী সে!

(৫)

কান্তের সাথে আজ শান্তির সাধ যত
লুপ্ত হয়েছে তার ; সুপ্ত বাসনা শত।
দেব নাহি অবশেষ কারো 'পরে এতটুক্
দূর মিলনের আশে সে যে গো বেঁধেছে বুক।

বিশ্ব-জগতের প্রাথমিক উপাদান

শ্রীপ্রফুল্লকুমার বসু

মানবজাতির উৎপত্তির সময় হইতেই, মানুষ সমস্ত নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করিয়া আসিতেছে। সে মনে মনে প্রশ্ন করিয়াছে—"পৃথিবী এমন কেন? গ্রহ-তারা, চন্দ্র-সূর্য্য কেন? কোথা হইতে ইহারা আসিয়াছে? আর ইহাদের পরিণতিই বা কোথায়?"

এই যে অনুসন্ধানের একটা প্রবল তৃষ্ণা, ইহা মানবের একটা মজ্জাগত স্বভাব। সত্যানুসন্ধানটা তাহার জীবনের একটা বিশিষ্টতা। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে সত্যানুসন্ধানের তীব্রতার তারতম্য দেখা যায় না। প্রাচীন কালের সভ্যদেশের লোকেরা যত অনুসন্ধিৎসু ছিলেন, আমাদের অনেকে তার চেয়ে বেশী অনুসন্ধিৎসু—বোধ হয় এ গর্ব্ব করিতে কেহই সাহসী হইবেন না। তাঁহাদের চিন্তার ধারাটা যদি ভুল পথেই গিয়া থাকে, তবে সে দোষটা তাঁহাদের সত্যান্বেষণের ইচ্ছার নয়—বিচারের দোষ বা অভিজ্ঞতার অভাব।

আজ পর্য্যন্ত জগতের একটা প্রধান সমস্যা জড়পদার্থের স্বরূপ। জড়পদার্থ কি? কি উপাদানে চন্দ্রসূর্য্য গঠিত—আর কি উপাদানেই বা উদ্ভিদ বা প্রাণীদেহ গঠিত? জড় পদার্থের উৎপত্তি কোথায়, কোথায় ইহার বিলয়? এই যে চেতন ও অচেতন পদার্থের স্বরূপনির্ণয়ের দুরন্ত বাসনা, ইহা সকল যুগেই মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তিকে সমভাবে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছে।

মানবের আর একটা ধর্ম্ম Intuition বা "সহজ-সংস্কার"। এই সহজ-সংস্কার অন্ধকারে পথ দেখায়; যে প্রশ্নের সমাধানে আমাদের সকল চিন্তা, সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান হার মানে, সেখানে সহজাত সংস্কার এমন একটা জবাব দেয়, যাহার সততায় অনেক সময় কোন সন্দেহই থাকে না। এই সংস্কারবশেই মানুষ প্রাচীন কাল হইতে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে যে, জড়দ্রব্য একটা কঠিন "বিচ্ছেদহীন একটানা" দ্রব্য নয়—"Matter is not continuous but discrete"; আর বাস্তবিকই জড়পদার্থের continuity বা "সন্ততি" আমাদের ধারণায় আসে না—বা ইহাতে আমাদের কোন কাজ চলে না; "বহুত্বই আবশ্যক, বিচ্ছেদই আবশ্যক"। সেইজন্যই জড়পদার্থের grained structure—কণিকাময় স্বরূপের কল্পনা।

জড়পদার্থ অণু বা পরমাণুর সমষ্টি—এ কল্পনাটী বহু পুরাতন। যদি কোন দ্রব্যকে ক্রমান্বয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে বিভক্ত করা যায়, তবে কোথায় তাহার শেষ হইবে? যত সূক্ষ্মই হৌক না কেন, ইহার চরম অবস্থা নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। পণ্ডিতেরা স্থির করিলেন, এমন এক অবস্থা আসিবে, যখন পদার্থ মাত্রেরই কণিকা অবিভাজ্য হইয়া দাঁড়ায়। এই অবিভাজ্য কণিকাই পরমাণু। অণু এক বা বহু পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। তাহা হইলে অণু ও পরমাণুর সমষ্টিই জড়-দ্রব্য। কিন্তু অণু-পরমাণুর কল্পনা পুরাতন হইলেও, বিভিন্ন প্রকৃতির অণু-পরমাণুর কল্পনা বেশী পুরাতন নয়। এই কল্পনা সকল সভ্যদেশেই বিভিন্ন যুগে, পণ্ডিতদের নিকট বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছিল। অনেকেই জড় পদার্থের আদি বস্তুর একটা স্বরূপ কল্পনা করিয়াছেন।

গ্রীক্ সভ্যতার উৎপত্তির অনেক পূর্ব্বে মহর্ষি কপিল বলিয়াছেন, "নাবস্তুনো বস্তু সিদ্ধি" অর্থাৎ পূর্ব্বে কোন বস্তু না থাকিলে স্বতঃই কোন বস্তুর উৎপত্তি হয় না। কিন্তু বৈশেষিক-দর্শন-প্রণেতা মহর্ষি কণাদের জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় তথ্যগুলিই সমধিক প্রসিদ্ধ ও ও অধিকতর প্রস্ফুট। কণাদ-মতে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, ও মরুৎ এই চারি ভূতের পরমাণু দ্বারা বিশ্ব গঠিত। পরমাণু সকল নিত্য—কিন্তু এই সকল পরমাণু-গঠিত জড় পদার্থ অনিত্য। জড়-পদার্থ পরমাণুসকলের সংযোগে উৎপন্ন বটে, তবে ঐ উৎপত্তির কারণ অজ্ঞাত। সাংখ্য ও বৈশেষিক-দর্শনের অনেক পূর্ব্বে জড়-পদার্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত ছিল। ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলেন—আদিতে এক অদ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন—তাঁহার বহু হইবার বাসনা হইলে তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন। এই তেজের বহু হইবার ইচ্ছা হইলে, ইহা হইতে অপ্ উদ্ভূত হইল—এবং ক্রমে এই অপ হইতে ক্ষিতির (অন্ন) জন্ম হইল। অন্যান্য উপনিষদে সৎ হইতে আকাশ (ether), পরে মরুৎ, এবং তৎপরে তেজের উৎপত্তি হইল—এই প্রকার কল্পনা আছে। এই ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুতের ইংরাজির অনুবাদ করা হয় যথাক্রমে—earth, water, fire and air; এবং আমরাও ইংরাজির বাংলা তর্জ্জমা করি—মৃত্তিকা, জল, অগ্নি ও বায়ু। কিন্তু হিন্দু-দর্শনশাস্ত্রে এই কথাগুলি এত সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইত না। Max Muller পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন—By water is meant all that is fluid and bright in colour—by food (অন্ন) is meant the earth, all that is heavy, firm and dark in colour. এক কথায় বলা যাইতে পারে, তরল পদার্থ মাত্রেই অপ্ এবং কঠিন দ্রব্য মাত্রেই ক্ষিতি, এবং সম্ভবতঃ বায়ুর বাহ্যিক গুণবিশিষ্ট বস্তু মাত্রেই (gaseous bodies) ছিল মরুৎ—তেজ তেজই ছিল, শুধু অগ্নি নহে। এবং কণাদের মতে এই চারি প্রকার পদার্থই প্রাথমিক বা fundamental principle বলিয়া তাঁহার কল্পিত পরমাণও হইতেছে চারি প্রকার, যথা—কঠিন পরমাণু, তরল-পরমাণু, মারুৎ-পরমাণু এবং তেজঃ-পরমাণু। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি একটী কঠিন পদার্থের পরমাণুর সঙ্গে অন্যান্য পদার্থের পরমাণুর কোন প্রকার বিভিন্নতা স্বীকার করেন নাই—বোধ হয় তাঁহার মতে কোন প্রকার বিভিন্নতা ছিল না।

ছান্দোগ্য উপনিষদে সনৎকুমার নারদকে বলিতেছেন—জলই আদি পদার্থ—জল বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিলে পৃথিবী, আকাশ, পর্ব্বত, কীট, পতঙ্গ, গো, মহিষাদি, মনুষ্য ও উদ্ভিদাদি উৎপন্ন হয়। গ্রীস দেশেও এই মতটী খুব পুরাতন, এবং প্রায় ১৫০০ বৎসর ধরিয়া লোকে 'জলই আদি পদার্থ' এই ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু যখন ফরাসী বৈজ্ঞানিক Lavoisier পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিলেন যে, জলকে মাটিতে পরিণত করা যায় না, তখন ঐ ধারণা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। এই মতবাদের ন্যায়, অনেক মতও প্রাচীন দার্শনিকদিগের উক্তি আমরা সমর্থন করিয়া আসিতেছি, কিন্তু আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখি না, উহা কতদূর সত্য। প্রাচীন দর্শনকারদিগের নিকট পরীক্ষা দ্বারা কোন ধারণা সপ্রমাণ করা হীন এবং অগৌরব বলিয়া বিবেচিত হইত। মনই প্রকৃত জ্ঞানের উৎপত্তি স্থান, বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা প্রকৃত জ্ঞানের সঞ্চার হইতে পারে না—ইহাই ছিল তাঁহাদের ধারণা। সৌভাগ্য বশতঃ আজকাল আবার কথায় কথায় নজির চাই, প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাই—এবং বৈজ্ঞানিকগণ প্রত্যক্ষ সত্যকেই সত্য বলিয়া মানিয়া লন। তাহা না হইলে আজ বিজ্ঞান-বিদ্যার এত দূর উন্নতি সাধিত হইত না। অন্ধ বিশ্বাস আমাদিগকে চিরকাল অন্ধকারেই রাখিত—জ্ঞানের আলোকে আমরা কোন কালে দেখিতে পাইতাম না। যাহা হউক, যাহা বলিতেছিলাম, তাহাই বলি।

সনৎকুমার ও Thales of Miletus (খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী) যেমন জলকেই প্রাথমিক উপাদান (first principle) বলিয়াছেন—Horakleitos (খৃঃ পূঃ ৪৫০) তেমনই অগ্নিকে প্রাথমিক উপাদান বলিয়াছেন। অগ্নি ঘনীভূত হইলে বায়ু, বায়ু ঘন হইলে জল এবং জল জমাট বাঁধিলে মাটিতে পরিণত হয়। অগ্নি ও সূর্য্য উপাসকেরা এই মতের সমর্থন করিত। আর একজন গ্রীক দার্শনিক (Archelaus) বলিয়াছেন—বায়ু ঘনত্ব কমিলে অগ্নিতে ও ঘনীভূত হইলে জলে পরিণত হয়। Anaxamenes (খৃঃ পূঃ ৫০০) ঐ একই কথা বলেন। আবার Pherekidos অনুমান করিয়াছেন—মাটীই জড়জগতের first principle। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কণাদের চারি প্রকার প্রাথমিক "পদার্থ" কোন না কোন সময়ে—কোন না কোন গ্রীসীয় পণ্ডিতের নিকট জড়জগতের প্রাথমিক উপাদান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

Empedocles কণাদের ন্যায় চারিটী মৌলিক পদার্থ মানিয়া লইয়াছেন, তবে বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার অনুমান অনেকটা পরীক্ষার উপর স্থাপিত। তিনি দেখিলেন, কাঠ পোড়াইলে—ধোঁয়া (gas), অগ্নি, জল ও ছাই (মাটী) এই চারিটী পদার্থ পাওয়া যায়—সুতরাং তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, যাবতীয় জড়দ্রব্যের উপাদান এই চারিটি পদার্থ, যথা—মরুৎ (gas) অগ্নি, জল ও মাটী। Aristotleও (৩৮৫—৩২২ খৃঃ পূঃ) ঐ কথাই বলিয়াছেন; তবে Empedoclesএর সঙ্গে তাঁহার প্রভেদ এই যে, তিনি বলেন জল বায়ু, অগ্নি ও মৃত্তিকার প্রত্যেকটিকে অন্য আর একটিতে পরিণত করা যায়, অর্থাৎ জল বায়ু, অগ্নি বা মাটির মধ্যে একটা বাহ্যিক বিভিন্নতা আছে মাত্র, গোড়ায় কোন প্রভেদ নাই। Aristotleএর এই মত কোনও পরীক্ষামূলক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কিন্তু হইলে কি হয়, তৎকালে তাঁহার মত জ্ঞানী কেহই ছিলেন না, কাজেই তাঁহার মত সম্পূর্ণ অমূলক হইলেও সকলেই তাহাতে আস্থা স্থাপন করিত,—অন্যান্য পণ্ডিতদের তর্কবুদ্ধি বড় একটা টিকিত না।

কিন্তু ঐ গ্রীসদেশেই Aristotle এর পূর্ব্বে নব্যবিজ্ঞানসম্মত একটা মত প্রচলিত ছিল। এই মতবাদের জন্মদাতা Anaxagoras (৫০০ খ্রীঃ পূঃ)। তিনি বলেন, আদিতে শৃঙ্খলা ছিল না, নিয়ম ছিল না, কোন মৌলিক পদার্থ ছিল না, শুধু এক প্রকার জড় কণিকা ছিল, যাহাকে তিনি homeomery বলিয়াছেন। সৃষ্টির সময়

কোন বুদ্ধিমান পুরুষ এই সমস্ত জড়পিণ্ডগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নির্দিষ্টভাবে সংযোজিত করিলে জড় পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছিল। একটী homeomery অণুটি হইতে বিভিন্ন নয়, বিভিন্ন সংখ্যক homeomeryএর সমবায়ে বিভিন্ন পদার্থের উৎপত্তি হয়। এই homeomeryই হইতেছে Anaxagorasএর ultimate matter (প্রাথমিক উপাদান)। এই homeomery বাদের সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের Electron বা তড়িৎকণাবাদের খুব সাদৃশ্য আছে।

এই ত গেল গ্রীসদেশের প্রাচীন পণ্ডিতদিগের কথা। তিব্বত, মিশর, চীন বা ব্যাবিলনে জড়পদার্থের স্বরূপ অনুমান করিতে এই সময়ে কেহই অগ্রসর হন নাই। কিছুকাল পরে, গ্রীসে যখন এই সমস্ত মতবাদ লইয়া একটা বিতণ্ডার সৃষ্টি হইতেছিল—তখন আরবদেশে ও মিশরীয় পুরোহিতদিগের মধ্যে পরীক্ষার উপর রসায়নশাস্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল।

"নানা মুনির নানা মতের" মধ্যে পড়িয়া প্রকৃত তথ্যটুকু জানিবার উপায় না থাকায়—গ্রীক যুবকেরা মিশরে উপস্থিত হইয়া বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে লাগিলেন, ফলে Aristotle ও Anaxagorasএর মতবাদ উল্টাইয়া গেল—খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে জড়পদার্থের উপাদান বিষয়ে এক নূতন মতবাদের সৃষ্টি হইল। ইহাই গন্ধক-লবণ-পারদ মতবাদ। ইহার পরিপোষকগণ বলিতেন, জড়দ্রব্য এই তিনটী উপাদানে গঠিত। ধাতু মাত্রেই পারদ ও গন্ধকসম্ভূত, তবে বিভিন্ন ধাতুতে পারদ ও গন্ধক বিভিন্ন অনুপাতে বর্ত্তমান। গন্ধক যত কম থাকে, ততই ধাতুর দগ্ধ হইবার ক্ষমতা কমিয়া যায় এবং ততই সেই ধাতু বহুমূল্য হয়। লোকে ভাবিল, এ যদি সত্য হয়, তবে ত লৌহ, তাম্র প্রভৃতি হীনধাতুদিগকে গন্ধকের সহিত রাসায়নিক সংযোগ করিয়া স্বর্ণ বা রৌপ্যে পরিণত করা যাইতে পারে। এই ধারণা লইয়া, প্রকাশ্যে বা গোপনে বহুমূল্য ধাতু প্রস্তুত করিবার একটা বিরাট চেষ্টা চলিতে লাগিল; এবং ইহাই ১৭০৫ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত alchemistsদের সাধনা হইয়া রহিল।

এই সময়ে Paracelsus বলিলেন, প্রত্যেক ধাতুর ভিতর এক প্রকার "রস" বা seminal flurd আছে, যাহার প্রভাবে একটী ধাতু অপর ধাতুতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। এইখানেই "স্পর্শমণির" প্রথম কল্পনা। এই কল্পনার আলোকে আকৃষ্ট হইয়া স্পর্শমণির অন্বেষণে বৈজ্ঞানিকদের দিনরাত অতিবাহিত হইতে লাগিল—ফলতঃ অবশেষে ইহাই এই যুগের ultimate matter হইয়া দাঁড়াইল। পরীক্ষার উপর পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা প্রমাণ হইল, এই সকল মতবাদ ভিত্তিহীন—একটা ভ্রান্ত অনুমান মাত্র; ক্রমে স্পর্শমণির কল্পনা রসায়নশাস্ত্র হইতে নির্ব্বাসিত হইল।

এই ত গেল মধ্যযুগের কথা। এইবার অপেক্ষাকৃত আধুনিক মতামতের কথা বলিব। Proutএর মতবাদ ইহাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বলিলেন যে, hydrogen বা উদ্‌জানই সমস্ত মৌলিক পদার্থের উপাদান। সমস্ত মৌলিক পদার্থ এই উদ্‌জানবাষ্পের বিভিন্নসংখ্যক পরমাণুর রাসায়নিক সমষ্টি মাত্র। হাজার বৎসর পূর্ব্বে এরূপ কোন মত প্রচারিত হইলে, হয় ত লোকে মানিয়া লইত। কিন্তু যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের যুগের প্রারম্ভ। কাজেই লোকে দেখিতে চাহিল, Proutএর মতবাদ কতদূর পর্য্যন্ত পরীক্ষামূলক তথ্যের উপর স্থাপিত। সংশ্লেষণ (synthesis) ও বিশ্লেষণ (analysis) উভয় প্রক্রিয়া দ্বারা সত্য নিরূপণ করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। কিন্তু উদ্‌জান বায়ুকে ঘনীভূত করিয়া অন্য পদার্থে পরিণত করা গেল না, কিংবা অন্যান্য পদার্থ বিশ্লেষণ করিয়া কেবল উদ্‌জানই পাওয়া গেল না। আরও এক কথা, দেখা গেল, অন্যান্য মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক ওজন (atomic weight) উদ্‌জানের পারমাণবিক ওজনের (উদ্‌জান সর্ব্বাপেক্ষা লঘু পদার্থ বলিয়া ইহার আপেক্ষিক পারমাণবিক ওজন এক ধরা হয়) অনুপাতে অনেক সময় অখণ্ডরাশি না হইয়া ভগ্নাংশ হইতেছে। কিন্তু পরমাণু যখন ভাঙ্গা যায় না, তখন ইহা কিরূপে সম্ভব? কাজেই বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট Proutএর অনুমানের কোন ভিত্তি থাকিল না। Proutএর শিষ্যেরা ছাড়িবার পাত্র নহেন, তাঁহারা বলিলেন—উদ্‌জান প্রাথমিক পদার্থ (ultimate mattter) নয়, কিন্তু উদ্‌জানকে চারি ভাগ বা আট ভাগ করিলে যে পদার্থ হয়, তাহাই প্রকৃত পক্ষে ultimate matter, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই নূতন মতবাদের দাবী প্রমাণাভাবে খুবই কম—নাই বলিলেই হয়।

ইহার পর আর কেহ খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া বা কেবল অনুমানের দোহাই দিয়া, অন্য কোন স্বরচিত মত প্রচার করিতে সাহসী হন নাই। কারণ কেবল মাত্র অনুমানের উপর যে সমস্ত মতের ভিত্তি, তাহা কখনই সুদৃঢ় নয় এবং অনেক সময় পরীক্ষা দ্বারা ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রমাণ হয়। যাহা হউক ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ও শেষভাগে তড়িৎসম্বন্ধীয় কতকগুলি পরীক্ষা করিতে গিয়া প্রকৃত সত্য বাহির হইয়া পড়িল। খুব অল্প চাপযুক্ত বায়ুপূর্ণ কাচের আবদ্ধ নলের ভিতর দিয়া, রুমকর্ফ যন্ত্রের সাহায্যে বৈদ্যুতিক অগ্নিশিখা পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিয়া দেখা গেল যে, চাপ যখন খুব কম থাকে, তখন বিয়োগসংজ্ঞক প্রান্ত (Negative electrode) হইতে একপ্রকার উজ্জ্বল রশ্মির উৎপত্তি হয়; উহা যে স্থানে পতিত হয়, সেই স্থান উজ্জ্বল হরিদ্রা বর্ণ ধারণ করে। এই রশ্মিগুলিকে cathode rays বলা হইল, কেন না এই রশ্মিগুলি cathode বা বিয়োগ সংজ্ঞক প্রান্ত হইতে উদ্ভূত হয়। সাধারণ আলোক বা বৈদ্যুতিক আলোক হইতে এই নূতন আলোক অবিভিন্ন কি না, ইহা অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখা গেল যে, ইহা সাধারণ আলোকের ন্যায় ছায়া উৎপাদন করিতে পারে, যে স্থানে পতিত হয় সেই স্থানের উষ্ণতা বৃদ্ধি করে এবং সরল পথে চলে। আরও দেখা গেল যে, এই cathode রশ্মি জড় পদার্থে চাপ দিতে পারে এবং চুম্বক দ্বারা আকর্ষিত হইতে পারে, ইহা বিয়োগসংজ্ঞক বিদ্যুতিক শক্তিপূর্ণ (negatively electrified) এবং ধাতুর পাতলা পর্দ্দা ভেদ করিয়া নির্গত হইতে পারে।

প্রথমে বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করিলেন যে, বায়ুর পরমাণুসকল বিয়োগসংজ্ঞক বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা অভিভূত হইয়া এই নূতন আলোক সৃষ্টি করে। Sir William Crookes অনুমান করিলেন যে, ইহা এক প্রকার জড় পদার্থ, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত অজ্ঞাত—a fourth state of matter বা radiant matter. পরে দেখা গেল যে, সকল পদার্থ একই প্রকার cathode রশ্মির সৃষ্টি করে। অর্থাৎ যদি কোন fourth state of matter থাকে, তাহা সব পদার্থেই বর্ত্তমান। এক কথায় ইহাই প্রাথমিক উপাদান। Sir J. J. Thomson এই radiant matterকে corpuscle নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে বায়ুহীন আবদ্ধ কাচনলের ভিতর বৈদ্যুতিক শক্তিপ্রভাবে, পরমাণু ভাঙ্গিয়া যায় এবং ঐ সকল corpuscle বা electronএর সৃষ্টি হয়। ইহাই নব্য বিজ্ঞানের Electron Theory বা তড়িৎ-কণাবাদ। সকল বৈজ্ঞানিকই এই তড়িৎকণাবাদ মানিয়া চলেন—না মানিয়াও ত উপায় নাই। ইহা পরীক্ষার দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে এবং হইতেছে। পরমাণু ভাঙ্গিয়া গেল,—এতকাল ধরিয়া (কণাদের আমল হইতে) যে পরমাণু দর্শনে, বিজ্ঞানে, অবিভাজ্য ছিল, তাহা আজ বিভাজ্য হইল—ডালটনের পরমাণুবাদের ভিত্তি কাঁপিয়া উঠিল।

এই সময় অধ্যাপক বেকারেল ইউরেনিয়মযুক্ত যৌগিক পদার্থ লইয়া নানাবিধ পরীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন, এই সকল radioactive বা 'সক্রিয়' পদার্থ এক প্রকার কিরণ বিতরণ করে। Radiumও এই সক্রিয় পদার্থের পর্য্যায়ভুক্ত। বেকারেলের সম্মানার্থ সক্রিয় পদার্থের রশ্মিগুলিকে—"বেকারেল রশ্মি" নামে অভিহিত করা হয়। পরে দেখা গেল যে, তিন প্রকার রশ্মির সংমিশ্রণে এই "বেকারেল রশ্মি" উৎপন্ন হয়। চুম্বক নিকটে আসিলে এই রশ্মি তিন ভাগে বিভক্ত হয়; (১) এক ভাগ চুম্বকের দিকে আকৃষ্ট হয়, (২) অন্যভাগ চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় না, বরং বিকর্ষিত হয় এবং (৩) তৃতীয় ভাগের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না। যে ভাগ কোনপ্রকারে পরিবর্ত্তিত হয় না, তাহার সহিত রঞ্জেন রশ্মির অনেক সাদৃশ্য আছে—যাহা চুম্বক দ্বারা বিকর্ষিত হয় তাহার সহিত ধনতড়িৎ সংযুক্ত হিলিয়ম নামক মারুতের অনেক সাদৃশ্য আছে এবং যে ভাগ চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় তাহা cathode রশ্মি হইতে অভিন্ন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, cathode রশ্মি দ্রুতগামী ঋণতড়িৎ শক্তিবিশিষ্ট তড়িৎকণা ব্যতীত আরকিছুই নহে। সুতরাং পরমাণু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যে তড়িৎকণা পাওয়া যায়—সক্রিয় পদার্থ হইতে সেই তড়িৎকণাই পাওয়া যায়। তবে উভয় প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রভেদ এই যে সক্রিয় পদার্থের এই যে তড়িৎকণাবিকীরণ, ইহা বৈজ্ঞানিকেরা নিজেদের শাসনে আনিতে পারেন নাই। সক্রিয় পদার্থ সর্ব্বদাই স্বেচ্ছায় আলোক, উত্তাপ এবং তড়িৎকণা দান করে—কোনরূপ বাহ্যিক শক্তি দ্বারা ইহার আলোক-উত্তাপ-তড়িৎকণা-বিকীরণ শক্তির প্রতিরোধ করা যায় না। এই সক্রিয় পদার্থের অদ্ভুত প্রকৃতি বৈজ্ঞানিক জগতে একটা সমস্যা। ইহাদের শাসন করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিক হার মানিয়াছেন।

কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, সক্রিয় পদার্থের তড়িৎকণা-আলোক-উত্তাপ বিকীরণ কত কাল ধরিয়া চলিবে? ইহার কি শেষ নাই, সক্রিয় পদার্থগুলি কি এক অসীম শক্তির ভাণ্ডার?—এ শক্তির কি অপচয় নাই? বৈজ্ঞানিকগণ ইহার উত্তর দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, ইহার শেষ আছে। সক্রিয় পদার্থের এই সক্রিয়তা (Radioactivity) এক দিন শেষ হইবে—প্রাণী-জগতের প্রাণীগণের মত, জড়জগতের এই সক্রিয় পদার্থগুলিও মৃত্যুর নিয়মাধীন। বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন uranium হইতে radiumএর উৎপত্তি হইয়াছে—radium চিরকাল radium থাকিবে না। ইহা আজ আশ্চর্য্য গুণাবলীর পরিচয় দিতেছে—ইহা বৈজ্ঞানিকের, গৃহস্থের, ব্যবসায়ীর সহস্র কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছে, কিন্তু প্রায় ২৫০০ বৎসর পরে এই ভেল্কির শেষ হইবে। আজ radium জড়পদার্থের রাজা, একচ্ছত্র সম্রাট, ইহার পরিণতি সীসকে। কালের এমনই কুটীল গতি! কিন্তু যে এখনও যৌবনে পদার্পণ করে নাই, ভবিষ্যৎ স্থবিরত্বের কঠোর কল্পনার চিত্রে তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করার চেয়ে দেখা যাউক, রেডিয়মের বংশ আমাদের আলোচ্য বিষয়ের কঠিন প্রশ্নের সমাধান করে কি না?

পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে, electron জড়পদার্থের একটী উপাদান। এই Electron বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষাগারের ভিতর বসিয়া তৈয়ারী করিতে পারেন। আর প্রকৃতি-রাণীও খেয়ালের বশে অহরহ কোটী কোটী electronএর সৃষ্টি করিতেছেন। Radioactivityর অন্ধ উপাসকেরা জগতের সমস্ত পদার্থকে কমবেশী সক্রিয় অনুমান করিয়া বলেন, জড়পদার্থের গঠনকৌশল সোজা হইয়া আসিতেছে—খুব ভারি পরমাণু ভাঙ্গিয়া অপেক্ষাকৃত হাল্কা পরমাণুর উৎপত্তি হইতেছে। Uranium হইতে radium উৎপন্ন হয়, আবার এই radiumই খুব সম্ভব সীসক হইবে। Thorium আর একটী সক্রিয় ধাতু, জানা গিয়াছে। অনেক বৎসর পরে ইহা Bismuth নামক পদার্থে পরিণত হইবে। Uranium, radium, thorium প্রভৃতি খুব ভারী ধাতু। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া অনেকে বলেন, জগতে বোধ হয় uranium অপেক্ষাও কোন ভারী পদার্থ সর্ব্বপ্রথমে সৃষ্ট হয়, পরে তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নানাবিধ সাধারণ ধাতু ও অন্যান্য পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। এই অজ্ঞাতকুলশীল অতিশয় ভারী পদার্থই সৃষ্টির প্রাথমিক উপাদান। ইহাকে Devolution Theory বলা হয়।

ওদিকে জ্যোতির্ব্বেত্তারা বলেন,—জগতের গঠন সরল হইতে হইতে ক্রমশঃ জটিল হইতেছে। দেখা গিয়াছে, নক্ষত্র যতই শীতল হয়, ততই তাহাতে নূতন নূতন মৌলিক পদার্থের আবির্ভাব হয়। যে সমস্ত নক্ষত্র খুব উত্তপ্ত, তাহাতে hydrogen, helium প্রভৃতি খুব লঘু পদার্থ বর্ত্তমান, অপেক্ষাকৃত শীতল নক্ষত্রগুলিতে calcium, magnesium প্রভৃতি পদার্থ পাওয়া যায়, এবং নক্ষত্র আরও শীতল হইলে আরও নূতন নূতন পদার্থ, এমন কি শেষে radium, uranium পর্য্যন্ত উদ্ভুত হয়।

জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের এই Evolution Theory যেমন পরীক্ষার উপর স্থাপিত,—radioactivityর পরিপোষকদিগের Devolution

Theoryও সেইরূপ পর্যবেক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই পরিণতিবাদ অনুসারে নক্ষত্র ক্রমশঃ শীতল হইয়া পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে, কাজেই hydrogen অপেক্ষা কোন লঘু পদার্থই বিশ্বের প্রাথমিক উপাদান, কিন্তু তাহা এখনও অজ্ঞাত। এই অজানা অচেনা অত্যন্ত লঘু পদার্থ হইতে প্রথমে hydrogen, পরে helium ও অন্যান্য পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। এই মতটা খুব সমীচীন বলিয়া মনে হয়, অনেক ধর্ম্মগ্রন্থে আছে যে, প্রথমে কিছুই ছিল না, একদিনে বিশ্বস্রষ্টার একটা ক্ষুদ্র ইচ্ছায় সসাগরা স্থাবর জঙ্গমশীল পৃথিবী চন্দ্রসূর্য্য গ্রহতারা সবই সৃষ্টি হইল। কিছুই ছিল না—কিছুর উৎপত্তি হইল। বৈজ্ঞানিক কিন্তু ইহা মানিতে চাহেন না, কারণ যেখানে কিছুই ছিল না কিরূপে সেখানে বাস্তব জিনিষের উৎপত্তি হয়, তাহা বৈজ্ঞানিকের জানা নাই। বৈজ্ঞানিকদিগকে খুব পীড়াপীড়ি করিলে হয় ত তাঁহারা এ পর্য্যন্ত স্বীকার করিবেন যে, আদিতে কিছু ছিল, তবে সেটা মানব-ইন্দ্রিয়-অগ্রাহ্য,রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দাদি বিহীন এমন কোন বস্তু, যাহাকে জড়জগতের প্রাথমিক পদার্থ বলিতে পারি।

উপনিষদ কিন্তু Evolution ও Devolution উভয় থিওরিই মানিতেছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, আকাশ (Ether) হইতে যাবতীয় বস্তুর উৎপত্তি (Evolution); এবং জড়দ্রব্য আকাশে পরিণত হইতে চায় (Devolution)। উপনিষদের এই কথাটা যেন astronomy ও radioactivityর বিরোধটা মিটাইয়া ফেলিতে চায়। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৈজ্ঞানিকেরা Devolution Theoryটাকে মোটেই আমল দিতে চাহেন না। Sir William Crookes বলেন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও যোগ্যতমের উদ্বর্তনবাদ জড়জগতের পক্ষেও খাটে। অভিব্যক্তির আবর্ত্তে পড়িয়া অনেক মৌলিক পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে; কিন্তু হয় ত সেগুলি প্রকৃতিদেবীর কুপুত্র, কাজেই সেগুলি জীবন-সংগ্রামে টিকিতে না পারিয়া লোপ পাইয়াছে—এই গুলিকে তিনি extinct elements বলিয়াছেন। আর কতকগুলি কোনরূপে বাঁচিয়া আছে—খুব বিরল, সেগুলি rare elements; আর যাহারা অযোগ্য অথচ কোন অজানা প্রাকৃতিক ঘটনাক্রমে কোনও সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু এখন যোগ্যতম নয় বলিয়াই হউক আর প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বশতঃ হউক জীবনযুদ্ধে ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইতেছে—ভবিষ্যতে লোপ পাইবে—তাহারাই আমাদের radioactive substance বা সক্রিয় পদার্থ।

অভিব্যক্তিবাদানুসারে জগতের প্রাথমিক উপাদানটী কিরূপ তাহা অনেকে অনুমান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তড়িৎ-কণা আবিষ্কারের পর অনেকেই এই ক্ষুদ্র বস্তুটী লইয়া যথেষ্ট মাথা ঘামাইয়াছেন। অনেক গবেষণার পর স্থির হইয়াছে যে, জড়পদার্থ (matter) বলিতে সচরাচর আমরা যাহা বুঝি, তাহার অস্তিত্ব তড়িৎ-কণায় নাই; তড়িৎ-কণার জড়ত্ব নির্ভর করে শুধু উহার গতি এবং বৈদ্যুতিক শক্তির উপর; বেগবান হইলে তড়িৎ-কণার জড়ত্ব আসে, বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভাবে জড়ত্ব আসে। আবার তড়িৎকে etherএর phenomenon বলা হয়; অর্থাৎ ether অবস্থাবিপর্য্যয়ে তড়িৎ হয়। পক্ষান্তরে তড়িৎ-কণাগুলিকে ether সমুদ্রে আবর্ত্ত বা ঘূর্ণি বলিয়া অনুমান করা হয়। আবার এই electron এর সমষ্টি লইয়া অণু-পরমাণু; সুতরাং Larmorএর কথায় বলিতে গেলে, the material atom is formed entirely of ether and has no material substratum. কথাগুলি যেন একটু অদ্ভুত শুনায়। আরও শুনুন, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Ostwald বলিতেছেন—matter কেবল অনুমান মাত্র—শক্তি বা energyই প্রকৃত সত্য। আমরা লক্ষ্য করি শুধু শক্তির পরিবর্ত্তন এবং এই শক্তিকে মনে মনে কোন বস্তুর সহিত সংলগ্ন করিতে গিয়া আমরা জড়পদার্থের কল্পনা করিয়াছি। কিন্তু সচরাচর আমরা উল্টাই বুঝি। ভৌতিক পরমাণুর কোনরূপ ভৌতিক অস্তিত্ব নাই—উহা ether, অথবা ether সমুদ্রে etherএর আবর্ত্তনের সমষ্টি মাত্র।

তড়িৎ-কণা বাস্তবিক যদি etherই হয়, তবে যেমন পরমাণুকে তড়িৎ-কণায় বিভক্ত করা হইয়াছে, সেইরূপ একদিন তড়িৎ-কণাকে etherএ পরিণত করা সম্ভব হইবে। সেদিন conservation of matter বা জড়ের নিত্যতা লোপ পাইবে, বিশ্ব-সংসার 'অনিত্য' হইবে, জড় পদার্থের মহানির্ব্বাণ লাভ হইবে। জগৎ তখন আর জড় থাকিবে না—তখন থাকিবে শুধু ether। Etherএর কথা অনেকবার বলিয়াছি বা বলিতেছি, আপনারাও এ কথাটা শুনিয়া থাকিবেন; বেদে উপনিষদে ইহাকে ব্যোম বা আকাশ বলা হইয়াছে। এই ether এর ধারণাটা খুবই পুরাতন, অতি প্রাচীনকাল হইতে আজও পর্য্যন্ত etherএর ধারণাটা প্রায় একই প্রকার আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই etherটা যে কি—ইহার স্বরূপ কি, তাহা কেহ কাহাকেও বুঝাইতে পারেন নাই—নিজেও ঠিক বুঝিয়াছেন কি না—বা ether বলিলে একই প্রকার কল্পনা করেন কি না, সে বিষয়ে আমার খুবই সন্দেহ আছে। একটী গল্প আছে (অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন):—এক রাজা কখনও আম খান নাই। মন্ত্রী মহাশয়কে আমের স্বাদ কিরূপ জিজ্ঞাসা করিলে মন্ত্রী মহাশয় নিজের পাকা দাড়ীতে তেঁতুল ও গুড় মাখাইয়া রাজাকে স্বাদ গ্রহণ করিতে বলেন। রাজা বুঝিলেন যে আম অম্লমধুর ও আঁশযুক্ত। যাঁহারা etherএর স্বরূপ ও স্বভাব অন্যকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা বোধ হয় মন্ত্রী মহাশয়ের মতই বিজ্ঞতার পরিচয় দেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Edison বলিয়াছেন—As for ether which speculative science supposes to exist, we know nothing about it

এখন বেশ বুঝা যাইতেছে—বৈজ্ঞানিকেরা, জড়-জগতের প্রাথমিক উপাদান খুঁজিতে গিয়া, এমন এক পদার্থের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন, যাহা নিজেরাও বুঝিতে পারেন না, পরকেও বুঝাইতে পারেন না,—একটা সরল সহজ পদার্থ বাহির করিতে গিয়া এমন এক 'অপদার্থ' বাহির করিয়া বসিলেন, যাহার আকৃতি-প্রকৃতি মধ্য যুগের 'স্পর্শমণির' মতই ঘোর অন্ধকারাবৃত ও রহস্যময়। জানি না, ভবিষ্যতে কোন্ বৈজ্ঞানিক এই রহস্যের আবরণ উন্মোচন করিবেন।

(নব্যভারত)

নব-জাতিবাদ

বাংলায় হিন্দু কমিতেছে, মুসলমানের সংখ্যা বাড়িতেছে, এটা সরকারী সেন্সাসের কথা। বাংলায় সংগঠন আন্দোলন খুব মন্দা, এমন কি এক রকম নাই বলিলেই হয়, ইহা প্রত্যক্ষ বিষয়। বিপিন বাবু হিন্দুসভা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, দ্বারভাঙ্গা হিন্দু-মুসলমান সন্ধিপত্র নাকচ করিতে আসেন, সংগঠন সভার শাখা বিস্তৃতির চেষ্টাও হেথায় হোথায় পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালী হিন্দুকে সংগঠনের ঢাক-পেটা হিন্দু এখনও বলা যায় না, কোনও দিন বলা যাইবে বলিয়াও মনে হয় না। ইহার কারণ বাংলার হিন্দুমুসলমান সমস্যা—সেটা জাতীয় সমস্যা নহে, সেটা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সমস্যা। বরং বাংলার সাম্প্রদায়িক সমস্যা যাহা কিছু, তাহা ঠিক শিক্ষিত বনাম অশিক্ষিতের মধ্যগত বলিয়াই ধরা যায়। বাঙ্গালীর জাতীয় রক্তে হিন্দুমুসলমান সমস্যা নাই, ওটা মনগড়া বাড়তি সামগ্রী, কণ্ঠমূলে গলগণ্ডের মত। বাংলাকে স্বাধীনভাবে দাঁড়াইয়া আপন মৌলিক জীবন সমস্যাই নিরাকরণ করিতে হইবে। পশ্চিম উত্তরভারতের অনুকরণে, গাত্রকণ্ডূয়নে ক্ষতসৃষ্টি করিলে চলিবে না।

* * * * *

কথাটা বুঝিবার। রক্তের সম্পর্কে বাংলার হিন্দু-মুসলমান ভিন্ন নয়, ভাই। চিরকাল তারা একই জাতির শোণিতধারা বহিয়া চলিয়া আসিয়াছে। মুসলমানধর্ম্ম স্বীকার তাঁদের একটা সাংস্কারিক ভাব পরিবর্ত্তন মাত্র। ঐতিহাসিক ঘটনার দিক দিয়া তাহার মূল্য আছে, কিন্তু জাতীয়তার মূলতত্ত্ব হিসাবে উহাতে বিশেষ কিছু প্রকৃতিস্বাতন্ত্র্য ঘটে নাই। জাতির ধাতু রক্ত, শুধু ভাব নহে, কথাটা অনেকেই হয়ত ভুলিয়া যান। সেইজন্যই তাঁরা জাতি সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। জাতিতত্ত্বে ধাতব ভেদসৃষ্টি সঞ্জাত হয়, এই মূলগত রক্ত-বিপর্য্যয় ঘটিলে। বাংলার তিনকোটী মুসলমানে, খাঁটী আরবদেশীয় অথবা তাতার রক্ত খুব কম, অধিকাংশ ধর্ম্মেই মুসলমান, রক্তে নহে। আর শুধু বাংলায় কেন, ভারতের সকল প্রদেশে অল্পবিস্তর তাই, এমন কি মুসলমান আক্রমণের লীলাভূমি পঞ্জাবে পর্য্যন্ত ১৯১১ সালের সেন্সাসের উপর ভর করিয়া, অনুমান করা হয় যে মুসলমানের মধ্যে শতকরা ১৫ অংশের বেশী হজ মুসলমানী শোণিত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বলিয়াছি অন্যান্য প্রদেশ সম্বন্ধে ত কথাই নাই, সুতরাং সমাজের ভিত্তিগঠনের দিক হইতে, ব্যাপারটা ভাবিবার নহে কি?

* * * *

আসল কথা, বাংলার জাতি মূলে হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়, বাংলার জাতি—বাঙ্গালী। আজ যেমন মুসলমান শোণিত জাতীয় দেহে কয়েক ফোঁটা আছে দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি, ভগবান না করুন জাতির তেমন দুর্ভাগ্য যদি কখনও ঘটে, কয়শতাব্দী বিদেশী খ্রীষ্টান রাজার আমলে থাকিতে হইলেও, নূতন শোণিত বিমিশ্রণের সম্ভাবনা অত্যল্প, এমন কি নাই-বলিলেও মনে সংশয় উপস্থিত হয় না। সেইরূপ কোনদিন বাংলার আর্য্য বিজেতাদের আমদানী শোণিত বাঙ্গালীর জাতীয় ধমনীতে কি পরিমাণে বহিতেছে তাহার নির্ণয় সম্ভব হইলে দেখা যাইত, বাঙ্গালীর আর্য্যরক্তও মৌলিক উপাদান তো দূরে, প্রধান ভাগও নহে। বাংলায় খ্রীষ্টান ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা অবনত শ্রেণীর মধ্যে বাড়িয়া যাইতেছে, খৃষ্টধর্ম্ম বাংলা ছাইয়া ফেলিলেও, বাংলার বাঙ্গালী জাতি, দেশপ্রকৃতি, ধাতুগঠনে ও সহজাত স্বভাবধর্ম্মে তবু যেমন বাঙ্গালীই থাকিবে, খ্রীষ্টান লোকসাগরে মিশিয়া লোপ পাইবে না, তেমনি বাংলার বাঙ্গালী তার মূলপ্রকৃতিতে মুসলমানও হয় নাই, আর্য্যহিন্দুও হইতে পারে নাই, তাহারা যে খাঁটী বাঙ্গালী সেই বাঙ্গালীই আছে, উপরের সাংস্কারিক ও সাংসারিকভাব ঘোলাইলেও, কচিৎ একটু আধটু বদলাইলেও, সে মৌলিক রক্তপ্রাধান্য মিলাইবার নহে। অন্য যাহা কিছু শোণিতসাকর্ষ্য, তাহা এই মূল রক্তপ্রবাহকে নানা বিভিন্ন রক্তধারায় বিচিত্র সম্পদে পরিপুষ্ট করিয়াই তুলিয়াছে, তুলিতেছে অথবা তুলিবে—বাঙ্গালীর ধাতুগত, বিশিষ্ট মৌলিকতা নষ্ট, লুপ্ত বা বিকৃত করিতে পারিবে না।

* * * *

এই রক্ত-সম্বন্ধেই জাতি। তাই জাতি হিসাবে বাঙ্গালী বাঙ্গালীই,—হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, খ্রীষ্টানও নয়। আজ যদি সমস্ত বাঙ্গালী ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহাতে বাঙ্গালী জাতি নূতন জাতি হইবে না, বাঙ্গালী ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী এইমাত্র বলিতে পারা যাইবে। তেমনি পঞ্জাব হইতে আর্য্যসমাজীরা শোধন করিতে আসিয়া যদি আপামর সাধারণকে, দয়ানন্দের আর্য্যমতে দীক্ষিত করিতে পারে, তাহাতে শুধু মতধর্ম্মাচারেই যুগান্তর আসিবে, জাতীয় রক্তভিত্তির পরিবর্ত্তন তৎসঙ্গে না আসিতেও পারে। আসমুদ্র সমস্ত সিলোন যদি বৌদ্ধধর্ম্ম বা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও তাদের অবিকৃত সিংহলী জাতীয়তা রক্ষা করিতে পারিত বা পারে, তাহা হইলে সিংহলের জাতিভিত্তিতে কিছু মৌলিক সর্ব্বনাশ ঘটে না, তেমনি বাঙ্গালী সম্বন্ধেও। বাঙ্গালী যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউক, বাঙ্গালী বাঙ্গালীই, তার দেহের, প্রাণের, মনের রক্ত, শক্তি ও সত্য বাংলা হইতে, বাংলায় উৎপন্ন, পরিপুষ্ট ও পরি-বৃদ্ধিশীল, সুতরাং বাংলায় জাতিবিপর্য্যয় আজ পর্য্যন্ত ঘটে নাই, ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রনৈতিক কারণেও নহে, ধর্ম্মগত সংস্কারপ্রলেপেও নহে। বাংলার জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি, বাঙ্গালীত্বের স্বরূপ, আজও বাংলার রক্তের মিশ্রণ, ভাবের প্রলেপ, ধর্ম্মসংস্কারের অতলে ডুবিয়া, স্পষ্ট, অখণ্ড, বিশুদ্ধতত্ত্বে ছানিয়া বাহির করা যায়। তাহাই বাংলার জাতীয় মুক্তির প্রথম ভিত্তিসোপান—বাঙ্গালীর জাতিত্বের আত্মোদ্ধার, বাঙ্গালীর আত্মপরিচয়। ইহা নহিলে সমস্যার ইয়ত্তা মিলিবে না।

* * * *

ধর্ম্মের বাঁধা সূত্র পরিয়া, বাঙ্গালী মুসলমান এই বাঙ্গালীত্ব হারায় নাই। বাংলার জাতি যেমন স্বতন্ত্র জাতি, বাঙ্গালী মুসলমানও তদনুগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া আবহমান-কাল চলিয়া আসিয়াছে। রক্তের টান বাংলার মুসলমান কোন দিন ভুলে নাই, ভুলিতে পারে

নাই। এই রক্তের ঘনিমা, ধর্ম্মের গোঁড়ামীকে ছাড়াইয়া বাঙ্গালী মুসলমানকে চিরদিন স্বাধীনমতাবলম্বী, স্বতন্ত্র ধর্ম্ম-আচার সভ্যতা-পরায়ণ করিয়াছে। বাঙ্গালী মুসলমান যখন পীরপয়গম্বরের স্তুতি গায়, দরগায় মসজিদে শিন্নি দেয়, ফকির দরবেশী ওকেলমকেলী সাধনার অনুসরণ করে, প্রেরণা ও রসান দেয়, তাঁর ভাব ও ভক্তির, সাধনা ও লোকাচারের প্রকৃতি ও তত্ত্ব নির্ণয় করে, আদর্শ ও লক্ষ্য অনুধাবন করায়। বাংলার হিন্দুমুসলমান একই সাধনতত্ত্বের অনুগামী নীতি ও আচার পরায়ণ, ফকিরের গুপ্তশাস্ত্র আর সাঁই সহজিয়ার গুপ্ত সাধন বিদ্যায় শুধু পারিভাষিক প্রভেদ, আসল লক্ষ্যে ও সাধনায় এতটুকুও তারতম্য নাই।

* * * *

যদি ইহাদের মুসলমান বলিতে হয়, বাংলার মুসলমানকে একটা বিশিষ্ট বিভিন্ন মুসলমান চিন্তা-তন্ত্রের (school of thought) মুসলমানই বলা উচিত। ভারতের সাকল্য আর্য্যহিন্দুসমাজের সঙ্গে যেমন বাংলার হিন্দুসমাজের নাড়ীগত সাদৃশ্য নাই, মিল নাই, তেমনি নিখিল ভারতের, তথা অখিল জগতের মুসলমান-মণ্ডলের মধ্যে বাংলার মুসলমান আপনাকে ধর্ম্ম, লোকাচার, রাষ্ট্র, সাহিত্য, সভ্যতা সকল দিক দিয়াই চিরদিন বিশিষ্ট করিয়া গড়িতে চাহিয়াছে, কোথাও অগৌণ বিষয়ে অপরাপর সমাজের সহিত তাহাদের মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এখানে মুসলমান কবি যখন ভক্তির উচ্ছ্বাসে গান রচনা করে—

চলত রাম সুন্দর শ্যাম পাঁচালি কাচরি রে।
বেণী মুরলি খুরলি গানরি রে॥

অথবা রাধাকৃষ্ণ পদ গাহিতে গিয়া ধুয়া ধরে—

ননদিনী রস-বিনোদিনী ও তোর কুবোল সহিতাম নারি।

তখন বাংলার বৈষ্ণব-প্রাণেরই রসমূল চিনিতে পারি, এরা তো মুসলমান নয়—বাঙ্গালী, বাঙ্গালীর প্রাণের গাথা ভক্তি প্রেমের রসে রসাইয়া গাহিয়া গিয়াছে। মুজা হুসেন আলির শ্যামা গান,—

যারে শমন এবার ফিরি।
এস না মোর আঙ্গিনাতে দোহাই লাগে ত্রিপুরারি॥
শ্যামা মায়ের খাস-তালুকে বসত করি॥

রামপ্রসাদের শ্যামা সঙ্গীতই স্মরণ করাইয়া দেয়, এরাও বাংলার সাধক, শ্যামা মায়ের চরণতলে খাস তালুকের প্রজা হইয়া, বাঙ্গালীত্বকেই সাধনায় ও সাহিত্যে ফুটাইয়া গিয়াছেন, হিন্দু মুসলমানত্বের বাচ বিচার এঁদের প্রাণের মর্ম্মে ঠাঁই পায় নাই।

* * * * *

বাংলার মুসলমান সহজসাধক চিরদিন পল্লীর শ্যাম আস্তরণে মাদুর বিছাইয়া দেহতত্ত্ব সাধিয়াছে ও শিখাইয়াছে, সেখানে হিন্দু সহজসাধকের সঙ্গে তাঁদের মোটেই ভেদ দেখা যায় নাই। আজও পদ্মাবক্ষে দাঁড় বাহিতে বাহিতে মুসলমান মাঝি, দেহের মাঝেই মক্কা মদিনা সকল তীর্থ কেন্দ্রীভূত এই তাৎপর্য্য গাহিয়া বেড়ায় ও ধারণা করে, দেহের মধ্যে চারিবেদের কথা ছেঁড়া পুঁথিতে পড়ে আর শুনায়, সনাতন ধর্ম্মের সঙ্গে তাদের ওকেল মকেলের সাধনার মিল ও গোপন সাধন রহস্য কাণ পাতিয়া শুনে ও কয়,—এগুলি সব একত্র মিলিয়া শুধু এই পরিচয়ই দেয়, বাংলার মর্ম্ম, সাধনা, বাঙ্গালীর ধর্ম্মসঙ্গীত, বাঙ্গালীর সহজবাদ ও রস-পুষ্টি হিন্দুমুসলমান নির্ব্বিশেষেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, বাংলার মুসলমান যুগের আবির্ভাবে, আর্য্যযুগের আবির্ভাবের ন্যায় দু এক ফোঁটা নূতন তাজা রক্তের আমদানির সঙ্গে, রক্তের ন্যায়, মনের ও প্রাণেরও আসল ধাতব বিপর্য্যয় কিছুই ঘটায় নাই, শুধু চিন্তায় ও সাধনায় কয়েকটা নূতন উপাদান ও পরিভাষা যোগাইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালী জাতি সমৃদ্ধই হইয়াছে, পরন্তু আপনাকে খোয়ায় নাই, ধর্ম্মে কর্ম্মে, সমাজে সাহিত্যে, শিল্পকলায়, বাঙ্গালী চিরদিন আর্য্য-প্রভাব ও আর্য্যীকরণ যেমন অস্বীকার করিয়াছে, আত্মসাৎ করিয়াছে কিন্তু আত্মহারা হয় নাই, বাংলার মুসলমান ধর্ম্ম ও সমাজ, চিন্তা ও সভ্যতা সম্বন্ধেও আসলে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে, আর্য্যের ন্যায় মুসলমান এখানে উপনিবেশ করে নাই, অধিকারও করে নাই, বাংলারই শিকড় হইতে রস টানিয়া, আগন্তুক অবদান মিশাল দিয়া বাঙ্গালীত্বকেই পুষ্ট, শক্তিপূর্ণ, ভাব-রক্ত-ও-প্রাণ প্রাচুর্য্যে বিচিত্র ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া তুলিয়াছে, পরন্তু কোথাও বহির্ভাবে চিরদিনের জন্য আচ্ছন্ন ও পরাভূত হয় নাই।

* * * * *

আজও বাঙ্গালীকে বাঙ্গালীই থাকিতে হইবে—ইহাই বাঙ্গালীর নব জাগরণের সত্য মর্ম্ম। বাহির হইতে আর্য্য সভ্যতা যেদিন আসিয়াছিল, বাংলার প্রকৃতির উপর তার আরোপ বেশী দিন টিকে নাই। বাংলার আত্মপ্রকৃতি, ধর্ম্মেতিহাসিক সুযোগ খুঁজিয়া, মাথা নাড়িয়া সে আরোপ ঝাড়িয়া ফেলিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করে নাই। বাংলার বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিকারে ও পৌরাণিক হিন্দু ভাবের নবোত্থানে, তান্ত্রিক কুলাচারের প্রবর্ত্তন তাহারই বৈশিষ্ট্য-সূচক। এই তন্ত্রাচারে বাঙ্গালী হিন্দু, আর্য্য কৌলীন্যের জয়স্তম্ভ চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রভাব ভিতরের সাধন তত্ত্বের দিক দিয়া একেবারে অস্বীকার করিয়াছিল—সমাজ-বিজ্ঞানের মূল মর্ম্মে অনাপোষী একাকারের গোড়াপত্তন করিয়াছিল। তন্ত্রের সাধনায় জাতি বিচার নাই, বর্ণধর্ম্ম বিচার নাই, যোনি-বিচার নাই। সাধনতত্ত্বে, বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান অভেদ জাতি, অখণ্ডধর্ম্মী।

* * * * *

আউল, বাউল, সহজিয়া, কর্ত্তাভজা, প্রভৃতি বাংলার ধর্ম্ম সম্প্রদায়, কিন্তু মূল মর্ম্মে ইহারা বিভিন্ন নয়, সকলে এক। তাহাদের সকলের অন্তরনিহিত উদ্দেশ্য, বাংলার সহজ প্রকৃতিকে মুক্তি দিয়া, এক জাতির সৃষ্টি করা। এক রক্তে এক জাতি হয়, তাই বাঙ্গালী তান্ত্রিকসমাজ, প্রকাশ্যে অথবা গোপনে একাচারী, রক্তের মিশ্রণে শুনা যায়, তারা শক্তিশালিনী পাঠান রমণীকেও আমন্ত্রণ করিতে কুণ্ঠা করে নাই। অবশ্য মুসলমানের উদার সামাজিক বিধান, বাঙ্গালীর মুসলমানী-

করণের যথেষ্ট সুযোগ দিয়াছিল। কিন্তু আর্য্যীকরণের ন্যায়, বাঙ্গালীর মুসলমানীকরণও তার সাধন-তন্ত্রে ও জীবন তন্ত্রে খুব মূল ও গভীর দিক দিয়া প্রশ্রয় পায় নাই। আজও যেমন রাজনৈতিক ও সামাজিক আনুকূল্যে, উন্নতি-লালসায় নিম্নশ্রেণীরা দলে দলে খৃষ্টান হয়, মুসলমান আমলেও তার বেশী কিছু ইতরবিশেষ ঘটে নাই। মৌলবীর শিক্ষার চেয়ে রাজপদের শীতল ছায়া অধিকতর প্রীতিপদ চিরদিনই ও উহাই অধিকাংশ ধর্ম্মান্তর গ্রহণের কারণ। তার উপর, মুসলমানের জোর জবরদস্তি ছিল, কোরাণের অপারগে কৃপাণের প্রবলতর যুক্তি কার্য্য করিত। সুতরাং বাংলায় মুসলমান প্রভাব, রাষ্ট্রনীতি আশ্রয় করিয়া সমাজ ও ধর্ম্মজীবনকে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল, গভীরতর ভিতরের পরশ দিয়া, আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী প্রকৃতিকে অধিকার করিতে পারে নাই। যে দীক্ষা লোভের, কামের বা প্রতিহিংসার, তাহাতে কালাপাহাড়ী কীর্ত্তিই শোভা পায়, মৌলিক প্রকৃতির পরিবর্ত্তন কিছুই ঘটায় না। বাংলার মুসলমান তাই দীক্ষান্তর গ্রহণ করিয়া শুধু সামাজিক সংস্কার পরিবর্ত্তন কতটুকু স্বীকার করিয়াছে, অন্তরগত সাধনায় ও জীবনে, হিন্দুর ছত্রিশ জাতি, চৌষট্টি উপজাতি বিচারের ন্যায়, মুসলমানের চতুর্জাতি বিচার প্রধান কথা নহে, বাঙ্গালীর মুসলমান বাংলার নব জাগরণে সাড়া দিলে, বাঙ্গালী হইয়াই তার যথার্থ সাড়া মিলিবে, মুসলমানী হজ সংস্কার তার তফাতে রাখিয়া দেওয়াই চাই।

* * * * *

আজিকার সাধ্য, এই মৌলিক প্রকৃতিগত আত্ম বৈশিষ্ট্যকেই ভিত্তি করিয়া রক্তের ও প্রাণের বন্ধনে, সামাজিক সম্বন্ধ আরও নিবিড় করিয়া, সেই ঐক্যানুভূতিকেই জাতীয় জীবনে মূর্ত্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত করিয়া তোলা চাই। বাংলার জাতিসাধনায় হিন্দু মুসলমান সংস্থা নাইও, থাকিবেও না, বাঙ্গালী জাতি, জাতি ও রাষ্ট্র হিসাবে, অখণ্ড অভেদমূর্ত্তি লইয়াই আত্মপ্রকাশ করিবে। ইহা ভবিষদ্ বাণী, হয় তো স্বপ্নময় ভাবুকতা আজিকার শিক্ষিত বাঙ্গালী অনেকে বলিবেন,— ইতিহাসের প্রকৃতি কিন্তু, বাংলার হিন্দু মুসলমান অথবা খৃষ্টানকে সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য ও বিকাশের ভেদমূলক নীতি ডুবাইয়া দিবার ইঙ্গিতই বরাবর দিয়া আসিয়াছে, রাষ্ট্র-জীবনে বাঙ্গালী হিন্দুর ন্যায় বাঙ্গালী মুসলমানও মোসলেম সার্ব্বভৌমিকতার বিরুদ্ধে বার বার বিদ্রোহ করিয়া তার স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিয়াছে,—উহাও এই ঐতিহাসিক ধারাবাহী প্রবাহে স্বাধীনতার রাষ্ট্র ভূমিকা প্রস্তুতির প্রচেষ্টা নহে কি? বাংলার জাতি, সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতার নীতি অনুসরণ করিয়া চলিবে, রাষ্ট্রে, সমাজে, জাতীয়তার সর্ব্বাঙ্গব্যাপী জীবন-রূপের প্রকাশে ও আত্মবিস্তারে—স্বাধীন তন্ত্রকেই (autonomy) লক্ষ্য-কেন্দ্র করিয়া অগ্রসর হইবে।

* * * * *

এক জাতি যাহাতে সর্ব্বজাতি অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, এক ধর্ম্ম যাহাতে সকলের ধর্ম্ম মর্ম্মগত ঐক্য খুজিয়া পায়, এক সমাজনীতি যাহাতে সর্ব্বজাতির রক্তের সম্মিলন ও সমন্বয় বাধে না, বাংলার সাধনতত্ত্ব গূঢ় এষণায় এই দিক দিয়াই জাতীয়তার বেদী নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত আছে—আজ গাঢ় অবগাহনে এই সাধনতত্ত্বের মধ্যে ডুব দিয়া নব জাতি-রূপ, সমাজ রূপ ও রাষ্ট্ররূপের সৃষ্টি করিতে হইবে, ইহাই বাংলার স্বরাজ দ্যোতনা। বাঙ্গালীত্বের প্রাপ্তি ও সিদ্ধিই তাহার পূর্ব্ব প্রস্তাবনা—এই ভূমিকার স্থির প্রতিষ্ঠা হইলে, বাংলার জাতি-ঘটে প্রাণশক্তির নূতন লীলা আরম্ভ হইবে, সে হইবে নূতন জাতীয়তার রূপ ও রাজ্য প্রতিষ্ঠা। উহাই দেবজাতি ও দিব্যরাজ্য—বাঙ্গালী, তোমার ভাগবত আহ্বান সেই লক্ষ্যেই। (প্রবর্ত্তক)

বিপথে

শ্রীপ্রফুল্ল হালদার এম্-এ

স্নেহের সুধা,

তোমার চিঠি পেয়েচি;—মনে করেছিলুম, জবাব দেবো না; যে হেতু, তুমি যা আমার কাছে জানতে চেয়েচ, ইচ্ছা ছিল না তা আর কাউকে জানাই। ভেবেছিলুম, নিজের জীবনের দুঃখের ও লজ্জার কাহিনীটা নিজের মুখে কারো কাছে বলে যাব না; কারণ, ঐ কথাটা যখন খুব অতিরঞ্জিত হয়ে তোমাদের নানা লোকের মুখ দিয়ে বেরোয়, সে আমার শুনতে ভারি ভালো লাগে। আর বলবোই বা কাকে?—আজ পর্য্যন্ত সংসারে একটী প্রাণীর কাছেও আমি সহানুভূতি পাই নি—শুধু নিন্দা ও অপবাদই আমার সম্বল হয়ে এসেচে। জানি, আমার চিঠি পড়ে তোমরা হাসবে, তোমাদের মত সতী-লক্ষ্মীরা এই বিপথ-গামিনীর প্রতি ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াবে, এবং নিন্দা ও অভিশাপে সে বেলাটা তোমাদের বেশ জমে উঠবে। কিন্তু

আজ যখন এত অনুরোধ করে তুমি আমার কাছে জানতে চেয়েচ তখন এ কথাটা বলবোই যে, যাকে তোমরা চিরদিন বিপথ বলে প্রচার করচ—তাকেই আমি সত্যিকারের পথ বলে জেনেচি ; এবং তাতে খুব সম্ভব ভুল করি নি।

আজ তোমার কাছে চিঠি লিখচি, আর চোখের জলের ভিতর দিয়ে মনে পড়চে আমাদের সেই সুখের বাল্য-জীবনের কথা—যখন তুমি ও আমি সর্ব্বদা এক সঙ্গে থাকতুম, একসঙ্গে বেড়াতুম ও একসঙ্গে ইস্কুলে যেতুম। সে আজ বহু দিনের কথা—তার পর এই পোড়া শরীরটার উপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে। কিন্তু সেই সুখের স্মৃতি এখনো আমার অন্তরের পুঞ্জীকৃত বেদনাকে মধুর করে তোলে। তোমরা ছিলে খুব বড়লোক, আর আমরা ছিলুম গরীব ; তোমার রং ছিল ফরসা, আর আমি ছিলুম কালো ; তুমি ছিলে বিখ্যাত সুন্দরী, আর আমি ছিলুম কুৎসিত। কিন্তু বিধাতা আমাকে সকল রকমে ঠকিয়েও না কি এক জায়গায় আমার জিৎ রেখেছিলেন,—লোকে বলত আমার বুদ্ধি না কি অসাধারণ ছিল। এখনো যে তারা তা স্বীকার না করে, এমন নয় ; কিন্তু তার সঙ্গে এ কথাটা যোগ করতে তারা ভুল করে না যে, সেই বুদ্ধিই না কি শেষকালে আমার সর্ব্বনাশ করেচে। এই বুদ্ধির জন্যে তোমার বাবা, মা আমাকে কত আদর করতেন, আমাকে নিয়ে কত গল্প ও তামাসা করতেন। তাঁদের স্নেহ কি আজো ভুলতে পেরেচি! তার পর আমাদের বয়স যখন বারো বছর হলো, তখন এক দিন শুনতে পেলুম, তোমার বিয়ের বর না কি ঠিক হয়ে গেচে। সে দিনকার সে গলা জড়িয়ে ধরে কান্নার কথা কি তোমার আজো মনে আছে? তুমি ত তোমার বংশের সম্মান রেখে ঠিক বয়সে গিন্নী হয়ে চলে গেলে ; কিন্তু এ দিকে আমার বাবা, মা আমাকে নিয়ে বড় বিপদে পড়লেন—মেয়ে যে আর ঘরে রাখা যায় না! সকলেই আশঙ্কা করতে লাগলো যে, তাঁদের সংসারের এত কালের গৌরব বোধ হয় আমার জন্যেই একেবারে ম্লান হয়ে যাবে। তাই বাবা খুব ব্যস্ত হয়ে ছুটী নিয়ে বর খুঁজতে বেরিয়ে পড়লেন। দেখতে দেখতে তিন বছর কেটে গেল! আমাকে ইস্কুল ছাড়িয়ে দেওয়া হল ; কারণ, এত বড় মেয়ের ইস্কুলে যাওয়া ভাল দেখায় না। শেষে বাবা বুঝতে পারলেন যে, বাজারে ঐ জিনিসটী পেতে হলে যে সম্বল থাকা দরকার, তাঁর তা কিছুই নেই—তিনি নিজে গরীব, আর তাঁর মেয়ে কুৎসিত।

এমন সময়ে আমার গোপালদা' আমাদের ওখানে বেড়াতে এলেন। তাঁকে কি তোমার মনে আছে? সেই যে এক দিন 'শিশু' বই থেকে একটা কবিতা বের করে আমাদের বলেছিলেন, যে আগে মুখস্থ করতে পারবে, তাকে পুরস্কার দেবেন। আমরা থাকতুম সাবডিভিসানে, আর তিনি সহরে থেকে বি-এ পড়তেন। লম্বা, সরু, ফরসা তাঁর চেহারা। বড়লোকের ছেলে, কিন্তু বিলাসিতার লেশ মাত্র তাঁর ছিল না। পুরানো একজোড়া চটী জুতা, একটী মোটা সার্ট ও একখানা মোটা চাদর ছিল তাঁর সম্বল। কিন্তু বাড়ী থেকে তিনি এত টাকা এনে কি করেন, এ নিয়ে তাঁর হিতৈষীদের আর চিন্তার শেষ থাকত না। বড়লোককে তিনি বড় ভয় করতেন। আমাদের বাড়ী যে তিনি প্রায়ই আসতেন, তার কারণ, আমরা গরীব। আমার মাও তাঁকে নিজের ভাইর ছেলে বলে বিশেষ করে আদর করতেন। তাঁর ধরণটা ছিল অন্য রকমের। সর্ব্বদা বসে ভাবতেন ; কারো কাছে ভয়ানক গম্ভীর, আবার কারো কাছে হয় ত বালকের মত সরলতা নিয়ে হাসি-তামাসা করতেন। কথা বলতে বলতে হয় ত তিনি কখনো হঠাৎ রবীবাবুর কবিতা আওড়াতে আরম্ভ করতেন ; অথবা খুব গম্ভীর হয়ে ডায়েরী লিখতে বসে যেতেন। সকলে যে কাজ করতে তাঁকে অনুরোধ করত, সে কাজ না করাটাতেই তিনি মজা পেতেন। এসব দেখে শুনে তাঁর নিজের ভাই-বোনরা পর্য্যন্ত তাঁকে পাগল বলত ;—বলত যে ওঁর মানসিক বিকার আছে। কিন্তু তাঁর ভিতরের মানুষটীর খোঁজ ওরা কেউ পায় নি। আমায় তিনি একটু বিশেষ করেই স্নেহ করতেন—খুব সম্ভব আমি সকলের উপেক্ষিতা বলেই। প্রথমে তিনি আমার বিয়ের বিপক্ষে অনেক যুক্তি-তর্ক করতে লাগলেন ; কিন্তু বিশেষ ফল হলো না। কোথায় কোন এক মিশনের সাধুর সঙ্গে আমার বিয়ে প্রায় ঠিক হয়ে উঠল। গোপালদা' মাকে কোন মতে বশ করে, ঐ বিয়ের প্রস্তাব ভেঙ্গে দিয়ে, আমাকে সহরে নিয়ে গিয়ে আবার বুড়ো বয়সে ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দিলেন। সেখানে আমি বোর্ডিংএ থাকতুম। বাবা

আমাকে মাসে মাত্র সাত টাকা করে পাঠাতেন; আর বাকী টাকা গোপালদা তাঁর পড়ার খরচের টাকা থেকে যোগাতেন।

এদিকে আমার চলে আসার কথা নিয়ে বেশ গোল বেধে গেল। আমার সম্বন্ধে নানারকম গল্প-গুজব বের হতে লাগল। মেয়েদের মহলে দিনগুলি বেশ কাটতে লাগল; কারণ একটা নূতন নিন্দার বিষয় জুটে গেল। এ নিয়ে আমার আত্মীয়-স্বজনরা পর্য্যন্ত বাবা-মাকে কত ঠাট্টা তামাসা করত,—এমন কি আমার সামনেই বাবা-মাকে গাল দিত। আমার জবাব ছিল একমাত্র চোখের জল।

এ সবকে আমি উপেক্ষা করেই চলতুম—আর গোপালদা'র কাছে শিখেছিলুমও তাই। তিনি বলতেন—"এদের তুই ক্ষমা করিস, এরা যে বড় ছোট;—নূতন সভ্যতার উদার আলো এখনো এরা পায় নি। অথচ ওরা সকলের হাততালি পেয়ে সারাটা জীবন সুখে ভাল-মানুষ বলে পরিচিত হয়ে কাটিয়ে দেবে। ওদের সঙ্গে যাদের মত মিলবে না, তাদেরই ওরা ছন্নছাড়া, লক্ষীছাড়া বলে গাল দেবে—এ ছন্নছাড়ার দলের যে সংসারে কত প্রয়োজন, তা ওরা বুঝেও বুঝবে না। কিন্তু ওদের সঙ্গে যেন তুই কোন দিন তর্ক করিস নে; কারণ, ওরা সংখ্যায় এত অধিক, এবং এত প্রবল যে, ওদের সঙ্গে পেরে উঠবি নে।" আমার ছুটীর সময় তিনি আমাকে সঙ্গে করে তাঁদের বাড়ী নিয়ে যেতেন, অথবা আমাদের বাড়ী এসে থাকতেন। ঐ সময়টা তিনি আমাকে নিজে পড়াতেন। কত আধুনিক বাঙলা ও ইংরাজী বই পড়ে আমাকে শুনাতেন ও বুঝিয়ে দিতেন। নূতন নূতন লেখকের নূতন মতগুলি আমাকে বিশেষ করে বুঝিয়ে দিতেন। মনে আছে, 'ইবসেনের' 'ডলস হাউসের' গল্পটা বলে আমাকে বলেছিলেন—"দেখ, ইচ্ছে নেই, অথচ যদি বাধ্য হয়েই স্বামীর সঙ্গে থাকতে হয়,—তাকে আর যাই বলতে পারি, অন্ততঃ বিয়ে বলতে পারি না। শুনে আমি চমকে উঠে-ছিলুম, আর দেবতার কাছে প্রণাম করে বলেছিলুম—হে ঠাকুর, আমায় কোন দিন এ অবস্থায় ফেলো না। তিনি যখন অনর্গল এ সকল কথা আমার কাছে বলে যেতেন, আমি সময় সময় একদৃষ্টিতে তাঁর পানে এমন ভাবে চেয়ে থাকতুম যে, আমার ভয় করত;—মনকে ধিক্কার দিয়ে বলতুম—"ওলো হতভাগী, এ কোন সর্ব্বনাশের পথে তুই পা দিচ্ছিস্—এ যে তোর আপন মামার ছেলে!" বিয়ের উপরে ছিল তাঁর একটা আন্তরিক ঘৃণা,—আর সমস্ত প্রাণ-মন দিয়ে যেন ঐটা আমার উপরে বদ্ধমূল করতে চেয়ে-ছিলেন। আমি জানতুম, আমার বিয়ে হবে না। মা বাবাও—অন্ততঃ মা, এক রকম তাই বুঝতে দিয়েছিলেন। এমন কি, আত্মীয়-স্বজন সকলের কাছেই এইটে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল যে, আমার আর বিয়ে হবে না। দাদা তাঁর আদর্শ দিয়ে আমাকে একেবারে ঢেকে ফেলেছিল। তখন 'আইডিয়ালিজম'এ আমার মন ভরপুর হয়ে উঠেছিল। ভাবতুম, সাধারণের মত দাসীবৃত্তি করতে আমি জন্মাই নি—আমি নিষ্কলঙ্ক, আমার আদর্শ সুন্দর, আমার উদ্দেশ্য মহৎ।

এমনি ভাবে হয় ত দিন কেটে যেত; কিন্তু পোড়া অদৃষ্ট যে আমাকে পাকে-পাকে ফেলে পিষে-পিষে মেরেচে। তখন আমার উনিশ বছর বয়স, ইংরাজী ইস্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি। এমন সময় এক বিপদ এসে জুটল। ঐ যে মিশনের সাধুর কথা বলেচি, সে কোথা থেকে কতকগুলি চিঠি নিয়ে এসে হাজির হল, এবং সকলের কাছে প্রমাণ করে বেড়াতে লাগল যে, ঐসব আমিই তাকে লিখেচি। এ সব কথা আজ তোমার কাছে লিখতে পর্য্যন্ত লজ্জায় আমার মাথা নীচু হয়ে যাচ্ছে। তখন ঘরে-বাইরে যে নিন্দার রোল পড়ে গিয়ে-ছিল, তা আমি রক্ত-মাংসের শরীর নিয়ে কি করে সহ্য করেছিলুম, বলতে পারি নে; কিন্তু তাতে পাষাণ পর্য্যন্ত মাটিতে সেঁধিয়ে যেত। অবশেষে বাবার কাছে লোক পাঠিয়ে সে আমার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব করল, এবং এমন ভাব দেখাল, যেন আমি এতে রাজি। বাবা স্পষ্ট নিষেধ করে দিলেন! সে দিনকার বাবা-মার অপমান দেখে আমি সমস্ত রাত্রি চোখের জলে ভিজে গিয়েছিলুম। তখন বাবা মা ঠিক করলেন যে আপদ বিদায় করতেই হবে—মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে। মা আমাকে নীতি শাস্ত্রের বাক্য তুলে নানা রকম উপদেশ দিতে লাগলেন। বিয়ে হলে যে এ সব নিন্দার কোন ভিত্তি থাকবে না তাও বল্লেন। গোপালদা'র সেবার এম-এ পরীক্ষা। আমি সব কথা লিখে তাঁর কাছে

চিঠি দিলুম। জবাবে তিনি লিখে পাঠালেন—যারা মিথ্যা নিন্দার ভয়ে নিজের মেয়েকে আপদ বলে বিদায় করতে চায়, তারা যে কত ক্ষুদ্র, তা আমি ভাবতেও পারি নে। তুমি যাদের বাবা বল, মা বল, ভাই বল, বন্ধু বল, তারা যে কত নীচ কত হীন, তা তুমি জানতেও পার নি। এ নীচতা থেকে যে আমি তোমাকে উদ্ধার করতে পারি, সে শক্তি বিধাতা আমায় দেন নি। যা হ'বে পরে সব কথা জানাইয়ো।

চিঠি প'ড়ে রাগে অপমানে আমার সমস্ত শরীর জলে উঠল। উদ্ধার করবার ক্ষমতা ত নেই-ই—আবার আমার মা বাবাকে গাল দিয়ে চিঠি দেওয়া—যাঁরা আমার জন্য এতদূর সহ্য করে এসেছেন। রাগের আরো একটা কারণ ছিল, ভেবেছিলুম তা আর লিখব না। শুনলুম, গোপালদা না কি কোথাকার কোন এক শিক্ষিতা, কলেজে-পড়া মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন! ঐ কথাটা যদিও তাঁর নিন্দুকদের—যে শুভাকাঙ্ক্ষীর দল চিরকাল তাঁর মানসিক, আর্থিক ও নৈতিক উন্নতির জন্যে চেষ্টার ত্রুটী করে নি—মুখে শুনেছিলুম, তবু সেদিন এ কথাটা বিশ্বাস করতে আমি এক মিনিটের জন্যও সঙ্কোচ বোধ করি নি। সমস্ত শরীর মন আমার বিষে জর্জ্জরিত হয়ে উঠল। সেদিন আমার অন্তর যে তাঁর বিরুদ্ধে কি বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল বলতে পারি নে। তাই সেদিন মা যখন আবার আমাকে উপদেশ দিতে এলেন, আমি বলে ফেল্লুম,—দাও মা আমায় বিদায় কোরে; কত লোক কত কষ্টে আছে, আর তোমরা কি যেমন তেমন করেও আমার একটা বিয়ে ঠিক করতে পারলে না? হায় রে, কি কুক্ষণে এ কথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল! বাবা ঐ কথাটা আমার সম্মতি বলে ধরে নিয়ে আবার বর খুঁজতে বেরিয়ে পড়লেন। এবারে বর জুটতেও বেশী দেরী হল না। কোথাকার কোন এক হরিসভার সাধুর সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। পরম সাত্ত্বিক তিনি, সমস্ত শরীর ফোঁটা তিলকে চিত্রিত—আর সন্ধ্যাবেলা হরিসংকীর্ত্তনে তার গলার স্বরটা থাকত সকলের উঁচুতে। শুনেছিলুম, কলেজে নাকি আই-এ পর্য্যন্ত পড়েও ছিল।

বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেল। বাবা ও বড়দা ধার করে বিয়ের জিনিস কিনতে সুরু করলেন, কারণ, আমায় যিনি দয়া করে গ্রহণ করবেন, তাঁকে উপযুক্ত দাম দিতে হবে ত। আত্মীয়-স্বজনরা এসে আমোদ আরম্ভ করে দিলে। আমার কিন্তু ভাই নীরবে কান্না ভিন্ন আর কোনো সম্বল ছিল না। কি অসহ্য বেদনা যে তখন আমার বুক চেপে ধরেছিল, তা শুধু অন্তর্যামীই জানেন। বিয়ের তিন দিন আগে গোপালদা এসে উপস্থিত। দেখে শরীর জলে উঠেছিল সত্য, কিন্তু মনে মনে একটা আশ্রয় পেলুম। প্রথম দিন তিনি বড় গম্ভীর ছিলেন; আপন মনে বসে বসে চিন্তা করতেন, কারো সঙ্গে একটা কথাও বল্লেন না। হঠাৎ আমাকে একবার কাঁদতে দেখে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু গম্ভীর হয়ে চলে গেলেন। আমার কান্না আরো বেড়ে গেল; হায় রে, আমার অন্তর্যামীও কি আমার অন্তরের বেদনা বুঝতে পারলেন না! তার পর দিন তিনি আমায় ডেকে আমার মাথায় হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন—তুই একবার আমার কাছে এ কথাটা বল যে—যে দুঃখ তুই নিজে সুখী হয়ে সহ্য করতে পারবি, তা অন্যে কেন পারবে না? তোর মুখ থেকে আমি একবার শুনতে চাই যে, এ কাজে তুই সুখী হবি। তাঁর সেই দুঃখকাতর মূর্ত্তি আমি কোন দিন ভুলতে পারব না। তাঁর কান্নার বেগ থামাতে গিয়ে তিনি কান্নাটাকে আরো স্পষ্ট করে তুল্লেন। আমিও কেঁদে ফেল্লুম। কিন্তু আমি তখন কি জবাব দিয়েছিলুম জান? আমার দেবতার কাছে আমি মিথ্যা বল্‌তে পারলুম না। বলেছিলুম,—এক মুটো ভাতের জন্যে একজনার সঙ্গে বাধ্য হয়ে চিরজীবন সহবাস করাতে কি সুখ আছে দাদা? আর আমার কোন মত কি তোমার অজানা আছে যে, আজ এ কথা জিজ্ঞেস কর্চ্ছ? রাগ করো না,—জানি এ কথা শুনে ঘৃণায় তোমরা আমার নামে থুথু ফেলবে। কারণ, ছোটকাল থেকে শিবপূজা করে তোমরা যে এর জন্যেই দেবতার কাছে কামনা করে এসেচ। বিয়ের নামে ধর্ম্মের মুখস পরিয়ে আর নীতিশাস্ত্রের উপদেশ দিয়ে এই বীভৎস ব্যাপারটাকে চিরকাল তোমাদের কাছে আদর্শ বলে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েচে; তাই মা বাপে জোর করে মেয়েকে গণিকা করে পাঠিয়ে দেওয়াটাও তোমাদের মত সতীদের কাছে অশোভন ঠেকে না। বিয়ের দিন ভোরে গোপালদার একখানা লম্বা চিঠি পেলুম,

সাঁওতালি নাচ

শিল্পী—শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র সিংহ

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

তার থেকে জানলুম যে, তিনি তাঁর এক বন্ধুকে নিয়ে আমার ভাবী স্বামীর কাছে গিয়েছিলেন, এবং তাকে আমার মত জানিয়ে এ বিয়ে থেকে নিবৃত্ত হতে অনেক অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু বিয়ের সুখস্বপ্ন তখন তাঁর মনে জেগেছিল, তাই পিতৃ মাতৃভক্ত বাঙালীর ছেলে তাতে রাজী হন নি। বাপ-মার দোহাই দিয়ে তিনি খুন করতে বেরিয়ে পড়লেন। চিঠির শেষে তিনি লিখেছেন,—"পুরুষ মানুষ যে এত বড় কাপুরুষ হতে পারে, তা আজ নিজের চক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতুম না। কি করে' যে একজন পুরুষ মেয়ের অমত জেনেও মুকুট মাথায় দিয়ে বিয়ের আসনে গিয়ে বসতে পারে—এ আমার আশ্চর্য্য ঠেকচে। আর আমার এত বড় দুর্ভাগ্য যে, তোমার জীবনের এই সময় তোমায় আমি অন্তরের সঙ্গে আশীর্ব্বাদ পর্য্যন্ত করতে পারচি নে। জানি না এর ফল কি দাঁড়ায়। তোমার সঙ্গে বোধ হয় আমার আর দেখা হবার আশা নেই।"

আমার বিয়ে হয়ে গেল, কিন্তু শুভক্ষণে কি অশুভক্ষণে বলতে পারি নে; কারণ, এখন থেকে আমার জীবনের যে অধ্যায় আরম্ভ হল, তাতে যে শুধু বাইরের গ্লানি ছিল তা নয়, আত্মগ্লানিতেও আমার শরীর মন জর্জ্জরিত হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের পরদিনই আমার স্বামী সকলের কাছে বলে বেড়াতে লাগল যে, গোপালদা আমাদের বিয়ে ভাঙতে গিয়েছিলেন। এ কথাটা নানারকম রং চড়িয়ে যখন সকলের কাণে পৌঁছাল, তখন বাড়ীশুদ্ধ লোক গোপালদার বিরুদ্ধে ক্ষেপে গেল এবং তাঁকে উপলক্ষ করে যে সব ঠাট্টা ও বিদ্রূপ চলতে লাগল তা অকথ্য। এমন কি আমাকে ও গোপালদাকে জড়িয়ে নানারকম বিশ্রী ইঙ্গিত করতে পর্য্যন্ত সেদিন এরা সঙ্কোচ বোধ করে নি। আমার মাসিমা—যাঁর দাঁতের বিষে আমার অবিবাহিত জীবন একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল,—তিনি সেদিন সকলের কাছে গোপালদার যে চরিত্র খারাপ, তা প্রমাণ করে বেড়াতে লাগলেন। হায়রে, হৃদয় বলে কি এদের কোন জিনিষ নেই! যাঁকে আমি চিরকাল দেবতার মত ভক্তি করে এসেচি, যিনি জীবনে কোন দিন এক মিনিটের জন্যও আমার অমঙ্গল কামনা করেন নি,—তাঁর নামে এসব কথা! কিন্তু মনে রেখো, এসব কথা সেদিন আমায় নীরবে সহ্য করতে হয়েছিল।

বিয়ের দু'দিন পরে গোপালদা কোথা থেকে ধূমকেতুর মত এসে উপস্থিত। তাঁর চেহারা ম্লান, চুল উস্কখুস্ক, গায়ে একখানা মোটা চাদর—কিন্তু দেখলে বোঝা যায় যে, বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের মত তিনি ভিতরে গুম্ গুম্ করচেন। এসেই তিনি সকলকে একত্র করে বলতে লাগলেন—আজ যখন এ কথাটা প্রকাশ হয়েই পড়েছে, তখন নিজের মুখে এর সত্য খবরটা সকলের কাছে আমি না বলে থাকতে পারব না, কারণ আমি জানি আমি অন্যায় করি নি। বাড়ীশুদ্ধ লোক অন্যায় করেচেন—একটা নির্দ্দোষ, নিরুপায় মেয়েকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটা অন্ধ অজানা পথে ছেড়ে দিতে আপনারা দ্বিধা বোধ করেন নি,—আর তার প্রতিবাদ করবার মত সাহস আমার ছিল বলেই অন্যায় হলো আমার? আর মজা এই—যে সকলের চাইতে বেশী দোষী, সেই কাপুরুষই এ কথাটা সকলের কাছে বড় গলা করে রটিয়ে বেড়াচ্ছে। আমার স্বামীকে তিনি কাপুরুষ, খুনী, খুনীর চাইতে নিকৃষ্ট এবং আরো কত কি বলতে লাগলেন। সেখানে এমন কেউ ছিল না যে, তাঁর কথার একটা প্রতিবাদ করে। আমার কিন্তু মাথায় তখন খুন চেপে গিয়েছিল। গোপালদার এসব গালি শুনে রাগে আমার শরীর জ্বলতে লাগল। আর বাইরের নিন্দা থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যও মনে মনে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছিলুম, কারণ, এরা যে আমার মধ্যে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মহৎ, সবই নষ্ট করতে বসেচে। এই দুর্নাম ও অবিশ্বাস নিয়ে আমি কি করে সারাজীবন বেঁচে থাকব। সুরাসুরের যুদ্ধ তখন আমার মনের মধ্যে চলছিল—তখনকার মত আমি একরকম পাগল হয়ে গিয়েছিলুম। তাই গোপালদা যখন এসব কথা খুব বড় গলা করেই বলছিলেন, আমি তখন সকলের সামনে গিয়ে বল্লুম যে, আমি কোনো দিন বিয়েতে অমত দিইনি। গোপালদা মাথা নীচু করে রইলেন; আর সকলে মুচ্‌কি হাসির সঙ্গে একটা অনুকম্পার দৃষ্টি ফেলে তাঁর দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু গোপালদাকে চিরকাল দেখেচি যে, যেখানে সত্য সেখানে তিনি ভেঙে পড়েচেন, তবু তাঁকে কেউ নোয়াতে পারে নি। তাই সকলে যখন তাঁকে দোষী করতে লাগল, তখন তিনি এই বলে চলে গেলেন—দোষী কি নির্দ্দোষ, তা প্রমাণ করবার মত দুর্ব্বুদ্ধি যেন আমার কোন দিন না হয়; কিন্তু

আপনারা এ কথাটা মনে রাখবেন যে, একজনকে বিশ্বেস করবার পর যদি সে আমায় ঠকায়, তবে অন্যায়টা আমার নয়।” তার পর যখন প্রকৃতিস্থ হলুম, তখন দেখলুম, সব হারিয়ে বসে আছি। কাঁদতে কাঁদতে চক্ষু ফুলিয়ে ফেল্লুম, তাঁর চরণে ক্ষমা চাইলুম—দেবতা আমার গুরু আমার, ভাই আমার, প্রাণের ঠাকুর আমার, তুমি আমায় ক্ষমা করো।

এখানেই আমার এ দুঃখের কাহিনী শেষ হয় নি। এখন থেকে যে বিপদ ঘনিয়ে এলো, তা তোমাদের কাছে এতই স্বাভাবিক যে, ঐ বিপদ না আসাটাকেই তোমরা দুঃখের বিষয় বলে ভাববে। কিন্তু ছোটকাল থেকেই আমার ধারণাটা ছিল অন্য রকম—তাই বিয়ের রাত্রে যখন প্রথম স্বামীর শয্যায় পড়ে রয়েছিলুম, তখন শত বৃশ্চিক দংশনে যেন আমার সমস্ত শরীর মন জলছিল। থেকে থেকেই আমার মনে হচ্ছিল—অন্যায়, অন্যায়, অন্যায়। এতদিনের আমার শিক্ষা দীক্ষা যেন সমস্ত সত্য হয়ে উঠে, সে রাত্রির অন্যায়টা আমার সামনে আঙুল দিয়ে দেখাতে লাগল। কিন্তু সে জঘন্য অন্যায় ও অপমানটার সঙ্গেও সেই সময় কোন মতে আপোষ করে নিয়েছিলুম। এরকম ভাবেও যদি শেষ দিনগুলি যেত, তাহলেও বুঝতুম, বিধাতা আমায় দয়া করেছেন। কিন্তু কয়েক দিন না যেতেই স্বামী আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলেন না। তখন যে সংগ্রাম অত্যাচার আরম্ভ হল, তা অকথ্য। কত রাত্রি আমি অনাহারে অনিদ্রায় বসে বসে কাটিয়েচি। এসব অত্যাচারে আমার শরীর তৃণের মত হয়ে গিয়েছিল। তবু আমি এ পর্য্যন্ত নিজেকে রক্ষা করে এসেছিলুম। কিন্তু কোন্ এক মোহের আবেষ্টনে পড়ে জানি না—এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে এক রাত্রিতে নিজেকে তার কাছে সমর্পণ করে দিলুম। সে ব্যাপারটাকে তোমরা সতীরা কি ভাবে নিতে বলতে পারিনে, কিন্তু যখন মোহ ভাঙল, তখন বুঝলুম আমার আত্মহত্যার আর বাকী নেই। তখন ইচ্ছা হল, নিজেকে একেবারে শেষ করে ফেলি, ইচ্ছা হল দৌড়ে গিয়ে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি। আমার শরীর তখন এতই অকর্ম্মণ্য ও দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল যে, নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারলুম না—আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলুম। তার পর থেকেই আমার ফিট্ হতে লাগল। একবার জ্ঞান হলে পর দেখলুম, বাপের বাড়ীতে বাবা মার কাছে বসে আছি—আর মাথার কাছে বসে গোপালদা। উতলা হয়ে “ক্ষমা করো, ক্ষমা করো” বলে তাঁর পায়ের উপরে পড়লুম।

ক্ষমা তিনি করেচেন কি না জানি না, তবে আজো তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আমার কলেজে পড়ার টাকা মাসে মাসে পাঠিয়ে দেন। ইতি—

অমলা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(৮)

প্রমথ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলে, অমলা পানের সরঞ্জাম লইয়া পাণ সাজিতে বসিয়াছিল; এবং সান্ধ্য হইলে, আজ আর প্রভাবতীর আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই, একটি রূপার ডিবায় কয়েক খিলি পাণ ভরিয়া, তাহার উপর সুগন্ধি গোলাপ জলের ছিটা দিয়া, প্রমথর নিকট উপস্থিত হইল।

প্রমথ তখন পুলক-প্রফুল্ল মুখে সুরেশের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল, এবং সুরেশ প্রমথর দেওয়া একরাশি লজেঞ্চুস্ মুখে পুরিয়া প্রমথর প্রতি করুণ-ক্লান্ত দৃষ্টিতে তাকাইয়া নিঃশব্দে চুষিয়া খাইতেছিল। তাহার সেই শিথিল-শান্ত চাহনির মধ্যে অপরিচয়ের বিমূঢ়তা, এবং স্ফীত-বিকৃত মুখের মধ্যে লোভের প্রমাণ, এই উভয় ব্যাপার প্রমথর চিত্তে যথেষ্ট কৌতুক সঞ্চার করিয়াছিল।

পিছন হইতে অমলা আসিয়া একমুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া

বলিল, "প্রমথ দাদা, পাণ নাও।" এবং প্রমথ ফিরিয়া চাহিতেই, সঙ্কোচ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সুরেশের দিকে তাকাইয়া বলিল, "ওঃ, তাঃ সুরেশের মুখে একেবারে কথা নেই!"

প্রমথ হাসিয়া বলিল, "সুরেশের মুখে কথার চেয়েও বেশী মিষ্টি জিনিস আছে।" তাহার পর অমলার হস্ত হইতে ডিবা লইয়া, দুই খিলি পাণ মুখে দিয়া, একবার চিবাইয়াই বলিয়া উঠিল, "কিন্তু তোমার পাণে যে তার চেয়েও বেশী মিষ্টি জিনিস রয়েছে অমলা!"

গভীর ঔৎসুক্যের সহিত অমলা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

প্রমথ সহাস্য মুখে বলিল, "এ যে লজেঞ্চুসের চেয়েও মিষ্টি লাগছে! তুমি সেজেছ না কি?"

একজন সতের বৎসর বয়স্কা, দূর-সম্পর্কীয়া যুবতীর প্রতি এ পরিহাস সঙ্গত এবং পরিমিত নহে; এবং সেদিন প্রাতঃকালেও এরূপ পরিহাস করিলে অমলা অন্ততঃ মনে মনেও বিরক্তি বোধ করিত। কিন্তু সন্ধ্যার সময়ে প্রমথ তাহাকে যে দারুণ দুর্ভাবনা ও মনঃকষ্ট হইতে উদ্ধার করিয়াছে, সেই উপকারের মূল্য স্বরূপ আজ সে প্রমথকে প্রসন্ন করিবার জন্য নিজের অগোচরে মনে মনে প্রস্তুত হইয়াছিল; এবং বহুমূল্য দ্রব্যের বিনিময়ে যেমন বহুল পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিতে হয়, ঠিক সেই রূপে, আজিকার এই প্রভূত উপকারের অনুপাতেই নিজেকে রিক্ত অথবা খর্ব্ব করিতে সে ন্যায়তঃ বাধ্য, এমনই একটা পরিশোধ-কল্পনা স্বতঃই তাহার মনের মধ্যে বিরাজ করিতেছিল। তাই সে প্রমথর এই পরিহাস পরিপাক করিয়া কহিল, "লজেঞ্চুসের চেয়ে পাণ যদি আপনার মিষ্টি লাগে, তাহলে আপনার লজেঞ্চুস্ মিষ্টি নয়; নোন্‌তা।"

প্রমথ সহাস্যমুখে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, না, আমার লজেঞ্চুস্ খুব মিষ্টি। কিন্তু নিশ্চয়ই তুমি পাণে চুণের বদলে চিনি দিয়েছ!"

এ কথায় অমলা হাসিয়া ফেলিয়া উত্তর দিল, "তা হলে নিশ্চয়ই খয়েরের বদলে ক্ষীরও দিয়েছি!"

বিস্ময়ের ভঙ্গীতে প্রমথ বলিল, "তা নইলে এত মিষ্টি লাগছে কেন? যে সেজেছে, তার হাতের গুণে? না, যে খাচ্ছে, তার মুখের গুণে?

এবার অমলার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না, এবং তাহার মুখের রেখা পাঠ করিয়া বিচক্ষণ প্রমথ তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিল যে, প্রথম দিবসের পক্ষে ঔষধের মাত্রা একটু অতিরিক্ত হইয়াছে, তাই প্রতিষেধ ক্রিয়ার জন্য তখনি কথাটাকে ভিন্ন মূর্ত্তি দিয়া বলল, "আমার বাসার জগন্নাথের সাজা পাণ কি চমৎকার, তা' ত জান না, তা হলে বুঝতে পারতে! কোন দিন লাগে ঝাল, কোন দিন পোড়ে গাল! এক দিন তোমার জন্য দুখিলি পকেটে করে নিয়ে আসব; খেয়ে দেখলে বুঝতে পারবে, তোমার পাণ মিষ্টি লাগছে বলে অন্যায় করেছি কি না!"

প্রমথর এই সামান্য একটু দুঃখের কাহিনী অমলার নারী-হৃদয়ে গিয়া আঘাত করিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "বাসায় জগন্নাথ ছাড়া আর কেউ নেই কি, যে একটু ভাল করে পাণ সেজে দেয়?"

কোন স্থান গলিয়া কোমল হইয়াছে; এবং সাবধানে আঘাত দিতে পারিলে, ইচ্ছানুরূপ গঠিত করিয়া লওয়া যাইবে, তাহা বুঝিতে পারিয়া প্রমথ মৃদু হাস্যের সহিত কহিল, "আছে; রায়ভদ্দর ঠাকুর আছে। কিন্তু পাণের দুঃখটাও আমি তারি হাতে পেতে চাই নে। শুনেই যে নিত্য পুঁড়িয়ে মারছে, চুণেও সে-ই পুড়োবে, তা আমার ইচ্ছা নয়।"

অমলা জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল রাঁধে না বুঝি?"

প্রমথ পুনরায় মৃদুহাস্য করিয়া বলিল, "বল ত এক দিন তাকে এখানে নিয়ে এসে রাঁধিয়ে দেখাই। তা হলে বুঝতে পারো, কি রকম কদাহারেও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে!"

ব্যথিত স্বরে অমলা জিজ্ঞাসা করিল, "বাসায় আর কেউ নেই?"

"বাড়ীতেই বা আর কে আছে যে, বাসায় থাকবে? শুনেছি, আমার যেদিন ষষ্ঠীপুজো হবার কথা ছিল, সেদিন মার আগুশ্রাদ্ধ হয়েছিল! আর আমার বাবার ইতিহাস শুনবে? বছর পাঁচেক হোল নৌকো করে চুঁচড়োয় যাচ্ছিলেন আমার জন্যে পাত্রী আশীর্ব্বাদ করতে; পাত্রীর বাড়ী পৌঁছিবার আগেই নৌকাডুবি হয়ে মারা যান। এই ত, আমার আপনার লোক, বাসাতে আর বাড়ীতে! এখন বোধ হয় বুঝতে পারছ অমলা, কত দুঃখে তোমাদের

কাছে মাঝে মাঝে ছুটে আসি ? আর কেনই বা তোমার হাতের সাজা পাণ এত মিষ্টি লাগে ?"

অমলা কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই প্রভাবতী হস্তে জলখাবারের রেকাবি লইয়া প্রবেশ করিলেন, এবং টেবিলের উপর তাহা স্থাপন করিয়া অমলাকে বলিলেন, "অমল, প্রমথকে এক গ্লাস জল দাও ।"

প্রমথ জলখাবারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সবিস্ময়ে কহিল, "মাসীমা, এত জলখাবার এখন যদি খাই, তা হলে আর বাসায় ফিরে গিয়ে কিছুই খেতে পারব না ।"

প্রভাবতী কহিলেন, "না, একটুও বেশী নয় । বাড়ীর তৈরী খাবার সবটুকু খেয়ে ফেল ।"

অমলা জল আনিতে যাইতেছিল, প্রমথ ও প্রভাবতীর কথা শুনিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আজ প্রমথ দাদা রাত্রের খাবারও এখান থেকে খেয়ে যাবেন মা । ওঁর খাওয়ার যে রকম কষ্ট বলছিলেন, অন্ততঃ আজ রাত্রে রামভদ্দর ঠাকুরের রান্না ওঁর খাওয়া হবে না ।"

প্রমথ হাসিয়া বলিল, "তাতে আমার আরও অসুবিধেই হবে অমলা ! আজ মাসীমার হাতের রান্না খেলে, কাল সকালে আর রামভদ্দরের রান্না গলা দিয়ে গলবে না ।"

"তা হোক !" বলিয়া অমলা জল আনিতে প্রস্থান করিল ।

প্রভাবতী বলিলেন, "সেই কথাই ভাল । জল খাওয়ার পর উনি একবার তোমাকে ডাকছেন, কথাবার্ত্তা কইতে দেরী হয়ে যাবে । রাত্রে একেবারে খেয়েই যেয়ো ।"

অমলা জল আনিলে সামান্য আপত্তি করিয়া প্রমথ জলখাবার খাইতে বসিল । খাইতে আরম্ভ করিয়া কিন্তু তাহার আর আপত্তির কোন লক্ষণ দেখা গেল না । বিনা বাক্যব্যয়ে দুই তিনটা সন্দেশ গলাধঃকরণ করিয়া বলিল, "মাসীমা, তোমার এ ছেলেটি একটু বিশেষ রকম মিষ্টপ্রিয় ! কলকাতায় এমন ভাল সন্দেশের দোকান নেই, যেখানে তার যাওয়া-আসা নেই । কিন্তু ভীম নাগই বল, আর যদু ময়রাই বল, কারো সাধ্য নেই যে তোমার তৈরী সন্দেশের মত সন্দেশ করে । সন্দেশের বিষয়ে এ সার্টিফিকেট আমার কাছে তুমি পেতে পার ।"

এই প্রচুর ও পর্য্যাপ্ত প্রশংসাবাদে মনে মনে বিশেষ প্রসন্ন হইয়া প্রভাবতী ঈষৎ হাস্য করিলেন, কিছু বলিলেন না ।

নারী-প্রকৃতি বিষয়ে যাঁহারা অভিজ্ঞ তাঁহারা জানেন যে, যে সকল পুরুষ কিছু আহারপ্রিয়, তাহাদের প্রতি সহৃদয়া নারীগণের একটু বিশেষ স্নেহ ও পক্ষপাত প্রকাশ পায় । এ তথটুকু প্রমথ বিলক্ষণ অবগত ছিল যে, রন্ধন-প্রিয়া স্ত্রীলোকের হৃদয় জয় করিবার প্রকৃষ্ট উপায় হইতেছে আহার বিষয়ে ঈষৎ লোভাতুরতা প্রকাশ করা । তাই সে নিঃশব্দে একে একে সব সন্দেশগুলি পরম পরিতোষ সহকারে নিঃশেষ করিয়া স্মিতমুখে বলিল, "মাসীমা, লোভের মত পাপ নেই, তবুও আরো দুটো সন্দেশ না চেয়ে থাকতে পারছি নে । যদি থাকে—"

"ওমা, আছে বই কি ! তুমি একটু বোসো, আমি নিয়ে আসছি" বলিয়া প্রভাবতী দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন, এবং দুইটার পরিবর্ত্তে চারিটা সন্দেশ আনিয়া প্রমথর পাত্রে দিলেন ।

রুচি অনুসারে প্রমথ মাংস-প্রিয় ; সন্দেশ রসগোল্লার প্রতি বৈরীভাব না থাকিলেও, তদ্বিষয়ে তাহার বিশেষ আসক্তি ছিল না । কিন্তু তাহার দুরদৃষ্ট বশতঃ আজ সন্দেশ দিয়াই তাহার পরীক্ষা চলিতে লাগিল । গলা দিয়া সন্দেশ আর সহজে নামিতেছিল না ; কোন প্রকারে তিনটা শেষ করিয়া চতুর্থটা সুরেশের দিকে আগাইয়া দিয়া প্রমথ বলিল, "সুরেশ, একটা তুমি খাও ভাই । আমি এত লোভী যে, ভাল জিনিসে তোমাকে ভাগ না দিয়ে নিজেই সব খেয়ে ফেল্লাম !"

প্রভাবতী তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না, না, সুরেশকে দেবার দরকার নেই ; সুরেশ সন্দেশ খেয়েছে । তুমি ওটা খেয়ে ফেল ।"

অমলা হাসিয়া বলিল, "তা ছাড়া সুরেশের মুখে সন্দেশের জায়গাই নেই ; লজেঞ্চুসে ভরা ।"

অমলার কথায় প্রভাবতী টেবিলের উপরিস্থিত লজেঞ্চুসের শিশি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ওঃ, তাই সুরেশ এমন লক্ষ্মী ছেলের মত চুপ করে রয়েছে ! অত লজেঞ্চুস ওকে কেন দিয়েছ প্রমথ ? ও লজেঞ্চুসের রাক্ষস ! আজ বোতলটি শেষ করে তবে ঘুমোবে ।"

অমলা সস্মিতমুখে বলিল, "মুখের মধ্যে বোধ হয় একেবারে গোটা পঁচিশ পুরেছে !"

অমলার কথা শুনিয়া জিহ্বার এক বিচিত্র কৌশলের

ঘারা নিমেষের মধ্যে সন্দেশগুলা বাম গালের এক দিকে ঠেলিয়া ধরিয়া হাঁ করিয়া সুরেশ বলিল, "কই গোটা পঁচিশ ?"

সুরেশের ভঙ্গী দেখিয়া সকলে উচ্চ স্বরে হাস্য করিয়া উঠিল।

প্রমথ বলিল, "তা যদি না থাকে, তাহলে সন্দেশটা তুমি খেয়ে ফেল সুরেশ।"

প্রভাবতী ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "না, না, সুরেশকে দিতে হবে না; তুমি ওটা খেয়ে ফেল।"

সুরেশের পক্ষ হইতে সন্দেশ খাইবার বিষয়ে কোন আগ্রহ দেখা গেল না; অধিকন্তু, সাত-আটটা সন্দেশ গলাধঃকরণ করিয়া যেটুকু প্রসার লাভ করিয়াছে, পাছে একটা সন্দেশের জন্য তাহার কোন হ্রাস হয়, এই আশঙ্কায় প্রমথ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, বাকি সন্দেশটা কোন প্রকারে খাইয়া ফেলিয়া, জলের গ্লাসটা নিঃশেষ করিয়া, একেবারে দুই তিনটা পান মুখে পুরিয়া দিয়া বলিল, "ডিস্‌পেপটিক যদি না হোতাম, তাহলে মাসীমার সব সন্দেশগুলাই আজ শেষ করে দিতাম। বাস্তবিক এমন চমৎকার হয়েছে!"

(৯)

প্রভাবতী প্রস্থান করিলে, অমলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রমথ বলিল, "তুমিই এই হাঙ্গামাটি বাধালে!'

"কি হাঙ্গামা ?"

"এই এত খেয়ে আবার রাত্রে খেয়ে যাওয়া!"

অমলা মৃদু হাসিয়া বলিল, "তাতে আর কি হয়েছে ?"

প্রমথ কণ্ঠস্বর ঈষৎ গাঢ় করিয়া লইয়া কহিল, "তাতে হয় নি কিচ্ছুই, শুধু তোমার হৃদয়ের একটু পরিচয় পেয়েছি! আমার খাওয়া-পরার এই তুচ্ছ দুঃখের কথা শুনে তোমার মন গলে গেল অমলা, আর আমার সারা দুঃখের কাহিনী যদি তোমাকে শুনাই, তাহলে তুমি যে কি কর, তা আমি ভেবে পাচ্ছিনে!"

কথাটা এমন কিছুই গুরুতর নহে; কিন্তু হঠাৎ কণ্ঠের স্বর একটু পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়া, ঈষৎ ভারি গলায় বলিবার ভঙ্গীতে, এই সাদা কথাগুলার অর্থ এমন একটু রঙ্গীন এবং সঙ্গীন হইয়া উঠিল যে, ইহার উত্তরে কি বলিবে তাহা অমলা ভাবিয়াই পাইল না। অথচ কোন কথা না কহিয়া একেবারে নির্ব্বাক থাকা উত্তর দেওয়া অপেক্ষাও অশোভন হইবে মনে করিয়া, সে হঠাৎ সুরেশকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "সুরেশ, তোমার মাষ্টার মশায়ের অসুখ এখনও সারে নি ?"

কিন্তু কথাটা বলিয়াই অমলা বুঝিতে পারিল যে, এক ব্যক্তি যখন সহানুভূতি লাভের প্রত্যাশায় সকাতর কণ্ঠে একটি চিত্তদ্রাবক প্রশ্ন করিয়াছে, তখন সে প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া, অপর কোনও ব্যক্তিকে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক এবং অসংলগ্ন একটি প্রশ্ন করিবার মত ধরা পড়িয়া যাওয়া আর কিছু হইতে পারে না। তাই সুরেশের মাষ্টারের শারীরিক সংবাদ শুনিবার জন্য এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা না করিয়া, অমলা ঈষৎ আরক্তমুখে প্রমথকে বলিল, "রামভদ্দর আর জগন্নাথকে ছাড়িয়ে দিয়ে অন্য চাকর, বামুন রাখলেই ত হয়।"

অমলার কথা শুনিয়া প্রমথ একটু হাসিল। অমলার মনের যথার্থ অবস্থা উপলব্ধি করিতে তাহার কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। সে বুঝিল যে ঔষধ প্রয়োগের মাত্রা পুনরায় কিঞ্চিৎ অধিক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সে, তাহার অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির বলে, নিজের আক্রমণ করিবার শক্তির তুলনায় অমলার প্রতিরোধ করিবার শক্তিকে এমন মাপিয়া লইয়াছিল যে, নিশ্চিন্ত মনে মাত্রা আরও একটু বাড়াইয়াই দিল। সুদক্ষ অস্ত্রচিকিৎসক যেমন ক্ষত পরীক্ষা করিবার জন্য লৌহ-শলাকা দিয়া ক্ষত স্থান বিদ্ধ করিয়া দেখে, তেমনি প্রমথ, অমলার চিত্ত কি ভাবে পরিণতি লাভ করিতেছে তাহা দেখিবার জন্য, তাহাকে আরো একটু গভীর ভাবে বিদ্ধ করিল।

একটু হাসিয়া সে বলিল, "রামভদ্দর আর জগন্নাথের দুঃখই আমার একমাত্র দুঃখ নয় অমলমণি, যে, তাদের ছাড়ালেই আমার সব দুঃখ যাবে! কুমীরে যাকে ধরেছে—দুটো কচ্ছপ তার দেহ থেকে ছাড়িয়ে নিলেই বা কি, আর না নিলেই বা কি ? কুমীরের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করতে পার অমলা ?"

ত্রস্ত হইয়া অমলা শুষ্ক মুখে জিজ্ঞাসা করিল, "কুমীর কাকে বলছ প্রমথ দাদা ?"

অমলার প্রশ্নে ও সন্ত্রাসে হাসিয়া ফেলিয়া প্রমথ বলিল, "রামভদ্দর বা জগন্নাথের মত কোন লোককে বলছি নে।

কুমীর হচ্ছে আমার দুঃখ আর আমার অভাব, যা আমাকে ক্রমে ক্রমে একেবারে গ্রাস করে ফেলেছে।"

অমলার একবার ইচ্ছা হইল যে জিজ্ঞাসা করে, তাহার দুঃখই বা কি, আর অভাবই বা কিসের। কিন্তু উত্তরে প্রমথ পাছে গুরুতর কিছু বলিয়া বসে, এই আশঙ্কায় তদ্বিষয়ে কোন প্রশ্ন করিতে তাহার সাহস হইল না। কোন কথা না বলিয়া প্রমথর দেওয়া লজেঞ্চুসের শিশিটা হাতে লইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সে দেখিতে লাগিল।

প্রমথ কিন্তু গুরুতর কথা বলিবার জন্য অমলার প্রশ্নের অপেক্ষায় থাকিল না। অমলার মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া নিম্নকণ্ঠে সে বলিল, "এই যে সন্দেশটা এত মিষ্টি লাগল,—এ কি শুধু ছানা আর চিনি কৌশলে মেশাবার গুণেই লাগল?—না, আরও কিছু তার সঙ্গে ছিল? তোমার সাজা পাণে যে চিনি দেওয়া ছিল বলছিলাম, সে কি বাজারে কেনা চিনি অমলমণি? সে চিনি তোমার মুখের মিষ্টি কথা, মিষ্টি হাসির চিনি! তোমার চোখের মিষ্টি চাহনির চিনি!"

প্রমথর কথাবার্ত্তার এই দুঃসাহসিকতায় অমলারা প্রাণের ভিতর কাঁপিতে লাগিল। এ কি ধরণের কথা যে ইহার উত্তর-প্রত্যুত্তর চলে না! কথার মধ্যে চিনির ছড়াছড়ি, তবু মিষ্ট লাগে না! তাহার পর এই অমলমণি বলিয়া সম্বোধন! তাহার এই সতের বৎসরের জীবনের মধ্যে যে আদরের সম্বোধন তাহার কোন আত্মীয়ই করিল না, দুই দিনের পরিচয়ের এই অর্দ্ধ অপরিচিত ব্যক্তি কোন্ সাহসে, কোন্ অধিকারে তাহা করে? শুধু যে করে তাহাই নয়; এমন অবলীলাক্রমে করে যে তাহাতে কোন প্রকার বাধা দিতে যাওয়ার সুবিধাই পাওয়া যায় না! সহজ ভাবে কথা কহিতে কহিতে অকস্মাৎ সে কোনো এক মুহূর্ত্তে আপত্তিকর হইয়া উঠে; কিন্তু আপত্তি করিবার অবসর না দিয়াই পুনরায় সে সহজ ভাবে কথা কহিতে আরম্ভ করে! কখন সে প্রবৃত্ত হইবে, তাহা যেমন অনিরূপেয়, কখন সে নিবৃত্ত হইবে, তাহাও তেমনি অনিশ্চিত!

প্রমথর হস্ত হইতে, বিশেষতঃ প্রমথর জটিল ও কুটিল কথোপকথন হইতে, কি করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিবে, অমলা তাহাই মনে মনে চিন্তা করিতেছিল, এমন সময়ে প্রমথ নিজেই তাহাকে নিষ্কৃতি দিল। রূপক চিনির আলোচনা হইতে সে একেবারে বাস্তব চিনির আলোচনায় আসিয়া পড়িল। সুরেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে বলিল, "সুরেশের রুচি আমার রুচি থেকে কিছু বিভিন্ন হবারই সম্ভাবনা; সে হয় ত' হাসির চিনির চেয়ে শিশির চিনিই বেশী পছন্দ করবে। শিশিটা তাকে দাও।"

প্রমথর কথা শুনিয়া ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া আরক্ত মুখে অমলা তাহার হস্তস্থিত লজেঞ্চুসের শিশিটা সুরেশের সম্মুখে স্থাপিত করিল; তাহার পর এই প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তনে মনে মনে হৃষ্ট হইয়া স্মিতমুখে বলিল, "এরি মধ্যে অতগুলো লজেঞ্চুস শেষ হয়ে গেল সুরেশ?"

সুরেশ প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "অতগুলো কোথায়? কম ত!"

অমলা স্মিতমুখে বলিল, "কম যদি, তা হলে শিশি অত কমে গেল কেন?"

অমলার কথা শুনিয়া সুরেশ ব্যগ্র ভাবে একবার লজেঞ্চুসের শিশি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া, অমলার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি বুঝি লজেঞ্চুস বার করে নিয়েছ?"

সুরেশের কথা শুনিয়া প্রমথ উচ্ছ্বসিত হইয়া হাসিয়া উঠিল। লজ্জারক্তমুখী অমলার দিকে চাহিয়া সে বলিল, "তোমার ভয় নেই অমলা, তোমার স্বপক্ষে আমি সাক্ষী আছি। কিন্তু তোমার বয়স এখনও এমন হয় নি, যাতে তোমার ওপর সুরেশ এ অপবাদ দিতে না পারে।"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া অমলা সুরেশের দিকে চাহিয়া স্মিতমুখে ভৎর্সনার সুরে বলিল, "বেশ ছেলে যা হোক! নিজে বসে বসে শেষ করছেন, আর পরের নামে দোষ!"

প্রমথ অমলার কথা শুনিয়া সহাস্যমুখে বলিল, "এ তোমার অন্যায় অমলা! তুমি কি পর?"

অমলা হাসিয়া বলিল, "পর না হলেও অপর ত?"

এইরূপে তাহাদের কথোপকথন ক্রমশঃ সহজ সাধারণ প্রবাহে ফিরিয়া আসিল, এবং সেদিন আর নূতন করিয়া কোন গোলযোগ বাধিল না।

রাত্রে আহার করিয়া প্রমথ তাহার বাসায় ফিরিয়া গেল।

[ক্রমশঃ]

কঙ্গো সর্দ্দার ও তাঁর কয়েকজন স্ত্রী

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের মত কঙ্গো দেশ ভারতবর্ষের কোনও অঙ্গ নয়। এ দেশ দক্ষিণ আফ্রিকার

কঙ্গো বালা

(শরীর ক্ষত-বিক্ষত ক'রে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য দেহে চিত্র-বিচিত্র দাগ কেটেছে)

একটা অংশ—উপস্থিত বেলজিয়ম, পোর্ত্তুগাল, ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীর মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেছে। বেলজিয়মের ভূতপূর্ব্ব নৃপতি দ্বিতীয় লিওপোল্ড্ নিজের ব্যক্তিগত চেষ্টায় ও নিজ ব্যয়ে ১৮৭৬ সাল থেকে ১,৮৪ সালের মধ্যে তাঁদের ভাগের কঙ্গো প্রদেশে একটি ঔপনিবেশিক রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। তাঁর অদম্য উৎসাহে ও অধ্যবসায়ের ফলে পঁচিশ বৎসরের মধ্যেই কঙ্গো দেশ য়ুরোপের অন্যান্য শক্তির অধীনস্থ উপনিবেশ সমূহের মত একটী উন্নতিশীল আধুনিক উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল। ১৯০৮ সালে বেলজিয়ান গভর্মেণ্ট নৃপতি দ্বিতীয় লিওপোল্ডের হাত থেকে কঙ্গো রাজ্যের শাসন-ভার গ্রহণ করে সেখানে

রূপসী পল্লীবাসিনী

(ইনি শুধু সুন্দরী নন, অপূর্ব্ব নৃত্য-কৌশল-পটিয়সী। নাচের বেশে সজ্জিত হয়েছেন। হাতে ঝুমঝুমী, কোমরে ঘণ্টী; মুখের এক দিকে সাদা এক দিকে লাল রং মেখেছেন।)

রাজতন্ত্রের পরিবর্ত্তে স্বাধীন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

নৃপতি দ্বিতীয় লিওপোল্ডের সুশাসনে কঙ্গো দেশের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। তিনি পঁচিশ বৎসরের মধ্যেই সেখান থেকে দাস-ব্যবসা তুলে দিয়েছিলেন, আরব অত্যাচারীদের দূরীভূত করেছিলেন। গুপ্ত অস্ত্রশস্ত্রের আমদানী এবং মদ প্রভৃতি আবগারীর চালান সেখানে একেবারে বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। তিনি সে দেশে যাতায়াতের পথ সুগম করেছিলেন, এবং সেখানে সর্ব্বপ্রথম রেল লাইন বিস্তার করেছিলেন। বড় বড় নদীতে জাহাজ ষ্টীমার প্রভৃতি চলাচলের ব্যবস্থা এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা হবে বলে

হাতির দাঁতের শিল্পী

সেকেলে যন্ত্রে সেকেলে শিল্প

গজদন্তের উপর পালিশ

সমুদ্রতীরে বন্দর নির্ম্মাণ করে দিয়েছিলেন। সেখানকার জমীতে তিনি কফি ও কোকো প্রভৃতির চাষ প্রবর্ত্তন করেছিলেন। তাঁর এই সব কাজের ফলে কঙ্গো আজ একটা সমৃদ্ধিশালী দেশ হ'য়ে উঠেছে। বেলজিয়ান গভর্মেণ্ট তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে আরও নানা দিক দিয়ে নানা ভাবে এই উপনিবেশের উন্নতিসাধনকল্পে মনোনিবেশ করেছে। এমন সুশৃঙ্খলার সঙ্গে এখানকার রাজকার্য্য পরিচালিত হ'চ্ছে যে, বিগত জার্ম্মাণ যুদ্ধে বেলজিয়ম যখন শত্রু-করতলগত হ'য়ে পড়েছিল এবং সে দেশের রাজপুরুষদের পলায়ন ক'রে এসে ফ্রান্সের আতিথ্য গ্রহণ ক'রতে হ'য়েছিল, তখন কঙ্গোর এই ঔপনিবেশিক রাজ্যে কিন্তু এক দিনের জন্যও কোনও গোলযোগ উপস্থিত হয়নি, বরং তাদের এখানকার ঔপনিবেশিক সৈন্যবাহিনী পূর্ব্ব আফ্রিকা থেকে জার্ম্মাণীর আধিপত্য কেড়ে নিতে মিত্র শক্তিপুঞ্জকে আশাতীত সাহায্য করেছিল।

যুদ্ধাবসানে শান্তি স্থাপনের পর, বেলজিয়ম তা'দের এই কঙ্গো দেশটাকে আফ্রিকার একটা আদর্শ প্রদেশে পরিণত করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। বেলজিয়ম আজ যে কাজের ভার স্বেচ্ছায় নিজের হাতে তুলে নিয়েছে, সে বড় অল্প ও সহজসাধ্য নয়।

প্রায় দশ লক্ষ বর্গ মাইল পরিমিত প্রদেশকে নানা দিক দিয়ে পরিপুষ্ট ক'রে তুলতে হ'বে! এ দেশের অসভ্য বর্ব্বর আদিম অধিবাসীদের মানুষ করে তুলে সভ্যতার আলোকে পছন্দ করে না। সুতরাং কঙ্গোর লোকসংখ্যা অনুমানের উপর নির্ভর ক'রে ঊর্দ্ধ সংখ্যা তিন কোটী আন্দাজ ধরা হয়।

স্ত্রী-পুরুষের অঙ্গ-শোভা

(শরীর ও মুখ ক্ষত-বিক্ষত ক'রে এরা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য নানা বিচিত্র উল্কী ধারণ করে।)

এই তিন কোটী বা দু'কোটী লোক আবার এক জাতীয় বা এক শ্রেণীর নয়। এদের মধ্যে নানা বিভিন্ন শাখা আছে। সামাজিক ব্যাপার ছাড়া, আচারে ব্যবহারে বুদ্ধি বিবেচনায় তাদের পরস্পরের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। একদল হয়ত য়ুরোপীয় সভ্যতা ও শিক্ষা গ্রহণের অনেকটা উপযুক্ত হ'য়ে উঠেছে; আর একদল হয় ত একেবারে বন্য বর্ব্বরতার চরম অবস্থায় বিরাজ ক'রছে। তবে দু'দলই কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের বিশেষ সন্দেহের চক্ষে দেখে। তারা তাদের জাতের ভূতের ওঝাদের ভারি খাতির ক'রে। সেই ভূতের ওঝারা শ্বেতাঙ্গদের প্রতি মোটেই সদয় নয়। কাজে কাজেই তাদের সন্দেহ একেবারে দূর ক'রতে শ্বেতাঙ্গদের এখনও দীর্ঘকাল অপেক্ষা ক'রে থাকতে হবে।

কঙ্গোর আদিম অধিবাসীদের অনেকেরই উৎপত্তি বান্তু-কাফ্রি বংশ থেকেই হ'য়েছে ব'লে নৃতত্ত্ববিদেরা নির্দ্ধারিত ক'রেছেন; এবং অল্পসংখ্যক নাউবা-কাফ্রীবংশসম্ভূত জাতও না কি একধারে আছে। সে

পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বেলজিয়ম তার কঙ্গো রাজ্যের জমীর মাপজোক ঠিক ক'রে নিয়েছে বটে, কিন্তু সে দেশের লোক-সংখ্যা এখনও ঠিক ক'রে উঠতে পারেনি, কারণ আদিম কঙ্গোবাসীরা মানুষ গণনা করাটা একেবারেই দেশে এখনও অত্যন্ত খর্ব্বাকৃতি যে একদল বামন জাতির অস্তিত্ব আছে, তারাই না কি আফ্রিকার প্রাচীনতম, আদিম অধিবাসী বলে স্থির হ'য়েছে। কঙ্গোর যে কয়টি প্রধান জাতির বাস, তাদের নাম যথাক্রমে 'বাঙগালা, বাটেক,

জান্দে যোদ্ধৃবৃন্দ

য়াঙ্গী, বাম্‌বালা, বালুবা, বাটাটেলা, বাকুবা, বাকুতু, বাকোঙ গো, বাকুয়েন্দা, বাসুন্দী, বাক্তোক্ ও বোলোকী। এই কয়টি জাতের কোনটিই কিন্তু উত্তর-কঙ্গো বা পূর্ব্ব-কঙ্গোতে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। কঙ্গোর পূর্ব্বাঞ্চলে যেসব জাত দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে জান্দে, মোঙ্গো, মাঙ্‌বেটু—এই তিন দলই প্রধান। এ ছাড়া আর যারা আছে, তারা যে অঞ্চলে বাস ক'রে, সেই স্থানের নামে, কিম্বা যে সর্দ্দারের তারা দলভুক্ত, সেই সর্দ্দারের নামে পরিচিত হয়। বামনদের মধ্যে কাশাই প্রদেশস্থ বাতোয়া, বেলী অঞ্চলের টীকৃটীকে, এবং উত্তর ইতুরী প্রদেশের ওয়াধুতীরাই প্রধান। রুয়ান্দা প্রদেশের রাক্ষসরাজ মুশীঙ্‌গার প্রজাদেরও অনেকে পূর্ব্ব-কঙ্গোর বাসিন্দা। রুয়ান্দাবাসীরা সকলেই রাক্ষসরাজ মুশীঙ্‌গার ক্রীতদাস।

সুন্দরীর মুখ-শোভা
(দীর্ঘকাল ধ'রে ক্রমাগত অস্ত্রোপচারের পর প্রলেপচার করে তবে এরা মুখের নানাস্থানে অতিরিক্ত মাংসপিণ্ডগুলির সৃষ্টি ক'রেছে। বর্ব্বর বুদ্ধির কি বীভৎস ধারণা!)

কঙ্গো নদীর বাম তীরবর্ত্তী প্রদেশের অধিবাসী বাকোঙ্‌গো, বাসুন্দী ও বাকুয়েন্দারা প্রাচীন কঙ্গোরাজের প্রজা ছিল, উপস্থিত তারা বেলজিয়ম ও পোর্ত্তুগালের অধীন হ'য়েছে। মুশারোঙ্গো বলে আর একটা সম্প্রদায়, যারা কঙ্গো নদীর দক্ষিণ কূলে বাস করে, তারা এখন ফরাসীদের অধীন। মুশারোঙ্গোরা বহুকাল ধ'রে শ্বেতাঙ্গদের সংস্পর্শে থাকায়, তাদের আদিম বর্ব্বরতা অনেকটা ঘুচে গেছে। এবং শ্বেতাঙ্গদের প্রতি তাদের অপ্রীতির ভাবটাও অনেকটা কমে এসেছে। এদের সমাজে মেয়েদের স্থান খুব বড়। তারা, ক্ষেতের কাজকর্ম্ম যা'কিছু সবই করে, আবার দলের পঞ্চায়েতে যোগ দিয়ে সম্প্রদায়ের ভালমন্দ সম্বন্ধেও আলোচনা করে, আবার জগতের সব জাতের নারীদের মতই পরনিন্দা, পরচর্চ্চা

হিন্দু ধর্ম্মানুসারে গঙ্গাতীরে তাহার শেষকৃত্য করিবার সুযোগ দেওয়া হয় নাই, এজন্য হিন্দু সাধারণ দুঃখিত।

শ্রীমান নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ভাগ্যবান পুরুষ। কয়েক দিন হইল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মেদিনীপুর শাখার বার্ষিক অধিবেশনে বাঙ্গলার সম্মিলিত সাহিত্যিকগণ শ্রীমান নলিনীরঞ্জনকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন। এই সম [illegible] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রমুখ সাহিত্যিক-প্রধানগণ মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদকে অনুরোধ করিয়াছিলেন; আমরা শ্রীমানের এই সম্মান লাভে আনন্দিত হইয়াছি। আশা করি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতেও তিনি যথা সময়ে সম্বর্দ্ধিত হইয়া বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণের মুখোজ্জ্বল করিবেন।

ভুল

শ্রীসুখেন্দুবিকাশ দাস

(১)

"ওগো ?" "কি ?" "ওঠ! রাত অনেক হ'য়েছে।—ওহো, বল্‌তে ভুলে গেছি; তুমি অমলার পত্রের উত্তর দাও নি ব'লে, সে আজ আমাকে দুঃখ ক'রে লিখেছে। একেই ত' তুমি তা'র বিয়েতে যাও নি ব'লে, সেই দিন থে'কেই সে তোমার উপর চটে আছে।"

জিজ্ঞাসার সুরে বিনয় বলিল, "অমলা?—ওহো, তোমার খুড়তুতো বোন্, অমলা? সত্যই ভারি অন্যায় হ'য়ে গেছে; কালই তা'র পত্রের উত্তর দিব। বিয়েতে কেন যাওয়া হ'য় নি, শুনবে। যে দিন অমলার বিয়ে, সেই দিনই তোমার বাবার নিকট হ'তে নিমন্ত্রণ পত্র পাই; কিন্তু বিয়ের লাল খাম দেখে, পত্রটা সারা রাত্রি খুলতে সাহস হয় নি, কি জানি যদি তোমারই বিয়ের—। তার পর, সকালে খুলে দেখলাম, অমলার বিয়ে।"

কৌতুকের সুরে অচলা বলিল, "তার পর ?"

"তার পর, ভগবানকে শতকোটি প্রণাম ক'রে, সেই দিনই সমস্ত লজ্জা ও সঙ্কোচ ঠেলে ফেলে, তোমার বাবার কাছে গি'য়ে তোমাকে দাবী করলাম।"

এই সময় 'টুং' করিয়া ঘড়িতে একটা বাজিল।

"এই! একটা বেজে গে'ল, শোবে চল," ব'লয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, পাশের চেয়ারে উপবিষ্ট বিনয়ের হাত ধরিয়া অচলা একটা টান দি'ল।

বাহিরে বিশ্ব-প্রকৃতি তখন জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গিয়াছে। হঠাৎ এক টুক্‌রা মেঘ আসিয়া চাঁদটাকে ঢাকিয়া ফেলিল। সুনীল আকাশ, বাহ্য প্রকৃতি পাণ্ডুর হইয়া উঠিল। মেঘের টুক্‌রাটি আবার সরিয়া গে'ল; জ্যোৎস্নার স্বপ্নভরা আলোয় রহস্যময়ী প্রকৃতি আবার হাসিয়া উঠিল। বিশ্ব-প্রকৃতির এই আলো-আঁধারের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ দেখিতে দেখিতে বিনয় বলিয়া উঠিল, "কি সুন্দর!"

অচলা উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিল, "Fine!"

দুজনে আবার আকাশের পানে চাহিল। কিছুক্ষণ পরে অচলা বলিয়া উঠিল, "দেখ, জীবনটা কি অদ্ভুত! মাঝে মাঝে যখন ভাবি, তখন বড় মজার লাগে! প্রকৃতিও তেমনি! ওই মেঘের টুক্‌রোটি কোথায় কত দূরে ছিল, ভাস্‌তে ভাস্‌তে এসে, কিছুক্ষণের জন্য চাঁদকে ঢেকে, এখানটাকে অন্ধকার ক'রে দিয়ে আবার কোথায় স'রে গে'ল।—" "বাস্তবিক! এই দেখ না, আমাদের বিয়ে হ'য়েছে মোটে দুবছর, আর, তা'র ছ'মাস আগে আলাপ হয়। এই আড়াই বৎসর পূর্ব্বে তুমিই বা কোথায় ছিলে, আমিই বা কোথায় ছিলাম! কেউ কাউকে জানতাম না—কিসে যেন টেনে নিয়ে সেই গঙ্গার ধারে দেখা করিয়ে দিলে। শুভক্ষণেই না চারিচক্ষুর মিলন হ'য়েছিল।

জীবনটা অদ্ভুত ঠেকে!—নাঃ, সত্যই অনেক রাত্রি হ'য়েছে, শো'বে চল।"

বিনয় ও অচলা বিবাহের পর এই দুই বৎসর এম্‌নি করিয়া বিভোর প্রাণে গল্প করিতে করিতে কত বিনিদ্র রজনী কাটাইয়া দিয়াছে।

(২)

বিনয় সকালে চা খাইয়া, বাড়ীর বাহিরে আসিয়া, পাশের বাড়ীর দরজায় দণ্ডায়মান একটা চাকরকে জিজ্ঞাসা করিল, "সুরেশ বাবু উঠেছেন?" "হাঁ বাবু, তিনি বাহিরে বসবার ঘরেই রয়েছেন।" বিনয় ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল, সুরেশ এবং তাহার ছোট বোন ইন্দু বসিয়া গল্প করিতেছে। সুরেশ বিনয়ের প্রায় সমবয়সী। সুরেশের বাবা প্রথমে কলিকাতাতেই বাস করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু কার্য্যোপলক্ষে মধ্যে তাঁহাকে বৎসর কয়েক অন্যত্র যাইতে হইয়াছিল। তখন তিনি সুরেশ ও ইন্দুকে বোর্ডিংএ ভর্ত্তি করিয়া দিয়া যান। প্রায় মাসখানেক হইল, তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন; এবং বিনয়দের এই পাশের বাড়ীটা কিনিয়া লইয়া বাস করিতেছেন। মেয়েকে ও ছেলেকে বোর্ডিং হইতে বাড়ী আনিয়াছেন। সুরেশ এই বছর এম্-এ দিয়াছে; ইন্দু বেথুনে একটা উঁচু ক্লাসে পড়ে। ভাই বোন দুজনেই এখনও অবিবাহিত। বিনয় সুরেশের দিকে চাহিয়া বলিল, "আজ যে খুব সকাল সকাল উঠেছেন, দেখ্‌ছি?" ইন্দু বলিল, "হায়! হায়! আপনি বুঝি ভাব্‌ছেন দাদা নিজে উঠেছেন? এই সকালে দাদাকে বিছানা হ'তে তুল্‌তে যে কত বেগই পে'তে হ'য়! বল্‌লে বিশ্বাস কর্‌বেন না, বিনয়বাবু, দশটিবার ধ'রে বসিয়ে [illegible]ই, দশটি বারই শু'য়ে প'ড়েন!—উনি আবার থিয়েটার [illegible]ব!"

[illegible] জিজ্ঞাসা করিল, "থিয়েটার করবেন? কি [illegible]

[illegible] বলিল, "হুঁ। কাল দাদার মাথায় এক ভূত [illegible] গেছে। বল্‌ছিলেন, আমরা এত বন্ধু বান্ধব রয়েছি, এ্যামেচার—" "সত্য না কি, সুরেশবাবু? বেশ একটা এ্যামেচার পার্টি তৈ'র করা যাক্। মাঝে [illegible] দুটো ভাল 'প্লে'—"

এই লইয়া আলোচনা করিতে করিতে বেলা বাড়িয়া চলিল। অচলার প্রেরিত চাকরটা বিনয়কে ডাকিয়া যাইবার পর আলোচনা বন্ধ হইল।

বিনয় ঘরে আসিতে, অচলা বলিল, "খুব যে গল্প হ'চ্ছিল। ক'টা বেজেছে, ঠিক্ আছে?"

খাইবার সময় কথায় কথায় বিনয় বলিল, "সুরেশবাবুরা বেশ লোক।"

"বাস্তবিক্! এই একটা মাস এসেছে, এরই মধ্যে ইন্দু আমাকে যেন কত আপনার ক'রে নিয়েছে। আচ্ছা, ইন্দুকে তোমার কেমন লাগে?"

"বেশ! খাসা! যেম্‌নি free, তেমন forward। কি সুন্দর গান গায়! বাহিরের অনেক study ও—"

"ওঃ! প্রশংসা যে আর ধরে না! কিছুই যে খাওয়া হ'ল না?"

"একেবারে ক্ষিধে নাই, অচলা। সকালে সুরেশবাবুর ওখানে আর একবার হয়েছিল। ইন্দু পুডিং আর চা তৈরি করেছিল, না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়লে না।"

(৩)

"জামাইবাবু এখনও এলেন না, রাত্রি দশটা বাজে।" বলিয়া একটি মেয়ে অচলার সোফার পাশে গিয়া বসিল। এই মেয়েটি অচলার এক দূর সম্পর্কের বোন, বৌবাজা[র] হইতে তাহাদের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে।

"মাথাটা কি এখনও ধরে আছে, দিদি?"

অচলা বলিল, "না।" সে ভাবিতেছিল, বিনয়ের কথা আজকাল যেন তাহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইতেছে রাত্রি আটটার পর যে কোন দিন বাহিরে থাকিত [না] সেই বিনয় আজকাল রাত্রি দশটা, এগারটার কম [যে] দিন সুরেশের বাড়ী হইতে গল্প করিয়া ফিরে না। [আজ] অচলার বোন তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়া এবং অচলার মাথা ধরা, শরীর খারাপ শুনিয়া [illegible] এখনও ইন্দু ও সুরেশের সঙ্গে গল্প হইতেছে! [illegible] অভিমানে অচলার বুকটা পূর্ণ হইয়া গেল। [illegible] সুরেশের সঙ্গে এই একটা মাসেই এতটা? তা'দের এত কিসেরই বা কথা? আজকাল আমার কাছে বস[তে] ভাল লাগে না দেখ্‌ছি! প্রতি দিনই সুরেশদের [illegible] তবে কি ইন্দুর—! না, না, ছিঃ, কি নীচ আমার! [illegible]

এবং পাড়ার কোনও বাড়ীর নূতন কোনও কেলেঙ্কারী নিয়ে জটলা পাকিয়ে ফিশ্‌ফিশ্‌ গুজ্‌গুজও ক'রে। তারা মাঠের কাজে যাবার সময় ছেলেদের পিঠে বেঁধে নিয়ে যায়, সাপে কামড়াবার ভয়ে আর ছেলেধরার আশঙ্কায় ঘরে রেখে মেয়েদের ক্ষেতের কাজকর্ম্ম সেরে এসে আবার রান্নাবান্নার কাজও ক'র্‌তে হয়; কারণ, পুরুষেরা এই রাঁধাবাড়া কাজটাকে তাদের পক্ষে অসম্মানজনক ব'লে মনে করে।

ব'তেকা, বায়াঞ্জী ও বাঙ্‌গালারা পাশাপাশি বাস করে। কঙ্গো উপনিবেশের মধ্যে এই তিনটে জাতই সবচেয়ে খাসা! বায়াঞ্জীরা প্রাচীনকাল থেকে নরখাদক ছিল বলে, এখনও যারা তাদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়, তাদের বন্দী করে ধরে এনে খেয়ে ফেলে! বাঙ্‌গালাদের লোকসংখ্যা সব জাতের চেয়ে বেশী। সমগ্র কঙ্গো প্রদেশের মধ্যে এরা সর্ব্বাপেক্ষা সুচতুর ও বুদ্ধিমান জাত। য়ুরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতা এরা খুব শীঘ্র আয়ত্ত ক'রে নিতে পারে। এদের মধ্যে অনেকে ফরাসী ভাষাও বেশ শিখতে পেরেছে। ঔপনিবেশিক সৈন্যদলের এরাই প্রধান অবলম্বন। এরা 'ড্রিল' শিখ্‌তে ভারি ভালবাসে। দলে দলে এসে সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হয় এবং খুব মনোযোগের সঙ্গে কুচ্‌কাওয়াজে যোগ দেয়। এরাও পুরাকালে নরখাদক ছিল, এখন কিন্তু সে লোভটা এদের-মধ্যে আর একেবারেই নেই।

বোলোকীরা বাঙ্‌গালাদেরই একটা শাখা বিশেষ।

কেশবিন্যাস

ওষ্ঠালঙ্কার

মাঙবেতু দম্পতী যুগল

যেতে সাহস করে না। বাকোঙ্‌গোরা কোনও কালে কখনও নরখাদক ছিল না বলে, তাদের নরমাংসাশী প্রতিবেশীদের ভয়ে সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হয়।

এরা সব একেবারে জন্ম-যোদ্ধা! লড়াই পেলে আর কিছু চায় না! যুদ্ধের নামে একেবারে মেতে ওঠে! এদের ছোরা আর বর্শা হ'চ্ছে প্রধান অস্ত্র। এরা অতি ভীষণ

প্রতিহিংসাপরায়ণ। আর একটা এদের পৈশাচিক দোষ ছিল, ক্রীতদাসদের মৃতদেহ ভোজন করা! অনেক সময় এদের নরমাংসলোলুপ রসনার পরিতৃপ্তির জন্য অনেক ক্রীতদাসকে অকালে প্রাণ দিতে হোতো। আজকাল এদের ব্যবসায়ীদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য ক্রমাগত তাদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে এসেছে। এই তিন দলের মধ্যে মাঙ্‌বেতুরা সবচেয়ে সুসভ্য হয়ে উঠেছে। এদের সামাজিক বিধি ব্যবস্থাও বেশ সুনিয়ন্ত্রিত। প্রথমটা বেলজিয়মকেও এরা

ফাঁসীর কাণ্ড
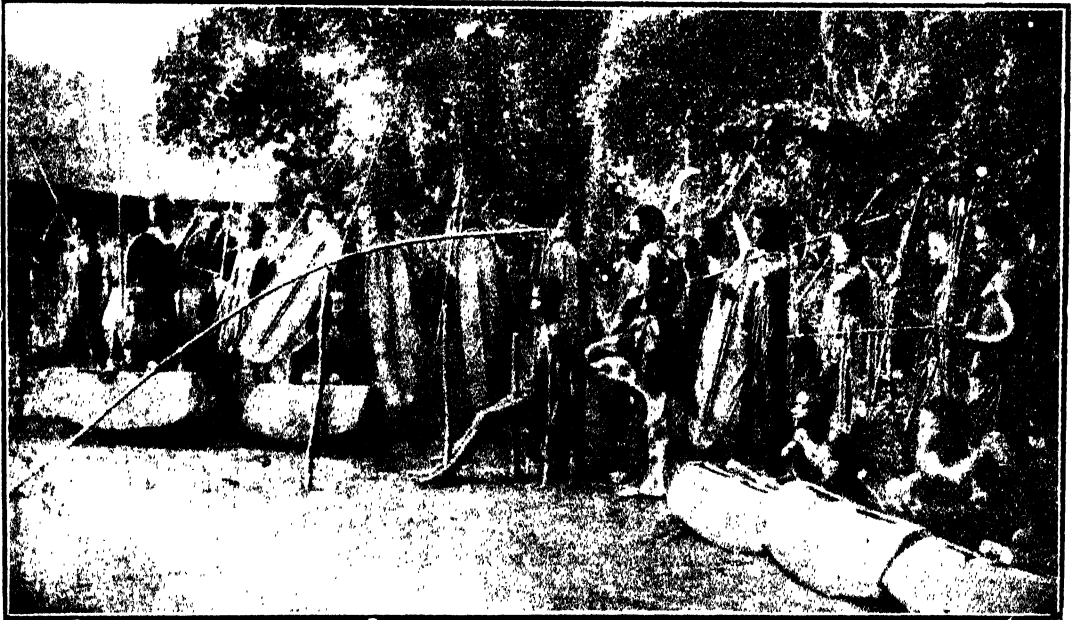
(অপরাধীর ফাঁসী হবার পূর্ব্বে ভূতের ওঝা এসে তার আত্মাকে মন্ত্রের দ্বারা বিনষ্ট ক'রে, যাতে না সে প'রে প্রেত হয়ে এসে পল্লীতে উৎপাত করতে পারে। ফাঁসীর সময় ঘাতক অস্ত্রাঘাতে দণ্ডিত ব্যক্তির মুণ্ডচ্ছেদ করে, এবং বাদ্যকরেরা জোরে বাজনা বাজায় ও উচ্চৈঃস্বরে সুর করে অপরাধীকে অভিসম্পাৎ দেয়।)

সে পৈশাচিক অভ্যাসটা দূর হ'য়েছে। এখন আর চুরী করার অপরাধে এরা অভিযুক্ত ব্যক্তির নাক কাণ কেটে নেয় না; আগে এইটেই ছিল তাদের দেশের আইন। এদের সম্প্রদায়ের মেয়েরা ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দেয় গলায় এক প্রকাণ্ড পিতলের কণ্ঠহার পরে! এই কণ্ঠহার এক একটীর ওজোন অনেক সময় দশ সেরেরও বেশী হয়! পিতলের দণ্ড ছিল এদের পুরাকালের প্রচলিত মুদ্রা, এবং সেই দণ্ডই হ'চ্ছে এদের কণ্ঠহার নির্ম্মাণের প্রধান উপকরণ। কাজেই যে লোকের স্ত্রীর কণ্ঠে যত বড় কণ্ঠহার দেখা যায়, সে তত বেশী ধনী বলে খ্যাত হয়।

বাঙ্‌গালাদের দেশের উত্তরপূর্ব্বাঞ্চলে বাবুয়া, বারাম্বো ও মাঙ্‌বেতুরা বাস করে। এরা সকলেই আজ ত্রিশ বছরের ওপোর হোলো বেলজিয়মের বশ্যতা স্বীকার করেছে: এর আগে তারা আরব দাস-

ডোম-সজ্জা

(ঝুড়ী-চাংড়ীও প্রয়োজন মত মেয়েরা নিজেরাই তৈরী করে।)

শক্রর চক্ষে দেখতো; কিন্তু পরে বেলজিয়মের সঙ্গে এদের মিত্রতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। বেলজিয়মের সঙ্গে এই বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ছিল তোমশাইনা নাম্নী একজন নারী সর্দ্দারণী। এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী নারী

রাজা মাঙ্গিপা আভুসুবা

(ইনি একজন নামজাদা জান্দে সর্দ্দার। রাক্ষসরাজ উগ্‌বার পুত্র। উগ্‌বার ভীষণ নরখাদক ব'লে অখ্যাতি ছিল। এদের জাতটার হামাইৎ ও নিগ্রোর সংমিশ্রণে উৎপত্তি হয়েছে। এরা অতি ভয়ঙ্কর জাত এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন।)

সুসজ্জিতা কঙ্গো সুন্দরী

(শিল্পীর হাতের তীক্ষ্ণধার ছুরি যে এঁর অঙ্গে এই বিচিত্র উল্কীর দাগ কেটে দিয়েছে, তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। এঁর পরিহিত অলঙ্কারগুলি বিলাসিদের লোভনীয়। দু'দিন ধরে পরিশ্রম করে ইনি মাথার চুলের কেয়ারী ক'রেছেন। তিন মাস আর মাথায় হাত দেবেন না।)

জংলী কাফ্রীর দল

(এদের ঠোঁট পুরু নয়, নাকও থাবড়া নয়। বেশ বুদ্ধিমানের মত চেহারা, অথচ এরা আফ্রিকারই জঙ্গলের অধিবাসী।)

তোমশাইনার অপ্রতিহত প্রভাবে মাঙবেতুরা বেলজিয়মের সঙ্গে সৌহার্দ্দ্য করতে বাধ্য হয়েছিল।

মাঙ্‌বেতুদের উত্তরে আর এক ভিন্ন জাতের আদিম অধিবাসীরা বাস করে তাদের নাম 'জান্দে' বা ন্যাম্‌-ন্যাম্‌। বান্তু-কাফ্রিদের সঙ্গে এদের অনেক বিষয়ে সম্পূর্ণ পার্থক্য দেখা যায়। এরা সকলে নাউবা কাফ্রী বংশ সমুদ্ভূত। এরা ভারি খাড়া লোক, এদের যে কথা সেই কাজ। "মরদ কা বাত হাতীকী দাঁত" এ প্রবাদ বাক্যটা এদের সমাজেই ঠিক বলা চলে। এরা অতি চমৎকার সৈনিক্। এদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই নিরামিষাশী, কেউ কেউ পাখী প্রভৃতি শিকার করেও খায়। এদের সমাজে

স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা খুব বেশী। এরা কেউ মেয়ে কেনা বেচা করে না। এদের মধ্যে সকলেই অতিরিক্ত গীতবাদ্য

রাজা আকন্দ

(উত্তর-পূর্ব্ব কঙ্গো অঞ্চলের ইনিই হ'চ্ছেন নরপতি। নৃত্য কলায় এঁর সমকক্ষ কেউ নেই। ইনি এই নর্ত্তকের বেশেই অধিকাংশ সময় সুসজ্জিত হয়ে থাকেন।)

রন্ধন-নিরতা কঙ্গো গৃহিণী

প্রিয়। তাদের প্রধান বাদ্যযন্ত্র হচ্ছে মাণ্ডোলীন্ (স্বরদের ...ত যন্ত্র)। এদের সর্দার সুলতান শেমীয়ো একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন ও রাজনীতি বিশারদ পুরুষ। তাদের অধিকাংশই এখন বোমুর উত্তরে ফরাসী রাজ্যে বসবাস করে।

রাণী নেন্‌জিমা

(ইনি নরমাংস ভোজী মাঙ্‌বেতুদের ভূতপূর্ব্ব রাজ্ঞী। এঁর যখন বিবাহ হয় তখন রাজার আরও ১৭১টি রাণী ছিল; কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অসাধারণ বাগ্মিতার গুণে ইনিই সর্ব্বপ্রধানা হ'য়ে উঠেছিলেন। এঁর রাজ্য উপস্থিত বেলজিয়মের অধিকারে।)

কঙ্গোর মধ্য প্রদেশে যেখান দিয়ে কাশাই নদী তার অসংখ্য শাখা প্রশাখা—বিস্তার করে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে, সেখানে বাবুন্দা, বাম্বালা, বাজোক, বাশোঙগো এবং বাঙ্‌কুতু জাতিরা বসবাস করে। এদের মধ্যে বাঙ্‌কুতুরা ছাড়া অপর' কটি জাত সবাই বেশ দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়ে চ'লেছে। কঙ্গো প্রদেশের এরাই হ'চ্ছে ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্থল!

বাবুন্দারা কাতারাক্ত অঞ্চলের বেশ সমৃদ্ধিশালী সম্প্রদায়। এদের মধ্যে 'রবার' জিনিসটাই মুদ্রা হিসাবে প্রচলিত। এদের যা কিছু কেনা বেচা সবই রবারের বিনিময়ে সম্পন্ন হয়। শরীরের গঠন হিসাবে এরা আফ্রিকার মধ্যে খুব সুপুরুষ জাতি; কিন্তু বর্ণের দিক দিয়ে মধ্য আফ্রিকার মধ্যে এরাই হ'চ্ছে সকলের চেয়ে কালো! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে এদের সন্তান

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী সভ্য কঙ্গো সর্দ্দার ও তাঁর সবস্ত্রা পত্নীবৃন্দ

মন্ত্রঃপূত যোদ্ধা

(বর্শা ও খড়্গধারী এই দুই বীরের গায়ে মুখে যে সব রং চং করা ফুলকাটা দেখছেন, এ সব শোভার জন্য নয়, যুদ্ধে অক্ষত থাকবার পক্ষে ওগুলি মন্ত্রঃপূত রক্ষা কবচ স্বরূপ।)

যখন প্রথম ভূমিষ্ঠ হয় তখন সেই সদ্যোজাত শিশুর বর্ণ থাকে একেবারে ধব ধবে সাদা! তার পর যতদিন যায়, ছেলে-মেয়েগুলি ক্রমে ততই কালো হ'য়ে যেতে থাকে! নিগ্রো-কাফ্রীদের অনেকেরই সদ্যোজাত শিশু গৌরবর্ণ হয়। বাবুন্দারা কেউ দল বেঁধে একত্র হয়ে গ্রামে বাস করে না, এদের একটা প্রধান বিশেষত্বই হ'চ্ছে যে, এরা এক একটি পরিবার বিজন মাঠের মাঝ-খানে এক একখানি কুটীর নির্ম্মাণ ক'রে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ-ভাবে বাস করে। বাম্বালারা এদেরই প্রতিবেশী। তারা পূর্ব্বাঞ্চলের কোয়াঙ্গো উপত্যকার বাসিন্দা। এরা সব কৃষী ব্যবসায়ী। এদের

যোঙ্গো দম্পতী

(এরা জঙ্গলে বাস করে। যখন সহরে যাবার দরকার হয়, স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে আসে। স্ত্রীকে রক্ষা করবার জন্য স্বামী সশস্ত্র হয়ে আসেন।)

কুম্ভকার-শিল্প
(কঙ্গোর মেয়েরাই নিজেদের আবশ্যক হাঁড়িকুড়ি তৈরী করে নেয়।)

বেশ সঙ্গতিপন্ন অবস্থা। সবারই জায়গা জমী, ক্ষেত-খামার আছে। এরাও খুব সঙ্গীতপ্রিয়। বাঁশের বাঁশী এদের চিরসঙ্গী। এরা আবার জুয়া খেল্‌তেও ভারি ভালবাসে। এদের সব মুখে মুখে ছড়া গান কবিতা প্রভৃতি রচনা করবার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখ্‌লে আশ্চর্য্য হ'তে হয়! প্রতি দিন সন্ধ্যায় এদের গ্রামগুলি আমোদ-প্রমোদে আনন্দ-কলরবে, হাস্য-কৌতুকে, বাঁশীর তানে ও প্রেমের গানে মুখরিত হ'য়ে উঠে! এদের প্রধান অস্ত্র হ'চ্ছে তীর ধনুক। এরাও এককালে নরমাংস ভোক্তী ছিল, এখন অনেকটা বৈষ্ণব হয়ে এসেছে।

লুলুয়া উপত্যকায়—কাশাই নদীর একটি শাখা ও শাঙ্কুরু প্রদেশের মধ্যে—বালুবারা বাস করে। এদের এই অংশটুকুর জমী এত উর্ব্বরা যে, 'বীজ বুন্‌লে সোনা ফলে' কথাটা এখানে খুব খাটে। কেউ কেউ বলে ওই জায়গাটুকুই ত হ'চ্ছে কঙ্গো দেশের মধ্যে অমরাবতী তুল্য! বালুবারা সকলে বেশ রাজভক্ত ও শান্ত প্রজা। বেলজিয়ম গবর্ণমেণ্টকে তারা সম্পূর্ণ মেনে চলে। এদের মধ্যে অনেকেই নৌ-চালন বিদ্যায় বেশ সুদক্ষ।

সর্দ্দারের দাড়ী
(সর্দ্দারের প্রকাণ্ড লম্বা দাড়ী বাঁরোমাস গুটিয়ে পাকিয়ে ছোট্ট করে এঁটে রাখা হয়। কদাচ কখন পালা-পার্ব্বণে বা উৎসব উপলক্ষে সর্দ্দার তাঁর এই মূল্যবান দাড়ী সবটা খুলে বাহার দেন।)

সর্দ্দার দাঙ্গা
(মাঙ্‌বেতুদের সর্দ্দার দাঙ্গা তার সিংহাসনে ব'সে আছে। দু'পাশে তার দু'টি তরুণী নারী রক্ষিণী দাঁড়িয়ে। শীঘ্রই এরা সর্দ্দারের পত্নীত্বলাভে সৌভাগ্যবতী হবে।)

ডোঙা, শাল্‌তী নৌকা প্রভৃতি নির্ম্মাণ ক'রতেও এরা খুব সুদক্ষ।

বাঙ্গোকুরা এক রকম ব্যাধের জাত। তারা কেউ গৃহবাসী নয়, শিকার ক'রে ক'রে ঘুরে বেড়ায়। হাতী শিকার করতে এরা একেবারে সিদ্ধহস্ত। কেউ চাষবাস বা ক্ষেতের কাজের কোনও ধার ধারে না। কেবল হাতীর দাঁতের কারবারেতেই এরা বেশ ধনী হয়ে উঠেছে। এরা বড় উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে। সারা রাত জেগে বসে তাড়ী খায় আর ভারি হৈ চৈ করে। এরা এই তাড়ীটা আকের রস থেকেই তৈরী করে। এদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা ক'রে দেখলে বেশ বোঝা যাবে যে, এরা কেউ এখানকার আদিম অধিবাসী নয়, কোনও দূর বিদেশ থেকে এখানে এসে বসবাস করতে সুরু করে দিয়েছে। এদের চাল চলন অনেকটা বামন জাতিদের সঙ্গে মেলে।

বুশোঙ্গোরা—লৌকিক ঐশ্বর্য্যের পরিবর্ত্তে তাদের অধ্যাত্ম বিদ্যার জন্যই বিশেষভাবে পরিচিত। এরা সবাই একেশ্বরবাদী—এবং যে সব ন্যায়নীতির অনুসরণ ক'রে চলে, তা সত্যই বিস্ময়কর। শিল্পবিদ্যায় তাদের অতুল প্রতিভা প্রকাশ পেয়েছে তাদের হাতের কাঠের খোদাই কাজে। এরা সবাই বেশ প্রতিভাবান তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন এবং শিল্প ও সৌন্দর্য্যানুরাগী লোক।

ধান ভ ডা
(এরা এখনও ঢেঁকী বা জাঁতার উদ্ভাবন ক'রতে পারেনি। শিলের সাহায্যেই ধান ভাঙে।)

উপরিউক্ত চারটি উন্নতিশীল জাতির তুলনায় বাঙ্‌কুতুরা এখনও অনেক নিম্নস্তরে পড়ে আছে। মধ্য আফ্রিকার মধ্যে এরাই হচ্ছে সবচেয়ে নোংরা জাত। স্ত্রীপুরুষ কখন কেউ কোনও কালে স্নান করে না, মুখ ধোয় না। মেয়েরা সব মুখখানাকে কেটেকুটে এমন বীভৎস রকম কুৎসিত ক'রে তোলে যে, তাদের মুখের দিকে চাওয়া যায় না। এরা এখনও এদের কোনও ক্রীতদাসের মৃত্যু হ'লে তাঁর মৃতদেহ ভক্ষণ করে। অনেক সময় নরমাংস লোভে তারা হয়ত তাদের কোনও প্রতিবেশীকে রাত্রের অন্ধকারে একা যেতে দেখলে গোপনে তার পশ্চাদনুসরণ ক'রে তাকে হত্যা ক'রে নিয়ে এসে খেয়ে ফেলে। বাঙ্‌কুতুদের সঙ্গে বাপেন্দী সম্প্রদায়ের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে—কেবল একটা বিষয়ে তারা পরস্পরের সম্পূর্ণ বিরোধী—সেটা হচ্ছে কুকুরের মাংস খাওয়া। বাপেন্দীদের কাছে কুকুরের মাংস পরম উপাদেয় ভোজ্য; কিন্তু বাঙ্‌কুতুরা কুকুরের মাংস একেবারে স্পর্শ পর্য্যন্ত করে না। অথচ এই কুকুরের মাংস ছাড়া এ জগতে আর এমন কোনও পদার্থ নেই, যা বাঙ্‌কুতুরা অখাদ্য ব'লে মনে করে।
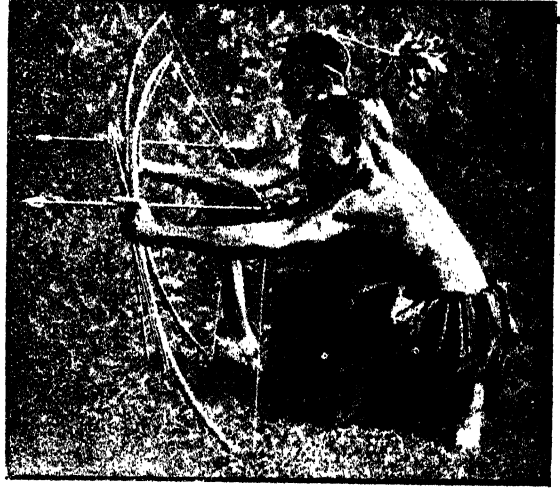
শিকারী সম্প্রদায়

কঙ্গো দেশের সমস্ত আদিম অধিবাসীদের মধ্যে সেরা জাত হ'চ্ছে বাতাতেলারা। এরা বীরের জাত,

বেলজিয়মের সঙ্গে দীর্ঘকাল এরা যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু বার বার পরাস্ত হ'য়ে শেষে বেলজিয়মদের সঙ্গে সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হ'য়ে তাদের সঙ্গে একজোটে এরা আরবদের বিরুদ্ধে অভিযান ক'রেছিল। এই নির্ভীক দুর্দ্ধর্ষ জাতের সাহায্যেই বেলজিয়ম আরব দস্যু ও দাসব্যবসায়ীদের দূরীভূত ক'রতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু বেলজিয়মের সঙ্গে এদের মিত্রতা বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। বেলজিয়মের আইন অনুসারে নরমাংসভোজীর শাস্তি ছিল প্রাণদণ্ড। বাতাতেলারা নরমাংসভোজী, বেলজিয়মের নিষেধ আজ্ঞা অবহেলা ক'রে তাদের সর্দ্দারেরা উৎসব উপলক্ষে নরমাংসভোজনের আয়োজন ক'রতো। বেলজিয়ম গভর্ণমেণ্ট এই অপরাধে উপর্য্যুপরি তাদের জনকতক সর্দ্দারের প্রাণদণ্ড দিতে বাধ্য হ'য়েছিল। এই ব্যাপারেই বাতাতেলারা বেলজিয়মের প্রতি যথেষ্ট বিরূপ হ'য়েছিল। তার উপর আবার তাদের সর্ব্বজনপ্রিয় প্রধান সর্দ্দার গঙ্গোলুতেটুকে যখন বেলজিয়ম বিশ্বাসঘাতকভেবে ভুল ক'রে অবিচার ক'রে ফাঁসি দিলে, তখন বাতাতেলারা একেবারে ক্ষেপে উঠ্‌লো এবং বেলজিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে। এই বিরোধ এমন প্রচণ্ড হ'য়ে উঠেছিল যে, বেলজিয়ম তার এই সাধের কাফ্রী উপনিবেশ প্রায় হারাতে বসেছিল। তিন চার বছর ধ'রে ক্রমাগত প্রাণপণ যুদ্ধ করে তবে বেলজিয়ম আবার দেশে শান্তিস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে।

ভূতের ওঝা

বাতাতেলাদের মধ্যে শিল্পানুরাগটা খুব প্রবল দেখতে পাওয়া যায়। কারুকার্য্য ও কলা বিদ্যার প্রতি এদের কেমন একটা স্বাভাবিক ঝোঁক আছে। এদের সকলের বাসগৃহের ভিত্তিগাত্র নানা বিচিত্র কারুকার্য্যে সুশোভিত।

বিগত জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় বেলজিয়ানরা আফ্রিকার জার্ম্মাণ অধিকার আক্রমণ ক'রে অনেকটা স্থান দখল করে নিয়েছে। বেলজিয়মের এই নূতন অধিকারের মধ্যে রুয়ান্দা প্রদেশের খানিকটাও তাদের দখলের মধ্যে এসে গেছে—এবং তাদের সৌভাগ্যক্রমে সেই অংশটুকুই হচ্ছে আফ্রিকার মধ্যে সবচেয়ে উর্ব্বর প্রদেশ। এই অংশটুকু আগে রুয়াদার প্রবল প্রতাপান্বিত সুধিপতি মুশীঙগার অধীনে ছিল। মুশীঙগার পূর্ব্বতন চার পাঁচ পুরুষ এই রাজ্যের অধীশ্বরত্ব ক'রে গেছে। উত্তরাধিকার সূত্রে মুশীঙগা এইবার সেই সিংহাসন পেয়েছে। কিন্তু তার রাজ্যের সবচেয়ে

উর্ব্বর অংশটুকু আজ বেলজিয়মের হাতে চলে গেছে বলে মুশীঙ্গা অত্যন্ত দুঃখিত। মুশীঙ্গার অধীনস্থ প্রজাবৃন্দের সংখ্যা প্রায় বিশলক্ষ হবে। তাদের প্রত্যেকেরই ঘরে অন্ততঃপক্ষে একটি না একটি গরু এবং গোটাকতক ছাগল ভেড়া আছেই। সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে মুশীঙ্গার প্রজাদের মতন এমন সুশ্রী সুপুরুষ আর দেখতে পাওয়া যায় না। যেমনি তারা সব ছ'ফুটেরও বেশী লম্বা (কেউ কেউ আট ফুট দীর্ঘাকারও আছেন) আবার তেমনি সব জোয়ানও বটে। অতি সুন্দর সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ এদের। এমন আকৃতির মানুষ আজকাল আর বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। এরা সকলেই ব্যায়াম কুচকাওয়াজ ও শক্তিসাধ্য ক্রীড়া কৌতুকের পক্ষপাতী। এরা আট দশ ফুট উচ্চ প্রাচীর অনায়াসে লাফিয়ে পার হয়ে যায়। ষাট গজ তফাৎ থেকেও বর্শা নিক্ষেপ ক'রে এরা লক্ষ্য বিদ্ধ করতে পারে। তাদের রাজা মুশীঙ্গাকে তারা সবাই খাজনা দেয়—টাকায় নয়—জিনিসপত্র উপহার দিয়ে।'

শৃঙ্গ-বাদক

(মাওবেতুদের রাজসভায় যে শৃঙ্গ বাদক থাকে তার শিঙাটি একটি প্রকাণ্ড হাতীর দাঁতের তৈরী, তাতে আবার নানা বিচিত্র কারুকার্য্য করা।)

বাদ্যকরের দল

শিঙা, দামামা, জয়ঢাক, কাড়া প্রভৃতি এই বাদ্যকর সম্প্রদায়ের প্রধান যন্ত্র।)

তাদের মধ্যে এখনও কোনপ্রকার মুদ্রার প্রচলন হয়নি। রাজাই এদের সর্ব্বেসর্ব্বা। তিনি যা করবেন, তাই এরা মেনে নেবে। কি রাজকীয়, কি ধর্ম্ম সম্পর্কীয়, কি সামাজিক—সকল ব্যাপারেই রাজার মত সবার উপরে। কেবল রাজমাতা যিনি—তিনিই শুধু রাজাকে কোনও আদেশ করতে পারেন, অপর কোন লোকের সে অধিকার নেই। রাজমাতার অনুমতি ও উপস্থিতি বিনা কোন রাজারই রাজ্যাভিষেক ও মুকুটোৎসব সম্পন্ন হ'তে পারে না। যে রাজার আপন গর্ভধারিণী জীবিত নেই, তাঁকে রাজ্যাভিষেকের সময় অন্ততঃ একজন ধর্ম্ম-মাতারও শরণাপন্ন হ'তে হয়। কারণ রাজমাতার অবর্ত্তমানে তাদের রাজ্যাভিষেক বা মুকুটোৎসব একবারেই অসিদ্ধ।

আর একটি যে খর্ব্বাকৃতি বামন জাতির পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি। তারা বামন হলেও কেউ চার ফুটের কম নয়। তারা সবাই শিকারীর জাত; কিন্তু নিগ্রোদের

মত তারা নোংরা নয়, খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। এরা মৃতদেহ সমাধিস্থ না করে আমাদের মত অগ্নি সৎকার করে। এদের মধ্যে কেউ কোনও পুরুষে কখনও নরমাংস ভোজন করেনি, এ খাদ্যটির প্রতি তাদের বরাবরই একটা অশ্রদ্ধা আছে। আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধাচরণ কেবল এই বেঁটের দলই কোনও দিন করেনি। এরা বরাবর তাদের সঙ্গে মিত্রতাই ক'রে এসেছে।

কঙ্গোর এই আদিম অধিবাসীদের সকলেরই সামাজিক আচার ব্যবহার প্রায়ই এক রকমের। ভূতের ওঝারাই একরকম এদের সমাজের ও ধর্ম্মের নেতা। তাদের এরা ভক্তি করে। ভূতের ওঝাদের এরা বলে "জাঙ্গা"। "জাঙ্গা" কথাটির মানে "সবজান্তা"। এই নাম থেকেই বোঝা যায় যে ভূতের ওঝাদের কি রকম প্রতিপত্তি।

জাঙ্গারা শুধু ভূতের ওঝা নয়—তারা সব রকম বিদ্যেই জানে। তারা রোগের চিকিৎসাও করে, আবার আধিভৌতিক আধিদৈবিক ব্যাপারেরও তারাই পুরোহিত। আজকাল কঙ্গোর কোনও কোনও অঞ্চলে এদের প্রতিপত্তি অনেকটা কমে আসছে। বেলজিয়ম গভর্ণমেণ্ট এদের ওপোর একটু কড়া নজর রাখায় এদের ভুতুড়ে ক্রিয়াকাণ্ডগুলো এখন বেশীর ভাগ গোপনেই সম্পন্ন হয়।

নিত্য-সন্ধ্যায় নৃত্য উৎসব

নরমাংস ভোজন-স্পৃহা এদের মধ্যে খুব দ্রুত কমে আস্‌ছে।

নৃত্যপরা নর্ত্তকীর দল

অদূর ভবিষ্যতে আশা করা যায় যে, মানুষে মানুষের মাংস খায়, এমন মানুষ আর এ দেশে থাকবে না। এরা ক্রমেই সভ্যতার পথে অগ্রসর হ'য়ে চলেছে। বহুবিবাহ প্রথাটাও এদের ভিতর থেকে ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে। মেয়েরা এখন আর সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় থাকতে চাচ্ছে না, তারা

বামন যোদ্ধার দল

কাপড় প'রতে শিখ্‌ছে। পুরুষেরাও তাদের বন্য বর্ব্বরতা ছেড়ে আস্তে আস্তে ভদ্র গৃহস্থ হয়ে উঠছে। তারা অনেকেই কফি, কোকো, তুলো, তামাক, রবার প্রভৃতির চাষবাসে মন দিচ্ছে। লুটপাট, খুন, দাঙ্গা এসব এখন অনেক কমে গেছে ; বেলজিয়মের সুশাসনে, আশা করা যায়, কঙ্গোদেশ শীঘ্রই পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশের সঙ্গে সমান হ'য়ে উঠ্‌বে।

স্বপ্ন

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

(৭)

বিস্মিত বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া শঙ্কর বলিল, তুমি,—তুমি আলি মহম্মদ!

আলি মহম্মদ পথের জনস্রোতের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিল।

কিন্তু এ বেশে ত তোমায় মসজিদে যেতে দেবে না।

বোধ হয় দেবে না, আপনি চলুন আমার বাড়ীতে,—

সহসা সম্মুখে একজন শুভ্র বোরখাবৃতা নারী আসিয়া দাঁড়াইতে দুইজনে একটু চমকিয়া চাহিল। এ নারী যেন তাহাদের পথ রোধ করিতে চায়। শঙ্কর তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অগ্রসর হওয়াতে, নারীটি পিছনে একটু সরিয়া গেল। দুইজনে এবার একটু দ্রুতপদে চলিতে লাগিল।

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, কোথায়,—তোমার বাড়ী?

হাঁ, আমার বাড়ী বেশী দূর হবে না। আমার বোন আপনাকে দেখলে ভারি আনন্দিত হবে, সে অনেক সংস্কৃত শাস্ত্র পড়েছে—

কিন্তু দেখো—

না, আজ আমি কোন আপত্তি শুনব'না—

শঙ্কর আপত্তি করিল না, ধীরে আলি মহম্মদের সহিত চলিল। শঙ্করের কাছে এ দিনটি বড় বিচিত্র বিস্ময়কর লাগিতেছিল। বিশ্ববিধাতা যেন তাহার চোখের সম্মুখে কোন রহস্যময় যবনিকা তুলিয়া কি আশ্চর্য্যকর লীলা দেখাইবেন; আর আলি মহম্মদের কাছে এ প্রভাতের উজ্জ্বল আলোক, পথের জনস্রোত, চারিদিকে আনন্দ কল্লোলময় জীবনধারা বড় মধুর অনির্ব্বচনীয় লাগিতেছিল। এক তরুণীর প্রেমদীপ্ত নয়নের চাউনিতে তাহার কপোলে আজ জ্যোতির্ম্ময় টীকা জ্বালা, এই হিন্দু তরুণীর প্রতি তাহার প্রেমের হোমানলে তাহার মাতৃ-পূজার জীবন-নৈবেদ্য পুণ্যময় হইয়া উঠিল। দুইজনেই প্রায় নীরবেই চলিল, তাহাদের পেছন পেছন যে একটি বোরখাবৃতা নারী আসিতেছে, তাহা কেহই লক্ষ্য করিল না।

বাড়ীতে আসিয়া শঙ্করকে নিজের ঘরে বসাইয়া আলি ডাকিল, শিরিণ! শিরিণের কোন সাড়া পাওয়া গেল না। ঘর হইতে বাহির হইয়া আলি দেখিল, দূরে যমুনার দিকে বারান্দার কোণে শিরিণ চুপ করিয়া বসিয়া আছে। কাছে গিয়া ধীরে আবার ডাকিল—শিরিণ—

দাদা! বলিয়া শিরিণ চমকিয়া উঠিল। দাদা, কোন দিক দিয়ে তুমি এলে?

বাগানের দিকের সুড়ঙ্গটা দিয়ে এসেছি, কাঁদছিলে কেন?

হাঁ, দাদা, তা'রা কোথায় চলে গেল, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

কা'রা?

সে তোমায় বলব'খন, কিন্তু ছেলেটার জ্বর রয়েছে, তাকে নিয়েই পাগলীটা চলে গেল—জানো দাদা, ছেলেটা কাল বিকারের ঝোঁকে ডুবে মরতে যাচ্ছিল—

এ করুণাময়ীর অন্তর-ব্যথার কথা আলি বিলক্ষণ জানিত। সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া আলি বলিল,—চল শিরিণ দেখবে, কাকে আজ নিয়ে এসেছি—

কে দাদা?

কে জানিস, শঙ্কর পণ্ডিত—

তিনি, সত্যি!

হাঁরে, আমি বল্লুম, আমার বোন খুব শাস্ত্র জানে, আপনার সঙ্গে তর্ক করবে, চলুন—

দাদা!

চল, আমার ঘরে বসে আছেন।

হাল্কা মেঘের এক পশলা বৃষ্টির পর শরতের রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের মত শিরিণের মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিল, সে ধীরে বলিল,—আমি কিন্তু শুধু তাঁকে প্রণাম করে চলে আসব, কথা কিছু বলতে পারব না।

আচ্ছা আর ত—

ঘরের প্রায় সম্মুখে আসিয়া দুইজনে থমকিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখের সিড়ি দিয়া একজন বোরখাবৃতা নারী উঠিয়া আসিতেছে। নারীটি উঠিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইতে, আলি অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিল, এই নারীই ত পথে তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। শিরিণ একটু অগ্রসর হইয়া গিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিল, কে বহিন?

নারী হাসিয়া বলিয়া উঠিল—কি আলি, চিনতে পাচ্ছ না?

একটু ভীত ক্রুদ্ধ ভাবে আলি চাহিয়া রহিল।

এতক্ষণ পেছন পেছন এলুম, চিনতে পার্লে না?

গলার স্বরটা যেন শুনেছি বলে মনে হচ্ছে—

মনে হচ্ছে! এ গলার গান শুনতে যে পাগল হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছ, তাও মনে হচ্ছে কি?

তুমি!

হাঁ, যার গান তুমি মদের চেয়েও ভালবাসতে—

ভীত ব্যথিত কণ্ঠে আলি মহম্মদ বলিল—তুমি, জামেলা!

ধীরে মুখের আবরণ খুলিয়া ক্রুর হাসিয়া জামেলা বলিল,—হাঁ, সেই রকমই ত মনে হচ্ছে—

করুণ কণ্ঠে আলি মহম্মদ বলিল—তুমি কেন এলে? তুমি যাও!

তাহার ভোগবিলাসের জীবনের এক জ্বালাময় স্মৃতি, তাহার যৌবনলালসার মাদকতার বহ্নিশিখা কেন আবার মূর্ত্তিমতী হইয়া তাহার সম্মুখে আসিল, আলি মহম্মদের ভয় হইল, বুঝি আপনাকে সে দমন করিতে পারিবে না।

ম্লান হাসিয়া জামেলা বলিল—কেন এলুম? মনে আছে বলেছিলে তুমি রাজা হলে আমায় রাণী করবে, সেইটা মনে করিয়ে দিতে এলুম—

অনুনয়ের সুরে আলি বলিল—তুমি যাও—

এবার ব্যথার সুরে জামেলা বলিল—হাঁ, যাবো, কিন্তু

জানো, তুমি চলে যাবার পর, তোমায় আমি কেবল খুঁজেছি আর খুঁজেছি। সবাই বল্লে, তুমি মরে গেছ, কিন্তু আমি আমার অন্তরে জানতুম তুমি মরোনি, আজ তাই দেখতে এলুম, নিজের মনের কাছে প্রমাণ দিতে এলুম, তুমি সত্যি বেঁচে আছো, সে আমায় মিছিমিছি ভুলোয়নি—আজ আল্লা—

জামেলা!

কি?

চুপ করো—

কেন —

বস্তুতঃ আলি মহম্মদ নিজের অন্তরের সঙ্গে যুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, মনের সহজাগ্রত তৃষ্ণা বেদনাকে একেবারে মূক করিয়া দিবার জন্য সে বিষসিক্ত সুতীক্ষ্ণ বাণটি নিক্ষেপ করিল; ক্ষুব্ধস্বরে বলিয়া উঠিল,—তুমি বাইজী!

জামেলার মুখ কালো হইয়া গেল, সে উদ্দীপ্ত অগ্নির মত বলিয়া উঠিল—হাঁ, বাইজী, কিন্তু এই বাইজীর জন্য তুমি—

বলিতে বলিতে জামেলা আর বলিতে পারিল না, তাহার কণ্ঠ হইতে কে ভাষা কাড়িয়া লইল! শঙ্কর আসিয়া তাহাদের সম্মুখে ধীরে দাঁড়াইল; এই প্রসিদ্ধা গায়িকার কণ্ঠ সে মূক করিয়া দিল। জামেলা সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এই ব্রাহ্মণটির দিকে চাহিল, এই পণ্ডিতটিকে সুমিষ্ট ভাষায় বহুক্ষণ গালাগাল দিলে যেন তাহার মনের শান্তি হয়, কিন্তু কথা ফুটিল না।

স্নিগ্ধকণ্ঠে শঙ্কর বলিল—মা, তুমি আজ আলিকে ক্ষমা করে যাও, ওকে আজ আমাদের দরকার, ও ভারত মায়ের কাছে আপনাকে দিয়েছে—

ক্রোধ-অভিমান-ক্ষুব্ধ চোখে জামেলা একবার শঙ্করের দিকে চাহিল। তার পর তাহার জ্বালাময় মুখ স্নিগ্ধ হইয়া আসিল। তার পর কান্নার সুরে সে বলিয়া উঠিল—কিন্তু আমি? আমার কি হবে?

কি চাও তুমি মা?

আমি শান্তি চাই—

শান্তি? ভোগের জীবনে শান্তি নেই। যদি সব ত্যাগ করতে পার, জীবন উৎসর্গ করতে পার, শান্তি পাবে—

বেশ, আমাকে সেই পথ বলুন—

এখন তুমি ঘরে যাও মা, এখন তোমার মন বড় চঞ্চল—

ঘর! আমার কোথায় ঘর? বলিয়া জামেলা ক্ষিপ্তার ন্যায় যে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিয়াছিল সে সিঁড়ি দিয়া চঞ্চলপদে নামিয়া চলিয়া গেল।

শঙ্কর ধীরে ধীরে বলিল—দেখ, আলি, ও কোথায় গেল।

আলি মহম্মদ ধীরে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

শিরিণ এককোণে একটি লতার মত দাঁড়াইয়া দৃশ্যটি দেখিতেছিল ও মাঝে মাঝে ব্যথায় কাঁপিতেছিল। শঙ্কর নিমেষের জন্য তাহার দিকে চাহিল, সরল করুণ চোখ দুইটি তাহার বড় মধুর লাগিল, সে যে তারাদের প্রতি চাহিয়া রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়াছে, ঠিক সেই তারাদের মত তাহার চোখ দুইটি, জামেলার পাশাপাশি ইহার রূপ যেন অপূর্ব্বরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। জামেলা যেন উল্কা, পূর্ণিমা রাত্রে বাগেশ্রী, বসন্তের রক্তজবা—আর শিরিণ যেন শুকতারা, ভোরের পূরবী, শরৎ প্রভাতের শুভ্র পদ্ম। নিমেষের জন্য চাহিয়া শঙ্কর আবার ঘরে ঢুকিল; কিন্তু শঙ্কর যদি ভাল করিয়া শিরিণের মুখ দেখিত, তবে দেখিতে পাইত সে পবিত্র শুভ্র মুখ প্রেমের আগুনে একটু রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, শুধু ভক্তি শুধু কৃতজ্ঞতা নয়, প্রেমের স্পর্শে অন্তর-আকাশ শরৎ ঊষার পূর্ব্বাকাশের মত সোনায় সোনা হইয়া উঠিতেছে।

(৮)

তিন দিন পরে।

সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিকে ঘনাইয়া আসিতেছে, শঙ্কর একা স্তব্ধ বসিয়া ভাবিতেছিল। প্রথম যেদিন ভারত-সিংহের সহিত দেখা হইয়াছিল, পুরাতন দিল্লীর ভগ্ন স্তূপের প্রায় সেই স্থানেই সে বসিয়া ভাবিতেছিল। অস্তগামী সূর্য্যের প্রতি রশ্মিশিখা সে যেন আপনার মধ্যে সঞ্চিত করিয়া রাখিতেছিল, এই সন্ধ্যার রক্তিম মায়ার মত যে মোগল-মহিমা ধীরে ধীরে অস্ত যাইতেছে, এই বিপ্লবের অন্ধকারে নবজীবনের অগ্নি তাহাকেই জ্বালাইয়া রাখিতে হইবে, তিমির-রাত্রি-শেষে জ্যোতির্ম্ময় জাগরণের বাণী

তাহাকেই বলিতে হইবে। হাঁ, সে শুধু একজন জ্যোতিষী, একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নয়, আজ তাহারি হাতে ভারতভাগ্য-বিধাতা নবজীবনের অগ্নি প্রদীপ দিয়া দিয়াছেন, তাহারি স্পর্শে দিকে দিকে ঘরে ঘরে প্রাণে প্রাণে সকলে জাগিয়া উঠিবে। সে শুধু এক সামান্য ব্রাহ্মণ শঙ্কর নয়, সে বিধাতার হাতের জয়শঙ্খ, তাঁহার উদ্যত বজ্র, এ রক্তের বিপ্লব-সমুদ্র মন্থন করিয়া যে শান্তির সাম্রাজ্য-শতদল বিকশিত হইয়া উঠিবে, সে তাহারি বাণী বহন করিয়া আনিয়াছে। শঙ্কর এরূপ ভাবে কোন দিন আপনাকে অনুভব করে নাই, তাহার যেন কোন অপূর্ব্ব সুখজ্বালাময় স্বপ্নের জীবন আরম্ভ হইল। সে আর যেন সহজ স্বাভাবিক রহিল না। আজ ভ্রাতৃদলের গুপ্ত সভায় সে কি বলিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল। কোন দিকে পথ? ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা গভীর অন্ধকারময় হইয়া আসিতেছে, নাদির শাহ লাহোর অধিকার করিয়া দিল্লীর দিকে আসিতেছে, কে তাহার পথরোধ করিবে! আমীর-উল্-ওমরা খাঁ দুরাণ তাহার পথরোধ করিতে গিয়া বার বার স্বয়ং বাদশাহকে আসিতে বলিতেছে; এ নাদির যদি দিল্লী অধিকার করে তবে মোগল সাম্রাজ্য চিরদিনের জন্য ধ্বংস হইয়া যাইবে। তার পর?

অদূরে ঘোড়ার খুরের শব্দ হওয়াতে শঙ্কর একটু চমকিয়া উঠিল, কিন্তু তাহার স্বপ্নের ঘোর কাটিল না। রাজপুতবেশী আলি মহম্মদ তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে সে উৎসাহের সহিত উঠিয়া আলি মহম্মদকে ঝাঁকুনি দিয়া বলিয়া উঠিল,—ভারতসিংহ, তুমি! হাঁ, তুমি পারবে, তুমি আলি মহম্মদ নও,—

কিন্তু—

তাহার দুই হাত ধরিয়া নাড়া দিয়া শঙ্কর বলিল—হাঁ, তুমি জান না তুমি কে!

শঙ্করের মুখে চোখে অস্বাভাবিক দীপ্তি ঝলসিয়া উঠিতেছে, তাহার দীপ্ত মূর্ত্তি দেখিয়া আলি মহম্মদ প্রথমে অবাক হইয়াছিল, কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরে হাতের স্পর্শে চক্ষের চাউনিতে যেন মন্ত্রাহত হইয়া গেল, তাহার মনে হইল সত্যই সে আলি মহম্মদ নয়, সে জানে না সে সত্যই কে। হয় ত সে সত্যই ভারতসিংহ।

শঙ্কর ধীরে বলিল—চলো, তোমার কথা আজ ভ্রাতৃদলকে বলব। ছদ্মবেশে শঙ্করের সহিত আলির একটুও ভয় করিল না।

ভগ্নস্তূপের মধ্যে সুড়ঙ্গ পথ দিয়া দুইজনে মাটির তলে এক প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। এখানে ভ্রাতৃ-সম্প্রদায়ের গুপ্ত সভা হয়; মারাঠা, রাজপুত, শিখ, বাঙ্গালী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সকল হিন্দু যুবক এ সম্প্রদায়ের সভ্য; এই ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতে একতা আনিয়া এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই ইহাদের উদ্দেশ্য। এক বৎসর পূর্ব্বে আলি ইহাদের সম্প্রদায়ে ছদ্মবেশে প্রবেশ করিয়াছে ও নিজ গুণে বুদ্ধিতে তাহাদের দলপতি হইয়াছে। সকলে ভারতসিংহ ও শঙ্করের প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহারা দুইজনে প্রবেশ করিতে সকলে উঠিয়া অভ্যর্থনা করিল। শঙ্কর আজ কাহারও সহিত কোন কথা কহিল না, সে ভারতসিংহকে পাশে লইয়া এক উঁচু পাথরের ওপর দাঁড়াইয়া সকলকে বসিতে বলিল, তার পর দীপ্তকণ্ঠে বলিতে লাগিল—ভাই সব, আমি দেখতে পেয়েছি—

তাহার মুখ অপূর্ব্ব জ্যোতিঃমণ্ডিত হইয়া উঠিল, অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মত তাহার মুখ হইতে প্রতি কথা জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল—আমি দেখছি তোমাদের মধ্যে পরমাশক্তি অবতীর্ণা হয়েছেন, তোমাদের প্রতিজনের মধ্যে, যে শক্তি দিয়ে রামচন্দ্র রাবণকে মেরেছিলেন, যে শক্তি দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ কংসকে ধ্বংস করেছিলেন, যে শক্তি দিয়ে অর্জ্জুনসখা কুরুক্ষেত্র জয় করেছিলেন, সেই শক্তির অংশ তোমরা, তুমি অজিত সিং, তুমি অরুণ সিং, তুমি ভারত সিং, তুমি রাজশেখর, তোমরা ইন্দ্রের বজ্র, তোমরা সুদর্শন চক্র,—এই অন্ধকার প্রাঙ্গণে এক কোণে এই প্রদীপটি যেমন জ্বলজ্বল করছে, তেমি তোমরা প্রতিজন নবশক্তির প্রদীপ, তোমাদের শিখা দিকে দিকে জ্বলে উঠবে—

প্রতিজন অনুভব করিতে লাগিল, সত্যই তাহারা নব-জীবনের বাহক।

উচ্ছ্বসিত প্রাণের আবেগে শঙ্কর বলিয়া যাইতে লাগিল—সেই বিচিত্রকর্ম্মা অপূর্ব্ব শক্তি আমি তোমাদের প্রতিজনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি; কিন্তু এ শক্তিকে সংহত করতে হবে, সংযত করতে হবে, "এক করতে হবে—এক করতে হবে—এক সঙ্গে কি আমাদের প্রতিজনের তরবারি শত্রুর বিরুদ্ধে নিষ্কাষিত উদ্যত হয়ে উঠবে না—

মন্ত্রমুগ্ধ ভ্রাতৃদল মুখে কোন উত্তর দিতে যেন পারিলনা, প্রত্যেকে আপন আপন তরবারি খাপ হইতে খুলিয়া হাতে ধরিয়া সম্মুখে নাচাইতে লাগিল, প্রদীপের কম্পিত আলোক তরবারিগুলির ওপর সাপের ফণার মত খেলিয়া গেল। শঙ্কর একটু শান্ত হইয়া বলিতে লাগিল,—এখনও তরবারি খোলবার সময় আসেনি—এখন সাধনায় শক্তি সংগ্রহের সময়—এখন যেন আমরা বিরোধ না করি—ভারত সিং তোমার কি বলবার আছে?

সকলে একটু বিস্মিত হইয়া ভারতসিংহের দিকে চাহিল। ভারত সিং স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, সে অনেক কথা বলিবে ভাবিয়া আসিয়াছিল। সে কিছুই বলিতে পারিল না, শুধু ধীরে বলিল—আমি আলি মহম্মদ। সকলে অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিল, ঠিক যেন বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। ভারতসিংহ আবার ধীরে বলিল— যে আলি মহম্মদের নাম তোমরা সবাই শুনেছ, আমি সেই আলি, ছদ্মবেশে তোমাদের মধ্যে এসেছি—

সকলে একটু ক্ষুব্ধ স্তব্ধ হইয়া রহিল, শুধু ভূতপূর্ব্ব দলপতি অজিত সিং বলিয়া উঠিল—তুমি মুসলমান!

শঙ্কর একটু ব্যথিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—হাঁ, মুসলমান, কিন্তু ভাই আমাদের ধর্ম্ম কি? একমাত্র দেশ সেবাই কি আমাদের ধর্ম্ম নয়—আমাদের কি জাত? সমস্ত দেশসেবক ভাইয়েরা কি এক জাত নয়—কে আমাদের আত্মীয় বন্ধু, কোথায় আমাদের ঘর? ভারতের প্রতি সন্তান কি আমার ভাই নয়—বলিয়া শঙ্কর ভারতসিংহকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। শঙ্করের কথায় ব্যবহারে সকলে বিমুগ্ধ হইয়া গেল। যেন তাহাদের সম্মুখে একটা ভোজবাজী হইয়া গেল। আলি মহম্মদকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিতে সকলে যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। প্রত্যেকে প্রত্যেককে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিয়া সে দিনকার সভা শেষ হইল।

সভার শেষে শঙ্কর ও আলি মহম্মদ আবার বাহিরে ভগ্নস্তূপের মধ্যে আসিয়া বসিল। মৃদু জ্যোৎস্নার আলো, মধুর বাতাস বহিতেছে, চারিদিকে জ্যোৎস্নাময় অন্ধকারের বিচিত্র মায়া। আলি মহম্মদ এ নির্জ্জন উন্মুক্ত আকাশের তলে আপনাকে যেন খুঁজিয়া পাইল, শঙ্কর এতক্ষণ তাহাকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল, সে যেন অলৌকিক শক্তি জানে, তাহার মায়ার বলে সে কিছুই বলিতে বা করিতে পারে নাই। শঙ্করের দিকে সে চাহিয়া দেখিল, তাহার মুখের সে উজ্জ্বল জ্যোতিঃ ম্লান হইয়া স্বাভাবিক হইয়াছে। ধীরে সে বলিল,—কিন্তু, আমি কাল যাচ্ছি—

কোথায়?

আমি ত ভুলতে পাচ্ছি না, আমি মুসলমান—

তোমায় ত আমি ভুলতে বলিনি, তুমি মুসলমান, এই তোমার সত্য পরিচয় নয়, তার চেয়েও বড় তুমি, তুমি ভারতের—

তাই আমি যুদ্ধে যেতে চাই, আজ ভারতের রাজধানী কি বিপন্ন নয়, আজ ভারতের মোগল সাম্রাজ্যের কি দুর্দ্দিন আসেনি?

হাঁ, আজ ঝড় উঠেছে, তাসের ঘর বুঝি টেঁকে না— কিন্তু দেখো কি শান্ত আকাশ, ওই তারাটার নাম জানো, ওই দূরে জল্ জল ক'রছে—

না, শুনুন আপনি, কাল দিল্লীর বাদশা স্বয়ং যাচ্ছেন নাদিরের পথরোধ করতে, তাঁর চিঠি নিয়ে আমাকে লক্ষ্ণৌ যেতে হবে সদৎখাঁর কাছে—বাদশা রাজপুত রাজাদের কাছে, পেশোয়া বাজীরাওয়ের কাছে সাহায্যভিক্ষা চেয়ে পাঠিয়েছেন কিন্তু কেউই এলো না—

তুমি তাহলে আবার আত্মপরিচয় দিয়েছ—

হাঁ, এখন, দিল্লীর বিপদের সময় -সদৎখাঁকে নিয়ে আমি পাঞ্জাবে যাবো—

বেশ, তোমায় বাধা দেব না, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্চি নাদির একটা উল্কার মত এসে চারিদিক জ্বালিয়ে চলে যাবে, এ সাম্রাজ্য চূর্ণবিচূর্ণ করে—ভারত, ভারত, তুমি পারবে—আমি দেখতে পাচ্চি তোমার মধ্যে—

ভারতসিংহের মধ্যে মুসলমান মানুষটি শঙ্কিত হইয়া উঠিল, বুঝি আবার তাহার সঙ্কল্প টুটিয়া যায়, সে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—আমাকে প্রলুব্ধ করবেন না—

মৃদু হাসিয়া শঙ্কর বলিল—হায়, তুমি জান না তুমি কে —আচ্ছা বেশ, রাজনীতিচর্চ্চা থাক, এসো একটু জ্যোতির্ব্বিদ্যা আলোচনা করি—দেখ ওই যে তারাটা—

শঙ্কর তাহাকে তারালোকের অপূর্ব্ব রহস্য কথা বলিয়া যাইতে লাগিল। ভারতসিংহ কিন্তু নিবিষ্ট মনে কিছু

শুনিতে পারিল না, সে বার বার ভাবিতে লাগিল, হয়ত সত্যই তাহার মধ্যে কোন সম্রাট জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

(৯)

প্রায় দুইমাস পরে।

এই দুই মাসে ভারতের ইতিহাস বদলাইয়া গিয়াছে। দিল্লীর বাদশা কর্ণালের যুদ্ধে নাদিরশার নিকট পরাস্ত ও বন্দী হয়েছেন। সেই বন্দী সম্রাটকে লইয়া নাদির আজ দিল্লীর সিংহাসনে আসিয়া বসিয়াছেন।

সন্ধ্যার অন্ধকারে নতমুখে ধীরপদে আলি মহম্মদ দিল্লীতে প্রবেশ করিল। হায়, সে সম্রাট হইবার স্বপ্ন দেখিয়াছিল, কিন্তু আজ দিল্লীর ময়ুর-সিংহাসনে কে বসিয়া—সুদূর পারস্যের এক দুর্দ্ধর্ষ দস্যু। পথে চারিদিকে নাদিরের বিজয়ী সৈন্যেরা লাল তুর্কী টুপি পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, উৎসব করিতেছে, ভীত পরাজিত দিল্লীবাসী মুখে করুণ হাসি লইয়া তাহাদের উৎসবে যোগ দিয়াছে। আলি মহম্মদ এই ভীষণ করুণ আনন্দ-উৎসব দেখিতে দেখিতে চলিল। চারিদিকে নাদিরের সৈন্য,—এই ত নাদিরের শক্তির উৎস, লোহার মত দৃঢ়, ঝঞ্ঝার মত রুদ্র, মৃত্যুর মত নির্ম্মল এই সবল সুদক্ষ সুশিক্ষিত সৈন্যদলই নাদিরের একমাত্র শক্তি; এইরূপ এক বৃহৎ সৈন্যদল গঠন করিয়া তাহাদের নেতা হইতে পারিলেই ত সে বিজয়ী সম্রাট হইতে পারিবে। এতদিন সে ভুল পথে গিয়াছে, তার অধীনে পাঠান সেনাদের সে যদি এইরূপ সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারিত তাহা হইলে হয়ত কর্ণালে নাদিরকে পরাজিত করিতে পারিত। কর্ণাল যুদ্ধে আমীর-উল-ওমরা যখন আহত হইল ও সদৎখাঁ বন্দী হইল, সে সম্রাট সৈন্য লইয়া একবার নাদিরের সহিত রণচাতুর্য্যের পরীক্ষা করিবার জন্য বাদশা'র কাছে নিবেদন করিয়াছিল, কিন্তু নিজাম ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাহাকে সৈন্য চালনার ভার দিলেন না, তাঁহার ভয় হইল, আলি জিতিলে সেই হয়ত আমীর-উল-ওমরা বা বাদশাহের প্রধান সৈনাধ্যক্ষ হইবে। তিনি নাদিরের সহিত সন্ধির প্রস্তাবে মত দিলেন। সন্ধি করিতে গিয়া বাদশা যখন বন্দী হইলেন, আলি মহম্মদ তাহার ক্ষুদ্র সৈন্যদল লইয়া দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইল। দিল্লীতে আসিয়া নগরাধ্যক্ষ লুৎফউল্লা খাঁর সহিত মিলিয়া নগর রক্ষার ব্যবস্থা করিতেছে, এমন সময় সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে নাদিরের জন্য দিল্লী অধিকার করিতে সসৈন্য সদৎখাঁ আসিয়া হাজির হইল। ব্যর্থ ক্ষুব্ধ হইয়া আলি মহম্মদ আপন পাঠান সেনাদল লইয়া দিল্লী ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু দিল্লীকে সে ভুলিয়া থাকিতে পারে না; এ যে তার প্রিয়া, তার স্বপ্নের রাণী, তার শিরে একদিন বিজয়-মুকুট পরাইবে, এ বন্দিনী দিল্লীকে সে দেখিতে আসিয়াছে।

পরাজিত সম্রাট যেদিন নতমুখে স্তব্ধ দিল্লীতে প্রবেশ করিলেন, উৎসব-বাদ্য বাজিল না, জয়পতাকা উড়িল না, মূক ব্যথায় বন্দিনী তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল না। পরদিন প্রভাতে যখন বিজয়ী নাদির মহাসমারোহে দিল্লী প্রবেশ করিলেন, সেনাদলের অশ্বক্ষুরবিক্ষত দিল্লীর পথে বিজয়-বাদ্য বাজিয়া উঠিল, ক্রূর হাসিয়া হাসিয়া রহস্যময়ী নগরী বিজয়ী বীরের দিকে চাহিল। বীরভোগ্যা সে, আজ তাহার মসজিদে মসজিদে নাদির সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, তাহার নামে প্রার্থনা হইয়াছে।

বসন্তের মধুর বাতাস বহিতেছে, জ্যোৎস্নার আলো চারিদিকে ঝিকিমিকি করিতেছে, হোলি উৎসব আসিতেছে। আলি মহম্মদ তারাভরা আকাশের দিকে একবার চাহিল, সম্মুখে জুম্মা মসজিদের মিনারগুলি করুণ প্রার্থনার মত উর্দ্ধে করযোড়ে যেন চাহিয়া আছে, এ চিরবিলাসিনী দিল্লী আজ ক্ষুব্ধ নত একাকিনী উদাসিনী দাঁড়াইয়া, তাহার মুখে উৎসবের ক্রূর হাসি, তাহার বুকে প্রতিহিংসার নির্ব্বাক বহ্নি। এ বহ্নি একবার মুক্তি পাইলে বুঝি আপনাকে আপনি দগ্ধ করিয়া ছাই করিয়া দিবে। পথের উৎসব কোলাহল, আলোকমালা, জনপ্রবাহ আলির চোখে বড় করুণ বোধ হইল। ধীরে সে চাঁদনী চকের দিকে চলিল।

(ক্রমশঃ)

ইঙ্গিত

শ্রীবিশ্বকর্ম্মা

টুথ ব্রাস

চাপাতলায় অনেকগুলি ব্রাসের কারখানা দেখিয়াছি। জুতার ব্রাস, বনাতের কোট ঝাড়িবার ব্রাস, চুল আঁচড়াইবার ব্রাস, রং লাগাইবার ব্রাস,—সকল রকম ব্রাসই সেখানে তৈয়ারী হইতেছে। জিনিসগুলি মন্দ হইতেছে না। অবশ্য সেগুলি আরও ভাল হইতে পারে, হওয়া উচিতও বটে, এবং হইবেও বোধ হয়। কারণ, এখনও ঐ ধরণের যে সব জিনিস বিদেশ হইতে আমদানী হয়, সেগুলি আমাদের দেশী ব্রাসের অপেক্ষা অনেক ভাল। তবে দেশী ব্রাসগুলিতে একরকম কাজ চলিয়া যাইতেছে, এবং বিক্রীও হইতেছে বেশ।

কিন্তু দেশী টুথ ব্রাস ত এখনও হইতে দেখিতেছি না। কেন? যখন সব রকম ব্রাস তৈয়ার হইতেছে, তখন টুথ ব্রাসই বা হইবে না কেন? ইহার হাড়, শূকরের লোম, কোন জিনিসই ত এখানে দুর্লভ নয়। আর জাপানী ধরণে হইলে বাঁশের হাতলেও হইতে পারে। শূকরের লোমেও কোন আপত্তি হইবে না বোধ হয়; কারণ, জাপানী কিম্বা ফরাসী কিম্বা বিলাতী যে সব টুথ ব্রাস আমদানী হইতেছে, সেগুলিও শূকরের লোমে প্রস্তুত; এবং তাহা অনেকেই ব্যবহার করিতেছেন।

তবে একটা কথা আছে। লোমগুলিকে ঔষধের দ্বারা শোধিত করিয়া (disinfect) লইতে হইবে। কারণ, শূকর বড় নোংরা জীব; এবং একবার জাপানী ব্রাস ব্যবহারের ফলে স্থান বিশেষে বহু লোকে anthrax রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল; এবং সেই ঘটনা লইয়া সংবাদপত্রে খুব হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল—জাপানী ব্রাসের আমদানী বন্ধ করিবারও কথা উঠিয়াছিল।

যে সকল ব্রাসের হাতল কাঠের, এবং যে সকল ব্রাস অন্য কাজে ব্যবহার করিতে হয়, সেগুলি তৈয়ার করিবার যন্ত্রগুলি মোটামুটি ধরণের হইলেই চলে। কিন্তু টুথ ব্রাস সৌখিন জিনিস, তাহা তৈয়ার করিবার যন্ত্রগুলিও কিছু সূক্ষ্ম হওয়া আবশ্যক। আর টুথ ব্রাস তৈয়ার করিতে হইলে কারিগরের কিছু অধিক নিপুণতাও থাকা চাই।

টুথ ব্রাসের লোমগুলি খুব সাদা ধবধবে হওয়া দরকার। সেজন্য উপযুক্ত লোম বাছিয়া লইয়া সেগুলিকে পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। অল্প গরম জলে soft soap দ্রব করিয়া সেই সাবান-গোলা জলে লোমগুলিকে প্রথমে বেশ করিয়া কাচিয়া লইতে হইবে। তার পর পরিষ্কার জলে ধুইয়া, sulphurous acidএর জলে দুই তিন দিন ভিজাইয়া রাখিলে, লোমগুলি খুব সাদা ত হইবেই, ইহাতে শোধনের (disinfecting) কাজও হইবে।

টুথ ব্রাসের লোমগুলি হাতলে তার দিয়া বসাইতে হয় না—উহা যুড়িবার আলাদা মসলা আছে। পিচ কিম্বা পাতগালা ১ কি ২ ভাগ, গটাপর্চ্চা ১ ভাগ একত্র করিয়া মৃদু তাপে গলাইয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া লইতে হইবে। মিশ্রিত হইলে শীতল জলে ঢালিয়া ঠাণ্ডা করিয়া লইতে হইবে। ব্যবহারের সময় ঈষৎ উত্তপ্ত করিয়া গলাইয়া লইয়া ব্যবহার করিতে হইবে। টুথ ব্রাসের হাতলে লোম যুড়িবার জন্য শিরিস কিম্বা ঐ রকম কোন আঠা ব্যবহার করা উচিত নহে। জলে না গলিয়া যায় অথচ লোমগুলি শক্তভাবে আটকাইয়া থাকে এমন অন্য কোন রকম আঠাও ব্যবহার করিতে পারা যায়। হাতলটিও খুব সাদা ও মসৃণ হওয়া চাই।

জাপানী ধরণে ভাত রান্না

আজ আমি আপনাদিগকে একটা নূতন ধরণের কথা বলিব। আমাদের দেশ দিন-দিন অধিকতর দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। এখন আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে মিতব্যয়ী হইতে হইবে, সকল রকম অপচয় নিবারণের চেষ্টা করিতে হইবে।

চাল আমাদের প্রধান খাদ্য। সেই চালের দাম দিন-দিন কিরূপ বাড়িয়া যাইতেছে, তাহা সকলেই

দেখিতেছেন। এখন হয় ধান্য কম জন্মিতেছে, না হয় বেশী লোকের জন্য চাউলের যোগান দিতে হইতেছে, অথবা খুব বেশী পরিমাণে চাউল বিদেশে রপ্তানী হইতেছে। এই তিনটি কারণের কোন একটা কারণে, কিম্বা দুইটী অথবা তিনটী কারণের সমবায়ে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে।

আমরা ভাত রাঁধিয়া ফ্যান ফেলিয়া দিয়া ভাত খাই। যাহাদের বাড়ীতে গরু কিম্বা ছাগল থাকে, তাঁহাদের বাড়ীতে হয় ত ফ্যানটা একেবারে নষ্ট হয় না,—গরু-ছাগলে খাইতে পারে। কিন্তু অন্য সকল বাড়ীতে ফ্যান ফেলা যায়। কিন্তু ফ্যান অখাদ্য নহে। ফ্যানে চাউলের অনেকটা সারাংশ থাকে। সেটা খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইলে চাউলের খরচ নিশ্চয়ই কিছু কমিতে পারে।

তাই বলিয়া আমি গোরু ছাগলের মতন কাহাকেও ফ্যান চুমুক দিয়া কিম্বা ভাতে মাখিয়া খাইতে বলিতেছি না; এবং সেটা কেহ পছন্দ করিবেন না। অথচ ফ্যানটা নষ্ট হইতেও দেওয়া যাইতে পারে না। সুতরাং এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে ফ্যান নষ্ট না হয়।

বিধবারা আলোচালের ভাত খান। তাঁহারা এমন ভাবে ভাত রাঁধেন যে তাঁহাদের ফ্যান গালিতে হয় না। আবার সিন্ধু দেশে আলোচালের ভাতও এমন ভাবে রাঁধা হয় যে, তাহারও ফ্যান গালিয়া ভাত খাইতে হয়। সে যাক। বিধবারা নিজেদের জন্য আলোচালের ভাত রাঁধিবার সময় এমন পরিমাণ মত জল দেন যে, ভাতগুলিও সুসিদ্ধ হয়, অথচ, ফেলিবার মত একটুও ফ্যান উদ্বৃত্ত হয় না। আবার তাঁহারাই যখন গৃহস্থের জন্য সিদ্ধ চালের ভাত রাঁধেন, তখন জল এত বেশী ব্যবহার করেন যে, ফ্যান না গালিলে চলে না।

অবশ্য পরিমাণ মত জল দিয়া রাঁধিলে সিদ্ধ চাউলের ভাতের হয় ত ফ্যান গালিতে হয় না। কিন্তু একই হাতে যখন দুই রকম চালের ভাত দুই রকমে রান্না হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, সিদ্ধ চালের ভাত রাঁধিবার সময় পরিমাণ মত জল দিয়া রাঁধিবার সুবিধা হয় না। কিন্তু এরূপ কুব্যবস্থা আর চলিতে দেওয়া যাইতে পারে না, এবং দেওয়া হইবেও না। ইহার প্রতিকার করিতেই হইবে। নচেৎ আমাদের দুর্দ্দশা দিন দিন অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিবে।

আজকাল রন্ধনের সাহায্যের জন্য একরকম "কুকার" প্রচলিত হইয়াছে; তাহাতে ভাতের ফ্যান গালিতে হয় না। কিন্তু এই কুকার কেবল ধনীরাই ব্যবহার করিয়া থাকেন; তাহাও নিত্য নয়। কুকার বোধ হয় সর্ব্বসাধারণের পক্ষে নিত্য ব্যবহার্য্য হয় নাই; নচেৎ এত সুবিধা সত্ত্বে সর্ব্বসাধারণ নিত্য তাহা ব্যবহার করেন না কেন? আমার বোধ হয়, কুকার কেবল বিশেষ বিশেষ স্থলে ও বিশেষ বিশেষ সময়ে ধনী লোকদের ব্যবহার্য্য জিনিসই থাকিবে—উহা সর্ব্বসাধারণের নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তু হইবে না। অতএব সর্ব্বসাধারণের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবহারের জন্য উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইবে। এক কথায়, আমাদিগকে জাপানী প্রথায় ভাত রাঁধিতে হইবে; অর্থাৎ বাষ্পের সাহায্যে চাউল সিদ্ধ করিতে হইবে। জাপানীরা আমাদের মতই অন্নভোজী। তাঁহারা এই প্রথায় বাষ্পের সাহায্যে ভাত রাঁধিয়া খান। তাঁহাদের অন্ন একটুও অপচয় হয় না; এবং তাঁহারা আমাদের মত অন্নভোজী হইয়াও আমাদের অপেক্ষা সবল ও দশের মধ্যে একজন।

জাপানীদের রন্ধনপাত্র কি রকম, তাহা আমি জানি না। কেবল এইটুকু জানি যে, জাপানীরা চাউল জলে সিদ্ধ করিয়া লন না, তাঁহারা বাষ্পের সাহায্যে ভাত সিদ্ধ করেন। এই মূলতত্ত্বটুকু যখন আমাদের জানা রহিল, তখন, আমরা একটা উপায় বাহির করিয়া লইতে পারিব না কেন? বাষ্পে ভাত রাঁধিবার উপযোগী করিয়া রন্ধনপাত্র তৈয়ার করিয়া লইতে পারিব না কেন?

আমি একটা উপায় স্থির করিয়াছি। এখন আমাদিগের ভাত রান্না একটী হাঁড়ীতে হয়। অতঃপর আমাদিগকে দুইটী হাঁড়ী ব্যবহার করিতে হইবে। একটা হাঁড়ী উনানের উপর থাকিবে, তাহাতে জল থাকিবে। আর একটী হাঁড়ী প্রথম হাঁড়ীটার উপর থাকিবে। দ্বিতীয় হাঁড়ীতে চাল থাকিবে। এই হাঁড়ীটী হইবে সচ্ছিদ্র। ছিদ্রগুলি খুব ছোট ছোট হইবে। ছিদ্রের মাপ এমন হইবে যে, তাহার ভিতর দিয়া চাউল গলিয়া নীচে না পড়িয়া যায়, অথচ, বাষ্প স্বচ্ছন্দে তাহার ভিতর দিয়া গিয়া চাউল স্পর্শ করিতে পারে। গরম বাষ্প আকর্ষণ করিয়া লইয়া চাউলগুলি সুসিদ্ধ হইবে, অথচ ফ্যান গালিবার মত

অতিরিক্ত জল টানিতে পারিবে না। ইহাতে আর এক সুবিধা এই যে, ভাত কখনও আঁকিয়া বা ধরিয়া বা পুড়িয়া যাইবে না। আর একটা সুবিধা এই যে, যতক্ষণ ইচ্ছা ভাত সমান গরম রাখিতে পারা যাইবে—গরম জলের হাঁড়ীর উপর ভাতের হাঁড়ী বসাইয়া রাখিলেই হইল। তৃতীয় সুবিধা—ভাত মাপে বাড়িবে, কারণ, ক্যান বাদ যাইবে না। চতুর্থ সুবিধা—ভাতগুলি বেশ ঝরঝরে থাকিবে, অতিরিক্ত গলিয়া গিয়া ডাালা পাকাইয়া যাইবে না, কিম্বা আধ-সিদ্ধ, শক্ত থাকিবে না। বলা বাহুল্য, প্রথম হাঁড়ীটা বেশ বড় হওয়া চাই, যেন তাহাতে যথেষ্ট জল ধরে, অথচ, ফুটন্ত জল উপরের চাউলের হাঁড়ীতে গিয়া পৌছিতে না পারে,—কেবল বাষ্পটুকু দ্বিতীয় হাঁড়ীর ভিতর যাইতে পারে, শুধু এই ব্যবস্থাটুকু করিয়া লইতে হইবে।

কিন্তু যত সহজে আমি আপনাদের কাছে এই প্রস্তাবটি করিতে পারিতেছি, আপনারাও ইহাকে যত সহজ মনে করিতেছেন,—কাজটি বাস্তবিক তত সহজ নয়। প্রথমতঃ আমাদের দেশ এত বেশী রক্ষণশীল, পুরাতনের প্রতি আমাদের প্রীতি এত প্রবল যে, ইহার উপকারিতা লোককে বুঝাইয়া দিয়া এই উপায় অবলম্বনে তাহাদিগকে প্রবৃত্ত করিতে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, রন্ধন পাত্রের ব্যয় এখন আমাদের যাহা পড়িতেছে, সংশোধিত উপায় অবলম্বন করিতে গেলে, তাহা কিছু বেশী,—বোধ হয় দ্বিগুণই পড়িবে। কিন্তু, ইহাতে চাউলের খরচ নিশ্চয়ই যথেষ্ট কমিবে; মোটের উপর কিছু লাভই থাকিয়া যাইতে পারে। কিন্তু এ তত্ত্বটি প্রথম প্রথম লোককে বুঝানোই কঠিন।

তৃতীয়তঃ, যে সচ্ছিদ্র হাঁড়ীতে চাউল থাকিবে, তাহা প্রথম প্রথম বাজারে কিনিতে পাওয়া যাইবে না, ফরমাস দিয়া তৈয়ার করাইয়া লইতে হইবে। কুমোররা প্রথম প্রথম এরূপ হাঁড়ী গড়িতে সম্মত হইবে কি না, সে পক্ষেও আমার ঘোর সন্দেহ আছে। তবে ইহাও দেখা যায় যে, সচ্ছিদ্র ভাতের হাঁড়ী তাহারা তৈয়ার না করুক, তুলসী গাছে জল দিবার জন্য "সহস্র ঝারা" তাহারা তৈয়ার করিয়া রাখে। আর আমাদের কলঙ্কভঞ্জনের দেশে সহস্র-ছিদ্র কলসীও বোধ হয় এক সময়ে তৈয়ার হইত। (শ্রীরাধিকার কলঙ্কভঞ্জন বহুকাল পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে। এখন মালক্ষ্মীদের কাছে আমার এই সকাতর প্রার্থনা—সহস্র-ছিদ্র হাঁড়ীতে ভাত রাঁধিয়া তাঁহারা আমাদের জাতীয় কলঙ্ক মোচনে সহায়তা করুন!) অতএব কুমোরদিগকে ফরমাইস দিয়া সচ্ছিদ্র হাঁড়ী তৈয়ার করিয়া লওয়া একেবারে অসম্ভব হইবে বলিয়াও বোধ হয় না।

আরও কোন কোন অসুবিধা হইতে পারে। সে সকলের উল্লেখ না করিলেও চলে। মোট কথা, জাতীয় কল্যাণের জন্য এই ব্যবস্থাটি আমাদিগকে করিতেই হইবে। ইহাতে যতই অসুবিধা ঘটুক, সে সমস্ত অতিক্রম করিতেই হইবে।

আমি গোড়াতে আপনাদিগকে বলিয়াছি যে, আজ আমি আপনাদিগকে একটা নূতন ধরণের কথা শুনাইব। কথাটা কতকটা নূতন ধরণের শুনাইতেছেও বটে। আসলে কিন্তু আমার এ কথাটা আগাগোড়াই নূতন নয়। ভাতের ফ্যান গালা নিবারণের জন্য অনেক বৎসর পূর্ব্বে কিছু আন্দোলন হইয়াছিল। কোন একটা ভদ্রলোক কিম্বা কোন একটা ক্লাব ভাতের ফ্যান না গালিবার উপকারিতা সম্বন্ধে প্রবন্ধ আহ্বান করিয়া পুরস্কার দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন,—প্রবন্ধ বিরচিত হইয়া পুরস্কার লাভও করিয়াছিল বলিয়া যেন মনে পড়ে। তবে সে প্রবন্ধ দেখিবার ও পড়িবার সৌভাগ্য আমার ঘটে নাই। আবার, বাষ্পে ভাত রাঁধার কথাও আমার নিজের কথা নয়—উহা জাপান হইতে ধার করা। সুতরাং এই প্রসঙ্গে নূতনত্বের কোন দাবীই আমি করিতেছি না, আমি কেবল আপনাদিগকে একটা পুরাতন কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি মাত্র। যে ধরণের হাঁড়ীতে ভাত রাঁধিবার প্রস্তাব আমি করিতেছি, তাহা আপনারা ভাবিয়া দেখুন। যদি সুবিধা বুঝেন, করুন। যদি এতদপেক্ষা ভাল উপায় কেহ বাহির করিতে পারেন, তাহা হইলে আরও ভালই হয়। তখন তিনি তাহার 'পেটেণ্ট' লইয়া ভাল ব্যবসা চালাইতে পারেন; এবং সর্ব্বসাধারণ এই প্রথার উপকারিতা বুঝিয়া ইহা গ্রহণ করিলে, চাই কি তিনি প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিতে পারেন। কিন্তু প্রথম ও প্রধান কথা—দেশের লোককে ইহার উপকারিতা ও সুবিধাগুলি বুঝাইয়া দেওয়া; লাভ-লোকসানের খতিয়ান করিয়া দেখাইয়া তাহাদিগকে এই প্রথা অবলম্বনে প্রবৃত্ত করা। কিন্তু

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কাজটি মোটেই সোজা নয়। সেজন্য, যাঁহারা আমার এই প্রস্তাবের উপকারিতা বুঝিবেন এবং স্বীকার করিবেন, তাঁহাদিগকে প্রথমে অগ্রসর হইতে হইবে ; কিছু ত্যাগ স্বীকার, হয় ত কিছু ক্ষতি স্বীকারও করিতে হইবে। প্রথমে তাঁহাদিগকে নিজ নিজ বাড়ীতে নিজ নিজ পরিবারে এই প্রথা চালাইতে হইবে। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত হইতে ইহার উপকারিতা ও সুবিধা প্রত্যক্ষ করিয়া অন্য লোকে ইহা অবলম্বন করিবে। Example is better than precept এই কথাটি এ ক্ষেত্রে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। তার পর একবার লোকে বুঝিয়া লইলে আর ভাবনা নাই—শনৈঃ শনৈঃ এ প্রথা প্রতি গৃহে অবলম্বিত হইবে।

শেষ কথা। আমি দুইটী আলাদা আলাদা হাঁড়ীর কথা বলিয়াছি। যদি তৈয়ার করাইবার সুবিধা হয়, তবে দুইটী হাঁড়ী একসঙ্গে combined ভাবেও হইতে পারে। অর্থাৎ দোতালা হাঁড়ী হইবে। আর মাটীর হাঁড়ীর পরিবর্ত্তে ধাতুপাত্রও ব্যবহার করা যাইতে পারে। পিতলের বা কলাইকরা তাঁবার হাঁড়ী কিম্বা এনামেল বা এ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ী বা ডেকৃচিও ব্যবহার করা যায়। চা ছাঁকিবার এ্যালুমিনিয়ামের ঝাঁঝরীতে যেরূপ ছিদ্র থাকে, হাঁড়ীগুলির তলায় সেইরূপ ছিদ্র করিয়া লইলে চলিবে। ফলে জাতির পক্ষে মহাকল্যাণকর একটী প্রথার প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটী নূতন শিল্পেরও সৃষ্টি হইবে। যাঁহারা নূতন হাঁড়ী বা ধাতুপাত্র নির্ম্মাণ করিবেন, তাঁহারা আর্থিক লাভ পাইবেন। যাঁহারা এই হাঁড়ী ব্যবহার করিবেন, তাঁহারাও ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না—সাংসারিক ব্যয় হ্রাস হইলে সেটাকেও লাভ বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে। তার পর স্বাস্থ্য ও বল লাভ—সেটা ফাউয়ের মধ্যে ধরুন। *

---

* শ্রীবিশ্বকর্ম্মার এই প্রস্তাবটি অতি সমীচীন। কিন্তু ইহা অতি বিরাট প্রশ্ন। বিশ্বকর্ম্মা প্রধানতঃ শিল্প-প্রচেষ্টার দিক হইতে কথাটা উত্থাপন করিয়াছেন, এবং প্রসঙ্গক্রমে অর্থনীতির দিকটা কেবল স্পর্শ করিয়া গিয়াছেন মাত্র। কিন্তু ইহার একটা স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের দিক আছে। সকল দিক হইতে যথোচিতভাবে আলোচনা না হইলে সুফল লাভের আশা কম।

'ভাপে' (বাষ্পে) রান্না আমাদের দেশে একেবারে নূতন বা সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত নহে। স্থলবিশেষে, সময়বিশেষে, ব্যক্তিবিশেষের জন্য 'ভাপে' রান্না ভাতের ব্যবস্থা করিতে হয়। বঙ্গ-মহিলারা ভাপে রান্নার নিয়মও জানেন। তবে কেন যে সাধারণ ভাবে এই সুন্দর প্রথা এ দেশে চলে না,—রহস্য এইখানেই। অনেকের ধারণা, ভাপে রান্না ভাত সহজে হজম হয় না। কথাটা অযৌক্তিক নয়। কিন্তু তাহার কারণ আছে। ভাপে রান্না ভাত নিয়মিত ভাবে নিত্য আহার করিলে, তাহা হজম করিবার জন্য যথেষ্ট শারীরিক পরিশ্রম করা দরকার। শ্রম-বিমুখ, আলস্যপরায়ণ, বিলাসী লোকদের ভাপে রান্না ভাত হজম না হইবারই কথা। সেই কারণে ধনী ও বিলাসী লোকদের জন্য ভাতের ফ্যান গালার প্রয়োজন হয়। আর তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র লোকদের মধ্যে এই প্রথা চলিতেছে। ভাপে রান্না ভাত যে কতখানি পুষ্টিকর, ফ্যান গালিয়া ভাত খাওয়ায় অন্নের কতখানি সারভাগ যে অপচয় হইতেছে, সে কথা কেহই চিন্তা করিয়া দেখেন না। কিন্তু আজ এই জীবন-সংগ্রামের দিনে, অন্ন-সমস্যার সঙ্কিক্ষণে জাতীয় অর্থনীতির দিক হইতে কথাটা ভাবিয়া দেখিবার বিলক্ষণ প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। ধনী, শ্রম-বিমুখ, অলস, বিলাসী লোকদের যদিই ভাপে রান্না ভাত হজম না হয়,—দরিদ্র, পরিশ্রমী লোকদের সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। ধনী লোকেরা না হয় ফ্যান-গালা ভাত খাইয়া, দুগ্ধ, ঘৃত ও অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্যের দ্বারা তাঁহাদের অভাব পোষাইয়া লইতে পারেন। কিন্তু যাহারা দুবেলা দুমুঠা পেট ভরিয়া ভাত খাইতে পায় না, অথচ দিবসের অধিকাংশ সময় যাহাদিগকে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে হয়,—একটা প্রথা মাত্রের অনুসরণ করিতে গিয়া তাহাদিগকে এরূপ পুষ্টিকর খাদ্য হইতে বঞ্চিত রাখা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে।

চাউল যেমন বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য (staple food), গোধুম তেমনি পশ্চিমাদিগের প্রধান খাদ্য। আমরা ভাতের ফ্যান গালিয়া পুষ্টিকর অংশ বাদ দিয়া ভাত খাই বলিয়া আমরা দুর্ব্বল, শক্তিহীন কাজেই সাহসহীন, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে শ্রম-কাতর। আর গোধুমের ফ্যান গালিয়া খাইতে হয় না, উহার খোসা বাদে সবটা খাওয়া হয়-বলিয়া পশ্চিমারা সবল, তেজস্বী, সাহসী। বাঙ্গালী জাতিকে যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তবে তাহার রন্ধনপ্রণালীর ও আহার্য্য বস্তুর সংশোধন করিতেই হইবে। ভাপে রান্না ভাত খাইবার প্রথা সাধারণ ভাবে প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। প্রথম প্রথম সহ্য না হইলে দুই একদিন অন্তর কিম্বা সপ্তাহে দুই দিন খাইয়া অভ্যাস আনিতে হইবে। এবং হজম করিবার জন্য নিয়মিত ভাবে শারীরিক পরিশ্রম অথবা ব্যায়াম করিতে হইবে। তবেই আমাদের বল, বীর্য্য, সাহস ফিরিয়া আসিবে, তবেই আমরা যথার্থ মানুষ বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিতে পারিব। বিষয়টী অতি গুরুতর ও ব্যাপক। সে কারণে, একটু বিস্তৃত ভাবে এই প্রশ্নটির আলোচনা হওয়া আবশ্যক। আমরা জাতীয় অর্থনীতি ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি।—ভারতবর্ষ সম্পাদক।

সম্পাদকের বৈঠক

প্রশ্ন

৫৩। মুদ্রা-তত্ত্ব

একটী তাম্রমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহার এক পৃষ্ঠে মধ্যস্থলে একটী সিংহাকৃতি। অপর পৃষ্ঠের লেখা অস্পষ্ট। কোন ঐতিহাসিক বলিয়া দিবেন কি, সিংহাকৃতি বিশিষ্ট মুদ্রা কোন দেশের, কোন সময়ের এবং কোন রাজা কর্ত্তৃক মুদ্রিত?

অন্য একটী তাম্রমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহার এক পৃষ্ঠে মধ্যস্থলে একটী বৃষাকৃতি। পার্শ্বে দেবনাগরী অক্ষরে লেখা "শ্রীমৎ মহারাজ শিবাজী রাব হোলকার ইন্দোর"। অপর পৃষ্ঠে লেখা "পাব," "অনাংস" "১২৩৫"। "তারিখ" ও "অনাংস" কথাটী অস্পষ্ট। অন্য কিছু হইতেও পারে। ইন্দোরের এই শিবাজী মহারাজের বিবরণ এবং তাহার রাজত্বের প্রকৃত তারিখ কেহ অনুগ্রহ করিয়া দিবেন কি?

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৫৪। দেবপূজার বলি

কালী, দুর্গা, শীতলা, কামাখ্যা প্রভৃতি দেবীর সম্মুখে পশুপক্ষী, মাষকলাই, ইক্ষু ইত্যাদি বলি দেওয়া হয় কেন? শ্রীউমাকান্ত পাল

৫৫। প্রত্নতত্ত্ব

কুমিল্লার ৫।৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কোটবাড়ী নামক স্থানে যে সকল দালানের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের প্রতিষ্ঠাতা কে? ইহার ইতিহাস এবং প্রতিষ্ঠাতার ইতিহাস কি?

শ্রীসুধীরচন্দ্র মৌলিক

৫৬। রাধাষ্টমী-তত্ত্ব

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষে "জন্মাষ্টমীব্রত" উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে। "রাধাষ্টমী" ব্রত কোন উৎসব উপলক্ষ করিয়া অনুষ্ঠিত হয়?

শ্রীভূপতিচন্দ্র শর্ম্মা

৫৭। শিবলিঙ্গ পূজা

শাস্ত্রমতে হিন্দুজাতি সকল দেবদেবীরই পুরা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করেন; কিন্তু একমাত্র দেবতা শিবের সম্বন্ধে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। শিবের মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে "শিবলিঙ্গ" পূজা করিবার পদ্ধতি কেন হইল, এ সম্বন্ধে কেহ শাস্ত্র-সঙ্গত প্রমাণ দ্বারা বুঝাইয়া দিলে বাধিত হইব। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার

৫৮। ফেজ টুপী

মুসলমান ভ্রাতাগণ "ফেজ" বা "তুর্কী" টুপী নামক লাল বর্ণের টুপী ব্যবহার করিয়া থাকেন। ঐ টুপীগুলিতে কোনও রূপ জোড়া থাকে না। এবং ঐ টুপীগুলিতে উপরে কাল বর্ণের একটী ঝুমকা থাকে। ঐরূপ "ফেজ" বা "তুর্কী" টুপী প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত কোনও কল খরিদ করা যায় কি না? যদি এ দেশে ঐ টুপী প্রস্তুতের কল পাওয়া যায়, তবে কোথায় পাওয়া যায়? একটী কলে দৈনিক কত টুপী প্রস্তুত হইতে পারে? কলগুলি হাতে চালান যায় কি না? যদি এ দেশে ঐ সকল কল না পাওয়া যায়, তবে কোথায় পাওয়া যায়? মূল্য কত?

ঐ রূপ "ফেজ" বা তুর্কী টুপী প্রস্তুত করিবার জন্য কি কি উপাদান ব্যবহৃত হইয়া থাকে? ঐ গুলি "felt" বলিয়া টুপী প্রস্তুতের জন্য যে জিনিষ ব্যবহৃত হয় সেই "felt" কি না? উক্ত "felt" কি ভাবে প্রস্তুত করিতে হয়? "felt" প্রস্তুত করিবার কোনও কল এ দেশে পাওয়া যায় কি না? যদি পাওয়া যায় তবে কোথায় পাওয়া যায় এবং মূল্য কত?

কিরূপ মূলধন হইলে উক্ত "ফেজ" বা তুর্কী টুপী প্রস্তুত করার একটী কারখানা চালান যাইতে পারে?

Felt প্রস্তুতের উপাদান কি? সমুদায় উপাদান এ দেশে পাওয়া যায় কি না? শ্রীযজ্ঞেশ্বর বসু

৫৯। গঙ্গার গতি

বহরমপুর হইতে মুর্শিদাবাদ পদব্রজে যাইতে একটী পোল পড়ে। অনেকে বলে সিরাজউদ্দৌলা প্রভৃতির সময়ে গঙ্গার গতি ঐ পোলের নীচে দিয়া ছিল। ইহা সত্য কি না? যদি সত্য না হয়, তবে গঙ্গার গতি কোন জায়গা দিয়া ছিল? শ্রীজীবনলাল দাশগুপ্ত

৬০। সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ইংরেজী সংবাদপত্র

ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ইংরেজী সংবাদপত্র কি?

শ্রীজীবনলাল দাশগুপ্ত

৬১। প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্র

প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীতের ক্রম অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্র গ্রন্থাদিও দ্রুত লোপ পাইতেছে। সঙ্গীতের হিসাবে না হইলেও প্রাচীন সভ্যতার দিক হইতেও উহা সংরক্ষণের চেষ্টা একান্ত কর্ত্তব্য মনে হয়। পরম শ্রদ্ধাভাজন স্বর্গীয় রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের সম্পাদিত ও তাঁহার সাহায্যে প্রকাশিত গ্রন্থাদিও অধুনা দুর্লভ। উক্ত মহাত্মার পুস্তকাদিতে এবং অন্যান্য অনেকের পুস্তকে যে সকল প্রাচীন গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়, তাহা বঙ্গদেশে আর ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না। বোম্বাই, পুনা প্রভৃতি স্থানের ২।৪টী পুস্তকালয়ে ২।৩ খানা মাত্র গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি। আপনার

পাঠকবর্গ যদি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের সংগৃহীত সংবাদ প্রকাশ করেন, তবে মহদুপকার সাধিত হইতে পারে। এই সম্পর্কে নিম্নোক্ত কয়েকটী বিষয় জ্ঞাতব্য।

১। কি কি মুদ্রিত পুস্তক পাওয়া যায়, তাহাদের নাম, ভাষা, রচয়িতা ও প্রকাশকের নাম, প্রাপ্তিস্থান ও মূল্য।

২। পাঠকবর্গের কাহারও নিকট কোন প্রাচীন গ্রন্থ থাকিলে, সেই গ্রন্থের ও তাহার রচয়িতার নাম, মুদ্রিত কি হস্তলিখিত, কোন্ ভাষায় লিখিত, মুদ্রিত হইলে কোথা হইতে কবে মুদ্রিত, প্রকাশকের নাম ও মূল্য।

৩। কলিকাতার এসিয়াটিক্ সোসাইটী ও ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী অথবা ভিন্ন প্রদেশস্থ কোন পুস্তকালয়ে, কোন পুস্তক আছে কি না, তাহা কেহ অবগত থাকিলে তদ্বিবরণ প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় হইবে।

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

৬২। Balance Sheet

Balance sheetএর কোন বাংলা বা হিন্দি প্রতিশব্দ থাকিলে তাহা জানাইবেন। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

উত্তর

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ

৭৫ প্রশ্নের [ভারতে দ্বাদশটী অনাদি শিবলিঙ্গ আছে কোথায় কোথায় এবং তাহার বিশেষত্ব কি?] যথাসাধ্য উত্তর। বর্ত্তমানে অনেক স্থানের নাম পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

দ্বাদশজ্যোতির্লিঙ্গানি

সৌরাষ্ট্রে সোমনাথঞ্চ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুনম্।
উজ্জয়িন্যাং মহাকালমোঙ্কারমমলেশ্বরম্॥ ১
পরল্যাং বৈদ্যনাথঞ্চ ডাকিন্যাং ভীমশঙ্করম্।
সেতুবন্ধেতু রামেশং নাগেশং দারুকাবনে॥ ২
বারাণস্যাং তু বিশ্বেশং ত্র্যম্বকং গৌতমী তটে।
হিমালয়ে তু কেদারং ঘুসৃণেশং শিবালয়ে॥ ৩
এতানি জ্যোতির্লিঙ্গানি সায়ংপ্রাতঃ পঠেন্নরঃ।
সপ্তজন্মকৃতং পাপং স্মরণেন বিনশ্যতি॥ ৪

ইতি দ্বাদশজ্যোতির্লিঙ্গানি।

দ্বাদশজ্যোতির্লিঙ্গস্তোত্রম্।

সৌরাষ্ট্রদেশে বিশদেঽতিরম্যে
জ্যোতির্ম্ময়ং চন্দ্রকলাবতংসম্।
ভক্তিপ্রদানায় কৃপাবতীর্ণং
তং সোমনাথং শরণং প্রপদ্যে॥ ১

শ্রীশৈলশৃঙ্গে বিবুধাতি সঙ্গে
তুলাদ্রিতুঙ্গেঽপি মুদা বসন্তম্
তমর্জ্জুনং মল্লিকপূর্ব্বমেকং
নমামি সংসার সমুদ্র সেতুম্॥ ২

অবন্তিকায়াং বিহিতাবতারং
মুক্তি প্রদানায় চ সজ্জনানাম্।
অকালমৃত্যোঃ পরিরক্ষণার্থং
বন্দে মহাকাল মহাসুরেশম্॥ ৩

কাবেরিকানর্ম্মদয়োঃ পবিত্রে
সমাগমে সজ্জনতারণায়।
সদৈব মান্ধাতৃপুরে বসন্ত-
মোঙ্কারমীশং শিবমেকমীড়ে॥ ৪

পূর্ব্বোত্তরে প্রজ্বলিকা নিধানে
সদা বসন্তং গিরিজাসমেতম্।
সুরাসুরারাধিত পাদপদ্মং
শ্রীবৈদ্যনাথং তমহং নমামি॥ ৫

যাম্যে সদঙ্গে নগরেঽতিরম্যে
বিভূষিতাঙ্গং বিবিধৈশ্চ ভোগৈঃ।
সদ্ভক্তিমুক্তিপ্রদমীশমেকং
শ্রীনাগনাথং শরণং প্রপদ্যে॥ ৬

মহাদ্রিপার্শ্বেচ তটে রমন্তং
সংপূজ্যমানং সততং মুনীন্দ্রৈঃ।
সুরাসুরৈর্যক্ষমহোরগাদ্যৈঃ
কেদারমীশং শিবমেকমীড়ে॥ ৭

সহ্যাদ্রিশীর্ষে বিমলে বসন্তং
গোদাবরীতীর পবিত্রদেশে।
যদ্দর্শনাৎ পাতকমাশু নাশং
প্রয়াতি তং ত্র্যম্বকমীশমীড়ে॥ ৮

সুতাম্রপর্ণীজলরাশিযোগে
নিবধ্য সেতুং বিশিখৈরসংখ্যৈঃ।
শ্রীরামচন্দ্রেণ সমর্পিতং তং
রামেশ্বরাখ্যং নিয়তং নমামি॥ ৯

যং ডাকিনীশাকিনিকা সমাজে
নিষেব্যমানং পিশিতাশনৈশ্চ।
সদৈব ভীমাদিপদ প্রসিদ্ধং
তং শঙ্করং ভক্তহিতং নমামি॥ ১০

সানন্দমানন্দবনে বসন্ত-
মানন্দকন্দং হৃতপাপবৃন্দম্।
বারাণসীনাথমনাথনাথং
শ্রীবিশ্বনাথং শরণং প্রপদ্যে॥ ১১

ইলাপুরে রম্যবিশালকেঽস্মিন্-
সমুল্লসন্তঞ্চ জগদ্বরেণ্যম্।
বন্দে মহোদারতরস্বভাবং
ঘৃষ্ণেশ্বরাখ্যং শরণং প্রপদ্যে॥ ১২

জ্যোতির্ম্ময়দ্বাদশলিঙ্গকানাং
শিবাত্মনাং প্রোক্তমিদং ক্রমেণ।
স্তোত্রং পঠিত্বা মনুজোঽতিভক্ত্যা
ফলং তমালোক্য নিজং ভজেচ্চ ॥১৩
ইতি শ্রীদ্বাদশজ্যোতির্লিঙ্গস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

শ্রীহরিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বসুদেবের পত্নী দেবকীর আটটী পুত্রের নাম যথা—

১। কীর্ত্তিমন্ত ২। সুষেণ ৩। ভদ্রসেন ৪। উদারধী ৫। ঋজু ৬। সম্মর্দ্দন ৭। অনন্ত বা সংকর্ষণ ৮। শ্রীকৃষ্ণ দ্বাদশ স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবত, দশম অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত।

শ্রীমতী প্রফুল্লবালা দেবী,
শ্রীরাখালচন্দ্র পণ্ডা,
শ্রীগৌরগোপাল গোস্বামী

ক্যামেরার আবিষ্কারক

ফটো তুলিতে যে ক্যামেরা ব্যবহৃত হয় তাহার আবিষ্কারক 'জিয়ামবেট্টিষ্টা ডিলা পোর্টা' (Giambattista della Porta)। তিনি নেপলস্ (Naples) নগরে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীনলিনীকান্ত দত্ত

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে টমাস্ ওয়েজউড (Thomas Wedgwood) দ্বারা ক্যামেরা সর্ব্বপ্রথম ফটোগ্রাফির জন্য ব্যবহৃত হয়। ইনি কোন দেশীয় তাহা ঠিক জানা যায় না। অনুমানে মনে হয় ইনি ইংলণ্ডবাসী। ক্যামেরার প্রকৃত আবিষ্কারক কে, তাহা বোঝা যায় না। সাধারণতঃ নেপলসের অন্যতম মনীষী গিওভ্যান্নী ব্যাপটিস্টা ডেলা পোর্টা (Giovanni Baptista della Porta) ক্যামেরার আবিষ্কারক বলিয়া ইতিহাসে পাওয়া যায়। ইনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। কিন্তু ইহার বহুপূর্ব্বে, এমন কি খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও আরব্যদেশের বিখ্যাত তত্ত্ববিৎ এ্যাল হেযেন (Alhazen) এর কাব্যগ্রন্থে ক্যামেরার উল্লেখ পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ক্যামেরা জ্যোতির্ব্বিদগণের জ্যোতির্ম্মণ্ডল নিরীক্ষণ করিবার একমাত্র যন্ত্র ছিল। তখন ইহা ফটোগ্রাফি কার্য্যে ব্যবহৃত হইত না। অতএব Thomas Wedgwood কে ফটোগ্রাফি হিসাবে ক্যামেরার আবিষ্কারক বলিয়া অভিহিত করিলে হয়ত নিতান্ত অযৌক্তিক হইবে না।

শ্রীচারুশীলা গুপ্তা

John Baptista Porta (১৫৪৪-১৬১৫) তাঁহার 'Magia Naturalis' নামক পুস্তকে বলিতেছেন যে, যদি একটা অন্ধকার কক্ষের জানালার একটী ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়া আলোক প্রবেশ করিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে বহিস্থিত বস্তুগুলি ঐ কক্ষের সাদা দেওয়ালের উপর স্ব স্ব স্বাভাবিক বর্ণে প্রতিফলিত হইবে এবং ঐ ছিদ্রের সম্মুখে একটী ন্যুব্জাকার কাচ (convex lens) বসাইলে ঐ বস্তুগুলিকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারা যাইবে। এবং ইহাই তাঁহার আবিষ্কৃত 'camera obscura'র মূলতত্ত্ব (principle)। বর্ত্তমান Photographic camera ও এই camera obscuraর মূলতত্ত্ব দুইটী পরস্পর তুলনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বর্ত্তমান camera ঐ camera obscura হইতেই উদ্ভূত ও তাহারই রূপান্তর মাত্র। এই camera obscura অনুমান ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে আবিষ্কৃত হয়। Porta নেপ্‌লস (Naples) নগরের অধিবাসী ছিলেন।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অনুমান ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে Scheele, the Swedish chemist প্রথমে photography আবিষ্কার করেন। শ্রীনলিনাক্ষ হোড়

ঘড়ির আবিষ্কারক

সপ্তদশ শতাব্দীতে Huygens প্রথমে ঘড়ি আবিষ্কার করেন।

শ্রীনলিনাক্ষ হোড়

শুক্র ও মঙ্গল গ্রহ

মঙ্গল গ্রহের চেয়ে শুক্র পৃথিবীর নিকটতর হইলেও নিম্নলিখিত কারণ দুটীর জন্য জ্যোতির্ব্বিদেরা শুক্র অপেক্ষা মঙ্গলের অভ্যন্তর ভাগই বেশী দেখিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন।

১। সূর্য্য হইতে শুক্র গ্রহ ৬৭০০০০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। পৃথিবী হইতে শুক্রের দূরত্ব ২৪২৪০৭০০ মাইল। শুক্রের আহ্নিক গতি নাই কেবলমাত্র বার্ষিক গতি আছে। সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে শুক্রের ২২৫ দিন লাগে। আহ্নিক গতি নাই বলিয়াই শুক্রের কেবল মাত্র অর্দ্ধাংশ বরাবর সূর্য্যের সামনে থাকে। এই প্রকাশমান অংশ মেঘ এবং গাঢ় বায়ুমণ্ডলে আচ্ছাদিত। সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া দেখিলেও শুক্রের উপরিভাগে দুই একটা কাল দাগের বেশী আর কিছু দেখা যায় না। শুক্র সমবৃত্তাকার কক্ষপথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।

২। মঙ্গল গ্রহ ডিম্বাকার কক্ষপথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে বলিয়াই ইহার দূরত্ব সব সময়ে এক প্রকার থাকে না। কোন সময় সূর্য্য হইতে ১৫৫০০০০০০ মাইল দূরে সরিয়া যায়; আবার কখনও বা ১২৪০০০০০০ মাইল নিকটে চলিয়া আসে। যখন ১২৮০০০০০০ মাইল নিকটে আসে তখন যদি মঙ্গল এবং পৃথিবী সূর্য্যের এক পার্শ্ববর্ত্তী হয় তবে দুইয়ের মাঝের ব্যবধান থাকে ৩৬৭৫১৩০০ মাইল। সেই সময় উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা মঙ্গল গ্রহ বেশ দেখা যায়। এই ভাবে মঙ্গলের অভ্যন্তর ভাগের ফটোগ্রাফ পর্য্যন্ত লওয়া হইয়াছে। মঙ্গলের আহ্নিক গতি এবং বার্ষিক গতি দুইই আছে। মঙ্গল গ্রহের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বায়ুমণ্ডল সূক্ষ্ম এবং স্বচ্ছ থাকার জন্যই দেখার বিশেষ সুবিধা হয়।

শ্রীবীরেশ্বর বাকচি

ধূপ প্রস্তুত প্রক্রিয়া

তন্ত্রসার, গরুড় পুরাণ, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে বিভিন্ন রকম ধূপের উল্লেখ দেখা যায়। তন্মধ্যে তন্ত্রসার লিখিত ষোড়শাঙ্গ ধূপ লিখিত হইল।

গুগ্গুলং সরলং দারুপত্রং মলয়সম্ভবং। হ্রীবেরমগুরুং কুষ্ঠং গুড়ং

সর্জ্জরসং বনং। হরীতকীং নখীং লাক্ষাং জটামাংসীঞ্চ শৈলজং। যোড়শাঙ্গং বিদুর্ধূপং দৈবে পিত্রে চ কর্ম্মাণি। শ্রীকালিদাস গঙ্গোপাধ্যায়

ম্যালেরিয়ার তুক

অদ্য একখানি বহু পুরাতন "থিওসফিক্যাল" মাসিকপত্রে ম্যালেরিয়ার কম্প জ্বরের একটি প্রক্রিয়া (বা চলিত কথায় যাহাকে তুক বলে) দেখিলাম। আমাদের এই ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত বঙ্গদেশে তাহা সকলে জানিতে পারিলে অনেকের উপকারে আসিতে পারে। ইহা দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে ইউরোপে; হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশেও ঐরূপ তুক লোকে বিশ্বাস করে। যাহা হউক ইহা আমরা সহজে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি।

তুকটি এই—রোগীর যখন জ্বরের কম্প উপস্থিত হইবে তাহার হাত পায়ের সমস্ত আঙ্গুলের নখগুলি কাটিয়া রুটির ভিতর করিয়া একটি কুকুরকে খাওয়াইয়া দিলে কম্পজ্বর ভাল হয়। এবং শুক্রবারে নখ কাটিলে দাঁতের অসুখ থাকে না; তাহাও ফুট নোটে আছে। The Theosophist, Vol. II, Bombay, October, 1840, No. 1, Page 13.

শ্রীকালিদাস গঙ্গোপাধ্যায়

কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং

"কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" এই শ্লোকাংশটী ভাগবতের ১।৩।২৮ শ্লোকের এক ভগ্নাংশ। অন্ততঃ অর্দ্ধেক শ্লোক উল্লেখ না করিলে ঐ বাক্যাংশটীর তাৎপর্য্য অববোধ হওয়া অসম্ভব। তাহা এই—'এতেচাংশ কলাপুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং' এইটা সমগ্র ভাগবতের পরিভাষা সূত্র।

অবতার সকলের চরিত্র বর্ণন করুন—এই প্রশ্ন দ্বারা সৌনক কর্ত্তৃক সুত পৃষ্ট হইয়া সংক্ষেপে সুত অবতার সকলের নামাদি উল্লেখ করিলেন—১ম অবতার কৌমার, ২য় নারদ, ৩য় বরাহ ইত্যাদি কল্কি পর্য্যন্ত ২৫টী প্রাকৃত জগতের অবতার বর্ণন করিলেন। তার পর কহিলেন :—"অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরে সত্ত্বনিধের্দ্বিজা"; হে দ্বিজগণ সত্ত্বনিধি হরির অসংখ্য অবতার। অর্থাৎ সেই অনন্তের অবতারও অনন্ত; প্রধান প্রধান কয়টী বলিলাম মাত্র। এই সকল অবতার বর্ণনার মধ্যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরও বর্ণনা সামান্য ভাবে হইয়াছে দেখিয়া তাঁহাকে পৃথক করিয়া বলিবার উদ্দেশ্যেই বলিলেন :—এতেচাংশ কলাপুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" অর্থাৎ এই যে অবতার সকলের নাম উল্লেখ করিলাম, তাহারা কেহ কেহ পুরুষের অংশ, কেহ কেহ কলা। কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। এই "তু" অব্যয়টী ভিন্ন উপক্রমে দেওয়া হইয়াছে। এই পুরুষটীর সামান্য পরিচয় দিই। ইনি কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু। অসংখ্যকোটী ব্রহ্মাণ্ড অঙ্গে ধারণ করিয়া কারণার্ণবে শয়ন করিয়া আছেন। ইনিই মায়ার ঈক্ষন কর্ত্তা "স ঐক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েতি" প্রভৃতি। ইনি অপ্রাকৃত রাজ্যের আদি পুরুষাবতার ও নানাবতারের বীজ স্বরূপ হইলেও শ্রীকৃষ্ণের এককলা মাত্র। যথা:—

"আদ্যোবতার পুরুষ" ইত্যুক্তা "এতন্নানাবতার নিধান বীজনব্যয়ং।" ভাগবত।

বিষ্ণুর্মহান ইহ যস্য কলা বিশেষো; গোবিন্দ মাদি পুরুষ তমহং ভজামি। ব্রহ্ম সংহিতা "কিন্তু স্বয়ং ভগবান" অর্থাৎ কাহার অংশ, বা কলা এমন কি পুরুষাবতার সাক্ষাৎ মহাবিষ্ণুও নহেন। ব্রহ্মা শিব বিষ্ণুর মধ্যে পালয়িতা বিষ্ণু ত নহেনই—তিনি কৃষ্ণের কলার কলা।

স্বয়ং রূপ কাহাকে বলা যায়? "অনন্যাপেক্ষিযদ্রূপং স্বয়ং রূপ স উচ্যতে" লঘুভাগবতামৃত। যিনি অন্য কাহারও অপেক্ষা রাখেন না তাঁহাকে স্বয়ংরূপ বলা যায়। অর্থাৎ যাঁর রূপ গুণ মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্যাদি স্বতঃসিদ্ধ তিনিই স্বয়ংরূপ। আর ভগ অস্ত্যার্থে বতু প্রত্যয় করিয়া ভগবান। ভগ শব্দে "ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃশ্রিয়ঃ। জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চৈবষন্নাং ভগইতিঙ্গনা" অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য্য-বীর্য্যাদি যাঁর আছে, তিনি ভগবান ও ঐ সকল গুণ যাঁর স্বতঃসিদ্ধ তিনিই স্বয়ং ভগবান। এ সম্বন্ধে জ্ঞানবৃদ্ধ প্রেমিক ভক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন "যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা। স্বয়ং ভগবান শব্দের তাঁহাতেই সত্তা।"

"দীপ হৈতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন......।
তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ।"চৈ চঃ
ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ।
অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্ব্বকারণ কারণ॥ ব্রঃসং

অবতীর্ণ হইবার সময় তিনি স্বয়ং স্বেচ্ছাতেই অবতীর্ণ হন। যথা—রামাদি মূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্', নানাবতার মকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু। কৃষ্ণ স্বয়ং সমভবৎ পরমপুমান—গোবিন্দমাদিপুরুষতমহং ভজামি। ব্রহ্মসং

কৃষ্ণাবির্ভাবের পূর্ব্বে ব্রহ্মা শিবাদি দেবগণ যখন ক্ষীরোদের তীরে বিষ্ণুর নিকট ধরণীর ভার হরণের নিমিত্ত স্তব করিয়াছিলেন, বিষ্ণু তখন স্পষ্টই বলিয়াছিলেন :—

বসুদেব গৃহে সাক্ষাৎ ভগবান পুরুষঃপরঃ।
জানিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ। ভাগবত

সাক্ষাৎ ভগবান পুরুষোত্তম আবির্ভাব হইবেন বলাতে আমি বা অন্য কেহ নহে ইহা বুঝাইতে ১ম পুরুষের আত্মনোপদ দেওয়া হইয়াছে।

২। মহাভারতে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তজ্জন্যই নারদ কর্ত্তৃক ভৎসিত হইয়া ব্যাসদেব মহাভারতের পর ভাগবত প্রণয়ন করেন। তবে মহাভারতের অন্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বে গীতায় কৃষ্ণ স্বমুখে যাহা বলিয়াছেন তাহা এই—"অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ মত্তঃ সর্ব্বপ্রবর্ত্ততে"। "মত্তঃপরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়"......।......যস্মাৎক্ষর মতীতোঽহমক্ষরাদপিচোত্তম। অতোঽস্মিন লোকে বেদে চ প্রথিত পুরুষোত্তম"। গীতা। অর্জ্জুনের স্তবে পাওয়া যায়—ত্বমাদিদেবপুরুষঃ পুরানঃ—ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং" ইত্যাদি।

৩। কোন কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য স্বয়ং ভগবান বলা হয়, দেখান যাইতেছে।

(ক) কংসকারাগারে আবির্ভাব হইয়াই বসুদেব দৈবকীর

পূর্ব্বজন্মের উপাস্য বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করাইলেন। বসুদেব স্তব করিতেছেন "বিদিতোঽসিভবান্ সাক্ষাৎপ্রকৃতেঃপুরুষঃপরঃ।" ইত্যাদি—

(খ) ৭ দিনের বালকের অত্যাশ্চর্য্যরূপে পুতনাবধ। সে স্তনে তীব্র বিষ মাখিয়া কৃষ্ণকে বধ করিতে আসিয়াছিল, আর শ্রীকৃষ্ণ কি করিলেন —"প্রাণৈঃসমং রোষসমন্বিতোঽপিবৎ" ক্রোধে স্তন্যের সহ পুতনার প্রাণ পান করিলেন। তন্নিমিত্ত কোন প্রকার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিতে হয় নাই; ৭ দিনের অতি অতি সুকোমল তনু দ্বারাই কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। নরসিংহাদির মত নহে। ইহাই স্বয়ং ভগবানের স্বতঃসিদ্ধ বীর্য্য।

(গ) অতি শৈশবে মা যশোদাকে মুখ মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড প্রদর্শন।

(ঘ) শৈশব পৌগণ্ডে অত্যাশ্চর্য্যরূপে তৃণাবর্ত্তাদি ভীষণ ভীষণ অসুর অবলীলাক্রমে বধ করা। নারদ বলেন—"যে দৈত্যা দুঃশকা হন্তুং চক্রে নাপি রথাঙ্গিনা। তেত্বয়া নিহতাকৃষ্ণ নবয়াবালালীলয়া,

সার্দ্ধং মিত্রৈ হরে ক্রীড়ন ভ্রুভঙ্গকুরুষে যদি। সশঙ্কা ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা কম্পন্তে খণ্ডিতা শুদা"। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ

(ঙ) ব্রহ্মমোহনের সময় স্বীয় অঙ্গ হইতে অসংখ্য বিষ্ণুমূর্ত্তির প্রকাশ করেন। স্বাংশ বলরাম পর্য্যন্ত কৃষ্ণমায়ায় মোহিত হইয়া বলিয়াছিলেন—"প্রায়মায়াস্তুমে ভর্ত্তু নান্যামেঽপি বিমোহিনী" ভাগবত। অর্থাৎ এ মায়া নিশ্চয় আমার ভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের মায়া নচেৎ দৈবি-আসুরি প্রভৃতি মায়া, আমাকে মুগ্ধ করিতে পারিত না।

(চ) রাসের সময় ও দ্বারকায় রাজকন্যাদের পাণিগ্রহণের সময় অসংখ্য প্রকাশ-মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছিলেন; যথা

"রাসোৎসব সং প্রবৃত্ত গোপীমণ্ডল মণ্ডিত।
যোগেশ্বরেন কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যেদ্বয়োর্দ্বয়ো" ভাগবত॥
"আসাং মুহূর্ত্ত একস্মিন্নানাগারেষু যোষিতাং।
সবিধ ক্বগৃহে পাণি মনুরূপং স্বমায়য়া" ভাগবত॥

ইত্যাদি বহু বহু বিশেষ বিশেষ কার্য্য দেখান যাইতে পারে। বাহুল্য বোধে পরিত্যক্ত হইল। ঐ সকল কার্য্য কবি বর্ণন বলিয়া উপেক্ষনীয় নহে; যেহেতু ভগবানের অবতার ঈশ্বরস্বরূপ ব্যাসদেব কর্ত্তৃক বর্ণিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন, "ভ্রমপ্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করনা পাটব। ঈশ্বরের বাক্যে নাই দোষ এই সব"। চৈ চঃ। তাহা ছাড়া নারদ কর্ত্তৃক প্রবুদ্ধ হইয়া সাধন সিদ্ধবস্তু, শ্রুতির ঋক্, বেদান্তের অর্থ;—গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ ভাগবত বর্ণন করেন। ইহাই ভাগবতের বিশেষত্ব। গরুড় পুরাণ বলেন—অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রানাং ভারতার্থ বিনির্ণয়। গায়ত্রী ভাষ্য রূপোঽসৌ বেদার্থ পরিবৃংহতি। ইত্যাদি—

৪। ভগবানের যে কেবল ১০টী অবতার নহে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। গীতগোবিন্দ কাব্যে জয়দেব ঠাকুর যে ১০টী অবতারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্যে এই যে, মৎসাদি অবতার সকল একটী একটী রসের অধিষ্ঠাতা; কিন্তু কৃষ্ণ সর্ব্বরসাধিষ্ঠাতা অখিল নায়ক সকলের শিরোরত্নস্বরূপ। যথা "অখিল রসামৃত" ও "নায়কানাং শিরোরত্ন কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" ইতি ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। নচেৎ মৎস্য আদি অবতার নহেন তাহাও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। কিম্বা জয়দেব অবতারদের মধ্যে ইঁহারা প্রধান বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন, কারণ প্রত্যেক অবতারের পৃথক পৃথক বন্দনা একরূপ অসম্ভব। কৃষ্ণ যে সর্ব্বরসাধিষ্ঠাতা তাহা "চন্দনচর্চ্চিত" ও "সঞ্চরদধরসুধা" গীতেতেই অনুভব হয়।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দেওঘরিয়া

শিবের পঞ্চম মুখ

পূজার সুবিধা হবে বলে নিরাকারে আকার কল্পনা করা হয়। যিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন, যাঁর আকারে জগতের আকার, যিনি সর্ব্বময়, তাঁর আকারের কল্পনা কর্ত্তে আমরা—পৃথিবীতে যতদূর দেখতে পাওয়া যায় ততদূর জ্ঞান নিয়ে—কল্পনা কর্ত্তে বসি; আর আকাশ হতে পৃথিবী পর্য্যন্ত প্রসার বাড়িয়ে বিরাট পুরুষের কল্পনা করি।

ভূতভাবন ভগবানের বিরাট মূর্ত্তির কল্পনায় পঞ্চভূতের বিকাশ। পঞ্চভূতের বিকাশ কর্ত্তে শিবের পাঁচ মুখ;—আর এই পাঁচমুখেই তিনি অনিত্য বিশ্বজ্ঞান থেকে নিত্য ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিচ্ছেন। এই পাঁচটী মুখের নাম,—সদ্যোজাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ ও ঈশান।

সদ্যোজাত—অর্থাৎ, নিরাকার ব্রহ্মের প্রকৃতি আশ্রয়ে যে ভাবের বিকাশ—অশরীরীর প্রথম বিকাশ—তাহাই আকাশ-বদন।

বামদেব—মানে, প্রতিকূলক্রীড়;—প্রকৃতির কল্পনায় বিকারশূন্য—জীবরক্ষায় ও জীবনাশে শক্তি বিকাশপর বায়ুবদন।

অঘোর—অর্থাৎ, যা হতে ঘোর আর কিছুই নেই সেই মহা-তেজোময় অথচ যাতে ঘোরতার লেশমাত্র নেই, যে মহত্তেজ আনন্দময় তাই হচ্ছে তৈজসবদন।

তৎপুরুষ—তৎ অর্থে ব্যাপক, ব্যাপক পুরুষ বিশ্বব্যাপী জলময়—জীবন-বদন।

ঈশান—অর্থাৎ, ঐশ্বর্য্য বিকাশপর ভৌম-বদন।

এই গেল 'পঞ্চবক্ত্র'। এখন ত্রিনেত্রের কথা। প্রকৃতির কোলে শুয়ে যতদূর দেখা যায় তার ভেতর বিরাট পুরুষের কল্পনা কর্ত্তে গেলে চন্দ্র, সূর্য্য আর অগ্নি এই তিনটী চোখের কল্পনাই কর্ত্তে হয়; নীল আকাশকে ভাবতে হয় তাঁর নিবিড় কেশরাশি আর আকাশের তারাগুলি সব হচ্ছে তাঁর মাথায় মণিবিন্যাস। সাপের মত আঁকা বাঁকা বিদ্যুৎ রেখাই তাঁর হাতের ভুজঙ্গবলয় আর পৃথ্বীব্যাপী দৃশ্যমান চক্রবাল হচ্ছে তাঁর কটিদেশের মেখলা।

এই হচ্ছে শিবমূর্ত্তি যা আমাদের সাধনবিধানের অবলম্বন তত্ত্ব।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস

সবুজ আলু

জীবদেহের ন্যায় উদ্ভিদদেহেরও প্রত্যেক অংশে (ফল, ফুল, মূল, কাণ্ড, পত্র প্রভৃতিতে) অসংখ্য পরিমাণে অতি ক্ষুদ্র (যাহা চর্ম্মচক্ষের দৃষ্টির অতীত) গহ্বর (cells) নানাবিধ তন্তু (tissue) দ্বারা সংলগ্ন আছে। এই সকল cell অনুবীক্ষণ যন্ত্রের অতি প্রচণ্ড সহন-ক্ষমতার (high magnifying power) দ্বারা অতি সুন্দর ভাবে দেখা যায়।

প্রতি জীবিত cell এ নানাবিধ রসসিক্ত বস্তু আছে, বৈজ্ঞানিক ভাষায় ইহাদিগকে cell-contents বলে। ইহাদের মধ্যে protoplasm এবং nucleus অন্যতম এবং এই বস্তুদ্বয়ই cell এর জীবনের লক্ষণ। এই protoplasmএর মধ্যে আবার তিন রকম বর্ণের বস্তু (colouring matters) আছে; ইংরাজিতে ইহাদিগকে pigment matters বলে; যথা—chloroplastids, chromoplastids এবং leucoplastids। ইহাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক গুণ (function) আছে। উদ্ভিদের যে অংশে (সচরাচর পত্রে এবং কাণ্ডে যাহা মৃত্তিকার উপরে অবস্থান করে) chloroplastids থাকে; সেই অংশ সবুজ হয় এবং এই chloroplastidsই উদ্ভিদের একমাত্র জীবনধারণ এবং খাদ্য প্রস্তুত ও হজম করিবার উপায়। এই বস্তুটী না থাকিলে উদ্ভিদ রাজ্য (plant kingdon) এ পৃথিবীতে থাকিতে পারিত না। তার পর chromoplastids ফল এবং ফুলে সংশ্লিষ্ট থাকে, এই জন্য ফল এবং ফুলে আমরা নানারকম বিচিত্র রং দেখিতে পাই। আর Leucoplastids এর আসল এবং একমাত্র গুণ হল জিনিসকে সাদা করা, ইহা যে অংশে থাকে উদ্ভিদের সেই অংশ সাদা হইয়া যায়। সচরাচর ইহা মাটীর ভিতরে অবস্থিত উদ্ভিদের অংশে (underground stemএ) দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্ভিদের এই সব অংশ বায়ুমণ্ডল এবং রৌদ্রের সংস্পর্শে সবুজ বর্ণ ধারণ করে এবং তাহাদের Leucoplastids উপরিউক্ত chloroplastidsএ পরিণত হয়। গোল আলুকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় (in botanic terms) underground stems কিম্বা tuber বলে। ইহারা মূলের মত দেখাইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহারা মূল নহে। এই গোল আলু মাটীর মধ্যে থাকে; সুতরাং ইহার cell-contentsএর নানাবিধ জিনিসের (যথা starch ইত্যাদি) সহিত Leucoplastids সংশ্লিষ্ট থাকে। ক্ষেত্রে মৃত্তিকা হইতে আলু বাহির করিবার সময় বায়ুমণ্ডল এবং রৌদ্রের সংস্পর্শে আলুর leucoplastids chloroplastidsএ পরিণত হয়, সুতরাং অধিকাংশ আলু নীলবর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু এই নীলবর্ণ আলু রন্ধনের পর খাইবার সময় কোন অসুবিধা জন্মায় না এবং অনায়াসে সাধারণ আলুর মত ভক্ষণ করা যায়।

আবার ক্ষেত্র কর্ষণ কালে অধিকাংশ আলুকে মাটী হইতে বাহির করিবার সময়েই ঐরূপ নীলবর্ণ দেখায়, কিন্তু এই নীলবর্ণ উপরিউক্ত কারণের জন্য ঘটে না। বায়ুমণ্ডলের মধ্যে কীটের মত এক জাতীয় উদ্ভিদ অনবরত দ্রুতবেগে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, চর্ম্মচক্ষে ইহাদিগকে ত দেখা যায় নাই, এমন কি অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ভাল করিয়া দেখা যায় কি না সন্দেহ। ইহাদের জন্যই মিষ্ট জিনিষ টক হয়, খেজুর রস বিস্বাদ হয়, রুটি প্রভৃতিতে ছাতা জন্মে। এই জাতীয় উদ্ভিদকে fungi বলে। ইহাদের মধ্যে এক জাতীয় fungus আলুকে যথেষ্ট পরিমাণে আক্রমণ করে বলিয়াই এই শ্রেণীর fungus কে potato fungus কিম্বা phytopthora infestans বলে। ইহার আক্রমণের ফলে আলু সবুজ বর্ণ কিম্বা কখনও কখনও লালবর্ণ হইয়া যায়; ফলে আলু শক্ত এবং কড়া হইয়া যায় এবং রন্ধনকালে ভাল সিদ্ধ না হইয়া অর্দ্ধ সিদ্ধ হয়। ভক্ষণ কালে এই আলু বিস্বাদ এবং তিক্ত বোধ হয়, এমন কি সময়ে সময়ে বমি হইবারও সম্ভাবনা থাকে। লাল আলুতে এইরূপ উপসর্গ বেশী পরিমাণে বিরাজ করে।

শোক-সংবাদ
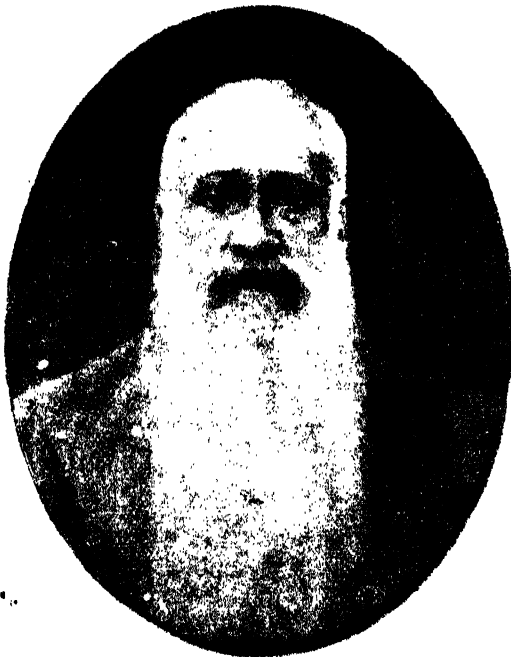
৺যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ

৺যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ

আলিগড় কলেজের গণিত-শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক বাংলা ও ইংরেজী পাটীগণিত-প্রণেতা বিখ্যাত যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিগত অগ্রহায়ণ মাসে পরলোক গমন করিয়াছেন। যাদব চক্রবর্ত্তীর পাটীগণিতের সাহায্যে অঙ্ক শিক্ষা করেন নাই, এরকম লোক বাংলা দেশের নব শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে নাই বলিলেই চলে। বাল্যকালে পিতৃহীন হইয়া কঠোর দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে তিনি অধ্যবসায় সহকারে প্রতি পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া সম্মানের সহিত এম-এ পাশ করেন; এবং অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী হন। চিরজীবন তিনি এই অধ্যাপনা কার্য্যেই কাটাইয়া গিয়াছেন। বাঙ্গলার শিক্ষা বিভাগে তিনি যাহা দান করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালী ছাত্রেরা সেজন্য চিরকাল তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।

সাময়িকী

"ভারতবর্ষে'র পাঠক-পাঠিকাগণ অভয় প্রদান করুন,— আমরা এবার আমাদের দেশের আগামী বর্ষের আয়-ব্যয়ের অর্থাৎ সরকারী বজেটের আলোচনা করিব। দুইটী বজেটের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ;—একটী ভারতীয় বজেট, আর একটী বাঙ্গালা দেশের বজেট,—এক বজেট দিল্লীর রাষ্ট্র-সভায় পেশ হইয়াছে, অপরটী আমাদের এই কলিকাতার মালসী মজলিসে।

দুই মজলিসেই এবার বজেটের অবস্থা ভাল; কারণ ঘাটতি নাই, বাড়তিই হইয়াছে; ভারতীয় বজেটে প্রায় সাড়ে তিন কোটী টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে; বাঙ্গালার বজেটেও কোটী টাকার উপর বাড়তি হইয়াছে। বিগত কয়েক বৎসর ঘোর টানাটানির পর এবার একেবারে স্বচ্ছল হইবার কারণ এই যে, ইঞ্চকেপ কুঠারের আঘাতে অনেক ব্যয় সংক্ষেপ হইয়াছে, এবং দুইটী দফায় আয় বিশেষ বাড়িয়াছে। সে দুইটী দফার নাম করিলেই পাঠক পাঠিকাগণ আমাদের দেশের অবস্থা বুঝিতে পারিবেন; তাহার একটী হইতেছে ষ্ট্যাম্প আর একটী হইতেছে আবকারী; অর্থাৎ উচ্ছন্ন যাইবার যে দুইটী প্রধান রাজপথ, আমাদের দেশের লোকে সেই রাজপথে দ্রুত অগ্রসর হইয়া রাজকোষের অর্থাভাব দূর করিতেছে। ভারতীয় রাজস্ব-সচিব সার বাসিল ব্লাকেট ও বাঙ্গলার রাজস্বসচিব শ্রীযুক্ত ডোনাল্ড মহোদয় খুব বাহাদুর বটে।

এই বাড়তি বজেট বা স্বচ্ছল অবস্থা উপলক্ষে আমাদের একটা গল্প মনে পড়িল। একজন আধুনিক ভাবাপন্ন সরকারী চাকুরীজীবী মাসিক ছয়শত টাকা বেতন পান; সংসার বড় নহে, একটী ছেলে, একটী মেয়ে, আর স্ত্রী; বেতন যাহা পান বাড়ীতে আসিয়া স্ত্রীর হাতে দেন এবং স্বামী স্ত্রীতে খরচ করেন। ছয়শত টাকাতেই এই ক্ষুদ্র পরিবারের চলে না, প্রতি মাসেই ধার হয়। এ ভাবে সংসার চালান অকর্ত্তব্য মনে হওয়ায় বাবু একদিন তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন "দেখ, এ রকম এলোমেলো খরচ করে আর চলিবে না; আমি একটা বজেট করিতেছি; সেই বজেট অনুসারে খরচ হইবে।" স্ত্রী তাহাতেই সম্মত হইলেন। পরবর্ত্তী রবিবারের সমস্ত প্রাতঃকালটা স্বামী মহাশয় বজেট প্রস্তুত করিলেন এবং মধ্যাহ্নে তাহা তাঁহার স্ত্রীর হুজুরে পেশ করিয়া বলিলেন "এই দেখ ত, আমি সমস্ত খরচ হিসাবভুক্ত করিয়া দিয়াও মাসে মাসে চল্লিশ টাকা উদ্বৃত্ত দেখাইয়াছি; প্রতি মাসে সেবিংস্ ব্যাঙ্কে চল্লিশ টাকা জমা দেওয়া যাইতে পারিবে।" তাঁহার স্ত্রী বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে বজেটখানি দেখিয়া বলিলেন "অতি সুন্দর বজেট হইয়াছে। দশজন চাকর, দুইজন আয়া, সহিস, কোচম্যান, গাড়ী-ঘোড়া, দরজী, কাপড়-চোপড় সমস্ত ব্যয়ই ধরা হইয়াছে; কিছুই বাদ যায় নাই। সমস্ত বাদেও মাসে চল্লিশ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। তবে, যাহা দেখিলাম, তাহাতে অতি তুচ্ছ অতি সামান্য একটা খরচ ধরা হয় নাই। সেটা আর কিছু নয়, এই এতগুলি লোকের আহারের ব্যয়; সেই সামান্য ব্যয়টাই ধরা হয় নাই।" এই বলিয়া বাবু গৃহিণী হাসিতে হাসিতে কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন। এই সকল বজেট দেখিয়া ঐ গল্পটাই আমাদের মনে পড়ে, আমাদেরও সেই বাবু গৃহিণীর মত বলিতে ইচ্ছা করে, "হাঁ, বজেট ঠিক হইয়াছে; সব কর্ম্মচারী ঠিক আছে, গাড়ীঘোড়া লোকলস্কর, আসবাবপত্র সমস্ত ঠিক হইয়াছে, কোন বিষয়ে কোনরূপ ব্যয়ের ক্রটী হয় নাই,—যা সামান্য একটু ক্রটী হইয়াছে, তাহা এই বাঁচিয়া থাকিবার ব্যয় সম্বন্ধে।" আমাদের বজেট সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছু বলিবার প্রয়োজন বোধ হইতেছে না।

এই বজেট লইয়া বাঙ্গালার মালসী মজলিসে যে প্রকার বাদানুবাদ চলিয়াছে, তাহাতে মনে হইতেছে, স্বরাজীবাদী দল এই বজেটখানিকে না-মঞ্জুর করিয়া দিবেন। কিন্তু তাহার পর? সরকার বলিবেন, তোমাদের কথা শুনিব না, এই বজেটই চলিবে; সার্টিফিকেটের ক্ষমতা ত গবর্ণর বাহাদুরের হাতে আছে। তখন কি হইবে? স্বদেশী দল বলিতেছেন, সে যাহা হয় পরে দেখা যাইবে। আমরাও পরে কি হয় দেখিবার জন্য বসিয়া রহিলাম।

বড় মজ্‌লিসের বড় বজেট সম্বন্ধে একটা খবর না দিলে নিমকহারামী করা হইবে; তাই সে সংবাদটী সকলের গোচর করিতেছি। পাঠক-পাঠিকাগণ ভুলিয়া যান নাই যে, বিগত বৎসরে বড় মজলিসের অধিকাংশ সদস্যের মতের বিরুদ্ধে, সুধু সার্টিফিকেট বিধানের বলে, বড়লাট বাহাদুর লবণের দর মণকরা একটাকা বাড়াইয়া দিয়াছিলেন; এবার মেহেরবাণী করিয়া সেই এক টাকার আট আনা কমাইয়া দিয়াছেন, অর্থাৎ পূর্ব্বে ছিল দেড় টাকা মণ, বিগত বৎসরে হইয়াছিল আড়াই টাকা, এবার হইল দুই টাকা। ইহার জন্য বড় মজলিশের রাজস্ব-সচিব সার বাসিল ব্ল্যাকেট মহোদয়কে আমরা বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

সেদিন চৌরঙ্গীতে গোপীনাথ সাহা নামক একটী যুবক অতি অসমসাহসিক কাণ্ড করিয়াছিল, রিভলভার চালাইয়া মিঃ আর্নেষ্ট ডে নামক একজন ইয়োরোপীয়কে

মিঃ আর্নেষ্ট ডে

হত্যা করিয়াছিল। হত্যাকাণ্ডের অল্পক্ষণ পরে কিছু দৌড়াদৌড়ি করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। যথা সময়ে হাইকোর্টের সেসনে তাহার বিচার হয় এবং বিচারফলে তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। প্রেসিডেন্সী জেলের ভিতর তাহার ফাঁসীও যথা সময়ে হইয়া গিয়াছে। এদেশে নরহত্যা অনেক হইয়াছে, ফাঁসীও বিস্তর হইয়াছে; কিন্তু এমন অসাধারণ হত্যাকাণ্ড কেহ কখনও দেখে নাই, হত্যাকাণ্ডের মামলার এরূপ আসামীও কখনও দেখা যায় নাই। ফাঁসির সময় পর্য্যন্ত গোপীনাথের মনে কোন ভয় উদ্বেগ বা অনুশোচনার ভাব দেখা যায় নাই। এমন কি, শুনা যায়, যে কয় দিন তাহাকে জেলে থাকিতে হইয়াছিল, সেই কয় দিনের মধ্যে সে না কি পাঁচ পাউণ্ড ওজনে বাড়িয়াছিল। ধরা পড়িবার পর গোপীনাথ না কি

গোপীনাথ সাহা

বলিয়াছিল যে, সে কলকাতার পুলিশ কমিশনার মিঃ টেগার্টকে খুন করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল; এবং মিঃ টেগার্টের সহিত মিঃ আর্নেষ্ট ডে'র আকারগত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখিয়া সে মিঃ ডেকে মিঃ টেগার্ট মনে করিয়া খুন করিয়াছিল। এবং এই ভ্রান্তির জন্য সে দুঃখিত। গোপীনাথের পক্ষ সমর্থন করিবার কালে তাহার ব্যারিষ্টার বলিয়াছিলেন, গোপীনাথ বিকৃত-মস্তিষ্ক; তাহার বংশের অনেকেরই মস্তিষ্ক বিকৃত, এবং এই রোগ তাহাদের বংশগত। গোপীনাথ তাহার কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিল, তাহাতে কাহারও বলিবার কিছুই নাই। তবে

অভিনয় করেছিলে কি না। কিন্তু কাল সন্ধ্যায় যখন নিজের কাণে শুনলাম যে, তুমি ইন্দুকে প্রণয় নিবেদন ক'রে জানাচ্ছ যে,—আজ পর্য্যন্ত কাউকে সত্য ভালবাসতে রয়েছে ই ;—সেই তোমার মানসী প্রতিমা!—তখনই তোমারবে ভুল ভেঙ্গে গেছে। আচ্ছা, মিথ্যা মোহ এবং পুরীতে নেশার জন্য একটা—নারীজন্ম মাটি ক'রে দেবার র'য়েছে আজন হ'য়েছিল, পতিদেবতা,—যদি সত্য "তে না পেরেছিলে? যাক্, আর বেশী দেরী কি দ'ক শীঘ্র শেষ করে নিই; কারণ, তোমার মুখখানা "সেসতাই মরতে ইচ্ছে ক'রে না। আমি চল্লাম। তুমি তা' কি মানসী প্রতিমা নিয়ে সুখে থাক। এ অপমানিত, এম অভিশপ্ত জীবন নিয়ে বেঁচে থাকা অসহ্য বলেই, বিনয়োজ আমি নিজের হাতে শেষ করে দিলাম। তাকাল?—তা ত' জানি না। আচ্ছা, বিদায়।"

সেই সময় পাশের বাড়ী হইতে ইন্দুর গলা ভাসিয়া আসিল,

"আমার মিলন লাগি, তুমি আস্‌বে কবে থেকে।"

ওঃ! এটা বুঝি বিনয়ের উদ্দেশেই গাওয়া হ'চ্ছে! ঘৃণায় অচলার মুখখানা সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। "O the flirt coquette" বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। আফিংটার দিকে একবার চাহিল। বুকের অগ্নি-বারিধিতে লহরী-লীলার তাণ্ডব-নৃত্য সুরু হইল। তার পর ঘরের চারি ধারে একবার চাহিল। ওই বারান্দায় বিনয়ের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে কত বিনিদ্র রজনী কাটাইয়া দিয়াছে; কত সুখের স্বপন দেখিয়াছে! এই বাড়ী এক দিন নূতন অতিথিদের কচি কচি সুন্দর মুখে ও তাদের হাসিতে ভরিয়া থাকিবে, তখন সে কি ক রবে, কিরূপ প্রণালীতে তাহা-দিগকে 'মানুষ' করিয়া তুলিবে—ভবিষ্যতের এই সব কথা ভাবিয়া কত স্বপ্নের জাল বুনিয়াছিল; কিন্তু দু'টো বছরও কাটিল না; সে জাল টুক্‌রো টুক্‌রো হইয়া নির্ম্মম ভাবে ছিঁড়িয়া গেল; আকাশ-কুসুম আকাশেই ঝরিয়া গেল! তা'র এই মাত্র একুশ বছর বয়সেই সবই ফুরাইয়া গেল, সব শেষ হইয়া গেল। অচলা বিছানার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িয়া, বালিশে মুখ গুঁজিল। খোলা জানালা দিয়া বৃষ্টির সুতীক্ষ্ণ ছাঁট আসিয়া বিঁধিতে লাগিল।

ঠিক এমনি সময়ে ঘরে প্রবেশ করিল বিনয়। বিছানার কাছে আসিয়াই টেবিলের উপর প্রথমে আফিংটার উপর পরে চিঠি দুটোর উপর তাহার নজর পড়িল। সে স্তব্ধ ভাবে স্বপ্নাচ্ছন্নের মত তেমনি ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল। না পারিল এক পা চলিয়া গিয়া অচলাকে তুলিতে, না পারিল তাহাকে ডাকিতে। কিছুক্ষণ পরে চীৎকার করিয়া ডাকিল "অচলা।"

অচলা চমকিয়া উঠিয়া বসিল। বিনয় পাশে বসিয়া তাহার একটা হাত নিজের হাতে লইবার চেষ্টা করিল; অচলা চীৎকার করিয়া উঠিল, "খবরদার, অপবিত্র!" বিনয় ম্লান হাসি হাসিয়া বাধা দিয়া বলিল, "আমি বুঝেছি কি হ'য়েছে। সমস্ত বল্‌ছি, শুন; কিন্তু তার মধ্যে ভীষণ কিছু করবার চেষ্টা কোরো না।"

তার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,"চিঠিটা পড়ে বুঝলাম, কি হ'য়েছে। কিন্তু ভুল আমারই হ'য়েছে, অচলা, তোমাকে সব কথা না জানানো। আমরা থিয়েটার করব ঠিক্ ক'রে একটা এ্যামেচার পার্টি খুলেছি। এই আগামী জন্মাষ্টমীর দিনে 'শুভদৃষ্টি' নাটকটি 'প্লে' করব; আর তা'তে আমি দেবকিশোরের 'পার্ট' নিয়েছি। সুরেশের বসবার ঘরে আমাদের প্রতি সন্ধ্যায় 'রিহাসে'ল' চলে, তাই প্রতি রাত্রে আমার ফিরতে দেরী হয়। আমি সেই দিনই কথাটা তোমাকে বলতাম, কিন্তু তোমার ঠাট্টার ভয়ে, কথাটা গুছিয়ে বলবলব করেও আজ পর্য্যন্ত বলা হয় নি। সুরেশের বাড়ীতে প্রতি দিন অত রাত্রি পর্য্যন্ত থাকবার আর অন্য কোন কারণ নেই, শুধু 'রিহার্সে'ল' ছাড়া;—ইন্দুকে আমি ছোট বোনের মত দেখি।"

তারপর, পকেট হইতে 'শুভদৃষ্টি' নাটকখানা ও তাহার নিজের 'পার্ট' লেখা কতকগুলো কাগজ বাহির করিয়া বলিল, "এই নাটকের নায়ক দেবকিশোর, নায়িকা ইন্দুর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। এক জায়গায় দেবকিশোর ইন্দুকে বলিতেছে, 'ইন্দু, আমি আজ পর্য্যন্ত কাহাকেও সত্য ভালবাসি নাই, এতদিন আমি আমার মানসী প্রতিমা খুঁজিতেছিলাম, আজ তার দেখা পেয়েছি;—সে তুমি, ইন্দু।' বলেছি ত' আমি আছি দেবকিশোরের ভূমিকায়, এবং মৃণাল, সেই ছোকরাটির আছে নাটকের নায়িকা ইন্দুর ভূমিকা। কাল সন্ধ্যেতে যখন আমি 'রিহার্সে'ল'

দিচ্ছিলাম, তখন বোধ হয় ওই কথাগুলো তোমার কাণে যায়! তাই নয় কি?"

এই বলিয়া বিনয় নাটকের সেই স্থানটা বাহির করিয়া অচলার চোখের সামনে ধরিল। অচলা অপলক দৃষ্টিতে দেখিল, তাই বটে। দু'হাত দিয়ে অচলা বুকটা চাপিয়া ধরিল। আঃ, তা হ'লে সব ভুল; সব মিথ্যা! আমার স্বামী আমারই আছে! কি পরম শান্তি! কি গভীর তৃপ্তি! তার পর নিজের সাংঘাতিক ভুল ভাবিয়া গভীর লজ্জায় সে বিনয়ের কোলে মুখ গুঁজিল।

"অচলা, ওঠ!"

"কি নীচ মন আমার! তোমাকে আমি ভুল ভেবেছিলাম। তোমাকে আমি নীচ সন্দেহ করেছিলাম! আমাকে কি ক্ষমা করতে পারবে? তোমার কাছে মুখ তুলতেও যে আজ আমার লজ্জা হ'চ্ছে।"

"ভুল তোমারও যেমন হয়েছে, আমারও তেমনি হয়েছিল,—চক্ষুলজ্জার জন্য তোমার কাছে সব কথা গোপন ক'রে রাখা।" তার পর আফিংটার দিকে চাহিয়াই তার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। "আর একটু আমার আসতে দেরী হ'লে, কি হ'ত বল দেখি? অতটা rash—। আচ্ছা, ওঠ, খাবে চল, অসুখের নাম ক'রে কাল সন্ধ্যে হ'তে ত' কিছুই খাওনি।" "না, উঠো না, বস।"

বাহিরে তখন ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর 'কাতরানি,' গুমরানি সমস্ত থামিয়া গিয়াছে। আকাশের কান্না থেমেছে। মেঘের লেশ নাই। স্বচ্ছ নীলাকাশের গা বাহিয়া পূর্ণিমার চাঁদ পৃথিবীকে রহস্যময়, স্বপ্নভরা জ্যোৎস্নায় আচ্ছন্ন করিয়া অনেক দূর উঠিয়া গিয়াছে। পৃথিবী শান্ত, ধীর, নিস্তব্ধ। শুধু গাছের পাতা হইতে এক একটি বারিবিন্দু জ্যোৎস্নার আলোয় হাজার বর্ণ-ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করিতে করিতে, অচলার বুকের স্পন্দনের প্রতিধ্বনি করিতে করিতে পৃথিবীর উপর ঝরিয়া পড়িতেছিল,—'টিপ' 'টিপ' 'টিপ'।

খোলা জানালা দিয়া জ্যোৎস্না আসিয়া বিছানার উপর ঝরিতে লাগিল। আর তারই উপর অচলা ও বিনয় পরস্পরকে নিবিড় আলিঙ্গনে বাঁধিয়া পরস্পরের বুকের স্পন্দন অনুভব করিতে লাগিল। কাছের একটা বাড়ী হইতে পিয়ানোর সুরের সহিত ভাসিয়া আসিল, "The moon shines bright in such a night." * * *

থিয়েটারের দিন বিনয় দেবকিশোরের ভূমিকায় নামিয়া নায়িকা ইন্দুর সহিত প্রেমের অভিনয় করিতে করিতে যখন বলিল, "তুমিই আমার মনিসী প্রতিমা, ইন্দু, তখন তাহার সেই সন্ধ্যার কথা মনে পড়িয়া গেল। ইহারই জন্য অচলা আত্মহত্যা করিতে বসিয়াছিল। উঃ, আর একটু বিলম্ব হইলে, সে কি জিনিসই না হারাইত? মুখখানার তাহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইল, বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল, চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িল; সে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া গেল। এমনিভাবে সে কতক্ষণ ছিল, তাহার সে জ্ঞান ছিল না। জ্ঞান হইল তখন যখন সহস্র দর্শক বৃন্দের হাততালি ও Pathetic রবে রঙ্গালয় মুখরিত করিয়া তুলিল। দর্শকবৃন্দ কিছুই বুঝিল না, শুধু ভাবিল, কি সুন্দর অভিনয়! কি করুণ! একজন শুধু চিকের আড়ালে বসিয়া একবার হাসিল, একবার কাঁদিল, আর একবার শিহরিয়া উঠিয়া ভাল হইয়া বসিল—সে অচলা।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত শৈলজা মুখোপাধ্যায় প্রণীত "ঝড়ো হাওয়া" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল; মূল্য ২৲ টাকা।

আট আনা গ্রন্থমালার ১৭ সংখ্যক গ্রন্থ শ্রীমতী সরসীবালা বসু প্রণীত "প্রেমের ফাঁদ" প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "গীতমালা" প্রকাশিত হইল। মূল্য ২।০ টাকা।

শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ প্রণীত কথা উপন্যাস "ভুল" প্রকাশিত হইল: মূল্য ১৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন সম্পাদিত "ভাগবত পুরাণ" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ৷৷০ আনা।

৺ব্যোমকেশ মুস্তফী প্রণীত "রোগশয্যার প্রলাপ" প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ১৲ টাকা।

৺উমেশচন্দ্র রৌপ্যপদক:—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, মীরাট শাখা হইতে ৺পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের জীবনী ও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য হইতে ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয় সম্বন্ধে এবং বর্ত্তমান যুগের বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার স্থান বিষয়ক শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লেখককে একটি রৌপ্য-পদক প্রদান করা হইবে। সাধারণের প্রতিযোগিতা একান্ত প্রার্থনীয়। প্রবন্ধ ১লা বৈশাখের (১৩৩১) মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

শ্রীযুক্ত রাজকিশোর রায়
৩২, ওয়েষ্ট ষ্ট্রীট, মীরাট ক্যাণ্ট।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA

Printer—Narendranath Kunar,
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street. CALCUTTA